# উদ্বোধন

"উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্ নিবোধত"

াধন কার্যালয় কলকাতা মাঘ ১৩৯৯ ৯৫তম বর্ষ ১ম সং
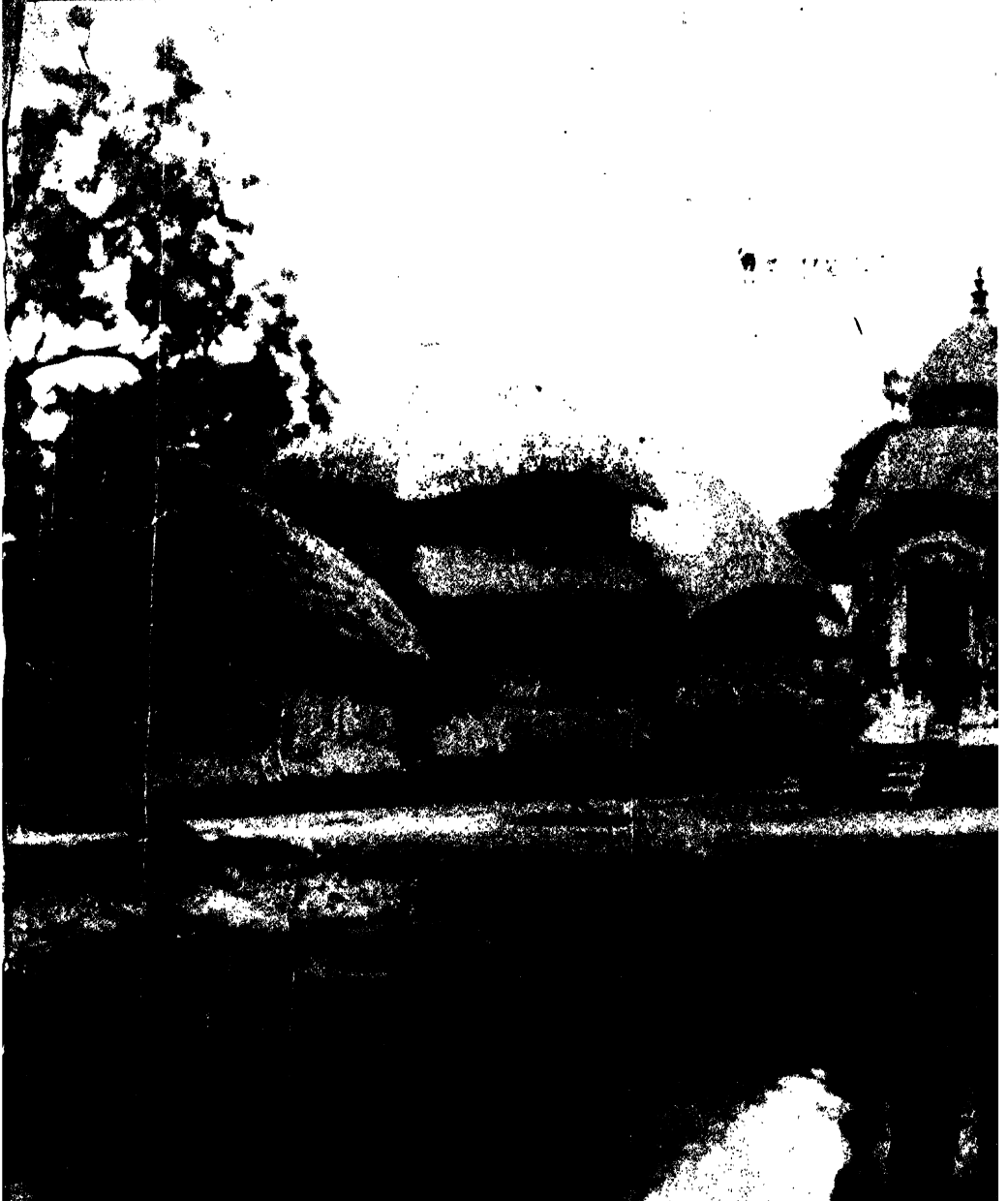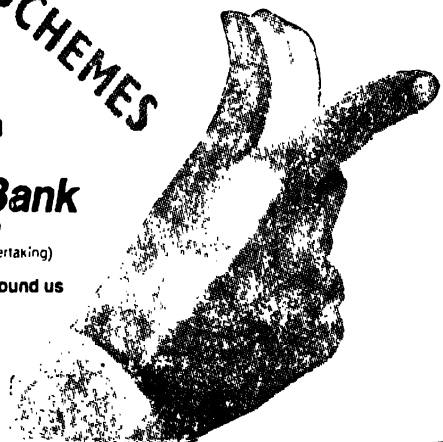
* Provides automatic renewal in cycles of 10 years and Subject to RBI directives

# উদ্বোধন

স্বামী বিবেকানন্দ প্রবর্তিত, রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের একমাত্র
বাঙলা মুখপত্র, চুরানব্বই বছর ধরে নিরবচ্ছিন্নভাবে প্রকাশিত
দেশীয় ভাষায় ভারতের প্রাচীনতম সাময়িকপত্র


## সূচীপত্র ৯৫তম বর্ষ মাঘ ১৩৯৯ (জানুয়ারি ১৯৯৩) ১ম সংখ্যা






সম্পাদক
**স্বামী সত্যব্রতানন্দ**

যুগ্ম সম্পাদক
**স্বামী পূর্ণাত্মানন্দ**

৮০/৬, গ্রে স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০০০৬-স্থিত বসুশ্রী প্রেস থেকে বেলুড় শ্রীরামকৃষ্ণ মঠের ট্রাস্টীগণের পক্ষে স্বামী সত্যব্রতানন্দ কর্তৃক মুদ্রিত ও ১ উদ্বোধন লেন, কলকাতা-৭০০ ০০৩ থেকে প্রকাশিত।

প্রচ্ছদ মুদ্রণ : স্বপ্না প্রিন্টিং ওয়ার্কস (প্রাঃ) লিমিটেড, কলকাতা-৭০০ ০০৯

আজীবন গ্রাহকমূল্য (৩০ বছর পর নবীকরণ-সাপেক্ষ) ☐ এক হাজার টাকা (কিস্তিতেও প্রদেয়—প্রথম কিস্তি একশো টাকা) ☐ সাধারণ গ্রাহকমূল্য ☐ পৌষ থেকে মাঘ সংখ্যা ☐ ব্যক্তিগতভাবে সংগ্রহ ☐ ছেচল্লিশ টাকা ☐ সডাক ☐ চুয়ান্ন টাকা ☐ বর্তমান সংখ্যার মূল্য ☐ ছয় টাকা

# কার্যালয় ভিন্ন 'উদ্বোধন'-এর গ্রাহকভুক্তি-কেন্দ্র

**আসাম** ☐ রামকৃষ্ণ মিশন সেবাশ্রম, শিলচর ;
রামকৃষ্ণ সেবাশ্রম, বঙ্গাই গাঁও

**বিহার** ☐ শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ সংঘ,
সেক্টর-১/বি, বোকারো স্টীল সিটি

**উড়িষ্যা** ☐ রামকৃষ্ণ মঠ, চক্রতীর্থ, পুরী

**বাংলাদেশ** ☐ রামকৃষ্ণ মিশন, ঢাকা-৩

**ত্রিপুরা** ☐ রামকৃষ্ণ মিশন, আগরতলা

**মধ্যপ্রদেশ** ☐ রামকৃষ্ণ সেবাসংঘ, কোয়ার্টার নং-৫০৭
(এস. এস.)/২, বাচেলি, জেলা : বস্তার

**মহারাষ্ট্র** ☐ রামকৃষ্ণ মঠ, রামকৃষ্ণ মিশন মার্গ,
খার, বোম্বাই-৫২

## পশ্চিমবঙ্গ

### কলকাতা

রামকৃষ্ণ যোগোদ্যান মঠ, কাঁকুড়গাছি
রামকৃষ্ণ মিশন পল্লীমঙ্গল, ২৮বি, গড়িয়াহাট রোড
সলিলা সরকার, এ-ই ৬৫৫, সল্ট লেক
রামকৃষ্ণ-সারদা সেবাশ্রম, ৫/৩৬, বিজয়গড়
দেবাশিস পেপার সাপ্লায়ার্স, ১৩/৫/৩,
রামকান্ত বসু স্ট্রীট, বাগবাজার
গদাধর আশ্রম, হরিশ চ্যাটার্জী স্ট্রীট, ভবানীপুর
রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ ভাবনালোক, সোদপুর
বিবেকানন্দ যুব কল্যাণ কেন্দ্র, চেতলা
শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম, টেম্পল লেন, ঢাকুরিয়া
বিবেকানন্দ গ্রন্থলোক, ৯, আর. এন. টেগোর রোড,
নবপল্লী, কলকাতা-৭০০ ০৬৩
রামকৃষ্ণ কুটির, এইচ-২৯এ নবাদর্শ, বিরাটি
উজ্জ্বল বুক স্টোর্স, ১৬/সি নিমতলা লেন, কলি-৬

### উত্তরবঙ্গ

রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম, জলপাইগুড়ি
বিবেকানন্দ যুব মহামণ্ডল, দিনহাটা, কুচবিহার

### মেদিনীপুর

রামকৃষ্ণ মঠ, তমলুক
শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ সেবাশ্রম, পাঁশকুড়া
খড়্গপুর, রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ সোসাইটি

### উত্তর ২৪ পরগনা

রামকৃষ্ণ মিশন বালকাশ্রম, রহড়া
বসিরহাট শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ সেবাসংঘ
বিবেকানন্দ সংস্কৃতি পরিষদ, নবব্যারাকপুর
অলক পাল চৌধুরী, সংকটাপল্লী, ঘোলা, সোদপুর
ঘোলা রামকৃষ্ণ সেবাশ্রম, বি৭, বি. পার্ক, সোদপুর

### দক্ষিণ ২৪ পরগনা

রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম, সরিষা
শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ ভক্তসংঘ, ভাঙ্গড়

### হুগলী

রামকৃষ্ণ মঠ, আটপুর
শ্রীরামকৃষ্ণ সারদা আশ্রম, দ্বারিক জঙ্গল রোড, কোতরং

### নদীয়া

রামকৃষ্ণ সেবক সংঘ, চাকদহ
রামকৃষ্ণ সেবাসংঘ, কল্যাণী ; রামকৃষ্ণ আশ্রম, কৃষ্ণনগর
শ্রীরামকৃষ্ণ সারদা সেবাসংঘ, রাণাঘাট

### বর্ধমান

পুস্তকালয়, ৬২ বি. সি. রোড, বর্ধমান
রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম, আসানসোল
দুর্গাপুর ☐ রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ সেবাশ্রম,
রামমোহন অ্যাভিনিউ ; রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ পাঠচক্র,
ডি. পি. এল. কলোনী ; স্বামী বিবেকানন্দ
বাণীপ্রচার সমিতি, বিদ্যাসাগর অ্যাভিনিউ ;
রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ সোসাইটি, এ বি এল টাউনশিপ

### বীরভূম

বোলপুর রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ সাহিত্যকেন্দ্র
পৌর বাণিজ্যিক সদন (বাস স্ট্যান্ড), স্টল নং ৫
আকালীপুর রামকৃষ্ণ সারদা সেবাশ্রম, পোঃ ভদ্রপুর

### সংগ্রহ-কেন্দ্র

এম. কে. বুক সেলার্স, পোঃ বি. চারালী,
জেলা : শোণিতপুর, আসাম
শ্যামবাজার বুক স্টল, ২/২০, এ. পি. সি. রোড
পাতিরাম বুক স্টল, কলেজ স্ট্রীট, কলকাতা
রামকৃষ্ণ মিশন সারদাপীঠ শো-রুম, বেলুড় মঠ
সর্বোদয় বুক স্টল, হাওড়া রেল স্টেশন

সৌজন্যে : আর. এম. ইণ্ডাস্ট্রিস, কাঁটাপুকুর, হাওড়া-৭১১ ৪০১

# উদ্বোধন

মাঘ, ১৩৯৯ জানুয়ারি ১৯৯৩ ৯৫তম বর্ষ—১ম সংখ্যা


## দিব্য বাণী

ভারতবর্ষ ঘুরে ঘুরে দেখেছি।…[ভারতের মানুষের] দারিদ্র্য আর অজ্ঞতা দেখে আমার ঘুম হয় না ; একটা বুদ্ধি ঠাওরালুম Cape Comorin-এ (কুমারিকা অন্তরীপে) মা কুমারীর মন্দিরে বসে, ভারতবর্ষের শেষ পাথর-টুকরার ওপর বসে—এই যে আমরা এতজন সন্ন্যাসী আছি, ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছি, লোককে metaphysics (দর্শন) শিক্ষা দিচ্ছি, এসব পাগলামি। 'খালি পেটে ধর্ম হয় না'—গুরুদেব বলতেন না?

(১৯ মার্চ ১৮৯৪ শিকাগো হইতে স্বামী রামকৃষ্ণানন্দকে লিখিত পত্র।) স্বামী বিবেকানন্দ

উদ্বোধন ৯৫তম বর্ষে পদার্পণ করিল। আগামী দিনগুলিতে 'উদ্বোধন' যেন তাহার ব্রত ও লক্ষ্যে অবিচল থাকিতে পারে সেজন্য 'উদ্বোধন'-এর সকল শুভানুধ্যায়ী, গ্রাহক ও পাঠকের শুভেচ্ছা একান্তভাবে আমাদের কাম্য।

## কথাপ্রসঙ্গে

# কলকাতা হইতে কন্যাকুমারীঃ রামকৃষ্ণ-পথে পরিব্রাজক স্বামী বিবেকানন্দ

পূর্ব হইতে উত্তর, উত্তর হইতে পশ্চিম, পশ্চিম হইতে মধ্য, পুনরায় মধ্য হইতে পশ্চিম এবং আবার পশ্চিম হইতে দক্ষিণে শত শত যোজন পথ পরিক্রমা করিতে করিতে ভারতপথিক স্বামী বিবেকানন্দ আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিলেন ভারতবর্ষের দক্ষিণতম প্রান্ত কন্যাকুমারীতে। সেখানে ভারতবর্ষের শেষ শিলাখণ্ডে তিনি ধ্যানমগ্ন হইয়াছিলেন। মোটামুটিভাবে এখন নিশ্চিত হওয়া গিয়াছে যে, কন্যাকুমারীতে স্বামীজীর পদার্পণের দিনটি ছিল ২৪ ডিসেম্বর ১৮৯২। ভারতবর্ষের সীমানার উল্লেখ করিতে হইলে আমরা সাধারণভাবে বলিয়া থাকি—'হিমালয় হইতে কন্যাকুমারী'। একদিকে হিমালয়, অন্যদিকে সমুদ্র। এই দুইয়ের মধ্যবর্তী যে বিশাল ভূখণ্ড ইহাই ভূগোলের ভারতবর্ষ, ইহাই ইতিহাসের ভারতবর্ষ, আবার ইহাই পুরাণের ভারতবর্ষ, ভাবের ভারতবর্ষ, সংস্কৃতির ভারতবর্ষ, সহস্র সহস্র বৎসরের কোটি কোটি মানুষের আধ্যাত্মিক আকাঙ্ক্ষা ও উপলব্ধির ভারতবর্ষ। এই ভারতবর্ষকে পায়ে পায়ে জরিপ করিয়া, দুই চোখ মেলিয়া দর্শন করিয়া, হৃদয়ের গভীরে অনুভব করিয়া এবং উপলব্ধির ভূমিতে ধারণ করিয়া স্বামীজী তখন স্বয়ং হইয়া দাঁড়াইয়াছেন ভারতবর্ষের চলমান বিগ্রহ। ভারতবর্ষের শেষ শিলাখণ্ডে তিনদিন তিনরাত্রি গভীর ধ্যানে অতিবাহিত করিয়া তিনি যখন পুনরায় পথে নামিলেন তখন তাঁহার ভারত-পরিক্রমার মূল-পর্ব সমাপ্ত হইয়াছে।

কন্যাকুমারীর শিলাখণ্ডে স্বামী বিবেকানন্দ কাহার ধ্যানে মগ্ন হইয়াছিলেন? ঈশ্বরের? সেই ধ্যান কি ছিল আত্মসাক্ষাৎকারের জন্য, নির্বিকল্প সমাধিলাভের জন্য, যাহার জন্য ভারতবর্ষের অধ্যাত্ম-পিপাসু সন্ত-সাধককুল যুগে যুগে লালায়িত হইয়াছেন? হিমালয়ের নির্জন গুহায় ঈশ্বরের ধ্যানে মগ্ন হইয়া থাকিবার, আত্মসাক্ষাৎকার এবং নির্বিকল্প সমাধির ভূমিতে পুনরায় আরূঢ় হইবার সুতীব্র বাসনা ও সঙ্কল্প লইয়া সার্ধ দুই বৎসর পূর্বে (জুলাই, ১৮৯০ খ্রীস্টাব্দ) তিনি প্রব্রজ্যায় বাহির হইয়াছিলেন। আলমোড়া এবং হিমালয়ের অন্যত্র তাঁহার সেই বহু আকাঙ্ক্ষিত ধ্যানে তিনি মগ্নও হইয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার জীবনদেবতার অভিপ্রায় ছিল অন্যরূপ। তাঁহার জীবনদেবতা, তাঁহার আচার্য দেহাবসানের পূর্বে সুস্পষ্ট ভাষায় তাঁহাকে বলিয়া গিয়াছিলেন তাঁহার জীবন ও কর্ম সাধারণ অধ্যাত্মপিপাসু ও অধ্যাত্মপথিকের মতো নহে। তাঁহাকে একটি মহৎ ব্রত সম্পাদন করিতে হইবে, একটি সুমহান 'দায়' বহন করিতে হইবে। গুরু তাঁহাকে বলিলেও এবং তাঁহার জীবনকালেই

ঈশ্বরদর্শন, আত্মসাক্ষাৎকার এবং নির্বিকল্প সমাধি-লাভের দুর্লভ সৌভাগ্য তাঁহার হইলেও তিনি তাঁহার সম্পর্কে গুরুর প্রত্যাশাকে তাঁহার প্রতি গুরুর অত্যধিক স্নেহজনিত উচ্ছ্বাস ভাবিয়া এক-রকম জোর করিয়াই হিমালয়ের পথে বহির্গত হইয়াছিলেন। যুগ যুগ ধরিয়া হিমালয় ভারতের অধ্যাত্মপথিকগণকে দুর্বারভাবে আকর্ষণ করিয়াছে। হিমালয় ভারতবর্ষের মানুষের অধ্যাত্ম-আকাঙ্ক্ষার প্রতীক, হিমালয়ের নির্জন গুহায় দুশ্চর সাধনায় ভারতের সাধককুল চিরকাল তাঁহাদের বাসনার পরিপূর্তি খুঁজিয়াছেন। কিন্তু চিরাচরিত প্রবাহ হইতে অদৃশ্যভাবে শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁহাকে সরাইয়া আনিলেন এবং সেই আনয়নের মধ্যেই নিহিত ছিল তাঁহার জীবনের পরবর্তী এবং অতি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় —ভারত-পরিক্রমার প্রেক্ষাপট এবং কন্যাকুমারীর শিলাখণ্ডে তাঁহার ধ্যানের ইষ্টবস্তুর আভাস।

কন্যাকুমারীর শিলাখণ্ডে স্বামী বিবেকানন্দ কাহার ধ্যান করিয়াছিলেন? তিনি ধ্যান করিয়া-ছিলেন ভারতবর্ষের। ভারতবর্ষের মধ্যে তাঁহার ঈশ্বর, তাঁহার আত্মসাক্ষাৎকার, তাঁহার নির্বিকল্প সমাধি—সব মিলিয়া মিশিয়া একাকার হইয়া গিয়াছিল। ঈশ্বরের সন্ধানে, আত্মসাক্ষাৎকারের আকাঙ্ক্ষায়, নির্বিকল্প সমাধির আকুতিতে যে-বিবেকানন্দ একদা বরানগর মঠ হইতে বাহির হইয়া হিমালয়ের গুহায় গুহায় ঘুরিয়াছেন, তিনিই আবার কেন ভারতের পথে-প্রান্তরে, লোকালয়ে লোকালয়ে, ধনীর প্রাসাদ হইতে ভিক্ষুকের কুটিরে, রাজা ও নবাবের দরবার হইতে কৃষকের ক্ষেত-খামারে, হিন্দু ব্রাহ্মণ ও ভাঙ্গীর গৃহ হইতে মুসলমান মৌলবী ও দরবেশের আবাসে ঘুরিয়াছেন পরম আগ্রহে ও মমতায়, কেন ঈশ্বরের ধ্যান ছাড়িয়া দিয়া পরিক্রমা-শেষে ভারতের ধ্যানে মগ্ন হইয়াছেন তাহা বুঝিতে হইলে আমাদের ফিরিয়া যাইতে হইবে স্বামীজীর সহিত হিমালয়েই।

হিমালয়ের পুণ্য পাদপীঠ হৃষীকেশে তপস্যা-নিরত স্বামী বিবেকানন্দ। সময় ১৮৯০ খ্রীষ্টাব্দের হেমন্তকাল। সঙ্গে আছেন তিন গুরুভ্রাতা—স্বামী তুরীয়ানন্দ, স্বামী সারদানন্দ এবং বৈকুণ্ঠনাথ সান্ন্যাল (তখন স্বামী কৃপানন্দ)। সেখানে চণ্ডেশ্বর মহাদেবের মন্দিরের নিকটে একটি পর্ণ-কুটির নির্মাণ করিয়া তাঁহারা তপস্যা করিতেছেন। অকস্মাৎ সেখানে প্রবল জ্বরে আক্রান্ত হইলেন স্বামীজী। চিকিৎসার অভাবে রোগ মারাত্মক হইয়া দাঁড়াইল। স্বামীজীর অন্যতম প্রধান জীবনীকার স্বামী গম্ভীরানন্দ এই ঘটনার বর্ণনা দিয়া লিখিতেছেন: "দুর্বলতা বর্ধিত হওয়ায় তিনি (স্বামীজী) চলচ্ছক্তিহীন হইলেন; এমনকি ভূমিতে বিস্তৃত একখানা কম্বলের উপর সংজ্ঞা-শূন্য অবস্থায় পড়িয়া রহিলেন। উপায়হীন গুরু-ভ্রাতাদের মন তখন অতীব বিষাদময় ও নৈরাশ্যপূর্ণ—বহু ক্রোশের মধ্যেও কোন চিকিৎসক নাই, যাহার সাহায্য প্রার্থনা করা চলে; আর এমন রোগীকে দূরে লইয়া যাওয়ার প্রশ্নই উঠিতে পারে না। তাই চিকিৎসার অভাবে একদিন জীবনসংশয় উপস্থিত হইল; সেদিন ক্রমাগত ঘর্মনিঃসরণের পর শরীর হিম হইয়া নাড়ী ছাড়িয়া গেল—যেন অন্তিমকাল উপস্থিত।··· তখন পর্ণকুটিরের দ্বারে হঠাৎ ধীর পদক্ষেপ শুনিয়া সাধুরা চকিতে চাহিয়া দেখিলেন, এক সাধু দণ্ডায়মান। সাধু তাঁহাদের সাদর আহ্বানে গৃহমধ্যে প্রবেশ করিয়াই অবস্থা বুঝিয়া লইলেন এবং থলি হইতে কিঞ্চিৎ মধু ও পিপ্পলচূর্ণ লইয়া উহা একত্রে মাড়িয়া স্বামীজীকে ধীরে ধীরে খাওয়াইয়া দিলেন [বৈকুণ্ঠনাথ সান্ন্যাল লিখিয়াছেন, সাধুর নির্দেশমত তিনিই মধু ও পিপ্পল সংগ্রহ করিয়া পাথরে ঘষিয়া স্বামীজীর মুখে লাগাইতে-ছিলেন।]। অমনি আশ্চর্য ফল ফলিল, স্বামীজী ক্ষণকালমধ্যে [ইংরেজী জীবনী এবং প্রাচীন বাঙলা জীবনী অনুসারে 'ক্ষণকালমধ্যে' হইলেও বৈকুণ্ঠনাথ সান্ন্যালের মতে, 'ভোররাত্রে' অর্থাৎ বেশ কিছুকাল পর] চক্ষু মেলিয়া অস্পষ্ট স্বরে কি যেন বলিতে চাহিলেন। জনৈক গুরুভ্রাতা তাঁহার মুখের কাছে কান পাতিয়া তাঁহার অধোচ্চারিত দুই-একটি কথা শুনিলেন, কিন্তু কিছু বুঝিতে পারিলেন না। [ইংরেজী জীবনীর মতে, "ক্ষীণকণ্ঠে প্রায় অশ্রুত স্বামীজীর কথা শুনিলেন: 'তোরা ভয় পাসনে! আমি মরব না।'" বৈকুণ্ঠনাথ সান্ন্যালের মতে, "স্বামীজী আমাদের অতি ক্ষীণস্বরে বলেন—'তোমরা হয়তো ভেবেছ আমার ভারী অসুখ হয়েছে ও আমি মরে যাব। এতকালের পর প্রভুর কৃপায় এই হৃষীকেশ তীর্থে পুনরায় নির্বিকল্প সমাধি পেয়েছি'।"]

"যাহা হউক, তিনি ক্রমে বললাভ করিতে লাগিলেন। পরে তিনি গুরুভ্রাতাদের নিকট বলিয়াছিলেন, অজ্ঞান অবস্থায় তাঁহার বোধ হইতেছিল তাঁহাকে যেন বিধাতার নির্দেশে কোন একটা বিশেষ কার্য করিতে হইবে; উহার সমাপ্তির

**পূর্বে তাঁহার বিশ্রাম নাই, শান্তি নাই। ঐ সময় হইতেই তাঁহার গুরুভ্রাতাদের স্পষ্ট বোধ হইত, স্বামীজীর দেহ-মন অবলম্বনে যেন এক বিপুল অব্যক্ত শক্তি আত্মপ্রকাশের জন্য আকুল—যেন কোন সীমার মধ্যে উহা আর আবদ্ধ থাকিতে পারিতেছে না—উপযুক্ত ক্ষেত্রলাভের জন্য অস্থির, চঞ্চল।"** ('যুগনায়ক', ১ম খণ্ড, পৃঃ ২৩৭-২৩৮)।

এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, স্বামী গম্ভীরানন্দের উপরি-উক্ত বর্ণনার সূত্র স্বামীজীর ইংরেজী ও প্রাচীন বাঙলা জীবনী। কিন্তু এই প্রসঙ্গে ইংরেজী জীবনীর মূল সংস্করণে প্রকাশিত কিছু কথা উহার সাম্প্রতিক সংস্করণে বর্জিত হইয়াছে, প্রাচীন বাঙলা জীবনী এবং স্বামী গম্ভীরানন্দের 'যুগনায়ক'-এও উহা উল্লিখিত হয় নাই। কিন্তু আমাদের মনে হয়, স্বামীজীর ভারত-পরিক্রমা এবং কন্যাকুমারী হইতে শিকাগো-যাত্রার প্রেক্ষাপট হিসাবে ঐ কথাগুলির অত্যন্ত গুরুত্ব রহিয়াছে। মূল ইংরেজী জীবনীর কথাগুলি হইল এই ঃ **"This ['a super-abundant spiritual energy welling up in him'] then sanctioned, as it were, that which he so deeply felt whilst dwelling in the cave, overhanging the mountain-village, near Almora. Of that time he once said later on, 'Nothing in my whole life ever so filled me with the sense of work to be done. It was as if I was *thrown out* from that life of solitude to wander to and fro in the plains below!' Aye, in the plains below he was to work and gather the elements of the mission which had been entrusted to him by the Master."** (Vol. II, pp. 121-122) [ "ইহা ('তাঁহার ভিতরে পুঞ্জীভূত বিপুল আধ্যাত্মিক শক্তি') যেন পার্বত্য পল্লী আলমোড়ার গুহায় অবস্থানকালে যাহা তিনি ব্যাকুলভাবে কামনা করিতেছিলেন তাহারই পরিপূর্তি। এই সময়ের অভিজ্ঞতা সম্পর্কে পরবর্তী কালে তিনি একদা বলিয়াছিলেন ঃ 'আমার সমগ্র জীবনে ইহার পূর্বে আর কোন কিছুই কর্মের প্রেরণায় আমাকে এমনভাবে আপ্লুত করে নাই। নির্জনতার জীবন হইতে যেন বলপূর্বক লোকালয়ে পরিব্রাজকের জীবনে আমি নিক্ষিপ্ত হইলাম!' হ্যাঁ, লোকালয়ে কাজ করিবার জন্য এবং তাঁহার উপর অর্পিত তাঁহার গুরুদেবের ব্রতের উপাদানসমূহ সংবদ্ধ করিবার জন্য তিনি ছিলেন দায়বদ্ধ।" ]

হৃষীকেশের ঘটনার মাস দুয়েক পূর্বেও (আগস্ট, ১৮৯০) স্বামীজী তাঁহার অন্তরে পুঞ্জীভূত প্রচণ্ড আধ্যাত্মিক শক্তির অস্ফুট আলোড়ন প্রবলভাবে অনুভব করিতেছিলেন। তিনি বুঝিতে পারিতেছিলেন, তাঁহার মাধ্যমে বিধাতা এক অভাবনীয় ঘটনা সংঘটিত করিবেন, স্বদেশে ও বিদেশে যাহার প্রতিক্রিয়া হইবে সুদূরপ্রসারী। হিমালয়ের পথে বারাণসীতে প্রমদাদাস মিত্র এবং আরও অনেকের উপস্থিতিতে বিপুল আত্মবিশ্বাসের সহিত তিনি একদিন বলিলেন ঃ "আমি এখন কাশী ছেড়ে যাচ্ছি, আবার যখন এখানে ফিরে আসব তখন আমি সমাজের ওপর একটা বোমার মতো ফেটে পড়ব এবং সমাজ আমাকে কুকুরের মতো অনুসরণ করবে।"

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য যে, এই ঘটনার প্রায় দুই বৎসর পূর্বে (আগস্ট-সেপ্টেম্বর, ১৮৮৮) হাতরাসে শিষ্য শরৎচন্দ্র গুপ্তকে তিনি ভারাক্রান্ত কণ্ঠে বলিয়াছিলেন ঃ "আমার জীবনে একটা মস্ত বড় ব্রত আছে, অথচ আমার ক্ষমতা এত অল্প যে, আমি ভেবেই আকুল—কি করে এটা উদ্যাপিত হবে। এ-ব্রত পরিপূর্ণ করার আদেশ আমি গুরুর কাছে পেয়েছি —আর সেটা হচ্ছে মাতৃভূমিকে পুনরুজ্জীবিত করা। দেশে আধ্যাত্মিকতা অতিশয় ম্লান হয়ে গেছে আর সর্বত্র রয়েছে বুভুক্ষা। ভারতকে সচেতন ও সক্রিয় হতে হবে এবং আধ্যাত্মিকতার বলে জগৎ জয় করতে হবে।"

হৃষীকেশ হইতে শুভানুধ্যায়ীদের পরামর্শে অসুস্থ শরীর সারাইবার জন্য স্বামীজী কনখল ও সাহারানপুর হইয়া নামিয়া আসেন মীরাটে। সেখানে ডাঃ ত্রৈলোক্যনাথ ঘোষের চিকিৎসাধীনে প্রথমে ডাঃ ঘোষের বাড়িতে এবং পরে 'শেঠজীর বাগানে' কয়েকজন গুরুভ্রাতাসহ ১৮৯০ খ্রীস্টাব্দের নভেম্বরের মধ্যভাগ (মতান্তরে ডিসেম্বরের দ্বিতীয় সপ্তাহ) হইতে ১৮৯১ খ্রীস্টাব্দের জানুয়ারির শেষভাগ পর্যন্ত অবস্থান করেন। মীরাটে অকস্মাৎ একদিন সকল গুরুভ্রাতাকে ডাকিয়া স্বামীজী বলিলেন ঃ **"আমার জীবনব্রত স্থির হয়ে গিয়েছে।** এখন থেকে আমি একাকী অবস্থান করব ; তোমরা আমায় ত্যাগ কর।" গুরুভ্রাতাগণ সস্নেহ উদ্বেগে অসুস্থ শরীর লইয়া একাকী তাঁহাকে ছাড়িতে চাহেন নাই। কিন্তু তাঁহাদের কোন অনুরোধেই তিনি কর্ণপাত করিতে প্রস্তুত ছিলেন না। নাছোড়বান্দা গুরুভ্রাতা স্বামী অখণ্ডানন্দ তাঁহার সহিত থাকিয়া সেবার অনুমতি

প্রার্থনা করিলে (তাঁহার প্রতি শ্রীশ্রীমায়ের আদেশ ছিল প্রব্রজ্যাকালে স্বামীজীকে 'দেখা'র।) স্বামীজী দৃঢ়ভাবে বলিলেন: "গুরুভাইদের মায়াও মায়া, বরং আরও প্রবল। এ মায়ার পাকে পড়লে কার্য-সাধনে বহু বিঘ্ন ঘটবে। আমি আর কোন মায়ার বোঁড় রাখতে চাই না।" ('যুগনায়ক', ১ম খণ্ড, পৃঃ ২৪৩)

অচিরেই তাঁহার সংকল্প কার্যে রূপায়িত হইল। ১৮৯১ খ্রীস্টাব্দের জানুয়ারির শেষভাগে একদিন প্রভাতে স্বামীজী একাকী দিল্লী অভিমুখে যাত্রা করিলেন। পক্ষকাল পর ফেব্রুয়ারির প্রথমে তিনি দিল্লী ত্যাগ করিয়া রাজপুতানার পথ ধরিলেন। আর হিমালয় নহে, "নির্জনতার আনন্দলোক" আর নহে। দিল্লী হইতে তাঁহার এই যে যাত্রা শুরু হইল ইহার শেষ হইয়াছিল প্রথম পর্বে কন্যাকুমারীতে, পরবর্তী পর্বে শিকাগোয়।

রোমাঁ রোলাঁ অপূর্ব ভাষায় লিখিয়াছেন: "হিমালয়ের নৈঃশব্দ্য হইতে তিনি মানবতার ধূলি-ধূসর কোলাহলের মধ্যে নিক্ষিপ্ত হইলেন।··· তিনি যদি মরিতেন—**তবে পথেই মরিতেন, তাঁহার নিজের পথে—যে-পথ তাঁহাকে তাঁহার ভগবান দেখাইয়া দিয়াছিলেন**।···

"উহা ছিল এক মহাপ্রয়াণ। তিনি ডুবুরির মতো ভারতের মহাসমুদ্রে ঝাঁপাইয়া পড়িলেন। ভারতের মহাসমুদ্রই তাঁহার পথরেখাকে নিশ্চিহ্ন করিয়া দিল।···" (বিবেকানন্দের জীবন—অনুঃ ঋষি দাস, পৃঃ ১৬)

যে দুর্বার শক্তি তাঁহার হৃদয়ে পুঞ্জীভূত হইয়াছিল তাহাকে আর ধরিয়া রাখা সম্ভব ছিল না। রোমাঁ রোলাঁ লিখিতেছেন: "তাঁহার সকল বন্ধন ছিন্ন করিতে, তাঁহার জীবনযাত্রা-পদ্ধতি, তাঁহার নাম, তাঁহার দেহ, তাঁহার সকল নিগড়—'নরেন' বলিয়া যাহা কিছু ছিল—দূরে নিক্ষেপ করিতে এবং ভিন্নতর জীবন, ভিন্নতর নাম ও ভিন্নতর দেহের সাহায্যে যাহার মধ্যে তাঁহার মধ্যাস্থিত নবজাত বিরাট পুরুষ স্বাধীনভাবে শ্বাস-প্রশ্বাস লইতে পারে, এমন একটি ভিন্নতর সত্তার সৃজন করিতে, নবজন্ম লাভ করিতে এই শক্তি কেবলই তাঁহাকে তাড়া দিতেছিল। এই নবজাতকই হইয়া-ছিলেন বিবেকানন্দ।··· ইহাকে আর তীর্থযাত্রার ডাক বলা চলে না। কারণ, তীর্থযাত্রীরা মানুষের কাছে বিদায় লইয়া ভগবানের অনুসরণ করেন।" **(ঐ, পৃঃ ১৪-১৫)** বিবেকানন্দ কি করিতেছিলেন? বিবেকানন্দ ভগবানকে অনুসরণ করা হইতে সরিয়া আসিয়া মানুষকে অনুসরণ করিতে লাগিলেন। ভারতের ঋষি-সন্তানগণের অধঃপতন, দেবভূমি ভারতের দৈন্য তাঁহার কাছে দুঃসহ হইয়া দাঁড়াইল। তিনি কাঁদিয়া ফেলিলেন:

"ওরে আমার দেশ! আমার দেশ!"

নিজের বুকে আঘাত করিয়া তিনি নিজেকে প্রশ্ন করিলেন: "আমরা সন্ন্যাসী, আমরা নাকি ভগবানের ভক্ত, আমরা এই অগণিত মানুষের জন্য কি করেছি?"

তাঁহার আচার্যের রূঢ় কথাগুলি তাঁহার মনে পড়িল: "খালি পেটে ধর্ম হয় না।"

ভারতবর্ষের অধঃপতন, ভারতবর্ষের মানুষের অধঃপতন, ধর্মের চরম বিকৃতি, ধর্মের নামে ব্যাভিচার দেখিয়া তিনি বুঝিলেন, ঈশ্বরের আরাধনা নয়, চাই স্বদেশের জাগরণ; ধর্ম নয়, চাই অন্ন; দার্শনিক কূটকচাল নয়, চাই গণশিক্ষা ও নারীশিক্ষা। তিনি স্থির করিলেন, ইহার জন্য তাঁহার সর্বশক্তি প্রয়োগ করিতে হইবে। এই ভাবনা তাঁহার সমগ্র হৃদয়কে ব্যাপ্ত করিল।

রোমাঁ রোলাঁ লিখিয়াছেন: "সেখানে আর কোন চিন্তার বিন্দুমাত্র স্থান রহিল না। ভারতের উত্তর প্রান্ত হইতে দক্ষিণ প্রান্ত পর্যন্ত ইহা তাঁহার অনুসরণ করিল, যেমন করিয়া ব্যাঘ্র তাহার শিকারের অনুসরণ করে। নিদ্রাহীন রজনীতে ইহা তাঁহাকে ক্ষত-বিক্ষত করিল। কুমারিকা অন্তরীপে ইহা তাঁহাকে প্রায় গ্রাস করিয়া ফেলিল। তখন তিনি ইহার কবলেই তাঁহার দেহ ও আত্মাকে ছাড়িয়া দিলেন। তিনি দুঃস্থ মানবের উদ্দেশে জীবন উৎসর্গ করিলেন।" (ঐ, পৃঃ ২১ ২২)

গুহা হইতে বাহির হইয়া আর তিনি গুহায় প্রবেশ করেন নাই। না, করিয়াছিলেন। তবে উহা ধ্যানের গুহা নহে—তিনি প্রবেশ করিয়াছিলেন সিংহের গুহায়। সিংহের গুহায় প্রবেশ করিয়া সিংহের সহিত যুদ্ধ করিয়া অবশেষে বিজয়ীর বর-মাল্য কণ্ঠে ধারণ করিয়া তিনি দাঁড়াইয়াছিলেন দুই গোলার্ধকে দুই হাতে ধরিয়া উহাদের মাঝখানে।

বরানগর হইতে হিমালয়, হিমালয় হইতে দিল্লী, দিল্লী হইতে কন্যাকুমারী। দূরত্বের ব্যবধান বিরাট, কিন্তু স্বামী বিবেকানন্দ পরিক্রমা করিয়াছেন এই পথে এক অদৃশ্য পুরুষের সুনির্দিষ্ট ছকে। **পরিব্রাজক অবশ্যই স্বামী বিবেকানন্দ, কিন্তু কলকাতা হইতে কন্যাকুমারী—রামকৃষ্ণ-পথে পরি-ব্রাজক তিনি।** ❑

ভাষণ

# যুগাচার্য স্বামী বিবেকানন্দ

## শঙ্করদয়াল শর্মা

কালাডি শ্রীরামকৃষ্ণ অদ্বৈত আশ্রম এবং কোচিন ভারতীয় বিদ্যাভবন গত ২৮ অক্টোবর, ১৯৯২ কোচিনের এর্নাকুলামে যুগ্মভাবে স্বামী বিবেকানন্দের ভারত-পরিক্রমা এবং ১৮৯৩ খ্রীস্টাব্দে শিকাগো ধর্মমহাসভায় স্বামীজীর অংশগ্রহণের শতবার্ষিকী উপলক্ষে একটি সভার আয়োজন করে। ঐ সভায় ভারতের রাষ্ট্রপতি ডঃ শঙ্করদয়াল শর্মা উদ্বোধনী ভাষণ দান করেন। ডঃ শর্মার সেই ভাষণের বঙ্গানুবাদ এখানে উপস্থাপন করা হলো।—যুগ্ম সম্পাদক, উদ্বোধন

ভারতের বহুমানিত সন্তপুরুষ স্বামী বিবেকানন্দের ভারত-পরিক্রমার শতবার্ষিকী উৎসব উপলক্ষে আপনাদের সঙ্গে মিলিত হতে পেরে আমি অত্যন্ত আনন্দিত; সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম-জিজ্ঞাসু, আধ্যাত্মিক আচার্য এবং সমাজ-সংস্কারকদের পর্যায়ে তাঁর স্থান। স্বামীজী ছিলেন আমাদের দেশের একজন যথার্থ অসাধারণ সন্তান। অনন্য চৌম্বক ব্যক্তিত্বের অধিকারী ছিলেন তিনি, তাঁর ভিতর থেকে বিচ্ছুরিত হতো বলিষ্ঠ তেজ ও অপরাজেয় শক্তি।

স্বামী বিবেকানন্দের ব্যাপক দৃষ্টি বহু ক্ষেত্রে বিস্তৃত ছিল এবং তাঁর স্বল্পায়ু জীবনে তিনি নানা কর্মধারাকে একত্র সন্নিবিষ্ট করে নিয়েছিলেন যা সম্পাদন করতে অপরের পক্ষে বহু দশক লেগে যেত। তিনি ছিলেন ভারতের যুবা-বৃদ্ধ-নির্বিশেষে সেইসব উজ্জ্বল পুরুষ ও নারীর অনুপ্রেরণার উৎস, দেশমাতৃকার জন্য যাঁদের আত্মবলিদান আমাদের রাজনৈতিক স্বাধীনতা এনে দিয়েছে। স্বাধীনতার পর আমাদের মহান দেশ অর্থনৈতিক উন্নয়নের নানা ক্ষেত্রে চমকপ্রদ প্রগতির স্বাক্ষর রেখেছে এবং আমরা সকলে এক গৌরবোজ্জ্বল ভারত গঠনে ব্রতী হয়েছি, যে-ভারত স্বামী বিবেকানন্দের দূরদৃষ্টি ও স্বপ্নে ধরা দিয়েছিল।

আজ আমরা এখানে স্বামীজীর ভারত-পরিক্রমার এবং ১৮৯৩ খ্রীস্টাব্দে শিকাগোর ধর্ম-মহাসভায় স্বামীজীর অংশগ্রহণের শতবার্ষিকী উদ্‌যাপন করতে সম্মিলিত হয়েছি। চারিত্রিক ও নৈতিক মূল্যবোধকে স্থায়িভাবে অনুশীলন করে মানবসমাজের উন্নয়নের জন্য স্বামীজী যে বিরাট কাজ করেছেন এবং আধুনিক ও ধর্মনিরপেক্ষ ভারতগঠনে যে ঐতিহাসিক অবদান তিনি রেখেছেন সেকথা স্মরণ করার চেয়ে আর কোন মহত্তর পরিতৃপ্তি তাঁর একজন অনুরাগীর পক্ষে লাভ করা সম্ভব। বাল্যকাল থেকেই আমি স্বামীজীর ব্যক্তিত্ব ও শিক্ষার প্রতি আকৃষ্ট হয়েছি। এই স্মরণীয় অনুষ্ঠানে আমাকে আমন্ত্রণ জানানোর জন্য আমি শতবার্ষিকী উৎসব সমিতির সভ্যগণকে ও সকল সংগঠককে আমার আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি।

শ্রীরামকৃষ্ণ ও স্বামী বিবেকানন্দের ভাবধারা বিশ্বজনীন ধর্মকে কেন্দ্র করে আবর্তিত। যথার্থ আধ্যাত্মিক জীবনের নীতিসমূহ তাতে বিধৃত। ১৮৮৬ খ্রীস্টাব্দে শেষ অসুস্থতার সময়ে শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর তরুণ শিষ্যের নিকট একটি দিব্য ব্রত সাধনের ভার অর্পণ করেছিলেন, যা সম্পন্ন করার জন্য স্বামী বিবেকানন্দ ভারত-পরিক্রমায় বেরিয়ে-ছিলেন এবং [তারপর] ব্যাপক বিদেশ ভ্রমণ করেছিলেন। সেকেলে দুর্বোধ্য আচার-অনুষ্ঠান থেকে সমাজকে মুক্ত করে এবং বেদান্তের ভাব প্রচার করে জাতির পুনরুত্থান ও পুনর্জাগরণকে তিনি একটি প্রক্রিয়ায় সঞ্চালিত করে দিয়েছিলেন। ত্রুটিগুলিকে বর্জন করে অতীতের ভিত্তির ওপর দেশ ও সমাজ গঠনে তিনি বিশ্বাসী ছিলেন। তিনি বিশ্বাস করতেন আত্মার শক্তিতে। তিনি বিশ্বাস করতেন, একমাত্র এই শক্তিই দেশের প্রতিষ্ঠানসমূহ এবং আইনব্যবস্থাকে সার্থকভাবে

কার্যকরী করতে সহায়তা করবে। তিনি বিশ্বাস করতেন, ব্যক্তিচরিত্রের বলিষ্ঠতা ও পবিত্রতায়। তিনি বলতেন, ব্যক্তিচরিত্রের বলিষ্ঠতা ও পবিত্রতাই নতুন সমাজ গঠনে প্রাণসঞ্চার করতে পারে।

স্বামীজী বারাণসী এবং হিমালয়ের তীর্থগুলিতে ভ্রমণ করেছিলেন। তিনি গিয়েছিলেন শ্রীকৃষ্ণের স্মৃতি এবং উপাখ্যান-পূত দ্বারকায়। পুনায় আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামের অন্যতম শীর্ষনেতা লোকমান্য তিলকের অতিথি হয়েছিলেন তিনি। ঐকালে তাঁর কেরালায় অবস্থানের একটি বর্ণনায় বলা হচ্ছেঃ "তাঁর এই অত্যাশ্চর্য ক্ষমতা ছিল যে, তিনি একই কালে একই সঙ্গে বহু প্রশ্নের উত্তর দিতে পারতেন। হয়তো কথা উঠল স্পেনসারের দর্শন, কালিদাস কিংবা সেক্সপীয়ারের কোন ভাব, ডারউইনের মতবাদ, ইহুদীদের ইতিবৃত্ত, আর্যসভ্যতার বিকাশ, বেদরাশি, ইসলামধর্ম অথবা খ্রীস্টধর্ম সম্বন্ধে—স্বামীজীর নিকট সর্ববিষয়েই সমুচিত উত্তর প্রস্তুত থাকত।"[১]

যখন স্বামী বিবেকানন্দ [ত্রিবান্দ্রমে] তাঁর আতিথ্যদাতার গৃহে উপস্থিত ছিলেন তখন তাঁর সঙ্গে ছিল একজন মুসলমান পিয়ন, যাকে পাঠানো হয়েছিল তাঁর পথপ্রদর্শকরূপে। স্বামীজী যদিও বিগত দুদিন সামান্য দুধ ছাড়া কিছুই আহার করেননি, তথাপি তিনি পিয়নটিকে আগে খাদ্য পরিবেশনের জন্য পীড়াপীড়ি করতে লাগলেন। স্থানীয় নগরবাসীরা দেখলেন চিন্তাধারায় স্বামীজী অত্যন্ত উদারপন্থী। তিনি চাইতেন যে, নারীরা ও সকল শ্রেণীর মানুষেরা শিক্ষালাভ করুক এবং নিজেদের প্রয়োজন ও চাহিদার প্রোজ্জ্বল অনুভবের আলোকে নিজেদের সামাজিক মান নির্ধারণ করুক। ত্রিবান্দ্রম থেকে তিনি রামেশ্বরে যান। সেখান থেকে তিনি উপমহাদেশের দক্ষিণতম প্রান্তে অবস্থিত কন্যাকুমারিকায় গিয়ে তাঁর মহান তীর্থপরিব্রজ্যা সমাপ্ত করলেন। এখানেই তাঁর প্রিয় মাতৃভূমির ধ্যান ও অনুধ্যানকালে স্বামীজী সেই আলোক পেলেন যা তাঁকে মানবসেবায় নিয়োজিত হবার ব্রত (mission) প্রদান করে এবং মানুষের ইতিহাসে তাঁর স্থান করে দেয়।

ভারত এবং বহির্ভারত সর্বত্রই স্বামীজী সকল ধর্মের সত্যতা এবং তাদের স্বতন্ত্রভাবে অবস্থিতির অধিকারকে সমর্থন করেছেন। ধর্মের সর্বজনীনতা সম্পর্কে নিম্নোক্ত কথাগুলি বলে একবার তিনি এক আলোচনার উপসংহার টেনেছিলেনঃ

"গ্রহণই আমাদের মূলমন্ত্র হওয়া উচিত—বর্জন নয়। কেবল পরমতসহিষ্ণুতা নয়—গ্রহণ।··· পরধর্মসহিষ্ণুতার মানে এই যে, আমার মতে আপনি অন্যায় করছেন, কিন্তু আমি আপনাকে বেঁচে থাকতে বাধা দিচ্ছি না। আমি 'গ্রহণে' বিশ্বাসী। ···অতীতে যত ধর্মসম্প্রদায় ছিল, আমি সবগুলিকেই সত্য বলে মানি এবং তাদের সকলের সঙ্গে উপাসনায় যোগদান করি। প্রত্যেক সম্প্রদায় যেভাবে ঈশ্বরের আরাধনা করে, আমি তাদের প্রত্যেকের সঙ্গে ঠিক সেই ভাবেই তাঁর আরাধনা করি।··· অতীতের ঋষিকুলকে প্রণাম, বর্তমানের মহাপুরুষদের প্রণাম এবং যাঁরা ভবিষ্যতে আসবেন, তাঁদের সকলকে প্রণাম।"[২]

ভারতীয় বিদ্যা এবং জ্ঞানের ঐশ্বর্যে পরিপূর্ণ ছিলেন স্বামী বিবেকানন্দ। জীবন সম্পর্কে ভারতীয় দৃষ্টিভঙ্গির প্রাচীন ভিত্তি। তার মহৎ কীর্তির কথা তিনি জানতেন। তিনি সেগুলি সাধারণ মানুষের কাছে এমন ভাষায় ব্যাখ্যা করতেন যা তারা সহজেই বুঝতে পারে। কিন্তু তিনি শুধু ভারতের মধ্যেই নিজেকে সীমাবদ্ধ রাখেননি এবং সেজন্য তাঁর কথা গভীর মনোযোগের সঙ্গে অন্যান্য দেশের মানুষেরাও শুনেছেন। তিনি বলেছিলেনঃ

"আমাদের গঠনমূলক ভাব দিতে হবে। নেতিবাচক ভাব কেবল মানুষকে দুর্বল করে দেয়। ···গঠনমূলক ভাব দিতে পারলে সাধারণে মানুষ

১ দ্রঃ যুগনায়ক বিবেকানন্দ—স্বামী গম্ভীরানন্দ, ১ম খণ্ড, ৫ম সং, ১৯৯১, পৃঃ ৩০৮

২ স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা, ৩য় খণ্ড, ১ম সং, ১৩৬৯, পৃঃ ১৯১-১৯২

হয়ে উঠবে ও নিজের পায়ে দাঁড়াতে শিখবে। ভাষা, সাহিত্য, দর্শন, কবিতা, শিল্প সকল বিষয়ে যা চিন্তা ও চেষ্টা মানুষ করছে, তাতে ভুল না দেখিয়ে ঐসব বিষয়ে কেমন করে ক্রমে ক্রমে আরও ভাল রকমে করতে পারবে, তাই বলে দিতে হবে।"[৩]

ধর্মমহাসভায় স্বামীজী ব্যাখ্যা করেছিলেন, কিভাবে হিন্দুধর্ম নিজেই একটি ধর্মমহাসভা হয়ে উঠেছে এবং কিভাবে হিন্দুধর্ম ঈশ্বরের দিকে যাবার বিভিন্ন পথকে সমান শ্রদ্ধার চোখে দেখে। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের প্রধান সংবাদপত্রগুলি তাঁর সম্পর্কে উচ্ছ্বসিত হয়ে লিখেছিল। 'নিউ ইয়র্ক হেরাল্ড' মন্তব্য করেছিলঃ "He is undoubtedly the greatest figure in the Parliament of Religions...."[৪] (নিঃসন্দেহে তিনি ছিলেন ধর্মমহাসভার মহত্তম ব্যক্তিত্ব।) এখন তাঁর জীবনব্রত হলো আধ্যাত্মিক শিক্ষার মধ্য দিয়ে মানুষকে তাদের নিজ উচ্চস্তরে উন্নীত করতে সাহায্য করা এবং তাঁর স্বদেশবাসীর দুঃখদুর্দশা লাঘব ও তাদের অজ্ঞতা বিদূরিত করার জন্য সংগ্রাম করা।

ডঃ অ্যানি বেসান্ত ধর্মমহাসভায় স্বামী বিবেকানন্দকে কিভাবে দেখেছিলেন সেকথা বলতে গিয়ে লিখেছেনঃ

"এক চিত্তাকর্ষক মূর্তি—হরিদ্রা ও কমলালেবুর বর্ণের বেশ পরিহিত, শিকাগোর ভারী আবহাওয়ার মধ্যে জাজ্বল্যমান ভারতীয় সূর্যসদৃশ, সিংহতুল্য মস্তক, সুতীক্ষ্ণ নয়নদ্বয়, সক্রিয় ওষ্ঠদ্বয়, চকিত ও দ্রুত পদসঞ্চারণ—এই ছিল স্বামী বিবেকানন্দ সম্বন্ধে আমার প্রাথমিক ধারণা, যখন প্রতিনিধিদের জন্য নির্দিষ্ট মহাসভার একটি কক্ষে আমি তাঁকে দেখতে পেলাম।... উদ্দেশ্যে অবিচল, উদ্যমশীল, শক্তিমান—তিনি মানুষের মধ্যে মানুষ বলে মাথা তুলে দাঁড়াতেন—আর সবসময় সক্ষম ছিলেন স্বমত সমর্থন করতে।"[৫]

মহাসভায় স্বামীজীর বিপুল সাফল্যের সংবাদ ভারতবর্ষে দেরিতে এসে পেঁছায়, কিন্তু একবার যখন তা এসে পেঁছাল তখন তা সৃষ্টি করল আনন্দ এবং জাতীয়-গৌরববোধের এক বিস্ফোরণ। নরেন্দ্রনাথ সম্পর্কে শ্রীরামকৃষ্ণের পূর্বতন ভবিষ্যদ্বাণী অনেকে স্মরণ করলেনঃ "নরেন জগতের ভিত্তিমূল পর্যন্ত কাঁপিয়ে দেবে।"

আমাদের স্মরণ রাখতে হবে যে, প্রাচীন হিন্দুশাস্ত্রে যার উদ্ভব হয়েছে সেই বেদান্ত প্রচার করেই স্বামীজী শুধুমাত্র বিরত হননি, তিনি তাঁর মতের সমর্থনে অন্য ধর্মকেও গ্রহণ করেছিলেন। ১৯০০ খ্রীস্টাব্দের জানুয়ারি মাসে ক্যালিফোর্নিয়ায় 'আমার জীবন ও ব্রত' ভাষণদানের সময় তিনি বর্ণনা করেছিলেন, কিভাবে তিনি ও তাঁর গুরুভ্রাতাগণ তাঁদের ভাবাদর্শ শ্রীরামকৃষ্ণের কাছ থেকে লাভ করেছিলেন এবং কিভাবে তাঁরা সকলে সমবেত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিলেন যে, এই আদর্শের প্রচার করতে হবে। তিনি আরও বলেছিলেনঃ "শুধু প্রচার নয়, এই আদর্শকে বাস্তবে পরিণত করতে চাইলাম। এর অর্থ—আমাদের দৈনন্দিন জীবনযাপনের মধ্য দিয়ে হিন্দুর আধ্যাত্মিকতা, বৌদ্ধের করুণা, খ্রীস্টানের কর্মপ্রবণতা ও ইসলামের ভ্রাতৃত্ব ফুটিয়ে তোলা।"[৬]

সামাজিক ও অর্থনৈতিক প্রগতির সহায়করূপে শিক্ষাকে কাজে লাগানোর প্রয়োজনীয়তা স্বামীজী সুস্পষ্টভাবে দেখেছিলেন। কিন্তু কেবলমাত্র পুঁথিগত বিদ্যা ও স্মৃতিশক্তির প্রশিক্ষণকে তিনি সমালোচনা করেছিলেন। তিনি বলেছিলেনঃ "বিভিন্ন ভাবকে এমনভাবে নিজের করে নিতে হবে, যাতে আমাদের জীবন গঠিত হয়, যাতে মানুষ তৈরি হয়, চরিত্র গঠিত হয়।... যদি শিক্ষা বলতে শুধু কতকগুলি বিষয় জানা বোঝায়, তবে গ্রন্থাগারগুলিই তো জগতের মধ্যে শ্রেষ্ঠ জ্ঞানী, অভিধানগুলিই তো ঋষি।"[৭]

৩ বাণী ও রচনা, ৯ম খণ্ড, পৃঃ ১৭৬

৪ দ্রঃ The Life of Swami Vivekananda by His Eastern and Western Disciples, 6th Edn., 1989, p.428

৫ দ্রঃ যুগনায়ক বিবেকানন্দ, ১ম খণ্ড, পৃঃ ৪২-৪৩

৬ দ্রঃ বাণী ও রচনা, ১০ম খণ্ড, পৃঃ ১৬৪

৭ ঐ, ৫ম খণ্ড, পৃঃ ২০০

তিনি ছিলেন নারীশিক্ষারও একজন একনিষ্ঠ সমর্থক এবং প্রায়ই মনুসংহিতা থেকে উধৃতি দিয়ে বলতেন: "কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ" (কন্যাদেরও পুত্রদের মতো একই রকম যত্ন ও মনোযোগের সঙ্গে পালন করতে ও শিক্ষা দিতে হবে)।[৮]

স্বামীজী উপলব্ধি করেছিলেন যে, মানুষের যে-গুণটি সবচেয়ে আগে প্রয়োজন তা হলো শক্তিমত্তা এবং যে-শিক্ষা তিনি প্রদান করতেন, বিশেষতঃ ভারতবর্ষের যুবক ও কিশোরদের, তা শক্তি অর্জনেরই শিক্ষা। কিছুকাল পরে মহাত্মা গান্ধী আমাদের একই শিক্ষা দিয়ে গেছেন। বলেছেন, আমাদের নির্ভীক হতে হবে। আমি বিশ্বাস করি যে, আজ আমাদের যুবক-যুবতীদের আগের চেয়েও স্বামী বিবেকানন্দের শিক্ষার সঙ্গে অনেক বেশি পরিচিত হতে হবে এবং তা থেকে অনুপ্রেরণা লাভ করতে হবে। তিনি যা শিক্ষা দিয়েছিলেন, তিনি যে বাণী ও রচনা রেখে গিয়েছেন, তা আমাদের পাঠ করতে হবে এবং তাঁর শিক্ষা থেকে জ্ঞান আহরণ করতে হবে। আমরা যদি তা করি তবে আমাদের দেশ আজ যেসব কঠিন সমস্যার সম্মুখীন তার সমাধান সহজতর হবে।

আমি আরেকটি বিষয়ে আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই যে, জনসাধারণের প্রতি গুরুত্ব আরোপে, তাদের শোষণ-পীড়নের বিরুদ্ধে ঘৃণা-প্রকাশে, ভারতবর্ষের প্রাচীন ধর্ম ও সংস্কৃতির জন্য গৌরব-প্রদর্শনে এবং দাসসুলভ অনুকরণের ফাঁদে না পড়ে পাশ্চাত্য বিজ্ঞান ও কারিগরী শিক্ষা থেকে এই দেশ উপকৃত হোক—এই সকল জ্বলন্ত আকাঙ্ক্ষা পোষণে স্বামী বিবেকানন্দ তাঁর সমকাল থেকে রাজনৈতিক ভাবে অনেক দূর এগিয়ে ছিলেন। আমি মনে করি, যে-ভাবধারা তিনি উপস্থাপিত করেছিলেন তা বাস্তবিকই তাঁর কাল ও যুগের পক্ষে বৈপ্লবিক ছিল এবং পরবর্তী কালে আমাদের দেশে রাজনৈতিক চিন্তায় ও কর্মে তা প্রচণ্ড প্রভাব বিস্তার করেছিল। তিনি প্রায়ই বলতেন: "হাজার হাজার লম্বা কথার চেয়ে এতটুকু কাজের দাম ঢের বেশি।"[৯]

আধুনিক ভারতের বাতাবরণ সৃষ্টিতে স্বামী বিবেকানন্দ যেসকল ক্ষেত্রে সহায়তা করেছিলেন, তা শুধুমাত্র ধর্মনিরপেক্ষতা ও সমাজতন্ত্রবাদেই সীমাবদ্ধ ছিল না, বেদান্ত এবং অন্যান্য ধর্মের উপলব্ধি তাঁকে অস্পৃশ্যতা সংক্রান্ত মারাত্মক দেশাচারের বিরুদ্ধে কঠোর প্রতিপক্ষে পরিণত করেছিল। অস্পৃশ্যতাকে তিনি প্রবলভাবে নিন্দা করতেন। এই কথাটিও উপলব্ধি করতে তাঁর বিলম্ব হয়নি যে, কর্মোদ্যমজনিত শান্তি অসহায়তা ও হতাশাজনিত শান্তির চেয়ে গুণগতভাবে সম্পূর্ণ পৃথক। সুতরাং যেসব কর্মোদ্যম উৎপাদনবৃদ্ধি ও দারিদ্র্য-দূরীকরণে সাহায্য করে, তিনি ছিলেন তার সমর্থক। তাঁর কাছে অবশ্য ঐহিক উন্নয়ন আধ্যাত্মিক উন্নয়নের পথে একটি অন্তর্বর্তীকালীন অবস্থা মাত্র কিন্তু তার বিকল্প নয়। গান্ধীজীর মতো তিনি জাগতিক প্রয়োজনীয় বস্তুর সীমিতকরণের পক্ষে ছিলেন; তিনি যে বস্তুগত উন্নতি চেয়েছিলেন তা বিশেষ করে জনসাধারণের জন্য, যাতে তারা তাদের নিত্য-প্রয়োজনীয় দ্রব্যের চাহিদা মেটাতে পারে। ১৯৪১ খ্রীস্টাব্দে [২২ জুলাই] গান্ধীজী তাঁর সম্বন্ধে লিখেছিলেন: "স্বামী বিবেকানন্দের রচনাবলীর জন্য নিশ্চয়ই কোন পরিচয়ের প্রয়োজন নেই। তাদের নিজস্ব মর্মস্পর্শিতাই অনিবার্য।"

এই প্রসঙ্গে মানবজাতির উদ্দেশে স্বামীজীর উদ্দীপ্ত আহ্বানের কথাও আমার মনে পড়ছে: "সেই প্রেমের পতাকা উড়াইয়া দাও।" বজ্রনির্ঘোষে তিনি বলেছিলেন: "ওঠো, জাগো, যতদিন না লক্ষ্যে পৌঁছুচ্ছ, ততদিন নিশ্চিন্ত থাকিও না।"[১০]

তাঁর শিষ্যদের তিনি বলেছিলেন, বিশ্বজনীন সত্তার সঙ্গে নিজের একাত্মতাবোধ এবং সেজন্য অপর সকলের সঙ্গেও অভিন্নতার স্বীকৃতিই হলো জীবনের লক্ষ্য। স্বামীজী বলেছিলেন: "অন্যকে যদি সাহায্য করতে চাও, তবে তোমার নিজের অহংকে বিসর্জন

৮ দ্রঃ বাণী ও রচনা, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃঃ ৩৮১

১০ ঐ, পৃঃ ৩৩৮

৯ ঐ, ৫ম খণ্ড, পৃঃ ১০০

দিতে হইবে।"[১১] স্বামীজী বলেছেন: "এই যুগে একদিকে মানুষকে হতে হবে চূড়ান্ত বাস্তববাদী আবার অন্যদিকে তাদের গভীর আধ্যাত্মিক জ্ঞান অর্জন করতে হবে।" আমার বিশ্বাস, একথা বলে স্বামীজী আচার্য বিনোবা ভাবের কর্মের পূর্বাভাস দিয়েছিলেন, যিনি আধুনিক জগতে বিজ্ঞান ও আধ্যাত্মিকতার মিলনসাধনের জন্য কাজ করে গেছেন।

দরিদ্রের জন্য স্বামীজীর গভীর বেদনা মূর্ত হয়ে উঠেছিল যখন তিনি বলেছিলেন: "এস, আমাদের প্রত্যেকে দিবারাত্র দারিদ্র্য, পৌরোহিত্য শক্তি এবং প্রবলের অত্যাচারে নিপীড়িত ভারতের লক্ষ লক্ষ পদদলিতের জন্য প্রার্থনা করি—দিবারাত্র তাদের জন্য প্রার্থনা করি। বড়লোক এবং ধনীদের কাছে আমি ধর্মপ্রচার করতে চাই না।… তাঁদেরই আমি মহাত্মা বলি যাঁদের হৃদয় থেকে গরিবদের জন্য রক্তমোক্ষণ হয়।"[১২]

কয়েকশো বছর আগে মহারাষ্ট্রের সন্ত তুকারাম গেয়েছিলেন:

জে কা রংজলে গাংজলে
ত্যাংসী ম্হণে জো আপুলে।
তোচী সাধু ওলখাবা,
দেব তেথেচী জাণাবা॥
—তুকারাম গাথা।

(আর্ত ও পীড়িতদের যিনি আপনজন বলে দেখেন তাঁকে ঋষি বলে, ঈশ্বরের সচল বিগ্রহ বলে জানবে।)

স্বামীজীর ভারত-পরিক্রমা এবং ধর্মমহাসভায় তাঁর প্রদীপ্ত অংশগ্রহণের শতবর্ষে এই কেরালার মাটিতে, যেখানে একদা তিনি পরিক্রমাকালে পদার্পণ করেছিলেন, তাঁর শিক্ষা এবং মানবসেবায় তাঁর অবদানের কথা স্মরণ করা সমীচীন। স্বামীজীর ভারত-পরিক্রমা যেমন আমাদের সাংস্কৃতিক ঐক্যকে একসূত্রে গেঁথে একটি সমন্বয়ের রূপদান করতে সাহায্য করেছিল এবং আমাদের জাতীয় চেতনার পুনর্জাগরণের ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ যোগসূত্র হয়ে দাঁড়িয়েছিল, তেমনি শিকাগোয় স্বামীজী ধর্মের এক নতুন দিক তুলে ধরলেন পাশ্চাত্যের নিকট, বস্তুতঃ ভারতবাসীদের নিকটও তিনি ভারতবর্ষের পরিচয় করিয়ে দিলেন।

কিন্তু কেবলমাত্র ব্যক্তি-বিবেকানন্দকে শ্রদ্ধা-জ্ঞাপনই যথেষ্ট নয়, স্বামী বিবেকানন্দ যে-ভাবধারা, যে-আদর্শাবলী আমাদের সামনে রেখে গিয়েছেন সেগুলি অনুধাবন, গ্রহণ ও কার্যকরী করা প্রয়োজন। কেবলমাত্র তাহলেই স্বামীজীর পুণ্যস্মৃতির প্রতি আমাদের যথার্থ শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করা হবে এবং তাঁর কাছ থেকে প্রাপ্ত সম্পদের প্রতি সুবিচার করা হবে।

অতএব আসুন, আমরা স্বামী বিবেকানন্দের প্রেরণাদায়ী বাণীকে কর্মে পরিণত করার সংকল্প নতুন করে গ্রহণ করি, হৃদয়ে দৃঢ় ও মনে বলীয়ান হতে চেষ্টা করি এবং অন্যায় ও অসৎ কুকর্মের নিকট কখনো নতিস্বীকার না করার শক্তি অর্জন করি। আমার প্রার্থনা ও একান্ত আশা এই যে, আমাদের আজকের ও অনাগত দিনের দেশবাসীরা, বিশেষ করে আমাদের কিশোর এবং যুবসম্প্রদায় যেন জাতীয় পুনর্গঠন ও সামাজিক পরিবর্তনের যে কঠিন কাজ আমাদের সম্মুখে রয়েছে, তা সার্থক-ভাবে সম্পাদন করার জন্য স্বামীজীর উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত গ্রহণ করার চেষ্টা করে।

আমাকে সানুগ্রহ আমন্ত্রণ জানাবার জন্য আমি [কালাডী রামকৃষ্ণ অদ্বৈত আশ্রম এবং কোচিন ভারতীয় বিদ্যাভবনের যৌথ উদ্যোগে গঠিত] শতবার্ষিকী উৎসব সমিতিকে পুনরায় কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি। এবং এখানে সমবেত স্বামী বিবেকানন্দের অসংখ্য ভক্ত ও অনুরাগিগণকেও আমার কৃতজ্ঞতা জানাই। আপনাদের সকলকে আমি অভিনন্দন ও সম্বর্ধনা জানাই এবং আগামী দিনগুলিতে আপনারা সকলে সাফল্য এবং আনন্দ লাভ করুন, এই প্রার্থনা করি। ☐

**ভাষান্তর: সুশীলরঞ্জন দাশগুপ্ত**

১১ বাণী ও রচনা ৫ম খণ্ড, পৃঃ ৩৩৮

১২ ঐ, ৭ম খণ্ড, পৃঃ ৫৭-৫৮

কবিতা

# কন্যাকুমারিকায় স্বামী বিবেকানন্দ

## মঞ্জুভাষ মিত্র

**১৮৯২ খ্রীস্টাব্দের** ডিসেম্বরের শেষ সপ্তাহে স্বামী বিবেকানন্দ কন্যাকুমারীতে এসেছিলেন। গত ডিসেম্বর **মাসে ঐ রম্যভূমিতে** তাঁর শুভ আগমনের একশো বছর পূর্ণ হলো। সেই পবিত্র স্মৃতির উদ্দেশ্যে কবিতাটি নিবেদিত।

মহান ঐতিহ্যময় এই ভারতবর্ষের উদাত্ত দক্ষিণ প্রান্তভূমি
স্নিগ্ধ কন্যাকুমারিকা, এক পরম পবিত্র অনুকম্পনে এখনো পূর্ণ হয়ে আছে,
মনে হয় নীলিমা-চুম্বিত এই শ্রীভূমির আকাশ বাতাস
প্রিয় বঙ্গোপসাগর, ভারতসাগর আর আরবসাগর হয়েছে মিলিত।
জল ঢেউ আলো ও নিসর্গ ডেকে বলে ঃ

"হে সন্ন্যাসি, আবির্ভূত হও তুমি
সেই একশো বছর আগের মতন ; দেহমন উদাসীন-করা এই ভূমিতে দাঁড়াও
আমেরিকার উজ্জ্বল ভূমির উদ্দেশে স্বপ্নে ঘুমে জাগরণে দুহাত বাড়াও
ডেকে বলো আবহমানের মানব ও মানবীকে—
'তোমাদের নিকটে এসেছি মানুষের মুক্তিদূত।' "

হৈমবতী কুমারী দেবীর পায়ের ছাপ আরক্ত শিলায়
বিবেকানন্দ-মন্দির-দৃশ্য গোধূলির শান্ত অন্ধকারে সুদূরে মিলায়
সাগরপাখির ঠোঁটে গাছের সবুজ পাতা তৃণাঙ্কুর ঠিক সেদিনের মতো।

হে তেজস্বী প্রবল সন্ন্যাসি, পরিব্রাজক নিঃসঙ্গ কপর্দকহীন
নৌকায় নয় সাগর সাঁতরে তুমি চরণ রেখেছ যেন পৃথিবীর শেষ প্রান্ততটে
ঢেউ-জিভ করেছে স্পর্শন লবণকণ্টক-জ্বালা এই শঙ্খ-ঝিনুকের দেশে,
তোমার আত্মায় অনির্দেশ্য আগুন উঠল জ্বলে ঝড়-ঝঞ্ঝা প্রলয়ের মতো
তুমি হবে অসীমের পথযাত্রী আসন্ন আগামী বর্ষে, সন্ন্যাসিপ্রবর!

কোথা পড়ে' জনপদ, স্বপ্নের মতন পড়ে' অরণ্য ও প্রদেশ ভূধর
কোথা প্রিয় রামনাদ, আলাসিঙ্গা, কোথা প্রিয় মর্ত্যবিশ্ব—তুমি কোন্ মায়াপুরী পানে ধাও
পৃথিবীর কোন্‌খানে অত্যাচারী অট্টহাসি হাসে পান করে ক্ষমতার মদ—
অগ্নিকুণ্ড থেকে উড়ে এসেছিল তোমার গেরুয়া-খণ্ড আমাদের প্রিয় সম্পদ,

ওগো অনন্তের যাত্রী এখনো তোমাকে দেখি নয়নে শিকাগো-স্বপ্ন, পথিক-চরণ।

# "ওঠো, জাগো'

## তাপস বসু

বজ্রদীপ্ত কণ্ঠে তিনি বলে উঠলেন : "ওঠো জাগো…"
আকাশ থেকে খসে পড়ল যেন নক্ষত্র
বাতাসের গতি হলো তীব্র থেকে তীব্রতর
কম্পমান সারা শরীরে শুধু একই শব্দ—
"ওঠো জাগো…"

দেখছি পায়ে পায়ে জরিপ করছেন তিনি ভারতবর্ষ—
ক্ষুধা ক্লান্তি অবসন্নতায় চলে না চরণযুগ
তবুও গৈরিক বসনের শক্তিতে চলেছেন
সামনের দিকে—ক্রমশঃ সামনের দিকে ;
দেখছেন দুচোখ ভরে দীর্ঘদিনের, নির্মম
অত্যাচারের ছবি
আর শুনছেন বুকফাটা আর্তনাদ
শীর্ণ-দীর্ণ মানুষের মুখগুলো যেন বোশেখের মাটি
তারা হারিয়েছে শক্তি, টলেছে পা
অজ্ঞাত থেকেছে স্বরূপ শক্তির ইতিবৃত্ত
অথচ তাদেরও মাথা উঁচিয়ে, জড়তা ঘুচিয়ে
উঠে দাঁড়াবার কথা ছিল
অথচ সেখানে জমাট বেঁধেছে তমোনিশার কৌতুক ;

পাশাপাশি দেখলেন বিপুল ঐশ্বর্যের স্তূপ
ঢাকা দিচ্ছে সূর্যের কিরণ
সারা অন্তরে জ্বলে উঠল আগুন
দীপ্র কণ্ঠে উচ্চারণ করলেন :
অভিজাত শোষকের দল—
তোমরা শূন্যে বিলীন হও…
নতুন ভারত জন্ম নিক ঐ শোষিত-বঞ্চিত-
রিক্ত মানুষের সম্মিলনে
পবিত্র পর্ণকুটিরের ভিতর থেকে
আপন শক্তির দেদীপ্যমান শক্তির উজ্জীবনে।

দেখছেন আর দেখছেন—
দুচোখ ভরে দেখছেন—
ধর্মের নামে বেসাতি, ভণ্ডামি
দেখছেন পৌরোহিত্য শক্তির অত্যাচার আর
অনুশাসনে, লোকাচারে
ধর্মের লুপ্ত বিবর্ণ রূপ ;

এক লহমায় ভেঙে ফেললেন সব ভণ্ডামি,
নামিয়ে আনলেন ধর্মের
লাল, নীল, হলুদ সব ধ্বজা
বিস্মৃত সেই অমোঘ ভারতীয় শাশ্বত বাণী
পুনরায় করলেন উচ্চারণ
সহজ ভাষায়, স্বচ্ছন্দ বিন্যাসে—
'ধর্ম অন্তরের দেবত্বের বিকাশ'।

অচল পয়সার মতো 'জাতীয় সংহতি' শব্দটি
থমকে দাঁড়িয়ে
কারা যেন নিকষ অন্ধকারে ছড়াচ্ছে
সাম্প্রদায়িকতার বিষ,
মানুষ পুড়িয়ে মারছে মানুষকে,
মানুষ জ্বালিয়ে দিচ্ছে মানুষের আশ্রয়।

একশো বছর আগে ভারতের ধর্মসিদ্ধির
ফল পৌঁছে দিতে ছুটলেন
পূর্ব দিগন্ত থেকে পশ্চিম ভারতের ঊষর ভূমিতে
উত্তর ভারতে হিমালয়ের বন্ধুর পথ অতিক্রম করে
মানুষের মুক্তির গন্ধ নাকে নিয়ে হাঁটলেন
দক্ষিণ ভারতের পথে পথে
সমকালীন ইতিহাসের পৃষ্ঠাগুলি হয়ে উঠলো
তাঁরই পদচিহ্নের পদাবলী।

কখনো তীব্র শ্লেষে, কখনো শাণিত ব্যঙ্গে,
কখনো আবেগদীপ্ত আহ্বানে
ক্ষোভ-আনন্দ-বেদনাকে দিয়েছেন ছড়িয়ে।

গুরুর সর্বশক্তি সংহত করে বলে উঠেছেন :
ভারতবাসী আমার ভাই ; ব্রাহ্মণ, চণ্ডাল,
মুচি, মেথর আমার ভাই…
হিন্দু, মুসলমান, বৌদ্ধ, খ্রীস্টান, শিখ,
আদিবাসী আমার রক্ত, আমার প্রাণ,
ভারতবর্ষ আমার দেশ।
বলছেন, বলে চলেছেন :
"ওঠো জাগো, ওঠো জাগো,
তোমার কি নিদ্রা সাজে ?"

# নাও টেনে নাও

## মোহন সিংহ

মন্ত্রশিখার রঙ গেরুয়ায় ত্যাগের আলোয় দীপ্ত
তোমার জীবনের রঙ
সত্যদ্রষ্টা হে সন্ন্যাসি, সত্য তব জীবনের পুজো
জ্বলতে থাকে জ্বলতে থাকে জ্বলতে থাকে···
জ্বলতে থাকুক ঐ আকাশে
যেখান থেকে আসছে আলো
দূরে নীলিমা স্পর্শ করে।
আত্মঘাতী ভোগের খেলা
বিশ্বভুবন গ্রাস করছে
স্বার্থপরের নাই কোন ঠাঁই
তাইতো ভাঙন ওলটপালট
একে একে প্রাণের প্রিয় মানচিত্র নিকট দূরে
ছিঁড়ছে কারা ছুঁড়ছে কারা কোথায় যেন
দিনের আলোয় কিম্বা গাঢ় অন্ধকারে।
সবাইকে ভালবাস, হিংসা দ্বেষ কারও প্রতি নয়
এই তো তোমার বাণী।
যৌবনের মূর্ত প্রতীক, হে রাজাধিরাজ,
ভালবাসার গভীর স্রোতে
নাও টেনে নাও দেশ দুনিয়া।

# স্বামীজীকে

## বিনয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

আমাদের তেজ দাও
বীর্য দাও
অমিত তেজোময়, বীর্যবান তুমি।
প্রাণময় তোমার অগ্নিস্পর্শ
আমাদের চেতনাকে উদ্দীপ্ত করুক
নতুন প্রত্যয়ে
ঝরে যাক জীবনের জীর্ণ পাতা।
তোমার সঞ্জীবন মন্ত্র নিয়ে আসুক নবীন বসন্ত
আমাদের দেহের শিরায়।
ক্লীবত্ব ঘুচে যাক—
নবারুণ সূর্যের মতো জেগে উঠি
তোমার পুণ্য স্পর্শে
এই প্রত্যুষায়।

# স্বামী বিবেকানন্দকে

## কঙ্কাবতী মিত্র

কেমন করে পাব তোমার পূবের উজ্জ্বল আলো?
কেমন করে আমার নিঃসঙ্গ মুহূর্তের সন্ধ্যাগুলি
বুকের ভিতর জমিয়ে তোলা
অনেকদিনের দুঃখের ভার
সরিয়ে দিয়ে ফিরে পাব
তোমার প্রসন্ন সেই মূর্তি
আমার বুকের তলায়?

কেমন করে ধরে রাখব তোমায়?
কেমন করে আমার শরীরের শিরায় রক্তের কোষে
ছড়িয়ে দেব তোমার মন্ত্র?

কেমন করে পাব
তোমার সূর্যের আলো?
কেমন করে চারপাশের অন্ধকার ঠেলে
বুকের ব্যথা সরিয়ে চোখের ভিতর
ফিরে পাব তোমার পূবের আকাশ আমার ঘরে?

# সপ্তঋষির এক ঋষি তুমি

## শ্যামাপদ বসুরায়

জয় নরেন্দ্র, বিবেকানন্দ, বীরেশ্বর, লহ প্রণাম,
শ্রীরামকৃষ্ণ-লীলার হোত্রী, বীরসন্ন্যাসী, প্রাণারাম।
সপ্তঋষির তুমি এক ঋষি
ধেয়ানে মগন চিদাকাশে বসি
কোথা হতে এক দেবশিশু আসি
ভাঙিল তোমার গভীর ধ্যান।
কহিল সে শিশু: "চলিলাম আমি,
নেমে এস ত্বরা ছাড়ি' এই ভূমি,
ঘুচাইতে হবে ধর্মের গ্লানি
জ্ঞান ও ভক্তি করিয়া দান।"
ভারত ভ্রমিয়া অবশেষে আসি
কন্যাকুমারী শিলাসনে বসি
ভারতের বাণী ছড়াবে বিশ্বে
লইলে শপথ মহাপ্রাণ।

# বিবেক-প্রণাম

## মৃণালকান্তি দাস

সৌন্দর্যের সন্মারতি যুগ যুগান্তর ধরে আজো চলমান।
অতলান্ত গভীর ঐ বিবেকের চোখ-দুটি সে কী দীপ্তিমান ॥
যাদু ছিল না তো সেই সন্ন্যাসীর শুধু দুটি চোখভরে।
মাথা পেতে ধন্য হতো শুদ্ধতায় রোমাঞ্চিত বিশ্বচরাচরে ॥
হেথায় জমিয়া ছিল আবর্জনা তাও যেন পর্বতপ্রমাণ।
অন্তরের ব্যাকুলতা সাত্ত্বিকের রূপ পেল বিবেক-সমান ॥
জহুরীর চোখে তাঁর খোঁজ নেওয়া সবকিছু এতটুকু হেলে।
সংস্কারে শাস্তি দিতে দ্বিধাহীন সত্যাশ্রয়ী একরোখা বিলে ॥
সত্যের সন্ধানী তিনি আজীবন সব ঠাঁই মন্দিরে মঠেতে।
নর-নারায়ণে তাঁর সেরা সেবা, শুধু নয় প্রতিমা পটেতে ॥
অলোকসামান্য তাঁর ভক্তি ও বুদ্ধির দ্যুতি অপূর্ব মিশ্রণ।
সর্বত্যাগী তবু কত অনাগত সমস্যার সদাই চিন্তন ॥
সন্ন্যাসীর চোখে ভাসে মমতার নরম কাজল অনুক্ষণ।
সর্বহারা পীড়িতের কান্না তাঁর সত্তাভরে করেছে বপন ॥
অসীমের ধরা দেওয়া সসীমেতে, শিশুর নিকটে জননী।
আলোর উত্তরণে আহা, সার্থক পরিক্রমা উদ্ভাসে আপনি ॥
পঞ্চভূতে মিশে গেছে নশ্বর শরীর তাঁর, আত্মা অবিনাশ।
হিরণ্যের কীর্তি আজো স্মরণ তোরণদ্বারে কী তার বিভাস ॥

# হে বীরসন্ন্যাসী

## নিমাই দাস

চেতনার আলো আর দেবত্বের জ্ঞান
বল বীর্য চরিত্র মানুষের গৌরব ও সম্মান
আত্মার বলিষ্ঠরূপ, সর্বকর্মে দুর্বার সে গতি
ভয়হীন দুর্জয় সাহস, সংগ্রাম ও সুনীতি—
এসবই তোমার শিক্ষা—মানুষ গড়ার
মানুষই অমৃত-পুত্র বিধাতার উজ্জ্বল সত্তার।
এ-ভারত পুণ্যভূমি, মহাপীঠ ধর্ম-সাধনার,
পৃথিবীর আলোর দিশারী, সমন্বয়ে শান্তি সবাকার,
দেশপ্রেম, ভ্রাতৃপ্রেম, সৌহার্দ্য, সম্প্রীতি
হাতে হাত, প্রাণে প্রাণ, ঐক্যব্রতে জাতির উন্নতি-
এসবই তোমার বাণী মানুষ গড়ার
স্বার্থ, ভেদ, দ্বন্দ্বে দীর্ণ এ বিশ্ব-সংসার।
মানুষ মানুষে খোঁজে, নিঃশঙ্ক প্রত্যয়ে
এক জাতি এক প্রাণ, সূত্রে সূত্রে হৃদয় বিছায়ে
নিঃস্বার্থ প্রেমের মন্ত্রে উদ্বোধিত এ ভারতবাসী
জাগ্রত মহিমা তার, একই ধ্যানে ভেদবুদ্ধি নাশি-
এসবই তোমার চিন্তা মানুষ গড়ার
শক্তি, কীর্তি, জ্ঞান, প্রেমে এ-ভারত শ্রেষ্ঠ ধরার।

# অমৃত সঙ্গীত

## সমীর বন্দ্যোপাধ্যায়

স্বামীজীর সাবলীল সুরের ধারায়
ভেসে যাই অনুভবে প্রতি সন্ধ্যায়।
অনুষঙ্গে আছে তোমার তানপুরাটির স্মৃতি,
তালবাদনের যন্ত্রটিরও নীরব অনুভূতি,
এমন গায়ন ভঙ্গি তোমার এমন সরল গতি,
তোমার পক্ষে সাজে প্রভু এমন দেবগীতি,
ধ্রুপদী সঙ্গীত ছিল তোমার অতি প্রিয়
অকাল প্রস্থিত তুমি বিশ্বে বরণীয়।
উদারা পঞ্চমে বাঁধা তোমার মধুর ভজন,
'খণ্ডন-ভব-বন্ধন জগ-বন্দন'।'
এ নহে আবেগঘন লঘু ললিত স্বর
উৎস থেকে উৎসারিত দিব্য সরোবর।
সেথায় নিত্য শুদ্ধ চিত্তে কর অবগাহন
ছিন্ন হোক সম্মোহন জাগো মুক্ত মন।
স্বামীজীর গান শুনি অমৃতসমান,
হে স্বামি, সুরের রাজ্যে তুমি বিত্তবান।

# মানুষের কাছে

## দিলীপ মিত্র

আকাঙ্ক্ষার কৃমি কীট হয়ে
ভুলে থাকি তোমাকেই।
হাত বাড়ালেই মানুষ, তবু
বিচ্ছিন্নতার স্বর্ণলতার ফাঁস
আমার চারদিকে, আমিও দেওয়াল!
চারদিকের কান্না পেঁাছোয় না কানে,
অহরহ আত্মমগ্ন ক্ষুধা!
তোমাকে খুঁজতে বেরিয়েছিলাম,
তুমি বললে ঃ 'দরজা, জানালা খুলে দাও!
দুচোখ মেলে চেয়ে দেখ, সামনে
পিছনে, পাশে আর কেউ নেই
তোমারই অসংখ্য সত্তা, মানুষ!'
তোমাকে খুঁজতে গিয়ে, চেতনার
অন্ধকারে আলো জ্বলে,
পেঁাছে যাই মানুষের কাছে॥

# অমৃতের পুত্র

## পিনাকীরঞ্জন কর্মকার

স্বর্গভ্রষ্ট দেবতার শিশু মাটির মর্তে বেঁধেছ ঘর
এনেছ মননে স্বর্গের দ্যুতি নন্দনবন-স্বপ্নহর।
বজ্রপাণির বিপুল বীর্য বক্ষে ধরিছ রাত্রিদিন
চক্ষে জ্বলিছে দুর্জয় রবি কণ্ঠে বাজিছে অগ্নিবীণ॥

মৃত্যু-সাগর মন্থন করি' ভরায়েছ প্রাণ দীপ্ততায়
রক্তে বহে যে অমৃতের ধারা অচ্যুৎ বলে কে তোমায়!
"আদম-ইভ"-এর সন্ততি তুমি মর্তের আজি কর্ণধার
মর্তে-ত্রিদিবে গড়িবারে সেতু করেছিলে দৃঢ়
অঙ্গীকার।

স্বর্গরাজ্য পুনঃ অধিকার কে বলে করার শক্তি নাই?
ভাঙা গড়া খেলা খেলিবার তরে কেন রবে শুধু
মর্তটাই?
'অমৃতস্য পুত্র' যে তুমি বন্দনা গীতি রচি' তোমার
মুক্তি-মন্ত্রে দীক্ষিত যাঁরা গাহি আমি কবি
মহিমা তার॥

# স্বামীজীর প্রতি

## রমলা বড়াল

কবিতাটিতে সুরারোপ করে নিখিল ভারত বঙ্গসাহিত্য সম্মেলনের গোয়ালিয়র অধিবেশনে সমবেত কণ্ঠে গীত হয়েছিল।

বীরসন্ন্যাসী, হে মহাবিবেক,
হে মহাবিবেকানন্দ
আবার স্বদেশে দাঁড়াও হে এসে
এসো হে জীবনানন্দ।
শুদ্ধং দেহি বলহে আবার
অন্যায় আর যত অনাচার
ধুলায় লুটাক, হোক ছারখার,
এসো হে সমরানন্দ॥
তব বীর্যকৃপাণ বজ্রসমান
জ্বলুক আবার আকাশে;
রুদ্ধদিনের হোক অবসান
ভীমগর্জন বাতাসে।
তব ভক্তহৃদয় সন্তানদল
উঠুক লভিয়া নব তপোবল
হিমালয় হতে কন্যাকুমারী
লভুক পরমানন্দ॥

বিশেষ রচনা

# স্বামীজীর ভারত-পরিক্রমা এবং শিকাগো ধর্মমহাসভায় তাঁর আবির্ভাব প্রসঙ্গে

স্বামী আত্মস্থানন্দ

॥ ১

স্বামী বিবেকানন্দ প্রায় ছয় বছরের (১৮৮৭—মে, ১৮৯৩) বেশি সময় নিঃসম্বল অবস্থায় ভারত-পরিক্রমা করেছিলেন। উত্তর-দক্ষিণ-পশ্চিম-মধ্য ভারত-পরিক্রমায় স্বামীজী নিজেকে যেমন যাচাই করে নিয়েছিলেন, তেমনি গভীরভাবে জেনেছিলেন বর্তমান ভারতবর্ষকে, জেনেছিলেন প্রাচীন ভারতবর্ষকে। পরিক্রমাকালে ভারতের সর্বশ্রেণীর মানুষের অন্তরাত্মার পরিচয় পেয়েছিলেন তিনি। তিনি উপলব্ধি করেছিলেন অখণ্ড ভারতের রূপ। সমগ্র ভারতের চিত্র তাঁর অন্তরলোকে ঐ সময় উদ্ভাসিত হয়েছিল। এর আগে কেউ স্বামীজীর মতো অখণ্ড ভারতের কথা চিন্তা করেননি। দেশীয় রাজন্যবর্গের মধ্যে কেউ ছিলেন বিলাসিতায় মগ্ন, কেউ বা নিজ নিজ রাজ্যের চিন্তায় মশগুল। রাজনৈতিক ও সামাজিক নেতারা নিজ নিজ গণ্ডিতে সীমাবদ্ধ। ধর্মীয় নেতা ও পণ্ডিতগণ নানা সঙ্কীর্ণতায় আচ্ছন্ন। অথচ এই কপর্দকহীন, নিঃসম্বল, অপরিচিত সন্ন্যাসীর দৃষ্টি ছিল স্বচ্ছ ও উদার। তিনি গোটা ভারতবর্ষের অর্থনৈতিক, নৈতিক, সামাজিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতির চিন্তা গভীরভাবে করেছিলেন। তিনি তাঁর ঐতিহাসিক ও আধ্যাত্মিক দৃষ্টি দিয়ে অনুভব করেছিলেন—বহু-বিস্তৃত আচার-অনুষ্ঠান সত্ত্বেও ভারতের ধর্ম এখনো সঞ্জীবিত। দোষ ধর্মের নয়, দোষ মানুষের। ধর্মের নামে ধর্ম-ব্যবসায়ী গোঁড়া পণ্ডিত ও পুরোহিতদের সমাজের ওপর আধিপত্যই সমাজ-জীবনের পঙ্গুত্বের অন্যতম কারণ। তাঁরাই সৃষ্টি করেছেন অসংখ্য শাখা-প্রশাখাসমন্বিত জাতিবিভাগ। ভারতীয় জাতির অখণ্ডতাবোধ জাগাতে হলে প্রয়োজন প্রচলিত সামাজিক সংস্কারের আমূল পরিবর্তন। ধর্ম-সাধনার অধিকার ও সামাজিক সুযোগ-সুবিধা দিতে হবে সর্বস্তরের মানুষকে। স্বামীজীর ধারণা হয়েছিল যে, শ্রীরামকৃষ্ণের প্রভাবে আপাত-বিচ্ছিন্ন ভারত ভাব ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে সম্প্রীতি, মিলন ও ঐক্যের ভূমিকে আবিষ্কার করতে পারবে, জাতীয় সংহতি রচনা করতে সমর্থ হবে। ভারতের পথে-প্রান্তরে, নগরে-শহরে, গ্রামেগঞ্জে পরিক্রমা করে স্বামীজীর ঐ ধারণা দৃঢ় হয়েছিল।

বৃন্দাবনের পথে মেথরের কাছ থেকে জোর করে তামাক খাওয়ার ঘটনায় স্বামীজী অনুভব করেছিলেন জাত্যাভিমান মানুষের মনে কত গভীরে প্রবেশ করেছে। হাতরাসে সহকারী স্টেশন মাস্টার শরৎচন্দ্র গুপ্তকে (পরবর্তী কালে স্বামী সদানন্দকে) স্বামীজী তাঁর মনোভাব প্রকাশ করে বলেছিলেন, যত দিন যাচ্ছে, ততই যেন স্পষ্টতররূপে তিনি বুঝছেন সনাতন ধর্মের লুপ্ত গৌরব পুনরুদ্ধার করাই। শ্রীরামকৃষ্ণের অভিপ্রেত কর্ম। ধর্মের শোচনীয় অধঃপতন এবং অনশনক্লিষ্ট ভারতবাসীর মর্মভেদী দুরবস্থা রোধ করে ভারতকে পুনরায় ধর্মের বৈদ্যুতিক শক্তিতে সঞ্জীবিত করতে হবে, ভারতের আধ্যাত্মিকতার দ্বারা সমগ্র জগৎ জয় করতে হবে।[১]

স্বামীজী তাঁর ভারত-পরিক্রমাকালে সুস্পষ্টভাবে বুঝতে পেরেছিলেন যে, ভারতের উচ্চ আধ্যাত্মিক তত্ত্ব বেদান্তদর্শন এবং ভারতীয় জনসাধারণের দুঃখ নিবারণের জন্য সেবাব্রত প্রচলন—উভয়ের সামঞ্জস্য করাই হবে শ্রীরামকৃষ্ণের অভীপ্সিত কর্ম।

পরিক্রমাকালে স্বামীজী অনুধাবন করেছিলেন, পুরাতনের নিন্দা বা সমালোচনার দ্বারা জাতির সংশোধন হতে পারে না। সর্বসাধারণের মধ্যে শিক্ষা-বিস্তার করাই হবে ভারতের উন্নতির অন্যতম পথ। বৈদেশিক শিক্ষাকে মূর্খের মতো অনুসরণ না করে দেশীয় শিক্ষার আদর্শ ও ঐতিহ্যের দিকে দৃষ্টি

১ দ্রঃ যুগনায়ক বিবেকানন্দ—স্বামী গম্ভীরানন্দ, ৪র্থ সং, ১৯৯১, পৃঃ ২০১

ফেরাতে হবে। দেশকে বুঝতে ও জানতে হবে। জাতীয় জীবনের গতি, বৃদ্ধি ও প্রসার কোন্‌দিকে, তার উদ্দেশ্য কোন্ লক্ষ্যের অভিমুখী তা দেখতে হবে। তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে, প্রচলিত সন্ন্যাসের দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তনেরও প্রয়োজন আছে। কাশীর পণ্ডিত প্রমদাদাস মিত্রকে স্বামীজী বলেছিলেন, সন্ন্যাসী হয়েছেন বলে হৃদয়কে পাষাণ করতে পারবেন না। বরং সন্ন্যাসীর হৃদয় গৃহস্থের চেয়েও কোমল হবে। তিনি অপরের দুঃখে যাতনা ভোগ করবেন।

ভাগলপুরের মথুরানাথ সিংহ স্বামীজীর মুখে নিঃস্বার্থ দেশপ্রেমের ব্যাখ্যা শুনেছিলেন। আলোয়ারের মানুষের কাছে স্বামীজী বলেছিলেন জাতীয় শিক্ষাদর্শের কথা, জাতীয় ইতিহাস ও ঐতিহ্য সম্পর্কে মৌলিক গবেষণার কথা। বলেছিলেন, জাতীয়তাবোধ জাগরণের প্রয়োজন। বলেছিলেন, ভারতীয় কৃষ্টি এবং পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের মিলনের কথা। আলমোড়াতে তিনি উপলব্ধি করেছিলেন, প্রাচীন ভারতের জাতীয় তান। আগ্রা, দিল্লীর ঐতিহাসিক কীর্তিদর্শনে তিনি উপলব্ধি করেছিলেন ভারতীয় সভ্যতায় মুসলিম সংস্কৃতির অবদান। পূর্ব, পশ্চিম, উত্তর ও দক্ষিণ ভারতে গ্রামের পর গ্রাম, জনপদের পর জনপদ পরিভ্রমণ করে তিনি বুঝেছিলেন, কোন ঘাত-প্রতিঘাতেই ভারতীয় সভ্যতার কোনদিন বিনাশ হবে না। বুঝেছিলেন ভারতীয় সভ্যতা কোন এক বিশেষ জাতির বা গোষ্ঠীর অবদানে গড়ে ওঠেনি। আর্য, দ্রাবিড়, আদিবাসী, গিরিবাসী, হিন্দু, বৌদ্ধ, মুসলমান, খ্রীষ্টান প্রভৃতি সকলের অবদানেই তা গড়ে উঠেছে।

ভারত-পরিক্রমার পর্বে তিনি প্রাচীন ভারতের মহিমার পরিচয় পেয়ে, ভারতের সাধারণ মানুষের ধর্মভাব, সততা এবং চরিত্রের ঐশ্বর্যের পরিচয় পেয়ে উৎফুল্ল হয়েছেন; আবার উচ্চবর্ণের মানুষের স্বার্থপরতা, শোষণের নগ্ন রূপ দেখে, ব্রিটিশ শাসকবর্গের নিপীড়ন ও অত্যাচারের ভয়াবহ চেহারা দেখে পীড়িত হয়েছেন, গভীর মর্মবেদনায় দগ্ধ হয়েছেন।

ভারত-পরিক্রমার সময় যেখানেই কোন সামন্ত রাজা বা মহারাজা বা পণ্ডিতের সংস্পর্শে স্বামীজী এসেছিলেন, সেখানেই তিনি—ভারতের কল্যাণ কোন্ পথে—তার আলোচনা তাঁদের সঙ্গে করেছিলেন। বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে চাষের উন্নতি, শিল্পের উন্নতি, গ্রামের উন্নতিই হবে ভারতের উন্নতি —একথা তিনি ঐকালেই বলেছেন।

ভারত-পরিক্রমার শেষ পর্বে কন্যাকুমারীতে শেষ শিলাখণ্ডে ধ্যানমগ্ন স্বামীজীর মানসনেত্রে অখণ্ড ভারতের অতীত ও ভবিষ্যৎ চিত্র উদ্ভাসিত হয়েছিল। এই উপলব্ধির কথা তিনি শিকাগো থেকে গুরুভাই স্বামী রামকৃষ্ণানন্দকে ১৯ মার্চ ১৮৯৪ তারিখের পত্রে লিখেছিলেন: "[ দেশের ] এই সব [ অধঃপতন ] দেখে—বিশেষ দারিদ্র্য আর অজ্ঞতা দেখে আমার ঘুম হয় না; একটা বুদ্ধি ঠাওরালুম Cape Comorin-এ ( কুমারিকা অন্তরীপে ) মা কুমারীর মন্দিরে বসে, ভারতবর্ষের শেষ পাথর-টুকরার উপর বসে—এই যে আমরা এতজন সন্ন্যাসী আছি, ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছি, লোককে Metaphysics ( দর্শন ) শিক্ষা দিচ্ছি, এসব পাগলামি। 'খালি পেটে ধর্ম হয় না'—গুরুদেব বলতেন না? ঐ যে গরিবগুলো পশুর মতো জীবনযাপন করছে, তার কারণ মূর্খতা; পাজী বেটারা [ উচ্চবর্ণরা ] চার যুগ ওদের রক্ত চুষে খেয়েছে, আর দু-পা দিয়ে দলেছে।··· আমাদের জাতটা নিজের বিশেষত্ব হারিয়ে ফেলেছে, সেইজন্য ভারতের এত দুঃখ কষ্ট। সেই জাতীয় বিশেষত্বের বিকাশ যাতে হয়, তাই করতে হবে—নীচু জাতিকে তুলতে হবে।··· তাদের উঠাবার যে শক্তি, তাও আমাদের নিজেদের ভেতর থেকে আনতে হবে—গোঁড়া হিন্দুদেরই একাজ করতে হবে। সব দেশেই যাকিছু দোষ দেখা যায়, তা তাদের ধর্মের দোষ নয়, ধর্ম ঠিক ঠিক পালন না করার দরুণই এইসব দোষ দেখা যায়। সুতরাং ধর্মের কোন দোষ নাই, লোকেরই দোষ। এই করতে গেলে প্রথম চাই লোক, দ্বিতীয় চাই পয়সা। গুরুর কৃপায় প্রতি শহরে আমি দশ-পনেরো জন লোক পাব। পয়সার চেষ্টায় তারপর ঘুরলাম। ভারতবর্ষের লোক পয়সা দেবে!!··· তাই আমেরিকায় এসেছি, নিজে রোজগার করব, করে দেশে যাব, আর আমার বাকী জীবন এই এক উদ্দেশ্যসিদ্ধির জন্য নিয়োজিত করব।"[২]

২ স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা, ৬ষ্ঠ খণ্ড, ১ম সং, পৃঃ ৪১২-৪১৩

॥ ২ ॥

স্বামীজীর উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়েছিল আমেরিকায় শিকাগো ধর্মমহাসভায়। সেখানে পাশ্চাত্যবাসীদের হৃদয় জয় করে সে-উদ্দেশ্যের জয়যাত্রা আরম্ভ হয়েছিল। ভারত-পরিক্রমাকালে কাশীতে স্বামীজী বলেছিলেন: "আমি সমাজের উপর বোমার মতো ফেটে পড়ব।" স্বামীজীর এই ভবিষ্যদ্বাণীর সত্যতা পরিলক্ষিত হয়েছিল শিকাগো ধর্মমহাসভায় ১৮৯৩ খ্রীস্টাব্দের ১১ সেপ্টেম্বর। বোমার মতোই স্বামীজী পাশ্চাত্য সভ্যতার ওপর সহসা আবির্ভূত হয়েছিলেন। অবশ্য সে-বোমা আণবিক বোমা নয়, সে-বোমা সাংস্কৃতিক-বোমা। এই বোমা ধ্বংসাত্মক নয়, পুরোপুরি গঠনমূলক। তবে ধ্বংসও করেছিল বইকি! সেই ধ্বংস আবর্জনাকে—সভ্যতার যা পরিপন্থী তাকে। একদিকে এই সাংস্কৃতিক-বোমা-বিস্ফোরণ পাশ্চাত্য চিন্তা ও কৃষ্টির ভিত্তিমূলকে প্রবলভাবে আন্দোলিত করেছিল, ভূমিসাৎ করেছিল পাশ্চাত্যবাসীদের শ্রেষ্ঠত্বের দাবিকে, বিনাশ করেছিল তাঁদের ধর্মীয় গোঁড়ামিকে—যেমন, প্রতিহিংসাপরায়ণ ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বাস এবং সহজাত পাপবাদ প্রভৃতি নৈরাশ্যব্যঞ্জক ভাবকে। অপরদিকে ধর্মমহাসভায় স্বামীজীর আবির্ভাবের গঠনাত্মকভাবের অধিকতর মূল্যবান তাৎপর্য আজও বিদ্যমান। স্বামীজী পাশ্চাত্যের মানুষকে দিয়েছিলেন নতুন এক জগতের সন্ধান, মানবাত্মার গরিমার কাহিনী, প্রদান করেছিলেন মানুষের ধর্মের অনুসন্ধিৎসার নবপ্রেরণা, জীবনে উচ্চতর লক্ষ্য ও আনন্দের অন্বেষণের নবীন আবেগ। পারস্পরিক আদান-প্রদানের ভিত্তির ওপর শ্রীরামকৃষ্ণ-প্রচারিত ধর্ম-সমন্বয়ের এক নতুন আদর্শ উপস্থাপিত করেছিলেন তিনি। পাশ্চাত্যবাসীদের নিকট স্বামীজী প্রতিভাত হয়েছিলেন ভারতের সুপ্রাচীন আধ্যাত্মিক সংস্কৃতির মূর্ত বিগ্রহরূপে। পাশ্চাত্যজগৎ ভারতবর্ষকে নতুনভাবে আবিষ্কার করেছিল স্বামীজীর মাধ্যমে।

ভারতীয় সমাজের ওপর ধর্মমহাসভায় স্বামীজীর উজ্জ্বল আবির্ভাবের প্রভাবও একইভাবে তাৎপর্যময়। বস্তুতঃ ধর্মমহাসভায় স্বামীজীর ঐতিহাসিক সাফল্য ভারতের নবজাগরণের সূচনা করেছিল। ভারতের মানুষকে আত্মসম্বিৎ ফিরিয়ে দিয়েছিল, তাদের হীনম্মন্যতা দূর করেছিল, ভারতের গৌরবময় ঐতিহ্য ও উত্তরাধিকার সম্পর্কে ভারতবাসীকে অবহিত করেছিল।

যখন আমরা ১৮৯৩ খ্রীস্টাব্দের শিকাগো ধর্ম-মহাসভার কথা চিন্তা করি, তখন স্বামীজীর একটি বাণী আমাদের মনে উদিত হয়। স্বামীজী বলেছিলেন যে, ধর্মমহাসভা তাঁরই জন্য অনুষ্ঠিত হতে চলেছে।[৩] কথাটি খুবই তাৎপর্যমণ্ডিত। স্বামীজী বলতে চেয়েছিলেন যে, ধর্মমহাসভা ছিল মানবজাতির জন্য ভারতের এবং শ্রীরামকৃষ্ণের বাণী-প্রচারের বিশ্বক্ষেত্র। স্বামীজী শুধু যন্ত্রমাত্র। তিনি ছিলেন যেমন তাঁর গুরুর তেমনি ভারতাত্মার অশরীরী বাণী। রোমাঁ রোলাঁ লিখেছেন: শ্রীরামকৃষ্ণ ছিলেন ভারতের কোটি কোটি জনসাধারণের বিগত দুহাজার বছরের আধ্যাত্মিক সাধনার পরিপূর্তি।[৪] শ্রীরামকৃষ্ণ কেবলমাত্র ভারতের প্রাচীন আধ্যাত্মিক সম্পদের পুনঃপ্রতিষ্ঠা করেননি, তাঁর নিজস্বতাও কিছু ছিল। বস্তুতঃ ধর্মমহাসভা হয়ে দাঁড়াল মানবজাতির জন্য ভারত এবং শ্রীরামকৃষ্ণের বিশ্বজনীন বাণীর প্রচারক্ষেত্র। সুতরাং ধর্মমহাসভায় স্বামীজীর আবির্ভাবের তাৎপর্য সুগভীর এবং সুদূরপ্রসারী।

স্বামীজী বহুবার তাঁর 'মিশন'-এর কথা বলেছিলেন। তাঁর 'মিশন'-এর প্রধান উদ্দেশ্য, তাঁর বাণীর মূল বক্তব্য—স্বয়ং নারায়ণই নররূপে প্রকট। স্বামীজীর বাণীর মূল মর্ম হলো মানুষের দেবত্ব। তিনি বলেছেন: "প্রত্যেক জীব অব্যক্ত ঈশ্বর। অন্তর্নিহিত এই দেবত্বের প্রকাশ করাই জীবের লক্ষ্য।" মানুষকে নিয়েই স্বামীজীর চিন্তা-ভাবনা সর্বাধিক। স্বামীজী বলছেন, মানুষকে তার সহজাত দেবত্ব জাগরিত করার আশ্বাসবাণী শোনাতে হবে। মানবাত্মার বিশেষ বৈশিষ্ট্য—অমৃতত্ব, স্বাধীনতা ও আনন্দ। ধর্ম হলো সেই অন্তর্নিহিত দেবত্বের প্রকাশের বিজ্ঞান। মানুষের সমগ্র জীবনের প্রচেষ্টা—নিম্নতর সত্য থেকে উচ্চতর সত্যে আরোহণ

৩ দ্রঃ Spiritual Talks by the First Disciples of Sri Ramakrishna, 1991, pp. 245-246

৪ The Life of Ramakrishna, 1979, p. 13

করা, মিথ্যা থেকে সত্যে নয়। ভারতের প্রাচীন ঋষিরা বলেছিলেন : "শৃন্বন্তু বিশ্বে অমৃতস্য পুত্রাঃ।" শতাব্দীর পর শতাব্দী মানুষকে সেই মন্ত্র অনুপ্রাণিত করেছে। আজ মানুষ তা ভুলে গেছে। স্বামীজীর কম্বুকণ্ঠে ধর্মমহাসভায় তা উচ্চারিত ও পুনরুচ্চারিত হয়েছিল।

মানুষের জীবনে চারটি পুরুষার্থ—ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ সমভাবে গুরুত্বপূর্ণ। "যে যেখানে আছে, সেখান থেকেই তাকে সাহায্য কর"—স্বামীজী বলতেন। স্বামীজী প্রতিষ্ঠিত রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনেরও একই লক্ষ্য—'মানুষের অন্তর্নিহিত দেবত্বের প্রকাশ' করা।

স্বামীজীর বাণীর আর একটি প্রধান ভাব—মানবজাতির ঐক্য। জাতি, ধর্ম, বর্ণ, দেশের পার্থক্য সত্ত্বেও জীবনের যেকোন ক্ষেত্রে নর-নারী যে যেখানেই থাকুক না কেন, স্বরূপতঃ এক। যেখানে অন্যদের দৃষ্টিতে পার্থক্য গোচর হচ্ছে, সেখানে স্বামীজীর দৃষ্টিভঙ্গি একত্ব। জ্ঞাতসারে অথবা অজ্ঞাতসারে মানুষ সেই ঐক্যের আদর্শ রূপায়িত করতে সংগ্রাম করে চলেছেন। ভারত-পরিক্রমাকালে স্বামীজী এই সত্যকে প্রত্যক্ষভাবে উপলব্ধি করে-ছিলেন আর তাকে বহির্বিশ্বে প্রচার করেছিলেন শিকাগো ধর্মসভার মঞ্চে। অর্থাৎ স্বামীজীর ভারত-পরিক্রমা ছিল বস্তুতপক্ষে সর্ব অর্থেই শিকাগো ধর্মমহাসভায় স্বামীজীর আবির্ভাব ও বাণী প্রচারের প্রস্তুতি-পর্ব। উভয় ঘটনার শতবর্ষ উপলক্ষে এসমস্ত কথা আজ আমাদের স্মরণ করা এবং অপর সকলকে স্মরণ করানো অত্যন্ত প্রয়োজন। □

পরমপদকমলে

# মূর্ত মহেশ্বর

## সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়

"হে প্রভু, আমার ভ্রাতৃগণের ভয়ংকর যাতনা আমি দেখেছি, যন্ত্রণামুক্তির পথ আমি খুঁজেছি এবং পেয়েছি—প্রতিকারের জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করেছি, কিন্তু ব্যর্থ হয়েছি। তোমার ইচ্ছাই পূর্ণ হোক, প্রভু!" স্বামীজী বস্টন থেকে মে ১৮৯৪ খ্রীষ্টাব্দে অধ্যাপক জে. এইচ. রাইটকে কথাগুলি লিখেছিলেন। স্বামীজী বলছেন : "আমি দেখেছি"। এই দেখার ওপরেই দাঁড়িয়ে আছে স্বামীজীর জীবনদর্শন, ধর্ম ও কর্মকাণ্ড। তিনি ছিলেন একঅর্থে সমাজ-বিজ্ঞানী। গোটা ভারতটা ঘুরে দেখে নিলেন সবার আগে। এই আমার কর্মভূমি। কার বিরুদ্ধে সংগ্রাম। সংগ্রাম নিরক্ষরতা, কুসংস্কার, দারিদ্র্য, বর্ণবৈষম্য, নারীশক্তির অবমাননার বিরুদ্ধে। সংগ্রাম ভারতবাসীর উদাসীনতার বিরুদ্ধে। যাদের আছে, যারা কিছু করতে পারে অথচ করে না, তাদের নিরেট স্বার্থপরতার বিরুদ্ধে।

খেতড়ির পণ্ডিত শংকরলালকে পরিব্রাজক স্বামীজী বোম্বাই থেকে ২০ সেপ্টেম্বর ১৮৯২ তারিখে লিখছেন : "আমাদিগকে ভ্রমণ করিতেই হইবে, আমাদিগকে বিদেশে যাইতেই হইবে। আমাদিগকে দেখিতেই হইবে, অন্যান্য দেশে সমাজ-যন্ত্র কিরূপে পরিচালিত হইতেছে। আর যদি আমাদিগকে যথার্থই পুনরায় একটি জাতিরূপে গঠিত হইতে হয়, তবে অপর জাতির চিন্তার সহিত আমাদের অবাধ সংস্রব রাখিতে হইবে। সর্বোপরি আমাদিগকে দরিদ্রের উপর অত্যাচার বন্ধ করিতে হইবে।"

স্বামীজীর কী ভয়ংকর দর্শন-ক্ষমতা, অবজার-ভেশান, কস্টিক রিমার্ক! একজন ভাঙ্গির জীবন সম্পর্কে ঐ চিঠিতে স্বামীজী লিখছেন : সমাজের হিংস্রতম অশ্রুধার বোঝা বইছে। সর্বত্রই চিৎকার—'তফাৎ যাও'! যেন সংক্রামক ব্যাধি। 'ছুঁস না, ছুঁস

না!' এইবার যদি কোন পাদ্রী সাহেব তার মাথায় জল ছিটিয়ে মন্ত্র পড়ে খ্রীস্টান করে দেয়, সঙ্গে সঙ্গে সে জাতে উঠে গেল। গোঁড়া বর্ণহিন্দুরাও তাকে আদর করে বসার চেয়ার এগিয়ে দেবে। করবে সপ্রেম করমর্দন।

এই হলো তখনকার ভারত! এই হলো তখনকার উচ্চবর্ণের মানসিকতা! দক্ষিণ ভারতে আর এক খেলা। সেখানে স্বামীজী দেখলেন, লক্ষ লক্ষ ব্রাত্য মানুষকে খ্রীস্টান করা হচ্ছে। উচ্চবর্ণের অনাদরই এর জন্যে দায়ী। গভীর বেদনা ও ক্ষোভের সঙ্গে স্বামীজী পণ্ডিত শংকরলালকে লিখলেন: "পৌরোহিত্যের অত্যাচার ভারতের সর্বাপেক্ষা যেখানে বেশি, সেই ত্রিবাঙ্কুরে, যেখানে ব্রাহ্মণগণ সমুদয় ভূমির স্বামী, এবং স্ত্রীলোকেরা—এমনকি রাজবংশীয় মহিলাগণ পর্যন্ত—ব্রাহ্মণগণের উপপত্নীরূপে বাস করা খুব সম্মানের বিষয় জ্ঞান করিয়া থাকে, তথাকার সিকিভাগ খ্রীস্টান হইয়া গিয়াছে।"

এই ভারতচিত্রে ক্ষুব্ধ স্বামীজী হিন্দুধর্মের মর্মোদ্ধারে আগ্রহী। ধর্মের গভীরে কি কোন সত্যই নেই? স্বামীজী বললেন, হিন্দুধর্মের মতো কোন ধর্মই এত উচ্চতানে মানবাত্মার মহিমা প্রচার করে না, অথচ আচরণে সেই ধর্ম কি পৈশাচিক! গরিব আর পতিতের গলায় পা তুলে দেয়। জগতের আর কোন ধর্ম তো এমন করে না। তাহলে হিন্দুধর্মের গর্বের আর রইল কি। না, এতে ধর্মের কোন দোষ নেই। ধর্ম ঠিকই আছে, আকাশের মতো উদার। আমেরিকা থেকে ২০ আগস্ট ১৮৯৩ আলাসিঙ্গাকে স্বামীজী লিখছেন: "তবে হিন্দুধর্মের অন্তর্গত আত্মাভিমানী কতকগুলি ভণ্ড 'পারমার্থিক' ও 'ব্যবহারিক' নামক মত দ্বারা সর্বপ্রকার অত্যাচারের আসুরিক যন্ত্র ক্রমাগত আবিষ্কার করিতেছে।"

স্বামীজীর সংগ্রাম ছিল একক সংগ্রাম। একাই লড়াই করে গেছেন যত বিরূপ শক্তির সঙ্গে। বিশ্বগোলকটিকে দুহাতে ধরে এমন নাড়া দিয়ে গেছেন, যে-আন্দোলন আজও স্থির হয়নি। অন্ধকারের শক্তি, বিষাক্ত শৈবাল কিছু ঝরে গেলেও, ক্লেদ এখনো আছে। ধর্ম সমদর্শী হলেও ধর্মের ধারকরা কেউই আদর্শ নয়। স্বামীজীকেও যারা জোচ্চোর, বদমাইশ বলেছে, উপহাস করেছে, ঘৃণা করেছে তাদের সম্পর্কে স্বামীজীর একটিই কথা: "আমি এসমস্তই সহ্য করিয়াছি তাহাদেরই জন্যে, যাহারা আমাকে উপহাস ও ঘৃণা করিয়াছে।" (দ্রঃ আলাসিঙ্গাকে লেখা পূর্বোক্ত পত্র) বলছেন: ঈশ্বর তোমাদের মঙ্গল করুন।। তোমাদের আঘাত যত প্রবল হবে, আমার শক্তি তত দুর্বার হবে। এই মানুষই একদা পরিত্রাতা যীশুকে ক্রুশবিদ্ধ করেছিল। দিস ইজ দ্য ফেট অফ ম্যানকাইন্ড। বৎস এ-জগৎ দুঃখের আগার। অবশ্যই। কিন্তু এ যে আবার মহাপুরুষগণের শিক্ষালয়স্বরূপ। মানুষের আঘাতেই কোন কোন মানুষের শক্তির উৎসমুখ বিদীর্ণ হয়। অর্জুন ভূমিতে একটি তীর নিক্ষেপ করলেন অমনি শতধারায় জল উৎক্ষিপ্ত হয়ে পিতামহ ভীষ্মের তৃষ্ণা তৃপ্ত করল। তোমরা পেটাও আমি তরোয়াল হই। তোমরা বিদ্বেষের আগুন জ্বালিয়ে যাও, আমার স্টীল টেম্পার্ড হোক। যারা আমাকে ভণ্ড বলছে, তাদের জন্যে আমার দুঃখ হয়। তাদের কোন দোষ নেই। তারা শিশু, অতি শিশু, যদিও সমাজে তারা মহাগণ্যমান্যের আসনে প্রতিষ্ঠিত। নিজেদের ক্ষুদ্র দৃষ্টিসীমার বাইরে তারা আর কিছু দেখতে পায় না। তাদের নিয়মিত কাজ হলো আহার, পান, অর্থোপার্জন আর বংশবৃদ্ধি। অঙ্কের নিয়মে পরপর করে চলেছে। এর অতিরিক্ত তাদের মাথায় আসে না। তারা যথেষ্ট সুখী। তাদের ঘুমের ব্যাঘাত কিছুতেই হয় না। স্বামীজী যেন তাঁর রক্ত দিয়ে লিখলেন কথাগুলি: "শত শত শতাব্দীর পাশব অত্যাচারের ফলে সমুত্থিত শোক, তাপ, দৈন্য ও পাপের যে কাতরধ্বনিতে ভারতাকাশ সমাকুল হইয়াছে, তাহাতেও তাহাদের জীবন সম্বন্ধে দিবাস্বপ্নের ব্যাঘাত হয় না। সেই শত শত যুগব্যাপী মানসিক, নৈতিক ও দৈহিক অত্যাচারের কথা যাহাতে ভগবানের প্রতিমাস্বরূপ মানুষকে ভারবাহী গর্দভে এবং ভগবতীর প্রতিমারূপা নারীকে সন্তান ধারণ করিবার দাসীস্বরূপা করিয়া ফেলিয়াছে এবং জীবন বিষময় করিয়া তুলিয়াছে, একথা তাহাদের স্বপ্নেও

মনে উদিত হয় না।" আমার ভারত এই ভোগী, স্বার্থপর, পরশ্রেষী, আত্মপর, পরনিন্দক ব্যবহারিকদের নিয়ে নয়। আছে, মানুষ আছে। তাঁরা প্রাণে প্রাণে বুঝছেন, হৃদয়ের রক্তময় অশ্রুবিসর্জন করছেন। তাঁরা মনে করেন, এর প্রতিকার আছে। শুধু প্রতিকার আছে নয়, প্রাণ পর্যন্ত পণ করে এর প্রতিকারে প্রস্তুত আছেন। স্বামীজী বললেন: "ইহাদিগকে লইয়াই স্বর্গরাজ্য বিরচিত। ইহা কি স্বাভাবিক নহে যে, উচ্চস্তরে অবস্থিত এই সকল মহাপুরুষের—ঐ বিষোদ্গিরণকারী ঘৃণ্য কীটগণের প্রলাপবাক্য শুনিবার মোটেই অবকাশ নাই?"

স্বামীজীর কোনকালেই এদের ওপর ভরসা ছিল না। ঐ যারা গণ্যমান্য, উচ্চপদস্থ অথবা ধনী, জীবনীশক্তিহীন একদল স্বার্থপর—তারা মৃতকল্প। নিজেদের জগতে তারা ভোগের বেহালা বাজাচ্ছে। ভরসা তাহলে কাদের ওপর? স্বার্থহীন ভাষায় আলাসিঙ্গাকে তিনি লিখলেন: "ভরসা তোমাদের উপর—পদমর্যাদাহীন, দরিদ্র, কিন্তু বিশ্বাসী—তোমাদের উপর।" ওদের ভারত নয়, তোমাদের ভারত। সংগ্রামের একটিই হাতিয়ার। বিশ্বাস বললেন: "ভগবানে বিশ্বাস রাখো। কোন চালাকির প্রয়োজন নাই; চালাকির দ্বারা কিছুই হয় না।"

অনুভব কর। "দুঃখীদের ব্যথা অনুভব কর।" আর সাহায্য চাও ভগবানের কাছে। সাহায্য আসবেই আসবে। বারোটা বছর আমি এই ভার নিয়ে, ধনীদের দ্বারে দ্বারে ঘুরেছি। বেরিয়ে এসো ভোগের লেপের তলা থেকে। ভারত গড়। তারা আমাকে জোচ্চোর ভেবেছে। এই গরিব, অজ্ঞ, অত্যাচার-পীড়িত ভারতের দায় আমি তোমাদের সমর্পণ করছি। জাগো, যুবশক্তি জাগো। অপূর্ব ভাষায় স্বামীজী বলছেন: "যাও, এই মুহূর্তে সেই পার্থসারথির মন্দিরে—যিনি গোকুলের দীনদরিদ্র গোপগণের সখা ছিলেন, যিনি গুহক চণ্ডালকে আলিঙ্গন করিতে সঙ্কুচিত হন নাই, যিনি তাঁহার বুদ্ধ-অবতারে রাজপুরুষগণের আমন্ত্রণ অগ্রাহ্য করিয়া এক বেশ্যার নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিয়া তাহাকে উদ্ধার করিয়াছিলেন; যাও, তাঁহার নিকট গিয়া সাষ্টাঙ্গে পড়িয়া যাও, এবং তাঁহার নিকট এক মহাবলি প্রদান কর; বলি—জীবন-বলি তাহাদের জন্য, যাহাদের জন্য তিনি যুগে যুগে অবতীর্ণ হইয়া থাকেন, যাহাদের তিনি সর্বাপেক্ষা ভালবাসেন, সেই দীন দরিদ্র পতিত উৎপীড়িতদের জন্য। তোমরা সারা জীবন এই ত্রিশ কোটি ভারতবাসীর উদ্ধারের জন্য ব্রত গ্রহণ কর, যাহারা দিন দিন ডুবিতেছে।"

অধ্যাপক রাইটকে ৪ সেপ্টেম্বর ১৮৯৩ সেলেম থেকে স্বামীজী লিখছেন:

"পাহাড়ে পর্বতে উপত্যকায়,
গির্জায়, মন্দিরে, মসজিদে—
বেদ বাইবেল আর কোরানে
তোমাকে খুঁজেছি আমি ব্যর্থ ক্রন্দনে।
মহারণ্যে পথভ্রান্ত বালকের মতো
কেঁদে কেঁদে ফিরেছি নিঃসঙ্গ,
তুমি কোথায়—কোথায়
আমার প্রাণ, ওগো ভগবান?
নাই, প্রতিধ্বনি শুধু বলে, নাই।

দিন, রাত্রি, মাস, বর্ষ কেটে যায়,
আগুন জ্বলতে থাকে শিরে,
কিভাবে দিন রাত্রি হয় জানি না,
হৃদয় ভেঙে যায় দুভাগ হয়ে।
গঙ্গার তীরে লুটিয়ে পড়ি বেদনায়,
রোদে পুড়ি, বৃষ্টিতে ভিজি,
ধূলিকে সিক্ত করে তপ্ত অশ্রু,
হাহাকার মিশে যায় জনকলরবে;
সকল দেশের সকল মতের মহাজনদের
নাম নিয়ে ডেকে উঠি অধীর হয়ে,
বলি, আমাকে পথ দেখাও, দয়া কর,
ওগো, তোমরা যারা পৌঁছেছ পথের প্রান্তে।"

এই মহা অন্বেষণের উত্তর ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ দিয়ে গিয়েছিলেন। সেদিনের ঘটনা। ঠাকুর বসে আছেন ভক্তসঙ্গে। আছেন নরেন্দ্রনাথ। ঠাকুর বলছেন, ভক্ত ও ভগবান, কৃষ্ণ ও বৈষ্ণব অভেদ জ্ঞান করে সর্বদা সাধু-ভক্তদের শ্রদ্ধা, পূজা আর বন্দনা করবে, আর কৃষ্ণেরই জগৎ-সংসার একথা হৃদয়ে ধারণা করে সর্বজীবে দয়া করবে। 'সর্বজীবে দয়া' পর্যন্ত

বলে ঠাকুর সমাধিস্থ। কিছুক্ষণ পরে অর্ধবাহ্যদশায় বললেন ঃ "জীবে দয়া—জীবে দয়া? দূর শালা; কীটানুকীট তুই জীবকে দয়া করবি? দয়া করবার তুই কে? না, না, জীবে দয়া নয়—শিবজ্ঞানে জীবের সেবা।"

ঠাকুরের ভাবভঙ্গের পর নরেন্দ্রনাথ ঘরের বাইরে এসে বললেন ঃ কি অদ্ভুত আলোকই আজ ঠাকুরের কথায় দেখতে পেলুম। শুষ্ক, কঠোর, নির্মম বেদান্তজ্ঞানকে ভক্তির সঙ্গে মিলিয়ে কি সহজ, সরল ও মধুর আলোকই প্রদর্শন করলেন। সর্বভূতে যতদিন না ঈশ্বরকে দেখতে পাওয়া যায়, তত দিন যথার্থ ভক্তি বা পরাভক্তি লাভ সাধকের পক্ষে সুদূরপরাহত। ভগবান যদি কখনও দিন দেন তো আজ যা শুনলুম এই অদ্ভুত সত্য সংসারে সর্বত্র প্রচার করব—পণ্ডিত, মূর্খ, ধনী-দরিদ্র, ব্রাহ্মণ চণ্ডাল সকলকে শুনিয়ে মোহিত করব।

পর্যটক স্বামী বিবেকানন্দ যত দেখছেন ততই জ্বলে উঠছেন, যেন এক অগ্নিগোলক। আমেরিকার পথে জাপানের ইয়োকোহামা থেকে ১০ জুলাই ১৮৯৩ লিখছেন নিজের শিক্ষিত দেশবাসীকে তিরস্কার করে ঃ "তোমরা কি করছ? সারাজীবন কেবল বাজে বকছ। এস, এদের দেখে যাও, তারপর যাও—গিয়ে লজ্জায় মুখ লুকোও গে। ভারতের যেন জরাজীর্ণ অবস্থা হয়ে ভীমরতি ধরেছে! তোমরা—দেশ ছেড়ে বাইরে গেলে তোমাদের জাত যায়!! এই হাজার বছরের ক্রমবর্ধমান জমাট কুসংস্কারের বোঝা ঘাড়ে নিয়ে বসে আছ? হাজার বছর ধরে খাদ্যাখাদ্যের শুদ্ধাশুদ্ধতা বিচার করে শক্তিক্ষয় করছ। পৌরোহিত্যরূপ আহাম্মকির গভীর ঘূর্ণিতে ঘুরপাক খাচ্ছ! শত শত যুগের অবিরাম সামাজিক অত্যাচারে তোমাদের সব মনুষ্যত্বটা একেবারে নষ্ট হয়ে গেছে!… তোমরা বই হাতে করে সমুদ্রের ধারে পায়চারি করছ! ইউরোপীয় মস্তিষ্কপ্রসূত কোন তত্ত্বের এক কণামাত্র—তাও খাঁটি জিনিস নয়—সেই চিন্তার বদহজম খানিকটা ক্রমাগত আওড়াচ্ছ, আর তোমাদের প্রাণমন সেই ৩০ টাকার কেরানিগিরির দিকে পড়ে রয়েছে; না হয় খুব জোর একটা দুষ্ট উকিল হবার মতলব ক । এই হলো ভারতীয় যুবকগণের সর্বোচ্চ আকাঙ্ক্ষা। প্রত্যেকের আশেপাশে একপাল ছেলে—তাঁর বংশধরগণ—'বাবা খাবার দাও, খাবার দাও' বলে মহা চীৎকার তুলেছে!! বলি, সমুদ্রে কি জলের অভাব হয়েছে যে, তোমাদের বই, গাউন, বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিপ্লোমা প্রভৃতি সমেত তোমাদের ডুবিয়ে ফেলতে পারে না?"

স্বামীজীর উদাত্ত আহ্বান—"এস, মানুষ হও। প্রথমে দুষ্ট পুরুতগুলোকে দূর করে দাও। কারণ এই মস্তিষ্কহীন লোকগুলো কখন শুধরোবে না। তাদের হৃদয়ের কখনো প্রসার হবে না।" বলছেন ঃ নিজেদের সংকীর্ণ গর্ত থেকে বেরিয়ে এস। পৃথিবীর দিকে তাকাও—সি দ্য প্রগ্রেস। দেশকে যদি ভালবাস তাহলে উন্নত হবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা কর। বলছেন ঃ "পেছনে চেও না, অতি প্রিয় আত্মীয়স্বজন কাঁদুক; পেছনে চেও না, সামনে এগিয়ে যাও। ভারতমাতা অন্ততঃ সহস্র যুবক বলি চান। মনে রেখো—মানুষ চাই, পশু নয়।" রাখো তোমাদের ঘণ্টা নাড়া। রাখো তোমাদের সেই ছেঁড়াছিড়ি তর্ক, শ্রীরামকৃষ্ণ মানব না অবতার! আমার প্রভু গুরু হতে চাননি, তাঁর গেরুয়ার বাণী—সেবা। তাঁর শেষ কথা—"তোমাদের চৈতন্য হোক।" মহা হুংকারে ভারত গঠনের কাজ আরম্ভ করে দাও। ভয় কি? কার সাধ্য বাধা দেয়?

স্বামীজী লিখছেন গুরুভাইদের (নিউ ইয়র্ক ২৫ সেপ্টেম্বর, ১৮৯৪) ঃ

"কুর্মস্তারকচর্বণং ত্রিভুবনমুৎপাটয়ামো বলাৎ।
কিং ভো ন বিজানাস্যস্মান্—রামকৃষ্ণদাসা বয়ম্।

"ডর? কার ডর? কাদের ডর?

"আমরা তারকা চর্বণ করব, ত্রিভুবন সবলে উৎপাটন করব, আমরা কে জান না? আমরা রামকৃষ্ণ-দাস।"

দেহকে যারা আত্মা বলে জানে তারা ক্ষীণ, দীন, তারাই নাস্তিক। আমরা যখন অভয়পদে আশ্রিত, তখন আমরা ভয়শূন্য বীর। এইটাই আস্তিক্য। "রামকৃষ্ণদাসা বয়ম্"। □

বিশেষ রচনা

# জীবনশিল্পী বিবেকানন্দ : শিকাগো ভাষণের মর্মবাণী

বিশ্বনাথ চট্টোপাধ্যায়

শুধু দিনযাপন করা, শুধু প্রাণধারণ করার গ্লানি থেকে স্বামী বিবেকানন্দ ভারতবাসীকে মুক্তি দিতে চেয়েছিলেন। তাঁর সংকল্প ছিল, তিনি তাদের বাঁচতে শেখাবেন। সত্যিকারের বাঁচা—বেঁচে মরে থাকা নয়। ভালভাবে মানুষের মতো বেঁচে থাকার প্রণালী অনেকেরই জানা নেই। এ-প্রণালীকে এক ধরনের শিল্প বা কলা হিসাবে গণ্য করা যেতে পারে। একে আমরা জীবনশিল্প বলতে পারি। আমাদের শাস্ত্রাদিতেও এধরনের ধারণা প্রচ্ছন্ন আছে এবং সে-কারণেই ব্রহ্মচর্য, গার্হস্থ্য, বানপ্রস্থ এবং সন্ন্যাস—এই চতুর্বিধ আশ্রমের পরিকল্পনা করা হয়েছে। আদর্শ হিন্দু তিনি যিনি এ-আদর্শ মেনে চলেন। তাঁর যে-ধর্মমত সেটাই হিন্দুধর্ম—এবং এই সনাতন হিন্দুধর্মই ছিল শিকাগো নগরীতে সর্বধর্ম-মহাসমিতির অধিবেশনের নবম দিবসে (অর্থাৎ ১৯ সেপ্টেম্বর ১৮৯৩) পঠিত বিবেকানন্দের প্রধান প্রবন্ধের বিষয়বস্তু।

### সেনানায়ক ও সহযোদ্ধা বিবেকানন্দ

তাঁর প্রতিটি ভাষণে ও রচনায় বিবেকানন্দ আমাদের—এবং কখনো কখনো বিদেশীদেরও—এই জীবনশিল্পের দীক্ষায় দীক্ষিত করেছেন এবং তাঁর শিকাগো বক্তৃতাবলীও এর ব্যতিক্রম নয়। সে-বক্তৃতার শতবর্ষের প্রাক্কালে আমাদের এই সহজ সত্যটি ভুললে চলবে না। স্বামী বিবেকানন্দের জীবন ও তাঁর বাণী, যে-জীবন শিল্পকর্মের সুষমায় মণ্ডিত এবং আধ্যাত্মিকতার দিব্যদ্যুতিতে সমুজ্জ্বল। অসামান্য সাহস ও পরিপূর্ণ আত্মবিশ্বাসের জ্যোতিতে তাঁর জীবন উদ্ভাসিত। বিদেশের যে-ধর্মমহাসভায় চারদিকে প্রবীণ পণ্ডিতদের ছড়াছড়ি, সেখানে অত সুন্দর ও সপ্রতিভভাবে হিন্দুধর্ম নিয়ে বক্তৃতা করার জন্য ত্রিশ বছরের তরুণের যে-প্রচণ্ড মনোবলের দরকার তা তাঁর ছিল। জীবন-সংগ্রামে তিনি ছিলেন অক্লান্ত যোদ্ধা। ১৮৯৮ খ্রীস্টাব্দের শেষদিকে তিনি হাঁপানিতে আক্রান্ত হয়েছিলেন; সেসময়ে তিনি বলেছিলেন : "Life is a battle. Let me die fighting."[১] ("জীবনটা একটা যুদ্ধক্ষেত্র। আমি যুদ্ধ করতে করতে মরতে চাই।") এ-যেন তিনি তাঁর প্রিয় কবি রবার্ট ব্রাউনিঙের 'প্রস্পিকে' (Prospice) কবিতার চারটি পঙ্ক্তির প্রতিধ্বনি করছেন :

"I was ever a fighter, so—one fight more,  
The best and the last!  
I would hate that death bandaged  
my eyes, and forbore,  
And bade me creep past."

("চিরদিনই আমি যোদ্ধা—এখন শুধু শেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ যুদ্ধটাই বাকি! আমি একেবারেই চাই না যে, মৃত্যু আমার চোখ বেঁধে দিয়ে অনুকম্পা দেখাবে, আর আমাকে বলবে গুটি-গুটি পার হয়ে যাওয়ার জন্য।") ব্রাউনিঙের কবিতায় যেমন, বিবেকানন্দের উক্তিতেও আমরা এক বীর যোদ্ধার কণ্ঠস্বর শুনতে পাই।

ভারতবর্ষের পরিবেশ ও আবহাওয়া এখন এক এমন অবস্থায় পৌঁছেছে যে, আমরা সবসময় সবকিছুর জন্য যুদ্ধ করার কথা ভাবছি। 'এ-লড়াই বাঁচার লড়াই, এ-লড়াই জিততে হবে'—এই ধ্বনি আজ সকলের মুখে মুখে। 'বাঁচার লড়াই' জেতার জন্য চাই সাহস, শক্তি, মনোবল ও আত্মবিশ্বাস। আর এগুলি পাওয়ার অন্যতম উৎস হলো বিবেকানন্দের ভাষণ ও রচনা। বেঁচে থাকতে হলে যুদ্ধ চালিয়ে যেতে হবে, একথা তো আমরা বহু

১ The Life of Vivekananda and the Universal Gospel—Romain Rolland, 1984, p. 147

দিন ধরেই শুনে আসছি। বিগত শতাব্দীতে চার্লস ডারউইন 'যোগ্যতমের উদ্বর্তন' বা 'Survival of the fittest'-এর তত্ত্ব আমাদের শুনিয়েছেন, যার কথা স্বামী বিবেকানন্দও আমাদের মনে করিয়ে দিয়েছেন। তবে এর বহু শতাব্দী আগে 'মহাভারতে' যে-কুরুক্ষেত্রের কথা পাই সেই 'কুরুক্ষেত্র' শব্দটির অর্থ 'কর্মভূমি'। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ সাংসারিক জীবনের প্রাত্যহিক সংগ্রামের সুস্পষ্ট প্রতীক। এই যুদ্ধ আমাদের সকলকে অবিরাম করে যেতে হবে জীবনের শেষদিন পর্যন্ত। এর থেকে পরাঙ্মুখ হওয়া কাপুরুষতার নামান্তর মাত্র। এ-কাপুরুষতা মাঝে মাঝে আমাদের পেয়ে বসে, যেমন পেয়ে বসেছিল পাণ্ডুপুত্র অর্জুনকে কিংবা ডেনমার্কের রাজপুত্র হ্যামলেটকে। সে-কাপুরুষতা শেষ পর্যন্ত কাটিয়ে ওঠাই মানুষের ধর্ম। এই শিক্ষাই আমরা বিবেকানন্দের কাছে পাই। তাঁর নিজের জীবনে তিনি অবিরত সংগ্রাম করে গেছেন। তাই জীবনসংগ্রামে তিনি আমাদের সহযোদ্ধা। আবার জীবনসংগ্রামে তিনি আমাদের সেনানায়কও। শুধুমাত্র তাঁর মূর্তিতে মালা দিলে ও তাঁর নামে সভা করলে আমরা তাঁর পুণ্যস্মৃতির ও মহৎ উত্তরাধিকারের অবমাননা করব। তাঁর আদর্শ নিয়ে, তাঁকে পাশে নিয়ে, তাঁর অনুপ্রেরণা থেকে শক্তি সংগ্রহ করে, তাঁর নেতৃত্বে যদি আমরা যুদ্ধ চালিয়ে যেতে পারি, তবেই আমরা তাঁর উপযুক্ত মর্যাদা তাঁকে দিতে পারব।

### মানুষ অমৃতের সন্তান

যেকথা শিকাগো ভাষণে এবং অন্যত্র স্বামী বিবেকানন্দ আমাদের বারবার মনে করিয়ে দিয়েছেন সেটা আমাদের কুলপরিচয় (identity)। রক্তমাংসের মানুষ তো আমরা নিশ্চয়ই, কিন্তু শুধু কি তাই? এটাই কি মানুষের প্রকৃত পরিচয়? তার প্রকৃত পরিচয় মানুষ জানে না এবং সেজন্যই মানুষের আজ এত দুরবস্থা। মানুষের প্রকৃত পরিচয়—সে অমৃতের সন্তান। ঈশ্বর তাঁর নিজের ছাঁচে, নিজের আদলে তাকে গড়েছেন। একথা একবার উপলব্ধি করার পরে মানুষের মনে কোন দুঃখ থাকতে পারে না। স্বামীজী 'শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ্' (২।৫)-এর সেই ঘোষণা শোনালেন ঃ

> "শোন শোন অমৃতের পুত্রগণ, শোন দিব্য-লোকের অধিবাসিগণ, আমি সেই পুরাতন মহান পুরুষকে জেনেছি। আদিত্যের ন্যায় তাঁর বর্ণ, তিনি সকল অজ্ঞান-অন্ধকারের পারে; তাঁকে জানলেই মৃত্যুকে অতিক্রম করা যায়, আর অন্য কোন পথ নেই।'

বৈদিক ঋষি যখন আমাদের 'অমৃতস্য পুত্রাঃ' বলে সম্বোধন করেন, যখন স্মরণ করিয়ে দেন যে, আমরা স্বর্গলোকের অধিবাসী, তখন তিনি আমাদের কাছে আনন্দের বার্তা বহন করে নিয়ে আসেন, যাকে বাইবেলের ভাষায় 'গস্পেল' বা 'সুসমাচার বলা হয়।

প্রাকৃতিক নিয়মে, সংসারের ঘাতপ্রতিঘাতে এবং ভাগ্যচক্রের চাপে আমরা যখন নিষ্পেষিত হই, তখন আশাই বা কি আর পরিত্রাণের পথই বা কোথায়? সদ্য-উদ্ধৃত উপনিষদের বাণীর মধ্যে স্বামীজী আশা ও সান্ত্বনা খুঁজে পেয়েছিলেন, যার উৎস রয়েছে করুণামৃতসিন্ধুর করুণাকণায়। সেখান থেকেই প্রেরণা পেয়েছেন বৈদিক ঋষি। সেই প্রেরণাই ধ্বনিত তাঁর উক্তিতে।

আমরা অমৃতের সন্তান, এবং সেজন্যই শুধু খাদ্য আমাদের বাঁচিয়ে রাখতে পারে না। কিন্তু এই সহজ সত্য অনেক সময় আমরা ভুলে যাই। ফলে নিরানন্দ জীবনের বিড়ম্বনা আমাদের ভোগ করতে হয়। স্বামীজী বলতেন, প্রকৃতিকে অনুসরণ করার জন্য মানুষের জন্ম নয়, প্রকৃতিকে জয় করার জন্যই মানুষের জন্ম। প্রকৃতির কাছে নিঃশর্তে আত্মসমর্পণ করার প্রবণতা আমাদের এই সর্বনাশ ডেকে আনে। আমরা বহু বাসনায় প্রাণপণে শুধু চেয়েই যাই। চাওয়া-পাওয়ার বাঁকা গলিঘুঁজিতে অন্ধের মতো ঘুরে মরি—"getting and spending we lay waste our powers" (পেয়েই আমরা ফুরিয়ে ফেলতে থাকি এবং এইভাবে আমাদের প্রাণশক্তির অপব্যয় করি)। এর সমাধান কোথায়? স্বামীজী মনে করেন, এর সমাধান পাওয়া যাবে তখনই, যখন মানুষ প্রকৃতির বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে স্বাধীন-ভাবে দাঁড়াতে শিখবে, ব্রহ্মকে স্বীয় স্বরূপ বলে উপলব্ধি করতে পারবে।

মুক্তির জন্য এই সংগ্রামের মধ্যে সত্যিকারের নৈতিকতা আছে বলে স্বামীজী মনে করতেন। এই মুক্তি তো কোন বিশেষ একজনের ব্যক্তিগত কোন বন্ধনমোচন নয়, এ সমগ্র মানবজাতির শৃঙ্খলমুক্তির প্রয়াস (সেই আমাদের অনুভূতির আতিশয্যের বন্ধন—দার্শনিক স্পিনোজা ও কথাসাহিত্যিক মম যাকে 'human bondage' বা 'মানবিক বন্ধন' বলেছেন—তার নাগপাশ থেকে)। নিখিল জীব-জগতের মধ্যে আছে এক অন্তর্নিহিত ঐক্য; প্রত্যেক প্রাণীর মধ্যে অন্তর্নিহিত রয়েছে দেবত্ব। এই ঐক্য, এই দেবত্বকে বলা যায়, শেক্সপীয়রের ভাষায়—"The one touch of nature that makes the whole world kin" (স্বভাবের সেই স্পর্শ যা সমগ্র সংসারকে আত্মীয়তার সূত্রে গ্রথিত করে)। জাগতিক সত্যের নিম্নতর রূপকে এই প্রয়াস কোন স্বীকৃতি দেয় না। স্বামীজীর ভাষায় বলা যায় যে, সব অবস্থাতেই নিখিল সংসারে ঈশ্বর পরিব্যাপ্ত রয়েছেন; আমাদের শুধু চোখ মেলে তাঁকে দেখতে হবে, তবেই আমাদের সকল কাঁটা ধন্য করে ফুল ফুটে উঠবে। মনে-প্রাণে যদি সেই পরমপুরুষের ছোঁয়া লাগে তাহলে ফুল আপনিই ফুটে ওঠে—স্বতই প্রস্ফুটিত। রবীন্দ্রনাথ বলছেন:

"যে পারে সে আপনি পারে,
পারে সে ফুল ফোটাতে।
সে শুধু চায় নয়ন মেলে
দুটি চোখের কিরণ ফেলে,
অমনি যেন পূর্ণপ্রাণের
মন্ত্র লাগে বোঁটাতে।
যে পারে সে আপনি পারে
পারে সে ফুল ফোটাতে।"
('ফুল ফোটানো', খেয়া)

কিভাবে এই 'নয়ন মেলে' চাইতে হয়, এটাই আমরা স্বামী বিবেকানন্দের কাছে শিখতে পারি।

### আত্মা মুখ্য, দেহ গৌণ এবং কর্মবাদ

'আমি' বলতে আমরা সাধারণতঃ আমাদের দেহগত রূপের কথা ভাবি; 'আমি'র অর্থই আমার দেহ। একথা স্বামীজী স্বীকার করেননি। কারণ তিনি কোনদিন বিশ্বাস করতে পারেননি যে, এ-দেহ শুধুই জড়ের সমষ্টি। 'হিন্দুধর্ম' শীর্ষক ভাষণে স্বামীজী বললেন: "বেদ বলিতেছেন, না, আমি দেহমধ্যস্থ আত্মা—আমি দেহ নই। দেহ মরিবে, কিন্তু আমি মরিব না।"[২] যা সৃষ্টি হয়, তা ধ্বংসও হয়; যেহেতু আত্মা অবিনশ্বর, তাই আত্মার কোন দিন সৃষ্টিও হয়নি। 'গীতায়' বলা হচ্ছে:

"ন জায়তে ম্রিয়তে বা কদাচিৎ
নায়ং ভূত্বা ভবিতা বা ন ভূয়ঃ।
অজো নিত্যঃ শাশ্বতোঽয়ং পুরাণো
ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে॥" (২।২০)

—[এই আত্মার] কখনো জন্ম বা মৃত্যু হয় না; জন্মগ্রহণের পরে এর অস্তিত্বের আরম্ভ নয়। এ জন্মরহিত, অক্ষয়, চিরকালীন এবং পরিণামশূন্য; শরীর হত হলেও এর হানি হয় না।

'শরীর হত হলেও আত্মার বিনাশ নেই'—এ-সত্য বুঝতে পারলে জীবন আর বাধায় ঠেকবে না।

আমাদের তীব্র দেহবোধ আমাদের অনেক দুঃখ-অশান্তির মূল। যে-মুহূর্তে আমরা হৃদয়ঙ্গম করব যে, আত্মা মুখ্য, দেহ গৌণ, আত্মা এক শাণিত ও উজ্জ্বল তরবারি যাকে ভঙ্গুর দেহকোষের মধ্যে বেশিদিন ধরে রাখা যায় না, সে-মুহূর্তে আমাদের বন্ধনমুক্তি ঘটবে। তাছাড়া এটাও ভাবা দরকার, যে-সুখের জন্য মানুষ সর্বদা লালায়িত, যে-সুখের দিকে তার দৃষ্টি সবসময় নিবদ্ধ (ভাগাড়ের দিকে শকুনের দৃষ্টির মতো), সেই ঐহিক সুখ ভোগ করার জন্য মানুষ সৃষ্ট হয়নি। তার জন্মের সময়ে তাকে কোন পক্ষ থেকে কোন প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়নি যে, সে সারাজীবন সুখে ডুবে থাকতে পারবে। চোখের সামনে অন্য অনেক অযোগ্য লোককে সুখে থাকতে দেখলে দুঃখে জর্জরিত ধর্মপরায়ণ মানুষের মনে ক্ষোভের সঞ্চার হতে পারে, মনে হতে পারে বিশ্ববিধাতার বিচিত্র বিধানে সুবিচার নেই। এই বোধ আসে অজ্ঞতা থেকে। আমাদের জানা দরকার, মানুষ কর্মফলের জালে জড়িয়ে আছে, সে প্রারব্ধ কর্মের দাস। শিকাগোয় 'হিন্দুধর্ম' ভাষণে স্বামী বিবেকানন্দ এই কথা আমাদের স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন:

২ স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা, ১ম খণ্ড, ১ম সং, পৃঃ ১৩

"যখন সকলেই এক ন্যায়পরায়ণ ও করুণাময় ঈশ্বর দ্বারা সৃষ্ট, তখন কেহ সুখী এবং কেহ দুঃখী হইল কেন? ভগবান কেন এত পক্ষপাতী?··· দয়াময় ও ন্যায়পরায়ণ ঈশ্বরের রাজ্যে একজনও কেন দুঃখভোগ করিবে?··· সৃষ্টিকর্তা ঈশ্বরের এই ভাবদ্বারা সৃষ্টির অন্তর্গত অসঙ্গতির কোন কারণ প্রদর্শন করিবার চেষ্টাও নাই; পরন্তু এক সর্বশক্তিমান স্বেচ্ছাচারী পুরুষের নিষ্ঠুর আদেশই স্বীকার করিয়া লওয়া হইল। স্পষ্টতই ইহা অবৈজ্ঞানিক। অতএব স্বীকার করিতে হইবে, সুখী বা দুঃখী হইয়া জন্মিবার পূর্বে নিশ্চয় বহুবিধ কারণ ছিল, যাহার ফলে জন্মের পর মানুষ সুখী বা দুঃখী হয়; তাহার পূর্বজন্মের কর্মসমূহই সেইসব কারণ।"[৩]

কর্মফলের এই ধারণা হিন্দু ধর্মমতের মৌলিক ধারণাগুলির অন্যতম এবং স্বাভাবিক কারণেই হিন্দুধর্ম নিয়ে আলোচনা করার সময়ে স্বামীজী শিকাগোতে এটির অবতারণা করেছেন। তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি ছিল বৈজ্ঞানিক এবং তিনি যথার্থই মনে করেছিলেন যে, কর্মবাদের দিক থেকে মানবজীবনের স্বরূপের ব্যাখ্যা আমাদের যুক্তিবাদী চিন্তার কাছে গ্রহণীয়। এ-বিশ্বাস ছিল থিয়সফির প্রবক্তা অ্যানি বেসান্তেরও। তাঁর 'কর্ম' শীর্ষক পুস্তিকায় তিনি কর্মবাদ নিয়ে সুন্দর আলোচনা করেছেন। প্রসঙ্গতঃ বলা যেতে পারে, মাদ্রাজে ভিক্টোরিয়া হলে, কলকাতার স্টার থিয়েটারে (১১ মার্চ, ১৮৯৮) এবং অন্যত্র স্বামীজী বেশ কয়েকবার অ্যানি বেসান্ত ও তাঁর কার্যকলাপের সপ্রশংস উল্লেখ করেছেন।

### শক্তি আনন্দের উৎস

আনন্দের তাৎপর্য উপনিষদে বারংবার আলোচিত হয়েছে: "আনন্দাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে" —আনন্দ থেকেই সব প্রাণী জন্ম নিয়েছে, সৃষ্টির সূত্রপাত হয়েছে। আনন্দ নিয়েই আমাদের বেঁচে থাকতে হবে—সেটাই প্রকৃত বেঁচে থাকা, সেটাই মানুষের ধর্ম। তাই শিকাগোতে তিনি কম্বুকণ্ঠে মানুষকে আহ্বান জানিয়েছেন:

"ওঠ এস, সিংহস্বরূপ হইয়া তোমরা নিজেদের মেষতুল্য মনে করিতেছ, এই ভ্রমজ্ঞান দূর করিয়া দাও। তোমরা অমর আত্মা, মুক্ত আত্মা,—চির-আনন্দময়। তোমরা জড় নও, তোমরা দেহ নও; জড় তোমাদের দাস, তোমরা জড়ের দাস নও।"[৪]

স্বামীজীর আদর্শ সাহসের আদর্শ, শৌর্যের আদর্শ, বীর্যের আদর্শ। সিংহ এই শৌর্য ও বীর্যের প্রতীক। তাই তিনি সিংহের উল্লেখ করেছেন। যুদ্ধেও যেমন, জীবনসংগ্রামেও তেমন, কাপুরুষের কোন স্থান নেই। অর্জুন যখন কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের প্রারম্ভে বিষণ্ণতায় আচ্ছন্ন এবং কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে বিলাপ করছিলেন, তখন শ্রীকৃষ্ণ তাঁকে কঠোরভাবে তিরস্কার করেন তাঁর সেই অবস্থাকে 'ক্লৈব্য' আখ্যা দিয়ে। নির্দেশ দেন, 'ক্ষুদ্র হৃদয়দৌর্বল্য' ত্যাগ করার জন্য। স্বামীজীর বাণীতে আমরা বারংবার শ্রীকৃষ্ণের এই নির্দেশের প্রতিধ্বনি শুনেছি। 'স্বদেশমন্ত্রে' তিনি আমাদের বলেছেন: "হে বীর, সাহস অবলম্বন কর।" যে-মন্ত্রে তিনি আমাদের দীক্ষা দিয়েছেন সে-মন্ত্র 'অভীঃ' যে-বাণীতে তিনি আমাদের উদ্বুদ্ধ করেছেন সে-বাণী 'মা ভৈঃ'। ভয় হতে ঈশ্বরের অভয়ের মাঝে রবীন্দ্রনাথ যে-নবজন্মের প্রার্থনা করেছেন সে-প্রার্থনা হওয়া উচিত সকল মানুষের প্রার্থনা, সকল ভারতীয়ের তো বটেই। সেটাই স্বামী বিবেকানন্দ আমাদের শিখিয়েছেন।

তিনি সর্বদা বলতেন যে, আমরা যেন সকলে ভাবি, আমরা অনন্ত বলশালী আত্মা। এইটা ঠিক ভাবতে পারলে আমাদের শক্তির কোন সীমা থাকবে না, কারণ যার যে-ধরনের ভাবনা তার সিদ্ধিই হয় সেই ধরনের। আর শক্তি থাকলে সাহস আপনি আসবে, আসতে বাধ্য। শক্তিহীনতা আমাদের নির্জীব, জড়পদার্থের মতো করে রেখেছে, আমরা যেন সাধের ঘুমঘোরে আচ্ছন্ন। স্বামীজী বারবার আমাদের জাগিয়ে তুলতে চেয়েছেন: "উত্তিষ্ঠত, জাগ্রত"। আমাদের হীনম্মন্যতা আমাদের প্রধান শত্রু। নিজেদের যখন আমরা 'দীনহীন' বা 'নিঃসহায়' মনে করি, তখনই নিজেদের ক্ষতি করি সবচেয়ে বেশি। যতদিন আমাদের দুর্বলতা (এবং দুর্বলতার মনোভাব) না যাবে, ততদিন আমাদের

৩ বাণী ও রচনা, ১ম খণ্ড, পৃঃ ১৫

৪ ঐ, পৃঃ ১৯

মনুষ্যত্বের উদ্বোধন হবে না; তাই শক্তির প্রয়োজন সর্বাগ্রে। বলহীন যে, তার আত্মার বিকাশ কোনদিন সম্ভব নয়। তাই যতদিন না আমরা শক্তিমান হতে পারছি, ততদিন "ভজন, পূজন, সাধন, আরাধনা, সমস্ত থাক পড়ে"। আপাততঃ "গীতা-পাঠের চেয়ে ফুটবল খেলার" প্রয়োজন তরুণদের কাছে অনেক বেশি—স্বামীজী বললেন।

### অনন্তের সুরে

শিকাগো-ভাষণে স্বামীজী আর একটি কথা বলেছেন, সেটাও আমাদের জীবনচর্যার পক্ষে অপরিহার্য। সেটা হিন্দু আদর্শের মূল লক্ষ্য ঃ

> "ক্রমাগত সংগ্রাম ও সাধনা দ্বারা সিদ্ধিলাভ করা—দিব্যভাবে ভাবান্বিত হইয়া ঈশ্বরের সান্নিধ্যে যাওয়া ও তাঁহার দর্শনলাভ করিয়া সেই 'স্বর্গস্থ পিতা'-র মতো পূর্ণ হওয়াই হিন্দুর ধর্ম।"[৫]

ঈশ্বরদর্শন ও ঈশ্বরপ্রাপ্তি মানবজীবনের পরম পাওয়া। তাঁকে লাভ করার পর অপর সব লাভই মূল্যহীন হয়ে পড়ে। তাঁকে পেলে আমাদের সব অপূর্ণতা পূর্ণতা পায়, সব দুঃখ আনন্দ হয়ে ওঠে, সব সাধনা হয় সিদ্ধিতে মণ্ডিত। তাই অনন্তের সুরে যদি আমাদের হৃদয়তন্ত্রী বাজতে পারে, তবেই আমাদের মানবজন্ম সার্থক হবে। আর তাঁকে—সেই পরমপুরুষকে, সেই পরমাশক্তিকে যখন আমরা ভালবাসব, তখন যেন ভালবাসার জন্যই ভালবাসি, তাঁর জন্যই তাঁকে ভালবাসি, কোন স্বার্থসিদ্ধির উদ্দেশ্য নিয়ে নয়। তাই যুধিষ্ঠিরের উক্তিতে স্বামীজী সেই ভালবাসার রূপ দেখেছিলেন ঃ

> "আমি তাঁহার নিকট কিছুই চাই না··· সর্ব অবস্থাতেই আমি তাঁহাকে ভালবাসিব। আমি ভালবাসার জন্য তাঁহাকে ভালবাসি। আমি ভালবাসার ব্যবসা করি না।"[৬] ☐

৫ বাণী ও রচনা, ১ম খণ্ড, পৃঃ ২১

৬ ঐ, পৃঃ ২০

মাধুকরী

# মানবমিত্র বিবেকানন্দ

## আমিনুল ইসলাম

ডঃ আমিনুল ইসলাম ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শন বিভাগের অধ্যাপক এবং উচ্চতর মানববিদ্যা গবেষণাকেন্দ্রের পরিচালক।
—যুগ্ম সম্পাদক, উদ্বোধন

নবযুগের যুগাচার্য স্বামী বিবেকানন্দের আবির্ভাব ঘটে এমন এক সময়ে যখন উপমহাদেশের মানুষ একদিকে পীড়িত ছিল দারিদ্র্য, পরাধীনতা ও আর্থ-সামাজিক অস্থিরতা দ্বারা, অন্যদিকে আচ্ছন্ন ছিল ধর্মীয় গোঁড়ামি, নৈতিক দীনতা ও আত্মিক জড়তায়। পরিস্থিতির উন্নতি এবং বিপুল জনগোষ্ঠীর সার্বিক মুক্তির জন্য অপরিহার্য হয়ে পড়েছিল সংস্কার। উনিশ শতকের প্রাক্কালে সংস্কারের প্রথম বার্তা বহন করে এনেছিলেন রাজা রামমোহন রায়। অতঃপর সেই একই আন্দোলন এগিয়ে চলে রাধাকান্ত, দেবেন্দ্রনাথ, কেশবচন্দ্র, অক্ষয়কুমার, বিদ্যাসাগর প্রমুখের চিন্তা ও কর্মের মধ্য দিয়ে। কিন্তু দীর্ঘ এক শতাব্দীর অব্যাহত চেষ্টাচরিত্রের পরও যখন সমস্যার সমাধান হলো না, লোকাচার ও দেশাচার যখন সবরকম সংস্কার-প্রচেষ্টাকেই ব্যাহত করল তখন শতাব্দীর শেষলগ্নে এক নতুন সংস্কারবার্তা, এক নতুন জীবনাদর্শ নিয়ে আবির্ভূত হলেন স্বামী বিবেকানন্দ।

এদেশের জনগণের মধ্যে আত্মমর্যাদা, স্বাধিকার চেতনা ও জাতীয়তাবোধ স্ফূর্তিতে আত্মনিযুক্ত হওয়া সত্ত্বেও পূর্ববর্তী সংস্কারকদের কেউই সনাতন ধর্মের বাণীকে, বিশেষতঃ সাধারণ মানুষের কাছে গ্রাহ্য ও আকর্ষণীয় করে তুলতে সক্ষম হননি। যেমন রামমোহন, দেবেন্দ্রনাথ প্রমুখ ব্রাহ্মধর্মে যেটুকু ভক্তি সঞ্চার করতে পেরেছিলেন তা আর যাই হোক সহজবুদ্ধি সাধারণ মানুষের চেতনাকে স্পর্শ করতে পারেনি। এছাড়া পূর্ববর্তী মনীষীরা সংস্কারের জন্য যেটুকু গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন ধর্মের ওপর, তার চেয়ে অনেক বেশি গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন পাশ্চাত্য যুক্তিবাদ ও মানবতাবাদের ওপর।

সংস্কার প্রসঙ্গে স্বামী বিবেকানন্দের দৃষ্টিভঙ্গি ছিল ভিন্নতর। আধুনিক পাশ্চাত্য দর্শন ও মানবতাবাদের প্রতি এতটুকু তাচ্ছিল্য প্রদর্শন না করেও তিনি সমাজ-সংস্কারের জন্য সর্বাগ্রে প্রয়োজনীয় মনে করেছিলেন ধর্ম-সংস্কারের। এবং একারণেই তিনি বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেন মানুষের মধ্যে ধর্মীয় প্রেরণা উদ্বোধনের ওপর। ধর্মকে তিনি মনে করতেন সমাজদেহের একটি অঙ্গ বলে এবং অদ্বৈত অনুভূতিকে তিনি গ্রহণ করেন সমাজ-সংস্কারের ভিত্তি বলে। তাঁর মতে, এদেশের মানুষের জাতীয় জীবন দাঁড়িয়ে আছে ধর্মীয় ভিত্তির ওপর। তাই সামাজিক বা রাজনৈতিক যেকোন রকম সংস্কারের জন্য অগ্রসর হতে হবে ধর্মের পথেই। তাছাড়া ধর্মের পথে অগ্রসর হওয়াই অধিকতর সহজ এবং নির্বিঘ্ন; আর যে-পথে বাধা কম—'the line of least resistance'—সে-পথে অগ্রসর হওয়াই সমাজবিজ্ঞানের দৃষ্টিতে অধিকতর যুক্তিযুক্ত।

এই প্রত্যয় ও সংকল্প নিয়েই স্বামী বিবেকানন্দ অগ্রসর হয়েছিলেন উপমহাদেশের বিপুল জনসংঘকে সংগঠিত করার, খাদ্য দিয়ে, জ্ঞান দিয়ে তাদের মধ্যে মনুষ্যত্বের উদ্বোধন ঘটাবার কাজে। তিনি যথার্থই উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন যে, একাজ অত্যন্ত দুরূহ এবং একে সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করতে হলে প্রথমেই সংগঠিত করতে হবে জনসাধারণকে, বিশেষতঃ যুবসমাজকে। আর তা করতে হলে অবশ্যই তাদের সামনে তুলে ধরতে হবে একটি নতুন কার্যকর আদর্শ। সেই আদর্শই তিনি পেয়েছিলেন তাঁর পূজ্যপাদ গুরু শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব থেকে।

গুরুর আদর্শ ও জীবনসাধনাকেই তিনি ছড়িয়ে দিতে চাইলেন দিগ্‌বিদিকে ধর্ম-বর্ণ-নির্বিশেষে আবালবৃদ্ধবনিতা, তথা আপামর জনসাধারণের মধ্যে। গুরুর শিক্ষা ও প্রেরণায়ই তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে, যথার্থ সংস্কারের জন্য জ্ঞান যেমন প্রয়োজন তেমনি প্রয়োজন প্রেম—মানুষের প্রতি মানুষের দরদ। কথাটি অভিনব নয়। শ্রীচৈতন্যও প্রেমের কথা বলেছিলেন, প্রেম-প্রীতির সাধনার পরামর্শ দিয়েছিলেন। কিন্তু সেই প্রেম ছিল অহৈতুকী, অতীন্দ্রিয় প্রেম, যার লক্ষ্যবস্তু যতটুকু না ছিল মাটির মানুষ তার চেয়ে অনেক বেশি অমৃতলোকের দেবদেবী। পক্ষান্তরে বিবেকানন্দ প্রচারিত প্রেম ছিল যথার্থই মানবকেন্দ্রিক প্রেম, এমন প্রেম বা মানুষের মনুষ্যত্বকে কোনভাবে ক্ষুণ্ণ না করে ভূমির সঙ্গে যুক্ত করে ভূমাকে, মানুষের মধ্যে খুঁজে পায় ভগবানকে।

বলা বাহুল্য, প্রেমের এই নতুন ধারণাও বিবেকানন্দ পেয়েছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণ থেকে। শ্রীরামকৃষ্ণই তাঁকে শিখিয়েছিলেন প্রেম মানে মানুষের প্রতি মানুষের শ্রদ্ধা, জীবের মধ্যে শিবের সাক্ষাৎকার। শ্রীচৈতন্য 'সর্বজীবে দয়া'র কথা বলেছিলেন। প্রসঙ্গক্রমে একদিন শ্রীরামকৃষ্ণ মন্তব্য করেন: "জীবে দয়া—জীবে দয়া?... কীটানুকীট তুই জীবকে দয়া করবি? দয়া করবার তুই কে? না, না, জীবে দয়া নয়—শিবজ্ঞানে জীবের সেবা।"[১] এটাই বোধকরি শ্রীরামকৃষ্ণ-প্রচারিত নতুন ধর্ম ও দর্শনের চুম্বক কথা।

বিবেকানন্দ প্রথমে কিছুদিন ছিলেন পাশ্চাত্য দর্শন-বিজ্ঞানের দ্বারা প্রভাবিত একজন চিত্তচঞ্চল সংশয়বাদী তার্কিক এবং ব্রাহ্মসমাজের একনিষ্ঠ সমর্থক। পাশ্চাত্য দর্শনের যুক্তিজাল আর ব্রাহ্মসমাজের প্রভাব তাঁর চিত্তকে দিয়েছিল এক যুক্তিবাদী আবরণ। কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণের সংস্পর্শে এসে তিনি পরিণত হলেন একজন আধ্যাত্মিক পুরুষ ও কামিনী-কাঞ্চনত্যাগী সন্ন্যাসীতে। তবে তাঁর এই সন্ন্যাসজীবন নিষ্ক্রিয় নয়, নির্বিকল্প সমাধিযোগে ঈশ্বরলাভই তাঁর একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল না। তিনি ছিলেন কর্মযোগে বিশ্বাসী একজন মানব-দরদী মানুষ। আর তাই তিনি অকপটে বলতে পেরেছিলেন: "যারা নিজেদের ভক্তি-মুক্তির কামনা ত্যাগ করে দরিদ্রনারায়ণের সেবায় জীবন উৎসর্গ করবে আমি তাদের চেলাভৃত্য—ক্রীতদাস।" এই মানবতাবাদী জীবনদর্শনও তিনি লাভ করেছিলেন তাঁর গুরু শ্রীরামকৃষ্ণ থেকে। কঠোর-তপা নরেন্দ্রনাথকে একদিন শ্রীরামকৃষ্ণ যখন ডেকে জিজ্ঞাসা করেন তিনি কি চান, উত্তরে তিনি নির্বিকল্প সমাধিযোগে সচ্চিদানন্দ সাগরে ডুবে থাকার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। তাতে শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁকে সস্নেহে ভর্ৎসনা করেছিলেন এইভাবে: "ছি! ছি! তুই এতবড় আধার।... আমি ভেবেছিলাম তুই বটগাছের মতো হবি, তোর ছায়ায় হাজার হাজার লোক আশ্রয় পাবে, তা না হয়ে, তুই কিনা নিজের মুক্তি চাস?... না-না, অত ছোট নজর করিসনি।"[২] এই উপদেশই দার্শনিক, তার্কিক, উদ্ধত নরেন্দ্রনাথকে পরিণত করেছিল গুরুভক্ত সাধক ও মানবমিত্র বিবেকানন্দে, যিনি ধ্যান-তপস্যায় অর্জিত সব জ্ঞান ও অন্তর্দৃষ্টিকে ব্যবহার করলেন মানুষের কল্যাণে, যিনি সংস্কারের জন্য ভারতবর্ষের বিশাল জনসঙ্ঘকে পরিণত করতে চাইলেন এক প্রবল শক্তিতে।

শুধু কথায় কিংবা তন্ত্রমন্ত্রের সাহায্যে নয়, মানুষের মতো সকল কর্মানুষ্ঠান দ্বারাই তিনি চেয়েছিলেন এই লক্ষ্য হাসিল করতে। স্থান থেকে স্থানান্তরে পর্যটন করে, দরিদ্র অস্পৃশ্য থেকে শুরু করে রাজা-মহারাজা পর্যন্ত সর্বস্তরের মানুষের সংস্পর্শে এসে, অনিদ্রা-অনাহারে দিন কাটিয়ে তিনি বুঝতে পেরেছিলেন কী ভীষণ দুর্দশার মধ্যে ভারত-বর্ষের জনসাধারণ কেবল পদদলিত হয়ে আসছে। তাদের বিশ্বাস অপবিত্র, ছায়া অস্পৃশ্য বলে প্রচার করা হয়েছে। অথচ তারাই দেশের মেরুদণ্ড। দরিদ্র অস্পৃশ্যদের পক্ষ সমর্থন করে তাই বিবেকানন্দের মন্তব্য: "কে অস্পৃশ্য! এরা নারায়ণ। হোক না দরিদ্র, কি আসে যায়? এরা যদি আলো না পায়,

১ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ—স্বামী সারদানন্দ, গুরুভাব—উত্তরার্ধ, ২য় ভাগ, ১৩৭৯, পৃঃ ২৬২

২ যুগনায়ক বিবেকানন্দ—স্বামী গম্ভীরানন্দ, ১ম খণ্ড, ২য় সং, ১৩৭৪, পৃঃ ১৭৯

এদের যদি জাগানো না হয়, এদের যদি আপনজন বলে পাশে স্থান না দেওয়া হয় তাহলে দেশ কোনদিন জাগবে না।"

গরিব দুঃখীদের দুর্দশা স্বামী বিবেকানন্দের মনকে যে কিভাবে বিচলিত করত তার পরিচয় পাওয়া যায় তাঁর বহু বাণীতে। এপ্রসঙ্গে একদিন তিনি আক্ষেপ করে বলেছিলেনঃ "আহা, দেশে গরিব-দুঃখীর জন্য কেউ ভাবে না রে। যারা জাতির মেরুদণ্ড, যাদের পরিশ্রমে অন্ন জন্মাচ্ছে, যে মেথর-মুদ্দফরাশ একদিন কাজ বন্ধ করলে শহরে হাহাকার রব উঠে, হায়! তাদের সহানুভূতি করে, তাদের সুখে-দুঃখে সান্ত্বনা দেয়, দেশে এমন কেউ নেই রে।··· আমরা দিনরাত কেবল তাদের বলছি— ছুঁস্‌নে ছুঁস্‌নে। দেশে কি আর দয়াধর্ম আছে রে বাপ!"[৩]

বিবেকানন্দ যথার্থই বুঝতে পেরেছিলেন যে, তথাকথিত শিক্ষিত ভদ্রলোকেরা বৃহত্তর জনগোষ্ঠী থেকে বিচ্ছিন্ন। তাঁরা জনগণকে চেনেন না, ভালবাসেন না। তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ আবার মুখে সংস্কারের কথা বলেন ঠিকই, কিন্তু যাদের শ্রমের বিনিময়ে তাঁরা ভদ্রলোক হলেন, তাদের উৎপীড়ন করতে তাঁদের এতটুকু বাধে না। সাধারণ লোকদের তাঁরা এমনভাবে পদদলিত করছেন যে, এরাও যে মানুষ একথা তারা ভুলেই গিয়েছে। এসব ওপরতলার মানুষের এই অত্যাচারে সাধারণ মানুষ তাদের ব্যক্তিত্ব হারিয়ে ফেলেছে। দিনরাত খেটে তারা অশন-বসনের সংস্থান করতে পারছে না। স্বামীজীর কাছে এ-আচরণ অসহনীয়। তিনি চাইলেন এদের স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত করতে; আর তাই ভক্ত-শিষ্যদের তিনি পরামর্শ দিলেন সমবেতভাবে এদের চোখ খুলে দিতে। তিনি বলেছিলেনঃ "আমি দিব্যচক্ষে দেখছি এদের ও আমার ভিতর একই ব্রহ্ম, একই শক্তি রয়েছে, কেবল বিকাশের তারতম্যমাত্র।"

সর্বাঙ্গে রক্তসঞ্চালন না হলে যেমন কেউ সুস্থভাবে টিকে থাকতে পারে না, তেমনি সর্বশ্রেণীর মানুষের ঐক্য ও সম্প্রীতি ছাড়া কোন দেশের উন্নতি হতে পারে না। বিবেকানন্দ একথা যে মনেপ্রাণে বিশ্বাস করতেন নিউ ইয়র্ক থেকে রাজা প্যারীমোহনের কাছে লেখা (১৮ নভেম্বর ১৮৯৪) তাঁর এক চিঠি থেকে তা স্পষ্ট। তিনি বলেনঃ "···কোন ব্যক্তি বা জাতি অন্য সকলের সহিত বিচ্ছিন্ন হইয়া বাঁচিতে পারে না। আমার মনে হয়, অপরের প্রতি ঘৃণার ভিত্তিতে কতকগুলি প্রথার প্রাচীর তুলিয়া স্বাতন্ত্র্য অবলম্বনই ভারতের পতন ও দুর্গতির কারণ।"[৪] এজন্যই তিনি অনুমোদন করতে পারেননি প্রচলিত জাতিভেদ ও বর্ণাশ্রম প্রথা, ব্রাহ্মণ ও শূদ্রের মধ্যকার কৃত্রিম ব্যবধান। তাঁর মতে, প্রত্যেক মানুষেরই সুখে থাকার অধিকার আছে; আর এজন্যই সাধারণ মানুষের অবহেলা (neglect of the mass)-কে তিনি আখ্যায়িত করেছিলেন একটি ঘোরতর অবিচার বা পাপ বলে।

মানুষের ইতিহাস, সমাজবিপ্লব এবং সমাজজীবনে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক শক্তির ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে বিবেকানন্দের অধ্যয়ন ও অন্তর্দৃষ্টি ছিল সুগভীর। তাই তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে, সমাজের নিচুতলার মানুষকে অনন্তকাল দাবিয়ে রাখা সম্ভব নয়। তিনি বলেছেনঃ "জগতে এখন বৈশ্যাধিকারের (বণিক) তৃতীয় যুগ চলিতেছে। চতুর্থ যুগে শূদ্রাধিকার (প্রলেটারিয়েট) প্রতিষ্ঠিত হইবে।"[৫] 'বর্তমান ভারত' প্রবন্ধে স্বামীজী ভারতবর্ষের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে বলেছিলেনঃ এমন একদিন আসবে যখন পদদলিত শূদ্ররা জেগে উঠবে, সর্বত্র একাধিপত্য লাভ করবে। তখন কেউ আর তাদের প্রতিরোধ করতে পারবে না। স্বামীজীর এই ভবিষ্যদ্বাণী আজও হয়তো সম্পূর্ণ বাস্তবায়িত হয়নি; তবে বিভিন্ন সমাজের মেহনতি মানুষ যে দিন দিন তাদের অধিকার সম্পর্কে সচেতন ও সোচ্চার হয়ে উঠছে, তা চারদিকে তাকালেই চোখে পড়ে।

সমকালীন আর্থ-সামাজিক অবস্থা সম্পর্কে স্বামী বিবেকানন্দের এই যে অন্তর্দৃষ্টিপূর্ণ সমীক্ষা, ভবিষ্যৎ সমাজব্যবস্থা সম্পর্কে তাঁর এই যে অগ্রদৃষ্টি, শ্রমজীবী মানুষের প্রতি তাঁর যে অকৃত্রিম দরদ—এসবই পরিচয় বহন করে তাঁর মানবতাবাদী ও সমাজতন্ত্রী মানসিকতার। এই একই মানসিকতা প্রতিফলিত তাঁর কর্মবহুল জীবনে ও অসংখ্য

৩ স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা, ৯ম খণ্ড, ৩য় সং, ১৩৮০, পৃঃ ২৩৫-২৩৬

৪ বিবেকানন্দ চরিত—সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার, ১৩৬৯, পৃঃ ১৪৫

৫ ঐ, পৃঃ ১৪৭

বাণীতে। তিনি বলেন ঃ "…আমি নিজে একজন সমাজতন্ত্রবাদী ( সোস্যালিস্ট )—এই ব্যবস্থা সর্বাঙ্গ-সুন্দর বলিয়া নহে, কিন্তু পুরা রুটি না পাওয়া অপেক্ষা অর্ধেক রুটি ভাল।"[৬] একজন আধ্যাত্মিক পুরুষ ও বৈদান্তিক সন্ন্যাসীর মুখে ( আচরণেও ) এধরনের মার্ক্সীয় সমাজতান্ত্রিক ধারণার সমর্থনের ব্যাপারটি সত্যিই কৌতূহলোদ্দীপক ও তাৎপর্য-পূর্ণ বটে। 171875

বীর সন্ন্যাসী বিবেকানন্দ ছিলেন একজন নিবেদিত-প্রাণ মানবপ্রেমিক এবং বিশেষতঃ একজন স্বদেশ-প্রেমিক। তিনি জানতেন, 'Charity begins at home'; আর তাই বিশ্বপ্রেমিক হয়েও তিনি সর্বাগ্রে ব্রতী হয়েছিলেন দেশমাতৃকার, সেদিনের ভারতবর্ষের তিরিশ কোটি মানুষের সেবায়। তিনি চেয়েছিলেন সেবামন্ত্রে দীক্ষিত এমন একদল কর্মকুশলী, ত্যাগী বাঙালী যুবক গড়ে তুলতে, যাদের স্নায়ুগুলো হবে ইস্পাতের মতো মজবুত, পেশীগুলো হবে লোহার মতো দৃঢ় এবং যাদের মন হবে বজ্রের মতো কঠোর। তাঁর আশা ছিল এমন কিছু মানুষ গড়ে তোলার, যারা হবে ত্যাগে পবিত্র, চরিত্রে উন্নত এবং সংকল্পে অটল। স্বামীজীর সেই আশা আজও পুরোপুরি পূরণ হয়নি। বরঞ্চ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির অভাবিত অগ্রগতির মধ্যেও আমরা, বিশেষতঃ দরিদ্র দেশের লোকেরা আজ একদিকে ভোগ করছি অর্থ-নৈতিক অন্তর্জ্বালা এবং অন্যদিকে প্রত্যক্ষ করছি নৈতিক মূল্যবোধের এক তীব্র সংকট। কি ধনী, কি দরিদ্র সব দেশেই আজ ধ্বনিত হচ্ছে হাহাকার, সর্বত্রই বিরাজ করছে হতাশা ও অশান্তি। এমনই এক অবাঞ্ছিত পরিবেশেই ঘটেছিল স্বামী বিবেকা-নন্দের আবির্ভাব, আর এথেকে উত্তরণের লক্ষ্যেই তিনি মানবতাকে উপহার দিয়েছিলেন এক নতুন কার্যকর জীবনদর্শন, যে-দর্শন প্রাচ্যের ত্যাগ, প্রেম ও ঐক্যের এবং পাশ্চাত্যের কর্মোদ্যম, বীর্য ও শৃংখলাবোধের সমন্বয়ে গঠিত। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের ধর্ম ও বিজ্ঞানের এবং শক্তি ও প্রেমের ঐক্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত এই সার্থক জীবনদর্শনের আলোকেই তিনি চেয়েছিলেন এ-উপমহাদেশের তথা জাতি-ধর্ম-বর্ণ-নির্বিশেষে নিখিল বিশ্বের মানুষের পার্থিব ও পারলৌকিক কল্যাণ বয়ে আনতে। মানবমিত্র বিবেকানন্দের এই অমোঘ জীবনদর্শনের সমকালীন দিশেহারা মানুষকে ন্যায়, সত্য ও কল্যাণের পথ প্রদর্শন করবে, পৃথিবীর অগণিত অসহায় মানুষকে স্থায়ী শান্তি ও অনাবিল সুখের সন্ধান দেবে—এ আশাই করছি। * □

৬ বিবেকানন্দ চরিত, পৃঃ ১৮৮

* উদ্দীপন, ডিসেম্বর, ১৯৮৬, পৃঃ ২২-২৬ ; প্রকাশস্থান—ঢাকা, বাংলাদেশ।

সংগ্রহ ঃ তাপস বসু

স্বামীজীর ভারত-পরিক্রমা এবং শিকাগো ধর্মমহাসম্মেলনে স্বামীজীর আবির্ভাবের শতবার্ষিকী উপলক্ষে উদ্বোধন কার্যালয় থেকে স্বামী পূর্ণাত্মানন্দের সম্পাদনায় **বিশ্বপথিক বিবেকানন্দ** শিরোনামে একটি সংকলন-গ্রন্থ প্রকাশের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। 'উদ্বোধন'-এর বিভিন্ন সংখ্যায় স্বামীজীর ভারত-পরিক্রমা এবং শিকাগো ধর্মমহাসভায় স্বামী বিবেকানন্দ সম্পর্কে যেসব প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে ও হচ্ছে সেগুলি ঐ সংকলন-গ্রন্থে স্থান পাবে। এছাড়াও উভয় ঘটনার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট অন্যান্য মূল্যবান সংবাদ এবং তথ্যও ঐ গ্রন্থে অন্তর্ভুক্ত হবে।

**গ্রন্থটি সংগ্রহের জন্য অগ্রিম গ্রাহকভুক্তির প্রয়োজন নেই।**

কার্যাধ্যক্ষ

১ মাঘ ১৩৯৯/১৫ জানুয়ারি ১৯৯৩ উদ্বোধন কার্যালয়

নিবন্ধ

# বর্তমান প্রেক্ষাপট এবং স্বামী বিবেকানন্দ

চিন্ময়ীপ্রসন্ন ঘোষ

কেউ কেউ বলেন, স্বামীজী বিগত শতকের মানুষ, ধর্মীয় আন্দোলনের প্রবক্তা, বর্তমান আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি ও বিজ্ঞানের যুগে তিনি কতটা প্রাসঙ্গিক? এধরনের দায়িত্বজ্ঞানহীন মন্তব্য বা চিন্তার মূল কারণ হলো, স্বামীজীর রচনা ও বাণীগুলির গভীরে প্রবেশ না করা। স্বামীজীর ভারতচিন্তা নিয়ে কেউ কেউ বিতর্কও তোলেন। এমনকি রোমিলা থাপারের মতো ঐতিহাসিকও তাঁকে 'পুনরুজ্জীবনবাদী' আখ্যা দিয়েছেন। অতীতকে জানার অর্থ কি পুনরুজ্জীবনবাদী হওয়া? সেই প্রশ্নই তুলেছিলেন স্বামীজীঃ "পুনর্বার কি বৈদিক যজ্ঞধূমে ভারতের আকাশ তরল মেঘাবৃত প্রতিভাত হইবে বা পশুরক্তে রন্তিদেবের কীর্তির পুনরুদ্দীপন হইবে?... মনুর শাসন কি পুনরায় অপ্রতিহত-প্রভাবে প্রতিষ্ঠিত হইবে বা দেশভেদে বিভিন্ন ভক্ষ্যাভক্ষ্য-বিচারই আধুনিককালের ন্যায় সর্বতোমুখী প্রভুতা উপভোগ করিবে? জাতিভেদ বিদ্যমান থাকিবে?" উত্তর দিয়েছেন তিনি নিজেই। বলেছেনঃ "না।" তাহলে চাই কি? তারও উত্তর দিয়েছেন তিনিঃ "যাহা যবনদিগের ছিল, যাহার প্রাণস্পন্দনে ইউরোপীয় বিদ্যুদাধার হইতে ঘন ঘন মহাশক্তির সঞ্চার হইয়া ভূমণ্ডল পরিব্যাপ্ত করিতেছে, চাই তাহাই। চাই সেই উদ্যম—সেই স্বাধীনতা-প্রিয়তা, সেই আত্মনির্ভর, সেই অটল ধৈর্য, সেই কার্যকারিতা, সেই একতাবন্ধন, সেই উন্নতিতৃষ্ণা।" অর্থাৎ অতীতকে জানতে হবে, তার থেকে শিক্ষণীয় বিষয়গুলি গ্রহণ করতে হবে আমাদের মৌলিক স্বকীয়তা বোঝার জন্য এবং রক্ষা করার জন্য। কিন্তু তা বলে প্রাচীনযুগে অন্ধের মতো ফিরে যাওয়া চলবে না। তাঁর ভাষায়ঃ "ঘরের সম্পত্তি সর্বদা সম্মুখে রাখিতে হইবে যাহাতে আসাধারণ সকলে তাহাদের পিতৃধন সর্বদা জানিতে ও দেখিতে পারে তাহার প্রযত্ন করিতে হইবে ও সঙ্গে সঙ্গে নির্ভীক হইয়া সর্বদ্বার উন্মুক্ত করিতে হইবে।" এই উন্মুক্তমনা সন্ন্যাসী কোন একটি যুগের বা কালের নন, তিনি ও তাঁর চিন্তা, কর্মধারা সর্বযুগের সর্বকালের সকল মানুষের। ভারত তথা সমগ্র বিশ্বকে উন্নততর করে তোলার প্রয়াসে আজকের চিন্তায় ও কর্মজগতে তিনি সমানভাবে আলোড়ন তুলতে পারেন। এতে কোন সন্দেহ নেই।

এক যুগসন্ধিক্ষণে যেমন স্বামীজীর আবির্ভাব আমরাও আজ তেমনি এক যুগসন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে। তখন দোর্দণ্ডপ্রতাপ ব্রিটিশ রাজশক্তির করতলগত ছিল তামাম বিশ্ব, আর আজ আমেরিকা তার অর্থনৈতিক শক্তির দ্বারা প্রভাবিত করতে চলেছে বিশ্বরাজনীতি। সোভিয়েত রাশিয়ার মতো বিরাট শক্তিধর দেশ আজ ভেঙে টুকরো টুকরো। মানুষ চাইছে ব্যক্তি-স্বাধীনতা, চিন্তার মুক্তি, ধর্মের অধিকার। কার্ল মার্ক্সের যে বস্তুতান্ত্রিক সাম্যবাদের ধারণা মানুষকে এতকাল মরুপ্রান্তরে মরীচিকার মতো প্রলুব্ধ করেছে আজ তার অসম্পূর্ণতা দিনের আলোর মতো প্রকট। মানুষের সামনে একটা বড় কিছু আদর্শ বা ভাবধারা স্থাপন করতে না পারলে মানুষ দিগ্‌ভ্রষ্ট হয়ে যায়। অচলায়তনে আর যে কেউ পারুক মানুষ তো থাকতে পারে না। কারণটা শ্রীরামকৃষ্ণের ভাষায় অতি সোজাঃ 'মান-হুঁশ' হওয়ার আকাঙ্ক্ষা যে মানুষের স্বাভাবিক। এখানেই এসে যায় ধর্মের প্রাসঙ্গিকতা যা সমাজ-সংস্কৃতিকে ধরে রাখে। ব্যক্তিমানুষ ও সমাজকে সুস্থ সবল ও প্রগতিশীল করে এরকম একটি নিয়ামক হলো ধর্ম। খালিপেটে যেমন ধর্ম হয় না আবার ধর্মকে বাদ দিয়ে পেট ভরালেও সব পাওয়া যায় না। তাই সাম্যবাদী ইউরোপীয় দেশগুলো তাসের ঘরের মতো ভেঙে পড়েছে।

এথেকে মনে হচ্ছে, কমিউনিজম বা সাম্যবাদের মোহ মানুষের মন থেকে কাটছে। মানুষের মতামত প্রকাশের স্বাধীনতা, ধর্মাচরণের অধিকার ফরাসী বিপ্লবকালীন স্বাধীনতা, সাম্য ও মৈত্রীর দাবির

মতো ইউরোপ-ইতিহাসে নতুন করে প্লাবন এনেছে। তফাতটা এই—তখন ছিল রাজতন্ত্রের শাসন-শোষণের অর্গল ভাঙার অভিযান আর এখন কমিউনিজম নামক নতুন শোষণের শৃংখল ভাঙার দুর্মদ প্রেরণা। এসব পরিবর্তন যে আসবে তা বহুকাল আগেই স্বামীজী বুঝতে পেরেছিলেন। আধুনিক বৈজ্ঞানিক সভ্যতার পীঠভূমি ইউরোপের উদ্দেশ্যে তাই তিনি তাঁর সাবধান-বাণী উচ্চারণ করেছিলেন: "ইউরোপ যদি আধ্যাত্মিকতার পথ গ্রহণ না করে তবে তার ধ্বংস অবশ্যম্ভাবী।" স্বামীজীর কথা আজ বাস্তবায়িত দেখে তাঁর গভীর প্রজ্ঞাদৃষ্টি এবং ইতিহাস ও সমাজবিজ্ঞান-মনস্কতার কথা ভেবে অবাক হতে হয়।

রাশিয়ায় আজ ধর্মচর্চা অবাধ। অবশ্য টলস্টয়ের সময় থেকে সেদেশে রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের চর্চা শুরু। লিও টলস্টয়ও স্বামীজীর 'রাজযোগ' পড়ে প্রভাবান্বিত হয়েছিলেন। টলস্টয় তাঁর ডায়েরীতে লিখেছেন যে, তিনি 'Sayings of Ramakrishna' পড়ে অভিভূত হয়েছেন। শ্রীরামকৃষ্ণের উপদেশগুলি বেছে বেছে একশোটি তাঁর ডায়েরীতে তিনি লিখে রেখে গেছেন। এখন রুশভাষায় সেগুলি প্রকাশিত হয়েছে। তিনি বিবেকানন্দের তিন খণ্ড রচনাবলীও পড়েছিলেন। ১৯১৪ খ্রীস্টাব্দে 'The Gospel of Sri Ramakrishna' রুশভাষায় অনূদিত হয়েছিল, কিন্তু পরে তার অস্তিত্বই লোপ পায়। এখন তা আবার প্রকাশিত হচ্ছে। ইতিমধ্যে স্বামীজীর নির্বাচিত রচনাবলীর দুই খণ্ড রুশ-ভাষায় প্রকাশিত হয়েছে। মস্কোতে ১৯৮৮ খ্রীস্টাব্দে স্থাপিত হয়েছে বিবেকানন্দ সোসাইটি। রোমাঁ রোলাঁর 'শ্রীরামকৃষ্ণের জীবন' বইটির দু-লক্ষ কপি এখন এই সোসাইটিতে ছাপা হচ্ছে। এর থেকে সহজে বোঝা যায়, স্বামীজী ও শ্রীরামকৃষ্ণের ভাবাদর্শ এখন বিশ্বে কী পরিমাণে জনপ্রিয় হয়ে উঠছে।

অপর কমিউনিস্ট দেশ চীনেও এই ভাবান্দোলন থেমে নেই। এপ্রসঙ্গে স্মরণ করা যেতে পারে, ১৮৯৩ খ্রীস্টাব্দে স্বামীজী চীনের ক্যান্টন, সাংহাই প্রভৃতি দর্শন করেছিলেন এবং আলাসিঙ্গা পেরুমলকে প্রেরিত পত্রে এসব জায়গার প্রশংসাও করেছিলেন। বেজিং বিশ্ববিদ্যালয়ে 'ইনস্টিটিউট অফ্ সাউথ এশিয়ান স্টাডিজ' প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এই বিশ্ব-বিদ্যালয়ের ইতিহাসের অধ্যাপক হুয়াং জিন চুয়াং একটি বই লেখেন। বইটির নাম—'The Modern Indian Philosopher Vivekananda: A Study'। বইটির পরিশিষ্টে শ্রীরামকৃষ্ণের জীবন আলোচিত হয়েছে। এথেকে স্পষ্ট বোঝা যায়, স্বামীজীর ভাবাদর্শ মাও-সে-তুং-এর চীনেও ক্রমশই জনপ্রিয় হচ্ছে।

স্বামী বিবেকানন্দের ভাবধারা কালজয়ী ও দেশ-জাতি-সমাজভেদেও ব্যবহারোপযোগী।

স্বামীজী রাজনীতির বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেছিলেন। ইতিহাসের ধারা গভীরভাবে সমীক্ষা করে তিনি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছিলেন যে, রাজনীতি দিয়ে যথার্থ মানবকল্যাণ ও সমাজপ্রগতি সম্ভব নয়। স্বার্থান্ধ রাজনীতিক ও তাদের সাকরেদদের ভ্রূকুটিকে উপেক্ষা করে তিনি দৃপ্তকণ্ঠে ঘোষণা করেছিলেন: "রাজনীতির মতো আহাম্মকি নিয়ে আমার কিছু করার নেই।" তবে আরেকটা কথা মনে রাখতে হবে, স্বামীজীই প্রথম ভারতীয় যিনি সমাজতন্ত্রকে সর্বপ্রথম অভিনন্দন জানিয়েছিলেন। তিনি ঘোষণা করেছিলেন যে, সর্বহারার জয় অবশ্যম্ভাবী। বলেছিলেন, নতুন ভারত জন্ম নেবে চাষার কুটীর থেকে, লাঙল ধরে, জেলে-মুচি-মেথর-ঝাড়ুদারের কুটির থেকে, ভুনা-ওয়ালার উনুনের পাশ থেকে, কলকারখানা থেকে, বন-জঙ্গল-পাহাড়-পর্বত থেকে। আর উচ্চবর্ণের হিন্দুদের তিনি কঠোর ভাষায় তিরস্কার করেছেন 'দশ হাজার বছরের পুরাতন মমি' বলে। প্রলেতারিয়েতরা, যাদের তিনি শূদ্রবর্ণ বলে অভিহিত করেছেন তারাই একদিন রাষ্ট্র-ক্ষমতায় আসবে। কেউই তাদের ঠেকাতে পারবে না। স্বামীজীর এই সমাজতান্ত্রিক ভাবধারা লক্ষ্য করে অধ্যাপক আর্নেস্ট পি. হারউইজ বলেছেন: "বিবেকানন্দ বুর্জোয়া শ্রেণীকে অত্যন্ত ঘৃণা করতেন এবং প্রলেতারিয়েতদের ভালবাসতেন।" স্বামীজী জানতেন, অর্থ হচ্ছে মৃত সম্পদ আর জাতির জীবন্ত সম্পদ হলো ব্যক্তির শ্রম যা শরীর, মন ও অন্তর গঠন করে। অধ্যাপক হারউইজ বিবেকানন্দকে নতুন সোভিয়েত রাশিয়ার জনক লেনিনের সঙ্গেও তুলনা করেছেন, বলেছেন লেনিনের সীমাবদ্ধতার কথা। সঙ্গে সঙ্গে তিনি

বলেছেন শ্রীরামকৃষ্ণের উত্তরসূরীরা সাংস্কৃতিক উপায়ে এক শ্রেণীহীন সমাজগঠনে দায়বদ্ধ।

স্বামীজীর 'নববেদান্ত' বলে, প্রত্যেক মানুষের মধ্যে অনন্ত সম্ভাবনার বীজ নিহিত। শ্রীরামকৃষ্ণ বলতেনঃ "জীবই শিব"। স্বামী বিবেকানন্দ বলতেন, যখন প্রত্যেক মানুষের মধ্যে নিজেকে বিকশিত করার শক্তি বা সম্ভাবনা নিহিত তখন প্রত্যেকেরই এই শক্তিকে বিকশিত করার সমান অধিকার বা সুযোগ থাকা দরকার। প্রত্যেক মানুষের মধ্যে একই শক্তি—কোথাও তার প্রকাশ বেশি, কোথাও কম। বিশেষ সুযোগ-সুবিধার দাবি আসে কোথা থেকে? বেদান্তের লক্ষ্য সমস্ত বিশেষ সুযোগ-সুবিধার কাঠামো ভেঙে ফেলা। তবে শ্রেণীহীন সমাজগঠনে স্বামীজী কোন রক্তক্ষয়ী বিপ্লবের পক্ষপাতী ছিলেন না। সর্বহারা শ্রেণীকে শিক্ষিত করে তুলে ক্রমশঃ তাদের অধিকার ও কর্তব্যে সচেতন করে তোলা এবং ভাল-মন্দ বিচারের শক্তি জাগিয়ে তোলাই হবে সমাজের পক্ষে হিতকর। গণতান্ত্রিক সমাজ পরিকাঠামোয় অবহেলিত শ্রেণীও তাদের অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নতি করতে পারবে। রক্তাক্ত 'বিপ্লবের কুফল সম্পর্কে পরিহাসচ্ছলে স্বামীজী বলছেনঃ মুক্তি ও সাম্যের নামে সারা ফরাসী জাতটাই পাগল হয়ে উঠল। তরবারির ধারে এবং বেয়নেটের আগায় নেপোলিয়ান 'স্বাধীনতা, সাম্য ও মৈত্রী'কে ছুঁড়ে দিলেন ইউরোপের একেবারে অস্থিতে-মজ্জায়। বিপ্লব-আগুনের ভস্ম থেকে বেরিয়ে এলেন নেপোলিয়ন। তাঁর আকস্মিক আবির্ভাব প্রমাণ করল কিভাবে রাজনৈতিক ক্ষমতা দখলের লড়াই উচ্চাকাঙ্ক্ষী রাজনীতিকদের ব্যক্তিগত ক্ষমতালাভের সুযোগে পরিণত হয়। তাই সমাজ পরিবর্তনের হাতিয়ার হিসাবে রাজনীতিকে স্বামী বিবেকানন্দের পছন্দ হয়নি।

ভারত-ইতিহাসের ধারা অনুসরণ করে তিনি বুঝেছিলেন, ভারতীয় সমাজে সামাজিক বিপ্লব কখনো সক্রিয় হয়নি। সামাজিক পরিবর্তন এসেছে আধ্যাত্মিক বিপ্লবের চেষ্টায়। যেমন, বৌদ্ধ ও জৈন ধর্মান্দোলনে ব্রাহ্মণরা ক্ষমতাচ্যুত হয়েছেন। ক্ষত্রিয়রা এসেছেন ক্ষমতায়। তাই তাঁর মতে সমাজ-বিপ্লবের পূর্বে আধ্যাত্মিক ও নৈতিক বিপ্লব খুবই জরুরী। রক্তক্ষয়ী সংগ্রামে জনগণকে নেতৃত্ব দেওয়ার তিনি ঘোর বিরোধী ছিলেন। কারণ, এরকম অবস্থায় নেতৃত্ব আসে উচ্চবর্ণের তথা শোষকশ্রেণীর থেকে। যে-শ্রেণী কখনোই ক্ষমতা হস্তান্তরের কথা ভাবতে পারে না। কারণ স্বামীজী বিশ্বাস করতেন, সর্বহারাদের কাছে উন্নত ভাবধারা পৌঁছে দিতে হবে। তাদের চোখ খুলে দিতে হবে এবং তারা নিজেদের মুক্তি তখন নিজেরাই অর্জন করে নেবে। তিনি ঘোষণা করেছিলেনঃ চিন্তা ও কর্মের অধিকার জীবনে সমৃদ্ধি ও প্রগতির একমাত্র লক্ষণ, যেখানে এগুলি নেই সেখানে মানুষ, দেশ ও জাতি অবশ্যই অধঃপাতে যায়।

মার্ক্সের মতো স্বামী বিবেকানন্দ ধনতান্ত্রিক রাষ্ট্রকাঠামোরও তীব্র সমালোচনা করেছেন। দক্ষিণ ভারতের পরমকুড়িতে সংবর্ধনার উত্তরে তিনি বলেছিলেনঃ ইউরোপের ধনতান্ত্রিক সভ্যতার বস্তু-কেন্দ্রিকতার অত্যাচার-শাসন ভয়াবহ। দেশের ধনসম্পদ ও শক্তি মুষ্টিমেয় লোকের হাতে, যারা কাজ করে না কিন্তু লক্ষ লক্ষ মানুষের কর্মশক্তিকে নিয়ন্ত্রণ করে ও কর্মের ফল ভালভাবে ভোগ করে। এই শক্তির দ্বারা তারা সারা পৃথিবীকে রক্তে ভাসায়। ধর্ম ও অন্যান্য সবকিছুই তাদের পায়ের তলায়। স্বামীজীর এই কথা আমাদের দু-দুটো বিশ্বযুদ্ধে মারণযজ্ঞের কথা মনে করিয়ে দেয়।

পাশ্চাত্যের তথাকথিত গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান ধন-তান্ত্রিক শোষণের একটি ভাল মুখোশ বলে স্বামীজী মনে করতেন। তাই বজ্রনাদী কণ্ঠে ঐ ভাষণে তিনি ঘোষণা করেছেনঃ পাশ্চাত্যজগৎ মুষ্টিমেয় শাইলকের দ্বারা শাসিত। সাংবিধানিক সরকার, স্বাধীনতা, পার্লামেন্ট প্রভৃতি যা কিছু বলা হয় সব বাজে কথামাত্র। তিনি তাঁর শিষ্য শরচ্চন্দ্র চক্রবর্তীকে একথাও বলেছেনঃ যদি উচ্চবর্ণেরা এখনো তাদের আচরণ পরিবর্তন না করে, যদি নিম্নবর্ণের ভাইদের মূল জাতীয় স্রোতে ফিরিয়ে আনতে সাহায্য না করে তবে তীব্র সংগ্রাম বা রক্তক্ষয়ী বিপ্লব অবশ্যম্ভাবী।

আজ পরিবর্তনশীল বিশ্ব-রাজনীতিতে বিবেকা-নন্দের নব বেদান্তবাদ বা মানুষকে নারায়ণজ্ঞানে সেবার ও ভালবাসার মহৎ আদর্শ নতুন করে ভাববার ও গ্রহণ করবার দিন উপস্থিত। □

প্রাসঙ্গিকী

## জিজ্ঞাসার উত্তর

গত সংখ্যায় (পৌষ, ১৩৯৯) মণিদীপা চট্টোপাধ্যায় তাঁর চিঠিতে আমার কাছে জিজ্ঞাসা রেখেছেন যে, শ্রীমায়ের জরিমানা সংক্রান্ত মজলিসে উপস্থিত ব্রাহ্মণগণ কি সকলেই জয়রামবাটীর অধিবাসী ছিলেন অথবা অন্য কোন গ্রামের ? উত্তরে জানাই, মজলিসে উপস্থিত সকল ব্রাহ্মণই ছিলেন জয়রামবাটী গ্রামের বাসিন্দা। মজলিসে ব্রাহ্মণেতর অন্যান্য যাঁরা উপস্থিত ছিলেন তাঁরাও ছিলেন জয়রামবাটীর অধিবাসী। আমার স্মৃতিকথায় (শারদীয়া উদ্বোধন, ১৩৯৯) আমি লিখেছি, ঐ মজলিসে উপস্থিত ছিলেন জিবটা গ্রামের শম্ভুনাথ রায়। তিনি মায়ের মন্ত্রশিষ্য ছিলেন। মজলিসে বাইরের গ্রামের শুধু তিনিই উপস্থিত ছিলেন। তিনি ছিলেন ঐ অঞ্চলের পত্তনীদার অর্থাৎ জমিদারের প্রতিনিধি। পত্তনীদার হলেও জিবটা গ্রামের রায়-পরিবার জমিদার হিসাবেই ঐ অঞ্চলে সম্মানিত হতেন এবং শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তিরূপে অধিকাংশ গ্রাম্য মজলিসে প্রায়ই উপস্থিত থাকতেন।

**সুধীরচন্দ্র সামুই**
জয়রামবাটী, বাঁকুড়া

## সময়োচিত নিবন্ধ

ইংরেজ কবি পি. বি. শেলীর জন্মের দ্বিশত-বর্ষপূর্তি উপলক্ষে গত অগ্রহায়ণ, ১৩৯৯ সংখ্যায় প্রকাশিত সমরেন্দ্রকৃষ্ণ বসুর 'শেলীর কাব্যে সনাতন ধর্মের মহত্তম উপলব্ধির অভিব্যক্তি' নিবন্ধটি সময়োপযোগী, সুখপাঠ্য এবং তথ্যপূর্ণ। শেলীর জন্মের দ্বিশতবর্ষপূর্তি উপলক্ষে অন্যান্য পত্র-পত্রিকাতেও শেলী সম্পর্কে কিছু রচনা চোখে পড়েছে, কিন্তু উদ্বোধন সেই উপলক্ষকে যোগ্য সমাদরের সঙ্গে স্মরণ করে একটি বিশেষত্ব দেখিয়েছে। সেই বিশেষত্ব হলো সময়, সমাজ এবং প্রাসঙ্গিকতাকে সম্মান দিয়ে নিজের ঐতিহ্যের প্রতি একনিষ্ঠতা। সমাজ এবং সময়ের প্রাসঙ্গিকতাকে মূল্যদানের সঙ্গে সঙ্গে ভারতীয় ঐতিহ্য এবং সংস্কৃতির দিকটি তুলে ধরার প্রয়াস উদ্বোধনের কাছে আমাদের প্রত্যাশা। বলা বাহুল্য, উদ্বোধন সেই প্রত্যাশা পূর্ণ করেছে। শেলীর কবিতায় প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের অধ্যাত্ম ভাবনার মিলন অপূর্ব-ভাবে ঘটেছে। বিষয়টি সুন্দরভাবে উপস্থাপন করার জন্য উদ্বোধন কর্তৃপক্ষ এবং নিবন্ধকার সমরেন্দ্রকৃষ্ণ বসুকে আন্তরিক অভিনন্দন জানাচ্ছি।

**স্বপনকুমার আইচ**
তুফানগঞ্জ, কুচবিহার

## গীতার সাংখ্যযোগ প্রসঙ্গে

'উদ্বোধন'-এর বিগত ভাদ্র সংখ্যায় (১৩৯৯) কৃষ্ণা সেনের 'গীতার সাংখ্যযোগ ও গীতাতত্ত্ব' পড়ে মুগ্ধ ও অভিভূত হয়েছি। গীতার দ্বিতীয় অধ্যায়ের প্রতিপাদ্য আত্মতত্ত্বের মূলকথাগুলি অতি প্রাঞ্জলভাবে লেখিকা তাঁর সুলিখিত নিবন্ধে তুলে ধরেছেন। আমাদের মতো সাধারণ পাঠকদের জন্য নিঃসন্দেহে এটি একটি মূল্যবান রচনা। সংস্কৃতে জ্ঞানের অভাবে সকলের পক্ষে মূল সংস্কৃত বা সেই সঙ্গে ভাষ্যকারের বিশদ আলোচনা বোধগম্য না-ও হতে পারে। উল্লিখিত নিবন্ধটির বৈশিষ্ট্য হলো, মূল এবং ভাষ্যটীকা অনুসরণ করেই এটি লিখিত। পড়তে পড়তে মনে হয়, গীতার দ্বিতীয় অধ্যায়ই যেন পাঠ করছি এবং তার ব্যাখ্যা শুনছি।

বিষয়বস্তুর আলোচনায় মধ্যে মধ্যে শ্রীরামকৃষ্ণ ও শ্রীঅরবিন্দের উদ্ধৃতি বক্তব্যবিষয়কে সুন্দরতর করে ফুটিয়েছে। উদ্ধৃতিগুলি অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক। এছাড়া ভারতীয় অধ্যাত্মসাধনার অনেক জ্ঞাতব্য তথ্যও রয়েছে। পূর্বজন্মের বা সংস্কারের কথা প্রসঙ্গে কালিদাসের 'অভিজ্ঞান শকুন্তলম্' থেকে উদ্ধৃতিটি চমৎকার। □

**অমর বসাক**
ডানকুনি, হুগলী

পরিক্রমা

# তপঃক্ষেত্র উত্তরকাশী

## তারকনাথ ঘোষ

সনাতন ভারতের সনাতন রূপকে প্রত্যক্ষ করার মানসে গিয়েছিলাম উত্তরকাশী। সেখানে পূর্ত-বিভাগের প্রধান করণের সামনে একটা বড় কাঠের ফলকে লিপিবদ্ধ হয়েছে স্কন্দপুরাণের কেদারখণ্ডের আড়াইটি শ্লোক ঃ

ইয়ং উত্তরকাশী হি প্রাণিনাং মুক্তিদায়িনী।
ধন্যা লোকে মহাভাগ কলৌ যেষামিহ স্থিতিঃ॥
যত্র সর্বার্থভাবেন বসন্তি সর্বদেবতাঃ।
যত্র ভাগীরথী গঙ্গা উত্তরাশ্রিতবাহিনী॥
অসি চ বরুণা যত্র সন্নিধানে সদৈব হি॥

—যেখানে সকল অর্থে সকল ভাবে সর্বদেবতা বাস করেন, যেখানে ভাগীরথী গঙ্গা উত্তরবাহিনী, যেখানে অসি আর বরুণা ( নদী-দুটি ) নিয়তই নিকটে অবস্থিতা—এই ( সেই ) উত্তরকাশী—জীবকুলের নিশ্চিত মুক্তিদাত্রী। হে মহাভাগ। কলিযুগে যাঁদের এখানে স্থিতি তাঁরা (ত্রি-)লোকে ধন্য।

শাস্ত্রবিৎ প্রাচীন সাধুরা অনেকে সমতলভাগের কাশীকে বলেন—পূর্বকাশী। হিমালয়ে আরও কয়েকটি কাশী আছে—সবই শিবক্ষেত্র। তবে উত্তরকাশীর বিশিষ্টতা আছে। তীর্থমাতা ভাগীরথী উত্তরবাহিনী হয়ে পূর্বকাশীর মতোই উত্তরকাশীকে বেষ্টন করে আছেন। বরুণা আর অসি নদী কাছাকাছিই এসে মিশেছে বলে উত্তরকাশীকে বারাণসীও বলা যায়—সে-নাম অবশ্য প্রচলিত নয়। বরং নামান্তর সৌম্যকাশী সাধু-সমাজে পরিচিত। এখানেও আছে কেদারঘাট, মণিকর্ণিকা-ঘাট। আর বিরাজ করছেন স্বয়ং বিশ্বনাথ—সৌম্য কাশীশ্বর স্বয়ম্ভু লিঙ্গ।

অবিমুক্ত ভূমি পূর্বকাশীতে ক্ষেত্রাধিপতি সদাশিব ইষ্টস্বরূপ কল্যাণমূর্তি হয়ে অহৈতুকী করুণায় আশ্রিত ভক্তদের অযাচিত মুক্তি বিতরণ করছেন। উত্তরকাশীতে তিনি যোগাশ্রয় মহাযোগীন্দ্র দক্ষিণামূর্তি গুরুস্বরূপ তপোনিষ্ঠ সাধকদের জীবন্মুক্তির অপার আনন্দ অনুভব করাতে চান। সমগ্র পরিমণ্ডলে সর্বথা ব্যাপ্ত শাম্ভবী কৃপার স্বতোবিচ্ছুরণ—যাঁর যেটুকু প্রযত্ন যতটা অধিকার তা পেয়ে যান।

এই শিবক্ষেত্রকে ঘিরে রেখেছে তিন পাহাড়—হরিপর্বত, নচিকেতা আর বারণাবত। এ কি মহাভারতের সেই বারণাবত, যেখানে জতুগৃহ দাহ হয়েছিল। উত্তরকাশীর লাক্ষেশ্বর ( লাক্ষা=গালা ) বা লক্ষেশ্বর শিব ভীমই প্রতিষ্ঠা করেছিলেন বলে কিংবদন্তী আছে। ঐ অঞ্চলে পোড়া ইট-পাথরও নাকি পাওয়া গেছে।

পূর্বকাশী সুদূর অতীতকাল থেকেই সংস্কৃতির—বিশেষ করে ধর্মসংস্কৃতির পীঠস্থান। সারা ভারতের ( সারা বিশ্বেরও বলা যায় ) অগণিত নরনারী বারাণসীতে তীর্থদর্শনে এসেছে, এখনো আসছে। সর্বসম্প্রদায়ের মিলনক্ষেত্র এই পুণ্যতীর্থ। এর অলিতে গলিতে মন্দির, মঠ, আশ্রম বা আখড়া। কেবল দেবারাধনা, পূজাপাঠ নয়, তার সঙ্গে চলেছে শাস্ত্রচর্চার নিয়ত অনুশীলনও।

উত্তরকাশীও সুপ্রাচীন তীর্থভূমি, কিন্তু সেটাই তার বড় পরিচয় নয়। এখানেও শাস্ত্রাধ্যয়ন হয়, তবে নিছক বিদ্যাচর্চার জন্য নয়—অধ্যাত্মজিজ্ঞাসার উত্তরের সন্ধানে সাধনশাস্ত্রের সুগভীর অনুধ্যান। কিন্তু এর বিশেষ পরিচয়—এটি তপঃক্ষেত্র। যুগ যুগ ধরে সংসারবিরাগী সাধুরা দেবাদিদেবের আশ্রয়ে থেকে দেহ-মন উৎসর্গ করে আসছেন।

সারা হিমালয়েই অবশ্য সাধুরা বিরাজ করছেন। উত্তরাখণ্ড বলতে ভৌগোলিক অঞ্চলমাত্র বোঝায় না, এই নামটি বিশেষ করে সাধুসমাজের কথাই মনে করিয়ে দেয়। হরিদ্বারে বা হৃষীকেশে অনেক সাধু-ব্রহ্মচারী আছেন। তাঁদের প্রায় সবাই আশ্রমিক—কোন আশ্রমে থেকে আশ্রমগুরু বা অধ্যক্ষের

নির্দেশে নির্ধারিত দায়িত্ব পালন করেন, অন্য আশ্রমিকদের সঙ্গে সমবেতভাবে সাধনাদি করেন। অবশ্য সকলে মিলে একসঙ্গে করলেও জপ-ধ্যানের সময় প্রত্যেকেই স্বতন্ত্র আত্মময় সাধনায় অভিনিবিষ্ট। এছাড়া বেশকিছু দেবায়তন আছে—কোন কোন সাধু সেখানেও আশ্রয় নেন।

উত্তরকাশীতে গোটাকয়েক আশ্রম আছে, দেবস্থানও আছে ( শুনে অবাক হওয়ার কথা—পূজারী থাকলেও পাণ্ডা নেই, এমনকি বিশ্বনাথ-মন্দিরেও নেই )। সব আশ্রমেই সাধু আছেন, আশ্রমিক জীবন কিন্তু তাঁদের কাছে মুখ্য ব্যাপার নয়; আধ্যাত্মিক সাধনাই তাঁদের উদ্দেশ্য—জীবনব্রত। অনেকেই স্বতন্ত্রভাবে থাকেন, কোথাও কোথাও জনকয়েক মিলে একটা আস্তানা করেন—একই সম্প্রদায়ের সাধুরাই যে সেখানে থাকেন তা নয়। মাথা গোঁজবার মতো একটা আশ্রয় থাকলেই হলো।

॥ ২ ॥

উত্তরকাশী এখন উত্তরপ্রদেশের একটি জেলা সদর। জেলারও ঐ নাম। সাধুসমাজে প্রসিদ্ধ হলেও এই স্থান আগে ছিল জনবিরল এক তীর্থ। এখন শাসনতান্ত্রিক বা সামরিক বিভাগের প্রয়োজনে ক্রমপ্রসারী জনপদ। সরকারি অফিস-আদালত, বাজার, দোকানপাট তো আছেই, তাছাড়াও আছে ডাকঘর ( এটি অনেক দিনের ), হাসপাতাল, স্কুল-কলেজ, স্টেট ব্যাঙ্কের শাখা, সামরিক শিক্ষাকেন্দ্র। নেহরু মাউন্টেনিয়ারিং ইনস্টিটিউটের উল্লেখ করতে হয়। এই প্রতিষ্ঠানের বাচেন্দ্রী পাল এভারেস্ট শৃঙ্গের চূড়ায় উঠেছিলেন। আগে দু-চারটে ধর্মশালা ছিল, এখন প্রয়োজন মেটাতে অথবা যুগের হাওয়ায় গড়ে উঠেছে হোটেল, টুরিস্ট-লজ। সিনেমা-হলও হয়েছে। তবে এখনো নগরের পরিধি সীমাবদ্ধ। জমজমাট কিছু অংশ বাদ দিলে দূরে-অদূরে কিছু আশ্রম, সাধুদের কুঠিয়া, মাঝে মাঝে পাহাড়ী গ্রাম।

এসবের কেন্দ্রে আছেন তীর্থভূমির অধীশ্বর দেবাদিদেব। মন্দিরের উত্তরমুখী প্রবেশপথে তোরণের মাথায় বেশ বড় 'ওঁ'—দূর থেকে দেখা যায়। মনে মনে বিশ্বনাথকে প্রণামান্তে ভিতরে প্রবেশ করে দেউড়ির দুপাশেই গণপতির দর্শন পাওয়া গেল। ডানদিকে সিঁদুরমাখানো কালোপাথরের মূর্তি, বাঁদিকেরটি শ্বেতপাথরের। সামনে এগোলে সিমেন্ট-বাঁধানো প্রাঙ্গণ, ডানদিকে বেশ বড় নাটমন্দির—সেখানে জনাকয়েক ভক্ত বা তীর্থযাত্রী—দু-একজন সাধুকেও দেখা যায়।

বিঘে-দুই জমির প্রায় মাঝখানে একটু পূব ঘেঁষে মূল মন্দির। এপাশে ওপাশে অনেকগুলি গাছ—স্বচ্ছন্দভাবে রোপণ করা অকৃত্রিম প্রাকৃতিক পরিবেশ গড়ে উঠেছে—যেন দেবাদিদেবের উদ্যান-মন্দির। অশ্বত্থ আর চাঁপা গাছ বিশেষ করে চোখে পড়ে—চাঁপাফুল শিবের প্রিয়।

উঁচু উঁচু চওড়া কয়েক ধাপ পাথরের সিঁড়ি বেয়ে উঠে এলে মন্দিরের চত্বর। ডানদিকে হোমকুণ্ড, বাঁদিকে মুক্তিমণ্ডপ—সিদ্ধমণ্ডপও বলে। কোন কোন সাধু, ভক্তজন এখানে কিছুক্ষণ বসে জপ করেন। একটু এগিয়ে গর্ভগৃহের বাইরে ছোট-বড় কয়েকটি ঝোলানো ঘণ্টা। সামনে পাথরের সুঠাম নন্দী ( ষাঁড় )—বিশ্বনাথের দিকে মুখ করে বসে আছেন। সাধু-ভক্তরা অনেকেই তার গায়ে হাত বুলিয়ে যেন আদর করেন।

গর্ভগৃহে একটু ঘেরা জায়গায় সৌম্য কাশী-বিশ্বনাথ—স্বয়ম্ভু লিঙ্গ। ব্যাস প্রায় আড়াই হাত। দেবাদিদেবের শরীর পূর্বকাশীর লিঙ্গদেহের মতো সুমসৃণ ও সুখস্পর্শ নয়—বিশেষভাবে কঠোরব্রতী সাধককুলের আরাধ্য বলেই কি? ওপরে প্রশস্ত জলাধার—ভক্তরা তাতে গঙ্গোদক অর্পণ করেন, কেউ কেউ অনুচ্চকণ্ঠে মন্ত্রোচ্চারণ বা স্তবপাঠ করেন। সুপ্রবীণ পুরোহিত উত্তর-পূর্ব কোণে বসে উপাংশু জপের মতো নিবিষ্ট হয়ে অস্ফুট স্বরে কোন শাস্ত্র-গ্রন্থ অথবা স্তোত্রমালা পাঠ করে চলেছেন দেখা যায়। কচিৎ কোন ভক্ত অনুরোধ করলে নামমাত্র উপকরণে পূজার ব্যবস্থা হয়। ক্ষেত্রাধিপতি চান শ্রদ্ধা, ভক্তি, বিশেষতঃ তপোময় আত্মনিবেদন—কেবল সাধু-ব্রহ্মচারীদের নয়, সর্বজনের কাছ থেকেই।

বিশ্বনাথ-মন্দিরের সামনে প্রাঙ্গণের সমতলে 'শক্তি মন্দির'। অন্নপূর্ণা বা কোন দেবীমূর্তি নয়—এই মন্দিরে শক্তিস্বরূপিণীর প্রতিনিধিরূপে অধিষ্ঠিত একটি বড় ত্রিশূল—দশ-বারো হাত উঁচু। কিংবদন্তী—জগদম্বিকা যখন মহিষাসুর মর্দন করেছিলেন তখন তিনি যে-ত্রিশূল নিক্ষেপ করে-

ছিলেন, সেই ত্রিশূলে পর্বত বিদীর্ণ করে এখানে অবস্থান করছে। ত্রিশূলের চারদিকে বেষ্টনী, তার মধ্যে কয়েকটি পট আর ছোট ছোট দেবমূর্তি।

উত্তরকাশীর সাধুসমাজের নিত্যকৃত্য বিশ্বনাথ-সন্দর্শন। প্রতিদিন সকালে ছত্রে যাওয়ার পথে মন্দিরে এসে তাঁরা দেবাদিদেবকে প্রণাম করেন—অনেকে আলিঙ্গনের ভাবে স্পর্শ করেন। যাঁরা নিত্য আসতে পারেন না, তাঁরা শিববার অর্থাৎ সোমবারে, অন্ততঃপক্ষে সংক্রান্তিতে আসেন।

উদ্দেশ্য কেবল দেবদর্শন নয়—সিতদেব মহাযোগীশ্বরের তপোব্রতী সাধকরা তাঁর কাছে আসেন নিত্য প্রেরণা নিতে—লৌকিক উপমায় বলা যায়, 'ব্যাটারি চার্জ' করিয়ে নিতে। বাইরে থেকে শুধু দর্শন-স্পর্শন দেখা যায়, অন্তরের উপলব্ধি বা ভাবভাবনার পরিচয় তো পাওয়া যায় না। অন্তর্ময়তাই উত্তরকাশীর মর্মকথা। মনে হয়, সেইজন্যই স্বয়ম্ভু লিঙ্গকে প্রণতি নিবেদন করলেই মন-প্রাণ ভরে ওঠে, শক্তিমন্দিরে শক্তিপ্রতীক দর্শন করলেই পরমা শক্তির করুণা চেতনায় সঞ্চারিত হয়।

বিশ্বনাথ-মন্দিরের পিছনদিকের দেওয়ালের গায়ে ছোট ছোট কয়েকটি খুপরি আছে। সেগুলিতে এক-একজন করে কয়েকজন সাধুনী থাকেন—প্রায় সকলেই নেপাল-দুহিতা, প্রবীণা। প্রত্যেকেই শান্তি ও স্নিগ্ধতার প্রতিমা।

॥ ৩ ॥

বারতিনেক এই তপোভূমিতে কয়েকদিন করে অবস্থানের সুযোগ হয়েছিল—সব মিলিয়ে মাস-দেড়েকের মতো। স্থান হয়েছিল বিশ্বনাথ-মন্দির থেকে প্রায় এক কিলোমিটার উত্তরে রুদ্রাবাস আশ্রম পরিমণ্ডলে, যার পরিচালনার ভার স্বামী তুরীয়ানন্দ ট্রাস্টের ওপর ন্যস্ত।

স্বামী তুরীয়ানন্দ—ঠাকুরের সন্তান হরি মহারাজের নাম সংযুক্ত হওয়ার ছোট একটি ইতিহাস আছে। হরি মহারাজ প্রায়ই নানা তীর্থে যেতেন—তীর্থবাতিকের জন্য নয়, তীর্থে আধ্যাত্মিক ভাবমণ্ডল ঘনীভূত আকারে ব্যাপ্ত থাকে বলে। সেবার উত্তরকাশীতে এসে কেদারঘাটে তপস্যা করছেন—তিতিক্ষাবান সন্ন্যাসীর বাসাহারের দিকে দৃষ্টি নেই। সেকালের বিশিষ্ট সাধু দেবীগিরি মহারাজের কাছে সে-সংবাদ পৌঁছাল। ব্রহ্মবর্চসুদীপ্ত সন্ন্যাসীকে দেখে মুগ্ধ হয়ে তিনি তাঁকে সাদরে আমন্ত্রণ জানালেন।

হরি মহারাজ এস্থানের বাতাবরণ আধ্যাত্মিক সাধনার পক্ষে বিশেষ অনুকূল অনুভব করে অনুগামী স্বামী সত্যানন্দের কাছে এখানে সম্প্রদায়-নির্বিশেষে সাধুদের অবস্থানের জন্য কয়েকটি কুঠিয়া নির্মাণ করানোর ইচ্ছা প্রকাশ করেন। তাঁর যোগাযোগে উত্তরকাশীর দু-একজন সাধুর প্রযত্নে গঙ্গার একেবারে কাছেই নির্মিত হয়েছে রুদ্রাবাস (১৯৩২)। এগারোটি কুঠিয়া—পাথরের দেওয়াল, পাইন কাঠের আড়ায় শ্লেট-পাথরের ছাউনি। স্বামীজীর জন্মশতবার্ষিকীতে তারই দক্ষিণে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে বিবেকানন্দ ভজনালয়, যেটিতে সাধু-ব্রহ্মচারীদের ব্যবহারের জন্য 'রামকৃষ্ণ গ্রন্থাগার' গড়ে উঠেছে। তারই গায়ে দুখানি ঘর ভক্তদের আনুকূল্যে তৈরি হয়েছে—ভক্তরা এলে পূর্বব্যবস্থা অনুসারে সেখানে থাকতে পারেন।

টুরিস্টের মতো ঘুরে ঘুরে দেখার জায়গা উত্তরকাশী নয়—তবে বিশ্বনাথ-দর্শনের পথে বা অন্য সময়েও কয়েকটি মন্দির আর দু-একটি আশ্রম দেখেছি। রুদ্রাবাসের কাছেই কৈলাস আশ্রম (কৈলাস মঠও বলে), হৃষীকেশে যার মূল আশ্রম। ঠাকুরের কয়েকজন সন্তান একসময় ঐ আশ্রমে অবস্থান করেছিলেন—ধনগিরি মহারাজ তখন সেখানকার অধ্যক্ষ। আশ্রমে লক্ষ্মীনারায়ণের সুন্দর মূর্তি আছে। কাছাকাছি সুপ্রাচীন অম্বিকামন্দির বা দুর্গামন্দির। বিশ্বনাথমন্দিরের কাছে জয়পুরের রাজার প্রতিষ্ঠিত একাদশ রুদ্রের মন্দির উল্লেখযোগ্য। মন্দিরের ভিতর দিকে আছে সিংহবাহিনী দেবীমূর্তি। গঙ্গার ওপারে জয়পুর-রাজার প্রতিষ্ঠিত দুটি কুটেট্টী বা কুটেশ্বরী মন্দির আছে—একটি প্রাচীন, অন্যটি নবনির্মিত। এছাড়া আছে অন্নপূর্ণা মন্দির, ভৈরব মন্দির, দত্তাত্রেয় মন্দির, পরশুরাম মন্দির, হনুমান মন্দির, গোপাল মন্দির, কৃত্তিবাসেশ্বর মন্দির ইত্যাদি। কোনটি প্রাচীন, কোনটি বা তেমন পুরনো নয়। মা আনন্দময়ীর কালীবাড়িটি বাঙালী ভক্তদের খুব প্রিয়। দেবীর মূর্তিটিও সুন্দর।

আশ্রমে আশ্রমে ঘুরে বেড়ানো অভিপ্রেত ছিল না। তাই সাধুদের সঙ্গে আলাপ জমানোর চেষ্টা করিনি। (অবশ্য অল্প কয়েকজন সাধুর কাছাকাছি

আসার সৌভাগ্য হয়েছিল।) তবে দু-এক জায়গায় গেছি। কৈলাস আশ্রমের অধ্যক্ষ মহারাজ এখানে কিছুদিনের জন্য এসে সকাল সাতটা থেকে ঘণ্টা খানেক মুখ্যতঃ সাধু-ব্রহ্মচারীদের বৃহদারণ্যক উপনিষদের পাঠ দিচ্ছিলেন। ভক্তজনেরও যাওয়ার অনুমোদন ছিল। দুদিন গিয়েছিলাম। আচার্য সরল হিন্দীতে শাংকরভাষ্য বিশ্লেষণ করছিলেন। অনন্ত-স্মৃতি আশ্রমেও কয়েকদিন গিয়েছিলাম। এখানে বেলা তিনটে থেকে ঘণ্টা দেড়েক নিয়মিত 'প্রস্থান'-এর পাঠ দেওয়া হয়। আচার্য শংকরের অনুগামী সন্ন্যাসীকে প্রস্থানের পাঠ 'শ্রবণ' করতে হয়—'মনন' ও 'নিদিধ্যাসন' তার পরে। শ্রুতিপ্রস্থান—ঈশ, কেন, কঠ, প্রশ্ন, মুণ্ডক, মাণ্ডুক্য, ঐতরেয়, তৈত্তিরীয়, ছান্দোগ্য, বৃহদারণ্যক—এই দশটি উপনিষদ্ শাঙ্কর-ভাষ্য সহযোগে পাঠ করতে হয়। স্মৃতি-প্রস্থান—শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা, সেইসঙ্গে শাংকরভাষ্য আর আনন্দগিরি-টীকা। ন্যায়-প্রস্থান—মহর্ষি বাদরায়ণের ব্রহ্মসূত্র, সেটির আচার্য শংকরকৃত শারীরকভাষ্য আর বাচস্পতি মিশ্রের ভামতী টীকা। সন্ন্যাসি-সমাজে প্রস্থানী সাধুর বিশেষ মর্যাদা। গীতার একাদশ আর দ্বাদশ অধ্যায়ের কিছু অংশের ব্যাখ্যান শোনার সৌভাগ্য আমার হয়েছিল।

ঠাকুরের ছোট একটি স্থান আছে। বিশ্বনাথ-মন্দির থেকে অল্প একটু দূরে ভাগীরথীর কোলের কাছে 'শ্রীরামকৃষ্ণ কুটীর'। রামকৃষ্ণ মঠের শাখা এটি। দু-চারজন সাধু বা ব্রহ্মচারী এখানে মাঝে মাঝে কিছুদিন থেকে যান তপস্যার জন্য। অবশ্য স্বামী সূর্যানন্দ মহারাজ এখানে দীর্ঘকাল ছিলেন। সম্প্রতি তাঁর দেহান্ত হয়েছে। মিষ্টভাষী প্রবীণ এই সন্ন্যাসীর সরস আলাপনে আনন্দ পেয়েছি। ইনি আমাকে বলেছিলেন উত্তরকাশীর তপোজাগ্রত পরিমণ্ডলের কথা। এখানে উচ্চকোটির অনেক সাধুকে তিনি দেখেছেন, তাঁদের কথা শ্রদ্ধা সহকারে বললেন।

উত্তরকাশীতে দুটি ছত্র—বাবা কালী কমলী-ওয়ালার ছত্র আর পঞ্জাব-সিন্ধ ছত্র। ছত্রে পরিবেশিত হয় পাঁচখানি রুটি আর এক-হাতা ডাল। মাঝে মাঝে কোন ভক্তের আনুকূল্যে দু-একটি পদ সংযোজিত হয়। সবই বাবা বিশ্বনাথের প্রসাদ। যা পাক করা হলো তার অগ্রভাগ বেলা সাড়ে আটটা নাগাদ ক্ষেত্রাধিপতিকে নিবেদন করা হয়। দেবাদিদেব সে-অর্ঘ্য গ্রহণ করেছেন—বাহক এসে এই সংবাদ দিলে সাধুদের প্রসাদ বিতরণ শুরু হয়। বেশির ভাগ সাধুরই অহোরাত্রের পথ্য ঐ দশখানি রুটি আর দু-হাতা ডাল। সাধুনীদের চাল বা আটা আর ডাল সিধা দেওয়া হয়। বিশেষ উপলক্ষে অথবা সাময়িক-ভাবে কোন কোন আশ্রমে প্রসাদ বিতরণ করা হয়।

ছত্রে সাধুদের ভিক্ষাগ্রহণ—সে এক দৃশ্য! সাধুমহাত্মাদের বিচিত্র সব মূর্তি। প্রথম দৃষ্টিতে তাঁদের সাধারণ বলে মনে হয়, কিন্তু একটু লক্ষ্য করলে অনেকের মধ্যেই বিশিষ্টতার—প্রবল ব্যক্তিত্বের ছাপ লক্ষ্য করা যায়। কারো কারো মুখে যেন অন্তলীন আনন্দের উদ্ভাস! কেউ কেউ ছত্রে বসেই 'ব্রহ্মার্পণের' অর্থাৎ আহারের পালা সাঙ্গ করে পাত্রটি ধুয়ে চলে যান। 'করপাত্রী' (দুই কর অর্থাৎ দুই হাত তাঁর ভোজনের পাত্র) সাধুর কথা শুনেছিলাম। দেখার সৌভাগ্যও হয়েছে। তিতিক্ষা-বান সে-সন্ন্যাসীর পাত্র ছিল না, দুই কর সংযুক্ত করে ভিক্ষাগ্রহণ করে ব্রহ্মাগ্নিতে সমর্পণ করলেন।

সাধুদের জীবনের ভিতর-মহলের খবর জানার অবকাশ পাইনি বা সুযোগ পাইনি। আসলে সে-অধিকারই ছিল না। তবে তাঁদের দিনযাত্রার, দৈনন্দিন কৃত্যসূচীর কিছুটা আভাস পেয়েছি যাতে মনে মনে একটা ধারণা গড়ে উঠেছে।

ভোর সাড়ে তিনটায় বিশ্বনাথের মঙ্গলারতি হয়। প্রায় সেই সময় থেকেই কুঠিয়ায় কুঠিয়ায় (বিভিন্ন আশ্রমেও) তপোব্রতীরা প্রাত্যহিক কর্ম সেরে জপ-ধ্যানে বসে যান। ঘণ্টা-দুই কেটে গেলে ধ্যান থেকে ব্যুত্থিত হয়ে ব্যবহারিক কিছু কিছু কৃত্য নিজেদেরই করতে হয়। তারপর সোয়া-আটটা সাড়ে-আটটা নাগাদ মন্দিরে মন্দিরে প্রণাম করতে করতে বিশ্বনাথ-মিলনে যাত্রা। সেখান থেকে ছত্রে ভিক্ষাগ্রহণ, ফিরে টুকিটাকি কাজ করে একসময় স্নান সেরে 'ব্রহ্মার্পণ'। কিছুক্ষণ বিশ্রামের পর সাধনশাস্ত্র বা সদ্গ্রন্থ পাঠ-পারায়ণ। অপরাহ্ণে স্বচ্ছন্দাচার। সন্ধ্যা নেমে এলে আবার আত্মসমাহিত হয়ে জপাশ্রয়ী ধ্যানযোগ। পরিশেষে ভিক্ষার অবশিষ্ট সরল পথ্য গ্রহণ করে 'শয়নে প্রণাম-জ্ঞান নিদ্রায় করো মাকে ধ্যান'।

এর বেশি আর কিছু জানতে পারিনি। □

# শ্রীশ্রীমহারাজের স্মৃতিকথা

## স্বামী ভবানন্দ

মহারাজ ( স্বামী ব্রহ্মানন্দ ) ছিলেন ঠাকুরের আধ্যাত্মিক মানসপুত্র। তাঁকে দর্শন করিবার ইচ্ছা অনেকদিন হইতেই মনে হইতেছিল। পিতাকে যখন দর্শন করিবার সৌভাগ্য হয় নাই, তখন মনে হইত মানসপুত্রকে দর্শন করিতে পারিলেই শ্রীশ্রীঠাকুরের দর্শনের সমতুল ফল হইবে। এই মানসে ১৯১৬ খ্রীস্টাব্দে স্বামীজীর জন্মোৎসবের সময় মঠে আসি এবং স্বামীজীর উৎসব, দরিদ্র-নারায়ণ সেবা এবং মহারাজের দর্শন করিবার সৌভাগ্য লাভ করি। তদবধি মহারাজের নিকট হইতে দীক্ষালাভ করিবার একটা ঐকান্তিক ইচ্ছা হইতেছিল। অনেকদিন হইতে চেষ্টা করিয়াও তাহা সফল হয় নাই। পরে ১৯১৮ খ্রীস্টাব্দে স্বামীজীর জন্মোৎসবে আমাদের কয়েকজনের মহারাজের কৃপায় তাঁহার নিকট হইতে ব্রহ্মচর্য ব্রতের অনুষ্ঠান হয়। তারপর একদিন সকালে মহারাজের ঘরে ধ্যান-জপের পর মহারাজকে প্রণাম করিয়া ভয়ে ভয়ে দীক্ষার প্রার্থনা জানাইলাম। মহারাজ কৃপা করিয়া বলিলেন: "যা, আজই তোর দীক্ষা হবে। এখন কিছুই খাস না, ঠাকুরঘরে গিয়ে বস।" সেই আদেশ অনুসারে ঠাকুরঘরে গিয়া বসিয়া রহিলাম। সকাল আটটা কি নয়টার সময় একজন সেবক ধ্যানঘরে ফুল, চন্দন, কোশা-কুশি প্রভৃতি পূজার আয়োজন করিয়া রাখিয়া দিলেন। কিছুক্ষণ পরে মহারাজ আসিয়া তাঁহার জন্য নির্দিষ্ট আসনে উপবেশন করিলেন এবং আমাকেও বসিতে আদেশ করিলেন। মহারাজ প্রথমে পূজাদি সমাপন করিয়া আমাকে দু-চারটি কথা জিজ্ঞাসা করিলেন এবং কতক্ষণ ধ্যানস্থ থাকিয়া আমাকে যথাবিহিত দীক্ষাদি দান করিলেন। আমার বহুদিনের আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হওয়ায় মন আনন্দে ভরপুর হইয়া গেল। সেসময় মহারাজ যখন মঠে থাকিতেন আমরা খুব ভোরে উঠিয়া মহারাজের ঘরে গিয়া বসিতাম। মহারাজও শেষরাত্রি হইতে উঠিয়া তাঁহার শয়নখাটের নিকটে অন্য একটি ছোট খাটে বসিয়া ধ্যানস্থ হইয়া থাকিতেন। সকাল হইয়া গেলে তিনি সকল সাধু এবং ব্রহ্মচারীদের নিত্য ধ্যান-জপ সম্বন্ধে অনেক মূল্যবান উপদেশ দিতেন, সেসব কথা কেহ কেহ তখনই নোট করিয়া রাখিতেন। তাহার অনেক কথা বর্তমানে 'ধর্মপ্রসঙ্গে স্বামী ব্রহ্মানন্দ' পুস্তকে বাহির হইয়াছে। মহারাজ বলরাম মন্দিরে থাকিলে সেখানে যাইয়া তাঁহাকে প্রণাম করিয়া আসিতাম। তারপর মহারাজের দর্শন পাই—১৯২০ খ্রীস্টাব্দে বারাণসীতে। সেখানেও আমরা খুব ভোররাত্রে মহারাজের ঘরে যাইয়া বসিতাম এবং ধ্যান-জপ করিয়া খুব আনন্দ পাইতাম। মহারাজ ধ্যান-জপের পর সকল সাধুদের লক্ষ্য করিয়া ধ্যান, জপ এবং তপস্যাদি করিতে বিশেষ উৎসাহিত করিতেন এবং বলিতেন: "একনাগাড়ে খুব খেটে অন্ততঃ তিনবছর করে দ্যাখ—নিশ্চয়ই ভগবানলাভ করতে পারবি।" ঐ বছর স্বামীজীর জন্মতিথির দিন আমাদের অনেককেই তিনি কৃপা করিয়া সন্ন্যাস দিলেন। এসময় অদ্বৈতাশ্রমের শ্রীশ্রীঠাকুরের পুরাতন পট পরিবর্তন করিয়া নূতন পট স্থাপন করিবার আয়োজন হইল। মহারাজ ঠাকুরের নূতন পট প্রতিষ্ঠা করিবেন। মহারাজ অদ্বৈতাশ্রমের হলঘরে ঠাকুরের যথাবিহিত পূজাদির পর নিজ হস্তে নূতন পট লইয়া ঠাকুরঘরে আসনে বসাইয়া প্রতিষ্ঠা করিলেন। তারপর হলঘরে খুব কীর্তন আরম্ভ হইল। কীর্তন খুব জমিয়া গেল। মহারাজ এবং হরি মহারাজ উভয়েই সেই কীর্তনে যোগ দিলেন। মহারাজ কীর্তনের সঙ্গে নৃত্য করিতে আরম্ভ করিলেন। হরি মহারাজও তাঁহার সঙ্গে নৃত্যে যোগ দিলেন। সে এক অপূর্ব দৃশ্য। আমরাও আনন্দে বিভোর হইয়া নাচিতে ও গাহিতে লাগিলাম। সে যে কী এক আনন্দের প্রবাহ বহিয়াছিল তাহা ভাষায় প্রকাশ করা যায় না। কেহ কেহ আনন্দে হাসিতে বা কেহ কেহ কাঁদিতে লাগিলেন। এই আনন্দের হাট অনেকক্ষণ চলিয়াছিল। একদিন হরি মহারাজ বলিয়াছিলেন: "মহারাজের একটা বিশেষ শক্তি ছিল যে, একটা বিশেষ আধ্যাত্মিক পরিমণ্ডল সৃষ্টি করে সকলকে

তার ভিতর প্রবেশ করাতে পারতেন। এই বিশেষ শক্তি মহারাজ ঠাকুরের কাছে থেকে লাভ করেছিলেন।"

বস্তুতঃ মহারাজ যখন যেখানেই থাকিতেন সেখানেই এই বিশেষ আধ্যাত্মিক পরিমণ্ডলের প্রভাব অনেকেই অনুভব করিতেন। একদিন মহারাজের ইচ্ছানুযায়ী বারাণসী সেবাশ্রম ও অদ্বৈতাশ্রমের সাধুরা মহারাজ এবং হরি মহারাজের সঙ্গে সংকটমোচনের মন্দিরে গিয়াছিলেন। আমরাও সকলে সেখানে রামনাম কীর্তন করিয়াছিলাম। যতক্ষণ রামনাম কীর্তন হইয়াছিল ততক্ষণ মহারাজ এবং হরি মহারাজকে গভীর ধ্যানে নিমগ্ন হইয়া থাকিতে দেখিয়াছি। রামনাম কীর্তন করিয়া আমরাও সেদিন এক অপূর্ব আনন্দলাভ করিয়াছিলাম। এই পরিমণ্ডলে যাঁহারা সেদিন বসিয়াছিলেন তাঁহারা সকলেই বিশেষ আধ্যাত্মিক ভাব উপলব্ধি করিয়াছিলেন। মহারাজের সঙ্গে কয়েকবার শ্রীশ্রীবিশ্বনাথ ও শ্রীশ্রীঅন্নপূর্ণা দর্শন করিবারও সৌভাগ্য হইয়াছিল। একদিন দর্শনাদির পর অন্নপূর্ণার মন্দিরে বসিয়া মহারাজের আদেশমত সকল সাধুরা মিলিয়া বহুক্ষণ কালীকীর্তন করিয়াছিলাম। মহারাজ সকল সময়েই যেন এক গভীর আধ্যাত্মিক ভাবে ডুবিয়া থাকিতেন, মনে হইত। তাঁহার নিকটে কেবল বসিয়া থাকিতেই ভাল লাগিত। এভাবে মহারাজের সান্নিধ্যে কাশীতে কয়েক মাস কাটাইয়াছিলাম। মহারাজ যেখানেই থাকিতেন সেখানে সকলের ভিতর একটা বিশেষ উৎসাহ, উদ্দীপনা এবং আনন্দের সাড়া পড়িয়া যাইত। বেলুড় মঠে সন্ধ্যারতির পর নিত্য ভিজিটরস রুমে সাধুরা কীর্তন করিতেন। মহারাজ মঠে থাকিলে কখনো কখনো কীর্তনে আসিয়া বসিতেন। একবার রামলাল দাদাকে লইয়া কীর্তন খুব জমিয়াছিল। ঠাকুর যেসব গান যেভাবে গাহিতেন সেইভাবে দাঁড়াইয়া হাত নাড়িয়া নাড়িয়া রামলাল দাদা গান গাহিয়াছিলেন। মহারাজ রামলাল দাদাকে লইয়া খুব আনন্দ করিতেন। □

## প্রচ্ছদ-পরিচিতি

প্রচ্ছদের আলোকচিত্রটি কামারপুকুরের শ্রীরামকৃষ্ণের বাসগৃহের। পাঁচের দশকের প্রথমদিকে আলোকচিত্রটি গৃহীত হয়েছিল।

বর্তমান বর্ষটি (১৯৯৩) শ্রীরামকৃষ্ণ-ভাবান্দোলনের ক্ষেত্রে একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বর্ষ। কারণ, এই বর্ষে শিকাগো ধর্মমহাসম্মেলনে স্বামী বিবেকানন্দের আবির্ভাবের শতবর্ষ পূর্ণ হচ্ছে। শিকাগো ধর্মমহাসভায় স্বামী বিবেকানন্দ যে-বাণী প্রচার করেছিলেন এবং যে-বাণী ধর্মমহাসভার সর্বশ্রেষ্ঠ বাণী বলে অভিনন্দিত হয়েছিল, সে-বাণী ছিল সমন্বয়ের বাণী। ধর্মের সমন্বয়, মতের সমন্বয়, সম্প্রদায়ের সমন্বয়, দর্শনের সমন্বয়, আদর্শের সমন্বয়—প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের সমন্বয়, প্রাচীন ও নবীনের সমন্বয়, অতীত বর্তমান ও ভবিষ্যতের সমন্বয়। ভারতবর্ষ সুপ্রাচীন কাল থেকে এই সমন্বয়ের বাণী ও আদর্শ প্রচার করে আসছে। আধুনিককালে এই সমন্বয়ের সর্বপ্রধান ও সর্বশ্রেষ্ঠ প্রবক্তা শ্রীরামকৃষ্ণ। সাধারণভাবে সনাতন ভারতবর্ষের এবং বিশেষভাবে শ্রীরামকৃষ্ণের সমন্বয়ের বাণীকে স্বামী বিবেকানন্দ বহির্বিশ্বের সমক্ষে উপস্থাপিত করেছিলেন। চিন্তাশীল সকল মানুষই আজ উপলব্ধি করছেন যে, সমন্বয়ের আদর্শ ভিন্ন পৃথিবীর স্থায়িত্বের আর কোন পথ নেই। সমন্বয়ের পথই বর্তমান পৃথিবীর বহুবিধ সমস্যা ও সঙ্কটের মধ্য থেকে উত্তরণের একমাত্র পথ। কামারপুকুরের পর্ণকুটীরে যাঁর আবির্ভাব হয়েছিল দরিদ্র এবং নিরক্ষরের ছদ্মবেশে, তিনিই বর্তমান এবং আগামীকালের বিশ্বের ত্রাণকর্তা। তাঁর বাসগৃহটি তাই আজ ও আগামীকালের সমগ্র পৃথিবীর তীর্থক্ষেত্র। শিকাগোর বিশ্বধর্মসভার মঞ্চে স্বামী বিবেকানন্দের কণ্ঠে শান্তি, সমন্বয় ও সম্প্রীতির যে-বাণী বারংবার উচ্চারিত হয়েছিল—যার মধ্যে নিহিত ভারত ও পৃথিবীর রক্ষাকবচ, তার গর্ভগৃহ কামারপুকুরের এই পর্ণকুটীর।—**যুগ্ম সম্পাদক, উদ্বোধন**

**আলোকচিত্র অলঙ্করণঃ নির্মলকুমার রায়**

নিবন্ধ

# স্বামী বিবেকানন্দ এবং ভারতের মুক্তিসংগ্রাম

## গণেশ ঘোষ

বিশ্ব-বিবর্তনে মহাকালের সমুদ্রে উৎক্ষিপ্ত কালের তরঙ্গ বিস্মৃতির কোন্ অতলান্ত গভীরে হারিয়ে যায়, তাকে আর খুঁজে পাওয়া যায় না। খুঁজে পাওয়া যায় না বলেই মানুষের স্মৃতিতে তা হয়ে যায় চিরন্তন কালের জন্য বিলীন। কিন্তু মহাকালের বুকে কালের খণ্ডাঙ্গ এমন এক-একটি দিবসের আবির্ভাব হয় যা কালজয়ী হয়ে মহাকালের বুকে চিরন্তন কাল বিরাজমান থাকে। ১২ জানুয়ারি এমনি এক কালজয়ী দিবস, মহাকালের ঊর্ধ্বে যার প্রতিষ্ঠা, মানুষের স্মৃতির স্বর্ণ-সিংহাসনে যার অধিষ্ঠান শাশ্বতকাল-ব্যাপী।

১৮৬৩ খ্রীস্টাব্দের ১২ জানুয়ারির প্রত্যুষে ভারতবর্ষে একটি আলোকশিশুর আবির্ভাব হয়েছিল। পৌষ মাসের কৃষ্ণাসপ্তমীর কুজ্ঝটিকার আড়ষ্ট আচ্ছন্নতা ও অস্পষ্টতার কুহেলি-জাল আর রাত্রির ঘন তমসাচ্ছন্ন অন্ধকারকে পিছনে ফেলে রেখে নবোদিত সূর্যের নতুন আলোকরশ্মি অভিনন্দিত করেছিল সেদিনের সেই নবজাত আলোকশিশুকে। সেই শিশুই উত্তরকালের পরাধীন ভারতের রাত্রির তপস্যার ফলশ্রুতি উদীয়মান ভাস্কর, বিপ্লব-সাধনার ঋত্বিক, দেশাত্মবোধের প্রমূর্ত প্রতীক স্বামী বিবেকানন্দ—ভারতের মুক্তি-সংগ্রামীদের অনুপ্রেরণার অনির্বাণ উৎস।

স্বামী বিবেকানন্দ গৃহত্যাগী সন্ন্যাসী ছিলেন, কিন্তু সাধারণ সন্ন্যাসীর সাথে তাঁর বিরাট পার্থক্য ছিল। সাধারণ সন্ন্যাসী সংসার ত্যাগ করেন আপন মুক্তিকামনায়, আর স্বামী বিবেকানন্দ সংসার ত্যাগ করেছিলেন নিজের মুক্তিকামনায় নয়—মাতৃভূমির মুক্তিকামনায়, ভারতের জনগণের মুক্তিকামনায় এবং বিশ্বের মানুষের মুক্তিকামনায়।

বিবেকানন্দ পরাধীন ভারতের মানুষকে দিয়েছিলেন জাগরণের নতুন মন্ত্র। ভারতের নবযুগের তিনি ছিলেন মন্ত্রগুরু। তিনি সমগ্র জাতিকে দিয়েছিলেন সেই মন্ত্র, যে-মন্ত্রে দাসত্ব-কলঙ্কিত মনের মুক্তিলাভ হয়। তাঁর উদাত্ত কণ্ঠে ধ্বনিত হয়েছিল সেই অমরবাণী: "ভুলিও না—তুমি জন্ম হইতেই 'মায়ের' জন্য বলিপ্রদত্ত।" তিনি বলেছিলেন: "আগামী পঞ্চাশ বৎসর আমাদের গরীয়সী ভারতমাতাই আমাদের একমাত্র উপাস্য দেবতা।" দেশের যুবকদের কাছে তিনি রেখে-ছিলেন এই আগ্নেয় আহ্বান:

"রে উম্মাদ, আপনা ভুলাও ফিরে নাহি চাও,
পাছে দেখ ভয়ঙ্করা।
দুখ চাও, সুখ হবে বলে,
ভক্তিপূজাছলে স্বার্থ-সিদ্ধি মনে ভরা॥
ছাগকণ্ঠে রুধিরের ধার, ভয়ের সঞ্চার,
দেখে তোর হিয়া কাঁপে।
কাপুরুষ! দয়ার আধার! ধন্য ব্যবহার!
মর্মকথা বলি কাকে?
ভাঙ্গ বীণা—প্রেমসুধাপান,
মহা আকর্ষণ—দূর কর নারীমায়া।
আগুয়ান, সিন্ধুরোলে গান,
অশ্রু জলপান, প্রাণপণ, যাক কায়া॥
জাগো বীর, ঘুচায়ে স্বপন, শিয়রে শমন,
ভয় কি তোমার সাজে?
দুঃখভার, এ ভব—ঈশ্বর,
মন্দির তাহার প্রেতভূমি চিতামাঝে॥
পূজা তাঁর সংগ্রাম অপার,
সদা পরাজয় তাহা না ডরাক তোমা।
চূর্ণ হোক স্বার্থ সাধ মান,
হৃদয় শ্মশান, নাচুক তাহাতে শ্যামা॥"

তাঁর দেশাত্মবোধের এই অগ্নিমন্ত্রে উদ্বুদ্ধ হয়েছিলেন সেদিনের অগ্নিযুগের বিপ্লবী কর্মি-গণ। বস্তুতঃ, বিবেকানন্দের বাণী ছিল সেদিনের বিপ্লবিগণের জীবনবেদ। স্বামীজীর জীবন ও বাণীতেই বিপ্লবের মহানায়ক অরবিন্দ ঘোষ পেয়েছেন তাঁর বিপ্লব-সাধনার মূল অনুপ্রেরণা। বিপ্লবিশ্রেষ্ঠ যতীন্দ্রনাথ মুখার্জী, যিনি 'বাঘা

যতীন' বলেই বেশি পরিচিত, তাঁর বিপ্লব-সাধনার ধর্মগুরু ছিলেন স্বামী বিবেকানন্দ। প্রখ্যাত বিপ্লবী নেতা হেমচন্দ্র ঘোষ তাঁর দেশাত্মবোধের প্রেরণা পেয়েছিলেন স্বামী বিবেকানন্দের কাছ থেকেই। ভারতের মুক্তি-সংগ্রামের মহানায়ক নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুর দেশপ্রেম ও মুক্তিসাধনার প্রধান প্রেরণা ছিল স্বামীজীর জীবন এবং তাঁর বাণী ও রচনা। ভারতের বিপ্লবীদের ওপর স্বামীজীর প্রভাব সম্পর্কে 'সিডিশন কমিটি'র রিপোর্টে ইঙ্গিত করে বলা হয়েছে—ভারতবর্ষের শিক্ষিত যুবসম্প্রদায়ের ওপর স্বামী বিবেকানন্দের প্রভাব অপরিসীম।

শুধুমাত্র দেশকে নয়, জাতি-ধর্ম-নির্বিশেষে সকল দেশবাসীকে ভালবাসতে শিখিয়েছেন স্বামী বিবেকানন্দ। তিনি ভারতের মানুষকে সম্বোধন করে বলেছেন : "তুমিও কটিমাত্র বস্ত্রাবৃত হইয়া বল ব্রাহ্মণ ভারতবাসী আমার ভাই, মূর্খ ভারতবাসী আমার ভাই, চণ্ডাল ভারতবাসী আমার ভাই।" স্বামীজীর স্বদেশপ্রেমের পূর্ণ পরিণতি মানবপ্রেমে —তাঁর দৃষ্টিতে জীবে প্রেমই ঈশ্বরে প্রেম; তাঁরই কথায়—"জীবে প্রেম করে যেইজন, সেইজন সেবিছে ঈশ্বর।"

১৯০২ খ্রীস্টাব্দে মহাপ্রয়াণের কিছু পূর্বে তিনি বেলুড় মঠে সখারাম গণেশ দেউস্করের নিকট ভারতের ভবিষ্যৎ বিপ্লব সম্পর্কে তাঁর নিজস্ব ধারণা, ভারতের বিপ্লব আয়োজনের সার্থকতা ও ভারতের স্বাধীনতালাভ সম্পর্কে তাঁর নিজস্ব সুদৃঢ় অভিমত ব্যক্ত করেন। স্বামীজীর দেহরক্ষার পর ১৯০৪ খ্রীস্টাব্দে সখারাম গণেশ দেউস্কর সেই যুগের প্রথম পর্যায়ের বিপ্লবী নেতৃবর্গের নিকট স্বামীজীর ধারণা ও অভিমত ব্যক্ত করেছিলেন। বিপ্লব সম্পর্কে স্বামীজীর ধারণা, ভারতের স্বাধীনতালাভ সম্পর্কে স্বামীজীর সুস্পষ্ট আশ্বাস সেকালের অগ্নিযুগের বিপ্লবী নেতৃবর্গকে নবপ্রেরণায় উদ্বুদ্ধ করে। স্বামীজীর মানসকন্যা ভগিনী নিবেদিতা ভারতের বিপ্লব-আন্দোলনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। তাঁর মধ্যে ভারতের বিপ্লবীরা দেখেছিলেন তাঁদের বিপ্লবের মহাগুরুর মহা-তেজস্বিনী উত্তরাধিকারীকে।

১২ জানুয়ারি মহাপুরুষ স্বামী বিবেকানন্দের শুভ আবির্ভাব দিবসরূপে স্মরণীয়। ভারতবর্ষের যুব-সম্প্রদায়ের শাশ্বত নায়ক বিবেকানন্দের জন্মদিবস এখন 'জাতীয় যুবদিবস'-রূপে চিহ্নিত। এই দিনটি স্মরণীয় আরেকজন মহাবিপ্লবীর মহাবলিদানের দিবসরূপেও—যিনি ছিলেন স্বামীজীর ভাবশিষ্য, তিনি মাস্টারদা সূর্য সেন। তাঁর অনুগামীদের কাছে জ্বলন্ত ভাষায় মাস্টারদা বলতেন স্বামীজীর কথা। নিজে প্রতিদিন পাঠ করতেন স্বামীজীর বাণী ও রচনা এবং তাঁর অনুগামীদেরও স্বামীজীর বাণী ও রচনা পাঠ ছিল আবশ্যিক। ১৯৩৪ খ্রীস্টাব্দের ১২ জানুয়ারি তারকেশ্বর দস্তিদারের সঙ্গে মহাবিপ্লবী সূর্য সেন দেশমাতৃকার মুক্তিযজ্ঞে বিদেশী সাম্রাজ্য-বাদী দস্যুদের বধ্যমঞ্চে নিজেকে আহুতি দেন। "জন্ম হইতেই তুমি 'মায়ের' জন্য বলিপ্রদত্ত"—স্বামীজীর এই মহামন্ত্রের সাকার বিগ্রহ ছিলেন মহাবিপ্লবী মাস্টারদা। স্বামীজীর এই মন্ত্রের বাস্তব রূপায়ণ করেছিলেন মাস্টারদা তাঁর জীবন বলিদান দিয়ে। ভারতের ভাববিপ্লবের স্রষ্টা স্বামী বিবেকানন্দ এবং তাঁর আদর্শ সমগ্র ভারতে প্রবর্তিত কর্ম-বিপ্লবের অন্যতম পুরোধা মাস্টারদা সূর্য সেন।* □

* চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের অন্যতম নায়ক সম্প্রতি (২৩ ডিসেম্বর ১৯৯২) প্রয়াত গণেশ ঘোষ এই নিবন্ধটি স্বামী পূর্ণাত্মানন্দের কাছে পাঠিয়েছিলেন গত ২৭ ফেব্রুয়ারি ১৯৮৬। স্বামী পূর্ণাত্মানন্দ প্রবীণ বিপ্লবীদের সঙ্গে স্বয়ং সাক্ষাৎ করে অথবা পত্রে যোগাযোগ করে স্বামী বিবেকানন্দ এবং ভারতের মুক্তিসংগ্রাম সম্পর্কে তাঁদের লেখা, বক্তব্য প্রভৃতি ১৯৭৬ খ্রীস্টাব্দ থেকে সংগ্রহ করছেন। গণেশ ঘোষের সঙ্গে তিনি প্রথম যোগাযোগ করেন ৮ অক্টোবর ১৯৭৭। ২৫ অক্টোবর ১৯৭৭ এবং পরে ১৬ মার্চ ১৯৭৯ দুটি পত্রে গণেশ ঘোষ স্বামী পূর্ণাত্মানন্দের কাছে ঐ বিষয়ে তাঁর নিজস্ব ধারণা এবং বক্তব্য লিখে পাঠান। উদ্বোধনের পরবর্তী কোন সংখ্যায় সেসব তথ্য প্রকাশ করার ইচ্ছা আমাদের আছে। বর্তমান নিবন্ধটি গণেশ ঘোষ স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে স্বামী পূর্ণাত্মানন্দের কাছে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। ভারতবর্ষের অগ্নিযুগের বিপ্লবীদের কাছে স্বামী বিবেকানন্দ কি পরিমাণ প্রেরণা সঞ্চার করেছিলেন তার কিছু ধারণা অগ্নিযুগের এই নায়কের লেখা থেকে পাওয়া যাবে।—যুগ্ম সম্পাদক, উদ্বোধন

**সংগ্রহ : স্বামী পূর্ণাত্মানন্দ**

বিজ্ঞান-নিবন্ধ

# আমাদের খাদ্যে প্রোটিন

## অমিয়কুমার দাস

### খাদ্যের উপাদানগুলি তিনভাবে কাজ করে

(ক) দেহকোষের গঠন ও বৃদ্ধিসাধন।

(খ) দেহের ক্ষয়পূরণ ও রক্ষণাবেক্ষণ। এই দুটিতে প্রোটিন, খনিজ লবণ ও ভিটামিন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেয়।

(গ) তাপ ও শক্তি উৎপাদন। এখানে শ্বেতসার ও শর্করা জাতীয় খাদ্য (কার্বোহাইড্রেট) এবং তেল ও চর্বি জাতীয় খাদ্য (ফ্যাট) গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেয়

প্রোটিন-বহুল খাদ্য ও প্রতি ১০০ গ্রামে প্রোটিনমান:

সয়াবীন—৪০ গ্রাম; ডাল, বাদাম, তৈলবীজ—২৪ গ্রাম; মাছ, মাংস (হাড় ও কাঁটা বাদে)—২০ গ্রাম; দুধ—৩.৫ গ্রাম; কম ছাঁটা সিদ্ধ চাল—৮ গ্রাম; বেশি ছাঁটা চাল ও আতপ চাল—৬ গ্রাম, ডিম, গম, জোয়ার, বাজরা, রাগি—১৩ গ্রাম।

### প্রোটিনের কাজ

(ক) দেহকোষ গঠন, দেহের ক্ষয়পূরণ ও বৃদ্ধিসাধন; (খ) দেহরক্ষায় রক্ত তৈরি, অ্যান্টিবডি (Antibody, যা রোগ আক্রমণের মোকাবিলা করে), এনজাইম (Enzyme, যা খাদ্য হজম ও দেহকোষের শ্বাসকার্যাদি করে) ও হরমোন (Hormone) তৈরি; (গ) খাদ্যাভাবে প্রোটিন (খাদ্যের ও দেহকোষের) ভেঙে দেহতাপ বজায় রাখে।

### প্রোটিনের গঠন

প্রোটিনে প্রায় ১৬% নাইট্রোজেন (Nitrogen) থাকে ও প্রায় ২০ প্রকার অ্যামাইনো অ্যাসিড (Amino Acid) দিয়ে প্রোটিন গঠিত হয়। উদ্ভিদ পরিবেশ থেকে নাইট্রোজেন নিয়ে অ্যামাইনো অ্যাসিড তৈরি করে। কিন্তু মানুষ ও প্রাণীকে প্রোটিনের জন্য উদ্ভিদ ও প্রাণীজ খাদ্যের ওপর নির্ভর করতে হয়।

### মানুষের প্রয়োজনীয় অ্যামাইনো অ্যাসিডগুলি

(ক) এসেনসিয়াল (Essential বা অত্যাবশ্যক)—আইসোলিউসিন্, লিউসিন্, লাইসিন্, মেথিও-নিন্, ফিনাইল-এলানিন্, থিওনিন্, ট্রিপ্টোফেন্ ও ভ্যালিন; এই সঙ্গে হিস্টিডিন্ ও আর্জিনিন্ শিশুদের বৃদ্ধির জন্য অত্যাবশ্যক। এই ৮-১০ রকমের অত্যাবশ্যক অ্যামাইনো অ্যাসিড মানুষকে খাদ্যের সঙ্গে পেতেই হয়।

(খ) সেমি-এসেনসিয়াল (Semi-essential বা অর্ধাবশ্যক)—সিস্টিন্ ও টাইরোসীন্। এসব খাদ্যে থাকলে যথাক্রমে মেথিওনিন্ ও ফিনিল এলানিন্ কম লাগে।

(গ) নন-এসেনসিয়াল (Non-essential বা গৌণ)—এলানিন্, এস্পার্টিক্ অ্যাসিড, গ্লুটামিক্ অ্যাসিড, গ্লাইসিন্, হাইড্রক্সি প্রলিন্, প্রলিন্, নরলিউসিন্, সেরিন্। এসব অ্যামাইনো অ্যাসিড মানুষের দেহে একটি থেকে অন্যটিতে রূপান্তরিত হতে পারে।

### প্রোটিনের দৈনিক প্রয়োজন

যথেষ্ট তাপ-উৎপাদক খাদ্য খেলে একজন প্রাপ্ত-বয়স্ক সুস্থ মানুষের কেজি প্রতি দেহের ওজনে ১ গ্রাম (১.৬ গ্রামের বেশি হবে না); পাঁচ বছর পর্যন্ত শিশুদের ৩.৫ গ্রাম; পাঁচ-বারো বছর বয়সে ৩ গ্রাম; তেরো-পনেরো বছর বয়সে ২.৫ গ্রাম ও ষোল-উনিশ বছর বয়সে ২ গ্রাম হিসাবে প্রোটিন প্রয়োজন। মেয়েদের গর্ভাবস্থার দ্বিতীয়ার্ধে মোট ১০০ গ্রাম ও স্তন্যদানকালে মোট ১১০ গ্রাম অতিরিক্ত প্রোটিন প্রয়োজন। এই পরিমাণ প্রোটিন পেতে বয়স্কদের অতিরিক্ত ডাল ও অতিরিক্ত দুধ দরকার; গর্ভাবস্থায় ও স্তন্যদান-কালে ১৫-৩০ গ্রাম ডাল ও ১০০ গ্রাম দুধ আরও অতিরিক্ত দরকার। শিশুর ও বারো বছর বয়স পর্যন্ত ৩৫-৪৫ গ্রাম ডাল ও ৩০০-২৫০ গ্রাম দুধ দরকার। ডাল না খেলে ২টি ডিম বা ৫০ গ্রাম মাছ-মাংস

অথবা ১টি ডিম ও ৩০ গ্রাম মাছ-মাংস খাওয়া যায়। ২০-৩০ গ্রাম ডাল খেলে ১টি ডিম বা ৩০ গ্রাম মাছ-মাংস খাওয়া দরকার। এই সঙ্গে মিশ্র খাদ্য—ভাত ও রুটি বা একবেলা ভাত একবেলা রুটি খেলে প্রোটিনের মান ও পরিমাণ উন্নত হয়। বেশি প্রোটিন প্রয়োজন—পেটে কেঁচো-কৃমি থাকলে, ডায়াবিটিস ও অন্য রোগে ভুগলে, রোগ আরোগ্যকালে, কাটা, পোড়া, জ্বর, অপারেশন, রক্তক্ষরণ, মানসিক ও দৈহিক বিপর্যয়ে। বেশি শ্রমে ফ্যাট ও কার্বোহাইড্রেট বেশি লাগে, প্রোটিন বেশি লাগে না।

### প্রোটিন নিয়ে আরও কিছু ভাবনা

(১) ডিম ও দুধের প্রোটিনে যে-অনুপাতে বিভিন্ন অত্যাবশ্যক অ্যামাইনো অ্যাসিড আছে, সেই মান মানুষের পক্ষে খুবই উপযোগী।

(২) জান্তব প্রোটিন—মাছ, মাংস, ডিম ও দুধে সকল প্রকার অত্যাবশ্যক অ্যামাইনো অ্যাসিড যথেষ্ট পরিমাণে থাকায় এদের সম্পূর্ণ প্রোটিন বা প্রথম শ্রেণীর প্রোটিনখাদ্য বলা হয়।

(৩) উদ্ভিজ্জ প্রোটিন—এদের মধ্যে কোন কোন অত্যাবশ্যক অ্যামাইনো অ্যাসিড (ডিমের অনুপাতে) কম আছে। চাল ও আটায় লাইসিন্ কম ও ডালে মেথিওনিন্ কম আছে। কয়েক প্রকার উদ্ভিজ্জ প্রোটিন মিশিয়ে খেলে ডাল-ভাত, ডাল-রুটি ও খিচুড়িতে প্রোটিন-মান উন্নত হয়। সেই সঙ্গে একটু জান্তব প্রোটিন, যেমন এক-আধ কাপ দুধ বা ডিম বা একটু মাছ-মাংস খেলে প্রোটিন-মান (ডিমের মতো) সুষম হয়। তৈলবীজ ও খোলের প্রোটিন-মান ডালের চেয়ে উন্নত। তবে খোল উত্তম রূপে তৈল-নিষ্কাষিত হওয়া প্রয়োজন।

(৪) প্রোটিন দেহে সঞ্চয় হয় না। দৈনিক প্রয়োজনীয় প্রোটিন দিনে তিনবার অন্য খাবারের সঙ্গে ভাগ করে খাওয়া উচিত। ভোজবাড়িতে একসঙ্গে অধিক প্রোটিন (মাছ, মাংস, দই, ছানার মিষ্টি, পায়েস) খেলে লাভের চেয়ে ক্ষতি বেশি হয়; দেহকে নাইট্রোজেন-মুক্ত করতে লিভার ও কিডনিকে অধিক পরিশ্রম করতে হয়।

(৫) প্রয়োজনীয় সকল প্রকার অত্যাবশ্যক অ্যামাইনো অ্যাসিড যথেষ্ট পরিমাণে একই সঙ্গে না পেলে অর্থাৎ কোন একটিরও অভাব ঘটলে প্রোটিন কোন কাজ করতে পারে না; লিভার সমস্ত অ্যামাইনো অ্যাসিডকে নাইট্রোজেন-মুক্ত করে কার্বো-হাইড্রেট, ফ্যাট ও তাপে রূপান্তরিত করে।

(৬) জলে প্রোটিন গোলে না। ছানার জলে ভিটামিন বি-কমপ্লেক্স (যেজন্য হলুদ দেখায়) ও ল্যাক্টোজ চিনি গুলে যায়, কিন্তু প্রোটিন ছানায় থাকে। দুধ, দই, ছানা উৎকৃষ্ট প্রোটিনখাদ্য। কিন্তু মিষ্টি দিয়ে ছানা, মাছ, মাংস আগুনে ফুটালে মেথিওনিন্ ও শর্করা যে-যৌগ তৈরি করে তা এনজাইম ভাঙতে পারে না ও হজম হয় না। তাই ছানার মিষ্টি অসম্পূর্ণ প্রোটিনখাদ্য। পায়েসে চিনি রান্নার শেষে দিতে হয়। চিনি দিয়ে দুধ ও চা ফুটাতে নেই।

(৭) ভারতে দুধের উৎপাদন জন প্রতি ১৫৭ গ্রাম হলেও অধিকাংশ মা ও শিশু (যাদের দুধের প্রয়োজন সবচেয়ে বেশি, ক্যাল্সিয়াম ও উৎকৃষ্ট প্রোটিনের জন্য) দুধ পায় না। আমরা যদি ছানার মিষ্টি বর্জন করি তবে তারা দুধ পাবে ও আমাদের ভবিষ্যৎ সুগঠিত হয়ে দেশের অশেষ কল্যাণ সাধিত হবে।

(৮) রান্নায় অর্থাৎ ভাজা পোড়া সিদ্ধ করলে প্রোটিন সহজপাচ্য হয় ও রোগজীবাণু বিনষ্ট হয়। ডাল, ছোলা, বাদাম, তৈলবীজ, খোল ও হাঁসের ডিমে অ্যান্টিট্রিপসিন্ এনজাইম আছে যা প্যাংক্রিয়াসের (Pancreas) ট্রিপসিনোজেনকে প্রোটিন-হজমে বাধা দেয়। কাঁচা ডিমের শ্বেত অংশে অ্যাভিডিন (Avidin) আছে যা বায়োটিন (Biotin) ভিটামিন হজম হতে দেয় না। কাঁচা ডিমে স্যালমোনেল্লা (Salmonella) জীবাণু থাকতে পারে যা গ্যাস্ট্রো-এন্টেরাইটিস রোগ সৃষ্টি করে। রান্নায় এসব দোষ দূর হয়। দুধ ফুটিয়ে খেলে অন্ত্রে দুধ ও জলবাহিত রোগ (আমাশয়, জন্ডিস ইত্যাদি) হয় না। রোগগ্রস্ত শূকর ও গরুর মাংসের ছিবড়ায় জড়ানো ফিতাকৃমির (tape worm) ডিম ও বাচ্চা থাকতে পারে। যেখানে রান্নায় যথেষ্ট তাপ ব্যবহৃত হয় না, সেখানে রোগ-জীবাণু মরে না ও রোগ ছড়ায়।

(৯) ডালকে গরিবের মাংস বলা হয়। তবে

যাদের গাউট বাত ( Gout ) আছে তাদের মুসুর ডাল, কিডনি, হার্ট, লিভার খাওয়া ভাল নয়, কারণ এরা পিউরিন্ (Purine) তৈরি করে। খেসারি ডাল বেশিদিন বেশি পরিমাণ খেলে ( দৈনিক মোট ক্যালরির 40% বা তার বেশি) ল্যাথিরিজম (Lathyrism ) নামে পক্ষাঘাত রোগ হতে পারে। খেসারি ডাল ভিজিয়ে সিদ্ধ করে ৩-৪ গুণ জলে ধুলে খেসারির বিষ বিটা-অক্সালো-অ্যামাইনো-অ্যালানিন্ ( Beta-Oxalo-Amino-Alanine বা B.O.A.A. ) জলে ধুয়ে যায়। আজকাল বিষ-মুক্ত খেসারি চাষ শুরু হয়েছে। সয়াবীনের দুধ ও ডাল ইন্দোনেশিয়া, চীন ও জাপানে বহুল প্রচলিত। ছাতাধরা শস্য, ডাল ও বাদামে অ্যাস্পারজিলাস্ ফ্লেভাস্ ( Aspergillus flavus) নামে ছত্রাক জন্মাতে পারে যা অ্যাফলাটক্সিন ( Aflatoxin ) নামে বিষ তৈরি করে; যারা কম প্রোটিনখাদ্য খায় এই বিষ তাদের লিভারে সিরোসিস ( cirrhosis of liver ) ও যারা বেশি প্রোটিন খায় তাদের লিভারে ক্যানসার ঘটায়।

(১০) খাদ্যে প্রোটিনের অভাব হলে হাম, আমাশয়, রক্তামাশয়, টাইফয়েড, যক্ষা ইত্যাদি সংক্রামক রোগের সম্ভাবনা থাকে।

(১১) দেখা যায়, সাধারণতঃ ভারতীয়রা প্রচুর ভাত খায়, ডাল ও তরকারি কম খায় বা খায় না। ভাতের পরিমাণ কমিয়ে ডাল ও শাক খেলে খাদ্য সুষম হয়।

(১২) ৬ মাস বয়স পর্যন্ত শিশুর প্রয়োজন মায়ের বুকের দুধে মিটতে পারে। কিন্তু তারপর মায়ের দুধে কুলোয় না, তখন শিশুকে প্রোটিন-বহুল খাদ্য ও গরুর দুধ খাওয়ানো উচিত। দুধের অভাবে খিচুড়ি একটু তেল ও গুড় দিয়ে খাওয়ানো যায়; সেই সঙ্গে একটু মাছ বা ডিমের কুসুম দিলে ভাল হয়।

কিন্তু প্রায়ই দেখা যায়, শিশুকে বার্লি, সাগু ও মিছরির জল খাওয়ানো হয় যেগুলি কার্বোহাইড্রেট খাদ্য; পেটের অসুখ হলে মায়ের বুকের দুধও বন্ধ করা হয়। ফলে প্রোটিনের অভাবে শিশুর বৃদ্ধি, দেহ ও মস্তিষ্কের গঠন ও বিকাশ রুদ্ধ হয় এবং পরে কোয়াশিওরকর ( Kwashiorkor ) রোগ হতে পারে। এই রোগে শিশু বাড়ে না, পা ও মুখ ফোলে, মাথার চুলে রঙ ধরে ও চুল উঠে যায়, চামড়া ফেটে যায়, সদা বিরক্ত ভাব থাকে।

অনেক সময় দেখা যায়, ৬ মাস বয়সের পরও শিশুকে বাইরের শক্ত খাবার খাওয়ানো হয় না, শুধু মায়ের দুধ খেয়ে থাকে। খাদ্যাভাব ও ক্যালরির অভাবে শিশু বাড়ে না, ক্রমে সে ম্যারাসমাস ( Marasmus ) রোগে আক্রান্ত হয়। এই রোগে তার চেহারা হয় অস্থিচর্মসার ও বানরের মতো মুখ। শৈশবে শরীর ও মস্তিষ্কের গঠনে ক্ষতি পরে কখনো পূরণ হয় না। উন্নত চিকিৎসার কল্যাণে এরা দুর্বল দেহ-মন নিয়ে বেঁচে থাকে। এরা কর্মক্ষেত্রের যেখানেই যায় সেখানে উৎপাদন কমে ও দেশ ক্ষতিগ্রস্ত হয়। সেজন্য সমাজের সকল স্তরে, বালিকা বিদ্যালয় ও মহিলা মহলে খাদ্য ও পুষ্টি-শিক্ষার ব্যাপক প্রসার প্রয়োজন।

(১৩) যেহেতু শিশুরাই দেশের ভবিষ্যৎ, তাদের সুস্থতার দিকে বিশেষ নজর দেওয়া প্রয়োজন। তাই সে-প্রসঙ্গে কয়েকটি কথা এখানে বলে রাখা দরকার। (ক) মেয়েরা ১৯ বছর বয়সের আগে দেহ-মনে পূর্ণতা লাভ করে না। তাই ১৯ বছর বয়সের আগে সন্তান জন্মালে মা ও শিশুর স্বাস্থ্যহানির আশংকা থাকেই। (খ) মাকে গর্ভাবস্থায় ও স্তন-দানকালে যথেষ্ট পুষ্টিকর খাদ্য খেতে হবে যাতে শিশুর স্বাস্থ্য সুগঠিত হয় এবং প্রচুর ভাল মানের স্তনদুগ্ধ উৎপাদন হয়। (গ) দুটির বেশি সন্তান হওয়া মায়ের পক্ষে স্বাস্থ্যহানিকর; দুটি সন্তানের জন্মের মধ্যেও যথেষ্ট ব্যবধান থাকা উচিত। (ঘ) গর্ভাবস্থায় চিকিৎসকের পরামর্শ ব্যতীত মা কোন ঔষধ, টিকা বা হরমোন নেবেন না। (ঙ) মায়ের হার্ট, কিডনি, ডায়াবিটিস, উচ্চ রক্তচাপ, যক্ষা, কুষ্ঠ ইত্যাদি রোগ না সারলে, গর্ভবতী কিনা পরীক্ষার্থে হরমোন ব্যবহার করলে ও এক্স-রে ( X-Ray ) করলে সেই গর্ভস্থ সন্তানের ক্ষতি হবার সমূহ সম্ভাবনা। (চ) ভাবী সন্তানের স্বাস্থ্যের জন্য নিকট রক্ত-সম্বন্ধের মধ্যে বিয়ে হওয়া উচিত নয়। (ছ) শিশু প্রচলিত টিকা নেবে ও ৬ মাস বয়সে অবশ্যই প্রোটিনবহুল শক্ত খাবার খাবে; মায়ের বুকে যতদিন দুধ থাকে, খাবে। (জ) পেটে কেঁচোকৃমি থাকলে সময়মত চিকিৎসা করা দরকার ও তা নিবারণের জন্য বাড়িতে স্যানিটারি পায়খানা বা গর্ত-পায়খানা প্রয়োজন। □

## গ্রন্থ-পরিচয়

# নতুন পৃথিবীর সন্ধানে স্বামী বিবেকানন্দ

### সান্ত্বনা দাশগুপ্ত

**ভারতের প্রথম সমাজতন্ত্রী বিবেকানন্দ**ঃ প্রণবেশ চক্রবর্তী। ভূতক। ৭৯ মহাত্মা গান্ধী রোড, কলকাতা-৭০০ ০০৯। মূল্য ঃ ৪৫ টাকা।

উনিশ শতকে যখন এদেশে অন্যান্য সমাজ-সংস্কারকদের দৃষ্টি সমাজের ওপরতলার মানুষদের ওপর নিবদ্ধ ছিল, তখন একমাত্র স্বামী বিবেকানন্দের দৃষ্টি নিবদ্ধ ছিল নিচুতলার মানুষদের দিকে। তিনিই সর্বপ্রথম আমাদের স্মরণ করিয়ে দিয়েছেনঃ "জাতি বাস করে কুটিরে"। তিনিই বলেছেন,অগণিত শ্রমজীবী সাধারণ মানুষই জাতির প্রধান অংশ, মুষ্টিমেয় সুবিধাভোগী উচ্চশ্রেণীর মানুষেরা নয়। সেই ঊনবিংশ শতাব্দীতে একমাত্র বিবেকানন্দেরই ছিল অনন্য সমাজতান্ত্রিক চেতনা। মানব-সভ্যতায় শ্রমজীবী মানুষদের অনন্য অবদানের কথা তিনিই উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা করেছিলেন, বলেছিলেনঃ "ঐ যারা বিজাতি-বির্জিত স্বজাতি-নিন্দিত ছোটজাত, তারাই আবহমানকাল নীরবে কাজ করে যাচ্ছে, তাদের পরিশ্রমফলও তারা পাচ্ছে না।" "তাদের পরিশ্রমফলও তারা পাচ্ছে না" —কথাকয়টি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। মার্কস তাঁর উদ্বৃত্তমূল্যতত্ত্বে ( Theory of Surplus value ) যা বলতে চেয়েছেন, সে-কথাই বিবেকানন্দ এখানে অতি সংক্ষেপে উপস্থাপিত করেছেন। শ্রমজীবীদের উৎপন্নের এক অতি বৃহদংশ অনুৎপাদক শ্রেণীরা নিয়ে যাচ্ছে। এই শোষণ তিনি কোনক্রমেই সমর্থন করতে পারেননি। তিনি ইতিহাস বিশ্লেষণ করেও দেখেছিলেন যে, অনতিদূরবর্তী কালে সমাজে শূদ্র বা শ্রমজীবী শ্রেণীর প্রাধান্য অর্জন অনিবার্য। পূর্ববর্তী কালে পর পর ক্ষমতায় এসেছে ব্রাহ্মণ পুরোহিত শ্রেণী, ক্ষত্রিয় রাজন্যশ্রেণী, বর্তমানে ক্ষমতায় আসীন ধনিক বৈশ্যশ্রেণী। এই তিনটি শ্রেণীশাসনের যুগই যে নিষ্ঠুর শোষণের, তিনি তা বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছেন। এবার যে ক্ষমতায় শূদ্রশ্রেণী অধিষ্ঠিত হবে—তা তাঁর অভ্রান্ত ঐতিহাসিক দৃষ্টির সামনে উদ্ভাসিত হয়েছিল। 'বর্তমান ভারত'-এ তিনি দৃঢ়কণ্ঠে ঘোষণা করেছিলেনঃ "তথাপি এমন সময় আসিবে যখন শূদ্রত্বসহিত শূদ্রের প্রাধান্য হইবে। তিনি আরও ঘোষণা করেছিলেন ঃ "সোস্যালিজম, এনার্কিজম, নাইহিলিজম প্রভৃতি সম্প্রদায় এই বিপ্লবের অগ্রগামী ধ্বজা।" সমকালীন পাশ্চাত্যের সমাজতান্ত্রিক বিভিন্ন চিন্তাধারার সঙ্গে তাঁর যে পরিচয় ছিল, তা এই উক্তির মধ্যে সুস্পষ্ট। সর্বাপেক্ষা আশ্চর্যের কথা—কোথায় এই শূদ্র-অভ্যুত্থান প্রথম ঘটবে সে-সম্পর্কেও তিনি অভ্রান্ত ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন, বলেছিলেনঃ "এই অভ্যুত্থান সর্বপ্রথম ঘটবে রুশদেশে, অতঃপর চীনে।" ১৮৯৭ খ্রীস্টাব্দেই এদেশের পক্ষ থেকে তিনি সর্বপ্রথম সমাজতন্ত্রবাদকে স্বাগত জানিয়ে ঘোষণা করেনঃ "আমি একজন সমাজতন্ত্রবাদী।"

কিন্তু তিনি যে পাশ্চাত্য সমাজতন্ত্রবাদী চিন্তাধারার সম্পর্কে ওয়াকিবহাল ছিলেন, তাই শুধু নয়, সে-চিন্তার ত্রুটি কোথায়, সেসম্বন্ধেও তিনি বিশেষভাবে অবহিত ছিলেন। এসম্পর্কে তাঁর বিচার নিম্নোক্তরূপ ঃ "আমি একজন সমাজতন্ত্রী। তা এই কারণে নয় যে, আমি ঐ মত সম্পূর্ণ নির্ভুল বলে মনে করি। তবে নেই মামার চেয়ে কানা মামা তো ভাল।" তাঁর মতে শূদ্র-শাসনকালে সাংস্কৃতিক অবনমন ঘটবে, জ্ঞানবিদ্যার মান নিচু হয়ে যাবে। তৎসত্ত্বেও একে তাঁর সমর্থন জানানোর কারণ হিসাবে তিনি বলেছেনঃ "অপর কয়টি প্রথাই ( অর্থাৎ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য-শাসন ) জগতে চলেছে, পরিশেষে সেগুলির ত্রুটি ধরা পড়েছে। অন্ততঃ আর কিছুর জন্য না হোক, অভিনবত্বের দিক থেকে এটিরও পরীক্ষা করা যাক। একই লোক চিরকাল সুখ বা দুঃখ ভোগ করবে, তার চেয়ে সুখ-দুঃখটা যাতে পর্যায়ক্রমে সকলের মধ্যে বিভক্ত হতে পারে, সেটাই ভাল।" ('বাণী ও রচনা',৭।৩০২)

এপর্যন্ত দেখা যায়, কার্ল মার্ক্স ও স্বামী বিবেকানন্দের চিন্তার সাদৃশ্য রয়েছে। কিন্তু মার্ক্স ও বিবেকানন্দের সমাজতন্ত্রের ধারণায় বিরাট পার্থক্যও রয়েছে এবং সে-পার্থক্য একেবারে মূলে।

মার্ক্সীয় মতবাদের ভিত্তিতে আছে বৈজ্ঞানিক জড়বাদ আর বিবেকানন্দের ধারণার ভিত্তিতে আছে বৈজ্ঞানিক অদ্বৈতবাদ—বেদান্তের জীবব্রহ্মবাদ, যা তাঁর কাছে মতবাদমাত্র ছিল না, ছিল উপলব্ধি-প্রসূত—প্রত্যক্ষীকৃত, জীবন্ত সত্য। "প্রতি জীবে এক ব্রহ্ম আছেন", অর্থাৎ প্রতি মানুষে একই শক্তি নিহিত আছে। সে শক্তি অসীম। বেদান্তোক্ত এই মূলসূত্রটির ফলশ্রুতি কোন ব্যক্তি বা শ্রেণীর বিশেষ অধিকারের মূলোচ্ছেদ। কারণ প্রত্যেক মানুষের মধ্যেই যদি একই অসীম শক্তি নিহিত থাকে, তাহলে বিশেষ অধিকার দাঁড়াবে কিসের ভিত্তিতে, কাউকে বিশেষ অধিকার দেওয়া হবে কোন্ যুক্তিতে? বেদান্ত তাই এক অগ্নিগর্ভ বিপ্লব-দর্শন, মানুষের সমান অধিকারের শ্রেষ্ঠ সনদ। বেদান্তের ঘোষণা: কেউ ছোট নয়, হীন নয়, তুচ্ছ নয়। সকলেরই বড় হবার ও মহৎ হবার অনন্ত সম্ভাবনা আছে। স্বামী বিবেকানন্দ বেদান্তের এই সুপ্রাচীন তত্ত্ব উদ্ঘাটিত করে আহ্বান জানিয়েছেন: "অজ্ঞ অশক্ত নর-নারী, ব্রাহ্মণ-চণ্ডাল, উচ্চ-নীচ সকলেই শোন—সকলেই সেই অজর, অমর, অনন্ত শক্তিমান আত্মা, সকলের বড় হবার ও মহৎ হবার অনন্ত সম্ভাবনা আছে। অতএব দৌর্বল্যের এ জড়তা ত্যাগ কর, ওঠ, জাগো।—তোমার মধ্যে যে ভগবান আছেন, তাকে অস্বীকার করো না।"

স্বামী বিবেকানন্দ ভারতের সুপ্রাচীন ধর্ম ও দর্শন-চিন্তার উচ্চতম চূড়া বেদান্তের ভিত্তিতেই গণমুক্তির পরিকল্পনা করেছেন, বলেছেন—"বেদান্তের অভীঃ মন্ত্রবলে আমি এদের জাগাব।" বেদান্তের প্রতিপাদ্য চূড়ান্ত সাম্য। বেদান্তকে বাস্তব করে তুললে তার পরিণাম—সমাজের 'আমূল রূপান্তর'। সেজন্যই তিনি ঘোষণা করেছিলেন: "ভারতকে রাজনৈতিক ও সমাজতান্ত্রিক ধারণাসমূহের দ্বারা প্লাবিত করার পূর্বে ধর্মের বন্যায় তাকে ভাসাও।"

মার্ক্সের চিন্তার সঙ্গে কত পার্থক্য এখানে! মার্ক্সের মতে, সমাজতন্ত্রে ধর্ম বর্জনীয়; বিবেকানন্দের মতে ধর্মই সমাজতন্ত্রের ভিত্তি, বর্জনীয় যা, তা হলো পৌরোহিত্য অর্থাৎ ধর্মের নামে বিশেষ সুবিধাবাদ।

প্রখ্যাত সাংবাদিক ও রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ সাহিত্যের ক্ষেত্রে সুপরিচিত লেখক প্রণবেশ চক্রবর্তী এইসকল মূল্যবান তথ্য ও বিশ্লেষণ আমাদের সামনে উপস্থাপিত করেছেন তাঁর সাম্প্রতিক গ্রন্থ **ভারতের প্রথম সমাজতন্ত্রী বিবেকানন্দ** গ্রন্থে। গ্রন্থখানি একটি প্রবন্ধ সংকলন, যার প্রথম প্রবন্ধটির শিরোনাম অনুসারে গ্রন্থের নামকরণ করা হয়েছে। উপরি-উক্ত বিষয়টি ব্যতীত এই গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত অন্যান্য প্রবন্ধগুলিও দৃষ্টি-আকর্ষক।

দীর্ঘদিন ধরে প্রণবেশ চক্রবর্তী যুবসম্প্রদায় ও বিবেকানন্দ-ভাবনার সঙ্গে যুক্ত। যুবসমাজই ছিল স্বামী বিবেকানন্দের নির্বাচিত বিপ্লবীদল, যারা তাঁর কল্পিত বিপ্লব বা সমাজের 'আমূল রূপান্তর' সাধন করবে। এইপ্রসঙ্গে স্বামী পূর্ণাত্মানন্দের লেখা গ্রন্থ থেকে স্বাধীনতা সংগ্রামে স্বামীজীর প্রভাব সম্পর্কে যে-তথ্যাদি শ্রীচক্রবর্তী পরিবেশন করেছেন তা প্রাসঙ্গিক হয়েছে। শ্রীচক্রবর্তী বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছেন: "স্বামী বিবেকানন্দ আমাদের সামনে এবং সমস্ত দেশের সর্বকালের যুবকদের সামনে যে চারটি অভ্রান্ত মন্ত্র তুলে ধরেছেন, তার প্রথমটি হচ্ছে 'শ্রদ্ধাবান হও', দ্বিতীয়টি হচ্ছে 'নির্ভয় হও, মা ভৈঃ', তাঁর সেই দুর্জয় অভীমন্ত্র, তৃতীয়টি হচ্ছে 'নিঃস্বার্থভাবে ত্যাগস্বীকার কর'... এবং সর্বশেষ 'স্বার্থপরতা ত্যাগ কর, ত্যাগের মাধ্যমে সেবা কর'।" (পৃঃ ১১২)

'বিবেকানন্দের রচনার বাহক' নিবন্ধে বিবেকানন্দের ভাষণসমূহের সাঙ্কেতিক লিপিকার অনন্য ত্যাগব্রতধারী ইংরেজ-শিষ্য গুডউইনের বিষয়ে সংবাদগুলি পাঠকদের কাছে সমাদর পাবে।

'উদ্বোধন' ও 'প্রবুদ্ধ ভারত' পত্রিকায় পূর্বে প্রকাশিত এবং পরে সম্প্রতি-প্রকাশিত অধ্যাপক নিমাইসাধন বসু সম্পাদিত 'শাশ্বত বিবেকানন্দ' গ্রন্থে নতুনতর তথ্যসহ অন্তর্ভুক্ত স্বামী পূর্ণাত্মানন্দের সোভিয়েত পণ্ডিত ডঃ ই. পি. চেলিশভের সঙ্গে অসাধারণ সাক্ষাৎকারটি শ্রীচক্রবর্তী আলোচ্য গ্রন্থে গ্রহণ করেছেন। সমাজতন্ত্রের সেদিনের পীঠস্থান সোভিয়েত দেশের বিখ্যাত তাত্ত্বিক পণ্ডিত ও মার্ক্সীয় বিশেষজ্ঞ সেই সাক্ষাৎকারে স্পষ্টভাবে জানিয়ে দিয়েছেন যে, প্রায় শতাব্দীকালের পুরনো স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা সোভিয়েত জনগণের কাছে "আজও সমান তেজোদীপ্ত, সমানভাবে প্রেরণাপ্রদ।"

গ্রন্থখানির বহুল প্রচার কামনা করি। □

# রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশন সংবাদ

## স্বামী বিবেকানন্দের ভারত-পরিক্রমার শতবার্ষিকী অনুষ্ঠান

গত ৭ ও ৮ নভেম্বর **আগরতলা আশ্রম** স্বামী বিবেকানন্দের ভারত-পরিক্রমার শতবর্ষ উপলক্ষে বিশেষ অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। অনুষ্ঠান উদ্বোধন করেন অধ্যাপক শঙ্করীপ্রসাদ বসু। এই উপলক্ষে আগরতলার টাউন হলে অনুষ্ঠিত আলোচনাসভায় প্রথম দিন সভাপতিত্ব করেন উদ্বোধন পত্রিকার যুগ্ম সম্পাদক স্বামী পূর্ণাত্মানন্দ, দ্বিতীয় দিন সভাপতিত্ব করেন ত্রিপুরা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ডঃ জলদবরণ গাঙ্গুলী। ত্রিপুরার প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী সুখময় সেনগুপ্ত, ত্রিপুরা সরকারের সাতজন মন্ত্রী, অধ্যক্ষ সুশান্তকুমার চৌধুরী প্রমুখ বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ দুদিনের বিভিন্ন অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন। ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী সমীররঞ্জন বর্মন অসুস্থতার জন্য নিজে যোগদান করতে না পারলেও যে লিখিত ভাষণ পাঠিয়েছিলেন, সেটি সভায় পাঠ করে শোনানো হয়। এই উপলক্ষে দুঃস্থদের মধ্যে ১০০ ধুতি ও ৮০টি কম্বল বিতরণ করা হয়। স্বামীজীর ভারত-পরিক্রমার ওপর অঙ্কিত তৈলচিত্রের প্রদর্শনী এবং বিশেষ পুস্তকবিক্রয়কেন্দ্রটি প্রচুর দর্শনার্থীর দৃষ্টি আকর্ষণ করে। অনুষ্ঠানের একটি আকর্ষণীয় বিষয় ছিল 'বিবেক জ্যোতি' মশাল নিয়ে পাঁচশো যুবকের রিলে দৌড়। ত্রিপুরার বিভিন্ন অঞ্চল থেকে যুবকরা সকাল ৯-৩০ মিনিটে আগরতলার বিবেক উদ্যানে স্বামী বিবেকানন্দের মূর্তির পাদদেশে মিলিত হয়। ৮ নভেম্বর ত্রিপুরার ১৫টি স্থানে এই অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। এই অনুষ্ঠানের অঙ্গ হিসাবে গত ৩১ অক্টোবর ও ১ নভেম্বর স্কুল-কলেজের ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে আবৃত্তি, বক্তৃতা ও প্রশ্নোত্তর প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। ৮ নভেম্বর সকাল আটটায় গান্ধীঘাটে প্রাক্তন স্বাধীনতা সংগ্রামীরা আশ্রমের সহযোগিতায় স্বামীজী সম্পর্কে একটি আলোচনাসভার আয়োজন করেছিলেন। সেখানে স্বামী পূর্ণাত্মানন্দ এবং অধ্যাপক শঙ্করীপ্রসাদ বসু ভাষণ দান করেন।

**রাজকোট আশ্রম** স্বামী বিবেকানন্দের গুজরাট-পরিভ্রমণের শেষ পর্যায়ের উৎসব উদ্‌যাপন করেছে গত ২০ থেকে ২৩ নভেম্বর। এই উপলক্ষে আয়োজিত প্রদর্শনী এবং লাইব্রেরী হলের সংযোজিত অংশের উদ্বোধন করেন রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের অন্যতম সহাধ্যক্ষ স্বামী গহনানন্দজী মহারাজ। ২২ নভেম্বর আয়োজিত যুবসম্মেলন ও আলোচনাচক্রে সভাপতিত্ব করেন রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের সাধারণ সম্পাদক স্বামী আত্মস্থানন্দজী। উৎসবের স্মারকগ্রন্থ প্রকাশ করেন গুজরাটের রাজ্যপাল স্বরূপ সিং। ট্যাবলো ও প্ল্যাকার্ডের মাধ্যমে স্বামীজীর ভারত-ভ্রমণের বিভিন্ন দৃশ্য এবং ভক্তিমূলক সঙ্গীত পরিবেশন সহ একটি বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রাও বের করা হয়েছিল। তাছাড়া নাটক, সঙ্গীত প্রভৃতি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানেরও আয়োজন করা হয়েছিল। উৎসবে মঠ ও মিশনের বিভিন্ন কেন্দ্র থেকে মোট ৫৩জন সন্ন্যাসী ও ব্রহ্মচারী যোগদান করেছিলেন।

**খেতড়ি আশ্রমের** প্রস্তাবানুযায়ী খেতড়ি পৌরসভা গত ১২ নভেম্বর শহরের একটি গুরুত্বপূর্ণ রাস্তার নামকরণ করেছে 'বিবেকানন্দ মার্গ'। ঐদিন অপরাহ্ণে স্বামীজীর রাজস্থানে পদার্পণের শতবর্ষপূর্তি উপলক্ষে খেতড়ি আশ্রমে এক জনসভা অনুষ্ঠিত হয়।

**দিল্লী আশ্রম** গত ২০ নভেম্বর স্বামীজীর দিল্লী-ভ্রমণের শতবর্ষপূর্তি উপলক্ষে রোশনারা রোড-এ এক অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছিল। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন দিল্লীর উপরাজ্যপাল পি. কে. দাবে। আশীর্বাণী প্রদান করেন স্বামী আত্মস্থানন্দজী। বহু ছাত্রছাত্রী এবং বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। উল্লেখ্য, যেখানে অনুষ্ঠান হয়েছে শতবর্ষ পূর্বে দিল্লী-ভ্রমণের সময় স্বামীজী সেখানে বাস করেছিলেন।

**কোয়েম্বাটোর (তামিলনাড়ু) আশ্রম** গত ২১-২৩ নভেম্বর স্বামীজীর ভারত-পরিক্রমার শতবর্ষপূর্তি উপলক্ষে নানা অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছিল। শিক্ষা-বিষয়ক আলোচনাচক্র, যুবসম্মেলন, সাধারণ সভা প্রভৃতির মাধ্যমে বর্তমান যুগে স্বামীজীর বাণীর প্রাসঙ্গিকতাকে তুলে ধরা হয়েছে।

যুবসম্মেলনে ১৫টি কলেজের ১৫০জন ছাত্র যোগদান করেছিল। শহরে অনুষ্ঠিত সাধারণ সভাতেও প্রচুর জনসমাগম হয়েছিল।

### উৎসব-অনুষ্ঠান

গত ৮ থেকে ১৩ নভেম্বর **সারদাপীঠের** সুবর্ণ-জয়ন্তী (১৯৪১-১৯৯১) উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। এই অনুষ্ঠানটির উদ্বোধন করেন রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের সাধারণ সম্পাদক স্বামী আত্মস্থানন্দজী। ঐদিন সন্ধ্যায় ইন্দোরের সাগর খারে ও ক্ষিতিজ খারে ভ্রাতৃদ্বয়ের যথাক্রমে 'বন্দেমাতরম্' নামে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ওপর ও স্বামী বিবেকানন্দের শিকাগো বক্তৃতাবলীর ওপর একাঙ্ক (একক) অভিনয় খুব আকর্ষণীয় হয়েছিল। ছয় দিনের বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে সারদাপীঠের বিভিন্ন বিভাগের ছাত্র-শিক্ষকগণ ও অন্য একটি সংস্থা অংশগ্রহণ করেন। ১৩ নভেম্বর সমাপ্তি অধিবেশনে ভাষণ দেন রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের সহ-সম্পাদক স্বামী প্রভানন্দ। সভাপতিত্ব করেন কাশীপুর রামকৃষ্ণ মঠের অধ্যক্ষ স্বামী নির্জরানন্দ। ১৩ নভেম্বর সুবর্ণজয়ন্তী অনুষ্ঠান শেষ হয় ওস্তাদ আলাউদ্দিন খাঁর ছাত্র ও ভূপালের রিজিওন্যাল কলেজ অব এডুকেশন-এর সঙ্গীত বিভাগের প্রধান ডঃ অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের সেতার বাদনের মাধ্যমে।

### ছাত্র-কৃতিত্ব

**মহীশূর আশ্রম** পরিচালিত 'রামকৃষ্ণ ইনস্টিটিউট অব মর‍্যাল অ্যান্ড স্পিরিচুয়াল এডুকেশন'-এর দুজন পরিক্ষার্থী মহীশূর বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালিত ১৯৯২ খ্রীস্টাব্দের বি. এড. ডিগ্রী পরীক্ষায় ৭ম ও ৯ম স্থান লাভ করেছে।

### ত্রাণ

#### তামিলনাড়ু বন্যা ও ঝঞ্ঝাত্রাণ

কোয়েম্বাটোর আশ্রম ও মাদ্রাজ মিশন আশ্রম তামিলনাড়ুর তিরুনেলভেলী ও রামেশ্বরম জেলায় বন্যায় ও ঝড়ে ক্ষতিগ্রস্তদের মধ্যে প্রাথমিক ত্রাণকার্য আরম্ভ করেছে।

#### উড়িষ্যা অগ্নিত্রাণ

পুরী মঠের মাধ্যমে পুরী পৌরসভার অধীনস্থ নুসাহি অঞ্চলের অগ্নিকাণ্ডে ক্ষতিগ্রস্ত ছয়টি পরিবারকে চাল, পোশাক-পরিচ্ছদ দেওয়া হয়েছে ও থাকার ব্যবস্থা করা হয়েছে।

### পুনর্বাসন

#### উত্তরপ্রদেশ

উত্তরকাশীতে ভূমিকম্পে ক্ষতিগ্রস্তদের জন্য যে গৃহনির্মাণ প্রকল্প নেওয়া হয়েছিল তা সমাপ্ত হয়েছে। গত ১৮ নভেম্বর নবনির্মিত গৃহগুলির উদ্বোধন করেন রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের অন্যতম সহ-সম্পাদক স্বামী প্রভানন্দ। নবনির্মিত মোট ৬৩টি বাড়ির সবগুলিই সত্বাধিকারীদের হাতে তুলে দেওয়া হয়।

#### পশ্চিমবঙ্গ

পুরুলিয়া জেলায় বন্যায় ক্ষতিগ্রস্তদের জন্য হুড়া ব্লকের লৌসেনবেরা গ্রামে ৪১টি গৃহনির্মাণের ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে।

### বহির্ভারত

**বেদান্ত সোসাইটি অব ওয়েস্টার্ন ওয়াশিংটন :** ১৬ ডিসেম্বর শ্রীমা সারদাদেবীর আবির্ভাব-তিথি পালন করা হয়। এই উপলক্ষে সন্ধ্যা ৭টায় পূজাদি ও ভক্তিমূলক সঙ্গীত পরিবেশিত হয়। অনুষ্ঠানের পর প্রসাদ বিতরণ করা হয়।

২৬ ডিসেম্বর ওয়াশিংটন 'ইন্টারফেইথ কাউন্সিল'-এর ব্যবস্থাপনায় বেলভিউ ফার্স্ট কংগ্রিগ্রেশন্যাল চার্চে 'বিভিন্ন ধর্মের সমন্বয়ের মাধ্যমে শান্তি' বিষয়ক এক অনুষ্ঠান আয়োজিত হয়। সঙ্গীত, প্রার্থনা, বিভিন্ন ধর্মগ্রন্থ থেকে পাঠ প্রভৃতি ছিল অনুষ্ঠানের অঙ্গ। উল্লেখ্য, এই বেদান্ত সোসাইটি ইন্টারফেইথ কাউন্সিলের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা সদস্য।

ওয়াশিংটনের রিচল্যান্ডে গত ২০ নভেম্বর একটি হিন্দু সোসাইটি গঠন করা হয়। এই সোসাইটির উদ্বোধন অনুষ্ঠানে স্বামী ভাস্করানন্দ আমন্ত্রিত হয়ে যোগদান করেছিলেন।

**বেদান্ত সোসাইটি অব স্যাক্রামেন্টো (ক্যালিফোর্নিয়া):** গত ৩ নভেম্বর বেলা সাড়ে-দশটা থেকে ধ্যান-জপ, পূজা, ভক্তিগীতি পরিবেশন ও প্রসাদ বিতরণের মাধ্যমে জগদ্ধাত্রীপূজা অনুষ্ঠিত হয়। উল্লেখ্য, ১৯৬৪ খ্রীস্টাব্দে জগদ্ধাত্রীপূজার দিন এই বেদান্ত সোসাইটির মন্দির উৎসর্গিত হয়েছিল।

**বেদান্ত সোসাইটি অব সেন্ট লুইস :** গত ২০

ডিসেম্বর শ্রীমা সারদাদেবীর আবির্ভাব-তিথি উপলক্ষে পূজা, সঙ্গীত পরিবেশন, জপ-ধ্যান, প্রসাদ বিতরণ অনুষ্ঠিত হয়েছে। ১৭ ডিসেম্বর খ্রীষ্টমাস উপলক্ষে, ধ্যান-জপ, পাঠ, ক্যারল-সঙ্গীত প্রসাদ বিতরণ প্রভৃতি অনুষ্ঠিত হয়েছে।

**বেদান্ত সোসাইটি অব টরেন্টো ( কানাডা ):** গত নভেম্বর ও ডিসেম্বর মাসের রবিবার ও শনিবারগুলিতে যথারীতি ভাষণ ও ক্লাস হয়েছে। ১৬ ডিসেম্বর এই কেন্দ্রে শ্রীমা সারদাদেবীর আবির্ভাব-তিথি পালন করা হয়েছে। ২৭ ডিসেম্বর এই বেদান্ত সোসাইটি কর্তৃক নর্থইয়র্ক মেমোরিয়াল কমিউনিটি হলের গোল্ড রুমে পূজা, ভক্তিগীতি, জপ-ধ্যান, পুষ্পাঞ্জলি ও প্রসাদ বিতরণের মাধ্যমে শ্রীশ্রীমায়ের জন্মোৎসব পালিত হয়েছে। গত ২৯ নভেম্বর বিকাল তিনটায় গোল্ড রুমে সোসাইটির বার্ষিক সভা অনুষ্ঠিত হয়।

**রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ সেন্টার অব নিউ ইয়র্ক:** গত নভেম্বর ও ডিসেম্বর মাসের রবিবারগুলিতে বিভিন্ন ধর্মীয় বিষয়ে ভাষণ দিয়েছেন এই কেন্দ্রের অধ্যক্ষ স্বামী আদীশ্বরানন্দ। ২০ ডিসেম্বর শ্রীমা সারদাদেবী ও ২৫ ডিসেম্বর ভগবান যীশুখ্রীস্টের ওপর আলোচনা হয়েছে। তাছাড়া স্বামী আদীশ্বরানন্দ প্রতি শুক্রবার শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা ও প্রতি মঙ্গলবার 'গস্‌পেল অব শ্রীরামকৃষ্ণ'-এর ক্লাস নিয়েছেন।

## শ্রীশ্রীমায়ের বাড়ীর সংবাদ

**আবির্ভাব-তিথি পালন:** গত ১৬ ডিসেম্বর '৯২ ( ১ পৌষ, ১৩৯৯ ) বিশেষ পূজা, হোম, চণ্ডীপাঠ, প্রসাদ বিতরণ প্রভৃতি অনুষ্ঠানের মাধ্যমে **শ্রীশ্রীমা সারদাদেবীর** ১৪০তম শুভ আবির্ভাব-তিথি সাড়ম্বরে উদ্‌যাপিত হয়েছে। ঐদিন ভোর থেকে রাত্রি ৮-৩০ পর্যন্ত অগণিত ভক্তনরনারী মাতৃচরণে প্রণাম নিবেদন করেন। সকলকেই হাতে হাতে প্রসাদ দেওয়া হয়। দুপুরে পাঁচ সহস্রাধিক ভক্তকে হাতে হাতে খিচুড়ি প্রসাদ দেওয়া হয়। সকাল ৭টায় 'আনন্দম' কীর্তন-গোষ্ঠী মাতৃসঙ্গীত, দুপুরে রামকৃষ্ণ মিশন সারদাপীঠের সাধু-ব্রহ্মচারিবৃন্দ কর্তৃক কালীকীর্তন, বিকালে শঙ্কর সোম ও তারাপদ বসু কর্তৃক লীলা-গীতি এবং সন্ধ্যায় 'অর্ঘ্য' সম্প্রদায় কর্তৃক লীলা-গীতি পরিবেশিত হয়। সকাল ৯টায় শ্রীশ্রীমায়ের জীবনী আলোচনা করেন স্বামী পূর্ণাত্মানন্দ।

গত ৩০ ডিসেম্বর **শ্রীমৎ স্বামী সারদানন্দজী মহারাজের** আবির্ভাব-তিথি উপলক্ষে বিশেষ পূজা, হোম, চণ্ডীপাঠ প্রভৃতি অনুষ্ঠিত হয়। দুপুরে উপস্থিত সকলকে হাতে হাতে খিচুড়ি প্রসাদ দেওয়া হয়। সকাল ৮টায় রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের অধ্যক্ষ শ্রীমৎ স্বামী ভূতেশানন্দজী মহারাজ মায়ের বাড়ীতে আসেন। সন্ধ্যারতির পর স্বামী সারদানন্দজীর জীবনী আলোচনা করেন স্বামী পূর্ণাত্মানন্দ।

**খ্রীস্টোৎসব:** গত ২৪ ডিসেম্বর যীশুখ্রীস্টের আবির্ভাবের প্রাক্‌সন্ধ্যা সাড়ম্বরে উদ্‌যাপন করা হয়। সন্ধ্যায় যীশুখ্রীস্টের প্রতিকৃতির সম্মুখে আরাত্রিক ও ভোগ নিবেদন করা হয়। তারপর যীশুর বাণীর তাৎপর্য আলোচনা করেন স্বামী পূর্ণাত্মানন্দ। অনুষ্ঠানান্তে উপস্থিত সকলকে প্রসাদ দেওয়া হয়। □

## দেহত্যাগ

**স্বামী কাশীশ্বরানন্দজী** ( বলাই মহারাজ ) গত ২৯ অক্টোবর রাত ৯-২০ মিনিটে রামকৃষ্ণ মিশন সেবাপ্রতিষ্ঠানে দেহত্যাগ করেন। তাঁর বয়স হয়েছিল ৯৫ বছর। ঐদিন সকালেই তাঁকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছিল। যদিও বয়সের তুলনায় তাঁর স্বাস্থ্য ভালই ছিল, তথাপি দেহত্যাগের দুই মাস পূর্ব থেকে তাঁর স্বাস্থ্য ক্রমশঃ ভেঙে যাচ্ছিল।

শ্রীমৎ স্বামী ব্রহ্মানন্দজী মহারাজের মন্ত্রশিষ্য স্বামী কাশীশ্বরানন্দজী ১৯২২ খ্রীস্টাব্দে মিহিজাম বিদ্যাপীঠ (বর্তমান দেওঘর বিদ্যাপীঠ)-এ যোগদান করেন। ১৯২৮ খ্রীস্টাব্দে তিনি শ্রীমৎ স্বামী শিবানন্দজী মহারাজের নিকট সন্ন্যাসলাভ করেন। যোগদানকেন্দ্র ছাড়াও তিনি বিভিন্ন সময়ে বেলুড় মঠ, ভুবনেশ্বর, গড়বেতা এবং ঢাকা আশ্রমের কর্মী ছিলেন। তিনি দীর্ঘকাল রামকৃষ্ণ মঠের সাধন-কুটির, লালগড় ( জেলা মেদিনীপুর ) এবং বাঁকুড়া জেলার খাত্রায় একটি প্রাইভেট আশ্রমে বাস করেছেন। ১৯৭৪ খ্রীস্টাব্দে কামারপুকুর আশ্রমে এবং ১৯৮৬ খ্রীস্টাব্দ থেকে বেলুড় মঠে বাস করছিলেন। সরলতা, দয়া, কৃচ্ছ্রতা, নিরহংকারিতা ও পবিত্র জীবনযাপন প্রভৃতি সাধুচিত গুণাবলীর জন্য তিনি সকলেরই অতি শ্রদ্ধাভাজন ছিলেন।

# বিবিধ সংবাদ

## উৎসব-অনুষ্ঠান

**অখিল ভারত বিবেকানন্দ যুব মহামণ্ডলের** হুগলী, হাওড়া ও বর্ধমান জেলার কেন্দ্রগুলির যৌথ উদ্যোগে গত ১২-১৪ জুন '৯২ হুগলীর জঙ্গলপাড়া কৃষ্ণরামপুর দেশপ্রাণ উচ্চ বিদ্যালয়ে বার্ষিক যুবশিক্ষণ শিবির অনুষ্ঠিত হয়। শিবিরের উদ্বোধন করেন স্বামী স্বতন্ত্রানন্দ। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে ভাষণ দেন মহামণ্ডলের সহ-সভাপতি তনুলাল পাল ও সহ-সম্পাদক বীরেন্দ্রকুমার চক্রবর্তী। শিবিরে শিক্ষার বিষয় ছিল স্বামী বিবেকানন্দের জাতিগঠনকারী চিন্তার বিভিন্ন দিক। তাছাড়া খেলাধুলা এবং শরীরচর্চার ব্যবস্থাও ছিল। ১৩ জুন সন্ধ্যায় সঙ্গীত পরিবেশন করেন স্বামী সর্বগানন্দ। ১৪ জুনের অধিবেশনে ভাষণ দেন প্রধান শিক্ষক অজিত মাইতি এবং সঙ্গীত পরিবেশন করেন সনাতন সিংহ। শিবিরে মোট ২৩৭জন শিক্ষার্থী যোগদান করেন।

**শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম, কুমীরমুড়া, হুগলী :** গত ১৩ জুন এই আশ্রমে মন্দির ও বিগ্রহ প্রতিষ্ঠার প্রথম বার্ষিক উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। এই উপলক্ষে নানা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও ছাত্রছাত্রীদের জন্য প্রতিযোগিতামূলক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছিল। অনুষ্ঠানে পুরস্কার বিতরণ ও ভাষণ দেন স্বামী সনাতনানন্দ।

গত ১২ ও ১৩ জুন **হাওড়া বিবেকানন্দ আশ্রম** শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীমা সারদাদেবী ও স্বামী বিবেকানন্দের জন্মোৎসব এবং ১৪ জুন আশ্রমের প্ল্যাটিনাম-জয়ন্তী উৎসবের সমাপ্তি-অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। প্রথম দিনের ধর্মসভায় পৌরোহিত্য করেন প্রব্রাজিকা অমলপ্রাণা। বক্তব্য রাখেন প্রব্রাজিকা প্রদীপ্তপ্রাণা ও প্রব্রাজিকা প্রবুদ্ধপ্রাণা। স্তোত্রপাঠ ও সঙ্গীত পরিবেশন করেন যথাক্রমে প্রব্রাজিকা ভবানীপ্রাণা ও প্রব্রাজিকা বেদান্তপ্রাণা। দ্বিতীয় দিনের সভায় পৌরোহিত্য করেন স্বামী বন্দনানন্দজী, বক্তব্য রাখেন স্বামী কমলেশানন্দ ও সাহিত্যিক হর্ষ দত্ত। ১৪ জুন বিশেষ পূজাদি অনুষ্ঠিত হয়। সঙ্গীত পরিবেশন করেন কেদারনাথ মুখোপাধ্যায়। ধর্মসভায় প্রশ্নোত্তর পর্ব পরিচালনা করেন স্বামী স্বতন্ত্রানন্দ এবং স্বামী দিব্যানন্দ। এই সভায় আশ্রমের পঞ্চাশ বছরের অধিক-বয়স্ক সদস্যদের সংবর্ধিত করা হয়। সভান্তে শ্রুতিনাট্য পরিবেশন করেন আশ্রমের কর্মিবৃন্দ।

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞান কলেজের শিক্ষক, অশিক্ষক কর্মী এবং ছাত্র-গবেষকদের নিয়ে গঠিত **বিবেকানন্দ স্টাডি ফোরাম** গত ৭ মে '৯২ স্বামী বিবেকানন্দের জন্মজয়ন্তী উদ্যাপন করেছে। সভায় আলোচ্য বিষয় ছিল 'স্বামীজীর দৃষ্টিতে নতুন সমাজ'। প্রধান বক্তা ছিলেন রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউট অব কালচারের অধ্যক্ষ স্বামী লোকেশ্বরানন্দ। অপর দুজন বক্তা ছিলেন নচিকেতা ভরদ্বাজ এবং অধ্যাপক বিশ্বনাথ চ্যাটার্জী। শ্রোতাদের গরিষ্ঠ সংখ্যক ছিলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রী, গবেষক, শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মী।

## যুবসম্মেলন

**রামেশ্বরপুর ইউনিয়ন উচ্চতর আদর্শ বিদ্যালয় ( উত্তর ২৪ পরগনা )** পরিচালিত স্বামী বিবেকানন্দ পাঠচক্রের ব্যবস্থাপনায় ও গোলপার্ক রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউট অব কালচারের সহযোগিতায় গত ২ মে ১৯৯২ বিদ্যালয়-প্রাঙ্গণে সারাদিনব্যাপী যুবসম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। বিভিন্ন বিদ্যালয়ের প্রায় ১৫০জন ছাত্রছাত্রী প্রতিনিধি, শিক্ষক-শিক্ষিকা ও কিছু অভিভাবক অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন। স্বামীজীর জীবনের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা, তাঁর বাণী-পাঠ ও কবিতা-আবৃত্তি প্রতিযোগিতায় প্রায় ২৫/৩০জন ছাত্রছাত্রী অংশগ্রহণ করে। অনুষ্ঠানে পৌরোহিত্য করেন স্বামী দিব্যানন্দ।

**শ্রীখণ্ড রামকৃষ্ণ সিসৃক্ষা সমিতি, বর্ধমান :** গত ১৬ মে শ্রীখণ্ড গ্রামে উক্ত সমিতির শ্রীরামকৃষ্ণদেবের মন্দির ও প্রতিকৃতি-প্রতিষ্ঠা উৎসব নানা অনুষ্ঠানের মাধ্যমে পালিত হয়। জয়রামবাটী

মাতৃমন্দিরের স্বামী নিস্পৃহানন্দ ও স্বামী বরিষ্ঠানন্দ উৎসবে যোগদান করেন। শ্রীখণ্ড কীর্তন-সমাজের প্রকাশানন্দ ঠাকুরের পদাবলী-কীর্তন এবং 'বেলুড় রামকৃষ্ণ সঙ্গীতাঞ্জলি' সম্প্রদায়ের লীলা-কীর্তন ছিল আকর্ষণীয় অনুষ্ঠান। কথা ও সুরে শ্রীরামকৃষ্ণের জন্মলীলা পরিবেশন করেন স্বামী নিস্পৃহানন্দ। দুপুরে বহুসংখ্যক ভক্তকে প্রসাদ দেওয়া হয়। বিকালে পণ্ডিত রামময় গোস্বামীর সভাপতিত্বে ধর্মসভা অনুষ্ঠিত হয়।

**শ্রীরামকৃষ্ণ বিশুদ্ধানন্দ সমিতির** উদ্যোগে গত ১৪ জুন '৯২ সন্ধ্যা ৬টায় ৩ ম্যান্ডেভিলা গার্ডেন্সে (কলকাতা-৭০০০১৯) শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত পাঠ, ভজনসঙ্গীত ও ধর্মসভা অনুষ্ঠিত হয়। ধর্মসভায় শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-প্রসঙ্গ করেন স্বামী পূর্ণাত্মানন্দ। প্রশান্তকুমার মুখোপাধ্যায় ও সোহিনী মুখোপাধ্যায় ভজন পরিবেশন করেন।

সমিতির অর্থানুকূল্যে গোলপার্ক রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউট অব কালচার আয়োজিত এবছরের **স্বামী বিশুদ্ধানন্দ স্মারক বক্তৃতাটিও** দান করেন স্বামী পূর্ণাত্মানন্দ। ইনস্টিটিউটের বিবেকানন্দ হলে গত ২২ আগস্ট অনুষ্ঠিত ঐ বক্তৃতার বিষয় ছিল 'শ্রীশ্রীমা ও রামকৃষ্ণ সঙ্ঘ'। সভায় পৌরোহিত্য করেন স্বামী ভৈরবানন্দ।

## পরলোকে

শ্রীমৎ স্বামী বিজ্ঞানানন্দজী মহারাজের মন্ত্রশিষ্য নড়াইল ভিক্টোরিয়া কলেজের প্রাক্তন উপাধ্যক্ষ **বলরাম কুণ্ডু** গত ২৭ মার্চ '৯২ বিকাল ৫টায় তাঁর উত্তর কলকাতার ৩৯/২এ, বাবুরাম ঘোষ লেনের বাসভবনে বিনা রোগভোগে পরলোক গমন করেন। তাঁর বয়স হয়েছিল ৮১ বছর। রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ ভাবধারায় অনুপ্রাণিত প্রয়াত অধ্যাপক কুণ্ডু রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউট অব কালচারের (তখন কেশব সেন স্ট্রীটে অবস্থিত) স্টুডেন্টস হোমে থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনা করেছেন এবং ইংরেজীতে এম.এ. পাশ করার পর দেওঘর বিদ্যাপীঠে তাঁর কর্মজীবন শুরু করেছিলেন।

নড়াইল কলেজিয়েট স্কুলে অধ্যয়নকালে তিনি শ্রীমৎ স্বামী সারদানন্দজী মহারাজের কৃপাপ্রাপ্ত অধ্যাপক গুরুদাস গুপ্তের সান্নিধ্যে আসেন এবং রামকৃষ্ণ ভাবধারার সঙ্গে পরিচিত হন। জীবনের শেষদিন পর্যন্ত সেই ভাবধারার প্রতি তিনি ঐকান্তিকভাবে অনুগত থেকেছেন।

শ্রীমৎ স্বামী সারদানন্দজীর মন্ত্রশিষ্যা **রমারানী দত্ত** গত ৮ মে '৯২ কলকাতাস্থ বেকবাগানের এক নার্সিংহোমে শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। তাঁর বয়স হয়েছিল ৭৪ বছর। মাত্র আট বছর বয়সে তিনি মহারাজের কৃপা পেয়েছিলেন। তাঁর পিতা ডাঃ অঘোরনাথ ঘোষ ও মাতা সুখবালা ঘোষ শ্রীশ্রীমা সারদাদেবীর মন্ত্রশিষ্য ছিলেন। তিনি বেলুড় মঠের বহু প্রাচীন সন্ন্যাসীর স্নেহধন্যা ছিলেন। রামকৃষ্ণ মঠের বহু সন্ন্যাসী তাঁদের দিনাজপুরস্থ (অধুনা বাংলাদেশে) পৈত্রিক বাড়িতে গিয়েছেন। উল্লেখ্য, বর্তমান বাংলাদেশের দিনাজপুর রামকৃষ্ণ মিশন তাঁর পৈত্রিক বাড়িতেই প্রথম স্থাপিত হয়েছিল।

শ্রীমৎ স্বামী মাধবানন্দজী মহারাজের মন্ত্রশিষ্য বদরপুরের **মৃত্যুঞ্জয় দে** শিলচরে তাঁর আত্মীয়ের বাড়িতে গত ২৩ জুন ('৯২) ৭২ বছর বয়সে করজপরত অবস্থায় শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। তাঁর জন্ম ঢাকা জেলার বিক্রমপুরে। কাছাড় জেলার বদরপুরে তিনি চাকরি করতেন। বদরপুরের সারদা রামকৃষ্ণ আশ্রমের প্রতিষ্ঠাকাল থেকেই তিনি তাঁর সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। তাঁর অমায়িক স্বভাবের জন্য সকলের প্রিয় ছিলেন। করিমগঞ্জ রামকৃষ্ণ সেবা সমিতির সঙ্গে তিনি ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিলেন।

শ্রীমৎ স্বামী ভূতেশানন্দজী মহারাজের মন্ত্রশিষ্য **সুখেন্দুকুমার মুখোপাধ্যায়** গত ১৭ জুলাই (১৯৯২) রামকৃষ্ণ মিশন সেবাপ্রতিষ্ঠানে মাত্র ৩৩ বছর বয়সে পরলোক গমন করেন। জন্ডিস ও অন্যান্য জটিল উপসর্গে তিনি দীর্ঘদিন ভুগছিলেন। সুখেন্দুবাবু বেলুড় মঠে এস্টেট অফিসের কর্মী ছিলেন।

শ্রীমৎ স্বামী ভূতেশানন্দজী মহারাজের মন্ত্রশিষ্যা মেদিনীপুর জেলার এগরা থানার অন্তর্গত পুরুন্দা গ্রাম-নিবাসিনী **প্রমীলাবালা মাইতি** গত ১৯ জুলাই '৯২ পরলোক গমন করেন। তাঁর বয়স হয়েছিল ৬৮ বছর। কাঁথি রামকৃষ্ণ মিশনের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ ছিল। ☐

হিন্দুগণ ধর্মের ভাবে পানাহার করে, ধর্মের ভাবে নিদ্রা যায়, ধর্মের ভাবে বিচরণ করে, ধর্মের ভাবে বিবাহাদি করে।... প্রত্যেক জাতিরই এ পৃথিবীতে একটি উদ্দেশ্য ও আদর্শ থাকে। কিন্তু যে-মুহূর্তে সেই আদর্শ ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়, সঙ্গে সঙ্গে সেই জাতির মৃত্যুও ঘটে।... যতদিন ভারতবর্ষ মৃত্যুপণ করিয়াও ভগবানকে ধরিয়া থাকিবে, ততদিন তাহার আশা আছে।

স্বামী বিবেকানন্দ

**উদ্বোধনের মাধ্যমে প্রচার হোক এই বাণী।**

শ্রীসুশোভন চট্টোপাধ্যায়

কার্বাঙ্কল, ফোড়া, দুর্গন্ধযুক্ত ঘা, পোড়া
বা পোড়ার ঘা, প্রভৃতি কঠিন পীড়া
কেবল লাগাইলেই সারিয়া যায়।

উদ্বোধন

স্বামী বিবেকানন্দ প্রবর্তিত, রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের একমাত্র
বাঙলা মুখপত্র, চুরানব্বই বছর ধরে নিরবচ্ছিন্নভাবে প্রকাশিত
দেশীয় ভাষায় ভারতের প্রাচীনতম সাময়িকপত্র

# সূচিপত্র ৯৫তম বর্ষ ফাল্গুন ১৩৯৯ (ফেব্রুয়ারি ১৯৯৩) সংখ্যা





সম্পাদক
স্বামী সত্যব্রতানন্দ

যুগ্ম সম্পাদক
স্বামী পূর্ণাত্মানন্দ

৮০/৬, গ্রে স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০ ০০৬-স্থিত বসুশ্রী প্রেস থেকে বেলুড় শ্রীরামকৃষ্ণ মঠের ট্রাস্টীগণের পক্ষে স্বামী সত্যব্রতানন্দ কর্তৃক মুদ্রিত ও ১ উদ্বোধন লেন, কলকাতা-৭০০ ০০৩ থেকে প্রকাশিত।
প্রচ্ছদ মুদ্রণ : স্বপ্না প্রিণ্টিং ওয়ার্কস (প্রাঃ) লিমিটেড, কলকাতা-৭০০ ০০৯
আজীবন গ্রাহকমূল্য (৩০ বছর পর নবীকরণ-সাপেক্ষ) ☐ এক হাজার টাকা (কিস্তিতেও প্রদেয়—প্রথম কিস্তি একশো টাকা) ☐ সাধারণ গ্রাহকমূল্য ☐ মাঘ থেকে পৌষ সংখ্যা ☐ ব্যক্তিগতভাবে সংগ্রহ ☐ ছেচল্লিশ টাকা ☐ সডাক ☐ চুয়ান্ন টাকা ☐ বর্তমান সংখ্যার মূল্য ☐ ছয় টাকা

# কার্যালয় ভিন্ন 'উদ্বোধন'-এর গ্রাহকভুক্তি-কেন্দ্র

**আসাম** ☐ রামকৃষ্ণ মিশন সেবাশ্রম, শিলচর ;
রামকৃষ্ণ সেবাশ্রম, বঙ্গাই গাঁও

**বিহার** ☐ শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ সংঘ,
সেক্টর-১/বি, বোকারো স্টীল সিটি
রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ সোসাইটি, ব্যাংক রোড, ধানবাদ

**উড়িষ্যা** ☐ রামকৃষ্ণ মঠ, চক্রতীর্থ, পুরী

**বাংলাদেশ** ☐ রামকৃষ্ণ মিশন, ঢাকা-৩

**ত্রিপুরা** ☐ রামকৃষ্ণ মিশন, আগরতলা

**মধ্যপ্রদেশ** ☐ রামকৃষ্ণ সেবাসংঘ, কোয়ার্টার নং-৫০৭
(এস. এস.)/২, বাচেলি, জেলা : বস্তার

**মহারাষ্ট্র** ☐ রামকৃষ্ণ মঠ, রামকৃষ্ণ মিশন মার্গ,
খার, বোম্বাই-৫২

## পশ্চিমবঙ্গ

### কলকাতা

রামকৃষ্ণ যোগোদ্যান মঠ, কাঁকুড়গাছি
রামকৃষ্ণ মিশন পল্লীমঙ্গল, ২৮বি, গড়িয়াহাট রোড
সলিলা সরকার, এ-ই ৬৫৫, সল্ট লেক
রামকৃষ্ণ-সারদা সেবাশ্রম, ৫/৩৬, বিজয়গড়
দেবাশিস পেপার সাপ্লায়ার্স, ৩/৫/৩,
রামকান্ত বসু স্ট্রীট, বাগবাজার
গদাধর আশ্রম, হরিশ চ্যাটার্জী স্ট্রীট, ভবানীপুর
রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ ভাবনালোক, সেলিমপুর
বিবেকানন্দ যুব কল্যাণ কেন্দ্র, চেতলা
শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম, টেম্পল লেন, ঢাকুরিয়া
বিবেকানন্দ গ্রন্থালোক, ৯, আর. এন. টেগোর রোড,
নবপল্লী, কলকাতা-৭০০ ০৬৩
রামকৃষ্ণ কুটির, এইচ-২৯এ নবাদর্শ, বিরাটি
উজ্জ্বল বুক স্টোর্স, ১৬/সি নিমতলা লেন, কলি-৬

### উত্তরবঙ্গ

রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম, জলপাইগুড়ি
বিবেকানন্দ যুব মহামণ্ডল, দিনহাটা, কুচবিহার

### মেদিনীপুর

রামকৃষ্ণ মঠ, তমলুক
শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ সেবাশ্রম, পাঁশকুড়া
খড়্গপুর রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ সোসাইটি

### উত্তর ২৪ পরগনা

রামকৃষ্ণ মিশন বালকাশ্রম, রহড়া
বসিরহাট শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ সেবাসংঘ
বিবেকানন্দ সংস্কৃতি পরিষদ, নবব্যারাকপুর
অলক পাল চৌধুরী, সংকটাপল্লী, ঘোলা, সোদপুর
ঘোলা রামকৃষ্ণ সেবাশ্রম, বি৭, বি পার্ক, সোদপুর

### দক্ষিণ ২৪ পরগনা

রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম, নরিন্দা
শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ ভক্তসংঘ, ভাঙ্গড়

### হুগলী

রামকৃষ্ণ মঠ, আঁটপুর
শ্রীরামকৃষ্ণ সারদা আশ্রম, দ্বারিক জঙ্গল রোড, কোন্নগর

### নদীয়া

রামকৃষ্ণ সেবক সংঘ, চাকদহ
রামকৃষ্ণ সেবাসংঘ, কল্যাণী; রামকৃষ্ণ আশ্রম, কৃষ্ণনগর
শ্রীরামকৃষ্ণ সারদা সেবাসংঘ, রাণাঘাট

### বর্ধমান

পুস্তকালয়, ৬২ বি. সি. রোড, বর্ধমান
রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম, আসানসোল
দুর্গাপুর ☐ রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ সেবাশ্রম,
রামমোহন অ্যাভিনিউ; রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ পাঠচক্র,
ডি. পি. এল. কলোনী ; স্বামী বিবেকানন্দ
বাণীপ্রচার সমিতি, বিদ্যাসাগর অ্যাভিনিউ ;
রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ সোসাইটি, এ বি এল টাউনশিপ

### বীরভূম

বোলপুর রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ সাহিত্যকেন্দ্র
পৌর বাণিজ্যিক সদন (বাস স্ট্যান্ড), স্টল নং ৫
আকালীপুর রামকৃষ্ণ সারদা সেবাশ্রম, পোঃ ভদ্রপুর

### সংগ্রহ-কেন্দ্র

এম. কে. বুক সেলার্স, পোঃ বি. চারালী,
জেলা : শোণিতপুর, আসাম
শ্যামবাজার বুক স্টল, ২/২০, এ. পি. সি. রোড
পাতিরাম বুক স্টল, কলেজ স্ট্রীট, কলকাতা
রামকৃষ্ণ মিশন সারদাপীঠ শো-রুম, বেলুড় মঠ
সর্বোদয় বুক স্টল, হাওড়া রেল স্টেশন

সৌজন্যে : আর. এম. ইণ্ডাস্ট্রিজ, কাঁটালিয়া, হাওড়া-৭১১ ৪০৯

# উদ্বোধন

ফাল্গুন, ১৩৯৯ | ফেব্রুয়ারি ১৯৯৩ | ৯৫তম বর্ষ— ২য় সংখ্যা

## দিব্য বাণী

তুমি আমার জন্য দেহধারণ করে এসেছ।...তুই রাত্রে এসে আমায় তুলালি, আর আমায় বলালি—'আমি এসেছি'।

শ্রীরামকৃষ্ণ

## কথাপ্রসঙ্গে

# বিবেকানন্দের ভারত-পরিক্রমা
# পরিব্রাজক শ্রীরামকৃষ্ণ

১৮৯০ খ্রীস্টাব্দের জুলাই মাসের মধ্যভাগে শ্রীশ্রীমা সারদাদেবীর অনুমতি ও আশীর্বাদ লইয়া স্বামী বিবেকানন্দ প্রব্রজ্যায় বাহির হইয়াছিলেন। সেই প্রব্রজ্যাই পরে রূপান্তরিত হইয়াছিল তাঁহার সুবিখ্যাত 'ভারত-পরিক্রমা'য়। প্রব্রজ্যা-গ্রহণের পূর্বে অথবা অব্যবহিত পরে তাঁহার চিন্তা ও চেতনার কোথাও ভারত-পরিক্রমার স্থান ছিল না। তাঁহার সেই যাত্রা ছিল একান্তভাবেই এক আধ্যাত্মিক তীর্থযাত্রা। ঈশ্বরদর্শন, আত্মসাক্ষাৎকার এবং ব্রহ্মানন্দ-প্রাপ্তিই ছিল উহার লক্ষ্য। সেই যাত্রা যথাকালে রূপলাভ করিল ভিন্ন এক যাত্রায় এবং সেই যাত্রা ছিল একরকম তাঁহার ইচ্ছার বিরুদ্ধেই। কিন্তু তাঁহার কোন উপায় ছিল না, কেহ যেন বলপূর্বক উহাতে সামিল হইতে তাঁহাকে বাধ্য করিয়াছিলেন। একটু ভাবিয়া দেখিলেই বোঝা যায় যে, উহাতে আকস্মিকতা কিছু ছিল না। দক্ষিণেশ্বর এবং কাশীপুরে উহার বীজ উপ্ত হইয়াছিল। বীজ হইতে মহীরুহে পরিণতি যেমন স্বাভাবিক, তেমনই অনিবার্য।

কাশীপুরে শেষ অসুখের সময় শ্রীরামকৃষ্ণ নরেন্দ্রনাথকে বলিয়াছিলেন: "আমার পিছনে তোকে ফিরতেই হবে, তুই যাবি কোথায়?" শুধুই মুখেই নয়, লেখনীমুখেও 'নিরক্ষর' ভগবান তাহা ঘোষণা করিয়াছিলেন। বস্তুতঃ, শুধু ভারত-পরিক্রমা নয়, নরেন্দ্রনাথ তথা বিবেকানন্দের জীবন-পরিক্রমার প্রত্যেক বর্ত্মে শ্রীরামকৃষ্ণই অগ্রপথিক, নরেন্দ্রনাথ তথা বিবেকানন্দ শুধু তাঁহাকে অনুসরণ করিয়াছেন, অনুবর্তন করিয়াছেন। এই প্রসঙ্গে স্মরণে আসে শ্রীরামকৃষ্ণের স্বহস্তে অঙ্কিত সেই অনবদ্য রেখাচিত্রটি: এক পুরুষের আবক্ষ-মূর্তি। মূর্তির কণ্ঠে ক্ষতচিহ্ন। মূর্তির পিছনে ধাবমান দীর্ঘপুচ্ছ একটি ময়ূর। দুরারোগ্য গল-রোগে আক্রান্ত শ্রীরামকৃষ্ণ অন্তিম প্রয়াণের কিছু কাল পূর্বে নিজের বুকের রক্ত দিয়াই যেন আঁকিয়া দিয়া গেলেন তাঁহার নরেন্দ্রের ভাবী পরিক্রমার পথরেখাটি। কেহ কেহ অবশ্য মনে করেন যে, আবক্ষমূর্তিটি নরেন্দ্রনাথের, ময়ূরের চিত্রটি শ্রীরামকৃষ্ণের। তাহা হইলেও মূল সত্য কিন্তু একই থাকিয়া যায়। নরেন্দ্রনাথের পরিক্রমা-পথে তাঁহাকে বহন করিয়া চলিবেন শ্রীরামকৃষ্ণ—সে-পথ স্বদেশেই হউক অথবা বহির্দেশেই হউক, অন্তর্জীবনেই হউক অথবা বহির্জীবনেই হউক। পথে অথবা পথের প্রান্তে যেখানেই নরেন্দ্রনাথ, সেখানেই শ্রীরামকৃষ্ণ। তপস্যার তাড়নায় অথবা প্রেমের প্রেরণায় যেখানেই যখন নরেন্দ্রনাথ ফিরিয়াছেন সঙ্গে থাকিয়াছেন অদৃশ্যভাবে এবং অনিবার্যভাবে শ্রীরামকৃষ্ণ।

উল্লিখিত ঘটনাটি ১৮৮৬ খ্রীস্টাব্দের ১১ ফেব্রুয়ারির। সেদিন শ্রীরামকৃষ্ণের গলকণ্ঠ পূর্বাপেক্ষা বাড়িয়াছে। গলস্ফোটক বাহিরে আসিয়া গিয়াছে। রোগযন্ত্রণার সেই দুঃসহ মুহূর্তে শ্রীরামকৃষ্ণ চাহিয়া লইলেন একখণ্ড কাগজ। তাহাতে পেন্সিল দিয়া লিখিলেন: "...নরেন শিক্ষে দিবে। যখন ঘুরে [ ঘরে ? ] বাহিরে হাঁক দিবে।..."

—জগতের আচার্য হইবেন নরেন্দ্রনাথ। ভারত পরিভ্রমণ করিয়া বহির্ভারতে গিয়া তিনি নিখিল মানবের কাছে অমোঘ আহ্বান রাখিবেন। সে-আহ্বানে ঘোষিত হইবে মানবতার জয়গান, জীবের শিবত্বে উত্তরণের সুসমাচার, মানবের অমরতার অঙ্গীকার।

অতঃপর ঐ কাগজেই শ্রীরামকৃষ্ণ আঁকিলেন পূর্বে-উল্লিখিত রেখাচিত্রটি। অঙ্কন সম্পূর্ণ হইলে ডাকিয়া পাঠাইলেন নরেন্দ্রনাথকে। নরেন্দ্রনাথ আসিলে তাঁহার হস্তে তিনি অর্পণ করিলেন ঐ কাগজ-খণ্ডটি। নরেন্দ্রনাথ দেখিলেন। তাঁহার অন্তরে তখন বৈরাগ্য ও তপস্যার অগ্নিস্রোত নিরন্তর প্রবাহিত। উহার প্রেরণায় তাঁহার মন তখন গভীরভাবে অন্তর্মুখ। মাত্রই কয়েকদিন পূর্বে নির্বিকল্প সমাধির আনন্দের তিনি আস্বাদ পাইয়াছেন, লাভ করিয়াছেন জগতের সীমার বাহিরে ইন্দ্রিয়াতীত রাজ্যের সন্ধান—যেখানে অনাবিল অপারিসীম অতুলনীয় আনন্দ নিত্য বর্তমান। সুতরাং সঙ্গে সঙ্গে তিনি বিদ্রোহীর কণ্ঠে বলিলেন : "আমি ওসব পারব না।" সুদৃঢ় প্রত্যয়ের সহিত শ্রীরামকৃষ্ণ বলিলেন : "তোর হাড় [ ঘাড় ? ] করবে।"

'কথামৃতে' আমরা দেখি, কাশীপুর উদ্যান-বাটিতে শ্রীম'র সঙ্গে নরেন্দ্রের কথা হইতেছে। ৪ জানুয়ারি ১৮৮৬, সোমবার। নরেন্দ্র বলিতেছেন, তাঁহার প্রাণ সমাধির শান্তির জন্য ব্যাকুল, অস্থির।

"নরেন্দ্র—কাল রবিবার, উপরে গিয়ে এঁর [ শ্রীরামকৃষ্ণের ] সঙ্গে দেখা করলাম। ওঁকে সব বললাম। আমি বললাম, 'সব্বাইয়ের হলো, আমায় কিছু দিন। সব্বাইয়ের হলো, আমার হবে না ?'

মণি [ শ্রীম ]—তিনি তোমায় কি বললেন ?

নরেন্দ্র—তিনি বললেন···'তুই কি চাস ?' আমি বললাম—আমার ইচ্ছা অমনি তিন-চার দিন সমাধিস্থ হয়ে থাকব। কখনো কখনো এক-একবার খেতে উঠব। তিনি বললেন, 'তুই তো বড় হীন-বুদ্ধি। ও অবস্থার উঁচু অবস্থা আছে। তুই তো গান গাস—যো কুছ হ্যায় সো তুঁহি হ্যায়।'

মণি—হ্যাঁ, উনি সর্বদাই বলেন যে, সমাধি থেকে নেমে এসে দেখে—তিনিই জীব-জগৎ, এই সমস্ত হয়েছেন।···"

শ্রীরামকৃষ্ণের দেহান্তের কয়েকমাস পর বরানগর মঠে আবার শ্রীম' ও নরেন্দ্রনাথ কথা বলিতেছেন। পুরাতন কথার রোমন্থন চলিতেছে :

"নরেন্দ্র—পাগলের মতো বাড়ি থেকে বেরিয়ে এলাম। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, 'তুই কি চাস ?' আমি বললাম, 'আমি সমাধিস্থ হয়ে থাকব।' তিনি বললেন, 'তুই তো বড় হীনবুদ্ধি। সমাধির পারে যা। সমাধি তো তুচ্ছ কথা।'

মাস্টার—হ্যাঁ তিনি বলতেন, 'জ্ঞানের পর বিজ্ঞান। ছাদে উঠে আবার সিঁড়িতে আনাগোনা করা'।"

অনুরূপ একটি ঘটনার উল্লেখ স্বামীজীর প্রাচীন বাঙলা জীবনীতে রহিয়াছে :

"কাশীপুরের বাগানে থাকিতে নরেন্দ্র পরমহংস-দেবের নিকট পুনঃপুনঃ নির্বিকল্প-সমাধি-অবস্থা-প্রাপ্তির ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিলেন। পরমহংসদেব··· ধীরভাবে জিজ্ঞাসা করেন, 'আচ্ছা, তুই কি চাস বল।' নরেন্দ্র বলিলেন, 'আমার ইচ্ছা হয় শুকদেবের মতো একেবারে পাঁচ-ছয় দিন ক্রমাগত সমাধিতে ডুবে থাকি, তারপর শুধু শরীর-রক্ষার জন্য খানিকটা নিচে নেমে এসে আবার সমাধিতে চলে যাই। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব ঈষৎ উত্তেজিত কণ্ঠে বলিলেন, 'ছি ছি। তুই এতবড় আধার, তোর মুখে এই কথা। আমি ভেবেছিলুম, কোথায় তুই একটা বিশাল বটগাছের মতো হবি, তোর ছায়ায় হাজার হাজার লোক আশ্রয় পাবে, তা না হয়ে কিনা তুই শুধু নিজের মুক্তি চাস ? এতো তুচ্ছ, অতি হীন কথা। নারে, অত ছোট নজর করিসনি।···"

স্বামী গম্ভীরানন্দ 'যুগনায়ক বিবেকানন্দ' গ্রন্থে ঘটনাটি উল্লেখ করিয়া মন্তব্য করিয়াছেন, 'কথামৃতে' উল্লেখিত ঘটনা ও এই ঘটনা সম্ভবতঃ দুটি পৃথক ঘটনা এবং হয়তো 'কথামৃতের' ঘটনা পূর্ববর্তী এবং ইহা পরবর্তী। সে যাহাই হউক, শ্রীরামকৃষ্ণের এইরূপ প্রতিক্রিয়ায় নরেন্দ্রনাথ অবাকই হইয়াছিলেন বলিয়া মনে হয়। অবাক হইবারই কথা। কারণ, ভারতবর্ষের অধ্যাত্ম-সাধনার এতাবৎ-কালের যে ঐতিহ্য ও চিন্তাধারার সঙ্গে তাঁহার পরিচয় ছিল তাহাতে তিনি বুঝিয়াছিলেন যে, ঈশ্বরদর্শন, আত্মসাক্ষাৎকার বা সমাধিলাভের সাধনাই সাধকের পরম আকাঙ্ক্ষিত এবং ঈশ্বরদর্শন, আত্মসাক্ষাৎকার বা সমাধিতে আরোহণ সাধকের জীবনের পরম প্রাপ্তি। কিন্তু এখন শ্রীরামকৃষ্ণের নিকট দ্ব্যর্থহীন ভাষায় তিনি শুনিলেন যে, শুধু ঈশ্বরদর্শন, আত্মমুক্তি এবং সমাধি লাভ অথবা শুধুমাত্র নিজমুক্তির জন্য লালায়িত হওয়াও এক-প্রকার স্বার্থপরতা, হীনবুদ্ধির পরিচায়ক।

নরেন্দ্রনাথ ইহার আগেও শ্রীরামকৃষ্ণের মুখে শুনিয়াছেন, "জীবে দয়া নয়, শিবজ্ঞানে জীব সেবা", "চোখ বুজলে ভগবান আছেন, আর চোখ খুললে কি তিনি নেই ?", "প্রতিমায় ঈশ্বরের পূজা হয়, আর জীয়ন্ত মানুষে কি হয় না ?", "যত্র জীব তত্র শিব" ইত্যাদি। শুনিয়াছেন দেওঘর ও কলাইঘাটায় শ্রীরামকৃষ্ণের দরিদ্রনারায়ণ সেবার কাহিনী। শুনিয়াছেন শ্রীরামকৃষ্ণের মুখে সেই

বৈপ্লবিক ঘোষণা ঃ "এখন দেখছি, তিনিই এক-একরূপে বেড়াচ্ছেন। কখনও সাধুরূপে, কখনও ছলরূপে—কোথাও বা খলরূপে। তাই বলি সাধুরূপে নারায়ণ, ছলরূপে নারায়ণ, খলরূপে নারায়ণ, লুচ্চেরূপে নারায়ণ।"

নরেন্দ্রনাথ স্বচক্ষে দেখিতেছিলেন, শ্রীরামকৃষ্ণ যতই অন্তিমলগ্নের নিকটবর্তী হইতেছিলেন ততই আর্ত মানুষের নিকট "অবিরাম আত্মদান" করিতে করিতে তাহার দেহ ক্ষয়প্রাপ্ত হইতেছিল। শ্রীরামকৃষ্ণ তখন বলিতেন ঃ

"একটি আত্মাকেও সাহায্য করার জন্য যদি আমাকে জন্ম জন্ম আসতে হয়, হোক না তা কুকুর জন্ম, তবু তাতে আমার কষ্ট নাই।"

"আমি একটি মানুষকেও সাহায্য করার জন্য এমন বিশ হাজার [ বার ] দেহত্যাগ করতে পারি। একটা মানুষকে সাহায্য করতে পারাও কি কম গৌরবের কথা ?"

ঐকালেও সামান্য ঈশ্বরীয় কথাতেই পূর্বের মতো শ্রীরামকৃষ্ণ সমাধিস্থ হইয়া পড়িতেন। কিন্তু উহা তাঁহার একান্তই অনভিপ্রেত ছিল। রোমাঁ রোলাঁ লিখিয়াছেন ঃ "এখন তিনি সমাধিস্থ হইবার জন্য নিজেকে তিরস্কার করিতেন। কারণ, তাহাতে অনেকখানি সময় নষ্ট হইত ; ঐ সময়টাতে তিনি অপর কাহাকেও সাহায্য করিতে পারিতেন। রামকৃষ্ণ বলিতেন, 'মাগো। আমাকে ঐ সুখের হাত থেকে রেহাই দে মা। আমাকে স্বাভাবিকভাবে থাকতে দে ; তাতে আমি জগতের আরও উপকার করতে পারব।'…

'তাঁহার জীবনের শেষ দিনগুলিতে… তিনি বলিতেন— 'আমার অর্ধেকটা মরে গেছে।'

"তাঁহার বাকি অর্ধেক অংশ…ছিল দীন-দুঃখী জনসাধারণ।…তিনি এই দীন-দুঃখী জনসাধারণকে তাঁহার প্রিয় শিষ্যদের মতোই অন্তরঙ্গ মনে করিতেন।" শুধু মনে করিতেন না, দুর্বল রুগ্ন শরীরের জন্য তিনি দীন-দুঃখী মানুষের যন্ত্রণায় তাহাদের পাশে দাঁড়াইতে পারিতেছেন না বলিয়া রক্তবমণ করিতে করিতে তিনি ক্রন্দন করিতেন। বলিতেন ঃ "একি কম কষ্ট রে।" উহাদের উত্তোলনকে শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁহার নিজের 'দায়' বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিলেন। রক্তবমন করিতে করিতে তিনি গাহিতেন ঃ

"এসে পড়েছি যে দায়, সে দায় বলব কায়।
যার দায় সে আপনি জানে,
পর কি জানে পরের দায়।"

নরেন্দ্রনাথ এসমস্তও জানিতেন ! তিনি বুঝিয়াও ছিলেন, এসবের প্রেরণা বেদান্ত, 'বনের বেদান্ত'কে জীবনের প্রতি পদক্ষেপে আনয়নের আকুতি। এক-সময়ে তিনি অঙ্গীকারও করিয়াছিলেন এই ভাব ও আদর্শকে তিনি "সংসারে সর্বত্র" প্রচার করিবেন। কিন্তু এখন নির্বিকল্প-সমাধিলাভের ব্যাকুলতায় জগতের সকল বন্ধন ও কর্মকে তিনি অস্বীকার করিতে চাহিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণের তিরস্কারের মর্ম অনুধাবন করিলেও তাঁহার অন্তর ঐ আদর্শকে স্বীকার করিতে তখন প্রস্তুত ছিল না। স্বামী গম্ভীরানন্দ লিখিতেছেন ঃ 'বুদ্ধিতে নবালোক প্রতিফলিত হইলেও, হৃদয় দিয়া উহা গ্রহণ করিতে [ নরেন্দ্রনাথের ] বেশ কিছু সময় লাগিয়াছিল ; এই নবতত্ত্ব লাভের পরেও হৃদয়ের আকাঙ্ক্ষা অতৃপ্ত রহিয়া গেল ; তাই ঠাকুরের ধিক্কারবচনে নরেন্দ্র-নাথের চক্ষে অজস্র অশ্রু বিগলিত হইলেও তাঁহার প্রাণ তখনও নির্বিকল্প-সমাধির জন্য পূর্বেরই ন্যায় লালায়িত রহিল।"

অবশেষে এই ঘটনার কয়েকদিন পরেই শ্রীরাম-কৃষ্ণের ইচ্ছায় এবং নিজের সাধনায় নরেন্দ্রনাথ তাঁহার বহুবাঞ্ছিত নির্বিকল্প-সমাধি লাভ করিলেন। সমাধি হইতে বুত্থিত হইলে শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁহাকে বলিলেন ঃ "কেমন, মা তো আজ তোকে সব দেখিয়ে দিলেন। চাবি কিন্তু আমার হাতে রইল। এখন তোকে কাজ করতে হবে। যখন আমার কাজ শেষ হবে তখন আবার চাবি খুলব।"

কিন্তু সমাধির নবলব্ধ আস্বাদ নরেন্দ্রনাথকে অস্থির করিয়া তুলিল। ফলে শ্রীরামকৃষ্ণের ঐ কথায় নরেন্দ্রনাথের মন বিশেষ প্রভাবিত হইল না। অল্প-দিন পরেই ( এপ্রিলের প্রারম্ভ. ১৮৮৬ ) নরেন্দ্রনাথ দুইজন গুরুভাইকে সঙ্গে লইয়া শ্রীরামকৃষ্ণ বা অপর কাহাকেও না জানাইয়া বুদ্ধগয়া গেলেন এবং বোধিদ্রুমতলে যে-আসনে সিদ্ধার্থ বুদ্ধত্ব লাভ করিয়াছিলেন সেই আসনে ধ্যানে নিরত হইলেন। তাঁহার ভারত-পরিক্রমার সূচনা তখনই—শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনকালেই এবং শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁহার কাছে যে-প্রত্যাশা রাখিয়াছিলেন যেন তাহার বিরুদ্ধাচারণ করিয়াই। শ্রীরামকৃষ্ণও তাঁহার শক্তি দেখাইলেন। তিন-চার দিন পরেই নরেন্দ্রনাথেরা কাশীপুরে ফিরিয়া আসিলেন। নরেন্দ্রনাথের অন্তর্ধানের সংবাদ শুনিয়া ইতঃপূর্বে শ্রীরামকৃষ্ণ মৃদু হাস্য করিয়া বলিয়াছিলেন ঃ "সে কোথাও যাবে না,

তাকে এখানে আসতেই হবে।"

মহাসমাধির আর মাত্র তিন-চারদিন বাকি। শ্রীরামকৃষ্ণ নরেন্দ্রনাথকে তাঁহার ঘরে একাকী আহ্বান করিলেন। নরেন্দ্র সম্মুখে বসিলে শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁহার দিকে একদৃষ্টে তাকাইয়া সমাধিস্থ হইলেন। বেশ কিছুক্ষণ অতিবাহিত হইল। শ্রীরামকৃষ্ণের দেহ হইতে তড়িৎকম্পনের মতো একটা সূক্ষ্ম তেজোরশ্মি নরেন্দ্রনাথের দেহমধ্যে প্রবেশ করিল। নরেন্দ্রনাথ বাহ্যজ্ঞান হারাইয়া ফেলিলেন। যখন তাঁহার চেতনা হইল তখন দেখিলেন শ্রীরামকৃষ্ণের গণ্ড বাহিয়া অশ্রুপাত হইতেছে। বিস্মিত নরেন্দ্রনাথ ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে শ্রীরামকৃষ্ণ সস্নেহে বলিলেন: "আজ যথাসর্বস্ব তোকে দিয়ে ফকির হলুম। তুই এই শক্তিতে জগতের অনেক কাজ করবি। কাজ শেষ হলে পরে ফিরে যাবি।"

সেই মুহূর্ত হইতে শ্রীরামকৃষ্ণের নিজের বলিয়া আর কিছু রহিল না। তাঁহার সকল শক্তি, সকল দায়, সকল ব্রত স্থানান্তরিত হইল নরেন্দ্রনাথের মধ্যে। রোমাঁ রোলাঁ লিখিয়াছেন: "The Master and the disciple were one" (গুরু এবং শিষ্য এক হইয়া গেলেন)। নরেন্দ্রনাথের নূতন জন্ম হইল। নরেন্দ্রনাথের মধ্যে জন্মলাভ করিলেন 'বিবেকানন্দ'। অবশ্য আনুষ্ঠানিক অর্থে নরেন্দ্রনাথের 'বিবেকানন্দ' হওয়া আরও কিছুকাল পরের ঘটনা হইলেও প্রকৃতপক্ষে বিবেকানন্দের জন্ম হইয়াছিল ঐ মুহূর্তেই, আবার বিবেকানন্দের সহিত রামকৃষ্ণও একীভূত হইয়া গিয়াছিলেন তখনই।

গুরুর মহাপ্রয়াণের পর বরানগর মঠে ১৮৮৭ খ্রীস্টাব্দের জানুয়ারি মাসে আনুষ্ঠানিকভাবে সন্ন্যাস গ্রহণের পর হইতে তপস্যা ও বৈরাগ্যের প্রেরণায় মাঝে মাঝেই নরেন্দ্রনাথ মঠ হইতে প্রব্রজ্যায় বাহির হইয়াছেন। শ্রীরামকৃষ্ণের তিরস্কার সত্ত্বেও অন্তরের সেই সুতীব্র ব্যাকুলতা তাঁহাকে কখনই ত্যাগ করে নাই। নির্বিকল্প সমাধির আনন্দের সেই আস্বাদ পুনরায় লাভ করিতে হইবে—ইহাই ছিল তাঁহার মনোগত বাসনা। প্রতিবারেই যাইবার সময় তিনি বলিতেন: "এই শেষ, আর ফিরছি না।" কিন্তু বার বার তাঁহাকে যেকোন কারণেই হউক মঠেই ফিরিয়া আসিতে হইয়াছে। এইভাবে কয়েকবার ব্যর্থ প্রয়াসের পর ১৮৮৯-এর ডিসেম্বরের শেষে তিনি পুনরায় প্রব্রজ্যায় বাহির হইলেন। শরীরপাত যদি হয় হউক, কিন্তু সাধন-সিদ্ধি চাই-ই—এই সংকল্প করিয়া তিনি এবার বাহির হইয়াছিলেন। ১৮৯০ খ্রীস্টাব্দের জানুয়ারির শেষভাগ হইতে এপ্রিলের প্রথম সপ্তাহ পর্যন্ত তিনি গাজীপুরে অবস্থান করেন। স্থির করিয়াছিলেন, সিদ্ধ যোগী পওহারী বাবার নিকট দীক্ষাগ্রহণ করিয়া যোগসাধনার পথে তিনি আত্মানুসন্ধানে নিমগ্ন হইবেন। শ্রীরামকৃষ্ণের সতর্ক-বাণী ও তিরস্কার আবার তিনি অগ্রাহ্য করিবার চেষ্টা করিলেন। কিন্তু না, বারবার চেষ্টা করিয়াও পওহারী বাবার কাছে দীক্ষালাভ তাঁহার হইল না। তিনি দেখিয়াছিলেন, শ্রীরামকৃষ্ণ বারবার দিব্যদেহে সস্নেহে এবং বেদনাভরা ছলছল আঁখি হইয়া তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইয়াছেন। মুখে কোন বাক্য-স্ফূর্তি করেন নাই তিনি, কিন্তু তাঁহার দৃষ্টিতে ছিল এক মর্মস্পর্শী আকূতি। মৌন ভাষায় তিনি যেন নরেন্দ্রনাথকে বলিতে চাহিতেছিলেন: মানুষের সঙ্গে সকল সম্পর্কশূন্য পওহারী বাবার এই ক্ষুদ্র গুহায় তুই কি আবদ্ধ হইয়া রহিবি? আমার কাজের জন্য, শাস্ত্রের মর্ম-উদ্ঘাটনের জন্য, স্বদেশের কল্যাণের জন্য, আর্ত মানুষের মুক্তির জন্য নিজেকে উৎসর্গ করিবি না?

নরেন্দ্রনাথ আবার ফিরিলেন। দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বলিলেন: "আর কোন মিঞার কাছে যাইব না। ...এখন সিদ্ধান্ত এই যে—রামকৃষ্ণের জুড়ি নাই।"

ফিরিলেন, কিন্তু আবার কিছুদিনের মধ্যেই পুরাতন প্রেম জাগিয়া উঠিল। ১৮৯০-এর জুলাই মাসে আবার তিনি প্রব্রজ্যায় বাহির হইলেন। এবার লক্ষ্য সোজা হিমালয়। হৃষীকেশের পর্ণকুটিরে নির্বিকল্প-সমাধিভূমিতে আরোহণও করিলেন তিনি, কিন্তু সেই ভূমি হইতে নামিবার সময় শুনিলেন তাঁহার জীবনদেবতার সুস্পষ্ট নির্দেশ: না, আর ধ্যানের গুহা নয়, আর ঈশ্বরের সন্ধান নয়—এবার সমাজ-সংসার, এবার লোকালয়, এবার মানুষ—এবার মানুষের সন্ধান। এবার মাতৃভূমির পুনর্জাগরণে আত্মদান, এবার দেশে দেশান্তরে অমর ভারতের শাশ্বত সনাতন বাণী প্রচার, এবার মানব-মুক্তির পথসন্ধান।

হিমালয় হইতে তিনি নামিলেন সমতলে। না, স্বেচ্ছায় নয়—রামকৃষ্ণ কর্তৃক তিনি নিক্ষিপ্ত হইলেন গুহা হইতে পথে। যাত্রা শুরু হইল বিবেকানন্দের। এক নতুন যাত্রা। প্রথম পর্বে সেই যাত্রার শেষ কন্যাকুমারীতে। এই পরিক্রমা প্রত্যক্ষতঃ বিবেকানন্দের, কিন্তু সর্ব অর্থেই উহা ছিল শ্রীরামকৃষ্ণেরই ভারত-পরিক্রমা। □

# অতীতের পৃষ্ঠা থেকে

## স্বামী শিবানন্দ

ফরাসীদেশের বিখ্যাত মনীষী রোমাঁ রোলাঁ শ্রীরামকৃষ্ণ সম্বন্ধে কয়েকটি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়া শ্রীরামকৃষ্ণের অন্যতম অন্তরঙ্গ শিষ্য ও পার্ষদ, রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের ভূতপূর্ব অধ্যক্ষ মহাপুরুষ স্বামী শিবানন্দের নিকট একখানা পত্র লিখিয়াছিলেন। তদুত্তরে পূজনীয় স্বামী শিবানন্দ ইংরেজীতে একখানা পত্র লিখিয়াছিলেন। এই প্রবন্ধটি সেই পত্রখানির বঙ্গানুবাদ। অনুবাদক—রমণীকুমার দত্তগুপ্ত

বাল্যকাল হইতেই ধর্মজীবন যাপনের দিকে আমার একটা স্বাভাবিক মনের গতি ছিল এবং ভোগ যে জীবনের উদ্দেশ্য নয় এই জ্ঞানটি আমার মজ্জাগত ছিল। জ্ঞান ও বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে এই দুইটি ভাব আমার মনকে দৃঢ়রূপে অধিকার করিয়া বসিল। আমি কলিকাতা নগরীর বিভিন্ন ধর্মসম্প্রদায় ও মন্দিরে ঈশ্বর সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ করিবার নিমিত্ত ব্যাকুল হইয়া ছুটাছুটি করিয়াছি। কিন্তু কোথাও প্রকৃত শান্তি লাভ করিতে পারিলাম না—কোন সম্প্রদায়ই ত্যাগের মহিমার উপর জোর দিত না এবং এই সকল স্থানে আমি একজন লোককেও প্রকৃত জ্ঞানের অধিকারী বলিয়া গ্রহণ করিতে পারি নাই। অবশেষে ১৮৮০ বা ১৮৮১ খ্রীস্টাব্দে আমি শ্রীরামকৃষ্ণের নাম শুনিতে পাইয়া কলিকাতার জনৈক ভক্তের বাড়িতে তাঁহাকে দর্শন করিতে যাই। এই সময়েই স্বামী বিবেকানন্দ ও শ্রীরামকৃষ্ণের অন্যান্য ত্যাগী শিষ্যগণ শ্রীরামকৃষ্ণদেবের পাদপদ্মে আশ্রয় গ্রহণ করিতে আরম্ভ করেন। প্রথম দর্শনের দিন শ্রীরামকৃষ্ণকে সমাধিমগ্ন দেখিতে পাই এবং যখন তিনি সমাধি হইতে ব্যুত্থিত হইয়া নিম্নভূমিতে অবরোহণ করিলেন তখন তিনি সমাধি এবং উহার স্বরূপ সম্বন্ধে বিস্তৃতরূপে বলিতে লাগিলেন। আমি তখন আমার হৃদয়ের অন্তরতম প্রদেশে অনুভব করিলাম যে, এই ব্যক্তিই বাস্তবিক ভগবানকে উপলব্ধি করিয়াছেন এবং আমিও তাঁহার শ্রীপাদপদ্মে চিরদিনের নিমিত্ত আত্মসমর্পণ করিলাম। শ্রীরামকৃষ্ণ একজন মানব কি অতিমানব, দেবতা কি স্বয়ং ভগবান ছিলেন—এই সম্বন্ধে আমি এখনও কোন চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারি নাই। কিন্তু আমি তাঁহাকে একজন সম্পূর্ণ নিঃস্বার্থ, মহান ত্যাগী, পরম জ্ঞানী এবং প্রেমের মূর্তবিগ্রহ বলিয়া গ্রহণ করিয়াছি। দিন যতই যাইতেছে, যতই আমি আধ্যাত্মিক রাজ্যের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত হইতেছি এবং যতই শ্রীরামকৃষ্ণের আধ্যাত্মিক ভাবের গভীরতা ও সম্প্রসারণ হৃদয়ঙ্গম করিতেছি, ততই আমার দৃঢ় বিশ্বাস হইতেছে যে, ভগবান বলিতে আমরা সাধারণতঃ যাহা বুঝি সেই অর্থে ভগবানের সহিত শ্রীরামকৃষ্ণকে তুলনা করিলে তাঁহার বিরাট মহত্ত্বকে ছোট করা হয়। শ্রীরামকৃষ্ণকে স্ত্রী-পুরুষ, জ্ঞানী-মূর্খ, পুণ্যাত্মা-পাপী—সকলের উপরই অকাতরে অহৈতুক প্রেম বর্ষণ করিতে, তাহাদিগের দুঃখ দূরীকরণার্থ ঐকান্তিক ও অফুরন্ত আগ্রহ এবং তাহারা যাহাতে শ্রীভগবানের সাক্ষাৎকার লাভ করিয়া পরম শান্তি লাভ করিতে পারে তজ্জন্য পরম প্রীতি ও করুণা প্রদর্শন করিতে দেখিয়াছি। আমি খুব জোরের সহিত বলিতেছি যে, শ্রীরামকৃষ্ণের ন্যায় লোককল্যাণ-সাধনরত দ্বিতীয় ব্যক্তি বর্তমান যুগে পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করেন নাই।

শ্রীরামকৃষ্ণ ১৮৩৬ খ্রীস্টাব্দে হুগলী জেলার কামারপুকুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি নামযশকে অন্তরের সহিত ঘৃণা করিতেন। তাঁহার আদর্শ ও উপদেশামৃত দ্বারা আমাদের মনে এরূপ দৃঢ় প্রতীতি জন্মিয়াছে যে, ব্রহ্মানন্দের নিকট পার্থিব সুখ-সম্ভোগ অতীব অকিঞ্চিৎকর। তিনি অহর্নিশ দিব্যভাবে আরূঢ় থাকিতেন এবং যে-সমাধি এত বিরল ও দুরধিগম্য উহাও তাঁহার নিকট সম্পূর্ণ স্বাভাবিক ছিল। অতএব যাহারা শ্রীরামকৃষ্ণকে দর্শন করে নাই তাহাদের নিকট একজন ঈশ্বর প্রেমোন্মত্ত সাধকের পক্ষে দৈনন্দিন জীবনের খুঁটিনাটির ঘনিষ্ঠ জ্ঞান ও পরিচয় রাখিয়া তৎসম্বন্ধে সমীপাগত লোকসকলকে উপদেশ দান, অসংখ্য সংসার-তাপক্লিষ্ট নরনারীর দুঃখ অপনোদনের পরম আগ্রহ প্রদর্শন প্রভৃতি কার্য বিরুদ্ধ ও

অস্বাভাবিক বলিয়া প্রতীত হইবে, ইহাতে আর আশ্চর্য কি। কিন্তু আমরা তাঁহার জীবনে এরূপ অসংখ্য ঘটনা স্বচক্ষে দর্শন করিয়াছি; যেসকল গৃহিভক্ত শ্রীরামকৃষ্ণের অপরিসীম করুণা এবং লোককল্যাণ-চিকীর্ষার কথা স্মরণ করিয়া নিজদিগকে ধন্য মনে করিতেন, তাঁহাদের মধ্যে কতিপয় ব্যক্তি এখনও জীবিত আছেন। মণি মল্লিক নামে জনৈক ব্যক্তি পুত্রশোকে কাতর ও ভগ্নহৃদয় হইয়া শ্রীরামকৃষ্ণের নিকট আসিয়াছিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণ যে কেবল তাঁহার শোকে মৌখিক সহানুভূতিই প্রকাশ করিয়াছিলেন তাহা নহে, পরন্তু ঐ ব্যক্তির শোক এত গভীরভাবে নিজহৃদয়ে অনুভব করিলেন যে, দেখিয়া মনে হইল, যেন তিনিই স্বয়ং শোকাতুর পিতা এবং তাঁহার শোক মল্লিকের শোককে পরাভূত করিয়াছে। এইভাবে কিছুক্ষণ চলিয়া গেল। সহসা শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁহার মনোভাব পরিবর্তন করিলেন এবং একটি গান গাহিলেন। সঙ্গীত শ্রবণ করিয়া মল্লিক কঠোর জীবনসংগ্রামের জন্য প্রস্তুত হইবার অপূর্ব প্রেরণা পাইলেন এবং মুহূর্তে তাঁহার শোকাগ্নি নির্বাপিত হইল—এই ঘটনা আমার স্মরণ আছে। সঙ্গীত শ্রবণে ভদ্রলোকটি হৃদয়ে বল ও শান্তি পাইলেন এবং তাঁহার শোক প্রশমিত হইল। শ্রীরামকৃষ্ণের নিকট ভাল অথবা মন্দ বলিয়া কিছু ছিল না; তিনি দেখিতেন যে, সর্বভূতে জগদম্বাই রহিয়াছেন, কেবল প্রকাশের তারতম্য। তিনি নারীজাতির মধ্যে জগদম্বাকে প্রত্যক্ষ দর্শন করিতেন এবং নিজ মাতা বলিয়া সকলকে ডাকিতেন ও পূজা করিতেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ হিন্দু, খ্রীস্টান, ইসলাম প্রভৃতি ধর্ম নিজ জীবনে সাধন করিয়া সর্বধর্মের সত্যতা প্রতিপাদন করিয়াছিলেন; উপনিষদ্, বাইবেল, কোরান প্রভৃতি বিভিন্ন ধর্মশাস্ত্রে লিপিবদ্ধ অনুভূতি সকলের সহিত তিনি স্বীয় উপলব্ধিসমূহের ঐক্য দেখিয়াছিলেন; তিনি ঘোষণা করিয়াছেন যে, সত্য এক, এই সত্য পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন ধর্মাবলম্বিগণ কর্তৃক বিভিন্ন নামে অভিহিত এবং পূজিত হইয়া থাকে। প্রকৃত তত্ত্বান্বেষী অন্য ধর্মাবলম্বী অসংখ্য ব্যক্তিকে শ্রীরামকৃষ্ণের নিকট আসিয়া তাঁহাদের আধ্যাত্মিক সমস্যাসমূহের মীমাংসা করিতে দেখিয়াছি। তাঁহাকে দর্শন করিয়াই আমরা বুদ্ধ, যীশু, মহম্মদ প্রভৃতির অবতারত্ব সম্বন্ধে বিশ্বাস করিতে এবং তাঁহাদের অপরিসীম করুণা অনুভব করিতে আরম্ভ করি। তিনি কখনও কাহারও ধর্মভাব ও আদর্শের বিরুদ্ধে কথা বলেন নাই। ধনী-নির্ধন, পণ্ডিত-মূর্খ, উচ্চ-নীচ—যে কেহ তাঁহার নিকট আসিতেন তিনি তাহাদিগকে ব্যক্তিগত ভাব, রুচি ও সংস্কার অনুসারে নিজ নিজ সাধনপথে অগ্রসর হইতে সহায়তা করিতেন।

জগতের অশেষ দুঃখ-কষ্টের প্রতি তিনি গভীরভাবে সজাগ ছিলেন। তিনি সমীপাগত লোকসকলের ব্যক্তিগত দুঃখ অপনোদন করিয়াই ক্ষান্ত থাকিতেন না, পরন্তু অনেকবার সমষ্টিগতভাবে তাহাদের দুঃখ দূর করিয়াছিলেন। তিনি স্বামী বিবেকানন্দ প্রমুখ তাঁহার শিষ্যগণকে জগতের দুঃখমোচন করিবার জন্য উপদেশ দিয়াছিলেন। আমি এখানে বলিব যে, স্বামী বিবেকানন্দ স্বয়ং উচ্চ আধ্যাত্মিক সম্পদের অধিকারী ছিলেন; শ্রীরামকৃষ্ণদেবের শ্রীমুখ হইতে শুনিয়াছি যে, স্বামী বিবেকানন্দের আধ্যাত্মিক শক্তি অতিশয় গভীর ছিল। একসময় শ্রীরামকৃষ্ণ দক্ষিণেশ্বর কালীবাড়ির প্রতিষ্ঠাত্রী রানী রাসমণির জামাতা মথুরানাথ বিশ্বাসের সহিত তাঁহার নদীয়া জেলাস্থিত জমিদারীতে গিয়াছিলেন। সেই সময় প্রজাগণের নিকট হইতে খাজনা আদায় করিবার সময় ছিল। কিন্তু ক্রমাগত দুই বৎসর জমিতে ফসল না হওয়ায় প্রজাগণ দুর্দশার চরম সীমায় উপনীত হইয়াছিল। প্রজাগণের অনাহারক্লিষ্ট জীর্ণশীর্ণ আকৃতি দেখিয়া শ্রীরামকৃষ্ণের হৃদয় গভীর দুঃখে অভিভূত হইল। তিনি মথুরবাবুকে ডাকাইয়া হতভাগ্য প্রজাদের খাজনা মাপ করিয়া তাহাদিগকে পরিতোষ সহকারে খাওয়াইতে ও বস্ত্র দান করিতে অনুরোধ করিলেন। মথুরবাবু বলিলেন: "বাবা, আপনি জানেন না পৃথিবীতে কত অধিক দুঃখ-ক্লেশ আছে। তাই বলিয়া প্রজাদের খাজনা মাপ করা যায় না।" শ্রীরামকৃষ্ণ প্রত্যুত্তরে বলিলেন: "মথুর, তোমার নিকট জগন্মাতার ধন-সম্পদ গচ্ছিত আছে বৈতো নয়। ইহারা জগন্মাতার প্রজা; জগদম্বার অর্থ ইহাদের দুঃখদূরীকরণার্থ ব্যয়িত হউক। ইহারা অশেষ দুঃখভোগ করিতেছে,

ইহাদের সাহায্য করিবে না? তোমাকে নিশ্চিতই ইহাদের সাহায্য করিতে হইবে।" মথুরবাবু শ্রীরামকৃষ্ণকে ঈশ্বরাবতারজ্ঞানে শ্রদ্ধাভক্তি করিতেন; সুতরাং তিনি শ্রীরামকৃষ্ণের অনুরোধ রক্ষা করিলেন। দ্বিতীয় আর একটি ঘটনার কথা উল্লেখ করিতেছি। এই ঘটনা বিহার প্রদেশের দেওঘর অঞ্চলে সংঘটিত হইয়াছিল। শ্রীরামকৃষ্ণ মথুরবাবুর সহিত তীর্থভ্রমণ করিতেছিলেন। সেই সময়ে শ্রীরামকৃষ্ণ স্বভাবতই অর্ধবাহ্যদশায় বিভোর হইয়া থাকিতেন। দেওঘরে পৌঁছিয়া শ্রীরামকৃষ্ণ স্থানীয় অধিবাসী সাঁওতাল-দিগকে অনাহারক্লিষ্ট, শীর্ণকায় ও উলঙ্গপ্রায় দেখিতে পাইলেন। তাহাদিগের এরূপ অস্বাভাবিক আকৃতি দেখিয়া শ্রীরামকৃষ্ণ শিবিকা হইতে অবতরণ করিলেন এবং মথুরবাবুকে ইহাদের পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন। সেই অঞ্চলে দুই বৎসর যাবৎ ভীষণ দুর্ভিক্ষ চলিতেছিল। শ্রীরামকৃষ্ণ পূর্বে আর কখনও এরূপ চরম দুঃখ-ক্লেশ দেখেন নাই। মথুরবাবু হতভাগ্য সাঁওতালদের অবস্থা বুঝাইয়া বলিলে শ্রীরামকৃষ্ণ মথুরকে উহাদের অন্ন, বস্ত্র, তৈল ও স্নানের বন্দোবস্ত করিতে আদেশ করিলেন। মথুর আপত্তি জানাইলে শ্রীরামকৃষ্ণ বলিলেন: "যে-পর্যন্ত ইহাদের দুঃখ দূর না হইবে সে-পর্যন্ত আমি ইহাদের সঙ্গে এখানে বাস করিব, এস্থান ছাড়িয়া যাইব না।" আদেশ পালন ব্যতীত মথুরের গত্যন্তর রহিল না। আমরা শ্রীরামকৃষ্ণকে দর্শন করিবার পূর্বেই এই দুইটি ঘটনা ঘটিয়াছিল কিন্তু আমি তাঁহার শ্রীমুখ হইতে এই দুই ঘটনার কথা শুনিয়াছি।

আমাদের সাক্ষাতে যে-সকল ঘটনা ঘটিয়াছিল তন্মধ্যে দুইটির কথা এখানে উল্লেখ করিব। এই দুইটি ঘটনা হইতে স্পষ্ট বুঝা যাইবে যে, শ্রীরামকৃষ্ণ পরদুঃখে কেবল মৌখিক সহানুভূতি এবং অনুরাগ প্রকাশ করিয়াই সন্তুষ্ট থাকিতেন না, পরন্তু তাহা-দিগের দুঃখ দূর করিবার জন্য স্বামী বিবেকানন্দও আমাদিগকে উপদেশ দিয়াছিলেন। একদিন শ্রীরামকৃষ্ণ দক্ষিণেশ্বরে অর্ধবাহ্যদশায় অবস্থিত থাকিয়া বলিলেন: "জীব শিব। জীবকে দয়া দেখাইবে কি! দয়া নয়, জীবকে শিবজ্ঞানে সেবা।" স্বামী বিবেকানন্দ তখন তথায় উপস্থিত ছিলেন। শ্রীরাম-কৃষ্ণের শ্রীমুখ হইতে সূত্রাকারে এই গভীর তত্ত্ব শ্রবণ করিয়া স্বামী বিবেকানন্দ আমাদিগকে বলিয়া-ছিলেন: "আজ আমি এক গভীর তত্ত্বের কথা শ্রবণ করিলাম। যদি কখনও সুযোগ উপস্থিত হয়, তবে আমি এই মহাসত্য জগতে প্রচার করিব।" রামকৃষ্ণ মিশন বিভিন্ন স্থানে যে-সকল সেবাকার্য পরিচালন করিতেছে উহাদের মূলে কারণ অনুসন্ধান করিলে এই ঘটনা পাওয়া যাইবে। অপর ঘটনাটি ১৮৮৬ খ্রীস্টাব্দের প্রথম ভাগে সংঘটিত হইয়াছিল। শ্রীরামকৃষ্ণ গলরোগে আক্রান্ত হইয়া চিকিৎসার্থ কলিকাতার নিকটবর্তী কাশীপুর বাগানে অবস্থান করিতেছিলেন। সেই বৎসরই সেইস্থানে তিনি মহাসমাধিতে দেহরক্ষা করেন। সেই সময় কাশীপুর উদ্যানে স্বামী বিবেকানন্দ প্রমুখ আমরা আরও পনের জন শ্রীরামকৃষ্ণের সেবাকার্যে নিযুক্ত ছিলাম। সেই সময় স্বামী বিবেকানন্দ তাঁহাকে নির্বিকল্প সমাধিতে নিমগ্ন করিবার জন্য শ্রীরামকৃষ্ণকে প্রায়ই ধরিয়া বসিতেন। একদিন ধ্যান করিতে করিতে স্বামী বিবেকানন্দ প্রকৃতপক্ষেই নির্বিকল্প সমাধিতে নিমগ্ন হইলেন। বিবেকানন্দকে বাহ্যজ্ঞানবিহীন ও মৃতব্যক্তির ন্যায় হিমাঙ্গ হইতে দেখিয়া আমরা তাড়াতাড়ি সশঙ্কিত চিত্তে শ্রীরামকৃষ্ণের নিকট গমন করিলাম এবং তাঁহাকে ঘটনাটি বলিলাম। শ্রীরামকৃষ্ণ কোনও উৎকণ্ঠার ভাব না দেখাইয়া সহাস্যে বলিলেন: "আচ্ছা বেশ।" তৎপর তিনি পুনঃ চুপ করিয়া রহিলেন। কিছুক্ষণ পরে স্বামীজী বাহ্যজ্ঞান লাভ করিয়া শ্রীরামকৃষ্ণের নিকট আসিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁহাকে বলিলেন: "বেশ, এখন বুঝতে পারিলে? এই নির্বিকল্প সমাধির চাবি এখন হইতে আমার নিকট রহিল। তোমাকে মায়ের কাজ করিতে হইবে। কাজ শেষ হইলেই মা চাবি খুলিয়া দিবেন।" স্বামী বিবেকানন্দ প্রত্যুত্তরে বলিলেন: "মহাশয়, আমি সমাধিতে সুখে ছিলাম। সেই পরম আনন্দে জগৎ ভুলিয়া গিয়াছিলাম। আমার সানুনয় প্রার্থনা—আমাকে সেই অবস্থায় রাখুন।" শ্রীরামকৃষ্ণ সজোরে বলিলেন: "ধিক তোকে! এই সকল চাহিতে তোর লজ্জা হয় না? তোকে অতি উচ্চ আধার বলিয়া মনে করিয়াছিলাম, কিন্তু এখন দেখিতেছি তুই সাধারণ লোকের ন্যায় আত্মসুখে নিমগ্ন থাকিতে ইচ্ছা করিস।

জগদম্বার কৃপায় এই উচ্চ অনুভূতি তোর নিকট এতই স্বাভাবিক হইবে যে, সাধারণ অবস্থাতেও তুই সর্বভূতে একই ঈশ্বরকে উপলব্ধি করবি। তুই পৃথিবীতে মহৎ কার্য সম্পন্ন করবি, লোকের ভিতর আধ্যাত্মিক জ্ঞান বিতরণ করবি এবং দীনহীনের দুঃখ-দুর্দশা অপনোদন করবি।"

অন্যের ভিতর আধ্যাত্মিকতা সঞ্চার করিয়া তাহাদিগকে উচ্চ অনুভূতির রাজ্যে লইয়া যাইবার অত্যদ্ভুত দিব্যশক্তি ছিল শ্রীরামকৃষ্ণের। চিন্তা, দৃষ্টি বা স্পর্শ দ্বারা তিনি এই কার্য সম্পাদন করিতেন। স্বামী বিবেকানন্দ প্রমুখ আমরা অনেকেই শ্রীরামকৃষ্ণের নিকট যাতায়াত করিতাম এবং সামর্থ্যানুসারে উচ্চ অনুভূতির রাজ্যে আরোহণ করিবার সৌভাগ্য আমাদের হইয়াছিল। শ্রীরামকৃষ্ণের জীবদ্দশায় তাঁহার স্পর্শ ও ইচ্ছায় আমি নিজেই তিনবার সেই উচ্চ আধ্যাত্মিক অনুভূতি (সমাধি) লাভে সমর্থ হইয়াছিলাম। তাঁহার উচ্চ আধ্যাত্মিক শক্তির প্রত্যক্ষ প্রমাণ দিবার জন্য আমি এখনও জীবিত আছি। ইহাকে সম্মোহন শক্তি অথবা গভীর নিদ্রার অবস্থা বলা যায় না, কারণ এরূপ অনুভূতি দ্বারা চরিত্র ও মনোভাবের এমন পরিবর্তন সাধিত হইয়াছিল যে, উহা স্বল্পাধিক পরিমাণে চিরস্থায়ী ছিল। সর্বক্ষণ উচ্চ আধ্যাত্মিক ভূমিতে অবস্থিত থাকিয়া শ্রীরামকৃষ্ণের ন্যায় একজন সাধকের পক্ষে দরিদ্রের সাংসারিক দুঃখ ক্লেশ অপনোদন করা সকল সময়ে স্বভাবতই সম্ভবপর ছিল না, কিন্তু তাই বলিয়া তিনি দরিদ্রের দুঃখ-কষ্টের প্রতি উদাসীন ছিলেন মনে করা অত্যন্ত দূষণীয় হইবে। তিনি স্বয়ং যাহা আচরণ করিয়াছিলেন এবং সূত্রাকারে ব্যক্ত করিয়াছিলেন উহাই পরবর্তী কালে স্বামী বিবেকানন্দ প্রমুখ আমরা নিজ জীবনে উপলব্ধি ও আচরণ করিয়াছি। শ্রীরামকৃষ্ণ যখন উচ্চ ভাবরাজ্যে অবস্থান করিতেন তখন তাঁহার পক্ষে নিজের প্রয়োজনাদির দিকে দৃষ্টি রাখাও অসম্ভব ছিল। অতএব যাঁহারা তাঁহার গভীর আধ্যাত্মিক সত্য সকল উপলব্ধি করিয়া বহুজনের সুখ ও বহুজনের হিতের জন্য আত্মনিয়োগ করিতে সমর্থ ছিলেন তাঁহাদিগের ভিতরই শ্রীরামকৃষ্ণ ভগবানের মস্ত্রস্বরূপ হইয়া স্বীয় আধ্যাত্মিক ভাবসমূহ সঞ্চারিত করিয়াছিলেন। স্বামী বিবেকানন্দই তাঁহাদিগের মধ্যে প্রধান ছিলেন —ইহা আমরা শ্রীরামকৃষ্ণের শ্রীমুখ হইতে শ্রবণ করিয়াছি এবং আমরা নিজেরাও অনুভব করিয়াছি। এই জন্যই স্বামী বিবেকানন্দের জীবনী আলোচনা করিলে আমরা দেখিতে পাই যে, একদিকে যেমন তিনি ধর্মসমন্বয়ের অত্যদ্ভুত বাণী প্রচার করিয়াছিলেন, অপরদিকে আবার দুঃস্থগণের মধ্যে ঐহিক-পারলৌকিক জ্ঞান, অন্ন-বস্ত্র, ঔষধ প্রভৃতি বিতরণ করিয়া যাহাতে তাহারা অভাবশূন্য হইয়া ক্রমশঃ আধ্যাত্মিক রাজ্যে প্রবেশ করিতে পারে তজ্জন্য সার্বজনীন সেবাধর্মও প্রচার করিয়াছেন। প্রকৃতপক্ষে স্বামী বিবেকানন্দ শ্রীরামকৃষ্ণ-জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যাখ্যাতা এবং গভীর আধ্যাত্মিক তত্ত্ব সম্বন্ধে শ্রীরামকৃষ্ণের সূত্রাকারে কথিত উপদেশসমূহের জ্বলন্ত ভাষ্যকার ছিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণের আধ্যাত্মিক অনুভূতি-সকলের গভীরতা সম্পূর্ণরূপে হৃদয়ঙ্গম করিতে কেহ কখনও সমর্থ হইবে কিনা তৎসম্বন্ধে আমার যথেষ্ট সন্দেহ আছে।

মানুষের ভিতর ঈশ্বরকে উপলব্ধি এবং সেবার উদ্দেশ্যে সকলের দুঃখে সহানুভূতি প্রদর্শনের মধ্যে পার্থক্য আছে বলিয়া কেহ কেহ ভাবিয়া থাকেন। আমার মনে হয়, এইগুলি মনের একই অবস্থার দুইটি দিক মাত্র, দুইটি বিভিন্ন অবস্থা নহে। মানুষের অন্তর্নিহিত দেবত্বকে উপলব্ধি করিয়াই আমরা তাহার দুঃখের গভীরতা ঠিক ঠিক অনুভব করিতে পারি, কারণ একমাত্র তখনই মানুষের আধ্যাত্মিক বন্ধন এবং ঐশ্বরিক পূর্ণতা ও সুখ-রাহিত্যের অবস্থা আমাদের হৃদয়ে দেদীপ্যমান হইয়া উঠে। মানুষের ভিতরের দেবত্ব এবং তৎসম্বন্ধে তাহার বর্তমান অজ্ঞতা ও তজ্জনিত দুঃখভোগের মধ্যে একটা পার্থক্য অনুভব উদ্বুদ্ধ হয়। নিজের করিতে পারিয়াই তাহার সেবার নিমিত্ত হৃদয় ও অপরের মধ্যে আত্মাকে উপলব্ধি না করিলে প্রকৃত সহানুভূতি, প্রেম ও সেবা হয় না। এইজন্যই শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁহার শিষ্যগণকে লোকসেবায় জীবন উৎসর্গ করিবার পূর্বে প্রথমতঃ আত্মজ্ঞান লাভ করিতে উপদেশ দিতেন।* □

* উদ্বোধন, শ্রীরামকৃষ্ণ শতবার্ষিকী সংখ্যা, ১৩৪২, পৃঃ ২৮২-২৮৬

## হোমাপাখির দল

### নীতেন্দ্রমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়

ওরা সব হোমাপাখির দল,
নিত্যসিদ্ধ নিত্যমন্ত্র
সাধনে অচঞ্চল।
সপ্তঋষির ধ্যানলোক হতে
এসেছে ধরায় সৃজনের স্রোতে
পরিত্রাণের মহাযজ্ঞের
জ্বালাইতে হোমানল।

ওরা সব চিরসিদ্ধের থাক ;
ওদের চলনে ওদের বলনে
মানুষ হয় অবাক।
ওদের প্রজ্ঞা প্রজ্ঞারও বাড়া
জড়তার ঝুঁটি ধরে দেয় নাড়া
নব ভাবলোকে চলার আলোকে
সৃষ্টিতে আনে বল।

ওরা আনে অমৃতের সংবাদ ;
তাপিত জীবনে বিলায় যতনে
পরম ধনের স্বাদ।
ত্রিতাপদগ্ধ মানুষের প্রাণে
ব্রহ্মানন্দের আশ্বাস আনে
অমৃতপরশে মনের হরষে
জীবন হয় সফল।

ওরা সব খেপা বাউলের দল,
যুগে যুগে আসে প্রেমে কাঁদে হাসে
করুণায় ঢল ঢল।
কেউ চেনে আর কেউবা চেনে না,
হায়রে কে এল বুঝেও বুঝে না,
শেষে চমক ভাঙিয়া কেঁদে ওঠে হিয়া
সার হয় আঁখিজল॥

## তুমি সখা

### ললিতকুমার মুখোপাধ্যায়

আলো দেখার প্রথম দিন থেকেই
শুধু পালিয়ে তো বেরিয়েছি এতদিন।
নিত্য-নতুন রঙিন চশমা পরে
তোমাকে দেখতে চাইনি। আর—
ভীরু শশকের বুদ্ধি নিয়ে
অন্ধকার আবর্তের ছোট ছোট গর্তে
নিজের মুখ ডুবিয়ে ভেবেছি
তুমি আমায় কিছুতেই দেখতে পাবে না।

অথচ টেনেছ আমায় নিয়ত
নিবিড় ভাবে একান্ত অলক্ষ্যে। স্থির বিশ্বাসে।
সংশয় ছিল না তোমার—
ফিরে আমি আসবই—তোমার কাছে।

মন তো অতলে আছে—
আদৌ আছে কিনা জানি না।
তবু যেন কোথাও থাকে
তোমারই প্রচ্ছন্ন ভাবনা—অমোঘ চেতনা।
অপ্রমত্ত জীবনের প্রাঙ্গণে এই যে
হাসি-কান্নার বেচা-কেনা, অহরহ স্বপ্ন দেখা
আর ভাঙার যাতনা—এই প্রবহমানতার
মধ্যেও কখনো তো শুনেছি দূরাগত কোন আহ্বান।
তাই আপাত অদৃশ্য এই অচ্ছেদ্য বন্ধন
আমার ক্ষণতৃপ্তির রিক্ততাকে বারবার প্রকট করেছে।
খদ্যোতালোকে উদ্ভাসিত মেকি সামগ্রীর
প্রগলভতায় প্রলুব্ধ আমি তাই বারবার
শ্রান্তিতে ফিরেছি তীব্র রিক্ততার অভিজ্ঞতা নিয়ে।
পরক্ষণেই আবার ছুটেছি ডানা-জ্বালানো
ক্ষীণ দীপাবলীর দিকে।

এখন প্রস্তুত অবশেষে। তুলে দিতে আমাকে
নিশ্চিন্ত সমর্পণে, প্রগাঢ় শান্তিতে
ফেলে দিতে নিতান্ত অবহেলায়—
সযত্নে অর্জিত আমার এই ভুয়া পণ্যের
সমস্ত পশরা।

## প্রণামে

### সুদীপ্ত মাজি

প্রণামে ছিলে প্রণামে আছ
প্রণামে বাজে তোমার প্রিয় গান,
প্রণত হলে এ-ভূমিতলে
তোমার মাঝে অমোঘ পরিত্রাণ।

প্রণামে ছিলে প্রণামে আছ,
আকাশময় তোমার নীলিমায়
বধির শোনে বুকের ভাষা
অন্ধ পড়ে, সমূহ অন্তরায়।

গিয়েছে ভেসে, প্রণামে শুধু
তোমার ভাষা, স্রোতস্বিনী নদী,
প্রণত আছি এ-ভূমিতলে
প্রণত আছি প্রথম দেখাবধি।

## পরশ পাওয়া

### সুখেন বন্দ্যোপাধ্যায়

দুহাত পাতিয়া চাহিনি তবু
দিয়াছ উজাড় করি—
অনাদরে তাহে করিনি হেলা
রাখিয়াছি হিয়া ভরি।

দুখে তাপে দেওয়া শত অপমান
তোমারি তো তাহা পরশ সমান
নিয়াছি মাথায় তুলি—
সংকট মাঝে আকুল আঁধারে
বর্ষিয়া তব শান্তিসুধারে
ভরিছ রিক্ত ঝুলি।

যাহা কিছু পাই সে তোমার দান
সঙ্গীতে জাগি' ওগো ভগবান
চিত্ত ভরিছ গানে—
তোমার আভাস ইঙ্গিত মাঝে
ব্যাপ্ত রাখিছ আপনার কাজে
তোমারিই সন্ধানে।

## মহাবোধন

### চণ্ডী সেনগুপ্ত

ইচ্ছা ছিল হৃদয়ে এক আসন পাতি।
চন্দনে আর বন্দনাতে, পুষ্পে পুষ্পে মাতামাতি।
স্তোত্র স্তবে গৃহ ভরাই রমণীয় গাথা গীতে
রাজাধিরাজ বসবে সেথায় আপন মনে অতর্কিতে॥

প্রতীক্ষাতে দিন কেটেছে, ঊর্মিমালায় সূর্য ডোবে
আসবে কখন!হে মহারাজ! কে আমাকে বলে দেবে!
কোথায় তোমায় বসতে দেব, হয়নি আজো আসন পাতা
কে আজ আমায় শিখিয়ে দেবে শুচি শুভ্র পবিত্রতা॥

তবে হয়তো এই দুটি হাত অবিরত
প্রচেষ্টাতে ব্যর্থ হলো করতে হৃদয় পরিশ্রুত।
নয়নজলে সিক্ত হয়ে হৃদয় ক্ষণিক হলে শোধন,
এক লহমায় বক্ষে সেদিন রাজেশ্বরের মহাবোধন॥

## দিশারি

### হীরেন্দ্রচন্দ্র ভট্টাচার্য

তোমার ছবিটি রাখি সমুখে আমার,
জপে ধ্যানে বসিয়াছি আমি যতবার—
যদি মন অন্যে ধায় বিষয়ে বিলীন,
তোমার শ্রীমুখ দেখি হয়েছে মলিন।

অন্তর ব্যথিত মোর লাজে নত শির,
নিরানন্দ চারিধারে বিষাদ গভীর।
যখনি তোমাকে হৃদে করেছি স্থাপনা
তোমাতেই সঁপিয়াছি যতেক ভাবনা;

চিত্ত সমাহিত আঁখি পুলকে সজল,
দেখিনু তোমার মুখ হয়েছে উজ্জল।
আমার সকল গতি আমার মনন
হে দিশারি, সদা তুমি কর নিয়ন্ত্রণ।

# প্রাণের ঠাকুর

## সবিতা দাস

আমি যেন কবে দেখেছি তোমায়, ভবতারিণীর ঘরে,
রুদ্ধদুয়ারে মা-ছেলেতে বসে, কি জানি কি কথা চলে।
কখনো দেখেছি, বসে আছ একা, তোমার খাটের 'পরে,
সমাধিমগ্ন, সন্ধ্যাবেলায় ঘরে ধূপধূনা জ্বলে॥

রাখাল, যোগীন, শরৎকে নিয়ে ডেকেছ ঘোড়ার গাড়ি,
লালপেড়ে ধুতি, গায়ে কালো কোট, পায়ে শুঁড়তোলা চটি।
কার গৃহ আজ পবিত্র হবে ? কোন্ ভক্তের বাড়ি ?
ব্রাহ্মসমাজ ? কেশব-কুটির ? না কি বলরাম-বাটি ?

মনে হয় যেন দেখেছি এসব আশে পাশে কোথা থাকি,
এত সুকৃতি কি করে বা হবে আমার ভাগ্যাকাশে ?
মেথর ছিলাম ? পথ-ঝাড়ুদার ? সহিস ছিলাম নাকি ?
ভিখারী কি আমি, বসে থাকতাম, মন্দির পথপাশে ?

দেখেছি, আঁধার কাশীপুরে সেই বিজন বাগানবাড়ি,
দিব্য বিভায় জ্যোতির্ময় দেহ মিশে আছে বিছানাতে।
একটি সঙ্ঘে ভক্ত-মালিকা গেঁথে রেখে গেছে তারি,
নিজেরে উজাড় করে গেছে গুরু নরেনের দুটি হাতে।

আজ পড়ে আছি স্বার্থের কূপে, হীনতা দীনতা পাঁকে,
মন্ত্র নিয়েছি, মন তো লাগে না, জপি যন্ত্রের মতো।
ধ্যান হয় কই ? সংসার-জালে মন কোথা পড়ে থাকে,
তোমাকে ভাবতে নিজের কথাই ভেবে চলি অবিরত।

তবু এই ভিড়ে, মনের গভীরে, কখন যে ডাক আসে,
তবুও আমার করুণাসাগর, আমাকে ভোল না তুমি।
সব ফেলে রেখে ছুটে যেতে চাই, তোমার চরণপাশে,
তপ্ত ললাটে গঙ্গার হাওয়া স্নেহাশিস দেয় চুমি।

পূজার কত যে নিয়মকানুন, কিছু তো শিখিনি কভু
চরণকমলে নয়নের জলে শুধু এই বলে আসি—
তুমি মোর পিতা, তুমি মোর মাতা, তুমি মোর সখা, প্রভু,
ঠাকুর, আমার প্রাণের ঠাকুর, তোমাকে যে ভালবাসি।

## শ্রীরামকৃষ্ণ

### অরুণকুমার দত্ত

তোমার কথা বলতে বা লিখতে ভয় হয়
পাছে ঘোর অমর্যাদা করে ফেলি,
গল্পের সেই অন্ধের হাতি দেখার মতো
কানে বা শুঁড়ে হাত রেখে বলি
এটাই তার আসল চেহারা।

তোমার অপার করুণার যে অজস্র প্রকাশ
প্রতিনিয়ত আমাকে ছুঁয়ে ছুঁয়ে যাচ্ছে
তার কোন্‌টিতে খুঁজব
তোমার পরিপূর্ণ মহিমা ?

কে কবে সূর্যকে স্পর্শ করেছে
উষ্ণতা অনুভব করতে,
অথবা কাছে গিয়ে প্রত্যক্ষ করেছে
তার পূর্ণাবয়ব ?

তোমার উপমাতেই বলি,
নুনের পুতুল হয়ে সাগর মাপবার
ধৃষ্টতা আমার নাই,
বরং তীরে বসে তরঙ্গোচ্ছ্বাসে
শুচিস্নিগ্ধ হতে হতে ধন্য হতে চাই,
মনের দর্পণটাকে নিরন্তর মার্জনা করে
এমন স্বচ্ছ করে রাখতে চাই যাতে
চরাচরে ব্যাপ্ত
তোমার অন্তহীন লীলাবৈচিত্র্য
আমাতে ক্রমে ক্রমে উদ্ভাসিত হতে থাকে।

তোমার কৃপা না পেলে
সাধ্য কি তোমার স্মরণ-মনন করি।

## মিনতি

### সুহাসিনী ভট্টাচার্য

দুখের বেশে আসবে যবে স্বামি,
এই দেহ মোর উঠবে কাঁপি কাঁপি
তখন তোমার স্নেহের পরশ দিয়ে
সকল জ্বালা জুড়ায়ে দিও তুমি ॥
এই ধরণীর সকল ছন্দে গানে
কর্ণ আমার বধির হয়ে রবে,
তখন আমার ওগো হৃদয়রাজ,
চরণধ্বনি যেন বাজে প্রাণে ॥
কণ্ঠ যখন স্তব্ধ হয়ে যাবে,
কারো ডাকেই দেবে না আর সাড়া,
প্রাণের তারে তখন প্রাণনাথ
তোমার বাণী গুঞ্জরিয়া ক'বে ॥
তখন যেন চিনতে তোমায় পারি
মরণ-রূপে আসবে যবে দয়াল,
তোমার জ্যোতির শুভ্র আলোয়
অন্তর মোর রেখো উজল করি ॥
প্রাণটি যখন চলবে দূরে, বহু দূরে
পথটি আমার করবে আলোয় আলো,
তোমার আলোয় ওগো জ্যোতির্ময়,
ধরার মাটি ছেড়ে গ্রহান্তরে ॥
আমার হাসি, আমার যত গান
রইবে তারা হাওয়ার সাথে মিশে
এই ধরণীর সবুজ মাঠের 'পরে,
কান্নাভরা সকল অভিমান ॥
রইবে হেথায় মুক্ত আকাশতলে,
আমার দেহের শেষের তাপটুকু
রাতের শেষে ফুলের সুবাস মাখি,
মিশবে গিয়ে তোমার চরণতলে ॥

## লভি আশ্রয়

### গীতি সেনগুপ্ত

জীবনে মরণে লভ আশ্রয়
শ্রীরামকৃষ্ণ চরণে ॥
শ্রীরামকৃষ্ণ নামে মন মজ রে
শ্রীরামকৃষ্ণ নাম মন ভজ রে
পাবে শান্তি শ্রীরামকৃষ্ণ-স্মরণে।
শ্রীরামকৃষ্ণ নামে সুর সাধো রে
শ্রীরামকৃষ্ণ লাগি প্রাণ কাঁদো রে
থাকো মগ্ন শ্রীরামকৃষ্ণ-চরণে ॥

বিশেষ রচনা

# শিকাগো বক্তৃতার শতবর্ষের আলোকে স্বামী বিবেকানন্দ

## হোসেনুর রহমান

১১ সেপ্টেম্বর, ১৮৯৩ খ্রীস্টাব্দ আধুনিক ভারতবর্ষের ইতিহাসে এক উজ্জ্বল মাইলস্টোন। দেশ তখন পরাধীনতার শৃংখলে মৃতপ্রায়; বুদ্ধি যুক্তি ব্যাপ্তি সেদিন ছিল আমাদের জন্য অপ্রত্যাশিত। ধর্ম, কর্ম, জীবন, দর্শন ছিল স্বপ্নের অতীত। কোনমতে জীবনধারণ, কোনমতে ধর্মের অনুষ্ঠান, পরকালের চর্চা, ইহকালের জন্য কেবলই দ্বিধা, কেবলই মনুষ্যত্বের বিস্তারে যত লজ্জা। আজ থেকে দেড়শো বছর আগে ভারতবর্ষের একটি মানুষ দক্ষিণেশ্বরে মানুষের মেলা বসিয়েছিলেন। বলেছিলেন, ভজন পূজন বুঝিনে, কেবল এই জীবনের লীলা বুঝি। বুঝি জীবনটাকে নিত্যশুদ্ধ করে তোলা চাই, চাই জীবনটাকে নিয়ত ঘষা-মাজা করা, মরচে যেন না পড়ে, থেমে যেন না যায়। যেতে যদি হয় যাব তবে। তার আগে কেনরে এত যাওয়ার ত্বরা। জীবনের সঙ্গে বোঝাপড়া আগে সেরে নেওয়া চাই, জীবনটাকে জীবনের সঙ্গে আগে যুক্ত করা চাই। জীবন রুদ্রবীণার মতো নিত্য বাজবে বলেই তো কান্নার শেষ নেই। কান্নার সরোবরে দাঁড়িয়ে মানুষ বলছে, আমার চেতনার আদি নেই, অন্ত নেই। আমার সময় নেই সময় নষ্ট করার।

দক্ষিণেশ্বরের এই গণদেবতা স্বহস্তে স্বপ্রেমে সশ্রদ্ধায় গড়লেন তাঁর গণপতিকে। যুক্তিতে তর্কে সন্দেহে সেই মানুষটি চিরকালের চিরযুবক। নাম তাঁর, বলাই বাহুল্য, নরেন্দ্রনাথ দত্ত। দক্ষিণেশ্বরে তাঁর পুনর্জন্ম। স্বামী বিবেকানন্দ। গুরুপ্রয়াণের পরবর্তী বিবেকানন্দের ইতিহাস রোমাঞ্চকর। যিনি বিপ্লব করতে পারতেন ('বিপ্লব' তো তিনি করেই ছিলেন), যিনি নিমেষে বদলে দিতে পারতেন মানুষের অভ্যস্ত জীবনধারা, কিংবা যিনি কাব্য থেকে সঙ্গীতচর্চায় সিদ্ধিলাভ করতে পারতেন স্বচ্ছন্দে; তিনি হলেন স্থিতধী, সাধক, সন্ন্যাসী। স্তব্ধ হতে চাইলেন গুরুর শ্রীচরণে। পরিব্রাজক বিবেকানন্দ হিমালয় গঙ্গা গোদাবরী নর্মদা যমুনায় আবিষ্কার করলেন ভারতবর্ষকে। সেই ভারতবর্ষে প্রত্যক্ষ করলেন নিজের গুরুকে। দেশের স্তরে স্তরে মানুষের চেতনাকে অনুভব করলেন। কর্মযোগী সন্ন্যাসী গোটা দেশকে কর্মশালায় মুখর দেখবেন বলে প্রতিদিন দীর্ঘকায় হয়ে উঠলেন।

শিকাগো ধর্মমহাসভায় বিবেকানন্দ গুরু রামকৃষ্ণকে প্রতিষ্ঠা করলেন। ঘোষণা করলেন, আমার গুরু জগদ্‌গুরু। প্রতিষ্ঠা করলেন ভারতকে। প্রমাণ করলেন, আমার ভারত অমর ভারত। তিনি মানুষের প্রাণের আর্তিকে, মানুষের কর্মকে, মানুষের প্রেমকে সর্বাগ্রে জায়গা দিলেন এই পৃথিবী নামক মন্দিরে। মানুষকে মুক্তি দিলেন।

শিকাগো ধর্মমহাসভায় বিবেকানন্দ মানুষের মুক্তির মন্ত্র উচ্চারণ করলেন। পশ্চিম পৃথিবীর মানুষ সচকিত হলো, স্তম্ভিত হলো, আনন্দে আত্মহারা হলো। কেউ বললেন, হ্যাঁ, এমন মানুষের জন্য আমি যুগ যুগ অপেক্ষা করেছি। এই মানুষই পারবেন সব ভণ্ডামি ভেঙে ফেলতে, পারবেন সত্য কথাটি বলতে অত্যন্ত সহজ করে। সহজে সত্যকে প্রকাশ করা যে দুঃসাধ্য এক মহাকাজ। অতি সন্তর্পণে সহজে বিবেকানন্দ সে-কাজটি সুসম্পন্ন করলেন। স্ব্যর্থহীন ভাষায় তিনি ঘোষণা করলেন:

"Asia laid the germs of Civilization, Europe developed man, and America is developing women and the masses··· the Americans are fast becoming liberal··· and this great nation is progressing fast towards the spirituality which was the standard boast of the Hindus." [শিকাগো থেকে লেখা স্বামীজীর চিঠি, ২ নভেম্বর ১৮৯৩]

এবার দুঃখের পালা। এবার অনুশোচনার মহাভারত। অতিক্রান্ত হতে চলেছে শিকাগো ইতিহাসের পর একশত বর্ষ। আয়োজন, উৎসব, অনুষ্ঠান ব্যাপকতর হতে চলেছে। চলেছি আমরা বিবেকানন্দ-ঐতিহ্য নিয়ে মার্কিন মুলুকে, চলেছি

রাশিয়ায়, জাপানে, আফ্রিকায়। এতো গেল উৎসবের তালিকা। ইতিপূর্বে দেখেছি আমরা 'ফেস্টিভ্যাল' নামক এক অত্যাশ্চর্য সাংস্কৃতিক বর্বরতা। বিবেকানন্দ-ঐতিহ্য অভিযান তেমন কোন মনুষ্য-বিশ্বাসের ব্যাভিচার হবে না নিশ্চয়ই।

আমাদের জীবনে শিকাগো শতবর্ষ-উৎসব হতে চলেছে ১৯৯৩-এর সেপ্টেম্বরে। অন্ততঃ ১৯৯৩-এর ফেব্রুয়ারিতে চারিদিকে তাকিয়ে দেখছি, সুস্থ জীবনের অধিকার আমাদের লুপ্ত হতে চলেছে। শ্মশানে বসে আছি যেন। মানবিভ্রান্তির যন্ত্রণা, মূল্যবোধের সংকট, সার্বিক অবক্ষয়—এসব শ্লোগানে সংবর্ধিত আমরা। এতো একপ্রকার ক্ষণিক আত্ম-জিজ্ঞাসা। তারপর? জীবনটা চলুক না যেমন চলছিল। সন্ন্যাসী, রাজনীতিবিদ্, বুদ্ধিজীবী, কবি-সাহিত্যিক-সাংবাদিক-অধ্যাপকদের শোভাযাত্রা। অগ্রভাগে স্বামী বিবেকানন্দ। শতকণ্ঠে সহস্র বিবেকানন্দের নামগান। তারপর? একশো বছরের হিসাব-নিকাশ: আত্মসমীক্ষা বনাম স্বামী বিবেকানন্দ। এ এক জাতীয় কর্তব্য। শত বছর অতিক্রান্ত। এ-দায়িত্বভার পালন করিনি আমরা। আমরা বিবেকী, ভাবুক, চিন্তাশীল মানুষ হিসাবে বিবেকানন্দ-ইতিহাস বিশ্লেষণে বসিনি, কারণ ভয় পেয়েছি, দায়িত্ব পালনে শঙ্কিত হয়েছি। বিবেকানন্দকে আমাদের বুদ্ধি ও প্রেমে, যুক্তি ও দর্শনে আমরা অনিবার্য করে তুলতে পারিনি। পূজার ঘরে প্রতিষ্ঠা করেছি বটে, কিন্তু আমাদের জীবনে তাঁকে আমাদের ঘনিষ্ঠ করিনি।

আজ দুর্যোগের ঘনঘটা চারিদিকে। ঘরে-বাইরে জীবন ভগ্নপ্রায়। নতুন জীবনের অভিযান প্রতীক্ষা অস্থির—কী ইউরোপ, কী এশিয়া, কী আমেরিকা—সর্বত্র জীবন, ধর্ম, মূল্যবোধ, পরিবার, সম্পর্ক মহাপরিবর্তনের মুখে। এই ঝড়, এই বিপর্যয়, এই ভূকম্পন 'রুধিবে কে'? এমন সময় শিকাগো শতবর্ষ আমাদের শতচ্ছিন্ন হৃদয়-দুয়ারে উপস্থিত।

বিগত শতাব্দীতে স্বামী বিবেকানন্দ কী চেয়েছিলেন আমাদের কাছে? তিনি ভাল করেই জানতেন, অসম্পূর্ণ মানুষ স্বয়ংসম্পূর্ণ হতে সময় নেয় অনেক। মানুষের সেই জন্মলগ্ন থেকে আরম্ভ হলো 'মানুষ' হয়ে ওঠার এক দীর্ঘ প্রসেস। একে আজকের ভাষায় সমাজবিজ্ঞানী বললেন: "Humanization is a process taking place after birth" এবং এই এক-মানুষকে 'মানুষ' হয়ে উঠতে হয় বহু মানুষের মধ্যে, বহু মানুষের সাহচর্যে, সান্নিধ্যে, সহানুভূতিতে। বিবেকানন্দ এও জানতেন, এই 'humanization' আদিতে ও অন্তে মানুষকে আয়ত্ত করতে হয়। তার প্রথম অধ্যায়: জ্ঞান-অন্বেষণ, সংগ্রহ ও সংরক্ষণ। এই সংরক্ষণের শিক্ষা মানুষকে সংযত করে। সে বুঝতে শেখে 'reason' এবং 'passion'—দুইয়ের যথার্থ সংযোগে মানুষ নতমস্তকে 'social norms'-এর অনুশাসন মেনে চলে। মানুষ সবটাই যুক্তির সাধক নয়, অথবা সে সবটাই 'instincts'-এর দ্বারা চালিত হতে পারে না। সে কোনমতেই নিজের সঙ্গে তার যুদ্ধ এড়াতে পারে না। আগে নিজেকে গড়ে তোলা, পরে জগৎকে বুঝতে পারা। এর অর্থ: nature বনাম nurture। একে অপরকে কব্জা করতে চায়। জীববিজ্ঞানী বলছেন, কোন পক্ষই বড় একটা বিজয়ের গৌরব অর্জন করতে পারছে না। এবং যদি কোন পক্ষ ঘটা করে বিজয়ী হয় তাহলে সে মানুষ, সে যা নিয়ে জন্মেছে, তার বহু জন্মের স্বভাব, সেই স্বভাব জয়ী হবে। এই স্বভাবকে শিক্ষিত করতে পারে মানুষ। এই হলো বিবেকানন্দের বাণী, তাঁর বিশ্বাস। সন্ন্যাসী বিবেকানন্দ ইতিহাস ও সমাজবিজ্ঞানের মেধাবী ছাত্র। দক্ষিণেশ্বরে না গিয়ে তিনি নিশ্চয়ই অক্সফোর্ড-কেমব্রিজ-কলাম্বিয়া-হার্ভার্ডের সমাজবিজ্ঞানের চেয়ার সহজেই অধিকার করতে পারতেন। কিন্তু তিনি স্বেচ্ছায় ত্যাগের, সাধনার, প্রেমের পথ বেছে নিলেন। তিনি যে বুঝেছিলেন, ইউরোপের রেনেসাঁর অর্থ "The withdrawal of God meant a triumphant entry of Man"। বিবেকানন্দ 'Glory of Man'-এর কথা এত বলেছেন যে, বলে শেষ করা যাবে না। মানুষ যে 'free will' সম্বল করে প্রতিদিন বিশিষ্ট হয়ে উঠবে, ব্যক্তি হয়ে উঠবে—এসব কথা বিবেকানন্দ বুঝতেন সবচেয়ে বেশি করে। তাই আনুষ্ঠানিক ধর্ম তাঁর গতিবেগকে খর্ব করতে পারেনি কোনদিন। সচেতনতা তাঁর একমাত্র অবলম্বন। তিনি জানতেন, "It was now up to

man to be born to Godlike existence." শব্দগুলো আজকের আধুনিক মানুষের, বিবেকানন্দের চিন্তা একশো বছর আগের। আমি একথা বলছি না যে, বিবেকানন্দ ছাড়া আর কেউ এমন চিন্তা করেননি। কিন্তু এবিষয়ে বিবেকানন্দ একজন পথপ্রদর্শক। আলোকবর্তিকা। এখন প্রশ্ন, মানুষকে 'অমৃতের সন্তান' হয়ে উঠতে হলে কি করতে হবে? এই সাধনা সারাজীবনের, এর থেকে কোন নিস্তার নেই। যতদিন বেঁচে থাকা ততদিন সংগ্রাম, ততদিন অনির্বাণ জিজ্ঞাসা, ততদিন অবিরাম অন্বেষণ। মানুষের স্বাধীনতার অর্থ—"ultimate is no less than perfection"। মানবমুক্তির নতুন ব্যঞ্জনা কি? তা হলো এই: "Human freedom of creation and self-creation meant that no imperfection, ugliness or suffering could now claim the right to exist, let alone legitimacy." আমার কীর্তি আমার চেয়ে মহৎ। আমার জীবন আমার বিধাতার চেয়েও বড়। স্বামী বিবেকানন্দ নিজেই এমন বিশ্বাস করতেন। যাঁরা স্বামীজীর 'ধৃক্তি ও ধর্ম' বক্তৃতা আত্মস্থ করেছেন তাঁরাই আমার বক্তব্য বুঝতে পারবেন।

স্বামী বিবেকানন্দ মন্দির, দল, সম্প্রদায় এসব চাননি। চেয়েছেন একটি মুক্ত পৃথিবী। যে-পৃথিবীতে মানুষ বিশ্বাস করবে, বহু মতবিশিষ্ট এই পৃথিবী মানুষকে নিয়ে ধন্য। আমরা কি বিবেকানন্দের এই জীবনদর্শন অনুসরণ করতে পেরেছি, না চেয়েছি? মঠ ও মিশন সেবা ও সাহায্যের ভাণ্ডার নিয়ে দুঃখী ও দুর্গত মানুষের পাশে দাঁড়িয়েছে। প্রচলিত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের তুলনায় মঠ ও মিশন উত্তম শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান গড়ে তুলতে পেরেছে। কিন্তু বিবেকানন্দ আস্ত মানুষ চেয়েছিলেন। যে-মানুষ সত্যের জন্য প্রয়োজনে জীবন তুচ্ছ করতে পারে, যে-মানুষ যথার্থ শিক্ষাপ্রাপ্ত হয়ে শিক্ষিত ভদ্রলোক, বিনত, বশংবদ কেবল হবে না, প্রয়োজনে আপসহীন, ভয়শূন্য, নির্মম হয়ে উঠতে পারবে। যে-মানুষ কেবল ভাল ঝকঝকে ডাক্তার, প্রশাসক, শিক্ষক হবে না, যথার্থ চরিত্রবান হবে, পথপ্রদর্শক হবে, আত্মত্যাগী হবে। এসবু কি একশো বছরে একবিন্দুও সম্ভব হয়েছে? বরং এজগতে যেখানে যে-ব্যবস্থা (বা অব্যবস্থা) আছে সেই ব্যবস্থাকে সম্পূর্ণ স্বীকার করে নিয়ে সেই ব্যবস্থার অধীনে থেকে যতটা ফসলাভ করা যায় সেটাই করা হয়েছে। একাজ কম কাজ, এমন কথা বলার মতো দুরভিসন্ধি আমার নেই। কিন্তু বিবেকানন্দ মানুষের রূপান্তর চেয়েছিলেন। তিনি সংকল্প করেছিলেন, মিশন ও মঠের শিক্ষাব্যবস্থায় শিক্ষিত মানুষ কেবলই বন্ধনদশা ঘুচিয়ে বড় মানুষ হয়ে উঠবে। তাঁর মানুষ বেদান্ত ধর্মের আধার হবে। বৈদান্তিক মানুষ সকল প্রচলিত ধর্মকে ছাড়িয়ে উঠবে। অথচ কাউকে মাড়িয়ে যাবে না। তিনি চেয়েছিলেন, পূর্বের সব ইতিহাস আমার মধ্যে বর্তমান থাকবে। আমি অতীতকে আত্মসাৎ করে বর্তমান; দৃষ্টি আমার ভবিষ্যতের দিকে। পরিপূর্ণতা হবে আমার লক্ষ্য। মঠ ও মিশন সে-প্রয়াসে ব্রতী, কিন্তু তার সহযাত্রী কেউ হয়েছি কি?

স্বামীজী বলছেন: "আমার গুরুদেবের নিকট আমি··· একটি বিশেষ প্রয়োজনীয় বিষয়—একটি অদ্ভুত সত্য শিক্ষা করিয়াছি। ইহাই আমার বিশেষ প্রয়োজনীয় বলিয়া বোধ হয় যে, জগতের ধর্মসমূহ পরস্পর-বিরোধী নহে। এগুলি এক সনাতন ধর্মেরই বিভিন্ন ভাবমাত্র। এক সনাতন ধর্ম চিরকাল ধরিয়া রহিয়াছে, চিরকালই থাকিবে, আর এই ধর্মই বিভিন্ন দেশে, বিভিন্ন ভাবে প্রকাশিত হইতেছে। অতএব আমাদের সকল ধর্মকে সম্মান করিতে হইবে আর যতদূর সম্ভব সবগুলিকে গ্রহণ করিবার চেষ্টা করিতে হইবে। কেবল যে বিভিন্ন জাতি ও বিভিন্ন দেশ অনুসারে ধর্ম বিভিন্ন হয়, তাহা নহে; ব্যক্তি হিসাবেও উহা বিভিন্ন ভাব ধারণ করে। কোন ব্যক্তির ভিতর ধর্ম তীব্র কর্ম-রূপে প্রকাশিত, কাহারও ভিতর গভীর ভক্তি-রূপে, কাহারও ভিতর যোগ-রূপে, কাহারও ভিতর বা জ্ঞান-রূপে প্রকাশিত। তুমি যে-পথে যাইতেছ, তাহা ঠিক নহে—একথা বলা ভুল। এইটি করিতে হইবে, এই মূল রহস্যটি শিখিতে হইবে: সত্য একও বটে, বহুও বটে। বিভিন্ন দিক দিয়া দেখিলে একই সত্যকে আমরা বিভিন্নভাবে দেখিতে পারি। তাহা হইলেই কাহারও প্রতি বিরোধ পোষণ

না করিয়া সকলের প্রতি আমরা অনন্ত সহানুভূতি-সম্পন্ন হইব।"[১] হ্যাঁ, মানুষকে বুঝতে পারার অর্থই হলো অর্ধেকটা সহানুভূতি অর্ধেকটা সংবেদনশীলতা। শান্তিতে অগ্রগতি, হিংসায় অনগ্রসরতা অনিবার্য। কারণ হিংসায় উন্মত্ততা বর্তমান, অহিংসায় মানব-চৈতন্য শাশ্বত। এই হলো ভারতের চিরকালের ধর্ম। একেই আমরা মানবধর্ম বলে জেনেছি। শিকাগো ধর্মমহাসভায় স্বামীজী এই বিশ্বাসকে বড় করে তুলেছিলেন।

শিকাগো ধর্মমহাসভায় প্রদত্ত তৃতীয় বক্তৃতা 'হিন্দুধর্ম' (১৯ সেপ্টেম্বর, ১৮৯৩) অত্যন্ত মূল্যবান। হিন্দুধর্ম বলতে কি বোঝায়, সেবিষয়ে স্বামী বিবেকানন্দ সেখানে বলেছেন: "The Hindu religion does not consist in struggles and attempts to believe a certain doctrine or dogma, but in realising—not in believing, *but in being and becoming*."

আমরা বিবেকানন্দ-বাণী মুখস্থ করেছি; কিন্তু তাঁর বাণীর মর্মোদ্ধার করিনি। সারকথা, আধুনিক মানুষ এজগতে ধর্মাচরণ করবে কোন্ পথে গিয়ে, সেই বিষয়টি বিবেকানন্দ আমাদের মানুষ হিসাবে বিচার করতে বললেন—তাত্ত্বিক হিসাবে নয়। বিবেকানন্দ সেই মানুষের সন্ধান করেছেন যিনি হিন্দু নন, মুসলমান নন—যিনি মানুষ, যিনি বুদ্ধিনির্ভর, যুক্তিবাদী, যিনি বলতে পারেন: আমি কর্মযোগী। আমাকে বলতে পারতেই হবে যে, আমি মানবসভ্যতার ফসল গোলায় তুলছি, ঝাড়ছি, পরিষ্কার করছি, সাজাচ্ছি। এই সম্পত্তি আমাকে রক্ষা করতে হবে। তাই তো মানুষকে প্রায় উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে প্রতিমুহূর্তে তার অবস্থান পরীক্ষা করতে হচ্ছে, তাকে নতুন নতুন আইন তৈরি করতে হচ্ছে; নতুন সংজ্ঞা, পরিকাঠামো উদ্ভাবন করতে হচ্ছে; নতুন ক্লাসিফিকেশন, রেকর্ডিং পদ্ধতি ব্যবহার করতে হচ্ছে। জগৎটা প্রতিদিন ছোট হয়ে আসছে। দূরের জগৎ বলে আজ আর কিছু নেই। এই ক্ষুদ্রায়তন পৃথিবীর দিকে তাকিয়েই বিবেকানন্দ কূপমণ্ডুকের গল্প উপহার দিলেন ধর্ম-মহাসমিতির ১৫ সেপ্টেম্বরের অধিবেশনে। এই ব্যাঙের গল্প আঘাত করল সংকীর্ণতাকে, ভেদবুদ্ধিকে, মানুষের ক্ষুদ্রতাকে। আমরা সবাই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বেড়াজালে নিজেদের আবদ্ধ করে রেখেছি। এই জাল ভেদ করে বেরিয়ে আসাকেই তো সার্থক আধুনিকতা বলতে হবে। আধুনিকতা কাকে বলি? এক স্পর্ধিত মানুষ, যিনি বলতে পারেন—আমার চৈতন্য আমার জীবনের শ্রেষ্ঠ মূলধন, সচেতনতা আমার অঙ্গুলি-বৃন্তে। আমি 'যতদিন বাঁচি ততদিন শিখি'। 'আধুনিক' মানুষ সর্বদা মুগ্ধ এক ব্যক্তিমানস, যিনি স্বয়ংসম্পূর্ণ, যিনি বলেন: "The splendour of universal and absolute standards of truth" আমার চূড়ান্ত আকাঙ্ক্ষা। আমি নইলে মিথ্যা হতো এই মানব-বসুন্ধরা। মিথ্যা হতো এত ঐশ্বর্য।

আজ জগতের একমাত্র প্রয়োজন 'tolerance' এবং 'acceptance'। আমিই সব, আর সব 'এহ বাহ্য'। রাজনীতি, অর্থনীতি, ধর্ম সর্বত্র আমি ও আমার মত একমাত্র সত্য। শিকাগো ধর্মমহাসভায় প্রদত্ত বিবেকানন্দের বক্তৃতাসমূহের প্রধান বক্তব্য: কেবল আমার ধর্ম নয়, সকলের ধর্মও সত্য; যা শাশ্বত, সত্য, নিত্য তাকে প্রণাম। যা শ্রেয়, সুন্দর, মঙ্গল তাকে প্রণাম। আমি সবাইকে গ্রহণ করে ধন্য। সদাচার, সহনশীলতা, সংহতি ভারতবর্ষের সংস্কৃতি। জগৎসভায় এই বক্তব্য পেশ করলেন স্বামী বিবেকানন্দ। তিনি তাঁর প্রথম অভিভাষণে বললেন: "আমরা শুধু সকল ধর্মকে সহ্য করি না, সকল ধর্মকেই আমরা সত্য বলিয়া বিশ্বাস করি। যে-ধর্মের পবিত্র সংস্কৃত ভাষায় ইংরেজী 'এক্সক্লুশন' (ভাবার্থ: বহিষ্করণ, পরিবর্জন) শব্দটি অনুবাদ করা যায় না, আমি সেই ধর্মভুক্ত বলিয়া গর্ব অনুভব করি। যে-জাতি পৃথিবীর সকল ধর্মের ও সকল জাতির নিপীড়িত ও আশ্রয়প্রার্থী জনগণকে চিরকাল আশ্রয় দিয়া আসিয়াছে, আমি সেই জাতির অন্তর্ভুক্ত বলিয়া নিজেকে গৌরবান্বিত মনে করি। আমি আপনাদের একথা বলিতে গর্ববোধ করিতেছি যে, আমরাই ইহুদীদের খাঁটি বংশধরগণের অবশিষ্ট অংশকে সাদরে হৃদয়ে ধারণ করিয়া রাখিয়াছি; যে-বৎসর রোমানদের ভয়ঙ্কর উৎপীড়নে তাহাদের পবিত্র

১ স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা, ৮ম খণ্ড, ১ম সং, পৃঃ ৪০২

মন্দির বিধ্বস্ত হয়, সেই বৎসরই তাহারা দক্ষিণ ভারতে আমাদের মধ্যে আশ্রয়লাভের জন্য আসিয়াছিল।

"জরথুস্ট্রের অনুগামী মহান পারসীক জাতির অবশিষ্টাংশকে যে-ধর্মাবলম্বিগণ আশ্রয়দান করিয়াছিল এবং আজ পর্যন্ত যাহারা তাঁহাদিগকে প্রতিপালন করিতেছে আমি তাহাদেরই অন্তর্ভুক্ত।

"কোটি কোটি নরনারী যে-স্তোত্রটি প্রতিদিন পাঠ করেন, যে-স্তবটি আমি শৈশব হইতে আবৃত্তি করিয়া আসিতেছি, তাহারই কয়েকটি পঙ্ক্তি উদ্ধৃত করিয়া আমি আপনাদের নিকট বলিতেছি :

'রুচীনাং বৈচিত্র্যাদৃজুকুটিলনানাপথজুষাম্।
নৃণামেকো গম্যস্ত্বমসি পয়সামর্ণব ইব॥'

—বিভিন্ন নদীর উৎস বিভিন্ন স্থানে, কিন্তু তাহারা সকলেই যেমন এক সমুদ্রে তাহাদের জলরাশি ঢালিয়া মিলাইয়া দেয় তেমনি হে ভগবান, নিজ নিজ রুচির বৈচিত্র্যবশতঃ সরল ও কুটিল নানা পথে যাহারা চলিয়াছে, তুমিই তাহাদের সকলের একমাত্র লক্ষ্য।"[২]

অথচ আজ থেকে একশো বছর আগে ইউরোপ-আমেরিকা আমাদের সম্বন্ধে কী ভেবেছে? তারা ভেবেছে, আমরা অতীত গৌরবগাথা নিয়ে বর্তমানে মৃতপ্রায় এক উদ্‌ভ্রান্ত মানবগোষ্ঠী। জগৎসভায় বিবেকানন্দের আবির্ভাব, বক্তব্য এবং ভাব প্রকাশ করল অন্য একটি বিশ্বাস : "We do not live in the past, but the past in us." অতীত সে যত মহৎ হোক বর্তমানকে সে ছাপিয়ে উঠতে পারে না। আজও বহু মানুষ আছেন যারা 'past in the present'-এ জীবন উৎসর্গ করবেন বলে দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ। তাদের জন্য স্বামী বিবেকানন্দ কেবল করুণাই করে গেলেন। বিদ্রূপ করে গেলেন। আর যেখানেই জীবনের সামগ্রী পেয়েছেন, উচ্ছ্বাস দেখেছেন, যেখানেই বুদ্ধির ব্যবহার দেখেছেন, সেখানেই শ্রদ্ধায়, প্রেমে, ভালবাসায় তিনি বিনত হয়েছেন। জীবনের শ্রেষ্ঠ ধন এই জীবন—এই কথাটি স্বামী বিবেকানন্দের বেদান্ত, তাঁর ইষ্ট-দেবতা, তাঁর একমাত্র চিন্তা।

উপসংহারে একথা বলতে হয়, এসব বুঝতেই আমাদের বেলা গড়িয়ে গেল, দিনের আলো ফুরিয়ে এল। জগৎ জুড়ে আজ অন্ধকার। একদিকে সম্ভোগ, ভোগ্যপণ্যবাদের ঐশ্বর্যসম্ভার, আর একদিকে অভাব, হাহাকার, মানুষের কি নিদারুণ দৈন্যদশা! দল আর দলাদলি, সম্প্রদায় আর সাম্প্রদায়িকতা, জাতি আর স্বাজাত্যবোধ, ধর্ম আর ধর্মান্ধতা। একশো বছর আগে আজকের পৃথিবীর এমন সব সমস্যার জটিলতাকে বিবেকানন্দ আক্রমণ করতে পেরেছিলেন। তিনি সকল সংকীর্ণ-তাকে আঘাত করে বলতে পেরেছিলেন যে, 'diversity of humankind' হচ্ছে একমাত্র মানবপন্থা। সংস্কৃতি বলতে ভারতবর্ষ চিরকাল বুঝেছে 'process of humanization'; বুঝেছে মানুষের 'মানহুঁশী'করণ। কোন এক পথে একটিমাত্র মতে তা হবার নয়। আজকের সমাজবিজ্ঞানীর ভাষায় : "There is an infinite variety of ways in which humans may be, and are humanized ; and it is strongly denied that one way is intrinsically better than another, or that one can prove its superiority over another, or that one should be substituted for another. Variety and coexistence have become cultural values... ." এই হচ্ছে বিবেকানন্দ-চিন্তার সম্প্রসারণ। (দ্রঃ Intimations of Post Modernity—Zymunt Bauman)

স্বামী বিবেকানন্দ ভারতবর্ষ নামক ধর্মগ্রন্থটির চর্চা করেছিলেন আজীবন। এজগতে এই ধর্মগ্রন্থের জায়গাটি পাকাপোক্ত করতেই তিনি যান মার্কিন-দেশে ও ইউরোপে। মানুষই ছিল তাঁর একমাত্র আরাধ্য দেবতা। এই মানুষকে সবার ওপর প্রতিষ্ঠিত দেখবেন বলে সন্ন্যাসীর গেরুয়া বসন দেহে ধারণ করেছিলেন তিনি। গেরুয়া বসন তাঁর জীবনে কেবল বাইরের ভূষণ ছিল না। একথাটি আমরা যেন ভুলে না যাই। এই পোশাক কোন বিশেষ চমৎকারিত্ব উৎপাদন করবার জন্য নয়। বরং এই পোশাক সার্বিক দহনযন্ত্রণা বহন করবার জন্য। এই পোশাক যিনি দেহে ধারণ করেন তিনি সর্বক্ষণ 'বক্ষে তোমার বাজে বাঁশি' শুনতে পান। যতদিন বাঁচি ততদিন এই দহনজ্বালা। বিবেকানন্দ দেখালেন, সন্ন্যাসীর এই আদর্শ। জীবনের এই সত্যমূল্য নির্ধারণ করতেই তিনি এসেছিলেন এজগতে।

এখানে বিবেকানন্দ-কথিত শ্রীরামকৃষ্ণের বাণী

২ বাণী ও রচনা, ১ম খণ্ড, ১ম সং, পৃঃ ৯-১০

উচ্চারণ করতে হয় ঃ "মতামত, সম্প্রদায়, গির্জা বা মন্দিরের অপেক্ষা রাখিও না। প্রত্যেক মানুষের ভিতরে যে সারবস্তু অর্থাৎ ধর্ম রহিয়াছে, তাহার সহিত তুলনায় উহারা তুচ্ছ ; আর যতই এই ভাব মানুষের মধ্যে বিকাশপ্রাপ্ত হয়, ততই তাহার ভিতর জগতের কল্যাণ করিবার শক্তি হইয়া থাকে। প্রথমে এই ধর্মধন উপার্জন কর, কাহারও উপর দোষারোপ করিও না, কারণ সকল মত, সকল পথই ভাল। তোমাদের জীবন দিয়া দেখাও যে,'ধর্ম' অর্থে কেবল শব্দ বা নাম বা সম্প্রদায় বুঝায় না, উহার অর্থ আধ্যাত্মিক অনুভূতি। যাহারা অনুভব করিয়াছে, তাহারাই ঠিক ঠিক বুঝিতে পারে। যাহারা নিজেরা ধর্মলাভ করিয়াছে, কেবল তাহারাই অপরের ভিতর ধর্মভাব সঞ্চারিত করিতে পারে, তাহারাই মানবজাতির শ্রেষ্ঠ আচার্য হইতে পারে, তাহারাই কেবল জগতে জ্ঞানের শক্তি সঞ্চার করিতে পারে।"[৩]

এবার নিঃসন্দেহে বলা সম্ভব, এই ধর্ম আগামীকালের পৃথিবীর মানুষের একমাত্র ধর্ম। এই ধর্মভাব যেদিন সম্ভব হবে সেদিন ধর্মের নামে এই বিশ্বব্যাপী বর্বরতার সমাপ্তি হবে। রামকৃষ্ণদেবের ধর্মভাব আজ একবিংশ শতাব্দীর সামনে দাঁড়িয়ে মনুষ্যজাতির কাছে দাবি করছে নতুন মূল্যবোধ, নতুন প্রতীক, নতুন ভাষা। বহু পুরনো বিগ্রহ ইতিমধ্যে পৃথিবীতে বাতিল হয়ে গেছে এবং যাচ্ছে। বহু বিশ্বখ্যাত ব্যক্তি রাজনীতির রঙ্গমঞ্চ থেকে ইতিমধ্যে বিদায় নিয়েছেন। আবার কোন কোন বিগ্রহ, কোন কোন বিশ্বব্যক্তিত্ব চিরকালীন, বিশ্বজনীন, মানবপ্রেমের প্রতীক। তেমন প্রতীক আগামীকালের সমগ্র মানবজাতির জন্য অপরিহার্য হতে চলেছে। এমন প্রতীক প্রতিষ্ঠার জন্য চাই নতুন ভাষা, নতুন প্রত্যয়, নতুন প্রকাশ-মাধ্যম। রামকৃষ্ণদেব ও বিবেকানন্দ এই কথাই বলছেন, মানুষের বাইরের ধর্ম ভিন্ন ভিন্ন। তাতে কিছু এসে যাচ্ছে না। যত দিন যাচ্ছে মানুষ ততই আবিষ্কার করতে পারছে তাদের ভিতরের ভাষা ও আর্তি এক ও অভিন্ন। বাইরে আমরা ভিন্ন, বিচ্ছিন্ন। ভিতরে বাউল সুফী সন্তের ভাষা ও ঈশ্বর-ভাবনা এক ও অভিন্ন। একেই আমরা আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতা বলি। সকল মানুষের কান্না বলি। আধ্যাত্মিক অনুভূতি, বিশ্ববোধ, বিশ্বচেতনা বলতে আমরা স্বামী বিবেকানন্দের এমন বাণী স্মরণ করতে পারি ঃ

"সারকথাটি এই যে, একটি সত্তামাত্র আছে, আর সেই এক সত্তাই বিভিন্ন মধ্যবর্তী বস্তুর ভিতর দিয়া দৃষ্ট হইলে তাহাকেই পৃথিবী স্বর্গ বা নরক, ঈশ্বর ভূত-প্রেত, মানব বা দৈত্য, জগৎ বা এইসব যতকিছু বোধ হয়। কিন্তু এই বিভিন্ন পরিণামী বস্তুর মধ্যে যাঁহার কখন পরিণাম হয় না—যিনি এই চঞ্চল মর্তজগতের একমাত্র জীবনস্বরূপ, যে-পুরুষ বহু ব্যক্তির কাম্যবস্তু বিধান করিতেছেন, তাঁহাকে যে-সকল ধীর ব্যক্তি নিজ আত্মার মধ্যে অবস্থিত বলিয়া দর্শন করেন, তাঁহাদেরই নিত্য শান্তিলাভ হয়—আর কাহারও নয়।"[৪]

শিকাগো বক্তৃতায় বিবেকানন্দ সেই 'সর্বোত্তম'-এর কথা বললেন একাধিক অর্থে। জীবন-সাধনার শেষ কথা হলো ঃ "যখন আমিই শ্রোতা ও আমিই বক্তা, যখন আমিই আচার্য ও আমিই শিষ্য, যখন আমিই স্রষ্টা ও আমিই সৃষ্ট, তখনই কেবল ভয় চলিয়া যায়। কারণ আমাকে ভীত করিবার অপর কেহ বা কিছু নাই। আমি ব্যতীত আর কিছুই নাই, তখন আমাকে ভয় দেখাইবে কে ?"

শিকাগো ধর্মমহাসম্মেলনে মানবজাতির উদ্দেশে এমন অভয়বাণী উচ্চারণ করলেন স্বামী বিবেকানন্দ। মানুষকে সবার আগে ভয়শূন্য হতে হবে, সকলের সঙ্গে যুক্ত হতে হবে। 'বিশ্বসাথে যোগে যেথায় বিহারো'। স্বামীজীর শিকাগো বক্তৃতার সারমর্ম—মানুষই ঈশ্বর, ঈশ্বরই মানুষ। এই বিশ্বজগৎ মানুষের কর্মশালা। কর্মযোগ তার একমাত্র প্রার্থনা।

ধর্ম আর কিছু নয়—আগামী দিনের স্বপ্নকে স্বচ্ছ করে তুলতে পারা। এই স্বপ্ন মানুষের অন্তর্দৃষ্টি। মানুষ এই অন্তরতম-এর সাহায্যে একদিন জ্যোতির্ময় হয়ে উঠবে। সেদিনের জন্য প্রস্তুতি চাই। গতকাল আমার বন্দীদশা ছিল, আজ তা ঘুচেছে। আজই আমাকে আগামীকালের জন্য প্রস্তুত হতে হবে। আমার আজকের শক্তি আমার আগামীকালের ভাগ্যবিধাতা, আমার ঈশ্বর। তাঁকে আমার প্রণাম। আমার বিশ্বাস, আমার ধর্ম, আমার কর্ম আমার ঈশ্বরকে চিনতে পারার উপায়মাত্র। এই হলো স্বামী বিবেকানন্দের জীবন ও বাণী। □

৩ বাণী ও রচনা, ৮ম খণ্ড, পৃঃ ৪১০

৪ ঐ, ৩য় খণ্ড, ১ম সং, পৃঃ ৭৬

নিবন্ধ

# 'কথামৃত' এবং শ্রীরামকৃষ্ণ

## স্বামী ব্রহ্মপদানন্দ

'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত' গ্রন্থে শ্রীরামকৃষ্ণের যে-বাণী আমরা পাই তার আকর হলো কথামৃতকার শ্রীম'র ডায়েরী। অবশ্য শ্রীম অনেক স্থলেই নিজেকে অলক্ষ্যে রেখেছেন, অনেক স্থলে ছদ্মনাম ব্যবহার করেছেন। 'মাস্টার', 'একজন ভক্ত', 'মণি' ইত্যাদি তাঁর ছদ্মনাম। যেখানে নিজেকে যত প্রচ্ছন্ন রাখা যায়, যেখানে 'ক্ষুদ্র অহং' যত গোপনে থাকে, সেখানে মহিমার প্রকাশ তত বেশি। বিশ্বস্রষ্টা এত সুন্দর এই জগৎ সৃষ্টি করে সকলের মাঝে নিজেকে সম্পূর্ণ লুকিয়ে রেখেছেন, তাইতো তাঁর মহিমার কোন শেষ নেই। শ্রীরামকৃষ্ণের প্রচুর স্নেহ-ভালবাসা পেয়েও শ্রীম'র একটুও অহঙ্কার অভিমান হয়নি। আবার কিছুই গোপন করেননি শ্রীম; যখন তিরস্কৃত হয়েছেন, তাও অকপটে লিখে রেখেছেন।

'কথামৃতে' স্থান-কাল-পাত্র সবই উপস্থাপিত। পরিবেশ সুন্দরভাবে চিত্রিত। শ্রীরামকৃষ্ণের কথা, সন, সাল,তারিখ ( ইংরেজী ও বাঙলা ) তিথি সহ লিপিবদ্ধ। পরিবেশের বর্ণনা, অন্যান্য বর্ণনা সব নিখুঁত। কিন্তু স্বকীয় চিন্তাধারার দ্বারা পাঠকের ওপরে প্রভাব বিস্তারের আদৌ প্রচেষ্টা করেননি শ্রীম, সহজ-সরলভাবে সকল কথা ও ঘটনা তিনি উল্লেখ করে গিয়েছেন। পাঠকের মনে 'কথামৃত' পাঠকালে এমন একটি ভাব জাগে যেন তিনিও তদানীন্তন শ্রোতৃবর্গের মধ্যেই একজন, অপরের সঙ্গে তাঁকেও উদ্দেশ করে যেন 'কথামৃত' পরিবেশিত। আমরা যারা 'কথামৃত' পাঠ করি বা শুনি, তারাও যেন সেই পরিবেশের মধ্যে শ্রীরামকৃষ্ণের মুখ থেকে তাঁর অমৃতময়ী বাণী শুনি, আমাদের উদ্দেশ করেই যেন শ্রীরামকৃষ্ণ কথা বলছেন, জীবনের কর্তব্য স্মরণ করিয়ে দিচ্ছেন—বলছেন, জীবনের উদ্দেশ্য হলো ভগবান-লাভ। 'কথামৃতে'-এ বারবার একথারই প্রতিধ্বনি। যে-প্রশ্ন অহরহ সকলেরই মনে উদিত হয়, যেসব সমস্যা কোন-না-কোন সময়ে সকল মানুষেরই জীবনে দেখা দেয় এবং যেগুলির সমাধান করা খুবই কঠিন হয়ে পড়ে, সেসব বিষয় আলোচিত হয়েছে 'কথামৃতে'।

'কথামৃত' যত পাঠ করা যায় ততই ভাল লাগে, পড়া হয়ে গেলেও পুরনো হতে চায় না। আজ পাঠ করে একরকম মানে বোঝা গেল, কাল পাঠ করলে আবার আরেক রকম নতুন আলো পাওয়া যাবে। তার ওপর পাঠের পর অনুধ্যান করলে প্রতিটি উপদেশের গভীর মর্মার্থ উপলব্ধি হতে থাকবে। নিত্য নব নব আলোকবর্ষী শ্রীরামকৃষ্ণের বাণী। 'কথামৃতের' স্বাধ্যায় নিত্যই প্রয়োজন। স্বাধ্যায়ের পর যেটি পড়া হলো সেটি নিয়ে একাগ্রভাবে চিন্তা করতে হবে, তাতে যে অমৃতের আস্বাদ উপলব্ধি হতে থাকবে তার কাছে অন্য বস্তু ও বিষয় অকিঞ্চিৎকর হয়ে যাবে। 'কথামৃত' পাঠ বা শ্রবণের সময় শ্রীরামকৃষ্ণের 'দিব্যমূর্তি', যেমন আমরা ফটোয় দেখি, আমাদের চিত্তে যেন উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে। ভগবানের জ্যোতির্ময় রূপ আমাদের চিত্তে, তাঁর অমৃতনিস্যন্দী বাণী আমাদের কর্ণে অনুরণিত হতে থাকে। সেই বাণী কী সুন্দর। যতই শোনা যায়—'মধু মধু মধু'—'মধুরং মধুরং মধুরম্'।

শ্রীরামকৃষ্ণের উপদেশের মধ্যে কতকগুলি ব্যক্তিগত, আবার কতকগুলি সার্বভৌম। সার্বভৌম বাণীগুলি সর্বদেশে সর্বকালে সকলের কল্যাণের জন্য। ব্যক্তিগত বাণীগুলি বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে যেমন প্রযুক্ত হয়েছে, অনুরূপ ক্ষেত্রে অনুসৃত হলে অত্যন্ত কঠিন সমস্যারও সহজ-সরল সমাধান পাওয়া যাবে। শ্রীরামকৃষ্ণের বাণী স্বয়ং ভগবানের বাণী। ভগবান যুগ-প্রয়োজনে শুদ্ধসত্ত্ব শরীর অবলম্বন করে কী অপূর্ব মাধুর্যময় লীলা করেছেন। শ্রীরামকৃষ্ণ যা-কিছু করেছেন

সবই ঈশ্বরের, তাঁর 'মায়ের' অর্থাৎ জগন্মাতার যন্ত্রস্বরূপ হয়ে। তিনি বলেছেনঃ "আমি কিছু জানি না, তবে এসব বলে কে? আমি বলি, 'মা, আমি যন্ত্র, তুমি যন্ত্রী, আমি ঘর, তুমি ঘরণী; আমি রথ, তুমি রথী; যেমন করাও তেমনি করি, যেমন বলাও তেমনি বলি, যেমন চালাও তেমনি চলি; 'নাহং নাহং, তুঁহু তুঁহু।' তাঁরই জয়; আমি তো কেবল যন্ত্র মাত্র।"[১]

শ্রীরামকৃষ্ণের বাণীতে দেখা যায় অজস্র উপমা। উপমা—অর্থালঙ্কার। উপমা হলো ভিন্নজাতীয় দুটি বস্তুর সাদৃশ্য-কথন। সাধারণ লোকের ধারণা, উপমা কবিদের বিলাস। উপমা প্রয়োগে কবির নৈপুণ্যের প্রকাশ। উপন্যাসেও এর প্রয়োগ দেখা যায়, যদিও কাব্যের মতো উপন্যাসে উপমার প্রয়োগ-বাহুল্য নেই। ধর্মের ক্ষেত্রে শাস্ত্রের নিগূঢ় তত্ত্ব বোঝাতে শ্রীরামকৃষ্ণ প্রয়োগ করেছেন অজস্র উপমা—সর্বার্থে সার্থক উপমা। আধ্যাত্মিকতার কঠিন বিষয়, শাস্ত্রের অতি দুর্বোধ্য ও জটিল বিষয় শ্রীরামকৃষ্ণের সহজ-সরল মনোজ্ঞ উপমার প্রয়োগে অতি প্রাঞ্জল সহজবোধ্য হয়ে ফুটে উঠেছে।

শ্রীরামকৃষ্ণের অধিকাংশ উপমাই বাস্তবধর্মী। কোন দুরূহ বিষয় বোঝাতে শ্রীরামকৃষ্ণ অতি সাধারণ জিনিসের উপমা দিয়েছেন, যা আমাদের জানাশোনা, ঘরের জিনিস। যেসব জিনিস হয় আমরা দেখেছি, নয় তাদের কথা শুনেছি, সেসব তাঁর উপমায় স্থান পেয়েছে। কোন উপমাই প্রায় অপরিচিত নয়, অজানা নয়। আমাদের ঘরে-বাইরে সেগুলির প্রায় সমস্তই ছড়িয়ে আছে। যোগীর চক্ষু কেমন? শ্রীরামকৃষ্ণদেব বুঝিয়েছেন, যখন পাখি ডিমে তা দেয়, তখন তার চোখ দুটি যেমন। কী অপূর্ব সার্থক উপমা। ভক্তের কথা বলতে গিয়ে উপমা দিয়েছেন শুকনো দেশলাই-এর। শুকনো দেশলাই একটু ঘষলেই জ্বলে ওঠে, আগুন বেরোয়। প্রকৃত ভক্ত যিনি, ঈশ্বরীয় প্রসঙ্গ হলেই, ভগবানের কথা শুনলেই তাঁর উদ্দীপনা হয়। মানুষের মন যখন সংসারের বিষয়ে ছড়িয়ে পড়ে তখন তার সঙ্গে কিসের উপমা দেওয়া যায়? বড় সহজ কথা নয়। এ যেন মনোবিজ্ঞানের বড় কঠিন প্রশ্ন। শ্রীরামকৃষ্ণ অতি সহজ উপমা দিয়েছেন। বলেছেন, মানুষের ছড়িয়ে পড়া মন যেন খুলে দেওয়া সরষের পুঁটলি। সরষের পুঁটলি খুলে ফেললে যেমন সমস্ত সরষে ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ে, সেগুলি একসঙ্গে করে আবার পুঁটলি বাঁধা বেশ কঠিন ব্যাপার। তেমনি সংসারের নানা বিষয়ে ছড়িয়ে পড়া মনটিকে গুটিয়ে এনে ভগবানের পাদ-পদ্মে দেওয়া, তাঁর চিন্তায় তন্ময় হওয়া খুবই কঠিন কাজ। অতুলনীয় এই উপমা।

সংসারে সব কাজের মধ্যে, নানা ঝামেলার মধ্যে, দুঃখ, দারিদ্র্য, অভাব, অভিযোগ, শোক, তাপ, জ্বালা ও যন্ত্রণার মধ্যে অবস্থান করেও কিভাবে ভগবানের পাদপদ্মে মন রাখতে হবে তা নানাভাবে বলেছেন শ্রীরামকৃষ্ণ। সংসারে আনন্দ ও বেদনা পাশাপাশি। কখনো হাসি, কখনো কান্না। কখনো পূর্ণিমার আলো, আবার কখনো অমানিশার অন্ধকার। নানা ধরনের উপমা দিয়ে তিনি বুঝিয়েছেন। বলেছেনঃ সংসারে থাকতে হবে পাঁকাল মাছের মতো। পাঁকাল মাছ পাঁকে থাকে, কিন্তু তার গায়ে পাঁক লাগে না। 'পাঁক' মানে আবিলতা, মলিনতা। মালিন্যের মধ্যে থেকেও মালিন্য থেকে নিজেকে সম্পূর্ণ মুক্ত রাখা, অনাসক্ত ও অসংপৃক্ত ভাবে অবস্থান করা। গীতার ভাষায় 'পদ্মপত্রমিবাম্ভসা'। কারও দৃষ্টি হয়তো পাঁকাল মাছের ওপর পড়ল, দেখামাত্রই হয়তো মনে হলো, শ্রীরামকৃষ্ণ তো বলেছেন পাঁকাল মাছের মতো থাকতে। সঙ্গে সঙ্গে মনে জাগতে পারে নির্লিপ্ততা অভ্যাসের সঙ্কল্প। তাঁর জানা-শোনা-দেখা জিনিসের উপমা তাই এত চমৎকার, দৃষ্টান্ত হিসাবে প্রয়োগের ক্ষেত্রে অনিবার্য তাদের শক্তি, অব্যর্থ তাদের আবেদন।

সংসারী লোকদের শ্রীরামকৃষ্ণ বলেছেনঃ সংসারে থাকবে বড় মানুষের দাসীর মতো। মনিবের বাড়ির সব কাজ করেও কিন্তু দাসীর মন পড়ে থাকে নিজের বাড়িতে, তাঁর প্রিয়জনের কাছে। তেমনি সংসারের সব কর্ম করেও ভগবানের দিকে লক্ষ্য স্থির রাখতে হবে। আরও কত দৃষ্টান্ত। হাতে তেল মেখে কাঁঠাল ভাঙা, পশ্চিমে মেয়েদের মাথায় জলের কলসী নিয়ে কথা বলতে বলতে পথ চলা, মাথায় বাসন নিয়ে

১ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত, ১।১৭।৪

নর্তকীর নৃত্য—এমনি সব। যেকোন একটি মনে রাখতে পারলেই হলো, সমস্যার সমাধানের পথ পেয়ে যাব। জীবনের গতি পরিবর্তিত হবে। সকল কর্মের মধ্যে অনাসক্তির অভ্যাস আর ঈশ্বরের স্মরণ-মনন কিভাবে করা যাবে তার ধারণা পাব।

রামকৃষ্ণদেব মায়ার আবরণশক্তি বুঝিয়েছেন অভিনব উপায়ে। পানাপুকুরে ঢাকা জলের উপমা দিয়ে। দুর্বোধ্য জিনিসটি অতি সহজবোধ্য করেছেন। পানা ঠেলে দিলেও আবার ফিরে এসে জল ঢেকে ফেলে। ব্রহ্মের স্বরূপও তেমনি আবৃত হয়ে আছে মায়ার আবরণ-শক্তিতে, বারবার সরাতে চেষ্টা করলেও সরতে চায় না। একেবারে হটিয়ে দিতে না পারলে পানাও যায় না, মায়াও যায় না।

শ্রীরামকৃষ্ণ জ্ঞানীর উপমা দিয়েছেন পোড়া দড়ির সঙ্গে। দড়িটি পুড়ে ছাই হয়ে গেছে, আকারটি শুধু দেখা যাচ্ছে। পোড়া দড়িতে বন্ধনের কাজ হবে না। জ্ঞানের অনলে সব অভিমান ও অহংকার দগ্ধ হয়ে গেছে। জ্ঞানীর শরীরটি আছে, কিন্তু তার দ্বারা জগতের অহিত হবে না কোনদিন।

উপমার মতো শ্রীরামকৃষ্ণের গল্পগুলিও অতি সুন্দর। সবই জানা-শোনা-দেখা বস্তু তাঁর গল্পের বিষয়। প্রতিটি গল্প যেন হীরকখণ্ডের মতো উজ্জ্বল হয়ে আছে 'কথামৃতে'। অতি দুর্বোধ্য বিষয়বস্তুও জলের মতো সোজা হয়ে যায় পাঠক ও শ্রোতার কাছে ঐ গল্পগুলির মাধ্যমে। বলার ভঙ্গিতে গল্পগুলি অন্তরস্পর্শী। বুদ্ধ এবং যীশু গল্প বলে বলে যেমন উচ্চতত্ত্ব পরিবেশন করতেন, শ্রীরামকৃষ্ণও তেমনি সহজ ও সরস গল্পের মাধ্যমে শাস্ত্রের নিগূঢ় তত্ত্ব উদ্ঘাটিত করেছেন। 'কথামৃতে'র গল্পের কথা মনে হলেই বাইবেলের গল্পের বিষয় মনে হয়। আবার অনেক সময় শ্রীরামকৃষ্ণের গল্প-গুলির প্রসঙ্গে বৌদ্ধ ও জৈন গ্রন্থের ছোট ছোট গল্পের কথাও স্মৃতিতে জাগে।

'কথামৃতে'র অতুলনীয় গল্পগুলি হৃদয়-মন অধিকার করে থেকে চরম কল্যাণের পথ দেখায়। হাতি-নারায়ণ আর মাহুত-নারায়ণ, রামের ইচ্ছা, বিষ না ঢেলে ফোঁস করা, বহুরূপী, অন্ধের হাতি দেখা, আঁশ চুপড়ির গন্ধ, একই গামলায় নানা রঙে ধোপার কাপড় ছোপানো, কাপড়ের খুঁটে রামনাম লেখা কাগজ, খবরের কাগজে বাড়ি ভাঙার কথা, গুরুর ঔষধে শিষ্যের সংসারের স্বরূপ জ্ঞান, 'কেশব কেশব গোপাল গোপাল হরি হরি হর হর', চার বন্ধুর পাঁচিলে ওঠা, খানা কেটে জল আনা, চিলের মুখে মাছ, ছাগলের পালে বাঘ, ছোট ছেলের ভোগ দেওয়া, মধুসূদন দাদা, মাস্তুলে পাখি বসা, ঢেঁকিতে চিড়ে কোটা, 'কৌপিন কা ওয়াস্তে', বনের পথে তিন ডাকাত, পদ্মলোচনের শাঁখ বাজানো প্রভৃতি প্রত্যেকটি গল্প অনুপম এবং বৈশিষ্ট্যে অনন্য।

শ্রীরামকৃষ্ণের কিছু গল্প অনুধ্যান করলে বোঝা যায়, আখ্যায়িকায় বর্ণিত মুখ্য চরিত্রটি কে। মনে হয়, যিনি কাহিনী পরিবেশন করেছেন, তিনিই যেন গল্পের নায়ক। তাই শ্রীরামকৃষ্ণের 'বহুরূপী' গল্পটি পড়ে মনে প্রশ্ন ওঠে—কে এই গাছতলার মানুষ, যিনি বহুরূপীকে দেখেছেন নানা রঙ ধরতে, আবার দেখেছেন তার কোন রঙ নেই? নিজের মনেই এই প্রশ্নের উত্তর পাওয়া যাবে—যিনি এই সংসাররূপী বৃক্ষের তলে উপবেশন করে ঈশ্বরকে নানা মত ও পথের মাধ্যমে উপলব্ধি করে ঘোষণা করছেন, ঈশ্বর সাকার ও নিরাকার, আবার সাকার-নিরাকারেরও পার, সেই সর্বধর্মসমন্বয়কারী সর্ব-দ্বন্দ্ব-নিরসনকারী শ্রীরামকৃষ্ণ স্বয়ং হচ্ছেন 'গাছ-তলার মানুষ'।

আর সেই অদ্ভুত রজক—যার কাছে রয়েছে অদ্ভুত রঙের পাত্র। যে যে-রঙ চায়, ঐ পাত্রে ডোবালেই সেই রঙে তার কাপড় ছুপবে। কে সেই রজক? শ্রীরামকৃষ্ণ স্বয়ং নয় কি? দ্বৈত, বিশিষ্টা-দ্বৈত, অদ্বৈত, ব্রাহ্মণ, শূদ্র, হিন্দু, মুসলমান, খ্রীস্টান—যে-ভাবেরই লোক আসুন না কেন, তাঁর কাছ থেকে নিজ নিজ ভাব পেয়ে শান্তচিত্তে সাধনপথে অগ্রসর হতে পারেন।

শ্রীরামকৃষ্ণের অনুভূত সত্য বিচিত্রভাবে প্রকাশিত হয়েছে তাঁর শ্রীমুখ থেকে। তাঁর বহু উপদেশের সঙ্গে মিল রয়েছে এমন সব শ্লোক পাওয়া যাবে শাস্ত্রগ্রন্থে—বেদে, পুরাণে, রামায়ণ-মহাভারতে, তন্ত্রে বা অন্যত্র। আবার বাইবেল, কোরান, ত্রিপিটক প্রভৃতিতে তাঁর বাণীর সমার্থক বা অনুরূপ বাণীও মেলে। আবার শঙ্করাচার্য, নানক, কবীর, চৈতন্য-দেব, রামানুজ বা অন্য কোন মহাপুরুষের বাণীর

সঙ্গে তাঁর কোন উপদেশের মিল পাওয়া যাবে। শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলতেন: "পড়ার চেয়ে শোনা ভাল, শোনার চেয়ে দেখা ভাল।" বলতেন: "যাবৎ বাঁচি তাবৎ শিখি।" স্কুল-কলেজের তথাকথিত শিক্ষার দিক দিয়ে না গেলেও তিনি শুনেছিলেন অনেক, দেখেছিলেন অনেক। তাঁর শোনা প্রত্যেকটি কথা তাঁর 'দর্শনের' দ্বারা অর্থাৎ প্রত্যক্ষ অনুভূতিতে প্রোজ্জ্বল। সাধারণ অসাধারণ যেকোন ব্যক্তিরই নিকট তিনি যা শুনতেন, বলার সময় সে-ব্যক্তিকে পূর্ণ স্বীকৃতি দিতেন, বলতেন—এটি অমুকের কাছে শুনেছি, অমুক জায়গায় শুনেছি, অমুক বলত ইত্যাদি। 'কথামৃতের' বহুস্থলে এরূপ উক্তি দেখা যায়। শ্রীরামকৃষ্ণদেব যখন শোনা কথা নিজের অনুভূতির আলোকে ভাস্বর করে প্রকাশ করতেন তখন সেই কথা এক অনন্য মাত্রা লাভ করত।

শ্রীরামকৃষ্ণের বাণী হৃদয়ের বাণী, মস্তিষ্কের বাণী নয়। মস্তিষ্কের বাণীতে বুদ্ধির কসরত, কিন্তু হৃদয়ের বাণীতে থাকে অনুভূতি। হৃদয়ের বাণী সকলেই বোঝে। তাই দেশে বিদেশে—জগতের সর্বত্র শ্রীরামকৃষ্ণের অমৃত বাণীর দুর্বার আকর্ষণ। শ্রীরামকৃষ্ণদেবের বাণীতে যেমন রয়েছে পূর্ণ আধ্যাত্মিকতা, তেমনি আছে যথার্থ মানবিকতা ও সমাজবোধ। বাণীগুলির পশ্চাতে রয়েছে সত্যানুভূতি, তাঁর বিচিত্র উপলব্ধি। প্রতিটি বাণী যেন দার্শনিক বা বিজ্ঞানীর যুক্তিবিচারের কষ্টি-পাথরে যাচাই করা। তাই তাঁর জীবৎকালে বাণী-গুলির আবেদন মানবমনে যেমন অপ্রতিরোধ্য ছিল, তাঁর প্রয়াণের এত বছর পরেও তা তেমনি আছে এবং ভবিষ্যতেও সেইরূপ থাকবে।

শ্রীরামকৃষ্ণের কথা অমৃতকথা। তাঁর কথা শ্রবণমঙ্গল, কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হলে কল্যাণ হবেই। তাঁর 'কথামৃত' সন্তপ্ত মানুষের জীবনে। তাপ, জ্বালা, যন্ত্রণা, অশান্তির অনলে দগ্ধ মানুষের প্রাণে ঢেলে দেয় সর্বতাপহারী শান্তিবারি। □

## প্রচ্ছদ-পরিচিতি

প্রচ্ছদের আলোকচিত্রটি কামারপুকুরের শ্রীরামকৃষ্ণের বাসগৃহের। পাঁচের দশকের প্রথমদিকে আলোকচিত্রটি গৃহীত হয়েছিল।

বর্তমান বর্ষটি (১৯৯৩) শ্রীরামকৃষ্ণ-ভাবান্দোলনের ক্ষেত্রে একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বর্ষ। কারণ, এই বর্ষে শিকাগো ধর্মমহাসম্মেলনে স্বামী বিবেকানন্দের আবির্ভাবের শতবর্ষ পূর্ণ হচ্ছে। শিকাগো ধর্ম-মহাসভায় স্বামী বিবেকানন্দ যে-বাণী প্রচার করেছিলেন এবং যে-বাণী ধর্মমহাসভার সর্বশ্রেষ্ঠ বাণী বলে অভিনন্দিত হয়েছিল, সে-বাণী ছিল সমন্বয়ের বাণী। ধর্মের সমন্বয়, মতের সমন্বয়, সম্প্রদায়ের সমন্বয়, দর্শনের সমন্বয়, আদর্শের সমন্বয়—প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের সমন্বয়, প্রাচীন ও নবীনের সমন্বয়, অতীত বর্তমান ও ভবিষ্যতের সমন্বয়। ভারতবর্ষ সুপ্রাচীন কাল থেকে এই সমন্বয়ের বাণী ও আদর্শ প্রচার করে আসছে। আধুনিক কালে এই সমন্বয়ের সর্বপ্রধান ও সর্বশ্রেষ্ঠ প্রবক্তা শ্রীরামকৃষ্ণ। সাধারণভাবে সনাতন ভারতবর্ষের এবং বিশেষভাবে শ্রীরামকৃষ্ণের সমন্বয়ের বাণীকে স্বামী বিবেকানন্দ বহির্বিশ্বের সমক্ষে উপস্থাপিত করেছিলেন। চিন্তাশীল সকল মানুষই আজ উপলব্ধি করছেন যে, সমন্বয়ের আদর্শ ভিন্ন পৃথিবীর স্থায়িত্বের আর কোন পথ নেই। সমন্বয়ের পথই বর্তমান পৃথিবীর বহুবিধ সমস্যা ও সঙ্কটের মধ্য থেকে উত্তরণের একমাত্র পথ। কামারপুকুরের পর্ণকুটীরে যাঁর আবির্ভাব হয়েছিল দরিদ্র এবং নিরক্ষরের ছদ্মবেশে, তিনিই বর্তমান এবং আগামী কালের বিশ্বের ত্রাণকর্তা। তাঁর বাসগৃহটি তাই আজ ও আগামীকালের সমগ্র পৃথিবীর তীর্থক্ষেত্র। শিকাগোর বিশ্বধর্মসভার মঞ্চে স্বামী বিবেকানন্দের কণ্ঠে শান্তি, সমন্বয় ও সম্প্রীতির যে-বাণী বারংবার উচ্চারিত হয়েছিল—যার মধ্যে নিহিত ভারত ও পৃথিবীর রক্ষাকবচ, তার গর্ভগৃহ কামারপুকুরের এই পর্ণকুটীর।—**যুগ্ম সম্পাদক, উদ্বোধন**

# আত্মজীবনীর পাতায় পাতায় শ্রীরামকৃষ্ণ-অনুধ্যান

## তাপস বসু

ভারতাত্মার মূর্ত প্রতীক, গ্রামীণ ভারতবর্ষের অগণিত মানুষের প্রবহমান লোকচেতনার নিঃশ্বাস বুকে নিয়ে আবির্ভূত হয়েছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণ গত শতাব্দীর তিনের দশকে। তাঁর আবির্ভাবে অপূর্ণ, অশুদ্ধ নবজাগরণের মন্ত্র বৃহত্তর প্রেক্ষাপটে শুদ্ধ ও পূর্ণ হয়ে উঠল। আত্মগত সংকটের নাগপাশ থেকে তিনি মুক্তি দিলেন আমাদের পূর্বসূরীদের; চিনিয়ে দিলেন বিস্মৃতপ্রায় ভারতবাসীকে শাশ্বত জীবনবোধে প্রবাহিত ভারতীয় ছবিটিকে। রবীন্দ্রনাথ তাঁর সম্পর্কে বলেছিলেনঃ "বহু সাধকের বহু সাধনার ধারা,/ধেয়ানে তোমার মিলিত হয়েছে তারা"; আর রোমাঁ রোলাঁ বলেছিলেনঃ "শ্রীরামকৃষ্ণ হলেন ভারতবর্ষের ত্রিশ কোটি মানুষের দু-হাজার বছরের অধ্যাত্ম-সাধনার ঘনীভূত রূপ।" শ্রীরামকৃষ্ণের পুণ্য আবির্ভাব শুধু ভারত-কল্যাণের জন্য নয়—তা সারা পৃথিবীর মানুষের মুক্তির জন্যেও। শ্রীরামকৃষ্ণ-ভাবাদর্শের ক্রমপ্রসারে আজকের ছবিটি সেকথাই প্রমাণ করে দেয়।

মাত্র পঞ্চাশ বছর শ্রীরামকৃষ্ণ মর্তে অধিষ্ঠান করেছেন। তাঁর সমগ্র জীবনই সর্বস্তরের মানুষকে বাঁচার মতো বেঁচে থাকতে শিখিয়েছে। জীবনের উদ্দেশ্য সম্পর্কে করেছে অবহিত। সুন্দর, পূর্ণ, শুদ্ধ মানুষ সুন্দরতম হয়ে উঠুক, হয়ে উঠুক পূর্ণতম শুদ্ধতম; সেই লক্ষ্যেই তিনি উত্তরণের উজ্জ্বল পথটিকে দিয়েছেন চিনিয়ে। তাঁর স্নিগ্ধ-মধুর সংস্পর্শে যাঁরা এসেছেন তাঁরাই ধন্য হয়েছেন; যাঁরা তাঁর কৃপা পেয়েছেন তাঁরা অনুভব করেছেন মুক্তির আস্বাদ, যাঁরা তাঁর সান্নিধ্যে এসেছেন তাঁরা উপলব্ধি করেছেন মানবদেহে ঈশ্বরের আগমনের তাৎপর্য। এ শুধু কথার কথা নয়, গত শতাব্দীতে এবং বর্তমান শতাব্দীতে রচিত কয়েকজন বিশিষ্ট বাঙালীর আত্মজীবনীর পাতায় পাতায় তা ধরা রয়েছে। সেগুলির সঙ্গে দৃষ্টি-বিনিময় করলেই তা আমরা বুঝতে পারব। এই আত্মজীবনীগুলিকে আমরা দুটি ভাগে ভাগ করে নিতে চাই। প্রথমটি হলো যাঁরা শ্রীরামকৃষ্ণকে দেখেছেন, তাঁর কৃপা পেয়েছেন এবং সান্নিধ্যে এসেছেন তাঁদের আত্মকথা, আর দ্বিতীয়টি হলো যাঁরা শ্রীরামকৃষ্ণকে চাক্ষুষ দেখেননি, তাঁর অমৃতনিষ্যন্দী 'কথামৃত' পাঠ করে, শ্রীমা সারদাদেবী ও স্বামী বিবেকানন্দের আলোকে শ্রীরামকৃষ্ণ-কথা জেনে পরোক্ষভাবে তাঁর কৃপালাভ করেছেন, তাঁদের আত্মকথা।

॥ ১ ॥

আত্মকথায় শ্রীরামকৃষ্ণ-অনুধ্যান প্রসঙ্গে যে-নামটি প্রথমেই মনে আসে, তিনি হলেন—সারদাসুন্দরী দেবী (১৮১৯—১৯০৭)। সারদাসুন্দরী দেবী শ্রীরামকৃষ্ণের কৃপাধন্য ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেনের গর্ভধারিণী। স্বামীর উৎসাহে তিনি স্বল্প লেখাপড়া শিখেছিলেন। মাত্র উনত্রিশ বছর বয়সে তিনি বিধবা হন। পরম ভক্তিমতি সারদাসুন্দরী দেবীর দীর্ঘজীবন শোক-তাপের মধ্যে অতিবাহিত হয়। তাঁর আত্মজীবনী তিনি নিজে লেখেননি; মুখে মুখে বলেছেন আর অনুলিখন করেছেন যোগেন্দ্রলাল খাস্তগীর। এটি প্রথমে 'মহিলা' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। সেকালে এই রচনাটি বেশ সাড়া জাগিয়েছিল। সমকালীন সমাজ, তাঁর ব্যক্তিজীবনের নানা ছবি এই আত্মজীবনীতে ধরা আছে। শ্রীরামকৃষ্ণদেবকে তিনি একাধিকবার প্রত্যক্ষ করেছেন। শ্রীরামকৃষ্ণ বেশ কয়েকবার কলকাতায় কেশবচন্দ্র সেনের বাড়িতে এসেছেন। ব্রাহ্মসভায় যোগ দিয়েছেন, কীর্তন করেছেন এবং সমাধিস্থ হয়েছেন। কেশবচন্দ্রও বহুবার দক্ষিণেশ্বরে গিয়ে শ্রীরামকৃষ্ণের সান্নিধ্য পেয়েছেন। শ্রীরামকৃষ্ণের সংস্পর্শে তাঁর জীবন-প্রবাহটি গিয়েছিল বদলে। সারদাসুন্দরী দেবী সেই অধ্যায়ের সঙ্গে পরিচিত ছিলেন। তাঁর আত্ম-জীবনীতে শ্রীরামকৃষ্ণকে বিশেষভাবে স্মরণ করেছেনঃ

"রামকৃষ্ণ পরমহংস মহাশয় একদিন আদি-সমাজ (আদি ব্রাহ্মসমাজ) দেখিতে গিয়াছিলেন। সেখানে তিনজন উপাসনা করিতেছিলেন। পরমহংস উপাসনার পর বলিলেন, 'এই তিনজনের ভিতর একজনকে দেখে বুঝিতে পারিলাম ইঁহারই হইয়াছে।' তারপর তিনি কেশবের সঙ্গে ভাব করেন।

তারপর থেকে আমাদের বাড়িতে আসিতেন। ঐ তেতলার ঘরে প্রথম আমি তাঁহাকে দেখি। কেশবের কাছে এসে তিনি কেশবের হাত ধরে নাচিতেন এবং গান গাহিতেন। আর একদিন কমল-কুটির মাঘোৎসবের সময় বরণের দিন, সংকীর্তনের পর আমি বলিলাম, 'আপনি কিছু খান।' তিনি খানিকক্ষণ ভাবিয়া বলিলেন, 'হাঁ ; মা বলিয়া দিয়া-ছিলেন, কেশবের বাড়ি থেকে একখানি জিলিপি খেয়ে আসিস।' আমি একখানি জিলিপি দিলাম, তিনি হাত কাত করিয়া লইয়া খাইলেন। তারপর যখন চলিয়া যান, কেশবকে বলিলেন, 'দেখ কেশব, আমি যখন আসি, মা বলিয়াছিলেন, কেশবের বাড়িতে যাইতেছ, একটি কুলপী বরফ খেয়ে এসো। তখন ওখানে কুলপীওয়ালা ছিল না, কেশব কুলপী কোথায় পান ভাবিতেছেন, এমন সময় হঠাৎ একজন কুলপীওয়ালা আসিল ; একটি কুলপী কেশব দিলেন, তিনি খুব আহ্লাদ করিয়া খাইলেন। সেই বরণের দিন সংকীর্তনের সময় কেশব ও পরমহংস অনেকক্ষণ হাত ধরাধরি করিয়া নাচিলেন।...

"তাঁহাকে ( শ্রীরামকৃষ্ণকে ) আমার বড় ভাল লাগিত। আমি প্রায়ই দক্ষিণেশ্বরে যাইতাম। তিনি যে ভাল ভাল কথা বলিতেন তাহা এখন আমার সব মনে নাই। একবার বলিয়াছিলেন, 'দ্যাখ্ মা, ভায়ে ভায়ে দড়ি মাপে, আর বলে, এই দিকটা তোর আর এই দিকটা আমার। কিন্তু কার জায়গা মাপছে আর কেই বা নেয়, সেটা কিছু ঠিক করে না'।..."[১]

সারদাসুন্দরী দেবীর আত্মজীবনীর উপরোক্ত অংশে যে ঐতিহাসিক তথ্যগুলি পরিবেশন করলেন —তা হলো (ক) শ্রীরামকৃষ্ণের আদি ব্রাহ্মসমাজে পদার্পণ প্রসঙ্গ। (খ) উপাসনারত তিনজনের মধ্যে কেশবচন্দ্রের বিশেষত্ব প্রত্যক্ষ করে তিনি তাঁর সঙ্গে সংযোগের সূত্রটি গ্রথিত করেন। (গ) কেশব-চন্দ্রের কমলকুটিরে ( বর্তমানে রাজাবাজারে অবস্থিত ভিক্টোরিয়া স্কুল ও কলেজ ) শ্রীরামকৃষ্ণের পদার্পণের সংবাদ। (ঘ) কেশবচন্দ্রের বাড়িতে মাঘোৎসবে যোগ দিয়ে সংকীর্তনে অংশগ্রহণ। (ঙ) শ্রীরামকৃষ্ণ এবং তাঁর কথামৃতের অমোঘ আকর্ষণে সারদাসুন্দরী দেবী দক্ষিণেশ্বরে কেশবচন্দ্রের সঙ্গে ছুটে গেছেন।

এরপরেই যাঁর আত্মজীবনীর সঙ্গে আমরা দৃষ্টি-বিনিময় করব, তিনি হলেন প্রখ্যাত ব্রাহ্মনেতা শিবনাথ শাস্ত্রী। জীবনের টুকরো টুকরো নানা প্রসঙ্গে ভরপুর শিবনাথ শাস্ত্রীর 'আত্মচরিতের' মধ্যপর্বে 'রামকৃষ্ণ পরমহংসের সহিত যোগ' শিরো-নামের অংশটি বর্ণিত হয়েছে এইভাবে ঃ

"একদিকে যেমন খ্রীস্টীয় শাস্ত্র ও খ্রীস্টীয় সাধুর ভাব আমার মনে আসে, অপরদিকে এই সময়েই রামকৃষ্ণ পরমহংসের সহিত আমার আলাপ হয়। তাহার ইতিবৃত্ত এই ঃ আমাদের ভবানীপুর সমাজের ( ব্রাহ্মসমাজ ) একজন সভ্য দক্ষিণেশ্বরে বিবাহ করিয়াছিলেন। তিনি মধ্যে মধ্যে শ্বশুর বাড়ি হইতে আসিয়া আমাকে বলিতেন যে, দক্ষিণে-শ্বরে কালীর মন্দিরে একজন পূজারী ব্রাহ্মণ আছেন, তাঁহার কিছু বিশেষত্ব আছে। এই মানুষটি ধর্ম-সাধনের জন্য অনেক ক্লেশস্বীকার করিয়াছেন। শুনিয়া রামকৃষ্ণকে দেখিবার ইচ্ছা হইল। যাইব যাইব করিতেছি, এমন সময় 'মিরার' ( 'ইন্ডিয়ান মিরার' ) কাগজে দেখিলাম যে, কেশবচন্দ্র সেন মহাশয় তাঁহার সঙ্গে দেখা করিতে গিয়াছিলেন এবং তাঁহার সহিত কথা কহিয়া প্রীত ও চমৎকৃত হইয়া আসিয়াছেন। শুনিয়া দক্ষিণেশ্বরে যাইবার ইচ্ছাটা প্রবল হইয়া উঠিল। আমার সেই বন্ধুটিকে সঙ্গে করিয়া একদিন গেলাম।

"প্রথম দর্শনের দিন হইতেই আমার প্রতি রামকৃষ্ণের বিশেষ ভালবাসার লক্ষণ দৃষ্ট হইল। আমিও তাঁহাকে দেখিয়া চমৎকৃত হইলাম। আর কোন মানুষ ধর্মসাধনের জন্য এত ক্লেশস্বীকার করিয়াছেন কিনা জানি না। রামকৃষ্ণ আমাকে বলিলেন যে, তিনি কালীর মন্দিরে পূজারী ছিলেন। সেখানে অনেক সাধু-সন্ন্যাসী আসিতেন। ধর্ম-সাধনার্থ তাঁহারা যিনি যাহা বলিতেন, সমুদয় তিনি করিয়া দেখিয়াছেন, এমনকি, এইরূপ সাধন করিতে করিতে তিনি ক্ষেপিয়া গিয়াছিলেন, কিছুদিন উন্মাদগ্রস্ত ছিলেন। তদ্ভিন্ন তাঁহার একটা পীড়ার সঞ্চার হইয়াছিল যে, তাঁহার ভাবাবেশ হইলেই তিনি সংজ্ঞাহীন হইয়া যাইতেন। এই সংজ্ঞাহীন অবস্থাতে আমি তাঁহাকে অনেকবার দেখিয়াছি ; এমনকি

১ আত্মকথা— নরেশচন্দ্র জানা, সম্পাদনা ঃ মানু জানা, অনন্য প্রকাশন, ১ম খণ্ড, ১ম প্রকাশ, ১৯৮১, পৃঃ ৩৯

অনেকদিন পরে আমাকে দেখিয়া আনন্দে অধীর হইয়া ছুটিয়া আসিয়া আমার আলিঙ্গনের মধ্যেই তিনি সংজ্ঞাহীন হইয়া গিয়াছেন।

"সে যাক। রামকৃষ্ণের সঙ্গে মিশিয়া এই একটা ভাব মনে আসিত যে, ধর্ম এক, রূপ ভিন্ন ভিন্ন মাত্র। ধর্মের এই উদারতা ও বিশ্বজনীনতা রামকৃষ্ণ কথায় কথায় ব্যক্ত করিতেন। ইহার একটি নিদর্শন উজ্জ্বলরূপে স্মরণ আছে। একবার আমি দক্ষিণেশ্বরে যাইবার সময় আমার ভবানীপুরস্থ খ্রীস্টীয় পাদরী বন্ধুটিকে সঙ্গে লইয়া গেলাম, তিনি আমার মুখে রামকৃষ্ণের কথা শুনিয়া তাঁহাকে দেখিতে গেলেন। আমি গিয়া যেই বলিলাম 'মশাই, এই আমার একটি খ্রীস্টান বন্ধু আপনাকে দেখতে এসেছেন', অমনি রামকৃষ্ণ প্রণত হইয়া মাটিতে মাথা দিয়া বলিলেন, 'যীশুখ্রীস্টের চরণে আমার শত শত প্রণাম।' আমার খ্রীস্টীয় বন্ধুটি আশ্চর্যান্বিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, 'মশাই যে যীশুর চরণে প্রণাম করছেন, তাকে আপনি কি মনে করেন?' উত্তর—কেন, ঈশ্বরের অবতার।

খ্রীস্টীয় বন্ধুটি বলিলেন, ঈশ্বরের অবতার কিরূপ? কৃষ্ণাদির মতো?

রামকৃষ্ণ—হ্যাঁ, সেইরূপ। ভগবানের অবতার অসংখ্য, যীশুও এক অবতার।

খ্রীস্টীয় বন্ধু—আপনি অবতার বলতে কি বোঝেন?

রামকৃষ্ণ—সে কেমন তা জানো? আমি শুনেছি, কোন কোন স্থানে সমুদ্রের জল জমে বরফ হয়। অনন্ত সমুদ্র পড়ে রয়েছে, এক জায়গায় কোন বিশেষ কারণে খানিকটা জল জমে গেল; ধরবার ছোঁবার মতো হলো। অবতার যেন কতকটা সেইরূপ। অনন্ত শক্তি জগতে ব্যাপ্ত আছেন, কোন বিশেষ কারণে কোন এক বিশেষ স্থানে খানিকটা ঐশী শক্তি মূর্তি ধারণ করলে, ধরবার ছোঁবার মতো হলো। যীশু প্রভৃতি মহাজনদের যা-কিছু শক্তি সে ঐশী শক্তি, সুতরাং তাঁরা ভগবানের অবতার।

"রামকৃষ্ণের সহিত মিশিয়া আমি ধর্মের সার্বভৌমিকতার ভাব বিশেষরূপে উপলব্ধি করিয়াছি।

"ইহার পর রামকৃষ্ণের সহিত আমার মিত্রতা আরও ঘনীভূত হয়। এমন দিনও গিয়াছে, আমাকে অনেকদিন দেখিতে না পাইয়া তিনি ব্যাকুল হইয়া আমার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আমার ভবনে আসিয়াছেন।"[২]

শিবনাথ শাস্ত্রীর বক্তব্যের প্রথমাংশে তাঁর দুটি ভুল ধারণার পরিচয় পাই—(ক) শ্রীরামকৃষ্ণ 'উন্মাদ-গ্রস্ত' ছিলেন—এটা মোটেই ঠিক নয়। ঈশ্বরসাধনায় মত্ত প্রেমিকপুরুষ তিনি। নানা অনুভূতির স্তরে বিচরণ করতে করতে তাঁর স্বভাব হয়ে পড়েছিল সাধারণ এবং কেতাবী মানুষজনের থেকে আলাদা। তাই লোকে তাঁকে পাগল ভাবত। (খ) শ্রীরামকৃষ্ণ ঈশ্বরচিন্তায় যখন বিভোর হতেন কিংবা শুদ্ধ মনের মানুষের দেখা পেতেন (যেমন নরেন্দ্রনাথ, কেশবচন্দ্র, শিবনাথ) তখনই তিনি সমাধিস্থ হতেন। এই সমাধিস্থ হওয়া আর 'সংজ্ঞাহীন' হওয়া—এক জিনিস নয়। শিবনাথ শাস্ত্রীর মতো প্রাজ্ঞ মানুষ এমন ভুল কেন করলেন—তা বোঝা যায় না। কেশবচন্দ্র কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণের সমাধিস্থ হওয়ার বিষয়টিকে চিন্তায়, চেতনায় প্রাধান্য দিয়েছেন। এছাড়া শাস্ত্রীমশায়ের বাকি অনুভব বিশ্বস্ত। অবতারের প্রকাশ-প্রয়োজনীয়তা, ভিন্ন ধর্মের মানুষের প্রতি শ্রীরামকৃষ্ণের সমান শ্রদ্ধাজ্ঞাপন, ধর্মের সার্বভৌমত্ব আবিষ্কার, ঈশ্বরের জন্য ব্যাকুলতা, দক্ষিণেশ্বরে শ্রীরামকৃষ্ণের অমোঘ আকর্ষণে শিবনাথের ছুটে যাওয়া ইত্যাদি প্রসঙ্গে শিবনাথ শাস্ত্রী যা জানিয়েছেন তা শুধু বিশ্বস্তই নয়, ইতিহাসের দিক থেকেও সত্য। শিবনাথ শাস্ত্রীর বর্ণনাভঙ্গিও প্রাণবন্ত এবং চমৎকার।

আরও একজন ব্রাহ্মনেতা কৃষ্ণকুমার মিত্র তাঁর 'আত্মচরিত'-এ শ্রীরামকৃষ্ণকে শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করেছেন। ব্রাহ্মসমাজের তাত্ত্বিক নেতারূপে তাঁর একটি বিশেষ ভূমিকা ছিল। স্বামী বিবেকানন্দ (তখন নরেন্দ্রনাথ) যখন ব্রাহ্মসভায় যেতেন (৮১নং বারাণসী ঘোষ স্ট্রীটে) তখন কৃষ্ণকুমারের সঙ্গে স্বামীজীর ঘনিষ্ঠতা গড়ে উঠেছিল। কৃষ্ণকুমার স্বামীজীর গানের খুব ভক্ত ছিলেন। আত্মচরিতে শ্রীরামকৃষ্ণ-প্রসঙ্গ উত্থাপনের আগে স্বামীজীর কথা তিনি শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করেছেন। তাঁর শ্রীরামকৃষ্ণ-

২ শিবনাথ রচনা সংগ্রহ, সাক্ষরতা প্রকাশন, ১৩৮৬, পৃঃ ৯৮-৯৯

স্মৃতির প্রাসঙ্গিক অংশ :

"আচার্য কেশবচন্দ্র, পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী প্রভৃতি ব্রাহ্মরাই রামকৃষ্ণকে দক্ষিণেশ্বরের কালীবাড়ির অজ্ঞাত কক্ষ হইতে জনসমাজের নিকট আনয়ন করিয়া তাঁহার হৃদয়ে বিশ্বব্যাপী উদারতার আদর্শ প্রদান করিয়াছিলেন এবং তাঁহাকে 'পরমহংস' উপাধি দান করিয়াছিলেন। তৎপূর্বে তাঁহাকে লোকে কালীবাড়ির পুরোহিত বলিয়া জানিত।

"নরেন্দ্রনাথ (স্বামী বিবেকানন্দ) রামকৃষ্ণের সরল ও ভক্তিপূর্ণ জীবন দর্শন করিয়া তাঁহার দিকে আকৃষ্ট হইয়াছিলেন। নরেন্দ্রনাথ পরমহংসের শিষ্য হইয়াছিলেন বটে, কিন্তু এই শিষ্য গুরুকে অসাম্প্রদায়িক করিয়া তুলিয়াছিলেন।

"পরমহংসকে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সিঁদুরিয়াপট্টির নেপালচন্দ্র ও গোপালচন্দ্র মল্লিকের বাটীর ব্রহ্মোৎসবে এবং বেণীমাধব দাসের [?] সিঁথি উত্তরপাড়ার বাগানবাটীর উৎসবে বহুবার দেখিয়াছি। তাঁহার ভক্তিপূর্ণ সুমিষ্ট ব্রহ্মসঙ্গীত শ্রবণ করিয়াছি। 'কত ভালবাস গো মানবসন্তানে'—ব্রহ্মসঙ্গীতের এই গানটি তিনি এমন তন্গত হইয়া গাহিতেন যে, সমস্ত লোক আত্মহারা হইয়া ব্রহ্ম-কৃপাসাগরে নিমজ্জিত হইয়া পড়িতেন, গাহিতে গাহিতে তাঁহার সমাধি হইত, তখন "ওঁ, ওঁ" বহুক্ষণ এই শব্দ উচ্চারণ করা হইত এবং তিনি সংজ্ঞালাভ করিতেন।

"তাঁহার এই সমাধির অবস্থা আমি অনেকবার দেখিয়াছি। তিনি ব্যাকুল চিত্তে ব্রহ্মোৎসবে যোগদান করিতে আসিতেন এবং প্রেমে উন্মত্ত হইতেন।"[৩]

কৃষ্ণকুমার মিত্র তাঁর আত্মকথায় যে-তথ্য পরিবেশন করেছেন সে-সম্পর্কে বলা যায় যে, (ক) কলকাতার শিক্ষিত সমাজে শ্রীরামকৃষ্ণের পরিচিত হওয়ার জন্য কেশবচন্দ্রের ভূমিকা অনস্বীকার্য কিন্তু শিবনাথ শাস্ত্রী প্রমুখের সে-ভূমিকা ছিল না। ইতঃপূর্বেই রানী রাসমণি প্রতিষ্ঠিত দক্ষিণেশ্বর মন্দির ও পূজারীর কথা তখন বাংলাদেশের নানা স্থানে ছড়িয়ে পড়েছিল। (খ) কেশবচন্দ্র এবং শিবনাথ শাস্ত্রী শ্রীরামকৃষ্ণের হৃদয়ে কখনই 'বিশ্বব্যাপী উদারতা' 'প্রদান' করেননি। এমন দাবি সংশ্লিষ্টজনেরাও কখনো করেননি। আর 'যত মত তত পথের' সাধনা, হিন্দু-ইসলাম-খ্রীস্টীয় সাধনার মধ্য দিয়ে সব ধর্মই যে সত্য তার জীবন্ত প্রামাণ্য রূপের উদ্গাতা শ্রীরামকৃষ্ণ আপন সাধনায়, মহাভাবে, প্রসারিত অনুভবে, দৃষ্টান্ত স্থাপন করে নিজেই বিশ্বব্যাপী উদারতার আদর্শকে উপলব্ধি করেছেন। রাজনারায়ণ বসুর জামাতা[৪] কৃষ্ণকুমারের তা বোধগম্য হয়নি। (গ) নরেন্দ্রনাথ মোটেও শ্রীরামকৃষ্ণকে 'অসাম্প্রদায়িক' করে তোলেননি। 'যত মত তত পথে'র উদ্গাতা শ্রীরামকৃষ্ণ স্বয়ং ছিলেন অসাম্প্রদায়িকতার উজ্জ্বলতম বিগ্রহ। তাঁর সাধনজীবন, সাধনোত্তর জীবন—সর্বত্রই তিনি অসাম্প্রদায়িক। স্বয়ং স্বামী বিবেকানন্দ শ্রীরামকৃষ্ণদেব সম্পর্কে অনুধ্যান করার সময় তিনি যে কোন বিশেষ সম্প্রদায় গঠন করতে আসেননি, বিশ্বব্যাপী উদারতার আদর্শে তিনি যে সমুজ্জ্বল, তা বারবার উল্লেখ করেছেন। সবকিছু মিলিয়েছেন তিনি। নতুন মত, নতুন পথ, নতুন সম্প্রদায় নয়—যে-সত্য ভারতের মর্মে মর্মে প্রবাহিত তার রূপটিকে তিনি আপন উপলব্ধির আলোয় আলোকিত করে দিয়েছিলেন। কৃষ্ণকুমার মিত্র এক্ষেত্রেও অজ্ঞতার পরিচয় দিয়েছেন। (ঘ) তবে শ্রীরামকৃষ্ণের কীর্তনানন্দে 'সমাধিস্থ' হয়ে যাওয়া, ব্যাকুল চিত্তে, প্রেমিক হৃদয়ে তাঁর ঈশ্বরোপাসনার যে-ছবিটি কৃষ্ণকুমার এঁকেছেন তা বিশ্বস্ত এবং মনোজ্ঞ।

কবি নবীনচন্দ্র সেন তিনটি খণ্ডে বিন্যস্ত তাঁর আত্মজীবনী 'আমার জীবন'-এ মর্মস্পর্শী ভাষায়, হৃদয়-নিষিক্ত অনুভবে শ্রীরামকৃষ্ণকে স্মরণ করেছেন এবং শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করেছেন। তিনি লিখেছেন :

"একদিন আলিপুর কোর্টে ফৌজদারি মোকদ্দমায় নিবিষ্ট আছি, এমন সময় ডাকে একখানি পত্র পাইলাম। পত্রপ্রেরক লিখিয়াছেন যে, তিনি একজন নিতান্ত ঘৃণিত চরিত্রের ইন্দ্রিয়পরায়ণ লোক ছিলেন। ৺রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের চরণছায়া

৩ আত্মচরিত—কৃষ্ণকুমার মিত্র, ২৯৪ দরগা রোড, কলকাতা, ১৯৩৭, পৃঃ ১৫৫

৪ রাজনারায়ণ বসুর কন্যা লীলাবতীর সঙ্গে ব্রাহ্মনেতা কৃষ্ণকুমারের বিবাহে রবীন্দ্রনাথ রচিত সঙ্গীত নরেন্দ্রনাথ (তখন ব্রাহ্মসমাজের সঙ্গে যুক্ত) গেয়েছিলেন। লীলাবতী দেবী পরবর্তী কালে আত্মজীবনী লিখলেও সেখানে এই ঐতিহাসিক ঘটনাটির উল্লেখ করেননি। দ্রষ্টব্য : অন্তঃপুরের আত্মকথা—চিত্রা দেব, আনন্দ পাবলিশার্স, ১৯৮৪, পৃঃ ৭৫

পাইয়া তিনি উদ্ধারলাভ করিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন, আমার 'রৈবতক', 'কুরুক্ষেত্র' ও 'অমিতাভ' তিনি তাঁহার ধর্মগ্রন্থ বলিয়া মনে করেন। 'অমিতাভ' পাঠ শেষ করিয়াই পত্র লিখিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন, আমি (নবীনচন্দ্র) বারংবার জিজ্ঞাসা করিয়াছি, শ্রীভগবান তাঁহার শ্রীমুখের কথা প্রতিপালন করিবার জন্য আবার কবে আসিবেন,—'পূর্ণ কাল, পূর্ণ ব্রহ্ম আসিবে কখন?' তিনি ত্রেতায় 'রাম' নাম এবং দ্বাপরের 'কৃষ্ণ' নাম একত্র করিয়া 'রামকৃষ্ণ' নামে আবার আসিয়াছিলেন। অতএব আমাকে এই 'রামকৃষ্ণ'র লীলাও লিখিতে হইবে। এই কয়টি কথায় আমার প্রাণস্পর্শ করিল। তাঁহার পত্রের ভক্তির উচ্ছ্বাসে আমার অশ্রুধারা বহিতে লাগিল। আমি যে নরকতুল্য কোর্টে বসিয়াছিলাম তাহা আমি ভুলিয়া গিয়াছিলাম। আমার অশ্রু দেখিয়া সমবেত আমলা, উকিল ও মোক্তারগণ মনে করিলেন, আমি কোন শোকসংবাদ পাইয়াছি। আমি তখন সাশ্রু হাসিয়া পত্রখানি তাঁহাদের পড়িয়া শুনাইলাম, দেখিলাম, পত্র তাঁহাদেরও হৃদয় স্পর্শ করিল। কিছুক্ষণ উহার লিখিত বিষয় সম্বন্ধে তাঁহাদের দুই-একজনের সহিত আলোচনা হইল। সমস্ত কোর্ট নীরবে ভক্তিভাবে শুনিল এবং সেই নরকেও এমন একটি পবিত্র গাম্ভীর্যের ছায়া আসিয়া পড়িল। উকিল-মোক্তারগণ বলিলেন যে, ইহার পর আর ফৌজদারী মোকদ্দমা করিতে তাঁহাদের মন যাইতেছে না। অতএব মোকদ্দমায় তারিখ ফেলিয়া দিয়া, সেই কোর্টে বসিয়া··· অবশিষ্ট সময় কেমন এক বিহ্বল অবস্থায় কাটাইলাম। বহু পূর্ব হইতে ৺রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের আমি একজন অযোগ্য ভক্ত ছিলাম। কিন্তু তাঁহার নাম ইতিপূর্বে এমন আমার প্রাণে লাগে নাই।"[৫]

নবীনচন্দ্রের আত্মজীবনীতে শ্রীরামকৃষ্ণ-প্রসঙ্গ উত্থাপনে আমরা যা পাচ্ছি তা হলো—(ক) প্রচণ্ডভাবে এক 'ইন্দ্রিয়পরায়ণ' ব্যক্তি শ্রীরামকৃষ্ণের 'চরণছায়া' অর্থাৎ কৃপা পেয়ে উদ্ধারলাভ করেছেন। (খ) 'রৈবতক', 'কুরুক্ষেত্র' কাব্যে নবীনচন্দ্র ভগবানের উদ্দেশে জিজ্ঞাসা রেখেছেন যে, আবার কবে তাঁর আবির্ভাব ঘটবে? সমকালেই যে 'রাম' এবং 'কৃষ্ণে'র মিলিত রূপে 'রামকৃষ্ণে'র পুণ্য আবির্ভাব ঘটেছে তা পত্রলেখক নবীনচন্দ্রকে স্মরণ করিয়ে দেওয়ায় নবীনচন্দ্র আবেগে-উচ্ছ্বাসে আপ্লুত হয়েছেন। (গ) শুধু তিনিই নন, আলিপুর কোর্টের ঐ কক্ষে উপস্থিত সকলেই শ্রীরামকৃষ্ণের নাম শ্রবণে উৎফুল্ল হয়ে উঠেছিলেন। নবীনচন্দ্রের কথায় 'নরকতুল্য' কোর্টও শ্রীরামকৃষ্ণ-নামে পবিত্র হয়ে উঠল। যদিও শ্রীরামকৃষ্ণকে নিয়ে তিনি উত্তরকালে কোন জীবনীকাব্য লেখেননি, হয়তো সময় পাননি; তবে শ্রীরামকৃষ্ণের ঐতিহাসিক আবির্ভাব ও তার তাৎপর্য সম্পর্কে উত্তরোত্তর শ্রদ্ধা-ভক্তি বর্ধিত হয়েছে। আত্মজীবনী 'আমার জীবন'-এর দ্বিতীয় খণ্ডে নবীনচন্দ্র ইতিহাসের অমোঘ সত্যকে মেলে ধরে ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্রের জীবনে ও ধর্মাদর্শে কিভাবে শ্রীরামকৃষ্ণের প্রভাব প্রত্যক্ষ এবং উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে তার বিবরণ দিয়েছেন এভাবে: "কেশববাবু তদানীন্তন খ্রীস্টধর্মের প্রাবল্যে বেদান্তমূল হইতে ব্রাহ্মধর্ম বিচ্ছিন্ন করিয়া উহা খ্রীস্টধর্মের স্রোতে এরূপ বেগে ভাসাইয়া দিয়াছিলেন যে, তাঁহার 'যীসাস ক্রাইস্ট ইউরোপ এ্যান্ড এশিয়া' বক্তৃতার পর তাঁহার (কেশবচন্দ্রের) বড় বাকি নাই বলিয়া মিশনারীরা আনন্দে নৃত্য করিয়াছিল। তাহার পর শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসের আকর্ষণে পড়িয়া কেশববাবু নিজের ভ্রম বুঝেন এবং রামকৃষ্ণের ধর্মই 'নবধর্ম' ('নববিধান') নাম দিয়া প্রচার করেন।"[৬]

বঙ্গের শ্রেষ্ঠ নট ও নাট্যকার গিরিশচন্দ্র ঘোষ শ্রীরামকৃষ্ণের মহাপ্রয়াণের পরে আত্মকথামূলক দুটি রচনা—'ভগবান শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব' ও 'পরমহংসদেবের শিষ্য স্নেহ'-এ শ্রীরামকৃষ্ণ সম্পর্কে অন্তরঙ্গ বহু কথা শুনিয়েছেন। যদিও এই দুটি রচনাকে পুরোপুরি আত্মজীবনী বলা যাবে না তাই আমরা বিস্তৃত আলোচনা থেকে বিরত রইলাম।

এই পর্বে শেষ যে-নামটি আমাদের বিশেষভাবেই উচ্চারণ করতে হবে, সেই নামটি হলো নটী বিনোদিনী। বিনোদিনী গত শতাব্দীর স্বনামধন্য ব্যক্তিত্ব। তিনি অভিনেত্রী শুধু নন,

৫ আমার জীবন—নবীনচন্দ্র সেন, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, ২য় খণ্ড, ১৩৬৩, পৃঃ ২৪৬ ৬ ঐ, পৃঃ ১৭৩

শ্রীরামকৃষ্ণের কৃপালাভেও ধন্য। সেই ঘটনা বঙ্গরঙ্গমঞ্চের ইতিহাসে স্মরণীয় একটি অধ্যায়ও বটে। তাঁর আত্মজীবনীটির নাম—'আমার কথা ও অন্যান্য রচনা'। এখানে সেকালের নানা প্রসঙ্গ উত্থাপনের মধ্যে যে-প্রসঙ্গটি স্বর্ণবিভায় উদ্ভাসিত হয়েছে তা অবশ্যই শ্রীরামকৃষ্ণ-প্রসঙ্গ। সেই অংশে দৃষ্টি প্রসারিত করলে আমরা জানতে পারি, প্রথমে অন্ধকার জীবনের বাসিন্দা, পরে সেই 'অন্ধকারের উৎস থেকে উৎসারিত আলো'য় উদ্ভাসিত বিনোদিনীর জীবনের চরম 'শ্লাঘার' কথা।

বিনোদিনী লিখেছেন : "আমার জীবনের মধ্যে চৈতন্যলীলার অভিনয় আমার সকল অপেক্ষা শ্লাঘার বিষয় এই যে, আমি পতিতপাবন ৺পরমহংসদেব রামকৃষ্ণ মহাশয়ের দয়া পাইয়াছিলাম। কেননা, সেই পরমপূজনীয় দেবতা 'চৈতন্যলীলা' অভিনয় দর্শন করিয়া আমায় তাঁহার শ্রীপাদপদ্মে আশ্রয় দিয়াছিলেন। অভিনয়কার্য শেষ হইলে আমি শ্রীচরণ-দর্শন জন্য যখন আপিসঘরে তাঁহার চরণ-সমীপে উপস্থিত হইতাম, তিনি প্রসন্ন বদনে উঠিয়া নাচিতে নাচিতে বলিতেন, 'হরি গুরু, গুরু হরি। বল মা, হরি গুরু, গুরু হরি'। তাহার পর উভয় হস্ত আমার মাথার উপর দিয়া আমার পাপদেহকে পবিত্র করিয়া বলিতেন যে, 'মা, তোমার চৈতন্য হউক।' তাঁহার সেই সুন্দর প্রসন্ন ক্ষমাময় মূর্তি[তে] আমার ন্যায় অধম জনের প্রতি কি করুণাময় দৃষ্টি!" পাতকীতারণ, পতিতপাবন যেন আমার সম্মুখে দাঁড়াইয়া আমায় অভয় দিয়াছিলেন। হায়! আমি বড়ই ভাগ্যহীনা অভাগিনী! আমি তবুও তাঁহাকে চিনিতে পারি নাই। আবার মোহ জড়িত হইয়া জীবনকে নরকসদৃশ করিয়াছি।

"আর একদিন যখন তিনি অসুস্থ হইয়া শ্যামপুকুরের বাটীতে বাস করিতেছিলেন, আমি শ্রীচরণ দর্শন করিতে যাই তখনও সেই রোগক্লান্ত প্রসন্ন বদনে আমায় বলিলেন, 'আয় মা বোস'। আহা কি স্নেহপূর্ণ ভাব! এ নরকের কীটকে যেন ক্ষমার জন্য সতত আগুয়ান! কতদিন তাঁহার প্রধান শিষ্য নরেন্দ্রনাথের 'সত্য শিবং' মঙ্গলগীতি মধুর কণ্ঠে থিয়েটারে বসিয়া শ্রবণ করিয়াছি। আমার থিয়েটার কার্যকরী দেহকে এইজন্য ধন্য মনে করিয়াছি। জগৎ যদি আমায় ঘৃণার চক্ষে দেখেন, তাতেও আমি ক্ষতি বিবেচনা করি না। কেননা, আমি জানি যে, পরমারাধ্য পরমপূজনীয় ৺রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব আমায় কৃপা করিয়াছিলেন। তাঁর সেই পীযূষপূরিত আশাময়ী বাণী—'হরি গুরু, গুরু হরি' আমায় আজও আশ্বাস দিতেছে। যখন অসহনীয় হৃদয়ভারে অবনত হইয়া পড়ি, তখন যেন সেই ক্ষমাময় প্রসন্ন মূর্তি আমার হৃদয়ে উদয় হইয়া বলেন যে, 'বল—হরি গুরু, গুরু হরি'। এই চৈতন্যলীলা দেখার পর তিনি কতবার থিয়েটারে আসিয়াছেন তাহা মনে নাই। তবে বক্ষে যেন তাঁর প্রসন্ন প্রফুল্লময় মূর্তি আমি বহুবার দর্শন করিয়াছি।"[৭] এমন স্বচ্ছন্দ, পরিপূর্ণ, জীবন্ত স্বীকারোক্তি আত্মজীবনীর পাতায় খুব কম মেলে।

॥ ২ ॥

শ্রীরামকৃষ্ণকে প্রত্যক্ষ করেননি, কিন্তু উত্তরকালে 'কথামৃত', স্বামী বিবেকানন্দের রচনাবলীর মধ্য দিয়ে শ্রীরামকৃষ্ণের স্বরূপটি যাঁদের কাছে উন্মোচিত হয়েছে, তাঁদের মধ্যে শ্রীঅরবিন্দ, বিপিনচন্দ্র পাল, দিলীপকুমার রায়, সুভাষচন্দ্র বসু প্রমুখ তাঁদের আত্মজীবনীতে শ্রীরামকৃষ্ণ-অনুধ্যান করেছেন। দিলীপকুমার রায়ের 'স্মৃতিচারণ' গ্রন্থে বারবার শ্রীরামকৃষ্ণ-প্রসঙ্গ এসেছে। সুভাষচন্দ্র প্রথম যৌবনের দোলাচলচিত্ততার মধ্যে প্রথমে স্বামী বিবেকানন্দের এবং সেই সূত্রেই শ্রীরামকৃষ্ণের ভাবধারার প্রতি আকৃষ্ট হন। সুভাষচন্দ্রের আত্মজীবনী 'ভারত পথিক'-এর পৃষ্ঠা ওল্টালেই আমরা তার প্রমাণ পাই।

ভারতের স্বদেশী আন্দোলনের অন্যতম এক পুরোধাপুরুষ বিপিনচন্দ্র পাল। জীবনের শেষ প্রান্তে দু-খণ্ডে লেখা তাঁর ইংরেজী আত্মজীবনীর ('Memoirs of My Life and Times') দ্বিতীয় সংস্করণে রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের প্রসঙ্গ এসেছে। শ্রীরামকৃষ্ণের বিশ্বজনীন, অসাম্প্রদায়িক স্বরূপ উন্মোচন করে তিনি 'প্রবুদ্ধ ভারতে' (জুলাই ১৯৩২)

৭ আমার কথা ও অন্যান্য রচনা—বিনোদিনী দাসী, সম্পাদনা : সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় ও নির্মাল্য আচার্য, সুবর্ণরেখা, কলকাতা, ১৩৭৬, পৃঃ ৪৭

লিখলেন : "রামকৃষ্ণ পরমহংস কোন বিশেষ দল বা সম্প্রদায়ের নন ; কিংবা বলা চলে তিনি ভারতীয় এবং অভারতীয় সকল দল বা সম্প্রদায়ের। যথার্থ বিশ্বজনীন পুরুষ তিনি, কিন্তু তাঁর বিশ্বজনীনতা বিদেহী তত্ত্বকথার বিশ্বজনীনতা নয়। বিভিন্ন ধর্মের নিজস্ব বৈশিষ্ট্যগুলি ছেঁটে ফেলে তিনি সর্বজনীন ধর্মদর্শন করতে চাননি। তাঁর কাছে 'সামান্য' ও 'বিশেষ' সূর্য ও তার ছায়ার মতো একত্রে অবস্থিত। তিনি জীবন ও চিন্তায় অনন্য বিশিষ্টতার মধ্য দিয়েই সর্বজনীনতার বাস্তবতাকে উপলব্ধি করেছিলেন। বিবেকানন্দ তাঁর গুরুর এই উপলব্ধিকে আধুনিক মানবতার ভাষায় মণ্ডিত করেছেন।

"রামকৃষ্ণ পরমহংসের ঈশ্বর যুক্তিতর্ক বা দর্শনের ঈশ্বর নন ; সাক্ষাৎ ব্যক্তিগত অন্তর্গত অভিজ্ঞতার ঈশ্বর তিনি। ... তিনি বৈদান্তিক... কিন্তু তাঁর বেদান্তকে শাঙ্কর বেদান্ত বলা যাবে কিনা সন্দেহ, যেমন তার ওপর কোন বৈষ্ণবীয় বেদান্তের ছাপও দেওয়া যাবে না।... রামকৃষ্ণ পরমহংস দার্শনিক নন, পণ্ডিত নন,... তিনি দ্রষ্টা, যা দেখেছেন তাকেই বিশ্বাস করেছেন। আর দ্রষ্টা সর্বদাই মিস্টিক। রামকৃষ্ণ পরমহংস মিস্টিক ছিলেন, যেমন ছিলেন যীশুখ্রীস্ট, যেমন মানবজাতির সকল অধ্যাত্ম নেতৃগণ। জনতা তাঁদের বুঝতে পারে না, সমকালের পণ্ডিত ও দার্শনিকেরা আরও কম বুঝতে পারেন। অথচ দর্শন যার সন্ধানে ঘুরে বেড়ায়, তাকেই তাঁরা উন্মোচন করেন। যীশুখ্রীস্টের মতোই পরমহংস রামকৃষ্ণের ব্যাখ্যাতার প্রয়োজন ছিল—যুগের কাছে তাঁর বাণীকে হাজির করার জন্য। সেন্ট পলের মধ্যে যীশু তার ব্যাখ্যাতাকে পেয়েছিলেন, রামকৃষ্ণ পেয়েছিলেন বিবেকানন্দের মধ্যে। তাই বিবেকানন্দকে তাঁর গুরুর উপলব্ধির আলোকে চিনে নিতে হবে।"

বিপিনচন্দ্র ইতিহাসের নিরিখে শ্রীরামকৃষ্ণের স্বরূপটি শুধু উন্মোচিত করেননি, সেই সঙ্গে আধুনিক বিশ্বে তাঁর স্থান কোথায় তাও নিরূপণ করেছেন। ব্রাহ্মসমাজের উদ্গাতারা সব ধর্মের বৈশিষ্ট্যকে ছেঁটে দিয়ে সমন্বয়-সাধন করতে চেয়েছিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণের সাধনা ও সমন্বয়-চেতনা যে তা থেকে পৃথক তা বিপিনচন্দ্র স্পষ্টভাবে বলেছেন।

শ্রীঅরবিন্দের জীবনও রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ ভাবধারায় বিশেষভাবে প্রভাবিত হয়েছিল। একথা তিনি নানা রচনা ও ভাষণে বিশেষভাবে উল্লেখ করেছেন। শ্রীঅরবিন্দের আত্মজীবনের কথা ধরা আছে 'নিজের কথা' এবং 'কারাকাহিনী'তে। তাঁর 'কারাকাহিনীতে' আছে সেই বিখ্যাত ঘটনার উল্লেখ। ঘটনাটি ১৯০৮ খ্রীস্টাব্দের। মুরারীপুকুরের বোমার মামলার অন্যতম আসামীরূপে শ্রীঅরবিন্দ গ্রেপ্তার হয়েছিলেন ঐ বছরের ২মে। গ্রেপ্তারের দিন অরবিন্দের ঘর তল্লাসী করার সময়ে সেই ঘটনাটি ঘটে। 'কারাকাহিনী'তে শ্রীঅরবিন্দ নিজেই তা উল্লেখ করেছেন এইভাবে : "মনে পড়ে, ক্ষুদ্র কার্ডবোর্ডের বাক্সে দক্ষিণেশ্বরের যে-মাটি রক্ষিত ছিল, ক্লার্ক সাহেব তাহা বড় সন্দিগ্ধ চিত্তে অনেকক্ষণ নিরীক্ষণ করেন, যেন তাঁহার মনে সন্দেহ হয় যে, এটা কী নূতন ভয়ঙ্কর তেজবিশিষ্ট স্ফোটক পদার্থ। এক হিসাবে ক্লার্ক সাহেবের সন্দেহ ভিত্তিহীন বলা যায় না।"[৮]

শ্রীঅরবিন্দ বিশ্বাস করতেন, শ্রীরামকৃষ্ণই ভারতের জাতীয় জীবনে বিস্ফোরণ ঘটিয়েছেন। তিনি লিখেছেন : "নবজাগরণ ঘটাতে সর্বাধিক কাজ যাঁর তিনি পড়তেও পারতেন না, লিখতেও পারতেন না। তিনি সেই মানুষ যাঁর বিষয়ে শিক্ষিত লোকেরা বলবেন—পৃথিবীর পক্ষে তিনি পুরো অপদার্থ। তাঁর মধ্যে ছিল বিশ্বাসের চেয়েও বড় বস্তু—পরম ঐশ্বরিক শক্তি। তিনি ঈশ্বরকে জেনেছিলেন। তাঁর জীবনরূপ দেখে অনেকেই বলবেন — তিনি — একেবারে শিক্ষাদীক্ষাহীন, সংস্কৃতি বা সভ্যতার বাহ্যচিহ্নহীন, ভিক্ষাজীবী। এমন মানুষ সম্বন্ধে ইংরেজী-শিক্ষিত ভারতবাসী বলতেই পারে—'লোকটি অজ্ঞ'।... কিন্তু ঈশ্বর জানতেন তিনি কী করছেন। তিনি ঐ মানুষটিকে বাংলায় পাঠিয়ে কলকাতার নিকটবর্তী দক্ষিণেশ্বর মন্দিরে রেখে দিলেন এবং উত্তর দক্ষিণ পূর্ব পশ্চিম সকল স্থান থেকে শিক্ষিত মানুষেরা—বিশ্ববিদ্যালয়ের গৌরব, ইউরোপের সর্বশেষ বিদ্যায় পারঙ্গম মানুষেরা—ধেয়ে এল ঐ তপস্বীর পায়ে লুটিয়ে পড়তে। আর তখনই ভারতের উন্নয়নের এবং মুক্তির কাজ আরম্ভ হয়ে গেল।"[৯] □

৮ অরবিন্দ রচনাবলী, জন্মশতবার্ষিক সং, পণ্ডিচেরী, ১৯৭২, ৪র্থ খণ্ড, পৃঃ ২৫৯

৯ ঐ, ১ম খণ্ড, পৃঃ ৬৫২।

## আচার্য শঙ্করের জন্মবর্ষ

'উদ্বোধন'-এর বিগত চৈত্র ( ১৩৯৮ ) সংখ্যার সম্পাদকীয় এবং জ্যৈষ্ঠ (১৩৯৯) সংখ্যার 'প্রাসঙ্গিকী'র সূত্র ধরে আমার নিম্নলিখিত নিবেদন।

আচার্য শংকরের জন্মবর্ষ নিয়ে বিভিন্ন মত আছে। কেউ বলেন, আচার্যের জন্মবর্ষ ৬৮৬ খ্রীস্টাব্দ, আবার কেউ বলেন, ৭৮৮ খ্রীস্টাব্দ। একমতে শংকরের জন্মতিথি বৈশাখী শুক্লা তৃতীয়া, অন্যমতে বৈশাখী শুক্লা পঞ্চমী। আমার প্রশ্ন—আচার্যের জন্মবর্ষ ও জন্মতিথি সম্পর্কে সঠিক কোন সিদ্ধান্ত হয়েছে কি ?

**বিজয়কুমার গঙ্গোপাধ্যায়**
শ্রীরামপুর, জেলা—হুগলী
পিন-৭১২২০১

## সঠিক দূরত্ব

'উদ্বোধন'-এর গত পৌষ ( ১৩৯৯ ) সংখ্যায় 'পরিক্রমা' বিভাগে 'তোমারি ভুবনমাঝে হে বিশ্বনাথ' ভ্রমণকাহিনীতে লেখিকা শ্রীমতী অনুরাধা সাধুখাঁ একজায়গায় লিখেছেন, তাঁরা গৌরীকুণ্ড থেকে পায়ে হেঁটে কেদারনাথজীর উদ্দেশে যাত্রা করে প্রথমে ৮ কিলোমিটার রাস্তা অতিক্রম করে 'রামওয়ারা' আসেন এবং তারপরে সেখান থেকে যাত্রা করে ১৪ কিলোমিটার অতিক্রম করে এসে পেঁছান কেদারনাথে। কিন্তু এই বিবরণটি সঠিক নয়। গৌরীকুণ্ড থেকে রামওয়ারার দূরত্ব ৮ কিলোমিটার এবং রামওয়ারা থেকে কেদারনাথের দূরত্ব ৬ কিলোমিটার—১৪ কিলোমিটার নয়।

**ফণীন্দ্রকুমার ভাদুড়ী**
কল্যাণী, জেলা—নদীয়া

## 'স্বামি-শিষ্য-সংবাদ' প্রণেতার কন্যার পুণ্য স্মৃতিচারণ

কিছুদিন আগে 'স্বামি-শিষ্য-সংবাদ' প্রণেতা স্বামীজীর শিষ্য শরচ্চন্দ্র চক্রবর্তীর কন্যা শ্রীমতী ইন্দিরা গঙ্গোপাধ্যায়ের সঙ্গে কথা বলেছিলাম। তিনি আমাদের প্রতিবেশী। পূর্ণিয়ার ভাট্টা-বাজারে আমরা থাকি, শ্রীমতী গঙ্গোপাধ্যায়ও থাকেন সেখানে। শ্রীমতী গঙ্গোপাধ্যায়ের বয়স এখন প্রায় বিরাশি বছর। তাঁকে তাঁর পুণ্য স্মৃতিকথার কিছু বলতে অনুরোধ করায় তিনি বলেছিলেন তাঁর শ্রীমাকে দর্শনের কথা, তাঁর পুণ্যশ্লোক পিতার কথা এবং পিতার কাছে শ্রুত স্বামীজীর কথা। তিনি বলেছিলেন: "খুব ছোটবেলায় 'উদ্বোধন'-এ শ্রীশ্রীমাকে আমি দেখি। মনে আছে, বাবা আমাদের দুই বোনকে ডেকে বললেন, 'চল্, তোদের মাকে দর্শন করিয়ে আনিগে।' আমরা তখনো জানতাম না কে 'মা'—বাবা আমাদের কার কাছে নিয়ে যাচ্ছেন। যাইহোক আমরা দুই বোন বাবার হাত ধরে উদ্বোধনে গেলাম। সেখানে দোতলার ঘরে মা ছিলেন। মায়ের মাথায় ঘোমটা, গায়ে চাদর জড়ানো। মা খাটে বসেছিলেন। বাবা আমাদের দুই বোনকে নিয়ে মায়ের কাছে গিয়ে মাকে প্রণাম করলেন। তখন মায়ের শরীর খারাপ। কাউকে প্রণাম করতে দেওয়া হচ্ছিল না। বাবা অবশ্য প্রণাম করলেন। আমরা প্রণাম করতে গেলে মা বললেন, 'শরৎ, এরা কে?' বাবা বললেন, 'আমার মেয়ে।' মা আমাদের দুই বোনের মাথায় হাত দিয়ে সস্নেহে হেসে বললেন, 'আচ্ছা।' ঐঘরে তখন যোগীন-মা এবং গোলাপ-মাও ছিলেন। তাঁরা আমাদের প্রসাদ দিলেন। দুপুরে 'মায়ের বাড়ী'তে প্রসাদ পেয়ে যখন বাবার সঙ্গে বাড়ি ফিরছি তখন বাবা বললেন, 'আজকে যাঁকে তোরা দর্শন করলি, তিনি কে জানিস? ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের স্ত্রী। আমাদের মা—মাঠাকরুণ। উনি সারা জগতের মা—স্বয়ং ভগবতী। মাকে দেখে, তাঁকে প্রণাম করে তোদের জন্ম সার্থক হলো। কত পুণ্যে তাঁর সাক্ষাৎ হয়!'

"মাকে সেই একবারই দেখি, মায়ের মুখের সেই

একটিই কথা—'আচ্ছা'—শুনেছিলাম, কিন্তু সেই একটি কথাই এখনো আমার বুকের মধ্যে, আমার মন-প্রাণ ভরে রয়েছে। এখনো চোখ বন্ধ করলেই যেন মাকে দেখতে পাই, আমাদের মাথায় তাঁর সস্নেহ স্পর্শ অনুভব করি, কানে বাজে তাঁর সেই মধুক্ষরা কথা 'আচ্ছা'।

"তেরো বছর বয়সে আমার বিয়ে হয়। বিয়ের পরে আমি পূর্ণিয়ায় চলে আসি। তারপর মাঝে মাঝে বাপের বাড়ি যেতাম। বাবা ছিলেন পুরুলিয়ায়। আমার নাম বাবাই দিয়েছিলেন 'ইন্দিরা'। বাবার সঙ্গে শেষ যেবার দেখা হয়, সেবার পূর্ণিয়ায় ফেরার সময় বাবার কাছে দাঁড়িয়ে কাঁদছিলাম। বাবা বললেন, 'এখন গৃহিণী হয়েছ। অনেক দায়িত্ব তোমার। চোখের জল ফেল না। আবার আসবে যাবে। তবে আমার সঙ্গে আর দেখা নাও হতে পারে।' সত্যি সত্যি এরপর বাবার সঙ্গে আমার আর দেখা হয়নি। বাবার কথাটাই সত্যি হয়ে গেল। শেষসময়ে আমার এক ভাই ও ভগ্নীপতি বাবার কাছে ছিলেন। তাঁদের মুখে শুনেছি, মৃত্যুর সময়ে বাবা বলেছিলেন, 'ঠাকুর, মা, স্বামীজী, মহারাজ (স্বামী ব্রহ্মানন্দ) এসেছেন আমাকে নিতে। ওঁদের বসাও, বসতে আসন দাও।' বলতে বলতেই বাবা শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন।

"বাবার কাছে স্বামীজীর অনেক কথা শুনতাম। বাবা একবার বললেন, স্বামীজী ভগিনী নিবেদিতা, বাবা এবং আরও কয়েকজনকে নিয়ে চিড়িয়াখানা দেখতে আলিপুরে গিয়েছিলেন। সেখানে চিড়িয়াখানার সুপারিন্টেন্ডেন্ট এবং অন্যান্য পদস্থ কর্মচারীরা খুব যত্ন করে স্বামীজী এবং তাঁর সঙ্গীদের চিড়িয়াখানা ঘুরিয়ে দেখানোর পরে স্বামীজী এবং তাঁর সঙ্গে যাঁরা ছিলেন তাঁদের নানা রকম খাবার খেতে দিয়েছেন। সবাই খাচ্ছেন। বাবা আগে প্রচণ্ড গোঁড়া ছিলেন, স্বামীজীর সংস্পর্শে এসে ক্রমে সব সংস্কার থেকে তিনি মুক্ত হয়েছিলেন। খাবার সময়ে এক টেবিলে নিবেদিতার ছোঁয়া খাবার খেতে বাবার স্বভাবতই সংকোচ ছিল। স্বামীজী তা বুঝতে পারছিলেন। বাবাকে হাত গুটিয়ে থাকতে দেখে বললেন, 'কিরে বাঙাল, চুপ করে বসে দেখছিস কি? খা।' বাবা আর কি করেন। বাধ্য হয়ে খেলেন। স্বামীজী তা দেখে চোখ বড় বড় করে বাবাকে বললেন, 'ও কিরে, তুই নিবেদিতার হাতের ছোঁয়া খাচ্ছিস? তোর যে জাত চলে গেল।' বাবা বললেন, 'আপনিও তো খান। কই আপনার কি কিছু হয়? আপনার যদি জাত না যায় তাহলে আমারও যাবে না।'

"আর একবার স্বামীজী নুড্‌লস্ মেশানো একটা খাবার খাচ্ছিলেন। বাবা সেখানে ছিলেন। বাবাকেও স্বামীজী কিছুটা খেতে দিলেন। বাবা খাচ্ছেন। এই বস্তুটির সঙ্গে বাবার আগে পরিচয় ছিল না। স্বামীজীকে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, 'এগুলি কি?' স্বামীজী গম্ভীর হয়ে বললেন, 'এগুলো হচ্ছে বিলেতী কেঁচো।' স্বামীজীর কথা শুনে উপস্থিত সবাই হাসতে লাগলেন। বাবা বললেন, 'তাই বুঝি এগুলি এতো সাদা?' বাবার কথা শুনে সবাই দ্বিগুণ জোরে হেসে উঠলেন। বাবা তো অপ্রস্তুত। বাবার সেই অবস্থা সকলেই উপভোগ করলেন।

"নাগমশাই বাবাকে খুব স্নেহ করতেন। তিনি যখন খুব অসুস্থ তখন গিরিশবাবু (গিরিশচন্দ্র ঘোষ) বাবাকে বললেন, 'তোকে তো উনি ছেলের মতো ভালবাসেন, ওঁর এই অসুখের সময় তুই ওঁর কাছে যা, ওঁর সেবাযত্ন কর।' বাবা সঙ্গে সঙ্গেই নাগমশায়ের কাছে গিয়েছিলেন। বাবা যাবার পর মাত্র সাতদিন বেঁচেছিলেন নাগমশাই। এই সাতদিন বাবা অক্লান্ত পরিশ্রম করে তাঁর সেবাযত্ন করেছিলেন। নাগমশায়ের শ্রাদ্ধাদি বাবাই সম্পন্ন করে এসেছিলেন। গিরিশবাবু বাবাকে বলেছিলেন, 'তুই একটা কাজের মতো কাজ করে এসেছিস। নাগমশাই তোকে ছেলের মতো ভালবাসতেন। ওঁর মতো মহাপুরুষের শেষসময়ে সেবা করে তুই জীবন ধন্য করলি—ছেলের কাজও করলি।' পরে বাবা 'সাধু নাগমহাশয়' নামে একটি বইও লিখেছিলেন।"

শরচ্চন্দ্র চক্রবর্তীর কন্যা শ্রীমতী ইন্দিরা গঙ্গোপাধ্যায়ের সঙ্গে আমার এই সাক্ষাৎকারের বিবরণটি উদ্বোধনে প্রকাশিত হলে অনেকে আনন্দ পাবেন—এই আশায় এটি আপনাদের কাছে পাঠালাম।

অম্বুজ রায়
ভাট্টাবাজার, পূর্ণিয়া, বিহার, পিন-৮৫৪৩০১

ফেব্রুয়ারি, ১৯৯৩

মাধুকরী

# বঙ্গ রঙ্গালয় ও শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত

## নীলিমা ইব্রাহিম

ডঃ নীলিমা ইব্রাহিম ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাঙলা বিভাগের প্রাক্তন অধ্যাপিকা। যুগ্ম সম্পাদক, উদ্বোধন

ধর্মভীরুতা মানবের সহজাত বৃত্তি; ধর্মের নামে মানুষ যত সহজে নতিস্বীকার করে যুক্তি-তর্কের দ্বারা তত সহজে তাকে বশ করা যায় না। ধর্ম বলতে যে আত্মিক শক্তি ও তার গতি-প্রকৃতির নির্দেশ আমরা বুঝি জনসাধারণের কাছে তা মনন-ইন্দ্রিয়ের বিষয়ভূত ব্যাপার নয়। তারা ধর্মের আচরণ, সংস্কার, প্রচলিত প্রথা ও অনুষ্ঠানকেই ধর্ম বলে মনে করে। সর্বধর্ম এক অর্থাৎ মূলতত্ত্বের দিক থেকে সেখানে মতদ্বৈতের অবকাশ কম একথা সাধারণের কাছে বললে মান অথবা ক্ষেত্র-বিশেষে প্রাণ বাঁচানো দায়।

ঊনবিংশ শতাব্দীর বাঙালীও তাই ধর্মভীরুতাকে চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য দান করতে এতটুকু সংকোচবোধ করেনি, তাদের প্রতিটি সামাজিক আচরণ ও ক্রিয়া-কলাপ ছিল ধর্মের অনুশাসনে জড়িত। ইংরেজ এল, সঙ্গে এল ইংরেজী সাহিত্য, দর্শন ও জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চা। বৈদান্তিক হিন্দুধর্মের সহজ ব্যাখ্যায় ব্রাহ্মণ্যধর্মের প্রাধান্য পুনঃস্থাপনে জড়সংস্কারের নাগপাশ ছিন্ন করবার মানসে যে-আন্দোলন হয়েছিল তার সংক্ষিপ্ত ইতিহাসের সঙ্গে বাংলার পরবর্তী কালের ধর্মমূলক নাট্যপ্রবাহ অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। ধর্মযাজক সম্প্রদায়ভুক্ত ছাড়া যেসব উন্নতমনা, উদার-হৃদয় ইংরেজের কাছে বাংলার শিক্ষা, সভ্যতা, সংস্কৃতি ও কৃষ্টি ঋণী তাঁদের ভিতর পণ্ডিত কোলব্রুক, এইচ. উইলসন, ঐতিহাসিক টড, শিক্ষাবিদ ডেভিড হেয়ার ও ড্রিংক ওয়াটার বেথুনের নাম সর্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য। এদের সঙ্গে যেসব ভারতীয়ের হস্ত সম্প্রসারিত হয়েছিল তাঁরা হলেন রামমোহন রায়, পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, রাজনারায়ণ বসু, স্যার সৈয়দ আহমেদ, সৈয়দ আমীর আলি, নবাব আবদুল লতিফ প্রমুখ।

রামমোহন ধর্মীয় সংস্কারে মন দিলেন। রামমোহন-প্রবর্তিত ব্রাহ্মসমাজে নতুন করে প্রাণ প্রতিষ্ঠা করলেন প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুরের পুত্র মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর। এযুগে আরেক তৃতীয় নেতার আবির্ভাব ঘটল। ইনিই স্বনামধন্য কেশবচন্দ্র সেন। ধীরে ধীরে হিন্দুর রীতি-নীতি আবার উচ্চবিত্ত শিক্ষিত সমাজ গ্রহণ করতে শুরু করল। আবির্ভাব ঘটল ঠাকুর রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের। নাট্যকার ও অভিনেতা গিরিশ তাঁর অনুগ্রহলাভে ধন্য হলেন, গিরিশ তখন 'বঙ্গের গ্যারিক', বঙ্গ রঙ্গালয়ের একচ্ছত্র সম্রাট। নটের জীবন থেকে অবসর গ্রহণ করতে চাইলেন। গুরু উপদেশ দিলেন।

"গিরিশঃ থিয়েটার আর ভাল লাগে না, ওসব ছেড়ে দেব।

ঠাকুরঃ কেন ছাড়বি কেন?

গিরিশঃ ঐ থিয়েটারের ডাক পড়েছে, এখনি তো উঠতে হবে। আপনাকে ছেড়ে যেতে মন চায় না।

ঠাকুরঃ তা ডাক পড়েছে সেখানে যেতে হবে বৈকি।

গিরিশঃ না, এবার ছোকরাদের হাতে সব ছেড়ে দেব মনে করেছি।

ঠাকুরঃ তা হবে না। এখানেও আসবি আর থিয়েটারও করতে হবে।

গিরিশঃ না প্রভু, ওসব একেবারেই ভাল লাগে না। এখন আর ওসব কেন, আপনি রয়েছেন।

ঠাকুরঃ জানিস ওতে কত লোকশিক্ষা হয়। তোর কাজ তুই ছাড়বি কেন? নরেনের কাজ নরেন করবে, তার কাজ কি তুই করতে যাবি? তোর কাজ তুই করবি। তবে দুই দিক বজায় রেখে চলতে হবে। জানিস তো জনক রাজা দুহাতে দুখানি তরোয়াল ঘোরাতেন। একখানি কর্মের আর একখানি ত্যাগের।"

গুরুর উপদেশ গিরিশ নতমস্তকে গ্রহণ করলেন, শুরু হলো নতুন তপস্যা। অবিনাশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় গিরিশের নাট্যরচনার এই যুগকে "নামভক্তির যুগ" বলে আখ্যাত করেছেন। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃতকে আপামর জনসাধারণের হৃদয়ে বিতরণ করাই ছিল গিরিশের এসময়ের সাধনা ও ঐকান্তিক কামনা। এসম্পর্কে অজিতকুমার ঘোষ বলেছেনঃ "বিভিন্ন স্রোতস্বিনী যেমন ইতস্তত প্রবাহিত হইয়াও অবশেষে একই সাগরে পরিণতি লাভ করে, তাঁহার নাটকের বিচিত্র ভাবও কিছুক্ষণ ঘাত-প্রতিঘাতে আলোড়িত হইয়া ধর্মের পারাবারে নিমজ্জিত হয়। মনে হয়, বাস্তব চরিত্র ও ঘটনাগুলি এক অদৃশ্য ধর্মশক্তির দ্বারা আকর্ষিত হইয়াছে।"[১]

একে একে 'বিল্বমঙ্গল', 'জনা', 'তপোবল', 'শংকরাচার্য', 'কালাপাহাড়', 'নসীরাম', 'করমেতি বাঈ' প্রভৃতি নাটকের মাধ্যমে গিরিশ গুরুর আদেশ পালন ও গুরুসেবা—এই উভয় কাজই করতে লাগলেন। শ্রীরামকৃষ্ণের ধর্মমত সম্পর্কে দেশী-বিদেশী বহু মনীষী বহু মন্তব্য করেছেন। অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত লিখেছেনঃ "পূজার চেয়ে জপ বড়, জপের চেয়ে ধ্যান বড়, ধ্যানের চেয়ে ভাব বড়, ভাবের চেয়ে মহাভাব বড়। মহাভাবেই প্রেম, আর প্রেম যা ঈশ্বরও তাই।"[২]

'বিল্বমঙ্গল' নাটককে স্বয়ং নাট্যকারই ভক্তিমূলক নাটক আখ্যা দিয়েছেন। "যুগাবতার রামকৃষ্ণ সেই সময়ে নিজ জীবনে বহু সাধনায় সিদ্ধিলাভ করিয়া জগতে প্রচার করিয়াছেন 'যত মত তত পথ', যিনি কালী তিনি শিব, তিনিই রাম বটেন আর যেমন-ভাবেই হউক ( আল্লা, গড, যীশু, ব্রহ্ম, হরি, কালী; যেমন রূপেই হউক সাকার, নিরাকার, সগুণ, নির্গুণ ) এক ঈশ্বর-জ্ঞান করিয়া যে উপাসনা করে তাহার উপাসনাই প্রকৃত উপাসনা।"[৩] এর সরল ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে ঠাকুর বলেছেনঃ "কোন পুষ্করিণীর চারিটি ঘাট আছে, এক ঘাটে হিন্দু, এক ঘাটে মুসলমান, অপর ঘাটে অপর ব্যক্তিরা জল পান করিতেছে। এতে ঘাটেও যেমন কাহারও পিপাসা নিবারণের ব্যতিক্রম হইতেছে না অথচ অদ্বিতীয় গঙ্গারও পরিবর্তন হইতেছে না। সেইরূপ সচ্চিদানন্দকে যাহাই বল, যেভাবেই ডাক, তিনি সকলেরই প্রার্থনা শুনিয়া থাকেন, এক ঈশ্বরের শক্তিবিশেষ জ্ঞান করিয়া যে যাহা করিবে তাহাতেই তাহার পরিত্রাণ করে।" এই সত্য ও তত্ত্বই গিরিশ বহু কণ্ঠে উচ্চারণ করেন।

'বিল্বমঙ্গলে'র পাগলীর মুখে গিরিশ কথামৃত পরিবেশন করেছেনঃ

"চিন্তামণি কভু এলোকেশী
উলঙ্গিনী ধনী
বরাভয় করা, ভক্ত মনোহরা
শবোপরে নাচে বামা।
কভু ধরে বাঁশী
ব্রজবাসী বিভোর সে তানে।
কভু রজত ভূধর
দিগম্বর জটাজুট শিরে,
নৃত্য করে বমবম বলি গালে।
কভু রাসরসময়ী প্রেমের প্রতিভা
সে রূপের দিতে নারি সীমা—
প্রেমে ঢলে বনমালা গলে,
কাঁদে বামা কোথা বনমালী বলে।"[৪]

ঠাকুরের মতে "তিনিই একাধারে পুরুষ ও প্রকৃতি, ব্রহ্ম ও শিবশক্তি, ব্রহ্মচৈতন্যস্বরূপ তাই তিনি শিব বা শব নিষ্ক্রিয়—আর ব্রহ্মকে অবলম্বন করিয়া শক্তিরূপী মাতা প্রকৃতি—জড় চঞ্চলা বা ক্রিয়।"[৫] পতিতপাবন বিল্বমঙ্গলকে ত্রাণ করলেন। বৈষ্ণবধর্মের রাধার স্বরূপ কৃষ্ণের প্রেমগুরুরূপে, নাটকের সমাপ্তিতে বিল্বমঙ্গল চিন্তামণিকে বলেছেঃ "একি গুরু? প্রেম শিক্ষাদাতা? বিশ্বমোহিনী আমাকে কৃপা করুন।" শ্রীরামকৃষ্ণ-পত্নী সারদাকে অঞ্জলি প্রদান করেন—এই সত্য আজ সর্বলোকজ্ঞাত।

১ বাংলা নাটকের ইতিহাস—অজিতকুমার ঘোষ, পৃঃ ১৩৭
২ পরমপুরুষ শ্রীরামকৃষ্ণ—অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, পৃঃ ২৬
৩ গিরিশ প্রতিভা—ডক্টর হেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত, পৃঃ ১৪২-১৪৩
৪ 'বিল্বমঙ্গল' ( গিরিশ রচনাবলী ), ১ম অংক, ৪র্থ গর্ভাংক
৫ গিরিশ প্রতিভা, পৃঃ ১৪৫

গিরিশের দ্বিতীয় নাটক 'জনা'তেও সেই অমৃতরূপী কথামৃত-বর্ষণ। ঠাকুর বলতেন: "বিশ্বাসের জোর কত তাতো শুনেছ। পুরাণে আছে, রামচন্দ্র যিনি পূর্ণব্রহ্ম তাঁর লংকায় যেতে সেতু বাঁধতে হলো, কিন্তু হনুমান রামনামে বিশ্বাস করে লাফ দিয়ে সমুদ্রের পাড়ে গিয়ে পড়লো, তাঁর সেতুর দরকার নেই।" এই গভীর আত্মহারা বিশ্বাসের রূপে গিরিশচন্দ্র ফুটিয়ে তুলেছেন 'জনা'র বিদূষক চরিত্রে। বিদূষক বলেছে:

"এক নামে মুক্তি পায় নরে
এ বিশ্বাস হৃদে যেই ধরে,
এ ভবসাগর গোষ্পদ সমান তার।"[৬]

অতি সহজ কথায় রঙ্গ-কৌতুকের মাধ্যমে বিদূষক 'নামকথা' প্রচার করেছে বঙ্গ রঙ্গালয়ে।

'জনা' গিরিশচন্দ্রের মাতৃচরিত্রের আদর্শ। "জনা মাতা, প্রয়োজন হইলে পতিকে পদদলিত করিয়া যে-মা সন্তানকে বরাভয় প্রদর্শন করেন, সেই মা ভারতের আদর্শ মাতৃমূর্তি, রণরঙ্গিণী, জগজ্জননী।"[৭]

'করমেতি বাঈ' নাটকেও এই কৃষ্ণপ্রেমের স্রোত বয়ে গেছে। চণ্ডীদাসের শ্রীরাধিকার মতো করমেতি বাঈ জন্মবিরহিণী উন্মাদিনী রাই। "রাই কোথা গেল। কোথা গেল। আমি তার কথা শুনব। তোমার নাম কি? শ্যাম। বেশ নাম। আমি শ্যামকে খুঁজি। আমি শ্যামকে খুঁজি।"[৮]
এ যেন—

'জপিতে জপিতে নাম অবশ করিল গো
কেমনে পাইব সই তারে।'

এ-চরিত্র আমাদের কৃষ্ণপ্রেমে আত্মহারা গিরিধারী-লালের সেবিকা মীরা বাঈয়ের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়, ভক্তহৃদয় নাট্যকারের মানসকন্যা বাংলার শাশ্বত শ্যামবিরহিণী রাধিকার অলৌকিক চিত্র। এধরনের অলৌকিক প্রভাবসম্পন্ন নাটকীয় চরিত্র সম্পর্কে স্বয়ং নাট্যকার মন্তব্য করেছেন:

"এই যে ভিতরে দ্বন্দ্ব internal dramatic action—সামান্য স্থূলভাবে প্রকাশ পায়, সেই internal action-কে দেখানই best literary art।"[৯]

'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত' সবচেয়ে বেশি পরিবেশিত হয়েছে 'নসীরাম' নাটকে। বিল্বমঙ্গলের পাগলিনী ও নসীরাম একই ভাবের আধার। কৃষ্ণপ্রেমে আত্মহারা, জীবন কৃষ্ণময়। পতিতপাবনরূপে ধরণীর জীবের ত্রাণের জন্যই এঁদের মর্তে আগমন। গিরিশ শ্রীরামকৃষ্ণের অবতার-তত্ত্বে বিশ্বাসী ছিলেন। ভক্ত-বৃন্দের মধ্যে তিনিই প্রথম কায়মনোবাক্যে এই সত্য স্বীকার করেন। ঠাকুরের ভিন্ন ভিন্ন সময়ে উচ্চারিত উক্তি একত্রিত করেই নসীরাম-চরিত্রের রূপায়ণ।

সংসারে অনাসক্ত নসীরামের উক্তি—"আমি মরতেও চাইনি, বাঁচতেও চাইনি, রাজার বাড়িও চাইনি, গাছতলাও চাইনি, ক্ষীর-সরও চাইনি, ক্ষুদ্র কুঁড়োও চাইনি, ওসব ভাবিইনি, জানি একদিন সুখ, একদিন দুঃখ আছেই, সুখ-দুঃখ দু-শালা সঙ্গের সাথী, ও যা হবার হোক, আমি করি হরিবোল হরিবোল।"[১০] "লোকের কি, শালাদের আমি দেখেছি—সে বেটারা তাদের মতো পাগল না হয় আপনার মজায় থাকে তারেই বলে পাগল। কোন শালা ধনের কাঙ্গাল, কোন শালা মানের কাঙ্গাল, কোন শালা মেয়েমানুষের কাঙ্গাল, কোন শালা ছেলের কাঙ্গাল, যে-শালা এ ক্যাংলাবৃত্তি না করে সে শালাই পাগল।"[১১]

ঠাকুরের কথার প্রতিধ্বনি শুনি নসীরামের বক্তব্যে:

"টাকা-কড়ি আজ বলছ তোমার, তোমার হাত থেকে গেলেই ওর, আর ওর হাত থেকে গেলেই তার। না যদি খরচ কর তবে দু-হাতে দু-মুঠো ধুলো ধর না কেন, বল এই আমার টাকা, এই আমার টাকা।"[১২]

৬ 'জনা' ( গিরিশ রচনাবলী, ১ম খণ্ড )
৭ গিরিশচন্দ্র—দেবেন্দ্রনাথ বসু, পৃঃ ৫৭
৮ 'করমেতি বাঈ' ( গিরিশ রচনাবলী, ২য় খণ্ড ), ২য় অংক, ১ম গর্ভাংক, পৃঃ ২০১
৯ গিরিশচন্দ্র ও নাট্য সাহিত্য—কুমুদবন্ধু সেন, পৃঃ ৬০
১০ 'নসীরাম' ( গিরিশ রচনাবলী, ১ম খণ্ড ), ২য় অংক, ২য় গর্ভাংক,
১১ ঐ, ৩য় গর্ভাংক
১২ ঐ, ৪র্থ গর্ভাংক

একথাই ঠাকুর বারবার বলেছেন : "টাকা থাকাই খারাপ, আরশির কাছে জিনিস রাখতে নেই, জিনিস থাকলেই প্রতিবিম্ব হবে। বুঝলে ওসব হবে না এখানে—যে ঠিক রাজার ব্যাটা সে মাসোহারা পায়।"[১৩]

গিরিশচন্দ্র স্বয়ং বলতেন : "পরমহংসদেবের সঙ্গতেও যদি আমোদ না পেতুম, আমি যেতে পারতুম না।"[১৪]

শ্রীরামকৃষ্ণ পতিতা অভিনেত্রী বিনোদিনীকে বলেছিলেন : "মা, তোর চৈতন্য হোক।" গিরিশ-চন্দ্র থিয়েটারে রামকৃষ্ণদেবের কথা বলতে বলতে বলতেন : "তোদের উদ্ধার করতে তো ত্যাগী সন্ন্যাসীরা কেউ আসবে না, এখানে পারবে এক নোটো গিরিশ ঘোষই।"[১৫]

শ্রীরামকৃষ্ণের সাধনজীবন সম্পর্কে আমরা জানি, তিনি হিন্দুভাবে হিন্দুধর্মের, ইসলামী পদ্ধতিতে ইসলামের ও খ্রীস্টীয় পদ্ধতিতে খ্রীস্টধর্ম সাধনা করেন। 'কালাপাহাড়' নাটকে গিরিশচন্দ্র ঠাকুরের সর্বধর্মসমন্বয় মতের প্রচার করেছেন :

"এক বিভু বহুনামে ডাকে বহুজনে
যথা জল একওয়া ওয়াটার পানি,
বোঝায় সলিলে, সেই মত আল্লা গড্
ঈশ্বর জিহোবা যীশু নামে নানা স্থানে
নানা জনে ডাকে সনাতনে। ভেদজ্ঞান
অজ্ঞান লক্ষণ, ভেদবুদ্ধি কর দূর
বহুনাম—প্রতি নাম সর্বশক্তিমান
যার যেই নামে প্রীতি ভক্তির উদয়
প্রফুল্ল হৃদয়, সেই নামে মনস্কাম
পূর্ণ, সেইজন যেই নাম উচ্চারণে।
মুসলমান হিন্দু খেরেস্তান এক বিভু
যবে করে উপাসনা, সে বিনা উপাস্য
কেবা ; কহ কার আর পূজা অধিকার
মূঢ় জনে ভেদজ্ঞানে দ্বন্দ্ব পরস্পর।"[১৬]

স্বামী বিবেকানন্দ বলেছেন : "ধর্মের সব গ্লানি দূর করবার জন্যই ভগবান শরীরধারণ করে বর্তমান যুগে অবতীর্ণ হয়েছেন। তাঁর ন্যায় মহাসমন্বয়াচার্য বহু শতাব্দী যাবৎ ভারতবর্ষে ইতিপূর্বে জন্মগ্রহণ করেন নাই।"[১৭]

এরপর গিরিশচন্দ্র 'শঙ্করাচার্য' নাটক রচনা করেন। শঙ্করাচার্য শিবস্তোত্রে অদ্বৈতবাদ প্রচার করেছেন :

"নমো নমো চরণে তোমার
দেহজ্ঞানে আমি তব দাস।
অংশ জীবজ্ঞানে
আত্মজ্ঞানে অভেদ চৈতন্যে সংমিলিত
দিব্যজ্ঞান জন্মিয়াছে তব দরশনে।"

মহামায়ার মোহ কাটলেই অবিদ্যার নাশ, আত্মার প্রকাশ—ব্রহ্মজ্ঞানে আত্মদর্শনই বেদান্তদর্শন। মোহে বদ্ধজীব জেনেও জানতে চায় না, বুঝেও বুঝতে পারে না।

শ্রীরামকৃষ্ণ শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত ছিলেন না। কিন্তু ভক্তিযুক্ত অন্তরে অতি সহজ-সরল ভাষায় যে-বেদান্তদর্শন তিনি আলোচনা করতেন, গিরিশের শঙ্করাচার্য সেই সহজ-সরল সর্ববিশ্বাসী ভক্তমূর্তি।

'তপোবল' গিরিশের সর্বশেষ ধর্মপ্রচারমূলক নাটক। এক ধর্মসাধিকা শ্রীগুরুকৃপানুগৃহীতা ভগ্নী নিবেদিতার উদ্দেশে অতি করুণ ও মর্ম-স্পর্শী ভাষায় তাঁর এই শেষ রচিত নাটক উৎসর্গ করেছেন। 'নোটো' গিরিশ নাস্তিক অবিশ্বাসী আত্মা ও উচ্ছৃংখল প্রবৃত্তিজাত কামমোহে লিপ্সু মন নিয়ে তপোবলে যে কি আত্মিক ঐশ্বর্যলাভ করে-ছিলেন এই নাটক তারই জ্বলন্ত নিদর্শন। ঋষিবাক্য "জন্মনা জায়তে শূদ্র সংস্কারাৎ দ্বিজ-মুচ্যতে"—এ বাণী গিরিশ আপন জীবনে সার্থক করেছিলেন।

১৩ পরমপুরুষ শ্রীরামকৃষ্ণ, পৃঃ ২৭
১৪ গিরিশচন্দ্র, পৃঃ ১৩
১৫ শ্রীরামকৃষ্ণ ও ভক্তভৈরব গিরিশ—ডঃ হেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত
১৬ 'কালাপাহাড়' ( গিরিশ রচনাবলী ), ৩য় অংক, ৬ষ্ঠ গর্ভাংক
১৭ স্বামি-শিষ্য-সংবাদ—শরচ্চন্দ্র চক্রবর্তী, ৩য় বল্লী, পৃঃ ৩০

বিশ্বামিত্র বলেছেন ঃ

"বর্ণান্তরে জন্মি যদি উচ্চ চেতাজন
করে আকিঞ্চন ব্রাহ্মণত্ব করিতে অর্জন,
তপের প্রভাবে তাহা লভিবে নিশ্চয়।"[১৮]

নাট্যকার স্বয়ং, বিবেকানন্দ, কেশবচন্দ্র প্রভৃতি সেকালের তত্ত্বজ্ঞানী পুরুষেরা কেউ ব্রাহ্মণ ছিলেন না, একমাত্র শ্রীগুরু-প্রসাদে কঠিন' তপোবলেই তাঁদের তত্ত্বজ্ঞান জন্মেছিল।

শ্রীরামকৃষ্ণের বাণীপ্রচারের জন্যই গিরিশ ভক্তিমূলক নাটক রচনায় আত্মনিয়োগ করেন। একথা সত্য যে, দক্ষিণেশ্বরের সর্বত্যাগী সন্ন্যাসীর মুখনিঃসৃত অমৃতসুধার অধিকারী সেদিন একমাত্র তাঁর ভক্তশিষ্যেরাই ছিলেন না, গিরিশ-নাটকের মাধ্যমে সেই স্বর্গীয় সুধায় বঙ্গের আপামর নাট্যামোদী চিত্তের রসতৃষ্ণা নিবারিত হয়েছিল।

এই নাটকগুলিতে আঙ্গিক ও শিল্পসৃষ্টির ত্রুটি-বিচ্যুতি বহু, তবুও ভক্তিস্রোত ও নামকীর্তনে তিনি বাংলার জনগণকে যে মুগ্ধ করেছিলেন এই সত্য সর্ববাদিসম্মত।

আজও বঙ্গ রঙ্গালয়ের প্রতিটি নট-নটী ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণকে প্রণাম করে মঞ্চে প্রবেশ করেন। তাঁরা জানেন, এ শুধু বিলাস শিল্পচর্চা নয়, এ জীবনসাধনার অঙ্গবিশেষ। শ্রীরামকৃষ্ণের কৃপালাভে বঙ্গ রঙ্গমঞ্চ আজ লোকশিক্ষার পাদপীঠে পরিণত হয়েছে। এ ভক্তভৈরবের গুরুপ্রণাম।* □

১৮ 'তপোবল' ( গিরিশ রচনাবলী ), ৫ম অংক, ২য় গর্ভাংক

* **উদ্দীপন, ফেব্রুয়ারি, ১৯৮৫, পৃঃ ৩৯-৪৩ ; প্রকাশস্থান—ঢাকা, বাংলাদেশ।**

**সংগ্রহ ঃ তাপস বসু**

পরিক্রমা

# আফ্রিকায় কয়েকটি দিন

## সুব্রতা মুখোপাধ্যায়

আফ্রিকা। বিচিত্র বিরাট মহাদেশ আফ্রিকা। তার সম্পর্কে সত্য ও কাল্পনিক কত না কাহিনীই শুনে আসছি সেই ছোটবেলা থেকে। বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে আফ্রিকা সম্পর্কে আগ্রহ কমেনি, বরং বেড়েই গিয়েছে এবং দেশটা দেখার ইচ্ছাটা ক্রমশঃ মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে। তাই বছর খানেক আগে যখন সেখানে যাবার একটা সুযোগ পাওয়া গেল তখন যেন ঠিক বিশ্বাসই করতে পারছিলাম না যে, সেখানে যাচ্ছি। পূর্ব আফ্রিকার কেনিয়াতে যাবার বন্দোবস্ত হলো। কেনিয়াকে বলা হয় 'Cradle of Mankind'—মানবের শৈশবভূমি। বিশেষজ্ঞদের মতে প্রায় দুশো মিলিয়ন বছর আগে এখানকার 'Great Rift Valley'-তে মানুষের পূর্বপুরুষ প্রথম সোজা হয়ে দাঁড়ায়।

কলকাতা থেকে ভারতের বাইরে যাওয়ার ব্যবস্থা খুবই সীমিত, তাই বোম্বাই যেতে হলো। বোম্বাই থেকে কেনিয়ার রাজধানী নাইরোবি পৌঁছাতে সময় লাগল ঘণ্টা পাঁচেক। পৌঁছালাম স্থানীয় সময় সকাল আটটায়। নাইরোবি সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে ৫,৫৮০ ফুট উঁচু, তাই অল্প অল্প ঠাণ্ডা পেলাম। সাম্প্রতিককালে এখানে পর্যটনব্যবস্থার ওপর খুব গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। কারণ, এর মাধ্যমে প্রচুর বিদেশী মুদ্রা অর্জন করা সম্ভব হচ্ছে।

যে-হোটেলটিতে আমরা উঠলাম সেটি নাইরোবির একটি অতিব্যস্ত রাজপথের ওপর। নাইরোবি শহরের বেশির ভাগ অঞ্চলই পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। পথঘাট চওড়া, দোকানপাট রাত্রে আলোকমালায় আলোকিত। বাকি অংশ কলকাতারই মতো—যথেষ্ট গাড়ির ভিড়, তবে মানুষের ভিড় কলকাতার তুলনায় কিছুই নয়। গাড়িতে করেই সেদিন শহরটি ঘুরে দেখলাম আমরা।

নাইরোবির অ্যানথ্রোপোলজিক্যাল মিউজিয়ামটি বিখ্যাত। ফেরার পথে এটি দেখার সুযোগ পেয়েছিলাম। এই যাদুঘরে মানবজন্মের ইতিহাস ধাপে ধাপে দেখানো হয়েছে। অন্যান্য প্রাণীদের সম্পর্কেও অনেক কিছু দেখানো হয়েছে। একটি ছোট্ট পাখি, মাত্র এক-আঙুল লম্বা, তার পাশেই একটা বড় মথ যেটা অনায়াসেই ঐ পাখিটিকে মেরে ফেলতে পারে। সাইবেরিয়া থেকে হাজার হাজার মাইল উড়ে দক্ষিণ গোলার্ধে কত পাখি আসে, তারও হিসাব রয়েছে। এখানে ঢোকার দর্শনী স্থানীয় লোকেদের জন্য ১০ শিলিং আর বহিরাগতদের জন্য ১০০ শিলিং।

পরদিন সকাল আটটায় আমরা রওনা হলাম 'মাসাই-মারা' ন্যাশনাল পার্কের পথে। রাস্তা আমাদের দেশেরই মতো—মাঝে মাঝে খারাপ, আবার মাঝে মাঝে ভাল। গাড়ির চালক যিনি, তিনিই পথপ্রদর্শক—খুব ভদ্র, ইংরেজীতে সবকিছু প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছিলেন। পথের ধারে চা ও ঠাণ্ডা পানীয়ের দোকান এবং স্থানীয় হস্ত-শিল্পসামগ্রীর দোকান। টয়লেটের ব্যবস্থাও আছে, সেটি অবিকল আমাদের দেশের গ্রামের বাড়ির মতোই। গাড়িতে যেতে যেতে একটা জিনিস লক্ষ্য করলাম, এত দরিদ্র দেশ, কিন্তু পথের ধারে যেখানে-সেখানে কেউ প্রাকৃতিক প্রয়োজনের কাজ সারছে না, যেটি আমাদের দেশে একটি ভয়াবহ সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে।

নাইরোবি থেকে মাসাই-মারার দূরত্ব দুশো কিলোমিটারের মতো। ঘণ্টা তিনেক যাবার পর ফাঁকা মাঠের মধ্যে এসে পড়লাম। দেখা পেলাম বিভিন্ন ধরনের হরিণের। এর মধ্যে ইম্পালা হরিণ অতি সুন্দর দেখতে। এছাড়া ঘুরে বেড়াচ্ছে জেব্রা, জিরাফ, বন্য মহিষ, কুৎসিত-দর্শন ওয়ার্টহগ, ওয়াইল্ড বীস্ট নামক ঘোড়া-জাতীয় প্রাণী এবং দু-একটি হাতি।

বেলা একটায় সারোভা-মারা লজে পৌঁছালাম। এরা পর্যটকদের অভ্যর্থনা করে এক গেলাস লেবুর সরবৎ দিয়ে। খুব তৃপ্তি পেলাম সেটি পান করে। এই লজটি সংরক্ষিত বনাঞ্চলের ভিতরেই এবং

অনেকখানি জায়গা জুড়ে। প্রধান হলটি গোলাকার। সেখানেই অফিস, সুভেনির ও বই-এর দোকান এবং খাবার জায়গা। এখানে প্রচুর খাবার সুন্দর করে সাজিয়ে দেয়। আফ্রিকার ফল বিখ্যাত, বিশেষ করে কলা ও পেঁপে; এছাড়া আম, তরমুজ, লেবু এসব তো আছেই। মাছ, মাংস, মোটা চালের ভাত, নানা রকম সব্জি ও স্যালাড দুবেলাই থাকত। বড় হাঁড়ায় 'সুপ' চড়ানো থাকত। এছাড়া রুটি, মাখন, চীজ, নানাবিধ কাস্টার্ড ও পুডিং পাওয়া যেত। ব্রেকফাস্টে ডিমের দু-তিনটি পদ এবং হ্যাম, বেকন, সসেজ ইত্যাদি। বড় বড় জগে ঠাণ্ডা ও গরম দুধের সঙ্গে ওট এবং কর্নফ্লেক্স। প্রচুর ফলের রসও সকালে পাওয়া যেত। বড় বড় ফ্লাস্কে চা ও কফি ভোরবেলা ও বিকালে রাখা থাকত।

থাকার ঘরগুলি হোটেলের মতো নয়—টেন্ট অর্থাৎ তাঁবু। ওপরটি তাঁবুর কাপড়ে ঢাকা, পাকা মেঝে এবং বাথরুম আধুনিক ধরনের। জল, কল, বিজলী বাতি কিছুরই অভাব নেই। অতিথিদের সুখ-সুবিধার দিকে এদের নজর খুব। ঘরের একপাশে ছাতা, মশা মারার স্প্রে, দেশলাই-মোমবাতি সব সাজানো আছে। ঘরের সামনের বারান্দায় চেয়ার পাতা। সামনে বড় বড় গাছ, সেখানে প্রচুর বাঁদর-পরিবারের বাস—তারা সর্বদাই আসে এবং বাচ্চারা জানলা দিয়ে উঁকি-ঝুঁকি মারে। প্রথমেই আমাদের সাবধান করে দেওয়া হলো যে, তাঁবুর দরজা যেন খুলে না রাখি। বাঁদরছানারা তাহলে ভিতরে ঢুকে পড়বে। জিনিসপত্র রেখে, লাঞ্চ খেয়ে আমরা বেরোলাম। আমাদের গাড়িটি ম্যাটাডর ভ্যানের মতো, মাথার ওপরটি খোলা যায়—দাঁড়িয়ে দেখার ও ছবি তোলার জন্য।

ন্যাশন্যাল পার্ক কিন্তু জঙ্গল নয়—তৃণভূমি। মাঝে মাঝে ঝোপ ও প্রায় ১৪/১৫ ফুট উঁচু মনসা-জাতীয় গাছ। রাস্তা আছে কিন্তু তৃণভূমির ওপরেও গাড়ি চালানো হয়। তৃণভূমি বিরাট এলাকা জুড়ে। একদিকে ছোট ছোট পাহাড়ও দেখা গেল। এখানে ঢুকে দেখলাম বিরাট হাতির দলকে। বড় বড় দাঁতাল হাতি, কানগুলোও বিরাট বড়। বিভিন্ন বয়সের হাতি। মা-হাতির সঙ্গে চলেছে খুদে হাতি—প্রায় টলে টলে হাঁটছে। ড্রাইভার বললেন, বয়স তার দু-সপ্তাহের মতো হবে। পাহাড়ের ঢাল বেয়ে নেমে আসছিল বন্য মহিষের পাল। জেব্রারাও চরে বেড়াচ্ছে, নানা বয়সের হরিণ তো আছেই। এদের তুলনায় জিরাফের সংখ্যা কম, একসঙ্গে পাঁচ-ছয়টির বেশি দেখতে পাইনি। পশুরাজ সিংহ? তাদের দেখা পেলাম, দু-তিনটি বড় বড় ঝোপের মধ্যে—একটাতে দু-তিনটি সিংহী কাচ্চাবাচ্চা নিয়ে ঘুমোচ্ছে, অন্য এক-একটি ঝোপে একটি করে সিংহ বসে রয়েছে রাজকীয় ভঙ্গিতে—আমাদের প্রতি ভ্রূক্ষেপও করল না। খানিক পরে সূর্য পশ্চিমদিকে ঢলে পড়ল। চারিদিকে স্নিগ্ধ শান্ত পরিবেশ। হরিণেরা নিশ্চিন্তে ঘুরে বেড়াচ্ছে। দেখে মনেই হয় না যে, মাইল খানেকের মধ্যেই সিংহরা রয়েছে, সেটা তাদের খেয়াল আছে। এখানকার নিয়ম—সন্ধ্যা ছটায় লজে ফিরে যেতে হবে। ছটার পর বনাঞ্চলে থাকার নিয়ম নেই এবং রাত্রে ঘোরারও কোন ব্যবস্থা নেই।

পরদিন সকালে আবার ঐ বনাঞ্চলে যাওয়া হলো। প্রথমে সাক্ষাৎ পেলাম একজোড়া অস্ট্রিচ পাখির; মন্থর গতিতে ঘুরে বেড়াচ্ছে তারা। হাতির দলে আজ আরও ভিড়, গুণে উঠতে পারলাম না তাদের সংখ্যা। তারা যখন রাস্তা পার হয় তখন সব গাড়ি থেমে যায়। তারা পার হলে তবেই আমরা মানুষেরা, রাস্তা পাই। হরিণ, জেব্রা, জিরাফ, ওয়ার্টহগ, ওয়াইল্ড বীস্ট প্রভৃতি প্রাণীরাও চরে বেড়াচ্ছে।

কিছুদূর গিয়ে দেখি, এক জায়গায় অনেক গাড়ির ভিড়। একটি বিরাট বন্য মহিষকে সদ্য মারা হয়েছে এবং সেটিকে চিৎ করে শুইয়ে, গলা থেকে পেট পর্যন্ত যেন ছুরি দিয়ে কেটে ফেলা হয়েছে। ২২।২৩টি সিংহ-সিংহী ও বাচ্চা মিলে আহারপর্ব শুরু করেছে। গলার কাছে দুটি অতিকায় সিংহ এবং তাদের দুপাশে সারি দিয়ে বসেছে সিংহী ও বাচ্চারা। এরকম অভাবনীয় দৃশ্য দেখতে পাব আশা করিনি—ঝটপট অনেকগুলি ক্যামেরার 'ফ্ল্যাশ' জ্বলে উঠল। আমাদের হাতে ক্যামেরা নেই, তাই মনের ক্যামেরাতে ছবিটি ধরে রাখলাম। বিকালে আবার যখন এখানে এলাম, তখন সিংহরা পেটপুরে খেয়ে একটু দূরেই পড়ে পড়ে ঘুমাচ্ছে। মায়েরা ও বাচ্চারা তখনও খেয়ে চলেছে।

এই সময়ে একটি গাড়ির চাকা কাদায় বসে যায়, ফলে গাড়ি আর নড়ে না। তখন স্থানীয় লোকেরা নেমে দড়ি বেঁধে—গাড়িটি তুলল, কিন্তু সিংহরা একবারও দেখল না, আমার কিন্তু ভয়ে বুক দুরদুর করছিল।

মাসাই-মারায় 'মারা' নদীতে জলহস্তীও দেখলাম। আমাদের কলকাতার চিড়িয়াখানায় যা আছে তার প্রায় দ্বিগুণ বড়। নদীর মধ্যে সারা শরীর ডুবিয়ে শুধু নাকটি তুলে আছে। জলহস্তীর ডাকও এই প্রথম শুনলাম। একটি কথাই মনে পড়ছিল—"বন্যেরা বনে সুন্দর"। আমরা যে এদের বন্দী করে খাঁচায় রাখি সেটি বড়ই নিষ্ঠুরতার কাজ।

পরদিন সকালে রওনা হলাম লেক নাকারুর উদ্দেশে। পথে অনেক গ্রামের মধ্য দিয়ে, রেল লাইন পাশে রেখে যাওয়া হলো। একটি বড় শহর পেলাম—'নাইভাসা'; চাইবাসার সঙ্গে কি মিল! কেমন করে হলো, তাই ভাবছিলাম। নাইভাসা ছাড়ার পর উঁচু রাস্তা থেকে একটু দূরে লেক দেখা যাচ্ছিল। মনে হলো, লেকের মধ্যে গোলাপী ফুল ফুটে আছে। আসলে ওগুলি গোলাপী ফেমিংগো পাখি। লেক নাকারু হলো গোলাপী ফেমিংগোদের আস্তানা। পাখিগুলি লেকের মাঝখানে দল বেঁধে বসে থাকে, কখনো তিরতির করে সাঁতার কেটে যায়, কখনো ঠোঁট ডুবিয়ে জলের মধ্যে খাবার খোঁজে, আবার ঝাঁক বেঁধে অসীম আকাশে উড়ে চলে।

এখানকার থাকার কটেজগুলিও খুব সুন্দর। পরের দিন ব্রেকফাস্টের পর নাইরোবি ফেরার জন্য বেরোলাম। আজকের পথ খুব ভাল। পথের ধারে কমলালেবু ও বাঁধাকপির ছোট ছোট দোকান। কাঠের তৈরি জন্তু-জানোয়ার ও পুতুলের দোকান। এই পথেই গ্রেট রিফ্ট ভ্যালী পার হলাম, কিন্তু আজ প্রচণ্ড ঘন কুয়াশার জন্য কিছুই প্রায় দেখা গেল না, যদিও ড্রাইভার বার কয়েক গাড়ি থামিয়ে দেখাবার চেষ্টা করলেন। নাইরোবির কাছাকাছি আসতে কুয়াশা কেটে গেল। রাস্তার ধারে দেখলাম কফির চাষ হচ্ছে। হোটেলে লাঞ্চ সেরে বিকালে রেলস্টেশনে চলে এলাম। স্টেশন ও প্ল্যাটফর্ম খুব পরিষ্কার এবং ভিড় একেবারেই নেই। বিনামূল্যে ট্যাক্সি থেকে ট্রেন পর্যন্ত মাল বয়ে নিয়ে যাওয়ার নির্দেশ লেখা আছে। কিন্তু ২০ শিলিং না পেলে মাল তুলবে না—কুলিটি জানিয়ে দিল। এই একবার এবং বিমানবন্দরে একবার কর্মচারীদের কাছে মন্দ ব্যবহার পেয়েছিলাম। এছাড়া সবসময়েই এখানকার মানুষের ব্যবহার অত্যন্ত ভদ্র। মহিলাদের এরা ডাকে 'মাম্মা' বলে, মনে হয় যেন 'মা' বলেই ডাকছে।

আমাদের ট্রেন সন্ধ্যা সাতটায় ছাড়ল। নাইরোবি থেকে মোম্বাসা ৪৫০ কিলোমিটার। যেতে লাগে তেরো ঘণ্টা। মাঝরাতে একবার মাত্র একটি স্টেশনে ট্রেন থামে। প্রথম শ্রেণীর কামরাগুলি সবই দুই বার্থের। পরিষ্কার ধবধবে বিছানা ভাড়া নেওয়া হলো পলিথিন-ব্যাগে। কামরাগুলি পরিষ্কার ও অন্যান্য সুবিধাযুক্ত। টয়লেটে পরিষ্কার কমোড এবং ফ্ল্যাশ টানলে জল পড়ে। অবাক হলাম ট্রেনে এত ভাল বাথরুমের ব্যবস্থা দেখে এবং তখনই মনে পড়ল দেশের ট্রেনের বাথরুমের অব্যবস্থার কথা।

ডাইনিং-কার আছে। ট্রেন ছাড়তেই স্টুয়ার্ড এলেন বসবার প্ল্যানসমেত কার্ড নিয়ে এবং জানালেন, আমাদের খেতে হবে পৌনে নয়টায় এবং আসন-ব্যবস্থা হবে এই। মেনু—ভাত, মাংস এবং কাস্টার্ড। পরিমাণে যথেষ্ট। এই ট্রেনটি Tsavo National Park-এর মধ্য দিয়ে যায়, ভোরের দিকে হরিণ, জেব্রা দেখতে পাওয়া গেল। মোম্বাসার কাছাকাছি এসে মনে হলো যেন বাংলার মধ্য দিয়েই যাচ্ছি, সেই তাল-নারকেল গাছ, কুঁড়েঘর, গ্রামের ছোট ছেলেমেয়েরা দাঁড়িয়ে আছে ট্রেন দেখবে বলে। বাংলার ছেলেমেয়েদের সঙ্গে তফাৎ এই যে, তাদের সবার গায়েই জামা-কাপড় আছে এবং বেশির ভাগের পায়েই জুতো আছে।

কেনিয়ার দক্ষিণ-পূর্বে ভারত মহাসাগরের তীরে একটি দ্বীপের ওপর মোম্বাসা অবস্থিত। এর দুপাশে দুটি খাঁড়ি থাকায় এটি স্বাভাবিক পোতাশ্রয় হিসাবে ব্যবহৃত হয়। মূল ভূখণ্ডে পুরনো মোম্বাসা শহরটি রয়েছে।

মোম্বাসার সমুদ্রতীর অপূর্ব সুন্দর—সাদা বালুর তটভূমি ঝকঝক তকতক করছে। যে-হোটেলে উঠেছিলাম সেটি নারকেল গাছের ছায়ায় ঢাকা। সবুজ নরম-ঘাসে ঢাকা লন। তার নিচেই তটভূমি। নিশ্চিন্তে এখানে বসে থাকা যায় ঘণ্টার পর ঘণ্টা।

পুরীর সমুদ্রের মতো বড় বড় ঢেউ নেই বটে, তবে যা আছে তা চোখ জুড়িয়ে দেয়।

এখানে দেখলাম 'ফোর্ট জিসাস'। এটি, যতদূর মনে পড়ে, ষোড়শ শতাব্দীতে পর্তুগীজদের দ্বারা তৈরি। পরবর্তী কালে আরবদের হাতে আসে এবং তারও পরে ব্রিটিশরা এটিকে কয়েদখানা হিসাবে ব্যবহার করে। এটি এখন একটি যাদুঘর। ওপর থেকে সমুদ্র অনেক দূর পর্যন্ত দেখা যায়।

বর্তমান মোম্বাসায় ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে ভারতীয়দেরই আধিপত্য। কয়েক পুরুষ ধরে প্রধানতঃ গুজরাট অঞ্চলের অধিবাসীরা এখানে ব্যবসায় চালিয়ে যাচ্ছেন। স্থানীয় লোকেরা হোটেলে, দোকানে, কারখানায় ও বাড়িতে কাজ করছেন। বয়, বেয়ারা, ড্রাইভার, মালী, ঝি, চাকর সকলেই স্থানীয় মানুষ। অনেক বাড়ির ও দোকানের ভারতীয় নাম দেখলাম, যেমন 'গঙ্গা নিকেতন', 'দিলবাহার পান হাউস' ইত্যাদি।

মোম্বাসা থেকেই আমরা আম্বোসেলি রওনা হলাম একদিন শেষরাতে জীপে চেপে। প্রায় পাঁচশো কিলোমিটার পথ, তার বেশির ভাগই দুর্গম, বন্ধুর। ধুলোয় প্রায় স্নান করে গেলাম। রোদের তেজও ছিল প্রচণ্ড, খুব কষ্ট হলো সেদিন। পথে কয়েকটি মাসাইদের গ্রাম পড়ল; দরমার ওপর কাদা দিয়ে লেপা গোলাকার ঘর। মাসাই মেয়ে-পুরুষ উভয়েই খুব রঙচঙে কাপড় পরে, গয়নাও পরে অনেকে। মেয়েদের কারো কারোর মাথা কামানো। পর্যটকেরা এদের ছবি তোলায় আগ্রহী বলে এরা নাকি আগেই সেজেগুজে নিয়ে তার জন্য দাম চেয়ে নেয়।

আম্বোসেলি আসার প্রধান কারণ কিলিমাঞ্জারো আগ্নেয়গিরি দেখা। সেটি দেখতে পেলাম ভর দুপুরে। তখন তার মাথায় খুব বেশি বরফ ছিল না। কিলিমাঞ্জারো আগ্নেয়গিরিটি আফ্রিকার সর্বোচ্চ পর্বত। (বর্তমানে তানজানিয়ার মধ্যে, আগে কেনিয়ার মধ্যেই ছিল শুনলাম)। এটি তানজানিয়া ও কেনিয়ার সীমান্তে অবস্থিত বলে কেনিয়ার দিক থেকে দেখার কোন অসুবিধা নেই। কিলিমাঞ্জারোর শেষ উদ্‌গীরণ হয়েছে ১৮৯০ খ্রীস্টাব্দে। পরে আমরা ঐ শিলীভূত লাভার মাঠের মধ্য দিয়ে গেলাম ও লাভার টুকরো সংগ্রহ করলাম।

'আম্বোসেলি লজ'-এর ব্যবস্থা মাসাই-মারার মতোই। রাতে খাবার পর খাবারঘরের সংলগ্ন বারান্দায় বসে আছি। মাঝখানে আগুন জেলে স্থানীয় যুবকেরা গীটার বাজিয়ে গান গাইছে। সারাদিনের ঘোরাঘুরির পর সবাই আরামে বসে গান শুনছি, হঠাৎ পাশের জঙ্গল থেকে বাচ্চা সহ একটি মা-হাতি এসে সামনের ছোট ছোট গাছগুলি খেতে শুরু করল; একটু পরেই অন্যদিক থেকে আরও একটি মা-হাতি এসে পড়ল। মা-হাতিটি তাকে তেড়ে গেলে সেটিও এগিয়ে এল, কিন্তু শেষে রণে ভঙ্গ দিয়ে পালালো। খানিক বাদে হেলতে দুলতে একটি জলহস্তী এসে ঘুরে গেল।

পরদিন ভোরে যখন কিলিমাঞ্জারো দেখলাম তখন তার মাথায় অনেক বরফ পড়েছে।

মোম্বাসায় ফিরে নাইরোবিতে এসে আফ্রিকা সফর শেষ করলাম। স্মরণীয় হয়ে রইল এই কয়টি দিন।

উপসংহারে দু-একটি কাজের কথা জানাই। আফ্রিকা যেতে হলে পীতজ্বরের টিকা নিতে হয়। ম্যালেরিয়ার ওষুধও খেলে ভাল হয়। ঘোরাঘুরির সময় স্থানীয় জল পান না করাই ভাল। আমরা নাইরোবি থেকে মিনারাল জলের বোতল কিনে নিয়েছিলাম।

নাইরোবি ও মোম্বাসায় ছিঁচকে চোরের উপদ্রব বেশ আছে। সন্ধ্যার পর হেঁটে রাস্তায় বের হতে ওখানকার সবাই নিষেধ করে থাকেন। কিন্তু স্থানীয় অধিবাসীদের ব্যবহার অত্যন্ত ভদ্র। দেখা হলেই 'জাম্বো' বলে শুভেচ্ছা জানায়।

এদের ভাষা সোয়াহিলী। সাধারণের প্রধান খাদ্য ভুট্টার আটার মণ্ড, তার সঙ্গে একটি শাকসেদ্ধ। মাংস যারা কিনতে পারে তারা খায়। কেনিয়ার অধিবাসীদের মধ্যে শতকরা ৬৬জন খ্রীস্টধর্মাবলম্বী, কেবল মাত্র ৬ ভাগ ইসলামধর্মীয় এবং বাকি অংশ ট্রাইব্যাল ধর্মের।

কেনিয়ার স্থানীয় মানুষের ধর্মচর্চা সম্পর্কে কোন প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা সংগ্রহ করতে পারিনি। এত অল্প সময়ের মধ্যে কোন গির্জা বা অন্য কোন স্থানীয় উপাসনালয়ে যাওয়াও সম্ভব হয়ে ওঠেনি। ☐

পরমপদকমলে

# 'আপনাতে আপনি থেকো মন'

## সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়

"আর কোন মিঞার কাছে যাইব না।"

স্বামীজী প্রমদাবাবুকে লিখছেন (৩ মার্চ, ১৮৯০)। পরিব্রাজক বিবেকানন্দের ঠিকানা তখন গাজীপুর। মহাযোগী পওহারীজীর কাছ থেকে স্বামীজী কিছু আধ্যাত্মিক সম্পদ লাভ করার চেষ্টা করেছিলেন। ভেবেছিলেন, এমন কিছু পাবেন, যা তিনি ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে পাননি। এমন ইচ্ছা হওয়ার কারণটা কী। নিজেই বলছেন ঐ চিঠিতে: "কঠোর বৈদান্তিক মত সত্ত্বেও আমি অত্যন্ত নরম প্রকৃতির লোক। উহাই আমার সর্বনাশ করিতেছে। একটুকুতেই এলাইয়া যাই।" প্রথম আবেগে ভেবেছিলেন এক। হলো আর এক। কেন গাজীপুরে এলেন। একটি চিঠিতে লিখছেন: "কিন্তু যে জন্য আসিয়াছি—অর্থাৎ বাবাজীকে দেখা—তাহা এখনও হয় নাই।" (২৪ জানুয়ারি, ১৮৯০) কয়েকদিন পরেই তিনি সেই যোগীবরের সঙ্গে দেখা করতে গেলেন। তাঁর বাড়ি দেখা হলো, কিন্তু তাঁর সঙ্গে দেখা হলো না। "পওহারী বাবার বাড়ি দেখিয়া আসিয়াছি। চারিদিকে উচ্চ প্রাচীর, ইংরেজী বাংলার মতন, ভিতরে বাগান আছে, বড় বড় ঘর, Chimney & c। কাহাকেও ঢুকিতে দেন না, ইচ্ছা হইলে দ্বারদেশে আসিয়া ভিতর থেকে কথা কন মাত্র। একদিন যাইয়া বসিয়া বসিয়া হিম খাইয়া ফিরিয়া আসিয়াছি।" (৩০ জানুয়ারি, ১৮৯০)

এর পরদিনই স্বামীজী লিখছেন: "বাবাজীর সহিত দেখা হওয়া বড় মুশকিল, তিনি বাড়ির বাহিরে আসেন না, ইচ্ছা হইলে দ্বারে আসিয়া ভিতর হইতে কথা কন। অতি উচ্চ প্রাচীরবেষ্টিত উদ্যান-সমন্বিত এবং চিমনিদ্বয়-শোভিত তাঁহার বাটী দেখিয়া আসিয়াছি, ভিতরে প্রবেশের ইচ্ছা নাই। লোকে বলে, ভিতরে গুফা অর্থাৎ তয়খানা গোছের ঘর আছে, তিনি তন্মধ্যে থাকেন; কি করেন তিনিই জানেন, কেহ কখনও দেখে নাই। একদিন যাইয়া, অনেক হিম খাইয়া বসিয়া বসিয়া চলিয়া আসিয়াছি, আরও চেষ্টা দেখিব।... এখানকার বাবুরা ছাড়িতেছেন না, নহিলে বাবাজী দেখিবার সখ আমার গুটাইয়াছে।" (৩১ জানুয়ারি, ১৮৯০)

দুটো মনের লড়াই চলেছে, এক মন ঠাকুরে নিবেদিত। তিনিই তো সব, আবার কেন! কিন্তু আর এক মনে চির-অনুসন্ধিৎসা, দেখাই যাক না, নতুন কি পাওয়া যায়! একটা শূন্যতার বোধও ভিতরে রয়েছে, শ্রীরামকৃষ্ণ নরশরীর সম্বরণ করেছেন। 'নরেন' বলে স্নেহ-সম্বোধন আর শোনা যাবে না। সর্বোপরি স্বামীজী হলেন এক উদার অধ্যাত্মবিজ্ঞানী। সব মত, সব পথ দেখতে চান। অন্তরালে ঠাকুর হাসছেন। রাশ একটু আলগা করে রেখেছেন। নরেন কারো নির্দেশে চলার পাত্র নয়। সে দেখবে, সে সিদ্ধান্তে আসবে। নিজের পথ নিজেই তৈরি করে নেবে। সেই কারণে পওহারীপর্ব আরও কিছু দূর এগল। স্বামীজী তাঁর দর্শন পেলেন। স্বামীজীর উচ্ছ্বাস প্রকাশ পেল পরবর্তী পত্রে: "ইনি অতি মহাপুরুষ—বিচিত্র ব্যাপার, এবং এই নাস্তিকতার দিনে ভক্তি এবং যোগের অত্যাশ্চর্য ক্ষমতার অদ্ভুত নিদর্শন। আমি ইঁহার শরণাগত হইয়াছি, আমাকে আশ্বাসও দিয়াছেন, সকলের ভাগ্যে ঘটে না। বাবাজীর ইচ্ছা—কয়েক দিবস এই স্থানে থাকি, তিনি উপকার করিবেন। অতএব এই মহাপুরুষের আজ্ঞানুসারে দিনকয়েক এস্থানে থাকিব।" (৪ ফেব্রুয়ারি, ১৮৯০)

এইবার বলরামবাবুকে স্বামীজী লিখছেন: "অতি আশ্চর্য মহাত্মা। বিনয় ভক্তি এবং যোগ-মূর্তি। আচারী বৈষ্ণব কিন্তু দ্বেষবুদ্ধিরহিত। মহাপ্রভুতে বড় ভক্তি। পরমহংস মহাশয়কে বলেন, "এক অবতার থে"। আমাকে বড় ভালবাসিয়াছেন। তাঁহার অনুরোধে কিছুদিন এস্থানে আছি। ইনি ২/৬ মাস একাদিক্রমে সমাধিস্থ থাকেন। বাঙ্গলা

পড়িতে পারেন। পরমহংস মশায়ের ফটোগ্রাফ রাখিয়াছেন। সাক্ষাৎ এখন হয় না। দ্বারের আড়াল থেকে কথা কহেন। এমন মিষ্ট কথা কখনও শুনি নাই।…ইঁহার জন্য একখানি চৈতন্যভাগবত পত্রপাঠ যেথায় পাও পাঠাইবে।… এরও একজন হৃদে (অর্থাৎ বড় ভাই) কাছে আছে—সেও বাটীতে ঢুকিতে পায় না। তবে হৃদের মত… নহে। চৈতন্যমঙ্গল যদি ছাপা হইয়া থাকে তাহাও পাঠাইও। ইনি গ্রহণ করিলে তোমার পরম ভাগ্য জানিবে। ইনি কাহারও কিছু লয়েন না। কি খান, কি করেন কেহই জানে না। আমি এস্থানে আছি কাহাকেও বলিও না ও আমাকেও কাহারও খবর দিবে না। আমি বড় কাজে বড় ব্যস্ত।" (৬ ফেব্রুয়ারি, ১৮৯০)

স্বামীজী একটা ঘোরে আছেন। নিজের শরীর ভাল নয়। লাম্বাগোয় (Lumbago) কষ্ট পাচ্ছেন। ম্যালেরিয়ার বিষ তো শরীরে রয়েছেই; কিন্তু পওহারীবাবার স্পেল কাজ করছে। প্রমদাবাবুকে লিখছেন: "আগুন বাহির হয়—এমন অদ্ভুত তিতিক্ষা এবং বিনয় কখন দেখি নাই। কোনও মাল যদি পাই, আপনার তাহাতে ভাগ আছে নিশ্চিত জানিবেন।" (১৩ ফেব্রুয়ারি, ১৮৯০)

এই পর্যায় পর্যন্ত আসার পরই ঠাকুর তাঁর অদৃশ্য খেলা খেললেন। রাশ টেনে ধরলেন। ঘটনাচক্র ঘুরে গেল, প্রমদাবাবুকে স্বামীজী লিখছেন: "কিন্তু এখন দেখিতেছি—উল্টা সমঝলি রাম! কোথায় আমি তাঁহার দ্বারে ভিখারী, তিনি আমার কাছে শিখিতে চাহেন! বোধহয়—ইনি এখনও পূর্ণ হয়েন নাই, কর্ম এবং ব্রত এবং আচার অত্যন্ত, এবং বড় গুপ্তভাব। সমুদ্র পূর্ণ হইলে কখনও বেলাবদ্ধ থাকিতে পারে না, নিশ্চিত।" অবশেষে উপলব্ধি:

"আর কোন মিঞার কাছে যাইব না—
আপনাতে আপনি থেকো মন, যেও নাকো কারু ঘরে,
যা চাবি তাই বসে পাবি, খোঁজ নিজ অন্তঃপুরে।
পরম ধন ঐ পরশমণি, যা চাবি তাই দিতে পারে
এমন কত মণি পড়ে আছে চিন্তামণির নাচদুয়ারে।"

ঠাকুর তাঁর প্রিয় সন্তানকে ভারত-পরিক্রমায় ঠেলে বের করেছিলেন দুটি কারণে—অভিজ্ঞতা সঞ্চয় আর বিশ্বাস দৃঢ় করার জন্যে। সব ঠাঁই ঘুরে এসে এক ঠাঁয়ে পাকা। ঘুঁটি পাকা করার কারণে। স্বামীজীর অবশেষ সিদ্ধান্ত: "রামকৃষ্ণের জুড়ি আর নাই, সে অপূর্ব সিদ্ধি, আর সে অপূর্ব অহেতুকী দয়া, সে intense sympathy বদ্ধ-জীবনের জন্য—এ জগতে আর নাই। হয়, তিনি অবতার—যেমন তিনি নিজে বলিতেন, অথবা বেদান্তদর্শনে যাঁহাকে নিত্যসিদ্ধ মহাপুরুষ—'লোক-হিতায় মুক্তোঽপি শরীরগ্রহণকারী' বলা হইয়াছে, নিশ্চিত নিশ্চিত ইতি মে মতিঃ, এবং তাঁহার উপাসনাই পাতঞ্জলোক্ত 'মহাপুরুষ-প্রণিধানাদ্বা'।

"তাঁহার জীবদ্দশায় তিনি কখনও আমার প্রার্থনা গরমঞ্জুর করেন নাই—আমার লক্ষ অপরাধ ক্ষমা করিয়াছেন, এত ভালবাসা আমার পিতামাতায় কখনও বাসেন নাই। ইহা কবিত্ব নহে, অতিরঞ্জিত নহে, ইহা কঠোর সত্য এবং তাঁহার শিষ্যমাত্রেই জানে। বিপদে প্রলোভনে 'ভগবান রক্ষা কর' বলিয়া কাঁদিয়া সারা হইয়াছি—কেহই উত্তর দেয় নাই—কিন্তু এই অদ্ভুত মহাপুরুষ বা অবতার বা যাই হউন, নিজ অন্তর্যামিত্বগুণে আমার সকল বেদনা জানিয়া নিজে ডাকিয়া জোর করিয়া সকল অপহৃত করিয়াছেন। যদি আত্মা অবিনাশী হয়—যদি এখনও তিনি থাকেন, আমি বারংবার প্রার্থনা করি—হে অপারদয়ানিধে, হে মমৈকশরণদাতা রামকৃষ্ণ ভগবান, কৃপা করিয়া…" ইত্যাদি।

ঠাকুর চাইতেন—নিজের বিচার, চাইতেন পরীক্ষা। তাঁর নিজের ভাষায়—আঁট। বলতেন, আঁট থাকা চাই। বলতেন, টল থেকে অটলে যাও। তিনি পছন্দ করতেন—সার্চ। খোঁজ। উচ্ছ্বাসের ধারায় খুলে পড়ে যাওয়ার সম্ভাবনাই বেশি। সেই কারণে, সমঝে ধর। ধাক্কা খেতে খেতে এস। বড় সুন্দর উপমা, একজনকে খোঁজা হচ্ছে। মালিককে। তিনি বসে আছেন অন্ধকার ঘরে। অন্ধকারে খুঁজছেন। এক-একটা জিনিস স্পর্শ করছেন—চেয়ার, টেবিল, টুল, খাটের বাজু। না, এ নয়, এ নয়। হঠাৎ হাত গিয়ে পড়ল হাঁটুতে এই তো বাবু, বসে আছেন চেয়ারে।

স্বামীজীর সেই অন্বেষণই শেষ হলো পরম উপলব্ধিতে—

"রামকৃষ্ণের জুড়ি আর নাই।" □

# করোনারী (ইশকিমিক) হৃদ্‌রোগ

অরবিন্দবিহারী মুখোপাধ্যায়

বর্তমান যুগে শহরাঞ্চলে মৃত্যুর একটি অন্যতম প্রধান কারণ হলো হৃদ্‌রোগ ( Heart Disease )। অন্য কারণগুলি হলো সেরিব্র্যাল অ্যাথিরোসক্লেরোসিস ( Cerebral Atherosclerosis ) বা 'স্ট্রোক' ( Stroke ), ক্যান্সার এবং পথ-দুর্ঘটনা।

হৃদ্‌রোগ এখন প্রায় সব ঘরেই হচ্ছে। শহরাঞ্চলে প্রধানতঃ ৪০ থেকে ৬০ বছর বয়স্ক পুরুষদের ক্ষেত্রে হৃদ্‌রোগের আধিক্য দেখা যায়। 'শহরাঞ্চলে' বললাম এই কারণে যে, গ্রামাঞ্চলের সঠিক সংখ্যা জানা যায় না এবং যেসকল কারণে হৃদ্‌রোগ হয়, সেই কারণগুলি শহরাঞ্চলেই বেশি পাওয়া যায়।

হৃদ্‌রোগ সম্পর্কে জানতে হলে হৃৎপিণ্ডের গঠন সম্পর্কে কিছু জানা দরকার। হৃৎপিণ্ড পেশী দিয়ে তৈরি একটি যন্ত্র (Muscular Organ)। এর ওজন প্রায় ২৫০ গ্রাম। পূর্ণবয়স্ক মানুষের হাতের মুঠোর মতো এর মাপ। হৃৎপিণ্ডটি স্টারনাম ( Sternum ) নামক বুকের হাড়ের পিছনে, বুকের মাঝামাঝি একটু বাঁদিক ঘেঁষে অবস্থিত। হৃৎপিণ্ডের চারটি ভাগ বা কক্ষ ঃ বাম অলিন্দ ( Left Ventricle ) ও ডান অলিন্দ ( Right Ventricle ) এবং বাম নিলয় ( Left Auricle ) ও ডান নিলয় ( Right Auricle )।

হৃদ্‌পিণ্ডের মাংসপেশীতে রক্ত সরবরাহ করে বাম ও দক্ষিণ করোনারী আর্টারী বা ধমনী ( left and right Coronary Arteries )। সরবৎ পান করার জন্য যে স্ট্র ( straw ) আমরা ব্যবহার করি ধমনীগুলি সেই মাপের। নানা ধরনের হৃদ্‌রোগের মধ্যে যেটিকে ইশকিমিক ( রক্তাল্পতাজনিত ) হার্ট ডিজিজ—সংক্ষেপে আই. এইচ. ডি. ( I. H. D.—Ischemic Heart Disease ) বলা হয় সেটিই এখানে আলোচ্য বিষয়।

হৃৎপিণ্ডে যখন রক্ত-সরবরাহের গোলমাল এবং অভাব ঘটতে থাকে তখন হৃৎপিণ্ড কাজের সময় এমনকি বিশ্রামের সময়ও তার কাজ ঠিকমত করতে পারে না। তখন তাকেই 'ইশকিমিক হার্ট ডিজিজ' বলা হয়। একে করোনারি আর্টেরিয়াল ডিজিজ ( Coronary Arterial Disease )-ও বলা হয়। আই. এইচ. ডি. এখন অনেক পরিবারেই কারোর না কারোর হচ্ছে। অনেক সময় এর লক্ষণগুলি অম্বল, বুকজ্বালা, স্নায়ুর ব্যথা এবং পেশীর ব্যথার সঙ্গে মিলে বিভ্রান্তির সৃষ্টি করে। কাজেই এই জাতীয় লক্ষণগুলি দেখা গেলে, বিশেষ করে চল্লিশোর্ধ্ব বয়স্ক ব্যক্তিদের ক্ষেত্রে চিকিৎসকের পরামর্শ নেওয়া ভাল।

আই. এইচ. ডি. কেন হয়? যে বা যেসব করোনারী ধমনীর ভিতর দিয়ে রক্ত যায়, সেই সব ধমনীগুলির ভিতর দিকে আস্তরণ পড়ে, যার ফলে ধমনীটি সরু হয়ে যায়, রক্ত-চলাচলের ব্যাঘাত ঘটে এবং হৃদ্‌পিণ্ডে রক্ত-সরবরাহ কম হয়। এর জন্য বুকে চাপ অনুভূত হয় এবং ব্যথা হয়। প্রথম প্রথম পরিশ্রম করলে ব্যথা হয়, কিন্তু পরে বিশ্রামের সময়ও ব্যথা হয়।

**আই. এইচ. ডি.-এর প্রধান কারণগুলি হলো ঃ**

(১) উচ্চ রক্তচাপ (Hypertension), (২) রক্তে স্নেহজাতীয় পদার্থের আধিক্য, (৩) ধূমপান, (৪) ডায়াবেটিস বা বহুমূত্র, (৫) মানসিক চাপ ও অশান্তি, (৬) দৈহিক পরিশ্রম না করে জীবনযাপন, (৭) মোটা হওয়া বা শরীরের অতিরিক্ত ওজন এবং (৮) পারিবারিক ধারা (Familial trend)।

### উচ্চ রক্তচাপ

একজন পূর্ণবয়স্ক ব্যক্তির রক্তচাপ যদি বেশির ভাগ সময়েই ১৪০/৯০ মিলিমিটারের বেশি থাকে তবে তার উচ্চ-রক্তচাপ আছে বলে ধরা হয়। এই সকল উচ্চরক্তচাপযুক্ত বা হাই-ব্লাডপ্রেসারের রোগীদের হৃদ্‌রোগ, মস্তিষ্কের রোগ ( Cerebral Attack ও বৃক্কের ( Kidney )-র অসুখের ভয় থাকে। ওষুধ খাওয়া ছাড়া রোগী নিজে নিজে যে-সাবধানতা অবলম্বন করতে পারেন তা হলো ঃ

(ক) নুন কম খাওয়া—দৈনিক ২ গ্রামের বেশি নয়, (খ) যাঁদের ওজন বেশি তাঁদের ওজন কমানো,

(গ) সব কাজকর্মই ধীরে ধীরে করা—তাড়াহুড়ো না করা, (ঘ) ভাবনা বা দুশ্চিন্তা না করা ও রাগ দমন করা, (ঙ) সুনিদ্রা যাতে হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখা এবং (চ) পায়খানা পরিষ্কার রাখা।

**রক্তে স্নেহজাতীয় পদার্থের আধিক্য**

রক্তে যখন স্নেহজাতীয় পদার্থের আধিক্য হয় তখন তাকে 'হাইপারলিপিডিমিয়া' বলা হয়। এর অন্যান্য উপাদানগুলির মধ্যে আছে লিপিড বা ফ্যাট (Lipid/Fat), ট্রাইগ্লিসারাইড (Tryglyceride), কোলেস্টেরল (Cholesterol)।

রক্তে কোলেস্টেরল প্রতি একশো কিউবিক সেন্টিমিটারে ১৮০ থেকে ২২০ মিলিগ্রামের বেশি হওয়া উচিত নয়। ট্রাইগ্লিসারাইডের পরিমাণ তেমনি ১৫০ মিলিগ্রামের বেশি হওয়া ঠিক নয়। এই মাপগুলি সাধারণভাবে প্রযোজ্য। হাইপারলিপিডিমিয়া প্রতিরোধের জন্য খাদ্যে স্নেহপদার্থের ভাগ কমাতে হবে এবং সুরাপায়ীদের, বিশেষ করে যাদের রক্তে ট্রাইগ্লিসারাইডের ভাগ বেশি তাদের সুরাপানের মাত্রা কমাতে হবে।

যেসব খাদ্যে কোলেস্টেরল বেশি আছে, যেমন—ডিম এবং গরু, শুকর, খাসী, ভেড়ার মাংস (Red Meat)—সেসব খাদ্য বর্জন করতে হবে। যেসব স্নেহপদার্থ জমে যায় (Saturated fat) যথা ঘি, মাখন, বনস্পতি, চীজ, ক্রীম খাওয়া চলবে না। আনস্যাচুরেটেড ফ্যাট (Unsaturated Fat) যথা বাদাম তেল, সূর্যমুখীর তেল এবং অল্প পরিমাণে সরষের তেল খাওয়া ভাল।

যদি ওপরের তালিকাভুক্ত খাদ্যগুলি বর্জন করার পরেও রক্তে স্নেহপদার্থের ভাগ (Lipid) না কমে তবে চিকিৎসকের পরামর্শমতো ওষুধ খেতে হবে। কিন্তু ওষুধ খেয়ে লিপিড কমানোর ব্যবস্থাটা খুব সন্তোষজনক নয়। কারণ, অনেকদিন ধরে ওষুধ খেতে হয় এবং ওষুধের জন্যই অন্যান্য উপসর্গ (side effects) দেখা দেয়। এছাড়া দীর্ঘদিন ধরে ওষুধ খাওয়াও ব্যয়সাপেক্ষ ব্যাপার।

**ধূমপান**

ধূমপানের ফলে আই. এইচ. ডি., রক্ত-সঞ্চালনের বিঘ্নজনিত হৃৎপিণ্ডের আংশিক বৈকল্য (Myocardial Infarction) ত্বরান্বিত হয় এবং হৃদ্‌রোগে মৃত্যুর সম্ভাবনা বৃদ্ধি পায়। বিভিন্ন দেশে সমীক্ষায় দেখা গিয়েছে যে, আই. এইচ. ডি-তে আক্রান্ত হবার প্রবণতা ধূমপায়ীদের ক্ষেত্রে অনেক বেশি এবং কম-বয়স্কদের ক্ষেত্রে ধূমপান অধিক ক্ষতিকর।

**ডায়াবেটিস**

ডায়াবেটিস বা বহুমূত্র রোগ অ্যাথেরোসক্লেরোটিক (Atherosclerotic) পরিবর্তন ঘটায়। শর্করা (চিনি, গুড় ও মিষ্টি) ও কার্বোহাইড্রেট (আলু, ভাত, চিঁড়ে) খাদ্য কম খেয়ে এবং নিয়মিত দৈহিক পরিশ্রম ও ব্যায়াম করে এই রোগ আয়ত্তের মধ্যে রাখা যেতে পারে। তা না হলে ওষুধ এবং ইঞ্জেকশনের আশ্রয় নিতে হয়।

**সিড্যান্টারি হ্যাবিটস**

সিড্যান্টারি হ্যাবিটস অর্থাৎ কোনরকম দৈহিক পরিশ্রম না করে জীবনযাপন। এঁদের অনেকেই কেবলমাত্র বসে থেকে মাথার কাজই করেন। অন্যদের থেকে তাঁদের আই. এইচ. ডি. হবার প্রবণতা বেশি থাকে। সেজন্য হৃদ্‌রোগকে অনেক সময় আধিকারিক বা অফিসার পর্যায়ের লোকের অসুখ (Disease of Business Executives) বলা হয়।

**ওবেসিটি বা মোটা হওয়া**

দেহের ওজন বেশি হওয়া হৃৎপিণ্ডের পক্ষে ক্ষতিকর। আজকাল এটি সকলেই জানেন। কাজেই ওজন বাড়ার প্রবণতা থাকলে সঙ্গে সঙ্গে তা কমানোর জন্য ব্যবস্থা নিতে হবে।

**পারিবারিক ধারা** (Familial trend)

যেসব পরিবারে কারো কারো আই. এইচ. ডি. হয়েছে সেই পরিবারের লোকদের এবিষয়ে বেশি সচেতন থাকা উচিত এবং প্রতিরোধের যেসব সাবধানতার কথা বলা হয়েছে সেগুলি মেনে চলা প্রয়োজন।

**মানসিক চাপ বা স্ট্রেস অ্যান্ড স্ট্রেন**

মানসিক চাপ, দুর্ভাবনা, অশান্তি আই. এইচ. ডি. হবার একটি প্রধান কারণ। অবশ্য একই কারণে একজন বেশি ভাবেন, একজন কম ভাবেন। হঠাৎ রেগে ওঠাও একটি ভয়ানক বিপজ্জনক ব্যাপার। অধিক দুশ্চিন্তাপ্রবণ ব্যক্তিদের রক্তে ক্যাটেকোলা-

মাইনস ( Catecholamines ) নামক রাসায়নিক পদার্থ বেশি হয়ে যাওয়ার ফলে হৃদ্‌রোগে আক্রান্ত হবার সম্ভাবনা বেড়ে যায়। জীবনে নানারকম সমস্যা আসে ; ঠাণ্ডা মাথায় সেগুলির মোকাবিলা করার চেষ্টা করলে এর হাত থেকে রক্ষা পাওয়া যায়।

অষ্টাদশ শতাব্দীর বিখ্যাত শল্যচিকিৎসক জন হান্টার ( John Hunter ) বলেছিলেন : "আমার প্রাণ নির্ভর করছে যেকোন একটি বদমাইসের ওপর, যে আমাকে রাগিয়ে দিয়ে, উত্তেজিত করে আমার জীবন নাশ করতে পারে।" কিন্তু ভাগ্যের এমনই পরিহাস যে, একটি চিকিৎসক-সম্মেলনে তর্কাতর্কির পর তিনি উত্তেজিত হয়ে ওঠেন ও কিছু পরেই তাঁর মৃত্যু ঘটে।

আই. এইচ. ডি. এবং অন্যান্য হৃদ্‌রোগ যাতে এড়ানো যায় সেই বিষয়ে এতক্ষণ বলা হলো। এখন দেখব, হার্ট অ্যাটাক ( Heart Attack ) বা আই. এইচ. ডি. হয়ে যাবার পর কি কি করতে হবে এবং কেমনভাবে চলতে হবে।

হৃৎপিণ্ডের অবস্থা বুঝে চিকিৎসক রোগীকে হাসপাতালে ১০ থেকে ১৪ দিন রেখে বাড়ি যেতে দেন ও আট সপ্তাহ পরে কর্মস্থলে যেতে এবং বসে বসে কাজ করতে বলেন। ব্যায়াম কবে থেকে শুরু করা যাবে, কতটা করা যাবে সেগুলো চিকিৎসকের কাছ থেকে জেনে নিতে হবে।

যদি ওষুধপত্র খেয়ে বুকে ব্যথা বা অ্যাঞ্জাইনা এবং শ্বাসকষ্ট না কমে তবে হৃৎপিণ্ডের অসুখটি ঠিক কোথায় তা জানার জন্য অ্যাঞ্জিওগ্রাম (Angiogram) প্রভৃতি নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষার প্রয়োজন হয়। অ্যাঞ্জিওগ্রাম ( যাতে হৃৎপিণ্ডের ধমনীগুলির ছবি ওঠে ) করার পর যদি দেখা যায় যে, করোনারী ধমনীগুলির অনেকগুলিতে এবং গুরুত্বপূর্ণ জায়গায় নল ছোট হয়ে গিয়েছে বা রক্ত-চলাচল ব্যাহত হচ্ছে তখন 'বেলুন অ্যাঞ্জিওপ্লাস্টি' এবং তারপরে 'বাইপাস' অস্ত্রোপচার করতে হবে। এই অস্ত্রোপচার সফল হলে হঠাৎ মৃত্যুর সম্ভাবনা কমে যায়। 'বাইপাস' অস্ত্রোপচার ব্যাপারটি হলো —রাস্তা যখন খারাপ হয় তখন তার পাশ থেকে 'বাইপাস' রাস্তা তৈরি করে উদ্দিষ্ট স্থানে পৌঁছাতে হয় ; এক্ষেত্রেও তেমনি অন্য ধমনী দিয়ে হৃৎপিণ্ডে রক্ত পাঠাবার ব্যবস্থা করা হয়। সাধারণতঃ পায়ের থেকে ধমনী নিয়ে হৃৎপিণ্ডে বসানো হয়। সত্তর বছরের কম বয়সী রোগীর অন্য কোন অসুখ না থাকলে বাইপাস অস্ত্রোপচার কার্যকরী হয় ও কার্যক্ষম জীবনযাপনে সহায়তা করে।

আই. এইচ. ডি. যে আসছে তা বোঝার লক্ষণগুলি হলো :

(১) অ্যাঞ্জাইনা পেকটোরিস (Angina Pectoris) —বুকের পিছনদিকে ব্যথা হয়। পরিশ্রম করলে বা মানসিক দুশ্চিন্তা হলে বাঁদিকে এবং ডানদিকের উর্ধ্বাঙ্গে এবং চোয়ালে ব্যথা হয়। বিশ্রাম নিলে ও গ্লিসেরিল ট্রাইনাইটিন ( Glyceril Trynitine ) বড়ি খেলে কমে যায়।

(২) এই রকম ব্যথা যখন খুব বেশি হয় ও অনেকক্ষণ ধরে থাকে এবং এর সঙ্গে ঘাম হয়, রক্তচাপ কমতে থাকে ও হাত-পা ঠাণ্ডা হতে থাকে তখন মায়োকার্ডিয়াল ইনফার্কশন (Myocardial Infarction ) হয়েছে ধরে নিতে হয়।

(৩) শ্বাসকষ্ট, পা ফোলা কনজেসটিভ ফেলিওর-এর পূর্বলক্ষণ।

(৪) লক্ষণহীন মায়োকার্ডিয়াল ইশকিমিয়া বা ইনফার্কশন ( Silent Myocardial Ischemia or Infarction )। এটি হৃদ্‌রোগগুলির মধ্যে সবচেয়ে ভয়াবহ, কারণ এর কোন লক্ষণ নেই। সন্দেহক্রমে ডাক্তার দেখাতে গিয়ে ধরা পড়ে। ই. সি. জি. করে ধরা না পড়লে হোলটার মনিটরিং ( Holter Monitoring ) করার দরকার হতে পারে। এতে চব্বিশ ঘণ্টার জন্য বুকে একটি যন্ত্র বেঁধে দেওয়া হয় যাতে পরিশ্রমে ও বিশ্রামে, নিদ্রায় ও জাগরণে হৃদ্‌যন্ত্র কেমন চলছে তা বোঝা যায়।

হৃদ্‌রোগ নানান ধরনের হয়। এখানে ইশকিমিক হার্ট ডিজিজ বা আই. এইচ. ডি. সম্পর্কেই প্রধানতঃ বলা হলো। কয়েকটি হৃদ্‌রোগ খুবই জটিল, দু-একটি অতটা জটিল নয়। আজকাল নানা পত্র-পত্রিকায়, বেতার ও দূরদর্শনে সাধারণের জন্য হৃদ্‌রোগ নিয়ে আলোচনা হচ্ছে। এইগুলি পড়ে ও শুনে এই রোগটি সম্বন্ধে সচেতন হয়ে সেইমত চললে কর্মক্ষম দীর্ঘজীবন লাভ করা অসম্ভব নয়। □

## গ্রন্থ-পরিচয়

# চিরন্তন সত্যের মনোগ্রাহী ব্যাখ্যা

## নলিনীরঞ্জন চট্টোপাধ্যায়

**The Way to God as taught by Sri Ramakrishna :** Swami Lokeswarananda, The Ramakrishna Mission Institute of Culture, Gol Park, Calcutta-700 029. Price : Rs. Seventy five.

শ্রীম কথিত 'কথামৃত'-এর প্রথম খণ্ড গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয় ১৯০২ খ্রীস্টাব্দে। তারপর একে একে পাঁচটি খণ্ডে শ্রীরামকৃষ্ণ-জীবনের শেষ পাঁচ বছরের অমূল্য উপদেশাবলী প্রকাশিত হয়েছে। বিগত প্রায় নব্বই বছর ধরে 'কথামৃত' বাংলাদেশের বৃহত্তর জনসমষ্টির সমাদর লাভ করে আসছে। আজ 'কথামৃত'-এর আবেদন শুধু বাঙলাভাষীদের কাছেই নয়, ভারতের সীমান্ত অতিক্রম করে সারা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়েছে 'গসপেল অব শ্রীরামকৃষ্ণ' অনুবাদ-গ্রন্থের মাধ্যমে। এর চাহিদা এখনও ক্রমবর্ধমান। রামায়ণ-মহাভারতের কথা বাদ দিলে অন্য কোন ভারতীয় গ্রন্থ এত প্রচারিত কিনা সন্দেহ। তাছাড়া 'কথামৃত'কে অবলম্বন করে যেসকল রচনা প্রকাশিত হয়েছে তার তালিকাও সুবিপুল। 'কথামৃত' ( Gospel of Sri Ramkrishna ) প্রসঙ্গে অলডাস হাক্সলির মন্তব্য : "a book unique…in the literature of hagiography." অনেকে বাইবেলের সঙ্গে 'কথামৃত'-এর সাদৃশ্য উল্লেখ করে থাকেন, কারণ উভয় ক্ষেত্রেই ভাষার সরলতা, কাহিনীর আকর্ষণ সমধর্মী। কিন্তু বাইবেলের সঙ্গে 'কথামৃত'-এর মূল পার্থক্য হলো, বাইবেল লিখিত হয়েছে খ্রীস্টের তিরোভাবের পর তাঁর অনুগামীদের স্মৃতিকথার ওপর নির্ভর করে ; সুতরাং তার মধ্যে কিছু কল্পনা, কিছু ভাষার সম্পাদনা অসম্ভব নয়। খ্রীস্টকে অবিকৃতভাবে কতখানি পাওয়া গেছে সেবিষয়ে অবশ্যই প্রশ্ন ওঠে। প্রকৃতপক্ষে খ্রীস্ট, বুদ্ধ বা হজরত মহম্মদ—সকলেরই উপদেশসমূহ গ্রথিত হয়েছে তাঁদের তিরোভাবের পর। অপরপক্ষে 'কথামৃত' 'যৎশ্রুতং তল্লিখিতম্'। শ্রীরামকৃষ্ণ-জীবনের শেষ পাঁচটি বছরের ঘটনার প্রায় অনুপুঙ্খ বিবরণ, শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতিদিনের কথা-বার্তা, আচার-আচরণ সেইদিনই ডায়েরীতে লিপি-বদ্ধ করতেন শ্রীম। যেদিন তিনি স্বয়ং শ্রীরামকৃষ্ণ-সান্নিধ্যে উপস্থিত হতে পারতেন না, সেদিনের বিবরণ প্রায় অনুক্তই রয়ে গেছে। তাঁর নিজস্ব কল্পনার কোন অবকাশই ছিল না। তাই দেখা যায়, মাঝে মাঝে একই কথার বা কাহিনীর পুনরুক্তি, ভাষার গ্রাম্যতা। কারণ শ্রীম নিজেকে রেখেছিলেন অন্তরালে, ফটোগ্রাফারের মতোই চিত্রগুলিকে উপস্থিত করেছেন অবিকৃতভাবে।

রামকৃষ্ণ মিশনের বিভিন্ন শাখায় 'কথামৃত' পাঠ ও ব্যাখ্যা প্রচলিত। প্রবীণ সন্ন্যাসী স্বামী লোকে-শ্বরানন্দ রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউট অব কালচারে কয়েক বছর ধরে 'কথামৃত' ব্যাখ্যা করছেন। উপস্থিত শ্রোতারা তার রস উপভোগ করেন, কিন্তু প্রেক্ষাগৃহের বাইরের মানুষ তা থেকে বঞ্চিত থাকেন। বৃহত্তর পাঠকমণ্ডলীর কাছে তাঁর সেই ব্যাখ্যা উপস্থিত করার উদ্দেশ্যেই 'তব কথামৃতম্' নাম দিয়ে প্রথমে ইনস্টিটিউট অব কালচার এবং পরে আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড একটি গ্রন্থ প্রকাশ করেন। গ্রন্থটি খুবই জনসমাদর লাভ করে। কিন্তু তার আবেদন এতদিন সীমিত ছিল শুধুমাত্র বঙ্গভাষীদের মধ্যেই, অথচ 'গসপেল অব শ্রীরামকৃষ্ণ'-এর পাঠকদের কাছে তার একটি সহজ ব্যাখ্যার প্রয়োজন ছিল। বিশেষ করে অ-বঙ্গভাষী বৃহত্তর পাঠকসাধারণের কথা স্মরণ করে সম্প্রতি 'রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউট অব কালচার' থেকে প্রকাশিত হয়েছে 'ওয়ে টু গড অ্যাজ টট বাই শ্রীরামকৃষ্ণ'—'তব কথামৃতম্'-এর ইংরেজী অনুবাদ।

সহজ ও সরল বাক্যবিন্যাস স্বামী লোকেশ্বরানন্দের ভাষণ ও রচনার বৈশিষ্ট্য। অনাবশ্যক পাণ্ডিত্য ও অবাঞ্ছিত অলংকার বর্জন করে তিনি তাঁর একটি নিজস্ব স্টাইল তৈরি করেছেন। মনে হয়, আমার সম্মুখে দাঁড়িয়ে যেন কেউ একান্ত ঘরোয়াভাবে আমাকে বোঝাচ্ছেন, যা অতি সহজেই অন্তরে প্রবেশ করতে পারে। সামান্য একটু উদাহরণ এই প্রসঙ্গে উপস্থিত করছি: খ্রীস্টীয় ধর্মমতে যে 'পাপ-বাদ' প্রচলিত শ্রীরামকৃষ্ণ ছিলেন তার বিরোধী। তিনি বলতেন, "যে কেবল বলে 'আমি পাপী' 'আমি পাপী' সেই শালাই পড়ে যায়। বরং বলতে হয়, আমি তাঁর নাম করেছি, আমার আবার পাপ কি'?" স্বামী লোকেশ্বরানন্দ শ্রীরামকৃষ্ণের এই কথাটির ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে খ্রীস্টীয় মত ও হিন্দুমতের পার্থক্য দেখিয়ে আদম-ইভের নিষিদ্ধ ফল ভক্ষণের কাহিনীর উল্লেখ করে খ্রীস্টানদের 'Doctrine of the Original Sin' বা 'আদি পাপ-এর ধারণা' সম্বন্ধে বলেছেন: "আমরা পৃথিবীর মানুষ অ্যাডাম এবং ইভের বংশধর। তাঁদের সেই যে পাপ, আমরা সবাই তার অংশীদার। সেই পাপ থেকে আমাদের উদ্ধার করতে পারেন যীশুখ্রীস্ট। যীশু কথার অর্থ হচ্ছে ত্রাণকর্তা। পাপ থেকে উদ্ধার করবার জন্যে ভগবান তাঁকে পাঠিয়েছেন। ঈশ্বরের পুত্র তিনি। —তাঁকে যদি ভজনা করি একমাত্র তাহলেই আমরা পাপ থেকে উদ্ধার পেতে পারি। এছাড়া আর কোন পথ নেই—এই হচ্ছে খ্রীস্টানদের মত

"হিন্দুদের দৃষ্টিটা কিছু অন্যরকম। হিন্দুরা বলেন, 'হ্যাঁ, মানুষ ভুল করে, অন্যায় করে, যেগুলোকে আমরা পাপ কাজ বলি, মানুষ অনেক সময় তাতে লিপ্ত হয়, কিন্তু সেটা একটা সাময়িক অবস্থা। তার যে প্রকৃত স্বরূপ সেটা হচ্ছে এই যে, সে নিত্য শুদ্ধ, বুদ্ধ, মুক্ত আত্মা। জ্ঞানের দৃষ্টিতে সবার মধ্যে এক ব্রহ্ম, এক সচ্চিদানন্দ বিরাজ করছেন। আর ভক্তিপথে আমরা বলি, সবার মধ্যে এক ভগবান বিরাজ করছেন। যে-ভাষাতেই বলা হোক না কেন মূল বক্তব্য হলো এই যে, আমার যে বর্তমান অবস্থা, যে-অবস্থায় আমার মধ্যে এত সংকীর্ণতা, এত ক্ষুদ্রতা, এত সীমাবদ্ধতা—এটা আমার স্থায়ী অবস্থা নয়। এটা একটা passing phase—এই অবস্থাটা এসে গেছে, চলে যাবে দুদিন পরে। যেমন, আকাশ মেঘে ঢাকা। আমরা দেখছি ধূসর আকাশ। কিছুক্ষণ পরে মেঘ কেটে যাবে, তখন আকাশের যেটা আসল রঙ, নীল রঙ—সেটা আমরা দেখতে পাব। আমাদের অবস্থাও ঠিক তাই।" ইংরেজীতে এই কথাগুলিই বলা হয়েছে সহজ, সর্বজনবোধ্য ও সাবলীল ভঙ্গিতে।

পুরো 'কথামৃত' বা 'Gospel'-এর ব্যাখ্যা আলোচ্য গ্রন্থে উপস্থাপিত হয়নি। শ্রীরামকৃষ্ণের কতকগুলি বিশিষ্ট উক্তি অবলম্বন করে সেগুলির ব্যাখ্যা করা হয়েছে এবং সেই অনুযায়ীই পরিচ্ছেদ-গুলির নামকরণ করা হয়েছে। এছাড়াও আছে শ্রীম ও 'কথামৃত' সম্পর্কে একটি সংক্ষিপ্ত ও মনোজ্ঞ আলোচনা, প্রথম রামকৃষ্ণ মঠ (বরানগর মঠ) স্থাপনার কাহিনী এবং বিদেশী পাঠকদের সুবিধার জন্য প্রস্তাবনা অংশে শ্রীরামকৃষ্ণ-জীবনের সংক্ষিপ্ত আলোচনা গ্রন্থের একটি উল্লেখযোগ্য আকর্ষণ।

গ্রন্থটির একটি উল্লেখযোগ্য অংশ হলো শ্রীরামকৃষ্ণ-প্রবর্তিত এবং স্বামী বিবেকানন্দ তথা রামকৃষ্ণ সঙ্ঘ প্রচারিত 'নব বেদান্তে'র স্বরূপ ও ফলিত রূপের মনোজ্ঞ ব্যাখ্যা ও আলোচনা। স্বামী লোকেশ্বরানন্দের এই ব্যাখ্যা এবং আলোচনায় রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের 'নব বেদান্ত' সম্পর্কে বহু জিজ্ঞাসার উত্তর পাওয়া যাবে।

গ্রন্থখানিতে লেখকের পাণ্ডিত্যের প্রমাণ যথেষ্ট লক্ষ্য করা যাবে। হিন্দু ও অহিন্দু শাস্ত্রের ব্যাখ্যা প্রায় সর্বত্রই লভ্য, কিন্তু তাকে সর্বজনবোধ্য করে তোলার ক্ষমতাই গ্রন্থটিকে বিশিষ্টতা দান করেছে। কোন সহজ বস্তুকে সহজভাবে উপস্থিত করাই শিক্ষকের কাজ, কিন্তু দুরূহ বস্তুকেও যিনি সহজ-ভাবে এবং দৈনন্দিন জীবনের সঙ্গে সংযুক্ত করতে পারেন তিনিই আদর্শ শিক্ষক। এখানে স্বামী লোকেশ্বরানন্দের ভূমিকা সেই আদর্শ শিক্ষকের।

শ্রীরামকৃষ্ণ-অনুরাগীদের কাছে তো বটেই, সাধারণ সাহিত্য-পাঠককেও এই গ্রন্থটি তৃপ্ত করবে, কারণ এটি শুধুমাত্র ধর্মতত্ত্ব আলোচনাই নয়, জীবনের মৌল সমস্যাগুলির সমাধানের পথনির্দেশও এতে রয়েছে। □

# রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশন সংবাদ

## রামকৃষ্ণ মিশন পরিচালনসভার ১৯৯১-'৯২ খ্রীস্টাব্দের সংক্ষিপ্ত কার্যবিবরণী

**রামকৃষ্ণ মিশনের** অধ্যক্ষ শ্রীমৎ স্বামী ভূতেশানন্দজী মহারাজের সভাপতিত্বে **রামকৃষ্ণ মিশনের ৮৩তম বার্ষিক সাধারণ সভা** গত ২০ ডিসেম্বর, ১৯৯২ বিকাল সাড়ে তিনটায় বেলুড় মঠে অনুষ্ঠিত হয়েছে। সভায় উপস্থিত সদস্যদের নিকট রামকৃষ্ণ মিশনের সাধারণ সম্পাদক স্বামী আত্মস্থানন্দজী রামকৃষ্ণ মিশনের ১৯৯১-'৯২ খ্রীস্টাব্দের নিম্নলিখিত কার্যবিবরণী উপস্থাপিত করেন।

**ত্রাণ ও পুনর্বাসনের** ক্ষেত্রে রামকৃষ্ণ মিশন আসাম, বিহার, উত্তরপ্রদেশ, পশ্চিমবঙ্গ ও দেশের অন্যান্য স্থানে ব্যাপক ত্রাণ ও পুনর্বাসনের কাজ করেছে। এক্ষেত্রে মোট ব্যয়ের পরিমাণ ৬০.৩৭ লক্ষ টাকা। এছাড়া প্রায় ৩৪ লক্ষ টাকার মতো ত্রাণ-সামগ্রী বিতরণ করা হয়েছে। বাংলাদেশে বিপুল ত্রাণ ও পুনর্বাসনের কাজে অর্থব্যয়ের পরিমাণ বাংলাদেশী মুদ্রায় প্রায় ১.৭৮ লক্ষ টাকা।

**জনকল্যাণমূলক কার্য-তালিকায়** ছিল দরিদ্র ছাত্র-ছাত্রীদের বৃত্তি ও ভাতা, আর্ত রোগীদের চিকিৎসার খরচ, বৃদ্ধ ও দুঃস্থদের সাময়িক দান এবং গ্রামাঞ্চলে হাজার হাজার পরিবারের জন্য শৌচালয়ের ব্যবস্থা। এই খাতে ব্যয়ের পরিমাণ ১.৪৬ কোটি টাকা। এক্ষেত্রে কলকাতার রামবাগানের বস্তিতে নির্মীয়মাণ গৃহের নির্মাণকার্য এবং সমগ্র মেদিনীপুর জেলায় শৌচালয়-নির্মাণ প্রকল্প বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

**চিকিৎসাসেবা কার্যে** মিশন ৯টি হাসপাতাল, এবং ভ্রাম্যমাণ চিকিৎসালয় সহ ৭৮টি দাতব্য চিকিৎসালয়ের মাধ্যমে মোট ৬.০৪ কোটি টাকা খরচ করে প্রায় ৪৪ লক্ষ রোগীর সেবা করেছে।

**শিক্ষা বিভাগে** রামকৃষ্ণ মিশনের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলি পরীক্ষার ফলাফলের অত্যন্ত উচ্চমান বজায় রেখেছে। ৮,৭৫০টি বিধিমুক্ত শিক্ষালয় ও নৈশবিদ্যালয় প্রভৃতি সহ রামকৃষ্ণ মিশন ৯,০৪৪টি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান পরিচালনা করে। এগুলির মোট ছাত্রসংখ্যা ১,৮৫,০৩৪ জন। শিক্ষাক্ষেত্রে মোট ব্যয়ের পরিমাণ ছিল ২৩.৯২ কোটি টাকা।

**বিদেশের শাখাকেন্দ্রগুলির** মাধ্যমে মিশনের নৈতিক ও আধ্যাত্মিক ভাবপ্রচার অব্যাহত ছিল।

আলোচ্য বর্ষে **বেলুড়ের মূলকেন্দ্র** ভিন্ন ভারতে ও বহির্ভারতে রামকৃষ্ণ মিশন ও রামকৃষ্ণ মঠের শাখাকেন্দ্রের সংখ্যা ছিল যথাক্রমে ৭৬ এবং ৭৯।

### উৎসব-অনুষ্ঠান

গত ১৬ ডিসেম্বর '৯২ **বেলুড় মঠে শ্রীশ্রীমা সারদাদেবীর ১৪০তম আবির্ভাব-উৎসব** নানা অনুষ্ঠানের মাধ্যমে সাড়ম্বরে উদ্‌যাপিত হয়েছে। সারাদিন ধরে অগণিত ভক্ত নরনারী উৎসবে যোগদান করেছে। দুপুরে প্রায় চৌদ্দ হাজার ভক্তকে হাতে হাতে খিচুড়ি প্রসাদ দেওয়া হয়েছে। বিকালে স্বামী আত্মস্থানন্দজীর পৌরোহিত্যে এক জনসভা অনুষ্ঠিত

### স্বামী বিবেকানন্দের ভারত-পরিক্রমার শতবার্ষিকী অনুষ্ঠান

**বিশাখাপত্তনম আশ্রম** গত ১৩, ১৪, ১৫ ও ১৭ নভেম্বর '৯২ যথাক্রমে অন্ধ্রপ্রদেশের টেক্কালাই, নৌপদা, সোমপেট ও বিজয়নগরমে একদিন করে অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছিল। শোভাযাত্রা, জনসভা ও গ্রামবাসীদের মধ্যে বস্ত্র-বিতরণ ছিল অনুষ্ঠানগুলির বিশেষ অঙ্গ। ২১ থেকে ২৩ নভেম্বর বিশাখাপত্তনম আশ্রমে তিনদিনের নানা অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছিল। ২২ নভেম্বর অনুষ্ঠিত যুবসম্মেলনের উদ্বোধন করেন অন্ধ্রপ্রদেশের পর্যটন, সংস্কৃতি ও ক্রীড়াদপ্তরের রাষ্ট্রমন্ত্রী ডঃ জে. গীতা রেড্ডি। সম্মেলনে ৫৭০ জন যুবপ্রতিনিধি যোগদান করেছিল। ২২ ও ২৩ নভেম্বরের জনসভায় সভাপতিত্ব করেন রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের অন্যতম সহাধ্যক্ষ স্বামী গহনানন্দজী মহারাজ।

**বাঙ্গালোর আশ্রম** গত ১৬ নভেম্বর '৯২ স্বামীজীর ভারত-পরিক্রমা উৎসব পালন করেছে। প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন ভারতের প্রাক্তন প্রধান বিচারপতি ই. এস. বেঙ্কটরামাইয়া। জনসভায় ভাষণ দেন কন্যাকুমারী বিবেকানন্দ

কেন্দ্রের সভাপতি ডঃ এম. লক্ষ্মীকুমারী। সভায় প্রায় ৩০০০ লোক যোগদান করেছিলেন।

**আলং আশ্রম** ( অরুণাচলপ্রদেশ ) গত ১ ডিসেম্বর '৯২ কুচকাওয়াজ, জনসভা, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান প্রভৃতির মাধ্যমে উক্ত উৎসব উদ্‌যাপন করে। এই উপলক্ষে দুঃস্থ গ্রামবাসী উপজাতিদের মধ্যে ৫০০ কম্বল দেওয়া হয়।

রাঁচির **মোরাবাদী আশ্রম** গত ২৪ ও ২৫ ডিসেম্বর '৯২ দু-দিনের এক যুবসম্মেলন ও জাতীয়-সংহতি শিবির পরিচালনা করে মোট ৪০০ প্রতিনিধি শিবিরে যোগদান করেছিল।

**রামকৃষ্ণ মিশনের নতুন শাখাকেন্দ্র**

আন্দামানের পোর্ট ব্লেয়ারে রামকৃষ্ণ মিশনের একটি নতুন শাখাকেন্দ্র খোলা হয়েছে। শাখাকেন্দ্রটির নাম হয়েছে, **রামকৃষ্ণ মিশন, পোর্ট ব্লেয়ার।**

## উদ্বোধন

**রাজমুন্দ্রি** ( অন্ধ্রপ্রদেশ ) আশ্রম শহরে একটি অ্যালোপ্যাথিক চিকিৎসাকেন্দ্র খুলেছে। গত ২৫ নভেম্বর '৯২ এই চিকিৎসাকেন্দ্রের উদ্বোধন করেন শ্রীমৎ স্বামী গহনানন্দজী।

## চিকিৎসা-শিবির

**পুরী মিশন আশ্রম** গত ১০ ডিসেম্বর '৯২ পুরী শহর থেকে প্রায় ২০০ কি.মি. দূরে কান্তিলোতে এক দন্তচিকিৎসা শিবির পরিচালনা করে। শিবিরে মোট ১৯০ জন রোগীকে বিনামূল্যে ওষুধ দেওয়া হয়। এর মধ্যে ১৪০ জনের দাঁত তোলা হয়।

**আঁটপুর আশ্রম** কলকাতা রামকৃষ্ণ মিশন সেবা-প্রতিষ্ঠানের সহযোগিতায় গত ২১ থেকে ২৭ নভেম্বর '৯২ এক বিনামূল্যে চক্ষু-অস্ত্রোপচার শিবির পরিচালনা করে। শিবিরে মোট ৬৬জন রোগীর চোখের ছানি অস্ত্রোপচার করা হয়।

## ছাত্র-কৃতিত্ব

**আলং মিশন** বিদ্যালয়ের একজন উপজাতি ছাত্র ও একজন উপজাতি ছাত্রী গত ৯-১১ ডিসেম্বর '৯২ অনুষ্ঠিত রাজ্যান্তরের বিজ্ঞান-প্রদর্শনীতে প্রথম ও ও দ্বিতীয় স্থান লাভ করেছে। তারা পূর্ব-ভারত এবং জাতীয় বিজ্ঞান প্রদর্শনীতে যোগদানের জন্যও নির্বাচিত হয়েছে।

## ত্রাণ

**পশ্চিমবঙ্গ দাঙ্গাত্রাণ**

**কলকাতার** ট্যাংরা ও তিলজলা অঞ্চলে ক্ষতিগ্রস্তদের ৪৩৩ কিলোঃ চাল ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র দেওয়া হয়েছে। তাছাড়া তিনদিন ধরে ১৭৭৭টি শিশুকে দুধ ও বিস্কুট এবং পাঁচদিন ধরে ১৩,০০০ লোককে খিচুড়ি খাওয়ানো হয়েছে। তাছাড়া ৩৪৭টি পরিবারকে ৩৪৬টি কম্বল, ২৫০টি ধুতি, ২৫০টি শাড়ি, ৩৮৫টি পশমী সোয়েটার, ৩০০টি শার্ট, ২৬০টি প্যান্ট ও ৯৫০টি শিশুদের পোশাক দেওয়া হয়েছে। দাঙ্গায় আহতদের জন্য চিকিৎসা-ত্রাণের ব্যবস্থাও করা হয়েছে।

দক্ষিণ ২৪ পরগনার মেটিয়াবুরুজ থানার অন্তর্গত কাশ্যপ পাড়া, মিতা তালাব, সিমপুকুর ও ভাঙ্গিপাড়া অঞ্চলের ২৭৪টি ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের মধ্যে ৫৪৯টি ধুতি, ৪৪৮টি শাড়ি, ৪২৩টি কম্বল, ১৯১টি মশারি, ২৭৯টি পশমী সোয়েটার, ৫৯৪টি শিশুদের পোশাক দেওয়া হয়েছে। এই অঞ্চলে আরও ত্রাণকার্য চলছে।

**তামিলনাড়ু বন্যা ও ঝঞ্ঝাত্রাণ**

**মাদ্রাজ মঠের** মাধ্যমে কন্যাকুমারী জেলার ৮টি গ্রামের ৮০০টি ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের মধ্যে ১২০০টি অ্যালুমিনিয়ামের বাসনপত্র,৩০০টি স্টেনলেস স্টীলের টাম্বুলার, ১১০০টি বিছানার ঢাকনা, ৮০০টি মাদুর, ৫০০টি ধুতি, ৫০০টি শাড়ি বিতরণ করা হয়েছে।

**মাদ্রাজ মিশন আশ্রমের** মাধ্যমে রামেশ্বরম জেলার ধনুষ্কোটী, ওতালাই এবং আরও ৮টি গ্রামে মোট ৭০২টি ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের মধ্যে ৩৫১০ কিলোঃ চাল, ৩০০টি থালা, ৩০০টি টাম্বুলার, ৩২৭টি শাড়ি, ৩১১টি লুঙ্গি, ১৭২২টি অন্তর্বাস, ৩২৭টি তোয়ালে এবং ১৭৪১টি পুরনো কাপড়-চোপড় বিতরণ করা হয়েছে। তাছাড়া চেরণকুটাই গ্রামে ( বিবেকানন্দ-পুরমে ) ২৮টি পরিবারের জন্য ২৮টি কাঁচাবাড়ি তৈরি করা হয়েছে।

**কোয়েম্বাটোর আশ্রমের** মাধ্যমে তিরোনেলভেলি ও চিদাম্বরম জেলার চেন্নালপট্টি, পোট্টাল ও আরও ৮টি গ্রামের ক্ষতিগ্রস্ত ৫৭৩টি পরিবারকে ২৩৮৪ কিলোঃ চাল, ১৬৮ কিলোঃ সুজি ও ময়দা, ২২১টি নতুন এবং ৩৫৭টি পুরনো কাপড়, ৩৬০ সেট বাসনপত্র, ৬৩টি প্লাসটিকের পাত্র দেওয়া হয়েছে।

**পশ্চিমবঙ্গ বন্যাত্রাণ**

পুরুলিয়া জেলার পুরুলিয়া ১নং ব্লক, আরশা ও মানবাজার ব্লকের ৭টি গ্রামে বন্যায় ক্ষতিগ্রস্তদের মধ্যে ৭৩৫ সেট শিশুদের পোশাক, ২৪০টি বিভিন্ন ধরনের কাপড়, ৬২ সেট (প্রতি সেটে ৮টি করে জিনিস) বাসনপত্র, ৬৬টি লণ্ঠন পুনরায় বিতরণ করা হয়েছে।

**শীতকালীন ত্রাণ**

**সারদাপীঠের** মাধ্যমে বেলুড় ও বালী অঞ্চলের ১০০টি দুঃস্থ পরিবারকে ১০০ কম্বল দেওয়া হয়েছে।

## পুনর্বাসন

**উত্তরপ্রদেশ**

উত্তরকাশী জেলায় ভূমিকম্পে ক্ষতিগ্রস্তদের জন্য পুনর্বাসনের যে-কাজ সমাপ্ত হয়েছে তারই অঙ্গ হিসাবে বুড়া কেদারের নিকট তিনগড় গ্রামে একটি প্রাথমিক বিদ্যালয়-গৃহ নির্মাণ এবং গণেশপুরে একটি ভগ্ন শিবমন্দিরকে পুনর্নির্মাণ করা হয়েছে।

## বহির্ভারত

**বেদান্ত সোসাইটি অব সেন্ট লুইস:** গত জানুয়ারি মাসের (১৯৯৩) রবিবারগুলিতে ধর্মীয় ভাষণ দিয়েছেন এই কেন্দ্রের অধ্যক্ষ স্বামী চেতনানন্দ, শিকাগো বিবেকানন্দ-বেদান্ত সোসাইটির স্বামী চিদানন্দ এবং বস্টন রামকৃষ্ণ-বেদান্ত সোসাইটির স্বামী সর্বাত্মানন্দ। ১৯ ও ২৬ জানুয়ারি মঙ্গলবার এবং ২১ ও ২৮ জানুয়ারি বৃহস্পতিবার 'উদ্ধব-গীতা'র ক্লাস হয়েছে। তাছাড়া ১৪ ও ২৪ জানুয়ারি যথাক্রমে স্বামী বিবেকানন্দ ও স্বামী ব্রহ্মানন্দের জন্মতিথি পালন করা হয়েছে।

**বেদান্ত সোসাইটি অব ওয়েস্টার্ন ওয়াশিংটন:** জানুয়ারি মাসের প্রতি রবিবার বিভিন্ন ধর্মীয় বিষয়ে ভাষণ দিয়েছেন এই কেন্দ্রের অধ্যক্ষ স্বামী ভাস্করানন্দ। তাছাড়া প্রতি মঙ্গলবার তিনি 'গসপেল অব শ্রীরামকৃষ্ণ'-এর ক্লাস নিয়েছেন। ১৪ জানুয়ারি পূজা, ভক্তিগীতি ও প্রসাদ বিতরণের মাধ্যমে স্বামী বিবেকানন্দের জন্মতিথি পালন করা হয়েছে।

**বেদান্ত সোসাইটি অব টরেন্টো (কানাডা):** ১০ জানুয়ারি স্বামী বিবেকানন্দের ওপর ভাষণ; ১৭ জানুয়ারি স্টাডি সার্কেলের মাধ্যমে স্বামী বিবেকানন্দের জীবন ও বাণীর ওপর আলোচনা; ২৪ জানুয়ারি পূজা, ধ্যান-জপ, ভক্তিগীতি, পুষ্পাঞ্জলি প্রদান, প্রসাদ বিতরণের মাধ্যমে স্বামী বিবেকানন্দের জন্মোৎসব পালন এবং ৩১ জানুয়ারি শ্রীমদ্ভগবদ্-গীতা আলোচনা হয়েছে। তাছাড়া ১ জানুয়ারি নববর্ষ ও কল্পতরু উৎসব অনুষ্ঠিত হয়েছে।

**বেদান্ত সোসাইটি অব স্যাক্রামেন্টো (ক্যালিফোর্নিয়া):** গত ১৬ ডিসেম্বর পূজা, জপ-ধ্যান, ভক্তিসঙ্গীত পরিবেশন, প্রসাদ বিতরণ প্রভৃতি অনুষ্ঠানের মাধ্যমে শ্রীমা সারদাদেবীর আবির্ভাব-তিথি পালন করা হয়েছে। গত ২০ ডিসেম্বর এবং ৩১ ডিসেম্বর অনুরূপ অনুষ্ঠানের মাধ্যমে যথাক্রমে শ্রীমৎ স্বামী শিবানন্দজী মহারাজের জন্মতিথি ও ইংরেজী প্রাক্-নববর্ষ উদ্যাপন করা হয়।

গত ১৪ জানুয়ারি '৯৩ স্বামী বিবেকানন্দের এবং ২৪ জানুয়ারি শ্রীমৎ স্বামী ব্রহ্মানন্দজী মহারাজের জন্মতিথি নানা অনুষ্ঠানের মাধ্যমে পালন করা হয়। উভয় দিনেই হাতে হাতে প্রসাদ বিতরণ করা হয়। তাছাড়া জানুয়ারি মাসে ধর্মীয় ভাষণ ও ক্লাস যথারীতি হয়েছে।

**রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ সেন্টার অব নিউ ইয়র্ক:** গত জানুয়ারি মাসের রবিবারগুলিতে ধর্মীয় ভাষণ দিয়েছেন এবং প্রতি শুক্রবার শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা ও প্রতি মঙ্গলবার 'গসপেল অব শ্রীরামকৃষ্ণ'-এর ক্লাস নিয়েছেন এই কেন্দ্রের অধ্যক্ষ স্বামী আদীশ্বরানন্দ।

## শ্রীশ্রীমায়ের বাড়ীর সংবাদ

### জাতীয় যুবদিবস

গত ১২ জানুয়ারি '৯৩ উদ্বোধন কার্যালয়ে স্বামী বিবেকানন্দের জন্মদিনে অনুচ্ছেদ রচনা, আবৃত্তি, বক্তৃতা, ক্যুইজ প্রভৃতি প্রতিযোগিতামূলক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে **স্বামীজীর ভারত-পরিক্রমার শতবর্ষ** এবং **জাতীয় যুবদিবস** পালন করা হয়। অনুষ্ঠানে প্রারম্ভিক ভাষণ দেন স্বামী মুক্তসঙ্গানন্দ। সমাপ্তি ভাষণ এবং পুরস্কার বিতরণ করেন স্বামী পূর্ণাত্মানন্দ।

**আবির্ভাব-তিথি পালন:** গত ২৪ জানুয়ারি শ্রীমৎ স্বামী ব্রহ্মানন্দজী ও ৬ ফেব্রুয়ারি শ্রীমৎ স্বামী অদ্ভুতানন্দজী মহারাজের আবির্ভাব-তিথি উপলক্ষে তাঁদের জীবনী আলোচনা করেছেন স্বামী সত্যব্রতানন্দ এবং ২৭ জানুয়ারি শ্রীমৎ স্বামী ত্রিগুণাতীতানন্দজী মহারাজের আবির্ভাব-তিথিতে তাঁর জীবনী আলোচনা করেন স্বামী পূর্ণাত্মানন্দ। □

# বিবিধ সংবাদ

## উৎসব-অনুষ্ঠান

নিম্নে উল্লেখিত প্রতিষ্ঠানগুলিতে গত বছর (১৯৯২) বিভিন্ন সময়ে অনুষ্ঠিত নানা উৎসব-অনুষ্ঠানের সংক্ষিপ্ত সংবাদ দেওয়া হলো :

**অক্ষয় স্মৃতি পাঠচক্র, ময়নাপুর (বাঁকুড়া) :** ২৯ মার্চ প্রতিষ্ঠা-বার্ষিকী উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। উৎসবে যোগদান করেছিলেন স্বামী সমাত্মানন্দ, স্বামী দেবময়ানন্দ ও স্বামী নিস্পৃহানন্দ।

**মাকড়দহ শ্রীরামকৃষ্ণ সাধনালয় (হাওড়া) :** ২ জুলাই থেকে পাঁচদিনব্যাপী নবনির্মিত মন্দিরের দ্বারোদ্ঘাটন উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। দ্বারোদ্ঘাটন করেন স্বামী নির্জরানন্দ। বিভিন্ন দিনে ধর্মালোচনা করেন স্বামী গৌতমানন্দ, স্বামী জয়ানন্দ, স্বামী পূর্ণাত্মানন্দ, প্রব্রাজিকা অমলপ্রাণা, প্রব্রাজিকা ভাস্বরপ্রাণা, ডঃ বন্দিতা ভট্টাচার্য প্রমুখ।

**শ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত পাঠভবন, বালটিকুরী (হাওড়া) :** ২৯ মার্চ শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জন্মোৎসব অনুষ্ঠিত হয়। উৎসবে পূর্বাহ্ণ ও অপরাহ্ণে ধর্মালোচনা করেন যথাক্রমে প্রব্রাজিকা বিশুদ্ধপ্রাণা ও দেবানন্দ ব্রহ্মচারী।

**শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ সেবাশ্রম, খারুপেটিয়া (আসাম) :** নবনির্মিত মন্দির উদ্বোধন উপলক্ষে ২৮ জুলাই থেকে সপ্তাহব্যাপী উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। মন্দির উদ্বোধন করেন রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের অন্যতম সহাধ্যক্ষ শ্রীমৎ স্বামী গহনানন্দজী।

**শ্রীরামকৃষ্ণ-নিরঞ্জনানন্দ আশ্রম, রাজারহাট-বিষ্ণুপুর (উত্তর ২৪ পরগনা) :** ১৩ আগস্ট স্বামী নিরঞ্জনানন্দজী মহারাজের জন্মতিথিতে আশ্রমের বার্ষিক উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। স্বামী পুরাণানন্দ, স্বামী কমলেশানন্দ, স্বামী মুক্তসঙ্গানন্দ উৎসবে যোগদান করেন ও ধর্মালোচনা করেন।

**শ্রীরামকৃষ্ণ সেবাশ্রম, স্যান্ডেলের বিল (উত্তর ২৪ পরগনা) :** ১১ সেপ্টেম্বর স্বামী বিবেকানন্দের শিকাগো ধর্মমহাসভায় যোগদানের শতবর্ষপূর্তি উৎসব নানা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও রক্তদান শিবিরের মাধ্যমে উদ্‌যাপন করা হয়। ২৯ নভেম্বর এই উপলক্ষে এক শিক্ষক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। স্বামী মহাব্রতানন্দ ও স্বামী আত্মপ্রিয়ানন্দ সম্মেলনে যোগদান করেন।

**তিলজলা বিবেকানন্দ সেবাসংসদ :** ১৩ সেপ্টেম্বর শিকাগো ধর্মমহাসভায় স্বামী বিবেকানন্দের যোগদানের প্রাক্‌শতবর্ষ উদ্‌যাপন উপলক্ষে যুব-সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। দুইশত যুবপ্রতিনিধির এই অনুষ্ঠানে ভাষণ দেন স্বামী ভৈরবানন্দ ও স্বামী বলভদ্রানন্দ।

**শ্রীরামকৃষ্ণ স্মরণ সংঘ শ্যামপুকুর বাটী (কলকাতা-৪) :** গত ২৭ আগস্ট থেকে তিনদিন-ব্যাপী পঞ্চদশ প্রতিষ্ঠা-দিবস উৎসব উদ্‌যাপিত হয়। উৎসবে ধর্মসভাগুলিতে ভাষণ দেন স্বামী নির্জরানন্দ, ডঃ ক্ষেত্রপ্রসাদ সেনশর্মা ও ডঃ বন্দিতা ভট্টাচার্য। ২৫ অক্টোবর বিশেষ পূজাদির মাধ্যমে বরাভয় লীলা-উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। আলোচনা করেন নির্মাল্য বসু।

**তুফানগঞ্জ :** গত ১৬ আগস্ট তুফানগঞ্জের বিধান-পল্লীতে নানা অনুষ্ঠানের মাধ্যমে '**শ্রীরামকৃষ্ণ সেবা-শ্রম**' নামে একটি নতুন আশ্রম প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

**শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ সেবাশ্রম, গন্ডিদা (ময়ূরভঞ্জ, উড়িষ্যা) :** ২ ও ৩ সেপ্টেম্বর আশ্রমের বার্ষিক উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। উৎসবে যোগদান এবং ভাষণ দিয়েছেন স্বামী কৃষ্ণানন্দ। ভক্তিগীতি পরিবেশন করেছেন শংকর সোম ও সহশিল্পিবৃন্দ এবং আশীস চ্যাটার্জী।

**বাঁকুড়া শ্রীশ্রীমা সারদা মিলনতীর্থ :** ২৬ সেপ্টেম্বর বার্ষিক উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন স্বামী ধৃতাত্মানন্দ। ভাষণ দেন স্বামী বামনানন্দ ও স্বামী পূর্ণাত্মানন্দ।

**বরানগর মঠ সংরক্ষণ সমিতি :** ১৮ ও ১৯ অক্টোবর প্রতিষ্ঠাদিবস উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। ধর্ম-সভায় প্রথম দিন ভাষণ দেন স্বামী পূর্ণাত্মানন্দ ও দ্বিতীয় দিন ভাষণ দেন স্বামী বিশ্বনাথানন্দ।

**শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ ভাবপ্রচার সমিতি, কটক (উড়িষ্যা) :** ১৯ সেপ্টেম্বর স্বামী বিবেকানন্দের ভারত-পরিক্রমার শতবার্ষিকী উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। উৎসবে যোগদান করেছিলেন রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের অন্যতম সহ-সম্পাদক স্বামী প্রভানন্দ, স্বামী শিবেশ্বরানন্দ ও স্বামী অমৃতানন্দ।

**শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম কৃষ্ণনগর ( নদীয়া )ঃ** ২২ নভেম্বর এই আশ্রমে সারাদিনব্যাপী এক যুবশিবির অনুষ্ঠিত হয়। শিবির পরিচালনা করেন স্বামী সর্বগানন্দ।

**কথামৃত পাঠচক্র, ঝাড়গ্রাম ( মেদিনীপুর )ঃ** ৮ নভেম্বর একদিনের এক সাধনশিবির অনুষ্ঠিত হয়। শিবিরে উপস্থিত ছিলেন স্বামী সারদাত্মানন্দ ও স্বামী কমলেশানন্দ।

**আগরতলার** প্রতাপগড়ের সুরেন্দ্রপল্লীতে গত ২৮ জুলাই শ্রীমৎ স্বামী রামকৃষ্ণানন্দজী মহারাজের জন্মতিথিতে উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। আগরতলা রামকৃষ্ণ মিশনের সম্পাদক স্বামী সুমেধানন্দ সহ কয়েকজন সন্ন্যাসী উৎসবে যোগদান করেছিলেন।

গত ৫-৭ জুন **অখিল ভারত বিবেকানন্দ যুবমহামণ্ডলের** কলকাতা আঞ্চলিক যুবশিক্ষণ কমিটি বাগবাজারের কাশীমবাজার পলিটেক্‌নিক কলেজে এক যুবশিক্ষণ শিবিরের আয়োজন করেছিল। শিবিরের উদ্বোধন করেন স্বামী পূতানন্দ। শিবিরে স্বামী বিবেকানন্দের আদর্শে চরিত্রগঠন ও দেশসেবায় আত্মনিয়োগ করার শিক্ষা বিষয়ে নানা কর্মসূচী ও আলোচনাচক্র অনুষ্ঠিত হয়। সভার বিভিন্ন অধিবেশনে আলোচনা করেন স্বামী মন্ত্রসঙ্গানন্দ, অধ্যক্ষ অমিয়কুমার মজুমদার, ডঃ নীরদবরণ চক্রবর্তী, নবনীহরণ মুখোপাধ্যায়, বীরেন্দ্রকুমার চক্রবর্তী প্রমুখ।

**যদুলাল মল্লিক স্মৃতি সমিতি** গত ২১ জুলাই '৯২ পাথুরিয়াঘাটে ভাবসমাধি উৎসব ও সর্বধর্ম-সমন্বয় সভার আয়োজন করেছিলেন। সভায় শ্রীরামকৃষ্ণের ওপর আলোচনা করেন স্বামী পূর্ণাত্মানন্দ ও স্বামী কমলেশানন্দ। খ্রীস্টধর্মের ফাদার ম্যাথুসিলিং, জৈনধর্মের গণেশ লালওয়ানি, ইসলামধর্মের আহমেদ উদ্দীন সামস ও নূর আহমেদ এবং বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের নারায়ণ মোহন্ত নিজ নিজ ধর্ম বিষয়ে বক্তব্য রাখেন।

## ভাবপ্রচার পরিষদের সভা

গত ২৬ ও ২৭ এপ্রিল '৯২ **উত্তর-পূর্বাঞ্চল রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ ভাবপ্রচার পরিষদের** অষ্টম বার্ষিক সম্মেলন **রামকৃষ্ণ মিশন শিলং** কেন্দ্রে অনুষ্ঠিত হয় এবং গত ৫ ও ৬ সেপ্টেম্বর '৯২ উক্ত পরিষদের নবম ষাণ্মাসিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় ডিমাপুর রামকৃষ্ণ সোসাইটিতে। প্রথমটিতে মোট ৬৫ জন এবং দ্বিতীয়টিতে ৫৮ জন প্রতিনিধি যোগদান করেছিলেন। প্রথম সম্মেলনে স্বামী রঘুনাথানন্দ ও স্বামী স্বতন্ত্রানন্দ যোগদান করেন এবং দ্বিতীয় সম্মেলনে স্বামী গৌতমানন্দ, স্বামী উদ্গীথানন্দ, স্বামী চন্দ্রানন্দ এবং স্বামী ইষ্টানন্দ যোগদান করেছিলেন।

গত ৩০ আগস্ট '৯২ **বর্ধমান, বাঁকুড়া ও পুরুলিয়া রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ ভাবপ্রচার পরিষদের** পঞ্চম সম্মেলন **শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ পাঠচক্রে** অনুষ্ঠিত হয়। ২২টি কেন্দ্র থেকে মোট ৫৮ জন প্রতিনিধি সম্মেলনে অংশগ্রহণ করেন। সম্মেলনে স্বামী শিবময়ানন্দ, স্বামী ভজনানন্দ ( দুজনেই রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের সহ-সম্পাদক) স্বামী উমানন্দ বামনানন্দ, স্বামী গিরিশানন্দ, স্বামী ধৃতাত্মানন্দ; স্বামী অধ্যাত্মানন্দ প্রমুখ যোগদান করেছিলেন।

## পরলোকে

গত ৪ আগস্ট সকাল ৯টা ১০ মিনিটে শ্রীমৎ স্বামী বিরজানন্দজী মহারাজের আশ্রিত **ফণীভূষণ সান্যাল** তাঁর সিঁথির বাসভবনে সজ্ঞানে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন। বাল্যকাল থেকেই শ্রীরামকৃষ্ণ-পরিমণ্ডলে বেড়ে ওঠায় তিনি আজীবন শ্রীরামকৃষ্ণ-ভাবের বিশেষ অনুরাগী ছিলেন। বেলুড় মঠ, উদ্বোধন ( শ্রীশ্রীমায়ের বাড়ী ), কাঁকুড়গাছি ও অন্যান্য মঠ-কেন্দ্রে তাঁর নিয়মিত যাতায়াত ছিল। বহু প্রবীণ সন্ন্যাসীর তিনি প্রিয়ভাজন ছিলেন। অকৃতদার ফণীভূষণ সান্যাল প্রথমে কলকাতার সেন্ট পলস কলেজে এবং পরে ইটাচুণায় বিজয় নারায়ণ মহাবিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করেছেন।

মাত্র ৪২ বছর বয়সে অধ্যাপনার কাজে ইস্তফা দিয়ে তিনি সম্পূর্ণভাবে শ্রীরামকৃষ্ণ-অনুচিন্তনে নিজেকে নিযুক্ত রাখেন। তাঁর সেই অনুচিন্তনের ফল বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে। নিত্য-সঙ্গী হিসাবে কিছু অনুচিন্তনের ধারা 'শ্রীরামকৃষ্ণ ভজনাঞ্জলি' নামক গ্রন্থে মুদ্রিত হয়েছে।

১৯৮৩ খ্রীস্টাব্দের অক্টোবর থেকে তিনি একটানা অসুস্থ হয়ে পড়েন। শেষে পুরোপুরি শয্যাশায়ী হতে বাধ্য হন। এই দীর্ঘ অসুস্থ সত্ত্বেও তিনি তাঁর স্বাভাবিক অন্তর্মুখিনতা এবং শ্রীরামকৃষ্ণ-চিন্তন থেকে কখনই সরে যাননি। প্রয়াণকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৭২ বছর।

হিন্দুগণ ধর্মের ভাবে পানাহার করে, ধর্মের ভাবে নিদ্রা যায়, ধর্মের ভাবে বিচরণ করে, ধর্মের ভাবে বিবাহাদি করে।... প্রত্যেক জাতিরই এ পৃথিবীতে একটি উদ্দেশ্য ও আদর্শ থাকে। কিন্তু যে-মুহূর্তে সেই আদর্শ ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়, সঙ্গে সঙ্গে সেই জাতির মৃত্যুও ঘটে।... যতদিন ভারতবর্ষ মৃত্যুপণ করিয়াও ভগবানকে ধরিয়া থাকিবে, ততদিন তাহার আশা আছে।

স্বামী বিবেকানন্দ

# উদ্বোধন

স্বামী বিবেকানন্দ প্রবর্তিত, রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের একমাত্র বাঙলা মুখপত্র, চুরানব্বই বছর ধরে নিরবচ্ছিন্নভাবে প্রকাশিত দেশীয় ভাষায় ভারতের প্রাচীনতম সাময়িকপত্র


## সূচিপত্র ৯৫তম বর্ষ চৈত্র ১৩৯৯ (মার্চ ১৯৯৩) সংখ্যা




সম্পাদক

স্বামী সত্যব্রতানন্দ | স্বামী পূর্ণাত্মানন্দ

৮০/৬, গ্রে স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০ ০০৬-স্থিত বসুশ্রী প্রেস থেকে বেলুড় শ্রীরামকৃষ্ণ মঠের ট্রাস্টীগণের পক্ষে স্বামী সত্যব্রতানন্দ কর্তৃক মুদ্রিত ও ১ উদ্বোধন লেন, কলকাতা-৭০০ ০০৩ থেকে প্রকাশিত।

প্রচ্ছদ মুদ্রণ : স্বপ্না প্রিন্টিং ওয়ার্কস (প্রাঃ) লিমিটেড, কলকাতা-৭০০ ০০৯

আজীবন গ্রাহকমূল্য (৩০ বছর পর নবীকরণ-সাপেক্ষ) ☐ এক হাজার টাকা (কিস্তিতেও প্রদেয়—প্রথম কিস্তি একশো টাকা) ☐ সাধারণ গ্রাহকমূল্য ☐ বৈশাখ থেকে পৌষ সংখ্যা ☐ ব্যক্তিগতভাবে সংগ্রহ ☐ পঁয়ত্রিশ টাকা ☐ সডাক ☐ একচল্লিশ টাকা ☐ বর্তমান সংখ্যার মূল্য ☐ ছয় টাকা

*Statement about Ownership and Other Particulars of*

## UDBODHAN

*FORM IV*

| | |
|---|---|
| Place of Publication : | 1, Udbodhan Lane, Baghbazar Calcutta-700003 |
| Periodicity of its Publication : | Monthly |
| Printer's Name | Swami Satyavratananda |
| Nationality | Indian |
| Address | 1, Udbodhan Lane, Calcutta-700003 |
| Publisher's Name | Swami Satyavratananda |
| Nationality | Indian |
| Address | 1, Udbodhan Lane, Calcutta-700003 |
| Editor's Name | Swami Satyavratananda & Swami Purnatmananda |
| Nationality | Indian |
| Address | 1, Udbodhan Lane, Calcutta-700003 |
| Name & Address of individuals who own the Newspaper | Trustees of the Ramakrishna Math, Belur Math, Howrah, West Bengal |

| | | |
|---|---|---|
| Swami Bhuteshananda | *President* | do |
| Swami Ranganathananda | *Vice-President* | do |
| Swami Gahanananda | *Vice-President* | do |
| Swami Atmasthananda | *General Secretary* | do |
| Swami Gitananda | *Asstt. Secretary* | do |
| Swami Prabhananda | " " | do |
| Swami Shivamayananda | " " | do |
| Swami Bhajanananda | " " | do |
| Swami Satyaghanananda | *Treasurer* | do |
| Swami Gautamananda | | do |
| Swami Hiranmayananda | | do |
| Swami Mumukshananda | | do |
| Swami Prameyananda | | do |
| Swami Smaranananda | | do |
| Swami Tattwabodhananda | | do |
| Swami Vagishananda | | do |
| Swami Vandanananda | | do |

I, Swami Satyavratananda, hereby declare that the particulars given above are true to the best of my knowledge and belief.

*Sd.* SWAMI SATYAVRATANANDA
*Signature of Publisher*

Date : 1. 3. 1993

Printed in compliance with the Rule 8 of the Registration of Newspapers (Central) Rules 1956

# উদ্বোধন

চৈত্র ১৩৯৯ মার্চ ১৯৯৩ ৯৫তম বর্ষ— ৩য় সংখ্যা

## দিব্য বাণী

আমাকে একটা ব্রত উদ্‌যাপন করতে হবে। এখন আমার বিশ্রাম অসম্ভব।

স্বামী বিবেকানন্দ

[ কথাগুলি পরিব্রাজক স্বামী বিবেকানন্দ বলেছিলেন লিমডির রাজা ঠাকুরসাহেব যশবন্ত সিংহকে। স্থান : হয় লিমডি, নতুবা মহাবালেশ্বর অথবা পুনা। কাল : হয় ১৮৯১ খ্রীস্টাব্দের ডিসেম্বর, নতুবা ১৮৯২ খ্রীস্টাব্দের মে-জুন। ]

## কথাপ্রসঙ্গে

# স্বামীজীর ভারত-পরিক্রমা : কিছু নিরুদ্দিষ্ট সূত্রের সন্ধানে

### মহাবালেশ্বরে স্বামীজীর নিজের সম্পর্কে উক্তি প্রসঙ্গে

আমেরিকা-যাত্রার পূর্বে স্বামীজীর সহিত স্বামী অভেদানন্দের শেষ সাক্ষাতের সময় স্বামীজী বলিয়াছিলেন : "কালী, আমার ভেতর এতটা শক্তি জমেছে যে, ভয় হয় পাছে ফেটে যাই।" ( দ্রঃ 'কথাপ্রসঙ্গে', অগ্রহায়ণ ১৩৯৯, পৃঃ ৫৮০) স্বামীজীর ইংরেজী জীবনীর সাম্প্রতিক সংস্করণ হইতে এখন জানা গিয়াছে যে, এই উক্তিটি স্বামীজী করিয়াছিলেন মহাবালেশ্বরে। (Life of Swami Vivekananda by His Eastern and Western Disciples, Vol. I, 6th Edn., 1989, p. 302 ) স্বামীজীর ইংরেজী জীবনীর প্রথম সংস্করণে স্থানটি বোম্বাই বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছিল। ( Vol. II, 1913, p. 177) স্বামীজীর বাঙলা জীবনীদ্বয়ের সাম্প্রতিক সংস্করণগুলিতে অবশ্য এখনও ইহা সংশোধন করা হয় নাই; পূর্বের মতো এখনও সেখানে বোম্বাই-ই থাকিয়া গিয়াছে। মজার বিষয় হইল যে, ইংরেজী জীবনীর প্রথম সংস্করণ প্রকাশের আঠারো বৎসর পরে ( ১৯৩১ ) প্রকাশিত রোমাঁ রোলাঁ প্রণীত স্বামীজীর সুবিখ্যাত জীবনী-গ্রন্থে স্বামীজীর উক্তিটির স্থান বরোদা বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। কোন্ তথ্যের ভিত্তিতে রোমাঁ রোলাঁ এইরূপ সুনির্দিষ্ট মন্তব্য করিলেন তাহা অজ্ঞাত, অথচ তিনি যেভাবে তাঁহার বর্ণনা দিয়াছেন তাহাতে ইহা স্পষ্ট যে, তাঁহার সূত্র ইংরেজী জীবনীর প্রথম সংস্করণ যেখানে, পূর্বেই বলা হইয়াছে, স্থানটি বোম্বাই বলিয়া উল্লিখিত। রোলাঁ প্রণীত জীবনীর স্থানে স্থানে রোলাঁর বক্তব্যকে অধিকতর পরিস্ফুট করিবার জন্য অথবা রোলাঁর বক্তব্যকে সম্প্রসারণ, সংশোধন বা পরিমার্জন করিবার জন্য পাদটীকায় প্রকাশকের পৃথক মন্তব্য রোলাঁর ইচ্ছা ও অনুমোদন অনুসারেই সংযোজিত হইয়াছিল। কিন্তু এক্ষেত্রে প্রকাশকের পক্ষ হইতে সেরূপ কোন মন্তব্য সংযোজিত হয় নাই। ইহা কি প্রকাশকের অনবধানতাবশতঃ, অথবা স্থানটি বরোদা বলিয়াও কোন প্রামাণ্য মত ঐ সময় পোষণ করা হইত? এখন ইহার উত্তর পাওয়া শক্ত।

আরও একটি মজার বিষয় এই যে, প্রাথমিক বিচারে রোলাঁর সূত্র ইংরেজী জীবনীর প্রথম সংস্করণ হইলেও রোলাঁর গ্রন্থে উপস্থাপিত স্বামীজীর উক্তির সহিত ইংরেজী জীবনীতে উপস্থাপিত স্বামীজীর উক্তির যথেষ্ট পার্থক্য বিদ্যমান। ইংরেজী জীবনীর প্রথম সংস্করণে ( p. 177 ) উক্তিটি এইরূপ : "[ Kali, ] I feel such a tremendous power and energy as if I shall burst." ( "আমার ভেতর এতটা শক্তি জমেছে যে, ভয় হয় ফেটে যাই।") ইংরেজী জীবনীর সাম্প্রতিক সংস্করণেও (১৯৮৯) উক্তিটি প্রায় একইরূপ। ( দ্রঃ Vol. I, p. 302 )

কিন্তু রোলাঁর গ্রন্থে ( দ্রঃ The Life of Vivekananda, 9th Imprn., 1979, p. 28, f. n. 2 ) স্বামীজীর উক্তিটি হইল নিম্নরূপ ঃ "[ Kali, ] I feel a mighty power ! It is as if I were about to blaze forth. There are so many powers in me ! It seems to me as if I could revolutionise the world." ( "আমি এক দুর্বার শক্তি অনুভব করি। মনে হয়, আমি বিস্ফোরণের মতো ফাটিয়া পড়িব। আমার মধ্যে এত শক্তি আছে যে, আমার মনে হয়, আমি সমগ্র পৃথিবীকে আমূল বদলাইতে পারিব।"—ঋষি দাস কৃত অনুবাদ ঃ বিবেকানন্দের জীবন, ১ম প্রকাশ, ১৩৬০, পৃঃ ২৩ )

রোলাঁর গ্রন্থে (p. 28, f.n.1) স্বামীজীর বরোদায় অবস্থানের তথা উক্তিটির সময় হিসাবে বলা হইয়াছে অক্টোবর ১৮৯২। বরোদা হইতে জুনাগড়ের দেওয়ান হরিদাস বিহারীদাস দেশাইকে ২৬ এপ্রিল ১৮৯২ তারিখের চিঠিতে স্বামীজী স্বয়ং লিখিয়াছেন, তিনি ঐদিন বরোদা ত্যাগ করিতেছেন। আমরা ইতঃপূর্বে দেখিয়াছি, ( দ্রঃ 'কথাপ্রসঙ্গে', অগ্রহায়ণ ১৩৯৯, পৃঃ ৫৭৯ ) স্বামীজী বরোদা ত্যাগ করিয়া ২৭ এপ্রিল ১৮৯২ তারিখে মহাবালেশ্বরে আগমন করিয়াছিলেন। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, কেহ কেহ স্বামীজীর মহাবালেশ্বরে আগমনকে পূর্ব-পরিকল্পিত বলিয়া উল্লেখ করিলেও জুনাগড়ের দেওয়ানজীকে লেখা স্বামীজীর পূর্বোক্ত পত্রকে অনুসরণ করিয়া বলা যায় যে, মহাবালেশ্বরে আগমন স্বামীজীর পূর্ব-পরিকল্পিত ছিল না, উহা ছিল তাঁহার তাৎক্ষণিক সিদ্ধান্ত। দেওয়ানজীকে স্বামীজী লিখিয়াছিলেন ঃ "আজ সন্ধ্যায় বোম্বাইয়ে চলিয়া যাইতেছি।... বোম্বাই হইতে সবিশেষ লিখিব।" ( দ্রঃ Complete Works of Swami Vivekananda, Vol. VIII, 1971, p. 286 )

আমরা পূর্বে দেখিয়াছি ( দ্রঃ 'কথাপ্রসঙ্গে', ভাদ্র ১৩৯৯ ) যে, ১৮৯২-এর সেপ্টেম্বরের ২৭/২৮ তারিখ হইতে অক্টোবরের ২৬ তারিখ পর্যন্ত স্বামীজী যথাক্রমে পুনা, কোলাপুর, বেলগাঁও-এ ছিলেন। ২৭ অক্টোবর স্বামীজী বেলগাঁও হইতে যান মারগাঁও এবং গোয়া। উভয় স্থানেই তিনি কয়েকদিন করিয়া থাকেন। অতএব দেখা যাইতেছে, রোমাঁ রোলাঁর গ্রন্থে ১৮৯২-এর অক্টোবরে স্বামীজীর বরোদায় অবস্থান সম্পর্কে মন্তব্যটি সঠিক নহে। [ মারগাঁও ও গোয়ায় স্বামীজীর আগমন এবং অবস্থান সম্পর্কে স্বামীজীর ইংরেজী জীবনীর সাম্প্রতিক সংস্করণ ( ১ম খণ্ড, পৃঃ ৩১৮-৩২০ ) এবং A Comprehensive Biography of Swami Vivekananda—Sailendra Nath Dhar, Part I, Vivekananda Kendra Prakashan, 2nd Edn., 1990, pp. 355-356 দ্রষ্টব্য। ]

**মহাবালেশ্বরে স্বামীজীর তৃতীয় একটি স্থানে অবস্থান এবং প্রায়-অজ্ঞাত একটি ঘটনা**

আমরা দেখিয়াছি ( দ্রঃ 'কথাপ্রসঙ্গে', অগ্রহায়ণ ১৩৯৯ ) মহাবালেশ্বরে স্বামীজী প্রথমে নরোত্তম মুরারজী গোকুলদাসের বাড়িতে আতিথ্য গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং পরে লিমডির মহারাজার আমন্ত্রণে তাঁহার মহাবালেশ্বর-আবাসে অবস্থান করেন। আমরা ইহাও দেখিয়াছি ( দ্রঃ ঐ ) যে, ১৮৯২-এর এপ্রিলের ২৭ তারিখ হইতে ১৫ জুনের দুই-চারদিন পূর্ব পর্যন্ত স্বামীজী মহাবালেশ্বরে দেড়মাসের মতো ছিলেন। নরোত্তম মুরারজী গোকুলদাস ও লিমডির ঠাকুরসাহেবের আবাস ভিন্ন মহাবালেশ্বরে অন্য কোথায়ও স্বামীজীর অবস্থানের সংবাদ স্বামীজীর কোন জীবনীগ্রন্থে নাই। কিন্তু রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের প্রয়াত দশম অধ্যক্ষ স্বামী বীরেশ্বরানন্দের নিকট হইতে জানা গিয়াছে যে, মহাবালেশ্বরে স্বামীজী স্থানীয় এক উকিলের বাড়িতে অতিথি হিসাবে বাস করিয়াছিলেন। স্বামীজীর পরিব্রাজক-জীবনের প্রায়-অজ্ঞাত একটি ছোট ঘটনার উল্লেখ প্রসঙ্গে বীরেশ্বরানন্দজী উপরোক্ত তথ্যটি জানান। ১৯৮৩ খ্রীষ্টাব্দের ৩ জানুয়ারি সিস্টার গার্গীকে ( মেরী লুইজ বার্ক'কে ) 'বিবেকানন্দ পুরস্কার' অর্পণ অনুষ্ঠানে গোলপার্ক রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউট অব কালচারে স্বামী বীরেশ্বরানন্দ যে-ভাষণ দান করেন তাহাতে তিনি বলেন ঃ

"[ আমেরিকা এবং ইউরোপে ] স্বামীজী সম্পর্কে গার্গী যে আবিষ্কার-কর্ম করেছেন সেজন্য তাঁকে আমরা অভিনন্দন জানাই। তাঁর এই গবেষণার জন্য আমরা তাঁর কাছে অত্যন্ত কৃতজ্ঞ। এই ধরনের আবিষ্কার ও গবেষণা ভারতে বিবেকানন্দ সম্পর্কে, বিশেষতঃ স্বামীজীর পরিব্রাজক জীবন সম্পর্কেও করা যেতে পারে। স্বামীজীর জীবন সম্পর্কে, তাঁর পরিব্রাজক-জীবন সম্পর্কে এখনো বহু ঘটনা, বহু তথ্যাদি অজ্ঞাত রয়েছে।—

"এই প্রসঙ্গে আমি একটি ছোট ঘটনার উল্লেখ

করতে চাই। ঘটনাটি খুব যে গুরুত্বপূর্ণ তা নয়, তবে খুবই চিত্তাকর্ষক। স্বামীজী তখন পশ্চিম ভারতে ভ্রমণ করছেন। **মহাবালেশ্বরে তিনি এক উকিলের বাড়িতে আতিথ্য গ্রহণ করেছিলেন।** উকিল ভদ্রলোকের একটি শিশুকন্যা ছিল। কন্যাটি বড় কাঁদত। তার কান্নার জন্য বাড়িতে রাত্রে কেউ ঘুমোতে পারত না। একরাত্রে বাচ্চাটি যথারীতি খুব কাঁদছে। স্বামীজী বাচ্চাটির বাবা-মাকে বললেন: 'বাচ্চাটি আমায় দিন। আজ রাত্রে সে আমার কাছে থাকবে।' বাচ্চাটির মা বললেন: 'স্বামীজী, আপনার কাছে ওকে রাখতে আমাদের কোন আপত্তি নেই, কিন্তু ও-তো আপনাকে ঘুমোতে দেবে না। ওর কান্না বন্ধ করবেন কি করে?' স্বামীজী বললেন: 'আপনারা ওকে আমার কাছে দিন, আমার কাছে ও চুপ করে শুয়ে থাকবে।' বাচ্চাটির মা বললেন: 'তাও কি সম্ভব, স্বামীজী? আমি মা হয়ে ওর কান্না থামাতে পারি না, আপনি কিভাবে পারবেন?' স্বামীজী শান্তভাবে বললেন: 'দেখি না চেষ্টা করে।' বাচ্চাটির মা বাচ্চাটিকে স্বামীজীর হাতে তুলে দিলেন। স্বামীজী বাচ্চাটিকে নিয়ে তাঁর ঘরে চলে গেলেন। ঘরে গিয়ে তাঁর শয্যায় বসলেন তিনি, তাঁর কোলে শুয়ে মেয়েটি কেঁদে চলেছে। স্বামীজী মেয়েটিকে তাঁর কোলে রেখে ডুবে গেলেন ধ্যানে। আশ্চর্য! কয়েক মুহূর্তের মধ্যে মেয়েটি একেবারে শান্ত হয়ে গেল। স্বামীজীও সারা রাত ধ্যানেই কাটিয়ে দিলেন। মেয়েটি সারা রাতের মধ্যে আর একবারও কাঁদল না। স্বামীজীর কোলে সে অসাড়ে ঘুমিয়ে রইল।" (দ্রঃ Bulletin of The Ramakrishna Mission Institute of Culture, March, 1983, p. 51)

বীরেশ্বরানন্দজী পরে এই ঘটনাটির উল্লেখ করিয়া বলিতেন: "স্বামীজী যখন ভারত-পরিক্রমা করছিলেন তখন ভারতের সাধারণ মানুষের দুর্গতি, দুরবস্থা এবং অধঃপতন দেখে তাঁর মন প্রবল বেদনায় আপ্লুত হচ্ছিল। তিনি পরিক্রমা করছিলেন আর সবসময় ঐ এক চিন্তা তাঁকে অস্থির করে তুলছিল, কি করে ভারতের মানুষের দুঃখ দূর করা যায়, কি করে তাদের দুঃখমুক্তির পথ নির্ধারণ করা যায়। সেই চিন্তা নিয়েই তিনি ভারত-পরিক্রমা শেষ করে কন্যাকুমারীর শেষ শিলাখণ্ডে ধ্যানে বসেছিলেন। যখন ধ্যান থেকে উঠেছিলেন তখন তাঁর হৃদয় শান্ত হয়েছে, তিনি আবিষ্কার করেছেন ভারতবর্ষের পুনর্জাগরণের পথ, ভারতের অগণিত দুঃখী-দরিদ্র মানুষের বেদনামুক্তির উপায়। কন্যাকুমারীতে স্বামীজীর মনে এই উপলব্ধি হয়েছিল যে, তিনি যে-পন্থা বা উপায় আবিষ্কার করেছেন তা শুধু ভারতের মানুষেরই অশ্রুমোচন করবে না, তা সারা জগতের মানুষেরও অশ্রুমোচন করতে সমর্থ। সুতরাং মহাবালেশ্বরের ঘটনাটি যেন এক হিসাবে কন্যাকুমারীতে স্বামীজীর ভারত-ধ্যানের তথা বিশ্ব-ধ্যানের ক্ষুদ্র রূপ। ঐ শিশুটি ছিল যেন ক্রন্দনরত নিখিল ভারতবাসীর তথা নিখিল মানবের প্রতীক।"

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য যে, সেদিনের ঐ শিশুর নাম কমলা, পরবর্তী কালে সাংলির মহারানী সরস্বতী দেবী। মহান অহংকারের সঙ্গে তিনি পরে বলিতেন: "আমি স্বামীজীর কোলে ঘুমোবার সুযোগ পেয়েছি।" (দ্রঃ বিশ্ববাণী, ৫৪ বর্ষ, ৮ম সংখ্যা, আশ্বিন ১৩৯৯, পৃঃ ৩৭৩) কমলা তথা সরস্বতী-দেবীর পরিচয় জানা গেলেও তাঁহার পিতামাতার নাম-পরিচয়াদি আমরা এখনও সংগ্রহ করিতে পারি নাই। জানিতে পারি নাই কমলার পিতার গৃহে স্বামীজী কখন এবং কতদিন অতিথি হিসাবে অবস্থান করেছিলেন তাহাও।

মহাবালেশ্বরে স্বামীজীর সঙ্গে স্বামী অভেদানন্দের আকস্মিক সাক্ষাৎ প্রসঙ্গে স্বামীজীর সুবৃহৎ জীবনীলেখক শৈলেন্দ্রনাথ ধর লিখিয়াছেন যে, জুনাগড় এবং মহাবালেশ্বরে সাক্ষাতের পর সম্ভবতঃ বোম্বাইয়ে স্বামী অভেদানন্দের সহিত স্বামীজীর আরও একবার সাক্ষাৎ হইয়াছিল ব্যারিস্টার রামদাস ছবিলদাসের বাড়িতে। ('Biography', Pt. I, p. 334 ; p. 393, f.n. 79) শৈলেন্দ্রনাথ ধর অবশ্য স্বামীজীর ইংরেজী জীবনীর প্রথম সংস্করণের ভিত্তিতে এই অনুমান করিয়াছেন। স্বামীজীর নিকট হইতে এই সম্পর্কে কোন কিছু না জানা গেলেও স্বামী অভেদানন্দ এসম্পর্কে সুস্পষ্ট ভাষায় তাঁহার আত্মজীবনীতে বিবরণ দিয়াছেন। স্বামী অভেদানন্দ লিখিয়াছেন, স্বামীজীর আমেরিকা-যাত্রার পূর্বে তাঁহার সহিত স্বামীজীর দুবার দেখা হইয়াছিল—জুনাগড়ে এবং মহাবালেশ্বরে। (দ্রঃ আমার জীবনকথা—স্বামী অভেদানন্দ, ১ম প্রকাশ, ১৯৬৪, পৃঃ ১৯৯-২০২) মহাবালেশ্বরে স্বামীজীর সহিত সাক্ষাতের পর সেখান হইতে পুনা ও দক্ষিণ ভারতের নানা তীর্থস্থান ভ্রমণ করিয়া কিছুদিন পর স্বামীজীর

নির্দেশে স্বামী অভেদানন্দ যখন কলকাতায় (আলমবাজার মঠে) প্রত্যাবর্তন করেন তখন স্বামীজী সম্পর্কে চিন্তান্বিত অপর গুরুভাইদের প্রশ্নে জুনাগড় ও মহাবালেশ্বরে তাঁহার সহিত স্বামীজীর সাক্ষাৎ হইয়াছিল বলিয়া অভেদানন্দজী জানান। (দ্রঃ ঐ, পৃঃ ২০৭) বোম্বাইয়ে স্বামীজীর সহিত দেখা হইলে অভেদানন্দজী নিশ্চয়ই তাহা তাঁহার আত্মজীবনীতে উল্লেখ করিতেন এবং গুরুভাইদের জিজ্ঞাসার উত্তরে অবশ্যই জানাইতেন। পরবর্তী কালে প্রকাশিত অভেদানন্দজীর আত্মজীবনীর ভিত্তিতে স্বামীজীর ইংরেজী জীবনীর সাম্প্রতিক সংস্করণে স্বামীজীর সহিত অভেদানন্দজীর বোম্বাইয়ে সাক্ষাতের তথ্যটি বর্জিত হইয়াছে।

### কানহেরী গুহায় স্বামীজী

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য যে, বোম্বাইয়ের ছবিলদাসের বাড়িতে মাস দুয়েক অবস্থানকালে (জুলাই, ১৮৯২-এর শেষ সপ্তাহ হইতে ২৬ সেপ্টেম্বর ১৮৯২) স্বামীজী বোম্বাইয়ের নিকটবর্তী কানহেরীর বৌদ্ধ গুহাগুলি পরিদর্শন করিয়াছিলেন। পরবর্তী কালে (জুন-জুলাই, ১৮৯৫) সহস্রদ্বীপোদ্যানে শিষ্য-শিষ্যাদের কাছে স্বামীজী তাঁহার ভাবী মঠ স্থাপনের নানা পরিকল্পনার কথা বলিতেন। সে-সময় তিনি একটি দ্বীপের কথা বলিতেন, যাহার তিনদিকে থাকিবে সমুদ্র। দ্বীপটিতে থাকিবে ছোট ছোট অনেক গুহা। সিস্টার ক্রিস্টিন তাঁহার একটি অপ্রকাশিত স্মৃতিকথায় অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন যে, ঐ গুহা-দ্বীপ হইল কানহেরীর বৌদ্ধ গুহা-দ্বীপ এবং বোম্বাইয়ে অবস্থানকালে স্বামীজী কানহেরী গুহা পরিদর্শন করিয়া আসিয়াছিলেন।

স্বামীজী সহস্রদ্বীপোদ্যানে এমন নিখুঁতভাবে গুহাগুলির বর্ণনা করিয়াছিলেন যে, তিনি যেন গুহাগুলি স্বয়ং দেখিতে পাইতেছেন। কিন্তু স্বামীজী যে সত্য সত্যই গুহাগুলি কখনও দেখিয়াছেন তাহার উল্লেখ তিনি করেন নাই। বহুদিন পর্যন্ত জানাও যায় নাই যে, স্বামীজী বাস্তবিকই গুহাগুলি পরিদর্শন করিয়াছিলেন। ফলে স্বামীজীর জীবনীগ্রন্থগুলিতে পূর্বে স্বামীজীর কানহেরী গুহাদর্শন অনুল্লিখিত ছিল। ১৯০৫ খ্রীস্টাব্দ নাগাদ সিস্টার ক্রিস্টিন বোম্বাই হইতে কানহেরী গুহায় যান এবং দেখিয়া অবাক হন যে, স্বামীজী সহস্রদ্বীপোদ্যানে যে গুহা-মঠের পরিকল্পনার কথা তাঁহাদের কাছে বলিতেন তাঁহার সেই পরিকল্পনা কোন অংশেই কাল্পনিক ছিল না। কানহেরী গুহায় স্বামীজী যে প্রাচীন বৌদ্ধ মঠের নিদর্শন দেখিয়াছিলেন তাহাই তাঁহার স্মৃতিতে জীবন্তভাবে জাগ্রত ছিল। স্বামীজীর মুখে সহস্রদ্বীপোদ্যানে যখন ক্রিস্টিন প্রমুখ শিষ্য-শিষ্যারা তাঁহার পরিকল্পনার কথা শুনিয়াছিলেন তখন উহা তাঁহাদের নিকট স্বামীজীর নিছক কল্পনাবিলাস বলিয়াই প্রতিভাত হইয়াছিল। সহস্রদ্বীপোদ্যানে অবস্থানের প্রায় দশ বৎসর পর ক্রিস্টিন যখন কানহেরী গুহা-দ্বীপ এবং উহার ভৌগোলিক পরিবেশ ইত্যাদি স্বচক্ষে দেখেন তখন তিনি নিশ্চিত হন যে, স্বামীজীর পূর্ব-উল্লিখিত পরিকল্পনার পশ্চাতে ছিল তাঁহার কানহেরী গুহা দর্শনের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা এবং ভারত-পরিক্রমাকালে বোম্বাইয়ে অবস্থানের সময় স্বামীজী কানহেরী গুহাগুলি দেখেন। পরে স্বামীজীর শিষ্য স্বামী সদানন্দকে যখন ক্রিস্টিন তাঁহার কানহেরী গুহা দর্শনের অভিজ্ঞতার কথা জানান তখন স্বামী সদানন্দও তাঁহাকে বলেন যে, আমেরিকা-গমনের পূর্বে পশ্চিম ভারতে পরিক্রমাকালে স্বামীজী কানহেরী গুহা দেখিতে যান। গুহাগুলির কথা কেহ তখন জানিত না। জনবসতি হইতে দূরে অবস্থিত হওয়ায় এবং জঙ্গলাকীর্ণ হওয়ায় এই গুহা-দ্বীপের কথা মানুষ বিস্মৃতও হইয়াছিল। গুহাগুলিতে (সংখ্যায় ১০৯) আদিযুগের বৌদ্ধ সন্ন্যাসীরা বাস করিতেন।

স্বামী সদানন্দ সিস্টার ক্রিস্টিনকে আরও বলেন যে, গুহাগুলি দেখিয়া স্বামীজী অভিভূত হইয়া পড়িয়াছিলেন। তাঁহার মনে হইয়াছিল, তাঁহার পূর্ববর্তী কোন জন্মে তিনি এই গুহার কোনটিতে বাস করিয়াছিলেন। তিনি আশা করিতেন, এই গুহা-দ্বীপে তিনি ভবিষ্যতে একটি মঠ স্থাপন করিবেন।

সিস্টার ক্রিস্টিনের অপ্রকাশিত স্মৃতিকথায় এই সমস্ত তথ্য আমরা পাইতেছি। 'প্রবুদ্ধ ভারত' পত্রিকার মার্চ ১৯৭৮ সংখ্যায় 'রেমিনিসেন্সেস অব স্বামী বিবেকানন্দ' শিরোনামে কানহেরী গুহার দুটি ফটো-সহ ক্রিস্টিনের স্মৃতিকথাটি প্রকাশিত হয়। পরে স্বামীজীর ইংরেজী জীবনীর সাম্প্রতিক সংস্করণের প্রথম খণ্ডে (পৃঃ ৩০৫-৩০৬) স্বামীজীর 'পশ্চিম ভারত পরিক্রমা' অধ্যায়ে ঐ স্মৃতিকথা হইতে প্রাসঙ্গিক অংশ অন্তর্ভুক্ত হয়।

কানহেরী গুহা দর্শন স্বামীজীর ভারত-পরিক্রমাকালের একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। ইহার কথা সিস্টার ক্রিস্টিনের সূত্রে এখন জানা যাইলেও, ঠিক কবে অর্থাৎ কোন্ তারিখ স্বামীজী কানহেরী গুহায় গিয়াছিলেন তাহা এখনও অজ্ঞাত। □

# স্বামী তুরীয়ানন্দের অপ্রকাশিত পত্র

[ গত অগ্রহায়ণ ১৩৯৯ সংখ্যার পর ]

॥ ৩৪* ॥

রামকৃষ্ণ অদ্বৈত আশ্রম
লাক্সা, বারাণসী, ইউ. পি.
৫ জানুয়ারি (১৯)১৩

প্রিয় রামচন্দ্র,

এই মাসের দুই তারিখের চিঠির জন্য তোমাকে অনেক ধন্যবাদ। চিঠিটি গতকাল আমি পাইয়াছি।

পোস্ট অফিস হইতে আমার নিকট একটি নির্দেশ আসিয়াছিল যে, আমার নামে ক্ষতিগ্রস্ত অবস্থায় একটি পার্সেল পোস্ট অফিসে আসিয়াছে—উহা খালাস করিতে হইবে এবং দায়িত্বশীল কোন ডাকবিভাগের কর্মচারির সামনে উহা খুলিতে হইবে। জিনিসটি খালাস হইবার পর দেখিলাম, পার্সেলটিতে পাঁচ বান্ডিল উত্তম ধূপ রহিয়াছে। কয়টি ধূপের বান্ডিল তুমি পাঠাইয়াছিলে? এখানে সকলেই এরূপ উত্তম ধূপ পাইয়া খুব খুশি হইয়াছেন। ইহাতে তোমার ভালমতই অর্থব্যয় করিতে হইয়াছে। তুমি এত বেশি পরিমাণ না পাঠাইয়া আরও কম পাঠাইতে পারিতে। ঠাকুরের মন্দিরে এক বান্ডিল এবং শ্রীশ্রীমাকে এক বান্ডিল দিয়া বাকিগুলি এখানকার সাধুদের মধ্যে বিতরণ করিয়া দিয়াছি। ধূপের দাম কত পড়িয়াছে আমাকে জানাইবে এবং কোথায় ঐ ধূপ পাওয়া যায় তাহাও জানাইবে।

কাজের অত্যধিক চাপ তোমার স্বাস্থ্যহানি ঘটাইয়াছে জানিয়া দুঃখিত হইয়াছি। আমি আশা করি ও প্রার্থনা করি, তোমাকে এত শ্রমসাধ্য কাজ আর বেশিদিন করিতে হইবে না এবং অবসর ও বিশ্রাম শীঘ্রই পাইবে। মা তোমার দৈহিক এবং মানসিক অবস্থা ভাল রাখুন যাহাতে তুমি আধ্যাত্মিক আনন্দ প্রাণ ভরিয়া উপভোগ করিতে পার।

শুনিয়া খুশি হইলাম যে, তুমি বোম্বাইয়ে স্বামীজী এবং গুরুমহারাজের জন্মোৎসবের আয়োজন করিতেছ। সেখানে অনেক বাঙ্গালী আছেন, পূর্ব হইতে বলিলে তাঁহারাও উহাতে যোগ দিতে পারিবেন। চিঠিতে তোমার প্রস্তাব অনুসারে স্বামী ব্রহ্মানন্দকে আমি বলিব যাহাতে তিনি কোন স্বামীজীকে সেখানে পাঠাইতে পারেন। যদি আমার স্বাস্থ্য এত খারাপ না হইত তবে আমি মিশনের পক্ষ হইতে নহে—ব্যক্তিগতভাবেই সেখানে যাইতাম। দীর্ঘকাল পরে তোমাকে দেখিয়া কত আনন্দই না হইত। শ্রীশ্রীমা সপ্তাহখানেকের মধ্যে এখান হইতে চলিয়া যাইবেন এবং আমরাও মাসখানেকের ভিতরেই তাঁহার পদানুসরণ করিব। যখন আমরা মঠে যাইব তখন তোমার ওখানে কাহাকেও পাঠানোর বিষয়ে কি করিতে পারি দেখিব। এবিষয়ে কিছু করার প্রয়োজন আমরাও অনুভব করি।

মিসেস সেভিয়ারের সঙ্গে এখন তোমার যোগাযোগ আছে কি? তাঁহারা মায়াবতী হইতে শীঘ্রই স্বামীজীর জীবনী প্রকাশ করিতে যাইতেছেন। ইহা তিন খণ্ডে সম্পূর্ণ হইবে। প্রথম খণ্ডটি আমি দেখিয়াছি। আমার মনে হইয়াছে, ইহা একটি চমৎকার কাজ হইবে। এই প্রসঙ্গে স্বামী স্বরূপানন্দের কথা মনে পড়িতেছে। আজ বাঁচিয়া থাকিলে সে কতই না খুশি হইত। স্বামীজীর প্রতি কী গভীর ভালবাসাই না তাহার ছিল। [ তবে ] মায়ের যাহা ইচ্ছা তাহাই তো হইবে। তোমার স্বাস্থ্যকে সুস্থ রাখিবার জন্য সাধ্যমত চেষ্টা করিবে। আশা করি তুমি সুস্থ এবং কুশলে আছ। আমার শুভেচ্ছা ও ভালবাসা জানিবে। ইতি

স্নেহবদ্ধ
তুরীয়ানন্দ

* চিঠিটি ইংরেজীতে লেখা।—যুগ্ম সম্পাদক, উদ্বোধন

নিবন্ধ

# শ্রীমা সারদাদেবী

## স্বামী বলভদ্রানন্দ

শ্রীমা সারদাদেবী সম্বন্ধে কোন কিছু লিখতে বা বলতে গেলে মনে প্রশ্ন জাগে : যদি তিনি নরদেহ ধারণ করে জন্মগ্রহণ না করতেন, তবে স্বয়ং বাল্মীকিও কি পারতেন, বিশ্বমাতৃত্বের এই অপরূপ প্রতিমাটিকে কল্পনা করতে? কল্পনাকেও হার মানিয়ে যে অনুপম মাতৃমূর্তি সারদাদেবীরূপে বাস্তব হয়ে উঠেছে, তাঁর জীবনকাহিনীকে ঈশারউডের ভাষা ধার করে অবশ্যই বলা চলে—"Story of a phenomenon"। শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনী রচনা করতে গিয়ে পিছিয়ে এসেছিলেন স্বামীজী, 'শিব গড়তে বানর গড়ে' ফেলবেন—এই ভয়ে। একই রকম ভয় পেয়েছিলেন স্বামীজী মায়ের ক্ষেত্রেও—"সাণ্ডেল (বৈকুণ্ঠনাথ সান্যাল) আমাকে তিন পাতা লেকচার দিয়েছে যে, মা ঠাকুরানীকে ভক্তি করতে হবে এবং তিনি আমায় কত দয়া করেন। সাণ্ডেলের এই মহা আবিষ্ক্রিয়ার জন্য ধন্যবাদ। তাঁর (শ্রীমায়ের বিষয়ে) একটা কিছু লিখব মনে করি; কিন্তু ভয়ে পেছিয়ে যাই।"[১]

স্বামীজী ভয় পেলেও আমরা যে বারবার মায়ের সম্বন্ধে আলোচনা করে থাকি, তার প্রথম কারণ এই যে, মা তাঁর নিজগুণে আমাদের বড় আপন। মায়ের কথা বলতে আমাদের ভাল লাগে। দ্বিতীয়তঃ, মায়ের সম্বন্ধে কোন কিছু আলোচনা করলে নিজেদেরই কল্যাণ। এ যেন গঙ্গাস্নানের মতো। গঙ্গাস্নান যেমন কখনোই পুরনো হবার নয়; নিত্য গঙ্গাস্নান নিত্য কল্যাণকর—এ-ও ঠিক তাই। মায়ের জীবন-গঙ্গায়, তাঁর লীলায় যতবার অবগাহন করি, ততবারই আমরা আরও একটু পবিত্র হয়ে উঠি। 'পবিত্রতাস্বরূপিণী'র অনুধ্যানের অর্থ পবিত্রতারই অনুশীলন। তৃতীয় কারণ সম্ভবতঃ এই : আমরা অধিকাংশই ইংরেজী প্রবাদের সেই মূর্খদের মতো, যাদের সেইসব অঞ্চলে ঝাঁপিয়ে পড়তে লজ্জা নেই, যেখানে দেবদূতেরাও সন্তর্পণে হাঁটেন। অনধিকার-চর্চা করতে আমরা ভয় পাই না, কারণ আমরা বুঝতেই পারি না, অনধিকার-চর্চা করছি। তাই স্বামীজীর মতো মহাপুরুষ পিছিয়ে এলেও সারদাদেবীর চরিত্র আলোচনা করতে আমাদের একটুও কুণ্ঠা নেই।

সমস্ত ঐশ্বর্যকে গোপন করে রেখেছেন বলেই মা আরও দুর্জ্ঞেয় হয়ে উঠেছেন। তাঁর অলোকসামান্য চরিত্রের চারপাশে যে সাধারণত্বের ঘেরাটোপ, তার ফলেই তিনি আরও দুর্বোধ্য। মাকে যাঁরা অসাধারণ মনে করে দেখতে এসেছেন, সাধারণের চেয়েও সাধারণ হয়ে মা তাঁদের ছলনা করেছেন, এরকম দৃষ্টান্ত আছে। যেমন কাশীর সেই মহিলাটি। মা বসে আছেন গোলাপ-মা প্রমুখ স্ত্রীভক্তের সঙ্গে। চেহারার আপাতত বৈশিষ্ট্য বা যেকোন কারণেই হোক, উপস্থিত সকলের মধ্যে গোলাপ-মাই দৃষ্টি কেড়ে নেন আগন্তুক মহিলা-ভক্তের। তিনি গিয়ে গোলাপ-মাকেই 'মা' ভেবে প্রণাম নিবেদন করেন। বিব্রত গোলাপ-মা সঙ্গে সঙ্গে মাকে দেখিয়ে দেন ও বলেন : তিনি নন, উনিই মা। মা-এর কাছে এগিয়ে যেতে মা মজা করার জন্য বললেন : না, না। যাকে প্রণাম করছিলে উনিই মা। আবার সেই মহিলা গোলাপ-মার দিকে যান এবং গোলাপমা আবার তাঁকে মায়ের দিকে পাঠিয়ে দেন। এইভাবে কয়েকবার চলার পর গোলাপ-মা বিরক্ত হয়ে ওঠেন এবং সেই বিরক্তিতেই মায়ের সম্বন্ধে একটি মূল্যবান কথা তাঁর মুখ থেকে বেরিয়ে আসে : "তোমার কি বুদ্ধি-বিবেচনা নেই। দেখছ না—

১ স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা, ৭ম খণ্ড, ১ম সং, পৃঃ ২৫৫

মানুষের মুখ কি দেবতার মুখ? মানুষের চেহারা কি অমন হয়?"[২]

মাকে সাধারণ নারীর মতো আত্মীয়স্বজন, ঘরকন্না নিয়ে ব্যস্ত থাকতে দেখে এক স্ত্রী-ভক্ত বলে ফেলেছিলেন: "মা, আপনি দেখছি মায়ায় ঘোর বদ্ধ।" মা সাধারণতঃ এই ধরনের প্রশ্ন এড়িয়ে যেতেন কিংবা বলতেন: "আমরা মেয়েমানুষ, আমাদের এরকমই।" কিন্তু সেদিন মা নিজেরও অজান্তে আত্মপ্রকাশ করে ফেলেছিলেন। অস্ফুটস্বরে বলেছিলেন: "কি করব মা, নিজেই মায়া।"[৩]

মা স্বয়ং মায়া; মহামায়ার অনির্বচনীয়তা তাঁর মধ্যে। তাই মা যে প্রকৃতপক্ষে কি তা বোঝা আমাদের পক্ষে এত কঠিন। মহাপুরুষ মহারাজ বলেছিলেন: "তাঁকে (শ্রীশ্রীমাকে) সাধারণ মানব কি বুঝবে? আমরাও প্রথমটা তাঁকে কিছুই বুঝতে পারিনি। নিজের ঐশীভাব এত গোপন করে থাকতেন যে, তাঁকে কিছুই বুঝবার জো ছিল না। তিনি যে কি ছিলেন তা একমাত্র ঠাকুরই জানতেন। আর স্বামীজী কতকটা বুঝেছিলেন।"[৪]

স্বামী সারদানন্দ, যিনি দীর্ঘকাল মায়ের সেবক ছিলেন, তাঁর পক্ষেও বোঝা সম্ভব হয়নি, সারদাদেবী কে ছিলেন। মায়ের লীলাবসানের পর কাশীধামে প্রাচীন সাধুরা সারদানন্দজীকে অনুরোধ করেছিলেন: আপনি 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ' লিখে জগতের মহা উপকার করেছেন। জীবনীও আপনি লিখলে ভাল হয়। উত্তরে কিছু না বলে শরৎ মহারাজ এই গানটি আবৃত্তি করেছিলেন শুধু:

"রঙ্গ দেখে রঙ্গময়ীর অবাক হয়েছি।
হাসিব কি কাঁদিব তাই বসে ভাবিতেছি॥
এতকাল রইলাম কাছে, ফিরলাম পাছে পাছে,
কিছু বুঝতে না পেরে এখন হার মেনেছি।
বিচিত্র তাঁর ভবের খেলা, ভাঙেন গড়েন দুইবেলা;
ঠিক যেন ছেলেখেলা—বুঝতে পেরেছি।"[৫]

আর একবার জনৈক সন্ন্যাসী শরৎ মহারাজকে শ্রীশ্রীমায়ের মন্ত্রদীক্ষা-প্রাপ্ত কোন একজনের সম্বন্ধে বলেছিলেন: শ্রীশ্রীমায়ের বিশেষ কৃপা পেয়েও সে কি করে অমন গর্হিত কাজ করতে পারল? এই প্রশ্ন শুনে শরৎ মহারাজ কিছুক্ষণ চুপ করে থাকলেন, তারপর ধীরে ধীরে বলতে লাগলেন: "যে-ভাবের চিন্তায় নিজের ক্ষুদ্র বিশ্বাস-ভক্তির হানি হয়, তা কখনো মনে স্থান দিয়ো না। তাকে তোমরা আজ এমন দেখছ, দশ বছর পর সে যে একজন মহাপুরুষ হয়ে দাঁড়াবে না, কী করে জানলে? তখন তোমরাই বলবে, 'তা হবে না? সে যে মার কত কৃপা পেয়েছিল।' মার মহিমা, মার শক্তি কতটুকু, আমাদের কী সাধ্য বুঝি। এমন আসক্তি দেখিনি, এমন বিরাগও দেখিনি। এদিকে তো 'রাধু, রাধু' করে অস্থির, কিন্তু শেষকালে বললেন, 'একে পাঠিয়ে দাও।' তাঁকে বললুম, 'মা, আপনি রাধুকে পাঠিয়ে দিতে বলছেন। পরে যখন আবার দেখতে চাইবেন, তখন কী হবে?' মা বললেন: 'না, আর আমার ওর ওপর কিছুমাত্র মন নেই'।"[৬]

জগতের কল্যাণের জন্যই মায়ের এই আসক্তির অভিনয়। তুরীয়ানন্দজী বলেছিলেন: "কী মহাশক্তি জগতের কল্যাণের জন্য রয়েছেন। যে-মনকে আমরা এখানে (কণ্ঠদেশে) ওঠাতে প্রাণপণ চেষ্টা করি, সেই মনকে তিনি সেখানে 'রাধু রাধু' করে জোর করে নাবিয়ে রেখেছেন।"[৭]

রাধুর প্রতি আসক্তি লোককল্যাণের জন্য—যে-লোককল্যাণব্রতের ভার শ্রীরামকৃষ্ণ দেহাবসানের আগে তাঁর ওপর ন্যস্ত করে গেছিলেন। তাই যতক্ষণ শ্রীরামকৃষ্ণের কাজ শেষ হয়নি, ততক্ষণ প্রচণ্ড আসক্তি। যখনই সেই কাজ শেষ হলো—পরিপূর্ণ বিরাগ।

'মায়ের বৈশিষ্ট্য কি?'—এই প্রশ্ন করলে বলতে হয়—তাঁর সব কিছুতেই বৈশিষ্ট্য। এত ধৈর্য ও ক্ষমা, এত স্নেহ-পবিত্রতা-উদারতা, এত নিজেকে

২ শ্রীমা সারদাদেবী—স্বামী গম্ভীরানন্দ, ১৩১৬, পৃঃ ২১৩
৩ ঐ, পৃঃ ২১২-২১৩
৪ শিবানন্দ-বাণী, ১ম ভাগ, ১৩৮৬, পৃঃ ১৫৯-১৬০
৫ মাতৃসান্নিধ্যে—স্বামী ঈশানানন্দ, ১৩১৬, পৃঃ ২১৪
৬ স্বামী সারদানন্দের জীবনী—ব্রহ্মচারী অক্ষয়চৈতন্য, ২য় সং, পৃঃ ১৬৫
৭ উদ্বোধন, ৬০ বর্ষ, পৃঃ ১৩১

মুছে ফেলা এবং সমস্ত লোকোত্তর বিশেষত্বকে এইভাবে অদ্ভুত নিপুণতায় আবৃত রেখে নিজেকে আর দশটি সাধারণ পল্লীরমণীর মতো প্রতিভাত করা—সবটুকুই নিঃসন্দেহে বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। কিন্তু জলের প্রধান বৈশিষ্ট্য যেমন তৃষ্ণা দূর করবার ক্ষমতা, তেমনই মায়েরও প্রধান বৈশিষ্ট্য তাঁর মাতৃত্ব। 'নিখিল-মাতৃহৃদয় সাগর-মন্থন-সুধা-মূরতি।' স্বামী বিশুদ্ধানন্দ তাঁর সম্বন্ধে বলছেনঃ 'গণ্ডিভাঙা মা'। স্বামী বিরজানন্দের প্রথম মাতৃদর্শনের অভিজ্ঞতাঃ "এ যে জন্মজন্মান্তরের চিরকালের আপনার মা।" মায়ের নিজের মুখের স্বীকৃতিঃ "আমি সতেরও মা, অসতেরও মা।" "সতীরও মা, অসতীরও মা।" "আমি সত্যিকারের মা; গুরুপত্নী নয়, পাতানো মা নয়, কথার কথা মা নয়—সত্য জননী।"

শরৎ মহারাজের প্রতি মায়ের বিশেষ স্নেহ সর্বজনবিদিত। মা তাঁকে নিজের 'মাথার মণি' বলতেন। বলতেন—বাসুকী; যেখানে জল পড়ে, সেখানেই ছাতা ধরে। মা শরৎ মহারাজের হৃদয়বত্তার উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করতেনঃ "নরেনের (স্বামীজীর) পর এত বড় প্রাণ আর একটিও পাবে না। ব্রহ্মজ্ঞ হয়তো অনেকে আছেন, শরতের মতো এমন হৃদয়বান দিলদরিয়া লোক ভারতবর্ষে নেই, সমস্ত পৃথিবীতে নেই।"

কিন্তু মায়ের বিশেষ স্নেহ ডাকাত আমজাদের প্রতিও। ডাকাত আমজাদ নিঃসংকোচে মায়ের কাছে যাতায়াত করে। মা-ও তাকে সন্তান-স্নেহে গ্রহণ করেন। মা জানেন আমজাদের কুকর্মের কথা। আমজাদও জানে, মা তার কুকর্মের কথা সব জানেন। তবুও মায়ের কাছে সে নিঃসংকোচ। যেকোন ভাবেই হোক সে উপলব্ধি করেছেঃ মায়ের স্নেহ তার দোষগুণ বিচার করে না। তাই মায়ের কাছে আসতে গেলে ডাকাতি ছাড়ার প্রয়োজন আছে, এটা আমজাদের মনে হয়নি! শুধু মায়ের প্রতি সম্ভ্রমবশতঃ জয়রামবাটী গ্রামকে সে ডাকাতি থেকে অব্যাহতি দিয়েছে।

একবার অনেকদিন পরে আমজাদ এসেছে মায়ের কাছে, সঙ্গে একঝুড়ি গাছের লাউ। মা জিজ্ঞেস করলেনঃ "অনেক দিন ভাবছিলুম তুমি আসনি কেন? কোথায় ছিলে?" আমজাদ নিঃসঙ্কোচে উত্তর দিল, গরু চুরির দায়ে ধরা পড়েছিল, তাই সে আসতে পারেনি। মা সেকথায় আমল না দিয়ে সহানুভূতির সুরে বললেনঃ "তাই তো ভাবছিলুম, আমজাদ আসে না কেন।"

ছিন্নবসনে ধূলি-ধূসরিত কেশ নিয়ে এইভাবে হঠাৎ হঠাৎই আমজাদ এসে হাজির হতো মায়ের কাছে। সারাদিন মায়ের কাছে থেকে খাওয়াদাওয়া গল্পগুজব করে দিনের শেষে যখন সে বাড়ি ফিরত, তখন তার সম্পূর্ণ অন্য চেহারা। গায়ে মাথায় তেল মেখে সে স্নান করেছে, খেয়েদেয়ে পান চিবোতে চিবোতে চলেছে। চোখে-মুখে তৃপ্তির ছাপ। হাতে হয়তো একটা কবিরাজী তেলের শিশি—মা-ই তাকে দিয়েছে, রাতে আমজাদের ঘুম হয় না বলে।

একদিন নলিনী-দিদি আমজাদকে পরিবেশন করছেন। ছোঁয়া লেগে যাবার ভয়ে দূর থেকে ছুঁড়ে ছুঁড়ে পরিবেশন করছেন। মা দেখে বলে উঠলেনঃ "অমন করে দিলে কি মানুষের খেয়ে সুখ হয়? তুই না পারিস আমি দিচ্ছি।" মা নিজেই পরিবেশন করলেন। খাওয়ার পরে এঁটো জায়গাও নিজের হাতে পরিষ্কার করলেন। তাই দেখে নলিনী-দিদি আঁতকে বলে উঠলেনঃ "তোমার জাত গেল।" মায়ের মুখ থেকে তখনই নিঃসৃত হয়েছিল সেই মহাবাক্যঃ "আমার শরৎ (স্বামী সারদানন্দ) যেমন ছেলে, এই আমজাদও তেমন ছেলে।"

মা ইতর জীবজন্তুরও মা। বাছুরের 'হাম্বা' ডাক শুনে মা ছুটে গিয়ে তাকে জড়িয়ে ধরতেন। বাছুরও শান্ত হয়ে যেত সঙ্গে সঙ্গে—যেন সে তার নিজের মাকেই পেয়েছে। বেড়াল নির্ভয়ে ঘুরে বেড়াত মায়ের সংসারে। ভয় দেখানোর জন্য মা কখনো হাতে লাঠি তুলে নিলে বেড়াল এসে আশ্রয় নিত তাঁরই পায়ে। মা-ও সঙ্গে সঙ্গে হাতের লাঠি ফেলে দিতেন। পোষা চন্দনা 'গঙ্গারাম' খিদে পেলেই ডাকতঃ "মা, ও মা"। মা-ও উত্তর দিতেনঃ "যাই বাবা, যাই।" এই বলে তিনি পাখিকে ছোলা-জল দিয়ে আসতেন।

মা সত্যিই "গণ্ডিভাঙা মা"। ইংরেজ তাঁর ছেলে, আমজাদ তাঁর ছেলে, পশুপাখিও তাঁর ছেলে।

ব্রহ্মাণ্ড জুড়ে সকলেই তাঁর সন্তান।

গর্ভধারিণী জননীর চেয়েও যেন তাঁর স্নেহ বেশি। পুত্রশোকাতুরা এক জননী এসেছে মায়ের কাছে। মা তার কাছে সেই দুঃসংবাদ শুনে ডাক ছেড়ে কাঁদতে লাগলেন। গর্ভধারিণী জননীর চেয়েও মাকে বেশি শোকার্ত মনে হচ্ছিল। তার চেয়েও বেশি কাঁদছিলেন মা।

অনেকে মায়ের কাছে এসে, মায়ের স্নেহের আস্বাদ পেয়েই বুঝতে পারত, গর্ভধারিণী জননীর কি মর্যাদা। ঘরে ফিরে গর্ভধারিণী জননীকে তারা আরও বেশি করে ভালবাসতে শিখত।

আর একটি বিষয় লক্ষণীয়ঃ মা-ডাক শোনার জন্য তিনি ব্যাকুল। স্বামী অরূপানন্দ মাকে 'মা' বলে ডাকতেন না প্রথম প্রথম। মা একদিন তাঁকে ডেকে বললেনঃ "অমুককে গিয়ে বলবে, মা এই বললেন।" বলে তিনি জিজ্ঞাসা করলেনঃ "কি বলবে বল দেখি?" অরূপানন্দজী বললেনঃ "গিয়ে বলব, আপনি এই এই বলেছেন।" মা সংশোধন করে দিয়ে বললেনঃ "না, বলবে যে, মা এটা বললেন।"— 'মা' শব্দটি বেশ জোর দিয়ে উচ্চারণ করলেন।

আরেক যুবক-ভক্তকে মা দীক্ষা দিয়ে বললেনঃ "ঠাকুরই গুরু—আমি গুরু নই, আমি মা, সকলের মা।" যুবক-ভক্তটি তা মানবেন না, বললেনঃ "তোমার কাছ থেকে আমি দীক্ষা নিয়েছি, তুমিই আমার গুরু। আর তুমি আমার মা হলে কি করে? আমার মা তো বাড়িতে আছেন।" মা বললেনঃ "না, আমিই তোমার সেই মা। চেয়ে দেখ ভাল করে।" যুবক-ভক্তটি স্পষ্ট দেখলেন, মায়ের শ্রীমূর্তির জায়গায় তাঁরই গর্ভধারিণী।

কেন মায়ের এত ব্যাকুলতা সন্তানের কাছে মাতৃরূপে প্রকটিত হবার জন্য, তাদের মুখে 'মা'-ডাক শোনার জন্য? নিজের তৃপ্তির জন্য? কিন্তু যিনি সারাজীবনে কোন কিছুই নিজের জন্য করেননি, নিজেকে মুছে দিয়েই যাঁর আনন্দ, তিনি মাতৃ-সম্বোধন শোনার জন্য কিংবা নিজের পরিতৃপ্তির জন্য ব্যাকুল—এটা বিশ্বাসযোগ্য নয়। 'মা'-ডাক শুনতে চাইতেন এইজন্য যে, তিনি জানতেন, তাঁকে মা বলে চিনলে আমাদেরই কল্যাণ। শ্রীরামকৃষ্ণ বলেছেনঃ ভুবনমোহিনী মায়া লজ্জায় মুখ লুকোন শুধু তখনই যখন তাঁকে মা বলে ডাকা হয়। আর সাধনায় সিদ্ধ হতে গেলে, মুক্তিলাভ করতে গেলে মায়াদেবীকে প্রসন্ন করতেই হবে। সেই সাক্ষাৎ মহামায়া সারদাদেবীরূপে অবতীর্ণা। মহামায়া স্বয়ং মাতৃমূর্তি পরিগ্রহ করেছেন জগতের কল্যাণের জন্য। সেই অতি স্পষ্ট মাতৃপ্রতিমাকেও যদি আমরা মা বলে চিনতে না পারি, তবে আমাদের মতো দুর্ভাগ্য আর কার! তাই সারদাদেবীর এত ব্যাকুলতা মা-ডাক শোনার জন্য। আমাদের পারমার্থিক কল্যাণের জন্যই তাঁর ঐ মাতৃত্বের আকুতি। শ্রীরামকৃষ্ণ এই ব্রতসাধনের জন্যই তাঁকে রেখে দিয়ে গেছিলেন। তাই গৃহকর্মে ব্যস্ত থাকার সময়ও মাঝে মাঝে আপনমনে তিনি বলতেনঃ "ছেলেরা, তোরা আয়।"

দেবী না মানবী—কি বলব তাঁকে? যদি দেবী বলি, ভুল বলা হয়। কারণ, দেবী কি এমন আটপৌরে হয়? এত কাছের হয়? ভাল-মন্দ, পাপী-পুণ্যবান সকলের জন্য কি দেবীর কৃপা এইভাবে প্রত্যক্ষ হয়ে ওঠে? এমন মানবিক গুণ কি দেবীর মধ্যে থাকে? আবার যদি মানবী বলতে চাই, তবে অসম্পূর্ণ বলা হয়। কারণ, এমন অ-লৌকিক ভালবাসা; এমন অ-সম্ভব ধৈর্য-ক্ষমা-সহিষ্ণুতা ও পবিত্রতা—একি মানুষের হয়? দেবী ও মানবী-ভাবের সমন্বয়ে সারদাদেবী এক অনন্য চরিত্র। তিনি নিজেই তাঁর উপমা। কোন বিশেষণে তাঁকে বিশেষিত করা যায় না।

নিবেদিতা তাঁকে দেখেছেন বিধাতার আশ্চর্যতম সৃষ্টিরূপে, শ্রীরামকৃষ্ণের বিশ্বপ্রেম ধারণের আধার-রূপে। গঙ্গার ওপর দিয়ে বয়ে আসা মৃদুমন্দ বাতাস, সূর্যের আলো, বাগানের সৌরভ—এই সব নিঃশব্দ বস্তুর মধ্যে নিবেদিতা সারদাদেবীর আংশিক উপমা খুঁজে পেয়েছেন। শ্রীশ্রীমায়ের নীরব, শান্ত জীবন তাঁকে মনে করিয়ে দিয়েছে যে, ভগবানের মহান সৃষ্টিগুলির সবগুলিরই ঐ এক বৈশিষ্ট্য—শান্ত, নীরবতা।

মিস ম্যাকলাউডও মায়ের শান্ত-নীরব জীবনের মাধুর্যে মুগ্ধ হয়েছেন। মায়ের দেহরক্ষার পরে মিস ম্যাকলাউড স্বামী সারদানন্দজীকে একটি চিঠিতে লিখেছিলেনঃ "সেই নির্ভীক, শান্ত, তেজস্বী

জীবনের দীপটি তাহলে নির্বাপিত হলো—আধুনিক হিন্দুনারীর কাছে রেখে গেল আগামী তিন হাজার বছরে নারীকে যে-মহিমময় অবস্থায় উন্নীত হতে হবে, তারই আদর্শ।"

শুধু হিন্দুনারী বা নারীজাতির আদর্শ নয়, নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সকলের আদর্শস্থল শ্রীমায়ের জীবন। কোনরকম পুঁথিগত শিক্ষার পরিশীলন ছাড়া শুধুমাত্র হৃদয়ের অনুভূতির জোরেই যে একজন মানুষ এত উদার হতে পারে, জাতি, দেশ ও ধর্মীয় সংকীর্ণতার ঊর্ধ্বে উঠে সকলকে ভালবেসে গ্রহণ করতে পারে, প্রকৃতই বিশ্ব-নাগরিক হয়ে উঠতে পারে—সারদাদেবীর জীবন তার প্রমাণ।

স্বামীজী জগতের সভ্যতাভাণ্ডারে ভারতের অবস্থানের কথা বলতে গিয়ে বারবার একটি উপমা ব্যবহার করেছেন: শিশিরবিন্দু রাত্রে ফুলের ওপরে এসে পড়ে, যখন সকলে ঘুমোয়। সকালে উঠে আমরা বাগানে প্রস্ফুটিত ফুলগুলিকে দেখি, কিন্তু যে-শিশিরবিন্দু সারারাত ধরে সকলের দৃষ্টির অগোচরে ফুলগুলিকে ফুটে উঠতে সাহায্য করেছে তাকে দেখি না। ভারতের অবদান ঐ শিশিরবিন্দুর মতো: নীরবে, সকলের অগোচরে ভারতবর্ষ জগতে মহৎ আদর্শের পুষ্পরাশি ফুটিয়ে চলেছে।

এই শিশিরবিন্দুর উপমা মায়ের জীবনের সঙ্গে খুব মেলে। সকলের দৃষ্টির অগোচরে লুকিয়ে থেকে, নিজেকে সম্পূর্ণ মুছে ফেলে, মা শুধু একটি আদর্শ জীবনযাপন করে গেছেন, যে-জীবন শান্ত, নীরব এবং "ভালবাসায় ভরপুর"। যে-জীবনের সর্বশেষ বাণী: "কেউ পর নয়, জগৎ তোমার।"

এই বাণী ভারতবর্ষের বাণী—"বসুধৈব কুটুম্বকম্।" সারদাদেবী এই ভারতবর্ষেরই প্রতীক। □

## প্রচ্ছদ-পরিচিতি

প্রচ্ছদের আলোকচিত্রটি কামারপুকুরের শ্রীরামকৃষ্ণের বাসগৃহের। পাঁচের দশকের প্রথমদিকে আলোকচিত্রটি গৃহীত হয়েছিল।

বর্তমান বর্ষটি (১৯৯৩) শ্রীরামকৃষ্ণ-ভাবান্দোলনের ক্ষেত্রে একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বর্ষ। কারণ, এই বর্ষে শিকাগো ধর্মমহাসম্মেলনে স্বামী বিবেকানন্দের আবির্ভাবের শতবর্ষ পূর্ণ হচ্ছে। শিকাগো ধর্ম-মহাসভায় স্বামী বিবেকানন্দ যে-বাণী প্রচার করেছিলেন এবং যে-বাণী ধর্মমহাসভার সর্বশ্রেষ্ঠ বাণী বলে অভিনন্দিত হয়েছিল, সে-বাণী ছিল সমন্বয়ের বাণী। ধর্মের সমন্বয়, মতের সমন্বয়, সম্প্রদায়ের সমন্বয়, দর্শনের সমন্বয়, আদর্শের সমন্বয়—প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের সমন্বয়, প্রাচীন ও নবীনের সমন্বয়, অতীত বর্তমান ও ভবিষ্যতের সমন্বয়। ভারতবর্ষ সুপ্রাচীন কাল থেকে এই সমন্বয়ের বাণী ও আদর্শ প্রচার করে আসছে। আধুনিক কালে এই সমন্বয়ের সর্বপ্রধান ও সর্বশ্রেষ্ঠ প্রবক্তা শ্রীরামকৃষ্ণ। সাধারণভাবে সনাতন ভারতবর্ষের এবং বিশেষভাবে শ্রীরামকৃষ্ণের সমন্বয়ের বাণীকে স্বামী বিবেকানন্দ বহির্বিশ্বের সমক্ষে উপস্থাপিত করেছিলেন। চিন্তাশীল সকল মানুষই আজ উপলব্ধি করছেন যে, সমন্বয়ের আদর্শ ভিন্ন পৃথিবীর স্থায়িত্বের আর কোন পথ নেই। সমন্বয়ের পথই বর্তমান পৃথিবীর বহুবিধ সমস্যা ও সঙ্কটের মধ্য থেকে উত্তরণের একমাত্র পথ। কামারপুকুরের পর্ণকুটীরে যাঁর আবির্ভাব হয়েছিল দরিদ্র এবং নিরক্ষরের ছদ্মবেশে, তিনিই বর্তমান এবং আগামীকালের বিশ্বের ত্রাণকর্তা। তাঁর বাসগৃহটি তাই আজ ও আগামীকালের সমগ্র পৃথিবীর তীর্থক্ষেত্র। শিকাগোর বিশ্বধর্মসভার মঞ্চে স্বামী বিবেকানন্দের কণ্ঠে শান্তি, সমন্বয় ও সম্প্রীতির যে-বাণী বারংবার উচ্চারিত হয়েছিল—যার মধ্যে নিহিত ভারত ও পৃথিবীর রক্ষাকবচ, তার গর্ভগৃহ কামারপুকুরের এই পর্ণকুটীর।—যুগ্ম সম্পাদক, উদ্বোধন

## সৎসঙ্গ-রত্নাবলী

# বিবিধ প্রসঙ্গ

### আলোচক: স্বামী বাসুদেবানন্দ

[ পূর্বানুবৃত্তি : শ্রাবণ ১৩৯৯ সংখ্যার পর ]

### ব্রহ্ম ও শক্তি

প্রশ্ন : শ্রীরামকৃষ্ণ যখন ব্রহ্মবাদী তখন শক্তির উপাসনা করলেন কেন ?

স্বামী বাসুদেবানন্দ : ব্রহ্ম ও শক্তি অভেদ—এই হলো শ্রীরামকৃষ্ণের মত। জড়-শক্তির উপাসনা তিনি করেননি। তিনি তাঁর 'মা'কে চৈতন্যরূপিণী বলে বুঝতেন। নির্বিকল্পের দিক থেকে তিনি ব্রহ্ম, আর সবিকল্পের দিক থেকে তিনিই শক্তি। তাঁকে ঈশ্বরও বলা যায় আবার ঈশ্বরীও বলা যায়। ঠাকুরকে জপ সমর্পণের সময় একজন 'তৎপ্রসাদাৎ মহেশ্বরি' বলায় আর একজন তাকে সংশোধন করতে বলল; শুনে মা বললেন, "ঠাকুর মহেশ্বর ও মহেশ্বরী উভয়ই।" ব্রহ্মই শক্তিরূপে দেশকাল-নিমিত্তাত্মিকা, ইচ্ছাজ্ঞানক্রিয়াত্মিকা, অস্তিভাতি-প্রীতিরূপা, সন্ধিনী-সম্বিৎ-হ্লাদিনীরূপা, বিক্ষেপা-বরণাত্মিকা, সত্ত্বরজোতমোগুণাত্মিকা হন—অধ্যাস, ভ্রান্তি, অধ্যারোপ, অচিন্ত্যা, অনির্বচনীয়া, বিমর্ষিণী তিনিই। ব্রহ্ম থেকে জড় বলে কোন একটা পৃথক সত্তা নেই। বিবর্ত, বিকার ব্রহ্মশক্তিই, তাঁর অতিরিক্ত কোন শক্তি নয়। একবার শ্রীশ্রীঠাকুর বলেছিলেন, "হাজরা কিছুতেই বিশ্বাস করে না যে, ব্রহ্ম ও শক্তি অভেদ। তখন প্রার্থনা করলুম,—মা, হাজরা এখানকার মত উল্টে দেবার চেষ্টা করছে। হয় ওকে বুঝিয়ে দাও, নয় ওকে সরিয়ে দাও।" (১১।১১।৪২)

প্রশ্ন : কল্পতরু উৎসবটি কি ?

স্বামী বাসুদেবানন্দ : কাশীপুর বাগানে যখন ঠাকুর ছিলেন, তখন এক পয়লা জানুয়ারিতে বহু লোককে অযাচিত কৃপা করেন। ১৮৮৬ খ্রীস্টাব্দের ঐ পয়লা জানুয়ারির হিন্দুমতে তিথি-টিথি কিছু জানা নেই। আগে কাঁকুড়গাছির বাগানে খুব উৎসব হতো।

প্রশ্ন : বেলুড় মঠে এতদিন হয়নি কেন ?

স্বামী বাসুদেবানন্দ : ঠাকুর কেবল কি ঐ বিশিষ্ট দিনেই কল্পতরুরূপে প্রকটিত হয়েছিলেন ? তিনি আর কখনো ওরূপভাবে জীবের কাছে উপস্থিত হননি, একথা আমরা বিশ্বাস করি না। অখণ্ড ব্রহ্মাণ্ডেশ্বর যেদিন নর-কলেবরে কামারপুকুরে অবতীর্ণ হলেন, সেদিন থেকেই তো এই অযাচিত কৃপা আরম্ভ হলো। যুগ যুগান্তর ধরে মুনি-ঋষিরা তপস্যা করে যাঁকে পায় না—তিনি লোকচক্ষে আবির্ভূত হয়ে শিক্ষা দিলেন, তাঁর সঙ্গে লোকে কথাবার্তা বললে, তিনি ইচ্ছা করে লোকের সেবা নিলেন, নানা লোককে নানা রূপে দর্শন করালেন, লোকের পাপ গ্রহণ করে তাদের দিব্যভাবে আরূঢ় করালেন—নিরন্তর এই কল্পতরু ভাব চলল—নিরন্তর অযাচিত কৃপা। 'আয় মন বেড়াতে যাবি।/ কালী কল্পতরুমূলেরে মন চারি ফল কুড়ায়ে পাবি।' চারি ফল চতুর্বর্গ—ধর্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ। ঠাকুরের কাছে যে যা চেয়েছে সে তাই পেয়েছে। উপেন মুখুজ্জে টাকা পেল। 'আর্ত, অর্থার্থী, জিজ্ঞাসু, জ্ঞানী চ ভরতর্ষভ।—চতুর্বিধা ভজন্তে মাম্।' তিনি হলেন জগন্নাথ, তিনি সকলেরই অভাব মেটান। কায়মনোবাক্যে ডাকলেই সব পাওয়া যায়। কিন্তু আবার মায়াচ্ছন্ন করে ফেলে। সাধুরা সর্বস্ব ত্যাগ করে তাঁর আশ্রয় নিয়েছে—তিনি যাদের বিপদে আপদে সর্বক্ষণ দেখছেন—তারা তা বেশ বুঝতে পারে, কিন্তু আবার দৈবী মায়া আচ্ছন্ন করে ফেলে, আবার সেই উদ্বেগ চিন্তা। তিনি যাকে নিশ্চিতভাবে প্রতিষ্ঠা করেছেন, তার আর কোন ভাবনা-চিন্তা নেই। তাঁর কৃপা হলে, তাঁর মূর্তির দিকে তাকালেই এক অভাবনীয় আনন্দে হৃদয় উদ্বেলিত হয়ে ওঠে। 'কেন হয়', 'কেন হয় না' তা কিছুই জীবের বোঝবার উপায় নেই। মনে কত সংশয়, প্রলোভন উঠেছে, সব তিনি মুক্ত করে দিচ্ছেন। এই দেখ এখনো কল্পতরু হয়ে রয়েছেন, যদিও বহুকাল তাঁর নর-কলেবর সাধারণ চক্ষুর অগোচর হয়েছে। (৫।১১।৪২) ☐ [ সমাপ্ত ]

বিশেষ রচনা

# শিকাগো ধর্মমহাসভায় স্বামীজীর আবির্ভাবের আধ্যাত্মিক পটভূমি ও তাৎপর্য

## অজিতনাথ রায়

[ পূর্বানুবৃত্তি ঃ অগ্রহায়ণ, ১৩৯৯ সংখ্যার পর ]

শ্রীঅজিতনাথ রায় ভারতের প্রাক্তন প্রধান বিচারপতি।
—যুগ্ম সম্পাদক, উদ্বোধন।

জীবাত্মার মধ্যে পরমাত্মার এই বিকাশের তত্ত্ব পৃথিবীর ধর্ম ও দর্শন-জগতে হিন্দুধর্মের মৌলিক অবদান। এই তত্ত্বের মূলকথা হলো জীব ও ব্রহ্মের একত্ব। হিন্দুধর্মের এই একত্বের তত্ত্ব বোঝাতে গিয়ে স্বামীজী বললেন, ধর্মের লক্ষ্যই হলো এই একত্বের আবিষ্কার ও উপলব্ধি। প্রসঙ্গতঃ স্বামীজী বললেন, বিজ্ঞানের লক্ষ্যও একত্বের আবিষ্কার। যখনই বিজ্ঞান একত্বের অবস্থায় উপনীত হয় তখনই বিজ্ঞান তার লক্ষ্যকে স্পর্শ করে। যেমন রসায়ন শাস্ত্র যদি একটি মূল পদার্থকে আবিষ্কার করে তখন দেখে তা অন্য অনেক পদার্থের উপাদানে গঠিত। অনুরূপভাবে পদার্থবিদ্যা যদি মূল শক্তি আবিষ্কার করে তখন দেখে,অন্যান্য সকল শক্তি সেই শক্তির রূপান্তর মাত্র। এই উপলব্ধিতেই পদার্থ বিজ্ঞানের কাজ শেষ হয়। যেমন শেষ হয় অনুরূপ উপলব্ধিতে রসায়ন বিজ্ঞান ও অন্যান্য বিজ্ঞানের কাজ। ধর্মবিজ্ঞানও তখনই পূর্ণতালাভ করে যখন তা নিত্য পরিবর্তনশীল জগতে একমাত্র অচল ও অটল ভিত্তি নিত্য আত্মাকে আবিষ্কার করে, উপলব্ধি করে জগতের যাবতীয় বস্তু ও প্রাণী তাঁরই প্রকাশ মাত্র। এইভাবে বহু ঈশ্বরবাদ, দ্বৈতবাদ, বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ প্রভৃতির ভিতর দিয়ে শেষে অদ্বৈতবাদে উপনীত হলে ধর্মবিজ্ঞান চূড়ান্ত অবস্থা প্রাপ্ত হয়। এখানেই ধর্মের পরিণতি। অর্থাৎ দ্বৈতবাদ, বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ প্রভৃতি পৃথক কোন দর্শন নয়। তারা প্রত্যেকে অদ্বৈতবাদে উপনীত হবার বিভিন্ন স্তর মাত্র।[২৫] 'হিন্দুধর্ম' শীর্ষক ভাষণে স্বামীজীর এই বক্তব্য হিন্দুধর্ম ও দর্শনের ক্ষেত্রে বাস্তবিক একটি নতুন সংযোজন। ভগিনী নিবেদিতা লিখেছেন ঃ

"তাঁহার উপদেশে নূতন কিছু ছিল না—এ-উক্তি কিন্তু সম্পূর্ণভাবে সত্য নয়। একথা কখনো ভুলিলে চলিবে না যে,'একমেবাদ্বিতীয়ম্' অনুভূতি যাহার অন্তর্গত, সেই অদ্বৈত দর্শনের শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষণা করিয়াও স্বামী বিবেকানন্দ হিন্দুধর্মে এই শিক্ষা সংযুক্ত করিয়া দিলেন যে, দ্বৈত, বিশিষ্টাদ্বৈত এবং অদ্বৈত একই বিকাশের তিনটি অবস্থা বা ক্রমিক স্তর মাত্র, এই বিকাশের চরম লক্ষ্য হইতেছে শেষোক্ত অদ্বৈত তত্ত্ব। ইহা আরেকটি আরও মহৎ ও আরও সরল তত্ত্বেরই অপরিহার্য অঙ্গ। বহু এবং এক—একই সত্তা, বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন অবস্থায় মনের দ্বারা অনুভূত একই সত্তার বিভিন্ন বিকাশ।...

"ইহাই আমাদের গুরুদেবের জীবনের চরম তাৎপর্য, এইখানেই তিনি যে শুধু প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মিলনকেন্দ্র হইয়াছেন, তাহা নয়, অতীত এবং ভবিষ্যতেরও। বহু এবং এক—যদি যথার্থই এক সত্তা হয়, তাহা হইলে শুধু সকল উপাসনা-পদ্ধতিই নয়, সমভাবে সকল কর্মপদ্ধতি—সকল প্রকার প্রচেষ্টা, সকল প্রকার সৃষ্টিকর্মই সত্যোপলব্ধির পন্থা। তাহা হইলে আধ্যাত্মিক ও লৌকিক —এই ভেদ আর থাকিতে পারে না। কায়িক পরিশ্রম করাই প্রার্থনা ; জয় করাই ত্যাগ করা, সমগ্র জীবনই ধর্মকার্য হইয়া যায়।"[২৬]

স্বামীজী বললেন ঃ ভারতবর্ষে বহু ঈশ্বরবাদ নাই। হিন্দুর সমগ্র ধর্মভাবের মূলকথা অপরোক্ষানুভূতি। হিন্দুধর্ম বলে, ঈশ্বরকে উপলব্ধি করে

২৫ দ্রঃ বাণী ও রচনা, ১ম খণ্ড, পৃঃ ২২

২৬ ঐ, ভূমিকা

মানুষকে দেবতা হতে হবে। বিগ্রহপূজা যে সকল হিন্দুর অবশ্যকর্তব্য তাও নয়। স্বামীজী বললেন: "হিন্দুর দৃষ্টিতে মানুষ ভ্রম হইতে সত্যে গমন করে না, পরন্তু সত্য হইতে সত্যে—নিম্নতর সত্য হইতে উচ্চতর সত্যে উপনীত হইতেছে। হিন্দুর নিকট নিম্নতম জড়োপাসনা হইতে বেদান্তের অদ্বৈতবাদ পর্যন্ত সাধনার অর্থ অসীমকে ধরিবার, উপলব্ধি করিবার জন্য মানবাত্মার বিবিধ চেষ্টা।"[২৭]

স্বামীজী তাঁর উল্লিখিত ভাষণে বললেন: প্রত্যেক ধর্মই জড়ভাবাপন্ন মানুষের চৈতন্যস্বরূপ বা দেবত্বকে বিকাশের কথা বলে এবং জীবে জীবে অধিষ্ঠিত সেই এক চৈতন্যস্বরূপ ঈশ্বরই সকল ধর্মের প্রেরণাদাতা। বস্তুতঃ, মানুষের ভিতর দেবত্ব বিকশিত করার দিকেই সকল ধর্মের সকল শক্তি নিয়োজিত হয়। হিন্দুধর্মের বেদান্ত প্রভৃতি শাস্ত্র এই কথা বারবার ঘোষণা করেছে। স্বামীজী বললেন: "আমি সাহস করিয়া বলিতেছি, সমুদয় সংস্কৃত দর্শন-শাস্ত্রের মধ্যে এরূপ ভাব কেহ দেখাইতে পারিবে না যে, একমাত্র হিন্দুই মুক্তির অধিকারী, আর কেহ নয়। আমাদের জাতি ও ধর্মমতের সীমানার বাহিরেও আমরা সিদ্ধপুরুষ দেখিতে পাই।"

পৃথিবীতে এই প্রথম একজন মহান আচার্য অন্য দেশে, অন্য ধর্মের সহস্র সহস্র মানুষের কাছে হিন্দুধর্মের সারতত্ত্ব ও বৈশিষ্ট্য বোঝাচ্ছেন। এত সরল ও সহজ ভাবে এই প্রথম আত্মতত্ত্ব ভারতের বাইরের মানুষের কাছে প্রচারিত হলো। বস্তুতঃ হিন্দুধর্ম কি এবং কি তার বৈশিষ্ট্য সেবিষয়ে শুধু বিদেশী ও অহিন্দুদেরই নয়, ভারতীয় হিন্দুদেরই স্পষ্ট কোন ধারণা ছিল না। ভগিনী নিবেদিতা স্বামীজীর 'হিন্দুধর্ম' ভাষণ সম্পর্কে বলেছেন: "যখন তিনি বক্তৃতা আরম্ভ করিলেন তখন তাঁহার বিষয়বস্তু ছিল 'হিন্দুদের ধর্মভাবসমূহ', কিন্তু যখন তিনি শেষ করিলেন, তখন হিন্দুধর্ম নূতন রূপলাভ করিয়াছে।"[২৮] নিবেদিতা অপূর্ব ভাষায় লিখিয়াছেন: "হিন্দুধর্মের প্রয়োজন ছিল নিজের ভাবাদর্শের সংগঠন ও সামঞ্জস্য-বিধান; পৃথিবীর প্রয়োজন ছিল এমন একটি ধর্মের—যাহা সত্য সম্পর্কে বিগতভী। এই উভয় বস্তুই এখানে পাওয়া গিয়াছে। সংকটমুহূর্তে যিনি জাতীয় চেতনাকে আহরণ করিয়া বাঙ্ময় করিয়া তুলিয়াছিলেন, সেই ব্যক্তিবিশেষের অভ্যুদয় অপেক্ষা সনাতন ধর্মের শাশ্বত বীর্যের এবং অতীতের মতোই ভারত যে বর্তমানে মহিমময় সে বিষয়ের মহত্তর প্রমাণ দেওয়া সম্ভব ছিল না।"[২৯]

স্বামীজী পাশ্চাত্যবাসীদের মনে এই বিশ্বাস জাগিয়ে দিলেন যে, মানুষের অন্তরে পূর্ব থেকে নিহিত দেবত্বের বিকাশই প্রকৃত ধর্ম। ধর্ম অনুষ্ঠানে নেই, শাস্ত্রে নেই, আছে উপলব্ধিতে। মানুষ তার সবরকম চিন্তার ভিতর দিয়ে জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে এই দেবত্বকেই বিকাশ করার চেষ্টা করে চলে। এইভাবে স্বামীজী ধর্মকে জীবনের স্বাভাবিক ও সকল মানুষের সর্বজনীন বিষয় বলে তুলে ধরলেন। এই ধারণার মধ্যে জগৎ ধর্ম সম্পর্কে এক নতুন দৃষ্টিভঙ্গির সন্ধান পেল। স্বামীজী বুঝিয়ে দিলেন, বহু জাতির বহু ভাষা, কিন্তু আত্মার ভাষা সর্বত্রই এক আর ধর্ম হলো সেই আত্মারই বিষয়। বিভিন্ন জাতি বিভিন্ন ভাষা ও বিভিন্ন প্রথার মাধ্যমে আত্মপ্রকাশের পথ করে নেয়। স্বামীজী বললেন, এই হলো ভারতের বাণী, হিন্দু-ধর্মের বাণী, এই হলো বেদান্ত। এতদিন বেদান্ত গুহায় ও অরণ্যে ছিল। ছিল মুষ্টিমেয় কিছু মানুষের কুক্ষিগত। সেই গণ্ডি ভেঙে স্বামীজী সনাতন বেদান্তের মধ্যে নবজীবন, নবভাব, নব-উদ্দীপনা আনলেন।

স্বামীজী হিন্দুধর্মের যে-ব্যাখ্যা উপস্থাপন করলেন তা তথাকথিত পণ্ডিতের বা দার্শনিকের ব্যাখ্যা ছিল না, তা ছিল আচার্যের ব্যাখ্যা। তার মূলে ছিল তাঁর আধ্যাত্মিক উপলব্ধি ও অনুভূতি, যা তিনি লাভ করেছিলেন গুরুর শিক্ষার আলোকে, নিজের সাধনার মাধ্যমে এবং তাঁর দীর্ঘ ভারত-পরিক্রমার অভিজ্ঞতায়। হিন্দুশাস্ত্র ও হিন্দু-দর্শন সম্পর্কে তাঁর গভীর ও ব্যাপক অধ্যয়ন অবশ্যই ছিল, কিন্তু তার সঙ্গে ছিল তাঁর অপূর্ব ধীশক্তি যা তিনি অর্জন করেছিলেন তাঁর আধ্যাত্মিক অন্তর্দৃষ্টি এবং অনুভূতির মাধ্যমে। তাই শুধু হিন্দুধর্মই নয়, বৌদ্ধধর্ম, খ্রীষ্টানধর্ম ও অন্যান্য

২৭ বাণী ও রচনা, ১ম খণ্ড, ভূমিকা, পৃঃ ২৫ ২৮ ঐ ২৯ ঐ

ধর্ম সম্পর্কেও তিনি নতুন আলোকসম্পাত করতে সমর্থ হয়েছিলেন।

স্বামীজী ২৬ সেপ্টেম্বর 'বৌদ্ধধর্মের সহিত হিন্দুধর্মের সম্বন্ধ' বিষয়ে ধর্মমহাসভায় ভাষণ দিয়েছিলেন। তাঁর ভাষণের সূচনায় তিনি বললেনঃ "আমি বৌদ্ধ নই, তথাপি একভাবে আমি বৌদ্ধ।" এরকম কথা স্বামীজীই বলতে পারেন, কারণ তাঁর ছিল আধ্যাত্মিক অনুভূতি ও উপলব্ধি। বুদ্ধের মহিমা সম্পর্কে তিনি অপূর্বভাবে বললেনঃ "শাক্যমুনি পূর্ণ করিতে আসিয়াছিলেন, ধ্বংস করিতে নয়। তিনি ছিলেন হিন্দুধর্মের স্বাভাবিক পরিণতি ও যুক্তিসঙ্গত সিদ্ধান্ত, ন্যায়সম্মত বিকাশ।" উপসংহারে স্বামীজী বললেনঃ "বৌদ্ধধর্ম ছাড়া হিন্দুধর্ম বাঁচিতে পারে না; হিন্দুধর্ম ছাড়িয়া বৌদ্ধধর্মও বাঁচিতে পারে না।...ব্রাহ্মণের ধীশক্তি ও দর্শনশাস্ত্রের সাহায্য না লইয়া বৌদ্ধেরা দাঁড়াইতে পারে না এবং ব্রাহ্মণও বৌদ্ধের হৃদয় না পাইলে দাঁড়াইতে পারে না।"[৩০] স্বামীজী 'হিন্দুধর্ম' ভাষণে বলেছিলেনঃ "কেহ এরূপ প্রশ্ন করিতে পারেন, সর্বতোভাবে ঈশ্বরপরায়ণ হিন্দুগণ কিরূপে অজ্ঞেয়বাদী বৌদ্ধ ও নিরীশ্বরবাদী জৈনদিগের মত বিশ্বাস করিতে পারেন?" উত্তরে স্বামীজী বললেনঃ সকল ধর্মের সেই মহান কেন্দ্রীয় তত্ত্ব মানুষের ভিতর দেবত্ব বিকশিত করে। হিন্দুধর্ম, বৌদ্ধধর্ম, জৈনধর্ম—সকল ধর্মেরই এই লক্ষ্য। সুতরাং সকলেই যখন একই লক্ষ্যের অভিমুখী তখন বিরোধিতা করলে সকলেরই ক্ষতি। স্বামীজী সেবিষয়ে সকলকে সতর্ক করে দিলেন।

স্বামীজী ২৭ সেপ্টেম্বর বিদায় অধিবেশনে যে-বক্তৃতা দিয়েছিলেন তা উপস্থিত সকল শ্রোতৃবৃন্দের হৃদয়ে এবং মনে আধ্যাত্মিকতার মূলসুরটিকে গেঁথে দিয়েছিল। আধ্যাত্মিকতার চরম উপলব্ধি একত্ব। সেই একত্বের ভূমিতে দাঁড়িয়ে স্বামীজী বললেনঃ ধর্মীয় ঐক্য কখনো একটির অভ্যুদয় ও অপরগুলির বিনাশ চাইতে পারে না। আমি কি ইচ্ছা করি যে, খ্রীষ্টান হিন্দু হয়?—ঈশ্বর তাহা না করুন। আমার কি ইচ্ছা যে, কোন হিন্দু বা বৌদ্ধ খ্রীষ্টান হউক?—ভগবান তাহা না করুন।

"বীজ ভূমিতে উপ্ত হইল; মৃত্তিকা, বায়ু ও জল তাহার চতুর্দিকে রহিয়াছে। বীজটি কি মৃত্তিকা, বায়ু বা জলের মধ্যে কোন একটিতে পরিণত হইয়া যায়?—না। সেই বীজ হইতে একটি চারাগাছ উৎপন্ন হয়, উহা ক্রমে নিজের স্বাভাবিক নিয়মানুসারে বর্ধিত হয় এবং মৃত্তিকা, বায়ু ও জল ভিতরে গ্রহণ করিয়া সেই-সকল উপাদান বৃক্ষে পরিণত করে এবং বৃক্ষাকারে বাড়িয়া উঠে।

"ধর্ম সম্বন্ধেও ঐরূপ। খ্রীষ্টানকে হিন্দু বা বৌদ্ধ হইতে হইবে না; অথবা হিন্দু ও বৌদ্ধকে খ্রীষ্টান হইতে হইবে না; কিন্তু প্রত্যেক ধর্মই অন্যান্য ধর্মের সারভাগগুলি গ্রহণ করিয়া পুষ্টিলাভ করিবে এবং স্বীয় বিশেষত্ব বজায় রাখিয়া নিজ প্রকৃতি অনুসারে বর্ধিত হইবে।

"...সাধুচরিত্র, পবিত্রতা ও দয়াদাক্ষিণ্য জগতের কোন একটি বিশেষ ধর্মমণ্ডলীর নিজস্ব সম্পত্তি নয়...।" পরিশেষে তিনি ঘোষণা করলেন সমন্বয় ও শান্তির সেই মহাবাণীঃ "বিবাদ নয়, সহায়তা; বিনাশ নয়, পরস্পরের ভাবগ্রহণ; মতবিরোধ নয়, সমন্বয় ও শান্তি।"[৩১]

আমেরিকার বিখ্যাত মহিলা-কবি হ্যারিয়েট মনরো মহাসভায় উপস্থিত ছিলেন। তিনি লিখেছেনঃ "সুমহিম স্বামী বিবেকানন্দই ধর্মসভাকে গ্রাস করিয়াছিলেন। গোটা শহরটাকে আত্মসাৎ করিয়া লইয়াছিলেন। অন্যান্য বিদেশীরা ভালই বলিয়াছিলেন... কিন্তু কমলা-বস্ত্র-ভূষিত সুদর্শন সন্ন্যাসীই নিখুঁত ইংরেজীতে আমাদের সর্বোত্তম বস্তু দিলেন। তাঁহার ব্যক্তিত্ব প্রচণ্ড ও আকর্ষণীয়; তাঁহার কণ্ঠস্বর ব্রোঞ্জের ঘণ্টাধ্বনিরই মতো গম্ভীর ও মধুর; তাঁহার সংযত আবেগের অন্তর্লীন প্রবলতা, প্রতীচ্য জগতের সামনে প্রথম উচ্চারিত ও আবির্ভূত তাঁহার বাণীর সৌন্দর্য—এই সমস্ত কিছু মিশ্রিত হইয়া চরম অনুভূতির একটি নিখুঁত বিরল মুহূর্ত আমাদের জন্য আনিয়া দিল। মানব-ভাষণের এই ছিল সর্বোত্তম উৎকর্ষ।"[৩২]

স্বামীজী দেখিয়ে দিলেন যে, জগতের ধর্মগুলি

৩০ বাণী ও রচনা, ১ম খণ্ড, পৃঃ ৩২

৩১ ঐ, পৃঃ ৩৪

৩২ 'যুগনায়ক বিবেকানন্দ', ২য় খণ্ড, পৃঃ ৫২

পরস্পর-বিরোধী নয়—তারা এক চিরন্তন ধর্মের বিভিন্ন রূপ। যদি একই স্কুলে একই ভাবে, একই পদ্ধতিতে অনুশীলিত হতো, তাহলে ধর্মগুলি লুপ্ত হয়ে যেত। স্বামীজী একসময়ে বলেছিলেন, যদি সবাই আমরা একরকম চিন্তা করতাম তাহলে যাদুঘরে রক্ষিত মিশরীয় মমিগুলির মতো হয়ে যেতাম। যত বেশি ধর্মমত, স্বামীজী বলেছেন, তত লোকে নিজের পছন্দমত ধর্মগ্রহণের সুযোগ পায়। স্বামীজী বলেছেন, সব ধর্মের মধ্যেই যে সর্বজনীন ভাব নিহিত আছে ধর্মগুলির মূল অংশের দিকে তাকালেই তা আমরা দেখতে পাব। মনে রাখতে হবে, ধর্ম হচ্ছে বৃক্ষ, আর ধর্মমত তার শাখা-প্রশাখা। স্বামীজী আমেরিকায় একটি গল্প বলে মূলধর্ম আর ধর্মমতের প্রভেদ দেখিয়েছিলেন। তিনি বলেছিলেন, যদি কোন বর্বর বা অসভ্য লোক রত্ন বা মণিমুক্তা পায় সে সেইগুলি চামড়া দিয়ে বেঁধে গলায় পরবে। যখন একটু সভ্য হবে সে হয়তো চামড়ার বদলে সুতো ব্যবহার করবে—আরও সভ্য হলে রেশম দিয়ে হার করবে—আরও সভ্য হলে সোনা দিয়ে হার করে পরবে। কিন্তু সেই রত্ন মণি-মানিক্য বরাবর একই থাকছে, তার কোন পরিবর্তন হচ্ছে না। ধর্ম হলো সেই রত্ন, যার কখনো পরিবর্তন হয় না। মূল ধর্ম চিরন্তন।[৩৩]

ধর্মমহাসভায় স্বামীজীর প্রথম আবির্ভাব শিহরণকারী। সমবেত সহস্র সহস্র নরনারী সেদিন যে অভূতপূর্ব সম্বর্ধনা স্বামীজীকে দিয়েছিলেন, ধর্মমহাসভার অপর কোন বক্তার ভাগ্যে তা জোটেনি। স্বামীজীর সুন্দর অবয়ব, মনোহর মুখশ্রী শ্রোতৃমণ্ডলীর মনে অবশ্যই একটি উল্লেখযোগ্য প্রভাব বিস্তার করেছিল, কিন্তু যদি অবয়ব বা রূপের আকর্ষণই শুধু স্বামীজীকে শ্রোতৃমণ্ডলীর নিকট প্রিয় করে থাকত তাহলে তাঁর প্রভাব হতো ক্ষণস্থায়ী। কিন্তু ইতিহাস বলছে, স্বামীজী সেই প্রথম আবির্ভাবেই ইতিহাস সৃষ্টি করেছিলেন, যার প্রভাব হয়েছিল সুদূরপ্রসারী। সেই প্রভাবের মূলে ছিল তাঁর বাণীর অনন্যতা, তাঁর ভাবের অসাধারণত্ব, তাঁর চিন্তার অভিনবত্ব এবং সবকিছুর মধ্যে ও সবকিছুর পিছনে ছিল তাঁর আধ্যাত্মিক উপলব্ধি ও অনুভূতির ঐশ্বর্য। ধর্মমহাসভায় প্রত্যেক ভাষণে তিনি এই সমস্ত কিছুকেই উজ্জ্বল করে তুলেছিলেন। ভাষণ তো পরের ব্যাপার, স্বামীজী ধর্মমহাসভায় তাঁর প্রথম ভাষণের প্রারম্ভে যে বিশেষ সম্বোধনটি করেছিলেন তার মধ্যেও পূর্ণমাত্রায় প্রতিফলিত হয়েছিল তাঁর উপলব্ধিজাত সেই অনন্য দৃষ্টি। তিনি সাধারণ সম্বোধনের রীতিকে অনুসরণ করেননি। তিনি যে পরিকল্পিত-ভাবে তা করেছিলেন তাও নয়। স্বামীজী নিজেই বলেছেন, তিনি পরিকল্পিতভাবে কোন প্রস্তুতি নেননি। তিনি নিজেকে ঈশ্বরের পাদপদ্মে সর্বতোভাবে সমর্পণ করেছিলেন, 'মায়ের' নিকট নিজেকে নিবেদন করে মঞ্চে দাঁড়িয়েছিলেন। যে অভূতপূর্ব সম্বোধন বাক্যরূপে তাঁর কণ্ঠ থেকে ভাষণের সূচনায় উচ্চারিত হয়েছিল তা ছিল স্বতঃস্ফূর্ত এবং সর্বতোভাবেই তা ছিল অসচেতন অভিব্যক্তি। অসচেতন সত্যিই, স্বতঃস্ফূর্ত সত্যিই. কিন্তু সেই অসচেতনতা অথবা স্বতঃস্ফূর্ততা ছিল আপাত, কেননা, কারণ ছাড়া কার্য হয় না। স্বামীজীর অজ্ঞাতসারেই শ্রীরামকৃষ্ণের প্রভাব, ভারতীয় জীবনা-দর্শ, ভারতীয় ঐতিহ্য, ভারতীয় আধ্যাত্মিকতার প্রভাব যা ভারত-পরিক্রমাকালে তাঁর চিন্তায় দানা বেঁধেছিল, তাঁর মানসিক গঠন সম্পূর্ণ করেছিল। তিনি বুঝেছিলেন, ভারতের জীবনাদর্শের প্রধান কথা একত্বের উপলব্ধি। তাই ভাষণ-সূচনায় যখন তিনি কম্বুকণ্ঠে সমবেত শ্রোতৃমণ্ডলীকে সম্বোধন করলেন: "Sisters and brothers of America" ("হে আমেরিকাবাসী ভগিনী ও ভ্রাতৃবৃন্দ") তখন তিনি তাঁর সেই গভীর আধ্যাত্মিক উপলব্ধির ভূমি থেকেই তা করলেন। আমেরিকার মানুষকে তিনি বুঝিয়ে দিলেন যে, আত্মার আত্মীয়তায় ভারত, আমেরিকা কোন ব্যবধান সৃষ্টি করতে পারে না। সকলেই এক পরম পিতার সন্তান। সকলেই ভগিনী এবং ভ্রাতা।

ভারতের আধ্যাত্মিক সাধনার ঐতিহ্য সমাজে নারীকে পুরুষের ওপরে স্থান দিয়েছে। সে-স্থান শ্রদ্ধার, মর্যাদার ও পূজার। সুতরাং স্বামীজী যখন তাঁর সম্বোধনে প্রথমে নারীকে স্থান দিলেন

৩৩ Swami Vivekananda in the West: New Discoveries—Marie Louese Burke, Part II, 1984, p. 357

তখন তা তিনি বক্তৃতার চমক সৃষ্টি করার জন্য করলেন না, তা করলেন তাঁর আধ্যাত্মিক অনুভূতির প্রেরণায়। ভগিনী নিবেদিতা এই প্রসঙ্গে বলেছেন: "[ধর্মমহাসভায়] অন্যান্য সকলে সমিতি, সমাজ, সম্প্রদায় বা কোন ধর্ম-সংস্থার প্রতিনিধিরূপে আসিয়াছিলেন। একমাত্র স্বামীজীর বক্তৃতার বিষয়বস্তু ছিল—হিন্দুদের আধ্যাত্মিক ভাবধারা; এবং সেদিন তাঁহারই মাধ্যমে ঐ ভাবগুলি সর্বপ্রথম সংজ্ঞা, ঐক্য ও রূপ লাভ করিয়াছিল। ভারতবর্ষের যে-ধর্মকে প্রথমে দক্ষিণেশ্বরে নিজ গুরুর মধ্যে এবং পরে ভারতের সর্বত্র ভ্রমণকালে তিনি দেখিয়াছিলেন, তাহাই এখানে তাঁহার মুখ হইতে নিঃসৃত হইল। যে-ভাবগুলিতে সমগ্র ভারতের ঐক্য আছে, সেই ভাবগুলিই তিনি ব্যক্ত করিয়াছিলেন, অনৈক্যের কথাগুলি তিনি বলেন নাই।...তিনি সরল ভারতীয় সম্বোধনে আমেরিকাবাসিগণকে 'ভগিনী ও ভ্রাতা' বলিয়া সম্ভাষণ করিলেন,... প্রাচ্য সন্ন্যাসী তিনি—নারীকে প্রথম স্থান দিয়া—সমগ্র জগৎকে নিজ পরিবার বলিয়া ঘোষণা করিলেন।"[৩৪]

সুতরাং দেখা যাচ্ছে, শিকাগো ধর্মমহাসভায় স্বামীজী যে নতুন বার্তা জগৎকে দিয়েছিলেন তা ছিল সর্বাংশে এবং সর্বতোভাবে আধ্যাত্মিক বার্তা। সেই বার্তার পিছনে ছিল স্বামীজীর তপস্যা এবং সাধনার পটভূমি—গভীর আধ্যাত্মিক অনুভূতি এবং উপলব্ধির ঐশ্বর্য। শ্রীরামকৃষ্ণের আধ্যাত্মিক উত্তরাধিকার সূত্রে এবং নিজের সাধনা, তপস্যা ও শাস্ত্রের মর্মোদ্ঘাটনের অতন্দ্র প্রয়াসের ফলে স্বামীজী বেদান্তের মহান সত্য ও তত্ত্বকে যথার্থ আলোকে প্রত্যক্ষ করতে সমর্থ হয়েছিলেন। সহস্র বছর ধরে যে মহান সত্য ও তত্ত্ব গ্রন্থের মধ্যে নিবদ্ধ ছিল, যথার্থ ব্যাখ্যাতার অভাবে যার আলোক অনাবিষ্কৃত ছিল, স্বামীজী তাকে সহজ সরল প্রাণস্পর্শী ভাষায় মানুষের সামনে তুলে ধরলেন। বললেন, হিন্দুর সকল শাস্ত্র, সকল সাধনা, সকল কর্মপ্রয়াসের মূলে রয়েছে মানুষ। বললেন, মানুষই ঈশ্বর, মানুষই সৃষ্টির তাজমহল। হিন্দুধর্ম সেই মানুষেরই জয়গান গেয়েছে। স্বামীজী অপূর্ব ভাষায় তাঁর 'হিন্দুধর্ম' শীর্ষক ভাষণে বললেন:

"'অমৃতের পুত্র!' কী মধুর ও আশার নাম! হে ভ্রাতৃগণ, এই মধুর নামে আমি তোমাদের সম্বোধন করতে চাই। তোমরা অমৃতের অধিকারী। হিন্দুগণ তোমাদিগকে পাপী বলিতে চায় না। তোমরা ঈশ্বরের সন্তান, অমৃতের অধিকারী—পবিত্র ও পূর্ণ। মর্তভূমির দেবতা তোমরা! তোমরা পাপী? মানুষকে পাপী বলাই এক মহাপাপ। মানবের যথার্থ স্বরূপের উপর ইহা মিথ্যা কলঙ্কারোপ। ওঠ, এস, সিংহস্বরূপ হইয়া তোমরা নিজেদের মেষতুল্য মনে করিতেছ, ভ্রমজ্ঞান দূর করিয়া দাও। তোমরা অমর আত্মা, মুক্ত আত্মা—চির আনন্দময়। তোমরা জড় নও, তোমরা দেহ নও; জড় তোমাদের দাস, তোমরা জড়ের দাস নও।"[৩৫]

এই বাণী ভারতের চিরন্তন বাণী, এই বাণী শ্রীরামকৃষ্ণের বাণী, এই বাণী স্বামী বিবেকানন্দের বাণী। ২৫ সেপ্টেম্বর ১৮৯৪ খ্রীস্টাব্দে স্বামীজী স্বামী রামকৃষ্ণানন্দকে লিখছেন: "দেহকেই যাহারা আত্মা বলিয়া জানে তাহারা কাতর হইয়া সকরুণ-ভাবে বলে—আমরা ক্ষীণ ও দীন—ইহাই নাস্তিক্য। আমরা যখন অভয়পদে অবস্থিত তখন আমরা ভয়শূন্য এবং বীর হইব। ইহাই আস্তিক্য। আমরা রামকৃষ্ণদাস। সংসারে আসক্তিশূন্য হইয়া, সকল কলহের মূল স্বার্থসিদ্ধি ত্যাগ করিয়া পরমামৃত পান করিতে করিতে সর্বকল্যাণস্বরূপ শ্রীগুরুর চরণ ধ্যান করিয়া, সমস্ত পৃথিবীকে প্রণাম করিয়া তাহাদিগকে ঐ অমৃত পান করিতে আহ্বান করিতেছি। অনাদি অনন্ত বেদরূপ সমুদ্র মন্থন করিয়া যাহা পাওয়া গিয়াছে, ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বরাদি দেবতা যাহাতে শক্তিপ্রদান করিয়াছেন, যাহা নারায়ণ অর্থাৎ ভগবানের অবতারগণের প্রাণসারের দ্বারা পূর্ণ, শ্রীরামকৃষ্ণ সেই অমৃতের পূর্ণপাত্রস্বরূপ দেহধারণ করিয়াছেন।"[৩৬]

শিকাগো ধর্মমহাসভায় স্বামীজীর আবির্ভাবের পিছনে ছিল শ্রীরামকৃষ্ণের আধ্যাত্মিক শক্তি এবং তাঁর নিজস্ব সাধনা, অভিজ্ঞতা, অনুভূতি ও উপলব্ধির ঐশ্বর্য। ☐ [সমাপ্ত]

৩৪ বাণী ও রচনা, ১ম খণ্ড, ভূমিকা, পৃঃ ৪-৫ ৩৫ ঐ, পৃঃ ১৮-১৯ ৩৬ ঐ, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃঃ ৪১০

## কবিতা

## তাপসী গঙ্গোপাধ্যায়

আঘাতে আঘাতে জর্জরিত
হয়েছে আমার হিয়া,
সব ব্যথা মোর ঘুচাও হে প্রভু,
তব দরশন দিয়া।

প্রেমের সাগর, দয়ার সাগর,
তুমি যে আমার প্রভু,
যন্ত্রণাভরা সংসার মাঝে
ঠেলে দিও নাকো কভু।

তুমি যে শুনেছি অকূলের কূল,
তুমি যে দীনের নাথ,
তবে কেন প্রভু আমাকে তোমার
দানিবে না সাক্ষাৎ?

জানি গো জানি পুণ্য আমার
নেইকো কিছুই জমা,
অহেতুক ওগো দয়াময় তুমি,
করিবে না তাহা ক্ষমা?

দয়াল ঠাকুর, প্রাণের ঠাকুর,
তুমি যে আমার প্রভু,
আমার ব্যথা কি আঘাত করে না
তোমার হৃদয়ে কভু?

বুঝেছি বুঝেছি আঘাত করেছে,
তাই বাড়ায়েছ হাত,
আমার দুঃখে, আমার ব্যথায়
জাগিয়া রয়েছ রাত।

কি করিয়া আমি শোধ দিব প্রভু
তোমার এহেন ঋণ,
আমি যে তোমার সেই সন্তান
দীন হতে অতি দীন।

## লড়াই

### দীপাঞ্জন বসু

আমার জন্মশত্রু আমি নিজেই,
নিজের সঙ্গে নিরন্তর চলে লড়াই;
এ-যুদ্ধ কানুন জানে না, নিয়মও মানে না
অন্তহীন এ লড়াই।

প্রতিপক্ষ যেন অগণিত রাক্ষস
অশেষ প্রাণে গড়া রক্তবীজ,
কত যে মায়াবী রূপ, ছলনার হাতছানি
মোক্ষম অস্ত্র হয়ে আমাকে জব্দ করে।
আমাকে মুক্তি দেয় আমার বিবেক
ভীত প্রাণ পায় স্পন্দন নির্ভীক।

প্রলোভন আর বন্ধনের পিঠে
চালাই নির্মম চাবুক,
আচ্ছন্নতা ভেদ করে
পলাতক 'আমি'-কে
আবার করি যুদ্ধে সামিল।

আমার অভিযানের লক্ষ্য স্পষ্ট হয়ে ওঠে॥

## আর এক ফেরিওয়ালা

### জয়ন্ত বসু চৌধুরী

"পুরনো ভাঙা পালটে নতুন নেবে গো"
ঝিমধরা দুপুর চমকে ওঠে।
ফেরিওয়ালা হেঁকে যায়, বাঁচার তাগিদে,
ঘরের সামনে, রাস্তায়॥
শব্দের তীক্ষ্ণ-শায়কে ছিন্ন হয়
অলস সুখের জাল,
ভেসে ওঠে, অতীতের যবনিকা ছিঁড়ে,
কুঠিবাড়ির ছাদে,
আর এক ফেরিওয়ালার ডাক
বেসাতির তরে নয়—প্রেমের তাগিদে,
"পুরনো জীর্ণ মন পালটে নিয়ে,
কে আছ, এস, মন দিয়ে,
মান-হুঁশ নাও"॥

# কবিতায় শ্রীরামকৃষ্ণ

## শান্তি সিংহ

### রসিক

ঝোলে-ঝালে-অম্বলে কখনো ভাজায়
রসিক তো পাঁচভাবে মাছ খেতে চায়।
ইচ্ছামত পুজো-জপ-ধ্যান-নামগান
একঘেয়ে হয় না রসিকের প্রাণ।
সাকার বা নিরাকার, হিন্দু বা খ্রীস্টান
যত মত তত পথ—সবই তাঁর গান।

**সূত্র ঃ** শ্যামপুকুরবাটীতে ঈশান, ডাক্তার সরকার, গিরিশ প্রভৃতি ভক্তসঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণের সরস কথোপকথন। ১৮৮৫, ২২ অক্টোবর।

ডাক্তার—( শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতি ) যে অসুখ তোমার হয়েছে, লোকেদের সঙ্গে কথা কওয়া হবে না। তবে আমি যখন আসব, কেবল আমার সঙ্গে কথা কইবে। ( সকলের হাস্য )

শ্রীরামকৃষ্ণ—এই অসুখটা ভাল করে দাও; তাঁর নাম-গুণ করতে পাই না।

ডাক্তার—ধ্যান করলেই হলো।

শ্রীরামকৃষ্ণ—সে কি কথা! আমি একঘেয়ে কেন হবো? আমি পাঁচ রকম করে মাছ খাই। কখন ঝোলে, কখন ঝালে, অম্বলে, কখন বা ভাজায়। আমি কখনো পুজো, কখনো জপ, কখনো বা ধ্যান, কখনো বা তাঁর নাম গুণগান করি, কখনো তাঁর নাম করে নাচি।

যে-পথেই থাকো, ব্যাকুল হয়ে তাঁকে ডাকা চাই। তিনি তো অন্তর্যামী—সে আন্তরিক ডাক শুনবেনই শুনবেন। ব্যাকুল হয়ে সাকারবাদীর পথেই যাও, আর নিরাকারবাদীর পথেই যাও, তাঁকেই ( ঈশ্বরকেই ) পাবে।

[ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত, ১।১৫।৩ ]

# মুক্তি

## দেবব্রত ঘোষ

পথ হারিয়ে গোলকধাঁধায়
ঘুরছি আমি প্রভু
তোমার দেখা না পাই যদি
মুক্তি নেইকো কভু।
এ আঁধারে তুমি এসে
হাত যদি না ধর
আঁধার আমার কাটবে নাকো,
জমবে থরো থরো।

কোন কাজে মন লাগে না,
ছুটি তোমার পানে
নীরস জীবন ভরবে কবে
তোমার গানে গানে!
হুহু করে যায় যে বেলা
আশায় থাকি তবু
তোমার দেখা না পাই যদি
মুক্তি নেইকো প্রভু।

# শবরীর প্রতীক্ষা

## স্বামী অচ্যুতানন্দ

প্রখর গ্রীষ্মের তাপে কে তুমি দাঁড়ায়ে দেবি,
দুয়ার ধরিয়া—
বামহাত তুলি আঁখি 'পরে, দেখিতেছ দূর পানে
ডানহাতে পত্রপুটে সজ্জিত সম্ভার
অরণ্যের নানা ফলমূল।
পরিধানে শুভ্রবাস এলাইয়া রুক্ষ কেশভার।
মনে লয়ে আশা কতদিনে দেখা পাবে তাঁর ॥ ১ ॥

ঘন ঘোর বরিষণে যবে—বজ্ররোলে দশদিক কাঁপে
সন্ত্রস্ত অরণ্য মাঝে পশুপাখি ছুটিছে গুহায়—
সেদিনও তোমাকে দেখি পত্রগুচ্ছ ধরি শিরোপরে
সিক্তবস্ত্রে ফের বনে বনে
হেরিবার তরে সেই রাজীবলোচনে ॥ ২ ॥

শরতের শ্বেতশুভ্র পুঞ্জ পুঞ্জ মেঘে ছেয়েছে আকাশ
তখনো ফিরিছ তুমি কাশবনে কুসুম চয়নে,
সাজাইতে আসন তাঁহার, শেফালি কমলদলে,
মিটাইতে বাসনা তোমার আসিবেন তিনি,
মর্যাদাপুরুষ, রামরূপে আবির্ভূত যিনি ॥ ৩ ॥

তীব্র শৈত্যবাহে কাঁপে যবে সবে থর থর করি
উত্তমাঙ্গে আবরি বল্কল, স্থির নেত্রে চাহ কার পানে,
ব্যাকুল আগ্রহে সাজাইয়া আহার্যসম্ভার,
ধ্যানে তুমি মগ্ন আছ কার ? ॥ ৪ ॥

ঋতুরাজ আসে ধীরে ধীরে বক্ষে লয়ে পুষ্পপত্রভার
সাজাইতে ধরণীরে রূপে-রসে-গন্ধে-গানে
নূতন সজ্জায়—
ওগো তপস্বিনি! জীবনে তোমার
নাহি কোন রূপান্তর—
অবসর নাহি প্রতীক্ষার ॥ ৫ ॥

ঋতুচক্র ঘুরে যায়, কেটে যায় কত কাল···
চিহ্ন রাখি তাপসী নারীর সর্বাঙ্গ জুড়িয়া।
কৃষ্ণকেশপাশ হয় শুভ্র জটাভার,
সুচিক্কণ চর্ম হয় লোল।
দৃষ্টিশক্তি ক্ষীণ, কর্ণ শ্রুতি-বোধ-হীন,
চলিতে চরণ বুঝি টলে ॥ ৬ ॥

সেই তৃণাসন পাশে পত্রপুটে লয়ে ফলমূল
অবিচল বিরাজিছ তুমি উদগ্র আশায়।
ব্যাকুলতা হয় তীব্রতর—"আরও কতকাল—
কতকাল রহিব আশায়।
কবে পাব দরশন, নৈবেদ্য আমার লইবেন তিনি,
এই প্রাণ-মনসহ শ্রীচরণে তাঁর" ॥ ৭ ॥

দীর্ঘদিন রহি তপোবনে সেবিয়া মতঙ্গ-ঋষি,
শবরদুহিতা লভেছিলা বর,
ভগবান আসিবেন দ্বারে।
যথাকালে ধরি নররূপ। দিব্য স্পর্শদানে
সফল করিতে তাঁর এ মরজীবন ॥ ৮ ॥

গুরুবাক্যের আশ্বাস-দীপ জ্বালায়ে হৃদয়-মাঝে।
তাপসী শবরী প্রতীক্ষা করে দিবসরাত্রি সাঁঝে ॥ ৯ ॥

ক্রমে হয় সুদিন উদয় অঙ্গ-গন্ধে হইয়া চঞ্চল,
তুলি জীর্ণ দেহভার বাহিরিয়া আসে
প্রতীক্ষার অবসানে।
আবির্ভূত আজি কুটিরে তাঁহার রঘুকুলমণি
উদ্ধারিতে শবর নারীরে ॥ ১০ ॥

নেহারে সম্মুখে, কমললোচন শ্যামলসুন্দরে
পীতাম্বর, জটাজুট শিরে, কণ্ঠে বনমালা
স্কন্ধে ধনুর্বাণ, সাথে লয়ে অনুজ লক্ষ্মণে
জগতজীবন সর্বসিদ্ধি সাধনার ধন ॥ ১১ ॥

ভূলুণ্ঠিত প্রেমাবেশে হইয়া অধীর
সিক্ত করি অশ্রুনীরে,
মোছাইয়া দীর্ঘকেশপাশে রাতুলচরণ।

রোমাঞ্চিত কলেবরে,
সাদরে বসান দোঁহে কুসুম-আসনে ॥ ১২ ॥

কম্পিত হৃদয়ে, সযতনে কন্দ-ফল-মূল
স্বয়ং আস্বাদ করি
একে একে তুলে দেন শ্রীরাম-অধরে।
ভক্তিরসসিক্ত সেই নৈবেদ্য লভিয়া
পুলকিত রাম-রামানুজ,
প্রশংসায় হন মুখরিত ভক্তিমতি দেবী শবরীর ॥ ১৩ ॥

লভিয়া আশ্বাস, জুড়ি দুইকর কহেন শবরী :
"নীচ জাতি আমি হীনবুদ্ধি তাহে,
জানি না কিভাবে স্তুতি করিব তোমারি—"
শুনি তাহা কন সীতাপতি : "শোন হে ভামিনি,
ভক্তির সম্পর্ক শুধু মানি ॥ ১৪ ॥

ভক্তিহীন উচ্চজাতি ধর্মখ্যাতি নামগুণরাশি
জলহীন জলদের অবস্থা যেমন—
নাহি স্থান তার মোর কাছে।
তুমি ভক্তিমতি সতী, মোর হৃদয়ের ধন ॥ ১৫ ॥

ভক্তির নবধা অঙ্গ তোমাতে প্রকাশ
দেখিতেছি আমি।
শোন নারী, কহিতেছি তাহা—
প্রথম লক্ষণ যার সাধুসঙ্গে মতি
দ্বিতীয়েতে সদা মোর প্রসঙ্গেতে রতি।

একমনে গুরুসেবা তৃতীয় ভকতি
চতুর্থেতে রাম নামে পরমা পীরিতি ॥ ১৬ ॥

পঞ্চমেতে নামজপ বিশ্বাসের সাথে ;
মনের দৃঢ়তা আর চরিত্র-শুদ্ধতা
ষষ্ঠে ভক্তে লয়ে যাবে সদাচার পথে।
সপ্তমে হেরিবে বিশ্ব সদা রামময়,
মোর ভক্ত আমা হতে বড় মনে হয় ॥ ১৭ ॥

যথা লাভে সন্তোষ নাহি দেখে পরদোষ
অষ্টম ভকতি সদা জানি।
নবমে সরল মতি—ছলনা না কারো প্রতি
সুখে দুঃখে আমাকেই মানি ॥ ১৮ ॥

এই নব ভক্তিধনে তুমি ধনী
ওগো ধনি!
মম দরশন-ফল না হবে বিফল
মিশে যাবে আমার হৃদয়ে
ফিরে পাবে স্বরূপ তোমার" ॥ ১৯ ॥

শুনি বাণী বক্ষে ধরি যুগলচরণ
অপলকে শ্রীবদনে রাখিয়া নয়ন
প্রতীক্ষার অবসানে পূর্ণকাম
কণ্ঠে লয়ে রামনাম।
যোগবলে ত্যজে তনু শবরকুমারী ॥ ২০ ॥

# বিবেকানন্দের প্রতি

## প্রসিত রায়চৌধুরী

সাতশো বছর চোখে ছিল
অগাধ গাঢ় ঘুম,
বিদেশীদের পায়ের তলায়
ভারত নিঝ্ঝুম।
বেদ-পুরাণের কথা তখন
সবাই ভুলে গেছে,
রাঙতা বাঁধে সোনা ফেলে,
নকল সাহেব সেজে—
মানুষ কাঁদে দুঃখে ব্যথায়
গভীর অপমানে,

তাদের কথা কেই বা ভাবে,
কেই বা মনে জানে ?
এমন সময় মশাল হাতে
এলে তুমি বীর,
দিলে বুকের তাজা রুধির,
ফেললে আঁখিনীর।
বললে হেঁকে : "ওঠো জাগো,
আঁধার কেটেছে"—
অমনি অবাক! মন্ত্রে যেন
আলোক ফুটেছে।

প্রাসঙ্গিকী

## শঙ্করের জন্মবর্ষ

গত ফাল্গুন ১৩৯৯ সংখ্যায় প্রকাশিত বিজয়কুমার গঙ্গোপাধ্যায়ের চিঠির উত্তরে জানাই যে, আচার্য শঙ্কর প্রতিষ্ঠিত দশনামী সম্প্রদায়ের অধিকাংশ মঠ ও আখড়ায় 'বৈশাখী শুক্লা পঞ্চমী' তিথিকেই আচার্যের জন্মতিথি বলেই মানা হয়ে থাকে। রামকৃষ্ণ মঠ-মিশনের প্রধান কার্যালয় সহ শাখাকেন্দ্রগুলিতেও এই তারিখেই আচার্যের জন্মতিথি পালিত হয়ে থাকে।

গত ১৯৮৮ খ্রীস্টাব্দের (১৩৯৫ বঙ্গাব্দের) বৈশাখী শুক্লা পঞ্চমী তিথিতে আচার্যের জন্মের দ্বাদশতম শতাব্দী পূর্তি সারা ভারতবর্ষে প্রতি-পালিত হয়েছে। অর্থাৎ আচার্যের জন্মবর্ষ হিসাবে গৃহীত হয়েছে ৭৮৮ খ্রীস্টাব্দটি। অধিকাংশ পণ্ডিতই ৭৮৮ খ্রীস্টাব্দকেই আচার্যের জন্মবর্ষ হিসাবে স্বীকার করে নিয়েছেন। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য যে, আচার্য মাত্র বত্রিশ বছর জীবিত ছিলেন। অধিকাংশ পণ্ডিতের মতে, আচার্যের প্রয়াণবর্ষটি হলো ৮২০ খ্রীস্টাব্দ।

যুগ্ম সম্পাদক
উদ্বোধন

## শ্রীশ্রীমায়ের ডাকাত-বাবা

'মায়ের কথা', 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ' এবং শ্রীশ্রীমায়ের জীবনীপাঠকমাত্রেই শ্রীশ্রীমায়ের ডাকাত-বাবার কথা জানেন। কিভাবে তেলো-ভেলোর মাঠে শ্রীমায়ের সঙ্গে ডাকাত-বাবার দেখা হলো, ডাকাত-বাবা ও ডাকাত-মা কত স্নেহযত্নের সঙ্গে রাত্রে শ্রীমায়ের আহার ও বিশ্রামের ব্যবস্থা করেছিলেন এবং পরদিন সকালে তারকেশ্বর পর্যন্ত শ্রীমাকে এগিয়ে দিয়েছিলেন সেসব কথা আমরা উপরি-উক্ত বইগুলি থেকে জেনেছি; কিন্তু কোথাও ডাকাত-বাবার নাম, নিবাস ইত্যাদি সম্পর্কে কিছু জানা যায় না। যদি এসম্পর্কে কোন তথ্য উদ্বোধনের মাধ্যমে আমরা জানতে পারি তাহলে খুব ভাল হয়।

মীরা দত্ত
শেক্সপীয়ার সরণী
কলকাতা-৭০০ ০৭১

শ্রীমতী দত্তের জিজ্ঞাসার উত্তরে জানাই যে, শ্রীমায়ের দুই সেবক স্বামী পরমেশ্বরানন্দ (কিশোরী মহারাজ) এবং স্বামী গৌরীশ্বরানন্দের (রামময় মহারাজের) কাছে আমরা শুনেছি, শ্রীমায়ের ডাকাত-বাবার নাম ছিল সাগর সাঁতরা। তিনি ছিলেন তেলো বা তেলুয়া গ্রামের বাসিন্দা। ভেলো বা ভেলুয়া তেলোর সংলগ্ন গ্রাম।

তেলো-ভেলো বর্ধমানের মহারাজার জমিদারীর অধীনস্থ সমরশাহী পরগনার অন্তর্ভুক্ত মৌজা। এই পরগনার পত্তনীদার (মূল জমিদারের অধীনস্থ ছোট জমিদার) ছিল মলয়পুরের সামন্ত পরিবার। সাগর সাঁতরা ছিলেন পত্তনীদারের অধীনস্থ ছোট জমিদার তেলোর ঘোষ পরিবারের পাইক। কখনো কখনো ডাকাতি করলেও পেশায় ডাকাত-বাবা কিন্তু ডাকাত ছিলেন না।

স্বামী পরমেশ্বরানন্দ বলতেন: "তেলো-ভেলোর ঘটনার অনেক বছর পরের কথা। মা তখন জয়রামবাটীতে আছেন। একটি বাগদী যুবক এসে মাকে বলে, 'আমাকে দীক্ষা দাও।' আমি তখন সেখানে উপস্থিত ছিলাম। মা বললেন, 'এখন আমার শরীর ভাল নেই, এখন তো দীক্ষা হবে না।' ছেলেটি ভাবল, সে বাগদী বলে—নীচ জাত বলে মা তাকে দীক্ষা দিচ্ছেন না। তাই সে খুব রাগ করে অভিমান-ভরা গলায় বলল, 'বুঝেছি,

বাগদীর মেয়ে হতে পারো, কিন্তু বাগদীর মা হতে পারো না। আমি তেলো থেকে আসছি। তুমি কি জান, তোমার ডাকাত-বাবা আমার বাবা?' একথা শুনে মা খুব খুশি হলেন এবং অসুস্থ শরীরেই তাকে সেদিন দীক্ষাও দিলেন।"

সাগর সাঁতরার নাতি (পৌত্র) কৃষ্ণপদ সাঁতরার সূত্রে আমরা অবগত আছি যে, তাঁর কাকা মেহারী সাঁতরা মায়ের কাছে মন্ত্রদীক্ষা নিয়েছিলেন। একথা তিনি শুনেছেন তাঁর বাবা বিহারী সাঁতরার কাছে। কৃষ্ণপদ জানিয়েছেন যে, তিনি তাঁর কাকাকে দেখেননি; কারণ, তাঁর জন্মের আগেই ২০/২২ বছর বয়সে তাঁর কাকা মারা যান। কৃষ্ণপদ আরও জানিয়েছেন, তাঁর ঠাকুরমা অর্থাৎ শ্রীমায়ের 'ডাকাত-মা'র নাম ছিল মাতঙ্গিনী। তাঁর ঠাকুরদা অর্থাৎ সাগরের বাবার নাম ছিল মথুর এবং মায়ের নাম ছিল তারারানী। মকর সংক্রান্তির দিন তাঁর ঠাকুরদার জন্ম হয়েছিল বলে তাঁর নাম রাখা হয়েছিল 'সাগর'।

ঠাকুরদাকে কৃষ্ণপদ দেখেননি, কিন্তু বাবার কাছে শুনেছেন, ঠাকুরদার বিরাট দশাসই চেহারা ছিল। গায়ে ছিল প্রচণ্ড শক্তি। মাথায় ছিল ঝাঁকরা ঝাঁকরা একমাথা কালো চুল। রাত্রে খাওয়ার পর যখন মুখ ধুতেন তখন তার আওয়াজে পাড়ার লোক জানত যে, সাগরের রাতের খাওয়া শেষ হলো।

ডাকাত-বাবা ওস্তাদ লাঠিয়াল ছিলেন। তিনি এত দ্রুত লাঠি ঘোরাতেন যে, ঢিল ছুঁড়লে তা ঐ লাঠিতে লেগে ফিরে আসত। ঐ অঞ্চলে সবাই তাঁকে সমীহ করত তাঁর স্বাস্থ্য ও শক্তির জন্য।

সাগরের অভিনয়-দক্ষতাও ছিল। গ্রামের কৃষ্ণ-যাত্রার দলে তিনি নিয়মিত অভিনয় করতেন। শোনা যায়, 'কংসবধ' পালায় তিনি কংসের এবং 'সতী বেহুলা' পালায় তিনি যমরাজের ভূমিকায় অভিনয় করতেন। গ্রামের সূত্রে জানা যায় যে, সাগর অশিক্ষিত হলেও মুখে মুখে পালার জন্য গান রচনা করে দিতেন। তাঁর রচিত তিনটি গানের কথা জানা গিয়েছে:

(১) কেন কাঁদে প্রাণ তাঁরই তরে—
সে যে নহে অন্তরঙ্গ
কুল করে যে ভঙ্গ,
সাধুর ঘরে যেন চোরে চুরি করে।

(২) শুন রাধে বিনোদিনী
চিন্তা কেন কর ধনী
উপায় করিব আমি,
হয়ো না উতলা।
ব্রজে তুমি রাইকিশোরী,
ছলেতে আয়ানের নারী
গোলোকে গোলোকেশ্বরী,
আপনি কমলা॥

(৩) এসেছি একেলা ভবে নিঃসম্বলে যেতে হবে
মন তুমি মজো না এ সংসার-ফাঁদে।
তুমি ওহে চিরস্বারী, ওহে ত্রিভঙ্গমুরারী
ঠাঁই দিয়ো, আমায় ঐ রাঙাপদে॥

।।রামকৃষ্ণপুঁথি'তে অক্ষয়কুমার সেন লিখেছেন যে, প্রথম গানটি ডাকাত-বাবা তারকেশ্বরের পথে শ্রীমাকে গেয়ে শুনিয়েছিলেন এবং এই গানটি শ্রীমায়ের খুব ভাল লেগেছিল। অক্ষয়কুমার সেন শ্রীশ্রীমায়ের মুখেই সেকথা শুনেছিলেন (শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণপুঁথি, ৮ম সং, ১৩৭৮, পৃঃ ২১২)।

১৯১০-১১ খ্রীস্টাব্দের এপ্রিল-মে (বৈশাখ) মাসে একদিন বেলগাছের ডাল কাটতে গিয়ে ডাকাত-বাবা গাছ থেকে পড়ে যান। তাঁর মাথায় খুব চোট লাগে এবং সে-আঘাতেই তাঁর মৃত্যু হয়। ডাকাত-বাবার মৃত্যুর নয়-দশ বছর পর ডাকাত-মা মারা যান। ☐

যুগ্ম সম্পাদক
উদ্বোধন

# সোভিয়েত রাশিয়াতে যা দেখেছি

## স্বামী ভাস্করানন্দ

[ পূর্বানুবৃত্তি : গত অগ্রহায়ণ ১৩৯৯ সংখ্যার পর ]

পিয়াতিগরস্কে তিনদিন থাকার পর আমরা ট্যুরিস্ট বাসে ককেশাসের জর্জিয়া প্রদেশ বা জর্জিয়া রিপাবলিকের দিকে রওনা হলাম। পথে স্বশাসিত উত্তর অসেশিয়ান অটোনমাস রিপাবলিকের রাজধানী অরদজোনিকিদজেতে আমাদের একরাত্রি থাকতে হবে।

পিয়াতিগরস্ক থেকে অরদজোনিকিদজের দূরত্ব প্রায় ১৮০ কিলোমিটার। পথে ট্যুরিস্ট বাসে যেতে যেতে কয়েকটি ছোট গ্রাম দেখতে পেলাম। গ্রামগুলিতে টিনের চালার ছোট ছোট একতলা কুঁড়ে ঘরের মতো বাড়ি রয়েছে। জিজ্ঞাসা করে জানা গেল যে, এসব বাড়ির অনেকগুলিই হচ্ছে 'ডাসা' ( Dacha ) বা গ্রীষ্মকালীন কুঠিয়া। এসব কুঠিয়া সাধারণতঃ সরকারি সম্পত্তি হলেও কিছু-কিছুর ব্যক্তিগত মালিকানাও রয়েছে। কোন কোন কুঠিয়ার চারপাশে ফলের গাছও দেখতে পেলাম। আমাদের গাইড বললেন, এক-একটি ডাসার দাম ৩০০০ রুবল। যাঁরা শহরে থাকেন তাঁরা গ্রীষ্মকালে ছুটি পেলে এই ডাসাগুলিতে এসে থাকতে পারেন। যাঁদের নিজস্ব ডাসা নেই তাঁরা সপ্তাহে এক রুবল ভাড়া দিয়ে ডাসাগুলিতে থাকতে পারেন।

আগেই বলেছি, রাশিয়াতে লোকের মাসিক বেতন তেমন বেশি না হলেও থাকা-খাওয়ার খরচ অত্যন্ত কম। উদাহরণস্বরূপ, মস্কোর একটি সাধারণ ফ্ল্যাটবাড়ির মাসিক ভাড়া ১২ রুবল মাত্র। ফ্ল্যাটটিতে একটি শোবার ঘর, একটি বসার ঘর বা ছোট ড্রইং রুম এবং একটি রান্নাঘর থাকে। মাসে এক রুবলের মতো বিদ্যুতের জন্য দিতে হয়। টেলিফোনের লোক্যাল কলগুলি ফ্রী। শুধু ট্রাংক-কলের জন্য পয়সা দিতে হয়। এক কিলো মাংসের দাম ১৯৮৯ খ্রীস্টাব্দে ছিল মাত্র দুই রুবল। রুটি এত সস্তা যে, কৃষকরা গ্রামাঞ্চলে রুটি কিনে তাদের শূকর, মুরগী ইত্যাদিকে খাওয়াতো। গর্বাচভ একবার অনুযোগ করেছিলেন এই বলে যে, তিনি ছেলেদের পাঁউরুটি দিয়ে ফুটবল খেলতে দেখেছেন। তবে এখনকার রাশিয়াতে রুটির জন্য লাইনে দাঁড়াতে হয়, তাতো সংবাদপত্রের মাধ্যমে সবাই জেনে গিয়েছেন।

স্বামী ও স্ত্রী উভয়েই কাজ করেন—এমন পরিবারে সমস্ত খরচ মিটিয়েও অনায়াসে বার্ষিক সঞ্চয় হতে পারে ১৫০০ রুবল। কাজেই ডাসা কিনতে তাঁদের মাত্র বছর দুয়েকের সঞ্চয় প্রয়োজন। আমি অবশ্য ১৯৮৯ খ্রীস্টাব্দের হিসাব বলছি।

অরদজোনিকিদজের দিকে যে-পথ দিয়ে আমরা যাচ্ছিলাম তা পাশ্চাত্যের সমৃদ্ধ দেশগুলির রাস্তার মতো চওড়া নয়। রাস্তাটি ভারতবর্ষের ন্যাশনাল হাইওয়েগুলির মতো।

আমরা আমাদের গন্তব্যস্থলে যখন এসে পৌঁছালাম তখন প্রায় বিকাল। শহরটি বেশ বড় ; লোকসংখ্যা তিন লক্ষেরও বেশি। ১৭৮০ খ্রীস্টাব্দে সামরিক প্রয়োজনে এই শহরটির পত্তন হয়। তখন এর নাম ছিল ভ্লাদিকাভকাজ ( Vladikavkaz )। পরে এক জর্জিয়ান বিপ্লবীর নামে এর নতুন নামকরণ হয়েছে। ১৯৪২ খ্রীস্টাব্দে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় জার্মান সাঁজোয়াবাহিনীকে ককেশাসের এই শহরটিতেই প্রথম প্রতিহত করা হয়। শহরটির রাস্তাগুলি প্রশস্ত ; ট্রামগাড়ি ইত্যাদি রয়েছে।

অরদজোনিকিদজে শহরে একরাত্রি থাকতে হলো ভ্লাদিকাভকাজ হোটেলে। এটিই শহরের সবচেয়ে বড় হোটেল। হোটেলটির কাছেই একটি সুন্দর মসজিদ রয়েছে, কিন্তু তাতে ১৯৮৯ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত উপাসনা হতো না। স্ট্যালিন অথবা ক্রুশ্চভের আমলে মসজিদটি মিউজিয়ামে রূপান্তরিত হয়েছিল। এই অঞ্চলটিতে বেশ কিছু ইসলাম-ধর্মাবলম্বী রয়েছে।

রাত্রিতে খেতে গিয়ে দেখতে পেলাম, আমাদের দলের ট্যুরিস্টদের মধ্যে বেশ কয়েকজন খাবার ঘরে অনুপস্থিত। খোঁজ নিয়ে জানা গেল, তাঁরা সবাই খুব অসুস্থ হয়ে পড়েছেন। রাশিয়ার অনেক জায়গায়, বিশেষতঃ ককেশাসের মতো পার্বত্য অঞ্চলে, পানীয় জলে 'জিয়ার্ডিয়া' রয়েছে। জিয়ার্ডিয়া-দুষ্ট জল পান করায় ওঁদের উদরাময়ের লক্ষণ দেখা দিয়েছে। রুগীদের জন্য ওষুধ চাওয়া হলে

আমাদের গাইড আল্লা লেভিতনা বললেন : "আমি খুবই দুঃখিত, এই হোটেলটিতে ওষুধ পাওয়া যাবে না। আমরা যখন জর্জিয়ার টিবিলিসি (Tbilisi) শহরে যাব তখন সেখানে ওষুধ পাওয়া যাবে।"

কিন্তু টিবিলিসিতে যাওয়ার পরও রুগীদের ওষুধ পেতে পাঁচদিন লেগে গেল। আমাদের দলের মধ্যে একমাত্র আমি ও এক ইংরেজ ইঞ্জিনিয়ার ছাড়া বাকি আঠাশজনকেই জিয়ার্ডিয়া-ঘটিত উদরাময়ে দু-তিনবার করে ভুগতে হয়েছে। আমার সঙ্গী ভক্ত-বন্ধুটিও একাধিকবার অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন। শেষ পর্যন্ত যখন ওষুধ এল তখন দেখলাম, ওষুধটি হচ্ছে 'সালফাথিয়াজোল' (Sulphathiazole) ট্যাবলেট। এই ওষুধটি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় ব্যবহৃত হতো। ইদানীং ভারত ও অন্যান্য বহু দেশে জিয়ার্ডিয়ার চিকিৎসার জন্য 'ফ্ল্যাজিল' বলে একটি অপেক্ষাকৃত আধুনিক ওষুধ ব্যবহৃত হয়।

সরকারি তরফের অবহেলা ও দুর্নীতির জন্য সোভিয়েত রাশিয়ার হাসপাতাল ও অন্যান্য চিকিৎসা-প্রতিষ্ঠানগুলির অবস্থা শোচনীয়। সাধারণতঃ হজমের গোলমাল, দাঁতব্যথা বা এধরনের কোন রোগ হলে ট্যুরিস্টদের পক্ষে ওষুধপত্র রাশিয়াতে পাওয়া বেশ কঠিন। তবে অস্ত্রোপচারের প্রয়োজন হলে সেখানকার চিকিৎসা-প্রতিষ্ঠানগুলিতে তার ব্যবস্থা মোটামুটি ভালই রয়েছে। কিন্তু নার্স ও হাস-পাতালের নিচুতলার কর্মীদের বেতন কম হওয়াতে ভাল সেবা-শুশ্রূষা পেতে হলে হাসপাতালগুলিতে বকশিশ বা 'টিপস' দিতে হয়।

অরদজোনিকিদজে থেকে সোভিয়েত রাশিয়ার জর্জিয়া প্রদেশের বা রিপাবলিক অব জর্জিয়ার রাজধানী টিবিলিসি যেতে আমাদের প্রধানতঃ জর্জিয়ান মিলিটারী হাইওয়ে দিয়ে যেতে হয়েছিল। ককেশাশ পর্বতমালার ভিতর দিয়ে এই রাস্তাটি টিবিলিসি গিয়েছে। পারসী ভাষায় এ-শহরটিকে 'টিফলিস' বলা হয়। স্থানীয় লোকেরা শহরটিকে 'কালাকি' বলে। অরদজোনিকিদজে শহর থেকে টিবিলিসির দূরত্ব প্রায় ২৩০ কিলোমিটার।

শুধু টিবিলিসি শহরই নয়, সমস্ত জর্জিয়া প্রদেশটিই প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে ভরপুর। গল্প আছে যে, ভগবান যেদিন পৃথিবীর সমস্ত লোককে জমি বিলিয়ে দিচ্ছিলেন তখন জর্জিয়ানদের পূর্বপুরুষের সেখানে পৌঁছাতে এত দেরি হয়ে গিয়েছিল যে, ভগবান ততক্ষণে পৃথিবীর অন্যান্য সবাইকে সমস্ত জমি বিলি করে দিয়েছেন। কিন্তু জর্জিয়ানটিকে দেখে ভগবানের করুণা হলো। তিনি তাই বললেন : "দেখ, আমি সব জমি বিলি করে দিলেও আমার নিজের ব্যবহারের জন্য কিছু বাছাই করা জমি রেখেছি। তা আর কি করব, তুমিই বরং সেটা নাও।" সে-জায়গাটিই নাকি জর্জিয়া। শুধু সৌন্দর্যেই নয়, প্রাকৃতিক সম্পদেও জর্জিয়া প্রদেশটি অত্যন্ত সমৃদ্ধ।

টিবিলিসির দিকে ট্যুরিস্ট বাসে পাহাড়ী পথ দিয়ে আসার সময় আমরা ককেশাশ পর্বতমালার সর্বোচ্চ শৃঙ্গ মাউন্ট এলব্রুস (Mount Elbrus) দেখতে পেয়েছিলাম। ৫,৩০০ মিটার উঁচু মাউন্ট এলব্রুস গ্রীষ্মকালেও বরফে ঢাকা থাকে। এছাড়া ৪,৭০০ মিটার উঁচু মাউন্ট কাজবেগির (Mount Kazbegi) পাদদেশে কাজবেগি গ্রামে কিছুক্ষণ আমাদের বাস থেমেছিল। ককেশাশের এই অঞ্চলটিতে পৃথিবীর সবচেয়ে দীর্ঘজীবী লোকেদের বাস। এ-অঞ্চলের অধিকাংশ লোকই একশো বছরের বেশি বাঁচেন। জর্জিয়া লোকনৃত্য এবং পুরুষদের 'কয়্যার' (Choir)-এর জন্য বিখ্যাত। শুনেতে পেলাম, এই অঞ্চলে একটি বিখ্যাত কয়্যার বা গায়কের দল রয়েছে, যার মধ্যে সত্তর বছরের কম বয়সের পুরুষদের গাইতে দেওয়া হয় না। এ-অঞ্চলের লোকেরা এত দীর্ঘায়ু কি করে হলেন সেবিষয়ে রিসার্চ যাঁরা করেছেন তাঁরা বলেন, ককেশাশের আবহাওয়া এবং সে-অঞ্চলের সমাজব্যবস্থাই খুব সম্ভবতঃ এর কারণ। জর্জিয়ার এই পার্বত্য অঞ্চলটিতে বৃদ্ধদের খুব সম্মান করা হয় বলে তাঁদের বেশিদিন বাঁচবার স্পৃহা বজায় থাকে, তাই নাকি তাঁরা এত দীর্ঘায়ু হন।

জর্জিয়া প্রদেশটির পাশেই রয়েছে আর্মেনিয়া প্রদেশ বা রিপাবলিক অব আর্মেনিয়া। এ-প্রদেশটি সম্পর্কেও একটি গল্প শোনা যায়। ভগবান সেদিন পৃথিবীর বিভিন্ন জাতিকে জমি বিলি করছিলেন। আর্মেনিয়ানদের পূর্বপুরুষও জমি পাওয়ার জন্য লাইনে দাঁড়িয়েছিলেন, কিন্তু খুব দেরি করে আসাতে যখন তাঁর পালা এল ততক্ষণে সমস্ত জমি

বিলি হয়ে গিয়েছে। ভগবান তাকে বললেন : "আমি খুব দুঃখিত, তোমার আসতে বেজায় দেরি হয়ে গিয়েছে।" আর্মেনিয়ানটি বললেন : "সামান্য একটু জমিও কি অবশিষ্ট নেই ?" ভগবান তখন তাঁর ঝুলি ঝাড়তে তার ভিতর থেকে কয়েক টুকরো নুড়ি-পাথর বেরিয়ে এল। তাই নাকি আর্মেনিয়া প্রদেশটি এত প্রস্তরময়। এ-প্রদেশের অর্ধেকেরও বেশি জমিতে চাষ করা অসম্ভব। আর্মেনিয়াই সোভিয়েত রাশিয়ার সবচেয়ে ছোট 'রিপাবলিক' বা প্রদেশ। লোকসংখ্যা পঁয়ত্রিশ লক্ষ। এছাড়া পনেরো লক্ষ আর্মেনিয়ান সোভিয়েত রাশিয়ার অন্যান্য প্রদেশে রয়েছেন। সোভিয়েত রাশিয়ার বাইরেও দশ লক্ষ আর্মেনিয়ান বিভিন্ন দেশে ছড়িয়ে আছেন। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য যে, একসময় কলকাতাতেও বেশ কিছু আর্মেনিয়ান ছিলেন। কলকাতার আর্মানিটোলা ও আর্মেনিয়ান গির্জা তার নিদর্শন।

জর্জিয়া একসময় স্বাধীন রাজ্য ছিল। কিন্তু পর পর মঙ্গোল, তুর্কী এবং পারসীদের আক্রমণে তিতিবিরক্ত হয়ে অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে জর্জিয়া শক্তিশালী রুশ-সাম্রাজ্যের তৎকালীন 'জারে'র কাছে অন্তর্ভুক্তির জন্য আবেদন করেছিল। এরপর থেকে জর্জিয়া রুশ-সাম্রাজ্যের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হিসাবেই রয়েছে।

কিন্তু জর্জিয়ার নিজস্ব গৌরবময় প্রাচীন ঐতিহ্য রয়েছে। ৩৩০ খ্রীস্টাব্দে এই রাজ্যটি খ্রীস্টধর্ম গ্রহণ করেছিল। প্রত্নতাত্ত্বিকদের মতে যীশুখ্রীস্টের জন্মের ৩০০০ বছর পূর্বেও জর্জিয়া অঞ্চলে লোকবসতি ছিল। জর্জিয়া রাজ্যের শাসক-শাসিকাদের মধ্যে বাখতাং (Vakhtang), ডেভিড (David) ও রানী তামারা (Tamara)-র নাম উল্লেখযোগ্য। শিক্ষায়, শিল্পে, স্থাপত্যে ও ভাস্কর্যে জর্জিয়া রাজ্য দ্বাদশ শতাব্দীতেও প্রসিদ্ধ ছিল। জর্জিয়ানদের নিজস্ব লিপি রয়েছে ; এ-লিপিতেই জর্জিয়ান ভাষার বিখ্যাত লেখক রুস্তাভেলি (Rustaveli) তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ 'The Knight in the Panther's Skin' লিখেছিলেন আজ থেকে প্রায় ৮০০ বছর আগে।

কিংবদন্তী অনুযায়ী জর্জিয়ার বর্তমান রাজধানী টিবিলিসির প্রতিষ্ঠা প্রাচীন ইবেরিয়া রাজ্যের রাজা বাখতাং করেছিলেন। এই শহরটির নামের অর্থ হচ্ছে 'উষ্ণ প্রস্রবণ'। শহরটি স্বাস্থ্যকর স্থান হিসাবে বহুকাল ধরে প্রসিদ্ধ।

১৭৯৫ খ্রীস্টাব্দে পারস্যের সম্রাট শাহ আগার আক্রমণে শহরটি ভগ্নস্তূপে পরিণত হয়। বিজয়ী শাহ আগার আদেশে টিবিলিসি থেকে প্রতিটি নাগরিককে অন্যত্র চলে যেতে হয়। পরে বিজিত বাগ্রাতি রাজবংশের রাজা হেরাক্লেসের অনুরোধে তদানীন্তন জারের প্রেরিত রুশ সৈন্যরা এসে শহরটি থেকে পারসী সেনাদের বিতাড়িত করে।

শহরটির পুনর্গঠনের সময় আর্মেনিয়া থেকে বহু শ্রমিক এসেছিল সেখানে কাজ করতে। তাদের অধিকাংশই সেখানে থেকে যায়। বর্তমানেও শহরটিতে এজন্য বহু আর্মেনিয়ানের বাস। ট্রাক ও বাস-ড্রাইভার এবং অন্যান্য শ্রমিকদের অধিকাংশই আর্মেনিয়ান বংশোদ্ভব।

আমরা টিবিলিসি শহরের মাঝখানে আদঝারিয়া হোটেলে ( Hotel Adzharia ) তিনরাত্রি ছিলাম। তখন শহরটির গোটা দুই বিখ্যাত মিউজিয়াম দেখার সুযোগ হয়েছিল। 'Museum of Georgian Art'-এ বহু দ্রষ্টব্যের মধ্যে নিকো পিরোসমানাশভিলির আঁকা কয়েকটি বিখ্যাত অয়েল পেইন্টিং ও অন্যান্য ছবি দেখার সুযোগ হয়েছিল। একদিন কেবল কার-এ শহরটির সবচেয়ের উঁচু জায়গা মাউন্ট মিতাসমিন্দায় ( Mount Mtasminda ) গিয়েছিলাম। সেখানে একটি চমৎকার পার্ক রয়েছে। এককালে পার্কের মধ্যে উঁচু বেদিতে স্ট্যালিনের একটি বড় মূর্তি ছিল। কিন্তু ক্রুশ্চভের আমলে সে-মূর্তিটি অপসারিত হয়। রাশিয়ার যেকয়টি শহর ও গ্রাম আমার দেখার সুযোগ হয়েছিল, সেখানে প্রায় কোথাও জোসেফ স্ট্যালিনের মূর্তি দেখিনি। স্ট্যালিন জর্জিয়ার লোক ছিলেন বলে কেবল জর্জিয়াতে বেড়াবার সময় তাঁর দু-একটিমাত্র মূর্তি দেখেছিলাম। অথচ লেনিনের মূর্তি প্রতি শহরেই রয়েছে।

জর্জিয়ার লোকেরা অতিথিপরায়ণতার জন্য প্রসিদ্ধ। কিন্তু আমরা সেখানে যাওয়ার কিছু পূর্বে জর্জিয়ার স্বাধীনতার দাবিতে টিবিলিসিতে রাজনৈতিক আন্দোলন শুরু হয়েছিল। আন্দোলন দমন করতে সৈন্য তলব করার পর তাদের হাতে কয়েকটি জর্জিয়াবাসীর মৃত্যু হয়। ফলে শহরটির আবহাওয়া তখনো সম্পূর্ণ স্বাভাবিক হয়নি। রাজনৈতিক আবহাওয়া তখনো বেশ উত্তপ্ত। [ ক্রমশঃ ]

# মার্শফিল্ড সারদা আশ্রম

## স্বামী সর্বাত্মানন্দ

আমেরিকার পূর্বপ্রান্তে আটলান্টিক মহাসাগরের উপকূলে 'মার্শফিল্ড হিলস'। 'হিলস' বলতে যা বোঝায় মার্শফিল্ড মোটেই তত উঁচু পাহাড় নয়। সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে হয়তো শ-খানেক ফিট উঁচু। তবে পাহাড়ের মতো ঘন সবুজ গাছপালায় ঘেরা এবং মাঝে মাঝে বড় বড় পাথরের বোল্ডার পড়ে থাকায় ও ভূমির স্বাভাবিক উঁচু-নিচু পার্থক্যের জন্য স্থানটি হয়তো এই নামে আখ্যায়িত। বস্টন শহর থেকে এর দূরত্ব মাত্র ৩৫ মাইল, কিন্তু গরমকালে বস্টনের তুলনায় এখানকার তাপমাত্রার তারতম্য যথেষ্ট—প্রায় ৮-১০° ফারেনহাইট কম। তাই গ্রীষ্মের মাসদুটিতে (জুলাই-আগস্ট) শহরের হাজার হাজার মানুষ এখানকার সমুদ্রসৈকতে ভিড় জমায়।

বস্টন রামকৃষ্ণ বেদান্ত সোসাইটি পরিচালিত মার্শফিল্ডে একটি আশ্রম আছে। প্রায় পনেরো একর জায়গা নিয়ে আপেল, নাশপাতি, পীচ প্রভৃতি ফল ও নানাবিধ ফুলগাছে ভরা মনোরম এই আশ্রমটির নাম 'সারদা আশ্রম'। প্রতি বছর (জুলাই ও আগস্ট) দুমাস মাত্র আশ্রমটি খোলা থাকে। তখন বস্টনের সাধু-কর্মীরা সাধন-ভজনের জন্য এখানে এসে থাকেন। রবিবার বা ছুটির দিন-গুলিতে সোসাইটির বস্টন ও প্রভিডেন্স কেন্দ্র থেকে অনেক ভক্তরাও এখানে সমবেত হন। কিছু সময় ধ্যান-ভজনাদিতে কাটিয়ে আশ্রমে মধ্যাহ্নভোজনের পর প্রায় সকলেই বাড়ি ফিরে যান। কেউ কেউ অবশ্য আশ্রমের নানাবিধ কাজে সাহায্য করার জন্য ও সন্ধ্যারতিতে যোগদানের অভিপ্রায়ে থেকে যান। তাঁরা নৈশভোজনের পর ফেরেন।

ঘন গাছপালায় ভরা সারদা আশ্রমের মধ্য দিয়ে একটি গোলাকার পথ রয়েছে গাড়ি চলার সুবিধার জন্য। এই পথের প্রায় সংলগ্ন বিভিন্ন স্থানে চারিটি পৃথক কুটিরে আশ্রমবাসীদের থাকার ব্যবস্থা। প্রধান বাড়িটির নাম 'চ্যাপেল হাউস'। এই বাড়ির সংলগ্ন একটি নতুন প্রার্থনাগৃহ নির্মিত হয়েছে। শ্রীশ্রীঠাকুর-মা-স্বামীজী ও মহারাজের (স্বামী ব্রহ্মানন্দের) প্রতিকৃতি বেদির ওপর প্রতিষ্ঠিত। সামনে শুচিশুভ্র একটি বাঙলা হরফের ওঁ-কার (বেলুড় মঠে স্বামীজীর মন্দিরের অনুরূপ) রক্ষিত। দেওয়ালের একদিকে বুদ্ধ ও যীশুখ্রীস্ট, অপরদিকে রামচন্দ্র ও কৃষ্ণের প্রতিকৃতি এবং অন্য একস্থানে ঠাকুরের ত্যাগী সন্তানদের একসঙ্গে বাঁধানো একখানি প্রতিকৃতি। সাধু-ভক্তেরা এখানেই সমবেত হয়ে নিয়মিত সকাল, দুপুর ও সন্ধ্যায় ধ্যান-ভজন-প্রার্থনাদি করেন। ধর্মপ্রসঙ্গাদিও এখানে হয়ে থাকে। আশ্রমের অধ্যক্ষ এ-বাড়িতেই থাকেন। এই বাড়ির সংলগ্ন রান্নাঘর ও 'ডাইনিং হলে' সকলের রান্না-খাওয়ার ব্যবস্থা আছে। তবে রবিবার ও উৎসবাদির দিনে ভক্তসংখ্যা বেশি হওয়ায় সামনের 'লনে' চেয়ার-টেবিলে খাবার-ব্যবস্থা হয়। এদেশে উৎসবাদির দিনে 'পটলাক' ও 'বুফে' প্রথায় পরিবেশন হওয়ায় আশ্রমের রান্নার ঝামেলা অনেক কম। ভক্তরাই নানাবিধ দ্রব্যাদি রান্না করে সঙ্গে নিয়ে আসেন, যা সকলের আহার্য হিসাবে যথেষ্ট।

দ্বিতীয় বাড়িটি 'গেস্ট হাউস' নামে পরিচিত। আশ্রমের প্রবেশপথে এটি প্রথমে পড়ে বলে এটিকে 'ফার্স্ট হাউস'-ও বলা হয়। সাধারণতঃ মঠের সন্ন্যাসীরা আমন্ত্রিত হয়ে যাঁরা এখানে আসেন তাঁরা সকলেই এই বাড়িটিতে বাস করেন। বাড়ির সামনে একটি সুন্দর ফুলবাগান। তৃতীয় বাড়িটি কিছুটা ভিতর দিকে। বাড়ির চারপাশ গাছপালায় ঘেরা থাকায় বাড়িটি সাধারণের প্রায় দৃষ্টিগোচর হয় না

—নাম 'হোলি মাদারস কটেজ'। বাড়ির পাশেই আশ্রমের শাকসব্জি উৎপাদনের বাগানটি থাকার জন্য বাড়ীটি 'গার্ডেন হাউস' নামেও পরিচিত। ভক্ত-মহিলারা দিনকয়েক একান্তভাবে সাধন ভজন করার জন্য আশ্রমে রাত্রিবাস করেন; এ-বাড়ীটিতে তাঁদের থাকার ব্যবস্থা। অপর বাড়ীটি অপেক্ষাকৃত ছোট বলে এর নাম—'স্মল হাউস'। ছোটখাট 'ফ্যামিলি' এলে সাধারণতঃ এই বাড়িতেই তাদের থাকার ব্যবস্থা হয়।

গ্রীষ্মের দুইমাসব্যাপী সারদা আশ্রমের প্রধান অনুষ্ঠানগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো ৪ জুলাই (আমেরিকার স্বাধীনতা দিবস), গুরুপূর্ণিমা, 'শ্রীম' অর্থাৎ মাস্টার মহাশয়ের জন্মদিবস, স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ, স্বামী নিরঞ্জনানন্দ ও স্বামী অদ্বৈতানন্দ—শ্রীশ্রীঠাকুরের এই তিনজন ত্যাগী সন্তানের জন্মতিথি এবং শ্রীকৃষ্ণ-জন্মাষ্টমী উৎসব। সাধারণতঃ রবিবার সকালে ভক্তসমাগম হয় বলে এই অনুষ্ঠানগুলি সংশ্লিষ্ট দিনগুলির পরবর্তী রবিবার বেলা ১১টার পর সম্পন্ন হয়ে থাকে। কয়েকটি সমবেত ভজনসঙ্গীত গাওয়ার পর উক্ত বিষয়ে সংক্ষিপ্ত ভাষণ বা জীবনীগ্রন্থাদি থেকে পাঠ করা হয়। জন্মাষ্টমী এই আশ্রমের শেষ ও সর্বপ্রধান উৎসব। এদেশের আশ্রমগুলির কোন অধ্যক্ষকে সাধারণতঃ শ্রীকৃষ্ণ-বিষয়ে বলার জন্য প্রতিবছর আমন্ত্রণ জানানো হয়। শ্রীমৎ স্বামী রঙ্গনাথানন্দজী এই উৎসবে কয়েকবার বক্তৃতা দিয়েছেন। বলা বাহুল্য, তাঁকে দিয়েই এই উৎসবের সূচনা হয়েছিল প্রায় বছর কুড়ি আগে। ঐ বছর শ্রীকৃষ্ণ-বিষয়ে তাঁর বক্তৃতা শুনতে হঠাৎ বেশ কিছু লোক উপস্থিত হন এবং জন্মাষ্টমীর দিন বলে আশ্রমে রান্না করে বক্তৃতাশেষে সকলকে প্রসাদ দেওয়া হয়। সেই থেকে এখানে জন্মাষ্টমী উৎসব চালু রয়েছে। সাধারণতঃ আগস্ট মাসের শেষাশেষি জন্মাষ্টমী পালিত হয়, ঐ সময় এখানে আকাশ মেঘাচ্ছন্ন থাকে এবং প্রায়ই বৃষ্টি হয়। আশ্রমপ্রাঙ্গণে ত্রিপল খাটিয়ে বড় প্যান্ডেল করা হয় যাতে বৃষ্টি হলেও ভক্তদের অসুবিধা না হয়। শ্রীকৃষ্ণের একখানি মনোরম ছবি একপাশে টেবিলের ওপর পুষ্পমাল্যাদি সহকারে সুন্দরভাবে সাজানো হয়।

গত বছরের (১৯৯২) জন্মাষ্টমী-উৎসবে বক্তৃতা দিতে এখানে আমন্ত্রিত হয়ে আসেন স্যাক্রামেন্টো কেন্দ্রের সহকারী স্বামী প্রপন্নানন্দ। সেদিন আকাশ পরিষ্কার থাকায় প্রায় শ-তিনেক ভক্ত সমবেত হয়ে শ্রীকৃষ্ণ-বিষয়ক ভজনসঙ্গীত ও বক্তৃতাদি শুনেছেন। তারপর সকলে আনন্দসহকারে প্যান্ডেলের ভিতর চেয়ারে বসে প্রসাদ পেয়েছেন।

উপরোক্ত উৎসব-অনুষ্ঠানাদি ছাড়া দুই মাসের সংক্ষিপ্ত সময়ের মধ্যে সারদা আশ্রমে আরও তিনটি অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়েছে পৃথগ্‌ভাবে—প্রতিটি এক-সপ্তাহব্যাপী। সোসাইটির একান্ত আগ্রহী ভক্তদের জন্য একটি 'Spiritual Retreat' বা সাধনশিবির অনুষ্ঠিত হয়। ঐ সময় ভগবদ্গীতার একাদশ অধ্যায় বিশদ্‌ভাবে আলোচনা করেন আশ্রম-অধ্যক্ষ স্বামী সর্বগতানন্দ। প্রতিদিন সকাল ও বিকালে ঘণ্টাদেড়েক ধরে তিনি এই ক্লাস নিয়েছেন। প্রতি ক্লাসের শেষে প্রশ্নোত্তরও থাকত। ভোর সাড়ে পাঁচটায় সকলে সমবেতভাবে কিছু সময় বেদপাঠ ও গীতা আবৃত্তির পর প্রায় ঘণ্টাখানেক জপ-ধ্যান করতেন। সন্ধ্যায় আরাত্রিক ভজনের পর পুনরায় জপ-ধ্যান চলত আধঘণ্টা। রাত্রিকালীন ভোজনের পর 'গস্‌পেল অব শ্রীরামকৃষ্ণ' থেকে কিছু অংশ পাঠ করা হতো। প্রায় ত্রিশজন ভক্ত এই ধর্মানুষ্ঠানে যোগ দিয়েছিলেন। তাঁদের মধ্যে কুড়িজনের থাকার ব্যবস্থা আশ্রমেই হয়েছিল; অন্যেরা শহরের নিজ নিজ বাড়ি থেকে প্রতিদিন যাতায়াত করতেন। এই সাধনশিবির বছরকয়েক যাবৎ চালু হয়েছে এবং প্রতি বছরেই তার জনপ্রিয়তা বাড়ছে।

আশ্রমের ভক্তদের মধ্যে যুবক-যুবতীদের (youth) জন্য একটি সপ্তাহব্যাপী শিবির এবং ছোট ছেলেমেয়েদের জন্য পৃথগ্‌ভাবে আরেকটি শিবির অনুষ্ঠিত হয়। এরা সকলেই বস্টন বা প্রভিডেন্স কেন্দ্রের সঙ্গে সংযুক্ত। বড়রা এখন অনেকেই উচ্চবিদ্যালয়ের পাঠ শেষ করে কলেজে পড়াশুনা করছে, কেউ কেউ চাকরিও করছে। এই বছর তাদের শিবিরে আলোচনার বিষয়বস্তু ছিল 'Spiritual living in daily life'। দশ-বারোজন ছেলেমেয়ে এই শিবিরে যোগদান করে। দৈনন্দিন নানাবিধ অনুষ্ঠানের প্রারম্ভে সকালে তাদের কিছু

সময় প্রার্থনা-সঙ্গীত গাওয়া এবং সন্ধ্যায় আরাত্রিক ভজনে যোগদান ও কিছুক্ষণ ধ্যানাভ্যাস করা আবশ্যিক ছিল। মধ্যাহ্নভোজনের পূর্বে বেলা বারোটা থেকে একটা পর্যন্ত স্বামী সর্বগতানন্দ তাদের জন্য একটি ক্লাস নিতেন। ছোটদের সংখ্যা ছিল জনা পনেরো। এদের মধ্যে একজন লন্ডন থেকে এসেছিল। তাদের সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা ও রন্ধনাদি কাজে সাহায্যের জন্য তাদেরই মা-বাবারা কয়েকজন নিযুক্ত ছিলেন। ছোটদের আলোচনার বিষয়বস্তু ছিল—'Friendship'। অন্যদিন ঐ একই সময়ে তাদের জন্য একটি ক্লাস নিতেন স্বামী সর্বগতানন্দ।

ছেলেমেয়েদের কাছে সবচেয়ে আকর্ষণীয় হলো আশ্রমের নিকটবর্তী সমুদ্রতট 'Humarock Beach'। দুপুরে আহারাদির পর সমুদ্রে স্নান করতে ও সাঁতার কাটতে মাইল খানেক দূরে এই বীচে প্রায় সকলেই যেত—গাড়িতে মাত্র তিন চার মিনিটের পথ। গ্রীষ্মকালে সমুদ্রের শীতল জল খুব আনন্দদায়ক; আর সমবয়সী সাথীদের সঙ্গে জলক্রীড়া উপভোগ্যও বটে। ছোটদের সবচেয়ে উপভোগ্য বস্তু আশ্রমের নানাবিধ ছোট-ছোট পাকা ফল—'ব্ল্যাকবেরি', 'ব্লুবেরি', 'স্ট্রবেরি' ইত্যাদি। আশ্রমের ছোট পদ্মপুকুরটি ('lotus pond') এদের কাছে কম আকর্ষণীয় নয়। সেখানে প্রস্ফুটিত পদ্ম ও শালুকের ফাঁকে রঙ-বেরঙের 'গোল্ড ফিস'-এর অবাধ বিচরণ এদের কাছে খুব মজার ব্যাপার।

আমেরিকার বাইরে থেকেও মাঝে মাঝে ভক্তরা আশ্রমে এসে কিছুদিন থাকেন। এবছর জন্মাষ্টমী উপলক্ষে ও তার পূর্বে আগত কানাডার জন কয়েক ভক্ত এবং সাধনশিবিরে যোগ দিতে আসা টরন্টো আশ্রমের এক ভক্ত-পরিবার সপ্তাহখানেক আশ্রমে কাটিয়ে গেলেন। দর্শকদের কাছে আকর্ষণীয় হলো 'Plymouth Rock'। মার্শফিল্ড থেকে এর দূরত্ব প্রায় দশ-বারো মাইল। ইতিহাসপ্রসিদ্ধ সমুদ্রতটের এই স্থানটিতে এক ইউরোপীয় অভিযাত্রীদল 'May flower' নামক জাহাজে প্রথম আটলান্টিক মহাসাগর পাড়ি দিয়ে ১৬২০ খ্রীস্টাব্দে আমেরিকার মাটিতে পদার্পণ করেছিলেন। আসল জাহাজটি কালের প্রভাবে বিনষ্ট হওয়ায় দর্শকদের মনস্তুষ্টির জন্য অনুরূপ আরেকটি জাহাজ 'May flower II' জলের ওপর ভাসমান রাখা হয়েছে। ঐ ইউরোপীয় অভিযাত্রীদল 'Pilgrims' নামে অভিহিত। আমেরিকার তৎকালীন বাসিন্দা 'আমেরিকান ইন্ডিয়ান'দের সঙ্গে এদের আচরণাদি ও সামাজিক অনুষ্ঠানাদি দেখিয়ে একটি 'Wax Museum' তৈরি হয়েছে সাম্প্রতিক কালে। বিদ্যুৎচালিত স্বয়ংক্রিয় মানবাকৃতি পুতুলের সাহায্যে সুন্দরভাবে সেগুলি দেখানো হয়েছে।

১৯৪৬ খ্রীস্টাব্দে স্থাপিত সারদা আশ্রম ইদানীং এত জাঁকিয়ে উঠলেও পূর্বে আশ্রমটি ব্যবহৃত হতো সাধারণতঃ বস্টন ও প্রভিডেন্স কেন্দ্রের সাধুকর্মীদের 'গ্রীষ্মকালীন আবাস' হিসাবেই। নিউইয়র্ক বেদান্ত সোসাইটি থেকে স্বামী পবিত্রানন্দ প্রায় প্রতিবছরই গরমের সময় এখানে এসে মাস-দুই কাটাতেন। শিকাগো থেকে স্বামী বিশ্বানন্দ ও সিয়াটল থেকে স্বামী বিবিদিষানন্দও মাঝে মাঝে এখানে এসে কিছুদিন থাকতেন। বর্তমান প্রেসিডেন্ট মহারাজ (শ্রীমৎ স্বামী ভূতেশানন্দজী মহারাজ) আশ্রমটি দেখে গেছেন বছর কয়েক পূর্বে। স্বামী নিত্যস্বরূপানন্দজীও (চিন্তাহরণ মহারাজ) এই আশ্রমে থেকে বক্তৃতো দিয়ে গেছেন কয়েক বছর আগে।

গরমের সময় আশ্রমটির যেমন সৌন্দর্য সারা বছর কিন্তু তেমন আর থাকে না। বিশেষ করে শীতের ছয়-সাত মাস এদিকে কেউ বড় একটা আসে না। বরফে অনেক সময় ঢাকা থাকে বনাঞ্চল। ঐ সময় চিরহরিৎ পাইনগাছগুলি ছাড়া কেবল কঙ্কালসার বৃক্ষরাজি দেখা যায়।

আমেরিকার বেদান্ত-আন্দোলন ধীরে ধীরে যেমন সম্প্রসারিত হচ্ছে, ভক্তদের আগ্রহ ও আন্তরিকতাও তত বাড়ছে। আর সঙ্গে সঙ্গে সাধুকর্মীদের বাড়ছে কর্মপ্রসারতার চাপ ও নতুন নতুন সমস্যাজনিত চিন্তাভাবনা।* □

* লেখক স্বামী সর্বাত্মানন্দ বস্টন রামকৃষ্ণ বেদান্ত সোসাইটির সহকারী অধ্যক্ষ।—যুগ্ম সম্পাদক

বিশেষ রচনা

# স্বামী বিবেকানন্দের ভারত-পরিক্রমা ও ধর্মমহাসম্মেলনের প্রস্তুতি-পর্ব

## স্বামী বিমলাত্মানন্দ

[ পূর্বানুবৃত্তি : অগ্রহায়ণ ১৩৯৯ সংখ্যার পর ]

পওহারী বাবার কাছে স্বামীজীর দীক্ষা গ্রহণের বাসনা এবং পরে সেই বাসনা ত্যাগের কি কোন বিশেষ তাৎপর্য আছে? স্বামী গম্ভীরানন্দ লিখেছেন : "হয়তো বা এইজন্যই অভিজ্ঞতার ভিতর দিয়া শ্রীরামকৃষ্ণ স্বামীজীর মুখে এই বাণী প্রচার করাইলেন যে, তাঁহাকে ছাড়িয়া আর অন্যত্র যাওয়া নিষ্প্রয়োজন।"[৫০]

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য, পরবর্তী কালে 'গাই গীত শুনাতে তোমায়' নামক বিখ্যাত কবিতায় স্বামীজী তাঁর মানসিক অবস্থার কথা অপূর্ব ভাষায় বর্ণনা করেছেন :

"গাই গীত শুনাতে তোমায়,
ভাল মন্দ নাহি গণি,
নাহি গণি লোকনিন্দা যশকথা।
দাস তোমা দোঁহাকার,
সশক্তিক নমি তব পদে।
আছ তুমি পিছে দাঁড়াইয়ে,
তাই ফিরে দেখি তব হাসিমুখ।

*

ছেলেখেলা করি তব সনে,
কভু ক্রোধ করি তোমা পরে,
যেতে চাই দূরে পলাইয়ে;
শিয়রে দাঁড়ায়ে তুমি রেতে,
নির্বাক আনন, ছল ছল আঁখি,
চাহ মম মুখপানে।
অমনি যে ফিরি, তব পায়ে ধরি,
কিন্তু ক্ষমা নাহি মাগি।
তুমি নাহি কর দোষ।
পুত্র তব, অন্য কে সহিবে প্রগল্‌ভতা?
প্রভু তুমি, প্রাণসখা তুমি মোর।"[৫১]

গাজীপুর থেকে স্বামীজী কাশী হয়ে বরানগর মঠে প্রত্যাবর্তন করেছিলেন ১৮৯০ খ্রীস্টাব্দের এপ্রিলের দ্বিতীয় সপ্তাহে। গাজীপুরে প্রথম আগমনকালে অথবা গাজীপুর ত্যাগকালে তাড়িঘাট স্টেশনে একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটে। এক ভোজনবিলাসী অবাঙালী ব্যবসায়ী স্বামীজীকে খুব ঠাট্টা-বিদ্রূপ করছিল। কপর্দকহীন, ক্ষুধার্ত ও বিশুষ্কবদন স্বামীজীকে দেখিয়ে দেখিয়ে সে পুরি, কচুরি, পেঁড়া, মিঠাই খেতে খেতে পয়সার ক্ষমতার মহিমা বর্ণনা করছিল : "দেখ হে, পয়সার কি ক্ষমতা। তুমি তো পয়সা-কড়ির ধার ধার না; তার ফলও দেখ; আর আমি পয়সা-কড়ি রোজগার করি, তার ফলও দেখ। এসব পুরি, কচুরি, পেঁড়া, মিঠাই কি আর বিনা পয়সায় হয়?" ঠিক সেসময় এক সাধারণ হালুইকর পুরি, তরকারি, মিঠাই, ঠাণ্ডা জল ইত্যাদি নিয়ে স্বামীজীর কাছে হাজির; স্বামীজীকে পীড়াপীড়ি করতে লাগল ঐ খাবার গ্রহণ করবার জন্য। স্বামীজী হতবাক, শ্লেষকারী ব্যবসায়ীও বিস্ময়ে হতবাক। স্বামীজী হালুইকরকে বারবার নিবৃত্ত করতে চাইলে হালুইকর তার স্বপ্নে দর্শন পাওয়া ইষ্ট শ্রীরামচন্দ্রের নির্দেশের কথা জানাল। বিস্মিত ও অভিভূত স্বামীজী তখন সেই খাবার গ্রহণ করলেন। বিদ্রূপকারী ব্যবসায়ীর চৈতন্যোদয় হলো। তাঁর বিশ্বাস হলো, স্বামীজী নিশ্চয় উচ্চকোটির মহাত্মা। অনুতপ্ত হৃদয়ে স্বামীজীর কাছে সে ক্ষমা ভিক্ষা করলো।[৫২]

স্বামীজী হালুইকরের হৃদয়বত্তার পরিচয় পেলেন। সেইসঙ্গে পেলেন ভারতের সাধারণ মানুষের সনাতন ধর্মবিশ্বাসের জ্বলন্ত পরিচয়। দেখলেন, ভারতের সাধারণ মানুষের ঈশ্বর-বিশ্বাস

৫০ যুগনায়ক বিবেকানন্দ, ১ম খণ্ড, পৃঃ ২৬২

৫২ যুগনায়ক বিবেকানন্দ, ১ম খণ্ড, পৃঃ ২৬৩-২৬৫

৫১ বাণী ও রচনা, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃঃ ২৭২-২৭৩

কী গভীর, তাদের ভগবদ্ভক্তি কত অকৃত্রিম। ধর্ম-পরায়ণ এই সাধারণ মানুষরাই ভারতের প্রাণ। এদের উন্নতিই জাতির উন্নতি। এসব চিন্তা স্বামীজীর মনে তখন থেকেই ঘুরপাক খাচ্ছিল।

॥ ৫ ॥

এপ্রিল থেকে জুলাই ১৮৯০-এর মধ্যভাগ পর্যন্ত স্বামীজী বরানগর মঠে ছিলেন। এই সময়ে তিনি স্থির করলেন সুদীর্ঘ প্রব্রজ্যা গ্রহণের। প্রিয় গুরু-ভ্রাতা স্বামী অখণ্ডানন্দ ভ্রমণে অভিজ্ঞ, বিশেষতঃ পাহাড়ী অঞ্চলে। তাঁকে সঙ্গীরূপে স্বামীজী নির্বাচিত করলেন। এই উদ্দেশ্যে স্বামীজী তাঁকে চিঠি লিখে মঠে আসতে বললেন। অখণ্ডানন্দজী নেতার আদেশ শিরোধার্য করে মধ্য-এশিয়া ভ্রমণ বন্ধ রেখে ছুটে এলেন বরানগর মঠে।

স্বামীজীর সেই সুদীর্ঘ প্রব্রজ্যার সংক্ষেপে একটি ব্যাখ্যা দিয়েছেন স্বামী গম্ভীরানন্দ। তিনি লিখেছেন: "উচ্চ প্রকৃতিসম্পন্ন ঈশ্বরকোটিরই সমুচিতরূপে তিনি (স্বামীজী) সর্বদা জগৎ বিস্মৃত হইয়া থাকিতে সচেষ্ট; আবার শ্রীরামকৃষ্ণের বার্তাকে লোককল্যাণার্থে নিয়োগ করার গুরুদায়িত্বও সর্বদাই তাঁহার হৃদয়ে জাগরূক থাকিয়া প্রতি মুহূর্তে তাঁহার অন্তর্মুখ মনকে বহির্জগতের দুঃখ-দারিদ্র্য প্রভৃতির বাস্তবতার প্রতি আকৃষ্ট করিতেছিল এবং অমনি তাঁহার করুণাবিগলিত হৃদয় প্রতিকারের উপায় আবিষ্কারের জন্য ব্যাকুল হইতেছিল।... তাঁহার জীবনের মহাব্রত পরিপালনের জন্য ভগবন্নির্দেশে হয়তো আরও বাস্তব অভিজ্ঞতা সঞ্চয়, আরও নিরালম্ব সাধনার প্রয়োজন ছিল; হয়তো দুই-চারিজন বন্ধুর সহায়তামাত্রের উপর মঠের ভিত্তি স্থাপিত না হইয়া বিরাট বিশ্বমানবের শুভেচ্ছার উপর উহার প্রতিষ্ঠা হওয়া আবশ্যক ছিল।... তাই উপায়ান্তর অন্বেষণ অত্যাবশ্যক। হয়তো এই জাতীয় কোন পরিকল্পনা লইয়া তিনি সুদীর্ঘ ভারতভ্রমণে নির্গত হওয়াই উচিত মনে করিলেন।"[৫৩]

সুদীর্ঘ পরিক্রমার পূর্বে স্বামীজী ও অখণ্ডা-নন্দজী বেলুড়ের কাছে ঘুষুড়িতে অবস্থানরত শ্রীশ্রীমায়ের আশীর্বাদ প্রার্থনা করতে গেলেন। স্বামীজী শ্রীশ্রীমায়ের চরণ বন্দনা করে বললেন: "মা! যে-পর্যন্ত শ্রীগুরুর ঈপ্সিত কার্য সম্পন্ন করিতে না পারি, সে-পর্যন্ত আর ফিরিয়া আসিব না; তুমি আশীর্বাদ কর যাহাতে আমার সংকল্প সিদ্ধ হয়।" শ্রীশ্রীমাও প্রাণখুলে আশীর্বাদ করলেন। স্বামীজীর হৃদয় এক দিব্যভাবে পূর্ণ হলো। তাঁর মনে হলো—তিনি এমন এক মহাশক্তিবলে বলীয়ান হলেন যা বাধা, বিপত্তি, সংশয়, দ্বন্দ্বে তাঁর হৃদয় অবিচলিত রাখবে; এমনকি মৃত্যুর বিভীষিকা পর্যন্ত তাঁকে সংকল্পচ্যুত করতে পারবে না।[৫৪] এইসঙ্গে শ্রীশ্রীমা অখণ্ডানন্দজীকে আদেশ দিলেন স্বামীজীর যথোচিত যত্নাদি নিতে।

১৮৯০ খ্রীষ্টাব্দের জুলাই-এর মধ্যভাগে স্বামীজী মঠ ত্যাগ করার পর ফিরে এসেছিলেন প্রায় সাত বছর পর।

স্বামীজী ও অখণ্ডানন্দজী ১৮৯০ খ্রীষ্টাব্দের আগস্ট মাসে ভাগলপুরে উপস্থিত হলেন। এখানে পরিচয় হলো কুমার নিত্যানন্দ সিংহ নামে এক ভদ্রলোকের সঙ্গে। প্রথম দর্শনেই কুমারসাহেব বুঝতে পেরেছিলেন, স্বামীজীরা সাধারণ সাধু নন, বিশেষতঃ এঁদের একজন অর্থাৎ স্বামীজী প্রতিভাবান। কুমারের গৃহশিক্ষক ব্রাহ্ম মন্মথ চৌধুরীর বাড়িতে স্বামীজী সাতদিন ছিলেন। স্বামীজী তাঁর বাগ্‌বৈভব ও বিশাল আধ্যাত্মিক জ্ঞানের সাহায্যে মন্মথনাথকে হিন্দুধর্মের প্রতি শ্রদ্ধাশীল করে তুলেছিলেন। এমনকি মন্মথবাবু রাধাকৃষ্ণলীলা সত্য বলে স্বীকারও করেছিলেন। এক-দিন স্বামীজী মহাত্মা পার্বতীচরণ মুখোপাধ্যায়কে এবং অন্য একদিন নাথনগরের জৈনমন্দির দেখতে গিয়েছিলেন। জৈন-আচার্যরা স্বামীজীর জৈন-দর্শনে পাণ্ডিত্য দেখে সন্তোষ প্রকাশ করেছিলেন। মন্মথবাবুর স্মৃতিকথায় এই কালে স্বামীজীর ভারত-চিন্তার কথা জানতে পারা যায়: "তিনি [স্বামীজী] যেসকল নূতন কথা বলিয়াছিলেন, তাহার মধ্যে দুইটি কথা আমার খুব মনে লাগিয়াছিল। 'প্রাচীন আর্যদের জ্ঞান, বুদ্ধি ও প্রতিভার যেটুকু এখনও অবশিষ্ট আছে, তাহা প্রায়শঃ সেসব জায়গায়ই

৫৩ যুগনায়ক বিবেকানন্দ, ১ম খণ্ড, পৃঃ ২৬৯-২৭০

৫৪ বিবেকানন্দ চরিত—সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার, ১৩৯৩, পৃঃ ৭৫

পাওয়া যায় যাহা গঙ্গাতীরের সন্নিকটে অবস্থিত। গঙ্গা হইতে যত দূরে যাওয়া যায় ততই সেগুলি কমিতে থাকে। এই বিষয়টা লক্ষ্য করলেই প্রাচীন শাস্ত্রে যে গঙ্গামাহাত্ম্য কীর্তিত হইয়াছে তাহাতে বিশ্বাস জন্মে।' 'নিরীহ হিন্দু—এই কথাটাকে একটা গালি হিসাবে না ধরিয়া বরং আমাদের চরিত্রের মহত্ব প্রকাশ করিতেছে বলিয়া আমাদের গৌরব-খ্যাপক বলিয়াই ধরা উচিত'।"[৫৫] কুমারসাহেবের আরেক গৃহশিক্ষক মথুরানাথ সিংহ (পরবর্তী কালে পাটনা হাইকোর্টের বিখ্যাত উকিল) ভাগলপুরে স্বামীজীর অবস্থানের স্মৃতিচারণ করেছেন: "তাঁহার সহিত আমার অনেক বিষয়ে—যথা সাহিত্য, দর্শন ও ধর্ম, বিশেষতঃ শেষোক্ত দুই বিষয়ে অনেক চর্চা হয়। আমার মনে হইয়াছিল, বিদ্যা ও দর্শন যেন তাঁহার নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসের সঙ্গে মিশিয়া আছে। আমি বুঝিতে পারিলাম, তাঁহার উপদেশের মূলে কথা ছিল এক সুগভীর স্বার্থলেশশূন্য দেশপ্রেম, এবং উহারই মিশ্রণে তিনি বক্তব্যগুলি জীবন্ত করিয়া তুলিতেন। ইহা ছিল তাঁহার চরিত্রের শাশ্বত রূপ। আমি যখন শিকাগো ধর্মমহাসভায় তাঁহার সাফল্যের সংবাদ পাঠ করিলাম, তখন মনে হইল, এতদিনে ভারত তাঁহার প্রকৃত নেতাকে পাইয়াছে।"[৫৬]

ভাগলপুর থেকে স্বামীজী ও অখণ্ডানন্দজী বৈদ্যনাথধামে যান। সেখানে তাঁরা সুবিখ্যাত ব্রাহ্ম-ধর্মপ্রচারক রাজনারায়ণ বসুর সঙ্গে সাক্ষাৎ ও আলোচনা করেছিলেন।

বৈদ্যনাথধাম থেকে স্বামীজী কাশীধাম ও অযোধ্যা দর্শন করে উপস্থিত হলেন তাঁর চির-আকাঙ্ক্ষিত নগাধিরাজ হিমালয়ের ক্রোড়ে। প্রথমে থামলেন নৈনীতালে। সেখানে বাবু রমাপ্রসন্ন [ইংরেজী জীবনী অনুসারে রামপ্রসন্ন] ভট্টাচার্যের বাড়িতে তাঁরা ছয়দিন ছিলেন। নৈনীতাল থেকে স্বামীজীরা যান আলমোড়ায়। তাঁদের উদ্দেশ্য ছিল বদরীনারায়ণ দর্শন। আলমোড়াতে পথ চলতে চলতে একদিন স্বামীজী একাকী বনের মধ্য দিয়ে যেতে চাইলেন। অখণ্ডানন্দজীকে নির্দেশ দিলেন হাঁটাপথে যেতে। অখণ্ডানন্দজী লিখেছেন: "কিছুদূরে গিয়ে স্বামীজীর সঙ্গে দেখা, দেখি স্বামীজী একা—কিন্তু হাসছেন, কার সঙ্গে যেন কথা কইছিলেন, চোখে মুখে কি এক আনন্দের ভাব। জিজ্ঞেস করলাম, 'ভাই, কার সঙ্গে কথা কইছিলে?' তিনি চুপ করে শুধু মুখ টিপে হাসতে লাগলেন।"[৫৭] আরেকদিন ঐভাবে যেতে যেতে স্বামীজী অখণ্ডানন্দজীকে বললেন: "তুই রাস্তা দিয়ে যা, আমি একটু বনের ভিতর দিয়ে গিয়ে ওধারে তোর সঙ্গে মিলব।" স্বামীজীর কথামত কিছুদূর গিয়ে অখণ্ডানন্দজী বনে প্রবেশ করে দেখলেন, বনের মধ্যে এক জায়গায় বেশ ফুল ফুটে আছে—চারিদিক সুগন্ধে আমোদিত। সেখানে শ্রীশ্রীঠাকুর ও স্বামীজী আলিঙ্গনাবদ্ধ। নীরবে এই দৃশ্য দেখে অখণ্ডানন্দজী আনন্দে পরিপূর্ণ হলেন।[৫৮]

আলমোড়ার পথে পানচাকিতে এক নির্ঝরিণীর ধারে এক বিরাট অশ্বত্থবৃক্ষের তলায় স্বামীজী ধ্যানে বসলেন। ধ্যানভঙ্গের পর স্বামীজী অখণ্ডানন্দজীকে বললেন: "দ্যাখ গঙ্গাধর, এই বৃক্ষতলে একটা মহা শুভমুহূর্ত কেটে গেল, আজ একটা বড় সমস্যার সমাধান হয়ে গেল। বুঝলাম, সমষ্টি ও ব্যষ্টি (বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড ও অণু-ব্রহ্মাণ্ড) একই নিয়মে পরিচালিত।"[৫৯] এই অপূর্ব অনুভূতির কথা স্বামীজী ডায়েরীতে লিখে রাখেন। অখণ্ডানন্দজী পরে দেখেছিলেন, স্বামীজী ডায়েরীতে লিখেছেন: "আমি (স্বামীজী) আজ ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ড ও বিরাট ব্রহ্মাণ্ডের একাত্মতা অনুভব করিয়াছি, বিশ্বের যাকিছু সব এই ক্ষুদ্র দেহমধ্যে আছে। দেখিলাম প্রতি পরমাণুর মধ্যে বিশ্বসংসার বিদ্যমান।"[৬০]

[ক্রমশঃ]

৫৫ যুগনায়ক বিবেকানন্দ, ১ম খণ্ড, পৃঃ ২৭৫ ৫৬ ঐ, পৃঃ ২৭৭

৫৭ স্মৃতির আলোয় স্বামীজী, পৃঃ ১৭ ৫৮ স্বামী অখণ্ডানন্দ—স্বামী অন্নদানন্দ, ২য় সং, ১৩৮০, পৃঃ ৬৮

৫৯ যুগনায়ক বিবেকানন্দ, ১ম খণ্ড, পৃঃ ২৮০

৬০ স্বামী বিবেকানন্দ—প্রমথনাথ বসু, ৪র্থ সং, ১৯৮৫, পৃঃ ১৫১

পরমপদকমলে

# স্বামীজীর ভারত-পরিভ্রমণের প্রেক্ষাপট

## সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়

[ পূর্বানুবৃত্তি : অগ্রহায়ণ ১৩৯৯ সংখ্যার পর ]

॥ ৩ ॥

তিনটি আবিষ্কার। ঠাকুরকে, নিজেকে ও ভারতকে। পরিব্রাজক স্বামীজীর তিনটি নতুন উপলব্ধি। রাজস্থান, উত্তরপ্রদেশ এবং মহারাষ্ট্র। ভারতের এই তিনটি অঞ্চলে তিনটি সত্য তিনি উচ্চারণ করেছিলেন। আমাদের ধর্মের নির্দেশ—সন্ন্যাসী ভারতের চারপ্রান্ত পরিভ্রমণ করবেন। দেশাচার, লোকাচার, ধর্মাচার জানবেন। জানবেন ভারতভূমির মহত্ব। দেখবেন, 'বিবিধের মাঝে' কেমন করে আছে 'মিলন মহান'। ধর্মের ভিত্তিভূমি হলো জ্ঞান। প্রকৃত ধার্মিক হলেন প্রকৃত বিজ্ঞানী। শিক্ষাই সবচেয়ে বড় কথা। আগে শিক্ষা, তারপর ধর্ম। স্বামীজীর পরিকল্পনাটি ছিল এই রকম—প্রথম ভূমি হলো চরিত্র। চাকরি অথবা ব্যবসায় সৎ থাকা অসম্ভব। নিজেকে বিকিয়ে দিলে মহৎ কিছু, বড় কিছুর ধারণা করা অসম্ভব। তাহলে পথ কী? সৎ থাকব, জীবিকাও অর্জন করব। পরিব্রাজক স্বামীজী বলছেন : "চরিত্র বজায় রেখে অর্থ উপার্জন করতে কেউ বড় চায় না, এবিষয়টা নিয়ে কেউ ভাবে না, কারুর মনে একটা সমস্যা উঠে না। আমাদের শিক্ষার দোষেই এটা দাঁড়িয়েছে। যাহোক আমি তো ভেবেচিন্তে চাষবাস করাটা বড়ই ভাল মনে করছি। চাষবাসের কথা বললেই এখন মনে হয় তবে লেখাপড়া কেন শিখলাম। চাষবাসের কথা বললেই প্রথমে মনে হয় দেশসুদ্ধ লোককে কি আবার চাষা হয়ে দাঁড়াতে হবে। দেশসুদ্ধ লোক তো চাষা আছেই, তাই না আমাদের এত দুর্গতি। তা নয়, মহাভারত পড়ে দেখ—জনক ঋষি এক হাতে লাঙ্গল দিচ্ছেন, আরেক হাতে বেদ অধ্যয়ন করছেন। আমাদের দেশের ঋষিরা সকলেই ঐ কাজ করেছেন। আবার আজকাল দেখ, আমেরিকা চাষবাস করেই এত বড় হয়েছে। নেহাত চাষাড়ে বুদ্ধিতে চাষবাস নয়, বিদ্বান ও বুদ্ধিমানের বুদ্ধিতে করতে হবে।"[১] বলছেন, চরিত্র বজায় রেখে জীবিকার পথ হলো চাষবাস। যে-মানুষ থাকে মাটির কাছাকাছি, সে অনেক খাঁটি। দ্বিতীয় কর্তব্য হলো, শিক্ষিতের সঙ্গে অশিক্ষিতের নিয়ত মেলামেশা। সে যেন পরশ-পাথরের ছোঁয়া। পরিব্রাজক স্বামীজীর লব্ধ জ্ঞান। যেখানেই গেছেন শিক্ষিত, অশিক্ষিত মানুষ ভিড় করে এসেছে। তারা শুনতে চায়, জানতে চায়। নলেজ, দ্য ইটারন্যাল থার্স্ট। আলোয়ারের মহারাজের কাছে স্বামীজীর আতিথ্য স্বীকারের প্রধান শর্তই ছিল ধনী, দরিদ্র, মূর্খ বা পণ্ডিত নির্বিশেষে সকল শ্রেণীর মানুষকে তাঁর কাছে অবাধে আসতে দিতে হবে। এই মিলনের ফল কি? সুদূরপ্রসারী ফল। স্বামীজী আলোয়ারবাসী তাঁর শিক্ষিত শিষ্যকে বলছেন : "এই ছোটজাত আর বড়জাতের মধ্যে একটা ভাই-ভাই ভাবে মেশামেশি হয়। যদি তোমাদের মতো লোকেরা কিছু লেখাপড়া শিখে পল্লীগ্রামে থেকে চাষবাস করে, আর চাষালোকের সঙ্গে আপনার মতো ব্যবহার করে, ঘৃণা না করে, তাহলে দেখবে তারা এতই বশীভূত হয়ে পড়বে যে, তোমার জন্য প্রাণ দিতে প্রস্তুত হবে। যেটা আমাদের এখন অত্যাবশ্যক—জনসাধারণকে শিক্ষা দেওয়া—ছোটজাতের মধ্যে ধর্মের উচ্চ উচ্চ ভাব দেওয়া, পরস্পর সহানুভূতি, ভালবাসা, উপকার করতে শেখানো, তাও অতি অল্প আয়াসেই আয়ত্ত হবে।"

শিষ্য প্রশ্ন করছেন : "সে কেমন করে হবে?"

স্বামীজী বলছেন : "কেন, দেখ না পল্লীগ্রামে ছোটজাতের সঙ্গে একটু মেশামেশি করলে তারা কেমন আগ্রহের সহিত ভদ্রলোকের সঙ্গ করতে চায়। জ্ঞানপিপাসা যে সকল মানুষের ভেতর রয়েছে, তাই না তারা একজন ভদ্রলোক পেলে তাঁকে ঘিরে

১ স্বামী বিবেকানন্দ—প্রমথনাথ বসু, ১ম খণ্ড, ৪র্থ সং, ১৯৮৫, পৃ: ১৪৭-১৪৮

বসে, আর তাঁর কথা গিলতে থাকে। তাঁরা সেই সুযোগে যদি নিজের বাড়িতে ঐ রকম তাদের সব জড় করে সন্ধ্যার সময় গল্পচ্ছলে শিক্ষা দিতে আরম্ভ করেন, তাহলে রাজনৈতিক আন্দোলন করে হাজার বৎসরে যা না করতে পারা যাবে, তার শতগুণ বেশি ফল দশ বৎসরে হয়ে পড়বে।"[২]

চরিত্র, শিক্ষা, সৎ জীবিকা—এই তিনের সমন্বয়ে তৈরি হবে উদার ভারত। যে-ভারতে বর্ণ-বৈষম্য, জাতিভেদ থাকবে না, কুসংস্কার থাকবে না, শোষণ থাকবে না। সেই দূর অতীতে বসে স্বামীজী সর্বকালের সত্যটি বলে গেলেন—রাজনীতি শোষণ-মুক্ত সাম্যবাদ আনতে পারবে না। শহরের শিক্ষিত মানুষকে গ্রামে যেতে হবে অহঙ্কার বিসর্জন দিয়ে। এছাড়া আর কোন পথ নেই।

সন্ন্যাসী বিবেকানন্দ ধর্মবিকাশের আগে মানব-বিকাশের পথটি দেখতে পেলেন। আধুনিক ভারতের মানুষ কেমন? স্বামীজী বলছেন: "The people are neither Hindus, nor Vedantists. They are merely don't-touch-ists; the kitchen is their temple, and Handi Bartans (cooking pots) are their Devata (object of worship). This state of things must go. The sooner it is given up, the better for our religion. Let the Upanishads shine in their glory, and at the same time let not quarrels exist among the different sects।"[৩]

[মানুষ (এখন) হিন্দুও নয়, বৈদান্তিকও নয়, তারা শুধুই ছুঁৎমার্গী; রান্নাঘর তাদের মন্দির এবং ভাতের হাঁড়ি তাদের দেবতা। এই অবস্থা দূর করতে হবে। যত শীঘ্র তার শেষ হয়, ততই মঙ্গল। উপনিষদ্‌সমূহ নিজ মহিমায় উদ্ভাসিত হোক এবং ঐসঙ্গে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে বিবাদ-বিসংবাদ যেন না থাকে।]

এই পরিক্রমায় স্বামীজী ভারত-আবিষ্কারের আগে বা সঙ্গে সঙ্গে নিজেকেও আবিষ্কার করলেন। তারও আগে তিনি আবিষ্কার করলেন গুরু শ্রীরামকৃষ্ণের অসাধারণ শক্তি। কোন্ শক্তিবলয়ে তাঁর অবস্থান! উপলক্ষ হলেন পওহারী বাবা। দক্ষিণেশ্বরের বাগানে স্বামীজী পওহারী বাবার কথা শুনেছিলেন মহাত্মা কেশবচন্দ্র সেনের মুখে। তিনি মহাপুরুষের সন্ধানে সারা ভারত ভ্রমণকালে গাজীপুরে এই মহাত্মার সন্ধান পেয়েছিলেন। সেই সময় থেকেই স্বামীজীর ইচ্ছা হয়েছিল মহাত্মাকে দর্শন করবেন। স্বামীজী তাঁর কাছে একবার গিয়েছিলেন না দুবার —এই সম্পর্কে মতভেদ আছে। উঁচু পাঁচিল-ঘেরা উদ্যানে এক গুহায় এই মহাপুরুষ থাকতেন। কারোকে দর্শন দিতেন না। অন্তরালে থেকে কথা বলতেন। অনেকবারের প্রয়াসে স্বামীজী তাঁর দর্শন পেলেন। চাক্ষুষ দর্শন নয়। কণ্ঠস্বর শুনলেন। আলাপ আলোচনার সুযোগ হলো।

পওহারী বাবা স্বামীজীকে বলেছিলেন: "যন্ সাধন তন্ সিদ্ধি।"

স্বামীজী জিজ্ঞেস করলেন: "তিতিক্ষা ক্যায়সে বনে?"

পওহারী বাবা বললেন: "গুরুকা ঘরমে গোকা মাফিক পড়া রহো।"

স্বামীজী মুগ্ধ হলেন। আরও মুগ্ধ হলেন যখন দেখলেন পওহারী বাবার গুহাতে পরমহংসদেবের একটি ফটো। ছবিটি স্বামীজীকে দেখিয়ে তিনি বলেছিলেন: "ইনি সাক্ষাৎ ভগবানের অবতার।" স্বামীজী সিদ্ধান্ত করলেন, পওহারী বাবার কাছে দীক্ষা নেবেন। এই ইচ্ছার দুটি কারণ। প্রথম কারণ, পওহারী বাবা হঠযোগে সিদ্ধ। একাসনে দীর্ঘকাল সমাধিস্থ থাকেন। প্রকৃতির শাসনমুক্ত সিদ্ধযোগী। একটা নতুন পথ, নতুন সাধনপদ্ধতি। সত্যান্বেষী স্বামীজী পথটা দেখতে চান। সমাধির ওপর তাঁর নিজের একটা আগ্রহ ছিলই। দ্বিতীয় কারণ, স্বামীজী ঐ সময় কোমরের বাত ও অজীর্ণ রোগে ভুগছিলেন। হঠযোগে শরীর রোগমুক্ত হয় স্বামীজীর এইরকম বিশ্বাস ছিল। বাবাজী স্বামীজীকে দীক্ষা দিতে রাজি হলেন। এরপরেই অদ্ভুত সব ঘটনা ঘটতে লাগল। বাবাজীর গুহার দিকে যাবেন বলে স্বামীজী উঠলেন, অমনি কে

২ স্বামী বিবেকানন্দ, ১ম খণ্ড, পৃঃ ১৮৮-১৮৯

৩ Complete Works of Swami Vivekananda, Vol. III, 1973, p. 439

যেন পিছন থেকে তাঁকে টেনে ধরল। পা আর চলে না। সমস্ত শরীর পাথরের মতো ভারি আর অবশ। স্বামীজী অবাক। এ আবার কি! এ কেমন পরীক্ষা! তবু দীক্ষাগ্রহণের সংকল্প তিনি ছাড়লেন না। দিনও স্থির হয়ে গেল। স্বামীজী সেই সময় পওহারী বাবার উদ্যানের অদূরে এক লেবুবাগানে অবস্থান করছিলেন। ভিক্ষা ও লেবুর রস—এই ছিল জীবনধারণের উপায়। দীক্ষার পূর্বরাত্রে নির্জন লেবুবাগানে খাটিয়ায় শুয়ে আছেন। ছোট্ট একটা ঘর। হঠাৎ সমস্ত ঘর আলোয় উদ্ভাসিত হলো। সামনেই দাঁড়িয়ে আছেন পরমহংসদেব। অদ্ভুত পবিত্র মূর্তি। স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছেন স্বামীজীর দিকে। সেই চোখে কতই স্নেহ, কতই করুণা! ঠাকুর তাকিয়ে আছেন অপলকে। সেই করুণ চোখ দেখে স্বামীজী আর স্থির থাকতে পারলেন না। মনে অপরাধবোধ। নিজেকে প্রশ্ন করলেন: "আমি কি অবিশ্বাসী! আমি কি কৃতঘ্ন!" তিনি ঘামছেন, সারা শরীর কাঁপছে। প্রায় আর্তনাদের স্বরে তিনি বলছেন: "না, না, তা কখনই হবে না। রামকৃষ্ণ ব্যতীত আর কেউ এ-হৃদয়ে স্থান পাবে না। প্রভু, দাস চিরদিন তোমারই চরণে বিক্রীত, আর কারো কাছে নয়। জয় রামকৃষ্ণ, জয় রামকৃষ্ণ!"

দীক্ষাগ্রহণের সংকল্প দুয়েক দিনের জন্য পিছলো। কিন্তু পরীক্ষা ছাড়া তো স্বামীজীর বিজ্ঞানী মন শান্ত হবার নয়। ঐ দর্শন তো 'হ্যালুসিনেশন' হতে পারে। চিন্তার বিভ্রম। অপরাধবোধ থেকে জাত। অতএব পরীক্ষা। শ্রীরামকৃষ্ণদেবের মূর্তিকে সরিয়ে পওহারী বাবার ধ্যান করবেন আসনে বসলেন। আবার ঠাকুরের আবির্ভাব। পরপর পাঁচ-ছয়দিন[৪] এই একই ব্যাপার ঘটল। শ্রীরামকৃষ্ণদেব কাঁদো কাঁদোভাবে দাঁড়িয়ে আছেন। স্বামীজীর দীক্ষা নেবার বাসনা ঘুচে গেল। বাবাজী অবশ্য দীক্ষাদানে খুবই আগ্রহী ছিলেন। স্বামীজীর মন তখন ঘুরে গেছে।[৫] স্বামীজী বলছেন: "এখন সিদ্ধান্ত এই যে—রামকৃষ্ণের জুড়ি আর নাই। সে অপূর্ব সিদ্ধি, আর সে অপূর্ব অহেতুকী দয়া, সে intense sympathy বদ্ধজীবনের জন্য—এজগতে আর নাই। হয়, তিনি অবতার—যেমন তিনি নিজে বলিতেন, অথবা বেদান্তদর্শনে যাঁহাকে নিত্যসিদ্ধ মহাপুরুষ 'লোকহিতায় মুক্তোঽপি শরীরগ্রহণকারী' বলা হইয়াছে। নিশ্চিত নিশ্চিত ইতি মে মতিঃ, এবং তাঁহার উপাসনাই পাতঞ্জলোক্ত 'মহাপুরুষ-প্রণিধানাদ্বা'।"[৬]

গাজীপুর স্বামীজীকে এই অভ্রান্ত সত্যে উপনীত হতে সাহায্য করেছিল। ঠাকুরের এও এক লীলা। বিচলিত করে চালিত করা। একটু টলিয়ে দিয়ে অটল করা। ঠাকুর যেমন বলতেন, যার টল আছে তার অটলও আছে। স্বামীজী প্রমাণ পেলেন, যা ঘটছে সব তাঁরই ইচ্ছায় ঘটছে। তিনি ধরে আছেন হাত। সেই মূর্তি, সেই পবিত্র জীবন যিনি কখনো কারও অমঙ্গল চিন্তা করেননি, কারও উদ্দেশে নিন্দা-অভিশাপ বর্ষণ করেননি। স্বামীজী বলছেন:

"Those lips never cursed any one, never even criticised any one. Those eyes were beyond the possibility of seeing evil, that mind had lost the power of thinking evil. He saw nothing but good. That tremendous purity, that tremendous renunciation is the one secret of spirituality."[৭]

(তাঁর মুখ থেকে কখনো কারও প্রতি অভিশাপ বর্ষিত হয়নি; এমনকি তিনি কারও সমালোচনা পর্যন্ত করতেন না। তাঁর দৃষ্টি মন্দ দেখার শক্তি হারিয়েছিল, তাঁর মন সবরকম কুচিন্তার সামর্থ্যও হারিয়েছিল। তিনি ভাল ছাড়া আর কিছু দেখতেন না। সেই মহাপবিত্রতা, মহাত্যাগই

৪ স্বামীজীর নিজের কথা অনুসারে—"উপর্যুপরি একুশ দিন"। দ্রঃ বাণী ও রচনা, ৯ম খণ্ড, ১ম সং, পৃঃ ২০২ —যুগ্ম সম্পাদক, উদ্বোধন

৫ স্বামী বিবেকানন্দ, ১ম ভাগ, পৃঃ ১৫২-১৫৪

৬ বাণী ও রচনা, ৬ষ্ঠ খণ্ড, ১ম সং, পৃঃ ৩২০-৩২১

৭ 'Complete Works', Vol. IV, 1972, p. 183

আধ্যাত্মিকতার মূল রহস্য।)

স্বামীজীকে এই পরিভ্রমণকালে শিষ্য হরিপদ মিত্র একটি প্রশ্ন করেছিলেন। স্বামীজী তখন বেলগাঁও-এ। হরিপদবাবু জিজ্ঞেস করছেন: "আপনি এত রাজা-মহারাজাদের সঙ্গে মেলামেশা করেন কেন?" অতিশয় উদ্ধত প্রশ্ন। বেলগাঁও-এ স্বামীজী হরিপদবাবুর আস্তানায় কিছুকাল ছিলেন। স্বামীজীকে তিনি অদ্ভুত অদ্ভুত প্রশ্ন করতেন। এর আগে একদিন খোঁচামারা প্রশ্ন করেছিলেন: "সাধু-সন্ন্যাসীরা কেন হৃষ্টপুষ্ট হবেন!" যেন শীর্ণতাই সাধু হবার প্রথম লক্ষণ! স্বামীজীর চেহারার প্রতি ইঙ্গিত। স্বামীজী দৃপ্ত-কণ্ঠে বললেন: "এই শরীরটা আমার ফেমিন ইনসিওরেন্স ফান্ড। যদি পাঁচ-সাতদিন খেতে না পাই তবু আমার চর্বি আমাকে জীবিত রাখবে। তোমরা একদিন না খেলেই সব অন্ধকার দেখবে। আর যে-ধর্ম মানুষকে সুখী করে না, তা বাস্তবিক ধর্ম নয়, ডিসপেপসিয়া-প্রসূত রোগবিশেষ বলে জেনো।" রাজা-মহারাজার সঙ্গে মেলামেশা সম্পর্কে স্বামীজী বললেন: "হাজার হাজার দরিদ্র লোককে উপদেশ দিয়ে সৎকার্য করাতে পারলে যে-ফল হবে, একজন শ্রীমান রাজাকে সেই দিকে আনতে পারলে তার চেয়ে কত বেশি ফল হবে ভাব দেখি। গরিব প্রজার ইচ্ছে থাকলেও সৎকার্য করবার ক্ষমতা কোথায়? কিন্তু রাজার হাতে সহস্র সহস্র প্রজার মঙ্গলবিধানের ক্ষমতা পূর্ব থেকেই রয়েছে, কেবল তা করবার ইচ্ছে নেই। সেই ইচ্ছে যদি কোনভাবে তার ভিতর জাগিয়ে দিতে পারি, তাহলে তার সঙ্গে সঙ্গে তার অধীনস্থ সকল প্রজার অবস্থা ফিরে যাবে এবং জগতের কত বেশি কল্যাণ হবে।"[৮] ভারতের সমাজকে, ভারতের দরিদ্র জনসাধরণকে, ভারতের রাজন্যবর্গ ও ধনীসমাজকে তাঁর দেখা ছিল। সমাজের প্রকৃত কল্যাণ কিভাবে সাধিত হতে পারে তার উপায়ও তাঁর জানা ছিল। আমেরিকা থেকে ফিরে এসে তাঁর মাদ্রাজ বক্তৃতায় সমাজ-সংস্কারকদের উদ্দেশে স্বামীজী বলেছিলেন: "They want to reform only little bits. I want root-and-branch reform. Where we differ is in the method. Theirs is the method of destruction, mine is that of construction. I do not believe in reform; I believe in growth."[৯]

(ওঁরা একটু-আধটু সংস্কার করতে চান। আমি চাই আমূল সংস্কার। আমাদের প্রভেদ কেবল সংস্কার-প্রণালীতে। তাঁদের প্রণালী ভেঙেচুরে ফেলা, আমার প্রণালী সংগঠন। আমি সাময়িক সংস্কারে বিশ্বাসী নই, আমার বিশ্বাস স্বাভাবিক উন্নতিতে।)

স্বামীজী চেয়েছিলেন কাজ। কাজ অর্থে কোন্ কাজ? ধর্মপ্রচার অবশ্যই নয়। জল থেকে টেনে তোলার কাজ—'Like the drowning boy and the philosopher'। ছেলেটা জলে পড়ে হাবুডুবু খাচ্ছে, দার্শনিক তীরে দাঁড়িয়ে বক্তৃতা, উপদেশ ইত্যাদি বর্ষণ করছেন। নিমজ্জমান বলছে, আগে টেনে তুলুন মশাই, তারপর জ্ঞান দেবেন। দেশের মানুষও এখন হাত জোড় করে বলছে: "We have had lectures enough, societies enough, papers enough; where is the man who will lend us a hand to drag us out? Where is the man who really loves us? Where is the man who has sympathy for us?"[১০]

(আমরা যথেষ্ট বক্তৃতা শুনেছি, অনেক সমিতি দেখেছি, ঢের কাগজ পড়েছি; এখন আমরা এমন লোক চাই, যিনি আমাদের হাত ধরে এই মহাপঙ্ক থেকে টেনে তুলতে পারেন। এমন লোক কোথায়? এমন লোক কোথায়, যিনি আমাদের প্রকৃতই ভালবাসেন? এমন লোক কোথায়, যিনি আমাদের প্রতি সহানুভূতি-সম্পন্ন?)

স্বামীজী তাঁর ভারত-পরিক্রমার সময় দেখেছিলেন ভারতের ডুবন্ত অবস্থা। সেই অবস্থা থেকে কি করে ভারতকে তুলবেন সেই চিন্তা তাঁকে গ্রাস করে নিয়েছিল। [ক্রমশঃ]

৮ স্মৃতির আলোয় স্বামীজী—স্বামী পূর্ণাত্মানন্দ (সম্পাদনা), ১৯৯১, পৃঃ ৭৮-৭৯
৯ 'Complete Works', Vol. III, p. 213
১০ Ibid, p. 215

শ্রীমদ্‌বিদ্যারণ্যবিরচিতঃ

# জীবন্মুক্তিবিবেকঃ

## বঙ্গানুবাদঃ স্বামী অলোকানন্দ

[ পূর্বানুবৃত্তিঃ গত শ্রাবণ ১৩৯৯ সংখ্যার পর ]

শারীরব্রাহ্মণেঽপি বিদ্বৎসন্ন্যাসবিবিদিষাসন্ন্যাসৌ স্পষ্টং নির্দিষ্টৌ।

"এতমেব বিদিত্বা মুনির্ভবত্যেতমেব প্রব্রাজিনো লোকমিচ্ছন্তঃ প্রব্রজন্তি" ইতি। মুনিত্বং মনন-শীলত্বং তচ্চাসতি কর্তব্যান্তরে সম্ভবতীত্যর্থাৎ সন্ন্যাস এবাভিধীয়তে। এতচ্চ বাক্যশেষে স্পষ্টী-কৃতম্।

### অন্বয়

শারীরব্রাহ্মণে অপি (শরীর ব্রাহ্মণেও) বিদ্বৎ সন্ন্যাস-বিবিদিষাসন্ন্যাসৌ (বিদ্বৎ ও বিবিদিষা-সন্ন্যাস), স্পষ্টং (স্পষ্টভাবে), নির্দিষ্টৌ (নির্দিষ্ট হয়েছে)।

এতম্ এব (এই আত্মাকেই), বিদিত্বা (জেনে), মুনিঃ ভবতি (জীবন্মুক্ত হয়), এতম্ লোকম্ এব (এই আত্মলোককে), ইচ্ছন্তঃ (ইচ্ছা করে), প্রব্রাজিনঃ (সন্ন্যাসীরা), প্রব্রজন্তি (সন্ন্যাস অব-লম্বন করেন)। মুনিত্বং (মুনিত্ব), মননশীলত্বম্ (মননশীলতাই), তৎ চ (তা-ও), কর্তব্যান্তরে অসতি (অন্য কর্তব্য না থাকলে), সম্ভবতি (সম্ভবপর হয়), ইতি (এরূপ), অর্থাৎ (অর্থাৎ), সন্ন্যাস এব (সন্ন্যাসই), অভিধীয়তে (নির্দিষ্ট হয়)। এতৎ চ (এটাই), বাক্যশেষে (শ্রুতিবাক্যের শেষে), স্পষ্টীকৃতম্ (স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে)।

### বঙ্গানুবাদ

শরীর ব্রাহ্মণে অর্থাৎ বৃহদারণ্যক উপনিষদের চতুর্থ অধ্যায়ে বিদ্বৎ ও বিবিদিষা এই উভয় প্রকার সন্ন্যাস স্পষ্টভাবে নির্দিষ্ট হয়েছে।—

"এই আত্মাকে জেনেই জীবন্মুক্ত হয়। এই আত্মলোককে ইচ্ছা করেই সন্ন্যাসীরা সন্ন্যাস অব-লম্বন করেন।" (বৃহদারণ্যক উপনিষদ্, ৪।৪।২২)

মুনিত্ব হলো মননশীলতা। তা-ও অন্যপ্রকার কর্তব্য না থাকলে সম্ভবপর হয় অর্থাৎ সর্বপ্রকারে সন্ন্যাসই নির্দিষ্ট হয়, শ্রুতিবাক্যের শেষে স্পষ্ট-ভাবে তা বলা হয়েছে।

"এতদ্ধ স্ম বৈ তৎপূর্বে বিদ্বাংসঃ প্রজাং ন কাময়ন্তে কিং প্রজয়া করিষ্যামো যেষাং নোঽয়-মাত্মাঽয়ং লোক ইতি তে হ স্ম পুত্রৈষণায়াশ্চ বিত্তৈষণায়াশ্চ লোকৈষণায়াশ্চ ব্যুত্থায়াথ ভিক্ষাচর্যং চরন্তি" ইতি। অয়ং লোক ইত্যপরোক্ষেণানুভূয়ত ইত্যর্থঃ।

### অন্বয়

তৎ এতৎ হ (সেই এই সন্ন্যাস বিষয়ে), যেষাম্ নঃ (যে আমাদের পক্ষে), অয়ম্ আত্মা অয়ম্ লোকঃ (এই আত্মাই সেই অভিপ্রেত ফল), প্রজয়া (সন্তান দ্বারা), কিম্ (কি) করিষ্যামঃ (করব), ইতি (এরূপে), পূর্বে (প্রাচীনগণ), প্রজাম্ হ বৈ (সন্তান অবশ্যই), ন কাময়ন্তে স্ম (কামনা করেননি), তে (তাঁরা), পুত্রৈষণায়াঃ চ (পুত্র-কামনা থেকে), বিত্তৈষণায়াঃ চ (বিত্তকামনা থেকে), লোকৈষণায়াঃ চ (লোককামনা থেকে), ব্যুত্থায় (উত্থিত হয়ে), অথ (অতঃপর), ভিক্ষাচর্যং (ভিক্ষাবৃত্তি), চরন্তি স্ম (অবলম্বন করেন)। অয়ম্ লোকঃ (এই লোক) ইতি (এরূপে), [ যঃ ] অপরোক্ষেণ (অপরোক্ষভাবে), অনুভূয়তে (অনুভব করেন), ইত্যর্থঃ (এই অর্থ)।

### বঙ্গানুবাদ

"সেই সন্ন্যাসবিষয়ে যে-আমাদের পক্ষে এই আত্মাই অভিপ্রেত ফল (সেই আমরা) সন্তান দ্বারা কি করব? প্রাচীন জ্ঞানিগণ অবশ্যই সন্তান কামনা করেননি, তাঁরা অবশ্যই পুত্রকামনা, বিত্তকামনা ও লোককামনা থেকে বিশেষভাবে উত্থিত হয়ে অতঃপর ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করেন।" 'এই লোক' এই শব্দ দ্বারা যা অপরোক্ষভাবে অনুভব করেন তা-ই নির্দেশ করা হয়—এই অর্থ।

নম্বত্র মুনিত্বেন ফলেন প্রলোভ্য বিবিদিষা সন্ন্যাসং বিধায় বাক্যশেষে স এব প্রপঞ্চিতঃ। অতো ন সন্ন্যাসান্তরং কল্পনীয়ম্।

**অন্বয়**

ননু অত্র ( যদি এখানে ), মুনিত্বেন ( মুনিত্ব-রূপ ), ফলেন ( ফল দ্বারা ), প্রলোভ্য ( প্রলোভিত করে ), বিবিদিষাসন্ন্যাসং ( বিবিদিষাসন্ন্যাস ), বিধায় ( নির্দিষ্ট করে ), বাক্যশেষে ( বাক্যশেষে ), সঃ এব ( তা-ই ), প্রপঞ্চিতঃ ( সবিস্তারে ব্যাখ্যা করা হয়েছে ), অতঃ ( অতএব ), সন্ন্যাসান্তরং ( অন্য-প্রকার সন্ন্যাস ), ন কল্পনীয়ম্ ( কল্পনা করা উচিত নয় )।

**বঙ্গানুবাদ**

( শঙ্কা ) যদি এরূপ বলা যায় যে, এখানে মুনিত্বরূপ ফল দ্বারা প্রলোভিত করে বিবিদিষা-সন্ন্যাস নির্দেশপূর্বক বাক্যশেষে তা-ই ( অর্থাৎ বিবিদিষাসন্ন্যাসই ) সবিস্তারে ব্যাখ্যা করা হয়েছে, অতএব অন্যপ্রকার সন্ন্যাস কল্পনা করা উচিত নয় ?

মৈবম্। বেদনস্যৈব বিবিদিষাসন্ন্যাসফলত্বাৎ। ন চ বেদনমুনিত্বয়োরেকত্বং শঙ্কনীয়ম্। "বিদিত্বা মুনির্ভবতীতি" পূর্বোত্তরকালীনয়োস্তয়োঃ সাধ্য সাধন ভাবপ্রতীতেঃ।

**অন্বয়**

মা ( না ), এবম্ ( এরূপ ), বেদনস্য এব ( বেদন অর্থাৎ আত্মাকে জানাই ), বিবিদিষাসন্ন্যাস-ফলত্বাৎ ( বিবিদিষাসন্ন্যাসের ফলহেতু ), বেদন-মুনিত্বয়োঃ ( আত্মাকে জানা এবং মুনিত্বের ), একত্বম্ ( একত্ব ), ন চ শঙ্কনীয়ম্ ( এরূপ শঙ্কা করাও উচিত নয় ), বিদিত্বা ( জানিয়া ), মুনিঃ ভবতি ( মুনি হন ), ইতি ( এরূপে ), তয়োঃ ( তাদের ), পূর্বোত্তরকালীনয়োঃ ( পূর্বকালীন আত্মজ্ঞানের সঙ্গে উত্তরকালীন মুনিত্বের), সাধ্যসাধন ভাব-প্রতীতেঃ ( সাধন ও সাধ্য সম্বন্ধ প্রতীত হয় )।

**বঙ্গানুবাদ**

( সমাধান ) না, এরূপ আশঙ্কা করা যায় না। যেহেতু আত্মাকে জানাই বিবিদিষাসন্ন্যাসের ফল। আত্মজ্ঞান ও মুনিত্বের একত্ব ভাবনা করাও উচিত নয়। কারণ 'আত্মাকে জানিয়া মুনি হন'—এরূপে পূর্বকালীন আত্মজ্ঞানের সঙ্গে উত্তরকালীন মুনিত্বের সাধন ও সাধ্য সম্বন্ধ প্রতীত হয়।

ননু বেদনস্যৈব পরিপাকাতিশয়রূপমবস্থান্তরং মুনিত্বম্। অতো বেদনদ্বারা পূর্বসন্ন্যাসস্যৈব তৎফলমিতি চেৎ।

**অন্বয়**

ননু ( প্রশ্নে ), বেদনস্য এব ( আত্মজ্ঞানেরই ), পরিপাকাতিশয়রূপম্ ( অতিশয় পরিপক্করূপে ), অবস্থান্তরং ( অবস্থান্তরকেই ), মুনিত্বম্ ( মুনিত্ব বলা হয় ), অতঃ ( অতএব ), বেদনদ্বারা ( আত্ম-জ্ঞানদ্বারা ), পূর্বসন্ন্যাসস্য এব (পূর্বোক্ত বিবিদিষা-সন্ন্যাসেরই ) তৎফলম্ ( সেই ফল লাভ হয় ) ইতি চেৎ ( এরূপ যদি বলা হয় )।

**বঙ্গানুবাদ**

( শঙ্কা ) আত্মজ্ঞানের অতিশয় পরিপক্করূপ অবস্থান্তরকেই যদি মুনিত্ব বলা হয় তাহলে আত্মজ্ঞানদ্বারা পূর্বোক্ত বিবিদিষাসন্ন্যাসেরই ফল-লাভ হয়।—যদি এরূপ বলা হয় ?

বাঢ়ম্। অতএব সাধনরূপাৎ সন্ন্যাসাদন্যং ফল-রূপমেতং সন্ন্যাসং ব্রূমঃ। যথা বিবিদিষাসন্ন্যাসিনা তত্ত্বজ্ঞানায় শ্রবণাদীনি সমপাদনীয়ানি, তথা বিদ্বৎ-সন্ন্যাসিনাপি জীবন্মুক্তয়ে মনোনাশবাসনাক্ষয়ৌ সম্পাদনীয়ৌ। এতচ্চোপরিষ্টাৎ প্রপঞ্চয়িষ্যামঃ।

**অন্বয়**

বাঢ়ম্ ( সত্য ), অত এব (অতএব), সাধনরূপাৎ সন্ন্যাসাৎ ( সাধনরূপ সন্ন্যাস অপেক্ষা ), অন্যম্ ( ভিন্ন ), এতম্ ( এই ), ফলরূপম্ সন্ন্যাসম্ ( ফলরূপ সন্ন্যাস বিষয়ে ), ব্রূমঃ ( বলব )। যথা ( যেরূপ ), বিবিদিষাসন্ন্যাসিনা ( বিবিদিষু সন্ন্যাসী-কর্তৃক ), তত্ত্বজ্ঞানায় ( তত্ত্বজ্ঞাননিমিত্ত ), শ্রবণাদীনি ( শ্রবণাদি সাধনসকল ), সম্পাদনীয়ানি ( সম্পাদন কর্তব্য ), তথা ( সেরূপ ), বিদ্বৎসন্ন্যাসিনা অপি ( বিদ্বৎসন্ন্যাসীরও ), জীবন্মুক্তয়ে ( জীবন্মুক্তির জন্য ), মনোনাশ-বাসনাক্ষয়ৌ ( মনোনাশ ও বাসনা-ক্ষয় ), সম্পাদনীয়ৌ ( সম্পাদন কর্তব্য ), এতৎ চ ( এবিষয়ে ), উপরিষ্টাৎ ( অনন্তর ), প্রপঞ্চয়িষ্যামঃ ( সবিস্তারে বলব )।

**বঙ্গানুবাদ**

( সমাধান ) হ্যাঁ ঠিক। অতএব সাধনরূপ সন্ন্যাস অপেক্ষা ভিন্ন এই ফলরূপ সন্ন্যাস বিষয়ে বলব। যেরূপ বিবিদিষু সন্ন্যাসীকর্তৃক তত্ত্বজ্ঞাননিমিত্ত শ্রবণাদি সাধনসকল সম্পাদন কর্তব্য, সেরূপ বিদ্বৎ-সন্ন্যাসীরও জীবন্মুক্তির জন্য মনোনাশ ও বাসনাক্ষয় সম্পাদন কর্তব্য। এবিষয়ে অতঃপর সবিস্তারে বলব। [ ক্রমশঃ ]

## স্মৃতিকথা

# পুণ্যস্মৃতি

## চন্দ্রমোহন দত্ত

এই অপ্রকাশিত স্মৃতিনিবন্ধটি লেখকের কনিষ্ঠ পুত্র কার্তিকচন্দ্র দত্তের সৌজন্যে প্রাপ্ত।—যুগ্ম সম্পাদক, উদ্বোধন

আমরা পূর্ববঙ্গীয়। দেশ ছিল অধুনা বাংলাদেশের ঢাকা জেলার বিক্রমপুর মহকুমার অন্তর্গত গাওপাড়া গ্রামে। গ্রামের প্রায় সব পরিবারই ছিল শিক্ষিত বৈদ্য, কেবল আমরাই ছিলাম কায়স্থ দত্ত-পরিবারের। আমাদের ছিল একান্নবর্তী পরিবার এবং অন্যান্য সচ্ছল গৃহস্থ পরিবারের মতোই আম-কাঁঠালের বাগান ও পুকুর সমেত কয়েক বিঘা জমির ওপরেই ছিল আমাদের বসতবাটী। বঙ্গভঙ্গের অনেক আগেই তা পদ্মার গর্ভে চলে যায়।

১৯১০ খ্রীস্টাব্দে আমি কলকাতায় আসি চাকরি করব বলে। স্বোপার্জিত অর্থে নিজের খরচ নিজেই চালাব—এই ছিল আমার ইচ্ছা। আমার বয়স তখন তিরিশ বছর। পারিবারিক কোন কথায় আত্মসম্মানে আঘাত পেয়েছিলাম। তাই স্ত্রী ও কন্যাকে দেশের বাড়িতে রেখে কলকাতায় ঠাকুরভাইয়ের (বড়দাদাকে 'ঠাকুরভাই' বলতাম) কাছে আসি। বড়দাদা কালীকুমার দত্ত আমার কলকাতায় আসার অনেক আগেই কলকাতার শোভাবাজারে বাড়ি ভাড়া করে থাকতেন। তিনি রেল কোম্পানীতে চাকরি করতেন।

ঠাকুরভাইয়ের কাছে আসার কয়েকদিনের মধ্যেই একটা খাবারের দোকানে হিসাব লেখার কাজ পেলাম। বেতন বা খাওয়া-পরা কিছুই পাব না, যাকে বলা যায় নির্জলা apprentice। কয়েক মাস 'ঘরের খেয়ে বনের মোষ তাড়িয়ে' চাকরি ছেড়ে দিয়ে নিজেই শোভাবাজারে একটা ঘর ভাড়া নিয়ে মুদিখানার দোকান খুললাম। বিক্রিবাটা তেমন নেই। একদিন দেখলাম, দোকানের সামনে দরজার ওপরে ভুষিকালি দিয়ে লেখা একটা কাগজ কে বা কারা টাঙিয়ে দিয়ে গেছে। কাগজে লেখা আছে: "আগামীকাল রবিবার বেলুড় মঠে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের জন্মোৎসব হইবে। আপনারা দলে দলে যোগদান করুন।" রামকৃষ্ণদেবের নাম এর আগে আমি শুনিনি। ধারণা হলো, ইনি নিশ্চয়ই মহাপুরুষ, নইলে এরকমভাবে লিখে জানাবে কেন! কলকাতার উৎসব সম্বন্ধে আমার কোন ধারণা ছিল না, তাই উৎসব দেখার খুব ইচ্ছা হলো। জানার আগ্রহ নিয়ে পাশের দোকানের বৃদ্ধ ভদ্রলোককে জিজ্ঞাসা করলাম: "মশায়, পরমহংসদেব কে? তাঁর উৎসব বেলুড় মঠে কাল রবিবার হবে, সে-সম্বন্ধে আপনার কিছু জানা থাকলে আমাকে দয়া করে বলবেন?" বৃদ্ধ ভদ্রলোক আমার দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে বললেন: "আপনার দেখছি খুব আগ্রহ! মহাপুরুষদের সম্বন্ধে শ্রদ্ধা-ভক্তি থাকা খুব ভাল। হ্যাঁ, আমি গত বছর বেলুড় মঠে গিয়েছিলাম। আপনাকে কি বলব মশায়, যে যত পারে খিচুড়ি, লুচি, বোঁদে, হালুয়া, প্রসাদ খেতে পারে।" জিজ্ঞাসা করলাম: "বেলুড় মঠ কোথায়? কেমন করে যেতে হয়?" ভদ্রলোক বললেন: "আহিরীটোলা ঘাট থেকে সকাল সাতটায় বেলুড়ে যাবার স্টীমার পাবেন। আপনি তাতে চড়ে চলে যাবেন, কোন অসুবিধা হবে না।"

কলকাতায় আমি খুব বেশিদিন হলো আসিনি। রাস্তা-ঘাট তেমন ভাল চিনি না, তাই দুজন পরিচিত ছেলেকে বললাম: "আগামীকাল বেলুড় মঠে শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের উৎসব হবে। উৎসবে প্রসাদের ভাল ব্যবস্থা আছে, তোমরা আমার সঙ্গে যাবে?" ওরা রাজি হলো।

পরমহংসদেবের প্রসাদের চাইতে পরমহংসদেবকে দেখার আগ্রহ আমাকে ব্যাকুল করে তুলল। আমি বাসায় না গিয়ে পাঁচ পয়সার মুড়ি-বাতাসা খেয়ে দোকানের রোয়াকে শুয়ে রইলাম। পরমহংসদেবের উৎসবে যাব—সেই আনন্দ ও উত্তেজনায় ঘুম আসছে না। কিছুতেই রামকৃষ্ণদেব নামক পরমহংসকে মাথা থেকে সরাতে পারছি না—ঘূর্ণীজলের মতো মাথায় ঘুরপাক খাচ্ছে তো খাচ্ছেই। তখন ঠিক করলাম যে,

পরমহংসদেব যখন মাথা থেকে যাবেনই না তখন তাঁর কথা চিন্তা করে রাতটা কাটিয়ে দিই। রামকৃষ্ণদেবকে ভাবতে ভাবতে ঘুমিয়ে পড়েছি। স্বপ্নে দেখছি, একটা বিরাট মাঠে চলে গেছি। দেখছি, অনেক লোক, কত রকমের আলোর ফুলঝুরি। ভীষণ ভিড় আমাকে ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দিচ্ছে। হঠাৎ একজন মোটা কালো লোক এসে আমাকে ভীষণ জোরে ধাক্কা দিল, আর আমার ঘুম ভেঙে গেল। তাকিয়ে দেখি, পুলিস আমাকে ধাক্কা দিচ্ছে আর বলছে: "এই ওঠো, ওঠো।" আমি পাহারাদার পুলিসকে বললাম: "কি ব্যাপার, আমাকে ধাক্কা দিচ্ছ কেন?" পুলিস বলল: "তুমি বাইরে শুয়ে আছ কেন? থানায় যেতে হবে।" আমি বললাম: "এটা তো আমার দোকানের রোয়াক।" তাই শুনে আর আমাকে কিছু না বলে পুলিসটি চলে গেল। বাইরে শুয়ে থাকলে সেই সময় পুলিস জিজ্ঞাসাবাদ করত ও সদুত্তর পেলে ছেড়ে দিত।

ভোর হলো। গতরাত্রে যে ছেলে দুজন বেলুড়ে যাবে বলেছিল, তাদের বাড়িতে গিয়ে দেখা করলাম; কিন্তু তারা দুজনেই জানাল যে, তারা যেতে পারবে না। আমি একটু দমে গেলাম। দোকানে ফিরে এসে ভাবছি, যাব কি যাব না। এদিকে যাবার খুব ইচ্ছা। স্বপ্ন দেখার পর ইচ্ছাটা আরও বেড়ে গেছে। অথচ রাস্তা-ঘাট মোটেই চিনি না, অজানা জায়গা বলে একা যেতে সাহসও পাচ্ছি না। যাই হোক, ঠিক করলাম যাব। মনে মনে ভাবলাম, পরমহংসদেবের নাম নিয়ে বেরিয়ে তো পড়ি, তারপর দেখা যাক না কি হয়। হাটখোলার ঘাটে গঙ্গায় স্নান করে একটা চাদর গায়ে জড়িয়ে রামকৃষ্ণ-নাম স্মরণ করে যাত্রা করলাম আহিরীটোলা ঘাটের দিকে। ঘাটে স্টীমার দাঁড়িয়ে আছে, খুব ভিড়। সকলেই বেলুড় মঠে যাবে দেখে সাহস হলো। দশ পয়সা দিয়ে রিটার্ন টিকিট কেটে স্টীমারে উঠলাম। উঠে ভাবছি, যেন উৎসব দেখতে পারি, প্রসাদ যেন পাই। বাঁশি বাজল, স্টীমারও ছাড়ল। যাত্রীরা বেশির ভাগই স্কুল-কলেজের ছেলে। তারা রামকৃষ্ণদেব ও স্বামী বিবেকানন্দের জয়ধ্বনি দিতে লাগল। ওদের জয়ধ্বনিতে উদ্দীপিত হয়ে আমিও বলতে লাগলাম: "জয় রামকৃষ্ণদেব কি জয়। জয় স্বামী বিবেকানন্দজী কি জয়।" জয়ধ্বনি দিতে বেশ আনন্দ পাচ্ছিলাম। আনন্দের মধ্যে একটা দিব্যভাব অনুভব করতে লাগলাম। মনের চঞ্চলতা বা উদ্বিগ্নভাব কোথায় যেন হারিয়ে গেল। মনটাও কেমন উদাস হয়ে গেল। ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই স্টীমার বেলুড় মঠের ঘাটে ভিড়ল। ঘাটে একদল ভক্ত দাঁড়িয়ে স্টীমারের যাত্রীদের দিকে তাকিয়ে বলছে: "জয় রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব কি জয়। জয় স্বামী বিবেকানন্দজী কি জয়।" যাত্রীরাও ওদের গলার সঙ্গে গলা মিলিয়ে জয়ধ্বনি দিতে লাগল। সমবেত জয়ধ্বনিতে আকাশ-বাতাস মুখরিত হয়ে উঠল।

ঘাটে গেরুয়া কাপড়-পরা এক দিব্যকান্তি সন্ন্যাসী দাঁড়িয়ে আছেন। স্টীমার থেকে যাত্রীরা নেমে একে একে সন্ন্যাসীকে প্রণাম করছেন। তিনি বলছেন: "জয় রামকৃষ্ণ।" আমিও প্রণাম করলাম, আমাকেও তিনি ঐ কথা বললেন। এরপর সন্ন্যাসী হাত তুলে নাচতে নাচতে বলতে লাগলেন: "জয় রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব কি জয়।" আমরাও ওঁর সঙ্গে রামকৃষ্ণ-নামে জয়ধ্বনি দিলাম। তৎক্ষণাৎ একদল লোক এসে খোল-করতাল বাজাতে বাজাতে সন্ন্যাসীকে ঘিরে জয়ধ্বনি দিতে লাগল আর নাচতে লাগল। আমি ঐ দিব্যকান্তি জ্যোতির্ময় সন্ন্যাসীর দিকে তাকিয়ে আছি আর আমার মন ভক্তিতে পূর্ণ হয়ে উঠছে। একজনকে জিজ্ঞাসা করে জানতে পারলাম, উনি স্বামী প্রেমানন্দ। ভগবান রামকৃষ্ণ পরমহংসের সাক্ষাৎ শিষ্য, স্বামী বিবেকানন্দের গুরু-ভাই। স্বামী প্রেমানন্দের প্রেমের স্পর্শে আমার মনেও প্রেম জেগেছে। মনে মনে বললাম: "স্বামী প্রেমানন্দ। সার্থক তোমার 'প্রেমানন্দ' নাম। তুমি অকৃপণ হাতে সকলকে প্রেম বিতরণ করছ। সেই প্রেমসমুদ্রের তরঙ্গে আমার মনও দুলছে, তোমার প্রেমবারিতে অবগাহন করে আজ আমি শুচি· আমি ধন্য।"

মন্দিরে ভগবান রামকৃষ্ণদেবকে দেখতে যাচ্ছি। পথের একধারে একজন লোক ফুল-বাতাসা বিক্রি করতে বসেছে। আমি এক পয়সা দিয়ে ফুল-বাতাসা কিনে নিলাম। মন্দিরে (পুরনো মন্দিরে) সেই ফুল-বাতাসা ঠাকুরকে নিবেদন করে প্রণাম করলাম। মন্দির থেকে বেরিয়ে ঘুরে ঘুরে

দেখতে লাগলাম কোথায় কি হচ্ছে।

বেলা ১১টা বাজে। গতরাতে পাঁচ পয়সা দিয়ে মুড়ি-বাতাসা কিনে জল খেয়েছি, এখনো পর্যন্ত কিছুই খাইনি। এতক্ষণ একটা ঘোরের মধ্যে থাকায় খিদে তেমন কিছুই বুঝতে পারিনি। এবার কিন্তু খিদেটা বেশ জানান দিচ্ছে। গতরাতে বৃদ্ধ ভদ্রলোক বলেছিলেন, বেলুড় মঠে প্রসাদ পাওয়া যায়। আমি সেই প্রসাদের সন্ধান করতে করতে দেখতে পেলাম, এক জায়গায় একটি যুবক সরায় করে প্রসাদ দিচ্ছে। আমি গেলে আমাকেও একটি সরা দিল। সরাতে আছে বিছুটা খিচুড়ি, দুটি লুচি ও হালুয়া। এই সামান্য প্রসাদ খেয়ে আমার কিছুই হলো না। আমি বাংলাদেশের (পূর্ববঙ্গের) লোক। খাওয়ার পরিমাণটা এদেশের লোকেদের চাইতে একটু বেশিই, তার ওপর কাল রাত থেকে পেটে কিছুই পড়েনি, সেখানে একটা সরা তো সমুদ্রে বারিবিন্দুবৎ। তাই আরেকটা সরা চেয়ে নিলাম। না, এতেও কিছুই হলো না। তৃতীয়বার সরা নিতে গেলে একজন সন্ন্যাসী বললেন: "আপনি কিরকম লোক, মশায়! দু-দুবার প্রসাদ নিয়ে আবার এসেছেন। প্রসাদ কেবল আপনার একার জন্য নয়—সকলের জন্য।" সন্ন্যাসীর কথায় লজ্জা পেলাম, অপমান বোধ করলাম; তবে ভীষণ রাগ হলো গতরাতের বৃদ্ধ লোকটির ওপর। উনিই তো বলেছিলেন, ইচ্ছামতো প্রসাদ পাবেন। তাইতো আমি বারে বারে নিচ্ছিলাম। বৃদ্ধ লোকটি যদি ঐ কথা না বলতেন তবে তো আমি সকালে বাড়ি থেকে খেয়েই আসতাম, আর ঐ একটা প্রসাদী সরাই যথেষ্ট হতো। সন্ন্যাসীর কাছ থেকে অমন কথা শুনতে হতো না, আর আমিও সন্ন্যাসীর বিরাগভাজন হতাম না। মন্দিরে গিয়ে ঠাকুরকে প্রণাম করে বললাম: "ঠাকুর অনেক আশা নিয়ে তোমার কাছে এসেছিলাম, কিন্তু অপূর্ণ আশা নিয়েই ফিরে যাচ্ছি।" এই কথাগুলি ঠাকুরকে জানিয়ে গঙ্গার ঘাটে গিয়ে জল খেয়ে স্টীমারঘাটের দিকে হাঁটতে লাগলাম। যাবার পথে দেখতে পেলাম, একটা খেজুরগাছের নিচে কয়েকজন ভদ্রলোক এক ঝুড়ি খিচুড়ি, তরকারি, চাটনি নিয়ে খাচ্ছে। সেখানে গেলে ওরা আমাকেও একটা শালপাতার ঠোঙা দিল—ঠোঙাতে ছিল খিচুড়ি, তরকারি, চাটনি। আমি তৃপ্তির সঙ্গে খেলাম। ঠাকুরকে উদ্দেশ করে বললাম: 'ঠাকুর আমার আশা পূর্ণ হলো না বলে অভিযোগ করেছিলাম। অপূর্ণ আশা যে অর্ধাহারজনিত, তা তুমি বুঝতে পেরে পূর্ণ আহার দিয়ে আমার আশা পূর্ণ করেছ। এখন ভাবছি, তোমার কাছে অভিযোগ করাটা অন্যায় হয়েছিল। তুমি আমাদের কত দিচ্ছ—সেসব না ভেবে স্বার্থপরের মতো বলেছিলাম কিনা অপূর্ণ আশা নিয়ে ফিরে যাচ্ছি। আমি অধম, আমি অকৃতজ্ঞ, আমায় ক্ষমা কর ঠাকুর।' এই কথা বলে ঠাকুরের উদ্দেশে হাতজোড় করে প্রণাম জানালাম। বিকাল পাঁচটায় স্টীমার ছাড়বে, এখনো ঘণ্টা দুয়েকের মতো সময় আছে। একটা গাছের ছায়ায় চাদর বিছিয়ে শুয়ে পড়লাম। ঠিক সময়ে স্টীমারে ফিরে এলাম। কিন্তু মনটাকে রেখে এলাম বেলুড় মঠে রামকৃষ্ণবৃক্ষের ছায়ায়।

আমার দোকান চলল না। পাততাড়ি গোটাতে হলো। ৫/৬ দিন পর একদিন সকালে ঘুম থেকে উঠে হাত-মুখ ধুয়ে বসে ভাবছি, এখন জীবনটাকে কেমনভাবে চালাব? সেই সময় ঠাকুরভাই আমাকে বললেন: "চন্দ্র, তোমার দ্বারা ব্যবসা-ট্যবসা হবে না। চাকরির চেষ্টা কর। আমার পক্ষে তোমাকে রাখাও আর সম্ভব নয়।" ঠাকুরভায়ের মুখে এধরনের কথা শুনতে হবে তা স্বপ্নেও ভাবিনি। আমরা তো সংসার থেকে ভিন্ন হয়ে যাইনি, তবে এমন কথা ঠাকুরভাই বললেন কেন? তবে কি ঠাকুরভাই আলাদা হয়ে গেছে? আমি কিছুই বুঝতে পারছি না। খাওয়া-পরার খোঁটা দেওয়ায় অপমানে সমস্ত শরীরে জ্বালা ধরে গেল। বড় ভাইয়ের মুখের ওপর কথা বলা যায় না। আমি চিরকালই একরোখা, গোঁয়ার। মনে মনে প্রতিজ্ঞা করলাম, আজকের মধ্যেই আমার চাকরি চাই, যদি না পাই তবে কলকাতা ছেড়ে চলে যাব পশ্চিমে, দাদার অন্নজল আর গ্রহণ করব না। জ্যৈষ্ঠমাসের প্যাচপ্যাচে গরমে আর অপমানে মাথাও গরম। পরনে যে-কাপড়খানি ছিল তাই পরে একটা চাদর নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম চাকরির খোঁজে। সম্বল মাত্র পাঁচ পয়সা। পাঁচ পয়সার এক পয়সা দিয়ে

গঙ্গার ঘাটের উড়িয়া পাণ্ডাঠাকুরের কাছ থেকে তেল নিয়ে গায়ে-মাথায় মেখে স্নান করলাম। বাকি এক আনা মা-গঙ্গাকে দিয়ে বললাম: "আজকের মধ্যে যদি চাকরি হয় ভাল, নইলে রেলের রাস্তা ধরে যেদিকে দুচোখ যায় পশ্চিমের পথ ধরে চলতে থাকব।" এই কথাগুলো বলে সিঁড়ির ওপরে বসে ভাবছি। সকাল থেকে কিছুই পেটে পড়েনি, খুব ক্ষিদে পেয়েছে। কিনে খাবার মতো পয়সাও নেই। যা ছিল তা তেল আর গঙ্গার জলে গেছে। একটা মুদির দোকান থেকে চাল ভিক্ষা করে জল দিয়ে খেলাম। ক্ষিদে কিছুটা শান্ত হলো। চাকরির জন্য কয়েকটা দোকানে ও অফিসে ঘুরলাম। কোথাও চাকরি পেলাম না। শেষে চাকরির আশা ছেড়ে দিয়ে নিমতলা ঘাটে এসে বসলাম। ভাবছি, কি করব। মনে পড়ল, বেলুড় মঠে যখন গিয়েছিলাম তখন শুনেছিলাম, রামকৃষ্ণ মিশন বিপদগ্রস্ত মানুষকে সাহায্য করে। আমিও তো বিপদের মধ্যেই আছি। আমার চাকরি নেই, হাতে একটা পয়সাও নেই, থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থাও নেই। যা শুনেছি তা যদি মিথ্যা না হয় তবে রামকৃষ্ণ মিশন আমার একটা ব্যবস্থা অবশ্যই করে দেবে। বেলুড় মঠে গেছি। বেলুড় মঠে যে রামকৃষ্ণ মিশনের হেড অফিস তাও শুনেছি। কিন্তু বেলুড় মঠ ছাড়া অন্য কোথাও রামকৃষ্ণ মিশনের শাখা আছে কিনা তা তো জানি না। ডুবন্ত মানুষ যেমন খড়-কুটো ধরে বাঁচতে চায়, আমিও সেইরকম শ্রীরামকৃষ্ণকে ধরেই বাঁচতে চাইলাম; রামকৃষ্ণ-নাম নিয়ে রামকৃষ্ণ মিশনের খোঁজে হাঁটিতে লাগলাম। পথের লোককে জিজ্ঞাসা করছি, রামকৃষ্ণ মিশন কোথায়? সঠিকভাবে কেউ বলতে পারছে না। জিজ্ঞাসা করতে করতে চলেছি। তখন একজন ভদ্রলোক বললেন: "বাগবাজারে রামকৃষ্ণ মিশনের একটি শাখা আছে। হেড অফিস বেলুড় মঠ।" আশার আলো দেখতে পেলাম। বাগবাজারে এসে একজন ভদ্রলোককে জিজ্ঞাসা করায় তিনি বললেন: "রামকান্ত বসু স্ট্রীটে বলরাম বসুর বাড়িতে কয়েকজন সাধু থাকেন। তাঁদের কাছে আপনি খোঁজ পাবেন।" রামকান্ত বসু স্ট্রীটে আমার এক আত্মীয় থাকে। সে যাতে আমাকে চিনতে না পারে সেজন্য মাথায় ঘোমটা দিয়ে চলেছি। তখন বেলা আন্দাজ ১১।১২টা হবে। আত্মীয়ের বাড়ির পাশ দিয়ে যাবার সময় দেখতে পেলাম, রাজেন (আমার ছোটবোন স্নেহলতার স্বামী রাজেন্দ্রলাল দাস, ওদের ছেলের নাম বঙ্কিম[১]) প্রায় ৩/৪ সেরের মতো মাংস নিয়ে যাচ্ছে। রাজেনের অবস্থা খুব ভাল, বড়বাজারে মশলার দোকান আছে। বলরাম বসুর বাড়ির কাছে গিয়ে দেখি, একজন হিন্দুস্থানী দারোয়ান টুলে বসে আছে। দারোয়ানকে বললাম: "আমি সাধুর সঙ্গে দেখা করব।" দারোয়ান বলল: "কোন সাধুকা পাশ যায়েগা?" কোন সাধুকেই চিনি না, কারোর নামও জানি না। তাই কোন সাধুর নাম বলতে পারলাম না। বললাম: "যেকোন একজন সাধুর দেখা পেলেই হবে।" দারোয়ান আমার উসকো খুসকো চেহারা দেখে উটকো লোক ভেবে বলল: "নেহি হোগা। ভাগো, হিয়াসে ভাগো।" বড় বড় থামওয়ালা বাড়ি দেখে এমনিতেই ভয় করে। তার ওপর গোদের ওপর বিষফোঁড়ার মতন লাঠি হাতে হিন্দুস্থানী দারোয়ানের কর্কশ ধমকে আর বেশি এগুনো বুদ্ধিমানের কাজ হবে না বলে মনে হলো। [ক্রমশঃ]

১ বঙ্কিমচন্দ্র দাস—বর্তমানে বয়স প্রায় ৯০ বছর—১৯২৬ খ্রীস্টাব্দে প্রথম কনভেনশনের সময় বেলুড় মঠে কর্মীরূপে যোগ দেন। ১৯২৭ খ্রীস্টাব্দে 'শ্রীশ্রীমায়ের বাড়ী' তথা 'উদ্বোধন'-এ কর্মীরূপে আসেন। তখন থেকেই এখানে আছেন। অত্যন্ত নিষ্ঠাবান কর্মী। অবসর গ্রহণের পরেও এই বয়সে স্বেচ্ছায় প্রতিদিন কিছু কাজ করেন। স্বামী শিবানন্দের কাছে তাঁর মন্ত্রদীক্ষা। স্বামী শিবানন্দ, স্বামী সারদানন্দ, স্বামী অখণ্ডানন্দ, স্বামী বিজ্ঞানানন্দ, স্বামী সুবোধানন্দ, স্বামী অভেদানন্দ এবং শ্রীম'—শ্রীরামকৃষ্ণের এই সাতজন পার্ষদের দর্শন ও সান্নিধ্য লাভ করার সৌভাগ্য তাঁর হয়েছে। তাঁর মামাতো ভাই, চন্দ্রমোহন দত্তের ছোটভাই লালমোহন দত্তের ছেলে যোগেশচন্দ্র দত্ত-ও ছোটবেলা থেকে বলরাম মন্দির ও 'মায়ের বাড়ী'র সঙ্গে যুক্ত। আগে কলকাতা কর্পোরেশনে কাজ করতেন। অবসর গ্রহণের পর ১৯৬২ খ্রীস্টাব্দ থেকে স্বেচ্ছাসেবী হিসাবে 'মায়ের বাড়ী'তে আছেন। বর্তমানে তাঁর বয়স উনআশি বছর। অবিবাহিত যোগেশবাবু মহাপুরুষ মহারাজের শিষ্য। প্রথম জীবনে তিনি স্বামী সারদানন্দ, স্বামী শিবানন্দ এবং শ্রীম'র সান্নিধ্যলাভ করেছেন।

—যুগ্ম সম্পাদক, উদ্বোধন

বিজ্ঞান-নিবন্ধ

# পৃথিবীর তাপমাত্রা বাড়ছে কেন?

জহর মুখোপাধ্যায়

পৃথিবীর পরমায়ু আর কত দিন? ব্যাপক বন-সংহার এবং পরিবেশ-দূষণের ফলে সূর্যের তাপ ধীরে ধীরে বাড়ছে। বদলে যাচ্ছে আবহাওয়ার চরিত্র। যে-কলকাতা ছিল নদীজলে নাতিশীতোষ্ণ, এখন সেখানে চিরাচরিত আবহাওয়া লোপাট হয়ে গেছে। গরমকালে দিল্লীর মতো লু বইতে শুরু করছে। শীতকালে ঠাণ্ডা বাড়ছে আগের চেয়ে বেশি। শুধু কলকাতা বা ভারতই নয়, সারা পৃথিবীতে যেভাবে তাপমাত্রা বাড়ছে তাতে পৃথিবী নিজেই একদিন অগ্নিবলয় হয়ে যাবে। তাপমাত্রা বৃদ্ধির এই সম্ভাবনার মধ্যে বিজ্ঞানীরা এক অশুভ সংকেত খুঁজে পেয়েছেন। এর ফলে মেরু-প্রদেশে জমে থাকা বরফের স্তর উত্তাপে গলতে শুরু করবে এবং মহাসমুদ্রের জলের উচ্চতা বাড়বে। আগামী পঞ্চাশ বছরের মধ্যে এই জলের উচ্চতা এক মিটারের বেশি হবে বলে মনে হয়। সঙ্গে সঙ্গে উপকূলবর্তী কয়েকটি দেশও জলের তলায় অধোবদনে লুকিয়ে পড়বে। গোটা বাংলাদেশের অনেকটা স্থলভাগ জলোচ্ছ্বাস গ্রাস করে নেবে। জলোচ্ছ্বাস হানা দেবে মালদ্বীপেও। কৃষিযোগ্য ভূমির ওপর ছড়িয়ে দেবে লবণাক্ত জলের আচ্ছাদন। কোটি কোটি মানুষকে ভিটেমাটি ছাড়া করবে। দেশে দেশে উদ্বাস্তুদের সংখ্যা বাড়বে। সেই উদ্বাস্তু-সমস্যায় জর্জরিত হবে অনেক দেশ। উত্তর আমেরিকার কঠিন বরফের চিরন্তন আস্তরণ উষ্ণতা পেয়ে সরে যাবে। ফলে উঁকি দেবে চাষের জমি। বাড়বে ফসলের পরিমাণ। ঠিক তার বিপরীত মেরুতে দক্ষিণ আমেরিকা বা মেক্সিকোয় চাষীর কপালে পড়বে হাত। সেখানকার মাটি উৎপাদনক্ষমতা হারিয়ে ফেলে বন্ধ্যা হয়ে পড়বে। মাটিতে নেমে আসবে মরু-অভিশাপ।

এসব সম্ভাবনা আর আশঙ্কার কথা শুনিয়েছেন ওয়াশিংটনের ওয়ার্ল্ড ওয়াচ ইনস্টিটিউটের পরিবেশ দপ্তর। আধুনিক যান্ত্রিক সভ্যতার বাহক হিসাবে কলকারখানা কিংবা যানবাহনের ধোঁয়া-ধুলো থেকে নির্গত কার্বন-ডাই-অক্সাইডের বীভৎস পরিমাপের কথা আমরা উড়িয়ে দিতে পারি না। আজ থেকে একশো বছর আগে রসায়নবিজ্ঞানী আর. হেনিয়াস এই অগ্নিসংকেতের কথা বলেছিলেন। বায়ুমণ্ডলে কার্বন-ডাই-অক্সাইডের পরিমাণ বেড়ে গেলে পৃথিবীর তাপমাত্রাও যে বেড়ে যাবে সেকথা তিনি অনেক আগেই বলেছিলেন। যার ফলে শিল্প-বিপ্লবের মতো আনন্দের খবরে তিনি মুষড়ে পড়েছিলেন। পৃথিবীর সমগ্র মানুষ যে একটা দারুণ দুর্বিসহ দিনের জন্য অপেক্ষা করছে সে-কথা তিনি একশো বছর আগেই বুঝতে পেরে-ছিলেন। আজকের দিনে ওঁর কথা প্রায় সত্যি হতে চলেছে।

বিগত একশো বছরে বাতাসে কার্বন-ডাই-অক্সাইড গ্যাসের পরিমাণ বেড়েছে ১২.৫ শতাংশ। আর তাপমাত্রাও সঙ্গে সঙ্গে চার ডিগ্রী বেড়েছে। আগামী পঞ্চাশ বছরে বাড়বে এখনকার তুলনায় আরও ৬০ শতাংশ। বিজ্ঞানীদের হিসাবে কলকারখানার জন্য আমরা প্রতি বছরে বাতাসে পাঁচশো কোটি টন কার্বন-ডাই-অক্সাইড ঢালছি। আর আছে চল্লিশ কোটি যানবাহন। তাদের থেকে নির্গত গ্যাসের পরিমাণ খুব একটা কম নয়। প্রায় পঞ্চাশ কোটি টনেরও বেশি। কার্বন-ডাই-অক্সাইড-এর তাপশোষন করে ধরে রাখার ক্ষমতা আছে যা বায়ুতে বর্তমান অন্যান্য গ্যাসের নেই। এছাড়া আছে অরণ্য-সংহারের প্রতিক্রিয়া। সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের খাদ্য ও কৃষি সংগঠনের রিপোর্ট অনুযায়ী বিগত পঞ্চাশ বছরে ৩.৩ মিলিয়ন বর্গমাইল অরণ্য ধ্বংস করা হয়েছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর থেকেই প্রতি বছর কুড়ি হাজার বর্গমাইল বনভূমি সংহার করা হয়েছে।

এইভাবে অরণ্যনিধন চলতে থাকলে আগামী একশো বছরের মধ্যে গ্রীষ্মমণ্ডলের সমস্ত বনভূমি নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। এর ফলে পৃথিবীর তাপমাত্রা আরও বেড়ে যাবে। বনাঞ্চল ধ্বংস হওয়ার জন্য বৃষ্টি-পাতের ধরন-ধারণও বদলে যাচ্ছে। বন্যপ্রাণী, মূল্যবান ঔষধি গাছ-গাছড়াও নিশ্চিহ্ন হয়ে যাচ্ছে। বন্যার প্রকোপ বাড়ছে। জমির ক্ষয় বেড়ে যাচ্ছে এবং বাঁধের জলাধার ও নদীতে পলি পড়ার জন্য তা অগভীর হয়ে যাচ্ছে।

এসব ঘটনার চেয়ে ক্ষতিকর আরও একটি সম্ভাবনার কথা ভেবে বিজ্ঞানীরা বিচলিত হয়ে পড়েছেন। ব্যাপারটা প্রথম লক্ষ্য করেছেন কয়েকজন ব্রিটিশ বিজ্ঞানী। কুমেরু প্রদেশে হ্যালি বের এক গবেষণাগারে বায়ুমণ্ডলে বর্তমান নানা গ্যাস নিয়ে অনেকদিন আগে থেকেই গবেষণা চলছে। কিন্তু এতদিন তেমন কোন বৈসাদৃশ্য বিজ্ঞানীদের দৃষ্টিকে আকর্ষণ করেনি। কিন্তু ১৯৮২ খ্রীস্টাব্দে ব্যাপারটা প্রথম ধরা পড়ে। কুমেরুর বায়ুমণ্ডলে ওজোন গ্যাসের পরিমাণ খুব কমে গেছে। অক্সিজেন গ্যাসের বিকল্প হিসাবেই ওজোনকে ধরা হয়। অক্সিজেনের অণুতে থাকে দুটি পরমাণু। ওজোনের একটি অণুতে রয়েছে অক্সিজেনের তিনটি পরমাণু। ভূ-পৃষ্ঠের দশ থেকে তিরিশ মাইল পর্যন্ত উচ্চতায় বায়ুমণ্ডলের যে-আস্তরণ আছে সেখানকার ওজোন গ্যাস মানুষের পক্ষে যথেষ্ট উপকারী। সূর্যের সবচেয়ে ক্ষতিকারক অতিবেগুনি রশ্মি ( আল্ট্রাভায়োলেট রে ) সরাসরি পৃথিবীতে আসার পথে বাধা সৃষ্টি করে আছে এই গ্যাস। ওজোনের আস্তরণ তেরছাভাবে এই রশ্মিকে আটকে রেখেছে। এই রশ্মি সরাসরি এসে পড়লে ফল হতো মারাত্মক। এই অতিবেগুনি রশ্মি ত্বকে ক্যান্সার সৃষ্টি করতে পারে কিংবা চোখের ওপর আঘাত হানতে পারে। মানুষের শরীরের সহজাত রোগ-প্রতিরোধ ব্যবস্থাকে নষ্ট করে দিতে পারে। আমেরিকার জাতীয় বিজ্ঞান অ্যাকাডেমির বিজ্ঞানীদের মতে বায়ুমণ্ডলে ওজোনের পরিমাণ মাত্র এক শতাংশ হ্রাস পেলে অনায়াসে দশহাজার লোক ত্বকের ক্যান্সারে আক্রান্ত হতে পারে।

ব্যাপারটা বিজ্ঞানীদের আরও কৌতূহলের সৃষ্টি করেছিল। ফলে তাঁরা অনেক তথ্য আর পরিসংখ্যান নিয়ে সাফল্যের দিকে এগোচ্ছিলেন। কুমেরুর স্ট্রাটোস্ফিয়ারে একটু একটু করে ওজোন গ্যাসের হ্রাস আর পৃথিবীর দক্ষিণ গোলার্ধের বায়ুমণ্ডলে ক্লোরিনজাত রাসায়নিক গ্যাসের পরিমাণ বৃদ্ধির মধ্যে কোথায় যেন একটা সম্পর্ক আছে। আর এই সম্পর্কের ব্যাপারটাই বিজ্ঞানীদের ভাবিয়ে তুলেছিল। কিন্তু ব্যাপারটা আরও পরিষ্কার হলো কিছুদিন পরে।

১৯৮৭ খ্রীস্টাব্দে মার্কিন মহাকাশ-গবেষণা সংস্থা 'নাসা' এই ঘটনা পর্যবেক্ষণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন। তাঁরা এই কাজে এক বিশেষ ধরনের বিমান ব্যবহার করলেন। মহাকাশে গুপ্তচরবৃত্তিতে সাহায্যকারী এসব বিমান নিয়ে বিজ্ঞানীরা চলে গেলেন ঊর্ধ্বাকাশে। গবেষণা হচ্ছে মহাকাশেও। সেপ্টেম্বরের মাঝামাঝি একদিন চিলির একটি বিমান-বন্দর থেকে বিজ্ঞানীরা মহাকাশে যাত্রা শুরু করে। ভূ-পৃষ্ঠ থেকে বাইশ মাইল উঁচুতে উঠে সেখানকার বাতাসে ওজোনের পরিমাপ নিলেন। মার্কিন আবহাওয়া-উপগ্রহ নিমবার্গ-৭ কুমেরুর আবহাওয়ার বিভিন্ন ছবি পাঠাল। সেসব ছবি দেখে মার্কিন বিজ্ঞানীরা চমকে উঠলেন। সেখানকার বায়ুমণ্ডলে ওজোনস্তরে যে বিশাল শূন্যতার সৃষ্টি হয়েছে তার আয়তন একটা মহাদেশের মতো। এই শূন্যতা সৃষ্টির মূলে কি ক্লোরিনজাত পদার্থ? মার্কিন কোম্পানি 'জেনারেল মোটরস'-এর বিজ্ঞানীরা এই ধরনের ক্লোরিন-সমৃদ্ধ নিষিদ্ধ গ্যাস প্রথম তৈরি করেন ১৯২৮ খ্রীস্টাব্দে। সেই সময় মোটরগাড়ি চালানোর কাজে এই ধরনের গ্যাস ছিল অত্যন্ত জরুরী। তেল পুড়িয়ে যে-গ্যাস উৎপন্ন হয় তা দিয়ে একটা ধাক্কা সৃষ্টি করার জন্য কোন নলের ফাঁকা রাস্তা দিয়ে ঐ নিষিদ্ধ গ্যাস মুহূর্তের মধ্যে বাইরে বের করে দেওয়া দরকার। এই প্রক্রিয়ায় কার্বন, ক্লোরিন ও ফ্লোরিনের যৌগ বের হয়ে আসে। এই নিষ্ক্রিয় গ্যাসের প্রধান গুণ—অন্য কোন পদার্থের সঙ্গে সচরাচর কোন রাসায়নিক বিক্রিয়ায় মিশে যায় না। যদি মিশে যেত তাহলে মোটরগাড়ির তেল পুড়িয়ে ধাক্কা সৃষ্টি করার সঙ্গে সঙ্গে গ্যাস বের হবার

আগেই কোন পদার্থ তৈরি হয়ে যেত। বিজ্ঞানীরা প্রথমে তৈরি করলেন ক্লোরো-ফ্লুরো-কার্বন নামে একটি রাসায়নিক যোগ, সংক্ষেপে যাকে সি. এফ. সি. বলা হয়। প্ল্যাস্টিক ফোম তৈরি করতে কিংবা রেফ্রিজারেটরের শীতল নলে দ্রুত তাপ নিষ্কাশনে এবং স্প্রে করার বিভিন্ন উপযোগী দ্রব্যে সি. এফ. সি. ব্যবহৃত হয়। এই প্রসঙ্গে আরও একটি রাসায়নিক পদার্থের কথা বলতে হয়, সংক্ষেপে যার নাম ডি. ডি. টি. — ডাইক্লোরো-ডাইফিনিল-ট্রাই-ক্লোরোইথেন। এক সুইস বিজ্ঞানী পল হারমান মুল্যার এর আবিষ্কর্তা। প্রথমে তিনি জীবাণুনাশক হিসাবে এটাকে ব্যবহার করেন। দ্বিতীয় বিশ্ব-যুদ্ধের সময় জলা-জঙ্গল থেকে আক্রমণ শুরু করার আগে সৈন্যরা ডি. ডি. টি. ছড়িয়ে দিত। এইভাবে তারা বিষাক্ত মশা-মাছি, কীটপতঙ্গের হাত থেকে রক্ষা পেত। এমনকি ম্যালেরিয়া ও পীতজ্বরের জীবাণুও সম্পূর্ণভাবে পর্যুদস্ত হয়েছিল। আর ঐ একটি আবিষ্কারের জন্য আন্তর্জাতিক বিজ্ঞান সোসাইটি মুল্যারকে নোবেল প্রাইজ দিয়ে কৃতজ্ঞতা জানিয়েছিলেন।

কিন্তু আলোর পাশাপাশি অন্ধকারের মতো ক্লোরিন গ্যাসের অপকারিতাজনিত তথ্য আজ কারও অজ্ঞাত নয়। আর ক্লোরো-ফ্লুরো-কার্বনের গুণের দিকটা যখন চারদিকে ছড়িয়ে পড়েছে তখন এর ত্রুটিবিচ্যুতিও বিজ্ঞানীদের দৃষ্টি এড়িয়ে যায়নি।

ভূ-পৃষ্ঠের দশ থেকে পনেরো কিলোমিটার উচ্চতার বায়ুস্তরে এই ক্লোরো-ফ্লুরো-কার্বন রীতিমতো এক আশঙ্কার কারণ। এই স্তরের স্ট্রাটোস্ফিয়ারে ক্লোরিন অণু ভেসে বেড়ায়। ঊর্ধ্বাকাশে ওজোন অণু তৈরি হয় অক্সিজেন অণু থেকে। অক্সিজেন অণুর ওপর সূর্যের অতিবেগুনি রশ্মি পড়ে দুটি আলাদা পরমাণু সৃষ্টি করে। তারপর ঐ পরমাণু-দুটি আরও দুটি নতুন অক্সিজেন অণুর সঙ্গে জুড়ে যায়। যার ফলে এমন দুটি অণু পাওয়া যায়, যাদের প্রতিটিতে রয়েছে তিনটি করে অক্সিজেন পরমাণু। এই তিন পরমাণু-বিশিষ্ট অক্সিজেনই হলো ওজোন। এই ওজোনই দশ থেকে পনেরো কিলোমিটার উচ্চতায় অক্সিজেনের একমাত্র বিকল্প।

ওজোন গ্যাসের ভিতরে অবাধে প্রবেশ করে গুপ্তঘাতকের মতো আঘাত হানছে ক্লোরো-ফ্লুরো-কার্বন। প্রথমে ওরা ওজোনস্তরের ওপর অতি-বেগুনি রশ্মির মধ্যে গাঢাকা দিয়ে লুকিয়ে থাকে। এই অতিবেগুনি রশ্মি প্রথমেই সি. এফ. সি. অণু থেকে ক্লোরিনের পরমাণুকে সরিয়ে দেয়। তারপর সেই ক্লোরিন পরমাণু ওজোনস্তরে আঘাত হানে। তিনটি অক্সিজেন গুণসম্পন্ন ওজোন পরমাণুকে আয়ত্তে নিয়ে সে ক্লোরিন মনোক্সাইডে পরিণত হয়ে যায়; ওজোন অক্সিজেনে রূপান্তরিত হয়। তারপর নতুন করে আর একটা ওজোন অণুকে অক্সিজেনে রূপান্তরিত করার জন্য শুরু হয় প্রস্তুতি। এভাবে ক্লোরিন পরমাণু একের পর এক ওজোন অণুকে অক্সিজেনে পরিণত করে শেষ পর্যন্ত পরিণত হয় মুক্ত ক্লোরিনে। ব্যাপারটা খুবই আশ্চর্যের। এইভাবে লক্ষ লক্ষ ওজোন অণুর সর্বনাশ করতে পারে ঐ ক্লোরো-ফ্লুরো-কার্বন। পৃথিবীর ওপর সর্বত্রই উপরি-উক্ত কারণে ওজোনস্তরের ক্ষতিসাধন হয়ে চলেছে, তবে কুমেরুর আকাশে ওজোনস্তরে বিশাল শূন্যতা সৃষ্টির কারণ মনে হয় স্থানীয় বিশেষ পরিবেশ।

১৯৮৭ খ্রীস্টাব্দের ১৬ সেপ্টেম্বর কানাডার মন্ট্রিলে ৪০টি দেশের এক শীর্ষসম্মেলন হয়। সেখানে যোগদানকারী দেশগুলির মধ্যে একটি চুক্তি হয়। বায়ুমণ্ডলে কার্বন-ডাই-অক্সাইডের পরিমাণ হ্রাস করা নিয়ে ব্যবস্থা গ্রহণে উদ্যোগী হবার জন্য প্রস্তাব গৃহীত হয়।

ভারতবর্ষের অন্যতম অঙ্গরাজ্য হিসাবে পশ্চিম-বঙ্গের বনাঞ্চলের অবস্থা খুব একটা ভাল নয়। বিশ্ব-বনভূমির মানচিত্রে পশ্চিমবঙ্গের বনাঞ্চল এক বিশেষ বৈচিত্র্যের দাবি রাখে। এখানে যেমন পাহাড়ী অঞ্চলের বনভূমি রয়েছে তেমনি আছে ডুয়ার্সের তরাই অঞ্চল। লাল পলিজ মাটির বন এবং দক্ষিণাঞ্চলের সুন্দরবনের সামুদ্রিক বন—এই বৈচিত্র্যই পশ্চিমবঙ্গের পরিবেশকে এক অনন্যসাধারণ রূপে সমৃদ্ধ করেছে। গ্রীষ্মমণ্ডলে অবস্থান সত্ত্বেও এখানকার বায়ুমণ্ডলে কখনো রুক্ষতার অভিশাপ ছিল না। কিন্তু ক্রমাগত কার্বন-ডাই-অক্সাইডের বৃদ্ধিতে বায়ুমণ্ডলে যেভাবে তাপবৃদ্ধি হচ্ছে তার ফলে অদূর ভবিষ্যতে সমগ্র পৃথিবীতে কি একদিন মরুভূমি নেমে আসবে? □

## গ্রন্থ-পরিচয়

# বিজ্ঞান ও বেদান্তের সৃষ্টিতত্ত্ব

বিশ্বরঞ্জন নাগ

**The Fate of Modern Science :** Dhananjay Pal. DNA Pharmaceuticals, Domjur, Howrah-711405. Pages 3+153, Price : not printed.

সত্য এক ; যদিও সত্যে পৌঁছাবার পথ বিভিন্ন। বিজ্ঞানীরা এক পথে এগিয়ে চলেছেন, যে-পথের নিশানা হলো জড়জগতের ঘটনাবলী। পরীক্ষা-ভিত্তিক ঘটনাগুলির ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বিজ্ঞানীরা প্রকৃতির নিয়মগুলি আবিষ্কার করছেন। নিয়মের প্রয়োগ করে নতুন নতুন ঘটনা ঘটাচ্ছেন এবং সূক্ষ্ম থেকে সূক্ষ্মতর প্রকৃতির স্বরূপ জানছেন।

অধুনা বিজ্ঞানীরা বিশ্বসৃষ্টির মুহূর্তে যে-ঘটনা ঘটেছিল সেই ঘটনাকে অনুমান করবার চেষ্টা করছেন। তাঁরা সিদ্ধান্তে এসেছেন যে, এই বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড দুই ধরনের কণা—বস্তুকণা (কোয়ার্ক) ও শক্তিকণার (বোসন) সংযোজনে গড়ে উঠেছে। এই দু-ধরনের কণা পরস্পরের স্বরূপে রূপান্তরিত হতে পারে। বস্তুকণা থেকে শক্তিকণা হতে পারে, আবার শক্তিকণা থেকে বস্তুকণা হতে পারে। বিজ্ঞানীরা মনে করছেন যে, সৃষ্টির মুহূর্তে বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড ছিল একটি বিন্দুতে ঘনীভূত অসীম শক্তি। সেই বিন্দু ক্রমান্বয়ে পরিবর্তিত ও পরিবর্ধিত হয়েছে একটি বিস্ফোরণের ('বিগ ব্যাং') ফলে। বিস্ফোরণটি কেন হলো তার কোন সন্তোষজনক ব্যাখ্যা নেই, কিন্তু এর পরবর্তী ঘটনাগুলি পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে বিজ্ঞানীরা অনুমান করার চেষ্টা করছেন। এই অনুমানের ভিত্তি কিন্তু বর্তমান বিশ্বের কতকগুলি নিয়ম, যেমন রিলেটিভিটি, কোয়ান্টাম মেকানিক্স। বিজ্ঞানীরা ধরে নিয়েছেন যে, এই নিয়মগুলি সৃষ্টির মুহূর্তেও প্রযোজ্য। যদি 'বিগ ব্যাং' মতবাদ ঠিক হয় তাহলে বর্তমান বিশ্বেও সেই ঘটনার ফলে কতকগুলি ঘটনা দেখা যাবে। বিজ্ঞানীরা সেই ঘটনাগুলি প্রত্যক্ষ করবার চেষ্টা করছেন। কিছু কিছু এমন ঘটনার, যেমন একধরনের মাইক্রোওয়েভ বিকিরণের সন্ধান পাওয়া গিয়েছে। কিন্তু সব ঘটনা এখনো জানা যায়নি। তাই 'বিগ ব্যাং' মতবাদ পুরোপুরি বৈজ্ঞানিক সত্য হিসাবে এখনো প্রতিষ্ঠিত হয়নি। অন্যান্য মতবাদ নিয়েও গবেষণা চলছে। তাই বিশ্ব-সৃষ্টির রহস্য বিজ্ঞানীদের কাছে এখনো অস্পষ্ট, যদিও জানবার পথে বিজ্ঞানীরা অনেক এগিয়ে গিয়েছেন।

বেদের ঋষিরা এই সত্যকে জেনেছিলেন অন্য পথে, যে-পথের আভাস পাওয়া যায়, কিন্তু পূর্ণ পরিচয় পাওয়া যায় না। মনে হয়, তাঁদের অন্ত-র্নিহিত মননশক্তিকে অবলম্বন করে যোগের মাধ্যমে তাঁরা অভীষ্ট সত্যকে আয়ত্ত করেছিলেন। তাঁদের মতে, এই বিশ্ব-সৃষ্টির উপাদান আকাশ ও প্রাণ। কল্প থেকে কল্পান্তরে এই আকাশ ও প্রাণের সংযোজনে প্রকৃতি রূপ পাচ্ছে, আবার অরূপে ফিরে যাচ্ছে। কল্পশেষে বিশ্বের অনন্ত শক্তি সাম্যাবস্থায় ফিরে যাচ্ছে। আবার আদ্যাশক্তির ইচ্ছায় নতুন রূপে তা প্রকাশিত হচ্ছে। সেই সৃষ্টির মুহূর্ত থেকে ক্রমান্বয়ে এই বিশ্বপ্রকৃতি যেভাবে প্রকাশিত হয়েছে তার যে-বর্ণনা ভাগবতে পাওয়া যায়, বিজ্ঞানীদের 'বিগ ব্যাং'-এর সঙ্গে তার অনেক সাদৃশ্য আছে। বিজ্ঞানীরা 'বিগ ব্যাং'-এর পরের ঘটনা অনুমান করেছেন, কিন্তু তার আগের ঘটনা সম্পর্কে কোন অনুমানই করতে পারছেন না। বেদ-বেদান্তে সৃষ্টির পূর্বঘটনারও আভাস দেওয়া হয়েছে এবং বর্তমানে সেই ঘটনা উপলব্ধি করা সম্ভব বলে মনে করা হয়েছে।

বিজ্ঞানের সিদ্ধান্ত এক বিজ্ঞানী অন্য বিজ্ঞানীকে বোঝাতে পারেন। সাধারণতঃ অঙ্কের মাধ্যমেই বিজ্ঞানের সিদ্ধান্ত প্রতিষ্ঠিত হয় এবং কোন তত্ত্বের অঙ্কটা বুঝতে পারলেই এক বিজ্ঞানীর বক্তব্য অন্য বিজ্ঞানী বুঝতে পারেন। সত্যের সন্ধান অবশ্য সোজাসুজি অঙ্কের মাধ্যমে পাওয়া যায় না, বিজ্ঞানীর চিন্তাজগতেই সত্য ভেসে ওঠে এবং খুব অল্পসংখ্যক ভাগ্যবান বিজ্ঞানীই সত্যকে প্রত্যক্ষ করেন। কিন্তু কোন বিজ্ঞানী সত্যকে জানতে পারলে

অন্য বিজ্ঞানীদের বোধগম্য করে সত্যকে প্রকাশ করতে পারেন। আবার নতুন পরীক্ষার দ্বারাও তিনি সত্যাসত্য প্রতিষ্ঠিত করতে পারেন। জড়-জগৎ নতুন ঘটনার দ্বারা প্রমাণিত না হলে বিজ্ঞানের কোন সত্য স্বীকৃত হয় না। তাই বিজ্ঞানের আবিষ্কৃত সত্য একজনের আবিষ্কৃত হলেও সর্বজনগ্রাহ্য।

বেদান্তের আবিষ্কৃত সত্য একজনের দ্বারা উপলব্ধ হলেও তাকে সর্বজনগ্রাহ্য করা সম্ভব নয়। যে-ঋষি সত্যকে জেনেছেন তিনিই ঘোষণা করেছেন : "বেদাহমেতং পুরুষং মহান্তম্" ; কিন্তু এই ঘোষণা তাঁর অন্তরের উপলব্ধির ভিত্তিতে। অন্যকে উপলব্ধি করানোর পন্থা বৈজ্ঞানিক সত্য প্রচারের মতো সহজ নয়। ঋষির বক্তব্যকে বিশ্বাস করে যদি কেউ তাঁর পথে এগিয়ে যায় তাহলে হয়তো সেও এই সত্যকে জানতে পারবে ; কিন্তু একাজ সহজ নয়। তাই সব যুগেই ব্রহ্মবিদের সংখ্যা অতি অল্প। বেদান্তের সত্যকে গ্রহণ করতে হলে মূলতঃ বিশ্বাসকে অবলম্বন করতে হয়। জড়জগতে পরীক্ষার দ্বারা বৈজ্ঞানিকরা যেভাবে সত্যের পরীক্ষা করেন সেভাবে আধ্যাত্মিক সত্যকে প্রত্যক্ষ করা বা অপরের কাছে প্রমাণ করা কঠিন।

ডঃ ধনঞ্জয় পালের **The Fate of Modern Science** নামের থিসিসটি বিজ্ঞান ও বেদান্তের সৃষ্টিতত্ত্ব নিয়ে। বিজ্ঞানীদের সৃষ্টিতত্ত্ব তিনি প্রাঞ্জলভাবে বর্ণনা করেছেন। বিজ্ঞানী বা বিজ্ঞানের ছাত্র না হলেও এই বর্ণনা প্রণিধান করা সহজেই সম্ভব। আবার বেদান্তের সিদ্ধান্তও ডঃ পাল সহজভাবে বর্ণনা করেছেন। দর্শনের কোন জ্ঞান না থাকলেও এই বর্ণনা থেকে মূল বক্তব্য সম্পর্কে ধারণা করা সম্ভব। নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, বিজ্ঞান ও বেদান্তের মতবাদ পাঠকের বোধগম্য করে পরিবেশনায় ডঃ পাল সফল হয়েছেন।

ডঃ পাল সিদ্ধান্ত করেছেন, বিজ্ঞান যতটা এগিয়েছে তার বেশি এগোতে গেলে নতুন পথ বেছে নিতে হবে। তিনি কতকগুলি সমস্যা ও তার সমাধানের কথা বলেছেন, কিন্তু এই সিদ্ধান্ত মেনে নেওয়ার সময় এখনো আসেনি। বিজ্ঞানীরা যে-পথে এগিয়ে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম কণার সন্ধান পেয়েছেন এবং পরীক্ষার মাধ্যমে তাদের অস্তিত্ব প্রমাণ করেছেন সে-পথে চরম সত্যকে জানা যাবে না—একথা সর্বজনগ্রাহ্য হবে না। বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের মূল শুধুমাত্র মনোজগতে প্রকাশিত—এমন ভাবার কোন কারণ নেই। জড়জগতেও তা প্রকাশিত এবং জড়জগতের অনুশীলন এবং বিশ্লেষণ থেকেও তাকে জানা যেতে পারে—বিজ্ঞানীদের এই বিশ্বাস এখনো ভেঙে যায়নি। তাই ডঃ পালের সিদ্ধান্ত গ্রহণযোগ্য নয়।

থিসিসটি সাধারণভাবে পাঠকের মনোযোগ আকর্ষণ করবে। তবে বহু জায়গায় একই বিষয়ের এবং একই বক্তব্যের পুনরাবৃত্তি থাকায় সিদ্ধান্ত-গুলি ঠিক কেন্দ্রীভূত হয়নি। পুনরাবৃত্তির ফলে থিসিসটি পড়তে গিয়ে প্রায়ই খেই হারিয়ে যায়।

সব মিলিয়ে বলা যায়, ডঃ পালের প্রচেষ্টাটি বিশেষভাবে প্রশংসার যোগ্য। বিশ্বরহস্য নিয়ে যাঁরা গবেষণা করেন, এই থিসিসটি তাদের নতুন চিন্তা করতে সাহায্য করবে।

## প্রাপ্তিস্বীকার

**পরাশিস :** সংকলন—ব্রহ্মচারিণী কৃষ্ণা দেবী ও ব্রহ্মচারিণী শিবানী দেবী। সন্ত-আশ্রম। বি ৬/১২৫ কল্যাণী, নদীয়া। পৃষ্ঠা ২০৮। মূল্য : কুড়ি টাকা।

**মাড়োয়ারী মোজেইক :** শান্তিলাল মুখোপাধ্যায়। প্রাইমা পাবলিকেশন্স। ৮৯, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা ৭০০ ০০৭। পৃষ্ঠা ৬+২১২। মূল্য : তিরিশ টাকা।

**গীতি-মালিকা :** মোহনলাল দত্ত। 'সাহিত্য প্রকাশ'। ৬০, জেমস লঙ সরণি, কলিকাতা-৭০০০৩৪। পৃষ্ঠা ১০+৬২। মূল্য : পনেরো টাকা।

**আরতি :** সমীরকুমার মুখোপাধ্যায়। রুদ্রনগর, বীরভূম। পৃষ্ঠা ৪+৩৬। মূল্য : তিন টাকা।

**আলো :** গঙ্গাধর ঘোষ। গ্রাম ও পোঃ—ছোটবেলুন, বর্ধমান। পৃষ্ঠা ৬+৬২। মূল্য : পাঁচ টাকা।

**Phalguni :** Ramakrishna Mission Vidyalaya, Narendrapur, 24 Parganas (South), West Bengal, Pin : 743508. Pages : 27+75+72+22. □

# রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশন সংবাদ

## উৎসব-অনুষ্ঠান

গত ১৪ জানুয়ারি বেলুড় মঠে স্বামী বিবেকানন্দের ১৩১তম আবির্ভাব-উৎসব নানা অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে উদ্‌যাপিত হয়। সারাদিন ধরে প্রচুর ভক্ত নরনারী উৎসবে যোগদান করেন। দুপুরে প্রায় ২১ হাজার ভক্তকে হাতে হাতে খিচুড়ি প্রসাদ দেওয়া হয়। অপরাহ্ণে স্বামী প্রভানন্দের সভাপতিত্বে এক জনসভায় স্বামী বিবেকানন্দের জীবন ও বাণী আলোচনা করা হয়।

গত ২৪ থেকে ২৬ ডিসেম্বর পর্যন্ত আঁটপুর রামকৃষ্ণ মঠের বার্ষিক উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। তিনদিনব্যাপী এই উৎসবে বিশেষ পূজা, হোম ধুনিপ্রজ্বালন ও ধর্মসভাসহ বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছিল। স্থানীয় ও বহিরাগত অগণিত ভক্ত এই উৎসবে যোগদান করেন। ধর্মসভাগুলিতে বক্তব্য রাখেন স্বামী নির্জরানন্দ, স্বামী অর্হানন্দ, স্বামী সনাতনানন্দ, স্বামী জয়ানন্দ, অধ্যাপক শঙ্করীপ্রসাদ বসু, অধ্যাপক প্রেমবল্লভ সেন, নচিকেতা ভরদ্বাজ, সৌরেন্দ্রনাথ সরকার, অমিয় চক্রবর্তী প্রমুখ। প্রতিদিনই গীতিনাট্য, গীতি-আলেখ্য, ভজন, কীর্তন ও বাউল গান পরিবেশিত হয়।

## জাতীয় যুবদিবস ও জাতীয় যুবসপ্তাহ পালন

বেলুড় মঠে গত ১২ জানুয়ারি জাতীয় যুবদিবস উপলক্ষে সারাদিনব্যাপী অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছিল। সকালে এক যুব-সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। সভাপতিত্ব করেন স্বামী শিবময়ানন্দ। বিকালে পশ্চিমবঙ্গ সরকার-আয়োজিত 'সংহতি দৌড়' নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ মিশন থেকে আরম্ভ হয়ে বেলুড় মঠে আসে। এই বৃহৎ যুবসমাবেশে সভাপতিত্ব করেন রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের সাধারণ সম্পাদক স্বামী আত্মস্থানন্দজী। পশ্চিমবঙ্গের যুব ও ক্রীড়ামন্ত্রী সুভাষ চক্রবর্তী ও হাওড়ার মেয়র স্বদেশ চক্রবর্তী সমাবেশে ভাষণ দেন। পশ্চিমবঙ্গের পরিবেশমন্ত্রী পতিতপাবন পাঠক সমাবেশে উপস্থিত ছিলেন।

রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের নিম্নলিখিত শাখাকেন্দ্রগুলিতে নানা অনুষ্ঠানের মাধ্যমে **জাতীয় যুবদিবস ও জাতীয় যুবসপ্তাহ** উদ্‌যাপন করা হয়েছে। কোন কোন আশ্রমের অনুষ্ঠানে কেন্দ্রীয় ও সংশ্লিষ্ট রাজ্যের মন্ত্রিগণ ও বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ যোগদান করেছিলেন।

মাদ্রাজ মঠ, কোয়েম্বাটোর রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যালয়, ত্রিবান্দ্রম রামকৃষ্ণ আশ্রম স্বাস্থ্য মঙ্গলম, জয়পুর রামকৃষ্ণ মিশন, কালাডি রামকৃষ্ণ অদ্বৈতাশ্রম, হায়দ্রাবাদ রামকৃষ্ণ মঠ, দিল্লী রামকৃষ্ণ মিশন, রাজকোট রামকৃষ্ণ আশ্রম, পুরুলিয়া রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যাপীঠ, আসানসোল রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম, চিঙ্গলপত্তু রামকৃষ্ণ মিশন, মনসাদ্বীপ রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম, জলপাইগুড়ি রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম, রাঁচি রামকৃষ্ণ মিশন স্যানাটোরিয়াম, আগরতলা রামকৃষ্ণ মিশন, চণ্ডীগড় রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম, খেতড়ি রামকৃষ্ণ মিশন, মালদা রামকৃষ্ণ মিশন এবং বিশাখাপত্তনম রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম।

## স্বামী বিবেকানন্দের ভারত-পরিক্রমার শতবর্ষপূর্তি উৎসব

**রাঁচি ( মোরাবাদী ) আশ্রম** গত ১২ জানুয়ারি স্বামীজীর ভারত-পরিক্রমার শতবর্ষপূর্তি উপলক্ষে স্বামী বিবেকানন্দের ওপর 'যুগনায়ক' নামে একঘণ্টা দৈর্ঘ্যের একটি ক্যাসেট প্রকাশ করেছে।

**চিঙ্গলপত্তু আশ্রম** স্বামী বিবেকানন্দের পণ্ডিচেরী পরিভ্রমণের শতবর্ষপূর্তি উপলক্ষে বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা এবং ১০০টি বিদ্যালয় ও মহাবিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে প্রতিযোগিতামূলক অনুষ্ঠান করেছে। গত ২৩ জানুয়ারি পুরস্কার বিতরণ করেন পণ্ডিচেরীর মুখ্যমন্ত্রী এবং উদ্বোধন করেন পণ্ডিচেরীর উপরাজ্যপাল।

**বিশাখাপত্তনম আশ্রম** গত ২৫ ও ২৬ ডিসেম্বর '৯২ নানা প্রতিযোগিতামূলক অনুষ্ঠান, ১ জানুয়ারি '৯৩ হাসপাতালের রোগীদের মধ্যে ফল বিতরণ এবং আদিবাসী ও অনুন্নত সম্প্রদায়ের মধ্যে চারহাজার পুরনো পোশাক-পরিচ্ছদ বিতরণ করেছে।

চণ্ডীগড় আশ্রম গত দু-মাসে পাঞ্জাবের বিভিন্ন শহরে সভা করেছে। তাছাড়া গত ১০ ও ১১ জানুয়ারি দু-দিন সাধন-শিবির পরিচালনা করেছে।

খেতড়ি আশ্রম গত দু-মাসে রাজস্থানের বিভিন্ন স্থানে ১৮টি জনসভা এবং খেতড়িতে সাংস্কৃতিক ও প্রতিযোগিতামূলক অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছিল।

হায়দ্রাবাদ মঠ গত ২ ও ৩ জানুয়ারি দু-দিনের এক শিক্ষক সম্মেলন এবং ছাত্রছাত্রীদের জন্য প্রতিযোগিতামূলক অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছিল।

মালদা আশ্রম তফসিলী জাতি ও উপজাতি ছাত্রছাত্রীদের পশমী কম্বল ও শিক্ষা-সরঞ্জাম দিয়েছে। এই আশ্রম মালদা ও দিনাজপুর জেলার ছয় জায়গায় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান করেছে।

দিল্লী আশ্রম রোশনারা রোডে ডঃ কর্ণ সিংয়ের সভাপতিত্বে এক জনসভা করেছে। প্রধান অতিথি ছিলেন কেন্দ্রীয় মানবসম্পদ উন্নয়নমন্ত্রী অর্জুন সিং।

## ছাত্র-কৃতিত্ব

মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক অনুষ্ঠিত ১৯৯২ খ্রীষ্টাব্দের বি. এ., বি. কম. ও এম. এ. পরীক্ষায় মাদ্রাজ বিবেকানন্দ কলেজের ছাত্রগণ নিম্নলিখিত স্থানগুলি লাভ করেছে ঃ

বি. এ. ঃ সংস্কৃতে—১ম, ২য় ও ৩য় স্থান। দর্শনে—৩য় স্থান। ইতিহাসে—৫ম স্থান।

বি. কম. ঃ ১ম ও ১০ম স্থান।

এম. এ. ঃ দর্শনে—১ম, ২য় ও ৩য় স্থান। সংস্কৃতে—১ম স্থান।

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক অনুষ্ঠিত ১৯৯২ খ্রীষ্টাব্দের বি. এসসি. পার্ট টু গণিতের সাম্মানিক পরীক্ষায় সারদাপীঠ বিদ্যামন্দিরের ছাত্ররা ৩য়, ৪র্থ, ৭ম, ১১শ, ১৬শ ও ১৭শ স্থান অধিকার করেছে।

## চক্ষু-অস্ত্রোপচার শিবির

রামকৃষ্ণ মিশন সেবাপ্রতিষ্ঠান গত ২৬ জানুয়ারি বর্ধমানে এক চক্ষু-অস্ত্রোপচার শিবির পরিচালনা করে। শিবিরে মোট ৮২জনের চোখের ছানি অস্ত্রোপচার করা হয়।

গড়বেতা আশ্রম পরিচালিত চক্ষু-অস্ত্রোপচার শিবিরে মোট ৬৭জনের ছানি অস্ত্রোপচার করা হয়েছে।

## চিকিৎসা-শিবির

পুরী মঠ পুরী শহরে ও নিমপাড়া গ্রামে একটি চিকিৎসা-শিবির পরিচালনা করেছে। শিবিরে ৩০৩জন দন্তরোগী সহ মোট ৫৮৬জন রোগীর চিকিৎসা করা হয়েছে।

## ত্রাণ

### পশ্চিমবঙ্গ দাঙ্গাত্রাণ

দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার মেটিয়াবুরুজ থানার অন্তর্গত কাশ্যপ পাড়া, বদরতলা ও লিচুবাগান অঞ্চলের ৩১৪টি পরিবারকে ৫৬৮টি পশমী কম্বল, ৯টি মশারি, ৪৬টি পুরনো কাপড়, ২৯০টি প্রসাধনী সাবান বিতরণ করা হয়েছে।

কলকাতার ট্যাংরা ও বিবিবাগান অঞ্চলে বরানগর আশ্রমের মাধ্যমে দাঙ্গায় ক্ষতিগ্রস্তদের মধ্যে ১১০টি পশমী কম্বল, ২২৪৯টি পুরনো কাপড়, ৩১০টি প্রসাধনী সাবান বিতরণ করা হয়।

### তামিলনাড়ু বন্যা ও ঝঞ্চাত্রাণ

কোয়েম্বাটোর আশ্রমের মাধ্যমে চিদাম্বরম ও তিরুনেলভেলী জেলার আত্তুর, মেক্কারাই এবং করায়ার গ্রামের ৯৯৫টি পরিবারের মধ্যে ৩৯৮০ কিলোঃ চাল, ৬০০ কিলোঃ ডাল, ৯৯৫ সেট বাসনপত্র, ১৬৫০ লিটার কেরোসিন তেল, ৩৯৫টি শাড়ি, ৩৯৫টি ধুতি, ৩৯৫টি বিছানার চাদর, ৭২৫টি মাদুর, ২৯০০টি পুরনো কাপড়, ৫০০ খাতা ও পেন্সিল বিতরণ করা হয়েছে।

মাদ্রাজ মিশন আশ্রমের মাধ্যমে রামেশ্বরম জেলার ৫টি গ্রামে বন্যায় ক্ষতিগ্রস্তদের মধ্যে ৫০০ কম্বল, ৫০০ তোয়ালে, ১০০ শাড়ি, ১০০ ধুতি ও ৫০০ মাদুর বিতরণ করা হয়েছে। তাছাড়া চেরন-কোভাই ও ধনুস্কোটিতে দুটি টিউবওয়েল বসানো হয়েছে ও একটি কমিউনিটি হল ( খড়ের ছাউনি ) নির্মাণ করা হয়েছে। উক্ত ত্রাণকার্যে মাদ্রাজ মঠও সহযোগিতা করেছে।

### পশ্চিমবঙ্গ গঙ্গাসাগর মেলাত্রাণ

গত ১১ থেকে ১৫ জানুয়ারি পর্যন্ত মকর-সংক্রান্তি উপলক্ষে গঙ্গাসাগরের মেলায় রামকৃষ্ণ মিশন সেবাপ্রতিষ্ঠান, সরিষা আশ্রম ও মনসাদ্বীপ আশ্রমের সহযোগিতায় একটি চিকিৎসা-ত্রাণ শিবির খোলা হয়েছিল। শিবিরের অন্তর্বিভাগে ৮জন

এবং বহির্বিভাগে ১৮৫৬জন রোগীর চিকিৎসা করা হয়েছে। তাছাড়া ৯০টি তুলোর কম্বল বিতরণ করা হয়েছে। মনসাদ্বীপ আশ্রম ২০০ তীর্থযাত্রীর থাকা ও খাওয়ার ব্যবস্থা এবং ১৬৪১জন তীর্থযাত্রীকে চা ও বিস্কুট দিয়ে সেবা করেছে।

### পশ্চিমবঙ্গ বন্যাত্রাণ

পুরুলিয়া জেলার পুরুলিয়া ২নং ব্লকের নবকুষ্ঠাশ্রম গ্রামে ৮২টি চাদর, ৫০টি বিছানার চাদর, ৩৫ কিলোঃ গুঁড়ো দুধ ও ১৫ কিলোঃ বিস্কুট বিতরণ করা হয়েছে।

### বহির্ভারত

**বেদান্ত সোসাইটি অব ওয়েস্টার্ন ওয়াশিংটন**ঃ গত ১৯ ফেব্রুয়ারি এই সোসাইটিতে শিবরাত্রি পালন করা হয়েছে। এই উপলক্ষে বিশেষ পূজা ও ভক্তিগীতি পরিবেশনের আয়োজন করা হয়েছিল। পূজান্তে প্রসাদ-বিতরণ করা হয়েছে। ২৩ ফেব্রুয়ারি শ্রীরামকৃষ্ণদেবের আবির্ভাব-তিথি উদ্‌যাপন করা হয়। ঐ দিন সন্ধ্যা ৭টায় বিশেষ পূজা, ভক্তিগীতি, প্রসাদ-বিতরণ প্রভৃতি অনুষ্ঠিত হয়েছে। প্রতি রবিবার ধর্মীয় ভাষণ ও মঙ্গলবার 'দ্য গসপেল অব শ্রীরামকৃষ্ণ'-এর ক্লাস হয়েছে।

**বেদান্ত সোসাইটি অব পোর্টল্যান্ড**ঃ ফেব্রুয়ারি মাসের রবিবারগুলিতে ধর্মীয় বিষয়ে ভাষণ হয়েছে। ৬, ১৯ ও ২৩ ফেব্রুয়ারি যথাক্রমে স্বামী অদ্ভুতানন্দজী মহারাজের জন্মতিথি, শিবরাত্রি এবং শ্রীরামকৃষ্ণদেবের আবির্ভাব-তিথি পালন করা হয়েছে।

গত ১৯ জানুয়ারি এই কেন্দ্রের স্বামী শান্তরূপানন্দ প্যাসিফিক বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শন বিভাগের আমন্ত্রণে ঐ বিশ্ববিদ্যালয়ের 'জেফারসন হল'-এ 'হিন্দুধর্ম' বিষয়ে ভাষণ দিয়েছেন।

**বেদান্ত সোসাইটি অব নিউ ইয়র্ক**ঃ ফেব্রুয়ারি মাসের রবিবারগুলিতে নানা ধর্মীয় বিষয়ে ভাষণ হয়েছে। ২৩ ফেব্রুয়ারি শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জন্মতিথি উপলক্ষে তাঁর বাণীর ওপর আলোচনা করেছেন এই কেন্দ্রের অধ্যক্ষ স্বামী তথাগতানন্দ। তাছাড়া প্রতি মঙ্গলবার ও শুক্রবার যথারীতি 'শ্রীরামকৃষ্ণ দ্য গ্রেট মাস্টার' ও ভগবদ্গীতার ক্লাস হয়েছে।

**বেদান্ত সোসাইটি অব নর্দান ক্যালিফোর্নিয়া, সানফ্রান্সিস্কো**ঃ গত ১৯ ও ২৩ ফেব্রুয়ারি যথাক্রমে শিবরাত্রি ও শ্রীরামকৃষ্ণদেবের আবির্ভাব-তিথি পালন করা হয়। উভয় দিনই ভক্তিগীতি, পাঠ, স্তোত্রপাঠ, জপ-ধ্যান, পূজা পুষ্পাঞ্জলি প্রদান, প্রসাদ-বিতরণ অনুষ্ঠিত হয়। এই দুদিন ভগবান শিব ও শ্রীরামকৃষ্ণের ওপর আলোচনা করেন এই কেন্দ্রের অধ্যক্ষ স্বামী প্রবুদ্ধানন্দ। তাছাড়া সাপ্তাহিক ক্লাস ও ভাষণ যথারীতি হয়েছে।

### দেহত্যাগ

**স্বামী অনামানন্দ** (কেনেথ আর. ক্রীচফিল্ড) গত ৩০ ডিসেম্বর '৯২ হলিউডের ট্রাবিউকো ক্যানিয়ন সাধুনিবাসে রাত ১·৩০ মিনিটে দেহত্যাগ করেন। তাঁর বয়স হয়েছিল ৭৯ বছর। কোমরের হাড় ভেঙে যাওয়ায় তিনি বিগত কয়েক বছর ধরে প্রায় শয্যাশায়ী ছিলেন।

স্বামী অনামানন্দ ছিলেন স্বামী প্রভবানন্দ মহারাজের মন্ত্রশিষ্য। তিনি ১৯৪৮ খ্রীস্টাব্দে হলিউড কেন্দ্রে যোগদান করেন এবং ১৯৬৪ খ্রীস্টাব্দে শ্রীমৎ স্বামী মাধবানন্দজী মহারাজের নিকট সন্ন্যাস লাভ করেন। যোগদান কেন্দ্র ছাড়াও তিনি শিকাগো কেন্দ্রের কর্মী ছিলেন এবং গত এগারো বছর যাবৎ ট্রাবিউকো সাধুনিবাসে ছিলেন। তাঁর খুব সেবাভাব ছিল এবং খুব নিষ্ঠা এবং প্রীতির সঙ্গে তিনি প্রবীণ সন্ন্যাসীদের সেবা করতেন। গত ১৬ জানুয়ারি হলিউড কেন্দ্রে তাঁর আত্মার শান্তিকামনায় বিশেষ পূজা অনুষ্ঠিত হয়।

## শ্রীশ্রীমায়ের বাড়ীর সংবাদ

**সাপ্তাহিক ধর্মালোচনা**ঃ সন্ধ্যারতির পর সারদানন্দ হল-এ স্বামী গর্গানন্দ প্রত্যেক সোমবার শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত, স্বামী পূর্ণাত্মানন্দ ইংরেজী মাসের প্রথম শুক্রবার ভক্তিপ্রসঙ্গ ও অন্যান্য শুক্রবার স্বামী কমলেশানন্দ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ এবং প্রত্যেক রবিবার স্বামী সত্যব্রতানন্দ শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা আলোচনা ও ব্যাখ্যা করছেন। ☐

# বিবিধ সংবাদ

### উৎসব-অনুষ্ঠান

**তিলজলা বিবেকানন্দ সেবা সংসদ** গত ১৬ ও ১৭ জানুয়ারি শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীমা সারদাদেবী ও স্বামী বিবেকানন্দের জন্মোৎসব উদ্‌যাপন করে। ধর্মসভা, শোভাযাত্রা, বিশেষ পূজা, হোম, কৃতী ছাত্র-ছাত্রীদের পুরস্কার বিতরণ প্রভৃতি ছিল অনুষ্ঠানের অঙ্গ। প্রথম দিন অনুষ্ঠানে পৌরোহিত্য করেন স্বামী লোকেশ্বরানন্দ। শ্রীরামকৃষ্ণ ও শ্রীমা সম্পর্কে ভাষণ দেন স্বামী জয়ানন্দ। দ্বিতীয় দিন ধর্মসভায় স্বামীজী সম্পর্কে আলোচনা করেন ডঃ হোসেনুর রহমান এবং ডঃ ক্ষেত্রপ্রসাদ সেনশর্মা। পুরস্কার বিতরণ করেন উপাচার্য রথীন্দ্রনাথ বসু, পৌরোহিত্য করেন স্বামী পূর্ণাত্মানন্দ। নিত্যরঞ্জন মণ্ডলের পরিচালনায় গীতি-আলেখ্য পরিবেশিত হয়।

**বিবেকানন্দ সংস্কৃতি পরিষদ, নব ব্যারাকপুর** ( **উত্তর ২৪ পরগনা** ) গত ২৫-২৭ ডিসেম্বর '৯২ নানা অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীমা সারদাদেবী ও স্বামী বিবেকানন্দের আবির্ভাব-উৎসব পালন করেছে। প্রথম দিন পূজানুষ্ঠানাদির পর ৮০০ ভক্তকে বসিয়ে খিচুড়ি প্রসাদ দেওয়া হয়। সন্ধ্যায় অনুষ্ঠিত ধর্মসভায় বক্তব্য রাখেন স্বামী তত্ত্বস্থানন্দ। দ্বিতীয় দিন অপরাহ্নে যুব-ছাত্র সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলনে প্রায় ২৫০জন ছাত্র-ছাত্রী যোগদান করে। আলোচনায় অংশগ্রহণকারী সকল ছাত্র-ছাত্রীকে পুরস্কার দেওয়া হয়। এদিন স্বামীজীর ওপর আলোচনা করেন স্বামী বন্দনানন্দ ও স্বামী অমলানন্দ। উৎসবের শেষদিনের ধর্মসভায় বক্তব্য রাখেন প্রব্রাজিকা বিকাশপ্রাণা ও প্রব্রাজিকা অজেয়প্রাণা। এদিন দুঃস্থদের মধ্যে ৯১টি কম্বল ও ২টি চাদর বিতরণ করা হয়। দ্বিতীয় ও শেষ দিন সন্ধ্যায় গীতিনাট্য পরিবেশন করেন শিবপুর 'শিল্পতীর্থ'-এর শিল্পিবৃন্দ।

**শ্রীরামকৃষ্ণ সারদা সেবা সংঘ, রানাঘাট ( নদীয়া ) :** গত ১৬ ডিসেম্বর থেকে ২০ ডিসেম্বর '৯২ পর্যন্ত নানা অনুষ্ঠানের মাধ্যমে এই আশ্রমের বার্ষিক উৎসব অনুষ্ঠিত হয়েছে। বিশেষ পূজা, প্রসাদ বিতরণ, ছাত্র-ছাত্রীদের প্রতিযোগিতামূলক অনুষ্ঠান, আশ্রম-সদস্যদের দ্বারা গীতি-আলেখ্য পরিবেশন, ধর্মসভা প্রভৃতি ছিল উৎসবের উল্লেখযোগ্য অনুষ্ঠান। বিভিন্ন অধিবেশন ও সভায় ভাষণ দেন স্বামী অনাময়ানন্দ, স্বামী তত্ত্বস্থানন্দ, স্বামী দিব্যানন্দ ও ডঃ সচ্চিদানন্দ ধর। ১৯ ডিসেম্বর প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণকারী ছাত্র-ছাত্রীদের পুরস্কার বিতরণ করেন স্বামী তত্ত্বস্থানন্দ।

**বরানগর মঠ সংরক্ষণ সমিতি :** গত ১৯ ও ২০ ডিসেম্বর '৯২ সমিতির বার্ষিক উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। প্রথম দিন স্বামী সর্বগানন্দের 'কথায় ও গানে কথামৃত' পরিবেশনের পর ধর্মসভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় পৌরোহিত্য করেন স্বামী রমানন্দ। ভাষণ দেন স্বামী গোপেশানন্দ, স্বামী বিশ্বনাথানন্দ ও নলিনীরঞ্জন চট্টোপাধ্যায়। এদিন একটি স্মারক পত্রিকা প্রকাশ করা হয়। দ্বিতীয় দিন বিশেষ পূজা-হোমাদি, ভক্তিমূলক সঙ্গীত, কালীকীর্তন, স্বামী বিশ্বনাথানন্দ কর্তৃক 'কথামৃত' পাঠ, নির্মল শীলের বাউল গান, তরুণ চক্রবর্তীর বেহালা-বাদন, ধর্মসভা প্রভৃতি অনুষ্ঠিত হয়। ধর্মসভায় সভাপতিত্ব করেন স্বামী তত্ত্বস্থানন্দ, ভাষণ দেন স্বামী পূর্ণাত্মানন্দ। এদিন ফ্রি কোচিং-ক্লাসের ছাত্রদের শীতবস্ত্র এবং আশ্রমকর্মীদের পুরস্কার দেওয়া হয়।

**কল্যাণী শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ সেবাসঙ্ঘ :** এই আশ্রমের যুবশাখার পরিচালনায় ২৭ নভেম্বর চরসরাটী কেন্দ্রীয় বিদ্যালয়ে ও ২৮ নভেম্বর ঘোষপাড়া সতী-মাতা এস্টেট ট্রাস্ট বিদ্যালয়ে যুব-সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলন-দুটিতে যথাক্রমে স্বামী শিবকানন্দ ও স্বামী দিব্যানন্দ যোগদান করেছিলেন।

**পশ্চিম রাজাপুর রামকৃষ্ণ সংঘ ( দক্ষিণ ২৪ পরগনা ) :** গত ২ নভেম্বর আশ্রম-প্রাঙ্গণে বিবেকানন্দ সমবায় বেত ও বাঁশ কারুশিল্প সমিতির উদ্যোগে প্রধানতঃ তপশিলী সম্প্রদায়ের জন্য বেত ও বাঁশের কাজের এক বছরব্যাপী প্রশিক্ষণের উদ্বোধন হয়। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন স্বামী দেবেশ্বরানন্দ।

### রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ ভাবপ্রচার পরিষদের সভা

গত ২৭ সেপ্টেম্বর '৯২ **বসিরহাট রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ সেবাসংঘে** উত্তর ২৪ পরগনা রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ ভাবপ্রচার পরিষদের ষাণ্মাসিক সম্মেলন

অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলনে ৩৬জন প্রতিনিধি যোগদান করেন। সভাপতিত্ব করেন স্বামী অমলানন্দ।

গত ২০ সেপ্টেম্বর **উক্ত পরিষদের নদীয়া ও তৎসংলগ্ন 'ডি' অঞ্চলের সভা কৃষ্ণনগর রামকৃষ্ণ আশ্রমে** অনুষ্ঠিত হয়। সভা পরিচালনা করেন স্বামী অচ্যুতানন্দ। বিকালে ৯০জন দুঃ নববস্ত্র বিতরণ করেন স্বামী রমানন্দ।

গত ২৬ ও ২৭ সেপ্টেম্বর '৯২ **উড়িষ্যা রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ ভাবপ্রচার পরিষদের** প্রথম বার্ষিক **সম্মেলন কটকে** অনুষ্ঠিত হয়। মোট ৮৬জন প্রতিনিধি এতে যোগদান করেছিলেন। সম্মেলনে প্রধান অতিথি ছিলেন স্বামী গৌতমানন্দ। স্বামী শিবেশ্বরানন্দ, স্বামী নিগমাত্মানন্দ, স্বামী দিনেশানন্দ, স্বামী দেবেশানন্দ সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন।

গত ৭ ও ৮ নভেম্বর '৯২ **উক্ত পরিষদের মুর্শিদাবাদ, নদীয়া ও তৎসংলগ্ন উত্তর ২৪ পরগনা, বর্ধমান ও বীরভূম জেলা-শাখার** ৮ম ষাণ্মাসিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। ২৫টি আশ্রম থেকে মোট ১০০জন প্রতিনিধি সম্মেলনে যোগদান করেছিলেন। সম্মেলন পরিচালনা করেন স্বামী দিব্যানন্দ।

**শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ ভক্তসংঘ, ভাঙ্গড়, (দক্ষিণ ২৪ পরগনা):** গত ১ জানুয়ারি ১৯৯৩ এখানে বার্ষিক কল্পতরু উৎসব উদ্‌যাপিত হয়। মঙ্গলারতি, শ্রীশ্রীচণ্ডীপাঠ, শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত পাঠ, প্রদর্শনী, ভক্তিগীতি, শ্রীশ্রীঠাকুর, শ্রীশ্রীমা ও স্বামীজীর বিশেষ পূজা, হোম, পদাবলী কীর্তন প্রভৃতি ছিল সারাদিনব্যাপী অনুষ্ঠানের প্রধান অঙ্গ। বিকাল ২-৩০ মিনিটের ধর্মসভায় বক্তব্য রাখেন স্বামী ভৈরবানন্দ ও স্বামী স্বতন্ত্রানন্দ। সভায় সভাপতিত্ব করেন স্বামী লোকেশ্বরানন্দ। ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন ডাঃ সুধীরকুমার রাহা। সারাদিনব্যাপী অনুষ্ঠানে প্রায় ৪৫ হাজার ভক্ত ও অনুরাগী যোগদান করেন। ২৫ হাজার ভক্ত নরনারীকে বসিয়ে এবং ১০ হাজার ভক্তকে হাতে হাতে খিচুড়ি প্রসাদ দেওয়া হয়।

## বহির্ভারত

গত ১২ জানুয়ারি '৯৩ **ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিবেকানন্দ শিক্ষা ও সংস্কৃতি পরিষদ** স্বামী বিবেকানন্দের ১৩১তম জন্মদিবস উপলক্ষে জগন্নাথ হল-এ এক অনুষ্ঠানের আয়োজন করেন। বিকাল ৪টায় আলোচনাসভা অনুষ্ঠিত হয়। সভাপতিত্ব করেন জগন্নাথ হল-এর প্রাধ্যক্ষ জগদীশচন্দ্র শুক্লাদাশ। উদ্বোধন করেন বিচারপতি দেবেশচন্দ্র ভট্টাচার্য। বিশিষ্ট অতিথিবর্গের মধ্যে ছিলেন ঢাকা রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের প্রধান স্বামী অক্ষরানন্দ, জনাব এস. এম. আলী, জনাব আহমদুল কবির। প্রধান আলোচক ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডঃ পরেশচন্দ্র মণ্ডল। সঙ্গীতানুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন বাংলাদেশের বিশিষ্ট শিল্পিবৃন্দ

## পরলোকে

শ্রীমৎ স্বামী সারদানন্দজী মহারাজের মন্ত্রশিষ্য, বিশিষ্ট স্বাধীনতা সংগ্রামী, বাঁকুড়া জেলার বিষ্ণুপুর শহর-নিবাসী **বঙ্কিমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়** গত ২৩ জানুয়ারি '৯২ পরলোক গমন করেন। তাঁর বয়স হয়েছিল প্রায় ৯০ বছর। বিষ্ণুপুরে 'রামকৃষ্ণ-মন্দির' নামে একটি আশ্রমের তিনি অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন। প্রয়াত বঙ্কিমবাবু আজীবন শ্রীরামকৃষ্ণ ভাবধারার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন এবং উদ্বোধন পত্রিকার নিয়মিত গ্রাহক ছিলেন।

শ্রীমৎ স্বামী বিরজানন্দজী মহারাজের মন্ত্রশিষ্যা ঢাকুরিয়ার **শিবানী দাশগুপ্ত** গত ১১ আগস্ট '৯২ ভোর ৪-৪৫ মিনিটে শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৬৮ বছর। তিনি উদ্বোধন পত্রিকার নিয়মিত গ্রাহিকা ছিলেন।

শ্রীমৎ স্বামী বীরেশ্বরানন্দজী মহারাজের মন্ত্রশিষ্য বঙ্গাইগাঁও (আসাম) রামকৃষ্ণ সেবাশ্রমের প্রাক্তন সম্পাদক **মনোমোহন দেব** ৮০ বছর বয়সে গত ১২ আগস্ট '৯২ পরলোকগমন করেন। তাঁর প্রচেষ্টাতেই বঙ্গাইগাঁওয়ে আশ্রম প্রতিষ্ঠিত হয়। তাছাড়াও তিনি নানা সেবামূলক কাজের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন।

শ্রীমৎ স্বামী বীরেশ্বরানন্দজী মহারাজের মন্ত্রশিষ্য **রামেশ্বর ঘোষ** গত ২ আগস্ট মুঙ্গেরে শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। তিনি উদ্বোধন পত্রিকার নিয়মিত গ্রাহক ছিলেন। ☐

## বিজ্ঞান-সংবাদ

# সেই বিখ্যাত বিলাসবহুল জাহাজ টাইটানিক

১৯১২ খ্রীস্টাব্দের ১৪এপ্রিল পৃথিবীর তৎকালীন বৃহত্তম জাহাজ 'টাইটানিক'-এর প্রথম যাত্রাতেই যখন আটলান্টিক মহাসাগরে ১৫২২জন যাত্রীসহ সলিল-সমাধি হয়েছিল তখন সারা বিশ্ব স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিল। সেই সময় থেকে সাম্প্রতিককাল পর্যন্ত এই নিয়ে নানা প্রশ্ন আলোচিত হয়েছেঃ সকল প্রকার সাবধানতা নেওয়া সত্ত্বেও কেন এমন হলো? ঠিক কোন্ জায়গায় এবং কিভাবে এই দুর্ঘটনা হলো? টাইটানিকের বিপদের সময় অন্য কোন জাহাজ সাহায্যের জন্য এগিয়ে যায়নি কেন? ১৯৮৫ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত এইসব প্রশ্নের কোন সদুত্তর পাওয়া যায়নি।

পঞ্চাশ হাজার টন ওজনের এই জাহাজটির মালিক ছিল ইংল্যাণ্ডের 'হোয়াইট স্টার লাইন'। যাত্রীদের সকল রকম সুবিধা, নিরাপত্তা ও আরামের দিকে দৃষ্টি রেখে জাহাজটি তৈরি হয়েছিল। প্রথম যাত্রায় ২৬০৩টি সংরক্ষিত আসনের সবগুলি ভর্তি হয়নি; যাত্রী ও জাহাজকর্মী মিলে সংখ্যা দাঁড়িয়েছিল ২২২৭। জাহাজের গন্তব্যস্থল ছিল সাউদাম্পটন বন্দর থেকে নিউ ইয়র্ক। আর ৪৮ ঘন্টার পরেই নিউ ইয়র্ক পৌঁছানোর কথা। এমন সময় ১৪ এপ্রিল রাত্রি ১১-৪০ মিনিটে জাহাজের সঙ্গে এক হিমবাহের সঙ্গে ধাক্কা লেগে জাহাজে জল ঢুকতে আরম্ভ করল। শক্তিশালী ট্রান্সমিটারের সাহায্যে বিপদ-সংকেত ঘোষণা করা হলো। নিকটবর্তী যে-জাহাজ (ক্যালিফোর্নিয়ান) ছিল, সে সংকেত পেলেও ঘটনাস্থলে আসতে তার দুঘন্টা সময় লাগত। উপায় নেই, কাজেই লাইফবোট নামানো সাব্যস্ত হলো। দুর্ভাগ্যবশতঃ লাইফবোটের সংখ্যা (২০) যা ছিল, তাতে ১১৭৮জন যাত্রীর স্থান হতে পারত। (বর্তমানে প্রতি যাত্রীই যাতে লাইফ-বোটে স্থান পায় সেরূপ নিয়ম চালু হয়েছে।) প্রথম লাইফবোট নামানো হয় মধ্যরাত্রির পর ১২-৪৫ মিনিটে এবং শেষেরটি নামানো হয় রাত্রি ২-০৫ মিনিটে। প্রথা অনুসারে প্রথমে নারী ও শিশুদের লাইফবোটে স্থান করে দেওয়া হয়। দুঃখের বিষয়, লাইফবোটগুলি সম্পূর্ণ ভর্তি হয়নি, কারণ অনিশ্চয়তার মধ্যে রাত্রির ঠান্ডায় (২৮$^0$ ফারেন-হাইটে) অনেক যাত্রী বিপদের ঝুঁকি নিতে চাননি। আরেকটি জাহাজ কার্থিপিয়া ৫৮ মাইল দূরে থেকে যখন ঘটনাস্থলে ভোর চারটে নাগাদ এসে পৌঁছাল, তখন টাইটানিক সমুদ্রগর্ভে; তবে লাইফবোটের যাত্রীদের সে তুলে নিতে পেরেছিল। জাহাজের ক্যাপ্টেন ছিলেন এডওয়ার্ড চার্লস স্মিথ, যাঁর ছিল ৪৩ বছরের সমুদ্রযাত্রার অভিজ্ঞতা; তাঁরও সলিল সমাধি হয়েছিল।

১৯১২ খ্রীস্টাব্দ থেকেই টাইটানিকের সন্ধান চালানো হচ্ছিল, তবে তার সঠিক অবস্থান নিরূপিত হয়েছে ১৯৮৫ খ্রীস্টাব্দে, ১ সেপ্টেম্বর—৪২$^0$ ল্যাটিচিউড উত্তরে ও ৫২$^0$ ল্যাটিচিউড পশ্চিমে। আমেরিকান ও ফরাসীদের যুগ্ম প্রচেষ্টায় এটি সম্ভব হয়েছে। টিমের অধিনায়ক ছিলেন রবার্ট ডি. ব্যালার্ড, যিনি ১৩ বছরের চেষ্টার পরে এই কাজে সফল হয়েছেন। ডুবোজাহাজের সাহায্যে ১৩০০০ ফিট (প্রায় আড়াই মাইল) নিচে টাইটানিকের কাছে পৌঁছাতে তাঁর সময় লেগেছিল আড়াই ঘন্টা। ভিডিও ক্যামেরার সাহায্যে নানা তথ্য এঁরা সংগ্রহ করেছেন। হিমবাহের ধাক্কায় যে ফাটল ধরেছিল, সেটি ৩০০ ফিট লম্বা। দেখা গেল, টাইটানিক দুভাগ হয়ে পড়ে আছে; সমুদ্রতলে ভূমিকম্প বা ধস নামার জন্য হয়তো এমন হয়েছে। টাইটানিকের আর সেই 'রানী'র চেহারা নেই। কাঠ-খাওয়া জীবাণুরা তার গায়ে গর্তের সৃষ্টি করেছে। জাহাজের কামরাগুলি, আসবাবপত্র, ইঞ্জিন—অনেক কিছুরই ছবি তোলা হয়েছে। জাহাজটিকে টুকরো টুকরো না করে, হয়তো কোনদিন তোলা সম্ভব হতে পারে কিন্তু তাতে খরচ পড়বে প্রচুর।

ক্যাপ্টেন ব্যালার্ড মনে করেন, অদূর ভবিষ্যতে এরকম কাজের জন্য মানুষকে সমুদ্রতলে যেতে হবে না, রোবট (robot)-এর সাহায্যেই খোঁজা, ছবি তোলা বা জিনিসপত্র তুলে আনা সম্ভব হবে। ☐

**[National Geographic, Dec. 1985, pp. 696-722; Dec. 1986, pp. 698-727]**

হিন্দুগণ ধর্মের ভাবে পানাহার করে, ধর্মের ভাবে নিদ্রা যায়, ধর্মের ভাবে বিচরণ করে, ধর্মের ভাবে বিবাহাদি করে।... প্রত্যেক জাতিরই এ পৃথিবীতে একটি উদ্দেশ্য ও আদর্শ থাকে। কিন্তু যে-মুহূর্তে সেই আদর্শ ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়, সঙ্গে সঙ্গে সেই জাতির মৃত্যুও ঘটে।... যতদিন ভারতবর্ষ মৃত্যুপণ করিয়াও ভগবানকে ধরিয়া থাকিবে, ততদিন তাহার আশা আছে।

স্বামী বিবেকানন্দ

উদ্বোধনের মাধ্যমে প্রচার হোক
এই বাণী। শ্রীসুশোভন চট্টোপাধ্যায়

উদ্বোধন
স্বামী বিবেকানন্দ প্রবর্তিত, রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের একমাত্র বাঙলা মুখপত্র, চুরানব্বই বছর ধরে নিরবচ্ছিন্নভাবে প্রকাশিত দেশীয় ভাষায় ভারতের প্রাচীনতম সাময়িকপত্র

# সূচীপত্র

৯৫তম বর্ষ বৈশাখ ১৪০০ (এপ্রিল ১৯৯৩) সংখ্যা



♣ ♣

সম্পাদক ☐ স্বামী পূর্ণাত্মানন্দ

৮০/৬, গ্রে স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০ ০০৬-স্থিত বসুশ্রী প্রেস থেকে বেলুড় শ্রীরামকৃষ্ণ মঠের ট্রাস্টীগণের পক্ষে স্বামী সত্যব্রতানন্দ কর্তৃক মুদ্রিত ও ১ উদ্বোধন লেন, কলকাতা-৭০০ ০০৩ থেকে প্রকাশিত। প্রচ্ছদ মুদ্রণ: স্বপ্না প্রিন্টিং ওয়ার্কস (প্রাঃ) লিমিটেড, কলকাতা-৭০০ ০০৯

আজীবন গ্রাহকমূল্য (৩০ বছর পর নবীকরণ-সাপেক্ষ) ☐ এক হাজার টাকা (কিস্তিতেও প্রদেয়—প্রথম কিস্তি একশো টাকা) ☐ সাধারণ গ্রাহকমূল্য ☐ বৈশাখ থেকে পৌষ সংখ্যা ☐ ব্যক্তিগতভাবে সংগ্রহ ☐ পঁয়ত্রিশ টাকা ☐ সডাক ☐ একচল্লিশ টাকা ☐ বর্তমান সংখ্যার মূল্য ☐ ছয় টাকা

# শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ, বেলুড়

## আবির্ভাব-তিথি ও পূজাদির সূচী

( বিশুদ্ধ সিদ্ধান্ত পঞ্জিকা মতে )

বাঙলা ১৪০০ সন, ইংরেজী ১৯৯৩-৯৪ খ্রীস্টাব্দ

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ১। | শ্রীশংকরাচার্য | বৈশাখ শুক্লা পঞ্চমী | ১৪ বৈশাখ | মঙ্গলবার | ২৭ এপ্রিল | ১৯৯৩ |
| ২। | শ্রীবুদ্ধদেব | বৈশাখ পূর্ণিমা | ২৩ বৈশাখ | বৃহস্পতিবার | ৬ মে | ,, |
| ৩। | গুরুপূর্ণিমা | আষাঢ় পূর্ণিমা | ১৮ আষাঢ় | শনিবার | ৩ জুলাই | ,, |
| ৪। | স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ | আষাঢ় কৃষ্ণা ত্রয়োদশী | ১ শ্রাবণ | শনিবার | ১৭ জুলাই | ,, |
| ৫। | স্বামী নিরঞ্জনানন্দ | শ্রাবণ পূর্ণিমা | ১৭ শ্রাবণ | সোমবার | ২ আগস্ট | ,, |
| ৬। | শ্রীকৃষ্ণ জন্মাষ্টমী | শ্রাবণ কৃষ্ণাষ্টমী | ২৫ শ্রাবণ | মঙ্গলবার | ১০ আগস্ট | ,, |
| ৭। | স্বামী অদ্বৈতানন্দ | শ্রাবণ কৃষ্ণা চতুর্দশী | ৩১ শ্রাবণ | সোমবার | ১৬ আগস্ট | ,, |
| ৮। | স্বামী অভেদানন্দ | ভাদ্র কৃষ্ণা নবমী | ২৪ আশ্বিন | রবিবার | ১০ অক্টোবর | ,, |
| ৯। | স্বামী অখণ্ডানন্দ | ভাদ্র অমাবস্যা | ২৯ আশ্বিন | শুক্রবার | ১৫ অক্টোবর | ,, |
| ১০। | স্বামী সুবোধানন্দ | কার্তিক শুক্লা দ্বাদশী | ৯ অগ্রহায়ণ | বৃহস্পতিবার | ২৫ নভেম্বর | ,, |
| ১১। | স্বামী বিজ্ঞানানন্দ | কার্তিক শুক্লা চতুর্দশী | ১২ অগ্রহায়ণ | রবিবার | ২৮ নভেম্বর | ,, |
| ১২। | স্বামী প্রেমানন্দ | অগ্রহায়ণ শুক্লা নবমী | ৬ পৌষ | বুধবার | ২২ ডিসেম্বর | ,, |
| ১৩। | শ্রীযীশুখ্রীস্ট | | ৮ পৌষ | শুক্রবার | ২৪ ডিসেম্বর | ,, |
| ১৪। | শ্রীশ্রীমা | অগ্রহায়ণ কৃষ্ণা সপ্তমী | ১৯ পৌষ | মঙ্গলবার | ৪ জানুয়ারি | ১৯৯৪ |
| ১৫। | স্বামী শিবানন্দ | অগ্রহায়ণ কৃষ্ণা একাদশী | ২৩ পৌষ | শনিবার | ৮ জানুয়ারি | ,, |
| ১৬। | স্বামী সারদানন্দ | পৌষ শুক্লা ষষ্ঠী | ৪ মাঘ | মঙ্গলবার | ১৮ জানুয়ারি | ,, |
| ১৭। | স্বামী তুরীয়ানন্দ | পৌষ শুক্লা চতুর্দশী | ১২ মাঘ | বুধবার | ২৬ জানুয়ারি | ,, |
| ১৮। | শ্রীশ্রীস্বামীজী | পৌষ শুক্লা সপ্তমী | ১৯ মাঘ | বুধবার | ২ ফেব্রুয়ারি | ,, |
| ১৯। | স্বামী ব্রহ্মানন্দ | মাঘ শুক্লা দ্বিতীয়া | ২৯ মাঘ | শনিবার | ১২ ফেব্রুয়ারি | ,, |
| ২০। | স্বামী ত্রিগুণাতীতানন্দ | মাঘ শুক্লা চতুর্থী | ২ ফাল্গুন | সোমবার | ১৪ ফেব্রুয়ারি | ,, |
| ২১। | স্বামী অদ্ভুতানন্দ | মাঘী পূর্ণিমা | ১৩ ফাল্গুন | শুক্রবার | ২৫ ফেব্রুয়ারি | ,, |
| ২২। | শ্রীশ্রীঠাকুর | ফাল্গুন শুক্লা দ্বিতীয়া | ৩০ ফাল্গুন | সোমবার | ১৪ মার্চ | ,, |
| | ( শ্রীশ্রীঠাকুরের আবির্ভাব মহোৎসব ) | | ৬ চৈত্র | রবিবার | ২০ মার্চ | ,, |
| ২৩। | শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভু | দোল পূর্ণিমা | ১৩ চৈত্র | রবিবার | ২৭ মার্চ | ,, |
| ২৪। | স্বামী যোগানন্দ | ফাল্গুন কৃষ্ণা চতুর্থী | ১৬ চৈত্র | বুধবার | ৩০ মার্চ | ,, |

---

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ১। | শ্রীশ্রীফলহারিণী কালীপূজা | বৈশাখ অমাবস্যা | ৬ জ্যৈষ্ঠ | বৃহস্পতিবার | ২০ মে | ১৯৯৩ |
| ২। | স্নানযাত্রা | জ্যৈষ্ঠ পূর্ণিমা | ২১ জ্যৈষ্ঠ | শুক্রবার | ৪ জুন | ,, |
| ৩। | শ্রীশ্রীদুর্গাপূজা | আশ্বিন শুক্লা সপ্তমী | ৪ কার্তিক | বৃহস্পতিবার | ২১ অক্টোবর | ,, |
| ৪। | শ্রীশ্রীকালীপূজা | দীপান্বিতা অমাবস্যা | ২৭ কার্তিক | শনিবার | ১৩ নভেম্বর | ,, |
| ৫। | শ্রীশ্রীসরস্বতীপূজা | মাঘ শুক্লা পঞ্চমী | ৩ ফাল্গুন | মঙ্গলবার | ১৫ ফেব্রুয়ারি | ১৯৯৪ |
| ৬। | শ্রীশ্রীশিবরাত্রি | মাঘ কৃষ্ণা চতুর্দশী | ২৬ ফাল্গুন | বৃহস্পতিবার | ১০ মার্চ | ,, |

# উদ্বোধন

বৈশাখ ১৪০০ | এপ্রিল ১৯৯৩ | ৯৫তম বর্ষ—৪র্থ সংখ্যা


## দিব্য বাণী

তিনি (স্বামীজী) প্রেমিকের হৃদয় লইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, আর তাঁহার আরাধ্য দেবতা ছিলেন জননী জন্মভূমি।

ভগিনী নিবেদিতা

## কথাপ্রসঙ্গে

বঙ্গাব্দের চতুর্দশশতবর্ষপূর্তি উপলক্ষে বিশেষ সম্পাদকীয়।

# নূতন শতাব্দীর প্রভাতী সঙ্গীত

বিগত শতাব্দীর সুখ ও দুঃখের স্মৃতিকে বহন করিয়া, বিগত শতাব্দীর গৌরব ও লজ্জার ঐতিহ্যকে ধারণ করিয়া, বিগত শতাব্দীর অতিক্রান্ত চরণ-রেখাকে অনুসরণ করিয়া নূতন একটি শতাব্দীর পদবিস্তার শুরু হইল। মনে রাখিতে হইবে, বিগত শতাব্দীর গোধূলি সঙ্গীতে অনুরণিত হইয়াছে নূতন শতাব্দীর পদধ্বনি। সুতরাং বিগত শতাব্দীর অতিক্রান্ত চরণরেখা ধরিয়াই আমরা খুঁজিব নূতন শতাব্দীর প্রাণস্পন্দনের মূল ধ্বনিক। আমরা দৃষ্টিসম্পাত করিব আজ হইতে শতবর্ষ পূর্বের ইতিহাসের পৃষ্ঠায়। দেশ তখন পরাধীন, বিদেশী শাসকবর্গের পদতলে দেশবাসী দলিত, মথিত। খরা, দুর্ভিক্ষ, মন্বন্তরের প্রকোপ তো ছিলই, তাহার সহিত যুক্ত হইয়াছিল নির্মম, নিষ্ঠুর বিদেশী শাসন। অশ্রু এবং রক্তময় ভারত-বর্ষের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্যন্ত যে-আর্তনাদ উঠিতেছিল তাহাতে বিচলিত হইল এক যুবক সন্ন্যাসীর হৃদয়। শতবর্ষ পূর্বে সেই যুবক সন্ন্যাসীর কর্ম এবং সাধনা, ধ্যান এবং স্বপ্ন নির্মাণ করিয়া দিয়াছিল পরবর্তী শতাব্দীর গতিপথ। গিরি-গুহায় ধ্যানে জীবন অতিবাহিত করিবেন, জীবন ও জগৎকে অস্বীকার করিয়া শুধু আত্মানন্দের সন্ধানে ও উপভোগে মগ্ন হইয়া রহিবেন—এই সংকল্প করিয়া তিনি গৃহত্যাগ করিয়াছিলেন। মাতা ও ভ্রাতাদের অর্ধাশন, অনশন, অসহায়তা, প্রিয় ভগিনীর শোচনীয় মৃত্যু—কোন কিছুই তাঁহার পথে প্রতিবন্ধকরূপে দাঁড়াইতে পারে নাই। প্রাণপ্রিয় গুরুভ্রাতাগণের স্নেহ ও প্রীতির নিগূঢ় বন্ধন তাঁহাকে টলাইতে পারে নাই। গুরুভ্রাতাগণ তাঁহাকে ভুল বুঝিয়াছেন, তিনিও মনোকষ্টে ভুগিয়াছেন। মাতা-ভ্রাতা ভগিনীর জন্য হৃদয় রক্তাক্ত হইয়াছে, গুরুভাইদের ছাড়িয়া যাইতে হৃদয় প্রপীড়িত হইয়াছে; কিন্তু সংকল্প হইতে তিনি একচুলও সরিয়া আসেন নাই।

তাঁহার নিজের কথাতেই শুনি সেই সংগ্রামের কাহিনী:

"আমি আদর্শ শাস্ত্র পাইয়াছি, আদর্শ মনুষ্য চক্ষে দেখিয়াছি, অথচ পূর্ণভাবে নিজে কিছু করিয়া উঠিতে পারিতেছি না, ইহাই অত্যন্ত কষ্ট; বিশেষ কলিকাতার নিকটে থাকিলে হইবারও কোন উপায় দেখি না। আমার মাতা এবং দুইটি ভ্রাতা কলিকাতায় থাকে।... ইহাদের অবস্থা পূর্বে অনেক ভাল ছিল, কিন্তু আমার পিতার মৃত্যু পর্যন্ত বড়ই দুঃস্থ, এমনকি কখনো কখনো উপবাসে দিন যায়। তাহার উপর জ্ঞাতিরা—দুর্বল দেখিয়া পৈত্রিক বাসভূমি হইতে তাড়াইয়া দিয়াছিল; মকদ্দমা করিয়া যদিও সেই পৈত্রিক বাটীর অংশ পাইয়াছেন, কিন্তু সর্বস্বান্ত হইয়াছেন।" (প্রমদাদাস মিত্রকে লিখিত পত্র: ৪ জুলাই ১৮৮৯)

"এবার 'শরীরং বা পাতয়ামি, মন্ত্রং বা সাধয়ামি'—প্রতিজ্ঞা করিয়াছি।" (প্রমদাদাস মিত্রকে লিখিত পত্র: ৫ জানুয়ারি ১৮৯০)

"আমার এক গুরুভাইয়ের সহিত... আমি অত্যন্ত নিষ্ঠুর ব্যবহার করিয়াছি, অর্থাৎ আমার সঙ্গ ত্যাগ করিবার জন্য তাঁহাকে অত্যন্ত বিরক্ত করিয়াছি।... আমার মানসিক অবস্থা আপনাকে কি

বলিব, মনের মধ্যে নরক দিবারাত্রি জ্বলিতেছে—কিছুই হইল না, এ-জন্ম বুঝি বিফলে গেল।... আমার গুরুভ্রাতারা আমাকে অতি নির্দয় ও স্বার্থপর বোধ করিতেছেন। কি করি, মনের মধ্যে কে দেখিবে? আমি দিবারাত্রি কি যাতনায় ভুগিতেছি, কে জানিবে?" (প্রমদাদাস মিত্রকে লিখিত পত্র: ৩১ মার্চ, ১৮৯০)

আত্মমুক্তির সাধনার উদগ্র প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ এই যুবক সন্ন্যাসীর নাম স্বামী বিবেকানন্দ। নির্জন সাধনার সুতীব্র ব্যাকুলতায় বিবেকানন্দ উপস্থিত হইয়াছেন কখনও কাশী, কখনও গাজীপুর, কখনও বৃন্দাবন, কখনও হরিদ্বার-হৃষীকেশ, কখনও আলমোড়া, কখনও বা হিমালয়ের নির্জনতর প্রদেশে। সেখানে গভীর সাধনায় ডুবিয়াও গিয়াছেন। দু-একবার গভীরতম আধ্যাত্মিক উপলব্ধিও তাঁহার হইয়াছে—যেমন আলমোড়ার অনতিদূরে কাকড়িঘাটে এক অশ্বত্থ বৃক্ষের নিচে এবং হৃষীকেশে চণ্ডেশ্বর মহাদেবের নিকটস্থ এক পর্ণকুটিরে। তাঁহার জীবনীপাঠকমাত্রই জানেন—শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনকালে কাশীপুরে কত বিনিদ্র রজনী তাঁহার কাটিয়াছিল গভীর ধ্যান ও সাধনায়। জানেন—তপস্যা ও বৈরাগ্যের আকর্ষণে তাঁহার বুদ্ধগয়ায় গমন এবং বোধিদ্রুমতলে বুদ্ধদেবের বজ্রাসনে উপবেশন করিয়া সমস্ত রাত্রি ধ্যানে অতিবাহিত করিবার কথা। জানেন—কাশীপুরে একদিন নির্বিকল্প সমাধিলাভের জন্য ব্যাকুল নরেন্দ্রনাথকে শ্রীরামকৃষ্ণের উত্তেজিত ভর্ৎসনার কথা। জানেন—কাশীপুরে তাঁহার নির্বিকল্প সমাধিলাভের কথা। জানেন—বরানগর মঠে তাঁহার নেতৃত্বে সকল গুরুভাইগণের ধ্যান-ভজনে ডুবিয়া যাইবার কথা। কতদিন সন্ধ্যায় ধ্যানে বসিয়াছেন, সমস্ত রাত্রি ধ্যানেই অতিবাহিত হইয়া গিয়াছে। নির্জনবাস, তপস্যা, স্বাধ্যায় এবং সর্বোপরি পুনরায় নির্বিকল্প সমাধিলাভের ব্যাকুলতা তাঁহাকে কখনও স্থির থাকিতে দেয় নাই। প্রতিবার তিনি বরানগর মঠ হইতে বাহির হইয়া গিয়াছেন আর ফিরিবেন না সংকল্প করিয়া। অবশেষে একদিন তিনি 'মহানিষ্ক্রমণ' করিলেন ১৮৯০ খ্রীস্টাব্দের জুলাইয়ের মধ্যভাগে। কয়েক মাস নির্জনবাস, তপস্যা, স্বাধ্যায় এবং গভীর সাধন-ভজনে অতিবাহিত করিলেন তিনি।

এপর্যন্ত তিনি যাহা করিলেন তাহার মধ্যে বিশেষত্ব কিছুই নাই। ভারতবর্ষের চিরায়ত আধ্যাত্মিক ঐতিহ্যের সহিত উহা একান্তভাবেই সামঞ্জস্যপূর্ণ। সহস্র সহস্র বৎসর ধরিয়া ভারতের সংসারত্যাগী সন্ন্যাসিগণ উহাই করিয়াছেন। কিন্তু ইহার পর শুরু হইল তাঁহার জীবনে এক সম্পূর্ণ নূতন পর্যায়। শুধু তাঁহার জীবনেই নহে, ভারতবর্ষের সমগ্র আধ্যাত্মিক ঐতিহ্যে এবং ইতিহাসে তাঁহার পরবর্তী ভূমিকাটি সম্পূর্ণ অভিনব এবং অনন্য এক দৃষ্টান্ত। ১৮৯১ খ্রীস্টাব্দের জানুয়ারির শেষভাগে একদিন হিমালয়ের আকর্ষণ পিছনে ফেলিয়া স্বামী বিবেকানন্দ যাত্রা করিলেন দিল্লীর পথে। তপস্যার জন্য হিমালয়ে তিনি আর কখনও যান নাই। পাশ্চাত্য হইতে প্রত্যাবর্তনের পর একাধিকবার তিনি হিমালয়ে গিয়াছেন, কিন্তু সেই যাত্রা তপস্যার কারণে নয়। দিল্লী-যাত্রার পূর্বে গুরুভাইদের কাছে কঠোর ভাষায় তিনি বলিয়া গেলেন, কাহাকেও তিনি সঙ্গে লইবেন না, কেহ যেন তাঁহাকে অনুসরণ না করেন। তাঁহার 'জীবনব্রত' স্থির হইয়া গিয়াছে। সেই ব্রত-সাধনে তিনি এখন বহির্গত হইবেন একক, নিঃসঙ্গ যাত্রায়। গুরুভাইদের অনুরোধ, উপরোধ, মিনতি, অশ্রুপাতকে অগ্রাহ্য করিয়া পরিব্রাজক বিবেকানন্দের শুরু হইল নূতন পরিক্রমা। দিল্লীর পথে পথে দিল্লীর পুরাতন ভাস্কর্য ও স্থাপত্যে প্রাচীন ও ও মধ্যযুগের ভারতবর্ষকে অনুসন্ধান ও আবিষ্কার করিতে লাগিলেন তিনি। পক্ষকাল পরে তিনি দিল্লী ত্যাগ করিলেন; চলিলেন রাজপুতানার পথে। আক্ষরিকভাবে বলিতে গেলে, ১৮৯১ খ্রীস্টাব্দের ফেব্রুয়ারির (১২৯৭ বঙ্গাব্দের ফাল্গুনের) সেই দিনটিই স্বামীজীর জীবনের একটি বিশেষ উল্লেখ-যোগ্য দিন। শুধু তাঁহার জীবনে কেন, আধুনিক ভারতবর্ষের ইতিহাসেও অজ্ঞাত সেই তারিখটি ছিল একটি উল্লেখযোগ্য দিন। ভারতের অচল ভাগ্য-বিধাতাও সেদিন ঐ অষ্টাবিংশতি বর্ষের অপরিচিত তরুণ সন্ন্যাসীর মধ্যে সচল হইয়া ভারত-পরিক্রমণ করিতে শুরু করিয়াছিলেন। বিগত শতাব্দীর সূচনার প্রাক্‌লগ্নে ভারতের ঐ চারণ সন্ন্যাসীর চিন্তা ও চেতনায় ভারতের ভাগ্যবিধাতা সাকার করিয়া দিতেছিলেন আগামী দিনের ভারতবর্ষের রূপচ্ছবিটি। বিগত শতাব্দীর প্রান্তনের গোধূলি সঙ্গীতে অনুরণিত হইতে শুরু করিয়াছিল আগামী শতাব্দীর প্রভাতী সঙ্গীত।

রাজপুতানা হইতে গুজরাট, গুজরাট হইতে

মহারাষ্ট্র, মহারাষ্ট্র হইতে মধ্যপ্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ হইতে পুনরায় মহারাষ্ট্র, মহারাষ্ট্র হইতে গোয়া, গোয়া হইতে কর্ণাটক, কর্ণাটক হইতে কেরল, অবশেষে কেরল হইতে তামিলনাদের দক্ষিণ অংশ ছুঁইয়া ভারতের দক্ষিণতম প্রান্ত কন্যাকুমারী। একেবারে আক্ষরিক অর্থেই হিমালয় হইতে কন্যাকুমারী— আসমুদ্রহিমাচল ভারতবর্ষ। শত শত যোজনব্যাপী এই বিরাট দূরত্ব অতিক্রম করিয়া স্বামী বিবেকানন্দ কন্যাকুমারীতে উপনীত হইলেন ২৪ ডিসেম্বর ১৮৯২—বাঙলা ৮ পৌষ ১২৯৯।

কন্যাকুমারী। দেবী কুমারীর মহা পুণ্যপীঠ। হিমালয় হইতে দেবাদিদেব মহাদেবের আগমন-প্রতীক্ষায় জগজ্জননী দেবী কুমারী এখানে তপস্যা-নিরতা। মন্দিরে তাঁহার অপূর্ব সুন্দর মূর্তি। ভারতবর্ষের দক্ষিণতম প্রান্তের প্রত্যন্তভূমিতে কুমারিকা অন্তরীপে (কেপ কমোরিন-এ) দেবী কুমারীর মন্দির অবস্থিত। বঙ্গোপসাগর, ভারত মহাসাগর এবং আরব সাগর—এই তিন সমুদ্র দেবীর মন্দিরপ্রান্তে মিলিত হইয়াছে। যেন তিন সমুদ্র তাহাদের মিলিত তরঙ্গবিভঙ্গে অবিরত দেবীর পদতল ধৌত করিয়া দিতেছে। মন্দিরের অদূরে সমুদ্রমধ্যে কয়েকটি প্রস্তরময় দ্বীপ। উত্তাল সমুদ্রের সংক্ষুব্ধ তরঙ্গমালা ক্ষণে ক্ষণে দ্বীপগুলিতে প্রবল শব্দে আছড়াইয়া পড়িতেছে। সব মিলাইয়া সে এক অপূর্ব দৃশ্য। তীরে দাঁড়াইয়া একই সমুদ্রে সূর্যোদয় এবং সূর্যাস্ত দেখিবার বিরল সৌভাগ্য ঘটে এখানে, আবার পূর্ণিমায় পশ্চিম দিগন্তে সূর্যাস্তের সঙ্গে সঙ্গে পূর্ব দিগন্তে চন্দ্রের উদয়—এই দুর্লভ দর্শনেরও সাক্ষী থাকা যায় এখানে।

২৪ ডিসেম্বর ১৮৯২— ৮ পৌষ ১২৯৯। বঙ্গাব্দের নূতন শতাব্দীকে স্পর্শ করিতে আর মাত্রই চার মাস বাকি। একটি শতাব্দী শেষ হইয়া আরেকটি শতাব্দীর সূচনা হইতে চলিয়াছে। মন্দিরে দেবী কুমারীকে দর্শন, প্রণিপাত ও পূজা করিয়া স্বামীজী চলিলেন সমুদ্রের দিকে। অদূরে সমুদ্রমধ্যে সর্বশেষ এবং বৃহত্তম শিলাখণ্ডটিতে তিনি যাইতে চাহিলেন। ঐ শিলাখণ্ডটির শীর্ষদেশে দেবী কুমারীর পদচিহ্ন উৎকীর্ণ রহিয়াছে। কথিত আছে, দেবী ঐ স্থানটিতে এক পদে দাঁড়াইয়া শিবের তপস্যা করিয়াছিলেন। দ্বীপটিতে যাইবার জন্য নৌকার মাঝি এক আনা চাহিল। কিন্তু স্বামীজীর কাছে একটি পয়সাও ছিল না। তাই কপর্দকহীন সন্ন্যাসী সাঁতার কাটিয়া ঐ দ্বীপে (স্বামীজীর স্মৃতিতে উহা এখন 'বিবেকানন্দ শিলা' নামে অভিহিত।) উপস্থিত হইলেন। সমুদ্রের ঐ অংশ হাঙ্গরে পূর্ণ। তরঙ্গের উদ্দামতাও সেখানে প্রচণ্ড। কিন্তু নির্ভীক সন্ন্যাসী কোন কিছুতেই দমিবার পাত্র ছিলেন না। জগন্মাতার পদচিহ্ন-শোভিত দ্বীপশীর্ষে আরোহণ করিয়া স্বামীজী ধ্যানে বসিলেন। প্রত্যক্ষদর্শীদের মতে, স্বামীজী ২৪ ডিসেম্বর হইতে ২৬ ডিসেম্বর পর্যন্ত তিনদিন তিনরাত্রি ঐ দ্বীপে ধ্যানে অতিবাহিত করেন।

স্বামীজীর জীবনে ২৪ ডিসেম্বর তারিখটি যেন একটি দৈবনির্দিষ্ট দিন। যীশুখ্রীস্টের জন্মের প্রাক্-দিবসটি স্পর্শ করিয়া রহিয়াছে স্বামীজীর জীবনের তথা রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের ইতিহাসের আরও একটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য ঘটনাকে। ১৮৮৬ খ্রীস্টাব্দের ২৪ ডিসেম্বর আঁটপুরে পবিত্র ধুনির অগ্নিকে সাক্ষী রাখিয়া নরেন্দ্রনাথের নেতৃত্বে তাঁহার নয়জন গুরু-ভাই সন্ন্যাস তথা সংসারত্যাগের সংকল্প গ্রহণ করিয়া-ছিলেন। শতবর্ষের কিঞ্চিৎ পূর্বে বাংলার এক প্রত্যন্ত পল্লীতে সেই রাত্রির নিঃসীম নীরবতায় লোকচক্ষুর অগোচরে এক পরম অধ্যাত্ম-নাটকের একটি গুরুত্ব-পূর্ণ দৃশ্য অভিনীত হইয়াছিল। সেই দৃশ্যের কুশীলব ছিলেন পৃথিবীতে আবির্ভূত দেহধারী ঈশ্বরের পার্ষদগণ, প্রধান ভূমিকায় ছিলেন তাঁহার প্রধান পার্ষদ ও প্রধান বার্তাবহ। সেই নাটকের বাকি দৃশ্যগুলিতে কী ছিল—সেদিন পৃথিবীর মানুষ জানিতে পারে নাই। পরবর্তী বর্ষগুলিতে এবং পরবর্তী শতবর্ষে তাহার যে-কয়েকটি মাত্র দৃশ্য উদ্ঘাটিত হইয়াছে তাহাতেই চমৎকৃত হইয়াছে বিশ্ব-জগৎ। সেই কতিপয় দৃশ্যের অন্যতম অবশ্যই ১৮৯২ খ্রীস্টাব্দের ২৪ ডিসেম্বরের ঘটনাটিও। উহাও ঘটিয়া-ছিল লোকলোচনের অলক্ষ্যে, গহন রাত্রির নীরন্ধ্র অন্ধকারে—শুধু তিন সমুদ্রের উত্তাল তরঙ্গ ধ্যানমগ্ন সন্ন্যাসী ও জগতের মধ্যে এক অদ্ভুত নীরবতার বাতাবরণ রচনা করিয়া চলিয়াছিল। সেই নীরব ধ্যান যে কত প্রবল শক্তি বিচ্ছুরণ করিতে পারে তাহা জগৎ ক্রমে বুঝিয়াছে এবং বুঝিতেছে। সমগ্র নাটকটির অভিনয়কাল অন্ততঃপক্ষে সার্ধসহস্র বৎসর—পরবর্তী কালে স্বামী বিবেকানন্দের মুখে আমরা শুনিয়াছি। ১৮৮৬ এবং ১৮৯২—উভয় বর্ষের ২৪ ডিসেম্বর তারিখে নাটকের যে-দুটি দৃশ্যপট উন্মোচিত হইয়াছিল সেই দুইটিতেই নাটকের নায়ককে আমরা

পাইয়াছি। কালের নিয়মে লোকচক্ষুর অন্তরালে তাঁহাকে সরিয়া যাইতে হইয়াছে, কিন্তু উভয় ক্ষেত্রেই রহিয়া গিয়াছে তাঁহার মুগ্ধজ্যোতি—চেতনাস্পন্দিত দুটি সিদ্ধপীঠ। এই দুই পীঠেই সেই সুমহান সংকল্প-অগ্নি ঊর্ধ্বশিখায় জ্বলিয়া উঠিয়াছিল: 'আর আত্মমুক্তি নয়, সমষ্টিমুক্তির সন্ধানে বহির্গত হইতে হইবে।' তিনি উহার জন্মের কথা ভাবিয়াছিলেন কিনা জানা না যাইলেও শতাব্দীর ব্যবধানে আমরা আজ বুঝিতে পারিতেছি—সেই সমষ্টি-সাধনার চলমান দেহের নাম রামকৃষ্ণ সঙ্ঘ—রামকৃষ্ণ ভাবান্দোলন—'রামকৃষ্ণ বিপ্লব'।

আমরা আবার ফিরিয়া যাই কন্যাকুমারীর শিলাক্ষেত্রে, পরিব্রাজক বিবেকানন্দ তাঁহার ভারত-পরিক্রমার শেষে যেখানে ধ্যানমগ্ন হইয়াছিলেন। কাহার ধ্যানে তিনি মগ্ন হইয়াছিলেন? আত্মমুক্তির ধ্যানে? হৃদয়ে অধিষ্ঠিত ঈশ্বরের ধ্যানে? কোন দূর গ্রহ অথবা অদৃশ্য কোন কল্প-জগতের অধিবাসী কোন সর্বনিয়ন্তার ধ্যানে? না, মোটেই তাহা নয়। তিনদিন, তিনরাত্রি ধরিয়া তিনি ধ্যান করিয়াছিলেন ভারতবর্ষের। কন্যাকুমারীতে স্বামীজীর ধ্যান প্রসঙ্গে স্বামী গম্ভীরানন্দ লিখিয়াছেন: "তাঁহার চিন্তায় ছিল বহু ধর্মের জন্মস্থান ও মিলনক্ষেত্র পুণ্যতীর্থ ভারতবর্ষ।—ভারতের গৌরবময় অধ্যাত্ম মহিমোজ্জ্বল অতীত, দুঃখ-দারিদ্র্যনিমগ্ন, হতবীর্য, হৃতগৌরব, হৃত-অধ্যাত্ম-সম্পদ বর্তমান এবং তিমিরাচ্ছন্ন অনিশ্চিত ভবিষ্যৎ। ভারতের লুপ্ত গৌরব কি পুনর্বার সুপ্রতিষ্ঠিত করা সম্ভব? যদি সম্ভব তবে কি সে উপায়? পূর্ব হইতে পশ্চিম এবং উত্তর হইতে দক্ষিণ পর্যন্ত সমগ্র ভারতভূমি তিনি পর্যটন করিয়া আসিয়াছিলেন। তিনি ঋষির সুদূরপ্রসারী দৃষ্টি লইয়া আবিষ্কার করিয়াছেন, গৌরবের উচ্চশিখরে অধিরূঢ় ভারত কেমন করিয়া অবনতির নিম্নতম স্তরে নামিয়া আসিল। অতীতের সেই বিশ্লেষণপূর্ণ স্মৃতির সঙ্গে সমন্বিত হইল বর্তমান ভারতের প্রত্যক্ষদৃষ্ট বাস্তব রূপ; আর মন খুঁজিয়া বেড়াইতে লাগিল ভবিষ্যতের পথ। সেই নির্জন দ্বীপে ধ্যানমগ্ন সন্ন্যাসীর হৃদয়ে জাগরূক রহিল একটিমাত্র চিন্তা—ভারত ও ভারতের ভাগ্যবিধাতার অভিপ্রায়। তিনি ভাবিতে লাগিলেন, এহেন পরিস্থিতিতে কিরূপ ব্রত তাঁহার পক্ষে গ্রহণীয় হইতে পারে এবং সে-ব্রত কেমন করিয়া উদ্যাপিত হইবে। সে-চিন্তা পরার্থে উৎসৃষ্টপ্রাণ সন্ন্যাসীকে এক আমূল সংস্কারক, সুমহান সংগঠক ও শক্তিমান আত্মানুভবসম্পন্ন দেশ-নায়কে রূপান্তরিত করিল। তিনি তখন বঙ্গদেশ, আর্যাবর্ত—অথবা দাক্ষিণাত্যের কথা না ভাবিয়া অখণ্ড ভারতেরই ভাবনায় মগ্ন রহিলেন। তাঁহার চক্ষের সম্মুখে ভারত-ইতিহাসের সব পৃষ্ঠাই যেন সমকালে খুলিয়া গেল, আর অন্তরে উদ্ভাসিত আধ্যাত্মিক আলোকসম্পাতে উহা পাঠ করিতে গিয়া তিনি পাইলেন ভারতীয় ধর্ম ও কৃষ্টির ভবিষ্যৎ-সম্ভাবনার একখানি পূর্ণ ও অত্যুজ্জ্বল চিত্র।" ('যুগনায়ক', ১ম খণ্ড, ৫ম সং, ১৩৯৮, পৃঃ ৩১৭-৩১৮)

কন্যাকুমারীর সেই ধ্যান ঈশ্বরের ধ্যান না হইয়া পর্যবসিত হইয়াছিল নবীন সন্ন্যাসীর ভারত-ধ্যানে। তাঁহার ভারত-পরিক্রমা রূপান্তরিত হইয়াছিল ভারত-সাধনায়—ভারত আবিষ্কারে। আত্মমুক্তি-প্রয়াসী সন্ন্যাসী রূপান্তরিত হইয়া গেলেন মহান দেশপ্রেমিক ও প্রত্যাদিষ্ট দেশনায়কে। ঈশ্বরের নাম নয়, ওষ্ঠে তাঁহার ইষ্টমন্ত্র—ভারত। ভারত। ভারত।

বস্তুতঃ, তাঁহার সকল আবেগের কেন্দ্রে এবং শীর্ষে ছিল ভারত, ভারতের ঐতিহ্য এবং ভারতের মানুষ। কন্যাকুমারীর শিলাদ্বীপে ঐ আবেগ তাঁহাকে সম্পূর্ণরূপে অধিকার করিয়াছিল। পরিক্রমার অভিজ্ঞতায় তাঁহার ধ্যানদৃষ্টিতে প্রতিভাত হইয়াছিল: "ভারত স্থবির বা জরাজীর্ণ নয়, পরন্তু নবযৌবনসম্পন্ন, ভাবী সম্ভাবনায় পরিপূর্ণ এবং··· অতীতে যাহা ছিল তাহা অপেক্ষা মহত্তর এক বিকাশের ভূমিতে সে দণ্ডায়মান।" কথাগুলি লিখিয়া ভগিনী নিবেদিতা মন্তব্য করিতেছেন: "ভারত সম্পর্কে ইহাই ছিল তাঁহার (স্বামীজীর) দৃঢ় বিশ্বাস। আমার মনে পড়ে··· এক গভীর শান্ত মুহূর্তে তিনি বলিয়াছিলেন: 'বহু শতাব্দীর পর আবির্ভূত বলে নিজেকে অনুভব করছি। আমি দেখতে পাচ্ছি, ভারত নবীন।'" (দ্রঃ The Master as I saw Him, 9th Edn., 1963, p. 51)

ভারত বয়সে সুপ্রাচীন, কিন্তু চেতনায়, চিন্তায়, প্রাণশক্তিতে সে সদা-সজীব, সদা-নবীন। স্বামী বিবেকানন্দ ভারতের জীবনবীণার তন্ত্রীতে তন্ত্রীতে এই সুর তুলিয়া দিয়াছিলেন। আজ হইতে শতবর্ষ পূর্বে একটি শতাব্দীর পূরবী রাগিণীতে সেই সুর বাজিয়া উঠিয়াছিল এবং একটি সমগ্র শতাব্দীকে তাহা পরিব্যাপ্ত করিয়া রাখিয়াছিল। আজ নূতন শতাব্দীর ভৈরবী বা আশাবরী রাগিণীতেও সেই সুরই যেন আবার বাজিতেছে। যাহার কান আছে, সেই শুনিতে পাইবে। ❑

# স্বামী তুরীয়ানন্দের অপ্রকাশিত পত্র*

॥ ৩৫ ॥

রামকৃষ্ণ মিশন সেবাশ্রম
কনখল
জেলা—সাহারানপুর
১৯ জুন, (১৯)১৩

প্রিয় রামচন্দ্র,

তোমার প্রেরিত 'বোম্বে ক্রনিকল' পত্রিকার প্রাপ্তিস্বীকার করিতেছি। পত্রিকাটি দেখিতে খুব পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন এবং মুদ্রণও খুবই সুন্দর, পরন্তু এই শ্রেণীর অন্যান্য পত্রিকায় যাহা দেখা যায় সেই মুদ্রণ-প্রমাদ হইতে ইহা মুক্ত। অন্য সকল বিষয়েও পত্রিকাটি খুবই সম্ভ্রান্ত। আমি আশা করি, সংবাদ-পত্রের জগতে ইতোমধ্যে পত্রিকাটি ইহার প্রভাব অনুভূত করাইতে পারিয়াছে। আমি মোটামুটি ভাল আছি। তুমি যে সংস্কৃত অভিধানটি পাঠাইয়াছ তাহা আমি পরিতোষ সহকারে ব্যবহার করিতেছি। তোমার সুস্বাস্থ্য এবং সমৃদ্ধি কামনা করি। আমার শুভেচ্ছা ও ভালবাসা জানিবে। ইতি

প্রভুপদাশ্রিত
তুরীয়ানন্দ

॥ ৩৬ ॥

হৃষীকেশ
১৭. ৩. (১৯)১৪

প্রিয় রামচন্দ্র,

তোমার এই মাসের ১২ তারিখের প্রীতিপূর্ণ পোস্টকার্ড যথাসময়ে পাইয়া বড়ই আনন্দিত হইলাম। ধূপের প্যাকেটটি একদিন পরে আমার হস্তগত হইয়াছে। ঐগুলির জন্য তোমাকে অনেক ধন্যবাদ। এবারের ধূপ, তুমি ঠিকই বলিয়াছ, আগের চাহিতে অনেক উৎকৃষ্ট মানের এবং মিষ্টিগন্ধযুক্ত। গতকাল যাহারাই ঘরে ঢুকিয়াছিল তাহারা সকলেই ধূপের মধুর গন্ধে আনন্দলাভ করিয়াছিল এবং এরূপ সুন্দর নির্বাচনের জন্য প্রেরককে প্রশংসা করিতেছিল। তুমি খুব সুস্থ শরীরে আছ জানিয়া আমি আনন্দিত—খুবই আনন্দিত। কোন কিছুর জন্য তোমার নিজেকে দোষারোপ করিবার প্রয়োজন নাই। মা তোমার আধ্যাত্মিক উন্নতির প্রতি দৃষ্টি রাখিবেন। শুধু ঐ বিষয়ে মায়ের নিকট বলিতে ভুলিও না। আমি জানি, তুমি মায়েরই আছ এবং কিছুতেই তাঁহাকে একেবারে ভুলিতে পারিবে না। বোম্বেতে তুমি উভয় [ শ্রীরামকৃষ্ণ ও স্বামীজীর ] জন্মবার্ষিকী অনুষ্ঠান উদ্‌যাপিত করিয়াছ এবং একটি পরিষদ গঠন করিয়াছ শুনিয়া সন্তুষ্ট হইলাম। যদি সম্ভব হয় তাহা হইলে একজন স্বামীজীকে তোমার ওখানে পাঠাইতে চেষ্টা করিব এবং পরে এবিষয়ে তোমাকে লিখিব। গিরিধারীর নিকট হইতে মাঝে মাঝে পত্রাদি পাও কি? এখান হইতে যাইবার পর তাহার কোন পত্রাদি পাই নাই। এখান হইতে খুব শীঘ্র চলিয়া যাইতে চাই। গ্রীষ্মের অত্যধিক কষ্টদায়ক গরমের হাত হইতে মুক্তি পাইতে আমি প্রথমে দেরাদুন এবং পরে অন্য কোন শীতল স্থানে যাইতে পারি। এখানে আসার পর আমার স্বাস্থ্য অনেক ভাল হইয়াছিল, কিন্তু এখন আবার খুব খারাপ বোধ করিতেছি। স্থান পরিবর্তনে স্বাস্থ্যের উন্নতি হইবে মনে করি। তোমার সুখ ও সমৃদ্ধি কামনা করি। আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা ও ভালবাসা জানিও। ইতি

স্নেহবদ্ধ
তুরীয়ানন্দ

* চিঠি-দুটি ইংরেজীতে লেখা।

নিবন্ধ

# 'ডুব দাও' প্রসঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণ

## স্বামী প্রমেয়ানন্দ

আধ্যাত্মিক উন্নতির অনেকটাই নির্ভর করে সত্যান্বেষীর ব্যক্তিগত প্রযত্নের ওপর, তাঁর অদম্য সাহস ও উৎসাহ-উদ্যমের ওপর। উপনিষদ্ বলছেন: "উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্ নিবোধত"[১]—ওঠো, জাগো, যতদিন পর্যন্ত না লক্ষ্যে পৌঁছাতে পারছ ততদিন নিশ্চিন্ত থেকো না। গীতামুখে ভগবান শ্রীকৃষ্ণেরও একই কথা—"ধৃত্যুৎসাহসমন্বিত"[২]—অধ্যবসায়ী ও উদ্যমশীল হও, তবেই হবে। প্রেমাবতার যীশুর উপদেশ: "প্রার্থনা কর, তাহলেই তোমাদের দেওয়া হবে। অন্বেষণ কর, তাহলে তোমরা দেখতে পাবে। এবং ধাক্কা দাও, তাহলেই দরজা খুলে যাবে।"[৩] নিঃসন্দেহে তাঁরা সকলেই সাধকের অধিকারিত্ব, আন্তরিক আগ্রহ, ব্যাকুলতা এবং সর্বোপরি লক্ষ্যে পেঁছানোর জন্য ঐকান্তিক প্রযত্নের ওপরই জোর দিয়েছেন। এযুগে শ্রীরামকৃষ্ণ ছোট একটি কথার মাধ্যমে এই ভাবটিকে অতি সুন্দরভাবে প্রকাশ করেছেন। কথাটি হচ্ছে—'ডুব দাও'।

আধ্যাত্মিক সংগ্রামে সাধককে উৎসাহ দেওয়ার জন্য 'ডুব দাও' কথাটি শ্রীরামকৃষ্ণকে প্রায়শই বলতে শোনা গেছে। সুপ্রচলিত দুটি বাঙলা গানের কলি—'ডুব ডুব ডুব রূপসাগরে আমার মন' এবং 'ডুব দেরে মন কালী বলে'—থেকে শব্দ দুটি তিনি চয়ন করেছেন। গান দুটি তাঁর এত প্রিয় ছিল যে, বহুবার তিনি তাঁর দেবদুর্লভ সুমধুর কণ্ঠে গান দুটি গেয়েছেন এবং উপস্থিত শ্রোতাদের মুগ্ধ করে পার্থিব পরিবেশকে অপার্থিব স্বর্গীয় পরিবেশে রূপান্তরিত করেছেন। সাধনপথে অগ্রসর হওয়ার জন্য 'অদম্য সাহস', 'উৎসাহ-উদ্যম' কথাগুলির সম্পূর্ণ তাৎপর্য ব্যক্ত হয়েছে শ্রীরামকৃষ্ণ-উচ্চারিত 'ডুব দাও' এই ছোট একটি কথাতেই। সাধকের মনে আশার সঞ্চার করে তিনি বলছেন: "এ যে অমৃতের সাগর, ওই সাগরে ডুব দিলে মৃত্যু হয় না, মানুষ অমর হয়।"[৪] আধ্যাত্মিক সাধনায় জোয়ার আনার জন্য, সংগ্রামে মহোৎসাহে অগ্রসর হওয়ার জন্য 'ডুব দাও' কথাটি খুবই আশাব্যঞ্জক এবং উৎসাহবর্ধক। ভগবদ্দ্রষ্টা ঋষিগণ সাধারণ পণ্ডিতদের মতো বৃথা বাক্যবিন্যাস করেন না। তাঁদের ভাষা অতি সহজ ও স্বচ্ছ, যা একবার কর্ণে প্রবেশ করলে হৃদয়-সাগর উদ্বেলিত হয়, মন আকুলি-বিকুলি করে। তার অনুপ্রেরণার শক্তি যেমন প্রবল, তেমনি ফলপ্রদ। তা অলস কল্পনামাত্র নয়। 'ডুব দাও' কথাটি এর এক অপূর্ব দৃষ্টান্ত।

শাস্ত্র ও মহাপুরুষরা বলেন: সৌভাগ্যক্রমে কারো যদি সত্য-অন্বেষণের ইচ্ছা জাগে, তাহলে তুচ্ছ তাত্ত্বিক গবেষণায় তাঁর অযথা সময় নষ্ট করা উচিত নয়। এই প্রসঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণের একটি উপদেশ বিশেষভাবে স্মরণ করতে পারি। তিনি বলছেন: "শাস্ত্রের মর্ম গুরুমুখে শুনে নিয়ে, তারপর সাধন করতে হয়।... ডুব দিলে তবে তো ঠিক ঠিক সাধন হয়। বসে বসে শাস্ত্রের কথা নিয়ে কেবল বিচার করলে কি হবে?"[৫] তাঁর মতে শাস্ত্রের ভূমিকা বাজারের ফর্দের মতো। কি কি জিনিস কিনতে হবে তা একবার জানা হয়ে গেলে ফর্দের আর কোন প্রয়োজন নেই। তখন কাজ শুধু ফর্দ অনুযায়ী জিনিস সংগ্রহ করা। সত্যোপলব্ধির জন্যও সেরূপ। শাস্ত্র ও গুরুমুখ থেকে সাধন-ভজনের নির্দেশ জেনে নিয়ে সেই অনুযায়ী সাধন-ভজন করা, তাতে ডুবে যাওয়া।

অশ্বিনীকুমার দত্ত শ্রীরামকৃষ্ণকে দর্শন করতে

১ কঠ উপনিষদ্, ১।৩।১৪ ২ গীতা, ১৮।২৫ ৩ বাইবেল, ম্যাথিউ, ৭

৪ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত, উদ্বোধন সং, পৃঃ ৫৪৮ ৫ ঐ, পৃঃ ৬৬৮

এসেছেন। অবাক হয়ে তিনি লক্ষ্য করছেন, 'ডুব ডুব ডুব' গাইতে গাইতে শ্রীরামকৃষ্ণ কোথায় যেন ডুবে গেলেন। একেবারে সমাধিস্থ। আনন্দময় পুরুষ কেমন আনন্দসাগরে ডুব দিলেন। আর এভাবে কিছুক্ষণ থাকার পর সাগর থেকে কত মণি-মাণিক্য আহরণ করে ফিরে এলেন। তাই তো শাস্ত্রের কথা, মহাপুরুষদের কথা—যদি সত্যিকারের শান্তি চাও, প্রকৃত আনন্দের খনির সন্ধান চাও, তবে ডুব দাও। অন্তর্মুখী হও, মোড় ফেরাও।

পণ্ডিত শশধর তর্কচূড়ামণি মহাপণ্ডিত। বেদাদি শাস্ত্র অনেক অধ্যয়ন করেছেন এবং জ্ঞানচর্চা করেন। শ্রীরামকৃষ্ণের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে তিনি দক্ষিণেশ্বরে এসেছেন। শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁকে বলছেন: "শাস্ত্রাদি নিয়ে বিচার কতদিন? যতদিন না ঈশ্বরের সাক্ষাৎকার হয়। ভ্রমর গুনগুন করে কতক্ষণ? যতক্ষণ ফুলে না বসে। ফুলে বসে মধুপান করতে আরম্ভ করলে আর শব্দ নাই।"[৬] আরও বলছেন: "বেদাদি অনেক শাস্ত্র আছে, কিন্তু সাধন না করলে, তপস্যা না করলে—ঈশ্বরকে পাওয়া যায় না।... পড়ার চেয়ে শুনা ভাল,—শুনার চেয়ে দেখা ভাল।... দেখলে সব সন্দেহ চলে যায়। শাস্ত্রে অনেক কথা তো আছে; ঈশ্বরের সাক্ষাৎকার না হলে—তাঁর পাদপদ্মে ভক্তি না হলে... সবই বৃথা।"[৭] এই ঈশ্বরের সাক্ষাৎকারের জন্য চাই নিরন্তর সাধনা, অন্তর-সমুদ্রে ডুব দেওয়া। নতুবা শাস্ত্রপাঠ, পাণ্ডিত্য—এসবের কোন সার্থকতা নেই। আচার্য শঙ্করের একটি শ্লোকে এই ভাবটি অতি সুন্দরভাবে বর্ণিত হয়েছে। তিনি বলছেন:

"বাগ্‌বৈখরী শব্দঝরী শাস্ত্রব্যাখ্যানকৌশলম্।
বৈদুষ্যং বিদুষাং তদ্‌বদ্‌ভুক্তয়ে ন তু মুক্তয়ে।"[৮]

—ভাষার ওপর অধিকার, শব্দপ্রয়োগে নৈপুণ্য, শাস্ত্রব্যাখ্যায় চাতুর্য আর বাক্য-অলঙ্কারাদিতে পাণ্ডিত্য—এসব বিদ্বান ব্যক্তিদের ভোগ্যপ্রাপ্তির সহায়ক হতে পারে, কিন্তু মুক্তিলাভের সহায়ক কখনো নয়।

বাক্যজাল বিস্তার করে সুবক্তা পণ্ডিত শ্রোতাদের মন হরণ করতে পারেন, কিন্তু তদ্দ্বারা তাঁর নিজের মুক্তি সাধিত হয় না। নিজের মুক্তিসাধনের জন্য সাধককে সাধন-সমুদ্রে ঝাঁপ দিতে হয়, অন্তর-সমুদ্রে ডুব দিতে হয়।

প্রতাপচন্দ্র মজুমদার ব্রাহ্মসমাজের নেতা, কেশব সেনের প্রধান সহযোগী। শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁকে বলছেন: "লেকচার দেওয়া, তর্ক, ঝগড়া, বাদ-বিসম্বাদ—এসব অনেক তো হলো। আর কি এসব তোমার ভাল লাগে? এখন সব মনটা কুড়িয়ে ঈশ্বরের দিকে দাও। ঈশ্বরে এখন ঝাঁপ দাও।"[৯] সাধনায় ভাসা ভাসা হলে চলবে না। ডুব দিতে হবে। ডুব দেবে কোথায়?—অন্তরে—'হৃদি-রত্নাকরের অগাধ জলে'। গীতায়ও শ্রীভগবান বলছেন: "ঈশ্বরঃ সর্বভূতানাং হৃদ্দেশেঽর্জুন তিষ্ঠতি।"[১০]—হে অর্জুন, অন্তর্যামী ঈশ্বর সর্বজীবের হৃদয়ে অধিষ্ঠিত। তাঁকে হৃদয়েই অনুভব করতে হবে। আর সেজন্যই বাইরের সাধন অপেক্ষা অন্তরের সাধন বেশি প্রয়োজন। এই অন্তর্সাধনেরই অপর নাম 'ডুব দেওয়া'।

'ডুব দাও' প্রসঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্রের সঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণের কথোপকথনটি স্মরণীয়। বঙ্কিমচন্দ্রকে শ্রীরামকৃষ্ণ বলেছিলেন: "তোমায় বলি, উপরে ভাসলে কি হবে? একটু ডুব দাও। গভীর জলের নিচে রত্ন রয়েছে, জলের উপর হাত-পা ছুঁড়লে কি হবে? ঠিক মানিক ভারী হয়, জলে ভাসে না...। ঠিক মানিক লাভ করতে গেলে জলের ভিতর ডুব দিতে হয়।"[১১] কিন্তু এই 'ডুব দেওয়া' খুব সহজ নয়। ঈশ্বরের রূপ-সাগরে ডুব দিতে হলে যে পরিশুদ্ধ মনের প্রয়োজন সে-মন আমাদের কোথায়? সেজন্যই যেন বঙ্কিমচন্দ্রের মুখে শুনতে পাই: "মহাশয়, কি করি, পেছনে শোলা বাঁধা আছে। ...ডুবতে দেয় না।"[১২] সংসাররূপ শোলা—কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ ইত্যাদি বাঁধা আছে বলে সংসার মানুষকে পিছনের দিকে টানছে—এগুতে দেয় না, সাধন-সাগরে ডুবতে দেয় না। ঈশ্বরকে সর্বদা স্মরণ-মনন করলে ক্রমে মনের মলিনতা দূর হয়

৬ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত, পৃঃ ৫৭৪
৭ ঐ, ৫৭৩-৫৭৪
৮ বিবেকচূড়ামণি, ৫৮
৯ কথামৃত, পৃঃ ৫৪৭
১০ গীতা, ১৮।৬১
১১ কথামৃত, পৃঃ ১২১৮
১২ ঐ

এবং সাধক ঈশ্বর-সমুদ্রে ডুব দিতে সক্ষম হন। তাই শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্বাস দিয়ে বলছেন: "তাঁকে স্মরণ করলে সব পাপ কেটে যায়। তাঁর নামেতে কাল-পাশ কাটে। ডুব দিতে হবে, তা না হলে রত্ন পাওয়া যাবে না। একটা গান শোন:

ডুব ডুব ডুব রূপসাগরে আমার মন।..."

"ঠাকুর তাঁহার সেই দেবদুর্লভ মধুর কণ্ঠে এই গানটি গাইলেন। সভাসুদ্ধ লোক আকৃষ্ট হইয়া একমনে এই গান শুনিতে লাগিলেন।"[১৩]

ঈশ্বর মানুষের জীবনে ও চিন্তায়, আকাঙ্ক্ষায় ও কার্যে অপরিহার্য। তাঁকে কেন্দ্র করেই জীবন। তাঁকে বাদ দিলে কিছুই থাকে না। শ্রীরামকৃষ্ণ যেমন বলতেন: "১-এর পর যদি পঞ্চাশটা শূন্য থাকে অনেক হয়ে যায়। ১-কে পুছে ফেললে কিছু থাকে না। ১-কে নিয়েই অনেক। ১ আগে, তারপর অনেক; আগে ঈশ্বর, তারপর জীব-জগৎ।"[১৪] কাজেই জীবনে চলার পথে ঈশ্বরকে বাদ দিলে সবকিছুই শূন্যে পর্যবসিত হয়। 'আগে ঈশ্বর'—এটা যাতে অনুমানের বিষয়মাত্র না হয়ে প্রকৃত জীবনীশক্তি লাভ করে, তার জন্যই সাধকের প্রতি উৎসাহবাণী—'ডুব দাও'। তাই শ্রীরামকৃষ্ণের 'ডুব দাও' কথাটি জীবনের লক্ষ্যে পেঁছাবার সাধনার মন্ত্রস্বরূপ। ☐

১৩ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত, পৃঃ ১২১৮

১৪ ঐ, পৃঃ ১২১৬

## প্রচ্ছদ-পরিচিতি

প্রচ্ছদের আলোকচিত্রটি কামারপুকুরের শ্রীরামকৃষ্ণের বাসগৃহের। পাঁচের দশকের প্রথমদিকে আলোকচিত্রটি গৃহীত হয়েছিল।

বর্তমান বর্ষটি (১৯৯৩) শ্রীরামকৃষ্ণ-ভাবান্দোলনের ক্ষেত্রে একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বর্ষ। কারণ, এই বর্ষে শিকাগো ধর্মমহাসম্মেলনে স্বামী বিবেকানন্দের আবির্ভাবের শতবর্ষ পূর্ণ হচ্ছে। শিকাগো ধর্ম-মহাসভায় স্বামী বিবেকানন্দ যে-বাণী প্রচার করেছিলেন এবং যে-বাণী ধর্মমহাসভার সর্বশ্রেষ্ঠ বাণী বলে অভিনন্দিত হয়েছিল, সে-বাণী ছিল সমন্বয়ের বাণী। ধর্মের সমন্বয়, মতের সমন্বয়, সম্প্রদায়ের সমন্বয়, দর্শনের সমন্বয়, আদর্শের সমন্বয়—প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের সমন্বয়, প্রাচীন ও নবীনের সমন্বয়, অতীত বর্তমান ও ভবিষ্যতের সমন্বয়। ভারতবর্ষ সুপ্রাচীন কাল থেকে এই সমন্বয়ের বাণী ও আদর্শ প্রচার করে আসছে। আধুনিক কালে এই সমন্বয়ের সর্বপ্রধান ও সর্বশ্রেষ্ঠ প্রবক্তা শ্রীরামকৃষ্ণ। সাধারণভাবে সনাতন ভারতবর্ষের এবং বিশেষভাবে শ্রীরামকৃষ্ণের সমন্বয়ের বাণীকে স্বামী বিবেকানন্দ বহির্বিশ্বের সমক্ষে উপস্থাপিত করেছিলেন। চিন্তাশীল সকল মানুষই আজ উপলব্ধি করছেন যে, সমন্বয়ের আদর্শ ভিন্ন পৃথিবীর স্থায়িত্বের আর কোন পথ নেই। সমন্বয়ের পথই বর্তমান পৃথিবীর বহুবিধ সমস্যা ও সঙ্কটের মধ্য থেকে উত্তরণের একমাত্র পথ। কামারপুকুরের পর্ণকুটীরে যাঁর আবির্ভাব হয়েছিল দরিদ্র এবং নিরক্ষরের ছদ্মবেশে, তিনিই বর্তমান এবং আগামীকালের বিশ্বের ত্রাণকর্তা। তাঁর বাসগৃহটি তাই আজ ও আগামীকালের সমগ্র পৃথিবীর তীর্থক্ষেত্র। শিকাগোর বিশ্বধর্মসভার মঞ্চে স্বামী বিবেকানন্দের কণ্ঠে শান্তি, সমন্বয় ও সম্প্রীতির যে-বাণী বারংবার উচ্চারিত হয়েছিল—যার মধ্যে নিহিত ভারত ও পৃথিবীর রক্ষাকবচ, তার গর্ভগৃহ কামারপুকুরের এই পর্ণকুটীর।

বিশেষ রচনা

# বিবেকানন্দ-মশালের রক্তরশ্মি

## স্বামী প্রভানন্দ

স্বামী বিবেকানন্দের ভারত-পরিক্রমার শতবর্ষ পূর্তি উপলক্ষে এই বিশেষ রচনাটি প্রকাশিত হলো।

পরিব্রাজক বিবেকানন্দ হেঁটে চলেছিলেন। উন্নতশির, পদ্মপলাশনেত্র, প্রেমোদ্ভাসিত মুখমণ্ডল। দণ্ড ও কমণ্ডলু হাতে নিঃস্ব সন্ন্যাসী হেঁটে চলেছিলেন। পাবনী গঙ্গার দুই কূলের মতো তাঁর চলার পথের দু-পাশে দেখা যাচ্ছিল শুভশক্তির উচ্ছল উন্মেষ। অতিক্রান্ত পথের ঘাটে-বাটে তিনি রেখে যাচ্ছিলেন তাঁর নিঃস্বার্থ প্রেমের সুখস্মৃতি। যেন মানুষের দুঃখে কাতর একটি মানবদরদী প্রবাহ বয়ে চলেছিল। সেসময়ে দেশের সৌভাগ্যসূর্য অস্তমিত, দেশের চারদিক গাঢ় অন্ধকারে আবৃত। পঁচিশ বছরের মধ্যে আঠারোটি দুর্ভিক্ষে প্রাণ হারিয়েছিল দুই কোটি ষাট লক্ষ মানুষ। প্লেগ, ম্যালেরিয়া প্রভৃতির মহামারীতে কীটপতঙ্গের মতো মারা যাচ্ছিল লক্ষ লক্ষ মানুষ। ডিগবি সাহেব লিখেছিলেন, ভারতবাসীর গড়পরতা দৈনিক আয় মাত্র তিন পয়সা। সরকারের উধর্বতন কর্মচারিগণের দাবি ছয় পয়সা। দেশের সম্পদ চলে যাচ্ছিল ইংল্যান্ডে। বাইবেল, বেয়নেট ও ব্রান্ডির দ্বারা শাসিত ভারতবাসীর জীবন হয়ে উঠেছিল দুর্বিষহ। ধর্মপ্রাণ দেশবাসী তখন অধর্মের প্রাদুর্ভাবে পযুর্দস্ত। "স্বজাতিনিন্দিত বিজাতিঘৃণিত" দেশের মানুষ হতাশার অন্ধকারে নিমগ্ন। তাদের মধ্য দিয়ে পথ ভেঙে চলেছিলেন মশাল হাতে স্বামী বিবেকানন্দ। তাঁর হাতে ছিল প্রেম ও বিবেকের মশাল। পথের অন্ধকার অপসারিত হচ্ছিল, কিন্তু চতুর্দিকের অন্ধকার গাঢ়তর দেখাচ্ছিল। তেজোদ্দীপ্ত সন্ন্যাসীকে মনে হচ্ছিল জ্যোতির বিগ্রহ। তাঁর ব্যক্তিত্বের ঝলক, বাণীর দমক, হৃদয়ের দমক পথে চমক সৃষ্টি করে চলছিল। মশালচী বিবেকানন্দের মশালের রাঙা শিখা সাতসমুদ্র পেরিয়ে শতগুণে জ্বলে উঠেছিল। সেই আলোকে গর্বোদ্ধত ও ভোগবিলাসে মত্ত পাশ্চাত্যবাসী ভারতবাসী-অর্জিত দুর্লভ অধ্যাত্মসম্পদকে শ্রদ্ধার সঙ্গে দেখেছিল, নতুনভাবে বুঝতে শিখেছিল মানবজীবনের উদ্দেশ্য।

শতবর্ষ পরে আজ বিবেকানন্দের প্রব্রজ্যার পদচিহ্ন অনুসরণ করতে গিয়ে দেখতে পাচ্ছি, তাঁর পরিক্রমার অন্তর্গত, তাঁর পাদস্পর্শে পূত সকল ভূখণ্ড বিবেকানন্দ-মশালের তাপে ও আলোকে প্রাণচঞ্চল।

বিগত শতাব্দীর শেষ দশকটি পরিব্রাজক বিবেকানন্দের আলোয় ভাস্বর। তাঁর এইকালের জীবনসাধনা তিনটি ধারায় ও কালপর্যায়ে বিভক্ত, বলা যেতে পারে। ১৮৯০ খ্রীস্টাব্দের জুলাই থেকে ১৮৯৩ খ্রীস্টাব্দের ৩১ মে, যেদিন তিনি বোম্বাই থেকে সমুদ্রপাড়ি দিয়েছিলেন—এই কালের মধ্যে তিনি মুখ্যতঃ ভারতপথিক। এই পর্যায়ে তিনি স্বদেশভূমি ঘুরে ফিরে দেখেছেন, স্বদেশবাসীর সঙ্গে মিলে-মিশে তাদের জীবনের সঙ্গে একাকার হয়ে গেছেন, চারদিকে বিক্ষিপ্ত চিন্তার উপলখণ্ডগুলি কুড়িয়েছেন, ভারতীয়গণের বাহ্য দুরবস্থার অন্তরালে প্রবাহিত অধ্যাত্মসুধা নিষ্কাষণ করে নিজে পান করেছেন, অপর সকলের মধ্যেও তা বিতরণ করেছেন। পরবর্তী সাড়ে তিন বছর তিনি মুখ্যতঃ আমেরিকা ও ইউরোপে ভারত ও ভারতীয় আদর্শের একনিষ্ঠ প্রবক্তা। সে-বাণীর ধ্বনিতে প্রতিধ্বনিতে যখন ভারতভূমি রোমাঞ্চিত, সেসময়ে তাঁর স্বদেশে পুনঃপদার্পণ ঘটেছিল। কলম্বোর বুকে তিনি পা রেখেছিলেন ১৮৯৬ খ্রীস্টাব্দের ২৬ ডিসেম্বর। কলম্বো থেকে আলমোড়া পর্যন্ত বিস্তৃত হয়েছিল তাঁর চরণরেখা। এই দীর্ঘপথে তাঁর ছড়ানো প্রেরণার আগুন সমগ্র দেশে প্রবল উদ্দীপনা সৃষ্টি করেছিল। এই পর্যায়ে তিনি মুখ্যতঃ ভারত-প্রবোধক। এভাবে দেখা যাচ্ছে, আলোচ্যকালের প্রতিক্ষণেই তিনি ভারত-পথিক, ভারত-প্রবক্তা অথবা ভারত-প্রবোধক। মনে পড়ে, আমেরিকা

থেকে ১৮৯৪ খ্রীস্টাব্দের ১ এপ্রিল তিনি তাঁর প্রিয় শিষ্য আলাসিঙ্গাকে লিখেছিলেন ঃ "এমন একটি প্রকাণ্ড মশাল জ্বালতে হবে, যা সমগ্র ভারতে আলো দেবে।" প্রকৃতপক্ষে, বিগত শতাব্দীর প্রত্যন্তে দেখা গেল, তিনি স্বয়ং একটি প্রকাণ্ড প্রেরণা-মশালের ন্যায় সমগ্র ভারতকে আলোকোজ্জ্বল করে তুলেছেন। সেই আলোর সাহায্যে পথের সন্ধান করেছেন অরবিন্দ, গান্ধী, রবীন্দ্রনাথ, সুভাষচন্দ্র প্রমুখ জাতীয় নেতৃবৃন্দ। সেই মশালের রক্তরশ্মিতে ভারতবাসী ক্রমে ক্রমে সম্বিৎ ফিরে পাচ্ছে, দেশের অতীত গৌরব ও ভবিষ্যভূমিকা মনন করতে শিখছে, ভবিষ্যতে চলার পথ বোধ করি চিনতে পারছে।

বর্তমানে আমরা দৃষ্টি দেব ভারতপথিক বিবেকানন্দের প্রতি। প্রথমেই দৃষ্টিতে পড়ে ভারত-পথিক সন্ন্যাসী বিবেকানন্দের দুটি আপাতবিরোধী ভাবমূর্তি। প্রথমটিতে, তিনি নির্বিকল্প সমাধি-সুখ পুনরায় আস্বাদনের জন্য লালায়িত। ১৮৯০ খ্রীস্টাব্দে শ্রীশ্রীমায়ের আশীর্বাদ মাথায় নিয়ে যাত্রা শুরু করেছিলেন। "মায়ের কাজ করতে হবে"—গুরু শ্রীরামকৃষ্ণের এই আদেশ সাময়িকভাবে ভুলে গিয়ে তিনি চলার পথে আলমোড়া, টিহিরি ও হরিদ্বারে নিবিড়ভাবে সাধন-ভজনের জন্য আসন পেতেছিলেন, কিন্তু প্রতিক্ষেত্রেই অপ্রত্যাশিতভাবে আগন্তুক বাধা তাঁর প্রয়াসকে ব্যর্থ করেছিল। ঘুরে ফিরে তিনি উপস্থিত হয়েছিলেন মীরাটে। এক শেঠজীর বাগানে অপর ছয়জন গুরুভাইয়ের সঙ্গে মিলিত হয়েছিলেন তিনি। তপস্বিগণের সমবেত চর্যায় স্থানটি হয়ে উঠেছিল 'দ্বিতীয় বরাহনগর মঠ'। কয়েক সপ্তাহ অবস্থানের পর তিনি একদিন অকস্মাৎ গুরুভাইদের বললেন ঃ "আমার জীবনব্রত স্থির হয়ে গেছে। এখন থেকে আমি একাকী থাকব। তোমরা আমায় ত্যাগ কর।" ইতঃপূর্বে তিনি শিষ্য স্বামী সদানন্দকে হাতরাসে এই ব্রতের বিষয় বলেছিলেন। হরিদ্বারে গুরুভাইদের তিনি বলেছিলেন যে, ব্রতসমাপ্তির পূর্বে তাঁর শান্তি নেই। যাহোক, স্বামীজীর সিদ্ধান্ত শুনে গুরুভাইগণ দুঃখিত হলেন। বিমর্ষ গুরুভাইদের ত্যাগ করে তিনি মীরাট থেকে যাত্রা করলেন ১৮৯১ খ্রীস্টাব্দের জানুয়ারির শেষ সপ্তাহে। ধীরে ধীরে স্পষ্ট হয়ে উঠল ভারতপথিক বিবেকানন্দের দ্বিতীয় ভাবমূর্তিটি। এখন তিনি গুরু-প্রদত্ত মহান দায়টি বহন করতে প্রস্তুত। একাকী অপরিগ্রহ নিরালম্ব সন্ন্যাসী চলেছেন। কখনো তাঁর আহার জুটেছে, কখনো বা তিনদিন উপবাস। ক্যালিফোর্নিয়ায় এক বক্তৃতায় তিনি বলেছিলেন ঃ "আমি কতবার ক্ষুধা-তৃষ্ণা ও পথশ্রমে মৃতপ্রায় হইয়াছি। কতদিন উপবাসে দিন কাটিয়াছে, পথ চলিবার ক্ষমতাও ছিল না। গাছের তলায় মূর্ছিত হইয়া পড়িয়াছি। মনে হইয়াছে মৃত্যু আসন্ন, কথা বলিবার বা চিন্তা করিবার শক্তি পর্যন্ত লোপ পাইয়াছে। কিন্তু হঠাৎ মনে পড়িয়া গিয়াছে, আমার জন্মও নাই, মৃত্যুও নাই, ক্ষুধাও নাই, তৃষ্ণাও নাই। সোঽহং সোঽহম্।" তিনি কখনো বাঘের মুখে, কখনো ব্যভিচারী তান্ত্রিকদের খপ্পরে পড়েছেন। আত্মগোপনের জন্য কখনো বিবিদিষানন্দ, কখনো বিবেকানন্দ[১], কখনো বা সচ্চিদানন্দ নাম গ্রহণ করেছেন। গুরুভাইদের এড়িয়ে চলবার চেষ্টা করলেও অখণ্ডানন্দ, অভেদানন্দ, ত্রিগুণাতীতানন্দ, তুরীয়ানন্দ ও ব্রহ্মানন্দ—এঁদের সঙ্গে পথে স্বামীজীর দেখা হয়েছে। তাঁর মনোভাব বুঝে গুরুভাইগণ তাঁর নিঃসঙ্গ ব্রতসাধনে বাদ সাধেননি। স্বপ্রকাশ সূর্যকে গোপন করা যায় না, তেমনি ভাস্বর বিবেকানন্দেরও আত্মগোপন সম্ভব হয়ে ওঠে না। তাঁর পাণ্ডিত্যের জৌলুষ, তাঁর সঙ্গীতের যাদু, তাঁর ব্যবহারের মাধুর্য সর্বত্রই মানুষকে আকর্ষণ করে-ছিল এবং তাঁর নিজেকে গোপন করার চেষ্টা ব্যর্থ করেছিল। তাঁর মেধা, ধর্মানুভূতি ও চৌম্বক ব্যক্তিত্ব তাঁর সঙ্গধন্য ব্যক্তিদের ওপর বিস্তার করে-ছিল প্রগাঢ় প্রভাব।

পরিব্রাজক বিবেকানন্দ আবু পাহাড়ে, গির্নার পাহাড়ের গুহাতে কয়েকদিন করে অতিবাহিত করেছেন, কিন্তু কোথাও সমাধিলাভের জন্যে তাঁর আকুলি-বিকুলি ভাব দেখা যায়নি। দেখা গিয়েছিল, তাঁর জিজ্ঞাসু মোহমুক্ত মন সর্বদাই অধিকতর জানবার, অধিকতর বুঝবার জন্য আগ্রহী।

১ ১৮৯২ খ্রীস্টাব্দে লিখিত 'স্বামী বিবেকানন্দ' নাম সই করা কয়েকটি পত্র বেলুড় মঠ সংগ্রহশালায় সুরক্ষিত।

পরিব্রাজক সন্ন্যাসী গ্রামে, জনপদে, অরণ্যে ভারত-ভারতীকে খুঁজেছেন। ভারতীয় জীবনের প্রাণ-রসের মূল উৎসের অনুসন্ধান করেছেন। খোলা মন নিয়ে তিনি জাতির ইতিহাস পাঠ করেছেন। একান্তভাবে অনুভব করেছেন ভারতের চিরকালের সাধনা হচ্ছে বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্য, বিরোধের মধ্যে মিলন, বহুর মধ্যে একের উপলব্ধি। পথ চলতে চলতে চাষার কুটিরে রুটি খেয়েছেন, ভাঙীর হুঁকোতে তামাক সেবন করেছেন, গুণী পণ্ডিতের নিকট শাস্ত্রপাঠ করেছেন, রাজদরবারের আতিথ্য গ্রহণ করেছেন। কখনো বা শিল্পনগরীতে শ্রমিকদের দিনচর্যা লক্ষ্য করেছেন। সর্বত্রই ছিল সন্ন্যাসীর স্বচ্ছন্দ গতিবিধি। সকলের জন্যে ছিল তাঁর দরদমাখা সহানুভূতিপূর্ণ ব্যবহার। এর ফলে, সামাজিক সকল স্তরের মানুষের, বিশেষতঃ চির-অবহেলিত নিম্নজাতি, জনজাতি, উপজাতি ও নারীজাতির সুখ-দুঃখ, হতাশা-স্বপ্ন ইত্যাদি তিনি অবগত হয়েছিলেন। সত্যিকার জাতির ঘনিষ্ঠ ও প্রকৃত পরিচয়লাভ করেছিলেন। তিনি উপলব্ধি করেছিলেন, দরিদ্রের কুটিরেই আমাদের জাতীয় জীবনের স্পন্দন। পরিক্রমাকালে নানান ভাষাভাষী, ধর্মাবলম্বী ও সাংস্কৃতিক গোষ্ঠীর মানুষের সঙ্গে, এককথায় সকল ভারতবাসীর সঙ্গে একাত্মতা অনুভব করেছিলেন তিনি। কোটি কোটি দরিদ্র, লাঞ্ছিত, পদদলিত, খেটেখাওয়া মানুষ, বিশেষতঃ নারীগণের ওপর অত্যাচার অবিচার অন্যায়ের মাত্রা দেখে ক্ষুব্ধ চঞ্চল হয়ে উঠেছিলেন, কখনো বা মুষড়ে পড়েছিলেন। এ-সকল 'ম্লান মূক মূঢ়' মানুষের দুঃখ-দুর্দশা তাঁর সংবেদনশীল সত্তায় যেন সেঁধিয়ে গিয়েছিল। মিস ম্যাকলাউড যথার্থই বলেছিলেন ঃ "অস্থিমজ্জায় তিনি মানুষের সমস্ত যন্ত্রণা অনুভব করতেন।"[২] কিন্তু স্বদেশবাসীর জীর্ণশীর্ণ রূপ দেখে তিনি শুধুমাত্র দুর্বলের অশ্রুবিসর্জন করেননি; তিনি দৃঢ়চিত্তে তাদের দুরপনেয় সমস্যা সমাধানের জন্য সচেষ্ট হয়েছিলেন। পবিত্রতার অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষিত হয়ে দরিদ্র পতিত ও পদদলিতদের প্রতি সহানুভূতিতে সিংহবিক্রমে বুক বেঁধে মুক্তি, সেবা, সাম্য ও সামাজিক উন্নয়নের মঙ্গলময়ী বার্তা দ্বারে দ্বারে বহন করে চলেছিলেন।

ভারতপথিকের চলার দুর্বার আকাঙ্ক্ষা কতকটা প্রশমিত হলো যখন তিনি ভারতমাতার চরণপ্রান্তে উপনীত হলেন। দেখতে পেলেন, তিনদিক থেকে নীলাম্বুরাশি মাতার চরণবন্দনায় নিরত। অদূরে দেখা গেল তরঙ্গবিক্ষুব্ধ সমুদ্রের বুকে শিলাখণ্ড। পরম্পরাগত কাহিনী অনুসারে, দেবী পার্বতী ঐ শিলার ওপর একপায়ে দাঁড়িয়ে তপস্যা করেছিলেন। তরঙ্গোচ্ছ্বাস, হাঙর এসকল অগ্রাহ্য করে সাহসী সন্ন্যাসী সাঁতরে চলে গেলেন ঐ শিলাখণ্ডে। ঐ শক্তিপীঠে তিনি ধ্যানে বসলেন। তিনদিন পানাহার ভুলে ধ্যানে ডুবে থাকলেন। সম্ভবতঃ ২৪ থেকে ২৬ ডিসেম্বর ১৮৯২। অদ্ভুত এই সন্ন্যাসী। তিনি ধ্যান করলেন পরব্রহ্মের নয়, সাকার-নিরাকার কোন দেবতার নয়, কোন বৈদিক মন্ত্রেরও নয়, তিনি ধ্যান করলেন ভারতবর্ষের। ভারতবর্ষের ও ভারতবাসীর মর্মান্তিক সমস্যার নিরাকরণের উপায় উদ্ভাবনের জন্য মনোনিবেশ করলেন তিনি। তাঁর প্রজ্ঞার আলোকে উজ্জ্বল হয়ে উঠল ভারতবর্ষের অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ। তিনি শুনতে পেলেন ভারতের মর্মবাণী। ভারতবাসীর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য, তার শক্তি ও দুর্বলতা আলোচনা করে তিনি ভারতবর্ষের পুনর্জাগরণের পন্থা নিরূপণ করলেন। সিদ্ধান্ত করলেন, সত্যিকার জাতি কুটিরে বাস করে, তারা তাদের ব্যক্তিত্ব ও মনুষ্যত্ব ভুলে গেছে। তাদের শিক্ষিত করা ও উন্নত করাই জাতীয় জীবন-গঠনের পন্থা। বছর খানেক পর তিনি গুরুভাই স্বামী রামকৃষ্ণানন্দকে একটি পত্রে লিখেছিলেন ঃ "দাদা, এইসব দেখে—বিশেষ দারিদ্র্য আর অজ্ঞতা দেখে আমার ঘুম হয় না; একটা বুদ্ধি ঠাওরালুম Cape Comorin [-এ] মা কুমারীর মন্দিরে বসে, ভারতবর্ষের শেষ পাথরটুকরার উপর বসে—এই যে আমরা এতজন সন্ন্যাসী আছি ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছি, লোককে metaphysics শিক্ষা দিচ্ছি—এসব পাগলামি, 'খালি পেটে ধর্ম হয় না'—গুরুদেব বলতেন না? ঐ যে গরিবগুলো পশুর মতো জীবন যাপন করছে, তার কারণ মূর্খতা।... মনে কর... কতকগুলি

২ ভারতবর্ষ (দিনপঞ্জী) (অনুবাদক ঃ অবন্তীকুমার সান্যাল)—রোমাঁ রোলাঁ, কলকাতা, ১৯৭৬, পৃঃ ১৯৩

নিঃস্বার্থ পরহিতচিকীর্ষু সন্ন্যাসী গ্রামে গ্রামে বিদ্যা বিতরণ করে বেড়ায়… তাহলে কালে মঙ্গল হতে পারে না কি?" একথা অনুমান করতে দ্বিধা নেই যে, স্বদেশের জনসাধারণের জন্য তাঁর অনুভূত তীক্ষ্ণ বেদনার অন্তর্দাহ তাঁর ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা নির্ণয়ে প্ররোচিত করেছিল।

অধঃপতিত নিপীড়িত স্বদেশবাসীর জন্য বেদনার্তই সন্ন্যাসী বিবেকানন্দকে দেশবাসীদের দ্বারে দ্বারে নিয়ে গিয়েছিল। তাঁর ধারণা হয়েছিল, জনসাধারণের চরম দুরবস্থার অন্যতম প্রধান কারণ হলো ইংরেজের কুশাসন এবং শাসনের আড়ালে শোষণ ও নিষ্পেষণ। প্রায় হাজার বছর ধরে ভারতের সমাজ ও রাষ্ট্রকে অধিকার ও শাসন করলেও ইসলামধর্ম তার প্রাণপাখিকে কাবু করতে পারেনি। কিন্তু ইংরেজের স্বল্পকালের অধিকার ও শাসনের আশ্রয়াধীনে খ্রীস্টধর্ম ও ইউরোপীয় সভ্যতা ভারতীয় সভ্যতার প্রাণধর্মকে উচ্ছেদ করতে উদ্যত হয়েছিল। বোধ করি, সেই কারণে তিনি এইকালে স্বদেশভূমিকে বিদেশী শাসন থেকে মুক্ত করতে অত্যধিক ব্যগ্র হয়ে উঠেছিলেন। পরবর্তী কালে জানা যায়, পরিব্রাজক সন্ন্যাসীর গতিবিধি সম্বন্ধে সন্দিগ্ধ হয়ে ব্রিটিশ গোয়েন্দা পুলিশের পদস্থ কর্মচারীরা ভারত সরকারের ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে সাবধান করে দিয়েছিলেন। দেশপ্রেমী স্বামী বিবেকানন্দকে তাঁর হ্রস্ব জীবনের প্রান্তে বলতে শোনা গিয়েছিলঃ "বিদেশী শাসন উৎখাত করবার জন্য আমি দেশীয় রাজন্যবর্গকে সংঘবদ্ধ করবার কথা ভেবেছিলাম। এই কারণে, আমি হিমালয় হতে কুমারিকা অন্তরীপ পর্যন্ত দেশময় দাবড়ে বেড়িয়েছিলাম। ঐ একই কারণে বন্দুক-আবিষ্কর্তা হিরম ম্যাক্সিমের সঙ্গে বন্ধুত্ব করেছিলাম।" অবশ্য এই পরিকল্পনা তাঁকে বর্জন করতে হয়েছিল। তিনি দেখতে পেয়েছিলেন, রাজন্যবর্গের অধিকাংশই স্বার্থপর, সংকীর্ণ দৃষ্টি, ভীরু ও কার্যকরবুদ্ধিশূন্য। উপরন্তু বুঝতে পেরেছিলেন যে, রাজন্যবর্গকে সঙ্ঘবদ্ধ করে ইংরেজ সরকারের অপসারণ সম্ভব হলেও দেশের স্বাধীনতা রক্ষার ও দেশোন্নয়নের জন্য সর্বপ্রথম প্রয়োজন শিক্ষিত ও উদ্বুদ্ধ জনসাধারণ। তিনি নতুন পরিকল্পনা রচনা করলেন। ঘোষণা করলেনঃ "যারা সর্বাপেক্ষা দীনহীন ও পদদলিত—তাদের দ্বারে দ্বারে সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য, নীতি, ধর্ম ও শিক্ষা বহন করে নিয়ে যেতে হবে—এটাই আমার আকাঙ্ক্ষা ও ব্রত।"

তিনি লক্ষ্য করেছিলেন—"জাতটা ঠিক বেঁচে আছে, প্রাণ ধক্ ধক্ করছে, উপরে ছাই চাপা পড়েছে মাত্র।" তিনি উপলব্ধি করেছিলেন, এ-জাতির প্রাণশক্তি ধর্ম। জাতীয় জীবনের ভরকেন্দ্র ধর্ম। জাতীয় জীবন-সঙ্গীতের প্রধান সুর ধর্ম। তিনি বলেছিলেনঃ "এ-দেশের প্রাণ ধর্ম, ভাষা ধর্ম, ভাব ধর্ম।" এ-জাতির জীবনমৃত্তিকার গভীরে প্রোথিত যে ধর্মের প্রেরণা, তাকে অবলম্বন করেই ভারতবর্ষের পুনরুত্থান ঘটবে। সেই সঙ্গে পূর্বেকার মতো ভারতবর্ষ জগতের সভ্যতার ভাণ্ডারে তার আস্তত অধ্যাত্মসম্পদ দান করবে। দেখা যাচ্ছে, আলোচ্য পর্যায়ে প্রেমিক সন্ন্যাসীর তপস্যার সাধ্যবস্তু ছিল ভারতবর্ষের পুনর্জাগরণ এবং জগৎসভায় ভারতবর্ষের গৌরবের আসনে প্রতিষ্ঠা। তিনি দিব্যদৃষ্টিতে দেখেছিলেন ভারতবর্ষের বিশাল জাগরণ। ভারতবর্ষ উঠবে চৈতন্যের শক্তিতে, ত্যাগ ও সেবার আদর্শের ভিত্তিতে এবং শান্তি ও প্রেমের পতাকা বহন করে। ভারতের উন্নয়ন প্রয়োজন শুধুমাত্র ভারতবাসীর জন্য নয়, ঐহিকতা-সর্বস্ব পাশ্চাত্যের কল্যাণের জন্যও। ভারতের প্রবোধন হলেই, ভারতের আধ্যাত্মিকতার প্রভাব বন্যাস্রোতের ন্যায় সমগ্র জগৎকে প্লাবিত করবে। সুতরাং বিবেকানন্দের আলোচ্যকালের সাধনাকে বলা চলে 'ভারতসাধনা'। এ-সাধনায় সিদ্ধ হয়ে বিবেকানন্দ "নিজেই হয়ে উঠেছিলেন ভারতবর্ষ—রক্তমাংসে গড়া ভারত-প্রতিমা।" তাঁর স্বসংবেদ্য উপলব্ধি প্রকাশ করে বলেছিলেন যে, তিনিই "ঘনীভূত ভারতবর্ষ"। "ঘনীভূত ভারতবর্ষ"-রূপে তাঁর ভূমিকা ছিল দ্বিমুখীঃ মানুষের নিকট তার অন্তর্নিহিত দেবত্বের বাণী প্রচার এবং জীবনের সর্বপাদে সেই দেবত্ব বিকাশের পন্থা নির্ধারণ।

তাঁর নিকট সান্নিধ্যে বাস করার সৌভাগ্যে

৩ স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা, ৬ষ্ঠ খণ্ড, ১ম সং, পৃঃ ১৬১

ভাগ্যবতী নিবেদিতা লিখেছিলেন: "ভারতের চারি-প্রান্তে যেখানে যেখানে যেকোন কাতর আর্তনাদ উত্থিত হইত, তাহার প্রত্যেকটি তাঁহার হৃদয় স্পর্শ করিয়া যাইত।" কিন্তু ভারতবর্ষ ও ভারতবাসী সম্বন্ধে ভারতদ্রষ্টা বিবেকানন্দের তীব্র বেদনাবোধ, সঞ্চারী সংবেদনশীলতা, অফুরন্ত দরদ যেমন তাঁর হৃদয়কে অধিকার করেছিল, সেই সঙ্গে তাঁর মস্তিষ্ক ভারতবর্ষের সমস্যা সমাধানের সন্ধানে মৌলিক প্রতিভার স্বাক্ষর রেখেছিল। দরদী মনস্বীর ভাবনাসূত্রগুলির মধ্যে নিম্নলিখিত কয়েকটি প্রধান এবং বর্তমানকালেও প্রাসঙ্গিক:

(১) "সত্যই, এ [ভারতবর্ষ] এক নৃতাত্ত্বিক সংগ্রহশালা··· বিভিন্ন জাতির তরঙ্গায়িত বিপুল মানবসমুদ্র—যুধ্যমান, স্পন্দমান, চেতনায়মান, নিরন্তর পরিবর্তনশীল—ঊর্ধ্বে উৎক্ষিপ্ত হইয়া ছড়াইয়া পড়িয়া ক্ষুদ্রতর জাতিগুলিকে আত্মসাৎ করিয়া আবার শান্ত হইতেছে—ইহাই ভারতবর্ষের ইতিহাস।"[৪] নানা জাতি, ধর্মমত, ভাষা ইত্যাদির বিরোধ সত্ত্বেও "বহুত্বের মধ্যে একত্বের" সূত্র-রহস্য আবিষ্কার করে ভারতবর্ষ কালজয়ী হয়েছে, ভারতবর্ষ সমন্বয়ের তীর্থে পরিণত হয়েছে; 'ভারততীর্থ' চিরকালই বিশ্ববাসীকে আহ্বান করছে। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন: "হেথায় সবারে হবে মিলিবারে যাবে না ফিরে।" পরিব্রাজক বিবেকানন্দ উপলব্ধি করেছিলেন, ভারতবর্ষের এই বৈশিষ্ট্য স্মরণে রেখেই উন্নয়নের পরিকল্পনা করতে হবে।

(২) স্বগৃহে জাত ও বহির্দেশ সমাগত অগণিত জাতি ও উপজাতির সম্মিলন-ভূমি ভারতবর্ষে বিবিধ রাজনৈতিক ও সামাজিক কারণে আর্যধর্ম ও আর্যভাব সমাজদেহের বিরাট এক অঙ্গের মধ্যে প্রবিষ্ট হয়নি। এদিকে বহিঃশক্তির আক্রমণে পর্যুদস্ত সমাজ বিবিধপ্রকার সংকীর্ণতার গণ্ডি দিয়ে আত্মরক্ষায় সচেষ্ট হয়েছিল। পরিণতিতে গণ্ডির বাইরে আজও পড়ে রয়েছে গিরিজন, তফসিলভুক্ত অনুন্নত সম্প্রদায়সকল। "রাক্ষসবৎ নৃশংস সমাজ" তাদের ওপর নিয়ত আঘাত করে চলেছে। যথাশীঘ্র সম্ভব আর্যভাব আর্যধর্ম তাদের মধ্যে বিস্তার করে তাদের জাতির মূলস্রোতে আনা প্রয়োজন।

(৩) ভোগাধিকারের তারতম্যের মহাসংগ্রামে ভারতীয় সমাজ পরাস্ত—"গতপ্রাণপ্রায়"। এই অসাম্যই মহা অনর্থের কারণ। স্বামীজীর মতে, এটি ভারতীয় সমাজব্যবস্থার প্রধান সমস্যা। উঁচুতলার মানুষ নীচুতলার মানুষের "রক্ত চুষে খেয়েছে, আর দুপা দিয়ে দলেছে।" আচণ্ডালে ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষের সমানাধিকারলাভের ব্যবস্থা না করা পর্যন্ত সমাজের স্থায়ী শান্তি ও প্রগতি অসম্ভব।

(৪) ব্রাহ্মণ পুরোহিতশ্রেণী ও ক্ষত্রিয়কুলের মধ্যে সামাজিক প্রতিপত্তি স্থাপনের জন্য দ্বন্দ্ব, ধর্ম বিষয়ে জনসাধারণকে সমানাধিকার দেবার জন্য শ্রীকৃষ্ণের প্রচেষ্টা, সামাজিক সাম্যসাধনের জন্য শ্রীবুদ্ধের আকাঙ্ক্ষা, নীচ-পতিতদের ধর্মের অধিকার দানের জন্য শ্রীচৈতন্যের উদ্যোগ, মুসলমান শাসন-কালে ধর্মীয় নেতাদের উদার নীতি, উনিশ শতকের সমাজ-সংস্কারকগণের ঠুনকো ব্যবস্থাসকল এদেশের "চির-পদদলিত শ্রমজীবীদের" নিশ্চিত কল্যাণের পথ দেখাতে পারেনি। স্বামীজী চাইলেন, জন-সাধারণকে শিক্ষিত করতে হবে, স্বদেশের ও বিদেশের মহৎ চিন্তাভাবনা তাদের নিকট পৌঁছে দিতে হবে, তাদের স্বনির্ভর ও সংঘবদ্ধ হতে সাহায্য করতে হবে, কিন্তু নিজেদের ভবিষ্যৎ নিরূপণের স্বাধীনতা তাদের দিতে হবে।

(৫) প্রবল পাশ্চাত্য-অনুকরণ-মোহে আবিষ্ট হয়ে সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ জাতীয় নেতৃবৃন্দ রাজনীতি আশ্রয় করেই জাতীয় জাগরণের পরিকল্পনা করছিলেন। এসকল নেতাগণকে সাবধান করে দিয়ে স্বামীজী মাদ্রাজে একটি ভাষণে বলেছিলেন: "ভারতে যেকোন সংস্কার বা উন্নতির চেষ্টা করা হউক, প্রথমতঃ ধর্মের উন্নতি আবশ্যক। ভারতকে সামাজিক বা রাজনীতিক ভাবে প্লাবিত করার আগে প্রথমে আধ্যাত্মিক ভাবে প্লাবিত কর।"[৫]

(৬) স্বামীজী ভারতবর্ষে লক্ষ্য করেছিলেন "ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যবাদের বেড়া দেওয়া সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা।" এই ভাবধারাটি রক্ষা করেই এদেশের জনসাধারণের লুপ্ত ব্যক্তিত্ববোধ ফিরিয়ে দিতে হবে।

(৭) স্বামীজীর সিদ্ধান্ত: "ভারতের ইতি-হাসে বরাবর দেখা গিয়াছে, যেকোন আধ্যাত্মিক

৪ বাণী ও রচনা, ৫ম খণ্ড, পৃঃ ৩৭৭-৩৭৮

৫ ঐ, ৫ম খণ্ড, পৃঃ ১১১

অভ্যুত্থানের পরে তাহারই অনুবর্তিভাবে একটি রাষ্ট্রনীতিক ঐক্যবোধ জাগ্রত হইয়া থাকে এবং ঐ বোধই আবার যথানিয়মে নিজ জনয়িত্রী যে বিশেষ আধ্যাত্মিক আকাঙ্ক্ষা, তাহাকে শক্তিশালী করিয়া থাকে।"[৬] তিনি বলেছিলেন, শ্রীরামকৃষ্ণের আবির্ভাব নবযুগের সূচনা করেছে। তাই তিনি ঘোষণা করেছিলেন: "এবার কেন্দ্র ভারতবর্ষ।"

(৮) তিনি বলেছেন, দেশবাসীর অর্ধেক হলো নারী। সুতরাং নারীদের উন্নতি ভিন্ন ভারতের উন্নতি অসম্ভব।

(৯) সামগ্রিকভাবে বিচার করলে দেখা যায়, ভারতবর্ষের এমন একটি সহজাত শক্তি রয়েছে যা চিরকাল একদিকে যাবতীয় প্রতিঘাতকে সহ্য করেও স্বকীয় বৈশিষ্ট্য বজায় রেখেছে, অন্যদিকে সকল বহিরাগতকে সমাজের অঙ্গীভূত করে নিয়েছে।

(১০) স্বামীজী বলেছেন: "সামাজিক বা রাজনীতিক সর্ববিধ বিষয়ের সফলতার মূলভিত্তি—মানুষের সাধুতা, পার্লামেন্ট কর্তৃক বিধিবদ্ধ কোন আইন দ্বারা কখন কোন জাতি উন্নত বা ভাল হয় না, কিন্তু সেই জাতির অন্তর্গত লোকগুলি উন্নত ও ভাল হইলেই জাতিও ভাল হইয়া থাকে।"[৭] এই কারণে স্বামীজী সর্বদা বলতেন: "মানুষ চাই, মানুষ চাই!"

(১১) স্বামীজীর ভবিষ্যদ্বাণী: "আমি মানসচক্ষে দেখিতেছি, এই বিবাদ-বিশৃঙ্খলা ভেদপূর্বক ভবিষ্যৎ পূর্ণাঙ্গ ভারত বৈদান্তিক মস্তিষ্ক ও ইসলামীয় দেহ লইয়া মহামহিমময় ও অপরাজেয় শক্তিতে জাগিয়া উঠিতেছে।" লেভিয়াথানের মতো শায়িত, মৃতপ্রায় জাতিকে জাগরণের জন্য স্বামীজী দুটি জীয়নকাঠির উল্লেখ করেছেন। প্রথম, অবহেলিত ঘৃণিত ভারতবাসীকে প্রাণ দিয়ে ভালবাসা; দ্বিতীয়, আত্মভোগসুখ বিসর্জন দিয়ে স্বদেশের নিপীড়িত মানুষের জন্য আত্মোৎসর্গে প্রস্তুত কিছু মানুষ। স্বামীজী একটি পত্রে লিখেছিলেন: "আমার বিশ্বাস যে, যদি কেউ এই হতশ্রী বিগতভাগ্য লুপ্তবুদ্ধি পরপদবিদলিত চিরবুভুক্ষিত কলহশীল ও পরশ্রীকাতর ভারতবাসীকে প্রাণের সহিত ভালবাসে, তবে ভারত আবার জাগিবে। যবে শত শত মহাপ্রাণ নরনারীসকল বিলাসভোগসুখেচ্ছা বিসর্জন করিয়া কায়মনোবাক্যে দারিদ্র্য ও মূর্খতার ঘনাবর্তে ক্রমশঃ উত্তরোত্তর নিমজ্জনকারী কোটি কোটি স্বদেশীয় নরনারীর কল্যাণ কামনা করিবে, তখন ভারত জাগিবে।"[৮]

ভারত-সাধনার সমকালে ভারতপথিক বিবেকানন্দের ব্যক্তিসত্তায় যে-বিবর্তন উপস্থিত হয়েছিল, তার দিকে দৃষ্টি ফেরালেও চমৎকৃত হতে হয়। মুক্তমনা বিবেকানন্দ চিরকালের শিক্ষার্থী। স্বদেশ-পরিক্রমা তাঁর নিকট মনে হয়েছিল একটি উন্মুক্ত গ্রন্থ। খেতড়িতে এক নর্তকী নিজের অজ্ঞাতসারে তাঁর সন্ন্যাসের অভিমান খর্ব করেছিল। বৃন্দাবনের পথে ভাঙ্গীর ব্যবহৃত হুঁকোর টান তাঁর অন্তরের গভীরে নিহিত একটি কুসংস্কার দূর করেছিল। হিমালয়ে তিব্বতীয় রমণীর ছয়জন স্বামীর সঙ্গে বসবাস তাঁকে শিখিয়েছিল যে, পরিপার্শ্বভেদে নীতির পার্থক্য ঘটে। পথ চলতে চলতে বিবেক-অরবিন্দ ক্রমে প্রস্ফুটিত হয়েছিল। বিকশিত সেই রূপ-গুণের ঐশ্বর্য গুরুভাইদের চোখে ধরা পড়েছিল। আর উদ্বর্তনের প্রমাণ ছিল তাঁর নিজমুখে স্বোপলব্ধির কথন। তাঁর বৈপ্লবিক পরিবর্তন লক্ষ্য করে স্বামী অভেদানন্দ লিখেছেন: "এ-সময় স্বামীজীর হৃদয়টা যেন অগ্নিকুণ্ডের ন্যায় হয়েছিল—আর কোন চিন্তা নেই, কেবল কি করে ভারতের প্রাচীন আধ্যাত্মিকতার পুনঃপ্রতিষ্ঠা হয়, অহর্নিশ এই ভাবতেন।" স্বামী অখণ্ডানন্দ তাঁর দেখা পেয়েছিলেন মাণ্ডবীতে; তাঁর মধ্যে দেখতে পেয়েছিলেন এক অদৃষ্টপূর্ব অলৌকিক মহাশক্তির প্রকাশ। স্বামীজীর পাশ্চাত্যযাত্রার প্রাক্কালে স্বামী তুরীয়ানন্দের মনে হয়েছিল: "জগতের দুঃখে স্বামীজীর হৃদয় তোলপাড় হচ্ছে—তাঁর হৃদয়টা যেন তখন একটা প্রকাণ্ড কড়াই, যাতে জগতের সমস্ত দুঃখকে রেঁধে একটা প্রতিষেধক মলম তৈরি করা হচ্ছিল।" স্বামীজীও তাঁর নিজস্ব উপলব্ধি প্রকাশ করেছিলেন স্বামী তুরীয়ানন্দের কাছে: "আমার হৃদয় খুব বেড়ে গেছে এবং আমি অপরের ব্যথায় ব্যথা বোধ করতে শিখেছি।" বলতে বলতে তাঁর কণ্ঠ রুদ্ধ হয়েছিল, অঝোরে তাঁর অশ্রু ঝরেছিল। স্বামী

৬ বাণী ও রচনা, ৫ম খণ্ড, পৃঃ ৩১৪ ৭ ঐ, ৯ম খণ্ড, পৃঃ ৪৪২ ৮ ঐ, ৭ম খণ্ড, পৃঃ ৩২৩-৩২৪

ত্রিগুণাতীতানন্দকে পোরবন্দরে স্বামীজী বলেছিলেন: "ঠাকুর যে বলতেন, এর ভিতর সব শক্তি আছে, ইচ্ছা করলে এ জগৎ মাতাতে পারে, একথা এখন কিছু কিছু বুঝতে পারছি।" তাঁর গুরুদেবের অভীপ্সিত ভূমিকা পালনের জন্য এইকালে তিনি প্রস্তুতি সম্পূর্ণ করেছিলেন। তিনি একটা বিশাল বটগাছের মতো হতে চলেছিলেন, যার ছায়ায় হাজার হাজার লোক আশ্রয় পাবে। সেই কারণে আমরা বিস্মিত হই না যখন জানতে পারি, বিশ্বধর্মসভায় সাফল্যের শিখরে তিনি আরোহণ করেছেন, অথচ সে-মুহূর্তেও তিনি অশ্রু বিসর্জন করে বলছেন: "মা, আমার স্বদেশ যেকালে অবর্ণনীয় দারিদ্র্যে নিপীড়িত, সেকালে মানযশের আকাঙ্ক্ষা কে করে? গরিব ভারতবাসী আমরা এমনি দুঃখময় অবস্থায় পৌঁছেছি যে, লক্ষ লক্ষ জন একমুষ্টি অন্নাভাবে প্রাণত্যাগ করি, আর এদেশের লোকেরা ব্যক্তিগত স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য লক্ষ লক্ষ টাকা ব্যয় করে। ভারতের জনতাকে কে উঠাবে? কে তাদের মুখে অন্ন দেবে? মা দেখিয়ে দাও, আমি কি করে তাদের সেবা করতে পারি।" বছর দেড়েক পরে তাঁকে একটি পত্রে নিম্নরূপ লিখতে দেখেও বিস্মিত হই না: "যে-ধর্ম বা যে-ঈশ্বর বিধবার অশ্রুমোচন করিতে পারে না অথবা অনাথ শিশুর মুখে একমুঠো খাবার দিতে পারে না, আমি সে-ধর্মে বা সে-ঈশ্বরে বিশ্বাস করি না।" পরিণতিতে ভারততীর্থসেবী বিবেকানন্দের মনোজগতে যে-পরিবর্তন উপস্থিত হয়েছিল, তাঁর রূপটি মোটামুটিভাবে বিধৃত হয়েছে তাঁরই লেখা একটি পত্রে। তিনি লিখেছিলেন: "আমার ভগবানকে, আমার ধর্মকে, আমার দেশকে—সর্বোপরি দরিদ্র ভিক্ষুককে ভালবাসি। নিপীড়িত, অশিক্ষিত ও দীনহীনকে আমি ভালবাসি, তাহাদের বেদনা অন্তরে অনুভব করি, কত তীব্রভাবে অনুভব করি, তাহা প্রভুই জানেন। তিনিই আমাকে পথ দেখাইবেন।" এভাবে দেখা যায়, তিনি একদিকে যেমন ভারতবর্ষকে পুনরাবিষ্কার করেছিলেন, অপরদিকে তেমনি "নিজেকে ধীরে ধীরে করিয়া তুলিতেছিলেন সমগ্র ভারতের বিবেক, ভারতের ঐক্য, ভারতের নিয়তি। এগুলি সমস্তই তাঁহার মধ্যে মূর্ত হইয়া উঠিয়াছিল।"[১]

বিবেকানন্দের ভারত-চর্চা ভারততীর্থের পরিচর্যা বৈ তো নয়। ভারতবর্ষ পুণ্যভূমি, দেবভূমি। তাঁর নিকট ভারতের প্রতিটি ধূলিকণা পবিত্র। সাধক বিবেকানন্দের ধ্যাননেত্রে ভারতবর্ষ এক মহান মন্দির, সে-মন্দিরের বেদিতে অধিষ্ঠিত রয়েছে বৈদিক ঋষিগণ প্রতিষ্ঠিত ভাববিগ্রহ। "বহুত্বের মধ্যে একত্ব সাধন"—এই আদর্শের বিগ্রহই এখানে উপাস্য। এই বিগ্রহের পূজো ও সেবা হয়ে দাঁড়িয়েছিল ভারত-প্রেমিক সন্ন্যাসীর নিত্যকর্ম। এই দেবতার নিয়ত স্মরণ-মনন করে তিনি হয়ে উঠেছিলেন চিন্ময় ভারতবর্ষের একটি চলমান বিগ্রহ। শাস্ত্রবচনে পাই, "তীর্থী কুর্বন্তি তীর্থানি।" স্বামীজীর মতো মহাজনের সেবায় ভারত-তীর্থের মাহাত্ম্য পুনঃপ্রকটিত হয়েছিল, তীর্থমাহাত্ম্য বেড়েও গিয়েছিল। তীর্থভ্রমণ সমাপনান্তে 'বসন্তবৎ লোকহিতং চরন্ত' স্বামীবিবেকানন্দের পূতসঙ্গ অল্পসময়ের জন্য হলেও মনে হতো কলুষহারিণী গঙ্গায় অবগাহনতুল্য।

বিবেকানন্দের ভারত-পরিক্রমার মাধ্যমে সুপরিস্ফুট হয়ে উঠেছিল অখণ্ড অবিভাজ্য ভারতবর্ষের সামগ্রিক রূপটি। ইউরোপের রাজনৈতিক দর্শনে রাষ্ট্রের ভূমিকা সর্বোচ্চ। ভারতবর্ষে আইনশৃঙ্খলা ও বিদেশী-আক্রমণ প্রতিহত করবার দায়িত্ব বহন করত রাষ্ট্র, নতুবা এদেশে প্রাচীনকাল থেকে প্রচলিত রীতি-নীতি ও গ্রাম-পঞ্চায়েত সমাজের দৈনন্দিন প্রশাসনিক দেখভাল করত। এদেশে ইংরেজ-রাজত্ব কায়েম হবার পূর্ব পর্যন্ত এ-ধারাই চালু ছিল। রাষ্ট্রীয় ঐক্য ছিল অগোছালো। প্রত্যক্ষ ইংরেজ-শাসনের বহির্ভূত ছিল বহুসংখ্যক ছোট-বড় করদ রাজ্য। রাজা-মহারাজা নবাব-বাদশার ছড়াছড়ি। স্বামী বিবেকানন্দ আবিষ্কার করেছিলেন যে, সকল ভারতবাসীর প্রাণে স্পন্দিত ধর্মীয় চেতনার সূত্রেই ভারতবর্ষ একটি অখণ্ড সত্তা। সংহতির এই সূত্রটিকে তিনি দৃঢ় করতে প্রয়াসী হয়েছিলেন। তাঁর ভূমিকা আচার্য শংকরের সঙ্গে তুলনীয়। ঐতিহাসিক কে. এম. পানিক্কর যথার্থভাবে স্বামীজীকে 'দ্বিতীয় শংকরাচার্য' আখ্যা দিয়েছেন।

১ বিবেকানন্দের জীবন—রোমাঁ রোলাঁ (অনুবাদক ঋষি দাস), ১ম প্রকাশ, ১৩৬০, পৃঃ ১৮

পরিব্রাজক বিবেকানন্দের সিদ্ধ সাধনায় উজ্জীবিত হয়ে উঠেছিল ভারত-চেতনা। সেই ভারত-চেতনার প্রসারিত জ্যোতিঃধারা অনুসরণ করেই শত সহস্র যুবক দেশমাতৃকার জন্য আত্মাহুতি দিয়েছেন। সে-জ্যোতির কিরণে দেশ-বিদেশের উদ্দীপ্ত বুদ্ধিজীবিগণ ভারতের সঞ্চিত অধ্যাত্মসম্পদ আহরণ ও মূল্যায়নে ব্যাপৃত। সেই জ্যোতির আলোকে পথের সন্ধান করে অগ্রসর হতে পারলেই জাতির যাবতীয় সমস্যার সমাধান সহজসাধ্য হবে।

বিবেকানন্দ ভারতবর্ষকে ধ্যানের মধ্যে প্রত্যক্ষ করেছিলেন, উপরন্তু তিনি জ্ঞান, কর্ম ও প্রেমের মধ্য দিয়ে ভারতের মর্মবাণী উপলব্ধি করেছিলেন। তার পরিণতিতে তিনি ভারতবর্ষকে যেরূপ নিবিড়ভাবে জেনেছিলেন এবং আত্মবুদ্ধিতে ভালবেসেছিলেন, সেরূপ আর কখনো কারও পক্ষে দেখা সম্ভব হয়নি। তাঁর 'ভারত-সাধনা'র ফলশ্রুতি, দেশব্যাপী আধ্যাত্মিক চেতনার অল্পবিস্তর পুনরুদ্বোধন। মানুষের মধ্যে স্বাভাবিকভাবেই সাড়া জেগেছিল, দেখা দিয়েছিল বিপুল এক আন্দোলনের সম্ভাবনা। শিল্পে, সাহিত্যে, দর্শনে, রাজনীতিতে নবপ্রাণ সঞ্চারিত হয়েছিল। গান্ধীজীর ডাণ্ডীযাত্রা, বিনোবাজীর ভূদান-যাত্রা, আধুনিক নেতাদের 'সম্ভাবনা' যাত্রা ও বিবিধ 'রথযাত্রা' অপেক্ষা অধিক শক্তিশালী ও সম্ভাবনাসূচক হয়ে দাঁড়িয়েছিল বিবেকানন্দের ভারত-পরিক্রমা। যদিও পরিক্রমার প্রথমাংশে বিবেকানন্দ চিরাচরিত পন্থানুসারী, আত্মমুক্তিকামী ও চরম সত্যের অনুসন্ধানী এবং দ্বিতীয়াংশে তিনি ভারতহিতব্রতে নিরত ভারত-প্রেমিক। সার্বিক দৃষ্টিতে তিনি ভারততীর্থের সেবক, ঋষিগণের উত্তরসাধক, যুগদেবতা শ্রীরামকৃষ্ণের বাণীবাহক এবং বর্তমানে পথপ্রদর্শক আলোক-বর্তিকা। তাঁর মধ্যে যথার্থই প্রকটিত হয়েছিল, বনফুলের ভাষায়, "ভারতবর্ষের আত্মার অভিব্যক্তি"।

ভারত-গগনে আজ কালোমেঘের ঘনঘটা। তার ললাট-কোণে গাঢ় চাপ চাপ অন্ধকার। ভাষা, ধর্ম, আঞ্চলিকতা-ভিত্তিক বিচ্ছিন্নতার বিষবাষ্পে আকাশ-বাতাস আজ দূষিত। হিংসা-দ্বেষে ক্ষতবিক্ষত দেশ থেকে পরমতসহিষ্ণুতা প্রায় অন্তর্হিত। এপ্রসঙ্গে দুটি বিষয় বিশেষভাবে লক্ষ্য করার মতো। প্রথমতঃ নির্মোহ বিচার-বিশ্লেষণে সহজেই নজর কাড়ে স্বদেশবাসিগণের একটি প্রবণতা। তারা যতটা বিবেকানন্দের মূর্তি গড়েছে, তাঁর ভজন-পূজন করেছে, ততটা দেশের পুনর্গঠনের জন্য তাঁর উপদেশ ও নির্দেশ অনুসরণ করেনি। ওপরে উল্লিখিত বিবেকানন্দ-প্রদর্শিত ভাবনা ও পন্থা থেকে স্বদেশবাসিগণ অনেকাংশে বিচ্যুত। এদিকে দেশের বর্তমান সঙ্কটকালে যেমন দক্ষিণপন্থী তেমনি বামপন্থী রাজনৈতিক দলের নায়কগণ, বিভিন্ন ধর্মমতের প্রধানগণ, সকল অঞ্চলের নেতাগণ বিবেকানন্দের ভারত-পরিক্রমার শতবর্ষ উদ্‌যাপনের জন্য উদ্যোগী হয়েছেন। মত-পথ-নির্বিশেষে দেশের মানুষের কাছে বিবেকানন্দ আজ সংকটমোচন-রূপে সমাদৃত। কিন্তু বিবেকানন্দকে কে কিভাবে বুঝেছেন, কতটুকু গ্রহণ করেছেন, সেবিষয়ে সন্দেহের অবকাশ বিদ্যমান। স্বামী বিবেকানন্দ ১৮৯৪ খ্রীষ্টাব্দে একটি পত্রে ক্ষুব্ধচিত্তে লিখেছিলেন: "ভারতের অসংখ্য নরনারী আমাকে বুঝিতে পারে নাই।"[১০] আজ একশো বছর পরে তাঁর একথা অধিকতর সত্য বলে মনে হয়। এই দোষস্খালনের জন্য একান্ত প্রয়োজন নিবিষ্টচিত্তে বিবেকানন্দের পাঠগ্রহণ, বিবেকানন্দের অনুচিন্তন। দ্বিতীয়তঃ আজকের বিরূপ পরিবেশের মধ্যেও সমনস্ক দৃষ্টি-পাত করলে নজরে পড়বে, কালিদাস রায়ের ভাষায়, "ভারত তনুর অণুতে অণুতে তারি তেজ আজো জ্বলে।" বিবেকানন্দের তেজোশক্তিতে উদ্দীপ্ত দেশ-বাসিগণ রাজনৈতিক স্বাধীনতা অর্জন করেছে, খাদ্য উৎপাদনে স্বয়ম্ভর হয়েছে, প্লেগ কালাজ্বর কলেরা বসন্তরোগ প্রভৃতি নির্মূল করেছে, কোন কোন অঞ্চলকে নিরক্ষরতার অভিশাপ থেকে মুক্ত করেছে। সেই তেজোবলেই দেশবাসিগণ বর্তমানের অন্ধকারের আবরণ ছিন্নভিন্ন করে অগ্রসর হবে। হতাশার কুয়াশা অতিক্রম করতে পারলেই দেশবাসী দেখতে পাবে বিবেকানন্দ-মশালের রক্তরশ্মি উজ্জ্বলতর দীপ্তিতে পথ দেখাতে প্রস্তুত। শুনতে পাবে, নর-দেবতা বিবেকানন্দের আহ্বান: "চরিত্রবান, বুদ্ধি-মান, পরার্থে সর্বত্যাগী এবং আজ্ঞানুবর্তী যুবক-গণের উপরেই আমার ভবিষ্যৎ ভরসা—আমার idea-গুলি যারা work out করে নিজেদের ও দেশের কল্যাণসাধনে জীবনপাত করতে পারবে।"[১১] □

১০ বাণী ও রচনা, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃঃ ৩১৪

১১ ঐ, ৯ম খণ্ড, পৃঃ ২১৭

কবিতা

# রামলালা খেলা করে

## প্রভা গুপ্ত

জীর্ণ প্রাচীন গৃহ-গহ্বরে
ক্ষুদ্র সিংহাসনে
রামলালা ছিল বসি,
ক্ষুদ্র চরণ করে টনটন
গুটি গুটি নামে ভূমিতে
হলুদ বরণ চেলি আঁটা ছিল
তার কটিতে।

হাতে আছে তার মোটা মোটা বালা
আর বাজুবন্ধ
কানে কানবালা দুলিছে
সোনার শিকল বাঁধা আছে তার
মাথার মধ্য-ঝুঁটিতে।

কণ্ঠে রয়েছে মানিকের মালা
ঝিকি-মিকি-ঝিকি জ্বলে,
চরণে নূপুর রিমি-ঝিমি-ঝিমি
চপল চরণে বাজিছে।
রামলালা খেলা করে।
তার নৃত্যের তালে তালে
প্রাচীন গৃহের দালান খিলানে
চুণ-বালি খসি পড়ে
মধুর হাসিয়া হেলাভরে
রামলালা খেলা করে।

বয়স্ক রহিম ছিলেন শয়ান
নিদ্ গেল তার টুটে
উঠিয়া বসেন ধীরে
কহেন ডাকিয়া, 'শোন রামলালা ভাই,
মোরে বিপদে ফেলিয়া দিলে।
তোমার নৃত্যের তালে তালে
ছাদ মোর খসি গেলে
মোর শুইবার ঠাঁই
যদি নাহি পাই ভাই,
দেখি বিপদ ডাকিয়া দিলে।
যুগ যুগ ধরি
বেশ তো আরামে বসিয়াছিলে'।

'বেশ তো—'
কহে রামলালা,
হাতে তালি দিয়া,
'চলো দুজনে মিলিয়া
ছাদে বসি গিয়া ভাই
করি খেলা—
পা দুটি মোর টনটন করে
নাও মোরে তুলে কোলে
প্রাচীন এ-গৃহ যাক না—
ভাঙিয়া-চুরিয়া।
আমাদের নৃত্যের তালে তালে।'

অবাক রহিম কহেন তাহারে,
'তাজ্জব করিলে মোরে
একি বিপদের কথা কহ ভাই,
দেখি ফ্যাসাদ ডাকিয়া দিলে।'

কহে রামলালা,
'গোঁসা করিও না ভাই
সময় থাকিতে দাওয়াই কি মোরে দিলে?
পা দুটি মোর টনটন করে,
নাও মোরে কোলে তুলে।'
বিষন্ন রহিম কহিল তাহারে, 'ভাই,
তোমায় তুলিতে
দেহেতে তাগদ নাই॥'

## স্বাগত নতুন শতাব্দী

### তাপস বসু

একটা শতাব্দী বিদায় নিল
নানা সুখ, উল্লাস, বেদনার সাথী হয়ে
ফাগুন-চৈত্রে আমের মুকুলের আঘ্রাণে
মুখ রেখে, সাল পিয়ালের ছায়ায়।
প্রাক্ বৈশাখের মাতাল হাওয়ায়

কত টইটম্বুর স্মৃতি চারিদিকে ছড়িয়ে
কত ধ্বংসলীলা, মানুষের মারণযজ্ঞ
কতশত রক্তের ধারা দু-দুটি বিশ্বযুদ্ধ
বিভেদের প্রাচীর তুলে সংকীর্ণতার আবদ্ধতা
অনাহার, মন্বন্তর, মহামারী আর দাঙ্গা।

এরই পাশে উল্লাসে, উচ্ছ্বাসে বুক ভরেছে গর্বে
এই শতাব্দী দেখেছে শ্রীশ্রীমা সারদাদেবীকে
শুনেছে স্বামী বিবেকানন্দের ওজস্বী ভাষণ
রবীন্দ্রনাথের গানের মূর্ছনা, নেতাজীর রণহুংকার
স্বাধীনতার রক্তিম উচ্ছ্বাস মেখেছে গায়ে।

স্বাগত নতুন শতাব্দী ১৪০০ বঙ্গাব্দ
সূর্যস্নাত প্রভাতের আলোয় ঢেকে যাক
মানুষের কপোল কপাল
শান্তির ধ্বজা উড়ুক আকাশে
ভেঙে যাক বিভেদের প্রাচীর
তমোনিশার সমস্ত বর্গক্ষেত্র
সহস্র আলোর দীপনে উদ্ভাসিত হোক
মানবিকতার জয় হোক
মানুষে মানুষে মিলন ঘটুক চৈতন্যের উদ্ভাসনে।

## আকাশ

### সুকুমার সূত্রধর

হে আকাশ, তুমি সাকার আবার নিরাকার,
তুমি সান্ত অথচ অনন্ত।
তুমি ঘটাকাশ আবার চিদাকাশ
তোমার বুকে কত রঙের মেঘ খেলা করে,
কিন্তু দাগ রেখে যায় না।
কত কি পরিবর্তন ঘটে তোমার কোলে
কিন্তু তুমি নির্বিকার।
তোমার রূপের দিকে তাকিয়ে
প্রেমিকের মন কোথায় উধাও হয়ে যায়।
যিনি ক্ষুদ্র, যিনি স্বার্থপর, যিনি মোহান্ধ
তিনি তোমার পানে তাকিয়ে
ছোট 'আমি'কে ফেলেন হারিয়ে।
আবার যিনি সাধক বা যোগী
তিনি তোমার অনন্ত সত্তার সঙ্গে
নিজেকে একীভূত করে ফেলেন্।
সেই যুগ যুগ ধরে তোমাকে দর্শন করছে
কোটি কোটি মানুষ
মহাপুরুষ থেকে কাপুরুষ,
কিন্তু তোমার কোন পরিবর্তন নেই,
তুমি সেই নিত্য, অনাদি, অনন্ত
হে আকাশ, যখন আমরা হতাশ হয়ে পড়ি,
যখন আমরা ঘাত-প্রতিঘাতে হেরে যাই,
তখন নিজেদের রক্ষার জন্য ভগবানের উদ্দেশে
তোমার দিকেই তাকাই।
হে আকাশ, তুমিই ঈশ্বর।

## ১৪০০ সাল

### শান্তিকুমার ঘোষ

খালি মাঠ ধান-কেটে-নেওয়া ঃ
একটি-দুটি শীষ কুড়িয়ে লক্ষ্মীলাভ
লোহিত-বর্ণ শতাব্দী-শেষে।
যে-প্রেরণা উন্মাদনার মতো ছিল যাত্রারম্ভে,
তার কি কিছু আছে বাকি।
সংঘর্ষ... আকাঙ্ক্ষা আর ক্ষমতার মধ্যে সংঘর্ষ
প্রায় নিঃশেষ করেছে আমাদের।
গেছে মিলিয়ে শূন্যতায়
রামধনুর মতো সম্পর্কগুলি।
বছর, কালের ঢেউ গড়িয়ে পড়ে
সিন্ধু-জলে, ঢেউয়ের পতনে।
প্রপাত ছাপিয়ে বন্যা ছাড়িয়ে
জাগে যে নবীন শতক ঃ
দিক-দেশ আলো করে দ্বিতীয় আবির্ভাব।

# কবিতায় শ্রীরামকৃষ্ণ

## শান্তি সিংহ

### চৈতন্যস্বরূপ

জ্বলন্ত আঁচের তেজে জল টগবগায়
ভাতের হাঁড়িতে আলু-বেগুন লাফায়।
সেই দৃশ্যে শিশুদল আনন্দিত মন—
আলু-বেগুনের শক্তি করে নিরীক্ষণ।
ইন্দ্রিয়াদি মদগর্বে ভাবে নিজরূপ
মিথ্যা দম্ভ দেখে হাসে চৈতন্যস্বরূপ।

**সূত্র ঃ** শ্যামপুকুরবাটীতে ভক্তসঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণ। শুক্রবার। আশ্বিনের কৃষ্ণপক্ষের সপ্তমী। ১৫ কার্তিক। ইংরেজী, ৩০ অক্টোবর, ১৮৮৫।

শ্রীরামকৃষ্ণ—তাঁকে চিন্তা করলে অচৈতন্য। যে চৈতন্যে জড় পর্যন্ত চেতন হয়েছে, হাত-পা-শরীর নড়ছে। বলে—শরীর নড়ছে, কিন্তু তিনি নড়ছেন জানে না। বলে—জলে হাত পুড়ে গেল। জলে কিছু পোড়ে না। জলের ভিতরে যে উত্তাপ, জলের ভিতর যে অগ্নি তাতেই হাত পুড়ে গেল।

"হাঁড়িতে ভাত ফুটছে। আলু-বেগুন লাফাচ্ছে। ছোট ছেলে বলে—আলু-বেগুনগুলো আপনি নাচছে। জানে না যে, নিচে আগুন আছে। মানুষ বলে, ইন্দ্রিয়েরা আপনা-আপনি কাজ করছে। ভিতরে যে সেই চৈতন্যস্বরূপ আছে, তা ভাবে না।"

[ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত, ৩।২১।৩ ]

# মার প্রতি

## ভক্তিময়ানন্দ*

আঃ, একদিন ঠিক 'মা, মা' বলে
কোথাও হারিয়ে যাব,
সব ছেড়েছুড়ে নেমে যাব পথে।

কি কাজ আমার জেনে
মার ক'টি হাত, কত আভরণ, গুণে,
কে সে সদাশিব মার সাথে চলে,
যদি পারি শুধু 'মা, মা' বলে
নেমে যেতে পথে, দিগন্তে হারাতে।

কারা তাড়া করে বেড়াবে আমায়,
কে জ্বালাবে আর
বলে 'এই তোর ঋণ-ভার'
অথবা 'মেটাও এসব দায়'?

কেননা তখন আমি 'মা, মা' বলে
সরোবর জলে ছায়া ফেলে
মেঘের আড়ালে উধাও।

একা একা ভেসে যাব পশ্চিম আকাশে
সরল হাওয়ার ধারা মুঠো করে ধরে।
কৈলাসচূড়ায়, মার কোল ঘেঁষে
দাঁড়াব নক্ষত্র-শিশুর মতো হেসে।

তুমি যবে দয়া করে টেনে নেবে কোলে,
হৃদয়-বাসনা পূর্ণ হবে,
তোমার কৃপায়, জননী আমার
তুমি আমি মিলে মিশে হব একাকার।

* স্যাক্রামেন্টো বেদান্ত সোসাইটির সঙ্গে যুক্ত স্বামী ভক্তিময়ানন্দের 'Toward the Mother' কবিতাটির বঙ্গানুবাদ করেছেন সুনির্মল বন্দ্যোপাধ্যায় ( সিয়াটল )।

প্রবন্ধ

# বেদান্তের আলোকে আচার্য শঙ্কর ও স্বামী বিবেকানন্দ

অমলেন্দু চক্রবর্তী

ভারতীয় অধ্যাত্মচেতনার মূলকেন্দ্রে অধিষ্ঠিত বেদান্তদর্শন সর্বযুগের সকল মানুষের নিকট একটি আলোকবর্তিকা। আচার্য শঙ্কর বেদান্তের অদ্বৈতবাদের সর্বপ্রসিদ্ধ প্রচারক। ভারতীয় অধ্যাত্মবাদের পরম সৌভাগ্য যে, ইতিহাসের এক মাহেন্দ্রক্ষণে তিনি আবির্ভূত হয়েছিলেন। ঐ বিশেষ সময়ে আচার্য শঙ্করের আবির্ভাব না হলে প্রবল বিকৃতদশাপ্রাপ্ত বৌদ্ধধর্মের চাপে হিন্দুধর্ম লোপ পেত অথবা কতিপয় অন্তঃসারশূন্য দার্শনিক তত্ত্বে তা পর্যবসিত হতো। যে অমানুষিক পরিশ্রম ও অধ্যবসায়ের মাধ্যমে আচার্য শঙ্কর হিন্দুধর্মকে বিকৃত বৌদ্ধধর্মের করাল গ্রাস থেকে উদ্ধার করার চেষ্টা করেছিলেন তা আজকের বা একবিংশ শতকের মানুষের নিকট অবিশ্বাস্য বলে মনে হবে। আচার্য শঙ্করের অলোকসামান্য প্রতিভা, গভীর তত্ত্বজ্ঞান, অসাধারণ চরিত্রবল ও লোককল্যাণচিকীর্ষার বহু নিদর্শন কালের অমোঘ প্রবাহকে ব্যাহত করে ভারতের আকাশে উজ্জ্বল জ্যোতিষ্কের মতো বিরাজ করছে।

আচার্য শঙ্কর প্রবর্তিত অদ্বৈত বেদান্তের প্রভাব ভারতের সর্বত্র পরিব্যাপ্ত। কিন্তু আমাদের অনেকেরই জানা নেই, বৌদ্ধপ্লাবনের পর হিন্দু-ধর্মকে সনাতন বৈদিক আদর্শে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করার জন্য ঐ তরুণ সন্ন্যাসীকে কি কঠোর সাধনা ও পরিশ্রম করতে হয়েছিল। সম্পূর্ণ পদব্রজে আসমুদ্রহিমাচলের পূর্ব থেকে পশ্চিমে, উত্তর থেকে দক্ষিণে ভ্রমণ করে বৈদিক ধর্মকে সকল প্রকার আবিলতামুক্ত করে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন তিনি। অতন্দ্র প্রহরীর মতো তিনি বৈদিক ধর্মের দ্বারা ভারতের চতুঃসীমা রক্ষা করে বৈদিক ধর্মের বিজয়-বৈজয়ন্তী উড্ডীন করেছিলেন। এক অর্থে দিগ্বিজয়ী সেনাপতির রাষ্ট্র-প্রতিরক্ষানীতির সঙ্গে শঙ্করের এই বিজয়-অভিযাননীতি তুলনীয়। আচার্য শঙ্কর ভারতের চারপ্রান্তে যে চারটি মঠ স্থাপন করেছিলেন—বিদ্বজ্জনদের মতে ঐ চারটি মঠ হলো শঙ্কর প্রবর্তিত চারটি ধর্মদুর্গ।

আচার্য শঙ্করের মতে অদ্বৈতানুভূতি ধর্ম-জীবনের প্রথম ও শেষ কথা। কিন্তু ঐ অনুভূতি-লোকে প্রতিষ্ঠিত হতে যে সোপানরাজি অতিক্রম করতে হয়, সেগুলিকে শঙ্কর আদৌ উপেক্ষা করেননি। তাই আমরা আচার্য শঙ্করকে দেখি উপাসনা, ভক্তি ও পূজার্চনার উৎসাহী প্রবর্তক-রূপেও। শঙ্করের দুর্লভ পরাভক্তি ও অসাধারণ হৃদয় তাঁর সমগ্র আধ্যাত্মিক জীবন ও রচনাবলীকে সরস করেছে এবং সমগ্র হিন্দুধর্ম তাঁর জীবনাদর্শে অভিনবরূপে ভাস্বর হয়ে উঠেছে। সনাতন হিন্দুধর্মের তিনি যে-রূপ দিয়েছেন, তা কালপ্রভাবে ম্লান হতে পারে; কিন্তু নষ্ট হয়নি। সমগ্র হিন্দু-জাতি ঐ বত্রিশ বছর বয়স্ক আচার্যের নিকট সর্বকালের জন্য ঋণী। আচার্য শঙ্কর ভারতীয় ধর্মজীবনের এক নবদিগন্তের সূচনা করেছিলেন। মৃতপ্রায় ভারতীয় জীবনে এনেছিলেন এক বৈপ্লবিক যুগান্তর।

আচার্য গৌড়পাদ প্রাচীনতর অদ্বৈতাচার্য হলেও ভারতে আচার্য শঙ্করই অদ্বৈত বেদান্তের প্রাণ-প্রতিষ্ঠা করে গিয়েছেন। অদ্বৈত বেদান্তের চিন্তা-রাজ্যে শঙ্কর নিঃসন্দেহে অবিসংবাদী সম্রাট। শঙ্করের ভাষ্যরচনার পর অদ্বৈত চিন্তাপ্রবাহ বিশ্ব-মানবের হৃদয়-রাজ্য প্লাবিত করে সহস্রধারায় প্রবাহিত হয়েছে। সুতরাং আচার্য শঙ্করই বেদান্ত ভাবধারার যথার্থ ভগীরথ।

আচার্য শঙ্কর অদ্বৈত বেদান্তের সিদ্ধান্তকে পরিপূর্ণ রূপদান করবার জন্য ব্রহ্মসূত্রভাষ্য, ঈশ,

কেন, কঠ, প্রশ্ন, মুণ্ডক, মাণ্ডুক্য, ঐতরেয়, তৈত্তিরীয়, শ্বেতাশ্বতর, ছান্দোগ্য ও বৃহদারণ্যক—এই এগারটি উপনিষদের ভাষ্য, শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা-ভাষ্য, বিষ্ণুসহস্রনাম-ভাষ্য, ব্রহ্মসূত্র-ভাষ্য প্রভৃতি ভাষ্য-গ্রন্থ রচনা করেন। আচার্য শঙ্কর রচিত এই গ্রন্থমালাকে অবলম্বন করে পরবর্তী কালে অসংখ্য গ্রন্থ রচিত হয়েছে। তবে এঁদের মধ্যে পদ্মপাদাচার্য, সর্বজ্ঞাত্মমুনি, সুরেশ্বরাচার্য, বাচস্পতিমিশ্র প্রভৃতি দার্শনিকরাই কেবল আচার্য শঙ্করের টীকাকার হিসাবে প্রসিদ্ধি লাভ করেছেন। আচার্য শঙ্কর ও তাঁহার অনুগামী এই সকল পণ্ডিতপ্রবরগণ মৌলিক চিন্তার সমাবেশের মাধ্যমে অদ্বৈত-চিন্তায় যুগান্তর আনতে সাহায্য করেছেন।

আত্ম-মীমাংসা বা ব্রহ্ম-মীমাংসাই শঙ্কর-দর্শনের প্রাণ। আত্মার অস্তিত্ব স্বতঃসিদ্ধ, তার অস্তিত্ব সম্বন্ধে কারও কোন বিবাদ নেই। আত্মাই ব্রহ্ম, সুতরাং ব্রহ্মের অস্তিত্বও সর্ববাদিসিদ্ধ। এই স্বতঃসিদ্ধ আত্মা বা ব্রহ্মই একমাত্র সত্য, তদ্ব্যতীত সমস্তই অসত্য। আত্মাকে 'আমি' বা অহংরূপে সকলেই প্রত্যক্ষ করে থাকে। আত্মার সম্বন্ধে আমাদের প্রত্যক্ষজ্ঞান আছে বলেই, আমি আছি কিনা, কিংবা আমি নেই—কোন স্থিতধী ব্যক্তিরই আত্মার সম্বন্ধে এইরূপ সন্দেহ বা ভ্রান্তবুদ্ধির উদয় হতে দেখা যায় না। কারণ, যে-ব্যক্তি প্রশ্ন করে, সে-ই আত্মা, আত্মা না থাকলে প্রশ্ন করে কে? আত্মা সচ্চিদানন্দস্বরূপ—এই আত্মজ্ঞানই প্রকৃত জ্ঞান, তদ্ভিন্ন সমস্তই অজ্ঞান। এটিই শঙ্কর তথা অদ্বৈত বেদান্তের মর্মকথা। আত্মজিজ্ঞাসা বা ব্রহ্ম-জিজ্ঞাসাই সকল জিজ্ঞাসার সার। এইজন্যই বেদান্তদর্শন (ব্রহ্মসূত্র) আরম্ভ হয়েছে "অথাতো ব্রহ্মজিজ্ঞাসা"—এই সূত্রের মাধ্যমে।

শঙ্করের দর্শনে নির্বিশেষ ব্রহ্মই পরতত্ত্ব। এই তত্ত্বটি অদ্বিতীয় তত্ত্ব বলে তা ভাষা বা বুদ্ধির বিষয় হতে পারে না। তাই তৈত্তিরীয় উপনিষদে বলা হয়েছে: "যতো বাচো নিবর্তন্তে। অপ্রাপ্য মনসা সহ।"[১] এতদ্সত্ত্বেও যদি পরতত্ত্বকে ভাষা ও বুদ্ধির বোধ্য করতে হয়, তবে বলতে হয় সেই পরতত্ত্ব ব্রহ্ম সচ্চিদানন্দস্বরূপ। তাই 'বাক্যসুধা' গ্রন্থে আচার্য শঙ্কর বলেছেন:

"অস্তি ভাতি প্রিয়ং রূপং নাম চেত্যংশ পঞ্চকম্।
আদ্যং ত্রয়ং ব্রহ্মরূপং জগদ্রূপং ততো দ্বয়ম্॥"[২]

অর্থাৎ লোকব্যবহারের বিষয়সকল পদার্থের পাঁচটি অংশে বিদ্যমান—অস্তি (সত্তা), ভাতি (প্রকাশ), প্রিয় (আনন্দ), নাম ও রূপ। এদের মধ্যে প্রথম তিনটি ব্রহ্মের রূপ (স্বরূপ); অপর দুটি জগতের রূপ। আত্মা বিষয়ে আচার্য শঙ্কর বলেছেন: স্থূল, সূক্ষ্ম ও কারণ-শরীর থেকে অতিরিক্ত পঞ্চ কোষের অতীত, জাগ্রৎ-স্বপ্ন সুষুপ্তি—এই তিনটি অবস্থার সাক্ষী যে সচ্চিদানন্দস্বরূপ—তা-ই আত্মা। স্বামী বিবেকানন্দও আত্মা প্রসঙ্গে বলেছেন: "প্রত্যেক মানুষেরই তিনটি অংশ আছে—দেহ, অন্তঃকরণ বা মন এবং মনের অন্তরালে আত্মা। দেহ আত্মার বাহিরের এবং মন আত্মার ভিতরের আবরণ।"[৩] —এখানে 'আবরণ' শব্দটির দ্বারা স্বামীজী কোষের কথাই বলেছেন। আবার এই সচ্চিদানন্দরূপ লক্ষণও যে চরম লক্ষণ নয়, তা-ও স্বামী বিবেকানন্দ বলতে ভোলেননি। সংক্ষেপে বলা যায় যে, পরতত্ত্ব ব্রহ্ম সম্পর্কে স্বামী বিবেকানন্দ যাকিছু বলেছেন সবই শঙ্করানুগত ভাবেই বলেছেন।

স্বামী বিবেকানন্দ অবশ্য অধিকারিভেদে, রুচিভেদে ও ঐতিহাসিক প্রয়োজনে অদ্বৈতবাদের সোপানরূপে দ্বৈতবাদ, বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ প্রভৃতির উপযোগিতা স্বীকার করেছেন। তথাপি শঙ্কর-প্রবর্তিত অদ্বৈতবাদই যে চরম সিদ্ধান্ত, সেবিষয়ে তিনি নিঃসন্দিগ্ধ। তাই স্বামী বিবেকানন্দ এক স্থানে বলেছেন: "তাঁহারা (বিশিষ্টাদ্বৈতবাদীরা) বলেন, বিশ্বে তিনটি সত্তা আছে—ঈশ্বর, জীব ও প্রকৃতি। প্রকৃতি ও জীব যেন ঈশ্বরের দেহ; এই অর্থেই বলা চলে যে, ঈশ্বর ও সমগ্র বিশ্ব এক। অদ্বৈত বেদান্তীরা অবশ্য জীব ও আত্মা সম্বন্ধে এই মতবাদ সমর্থন করেন না। তাঁহাদের মতে সমগ্র বিশ্ব ব্রহ্ম হইতে বিকশিত বলিয়া প্রতীত হন মাত্র। অদ্বৈতবাদের ভাষায় বলিতে গেলে এই আত্মাই

১ তৈত্তিরীয় উপনিষদ্, ২।৯

২ বাক্যসুধা, ২০

৩ স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা, ২য় খণ্ড, ৫ম সং, পৃঃ ৩০৯

ব্রহ্ম, কেবল নাম-রূপ-উপাধিবশতঃ 'বহু' প্রতীত হইতেছে।"

ভারতীয় দর্শন ও শাস্ত্রে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ পাশ্চাত্যবাসীদের বোঝাবার জন্য স্বামীজী অনেক কথা সহজ ও সরল করে বললেও তাঁর সুচিন্তিত অভিমত যে শংকরের অনুগামী, এবিষয়ে আমাদের কোন সংশয়ই নেই। নির্বিশেষ, নির্গুণ সচ্চিদানন্দ ব্রহ্মতত্ত্ব আলোচনার পর শঙ্কর ও বিবেকানন্দ যে-তত্ত্বটি বারংবার উল্লেখ ও আলোচনা করেছেন, সেটি হলো ঈশ্বরতত্ত্ব। এই ঈশ্বরতত্ত্ব আলোচনা করতে গেলেই মায়ার কথা প্রাসঙ্গিক হয়ে পড়ে; কেননা এই মায়া-উপাধিযোগেই শুদ্ধ ব্রহ্ম ঈশ্বর হয়ে অধিষ্ঠান করছেন জীব ও জগতের হৃদয়পদ্মে। শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ্ বলছেন: "মায়াং তু প্রকৃতিং বিদ্যান্মায়িনন্তু মহেশ্বরম্।"[৪] আচার্য শঙ্করও ব্রহ্মসূত্রভাষ্যে জগৎকারণ—জগতের উপাদানকারণ ও নিমিত্তকারণ (কর্তা) ঈশ্বরের কথাই সর্বত্র উল্লেখ করেছেন। 'বাক্যসুধা'য় শঙ্কর বলেছেন: "বিক্ষেপ ও আবৃতিরূপিণী মায়া ব্রহ্মে অবস্থিতা হয়ে ব্রহ্মের অখণ্ডতা (পূর্ণতা) আবৃত করে তাতে জগৎ ও জীবের কল্পনা করে থাকে।"[৫]

বিবেকানন্দও ঈশ্বর প্রসঙ্গে বলেছেন: "এই সগুণ ঈশ্বর মায়ার মাধ্যমে দৃষ্ট সেই নির্গুণ ব্রহ্ম ব্যতীত আর কিছু নন। মায়া বা প্রকৃতির অধীন হলে সেই নির্গুণ ব্রহ্মকে 'জীবাত্মা' বলে এবং মায়াধীশ বা প্রকৃতির নিয়ন্তারূপে সেই নির্গুণ ব্রহ্মই 'ঈশ্বর' বা সগুণ ব্রহ্ম।"[৬] তিনি আবার বলেছেন: "আমাদের অস্তিত্ব যতটুকু সত্য, সগুণ ঈশ্বরও ততটুকু সত্য, তদপেক্ষা অধিক সত্য নয়। যতদিন আমরা মানুষ রহিয়াছি, ততদিন আমাদের ঈশ্বরের প্রয়োজন; আমরা যখন নিজেরা ব্রহ্মস্বরূপ হইব, তখন আর আমাদের ঈশ্বরের প্রয়োজন থাকিবে না।"[৭] আমাদের সর্বদাই মনে রাখা আবশ্যক, ভক্তের উপাস্য সগুণ ঈশ্বর ব্রহ্ম থেকে পৃথক নন। সবই সেই একমেবাদ্বিতীয়ম্ ব্রহ্ম। তবে ব্রহ্মের এই নির্গুণ স্বরূপ অতিসূক্ষ্ম বলে প্রেম বা উপাসনার সহজসাধ্য নয়। এই কারণেই ভক্ত ব্রহ্মের সগুণভাব অর্থাৎ পরম নিয়ন্তা ঈশ্বরকেই উপাস্যরূপে স্থির করেন। তবে অদ্বৈতবাদীরা তাঁর প্রতি 'সৎ-চিৎ-আনন্দ' ব্যতীত অন্য কোন বিশেষণ প্রয়োগ করতে প্রস্তুত নন।

ব্রহ্মসূত্র-ভাষ্যে আচার্য শংকরের ঈশ্বর প্রসঙ্গে বক্তব্য এই যে, "ঈশ্বরের সর্বজ্ঞত্ব ও সর্বশক্তিমত্তা—এসবই অবিদ্যাত্মক উপাধির পরিচ্ছেদ; বিদ্যার দ্বারা সকল উপাধির ধর্ম দূরীভূত হলে সেই অদ্বিতীয় আত্মাতে ঈশিতৃ (প্রভু) ঈশিতব্য (অধীন) প্রভৃতি ব্যবহার থাকে না।"[৮] পরমার্থস্বরূপে সকল ব্যবহারের অভাবই বেদান্ত ঘোষণা করে।

অদ্বৈতবেদান্তই যে সকল নীতিধর্মের মূল—এই সত্যটি বিবেকানন্দ দেশে ও বিদেশে সগর্বে ঘোষণা করেছেন। সকলের মধ্যে এক আত্মার বা আমার আত্মার অস্তিত্বই সকল নীতিধর্মের মূলভিত্তি—এ তত্ত্বের বীজ উপনিষদ্ ও ভগবদ্গীতায় থাকলেও এত দৃঢ়ভাবে স্বামী বিবেকানন্দের পূর্বে আর কেউ ঘোষণা করেনি। বিবেকানন্দ বলেছেন: "এই অদ্বৈততত্ত্ব হইতেই আমরা নীতির মূলভিত্তির সন্ধান পাই; আমি স্পর্ধার সঙ্গে বলিতে পারি, আর কোন মত হইতে আমরা কোনরূপ নীতিতত্ত্ব পাই না।"[৯] বিশ্বের সকল ধর্মেই অবশ্য নীতিধর্মের শাস্ত্রীয় আদেশ আছে, কিন্তু তা সর্বজনীন নয়, কেননা অন্যান্য ধর্মাবলম্বীরা সেই আদেশের বা সেই শাস্ত্রের প্রামাণ্য মানে না। অপরদিকে পাশ্চাত্য নীতিদর্শনেও নীতিধর্মের ভিত্তি ও লক্ষণ নিরূপণের বহু চেষ্টা সত্ত্বেও সর্ববাদিসম্মত কোন ভিত্তি অদ্যাবধি নির্ণীত হয়নি। কিন্তু বেদান্তের অদ্বৈততত্ত্ব নীতিধর্মের সর্বজনীন যৌক্তিক ভিত্তি রচনা করতে সমর্থ হয়েছে। এই প্রসঙ্গে বিবেকানন্দ যথার্থই বলেছেন: "অনাদি অনন্ত আত্মতত্ত্ব ব্যতীত নীতিবিজ্ঞানের সনাতন ভিত্তি আর কি হইতে পারে? আমার অনন্ত (অখণ্ড) একত্বই সর্বপ্রকার নীতির মূলভিত্তি; প্রকৃতপক্ষে তুমি আমি এক—ভারতীয় দর্শনের ইহাই সিদ্ধান্ত।

৪ শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ্, ৪।১০
৫ বাক্যসুধা, ৩৫
৬ বাণী ও রচনা, ২য় খণ্ড, পৃঃ ৪৫৩
৭ বিবেকানন্দের বাণী সঞ্চয়ন, ৩য় সং, ১৩৯২, পৃঃ ১১৪-১১৫
৮ ব্রহ্মসূত্র—শাংকরভাষ্য, ২।১।১৪
৯ বাণী ও রচনা, ২য় খণ্ড, পৃঃ ২৬৬

সর্বপ্রকার নীতি ও ধর্মবিজ্ঞানের মূলভিত্তি এই একত্ব।"[১০] নীতিশাস্ত্রের এই ঘোষণাটি বিবেকানন্দের একটি বেদান্তভিত্তিক মৌলিক চিন্তা—একথা নিঃসন্দেহে বলা যেতে পারে।

শঙ্করও ঈশ-উপনিষদের ভাষ্যে বলেছেন: "সেই সমুদয় প্রাণীরও আত্মা-রূপে নিজের আত্মাকে··· সকল জীবে নির্বিশেষ আত্মাকে যিনি দর্শন করেন—সেই দর্শনের ফলেই তিনি কাকেও ঘৃণা করেন না।··· সকল ঘৃণা আত্মা থেকে অন্য দুষ্ট পদার্থ দর্শনকারীরই হয়ে থাকে; সর্বত্র নিরন্তরভাবে অত্যন্ত বিশুদ্ধ আত্মার দর্শনকারীর ঘৃণার নিমিত্ত (কারণ) কোন অন্য পদার্থই নেই।"[১১] বিশেষভাবে লক্ষণীয় যে, আচার্য শঙ্করের ব্যাখ্যা সর্বত্রই তত্ত্বাভিমুখী। অপরদিকে বিবেকানন্দের ব্যাখ্যাসমূহ তত্ত্বাভিমুখী হওয়া সত্বেও মূলতঃ মানবাভিমুখী ও সমাজাভিমুখী। কারণ, বিবেকানন্দ বেদান্তের তত্ত্বকে কেবলমাত্র মুমুক্ষু ব্যক্তির মুক্তির জন্য প্রয়োগ করতে চাননি, মানবসমাজের সর্বাত্মক কল্যাণের জন্য প্রয়োগ করতে চেয়েছেন। এজন্যই স্বামীজীর মূলমন্ত্র হলো: "আত্মনো মোক্ষার্থং জগদ্ধিতায় চ।" এখানে শঙ্করের বেদান্ত থেকে বিবেকানন্দের বেদান্তের একটু উদ্দেশ্যগত পার্থক্য লক্ষণীয় বলে মনে হয়। তবে শঙ্কর যে কেবলমাত্র মুমুক্ষু ব্যক্তির মুক্তির জন্যই বেদান্ত অবলম্বন ও বেদান্ত প্রচার করেছিলেন তা নয়। তিনিও বৈদিক ধর্মের ভিত্তিতে সমাজগঠন, বৈদিক ধর্ম থেকে ভ্রষ্ট উচ্চবর্ণগুলিকে স্বধর্মে আনয়ন এবং লোকহিতকর বহু সামাজিক উদ্দেশ্য সাধন করেছিলেন। বিবেকানন্দ বহু জায়গায় আচার্য শঙ্করের প্রতি এই ভূমিকার কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করেছেন।

বেদান্তের ব্যাখ্যায় বিবেকানন্দ তাঁর শ্রোতাদের উপযোগী করার জন্য বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা ও বৈজ্ঞানিক দৃষ্টান্ত দেবার চেষ্টা করলেও সিদ্ধান্তে তিনি সত্যই শঙ্করের অনুগামী। "একমাত্র শঙ্করই বেদের ধ্বনিটি ঠিক ঠিক ধরতে পেরেছিলেন।"[১২] —একথাটি নিঃসন্দেহে শঙ্করের প্রতি তাঁর গভীর শ্রদ্ধা ও আনুগত্য প্রমাণ করে। তাঁর বহু ভাষণে স্বামী বিবেকানন্দ আচার্য শঙ্করের উদ্ধৃতি প্রদান করেছেন। বলেছেন: "বেদান্তদর্শনের সর্বশ্রেষ্ঠ শিক্ষাদাতা শঙ্করাচার্য।"[১৩] বলেছেন: "শঙ্করের দার্শনিক প্রতিভা বর্তমান জগতেরও বিস্ময়।"[১৪] বিবেকানন্দের এই সমস্ত উক্তি শঙ্করের প্রতি তাঁর গভীর শ্রদ্ধার প্রমাণ। বিবেকানন্দ অল্পবিস্তর ভারতের সকল দার্শনিক মতবাদ নিয়েই আলোচনা করেছেন, কিন্তু তাঁর চরম সিদ্ধান্ত যে, শঙ্কর-বেদান্তই সকল মতবাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ও সর্বাধিক যুক্তিপূর্ণ। বিবেকানন্দ-প্রদত্ত ব্যাখ্যা বিজ্ঞানভিত্তিক এবং যুক্তিবাদভিত্তিক হলেও মূলতঃ যে তা শঙ্করানুগামী সেকথা আগেই উল্লেখ করা হয়েছে। বিবেকানন্দ মনে-প্রাণে বিশ্বাস করতেন, শুধুমাত্র তাত্ত্বিক জ্ঞানলাভের মাধ্যমে মানবসমাজের উন্নয়নসাধন সম্ভব নয়। তিনি মর্মে মর্মে উপলব্ধি করেছিলেন—ভারতের উন্নতি নির্ভর করে দরিদ্র অবহেলিত গণমানুষের উন্নয়নেচ্ছার ওপর। কারণ, এরা ধর্মজ্ঞানহীন ও শাস্ত্রজ্ঞানহীন থাকার ফলেই ভারতের ভাগ্যে পরাধীনতা এসেছে এবং ধর্মান্ধতা প্রসারিত হওয়ার সুযোগ লাভ করেছে। তাই বেদান্তী বিবেকানন্দের উপলব্ধি হলো: "আত্মনো মোক্ষার্থং জগদ্ধিতায় চ।" গীতাতেও আমরা পাই: "সকল প্রাণীর হিতসাধনে রত থেকে সংযতাত্মা ঋষিগণ পাপরহিত ও নিঃসংশয় হয়ে ব্রহ্মনির্বাণ লাভ করেন।"[১৫]

আচার্য শঙ্করের 'বিবেকচূড়ামণি' গ্রন্থটি স্বামীজীর অত্যন্ত প্রিয় ছিল। তিনি তাঁর বহু ভাষণেই উক্ত গ্রন্থ থেকে উদ্ধৃতি দিয়েছেন। এক জায়গায় তিনি বলেছেন: "আমরা জানি···হৃদয়েরই প্রয়োজন বেশি। হৃদয়ের দ্বারাই ভগবৎ-সাক্ষাৎকার

১০ বাণী ও রচনা, ৫ম খণ্ড, পৃঃ ৭৭-৭৮
১১ ঈশ উপনিষদ্—শাঙ্করভাষ্য, ৬
১২ বাণী ও রচনা, ১ম খণ্ড, পৃঃ ২৮৯
১৩ ঐ, ২য় খণ্ড, পৃঃ ৪০৫
১৪ ঐ, ৫ম খণ্ড, পৃঃ ১৫৯
১৫ গীতা, ৫।২৫

হয়।"[১৬] হৃদয়ের অনুভবশক্তিকেই দেবত্বে রূপান্তরিত করতে হবে। নিছক বুদ্ধি-প্রদর্শন বা শব্দ-যোজনার কৌশলের মাধ্যমে শাস্ত্রব্যাখ্যা সম্ভব হতে পারে, মুক্তির জন্য এই পন্থা মোটেই উপযোগী নয়। জগতের সকল মহাপুরুষই এই অনুভবের ওপর বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করেছেন। ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্যে আচার্য শঙ্কর বলেছেন: "অবগতি-পর্যন্তং জ্ঞানং মনবাচ্যয়ো ইচ্ছায়াঃ কর্ম।—ব্রহ্মা-বগতির্হি পুরুষার্থঃ।"[১৭] আচার্য শঙ্কর হৃদয় বা ভাবভক্তির কথা আলাদা করে না বললেও মোক্ষের উপায়সকলের মধ্যে ভক্তি যে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ তা বারংবার বলেছেন। ব্রহ্মজিজ্ঞাসা বা বিবিদিষা নিছক কৌতূহল নয়, ব্রহ্মত্মাকে জানবার তীব্র আকাঙ্ক্ষা—তীব্র অনুরাগ। ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্যে শঙ্কর বলেছেন, ভক্তিপূর্বক উপাসনা ও ধ্যানের দ্বারাও ব্রহ্ম-সাক্ষাৎকার সম্ভব।

শঙ্কর ও বিবেকানন্দের বেদান্ত-ব্যাখ্যা পাশা-পাশি আলোচনা করলে আমরা দেখতে পাই যে, বেদান্তের যা মূলকথা সেসবই বিবেকানন্দ মেনেছেন। বিবেকানন্দ যথার্থই বলেছেন: "বেদান্তদর্শনের সর্বশ্রেষ্ঠ শিক্ষাদাতা শঙ্করাচার্য। তিনি অকাট্য যুক্তিসহকারে বেদের সারসত্যগুলি সংগ্রহ করিয়া অপূর্ব জ্ঞানশাস্ত্র রচনা করিয়াছেন। যাহা তাঁহার ভাষ্যের মাধ্যমে শিক্ষণীয়।"[১৮]

তবে এটাও ঠিক যে, তত্ত্বাংশে বিবেকানন্দের বেদান্ত শঙ্করানুগামী হলেও সামাজিক ব্যাপারে বিবেকানন্দ শঙ্কর থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন মত পোষণ করতেন। শাস্ত্রীয় বর্ণাশ্রম সমর্থন করে শঙ্কর জন্মগত জাতিভেদকে সমর্থন করতেন। বিবেকা-নন্দ জন্মগত জাতিভেদের সর্বদাই বিরোধিতা করেছেন। অবশ্য বিবেকানন্দের আবির্ভাব ঘটে শঙ্কর থেকে প্রায় এগারশো বছর পরে। কাজেই দুই আচার্য-পুরুষের মধ্যে এজাতীয় মতপার্থক্য অস্বাভাবিক নয়। বস্টনে প্রদত্ত 'টোয়েন্টিয়েথ সেঞ্চুরী ক্লাবে' প্রদত্ত ভাষণে বিবেকানন্দ বলেছেন: "মানুষ যখন তাহার বিকাশের উচ্চতম স্তরে উপনীত হয়, তখন নরনারীর ভেদ, লিঙ্গভেদ, মতভেদ, বর্ণভেদ, জাতিভেদ প্রভৃতি কোন ভেদ তাহার নিকট প্রতিভাত হয় না, যখন সে এই সকল ভেদবৈষম্যের ঊর্ধ্বে উঠিয়া সর্বমানবের মিলনভূমি মহামানবতা বা একমাত্র ব্রহ্মসত্তার সাক্ষাৎকার লাভ করে, কেবল তখনই সে বিশ্বভ্রাতৃত্বে প্রতিষ্ঠিত হয়। একমাত্র ঐরূপ ব্যক্তিকেই প্রকৃত বৈদান্তিক বলা যাইতে পারে।"[১৯]

আজ ভারতবাসী এক চরম সংকটের সম্মুখীন হয়েছে। আমাদের সমাজজীবনে ও রাষ্ট্রীয়-জীবনে এক বিরাট শূন্যতা দেখা দিয়েছে। আজ আমরা শুনতে পাই চারিদিকে ক্ষমতার অধিকারীদের প্রচণ্ড হুংকার, প্রবঞ্চিতের দীর্ঘশ্বাস, ও ক্ষুধিতের আর্তনাদ। বিচ্ছিন্নতাবোধ ও নৈতিক অবক্ষয় আজ আমাদের জাতীয় জীবনে অভিশাপ-রূপে দেখা দিয়েছে। তাই এই সংকটের মুহূর্তে আমাদের একান্ত প্রয়োজন এমন বাণী, এমন আদর্শ যা আমাদের আলোকের সন্ধান দিতে পারবে। স্বামী বিবেকানন্দের শিক্ষা এবং বেদান্তের বাণীই, যে-বেদান্তের দুন্দুভিনাদ আজ থেকে বারোশো বছর আগে আচার্য শঙ্কর তুলেছিলেন, সম্পূর্ণ মনুষ্যত্বের প্রকৃত উদ্বোধন করার সামর্থ্য রাখে। আজ মানুষের নানা ঐশ্বর্য, নানা বৈভব সত্ত্বেও তার দুঃখ-সন্তাপের শেষ নেই। কেননা নতুন নতুন মোহ ও ভ্রান্তি তার জ্ঞান-বুদ্ধিকে আচ্ছন্ন করছে। তাহলে পরিত্রাণ কোথায়? পরিত্রাণ শুধু মানুষের আত্ম-আবিষ্কারে। তাই আচার্য শঙ্করকে আজ আমাদের নতুন করে স্মরণ করতে হবে। স্মরণ করতে হবে স্বামী বিবেকানন্দকে। কারণ, আত্ম-আবিষ্কারের উপায় ও যথার্থ প্রেরণা পাওয়া সম্ভব আচার্য শঙ্কর এবং স্বামী বিবেকানন্দ প্রদর্শিত পথ ও আদর্শ থেকেই। □

১৬ "হৃদয়েন হি সত্যং জানাতি"—বিবেকচূড়ামণি, ৬০

১৭ ব্রহ্মসূত্র—শাংকরভাষ্য, ১।১।১

১৮ বাণী ও রচনা, ২য় খণ্ড, পৃঃ ৪০৫

১৯ ঐ, ৩য় খণ্ড, পৃঃ ৩২৮

নিবন্ধ

# শ্রীশ্রীমা সারদামণি

## প্রাণতোষ বিশ্বাস

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের সাধনকালের প্রথম চারবছর শেষ হয়েছে। মা ভবতারিণী তাঁকে দর্শন দিয়েছেন। তাঁর সাধনা, বর্তমান মানসিক অবস্থা ও নানা প্রকার দিব্যোন্মত্ততা সাধারণের বোধগম্য নয়—একারণে সাধারণ মানুষ শ্রীরামকৃষ্ণ 'পাগল' হয়ে গেছেন মনে করতে শুরু করেছেন। সুদূরে কামারপুকুরে তাঁর মা চন্দ্রমণির কাছেও এই খবর পেঁাছে গেছে। তখন তাঁর বড়দাদা রামকুমার প্রয়াত। সংসারে নানা দুঃখের মধ্যে ঠাকুর উপদেবতাবিষ্ট হয়েছেন—দরিদ্র কুটিরে এ এক নতুন দুঃখজনক সংবাদ। মা চন্দ্রমণি অস্থির হয়ে পড়েছেন, ব্যাকুল হয়েছেন কিসে তাঁর ছেলে গদাধর সুস্থ ও স্বাভাবিক হয়ে ওঠেন।

চন্দ্রমণি দক্ষিণেশ্বর থেকে গদাধরকে আনিয়ে গ্রামে 'চণ্ড' নামানো ও পরে শিবের নিকট হত্যা দেওয়া, গ্রাম্যচিকিৎসা প্রভৃতি সমাপনান্তে তাঁর বিবাহ দেওয়া সাব্যস্ত করলেন। চন্দ্রমণি ও তাঁর মেজছেলে রামেশ্বর গদাধরের জন্য পাত্রী খোঁজ করতে এদিকে-ওদিকে লোক পাঠালেন। কিন্তু মনোমত পাত্রীর খোঁজ পাওয়া গেল না। শেষে স্বয়ং গদাধরই পাত্রীর সন্ধান দিলেন। বললেন, জয়রামবাটীতে শ্রীরামচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের বাড়িতে পাত্রী "কুটো বাঁধা" হয়ে আছেন।

কিছুদিনের মধ্যেই বিয়ের কথাবার্তা পাকা হয়ে বাঙলার ১২৬৬ সালের বৈশাখ মাসে বিবাহ সুসম্পন্ন হয়ে গেল। বিয়ের সময় রামকৃষ্ণদেবের বয়স চব্বিশ বছর ও শ্রীমা সারদার বয়স সবে পাঁচ বছর পেরিয়েছে। যে-সমস্যায় পড়ে চন্দ্রমণি গদাধরের বিয়ে দিলেন, তার সমাধানের জন্য যে অব্যর্থ উপায়ের কথা ভাবা হয়েছিল তা সম্পন্ন হলো। কারও মনে হলো না, পাঁচ বছরের একটি ছোট্ট মেয়ে, সে কিভাবে চব্বিশ বছরের স্বামীর দিব্য-উন্মাদনা প্রশমিত করবে। কেউই ভাবেনি, ভাবার অবকাশও ছিল না কারও। কারণ, ঐ ঘটনা ছিল দৈবনির্দিষ্ট—বিধির বিধান। তার পশ্চাতে নিহিত ছিল এবারের অবতারলীলার নিগূঢ় রহস্য। লীলাময় স্বয়ং নির্বাচন করলেন তাঁর লীলাসঙ্গিনীকে। অবশ্য তারও আগে সারদা যখন নিতান্তই শিশু, শিহড় গ্রামে এক যাত্রাগানের আসরে কোন আত্মীয়ার কোলে বসে তিনি এক রসিকা গ্রামবাসিনীর রঙ্গভরে জিজ্ঞাসিত প্রশ্নের উত্তরে দেখিয়ে দিয়েছিলেন গদাধরকে তাঁর ভাবী স্বামী হিসাবে। সুতরাং নির্বাচনের ব্যাপারে 'মা'-ই অগ্রগণ্যা। অবতার-পুরুষের 'শক্তি' কিনা। শক্তিই আগাম চিনেছেন শিবকে।

শ্রীরামকৃষ্ণের দিব্যদৃষ্টিতে শ্রীশ্রীমা সারদা যেরূপ উদ্ভাসিত, বিভাসিত হয়েছেন—ঠাকুর তার কিছু কিছু পরিচয় দিয়ে গেছেন। তা না হলে শ্রীমাকে কেউই জানতে পারত না যে, কে তিনি। মা স্বয়ং বৈকুণ্ঠের লক্ষ্মী, সাক্ষাৎ সরস্বতী এবং মন্দিরের মা ভবতারিণী। অসার সংসারে সার দিতে এসেছেন তিনি, তাই তার নাম 'সারদা'। এসব কথা কেউ জানতই না। রামকৃষ্ণদেব এসবই বলে গিয়েছেন; শুধু বলেই যাননি, তাঁর জীবনে, কর্মে, দর্শনে, মানসে তিনি প্রকট করেছেন। ষোড়শী পূজা করে মাতাঠাকুরানীর স্বরূপকে তিনি জগতের মাঝে উন্মোচিত করে দিয়ে গেছেন। যদিও তা করেছিলেন খুব গোপনে, লোকচক্ষুর অন্তরালে, কিন্তু সেই মহাঘটনার কথা জগতের কাছে অপ্রকাশ্য থাকেনি। তাঁর পার্ষদগণও মাকে বুঝেছিলেন এবং মায়ের মহিমা বলেও গিয়েছেন। তবুও কি মাতাঠাকুরানীকে সকলে বুঝতে পেরেছে? পারেনি। চণ্ডীতে আছে—সমস্ত জগৎকে তিনি মোহগ্রস্ত করেছেন—"সম্মোহিতং দেবি সমস্তমেতৎ।" ঠাকুরও বলেছেন: "ও (সারদাদেবী) রূপ ঢেকে এসেছে।"

স্বামী প্রেমানন্দ বলেছেন: "শ্রীশ্রীমাকে কে বুঝেছে, কে বুঝতে পারে? তোমরা সীতা, সাবিত্রী,

বিষ্ণুপ্রিয়া, শ্রীমতী রাধারানী এঁদের কথা শুনেছি। মা যে এঁদের চেয়ে কত উচুঁতে উঠে বসে আছেন। কিন্তু ঐশ্বর্যের লেশ নেই।" স্বামী শিবানন্দ বলেছেন: "তিনি (মা) যে কি ছিলেন তা একমাত্র ঠাকুরই জানতেন। আর স্বামীজী কতকটা বুঝেছিলেন।… মাকে আমরাই বা কতটুকু জেনেছি? তবে তিনি কৃপা করে এটুকু বুঝিয়ে দিয়েছেন যে, তিনি সাক্ষাৎ জগন্মাতা।"

স্বামী শিবানন্দকে লেখা স্বামীজীর এক চিঠিতে আমরা পাই: "দাদা, মায়ের কথা মনে পড়লে সময় সময় বলি, 'কো রামঃ'। দাদা, ঐ যে বলেছি ওইখানটায় আমার গোঁড়ামি।— রামকৃষ্ণ পরমহংস ঈশ্বর ছিলেন কি মানুষ ছিলেন, যা হয় বল দাদা কিন্তু যার মায়ের উপর ভক্তি নাই, তাকে ধিক্কার দিও।" স্বামী অদ্ভুতানন্দও বলেছেন: "মা-ঠাকরুণ যে কি তা একমাত্র স্বামীজীই বুঝেছিল। তিনি যে স্বয়ং লক্ষ্মী, তা আর কেউ বোঝেনি।… তাঁকে জানতে হলে তপস্যা করতে হয়। তবে তাঁর দয়া হয়। সেই দয়ায় মাকে বোঝা যায়।"

শ্রীমায়ের স্তবে আছে: "দোষানশেষান্ সগুণী করোষি"—মা, আমাদের যত দোষ আছে, তা তুমি গুণে পরিণত করে নাও। "স্নেহেন বধ্নাসি মনোঽস্মদীয়ং"—তোমার স্নেহের বাঁধনে আমাদের মনকে বেঁধে দাও।

আমজাদ ডাকাতকে মা নিজ হাতে বিশ্বমাতৃত্বের স্নেহের পীযূষধারায় অভিসিঞ্চিত করছেন। তার জীবনের আঁধার দূরে চলে গিয়েছে। তার জীবন আলোকময় হয়েছে। ঠিক এমনি ভাবেই এক গভীর নিশীথে তেলোভেলোর নির্জন নিভৃত প্রান্তরে একটি লীলা হয়েছিল। সেখানেও এক ডাকাত-সর্দারের তমসাচ্ছন্ন জীবনে মা আলোকের প্রদীপ জেলে দিয়েছিলেন। মায়ের মুখে 'বাবা' ডাক শুনে ডাকাত-সর্দারের মনে নেমে এসেছিল বাৎসল্যের রসোধারা। মমতাময়ী মা ডাকাতের বুদ্ধিকে প্রকৃষ্টরূপে চালনা করেছিলেন।

এভাবে অনেকে জীবনের পথ হারিয়ে দিগ্‌ভ্রান্ত পথভ্রান্ত হয়ে শ্রীশ্রীমায়ের চরণতলে এসে পেয়েছিলেন যথার্থ পথ। মূলে ছিল অপার করুণাময়ী জগজ্জননীর পালিনী শক্তি—তাঁর স্নেহের পুণ্য-পীযূষধারা। বাস্তবিকই তিনি ছিলেন—"মনসি বচসি কায়ে পুণ্য-পীযূষপূর্ণা।"

মায়ের কথা বলে শেষ করা যায় না। শেষ করার প্রয়োজনই বা কী? যা প্রয়োজন তা হলো মাকে ব্যাকুলভাবে ডাকা, প্রার্থনা করা, তাঁর কাছে কেঁদে কেঁদে মনের গভীরের সব কথা জানানো। তাহলেই হবে। বৃথা শুধু আলোচনার কি প্রয়োজন? মাতৃভাবের ধারায় মনকে সিক্ত করতে হবে।

"বৃথা শব্দং পরিত্যাজ্য বদ জিহ্বে নিরন্তরং
সারদে সারদে মাতঃ জয়ানন্দময়ীতি চ।"

—হে আমার রসনা, বৃথা বাক্যব্যয় না করে আনন্দময়ী মা সারদা নাম অবিরত জপ কর।

রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে কণ্ঠ মিলিয়ে শুধু যেন গাই—

"আর আমি যে কিছু চাহি নে,
চরণতলে বসে থাকিব।
আর আমি যে কিছু চাহি নে,
জননী বলে শুধু ডাকিব।" □

# রবীন্দ্রকাব্যে রাগ-রাগিণী

## ভূপেন্দ্রনাথ শীল

রবীন্দ্রনাথ তাঁর কাব্যে শব্দ-সন্নিবেশের সঙ্গে সঙ্গে রাগসঙ্গীতের উল্লেখের মাধ্যমে তাঁর আন্তর ভাবকে প্রকাশ করেছেন। শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের জ্ঞান কবির কাব্যরচনাকে বিশেষভাবে সমৃদ্ধ করেছে। রাগ-রাগিণীর উল্লেখ তাঁর কাব্যরচনার মৌলিকতাকে প্রমাণ করে। রবীন্দ্রকাব্য অনেকাংশেই রাগসঙ্গীতের ভাবাশ্রয়ী।

দিনান্তের একটি বিশেষ রাগ 'মুলতান'। রাগটির আরোহণের স্বরগুলি হলো—ন স গ ম প। এই স্বরগুলি কণ্ঠে গীত হলে সায়ংকালীন সন্ধিক্ষণ প্রকাশের ভাবটি স্বভাবতই মনে জাগে। রাগটির ভাব বর্ণনায় বলা হয়েছে যে, "মুলতান যেন রৌদ্র-তপ্ত দিনান্তের ক্লান্তিনিঃশ্বাস।"[1] কবির 'আমার দিনের শেষ ছায়াটুকু' কবিতাটিতে রাগটির ভাবরূপ নিখুঁতভাবে ব্যক্ত হয়েছে। জীবনসন্ধ্যার প্রাক্কালে দাঁড়িয়ে ক্লান্ত কবি বলেছেন :

"আমার দিনের শেষ ছায়াটুকু মিশাইলে মুলতানে—
গুঞ্জন তার রবে চিরদিন, ভুলে যাবে তার মানে।
কর্মক্লান্ত পথিক যখন বসিবে পথের ধারে
এই রাগিণীর করুণ আভাস পরশ করিবে তারে,
নীরবে শুনিবে মাথাটি করিয়া নিচু ;
শুধু এইটুকু আভাসে বুঝিবে,
বুঝিবে না আর কিছু—
বিস্মৃত যুগে দুর্লভ ক্ষণে বেঁচেছিল কেউ বুঝি,
আমরা যাহার খোঁজ পাই নাই
তাই সে পেয়েছে খুঁজি ॥"

কবিতাটি রচনার তারিখ ( ১৩ নভেম্বর, ১৯৪০ ) কবির জীবনে তাৎপর্যপূর্ণ। 'মুলতান'-এর ভাব বিশ্লেষণ করতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন : "আমাদের মুলতান রাগিণীটি এই চারটে-পাঁচটা বেলাকার রাগিণী। তার ঠিক ভাবখানা হচ্ছে—'আজকের দিনটা কিছুই করা হয়নি'।... আজ আমি এই অপরাহ্নের ঝিক্‌মিকি আলোতে জলে স্থলে শূন্যে সব জায়গাতেই সেই মুলতান রাগিণীটাকে তার করুণ চড়া অন্তরা-সুদ্ধ প্রত্যক্ষ দেখতে পাচ্ছি—না সুখ, না দুঃখ, কেবল আলস্যের অবসাদ এবং তার ভিতরকার একটা মর্মগত বেদনা।"[2]

'মেঘমল্লার' বর্ষা ঋতুর রাগ। বর্ষার রাগের বিশেষ উল্লেখ রবীন্দ্রকাব্যে পাই, যেমন 'বর্ষামঙ্গল' ও 'নববর্ষা' এই কবিতা দুটির মধ্যে। প্রসঙ্গতঃ বলা যায় যে, বর্ষা ঋতুর বিভিন্ন রাগ রবীন্দ্রসঙ্গীতে ব্যবহৃত হয়েছে, যেমন নটমল্লার, দেশ, মিশ্রমল্লার, সুরটমল্লার। 'সঙ্গীতচিন্তা'য় রবীন্দ্রনাথ বলেছেন : "দেশমল্লার যেন অশ্রুগঙ্গোত্রীর কোন্ আদিনির্ঝরের কলকল্লোল।"[3] নবযৌবনা বর্ষার ঘনঘটাকে বর্ণনা করতে গিয়ে কবির মেঘমল্লার রাগের উল্লেখ 'বর্ষা-মঙ্গল' কবিতাটিকে কাব্যমাধুর্যে মণ্ডিত করেছে। নবীন বর্ষা এসেছে। তাই তো কবির আহ্বান :

"আনো মৃদঙ্গ মুরজ মুরলী মধুরা,
বাজাও শঙ্খ, হুলুরব কর বধূরা—
এসেছে বরষা ওগো নব-অনুরাগিণী,
ওগো প্রিয়সুখভাগিনী।
কুঞ্জকুটিরে অয়ি ভাবাকুললোচনা,
ভূর্জপাতায় নব গীত করো রচনা
মেঘমল্লাররাগিণী।
এসেছে বরষা ওগো নব-অনুরাগিণী।"

( 'বর্ষামঙ্গল' )

'নববর্ষা' কবিতায় ব্যক্ত হয়েছে কবির উচ্ছ্বসিত আনন্দ অনুভব। মধুর চিত্রপরম্পরার সঙ্গে বর্ষা ঋতুর বাদলরাগিণীর ভাব মিশ্রিত হওয়ায় কবিতাটি বিশেষভাবে বর্ষাভাবব্যঞ্জক হয়ে উঠেছে :

১ সঙ্গীতচিন্তা—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, কলকাতা, ১৩৯২, পৃঃ ৪৮

২ ঐ, পৃঃ ১১১

৩ ঐ, পৃঃ ২২৭

"বিকচকেতকী তটভূমি-'পরে কে বেঁধেছে
তার তরণী, তরুণ তরণী ?
রাশি রাশি তুলি শৈবালদল
ভরিয়া লয়েছে লোল অঞ্চল,
বাদলরাগিণী সজলনয়নে গাহিছে পরাণহরণী।
বিকচকেতকী তটভূমি-'পরে
বেঁধেছে তরুণ তরণী ॥"

বর্ষা কবির প্রিয় ঋতু। একথা বলা প্রয়োজন যে, রবীন্দ্রনাথের বেশ কয়েকটি প্রবন্ধ বর্ষা সম্পর্কিত। যেমন, 'মেঘদূত' (প্রাচীন সাহিত্য), 'নব বর্ষা' (বিচিত্র প্রবন্ধ), 'মেঘদূত' (লিপিকা), 'শ্রাবণ সন্ধ্যা' (শান্তিনিকেতন)। বর্ষা আমাদের কল্পনাকে সুদূরপ্রসারী করে। বর্ষা ঋতুর রাগগুলি আমাদের উন্মনা করে সুদূরের সঙ্গে আমাদের মনকে যুক্ত করে। আগেই বলা হয়েছে, 'দেশমল্লার' রাগটি যেন "অভ্রভেদী গঙ্গোত্রীর কোন্ আদিনির্ঝরের কলকল্লোল।" রবীন্দ্রনাথ বলেছেন: "এতে করে আমাদের চেতনা দেশকালের সীমা পার হয়ে নিজের চঞ্চল প্রাণধারাকে বিরাটের মধ্যে উপলব্ধি করে।"[৪] 'মেঘমল্লার' রাগের ভাবটি কবির 'মেঘদূত' প্রবন্ধের মধ্যে পরিব্যাপ্ত। বর্ষা বিরহ-বেদনার সঙ্গে যুক্ত। তাই বর্ষার রাগ কবিকে মনে করিয়ে দেয় আকাশ ও পৃথিবীর মাঝখানকার যে-বিরহ, তাকে। কবি 'মেঘদূত' প্রবন্ধের শেষে সুন্দরভাবে বলেছেন: "সেই আকাশ-পৃথিবীর বিবাহমন্ত্রগুঞ্জন নিয়ে নববর্ষা নামুক আমাদের বিচ্ছেদের 'পরে। প্রিয়ার মধ্যে যা অনির্বচনীয় তাই হঠাৎ-বেজে-ওঠা বীণার তারের মতো চকিত হয়ে উঠুক। সে আপন সিঁথির 'পরে তুলে দিক দূর বনান্তের রঙটির মতো তার নীলাঞ্চল। তার কালো চোখের চাহনিতে মেঘমল্লারের সব মিড়গুলি আর্ত হয়ে উঠুক। সার্থক হোক বকুলমালা তার বেণীর বাঁকে বাঁকে জড়িয়ে উঠে।" প্রসঙ্গতঃ বলা যায় যে, রবীন্দ্রনাথের প্রকৃতি পর্যায়ের গানগুলির মধ্যে বর্ষার গানই সবচেয়ে বেশি। তার মধ্যে বেশির ভাগ গানেই বিরহ ও বিদায়ের সুর। 'মেঘমল্লার' রাগে বিরহ ও বিদায়ের সুর। এই সুর প্রকৃতিব্যাপী। রবীন্দ্রনাথের কাব্যে 'মেঘমল্লার' রাগ উল্লেখের সার্থকতা সম্পর্কে বলতে গিয়ে স্বামী প্রজ্ঞানানন্দের উক্তি বিশেষভাবে স্মরণীয়: "গান বা রাগ-রাগিণী সকলের মনে একটি আবেগ সৃষ্টি করে ও সেই আবেগ দেশকালাতীত বিরাট বিশ্বপ্রকৃতির মহিমাকেই উপলব্ধি করার জন্য সহায়তা করে।"[৫]

স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ বলেছেন, গানে শুধু নয়—কাব্যে, নৃত্যে ও নাটকেও রবীন্দ্রনাথ ভাবের স্থান দিয়েছেন সবার ওপরে। প্রকৃতির সঙ্গে রাগ-রাগিণীর সম্পর্ক নিবিড়। রবীন্দ্রনাথের জীবনে এই উপলব্ধি ছিল এক পরম সত্য। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন: "যতবার পদ্মার উপর বর্ষা হয় ততবারই মনে করি মেঘমল্লারে একটা নতুন বর্ষার গান রচনা করি··· কথা তো ঐ একই—বৃষ্টি পড়ছে, মেঘ করেছে, বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে। কিন্তু তার ভিতরকার নিত্যনূতন আবেগ, অনাদি অনন্ত বিরহবেদনা, সেটা কেবল গানের সুরে খানিকটা প্রকাশ পায়।"[৬]

'সাহানা' মিশ্ররাগ। দুই নিখাদ ও কোমল গান্ধার সম্বলিত এই রাগে দরবাড়ী কানাড়া ও মল্লারের ছায়া পাওয়া যায়। রবীন্দ্রনাথের 'নিবিড় ঘন আঁধারে' ও 'কী গাব আমি কী শুনাব' এই গানদুটি 'সাহানা' রাগের ভাবরূপে সমৃদ্ধ হয়েছে। 'সাহানা' রাগের আন্তর ভাবটি গভীর। রবীন্দ্রনাথ এই রাগটির ভাব বিশ্লেষণ করতে গিয়ে বলেছেন: "ভারতবর্ষের সঙ্গীত মানুষের মনে বিশেষ-ভাবে এই বিশ্বাসটিকেই বসাইয়া তুলিবার ভার লইয়াছে। মানুষের বিশেষ বেদনাগুলিকে বিশেষ করিয়া প্রকাশ করা তার অভিপ্রায় নয়। তাই, যে সাহানার সুর অচঞ্চল ও গভীর, যাহাতে আমোদ-আহ্লাদের উল্লাস নাই, তাহাই আমাদের বিবাহ উৎসবের রাগিণী। নরনারীর মিলনের মধ্যে যে চিরকালীন বিশ্বতত্ত্ব আছে সেইটিকে সে স্মরণ করাইতে থাকে, জীবজন্মের আদিতে যে দ্বৈতের সাধনা তাহারই বিরাট বেদনাটিকে ব্যক্তিবিশেষের বিবাহঘটনার উপরে সে পরিব্যাপ্ত করিয়া দেয়।"[৭]

৪ সঙ্গীতচিন্তা, পৃঃ ২২৭

৫ সঙ্গীতে রবীন্দ্রপ্রতিভার দান—স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ, শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠ, ১৯৮৪, পৃঃ ২৯-৩০

৬ সঙ্গীতচিন্তা, পৃঃ ১৯৩

৭ ঐ, পৃঃ ৪৮-৪৯

রবীন্দ্রনাথের রাগ-রাগিণীর চিন্তা স্থান ও কালের সীমা ছাড়িয়ে অসীমকে স্পর্শ করেছে। তাই মেঘমল্লার তাঁর কাছে বিশ্বের বর্ষারূপে অনুভূত হয়েছে। তাই এই রাগের মধ্যে অনাদি অনন্ত বিরহবেদনা তিনি লক্ষ্য করেছেন। 'শেষ সপ্তক'-এর অন্তর্গত 'তুমি প্রভাতের শুকতারা' কবিতাটিতে রবীন্দ্রনাথের 'সাহানা' রাগটির উল্লেখ কবিতাটির ভাবসৌন্দর্য বৃদ্ধি করেছে। নিম্নোক্ত চিত্রটি গোধূলি লগ্নে নরনারীর মিলনের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। সাহানার সঙ্গে বিরহ বিষাদে রাগ ভৈরবীর পার্থক্যটিও এই অংশে বিশেষভাবে লক্ষ্য করা যায় :

"তুমি প্রভাতের শুকতারা
আপন পরিচয় পাল্‌টিয়ে দিয়ে
কখনো বা তুমি দেখা দাও
গোধূলির দেহলিতে,
এই কথা বলে জ্যোতিষী।
সূর্যাস্তবেলায় মিলনের দিগন্তে
রক্ত অবগুণ্ঠনের নীচে
শুভদৃষ্টির প্রদীপ তোমার জ্বাল
সাহানার সুরে।
সকালবেলায় বিরহের আকাশে
শূন্য বাসরঘরের খোলা দ্বারে
ভৈরবীর তানে লাগাও
বৈরাগ্যের মূর্ছনা।"

'সানাই' কাব্যের অন্তর্নিহিত ভাব আলোচনা করতে গিয়ে ক্ষুদিরাম দাস বলেছেন : "এ কাব্যে কোথাও পুরানো দিনের অনুরাগের স্মৃতি, কোথাও সুদূরের অন্বেষণ, কোথাও বিহ্বল মন নিয়ে প্রকৃতির ক্ষণিক মাধুর্যরস আস্বাদন, কোথাও তাঁর বহুবর্ণিত লীলাসঙ্গিনীর পরিচয় বিভিন্ন কালের কয়েকটি কবিতার মধ্যে প্রকাশ লাভ করেছে।"[৮] বস্তুতঃ এই কাব্যে সুদূরের পানে চাওয়ার সুরটি প্রায় সর্বত্র বর্তমান। আমাদের রোমান্টিক কল্পনায় 'সাহানা' বসন্ত ঋতুর কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। বিবাহ উৎসবের গভীর ও অচঞ্চল ভাবটি 'সানাই' কবিতাটিতে বিশেষভাবে ফুটে উঠেছে। সানাই-এর সুর বহুবিচিত্র অসঙ্গতির মধ্যেও আনে এক পরম ঐক্যের ভাব। স র ম প ধ ণ স, র্স ন র্স ধ ণ ধ পম প জ্ঞ ম র স —এই স্বরগুলির সমন্বয় মানুষের কল্পনাকে সুদূরে প্রসারিত করে। 'সানাই' কবিতাটিতে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন :

"অরূপের মর্ম হতে সমুচ্ছ্বাসি
উৎসবের মধুচ্ছন্দ বিস্তারিছে বাঁশি।
সন্ধ্যাতারা-জ্বালা অন্ধকারে
অনন্তের বিরাট পরশ যথা অন্তরমাঝারে,
তেমনি সুদূর স্বচ্ছ সুর
গভীর মধুর
অমর্ত্য লোকের কোন্ বাক্যের অতীত
সত্যবাণী
অন্যমনা ধরণীর কানে দেয় আনি।
নামিতে নামিতে এই আনন্দের ধারা
বেদনার মূর্ছনায় হয় আত্মহারা।
বসন্তের যে দীর্ঘনিঃশ্বাস
বিকচ বকুলে আনে বিদায়ের বিমর্ষ আভাস,
সংশয়ের আবেগ কাঁপায়
সদ্যঃপাতী শিথিল চাঁপায়,
তারি স্পর্শ লেগে
সাহানার রাগিণীতে বৈরাগিণী
ওঠে যেন জেগে—
চলে যায় পথহারা অর্থহারা দিগন্তের পানে।"

একথা বলা বিশেষ প্রয়োজন যে, রবীন্দ্রনাথের রোমান্টিকতা তাঁর সঙ্গীত-চেতনার ওপর অনেকাংশেই নির্ভরশীল। তাঁর সৃষ্টিতে কাব্য ও সঙ্গীত এইভাবে একাকার হয়ে গেছে। তাঁর কাব্যে বিভিন্ন রাগের উল্লেখ তাই নিছক শব্দের ব্যবহার নয়। কবির সৃজনীশক্তির এক অপূর্ব ক্ষমতা এই যে, কাব্যসৃষ্টির মধ্যে তিনি রাগসঙ্গীতের ভাবরূপের সার্থক প্রয়োগ করেছেন। □

৮ রবীন্দ্র-প্রতিভার পরিচয়—ক্ষুদিরাম দাস, ওরিয়েন্ট বুক কোম্পানি, কলকাতা, ১৩৮৪, পৃঃ ৩৭৫

# পুণ্যস্মৃতি

## চন্দ্রমোহন দত্ত

[ পূর্বানুবৃত্তি ]

আমার অবস্থা দেখে একজন ভদ্রলোক, মনে হলো পাড়ার লোক, বললেন: "আপনি ১নং মুখার্জী লেনে[২] যান, সেখানে রামকৃষ্ণ মিশনের শাখা উদ্বোধন কার্যালয় আছে। ভদ্রলোকের কথামতো কিছুক্ষণ হাঁটার পর একটা বাড়ি দেখতে পেলাম। বাড়িটা দোতলা, দরজার পাশে লেখা আছে 'উদ্বোধন কার্যালয়'। দরজার দু-দিকে লাল-সিমেন্টের রোয়াক। কাউকে দেখতে পাচ্ছি না, কার্যালয় জেনেও ঢুকতে সাহস পাচ্ছি না। কারণ ইতিপূর্বে বলরাম বসুর বাড়ির দারোয়ানের কাছে যে-অভ্যর্থনা পেয়েছি তা এর মধ্যেই ভুলে যাইনি। বুকের মধ্যে সেই যে ধুকপুক শুরু হয়েছিল তা এখনো থামেনি। রোয়াকে বসে আছি যদি কাউকে দেখতে পাই। একটি লোককে আসতে দেখে (পরে জানতে পেরেছিলাম, ওর নাম 'মোহন') জিজ্ঞাসা করলাম: "এই বাড়িটা কি রামকৃষ্ণ মিশনের অফিস?" মোহন বলল: "হ্যাঁ, এটা রামকৃষ্ণ মিশন, এখানে মা থাকেন আর সন্ন্যাসীরা থাকেন। আপনার কি দরকার?" লোকটি বেশ বিনয়ী। ঐ হিন্দুস্থানী দারোয়ানের মতো নয় দেখে সাহস করে জিজ্ঞাসা করলাম: "যিনি এখানে সবচেয়ে বড় তাঁর সঙ্গে দেখা করতে পারব?" মোহন আমাকে অপেক্ষা করতে বলে ভিতরে চলে গেল। কিছুক্ষণ পর এসে আমাকে বলল: "চলুন, মা আপনাকে নিয়ে যেতে বলেছে।" 'মা' নিয়ে যেতে বলেছে শুনে অবাক হলাম। ভাবছি, এখানে সন্ন্যাসীরা থাকেন শুনেছি। এখন শুনছি মহিলাও থাকেন। ঠিক বুঝতে পারছি না রহস্যটা কি। বুকের ধুকপুক আবার বাড়ছে। যাই হোক, মোহনের সঙ্গে 'মা'য়ের কাছে গেলাম। প্রথম দর্শনেই মাকে আমার খুব আপন বলে মনে হলো। চোখ দুটি কি শান্ত, আর করুণা যেন ঝরে পড়ছে। আমি মাকে প্রণাম করলাম। মা আমার মাথা স্পর্শ করলেন। আমার নাম, কোথায় বাড়ি, বাড়িতে কে কে আছে—সব জিজ্ঞাসা করলেন। তাঁর কথা বলার মধ্যে এমন আপনভাব ছিল যে, আমাকে মন্ত্রমুগ্ধ করে সব বলিয়ে নিলেন। সকাল থেকে যা যা করেছি সব বলে গেলাম। ঠাকুরভাইয়ের কথা বলব না ভেবেছিলাম, কারণ ঘরের কথা তো বাইরে বলা যায় না। কিন্তু মাকে আমার পর মনে হচ্ছিল না, বরং আপন মায়ের চাইতেও আপন মনে হচ্ছিল ঐ কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই। তাই ঠাকুরভাইয়ের কথা বলতে দ্বিধা করলাম না। সব শুনে মা আমার দিকে সস্নেহে তাকিয়ে বললেন: "তুমি সবরকমের কাজ করতে পারবে? মান-সম্ভ্রমে বাধবে না তো?" আমি বললাম: "আমি তো মায়ের কাজ করব। সেখানে মান-সম্ভ্রমের প্রশ্ন কোথায়?" মা তখন বললেন: "এখানে আমার কয়েকজন সন্ন্যাসি-ছেলে ও আমরা কয়েকজন মেয়ে থাকি। একজন বাজার করার লোকের দরকার, তবে লোক রাখবে আমার ছেলে শরৎ। তুমি মোহনের সঙ্গে শরতের কাছে যাও।" মায়ের কথামতো মোহন আমাকে বলিষ্ঠ-দেহী শ্যামবর্ণ গম্ভীর এক সন্ন্যাসীর কাছে নিয়ে গিয়ে বলল: "মহারাজ, মা এই ভদ্রলোককে আপনার কাছে পাঠিয়ে দিয়েছেন। মা বলেছেন, যদি প্রয়োজন মনে করেন তবে একে বাজার করার কাজে রাখতে পারেন।" মহারাজ হেসে বললেন: "আমি আর কি রাখব, নিয়োগপত্র তো নিয়েই এসেছ।" মহারাজ আমার দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন: "কিগো ছেলে, তুমি কি চাও?" অতবড় শরীর এবং ঐরকম গম্ভীর মানুষের কাছ থেকে যেধরনের গম্ভীর আওয়াজ আশা করেছিলাম তা তো নয়, এ যে প্রায় মেয়েদের মতো গলা। মহারাজের কথার উত্তর দিতে পারছি না। উত্তর দেব কি, আমি তো ভাবতেই পারছি না—আমার চাকরি হয়েছে। সন্ন্যাসীদের কাছে থাকব—এ-বাসনা যে এত তাড়াতাড়ি বাস্তবে সত্য হবে তা ভাবতেই পারছিলাম না। তাই কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়েছিলাম। মহারাজ

২ বর্তমানে মুখার্জী লেন পরিবর্তিত হয়ে 'উদ্বোধন লেন' হয়েছে।

আবার জিজ্ঞাসা করলেন : "কি হলো চুপ করে আছ কেন ?" উত্তর দেব কি, তখনো আমি স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসিনি। মহারাজ কথার পুনরুক্তি না করে কিছুক্ষণ আমার দিকে তাকিয়ে রইলেন। তার পর কিশোরী নামে একজন লোককে ডেকে বললেন : "তোমাদের একজন লোকের দরকার বলেছিলে, এই ছেলেটিকে শিখিয়ে-পড়িয়ে নিলে কাজে দেবে।" সেইদিন থেকে মায়ের চরণে আশ্রয় পেলাম। এই জীবনে আর ঐ চরণ-ছাড়া হইনি।

চাকরি পেলাম। মাইনে হলো দশ টাকা। মোহনকে নিয়ে রোজ বাজারে যেতাম। কিছুদিন বাজার করার পর মহারাজ আমাকে উদ্বোধনের বই প্যাক করা ও বিক্রি করার কাজে লাগালেন।

বাংলাদেশের কয়েক জায়গায় তখন রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম হয়েছে। সেইসব মিশনে বা আশ্রমে ঠাকুর-স্বামীজীর উৎসব হলে আমি উদ্বোধনের বই নিয়ে বিক্রি করতে যেতাম। মুটে পাঁচু বই নিয়ে যেত। পাঁচু যখন আসতে পারত না তখন আমি বইয়ের প্যাকেট কাঁধে করে নিয়ে যেতাম, অন্য মুটে বা রিক্সা ব্যবহার করতাম না। অবশ্য দূরে যেতে হলে একটা কিছু ব্যবস্থা করতে হতো। অযথা মঠের পয়সা খরচ করতাম না। যতটুকু বাঁচবে তাতো মিশনের কাজেই লাগবে। ইতিমধ্যে করুণাময়ী শ্রীশ্রীমায়ের কাছ থেকে মহামন্ত্র পেয়েছি। এখন উদ্বোধন আর কেবল কর্মক্ষেত্র নয়, গুরুবাড়িও। গুরুবাড়ির নর্দমা পরিষ্কার করাকেও আমি পুণ্য-কর্ম বলে মনে করি, তাই বইয়ের প্যাকেট কাঁধে করে নিয়ে যাবার সময় মনে হতো, আমি মায়ের চরণ কাঁধে করে নিয়ে যাচ্ছি। মা আমাকে পরে জপ করার জন্য একটি রুদ্রাক্ষের মালা নিজের হাতে শোধন করে দেন। সেই মালায় আমি নিত্য জপ করি।

আমি মায়ের অনেক ছোট-খাটো কাজ করতাম। মায়ের কাছে আমি যখন-তখন যেতে পারতাম। তাঁর কাছে আমার কোন সংকোচ হতো না, মা-ও আমার কাছে অসংকোচে কথা বলতেন। আমাকে খুবই স্নেহ করতেন মা। প্রয়োজনে অপ্রয়োজনে আমাকে ডেকে যখন যা বলতেন, তা-ই পালন করে আমি খুব আনন্দ পেতাম। নিজেকে কৃতকৃতার্থ মনে করতাম। একদিন মা আমাকে বললেন : "চন্দ্র, (মা আমাকে আদর করে 'চন্দু' বলে ডাকতেন) তোমাকে দিয়ে আমার কিছু কাজ করিয়ে নিচ্ছি কেন, জানো ? আমি যখন থাকব না তখন এইসব কাজ-গুলির কথা মনে করে তুমি শান্তি পাবে।" একদিন কথায় কথায় তিনি বললেন : "আমার সন্তানদের আর জন্ম হবে না। তোমারও আর জন্ম হবে না, এজন্মই তোমার শেষ জন্ম।" শুনে আমি কিছুই বলতে পারিনি, কৃতজ্ঞতা প্রকাশের ভাষাও ছিল না আমার মুখে। শুধু চোখের কোল বেয়ে অশ্রু গড়িয়ে পড়ছিল। নিচে নেমে আসার সময় দেখলাম, সিঁড়ির মুখে শরৎ মহারাজ দাঁড়িয়ে আছেন। আমার চোখে তাঁর চোখ—সে-চোখে রয়েছে কৌতুকের হাসি। মহারাজ বললেন : "কিহে, ষোল আনা কাজ গুছিয়ে নিলে। যাঁর কাছ থেকে ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর কৃপা পাবার জন্যে দিনরাত কত তপস্যা করছে, আর তুমি কিনা তাঁর কি একটু-আধটু কাজ করে আসল কাজটিই হাসিল করে নিলে। যাও, আর ভাবনা কি, এখন ড্যাং ড্যাং করে ঘুরে বেড়াও।" আমি আর কি বলব। আনন্দে আহ্লাদে আমি তখনো নির্বাক। শুধু চোখ জলে ভেসে যাচ্ছে।

জ্যৈষ্ঠ মাস, আম-কাঁঠাল-পাকানো গরম পড়েছে। একদিন আমি খালি গায়ে বই প্যাক করছি। আমার কাঁধে ঘা হয়েছে। খবর এলো—মা ডাকছেন। খালি গায়েই মায়ের কাছে গেছি। কিছু বলার জন্য মা আমার মুখের দিকে তাকাতেই কাঁধের ঘা দেখতে পেয়ে বললেন : "চন্দু, তোমার কাঁধে ঘা হলো কি করে ?" বললাম : "বইয়ের প্যাকেট কাঁধে করে মাঝে মাঝে নিয়ে যাই, তার ঘষাতেই বোধ হয় ঘা হয়েছে, দু-দিন পরেই শুকিয়ে যাবে।" মা বললেন : "পাঁচু কোথায় ?" বললাম : "পাঁচু কয়েকদিন আসছে না।" শুনে তিনি বললেন : "অন্য ব্যবস্থা করনি কেন ?" আশ্রমের পয়সা বাঁচানোর কথা বলায় তিনি বললেন : "পাঁচু যেদিন আসবে না সেদিন অন্য ব্যবস্থা করবে।" এই কথা বলে একটা ছোট বাটিতে কিছুটা তেল মন্ত্র পড়ে দিয়ে বললেন : "এই তেলটা ঘায়ের জায়গায় কয়েকদিন মেখো, কমে যাবে।" কয়েকদিন মাখার পর কাঁধের ঘা একেবারে শুকিয়ে গেল। আর কোনদিন হয়নি। [ ক্রমশঃ ]

পরিক্রমা

# সোভিয়েত রাশিয়াতে যা দেখেছি

## স্বামী ভাস্করানন্দ

[ পূর্বানুবৃত্তি ]

রাশিয়ার লোকেরা ঘোল খেতে ভালবাসে। আমার সঙ্গী ভক্তটি জিয়ার্ডিয়া ঘটিত হজমের গোলমালে ভুগছিলেন বলে আমি আমাদের গাইডকে অনুরোধ করি যাতে আমার সঙ্গীকে কিছু ঘোল খেতে দেওয়া হয়। তখন গাইড বললেন ঃ "আমি চেষ্টা করব, কিন্তু তাতে কাজ হবে কিনা জানি না। জর্জিয়া আমাদের অন্যান্য রিপাবলিকগুলির মতো নয় ; হোটেলের কর্মীরা সব জর্জিয়ান বলে এরা আমার কথা এখন শুনবে কিনা জানি না।" তাঁর চেষ্টা সত্ত্বেও জর্জিয়াতে আমার সঙ্গীর ঘোল আর জোটেনি। এক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য যে, আমাদের গাইড যিনি ছিলেন তিনি জর্জিয়ান নন, তাঁর মাতৃভাষা রাশিয়ান।

রুশভাষী রাশিয়ানদের প্রতি জর্জিয়ানদের বিরূপ মনোভাব জর্জিয়াতে বেড়াবার সময় নানাভাবে প্রকাশ পেতে দেখেছি। কারণটি অবশ্যই রাজনৈতিক। কিন্তু রুশভাষী রাশিয়ানদের প্রতি বিরূপ মনোভাব সত্ত্বেও বিদেশী ট্যুরিস্টদের প্রতি জর্জিয়ানদের ব্যবহার কিন্তু খুবই হৃদ্যতাপূর্ণ। আমাদের ট্যুর গ্রুপের দুটি ইংরেজ মহিলা জর্জিয়ার টিবিলিসি শহরে একটি আইসক্রীমের দোকানে আইসক্রীম কিনতে গিয়েছিলেন। সোভিয়েত রাশিয়ার আইসক্রীম খেতে অতি চমৎকার। মহিলাদুটি ইংল্যান্ড থেকে এসেছেন জেনে এক জর্জিয়ান ভদ্রলোক, যিনি নিজে আইসক্রীম কিনতে এসেছিলেন, তাঁদের বললেন ঃ "আপনারা আমাদের (অর্থাৎ জর্জিয়ানদের) অতিথি। আপনাদের আইসক্রীমের জন্য কোনও দাম দিতে হবে না।" মহিলাদুটির আপত্তি সত্ত্বেও ভদ্রলোক আইসক্রীমের দাম দিয়ে দিলেন। শুধু তাই নয়, মহিলাদুটি যাতে নিরাপদে হোটেলে ফিরে যেতে পারেন তার জন্য ভদ্রলোক তাঁদের বাসে তুলে দিলেন এবং জর্জিয়ান ভাষায় ড্রাইভারকে বলে দিলেন কোন্ হোটেলের কাছে বাস থামাতে হবে।

জর্জিয়াতে আর একটি বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করেছিলাম। জর্জিয়ার বাইরে পিয়াতিগরস্ক ইত্যাদি শহরের রেস্তোরাগুলিতে বহু কমবয়সী যুবতী মেয়েদের ওয়েট্রেসের (waitress) কাজ করতে দেখেছি। কিন্তু জর্জিয়ার কোন শহরে তা দেখিনি। এতে আমার ধারণা হয়েছিল যে, জর্জিয়ার সমাজ হয়তো অপেক্ষাকৃত রক্ষণশীল। টিবিলিসি শহরে আমরা যখন যাই তখন আমাদের স্থানীয় গাইড হয়েছিলেন একজন প্রৌঢ়া জর্জিয়ান মহিলা। তাঁকে আমার ধারণাটির কথা বলাতে তিনি বললেন ঃ "আপনি ঠিকই ধরেছেন। আমরা জর্জিয়ার মায়েরা আমাদের অবিবাহিত মেয়েদের ক্ষতিকর পরিবেশ থেকে রক্ষা করার চেষ্টা করি। তাই আমরা তাদের সব রকমের কাজ করতে দিই না।" আমি বললাম ঃ "এ-বিষয়ে দেখছি আমাদের দেশের সঙ্গে আপনাদের সমাজের খুব মিল রয়েছে।" তিনি তখন জানতে চাইলেন, আমি কোন্ দেশের লোক। আমি ভারতবর্ষের লোক বলাতে তিনি খুব খুশি হলেন। বললেন ঃ "আমরা ভারত ও ভারতের লোকেদের খুব পছন্দ করি।"

শুধু এদিক দিয়েই নয়, জর্জিয়ার সঙ্গে ভারতবর্ষের অন্যান্য দিক দিয়েও বেশকিছু মিল রয়েছে। জর্জিয়ার রান্নাবান্না অনেকটা উত্তর ভারতের রান্নার মতো। রান্নায় ধনেপাতার প্রচুর ব্যবহার হয়। ঘোল, চাপাটি, শিককাবাব এখানকার লোকেদের প্রিয়।

ভারতের মতোই জর্জিয়াতে বর্ষীয়ানদের সম্মান করা হয়। জর্জিয়ান পরিবারে ও জর্জিয়ান সমাজে মায়ের স্থান খুব উঁচুতে। সাধারণতঃ ইউরোপ ও আমেরিকার সম্পদশালী দেশগুলিতে একই পরিবারের বিভিন্ন লোকেদের মধ্যে প্রীতি ও ভালবাসার ক্ষেত্রে প্রায়ই বেশ অভাব দেখতে পাওয়া যায়। বস্তুতন্ত্রের প্রভাব ও ব্যক্তিগত আর্থিক স্বয়ংসম্পূর্ণতাই হয়তো মুখ্যতঃ এর জন্য দায়ী। সে যাহোক, জর্জিয়ার সমাজ কিন্তু এর ব্যতিক্রম।

বাপ-মা ও ছেলেমেয়েদের মধ্যে বা ভাই-বোন এবং আত্মীয়দের মধ্যে স্নেহ-ভালবাসার প্রকাশ এঁদের সমাজে বেশ দেখতে পাওয়া যায়। এদিক দিয়েও ভারত ও জর্জিয়ার মধ্যে বেশকিছু সাদৃশ্য রয়েছে।

টিবিলিসিতে থাকাকালীন সে-অঞ্চলের দুটি প্রাচীন গির্জা দেখার সুযোগ হয়েছিল। তার মধ্যে একটি হচ্ছে 'Church of Dzhvari'। ষষ্ঠ শতাব্দীতে তৈরি এই গির্জাটি টিবিলিসি থেকে চল্লিশ কিলোমিটার দূরে একটি পাহাড়ের ওপর অবস্থিত। গির্জাটির বহিশ্চত্বর থেকে বহু মাইল-বিস্তৃত নিচের উপত্যকার অতি সুন্দর দৃশ্য দেখতে পাওয়া যায়। সে-উপত্যকাটিতেই দুটি নদীর সঙ্গমস্থলে রয়েছে জর্জিয়ার প্রাচীন রাজধানী 'মাৎসখেতা' ( Mtskheta )। পাহাড়টির পাদদেশে একটি মিলিটারী ক্যাম্প দেখতে পেলাম। ক্যাম্পটিতে রুশ সামরিক বাহিনীর অনেকগুলি ট্যাঙ্ক রয়েছে। মনে হলো, টিবিলিসির উত্তপ্ত রাজনৈতিক আবহাওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে সম্ভাব্য গণবিপ্লবের মোকাবিলার জন্য ট্যাঙ্কগুলিকে সেখানে রাখা হয়েছে।

গির্জাটি দেখার পর আমরা গেলাম মাৎসখেতার অতি বিখ্যাত গির্জা 'Cathedral of Svetitskhoveli' বা 'জীবনতরুর গির্জাটি' দেখতে। এই গির্জাটিতে যীশুখ্রীস্টের আলখাল্লা সংরক্ষিত আছে।

কিংবদন্তী অনুযায়ী খ্রীস্টীয় প্রথম শতাব্দীতে আলিওজ ( Alioz ) নামে এক বণিক জেরুজালেম থেকে যীশুখ্রীস্টের আলখাল্লাটি সংগ্রহ করে মাৎসখেতা শহরে এনেছিলেন। তিনি তাঁর বোন সিদোনিয়াকে ( Sidonia ) আলখাল্লাটি উপহার দেন। কিন্তু আলখাল্লাটি পেয়ে আনন্দাতিশয্যে সিদোনিয়া সঙ্গে সঙ্গে মারা যান। কিন্তু এমন দৃঢ়মুষ্টিতে তিনি আলখাল্লাটি ধরে রেখেছিলেন যে, মৃত্যুর পরও আলখাল্লাটি সিদোনিয়ার হাত থেকে বিচ্ছিন্ন করা সম্ভব হলো না। তাই মাৎসখেতা শহরে সিদোনিয়াকে যীশুখ্রীস্টের আলখাল্লা সমেত কবর দেওয়া হয়। কিছুকাল পরে সিদোনিয়ার কবরের ওপর একটি সিডার গাছ আপনার থেকেই গজিয়ে ওঠে। স্থানীয় লোকেরা গাছটির নাম দিয়েছিল—'জীবনতরু' ( Tree of life বা 'Svetitskhoveli' )।

খ্রীস্টীয় তৃতীয় শতকে তুরস্কের কাফগোকিয়া ( Kaphgokia ) গ্রামে নীনো ( Nino ) নামে একটি মেয়ে যীশুখ্রীস্টের মা মেরীর দর্শন পায়। মেরী নীনোকে যীশুখ্রীস্টের আলখাল্লার কথা বলেন এবং তাকে মাৎসখেতা শহরে গিয়ে সিদোনিয়ার সমাধিস্থলে একটি গির্জা তৈরি করে সেখানে খ্রীস্টধর্ম প্রচার করতে বলেন। গির্জাটি উল্লিখিত জীবনতরুর কাঠ দিয়ে তৈরি হয়েছিল বলে গির্জাটির নাম হয় 'জীবনতরু গির্জা' বা 'Cathedral of Svetitskhoveli'। খ্রীস্টীয় চতুর্থ শতকে রাজা ভাখতাং ( Vakhtang ) বড় করে গির্জাটির পুনর্নির্মাণ করিয়েছিলেন; কিন্তু পরে তৈমুর লঙের আক্রমণে তা খুবই ক্ষতিগ্রস্ত হয়। খ্রীস্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীতে ইঁট ও পাথর দিয়ে গির্জাটিকে মজবুত করে তৈরি করা হয়; সেই গির্জাটি এখনো রয়েছে। স্ট্যালিন ও ক্রুশ্চভের আমলে বহু সহস্র উপাসনালয় বন্ধ বা ধ্বংস করা হলেও এই গির্জাটিতে কখনও উপাসনা বন্ধ হয়নি।

আমরা যখন গির্জাটি দেখতে যাই তখন সেখানে একটি ধর্মীয় অনুষ্ঠান হচ্ছিল। পবিত্র গম্ভীর পরিবেশে স্বল্পান্ধকার গির্জাটির চ্যাপেলে যতক্ষণ অনুষ্ঠানটি হচ্ছিল ততক্ষণ মনে হচ্ছিল না যে, আমরা নাস্তিকতাবাদী কোনও কম্যুনিস্ট রাষ্ট্রে রয়েছি। কিন্তু দেখতে পেলাম যে, গির্জাটিতে উপাসনারত স্থানীয় লোকেদের প্রায় সবাই বর্ষীয়সী মহিলা। কমবয়সী কাউকে দেখতে পেলাম না।

জর্জিয়ার পূর্বাঞ্চলের নাম কাখেটিয়া ( Kakhetia )। কাখেটিয়ার প্রাচীন রাজধানী তেলাভিতে ( Telavi ) আমরা দুদিন ছিলাম। তেলাভির যে-হোটেলটিতে আমরা ছিলাম সেই বহুতল হোটেলটি রুশ সরকারি ট্যুরিস্ট সংস্থা 'ইনট্যুরিস্ট' পরিচালিত এবং সেটি তেলাভির সবচেয়ে ভাল হোটেল। কিন্তু হোটেলটির অবস্থা শোচনীয়। বিশেষতঃ বাথরুমের টাবগুলি নোংরা; তাছাড়া দেখতে পেলাম, আমাদের ঘরের সংলগ্ন বাথরুমটির জলের কল দিয়ে অনবরত জল বেরিয়ে যাচ্ছে। চেষ্টা করেও তা বন্ধ করা গেল না। হোটেল-কর্তৃপক্ষকে খবর দেওয়া সত্ত্বেও মেরামত করার জন্য দুদিনের মধ্যে কোন মিস্ত্রি এল না। পরে আমাদের দলের অন্যান্য ট্যুরিস্টদের

কাছে শুনতে পেলাম যে, তাঁদের ঘরের বাথরুম-গুলিরও একই শোচনীয় অবস্থা। সারাদিন ধরে এভাবে জলের অপচয় হওয়ার ফলে মধ্যরাত্রি থেকে সকাল সাতটা-আটটা পর্যন্ত প্রতিদিন জল বন্ধ। এছাড়া সোভিয়েত রাশিয়ার হোটেলগুলিতে গায়ে মাথার যে-সাবান দেওয়া হয় তুলনায় সেই সাবান ভারতবর্ষের কাপড়-কাচার যে বারসোপ পাওয়া যায় তার থেকেও নিকৃষ্ট। রঙ ও সুগন্ধ-বিহীন সরু এক ফালি করে সাবান বাথরুমগুলিতে দেওয়া হয়। ঘরের জানালাগুলির পর্দা প্রায়ই ছেঁড়া। টিবিলিসির সবচেয়ে ভাল হোটেলে যখন আমরা ছিলাম তখন ঘরে ঢুকতে গিয়ে দেখি যে, চাবি দিয়েও দরজা খোলা যাচ্ছে না। কি করব ভাবছি, এমন সময় হোটেলের একজন কর্মচারী এসে দেখিয়ে দিলেন দরজাটি কি করে খোলা যায়। তিনি দরজাটিতে সজোরে লাথি দিতেই দরজাটি দড়াম করে খুলে গেল। কর্মচারীটি হাসিমুখে বললেন: "এভাবেই দরজাটি খুলতে হয়।" সে-হোটেলে যে কয়দিন ছিলাম প্রতিবার দরজা খুলতে কর্মচারীটির সে-দৃষ্টান্ত আমার অনুসরণ করতে হয়েছিল। মিস্ত্রিদের কাজে গাফিলতির ফলে অধিকাংশ হোটেলের দরজা ও জানালাগুলির এই অবস্থা। একমাত্র লেনিনগ্রাদের 'মস্কোয়া' (Moskva) হোটেলে যখন ছিলাম তখন এই দুর্ভোগ আমাদের ভুগতে হয়নি।

তেলাভির লোকনৃত্য এবং পুরুষদের গানের 'কয়্যার' খুবই বিখ্যাত। তেলাভিতে থাকাকালীন জর্জিয়ার সংস্কৃতির এদুটি দিকের সঙ্গে আমাদের পরিচয় হয়েছিল।

তেলাভিতে থাকার পালা শেষ হলে আমাদের আবার টিবিলিসিতে ফিরে যেতে হলো। সেখানে একরাত থাকার পর প্লেনে করে আমাদের যেতে হবে লেনিনগ্রাদে। সেখানে আমাদের দুদিন থাকতে হবে; তারপর আমরা ফিরব লন্ডনে।

তেলাভি থেকে টিবিলিসি যাওয়ার পথে আমাদের বাস একটি ছোট শহরে কিছুক্ষণের জন্য থেমেছিল। কাছেই বাজার। কৌতূহলবশে সেখানে গিয়ে দেখতে পেলাম, দোকানগুলিতে জুতো, জামা-কাপড় ইত্যাদি যাকিছু বিক্রি হচ্ছে তা এত নিকৃষ্ট মানের যে, সেসব জিনিসপত্র ভারতবর্ষের গ্রামাঞ্চলেও কেউ কিনতে রাজি হবে না। অথচ জর্জিয়া প্রদেশটি সোভিয়েত রাশিয়ার সবচেয়ে সমৃদ্ধ প্রদেশ। প্রদেশটিতে বহু লাখপতি লোক রয়েছে। জনপ্রতি মোটরগাড়ির সংখ্যা জর্জিয়া-তেই সবচেয়ে বেশি। তা-সত্ত্বেও সেখানকার লোকের জীবনযাত্রার মান ইউরোপ ও আমেরিকার অ-কম্যু-নিস্ট দেশগুলির তুলনায় অনেক ধাপ নিচে।

টিবিলিসি থেকে এরোফ্লটের বিমানে আমরা যখন লেনিনগ্রাদে গিয়ে পৌঁছালাম তখন বিকেল। সেখানে তখন ঝিরঝির করে বৃষ্টি হচ্ছিল। সরকারি নাম লেনিনগ্রাদ হলেও স্থানীয় লোকেরা এখনো শহরটিকে 'পিটার' বলে। 'পিটার' হচ্ছে এই শহরটির আদি নাম 'সেন্ট পিটার্সবার্গের' অপভ্রংশ। ১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দে শহরটির নাম বদলে 'পেত্রোগ্রাদ' করা হয়। কম্যুনিস্ট বিপ্লবের পর ১৯২৪ খ্রীষ্টাব্দে পেত্রোগ্রাদের পুনর্নামকরণ করা হয়—'লেনিনগ্রাদ'। সোভিয়েত রাশিয়া ভেঙে যাবার পর এখন আবার পুরনো নাম 'সেন্ট পিটার্স-বার্গ' ফিরে এসেছে।

পিটার দ্য গ্রেট এ-শহরটির স্রষ্টা। তিনিই শহরটির নাম দিয়েছিলেন সেন্ট পিটার্সবার্গ। ১৭০৩ খ্রীষ্টাব্দে তিনি বাল্টিক সাগরের তীরে এই শহরটি তৈরি করার সিদ্ধান্ত নেন। বহু বছর ধরে বহু সহস্র শ্রমিকের প্রচেষ্টায় শহরটি গড়ে ওঠে। শোনা যায় যে, পিটার পোলটাভা-র (Poltava) যুদ্ধে সুইডেনের সেনাবাহিনীকে পরাভূত করার পর সহস্র সহস্র যুদ্ধবন্দীকে তিনি সেন্ট পিটার্স-বার্গ তৈরির কাজে লাগিয়েছিলেন। ফলে অতি পরিশ্রমে হাজার হাজার যুদ্ধবন্দী মারা যায়।

কিন্তু সৌন্দর্যের বিচারে শহরটি নিঃসন্দেহে ইউরোপের সবচেয়ে সুন্দর শহর। পিটার ইউরোপের বিভিন্ন দেশ থেকে বিখ্যাত স্থপতিদের এনেছিলেন এ-শহরটির অসংখ্য প্রাসাদতুল্য বাড়িগুলি তৈরি করতে। Rastrelli, Quarenghi, Charles Cameron, Domenico Trezzini প্রমুখ প্রখ্যাত-নামা স্থপতিরা সেন্ট পিটার্সবার্গের বিভিন্ন প্রাসাদ-গুলির ডিজাইন করেছিলেন। প্যারিস ও ভেনিস এদুটি শহরকে যদি একত্র করা সম্ভব হতো তাহলে

সেই সম্মিলিত শহরটি হয়তো কিছুটা সেণ্ট পিটার্সবার্গের মতো হতে পারত। রুশ স্থপতিদের মধ্যে ইভান করোবভ (Ivan Korobov) এই শহরটির কয়েকটি বিখ্যাত প্রাসাদ বা সৌধ তৈরি করেছিলেন।

সেণ্ট পিটার্সবার্গ এত সুন্দর শহর হলেও ট্যুরিস্টদের পক্ষে এখানকার পানীয় জল খাওয়া নিরাপদ নয়। এখানকার পানীয় জলে জিয়ার্ডিয়া জীবাণু রয়েছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় ৯০০ দিন জার্মান সেনাবাহিনী এ-শহরটিকে অবরোধ করে রেখেছিল। সে-সময় প্রধানতঃ খাদ্যাভাবে ও অসুখ-বিসুখে পাঁচ লক্ষেরও বেশি নগরবাসীর মৃত্যু হয়। তাদের লেনিনগ্রাদ শহরে 'জনতা সমাধি'তে কবর দেওয়া হয়। পিটার্সবার্গের ভূগর্ভস্থ পানীয় জল এরই ফলে দূষিত ও জীবাণুদুষ্ট হয়েছে বলে সবার ধারণা। আমরা যখন সেখানে ছিলাম তখন, এমনকি মুখ ধুতে বা দাঁত মাজতেও বোতলের মিনারেল ওয়াটার ব্যবহার করেছি।

যুদ্ধের ফলে বিধ্বস্ত বাড়ি ও প্রাসাদগুলির প্রায় সবগুলিই মেরামত করা হয়েছে। কিন্তু হিটলারের নৃশংস সেনাবাহিনীর হাতে গণহত্যার স্মৃতি এখনো এখানকার মানুষেরা ভুলতে পেরেছেন কিনা সন্দেহ। 'পিসকারিওভকা মেমোরিয়্যাল সমাধিক্ষেত্র'—যেখানে লক্ষ লক্ষ পিটার্সবার্গবাসী অন্তিম শয়ানে শায়িত রয়েছেন—তাঁদের এঁরা কখনো ভুলতে পারবেন কি? দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে ইংল্যাণ্ড ও আমেরিকার মোট যতজন মারা গিয়েছিল, একমাত্র লেনিনগ্রাদ শহরে মৃতের সংখ্যাই তার চেয়ে বেশি।

লেনিনগ্রাদ নানা ঐতিহাসিক ঘটনার স্মৃতি-বিজড়িত শহর। পিটার দ্য গ্রেট মস্কো থেকে এখানে রাজধানী স্থানান্তরিত করার পর বেশ কয়েকজন রুশ জার ও জারিনা এখানে থেকে রাজত্ব করে গেছেন। নেভস্কি প্রসপেক্ট বা অ্যাভিনিউ লেনিনগ্রাদের একটি প্রধান রাজপথ। এ-রাজপথটির পাশেই কাজান স্কোয়ার। ১৮৭৬ খ্রীস্টাব্দে কাজান স্কোয়ারেই সর্বপ্রথম শ্রমিক ও মজদুরদের গণবিপ্লব শুরু হয়েছিল। আবার ১৯১৭ খ্রীস্টাব্দের ফেব্রুয়ারিতে রাশিয়াতে যে গণবিপ্লব হয়েছিল সেটিও কাজান স্কোয়ারেই হয়েছিল।

নেভস্কি প্রসপেক্টের ওপরেই 'Church of the Saviour of the Spilled Blood' রয়েছে। যে-জমির ওপর এ-গির্জাটি তৈরি হয়েছে সেখানে ২য় জার আলেকজাণ্ডারকে হত্যা করা হয়েছিল। লেনিনগ্রাদের ইউসুপভ রাজপ্রাসাদে কুখ্যাত রাসপুটিনকে হত্যা করা হয়।

এ-শহরের বিখ্যাত সাহিত্যিকদের মধ্যে গোগোল, টুর্গেনেভ ও সেইকভস্কির নাম উল্লেখযোগ্য। গোগোলের নামে একটি রাস্তা লেনিনগ্রাদে রয়েছে। ১৩ নম্বর নেভস্কি প্রসপেক্টের বাড়িটিতে সেইকভস্কি কলেরা রোগে মারা যান।

পিটার্সবার্গে বহু মিউজিয়াম রয়েছে। তার মধ্যে 'হারমিটেজ' পৃথিবীবিখ্যাত। এ-মিউজিয়ামটি এত বড় যে, এটিকে ভাল করে দেখতে গেলে দু-তিন সপ্তাহ লাগবে। হারমিটেজে তিনটি প্রাসাদতুল্য বাড়ি রয়েছে। তাদের নাম 'Winter Palace', 'Large Hermitage' এবং 'Small Hermitage'। এছাড়াও আর একটি বাড়ি রয়েছে; তার নাম 'Hermitage Theatre'। এ-বাড়িটিতে আজকাল শুধু বক্তৃতাদি দেওয়া হয়।

আমাদের প্রাতরাশের পর একদিন নেভা (Neva) নদীর পারে 'Ploschad Dekabristov' নামে একটি বড় স্কোয়ারে নিয়ে যাওয়া হলো। এই স্কোয়ারটির মধ্যস্থলে পিটার দ্য গ্রেটের একটি খুব বড় ব্রোঞ্জের মূর্তি রয়েছে। স্কোয়ারটির পাশেই একটি জেটি থেকে হাইড্রোপ্লেনে করে আমাদের জলপথে 'Winter Palace' দেখাতে নিয়ে যাওয়া হলো। ঘণ্টা তিনেক সেখানকার অসংখ্য অমূল্য শিল্পসম্ভার দেখার পর আমাদের হোটেলে মধ্যাহ্ন-ভোজের জন্য ফিরিয়ে নিয়ে আসা হলো। আবার বিকালে আমাদের 'বড়' ও 'ছোট' হারমিটেজ দেখাতে নিয়ে যাওয়া হলো ট্যুরিস্ট বাসে।

হারমিটেজ মিউজিয়ামের এই দুটি বাড়িতে লিওনার্ড, বত্তিচেল্লি, র‍্যাফেল, রেমব্রাণ্ট, ভ্যানডাইক প্রভৃতি পৃথিবী-বিখ্যাত চিত্রশিল্পীদের আঁকা বহু তৈলচিত্র রয়েছে। প্যারিসের লুভ্যর মিউজিয়াম ছাড়া এত বেশি সংখ্যায় এত বহুমূল্য ছবি আর কোথাও দেখিনি।

রাত্রিতে আমাদের একদিন একটি থিয়েটারে

কশ্যাকদের লোকনৃত্য দেখাতে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। এ-লোকনৃত্যের দলটি নাকি সোভিয়েত রাশিয়াতে খুব বিখ্যাত।

পূর্বতন লেনিনগ্রাদে আমরা মাত্র দুদিন ছিলাম। এত অল্প সময়ের মধ্যে সে-শহরটিকে ভাল করে দেখা বা জানা অসম্ভব। আমাদের গাইড আল্লা লেভিতিনা বললেন ঃ "শহরটিকে ভাল করে দেখতে আপনাদের আবার এদেশে বেড়াতে আসতে হবে।" শুনে আমাদের দলের ট্যুরিস্টরা চুপ করে রইলেন, কোন মন্তব্য করলেন না। এঁদের অধিকাংশই ট্যুর শুরু হওয়ার পর থেকেই জিয়ার্ডিয়াতে ভুগে ভুগে দুর্বল ও ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলেন। তাই এরোফ্লটের বিমান যখন আমাদের নিয়ে নিরাপদে লন্ডনের গ্যাটউইক বিমানবন্দরে নামলো তখন তাঁরা রাশিয়া ছেড়ে আসার আনন্দে হাততালি দিয়ে উঠলেন। তাঁদের হাততালির শব্দ অতি রূঢ় ও নিষ্ঠুর ধিক্কারের মতো শোনালো; কিন্তু এরোফ্লটের গম্ভীর ও ভাবলেশহীন ক্যাবিন অ্যাটেন্ডেন্টদের মুখে কোন ভাবান্তর দেখা গেল না। ☐ [ সমাপ্ত ]

বেদান্ত-সাহিত্য

## শ্রীমদ্‌বিদ্যারণ্যবিরচিতঃ

### বঙ্গানুবাদ : স্বামী অলোকানন্দ

[ পূর্বানুবৃত্তি ]

এখন পূর্বপক্ষের মত উপস্থাপন করছেন—

সত্যপ্যনয়োঃ সন্ন্যাসয়োরবান্তরভেদে পরমহংস-স্বাকারেণৈকীকৃত্য "চতুর্বিধা ভিক্ষবঃ" ইতি স্মৃতিষু চতুঃসংখ্যোক্তা।

**অন্বয়**

অনয়োঃ সন্ন্যাসয়োঃ (ঐ দুই প্রকার সন্ন্যাসের), অবান্তরভেদে সতি অপি (অবান্তর ভেদ হলেও), পরমহংসত্ব-আকারেণ (পরমহংসরূপে), একীকৃত্য ([উভয়কে] একত্রপূর্বক), চতুর্বিধা ভিক্ষবঃ (ভিক্ষুগণ চতুর্বিধ), ইতি স্মৃতিষু (স্মৃতিতে), চতুঃসংখ্যোক্তা (চারি সংখ্যক ভিক্ষুকের কথা উল্লেখিত হয়েছে)।

**বঙ্গানুবাদ**

বিবিদিষা ও বিদ্বৎ উভয়প্রকার সন্ন্যাসের অবান্তর ভেদ থাকলেও, পরমহংসরূপে উভয়কে একত্র করে স্মৃতিশাস্ত্রে 'ভিক্ষুগণ (কুটীচকাদি ভেদে) চতুর্বিধ' এই বাক্যে চারিসংখ্যক সন্ন্যাসীর কথা উল্লেখিত হয়েছে।

স্মৃতিশাস্ত্রে যে চার প্রকার ভিক্ষুর কথা রয়েছে, এর পক্ষে পারাশর-মাধবীয়ে হারীতবচনে আছে ঃ

"চতুর্বিধা ভিক্ষবস্তু প্রোক্তাঃ সামান্যলিঙ্গিনঃ।

* * *

কুটীচকো বহূদকো হংসশ্চৈব তৃতীয়কঃ।

চতুর্থঃ পরমোহংসঃ যো যঃ পশ্চাৎ স উত্তমঃ॥"

(উদ্বোধন, ২১ বর্ষ, ১০ম সংখ্যা, পৃঃ ৬২০)

পূর্বোত্তরয়োরুভয়োঃ সন্ন্যাসয়োঃ পরমহংসত্বং জাবালশ্রুতাবগম্যতে।

তত্র হি জনকেন সন্ন্যাসে পৃষ্টে সতি যাজ্ঞবল্ক্যোঽধিকারবিশেষবিধানেনোত্তরকালানুষ্ঠেয়েন চ সহিতং বিবিদিষাসন্ন্যাসমভিধায় পশ্চাদত্রিণা যজ্ঞোপবীতরহিতস্যাক্ষিপ্তে ব্রাহ্মণ্যে সতি পশ্চাদাত্মজ্ঞানমেব যজ্ঞোপবীতমিতি সমাদধৌ। অতো বাহ্যোপবীতাভাবাৎ পরমহংসত্বং নিশ্চীয়তে।

**অন্বয়**

পূর্বোত্তরয়োঃ উভয়োঃ (পূর্ব ও পর উভয়), সন্ন্যাসয়োঃ (সন্ন্যাসের), পরমহংসত্বং (পরমহংসত্ব), জাবালশ্রুতৌ (জাবালশ্রুতিতেও), অবগম্যতে (জানা যায়)। তত্র হি (সেখানে), জনকেন (জনক কর্তৃক), সন্ন্যাসে পৃষ্টে সতি (সন্ন্যাস সম্বন্ধে জিজ্ঞাসিত হলে), যাজ্ঞবল্ক্যঃ (যাজ্ঞবল্ক্য), অধিকারবিশেষবিধানেন (বিশেষ বিশেষ কর্তব্য নির্ধারণপূর্বক), চ (এবং), উত্তরকাল-অনুষ্ঠেয়েন সহিতং (পরবর্তী কালে অনুষ্ঠেয় বিধিনির্দেশসহ), বিবিদিষাসন্ন্যাসম্ (বিবিদিষাসন্ন্যাস), অভিধায় (ব্যাখ্যা করে), পশ্চাৎ (তৎপরে), অত্রিণা (অত্রি কর্তৃক), যজ্ঞোপবীতরহিতস্য (যজ্ঞোপবীতহীন

ব্যক্তির ), ব্রাহ্মণ্যে ( ব্রাহ্মণত্বিবিষয়ে ), আক্ষিপ্তে সতি ( দোষ নির্দিষ্ট হওয়ায় ), পশ্চাৎ ( পরে ), আত্মজ্ঞানম্ এব ( আত্মজ্ঞানই ), যজ্ঞোপবীতম্ ( যজ্ঞোপবীত ), ইতি (এই), সমাদধৌ (সমাধান করলেন)। অতঃ ( অনন্তর ), বাহ্য-উপবীত-অভাবাৎ ( বাহ্য উপবীতচিহ্নের অভাবহেতু ), পরমহংসত্বং ( পরমহংসত্ব ), নিশ্চীয়তে ( নিশ্চিত করা হয় )।

**বঙ্গানুবাদ**

পূর্ব ও পর ( বিবিদিষা ও বিদ্বৎ ) উভয়প্রকার সন্ন্যাসে পরমহংসত্ব জাবালশ্রুতি থেকেও ( জাবাল উপনিষদ্, ৪-৫ ) জানা যায়। জাবালশ্রুতিতে জনক সন্ন্যাস সম্বন্ধে যাজ্ঞবল্ক্যকে জিজ্ঞাসা করলে যাজ্ঞবল্ক্য অধিকারিবিশেষে বিশেষ বিশেষ কর্তব্য নির্ধারণ করেন। তারপর অনুষ্ঠেয় বিধিনির্দেশসহ বিবিদিষা সন্ন্যাস ব্যাখ্যা করেন। তারপরে অত্রি যজ্ঞোপবীতহীন ব্যক্তির ব্রাহ্মণত্ববিষয়ে দোষ ধরলে যাজ্ঞবল্ক্য 'আত্মজ্ঞানই যজ্ঞোপবীত' এই বাক্যদ্বারা উক্ত প্রসঙ্গের সমাধান করেন। অনন্তর বাহ্য উপবীত-চিহ্নের অভাবহেতু (বিবিদিষাসন্ন্যাসের) পরমহংসত্ব নিশ্চিত করা হয়।

তথাঽন্যস্যাং কণ্ডিকায়াং পরমহংসো নামেত্যুপক্রম্য সম্বর্তকাদীন্ বহূন্ ব্রহ্মবিদো জীবন্মুক্তানুদাহৃত্য "অব্যক্তলিঙ্গা অব্যক্তাচারা অনুন্মত্তা উন্মত্তবদাচরন্তঃ" ইতি বিদ্বৎসন্ন্যাসিনো দর্শিতাঃ।

**অন্বয়**

তথা ( সেইরূপ ), অন্যস্যাং কণ্ডিকায়াং ( অন্য কণ্ডিকায় ), পরমহংসঃ নাম ইতি ( পরমহংস এই শব্দ ), উপক্রম্য ( শুরু করে ), সম্বর্তকাদীন্ ( সম্বর্তক প্রভৃতি ), বহূন্ (বহু) ব্রহ্মবিদঃ ( ব্রহ্মবিদ্‌গণ ) জীবন্মুক্তান্ (জীবন্মুক্তদের) উদাহৃত্য ( উদাহরণ দিয়ে ), অব্যক্তলিঙ্গাঃ ( আশ্রমবিশেষের চিহ্নশূন্য ) অব্যক্তাচারাঃ ( নির্দিষ্ট আচাররহিত ), অনুন্মত্তাঃ ( উন্মত্ত না হয়েও ), উন্মত্তবৎ ( উন্মত্তের ন্যায় ), আচরন্তঃ ( আচরণকারী ), ইতি ( এই প্রকারে ), বিদ্বৎসন্ন্যাসিনঃ ( বিদ্বৎসন্ন্যাসীদের অবস্থা ), দর্শিতাঃ ( প্রদর্শিত হয়েছে )।

**বঙ্গানুবাদ**

সেইরূপ উক্ত জাবালশ্রুতির অন্য ( ষষ্ঠ ) কণ্ডিকায় 'পরমহংস' শব্দ দিয়ে শুরু করে সম্বর্তক প্রভৃতি বহু ব্রহ্মবিদ্ জীবন্মুক্তদের উদাহরণ সহযোগে "তাঁরা আশ্রমবিশেষের চিহ্নশূন্য, নির্দিষ্ট আচাররহিত, উন্মত্ত না হয়েও উন্মত্তের মতো আচরণকারী" এই প্রকারে বিদ্বৎসন্ন্যাসীদের অবস্থা প্রদর্শিত হয়েছে।

তথা—"ত্রিদণ্ডং কমণ্ডলুং শিক্যং পাত্রং জলপবিত্রং শিখাং যজ্ঞোপবীতং চেত্যেতৎ সর্বং ভূঃ স্বাহেত্যপ্সু পরিত্যজ্যাত্মানমন্বিচ্ছেৎ" ইতি ত্রিদণ্ডিনঃ সত একদণ্ডলক্ষণং বিবিদিষাসন্ন্যাসং বিধায় তৎফলরূপং বিদ্বৎসন্ন্যাসমেবমুদাজহার।

**অন্বয়**

তথা ( আরও )—ত্রিদণ্ডং ( ত্রিদণ্ড ), কমণ্ডলুং ( কমণ্ডলু ), শিক্যং ( শিকা ), পাত্রম্ ( পাত্র ) জলপবিত্রম্ ( জলছাঁকনি ), শিখাং ( শিখা ), যজ্ঞোপবীতং চ ( এবং যজ্ঞোপবীত ), ইতি এতৎ সর্বং ( এই সকল ), ভূঃ স্বাহা ( ভূঃ স্বাহা ), ইতি ( এই মন্ত্রোচ্চারণপূর্বক ), অপ্সু (জলে), পরিত্যজ্য ( পরিত্যাগ করে ), আত্মানম্ ( আত্মার ), অন্বিচ্ছেৎ ( অন্বেষণ কর্তব্য )। ইতি ( এই বাক্য দ্বারা ), ত্রিদণ্ডিনঃ সতঃ ( ত্রিদণ্ডী সন্ন্যাসীর জন্য ), একদণ্ড লক্ষণং ( একদণ্ড ধারণরূপ ), বিবিদিষাসন্ন্যাসং বিধায় ( বিবিদিষাসন্ন্যাসের বিধানপূর্বক ), তৎ ফলরূপং ( তার ফলস্বরূপ ), বিদ্বৎসন্ন্যাসম্ এব (বিদ্বৎসন্ন্যাসই), উদাজহার ( উদাহরণ দিয়েছেন )।

**বঙ্গানুবাদ**

আরও—"ত্রিদণ্ড, কমণ্ডলু, শিকা, পাত্র, জলছাঁকনি, শিখা, যজ্ঞোপবীত—সকল বস্তু 'ভূঃ স্বাহা' মন্ত্রোচ্চারণপূর্বক জলে পরিত্যাগ করে আত্মার অন্বেষণ কর্তব্য"—এই বাক্যদ্বারা ত্রিদণ্ডী সন্ন্যাসীর জন্য একদণ্ডধারণরূপ বিবিদিষাসন্ন্যাসের বিধানপূর্বক তার ফলস্বরূপ বিদ্বৎসন্ন্যাসেরই উদাহরণ দিয়েছেন ( অর্থাৎ নিম্নলিখিত প্রকারে বর্ণনা করেছেন )।

ত্রিদণ্ড কমণ্ডলু ইত্যাদি বাক্যদ্বারা এখানে সন্ন্যাসের ক্রমপরম্পরা বর্ণিত হয়েছে। প্রাথমিক পর্যায়ে দণ্ড, কমণ্ডলু প্রভৃতি বাহ্যবস্তুর ত্যাগ দ্বারা ত্রিদণ্ড থেকে একদণ্ড ধারণের বিধান, অবশেষে সর্বদণ্ড পরিত্যাগপূর্বক অলিঙ্গ বিদ্বৎসন্ন্যাসের বিধান। সেখানে আত্মজ্ঞান ব্যতিরিক্ত বাহ্যাড়ম্বরের চিহ্নমাত্র নেই। সেরূপ সন্ন্যাসীর উদাহরণ পরবর্তী অংশে ( জাবালোপনিষদে ) নির্দেশ করা হয়েছে। [ক্রমশঃ]

বিশেষ রচনা

# স্বামী বিবেকানন্দের ভারত-পরিক্রমা ও ধর্মমহাসম্মেলনের প্রস্তুতি-পর্ব

## স্বামী বিমলাত্মানন্দ

[ পূর্বানুবৃত্তি ]

আলমোড়ায় একদিন এক মুসলমান ফকির শশা খাইয়ে ক্ষুধার্ত স্বামীজীর জীবনরক্ষা করেছিলেন। এই ঘটনার উল্লেখ করে স্বামীজী বলেছিলেন: "লোকটি বাস্তবিক সেদিন আমার প্রাণরক্ষা করেছিল, কারণ আমি আর কখনো ক্ষুধায় অতটা কাতর হইনি।"[৬১] স্বামীজী এই মুসলমান ফকিরের মধ্যে দেখেছিলেন সেই প্রেম ও মমতা, যেখানে ধর্মমতের গণ্ডি শিথিল হয়ে যায়। হিন্দু-মুসলমানের, তথা অন্য ধর্মের সম্মিলনে এই ভারতবর্ষ। ভারতবর্ষের স্থায়িত্বের মন্ত্র ঐ প্রেমদৃষ্টি—স্বামীজীর চোখে ধরা পড়েছিল।

এখানে স্বামীজীর এক অপূর্ব দর্শন হয়েছিল—স্বর্ণোজ্জ্বল অক্ষরে মন্ত্রদর্শন। সম্ভবতঃ এই সময়েই অপর একটি দর্শনের কথা স্বামীজী পরবর্তী কালে নিবেদিতাকে বলেছিলেন। নিবেদিতা লিখেছেন: "তিনি বলিলেন, 'সন্ধ্যা হইয়াছে; আর্যগণ সবেমাত্র সিন্ধুনদতীরে পদার্পণ করিয়াছেন, ইহা সেই যুগের সন্ধ্যা। দেখিলাম, বিশাল নদের তীরে বসিয়া এক বৃদ্ধ। অন্ধকার-তরঙ্গের পর অন্ধকার-তরঙ্গ আসিয়া তাঁহার উপর পড়িতেছে, আর তিনি ঋগ্বেদ হইতে আবৃত্তি করিতেছেন। তারপর আমি সহজ অবস্থা প্রাপ্ত হইলাম এবং আবৃত্তি করিয়া যাইতে লাগিলাম, বহু প্রাচীনকালে আমরা যে-সুর ব্যবহার করিতাম, ইহা সেই সুর।"[৬২]

আলমোড়ায় স্বামীজীরা লালা বদ্রীশার বাড়িতে ছিলেন। এখানে এসে স্বামীজীর সঙ্গে মিলিত হলেন স্বামী সারদানন্দ এবং স্বামী কৃপানন্দ (বৈকুণ্ঠনাথ সান্যাল)। তাঁদের মন তপস্যার আনন্দে পরিপূর্ণ। বদরীনাথের পথে তাঁরা কর্ণপ্রয়াগ ও রুদ্রপ্রয়াগ হয়ে শ্রীনগরের অভিমুখে যাত্রা করলেন। পথে চটিতে বিশ্রামকালে স্বামীজী গুরুভাইদের উপনিষদ্ পড়াতেন। স্বামীজীর অনুভব হয়েছিল—নদীর প্রবাহের একটা সুর আছে। একদিন তিনি গুরুভ্রাতাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বললেন: "মন্দাকিনী এখন কেদার-রাগে চলেছে।"[৬৩]

কর্ণপ্রয়াগে অখণ্ডানন্দজীর জ্বর হয়েছিল। শ্রীনগরের পথে স্বামীজীর শরীরও অসুস্থ হলো। দুর্বল শরীরে তাঁরা এক ধর্মশালায় আশ্রয় নিলেন। জনৈক আমিন তাঁদের কবিরাজী ওষুধ দিয়ে ডাণ্ডীতে করে শ্রীনগরে পৌঁছে দেবার ব্যবস্থা করলেন।

শ্রীনগরে এক নির্জন কুটিরে স্বামীজী ও তাঁর গুরুভাইরা এক মাস তপস্যা করেছিলেন। এই কুটিরে পূর্বে স্বামী তুরীয়ানন্দও ছিলেন। এই স্থানে স্বামীজী গুরুভাইদের মনে উপনিষদের উপদেশ বিশেষভাবে বদ্ধমূল করবার চেষ্টা করেছিলেন। দিনের পর দিন এই কুটিরে তাঁরা প্রাচীন আর্যঋষিগণের নিকট প্রকাশিত গভীর তত্ত্বকথা আলোচনা করতে করতে ভাবে তন্ময় হয়ে যেতেন।[৬৪]

শ্রীনগর থেকে টিহিরি। এখানে দিন পনেরো-কুড়ি তাঁরা সাধন-ভজনে মগ্ন ছিলেন। শ্রীশ্রীমায়ের নির্দেশানুসারে অখণ্ডানন্দজী নিত্য মাধুকরী করে স্বামীজীকে খাওয়াতেন। দেখতেন যাতে তাঁদের 'মাথার মণি' স্বামীজীর এতটুকু কষ্ট না হয়। গণেশপ্রয়াগে স্বামীজী কিছুকাল তপস্যা করার সংকল্প করেছিলেন। কিন্তু অখণ্ডানন্দজীর ব্রঙ্কাইটিস হওয়ায় তাঁরা দেরাদুন অভিমুখে যাত্রা করলেন। টিহিরির দেওয়ান রঘুনাথ ভট্টাচার্যের ব্যবস্থাপনায় তাঁরা মুসৌরী হয়ে দেরাদুনে পৌঁছালেন। পথে রাজপুরে এক নির্জন স্থানে তাঁরা শিবমন্দিরে তপস্যারত স্বামী তুরীয়ানন্দের দেখা পেলেন। অখণ্ডানন্দজী এই সময়ে স্বামীজীর

৬১ যুগনায়ক বিবেকানন্দ, ১ম খণ্ড, পৃঃ ২৮৪

৬২ বাণী ও রচনা, ৯ম খণ্ড, পৃঃ ২৮৮

৬৩ স্বামী অখণ্ডানন্দ—স্বামী অন্নদানন্দ, পৃঃ ৬৯

৬৪ স্বামী বিবেকানন্দ—প্রমথনাথ বসু, ১ম ভাগ, পৃঃ ১৬৩

মনোভাবের কথা লিখেছেন : "আমি স্বামীজীকে অসংখ্যবার বলতে শুনেছি যে, যখনই তিনি নির্জন নীরব সাধনায় ডুবে যেতে চেষ্টা করেছেন, তখনই ঘটনাপরম্পরার চাপে তাঁকে তা ছাড়তে হয়েছে।"[৬৫]

দেরাদুনের সিভিল সার্জেন ডাঃ ম্যাকলারেন অখণ্ডানন্দজীকে পরীক্ষা করে উপদেশ দিলেন—পাহাড়ে না ঘুরে সমতলে গিয়ে চিকিৎসা করাতে। কপর্দকহীন সন্ন্যাসী তাঁরা। সমতলে যাওয়া বা চিকিৎসা করা তাঁদের পক্ষে সহজ নয়। গুরু-ভাইয়ের জন্য স্বামীজী স্বারে স্বারে আশ্রয় ও সাহায্য-প্রার্থনা করতে লাগলেন। কেউ আশ্রয় দিলেন না। একজন কাশ্মীরী পণ্ডিত উকিল আনন্দ নারায়ণ সানন্দে রাজি হলেন আশ্রয় দিতে। তিনি পরম যত্নে অখণ্ডানন্দজীর চিকিৎসার দায়িত্বও নিলেন। দেরাদুনে তাঁরা তিন সপ্তাহ ছিলেন। কৃপানন্দজীকে গুরুভাই-এর সেবার জন্য রেখে স্বামীজী, তুরীয়ানন্দজী, সারদানন্দজী তপঃক্ষেত্র হৃষীকেশের পথে পা বাড়ালেন।

হৃষীকেশে চণ্ডেশ্বর শিবমন্দিরের কাছে পর্ণ-কুটিরে স্বামীজীরা গভীর তপস্যায় ডুবে গেলেন। সেখানে ব্রহ্মসূত্র আলোচনা করতেন তাঁরা। সেখানে শংকরগিরি নামে এক সাধুর সঙ্গ করে স্বামীজী প্রভূত আনন্দ পেয়েছিলেন। স্বামী তুরীয়ানন্দ তাঁদের হৃষীকেশবাসের স্মৃতি রোমন্থন করে বলেছেন : "আমরা একত্রে হৃষীকেশে রয়েছি। স্বামীজী একটা আলাদা ঝুপড়িতে থাকতেন। সকালবেলা আমাদের কাছে একসঙ্গে চা খেতে আসতেন। প্রত্যহই একজন পশ্চিমা দেশীয় সাধু ঐখানে বসে গীতা পাঠ করতেন। তাঁর লেখাপড়া বিশেষ জানা ছিল না। পাঠে প্রায়ই ভুল হতো। 'গুড়াকেশেন' শব্দটি তিনি 'গুড্ডাকেশেন' বারংবার উচ্চারণ করছেন শুনে স্বামীজী পরম যত্ন ও বিশেষ দরদের সঙ্গে সংশোধন করে দিলেন। আমাদের বললেন, 'তোমরা রোজই এই ভুল পড়া শোন? আর শুধরে দাও না? তোমাদের সাধুর উপর এতটুকু সমবেদনা (sympathy) নেই?' শেষে স্বামীজী তাঁকে আরও বললেন, 'মহারাজ! আপনি গীতার চেয়ে সহজ বিষ্ণুসহস্রনাম পাঠ করলে অনায়াসেই শুদ্ধভাবে পাঠ করতে পারবেন। আর ভগবানের নামোচ্চারণে আনন্দও পাবেন।"[৬৬]

এখানে একদিন স্বামীজীর রোগে প্রাণসংশয় উপস্থিত হয়। গুরুভাইরা কাঁদতে কাঁদতে ভগবানকে ডাকছেন। তুরীয়ানন্দজী 'আদিত্যহৃদয়স্তোত্র' পাঠ করছেন। হঠাৎ কোথা থেকে এক সাধু এসে উপস্থিত। তাঁর ওষুধে স্বামীজীর চেতনা ফিরে আসে। অজ্ঞান অবস্থায় স্বামীজীর বোধ হয়েছিল : "এখনও আমার বহু কর্ম অবশিষ্ট আছে, তাহা শেষ না হওয়া পর্যন্ত দেহত্যাগ হইবে না।"[৬৭] গুরুভাইদের স্পষ্ট প্রতীতি হলো—স্বামীজীর দেহ-মন অবলম্বনে যেন এক বিপুল অব্যক্ত শক্তি আত্মপ্রকাশের জন্য ব্যাকুল—যেন কোন সীমার মধ্যে তা আর আবদ্ধ থাকতে পারছে না—উপযুক্ত ক্ষেত্রলাভের জন্য তা অস্থির, চঞ্চল।[৬৮]

হিমালয়-ভ্রমণকালে স্বামীজী দেখেছিলেন সাধু-সমাজের জড়তা। স্বামী অখণ্ডানন্দ লিখেছেন : "স্বামীজী ও আমি একসঙ্গে যেতে যেতে পাহাড়ে এক জায়গায় দেখি, এক সাধু ধ্যান করতে বসেছে—বেশ কাপড়-চোপড় মুড়ি দিয়ে মাথা পর্যন্ত, আর সজোরে নাক ডাকাচ্ছে। স্বামীজী চেঁচিয়ে উঠেছেন, 'ওরে! বেটা বসে বসে ঘুমুচ্ছে—দে বেটার কাঁধে লাঙ্গল জুড়ে। তবে যদি এর কোন কালে কিছু হয়।' এসব দেখেশুনেই স্বামীজী বলতেন, 'সত্ত্বের ধুয়া ধরে দেশ তমঃসমুদ্রে ডুবতে বসেছে, এদের বাঁচাতে হলে চাই আপাদমস্তক শিরায় শিরায় বিদ্যুৎসঞ্চারী রজোগুণ।' তাইতো কর্মের উপর স্বামীজী জোর দিয়েছিলেন।"[৬৯]

হৃষীকেশে স্বামীজী অনেক মহাপুরুষ ও মহাত্মাদের দর্শন পেয়েছিলেন, যাঁরা আত্মগোপন করে থাকতেন। এঁদের সম্বন্ধে স্বামীজী বলতেন : "ইঁহাদের তপস্যা, তীর্থযাত্রা বা পূজাদির কোন প্রয়োজন নাই; তবে যে ইঁহারা তীর্থে তীর্থে ঘুরিয়া বেড়ান ও তপস্যাদি কঠোর অনুষ্ঠান করেন, সে শুধু নিজ নিজ পুণ্যবলে লোক-কল্যাণের জন্য।"[৭০] পওহারী বাবার গুহায় যে চোর চুরি

৬৫ যুগনায়ক বিবেকানন্দ, ১ম খণ্ড, পৃঃ ২৮৮

৬৬ স্মৃতির আলোয় স্বামীজী, পৃঃ ৭

৬৭ বিবেকানন্দ চরিত—সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার, ১৩৯৩, পৃঃ ৭৭

৬৮ যুগনায়ক বিবেকানন্দ, ১ম খণ্ড, পৃঃ ২৯২

৬৯ স্মৃতির আলোয় স্বামীজী, পৃঃ ১৭

করতে এসেছিল সে পরে তার জীবনধারা পরিবর্তন করে এবং এক অনুভূতিসম্পন্ন সাধুতে রূপান্তরিত হয়। স্বামীজী তারও দর্শন পেয়েছিলেন। তাই স্বামীজী বলতেন: "পাপীদিগের মধ্যেও সাধুত্বের বীজ লুক্কায়িত আছে।"[৭১]

ব্রহ্মানন্দজী তখন কনখলে তপস্যারত। স্বামীজীরা সকলে ব্রহ্মানন্দজীর সঙ্গে মিলিত হলেন। বহুদিন পরে গুরুভ্রাতারা পরস্পরের সাক্ষাৎ পেয়ে আনন্দে ভরপুর। তাঁরা সবাই সাহারানপুরের উকিল শ্রীবঙ্কুবিহারী চট্টোপাধ্যায়ের বাড়িতে উঠলেন। ওখানেই শুনলেন, অখণ্ডানন্দজী মীরাটে আছেন। সকলে মীরাট অভিমুখে যাত্রা করলেন। পরিব্রাজক জীবনে এখানেই স্বামীজীর হিমালয়-পরিক্রমার ইতি।

মীরাটে ডাক্তার ত্রৈলোক্যনাথ ঘোষের বাড়িতে অখণ্ডানন্দজীকে স্বামীজীরা দেখতে পেলেন। ডাঃ ঘোষ তাঁদের সাদর অভ্যর্থনা জানালেন। এখানে শেঠজীর বাগানে স্বামীজীরা বেশ কিছুকাল ছিলেন। স্বাস্থ্যের কারণে স্বামীজী প্রথমে ডাক্তার ঘোষের বাড়িতে থাকতেন। তীর্থশেষে গোপালদাদাও এসে তাঁদের সঙ্গে যোগ দিলেন। স্বামীজী, ব্রহ্মানন্দজী, তুরীয়ানন্দজী, সারদানন্দজী, অখণ্ডানন্দজী, অদ্বৈতানন্দজী ও কৃপানন্দজী মোট সাতজন গুরু-ভাই একসঙ্গে মিলিত হয়ে ধ্যান-ধারণায়, জপ-তপে, সাধন-ভজনে মেতে উঠলেন। শেঠজীর বাগান হয়ে উঠল 'দ্বিতীয় বরাহনগর মঠ'। এখানে স্বামীজী সংস্কৃতের ক্লাস নিতেন। এভাবে বহু সংস্কৃত বই তাঁর পড়া হয়ে গেল। স্বামীজী নিজেও খুব অধ্যয়ন করতেন। স্যার জন লাবকের গ্রন্থাবলী তিনি এখানে পড়ে শেষ করলেন। পরিপূর্ণ বিশ্রামের ফলে স্বামীজীর শরীরও সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে উঠল।

মীরাটের স্মৃতিচারণা করেছেন স্বামী তুরীয়ানন্দ: "মীরাটের অবস্থান যে কি সুখের হইয়াছিল তাহা বর্ণনা করা যায় না। স্বামীজী আমাদের জুতা-সেলাই হতে চণ্ডীপাঠ পর্যন্ত সব শিক্ষা সেই সময় দিতেন। এদিকে বেদান্ত, উপনিষদ্, সংস্কৃত নাটক-সকল পাঠ ও ব্যাখ্যা করিতেন, ওদিকে··· রান্না শিখাইতেন। আরও কত কি যে করিতেন।··· কত যে যত্ন, কত যে ভালবাসা, কত গল্প, কত বেড়ানো—সব স্মৃতিপটে জ্বলজ্বল করিতেছে।"[৭২]

মীরাটে গুরুভাইদের প্রীতির সম্বন্ধ আরও প্রীতিময়, সজীব ও নিবিড় হয়ে উঠেছিল—পরস্পর বিচ্ছিন্ন জীবনযাপন করা তাঁদের কাছে অকল্পনীয়। তাঁরা সকলেই স্বামীজীর প্রতি নির্ভরশীল। কিন্তু ঠিক সেসময়ে স্বামীজীর মনে অন্য চিন্তাস্রোত প্রবাহিত হচ্ছিল। তিনি ভাবলেন—প্রত্যেককেই আত্মনির্ভরশীল হতে হবে, কেউ কারুর মুখাপেক্ষী হয়ে থাকবে না। স্বামীজী শুনতে পেয়েছিলেন অন্তরের ডাক—নিঃসঙ্গ জীবনযাপন করার। তাই একদিন স্বামীজী অখণ্ডানন্দজীকে বললেন: "গুরুভাইদের সঙ্গে থাকায় তপস্যার বিশেষ বিঘ্ন হয়। দেখ না, তোমার ব্যারামে টিহিরিতে ভজন করতে পারলাম না। গুরুভাই-এর মায়া না কাটালে সাধন-ভজন হবে না। যখনই তপস্যা করব মনে করি, তখনই ঠাকুর একটা বাগড়া দেন। আমি এবার একলা বেরুব। কোথায় থাকব, কাউকে সন্ধান দেব না।"[৭৩] তিনি অন্য গুরুভাইদের ডেকে বললেন: "আমার জীবনব্রত স্থির হইয়া গিয়াছে। এখন হইতে আমি একাকী অবস্থান করিব; তোমরা আমায় ত্যাগ কর।"[৭৪] অখণ্ডানন্দজী খুব আপত্তি করলেন, কিন্তু স্বামীজী নিজের সংকল্পে অটল। গুরুভাইরা বাধ্য হয়ে স্বামীজীর নির্দেশ শিরোধার্য করলেন। গভীর ভারাক্রান্ত হৃদয়ে তাঁরা স্বামীজীকে বিদায় জানালেন।

স্বামীজীর একাকী পরিক্রমার কারণ নিশ্চয়ই আছে। তাঁর মনোভাণ্ডারে তখন কত বিচিত্র অভিজ্ঞতা, কত দর্শন, হৃদয়-কন্দরে কত অনুভূতি, ভাবী কার্যের জন্য তাঁর কত আকুলতা-ব্যাকুলতা, তাঁর মনোজগতে কত চিন্তা-ভাবনা। বিশেষতঃ ভবিষ্যৎ কর্মপন্থার জন্য স্বামীজীর প্রয়োজন ছিল প্রস্তুতির। নিঃসঙ্গ জীবন সহায়তা করবে সে-প্রস্তুতিকে। আর ভবিষ্যৎ কর্মপন্থার মধ্যে তাঁর মনে ছিল বিদেশে বেদান্তের প্রচার। ঘটনাচক্রে ধর্মসম্মেলনের আয়োজন-সংবাদ স্বামীজী পেয়েছিলেন তাঁর ভারত-পরিক্রমার সময়। কিন্তু এই নিঃসঙ্গ জীবনের ইঙ্গিত স্বামীজী কি শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে পাননি? [ক্রমশঃ]

৭০ যুগনায়ক বিবেকানন্দ, ১ম খণ্ড, পৃঃ ২৯৪
৭১ ঐ, পৃঃ ২৯৫
৭২ স্বামী তুরীয়ানন্দের পত্র, উদ্বোধন কার্যালয়, ১৩৭০, পৃঃ ১৯৩
৭৩ স্মৃতিকথা—স্বামী অখণ্ডানন্দ, পৃঃ ৬০
৭৪ যুগনায়ক বিবেকানন্দ, ১ম খণ্ড, পৃঃ ২৯৮

প্রাসঙ্গিকী

# 'উদ্বোধন'-এর প্রচ্ছদ এবং একটি অনুরোধ

স্বামী বিবেকানন্দ প্রবর্তিত 'উদ্বোধন' পত্রিকাটির আমি এক লোভী পাঠক ও অনুরাগী গ্রাহক। 'উদ্বোধন' পত্রিকার প্রতি সংখ্যার প্রচ্ছদেই পাওয়া যায় আত্মবিস্মরণের তামসিকতার করাল গ্রাস থেকে আত্মজাগরণের ভূমিতে উঠে আসবার সেই অমোঘ বার্তা—"উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্ নিবোধত।" এই পত্রিকার অন্তর্ভুক্ত বিভিন্ন লেখাগুলি একাধারে যেমন মনোগ্রাহী ও তথ্যপূর্ণ তেমনি অপরদিকে গভীর অনুসন্ধান-প্রসূত। একথা অবশ্য বলার অপেক্ষা রাখে না। কিন্তু 'উদ্বোধন'-এর প্রচ্ছদগুলিও গভীরতা ও ভাবব্যঞ্জনায় কিছু কম নয়। তবে প্রতি বছর উদ্বোধনের নববর্ষে ( মাঘ সংখ্যায় ) যে-প্রচ্ছদ আমরা পাই তা হাতে নিয়ে বিস্ময়-বিমুগ্ধ চিত্তে রোমাঞ্চিত হতে থাকি যখন দেখি এ-প্রচ্ছদ নিজেই এক ব্যঞ্জনাময় ভাব ও কখনো প্রিয় বস্তুর অনন্যসাধারণ আলোকচিত্র নিয়ে উপস্থিত। আবার প্রতি বছরেই উদ্বোধনের শারদীয়া সংখ্যাটির প্রচ্ছদও শৈল্পিক মাত্রায় অসাধারণ। এখন বার্ষিক প্রচ্ছদগুলির প্রসঙ্গে আসি।

৯৩তম বর্ষে উদ্বোধনের প্রচ্ছদে আমরা বেলুড় মঠের মায়ের মন্দিরের এবং ৯৪তম বর্ষে দক্ষিণেশ্বরের মন্দিরগুলির যে অসামান্য আলোকচিত্র পাই, তার প্রাসঙ্গিকতার কথা আপনাদের প্রদত্ত 'প্রচ্ছদ পরিচিতি'-তে পেয়েছি। বিদগ্ধ অধ্যাপক শংকরীপ্রসাদ বসু মহাশয় ৯৩তম বর্ষের প্রচ্ছদ সম্পর্কে লিখেছিলেন : "উদ্বোধনের প্রচ্ছদ অপূর্ব। প্রকৃতির ভিতর থেকে মহাপ্রকৃতি যেন উঠছেন। চমৎকার।" ৯২তম বর্ষে আমরা প্রচ্ছদে পেয়েছিলাম বেলুড় মঠের শ্রীরামকৃষ্ণ মন্দিরের 'গোপুরম', যেখানে উৎকীর্ণ হয়ে আছে স্বামীজীর পরিকল্পিত শ্রীরামকৃষ্ণ মঠের প্রতীক। প্রচ্ছদে যখন এই প্রতীকটিকে বড় আকারে দেখি তখন এর অন্তর্নিহিত অর্থ বারবার মনে অনুরণন তোলে। ৯১তম বর্ষে পেয়েছিলাম বেলুড়ে বিবেকানন্দ মন্দিরের আলোকচিত্র। হাতে উদ্বোধন, যা কিনা "স্বামীজীর শঙ্খ", "ভাবপ্রতিমা" ও "বাণীশরীর"; আর প্রচ্ছদে বিবেকানন্দ মন্দির। মনে হয়, স্বামীজীর কাছেই যেন বসে আছি। ৯০তম বর্ষের প্রচ্ছদটি দেখলেই মনে পড়ে, স্বামীজীর সম্পর্কে ঠাকুরের সস্নেহ তিরস্কারের কথা—"কোথায় তুই একটা বিশাল বটবৃক্ষের মতো হবি—তোর ছায়ায় হাজার হাজার লোক আশ্রয় পাবে—তা না হয়ে কিনা তুই নিজের মুক্তি চাস।" এই প্রচ্ছদটি প্রকাশ করছে সেই বিশ্ব-আমিত্ববোধের স্ফুরণের ক্রমপর্যায় ও বিবেকানন্দ-রূপ মহীরূহকে। ৮৯তম বর্ষের প্রচ্ছদে দেখা যাচ্ছে সমুদ্রের মধ্য দিয়ে সূর্য উঠছে। মনে করিয়ে দিচ্ছে, এ সমুদ্র তো আমাদের প্রত্যেকের মধ্যেই রয়েছে। মনের ক্লীবতা, জড়তা, নৈরাশ্যই সেই সমুদ্র। সেই সমুদ্র ভেদ করে আমরাই সূর্য হয়ে প্রকাশিত হতে পারি। ৮৮তম বর্ষের প্রচ্ছদে কাশীপুর উদ্যানবাটীর এক অপরূপ সুন্দর চিত্র পেয়েছিলাম। এই চিত্র স্মরণ করিয়ে দিয়েছিল, আমাদের হৃদয়-কাশীপুরে কল্পতরু শ্রীশ্রীঠাকুরের পুণ্যময় উপস্থিতি। মানুষের দুঃখ, জ্বালা, যন্ত্রণা দেখে ঠাকুরের শ্রীমুখ-নিঃসৃত আশীর্বাদ কানে যেন বাজতে থাকে—"তোদের চৈতন্য হোক।"

এইভাবে প্রতিটি প্রচ্ছদই এক নববোধের দরজা খুলে দিচ্ছে। আর কয়েক বছর পরেই শতবর্ষে উদ্বোধন পা রাখবে। এই একশো বছরে উদ্বোধনে যেসমস্ত প্রচ্ছদ ছাপা হয়েছে ও হবে, সেই সমস্ত প্রচ্ছদগুলি নিয়ে যদি সেগুলির পরিচিতি-সহ একটি পৃথক বই বের করা হয় তবে আমরা দুই মলাটের মধ্যে একটি শতাব্দীকে দেখতে পাব। প্রতিটি প্রচ্ছদ আমাদের পৌঁছে দেবে বিগত শতাব্দীর প্রতিটি বছরের দরজায়। আমাদের মনোভূমি ও চিন্তা-জগৎ সেই বিশেষ দর্শনে অভিসিঞ্চিত হবে। এতে আগ্রহী পাঠক ও গবেষকরাও পাবেন নতুনতর জ্ঞান ও গবেষণার এক জগতের সন্ধান। ☐

অনুপকুমার মণ্ডল
চকচাটুরিয়া,
পোঃ—ন পাড়া, উত্তর ২৪ পরগনা

বিজ্ঞান-নিবন্ধ

# দীর্ঘ জীবনের বৈজ্ঞানিক কারণ

## সৈয়দ আনিসুল আলম

ভাগ্যের খেলায় অথবা খেয়াল-খুশিমত আপনিই মানুষ দীর্ঘ জীবন লাভ করে না। এর পশ্চাতে বৈজ্ঞানিক কারণ রয়েছে। দু-একটা সহজ উদাহরণ দিয়ে বলছি। এই শতকের গোড়ার দিকে আমাদের এদেশের মানুষের গড় আয়ু ছিল মাত্র তিরিশ বছর। কিন্তু এখন তা বেড়ে প্রায় দেড়গুণ হয়ে গেছে। এই সুনিশ্চিত উন্নতির কারণ হলো বিজ্ঞানের আশীর্বাদ এবং মানুষের আন্তরিক প্রচেষ্টা। সেযুগে এদেশে ছিল বসন্ত, ম্যালেরিয়া ইত্যাদির প্রচণ্ড দাপট। এক-একবারে এরা মড়কে উজাড় করে দিত গ্রাম, গঞ্জ ও নগর। বৈজ্ঞানিক চিকিৎসাপদ্ধতি এনে দিল যুগান্তর। বসন্তের টিকা আবিষ্কৃত হলো। এখন বসন্ত এদেশে আর নেই। ম্যালেরিয়া কিছুটা থাকলেও তেমন মারাত্মক নয়। নতুন নতুন আবিষ্কার এবং উন্নত চিকিৎসাব্যবস্থার ফলে কলেরা ও টাইফয়েডের মতো ভয়াল রোগের বিষদাঁত চূর্ণ হয়ে গেছে। মধ্যযুগের অন্ধকারে ইংল্যান্ডে প্লেগমহামারী প্রায়ই লেগে থাকত। বর্তমান যুগে বিজ্ঞানের কল্যাণে ইংল্যান্ড থেকে চিরকালের মতো এই সকল মহামারী বিদায় নিয়েছে।

দীর্ঘ জীবনের বৈজ্ঞানিক কারণ খুঁজতে ১৯৬০ খ্রীস্টাব্দে একদল বিজ্ঞানী আমেরিকায় কয়েকশো দীর্ঘজীবী মানুষদের নিয়ে একটি সমীক্ষা চালান। ঐ সমীক্ষায় তাঁদের মধ্যে আচার-আচরণের কিছুটা ভিন্নতা পাওয়া গেলেও কয়েকটি মূল্যবান বিষয়ে বিজ্ঞানীরা পেয়েছিলেন সুন্দর সামঞ্জস্য এবং এগুলোই ছিল, তাঁদের মতে, দীর্ঘ জীবনের সঠিক কারণ। সেগুলোই এখন বর্ণনা করা যাক।

(১) তাঁদের ছিল দৈনিক কাজকর্মে নিয়মানুবর্তিতা। নির্দিষ্ট কাজ তাঁরা নির্দিষ্ট সময়েই করতেন।

(২) তাঁরা সবসময় আহার করতেন টাটকা ফলমূল এবং তাজা শাকসবজি। ভেজাল ও কৃত্রিম খাদ্য তাঁরা খাননি।

(৩) তাঁদের ছিল নিরলস কর্মবহুল জীবন এবং সকল কাজেই সানন্দে অংশগ্রহণ।

(৪) অবসর জীবনেও তাঁরা নিজেদের কিছু-না-কিছু কাজে যুক্ত রেখেছেন। বাগানের কাজ, বই পড়া বা লেখার কাজ, সংসারের হালকা ধরনের কাজ তাঁরা করেছেন। কাজের সঙ্গে সঙ্গে তাঁরা বিশ্রামও নিয়েছেন।

(৫) তাঁরা ছিলেন নিরুদ্বিগ্ন ও দুশ্চিন্তামুক্ত।

(৬) তাঁরা প্রয়োজনীয় কথাটুকু ছাড়া বেশি কথা বলতেন না।

(৭) পারিবারিক জীবনে তাঁরা ছিলেন সুখী এবং প্রাণোচ্ছল।

(৮) তাঁরা কেউ বেশি ওষুধ ব্যবহার করা পছন্দ করতেন না।

(৯) তাঁরা সকলেই নীতিপরায়ণ এবং সাধারণতঃ ধর্মভাবাপন্ন ছিলেন।

(১০) তাঁরা মজলিসী নির্মল আমোদ পছন্দ করতেন।

রাশিয়ার ককেশাস অঞ্চলের জর্জিয়া, তাজিকিস্তান এবং কাশ্মীরের হুনজা অঞ্চলের অধিবাসীদের গড় বয়স অন্যান্য স্থানের সাধারণ লোকজনের তুলনায় অনেক বেশি। এমন হবার যথেষ্ট কারণ রয়েছে। ঐ সকল স্থানে রয়েছে সবরকম দূষণহীন পরিচ্ছন্ন পরিবেশ, নির্মল আকাশ, রোদঝলমল পরিমণ্ডল। আরও রয়েছে সবুজ ফসলে ভরা বড় বড় মাঠ। বাগানভরা পুষ্টিকর ফলমূল ও সবজি। সেখানে ঘিঞ্জি বসতি, কোন কল-কারখানার ধোঁয়া নেই। সেখানকার বাতাসে ধুলো নেই। সেখানে কোন উচ্চ শব্দ নেই, যে-উচ্চ কর্কশ শব্দ দেহের স্নায়ুমণ্ডলের ওপর অনিষ্টকর প্রতিক্রিয়া আনে।

অল্প বয়সে দেহকোষের বিভাজন ঠিকমত হতে থাকে। দেহের বৃদ্ধি ও গঠন ভালভাবে চলতে থাকে। বয়স বাড়লেই দেহকোষের বিভাজন-শক্তি কমে যায়। তাই নতুন দেহকোষ তৈরি কম হয়। এইভাবে দেহকোষ তৈরি হওয়া অপেক্ষা দেহকোষ ধ্বংসের পরিমাণ বেড়ে যায়। এর ফলে দেহের দ্রুত পরিবর্তন আসে। তাড়াতাড়ি দেহে বার্ধক্য এসে যায়।

পূর্বপুরুষ-অর্জিত বৈশিষ্টের ফলে বার্ধক্য এবং দীর্ঘ জীবনের প্রতিক্রিয়া পরবর্তী সন্তানদের ওপর আসে। পিতৃপুরুষদের জিনের প্রভাবেই তা হওয়া সম্ভব। চুল পাকা, পেশী সিথিল হওয়া, চামড়া কুঁচকে যাওয়া, কপালে ভাঁজ পড়া ইত্যাদি।

মস্তিষ্কই দেহের সবরকম মূল্যবান কাজের ধারক ও বাহক। কিন্তু বয়স বাড়লে সাধারণতঃ মস্তিষ্কে নিউরোম্যালানাইন পিগমেন্ট ( neuro-malanine pigment ) জমা হয় বেশি। মস্তিষ্কের বিভিন্ন অংশে বিভিন্ন প্রকৃতির এই পিগমেন্ট ( pigment ) তৈরি হয়। এই অপ্রয়োজনীয় পদার্থ মস্তিষ্কে যত বেশি জমবে তত বেশি তার কার্যকরী শক্তি কমে যাবে। বার্ধক্যের এটা একটা বড় কারণ। পুষ্টিকর খাদ্য, ভাল পরিবেশ ও দেহকোষের সক্রিয়তা মস্তিষ্কে এই pigment জমা হওয়া কমায়। যার ফলে বার্ধক্য বিলম্বে আসতে সহায়তা করে।

ভাল-মন্দ পরিবেশের স্ট্রেস ( stress ) বা আঘাত বার্ধক্য এবং দীর্ঘ জীবনের ওপর যথেষ্ট প্রতিক্রিয়াশীল। পরিবেশ দুই প্রকার—অন্তরের ও বাইরের। ভাল পরিবেশ ভাল এবং মন্দ পরিবেশ মন্দ প্রতিক্রিয়া আনবে। আগেই বলা হয়েছে, রাশিয়ায় ককেশাস অঞ্চলের জর্জিয়া, তাজিকিস্তান এবং কাশ্মীরের হুনজা অঞ্চলের অধিবাসীদের গড় বয়স অন্যান্য স্থানের তুলনায় অনেক বেশি। বিনা কারণে এমনটি ঘটেনি। এই সকল অঞ্চলে রয়েছে সব রকম দূষণহীন পরিবেশ।

রোগহীন সুস্বাস্থ্য বিলম্বে বার্ধক্য আনে। দীর্ঘ জীবনলাভের ক্ষেত্রে সবচেয়ে প্রয়োজনীয় এবং গুরুত্বপূর্ণ হলো সুষম খাদ্য গ্রহণ। বয়স অনুপাতে, দেহের ওজন ও চাহিদামত উপযুক্ত পরিমাণ খাদ্য চাই। দৈহিক ও মানসিক কর্ম ও শ্রম বিচার-বিবেচনা করে খাদ্যতালিকা তৈরি হবে। আবার ঋতু অনুযায়ী খাদ্যের পরিবর্তন আনতে হয়। শুধু এই ব্যবস্থামত সুষম খাদ্য খেলেই দায়িত্ব শেষ হয় না। খাদ্য-বস্তুগুলো যাতে ভালভাবে হজম হয় সেদিকে বিশেষ নজর দিতে হবে। প্রয়োজনের থেকে বেশি আহার ক্ষতিকর। আবার দৈহিক প্রয়োজন থেকে অল্প আহারের পরিণামও খারাপ। দৈহিক বল ও শক্তির প্রয়োজনে শর্করা ও প্রোটিন জাতীয় খাদ্য চাই। মানসিক কাজের উৎসাহ ও শক্তি আনতে পটাসিয়াম ও ফসফরাস-ঘটিত খাদ্য-বস্তুই উত্তম। দেহের প্রয়োজনের তুলনায় অল্প আহার আয়ুহ্রাসের অন্যতম কারণ। ড্রাসোফিলা ও ইঁদুরের ওপর পরীক্ষা করে এই তথ্য প্রমাণিত হয়েছে।

বেশি বয়স হলে স্বাভাবিক কারণেই দেহযন্ত্র-গুলো দুর্বল হয়ে পড়ে। তাই খুশিমত লোভে পড়ে দেহের পক্ষে অনিষ্টকর দ্রব্যাদি আহার করলে অথবা বেশি আহার করলে দুর্বল দেহযন্ত্রগুলো আরও তাড়াতাড়ি অকেজো এবং দুর্বল হয়ে পড়বে। বয়স্ক লোকদের বেশি মাংস ও চর্বিজাতীয় খাদ্য খুব অনিষ্টকর। এর ফলে কিডনী ও হার্টের অসুখ হতে পারে। তার কারণ রক্তে কোলেস্টেরল নামক ক্ষতিকর পদার্থ প্রয়োজনীয় পরিমাণের তুলনায় অনেক বেশি জমা হতে থাকে। এতে ধমনীর ভিতরের দেওয়ালগুলো শক্ত ও মোটা হয়ে যায়। রক্ত জমাট বেঁধে রক্ত চলাচলে বাধার সৃষ্টি করে। এর ফলে স্ট্রোক বা থ্রম্বোসিস হতে পারে। আবার অনেককে মূত্রযন্ত্রের জটিল পীড়ায় মৃত্যুর দিকে এগিয়ে নিয়ে যায়। কেউ কেউ দেখিয়েছেন যে, যে-সকল দেশে আমিষভোজীর সংখ্যা বেশি সেখানে ক্যান্সার রোগে মৃত্যুর হার বেশি। সেদিক থেকে নিরামিষ ভোজনই সবচেয়ে নিরাপদ।

উপযুক্ত পুষ্টি ও ক্ষয় পূরণের অভাবে দেহ ক্রমশঃ দুর্বলতর হতে থাকে। দেহে রোগ প্রতিরোধ শক্তি কমে যায়। নানারকম ব্যাধি আক্রমণ করার সহজ সুযোগ পায়।

দীর্ঘজীবী মানুষের বংশে বিবাহ করলেও

পরবর্তী প্রজন্মের সন্তানাদি দীর্ঘজীবী হতে দেখা যায়। বংশগতি বা জিনের প্রভাবেই এটা ঘটে।

দীর্ঘ জীবনের আরও একটা বড় অন্তরায় বা বাধা হলো মানসিক দুঃখ, দুশ্চিন্তা ও অশান্তি। এই সকল মানসিক চিন্তা বা আঘাতগুলো মানব-দেহকে কুরে কুরে খায়। যতই ভাল খাদ্যবস্তু আহার করা যাক না কেন মানসিক চিন্তা দেহের নার্ভ ও মস্তিষ্ককে দুর্বলতর করতে থাকবে। তাছাড়া পাকস্থলী এবং দেহের মূল্যবান যন্ত্রগুলোর কাজ-কর্মে ব্যাঘাত সৃষ্টি করবে। মুখমণ্ডলসহ সারা দেহের মাংসপেশী শুকোতে থাকবে। তাই যেকোন উপায়েই হোক সবরকম ক্ষতিকর মানসিক চিন্তা বা আঘাত সহ্য করার শক্তি গড়ে তুলতে হবে।

নেশার বস্তুগুলো, যেমন হেরোইন, হাশিশ ইত্যাদি অত্যন্ত অনিষ্টকর। তাছাড়া মদ ইত্যাদিও ক্ষতিকর। এজন্য এগুলো সবই মানুষের দীর্ঘ জীবনের পথে মস্ত বাধা। সমীক্ষা চালিয়ে দেখা গেছে, যাঁরা ধূমপান করেন না তাঁদের আয়ু ধূমপানকারীদের থেকে বেশি হয়।

দেখা গেছে যাঁরা দীর্ঘ দিন বেঁচে থাকেন তাঁরা মিতাহারী হন, তাঁদের দৈনন্দিন জীবনযাত্রা হয় নিয়মিত, রুটিনমাফিক। খুব ভোরে তারা ওঠেন, প্রাতঃভ্রমণ করেন, হালকা ব্যায়াম বা যোগাসন করেন, তাঁদের দৈনন্দিন খাদ্য সাধারণতঃ ডাল, রুটি, দুধ ও তরকারি। এই শতকের সবচেয়ে দীর্ঘ-জীবী মানুষ জারো আগা ১৫৬ বছর বয়সেও বেশ চলাফেরা করতেন। ছোটখাটো সহজ কাজকর্মও করতেন। চোখে চশমা নিতেন না। তিনি ছিলেন আজীবন নিরামিশাষী।

দেহকে কর্মহীন রাখা দীর্ঘ জীবনের পথে বড় বাধা। তাই যাঁরা কাজকর্ম করেন না, যাঁদের দৈহিক অঙ্গ পরিচালনার প্রয়োজন হয় না তাঁদের দৌড়ানো অথবা ভ্রমণ, সামর্থ্যমত নিয়মিত ব্যায়াম বা আসন ও পরিমিত আহার একান্ত দরকার।

উল্লিখিত বিষয়গুলি বিচার-বিবেচনা করলে দেখা যায়, দীর্ঘ জীবনলাভ একটা বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়। বিজ্ঞানের সমস্ত বিধানগুলি জ্ঞাতসারে অথবা অজ্ঞাতসারে সারাজীবন নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করাই দীর্ঘ জীবনলাভের মূল কারণ। ☐

## গ্রন্থ-পরিচয়

# শ্রীরামকৃষ্ণ এবং শ্রীমা সম্পর্কে দুটি গ্রন্থ

### তাপস বসু

**শ্রীশ্রীমা সারদা কথামৃত :** পরিমল চক্রবর্তী ও অপর্ণা চক্রবর্তী। মাদার পাবলিকেশন্স, ৩৪/২এ, ঝামাপুকুর লেন, কলকাতা-৭০০ ০০৯। পৃষ্ঠা : ২০৪+১৬। মূল্য : সাতাশ টাকা।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত বিশ্ববিখ্যাত একটি গ্রন্থ। এই অনন্য গ্রন্থের অনুসরণে বিভিন্ন মহাপুরুষের নানা আধ্যাত্মিক উপদেশাদি বর্তমান কালে লেখা হচ্ছে এবং ভবিষ্যতেও হবে। কিন্তু শ্রীশ্রীমা সারদা-দেবীর কোন কথামৃত আমরা পাইনি। স্মৃতিচারণা-মূলকগ্রন্থ 'শ্রীশ্রীমায়ের কথা' এবং 'মাতৃদর্শন', ব্রহ্মচারী অক্ষয়চৈতন্যের 'শ্রীশ্রীসারদাদেবী', স্বামী ঈশানানন্দের 'মাতৃসান্নিধ্যে', স্বামী সারদেশানন্দের 'শ্রীশ্রীমায়ের স্মৃতিকথা', স্বামী গম্ভীরানন্দের 'শ্রীশ্রীমা সারদাদেবী', স্মৃতিচারণে সমৃদ্ধ 'শতরূপে সারদা' প্রভৃতি গ্রন্থে ছড়িয়ে আছে শ্রীশ্রীমায়ের অপরূপ নানা কথা। শুধু তাই নয়, তাঁর সমগ্র জীবনের রূপচ্ছবি আমাদের যন্ত্রণাকাতর হৃদয়কে সান্ত্বনা দেয়, শক্তি যোগায়, আর তাঁর বাণী আমাদের হৃদয়ে শুভবোধের আলো জ্বালে, শতদলকে বিকশিত করে।

এই সান্ত্বনা, শক্তি ও আলোর উৎসকে সামনে রেখে পরিমল চক্রবর্তী ও অপর্ণা চক্রবর্তী প্রণীত 'শ্রীশ্রীমা সারদা কথামৃত' প্রস্তুত হয়েছে। উপরোক্ত গ্রন্থগুলিতে শ্রীশ্রীমায়ের যে-কথাগুলি আমরা পাই সেগুলি ছয়টি ভাগে বিভক্ত করে এখানে সাজিয়ে দেওয়া হয়েছে। বিভাগগুলি হলো—ভক্তি, ভালবাসা, মন, কর্ম, সন্ন্যাস ও সংসার। বিভাগগুলি নিঃসন্দেহে গুরুত্বপূর্ণ

আলোচ্য গ্রন্থে শ্রীশ্রীমায়ের কথামৃতের সঙ্গে আমরা পেয়েছি ভালবাসার মূর্তবিগ্রহ শ্রীশ্রীমাকেও।

গ্রন্থটির ছাপা ভাল। স্বামী পূর্ণাত্মানন্দের ভূমিকাটি ছোট হলেও মনোজ্ঞ এবং তথ্যসমৃদ্ধ।

**কথামৃত কুইজ :** পরিমল চক্রবর্তী, অপর্ণা চক্রবর্তী, শিবানী চক্রবর্তী। মাদার পাবলিকেশন্স, ৩৪/২, ঝামাপুকুর লেন, কলকাতা-৭০০ ০০৯। পৃষ্ঠা : ৮+১৩৬। মূল্য : সতেরো টাকা।

আজকাল 'কুইজ' অর্থাৎ নানা বিষয়ে প্রশ্নোত্তর সর্বত্র খুবই জনপ্রিয়তা পেয়েছে। কুইজ নিয়ে নানা প্রতিযোগিতা যেমন হচ্ছে, তেমনি কুইজ নিয়ে নানা গ্রন্থ বিচিত্র সব বিষয় নিয়ে প্রকাশিত হচ্ছে।

রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ বিষয় নিয়ে নানা অনুষ্ঠানে, প্রতিযোগিতায় ইদানীংকালে আমরা 'কুইজ' বিষয়টির ব্যাপক প্রসার লক্ষ্য করছি। এবিষয়ে ছাত্র-যুব তথা সাধারণ মানুষের আগ্রহের দিকে লক্ষ্য রেখেই আলোচ্য গ্রন্থটি প্রকাশিত হয়েছে। এই গ্রন্থে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃতের অমৃত কথাগুলি আরও সহজ, সরল ভঙ্গিতে প্রশ্নোত্তরের আকারে সুন্দরভাবে সাজিয়ে প্রকাশ করা হয়েছে। আরও একটি কথা। যাঁরা শ্রীরামকৃষ্ণ বিষয়ে অজ্ঞ, তাঁরা এই গ্রন্থটি পড়ে তাঁদের অজ্ঞতা দূর করতে পারবেন।

শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনের নানা ঘটনা, শ্রীরামকৃষ্ণের সান্নিধ্যে যাঁরা এসেছিলেন তাঁদের কথা, বিশেষ করে গত শতাব্দীর গুরুত্বপূর্ণ নানা অধ্যায় ও বিশিষ্ট ব্যক্তির মুখগুলোও এই 'কথামৃত কুইজ' গ্রন্থে আমরা পেয়ে যাই। তাছাড়া পাঁচখণ্ড কথামৃতের কিছু আস্বাদ স্বামী কমলেশানন্দের ভূমিকা সম্বলিত এই ছোট বইতে পাওয়া যায়।

### রমা চক্রবর্তী

**দাস হারাণ :** তারাশঙ্কর চট্টোপাধ্যায়। মাকড়দহ, শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ সাধনালয়, হাওড়া। পৃষ্ঠা : ৮+২৪৮। মূল্য : তিরিশ টাকা।

তারাশঙ্কর চট্টোপাধ্যায়ের 'দাস হারাণ' বইখানি নিঃসন্দেহে একজন আদর্শ গৃহী ভক্তের উজ্জ্বল চিত্র। যুগাবতার শ্রীরামকৃষ্ণ-কথিত 'বাজনার বোল হাতে আনার' সুন্দর রূপায়ণ এই জীবনালেখ্য। বস্তুতঃ হারাণচন্দ্র মুখোপাধ্যায় বাহ্যিক দৃষ্টিতে একজন সাধারণ সংসারধর্মী মানুষ। কিন্তু ফল্গুধারার

মতো অন্তঃসলিলা তাঁর ভক্তি-প্রবাহিনী। সেই পূত সলিলে অবগাহন করে ধন্য হয়েছেন অসংখ্য ভক্ত। লেখকও সেই অনুরাগী ভক্তগোষ্ঠীর অন্যতম। তার লেখনীগুণে বইখানির পূর্বাপর কোন অংশে সেই মহান চরিত্র ক্ষুণ্ণ হয়নি। তাঁর প্রতি লেখকের গভীর অনুরক্তি প্রকাশ পেয়েছে স্থানে স্থানে। তাঁর সহজ-সরলভাবে পথের নির্দেশদান অনুগামীদের প্রতি এক বিশেষ আকর্ষণীয় বিষয়। বইখানির শিরোনামটিও অর্থপূর্ণ। হারাণচন্দ্র যথার্থই 'বড়লোকের বাড়ির দাসী'র মতন নিজেকে রেখেছিলেন। সংসারের কর্তব্যকর্মের মাঝে সম্পূর্ণ ঈশ্বরনির্ভর ছিল তাঁর মন, তাঁর জীবন, তাঁর আচরণ। 'সাধনালয়ে' ভক্তদেরও তিনি এই ভাবেই উপদেশ দিতেন।

সমালোচনার দৃষ্টিতে বলতে গেলে অবশ্য বলা যায় যে, বইখানিতে ভাবের প্রাধান্য থাকলেও ভাষার বৈচিত্র্য ও আকর্ষণ তেমন কিছু নেই। তবুও বলা যায়, বইখানি এক মহান জীবন ও তাঁর আরাধ্যা জননী সারদামণির একটি পূর্ণাবয়ব চিত্র পাঠকের সামনে উপস্থাপন করতে সমর্থ হয়েছে।

# রসোত্তীর্ণ একটি গীতি-গ্রন্থ

## অনুপকুমার রায়

**গীতি মঞ্জরী :** মণীন্দ্রনাথ সান্যাল। পরিবেশনায় : নাথ ব্রাদার্স, ৯ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা-৭০০ ০৭৩। পৃষ্ঠা : ১০+১১৯। মূল্য : কুড়ি টাকা।

মণীন্দ্রনাথ সান্যালের রচিত গীতি মঞ্জরী (প্রথম খণ্ড) শীর্ষক গীতি-গ্রন্থটি ইদানীংকালে প্রকাশিত অনেক গীতি-গ্রন্থ থেকে স্বতন্ত্র। শ্রীসান্যাল তাঁর এই গ্রন্থে সর্বমোট ৪২টি গান সংকলন করেছেন। সূচীপত্রে গানগুলিকে তিনটি পর্যায়ে বিভক্ত করা হয়েছে : প্রথম (ঋতুবন্দনা), দ্বিতীয় (প্রভাতী), তৃতীয় (আরাধনা)।

প্রস্তাবনায় শ্রীসান্যাল জানিয়েছেন যে, তৃতীয় পর্যায় বা 'আরাধনা' পর্যায়ের অধিকাংশ গান উপনিষদ্ এবং শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃতের ভাবাশ্রয়ী। আলোচ্য গ্রন্থটি পর্যালোচনা করলে বোঝা যায় যে, রবীন্দ্রনাথের গানের ভাব ও বাণী রচয়িতাকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করেছে। এছাড়া অনেক সুপরিচিত গানের ভাব ও বাণীর প্রভাবও রচয়িতার গানগুলিতে লক্ষ্য করা যায়। এই প্রভাব, বলা বাহুল্য, গানগুলিকে সমৃদ্ধ করেছে, নতুন প্রাণরসে সঞ্জীবিত করে নতুন মাত্রা সংযোগ করেছে। প্রত্যেকটি গানের রাগ উল্লেখ করে দেওয়া হয়েছে এবং সুন্দর স্বরলিপিও উপস্থাপিত হয়েছে। শ্রীসান্যাল তাঁর অধিকাংশ গানের সুরারোপ করতে গিয়ে শুদ্ধ রাগ-রাগিণীর আশ্রয় নিয়েছেন। তিনি নিজে সুগায়ক হওয়ায় গানগুলির ভাষা ও ভাবের সঙ্গে সুরের সুন্দর সমন্বয় ঘটাতে পেরেছেন। এর ফলে গানগুলি রসোত্তীর্ণ হতে পেরেছে।

গানগুলির বাণী মনের মধ্যে একটি ধ্বনি তোলে। দৃষ্টান্তস্বরূপ কিছু গানের দুই-এক কলি করা যেতে পারে।—

"আমি যদি ভুলি তোমায়
তুমি কি মা, ভুলতে পারো ?

তোমার আলোধারায় মাগো,
হৃদয় আমার পূর্ণ করো।" (৩২)

"এ কী করুণাধারা—
ছন্দে সুরে মহাবিশ্বে প্রাণে জাগায় সাড়া।
সে সুরধারা স্রোতের মতো
বহিয়া যায় অবিরত,
পরশে তার বিশ্ব জাগে,
জাগে সূর্য-তারা।" (৩৭)

"হে মনপ্রাণ-সাথী, প্রভু মোর,

*

আমারে জীবন করি দান
আড়ালে রয়েছো হে মহীয়ান।
আলোকে এসো গো, ঘুচাও আঁধার,
চির প্রেমে বাঁধো তোমার আমার
মিলন-ডোর।" (৪২)

প্রতিটি গানেই শ্রীসান্যালের ভাবুক ও সাধক মনটি ধরা পড়ে এবং সেই ভাব ও সাধনাপ্রবাহ পাঠক ও শ্রোতার মনে সঞ্চারিত হয়। এখানেই গানগুলির সার্থকতা। ☐

# রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশন সংবাদ

## উৎসব-অনুষ্ঠান

গত ২৩ ফেব্রুয়ারি '৯৩ বেলুড় মঠে শ্রীরামকৃষ্ণ দেবের ১৫৮তম আবির্ভাব-উৎসব নানা অনুষ্ঠানের মাধ্যমে উদ্‌যাপিত হয়। ঐদিন প্রায় ২৫ হাজার ভক্ত নরনারীকে হাতে হাতে খিচুড়ি প্রসাদ দেওয়া হয়। অপরাহ্ণে স্বামী লোকেশ্বরানন্দের সভাপতিত্বে এক জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। ২৮ ফেব্রুয়ারি '৯৩ অনুষ্ঠিত হয় সাধারণ উৎসব। ঐ দিন অগণিত নরনারী সারাদিন ধরে নানা অনুষ্ঠানে যোগদান করেন। দুপুরে প্রায় ৩৩ হাজার ভক্তকে হাতে হাতে খিচুড়ি প্রসাদ দেওয়া হয়।

গত ১৬ ডিসেম্বর থেকে ২০ ডিসেম্বর '৯২ পর্যন্ত বারাসাত রামকৃষ্ণ মঠে বার্ষিক উৎসব বেদপাঠ, শ্রীশ্রীচণ্ডীপাঠ, বিশেষ পূজা, ধর্মসভা, ভক্তিগীতি প্রভৃতির মাধ্যমে উদ্‌যাপিত হয়। চারদিনে ধর্মসভায় সভাপতিত্ব করেন যথাক্রমে স্বামী মুমুক্ষানন্দ, স্বামী অসক্তানন্দ, স্বামী প্রভানন্দ এবং স্বামী লোকেশ্বরানন্দ। বক্তা ছিলেন স্বামী ভৈরবানন্দ, স্বামী বিশ্বনাথানন্দ, স্বামী দিব্যানন্দ, স্বামী বিমলাত্মানন্দ, স্বামী পূর্ণাত্মানন্দ, স্বামী জয়ানন্দ, স্বামী পূর্ণানন্দ এবং ডঃ তাপস বসু। উৎসবের কয়দিন প্রায় ১২০০০ ভক্তকে হাতে হাতে খিচুড়ি প্রসাদ বিতরণ করা হয়।

স্বামী বিবেকানন্দের ভারত-পরিক্রমার তাৎপর্য বিষয়ে স্বামী প্রভানন্দের পৌরোহিত্যে স্বামী পূর্ণাত্মানন্দ এবং ডঃ তাপস বসু ভাষণ দেন।

গত ১৪ জানুয়ারি ১৯৯৩ মেদিনীপুর রামকৃষ্ণ মঠে স্বামী বিবেকানন্দের ১৩১তম পুণ্য জন্মতিথি সারাদিনব্যাপী অনুষ্ঠানের মাধ্যমে উদ্‌যাপিত হয়। সন্ধ্যায় আলোচনাসভায় সভাপতিত্ব করেন স্বামী সারদাত্মানন্দ। স্বামীজীর জীবন ও বাণী নিয়ে আলোচনা করেন ডঃ তাপস বসু।

## জাতীয় যুবদিবস ও জাতীয় যুবসপ্তাহ পালন

পুরী রামকৃষ্ণ মিশন গত ১২ জানুয়ারি '৯৩ এক যুব সমাবেশের আয়োজন করেছিল। তাছাড়া সপ্তাহব্যাপী বিভিন্ন বিদ্যালয়ে ও মহাবিদ্যালয়ে ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে বক্তৃতা প্রতিযোগিতা এবং বিভিন্ন গ্রামে জনসভার আয়োজন করা হয়।

নট্টরামপল্লী (তামিলনাড়ু) আশ্রম জাতীয় যুবদিবস উপলক্ষে গত ৩০ জানুয়ারি উচ্চবিদ্যালয়ের ছাত্র-শিক্ষক ও মহাবিদ্যালয়ের ছাত্রদের নিয়ে একটি শিবির পরিচালনা করেছে। ১৯৫ জন এই শিবিরে যোগদান করেছিল।

গত ১২ জানুয়ারি '৯৩ কলকাতার ভবানীপুরস্থ গদাধর আশ্রমের উদ্যোগে এক বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা ভবানীপুর অঞ্চলের বিভিন্ন পথ পরিক্রমা করে হরিশ পার্কে সমবেত হয়। সমাবেশে বক্তব্য রাখেন স্বামী তত্ত্বজ্ঞানন্দ ও কাউন্সিলার অনিলকুমার মুখোপাধ্যায়। বিদ্যালয় ও ক্লাব সহ মোট ত্রিশটি সংস্থা শোভাযাত্রায় অংশগ্রহণ করে। অংশগ্রহণকারী প্রায় ২,২০০ জনকে অনুষ্ঠানের শেষে টিফিন-প্যাকেট দেওয়া হয়।

কলকাতা অদ্বৈত আশ্রমে (৫, ডিহি এন্টালী রোড) গত ১০ জানুয়ারি '৯৩ অনুষ্ঠিত স্বামীজীর ভারত-পরিক্রমার তাৎপর্য বিষয়ে বিশেষ সভায় পৌরোহিত্য করেন স্বামী শিবময়ানন্দ। বক্তা হিসাবে উপস্থিত ছিলেন অধ্যাপিকা সান্ত্বনা দাশগুপ্ত, অধ্যাপক নলিনীরঞ্জন চট্টোপাধ্যায় এবং স্বামী পূর্ণাত্মানন্দ।

গত ১৭ জানুয়ারি এই আশ্রম 'বিবেকানন্দ যুবদিবস' উদ্‌যাপন করে। অপরাহ্ণে অদ্বৈত আশ্রমের বক্তৃতা-কক্ষে যোগদানকারী যুবপ্রতিনিধিরা 'স্বামী বিবেকানন্দের ভারত-পরিক্রমা ও তাঁর ভারত-পুনর্গঠন পরিকল্পনা' এবং 'বর্তমান সংকট সময়ে বিবেকানন্দ-ভাবধারার প্রাসঙ্গিকতা' বিষয়ে আলোচনায় অংশগ্রহণ করে। তাছাড়া বিবেকানন্দ-বিষয়ক কবিতা আবৃত্তি, সঙ্গীত, ক্যুইজ প্রভৃতিও অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন স্বামী সত্যপ্রিয়ানন্দ। বিশেষ অতিথি হিসাবে ভাষণ দেন স্বামী একাত্মানন্দ। অংশগ্রহণকারী যুবক-যুবতীদের স্বামীজী-বিষয়ক গ্রন্থ উপহার দেওয়া হয়।

## স্বামী বিবেকানন্দের ভারত-পরিক্রমার শতবর্ষপূর্তি উৎসব

হায়দ্রাবাদ মঠে গত ১৩ জানুয়ারি '৯৩ স্বামী বিবেকানন্দের হায়দ্রাবাদ-ভ্রমণের শতবর্ষপূর্তি অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন ভারতের উপরাষ্ট্রপতি

কে. আর. নারায়ণন। এই উপলক্ষে অনুষ্ঠিত এক বৃহৎ জনসভায় সভাপতিত্ব করেন রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের সাধারণ সম্পাদক স্বামী আত্মস্থানন্দজী। সম্মানিত অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন অন্ধ্রপ্রদেশের রাজ্যপাল কৃষ্ণকান্ত। বিভিন্ন ধর্মের প্রতিনিধিরাও অনুষ্ঠানে যোগদান করেন। ১৪ ফেব্রুয়ারি '৯৩ এক যুবসম্মেলনের আয়োজন করা হয়েছিল। সম্মেলনে ভাষণ দেন রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের অন্যতম সহাধ্যক্ষ শ্রীমৎ স্বামী রঙ্গনাথানন্দজী মহারাজ। সারাদিনব্যাপী এই সম্মেলনে প্রায় ১৮০০ যুবপ্রতিনিধি অংশগ্রহণ করেছিল। ১৫ ফেব্রুয়ারি '৯৩ প্রায় ৬০০০ জনতার এক সমাবেশে ভাষণ দেন অন্ধ্রপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী কে. বিজয়ভাস্কর রেড্ডি, স্বামী রঙ্গনাথানন্দজী ও স্বামী আত্মস্থানন্দজী। বিশিষ্ট নাগরিকবৃন্দ এবং সরকারি উচ্চপদস্থ কর্মচারিবৃন্দ অনুষ্ঠানে যোগদান করেন।

নানা অনুষ্ঠানের মাধ্যমে নিম্নলিখিত আশ্রমগুলিতেও স্বামী বিবেকানন্দের ভারত-পরিক্রমার শতবর্ষপূর্তি উৎসব অনুষ্ঠিত হয়:

শিলচর, চণ্ডীগড়, নরোত্তমনগর ( অরুণাচল প্রদেশ ), টাকী, পোনামপেট ( কর্ণাটক )।

## ছাত্র-কৃতিত্ব

কোয়েম্বাটোর বিদ্যালয়ের চারজন ছাত্র প্রজাতন্ত্র দিবসে অনুষ্ঠিত রাজ্যস্তরে 'অ্যাথলেটিক মীট'-এ একশো মিটার রিলে প্রতিযোগিতায় স্বর্ণপদক পেয়েছে। উল্লেখ্য যে, কোয়েম্বাটোর বিদ্যালয় তাদের 'কলেজ অব এডুকেশন'-এ প্রতিবন্ধীদের সর্বোচ্চ সংখ্যায় নিয়োগ করার জন্য মুখ্যমন্ত্রীর একটি বিশেষ পুরস্কারের জন্য নির্বাচিত হ'য়েছে।

বৃন্দাবন আশ্রমের নার্সিং স্কুলের দুজন ছাত্রী উত্তরপ্রদেশ স্টেট মেডিক্যাল ফেকাল্টি, লখনৌ কর্তৃক ১৯৯২ খ্রীস্টাব্দের জেনারেল নার্সিং পরীক্ষায় দ্বিতীয় স্থান লাভ করেছে।

আলং আশ্রম পরিচালিত বিদ্যালয়ের একজন উপজাতি ছাত্র পূর্বভারত বিজ্ঞান প্রদর্শনীতে দ্বিতীয় স্থান এবং কলকাতা বিড়লা ইন্ডাস্ট্রিয়াল অ্যান্ড টেকনোলজিক্যাল মিউজিয়ামের পৃষ্ঠপোষকতায় অনুষ্ঠিত পূর্বভারত সায়েন্স কুইজ প্রতিযোগিতায় তৃতীয় স্থান লাভ করেছে।

## চিকিৎসা-শিবির

এলাহাবাদ আশ্রম মাঘমেলা উপলক্ষে ত্রিবেণী সঙ্গমে একমাসব্যাপী চিকিৎসা-শিবির পরিচালনা করেছে। শিবিরে মোট ১৯,৫৯৫ জন রোগীর চিকিৎসা করা হয়েছে। তাছাড়া মেলাতে স্বামী বিবেকানন্দের জীবন ও বাণী নিয়ে একটি চিত্র-প্রদর্শনীর আয়োজনও করা হয়েছিল।

নটুরামপল্লী আশ্রম গত ১৫, ১৬ ও ১৭ ফেব্রুয়ারি '৯৩ আশ্রমের নিকটবর্তী বিদ্যালয়গুলিতে দন্ত-চিকিৎসা-শিবির পরিচালনা করেছে। শিবিরগুলিতে মোট ৩২০০ জন ছাত্রছাত্রীর দন্ত পরীক্ষা করা হয়েছে এবং কিছু সংখ্যক ছাত্রছাত্রীর চিকিৎসা করা হয়েছে।

গত ২৫ ফেব্রুয়ারি পুরী রামকৃষ্ণ মিশন রাণাপুর-গোপালপুর গ্রামে এক দন্ত-চিকিৎসা-শিবির পরিচালনা করে। শিবিরে মোট ২০৭ জন রোগীর চিকিৎসা করা হয়।

## ত্রাণ

### তামিলনাড়ু বন্যা ও ঝঞ্ঝাত্রাণ

মাদ্রাজ মিশন আশ্রম রামেশ্বরম দ্বীপের ধনুষ্কোটি অঞ্চলে কাশ্বিপাড়া ও পালেম গ্রামে বন্যা ও ঝড়ে ক্ষতিগ্রস্ত ২৮৩টি পরিবারের মধ্যে ৫০০ তোয়ালে, ৫০০ স্টেনলেস স্টীলের থালা ও ৫০০ স্টেনলেস স্টীলের টাম্বলার বিতরণ করেছে। তাছাড়া গত ২৩ ফেব্রুয়ারি '৯৩ শ্রীরামকৃষ্ণের আবির্ভাব-তিথিতে ঐ দুটি গ্রামের ১১০৬জনকে খাওয়ানো হয়েছে।

### দিল্লী অগ্নিত্রাণ

দিল্লী আশ্রম সঞ্জয় অমর কলোনিতে অগ্নিকাণ্ডে ক্ষতিগ্রস্তদের মধ্যে ১০০ পশমী কম্বল বিতরণ করেছে।

### পশ্চিমবঙ্গ বন্যাত্রাণ

পুরুলিয়া জেলার লাউসেনবেরা ও সর্পসমুলিয়া গ্রামে ক্ষতিগ্রস্ত গ্রামবাসীদের মধ্যে ৬৩টি কম্বল, ৮৩টি পোশাক, ৭২০টি পুরনো কাপড় বিতরণ এবং ১৯ জানুয়ারি '৯৩ খিচুড়ি খাওয়ানো হয়েছে।

### বিহার খরাত্রাণ

বিহারের গাড়ওয়া জেলার বাকা ব্লকে খরাপীড়িত অসুস্থদের জন্য চিকিৎসা-ত্রাণের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

## বহির্ভারত

**হলিউড আশ্রম** গত ৯ জানুয়ারি স্বামী বিবেকানন্দের শিকাগো ধর্মমহাসভায় যোগদানের শতবর্ষপূর্তি উপলক্ষে একদিনের একটি সেমিনারের আয়োজন করেছিল। বিষয়বস্তু ছিল 'মায়া বনাম বাস্তব জগৎ—বিজ্ঞান ও ধর্ম'। বিজ্ঞান ও অংক-শাস্ত্রে বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিবর্গ সেমিনারে ভাষণ দেন। সেমিনারে বহু শ্রোতা সমবেত হয়েছিলেন।

**বেদান্ত সোসাইটি অব টরন্টো:** গত ২৩ ফেব্রুয়ারি পূজা, পাঠ, ধ্যান-জপ, ভক্তিগীতি, পুষ্পাঞ্জলি,প্রসাদ-বিতরণের মাধ্যমে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের আবির্ভাব-তিথি পালন করা হয়েছে। ফেব্রুয়ারি ও মার্চ মাসের রবিবারগুলিতে বিভিন্ন ধর্মীয় বিষয়ে ভাষণ এবং শনিবারগুলিতে শাস্ত্রের ক্লাস হয়েছে।

**বেদান্ত সোসাইটি অব সেন্ট লুইস:** গত ২৮ ফেব্রুয়ারি পূজা, ধ্যান-জপ, ভক্তিগীতি, প্রসাদ-বিতরণ প্রভৃতির মাধ্যমে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের আবির্ভাব-উৎসব উদযাপিত হয়েছে। মার্চ মাসের রবিবার-গুলিতে বিভিন্ন ধর্মীয় বিষয়ে ভাষণ এবং প্রতি মঙ্গলবার মাণ্ডূক্য উপনিষদ্‌ ও প্রতি বৃহস্পতিবার 'শ্রীরামকৃষ্ণ দ্য গ্রেট মাস্টার'-এর ক্লাস হয়েছে।

**বেদান্ত সোসাইটি অব ওয়েস্টার্ন ওয়াশিংটন:** গত মার্চ মাসের রবিবারগুলিতে বিভিন্ন ধর্মীয় বিষয়ে ভাষণ দিয়েছেন এই কেন্দ্রের অধ্যক্ষ স্বামী ভাস্করানন্দ। প্রতি মঙ্গলবার 'দ্য গসপেল অব শ্রীরামকৃষ্ণ'-এর ক্লাস হয়েছে। গত ২৫ মার্চ স্বামী ভাস্করানন্দ ভ্যাঙ্কুভার পাব্লিক লাইব্রেরীতে "হিন্দু-ধর্ম" বিষয়ে ভাষণ দিয়েছেন।

**বেদান্ত সোসাইটি অব স্যাক্রামেন্টো:** গত ১৯ ফেব্রুয়ারি সন্ধ্যায় পূজা, ধ্যান-জপ, আলোচনা, পাঠ, ভক্তিগীতি, প্রসাদ-বিতরণ প্রভৃতির মাধ্যমে শিবরাত্রি পালন করা হয়েছে। ২৩ ফেব্রুয়ারি সকাল সাড়ে সাতটায় অনুরূপ অনুষ্ঠানের মাধ্যমে শ্রীরামকৃষ্ণ-দেবের আবির্ভাব-তিথি পালন করা হয়েছে। মার্চ মাসে সাপ্তাহিক ভাষণ ও ক্লাস যথারীতি, হয়েছে। স্বামী বিবেকানন্দের শিকাগো ধর্মমহাসভায় যোগদানের শতবর্ষপূর্তি উপলক্ষে গত ৫ মার্চ একটি সঙ্গীতানুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছিল।

**বেদান্ত সোসাইটি অব নর্দান ক্যালিফোর্নিয়া:** মার্চ মাসের প্রতি বুধবার ও রবিবার বিভিন্ন ধর্মীয় বিষয়ে ভাষণ দিয়েছেন এই কেন্দ্রের অধ্যক্ষ স্বামী প্রবুদ্ধানন্দ। ২০ মার্চ সন্ধ্যায় ভক্তিগীতি অনুষ্ঠিত হয়েছে।

**বেদান্ত সোসাইটি অব নিউ ইয়র্ক:** মার্চ মাসের প্রতি রবিবার বিভিন্ন ধর্মীয় বিষয়ে ভাষণ, প্রতি শুক্রবার শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা এবং প্রতি মঙ্গলবার 'দ্য গসপেল অব শ্রীরামকৃষ্ণ'-এর ক্লাস নিয়েছেন এই কেন্দ্রের অধ্যক্ষ স্বামী আদীশ্বরানন্দ।

## দেহত্যাগ

**স্বামী জ্ঞেয়ানন্দ** (ভরত) গত ২৯ জানুয়ারি রাত ১১-৩০ মিনিটে আলসুর (কর্ণাটক) আশ্রমে দেহত্যাগ করেন। তিনি গত কয়েক মাস যাবৎ ফুসফুসে ক্যান্সার-আক্রান্ত হয়ে শয্যাশায়ী ছিলেন। তাঁর বয়স হয়েছিল ৭৭ বছর।

স্বামী জ্ঞেয়ানন্দ ছিলেন শ্রীমৎ স্বামী বিরজা-নন্দজী মহারাজের মন্ত্রশিষ্য। ১৯৪৫ খ্রীস্টাব্দে তিনি করাচি কেন্দ্রে যোগদান করেছিলেন। ১৯৫৭ খ্রীস্টাব্দে তিনি শ্রীমৎ স্বামী শঙ্করানন্দজী মহা-রাজের নিকট সন্ন্যাস লাভ করেন। ১৯৪৭ খ্রীস্টাব্দে কুরুক্ষেত্রে পূর্ব পাঞ্জাবের শরণার্থীদের জন্য ত্রাণ-কার্যে অংশগ্রহণ করেছিলেন। তাছাড়া বিভিন্ন সময়ে তিনি রেঙ্গুন, পুরী মঠ, কনখল, চণ্ডীগড়, বোম্বে, সালেম, ইনস্টিটিউট অব কালচার, কামার-পুকুর, ব্যাঙ্গালোর ও সেবাপ্রতিষ্ঠানের কর্মী ছিলেন। ১৯৮৯ খ্রীস্টাব্দ থেকে তিনি আলসুর সাধুনিবাসে বাস করছিলেন। অনাড়ম্বর জীবন-যাপন ও হাসিখুশি স্বভাবের জন্য তিনি সকলের প্রিয় ছিলেন।

# শ্রীশ্রীমায়ের বাড়ীর সংবাদ

**আবির্ভাব-তিথি পালন:** গত ১১ মার্চ শ্রীমৎ স্বামী যোগানন্দজী মহারাজের আবির্ভাব-তিথিতে সন্ধ্যারতির পর তাঁর জীবনী আলোচনা করেন স্বামী দিব্যাশ্রয়ানন্দ।

**সাপ্তাহিক ধর্মালোচনা:** প্রতি শুক্রবার, রবিবার ও সোমবার সন্ধ্যারতির পর যথারীতি চলছে। □

# বিবিধ সংবাদ

## উৎসব-অনুষ্ঠান

### শ্রীমা সারদাদেবীর আবির্ভাব-উৎসব

**শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ সেবাসংঘ, সম্বলপুর (উড়িষ্যা)ঃ** গত ২০ ডিসেম্বর '৯২ স্থানীয় কালীবাড়ি প্রাঙ্গণে শ্রীমা সারদাদেবীর জন্মোৎসব পালন করা হয়। এই দিন স্থানীয় অনাথ আশ্রমে সংঘের তরফ থেকে ৫২টি উলের সোয়েটার ও ২টি শাল বিতরণ করা হয়। দুপুরে প্রায় ৪০০ ভক্তকে বসিয়ে খিচুড়ি প্রসাদ দেওয়া হয়। সন্ধ্যায় পাঠ ও ভজন-কীর্তনাদি অনুষ্ঠিত হয়।

**শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ ভক্তসংঘ, জামালপুর (মুঙ্গের, বিহার)ঃ** গত ২৭ ও ২৮ ডিসেম্বর '৯২ নানা অনুষ্ঠানের মাধ্যমে শ্রীমা সারদাদেবীর জন্মোৎসব পালন করা হয়। উৎসবের বিভিন্ন অধিবেশনে শ্রীশ্রীমা ও শ্রীরামকৃষ্ণ-ভাবান্দোলন নিয়ে আলোচনা করেন স্বামী সুহিতানন্দ, স্বামী লোকনাথানন্দ, স্বামী ভাবাত্মানন্দ প্রমুখ। ২৭ ডিসেম্বর প্রায় ৫০০ ভক্ত বসে প্রসাদ পান।

গত ১৬ ডিসেম্বর '৯২ দমদম সাতপুকুর পাঠ-চক্রে নানা অনুষ্ঠানের মাধ্যমে উক্ত উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। বিকালে ধর্মসভায় শ্রীশ্রীমায়ের জীবন ও বাণী আলোচনা করেন স্বামী কমলেশানন্দ। গীতিনাট্য পরিবেশন করে শিবপুর 'প্রফুল্ল তীর্থ'।

**বাগআঁচড়া রামকৃষ্ণ সারদা আশ্রম (শান্তিপুর, নদীয়া)ঃ** শ্রীশ্রীমায়ের জন্মোৎসব উপলক্ষে গত ২৭ ডিসেম্বর '৯২ এই আশ্রমের পক্ষ থেকে স্থানীয় বিদ্যালয়ের শিক্ষক দেবপ্রসাদ চক্রবর্তী ও শচীন্দ্র গাঙ্গুলীর ব্যবস্থাপনায় ৭০জন দুঃস্থ গ্রামবাসীকে বস্ত্র ও খাদ্য প্রদান করা হয়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন রহড়া রামকৃষ্ণ মিশনের স্বামী অকুণ্ঠাত্মানন্দ।

গত ১০ জানুয়ারি '৯৩ শ্রীরামকৃষ্ণ বাণীপ্রচার সংঘের উদ্যোগে দমদম করুণাময়ী আশ্রমে শ্রীশ্রীমা সারদাদেবীর ১৪০তম শুভজন্মোৎসব নানা অনুষ্ঠানের মাধ্যমে উদ্‌যাপিত হয়েছে। এই উপলক্ষে প্রভাতফেরী, বিশেষ পূজা, ধর্মালোচনা, সঙ্গীতানুষ্ঠান ইত্যাদি অনুষ্ঠিত হয়। ধর্মসভায় শ্রীমা সারদাদেবীর জীবনী আলোচনা করেন স্বামী গর্গানন্দ। ভক্তিগীতি পরিবেশন করেন শঙ্কর সোম, কাবেরী চৌধুরী ও নিরঞ্জন গাঙ্গুলী। দুপুরে প্রায় ৩০০ ভক্তকে বসিয়ে প্রসাদ দেওয়া হয়।

গত ১৬ ডিসেম্বর '৯২ বুধবার স্থানীয় মহিলা-দের সংগঠন নদীয়া জেলার **বঙ্কিমনগর শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমে** শ্রীমা সারদাদেবীর জন্মোৎসব মঙ্গলারতি, পূজা, হোম,ভোগারতি, সঙ্গীত, ধর্মালোচনা প্রভৃতি অনুষ্ঠানের মাধ্যমে পালন করেছে। প্রায় ৩৫০জন ভক্তকে বসিয়ে খিচুড়ি প্রসাদ দেওয়া হয়েছে।

### জাতীয় যুবদিবস ও স্বামী বিবেকানন্দের ভারত-পরিক্রমার শতবর্ষপূর্তি-উৎসব

**কন্যাকুমারী বিবেকানন্দ কেন্দ্র** স্বামী বিবেকানন্দের ভারত-পরিক্রমার শতবর্ষ স্মরণে ১৯৯২ খ্রীষ্টাব্দকে 'রাষ্ট্রীয় চেতনা বর্ষ' হিসাবে পালন করেছে। এক বছর ধরে ভারতব্যাপী ৩৪৭ দিনের নানা কার্যক্রমের সমাপ্তি অনুষ্ঠান এই কেন্দ্রের প্রধান কার্যালয়ে গত ২৭ ডিসেম্বর অনুষ্ঠিত হয়। তিন দিনের এই অনুষ্ঠানের বিভিন্ন দিনে ডিভাইন লাইফ সোসাইটির স্বামী চিন্ময়ানন্দ, বৌদ্ধ ধর্মগুরু দলাই লামা, মাদ্রাজ রামকৃষ্ণ মঠের অধ্যক্ষ স্বামী স্মরণানন্দ ও বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ অংশগ্রহণ করেন। স্বামী বিবেকানন্দের ভারত-পরিক্রমার শতবর্ষে যেসব কার্যক্রম আরম্ভ করা হয়েছে তা সুদৃঢ় ও অগ্রসর করতে এই কেন্দ্র ১৯৯২ থেকে ২০০২ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত 'বিবেকানন্দ দশক' পালন করবে।

গত ২৮ ডিসেম্বর '৯২ ভারত সরকারের পক্ষ থেকে কন্যাকুমারীতে 'রাষ্ট্রচেতনা বর্ষ' উদ্‌যাপন করা হয়। একদিনের এই অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী পি. ভি. নরসিমা রাও, মানবসম্পদ উন্নয়নমন্ত্রী অর্জুন সিং, রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউট অব কালচারের অধ্যক্ষ স্বামী লোকেশ্বরানন্দ যোগদান করেন।

**তুফানগঞ্জ শ্রীরামকৃষ্ণ সেবাশ্রম (কোচবিহার)** গত ১২ জানুয়ারি '৯৩ জাতীয় যুবদিবস পালন করেছে। ঐ দিনের বিশেষ অনুষ্ঠানের মধ্যে ছিল প্রভাতফেরী, নানা প্রতিযোগিতামূলক অনুষ্ঠান, হাসপাতাল ও অনাথ আশ্রমে ফল বিতরণ, হাতে হাতে খিচুড়ি প্রসাদ বিতরণ, পুরস্কার বিতরণ

প্রভৃতি। পুরস্কার বিতরণ করেন তুফানগঞ্জের মহকুমা শাসক।

**সালকিয়া বিবেকানন্দ স্পোর্টিং ক্লাব** গত ১২ জানুয়ারি থেকে ১৫ জানুয়ারি '৯৩ পর্যন্ত স্বামী বিবেকানন্দের জন্মদিন ও জাতীয় যুবদিবস উপলক্ষে নানা অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছিল। ১২ জানুয়ারি '৯৩ রক্তদান শিবির ও সন্ধ্যায় স্বামী বৈকুণ্ঠানন্দের ভাষণ ও দুঃস্থদের শীতবস্ত্র প্রদান; ১৩ জানুয়ারি সকালে অংকন প্রতিযোগিতা, বিকালে এরিয়ান্স বনাম জর্জটেলিগ্রাফের মধ্যে ফুটবল খেলা, সন্ধ্যায় সবিতাব্রত দত্ত ও শুভব্রত দত্ত কর্তৃক দেশাত্মবোধক সঙ্গীত পরিবেশন, যাদু ও কথাবলা পুতুল প্রদর্শন, ১৪ জানুয়ারি কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায়কে সংবর্ধনা জ্ঞাপন, প্রতিবন্ধীদের হুইল চেয়ার প্রদান ও যাত্রানুষ্ঠান এবং ১৫ জানুয়ারি সন্ধ্যায় খিচুড়ি বিতরণ করা হয়। এই উপলক্ষে রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ সাহিত্যের একটি বুকস্টল খোলা হয়েছিল।

**শ্রীরামকৃষ্ণ নিরঞ্জনানন্দ আশ্রমে (রাজার হাট-বিষ্ণুপুর, উত্তর ২৪ পরগনা)** গত ১২ জানুয়ারি '৯৩ স্বামীজীর জন্মদিনে জাতীয় যুবদিবস উদ্‌যাপিত হয়। ঐদিন রাজারহাট স্বামীজী জন্মোৎসব কমিটির সক্রিয় সহযোগিতায় সকালে এক শোভাযাত্রা আশ্রম থেকে বের হয়। প্রায় চার শতাধিক মানুষ চার কিলোমিটার পথ পরিক্রমা করে রাজারহাট রেল ময়দানে সমবেত হয়। সভায় এক ঘণ্টার কর্মসূচীতে স্বামীজীর জীবন ও বাণীর প্রাসঙ্গিকতা তুলে ধরা হয়। সমাবেশে বক্তব্য রাখেন কৃষ্ণকান্ত দত্ত, ডাঃ সুধীরকুমার রাহা প্রমুখ।

১৪ জানুয়ারি '৯৩ আশ্রমে স্বামীজীর জন্মতিথিপূজা অনুষ্ঠিত হয়। বৈকালীন সমাবেশে স্বামীজীর জীবন ও বাণী অবলম্বনে আলোচনা-চক্রের আয়োজন করা হয়।

গত ১৫ নভেম্বর ১৯৯২ **মালদা তিলাসন সিংহাবাদ বিবেকানন্দ পাঠচক্রের** উদ্যোগে তিলাসন, সিংহাবাদ হাইস্কুল প্রাঙ্গণে স্বামী বিবেকানন্দের ভারত-পরিক্রমার শতবর্ষপূর্তি-উৎসব উদ্‌যাপিত হয়। অনুষ্ঠানে আবৃত্তি প্রতিযোগিতা হয়। স্বামীজী সম্পর্কে আলোচনা করেন স্থানীয় স্কুলের সহকারী প্রধান শিক্ষক আশিসভূষণ সিংহ এবং মালদা রামকৃষ্ণ মিশন বিবেকানন্দ বিদ্যামন্দিরের প্রধানশিক্ষক স্বামী গিরিজাত্মানন্দ। গীতিনাট্য 'বুদ্ধহৃদয় বিবেকানন্দ' পরিবেশন করে মালদা রামকৃষ্ণ মিশন বিবেকানন্দ বিদ্যামন্দিরের ছাত্রবৃন্দ।

## পরলোকে

বিশিষ্ট সাংবাদিক **বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায়** গত ২০ মার্চ '৯৩, শনিবার, বিকাল ৪-৩০ মিনিটে কলকাতার উডল্যান্ডস নার্সিং হোমে পরলোক গমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮৮ বছর। গত কয়েক বছর ধরেই তিনি সেকেন্ডারি পার্কিনসন ও সেরিব্রাল ডিজেনারেশনে ভুগছিলেন। তিনি ছিলেন শ্রীমৎ স্বামী সারদানন্দ মহারাজের দীক্ষিত শিষ্য।

১৯০৪ খ্রীস্টাব্দে অধুনা বাংলাদেশের ফরিদপুরে তাঁর জন্ম। ১৯২৫ খ্রীস্টাব্দে আনন্দবাজার পত্রিকায় শুরু হয় তাঁর সাংবাদিক জীবন। সাংবাদিক জীবন শুরু হওয়ার পূর্বেই 'উদ্বোধন' পত্রিকায় (২৬ বর্ষ, ১২শ সংখ্যা) কবিতা লিখে তিনি কবি হিসাবে আত্মপ্রকাশ করেন। তাঁর রচিত প্রথম কবিতাটির নাম 'বন্ধন ভীতি'। জীবনের শেষপ্রান্তেও 'উদ্বোধন' তাঁর প্রিয় ছিল। উদ্বোধন-এর ৯১তম বর্ষ-এর মাঘ ও বৈশাখ সংখ্যায় উদ্বোধন সম্পর্কে তাঁর দুটি লেখা প্রকাশিত হয়েছিল। আনন্দবাজার পত্রিকায় তিনি সহকারী সম্পাদক হিসাবে কাজ করেছেন। তারপর তিনি 'যুগান্তর', 'দৈনিক বসুমতী', 'সত্যযুগ' প্রভৃতি পত্রিকার প্রধান সম্পাদক হিসাবে কাজ করেছেন। তাঁর সম্পাদনাকালেই 'যুগান্তর' পত্রিকা প্রভূত জনপ্রিয়তা লাভ করে। সাহিত্যিক হিসাবেও বিবেকানন্দবাবু যথেষ্ট সুনাম অর্জন করেছিলেন। তাঁর রচিত উল্লেখযোগ্য গ্রন্থগুলি হলো: 'দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের ইতিহাস', 'রুশ-জার্মান সংগ্রাম', 'জাপান যুদ্ধের ডায়রি', 'পশ্চিম এশিয়ার বন্ধনমুক্তি', 'রুশ-মার্কিন পররাষ্ট্রনীতি' এবং 'সম্পাদকের দপ্তর থেকে'। তাঁর উল্লেখযোগ্য কবিতার বই 'শতাব্দীর সঙ্গীত'। সাংবাদিকতায় উল্লেখযোগ্য অবদানের জন্য তিনি ১৯৭০ খ্রীস্টাব্দে 'পদ্মভূষণ' উপাধি লাভ করেন। মৃত্যুকালে তিনি স্ত্রী, এক পুত্র, দুই কন্যা, নাতি-নাতনী ও তাঁর অসংখ্য গুণমুগ্ধ মানুষ রেখে গেছেন। □

# বিজ্ঞান-সংবাদ

## সিগারেট-এর বিজ্ঞাপন বন্ধ হওয়া উচিত

'ইউরোপীয়ান কমিউনিটি'র দেশগুলিতে প্রতি বছর সিগারেট-ধূমপানের জন্য মৃত্যু হয় ৪·৩ লক্ষ লোকের; ব্রিটেনে ঐ সংখ্যা ১·১ লক্ষ। ১৯৬০ খ্রীস্টাব্দের পর ইউরোপে ধূমপানের পরিমাণ কমে গেছে সত্য, কিন্তু আমেরিকার যুবকদের চেয়ে ইউরোপের যুবকরা আরও বেশি ধূমপান করছে। ইউরোপের বেশিরভাগ দেশেই কম বয়সের মেয়েদের মধ্যে ধূমপানের অভ্যাস বেড়েই চলেছে। ব্রিটেনের সেক্রেটারি অব স্টেটস এবং জার্মানি, নেদারল্যান্ড ও গ্রীসের সমপর্যায়ের আধিকারিকরা আইন করে ধূমপান বন্ধ করার বিরুদ্ধে। এঁদের অনেকে মনে করেন, বিজ্ঞাপন বন্ধ করার বিষয়টি দেশগুলির ওপর ছেড়ে দেওয়া হোক। সেক্ষেত্রে বিজ্ঞাপন-দাতারা এই অবস্থার সুযোগ নেবে নিশ্চয়। এদিকে আবার ব্রিটেনের সেক্রেটারি অফ স্টেটস যদিও জানেন যে, মৃত্যু প্রতিরোধ করার যেসব উপায় আছে, তাদের মধ্যে ধূমপান বন্ধ করাই অন্যতম। পরিস্থিতিটা এইরকম অদ্ভুত হয়ে দাঁড়িয়েছে।

সিগারেট-প্রস্তুতকারকরা সিগারেটের বিজ্ঞাপন বন্ধ করার ঘোর বিরুদ্ধে। তাঁরা বলেন যে, এটা হলে তা হবে ব্যবসা-বাণিজ্যের স্বাধীনতা হরণ। যদি সিগারেট বিক্রয় করা আইনসঙ্গত হয়, তাহলে সিগারেটের বিজ্ঞাপন কখনও বেআইনী হতে পারে না। তাঁরা বলেন, ইউনাইটেড কিংডম-এ এমনিতেই যখন ধূমপানের মাত্রা কমে আসছে, তখন বিজ্ঞাপনকে ধূমপানজাত মৃত্যু বা অসুখের জন্য দায়ী করা যেতে পারে না।

কিন্তু আরও অধিক ব্যাপার আছে। বয়স্ক ধূমপানকারীদের মধ্যে দেখা যাচ্ছে যে, প্রতি ছয়জনের মধ্যে পাঁচজন ধূমপান শুরু করেছে ১৬ বছর বয়স্ক হবার আগেই, যখন তারা ধূমপানের কুফল ভাল করে অনুধাবন করতে পারে না এবং ধূমপানের মোহে আকৃষ্ট হয়। কয়েক বছরের মধ্যেই এদের প্রতি চারজনের মধ্যে তিনজন ধূমপান বন্ধ করতে চেষ্টা করে, কিন্তু পারে না। যদি বিজ্ঞাপন ছেলেদের ধূমপানে আকৃষ্ট করে, তাহলে বিজ্ঞাপন বন্ধ করাই উচিত। কিন্তু এমন যে হয়, তার প্রমাণ কি?

সিগারেট কোম্পানিগুলি যাই বলুক, এটা ঠিক যে, যেখানে-সেখানে দেওয়া বিজ্ঞাপনগুলিও ছেলেদের নজরে পড়ে। স্কটল্যান্ডের এক সমীক্ষায় দেখা গেছে যে, ১১-১৪ বছরের বয়স্কদের মধ্যে প্রায় বেশির ভাগই সিগারেটের বিজ্ঞাপন চিনতে পারে এবং টেলিভিশনে তারা এই বিজ্ঞাপন দেখেছে। আরও জানা গেছে, বিজ্ঞাপন দেখে ঐ বয়সের অনেকেরই ধূমপান করার ইচ্ছা জাগে।

সম্প্রতি একটি সমীক্ষায় প্রমাণিত হয়েছে যে, ব্রিটেনে যে চারটি কোম্পানির সিগারেট সম্বন্ধে সবচেয়ে বেশি বিজ্ঞাপন বের হয়—বেনসন অ্যান্ড হেজেস, সিল্ককাট, এমব্যাসি এবং মার্লবোরো—১১-১৪ বছরের বয়স্করা এইগুলিই বেশি খায়। যেসব সিগারেট কোম্পানিরা টেলিভিশনে খেলা দেখানোর খরচ যোগায়, তারাই ধূমপানের ইন্ধন যোগায়।

বিজ্ঞাপনের চেয়ে বেশি আকৃষ্টকর কয়েকটি ব্যাপারও নিঃসন্দেহে সিগারেট খাওয়া অব্যাহত রাখতে শিশুদের উদ্বুদ্ধ করে। এগুলি হলো—পরিবারের অন্য কারও এবং কর্মক্ষেত্রে সঙ্গিসাথীর ধূমপান। প্রশ্ন উঠছে—বিজ্ঞাপনের ফলে ধূমপান বাড়ে, এর পক্ষে প্রমাণ থাকলেও বিজ্ঞাপন কমালে কি ধূমপান কমবে? নিউজিল্যান্ড ও আরও কয়েকটি দেশে দেখা গেছে যে, বিজ্ঞাপন বন্ধ করার ফলে ধূমপান কমেছে। নরওয়েতে ১৯৭৫ খ্রীস্টাব্দে বিজ্ঞাপন বন্ধ করায় ১৩-১৫ বছর বয়স্কদের মধ্যে ধূমপায়ীর সংখ্যা ১৭ শতাংশ থেকে ১৯৯০ খ্রীস্টাব্দে ১০ শতাংশে নেমে গেছে।

"সিগারেট বিক্রি করা আইনসঙ্গত, কাজেই তার বিজ্ঞাপন বেআইনী হতে পারে না"—এযুক্তিটা ঠিক নয়। ব্রিটেনে ষোল বছরের সমবয়স্কদের কাছে সিগারেট বিক্রয় বেআইনী; তাদের কাছে সিগারেটের বিজ্ঞাপন দেখান কি উচিত? তত্ত্বগতভাবে বয়স্কদের জন্য বিজ্ঞাপন হলেও কমবয়সীদের বিজ্ঞাপন দেখা বন্ধ করা কি সম্ভবপর? □

[ **British Medical Journal,**
9 May 1992, pp. 1195-1196 ]

**বিশ্বব্যাপী চৈতন্যই ঈশ্বর। সেই বিশ্বব্যাপী চৈতন্যকেই লোকে প্রভু, ভগবান, খ্রীস্ট, বুদ্ধ বা ব্রহ্ম বলিয়া থাকে—জড়বাদীরা উহাকেই শক্তিরূপে উপলব্ধি করে এবং অজ্ঞেয়বাদীরা ইহাকেই সেই অনন্ত অনির্বচনীয় সর্বাতীত বস্তু বলিয়া ধারণা করে। উহাই সেই বিশ্বব্যাপী প্রাণ, উহাই বিশ্বব্যাপী চৈতন্য, উহাই বিশ্বব্যাপিনী শক্তি এবং আমরা সকলেই উহার অংশস্বরূপ।**

**স্বামী বিবেকানন্দ**

**উদ্বোধনের মাধ্যমে প্রচার হোক**
**এই বাণী।** **শ্রীসুশোভন চট্টোপাধ্যায়**

# উদ্বোধন

স্বামী বিবেকানন্দ প্রবর্তিত, রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের একমাত্র বাঙলা মুখপত্র, চুরানব্বই বছর ধরে নিরবচ্ছিন্নভাবে প্রকাশিত দেশীয় ভাষায় ভারতের প্রাচীনতম সাময়িকপত্র

৯৫তম বর্ষ ১৪০০ (মে ১৯৯৩) সংখ্যা





সম্পাদক ☐ স্বামী পূর্ণাত্মানন্দ

৮০/৬, গ্রে স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০ ০০৬-স্থিত বসুশ্রী প্রেস থেকে বেলুড় শ্রীরামকৃষ্ণ মঠের ট্রাস্টীগণের পক্ষে স্বামী সত্যব্রতানন্দ কর্তৃক মুদ্রিত ও ১ উদ্বোধন লেন, কলকাতা-৭০০ ০০৩ থেকে প্রকাশিত।

প্রচ্ছদ মুদ্রণ : স্বপ্না প্রিন্টিং ওয়ার্কস (প্রাঃ) লিমিটেড, কলকাতা-৭০০ ০০৯

আজীবন গ্রাহকমূল্য (৩০ বছর পর নবীকরণ-সাপেক্ষ) ☐ এক হাজার টাকা (কিস্তিতেও প্রদেয়—প্রথম কিস্তি একশো টাকা) ☐ সাধারণ গ্রাহকমূল্য ☐ বৈশাখ থেকে পৌষ সংখ্যা ☐ ব্যক্তিগতভাবে সংগ্রহ ☐ পঁয়ত্রিশ টাকা ☐ সডাক ☐ একচল্লিশ টাকা ☐ বর্তমান সংখ্যার মূল্য ☐ ছয় টাকা

# কার্যালয় ভিন্ন 'উদ্বোধন'-এর গ্রাহকভুক্তি-কেন্দ্র

**আসাম** ☐ রামকৃষ্ণ মিশন সেবাশ্রম, শিলচর ;
রামকৃষ্ণ সেবাশ্রম, বঙ্গাইগাঁও

**বিহার** ☐ শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ সঙ্ঘ,
সেক্টর-১/বি, বোকারো স্টীল সিটি
রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ সোসাইটি, ব্যাঙ্ক রোড, ধানবাদ

**উড়িষ্যা** ☐ রামকৃষ্ণ মঠ, চক্রতীর্থ, পুরী

**বাংলাদেশ** ☐ রামকৃষ্ণ মিশন, ঢাকা-৩

**ত্রিপুরা** ☐ রামকৃষ্ণ মিশন, আগরতলা

**মধ্যপ্রদেশ** ☐ রামকৃষ্ণ সেবাসঙ্ঘ, কোয়ার্টার নং-৫০৭
(এস. এস.)/২, বাচেলি, জেলা : বস্তার

**মহারাষ্ট্র** ☐ রামকৃষ্ণ মঠ, রামকৃষ্ণ মিশন মার্গ,
খার, বোম্বাই-৫২

## পশ্চিমবঙ্গ

### কলকাতা

রামকৃষ্ণ যোগোদ্যান মঠ, কাঁকুড়গাছি
রামকৃষ্ণ মিশন পল্লীমঙ্গল, ২৮বি, গড়িয়াহাট রোড
সলিলা সরকার, এ-ই, ৬৫৫, লেক টাউন
রামকৃষ্ণ-সারদা সেবাশ্রম, ৫/৩৬, বিজয়গড়
দেবাশিস পেপার সাপ্লায়ার্স, ১৩/৫/৩,
রামকান্ত বসু স্ট্রীট, বাগবাজার
গদাধর আশ্রম, হরিশ চ্যাটার্জী স্ট্রীট, ভবানীপুর
রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ ভাবনালোক, সোদপুর
বিবেকানন্দ যুব কল্যাণ কেন্দ্র, চেতলা
শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম, টেম্পল লেন, ঠাকুরিয়া
বিবেকানন্দ গ্রন্থলোক, ১, আর. এন. টেগোর রোড,
নবপল্লী, কলকাতা-৭০০ ০৬৩
রামকৃষ্ণ কুটির, এইচ-২১এ নবাদর্শ, বিরাটি
উজ্জ্বল বুক স্টোর্স, ১৬/সি নিমতলা লেন, কলি-৬

### উত্তরবঙ্গ

বিবেকানন্দ যুব মহামণ্ডল, দিনহাটা, কুচবিহার

### মেদিনীপুর

রামকৃষ্ণ মঠ, তমলুক
শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ সেবাশ্রম, পাঁশকুড়া
খড়গপুর রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ সোসাইটি

### উত্তর ২৪ পরগনা

রামকৃষ্ণ মিশন বালকাশ্রম, রহড়া
বসিরহাট শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ সেবাসঙ্ঘ
বিবেকানন্দ সংস্কৃতি পরিষদ, নবব্যারাকপুর
অলক পাল চৌধুরী, সঙ্কটাপল্লী, ঘোলা, সোদপুর
ঘোলা রামকৃষ্ণ সেবাশ্রম, বি৭, বি. পার্ক, সোদপুর
বিবেকানন্দ আলোচনা-চক্র, নিমতলা

### দক্ষিণ ২৪ পরগনা

রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম, নরিষা
শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ ভক্তসঙ্ঘ, ভাংগড়

### হুগলী

রামকৃষ্ণ মঠ, আঁটপুর
শ্রীরামকৃষ্ণ সারদা আশ্রম, ঘারিক জঙ্গল রোড, কোন্নগর

### নদীয়া

রামকৃষ্ণ সেবক সংঘ, চাকদহ
রামকৃষ্ণ সেবাসঙ্ঘ, কল্যাণী ; রামকৃষ্ণ আশ্রম, কৃষ্ণনগর
শ্রীরামকৃষ্ণ সারদা সেবাসঙ্ঘ, রানাঘাট

### বর্ধমান

পুস্তকালয়, ৬২ বি. সি. রোড, বর্ধমান
রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম, আসানসোল
দুর্গাপুর ☐ রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ সেবাশ্রম,
রামমোহন অ্যাভিনিউ ; রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ পাঠচক্র,
ডি. পি. এল. কলোনী ; স্বামী বিবেকানন্দ
বাণীপ্রচার সমিতি, বিদ্যাসাগর অ্যাভিনিউ ;
রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ সোসাইটি, এ বি এল. টাউনশিপ

### বীরভূম

বোলপুর রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ সাহিত্যকেন্দ্র
পৌর বাণিজ্যিক সদন (বাস স্ট্যান্ড), স্টল নং ৫
আকালীপুর রামকৃষ্ণ সারদা সেবাশ্রম, পোঃ ভদ্রপুর

### সংগ্রহ-কেন্দ্র

এম. কে. বুক সেলার্স, পোঃ বি. চারালী,
জেলা : শোণিতপুর, আসাম
শ্যামবাজার বুক স্টল, ২/২০, এ. পি. সি. রোড
পাতিরাম বুক স্টল, কলেজ স্ট্রীট, কলকাতা
রামকৃষ্ণ মিশন সারদাপীঠ পো-বুথ, বেলুড় মঠ
সর্বোদয় বুক স্টল, হাওড়া রেল স্টেশন

# উদ্বোধন

জ্যৈষ্ঠ ১৪০০ মে ১৯৯৩ ৯৫তম বর্ষ—৫ম সংখ্যা

## দিব্য বাণী

হে সত্য! তোমার তরে হের
প্রতীক্ষায় আছে বিশ্বজন,
—তব মৃত্যু নাহি কদাচন। স্বামী বিবেকানন্দ

## কথাপ্রসঙ্গে

শিকাগো ধর্মমহাসভার উদ্দেশে স্বামীজীর সমুদ্রযাত্রার শতবর্ষ-পূর্তি উপলক্ষে বিশেষ সম্পাদকীয়।

# কন্যাকুমারীতে স্বামীজীর উপলব্ধি: "আমার ভারত অমর ভারত"

কন্যাকুমারীর শিলাদ্বীপে ধ্যানমগ্ন সন্ন্যাসী! তাঁহার মানসচক্ষের সম্মুখে উন্মোচিত ভারত-ইতিহাসের সকল পৃষ্ঠাগুলি অন্তরে উদ্ভাসিত আধ্যাত্মিক আলোকে পাঠ করিয়া যুগপৎ আনন্দ ও বিস্ময়ে অভিভূত হইলেন। তিনি দেখিলেন সভ্যতার ধাত্রীজননী, সনাতন ধর্মের প্রসূতি ভারতবর্ষ সভ্যতা ও ধর্মের উদ্ভবের ঊষালগ্ন হইতে কিভাবে জগৎকে চৈতন্যের আলোক দান করিয়া আসিতেছে। দেখিলেন, পাশ্চাত্যের কোন কোন মহল হইতে যে তারস্বরে প্রচার চলিতেছিল ভারত একটি মুমূর্ষু দেশ, ভারতের কোন সভ্যতা নাই, ভারতের কোন মহান্ ঐতিহ্য নাই; ভারতের প্রাচীন ধর্মসাহিত্য, সাধারণ সাহিত্য, ইতিহাস, পুরাণ সমস্তই উদ্ভট কল্পকাহিনী এবং নিকৃষ্ট-মানের মস্তিষ্কের ফসল—উহা নিতান্তই অপপ্রচার, চূড়ান্ত মিথ্যা এবং একান্তভাবে উদ্দেশ্যপ্রণোদিত। কালের প্রস্তরফলকে আন্তর সত্যের উদ্ভাসিত আলোকে তিনি দেখিলেন ঋষিদের তপোভূমি ভারত, দেবতার লীলাভূমি ভারত, সত্য, ত্যাগ, প্রেম, পবিত্রতা, উচ্চ ও মহৎ চিন্তার পীঠভূমি ভারত কখনও মরে নাই। ভারত অমর, ভারত চিরন্তন। তিনি দেখিলেন, ভারতের আকাশ, ভারতের বাতাস নিয়ত আধ্যাত্মিকতায় স্পন্দিত হইতেছে। ইতিহাসের বিস্মৃত অতীত হইতে শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরিয়া ভারতবর্ষের ধর্ম, ভারতবর্ষের সাহিত্য, ভারতবর্ষের শ্রেষ্ঠ সন্তানেরা পশুসত্তাকে বিজয় করিয়া মানুষকে দিব্যসত্তায় উত্তরণ করিতে আহ্বান জানাইয়াছে।

সুদীর্ঘ ইতিহাসের উন্মোচিত পৃষ্ঠায় পৃষ্ঠায় তিনি পাঠ করিলেন: "এই সেই দেশ—যেখানে আনন্দের পাত্রটি পরিপূর্ণ হইয়া উঠিয়াছিল, বেদনার পাত্রটি পূর্ণতর হইলে অবশেষে এইখানেই মানুষ সর্বপ্রথম উপলব্ধি করিয়াছিল—এ সবই অসার; এখানেই যৌবনের প্রথম সূচনায়, বিলাসের ক্রোড়ে, গৌরবের সমুচ্চ শিখরে, ক্ষমতার অজস্র প্রাচুর্যের মধ্যে মানুষ মায়ার শৃঙ্খল চূর্ণ করিয়া বাহির হইয়াছে।" (বাণী ও রচনা, ৫ম খণ্ড, ১ম সং, ১৩৬৯, পৃঃ ৩৭৪)

নব্যবঙ্গের প্রতিভূ হিসাবে স্বামীজীও হয়তো এক-সময় বিশ্বাস করিতেন এবং দীর্ঘ ভারত-পরিক্রমাকালে দেশের নানা স্থানে তথাকথিত শিক্ষিত ব্যক্তিদের মুখে তিনি বারংবার শুনিয়াছেন, ধর্মই এদেশের অধঃপতনের মূল কারণ। ধর্মের বিকৃতি, ধর্মের নামে চূড়ান্ত ভ্রষ্টাচার, অনাচার এবং শোষণের ভয়াবহ রূপ তিনিও স্বচক্ষে দেখিয়াছেন। কিন্তু দীর্ঘ ভারত-পরিক্রমার সুবাদে যে-অভিজ্ঞতা ও অনুভূতি তাঁহার লাভ হইয়াছিল তাহার আলোকে কন্যাকুমারীর ধ্যানাসনে বসিয়া তিনি উপলব্ধি করিলেন যে, সমাজের বর্তমান অধঃপতনের জন্য ধর্মের কোন অনিষ্টকর ভূমিকা তো নাই-ই, বরং ধর্মকে যথাযথ-ভাবে অনুশীলন ও পালনের ব্যর্থতাই উহার জন্য দায়ী। (ঐ, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃঃ ৪১২-৪১৩) ভারতবর্ষ এমন একটি দেশ যেখানে ধর্ম একটি "বাস্তব সত্য" (ঐ, ৫ম খণ্ড, পৃঃ ৩৭৪), ধর্ম তাহার "জাতীয় জীবনসঙ্গীতের প্রধান সুর", ধর্ম তাহার "জাতীয় জীবনের মূল ভাব" (ঐ, পৃঃ ২১০-২১১), "মূল ভিত্তি" (ঐ, পৃঃ ১৮৫), ধর্ম তাহার "শোণিত-স্বরূপ" (ঐ, পৃঃ ১৮৪), ধর্মই ভারতবাসীর

"জাতীয় মন, জাতীয় প্রাণপ্রবাহ" (ঐ, পৃঃ ১৮৬)।

তাহা হইলে ভারতের কি সত্যই কোন অবনতি হয় নাই? স্বামীজী বলিলেন: "আমরা সকলেই ভারতের অধঃপতন সম্বন্ধে শুনিয়া থাকি। এক-কালে আমিও ইহা বিশ্বাস করিতাম। কিন্তু আজ অভিজ্ঞতার দৃঢ়ভূমিতে দাঁড়াইয়া, সংস্কারমুক্ত দৃষ্টি লইয়া, সর্বোপরি দেশের সংস্পর্শে আসিয়া উহাদের অতিরঞ্জিত চিত্রসমূহের বাস্তব রূপ দেখিয়া সবিনয়ে স্বীকার করিতেছি, আমার ভুল হইয়াছিল।

"হে পবিত্র আর্যভূমি, তোমার তো কখনও অবনতি হয় নাই। কত রাজদণ্ড চূর্ণ হইয়া দূরে নিক্ষিপ্ত হইয়াছে, কত শক্তির দণ্ড এক হাত হইতে অন্য হাতে গিয়াছে, কিন্তু ভারতবর্ষে রাজা ও রাজসভা অতি অল্প লোককেই প্রভাবিত করিয়াছে। উচ্চতম হইতে নিম্নতম শ্রেণী অবধি বিশাল জন-সমষ্টি আপন অনিবার্য গতিপথে ছুটিয়া চলিয়াছে; জাতীয় জীবনস্রোত কখনও মৃদু অর্ধচেতনভাবে, কখনও প্রবল জাগ্রতভাবে প্রবাহিত হইয়াছে।

"শত শতাব্দীর সমুজ্জ্বল শোভাযাত্রার সম্মুখে আমি স্তম্ভিত বিস্ময়ে দণ্ডায়মান, সে-শোভা-যাত্রার কোন কোন অংশে আলোকরেখা স্তিমিত-প্রায়, পরক্ষণে দ্বিগুণ তেজে ভাস্বর, আর উহার মাঝখানে আমার দেশমাতৃকা রানীর মতো পদ-বিক্ষেপে পশুমানবকে দেবমানবে রূপান্তরিত করি-বার জন্য মহিমময় ভবিষ্যতের অভিমুখে অগ্রসর হইতেছেন; স্বর্গ বা মর্ত্যের কোন শক্তির সাধ্য নাই—এ-জয়যাত্রার গতিরোধ করে।...

"সমগ্র মানবজাতির আধ্যাত্মিক রূপান্তর—ইহাই ভারতীয় জীবনসাধনার মূলমন্ত্র, ভারতের চিরন্তন সঙ্গীতের মূল সুর, ভারতীয় সত্তার মেরুদণ্ডস্বরূপ, ভারতীয়তার ভিত্তি, ভারতবর্ষের সর্বপ্রধান প্রেরণা ও বাণী। তাতার, তুর্কী, মোগল, ইংরেজ—কাহারও শাসনকালেই ভারতের জীবন-সাধনা এই আদর্শ হইতে কখনও বিচ্যুত হয় নাই।... ভারতের প্রভাব চিরকাল পৃথিবীতে নিঃশব্দ শিশির-পাতের ন্যায় সকলের অলক্ষ্যে সঞ্চারিত হইয়াছে, অথচ পৃথিবীর সুন্দরতম কুসুমগুলি ফুটাইয়া তুলিয়াছে।... লক্ষ লক্ষ লোক প্রত্যেক সভ্যদেশে সেই বাণীর জন্য অপেক্ষমাণ, যে-বাণী—আধুনিক যুগের অর্থোপাসনা যে ঘৃণ্য বস্তুবাদের নরকাভি-মুখে তাহাদিগকে তাড়াইয়া লইয়া চলিয়াছে, তাহার কবল হইতে তাহাদিগকে রক্ষা করিবে।" (ঐ, পৃঃ ৩৭৫-৩৭৬)

সুতরাং ভারতের পুনরভ্যুত্থান প্রয়োজন এবং এই পুনরভ্যুত্থান অনিবার্যও। ভারতের ভাবী পুনরভ্যুত্থান শুধু ভারতের জন্যই ঘটিবে না, ঘটিবে সমগ্র জগতের জন্যও। কারণ, ভারতের অধ্যাত্মসম্পদের মধ্যে রহিয়াছে সেই সঞ্জীবনী শক্তি যাহা একদিকে সহস্র সহস্র বৎসর ধরিয়া নানা বিপর্যয় ও উত্থান-পতনের মধ্যেও ভারতবর্ষকে জরা ও মরণের শিকার হইতে দেয় নাই, ভারতবর্ষকে চিরযৌবন দান করিয়াছে, অন্যদিকে বহির্জগতের মানুষের কাছে রাখিয়াছে লোকোত্তর জগৎ ও জীবনের নিত্য আহ্বান, দান করিয়াছে ত্যাগ ও অপার্থিবতা মানুষকে কোন্ ভূমিতে উত্তরণ করায় তাহার উজ্জ্বলতম আদর্শ।

কন্যাকুমারীর শিলাসনে ধ্যানের গভীরে স্বামীজী উপলব্ধি করিলেন, ভারত সেই অনির্বাণ দীপশিখা যাহা জগতের সভ্যতাকে চিরকাল ধ্রুব-নক্ষত্রের মতো পথ দেখাইবে—বাঁচার পথ, জীবনের পথ, উত্তরণের পথ। সেই উপলব্ধিই পরবর্তী কালে তাঁহার লেখনীতে বাঙ্ময় হইয়া উঠিল: "ভারত কি মরিয়া যাইবে? তাহা হইলে জগৎ হইতে সমুদয় আধ্যাত্মিকতা বিলুপ্ত হইবে; চরিত্রের মহান্ আদর্শ-সকল বিলুপ্ত হইবে, সমুদয় ধর্মের প্রতি মধুর সহানুভূতির ভাব বিলুপ্ত হইবে, সমুদয় ভাবুকতা বিলুপ্ত হইবে; তাহার স্থলে দেবদেবীরূপে কাম ও বিলাসিতা যুগ্ম রাজত্ব চালাইবে; অর্থ সে-পূজার পুরোহিত; প্রতারণা, পাশববল ও প্রতিদ্বন্দ্বিতা—তাহার পূজাপদ্ধতি, আর মানবাত্মা তাহার বলি।" (ঐ, পৃঃ ৪৬২)

অতএব ভারতের যে-পুনরুত্থান সে-পুনরুত্থান কোন দেশের নয়, কোন সভ্যতার নয়। ভারতের পুনরুত্থান চিরন্তন সত্যের পুনরুত্থান—শাশ্বত আদর্শের পুনরুত্থান, যে-সত্য এবং যে-আদর্শ কোন কালেই নষ্ট হয় না, লুপ্ত হয় না, পরিবেশ এবং পরিপ্রেক্ষিত অনুযায়ী আবৃত থাকে মাত্র। আবার দিন আসিতেছে যখন সেই সত্য এবং আদর্শ উজ্জ্বল মহিমায় বিকাশলাভ করিবে। দেবাত্ম-ভূমি ভারত আবার উঠিবে। স্বামীজী দেখিলেন: "ভারত আবার উঠিবে, কিন্তু জড়ের শক্তিতে নয়, চৈতন্যের শক্তিতে; বিনাশের বিজয়পতাকা লইয়া নয়, শান্তি ও প্রেমের পতাকা লইয়া—সন্ন্যাসীর গৈরিক বেশ সহায়ে; অর্থের শক্তিতে নয়, ভিক্ষা-পাত্রের শক্তিতে।" (ঐ, পৃঃ ৪৬৫) তিনি বলিলেন: "আমি যেন দিব্যচক্ষে দেখিতেছি যে, আমাদের সেই প্রাচীনা জননী আবার জাগিয়া উঠিয়া পুনর্বার

নবযৌবনশালিনী ও পূর্বাপেক্ষা বহুগুণে মহিমান্বিতা হইয়া তাঁহার সিংহাসনে বসিয়াছেন।" (ঐ, পৃঃ ৪৬৬)

এই প্রসঙ্গে বিশ্ববিখ্যাত প্রাচ্যতত্ত্ববিদ্ অধ্যাপক ফ্রেডরিক ম্যাক্সমূলারের প্রসিদ্ধ কথাগুলি আমাদের মনে পড়িতেছে। ১৮৮২ খ্রীস্টাব্দে কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে ভারত সম্পর্কে যে-বক্তৃতামালা অধ্যাপক ম্যাক্সমূলার প্রদান করিয়াছিলেন তাহা তাঁহার রচনা-সংগ্রহে 'India—What Can it Teach Us?' শিরোনামে অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে। উহার প্রথম বক্তৃতায় তিনি বলিয়াছিলেন :

"সমগ্র পৃথিবীর মধ্যে যদি সেই দেশটিকে আমাকে খুঁজিতে হয় যে-দেশ সমগ্র ঐশ্বর্যে, শক্তিতে এবং সৌন্দর্যে প্রকৃতির উদারতম দাক্ষিণ্য-ধন্য—কোন কোন অংশে যে-দেশ বাস্তবিকই ভূস্বর্গ-সদৃশ—তাহা হইলে আমি ভারতবর্ষের দিকেই অঙ্গুলি দেখাইব। যদি আমাকে জিজ্ঞাসা করা হয়, কোন্ আকাশের নিচে মানবমন তাহার সর্বশ্রেষ্ঠ গুণাবলীকে পরিপূর্ণভাবে বিকশিত করিয়াছে, জীবনের বৃহত্তম সমস্যাবলী লইয়া গভীরভাবে চিন্তা করিয়াছে এবং উহাদের কয়েকটির সমাধানও আবিষ্কার করিয়াছে—যে-সমাধান এমনকি প্লেটো এবং কান্টের দর্শনবেত্তাদেরও ভাবাইবে, তাহা হইলে আমি ভারতবর্ষের দিকেই অঙ্গুলি দেখাইব। আর, যদি আমি আমাকে প্রশ্ন করি, আমরা ইউরোপের মানুষ যাহারা প্রায় সম্পূর্ণতঃ গ্রীক ও রোমান এবং সেমিটিক ইহুদীদিগের চিন্তা-ধারায় লালিত হইয়াছি, কোথা হইতে আমাদের সঠিক আদর্শ পাইতে পারি, যে-আদর্শ আমাদের অন্তর্জীবনকে পূর্ণতর করিতে, পূর্ণাঙ্গতর করিতে, অধিকতর সর্বজনীন করিতে, বস্তুতঃ অধিকতর যথার্থ মানবিক গুণে অভিষিক্ত করিতে—আমাদের জীবনকে শুধু লৌকিক ঐশ্বর্যে নয়, লোকোত্তর ও নিত্য ঐশ্বর্যে মণ্ডিত করিতে আমাদের সর্বাধিক প্রয়োজন? আমি আবার ভারত-বর্ষের দিকেই অঙ্গুলি তুলিব।" (দ্রঃ Collected Works—F. Max Mueller, Vol. XIII, 1899)

ম্যাক্সমূলার কখনও ভারতবর্ষে আসেন নাই, ভারতবর্ষকে স্বচক্ষে দেখেন নাই। শুধু ভারত-বর্ষের অধ্যাত্মসাহিত্যকে তিনি গভীরভাবে অধ্যয়ন করিয়াছিলেন এবং তাহার ফল লাভ করিয়া-ছিলেন এক গভীর অন্তর্দৃষ্টি। সেই অন্তর্দৃষ্টিতে এই প্রাজ্ঞ পাশ্চাত্য মনীষী দেখিয়াছিলেন ভারত-বর্ষের আন্তর রূপকে, তাহার নিত্য রূপকে। কিন্তু স্বামীজীর উপলব্ধি শুধু অধ্যয়ন এবং অধ্যয়ন-জাত অন্তর্দৃষ্টি হইতে আসে নাই। ভারতের অধ্যাত্ম-সাহিত্যকে তিনি গভীরভাবে অধ্যয়ন যেমন করিয়া-ছিলেন, তেমনিই অধ্যয়ন করিয়াছিলেন ভারতের ইতিহাস, ভারতের ভূগোল, ভারতের সমাজনীতি, রাষ্ট্রনীতি, দর্শন, সাহিত্য এবং মনোবিদ্যাও। সেখানেই তিনি থামেন নাই। হিমালয় হইতে কন্যাকুমারী পর্যন্ত ভারতের গ্রাম, জনপদ, নগর, অরণ্য, নদী, পর্বত, ভারতের মাটি, ভারতের মানুষের ভাবরূপ ও বস্তুরূপকে নিজের চোখে দেখিয়াছিলেন, নিজের বুদ্ধিতে বিচার করিয়াছিলেন, নিজের হৃদয়ে অনুভব করিয়াছিলেন এবং অবশেষে নিজের সত্তার গভীরে ধ্যানের আলোকে প্রত্যক্ষ করিয়া-ছিলেন। মোহিতলাল মজুমদারকে অনুসরণ করিয়া বলা যায় যে, অধ্যাপক ম্যাক্সমূলারের যে-ভারতদৃষ্টি তাহা তাঁহার "জ্ঞানচক্ষু" হইতে নিঃসৃত, কিন্তু স্বামীজীর যে-ভারতদৃষ্টি তাহা নিঃসৃত তাঁহার "প্রাণচক্ষু" হইতে। বোধহয় "প্রেমচক্ষু" শব্দটি ব্যবহার করিলে আরও যথার্থ হইত। বস্তুতঃ, স্বামীজীর ভারতদৃষ্টি নিঃসৃত হইয়াছিল তাঁহার জ্ঞানচক্ষু, প্রাণচক্ষু এবং প্রেমচক্ষুর সঙ্গম হইতে। বিবেকানন্দের ভারতদৃষ্টি ভারতবর্ষকে শুধু আবিষ্কারই করে নাই, ভারতবর্ষকে উন্মোচিত করিয়াছিল, ভারতবর্ষ নামক ভূখণ্ডের পশ্চাতে যে ভারত-সত্য নামক নিত্য-সত্তা রহিয়াছে তাহাকে অপাবৃত করিয়াছিল।

স্বামীজী বুঝিয়াছিলেন, সেই ভারত-সত্যকে জগতের সম্মুখে স্থাপন করা প্রয়োজন। কারণ, ভারত-বর্ষ একটি ভৌগোলিক ভূখণ্ডমাত্র নয়, ভারতবর্ষ একটি আদর্শ, ভারতবর্ষ একটি প্রতীক, ভারতবর্ষ একটি জীবনদর্শন। কন্যাকুমারীর ধ্যান যখন তাঁহার ভাঙিল তখন তাঁহার উন্মীলিত নয়নদ্বয় পতিত হইল দিগন্তবিস্তৃত মহাসমুদ্রের উপর। রোমাঁ রোলাঁ লিখিয়াছেন : "তিনি (স্বামীজী) মহাসমুদ্রের পানে তাকাইলেন, তাকাইলেন মহাসমুদ্রপারের দেশ-গুলির দিকে। সমস্ত বিশ্বের কাছে তিনি আবেদন করিবেন। ভারতকে যে সমগ্র বিশ্বের চাই। ভারতের সুস্থ জীবন ও মৃত্যুর সহিত সমস্ত বিশ্ব যে জড়াইয়া আছে। মিশর, ক্যালডিয়া প্রভৃতি দেশ-গুলির মতো ভারতের মহা মানস-সম্পদও কি বিলুপ্ত হইবে? মিশর ও ক্যালডিয়াকে আজ মৃত্তিকাগর্ভ হইতে আবিষ্কার করিবার চেষ্টা চলিতেছে। কিন্তু

সেখানে তো ধ্বংসাবশেষ ভিন্ন আর কিছুই অবশিষ্ট নাই ; চিরতরে সেগুলির আত্মার মৃত্যু হইয়াছে।" ( বিবেকানন্দের জীবন—রোমাঁ রোলাঁ ; অনুঃ ঋষি দাস, ১ম প্রকাশ, ১৩৬০, পৃঃ ২২ ) সেই মুহূর্তেই স্বামীজী তাঁহার লক্ষ্যটি বাছিয়া লইলেন। কী সেই লক্ষ্য ? সমুদ্রপারের দেশগুলিতে তিনি ভারতের চিরন্তন বাণী ও আদর্শকে পৌঁছাইয়া দিবেন। ভারতের বাহিরে ভারতের সাংস্কৃতিক ও আধ্যাত্মিক দূত হইবেন তিনি। বহির্বিশ্ব বুঝিবে, ভারত মরে নাই, ভারত মরিবে না। বুঝিবে, ভারত সভ্যতার ধাত্রী-জননী, পৃথিবীর সভ্যতার স্থায়িত্ব নির্ভর করিতেছে ভারতের স্থায়িত্বের উপর।

একদিকে ভারতের মহিমা, ভারতের গৌরবকে বিশ্বসভায় প্রচার ও প্রতিষ্ঠা, অন্যদিকে বিশ্বের সভ্যতাকে আক্রমণ এবং বিজয়—এই যুগ্ম লক্ষ্য ভারতের চারণ সন্ন্যাসীর নয়নসমক্ষে উদ্ভাসিত হইল। ভারতের ইতিহাসের নিবিষ্ট ছাত্র বিবেকানন্দ সেদিন ধ্যানের গভীরে সেই ইতিহাসের পৃষ্ঠায় পৃষ্ঠায় উপলব্ধির আলোকসম্পাত করিলেন। সেই পাঠোদ্ধারের কাহিনী তিনি পরে ভারতবর্ষের মানুষকে শুনাইয়াছেন : "পৃথিবীতে অনেক বড় বড় দিগ্বিজয়ী জাতি আবির্ভূত হইয়াছে ; আমরাও বরাবর দিগ্বিজয়ী। আমাদের দিগ্বিজয়ের উপাখ্যান ভারতের মহান্ সম্রাট অশোক ধর্ম ও আধ্যাত্মিকতার দিগ্বিজয়রূপে বর্ণনা করিয়াছেন। আবার পৃথিবীকে জয় করিতে হইবে। ইহাই আমার জীবনস্বপ্ন।... ইহাই আমাদের সম্মুখে মহান আদর্শ।... ভারতের দ্বারা সমগ্র জগৎ জয়—ইহার কম কিছুতেই নয়।..." উদ্দীপ্ত সন্ন্যাসী বলিয়া চলিলেন : "ওঠ ভারত, তোমার আধ্যাত্মিকতা দ্বারা জগৎ জয় কর।— যখন একদল সৈন্য অপর দলকে বাহুবলে জয় করিবার চেষ্টা করে, তখন তাহারা মানবজাতিকে পশুতে পরিণত করে এবং ক্রমশঃ ঐরূপ পশুর সংখ্যা বাড়িতে থাকে। [ ভারতের ] আধ্যাত্মিকতা অবশ্যই পাশ্চাত্যদেশ জয় করিবে। ...ভারতীয় মহান্ ঋষিগণের ভাবরাশি— বেদান্তের মহান সত্যসমূহ... জগতের প্রয়োজন হইয়াছে। ইহা না হইলে জগৎ ধ্বংস হইয়া যাইবে। সমুদয় পাশ্চাত্য জগৎ যেন একটি আগ্নেয়গিরির উপর অবস্থিত, কালই ইহা ফাটিয়া চূর্ণবিচূর্ণ হইয়া যাইতে পারে।— অতএব··· আধ্যাত্মিকতা ও দার্শনিক চিন্তার দ্বারা আমাদিগকে পৃথিবী জয় করিতে হইবে। ইহা ভিন্ন আর গত্যন্তর নাই ; এইরূপই করিতে হইবে, নতুবা মৃত্যু নিশ্চিত। জাতীয় জীবনকে—যে-জাতীয় জীবন একদিন সতেজ ছিল তাহাকে পুনরায় সতেজ করিতে গেলে ভারতীয় চিন্তারাশি দ্বারা পৃথিবী জয় করিতে হইবে।" ( বাণী ও রচনা, ৫ম খণ্ড, পৃঃ ১৭১-১৭৩ )

স্বামীজীর এই 'জীবনস্বপ্ন' কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণের নিকট হইতে প্রাপ্ত। উহা শ্রীরামকৃষ্ণেরই দান।

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য যে, ১৮৮৮ খ্রীষ্টাব্দের শেষার্ধে পরিব্রাজক স্বামীজী যখন হাতরাসে আছেন তখন একদিন শিষ্য শরৎচন্দ্রকে তিনি বলিয়াছিলেন : "আমার জীবনে একটা মস্ত বড় ব্রত আছে।... এ-ব্রত পরিপূর্ণ করবার আদেশ আমি গুরুর কাছে পেয়েছি —আর সেটা হচ্ছে মাতৃভূমিকে পুনরুজ্জীবিত করা। দেশে আধ্যাত্মিকতা অতিশয় ম্লান হয়ে গেছে আর সর্বত্র রয়েছে বুভুক্ষা। ভারতকে সচেতন ও সক্রিয় হতে হবে এবং আধ্যাত্মিকতার বলে জগৎ জয় করতে হবে।" ( যুগনায়ক বিবেকানন্দ—স্বামী গম্ভীরানন্দ, ৫ম সং, ১৩৯৮, পৃঃ ২০১ )

বস্তুতঃ, 'একটি' ব্রত নয়—'যুগ্ম' ব্রত : (১) আধ্যাত্মিক আদর্শকে বেগবান করিয়া মাতৃভূমির পুনর্জাগরণ—যে-জাগরণ দেশের সমাজদেহকে অস্বীকার করিয়া নয়, দৈহিক বুভুক্ষা দূরীকরণও ঐ জাগরণের অন্যতম প্রধান অঙ্গীকার—এবং (২) জড়বাদী পাশ্চাত্যের ভোগদুর্গকে আক্রমণ ও উহার বিজয়সাধন। এই মহান্ ব্রত উদ্‌যাপনের চিন্তা পরিব্রাজক স্বামীজীর হৃদয়-মনকে সর্বদা অধিকার করিয়া রাখিত। ১৮৯১ খ্রীষ্টাব্দের শেষে তিনি যখন গুজরাটের পোরবন্দরে ফরাসী ভাষা শিখিতেছিলেন সেখানে একজন পণ্ডিত তাঁহাকে পাশ্চাত্যে গমন করিতে পরামর্শ দিয়া বলেন : "যাও, ঝঞ্ঝার বেগে উহাকে আক্রমণ কর এবং অধিকার করিয়া ফিরিয়া এস।" ( দ্রঃ বিবেকানন্দের জীবন, পৃঃ ২২ )

কন্যাকুমারীর শিলাখণ্ডে ধ্যানের আসনে বসিয়া তিনি যেন শুনিলেন ভারতের ভাগ্যবিধাতার নির্দেশ : "যাও, ঝঞ্ঝার বেগে পাশ্চাত্যকে আক্রমণ কর এবং পাশ্চাত্যকে জয় কর। ঐ বিজয় নিদ্রিত ভারতকে জাগ্রত করিবে, ভারতকে উত্তোলন করিবে এবং জগৎকে রক্ষা করিবে।"

ঐ বাণী স্বামীজীর কানে বাজিতে লাগিল, তাঁহার প্রাণে ধ্বনি তুলিতে লাগিল। তাঁহার হৃদয় মন এক অভূতপূর্ব গর্ব ও আনন্দে এই উপলব্ধিতে শিহরিত হইতে লাগিল : "সহস্র বিপর্যয় ও শত আঘাত সত্ত্বেও আমার ভারত অমর ভারত।" ▣

# স্বামী তুরীয়ানন্দের অপ্রকাশিত পত্র*

॥ ৩৭ ॥

রামকৃষ্ণ মিশন সেবাশ্রম
পোঃ কনখল
জেলা—সাহারানপুর ইউ.পি.
৩০ জুলাই, ১৯১৪

প্রিয় রামচন্দ্র,

অনেক দিন হইল তোমার নিকট হইতে কোন সংবাদ পাইতেছি না। আশা করি তুমি সম্পূর্ণ সুস্থই আছ। আমার স্বাস্থ্য, দুঃখের বিষয়, যেমন থাকিবে ভাবিয়াছিলাম সেরূপ নয়। আমি প্রায় গত তিন বৎসর যাবৎ বহুমূত্র রোগে ভুগিতেছি। দিন দিনই অবস্থা খারাপই হইতেছে। যাহা হউক, তাহার জন্য আমি মোটেই ভাবি না। প্রভুর ইচ্ছা যাহা তাহাই হইবে। স্বামী কল্যাণানন্দও বলিতেছিলেন, তিনিও তোমার নিকট হইতে তাঁহার চিঠির জবাব পান নাই। তাহাতেই আমি একটু চিন্তিত হইয়াছি। যদি অসম্ভব না হয় তবে যথাশীঘ্র সম্ভব কয়েক ছত্র আমাকে লিখিয়া পাঠাও। আমার ধূপ শেষ হইয়া আসিয়াছে। কিছু ধূপও পাঠাইতে চেষ্টা করিবে। তবে তাড়াহুড়া করিবার দরকার নাই। পরে পাঠাইলেও চলিবে। স্বামী কল্যাণানন্দ এবং আশ্রমের অন্যান্য সকলে ভালই আছে এবং আশ্রমের কাজ বেশ সুষ্ঠুভাবে চলিতেছে। আশা করি তুমি সুখে-সমৃদ্ধিতে কাটাইতেছ। আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা ও ভালবাসা জানিবে। ইতি

প্রভুপদাশ্রিত
তুরীয়ানন্দ

॥ ৩৮ ॥

মায়াবতী
১০. ১০. ১৯০৫

প্রিয় কালীকৃষ্ণ,[১]

তোমার পাঠানো ভগবদ্গীতাখানি ঠিক সময়েই পাইয়াছি। সেজন্য তোমাকে অনেক ধন্যবাদ। আশা করি তোমরা সকলে কুশলে আছ। এখানকার সকলে ভালই আছে। আমার স্বাস্থ্য পূর্বাপেক্ষা অনেক সুস্থ, কিন্তু এখনও উপসর্গমুক্ত নহি।

মঠের সকলকে আমার ৺বিজয়ার প্রণাম ও সম্ভাষণ জানাইবে এবং তুমিও আমার বিজয়ার শুভেচ্ছা গ্রহণ করিবে।

আশা করি, তোমরা সকলেই সুস্থ ও কুশলে আছ। তুমি আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা ও ভালবাসা জানিবে। ইতি

স্নেহাবদ্ধ
তুরীয়ানন্দ

* চিঠি-দুটি ইংরেজীতে লেখা।—সম্পাদক, উদ্বোধন

১ স্বামী বিরজানন্দ

ভাষণ

# ঐক্য, সংহতি ও রাষ্ট্রচেতনার উন্মেষে স্বামী বিবেকানন্দের আহ্বান

## পি. ভি. নরসিমহা রাও

১৯৯২-এর ২৮ ডিসেম্বর কন্যাকুমারীতে ভারত সরকার আয়োজিত স্বামী বিবেকানন্দের ভারত-পরিক্রমা এবং শিকাগো ভাষণের শতবর্ষ উৎসবে প্রধানমন্ত্রী পি. ভি নরসিমহা রাওয়ের ভাষণ।—সম্পাদক, উদ্বোধন

স্বামী বিবেকানন্দের শিকাগো বিশ্বধর্ম-সম্মেলনে আবির্ভাবের শতাব্দী-জয়ন্তী বর্ষকে (১৯৯৩) ভারত সরকার 'রাষ্ট্রচেতনা বর্ষ' রূপে চিহ্নিত করেছে। ভাবগত অর্থে যে-ভূমি থেকে তাঁর বিশ্বপরিক্রমার সূচনা হয়েছিল সেই কন্যাকুমারীর পবিত্র ভূমিতে রাষ্ট্রচেতনা বর্ষের শুভ উদ্বোধন উৎসবে বক্তব্য রাখতে পারাকে আমি দুর্লভ সৌভাগ্য বলে মনে করছি। এই সুযোগে আমি এই সম্মেলনের উদ্যোক্তাদের সাধুবাদ দিতে চাই। কারণ তাঁরা স্বামী বিবেকানন্দের ভারত-পরিক্রমা এবং শিকাগোর বিশ্বধর্মসম্মেলনে প্রদত্ত স্বামীজীর যুগান্তকারী ভাষণের শতবর্ষ উপলক্ষে যে-আন্দোলনের সূচনা করছেন, তা দেশের কাঠামোকে মজবুত করবে এবং সেইসঙ্গে রাষ্ট্রীয় চেতনাকে আরও উন্নত করতে সহায়তা করবে। রাষ্ট্রচেতনা-বর্ষের উদ্বোধনই এক উল্লেখযোগ্য ঘটনা। সেরকমই স্বামী বিবেকানন্দের ভারত-পরিক্রমা এবং শিকাগোর বিশ্বধর্মসম্মেলনে আমাদের সনাতন ধর্মের গৌরব ও মহিমা সম্পর্কে তাঁর ভাষণের শতবর্ষ উৎসব ততটাই গুরুত্বপূর্ণ। আমাদের জনসাধারণের জীবনের এই গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্তে একটি সাংস্কৃতিক আন্দোলনের মধ্যে দুটি এহেন গতিশীল ঘটনার মিলন এই সমাবেশকে সর্বোৎকৃষ্ট তাৎপর্য দিয়েছে।...

আজ আপনাদের মধ্যে আসতে পেরে আমি নিজেকে অত্যন্ত ভাগ্যবান মনে করছি। কারণ, এখানে উপস্থিত অন্যান্য বক্তাদের কাছে স্বামীজীর আশা-আকাঙ্ক্ষা সম্বন্ধে বক্তব্য শুনতে পাব এবং যে নৈতিক অস্থিরতা আজকের ভারতবাসীকে বিচলিত করছে সেবিষয়ে এবং স্বামীজী প্রদর্শিত যে-পথে জনসাধারণ তাঁদের স্বপ্নের সুন্দর সমাজ গড়ে তুলতে পারবেন, সেবিষয়েও জানতে পারব।...

### আমাদের সভ্যতার শক্তি

ভারতের সভ্যতা সুপ্রাচীন ঐতিহ্যের সভ্যতা। তবু রাষ্ট্রত্বের ধারণার সঙ্গে আমরা নতুন পরিচিত এবং আমাদের রাষ্ট্র যে একটি ধর্মনিরপেক্ষ এবং গণতান্ত্রিক সাধারণতন্ত্র হিসাবে গঠিত হয়েছে, তার বয়স অর্ধ শতকের কম। ভাবগত অর্থে শতবর্ষ পূর্বে স্বামীজী যে-রাষ্ট্রচেতনার বীজ বপন করেছিলেন তাকে পুষ্ট করলে আমাদের প্রজাতন্ত্র মজবুত হবে। আমাদের সভ্যতার আধ্যাত্মিক ঐতিহ্য এর স্থায়ী কাঠামো হতে পারে। এ-কাঠামো আমাদের নেতৃবর্গ এবং যাঁদের আত্মত্যাগে ভারতীয় জাতীয়তাবাদের বিজয় হয়েছিল, তাঁদের আদর্শ ও দূরদর্শিতার প্রতিভূ। কারণ, ভারতীয় সংস্কৃতি হাজার হাজার বছর ধরে দূরে-কাছে সর্বত্র গিয়েছে। পৃথিবীর প্রতিটি কোণে ভারতীয় সংস্কৃতির প্রতিধ্বনি আপনারা শুনতে পাবেন। কারণ, এটি শুধু একটিমাত্র দেশের ধর্ম বা সংস্কৃতি নয়; এই সংস্কৃতি সমগ্র মানবজাতির।

আমাদের সমাজের গঠন ও বিকাশে ধর্মীয় নেতাদের গুরুত্বকে মানবিক বিষয়ের পণ্ডিতজনেরা স্বীকৃতি দিয়েছেন। তাঁরা সংসারত্যাগীদের আধ্যাত্মিক শক্তির কথা বলেন। আমাদের এই সমাজে তিনিই মহত্তম ব্যক্তি, যিনি সবকিছু ত্যাগ করেন। তাঁর সমকক্ষ আর কেউ নন। সংসার-

ত্যাগীর স্থান সবার ওপরে। তাঁর কাছে মাথা নত হয় প্রত্যেকের। তিনি যদি 'স্বামী' হন বা সন্ন্যাসী হন, তবে তাঁর কাছে আমরা কেবল প্রেরণাই গ্রহণ করি। আমাদের বিশ্বাস ও ধারণা অনুযায়ী সেটাই তাঁর শ্রেষ্ঠ সাফল্য। সম্ভবতঃ এ-জিনিস পৃথিবীর অন্য অনেক দেশেই দেখা যায় না এবং ত্যাগী পুরুষের স্থান সবার ওপরে—ভারতের এই বৈশিষ্ট্যও অনন্যসাধারণ। বিগত শতাব্দীর মতোই আমাদের কালেও নৈতিক শৃংখলা ও সামাজিক সুসঙ্গতির প্রকৃত ভিত্তি হলো, সমাজের কাঠামোর মাধ্যমে নৈতিক প্রবক্তাদের কথিত বাণীর প্রচার এবং তার ফলস্বরূপ জনগণের দিক থেকে ঐক্যবদ্ধ কর্মোদ্যোগ।

এদেশে শত শত সাধু-সন্ত জন্মেছেন। তাঁরা মানুষকে যে-পথের নির্দেশ দিয়ে গেছেন, সমস্ত গ্রন্থ একত্র করলেও তা পাওয়া যাবে না। কবীর, দাদু বা দয়াল, মহারাষ্ট্রের তুকদেওজী মহারাজ কিংবা অন্ধ্রের মহান হরিদাস—এঁদের যেকোন একজনকেই দেখুন। তাঁরা সমাজকে বহুল পরিমাণে নৈতিক উপদেশ দিয়ে গেছেন, যা গ্রন্থে পাওয়া যাবে না; পুস্তকের জ্ঞানের চেয়ে অনেক সুচারুরূপে তাঁরা সমাজকে পরিচালিত করেছেন। যদিও পুস্তকলব্ধ জ্ঞানের প্রয়োজন যথেষ্ট, কিন্তু মুখের ভাষা ভারতীয় ইতিহাসে অত্যন্ত সফল শক্তিরূপে কাজ করেছে। কারণ, যিনি জনগণকে উপদেশ দিচ্ছেন, যিনি যুক্তি দিচ্ছেন, যিনি শ্রোতাদের অন্তরকে উজ্জীবিত করছেন তাঁর এবং শ্রোতাদের মধ্যে এক সরাসরি যোগাযোগ স্থাপিত হয়। এই প্রত্যক্ষ যোগাযোগের কোন বিকল্প নেই এবং এটাই শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে আমাদের সমাজকে অনুপ্রাণিত করেছে। আসলে, নৈতিক প্রবক্তাদের ব্যক্তিগত যে জীবন ও কর্মের উদাহরণ এবং মৌখিক ধর্মসংক্রান্ত ভাষণ সামাজিক ক্রিয়াকলাপকে উদ্বুদ্ধ করে, সেই মহান ঐতিহ্য আগের মতো আজও আমাদের দেশে সজীব।...

আজ আমরা স্বামী বিবেকানন্দের ভারত-পরিক্রমা এবং বিশ্ববাসীর প্রতি তাঁর উদাত্ত আহ্বানের কথা স্মরণ করছি; কারণ আমাদের রাষ্ট্রচেতনাকে আমরা গভীরতা দিতে চাই। গান্ধীজী ভারতের নৈতিক ও সামাজিক ইতিহাসকে এক দিশায় চালিত করে যে প্রাথমিক রূপান্তর ঘটিয়েছিলেন, স্বামীজী ছিলেন তার পূর্বসূরী। গান্ধীজীর রচনা থেকে আমরা জানতে পারি, তিনি রামকৃষ্ণ পরমহংস এবং তাঁর শিষ্য স্বামী বিবেকানন্দের দ্বারা গভীরভাবে প্রভাবিত হয়েছিলেন। গান্ধীজীর রচনা, প্রবন্ধ থেকে যেমন, তেমনি সময়ে সময়ে শ্রোতাদের কাছে প্রদত্ত তাঁর ভাষণ থেকেও তা জানতে পারা যায়। আমরা বুঝতে পারি, গান্ধীজীর জীবন ও কর্মের ওপরে শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস এবং স্বামী বিবেকানন্দের জীবন ও আদর্শের কত গভীর প্রভাব ছিল।

### স্বামী বিবেকানন্দের বৈশিষ্ট্য

শ্রীরামকৃষ্ণদেবের শিক্ষা ও বাণীর গভীর প্রভাব স্বাভাবিকভাবেই স্বামী বিবেকানন্দের ওপর পড়েছে। কিন্তু স্বামীজীকে শুধুমাত্র তাঁর গুরুর অনুসরণকারিরূপে দেখা ভুল হবে। তিনি ছিলেন অসামান্য প্রতিভার অধিকারী। গুরুর শিক্ষায় তিনি সকল শুভ প্রভাবের দিকে নিজের হৃদয় ও মস্তিষ্ককে উন্মুক্ত রেখেছিলেন। স্বামীজীর একটি প্রতিকৃতির দিকে কিছুক্ষণ স্থির দৃষ্টিতে চেয়ে থাকলে আমরা দেখতে পাই কী অন্তর্ভেদী তীক্ষ্ণ বুদ্ধিমত্তা, অশান্ত উদ্যম এবং আধ্যাত্মিক জীবনীশক্তি দিয়ে এই মহান ব্যক্তি গঠিত।

স্বামী বিবেকানন্দ মহান আধ্যাত্মিক ক্রিয়াকর্মের শুধু দ্রষ্টা অথবা নির্মাতা ছিলেন না, সবার ওপরে তিনি ছিলেন কর্মযোগী, কর্মবীর। অবশ্য তাঁর মধ্যে চিন্তাধারা ও কর্ম—এই দুই গুণেরই সুষ্ঠু সমাবেশ ঘটেছিল, যা একই ব্যক্তির মধ্যে দুর্লভ। এটাই হলো স্বামী বিবেকানন্দের অনন্যসাধারণ বৈশিষ্ট্য। তিনি নিজেই শুধু মহান ছিলেন না, তিনি অন্যের মধ্যেও সেই সকল গুণাবলী সঞ্চারিত করতেন। কারণ, সবার ওপরে তিনি ছিলেন বিরাট কর্মিপুরুষ।

স্বামীজী বিশ্বাস করতেন, অন্য সবকিছু ছেড়ে দিলেও ভারতের প্রয়োজন এক আধ্যাত্মিক বিপ্লবের। আধ্যাত্মিক পথেই শুধু ভারতের স্থায়ী সামাজিক গতিশীলতা আসতে পারে। এই প্রত্যয় থেকেই তাঁর সামাজিক ও রাষ্ট্রনৈতিক মতবাদ

তিনি তৈরি করেছিলেন। তাঁর আসল লক্ষ্য ছিল সমাজ-বিপ্লব এবং সে-পথে তিনি যা আনতে চেয়েছিলেন, তা হলো আধ্যাত্মিক বিপ্লব। তাঁর চিন্তাধারার এই দুটিভাব পাশাপাশি চলেছে।

স্বামী বিবেকানন্দের ওপরে শ্রীরামকৃষ্ণের যে গভীর প্রভাব ছিল তা প্রতিফলিত হয়েছে সনাতন হিন্দুধর্মের অন্তর্নিহিত নীতি এবং অন্যান্য ধর্ম-ব্যবস্থার সঙ্গে তার সম্পর্কের বিষয়ে স্বামীজীর বাণী ও রচনায়। তাঁর আচার্যদেবের মতো স্বামীজী মনে করতেন, হিন্দু অধ্যাত্মবাদের উৎস হলো বেদান্ত এবং বহুবিধ নৈতিক পথের অতি প্রয়োজনীয় বুনিয়াদ রয়েছে হিন্দুসমাজের মধ্যে। তিনি বলেছেন: "বেদান্ত শব্দটির মধ্যেই আছে ভারতের ধর্মীয় জীবনের সমগ্র পটভূমি।" তিনি আরও বলছেন: "আমি এমন একটি ধর্ম প্রচার করছি বৌদ্ধধর্ম যার বিদ্রোহী সন্তান এবং খ্রীস্টধর্ম যার দূরাগত প্রতিধ্বনি।" এহেন সমতাই তিনি সব ধর্মের মধ্যে প্রত্যক্ষ করেছিলেন। এধরনের সাদৃশ্যই তিনি পৃথিবীর সব ধর্মের মধ্যে উপলব্ধি করেছিলেন।

যদিও স্বামী বিবেকানন্দের মধ্যে শ্রীরামকৃষ্ণের সহিষ্ণুতা ও উদারতার আদর্শের প্রভাব স্পষ্ট, কিন্তু তাঁর আধ্যাত্মিক ভাষণাবলী ছিল সঞ্জীবনী শক্তিতে এবং মহৎ উৎসাহে সমৃদ্ধ যা ছিল প্রধানতঃ তাঁর ব্যক্তিগত, আধ্যাত্মিক ও সামাজিক গতিশীল ভাবনার ফলশ্রুতি। শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর উত্তরসূরী হিসাবে তাঁকে এই গুণাবলীর জন্যই বেছে নিয়েছিলেন, এটা মনে করার যথেষ্ট ও সঙ্গত কারণ আছে।

### সামাজিক গতিশীলতা

যাঁরা পাশ্চাত্যের তথাকথিত বস্তুতান্ত্রিকতাকে বিদ্রূপ করেছেন, স্বামী বিবেকানন্দ তাঁর যুক্তিপূর্ণ ভাষণে তাঁদের মত খণ্ডন করেছেন। স্বামীজীর ভাষণের মধ্যে আধ্যাত্মিক ও সামাজিক গতিশীলতার ( social dynamism ) অজস্র নজির আমরা পাই। মনে রাখতে হবে, এসব কথা তিনি বলে গেছেন ১৮৯৩ খ্রীস্টাব্দে—আজ থেকে ১০০ বছর আগে। তিনি বলেছেন: আমরা নির্বোধের মতো বস্তুতান্ত্রিক সভ্যতার বিরুদ্ধে কথা বলি। এ যেন আঙুর ফল টক বলা। বস্তুতান্ত্রিক সভ্যতা হয়তো বিলাসবহুল, কিন্তু দরিদ্রের জন্য কর্মসৃষ্টির উদ্দেশ্যে এর প্রয়োজন আছেই। "যে-ঈশ্বর আমাকে এখানে খাদ্য দিতে পারেন না, তিনি আমাকে স্বর্গে শান্তি দিতে পারবেন, তাঁর সম্পর্কে আমার বিশ্বাস নেই"—স্বামীজী বলেছেন। আজ থেকে একশো বছর আগে এর চেয়ে বিপ্লবাত্মক দৃষ্টিভঙ্গি, এর চেয়ে বিপ্লবাত্মক বিবৃতি কল্পনা করতে পারি কি? তিনি বলেছেন: "ক্ষুধার্ত ব্যক্তির কাছে ঈশ্বর একটুকরো রুটিরূপেই প্রতিভাত হয়।" গান্ধীজীও ঠিক এই কথা বলেছেন। স্বামীজী নিজের দেশকে সঞ্জীবিত করার জন্য পশ্চিম থেকে উদারভাব গ্রহণ করার পক্ষপাতী ছিলেন। 'বর্তমান সমস্যা' প্রবন্ধে তিনি বলেছেন: ইউরোপের বৃহৎ কর্মযজ্ঞশালা থেকে প্রচণ্ড শক্তির বৈদ্যুতিক প্রবাহ সমগ্র জগৎকে সজীব করে তুলছে। আমরা চাই সেই কর্মশক্তি, সেই স্বাধীনতাপ্রীতি, চাই আত্মনির্ভরতার আদর্শ, চাই অবিচল ধৈর্য, কর্মকুশলতা, লক্ষ্যের প্রতি একাগ্রতা, চাই উন্নতির জন্য তীব্র আকাঙ্ক্ষা। সুদীর্ঘ এক শতাব্দী আগে এইসব গুণাবলী তিনি পাশ্চাত্যের সমাজে দেখেছিলেন। পাশ্চাত্যের ভাল-মন্দ দুইই তিনি দেখেছেন। দুয়ের মধ্যে তিনি বেছে নিয়েছেন ভালকে, আর যা শ্রেয় নয় তা বর্জন করতে বলেছেন। তাঁর মধ্যে ছিল উদারতা, ছিল সমদৃষ্টি। প্রকৃত সাধুব্যক্তির এটি এক মহান বৈশিষ্ট্য এবং এই কারণেই তিনি মানুষের নেতা হয়ে ওঠেন। স্বামীজীও তা-ই হয়েছিলেন।

১৮৮৬ খ্রীস্টাব্দে শ্রীরামকৃষ্ণের তিরোধানের পর স্বামী বিবেকানন্দ যখন তাঁর প্রধান শিষ্য হিসাবে আবির্ভূত হলেন তখন যে সামাজিক প্রেক্ষাপট তিনি কাজের জন্য বেছে নিলেন, তা দক্ষিণেশ্বরের সন্তপুরুষের কর্মক্ষেত্রের চেয়ে আপাতদৃষ্টিতে অবশ্যই ব্যাপকতর ছিল। সুদূর অতীত কাল প্রত্যক্ষ করেছে খ্রীস্টপূর্ব পঞ্চম শতকে বুদ্ধের পর্যটন অথবা অষ্টম খ্রীস্টাব্দে শঙ্করের ভ্রমণ; সারা দেশে তীর্থযাত্রা অথবা ভারত-পরিক্রমার ধারণা ভারতে আধ্যাত্মিক পুরুষদের শিক্ষার এক অভিন্ন উপকরণ ছিল। ১৮৮৮ খ্রীস্টাব্দে স্বামী বিবেকানন্দ ভারতের মধ্যেই অন্যান্য স্থানের ধর্মগুরুদের সঙ্গে ভাবের আদান-প্রদানের উদ্দেশ্যে এবং সামগ্রিকভাবে

দেশের সামাজিক ও আধ্যাত্মিক বাতাবরণ সম্পর্কে জ্ঞানলাভের উদ্দেশ্যে তাঁর পর্যটন শুরু করেন। আসলে একজন সাধারণ হিন্দুর জীবনে এটাই হলো বানপ্রস্থ জীবন। কোন একস্থানে তাঁর স্থায়িভাবে বাস করার কথা নয়, এমনকি স্বগৃহেও নয়। তাঁকে গৃহত্যাগ করতে হয়, একস্থান থেকে অন্যস্থানে ঘুরে বেড়াতে হয়, মানুষের কাছ থেকে জ্ঞানলাভ করতে হয় এবং জীবন থেকে নিজে যাকিছু শিখেছেন, তা অন্যকে দিতে হয়। একজন সাধারণ ভারতীয়ের জীবনের এটাই হলো পূর্ণ জ্ঞানার্জনের পদ্ধতি। সুতরাং পরিক্রমার আসল লক্ষ্য হলো এটাই। মহান ব্যক্তিরা সারা দেশে ঘুরে বেড়ান। সামান্য ব্যক্তি সমগ্র দেশে যেতে পারেন না; যতটা দূরত্ব তাদের সাধ্যের ভিতরে, ততটাই তাঁরা যান।

### স্বামীজীর ভারত-পরিক্রমা : প্রেরণাময় এক অভিজ্ঞতা

ভারত-পরিক্রমার ফলে ভারতের আধ্যাত্মিক অখণ্ডতার বিষয়ে স্বামীজীর ধারণা আরও বিস্তৃত ও গভীর হয়েছিল। সেইসঙ্গে দেশের জন্য কি কাজ করা প্রয়োজন, সেবিষয়েও তাঁর ধারণা হয়েছিল। স্বামীজীর আধ্যাত্মিক ভ্রমণ শেষ পর্যন্ত তাঁকে নিয়ে আসে উপমহাদেশের দক্ষিণতম প্রান্তে কন্যাকুমারীতে। কন্যাকুমারীতে তিনি বিনিদ্র রাত কাটিয়ে তাঁর পরিক্রমাকালে কী দেখেছেন, কী শুনেছেন তা নিয়ে চিন্তা করতে লাগলেন। রাত্রির নিস্তব্ধতার মধ্যে চিন্তামগ্ন অবস্থায়, ধ্যানের গভীরে তাঁর চোখের সামনে ভেসে উঠল এক উজ্জ্বল ভারতের ছবি, যার আধ্যাত্মিক ও সামাজিক অস্তিত্ব গড়া হয়েছে বিবিধ সংস্কৃতি এবং ধর্ম দিয়ে। এই বিভিন্নতা সত্ত্বেও প্রকৃত উদার এবং বিশাল অখণ্ড এক সভ্যতা এক অভিন্নতার সূত্রে গড়ে উঠেছে। গভীর ধ্যানের মধ্য দিয়ে স্বামীজী আরও অনুভব করলেন, এক নতুন আধ্যাত্মিক ও সামাজিক চেতনা, উদার, গণতান্ত্রিক ও একই সঙ্গে দৃঢ় রাষ্ট্রচেতনার মাধ্যমে কিভাবে মানুষের ভাগ্যের উন্নতিসাধন সম্ভব এবং ভারতের ঐক্যকে শক্তিশালী করতে সমর্পিতপ্রাণ সন্ন্যাসীরা কিভাবে কাজ করতে পারেন। এর পরে এই সবকিছুই তাঁর জীবনের একনিষ্ঠ ব্রত হয়ে উঠল।

স্বামী বিবেকানন্দের ভারত-পরিক্রমার শেষ পর্যায়ে তাঁকে এমন একটি সিদ্ধান্ত নিতে দেখি যা তাঁর আধ্যাত্মিক কর্মধারাকে অত্যন্ত অভাবনীয়ভাবে প্রভাবিত করেছে। ১৮৯৩ খ্রীস্টাব্দে শিকাগোয় বিশ্ব-ধর্মসম্মেলন হবার কথা। কিছুদিন থেকেই নিজের মনে একটা ভাবনাকে নাড়াচাড়া করছিলেন তিনি, তা হলো সনাতন ধর্মের চিন্তাধারা ও আদর্শকে এই সম্মেলনে উপস্থাপন করতে হবে। পরিক্রমার অভিজ্ঞতায় উৎসাহিত হয়ে তিনি বিশ্বধর্মসম্মেলনে যাওয়াই স্থির করলেন। ১৮৯৩ খ্রীস্টাব্দের সেপ্টেম্বরে শিকাগোয় বিশ্বধর্মসম্মেলনে স্বামীজীর আধ্যাত্মিক কর্মসাফল্যকে পূর্ণভাবে উপলব্ধি করতে হলে ঊনবিংশ শতকের শেষভাগে পাশ্চাত্যে হিন্দু-ধর্মকে কিভাবে উপলব্ধি করা হয়েছে, সংক্ষেপে তা জানা প্রয়োজন। এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ, কারণ, এরপর আমরা অনেক বছর পার হয়ে এসেছি। হিন্দুধর্মকে নিছক একটি ধর্ম হিসাবে নেওয়া চলে না। হিন্দুধর্মের বহু নেতা বিদেশে গেছেন, সেখানে অসাধারণ কাজ করেছেন। কিন্তু এখনো ভারতে ভয়ঙ্কর কিছু ঘটে যার ফলে পৃথিবীর সর্বত্র হিন্দুত্বের মর্যাদা ক্ষুণ্ণ হয় এবং এই প্রসঙ্গে অতি সাম্প্রতিক কালে দেশে যা ঘটে গেল তার কথা আমি সবাইকে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি।

ঐসময়ে অর্থাৎ উনিশ শতকের শেষভাগে ভারত ছিল ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের পরাধীন এবং বিশ্বসমাজ ভারতবর্ষকে জানত দারিদ্র্য, আচার-বিচার এবং কুসংস্কারের বোঝায় ভারাক্রান্ত দেশরূপে। দুনিয়া তাই বিশ্বাস করত এবং আরও ভাবত, এর পিছনে কোন বৃহত্তর নৈতিক আদর্শ নেই। জনৈক প্রসিদ্ধ ইংরেজ হিন্দুধর্মকে বলেছেন, কতগুলি ইতরশ্রেণীর দেবদেবী, কাঠ ও পাথরের দানব, মিথ্যা নীতি ও দুর্নীতিগ্রস্ত অভ্যাস এবং মিথ্যা কিংবদন্তী ও জাল অনুশাসনযুক্ত পৌত্তলিকতা। এখন আপনারা চিন্তা করুন, সেই অবস্থা থেকে স্বামী বিবেকানন্দ পাশ্চাত্যের জনগণের চোখে, সারা পৃথিবীর চোখে ভারতকে কোথায় তুলে নিয়ে গিয়েছিলেন এবং এটাই হলো তাঁর মহত্ত্বের প্রকৃত স্বরূপ,

মাতৃভূমিকে তিনি যে সেবা করে গেছেন, এটাই তার যথার্থ প্রকৃতি।

### স্বামীজীর শিকাগো ভাষণ

শিকাগোয় স্বামী বিবেকানন্দের বক্তৃতা, বলতে গেলে সমগ্র পশ্চিমী দুনিয়ায় ঝড় বইয়ে দিল। বিবেকানন্দ এক ঝটকায় হিন্দুর সনাতন ধর্ম সম্বন্ধে পশ্চিমী চিন্তাধারায় নাটকীয় পরিবর্তন ঘটালেন। সম্মেলনের একজন প্রতিনিধি বলেছেন, বিবেকানন্দ ছিলেন ঐ সভার প্রশ্নাতীতভাবে সর্বাপেক্ষা জনপ্রিয় ও প্রভাবশালী পুরুষ। শিকাগোর একটি প্রধান সংবাদপত্র তাঁর বর্ণনা করতে গিয়ে বলেছেন, স্বামীজী সুউচ্চ মানসিক শক্তির অধিকারী এক ব্যক্তিত্ব, যিনি নিজের অবস্থার প্রভু।

আমাদের দেশে আজকের রাষ্ট্রচেতনার সঙ্গে স্বামী বিবেকানন্দের এই উদার দৃষ্টিভঙ্গির সম্পর্ক আমরা কেমন করে স্থাপন করতে পারি? এই প্রশ্নটাই এখন আমাদের সকলের সামনে এবং এর উত্তর দেওয়া বড় সহজ নয়। তাছাড়া বর্তমান কালে বিভিন্ন ধর্মীয় সম্প্রদায়ের মধ্যে যে দুস্তর ব্যবধান সৃষ্টি হয়েছে, স্বামীজীর জীবন ও চিন্তাধারার সাহায্যে কিভাবে তাকে কমিয়ে আনা যায় তা ভেবে দেখতে হবে। কিভাবে আমরা তা করব? এসব প্রশ্নের উত্তর দিতে পারেন বিভিন্ন ধর্মের বিভিন্ন নেতাগণ। আধ্যাত্মিক বিষয়ে এবং আমাদের জনগণের ক্ষোভ-দুঃখ সম্বন্ধে যাঁরা অবগত আছেন, তাঁরা সাধারণ রাজনীতিকদের চেয়ে অনেক ভালভাবে এ-প্রশ্নের জবাব দেবেন। আমি জোর দিয়ে বলতে চাই, এর জবাব পাওয়া আজ অত্যন্ত জরুরী। আজই আমরা তা চাই। সময় নষ্ট করা চলবে না। কারণ, যদি আমরা স্পষ্ট কোন উপায় বের করতে না পারি, জনগণকে সেগুলো বোঝাতে, শুধু বোঝাতে নয়—তাদের জীবনে তা প্রতিফলিত করে যত শীঘ্র সম্ভব সমগ্র দেশের জীবনধারার উন্নতি যদি করতে না পারি, তবে ভারতের সর্বনাশ হয়ে যাবে। আমরা কি একাজ করতে পারব? এটাই এখন জিজ্ঞাসা। আজ এর এত বেশি প্রয়োজন, যা আগে কখনো মনে হয়নি। আমার সীমিত বুদ্ধিতে আমি যা বুঝি, তা বিনীতভাবে আপনাদের সামনে তুলে ধরতে চাই। আমার মনে হয়, একশো বছর আগে স্বামী বিবেকানন্দ বিশ্বের সামনে সহিষ্ণুতা এবং সর্ব-ধর্মের প্রতি যে সম-অনুভূতি, মৈত্রী, উদারতা এবং সকল আধ্যাত্মিক পথের ঐক্যের বাণী শুনিয়েছিলেন, তা হিন্দু, মুসলিম, খ্রীস্টান, শিখ ও অন্য সব ধর্মের পক্ষেই তাৎপর্যপূর্ণ। স্বামীজীর বাণী সেদিনও যেমন প্রাসঙ্গিক ছিল, আজও সেরকমই প্রাসঙ্গিক। বরং আজকের দিনে তা আরও বেশি প্রাসঙ্গিক ও তাৎপর্যপূর্ণ।

### স্বামীজীর প্রাসঙ্গিকতা

গত শতাব্দীর শেষ দশকে স্বামীজী সনাতন ধর্মের আদর্শকে যেমন দেখেছিলেন, তাঁর উদাত্ত বক্তৃতায় তা তেমনই ধরে রেখেছিলেন। আজকের দিনে তা অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক। আজ আমরা দেশে যে-রাষ্ট্রচেতনা জাগানোর চেষ্টা করছি, তা আমাদের ধর্মের মহৎ ও চিরস্থায়ী আদর্শ থেকে নিতে পারি। ঐ আদর্শ দিয়ে আমাদের দেশকে এক সুসংগঠিত রাষ্ট্র করে গড়ে তুলতে পারি, যেখানে তার নাগরিক-দের জীবনে থাকবে নৈতিক মর্যাদা ও বস্তুগত প্রাচুর্য। এই পরমোৎকর্ষ অর্জনই হবে স্বামী বিবেকানন্দের প্রতি আমাদের শ্রদ্ধা প্রদর্শনের শ্রেষ্ঠ উপায়, যাঁর জীবন ও ব্রত আজ আমরা স্মরণ করছি।

সত্যের পথে, একতার পথে, সংহতির পথে এই মহান যাত্রায় রাজনীতিবিদ, সমাজসেবী, দেশের প্রতিটি মানুষ সহায়তা করতে পারেন। কিন্তু অন্য সকলের চেয়েও আমাদের প্রয়োজন ধর্মীয় নেতাদের, আধ্যাত্মিক নেতাদের পথনির্দেশ। আধ্যাত্মিক নেতা আমাদের দেশে অনেক আছেন। শুধু যদি তাঁরা সংগঠিত হন, যদি একসাথে এগিয়ে আসেন, যদি তাঁরা আন্তরিকভাবে এবং যথার্থভাবে স্বামী বিবেকানন্দের প্রচারিত ও প্রদর্শিত ভাব ও আদর্শ প্রচার করেন এবং আমাদের পথ দেখান তবে আমাদের দেশ এক সুন্দর বাসভূমিতে পরিণত হবে।

স্বামীজীর ভারত-পরিক্রমা, তাঁর শিকাগো ভাষণের শতবর্ষ এবং রাষ্ট্রচেতনা বর্ষ উদ্‌যাপনের তাৎপর্য এখানেই। আমরা যার জন্য চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি, ভারতের ও ভারতের ভবিষ্যতের সেই বিপন্মুক্তি এতেই নিহিত।

বিশেষ রচনা

# বিবেকানন্দ-জীবনের সন্ধিক্ষণ : পরিব্রজ্যার অভিজ্ঞতা ও উপলব্ধির ঐতিহাসিক তাৎপর্য

নিমাইসাধন বসু

স্বামী বিবেকানন্দ পরিব্রজ্যায় বেরিয়ে একদিন বলেছিলেন : "যখন ফিরব সমাজের ওপর বোমার মতো ফেটে পড়ব।"[১] ঘটেও ছিল তাই। কিন্তু এই বোমা সাধারণ বোমা ছিল না। আণবিক বোমার মতো ছিল তার প্রতিক্রিয়া ও সুদূরপ্রসারী প্রভাব—দেশে ও বিদেশে, বিশেষ করে ভারতবর্ষে। তবে উপমাটিকে একটু সংশোধন করে নেওয়া প্রয়োজন। স্বামীজীর পরিব্রাজক-জীবন ও পরে শিকাগো ধর্মমহাসম্মেলনে তাঁর ভূমিকার যোগফল ছিল আণবিক শক্তির মতো। কিন্তু ঐ মহাশক্তি ধ্বংসের কাজে নিয়োজিত হয়নি, তা মানুষ গড়া ও জাতি গড়ার কাজে নিযুক্ত হয়েছিল। সুতরাং একথা অবশ্যই বলা চলে যে, স্বামীজীর জীবন ও বাণীর প্রতিক্রিয়া সাধারণ আণবিক বোমা বা পারমাণবিক বোমার চেয়ে লক্ষগুণ বেশি শক্তিশালী এবং সেই বোমা সত্যিই বিস্ফোরিত হয়েছিল ১৮৯৩ খ্রীস্টাব্দে। কিন্তু এর প্রস্তুতি-পর্ব চলেছিল তার অনেক আগে থেকেই। আমেরিকার মানুষ জেনেছিল, ভারতবর্ষের মানুষ কিছু পরে জেনেছিল যে, একটি বোমা ফেটে পড়েছে যে-বোমা ধ্বংস করে না, যে-বোমা ধ্বংসের হাত থেকে মানুষকে রক্ষার পথ বাতলে দেয়। হিরোসিমা-নাগাসাকিতে বা পরবর্তী কালে অন্যত্র যে-বোমা পড়েছে তাদেরও প্রস্তুতি-পর্ব বহু আগে থেকেই শুরু হয়েছিল। বহু বিজ্ঞানীর দীর্ঘ গবেষণার ফলশ্রুতি কোন্ মর্মান্তিক পরিণতি এনেছিল তা আমরা জানি; কিন্তু বিবেকানন্দ-রূপী যে-বোমা তা পৃথিবীর মানুষকে নতুন করে বাঁচার কৌশল দান করেছিল, তার প্রস্তুতি চলেছিল কয়েকটি স্তরে, কয়েকটি পর্যায়ে এবং সেই পর্যায়ের চূড়ান্ত রূপ আমরা দেখতে পাই পরিব্রাজক স্বামীজীর জীবনে। তরুণ সন্ন্যাসী বিবেকানন্দ কিভাবে ঐ শক্তি অর্জন করেছিলেন, ধারণ করেছিলেন ও কিভাবে তার প্রয়োগ ঘটেছিল ভারতীয় জীবন ও মননের সর্বস্তরে তা বিশ্লেষণ করার প্রয়োজন আছে। আর এই বিশ্লেষণে সবচেয়ে বেশি সহায়তা করবে ভগিনী নিবেদিতার সাক্ষ্য, স্বামীজীর গুরুভাইদের সাক্ষ্য, স্বামীজীর জীবনীগ্রন্থগুলি এবং অবশ্যই স্বামীজীর নিজের বক্তব্য।

ইংল্যান্ডে স্বামীজীর সঙ্গে প্রথম সাক্ষাৎকার ও পরিচয়ের অল্পকালের মধ্যে নিবেদিতাকে কথাপ্রসঙ্গে স্বামীজী বলেছিলেন : "ইংরাজরা একটি দ্বীপে জন্মগ্রহণ করে এবং চিরকাল ঐ দ্বীপেই বাস করতে চায়।"[২] আর একবার অনুরূপ সুরে তিনি নিবেদিতাকে বলেছিলেন : "কোন গির্জায় জন্মগ্রহণ করা অবশ্যই ভাল; কিন্তু ঐখানেই মৃত্যু হওয়া ভয়াবহ।"[৩] কথাগুলির তাৎপর্য ও শিক্ষা নিবেদিতা বুঝতে পেরেছিলেন। স্বামীজী বোঝাতে চেয়েছিলেন যে, মানুষ যে-দেশে ও যে-পরিবেশে জন্মগ্রহণ করে তার বাইরের জগৎ সম্বন্ধে সে যদি সারাজীবন অজ্ঞ থেকে যায় তাহলে তা হবে খুবই দুঃখের কথা। বৃহত্তর জগৎ, পরিবেশ ও মানবসমাজকে না জানলে ক্ষুদ্রতা, সংকীর্ণতা দূর হয়

১ দ্রঃ যুগনায়ক বিবেকানন্দ—স্বামী গম্ভীরানন্দ, ১ম খণ্ড, ৫ম সং, ১০৯৮, পৃঃ ২২৮ ; বিবেকানন্দ ও সমকালীন ভারতবর্ষ—শংকরীপ্রসাদ বসু, ১ম খণ্ড, পৃঃ ৫১ ; Life of Vivekananda—Roman Rolland, 9th imprn. 1970, P, 18

২ The Master as I Saw Him—Sister Nivedita, 9th edn., 1963, p. 33 ৩ Ibid, p. 6
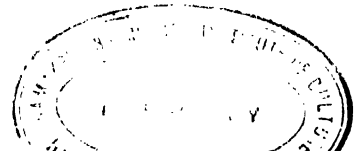
না, দৃষ্টি ও মনের প্রসার ঘটে না। স্বামীজী 'বিশ্বাস' (faith) কথাটি পছন্দ করতেন না। তাঁর পছন্দ ছিল 'উপলব্ধি' (realisation) কথাটি।[৪] স্বামীজীর নিজের জীবনেরও মূলকথা ছিল উপলব্ধি। এটি শুধুমাত্র তাঁর কাছে কোন তত্ত্বকথা ছিল না, ছিল তাঁর জীবনবেদ, তাঁর নিজের জীবনের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতালব্ধ সুদৃঢ় বিশ্বাস। আর এটি তাঁর জীবনে ঘটেছিল যখন তিনি পরিব্রাজকরূপে ভারতবর্ষের পথে-প্রান্তরে গভীর অরণ্যে পর্বতে শহরে গ্রামে দিনের পর দিন ঘুরে বেড়িয়েছিলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ প্রসঙ্গে স্বামী বিবেকানন্দ একবার বলেছিলেন: "তিনি বেদান্ত সম্বন্ধে কিছুই জানতেন না, তত্ত্বকথা কিছুই তাঁর জানা ছিল না। তিনি শুধু নিজে এক মহান জীবন যাপন করেছিলেন। অন্যদের তা ব্যাখ্যা করার দায়িত্ব দিয়ে গিয়েছিলেন।"[৫] হঠাৎ পড়লে স্বামীজীর এই উক্তি বিস্ময়কর মনে হবে, পাঠকের মনে ভ্রান্তির সৃষ্টি করবে। কিন্তু স্বামীজী নিজেই তাঁর বক্তব্যের মূলকথাটি সুন্দরভাবে ব্যাখ্যা করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন: "সেই জীবনই মহান ও সার্থক যিনি সত্যিই মানুষের মধ্যে দেবত্বের উপস্থিতি উপলব্ধি করতে পেরেছেন। তাঁর আর কিছু করার প্রয়োজন নেই। তিনি মানুষের চোখ খুলে দিয়েছেন।"[৬] অর্থাৎ গুরুর কাজ, মহান জীবনের কাজ হলো নিজের জীবনের দৃষ্টান্ত দিয়ে অন্যের চোখ খুলে দেওয়া। এর পরের কাজ তার, যার চোখ খুলে গেছে তার নিজের। দৃষ্টিশক্তি দেওয়া যায়, কিন্তু জোর করে চোখ খোলানো সম্ভব নয়। শ্রীরামকৃষ্ণ নরেন্দ্রনাথের চোখ খুলে দিয়েছিলেন। এবার নিজের চোখে দেখার, দৃষ্টিশক্তি যথাযথ ব্যবহারের দায়িত্ব ছিল নরেন্দ্রনাথের নিজের। সেই ঘটনাটিও ঘটেছিল, তাঁর পরিব্রাজক জীবনেই। তিনি অন্তর্দৃষ্টি, দূরদৃষ্টি এবং দিব্যদৃষ্টি লাভ করেছিলেন।

প্রসঙ্গটির আর একটু বিশদ আলোচনা প্রয়োজন। নিবেদিতার কথায় আবার ফিরে আসি। নিবেদিতার মতে, স্বামী বিবেকানন্দের জীবনে তিনটি প্রভাব সর্বাপেক্ষা বেশি কাজ করেছিল। প্রথমতঃ তাঁর ইংরেজী ও সংস্কৃত সাহিত্য এবং শাস্ত্রগ্রন্থের জ্ঞান, দ্বিতীয়তঃ গুরু শ্রীরামকৃষ্ণের মহান জীবন ও বাণী এবং তৃতীয়তঃ ভারত ও ভারতবাসী সম্বন্ধে তাঁর ব্যক্তিগত জ্ঞান এবং উপলব্ধি।[৭] প্রসঙ্গতঃ একটি কথা স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে, নিবেদিতা যেভাবে স্বামী বিবেকানন্দের চরিত্র, মানসিকতা, দৃষ্টিভঙ্গি ও পূর্ণ ব্যক্তিত্বের গঠন এবং বিকাশের পিছনে প্রধান প্রধান প্রভাবগুলির অনুসন্ধান করেছিলেন তা তাঁর মননশীল বিশ্লেষণী দৃষ্টির পরিচয় বহন করে। কোন ঐতিহাসিক ব্যক্তি, যিনি মানব-ইতিহাসে স্থান পেয়েছেন, একদিনে গড়ে ওঠেন না বা কোন যুগেই হঠাৎ গড়ে ওঠেননি। নানা ঘাত-প্রতিঘাত, অভিজ্ঞতা, উপলব্ধি, পরিবর্তন ও প্রভাবের ফলে তাঁদের জীবন পূর্ণতা লাভ করে। স্বামী বিবেকানন্দও এই নিয়মের ব্যতিক্রম ছিলেন না। স্বামীজীর শাস্ত্রজ্ঞান সম্বন্ধে অধিক লেখা বাহুল্যমাত্র। শুধুমাত্র হিন্দুর ধর্মশাস্ত্র, বেদ-বেদান্ত, পুরাণ, মহাকাব্যই তিনি পাঠ করেননি, খ্রীস্টধর্ম, বৌদ্ধ ও জৈনধর্ম, ইসলাম, শিখ প্রভৃতি সকল ধর্মের মূল সাহিত্য তিনি গভীর মনোযোগ দিয়ে অধ্যয়ন করেছিলেন। বিভিন্ন ধর্মের তত্ত্ব ও তথ্যের গভীরে তিনি প্রবেশ করেছিলেন। অন্যদিকে পাশ্চাত্যের জ্ঞান-বিজ্ঞান, ইতিহাস, নৃতত্ত্ব, সমাজবিদ্যা, অর্থনীতি, ভূগোল, দর্শন, শিল্প-চারুকলা প্রভৃতি এমন কোন বিষয় ছিল না যে-বিষয়ে তিনি পড়াশোনা করেননি। স্বামীজীর পড়াশোনা ও জ্ঞানের ব্যাপ্তি ও গভীরতা, সারমর্ম উপলব্ধি ও গ্রহণ করার ক্ষমতা ছিল অবিশ্বাস্য। আধুনিক ঐতিহাসিকেরা স্বামীজীর পড়া বিভিন্ন বিষয় ও প্রসঙ্গের তালিকা দেখে বিস্মিত বোধ করেন।[৮] ভাবলে অবাক লাগে, প্রশ্ন আসে মনে—স্বামীজী এত পড়াশোনার সময় ও সুযোগ পেলেন কখন?

৪ The Master as I Saw Him, p. 6

৫ Ibid, p. 36

৬ Ibid, p. 37

৭ Ibid, p. 77

৮ তপন রায়চৌধুরীর 'ইউরোপ রিকনসিডার্ড' ('Europe Re-considered') গ্রন্থে বিবেকানন্দ বিষয়ক অধ্যায়টি এই প্রসঙ্গে দ্রষ্টব্য।

শ্রীরামকৃষ্ণ যখন দেহত্যাগ করেন তখন স্বামীজীর বয়স মাত্র তেইশ বছর। ইতিপূর্বেই তিনি কলেজে পড়া শেষ করেছেন ও সহজেই অনুমান করা যায় যে, প্রচুর পড়াশোনা করেছেন। এও অনুমান করা কঠিন নয় যে, পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞান সম্পর্কেই ঐসময় তিনি বেশি অধ্যয়ন করেছিলেন। কিন্তু ঐসময়ের অর্জিত ও অধীত বিদ্যা নিশ্চয় এমন ছিল না যার পরিচয় পেয়ে হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক জন হেনরি রাইট ধর্মমহাসম্মেলনের কর্তৃপক্ষকে স্বামীজীর পরিচয়পত্রে লিখেছিলেন : "এঁর (বিবেকানন্দের) পাণ্ডিত্য আমাদের সমস্ত বিদগ্ধ অধ্যাপকদের পাণ্ডিত্যের সমষ্টির চেয়েও বেশি।"[৯] ধর্মমহাসভার জন্য স্বামীজীর পরিচয়পত্র প্রসঙ্গে তিনি বলেছিলেন : "তিনি সূর্যতুল্য, যার কিরণ বিস্তারের জন্য পরিচয়পত্রের প্রয়োজন হয় না।"[১০] তেইশ থেকে তিরিশ—মাত্র সাত বছরের মধ্যে এই রকম এক অত্যাশ্চর্য পরিবর্তন কি করে ঘটেছিল? সূর্যতুল্য তেজ, অতলান্ত পাণ্ডিত্য, অসীম জ্ঞান-ভাণ্ডার তিনি কেমন করে লাভ করেছিলেন? অবশ্যই এর প্রধান কারণ ছিল শ্রীরামকৃষ্ণের সান্নিধ্য, তাঁর জ্বলন্ত শিক্ষা, অপার স্নেহ ও আশীর্বাদ। শ্রীরামকৃষ্ণের জীবন ও বাণী নরেন্দ্রনাথের চক্ষু উন্মীলন করেছিল। তিনি দিব্যদৃষ্টি ও অসীম শক্তি লাভ করেছিলেন। কিন্তু তখনো তাঁর শিক্ষা সম্পূর্ণ হয়নি। বাকি শিক্ষাটুকু সম্পূর্ণ হয়েছিল তাঁর পরিব্রাজক জীবনে। সকল ধর্মের সারমর্ম তিনি কণ্ঠস্থ ও আত্মস্থ করেছিলেন এই কয়বছরে। ঐ শিক্ষা তিনি শুধুমাত্র গ্রন্থপাঠ করে লাভ করেননি, জীবন থেকে প্রত্যক্ষভাবে পেয়েছিলেন। তার চূড়ান্ত পরিণতি ঘটেছিল কন্যাকুমারীতে সমুদ্রের বুকে শিলাখণ্ডে গভীর ধ্যানমগ্ন অবস্থায়।

স্বামীজীর জীবনের গঠনকর (formative) অধ্যায়ে আর এক বিরাট প্রভাব ছিল তাঁর স্বদেশ বা মাতৃভূমির। দেশ ও দেশের সর্বস্তরের মানুষ সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতাই ছিল তাঁর স্বদেশপ্রেমের উৎসমুখ। 'জাতীয়তাবোধ' বা 'জাতিগঠন' শব্দ দুটি বিবেকানন্দের পছন্দ ছিল না। তাঁর প্রিয় কথাটি ছিল 'মানুষ গড়া' ('man making')।[১১] ভারতবর্ষ ও ভারতবর্ষের মানুষকে তিনি গভীরভাবে ভালবাসতেন। ঐ ভালবাসার কোন সীমা-পরিসীমা ছিল না। এই ভালবাসা স্বামী বিবেকানন্দের সারা মন ও সারা জীবনকে সম্পূর্ণভাবে আচ্ছন্ন ও অভিভূত করেছিল। এটি সম্ভব হয়েছিল তাঁর পরিব্রাজক জীবনের কল্যাণেই এবং এই ঘটনা ঘটেছিল তাঁর পরিব্রাজক জীবনে। শঙ্করীপ্রসাদ বসু বিবেকানন্দের জীবনের এই অধ্যায়ের তাৎপর্য সুন্দরভাবে ব্যক্ত করেছেন। তিনি লিখেছেন : "ভারতবর্ষের বহু সহস্র বর্ষের সাধনলব্ধ যে বেদান্ত-সত্যকে নিজ জীবনে আকর্ষণ করেছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণ, তাকে সংসারের উপর বর্ষণ করবার যোগ্যত্ব দিয়েছিলেন নরেন্দ্রনাথকে। সুতরাং নরেন্দ্রনাথকে বরানগর ত্যাগ করে ভারতের পথে-প্রান্তরে বিচরণ করতে হবে। তারও পরে যেতে হবে সমুদ্রপারে—সেই তাঁর ভবিতব্য।"[১২] আসলে, বিবেকানন্দের পরিব্রাজকের জীবন ও তারপরেই শিকাগো ধর্মমহাসম্মেলনে যোগদান করতে যাওয়া —এই দুটি ঘটনা বা অধ্যায় অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িত। প্রথমটিকে বাদ দিয়ে বা উপেক্ষা করে পরেরটির অধ্যয়ন ও মূল্যায়ন সম্ভব নয়। পরিব্রাজক জীবনেই বিবেকানন্দ দেখেছিলেন, হৃদয় দিয়ে অনুভব করেছিলেন কেমনভাবে "একটি সহিষ্ণু জাতির ওপর কঠিনতম নিষ্ঠুরতা ও উৎপীড়ন"[১৩] চলেছে। যন্ত্রণায় কাতর বিবেকানন্দের বিশাল হৃদয় জ্বলেছিল। তিনি অসহিষ্ণু ও ব্যাকুল হয়ে পড়েছিলেন এর প্রতিকারের জন্য। অল্পকাল পরে তাঁর আমেরিকা-যাত্রা, ধর্মমহাসম্মেলনে যোগদান ও সাফল্য, আমেরিকা ও ইউরোপে তাঁর কর্মসাধনা

৯ Life of Swami Vivekananda by His Eastern and Western Disciples, Vol. I, 5th Edn. 1979, p. 405

১০ Ibid, p. 406

১১ Master as I Saw Him, p. 47

১২ বিবেকানন্দ ও সমকালীন ভারতবর্ষ—শঙ্করীপ্রসাদ বসু, ১ম খণ্ড, ১৩৮২, পৃঃ ৪

১৩ ঐ, পৃঃ ৫

ও বিভিন্ন ভাষণের গুরুত্ব সবকিছুই তাঁর পরিব্রাজক জীবনের অভিজ্ঞতার সঙ্গে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে জড়িত। বিবেকানন্দের গভীর আত্মবিশ্বাস, অসীম মনোবল, ভবিষ্যৎ কর্মসূচীর পরিকল্পনা এবং তা কার্যকরী করার জন্য লৌহদৃঢ় সংকল্প—সব কিছুরই বীজ অংকুরিত হয়েছিল তাঁর জীবনের ঐ অধ্যায়ে। ১৮৯৩ খ্রীস্টাব্দের ২০ আগস্ট আলাসিঙ্গা পেরুমলকে তিনি লিখেছিলেন তাঁর সেই বিখ্যাত চিঠি, যাতে তিনি ঘোষণা করেছিলেনঃ "কোন চালাকির প্রয়োজন নাই। চালাকির দ্বারা কিছুই হয় না।" বলেছিলেন—প্রয়োজন হলো ভগবানে বিশ্বাস, সাধারণ পদমর্যাদাহীন দরিদ্র মানুষের ওপর বিশ্বাস। মানুষের দুঃখ-দারিদ্র্য-মোচন, কল্যাণ ও সেবার কাজে আত্মনিয়োগ করার আহ্বান জানিয়ে বিবেকানন্দ বলেছিলেনঃ "বিশ্বাস, বিশ্বাস, সহানুভূতি। অগ্নিময় বিশ্বাস, অগ্নিময় সহানুভূতি। জয় প্রভু! জয় প্রভু! তুচ্ছ জীবন, তুচ্ছ মরণ, তুচ্ছ ক্ষুধা, তুচ্ছ শীত। জয় প্রভু! অগ্রসর হও! প্রভু আমাদের নেতা। পশ্চাতে চাহিও না।"[১৪] স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে, স্বামীজী এই চিঠি যখন লিখেছিলেন তখনো শিকাগোর ধর্মমহাসম্মেলন শুরু হয়নি। বিবেকানন্দ তখনো আমেরিকা বা ভারতবর্ষের অগণিত মানুষের সমাদর ও অভিনন্দন লাভ করেননি। প্রতিকূল পরিবেশে তাঁর সংগ্রামের প্রস্তুতি চলেছে মাত্র। কিন্তু আত্মপ্রত্যয়, গভীর উপলব্ধি ও অনুভূতি তাঁর হৃদয়ের অন্তর্নিহিত শক্তিকে প্রজ্বলিত করে তুলেছে। এই অগ্নিশিখার প্রথম স্ফুলিঙ্গ তিনি পেয়েছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণের কাছ থেকে। পরিব্রাজক জীবন সেই শিখাকে প্রজ্বলিত অগ্নিচ্ছটায় পরিণত করেছিল। স্বামীজী যে-বিশ্বাসের কথা বলেছিলেন তা অন্ধ যুক্তিহীন বিশ্বাস নয়, এই বিশ্বাস ছিল তাঁর দৃঢ় প্রত্যয় ( conviction )।

ভারতীয় সভ্যতা-সংস্কৃতির বিবর্তন ও ইতিহাস স্বামীজী গভীরভাবে অনুশীলন করেছিলেন। ভারত-ইতিহাসের ধারার বিচিত্র জটিল ও নানামুখী গতি তিনি বিশ্লেষণ করেছিলেন নিপুণভাবে। ঐরকম সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ শুধুমাত্র বইপড়া বিদ্যা নিয়ে করা সম্ভব ছিল না। তাঁর বিভিন্ন বক্তৃতা, আলোচনা, লেখা ও চিঠিপত্রে ভারতবর্ষের ইতিহাস, ঘটনাবহুল কাহিনী ও বৈশিষ্ট্য প্রাণবন্ত হয়ে উঠত। ঐ প্রসঙ্গে নিবেদিতা লিখেছেন যে, রাজপুতদের বীরত্ব, শিখদের গভীর ধর্মবিশ্বাস, মারাঠীদের শৌর্য, সাধু-সন্তদের ভক্তি, মহীয়সী নারীদের সংকল্পের দৃঢ়তার বহু কাহিনী স্বামীজীর মুখে শোনার পর যেন চোখের সামনে ভেসে উঠত, জীবন্ত রূপ নিত। স্বামীজীর বর্ণিত ইতিহাসে হুমায়ুন, শের শাহ, আকবর, শাহজাহান প্রমুখ মুসলমান শাসকদের উজ্জ্বল নামগুলি বাদ যেত না। আকবরের রাজসভায় তানসেনের কথা অথবা মুঘল সম্রাটদের হিন্দু-স্ত্রীদের স্বধর্মনিষ্ঠ নিঃসঙ্গ জীবনের কথা বা পলাশীর যুদ্ধের শোচনীয় পরাজয়ের কাহিনী তিনি এমনভাবে উল্লেখ করতেন যা ছিল অত্যন্ত চিত্তস্পর্শী।[১৫] প্রত্যক্ষ অনুভব ও অনুভূতি না থাকলে ইতিহাসের কথনো এত মূর্ত হয়ে ওঠা সম্ভব ছিল না। পরিব্রাজক জীবনই বিবেকানন্দকে সেই সুযোগ করে দিয়েছিল।

স্বামীজীর এক কবিমন ছিল। এই কবি বিবেকানন্দ গভীরভাবে ভালবেসেছিলেন, প্রেমে পড়েছিলেন ভারতবর্ষ ও ভারতবর্ষের মানুষের। কোন কোন চিঠিপত্রে বা আলোচনা প্রসঙ্গে তিনি অবশ্য বলেছেনঃ "সন্ন্যাসীর আবার স্বদেশ কী?" ঠিকই, স্বামী বিবেকানন্দের কাছে সারা বিশ্বই ছিল স্বদেশ। বিশ্বজনীন ছিল তাঁর চিন্তা-ভাবনা, সমগ্র জগৎই ছিল তাঁর কর্মক্ষেত্র। তবুও একথা অনস্বীকার্য যে, তাঁর কাছে, তাঁর কথায় ও কাজে ভারতভূমি—তাঁর প্রিয় মাতৃভূমি প্রধান স্থান জুড়ে থাকত। এটিও মূলতঃ ঘটেছিল তাঁর পরিব্রাজক জীবনেই। পাশ্চাত্যে থাকাকালে তিনি প্রায়ই বলতেন তাঁর পরিব্রাজক জীবনের নানা ছোট-খাটো

১৪ স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা, ৬ষ্ঠ খণ্ড, ১ম সং, ১৩৬৯, পৃঃ ৩৬৭

১৫ The Master as I Saw Him. p. 49

মধুর স্মৃতিতে ভরা গল্পকথা। কবে একদিন কে তাঁকে মিষ্টান্ন খেতে দিয়েছিল, কোথায় তিনি কস্তুরী মৃগের সন্ধান পেয়েছিলেন ইত্যাদি নানান গল্প তিনি শোনাতে ভালবাসতেন। তাঁর মন ব্যাকুল হতো ভারতীয় গ্রামে গোধূলি লগ্নে ঘরে ফেরা গরুর গলার ঘণ্টার আওয়াজ, রাখালদের উচ্চ কণ্ঠস্বর বা বর্ষার বৃষ্টির শব্দ শোনার জন্য। স্বামীজীর দেখা মধুরতম দৃশ্য ছিল এক পাহাড়ি গ্রামের মা। পিঠে শিশু সন্তানকে নিয়ে মা একটির পর একটি পাথরে পা দিয়ে খরস্রোতা পার্বত্য নদী পার হচ্ছেন। মাঝে মাঝে ফিরে দেখছেন পিঠের সন্তানকে, সস্নেহে তাকে আদর করছেন। স্বামীজীর স্বপ্নের মৃত্যুকামনা ছিল হিমালয়ের অরণ্যে সংকীর্ণ শৈলশিরায় এক প্রস্তরখণ্ডের ওপর শায়িত হয়ে, খরস্রোতা নদীর পতনের শব্দ শুনতে শুনতে, মুখে "হর। হর। মুক্ত। মুক্ত।" নাম করতে করতে।[১৬] এই বর্ণনায় সন্ন্যাসী বিবেকানন্দ এবং প্রেমিক, সাধক ও কবি বিবেকানন্দের দুই ভিন্ন সত্তা একীভূত হয়ে যেত।

পরিব্রাজক বিবেকানন্দ আবিষ্কার করেছিলেন চিরনবীন, চিরন্তন ভারতবর্ষকে। ঐ ভারত প্রাচীন, বৃদ্ধ বা জরাগ্রস্ত হয় না কোনদিন। স্বামীজী সেই ভারতবর্ষকে প্রত্যক্ষ করেছিলেন, সমস্ত হৃদয় দিয়ে ভালবেসেছিলেন। গভীর আবেগে নিজের অনুভূতি ব্যক্ত করে স্বামীজী বলেছিলেন : "মনে হয় আমি সেই মানুষ, যে বহু শত বছর পরে জন্মগ্রহণ করে দেখছে যে, ভারতবর্ষ নবীনই রয়ে গেছে।" তিনি দেখেছিলেন এক নবীন ভারতকে : "I see that India is young।"[১৭] কয়েক দশক পরে মহাত্মা গান্ধীও তা প্রত্যক্ষ করেছিলেন, বলেছিলেন 'নবীন ভারত'-এর ('Young India') কথা। প্রসঙ্গতঃ মনে আসে প্রখ্যাত ভারততত্ত্ববিদ্ প্রয়াত এ. এল. ব্যাশমের (A. L. Basham) একটি কথা। ব্যাশম ভারতবর্ষের সভ্যতা ও জীবন সম্পর্কে বলতেন যে, বুদ্ধদেব প্রায় আড়াই হাজার বছর পূর্বে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু আজ যদি তিনি আবার আবির্ভূত হয়ে ভারতবর্ষের কোন গ্রামে যেতেন তাহলে তাঁর মনে হতো না যে, তিনি কোন অজানা স্থান বা পরিবেশে রয়েছেন। এত দিন পরেও তাঁর সবকিছুই পরিচিত বলে মনে হতো। এর অর্থ এই নয় যে, ভারতের কোন পরিবর্তন হয়নি বিগত আড়াই হাজার বছরে। কিন্তু ভারতীয় জীবন ও গ্রামীণ পরিবেশে এমন কিছু রয়েছে যা চিরন্তন ও শাশ্বত। ভারতীয় জীবন, ধর্ম ও সংস্কৃতির মূল শিকড় রয়েছে গভীরে। তাঁর সুবিখ্যাত 'দ্য ওয়ান্ডার দ্যাট ওয়াজ ইন্ডিয়া' গ্রন্থেও অধ্যাপক ব্যাশম ভারতীয় ইতিহাস ও ঐতিহ্যের এই বৈশিষ্ট্যের কথা বলেছেন।

পরিব্রাজক জীবনের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা বিবেকানন্দকে এক নতুন জীবন দান করেছিল বললে বোধ হয় অত্যুক্তি হবে না। মোহিতলাল মজুমদার এই ঘটনাকে 'নরেন্দ্রনাথের দ্বিজত্বলাভ' বলে অভিহিত করেছেন। মোহিতলাল লিখেছেন যে, নরেন্দ্রনাথ "পরিব্রাজকরূপে মহামাতৃভূমির শীর্ষ হইতে পাদদেশ পর্যন্ত তাহার বিরাট দেহের সকল দৈন্য ও সকল ঐশ্বর্য চাক্ষুষ করিয়া, বেদনা ও বিস্ময়ে, ভক্তি ও করুণায় এমন এক দিব্যজ্ঞান লাভ করিলেন, যাহা আর কোন সন্তান এ-পর্যন্ত লাভ করে নাই। বস্তুতঃ ইহাই তাঁহার জীবনের চরম দীক্ষা; এতদিনে তিনি দ্বিজত্ব লাভ করিলেন—ইহার পরেই তাঁহার বিবেকানন্দ-জীবনের আরম্ভ।"[১৮] তাঁর জ্ঞানচক্ষু পূর্বেই উন্মীলিত হয়েছিল। এবার তাঁর প্রাণচক্ষু উন্মীলিত হলো। সন্ন্যাসীও প্রেমে পড়লেন স্বদেশ ও স্বদেশবাসীর। এই প্রেমই বিশ্বমানবপ্রেমের সুবিশাল রূপ পেয়েছিল স্বামীজীর জীবনের কর্ম, সাধনায় ও ধ্যানে। [ক্রমশঃ]

১৬ The Master as I Saw Him, p. 50-51

১৭ Ibid, p. 51

১৮ বীর সন্ন্যাসী বিবেকানন্দ—মোহিতলাল মজুমদার, ১৩৬৯, পৃঃ ৮৬

# কবিতায় শ্রীরামকৃষ্ণ

## শান্তি সিংহ

### রসময়-আনন্দরূপ ঈশ্বর

'ঈশ্বর বাক্যমনাতীত, নেই তাঁর রস,
প্রেমভক্তি ভজনায় করহ সরস'—
এসব সামাধ্যায়ী কথা, শুনিয়া রামকৃষ্ণ
হাসিয়া বলেন লোকশিক্ষার জন্য—
'রসময়-আনন্দরূপ নীরস কি হন ?
প্রেমময় প্রতি ইহা নহে সুবচন।'

**সূত্র :** শ্রীরামকৃষ্ণ—যে ঈশ্বর দর্শন করে নাই, তার উপদেশ ঠিক ঠিক হয় না। একটা কথা যদি ঠিক হলো, তো আর একটা কথা গোলমেলে হয়ে যায়।

সামাধ্যায়ী লেকচার দিলে। বলে—ঈশ্বর বাক্য-মনের অতীত—তাঁতে কোন রস নাই—তোমরা প্রেমভক্তিরূপ রস দিয়ে তাঁর ভজনা কর। দ্যাখো, যিনি রসস্বরূপ, আনন্দস্বরূপ, তাঁকে এইরূপ বলছে। এ লেকচারে কি হবে ? এতে কি লোকশিক্ষা হয় ?

[ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত, ৪।২৭।৫ ; আরও দ্রষ্টব্য : ঐ, ১।৮।৪ ; ১।১০।৭ ]

# কামনা

## শান্তশীল দাশ

তোমার স্নেহের স্পর্শ রাখ তুমি ললাটে আমার,
নিদ্রা যাই অকাতরে রাত্রির তিমিরে।
তারপর নিদ্রাশেষে প্রসন্ন অন্তরে
জেগে উঠি আলোকিত প্রভাতবেলায়
নূতন উৎসাহ আর নূতন উদ্যমে।
তোমার স্নেহের স্পর্শ সারা অঙ্গে মেখে
সৌরভের মতো
কাজ করি হাসিমুখে ; যারা কাছে আসে
দিই সেই সৌরভের অংশ কিছুখানি ;
পেয়ে তারা খুশি হয়, খুশি হয়ে তারা চলে যায়
কাজ শেষ হয়ে গেলে ফিরে আসি ঘরে ;
আবার সে-রাত্রি আসে,
আবার দাঁড়াও তুমি শিয়রে আমার
তোমার স্নেহের স্পর্শ নিয়ে ;
আবার আবার আমি নিদ্রার কোলে ঢলে পড়ি
শান্ত স্নিগ্ধ নিদ্রার গভীরে।

## বিবিক্ত

### নীলাম্বর চট্টোপাধ্যায়

অনন্ত তুমি তো বিভু।
নতশির ক্ষুদ্র আমি, তবু
ঘর্ঘর চক্রতলে মায়ার বন্ধন।
হে অনঘ,
তুমি যদি সর্বশক্তিমান,
আমি প্রতিভাস,
তবে কেন বারংবার আসা-যাওয়া
রহস্য তোমার—
অদৃশ্য বা দৃশ্যমান অন্তর আকাশে
কম্পিত আবেগ।
ক্রমসংকুচিত আমি অণু-পরমাণু
ক্রমবিকশিত তুমি পুনরীশ্বর,
তবে কেন কুটিল বন্ধন
আর জন্মান্তের সহস্র যন্ত্রণা।
প্রকৃতি বিলুপ্ত হলে
আঁখি মেলি' চাহিবে কি সূর্য-সম্ভাবনা,
হে বিবিক্ত,
প্রতীক্ষার সেই তবে শেষ?

## প্রার্থনা

### নন্দিনী মিত্র

হাজার বছরের অন্ধকার ঘর যেমন
একটি দেশলাই-এর কাঠিতে আলোকিত হয়ে ওঠে,
তেমনি কত জন্ম-জন্মান্তরের বন্ধ
আমার এ হৃদয়-মন্দির
তোমার কৃপাজ্যোতিতে ভরিয়ে দাও প্রভু!
অর্গলমুক্ত কপাট যাক খুলে—
উদ্ভাসিত দুয়ারে দাঁড়িয়ে অপার্থিব বিস্ময়ে
বলে উঠি—'তুমি? বসে আছ?'
এতদিন তোমাকে এক হাতে ধরার চেষ্টা করেছি,
আজ সংসার-অন্তে তোমাকে দুহাতে ধরতে দাও।
আর সেই যে কাঠুরে?
এগিয়ে যেতে যেতে পর পর
চন্দন কাঠের বন, রুপোর খনি, সোনার খনির
সন্ধান পেয়ে গিয়েছিল—
তার মতো, তোমার অনন্ত লীলা-ঐশ্বর্যের
কণাটুকুও আস্বাদন করতে দাও
চিরন্তন মন্ত্র 'চরৈবেতি' অন্তরে ধারণ করে।

## শব্দ

### ভগবানচন্দ্র মুখোপাধ্যায়

কোথা হতে তুমি এসেছ,
কোথায় তোমার শেষ?
তুমি আদি, অনাহত,
না আছে তোমার বেশ।
মন্ত্রে আছ, তন্ত্রে আছ,
গ্রন্থে তোমার নাম,
তোমার সাধন, তোমার ভজন,
মিলায় প্রাণারাম।

সঙ্গীতে তব ঝংকার-রব,
নৃত্যে তোমার তাল,
গগন ভেদি' গর্জন-রব,
সিন্ধুতে উত্তাল।
বায়ুতে মেশানো তেজ তোমার,
অগ্নিতে তুমি ভরা,
মরুর বুকে জ্বালাময়ী তুমি,
মহাশক্তিতে গড়া।

প্রবন্ধ

# হিন্দুধর্ম

## অরুণেশ কুণ্ডু

'ধর্ম' শব্দটি সংস্কৃত 'ধৃ' ধাতু থেকে নিষ্পন্ন হয়েছে, যার অর্থ 'ধারণ করা'—একথা আমরা সবাই জানি। ধর্ম কি ধারণ করে?—হিন্দুধর্ম বলেছে: "যেনাত্মনস্তথান্যেষাং জীবনং বর্ধনাঞ্চাপি ধ্রিয়তে স ধর্মঃ।" অর্থাৎ যার দ্বারা নিজের এবং অপরের জীবন ও সমৃদ্ধি বিধৃত হয়, তা-ই ধর্ম। এই সূত্র ধরে সহজেই বলা যায়—ধর্ম একটি সর্বজনীন ব্যাপার। এটি এমন একটি বিষয় যা সকলের কল্যাণসাধন করে।

এখন দেখা যাক, ধর্মের লক্ষণ কি? মহর্ষি মনুর মতে, ধৃতি (ধারণ বা ধৈর্য), ক্ষমা, দম (দমন), অস্তেয় (অচৌর্য), শৌচ (শুচিতা), ইন্দ্রিয়নিগ্রহ, ধী (বুদ্ধি), বিদ্যা, সত্য ও অক্রোধ—এই দশটি ধর্মের সাক্ষাৎ লক্ষণ (মনু-সংহিতা, ৬।৯২)। অর্থাৎ যেকোন ব্যক্তির পক্ষে সদ্যোক্ত দশটি আচরণই ধর্মাচরণ বলে গণ্য হবে এবং এই দশটি আচরণই ধার্মিক লোকের, তিনি যেকোন ধর্ম বা ধর্মমতেই বিশ্বাসী হোন-না-কেন, লক্ষণ।

হিন্দুধর্মের যথার্থ নাম সনাতন ধর্ম। 'সনাতন' শব্দের অর্থ—যা অনাদি কাল থেকে চলে আসছে। আমরা যদি অনুমান করি, সভ্যতার বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে অর্থাৎ যখন থেকে মানুষ তার দ্বিপদ পশুত্বকে অতিক্রম করে চৈতন্যের আলোয় নিজেকে আবিষ্কার করতে শুরু করল, তখন থেকেই যে-আচরণগুলিকে মনুষ্যত্বের লক্ষণ বলে চিহ্নিত করা হয়েছিল সেগুলিই মনু-কথিত ধর্মেরই দশটি লক্ষণ। 'সনাতন ধর্ম' বলতে আমরা সেই ধর্মকেই বুঝব যা মনু-কথিত ধর্মের দশটি লক্ষণকেই আচরণে প্রকাশ করতে বলে। এই ধর্মের মূল আশ্রয় বেদ। সংস্কৃত 'বিদ্' ধাতু থেকে নিষ্পন্ন 'বেদ' শব্দের অর্থ 'জ্ঞান'। বেদকে 'অপৌরুষেয়' এবং 'শ্রুতি' বলা হয়। 'অপৌরুষেয়' এই জন্য যে, এই জ্ঞান কোন ব্যক্তি বা পুরুষবিশেষের বুদ্ধির ক্রিয়া দ্বারা অর্জিত এবং প্রচারিত নয়; জ্ঞাত ও অজ্ঞাত বহু ঋষির হৃদয়ে অনুভব বা উপলব্ধিরূপে সেই জ্ঞান উদ্ভাসিত বা প্রকাশিত হয়েছিল। 'শ্রুতি' এই জন্য যে, যখন লিপির আবিষ্কার হয়নি, সেই কালে উপলব্ধ জ্ঞান মুখের ভাষায় পিতা থেকে পুত্রে, গুরু থেকে শিষ্যে পরম্পরাক্রমে প্রবাহিত হতো।

ঋক্, সাম, যজুঃ ও অথর্ব—এই চারভাগে বেদ বিভক্ত। বেদের জ্ঞান যাঁদের অনুভবে ও উপলব্ধিতে প্রকাশিত হয়েছিল তাঁদের আমরা বলি 'ঋষি' বা 'দ্রষ্টা'। দীর্ঘ সাধনা, কঠোর মনন ও নিদিধ্যাসনের ফলে এই সমস্ত আধিকারিক পুরুষদের মধ্যে বেদের জ্ঞান স্ফুরিত হয়েছিল, উদ্ভাসিত হয়েছিল।

'মানুষ' শব্দের অর্থ মননশীল জীব। মানুষ যেদিন থেকে 'মানুষ' হয়েছে, অর্থাৎ মনন করতে শুরু করেছে, সেদিন থেকেই তার মনে প্রশ্ন জেগেছে: 'আমি কে?' 'আমি কি?' 'আমি কেন?'—এই মূল দার্শনিক প্রশ্নের উত্তর রয়েছে সমগ্র বেদে।

সমগ্র বেদ আবার দুভাগে বিভক্ত। প্রথম ভাগের নাম 'কর্মকাণ্ড' এবং দ্বিতীয় ভাগের নাম 'জ্ঞানকাণ্ড'। সমাজভুক্ত ব্যক্তি ও তার পরিবারের জীবনধারণের জন্য প্রয়োজনীয় অগ্নিহোত্রাদি কর্ম এবং যাগযজ্ঞাদির বিভিন্ন প্রক্রিয়া ও মন্ত্রাদির বিস্তৃত বিবরণ আছে কর্মকাণ্ডে। জীবনের মূল রহস্যের অনুসন্ধান, অর্থাৎ পূর্বোক্ত প্রধান দার্শনিক প্রশ্নের আলোচনা ও সমাধান আছে জ্ঞানকাণ্ডে। বেদের এই ভাগটি সাধারণতঃ 'উপনিষদ্' বা 'রহস্য বিদ্যা' নামে পরিচিত।

উপনিষদের সংখ্যা অনেক। এর মধ্যে বৃহদারণ্যক, ছান্দোগ্য, মুণ্ডক, কঠ, কেন, ঈশ প্রভৃতি বারোটি উপনিষদ্ প্রধান। সমগ্র উপনিষদের জ্ঞানকে এককথায় 'বেদান্ত' বলে উল্লেখ করা হয়। 'বেদান্ত' শব্দের অর্থ বেদের অন্ত। 'অন্ত' শব্দের দুটি অর্থ হতে পারে। এক—শেষ এবং দুই—নির্যাস। উপনিষদ্গুলি সাধারণতঃ বেদের শেষ অংশে থাকায় সেগুলিকে যেমন বেদান্ত বলা হয়, তেমনি বেদের সার বা নির্যাস উপনিষদের মধ্যে

বিধৃত বা নিহিত আছে বলেও উপনিষদ্‌গুলিকে বেদান্ত বলা হয়। বেদ-উপনিষদের ঋষিরা জীবনের রহস্য ও তাৎপর্য সন্ধান করতে গিয়ে এক নিত্য সত্যের আবিষ্কার করেছেন যাঁকে তাঁরা 'ব্রহ্ম' বা 'আত্মা' বলেছেন এবং যে-বিদ্যার চর্চার দ্বারা ব্রহ্মের তত্ত্ব বা আত্মার তত্ত্ব জানা যায়, তাকে 'ব্রহ্মবিদ্যা' বা 'আত্মবিদ্যা' বলেছেন। এই বিদ্যালাভ হলে ব্রহ্মজ্ঞান বা আত্মজ্ঞান হয়। এই ব্রহ্মবিদ্যা ও ব্রহ্মজ্ঞানের আলোচনা রয়েছে উপনিষদ্‌গুলিতে।

ঋষিরা বলেছেন, ব্রহ্মের স্বরূপ হলো—

"সত্যং জ্ঞানম্ অনন্তম্।"
( তৈত্তিরীয় উপনিষদ্, ২।১।৩ )

আর আত্মার স্বরূপ হলো—

"নিত্য-শুদ্ধ-বুদ্ধ-মুক্ত।"
( গীতা : শাঙ্করভাষ্য, উপক্রমণিকা )

ব্রহ্ম ও আত্মা—দুই-ই এক। জ্ঞানীরা যাঁকে ব্রহ্ম বলেন, যোগীরা তাঁকেই আত্মা বলেন। যিনি জ্ঞান-স্বরূপ, বোধ স্বরূপ অর্থাৎ ব্রহ্ম, তাঁকে জানলেই পূর্ণজ্ঞান হয়। পূর্ণজ্ঞান লাভ করাই অর্থাৎ ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করাই যদি উদ্দেশ্য হয়, তবে সেটি লাভ হলেই জ্ঞানের পরাকাষ্ঠা— অর্থাৎ জ্ঞানচর্চার অন্ত হয়। তাই বেদান্ত হলো জ্ঞানান্বেষণের শেষ ধাপ। কিন্তু আমাদের মনে রাখতে হবে যে, ব্রহ্ম অনন্তও বটেন। তাই সেই অর্থে তাঁকে জানা শেষ হতে পারে না। আসলে, তাঁকে জানা, সীমার মধ্যে বস্তুকে যেভাবে জানা হয়, সেভাবে জানা নয়। প্রকৃতপক্ষে ব্রহ্মকে জানার অর্থ ব্রহ্মে লীন হওয়া অর্থাৎ ব্রহ্মই হওয়া। শ্রীরামকৃষ্ণ যেমন উপমা দিয়েছেন : নুনের পুতুল সমুদ্র মাপতে গিয়ে সমুদ্রের নোনাজলে গলে মিশে সমুদ্রের সঙ্গে একাকার হয়ে গেল।

চারটি বেদে ব্রহ্মের স্বরূপ চারভাবে সন্ধান করা হয়েছে। অন্বেষণের এই মূল সূত্রগুলিকে 'মহাবাক্য' বলে। যেমন—

"প্রজ্ঞানং ব্রহ্ম" ( ঋগ্বেদ : ঐতরেয় উপনিষদ্, ৩।১।৩) ; "অহং ব্রহ্মাস্মি" ( যজুর্বেদ : বৃহদারণ্যক উপনিষদ্, ১।৪।১০ ) ; "তত্ত্বমসি" ( সামবেদ : ছান্দোগ্য উপনিষদ্, ৬।৮।৭ ) এবং "অয়মাত্মা ব্রহ্ম" ( অথর্ববেদ : মাণ্ডুক্য উপনিষদ্, ২ )
—এই চারটি মহাবাক্য। এই মহাবাক্য চারটির প্রতিপাদ্য বিষয় হলো, জীব ও ব্রহ্মের সম্বন্ধ নির্ণয়।

ব্রহ্মের স্বরূপ অন্যভাবে বলা হয়—সচ্চিদানন্দ —সৎ, চিৎ ও আনন্দ। 'সৎ' শব্দের অর্থ—যা আছে, নিত্য, অর্থাৎ তিনকালেই আছে—অতীতে ছিল, বর্তমানে আছে এবং ভবিষ্যতেও থাকবে। এককথায় অনাদি, অনন্ত। ব্রহ্মই একমাত্র নিত্য বস্তু। 'চিৎ' শব্দের অর্থ চৈতন্য, যা উদ্ভিদ, কীট-পতঙ্গ, ইতর প্রাণী এবং মানুষের মধ্যে প্রাণ-রূপে প্রকাশিত। বিশ্বচরাচরের সর্বপ্রাণীতে, সর্ববস্তুতে তিনিই বিভু, চৈতন্যরূপে অনুস্যূত হয়ে আছেন। 'আনন্দ' একটি বিশিষ্ট স্পন্দন বা অনুভূতি, যা সমস্ত সৃষ্টির মূলে। তিনি রসস্বরূপ, আনন্দস্বরূপ। বেদ বলছেন—তিনি নিরাকার, নির্গুণ এবং নিষ্ক্রিয়। শাস্ত্র বলছেন—নিষ্ক্রিয় ব্রহ্মের ইচ্ছাই প্রথম স্পন্দন। এই স্পন্দনই ওঁ-কার। সৃষ্টির মূলে এই ওঁ-কার বা অনাহত নাদ। 'নাদ' কথাটির অর্থ শব্দ। বস্তুজগতে শব্দের সৃষ্টি হয় বাতাসের সঙ্গে কোন বস্তুর সংঘাতের ফলে। ওঁ-কার সেই রকম কোন শব্দ নয়। কারণ, ওঁ-কার সৃষ্টির আগে তো বায়ুর অস্তিত্বই নেই। মূল স্পন্দন ওঁ-কারই বিকারপ্রাপ্ত হতে হতে দৃশ্যমান বিশ্ব-চরাচরের সমস্ত কিছুর মূল উপাদান সূক্ষ্ম পঞ্চভূতে ( ব্যোম, মরুৎ, তেজ, অপ ও ক্ষিতি ) সূক্ষ্মরূপে পরিণত হলো। তারপর এই সূক্ষ্ম পঞ্চভূতের বিশেষ সংমিশ্রণ প্রক্রিয়া, যাকে 'পঞ্চীকরণ' বলে, তার দ্বারা স্থূল পঞ্চভূতের ( আকাশ, বায়ু, অগ্নি, জল ও মাটি ) সৃষ্টি হলো। এরপর মানুষের পাঁচটি জ্ঞানেন্দ্রিয়ের ( চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা এবং ত্বক ) দ্বারা আস্বাদযোগ্য যাকিছু তার সৃষ্টি হলো। একেই আমরা 'জগৎ' বলি।

সৃষ্টির মধ্যে আমি এবং আমাকে ঘিরে যে-জগৎ তারই পারস্পরিক সম্পর্ক নির্ণয় করেছেন উপনিষদের ঋষিরা। 'ব্রহ্ম' শব্দের অর্থ বৃহত্তম— অর্থাৎ সর্বব্যাপক, সমস্ত কিছুকে ঘিরে আছেন।

আবার শুধু যে দৃশ্য এবং অদৃশ্য সকল কিছুকে ঘিরে আছেন তাই নয়, সমস্ত কিছুর মধ্যে তিনি অনুস্যূত হয়ে আছেন। এই ব্রহ্ম চৈতন্য-স্বরূপ বলেই এঁকে আত্মাও বলা হয়। কাজেই আত্মাই সর্ব-ব্যাপক সত্তা—যা জীবের মধ্যে প্রাণরূপে প্রকাশিত। মানুষের এই যে দেহ, মানুষে মানুষে দেহের এই যে ভেদ, বেদান্তের ভাষায় তাকে বলা হয়েছে—নাম ও রূপের ভেদ। অর্থাৎ ব্রহ্ম বা আত্মার প্রকাশ-লক্ষণ, "অস্তি-ভাতি-প্রিয়"। (বাক্যসুধা, শ্লোক-২০) 'অস্তি' অর্থে যিনি নিত্য আছেন, 'ভাতি' অর্থে যিনি স্বয়ংপ্রকাশ, যাঁর প্রকাশে এই জগৎ প্রকাশ পাচ্ছে এবং 'প্রিয়' অর্থে জগতের যাকিছু আমাদের ভাল লাগছে, যার থেকে আমরা আনন্দ পাচ্ছি তার মধ্যে ব্রহ্মের আনন্দময় সত্তারই প্রকাশ ঘটছে। এর যে সর্বব্যাপকতা, তা নাম ও রূপের ব্যবধানের দরুন খণ্ডিত বলে আমাদের বোধ হচ্ছে। বস্তুতঃ, জগতের প্রতিটি জীব বা বস্তু মূলতঃ বা স্বরূপতঃ ব্রহ্ম বা আত্মা বা চৈতন্য। জীবদেহের মধ্যে আত্মার অবস্থানের দরুন তাঁকে জীবাত্মাও বলা হয়। যে মূল দার্শনিক প্রশ্নের উল্লেখ আগে করেছি, উক্ত আলোচনার সূত্র ধরে আমরা এখন তার উত্তর পেতে পারি। 'আমি কে?' আমি সর্বব্যাপক অখণ্ড চৈতন্য অর্থাৎ ব্রহ্ম বা আত্মা—এই আমার স্বরূপ। 'আমি কি?' আমি নাম-রূপের দ্বারা খণ্ডিত হওয়ার ফলে জীব বা জীবাত্মা। 'আমি কেন?' বেদ বলছেন: "একং সৎ বিপ্রা বহুধা বদন্তি (ঋগ্বেদ, ১।১৬৪।৪৬)।— এক ব্রহ্ম বা আত্মাই কেবল আছেন, কিন্তু পণ্ডিতেরা তাঁকেই বহু বলেন। এক অখণ্ড আত্মাই নাম-রূপের দ্বারা নিজেকে খণ্ডিত করেছেন—বিভাজিত হয়ে আনন্দ আস্বাদন করবেন বলে। এরই নাম লীলা। আমি তাঁর লীলার অঙ্গ।

পূর্বোক্ত আলোচনা থেকে এটা নিশ্চয়ই বোঝা গেল যে, সনাতন ধর্মের মূলকথা—জগতে দুই নেই; এক ব্রহ্মই জড় এবং চেতন দুই-ই হয়েছেন। তাই শাস্ত্র তাঁকে বলেছেন: "একমেবাদ্বিতীয়ম্" (ছান্দোগ্য উপনিষদ্, ৬।২।১)।— তিনি এক এবং দ্বিতীয়-রহিত। এর চেয়ে মহৎ ধারণা আজ পর্যন্ত মানুষের চিন্তারাজ্যে পাওয়া যায়নি। এরই নাম অদ্বৈতবাদ, এই বেদান্তের সিদ্ধান্ত।

বেদান্ত মানুষের স্বরূপ-সন্ধানের পাশাপাশিই তার দুঃখের মূলও সন্ধান করেছে। এবিষয়ে বেদান্তের মূল সিদ্ধান্ত—মানুষ যে স্বরূপতঃ ব্রহ্ম, একথা না জানাই তার দুঃখের কারণ। এই না-জানার নাম অজ্ঞান। দেহ এবং আত্মা যে ভিন্ন, যদিও দেহের মধ্যে আত্মা আছেন বলেই দেহ চলে-ফিরে বেড়াচ্ছে, এটি বোঝা দুরূহ বলেই এই অজ্ঞান দুরতিক্রমণীয় মনে হয়। আত্মা নির্গুণ, নিষ্ক্রিয়, সাক্ষিস্বরূপ এবং নিরাকার, তাঁকে দেখা যায় না বলে দেহকেই অনেকে আত্মা বলে মনে করেন। কিন্তু আত্মা নিত্য-শুদ্ধ-বুদ্ধ-মুক্ত বলে দেহাভ্যন্তরস্থ আত্মার সুখ বা দুঃখ বলে কিছু নেই। সুখ-দুঃখ দেহের।

শাস্ত্র-মতে দেহ পাঁচটি কোষের দ্বারা গঠিত—অন্নময় কোষ (স্থূল), প্রাণময় কোষ (সূক্ষ্ম—বায়বীয়), মনোময় কোষ, বিজ্ঞানময় কোষ এবং আনন্দময় কোষ। এই কোষগুলি ক্রমশঃ স্থূল থেকে সূক্ষ্ম, আরও সূক্ষ্ম পরিণত হয়েছে। এর মধ্যে মনোময় কোষই স্থূল ও সূক্ষ্মের ভেদরেখার ওপর রয়েছে। আত্মচৈতন্যের আলো শক্তিরূপে মনের ওপর প্রতিফলিত হচ্ছে। এই শক্তিতে মন ইন্দ্রিয়াদির দ্বারা দেহকে চালাচ্ছে। এই দেহের দুঃখ ত্রিবিধ—একে ত্রিতাপ দুঃখ বা ত্রিতাপ জ্বালা বলে। জগতে যত রকমের দুঃখের উপলক্ষ আছে তাদের তিন শ্রেণীতে ভাগ করা হয়। এগুলি হলো: আধিভৌতিক (যেকোন সৃষ্ট পদার্থ, অর্থাৎ ভূত বা জাত, তজ্জনিত দুঃখ), আধিদৈবিক (ঝড়, বৃষ্টি, খরা, প্লাবন, ভূমিকম্প, দাবানল প্রভৃতি অতিমানবীয় প্রাকৃতিক অর্থাৎ দৈবীশক্তিজাত দুঃখ) এবং আধ্যাত্মিক (মন এবং বুদ্ধিজাত দুঃখ)। এই ত্রিবিধ দুঃখের হাত থেকে পরিত্রাণের জন্য বেদান্তের উপদেশ—আত্মজ্ঞান (আত্মাকে জানা) বা ব্রহ্মজ্ঞান (ব্রহ্মকে জানা) বা তত্ত্বজ্ঞান ('তৎ'—তাঁকে অর্থাৎ পরম সত্যকে জানা)।

ব্রহ্ম নিরাকার, নির্গুণ ও নিষ্ক্রিয়। তিনিই যখন সগুণ হন তখন সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয় করেন, তখন তাঁকে ঈশ্বর বলি। ঈশ্বর শব্দের অর্থ—

সর্বশক্তিমান। তাঁর তিনটি গুণ—সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ। সৃষ্টি বা জগৎরূপে তাঁর যে প্রকাশ ঘটে তার মূলে আছে প্রকৃতি। ঈশ্বরেরই প্রকৃতি—ঈশ্বর থেকে অভিন্ন। সৃষ্টির আগে প্রকৃতিতে তিনটি গুণ সম অবস্থায় থাকে। ঈশ্বরের ইচ্ছায় প্রথম স্পন্দন সৃষ্টি হলেই প্রকৃতিতে গুণের অসাম্য ঘটে এবং তারই ফলে সূক্ষ্ম আকাশ থেকে ক্রমে স্থূল গ্রহ-নক্ষত্রাদি জড় ও জীবের সৃষ্টি হয়। এই সৃষ্টি নিয়ত পরিবর্তনশীল, তাই একে জগৎ (গম্ ধাতু থেকে নিষ্পন্ন) অর্থাৎ যা চলছে বা সংসার (সংসরতি ইতি সংসারঃ)—অর্থাৎ সম্যগ্‌ভাবে বা অনিবার্যভাবে যা সরে সরে যাচ্ছে, বা পরিবর্তিত হচ্ছে—বলা হয়। এই নিয়ত পরিবর্তনশীল জগতে জীব জন্ম-মৃত্যুর চক্রে নিয়ত পরিবর্তিত হচ্ছে। এই পরিবর্তন সম্পূর্ণতঃ দেহকেন্দ্রিক। দেহ জড় এবং পরিবর্তনশীল অর্থাৎ পরিণামী। দেহের মধ্যে যে-আত্মা তা-ই নিত্য—সচ্চিদানন্দস্বরূপ। এই আত্মাকে জানা, আত্মজ্ঞান তথা ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করাই মানুষের জীবনের প্রকৃত উদ্দেশ্য। এই জ্ঞানলাভ করলেই মানুষ নিত্য আনন্দে প্রতিষ্ঠিত হতে পারবে, সমস্ত দুঃখের হাত থেকে পরিত্রাণ পাবে।

এক অর্থে বেদান্ত কোন ধর্ম নয়, এটি একটি দর্শন। অন্যভাবে বলা যায়—বেদান্ত একই সঙ্গে দর্শনও বটে, আবার ধর্মও বটে। বেদান্ত একটি সর্বজনীন ধর্মের দর্শন ; সেই ধর্মের নাম সনাতন ধর্ম। এককথায় একে 'সত্য-ধর্ম' বলা চলে। সত্য অর্থাৎ সৎ-এর ভাব বা নিত্যের ভাব অর্থাৎ অদ্বৈত তত্ত্ব যাতে প্রকাশিত।

উত্তর-পশ্চিম ভারতের সিন্ধু নদের উপত্যকায় যে-জনগোষ্ঠী বাস করত পরবর্তী কালে উত্তর-পশ্চিম ভারত-আক্রমণকারী আলেকজান্ডার প্রমুখ গ্রীকরা এই জনগোষ্ঠীকে 'হিন্দু' নামে অভিহিত করে। তারা 'স' কে 'হ' উচ্চারণ করত। সেই থেকেই সিন্ধু-উপত্যকাবাসীরা 'হিন্দু' নামে পরিচিতি লাভ করে। এরা যে-ধর্ম আচরণ করত তা-ই সনাতন ধর্ম অর্থাৎ বেদের ধর্ম বা বৈদিক ধর্ম নামে খ্যাত। সাধারণভাবে একেই 'হিন্দুধর্ম' বলা হয়। কাল-ক্রমে এই জনগোষ্ঠী সমগ্র ভারতে ছড়িয়ে পড়ে। এভাবেই হিন্দুধর্ম বিস্তারলাভ করে।

সনাতন ধর্ম অর্থাৎ বৈদিক ধর্ম ব্যবহারিক ক্ষেত্রে বর্ণাশ্রম ধর্ম নামে পরিচিত হয়। বর্ণ ও আশ্রম হিন্দুধর্মের একটি বৈশিষ্ট্য। হিন্দুরা সমাজের সকল মানুষকে তাদের প্রকৃতিদত্ত কর্মপ্রবণতা অনুযায়ী চারটি ভাগে ভাগ করে—ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এবং শূদ্র। এই বিভাজন যে অত্যন্ত বৈজ্ঞানিক, একটু চিন্তা করলেই সেকথা বোঝা যাবে। বিশ্বসৃষ্টির মূলে যে তিনটি গুণের (সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ) উল্লেখ আগেই করা হয়েছে, তার দ্বারা জীব-জগতের প্রকৃতি যেভাবে নিয়ন্ত্রিত হয়, সেই লক্ষণের সঙ্গে মিলিয়ে দেখলেই বিষয়টি পরিষ্কার হবে। সত্ত্বগুণ প্রকাশাত্মক। মনুষ্যত্বের প্রকাশ। মানুষের মধ্যে এর লক্ষণ—সরলতা, উদারতা, দয়া, মহত্ত্ব প্রভৃতি। যেসব মানুষ নিয়ত উচ্চ চিন্তা অর্থাৎ ঈশ্বর-চিন্তা বা ব্রহ্মের চিন্তায় নিরত থাকে, যাদের চিন্তা প্রকৃত-পক্ষে সভ্যতার আলোকবর্তিকা, সেই প্রকৃতির মানুষই 'ব্রাহ্মণ'রূপে পরিচিত হলো। রজঃ গুণের লক্ষণ কর্মোদ্যম। এরই শ্রেষ্ঠ প্রকাশ বীরত্ব, নির্ভীকতা প্রভৃতি গুণাবলীতে। এই প্রকৃতির মানুষ সমাজের সকল মানুষের রক্ষকের ভূমিকা পালন করে। এরাই রাজপুরুষ। সমাজ, রাষ্ট্র বা রাজ্য এরাই প্রতিপালন করে। এদের বলা হলো 'ক্ষত্রিয়'। তমোগুণের লক্ষণ জড়ত্ব, চিন্তায় বা কর্মে উদ্যোগহীনতা। তমোমিশ্রিত বহুলাংশে রজোগুণসম্পন্ন মানুষেরা ব্যবসা-বাণিজ্যাদি কর্ম সম্পাদন করে। মানুষের গ্রাসাচ্ছাদনের আয়োজন এই প্রকৃতির মানুষরাই করে থাকে। এদেরই বলে 'বৈশ্য'। যে-প্রকৃতির মানুষের মধ্যে অল্প রজোগুণ এবং বহুলাংশে তমোগুণের প্রভাব, তারা সমাজভুক্ত মানুষের রক্ষা বা প্রতিপালনের দায়িত্ব নেবার উপযুক্ত না হলেও সমাজভুক্ত বিভিন্ন মানুষকে সেবা করতে পারে। এদেরই বলা হয় 'শূদ্র'।

দেখা যাচ্ছে, এই ব্যবস্থায় সমাজের প্রতিটি মানুষেরই সমাজকে কিছু দেবার আছে এবং সেটি নির্ভর করছে তার গুণ অর্থাৎ প্রকৃতির ওপর। এইজন্য হিন্দুদের সর্বাধিক জনপ্রিয় ধর্মগ্রন্থ 'গীতা'য় ভগবান শ্রীকৃষ্ণ গুণ-কর্মানুসারে সমাজভুক্ত মানুষের শ্রেণীবিন্যাসের কথা বলেছেন। এই ব্যবহারিক শ্রেণীবিন্যাসই বর্ণ-ধর্মের যথার্থ রূপ।

এখানে অবশ্যই আমাদের একথা মনে রাখা দরকার, মাত্র একটি গুণ সম্পূর্ণভাবে সবসময়ের জন্য সাধারণ কোন মানুষের মধ্যে প্রকাশ পায় না। কম-বেশি তিনটি গুণই সকল মানুষের মধ্যে ক্রিয়াশীল, কিন্তু এরই মধ্যে একটির মূল-প্রবণতা থাকে। সেই অনুযায়ীই গুণ-কর্ম বিভাগ। এই বিভাজন একটি পরিণত মানুষের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য।

হিন্দুরা বর্ণনির্বিশেষে সমাজভুক্ত সকল মানুষের জীবনকেই চারটি পর্বে ভাগ করে—ব্রহ্মচর্য, গার্হস্থ্য, বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাস। এই পর্বগুলিকে বলা হয় 'আশ্রম'। এর প্রতিটি পর্বেই মানুষ সংসারে ও সমাজে জীবনধারণের জন্য আনন্দে শ্রমদান করে—এই জন্যই আশ্রম। পৃথিবীতে মানুষ আসে কর্ম করার জন্য। তাই এই কর্মভূমিতে বিস্তৃতভাবে শ্রমদান করা অর্থেও আশ্রম কথাটি ব্যাখ্যা করা চলে। কিন্তু মূলকথাটি এই যে, সকলের সব অবস্থার সম্মিলিত শ্রমেই সমাজের শ্রীবৃদ্ধি। সুতরাং সুন্দর আদর্শ সমাজ গড়ার ক্ষেত্রে আশ্রমধর্মই সবচেয়ে উপযোগী। এবং এটি যে বৈজ্ঞানিক চিন্তা তাতে সন্দেহের অবকাশ থাকে না।

বর্ণ ও আশ্রমধর্মকে পরিচালনা করে বেদ। প্রাচীনকালে যখন লিপির আবিষ্কার হয়নি, তখন থেকেই হিন্দুসমাজভুক্ত প্রতিটি মানুষের জন্যই বেদ-অনুশীলনের একটি নির্দিষ্ট রীতি ছিল। চারটি আশ্রমে একজন ব্যক্তি চারভাবে বেদের অনুশীলন করত। ব্রহ্মচর্যাশ্রমে 'মন্ত্র', গার্হস্থ্যাশ্রমে 'ব্রাহ্মণ', বানপ্রস্থাশ্রমে 'আরণ্যক' এবং সন্ন্যাসাশ্রমে 'উপনিষদ্'।

ব্রহ্মচর্যাশ্রমে গুরুগৃহে 'মন্ত্র' চর্চার কালে শুদ্ধ উচ্চারণ ও মন্ত্রগুলি স্মৃতিতে যথাযথভাবে ধারণ করার ওপর জোর দেওয়া হতো। 'ব্রাহ্মণ' ভাগে গার্হস্থ্যাশ্রমে ব্যবহার্য মন্ত্রগুলির অর্থ অনুধাবন এবং প্রয়োগ করা হতো। 'আরণ্যক' ভাগে বানপ্রস্থাশ্রমে, অর্থাৎ আধুনিক পরিভাষায় সংসার জীবন থেকে অবসরকালে গার্হস্থ্যাশ্রমে পালনীয় যাগ-যজ্ঞাদি ক্রিয়ার দার্শনিক তত্ত্ব সন্ধান করা হতো। এই প্রক্রিয়ায় কারো বৈরাগ্য উদ্দীপিত হলে পরিপূর্ণভাবে সংসার ত্যাগ করে সে সন্ন্যাস গ্রহণ করে 'উপনিষদ্' ভাগে ব্রহ্ম বা আত্মার স্বরূপসন্ধানে ব্রতী হতো এবং ভাগ্যবান কেউ কেউ ব্রহ্মজ্ঞান বা আত্মজ্ঞান লাভ করে ধন্য হতো।

দেখা যাচ্ছে, ধর্ম সেকালে জীবনচর্যার অপরিহার্য অঙ্গ ছিল। একজন ব্যক্তি জীবনে যাকিছু পেতে চায়, বেদের ঋষিরা তারও শ্রেণীবিন্যাস করেছেন। এগুলিকে বলা হয় 'পুরুষার্থ'—পুরুষ বা ব্যক্তির লভ্য অর্থ অর্থাৎ বিষয় বা প্রয়োজন যথাক্রমে ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ। সাধারণ মানুষের জন্য প্রথম তিনটি পুরুষার্থ। সাধারণ মানুষের স্বভাবতই দেহ এবং ইন্দ্রিয়াদির ভোগের দিকে আগ্রহ থাকে। কিন্তু এগুলির শুরুতেই আছে ধর্ম—অর্থাৎ সেই শিক্ষা যা ভোগকে সুনিয়ন্ত্রিত করে যথার্থ আনন্দলাভ করতে মানুষকে সাহায্য করে। বিষয়ভোগের অনিবার্য পরিণাম দুঃখ। ধর্মশিক্ষা মানুষকে এবিষয়ে সচেতন করে নিয়ন্ত্রিত ভোগ, জীবনধারণের জন্য যেটুকু অপরিহার্য তাই করবার উপদেশ করে এবং বলে যে, এভাবে চললেই সংসারে মানুষ সুখী হতে পারে। প্রকৃতপক্ষে ধর্মবিহীন জীবন উচ্ছৃংখল জীবনেরই অপর নাম এবং তা অশেষ দুঃখের কারণ হয়। একথা আজকের দিনেও সত্য। নিরবচ্ছিন্ন সুখ অর্থাৎ নিত্য আনন্দলাভের জন্যই মানুষের জীবনের উদ্দেশ্য ব্রহ্মজ্ঞান বা আত্মজ্ঞান বা ঈশ্বরলাভ।

সভ্যতা বিকাশের শুরুতে মানুষ বিভিন্ন প্রাকৃতিক শক্তিকে সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের প্রকাশরূপে উপাসনা করতে শুরু করে। এগুলিকে দৈবীশক্তি বলা হয়। তারই প্রতীক বিভিন্ন দেবতা, যাঁদের নাম আমরা বেদে পাই। লক্ষণীয় বিষয় এই যে, ইন্দ্র, বরুণ, অগ্নি প্রভৃতি দেবতা, বেদে যাঁর যখনই উপাসনা করা হচ্ছে, তখন তাঁকেই সর্বশক্তিমান ঈশ্বর বলা হচ্ছে। অর্থাৎ এক ঈশ্বরই ভিন্ন ভিন্ন রূপে জগতে প্রকাশিত হচ্ছেন এবং বিভিন্ন ব্যক্তির দ্বারা বিভিন্নভাবে পূজিত হচ্ছেন।

প্রকৃতপক্ষে হিন্দুরা একেশ্বরবাদী। কিন্তু ব্যবহারিক ক্ষেত্রে ইন্দ্র-অগ্নি-বরুণাদি রূপকের নাম-রূপের ভেদের দরুন হিন্দুদের মধ্যেই বিভিন্ন উপাসকগোষ্ঠীর উদ্ভব হয়েছে। এই গোষ্ঠীগুলিকে একত্রে 'বহু ঈশ্বরবাদী' বলে কোন কোন পণ্ডিত বর্ণনা করে থাকেন। সে-তত্ত্বটি সর্বৈব

ভুল। কিন্তু মুশকিলটা অন্য জায়গায়। হিন্দুদের মধ্যে শাক্ত, শৈব, সৌর, গাণপত্য প্রভৃতি উপাসক-গোষ্ঠীর সাধারণ মানুষও মূলতত্ত্ব ভুলে গিয়ে নাম-রূপের ভেদ নিয়ে বিভেদ সৃষ্টি করে। ফলে অহিন্দুরা যারপরনাই বিভ্রান্ত হয়। অথচ প্রত্যেক ব্যক্তিকে তার পছন্দমতো নাম ও রূপে ঈশ্বরকে উপাসনা করবার যে-স্বাধীনতা হিন্দুধর্ম দেয়, তা আর অন্য কোন ধর্মমতেই নেই।

এখানে প্রাসঙ্গিকভাবে একথা বলা ভাল যে, বেদ অর্থাৎ বৈদিক ধর্ম অপৌরুষেয় হলেও পৃথিবীর আর সমস্ত ধর্মই ব্যক্তিবিশেষের দ্বারা বিশেষ যুগে, বিশেষ ভৌগোলিক অঞ্চলে, বিশেষ জনগোষ্ঠীর জন্য প্রচারিত, অর্থাৎ স্থান-কাল-পাত্র দ্বারা সীমাবদ্ধ। এই সমস্ত প্রচারকরাই মহান ব্যক্তি এবং বিশেষ বিশেষ জনগোষ্ঠীর অশেষ কল্যাণসাধন করেছেন। এঁরা যা বলেছেন তার মর্মের সঙ্গে সনাতন ধর্মের সারসত্যের কোন ভিন্নতা নেই। কিন্তু মূলতঃ যুগোপযোগিতার অর্থাৎ কালের দ্বারা সীমাবদ্ধ বলে ঐগুলিকে 'ধর্ম' না বলে 'ধর্মমত' বলাই সঙ্গত। ধর্মমত কালভেদে যুগোপযোগীরূপে সংশোধিত না হলে কোন একটি বিশেষ মতাবলম্বী জনগোষ্ঠীর মধ্যেও দ্বন্দ্ব উপস্থিত হয় এবং তা সমাজকে বিপন্ন করে।

বর্তমানে 'মৌলবাদ' কথাটি খুব প্রচলিত। শব্দটি ইংরেজী 'Fundamentalism'-এর বাঙলা প্রতিশব্দ। বিখ্যাত দার্শনিক বিমলকৃষ্ণ মতিলাল লিখেছেন: " 'মৌলবাদ' কথাটির উৎপত্তি পশ্চিমে। 'ফান্ডামেন্টালিজম'কে একটি 'ইজম'-এ পরিণত করা হয়েছে সর্বপ্রথমে আমেরিকায় ১৮৯৫ খ্রীস্টাব্দের 'নায়গ্রা কনফারেন্স'-এ। মূলতঃ প্রোটেস্ট্যান্ট ধর্মের এক নবতম রূপকে 'ফান্ডামেন্টালিজম' আখ্যা দেওয়া হলো। বলা হলো, শেষোক্ত মতবাদটি অর্থাৎ মৌলবাদ পাঁচটি পয়েন্ট অথবা পাঁচটি বিষয়ে প্রথমোক্ত (প্রোটেস্ট্যান্ট) মতবাদ থেকে ভিন্ন। খ্রীস্টীয় শাস্ত্রের অভ্রান্ততা, যীশুর ঈশ্বরত্ব, মাতা মেরীর মধ্যে কুমারীত্ব ও মাতৃত্বের সুশৃঙ্খল সহাবস্থান, পাপের জন্য অনুতাপে প্রায়শ্চিত্ত এবং যীশুর যুগান্তে সশরীরে দ্বিতীয় আবির্ভাব—এই পাঁচটির ওপর সন্দেহ-বিনির্মুক্ত বিশ্বাস—সেই মৌলবাদের ভিত্তিভূমি রচনা করেছিল। এছাড়া অন্যান্য বিষয়ে এই মৌলবাদীরা সযত্নে যুক্তির আশ্রয় নিতেন এবং সভ্যতার অগ্রগতির পরিপন্থী তাঁরা ছিলেন না।

"মৌলবাদের একটা অনতিদূষণীয় রূপ ছিল এই শতকের তৃতীয়-চতুর্থ দশকে—একেবারে সর্বাংশে গ্রহণযোগ্য না হলেও তা সামগ্রিকভাবে দোষাবহ ছিল না। মৌলবাদকে তখন কট্টর সংযত নৈতিক জীবনযাপনের দর্শন মনে করা হতো। প্রত্যেক ব্যক্তি নিজে থেকে ইন্দ্রিয়পরায়ণতা, ভোগোন্মুখতা থেকে বিরত থাকবে এবং অন্যান্য বিলাস-ব্যসন থেকে সংযত হবে—এই ছিল মৌলবাদীদের উপদেশ।... ব্যক্তিগত চারিত্রিক শুচিতা ছিল তাদের লক্ষ্য।"[১]

এবার ভারতীয় পটভূমিতে মৌলবাদ শব্দটি ও তার ভূমিকা আলোচনা করা যেতে পারে। 'মৌল' শব্দটি 'মূল'-এর বিশেষণ-রূপ। 'বাদ' সচরাচর আমরা মতবাদ বুঝি। তাহলে 'মৌলবাদ' বলতে এমন একটি মতবাদকে বোঝায় যা মূলকেই আশ্রয় করতে চায়। ভারতবর্ষের সুদীর্ঘ ইতিহাস পর্যালোচনা করলে এটুকু বোঝা যাবে যে, অনেক বৈচিত্র্যের মধ্যেও ভারতবর্ষে হিন্দু, বৌদ্ধ, জৈন, প্রভৃতি বিভিন্ন ধর্ম ও ধর্ম-মতাবলম্বী মানুষের মধ্যে জীবনদর্শনগত একটা মূল ঐক্য আছে যেটি উদার হিন্দুধর্মের প্রেক্ষাপটে ঔপনিষদিক বা বৈদান্তিক ধ্যান-ধারণার ওপর দাঁড়িয়ে আছে। ইতিহাসের নিরিখেই বলা যায় যে, হিন্দুরা পরমতসহিষ্ণু। ফলে ইতিহাসের আদিকাল থেকে যেসব আগ্রাসী নরপতি ও জনগোষ্ঠী ভারতবর্ষের উত্তর-পশ্চিমাংশ অধিকার করে এদেশে রয়ে গেছে কালক্রমে তারা হিন্দুদের মূল জীবনস্রোতে নিজেদের মিশিয়ে দিয়ে ভারতীয় জনগোষ্ঠীরই অঙ্গীভূত হয়ে গেছে। এমন নয় যে, তাদের ধর্মমত-গত স্বাতন্ত্র্য বিসর্জন দিতে হয়েছে। তাদের দৃষ্টিভঙ্গি প্রসারিত হয়েছে। ভারতীয় হিন্দুরা কখনো ধর্মের নাম করে ধর্মের প্রচার ও প্রসারের জন্য রক্তপাত বা হানাহানিতে লিপ্ত হয়নি। প্রধান জনগোষ্ঠীর এই মানসিকতাই ভারতবর্ষে বসবাসকারী সকল মানুষের মধ্যে ঐক্য ও সম্প্রীতি বজায় রেখেছে।

১ 'মৌলবাদ: কি ও কেন?'—বিমলকৃষ্ণ মতিলাল, দেশ, ৩০ জুন, ১৯৯০, পৃঃ ১৫

হিন্দুধর্মে 'শাস্ত্র' বলতে বোঝায় প্রধানতঃ শ্রুতি বা বেদকে। বেদ-এর শাসন অর্থাৎ নির্দেশই হলো ধর্মীয় অনুশাসন। আগেই আলোচনা করা হয়েছে যে, হিন্দুদের ব্যবহারিক জীবন এবং ধর্ম-জীবন অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। বেদের তত্ত্ব বা নির্দেশ সাধারণ মানুষের পক্ষে ব্যক্তিগতভাবে বুঝে সেইমতো আচরণ করা কালক্রমে কঠিন হতে পারে মনে করেই অতি প্রাচীনকালেই বেদের নির্দেশমতো সমাজজীবনে কোন ব্যক্তির কি কি করা উচিত এবং কি কি করা উচিত নয়, এসম্পর্কে নির্দেশনামা তৈরি হয়। উচিত অংশকে বলা হয় 'বিধি', অনুচিত অংশকে বলা হয় 'নিষেধ'। 'বিধি-নিষেধ'-এর নির্দেশ-সম্বলিত সূত্রাকারে গ্রথিত রচনাটিকে বলা হয় 'স্মৃতি'— মনু প্রমুখ আচার্য এগুলির সংকলক এবং নির্দেশক। 'শ্রুতি' বা 'বেদে'র মতো 'স্মৃতি'কেও অনেকে শাস্ত্র বলেন। প্রাচীনকালের সমাজে স্মৃতির ব্যবহার অপরিহার্য ছিল। এর মধ্যে এমন বহু লোককল্যাণকর নির্দেশাদি আছে যা আজকের সামাজিক পরি-স্থিতি'তেও সমান প্রযোজ্য। মনে রাখতে হবে, স্মৃতি রচিত হয়েছিল সংশ্লিষ্ট যুগের প্রয়োজনে। তাহলেও স্মৃতির অনেক অংশ সর্বকালীন প্রাসঙ্গিকতা-যুক্ত। তবে যেগুলি পরবর্তী কালে প্রযোজ্য নয়, সেগুলি বর্জনের নির্দেশও স্মৃতিকারগণ দিয়েছেন।

কিন্তু কালক্রমে তন্ত্র ( যাতে বিশ্ব-সৃষ্টির মূলে শক্তিকে মাতৃরূপে কল্পনা করা হয়েছে এবং সে-রূপে উপাসনার কথা বলা হয়েছে। ) ও পুরাণ (যার মধ্যে ঈশ্বরকে সাকার অর্থাৎ নাম-রূপে উপাসনার কথা এবং ঈশ্বরের বিভিন্ন রূপ, তাঁর মাহাত্ম্য ও লীলা বর্ণনা করা হয়েছে। ) এই দুটিকে আশ্রয় করে মূর্তিপূজার মাধ্যমে ধর্মচর্চার যে-ধারা গড়ে উঠেছিল, পরবর্তী কালে তার সূত্র ধরেই উপাসনা-ভিত্তিক নানা সম্প্রদায় গড়ে ওঠে। কিন্তু উপাসনার মূল উদ্দেশ্য যে ব্রহ্মজ্ঞান লাভ, তা লোকে ভুলতে শুরু করে এবং নাম-রূপের সীমার মধ্যে যে খণ্ডতা ও আচার-অনুষ্ঠানের বিভিন্নতা বর্তমান তার দ্বারা সমাজের মধ্যে দ্বন্দ্বের বীজ ছড়িয়ে পড়ে। কালক্রমে ধর্মের মূল উদ্দেশ্য ভুলে গিয়ে আচার-অনুষ্ঠান এবং তজ্জনিত বিভেদই বড় হয়ে উঠতে থাকে।

অন্যদিকে গুণ-কর্ম অনুসারে বর্ণভেদ ও জাতি-নির্ণয়ের মূলধারা কালক্রমে পরিবর্তিত হয়। বর্ণ ও জাতি নির্ণিত হতে থাকে কে কোন্ বর্ণের কুলে জন্মেছে তাই দিয়ে। ব্রাহ্মণ বর্ণশ্রেষ্ঠ এবং অধঃক্রমে ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র-এর প্রভাবে জাতিভেদও প্রবল আকার ধারণ করে। এর ফলে জাতিগত এবং প্রধানতঃ সম্প্রদায়গত বিভেদ ক্রমশঃ বড় হয়ে ওঠে ; সম্প্রদায়ে সম্প্রদায়ে বৈরিতা সৃষ্টি করে। হিন্দুদের মধ্যে বিভিন্ন মতাবলম্বী মানুষের সঙ্গে এবং কালক্রমে অন্যান্য ধর্মমতে বিশ্বাসী মানুষের মধ্যেও ব্যবধান গড়ে ওঠে। ধর্মের এই বিকৃত ব্যবহারিক রূপটিই বিভিন্ন সাম্প্রদায়িক জনগোষ্ঠীর কাছে মুখ্য হয়ে ওঠে।

সাম্প্রতিককালে ভারতবর্ষে 'মৌলবাদী' বলতে তাদেরই বোঝায় যারা স্ব স্ব সম্প্রদায়ের মূল পরিচয়, যা কোন উদার তত্ত্বনির্ভর নয় বরং যা সংকীর্ণ-মানসিকতা-চর্চিত আচার-অনুষ্ঠানের প্রকাশ, তারই সমর্থন করে। ফলে সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষ অনিবার্য হয়ে ওঠে। এ যে প্রকৃতপক্ষে মূলে ফেরা নয়, অথচ প্রকৃত মূলে ফিরতে পারলেই যে মানুষের যথার্থ কল্যাণ, তা এদের বোঝানো যায় না। তথাকথিত মৌলবাদ হীন রাজনৈতিক উদ্দেশ্যসিদ্ধির হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহৃত হয়। কিছু পণ্ডিতম্মন্য বুদ্ধিজীবী মৌলবাদের কথা শুনলেই অজ্ঞতাবশতঃ 'গেল গেল' রব তোলেন। তাঁরা ভুলে যান যে, মানুষ যদি যথার্থই তার মূল অনুসন্ধান করে, তবেই তার পক্ষে বোঝা সম্ভব হয় যে, ব্যক্তিমানুষ, যে যেভাবেই জীবনচর্চা করুক না কেন, প্রকৃতপক্ষে মানুষে মানুষে কোন ভেদ নেই এবং সেই কারণেই দ্বন্দ্বেরও কোন অবকাশ নেই। অন্যভাবে বলতে গেলে, ভারতীয় সংস্কৃতিতে বৈচিত্র্যের মধ্যে যে ঐক্য ঐতিহাসিক সত্য, যাকে আমরা 'সংহতি' বলছি সেই বিপন্ন সংহতিকে আমরা যথার্থ মৌলবাদের চর্চার দ্বারাই বিপন্মুক্ত করতে পারি। 'যথার্থ মৌলবাদ' বেদান্তের অদ্বৈত তত্ত্বের ওপর প্রতিষ্ঠিত। □

## স্মৃতিকথা

# পুণ্যস্মৃতি

### চন্দ্রমোহন দত্ত

[ পূর্বানুবৃত্তি ]

এই অপ্রকাশিত স্মৃতিনিবন্ধটি লেখকের কনিষ্ঠ পুত্র কার্তিকচন্দ্র দত্তের সৌজন্যে প্রাপ্ত।—সম্পাদক, উদ্বোধন

আমি রামকান্ত বসু স্ট্রীট সেকেন্ড লেনে[1] মায়ের আদেশমতো বাড়ি ভাড়া করে দেশ থেকে স্ত্রী ও ছেলে-মেয়েকে ( ইন্দু ও অমূল্যকে ) নিয়ে এলাম। কিন্তু বাড়িওয়ালা লোক হিসাবে বিশেষ সুবিধার ছিল না। প্রায়ই ছেলে-মেয়ের খেলার সরঞ্জাম কখনো নিজে, কখনো বা চাকর দিয়ে ভেঙে ছত্রখান করে দিত। ভাই-বোনের খেলা প্রায় বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। ওরা মনমরা হয়ে ঘুরত। শেষে এমন হলো, বাড়িওয়ালাকে দেখলেই ওরা ভয়ে ঘরের ভিতর ঢুকে পড়ত। একদিন শ্রীমাকে বাড়িওয়ালার ব্যবহারের কথা বলায় মা খুব দুঃখ পেয়ে বললেন: "আহা! শিশুদের খেলা বন্ধ করে দিতে ওর মনে একটুও কষ্ট হয় না?" তারপরই শরৎ মহারাজকে ডেকে বললেন: "শরৎ, বাড়িওয়ালা চন্দ্রর খোকা-খুকির খেলা বন্ধ করে দিয়েছে, তুমি চন্দ্রর জন্য একটা জায়গা দেখে বাড়ি করে মাথা গোঁজার ব্যবস্থা করে দাও। শিশুরা খেলতে পারবে না সেকি হয়!" শ্রীমায়ের ইচ্ছায় আর শরৎ মহারাজের চেষ্টায় বাগবাজারের বোসপাড়া লেনে[2] সাড়ে সাত কাঠা জমি যোগাড় হলো। শরৎ মহারাজই সবকিছু করে দিলেন। সাড়ে তিন কাঠার ওপর হলো বাড়ি আর বাকি জায়গায় শাক-সবজির বাগান। বাড়ি তৈরির যাবতীয় খরচ ও ব্যবস্থার দায়িত্ব নিলেন শরৎ মহারাজ। নতুন বাড়িতে ছেলে-মেয়ে আর স্ত্রীকে নিয়ে এলাম। পাকা দেওয়াল, টিনের ছাদ। একটি খুঁটি পুঁতে শরৎ মহারাজ ভিত্তি-স্থাপন করলেন। মা তখন দেশে ছিলেন। মাকে আগেই ভিত্তি-স্থাপনের কথা চিঠিতে লিখেছিলাম। মা উত্তরে ( ১৫ ফাল্গুন, ১৩২৫) আমাকে লিখেছিলেন: "তোমার পত্র পাইয়া লিখিত সমাচার জ্ঞাত হইলাম। তোমার বাড়ির খুঁটি পুঁতিবার দিন শরৎ ( স্বামী সারদানন্দজী ) যে ঠিক করিয়া দিয়াছে তাহাই উত্তম।"[3] সাধু-ব্রহ্মচারীদের নিয়ে এলাম গৃহপ্রবেশের দিন। সেদিন শরৎ মহারাজ আসেননি, স্বামী বিরজানন্দ ও অন্যান্যরা এসেছিলেন। তাঁরা ষোড়শোপচারে শ্রীমা ও ঠাকুরের পট পুজো করলেন। চণ্ডীপাঠ এবং রামনামকীর্তনও করলেন। শ্রীমা স্বয়ং নিজের ও ঠাকুরের পট পুজো করে দিয়েছিলেন 'মায়ের বাড়ী'তেই। সেই পট নিয়ে এসে বসানো হলো। আজও বাড়িতে সেই পটের নিত্যপুজো হয়। ঠাকুরঘরে শ্রীমায়ের চুল, নখ, কাপড় রাখা আছে।[4] বাড়িতে শ্রীমায়ের চরণচিহ্ন বাঁধানো আছে। মায়ের পায়ে দেওয়া পুষ্পাঞ্জলির ফুল, মন্ত্রপড়া হরীতকী ও মায়ের জপ করে দেওয়া রুদ্রাক্ষের মালা আছে। শ্রীশ্রীমা একবার একমুঠো চাল আমার হাতে দিয়ে বলেছিলেন: "এগুলো চালের গোড়ায় ( জালায় ) রেখে দিও পুঁটুলি বেঁধে। চালের অভাব কোনদিন হবে না তোমাদের।"

প্রসঙ্গতঃ একটি কথা বলি, যা আমার স্ত্রীকে ছাড়া কাউকে বলিনি। শ্রীমা কে তা তিনি আমাকে দয়া করে দেখিয়েছিলেন, বুঝিয়ে দিয়েছিলেন—তিনি স্বর্গের দেবী, মর্তে মানবী হয়ে জন্ম নিয়েছেন আমাদের উদ্ধার করতে। কাউকে বলিনি, কারণ মায়ের নিষেধ ছিল তাঁর জীবনকালে ঘটনাটি প্রকাশ করার। ঘটনাটি হলো এই: শ্রীমা যখন জয়রামবাটীতে যেতেন তখন কখনো কখনো আমাকেও সঙ্গে নিয়ে যেতেন। একবার জয়রামবাটী থেকে শ্রীমা কলকাতায় ফিরছেন। গরুর গাড়ি করে কোয়ালপাড়া হয়ে বিষ্ণুপুরে যাচ্ছি আমরা। আমার হঠাৎ খুব ইচ্ছা হলো শ্রীমায়ের আসল রূপ দেখার। এক জায়গায় গাড়ি থামিয়ে মা বিশ্রাম করছেন গাছের ছায়ায়। নিরিবিলি দেখে মাকে একান্তে বললাম: "মা, আপনি আমাকে সন্তানের মতো স্নেহ করেন। আপনার দয়াতেই আমি স্ত্রী-পুত্র-কন্যা

১ রাস্তাটির বর্তমান নাম নিবেদিতা লেন।—সম্পাদক, উদ্বোধন ২ বর্তমান রাস্তাটির নাম মা সারদামণি সরণি।—সঃ উঃ

৩ শ্রীশ্রীমায়ের এই পত্রটি 'উদ্বোধন'-এর পৌষ ১৩৮৪ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছে।—সম্পাদক, উদ্বোধন

৪ চন্দ্রমোহন দত্তের কনিষ্ঠ পুত্র কার্তিকচন্দ্র দত্ত জানিয়েছেন, এইগুলি পরবর্তীকালে চুরি হয়ে যায়।—সম্পাদক, উদ্বোধন

নিয়ে বেঁচে আছি; সমস্ত আপদ-বিপদ থেকে আপনি রক্ষা করছেন, তবুও আমার একটা অতৃপ্ত বাসনা আছে। সেই বাসনা আপনি পূর্ণ করে দিলে আমার মনস্কামনা ষোলকলায় পূর্ণ হয়।" শ্রীমা বাসনাটি জানতে চাইলেন। বললামঃ "আপনার আসল রূপ দেখাই আমার শেষ বাসনা।" মা কিছুতেই রাজি হলেন না। অনেক কাকুতি-মিনতি করায় মা গররাজি হয়ে অন্যান্যদের বললেনঃ "তোমরা একটু সরে যাও। ওর সঙ্গে আমার একটু কথা আছে।" আমাকে বললেনঃ "দেখ, শুধু তুমিই দেখবে। ওরা কেউ দেখতে পাবে না। কিন্তু আমার আসল রূপ দেখে ভয় পেয়ো না, আর যা দেখবে কাউকে বলবেও না যতদিন আমি বেঁচে থাকব।" এই কথা বলে মা আমার সামনেই নিজমূর্তি ধরলেন। জগদ্ধাত্রী মূর্তি। মায়ের ঐ দিব্য জ্যোতির্ময়ী মূর্তি দেখে আমি তো ভয়ে একেবারে কাঠ। মায়ের শরীর থেকে জ্যোতি বেরোচ্ছে। চারদিক জ্যোতির আলোয় আলো হয়ে গেছে। তীব্র আলোর জ্যোতিতে আমার চোখ ধাঁধিয়ে গেল। তারই মধ্যে দেখতে পেলাম, মায়ের দুই পাশে জয়া-বিজয়া। আমার সমস্ত শরীর থরথর করে কাঁপতে লাগল, কাঁপুনি আর থামে না। স্থির হয়ে দাঁড়াতে পারছি না। মায়ের পায়ে লুটিয়ে পড়লাম। শ্রীমা জগদ্ধাত্রীর রূপ সংবরণ করে মানবী হয়ে আমার গায়ে হাত বুলিয়ে দিতে লাগলেন। আস্তে আস্তে আমার কাঁপুনি থামল। স্বাভাবিক হয়ে আসতে মা বললেনঃ "যা দেখলে তা কিন্তু কাউকে বলো না যতদিন আমি বেঁচে আছি।" মাকে জিজ্ঞাসা করলাম আপনার জয়া-বিজয়া কারা? মা বললেনঃ "গোলাপ আর যোগেন।"

একটি ঘটনা শুনেছিলাম রাসবিহারী মহারাজের (স্বামী অরূপানন্দের) মুখে মায়ের শরীর যাবার বেশ কিছুদিন পর। রাসবিহারী মহারাজ ছিলেন মায়ের সেবক। মা খুব স্নেহ করতেন তাঁকে। জয়রামবাটীতে একদিন রাসবিহারী মহারাজ মাকে ক্ষোভের সঙ্গে বলছেনঃ "মা আমার কি জীবন এভাবেই যাবে?—এই বাড়ি তৈরি, বাজার করা, হিসাব লেখা এসব করে কি হবে আমার?" মা শান্তকণ্ঠে বললেনঃ "তা বাবা, আর কি করবে বল। এবার যে এসব করেই তাঁকে লাভ করার পথ করে দিয়ে গেছেন স্বামীজী। নিষ্কামভাবে, তাঁর উপাসনা ভেবে এসব কাজ করলেই মুক্তি হয়ে যাবে। আর কি করতেই বা চাও তুমি? তপস্যা করতে চাও—হিমালয়ে যেতে চাও? সেখানে গিয়ে দেখবে, সাধুরা নিজেদের মধ্যে মারামারি করছে একটা রুটির জন্য, একটা কম্বলের জন্য। পাহাড়, জঙ্গলে গিয়ে চোখ বুজলেই কি তিনি এসে যাবেন তোমার সামনে। তার চেয়ে নরেন এই যে ব্যবস্থা করেছে, এর কি তুলনা আছে? শুধু তাঁর কাজ ভেবে, তাঁর সেবা ভেবে কাজ করা। আর তুমি যে-কাজ করছ—বাড়ি তৈরি, বাজার করা, হিসাব রাখা—এসব যে গো আমার কাজ। শুনছ রাসবিহারী, দেখ আমার দিকে চেয়ে।" রাসবিহারী মহারাজ মায়ের দিকে তাকিয়ে দেখেন, সেই বৃদ্ধা সাদামাটা মহিলাটি, যিনি এতক্ষণ কথা বলছিলেন, তাঁর জায়গায় জ্যোতির্ময়ী এক দেবীমূর্তি বসে আছেন। চারদিক জ্যোতির বন্যায় ভেসে যাচ্ছে। রাসবিহারী মহারাজ সেই মূর্তির দিকে আর তাকাতে পারলেন না। ভয়ে বিস্ময়ে দুচোখ ঢাকলেন তিনি। সঙ্গে সঙ্গে শুনলেন সেই চেনা স্বরে মা বলছেনঃ "ওকি রাসবিহারী, কি হলো তোমার, চোখ বন্ধ করলে কেন? দেখ, চেয়ে দেখ।" রাসবিহারী মহারাজ চেয়ে দেখেন, সেই আগেকার মা তার অতিপরিচিত চেহারায় তার সামনে বসে আছেন। মুখে সেই পরিচিত মিষ্টি হাসি।

আমাকে লেখা মায়ের চিঠিগুলি[৫] আমি খুব যত্ন করে রেখেছি। সাধারণ চিঠি, কিন্তু তার মধ্যে মায়ের অসীম ভালবাসা ছত্রে ছত্রে রয়েছে। একটি চিঠিতে মা আমাকে লিখেছিলেনঃ "শ্রীশ্রীঠাকুর যাহা করেন তোমাদের মঙ্গলের জন্য, তবে সত্যপথে থাকিবা।" জীবনে অনেক বিপদ-আপদ এসেছে, অনেক সঙ্কট এসেছে সবসময় মায়ের কথাগুলি স্মরণ রাখার চেষ্টা করেছি, যথাসাধ্য

৫ চন্দ্রমোহন দত্তকে লিখিত শ্রীশ্রীমায়ের কয়েকটি চিঠি আশ্বিন, ১৩৮৪ এবং পৌষ, ১৩৮৪ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছে।—সম্পাদক, উদ্বোধন

পালন করারও চেষ্টা করেছি। আমার বাবার শেষ অসুখের সময় শ্রীমা দেশে ছিলেন। বাবার অসুখের সংবাদ মাকে জানিয়েছিলাম। মায়েরই নির্দেশে আমি বাবাকে দেশ থেকে কলকাতায় আমার বাসায় এনেছিলাম চিকিৎসার জন্য। বাবার ক্যান্সার হয়েছিল। কলকাতার বড় ডাক্তারদের দেখানো হয়েছিল। শরৎ মহারাজের ব্যবস্থাপনায় বাবার মৃত্যু-সংবাদ মাকে জানিয়ে চিঠি দিয়েছিলাম। মা সেই চিঠির উত্তরে লিখেছিলেন (২৫ বৈশাখ ১৩২৬) : "তোমার পত্রে তোমার পিতার মৃত্যুসংবাদ শুনিয়া সুখী হইলাম। কারণ, বৃদ্ধবয়সে তোমার পিতা তোমাদের সকলকে রাখিয়া ৺গঙ্গালাভ করিয়াছেন, সেই জন্য।" বাবার মৃত্যুতে আমি খুব ভেঙে পড়েছিলাম, কিন্তু মায়ের এই চিঠিটি পাবার পর আমার সব দুঃখ-শোক একমুহূর্তে কোথায় চলে গেল।

একবার বন্যায় পদ্মা আমাদের ঘরবাড়ি সব ভাসিয়ে দেয়। কলকাতায় আমার কাছে সে-খবর এসে পৌঁছাল। বাবা-মা-স্ত্রী-পুত্র-কন্যাসহ আমাদের গোটা পরিবার নিরাশ্রয় হয়ে পড়েছে। কি করব, কাকে বলব কিছু ঠিক করতে পারছি না। মায়ের বাড়িতে রোজ কত খরচাপাতি হয় সেতো আমি জানি। অন্নপূর্ণা-মায়ের দাক্ষিণ্যে সেখানে অভাব কিছু নেই জানি; কিন্তু দেখেছি, ভক্তদের দেওয়া দান ও প্রণামীতেই মায়ের সংসার চলে। তাই মা অথবা শরৎ মহারাজ কাউকেই আমার দুর্দৈবের কথা সংকোচে বলতে পারিনি। চিন্তায় চিন্তায় রাত্রে আমার ঘুম নেই, খাওয়া-দাওয়ায় মন নেই। কিন্তু অন্তর্যামিনী মা সব টের পেয়েছেন। একদিন আমাকে ডেকে খুব স্নেহ ও মমতামাখা-কণ্ঠে মা বললেন : "ভাগ্যের ওপরে তো কারো হাত নেই চন্দ্র। তুমি অত ভেঙে পড়ো না। তুমি একবার দেশে গিয়ে ওদের একটা ব্যবস্থা করে দিয়ে এস। অত চিন্তা করে কি হবে? খাওয়া-দাওয়া বন্ধ করেছ কেন?" মায়ের কথায় আমার চোখ ফেটে জল এল। আমি বললাম : "কিন্তু মা, আমি ওখানে গিয়ে কি করব? বাড়ি-ঘর যে সব ভেসে গেছে। ব্যবস্থা একটা করতে তো অনেক টাকার দরকার। তাছাড়া যাওয়া-আসার পয়সাও তো আমার কাছে এখন নেই।" করুণাময়ী মা শান্তভাবে বললেন : "আমি সব জানি। তুমি এই টাকা কয়টা নিয়ে বাড়ি যাও। এটি আমার কাছে ছিল। এতে তোমার পথের খরচ এবং বাড়ি তৈরির খরচ সব হয়ে যাবে। তবে আমি যে তোমায় টাকা দিয়েছি তা কাউকে বলবে না। শুধু বলবে, 'বানে বাড়ি ভেসে গেছে খবর পেয়ে বাড়ি যাচ্ছি'।" কথাগুলি বলে মা তাঁর কাপড়ের আঁচলে বাঁধা একতাড়া টাকা আমার হাতে তুলে দিলেন। মায়ের ভালবাসার পরিচয় এরকমভাবে আমার জীবনে কতবার যে পেয়েছি তার হিসাব নেই। শুধু আমি কেন, আরও কতজনকে মা গোপনে এভাবে স্নেহ ও কৃপা বিতরণ করেছেন তার কিছু কিছু সংবাদ আমরা পরে জেনেছি।

একদিন দেবব্রত মহারাজের (স্বামী প্রজ্ঞানন্দের) সঙ্গে গঙ্গাস্নানে যাচ্ছি। সুধীর মহারাজ (স্বামী শুদ্ধানন্দ) হঠাৎ আমাকে বললেন : "চন্দ্র, তুমি তো মায়ের কাছে সবসময় যেতে পার, মাও তোমাকে খুব স্নেহ করেন। একটা কথা বলব—তুমি মাকে বলতে পারবে?" আমি বললাম : "নিশ্চয়ই, বলুন কি বলতে হবে?" সুধীর মহারাজ বললেন : "বেশি কিছু নয়—শুধু ছোট্ট একটি কথা। মাকে গিয়ে বলতে পারবে—'মা, আমি মুক্তি চাই'?" আমি বললাম : "এক্ষুনি বলে আসছি।" আমি দৌড়ে ওপরে মায়ের ঘরে গেলাম। গিয়ে দেখি মা পুজো করছেন। কতবার তাঁর ঘরে এসেছি, কিন্তু আজ পূজারতা মাকে দেখে আমার ভীষণ ভয় করতে লাগল। আমার সারা শরীর কাঁপতে লাগল। ভাবছি, ঘর থেকে বেরিয়ে আসি, কিন্তু সেই শক্তিও আর শরীরে নেই। পা ঠকঠক করে কাঁপছে, গলা শুকিয়ে কাঠ, আমি ঘামছি। হঠাৎ মা আমার দিকে মুখ ফেরালেন। স্বাভাবিক ভাবেই বললেন : "কিছু বলবে?" আমার গলা দিয়ে কোন কথা বেরুচ্ছে না। মা আবার বললেন : "কিছু বলতে এসেছিলে?" মুখ দিয়ে শুধু আমার অজ্ঞাতসারে বেরিয়ে গেল 'প্রসাদ'। মা আঙুল দিয়ে খাটের নিচে রেকাবীতে রাখা প্রসাদ দেখিয়ে দিলেন। প্রসাদ দেখিয়ে দিয়েই আবার পুজো করতে শুরু করলেন। কাঁপতে কাঁপতে ঘর্মাক্ত কলেবরে প্রসাদ নিয়ে যখন দৌড়ে নিচে নেমে এলাম, দেখলাম

সুধীর মহারাজ আর দেবব্রত মহারাজ খুব আগ্রহের সঙ্গে আমার জন্য অপেক্ষা করছেন। বললেন: "কি চন্দ্র, চেয়েছ তো? মা কি বললেন?" কাঁপতে কাঁপতে যা হয়েছে তা তাঁদের জানালাম। গঙ্গাস্নান করতে যাওয়া আর হলো না। স্বাভাবিক অবস্থায় আসতে সেদিন অনেক সময় লাগে।

আমার জীবনের সবথেকে বড় আক্ষেপ—আমি মায়ের একটি আদেশ পালন করতে পারিনি। আমার প্রথম সন্তান[৬], আমার বড় মেয়ে ইন্দুর (মা তাকে আদর করে 'বড়খুকি' বলে ডাকতেন। আমার ভাই লালমোহনের মেয়ে রানীকে মা ডাকতেন 'ছোটখুকি' বলে।) বিয়ে দিতে নিষেধ করেছিলেন। ইন্দু তখন নিবেদিতা স্কুলে সপ্তম শ্রেণীতে পড়ছে—বয়স ১৫ বছর। আমাদের পালটি কুলীন ঘরে ভাল ছেলে পাওয়া যেতে আমার বাবা, ঠাকুরভাই, বড় দিদি, ছোট ভাই অন্যান্যরা ইন্দুকে পাত্রস্থ করতে বলেন। আমি সবকিছু শ্রীশ্রীমাকে জিজ্ঞাসা করে করতাম। সুতরাং ইন্দুর বিয়ের কথা উঠলে মাকে গিয়ে জিজ্ঞাসা করলাম। মা সোজা বললেন: "চন্দু, বড় খুকির বিয়ে না দিয়ে লেখাপড়া শেখাও। ও যেমন নিবেদিতার স্কুলে পড়ছে তেমনি পড়ুক।" আমি বাড়িতে এসে মায়ের নির্দেশ সবাইকে জানালাম। বাবা এবং অন্যান্য সকলে বললেন: "তা কি করে হয়? মেয়ে বিয়ের যুগ্যি হয়েছে—এখন বিয়ে না দিলে লোকে আমাদের দুষবে। এতবড় আইবুড়ো মেয়েকে স্কুলে পড়ালেই বা লোকে কি বলবে? সমাজ কি বলবে?" আবার মায়ের কাছে গিয়ে এসব কথা জানালাম। মা বললেন: "ওর বিয়ে দিলে ভাল হবে না? ও তো বেশ পড়ছে—পড়ুক না।" বাড়িতে এসে সব জানালাম, কিন্তু তারপরেও মায়ের কথার ওপর ওঁরা গুরুত্ব দিলেন না; বললেন, বিধির বিধান কেউ খণ্ডাতে পারে না, যদি ওর ভাগ্যে কষ্ট থাকে সে আমরা কি করতে পারি? কিন্তু এত ভাল সম্বন্ধ হাতছাড়া হলে পরে পস্তাতে হবে। 'জন্ম-মৃত্যু-বিয়ে তিন বিধাতা নিয়ে।' তুমি আমি কে? প্রজাপতির নির্বন্ধ। মেয়ের কপালে সুখ থাকলে সুখ হবে, দুঃখ থাকলে দুঃখ। কপালে যা আছে তাইতো হবে। নিয়তি কে খণ্ডাবে? মেয়ের ১৫ বছর বয়স হলো, এতদিন বিয়ে না দিয়ে রেখেছ, তাতেই তোমার যথেষ্ট অন্যায় হয়েছে। বিয়ে না দিলে, আইবুড়ো সুন্দরী মেয়ে ঘরে রাখলে একটা কিছু অঘটন ঘটলে তখন কি করবে?" ওদের কথা শুনে আমার সব গুলিয়ে গেল। একদিকে গুরুর নিষেধ, যে-গুরু আমার ইষ্ট—আমার জীবন-মরণের মুক্তির নিঃশ্বাস, অন্যদিকে বাবা কাকা দিদি, দাদা এবং সমাজের লাল চোখ। শেষে ওঁদের চাপের কাছে হার মেনে নিয়তির হাতেই মেয়ের ভাগ্যকে সঁপে দিলাম। এখানেই মস্তবড় ভুল করলাম আমি এবং সেই ভুলের মাশুল আমাকে আজও দিতে হচ্ছে। বিয়ের বছর ছয়েক পরেই আমার মেয়ে বিধবা হয়। দাঁড়িপাল্লার একদিকে গুরুকে বসিয়ে অন্যদিকে সারা বিশ্বসংসার বসালেও তা গুরুর সমান হবে না। আমার গুরু স্বয়ং জগজ্জননী, তিনিই আমার ইষ্ট। তাঁর আদেশ অন্যথা করে আজও তার ফলভোগ করছি। মেয়ে তার চার বছরের কন্যা এবং নয় মাসের পুত্রকে নিয়ে আমার কাছে এসে উঠেছে।

অবশেষে এল ১৯২০ খ্রীষ্টাব্দের সেই ২০ জুলাই। শ্রীমা চিরদিনের জন্য সকলকে কাঁদিয়ে চলে গেলেন রামকৃষ্ণলোকে। ভক্তরা জানেন, শ্রীমায়ের মৃত্যু নেই, অদৃশ্যলোক থেকে তাঁর সন্তানদের তিনি চিরকাল মঙ্গলকামনা করবেন, কিন্তু স্নেহময়ী মাকে যে তাঁরা চর্মচক্ষে আর দেখতে পাবেন না। বাঁধ-ভাঙা বন্যার মতো ভক্তদের গণ্ড বেয়ে অশ্রু ঝরে পড়ছে। মহাসমাধির আগের দিন অতন্দ্র প্রহরীর মতো সারারাত জেগেছিলেন শরৎ মহারাজ। তাঁর সঙ্গে আমরাও ছিলাম, যদি কোন কিছুর প্রয়োজন হয়। সব প্রয়োজনের অবসান হলো। শ্রীমায়ের মরদেহের সঙ্গে আমিও গিয়েছিলাম বেলুড় মঠে। চিতায় যখন অগ্নির লেলিহান শিখা ঊর্ধ্বমুখী, তখন গঙ্গার পূর্বপ্রান্তে মুষলধারে বৃষ্টি। কিন্তু আশ্চর্য! এই প্রান্তে কোন বৃষ্টি নেই। নিভন্ত চিতায় শরৎ মহারাজ প্রথমে এক কলসী জল দিলেন, অমনি থমকে থাকা বৃষ্টির ধারা হুহু করে এসে চিতাকে ভাসিয়ে দিল। শরৎ মহারাজের জল দেওয়াই প্রথম এবং শেষ—দ্বিতীয় আর কেউই চিতায় জল দিতে পারেননি। স্বর্গের দেবতারা বুঝি ঢাললেন ধারা। [ক্রমশঃ]

৬ আসলে দ্বিতীয় সন্তান, প্রথম সন্তান জন্মের কয়েকমাস পরেই মারা যায়। সূত্র: কার্তিকচন্দ্র দত্ত।—সম্পাদক, উদ্বোধন

অতীতের পৃষ্ঠা থেকে

# ঐশ্বর্যময়ী মা

## স্বামী হরিপ্রেমানন্দ

একদিনের ঘটনা বলি। সাল, তারিখ মনে নেই। আর সাল, তারিখের দরকারই বা কী? মায়ের ভাইঝি রাধু অনেকদিন থেকে একটা দুরারোগ্য রোগে ভুগছিল। ভুগতে ভুগতে চেহারা হয়েছে কঙ্কালসার। কথা বলতে পর্যন্ত পারে না, গলা থেকে চিঁচিঁ আওয়াজ বেরোয়। মায়ের বড় দয়া হলো। বললেন: "হরি, চল তো আমার সঙ্গে—মেয়েটাকে নিয়ে বাঁকুড়া যাই। বাঁকুড়ায় বৈকুণ্ঠ আছে, অ্যালোপ্যাথিক এম. বি. ডাক্তার, কিন্তু হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা করে। খুব নাম হয়েছে।" তাঁর কথার মধ্যেই বাধা দিয়ে বললাম: "বৈকুণ্ঠ মানে বৈকুণ্ঠ মহারাজ? স্বামী মহেশ্বরানন্দ?"

"হ্যাঁ, হ্যাঁ। তুই তো বাঁকুড়া শহরে থাকিস। নিশ্চয় চিনিস।"

"হ্যাঁ, খুব চিনি। বাঁকুড়া মঠের অধ্যক্ষ। হোমিওপ্যাথিতে ধন্বন্তরী।"

"হ্যাঁরে। ওঁর কথাই বলছি।"

তা, মা তো এলেন ভাইঝিকে নিয়ে। আমি এলাম ওঁদের সঙ্গে। বাঁকুড়া মঠে তখন ঘরবাড়ি বিশেষ হয়নি। বাইরের লোককে বিশেষ করে মেয়েদের থাকতে দেবার মতো জায়গা মোটেই ছিল না। তাই ফীডার রোডে একটা ছোট ঘর ভাড়া নেওয়া গেল। সেখানেই মায়ের ভাইঝির চিকিৎসা হতে লাগল। ঘরে মাত্র দুটি কামরা। একটিতে থাকে রুগী, আরেকটিতে মা আর আমি। সেদিন সন্ধ্যার পর ডাক্তার মহারাজ রুগী দেখে ফিরে গেছেন। আমাদের কামরায় একটা ছোট টুল ছিল; মা তার ওপর বসে আছেন। আমার কী মনে হলো, মায়ের দুটি পায়ে হাত বুলিয়ে দিতে লাগলাম। শুষ্ক দুখানি পা। মায়ের শরীর তখন জীর্ণশীর্ণ হয়ে গেছে। পায়ে হাত বুলোতে বুলোতে হঠাৎ মনে প্রশ্ন জাগল—মা কি সত্যিই জগজ্জননী? জগজ্জননীর এমনি শিরা-বের-করা পা? প্রশ্নটা মনে উদয় হলেও মুখে কিছুই বলছি না। পায়ে হাত বুলিয়ে যাচ্ছি। ধীরে ধীরে অনুভব করতে লাগলাম, এতো একজন বৃদ্ধার শীর্ণ পা নয়, এক যুবতী নারীর সুপুষ্ট পা। কাছেই একটা হ্যারিকেন জ্বলছে; তার আলোয় স্পষ্ট দেখলাম, আলতা-পরা অপরূপ দুটি চরণ, ঘন-সন্নিবিষ্ট পরিপুষ্ট অঙ্গুলিতে অর্ধচন্দ্রের মতো পদনখের শোভা। দুই চরণে সোনার নূপুর—নূপুরে খচিত রয়েছে মণি-মুক্তা। এ কার পদসেবা করছি আমি।

বিস্ময়ে হতবাক হয়ে চরণ থেকে আমার দৃষ্টি নিবদ্ধ করতে চেষ্টা করলাম মায়ের মুখের ওপর। তাকিয়ে দেখি—স্বর্ণকান্তি, ত্রিনয়না, চতুর্ভুজা, নানা অলঙ্কার-শোভিতা জগদ্ধাত্রী মূর্তি। মাথায় মুকুট, হাতে অস্ত্র। তাঁর সর্বাঙ্গ থেকে বিচ্ছুরিত হচ্ছে অপরূপ জ্যোতি। ভাল করে দেখবার আগেই 'মা' 'মা' বলে চৈতন্য হারালাম। কতক্ষণ যে ঐ অবস্থায় ছিলাম, কে জানে। যখন চেতনা ফিরে এল তখন দেখি, মা আমার পিঠে হাত বুলোতে বুলোতে বলছেন: "ও হরি, ও হরি, কি হলো তোর? ওঠ। ওঠ।"

উঠে বসলাম। দেখলাম, শীর্ণদেহা বৃদ্ধা মা রোগ-যন্ত্রণাকাতর ভাইঝিটির দিকে তাকিয়ে বসে আছেন। এই আমাদের জগজ্জননী, মা সারদামণি, ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণের লীলাসঙ্গিনী। জয় মা। জয় ঠাকুর।* □

* উদ্বোধন, ৮৮তম বর্ষ, ১২শ সংখ্যা, পৌষ, ১৩৯৩, পৃঃ ৭৩৬-৭৩৭

## 'শ্রীশ্রীমায়ের কথা'র আলোচনা

'উদ্বোধন'-এর অগ্রহায়ণ, ১৩৯৯ সংখ্যায় স্বামী গিরিজাত্মানন্দের "আবার এসো" নিবন্ধের শুরুতে সম্পাদকীয় মন্তব্যে বলা হয়েছে : "'মায়ের কথা' প্রকাশ্য সভায় নিয়মিত আলোচনার সূত্রপাত করেন বলরাম মন্দির কর্তৃপক্ষ ১৯৮৭ খ্রীস্টাব্দে।" আমার বেশ মনে আছে, ১৯৪৭ খ্রীস্টাব্দের প্রথমার্ধে (বোধ হয় এপ্রিল / মে মাস হবে।) ঢাকা রামকৃষ্ণ মিশনে স্বামী জ্ঞানাত্মানন্দ সপ্তাহে একদিন 'শ্রীশ্রীমায়ের কথা' পাঠ, ব্যাখ্যা এবং আলোচনার ব্যবস্থা করেন। প্রধানতঃ তা হতো মহিলা ভক্তদের জন্য এবং তা শোনার জন্য যথেষ্ট শ্রোতৃ-সমাগম হতো। যতদূর মনে পড়ে, প্রতি বৃহস্পতিবার ঢাকা আশ্রমে 'মায়ের কথা' পাঠ হতো। শনিবার যুবকদের জন্য স্বামীজীর বই এবং রবিবার 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত' পাঠ ও আলোচনা হতো। দেশভাগের কিছুদিন পর আমরা ঢাকা ছেড়ে চলে আসি। তারপর কতদিন এই পাঠ চলে তা আমার জানা নেই।

**কৃষ্ণা বর্মা**
ইনস্টিটিউট অফ ইকনমিক গ্রোথ,
মালকাগঞ্জ, দিল্লী-১১০০০৭

## সম্পাদকীয় বক্তব্য

শ্রীমতী কৃষ্ণা বর্মা লিখেছেন যে, ঢাকা রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমে ১৯৪৭ খ্রীস্টাব্দের সম্ভবতঃ এপ্রিল/মে মাস থেকে 'শ্রীশ্রীমায়ের কথা'র পাঠ, ব্যাখ্যা ও আলোচনা হতো। এই আলোচনা, শ্রীমতী বর্মা জানিয়েছেন, প্রধানতঃ হতো মহিলা ভক্তদের জন্য। অর্থাৎ এই আলোচনা 'প্রকাশ্য' বা সর্বসাধারণের জন্য উন্মুক্ত ছিল, বলা যাবে না। কিন্তু বলরাম মন্দির কর্তৃপক্ষ ১৯৮৭ খ্রীস্টাব্দ থেকে 'মায়ের কথা'র যে আলোচনার ব্যবস্থা করেছেন সেটি সর্বসাধারণের জন্য উন্মুক্ত, মহিলা-পুরুষ, যুবক-যুবতী সকলেই এই সভায় যোগদান করতে পারে। সুতরাং আমাদের পূর্বে বক্তব্যে ভুল কিছু ছিল না।

**সম্পাদক**
**উদ্বোধন**

## শিকাগো ধর্মমহাসভায় স্বামী বিবেকানন্দের আবির্ভাবের আধ্যাত্মিক তাৎপর্য

আমি 'উদ্বোধন'-এর একজন অনুরাগী পাঠিকা। গত কার্তিক সংখ্যা থেকে ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত ভারতবর্ষের প্রাক্তন প্রধান বিচারপতি শ্রদ্ধেয় অজিতনাথ রায়ের 'শিকাগো ধর্মমহাসভায় স্বামীজীর আবির্ভাবের আধ্যাত্মিক পটভূমি ও তাৎপর্য' আমাকে চমৎকৃত করেছে। শ্রীরায় অপূর্ব-ভাবে স্বামীজীর প্রস্তুতির কথা ও ধীরে ধীরে সম্পূর্ণ 'স্বামীজী' হয়ে গড়ে উঠার কথা লিখেছেন। স্বামীজীর হৃদয়ের গভীর ভাব, তাঁর আধ্যাত্মিকতার নানা স্তর ও অবশেষে অনুভূতির মাধ্যমে বিশ্বগুরু-রূপে তাঁর পরিপূর্ণতার কথা এত সহজ ভাষায় আমাদের বোধগম্য করেছেন যে, 'উদ্বোধন'-এর পাঠক-পাঠিকাদের কাছে তিনি চিরকাল প্রণম্য হয়ে থাকবেন। ব্যক্তিগতভাবে প্রবন্ধটি আমার নিজের এত ভাল লেগেছে যে, আমি অনেককে এটি পড়তে অনুরোধ করেছি। শিকাগোয় স্বামীজীর ভাষণগুলি এর আগেও বহুবার পড়েছি। কিন্তু সেই ভাষণগুলি শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত রায়ের বিশ্লেষণের আলোকে পড়তে গিয়ে আমার কাছে অধিকতর বিশেষত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। সেজন্য প্রথমবারের পর প্রবন্ধের পরবর্তী অংশগুলির জন্য সাগ্রহে অপেক্ষা করেছি।

**আরতি ঘোষ**
হাজরা পাড়া,
চন্দননগর, হুগলী
পিন ৭১২১৩৭

## শ্রীমদ্‌বিদ্যারণ্যবিরচিতঃ

### বঙ্গানুবাদ : স্বামী অলোকানন্দ

[ পূর্বানুবৃত্তি ]

"যথাজাতরূপধরো নির্দ্বন্দ্বো নিষ্পরিগ্রহস্তত্ত্ব ব্রহ্মমার্গে সম্যক্ সম্পন্নঃ শুদ্ধমানসঃ প্রাণসন্ধারণার্থং যথোক্তকালে বিমুক্তো ভৈক্ষ্যমাচরন্নুদরপাত্রেণ লাভালাভৌ সমৌ কৃত্বা শূন্যাগারে দেবতাগৃহতৃণ-কূটবল্মীক-বৃক্ষমূলকুলালশালাগ্নিহোত্রনদীপুলিন-গিরিকুহর-কন্দরকোটরনির্ঝরস্থণ্ডিলেষ্বনিকেতবাস্য-প্রযত্নো-নির্মমঃ শুক্লধ্যানপরায়ণোঽধ্যাত্মনিষ্ঠঃ শুভা-শুভ-কর্মনির্মূলনপরঃ সন্ন্যাসেন দেহত্যাগং করোতি স এব হংসো নাম" ইতি।

**অন্বয়**

যথা জাতরূপধরঃ ( সদ্যোজাত শিশুর ন্যায় ), নির্দ্বন্দ্বঃ ( শীতোষ্ণাদি দ্বন্দ্বরহিত ), নিষ্পরিগ্রহঃ ( পরিগ্রহশূন্য অর্থাৎ সর্ববিধ সম্পত্তিবিহীন ), ব্রহ্মমার্গে ( ব্রহ্মবিষয়ে ), সম্যক্ সম্পন্নঃ ( যথার্থ নিষ্ঠাসম্পন্ন ), শুদ্ধমানসঃ ( শুদ্ধচিত্ত ), প্রাণসন্ধার-নার্থং ( প্রাণরক্ষানিমিত্ত ), যথোক্তকালে (যথাসময়ে), বিমুক্ত ( আসন থেকে উত্থিত হয়ে ), উদরপাত্রেণ ( উদরপাত্র দ্বারা ) ভৈক্ষম্ আচরণ ( ভিক্ষাচর্যা করেন ), লাভালাভৌ ( লাভ ও অলাভকে ), সমৌ কৃত্বা ( সমজ্ঞান করে ), অনিকেত-বাস্যপ্রযত্ন ( গৃহ-বাসের জন্য চেষ্টাশূন্য ), শূন্যাগারে ( শূন্য গৃহে ), দেবতাগৃহ ( দেবমন্দির ), তৃণকূট ( তৃণকুটির ), বল্মীকবৃক্ষমূল ( উইঢিবি ও বৃক্ষমূল ), কুলালশালা ( কুম্ভকারের কর্মশালা ), অগ্নিহোত্র ( যজ্ঞাগার ), নদীপুলিন ( নদীতীর ), গিরিকুহর ( পর্বতগহ্বর ), কন্দর ( কন্দর ), কোটর ( বৃক্ষকোটর ), নির্ঝর ( ঝরনার পাশে ), স্থণ্ডিলেষু ( যজ্ঞবেদির ওপরে ), নির্মমঃ ( দেহাদিতে অনাসক্ত ), শুক্লধ্যানপরায়ণঃ ( শুদ্ধব্রহ্মের ধ্যানে নিরত ), অধ্যাত্মনিষ্ঠঃ ( আত্ম-নিষ্ঠাযুক্ত ), শুভাশুভকর্মনির্মূলনপরঃ ( শুভা-শুভকর্মের নিঃশেষে বিনাশপরায়ণ হয়ে ), সন্ন্যাসেন ( সন্ন্যাস মার্গে ), দেহত্যাগং করোতি ( দেহত্যাগ করেন ), সঃ এব ( তিনিই ), হংসঃ নাম ( পরমহংস নামে বিদিত ), ইতি।

**বঙ্গানুবাদ**

সদ্যোজাত শিশুর মতো, শীতোষ্ণাদি দ্বন্দ্ব-রহিত, পরিগ্রহশূন্য ব্রহ্মবিষয়ে যথার্থ নিষ্ঠাসম্পন্ন, শুদ্ধচিত্ত যে-সাধক প্রাণধারণের জন্য যথাকালে আসন থেকে উত্থিত হয়ে উদরপাত্রে ভিক্ষাচরণ করেন এবং লাভ ও অলাভে সমজ্ঞান করে বাসের জন্য সর্ব-প্রচেষ্টারহিত অর্থাৎ অনির্দিষ্টাশ্রয় হয়ে শূন্যগৃহে, দেবমন্দিরে, তৃণকুটিরে, উইঢিবি অথবা বৃক্ষমূলে, কুম্ভকারের কর্মশালায় অথবা যজ্ঞগৃহে, নদীতটে, পর্বতগহ্বরে, কন্দরে, বৃক্ষকোটরে, ঝরনার পাশে অথবা যজ্ঞশালায় বাস করেন এবং দেহাদিতে অনাসক্ত, শুদ্ধব্রহ্মের ধ্যানে নিরত, আত্মনিষ্ঠাযুক্ত শুভাশুভ কর্মের নিঃশেষে বিনাশপরায়ণ সন্ন্যাস-মার্গে দেহত্যাগ করেন তিনিই পরমহংস নামে বিদিত।

এখানে শ্রুতিবাক্যানুসারে পরমহংস সন্ন্যাসীর লক্ষণ নির্দেশ করা হয়েছে। সদ্যোজাত শিশুর যেরকম দেহ ব্যতীত অন্য কোন আড়ম্বর থাকে না, শীতোষ্ণাদি বিপরীতভাবের জ্ঞান থাকে না সেরকম পরমহংস সন্ন্যাসীকে বাহ্য আকৃতিতে দেহধারিরূপে দেখা গেলেও তাঁর দেহবোধ থাকে না। ফলে স্বভাবতই দেহের সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত শীতোষ্ণাদি দ্বন্দ্বের অনুভূতিও তাঁর থাকে না। প্রারব্ধবশে দেহরক্ষার জন্য ভিক্ষাচর্যায় জীবনধারণ করেন, কিন্তু সেখানে সঞ্চয় থাকে না; তাই উদরপাত্রে ভিক্ষাগ্রহণের কথা বলা হয়েছে। তদুপরি তিনি অনিকেত অর্থাৎ গৃহশূন্য হয়ে থাকেন। স্থায়ী কোন গৃহ রাখেন না। 'সমদর্শী' হওয়ায় এবং দেহসুখ সর্বতোভাবে পরিবর্জিত হওয়ায় প্রাসাদোপম গৃহ, যজ্ঞাগার, কুম্ভকারের কর্মশালা, বৃক্ষমূল, নদীতীর, পর্বতগহ্বর যখন যেখানে খুশি সন্তুষ্টচিত্তে তিনি

অবস্থান করেন এবং সর্বদাই ব্রহ্মধ্যানে নিমগ্ন থাকেন। অবশেষে ব্রহ্মধ্যানেই শরীরকে সাপের খোলসের মতো পরিত্যাগ করে 'যথোদকং শুদ্ধে শুদ্ধমাসিক্তং তাদৃগেব ভবতি' (কঠ, ২।১।১৫) অর্থাৎ শুদ্ধজল যেরকম শুদ্ধজলে একীভূত হয় সেরূপ পরমহংস সন্ন্যাসী ব্রহ্মে লীন হয়ে যান।

স্বামী বিবেকানন্দ চিত্তবিকারহীন এইরকম সন্ন্যাসীর বর্ণনা প্রসঙ্গে কবিতাকারে বলেছেন ঃ

"সুখতরে গৃহ করো না নির্মাণ,
কোন গৃহ তোমা ধরে, হে মহান ?
গৃহছাদ তব অনন্ত আকাশ,
শয়ন তোমার সুবিস্তৃত ঘাস ;
দৈববশে প্রাপ্ত যাহা তুমি হও,
সেই খাদ্যে তুমি পরিতৃপ্ত রও ;
... ... ...
হও তুমি চল-স্রোতস্বতী মতো,
স্বাধীন উন্মুক্ত নিত্য প্রবাহিত।"
(স্বামীজীর বাণী ও রচনা, ৭।৩১০)

দক্ষিণেশ্বরে শ্রীরামকৃষ্ণের নিকট শ্রীমৎ তোতাপুরীর আগমন ও অবস্থিতির কথা শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনীপাঠকমাত্রেরই জানা আছে। ঐ সন্ন্যাসী তোতাপুরীজীর অবস্থা পরমহংস পর্যায়ের ছিল। তিনি বৃক্ষতলে, পবিত্র ধুনির পাশে সারারাত ব্রহ্মধ্যানে নিমগ্ন থাকতেন।

তস্মাদনয়োরুভয়োঃ পরমহংসত্বং সিদ্ধম্। সমানেঽপি পরমহংসত্বে সিদ্ধে বিরুদ্ধধর্মাক্রান্তত্বাদবান্তরভেদোঽপ্যভ্যুপগন্তব্যঃ। বিরুদ্ধধর্মত্বং চারুণ্যুপনিষৎপরমহংসোপনিষদোঃ পর্যালোচনায়ামবগম্যতে।

**অন্বয়**

তস্মাৎ (সেইজন্য), অনয়োঃ উভয়োঃ (বিবিদিষা ও বিদ্বৎ এই উভয় প্রকার সন্ন্যাসের), পরমহংসত্বং (পরমহংসত্ব), সিদ্ধম্ (সিদ্ধ হয়)। পরমহংসত্বে (পরমহংসত্ব), সমানে সিদ্ধে অপি (সমভাবে উভয়ত্র সিদ্ধ হলেও), বিরুদ্ধধর্মাক্রান্তত্বাৎ (পরস্পর বিপরীত স্বভাবত্ব হেতু), অবান্তরভেদঃ অপি (অবান্তরভেদও), অভ্যুপগন্তব্যঃ (অবশ্যস্বীকার্য)। বিরুদ্ধধর্মত্বং (এই উভয় প্রকার সন্ন্যাসের বিরুদ্ধধর্মত্ব), আরুণি উপনিষৎ (আরুণি উপনিষদ্), চ (এবং), পরমহংস উপনিষদোঃ (পরমহংস উপনিষদের), পর্যালোচনায়াম্ (পর্যালোচনাতে), অবগম্যতে (জানা যায়)।

**বঙ্গানুবাদ**

সেহেতু বিবিদিষা ও বিদ্বৎ এই উভয়প্রকার সন্ন্যাসের পরমহংসত্ব সিদ্ধ হয়। পরমহংসত্ব উভয়ত্র সমানভাবে সিদ্ধ হলেও পরস্পর বিপরীত স্বভাব হেতু উভয়ের মধ্যে অবান্তরভেদও অবশ্যস্বীকার্য। উভয়প্রকারের বিরুদ্ধধর্ম আরুণি উপনিষদ্ এবং পরমহংস উপনিষদের পর্যালোচনা থেকে জানা যায়। [ক্রমশঃ]

বিশেষ রচনা

# স্বামী বিবেকানন্দের ভারত-পরিক্রমা ও ধর্মমহাসম্মেলনের

## স্বামী বিমলাত্মানন্দ

[ পূর্বানুবৃত্তি ]

৬ ॥

গুরুভাইদের মায়া-বন্ধন ছেদন করে মীরাট ত্যাগ করে দিল্লীতে এসে উপস্থিত হলেন স্বামী বিবেকানন্দ। হিন্দু-মুসলিম শাসকবর্গের স্মৃতি-বিজড়িত প্রাচীন প্রাসাদ, দুর্গ, সমাধিস্থান প্রভৃতি ঘুরে ঘুরে সন্ধানী চোখ দিয়ে দেখলেন স্বামীজী। ঐতিহাসিক চেতনায় তাঁর মননালোকে উদ্ভাসিত হলো ভারতীয় সভ্যতা, সংস্কৃতি ও কৃষ্টির বিচিত্র ও চিরন্তন রূপ, ভারতের কৃষ্টির সমন্বয়ী ঐতিহ্য। আর সেইসঙ্গে তাঁর অনুভব হলো—কত ক্ষণভঙ্গুর এসব ঐশ্বর্য। মহতো মহীয়ান আত্মাই চিরভাস্বর। স্বামীজী সপ্তাহ দুয়েক ছিলেন দিল্লীতে। প্রথমে শেঠ শ্যামল দাসের বাড়ির দোতলায়, পরে চাঁদনীচকে ডাঃ হেমচন্দ্র সেনের বাড়ির দোতলার একটি ঘরে।[৭৫] গুরুভাইরা মীরাট থেকে দিল্লীতে ঘুরতে ঘুরতে আকস্মিকভাবে স্বামীজীর খোঁজ পেলেন। তাঁদের দেখে স্বামীজী মনে মনে আনন্দিত হলেন; কিন্তু কৃত্রিম রাগ প্রকাশ করে বললেন: "দেখ ভাই, আমি তোমাদের আগেই বলেছি, আমি নিঃসঙ্গ থাকতে চাই। আমি তোমাদের বলেই রেখেছি, আমার অনুসরণ করো না। সেই কথাই আবার বলি—আমি চাই না যে, কেউ আমার সঙ্গে থাকে। আমি এখনই দিল্লী ছেড়ে যাচ্ছি। কেউ যেন আমার অনুসরণে উদ্যত না হয়, কেউ যেন আমাকে খুঁজে বের করতে প্রয়াসী না হয়। আমি চাই যে, তোমরা আমার কথা রাখ। আমি সমস্ত অতীতের সম্বন্ধ ছিন্ন করতে চাই। আমি আপন-মনে ঘুরে বেড়াব—পাহাড়, জঙ্গল, মরুভূমি অথবা নগর—যাই হোক না কেন, যায় আসে না। আমি চললাম। প্রত্যেকে নিজের নিজের বুদ্ধি-বিবেচনা অনুযায়ী সাধনে রত হোক, এই আমি চাই।"[৭৬] গুরুভাইরা স্বামীজীর বাক্য শিরোধার্য করে বললেন: দিল্লীতে স্বামী বিবিদিষানন্দ নামে এক ইংরেজী-জানা সাধুর কথা শুনে তাঁকে দেখতে এসে তোমায় দেখতে পেলাম। এই দেখা একটি আকস্মিক ঘটনামাত্র।

স্বামীজী দিল্লী থেকে একদিন বেরিয়ে পড়লেন। এই সময়ে তিনি অন্তরে অনুভব করেছিলেন, এক অদৃশ্য শক্তি তাঁকে ক্রমাগত নিঃসঙ্গ পরিক্রমার পথে চালিত করছিল; কে যেন তাঁকে আদেশ করছিল- "এই কর"। স্বামীজীও সে-আদেশ নতমস্তকে পালন করে চলছিলেন।[৭৭]

স্বামীজীর পরবর্তী পরিক্রমা রাণা প্রতাপের জন্মভূমি, পদ্মিনীর ভূমি, বীরপ্রসবিনী রাজপুতানা। ১৮৯১ খ্রীস্টাব্দের ফেব্রুয়ারি মাস। স্বামীজী প্রথমে গেলেন আলোয়ারে। আলোয়ারে বাঙালী ডাক্তার গুরুচরণ লস্করের ব্যবস্থায় বাজারে একটি দ্বিতল গৃহে[৭৮] স্বামীজী আশ্রয় পান। সেই গৃহে রোজ আলোচনা-সভা বসত।

৭৫ শেঠ শ্যামল দাসের বাগানবাড়িটি বর্তমানে পুরনো দিল্লীর রোশনারা রোডে। বহু বছর আগে এই বাড়িটি দিল্লী প্রশাসন অধিগ্রহণ করে। প্রথমে এখানে প্রাথমিক বিদ্যালয় ছিল, পরে সরকারি 'মডেল সিনিয়র সেকেন্ডারী স্কুল ফর গার্লস' হয়। বাড়িটি অত্যন্ত জীর্ণদশার জন্য ব্যবহারের অনুপযোগী হয়ে পড়ে। বাগান-বাড়ির ক্যাম্পাসে স্কুলের জন্য কয়েকটি একতলা নতুন বাড়ি হয়েছে। গত ২০ নভেম্বর ১৯৯২ দিল্লীতে স্বামীজীর পদার্পণ উপলক্ষে এই বাড়ির প্রাঙ্গণে স্বামীজীর ভারত-পরিক্রমার শতবর্ষ উদ্‌যাপিত হয়েছে।

৭৬ যুগনায়ক বিবেকানন্দ, ১ম খণ্ড, পৃঃ ৩০১ ৭৭ স্বামী বিবেকানন্দ, ১ম ভাগ, পৃঃ ২২২

৭৮ এই বাড়িটি এখনো আছে। বর্তমানে আলোয়ারের পুরনো শহরের আট্টা মন্দিরের ঠিক বিপরীতে।

হিন্দু-মুসলমান সম্প্রদায়ের বহু ব্যক্তি সে-আলোচনায় অংশগ্রহণ করতেন। উপনিষদ্, পুরাণ, কোরান, বাইবেল থেকে শুরু করে বুদ্ধ, শঙ্কর, রামানুজ, নানক, চৈতন্য, তুলসীদাস, কবীর, রামকৃষ্ণ প্রভৃতি অবতার ও মহাপুরুষগণের জীবন ও ভাবের ব্যাখ্যা করতেন স্বামীজী। কখনো তিনি সুরদাস, চণ্ডীদাস, বিদ্যাপতি প্রভৃতি ভক্ত কবিদের রচিত ভজন গেয়ে শ্রোতৃবৃন্দকে ভক্তিরসে আপ্লুত করে দিতেন। ডাঃ লস্করের বাড়িতে স্থান সংকুলান না হওয়ায় স্থানীয় অনুরাগিবৃন্দ আলোয়ার রাজ্যের অবসরপ্রাপ্ত ইঞ্জিনীয়ার পণ্ডিত শম্ভুনাথজীর বাড়িতে তাঁর অবস্থান ও আলোচনার ব্যবস্থা করলেন।

আলোয়ারে "কত ব্যক্তিই না স্বামীজীর দর্শন, সান্নিধ্য, উপদেশ ও ভাবসঞ্চারে কৃতার্থ হইলেন—কত পণ্ডিত, কত অজ্ঞ, কত বৃদ্ধ, যুবক, বালক, কত বিভিন্ন ধর্মের, বিভিন্ন রুচির, ধনী, দরিদ্র সকলে আসিলেন, সকলে নবজীবনের আস্বাদ পাইলেন। এই সময়ে স্বামীজী বিশেষ ভাগ্যবান কাহাকে কাহাকেও মন্ত্রদীক্ষাও দিয়াছিলেন।"[৭৯]

ক্রমে স্বামীজীর গুণাবলীর কথা পৌঁছে গেল আলোয়ার-রাজের দেওয়ান মেজর রামচন্দ্রজীর কাছে। রামচন্দ্রজী স্বামীজীর সঙ্গে আলাপমাত্রেই বুঝতে পারলেন, স্বামীজী উচ্চকোটির অনুভূতি-সম্পন্ন মহাযোগী। এই মহাত্মাই পারবেন পাশ্চাত্য-ভাবে ভাবিত, রাজকার্যে অমনোযোগী রাজা মঙ্গল সিং-এর মতিগতি পরিবর্তন করতে।

প্রথম পরিচয়ের পর দেওয়ানজী স্বামীজীকে সৎপ্রসঙ্গ আলোচনার জন্য নিজের বাড়িতে নিয়ে এলেন। মহারাজ মঙ্গল সিং তখন শহর থেকে দুই-তিন মাইল দূরে এক নিভৃত প্রাসাদে বাস করছিলেন। দেওয়ানজী মহারাজকে স্বামীজীর কথা জানিয়ে চিঠি দিলেন। রাজা সোজা দেওয়ান রামচন্দ্রজীর বাড়িতে[৮০] এসে স্বামীজীকে দর্শন করলেন। মঙ্গল সিং ছিলেন মূর্তিপূজার বিরোধী। মূর্তিপূজাকে ব্যঙ্গও করতেন তিনি। স্বামীজীর সঙ্গে কিছুক্ষণ আলাপ-আলোচনার পর মহারাজ ব্যঙ্গস্বরে প্রশ্ন করলেন: "আচ্ছা স্বামীজী মহারাজ, এই যে সকলে মূর্তিপূজা করে, আমার ওতে মোটে বিশ্বাস নেই; তা আমার দশা কি হবে?" স্বামীজীর উত্তরের জন্য উপস্থিত পরিষদবর্গ উত্তেজনায় টান-টান। দেওয়ালে টাঙানো রাজার প্রতিকৃতির দিকে দৃষ্টি পড়ল স্বামীজীর। তিনি প্রতিকৃতিকে নামিয়ে আনতে বললেন। স্বামীজী দেওয়ানজী সহ সভাসদবর্গকে অনুরোধ করলেন রাজার প্রতিকৃতির ওপর থুথু ফেলতে। তখন সকলের চোখ ভয়ে ও বিস্ময়ে বিস্ফারিত। সকলেই হতভম্ব। কিংকর্তব্য-বিমূঢ় দেওয়ানজী বলতে বাধ্য হলেন রাজার প্রতিকৃতির ওপর থুথু ফেলা অসম্ভব। কারণ এ যে তাঁদের মহারাজের প্রতিকৃতি। তখন স্বামীজী মৃদু হেসে মহারাজের উপস্থিতিতে দেওয়ানজীকে বললেন: "হলোই বা তা-ই; কিন্তু মহারাজ তো আর সশরীরে এ-ছবির ভিতরে নেই।... তবু আপনারা এর মধ্যে মহারাজের কায়ার ছায়া দেখতে পান।" তারপর স্বামীজী মহারাজের দিকে ফিরে বললেন: "দেখুন মহারাজ, একদিক থেকে যদিও আপনি এ-ছবি নন আর একদিক থেকে কিন্তু আপনি তাই।... এতে আপনার প্রতিবিম্ব আছে; এইটি তাঁদের কাছে আপনাকে মনে করিয়ে দেয়। এর দিকে তাকালেই তাঁরা স্বয়ং আপনাকে দেখতে পান। তাই আপনাকে ব্যক্তিগতভাবে তাঁরা যতটা সম্মান করেন, এই ছবিকেও ঠিক তেমনি সম্মান করেন। যেসব ভক্তেরা পাথর বা ধাতুতে নির্মিত প্রতিমাতে দেবদেবীর পূজা করেন, তাঁদের সম্বন্ধেও ঠিক এই একই কথা খাটে—ভক্তেরা এইজন্য ভগবানকে প্রতিমাতে পূজা করেন যে, ঐ প্রতিমা তাঁদেরকে তাঁদের ইষ্টের কথা বা ইষ্টের ঐশ্বর্য-মহিমার কথা স্মরণ করিয়ে দেয় এবং তাঁদের ধ্যান-

৭৯ যুগনায়ক বিবেকানন্দ, ১ম ভাগ, পৃঃ ৩০৮

৮০ দেওয়ান রামচন্দ্রজীর বাড়ি পুরনো আলোয়ার শহরে হরবক্স মহল্লায় অবস্থিত। দেওয়ানজীর বাড়িটি এখনো আছে; তবে অত্যন্ত জীর্ণদশাগ্রস্ত। বাড়িটির দোতলার একটি ঘরে স্বামীজী থাকতেন। ঐ অংশটি বর্তমানে ব্যবহারের অযোগ্য। দেওয়ানজীর বর্তমান বংশধর হলেন রামচন্দ্রজীর নাতি শ্রীব্রজেন্দ্র বাহাদুর, এখন (১৯৯৩) বয়স ৭৫ বছর।

ধারণার সহায় হয়। তারা তো আর ঐ পাথর বা ধাতুকেই পুজো করে না।··· সকলে শুধু সেই এক অদ্বিতীয় চৈতন্যস্বরূপ পরমাত্মারই পুজো করে থাকে; এবং ভগবানকে যে যেভাবে বুঝে বা যেরূপে চিন্তা করে, তিনিও তাঁর কাছে সেভাবেই দেখা দেন।"[৮১] মঙ্গল সিং স্বামীজীর কাছে কৃপা ভিক্ষা করে বললেন: "স্বামীজী, আপনি এইমাত্র যেভাবে মূর্তিপুজোর ব্যাখ্যা করলেন,··· আমি এ তত্ত্ব জানতাম না; আপনি আমার চোখ খুলে দিলেন।" স্বামীজী বিদায় গ্রহণ করলে অভিভূত মঙ্গল সিং দেওয়ানজীকে বললেন: "এরূপ মহাত্মা আমি আর কখনো দেখিনি; আপনি এঁকে কিছু দিন আপনাদের এখানে ধরে রাখুন না।" দেওয়ানজী স্বামীজীকে মঙ্গল সিং-এর ইচ্ছার কথা জানিয়ে তাঁর আবাসে আতিথ্যগ্রহণ করতে অনুরোধ করলে স্বামীজী একটি শর্তে রাজি হলেন। শর্তটি হলো: ধনী, দরিদ্র, মূর্খ বা পণ্ডিত নির্বিশেষে সকল শ্রেণীর লোককে স্বাধীনভাবে তাঁর কাছে যাতায়াত করতে দিতে হবে। বলা বাহুল্য, দেওয়ানজী ঐ শর্তে সানন্দে রাজি হলেন।[৮২]

আলোয়ারে স্বামীজী ছিলেন প্রায় সাত সপ্তাহ। আলোয়ারবাসীরা এখানে তাঁকে একজন পরিপূর্ণ আচার্যরূপে পেয়েছিলেন। ভাব, ভক্তি ও জ্ঞান —কোনটিরই কমতি নেই। স্বামীজী অকাতরে বিলোচ্ছেন সবাইকে। আলোয়ার-রাজ্যের সেনা-বিভাগের প্রধান করণিক লালা গোবিন্দ সহায় ও জেল-অধীক্ষক হরবক্স ফৌজদার স্বামীজীর দ্বারা গভীরভাবে আকৃষ্ট হয়েছিলেন। গোবিন্দ সহায় স্বামীজীর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেছিলেন।[৮৩] আজমীর ও আবুপাহাড় থেকে স্বামীজী গোবিন্দ সহায়কে তিনটি চিঠি লিখেছিলেন। তার একটিতে (৩০ এপ্রিল ১৮৯১) স্বামীজী লিখেছিলেন: "বৎসগণ ধর্মের রহস্য শুধু মতবাদে নহে, পরন্তু সাধনার মধ্যে নিহিত। সৎ হওয়া এবং সৎ কর্ম করাতেই সমগ্র ধর্ম পর্যবসিত।"[৮৪]

স্বামীজী আলোয়ারের যুবকদের সংস্কৃতশিক্ষা ও ভারত-সাহিত্য সন্ধানের কার্যকারিতা ব্যাখ্যা করে বলেছিলেন: "সংস্কৃত পড় এবং সঙ্গে সঙ্গে পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের চর্চা কর, আর সব জিনিসটা যথাযথভাবে দেখতে বলতে শেখ। পড় আর খাট, যাতে করে আমাদের দেশের ইতিহাসকে বিজ্ঞানসম্মত ভিত্তিতে নূতন করে গড়তে পার।··· এখন বেদ, পুরাণ এবং ভারতের প্রাচীন ইতিবৃত্ত অধ্যয়নের জন্য কি করে ভারতীয় ইতিহাসের গবেষণাক্ষেত্রে আমাদের একটা নিজস্ব স্বাধীন পথ গড়ে তুলতে হবে এবং সেগুলিকে অবলম্বন করে সহানুভূতি-সম্পন্ন অথচ উদ্দীপনাময় ভাষায় এই ভূমির ইতিহাস-সঙ্কলনকে নিজ জীবনের সাধনা-রূপে গ্রহণ করতে হবে—সেসব হচ্ছে আমাদের নিজেদের দায়িত্ব। ভারতের ইতিহাস ভারতীয়গণকেই রচনা করতে হবে। অতএব বিস্মৃতি-সাগর থেকে আমাদের লুপ্ত ও গুপ্ত রত্নরাজি উদ্ধারের জন্য বদ্ধপরিকর হও।··· যতক্ষণ ভারতের গৌরবময় অতীতকে জনমনে পুনরুজ্জীবিত না করতে পাচ্ছ ততক্ষণ তোমরা থেমো না। তাই হবে প্রকৃত জাতীয় শিক্ষা এবং এ-শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে প্রকৃত জাতীয়তাবোধ জেগে উঠবে।"[৮৫]

এইভাবে আলোয়ারের যুবকদের কাছে তিনি ভারত-কল্যাণচিন্তার রূপরেখা উপস্থাপন করে-ছিলেন।

স্বামীজীর চিন্তা কত সুদূরপ্রসারী ও ব্যবহারিক, তা ভাবলে অবাক হতে হয়। তিনি বলেছিলেন: "চরিত্র বজায় রেখে অর্থ উপার্জন করতে কেউ চায় না; এবিষয়টা নিয়ে কেউ ভাবে না, কারুর মনে সমস্যাও ওঠে না। আমাদের শিক্ষার দোষেই এমনটি দাঁড়িয়েছে। যাহোক, আমি তো ভেবেচিন্তে চাষবাস করাটাই ভাল মনে করছি।... নেহাত চাষাড়ে বুদ্ধিতে চাষ নয়, বিদ্বান বুদ্ধিমানের বুদ্ধিতে করতে হবে। পল্লীগ্রামের ছেলেরা দুপাতা ইংরেজী পড়ে শহরে পালিয়ে আসে, গ্রামে হয়তো অনেক জায়গা-জমি আছে, তাতে তাদের পেট ভরে না—মনের তৃপ্তি হয় না; শহুরে

৮১ যুগনায়ক বিবেকানন্দ, ১ম খণ্ড, পৃঃ ৩০৯-৩১১ ৮২ ঐ, পৃঃ ৩১১; স্বামী বিবেকানন্দ, ১ম ভাগ, পৃঃ ২০৫

৮৩ রাজস্থান মেঁ স্বামী বিবেকানন্দ: বিবিদিষানন্দ সে বিবেকানন্দ (হিন্দি)—ঝাবরমল শর্মা, ১ম খণ্ড, ১ম সং, ভীলবারা সংস্কৃতি প্রকাশন, নিউ দিল্লী, ১৯৮৯, পৃঃ ১৪৯-১৫০।

৮৪ বাণী ও রচনা, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃঃ ৩৩৫

৮৫ যুগনায়ক বিবেকানন্দ, ১ম খণ্ড, পৃঃ ৩১২-৩১৩

হতে হবে, চাকরি করতে হবে।... পল্লীগ্রামে বাস করলে পরমায়ু বাড়ে, লেখাপড়া-জানা লোক পল্লীগ্রামে বাস করলে আর চাষবাসটা বিজ্ঞান সাহায্যে করলে উৎপাদন বেশি হয়—চাষাদের চোখ খুলে যায়; তাদেরও একটু আধটু বুদ্ধি খোলে, লেখাপড়া করতে ইচ্ছা হয়, আর যেটা আমাদের দেশে সর্বাপেক্ষা বেশি আবশ্যক তাও হয়।" একজন শিষ্য জিজ্ঞাসা করলেন: "সেটা কি স্বামীজী?" স্বামীজীর উত্তর: "এই ছোট জাত আর বড় জাতের মধ্যে একটা ভাই ভাই ভাবে মেশামেশি হয়। যদি তোমাদের মতো লোকেরা কিছু লেখা-পড়া শিখে পল্লীগ্রামে থেকে চাষবাস করে, আর চাষাদের সঙ্গে আপনার মতো ব্যবহার করে, ঘৃণা না করে, তাহলে দেখবে, তারা এত বশীভূত হয়ে পড়বে যে, তোমার জন্য প্রাণ দিতে প্রস্তুত হবে। যেটা আমাদের এখন অত্যাবশ্যক জনসাধারণকে শিক্ষা দেওয়া, ছোট জাতের মধ্যে ধর্মের উচ্চ উচ্চ ভাব দেওয়া, পরস্পর সহানুভূতি, ভালবাসা, উপকার করতে শেখানো—তাও অতি অল্প আয়াসেই আয়ত্ত হবে।" শিষ্যের আবার প্রশ্ন: "সে কেমন করে হবে?" স্বামীজীর উত্তর: "জ্ঞানপিপাসা সকল মানুষের ভেতরই রয়েছে। তাই না তারা একজন ভদ্রলোক পেলে তাঁকে ঘিরে বসে, আর তাঁর কথা গিলতে থাকে। তাঁরা সেই সুযোগে যদি নিজের বাড়িতে ঐ রকম তাদের সব জড় করে সন্ধ্যার সময় গল্পচ্ছলে শিক্ষা দিতে আরম্ভ করেন, তাহলে রাজনৈতিক আন্দোলন করে হাজার বৎসরে যা না করতে পারা যাবে, তার শতগুণ বেশি ফল দশ বৎসরে হয়ে পড়বে।"[৮৬]

ভারত-পরিক্রমাকালে আলোয়ারে যে-স্বামীজীকে আমরা দেখছি তিনি তখন একজন সাধারণ সন্ন্যাসিমাত্র নন, তাঁর মধ্যে একজন প্রাজ্ঞ দেশনেতারও স্ফুরণ হয়েছে। তিনি তখনই অনুধাবন করতে পেরেছিলেন কৃষিপ্রধান ভারতের বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে চাষ করার প্রয়োজনীয়তা, সর্বস্তরের জনসাধারণের মধ্যে শিক্ষাবিস্তারের উপযোগিতা, গ্রামের উন্নতির কার্যকারিতা। ঐ সময়ে এ-ধরনের ভারত-মঙ্গলচিন্তা কেউ করেছেন বলে আমাদের জানা নেই।

আলোয়ারের অনুরাগী, ভক্তশিষ্যদের নিকট বিদায় নিয়ে স্বামীজী জয়পুরের পথে রওনা হলেন। জয়পুরে আলোয়ারের এক অনুরাগীর, যিনি পথিমধ্যে একটি রেলস্টেশন থেকে স্বামীজীর সঙ্গী হয়েছিলেন, আগ্রহে ও অনুরোধে স্বামীজীর ফটো তোলা হয়। পরিব্রাজক স্বামীজীর এটিই প্রথম আলোকচিত্র।

জয়পুরে স্বামীজী ছিলেন দু-সপ্তাহ। তিনি জয়পুরে ঠিক কোথায় ছিলেন তা আমাদের অজ্ঞাত। তবে জয়পুরের মহারাজার প্রধানমন্ত্রী সংসারচন্দ্র সেনের বাড়িতে তিনি কয়েকদিন ছিলেন। এখানে স্বামীজী তাঁর সুমধুর কণ্ঠে গান গেয়ে প্রবাসী বাঙালীদের হৃদয় জয় করেছিলেন। সংসার সেনের কন্যা জ্যোতির্ময়ী দেবী লিখেছিলেন: "বাড়ির বৈঠকখানা তখন চালাঘরে, সেই ঘরেই স্বামীজী বসেছিলেন।

"মেয়েরা—মা, ঠাকুরমা, পিসিমা, অন্য আত্মীয়ারা, সকলে পাশের একটি ঘরে চিকের আড়ালে বসে ঐ জগদ্‌বিখ্যাত সন্ন্যাসীকে দর্শন করেছিলেন। [তখন অবশ্য স্বামীজী একজন অপরিচিত সন্ন্যাসী] আর শুনেছিলেন কয়েকটি গান।... গিরিশচন্দ্রের 'বুদ্ধদেব-চরিতের' বিখ্যাত গান—

জুড়াইতে চাই কোথায় জুড়াই।
কোথা হতে আসি কোথা ভেসে যাই।...

"কে জানত ভস্মাচ্ছাদিত আগুনের মতো ঐ সন্ন্যাসীর দীপ্তি আর মহিমা? যখন ১৮৯৩ খ্রীস্টাব্দে একমুহূর্তে জগদ্‌বাসী আশ্চর্য হয়ে তাঁর দিকে চাইল, সেদিন বোধহয় ঐ প্রবাসী মানুষগুলি ও অন্তঃপুরবাসিনীরাও পরম বিস্ময়ে তাঁর জয়পুরবাসের ঐ-কদিনের কথা মুগ্ধ হয়ে ভেবেছিলেন। গান আরও দু-তিনটি হয়েছিল—

এলো কৃষ্ণ এলো ওই, বাজলো বাঁশরী।
রাধা-অভিলাষী, 'রাধা' বলে বাঁশি।
বাঁশি ডাকে তোরে, ওঠ লো কিশোরী।...

গাইলেন আর একটি গান—

যাবে কি হে দিন আমার বিফলে চলিয়ে...।"[৮৭]

[ক্রমশঃ]

৮৬ যুগনায়ক বিবেকানন্দ, ১ম খণ্ড, পৃঃ ৩১৫-৩১৬

৮৭ স্মৃতির আলোয় স্বামীজী, পৃঃ ৩০২।

পরিক্রমা

# পঞ্চকেদার ভ্রমণ

## বাণী ভট্টাচার্য

উমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের পঞ্চকেদার ভ্রমণ-কাহিনী পড়ার পর পঞ্চকেদার ভ্রমণের আগ্রহ জেগেছিল। হঠাৎ সেই সুবর্ণ সুযোগ এসে গেল গত সেপ্টেম্বর মাসে।

৩ সেপ্টেম্বর আমরা কয়েকজন হৃষীকেশে পেঁছালাম। জানতাম, এই ভ্রমণে প্রচুর চড়াই-উতরাই, দুর্গম পথ, ঘন জঙ্গল পেরোতে হবে। তবুও হিমালয়ের সবুজ পর্বতশ্রেণী, তুষারাবৃত গিরিশিখর, নীল আকাশ, অজানা ফুলের সমারোহ, ঝরনা প্রভৃতি বারবার হাতছানি দিয়ে ডাকে। ভয় যে একেবারে ছিল না তা নয়, তবে রোমাঞ্চই ছিল বেশি।

মহাভারতের মহাপ্রস্থান পর্বে পঞ্চকেদার বিখ্যাত। কুরুক্ষেত্রের ধর্মযুদ্ধে জয়লাভের পর পাণ্ডবগণ স্বজন-নিধনজনিত পাপবোধে মর্মান্তিক মানসিক পীড়ায় আক্রান্ত হয়ে পাপস্খালনের জন্য মহাদেবের দর্শনের উদ্দেশ্যে হিমালয়-যাত্রা করেন। নারদের কূট পরামর্শে শিব পাণ্ডবদের দর্শন দিতে অনিচ্ছুক হন। মহাদেব কেদারভূমিতে মহিষরূপ ধারণ করলেন। পাণ্ডবগণ ধ্যানযোগে এ-ব্যাপার জানার পর ভাবতে শুরু করলেন, কি করে মহিষরূপী শিবকে আবিষ্কার করবেন। ভীম চিন্তা করলেন, তিনি যদি দুপা ফাঁক করে পথে দাঁড়ান, মহিষরা গৃহে ফিরে যাবার সময় ঐ ফাঁক দিয়ে চলে যাবে, কিন্তু শিবরূপী মহিষ যাবেন না। এই চিন্তানুযায়ী ব্যবস্থাগ্রহণের পর, মহিষরা যখন সব চলে গেল, মহিষরূপী শিব পালিয়ে যাওয়ার উদ্দেশ্যে মেদিনী-মধ্যে প্রবেশের চেষ্টা করতেই ভীম ওঁর পশ্চাদ্ভাগ জাপটে ধরলেন। কেদারনাথে শিবের আকারও তাই মহিষের পশ্চাদ্ভাগ-সদৃশ। কিংবদন্তী, কেদারনাথের প্রথম মন্দিরও পাণ্ডবরাই প্রতিষ্ঠা করেন। ঐ মহিষরূপী শিবের নাভি মদমহেশ্বরে, বাহু তুঙ্গনাথে, মুখ রুদ্রনাথে এবং জটা কল্পনাথে। গাড়োয়ালের মন্দাকিনী ও অলকানন্দার মধ্যবর্তী কেদারখণ্ডে এই পঞ্চকেদার অবস্থিত। পাণ্ডবরা এখানে জপ ও তপস্যা করে দেবাদিদেবকে তুষ্ট করেন এবং পাপমুক্ত হয়ে স্বর্গারোহণ করেন।

আমাদের গন্তব্যস্থল এই পঞ্চকেদার। ৫ সেপ্টেম্বর সকাল সাড়ে পাঁচটার বাসে হৃষীকেশ থেকে রওনা হওয়া গেল গৌরীকুণ্ডের উদ্দেশে। দূরত্ব প্রায় ২১৬ কি. মি.। পাহাড়ী পথে চড়াই-ই বেশি। হৃষীকেশ থেকে দেবপ্রয়াগ (অলকানন্দা ও ভাগীরথীর সঙ্গম) পর্যন্ত গঙ্গা পথের ডানদিকে প্রবাহিত। দেবপ্রয়াগ থেকে রুদ্রপ্রয়াগ (অলকানন্দা ও মন্দাকিনীর সঙ্গম) পর্যন্ত অলকানন্দা পথের সাথী ছিল। এরপর মন্দাকিনীকে ডানদিকে রেখে কেদারের চড়াইয়ের পথে আমাদের যাত্রা।

কয়দিন যাবৎ প্রবল বর্ষণের ফলে রাস্তায় নানা জায়গায় ধস নেমেছে। আঁকাবাঁকা রাস্তা। এক পাশে গভীর খাদ, অপরদিকে আকাশছোঁয়া পর্বতশ্রেণী অতিক্রম করে গৌরীকুণ্ডে পেঁছাতে বিকাল সাড়ে তিনটে বেজে গেল। বৃষ্টি অবিরাম হয়ে চলেছে।

মন্দাকিনীর তীরে গৌরীকুণ্ড (৬৫০০ ফিট) অবস্থিত। আকাশ মেঘাচ্ছন্ন। বৃষ্টিতে আমরা ভিজে গেলাম। একটি হোটেলে রাত্রিবাসের ব্যবস্থা হলো। রাত্রির আহারের পর মন্দাকিনীর গর্জন শুনতে শুনতে আমরা ঘুমিয়ে পড়লাম।

৬ সেপ্টেম্বর। ভোরের আকাশ মেঘাচ্ছন্ন। মন্দাকিনীর অপর তীরের পর্বতশ্রেণী মেঘে ঢাকা। অল্প অল্প বৃষ্টি পড়ছে। সকালে উষ্ণকুণ্ডে স্নান করে কুণ্ডের তীরে অবস্থিত গৌরীদেবীর মন্দিরে পুজো দিলাম। সকাল ৮টায় কেদারের উদ্দেশে যাত্রা শুরু হলো আমাদের।

গৌরীকুণ্ড থেকে ১ কি. মি. দূরে মন্দাকিনীর তীরে চার-পাঁচশ ঘোড়ার আস্তাবল। প্রথমেই দেখা গেল, এই ঘোড়ার মলমূত্রে নদীর জল দূষিত ও অপবিত্র হচ্ছে। পূর্বে এমনটা ছিল না। গঙ্গা পরিশোধনের ব্যবস্থাগ্রহণ সত্ত্বেও প্রায় উৎসেই দূষিত হচ্ছে গঙ্গাবারি।

এখান থেকে কেদারনাথ ১৪ কি. মি.। ঘোড়াতে যাব স্থির হলো। ৭০ টাকা নেবে। ডাণ্ডি ও কাণ্ডিরও ব্যবস্থা রয়েছে। বেশির ভাগ সময় ঘোড়া পথের ধার দিয়ে খাদের দিকে হাঁটতে থাকে। পড়ে যাবার খুব সম্ভাবনা। সহিসকে তাই সাথে সাথে থাকতে হয়। ধীরে ধীরে পায়ে হেঁটে গেলে কষ্ট হয় না। পথ বর্তমানে বেশ চওড়া। তবে ঘোড়ার মলমূত্রে অপরিচ্ছন্ন অবস্থা।

পথ ক্রমশঃ চড়াই। ডানদিকে মন্দাকিনীর নানা রূপ। কখনো উঁচু পাথর ভেদ করে প্রবল গর্জনসহ তার নিম্নে অবতরণ, কখনো পাথরের মধ্যবর্তী সংকীর্ণ স্থান দিয়ে প্রবল গর্জনে ধাবমান। মাঝে মাঝে পাশের পর্বত থেকে নানা আকারের ঝরনার ধারা মন্দাকিনীর ক্রোড়ে আশ্রয় নিচ্ছে। যেন গলিত রূপোর ধারা। মেঘ পর্বতকে আচ্ছাদিত করছে। কখনো বৃষ্টিধারা পথিককে সিক্ত করছে।

বাঁপাশে পাহাড়ের গা ঘেঁসে রাস্তা চলে গেছে। মাঝে মাঝে পথের পাশে সাধুরা বসে আছেন। আপন মনে তাঁরা ধ্যানমগ্ন। পথে অনেক যাত্রী দেখলাম নগ্নপদে বৃষ্টিতে ভিজে হেঁটে চলেছেন। সকলের কণ্ঠে "জয় বাবা কেদারনাথ"। অনেক স্থূলকায়া মহিলা ডাণ্ডিতে যাচ্ছিলেন। চারজন ডাণ্ডিবাহকের অবস্থা দেখে কষ্ট হচ্ছিল।

জঙ্গল চটি ( ৮০০০ ফিট ) ও রামওয়ারা ( ৯০০০ ফিট ) ছাড়িয়ে পথ আরও চড়াই। মন্দির থেকে ১ কি. মি. দূরে দেব-দেখনি ( ১১,০০০ ফিট ) থেকে প্রথম মন্দিরচূড়ার দর্শনলাভ করলাম। শুনলাম, আগে এখান থেকে সবুজ তৃণাচ্ছাদিত, নানা বর্ণের ফুলে শোভিত মালভূমি দেখা যেত। বর্তমানে সেই দৃশ্যের পরিবর্তে বহু হোটেল, ধর্মশালা, বাড়িঘর এবং অপরিচ্ছন্ন ঘোড়ার আস্তাবল দেখা যায়

মন্দাকিনীর ওপর নতুন সেতু হয়েছে। পথও প্রশস্ত হচ্ছে। যাঁরা আগে এই পথে গেছেন তাঁরা বললেন, পূর্বের সেই প্রাকৃতিক সৌন্দর্য এখন অনেকটা ম্লান। বিকাল চারটা নাগাদ কেদারনাথে পেঁছানো গেল। ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘে আমাদের থাকার ব্যবস্থা। বৃষ্টি হচ্ছে। আর্দ্র আবহাওয়া। কনকনে শীত। সন্ধ্যায় রাজবেশে সজ্জিত কেদারনাথজীর আরতি দর্শন হলো। ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘে রাত্রির আহার গ্রহণ করে আমরা বিশ্রাম নিলাম। ঠাণ্ডাতে আমার মাথায় খুব যন্ত্রণা ও বমির ভাব হচ্ছিল।

৭ সেপ্টেম্বর। ভোর হতেই দেখা গেল আকাশ মোটামুটি পরিষ্কার। মন্দিরের পিছনে কেদার শৃঙ্গে (২২, ৭৭০ ফিট ) বরফ পড়েছে। সূর্যের প্রথম কিরণ ঐ শিখরে যেন রূপোর মুকুট পরান। তুষারাবৃত কেদার পর্বতের পাদদেশে এই কেদারনাথ মন্দির। ঐশ্বর্যের সে এক আশ্চর্য রূপ। কেদারনাথের উচ্চতা ১১,৭৫০ ফিট। নৈসর্গিক শোভার মাঝে মন্দাকিনীর তীরে বিরাজ করছেন দেবাদিদেব মহাদেব। উঁচু পর্বতের গা বেয়ে চোরাবালিতাল থেকে উৎপন্ন মন্দাকিনীর ধীরে ধীরে মর্তে আগমন। পাহাড়ের গায়ে গ্লেসিয়ার, শিলাখণ্ডরাশি, সবুজ ঘাস। দুধগঙ্গা, মধুগঙ্গা, স্বর্গদুয়ারী ও সরস্বতী—'স্বর্গের' এই চার নদী এসে মিশেছে মন্দাকিনীতে।

মন্দিরের পিছনে জগদ্গুরু শঙ্করাচার্যের শ্বেত পাথরের আবক্ষমূর্তি। জীবনের অন্তিমলগ্নে কেদারনাথের পূজো সমাপন করে তিনি এখানেই যোগবলে দেহরক্ষা করেন। মন্দিরের চত্বর বেশ উঁচু। চারপাশে অপেক্ষমাণ যাত্রীদের জন্য আবৃত স্থান। সামনের চত্বরে পাথরের বিরাট শিববাহন নন্দী। ডানদিকে গণেশের মূর্তি। এঁদের প্রণাম করে নাটমন্দিরে প্রবেশ করতে হয়। গর্ভমন্দির এই নাটমন্দিরের পরে। দ্বিতীয় প্রবেশদ্বারের ডানদিকে পার্বতী ও বামে লক্ষ্মীর মূর্তি। নাটমন্দিরের মধ্যস্থলে পিতলের ষাঁড়।

গর্ভমন্দিরে মহাদেবের ত্রিভুজাকৃতি প্রস্তর-মূর্তি। একটি ঘিয়ের বাতি অনবরত জ্বলছে—অখণ্ড জ্যোতিঃ। যাত্রীর ভিড় বেশি না থাকাতে খুব ভালভাবে দর্শন হলো। সমতলভূমি থেকে

সংগৃহীত বিল্বপত্র, ঘি, মধু এবং কেদারের ব্রহ্মকমল দিয়ে দ্বাদশ জ্যোতির্লিঙ্গের অন্যতম কেদারনাথকে পূজা, দর্শন, স্পর্শন ও আলিঙ্গন করে হৃদয়ে অপরিসীম আনন্দ অনুভূত হলো। দেবতাকে আলিঙ্গন করার রীতি আর কোথাও নেই, একমাত্র এখানেই রয়েছে। এখানে জাতিভেদ নেই। সকলেই তাঁর সন্তান। সকলের অবারিত দ্বার। কেউ কেউ অনবরত "শিবমহিম্নঃ স্তোত্র" পাঠ করে যাচ্ছেন। শীতের সকালে, দীপের স্তিমিত আলোতে, নিস্তব্ধ মন্দিরে পাষাণদেবতা যেন জীবন্ত হয়ে উঠলেন আমাদের কাছে। মন হুহু করে ওপরে উঠছে। মন থেকে স্বতোৎসারিত হলো এই প্রার্থনা: ভারতের শান্তি হোক। জগতের শান্তি হোক। হে শিব, হে দেবাদিদেব! জগতের সকলের কল্যাণ কর। জগৎকে অকল্যাণ থেকে রক্ষা কর।

এখানে মন্দির-কমিটি রয়েছে। মে থেকে অক্টোবর পর্যন্ত মন্দির খোলা থাকে। এরপর বন্ধ হয়। জুন-জুলাই থেকে অক্টোবর পর্যন্ত বরফ দেখা যায় না। অক্টোবর থেকে বরফ পড়তে শুরু হয়।

মন্দির থেকে দেড় কি. মি. দূরে পাহাড়ের ওপর ভৈরবঘাটি। এখানে ফুলের অপূর্ব সমারোহ। যেন স্বর্গের নন্দনকানন। এখানে কয়েকটি কুণ্ড আছে। উদক, রেতস, রুদ্র, হংস, ঋষি। রেতস কুণ্ডের কাছে দাঁড়িয়ে হাততালি দিয়ে "হর হর, বোম্ বোম্" বলে ধ্বনি দিলে জলে বুদবুদ হয়। এখান থেকে ১৩ কি. মি. দূরে বাসুকিতাল ও চোরাবালিতাল। পথ অত্যন্ত দুর্গম। একমাত্র অ্যাডভেঞ্চার-প্রিয় যাত্রীরা সেখানে যেতে পারেন।

পুজো ও দর্শনের পর বৃষ্টি একটু কমলে দশটা নাগাদ গৌরীকুণ্ডের উদ্দেশে আমাদের যাত্রা শুরু হলো। কেবল উতরাই, সাবধানে পথ চলতে হয়। বিকাল চারটায় আমরা গৌরীকুণ্ডে পৌঁছালাম।

৮ সেপ্টেম্বর। গৌরীকুণ্ডের প্রভাত। নির্মেঘ ঘন নীল আকাশপটে শৃঙ্গগুলির তরঙ্গায়িত প্রান্ত-রেখায় প্রথম সূর্যকিরণকে প্রণাম জানিয়ে মদ-মহেশ্বরের উদ্দেশে যাত্রা শুরু হলো আমাদের। সাড়ে দশটার বাসে আমরা গুপ্তকাশীতে বেলা বারোটায় পৌঁছালাম। বৃষ্টি না হওয়ায় আমাদের মন তখন প্রফুল্ল। জনশ্রুতি, মহাদেব কাশী থেকে পালিয়ে এখানে গুপ্তকাশীর মন্দিরে এসে গুপ্ত হয়েছিলেন পাণ্ডবদের অজ্ঞাতে থাকবেন বলে। শিবের আদেশেই অর্জুন মন্দিরের দুপাশে গঙ্গা ও যমুনাকে আনয়ন করেন।

ছোট মফঃস্বল শহর। মন্দিরে যাবার পথের দুপাশে ধান, রামদানা, সয়াবীনের ক্ষেত রয়েছে। ছোট-বড় হোটেল আছে। এখান থেকে কালীমঠ ১২ কি. মি. দূরে। হেঁটে অথবা বাসে যাওয়া যায়। বিকাল তিনটার সময় বাসে রওনা হয়ে বেলা পাঁচটায় কালীমঠে এসে পৌঁছালাম। গৌরীকুণ্ড থেকেই আমাদের সঙ্গে দুজন কুলী নিয়ে আসা হয়েছিল—গোপাল ও প্রেমবাহাদুর। দৈনিক পঞ্চাশ টাকা দিতে হবে এবং সেই সঙ্গে থাকা ও খাওয়া। কালীমঠে আমাদের রাত্রিবাস। এখান থেকে পদযাত্রা শুরু।

কালীমঠ কালীগঙ্গার তীরে অবস্থিত। চটি, ধর্মশালা, স্কুল, পোস্ট অফিস সব রয়েছে। সরকারি বিদ্যালয়ে অষ্টমশ্রেণী পর্যন্ত পড়ানো হয়। ওখানকার শিক্ষক গোপাল সিং এবং ওঁর স্ত্রী আমাদের ধর্মশালার পাশের ঘরে আছেন। কিভাবে অতিথিসৎকার করবেন তাঁরা ভেবে পাচ্ছিলেন না। যেন কতদিনের পরিচয়। ভদ্রমহিলা আমাদের কালী-মঠে নিয়ে গেলেন। কালীগঙ্গার সেতু অতিক্রম করে মন্দিরে যেতে হয়। নদীর মধ্যে একটি বিরাট শিলাখণ্ড রয়েছে। নাম দৈত্যশিলা। প্রবাদ, দেবী দুর্গা এখানে শুম্ভ-নিশুম্ভকে বধ করেন। পাথরের গায়ে রক্তধারার ন্যায় লাল দাগ আছে। নবরাত্রির সময় ঐ দাগ খুব উজ্জ্বল হয় এবং জলের রঙও নাকি বদলায়। যেন রক্তধারা।

মন্দিরে কোন মূর্তি নেই। একটি গুহার মতো স্থানে জল ভর্তি রয়েছে। ওপরে পিতলের বড় ঢাকনা। চারপাশে চারটি কাঠের থাম। চারদিক খোলা। কথিত আছে, শুম্ভ-নিশুম্ভকে বধ করার পর দেবী এখানে অবস্থান করেন। নবরাত্রির সময় এই গুহা পরিষ্কার করার জন্য গ্রামের কোন ব্যক্তি আদিষ্ট হন।

এখানে মহাকালী, মহালক্ষ্মী ও মহাসরস্বতীর মন্দির আছে। মন্দিরের পূজারী বদ্রীবাবার সাথে আলাপ হলো। আমরা মা কামাখ্যার দেশ থেকে

এসেছি জেনে তাঁর কি আনন্দ। রাত্রিতে রুটি, ডাল ও সবজি দিয়ে আহার করে বিশ্রাম। এখানে ইলেকট্রিক আলোর ব্যবস্থা রয়েছে, কিন্তু আলো নেই।

কালীমঠের চারদিকে পাহাড়। ১০/১২টি পাথরের বাড়ি নিয়ে এই গ্রাম। আশপাশের পাহাড়ে ৬/৭টি ঘর নিয়ে এক-একটি গ্রাম। এখানকার লোকেরা খুবই গরিব।

৯ সেপ্টেম্বর। ৬-১৫ মিঃ হাঁটাপথে আমাদের যাত্রা শুরু হলো মদমহেশ্বরের উদ্দেশে। মদমহেশ্বর মধ্যম কেদার। শিবভূমির যেন মধ্যমণি। পথ ক্রমশঃ চড়াই। ডানদিকে গভীর খাদ। বয়ে চলেছে মদমহেশ্বর গঙ্গা। বাঁদিকে ঘন বনাশ্রিত পর্বতশ্রেণী। ডানদিকে পাহাড়ের গায়ে স্তরে স্তরে আচ্ছাদিত শস্যক্ষেত্র। হাওয়ার ঢেউগুলো সবুজক্ষেতের ওপর দিয়ে স্রোতের মতো গড়িয়ে যাচ্ছে। ৭ কি. মি. চড়াই অতিক্রম করে রাও লেঙ্কে (৫০০০ ফিট) পেঁছালাম। এখানে একটি আয়ুর্বেদিক ঔষধালয় রয়েছে। ডাক্তারবাবু তীর্থযাত্রীদের সেবা করেন। কোন পারিশ্রমিক নেন না। এখানে একটি উচ্চমাধ্যমিক স্কুল রয়েছে। আমার ছোড়দা (বীরেন মজুমদার) ফটো তুলছে দেখে স্কুলের ছেলে-মেয়েরা সকলে ফটো তোলার জন্যে ছোড়দাকে ঘিরে ধরল। ছেলেমেয়েরা দেখতে খুবই সুন্দর। যেন দেবশিশু। আবার আমাদের যাত্রা শুরু—৬ কি. মি দূরে রাঁশুর উদ্দেশে।

পথের দুপাশে পাইন এবং রডোডেনড্রনের বন। সবুজ পর্বতমুখর দৃশ্যমালা। পাইনের 'কোণ' পথে পড়ে রয়েছে—শিলং-এর তুলনায় আকারে বেশ বড়। বড় বড় লোমশ কুকুর পথে শুয়ে আছে। নির্বিকার। মাঝে মাঝে স্থানীয় মেয়েদের দেখা যাচ্ছে গরু নিয়ে, মাথায় ঘাসের বোঝা নিয়ে গৃহাভিমুখে আসছে। কেউ কেউ পিঠে গমের বোঝা নিয়ে জলচাক্কিতে পিষতে যাচ্ছে। বড় ঝরনার ধারে জলচাক্কিত অবস্থিত। পেষাই হয়ে গেলে ১ কে. জি. গম মূল্য হিসাবে সেখানে দিতে হয়।

৬ কি. মি. চড়াই পথ চলার পর রাঁশুতে (৬৫০০ ফিট) পেঁছালাম। ছোট গ্রাম। চতুর্দিকে সবুজ শস্যক্ষেত্র। এখানে একটি মন্দির রয়েছে। প্রধান বিগ্রহ—রাকেশ্বরী দেবীর। তাই থেকে গ্রামের নাম 'রাঁশু'। মন্দিরের অভ্যন্তরে সারাক্ষণই ধুনি জ্বলছে। গ্রামে একটা স্কুল আছে। তৃতীয়বার কেদার-ভ্রমণের আগে হিমালয়-প্রেমিক ছোড়দার পরিচিত জনানন্দ পুজারীর বাড়িতে আমাদের দুপুরের আহারের ব্যবস্থা করা হয়েছে। পুজারী জনানন্দজী তখন কয়েক মাস হলো হঠাৎ প্রয়াত হয়েছেন। তাঁর প্রৌঢ়া স্ত্রী এবং তাঁর পুত্রবধূরা আমাদের গরম খিচুড়ি, বাড়িতে তৈরি ঘি ও কাঁচ 'কাঁকরি' খেতে দিলেন। আমার ছোড়দাকে দেখে প্রৌঢ়া মহিলা এমন ব্যবহার করলেন যেন বহুদিন বাদে বিদেশ থেকে তাঁর ছেলে ফিরে এসেছে। এশুধু হিমালয়েই সম্ভব। পুত্রবধূরা দেখতে অতি সুন্দরী, কিন্তু ওদের হাতের অবস্থা দেখে দুঃখ হয়। ঘাস কাটা, ধান ভাঙা গৃহের যাবতীয় কাজ মেয়েরা করে। ফলে কচি কচি হাতের ঐ অবস্থা। গাড়োয়ালে একটি জিনিস লক্ষ্য করলাম, সংসারের যাবতীয় কাজ মেয়েরাই করে। ছেলেরা ভেড়ার লোম থেকে উল তৈরি করা, দোকানে চা বানানো ইত্যাদি হাল্কা কাজ করে।

বেলা ৫টায় গোণ্ডারের উদ্দেশে রওনা হওয়া গেল। পথ সামান্য উতরাই। ঘন জঙ্গল। পথে ছোট ছোট ঝরনা। সন্ধ্যা হয়ে আসছে। সন্ধ্যা হলে এসব পথে ভালুকের ভয় থাকে। চলতে চলতে হঠাৎ এক জায়গায় দেখা গেল—ঝরনার ওপরের সেতুটি বোল্ডার পড়ে ভেঙে রয়েছে। আমি খুব ভয় পেলাম। ছোড়দার সাহায্যে অতিকষ্টে ঐ ঝরনা অতিক্রম করলাম। প্রায় সাড়ে সাতটার সময় গোণ্ডার গ্রামে পেঁছালাম। এই গ্রামে (৫৫৪০ ফিট) ঝরনার ধারে মাত্র কয়েকটি বাড়ি। ধর্মশালা আছে। শ্লেটপাথরে তৈরি বাড়ির ছাদ। ছোট পাঠশালাও আছে। স্যানিটারী পায়খানা ও জলের ট্যাংক রয়েছে ধর্মশালার কাছে। আলোর ব্যবস্থা নেই। রুটি ও ডাল দিয়ে রাত্রির আহারের পর ঘুমের চেষ্টা করলাম বটে, কিন্তু বিছানার উৎকট গন্ধ ও পিশুর (একরম পাহাড়ী পোকা) কামড়ে ঘুম আর আসতে চায় না।

[ক্রমশঃ]

## বিজ্ঞান-নিবন্ধ

# স্মৃতিশক্তি ও স্নায়ুতন্ত্র

বাণী মার্জিত

স্বামীজীর জীবনের তিনটি ঘটনা এখানে প্রথমে উদ্ধৃত করছি :

"স্বামীজী একদিন হাস্যরসময় 'পিকউইক পেপার্স' হইতে অনর্গল কয়েক পৃষ্ঠা মুখস্থ বলিয়া গেলে হরিপদবাবু ভাবিলেন, সন্ন্যাসী হইয়াও ইনি এই সামাজিক গ্রন্থ এত কষ্ট করিয়া বারবার পড়িয়া মুখস্থ করিতে গেলেন কেন? জিজ্ঞাসা করায় স্বামীজী বলিলেন: 'দুইবার পড়িয়াছি—একবার স্কুলে পড়িবার সময়, ও আজ পাঁচ-ছয়মাস হইল আর একবার।' পুনর্বার জিজ্ঞাসিত হইয়া তিনি বুঝাইয়া দিলেন যে, একাগ্রতা ও ব্রহ্মচর্যের ফলে এইরূপ স্মৃতিশক্তি সম্ভব হয়।"

"অধ্যাপক একসময়ে দেখিলেন, স্বামীজী একখানি কাব্যগ্রন্থ লইয়া উহার পাতা উল্টাইয়া যাইতেছেন। তাঁহাকে সম্বোধন করিয়াও কোন প্রত্যুত্তর পাওয়া গেল না। পরে স্বামীজী ইহা জানিতে পারিয়া বলিলেন, পাঠে নিবিষ্ট থাকায় তিনি তাঁহার কথা শুনিতে পান নাই। ইহাতে অধ্যাপকের হয়তো প্রত্যয় হয় নাই; কিন্তু পরে যখন কথাপ্রসঙ্গে স্বামীজী ঐ গ্রন্থের উদ্ধৃতি দিয়া উহার ব্যাখ্যা করিতে থাকিলেন তখন অধ্যাপক অতিমাত্র আশ্চর্যান্বিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, এইরূপ স্মৃতিশক্তি তিনি কিরূপে পাইলেন। উত্তরে স্বামীজী মনঃসংযম ও একাগ্রতার কথা তুলিলেন। ব্রহ্মচর্যপালন ঠিক ঠিক করিতে পারিলে সমস্ত বিদ্যা মুহূর্তে আয়ত্ত হইয়া যায়—শ্রুতিধর, স্মৃতিধর হয়।"

"মঠে নূতন Encyclopaedia Britannica (এনসাইক্লোপেডিয়া ব্রিটানিকা) ক্রয় করিবার পর এক শিষ্য স্বামীজীকে বলিল: 'এত বই এক জীবনে পড়া দুর্ঘট।' শিষ্য তখন জানে না যে, স্বামীজী ঐ বইগুলির দশখণ্ড ইতোমধ্যে পড়িয়া শেষ করিয়া একাদশ খণ্ডখানি পড়িতে আরম্ভ করিয়াছেন। তাই স্বামীজী তাহাকে ঐ সকল পুস্তক হইতে প্রশ্ন করিতে বলিলে শিষ্য কঠিন কঠিন বিষয়সকল জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল এবং স্বামীজী স্থানে স্থানে পুস্তকের ভাষা উদ্ধৃত করিয়া পুস্তকে নিবদ্ধ মর্ম বলিলেন। স্বামীজীর অসাধারণ ধী ও স্মৃতিশক্তি দেখিয়া শিষ্য অবাক হইয়া বলিল: 'ইহা মানুষের শক্তি নয়'।"

উপরি-উক্ত ঘটনাগুলি থেকে আমরা দেখতে পাই যে, স্মৃতিশক্তির সঙ্গে ব্রহ্মচর্য, একাগ্রতা ও মনঃসংযম-এর পারস্পরিক সম্পর্ক আছে।

স্বামীজী বলেছেন: "যদি মনকে কোন কেন্দ্রে বারো সেকেণ্ড স্থির করা যায় তাহাতে একটি ধারণা হইবে; এইরূপ বারোটি ধারণা হইলে একটি ধ্যান এবং এই ধ্যান দ্বাদশ গুণ হইলে একটি সমাধি হইবে।"

নানান অভিজ্ঞতার ফলে মনের মধ্যে আমাদের একটা ছাপ পড়ে এবং যার কিছু কিছু বিবরণ মস্তিষ্কে থেকে যায়। পরে আবার প্রয়োজনের সময় সেগুলো মনে করতে পারি। এরই নাম স্মৃতিশক্তি। অভিজ্ঞতা ও একাগ্রতার সাহায্যে আমরা স্মৃতিশক্তির ক্ষমতা বাড়াতে পারি।

আমরা একটা বই পড়লাম বা কোন দৃশ্য দেখলাম, কিন্তু খুব মনোযোগ দিয়ে ঐ পড়া বা দেখার কাজটি না করলে কিছুদিন পরে আমরা সেটা ভুলে যাই। অথবা এটাও হতে পারে যে, যেটা পড়লাম বা দেখলাম সেটা কিছু কিছু মনে থাকলেও পরে কিন্তু যখন আবার সেটা প্রকাশ করছি তখন আমাদের অজান্তেই কিছু কিছু তথ্যগত পরিবর্তন হয়ে গেছে। হুবহু একরকম না হয়ে তার মধ্যে কিছু কিছু পার্থক্য দেখা যায়। যেমন, বিস্তারিত কোন ঘটনার খুঁটিনাটি বাদ গিয়ে

কিছুটা হয়তো সংক্ষিপ্ত হয়ে গেছে অথবা সেটি অতিরঞ্জিত হয়ে অনেকটাই বদলে গেছে। তার মানে এই নয় যে, আমরা ঘটনাটি ভুলে গেছি বা মস্তিষ্কে ঠিকমত ছাপ পড়েনি। আবার স্বামীজীর ক্ষেত্রে আমরা প্রতিবারই লক্ষ্য করেছি, তিনি যা পড়েছেন হুবহু তা মনে রেখে উদ্ধৃত করতে পেরেছেন। এর ব্যাখ্যা করতে হলে মানবদেহের গঠনে সম্বন্ধে কিছু আলোচনার প্রয়োজন।

আমাদের মস্তিষ্কে স্নায়ুকোষের (Nerve Cell) সংখ্যা দশকোটি (১০$^{৮}$)। এই সংখ্যা মানবজীবনে জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত অপরিবর্তিত থাকে। কোন ঘটনাকে মস্তিষ্ক এক সেকেন্ডের দশভাগের একভাগ সময়ে ধরতে পারে। ঐ একই সময়ে মস্তিষ্ক স্নায়ুকোষের সাহায্যে হাজার একক (1000 units) খবর গ্রহণ করতে সক্ষম। ব্যাপারটা অনেকটা এইরকম—একটি সংঘর্ষের ঘটনা দেখে বাড়ি ফিরেই ঘটনাটি বর্ণনা করার সময় বিস্তারিত বিবরণ আমরা দিতে পারি। কারণ, ঘটনাটি মুহূর্তের মধ্যে ঘটলেও তার আনুষঙ্গিক ব্যাপার আমাদের মস্তিষ্ক ঐ একই সময়ে গ্রহণ করে নিয়েছে, তাই বলা সম্ভব হয়। হিসাব করে দেখা গিয়েছে, একজন সত্তর বছর বয়স্ক মানুষের (ঘুমন্ত অবস্থা বাদ দিয়ে, কারণ ঘুমের সময় বাইরের স্নায়ুপ্রবাহ ধীরগতিসম্পন্ন হয়) মস্তিষ্ক পনেরশো পরার্ধ বা পনেরো হাজার কোটি (১৫×১০$^{১০}$) সংখ্যক খবর গ্রহণ করতে পারে। এই সংখ্যা আমাদের স্নায়ুকোষের তুলনায় বেশ কয়েক হাজার গুণ বেশি। তাহলে কিভাবে আমাদের স্নায়ুকোষ এটির সমন্বয় করে তা দেখা যাক।

দেহের পেশী সঞ্চালন করার সময় যেমন মাংসপেশী স্ফীত হয় তেমনি স্নায়ুতন্তুর মধ্য দিয়ে যখন স্নায়ুপ্রবাহ যায় তখন স্নায়ুতন্তুর (Nerve-fibre) প্রান্তভাগ সামান্য ফুলে ওঠে। একটি স্নায়ুকোষ থেকে অপর কোষে স্নায়ুপ্রবাহ চলাচল করার জন্য দুটি কোষ পরস্পরের খুব কাছাকাছি আসে; এই সংস্পর্শ অংশকে সাইন্যাপ্স (Synapse) বলে। প্রত্যেক মানুষের দেহকোষের নিজস্ব রাসায়নিক গঠন আছে। স্নায়ুপ্রবাহ কোন স্নায়ুকোষে প্রবেশ করলে সেখানে প্রোটিন-অণুর কিছু রাসায়নিক পরিবর্তন হয়। এই রাসায়নিক পরিবর্তন স্নায়ুকোষের যেকোন স্থানেই হতে পারে, তবে সবচেয়ে বেশি হয় সাইন্যাপ্স অংশে। এই অংশে স্নায়ুতন্তুর প্রান্তদেশ বেলুনের মতো ফুলে থাকে, একে এন্ড বাল্ব (End bulb) বলে এবং এই স্ফীত অংশ থেকে অত্যন্ত ছোট ছোট আঙুলের মতো কতকগুলো উদ্গত অংশ (Boutons en-passage) তৈরি হয়। তুলনামূলকভাবে আমাদের বাহুকে স্নায়ুতন্তু, হাতের পাতাকে—স্ফীত অংশ এবং হাতের আঙুলগুলিকে—উদ্গত অংশের সঙ্গে তুলনা করলে বুঝবার সুবিধা হয়। একটি স্নায়ুকোষ তার দেহের বিভিন্ন অংশে বিভিন্ন কোষের ৫৫০০টি স্ফীত অংশের সংস্পর্শে এসে সাইন্যাপ্স তৈরি করতে পারে। আমাদের মস্তিষ্কে এইরূপ সংস্পর্শের সংখ্যা ১০$^{১৪}$ টি। স্নায়ুতন্তুর স্ফীত অংশে কিছু রাসায়নিক পদার্থ, নিউরোট্রান্সমিটার (Neurotransmitter) থাকে। সাইন্যাপ্স অংশে বাইরের উত্তেজনার ফলে ঐ রাসায়নিক পদার্থ নির্গত হয় ও কিছু পরিবর্তন (reaction) হয়। এই পরিবর্তন হতে সাধারণতঃ ০·৫ সেকেন্ড সময় লাগে। স্নায়ুতন্তু মারফত মস্তিষ্কে সংবাদপ্রবাহ গিয়ে তা প্রতিষ্ঠিত হতে কিছুটা সময় লাগে। বাইরের উত্তেজনায় সাড়া দিতে দেরি হলে বুঝতে হবে, সাইন্যাপ্স অংশে কিছু গোলমাল হয়েছে, যা কিনা রাসায়নিক পরিবর্তনকে বিলম্বিত করছে। এই পরিবর্তন আমাদের দেহের অটোনমিক স্নায়ুতন্ত্র[১] (Autonomic Nervous System) দ্বারা পরিচালিত। এই পরিবর্তনের চরিত্র অনুযায়ী স্মৃতিশক্তির স্থায়িত্ব নির্ভর করে অর্থাৎ স্মৃতিশক্তি

১ আমাদের দেহে স্নায়ুতন্ত্র (nervous system) দুইভাগে বিভক্ত: সেন্ট্রাল নার্ভাস সিস্টেম (যা প্রধানতঃ শরীরের মাংসপেশীকে পরিচালিত করে) এবং অটোনমিক নার্ভাস সিস্টেম (যা প্রধানতঃ হৃৎপিন্ড, ফুসফুস, পাকস্থলী, অন্ত্র প্রভৃতিকে পরিচালিত করে)।—সম্পাদক, উদ্বোধন

ক্ষণস্থায়ী না দীর্ঘস্থায়ী হবে তা নির্ণয় করা যায়। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়—দুধের রাসায়নিক গঠনকে জল, তাপ বা অম্ল ইত্যাদির মিশ্রণের সাহায্যে পরিবর্তন ঘটিয়ে খুব পাতলা দুধ, ক্ষীর, ছানা বা দই করতে পারি। স্নায়ুপ্রবাহের (Nerve impulse) প্রকার ও স্থায়িত্বের প্রভাবে স্মৃতিশক্তিরও তেমনি পরিবর্তন ঘটিয়ে ক্ষণস্থায়ী বা দীর্ঘস্থায়ী করা যায়। দুধকে না ফুটিয়ে রেখে দিলে খারাপ হয়ে যায় (ক্ষণস্থায়ী) আবার ক্ষীর করলে তা দীর্ঘস্থায়ী হয়।

এই প্রসঙ্গে একটি ঘটনা মনে পড়ে। "একবার ললিতমোহন চট্টোপাধ্যায় (শ্রীশ্রীমায়ের একনিষ্ঠ ভক্ত) শ্রীমাকে গড়ের মাঠে সার্কাস দেখাতে নিয়ে যান। অনেক রাত্রি হওয়ায় কোন ঘোড়ার গাড়ি পাওয়া না যাওয়ায় ললিতবাবু একখানা ট্যাক্সি ভাড়া করিয়া আনিলেন। কিন্তু মা ট্যাক্সিতে যাইতে কিছুতেই রাজি হইলেন না। কারণ একবার এক জায়গায় যাইবার সময় মায়ের ট্যাক্সির নিচে একটি কুকুর চাপা পড়িয়াছিল। সেইদিন হইতে মা আর ট্যাক্সিতে উঠেন নাই। ট্যাক্সির কথা হইলেই মায়ের ঐ দিনটির কথা মনে পড়িত। অর্থাৎ ঘটনাটি মুহূর্তমধ্যে ঘটিলেও সেটি মায়ের মস্তিষ্কে দীর্ঘস্থায়ী স্মৃতিশক্তি হিসাবে দাগ কাটিয়াছিল।

অনেক সময় স্নায়ুতন্ত্রের প্রচ্ছন্ন কর্মশক্তির (Potential energy) কিছু পরিবর্তন হওয়ার ফলে এর কর্মক্ষম অবস্থাটি দীর্ঘস্থায়ী হয়। আমরা জানি, একই কাজ বা ঘটনার পুনরাবৃত্তি স্মৃতিশক্তি বাড়াতে সাহায্য করে। একই জায়গা দিয়ে জলস্রোত প্রবাহিত হতে হতে সে-জায়গাটি যেমন গভীর হয়ে যায় তেমনি আমাদের মস্তিষ্কেও একই স্পন্দন বা আবেগপ্রবাহ বারবার একই পথে যদি প্রবাহিত হয় তাহলে সেখানে একটি স্থায়ী পদার্থগত পরিবর্তন হয়। এজন্য বারংবার দেখা কোন ঘটনা আমরা অনেকদিন পরেও স্মৃতি থেকে উদ্ধার করতে পারি। একাগ্রভাবে কোন কিছু পড়লে বা কিছু দেখলেও ঐরকম স্থায়ী পরিবর্তন সম্ভব।

কোন ব্যক্তি তার জীবদ্দশায় যত সংখ্যক সংবাদ স্মৃতিতে গ্রহণ করতে পারে, তার সঙ্গে এই স্ফীত অংশের সংখ্যার কোন সম্বন্ধ নেই। একটি 'স্মৃতি' আমাদের মস্তিষ্কে এসে কোন একটি স্নায়ুকোষে জায়গা করে বরাবরের জন্য যদি থেকে যায় তাহলে একসময় মস্তিষ্কে জায়গার অভাব হয়ে যাবে। কলকাতার রাস্তার মতো যানজট সৃষ্টি হবে। যদি প্রত্যেক স্মৃতির জন্য আলাদা আলাদা নির্দিষ্ট স্থান থাকত তাহলে চিকিৎসার ব্যাপারটা অবশ্য অনেক সহজ হয়ে যেত। প্রয়োজনমত বিশেষ বিশেষ স্থানকে উত্তেজিত করে স্মৃতিশক্তি ফিরিয়ে আনা যেত। মোটামুটিভাবে আমরা জানি, মস্তিষ্কের দুইপাশের অংশ—টেম্পোরেল লোব (Temporal lobe) স্মৃতিশক্তির জন্য নির্দিষ্ট এবং এই কারণেই মানসিক রোগীর চিকিৎসার সময় মাথার দুই পাশে তড়িৎপ্রবাহ (Electric shock) দেওয়া হয়

ক্ষণস্থায়ী স্মৃতিশক্তিকে তড়িৎপ্রবাহের সাহায্যে পরিবর্তন করা গেলেও দীর্ঘস্থায়ী স্মৃতিশক্তি পরিবর্তিত হয় না। মানসিক রোগীর ক্ষেত্রে স্নায়ুতন্তুর উদ্গত অংশগুলি অসংলগ্নভাবে সাইন্যাপ্সে থাকে, ফলে রাসায়নিক পরিবর্তনও অসংলগ্ন হয়। এসব ক্ষেত্রে ঔষধ অথবা তড়িৎপ্রবাহ দিয়ে বিশৃঙ্খল সংস্পর্শকে বিচ্ছিন্ন করে স্নায়ুকোষকে সুস্থ করে দেওয়া হয়। যদিও এসময় এধরনের ব্যক্তির স্মৃতিশক্তি প্রাথমিকভাবে দুর্বল থাকে কিন্তু দেখা যায়, তার পূর্বস্মৃতি (দীর্ঘস্থায়ী স্মৃতিশক্তি) অক্ষুণ্ণ থাকে।

একাগ্রতা ও ধ্যানের সাহায্যে আমরা স্নায়ুতন্ত্রকে আয়ত্ত করতে পারি। পূর্ববর্ণিত ঘটনাগুলিতে শ্রীশ্রীমা বা স্বামী বিবেকানন্দের স্মৃতিশক্তির যে-বিবরণ আমরা পেয়েছি তার কারণ হিসাবে বলা যায়, তাঁরা মনঃসংযম, একাগ্রতা, ব্রহ্মচর্য ও ধ্যানের সাহায্যে স্নায়ুতন্ত্রকে হাই ভোল্টেজ কারেন্ট (High voltage current)-এর মতো সজাগ করে রেখেছেন যা অতি অল্প সময়েই স্মৃতিশক্তিকে জাগিয়ে দিতে সক্ষম হয়। □

## গ্রন্থ-পরিচয়

# 'কথামৃত'-চর্চায় নতুন সংযোজন

**স্বামী পূর্ণাত্মানন্দ**

দিব্যামৃতবর্ষী কথামৃত : অহিভূষণ বসু। প্রকাশক : প্রশান্ত তালুকদার। মৌসুমী সাহিত্য মন্দির, ১৫বি টেমার লেন, কলকাতা-৭০০ ০০৯। পৃষ্ঠা : ২১২+১৬। মূল্য : তিরিশ টাকা।

বেলুড় মঠের ঐতিহ্যে একটি কথা প্রচলিত আছে। স্বামী ব্রহ্মানন্দ একদিন তাঁর পদপ্রান্তে উপবিষ্ট উপদেশপ্রার্থী সাধু-ব্রহ্মচারীদের বলেছিলেন : "আমি তোমাদের এককথায় ব্রহ্মজ্ঞানলাভের পথ বলে দিতে পারি। প্রতিদিন 'কথামৃত' পড়। যদি বারো বছর নিরবচ্ছিন্নভাবে প্রতিদিন 'কথামৃত' পাঠ কর, তোমরা ব্রহ্মজ্ঞানলাভ করবে।"

'কথামৃত' এযুগের মহাগ্রন্থ। কাজী নজরুল ইসলাম বলেছেন : "তব কথামৃত কলির নববেদ, একাধারে ভাগবত ও গীতা।" গীতাকে যেমন বলা হয় 'সর্বশাস্ত্রময়ী', 'সর্বশাস্ত্রসার', তেমনি শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃতকেও এযুগের ঋষিরা, প্রাজ্ঞজনেরা বলছেন—সর্বশাস্ত্রময়ী, সর্বশাস্ত্রসার।

সমগ্র 'কথামৃত'-এর প্রথম পৃষ্ঠা থেকে শেষ পৃষ্ঠা পর্যন্ত একটি বাণীই বারবার পাঠকের কানে বাজে—"ঈশ্বরলাভই মানবজীবনের উদ্দেশ্য"। শ্রীরামকৃষ্ণ এমনই একটি যুগে আবির্ভূত হয়েছিলেন যখন ভারতবর্ষের অনেক শিক্ষিত মানুষ পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রভাবে, পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের প্রচারে ঈশ্বরের অস্তিত্বে অবিশ্বাসী হয়ে উঠেছিলেন। নিজেদের অবিশ্বাসকে তাঁরা বিস্তৃত করে দিচ্ছিলেন অপর সকলের কাছে। আবার একদল শিক্ষিত মানুষ তারস্বরে প্রচার করছিলেন হিন্দুধর্ম একটি নিকৃষ্ট ধর্ম—এই ধর্মে কোন সুসংবদ্ধ দর্শন নেই, এই ধর্ম মানুষের বাঞ্ছিত বিকাশকে পদে পদে বাধাদান করে, এই ধর্ম যাবতীয় কুসংস্কার ও সংকীর্ণতাকে প্রশ্রয় দেয়। তাঁরা ঐসঙ্গে প্রচার করেছিলেন খ্রীস্টধর্মের মহিমার কথা, এমনকি আহ্বান জানাচ্ছিলেন খ্রীস্টধর্ম গ্রহণের জন্যও।

যুগের এই অবিশ্বাস এবং অশ্রদ্ধার উত্তর হিসাবে আবির্ভূত হয়েছিলেন যুগাবতার শ্রীরামকৃষ্ণ।

'দিব্যামৃতবর্ষী কথামৃত' গ্রন্থটিতে অহিভূষণ বসু বিভিন্ন দিক থেকে 'কথামৃত'-এর আলোচনা করেছেন। 'কথামৃত'-এর আলোচনা ছাড়া 'কথামৃত'-এর বিবরণের ভিত্তিতে বিভিন্ন মনীষীর সঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণের মিলনপ্রসঙ্গও গ্রন্থটিতে আলোচিত হয়েছে। এছাড়া এই গ্রন্থে বুদ্ধদেব, যীশুখ্রীস্ট এবং শ্রীচৈতন্য প্রসঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণ যেসব কথা বলেছিলেন 'কথামৃত'-এর আলোকে তারও আলোচনা রয়েছে।

লেখক জানিয়েছেন, তাঁর 'কথামৃত' আলোচনার প্রেরণা তিনি রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের অষ্টম অধ্যক্ষ স্বামী বিশুদ্ধানন্দের কাছে পেয়েছেন। গ্রন্থটিতে নানা আলোচনায় লেখক তাঁর রামকৃষ্ণ-সাহিত্যে বিশেষ পরিচয়ের স্বাক্ষর যেমন রেখেছেন, তেমনি তাঁর চিন্তার স্বচ্ছতা, ভাষার সাবলীলতা ও আলোচনার সরসতার পরিচয়ও তিনি রেখেছেন গ্রন্থটির পৃষ্ঠায় পৃষ্ঠায়। 'কথামৃত' থেকে মানুষ কি পায় সে-সম্পর্কে তিনি খুব সুন্দরভাবে লিখেছেন : "'কথামৃত'-এর ডাক বা ধ্বনি অমৃতের ধ্বনি—যার কানে যাবে তাকে ফিরে দাঁড়াতেই হবে। পা আর বেচালে পড়বে না।" বলেছেন, 'কথামৃত' যেন আমাদের জীবনের "নকশা", আমাদের জীবনের ছাঁচ যাতে ফেলে আমরা আমাদের জীবনকে সুন্দর করতে পারি। বলেছেন : "কেবল কথাই নেই 'কথামৃত'-এ, আছে—রামকৃষ্ণসত্তা। রামকৃষ্ণকথা শুনলেই, পড়লেই কথার ওপরে ভেসে ওঠে এক জীবন্ত মানুষ।... 'কথামৃত' আর শ্রীরামকৃষ্ণকে আলাদা করা যায় না। 'কথামৃত' মানেই রামকৃষ্ণ নিজে।"

লেখক তাঁর গ্রন্থে শুধু 'কথামৃত'কেই উপস্থাপন করেননি, জীবন্ত শ্রীরামকৃষ্ণকেও পাঠকের সামনে উপস্থাপিত করেছেন। আমাদের মনে হয়, এখানেই গ্রন্থটির সার্থকতা।

# গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে বিতর্কিত গ্রন্থ

## পলাশ মিত্র

**শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ ও শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ও শ্রীনিত্যানন্দ :** শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ঠাকুর। প্রাচী পাবলিকেশন্স, ৩/৪ হেয়ার স্ট্রীট, কলিকাতা-১। পৃষ্ঠা : ১১+২৬০+২৮। মূল্য : চল্লিশ টাকা।

আলোচ্য গ্রন্থটি নানা কারণেই পণ্ডিতমহলে ইতিমধ্যে বিতর্কের ঝড় তুলেছে। কবিরাজ গোস্বামী, নিত্যানন্দ ও চৈতন্যচরিতামৃতকে একালের পাঠকের হাতে তুলে দিয়ে তাঁদের ভাবনাচিন্তায় আলোড়ন তুলতে লেখক যে একেবারে ব্যর্থ হননি, তা নিশ্চিধায় বলা যায়। তবে লেখকের বহু মতামত ও সিদ্ধান্তের সঙ্গে অনেকেই সহমত পোষণ করবেন বলে মনে হয় না। তথ্যানুসন্ধানে লেখক বিস্ময়কর কৃতিত্বের পরিচয় দিলেও তাঁর নানা মন্তব্য এবং কোথাও কোথাও অকারণ ব্যঙ্গোক্তি অনেক পাঠক সহজভাবে গ্রহণ করতে পারবেন কিনা সন্দেহ। লেখক স্বয়ং পণ্ডিত ও শ্রদ্ধেয় ব্যক্তি এবং গ্রন্থের বিষয়ও যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ, কিন্তু নিজস্ব মতামত বলার প্রচণ্ড তাগিদে বিরুদ্ধ মতামত খণ্ডন করবার জন্য তিনি কোন কোন ক্ষেত্রে ক্রোধ, লঘুতা ও ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ করার লোভ সংবরণ করতে না পারায় গ্রন্থের গুরুভাব কিঞ্চিৎ খর্ব হয়েছে বলে মনে হয়। এই গ্রন্থে উদ্ধৃত একটি পত্রে অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় যথার্থই বলেছেন : "তত্ত্বগ্রন্থে লঘুভাব ও কটূক্তি থাকলে গ্রন্থের উদ্দেশ্য ব্যর্থ হয়।"

এই জাতীয় তত্ত্বগ্রন্থে বানান-ভুলের আধিক্যও মনকে পীড়া দেয়। 'তত্ত্ব' কথাটি যে কতবার ভুল বানানে (বা মুদ্রণ-প্রমাদে) 'তত্ব'রূপে মুদ্রিত (দ্রষ্টব্য পৃষ্ঠা ৫৩, ৫৬, ৫৮, ৫৯, ৬০, ৬২ এবং আরও অনেক পাতায়) তার উদাহরণ অসংখ্য। এছাড়া 'উচিত' হয়েছে 'উচিৎ' (পৃষ্ঠা ১২৭), 'সত্ত্বেও' হয়েছে 'সত্বেও' (পৃষ্ঠা ১৩২), 'মহত্ত্ব' তার মাহাত্ম্য হারিয়ে হয়েছে 'মহত্ব' (পৃষ্ঠা ৬৭) এবং 'সান্ত্বনা'র চেহারা দাঁড়িয়েছে 'সান্তনা'য় (পৃষ্ঠা ২২৭)। এছাড়া আরও বহু ভুল বানান গ্রন্থের গুরুত্বহানি করেছে। গ্রন্থের প্রকাশনমান আরও শোভনসুন্দর হওয়া প্রত্যাশিত ছিল।

এই গ্রন্থের শেষে 'এ সন্দর্ভের ভূমি পরীক্ষায় যাঁরা অগ্রণী' শিরোনামে লেখক পক্ষে-বিপক্ষে অনেকগুলি পত্র তথা মতামত প্রকাশ করে সাহসের পরিচয় দিয়েছেন। এর মধ্যে অনেক খ্যাতনামা ব্যক্তি আছেন। প্রশংসামূলক পত্র অনেক গ্রন্থেই থাকে কিন্তু তীব্র বিরোধিতার বল্লম-লাঞ্ছিত পত্রগুলিকেও এখানে সমান মর্যাদায় স্থান দিয়েছেন লেখক। ঐকমত্য হোক না হোক, এই গ্রন্থ পাঠ করার সময়ে মুহূর্তের জন্য পাঠক অন্যমনস্ক হবেন না—একথা জোর দিয়ে বলা যায়।

# ভ্রমণে সাধুসঙ্গ

## পরিমল চক্রবর্তী

**ভ্রমণ ও সাধুসঙ্গ** (প্রথম খণ্ড) : শিবশঙ্কর ভারতী। ওরিয়েন্ট বুক এম্পোরিয়াম। ১০৩ সি, সীতারাম ঘোষ স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০ ০০৯। পৃষ্ঠা : ১২+২৩৯। মূল্য : ছত্রিশ টাকা।

অনেক দিন পর বইয়ের মতো বই পড়লাম একটা। নামেই বইটির বিষয়বস্তু বেশ বোঝা যায়। এতে ভ্রমণের বৃত্তান্ত দেওয়া হয়েছে। আবার আছে সাধুসঙ্গের কথা। থাকা-খাওয়ার খোশগল্প, পথঘাটের পরিচয়, ভৌগোলিক ও ঐতিহাসিক আলোচনা, প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের বর্ণনা বা বেড়াবার ব্যক্তিগত বৃত্তান্তসহ শুধু সাধারণ ভ্রমণের কথা এতে নেই। যেহেতু সাধুসঙ্গের কথা আছে, তাই বলে কেবল গুরুগম্ভীর আধ্যাত্মিক আলোচনাও আবার আসেনি এখানে।

ঐ দুটো দিকের দারুণ এক সুন্দর সংমিশ্রণ ঘটিয়েছেন লেখক তাঁর অদ্ভুত অভিজ্ঞতার আলোকে। বইটি পড়তে পড়তে দেখি, লেখক যেমন বিভিন্ন দুর্গম অথচ অতি সুন্দর জায়গায় বেড়িয়েছেন, তেমনি মিশেছেন অনেক সাধুসন্তের সঙ্গে—শুনেছেন তাঁদের কথা ও কাহিনী। আর সঙ্গে সঙ্গে সেই সব অঞ্চলের আগেকার ইতিহাস ও বর্তমান ব্যবস্থাও বেশ বুঝেছেন। তাই এই গ্রন্থটিকে নিছক ভ্রমণকাহিনী না বলে, বলা যেতে পারে ভ্রমণ ও সাধুসন্তের কাহিনী।

দেবদেবী ও সাধুসন্তদের প্রসঙ্গ ছাড়া বইটির দশটি অধ্যায়ে আছে হরিদ্বার, হৃষীকেশ, যমুনোত্রী, গঙ্গোত্রী, গোমুখ, কেদারনাথ, বদরীনারায়ণ, বারাণসী, অযোধ্যা, অমরনাথ, জম্মু, শ্রীনগর প্রভৃতি স্থানের নানা বিবরণ।

এজন্য একদিকে এই গ্রন্থে যেমনি পর্যটনের প্রভৃত আনন্দ পাওয়া যাবে, তেমনি মিটবে সাধুসন্তদের মনের কথা জানার অসীম কৌতূহল। আর সঙ্গে সঙ্গে সাধুসঙ্গ লাভের পরম পরিতৃপ্তি তো পাওয়া যাবেই। আর উপরি-পাওনা হিসাবে কোন কোন ক্ষেত্রে, বিশেষতঃ "নৈমিষ্যারণ্যে দুটি রাত" নামে অধ্যায়টিতে উপন্যাস পাঠের উত্তেজনাও উপভোগ করা যাবে বলে বোধ করি। তাই পর্যটন-পিপাসু, অধ্যাত্মজ্ঞান-অভিলাষী, উপন্যাসে উৎসাহী —প্রত্যেক প্রকার পাঠকই পুস্তকটিতে পাবেন তাঁদের মনের মতো সব সামগ্রী। আর যাঁরা ঐ সব জিনিস একত্রে চান তাঁদের তো সোনায় সোহাগা।

পরমহংসদেব প্রায়ই সাধুসঙ্গের কথা বলতেন। সাধুসঙ্গের গুরুত্বের কথা বারবার বুঝিয়েছেন তিনি। এই বইটির সাহায্যে সেই সাধুসঙ্গের সুযোগ সহজেই মিলবে। তবে মনে মৃদু অভিযোগ আসে একটু। লেখক এখানে শুধু পরিব্রাজক সাধুদের কথাই বলেছেন। তাঁরা যেসমস্ত দুর্গম প্রাকৃতিক পরিবেশে পথ চলেন সেই সব জায়গায় আমাদের অনেকেরই অনেক সময় যাওয়া হয়তো হয়ে ওঠে না বা সম্ভবপর হয় না। তথাপি বিশেষ করে রামকৃষ্ণ মঠ-মিশন ও ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের সন্ন্যাসীদের সম্বন্ধে আলোচনা বাদ দেওয়াটা বোধ হয় যুক্তিযুক্ত হয়নি। তাঁদের সম্বন্ধে আমরা হয়তো তুলনামূলকভাবে কিছুটা বেশি জানি। তবে তাঁদের নিয়ে আলোচনায় আমরা অধিক আনন্দিত হই। সুতরাং নিঃস্বার্থ সেবাব্রতী আত্মবিলয়ী সেইসব সাধুদের সম্বন্ধে আলোচনা থাকলে গ্রন্থটি আরও আকর্ষণীয় হতে পারত বলে আমাদের ধারণা। পরবর্তী খণ্ডে যদি লেখক এই দিকটি ভাবেন ভাল হয়।

সব দিক বিবেচনা করে অবশ্য বলা যায় যে, বইটির বিষয়বস্তু বিশেষ ধরনের এবং এটি একটি অন্য আঙ্গিকে আলোচিত হয়েছে। লেখার ভঙ্গিও ভাল। প্রচুর ছবি গ্রন্থটির একটি অতিরিক্ত আকর্ষণ। ছাপাও চমৎকার।

এই ধরনের সাধুসঙ্গে ও আধ্যাত্মিক ভ্রমণে আমরা "পশু-মানব' থেকে "বুদ্ধ-মানব"-এর পথে পাড়ি দিতে পারি। স্বামী বিবেকানন্দ একদা বলেছিলেন: "Religion, of course, is a journey; but it is never a journey from Calcutta to Kedarnath. It is a journey from Brute-man to Budha-man." (দ্রঃ এবার কেন্দ্র বিবেকানন্দ—স্বামী পূর্ণাত্মানন্দ, ১৯৯১, পৃঃ ১৩৬)

## প্রাপ্তিস্বীকার

**পুণ্যতীর্থ কামারপুকুর:** সম্পাদক—রতিরঞ্জন মণ্ডল। শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন রোড, কামারপুকুর, হুগলী। পৃষ্ঠা: ৫২। মূল্য: আট টাকা।

**বিবেক:** বিশ্বজিৎ ঘোষ। নলডাঙা, ব্যাণ্ডেল, হুগলী। পৃষ্ঠা: ১০৪। মূল্য: ত্রিশ টাকা।

**ফুলের সাজি:** অশোক সিনহা। ৯/৪বি, কালীচরণ ঘোষ রোড, কলিকাতা-৭০০ ০৫০। পৃষ্ঠা: ৯+৪০। মূল্য: আট টাকা।

**ওঁ শ্রীশ্রীগুরবে নমঃ:** কানাইলাল সরকার। সারদা আশ্রম, সুভাষপল্লী, বর্ধমান। পৃষ্ঠা: ৬+২৮+২১৩+৫। মূল্য: পঁয়ত্রিশ টাকা। □

# রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশন সংবাদ

## উৎসব-অনুষ্ঠান

**রামকৃষ্ণ মিশন ব্রহ্মানন্দ আশ্রমে (শিকড়াকুলীন গ্রাম) গত ২২ জানুয়ারি থেকে ২৪ জানুয়ারি পর্যন্ত** বার্ষিক উৎসব অনুষ্ঠিত হয়েছে। ২৪ তারিখ সকালে ভজন, পাঠ প্রভৃতি অনুষ্ঠিত হয়। বিকালে ধর্মসভায় শ্রীরামকৃষ্ণ ও শ্রীশ্রীমা সম্পর্কে আলোচনা করেন স্বামী জয়ানন্দ ও ডঃ সচ্চিদানন্দ ধর। সন্ধ্যায় পরিবেশিত হয় কালীকীর্তন ও স্বামীজী সম্পর্কে চলচ্চিত্র প্রদর্শন। ২৩ তারিখ যুব ও শিক্ষক সমাবেশে সভাপতি ও প্রধান অতিথিরূপে উপস্থিত ছিলেন স্বামী পূর্ণাত্মানন্দ ও ডঃ সুভাষ বন্দ্যোপাধ্যায়। ২৪ তারিখ স্বামী ব্রহ্মানন্দের আবির্ভাব-তিথিতে বিশেষ পূজা, পাঠ, ভজন প্রভৃতি অনুষ্ঠিত হয়। দুপুরে প্রায় ১৫,০০০ ভক্তকে খিচুড়ি প্রসাদ দেওয়া হয়। সঙ্গীতাঞ্জলি পরিবেশন করেন শ্রীকুমার চট্টোপাধ্যায় ও নারায়ণ চট্টোপাধ্যায়। ধর্মসভায় স্বামী ব্রহ্মানন্দের ওপর আলোচনা করেন স্বামী লোকেশ্বরানন্দ ও স্বামী অমলানন্দ।

গত ১৪ জানুয়ারি স্বামী বিবেকানন্দের জন্মতিথিকে কেন্দ্র করে **বরানগর রামকৃষ্ণ মিশন** আশ্রমে তিনদিনব্যাপী বার্ষিক উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। ঐদিন ছয় সহস্রাধিক ভক্তকে বসিয়ে খিচুড়ি প্রসাদ দেওয়া হয়। উৎসবের অঙ্গ হিসাবে ধর্মসভা, বিদ্যালয়ের কৃতী ছাত্রদের পুরস্কার বিতরণ, শিক্ষামূলক প্রদর্শনী, ছাত্র ও শিক্ষকদের নাট্যানুষ্ঠান, বিশিষ্ট শিল্পীদের সঙ্গীতানুষ্ঠান প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। ধর্মসভায় সভাপতিত্ব করেন 'উদ্বোধন'-এর সম্পাদক স্বামী পূর্ণাত্মানন্দ। ভাষণ দেন রহড়া বালকাশ্রমের অধ্যক্ষ স্বামী জয়ানন্দ ও অধ্যাপক প্রেমবল্লভ সেন। পুরস্কার বিতরণী সভায় পৌরোহিত্য করেন রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের সাধারণ সম্পাদক স্বামী আত্মস্থানন্দজী। পুরস্কার বিতরণ করেন পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদের সচিব অধ্যাপক সুদিন চট্টোপাধ্যায়। খেলোয়াড়দের পুরস্কার বিতরণ করেন প্রখ্যাত ফুটবলার গোষ্ঠ সরকার ও বিদেশ বসু। শিক্ষামূলক প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেন পূর্তমন্ত্রী যতীশ রায়। ১২ জানুয়ারি যুবদিবস উপলক্ষে এক বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রার আয়োজন করা হয়েছিল। শোভাযাত্রার সূচনা করেন রাজ্যের ক্রীড়া ও যুবকল্যাণমন্ত্রী সুভাষ চক্রবর্তী।

গত ২৪ মার্চ '৯৩ সরিষা আশ্রমে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের মর্মরমূর্তি প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। অনেক সন্ন্যাসী, ব্রহ্মচারী ও ভক্তের উপস্থিতিতে মূর্তি উৎসর্গ করেন রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের অধ্যক্ষ শ্রীমৎ স্বামী ভূতেশানন্দজী মহারাজ। এই উপলক্ষে অপরাহ্নে এক জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় পৌরোহিত্য করেন রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের সাধারণ সম্পাদক স্বামী আত্মস্থানন্দজী।

## স্বামী বিবেকানন্দের ভারত-পরিক্রমা ও শিকাগো ধর্মমহাসভায় যোগদানের শতবর্ষ এবং জাতীয় যুবদিবস

**ভুবনেশ্বর রামকৃষ্ণ মিশনের** ব্যবস্থাপনায় গত ১২ জানুয়ারি থেকে ২০ জানুয়ারি '৯৩ পর্যন্ত উড়িস্যার বিভিন্ন স্থানে স্বামী বিবেকানন্দের ভারত-পরিক্রমা ও শিকাগো ধর্মমহাসভায় যোগদানের শতবর্ষ এবং জাতীয় যুবদিবস উদ্‌যাপিত হয়েছে। ১২ জানুয়ারি ভুবনেশ্বর আশ্রমে এই অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন উড়িষ্যার মুখ্যমন্ত্রী বিজু পট্টনায়ক। সভাপতিত্ব করেন উড়িষ্যার সংস্কৃতি, ক্রীড়া ও যুবকল্যাণমন্ত্রী শরৎকুমার কর। ভাষণ দেন আশ্রমাধ্যক্ষ স্বামী শিবেশ্বরানন্দ, উড়িষ্যা সরকারের সংস্কৃতি দপ্তরের সচিব অশোককুমার মিশ্র, যুব ও ক্রীড়াদপ্তরের অধিকর্তা বিমলেন্দু মহান্তী। ঐ দিন প্রায় পাঁচহাজার যুবপ্রতিনিধিকে নিয়ে একটি বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা ভুবনেশ্বর শহরের প্রধান প্রধান রাস্তাগুলি পরিক্রমা করে। পরিক্রমাশেষে শোভাযাত্রায় অংশগ্রহণকারী সকলকে খাবার দেওয়া হয়। বিকালে প্রতিযোগিতামূলক অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণকারী সকল প্রতিযোগীদের পুরস্কার ও প্রশংসাপত্র দেওয়া হয়।

**নরোত্তমনগর ( অরুণাচল প্রদেশ ) আশ্রম** গত ৩১ জানুয়ারি এক জনসভার আয়োজন করেছিল।

অনুষ্ঠানে ভাষণ দেন রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের অন্যতম সহাধ্যক্ষ স্বামী গহনানন্দজী মহারাজ এবং আশ্রম-বিদ্যালয় থেকে প্রকাশিত পত্রিকার একটি বিশেষ সংখ্যা তিনি প্রকাশ করেন।

**বড়িষা মঠের** বৃন্দাবাসে গত ১২ ফেব্রুয়ারি আবাসিক ও ভক্তবৃন্দের এক সমাবেশে স্বামী বিবেকানন্দের ভারত-পরিক্রমার তাৎপর্য সম্পর্কে ভাষণ দেন স্বামী শ্রীধরানন্দ।

স্বামী বিবেকানন্দের শিকাগো ধর্মমহাসম্মেলনে যোগদানের শতবর্ষ উপলক্ষে **দেওঘর আশ্রম** গত ৩ মার্চ এক শিক্ষক-সম্মেলন এবং ১৭ মার্চ এক যুব-সম্মেলনের আয়োজন করেছিল। দেওঘর অঞ্চলের কয়েকটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানও এই সম্মেলনে যোগদান করেছিল।

**আঁটপুর রামকৃষ্ণ মঠ** গত জুলাই '৯২ থেকে ডিসেম্বর '৯২ পর্যন্ত বিভিন্ন স্কুল-কলেজে স্বামী বিবেকানন্দের ভারত-পরিক্রমার শতবর্ষ অনুষ্ঠান উদ্‌যাপন করেছে। ২৭ ডিসেম্বর আঁটপুর মঠে অনুষ্ঠিত বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় ১ম, ২য় ও ৩য় স্থানাধিকারীদের পুরস্কার দেওয়া হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন স্বামী জয়ানন্দ এবং প্রধান অতিথি ছিলেন অধ্যাপক শংকরীপ্রসাদ বসু। গত ১২ জানুয়ারি '৯৩ জাতীয় যুবদিবসে এক বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা ও স্বামীজীর ওপর আলোচনাদির ব্যবস্থা করা হয়েছিল।

**শিলচর আশ্রম** ১২ জানুয়ারি একটি শোভাযাত্রা, ১৮ জানুয়ারি ১৭৫জন যুবপ্রতিনিধিকে নিয়ে একদিনের এক যুবসম্মেলন এবং ১৯ জানুয়ারি ভক্ত-সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়।

**রায়পুর আশ্রম** গত ১২ জানুয়ারি এই আশ্রমের ব্যবস্থাপনায় রায়পুর বিশ্ববিদ্যালয়-প্রাঙ্গণে জাতীয় যুবদিবস পালন করা হয়েছে। সারাদিনব্যাপী অনুষ্ঠানে মোট ১৫০০জন যুব-প্রতিনিধি যোগদান করেছিল। গত ২২ জানুয়ারি 'স্বামী বিবেকানন্দের বাণীর প্রাসঙ্গিকতা' বিষয়ে এক আলোচনাচক্র এবং ২৮ জানুয়ারি এক ভক্ত-সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়।

**আলমোড়া আশ্রম** গত ১১ ও ১২ মার্চ আলমোড়ায় দুটি জনসভা এবং ১৪ মার্চ নৈনিতালে একটি জনসভার আয়োজন করেছিল। বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষ সহ বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ জনসভাগুলিতে অংশগ্রহণ করেছিলেন।

**জামতাড়া আশ্রম** স্বামী বিবেকানন্দের ওপর চিত্র প্রদর্শনী, আদিবাসী সম্প্রদায়ের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান এবং কণ্ঠ ও যন্ত্রসঙ্গীতানুষ্ঠানের আয়োজন করেছিল। তাছাড়া চারটি গ্রাম্য সমাজগৃহ এবং একটি সমাজকেন্দ্রসহ প্রশিক্ষণকেন্দ্রের উদ্বোধন করা হয়েছে।

### চক্ষু-অস্ত্রোপচার শিবির

**পুরী মঠ** গত ২০-২৬ ফেব্রুয়ারি রামকৃষ্ণ মিশন সেবাপ্রতিষ্ঠানের সহযোগিতায় এক চক্ষু-অস্ত্রোপচার শিবির পরিচালনা করে। শিবিরে মোট ৬৩জন রোগীর ছানি অস্ত্রোপচার করা হয়। গত ২৯ জানুয়ারি মাঘী সপ্তমীতে চন্দ্রভাগা নদী ও বঙ্গোপসাগরের সঙ্গমস্থলে তীর্থযাত্রীদের চিকিৎসা ও পানীয় জলের ব্যবস্থা করা হয়।

### জাতীয় পুরস্কার লাভ

**পুরুলিয়া রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যাপীঠ** ১৯৯২ খ্রীস্টাব্দের জাতীয় শিশুকল্যাণ পুরস্কার লাভ করেছে। গত ৩ মার্চ ভারতের রাষ্ট্রপতি শংকর-দয়াল শর্মার হাত থেকে এই পুরস্কার গ্রহণ করেন বিদ্যাপীঠের সম্পাদক স্বামী উমানন্দ। পুরস্কারের মূল্য দুই লক্ষ টাকা ও একটি প্রশস্তিপত্র।

## ত্রাণ

### আসাম দাঙ্গাত্রাণ

গৌহাটি কেন্দ্রের মাধ্যমে নওগাঁও জেলার দবোকায় গত দাঙ্গায় ক্ষতিগ্রস্ত ১৫০টি পরিবারকে ১৫০টি লণ্ঠন, পুরনো কাপড়, শিশুদের পোশাক দেওয়া হয়েছে। তাছাড়া ২২২জন রোগীর চিকিৎসা করা হয়েছে। ঐ অঞ্চলে শিলং আশ্রমের মাধ্যমেও ত্রাণকার্য করা হয়েছে।

### গুজরাট দাঙ্গাত্রাণ

রাজকোট আশ্রমের মাধ্যমে আহমেদাবাদের দাঙ্গাকবলিত অঞ্চলগুলির ২৫০জন কর্মহীন দিন-মজুরকে ২৫০০ কিলোঃ আটা, ২৫০ কিলোঃ চিনি, ২৪০ কিলোঃ তেল, ৫০ কিলোঃ চা, ২৫০টি সাবান ও ২৫০টি চাদর দেওয়া হয়েছে।

### বিহার খরাত্রাণ

গাড়ওয়া জেলার বাঁকা ব্লকের রামকান্ড গ্রামে একটি ত্রাণশিবির স্থাপন করা হয়েছে। এই শিবির থেকে খরাপীড়িত গরিব পরিবারের শিশুদের প্রতিদিন দুধ ও বিস্কুট দেওয়া হচ্ছে। তাছাড়া এই ব্লকের উদয়পুর পঞ্চায়েতের সাবানে গ্রামে 'খাদ্যের বিনিময়ে কাষ' প্রকল্পের মাধ্যমে একটি পুকুর খনন করা হচ্ছে।

### তামিলনাড়ু বন্যা ও ঝঞ্ঝাত্রাণ

মাদ্রাজ মিশন আশ্রম রামেশ্বরম দ্বীপের রামকৃষ্ণপুরম গ্রামে ক্ষতিগ্রস্ত জেলেদের ১০০ মাদুর ও ২৭৮০টি পুরনো কাপড়-চোপড় বিতরণ করেছে। বিতরণের দিন সকল গ্রামবাসীকে পর্যাপ্তভাবে খাওয়ানো হয়েছে।

### বহির্ভারত

ঢাকা রামকৃষ্ণ মঠ গত ২২ ফেব্রুয়ারি থেকে ২৬ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ১৫৮তম আবির্ভাব-তিথি ও বার্ষিক উৎসব উদ্যাপন করেছে। ২২ তারিখ অনুষ্ঠিত হয় আশ্রম-পরিচালিত বিদ্যালয়ের বার্ষিক অনুষ্ঠান ও পুরস্কার বিতরণ। নানা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান-সূচী-সম্বলিত এই অনুষ্ঠানের সভাপতিত্ব করেন স্বামী অক্ষরানন্দ, প্রধান অতিথি ছিলেন বাংলাদেশের যুব ও ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রী জনাব সাদেক হোসেন। ২৩ ফেব্রুয়ারি শ্রীরামকৃষ্ণের আবির্ভাব-তিথিতে বিশেষ পূজা-পাঠাদি সহ নানা অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছিল। ধর্মসভায় সভাপতিত্ব করেন বিচারপতি দেবেশচন্দ্র ভট্টাচার্য। স্বাগত ভাষণ দেন স্বামী অক্ষরানন্দ। অন্যান্য বক্তাদের মধ্যে ছিলেন শ্রীমৎ শুদ্ধানন্দ মহাথের, ব্রাদার জে. ডি. সুজা, অধ্যাপক অজয়কুমার রায় ও জনাব ফজলুর রহমান। ২৪ ফেব্রুয়ারি চিত্রা ভট্টাচার্যের পৌরোহিত্যে ধর্মসভায় 'বিশ্বজনীন সারদাদেবী' বিষয়ে বক্তব্য রাখেন ডঃ সুনন্দা বড়ুয়া, ডঃ মারুফী খান, ডঃ জয়া সেনগুপ্তা, আফরোজা আলম প্রমুখ। ২৫ ফেব্রুয়ারির ধর্মসভায় শিকাগো ধর্মমহাসম্মেলন ও স্বামী বিবেকানন্দ বিষয়ে ভাষণ দেন ডঃ ইমানুল হক, শিবশঙ্কর চক্রবর্তী, মনোরঞ্জন রাজবংশী। সভাপতিত্ব করেন অধ্যাপক পরেশচন্দ্র মণ্ডল, প্রধান অতিথি ছিলেন বাংলাদেশ মঞ্জুরী কমিশনের চেয়ারম্যান অধ্যাপক এম. শামসুল হক এবং বিশেষ অতিথি ছিলেন 'ডেলি স্টার' পত্রিকার সম্পাদক জনাব এস. এম. আলী। উদ্বোধনী ভাষণ দেন স্বামী অক্ষরানন্দ।

বেদান্ত সোসাইটি অব স্যাক্রামেন্টো, বেদান্ত সোসাইটি অব পোর্টল্যান্ড, বেদান্ত সোসাইটি অব ওয়েস্টার্ন ওয়াশিংটন, বেদান্ত সোসাইটি অব সেন্ট লুইস, বেদান্ত সোসাইটি অব টরন্টো (কানাডা), বেদান্ত সোসাইটি অব নর্দার্ন ক্যালিফোর্নিয়া (সানফ্রান্সিস্কো), রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ সেন্টার অব নিউইয়র্ক আশ্রমগুলিতে যথারীতি সাপ্তাহিক ভাষণ ও ক্লাস হয়েছে।

### দেহত্যাগ

স্বামী মর্ষানন্দ (নারায়ণ) গত ২০ ফেব্রুয়ারি '৯৩ ভোর ৪-৫০ মিনিটে রামকৃষ্ণ মিশন সেবাপ্রতিষ্ঠানে দেহত্যাগ করেন। তাঁর বয়স হয়েছিল ৬৯ বছর। গত অক্টোবর ১৯৯২-এ তাঁকে ক্যান্সারের চিকিৎসার জন্য হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছিল।

স্বামী মর্ষানন্দ ছিলেন শ্রীমৎ স্বামী বিরজানন্দজী মহারাজের মন্ত্রশিষ্য। ১৯৪৭ খ্রীস্টাব্দে তিনি কনখল সেবাশ্রমে যোগদান করেন এবং ১৯৫৭ খ্রীস্টাব্দে শ্রীমৎ স্বামী শংকরানন্দ মহারাজের নিকট সন্ন্যাসলাভ করেন। যোগদানের কেন্দ্র ছাড়াও তিনি বিভিন্ন সময়ে বারাণসী অদ্বৈতাশ্রম, বারাণসী সেবাশ্রম, শ্যামলাতাল, বোম্বাই, কলকাতার গদাধর আশ্রম এবং পাটনা আশ্রমের কর্মী ছিলেন। শেষের কয়েক বছর তিনি বেলুড় মঠে স্বামী ব্রহ্মানন্দ মহারাজের মন্দিরের পূজারী ছিলেন। ১৯৮৩ খ্রীস্টাব্দ থেকে তিনি বেলুড় মঠে অবসর জীবনযাপন করছিলেন। সহজ সরল অনাড়ম্বর জীবনযাপনের জন্য তিনি সকলের প্রিয় ছিলেন।

## শ্রীশ্রীমায়ের বাড়ীর সংবাদ

**সাপ্তাহিক ধর্মালোচনা :** প্রতি শুক্রবার, রবিবার ও সোমবার সন্ধ্যারতির পর যথারীতি চলছে। ☐

# বিবিধ সংবাদ

### উৎসব-অনুষ্ঠান

**মাকড়দহ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ সাধনালয় ( হাওড়া )** গত ১৬ জানুয়ারি স্বামী বিবেকানন্দের জন্মোৎসব ও সেইসঙ্গে স্বামীজীর ভারত-পরিক্রমা ও শিকাগো ধর্মমহাসভায় যোগদানের শতবার্ষিক উৎসব নানা অনুষ্ঠানের মাধ্যমে পালন করেছে। ছাত্র-ছাত্রীদের নিয়ে অনুষ্ঠানগুলি ছিল উৎসবের মূল আকর্ষণ। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন প্রধান শিক্ষক শশাংকশেখর বেরা এবং প্রধান অতিথি ছিলেন স্বামী স্বতন্ত্রানন্দ। অনুষ্ঠানে ১৯৯২ খ্রীস্টাব্দের উচ্চমাধ্যমিক ও মাধ্যমিক পরীক্ষায় কৃতী তিনজন ছাত্রছাত্রীকে বিশেষ পুরস্কার দেওয়া হয়।

**রামকৃষ্ণ মিলন মন্দির, এগরা ( মেদিনীপুর )** গত ১২, ১৪ ও ১৭ জানুয়ারি স্বামীজীর ভারত-পরিক্রমা এবং শিকাগো ধর্মমহাসভায় তাঁর আবির্ভাবের শতবার্ষিক উৎসব পালন করেছে। ১২ জানুয়ারি শিশু সমাবেশ, ১৩ ও ১৪ জানুয়ারি ক্রীড়ানুষ্ঠান এবং ১৭ জানুয়ারি এগরা থেকে কাঁথি রামকৃষ্ণ মঠ পর্যন্ত এক পদযাত্রার আয়োজন করা হয়েছিল। কাঁথি-মঠে ছাত্রছাত্রী ও শিক্ষকমণ্ডলীর সমাবেশে স্বামী বিবেকানন্দের বিষয়ে ভাষণ দেন এই মঠের অধ্যক্ষ স্বামী আপ্তকামানন্দ।

বিগত নয় বছরের মতো এবারও **কলকাতার টালিগঞ্জবাসীদের** উদ্যোগে গত ১৭ জানুয়ারি স্বামী বিবেকানন্দের স্মরণে এক শোভা-যাত্রার আয়োজন করা হয়। সকাল ৭টায় গল্ফ ক্লাব রোড পল্লী থেকে শোভাযাত্রা আরম্ভ হয়। স্বামীজীর বাণী-সংবলিত প্ল্যাকার্ড ও স্বামীজীর বাণী-পাঠ করতে করতে শোভাযাত্রাটি টালিগঞ্জের বিভিন্ন রাস্তা পরিক্রমা করে। সমবেত জনতার উদ্দেশে স্বামী বিবেকানন্দের ওপর সংক্ষিপ্ত ভাষণ দেন স্বামী তত্ত্বস্থানন্দ। বাগবাজার রামকৃষ্ণ মঠ ( উদ্বোধন )-এর অধ্যক্ষ স্বামী সত্যব্রতানন্দ সহ কয়েকজন সন্ন্যাসী এই শোভাযাত্রায় অংশগ্রহণ করেন। দুপুরে ছাত্রছাত্রীদের জন্য স্বামী বিবেকানন্দের ওপর বক্তৃতা-প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়েছিল।

গত ১৪, ১৬ ও ১৭ জানুয়ারি **কৃষ্ণনগর শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমে** স্বামী বিবেকানন্দের জন্মোৎসব উপলক্ষে নানা অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছিল। প্রথম দিন বিশেষ পূজা, হোম, প্রসাদ বিতরণ ও আলোচনাদি অনুষ্ঠিত হয়। বিকালে নদীয়া জেলা যোগাসন ও দেহসৌষ্ঠব সংস্থার সদস্যদের দ্বারা যোগব্যায়াম প্রদর্শন অনুষ্ঠিত হয়। ১৬ জানুয়ারি অনুষ্ঠিত হয় চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতা। পরে বালক-বালিকাদের সমবেত ব্যায়াম, ড্রিল ও যোগাসন অনুষ্ঠিত হয়। ১৭ জানুয়ারি কলকাতা রামকৃষ্ণ মিশন সেবাপ্রতিষ্ঠানের সহযোগিতায় রক্তদান শিবির অনুষ্ঠিত হয়। পরে ছাত্রছাত্রীদের নানা প্রতিযোগিতামূলক অনুষ্ঠান হয়। এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন স্বামী মুক্তসঙ্গানন্দ। সন্ধ্যায় ধর্মালোচনা করেন কামারপুকুর আশ্রমের অধ্যক্ষ স্বামী দেবদেবানন্দ।

**বাঁকুড়ার ভাদুল চ্যাটার্জী পাড়া প্রাথমিক বিদ্যালয়ে** গত ১২ জানুয়ারি স্বামী বিবেকানন্দের জন্মদিন পালন করা হয়েছে। অনুষ্ঠানে ঐ অঞ্চলের চারটি প্রাথমিক বিদ্যালয় যোগদান করেছিল।

গত ১০ জানুয়ারি দক্ষিণ ২৪ পরগনার **গোচারণ আনন্দধারা রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউট অব কালচারের** সহযোগিতায় একদিনের এক স্বামী বিবেকানন্দ যুবসম্মেলনের আয়োজন করেছিল। যুবপ্রতিনিধিরা আবৃত্তি, বাণীপাঠ, বক্তৃতা, আলোচনা, সঙ্গীত প্রভৃতি প্রতিযোগিতামূলক অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করে। প্রশ্নোত্তর অধিবেশন পরিচালনা করেন প্রণবেশ চক্রবর্তী। 'জাতীয় সংহতি ও বিবেকানন্দ' বিষয়ে ভাষণ দেন ডঃ তাপস বসু। অনুষ্ঠানের উদ্বোধন ও পুরস্কার বিতরণ করেন স্বামী বলভদ্রানন্দ।

**চকগোপাল বিবেকানন্দ পাঠচক্র (মেদিনীপুর)** গত ১২ জানুয়ারি জাতীয় যুবদিবস পালন করেছে। বিভিন্ন বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীরা এই অনুষ্ঠানে যোগদান করে। সকাল ৯টায় শোভাযাত্রার পর

দুপুরে সকলকে খিচুড়ি খাওয়ানো হয়। বিকালে অনুষ্ঠিত জনসভায় সভাপতিত্ব করেন প্রধান শিক্ষক পূর্ণানন্দ মাইতি এবং প্রধান অতিথি ছিলেন অধ্যাপক নির্মলচন্দ্র জানা। সভার শেষে ১০ জানুয়ারি অনুষ্ঠিত প্রতিযোগিতামূলক অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণকারী সফল প্রতিযোগিদের পুরস্কার দেওয়া হয়।

**শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ সংঘ, বিশ্বনাথ চারিয়ালি, (শোনিতপুর, আসাম)** গত ১১ ও ১২ জানুয়ারি জাতীয় যুবদিবস, স্বামীজীর ভারত-পর্যটনের শতবর্ষ ও শিকাগো ধর্মমহাসভায় যোগদানের শতবর্ষ উদ্‌যাপন করেছে। এই উপলক্ষে নানা প্রতি-যোগিতামূলক অনুষ্ঠান, শোভাযাত্রা, ফলবিতরণ, বস্ত্রবিতরণ, ধর্মসভা, নাটক, সঙ্গীত প্রভৃতি অনুষ্ঠিত হয়। ধর্মসভায় সভাপতিত্ব করেন প্রফুল্ল শর্মা। বিশিষ্ট অতিথি ছিলেন স্বামী দিব্যরূপা-নন্দ। উল্লেখ্য গত ডিসেম্বর, '৯২ মাসের দাঙ্গায় ক্ষতিগ্রস্ত কিছু অঞ্চলে এই সংঘের পক্ষ থেকে ধুতি, শাড়ি, গামছা, শার্ট, প্যান্ট ও গৃহস্থালীর সরঞ্জাম দেওয়া হয়।

**পূর্বসিঁথি রামকৃষ্ণ সংঘ** গত ২৫-২৭ ডিসেম্বর '৯২ বার্ষিক উৎসব উদ্‌যাপন করেছে। প্রথম দিনের ধর্মসভায় শ্রীমা সারদাদেবীর ওপর আলোচনা করেন প্রব্রাজিকা অমলপ্রাণা। দ্বিতীয় দিন স্বামী বিবেকানন্দের ওপর বক্তব্য রাখেন স্বামী মুক্তসঙ্গা-নন্দ ও অধ্যাপক শান্তিরঞ্জন চট্টোপাধ্যায়। শেষ দিন বিশেষ পূজা ও প্রসাদ-বিতরণাদি অনুষ্ঠিত হয়। বেলা ১১টায় শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন স্বামী কমলেশানন্দ। সন্ধ্যায় অনুষ্ঠিত ধর্মসভায় ভাষণ দেন স্বামী বিশ্বনাথা-নন্দ। উৎসবের তিনদিনই ভক্তিমূলক সঙ্গীতের অনুষ্ঠান হয়েছে। শেষের দিন ধর্মসভার পর 'কথামৃতের গান' পরিবেশন করেন স্বামী সর্বগানন্দ।

গত ১২ জানুয়ারি গোপীবল্লভপুর **শ্রীরামকৃষ্ণ প্রচার পরিষদের** উদ্যোগে জাতীয় যুবদিবস ও স্বামী বিবেকানন্দের জন্মোৎসব নানান অনুষ্ঠানের মাধ্যমে উদ্‌যাপন করা হয়। এই উপলক্ষে প্রভাতফেরী, পূজা, পাঠ, রক্তদান শিবির, দৌড়, বসে আঁকো, সঙ্গীত প্রভৃতি প্রতিযোগিতামূলক অনুষ্ঠান ছিল অনুষ্ঠানসূচীর প্রধান অঙ্গ। সান্ধ্য অনুষ্ঠানে আবৃত্তি করেন পার্থ ঘোষ, সঙ্গীত পরিবেশন করেন শঙ্কর সোম ও শ্রীকুমার চট্টোপাধ্যায়।

১২ জানুয়ারি '৯৩ স্বামী বিবেকানন্দের জন্মদিন জাতীয় যুবদিবস উপলক্ষে **বিবেকানন্দ সেবাকেন্দ্রের** (বেনিয়াপাড়া লেন, কলকাতা-১৪) পরিচালনায় এক বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা বের হয়। শোভাযাত্রায় পল্লীর সকল শ্রেণীর মানুষ যোগদান করেছিলেন। পরে পল্লীর স্কুলের ছেলেমেয়েরা স্বামী বিবেকানন্দের জীবন ও আদর্শ নিয়ে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করে।

## পরলোকে

আগরতলা রামকৃষ্ণ মিশনের পরিচালন সমিতির সদস্য ও রামকৃষ্ণ মঠ-মিশনের একান্ত অনুরাগী প্রবীণ ভক্ত **শচীন্দ্রলাল বণিক** গত ৩০ সেপ্টেম্বর ১৯৯২ রাত্রি ১-৫৫ মিনিটে সজ্ঞানে করজপরত অবস্থায় পরলোক গমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৭১ বছর। ১৯৪২ খ্রীস্টাব্দে অবিভক্ত বাংলার কুমিল্লায় শচীন্দ্রলাল বণিক শ্রীমৎ স্বামী শর্বানন্দজী মহারাজের নিকট মন্ত্রদীক্ষা লাভ করেন। মধুর-ভাষী, সদালাপী ও সেবাব্রতী শচীনবাবু সাধু-ভক্ত, ধনী-দরিদ্রের কাছে সমভাবে প্রিয় ছিলেন। প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও অন্যান্য সকল অসুবিধা উপেক্ষা করেও তিনি আগরতলা আশ্রমে প্রাত্যহিক আরাত্রিক ও পাক্ষিক রামনামে যোগদান করা ছাড়াও শহরের বিভিন্ন এলাকায় সাপ্তাহিক পাঠচক্র-গুলিতে উপস্থিত থাকতেন।

শ্রীশ্রীদুর্গাপূজা উপলক্ষে আমতলী মঠ থেকে দরিদ্রদের বস্ত্রদানের জন্য তিনি জীবনের শেষদিনও নিজ অর্থে অনেক বস্ত্রাদি স্বয়ং ক্রয় করেন। সেইসঙ্গে অন্যান্য শুভানুধ্যায়ীদের নিকট থেকে সংগৃহীত অর্থেও তিনি বস্ত্রাদি ক্রয় করেন। অতঃপর সন্ধ্যায় সেগুলি আশ্রমে পৌঁছে দেন। পরদিন সকালে বস্ত্রবিতরণ অনুষ্ঠানে যোগ দেওয়ার কথা ছিল তাঁর। কিন্তু সেই রাত্রেই তিনি আকস্মিক শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। শচীনবাবু মঠ ও মিশনের বহু প্রবীণ সন্ন্যাসীর সান্নিধ্যলাভ করেছেন। □

# বিজ্ঞান-সংবাদ

## সমুদ্রগর্ভে উষ্ণ প্রস্রবণের অবদান

সকলেই জানেন যে, সমুদ্রের জল লবণাক্ত। এই জলের তিন শতাংশ হচ্ছে লবণ বা সোডিয়াম ক্লোরাইড। কিন্তু নদীর জল সমুদ্রে গিয়ে লবণাক্ত হয়ে যাচ্ছে এরূপ ভাবা ঠিক হবে না, কারণ লবণ ও আম্লিক মিশ্রণ বা যৌগের (Chemical Compound) পরিমাণ নদীর ও সমুদ্রের জলে অনেক তফাত। সমুদ্র কিভাবে এইসব যৌগগুলি পায় বা কিভাবে এদের পরিমাণ বজায় রাখে, এ নিয়ে বহু আলোচনা হয়ে গিয়েছে। আটল্যান্টিক মহাসাগরের গর্ভস্থিত উষ্ণ প্রস্রবণগুলি পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে যেসব তথ্য পাওয়া যাচ্ছে তাতে মনে হচ্ছে যে, এই প্রস্রবণগুলি এ-ব্যাপারে বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ করে।

এক লিটার সমুদ্রের জলে ৩৫ গ্রাম যৌগ গলিত অবস্থায় থাকে (dissolved salts), নদীর সমপরিমাণ জলে থাকে ০'১ গ্রাম। এগুলি থাকে অণু (ion) হিসাবে। এই অণু ও যৌগগুলি হলো সোডিয়াম, ম্যাগনেসিয়াম, ক্যালসিয়াম, ক্লোরাইড, সালফেট এবং বাইকার্বোনেট। আধিক্যের ক্রম-অনুসারে সমুদ্রের জলে পাওয়া যায় সোডিয়াম, ম্যাগনেসিয়াম, ক্যালসিয়াম, ক্লোরাইড, সালফেট ও বাইকার্বোনেট। নদীর জলে এদের ক্রম—ক্যালসিয়াম, সোডিয়াম, ম্যাগনেসিয়াম, বাইকার্বোনেট, সালফেট, ক্লোরাইড। ১৯৭০ খ্রীস্টাব্দের আগে পর্যন্ত ভাবা হতো যে, সমুদ্রের জলে নদীগুলি যেসব যৌগ এনে ফেলছে, সেগুলি সমুদ্রের জল কিভাবে বা কোন্ দিকে আগে পরে দূর করছে তার ওপর সমুদ্রের জলের গঠন নির্ভর করে। এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, সমুদ্রের জলে বসবাসকারী বহু আণবিক প্রাণী বা উদ্ভিদ জল থেকে ক্যালসিয়াম নিয়ে তাদের খোলস গঠন করে; সেজন্য জলে ক্যালসিয়াম কমে যায়। আবার প্রাণী বা উদ্ভিদের মৃত শরীরও অনেক রকম যৌগকে গায়ে শুষে (adsorption) নেয়। তিরিশ বছর আগে থেকেই সমুদ্রবিষয়ক ভূ-বিজ্ঞানীরা (Marine Geologizts) সমুদ্রের নিচে অবস্থিত পর্বতশ্রেণী ধরে অনুসন্ধান চালাচ্ছিলেন।

১৯৭৭ খ্রীস্টাব্দে অ্যালভিন নামে এক বিশেষ ধরনের ডুবোজাহাজের সাহায্যে দেখা গেল যে, এক বিরাট এলাকা জুড়ে রয়েছে বৃহদাকার শামুক এবং গলদা চিংড়ি জাতীয় প্রাণীদের স্তূপ। তার পাশে দেখা গেল, ফেটে যাওয়া সমুদ্রগর্ভ থেকে উঠছে সতেরো ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড তাপের গরম কালো জল এবং সেই জলে রয়েছে নানা যৌগিক পদার্থ। সমুদ্রের যে-অংশে প্রথম এইরকম উষ্ণ প্রস্রবণ থাকা সন্দেহ করা হয়েছিল এবং যেখানে সত্যিই তা পাওয়া গেল, সমুদ্রের সেই অংশটির নাম 'গ্যালাপাগোস' (Galapagos)। দেখা গিয়েছে যে, এক-একটি ভেন্ট (vent) বা নির্গমন পথ দিয়ে এক সেকেন্ডে ৪০ কিলোগ্রাম গরম জল বের হচ্ছে এবং তারপরে তা ক্রমে ক্রমে সমুদ্রের জলে মিশে যাচ্ছে। আরও দেখা গিয়েছে, উষ্ণ জলের নির্গমন-পথের মুখের ধারে ধারে নানা খনিজ পদার্থ জমাট বেঁধে রয়েছে। সমুদ্রের নিচে এইরকম নির্গমন-পথ খোঁজার একটি সহজ পন্থা হলো জলের ম্যাঙ্গানিজের পরিমাণ নির্ণয়করণ। সমুদ্রের জলে সাধারণতঃ ম্যাঙ্গানিজ থাকে খুব কম, কিন্তু নির্গমন-পথের কাছাকাছি জলে ম্যাঙ্গানিজ পাওয়া যায় লক্ষ লক্ষ গুণ বেশি। বৈজ্ঞানিকগণ আশা করছেন যে, এই আবিষ্কারই সমুদ্রের জলের গঠনসংক্রান্ত নানা অজানা তথ্যের সন্ধান দেবে। এই আবিষ্কারকে কেন্দ্র করে নানা ধরনের গবেষণা আরম্ভ হয়েছে। □

[ New Scientists,
13 June, 1992, pp. 31-35 ]

বিশ্বব্যাপী চৈতন্যই ঈশ্বর। সেই বিশ্বব্যাপী চৈতন্যকেই লোকে প্রভু, ভগবান, খ্রীস্ট, বুদ্ধ বা ব্রহ্ম বলিয়া থাকে—জড়বাদীরা উহাকেই শক্তিরূপে উপলব্ধি করে এবং অজ্ঞেয়বাদীরা ইহাকেই সেই অনন্ত অনির্বচনীয় সর্বাতীত বস্তু বলিয়া ধারণা করে। উহাই সেই বিশ্বব্যাপী প্রাণ, উহাই বিশ্বব্যাপী চৈতন্য, উহাই বিশ্বব্যাপিনী শক্তি এবং আমরা সকলেই উহার অংশস্বরূপ।

স্বামী বিবেকানন্দ

উদ্বোধনের মাধ্যমে প্রচার হোক
এই বাণী। শ্রীসুশোভন চট্টোপাধ্যায়

এন্টিফ্লজিস্টিন
কার্বঙ্কল, ফোঁড়া, চুলকানিযুক্ত ঘা, পোড়া
বা পোড়ার ঘা, প্রভৃতি কঠিন পীড়া
কেবল লাগাইলেই সারিয়া যায়।

স্বামী বিবেকানন্দ প্রবর্তিত, রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের একমাত্র বাঙলা মুখপত্র, চুরানব্বই বছর ধরে নিরবচ্ছিন্নভাবে প্রকাশিত দেশীয় ভাষায় ভারতের প্রাচীনতম সাময়িকপত্র

# সূচিপত্র ৯৫তম বর্ষ আষাঢ় ১৪০০ (জুন ১৯৯৩) সংখ্যা



♣ ♣


সম্পাদক ☐ স্বামী পূর্ণাত্মানন্দ

৮০/৬, গ্রে স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০ ০০৬-স্থিত বসুশ্রী প্রেস থেকে বেলুড় শ্রীরামকৃষ্ণ মঠের ট্রাস্টীগণের পক্ষে স্বামী সত্যব্রতানন্দ কর্তৃক মুদ্রিত ও ১ উদ্বোধন লেন, কলকাতা-৭০০ ০০৩ থেকে প্রকাশিত।

প্রচ্ছদ মুদ্রণ : স্বপ্না প্রিন্টিং ওয়ার্কস (প্রাঃ) লিমিটেড, কলকাতা-৭০০ ০০৯

আজীবন গ্রাহকমূল্য (৩০ বছর পর নবীকরণ-সাপেক্ষ) ☐ এক হাজার টাকা (কিস্তিতেও প্রদেয়—প্রথম কিস্তি একশো টাকা) ☐ সাধারণ গ্রাহকমূল্য ☐ বৈশাখ থেকে পৌষ সংখ্যা ☐ ব্যক্তিগতভাবে সংগ্রহ ☐ পঁয়ত্রিশ টাকা ☐ সডাক ☐ একচল্লিশ টাকা ☐ বর্তমান সংখ্যার মূল্য ☐ ছয় টাকা

# আবেদন

সুধী,

'আত্মনো মোক্ষার্থং জগদ্ধিতায় চ'— এই মহামন্ত্রকে আলোকবর্তিকার মতো সামনে রেখে **রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশন, বেলুড় মঠ** প্রতিষ্ঠিত হয়। জগজ্জননী শ্রীশ্রীসারদাদেবীর সম্মতিক্রমে ১৯১৪ খ্রীস্টাব্দে শ্রীরামকৃষ্ণের অন্তরঙ্গ পার্ষদ পরম পূজ্যপাদ স্বামী প্রেমানন্দজী মহারাজের মালদায় শুভ পদার্পণে মালদাবাসী ধন্য হন। তাঁরই অনুপ্রেরণায় এই অঞ্চলে শ্রীরামকৃষ্ণের ভাবধারা এক মহৎ উদ্দীপনার সঞ্চার করে, যার ফলশ্রুতিতে ১৯২৪ খ্রীস্টাব্দে **রামকৃষ্ণ মঠ, মালদা** বেলুড় মঠের একটি শাখাকেন্দ্ররূপে আত্মপ্রকাশ করে। **রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশন, মালদা** শিক্ষাবিস্তারে ও জনসেবা-মূলক কাজে নিরলসভাবে ব্রতী। এই সেবামূলক কার্যের মূল প্রেরণা শ্রীরামকৃষ্ণদেব, শ্রীসারদাদেবী ও স্বামী বিবেকানন্দের ভাবধারা।

আধ্যাত্মিক চেতনার সমৃদ্ধিসাধনে পূজনীয় স্বামী গদাধরানন্দজী ও স্বামী পরশিবানন্দজী প্রমুখ সন্ন্যাসী এবং ভক্তবৃন্দের উদ্যোগে রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশন, বেলুড় মঠের অধ্যক্ষ পরম পূজ্যপাদ স্বামী বিশুদ্ধানন্দজী, স্বামী মাধবানন্দজী, স্বামী বীরেশ্বরানন্দজী, স্বামী গম্ভীরানন্দজী ও স্বামী ভূতেশানন্দজী বিভিন্ন সময়ে এবং সম্প্রতি বেলুড় মঠের অন্যতম সহাধ্যক্ষ পরম পূজ্যপাদ স্বামী গহনানন্দজী এই আশ্রমে শুভ পদার্পণ করেন। সূচনা থেকে মঠের মন্দিরে পূজা, পাঠ, আরাত্রিক ভজন, শাস্ত্রাদি আলোচনা এবং ধ্যান-জপ নিয়মিত হয়ে থাকে।

মন্দির-প্রতিষ্ঠাকালে আর্থিক অভাবহেতু নাটমন্দির এবং গর্ভগৃহের সুদৃঢ় ভিত গড়ে তোলা সম্ভব হয়নি। ফলে বিগত কয়েক বছরের বন্যায় এই মন্দির ভগ্নদশায় পরিণত। স্বল্প-পরিসর এবং চারদিক খোলা নাটমন্দিরের কিছু অংশ টিনের ছাউনী দেওয়া ও জরাজীর্ণ— যা পূজা-অর্চনা ও ধ্যান-ধারণার পক্ষে সহায়ক নয়। প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও বন্যায় এই গুরুত্বপূর্ণ পবিত্র স্থানের সমূহ ক্ষতির সম্ভাবনা রয়েছে। মেরামতির জন্য প্রচুর অর্থব্যয় করেও আশানুরূপ ফল না পাওয়ায় বিশেষজ্ঞদের পরামর্শে এবং ভক্তবৃন্দের ঐকান্তিক ইচ্ছায় **শ্রীরামকৃষ্ণদেবের নতুন মন্দিরনির্মাণে আমরা ব্রতী হয়েছি।**

এই শুভ ও মহৎ পরিকল্পনার বাস্তব রূপায়ণের জন্য অন্ততঃ **১৬,০০,০০০ ( ষোল লক্ষ ) টাকার** প্রয়োজন। সহৃদয় জনসাধারণের কাছে মুক্তহস্তে দান করার জন্য আমরা আন্তরিকভাবে আবেদন জানাই।

অনুগ্রহ করে আপনার দান নগদে বা চেক, ড্রাফট-এর মাধ্যমে **রামকৃষ্ণ মঠ, মালদা**— এই নামে পাঠাতে অনুরোধ করি। আপনার সমুদয় আর্থিক দান **আয়কর বিভাগের ১৯৬১ খ্রীস্টাব্দের আইনের ৮০জি ধারা অনুসারে আয়করমুক্ত।**

সকলের সর্বাঙ্গীণ সহযোগিতা একান্তভাবে প্রার্থনা করি। ইতি—

বিনীত
**স্বামী মঙ্গলানন্দ**
**অধ্যক্ষ**
**রামকৃষ্ণ মঠ, মালদা**

১৬ জুন, ১৯৯৩

# উদ্বোধন

আষাঢ় ১৪০০ জুন ১৯৯৩ ৯৫তম বর্ষ—৬ষ্ঠ সংখ্যা


## দিব্য বাণী

আমরা শুধু সকল ধর্মকে সহ্য করি না, সকল ধর্মকেই আমরা সত্য বলিয়া বিশ্বাস করি।

স্বামী বিবেকানন্দ

## কথাপ্রসঙ্গে

## কন্যাকুমারীতে স্বামীজীর উপলব্ধি: সহন ও গ্রহণের পীঠভূমি ভারত

ভারত-ইতিহাসের অনুসন্ধানী পাঠক ও ছাত্র হিসাবে স্বামীজী জানিয়াছিলেন ভারতবর্ষের বিচিত্র ঐতিহ্যের কথা। জানিয়াছিলেন, বৈচিত্র্যের মধ্যে ভারতবর্ষ কিভাবে সহস্র সহস্র বৎসর ধরিয়া ঐক্যের সন্ধান করিয়াছে এবং কিভাবে ঐক্যের সাধনাকে তাহার সংস্কৃতির অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য করিয়া তুলিয়াছে। ভারতবর্ষের এই সংস্কৃতির প্রভাব স্বামীজী তাঁহার পূর্বাশ্রমেও সুস্পষ্টভাবে অনুভব করিয়াছিলেন। বাড়ির পরিবেশ, তাঁহার পিতা ও মাতার বিশ্বাস, আচরণ এবং ধ্যান-ধারণায় ঐ বৈশিষ্ট্য তিনি আশৈশব এমনভাবে লক্ষ্য করিয়াছিলেন যে, উহা তাঁহার মানসিক গঠনের সহিত একাত্ম হইয়া গিয়াছিল। প্রথম যৌবনে যখন তিনি পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ সমন্বয়াচার্য শ্রীরামকৃষ্ণের সান্নিধ্যে আসিলেন এবং ক্রমে তাঁহার নিকট নিজেকে সমর্পণ করিলেন তখন দেখিলেন শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনে ভারতের সহস্র সহস্র বৎসরের সমন্বয়ী ঐতিহ্য কিভাবে সাকার হইয়া উঠিয়াছে। এইভাবে গৃহের আবেষ্টনী, অধ্যয়ন এবং গুরুর সান্নিধ্য ভারতীয় সংস্কৃতির একটি প্রধান ঐতিহ্যের সহিত তাঁহাকে পরিচিত করাইয়াছিল।

গুরুর তিরোধানের পর যখন তিনি প্রব্রজ্যা ও তপস্যায় এবং পরিশেষে তাঁহার সুবিখ্যাত 'ভারত-পরিক্রমা'য় বহির্গত হইয়াছিলেন তখন দেখিয়াছিলেন ভারতের সর্বশ্রেণীর ও সর্বসম্প্রদায়ের মানুষের বিশ্বাস, আচরণ ও ধ্যান-ধারণাকে কিভাবে ভারতের সমন্বয়ী ঐতিহ্য প্রত্যক্ষভাবে এবং পরোক্ষভাবে প্রভাবিত করিয়াছে। ইহা তিনি শুধু যে নিজের চোখেই দেখিয়াছিলেন তাহা নহে, তাঁহার হৃদয় দিয়া অনুভবও করিয়াছিলেন। শুধু তাহাই নহে, ভারতের মাটি, পাহাড়, নদ-নদী, অরণ্যে—এক-কথায় ভারতের সমগ্র বাতাবরণের মধ্যে অপরকে সহ্য করিবার, অপরকে গ্রহণ করিবার মহান্ উদার মানসিকতা অঙ্গাঙ্গিভাবে যুক্ত হইয়া রহিয়াছে বলিয়া তিনি ঐকালে অনুভব করিয়াছিলেন। অনুভব করিয়াছিলেন, ঝরনার কলস্বরে, বৃক্ষপত্রের মর্মরে, পাখির কূজনেও যেন উহার ধ্বনি উঠিতেছে। বিভেদ এবং বৈষম্য কি তিনি দেখেন নাই, দ্বন্দ্ব এবং সংঘাত কি তিনি দেখেন নাই, অসহিষ্ণুতা এবং মতান্ধতার পরিচয় কি তিনি পান নাই? অবশ্যই দেখিয়াছেন। অবশ্যই পাইয়াছেন। কিন্তু তিনি দেখিয়াছেন সকল বিভেদ-বৈষম্য, সকল দ্বন্দ্ব-সংঘাত, সকল অসহিষ্ণুতা ও মতান্ধতাকে ছাড়াইয়া, ছাপাইয়া যে-ভাব, যে-আকাঙ্ক্ষা, যে-আর্তি ভারতের মানুষকে, ভারতের পরিমণ্ডলকে, ভারতের সংস্কৃতিকে আপ্লুত করিয়া রাখিয়াছে তাহা হইল সহন এবং গ্রহণের ভাব, সহন এবং গ্রহণের আকাঙ্ক্ষা, সহন এবং গ্রহণের আর্তি।

এই দৃষ্টি, এই অভিজ্ঞতা এবং এই অনুভূতি বক্ষে ও মস্তিষ্কে ধারণ করিয়া আসমুদ্রহিমাচল পরিক্রমান্তে তিনি আসিয়া উপস্থিত হইলেন ভারতের দক্ষিণতম প্রান্তে কন্যাকুমারীর সর্বশেষ শিলাভূমিতে। ভারতপথিক বিবেকানন্দের ভারত-পরিক্রমা এবং কন্যাকুমারীতে আগমন প্রসঙ্গে মনীষী

রোমাঁ রোলাঁ অপূর্ব ভাষায় লিখিয়াছেন: "He had traversed the vast land of India upon the soles of his feet. For two years his body had been in constant contact with its great body.··· At last his task was at an end, and then, looking back as from a mountain he embraced the whole of India he had just traversed, and the world of thought that had beset him during his wanderings". (The Life of Vivekananda, 1979, p. 28) [তিনি সুবিশাল ভারত-ভূখণ্ড পদব্রজে পরিক্রমা করিয়াছেন। দুই বৎসর ধরিয়া তাঁহার দেহ অনুক্ষণ ভারতের মহা-দেহের সংস্পর্শে আসিয়াছে।··· অবশেষে তাঁহার পরিক্রমা সমাপ্ত হইল এবং তিনি যেন পর্বতশিখরে দাঁড়াইয়া সমগ্র ভারতভূমিকে প্রত্যক্ষ করিলেন, যে-ভূমি তিনি সবেমাত্র পর্যটন করিয়া আসিয়াছেন। পরিক্রমাকালে যেসকল চিন্তা তাঁহার মনে জাগিয়াছিল, সেগুলি তাঁহার মনে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল।]

ইহার পর তিনি যখন শিলাভূমিতে ধ্যানমগ্ন হইলেন তখন সুবিশাল ভারতভূখণ্ড তাঁহার চেতনাকে অধিকার করিয়া রহিল। ধ্যানের স্বচ্ছ আলোকে তাঁহার এতদিনের বিশ্বাস, ধারণা, জ্ঞান, অভিজ্ঞতা এবং অনুভূতি এক নূতন ও গভীর মাত্রা লাভ করিল। উহার এখন উপলব্ধির স্তরে উত্তরণ ঘটিল। সেই কোন্ প্রাগৈতিহাসিক যুগ হইতে, যখন ভারতবর্ষে বৈদিক সভ্যতারও বিকাশলাভ ঘটে নাই, ভারতের সভ্যতা কোন্ খাতে প্রবাহিত হইতে শুরু করিয়াছে তাহা তিনি প্রত্যক্ষ করিলেন। দেখিলেন, দ্রাবিড় ও উহার পূর্বতন সভ্যতা কিভাবে আর্য বা বৈদিক সভ্যতার সহিত মত-বিনিময় করিয়াছে, কিভাবে বিভেদ ও বৈষম্যকে অতিক্রম করিয়া একে অপরকে অথবা অপরসকলকে সহ্য করিয়া, গ্রহণ করিয়া ভারত-বর্ষকে একটি সমন্বিত সভ্যতা ও সংস্কৃতির পীঠভূমি-রূপে নির্মাণ করিবার ভিত্তি স্থাপন করিয়াছে। ধ্যানের আলোকে তিনি ভারতের এই অনন্য বৈশিষ্ট্যকে আবিষ্কার করিলেন। তিনি আবিষ্কার করিলেন ভারতের সেই অপূর্ব জীবনদর্শন যাহা অপরকে ছাড়াইয়া [illegible]তে অবশ্যই প্রেরণা দেয়, কিন্তু কখনও কাহাকেও মাড়াইয়া যাইতে বলে না।

স্বামীজী আরও আবিষ্কার করিলেন যে, ভারতবর্ষের এই অপূর্ব ঐতিহ্যের মূলে রহিয়াছে তাহার নিজস্ব "স্বাঙ্গীকরণ পদ্ধতি" এবং ভারতবর্ষে "সুদূর অতীত হইতে এই প্রচেষ্টা চলিয়া আসিতেছে"। (বাণী ও রচনা, ৫ম খণ্ড, ১৩৬৯, পৃঃ ৩৭৯) "স্বাঙ্গীকরণ" বলিতে কি বুঝায় আমরা জানি— বিজাতীয় বা বিরুদ্ধ কোন বস্তু বা ভাবকে নিজের অঙ্গের বা দেহের অংশীভূত করিয়া লওয়া। ভারতীয় ঐতিহ্যের বৈশিষ্ট্য বুঝাইতে স্বামীজীই সম্ভবতঃ সর্বপ্রথম এই অপূর্ব শব্দটি ব্যবহার করিয়াছিলেন। ঐ একই প্রসঙ্গে স্বামীজী আরও একটি অনবদ্য শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন। শব্দটি হইল "আত্মসাৎ"। স্বামীজী তাঁহার ধ্যাননেত্রে দেখিয়া-ছিলেন, ভারতবর্ষ তাহার বিশাল বিরাট হৃদয়ে সবাইকে শুধু স্থানই দেয় নাই, সবাইকে তাহার অঙ্গের অংশ করিয়া লয় নাই, সবাইকে আত্মসাৎ করিয়াও লইয়াছে। এবং স্বামীজী আবিষ্কার করিলেন— "ইহাই ভারতবর্ষের ইতিহাস।" (ঐ, পৃঃ ৩৭৮)

সমগ্র পৃথিবীর মধ্যে অপর যেকোন দেশ অথবা জাতির অপেক্ষা ভারতবর্ষের সুদীর্ঘ ইতিহাসেই শুধু এই মহান্ উদার মানসিকতার পরিচয় পাওয়া যায়। ধ্যানোত্থিত সন্ন্যাসী তাঁহার সদ্যলব্ধ উপলব্ধির আলোকে স্থির করিলেন যে, জগৎকে ভারতের এই মহান্ ঐতিহ্যের অংশীদার করিতে হইবে। জগৎকে এই সহিষ্ণুতা ও গ্রহীষ্ণুতার বাণী শোনাইতে হইবে, এই ভাব ও আদর্শ জগৎকে শিক্ষা দিতে হইবে। পৃথিবীর বুকে যে হানাহানি, রেষারেষি, সংঘাত, সংঘর্ষ চলিতেছে এবং সুদীর্ঘকাল ধরিয়া চলিয়া আসিতেছে, উহার নিরসন করিতে হইলে এই বাণী, এই ভাব ও আদর্শ ভিন্ন গত্যন্তর নাই। পরবর্তী কালে যখন নিম্নে উল্লিখিত কথাগুলি স্বামীজী বলিয়াছিলেন তখন, বলা বাহুল্য, তাঁহার ঐ উপ-লব্ধির উপর ভিত্তি করিয়াই তিনি বলিয়াছিলেন:

"ভারত জগৎকে কোন্ তত্ত্ব শিখাইবে, তাহা বলিতেছি।··· ভারতের ও সমগ্র জগতের সৌভাগ্যক্রমে এই অশান্তি-কোলাহলের মধ্য হইতে 'একং সদ্বিপ্রা বহুধা বদন্তি' (ঋগ্বেদ, ১।১৬৪।৪৬)— একমাত্র সৎ-স্বরূপই আছেন, জ্ঞানী ঋষিগণ তাঁহাকে নানা প্রকারে বর্ণনা করিয়া থাকেন—এই মহাবাণী [ভারতে] উত্থিত হইয়াছিল।··· নাম বিভিন্ন, কিন্তু বস্তু এক।

পূর্বোক্ত কয়েকটি কথার মধ্যে ভারতের সমগ্র ইতিহাস পাঠ করিতে পারা যায়। সমগ্র ভারতের বিস্তারিত ইতিহাস ওজস্বী ভাষায় সেই এক মূল-তত্ত্বের পুনরুক্তিমাত্র। এই দেশে এই তত্ত্ব বারবার উচ্চারিত হইয়াছে, পরিশেষে উহা এই জাতির রক্তের সহিত মিশিয়া গিয়াছে, এই জাতির ধমনীতে প্রবাহিত প্রতিটি শোণিত-বিন্দুতে উহা মিশ্রিত হইয়া শিরায় শিরায় প্রবাহিত হইয়াছে— জাতীয় জীবনের উপাদানস্বরূপ হইয়া গিয়াছে, যে-উপাদানে এই বিরাট জাতীয় শরীর নির্মিত, তাহার অংশস্বরূপ হইয়া গিয়াছে। এইরূপে এই ভারতভূমি পরধর্ম-সহিষ্ণুতার এক অপূর্ব লীলা-ক্ষেত্রে পরিণত হইয়াছে। এই শক্তিবলেই আমরা আমাদের এই প্রাচীন মাতৃভূমিতে সকল ধর্মকে, সকল সম্প্রদায়কে সাদরে ক্রোড়ে স্থান দিবার অধিকার লাভ করিয়াছি।" (ঐ, পৃঃ ১১-১২)

"নৃতাত্ত্বিক সংগ্রহশালা" ভারতবর্ষে সুদূর অতীতকাল হইতেই অগণিত সম্প্রদায় বর্তমান। পরবর্তী কালেও বহিরাগত নানা সম্প্রদায় আসিয়া এখানে আশ্রয়লাভ করিয়াছে। একটি সম্প্রদায়ের সহিত আরেকটি সম্প্রদায়ের কত পার্থক্য—কখনও কখনও একটি অপরটি হইতে সম্পূর্ণ বিপরীত-ধর্মীও! অথচ সহস্র সহস্র বৎসর ধরিয়া সম্প্রদায়-গুলি এখানে নির্বিরোধে বাস করিয়া আসিতেছে। ইহা বাস্তবিকই একটি "অপূর্ব ব্যাপার", পৃথিবীর ইতিহাসে ইহার দ্বিতীয় কোন দৃষ্টান্ত আর নাই। পাশ্চাত্য দেশে তথাকথিত শিক্ষা, বিদ্যা ও সভ্যতার বহুল প্রচার সত্ত্বেও সেখানে পরমত-অসহিষ্ণুতা অত্যন্ত প্রকট। সেখানে কেহ কাহারও মতকে স্বীকার তো দূরের কথা, সহ্য করিতেই প্রস্তুত নহে। প্রত্যেকেই সেখানে স্ব-স্বপ্রধান এবং একে অন্যের উপর নিজের মত চাপাইয়া দিতে এবং উহাকে অপরের মত অপেক্ষা, এমনকি অপরসকলের মতঃ অপেক্ষা মহত্তর বলিয়া প্রতিষ্ঠা করিতে সদা-তৎপর। ইহার ফলে পাশ্চাত্যের ব্যক্তিজীবনে, পারিবারজীবনে, সমাজজীবনে, কর্মজীবনে এবং জাতীয়জীবনে অশান্তি অপরিহার্য একটি সমস্যা।

পাশ্চাত্যগমনের পূর্বে পাশ্চাত্যজীবন সম্পর্কে স্বামীজীর প্রত্যক্ষ ধারণা ছিল না সত্য, কিন্তু কন্যা-কুমারীর ধ্যান যেমন ভারতের চিরায়ত ঐতিহ্যকে, চিরন্তন ভারতকে তাঁহার মানসনেত্রের সম্মুখে উন্মোচিত করিয়াছিল, তেমনই পাশ্চাত্যের আত্মিক প্রয়োজন এবং পাশ্চাত্যের সমাজ ও সভ্যতার দুর্বলতাকেও উন্মোচিত করিয়াছিল। কারণ, যে-বাণী ও আদর্শ তিনি ইহার পর পাশ্চাত্যের সম্মুখে উপস্থাপন করিবেন উহাতে শুধু ভারতের নহে, পাশ্চাত্য তথা সমগ্র জগতের কল্যাণ নিহিত। উহার জন্যই যুগাবতার তাঁহাকে তিল তিল করিয়া নির্মাণ করিয়াছিলেন এবং উহার জন্যই যুগাবতার-নির্দিষ্ট তাঁহার ভারত-পরিক্রমা এবং বিশ্ব-পরিক্রমা। আমরা এখানে শ্রীরামকৃষ্ণের স্বহস্ত-লিখিত ঘোষণাপত্রটি স্মরণ করিতেছি : "নরেন শিক্ষা দিবে। যখন ঘরে বাহিরে হাঁক দিবে।" বিবেকানন্দের 'হাঁক' বা আহ্বান সমগ্র জগতের মানুষের চৈতন্য সম্পাদনের জন্য, জগতের সকল মানুষকে উত্তোলন করিবার জন্য। পাশ্চাত্য-ভূখণ্ডের সহিত প্রত্যক্ষভাবে পরিচিত হইয়া পাশ্চাত্যের চরিত্র তিনি সম্যক্‌ভাবে অবহিত হইয়াছিলেন সন্দেহ নাই, কিন্তু পাশ্চাত্যে পদার্পণের পূর্বেই কন্যাকুমারীতে তিনি ধ্যানের আলোকে জানিয়াছিলেন— আত্মকেন্দ্রিকতা ও পরমত-অসহিষ্ণুতা পাশ্চাত্যকে ধ্বংসের মুখে দাঁড় করাইয়া দিবে। উহা হইতে পাশ্চাত্যকে রক্ষা করিতে হইবে। পরে পাশ্চাত্যসমাজকে স্বচক্ষে দেখিয়া স্বামীজীর মনে হইয়াছিল, সমগ্র পাশ্চাত্যজগৎ যেন "একটি আগ্নেয়গিরির উপর অবস্থিত" এবং যেকোন মুহূর্তে উহা "ফাটিয়া চূর্ণবিচূর্ণ হইয়া যাইতে পারে।" (ঐ, পৃঃ ১৭২, ৫১-৫২) সেই ধ্বংস হইতে পাশ্চাত্য তথা পৃথিবীকে রক্ষা করিতে পারে একমাত্র সহিষ্ণুতা ও গ্রহীষ্ণুতার আদর্শই। স্বামীজীর হৃদয়ে এই সত্য উদ্ভাসিত হইল যে, পৃথিবীর পক্ষে ভারতের ঐ উদার শিক্ষার তাই একান্ত প্রয়োজন— ভারতের নিকট পৃথিবীকে অপরের মতের প্রতি শুধু সহিষ্ণুতাই নহে, অপরের মতের প্রতি সহানুভূতি, শ্রদ্ধা এবং স্বীকার করিবার ঔদার্যের আদর্শ শিক্ষা করিতে হইবে। (দ্রঃ ঐ, পৃঃ ১৩)

ঐ আদর্শ মানুষের মন হইতে ভেদকে নির্মূল করিবে, বিসম্বাদকে উৎপাটন করিয়া দিবে। কিন্তু ঐ আদর্শের "লীলাক্ষেত্র" ভারতবর্ষেই কি উহা সম্ভব হইয়াছে? তাহা তো হয় নাই। ইহার উত্তরও স্বামীজী দিয়াছেন। তিনি বলিলেন :

"[ পৃথিবী হইতে ] সর্ববিধ ভেদ দূরীভূত হইবে, ইহা অসম্ভব। ভেদ থাকিবেই। বৈচিত্র্য ব্যতীত জীবন অসম্ভব। চিন্তারাশির এই সংঘর্ষ ও বৈচিত্র্যই জ্ঞান, উন্নতি প্রভৃতি সকলের মূলে। পৃথিবীতে অসংখ্য পরস্পরবিরোধী ভাবসমূহ থাকিবেই। কিন্তু তাহা বলিয়া যে পরস্পরকে ঘৃণা করিতে হইবে, পরস্পর বিরোধ করিতে হইবে, তাহার কোন প্রয়োজন নাই।" ( ঐ, পৃঃ ১৪ )

কিভাবে ঘৃণা দূর করা যায়, কিভাবে পরস্পরের মধ্যে বিরোধ নাশ করা যায় এবং কিভাবে পৃথিবীকে অধিকতর বাসযোগ্য করিয়া তোলা যায় সেই পথের সন্ধান সুস্পষ্টভাবে তিনি লাভ করিলেন কন্যাকুমারীর শিলাভূমিতে। সেই পথ হইল জগতের সমক্ষে সহন ও গ্রহণের পীঠভূমি ভারতবর্ষকে উপস্থাপন। স্বামীজী বলিলেন: "ভারতকে জগতের সমক্ষে এই সত্য প্রচার করিতে হইবে।... এই সত্য শুধু যে আমাদের শাস্ত্রগ্রন্থে নিবন্ধ তাহা নয়, আমাদের জাতীয় সাহিত্যের প্রত্যেক বিভাগে, আমাদের জাতীয় জীবনে ইহা অনুপ্রবিষ্ট হইয়া রহিয়াছে। এখানে— কেবল এখানেই ইহা প্রাত্যহিক জীবনে অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে, আর চক্ষুষ্মান্ ব্যক্তিমাত্রেই স্বীকার করিবেন যে, এখানে ছাড়া আর কোথাও ইহা কার্যে পরিণত করা হয় নাই।... 'একং সদ্বিপ্রা বহুধা বদন্তি'।" ( ঐ, পৃঃ ১৪-১৫ )

স্বামীজী তাঁহার ধ্যানে ভারতের অতীত ঐতিহ্যকে যেমন আবিষ্কার করিলেন, তেমনি আবিষ্কার করিলেন, নানা বিপর্যয় সত্ত্বেও নানা ধর্ম ও সংস্কৃতির বিচিত্র সমাবেশে বর্তমান ও ভবিষ্যৎ ভারতও "বৈচিত্র্যের মধ্যে একত্ব লইয়া বিরাজিত এক অখণ্ড সত্তা"। স্বামীজীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ জীবনীকার স্বামী গম্ভীরানন্দ লিখিয়াছেন: "তাঁহার ( স্বামীজীর ) শান্ত সমাহিত বিশুদ্ধ চিত্তে এই বাণীই ধ্বনিত হইল, 'যে প্রগাঢ় আধ্যাত্মিক অনুভূতি-প্রভাবে ভারতবর্ষ একদিন বিভিন্ন সংস্কৃতির ও বিভিন্ন ধর্মের জন্মভূমি ও মিলনক্ষেত্রে পরিণত হইয়াছিল, একমাত্র সেই অনুভূতিবলেই [ভারতের] পুনরভ্যুত্থান ও পুনঃপ্রতিষ্ঠা সম্ভবপর'।" ( যুগনায়ক বিবেকানন্দ, ১ম খণ্ড, ৫ম সং, পৃঃ ৩১৮ ) স্বামীজী আরও জানিলেন, সেই পুনরভ্যুত্থান ও পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্যই শ্রীরামকৃষ্ণের আবির্ভাব।

শুধু ভারতের পুনরভ্যুত্থান নহে, জগতের পুনরভ্যুত্থানও ভারতের ঐ সমন্বয়-আদর্শের উপর নির্ভরশীল। ধর্মমহাসভায়— যে-ধর্মমহাসভা জীবন্ত-রূপ পরিগ্রহ করিয়াছিল তাঁহার আচার্য শ্রীরামকৃষ্ণের মধ্যে—সেই বাণীই তিনি তাঁহার প্রথম ভাষণেই উপস্থাপন করিয়াছিলেন। বলিলেন: "পরস্পরকে বুঝ। পরস্পরকে গ্রহণ কর।"

রোমাঁ রোলাঁ লিখিতেছেন: "তাঁহার সেই ভাষণ ছিল যেন লেলিহান অগ্নিশিখা। নিষ্প্রাণ তত্ত্ব-আলোচনার ধূসর প্রান্তরে তাহা সমবেত মানুষের আত্মায় আগুন ধরাইয়া দিল।" ( দ্রঃ The Life of Vivekananda, p. 37 )

স্বামীজী বলিলেন, সেই বুঝা এবং গ্রহণের ভিত্তি হইবে ধর্ম, আধ্যাত্মিক মূল্যবোধ এবং ঈশ্বর। স্বামীজীর পূর্বেও অন্যান্য সম্প্রদায়ের বক্তারা ধর্মের কথা বলিয়াছিলেন, আধ্যাত্মিক মূল্যবোধের কথা বলিয়াছিলেন, বলিয়াছিলেন ঈশ্বরের কথাও। কিন্তু সেই ধর্ম, সেই মূল্যবোধ, সেই ঈশ্বর তাঁহাদের স্ব-স্ব সম্প্রদায়ের ধর্ম, স্ব-স্ব সম্প্রদায়ের মূল্যবোধ এবং স্ব-স্ব সম্প্রদায়ের ঈশ্বর। বিবেকানন্দ— শুধু বিবেকানন্দই সকলের ধর্মের কথা বলিলেন, সকলের মূল্যবোধের কথা বলিলেন, সকলের ঈশ্বরের কথা বলিলেন। তিনি সকলের আকাঙ্ক্ষাকে এক অসীম, অনন্ত "বিশ্বসত্তায়" মিলাইয়া দিলেন। ইহাই ছিল শ্রীরামকৃষ্ণের অভিপ্রায়। রোমাঁ রোলাঁ লিখিয়াছেন: "ইহা ছিল রামকৃষ্ণের নিঃশ্বাস, সমস্ত বাধা অতিক্রম করিয়া তাহা তাঁহার মহান্ শিষ্যের মুখ দিয়া নির্গত হইল।" ( ঐ, পৃঃ ৩৮ ) ❏

**গত ৩১ মে ১৯৯৩ থেকে ২ জুন ১৯৯৩ পর্যন্ত তিনদিনব্যাপী নানা অনুষ্ঠানসূচীর মাধ্যমে কাঁকুড়গাছি রামকৃষ্ণ যোগোদ্যান মঠ বিশ্বধর্মমহাসভায় স্বামীজীর অভিযাত্রার শতবর্ষপূর্তি-উৎসব পালন করেছে। মঠ ও মিশনের অধ্যক্ষ শ্রীমৎ স্বামী ভূতেশানন্দজী মহারাজের শুভেচ্ছাবাণী পাঠের পর উৎসবের উদ্বোধন করেন মঠ ও মিশনের অন্যতম সহাধ্যক্ষ শ্রীমৎ স্বামী গহনানন্দজী মহারাজ এবং প্রথম দিনের সভায় সভাপতিত্ব করেন মঠ ও মিশনের সাধারণ সম্পাদক শ্রীমৎ স্বামী আত্মস্থানন্দজী মহারাজ। বিস্তৃত সংবাদ পরের সংখ্যায়।—সম্পাদক, উদ্বোধন**

# স্বামী তুরীয়ানন্দের অপ্রকাশিত পত্র*

॥ ৩৯ ॥

হৃষীকেশ
৩১. ১. (১৯)১৪

প্রিয় কালীকৃষ্ণ,

তোমার এই মাসের ১৪ তারিখের প্রীতিপূর্ণ পোস্টকার্ড আমি সময়মতই পাইয়াছি এবং এই কয়েক বৎসর যাবৎ কাজে নিযুক্ত থাকিবার পর বিশ্রাম গ্রহণ করিয়া অনেক সুস্থবোধ করিতেছ জানিয়া যথার্থ আনন্দিত হইয়াছি। তুমি আধ্যাত্মিক অনুভূতিলাভের জন্য নিজেকে সামগ্রিকভাবে নিযুক্ত করিতে চাহ জানিয়া সন্তুষ্ট হইলাম। পূর্বে একাধিকবার চেষ্টা করিয়াও যেকোন কারণেই হউক খুব ভালভাবে তুমি উহাতে সফল হইতে সমর্থ হও নাই। ইহা জানিয়া বাস্তবিক খুব তৃপ্তিলাভ করিলাম যে, এই সময় তুমি অনুকূল আবহাওয়া এবং "মাদার"[১]-এর দয়া ও মাতৃসুলভ স্নেহের সুবাদে তোমার পরিকল্পনানুযায়ী সাধনার জন্য একটি উপযুক্ত স্থান ও যথাযথ সাহায্যলাভে সমর্থ হইবে। কিন্তু আজ হইতে এক বৎসরের মধ্যে মাদার ইংল্যান্ডে চলিয়া যাইতে চাহেন জানিয়া খুব দুঃখিত হইলাম। আশা করি, তথায় তাঁহার যাওয়া চিরতরে নহে, পূর্ব পূর্ব বারের ন্যায় সাময়িকই হইবে এবং তিনি পরে পুনরায় আমাদের কাছে—তাঁহার পুত্রগণের কাছে—ফিরিয়া আসিবেন, যাহারা অবশ্য কোনমতেই তাঁহার স্নেহের যোগ্য নয়। অনুগ্রহ করিয়া তাঁহাকে আমার প্রীতিপূর্ণ শ্রদ্ধা এবং সম্ভাষণ জানাইবে। তোমার নূতন আশ্রমে, যাহা তুমি শীঘ্রই শুরু করিতে যাইতেছ, উপস্থিত হইবার নিমন্ত্রণের জন্য তোমাকে ধন্যবাদ। মা তোমার মহৎ উদ্দেশ্য সাধন করিতে এবং উহাতে কৃতকার্য হইতে তোমার সহায় হউন। স্বামীজীর জীবনীর[২] তৃতীয় খণ্ডের প্রকাশের আশায় অনেকেই ব্যগ্রভাবে অপেক্ষা করিতেছেন। আমি বিশ্বাস করি, অত্যন্ত জরুরী কারণে বাধ্য না হইলে বেশিদিন তাঁহাদের অনিশ্চয়তার মধ্যে ফেলিয়া রাখিবে না। স্বামীজীর জীবনীর তৃতীয় খণ্ডটি বিশেষভাবে আকর্ষণীয় হইবে বলিয়া মনে করি। কারণ, উহার মধ্যে তাঁহার মর-পৃথিবীতে অনন্য এবং অসাধারণ যুগন্ধর জীবন ও বাণীর শেষ ও অন্তিম অংশ বিধৃত হইতে চলিয়াছে।

আমার অনুমান, নবাগতরা তাহাদের কর্ম এবং স্থান সকল দিক হইতে অনুকূল বোধ করিতেছে এবং তাহারা সেখানে[৩] পরম আনন্দ পাইতেছে।

আমার স্বাস্থ্য প্রতিদিনই খারাপ হইতেছে। কিন্তু কিই-বা করা যাইবে? মায়ের যাহা ইচ্ছা তাহাই হইবে। ব্রহ্মচারীরা এখানে সবাই ভাল আছে এবং আমার সুখ-সুবিধার প্রতি সর্বপ্রকারে নজর রাখিতেছে। মা তাহাদের আশীর্বাদ করুন। আশা করি, তোমার স্বাস্থ্য সর্বতোপ্রকার কুশল এবং তুমি মানসিক দিক দিয়া পূর্ণ শান্তিতে রহিয়াছ। আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা ও ভালবাসা জানিবে। ইতি

স্নেহবদ্ধ
**তুরীয়ানন্দ**

*চিঠিটি ইংরেজীতে লেখা—সম্পাদক, উদ্বোধন।

১ মিসেস সেভিয়ার ২ 'Life of Swami Vivekananda' by His Eastern and Western Disciples

৩ কালীকৃষ্ণ মহারাজ (স্বামী বিরজানন্দ) তখন মায়াবতী অদ্বৈত আশ্রমে আছেন।—সঃ উঃ

নিবন্ধ

# অ্যান ফ্র্যাঙ্ক

## স্বামী তথাগতানন্দ

সৌন্দর্য ও বৈচিত্র্যে ভরা নেদারল্যান্ড (হল্যান্ড) দেশটির কিছুটা বৈশিষ্ট্য আছে। এই দেশের আয়তন মাত্র ১৬,১৩৩ বর্গমাইল আর জনসংখ্যা ১,৪৮,২৫,০০০। বর্তমানে দেশটির অধিকাংশ জমিই সমুদ্রের গহ্বর থেকে কৃত্রিম জলসেচন প্রণালী দ্বারা উদ্ধার করা হয়েছে। 'উত্তর-সমুদ্রের' জলসেচন করে জমি-উদ্ধারের কাজে এক তরুণ সিভিল ইঞ্জিনীয়ারের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তাঁর নাম আই. আর. সি. লেবী (**I. R. C. Leby**)। নেদারল্যান্ডের আর একটি বৈশিষ্ট্য হলো সেচখালের (**Canal**) প্রাচুর্য। এত সেচখাল বোধ হয় আর অন্য কোন দেশে নেই। ব্যবসা-বাণিজ্যের জন্য এগুলি করা হয়েছে। বাণিজ্যের জন্য, বিশেষতঃ জাহাজী ব্যবসার জন্য প্রসিদ্ধ এদেশ। এদেশের আমস্টারডম বন্দর ইউরোপের মধ্যে একটি নামকরা বন্দর। এই সেচখালগুলির সাহায্যে সহজে পণ্যদ্রব্য আমদানি ও রপ্তানি করা যায়। সেচখাল আর নানা ধর্মের সহাবস্থানের জন্য এদেশ বিশেষ খ্যাতিলাভ করেছে। সেজন্য ধর্ম-নির্যাতিত বহু মানুষ বিভিন্ন দেশ থেকে এসে এদেশে বসবাস করছেন। এদের মধ্যে অবশ্য ইহুদীরাই সংখ্যায় বেশি। ইউরোপের মধ্যে এদেশেই তাঁদের বেশি বসবাস। মনোরম প্রাকৃতিক সৌন্দর্য, বিভিন্ন স্থানে বসবাস করার সুযোগ-সুবিধা, আরামপ্রদ আবহাওয়া দেশটির প্রতি মানুষকে আকর্ষণ করেছে।

'ইমিটেশন অফ ক্রাইস্ট' ('ঈশানুসরণ')-এর রচয়িতা টমাস আ কেম্পিসের জন্ম এদেশে। বিখ্যাত দার্শনিক স্পিনোজার জন্ম এদেশে। রামকৃষ্ণ মঠ-মিশনের প্রয়াত বিখ্যাত সন্ন্যাসী স্বামী অতুলানন্দের (গুরুদাস মহারাজের) জন্ম আমস্টারডমে। আমস্টারডমে তাঁদের পৈত্রিক বাড়িটি আজও আছে। বাড়িটি অবশ্য এখন অন্যদের দখলে। সেজন্য কোন স্মৃতিচিহ্ন নেই। স্বামী বিবেকানন্দ জার্মানী থেকে ইংল্যান্ড যাবার পথে আমস্টারডমে তিনদিন ছিলেন। গবেষক সন্ন্যাসী স্বামী বিদ্যাত্মানন্দের মতে, স্বামীজী আমস্টারডমে ভিক্টোরিয়া হোটেলে ছিলেন। হোটেলটি আজও বর্তমান। অবশ্য স্বামীজীর কথা সেখানকার কেউ জানে না।

আমি এখন অ্যান ফ্র্যাঙ্কের কথা বলব। ছয় মিলিয়ন ইহুদীকে জার্মানরা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে হত্যা করেছে। বালিকা অ্যান তাদেরই অন্যতম। কিন্তু আজ অ্যান ফ্র্যাঙ্ক পৃথিবীবিখ্যাত নাম। তার নামে স্কুল, পার্ক, বনানী, শিশুনিকেতন, যুবনিবাস পৃথিবীর সর্বত্র নানা স্থানে রয়েছে। তার রচিত 'ডায়েরী অফ আ ইয়ং গার্ল' আমস্টারডম থেকে প্রথম প্রকাশিত হয় ১৯৪৭ খ্রীস্টাব্দের জুন মাসে। এরপর বিভিন্ন দেশের আটত্রিশটি ভাষায় এই বইটি অনূদিত হয়ে প্রকাশিত হয়েছে। বাঙলা ভাষাতেও হয়েছে। ভারতীয় ভাষার মধ্যে শুধু বাঙলাতেই বইটি অনূদিত হয়েছে।

ইতিহাস পাঠ করলে আমাদের দৃষ্টি স্বচ্ছ হয়। মানুষের ভাল-মন্দ সবকিছুই ইতিহাসে বিধৃত থাকে। বুদ্ধিমান মানুষ নিজের জীবনকে উন্নত করতে পারে ইতিহাস পাঠের মাধ্যমে। মানুষের প্রতি মানুষের ঘৃণা সমাজজীবনে এনেছে অনেক অনর্থ, জীবনকে করেছে কলঙ্কিত, আর মানুষের মধ্যে ছড়িয়ে দিয়েছে ঘৃণার বীজ। উপনিষদ্ বলেছেনঃ "মা বিদ্বিষাবহৈ।" কবি বলেছেনঃ "অন্তর হতে বিদ্বেষ বিষ নাশো।" আমরা সেই বাণী শুনিনি। এইভাবে মানুষের দুঃখ-বেদনা মানুষই সৃষ্টি করেছে এবং করে চলেছে। একেই আমরা 'কর্ম' বলি। বলি, 'যেমন

কর্ম তেমন ফল'। রাজনীতির লোকেরা কৌশলে কাজে লাগায় মানুষের সেই সহজাত ঘৃণাকে। এরা ধর্মের দোহাই দিয়ে রাজনীতির সাহায্যে নিজেদের স্বার্থসিদ্ধি করে। আসলে এসব প্রতিক্রিয়ার জন্য আমাদের 'অজ্ঞান'ই দায়ী। অজ্ঞানই পাপ। সেই জন্যই ব্যক্তিজীবনে বা সমাজজীবনে এই অজ্ঞানই আমাদের জীবনকে করেছে অভিশপ্ত।

১৯১৯ খ্রীস্টাব্দের মে মাস। যুদ্ধে পরাজিত জার্মানজাতিকে 'শিক্ষা' দেবার জন্য বিজয়ী শক্তি 'ভার্সাই সন্ধি' করে। এই সন্ধিপত্রের শর্ত ছিল জঘন্য। বিজিত জার্মানদের ভয় দেখিয়ে জোর করে মিত্রশক্তি সন্ধিপত্রে স্বাক্ষর করিয়েছিল। সেটা ছিল ১৯১৯ খ্রীস্টাব্দের ২৮ জুন। এই কুখ্যাত দলিলে ভয় দেখিয়ে সই নেওয়ার পর জার্মান সংবাদপত্র লেখে: **"Vengeance! German Nation! To-day the disgraceful Treaty is being Signed. Don't forget it. The German people— will press forward reconquer the place among nations to which it is entitled. Then will come Vengeance for the same of 1919."**

নিদারুণ অর্থনৈতিক বিপর্যয়, গভীর হতাশা এবং চরম জাতীয় অবমাননার সুযোগ নিয়ে হিটলার এলেন জার্মান রাজনীতির মঞ্চে। সেটা ১৯৩৩ খ্রীস্টাব্দ। হিটলার হলেন জার্মান রাষ্ট্রের চ্যান্সেলর। ন্যাৎসী পার্টি—হিটলারের পার্টি। ন্যাৎসীরা ইহুদীদের ধ্বংস করার সবরকম ব্যবস্থা করতে থাকে। তাদের সব স্বাধীনতা ধীরে ধীরে হরণ করা হয়। তারা জার্মানদের কাছে শত্রু হয়ে দাঁড়ায়। এইভাবে তাদের জীবনে জোটে অকথ্য অত্যাচার ও অচিন্তনীয় পৈশাচিক ব্যবহার। ইহুদী-বিদ্বেষ জার্মানীতে ছিল। এর জন্য প্রত্যক্ষভাবে দায়ী চার্চ। একজন খ্রীস্টান গবেষক মনে করেন, খ্রীস্টান সমাজের ইহুদী-বিদ্বেষকে হিটলার নিজ স্বার্থে প্রয়োগ করেছিলেন মাত্র।

যীশুর সুসমাচার লক্ষ লক্ষ ইহুদীদের কাছে হয়ে উঠল মৃত্যুর বার্তাবহ। এর পরিপ্রেক্ষিতে লক্ষ লক্ষ খ্রীস্টান ইহুদীদের ওপর অতিশয় ঘৃণা পোষণ করতে লাগল। তারা মনে করল, যীশুর হত্যাকারী ইহুদীদের ধ্বংস করা বা ক্রীতদাসে পরিণত করার ডাক তারা পেয়ে গেছে। খ্রীস্টীয় ইউরোপে ইহুদী জাতি ছিল ঘৃণ্য, অভিশপ্ত। তাই মৃত্যু, নির্বাসন অথবা বাধ্যতামূলক খ্রীস্টধর্মে দীক্ষাগ্রহণ—এই তিন-এর মধ্যে এক বা একাধিক বিকল্প ব্যবস্থা তাদের মেনে নিতে হতো।

বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে ইহুদীদের সম্পর্কে খ্রীস্টীয় জগতের সহানুভূতিহীন উদাসীনতা খ্রীস্টানদের বোধশক্তিকে আচ্ছন্ন করেছিল। এই উদাসীনতাই ইউরোপকে ইহুদীদের সমাধিক্ষেত্রে পরিণত করতে হিটলারকে সক্ষম করেছিল। শতাব্দীর পর শতাব্দী খ্রীস্টীয় শিক্ষা এবং ধর্ম-প্রচার ব্যতীত 'ন্যাৎসীবাদ' কখনো উদ্ভূত হতো না। হিটলার নিশ্চিতভাবে প্রমাণ করেছিলেন যে, চার্চ পনেরশো বছর ধরে যে অনুভূতি এবং সক্রিয়তা দেখিয়েছিল তিনি তারই প্রয়োগ করেছেন মাত্র। মৃত্যু অবধি হিটলার প্রধান খ্রীস্টীয় চার্চগুলির দায়িত্বশীল নেতৃবৃন্দের সমর্থন লাভ করেছিলেন। বস্তুতঃ তিনি কখনই চার্চের সমর্থন থেকে বঞ্চিত হননি এবং তাঁর গ্রন্থাবলী কখনই নিষিদ্ধ পুস্তক-তালিকায় স্থান পায়নি।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ শুরু হলো। ফ্রান্স, ইংল্যান্ড এবং কানাডা যুদ্ধ ঘোষণা করল জার্মানীর বিরুদ্ধে। ১০ মে, ১৯৪০ জার্মানী হল্যান্ড আক্রমণ করে। সপারিষদ প্রধানমন্ত্রী ও রাজপরিবার ইংল্যান্ডে আশ্রয় নেন। মাত্র পাঁচদিনের যুদ্ধের পর হল্যান্ডের পতন হয়। শুরু হয় হল্যান্ডের ওপর জার্মানীর বর্বর আচরণ। শুরু হয় ইহুদীদের প্রতি অকথ্য অত্যাচার। লক্ষ লক্ষ ইহুদীর জীবন হয় বিপন্ন। হল্যান্ডে ইহুদীদের ওপর অত্যাচার শুরু হয় ১৯৪১ খ্রীস্টাব্দের ফেব্রুয়ারিতে। অটো ফ্র্যাঙ্ক (Otto Frank) ছিলেন একজন অত্যাচারিত ইহুদী। ফ্র্যাঙ্কফুর্ট শহরে ১৮৮৯ খ্রীস্টাব্দের ১২ মে তাঁর জন্ম। তিনি জার্মানীতে বাস করছিলেন। তিনি ছিলেন একজন মহাজন (Banker)। এডিথ (Edith)-কে তিনি বিয়ে করেন ১৯২৫ খ্রীস্টাব্দে।

তাঁদের বড় মেয়ে মার্গট (Margot) ১৯২৬ খ্রীস্টাব্দে জন্মগ্রহণ করে। ছোট মেয়ে অ্যান (Anne)-এর জন্ম ১৯২৯ খ্রীস্টাব্দের ১২ জুন। জার্মানীদের অত্যাচারের জন্য অটো ফ্র্যাঙ্ক পালিয়ে আসেন হল্যান্ডে। আমস্টারডমে শুরু করেন ব্যবসা। অটোকে তাঁর কর্মচারীরা শ্রদ্ধা করত তাঁর ভদ্র ব্যবহার ও নির্ভীক আচরণের জন্য। একবার ব্যবসাতে মন্দা দেখা দেয়। অটো সকলের মাইনে কমিয়ে দিতে বাধ্য হন। কিন্তু তাঁর প্রতি সকলের বিশ্বাস থাকায় কেউ অন্যত্র চলে যায়নি। সকলেই ব্যবসার উন্নতির জন্য অটোকে সাহায্য করে।

হল্যান্ডে ইহুদী ছিল ১,১৬,০০০ জন। অত্যাচারের জন্য জার্মানী থেকে ২৫,০০০ ইহুদী পালিয়ে হল্যান্ডে আশ্রয় নেয়। কিন্তু মাত্র মুষ্টিমেয় কিছু ইহুদী লুকিয়ে বাঁচে।

অটো আগেই বুঝেছিলেন, কী দুর্দশার দিনই আসছে। সেজন্য বিশ্বস্ত ইহুদী সহযোগী ভ্যান ডানকে (Van Daan) নিয়ে দুই পরিবারের সাতজন ও একজন দন্তচিকিৎসক অর্থাৎ মোট আট-জন অটোর বাড়ির মধ্যেই গোপনে লুকিয়ে থাকে। চারজন অত্যন্ত সাহসী ও বিশ্বস্ত কর্মচারী ওদের জন্য খাদ্য ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় জিনিস সরবরাহ করত। দীর্ঘ পঁচিশ মাস তাঁরা লুকিয়ে ছিলেন। এর মধ্যে মার্গট ও অ্যান নিয়মিত পড়াশুনা চালিয়ে যাচ্ছিল। অ্যান যেবার ১৩ বছরে পড়ল, সেই জন্মদিনে—১২ জুন ১৯৪২—অটো তাকে একটি দিনপঞ্জী উপহার দেন। অ্যানের সেই ডায়েরী আজ পৃথিবীর বহুলপঠিত একটি গ্রন্থ। অ্যান এই ডায়েরীতে তার জীবনের ছবি দিয়েছে। তার নিজের মনের চেহারা এতে ফুটে উঠেছে। বালিকার কমনীয়তা, আশা, আকাঙ্ক্ষা, মনের ভাব-বিহ্বলতা সবই নিঃসঙ্কোচে সেখানে সে প্রকাশ করেছে।

বেশিদিন তাদের সুখের জীবন চলেনি। এতে পূর্ণচ্ছেদ পড়ে ৪ আগস্ট ১৯৪৪-এ। ঐদিন একজন জার্মান ও চারজন ডাচ ন্যাৎসী পুলিস সহসা ওদের বাড়িতে হামলা করে। নিশ্চয়ই কোন বিশ্বাসঘাতকের হাত ছিল এই সংবাদ দেওয়ার পিছনে। "তোমাদের টাকা ও গয়না কোথায় আছে?"—উদ্ধতভাবে পুলিস প্রশ্ন করে। গয়না সহজে পুলিস পেয়ে যায়। কিভাবে এগুলো নিয়ে যাবে এই চিন্তায় তারা কোন ব্যাগ বা স্যুটকেস খুঁজতে গিয়ে দেখে একটা চামড়ার তৈরি চ্যাপ্টা ব্রীফকেস। ঐটাতে ছিল অ্যান-এর ডায়েরী। ডায়েরী না পড়েই সেটাকে ফেলে দিয়ে তারা ব্রীফকেসে গয়না ভরে নেয়। তারপর আটজনকে তারা গ্রেপ্তার করে। এমনি দুর্ভাগ্য যে, ঠিক সেসময়ে আইসেনহাওয়ারের নেতৃত্বে মিত্রপক্ষ ঢুকে পড়েছে ইংল্যান্ডে, জার্মানদের পালিয়ে যাওয়ার দিন ঘনিয়ে এসেছে। গবাদি পশু বহন করার একটি ট্রাকে করে ওদের অসচুইজ (Auschwitz) কনসেন্ট্রেশন ক্যাম্পে নিয়ে যাওয়া হলো। সেদিন ওটিই ছিল ইহুদীদের ধরে নিয়ে যাওয়ার সর্বশেষ যান। কি দুর্ভাগ্য! কনসেন্ট্রেশন ক্যাম্প অনেক ছিল। তার মধ্যে পনেরোটি ছিল প্রধান। আর সবচেয়ে বেশি মৃত্যু হয়েছিল অসচুইজ ক্যাম্পে। ক্যাম্পে এনে অটো ফ্র্যাঙ্ককে তাঁর পরিবার থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেওয়া হয়। মিসেস ফ্র্যাঙ্ক ও দুই মেয়ে চলে যান অন্য স্থানে যেখানে মেয়ে-বন্দীদের রাখা হয়েছিল। মিসেস ফ্র্যাঙ্ক ও ভ্যান ডান মারা যায়। অ্যান ছিল অত্যন্ত সাহসী। কিছুদিন পর তাদের দুবোনকে নিয়ে আসা হয় বার্লিন এবং হামবুর্গের মাঝে বার্গেন-বেলসেন ক্যাম্পে। এখানে ৫০,০০০ ইহুদী মারা যায়। এখানে একজন প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণ: প্রচণ্ড ঠাণ্ডায় ও ক্ষুধা-কাতরতায় এদের জীবনে আসে মৃত্যুর করুণ আর্তনাদ। বন্দীদের মাথা মুড়িয়ে দেওয়া হয়। চেহারা শুধু হাড়-চামড়া দিয়ে ঢাকা। অত্যন্ত সাধারণ কাপড় দিয়ে দেহটি ঢাকা মাত্র। এখানে মার্গট মারা যায় টাইফয়েডে। কয়েকদিন পর অ্যানও মারা যায় ১৯৪৫ খ্রীস্টাব্দের মার্চে। তখন তার বয়স মাত্র পনেরো বছর। অটো ফ্র্যাঙ্ক বেঁচে যান। ১৯৪৫-এর গোড়ায় তিনি ছাড়া পান এবং কিছুদিন পরে হল্যান্ডে চলে আসেন। এখানেই কিছুদিন পর সংবাদ পান যে, তাঁদের পরিবারের কেউ বেঁচে নেই। এই সময় একদিন তাঁর বিশ্বস্ত টাইপিস্ট মিয়েপ গিয়েস (Miep Gies) অ্যানের ডায়েরীটি তার বাবার হাতে দেয়। অ্যানদের গ্রেপ্তার করে

নিয়ে যাওয়ার এক সপ্তাহ পর গিয়েস সাহস করে ওদের বাড়িতে এসে স্তূপীকৃত কাগজপত্রের মধ্যে অ্যানের হাতের লেখা ডায়েরীটি নিয়ে চলে যায়। সে কিন্তু পড়েনি। পড়লে নিশ্চয়ই ভয়ে নিজেই ডায়েরীটি নষ্ট করে দিত। কারণ ডায়েরীতে দুর্দিনের বিশ্বস্ত বন্ধুদের নাম ছিল। একেই বোধ হয় বলে দৈব। একদিন যে-ডায়েরী পৃথিবীর নানা প্রান্তে অগণিত মানুষকে বিশেষভাবে নাড়া দেবে, যা ভবিষ্যতে লক্ষ লক্ষ মানুষ পড়বে, তাকে এইভাবেই ভগবান রক্ষা করলেন।

অটো ফ্র্যাঙ্ক পড়েন ডায়েরীটি। তাঁর বুড়ী মা তখনো বেঁচে। তিনি সুইজারল্যান্ডে পালিয়ে গিয়েছিলেন। প্রধানতঃ তাঁকে দেবার জন্যই অটো ডায়েরীটির একটি কপি করে নেন। প্রকাশ করার তাগিদ বা ইচ্ছা তাঁর ছিল না। একটি কপি তিনি দেন তাঁর এক বিশেষ বন্ধুকে। বন্ধু আবার ওটা পড়তে দেন একজন ইতিহাসের অধ্যাপককে। ১৯৪৭ খ্রীস্টাব্দে অটোর অজান্তেই ঐ অধ্যাপক একটি ওলন্দাজ (ডাচ) পত্রিকায় প্রবন্ধ লেখেন অ্যানের ডায়েরীর ওপর ভিত্তি করে। এরপর বন্ধুদের তাগিদে অটো ফ্র্যাঙ্ক অ্যানের ডায়েরীটি ছাপার ব্যবস্থা করতে রাজি হন। প্রথম প্রকাশের পর ওলন্দাজ ভাষায় বইটি বিক্রি হয় দেড় লক্ষ কপি। কিন্তু যে-বই সারা পৃথিবীতে একটা বিশেষ সাড়া জাগাতে দৈবনির্দিষ্ট ছিল সেই বইটিকে প্রথম দুজন প্রকাশক অগ্রাহ্য করেছিলেন। যাই হোক, ক্রমে বইটির প্রচার সারা বিশ্বে একটা রেকর্ড সৃষ্টি করে। জাপানে আড়াই লক্ষ কপি, ইংল্যান্ডেও তাই এবং আমেরিকায় চার লক্ষ পঁয়ত্রিশ হাজার কপি বিক্রি হয়। এখন পৃথিবীর আটত্রিশটি ভাষায় ডায়েরীটি প্রকাশিত হয়েছে।

নেদারল্যান্ডে অ্যানদের বাড়িতে আমি বাঙলা সংস্করণটি দেখেছি। বাড়িটি বর্তমানে 'অ্যান ফ্র্যাঙ্ক ফাউন্ডেশন' নামে খ্যাত। বিশ্বের সব দেশ থেকেই লোকেরা আসেন অ্যানের স্মৃতিকে শ্রদ্ধা জানানোর জন্য। বইটির প্রায় দুকোটি কপি সারা বিশ্বে এর মধ্যে বিক্রি হয়েছে। ডায়েরীটিকে নিয়ে নাটকও লেখা হয়েছে এবং সেই নাটক আমেরিকাতে শ্রেষ্ঠ সম্মান পুলিৎজার পুরস্কার পেয়েছে। আমেরিকায় ১৯৫৬-৫৭ খ্রীস্টাব্দে একটি সীজনে কুড়িটি দেশে দুকোটি লোক দেখেছেন ঐ নাটক। আমেরিকার বিখ্যাত সিনেমা সংস্থা এটিকে নিয়ে ফিল্ম করেন। এপর্যন্ত ডায়েরীটির সর্বমোট পঞ্চাশটি সংস্করণ বেরিয়েছে।

অটো ফ্র্যাঙ্ক বিদেশ থেকে হাজার হাজার চিঠি পান। প্রত্যেক চিঠির জবাব তিনি নিজে দেন। মেয়ের জন্মদিনে এমনিতেই কত লোক ভালবেসে ফুল পাঠিয়ে দেন। একটি ওলন্দাজ মহিলা-শিল্পী অ্যানের একটি প্রতিকৃতি তৈরি করেছেন। প্রতিকৃতিটি ওদের বাড়িতে আছে।

চিঠির ধাক্কায় অটো ব্যবসা ছাড়তে বাধ্য হন। ১৯৫০ খ্রীস্টাব্দে জার্মানীতে বইটির মাত্র ৪৫০০ কপি বিক্রি হয়। প্রথমে অনেক বই-ব্যবসায়ী ঐ বই দোকানে রাখতে রীতিমত ভয় পেত। এখন শুধু জার্মানীতেই এর পকেট সুলভ সংস্করণ বিক্রি হয়েছে পাঁচ লক্ষ কপি। এটি নাটক-আকারে প্রথম একসঙ্গে সাতটি জার্মান নাট্যমঞ্চে দেখানো হয়। এখন জার্মানীর আটান্নটি শহরে দশ লক্ষেরও বেশি লোক ঐ নাটক দেখছে। এই নাটক দেখে মানুষের মনে ন্যাৎসীদের সম্পর্কে ঘৃণা জেগেছে। অ্যানের স্মৃতিকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য জার্মানীতে একটি বাড়িতে 'অ্যান ফ্র্যাঙ্ক হোম' প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। যুবক-যুবতীদের মধ্যে সমাজসেবামূলক কাজ করার জন্য ব্যবস্থা হয়েছে ঐ বাড়িতে। ইজরায়েলেও অ্যানের নামে একটি প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হয়েছে। নেদারল্যান্ডে হাজার হাজার মানুষ আসে বিশ্বের নানান প্রান্ত থেকে অ্যানের স্মৃতিতে ভরা বাড়িটি দেখতে এবং নিষ্ঠুর ঘৃণার শিকার সেই ছোট্ট মেয়েটিকে এবং তার সঙ্গে নির্যাতিত কোটি কোটি মানুষের আত্মার উদ্দেশে তাদের শ্রদ্ধা জানাতে। এই শ্রদ্ধা শুধু সেই বালিকার উদ্দেশেই নয়, সেই সঙ্গে বর্বরতার শিকার সমগ্র লাঞ্ছিত ও নিপীড়িত নরনারীর উদ্দেশেই শ্রদ্ধা জানায় তারা অ্যানের মাধ্যমে। □

বিশেষ রচনা

# বিবেকানন্দ-জীবনের সন্ধিক্ষণ : পরিব্রজ্যার অভিজ্ঞতা ও উপলব্ধির ঐতিহাসিক তাৎপর্য

নিমাইসাধন বসু

[ পূর্বানুবৃত্তি ]

পরিব্রাজক বিবেকানন্দের জীবনে একাধিকবার যেসব চমকপ্রদ ঘটনা ঘটেছিল তা অলৌকিক মনে করলেও অত্যুক্তি হবে না। কিন্তু অলৌকিক ব্যাপার নিয়ে আলোচনায় আমাদের প্রয়োজন নেই। স্বামীজী নিজেও অলৌকিক ঘটনা বা ব্যাখ্যা পছন্দ করতেন না বা গুরুত্ব দিতে চাইতেন না। তবুও একথা অনস্বীকার্য যে, একাধিকবার, বিশেষ করে পরিব্রাজক জীবনে এমন কিছু কিছু অভিজ্ঞতা স্বামীজীর হয়েছিল যা শুধুমাত্র যুক্তি দিয়ে ব্যাখ্যা করা সম্ভব নয়। একটি লক্ষণীয় বিষয় হলো যে, যখনই স্বামীজী ধ্যান ও তপস্যামগ্ন হয়ে এই জগৎ ও পরিবেশ থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত হয়ে অন্য এক লোকে উত্তীর্ণ হয়ে নির্জন নিঃসঙ্গ পূর্ণশান্তি ও স্বর্গসুখের অধিকারী হতে চলেছেন তখনই কোন অদৃশ্যশক্তি যেন তাঁকে হিমালয়ের নৈঃশব্দ থেকে নিচের সমতল ভূমির জনজীবনের কোলাহল ও ধূলাবালির মধ্যে ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছে।[১৯] স্বামী অখণ্ডানন্দকে স্বামীজী বলেছিলেন যে, যখনই তিনি নির্জন নীরব সাধনায় ডুবে যেতে চেষ্টা করেছেন তখনই ঘটনা পরম্পরায় চাপে পড়ে তাঁকে তা ছাড়তে হয়েছে।[২০] আলমোড়ার কাছে কাকরিঘাটে এক নির্ঝরিণীতে স্নান করার পর এক অশ্বত্থগাছের তলায় ধ্যানে বসার কিছু পরে স্বামীজী তাঁর সঙ্গীকে বলেছিলেন : "এই বৃক্ষতলে একটা মহা শুভ মুহূর্ত কেটে গেল। আজ একটা বড় সমস্যার সমাধান হয়ে গেল। বুঝলাম, সমষ্টি ও ব্যাষ্টি ( বিশ্বব্রহ্মাণ্ড ও অণুব্রহ্মাণ্ড ) একই নিয়মে পরিচালিত।"[২১]

স্বামী বিবেকানন্দের পরিব্রাজক জীবনের কাহিনী ও অভিজ্ঞতা বিশ্লেষণ করলে একটি প্রশ্নের মীমাংসার গুরুত্বপূর্ণ সূত্র ও তথ্য পাওয়া যায়। প্রচলিত একটি ধারণা বা অভিমত আছে ( বিশেষ করে পাশ্চাত্যের লেখক ও কিছু কিছু আধুনিক ভারতীয় ঐতিহাসিকদের মধ্যে ) যে, রামকৃষ্ণ মিশন প্রতিষ্ঠার ( ১ মে, ১৮৯৭ ) চিন্তা ও অনুপ্রেরণা স্বামীজী পেয়েছিলেন তাঁর আমেরিকা ও পাশ্চাত্য ভ্রমণের অভিজ্ঞতার ফলে ও খ্রীস্টান মিশনারিদের দৃষ্টান্ত দেখে। শ্রীরামকৃষ্ণের ধর্মচিন্তা ও নির্দেশিত পথ থেকে তিনি অনেকখানি সরে এসেছিলেন। রামকৃষ্ণ মিশন প্রতিষ্ঠা, মিশনের উদ্দেশ্য ও কাজকর্ম নির্ধারণ এবং স্বামীজীর স্বদেশ ও সমাজচিন্তায় তারই প্রতিফলন হয়েছিল। অন্যদিকে যাঁরা এই বক্তব্য খণ্ডন করেন তাঁরা প্রধানতঃ স্বামীজীর জীবনের দুটি বিশেষ পরিচিত ঘটনার উল্লেখ করেন। প্রথমটি হলো—দক্ষিণেশ্বরে একদিন শ্রীরামকৃষ্ণ স্বামীজীকে জীবকে 'শিবজ্ঞানে সেবা' করার মন্ত্রে অনুপ্রাণিত করেছিলেন। দ্বিতীয়টি হলো—কাশীপুরে নরেন্দ্রনাথ যখন নির্বিকল্প সমাধিলাভের ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন তখন শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁকে তিরস্কার করে বলেছিলেন : "ছি ছি, তুই এত বড় আধার, তোর মুখে এই কথা! আমি ভেবেছিলাম, কোথায় তুই একটা বিশাল বটগাছের মতো হবি, তোর ছায়ায় হাজার হাজার লোক আশ্রয় পাবে, তা না হয়ে তুই কিনা শুধু নিজের মুক্তি চাস। এ তো অতি তুচ্ছ হীন কথা। নারে, এত ছোট নজর করিসনি।"[২২]

বস্তুতঃ, পরিব্রাজক জীবনের বিভিন্ন কাহিনী পড়লে বোঝা যায় যে, ঐ সময়েই স্বামীজী সেবাব্রত ও মানবকল্যাণ-প্রচেষ্টাকে তাঁর জীবনের আদর্শ ও লক্ষ্যরূপে গ্রহণ করেছিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণ স্বয়ং

১৯ দ্রঃ Life of Vivekananda—Romain Rolland, p. 20

২০ যুগনায়ক বিবেকানন্দ, ১ম খণ্ড, পৃঃ ২০৪-২০৫

২১ ঐ, পৃঃ ২০১ ; স্বামী বিবেকানন্দ—প্রমথনাথ বসু, ১ম ভাগ, ৪র্থ সং, ১০৯২, পৃঃ ১৫১

২২ যুগনায়ক বিবেকানন্দ, ১ম খণ্ড, পৃঃ ১৫১

উপস্থিত না থাকলেও প্রতিটি ঘটনার পিছনে যেন তাঁর অদৃশ্য হাত কাজ করছিল। অন্যভাবে দেখলে একথা বলা যায় যে, শ্রীরামকৃষ্ণের জীবন ও তাঁর শিক্ষা ('তিরস্কার'ও বলা যায়) যুবক নরেন্দ্রনাথের মনের গভীরে যে-বীজ বপন করেছিল, পরিব্রাজক জীবনের অভিজ্ঞতা সেই বীজকে অঙ্কুরিত করেছিল। স্বামী গম্ভীরানন্দের বিবেকানন্দ-জীবনীতে সুস্পষ্টভাবে না হলেও এর ইঙ্গিত রয়েছে। তিনি লিখেছেন যে, তীর্থদর্শনকালে স্বামীজী ভারতাত্মার পরিচয় পেয়েছিলেন, তাঁর দৃষ্টি পূর্বাপেক্ষা প্রসারিত হওয়ায় তিনি চাইতেন যে, তাঁর গুরুভায়েরাও অনুরূপ চিন্তা করুক। স্বামী গম্ভীরানন্দ লিখেছেন ঃ "চকিতে তাঁহার মনে ধর্মপ্রচারের সঙ্কল্প উঠিত এবং দুঃস্থ ও নিপীড়িতদের দুঃখমোচনার্থে কর্মক্ষেত্রে ঝাঁপাইয়া পড়িতে অভিলাষ জাগিত, বেদান্ততত্ত্বকে কার্যে পরিণত করার চিন্তায় তাঁহার মন উদ্বেলিত হইত। গুরুভ্রাতাদের মধ্যেও তিনি ধর্মের এই নবীন ধারণা অনুসঞ্চারিত করিতে সচেষ্ট থাকিতেন।"[২৩]

পরিব্রাজক জীবনের অভিজ্ঞতা স্বামীজীর পরবর্তী চিন্তাধারা, কর্মসূচী এবং রামকৃষ্ণ মিশনের প্রতিষ্ঠার মানসিক প্রস্তুতি ও সঙ্কল্পকে প্রভাবিত করার অসীম গুরুত্বের কথা মনে রাখার সঙ্গে সঙ্গে পাশ্চাত্যের (বিশেষ করে আমেরিকার) প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার প্রভাব অস্বীকার করা অনৈতিহাসিক বিশ্লেষণ হবে। শিকাগো ধর্মমহাসম্মেলনে যোগদানের পূর্বের এবং পরের উভয় অভিজ্ঞতা ও অনুভূতি স্বামীজীর জীবনে সুগভীর প্রভাব ফেলেছিল। যেকোন ঐতিহাসিক মহান জীবনেই নানা প্রভাব, পরিবর্তন ও ভাবধারার সংমিশ্রণের প্রতিফলন ঘটে। স্বামী বিবেকানন্দের জীবনেও তাই ঘটেছিল।

স্বামী বিবেকানন্দের পরিব্রাজক জীবন ও তার সুদূরপ্রসারী গুরুত্ব সম্পর্কে রোমাঁ রোলাঁর বিবেকানন্দ-জীবনীতে একটি সুন্দর অধ্যায় রয়েছে। রোমাঁ রোলাঁ লিখেছেন যে, ভারতবর্ষের বিশালতা স্বামীজীকে সম্পূর্ণ গ্রাস করেছিল। রোমাঁ রোলাঁ লিখছেন ঃ "He was swallowed up for years in the immensity of India."[২৪] কিন্তু ভারতীয় ইতিহাস ও জনজীবনের গভীরে নিমজ্জিত থাকার পর যে-নরেন্দ্রনাথ জেগেছিলেন তিনি ছিলেন এক মহাশক্তিমান পুরুষ। দুর্জয়, লৌহকঠোর অথচ শিশুর মতো সরল, স্নেহময়ী জননীর মতো কোমলহৃদয় এক মানুষ। আশ্চর্যের বিষয় হলো, শ্রীরামকৃষ্ণ দিব্যদৃষ্টিতে তাঁর পরম স্নেহাস্পদ ও প্রিয়তম সন্তান নরেন্দ্রনাথের এই নবজন্মের ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন। শুধুমাত্র যুক্তিবাদী দৃষ্টিতে শ্রীরামকৃষ্ণের এই ভবিষ্যদ্বাণীর ব্যাখ্যা করা সম্ভব হবে না। যখন অন্য অনেকেই আপাত-উদ্ধত, অহঙ্কারী, সন্দিগ্ধচিত্ত নরেন্দ্রনাথ সম্বন্ধে সন্দেহপ্রকাশ করছেন তখন শ্রীরামকৃষ্ণ সকলকে আশ্বস্ত করে বলেছিলেন ঃ "যেদিন নরেন মানুষের দুঃখ-কষ্ট-দারিদ্র্যের সংস্পর্শে আসবে তখন তার চরিত্রের অহংকারবোধ দূর হয়ে অসীম মমতায় পরিণত হবে। যারা নিজের ওপর আস্থা ও বিশ্বাস হারিয়েছে, তার নিজের গভীর আত্মবিশ্বাস তাদের তা ফিরে পেতে সাহায্য করবে।"[২৫] শ্রীরামকৃষ্ণের কথা অক্ষরে অক্ষরে মিলে গিয়েছিল। পরিব্রজ্যায় বেরিয়ে মানুষের দারিদ্র্য, যাতনা ও বেদনা দেখে স্বামীজী বুঝেছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণের বাণী—"খালিপেটে ধর্ম হয় না"—কী মর্মান্তিকভাবে সত্য। ঐ অনুভূতি স্বামীজীর জীবনে ইস্পাতের ওপর অগ্নিস্ফুলিঙ্গের মতো কাজ করেছিল। তাঁর ধর্ম, জ্বলন্ত দেশপ্রেম, মানবসেবাব্রতের সঙ্কল্প সব মিলে-মিশে অভিন্ন হয়ে উঠেছিল।

তাঁর জীবনে ও মননে যে অভূতপূর্ব পরিবর্তন ঘটেছিল সে-সম্পর্কে স্বামীজী নিজেই সচেতন ছিলেন। ১৮৯৬ খ্রীস্টাব্দের ৬ জুলাই তারিখের এক চিঠিতে স্বামীজী লিখেছিলেন ঃ "কুড়ি বছর বয়সে আমি ছিলাম অত্যন্ত সহানুভূতিহীন, অসহিষ্ণু ও গোঁড়া। কলকাতার রাস্তার যে-ধারে থিয়েটার হল রয়েছে সেই ফুটপাত ধরে পর্যন্ত আমি হাঁটিতাম না।" কিন্তু ভারত-পরিক্রমাকালের নানান ঘটনা ও অভিজ্ঞতা তাঁর মনকে ক্রমেই গোঁড়ামি ও যুক্তিহীন সংস্কার-মুক্ত

২৩ যুগনায়ক বিবেকানন্দ, ১ম খণ্ড, পৃঃ ১১৬ ২৪ Life of Vivekananda, p. 14. ২৫ Ibid, p. 10

করে তোলে। ছোট-বড়, পবিত্র-অপবিত্র, তথা-কথিত পতিত-পতিতা—সকল মানুষের মধ্যেই তিনি সেই একই ঈশ্বরের অধিষ্ঠান উপলব্ধি করেছিলেন। এই শিক্ষা তিনি যেমন পেয়েছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণের কাছ থেকে, তেমন প্রত্যক্ষভাবে শিক্ষা পেয়েছিলেন অতি সাধারণ মানুষের কথায় ও জীবনে। তিনি হৃদয় দিয়ে অনুভব করেছিলেন ও তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস জন্মেছিল যে, আপাত ঘোর পাপীর মধ্যেও সুপ্ত দেবত্বভাব রয়েছে।[২৬] মানুষের মধ্যে ঐ দেবত্বের বিকাশই হলো ধর্ম ও শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য। মোহিতলাল মজুমদার কবিসুলভ দৃষ্টি ও ভাষায় স্বামীজীর জীবনের এই রূপান্তরটি তুলে ধরেছেন। তিনি লিখেছেনঃ "একদিকে যেমন গভীর মমতায়, অপরিসীম অনুকম্পায় তাঁহার হৃদয় আপ্লুত হইয়াছিল, অপরদিকে তেমনই যেন তাঁহার ললাটের তৃতীয় নয়নে, এই দুর্গতির নিম্নাভিমুখী ধারার যুগযুগান্তর উদ্ঘাটিত হইয়া গেল। সেই স্থির অপলক দৃষ্টি যতই গভীর হইয়া উঠিল, ততই যেন সেই দুই প্রান্তের ব্যবধান—সেই দেবত্ব ও পশুত্বের বৈসাদৃশ্য—লোপ পাইতে লাগিল। সোনায় কখনো কলঙ্ক ধরে না, আত্মার কখনো অধোগতি হয় না··· তিনি যেন দিব্যদৃষ্টিতে দেখিতে পাইলেন, ঐ দেহ মৃত বা পতিত নয়—ঐ মোহ সাময়িক মূর্ছামাত্র; বরং ঐ দেহেই আত্মার পুনর্জাগরণ সুসাধ্য।"[২৭]

পরিব্রাজক জীবনের পরিসমাপ্তির পর শিকাগো ধর্মমহাসম্মেলনে যোগ দিতে যাওয়ার পূর্বে স্বামীজীর হৃদয় আর্তমানবের সেবা ও দুঃখ-দারিদ্র্য মোচনের জন্য কতটা উদ্বেলিত হয়েছিল, নিজের মুক্তি অপেক্ষা জনগণের মুক্তি ও উজ্জীবনের জন্য সর্বশক্তি নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়তে তিনি কতখানি ব্যাকুল হয়েছিলেন তার বিবরণ আমরা পাই প্রত্যক্ষদর্শী স্বামীজীর গুরুভাই স্বামী তুরীয়ানন্দের স্মৃতি-চারণে। আমেরিকায় পাড়ি দেবার অল্প কিছুকাল আগে আবু রোড স্টেশনে আকস্মিকভাবে স্বামীজীর সঙ্গে স্বামী ব্রহ্মানন্দ ও স্বামী তুরীয়ানন্দের দেখা হয়। প্রিয় গুরুভাইদের দেখে স্বামীজী গভীর আবেগ ও ব্যাকুলতার সঙ্গে তাঁদের বলেন যে, সারা ভারতবর্ষ পরিক্রমা করে নিজের চোখে মানুষের অসীম দুঃখ-দারিদ্র্য ও বেদনা প্রত্যক্ষ করে তিনি অশ্রুসংবরণ করতে পারছেন না। তাঁর এখন স্থির বিশ্বাস জন্মেছে যে, আগে দারিদ্র্য-যাতনা দূর না করে ধর্মপ্রচার হবে অর্থহীন। তাই মানুষের দুঃখমোচনের জন্য আর্থিক সংস্থানের উদ্দেশ্যেই তাঁর আমেরিকাযাত্রার সিদ্ধান্ত। এই ঘটনার উল্লেখ করে স্বামী তুরীয়ানন্দ লিখেছেন যে, তিনি ও স্বামী ব্রহ্মানন্দ আবু পাহাড়ের কাছে নিরালায় তপস্যার জন্য গিয়েছিলেন। আবু পাহাড় স্টেশনে তাঁরা স্বামীজীর দেখা পাবেন তা চিন্তাও করেননি। হঠাৎ দেখা হবার পর স্বামীজী তাঁদের কাছে তাঁর শিকাগো ধর্মমহাসম্মেলনে যোগদানের সিদ্ধান্ত ও উদ্দেশ্যের কথা বলেন। স্বামীজী বলেন, তাঁর ঐ সিদ্ধান্ত ঈশ্বরের ইচ্ছার ফল। অশ্রুসজল রক্তিম মুখে, গভীর ভাবাবেগে স্বামীজী তুরীয়ানন্দজীকে বলেনঃ "হরিভাই, আমি তোমাদের তথাকথিত ধর্ম বুঝি না।" তারপর গভীর অব্যক্ত বেদনার সঙ্গে নিজের বুকে কম্পিত হাত রেখে স্বামীজী বলেনঃ "আমার হৃদয় অনেক, অনেক বেশি বড় হয়ে গেছে। আমি অন্যের দুঃখ অনুভব করতে শিখেছি। বিশ্বাস কর, আমি হৃদয়ের অন্তস্তলে এই বেদনা অনুভব করি।" ভাবাবেগে স্বামীজীর কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে গিয়েছিল। তিনি নির্বাক হয়ে গিয়েছিলেন, দুই চোখ দিয়ে বয়ে চলেছিল অশ্রুধারা। স্বামী তুরীয়ানন্দও নিজেকে সামলাতে পারেননি। তাঁর চোখও জলে ভরে উঠেছিল। তিনি ঐ ঘটনার কথা বলতে গিয়ে বলেছিলেনঃ "যখন স্বামীজীর ঐ বিশাল দুঃখ-বোধ প্রত্যক্ষ করলাম তখন আমার মনের অবস্থা কী হয়েছিল তা অনুমান করতে পার?" স্বামী তুরীয়ানন্দের সেই মুহূর্তে মনে হয়েছিল গৌতম বুদ্ধের কথা। মনে হয়েছিল, যেন মানুষের সব দুঃখ-বেদনা স্বামীজীর স্পন্দিত হৃদয়ে প্রবেশ করেছে। তিনি বলেছিলেন যে, স্বামীজীকে কারো পক্ষে সামান্যতম বোঝাও সম্ভব নয়, যদি না সে স্বামীজীর মধ্যে যে আগ্নেয়গিরির বিস্ফোরণ হচ্ছিল তার ভগ্নাংশও প্রত্যক্ষ করে থাকে।[২৮]

২৬ Life of Vivekananda, p. 24.

২৭ বীর-সন্ন্যাসী বিবেকানন্দ, পৃঃ ১৬-১৭

২৮ *Life of Vivekananda*—Romain Rolland, pp. 30-31

তুরীয়ানন্দজীর এই স্মৃতিচারণ এক অমূল্য সম্পদ। স্বামীজীর পরিব্রাজক জীবনের গুরুত্ব বোঝার জন্য এ এক অতি মূল্যবান উপাদান কিন্তু প্রসঙ্গতঃ আর একটি কথাও স্মরণ রাখা প্রয়োজন। শিকাগো ধর্মমহাসম্মেলনে যোগদানের কারণ সম্পর্কে স্বামীজী তুরীয়ানন্দজী ও ব্রহ্মানন্দজীকে ঐসময় যা বলেছিলেন তা তাঁর তৎকালীন মানসিক অবস্থা ও ভাবনা-চিন্তার প্রতিফলন। অবশ্যই স্বামীজীর আমেরিকাযাত্রার সিদ্ধান্তের পিছনে ভারতের দুঃখ-দারিদ্র্যমোচনের উপায়সন্ধানের সঙ্কল্প কাজ করেছিল। কিন্তু এছাড়াও তাঁর অন্য উদ্দেশ্যও ছিল। বহির্জগতে শ্রীরামকৃষ্ণ তথা সনাতন ধর্মের শাশ্বত বাণীর ব্যাখ্যা ও প্রচার, বিশ্বশান্তি, ঐক্য ও সর্বজনীন মানবিক ধর্মের প্রয়োজনের কথা তুলে ধরা, ভারতীয় সভ্যতা, সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের বিরুদ্ধে পাশ্চাত্যের রাজনৈতিক ও ধর্মীয় আক্রমণের উপযুক্ত জবাব দিয়ে ভারতবাসীর আত্মবিশ্বাস ও মর্যাদাবোধ পুনঃপ্রতিষ্ঠা করাও তাঁর পাশ্চাত্যে যাওয়ার কারণ।[২১] কিন্তু আবু রোড স্টেশনে স্বামী ব্রহ্মানন্দ ও স্বামী তুরীয়ানন্দের সঙ্গে আকস্মিক সাক্ষাৎকারের মুহূর্তে স্বামীজীর সারা মন ও হৃদয় জুড়ে ছিল ভারতবর্ষের লক্ষ লক্ষ অবহেলিত, বঞ্চিত, দারিদ্র্য-লাঞ্ছিত মানুষের কল্যাণ-চিন্তা। তাই বিদেশযাত্রার উদ্দেশ্যের কথা বলতে গিয়ে ঐ কারণটাই অগ্রাধিকার পেয়েছিল। আর একটি ব্যাখ্যাও হতে পারে। স্বামীজীর অন্যান্য গুরুভাইরা শ্রীরামকৃষ্ণের মহাপ্রয়াণের পর সাধন-ভজন ও তপস্যার ওপরই বেশি গুরুত্ব দিয়েছিলেন। ব্যক্তি-মুক্তির (personal salvation) চিন্তাই তাঁদের মুখ্য চিন্তা ছিল। পরিব্রাজক জীবনের অভিজ্ঞতা ও উপলব্ধির পর এবং তাঁর কাছে শ্রীরামকৃষ্ণের বিশেষ নির্দেশের প্রভাবে স্বামীজীর মন কিন্তু অন্য খাতে বইছিল। তাঁর গুরুভাইদের সঙ্গে এই বিষয়ে কিছুটা মানসিক ব্যবধান, এমনকি ভুল বোঝাবুঝিরও সৃষ্টি হচ্ছিল। স্বামীজীর তা অজানা ছিল না। তাই স্বামী ব্রহ্মানন্দ এবং স্বামী তুরীয়ানন্দকে দীর্ঘদিন পর দেখে স্বামীজী তাঁর মনের সব ভাব, ব্যথা, বেদনা ও আকুলতা উজাড় করে দিয়েছিলেন।

পরিশেষে আর একটি কথা বলা প্রয়োজন। সমালোচকরূপে স্বামী বিবেকানন্দ ছিলেন অত্যন্ত কঠোর, প্রায়শই নির্মম। যেকোন মানুষ বা দেশের পক্ষে আত্মসমালোচনা তিনি একান্ত প্রয়োজন বলে বিশ্বাস করতেন। নিজের দুর্বলতা, ব্যর্থতা ও অক্ষমতা প্রকাশ্যে স্বীকার করার সাহস ছাড়া কোন ব্যক্তি, সমাজ, দেশ বা জাতির উন্নতি হওয়া, বিকাশ হওয়া সম্ভব নয় বলে তিনি মনে করতেন। স্বদেশ, স্বদেশবাসী, ভারতীয় সমাজ, জীবন, রীতি-নীতি, ধর্ম কোন কিছুরই সমালোচনা করতে তিনি দ্বিধা করতেন না। ভ্রাতৃপ্রতিম গুরুভাইদের, প্রিয় শিষ্য-শিষ্যা এবং অনুরাগীদেরও তিনি প্রয়োজনবোধে সমালোচনা করতেন। অতি পরিচিত প্রিয়জনের সমালোচনা করতে তিনি কোন দ্বিধা করতেন না। স্বভাবতই নিজেকেও তিনি অব্যাহতি দিতেন না। প্রথম যৌবনের নরেন্দ্রনাথের যে-সমালোচনা তিনি পরে করেছিলেন তার যৌক্তিকতা সেইভাবে বিচার করতে হবে। প্রকৃতপক্ষে স্বামীজী তাঁর নিজের কুড়ি বছর বয়সের যে-চরিত্রচিত্রণ করেছিলেন তা সম্পূর্ণ ঠিক নয়। শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে যে-যুবক নরেন্দ্রনাথ এসেছিলেন, যাঁর জন্য শ্রীরামকৃষ্ণ প্রতীক্ষা করে বসেছিলেন, যাঁকে না দেখলে তিনি অধীর হয়ে উঠতেন এবং যে-নরেনকে তিনি তাঁর অন্য সব সন্তানদের তথা সারা দেশের মানুষকে দেখা ও শিক্ষা দেবার 'দায়িত্ব' দিয়ে গিয়েছিলেন, সেই নরেন্দ্রনাথ মোটেই সহানুভূতিশূন্য, উগ্র, সঙ্কীর্ণমনা যুবক ছিলেন না। তাঁর বিশাল হৃদয় ও মানবিকতার পরিচয় কৈশোর থেকেই পরিস্ফুট হচ্ছিল। শ্রীরামকৃষ্ণের সংস্পর্শ, শিক্ষা এবং পরিব্রাজক জীবনের অভিজ্ঞতা তাঁর অন্তর্নিহিত দিব্যভাব ও শক্তিকে পূর্ণতাদান করে উদ্ভাসিত করেছিল। শিকাগো ধর্মমহাসম্মেলন ছিল সেই পূর্ণমানব স্বামী বিবেকানন্দের বৃহত্তর জগৎ ও মঞ্চে আবির্ভাবের ঐতিহাসিক সন্ধিক্ষণ। ☐ [ সমাপ্ত ]

২১ দ্র: Swami Vivekananda in the West: New Discoveries—Marie Louise Burke, Vol. III., 1985, pp. 5-7 এবং বিবেকানন্দ ও সমকালীন ভারতবর্ষ—শঙ্করীপ্রসাদ বসু, ১ম খণ্ড, পৃঃ ৬-৯।

# স্বামী বিবেকানন্দের ভারত-পরিক্রমা ও ধর্মমহাসম্মেলনের প্রস্তুতি-পর্ব

## স্বামী বিমলাত্মানন্দ

[ পূর্বানুবৃত্তি ]

জয়পুরে স্বামীজী একজন সুপণ্ডিত বৈয়াকরণের কাছে পাতঞ্জল ভাষ্যসহ পাণিনির অষ্টাধ্যায়ী অধ্যয়ন করেছিলেন। স্বামীজীর গভীর মনঃসংযোগ ও পাণ্ডিত্য দেখে পণ্ডিতজী স্তম্ভিত হয়েছিলেন। রাজ্যের প্রধান সেনাপতি নিরাকারবাদী বেদান্তী সর্দার হরিসিংহ লাডকানী এবং সর্বজনমানিত বেদান্তী সুরজনারায়ণের সঙ্গে স্বামীজীর পরিচয় হয়। ক্রমে সে-পরিচয় ঘনিষ্ঠতায় পরিণত হয়। হরিসিংহের বাড়িতে স্বামীজী ধর্মতত্ত্ব ও শাস্ত্রাদি আলোচনা ও বিচারাদি করতেন। প্রতিমা-পূজায় অবিশ্বাসী হরিসিংহ স্বামীজীর সঙ্গে আলোচনার পর মূর্তিপূজায় বিশ্বাসী হয়েছিলেন। পরিব্রাজক জীবনে স্বামীজী পরেও দুবার জয়পুরে এসেছিলেন—একবার রাজা অজিত সিংহের সঙ্গে আবু পাহাড় থেকে খেতড়ি যাবার পথে এবং আমেরিকা-যাত্রার আগে খেতড়ি থেকে বোম্বাইয়ের পথে।

জয়পুরের পর স্বামীজী গেলেন আজমীরে। সেখান থেকে আবু পাহাড়ে। এখানে তিনি কিছুদিন এক মুসলমান উকিলের বাড়িতে আতিথ্য-গ্রহণ করেছিলেন। আবু পাহাড়েই স্বামীজীর সঙ্গে খেতড়ি-রাজের প্রাইভেট সেক্রেটারী এবং খেতড়ির রাজা অজিত সিংহের সঙ্গে পরিচিত হন। খেতড়ি-রাজ তাঁকে খেতড়ি নিয়ে যান। স্বামীজী আজমীরে আকবর শাহের প্রাসাদ, চিস্তি সাহেবের দরগা, পুষ্করতীর্থ, সাবিত্রী মন্দির, ব্রহ্মা মন্দির প্রভৃতি দর্শন করেন। ১৮৯১ খ্রীস্টাব্দের ১৪ এপ্রিল আজমীর থেকে তিনি আসেন আবু পাহাড়ে। এখানে অতুলনীয় কারুকার্যময় দিলওয়ারা জৈন মন্দির দেখে স্বামীজী অভিভূত হয়েছিলেন। আবু পাহাড়ের নির্জন চম্পাগুহায় স্বামীজী সাধন-ভজন ও তপস্যাদি করেছিলেন। আবু পাহাড়ে স্বামীজীর অবস্থান দুই মাসের বেশি ( ১৪ এপ্রিল-২৪ জুলাই )। মুসলমান উকিলের বাড়িতে থাকার জন্য পরিচয়ের প্রথমেই জগমোহনলাল স্বামীজীকে প্রশ্ন করেনঃ হিন্দু সন্ন্যাসী হয়ে মুসলমানের বাড়িতে তিনি কি করে আছেন? স্বামীজী বললেনঃ "আপনি বলছেন কি? আমি তো সন্ন্যাসী, আমি আপনাদের সমস্ত সামাজিক বিধি-নিষেধের ঊর্ধ্বে। আমি ভাঙ্গীর সঙ্গে পর্যন্ত খেতে পারি। ভগবান অপরাধ নেবেন, সে-ভয় আমার নেই ; কেননা এটা ভগবানের অনুমোদিত। শাস্ত্রের দিক থেকেও আমার ভয় নেই, কেননা শাস্ত্রে এটা অনুমোদিত। তবে আপনাদের এবং আপনাদের সমাজের ভয় আছে বটে। আপনারা তো আর ভগবান বা শাস্ত্রের ধার ধারেন না। আমি দেখি বিশ্বপ্রপঞ্চের সর্বত্র ব্রহ্ম প্রকাশিত আছেন। আমার দৃষ্টিতে উচ্চনীচ নেই। শিব, শিব!"[৮৮] স্বামীজীর কথায় স্তম্ভিত জগমোহনলাল মনে মনে স্থির করলেন যে, খেতড়িরাজের সঙ্গে এই নির্ভীক ও পণ্ডিত সন্ন্যাসীর পরিচয় হলে রাজা পরম লাভবান হবেন। অজিত সিংহকে জগমোহনলাল সব জানালেন। রাজা সব শুনে স্বামীজীর কাছে গিয়ে সাক্ষাৎ করতে ব্যাকুল হলেন। স্বামীজী সেকথা শুনে নিজেই দেখা করলেন আবুর খেতড়ি প্রাসাদে অজিত সিংহের সঙ্গে। অল্প সময়েই পরস্পরের মধ্যে এক আত্মিক সম্বন্ধ স্থাপিত হলো। রাজা স্বামীজীকে খেতড়িতে নিমন্ত্রণ করলেন, আর স্বামীজী সানন্দে সে-নিমন্ত্রণ গ্রহণ করলেন। পরে রাজা অজিত সিংহ স্বামীজীর মন্ত্রশিষ্য হয়েছিলেন এবং রামকৃষ্ণ-আন্দোলনে এক উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নিয়েছিলেন।

৮৮ যুগনায়ক বিবেকানন্দ, ১ম খণ্ড, পৃঃ ৩২২

আবু পাহাড়ের খেতড়ি-প্রাসাদে শাস্ত্রীয় আলোচনা ও সঙ্গীতের আসর বসত। এখানে যোধপুরের হরদয়াল সিংহ, জলেশ্বরের ঠাকুরসাহেব মুকুন্দ সিংহ ও আজমীরের আর্যসমাজের সভাপতি পণ্ডিত হরবিলাস সর্দারের সঙ্গে স্বামীজীর পরিচয় হয়। হরবিলাসজী স্বামীজীর স্মৃতিচয়নে বলেছেন: "স্বামী বিবেকানন্দের সঙ্গে আমি চারবার মিলিত হয়েছি। প্রথম সাক্ষাৎ মাউণ্ট আবুতে।... আমি আমার বন্ধু আলিগড় জেলার চাহলাসের টি. মুকুন্দ সিংহের সঙ্গে গ্রীষ্ম কাটাতে মাউণ্ট আবুতে গিয়েছিলাম। সেখানে গিয়ে দেখি, টি. মুকুন্দ সিংহের সঙ্গে স্বামী বিবেকানন্দ রয়েছেন।... আমার বন্ধুর সঙ্গে প্রায় দশদিন ছিলাম এবং স্বামীজীর সঙ্গে মিলিত হয়ে বহু কথাবার্তা বলেছি। আমার বয়স তখন ২১। স্বামীজীর ব্যক্তিত্ব আমাকে মুগ্ধ করেছিল। অতি চমৎকার কথাবার্তা বলেন, সব বিষয়ে সংবাদ রাখেন। প্রথমদিন নৈশ আহারের পরে স্বামী বিবেকানন্দ ঠাকুরসাহেবের অনুরোধে একটি গান গাইলেন। এমন অপূর্ব মধুর সুরে গানটি গেয়েছিলেন যে, মনপ্রাণ ভরে গিয়েছিল আনন্দে। তাঁর সঙ্গীতে আমি একেবারে মোহিত হয়ে গিয়েছিলাম। প্রতিদিন তাঁকে একটি-দুটি গান গাইতে অনুরোধ করতাম। তাঁর সঙ্গীতময় কণ্ঠস্বর এবং আচার-আচরণ আমার ওপর স্থায়ী ছাপ রেখে গেছে। আমরা কখনো কখনো বেদান্ত-বিষয়ে কথাবার্তা বলতাম, যেবিষয়ে আমার কিছু জানাশুনা ছিল।... বেদান্ত-বিষয়ে স্বামী বিবেকানন্দের কথাবার্তা আমাকে গভীরভাবে আকৃষ্ট করেছিল। বিভিন্ন বিষয়ে তাঁর মতামত আমার কাছে পরম বরণীয় বস্তু ছিল। কারণ, সেগুলি গভীর দেশপ্রেমে পূর্ণ। মাতৃভূমি এবং হিন্দু-সংস্কৃতির প্রতি প্রেমে তিনি পূর্ণ ছিলেন। তাঁর সঙ্গে যেসময় আমি কাটিয়েছি, তা আমার জীবনের সর্বাধিক আনন্দপূর্ণ সময়ের মধ্যে পড়ে। আমাকে বিশেষভাবে আকৃষ্ট করেছিল তাঁর স্বাধীনচিত্ততা।"[৮৯]

আজমীরে স্বামীজী আবার এসেছিলেন ২৭ অক্টোবর ১৮৯১। হরবিলাসজী ও পণ্ডিতপ্রবর শ্যামজী কৃষ্ণবর্মার (পরবর্তী কালে চরমপন্থী রাজনীতিবিদ্) বাড়িতে তিনি ছিলেন প্রায় তিন সপ্তাহ। হরবিলাসজী লিখেছেন: "আমার পরিষ্কার মনে আছে, স্বামী বিবেকানন্দের সঙ্গে আমাদের অত্যন্ত চিত্তাকর্ষক কথাবার্তা হয়েছিল। তাঁর বাগ্মিতা, দেশপ্রেমিকতা, আচরণের মাধুর্য আমাকে আনন্দিত করেছিল, গভীর প্রভাব বিস্তার করেছিল আমার ওপর। শ্রীযুক্ত শ্যামজী এবং স্বামী বিবেকানন্দ যখন সংস্কৃত সাহিত্য ও দর্শনের কোন বিষয় আলোচনা করতেন, তখন আমার ভূমিকা ছিল অধিকাংশ ক্ষেত্রে কেবল শ্রোতার।... তাঁর যে-তিনটি জিনিস আমাকে সর্বাধিক প্রভাবিত করেছিল, তা হলো বাকপটুত্বের দ্বারা অপরের মধ্যে ভাবপ্রবেশ করবার ক্ষমতা, সঙ্গীতময় কণ্ঠস্বর এবং স্বাধীন নির্ভীক চরিত্র।"[৯০]

আবু পাহাড় থেকে ২৪ জুলাই ১৮৯১ রাজা অজিত সিংহের সঙ্গে স্বামীজী আজমীর, জয়পুর, খৈরথল, কোটে হয়ে খেতড়িতে পেঁছালেন ৭ আগস্ট ১৮৯১। খেতড়িতে স্বামীজী প্রায় তিন মাস (৭ আগস্ট-২৭ অক্টোবর ১৮৯১) ছিলেন। খেতড়িতে স্বামীজীকে নিয়ে আসার অল্পদিন পরেই খেতড়ি-রাজ স্বামীজীর কাছে মন্ত্রদীক্ষা গ্রহণ করেন। খেতড়ি-রাজের দুটি প্রাসাদ ছিল—পুরনো প্রাসাদ পাহাড়ের চূড়ায় এবং নতুন প্রাসাদ শহরের মধ্যে। স্বামীজী দুটি প্রাসাদেই ছিলেন। তবে বেশির ভাগ তিনি নতুন প্রাসাদে থাকতেন। এই প্রাসাদে নিচের তলায় রাজদরবার ছিল। দোতলায় রাজা অজিত সিংহ থাকতেন।[৯১] তিনতলায় একটি ঘরে স্বামীজীর বাসস্থান ছিল। দুজনে কখনো শাস্ত্রীয় আলোচনা করতেন, কখনো বা ধর্ম ও দর্শনের প্রসঙ্গ হতো, কখনো তাঁরা বহির্দৃশ্য দর্শনে বের হতেন, কখনো ঘোড়ায় চড়তেন, কখনো সঙ্গীতের আসর বসত। রাজা ছিলেন একজন ভাল বীণাবাদক—তিনি স্বামীজীকে বীণা বাজিয়ে শোনাতেন। কখনো বা স্বামীজী গান গাইতেন, হারমোনিয়াম

৮৯ বিবেকানন্দ ও সমকালীন ভারতবর্ষ—শংকরীপ্রসাদ বসু, ১ম খণ্ড, পৃঃ ৭৫-৭৬ ৯০ ঐ

৯১ প্রাসাদের এই অংশটি অজিত সিংহের প্রপৌত্র রাজা সর্দার সিং রামকৃষ্ণ মিশনের শাখাকেন্দ্রর জন্য দান করেন।

বাজাতেন রাজা স্বয়ং।[১২] এই সময়ে রাজা স্বামীজীর কাছে পদার্থবিদ্যা, রসায়নবিদ্যা ও নক্ষত্র-বিদ্যার পাঠ গ্রহণ করেন। প্রাসাদের সর্বোচ্চ গৃহে স্বামীজী একটি ল্যাবরেটরি স্থাপন করিয়েছিলেন। ঐ গৃহের ছাদে একটি দূরবীক্ষণও বসানো হয়েছিল। রাত্রিতে দূরবীক্ষণের সাহায্যে গুরু-শিষ্য আকাশে নক্ষত্রের গতিবিধি অবলোকন করতেন।[১৩]

স্বামীজী রাজপ্রাসাদে থাকলেও তাঁর নিজস্ব ধ্যান-ধারণা, সাধন-ভজন যথারীতি চলত। শোনা যায় যে, রাত্রিতে অনেক সময় স্বামীজী নিকটস্থ শ্রীহনুমান মন্দিরে জপ-ধ্যান করতেন। এই সময়ে খেতড়িরাজের সভাপণ্ডিত তৎকালীন রাজস্থানের অদ্বিতীয় বৈয়াকরণ পণ্ডিত নারায়ণ দাস শাস্ত্রীর কাছে তাঁর অসমাপ্ত পাণিনি ব্যাকরণের পাঠ শুরু করেন স্বামীজী। পণ্ডিতজী রাজকীয় সংস্কৃত বিদ্যালয়ের শিক্ষক ছিলেন। ওখানেই স্বামীজী পড়তে যেতেন। নারায়ণ দাসজী বলতেন, জীবনে স্বামীজীর মতো মেধাবী ছাত্র তিনি কখনো পাননি। তিনি বলেছিলেনঃ "মহারাজ, আপকো মাফিক বিদ্যার্থী মিলনা মুস্কিল।"[১৪] পণ্ডিতজী একদিন বললেনঃ "স্বামীজী! আমার যাহা শিখাইবার ছিল তাহা শেষ হইয়াছে। এরূপ প্রতিভা মানবে সম্ভব, ইহা আপনাকে না দেখিলে বিশ্বাস করিতাম না।"[১৫] বেদজ্ঞ পণ্ডিত সুন্দরলালজী ওঝা, পণ্ডিত শঙ্করলাল শর্মা, পণ্ডিত ঠাকুরচন্দ্র সিংহ প্রমুখের সঙ্গে স্বামীজীর হৃদ্যতা হয়েছিল।[১৬]

স্বামীজী শুধু রাজপ্রাসাদেই সবসময় অতিবাহিত করতেন না। তিনি মাঝে মাঝে প্রজাদের বাড়িতে বেরিয়ে পড়তেন। তাঁদের সঙ্গে তিনি ধর্ম-প্রসঙ্গ করতেন। রাজাকে যেভাবে দেখতেন তিনি, সেই একই দৃষ্টিভঙ্গিতে দেখতেন রাজার দীনতম প্রজাকেও। সমগ্র খেতড়ি স্বামীজীকে দেখে মুগ্ধ হয়েছিল। খেতড়িরাজের এক দরিদ্র চর্মকার প্রজা স্বামীজীর পরিব্রাজক জীবনে এক বিশেষ চরিত্র-রূপে চিহ্নিত হয়ে আছে। একবার তিনদিন অভুক্ত স্বামীজী ঐ দরিদ্র চর্মকারের তৈরি করা রুটি খেয়ে বলেছিলেন, স্বয়ং নারায়ণ বুঝি দীনবেশে তাঁর কাছে এসেছিলেন। দেবরাজ ইন্দ্র স্বর্ণপাত্রে সুধা এনে দিলেও তেমন তৃপ্তিকর হতো কিনা সন্দেহ। ঐ দরিদ্র ব্যক্তির ধর্মপ্রাণতা এবং হৃদয়বত্তা দেখে অভিভূত স্বামীজী ভাবলেন—"এরূপ কত শত উচ্চচেতা ব্যক্তি পর্ণকুটীরে বাস করে। কিন্তু আমাদের চক্ষে তারা চিরদিন ঘৃণ্য, হীন।"[১৭] রাজপুতানায় ট্রেন-ভ্রমণের সময় অলৌকিকতায় অতি-মাত্রায় বিশ্বাসী এক বিদ্বান থিওসফিস্টকে তিরস্কার করে স্বামীজী বলেছিলেনঃ "বন্ধু, আপনাকে দেখে তো বুদ্ধিমান বলেই মনে হয়। আপনার মতো লোকের পক্ষে একটু বুদ্ধি-বিবেচনা করে চলা উচিত। সিদ্ধাই-এর সঙ্গে আধ্যাত্মিকতার কোন সম্বন্ধ নেই, কেননা বিচার করে দেখলে এই পাওয়া যায়—যে-ব্যক্তি সিদ্ধাই দেখায়, সে নিজ বাসনার দাস এবং অতিশয় আত্মম্ভরী। আধ্যাত্মিকতার অর্থ হচ্ছে চরিত্রবলরূপ যথার্থ শক্তি অর্জন করা, এর অর্থ হচ্ছে রিপুজয় এবং বাসনা নির্মূল করা। এই সকল ভোজবাজী, যাতে মনুষ্য-জীবনের কোন সমস্যারই প্রকৃত সমাধান হয় না, এর পিছনে দৌড়ানো মানে শক্তির অযথা অপব্যয়; এটা একটা হীন স্বার্থপরতা ছাড়া আর কিছুই নয়, আর এর ফলে মস্তিষ্কবিকার উৎপন্ন হয়। এইসব আহাম্মকই তো আমাদের জাতের সর্বনাশ করেছে। এখন আমাদের প্রয়োজন হচ্ছে বেশ শক্ত ও সবল সাধারণ বুদ্ধি, সর্বসাধারণের সহিত সহানুভূতি এবং মানুষ-গড়ার মতো দর্শন ও ধর্ম।" স্বামীজীর কথায় থিওসফিস্ট ভদ্রলোকটি বুঝতে পেরেছিলেন ধর্মের আসল রহস্য। তিনি

১২ Swami Vivekananda—A Forgotten Chapter of His Life—Beni Sankar Sharma. Oxford Book & Stationery Co., Calcutta, 1963, p. 20 এবং প্রবন্ধকারের খেতড়িতে তথ্যসংগ্রহ : তারিখ ২১ নভেম্বর, ১৯৯২।

১৩ যুগনায়ক বিবেকানন্দ, ১ম খণ্ড, পৃঃ ৩২৫

১৪ স্বামী বিবেকানন্দ, ১ম ভাগ, পৃঃ ২৫২

১৫ বিবেকানন্দ চরিত, পৃঃ ৮৩

১৬ রাজস্থান মেঁ বিবেকানন্দ, পৃঃ ১৫৪-১৫৫

১৭ যুগনায়ক বিবেকানন্দ, ১ম খণ্ড, পৃঃ ৩৩০-৩৩১

প্রতিজ্ঞা করেছিলেন যে, স্বামীজীর উপদেশই তিনি জীবনে অনুসরণ করবেন।[৯৮] রাজস্থানেই একবার ট্রেনে দুজন ইংরেজ সহযাত্রী স্বামীজীকে সামান্য ফকির জ্ঞান করে ইংরেজীতে খুবই ঠাট্টা-বিদ্রূপ করেছিলেন। যখন তাঁরা জেনেছিলেন, স্বামীজী ইংরেজী জানেন, তখন তাঁরা বিশেষ বিব্রত হয়ে পড়েন এবং স্বামীজীর কাছে ক্ষমাভিক্ষা করেন। স্বামীজী তাঁদের বলেছিলেন: "আহাম্মকদের সংস্পর্শে আসা আমার জীবনে নতুন নয়।"[৯৯]

॥ ৭ ॥

রাজপুতানার পর স্বামীজী গেলেন গুজরাটে। তাঁর প্রথম পরিক্রমাস্থল আমেদাবাদ। আমেদাবাদের পর কাথিয়াবাড়, লিমডি, ভাবনগর, সিহোর, জুনাগড় ( চারবার ), বিলাওয়াল, সোমনাথ, গীর্ণার পর্বত, ভুজ ( কয়েকবার ), পোরবন্দর (কয়েকবার); দ্বারকা, মাণ্ডবী, পলিটানা ও বরোদা। স্বামীজীর গুজরাট-পরিক্রমাকাল ১৮৯১ খ্রীস্টাব্দের নভেম্বরের শেষ থেকে পরবর্তী মার্চ-এপ্রিল (১৮৯২) পর্যন্ত। গুজরাটে স্বামীজীর অসামান্য প্রতিভার পরিচয় প্রকাশিত হয়েছিল। তিনি প্রতিভাত হয়েছিলেন তপস্বীরূপে, আত্মজ্ঞাননিষ্ঠ সত্যদ্রষ্টা ঋষিরূপে, গুরুরূপে, রাজা-মহারাজা-অভিজাত সম্প্রদায়ের দ্বারা বহুমানিত আচার্যরূপে, ধর্ম-বিজ্ঞানের সমন্বয়কারিরূপে এবং ভারতের সাংস্কৃতিক পুনরুত্থানের অগ্রদূতরূপে।

আমেদাবাদে জৈন মন্দির, হিন্দু মন্দির, মসজিদ ও সমাধিসৌধে সুশোভিত কীর্তিস্থলগুলি দর্শন করে স্বামীজী অভিভূত হয়েছিলেন। জৈন পণ্ডিতদের সঙ্গে জৈন দর্শন আলোচনা করে তিনি নিজের জ্ঞানভাণ্ডার বৃদ্ধি করেছিলেন। লিমডিতে একদল ব্যভিচারী তান্ত্রিকদের পাল্লায় পড়েছিলেন তিনি। লিমডিরাজ ঠাকুরসাহেব যশোবন্ত সিংহের সহায়তায় তিনি তাদের হাত থেকে রক্ষা পেয়েছিলেন। লিমডিরাজের পরামর্শে এরপর থেকে বাসস্থান নির্বাচন সম্বন্ধে তিনি সতর্ক হয়েছিলেন। লিমডিতে পুরী গোবর্ধন মঠের তদানীন্তন শংকরাচার্য ও অন্যান্য পণ্ডিতেরা স্বামীজীর পাণ্ডিত্য ও বিচার-শক্তিতে চমৎকৃত হয়েছিলেন। ভাবনগর ও সিহোর হয়ে স্বামীজী যান জুনাগড়ে। জুনাগড়ের দেওয়ান হরিদাস বিহারীদাস দেশাইয়ের গৃহে তিনি অতিথিরূপে ছিলেন। ক্রমে বিহারীদাস স্বামীজীর একজন অন্তরঙ্গ বন্ধু ও পরম শুভাকাঙ্ক্ষী হয়ে ওঠেন। বিহারীদাসজীর বাড়িতে স্বামীজী ধর্ম, বহির্জগতে ভারতের সাংস্কৃতিক অবদান, দেশপ্রেম ও পাশ্চাত্য জগতে ভারতীয় চিন্তাধারার প্রসারের প্রয়োজনীয়তা প্রভৃতি বিভিন্ন প্রসঙ্গে আলোচনা করতেন। ওজস্বী ভাষায় বলতেন, সনাতন ধর্ম কত প্রাচীন অথচ কত নবীন, কত উদার, কত বেগবতী। প্রাচীন খ্রীস্টসন্তদের উন্নত জীবনের প্রশংসা যেমন তিনি করতেন, তেমনি আধুনিক খ্রীস্টান পাদরীদের মধ্যে অনেকের ভারত-বিদ্বেষ এবং হীন মনোবৃত্তিকে তীব্র আক্রমণ করতেন। শোনাতেন, তাঁর গুরুদেব শ্রীরামকৃষ্ণের অভূতপূর্ব জীবন ও দর্শনের বৃত্তান্ত। দেওয়ান অফিসের ম্যানেজার সি. এইচ. পাণ্ড্য লিখেছেন: "জুনাগড়ে আমরা সকলেই স্বামীজীর অকপটভাব, আড়ম্বরশূন্যতা, বিবিধ শিল্প-বিজ্ঞানে গভীর জ্ঞান, উদার মতসমূহ, ধর্মপ্রাণতা, প্রাণস্পর্শী বাগ্মিতা এবং অদ্ভুত আকর্ষণী শক্তিতে বিমুগ্ধ হইয়াছিলাম। এই সকল গুণ ব্যতীত তাঁহার সঙ্গীতে অসাধারণ দক্ষতা এবং বহুবিধ ভারতীয় কলাবিদ্যায় পারদর্শিতা ছিল।... আমরা সকলেই তাঁহার অনুরাগী হইয়া পড়িয়াছিলাম।"[১০০] জুনাগড়-নবাবের প্রাইভেট সেক্রেটারী গুজরাটী ব্রাহ্মণ মনসুখরাম সূর্যরাম ত্রিপাঠীর বাড়িতেও স্বামীজী কিছুদিন ছিলেন। এখানে তিনি প্রব্রজ্যারত গুরুভাই স্বামী অভেদানন্দের সঙ্গে অপ্রত্যাশিতভাবে সাক্ষাত হওয়ায় খুব আনন্দিত হয়েছিলেন। বিচক্ষণ শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত মনসুখরামের সঙ্গে স্বামীজী অদ্বৈত বেদান্তের আলোচনা করতেন। স্বামী অভেদানন্দ স্থির করেছিলেন, আর বরানগর মঠে ফিরবেন না। সেকথা শুনে স্বামীজী আবেগমথিত ভাষায় অভেদানন্দজীকে বলেছিলেন:

৯৮ যুগনায়ক বিবেকানন্দ, ১ম খণ্ড, পৃঃ ৩২৯
৯৯ ঐ, পৃঃ ৩৩০-৩৩১
১০০ ঐ, পৃঃ ৩৩৫-৩৩৬

"ভাই, তুমি শ্রীরামকৃষ্ণের সন্তান। তোমাদের লইয়াই মঠ। তোমরা মঠে না গেলে মঠ আর কাহার জন্য?" অভেদানন্দজী লিখেছেন, স্বামীজীর ঐকথা শুনে তাঁর চোখ জলপূর্ণ হলো। স্বামীজী সস্নেহে কাছে টেনে নিয়ে অভেদানন্দজীকে মঠে ফিরে যেতে বললেন। স্নেহের ঐ দুর্বার আকর্ষণে অভেদানন্দজী তাঁর মত পরিবর্তন করলেন। স্বামীজী তখন আশ্বস্ত হলেন। তিন-চারদিন একসঙ্গে থাকার পর অভেদানন্দজী দ্বারকা অভিমুখে যাত্রা করলেন। অভেদানন্দজী লিখেছেন: "নরেন্দ্রনাথের নিকট বিদায় লইলাম। দেখিলাম, নরেন্দ্রনাথের দুই চক্ষে জল। কাশীপুরে শ্রীশ্রীঠাকুরের সহিত সেই আনন্দময় দিনগুলির কথা তখন মনে পড়িল। আমিও চক্ষের জল সম্বরণ করিতে পারিলাম না।"[১০১]

সুবিখ্যাত গীর্ণার পর্বতে হিন্দু-মুসলমান-বৌদ্ধ-জৈন সম্প্রদায়ের বহু প্রাচীন পবিত্র কীর্তি ও ধ্বংসাবশেষের অপরূপ ভাস্কর্য দর্শন করেছিলেন স্বামীজী। কচ্ছের রাজধানী ভুজের দেওয়ানের বাড়িতে স্বামীজী কিছুকাল ছিলেন। এখানেও জুনাগড়ের মতো আলোচনাসভা বসত। স্বামীজী সেখানে বলিষ্ঠ ও প্রাঞ্জল ভাষায় ধর্ম ও অধ্যাত্ম-আলোচনার সঙ্গে সঙ্গে ভারতের শিল্প, কৃষি, অর্থনীতির জাগরণের কথাই বলতেন। ভুজ থেকে স্বামীজী জুনাগড়ে আসেন, জুনাগড়ে কিছুদিন থেকে তিনি যান সোমনাথ ও প্রভাসে। পূর্বেই কচ্ছের রাজা খেঙ্গারজী ত্রিজার সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয়েছিল। প্রভাসে পুনরায় উভয়ের সাক্ষাৎ হলো। স্বামীজীর অগাধ পাণ্ডিত্য এবং নানান বিষয়ে তাঁর আধুনিক অথচ সজীব চিন্তাধারা লক্ষ্য করে আশ্চর্যান্বিত রাজা খেঙ্গারজী বলেছিলেন: "স্বামীজী, একসঙ্গে অনেক পুস্তক পড়িতে গেলে যেমন মস্তিষ্ক দিশেহারা হয়ে পড়ে, তেমনি আপনার সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে আমার মস্তিষ্ক কূল-কিনারা হারিয়ে ফেলে। এত প্রতিভার প্রয়োগ কোথায় কিভাবে হবে? একটা কিছু অত্যাশ্চর্য ব্যাপার না ঘটিয়ে আপনি থামবেন না!"[১০২] বস্তুতঃ পরবর্তী কালে স্বামীজী অত্যাশ্চর্য ব্যাপারই ঘটিয়েছিলেন শিকাগো ধর্মমহাসম্মেলনে।

পোরবন্দরের শাসনকর্তা, রাজ্যের দেওয়ান বেদজ্ঞ শঙ্কর পাণ্ডুরঙ্গের গৃহ ভোজেশ্বর বাংলোতে স্বামীজী আতিথ্যগ্রহণ করেছিলেন। তিনি সুপণ্ডিত পাণ্ডুরঙ্গকে তাঁর অথর্ববেদের ভাষ্য রচনা করতে উল্লেখযোগ্য সাহায্য করেছিলেন। পাণ্ডুরঙ্গের কাছে স্বামীজী সংস্কৃতে কথা বলার অভ্যাস করেছিলেন। তাঁরই পরামর্শে তিনি ফরাসী ভাষা শিক্ষা করেছিলেন। পাণিনির পাতঞ্জল ভাষ্য সমাপ্ত করারও সুযোগ তিনি পেয়েছিলেন তাঁর কাছে। এইসময়ে স্বামীজী তাঁর ভিতরে এক বিশেষ শক্তির স্ফুরণ অনুভব করেছিলেন। তাঁর চিন্তায় প্রথম ও প্রধান স্থান ছিল ভারতের আধ্যাত্মিক পুনরভ্যুত্থান। তাঁর দৃষ্টিতে ধরা পড়েছিল, ভারত তাঁর সনাতন ধর্ম ও আর্য সংস্কৃতির প্রভাবে অভূতপূর্ব মহিমায় মহিমান্বিত হবে। কিন্তু তাঁর অন্তরও হাহাকার করেছিল তাঁর শিক্ষিত দেশবাসীর নীচতা, ঈর্ষা ও দেশপ্রেমের অভাব দেখে। তাঁর হৃদয় ক্রন্দন করেছিল তথাকথিত নেতা ও সমাজ-সংস্কারকদের কথায়-কাজে অমিল দেখে। দেশের অগণিত দরিদ্র ও পদদলিত সাধারণ মানুষের দুঃখের কথা ভেবে তাঁর হৃদয় ব্যাকুল হয়েছিল। তাঁর স্পষ্ট বোধ হয়েছিল—এ-অবস্থার পরিবর্তন অত্যাবশ্যক ও অবশ্যম্ভাবী। কিন্তু দেশের রাজা-মহারাজা বা অভিজাত ব্যক্তিবর্গ এবং তথাকথিত শিক্ষিত মানুষদের মধ্যে খুব কম লোকই এবিষয়ে সচেতন। দেওয়ানের বাড়িতে স্বামীজীর সাক্ষাৎ হয় গুরুভাই স্বামী ত্রিগুণাতীতানন্দের সঙ্গে। স্বামীজী তাঁকে বলেছিলেন: "ঠাকুর যে বলতেন, এর ভেতর সব শক্তি আছে, ইচ্ছা করলে এ জগৎ মাতাতে পারে, একথা এখন কিছু কিছু বুঝতে পারছি।"[১০৩]

[ক্রমশঃ]

১০১ আমার জীবনকথা—স্বামী অভেদানন্দ, ১ম প্রকাশ, ১৯৬৪, পৃঃ ২০১

১০২ যুগনায়ক বিবেকানন্দ, ১ম খণ্ড, পৃঃ ৩৪০

১০৩ ঐ, পৃঃ ৩৪৩

কবিতা

## বিবেকানন্দ

### স্বামী পূর্ণাত্মানন্দ

বিদ্যুৎ-বিহঙ্গ তুমি, প্রজ্বলন্ত তুমি বহ্নিশিখা,
উন্নত ললাটে তব পৌরুষের জয়টীকা আঁকা
জন্মলগ্ন হতে; বিপ্লবের অগ্নিশিশু, হে মহাবিদ্রোহী,
জাতির জীবনে তুমি মুক্তির চেতনা আনিলে বহি'
বলিষ্ঠ সঙ্কেতে ; অভী'র অমোঘ মন্ত্রে হে রুদ্রতাপস,
আত্মার আহুতি-যজ্ঞে বজ্রনাদী তোমার নির্ঘোষ
জাতির স্তিমিত রক্তে করেছে সঞ্চার উন্মদ স্পন্দন—
জেগেছে ঘুমন্ত সিংহ ছিন্ন করি' সকল বন্ধন
অমিত উৎসাহে ; চূর্ণ করি' দীনতার ঘৃণিত শৃঙ্খল,
বন্দীদল তুলেছে মস্তক পৃথ্বীচ্ছেদি স্পর্শি' নভস্তল,
বীর্যমূর্তি হে যোদ্ধা-সন্ন্যাসী, ভারতের পথে পথে
ক্লান্তিহীন একাকী চলেছে হেঁটে অরণ্যে পর্বতে,
দেখ নাই ফিরি' আঁখি কে কাঁদিছে পশ্চাতে তোমার
জননী, ভগিনী, ভ্রাতা, আরও কত আত্মীয় আত্মার
অনাহারে অর্ধাহারে যায় বুঝি তাহাদের প্রাণ,
বারেক ফেরনি তবু, ভোল নাই গুরুর আহ্বান ঃ
"যত্র জীব তত্র শিব, পাপী নয়—অমৃত-সন্তান,
মানুষের মাঝে দেখ গুপ্তভাবে সুপ্ত ভগবান !"
আসমুদ্রহিমাচল দেশ হতে অন্য দেশান্তরে
সে-বাণী শোনালে বীর, নিশিদিন মেঘমন্দ্র বরে!
মানবের ইতিহাসে খুলি' গেল নবদিক, ঘুচি' অন্ধকার
দিগন্ত উঠিল রাঙি', শোনা গেল পদধ্বনি নতুন উষার ॥

## নমুনা

### প্রীতম সেনগুপ্ত

শিশু দেখে প্রাজ্ঞেরা, জ্যেষ্ঠেরা, প্রবীণেরা
আনন্দ পায়—ভালবাসে শিশুকে ;
লাল গাল, আধো-আধো কথা,
নিষ্পাপ দুষ্টুমি ।
অবাক হয় কি ?
ঐ একই হাত-পা চোখ-মুখ
অঙ্গপ্রত্যঙ্গ নিয়ে তারাও তো বড় হয়েছে,
কপট হয়েছে, স্বার্থপর হয়েছে,
হিংস্র হয়েছে ।
মানুষ আজন্ম শিশু থাকে ভিতরে,
সুন্দর পদ্মফুলের মতো মন ।
তবু অবাক হয় কি ?
কেন যে অহেতুক
নোংরা দিয়ে ঢাকতে চায় নিজেকে !
পদ্মফুলটা যদি সারাজীবনই প্রকাশিত থাকত
কিই বা ক্ষতি হতো ?
সুন্দর পদ্মবনের মধ্যে আমরা থাকতাম,
সেখানে সবই 'সত্য শিব সুন্দর' ।
তবু হয় না—তা কোনদিনই হয় না ।
যদি হতোই তবে আর এত অন্ধকার কেন ?
নমুনা তো থাকে সবকিছুর ।
আজন্ম শিশুরও আছে ।
সুন্দর পদ্মফুলের আছে ।
যুগে যুগেই থাকে—
সৌন্দর্য অন্ধকারকে পথ দেখায় ।
এমনই এক নিটোল পদ্মফুল—
এক আজন্ম শিশু—শ্রীরামকৃষ্ণ ।

## শরণাগত

### লালী মুখার্জী

যে বুঝেছে সেই বুঝেছে
যে বোঝেনি, বোঝেনি ।
যে চিনেছে সেই চিনেছে,
যে চেনেনি, চেনেনি ।

আমার মনে মিশে আছে
বালি আর চিনি
পৃথক করার বোধ দাও
তোমায় যেন চিনি ।

## শোনগো জগদ্বাসী

### রবীন মণ্ডল

শোনগো জগদ্‌বাসী
দেখগো হেথায় আসি
জননী রয়েছে বসি
ভাবনা করো না।

রামচন্দ্রের কন্যা তিনি,
শ্যামাদেবীর নয়নমণি,
জয়রামবাটীর সারদামণি,
উঁচু-নীচু কিছু মানে না।

মা যে দুর্গা, সীতা, রাধেশ্বরী,
রামকৃষ্ণের সহচরী,
পাপি-তাপীর উদ্ধারকারী,
কারো দোষ দেখে না।

চন্দ্র সূর্য গ্রহ তারা
মায়ের পায়ে লুটায় তারা,
মুখটি মায়ের হাসিভরা
ভাবছে মোদের ভাবনা।

## জীবন

### কমল নন্দী

ধীরে ধীরে ম্লান হয়ে আসে সব
স্মৃতি, প্রেম, ঘৃণা, হিংসা, ক্ষোভ
জীবনে কমে আসে সব টান, সব মোহ
ধীরে ধীরে বাড়ে অনীহা, নিস্পৃহতা।

জীবনে আছে দুঃখ, আছে সুখ
আছে বিরহ-বেদনা জ্বালা
পথের প্রান্তে আছে আনন্দ,
আছে প্রেম, আছে শান্তি।

কাল, মহাকাল সবকিছু গ্রাস করে
অমসৃণ, মলিন, জীর্ণ, শীর্ণ যতকিছু সব

উত্তাল তরঙ্গসঙ্কুল জীবনসমুদ্রও
একদিন শান্ত হয়ে আসে,
তরঙ্গভঙ্গ হয় লয়।

জীবনসঙ্গীতের এ মহাছন্দ,
মহাকালের এ প্রলয় নৃত্য,
যে দেখে, যে বোঝে, সেই ধন্য।

## নিবেদন

### অরুণ গঙ্গোপাধ্যায়

"এই নাও আমার সুখ
এই নাও আমার দুঃখ।"

হাঁটতে হাঁটতে এসেছি ধুলো পায়
এবার এ-ভার বইতে পারা দায়…

এই রইল আমার দিন
এই রইল আমার রাত্রি

এই নাও আমার জন্ম
এই নাও আমার মৃত্যু।

এখন যেমন জলের ছায়া ভাঙে
দুকূল ডোবা অতীতচারী গাঙে

তেমনি ভাঙো, কাঁপুক চোখে জল
ধোয়াক তোমার ওদুটি পদতল।…

# পুণ্যস্মৃতি

## চন্দ্রমোহন দত্ত

[ পূর্বানুবৃত্তি ]

**চন্দ্রমোহন দত্ত ১৯৩৯ খ্রীস্টাব্দের ১৭ অক্টোবর দুর্গা-পঞ্চমীর দিন পরলোকগমন করেন। তাঁর এই অপ্রকাশিত স্মৃতিনিবন্ধটি লেখকের কনিষ্ঠ পুত্র কার্তিকচন্দ্র দত্তের সৌজন্যে প্রাপ্ত। কার্তিকচন্দ্র দত্ত বরানগর রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম এরিয়া লাইব্রেরীর লাইব্রেরিয়ান।—সম্পাদক, উদ্বোধন**

শরৎ মহারাজকে আমি মায়ের পরেই সবচেয়ে বেশি ভক্তি-শ্রদ্ধা করতাম। মা আমাকে বলেছিলেনঃ "শরৎ সাধারণ ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষ নয়, শরৎ সর্বভূতে শুধু ব্রহ্ম দেখে না, সে সব মেয়ের মধ্যে আমাকে দেখে, সব পুরুষের মধ্যে ঠাকুরকে দেখে। শরতের মতো হৃদয় দেখা যায় না, নরেনের পরেই ওর হৃদয়।" বাস্তবিক, তাঁর যেমন বিশাল চেহারা ছিল, তেমনি ছিল বিরাট হৃদয়। কত দুঃস্থ ও গরিব মানুষ, কত দুঃখী মেয়ে, কত অসহায় বিধবাকে যে তিনি গোপনে কতভাবে সাহায্য করেছেন তার ইয়ত্তা নেই। একজন তরুণ সন্ন্যাসী একদিন দেখলেন, শরৎ মহারাজ দুপুরে খাওয়ার পর বিশ্রাম না করে বাইরে বেরুচ্ছেন। সন্ন্যাসী জিজ্ঞাসা করলেনঃ "মহারাজ, আপনি কোথাও বেরুচ্ছেন?" মহারাজ বললেনঃ "হ্যাঁ, একটু কাজ আছে।" এই বলে তিনি রাস্তায় নামলেন। যুবক সন্ন্যাসীর মনে কৌতূহল হলো—মহারাজ কোথায় যান দেখতে হবে। তিনি দূর থেকে মহারাজকে অনুসরণ করতে শুরু করলেন। মহারাজ হাঁটতে হাঁটতে একটি বস্তির মধ্যে ঢুকলেন। সন্ন্যাসীও পিছনে পিছনে আসছিলেন। শরৎ মহারাজ একটি বাড়িতে ঢুকলেন। সন্ন্যাসী তাঁকে অনুসরণ করে সেই বাড়িটির কাছে গেলেন। ভিতরে ঢুকে দেখলেন, একটি ছোট্টঘরের মধ্যে কঙ্কালসার একটি লোক শুয়ে শুয়ে কাশছে। মহারাজ তার পাশে বসে বুকে হাত দিয়ে বলছেনঃ "কেমন আছ তুমি?" লোকটি কাশতে কাশতে বললঃ "ভাল আর কই আছি।" মহারাজ সস্নেহে বললেনঃ "কিন্তু তোমাকে তো আগের থেকে ভাল দেখছি, ওষুধ ঠিকমতো খাচ্ছ তো? ফলগুলো বোধ হয় সব শেষ হয়ে গেছে?" লোকটি বললঃ "ওষুধ খাচ্ছি, ফলও খাচ্ছি কিন্তু আপনি যতই চেষ্টা করুন, যতই ওষুধ আর ফল আমাকে খাওয়ান আমি জানি, যে-রোগ আমার হয়েছে তাতে আমি আর বাঁচব না।" মহারাজ স্নেহভরা কণ্ঠে বললেনঃ "কে বলেছে তুমি বাঁচবে না। তুমি একেবারে ভাল হয়ে যাবে। এই ওষুধ আর ফলগুলো রেখে যাচ্ছি, তুমি ঠিকমতো খাবে।" মহারাজের কথা শুনে লোকটি কাঁদতে কাঁদতে বললঃ "মহারাজ, আপনি মানুষ নন, আপনি দেবতা। এই রোগের ভয়ে আমার আত্মীয়স্বজন আমাকে ছেড়ে পালিয়েছে। আর আপনি এসে আমার পাশে নির্ভয়ে বসেছেন। আমার ওষুধ এবং পথ্যের ব্যবস্থা করছেন।" যুবক সন্ন্যাসীটি বাইরে থেকে জানালা দিয়ে এই দৃশ্য দেখে আর থাকতে পারলেন না। ছুটে গিয়ে ঘরে ঢুকে মহারাজের পায়ে পড়লেন। কাঁদতে কাঁদতে বললেনঃ "আমি মহা অপরাধী মহারাজ, আমি আপনাকে ঘৃণ্য সন্দেহ করেছিলাম। আমাকে ক্ষমা করুন।" মহারাজ তো সন্ন্যাসীকে সেখানে দেখে অবাক। শান্তভাবে শুধু বললেনঃ "সন্দেহ মনে পুষে না রেখে সঙ্গে সঙ্গে সমাধান করে নিয়ে তো ভালই করেছ। এই রকমই তো চাই।"

মহারাজের সেবক স্বামী অশেষানন্দের (কিরণ মহারাজের) কাছেও অনুরূপ একটি ঘটনা শুনেছিলাম। সেটি টেরিটি বাজার এলাকায় এজরা স্ট্রীটের একটি হোটেলে এক অবাঙালী যক্ষ্মা-

রোগাক্রান্ত ব্যক্তির ঘটনা। লোকটির নাম খোকানী। আত্মীয়-পরিত্যক্ত নির্বান্ধব ঐ লোকটিকেও মহারাজ মাঝে মাঝে গোপনে হোটেলে গিয়ে দেখে আসতেন, তার সঙ্গে কিছু সময় কাটিয়ে আসতেন। তার বিছানায় বসে তার ছাড়িয়ে দেওয়া ফল নির্বিকারভাবে তিনি খেতেন। হয়তো কাশতে কাশতেই খোকানী ছুরি দিয়ে ফল ছাড়াচ্ছে এবং কাশতে কাশতেই সেই ফল মহারাজের হাতে তুলে দিচ্ছে।

আমার ওপরে শরৎ মহারাজের দয়ার কথা আর কি বলব। আজ যে কলকাতায় আমার একটা আশ্রয় হয়েছে, আমি যে খেয়ে-পরে পরিবার-পরিজন নিয়ে স্বচ্ছন্দে বাস করছি তার পিছনে অবশ্যই রয়েছে মায়ের কৃপা। কিন্তু মায়ের কৃপা আমার ক্ষেত্রে কার্যকরী হয়েছে শরৎ মহারাজের মাধ্যমে। আমার বাবার শেষ অসুখের সময় কলকাতার বড় বড় ডাক্তারদের দিয়ে চিকিৎসা করিয়েছিলাম। তাও সম্ভব হয়েছিল শরৎ মহারাজের ব্যবস্থাপনায়, একথা আগেই উল্লেখ করেছি। ১৩২৬ সালের ১২ বৈশাখ বাবা বিকেল ৫-৩০ মিনিটে শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। এর কয়েকদিন আগে ৩ বৈশাখ বিকালে শরৎ মহারাজ আমাকে ডেকে বললেনঃ "একটা গাড়ি ডেকে নিয়ে এসো।" আমি জিজ্ঞাসা করলামঃ "কোথায় যাবেন, মহারাজ?" মহারাজ শান্তভাবে বললেনঃ "তোমার বাবাকে দেখতে।" বাবা তখন শয্যাশায়ী, যেকোন দিন শরীর চলে যাবে এরকম অবস্থা। শরৎ মহারাজ রোজই আমাকে ডেকে বাবার খবর নিতেন। কিন্তু সেদিন শরৎ মহারাজের কথা শুনে আমি বেশ অসহায় বোধ করলাম। কারণ, প্রথমতঃ গাড়িভাড়া দেবার সামর্থ্যও আমার ছিল না, দ্বিতীয়তঃ শোভাবাজারের সামনে শিবমন্দিরের কাছে নন্দরাম সেন লেনের ধারে যে ছোট গলিতে বাবা আছেন সেই গলিতে শরৎ মহারাজের পক্ষে সোজাসুজি হাঁটাও সম্ভব নয়। যে-দুটি কারণে গাড়ি ডাকতে আমি সঙ্কোচ বোধ করছিলাম, সে-দুটি কারণ বাধ্য হয়ে মহারাজকে জানালাম। শরৎ মহারাজ গম্ভীর হয়ে বললেনঃ "গাড়ি তো নিয়ে এসো, তারপর দেখা যাবে।" গাড়ি নিয়ে এলাম। শরৎ মহারাজ এবং আমাকে নিয়ে গাড়ি সেই সরু গলির ধারে এসে দাঁড়াল। গাড়ি থেকে নেমে মহারাজকে নিয়ে গলিতে ঢুকতে গিয়ে দেখলাম, আমি যা ভয় করেছিলাম ঠিক তাই—শরৎ মহারাজ সোজা হয়ে ঐ গলিতে ঢুকতে পারছেন না। আমার তখন খুবই বিব্রত অবস্থা। কিন্তু অবাক হয়ে দেখলাম, মহারাজ আমার পিছনে পাশাপাশি ভাবে গলি দিয়ে হাঁটতে শুরু করেছেন। বাড়িতে গিয়ে মহারাজ বাবার শয্যাপার্শ্বে দাঁড়ালেন। আমাকে বললেনঃ "আমার পায়ের ধুলো নিয়ে তোমার বাবার মাথায় দাও।" এই কথা শুনে আমার মন-প্রাণ আনন্দে ভরে উঠল ঠিকই, কিন্তু এতে আমি বিস্মিতও কম হইনি। কারণ, শরৎ মহারাজ কারোর প্রণাম নিতে চাইতেন না। সেই তিনি এই রকম অযাচিত করুণার ভাবে অভিভূত হতে পারেন— এ আমার চিন্তারও বাইরে ছিল। যাই হোক, আনন্দে ও বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে মহারাজের পায়ের ধুলো নিয়ে আমি বাবার মাথায় দিলাম। বাবা শুয়ে শুয়ে হাতজোড় করে মহারাজকে প্রণাম করলেন। মহারাজ বাবাকে জিজ্ঞাসা করলেনঃ "আপনার কাশীতে যাওয়ার ইচ্ছা আছে?" বাবা মাথা নাড়লেন। কোন্ অর্থে তিনি 'না' বললেন আমি জানি না, তবে আমার মনে হলো, শেষ সময়ে শরৎ মহারাজের মতো শিবতুল্য মহাপুরুষের দর্শন ও আশীর্বাদলাভ করেই বাবার কাশীতে মৃত্যুর আকাঙ্ক্ষা তুচ্ছ মনে হয়েছিল।

গাড়ি দাঁড় করানোই ছিল। মহারাজকে নিয়ে উদ্বোধনে ফিরে এলাম। কয়েকদিন পর দুপুরে প্রসাদ পেয়ে অফিসে কাজ করছি। বাইরে থেকে কিছু বইয়ের অর্ডার ছিল। সেগুলি রেলওয়ে পার্শেল করতে শিয়ালদা যাবার জন্য বেরোব। এমন সময় শরৎ মহারাজ এসে বললেনঃ "কোথায় যাচ্ছ, চন্দ্র?" আমি বললামঃ "বই পার্শেল করতে শিয়ালদা যাচ্ছি।" মহারাজ বললেনঃ "আগে বাড়ি গিয়ে তোমার বাবা কেমন আছেন দেখে এসো, তারপর শিয়ালদা যাবে।" মহারাজের আদেশমতো বাড়ি গিয়ে দেখলাম, বাবার নাভিঃশ্বাস শুরু হয়েছে। তাড়াতাড়ি উদ্বোধন-এ ফিরে এলাম মহারাজকে খবর দিতে। মহারাজ তখন

বিশ্রাম করছিলেন। আমি ওঁর ঘরের দরজার পাশে দাঁড়িয়ে আছি। হঠাৎ পাশ ফিরতে গিয়ে আমাকে দেখে মহারাজ বললেন: "কি খবর? বাবাকে কেমন দেখে এলে?" আমি কোনরকমে বললাম: "বাবার শেষসময় উপস্থিত।" মহারাজ সঙ্গে সঙ্গে উঠে ড্রয়ার খুলে কিছু টাকা আমার হাতে দিয়ে বললেন: "বাবার সৎকার করোগে।" সেদিন বিকাল ৫-৩০ মিনিটে বাবা চলে গেলেন। ঐদিনটি ছিল ১২ বৈশাখ ১৩২৬ সাল। মহারাজ তাঁর ডায়েরীতে ঐদিন লিখেছিলেন: "Chandra's father died at 5-30 P. M."

শ্রীশ্রীমায়ের পদপ্রান্তে আসার কিছুদিন পর তাঁকে যখন আমি কিছুটা ধারণা করতে পেরেছি তখন একদিন তাঁর কাছে গিয়ে করজোড়ে আবদার করি: "মা, আমি আপনার সেবা করতে চাই।" মা বললেন: "এখানে যেসব কাজ করছ সেসব তো আমারই সেবা, চন্দ্র।" আমি বললাম: "না মা, ওসব কাজ করেও আমি আপনার সামান্য কোন সেবাও করতে চাই।" মা শান্তভাবে বললেন: "না বাবা, তুমি উদ্বোধনের যে-কাজ করছ সেই কাজই কর। ওটি যেমন আমার সেবা তেমনি ঠাকুরেরও সেবা। সরলাই[৭] তো আমার সেবা করছে। তুমি বরং উদ্বোধনের কাজ করে যখন সময়-সুযোগ পাবে তখনই শরতের সেবা করবে। যদি তুমি তাঁর আন্তরিকভাবে সেবা কর এবং শরৎ যদি তোমার ওপরে সন্তুষ্ট থাকে তাহলে জেনো, তোমার ব্রহ্মজ্ঞান হবেই হবে। যেকেউ শরৎকে ভালবেসে সেবা করবে, মুক্তি তার কেনা। শরৎ ঠাকুরের গণেশ, শরৎ আমার মাথার মণি সারা দুনিয়ায় শরতের মতো মহাপুরুষ খুব কম আছে জানবে।"

মায়ের শরীররক্ষার পরে শরৎ মহারাজের মধ্যে আমি মাকেই পেয়েছিলাম। শুধু আমি কেন, আমার মতো অনেকেই, এমনকি মেয়ে ভক্তরাও শরৎ মহারাজের মধ্যে মাকেই পেয়েছিলেন। শরৎ মহারাজ রামকৃষ্ণময় তো ছিলেনই, পরন্তু তিনি বোধহয় তার চেয়েও বেশি ছিলেন মা-ময়—সারদাময়। স্বামীজী তাঁর যে-নাম রেখেছিলেন 'সারদানন্দ', তা ছিল সম্পূর্ণ সার্থক নাম। আমার জীবনের মহা-সৌভাগ্য, আমি এই মহাপুরুষের পদপ্রান্তে আসতে পেরেছিলাম। জীবনের বেশ কয়েকটি বছর তাঁর সান্নিধ্যে, তাঁর সেবায় আমি কাটাতে পেরেছি আমার গুরু, আমার জীবনের আরাধ্যা দেবী, সাক্ষাৎ জগদম্বা শ্রীশ্রীমায়ের কৃপায়। শরৎ মহারাজ সম্পর্কে তিনিই আমার চোখ খুলে দিয়েছিলেন ❐

[ সমাপ্ত ]

৭ সরলাদেবী। পরবর্তী কালে শ্রীসারদা মঠের অধ্যক্ষা—প্রব্রাজিকা ভারতীপ্রাণা।—সম্পাদক, উদ্বোধন

## সংশোধন

| সংখ্যা | পৃষ্ঠা | মুদ্রিত | হবে |
|---|---|---|---|
| বৈশাখ, ১৪০০ | সূচীপত্রের পরের পৃষ্ঠা | **শ্রীশ্রীস্বামীজী** পৌষ শুক্লা সপ্তমী | পৌষ **কৃষ্ণা** সপ্তমী |
| জ্যৈষ্ঠ, ১৪০০ | ২০৫ | সুধীর মহারাজ ( স্বামী শ্রদ্ধানন্দ ) | সুধীর মহারাজ ( স্বামী শুদ্ধানন্দ ) |

### শ্রীমদ্‌বিদ্যারণ্যবিরচিতঃ

# জীবন্মুক্তিবিবেকঃ

### বঙ্গানুবাদ : স্বামী অলোকানন্দ

[ পূর্বানুবৃত্তি ]

"কেন ভগবন্ কর্মাণ্যশেষতো বিসৃজানীতি" শিখাযজ্ঞোপবীত-স্বাধ্যায়গায়ত্রীজপাদ্যশেষকর্মত্যাগ-রূপে বিবিদিষাসন্ন্যাসে শিষ্যেণারুণিনা পৃষ্টে সতি গুরুঃ প্রজাপতিঃ "শিখাং যজ্ঞোপবীতম্" ইত্যাদিনা সর্বত্যাগমভিধায় "দণ্ডমাচ্ছাদনং কৌপীনং চ পরিগ্রহেৎ" ইতি দণ্ডাদিস্বীকারং বিধায় "ত্রিসন্ধ্যাদৌ স্নানমাচরেৎ। সন্ধিং সমাধাবাত্মন্যাচরেৎ সর্বেষু বেদেষ্বারণ্যমাবর্তয়েৎ। উপনিষদমাবর্তয়েৎ" ইতি বেদনহেতুনাশ্রমধর্মাননুষ্ঠেয়তয়া বিধত্তে।

#### অন্বয়

ভগবন্ ( হে ভগবন্ ), কেন ( কোন উপায়ে ), অশেষতঃ ( নিঃশেষে ), কর্মাণি ( কর্মসকল ), বিসৃজানি ( ত্যাগ করতে পারি ), ইতি ( এই বাক্যদ্বারা ), শিষ্যেণ আরুণিনা ( শিষ্য আরুণি কর্তৃক ), স্বাধ্যায়-গায়ত্রীজপাদি-অশেষ-কর্মত্যাগ-রূপে ( স্বাধ্যায়, গায়ত্রীজপ প্রভৃতি সর্বপ্রকার কর্মত্যাগরূপ ), বিবিদিষাসন্ন্যাসে ( বিবিদিষা সন্ন্যাসের কথা ), পৃষ্টে সতি ( জিজ্ঞাসা করা হলে ), গুরুঃ প্রজাপতিঃ ( গুরু প্রজাপতি ), শিখাং যজ্ঞোপবীতং ( শিখা যজ্ঞোপবীত ) ইত্যাদিনা ( ইত্যাদি বাক্যদ্বারা ), সর্বত্যাগম্ ( সর্বত্যাগ ), অভিধায় ( নির্দেশ করেন ), দণ্ডম্ ( দণ্ড ), আচ্ছাদনং ( আচ্ছাদন ), চ ( এবং ), কৌপীনং ( কৌপীন ), পরিগ্রহেৎ ( গ্রহণ করবে ), ইতি ( এই প্রকারে ), দণ্ডাদিস্বীকারং ( দণ্ডাদিগ্রহণ ), বিধায় ( বিধানপূর্বক ), ত্রিসন্ধ্যা আদৌ ( ত্রিসন্ধ্যার পূর্বে ), স্নানম্ ( স্নান ), আচরেৎ ( করবে ), সমাধৌ ( সমাধিতে ), আত্মনি ( আত্মাতে ), সন্ধিং ( সংযোগ ), আচরেৎ ( সাধন করবে ), সর্বেষু বেদেষু ( বেদসমূহের মধ্যে ), আরণ্যম্ ( আরণ্যক অংশের ), আবর্তয়েৎ (আবৃত্তি করবে ), উপনিষদম্ ( উপনিষদ্ ), আবর্তয়েৎ ( আবৃত্তি করবে ), ইতি ( এই বাক্য দ্বারা ), বেদনহেতূন্ ( আত্মজ্ঞানের হেতু ), আশ্রমধর্মান্ ( আশ্রমধর্মসমূহ ), অনুষ্ঠেয়-তয়া ( অনুষ্ঠিতব্য ), বিধত্তে ( বিধান করলেন )।

#### বঙ্গানুবাদ

'হে ভগবন্, কোন্ উপায়ে নিঃশেষে কর্মত্যাগ করতে পারি' এই বাক্যের দ্বারা শিষ্য আরুণি গুরু প্রজাপতিকে শিখা, যজ্ঞোপবীত, স্বাধ্যায়, গায়ত্রী-জপ প্রভৃতি সর্বপ্রকার কর্মত্যাগরূপ বিবিদিষা সন্ন্যাসের কথা জিজ্ঞাসা করলে গুরু প্রজাপতি ( প্রথমে ) 'শিখা যজ্ঞোপবীত' ইত্যাদি বাক্যের দ্বারা সর্বত্যাগ নির্দেশ করেন। ( পরে ) 'দণ্ড, আচ্ছাদন এবং কৌপীন গ্রহণ করবে' এই বাক্যের দ্বারা দণ্ডাদি গ্রহণ বিধান করলেন। 'ত্রিসন্ধ্যার পূর্বে স্নান করবে, সমাধিতে আত্মার সঙ্গে সংযোগ অভ্যাস করবে, বেদসমূহের মধ্যে আরণ্যক ( আরণ্যকের অংশ-বিশেষ ) আবৃত্তি করবে, উপনিষদ্ আবৃত্তি করবে'—এই বাক্যের দ্বারা আত্মজ্ঞানের হেতুস্বরূপ যে আশ্রমধর্মসমূহ, সেগুলির অনুষ্ঠান কর্তব্য বলে বিধান করলেন।

পূর্বেই বলা হয়েছে, বিবিদিষা ও বিদ্বৎ-সন্ন্যাসের অবান্তর ভেদের কারণ উভয়ের বিরুদ্ধ-স্বভাব। উভয়ের বিরুদ্ধধর্মত্ব আরুণিক ও পরমহংস নামক উপনিষদ্দ্বয়ে যেরূপ আলোচনা করা হয়েছে তা-ই এখানে ক্রমান্বয়ে প্রদর্শিত হয়েছে। প্রথমে আরুণিকোপনিষদের প্রজাপতি-আরুণি সংবাদ থেকে উদ্ধার করে দেখানো হয়েছে। শিষ্য আরুণির প্রশ্নের উত্তরে গুরু প্রজাপতি ক্রমান্বয়ে সন্ন্যাসপথে সাধন-প্রক্রিয়াগুলি ব্যক্ত করেন। শিখা, যজ্ঞোপবীত পরিত্যাগ করে দণ্ডাদি গ্রহণ এবং সর্বদা আত্মধ্যানে নিমগ্ন থাকার নির্দেশ করেন। আত্মধ্যানে নিরত হওয়ার উপায় হিসাবে সর্বদা

উপনিষদের তত্ত্বচিন্তন, আত্মৈক্যবোধে চিত্তকে লগ্ন করা একান্ত কর্তব্য। আত্মজ্ঞানের পথে সাধারণ ক্রমগুলির অনুষ্ঠান মাধ্যমে বিশেষ সাধন যে আত্মধ্যান, তাতে নিমগ্ন হওয়াই এইরূপ সাধনবিধি নির্দেশের হেতু।

অতঃপর পরমহংসোপনিষদের প্রজাপতি-নারদ সংবাদে বিদ্বৎসন্ন্যাস প্রসঙ্গ উদ্ধার করে দেখানো হয়েছে ঃ

অথ যোগিনাং পরমহংসানাং কোঽয়ং মার্গ ইতি বিদ্বৎসন্ন্যাসে নারদেন পৃষ্টে সতি গুরুর্ভগবান্ প্রজাপতিঃ স্বপুত্রমিত্রেত্যাদিনা পূর্ববৎ সর্বত্যাগমভিধায় "কৌপীনদণ্ডমাচ্ছাদনং চ স্বশরীরোপভোগার্থায় চ লোকস্যোপকারার্থায় চ পরিগ্রহেৎ" ইতি। দণ্ডাদিস্বীকারস্য লৌকিকত্বমভিধায় তচ্চ ন মুখ্যোঽস্তীতি শাস্ত্রীয়ত্বং প্রতিষিধ্য কোঽয়ং মুখ্য ইতি চেদয়ং মুখ্যো "ন দণ্ডং ন শিখাং ন যজ্ঞোপবীতং ন চাচ্ছাদনং চরতি পরমহংস" ইতি দণ্ডাদিলিঙ্গরাহিত্যস্য শাস্ত্রীয়তামুক্ত্বা "ন শীতং ন চোষ্ণম্" ইত্যাদি বাক্যেন "আশাম্বরো নির্নমস্কার" ইত্যাদি বাক্যেন চ লোকব্যবহারাতীতত্বমভিধায়ান্তে "যৎ পূর্ণানন্দৈকবোধস্তদ্ ব্রহ্মাহমস্মীতি কৃতকৃত্যো ভবতী"ত্যন্তেন গ্রন্থেন ব্রহ্মানুভবমাত্রপর্যবসানমাচষ্টে। অতো বিরুদ্ধ ধর্মোপেতত্বাদনয়োর্মহান্ ভেদঃ।

**অন্বয়**

অথ (অতঃপর), পরমহংসানাং যোগিনাং (পরমহংস যোগীদের), কোঽয়ং মার্গঃ (পথ কিরূপ), ইতি (এইরূপে), বিদ্বৎসন্ন্যাসে (বিদ্বৎ সন্ন্যাসপ্রসঙ্গে), নারদেন (নারদ কর্তৃক), পৃষ্টে সতি (জিজ্ঞাসিত হলে), গুরুঃ ভগবান্ প্রজাপতিঃ (গুরু ভগবান প্রজাপতি), স্বপুত্রমিত্র (নিজপুত্র মিত্র), ইত্যাদিনা (ইত্যাদি বাক্যদ্বারা), পূর্ববৎ (পূর্বের ন্যায়), সর্বত্যাগম্ (সকল বস্তুর ত্যাগ), অভিধায় (নির্দেশপূর্বক), কৌপীনং (কৌপীন), দণ্ডম্ (দণ্ড), চ (এবং), আচ্ছাদনম্ (আচ্ছাদন), স্বশরীরোপভোগার্থায় (নিজ শরীরের ভোগের নিমিত্ত), চ (এবং), লোকস্য (অপরের), উপকারার্থায় (উপকার নিমিত্ত), পরিগ্রহেৎ (গ্রহণ কর্তব্য), ইতি (এইরূপে), দণ্ডাদিস্বীকারস্য (দণ্ড প্রভৃতি গ্রহণের), লৌকিকত্বম্ (লৌকিক প্রয়োজন), অভিধায় (নির্দেশ করে), তৎ চ (তাও), ন মুখ্যঃ অস্তি (প্রধান নয়), ইতি (এই প্রকারে), শাস্ত্রীয়ত্বং (দণ্ডগ্রহণের শাস্ত্রীয় ভিত্তি), প্রতিষিধ্য (নিষেধপূর্বক), কঃ অয়ং মুখ্যঃ (কে মুখ্য), ইতি চেৎ (এইরূপ প্রশ্ন হলে), অয়ং (এই), মুখ্যঃ (মুখ্য), ন দণ্ডং (দণ্ড নয়), ন শিখাং (শিখা নয়), ন যজ্ঞোপবীতং (যজ্ঞোপবীত নয়), ন চ আচ্ছাদনং (আচ্ছাদনও নয়), পরমহংসঃ (পরমহংস), চরতি (বিচরণ করেন), ইতি (এইরূপে), দণ্ডাদিলিঙ্গরাহিত্যস্য (দণ্ডাদিলিঙ্গবিহীনের), শাস্ত্রীয়তাম্ (শাস্ত্রীয়ত্ব), উক্ত্বা (নির্দেশ করে), ন শীতং (শীত নেই), চ (এবং), ন উষ্ণং (গ্রীষ্ম নেই), ইত্যাদি বাক্যেন (ইত্যাদি বাক্যদ্বারা), চ (এবং), আশাম্বরঃ (দিগম্বর), নির্নমস্কারঃ (নমস্কারবিহীন), ইত্যাদি বাক্যেন (ইত্যাদি বাক্যদ্বারা), লোকব্যবহার-অতীতত্বম্, (লোকব্যবহারের অতীত অবস্থা), অভিধায়ান্তে (ব্যাখ্যা করেন), যৎ (যিনি), পূর্ণ (পূর্ণ), আনন্দ (আনন্দস্বরূপ), এক (একসত্তা), বোধ (বোধস্বরূপ), তৎ (সেই), ব্রহ্ম (ব্রহ্ম), অহম্ (আমি), অস্মি (হই), ইতি (এই চিন্তাদ্বারা), কৃতকৃত্যঃ (কৃতকৃত্য), ভবতি (হন), ইতি (এই প্রকার), অন্তেন গ্রন্থেন (বাক্যশেষ দ্বারা), ব্রহ্মানুভবমাত্র (ব্রহ্মানুভবেই), পর্যবসানম্ (পরিসমাপ্তি), আচষ্টে (ব্যাখ্যাত হয়েছে), অতঃ (অতএব), বিরুদ্ধধর্মোপেতত্বাৎ (বিবিদিষা ও বিদ্বৎসন্ন্যাসের মধ্যে বিরুদ্ধস্বভাব থাকায়), অনয়োঃ (উহাদের মধ্যে), মহান্ ভেদঃ (বিশেষ ভিন্নতা), অস্তি এব (বিদ্যমান)।

**বঙ্গানুবাদ**

অতঃপর বিদ্বৎসন্ন্যাস প্রসঙ্গে নারদ কর্তৃক 'পরমহংস যোগীদের কোন্ পথ?' এইরূপ জিজ্ঞাসিত হয়ে গুরু ভগবান প্রজাপতি 'নিজপুত্র-মিত্র' ইত্যাদিবাক্য দ্বারা পূর্বের মতো সকল বস্তুর ত্যাগ নির্দেশ করেন। 'কৌপীন, দণ্ড ও আচ্ছাদন নিজ শরীরের ভোগ নিমিত্ত ও অপরের কল্যাণার্থ পরিগ্রহ করবে'—এই প্রকারে দণ্ডাদি পরিগ্রহণের লৌকিক প্রয়োজন নির্দেশ করেন এবং 'তা-ও মুখ্য

নয়'—এই বলে দণ্ডগ্রহণের শাস্ত্রীয় ভিত্তি নিষেধ করেন (অর্থাৎ দণ্ডাদিগ্রহণ একান্ত আবশ্যক নয় তা বুঝালেন)। (পরে) মুখ্য কি? এই প্রশ্নের উত্তরে এই মুখ্য (উল্লেখ করে বললেন)—'দণ্ড, শিখা, যজ্ঞোপবীত, আচ্ছাদন ছাড়াই পরমহংস পরিভ্রমণ করেন' এই বাক্যে দণ্ডাদিলিঙ্গবিহীনের শাস্ত্রীয়তা নির্দেশ করেন। 'শীত নেই, গ্রীষ্ম নেই' এবং 'দিগম্বর, নমস্কারবিহীন' ইত্যাদি বাক্যের দ্বারা লোকব্যবহারের অতীত অবস্থা ব্যাখ্যা করেন; এবং "যিনি পূর্ণ, আনন্দস্বরূপ, একসত্তা, বোধ-স্বরূপ, সেই ব্রহ্মই আমি—এরূপ চিন্তাদ্বারা কৃতকৃত্য হন।'—এই বাক্যশেষ দ্বারা সকল কর্তব্যই যে ব্রহ্মানুভবমাত্রেই পরিসমাপ্ত হয় তা ব্যাখ্যা করা হয়েছে। অতএব বিবিদিষা ও বিদ্বৎসন্ন্যাসের মধ্যে বিরুদ্ধস্বভাব থাকায় তাদের মধ্যে বিশেষ পার্থক্য বিদ্যমান।

পরমহংসোপনিষদের নারদ-প্রজাপতি-সংবাদে বিদ্বৎসন্ন্যাসের প্রসঙ্গ গ্রন্থকার এখানে উল্লেখ করেছেন। বিবিদিষা ও বিদ্বৎ—দুই প্রকার সন্ন্যাসের অবান্তর ভেদ দেখানোর জন্যই এই প্রয়াস। আরুণিকোপনিষদে আরুণি ও প্রজাপতির কথোপ-কথনচ্ছলে বিবিদিষা সন্ন্যাসের ব্যাখ্যাকালে বলা হয়েছে—ক্রমান্বয়ে সাধন অবলম্বনপূর্বক ব্রহ্মধ্যানে একান্তভাবে লীন হওয়াই উদ্দেশ্য। বিদ্বৎসন্ন্যা-সেরও মুখ্য লক্ষ্য ব্রহ্মচিন্তায় নিরত হওয়া। দণ্ডাদি চিহ্ন অবান্তর মাত্র। এখানে দণ্ডাদি গ্রহণ, শরীর ধারণ, এবং শরীরধারণ কেবল লোককল্যাণার্থ। নতুবা পরমহংস সন্ন্যাসীর বিন্দুমাত্রও স্বপ্রয়োজন নেই। প্রকৃতপক্ষে তিনি দিগম্বর। নমস্কারবিহীন। সমস্ত লৌকিক বৈদিক আচারের উর্ধ্বে অবস্থান করেন। শাস্ত্র বলেন: "নিস্ত্রৈগুণ্যে পথি বিচরতাং কো বিধি কো নিষেধঃ।" অবশ্য তিনি যথেচ্ছাচারী —এরূপ মনে করার কোন কারণ নেই। তাঁর ক্ষেত্রে দেহবোধরাহিত্যই এইরূপ ব্যবহারের সৃষ্টি করে। নিজ চেষ্টায় তাঁকে কোনরূপ আচরণ করতে হয় না। সেখানে জগতের প্রতি অনিত্যত্ব বোধ থাকায় অনাসক্তভাবে তিনি সকল ব্যবহারের অতীত অবস্থায় অবস্থান করেন।

বিবিদিষা সন্ন্যাসে দেহবোধ বিদ্যমান। পরম তত্ত্বকে জানবার প্রবল ইচ্ছা নিয়ে সাধক ক্রমান্বয়ে সাধনার চরমতম অবস্থায় পরহংসত্ব লাভ করেন। কিন্তু বিদ্বৎসন্ন্যাসে সমস্ত বাসনার উর্ধ্বে থাকায় সাধক প্রথমাবধিই ব্রহ্মধ্যানে নিমগ্ন, সর্বব্যবহারা-তীত পরমহংসত্বে প্রতিষ্ঠিত হন। উভয়ত্রই পরম-হংসত্ব বিদ্যমান, কিন্তু অবান্তর ভেদও বিদ্যমান।

[ক্রমশঃ]

যৎকিঞ্চিৎ

# ধর্মের শিক্ষা

## সরিৎপতি সেনগুপ্ত

'ধৃ' ধাতু থেকে নিষ্পন্ন 'ধর্ম' শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ—"যা ধারণ করে থাকে"। অর্থাৎ যা অবলম্বন করে আমরা আমাদের এই জীবন যথার্থ সুখ, শান্তি ও আনন্দে যাপন করতে পারি।

আমাদের শরীরের সুষম বৃদ্ধি ও পুষ্টির জন্য যেমন উপযুক্ত খাদ্যের প্রয়োজন, তেমনি আমাদের মানসিক তথা আধ্যাত্মিক বিকাশের জন্য আবশ্যক সুস্থ বাতাবরণ তথা উপযুক্ত পরিবেশ এবং উদার ও পর্যাপ্ত শিক্ষা যাতে আমরা আমাদের সামাজিক চেতনা ও চিন্তাধারাকে করুণা ও মৈত্রীর পথে ধীরে ধীরে বিকশিত করে জগতের কল্যাণের জন্য নিজ নিজ কর্মের পথে অগ্রসর হতে পারি।

"ঈশাবাস্যমিদং সর্বং যৎ কিঞ্চ জগত্যাং জগৎ।" ঈশোপনিষদের এই প্রথম মন্ত্রের অর্থ—এই জগতে সর্বত্র এবং সকলের হৃদয়ে ঈশ্বর বিরাজমান। আমাদের অন্তরের এই ঈশ্বরীয় ভাবকে বা দেবত্বকে পূর্ণ বিকাশের পথে নিয়ে যেতে হলে কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, অহঙ্কার, হিংসা, দ্বেষ, স্বার্থপরতা, সংকীর্ণতা—এইসব মলিনতা থেকে মনকে ধীরে ধীরে মুক্ত করার প্রয়োজন। ধর্মই এবিষয়ে একমাত্র সহায়ক। যেমন কাঁচকে পরিষ্কার না করলে তার মধ্য দিয়ে আলোক প্রবেশ করতে পারে না, তেমনি যতদিন আমাদের মন এই মালিন্য থেকে মুক্ত না হয়, ততদিন আমাদের অন্তরের দিব্যভাবের বা অব্যক্ত ব্রহ্মভাবের পূর্ণ প্রকাশ হয় না। তাই মানব-মনকে পবিত্র ও ঈশ্বরাভিমুখী করে তোলার জন্য ও মানবের চেতনাকে বিকাশিত করার জন্য প্রয়োজন ধর্মনির্দিষ্ট পথে চলা।

ধর্মনির্দিষ্ট পথ কি? সাধারণভাবে মন্দিরে, মসজিদে, গির্জায় অনুষ্ঠিত ধর্মনির্দিষ্ট উপাসনা-পদ্ধতি হলো ধর্মনির্দিষ্ট পথ। বিভিন্ন ধর্মে বিভিন্ন প্রকারের পদ্ধতি আছে। কিন্তু মনে রাখতে হবে, এগুলি ধর্মের 'বহিরঙ্গ' মাত্র। এগুলিকেই ধর্মের যথাসর্বস্ব মনে করে অপরের ধর্মকে ছোট করে দেখার মনোভাব থেকেই সম্প্রতি 'মৌলবাদ' বা **fundamentalism** কথাটি ব্যবহৃত হচ্ছে। সকল মানুষের মধ্যে ঐক্য স্বীকার করে প্রত্যেককে নিজের আত্মীয়জ্ঞান করা এবং কাউকে ছোট করে না দেখাই হলো ধর্মের মূল শিক্ষা। এই শিক্ষাকে আমরা মানবতাবাদ বা **Humanism** বলতে পারি। তথাকথিত মৌলবাদ থেকেই ধর্মের নামে অধর্ম, বিবাদ ও অশান্তির শুরু। স্বামী বিবেকানন্দ ও রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মানবধর্মে দৃঢ়বিশ্বাসী ছিলেন। ঈশ্বর, প্রকৃতি এবং মানুষের মধ্যে তাঁরা মানুষকেই বেশি ভালবেসেছিলেন। তাঁরা বিশ্বাসী ছিলেন মননের সক্রিয়তায়। কিন্তু তথাকথিত 'মৌলবাদে' চিন্তার বিস্তার নেই, আছে সংকীর্ণতা; অনুভবের ঔদার্য নেই, আছে অসহিষ্ণুতা।

আজ থেকে একশ বছর আগে স্বামী বিবেকানন্দ আমেরিকার শিকাগোয় অনুষ্ঠিত বিশ্বধর্মসম্মেলনে যোগদান করেছিলেন। তিনি সেই সম্মেলনে প্রত্যেকের সামনে তুলে ধরেছিলেন সকল ধর্মের অন্তর্নিহিত মূল সত্যটি। তাঁর গুরু শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে তিনি জেনেছিলেন, সকল ধর্মের মূল সত্য হলো একত্ব। জেনেছিলেন, "যত মত তত পথ", "অনন্ত মত অনন্ত পথ", কিন্তু সব মত ও পথ গিয়ে শেষ হয় "এক"-এ। ভারতবর্ষের ধর্মশাস্ত্র মন্থন করেও তিনি জেনেছিলেন, ধর্মের মূল সত্য ঐ একত্বের সন্ধানের মধ্যেই নিহিত। শিকাগো ধর্মমহাসভায় স্বামী বিবেকানন্দ বললেন: "একত্বের আবিষ্কার ব্যতীত বিজ্ঞান আর কিছুই নয়; এবং যখনই কোন বিজ্ঞান সেই পূর্ণ একত্বে উপনীত

হয়, তখন উহার অগ্রগতি থামিয়া যাইবেই, কারণ ঐ বিজ্ঞান তাহার লক্ষ্যে উপনীত হইয়াছে।... ধর্মবিজ্ঞানও তখনই পূর্ণতালাভ করিয়াছে, যখন তাঁহাকে আবিষ্কার করিয়াছে, যিনি এই মৃত্যুময় জগতে একমাত্র জীবনস্বরূপ, যিনি নিত্যপরিবর্তনশীল জগতের একমাত্র অচল, অটল ভিত্তি, যিনি একমাত্র পরমাত্মা—অন্যান্য আত্মা যাঁহার ভ্রমাত্মক প্রকাশ। এইরূপে বহুবাদ, দ্বৈতবাদ প্রভৃতির ভিতর দিয়া শেষে অদ্বৈতবাদে উপনীত হইলে ধর্মবিজ্ঞান আর অগ্রসর হইতে পারে না। ইহাই সর্বপ্রকার জ্ঞান বা বিজ্ঞানের চরম লক্ষ্য।"[১]

শিকাগোয় স্বামী বিবেকানন্দের আবির্ভাবের পর এক শতাব্দীকাল অতিবাহিত হতে চলেছে। এর মধ্যে জগতের নানা উত্থান ও পতন হয়েছে। দু-দুটি বিশ্বযুদ্ধ সংঘটিত হয়েছে এই পৃথিবীর বুকে। যেকোন সময়ে তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের আশঙ্কায় আমরা দিন গুনছি। বর্তমান শতাব্দীও সমাপ্তির মুখে দাঁড়িয়ে একবিংশ শতাব্দীকে স্বাগত জানাতে চলেছি আমরা। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার অভূতপূর্ব প্রগতি হয়েছে এই শতবর্ষের মধ্যে। পৃথিবীর এই পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে ধর্মের মূল সত্যটিকে বিশ্ববাসীর আজ আরও বেশি করে উপলব্ধি করার সময় এসেছে। কিছুদিন আগে দালাই লামা দিল্লীতে বলেছিলেন: "My religion is simple. My religion is kindness and compassion." অর্থাৎ আমার ধর্ম অতি সরল, আমার ধর্ম করুণা ও মুদিতা। সাম্প্রতিক একটি শব্দ চয়ন করে বলা যায়, ধর্ম হলো 'সম্ভাবনা'।

মহাভারতে বলা হচ্ছে: "ধর্মস্য তত্ত্বং নিহিতং গুহায়াং মহাজনো যেন গতঃ স পন্থাঃ।" ধর্মের প্রকৃত তত্ত্ব গভীর। সাধারণ মানুষের পক্ষে তা বোঝা এবং সেই অনুযায়ী আচরণ করা কঠিন। তাই যে-পথে মহৎ লোকেরা গমন করেছেন এবং যে-পথে বহু লোক তাঁর অনুসরণ করেছে সেই পথই ধর্মের পথ। ধর্ম আনে মানুষের সর্বাত্মক প্রকর্ষ। ধর্ম কখনো ঐহিক জগৎকে অস্বীকার করতে শেখায় না। ধর্ম শুধু বলে, ঐহিক জগতের সুখ, আনন্দ নশ্বর। তুমি ঐ সুখৈশ্বর্যের বাইরে অন্য সুখের সন্ধান কর—যে-সুখ ও ঐশ্বর্য চিরন্তন। ধর্ম থেকেই আমরা আধ্যাত্মিক ও সাংস্কৃতিক প্রগতির অভ্রান্ত নির্দেশ যেমন পেয়ে এসেছি, তেমনি অভ্যুদয় অর্থাৎ জাগতিক প্রগতির প্রেরণাও আমরা পেয়েছি।

রবীন্দ্রনাথ তাঁর "পূর্ব ও পশ্চিম" গ্রন্থের 'সমাজ' প্রবন্ধে (১৯০৮ খ্রীস্টাব্দে প্রকাশিত) বলেছেন: "ভারতবর্ষেও যে-ইতিহাস গঠিত হইয়া উঠিতেছে এ ইতিহাসের শেষ তাৎপর্য এ নয় যে, এদেশে হিন্দুই বড় হইবে বা আর কেহ বড় হইবে। ভারতবর্ষে মানবের ইতিহাস একটি বিশেষ সার্থকতার মূর্তি পরিগ্রহ করিবে, পরিপূর্ণতাকে একটি অপূর্ব আকার দান করিয়া তাহাকে সমস্ত মানবের সামগ্রী করিয়া তুলিবে—ইহা অপেক্ষা কোন অভিপ্রায় ভারতবর্ষের ইতিহাসে নাই।"[২] তাঁর 'বিশ্বভারতী' প্রবন্ধেও ঐ একই কথা রবীন্দ্রনাথ সুন্দরভাবে লিখেছেন:

"...ভারতবর্ষের শিক্ষাব্যবস্থায় বৈদিক পৌরাণিক বৌদ্ধ জৈন মুসলমান প্রভৃতি সমস্ত চিত্তকে সম্মিলিত ও চিত্তসম্পদকে সংগৃহীত করিতে হইবে; এই নানা ধারা দিয়া ভারতবর্ষের মন কেমন করিয়া প্রবাহিত হইয়াছে তাহা জানিতে হইবে। এইরূপ উপায়েই ভারতবর্ষ আপনার নানা বিভাগের মধ্য দিয়া আপনার সমগ্রতা উপলব্ধি করিতে পারিবে।"[৩]

হিংসায় পৃথিবী সত্যই আজ 'উন্মত্ত'। পৃথিবীর আকাশ আজ আবার মেঘাচ্ছন্ন। সাম্প্রদায়িকতা, বিচ্ছিন্নতাবাদ, হিংসা ও ধর্মান্ধতার কালো ছায়া আজকের পৃথিবীর প্রান্তে প্রান্তে বিস্তারলাভ করেছে এবং আমাদের দেশেও সেই ছায়া আমাদের শুভবুদ্ধি ও উন্নত উদার মানসিকতাকে গ্রাস করতে উদ্যত হয়েছে। তাই এই মুহূর্তে আজ সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন ধর্মের লক্ষ্য সম্পর্কে পূর্ণরূপে অবহিত হওয়া, অবহিত হওয়া ভারতের সুদীর্ঘ ঐতিহ্যের ধারাকে এবং স্বয়ং অবহিত হয়ে অন্য সকলকেও তা অবহিত করানোও সমান জরুরী। ☐

১ স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা, প্রথম খণ্ড, ৩য় সং, পৃঃ ২২

২ রবীন্দ্র-রচনাবলী, দ্বাদশ খণ্ড, বিশ্বভারতী, ১৩৮৭, পৃঃ ২৬২-২৬৩

৩ ঐ, সপ্তবিংশ খণ্ড, বিশ্বভারতী, ১৩৮১, পৃঃ ৩৪১

## প্রাসঙ্গিকী

### 'এক নতুন মানুষ'

কিছুদিন আগে একটি বইয়ের দোকান থেকে স্বামী আত্মস্থানন্দজীর লেখা উদ্বোধন কার্যালয় থেকে প্রকাশিত 'এক নতুন মানুষ' বইখানি ক্রয় করি। বাড়িতে এসে এক নিঃশ্বাসে বইটি পড়ে ফেলি। সত্যি, বইটি আমার অত্যন্ত ভাল লেগেছে। ইংরেজীতে বলতে গেলে বলতে হয়ঃ "The book is simply superb." প্রসঙ্গতঃ বলি, বহুদিন আগে শ্রীমৎ স্বামী বিশুদ্ধানন্দজী মহারাজ আমায় কৃপা করেছিলেন। সেই সুবাদে শ্রীশ্রীঠাকুর, শ্রীশ্রীমা এবং স্বামীজীর জীবন ও বাণীর নানা দিক থেকে আলোচনা-সমৃদ্ধ অনেক বই পড়ার সুযোগ আমার হয়েছে। আমি একজন সাধারণ পাঠক। সাধারণ পাঠকের জ্ঞান ও ধারণা থেকে বলছি, এই বইটির মতো আর কোন বই আমার মনকে এত নাড়া দেয়নি। বর্তমানে আমার বয়স প্রায় সত্তর বছর। আমার মনে হলো, আমি যেমন এই বই পড়ে অনুপ্রাণিত বোধ করছি, তেমনি আমার মতো যাঁরা সাধারণ পাঠক ও ভক্ত আছেন, আমার বিশ্বাস, তাঁরাও এই বইটি পড়ে অনুপ্রাণিত হবেন এবং বিশুদ্ধ আধ্যাত্মিক আনন্দ লাভ করবেন—সেই ইচ্ছা নিয়েই এই চিঠিটি লিখলাম।

**আর. এন. দে**
পর্ণশ্রী পল্লী, বেহালা
কলকাতা-৭০০০৬০

### উদ্বোধন-এর বৈশাখ, ১৪০০ সংখ্যার প্রচ্ছদ

নবীন শতাব্দীর আগমনী বার্তা নিয়ে 'উদ্বোধন' পত্রিকার বৈশাখ, ১৪০০ সংখ্যা এসে পেঁছাল। প্রচ্ছদের এমন মনমাতানো মিষ্টি রঙ আমাকে দারুণভাবে আকৃষ্ট করেছে। কালবৈশাখী হয়ে যাবার পর প্রকৃতিতে যে-সজীবতা চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে, উদ্বোধনের এবারের প্রচ্ছদে সেই সজীবতার প্রতীক হালকা সবুজ রঙ মন মাতিয়ে দিয়েছে। এমন রঙের সমন্বয় দেখে মন ভরে যায়। আগামী শতাব্দীর জন্য 'উদ্বোধন'-এর অগণিত পাঠকবৃন্দের কাছে অগ্রিম এক উজ্জ্বল উপহার এই প্রচ্ছদখানি। প্রচ্ছদ সম্পর্কে গত বৈশাখ সংখ্যার 'প্রাসঙ্গিকী' বিভাগে অনুপকুমার মণ্ডল যে-চিঠি লিখেছেন তাঁর সঙ্গে আমি সম্পূর্ণ একমত। উদ্বোধন-এর শতবার্ষিকী স্মারকগ্রন্থে প্রচ্ছদ নিয়ে একটি মনোজ্ঞ আলোচনা থাকুক—এটা আমরাও চাই।

**তাপস বসু**
কলকাতা-৭০০০৩৯

### বলরাম বসুর পৌত্রীদের নাম

'উদ্বোধন'-এর কার্তিক, ১৩৯৭ সংখ্যা থেকে ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত স্বামী বিমলাত্মানন্দের লেখা 'বলরাম মন্দিরঃ পুরনো কলকাতার একটি ঐতিহাসিক বাড়ি' প্রবন্ধের প্রথম কিস্তিতে (কার্তিক, ১৩৯৭, পৃষ্ঠাঃ ৬৩২) বলরাম বসুর বংশ-তালিকা প্রকাশিত হয়েছিল। এই তালিকায় বলরাম বসুর পুত্র রামকৃষ্ণ বসুর পুত্র হৃষীকেশের (অল্প বয়সে মারা যান) এবং পোষ্যপুত্র রাধাকান্তর (পার্থর) নাম আছে, কিন্তু কন্যাদের নাম নেই। আমার মনে হয়, রামকৃষ্ণ বসুর কন্যাদের নামোল্লেখ না থাকলে তালিকাটি অসম্পূর্ণ রয়ে যাবে। রামকৃষ্ণ বসুর পাঁচ কন্যাঃ মঞ্জুলালী মিত্র, মাধবীলতা কর, মহামায়া সরকার, মহাশ্বেতা দে এবং মহালক্ষ্মী দত্ত। এঁদের মধ্যে এখন একমাত্র মহাশ্বেতা দে জীবিতা (বর্তমানে বয়স ৭৮ বছর, জন্মঃ ১৯১৫—ঠিকানাঃ পি ৪৮১ কেয়াতলা রোড, কলকাতা-৭০০০২৯, টেলিফোনঃ ৭৪-৩৬১৫)।

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করি যে, রামকৃষ্ণ বসু আমার দাদু। তাঁর তৃতীয়া কন্যা মহামায়া সরকার আমার মা। আমার বাবা প্রয়াত ডাঃ মণীন্দ্রনাথ সরকার কলকাতা মেডিকেল কলেজে একসময়ে প্রিন্সিপাল ও সুপারিন্টেন্ডেন্ট ছিলেন।

**অঞ্জলি ঘোষ**
কলকাতা-৭০০০২৬

নিবন্ধ

# মধুপুরের 'শেঠভিলা'য় মহাপুরুষ মহারাজ

## অমরেন্দ্রনাথ বসাক

স্বামীজী ও শ্রীশ্রীঠাকুরের অন্যান্য পার্ষদগণের সঙ্গে আমার মাতামহ পূর্ণচন্দ্র শেঠের ঘনিষ্ঠভাবে মেলামেশা করার এবং তাঁদের স্নেহ ও শুভেচ্ছা লাভ করার সৌভাগ্য হয়েছিল। তাঁর বড়বাজারের বাসভবনে শ্রীশ্রীঠাকুরের সন্তানদের অনেকেই কার্যব্যপদেশে আসতেন এবং সেখানে কেউ কেউ রাত্রিযাপনও করেছিলেন। এই গৃহের সন্নিকটেই অবস্থিত ছিল 'উদ্বোধন' পত্রিকার প্রথম ছাপাখানা। এজন্য পূর্ণচন্দ্র শেঠ প্রায়ই সেখানে গিয়ে স্বামী ত্রিগুণাতীতানন্দ মহারাজের দর্শন ও তাঁর সঙ্গে আলাপাদির সুযোগলাভে ধন্য হতেন। ত্রিগুণাতীতানন্দজী আমেরিকায় থাকাকালীন তাঁর নির্দেশমত মাতামহ পূজার বাসনপত্র, ডাল, বড়ি, আচার প্রভৃতি আমেরিকায় তাঁর কাছে পাঠাতেন। মাতামহকে লেখা ত্রিগুণাতীতানন্দজীর বহু পত্র আমার মামার বাড়িতে আজও বর্তমান। এই সঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে, স্বামীজী আমেরিকা থেকে ফেরার পর শিয়ালদহ স্টেশন থেকে তাঁকে যে ফিটন-গাড়ি করে বাগবাজারের পশুপতি বসুর বাড়িতে আনা হয়েছিল, সেই গাড়িটি ছিল আমার মাতামহের পারিবারিক গাড়ি। স্বামীজীর অভ্যর্থনার জন্য এই গাড়িটি মাতামহ দিয়েছিলেন। আমার মনে হয়, এই সংবাদটি স্বামীজীর কোন জীবনীগ্রন্থে উল্লিখিত নেই।

১৯২৭ খ্রীস্টাব্দ। মাতুল প্রভাতকুমার শেঠ ব্যারিস্টারি পাস করে সদ্য বিলাত থেকে ফিরেছেন। বিলাত যাবার আগে তিনি মন্ত্রদীক্ষা নিয়েছিলেন মঠের তৎকালীন অধ্যক্ষ শ্রীরামকৃষ্ণ-পার্ষদ স্বামী শিবানন্দজীর কাছে। কিছুদিন পর তিনি বেলুড় মঠে শ্রীগুরুর দর্শনমানসে মহাপুরুষ মহারাজ বা স্বামী শিবানন্দজী মহারাজের সমীপে এসেছেন। তখন মহাপুরুষজীর স্বাস্থ্যের অবনতির জন্য চিকিৎসকগণ তাঁকে বায়ুপরিবর্তনের কথা বলেছিলেন। মধুপুরে প্রভাতবাবুদের প্রাসাদোপম একটি বাড়ি ও তৎসংলগ্ন প্রশস্ত বাগান রয়েছে। বাড়িটির নাম 'শেঠভিলা'। তিনি মহাপুরুষজীর কাছে প্রস্তাব রাখলেন, যদি তিনি অনুগ্রহ করে কিছুদিনের জন্য মধুপুরে আসেন তাহলে তাঁর স্বাস্থ্যের উন্নতি হবে। মহাপুরুষজী সে-প্রস্তাব সঙ্গে সঙ্গে প্রত্যাখ্যান করলেন। মঠে তখন অন্যতম শ্রীরামকৃষ্ণ-পার্ষদ গঙ্গাধর মহারাজ বা স্বামী অখণ্ডানন্দজী মহারাজও ছিলেন। প্রভাতবাবু তাঁর কাছে ঐ অভিপ্রায় ব্যক্ত করায় তিনি বললেন: "দাদাকে বলে রাজি করিয়ে রাখব। তুমি আর একদিন এসো।" পরে একদিন প্রভাতবাবু তাঁর কাছে এলে তিনি বললেন: "দাদাকে রাজি করিয়েছি।" গঙ্গাধর মহারাজ মহাপুরুষজীকে 'দাদা' বলতেন।

এর পর ঐ বছর সেপ্টেম্বরের শেষভাগে শেঠ-ভিলায় মহাপুরুষজীর শুভাগমন ঘটে। মধুপুরের স্বাস্থ্যকর জল-হাওয়া, নির্জন পরিবেশ এবং সেবা-যত্নাদির ফলে অল্পদিনের মধ্যেই তাঁর স্বাস্থ্যের উন্নতি দেখা গেল। এখানে তিনি প্রায় দুমাস ছিলেন। দেওঘর, জামতাড়া ও অন্যান্য স্থান থেকে নিত্যই তাঁকে দর্শন করবার জন্য সাধু ও ভক্তদের সমাগম হতো। ফলে তাঁর অবস্থিতিতে 'শেঠভিলা' সেসময় যেন 'দ্বিতীয় বেলুড় মঠে' পরিণত হয়েছিল। মহাপুরুষ মহারাজ সেখানে কয়েকজনকে মন্ত্রদীক্ষাও দিয়েছিলেন।[১] একজনের দীক্ষার কথা স্বামী ধীরেশানন্দ লিখেছেন: "দুপুরে আহারের পর তিনি [মহারাজ] শুয়ে বিশ্রাম করছিলেন। আমি তাঁর পায়ে হাত বুলিয়ে দিচ্ছি। একজন দক্ষিণদেশ-বাসী ভক্ত বেলুড় মঠ হয়ে সেখানে মহারাজের কাছে দীক্ষাপ্রার্থী হয়ে এসেছে, কিন্তু তাঁর শরীর বিশেষ অসুস্থ, তাই দীক্ষা হবে না শুনে লোকটি মনঃক্ষুণ্ণ হয়ে বাইরের বারান্দায় বসে কাঁদছে। তখন বেলা প্রায় তিনটে। তিনি চোখবুজে জেগেই ছিলেন। হঠাৎ আমাকে জিজ্ঞেসা করলেন: 'সে-লোকটি কোথায়? তাকে ডেকে নিয়ে এস তো।' তাঁর সেবকদের বলে আমি লোকটিকে ডেকে আনলাম।

১ দ্রঃ দেবলোকে—স্বামী অপূর্বানন্দ, ২য় মুদ্রণ, ১৯৪২, পৃঃ ২১৬

তিনি আমাকে দরজাটা ভেজিয়ে দিয়ে বাইরে যেতে বললেন। কিছুক্ষণ পরে সে-লোকটি বাইরে আসতেই দেখলাম, তার মুখে আনন্দ ও গভীর শান্তির প্রতিচ্ছায়া। বেচারা কতদূর থেকে এসেছে; আজ তার বাসনা পূর্ণ হলো। পরিপূর্ণ হৃদয়ে সে দেশে ফিরে গেল।"[২]

মহাপুরুষজীর অবস্থানকালে শেঠভিলায় এক দিব্যভাবের বাতাবরণ সৃষ্টি হয়েছিল। মহারাজ প্রতিদিন সমাগত সাধু-ভক্তবৃন্দকে উপদেশ দান করতেন। একদিন একজন সাধু সাধন-ভজন করে আশানুরূপ ফল হচ্ছে না বলে দুঃখপ্রকাশ করায় মহাপুরুষজী বলেছিলেন: "দেখ, ছোট ছেলে অসুখ থেকে সেরে উঠলে মাকে বলে, 'মা, আমায় ভাত দাও, আমি একথালা ভাত খাব।' মা কিন্তু জানেন, তার পেটে কতটুকু সইবে, তাই ধীরে ধীরে ততটুকুই দিয়ে যান, পরে তা যখন সয়ে যায়, তখন হয়তো আরও বেশি দেন; তোমাদেরও তাই হয়েছে, তিনি সময় বুঝে সব দিয়ে দেবেন।"[৩]

৬ অক্টোবর ১৯২৭। বিজয়া দশমী। দেওঘর বিদ্যাপীঠ থেকে সাধু-ব্রহ্মচারীরা মহাপুরুষজীকে দর্শন ও প্রণাম নিবেদন করতে এসেছেন। স্বামী গম্ভীরানন্দজীও ঐদিন দেওঘর থেকে সাইকেলে মঠের রাস্তা ধরে একা শেঠভিলায় এসেছিলেন মহাপুরুষজীকে প্রণাম করতে। সেদিন গম্ভীরানন্দজীকে মহাপুরুষজী বলেছিলেন: "তোমরা সব ঠাকুরের কাজ করছ, ঠাকুরের কাছে এসেছ, ধর্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষ সব পাবে।"[৪]

শেঠভিলায় মহাপুরুষজী তাঁর অবস্থান খুব উপভোগ করেছিলেন। কাশীধাম থেকে ২ ডিসেম্বর ১৯২৭ তারিখে তিনি শ্রীযুক্ত প্রভাতবাবুকে লিখেছিলেন: "মধুপুরে থাকাকালীন কি আনন্দই না লাভ করিয়াছি।" মাতুলের মুখে শুনেছি, সেই সময় শেঠভিলায় সেবার জন্য স্বামী ভূতেশানন্দজী (বেলুড় মঠের বর্তমান প্রেসিডেন্ট মহারাজ) কয়েকদিন ছিলেন। জগদ্ধাত্রীপূজার দিন তিনি মহাপুরুষজীকে চণ্ডীপাঠ করে শুনিয়েছিলেন।

মহাপুরুষজী শেঠভিলায় থাকাকালীন মাতুল একদিন তাঁর কাছে এক অভিনব প্রার্থনা রাখলেন। তিনি মহাপুরুষজীকে জিজ্ঞাসা করলেন: "শেষসময়ে অজ্ঞান চলে যাবে তো?" প্রশ্ন শুনে মহাপুরুষ মহারাজ খুব জোরের সঙ্গে বলেছিলেন: "Sure and Certain! Sure and Certain!" যখন বরানগরের বাড়িতে মাতুলের দেহাবসানে তাঁর মরদেহ শায়িত ছিল, তখন আমার একথাই মনে উঠছিল, ব্রহ্মজ্ঞ মহাপুরুষের বাক্য তো বৃথা হতে পারে না। আমরা বুঝতে না পারলেও নিশ্চয়ই শেষসময়ে মাতুলের ব্রাহ্মীস্থিতি লাভ হয়েছে।

এই শেঠভিলাতেই আমার মাতামহী (সুশীলা শেঠ—শ্রীশ্রীঠাকুরের চিকিৎসক ডাঃ নিতাই হালদারের মেয়ে) একদিন পায়সান্ন রান্না করে অব্রাহ্মণশরীরে ঠাকুরকে ভোগ দেবেন কিনা ভেবে ইতস্ততঃ করছিলেন। মহাপুরুষজীকে জিজ্ঞাসা করায় তিনি মাতামহীকে সানন্দে অনুমতি দিয়েছিলেন।

শেঠভিলার প্রশস্ত বাগানের এক প্রান্তে এক বিশাল কুরুম গাছ (শালজাতীয় গাছ) ছিল। মাতুলের কাছে শুনেছি, এই গাছের নিচে বসে মহাপুরুষজী আমার মাতামহ পূর্ণচন্দ্র শেঠের সঙ্গে ধর্ম-প্রসঙ্গ করতেন। শেঠভিলায় স্বামী অখণ্ডানন্দজীরও শুভাগমন হয়েছিল। তিনি মাতুলকে বলেছিলেন: "এত সুন্দর খোলামেলা জায়গা। এখানে হাওয়া খেয়েই বেঁচে থাকা যায়।" পরবর্তী কালে এখানে মঠের আরও অনেক সাধু মহারাজের পদার্পণ ঘটে।

যতদূর মনে পড়ে, মাতুল আমাকে বলেছিলেন, স্বামী ব্রহ্মানন্দজীর নির্দেশে শেঠভিলার কয়েকটি গোলাপের চারা মাতামহ পূর্ণচন্দ্র শেঠ ভুবনেশ্বর মঠের জন্য পাঠিয়েছিলেন।

আজ শেঠভিলার জীর্ণদশা। আগের সেই নানাবিধ ফলফুলের সম্ভার, নানান গাছপালার সমারোহ আর নেই। কালের দুর্বার গতিতে সবই বিনাশের পথে। শেঠভিলার সামনে রয়েছে লাল কাঁকড়ের প্রশস্ত বীথি—যার দুধারের ইউক্যালিপটাসের ঘন সারি সৌন্দর্যের মায়াজাল সৃষ্টি করে আজও দাঁড়িয়ে আছে অতীত দিনের নীরব সাক্ষী হয়ে। উন্নতশির বৃক্ষের পল্লবে পল্লবে সঞ্চারিত সমীরণের মর্মর শব্দে যেন ভেসে আছে বিগতদিনের ভাবজগতের সামগীতি। □

২ শিবানন্দ-স্মৃতি সংগ্রহ—স্বামী অপূর্বানন্দ সংকলিত, ১ম খণ্ড, ১ম সং, ১৩৭৪, পৃঃ ৩৮০
৩ ঐ, ২য় খণ্ড, ১ম সং, ১৩৭৫, পৃঃ ১৪১-১৪২
৪ ঐ, পৃঃ ১১৩-১১৪

# অথ পুরুষোত্তমকথা
## অনিন্দ্য মুখোপাধ্যায়

"সর্বং রহস্যং পুরুষোত্তমস্য।
দেবো না জানাতি কুতো মনুষ্যঃ ॥"

সত্যিই, যে পুরুষোত্তম জগন্নাথের লীলা দেবগণেরও বোধগম্য নয়, তা সাধারণ মানুষ কেমন করে অনুভব করবে?

তাঁর দেহ ঘোর কৃষ্ণবর্ণ। এত কালো যে, আলোও পিছলে যায়। তাঁর হাত নেই, পা নেই। তাঁর সবচেয়ে দর্শনীয় অঙ্গ হলো বিশাল মুখমণ্ডল। সেই মুখে আবার সবচেয়ে প্রকট দুটি চোখ। গোলাকার পল্লবহীন দুটি চোখ। দৃষ্টিতে তাঁর ক্লান্তি নেই, পলক পড়ে না তাঁর চোখে। দেখে চলেছেন জগৎ-সংসারকে, সমস্ত কর্মের সাক্ষী হয়ে তিনি দাঁড়িয়ে আছেন নিজের সৃষ্টির মাঝে। কিন্তু নেই কোন "সৃষ্টিসুখের উল্লাস"। তিনি নীলাচল পুরীর অধীশ্বর, শ্রীক্ষেত্রের পুরুষোত্তম, উড়িষ্যার নয়নমণি, ভক্তের ভগবান, সাধকের সিদ্ধি, বিদেশীর বিস্ময়—তিনি জগন্নাথ-স্বামী।

শ্রীক্ষেত্র এবং জগন্নাথ—যুগে যুগে এই শব্দদুটি প্রতিধ্বনিত হয়ে ফিরছে পুরাণ থেকে মহাকাব্যে, ভক্তের হৃদয় থেকে শিলালিপিতে, তালপাতার পুঁথি থেকে সংবাদপত্রে। রামায়ণে ভগবান শ্রীরামের কণ্ঠে শুনি বিভীষণকে জগন্নাথ-উপাসনার উপদেশ। মহাভারতে যে 'বেদি' বা 'অন্তর্বেদি'র উল্লেখ আছে, তা কোন কোন পণ্ডিতের মতে জগন্নাথ-মন্দিরের গর্ভগৃহের বেদি। পণ্ডিতমহলের একাংশ আবার জগন্নাথদেবের দারুব্রহ্ম রূপকে ঋগ্বেদোক্ত (১০।১৫৫) 'অপুরুষং দারু'-র সঙ্গে অভেদত্বের দাবি করেন। নবম শতাব্দীর বজ্রযান সম্প্রদায়ভুক্ত ইন্দ্রভূতি নামক জনৈক ভক্তের 'জ্ঞানসিদ্ধি' গ্রন্থে পাওয়া যায়ঃ "প্রণিপত্য জগন্নাথং সর্বজিনবরার্চিতম্"। এই সেই আদি ও অকৃত্রিম শ্রীক্ষেত্র, যেখানে যুগে যুগে এসেছেন আচার্যগণ, সাধুসন্তগণ। এসেছেন আচার্য শঙ্কর, রামানুজ, শ্রীচৈতন্য এবং শ্রীমা সারদাদেবী। ধার্মিক হিন্দু অথচ পুরীধামে যাননি বা জগন্নাথকে দর্শন করেননি—এ বোধহয় সম্ভব নয়। প্রকৃতপক্ষে, শ্রীক্ষেত্রের প্রতি ভক্তের আকর্ষণ অমোঘ, যেমন অমোঘ চুম্বকের দিকে লোহার ছুটে যাওয়া। তাই পুরীযাত্রী ভক্তের মুখে প্রায়ই শোনা যায়—"জগন্নাথদেব টেনেছেন তাই যাচ্ছি।"

পুরীধামের নামও বহু—শ্রীক্ষেত্র, নীলাচল, পুরুষোত্তমক্ষেত্র, জগন্নাথপুরী, শঙ্খক্ষেত্র ইত্যাদি। শঙ্খক্ষেত্র সম্পর্কে একটি কথা বলার আছে। পুরী শহরে জগন্নাথ-মন্দিরকে কেন্দ্র করে চারিদিকে ছড়িয়ে আছে অগণিত দেবদেউল এবং পবিত্র কুণ্ড। এগুলি শ্রীক্ষেত্র তীর্থেরই অঙ্গ, যেমন লোকনাথ শিব, গুণ্ডিচা বাড়ি, চক্রতীর্থ, স্বর্গদ্বার শ্মশান, ইন্দ্রদ্যুম্ন সরোবর ইত্যাদি। এই দেবদেউল ও পবিত্র স্থানগুলিকে যদি একটি কাল্পনিক রেখা দ্বারা যোগ করা যায় তাহলে তা অনেকটা শঙ্খের আকার নেয়। তাই যেমন করে আকাশের তারার সমষ্টিতে সৃষ্টি হয়েছে কালপুরুষ, লুব্ধক ব সপ্তর্ষি, তেমন করেই জগন্নাথপুরী হয়েছে শঙ্খক্ষেত্র

মানুষের হৃৎপিণ্ডের সাইনো-অরিকুলার নোড থেকে যেমন হৃদস্পন্দন উৎপন্ন হয় তেমন জগন্নাথ-পুরীরও প্রাণস্পন্দন-কেন্দ্র হলো জগন্নাথ-মন্দির—পুরীবাসীর ভাষায় 'বড় দেউল'। সামাজিক আধ্যাত্মিক এবং অর্থনৈতিক দিক থেকে বিচার করলে এই মন্দির উড়িষ্যা তথা ভারতের একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ স্থান। বর্তমান মন্দিরটি তৈরি হয়েছিল দ্বাদশ শতাব্দীতে। তাহলে তার আগে কি জগন্নাথ-মন্দির ছিল না? ইতিহাস-মতে নব শতাব্দীতে রাজা যযাতি ঠিক ঐ স্থলেই একটি জগন্নাথ-মন্দির নির্মাণ করিয়েছিলেন। তার ধ্বংস স্তূপেরই ওপর গড়ে ওঠে বর্তমান কাঠামো।

কিংবদন্তী অনুযায়ী এরও বহু আগে ইন্দ্রদ্যুম্ন নামক এক পৌরাণিক রাজা শ্রীক্ষেত্রে সর্বপ্রথম জগন্নাথদেবের দেবায়তন গড়ে তোলেন। পুরাণ মতে যদুবংশ ধ্বংসের পর কৃষ্ণের মৃত্যু হলে তাঁর মরদেহ একটা গাছের নিচে পড়েছিল এই সময়ে কয়েকজন ভক্ত কৃষ্ণের কয়েকটি অস্থি সংগ্রহ করে বাক্সে তুলে রাখেন। রাজা ইন্দ্রদ্যুম্ন বিষ্ণুর পুজো করতে উদ্যোগী হলে তিনি তাঁ সনাতন মূর্তি নির্মাণ করে তার মধ্যে কৃষ্ণের অস্থি

রক্ষা করতে বলেন। বিশ্বকর্মা এই মূর্তিনির্মাণের ভার নেন। শর্ত ছিল, মূর্তিনির্মাণ সম্পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত কেউ যেন তাঁকে না ডাকেন। কিন্তু পনেরো দিন পর রাজা অধৈর্য হয়ে নির্মাণকক্ষে এসে উপস্থিত হন। ফলে মূর্তি অসম্পূর্ণ থেকে যায়। ইন্দ্রদ্যুম্ন তখন উপায়-সন্ধানের জন্য ব্রহ্মার কাছে কাতর প্রার্থনা করলে ব্রহ্মা প্রীত হয়ে চক্ষু ও প্রাণদান করে স্বয়ং পুরোহিত হয়ে জগন্নাথদেবের পুজা করেন।

প্রবাদ, বিশ্বাবসু নামে এক শবরজাতীয় অন্ত্যজ-শ্রেণীর ব্যক্তি নীলাচলে নীলমাধবের পুজা করতেন। পরে এই নীলমাধব জগন্নাথে পরিণত হন। বিশ্বাবসুর মেয়ের বংশের লোকেরা দইতাপাতি নামে পরিচিত এবং এখনও জগন্নাথের বিশেষ বিশেষ সেবায় তাঁরা নিযুক্ত আছেন। তবে যেহেতু জগন্নাথ-মন্দিরের ইতিহাস এবং বিবর্তন এই রচনার লক্ষ্য নয়, তাই ন্যূনতম প্রয়োজনীয় কিছু তথ্যেই এই লেখা সীমাবদ্ধ রাখতে চাই। বর্তমান মন্দিরটি নির্মাণের আদেশ দিয়েছিলেন গঙ্গবংশীয় রাজা অনঙ্গভীমদেব (১১৯৮ খ্রীঃ-১২২৩ খ্রীঃ)। তাল-পাতার পুঁথি 'মাদলা পাঞ্জি'[১] অন্ততঃ সেই কথাই বলে। আবার, ১৯৪৯-এ কটকের কাছে পুরাতাত্ত্বিক খননের ফলে আবিষ্কৃত একটি তামার ফলক থেকে জানা যায় যে, অনঙ্গভীমদেবই মন্দিরের নির্মাতা। কিন্তু, মহামহোপাধ্যায় সদাশিব কাব্যকান্তর 'শ্রীজগন্নাথ-মন্দির' গ্রন্থে পাওয়া যায়, মন্দিরটির নির্মাতা গঙ্গবংশের প্রতিষ্ঠাতা রাজা অনন্তবর্মণ ছোড়গঙ্গদেব (১১৯৭ খ্রীঃ)। কোন কোন পণ্ডিতের মতে, মন্দিরনির্মাণ শুরু হয় ছোড়গঙ্গ-দেবের রাজত্বকালে এবং শেষ হয় তাঁর পরবর্তী রাজা অনঙ্গভীমদেবের আমলে। অতএব বড় দেউল তৈরির কৃতিত্ব দুজনই দাবি করতে পারেন। তবে ভক্তরা বলবেন, ভক্তের প্রয়োজনে ভক্তেরই দ্বারা নিজের দেউল নির্মাণ করিয়েছিলেন শ্রীভগবান স্বয়ং। জগন্নাথ-প্রভু যদি নির্মাতা রাজাদের অনুপ্রাণিত, অনুভাবিত এবং চালনা না করতেন, তাহলে আমরা কি দেখতে পেতাম এই পর্বতপ্রমাণ মন্দির? তাই মন্দিরের প্রকৃত নির্মাতা তো তিনিই। ভক্তহৃদয়ের কাছে এর চেয়ে বড় কোন ঐতিহাসিক প্রমাণের প্রয়োজনীয়তা নেই।

সুবিশাল মন্দিরের গর্ভগৃহে বসে আছেন জগন্নাথ। পাশে বোন সুভদ্রা এবং দাদা বলভদ্র। পূর্বমুখী মন্দির চারভাগে বিভক্ত রয়েছে—'মূল-মন্দির', 'মুখশালা', 'নাট্যমন্দির' এবং 'ছত্রভোগ-মণ্ডপ'। মন্দির তো নয়, যেন একটি দুর্গপ্রাসাদ। কুড়ি থেকে চব্বিশ ফুট উঁচু আয়তাকার দেওয়াল দিয়ে ঘেরা এই মন্দির। 'দেওয়াল' কথাটা এখানে ঠিক মানায় না, যথাযথ হয় 'প্রাকার' শব্দটি। একে-বারে বাইরের প্রাকারের নাম "মেঘনাদ প্রাচীর"। এটি ৬৬৫ ফুট লম্বা এবং ৬৪০ ফুট চওড়া। ভিতরের প্রাকারটি হলো 'কূর্মবেড়'। এটি লম্বায় ৪২০ ফুট এবং চওড়ায় ৩১৫ ফুট। এই দুটি প্রাকারই তৈরি হয়েছিল পঞ্চদশ থেকে ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যে—মুসলিম আক্রমণের ভয়ে। তবুও তা কালা-পাহাড়কে ঠেকাতে পারেনি। পারবে কি করে? প্রাকার তো আর যুদ্ধ করে না। যুদ্ধ করে মানুষ। পুরীর বৈষ্ণব পুজারীরা তো আর যোদ্ধা ছিলেন না। পূর্ব, পশ্চিম, উত্তর ও দক্ষিণে চারটি বিশাল দ্বার। পূর্বদ্বারটি প্রধান প্রবেশপথ এবং এর নাম 'সিংহদ্বার'। পশ্চিম, উত্তর ও দক্ষিণ দরজাগুলির নাম হলো যথাক্রমে—'ব্যাঘ্রদ্বার', 'হস্তিদ্বার' ও 'অশ্বদ্বার'। জগন্নাথ-মন্দিরে চারটি প্রবেশপথ মানবজীবনের চারটি পুরুষার্থের প্রতীক —ধর্ম (সিংহদ্বার), অর্থ (হস্তিদ্বার), কাম (ব্যাঘ্রদ্বার) এবং মোক্ষ (অশ্বদ্বার)। পুরীর বর্তমান গজপতিরাজারাও বংশানুক্রমে অশ্বদ্বার দিয়েই মন্দিরে প্রবেশ করেন। সিংহদ্বারের সামনে ষোড়শতলবিশিষ্ট একটি স্তম্ভ দাঁড়িয়ে আছে। এটি 'অরুণস্তম্ভ'। ৩৩ ফুট ৮ ইঞ্চি উঁচু এই স্তম্ভের মাথায় আছে সূর্যের রথচালক অরুণের একটি মূর্তি। অষ্টাদশ শতাব্দীতে এই স্তম্ভটি আনা হয়েছিল কোনারক থেকে। সিংহদ্বার দিয়ে প্রবেশকালে ডানদিকে চোখে পড়ে 'পতিতপাবন' জগন্নাথের একটি ছোট প্রতিভূ। ইতিহাস অনুসারে, রাজা রামচন্দ্রদেবের (দ্বিতীয়) রাজত্বকালে (১৭২৭ থেকে ১৭৩৮ খ্রীস্টাব্দের মধ্যে) এই মূর্তিটি

১ উড়িষ্যার প্রাচীন ইতিহাস-স্বরূপ এই 'মাদলা পাঞ্জি'তে জগন্নাথ-মন্দির ও উড়িষ্যার নৃপতিদের ইতিবৃত্ত লেখা আছে।

এখানে স্থাপিত হয়, যাতে অহিন্দুরা মন্দিরে প্রবেশ না করেই জগন্নাথদর্শন করতে পারেন। এরপর আঠারোটি বিশাল পাথরের ধাপ পেরিয়ে প্রবেশ করা যায় কূর্মবেড়ের অভ্যন্তরে—মন্দিরচত্বরে। মন্দির প্রথম তৈরির সময় এই ধাপ ছিল বাইশটি। তাই নামও ছিল 'বাইশ পাহ'চ'। নাম আজও আছে, কিন্তু অস্তিত্ব হারিয়েছে চারটি ধাপ। মূল মন্দিরকে ঘিরে আছে কতশত ছোট-বড় মন্দির। হিন্দুদের সব দেবদেবীই যেন সেখানে উপস্থিত। শোনা যায়, মন্দিরের ওপরে 'নীলচক্র' নামক সুদর্শনচক্রটি অষ্টধাতুনির্মিত।

জগন্নাথদেবের নাম অনেক তবে প্রচলিত কয়েকটি হলো নীলমাধব, পুরুষোত্তম, জগবন্ধু, জগন্নাথ, দারুব্রহ্ম। কিন্তু এইসব নামের চেয়ে পুরী তথা উড়িষ্যার মানুষ তাঁকে আরও ঘরোয়া, আদরের নামে ডাকতে পছন্দ করে। তাই প্রভুর নাম কখনো 'কালিআ', কখনো বা 'চকাডোলা', চকানয়ন', 'চকা-আখি' ইত্যাদি। বলা বাহুল্য, এইসব নামের কারণ প্রভুর নয়নযুগল। ঐ চোখদুটি যেন সম্মোহিত করে ভক্তমনকে। আরও অদ্ভুত ব্যাপার, বিগ্রহের হাত-পা নেই। কেবলমাত্র বিশেষ বিশেষ দিনে প্রভু সোনার হাত-পা ধারণ করেন। স্থূলভাবে দেখলে জগন্নাথদেবের দারুমূর্তিকে তাই মনে হয়, অর্থহীন। কিন্তু কেন প্রভুর এই রূপ? কেন নেই তাঁর আঁখিপল্লব?

কোন কোন পণ্ডিত মনে করেন, প্রভুর এরূপ চোখের অর্থ— প্রভু সর্বদা দৃষ্টি রাখছেন জীবকুলের ওপরে। প্রভুর পল্লবহীন চোখকে কোন কোন পণ্ডিত ভগবানের মৎস্যাবতারের পরিচায়ক বলে মনে করেছেন।

আসলে সকল দিকেই যে তাঁর (জগন্নাথের) হাত-পা-মুখ-চোখ-কান, ব্রহ্মাণ্ড সংসার জুড়ে তাঁর বিস্তৃতি। তাই পরমাত্মা জগন্নাথের বিগ্রহে হাত-পা ইত্যাদির কী প্রয়োজন? জ্ঞানীর কাছে তিনি পরম ব্রহ্ম। তাঁকে পূর্ণরূপে ব্যাখ্যা করা যায় না। তাই তাঁর মূর্তিও অর্ধসমাপ্ত। ঋগ্বেদে (১০।৯০) বলা হয়েছে: "সহস্রশীর্ষা পুরুষঃ সহস্রাক্ষঃ সহস্র-পাৎ।" —তাঁর অনন্ত মস্তক, অনন্ত চক্ষু, অনন্ত চরণ। গীতার ত্রয়োদশ অধ্যায়েও (১৩ শ্লোক) সেকথাই বলা হচ্ছে:

সর্বতঃ পাণিপাদং তৎ সর্বতোঽক্ষিশিরোমুখম্।
সর্বতঃ শ্রুতিমল্লোকে সর্বমাবৃত্য তিষ্ঠতি।

শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে (৩।১৯) বলা হচ্ছে:

অপাণিপাদো জবনো গ্রহীতা
পশ্যত্যচক্ষুঃ স শৃণোত্যকর্ণঃ।
স বেত্তি বেদ্যং ন চ তস্যাস্তি বেত্তা
তমাহুরগ্র্যং পুরুষং মহান্তম্॥

—তাঁর হস্ত-পদ না থাকলেও তিনি দ্রুত গমন করেন এবং সর্ববস্তু গ্রহণ করেন। চক্ষু না থাকলেও তিনি দর্শন করেন, কর্ণ না থাকলেও শ্রবণ করেন। তিনি জ্ঞাতব্য সবকিছু জানেন, অথচ কেউ তাঁকে জানে না। জ্ঞানীরা তাঁকে সর্বাগ্রণী মহান্ পুরুষ বলে অভিহিত করেন।

আবার ফিরে আসি তাঁর চোখের আকারে। তাঁর চোখদুটি চক্রাকার, যা কালের প্রতীক। চোখের কেন্দ্রস্থলে বিন্দু, যা সৃষ্টির উৎসবিন্দু। সেই চক্রচক্ষুকে বেষ্টন করে যে লালবর্ণের অংশ তা কর্মের প্রতীক। সেই লালবর্ণের অংশ কিন্তু সীমাবদ্ধ নয়, বরং সীমারেখাদুটি বিপরীতমুখী, ফলে তা অনন্তগামী। অর্থাৎ, এই জগৎসংসার চলছে কর্মের প্রবাহে, তাড়নায় এবং এই কর্ম অনন্ত, অসীম। অনাদি, অনন্তকাল ধরে এই নয়নযুগল আকর্ষণ করে আসছে অগণিত মানুষকে, সৃষ্টির উৎসসন্ধানী জ্ঞানীকে পথ দেখিয়েছে এই চক্ষু। সত্যের লালনকারী, অসত্যের বিনাশকারী এই চক্ষুদ্বয় অবিনশ্বর পরমাত্মারই প্রতীক। দেব-মূর্তির এত উচ্চতম আধ্যাত্মিক তত্ত্ব আর কোথাও বিগ্রহায়িত হয়েছে কিনা সন্দেহ!

জগবন্ধুর একটি নাম 'দারুব্রহ্ম'। আগেই বলা হয়েছে যে, কেউ কেউ 'দারুব্রহ্ম' নামে ঋগ্বেদোক্ত 'অপুরুষং দারু'-র প্রতিফলন দেখেন। শ্রীজগন্নাথদেবের বিগ্রহটি নিমকাঠের তৈরি। বলভদ্র ও সুভদ্রারও তাই। জগন্নাথের সেই দারুনির্মিত মূর্তির নাভি অংশে রক্ষিত আছে এক অদেখা বস্তু। কিংবদন্তী, ঐ অদেখা বস্তুটি হলো শ্রীকৃষ্ণের নাভি। স্বয়ং ভগবানের নাভি বলে বস্তুটিকে বলা হয় 'ব্রহ্ম'। দারুমূর্তিতে ব্রহ্মের অবস্থানের কারণেই 'দারুব্রহ্ম' নাম। ☐

## পরিক্রমা

# পঞ্চকেদার ভ্রমণ
## বাণী ভট্টাচার্য
[ পূর্বানুবৃত্তি ]

১০ সেপ্টেম্বর। মদমহেশ্বরের উদ্দেশে সকাল ৬-১৫ মিনিটে পদব্রজে যাত্রা শুরু করলাম। এখান থেকে দেড় কি. মি. দূরে বানতোলি। এখানে নন্দীকুণ্ড থেকে উৎপন্ন সরস্বতী-গঙ্গা মদমহেশ্বর-গঙ্গার সাথে মিশেছে। বানতোলির পর জলের ব্যবস্থা না থাকাতে জল এখান থেকে সংগ্রহ করে নিতে হয়।

মদমহেশ্বরের প্রচণ্ড চড়াই এখান থেকে শুরু। পাহাড়ের গায়ে 'Z' অক্ষরের মতো পথ ক্রমশঃ ওপরে উঠে গিয়েছে। ১০ কি.মি. পথে ১০,০০০ ফিট ওপরে উঠতে হবে। নানা আকারের পাহাড়ী পথ। পথের ওপর পাইন, রডোডেনড্রনের পাতা পড়ে আছে। ঘন বনের জন্য এখানে সূর্যালোক প্রবেশ করে না। পথ ভেজা।

বানতোলি থেকে ২ কি.মি. যাবার পর খাড়ায়তে চা-পানের ব্যবস্থা হলো। একটিমাত্র ঘর। যাত্রীদের সেবার জন্যে লোক রয়েছে। মাঝপথে চৌখাম্বার বরফাবৃত একটি শৃঙ্গ দেখা গেল। জঙ্গলের ভিতর দিয়ে ধীরে ধীরে পথ চলতে হয়। ঘাম হয়, শ্বাসকষ্ট হয়। আবার লাঠিতে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে হিমালয়ের পবিত্র বাতাস প্রাণভরে নিশ্বাস নিলে সমস্ত ক্লান্তি দূর হয়। মুখে শুকনো আমলকী, গোলমরিচ ও লজেন্স রাখলে আরাম হয়।

নান্নু থেকে মদমহেশ্বর ৯ কি.মি. পথ। এখানে জলের কোন ব্যবস্থা নেই। মদমহেশ্বর থেকে জল আনতে হয়। বর্তমানে সরকারের পূর্তবিভাগ পাইপ দিয়ে জল আনার ব্যবস্থা করেছে।

নান্নু থেকে শুধু চড়াই আর চড়াই। মাঝে মাঝে মেঘ এসে পথিককে আলিঙ্গন করে পথচলার ক্লান্তি হরণ করে নিচ্ছে। মনে হবে আক্ষরিক অর্থেই 'মেঘালয়ে' রয়েছি। পথ নির্জন। কোথাও কোন শব্দ নেই। এমনকি ঝিঁঝিঁপোকার ডাক পর্যন্ত নেই। দুপাশে নানা জাতীয় ফুলের সমাবেশ। ডানপাশে খাদের নিচে নদীর জলধারা ক্ষীণ থেকে ক্ষীণতর। তবে কখনো কখনো গর্জন শোনা যায়। দুপাশে পাহাড়ের গায়ে রডোডেনড্রন, পাইন, ও বার্চ গাছের ঘন বন। কোন কোন জায়গায় পাহাড়ের গায়ে ঘন সবুজ বুগিয়াল ঘাসের বন। মুনিয়ান পাখি, দাড়িযুক্ত চিল ও বড় বড় গিরগিটি দেখা যাচ্ছিল। দুপাশের গাছ পথকে আচ্ছাদিত করে রেখেছে। এখানে দাঁড়িয়ে দূরে গগনচুম্বী পাহাড় থেকে আকাশগঙ্গার উৎপত্তিস্থল দেখা যায়। সূর্যালোকে তা উজ্জ্বল দেখায়।

পথ চলতে চলতে কেন জানি না মাঝে মাঝে আমার অনুভূতি হচ্ছিল, পাশে পাশে যেন ঠাকুর চলেছেন। যেই মনে হওয়া, পথের ক্লান্তি সে-মুহূর্তে দূর হয়ে যাচ্ছিল। পথের ধারে কত নাম-না-জানা ফুলের গাছ—ফুলে ভরে আছে। কিছু ফুল তুলে নিলাম। বরফ পড়ার জন্যে ১০,০০০ ফিটের ওপরে বড় গাছের উচ্চতা ক্রমশঃ হ্রাস পায়। ধরিত্রীমাতা গাছকে বরফ থেকে রক্ষা করার উদ্দেশ্যে মসের চাঁদোয়া দিয়ে যেন তাকে আবৃত করে রেখেছেন। মস গাছের পাতার শেষ-প্রান্ত থেকে মালার মতো ঝুলে থাকে।

মসের সেই মালার মতো কিছু অংশ পথের ওপরে পড়ে রয়েছে। যত্ন সহকারে তুলে নিলাম। মদমহেশ্বরে পৌঁছে বনফুল ও বনমালা দিয়ে দেবাদিদেবের পূজা করা যাবে। প্রায় সাড়ে তিনটার সময় বৃষ্টি শুরু হলো। মেঘ ও বৃষ্টিতে চারদিক অন্ধকার। চড়াই পথ উঠতে উঠতে যখন মন ও শরীর দুই-ই ক্লান্ত, তখন হঠাৎ বাঁদিকে ঘুরেই দেখা গেল সবুজ ঘাসে ঢাকা মালভূমি।

তিনদিকে শ্যামল পর্বতশ্রেণী। গিরিশৃঙ্গ তুষারাবৃত। চৌখাম্বা পর্বতশ্রেণীর পাদদেশে মদমহেশ্বরের মন্দির অবস্থিত। উচ্চতা ১১,৪৭৫ ফিট। বৃষ্টির জন্যে চারপাশ ভাল দেখা যায় না। একদল ভেড়া বৃষ্টিতে ভিজছে, আর চিৎকার করছে। পাশে দাঁড়িয়ে দুই-তিনটা লোমশ পাহাড়ী কুকুর, গলায় টিনের চাক্তি। তারা ভেড়াগুলোকে পাহারা দিচ্ছে, বাঘ বা অন্য কোন হিংস্র প্রাণী যাতে আক্রমণ করতে না পারে। পাশে মদমহেশ্বরের মন্দির—কাঠামো অনেকটা কেদারের মতো, তবে আকারে ছোট। পাশেই পূজারীর বাসস্থান।

বেলা পাঁচটা বাজে। মন্দির বন্ধ। চা-পানের পর চারদিকে ঘুরে দেখছি। মন্দিরের কাছে টুরিস্ট-লজের দোতলা কাঠের বাড়ি। কাঠের মেঝে। বৈদ্যুতিক আলোর ব্যবস্থা নেই। স্যানিটারি পায়খানারও ব্যবস্থা নেই। ঝরনাতে হাত-মুখ ধুয়ে, বনফুল ও মালা, 'মর্ত্য' থেকে আনা গঙ্গাধূপ ও মোমবাতি দিয়ে আমরা প্রাণের ঠাকুরের আরাধনা করলাম। আমাদের হৃদয়স্থিত ঠাকুর তখন মদমহেশ্বরের শোভা দেখছেন।

সাতটার সময় মন্দিরে আরতি-দর্শন হলো। খিচুড়ি ও সবজি খেয়ে রাত্রিবাস। এখানেও পিশুর খুব উৎপাত।

১১ সেপ্টেম্বর। ভোরের আকাশ পরিষ্কার। হিমালয়ে সদ্য সূর্যোদয় হয়েছে। উষার অরুণিমায় রঞ্জিত তুষারপুঞ্জ। উমা ও মহেশ্বরের বাসস্থান ঐ গিরিশিখর। হঠাৎ দূরের পাহাড়ের দিকে তাকিয়ে মনে হলো যেন ঠাকুর, মা ও স্বামীজী বসে আছেন। ধ্যানমগ্ন। আর শুভ্র মেঘমালা ঐ পর্বতশিখরকে বন্দনা করছে। মনে পড়ছে স্বামীজীর কথাঃ "ঐ যে ঊর্ধ্বে শুভ্র তুষারমণ্ডিত গিরিশিখর ঐ হলো শিব। আর ওঁর উপরে যে আলোকবর্ষণ হয়েছে—উনি উমা, জগন্মাতা।" তিনি বলতেন, "ঈশ্বরই জগৎ। বলা হয়, তিনি জগতের অন্তর্গত বা বাহিরে অবস্থিত—না, তিনি তা নন; আবার জগৎও ঈশ্বর বা ঈশ্বরের প্রতিমা নয়। না, ঈশ্বরই জগৎ, যাকিছু আছে সবই ঈশ্বর।"

সকাল সাতটায় মন্দির খুলে গেল। পূজারী দক্ষিণ ভারতীয় লিঙ্গায়েৎ সম্প্রদায়ের ব্রাহ্মণ। নাম—রাও লিঙ্ক। চমৎকার সংস্কৃত মন্ত্র আবৃত্তি করে ভক্তিভরে ব্রহ্মকমল দিয়ে তিনি আমাদের পূজা করালেন। পূজার পর আমাদের প্রসাদী ফুল-চন্দন দিলেন। দেখলাম, ভোগ দেওয়া হলো শুধু ভাত। জগতের ঈশ্বরকে এই সামান্য ভোগ। যাঁর ঘরণী অন্নপূর্ণা! তবে তিনি যে আশুতোষ, অল্পেতেই তুষ্ট।

গর্ভমন্দিরে প্রবেশ করা যায় না। দূর থেকে দেখা যায়, একটি কালোপাথরের ঈষৎ হেলানো শিবমূর্তি। গর্ভমন্দিরের সম্মুখে শিবের অনুচর নন্দীর পিতল মূর্তি।

বাইরের চত্বর পাথর দিয়ে বাঁধানো। পরিক্রমার সময় ডানপাশে গেলেই দেখা যাবে চারটি খুরের দাগ রয়েছে। প্রাচীন প্রবাদ, তিব্বতের দিক থেকে প্রত্যহ একটি গাভী এসে শিবলিঙ্গের ওপর দাঁড়িয়ে দুধ ঢেলে দিয়ে যেত। গরুর মালিক দুধ না পেয়ে খোঁজ করতে এসে ব্যাপারটা জানতে পারে এবং ঐ অবস্থায় গাভীকে আঘাত করে। লাঠির আঘাতেই নাকি ওখানকার শিবলিঙ্গ দ্বিখণ্ডিত। এরপর গাভীটি এই জায়গায় এসে দাঁড়ায়। এখানেও পূজার বিধি আছে। পিছনে একটি ছোট মন্দিরে অপূর্ব সুন্দর দেবী পার্বতীর মূর্তি। অপরটিতে হর-পার্বতীর যুগলমূর্তি। শিবের বাম উরুতে পার্বতী উপবিষ্টা। এত সুন্দর কোমল সজীব কালোপাথরের মূর্তি বড় দেখা যায় না।

এখান থেকে ৩ কি. মি. দূরে বৃদ্ধ মদমহেশ্বর। লিঙ্গমূর্তি। পাথর সাজিয়ে দেওয়াল তৈরি হয়েছে। তথাকথিত মন্দির নয়। কিংবদন্তী, পাণ্ডবরা এর প্রতিষ্ঠাতা। চতুর্দিকে সবুজ তৃণভূমি। প্রচুর ফুল ফুটে রয়েছে। মাসে একবার পূর্ণিমার সময় পূজারী গিয়ে সেখানে পূজা দিয়ে আসেন।

একটু এগিয়ে গেলে একটি ছোট সরোবর। চারপাশে চৌখাম্বার তুষারাবৃত পর্বতশিখর। অনেক ভেড়া চড়ে বেড়াচ্ছে। আরও ১০০০ ফিট উঁচুতে গেলে ভৈরবনাথের মন্দির—পাণ্ডবদের অস্ত্রাগার বলে কথিত। কিন্তু আমাদের তা দেখা হয়নি। এখান থেকে হাঁটাপথে কেদারনাথ যাওয়া যায়। পথ খুবই দুর্গম।

এবার ফেরার পালা। প্রিয়বিচ্ছেদের ব্যথায়

হৃদয় ভারাক্রান্ত। বারবার পিছন ফিরে প্রণাম করি মদমহেশ্বরকে, চৌখাম্বা পর্বতশ্রেণী ও সবুজ তৃণভূমিকে। মেঘের খেলা দেখতে দেখতে নিচে নামতে থাকি। নামার সময় পায়ে খুব চাপ পড়ে। আমার পা-দুটো যেন অসাড় মনে হচ্ছিল। বহু কষ্টে গৌণ্ডার গ্রামে এসে পেঁছালাম প্রায় ছটার সময়। এখানেই রাত্রিবাস।

১২ সেপ্টেম্বর। রাত্রিতে যদিও পিশুর উৎপাতে ঘুম ভাল হয়নি, তবু বিশ্রামের ফলে সকলের অনেক সুস্থবোধ হচ্ছিল। সকালবেলা উখীমঠের উদ্দেশে আমাদের যাত্রা শুরু হলো। রাঁশু হয়ে লেংক পেঁছানো গেল বেলা তিনটার সময়। এখান থেকে জিনিসপত্র নিয়ে পদব্রজে চলেছি মনসুনা। পথ খুবই দুর্গম। প্রচণ্ড উতরাই ও চড়াই। মনসুনা গ্রামের কাছে দেখা গেল সুন্দরী কিশোরী বালিকাদের। বৃষ্টিতে ভিজে ভিজে তারা পাহাড়ে গরু-মোষ চড়াচ্ছে। কোন ভাবনা নেই। সুনীতা, সুদামা—এইসব সুন্দর সুন্দর নাম তাদের।

আমদের তীর্থযাত্রী জেনে তারা বলল: "কাঁকড়ি খাওগি ?" বলেই তারা দৌড়ে কাঁকড়ি আনতে গেল। হাত থেকে আমাদের ছাতাগুলো নিজেরা বাসস্ট্যান্ড পর্যন্ত বয়ে নিয়ে গেল। লজেন্স খেতে দেওয়ায় তাদের কি আনন্দ! অজানা অচেনাকে আপন করতে হিমালয়বাসীদের কাছে শিখতে হয়। মনসুনা থেকে বাসে গেলাম উখীমঠ। এখানেই রাত্রিবাস।

১৩ সেপ্টেম্বর। ছোট মফঃস্বল শহর উখীমঠ। এখান থেকে কেদার, বদরী, তুঙ্গনাথ ও মদমহেশ্বরের তুষারাবৃত পর্বতশিখর দেখা যায়। এখানে খুব পুরনো মন্দির রয়েছে। কথিত আছে, রাজা মান্ধাতা এখানে একপায়ে দাঁড়িয়ে মহাদেবের ধ্যান করেন। তিনি এখানে একটি শিবমন্দির স্থাপন করেন। মন্দিরতোরণ ও অভ্যন্তর রাজপ্রাসাদের মতো। প্রশস্ত চত্বর, চারপাশে দোতলা কাঠের ও পাথরের বাড়ি। পূজারী এবং যাত্রীরা এখানে থাকেন। মন্দিরে ওঁকারেশ্বর শিবের অধিষ্ঠান। এছাড়া রয়েছে পঞ্চকেদারের মূর্তি। পাশে উষা-অনিরুদ্ধ, চিত্রলেখা, গঙ্গা, মান্ধাতা ও নবদুর্গার মূর্তি। উখীমঠ হলো পুরাণে বর্ণিত বাণরাজার রাজ্য। বাণরাজার কন্যা উষা শ্রীকৃষ্ণের পৌত্র অনিরুদ্ধের প্রণয়াসক্ত হন। উষার প্রিয় সখী চিত্রলেখার সহায়তায় এই প্রণয় পরিণয়ে পরিণত হয়। উষা-অনিরুদ্ধের যেখানে বিবাহ হয়েছিল বলে কথিত, সেই মণ্ডপটি পূজারী আমাদের দেখালেন। উষার নাম থেকেই এই স্থানের নাম হয় উষামঠ, পরে উখীমঠ। শীতকালে এখানে কেদারনাথ ও মদমহেশ্বরের পূজা হয়। এখান থেকে বাসে চোপতা যাওয়া যায়। চোপতা থেকে তুঙ্গনাথ। ধস নামার ফলে বাসের রাস্তা বন্ধ আছে। স্থির হলো, বাসে রুদ্রপ্রয়াগ হয়ে মণ্ডল যাব।

আমরা রুদ্রপ্রয়াগ পেঁছালাম বারোটার সময়। 'বদ্রী কেদার লজে' আমাদের থাকার ব্যবস্থা হলো। এই লজ ঠিক অলকানন্দার তীরে। অনবরত স্রোতের গর্জন শোনা যাচ্ছিল। রুদ্রপ্রয়াগ সঙ্গমের ঠিক ওপরেই কালিকাদেবীর মন্দির। এখানে ভৈরবী-মাতাজী পূজারিণী। মাতাজীর শান্ত ও সৌম্য চেহারা দেখলে ভক্তি হয়। এই মন্দির থেকে খাড়াই পথ অতিক্রম করে, অনেক সিঁড়ি ভেঙে একটি উঁচু জায়গায় রুদ্রনাথের ছোট নিরাবরণ মন্দির।

১৪ সেপ্টেম্বর। রুদ্রপ্রয়াগ থেকে সকলে সাতটার বাসে মণ্ডলের উদ্দেশে আমাদের যাত্রা শুরু। যাবার সময় দেখলাম, গোচরের কাছে একটি বাস-দুর্ঘটনা ঘটেছে। মন খুব খারাপ হয়ে গেল। মাত্র ১৫ মিনিট আগেই এই ঘটনা ঘটেছে। পথের পাশে গভীর খাদে বাস উল্টে পড়ে আছে। আমাদের বাস পাহাড়ের ধারে আঁকাবাঁকা পথ দিয়ে ক্রমশঃ ওপরে উঠছে। আকাশ মেঘাচ্ছন্ন। বৃষ্টি পড়ছে। পথে অনেক জায়গায় ধস নেমেছে। কর্ণপ্রয়াগ (পিণ্ডার ও অলকানন্দার সঙ্গম), নন্দপ্রয়াগ (মন্দাকিনী ও অলকানন্দার সঙ্গম), চামোলী, গোপেশ্বর হয়ে মণ্ডলে পেঁছালাম প্রায় বারোটার সময়।

ছোড়দার পূর্বপরিচিত বসন্ত সিং বিস্ত-এর 'মধুবন' হোটেলে আমাদের থাকার ব্যবস্থা হলো। ৪০।৫০ জন গ্রামবাসী নিয়ে 'মণ্ডল' ছোট একটি গ্রাম। মোটামুটি সব প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র এখানে পাওয়া যায়। বৈদ্যুতিক আলোর ব্যবস্থা আছে।
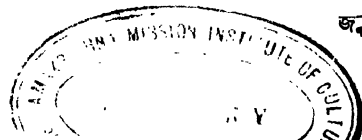
রাত নয়টার পর অল্প আলো দেখা যায়। স্যানিটারি শৌচাগারের ব্যবস্থা নেই। চতুর্দিক সুউচ্চ পর্বত পরিবেষ্টিত। মনে হয়, 'মণ্ডল' যেন পাহাড়ের প্রাচীর দিয়ে ঘেরা মধ্যবর্তী স্থান। পাশে বালখিল্য নদী। পাহাড়ী প্রথায় পাহাড়ের গায়ে ধান, মনুয়া, রামদানা, ভুট্টা ও কাঁকিড় চাষ হয়। তিন কি.মি. দূরে একটি হিন্দী উচ্চ বিদ্যালয় রয়েছে। ছেলে-মেয়েরা পায়ে হেঁটে স্কুলে যায়।

বালখিল্য ও অমৃতগঙ্গার সেতু অতিক্রম করে প্রায় দেড় কি.মি. দূরে স্বামী সচ্চিদানন্দ সরস্বতীর সংস্কৃত মহাবিদ্যালয় অবস্থিত। ছোড়দার পূর্ব-পরিচিত কৃষ্ণমণি পূজারী এখানকার অধ্যাপক। এঁর মায়ের আন্তরিকতা ও ভালবাসার কথা উমা-প্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের বইতেও পড়েছি।

পূজারীজী বললেনঃ "আজকাল বাতাবরণ খুব বদলে গিয়েছে। আধ্যাত্মিক পণ্ডিত, ঋষি নই পূর্বের মতো। জীবিকানির্বাহ খুবই কঠিন। অর্থ সর্বত্রই প্রয়োজন। কিন্তু মানুষের ত্যাগ করার প্রবৃত্তি আজ একদম নেই। কোন ধনী ব্যক্তি যদি সাধুদের জন্য কোন সংস্থা তৈরি করে দেন হিমালয়ের কোন কোন তীর্থস্থানে, তবে আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্য কাজ করতে পারা যায়। পুরোহিত, সাধু হলেও খেতে হবে তো? দান কোথায়? যেসব অর্থ আসে, দাতাদের ভাব অধিকাংশ ক্ষেত্রেই নিঃস্বার্থ ও প্রেমময় থাকে না। গ্রহীতার ওপরও তাই তার প্রতিফলন হয়।"

বিকালের দিকে আট-নয় বছরের কয়েকটি সুন্দর ফুটফুটে বালিকা হোটেলের পাশ দিয়ে কৌতূহলবশতঃ আমাদের দেখতে দেখতে যাতায়াত করছিল। ডেকে লজেন্স দেওয়াতে তাদের কি আনন্দ! "নাচ-গান জানো নাকি?" জিজ্ঞাসা করাতে এ-ওর গায়ে হেসে গড়িয়ে পড়ে। লজ্জাবনত মুখে তারা জানে বলে মাথা নাড়লো এবং নৃত্য সহকারে তাদের লোকগীতি শোনালো। বেশ মর্মস্পর্শী সুর। গাড়োয়ালে দারিদ্র্য, বেকারসমস্যা প্রচুর। সরকারি চাকরি যারা করেন, বেশির ভাগই সিপাহী, সেজন্যে তাদের গানের কথাও সেভাবে রচিত।

হোটেলের পার্শ্ববর্তী স্থানের বাড়িগুলোর স্থানীয় ব্যক্তিদের সাথে আলাপ হলো। পাশেই রচনাদের বাড়ি। রচনার বাবা শিক্ষক ছিলেন। অবসরগ্রহণ করেছেন। বড় মেয়েদের বিয়ে হয়ে গেছে। ছোট মেয়ে রচনা একাদশ শ্রেণীতে পড়ছে। স্কুলে পড়লে কি হবে, ভোর পাঁচটার সময় গরু-মোষ নিয়ে পাহাড়ে চরাতে যায়, ঘাস কেটে নিয়ে আসে, সংসারের কাজে সাহায্য করে। এরপর পড়ার অবসর। রচনার মা বললেনঃ "আমাদের কত মেয়ে ঘাস কাটতে গিয়ে ভালুকের মুখে পড়েছে। পাহাড় থেকে পড়েও অনেকে মারা গিয়েছে। এই গতকালই একটি মেয়েকে ভালুকে কামড়ে দিয়েছে। এখান থেকে ১৩ কি.মি. দূরে গোপেশ্বর হাস-পাতালে পায়ে হেঁটে যেতে হয়েছে চিকিৎসার জন্য।" উনি আরও বললেনঃ "গতকাল হোটেলের কাছে ঝরনার ধারে একটি বাঘ একটি গর্ভবতী গাভীকে খেয়েছে। কিন্তু বাচ্চাটা বেঁচে গিয়েছে।" এই তো এদের অনিশ্চিত জীবন। তবে ভাল লাগল, মেয়েরা পড়াশুনা করে, আবার সংসারের কাজও করছে। কিন্তু এজন্যে এদের কোনরকম মনোবিকার বা অভিযোগ নেই। মেয়েদের বিয়েতে এখানে কোন পণপ্রথা নেই। বয়স্ক মহিলারা ভেড়ার লোমে হাতে তৈরি কালো কম্বলের মতো কাপড় দিয়ে ঘাগরার মতো পোশাক ব্যবহার করে। চার-পাঁচশো টাকা নাকি দাম! একটি কাপড় তিন-চার বছর যায়। মাসে একবার ধোয়। অল্পবয়স্ক মেয়েরা শাড়ি পরে। সকলেই মাথায় পাগড়ী অথবা উলের স্কার্ফ ব্যবহার করে। আর একটি জিনিস লক্ষ্য করলাম, নাকের নোলক। যার স্বামী যত বিত্তবান, তার নোলকও তত লম্বা। সকলেই খুব সুন্দরী, কিন্তু স্নান না করার জন্য

হোটেলের সামনে খোলা চত্বরে রাতে চারটি বাস থাকে। সকাল আটটার আগে গোপেশ্বর, হরিদ্বার, দেরাদুন ও রুদ্রপ্রয়াগ রওনা দেয়। চালকরা ঐ মধুবন হোটেলেই আহার করে এবং থাকে। আমাদেরও এই হোটেলে খাওয়া ও রাত্রি-বাস। পিশুর উৎপাত এখানেও। [ক্রমশঃ]

নিবন্ধ

# রাজস্থানের যশোরেশ্বরী

## গৌরীশ মুখোপাধ্যায়

স্থানীয় লোকেরা বলে 'শিলাদেবী', কিন্তু বাঙালীরা বলে 'যশোরেশ্বরী'। বস্তুতঃ রাজস্থানের অম্বরের শিলাদেবী নামের আড়ালে আছে দীর্ঘ পাঁচ শতাব্দীর ইতিহাস, তবু যশোরেশ্বরীকে ভুলতে পারেনি বাঙালী। জয়পুর গেলে বাঙালী মাত্রেই অম্বরদুর্গে গিয়ে একবার মা-যশোরেশ্বরীকে দর্শন করে আসে।

রাজস্থানের বর্তমান রাজধানী 'পিংক সিটি' জয়পুর থেকে ১১ মাইল উত্তর-পূর্বে প্রাচীন অম্বর-রাজ্যের রাজধানী অম্বরনগর। অবশ্য নগর বলতে এখন অবশিষ্ট আছে একটি দুর্গ ও প্রাসাদ। মহারাজা মানসিংহ অম্বরনগরের নির্মাণ শুরু করে-ছিলেন। প্রায় একশো বছর পরে নির্মাণ শেষ করেন মহারাজা জয় সিংহ। চারদিকে আরাবল্লীর শাখা-প্রশাখায় ঘেরা অম্বরদুর্গ। পাহাড়ের গায়ে 'মাওটা' হ্রদ। তার জলে অম্বরদুর্গ প্রতিফলিত।

সিঁড়ি বেয়ে অনেক উঁচুতে উঠলে দুর্গের প্রথম তোরণ। প্রথম তোরণের পর চড়াই পথে পাহাড়ী পাকদণ্ডী বেয়ে উঠলে দ্বিতীয় তোরণ। দ্বিতীয় তোরণ পার হলেই হঠাৎ যেন ভেসে ওঠে নয়না-ভিরাম এক পুষ্পোদ্যান, আড়াআড়ি পথ দিয়ে চারভাগ করা। উদ্যান পার হয়ে বাঁদিকে মুখ ফেরালেই বিশাল প্রশস্ত সোপানশ্রেণী, যার শেষে যশোরেশ্বরী-মন্দিরের প্রবেশদ্বার। দ্বারের পাশেই এক মার্বেল-ফলকে উৎকীর্ণ রয়েছে যশোরেশ্বরীর অম্বরপ্রাসাদে আগমনের সংক্ষিপ্ত বৃত্তান্ত ঃ

"This image was brought by Maharaja Mansingh from the eastern part of Bengal in the last quarter of the 16th Century A. D. while in an encounter with the Ruler Kedar Maharaja. Mansingh did not get success for the first time and so he prayed for success to the Goddess Kali. The Goddess gave him a vision in dream and took from him a promise for Her salvation from the lot. She was then subjected to as a slab ( shila ). As a result of the promise given by Maharaja, the Goddess blessed him with victory in the forthcoming battle. This stone-image lying in the sea in the form of a slab was taken out and brought by the Maharaja at Amber where it became popular by the name of Shila Devi.

"Some say that the Ruler Kedar ( of Bengal ) after his defeat, had married his daughter to Maharaja Mansingh and presented this image to him.

"The Goddess is named locally as 'Shila Devi', but called 'Jessoreswari' by the Bengalees."

["মহারাজা মানসিংহ ষোড়শ শতকের শেষভাগে বাংলার পূর্বভাগ থেকে এই প্রতিমা নিয়ে এসে-ছিলেন। রাজা কেদারের সঙ্গে প্রথম যুদ্ধে জয়ী হতে না পেরে তিনি দেবী কালিকার কাছে জয়-লাভের জন্য প্রার্থনা করেন। দেবী তাঁকে স্বপ্নে দেখা দেন এবং তাঁর ( দেবী-প্রতিমার ) দুরবস্থা থেকে উদ্ধারের অঙ্গীকার আদায় করেন। তখন

দেবী এক পাষাণ-পেটিকায় (শিলায়) আবদ্ধ ছিলেন। মহারাজা প্রতিশ্রুতি দান করলে দেবী তাঁকে আগামী যুদ্ধে জয়লাভের আশীর্বাদ করেন। পরে মহারাজা সাগরতল থেকে পাষাণ-প্রতিমাকে তোলেন এবং অম্বরদুর্গে নিয়ে আসেন। দেবী এখানে 'শিলাদেবী' নামে পরিচিতা হন।

"অনেকে বলেন, যুদ্ধে পরাজয়ের পর (বাংলার) রাজা কেদার মহারাজা মানসিংহের সঙ্গে তাঁর কন্যার বিবাহ দেন এবং যৌতুকস্বরূপ এই প্রতিমা দান করেন।

"এই দেবীর স্থানীয় নাম 'শিলাদেবী', কিন্তু বাঙালীরা দেবীকে 'যশোরেশ্বরী' বলে থাকে।" ]

মার্বেল-ফলকে খোদিত বৃত্তান্তটির সঙ্গে মহারাজা মানসিংহের বাংলাজয়ের ইতিহাসের অনেকাংশে মিল দেখা যায়। কিন্তু দ্বিতীয় অনুচ্ছেদটিতে সন্দেহ প্রকাশের যথেষ্ট কারণ আছে। ঐতিহাসিক প্রভাসচন্দ্র সেন রচিত 'বাংলার ইতিহাস' গ্রন্থে মানসিংহের ভূষণা (যশোর) দখলের কাহিনী এই প্রসঙ্গে উদ্ধৃত করা যায়। তিনি লিখেছেন :

"রাজা মানসিংহ ১৫৯৪ খ্রীস্টাব্দের ৪ঠা মে সুবে বাংলার সুবেদার এবং সুবে বাংলার জায়গীর পাইয়া তাঁহার নতুন সুবেদারী কার্যে যোগ দিলেন। ইতিপূর্বে ১৫৯৩ খ্রীস্টাব্দের ১১ ফেব্রুয়ারি উত্তর উড়িষ্যার নেতা কতলু খাঁর দুই ভ্রাতুষ্পুত্র সুলেমান ও ওসমান ভূষণায় (যশোর জেলায়) তাহাদের আশ্রয়দাতা কেদার রায়ের পুত্র চাঁদ রায়কে হত্যা করিয়া ভূষণা দখল করে।...

"মানসিংহের পুত্র হিম্মত সিংহ ১৫৯৫ খ্রীস্টাব্দের ২রা এপ্রিল ভূষণা দুর্গ অধিকার করেন। তার কিছুদিন পর খাজা সুলেমান লোহানী ও কেদার রায় ভূষণা দুর্গ পুনরায় দখল করেন। কিন্তু ১৫৯৬ খ্রীস্টাব্দের ২০শে জুন মানসিংহের পুত্র দুর্জন সিংহ ভূষণা পুনর্দখল করেন। সুলেমান নিহত হন এবং কেদার রায় আহত হইয়া ঈশা খাঁর নিকট পলায়ন করেন।...

"১৬০৩ খ্রীস্টাব্দের আগস্ট মাসে কেদার রায় তাঁর বিপুল নৌবহর লইয়া মগদের সহিত যোগদান করেন এবং শ্রীনগরের মোগল সেনানিবাস আক্রমণ করেন। মগেরা ঢাকার জলপথ অবরোধ করিয়া মোগল শিবির আক্রমণ করে। বিক্রমপুরের নিকট ভীষণ যুদ্ধে কেদার রায় স্বয়ং আহত ও বন্দী হন। কিন্তু তাঁর আহত দেহ মানসিংহের নিকট নীত হইবা মাত্র তাঁহার জীবনাবসান ঘটে।"[১]

উক্ত তথ্যানুসারে কেদার রায় যুদ্ধে এমন ভীষণ-ভাবে আহত হন যে, মানসিংহের নিকট নিয়ে আসা মাত্র তাঁর মৃত্যু হয়। এই তথ্য সত্য হলে মান-সিংহের সঙ্গে কন্যার বিবাহ এবং সেই উপলক্ষে রাজাকে যশোরেশ্বরী-প্রতিমা উপহার দেবার সুযোগ তিনি পাননি। যদি ১৫৯৬ খ্রীস্টাব্দে দুর্জন সিংহের নিকট পরাজিত হয়ে রাজা মানসিংহের সঙ্গে কন্যার বিবাহ এবং তাঁকে যশোরেশ্বরীর প্রতিমা উপহার দিতেন তাহলে ঈশা খাঁর নিকট পলায়নের কারণ থাকে না।

যশোরেশ্বরীকে ভূষণা থেকে অম্বরদুর্গে নিয়ে যাওয়া সম্পর্কে বাংলায় কিংবদন্তী আছে যে, মহারাজ মানসিংহ যশোরেশ্বরীর প্রতিমা চুরি করিয়েছিলেন। এই কিংবদন্তীর ভিত্তি সত্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত বলে মনে হয় না। সুবে বাংলার সুবেদার, জায়গীরদার এবং সমগ্র বাংলাজয়ী মহারাজা মানসিংহ চুরির আশ্রয় নিয়েছিলেন এরূপ ভাবার কারণ নেই।

মহারাজা মানসিংহ কিভাবে যশোরেশ্বরী-প্রতিমাকে লাভ করেছিলেন সেই তথ্য নির্ণয় করা শক্ত। তবে যেভাবেই তিনি মূর্তি হস্তগত করুন না কেন যশোরেশ্বরীকে তিনি পরম শ্রদ্ধায় অম্বরদুর্গে নিয়ে যান এবং প্রাসাদ-সংলগ্ন স্থানে শ্বেতপাথরের অপূর্ব কারুকার্যখচিত মন্দির নির্মাণ করে দেবীকে তথায় সাড়ম্বরে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন

১ বাংলার ইতিহাস— প্রভাসচন্দ্র সেন, কথাশিল্প প্রকাশন, ১ম প্রকাশ, ১৩৭২, পৃঃ ৩১৯-৩২২

পিঙ্করঙের পাথরের প্রাকার-তোরণ-প্রাসাদাদি দেখতে দেখতে পিঙ্করঙেই দৃষ্টি অভ্যস্ত হয়ে ওঠে। তাই মন্দিরদ্বারে প্রবেশ করা মাত্র দৃষ্টি যেন সক্রিয় হয়ে ওঠে। সর্বত্র শ্বেতমর্মর প্রস্তরের অপূর্ব কারুকার্য— কেবল রঙে নয়, কারুকার্যের সূক্ষ্মতায়ও পারিপার্শ্বিক সবকিছু থেকে আলাদা। স্বভাবতই মনে হয়, মহারাজা মানসিংহ কেবল দেবী যশোরেশ্বরীকেই বাংলা থেকে আনেননি, দেবীকে প্রতিষ্ঠিত করতে মন্দিরনির্মাণের জন্য দূর দেশ থেকে শ্বেত মার্বেলপাথর আনিয়েছিলেন। রাজস্থানী কারিগররা লাল বা হলুদ পাথরের কাজ জানলেও শ্বেতপাথরের সূক্ষ্ম কারুকার্যে নিপুণ ছিল না। তাই শ্বেতপাথরের সঙ্গে দক্ষ শিল্পীও আনাতে হয়েছিল দূর দেশ থেকে।

তিনফুট প্রস্থ এবং সাড়ে তিনফুট উচ্চতার একটিমাত্র প্রস্তরফলকে দেবী কালিকার মূর্তি উৎকীর্ণ। মা অষ্টভুজা। চক্র, বাণ, ত্রিশূল, কৃপাণ, ঢাল এবং ধনুক—এই ছয়টি আয়ুধ দেবীর ছয় হস্তে ধৃত। সপ্তম হস্তে ধৃত মহিষাসুরের কেশ। অষ্টম হস্তে অভয়মুদ্রা। ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর, কার্তিক ও গণেশ—এই পঞ্চদেবতা দেবীর চালচিত্রে উৎকীর্ণ।

দেবীর সঙ্গে দেবীপূজার নির্ঘন্টও নিয়ে গিয়েছিলেন মানসিংহ। সেই নির্ঘন্ট অনুসারে আজও দেবীর পূজা হয়। দেবীর রাজভোগে প্রতিদিন একটি করে ছাগবলির ব্যবস্থা তিনি করেছিলেন। তাছাড়া মহাসপ্তমী, মহাষ্টমী ও মহানবমীর পূজায় একটি করে মহিষবলিও হতো। ১৯৭৫ খ্রীস্টাব্দে জরুরী অবস্থার সময় আইন করে ছাগ ও মহিষবলি বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে।

যশোরেশ্বরীর পূজা-নির্বাহের জন্য মহারাজা মানসিংহ রাজকোষ থেকে অর্থ বরাদ্দ করেছিলেন। সেই থেকে রাজকোষের অর্থেই পূজার ব্যয়-নির্বাহ হয়ে আসছে।

যশোরেশ্বরীর সঙ্গে যশোর থেকে পুরোহিতও এনেছিলেন মানসিংহ। সেই পুরোহিতের বংশধরগণ যশোরেশ্বরীর পূজা করে আসছিলেন। কিন্তু বছর কুড়ি আগে সেই পুরোহিতের বংশধর যশোরেশ্বরীর পূজার কাজ ছেড়ে অন্য জীবিকায় চলে গেছেন। বর্তমানে পূজা করেন বিহারের দ্বারভাঙ্গা থেকে আগত পুরোহিতরা। সংখ্যায় তাঁরা ছয় জন।

মহারাজা মানসিংহ সুবেদার হয়ে এসে সামরিক শক্তিতে জয় করেছিলেন সুবে বাংলাকে। বাঙালী পরাজিত হয়েছিল তাঁর ক্ষাত্রশক্তির কাছে। কিন্তু আন্তর শক্তিতে বাঙালী জয় করেছিল মহারাজা মানসিংহকে। অন্ততঃ দুটি ঘটনা তার সাক্ষ্য দেয়। প্রথমটি হলো, মহারাজা মানসিংহ জাতিতে ছিলেন রাজপুত। কিন্তু তিনি কোন রাজপুত গুরুর কাছে দীক্ষাগ্রহণ না করে দীক্ষা নিয়েছিলেন প্রখ্যাত ষড় গোস্বামীর অন্যতম ভট্ট রঘুনাথের কাছে। এই রঘুনাথ ভট্ট ছিলেন শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর ভক্ত তপন মিশ্রের পুত্র। ডঃ সুকুমার সেন রচিত 'চৈতন্যাবদানে' রয়েছে, "জয়পুরের রাজা মানসিংহ তাঁর ( রঘুনাথ ভট্টের ) শিষ্য হয়েছিলেন এবং তাঁর অনুরোধে বৃন্দাবনে গোবিন্দের বিরাট মন্দির তৈরি করে দিয়েছিলেন।"

দ্বিতীয়টি হলো, যশোরেশ্বরীকে সুবে বাংলা থেকে পরম শ্রদ্ধাভরে অম্বররাজ্যে আনয়ন এবং পরম মর্যাদায় অম্বরদুর্গে দেবীর প্রতিষ্ঠা। বৈষ্ণবধর্মে বৈষ্ণব গুরুর নিকট দীক্ষাগ্রহণ করলেও মহারাজা মানসিংহ বঙ্গে প্রচলিত শাক্তধর্মের আচার-আচরণ ও শক্তিপূজার প্রতিটি বিধিসহ দেবী যশোরেশ্বরীর পূজা অব্যাহত রেখেছিলেন। মহিষ এবং ছাগবলির বিধিও তা থেকে বাদ পড়েনি। এমনকি, পুরোহিতও এনেছিলেন সুবে বাংলা থেকেই। মহারাজা মানসিংহ তাঁর অম্বরদুর্গে দেবী যশোরেশ্বরীর সঙ্গে বাঙালীর কৃষ্টিকেও প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। প্রায় চারশ বছর ধরে অম্বরদুর্গে আজও তা অম্লান হয়ে আছে। ☐

বিজ্ঞান-নিবন্ধ

# টনিক 'পরশপাথর' নয়

## সন্তোষকুমার রক্ষিত

"ডাক্তারবাবু একটা টনিক দেবেন না ?" রোগ দেখাতে এসে রোগীরা প্রায়ই চিকিৎসকদের এটা বলেন ; যেন ওষুধের সঙ্গে সুদৃশ্য চকচকে রঙীন কাগজে মোড়া একটা টনিক না দিলে তাঁর রোগই সারবে না। অধিকাংশ রোগীই আজ এই ধারণার বশবর্তী। সৎ, অভিজ্ঞ চিকিৎসক টনিকের অপ্রয়োজনীয়তার কথা বুঝিয়ে রোগীকে টনিক খেতে নিষেধ করেন। যদিও এইসব চিকিৎসকদের সংখ্যা অতি নগণ্য। কিন্তু অধিকাংশ রোগীই এতে সন্তুষ্ট হন না। ভাবেন, এই ডাক্তারবাবু কিছুই জানেন না। কেউ কেউ ভাবেন, ঐ তো আগের বার অসুখের সময় ডাক্তারবাবু বুক দেখে, জিভ দেখে, পেট টিপে বললেন : 'শুধু ওষুধে এই রোগ সারবে না, টনিক খেতে হবে।' দিলেনও একটা বড় শিশি। কি তার গন্ধ! কি তার রঙ! এক শিশি টনিক খেতেই শরীর অনেক ভাল হয়ে গেল। আরও দুটো শিশি খেতে হলো শরীরে বল পাবার জন্য। পয়সা একটু খরচ হলো ঠিক কথা কিন্তু রোগ সারল, শরীরে বল এল।

এখন প্রশ্ন—টনিক কি? এতে কি থাকে? টনিক কি রোগ সারায়, শরীরে বল আনে? টনিক এত বিক্রি হয় কেন? টনিক খাওয়ার প্রয়োজন আছে কি? একটু বিশ্লেষণ করে দেখা যাক।

টনিক প্রস্তুতকারী কোম্পানী ফলাও করে বিজ্ঞাপন দেয়, টনিকে প্রচুর ভিটামিন আছে। যেন একেবারে 'এ' থেকে 'জেড' পর্যন্ত।

তবে কিছু ভিটামিন টনিকে থাকে। আর এই 'ভিটামিন' শব্দটা সাধারণ মানুষকে ভীষণভাবে আকৃষ্ট করে। 'ভিটামিন' জিনিসটা আসলে কি, এটা শরীরে কি কাজে লাগে বা কতটুকু প্রয়োজন হয় বা অন্য কিভাবে তা পাওয়া যায়—সে-সম্বন্ধে অধিকাংশেরই কোন ধারণা নেই। কিন্তু এটি খেলে শরীরে বল হবে বা খাওয়া ভাল, শুধুমাত্র এইটুকুই তাঁরা জানেন। আর ওষুধের কোম্পানীগুলি এই ভিটামিনকেই তুরুপের তাস হিসাবে কাজে লাগিয়ে টনিক বিক্রি করছে।

আগেই বলেছি, টনিকে কিছু ভিটামিন থাকে, যা অতি সামান্য। এছাড়া থাকে কৃত্রিম রঙ, চিনি বা সরবিটাল, অ্যালকোহল আর বাকিটা জল। অবশ্য কোন কোন টনিকে কিছু পরিমাণ আয়রন (লোহা) থাকে যা রক্তের প্রয়োজনীয় উপাদান হিমোগ্লোবিন তৈরিতে সাহায্য করে। অতএব এক শিশি টনিকে কয়েকটি ভিটামিন এবং আয়রন ছাড়া আর প্রায় কিছুই থাকে না যা শরীরের প্রয়োজন। অথচ একটি টনিক কিনতে যে-অর্থ ব্যয় হয় তার অনেক কম অর্থ ব্যয় করে ঐ জিনিসগুলি অতি সহজেই বিভিন্ন খাবারের মাধ্যমে আমরা পেতে পারি।

এখন আবার ছাত্রছাত্রীদের মেধাবৃদ্ধির জন্য কোন কোন কোম্পানী বাজারে 'ব্রেন টনিক' বের করেছে। তারা প্রচার করছে যে, এই টনিক খেলে মেধা বাড়বে, পড়াশোনা ভাল হবে, স্মৃতিশক্তি বাড়বে। বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় এমনকি কোন কোন পাঠ্যপুস্তকেও এর বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হচ্ছে। বক্তব্য, যেন বই কেনার সঙ্গেই দু-এক শিশি এই টনিকও কিনে নিয়ে খাওয়া দরকার। টনিক খাবে আর লেখাপড়া করবে। তারপর পরীক্ষার খাতায় গড়গড় করে সব বের করে দেবে। কি নির্লজ্জভাবে মানুষকে ঠকানোর প্রয়াস! এই টনিক কোম্পানীগুলি কি জানে না যে, মস্তিষ্কের কোষ, যা স্মৃতিশক্তি বা মেধার কেন্দ্র, তার সংখ্যা বাড়ানো যায় না? ওষুধ দিয়েও তা হয় না। টনিক দিয়ে বাড়ানোর তো কোন প্রশ্নই আসে না। আবার হোমিওপ্যাথিতে নাকি মেধাবৃদ্ধি বা পড়া মনে রাখার ওষুধ আছে। হোমিওপ্যাথরা এইরকম দাবী করেন। অবশ্য এটা শুধুমাত্র ঘরে দু-একটা সাধারণ বইপড়া তথাকথিত হোমিওপ্যাথরাই বলেন। প্রকৃত শিক্ষিত এবং হোমিও-নীতি মেনে চলা চিকিৎসকরা কখনই ঐ রকম বলেন না

বলে মনে হয়। যদি 'ব্রেন টনিক' বা হোমিও ওষুধ খেলেই মেধা বাড়ত তাহলে কষ্ট করে রাত জেগে পড়া, বিভিন্ন ধরনের পুস্তক অনুসরণ করা ইত্যাদির প্রয়োজনই হতো না। বোতল বোতল 'ব্রেন টনিক' আর হোমিও ওষুধ খেয়ে অল্প পড়েই সব পরীক্ষাতে কৃতকার্য হওয়া যেত। আসলে মেধাবৃদ্ধি বা পড়া মনে রাখার একটাই উপায়—মনসংযোগ, একাগ্রতা ও অধ্যবসায়। অনেক কঠিন বিষয়ও বারবার মন দিয়ে পড়লে বোঝা যায় এবং মনে থাকে। এইসব অভ্যাস করলে পাঠ্যবিষয় আস্তে আস্তে আয়ত্তে এসে যাবে এবং এর সঙ্গে দরকার উপযুক্ত বিশ্রাম।

টনিক কোন জীবাণুনাশক ওষুধ নয়। কাজেই তা বহু ধরনের রোগ সারাতে পারে না। আর টনিকে যে কয়েক রকম ভিটামিন থাকে, যা শরীরের পক্ষে প্রয়োজন হতে পারে, তা টনিক-আকারে নয়, আমাদের নিত্যদিনের সাধারণ খাবার থেকেই পাওয়া যায়। আমরা রোজ যেসব খাবার খাই যেমন ভাত, রুটি, ডাল, শাক-সবজি, মাছ, ডিম, দুধ প্রভৃতি থেকেই আমাদের প্রয়োজনীয় ভিটামিন আমরা পেয়ে থাকি। রোজ যদি ভাতের সাথে একটুকরো লেবু খাই তাতে ভিটামিন 'সি'র অভাব প্রায় মিটে যায়। ভিটামিন 'এ', যার অভাবে রাতকানা রোগ হয়, তা হলুদ রঙের সবজিতে বিশেষতঃ গাজরে প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। ভিটামিন 'ডি'র অভাবে রিকেট হয়। এর জন্য নবজাতককে ভাল করে তেল মাখিয়ে রোদে দিলে সূর্যরশ্মি বিক্রিয়া করে শরীরে ভিটামিন 'ডি' তৈরি করে দেয়। কিন্তু বর্তমানে অনেক মায়েরাই বাচ্চা কালো হয়ে যাবে বলে এই পুরনো গ্রাম্য পদ্ধতিকে বিসর্জন দিয়ে বিশেষ কোম্পানীর ভিটামিনযুক্ত তেল ব্যবহার করেন, যা সূর্যরশ্মি থেকে প্রাপ্ত ভিটামিন 'ডি'র থেকে উৎকৃষ্ট নয়। অবশ্য এখন শহরে রোদেরও অভাব। অনেকেই জানেন না যে, দু-একটা সাধারণ ফল আমাদের সারাদিনের প্রয়োজনীয় ভিটামিন যোগান দেয়। যেমন একটি কলা, একটি পাকা আম, একটি পেয়ারা, একটি আমলকী। হাড় ও দাঁত গড়তে এবং মজবুত করতে ক্যালসিয়াম-এর দরকার। তা অতি সহজেই একটু দুধ বা ডিম এবং ছোট ছোট কাঁটাযুক্ত চারামাছেই পাওয়া যায়। বিভিন্ন টাটকা শাকসবজি স্কার্ভি রোগ প্রতিরোধ করে। আমরা বেশি পয়সা দিয়ে টনিক খাই, কিন্তু অতি সস্তার প্রাকৃতিক ভিটামিন, আয়রন, ক্যালসিয়াম খাই না। কারণ, টনিকের শিশির লেবেলে বিভিন্ন ভিটামিনের নাম লেখা থাকে, আর এইসব খাবারের গায়ে তা লেখা থাকে না। এটাই আমাদের দুর্ভাগ্য।

তবে ল্যাবরেটরিতে তৈরি ভিটামিনের প্রয়োজন নেই সেকথা বলছি না। কিছু কিছু ক্ষেত্রে তার প্রয়োজন অবশ্যই আছে। যেমন ভিটামিনের অভাবজনিত রোগে গর্ভবতী মায়েদের রক্তাল্পতা দেখা দিলে ল্যাবরেটরিতে প্রস্তুত ভিটামিন উপকারে আসে। তবে টনিক হিসাবে নয়, এইসব ভিটামিন দিয়ে প্রস্তুত সস্তার ট্যাবলেট খেয়ে ভিটামিনের অভাব পূরণ হতে পারে।

যে-শিশুটি মায়ের গর্ভ থেকে দশমাস পর ভূমিষ্ঠ হবে, মায়ের গর্ভে থাকাকালীন তার বৃদ্ধি ও পুষ্টি মায়ের মাধ্যমে হবে। কিন্তু এই অবস্থায় মাকে অতিরিক্ত খাবার (যা শিশুর দরকার) দিলে মা তা হজম করতে পারবে না। এইসব ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় কিছু ভিটামিন ট্যাবলেট এবং আয়রন ট্যাবলেট দেওয়া যেতে পারে, তবে অবশ্যই চিকিৎসকের পরামর্শ নিয়ে।

অনেকের ধারণা, ভিটামিন খেলে কোন ক্ষতি হয় না। সেজন্য অনেকেই ভাল স্বাস্থ্যের আশায় নিয়মিত বিভিন্ন ভিটামিন খেয়ে থাকেন। কিন্তু তাঁরা বোধ হয় জানেন না যে, আমাদের শরীরে প্রত্যেকদিনের জন্য খুবই অল্প পরিমাণ ভিটামিন লাগে, যা সাধারণতঃ খাবারের মধ্যেই পাওয়া যায়। কিন্তু এছাড়াও নিয়মিত অতিরিক্ত ভিটামিন খেলে সেগুলি শরীরের কোন কাজেই লাগে না, পরন্তু প্রস্রাবের সঙ্গে বেরিয়ে যায় অর্থাৎ পয়সা দেওয়া জিনিস নষ্ট হয়। সেজন্য ভিটামিন খেলে প্রস্রাবের রঙ গাঢ় হয় এবং তাতে ভিটামিনের গন্ধ বের হয়। তাছাড়া দীর্ঘদিন ধরে কোন কোন ভিটামিন অতিরিক্ত পরিমাণে খেলে তা শরীরে বিষক্রিয়া হয়ে মৃত্যুও ডেকে আনতে পারে।

এখন বিজ্ঞাপনের যুগ। মানুষকে আকৃষ্ট করার জন্য টনিক কোম্পানীরা বিভিন্ন প্রচারমাধ্যমে

যেমন সংবাদপত্রে, প্রাচীরপত্রে, বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায়, বেতারে, দূরদর্শনে আকর্ষণীয় ও লোভনীয় বিজ্ঞাপন দেয় এবং মানুষকে বিভ্রান্ত করে। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সাধারণ মানুষ টনিকের গুণাগুণ সম্বন্ধে এইভাবে অবহিত হন। এছাড়া কোম্পানীর প্রতিনিধিরা খুচরো বিক্রেতাদের বেশি কমিশনের লোভ দেখিয়ে টনিক বিক্রি করতে উৎসাহিত করেন। বহু চিকিৎসকও টনিকের অপ্রয়োজনীয়তার কথা জেনেও এগুলি রোগীদের খেতে পরামর্শ দেন। টনিক কোম্পানীগুলি শুধুমাত্র বিজ্ঞাপন বাবদ তাদের মোট খরচের কুড়ি থেকে তিরিশ শতাংশ খরচ করে। এই খরচটা তারা টনিক-ক্রেতার কাছ থেকেই তুলে নেয়। বিদেশে টনিকের এত রমরমা ব্যবসা নেই, কারণ সেখানকার মানুষ টনিক খায় না, আর তাদের বোকা বানানোও বোধ হয় কঠিন। তাই বিদেশী কোম্পানীগুলি আমাদের দেশে এসে টনিকের রমরমা ব্যবসা চালাচ্ছে, অথচ প্রয়োজনীয় জীবনদায়ী ওষুধ-উৎপাদন কম করছে। কারণ, এতে মুনাফা কম।

আমাদের দেশের অধিকাংশ মানুষের আর্থিক অবস্থা ভাল নয়। জীবনযাত্রার মান ক্রমশঃ নিম্নমুখী হচ্ছে। বাঁচার জন্য কঠিন পরিশ্রম করতে হচ্ছে। ফলে বিভিন্ন রোগের সৃষ্টি হচ্ছে। এর থেকে পরিত্রাণ পাওয়া খুবই মুসকিল। তবু সুস্থভাবে বাঁচতে হবে। পরিবেশকে সুস্থ রাখতে হবে। রোগ হলে উপযুক্ত চিকিৎসককে দেখিয়ে প্রয়োজনীয় ওষুধ খেতে হবে। কিন্তু নিজেই দোকান থেকে ওষুধ কিনে খাওয়া উচিত নয়। এতে হিতে বিপরীত হবার খুবই সম্ভাবনা। আর নিয়মিত টাটকা শাকসবজি, দু-একটা ফল, একটু দুধ, মাছ প্রাত্যহিক খাবারের তালিকায় রাখতে হবে। বেশি দাম দিয়ে টনিক খাওয়ার কোনই প্রয়োজন নেই। এতে শুধু আপনার পয়সাই খরচ হবে, আর এক শ্রেণীর অসাধু ব্যবসায়ীর পকেট ভরবে।

সাধারণ মানুষকে এসব বোঝানোর জন্য শুধু-মাত্র দু-একটা পত্র-পত্রিকায় লিখে কিছু হবে না। শিক্ষিত মানুষকে বিশেষতঃ যুবগোষ্ঠীকে এগিয়ে আসতে হবে। মানুষকে স্বাস্থ্য-রক্ষার উপায় সম্বন্ধে সচেতন করতে হবে। তবেই বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (W. H. O.) ২০০০ খ্রীস্টাব্দের মধ্যে সকলের সুস্বাস্থ্যের যে-ডাক দিয়েছে তা সফল হবে। ☐

## প্রচ্ছদ-পরিচিতি

**প্রচ্ছদের আলোকচিত্রটি কামারপুকুরের শ্রীরামকৃষ্ণের বাসগৃহের। পাঁচের দশকের প্রথমদিকে আলোকচিত্রটি গৃহীত হয়েছিল।**

**বর্তমান বর্ষটি (১৯৯৩) শ্রীরামকৃষ্ণ-ভাবান্দোলনের ক্ষেত্রে একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বর্ষ। কারণ, এই বর্ষে শিকাগো ধর্মমহাসম্মেলনে স্বামী বিবেকানন্দের আবির্ভাবের শতবর্ষ পূর্ণ হচ্ছে। শিকাগো ধর্ম-মহাসভায় স্বামী বিবেকানন্দ যে-বাণী প্রচার করেছিলেন এবং যে-বাণী ধর্মমহাসভার সর্বশ্রেষ্ঠ বাণী বলে অভিনন্দিত হয়েছিল, সে-বাণী ছিল সমন্বয়ের বাণী। ধর্মের সমন্বয়, মতের সমন্বয়, সম্প্রদায়ের সমন্বয়, দর্শনের সমন্বয়, আদর্শের সমন্বয়—প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের সমন্বয়, প্রাচীন ও নবীনের সমন্বয়, অতীত বর্তমান ও ভবিষ্যতের সমন্বয়। ভারতবর্ষ সুপ্রাচীন কাল থেকে এই সমন্বয়ের বাণী ও আদর্শ প্রচার করে আসছে। আধুনিক কালে এই সমন্বয়ের সর্বপ্রধান ও সর্বশ্রেষ্ঠ প্রবক্তা শ্রীরামকৃষ্ণ। সাধারণভাবে সনাতন ভারতবর্ষের এবং বিশেষভাবে শ্রীরামকৃষ্ণের সমন্বয়ের বাণীকে স্বামী বিবেকানন্দ বহির্বিশ্বের সমক্ষে উপস্থাপিত করেছিলেন। চিন্তাশীল সকল মানুষই আজ উপলব্ধি করছেন যে, সমন্বয়ের আদর্শ ভিন্ন পৃথিবীর স্থায়িত্বের আর কোন পথ নেই। সমন্বয়ের পথই বর্তমান পৃথিবীর বহুবিধ সমস্যা ও সঙ্কটের মধ্য থেকে উত্তরণের একমাত্র পথ। কামারপুকুরের পর্ণকুটীরে যাঁর আবির্ভাব হয়েছিল দরিদ্র এবং নিরক্ষরের ছদ্মবেশে, তিনিই বর্তমান এবং আগামীকালের বিশ্বের ত্রাণকর্তা। তাঁর বাসগৃহটি তাই আজ ও আগামীকালের সমগ্র পৃথিবীর তীর্থক্ষেত্র। শিকাগোর বিশ্বধর্মসভার মঞ্চে স্বামী বিবেকানন্দের কণ্ঠে শান্তি, সমন্বয় ও সম্প্রীতির যে-বাণী বারংবার উচ্চারিত হয়েছিল—যার মধ্যে নিহিত ভারত ও পৃথিবীর রক্ষাকবচ, তার গর্ভগৃহে কামারপুকুরের এই পর্ণকুটীর।—সম্পাদক, উদ্বোধন**

## ক্যাসেট সমালোচনা

# শ্রীরামকৃষ্ণ-বন্দনাঃ গীতি-অর্ঘ্য

### হর্ষ দত্ত

**শ্রীরামকৃষ্ণ ভজনামৃত ( ভক্তিগীতি ):** শঙ্কর সোম। 'কিরণ'—সাউন্ড রেকর্ডিং কোং। কলকাতা-৭০০ ০৭২। মূল্যঃ চব্বিশ টাকা।

**'কে ঐ আসিল রে কামারপুকুরে'। ভজনামৃত:** শঙ্কর সোম। 'প্লেজ'—মিত্রা ক্যাসেট ইন্ডাস্ট্রি। কলকাতা-৭০০ ০৭৪। মূল্যঃ চব্বিশ টাকা।

শ্রীরামকৃষ্ণ ও তাঁর সপার্ষদ-লীলাবিষয়ক সঙ্গীত পরিবেশন করে শিল্পী শঙ্কর সোম ইতিমধ্যে বিশেষ পরিচিতি লাভ করেছেন। রামকৃষ্ণ-অনুরাগী ভক্তবৃন্দ বিভিন্ন সভায় তাঁর গান শুনেছেন। শিল্পীর পরিচয় নতুন করে দেওয়ার কিছু নেই। সম্প্রতি শ্রীসোমের গাওয়া দুটি ক্যাসেট প্রকাশিত হয়েছে।

উল্লিখিত **প্রথম ক্যাসেটে** ধৃত দশটি গান পুরোপুরি শ্রীরামকৃষ্ণ-সম্পর্কিত। তাঁর পুণ্য আবির্ভাব থেকে শুরু করে অন্ত্যলীলা পর্যন্ত একটি পারম্পর্য রক্ষার চেষ্টা করা হয়েছে। প্রথম গান যেমন 'কামারপুকুরে এসেছিলে', তেমনি শেষ বা দশম গান 'বাউলের দল এল গেল'—কীর্তনাঙ্গ, বাউলাঙ্গ কিংবা রাগাশ্রয়ী প্রত্যেকটি গান শিল্পী বলিষ্ঠ গলায় তুলে ধরেছেন। অযথা ভাবালুতাকে তিনি প্রশ্রয় দেননি। জটাধর পাইন ও নিজের দেওয়া সুরে প্রত্যেকটি গান হৃদয়গ্রাহী করে তুলতে তিনি চেষ্টা করেছেন। রেকর্ডিং সুন্দর। সাউন্ড রেকর্ডিং কোম্পানী তাঁদের সুনাম বজায় রেখেছেন।

আলোচ্য **দ্বিতীয় ক্যাসেটটির** গানগুলির (মোট ১২টি) মধ্যে ছয়টি শ্রীরামকৃষ্ণের উদ্দেশে নিবেদিত। বাকি ছয়টির মধ্যে তিনটি শ্রীমা সারদা-দেবী সম্পর্কীয় এবং তিনটি বিবেকানন্দ-বন্দনা। বাণী ও ভাবের দিক থেকে সব মিলিয়ে মিশ্র নিবেদন। 'কে ঐ আসিল রে', 'আজি প্রেমানন্দে মনরে গাহ', 'করুণাপাথার জননী আমার', 'শৌর্য দাও বীর্য দাও' প্রভৃতি গান বিখ্যাত ও বহুশ্রুত। এইসব গান পরিবেশনের ক্ষেত্রে শিল্পী প্রচলিত সুরকেই মেনেছেন। কয়েকটি গানের ক্ষেত্রে তিনি নিজেই সুরকার। তবে দুদিক থেকেই শিল্পীর গায়নশৈলী অক্ষুণ্ণ থেকেছে। নিম্নমানের রেকর্ডিং-এর জন্য শ্রীসোমের গলার কাজ অনেক সময় ঠিক বোঝা যায়নি। মানব মুখার্জির সঙ্গীতায়োজন মোটামুটি।

একটি কথা, ক্যাসেট-দুটির স্বত্বাধিকারী প্রকৃতপক্ষে কে কে? প্রথমটির ক্ষেত্রে ক্যাসেট-কভার বলছে, সাউন্ড রেকর্ডিং কোং। অথচ ক্যাসেট-বক্সে ছাপা আছে, বেরি মিউজিক হাউস। দ্বিতীয়টির ক্ষেত্রেও তেমনই—মিত্রা ক্যাসেট ইন্ডাস্ট্রি, না প্লেজ ক্যাসেট ইন্ডাস্ট্রি।

## গ্রন্থ-পরিচয়

# রমণীয় রচনা

### তাপস বসু

**বৈঠকী বেদান্তঃ** স্বামী গোপেশানন্দ। রামকৃষ্ণ মঠ, বড়িষা। পৃষ্ঠাঃ ৮০+৪। মূল্যঃ পঁচিশ টাকা।

'বেদান্ত' কথাটি শুনলেই একটা গুরুগম্ভীর বিষয় মনে হয়। ভয় হয়, সমীহ হয়, সম্ভ্রম হয়। সাধারণ মানুষ ঐ বিষয় থেকে দূরে দূরেই থাকে। কিন্তু 'বেদান্ত'কে আমাদের বৈঠকখানায় এনে যে উপস্থিত করা যায়, বৈঠকী ভঙ্গি ও ভাষায় বেদান্তের মূল বক্তব্যকে যে পরিবেশন করা যায়, তার প্রমাণ পাওয়া গেল স্বামী গোপেশানন্দের **'বৈঠকী বেদান্ত'** গ্রন্থটিতে। সাতাশটি নানা ধরনের ছোটখাট রচনার সংকলন স্বামী গোপেশানন্দের বৈঠকী বেদান্ত গ্রন্থটি। লেখক সূক্ষ্ম হিউমারের সঙ্গে রচনাগুলি উপস্থাপন করেছেন। রচনাগুলির বিষয়বস্তু ভিন্ন হলেও মূল সুর এক

জায়গায় বাঁধা, তাহলো—শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীমা এবং স্বামী বিবেকানন্দ। কোথাও শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীমা ও স্বামীজী সরাসরি আলোচনা-প্রসঙ্গে এসেছেন, কোথাও এসেছেন ব্যঞ্জনার মধ্য দিয়ে। বেদান্তের নানা প্রসঙ্গই গ্রন্থটিতে আলোচিত হয়েছে, তবে নিবন্ধগুলির মধ্যে একটা যুক্তিশৃঙ্খলতা বিশেষভাবে লক্ষণীয়। নিবন্ধগুলির কয়েকটি প্রকাশিত হয়েছে 'উদ্বোধন' সহ বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায়, কিছু পঠিত হয়েছে বৈঠকী আসরে। রচনাগুলির মধ্যে এক বিশেষ ভঙ্গি লক্ষ্য করা যায়। গুরুত্বপূর্ণ বিষয়কে লঘু করে তুলেও পরিশেষে আলোচ্য বিষয়ের গাম্ভীর্য ও ধর্ম সর্বদা বজায় রাখা হয়েছে।

প্রত্যেকটি রচনাই আপন বৈশিষ্ট্যে উজ্জ্বল, আলাদা করে নাম করতে হলে মুসকিলে পড়তে হয়। তবুও 'জুলুম', 'এক এবং শূন্য', 'মা। ত্বং হি প্রাণাঃ সঙ্ঘশরীরে', 'মনুমেন্ট', 'পরীক্ষা', 'ত্রাণকার্যের অন্তরালে', 'সেই এক', 'মন্ত্রচৈতন্য', 'সংসারী বনাম সন্ন্যাসী', 'ধর্ম আমি মানি না' ইত্যাদি রচনাগুলি আমাদের বিশেষভাবে নাড়া দেয়। কিছু রচনার গাম্ভীর্য অসাধারণ। যেমন 'মা সরস্বতী', 'স্বামীজীর অপ্রকাশিত চিন্তা', 'শিক্ষা ও সত্য', 'স্বামীজী—শিব ও বুদ্ধ' ইত্যাদি।

স্বামী গোপেশানন্দ সহজ, সরল ভঙ্গিতে যে-রচনাগুলি আমাদের উপহার দিয়েছেন, তা এককথায় অনবদ্য। বৈঠকী মেজাজ থেকে কোন রচনাই বিচ্যুত হয়নি। নিবন্ধগুলি পড়তে পড়তে আমরাও তাঁর মানসসঙ্গী হয়ে পড়ি। সত্যি সত্যিই মনে হয়, আমরা যেন তাঁর 'বৈঠকের' সভ্য। গ্রন্থটির প্রচ্ছদপট চমৎকার। যেমন অর্থবহ, তেমনি দৃষ্টিশোভন।

পরিশেষে এবং পুনশ্চ বলতে হয় যে, বেদান্তের মতো একটা গম্ভীর এবং গভীর বিষয়কে এত সহজভাবে, এত সাবলীলভাবে এবং এত হালকা মেজাজে পরিবেশন করা যায় তা 'বৈঠকী বেদান্ত' গ্রন্থটি হাতে না এলে আমাদের অজানা রয়ে যেত। এই মনোজ্ঞ গ্রন্থটি আমাদের উপহার দেওয়ার জন্য স্বামী গোপেশানন্দকে ধন্যবাদ। তাঁর ভাষা ও প্রকাশভঙ্গির এমন এক অনিবার্য আকর্ষণ, যা মনকে একেবারে টেনে রাখে। তাঁর কাছে এই ধরনের গম্ভীর বিষয়ের ওপর সহজ ও হিউমারযুক্ত প্রবন্ধ বা গ্রন্থ আমরা আবার আশা করব। □

## প্রাপ্তিস্বীকার

**খড়কুটোর মতো ভাসতে ভাসতে :** কালী সাহু, মদনমোহন মণ্ডল, শচীদুলাল সামন্ত। ডাঃ স্বদেশভূষণ চৌধুরী। ডাকঘর—ঘাটাল, জেলা—মেদিনীপুর। পৃষ্ঠা : ৯+৬৪। মূল্য : দশ টাকা।

**অক্ষয় জীবন :** ডঃ সুধীন্দ্র চন্দ্র চক্রবর্তী। পরেশচন্দ্র বর্ধন। ১৩২, যোধপুর পার্ক, কলিকাতা-৭০০ ০৬৮। পৃষ্ঠা : ১৫+১৪৪। মূল্য : বারো টাকা।

**নারীর রাজনীতি :** গীতিকণ্ঠ মজুমদার। ত্রয়ী, ৭৩ মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা-৭০০ ০০৯। পৃষ্ঠা : ৭২। মূল্য : ষোল টাকা।

**আসরের বিচার :** গীতিকণ্ঠ মজুমদার। অণিমা প্রকাশনী, ১৪১ কেশবচন্দ্র সেন স্ট্রীট, কলিকাতা-৭০০ ০০৯। পৃষ্ঠা : ৯১। মূল্য : আঠারো টাকা।

**মুকুলিকা :** রামকৃষ্ণ মিশন বালকাশ্রম, রহড়া, উত্তর ২৪ পরগনা। পৃষ্ঠা : ১২২। মূল্য : অমুদ্রিত। □

# রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশন সংবাদ

## উৎসব-অনুষ্ঠান

**গৌহাটী রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমে** ভগবান শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের ১৫৮তম জন্মোৎসব গত ২৩ ফেব্রুয়ারি বৈদিক স্তোত্রপাঠ, বিশেষ পূজা, ভক্তিগীতি ইত্যাদি সারাদিনব্যাপী নানা অনুষ্ঠানের মাধ্যমে উদ্‌যাপিত হয়। 'কথামৃত' পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন আশ্রমাধ্যক্ষ স্বামী ইজ্যানন্দ। দুপুরে প্রায় তিনহাজার নরনারী প্রসাদ গ্রহণ করেন। ২৬ থেকে ২৮ ফেব্রুয়ারি তিনদিন শ্রীশ্রীমা সারদাদেবী, স্বামী বিবেকানন্দ ও শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের জন্মোৎসব ও স্বামীজীর ভারত-পরিক্রমার শতবর্ষ উপলক্ষে ভাষণ দিয়েছেন যথাক্রমে অধ্যাপিকা প্রীতি বড়ুয়া, ডাঃ আশা দত্ত, মহেশচন্দ্র বড়ুয়া, ডাঃ বাণী ভট্টাচার্য, ডঃ রামচরণ ঠাকুরীয়া এবং স্বামী পূর্ণাত্মানন্দ। প্রথম দুদিনের সভায় স্বামী পূর্ণাত্মানন্দ এবং শেষ দিনের সভায় আশ্রম পরিচালন কমিটির সভাপতি ভবানীকান্ত বড়ুয়া পৌরোহিত্য করেন।

**রামকৃষ্ণ মঠ, তমলুক** গত ২৩-২৬ ফেব্রুয়ারি শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ১৫৮তম জন্মোৎসব পালন করে। প্রথমদিন পূর্বাহ্ণে প্রভাতফেরী, বিশেষ পূজা, প্রসাদ-বিতরণ প্রভৃতি অনুষ্ঠিত হয়। প্রায় বারো হাজার নরনারীকে বসিয়ে খিচুড়ি প্রসাদ দেওয়া হয়। সন্ধ্যায় 'ভক্ত প্রহ্লাদ' নাটক অভিনীত হয়। ২৪ ফেব্রুয়ারি বিকালে অনুষ্ঠিত ধর্মসভায় পৌরোহিত্য করেন স্বামী অমেয়ানন্দ, শ্রীশ্রীমায়ের ওপর বক্তব্য রাখেন অধ্যাপিকা বন্দিতা ভট্টাচার্য। ২৫ ফেব্রুয়ারির ধর্মসভায় স্বামী বিবেকানন্দের ওপর বক্তব্য রাখেন নবনীহরণ মুখোপাধ্যায়। সভায় পৌরোহিত্য করেন স্বামী সুপর্ণানন্দ। পরে সারদা ভি. ডি. ও. হলের সৌজন্যে 'নদের নিমাই' ছায়াছবি প্রদর্শিত হয়। ২৬ ফেব্রুয়ারি অপরাহ্ণে আশ্রম-পরিচালিত বিদ্যালয়সমূহের কৃতী ছাত্রছাত্রীদের পারিতোষিক দেওয়া হয়। সন্ধ্যায় শ্রীরামকৃষ্ণের জীবন ও বাণী নিয়ে আলোচনা করেন নচিকেতা ভরদ্বাজ ও স্বামী সুপর্ণানন্দ।

গত ১১ ও ১২ জানুয়ারি জাতীয় যুবদিবস উপলক্ষে নানা অনুষ্ঠানের মাধ্যমে এই আশ্রমে যুবসম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন স্বামী গোপেশানন্দ, স্বামী শিবনাথানন্দ, স্বামী হরিদেবানন্দ, দীপককুমার দত্ত, ডঃ রথীন্দ্রনাথ মজুমদার প্রমুখ। সমাপ্তি ভাষণ দেন মঠাধ্যক্ষ স্বামী বিশুদ্ধাত্মানন্দ।

**মনসাদ্বীপ রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমের** সহযোগিতায় সুন্দরবনের বিভিন্ন অঞ্চলে (সতেরোটি প্রতিষ্ঠানে) ১৯ জানুয়ারি থেকে ৩ মার্চ পর্যন্ত নানা অনুষ্ঠানের মাধ্যমে শ্রীরামকৃষ্ণদেব, শ্রীশ্রীমা সারদাদেবী ও স্বামী বিবেকানন্দের জন্মবার্ষিকী উৎসব এবং স্বামীজীর ভারত-পরিক্রমা ও শিকাগো বক্তৃতা শতবর্ষজয়ন্তী অনুষ্ঠিত হয়েছে। অনুষ্ঠানগুলিতে বিদ্যালয়ের প্রচুর ছাত্রছাত্রী, শিক্ষক-শিক্ষিকা এবং ভক্তবৃন্দ ও জনসাধারণ যোগদান করেছে। বিভিন্ন অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন আশ্রমের অধ্যক্ষ স্বামী বিকাশানন্দ, স্বামী ঋদ্ধানন্দ, স্বামী শিবনাথানন্দ, স্বামী ব্রজেশানন্দ, নবনীহরণ মুখোপাধ্যায়, অধ্যাপিকা সান্ত্বনা দাশগুপ্ত প্রমুখ।

গত ২৫ এপ্রিল **নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমের** বর্ষব্যাপী সুবর্ণজয়ন্তী উৎসবের উদ্বোধন করেন রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের অধ্যক্ষ শ্রীমৎ স্বামী ভূতেশানন্দজী মহারাজ। রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের বিভিন্ন কেন্দ্র থেকে বহু সন্ন্যাসী ও ব্রহ্মচারী এবং বহুসংখ্যক ভক্ত নরনারী ও হিতৈষিগণ অনুষ্ঠানে যোগদান করেন। এই উপলক্ষে এক জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় আশীর্বাণী প্রদান করেন শ্রীমৎ স্বামী ভূতেশানন্দজী মহারাজ। সভাপতিত্ব করেন রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের অন্যতম সহাধ্যক্ষ শ্রীমৎ স্বামী গহনানন্দজী মহারাজ এবং প্রধান অতিথি ছিলেন রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের সাধারণ সম্পাদক শ্রীমৎ স্বামী আত্মস্থানন্দজী মহারাজ।

গত ১০ এপ্রিল **গোলপার্ক রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউট অব কালচার** আয়োজিত 'সতী রায় স্মারক বক্তৃতা' প্রদান করেন স্বামী পূর্ণাত্মানন্দ। তাঁর বক্তৃতার বিষয় ছিল 'স্বামী বিবেকানন্দের ভারত-পরিক্রমার তাৎপর্য"। পৌরোহিত্য করেন ইনস্টিটিউটের অধ্যক্ষ স্বামী লোকেশ্বরানন্দ।

গত ৩১ জানুয়ারি, রবিবার **রহড়া রামকৃষ্ণ**

**মিশন বালকাশ্রমে** শ্রীরামকৃষ্ণ-ভক্ত ও ভাবানুরাগী সম্মেলনে প্রায় এক হাজার ভক্ত যোগদান করেন। মন্দিরে অর্ঘ্য প্রদান, পাঠ, জপ-ধ্যানের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের শুভারম্ভ হয়। সারাদিনব্যাপী অনুষ্ঠানে 'কথামৃত' পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন স্বামী পূর্ণাত্মানন্দ, শ্রীশ্রীঠাকুরের জীবন ও বাণী আলোচনা করেন স্বামী লোকেশ্বরানন্দ এবং প্রশ্নোত্তর আসর পরিচালনা করেন স্বামী সনাতনানন্দ। স্বাগত ভাষণ দেন আশ্রমাধ্যক্ষ স্বামী জয়ানন্দ।

## স্বামী বিবেকানন্দের ভারত-পরিক্রমার শতবর্ষ-অনুষ্ঠান

**রাঁচী স্যানাটরিয়াম** গত ১৮ থেকে ২৬ ফেব্রুয়ারি বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে বক্তৃতা, প্রবন্ধ-রচনা, চিত্রাঙ্কন প্রভৃতি প্রতিযোগিতামূলক অনুষ্ঠান এবং ৩ ও ৪ এপ্রিল অন্যান্য অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছিল। এই অনুষ্ঠানে প্রতিযোগিতামূলক বিষয়ে অংশগ্রহণকারী সফল প্রতিযোগীদের পুরস্কার দেওয়া হয়।

**খেতড়ি আশ্রম** খেতড়ি ও তার আশপাশের অঞ্চলে নয়টি জনসভা করেছে।

## ভিত্তিপ্রস্তর-স্থাপন

**বিশাখাপত্তনম আশ্রমে** গত ১৮ মার্চ ১৯৯৩ প্রস্তাবিত পাঠাগার ভবনের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের অন্যতম সহাধ্যক্ষ শ্রীমৎ স্বামী রঙ্গনাথানন্দজী।

**ভুবনেশ্বর আশ্রমে** গত ১ এপ্রিল উপজাতি ছাত্রদের জন্য প্রস্তাবিত ছাত্রাবাসের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের অন্যতম সহাধ্যক্ষ শ্রীমৎ স্বামী গহনানন্দজী।

## উদ্বোধন

গত ১ এপ্রিল **রামহরিপুর আশ্রমের** নবনির্মিত পাঠাগারের উদ্বোধন করেন শ্রীমৎ স্বামী গহনানন্দ।

## পরিদর্শন

গত ১৪ এপ্রিল কেন্দ্রীয় কৃষিদপ্তরের রাষ্ট্রমন্ত্রী অরবিন্দ নেতাম **নারায়ণপুর (মধ্যপ্রদেশ) আশ্রম** পরিদর্শন করেন।

## চিকিৎসা-শিবির

গত ২৭ ও ২৮ মার্চ **পুরী মঠ** কোনারক ও **ছেতান গ্রামে** বিনামূল্যে দন্ত ও সাধারণ চিকিৎসা-শিবির পরিচালনা করেছে। শিবিরে মোট ৫৪০ জন রোগীর চিকিৎসা করা হয়েছে।

**খেতড়ি আশ্রম** মধ্যপ্রদেশের বচসার গ্রামে এক বিনামূল্যে চিকিৎসা-শিবির পরিচালনা করেছে। শিবিরে মোট ১৬২ জন রোগীর চিকিৎসা করা হয়।

## ত্রাণ

### বিহার খরাত্রাণ

দৈনিক ১৫০ জন শিশুকে দুধ ও বিস্কুট দেওয়া ছাড়াও 'কাজের বিনিময়ে খাদ্য' প্রকল্পের মাধ্যমে গাড়ুয়া জেলার রাঁকা ব্লকের উরয়পুর ও রামকাণ্ড পঞ্চায়েতের অন্তর্গত সাবনে, মুরখুর ও কেরুয়া গ্রামে তিনটি পুকুর খনন করা হয়েছে। তাছাড়া খরাপীড়িতদের চিকিৎসার জন্যে চিকিৎসাত্রাণের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

### পশ্চিমবঙ্গ ঝঞ্ঝাত্রাণ

**সারগাছি আশ্রমের** মাধ্যমে মুর্শিদাবাদ জেলার কান্দী মহকুমায় প্রচণ্ড ঘূর্ণিঝড়ে ক্ষতিগ্রস্ত সুজাপুর গ্রামের ১০০০ মানুষকে পাঁচদিন রান্না করা খাবার সরবরাহ করা হয়েছে। দুধ, বিস্কুট, জল পরিশোধন-বটিকা এবং ও.আর.এস. প্যাকেটও বিতরণ করা হয়েছে। তাছাড়া ২০০ শাড়ি, ২০০ ধুতি, ২৪০ সেট শিশুদের পোশাক, ১৪০টি মশারি, ১৫০টি মাদুর, ১৪০টি তোয়ালে, ১৪৪টি লণ্ঠন এবং ১৪০ সেট (প্রতি সেটে দশটি জিনিস) অ্যালুমিনিয়ামের বাসনপত্র দেওয়া হয়েছে।

### রাজস্থান দুর্গতত্রাণ

**খেতড়ি আশ্রম** খেতড়ির আশপাশের দুঃস্থদের মধ্যে ৬৭১টি কম্বল ও চাদর বিতরণ করেছে।

## পুনর্বাসন

### পশ্চিমবঙ্গ

পুরুলিয়া জেলার লাউসেনবেরা গ্রামে ৪১টি গৃহনির্মাণের কাজ শেষ হয়েছে এবং গত ১৬ এপ্রিল বাড়িগুলি প্রাপকদের হাতে তুলে দিয়েছেন কেন্দ্রীয় কয়লামন্ত্রী অজিত পাঁজা। পুরুলিয়া ১নং ব্লকের সর্বাসমুলিয়া গ্রামে আরও ৬০টি গৃহনির্মাণের কাজ এগিয়ে চলেছে।

### তামিলনাড়ু

**কোয়েম্বাটোর ও মাদ্রাজ মঠের** সহযোগিতায় কন্যাকুমারীর বন্যায় ক্ষতিগ্রস্তদের জন্য পুনর্বাসনের ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে।

## বহির্ভারত

**বেদান্ত সোসাইটি অব টরন্টো (কানাডা):** এই আশ্রমের অধ্যক্ষ স্বামী প্রমথানন্দের পরিচালনায় গত মে মাসে সাপ্তাহিক ভাষণ এবং শাস্ত্রীয় ক্লাস যথারীতি হয়েছে।

**বেদান্ত সোসাইটি অব নর্থ ক্যালিফোর্নিয়া:** গত ১ মে শান্তি আশ্রমে বার্ষিক তীর্থযাত্রার আয়োজন করে। এই উপলক্ষে শান্তি আশ্রমে বেলা ১১টা থেকে নানা অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। ভক্তিগীতি, ভজন, পাঠ ও আলোচনা, আশ্রম-পরিভ্রমণ, ধ্যান-জপ প্রভৃতি ছিল অনুষ্ঠানের অঙ্গ। বার্কলে কেন্দ্রের স্বামী অপর্ণানন্দ ও স্যাক্রামেন্টো কেন্দ্রের স্বামী প্রপন্নানন্দ বিশেষ অতিথি হিসাবে অনুষ্ঠানে যোগদান করেছিলেন। তাছাড়া সাপ্তাহিক ভাষণ ও ক্লাস যথারীতি হয়েছে।

**বেদান্ত সোসাইটি অব স্যাক্রামেন্টো:** গত ৬ মে এই আশ্রমে পূজা, ভক্তিগীতি, আলোচনা, প্রসাদ-বিতরণ প্রভৃতির মাধ্যমে ভগবান বুদ্ধের আবির্ভাব-তিথি পালন করা হয়েছে। তাছাড়া এই কেন্দ্রের অধ্যক্ষ স্বামী শ্রদ্ধানন্দ এবং স্বামী প্রপন্নানন্দ যথারীতি সাপ্তাহিক ভাষণ ও ক্লাস নিয়েছেন।

**বেদান্ত সোসাইটি অব সেন্ট লুইস:** আশ্রমের অধ্যক্ষ স্বামী চেতনানন্দ মে মাসে সাপ্তাহিক ক্লাস নিয়েছেন। আমন্ত্রিত বক্তা হিসাবে উপস্থিত ছিলেন বেদান্ত সোসাইটি অব পোর্টল্যান্ডের স্বামী শান্তরূপানন্দ।

**রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ সেন্টার অব নিউইয়র্ক, বেদান্ত সোসাইটি অব ওয়েস্টার্ন ওয়াশিংটন, বেদান্ত সোসাইটি অব পোর্টল্যান্ড, বেদান্ত সোসাইটি অব বস্টন** কেন্দ্রসমূহে সাপ্তাহিক ধর্মীয় ভাষণ ও শাস্ত্রের ক্লাস যথারীতি হয়েছে।

গত ১৩ এপ্রিল পোর্টল্যান্ড বেদান্ত সোসাইটির স্বামী শান্তরূপানন্দ রিভারটনের ফার্স্ট ইউনাইটেড মেথডিস্ট চার্চের আমন্ত্রণে হিন্দুধর্মের ওপর ভাষণ দিয়েছেন। সোসাইটিতে মে মাসের রবিবারগুলিতে আশ্রম-অধ্যক্ষ স্বামী অশেষানন্দ এবং সহকারী অধ্যক্ষ স্বামী শান্তরূপানন্দের পরিচালনায় বিভিন্ন বিষয়ে অধ্যাত্মপ্রসঙ্গ আলোচিত হয়েছে।

## দেহত্যাগ

**স্বামী নির্বৈরানন্দ (রোহিণী):** গত ৮ এপ্রিল বেলা ২টায় বারাণসী রামকৃষ্ণ মিশন সেবাশ্রম হাসপাতালে দেহত্যাগ করেন। তাঁর বয়স হয়েছিল ৮১ বছর। গত ৮ মার্চ তাঁকে অন্ত্রের প্রদাহ রোগের জন্য হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। যথোপযুক্ত চিকিৎসা সত্ত্বেও তাঁর স্বাস্থ্য ক্রমশঃ খারাপ হতে থাকে। অবশেষে ৮ এপ্রিল তিনি শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

স্বামী নির্বৈরানন্দ ছিলেন শ্রীমৎ স্বামী বিজ্ঞানানন্দজী মহারাজের মন্ত্রশিষ্য। ১৯৩৭ খ্রীস্টাব্দে তিনি শিলচর আশ্রমে যোগদান করেন এবং ১৯৪৬ খ্রীস্টাব্দে তিনি শ্রীমৎ স্বামী বিরজানন্দজী মহারাজের নিকট সন্ন্যাসলাভ করেন। যোগদানের কেন্দ্র ছাড়াও তিনি কলকাতার গদাধর আশ্রম, রামকৃষ্ণ মিশন সারদাপীঠ ও জলপাইগুড়ি আশ্রমের কর্মী ছিলেন। তিনি দেওঘর খরাত্রাণেও অংশগ্রহণ করেছিলেন। ১৯৬৮ খ্রীস্টাব্দ থেকে তিনি বারাণসী অদ্বৈতাশ্রমে প্রথমে কর্মী হিসাবে ও পরে অবসর জীবনযাপন করতে থাকেন। দয়ালু, হাসিখুশি ও সেবাপরায়ণ এই সন্ন্যাসী সকলের প্রিয় ছিলেন।

## শ্রীশ্রীমায়ের বাড়ীর সংবাদ

**আবির্ভাব-তিথি পালন:** গত ২৭ এপ্রিল শঙ্করাচার্যের আবির্ভাব-তিথি ও গত ৬ মে ভগবান বুদ্ধের আবির্ভাব-তিথি উপলক্ষে সন্ধ্যারতির পর তাঁদের জীবন ও বাণী আলোচনা করেন স্বামী পূর্ণাত্মানন্দ।

**স্বামী বিবেকানন্দের ভারত-পরিক্রমার শতবর্ষপূর্তি অনুষ্ঠান:** গত ১৫ মে স্বামী বিবেকানন্দের ভারত-পরিক্রমার শতবর্ষপূর্তি উপলক্ষে উদ্বোধন কার্যালয়ের 'সারদানন্দ হল'-এ এক একক সঙ্গীতানুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দবিষয়ক সঙ্গীত পরিবেশন করেন বিশিষ্ট সঙ্গীতশিল্পী মহেশরঞ্জন সোম। অনুষ্ঠানে প্রারম্ভিক ভাষণ দেন স্বামী পূর্ণাত্মানন্দ।

**সাপ্তাহিক ধর্মালোচনা:** প্রতি শুক্রবার, রবিবার ও সোমবার সন্ধ্যারতির পর যথারীতি চলছে। □

# বিবিধ সংবাদ

## উৎসব-অনুষ্ঠান

**রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ সঙ্ঘ, কাঠডাঙ্গা ( নদীয়া )** গত ৩০ ও ৩১ জানুয়ারি পূজা, পাঠ, নগর পরিক্রমা, নানা প্রতিযোগিতামূলক অনুষ্ঠান, ধর্মসভা প্রভৃতির মাধ্যমে শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীশ্রীমা ও স্বামী বিবেকানন্দের জন্মোৎসব উদ্‌যাপন করেছে। অনুষ্ঠিত ধর্মসভায় বক্তব্য রাখেন স্বামী দিব্যানন্দ, নিতাই কর্মকার, অশোককুমার ঘোষ প্রমুখ। উভয় দিনই সন্ধ্যায় গীতি-আলেখ্য পরিবেশন করে 'শ্রীরামকৃষ্ণ বাণী প্রচার সঙ্ঘ'। শেষদিন রাত্রে রামকৃষ্ণ মিশন সারদাপীঠ জনশিক্ষা মন্দিরের সৌজন্যে চলচ্চিত্র প্রদর্শন করা হয়।

**শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ ভক্তসঙ্ঘ, জামালপুর ( মুঙ্গের, বিহার )** ইনস্টিটিউশন অব ইঞ্জিনীয়ার্স ( ইন্ডিয়া )-এর স্টুডেন্টস চ্যাপটার-এর সহযোগিতায় গত ৩০ ও ৩১ জানুয়ারি জামালপুরস্থ রোমান ক্যাথলিক মিশনারী প্রতিষ্ঠান নটরদাম অ্যাকাডেমীর প্রেক্ষাগৃহে এক যুবসমাবেশের আয়োজন করেছিল। যুবসমাবেশে নানা সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতামূলক অনুষ্ঠানে বারোটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের প্রায় পাঁচশতাধিক প্রতিযোগী অংশগ্রহণ করেছিল। প্রতি বিভাগের ১ম, ২য় ও ৩য় স্থানাধিকারীদের পুরস্কার দেওয়া হয়। অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন সিস্টার্স অব নটরদাম অ্যাকাডেমীর সিস্টার সাগরিকা। প্রধান অতিথি ছিলেন স্বামী সুহিতানন্দ। ভাষণ দেন স্বামী ভাবাত্মানন্দ। এই উপলক্ষে আশ্রম পরিচালিত লাইব্রেরীর দ্বারোদ্ঘাটন করেন স্বামী ভাবাত্মানন্দ।

**শ্রীরামকৃষ্ণ সারদা আশ্রম, কোতরং ( হুগলী )** গত ১৪ ফেব্রুয়ারি বার্ষিক উৎসব উদ্‌যাপন করা হয়। পূর্বাহ্নে পূজা, পাঠ, প্রসাদ-বিতরণ প্রভৃতি অনুষ্ঠিত হয়। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন স্বামী জিনানন্দ। দুপুরের প্রায় তিন হাজার ভক্তকে হাতে হাতে খিচুড়ি প্রসাদ দেওয়া হয়। বিকালে ধর্মসভায় সভাপতিত্ব করেন স্বামী অচ্যুতানন্দ। অনুষ্ঠানে সঙ্গীত পরিবেশন করেন স্থানীয় শিল্পিবৃন্দ।

গত ২৩ ও ২৪ ফেব্রুয়ারি '৯৩ **ঘাটশিলা শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ আশ্রমে** শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ১৫৮তম আবির্ভাব-উৎসব উদ্‌যাপিত হয়। ধর্মসভায় শ্রীরামকৃষ্ণ ও শ্রীশ্রীমায়ের জীবনী ও বাণী আলোচনা করেন যথাক্রমে স্বামী বন্দনানন্দ ও স্বামী অখিলাত্মানন্দ। দুপুরে সহস্রাধিক ভক্তকে প্রসাদ দেওয়া হয়। সন্ধ্যায় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও পরে 'সাধক বামাক্ষেপা' চলচ্চিত্র প্রদর্শিত হয়।

**রামকৃষ্ণ সেবাশ্রম, স্যান্ডেলের বিল ( উত্তর ২৪ পরগনা )** গত ৭ ফেব্রুয়ারি নানা প্রতিযোগিতামূলক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে স্বামী বিবেকানন্দের ভারত-পরিক্রমার শতবর্ষপূর্তি-উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। এই উপলক্ষে এক ধর্মসভাও অনুষ্ঠিত হয়। সভায় পৌরোহিত্য করেন স্বামী সনাতনানন্দ। মধ্যাহ্নে তিন সহস্রাধিক ভক্তকে বসিয়ে খিচুড়ি প্রসাদ দেওয়া হয়।

**কল্যাণী রামকৃষ্ণ সোসাইটি :** গত ২০ ও ২১ ফেব্রুয়ারি নানা অনুষ্ঠানের মাধ্যমে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের স্মরণোৎসব অনুষ্ঠিত হয়। ২১ তারিখ ধর্মসভায় বক্তব্য রাখেন অধ্যাপিকা বন্দিতা ভট্টাচার্য। বৈদিক মন্ত্রপাঠ করেন নমিতা দত্ত। সন্ধ্যায় চলচ্চিত্র প্রদর্শিত হয়। দ্বিতীয় দিন বিশেষ পূজাদি অনুষ্ঠিত হয়। ভক্তিগীতি ও গীতি-আলেখ্য পরিবেশন করেন যথাক্রমে স্থানীয় শিল্পিবৃন্দ এবং রানাঘাট শ্রীরামকৃষ্ণ-সারদা সেবাসঙ্ঘের সদস্যাগণ। দুপুরে ছয় শতাধিক ভক্তকে বসিয়ে খিচুড়ি প্রসাদ দেওয়া হয়। বিকালে ধর্মসভা এবং প্রতিযোগিতামূলক অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণকারী সফল প্রতিযোগীদের পুরস্কার বিতরণ করা হয়। পুরস্কার বিতরণ ও ধর্মসভায় সভাপতিত্ব করেন স্বামী মুক্তসঙ্গানন্দ। প্রধান অতিথি হিসাবে বক্তব্য রাখেন ডঃ সচ্চিদানন্দ ধর। উল্লেখ্য, ৩১ জানুয়ারি স্বামী বিবেকানন্দের শিকাগো ধর্মমহাসভায় যোগদানের শতবর্ষপূর্তি উপলক্ষে ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে নানা প্রতিযোগিতামূলক অনুষ্ঠান হয়। অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন স্বামী দিব্যানন্দ।

গত ২৩ ফেব্রুয়ারি শ্রীরামকৃষ্ণের আবির্ভাব-তিথিতে কলকাতার গোয়াবাগানের ঈশ্বর মিল লেনে ( কলকাতা-৬ ) **রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ সেবাসঙ্ঘ** নামে

একটি সংস্থার উদ্বোধন করা হয়েছে। ঐদিন পূজা, হোম ও প্রসাদ বিতরণাদি অনুষ্ঠিত হয়। পরদিন সন্ধ্যায় ধর্মসভা ও ভক্তিগীতি পরিবেশিত হয়। ধর্মসভায় বক্তব্য রাখেন স্বামী বিশ্বনাথানন্দ, ডঃ শশাঙ্কভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় ও নির্মাল্য বসু। ভক্তিগীতি পরিবেশন করেন সবিতাব্রত দত্ত ও শুভব্রত দত্ত।

স্বামী বিবেকানন্দের ভারত-পরিক্রমা ও শিকাগো ধর্মমহাসভায় যোগদানের শতবর্ষ-পূর্তি উপলক্ষে গত ৭ মার্চ **কৃষ্ণনগর শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমে** এক যুব-সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলনে বক্তব্য রাখেন অধ্যাপক তাপস বসু ও নচিকেতা ভরদ্বাজ।

## পরলোকে

শ্রীমৎ স্বামী শিবানন্দজী মহারাজের মন্ত্রশিষ্যা চন্দননগরের **দুর্গারানী মজুমদার** গত ৭ সেপ্টেম্বর ১৯৯২ কলকাতার শম্ভুনাথ পণ্ডিত হাসপাতালে শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। তাঁর বয়স হয়েছিল ৭৩ বছর। শ্রীমা সারদাদেবীর মন্ত্রশিষ্য বাঁকুড়া নিবাসী বিভূতিভূষণ ঘোষ ছিলেন তাঁর পিতা। পিতার প্রথম কন্যা ছিলেন তিনি। শ্রীশ্রীমা-ই তাঁর নাম রেখেছিলেন 'দুর্গা'। রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের বিভিন্ন কেন্দ্রের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ ছিল। তিনি 'উদ্বোধন'-এর নিয়মিত গ্রাহিকা ছিলেন। তাঁর স্বামী প্রয়াত যোগেশচন্দ্র মজুমদারও শ্রীমৎ স্বামী শিবানন্দজী মহারাজের মন্ত্রশিষ্য ছিলেন।

শ্রীমৎ স্বামী শিবানন্দজী মহারাজের মন্ত্রশিষ্য **জগদ্বন্ধু হালদার** তাঁর কলকাতার ভূপেন বোস অ্যাভিনিউ-এর (শ্যামবাজার) বাসভবনে গত ৪ ডিসেম্বর, ১৯৯২ পরলোকগমন করেন। তাঁর বয়স হয়েছিল ৯২ বছর।

শ্রীমৎ স্বামী বিজ্ঞানানন্দজী মহারাজের মন্ত্র-শিষ্য, উত্তর ২৪ পরগনা জেলার নূতনপুকুর শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমের (পোঃ পাথরঘাটা) প্রতিষ্ঠাতা-সভাপতি **রজনীকান্ত মণ্ডল** গত ২৪ ডিসেম্বর '৯২ ভোর পাঁচটায় পরলোকগমন করেন। তাঁর বয়স হয়েছিল ৮৫ বছর। প্রয়াত রজনীকান্ত মণ্ডল কলেজে পড়াকালীন বিপ্লবী বিপিনবিহারী গাঙ্গুলীর সংস্পর্শে এসে স্বাধীনতা সংগ্রামে আত্ম-নিয়োগ করেছিলেন। ঐসময় থেকেই তিনি রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ ভাবধারায় অনুপ্রাণিত হন এবং রঘুনাথ-পুর চারিগ্রামে শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম প্রতিষ্ঠা করেন। ১৯৪০ খ্রীস্টাব্দে তিনি নিজ গ্রাম নূতনপুকুরে আশ্রম প্রতিষ্ঠা ও একটি প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপন করেন। তাঁর সংস্পর্শে এসে অনেকে শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ ভাবধারায় অনুপ্রাণিত হয়েছেন। চল্লিশ বছরের বেশি সময় ধরে তিনি 'উদ্বোধন'-এর গ্রাহক ছিলেন।

শ্রীমৎ স্বামী বিরজানন্দজী মহারাজের মন্ত্র-শিষ্য **ডাঃ মোহিনীমোহন কুণ্ডু** গত ১৪ সেপ্টেম্বর '৯২ ৮৫ বছর বয়সে তাঁর শ্যামনগরের বাসভবনে শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। তিনি নদীয়া জেলার শান্তিপুরে আশ্রম স্থাপন করে গরিবদের জন্য দাতব্য হোমিওপ্যাথি চিকিৎসার ব্যবস্থা করেছিলেন।

শ্রীমৎ স্বামী বিরজানন্দজী মহারাজের মন্ত্র-শিষ্যা **শতদল ঘোষ** কলকাতার ৫৮/৩, রাজা দীনেন্দ্র স্ট্রীটের বাসভবনে গত ১৪ নভেম্বর '৯২ রাত ১২.০৬ মিনিটে করজপরত অবস্থায় শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন। তাঁর বয়স হয়েছিল ৯২ বছর। উল্লেখ্য, তাঁর স্বামী প্রয়াত ফণিভূষণ ঘোষও শ্রীমৎ স্বামী বিরজানন্দজী মহারাজের মন্ত্রশিষ্য ছিলেন।

শ্রীমৎ স্বামী ভূতেশানন্দজী মহারাজের মন্ত্র-শিষ্য **দেবপ্রসাদ চৌধুরী** দমদম ২৭, যোগীপাড়ার বাসভবনে গত ২১ জুলাই '৯২ রাত ৯-১৫ মিনিটে হৃদ্‌রোগে আক্রান্ত হয়ে পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৫৫ বছর।

শ্রীমৎ স্বামী বীরেশ্বরানন্দজী মহারাজের মন্ত্রশিষ্যা **বাণী বসু** ৬/১, গঙ্গাধর সেন লেনের (কলকাতা-৩৫) বাসভবনে গত ৭ নভেম্বর '৯২ হৃদ্‌রোগে আক্রান্ত হয়ে পরলোকগমন করেন। তাঁর বয়স হয়েছিল ৫২ বছর। সেবাপরায়ণতা ছিল তাঁর অন্যতম চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য।

শ্রীমৎ স্বামী বীরেশ্বরানন্দজী মহারাজের মন্ত্র-শিষ্য **প্রশান্তকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়** গত ৩১ ডিসেম্বর '৯২ সকাল ৬-৫০ মিনিটে পাঞ্জাবের চণ্ডীগড় পি. জি. আই. হাসপাতালে শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। শেষদিন পর্যন্ত তিনি ন্যাশন্যাল ফার্টিলাইজার লিমিটেডের নাঙ্গাল শাখার চীফ ইঞ্জিনীয়ার ছিলেন। চণ্ডীগড় রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল। □

# বিজ্ঞান-সংবাদ

## শীতে জমে যাওয়া প্রাণীরা কিভাবে বেঁচে ওঠে

বাইরের তাপমাত্রা যখন শূন্য ডিগ্রির নিচে চলে যায়, তখন আমরা গরম ঘরে যেতে চাই বা গরম দেশে বেড়াতে যেতে চাই। বেশি শীতের কয়েক মাস খুব কম জীবজন্তুই কর্মশীল থাকে। শীতের দেশের পাখিরা দক্ষিণে গরম দেশে যেতে আরম্ভ করে এবং বহু জন্তু গুহাতে বা অন্যত্র শীতযাপন করে। কিন্তু যেসব জীবজন্তু বেশি গরম তাপমাত্রায় থাকতে অভ্যস্ত অথবা যাদের দেহ ঠাণ্ডা —ব্যাঙ, মাকড়সা ইত্যাদি—তাদের শরীরস্থ রক্ত বা দেহরস ( body fluids ) যখন বরফ হয়ে যাবার উপক্রম হয়, তখন তারা কিভাবে বেঁচে থাকে? কোন কোন প্রাণী তাদের শরীরে প্রাণরসায়নী ( biochemical ) পরিবর্তন এনে ঠাণ্ডা সহ্য করে, কিন্তু অন্য কিছু প্রাণী জমে বরফ (frozen solid) হয়েও বেঁচে থাকে। হাজার হাজার কীটপতঙ্গ বহুদিন যাবৎ জমা অবস্থায় থাকে। উত্তর মেরুতে ( যেখানে তাপমাত্রা —৫০° সেন্টিগ্রেড হয় ) এক ধরনের শুঁয়াপোকা জাতীয় জীব ( cater pillar ) বছরের দশমাস জমে যাওয়া অবস্থায় কাটায়। চার ধরনের ব্যাঙ পাওয়া গেছে, যাদের শরীরের ৬৫ শতাংশ দেহরস জমে গেলেও পরে তারা বেঁচে ওঠে।

কিন্তু জীবকোষের পক্ষে বরফ হয়ে জমে যাওয়া খুবই সাংঘাতিক ব্যাপার। কারণ, এমন হলে রক্ত-চলাচল বন্ধ হয়ে যায়, ফলে জীবকোষরা অক্সিজেন পায় না। তাছাড়া শক্ত বরফটুকরোগুলি ( ice crystals ) দেহকোষকে ভেঙে ফেলতে পারে এবং সূক্ষ্ম রক্তনালীগুলিকে ( capillaries ) ছিঁড়ে ফেলতে পারে। ল্যাবরেটরীতে দেখা গেছে যে, বরফটুকরোর এই বিধ্বংসী ক্ষমতা সমস্ত স্তন্যপায়ী জন্তুর দেহকোষেই প্রযোজ্য। শরীরের দেহকোষ-গুলিকে ঘিরে থাকে তরল রস, যাতে থাকে জল এবং নানারকম রাসায়নিক লবণ বা সল্ট ( salt )। জল-অংশ যদি বরফ হয়ে যায়, তাহলে রাসায়নিক সল্টগুলি ঘন হয়ে দেহকোষের ভিতরের জলীয় অংশ টেনে নেয়। এর ফলে দেহকোষের চারিধারে যে-পর্দা আছে ( cell membrane ) তা কুঁচকে যায় এবং কার্যক্ষমতা হারিয়ে ফেলে। এই অবস্থা থেকে উদ্ধার পাওয়ার জন্য জীবজন্তুরা দুভাবে চেষ্টা করে। একরকম হচ্ছে—জলের নিচে কিংবা মাটির নিচে অপেক্ষাকৃত গরম জায়গায় আশ্রয় নেওয়া; ব্যাঙ, কচ্ছপ, সাপ এই শ্রেণীতে পড়ে। আরেক উপায় হচ্ছে, শারীরিক পরিবর্তন এনে শরীরের তরল পদার্থকে শূন্য ডিগ্রির নিচের তাপমাত্রায় ও তরল অবস্থায় রাখা। এমন যে হয় তার একটা উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে: মানুষের প্লাজমা বা রক্তরস যদিও ৮° সেন্টিগ্রেড-এ জমে যায়, কিন্তু নানা প্রক্রিয়ার সাহায্যে তাকে —১৬° সেন্টিগ্রেডেও তরল অবস্থায় রাখা সম্ভব। এই শারীরিক পরিবর্তন বিভিন্ন প্রাণীতে বিভিন্ন ধরনের এবং প্রক্রিয়াগুলি খুবই জটিল। কিছু কিছু প্রাণীতে এই ব্যাপার পরীক্ষিত হয়েছে; কিন্তু বহু প্রাণী কিভাবে শারীরিক তরল পদার্থকে বরফ হয়ে যেতে দেয় না, তা এখনো জানা নেই। এইসব পরীক্ষা থেকে একটা লাভ হতে পারে; সেটা হচ্ছে— মানুষের শরীরাংশ ( human tissue ) কোন্ উপায়ে আরও ভালভাবে রক্ষিত হতে পারে, তার সূত্র এইসব পরীক্ষার মাধ্যমে খুঁজে পাওয়া যেতে পারে। □

**[ Scientific American, December 1990, pp. 92-97. ]**

---

**বিশ্বব্যাপী চৈতন্যই ঈশ্বর। সেই বিশ্বব্যাপী চৈতন্যকেই লোকে প্রভু, ভগবান, খ্রীস্ট, বুদ্ধ বা ব্রহ্ম বলিয়া থাকে— জড়বাদীরা উহাকেই শক্তিরূপে উপলব্ধি করে এবং অজ্ঞেয়বাদীরা ইহাকেই সেই অনন্ত অনির্বচনীয় সর্বাতীত বস্তু বলিয়া ধারণা করে। উহাই সেই বিশ্বব্যাপী প্রাণ, উহাই বিশ্বব্যাপী চৈতন্য, উহাই বিশ্বব্যাপিনী শক্তি এবং আমরা সকলেই উহার অংশস্বরূপ।**

**স্বামী বিবেকানন্দ**

উদ্বোধনের মাধ্যমে প্রচার হোক
এই বাণী। শ্রীসুশোভন চট্টোপাধ্যায়

# উদ্বোধন

স্বামী বিবেকানন্দ প্রবর্তিত, রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের একমাত্র বাঙলা মুখপত্র, চুরানব্বই বছর ধরে নিরবচ্ছিন্নভাবে প্রকাশিত দেশীয় ভাষায় ভারতের প্রাচীনতম সাময়িকপত্র


## সূচিপত্র ৯৫তম বর্ষ শ্রাবণ ১৪০০ (জুলাই ১৯৯৩) সংখ্যা




সম্পাদক ☐ স্বামী পূর্ণাত্মানন্দ

৮০/৬, গ্রে স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০ ০০৬-স্থিত বসুশ্রী প্রেস থেকে বেলুড় শ্রীরামকৃষ্ণ মঠের ট্রাস্টীগণের পক্ষে সত্যব্রতানন্দ কর্তৃক মুদ্রিত ও ১ উদ্বোধন লেন, কলকাতা-৭০০ ০০৩ থেকে প্রকাশিত।

প্রচ্ছদ মুদ্রণঃ স্বপ্না প্রিন্টিং ওয়ার্কস (প্রাঃ) লিমিটেড, কলকাতা-৭০০ ০০৯

আজীবন গ্রাহকমূল্য (৩০ বছর পর নবীকরণ-সাপেক্ষ) ☐ এক হাজার টাকা (কিস্তিতেও প্রদেয়—প্রথম কিস্তি একশো টাকা) ☐ সাধারণ গ্রাহকমূল্য ☐ শ্রাবণ থেকে পৌষ সংখ্যা ☐ ব্যক্তিগতভাবে সংগ্রহ ☐ তিরিশ টাকা ☐ সডাক ☐ চৌত্রিশ টাকা ☐ বর্তমান সংখ্যার মূল্য ☐ ছয় টাকা

# উদ্বোধন-এর গ্রাহকদের জন্য বিজ্ঞপ্তি

**উদ্বোধন : আশ্বিন (শারদীয়া) ১৪০০ এবং স্বামীজীর ভারত-পরিক্রমা ও শিকাগো ধর্মমহাসভায় আবির্ভাবের শতবার্ষিক সংখ্যা**

☐ যথারীতি নানা গুণিজনের রচনায় সমৃদ্ধ হয়ে এবারেও **'উদ্বোধন'-এর আশ্বিন/সেপ্টেম্বর (শারদীয়া)** সংখ্যা প্রকাশিত হবে। **এবছর এই সংখ্যাটি একই সঙ্গে স্বামীজীর ভারত-পরিক্রমা এবং শিকাগো ধর্মমহাসভায় আবির্ভাবের শতবার্ষিক সংখ্যা হিসাবেও প্রকাশিত হবে। সংখ্যাটির মূল্য : তিরিশ টাকা।**

☐ **'উদ্বোধন'-এর গ্রাহকদের** এই সংখ্যার জন্য **আলাদা মূল্য দিতে হবে না।** তাঁরা নিজের কপি ছাড়া **অতিরিক্ত প্রতি কপি বাইশ টাকায়** পাবেন ; **৩১ আগস্ট '৯৩-এর মধ্যে অগ্রিম টাকা জমা দিলে** তাঁরা প্রতি কপি **কুড়ি টাকায়** পাবেন, **রেজিস্ট্রি ডাকে** সংখ্যাটি নিলে অতিরিক্ত **সাত টাকা** জমা দিতে হবে।

☐ **সাধারণ ডাকে** যাঁরা পত্রিকা নেন, তাঁরা **ব্যক্তিগতভাবে** (By Hand) এই সংখ্যাটি সংগ্রহ করতে চাইলে **৩১ আগস্ট '৯৩-এর মধ্যে সেই সংবাদ** কার্যালয়ে **অবশ্যই** পেঁছিানো প্রয়োজন। **৩১ আগস্ট '৯৩-এর** মধ্যে **কোন সংবাদ কার্যালয়ে না পেঁছালে পত্রিকা সাধারণ ডাকেই** যথারীতি পাঠিয়ে দেওয়া হবে।

☐ **সাধারণ ডাকে এই সংখ্যাটি না পেলে** আমাদের পক্ষে **দ্বিতীয়বার** দেওয়া সম্ভব নয়।

☐ **সাধারণ ডাকে** যাঁরা পত্রিকা নেন, তাঁরা ইচ্ছা করলে **রেজিস্ট্রি ডাকেও** আশ্বিন সংখ্যাটি নিতে পারেন। সেক্ষেত্রে রেজিস্ট্রি ডাক ও আনুষঙ্গিক খরচ বাবদ **সাত টাকা ৩১ আগস্ট** '৯৩-এর মধ্যে **কার্যালয়ে পেঁছানো** প্রয়োজন। **ঐ তারিখের পরে** টাকা কার্যালয়ে পেঁছালে সেই টাকা সংশ্লিষ্ট গ্রাহকদের **আগামী বছরের** ডাকমাশুল বাবদ **জমা** রাখা হবে।

☐ **ব্যক্তিগতভাবে** যাঁরা পত্রিকা সংগ্রহ করবেন তাঁদের **২৭ সেপ্টেম্বর থেকে ২ অক্টোবর ('৯৩) পর্যন্ত** কার্যালয় থেকে **আশ্বিন সংখ্যাটি** দেওয়া হবে। সংশ্লিষ্ট গ্রাহকদের কাছে অনুরোধ, তাঁরা যেন **এই সময়ের মধ্যে** তাঁদের সংখ্যাটি সংগ্রহ করে নেন। বিশেষ কারণে ঐ তারিখের মধ্যে সংগ্রহ করা সম্ভব না হলে **১ নভেম্বর থেকে ১৬ নভেম্বরের মধ্যে অবশ্যই সংগ্রহ করতে হবে।** কার্যালয়ে স্থানাভাবের জন্য **১৬ নভেম্বরের ('৯৩) পর সংখ্যাটি প্রাপ্তির নিশ্চয়তা থাকবে না।** আশা করি, সহৃদয় গ্রাহকবর্গের সানুগ্রহ সহযোগিতা আমরা এবিষয়ে পাব।

☐ কার্যালয় শনিবার বেলা ১-৩০ পর্যন্ত **খোলা** থাকে, রবিবার **বন্ধ।** অন্যান্য দিন সকাল ৯-৩০ মিঃ থেকে বিকাল ৫-৩০ মিঃ পর্যন্ত খোলা। **১৫ অক্টোবর মহালয়া উপলক্ষে এবং ২১ অক্টোবর থেকে ৩১ অক্টোবর পর্যন্ত দুর্গাপূজা উপলক্ষে পত্রিকা বিভাগ বন্ধ থাকবে।**

☐ ডাকবিভাগের নির্দেশমত **ইংরেজী মাসের ২৩ তারিখ** (২৩ তারিখ রবিবার কিংবা ছুটির দিন হলে ২৪ তারিখ) 'উদ্বোধন' পত্রিকা কলকাতার জি. পি. ও-তে ডাকে দিই। এই তারিখটি **সংশ্লিষ্ট বাঙলা মাসের** সাধারণতঃ **৮/৯ তারিখ** হয়। ডাকে পাঠানোর সপ্তাহখানেকের মধ্যে গ্রাহকদের পত্রিকা পেয়ে যাবার কথা। তবে ডাকের গোলযোগে কখনো কখনো পত্রিকা পেঁছাতে বিলম্বও হয়। অনেক সময় গ্রাহকরা একমাস পরেও পত্রিকা পান বলে খবর পাই। সে-কারণে সহৃদয় গ্রাহকদের **একমাস পর্যন্ত অপেক্ষা** করতে অনুরোধ করি। **একমাস পরে** ( অর্থাৎ পরবর্তী ইংরেজী মাসের ২৪ তারিখ / পরবর্তী বাঙলা মাসের ১০ তারিখ পর্যন্ত ) পত্রিকা না পেলে **গ্রাহকসংখ্যা উল্লেখ করে** কার্যালয়ে জানালে **ডুপ্লিকেট বা অতিরিক্ত কপি** পাঠানো হবে।

☐ যাঁরা **ব্যক্তিগতভাবে** (By Hand) **পত্রিকা সংগ্রহ** করেন তাঁদের পত্রিকা **ইংরেজী মাসের ২৭ তারিখ** থেকে বিতরণ শুরু হয়। **স্থানাভাবের** জন্য **দুটি সংখ্যার** বেশি কার্যালয়ে জমা রাখা **সম্ভব নয়।** তাই সংশ্লিষ্ট গ্রাহকদের কাছে অনুরোধ, তাঁরা যেন সেইমত তাঁদের সংখ্যা **সংগ্রহ করে নেন।**

☐ **শ্রাবণ সংখ্যা** থেকে ( **পৌষ সংখ্যা** পর্যন্ত ) গ্রাহক হলে **গ্রাহকমূল্য : ব্যক্তিগতভাবে সংগ্রহ (By Hand)—৩০ টাকা, ডাকযোগে (By Post) সংগ্রহ—৩৪ টাকা ( মাঘ-আষাঢ় সংখ্যা নিঃশেষিত )।**

# উদ্বোধন

শ্রাবণ ১৪০০     ১৯৯৩     ৯৫তম বর্ষ—৭ম সংখ্যা


## দিব্য বাণী

ক্রমাগত সংগ্রাম ও সাধনা দ্বারা সিদ্ধিলাভ করা ও সেই 'স্বর্গস্থ পিতা'র মতো পূর্ণ হওয়াই… ধর্ম।

স্বামী বিবেকানন্দ



## কথাপ্রসঙ্গে

### কন্যাকুমারীতে স্বামীজীর উপলব্ধি দেবত্বই মানুষের স্বরূপ

"এক বৈদিক ঋষি… বিশ্বসমক্ষে দণ্ডায়মান হইয়া তারস্বরে জগতে এই আনন্দ-সমাচার ঘোষণা করিলেন—'শোন শোন অমৃতের সন্তানগণ, শোন দিব্যলোকের অধিবাসিগণ'…।

"'অমৃতের সন্তান'! কি মধুর ও আশার নাম! হে ভগিনী ও ভ্রাতৃবৃন্দ, এই মধুর নামে আমি তোমাদের সম্বোধন করিতে চাই। তোমরা অমৃতের অধিকারী।… তোমরা ঈশ্বরের সন্তান, অমৃতের অধিকারী—পবিত্র ও পূর্ণ। মর্ত্যভূমির দেবতা তোমরা! তোমরা পাপী? মানুষকে পাপী বলাই মহাপাপ। মানবের যথার্থ স্বরূপের উপর ইহা মিথ্যা কলঙ্কারোপ। ওঠ, এস, সিংহস্বরূপ হইয়া তোমরা নিজেদের মেষতুল্য মনে করিতেছ। [ঐ] ভ্রমজ্ঞান দূর করিয়া দাও। তোমরা অমর আত্মা, মুক্ত আত্মা—চির-আনন্দময়।"

শিকাগোর ধর্মমহাসভায় দাঁড়াইয়া উদাত্ত কণ্ঠে স্বামী বিবেকানন্দ যখন এই উদ্ঘোষণ করিয়াছিলেন তখন এক মুহূর্তে সমগ্র ধর্মমহাসভার চিন্তাস্রোত অন্য এক পথে—এক আলোকিত ধারায় প্রবাহিত হইতে শুরু করিয়াছিল। সব ধর্মই চিরকাল মানুষকে নরকের ভয় দেখাইয়াছে, পাপের ভয় দেখাইয়াছে। প্রত্যক্ষভাবে অথবা পরোক্ষভাবে মানুষকে 'পাপী' বলিয়া চিহ্নিত করিয়াছে, 'পাপের সন্তান' বলিয়া প্রচার করিয়াছে। না, হিন্দুধর্মও তাহার ব্যতিক্রম নহে। হিন্দুধর্মের যে লৌকিক অংশ, যে পৌরাণিক ও স্মার্ত অংশ সেখানেও ঐ ভাব বহুল পরিমাণে রহিয়াছে। কিন্তু বেদান্তে যাহার নির্যাস বিধৃত রহিয়াছে সেই বিশুদ্ধ হিন্দুধর্মে—পৃথিবীর সকল ধর্মের মধ্যে শুধু সেখানেই, আমরা পাই উহার একমাত্র উজ্জ্বল ব্যতিক্রম। সেখানে বার বার উদ্ঘোষিত হইয়াছে মানব-মহিমার কথা: মানুষ হীন নহে, মানুষ দুর্বল নহে, মানুষ পাপী নহে—মানুষের মধ্যে রহিয়াছে অনন্ত সম্ভাবনা, অভাবনীয় ঐশ্বর্য। জাতি, বর্ণ, ধর্ম, স্ত্রী-পুরুষ নির্বিশেষে মানুষের মধ্যে চৈতন্য-শক্তি বিরাজিত রহিয়াছে। মানুষের সঙ্গে মানুষের পার্থক্য শুধু সেই চৈতন্য-শক্তির বিকাশের তারতম্যে। অধিকাংশ মানুষ তাহাদের অন্তর্নিহিত ঐশ্বর্য সম্পর্কে অবহিতই নহে। এই যে অজ্ঞতা, এই যে অজ্ঞান—ইহাকে দূর করিবার জন্য প্রয়াস এবং উহার আবরণ-স্তর উন্মোচনে সাফল্যের মধ্যে নিহিত মানুষের গৌরব

স্বামীজী পরবর্তী কালে ভারতের মানুষকে মগ্ন-চৈতন্য হইতে উদ্ধার করিবার জন্য এই বাণী বারম্বার শুনাইয়াছেন। পাশ্চাত্য হইতে ভারতে পদার্পণের পর পরমকুড়ি-ভাষণে তিনি বলিয়াছিলেন: "তোমার প্রকৃত স্বরূপ অপবিত্রতার আবরণে আবৃত রহিয়াছে।… বাহিরের সাহায্য কিছুমাত্র আবশ্যক নাই।… শুধু জানা এবং না জানাতেই অবস্থার তারতম্য।… ভগবান ও মানুষে, সাধুতে ও পাপীতে প্রভেদ কিসে?—কেবল অজ্ঞানে। অজ্ঞানেই প্রভেদ হয়। সর্বোচ্চ মানুষ এবং তোমার পদতলে অতি কষ্টে বিচরণকারী ঐ ক্ষুদ্রকীটের মধ্যে প্রভেদ কিসে?—অজ্ঞানই এই প্রভেদ করিয়াছে। কারণ, অতি কষ্টে বিচরণশীল ঐ ক্ষুদ্র কীটের মধ্যেও অনন্ত শক্তি, জ্ঞান ও পবিত্রতা… অব্যক্তভাবে রহিয়াছে। উহাকে ব্যক্ত করিতে হইবে।

**"ভারত জগৎকে এই এক মহাসত্য শিখাইবে, কারণ ইহা আর কোথাও নাই।"**

আত্মার এই ঐশ্বর্যের তত্ত্ব এবং ইতিহাস বিশুদ্ধ হিন্দুধর্মের বা উচ্চতম হিন্দুধর্মের তথা ভারতবর্ষের নিজস্ব। এই তত্ত্ব ও ইতিহাসের সহিত স্বামীজীর পরিচয় হইয়াছিল যথাক্রমে দক্ষিণেশ্বর, শ্যামপুকুর ও কাশীপুরে এবং তাহার পরে তাঁহার ভারত-পরিক্রমা পর্বে। মানুষ যে নিছক মানুষ নহে, মানুষই যে ঈশ্বর, জীবই যে স্বয়ং শিব—বেদান্তের এই মহোচ্চ বাণীর প্রতিধ্বনি দক্ষিণেশ্বরে শ্রীরামকৃষ্ণের কণ্ঠে একদিন শুনিয়া তিনি অভিভূত হইয়াছিলেন। সে-দিন তিনি সংকল্প গ্রহণ করিয়াছিলেন ভবিষ্যতে ঐ সত্যকে—"বনের বেদান্ত"কে মানুষের ঘরে ঘরে—"সংসারের সর্বত্র" তিনি প্রচার করিবেন। স্বামীজী দেখিয়াছিলেন গিরিশচন্দ্র ঘোষ, যিনি নিজের সম্পর্কে বলিতেন, 'আমি যেখানে বসতাম সে মাটি অশুদ্ধ', কিভাবে শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে আসিয়া নিত্য তাঁহার আন্তর চৈতন্যের উজ্জ্বল প্রকাশ করিয়া চলিতেছিলেন। কতবার তিনি শুনিয়াছেন গিরিশচন্দ্র অথবা অন্য কেহ নিজেকে 'পাপী' বলিলে শ্রীরামকৃষ্ণ কী পরিমাণ বিচলিত হইয়া গভীর প্রত্যয়ের সহিত বলিতেন: পাপী? পাপ? কে পাপী? কিসের পাপ? মানুষ যে ঈশ্বর, ঈশ্বরের অংশ, তাঁহার ঐশ্বর্যের অধিকারী। কাশীপুরে অন্ত্যলীলা-পর্বের প্রত্যেকটি দিন তাঁহার কাটিয়াছিল—কিভাবে মানুষ তাহার চৈতন্যে প্রতিষ্ঠিত হইবে সেই অগ্নিময় আকুতিতে। সেই আকুতিতে রোগপাণ্ডুর গণ্ড বাহিয়া তিনি নীরবে অশ্রুপাত করিয়াছেন। কখনও কখনও সেই নীরবতা বাঙ্ময় হইয়াছে। কাঁদিতে কাঁদিতে দুর্বল ও ক্ষীণ কণ্ঠে রক্তবমন করিতে করিতে কম্পিত ওষ্ঠে তিনি আপন মনে গাহিয়াছেন:

এসে পড়েছি যে দায়,
সে দায় বলব কায়!
যার দায় সে আপনি জানে,
পর কি জানে পরের দায়!

শ্রীরামকৃষ্ণের এই গভীর মর্মদাহের কথা স্বামীজী জানিতেন। মানুষকে তাহার চৈতন্যসত্তার কথা শুনাইবার জন্য, মানুষকে তাহার চৈতন্য-সত্তায় প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য তিনি নির্বিকল্প সমাধিকেও তুচ্ছজ্ঞান করিবার শিক্ষা তাঁহার শিষ্যকে দিয়াছিলেন। যতবার স্বামীজী মানুষ ও সমাজের নিকট হইতে দূরে যাইয়া আত্মমুক্তির সাধনায় বসিতে চাহিয়াছেন ততবার অদৃশ্যভাবে তাঁহাকে তাঁহার নির্জন সাধনার আসন হইতে বলপূর্বক তুলিয়া আনিয়া শ্রীরামকৃষ্ণ নিক্ষেপ করিয়াছেন মানুষের কোলাহলের মধ্যে। ব্যষ্টির মুক্তির আকাঙ্ক্ষাকে তিনি ঘৃণা করিতেন। সমষ্টির মুক্তি, সমষ্টিকে চৈতন্যসত্তায় প্রতিষ্ঠিত করিবার অভিযান ছিল তাঁহার আকাঙ্ক্ষা। হিমালয় হইতে কন্যাকুমারী পর্যন্ত পরিভ্রমণকালে স্বামীজী স্বচক্ষে দেখিয়াছিলেন, ভারতের বেদান্ত মিথ্যা বলে নাই, শ্রীরামকৃষ্ণ মিথ্যা বলেন নাই। তিনি দেখিয়াছিলেন মানুষ বস্তুতই ঈশ্বরের ঐশ্বর্যের অধিকারী। রাজার প্রাসাদে, দরিদ্রের কুটিরে, পথে অথবা ক্ষেতে যেখানে যখনই মানুষের সংস্পর্শে তিনি আসিয়াছেন, তিনি দেখিয়াছেন সকলের মধ্যেই সেই ঐশ স্ফুলিঙ্গ বিদ্যমান। সেই স্ফুলিঙ্গ কখনও সারল্য ও সততার আকারে, কখনও উদারতার আকারে, কখনও নিঃস্বার্থপরতার আকারে, কখনও প্রেমের আকারে, কখনও বীরত্বের আকারে, কখনও বৈরাগ্যের আকারে, কখনও আধ্যাত্মিক বিকাশের আকারে প্রকাশিত।

হিমালয় ভ্রমণকালে স্বামীজী একসময় এক তিব্বতী পরিবারে কয়েকদিন বাস করিয়াছিলেন। তাহাদের প্রথা অনুসারে একজন নারী একই পরিবারে একই সঙ্গে একাধিক পুরুষের স্ত্রী হইতে পারে। স্বামীজী যে-পরিবারে অতিথি হিসাবে ছিলেন, সেই পরিবারে ছয় ভাইয়ের এক স্ত্রী ছিল। স্বভাবতই এই ব্যাপারটি স্বামীজীর কাছে বীভৎস বলিয়া মনে হইয়াছিল এবং তিনি এই প্রথার কদর্যতা ঐ পরিবারের পুরুষদের বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। তাহারা স্বামীজীর কথা শুনিয়া খুব বিস্মিত হইয়া বলিয়াছিল: "স্বামীজী, আপনি সাধু হয়ে অপরকে এত স্বার্থপর হতে কি করে বলছেন? স্ত্রী শুধু একজনের জন্য হবে? কী স্বার্থপরতা? এতো অত্যন্ত নিন্দনীয়। আমরা কেন এমন স্বার্থপর হব যে, প্রত্যেকেই একজন করে স্ত্রী রাখব? ভাইয়েরা সবকিছু সমানভাবে পাবে—স্ত্রী পর্যন্ত।" পাহাড়ী মানুষদের এই অদ্ভুত যুক্তি শুনিয়া হতবাক হইলেও তাহাদের অকপটতা ও সরলতা তাঁহাকে মুগ্ধ করিয়াছিল। তিনি ভাবিলেন, তথাকথিত সভ্যসমাজে এই প্রথা বর্বরতা বলিয়া উপহসিত হইবে; কিন্তু মানুষের

মধ্যে সহজাত দেবত্ব না থাকিলে এরূপ স্বার্থ-লেশহীনতা, এই অকপটতা ও সরলতা কি সম্ভব?

রাজস্থানে পরিক্রমাকালে একবার একটি রেল-স্টেশনের প্ল্যাটফর্মে স্বামীজীকে কয়েকদিন থাকিতে হইয়াছিল। সন্ন্যাসী দেখিয়া এবং হয়তো তাঁহার প্রদীপ্ত আকৃতির আকর্ষণে অনেকেই তাঁহার কাছে আসেন এবং আলাপাদি করেন। এইরূপ চলিতেছে। প্রতিদিন লোকের সংখ্যা বৃদ্ধি পাইতেছে। একদল যাইতেছে, আরেক দল আসিতেছে। সকলেই তাঁহার সহিত আলাপ-আলোচনা করিতে চাহে, কিন্তু কেহই তাঁহারা আহারাদি সম্পর্কে কোন খোঁজ লওয়ার প্রয়োজন মনে করে না। তৃতীয় রাত্রে সবাই চলিয়া গেলে এক দীন-দরিদ্র লোক আসিয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল ঃ "মহারাজ, আপনি তিনদিন অনবরত কথাই বলেছেন, জল পান পর্যন্ত করেননি, এতে আমার প্রাণে বড় ব্যথা লেগেছে।" স্বামীজীর মনে হইল, স্বয়ং নারায়ণ বুঝি দীন-দরিদ্র বেশে তাঁহার নিকট আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন। স্বামীজী তাহাকে বলিলেন ঃ "তুমি কি আমাকে কিছু খেতে দেবে?" লোকটি অতি বিনীতভাবে বলিল ঃ "আমার প্রাণ তো তাই চায়; কিন্তু আমার তৈরি রুটি আপনাকে দেব কি করে? আমি যে জাতে চামার। আমি বরং আটা, ডাল এনে দিই, আপনি বানিয়ে নিন।" স্বামীজী বলিলেন ঃ "তোমার তৈরি রুটিই আমায় দাও, আমি তাই খাব।" স্বামীজীর কথায় সে অভিভূত হইয়া গেল, কিন্তু ভয়ও পাইল খুব। সে খেতড়ির রাজার প্রজা। রাজা যদি শোনেন যে, চামার হইয়াও সে সন্ন্যাসীকে তাহার বানানো রুটি খাইতে দিয়াছে, তাহা হইলে তিনি তাহাকে গুরুতর শাস্তি দিবেন, এমনকি ঐ অপরাধে রাজ্য হইতে তাহার বিতাড়িত হওয়াও অসম্ভব নহে। সেকথা সে ভয়ে ভয়ে স্বামীজীকে বলিল। স্বামীজী তাহাকে বলিলেন ঃ "তোমার কোন ভয় নেই, রাজা তোমাকে শাস্তি দেবেন না।"

স্বামীজীর কথায় সে বোধহয় সম্পূর্ণ আশ্বস্ত হইতে পারে নাই, তবে তাহার সহজাত মমতায় এবং সাধুসেবার প্রবল ব্যাকুলতায় নিজের ভবিতব্যকে উপেক্ষা করিয়া সে তাহার স্বহস্তে প্রস্তুত খাবার স্বামীজীকে আনিয়া দিল। স্বামীজী পরবর্তী কালে বলিয়াছিলেন ঃ "সেসময় দেবরাজ ইন্দ্র স্বয়ং স্বর্ণ-পাত্রে সুধা এনে দিলেও তেমন তৃপ্তিকর হতো কিনা সন্দেহ। তার দয়া দেখে আমার চোখে জল এল। ভাবলাম, 'এরূপ কত শত উচ্চহৃদয় মানুষ পর্ণকুটিরে বাস করে, কিন্তু আমাদের চোখে তারা ঘৃণ্য, হীন'।"

স্বামীজী যখন আহার করিতেছেন, তখন সেখানে জনকয়েক ভদ্রলোক আসিয়া উপস্থিত। তাঁহারা বলিলেন ঃ "আপনি যে এই ছোটলোকের ছোঁয়া খাবার খেলেন, এটা কি ভাল হলো?" স্বামীজী বলিলেন ঃ "তোমরা যে এতগুলো ভদ্র-লোক আমাকে তিনদিন ধরে বকালে, কিন্তু আমি কিছু খেলাম কিনা, তার কি খোঁজ নিয়েছ? অথচ এই লোকটিকে তোমরা ছোটলোক বলছ, আর নিজেদের ভদ্রলোক বলে বড়াই করছ। ও যে মনুষ্যত্ব দেখিয়েছে, তাতে ও নীচ হলো কি করে?"

মধ্যপ্রদেশে ভ্রমণকালে স্বামীজী এক মেথর-পরিবারে কিছুদিন বাস করিয়াছিলেন। সেই দরিদ্র, অবহেলিত এবং অস্পৃশ্য শ্রেণীর মানুষগুলির মধ্যে অসাধারণ মহত্ত্ব ও হৃদয়বত্তার পরিচয় তিনি পান।

খেতড়িতে (কেহ কেহ বলেন জয়পুরে) একবার এক বাইজীর গানের আসরে আসিবার জন্য খেতড়ির রাজা স্বামীজীকে অনুরোধ করেন। পরিব্রাজক সন্ন্যাসী দৃঢ়ভাবে তাঁহার অসম্মতি জ্ঞাপন করিয়া বলেন, সন্ন্যাসীর পক্ষে ঐ আসরে যোগদান করা অনুচিত। স্বভাবতই বাইজী স্বামীজীর ঐ কথায় খুব ব্যথিত হন। তাঁহার মনের আর্তিকে ব্যক্ত করিবার জন্যই যেন তিনি তখন সুরদাসের বিখ্যাত ভজনটি গাহিতে শুরু করিলেন ঃ

প্রভু মেরে অবগুণ চিত ন ধরো  
সমদরশী হ্যায় নাম তিহারো,  
চাহো তো পার করো।...

গানটি শুনিয়া স্বামীজীর হৃদয় আকুল হইয়া উঠিল। গানের মাধ্যমে বাইজী যেন তাঁহাকে সেই মহা-সত্যটি স্মরণ করাইয়া দিলেন—সকলের মধ্যেই এক ঈশ্বর বিরাজ করিতেছেন। সাধুর মধ্যেও তিনি, পাপীর মধ্যেও তিনি, সতীর মধ্যেও তিনি, পতিতার মধ্যেও তিনি। স্খলন তো মানুষের জীবনে থাকিবেই, স্খলন না থাকিলে উত্তরণের মহিমা কোথায়? পরবর্তী কালে স্বামীজী বলিয়াছিলেন ঃ "গানটি শুনে আমার মনে হলো, এই কি আমার সন্ন্যাস? আমি সন্ন্যাসী, অথচ আমার ও এই নারীর মধ্যে এখনো আমার ভেদজ্ঞান রয়ে গেছে। সেই ঘটনাতে আমার চোখ খুলে গেল।"

গানটির সর্বশেষ কলিটি ছিলঃ "অজ্ঞানসে ভেদ হৈ, জ্ঞানী কাহে ভেদ করো।"—অজ্ঞান থেকেই সতী-অসতী, পাপী-পুণ্যবানের ভেদ, জ্ঞানে তো কোন ভেদ থাকে না। কথাগুলি যেন স্বামীজীর কানে অগ্নিশলাকার মতো বিদ্ধ হইল। যেন তাঁহার চোখের সম্মুখ হইতে একটা পর্দা উঠিয়া গেল। তিনি আর থাকিতে পারিলেন না। সঙ্গীতসভায় আসিয়া আবেগতপ্ত কণ্ঠে তিনি বাইজীকে বলিলেনঃ "মা, আমি অপরাধ করেছি। তোমাকে ঘৃণা করে তোমার গান শুনতে অস্বীকার করেছিলাম। তোমার গানে আমার চৈতন্য হলো।"

এই ঘটনাটি চিরদিনের জন্য স্বামীজীর মনে এই ভাবটি অঙ্কিত করিয়া দিলঃ "সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম"—"ব্রহ্ম হতে কীট পরমাণু সর্বভূতে সেই প্রেমময়।" আমেরিকায় এক প্রশ্নোত্তর-সভায় একজন সহসা তাঁহাকে প্রশ্ন করিয়াছিলেনঃ "স্বামীজী, অপবিত্রতার ঘনীভূত প্রতিমারূপ বেশ্যাদের দ্বারা সমাজের অমঙ্গল ভিন্ন আর কিছু হয় কি?" করুণার্দ্রকণ্ঠে তৎক্ষণাৎ প্রশ্নকারীর দিকে ফিরিয়া স্বামীজী বলিলেনঃ "পথে তাদের দেখে ঘৃণায় নাসিকা কুঞ্চিত করো না। তারাই বর্মের মতো দাঁড়িয়ে শত শত সতীকে লম্পটের অন্যায় অত্যাচার থেকে রক্ষা করছে বলে তাদের ধন্যবাদ দিও। তাদের ঘৃণা করো না।"

হৃষীকেশে স্বামীজী এক সাধুর দর্শন পাইয়াছিলেন, যাঁহার সৌম্যমূর্তি এবং আচরণ দেখিয়া তাঁহার মনে হইয়াছিল আধ্যাত্মিক অনুভূতির ক্ষেত্রে তিনি অতি উচ্চ অবস্থা লাভ করিয়াছেন। কথাপ্রসঙ্গে স্বামীজীকে সেই সাধুটি বলিয়াছিলেন, তিনিই সেই ব্যক্তি যিনি পওহারী বাবার কুটিরে চুরি করিতে গিয়াছিলেন।

চুরির ঘটনাটি সুপরিচিত ছিল, কিন্তু কাহারও জানা ছিল না তাহার পরবর্তী অধ্যায়টি। সাধুটি স্বামীজীকে বলিয়াছিলেনঃ "পওহারী বাবা যখন নারায়ণজ্ঞানে অকুণ্ঠিত চিত্তে আমাকে তাঁর যথা-সর্বস্ব সমর্পণ করলেন, তখন আমার নিজের ভ্রম ও হীনতা বুঝতে পারলাম এবং তখনই সংকল্প নিলাম যে, না, আর ঐ ঘৃণ্য পথ নয়। তখন থেকেই অর্থের সন্ধানে বিরত হয়ে পারমার্থিক অর্থের সন্ধানে ঘুরতে লাগলাম।"

এই ঘটনাটি স্বামীজী আজীবন মনে রাখিয়া-ছিলেন। তিনি যখন পরবর্তী কালে বলিতেনঃ "পাপীদের মধ্যেও সাধুতার বীজ নিহিত আছে", তখন ঐ সাধুর বিবর্তনের কাহিনী তাঁহার স্মরণ-পথে উদিত হইত, সন্দেহ নাই।

পরিক্রমাকালে অনেক নীচ ও হীন মনোবৃত্তি-সম্পন্ন মানুষের সাক্ষাৎও তিনি পাইয়াছিলেন, নিষ্ঠুর দস্যু ও বিবেকবর্জিত তস্করের মুখোমুখিও তিনি হইয়াছিলেন। কিন্তু উহাদের দেখিয়াও তাঁহার বিশ্বাস টলে নাই। তাঁহার অভিজ্ঞতা তাঁহাকে বলিতে অনুপ্রাণিত করিয়াছেঃ "[আপাতদৃষ্টিতে] ইহারা পাপী; তবে ইহাদের মধ্যেও পুণ্যার্জনের শক্তি সুপ্ত রহিয়াছে।" বেলুড় মঠের প্রাচীন সন্ন্যাসী-সূত্রে শুনিয়াছি, স্বামীজীর মধ্যম ভ্রাতা মহেন্দ্রনাথ স্বামীজীর মুখে একটি কথা বহুবার শুনিয়াছিলেনঃ "There is no saint without a past and no sinner without a future."—এমন কোন মহাজীবন নাই যাঁহার একটি [উত্তরণের] অতীত নাই, এবং এমন কোন পাপী নাই যাহার নাই একটি [রূপান্তরের] ভবিষ্যৎ।

দক্ষিণেশ্বর হইতে হিমালয়, হিমালয় হইতে কন্যা-কুমারী—শত শত যোজন পথ। সেই পথে পর্যটন করিতে করিতে তরুণ সন্ন্যাসী তাঁহার দেশকে দেখিয়া-ছিলেন নিজের চোখে। নিজের অনুভূতিতে তিনি প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন তাঁহার দেশের ঐতিহ্যকে, তাঁহার দেশের অগণিত মানুষকে। সেই প্রত্যক্ষ দর্শন, সেই প্রত্যক্ষ অনুভূতি, সেই প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতাই অবশেষে তাঁহার হৃদয়ে অপরোক্ষ উপলব্ধিতে রূপলাভ করিল কন্যাকুমারীতে—ধ্যানের গভীরে। শিকাগোর ধর্মমহাসভায় যখন তিনি সকলকে "অমৃতের সন্তান" বলিয়া সম্বোধন করিয়াছিলেন তখন উহা তাঁহার বাগ্মিতা বা লেখনীর উচ্ছ্বাস ছিল না, উহার পশ্চাতে ছিল তাঁহার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা ও অপরোক্ষ উপলব্ধিঃ দেবত্বই মানবের যথার্থ স্বরূপ, মানুষই অব্যক্ত ঈশ্বর। সেই উপলব্ধিই বারম্বার মর্মস্পর্শী ভাষায় তাঁহার কণ্ঠে বাঙ্ময় হইয়াছেঃ

"আমরা সেই 'ভগবান'-এর সেবক, অজ্ঞরা যাঁহাকে ভুল করিয়া বলে 'মানুষ'।"

"কোন জীবনই ব্যর্থ হইবে না; জগতে ব্যর্থতা বলিয়া কিছু নাই। শতবার মানুষ নিজেকে আঘাত করিবে, সহস্রবার হোঁচট খাইবে, কিন্তু পরিণামে অনুভব করিবে, সে ঈশ্বর।" □

# স্বামী তুরীয়ানন্দের অপ্রকাশিত পত্র

॥ ৪০ ॥

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণঃ শরণম্ কনখল,

প্রিয় তেজনারায়ণ,* ৮. ৪. (১৯)১২

তোমার ৩১ তারিখের পত্র পাইয়াছি। অনেকদিন পরে তোমার হস্তাক্ষরপাঠে আনন্দ অনুভব করিলাম। তুমি বেশ কাজকর্ম করিতেছ জানিয়া সুখী হইয়াছি। সরল চিত্তে প্রভু যেমন বুঝাইতেছেন সেইরূপভাবে আপনার কোন স্বার্থ-উদ্দেশ্য না রাখিয়া জিজ্ঞাসুদিগকে তাহাদের মতো হইয়া অর্থাৎ তাহারা কোন্ ভাব হইতে প্রশ্নাদি করিতেছে তাহা যথাযথ উপলব্ধি করিবার চেষ্টা করিয়া পরে যাহাতে তাহাদের প্রকৃত উপকার হয় এই ভাবনা মনে রাখিয়া যথাজ্ঞান উপদেশ করিলে সে-উপদেশ সুফল উৎপন্ন করিবেই করিবে, ইহাতে সন্দেহ নাই। হৃদয়ে ভালবাসা ও প্রভুসন্নিধানে অকপট প্রার্থনা থাকিলে সাধকের আর কিছুরই অভাব হয় না। অন্তর্যামী পরমাত্মা তাহার সকল সুবিধা করিয়া দেন। বিনীত ভাব আত্মোন্নতির এক পরম সহায়। শ্রীশ্রীঠাকুর বলিতেন ঃ "নিচু জায়গায় জল জমে, উঁচু থেকে গড়িয়ে যায়"। সকল সদ্‌গুণ বিনয়ীকে আশ্রয় করে। বিনয় এক অদ্ভুত উপাদেয় বস্তু। প্রভু তোমায় বিনয়গুণে ভূষিত করিয়াছেন। আমার বিশ্বাস, তোমার দ্বারা তিনি অনেক সৎকর্ম করাইবেন। করিয়া যাও আপন কার্য যথাশক্তি ও যথাজ্ঞানে। ভাবিও না তাহার ফলাফল, প্রভুপদে সব ন্যস্ত কর। তিনি কল্যাণময়, কল্যাণই করিবেন। তাঁহার পদে মতি থাকিলে কখনও কি লক্ষভ্রষ্ট হইতে হয়? তিনিই যে জীবনের ধ্রুবতারা। তিনিই উদ্দেশ্য তিনিই উপায় এবং তিনিই ফলাফল। যে-ব্রত গ্রহণ করিয়াছ তাহার কি উদ্যাপন আছে? ইহার আদি অন্ত মধ্য সবই যে তিনি। তিনি ভিন্ন অন্য গতি নাই। এ-ব্রতে "শয়নে প্রণাম জ্ঞান, নিদ্রায় কর মাকে ধ্যান,/ আহার কর মনে কর আহুতি দিই শ্যামা মারে।" ইহাতে "যত শোন কর্ণপুটে, সবই মায়ের মন্ত্র বটে,/ কালী পঞ্চাশৎ বর্ণময়ী বর্ণে বর্ণে নাম ধরে।" ইহাতে "আনন্দে রামপ্রসাদ রটে, মা বিরাজেন সর্বঘটে,/ নগর ফের মনে কর প্রদক্ষিণ শ্যামা মারে।" যা চুকে গেল। এ-ব্রতের এই উদ্যাপন। মনে রাখিলে ইহা হইতে লক্ষভ্রষ্ট হইবার উপায় নাই। তিনি সর্বময়ী। আমার শরীর সেইরূপেই চলিতেছে। এখানে আসিয়া গাত্রদাহাদি কিছু কম এই পর্যন্ত। মহারাজের শরীর প্রথম প্রথম ভাল ছিল না, এখন বেশ। মহাপুরুষ বেশ ভাল আছেন। এখানে ভাত, ডাল, রুটি সবই খাইতেছেন ও বেশ হজমও হইতেছে। অন্যান্য সকলেই উপকার বোধ করিতেছে। অমূল্যের একটু অর্শ চাগাইয়াছিল প্রথমে, এখন কিন্তু আর নাই। ভালই আছে। কেদারবাবাও বেশ আছে ৺পুরীতে এবং কলিকাতায় পায়ে বাতের মতো বোধ করিত, এখানে তাহা করিতে হয় না। খুব তপস্যায় মন দিয়াছে। রুদ্রও ভাল আছে বোধহয়, শীঘ্রই কলিকাতা যাইবে। পরে আবার মাদ্রাজ যাইতে পারে। আগামী সংক্রান্তি নূতন গৃহপ্রবেশ উৎসব এখানে সম্পন্ন হইবে। এখানে এখন নিত্য উৎসব বলিলেই হয়। কল্যাণও নিশ্চয় খুব খুশি, সতত অবহিত থাকিয়া সেবা শুশ্রূষায় তৎপর। কোন ত্রুটি হইতে দেয় না। এইরূপে এখানে সবই একরূপ মঙ্গলই বলিতে হইবে। গীতা সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছ আপাতদৃষ্টিতে ঐরূপ মনে হয় বটে, কিন্তু [ বস্তুতঃ ] তাহা নহে। শ্রীধর স্বামী উহা বুঝিয়াছিলেন বোধহয়, তাই তাঁহার স্বয়ং টীকা করিবার প্রবৃত্তি। লিখিয়াছেন সেইরূপ। অর্থাৎ শঙ্কর জ্ঞানপ্রধান। সংসার পরে। তাই ঐরূপ বোধ হয়। ঠাকুরের অদ্বৈত ও শঙ্করের অদ্বৈত ভিন্ন নহে। একই তবে প্রয়োগে application-এ ভিন্ন বোধ হয়। ইহা অন্য পত্রে যখন তোমার বিস্তারিত পত্র পাইব তাহার উত্তরে লিখিবার চেষ্টা করিব। স্বামীজীর পত্র এক অপূর্ব জিনিস। পাঠে যে-ভাব হইল [ তাহা ] বর্ণনাতীত। অনাসক্তির চরম দৃষ্টান্ত। সন্ধ্যাবেলা ঘরের ছেলে ঘরে ফিরিতেছেন। দিনের বেলা খেলাধুলা খুব করিলেন, কিন্তু তাহা আর মনে করিতেছেন না। এখন মাকে মনে পড়িয়াছে, এখন "মা যাবো" ভাব। আমার ভালবাসাদি জানিবে ও জানাইবে। ইতি—

শ্রীতুরীয়ানন্দ

* স্বামী শর্বানন্দ।

# সৎসঙ্গ-রত্নাবলী

## ভগবৎ প্রসঙ্গ

### স্বামী মাধবানন্দ

**১৯৫৬ খ্রীস্টাব্দে নিউইয়র্ক বেদান্ত সোসাইটিতে অনুষ্ঠিত এবং ডিসেম্বর ১৯৬৮ খ্রীস্টাব্দের 'Prabuddha Bharata' পত্রিকায় প্রকাশিত প্রশ্নোত্তরমালার প্রথম অংশের ভাবানুবাদ। ইংরেজী থেকে বাঙলায় অনুবাদ করেছেন স্বামী শরণ্যানন্দ।—সম্পাদক, উদ্বোধন।**

প্রশ্ন—আত্মানুভূতি কাকে বলে ?

উত্তর—পরম সত্যকে প্রত্যক্ষভাবে জানার নামই আত্মানুভূতি। পরম সত্যকেই ঈশ্বর, ব্রহ্ম প্রভৃতি বিভিন্ন নামে অভিহিত করা হয়। অবশ্য 'প্রত্যক্ষভাবে জানা' বললে সঠিক ভাব প্রকাশিত হয় না, কারণ বিষয়জ্ঞান বা ইন্দ্রিয়লব্ধ জ্ঞানকে সাধারণতঃ প্রত্যক্ষ জ্ঞান বলে। আত্মানুভূতি একপ্রকার প্রত্যক্ষ জ্ঞান হলেও তা ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে লাভ করা যায় না। বিষয়টি ব্যাখ্যা করা কঠিন, তাই এই জ্ঞানকে আত্মজ্ঞান বা আত্মানুভূতি বলা হয়। বিষয়জ্ঞানের সঙ্গে এই জ্ঞানের পার্থক্য, এই জ্ঞান অতীন্দ্রিয়-বিষয়ক। কারণ, অনুভূতিকালে ইন্দ্রিয়গুলি নিষ্ক্রিয় হয়ে থাকে, মনও (স্বাভাবিক অবস্থায়) ঐ সময় কাজ করতে পারে না। কেবল শুদ্ধ মনের দ্বারা ঈশ্বরের বা পরমাত্মার সাক্ষাৎ উপলব্ধি হয়।

প্রশ্ন—বিবেক কাকে বলে ?

উত্তর—বেদান্তমতে 'বিবেক' শব্দের অর্থ 'নিত্য-অনিত্য বস্তু-বিচার'। ঈশ্বর বা আত্মা একমাত্র নিত্য বা শাশ্বত বস্তু, যা বর্তমান, অতীত, ভবিষ্যৎ —তিনকালেই অপরিবর্তিত অবস্থায় থাকে এবং জগৎ-সংসার অনিত্য—যা তিনকালে একইরূপে থাকে না। জগতের অস্তিত্ব মাত্র কিছুকালের জন্য, ঈশ্বরের মতো অনন্তকালব্যাপী নয়। এইভাবে ঠিক অনুভূতি নয়—বুদ্ধির সাহায্যে বিচার করে জানা যে, ঈশ্বরই একমাত্র নিত্যবস্তু এবং জগৎ অনিত্য। এই বিচারকে বলে বিবেক। বেদান্তমতে বিবেক-বিচার সাধকের পক্ষে অবশ্য কর্তব্য।

প্রশ্ন—বিবেক-বিচার কিভাবে সাধন করা হয় ?

উত্তর—পূর্বোক্ত বিষয়ের চিন্তা মনের মধ্যে সর্বদা জাগরূক রাখা কর্তব্য। আমরা যেসব বিষয় চিন্তা করি সেগুলি মনের গভীরে প্রবেশ করে থাকে। এই দৃশ্যমান জগৎকে আমরা সত্য বলে মনে করি এবং একে অনেক মূল্য দিয়ে থাকি। প্রকৃতপক্ষে জগতের নিজস্ব কোন মূল্য নেই। আমরাই জগতের বিভিন্ন বিষয়ে মূল্য দিই, তাই জগৎ আমাদের কাছে মূল্যবান বলে প্রতীত হয়। যদি সর্বদা অথবা যতক্ষণ সম্ভব আমরা এমন চিন্তা করতে পারি যে, ঈশ্বরই একমাত্র সত্যবস্তু এবং জগৎ-সংসার অলীক তাহলে আমাদের মন জাগতিক বিষয়ে সর্বদা সতর্ক হয়ে থাকবে (এবং সহজে তার প্রতি আকৃষ্ট হবে না)—এই হলো বিবেক-বিচারের সাধনা। এই বিষয়ে বিষদভাবে ব্যাখ্যা করার প্রয়োজন নেই। এই বিচার আমাদের জীবনে সর্বক্ষেত্রে প্রয়োগ করা উচিত। তৃষ্ণা পেলে লোকে জলপান করতে চায়। যতক্ষণ না জল পাওয়া যায় ততক্ষণ ব্যাকুল হয়ে জলের অনুসন্ধান করতে থাকে। তেমনি বিবেক-বিচাররূপ তৃষ্ণা মনের মধ্যে সর্বদা অথবা যতক্ষণ সম্ভব জাগরূক রাখা উচিত। এছাড়া বিবেক-সাধনার আর কোন নির্দিষ্ট পথ নেই।

যদি আমরা চোখ-কান খোলা রেখে জগতের ঘটনাবলী পর্যবেক্ষণ করি তাহলে দেখতে পাব, এই জগৎ মোটেই সত্য নয়। আমাদের নিজেদের জীবনেই দেখতে পাই, বন্ধু-বান্ধব, আত্মীয়-পরিজন সকলেই একে একে পৃথিবীর মায়া ত্যাগ করে চলে যাচ্ছে। যেসব জিনিস আপন মনে করে ধরে রাখার চেষ্টা করি তাও আমাদের নাগালের বাইরে চলে যায়। আমাদের শরীরও কত দ্রুত পরিবর্তিত হচ্ছে চোখের সামনেই এইসব গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাসমূহ

লক্ষ্য করলে বিবেক-বিচার সহজে সাধন করা যায়, চোখ-কান বন্ধ রাখলে হয় না। জগতের প্রতি আসক্তিবশতঃ আমরা যেন ভুলে না যাই যে, জগৎ সর্বদাই পরিবর্তিত হচ্ছে, সেই সঙ্গে আমাদের শরীরও ক্রমশঃ বিনাশের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। যৌবন, অর্থ, প্রতিষ্ঠা—কোন জিনিসই চিরস্থায়ী নয়, একমাত্র ঈশ্বরই শাশ্বত, নিত্যবস্তু। এটি যদি আমরা সর্বদা চিন্তা করতে পারি এবং মনের মধ্যে দৃঢ়ভাবে তা ধরে রাখতে পারি তবেই বিবেক-সাধন সুষ্ঠুভাবে করা সম্ভব হবে।

প্রশ্ন—শরণাগতি সাধনার উপায় কি?

উত্তর—শরণাগতি তখনই আসে যখন পুরুষকারের সাহায্যে কর্ম সম্পাদন করতে গিয়ে আমরা ব্যর্থ হই। নিজের চেষ্টায় কর্ম সম্পাদন করার পূর্বে আত্মসমর্পণের ভাব আসে না। পূর্ণ শরণাগতি অনেক পরে আসে। যখন অধ্যবসায়ের সঙ্গে কর্ম সম্পাদন করতে গিয়ে আমরা দেখি যে, ঈশ্বরের কৃপাতেই কার্যে সফলতা আসে, তাঁর কৃপা না হলে হয় না, তখনই শরণাগতির ভাব উৎপন্ন হয়। পুরুষকার থেকেই শরণাগতি আসে। যিনি প্রাণপণ অধ্যবসায়ের সঙ্গে সাধনা করেন, তিনিই পূর্ণ-শরণাগতি লাভ করেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ-কথিত জাহাজের মাস্তুলে বসা পাখির কথা স্মরণ করুন। অজ্ঞানবশতঃ পাখিটি বুঝতে পারেনি যে, জাহাজ তীর ছেড়ে সমুদ্রের দিকে যাত্রা শুরু করেছে। কিছুদূরে যাওয়ার পর পাখিটি তীরে ফিরে আসার জন্য একদিকে উড়তে শুরু করে। সেদিকে জমি দেখতে না পেয়ে অন্যদিকে উড়ে যায়। এইভাবে বিভিন্ন দিকে উড়তে গিয়ে যখন সে কোনদিকেই জমি খুঁজে পায় না তখন ফিরে এসে জাহাজের মাস্তুলের ওপরেই আবার নিশ্চেষ্ট হয়ে বসে পড়ে। এই হলো পুরুষকার ও শরণাগতির দৃষ্টান্ত। প্রাণপণ চেষ্টা ও অধ্যবসায়ের সঙ্গে সাধন করলে শেষে শরণাগতি আসে। তখন আমরা বুঝতে পারি যে, সাধন-ভজনের দ্বারা ঈশ্বরলাভের পথে কিছুদূরে পর্যন্ত অগ্রসর হওয়া যায়, কিন্তু তাঁর কৃপা ছাড়া তাঁকে লাভ করা সম্ভব নয়।

প্রশ্ন—মৃত্যুর সময়ে যদি কেউ ইষ্টনাম জপ করে তবে তাকে কি আবার জন্মগ্রহণ করতে হবে?

উত্তর—আমাদের শাস্ত্র বলেন, ঈশ্বরের নামজপ যন্ত্রের মতো করলেও তার দ্বারা কিছু লাভ হয়। অবশ্য মৃত্যুর সময়ে নামজপ করলে আবার জন্ম নিতে হবে কিনা বলা কঠিন। মনের মধ্যে যদি প্রবল বাসনা থাকে, মৃত্যুর সময়ে নামজপ করলেও তাকে আবার জন্মগ্রহণ করতে হবে। অবশ্য জন্ম নিলেও যারা মৃত্যুর সময়ে ঈশ্বরচিন্তা করে না তাদের সঙ্গে এমন ব্যক্তির অনেক পার্থক্য থাকে। জন্মগ্রহণ করার পর পারিপার্শ্বিক অবস্থা তাকে ধর্ম-জীবন গড়ে তুলতে সাহায্য করবে। সুতরাং এর জন্য নিরাশ হওয়া উচিত নয়। আবার জন্ম নিতে হলেও কোন ক্ষতি নেই। আমাদের কর্তব্য যথাসাধ্য ঈশ্বরচিন্তা করা, যাতে মৃত্যুর সময়েও অভ্যাস-বশতঃ তাঁর চিন্তা মনে আসে। মৃত্যুর সময়ে শরীর, মন, ইন্দ্রিয় প্রভৃতি অত্যন্ত দুর্বল হয়ে পড়, অনেক সময় শারীরিক কষ্ট মনকে অবসন্ন করে ফেলে। তাই সর্বদা জপ করার অভ্যাস থাকলে মৃত্যুর সময়েও মনের মধ্যে ঈশ্বরচিন্তা আসার সম্ভাবনা থাকে। এই পবিত্র চিন্তা আমাদের পক্ষে কল্যাণকর হবে এবং তার ফলে দেহত্যাগের পর আমরা ঊর্ধ্বলোকে যেতে পারি অথবা পৃথিবীতে আবার জন্ম নিতেও পারি। পৃথিবীতে এলেও আমরা শুভ সংস্কার নিয়েই আসব এবং অনুকূল পরিবেশ লাভ করে সহজেই ঈশ্বর-লাভের পথে এগিয়ে যেতে পারব।

প্রশ্ন—আমাদের সকলের মধ্যে বিভিন্ন ইন্দ্রিয় আছে। ঈশ্বরলাভ করতে হলে কেন ইন্দ্রিয়গুলিকে সংযত রাখতে হয় এবং স্বাধীনভাবে চলতে দেওয়া উচিত নয়?

উত্তর—আমাদের মধ্যে বিভিন্ন ইন্দ্রিয় আছে সত্য, শুধু আমাদের কেন সকল প্রাণীর মধ্যেই আছে। যদি মনে করি যে, ইন্দ্রিয়গুলিকে স্বাধীন-ভাবে চলতে দেওয়া উচিত, তবে পশুদের সঙ্গে মানুষের কোন তফাৎ থাকে না। তবে অন্যান্য প্রাণীর তুলনায় মানুষের শ্রেষ্ঠত্ব কোথায়? পশুরা সাধারণতঃ নিজেদের সংস্কারের বশে চলে। তাদের এমন কোন শক্তি নেই যাতে তারা ইন্দ্রিয়গুলিকে সংযত করে সৎপথে, বিশেষতঃ ঈশ্বরদর্শনের মতো

উচ্চ আদর্শের পথে চলতে পারে। পশুরা স্বাভাবিক প্রবৃত্তিবশতঃ কর্ম সম্পাদন করে। কিন্তু আমাদের কর্তব্য—শাস্ত্র ও মহাপুরুষদের নির্দেশমত ইন্দ্রিয়-গুলিকে সর্বদা সংযত রাখা।

শ্রীরামকৃষ্ণ সানাইওয়ালার দৃষ্টান্ত দিয়েছেন (ভিন্ন প্রসঙ্গে)। সানাইয়ের মধ্যে কতকগুলি গর্ত থাকে। গর্তগুলিতে আঙুল না লাগিয়ে বাজালে একটা একটানা শব্দ বেরুতে থাকে। কিন্তু আঙুল লাগিয়ে এবং সঠিকভাবে আঙুলগুলি চালনা করে বাজালে সানাই থেকে মধুর সুর বের হয়। আমাদের শরীরে যেসমস্ত শক্তি রয়েছে তার কিয়দংশ ইন্দ্রিয়-দ্বার দিয়ে বেরিয়ে যায়। ইন্দ্রিয়ের পিছনে মন থাকে, যা ইন্দ্রিয় অপেক্ষা শক্তিশালী। মনের সাহায্যেই পরমাত্মার আভাস উপলব্ধি করা যায়।* আবার, কোন স্বচ্ছ জলপূর্ণ হ্রদে একটি মুদ্রা ফেলে দিলে ওপর থেকে মুদ্রাটি দেখা যাবে। তেমনি ইন্দ্রিয়সংযম ও একাগ্রচিত্তে সাধনার দ্বারা চিত্তশুদ্ধ হলে আত্মাকে দর্শন করা যায়। প্রত্যেক ধর্মেই ইন্দ্রিয়সংযম ও চিত্তের একাগ্রতা—এই দুই সাধনার কথা বলা হয়েছে। আমাদের সকলেরই অন্তরে আত্মা রয়েছেন, তাই অন্তরেই তাঁকে দর্শন করার চেষ্টা করা উচিত, বাইরে নয়। সুতরাং ইন্দ্রিয়গুলিকে অসংযত রেখে পশুর মতো জীবন-যাপন অপেক্ষা এগুলিকে সংযত করে সৎপথে চালিত করাই সকলের পক্ষে কল্যাণকর।

প্রশ্ন—ভক্তিলাভের উপায় কি?

উত্তর—এটি একটি বড় প্রশ্ন। ভক্তিলাভের একটি উপায় নয়, বিভিন্ন উপায় আছে। ভক্তির অর্থ ঈশ্বরের প্রতি ভালবাসা। যিনি আমাদের জীবনের শ্রেষ্ঠ আদর্শস্বরূপ। বুদ্ধি বা ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে আমরা যেসব বিষয় প্রত্যক্ষ করি, তাদের প্রতি ভালবাসাকে ভক্তি বলে না। ভক্তিলাভের বিভিন্ন উপায়ের কথা আমাদের শাস্ত্রে বলা হয়েছে।

ভগবানের নামজপ একটি অন্যতম উপায়। কেবল যন্ত্রের মতো নাম উচ্চারণ করলে কিছু ফল-লাভ হলেও বিশেষ ফললাভ হয় না। দীর্ঘকাল নিষ্ঠার সঙ্গে জপ করতে থাকলে অবশ্যই উন্নতি-লাভ হবে। গ্রামোফোনের ডিস্কে ভগবানের নাম রেকর্ড করে বাজালে সেও একরকম জপ হয়, কিন্তু তাতে কারুর কল্যাণ হয় না। ভগবানে চিত্ত নিবিষ্ট করে জপ করতে হয়। আমাদের শাস্ত্র বলেন, যত অনুরাগের সঙ্গে নামজপ করা যায় ততই আমাদের পক্ষে কল্যাণকর। এমনকি অল্প সময়ের জন্যও অনুরাগের সঙ্গে জপ করলে চিত্তশুদ্ধি এবং পরিণামে ঈশ্বরদর্শন হতে পারে।

ভক্তিলাভের দ্বিতীয় উপায়—ধ্যান। পূজা, উপাসনা প্রভৃতির দ্বারাও ভক্তিলাভ হয়। আবার যেসব মহাপুরুষ ঈশ্বরের সাক্ষাৎলাভ করেছেন তাঁদের সঙ্গলাভও ভক্তিলাভের একটি সহজ ও অন্যতম শ্রেষ্ঠ উপায়। এরূপ মহাপুরুষের সান্নিধ্যে থাকলে ঈশ্বরচিন্তা স্বাভাবিকভাবে হতে থাকে। মানবজীবনের শ্রেষ্ঠ আদর্শ ঈশ্বরদর্শন, তাঁরা তা নিজেদের জীবনে রূপায়িত করেছেন। তাই এইসব মহাপুরুষের সঙ্গলাভ করলে আমরাও আদর্শের প্রতি অনুপ্রাণিত হব, তাঁদের মুখমণ্ডল থেকে নির্গত পবিত্রভাব আমাদেরও পবিত্র করবে।

শাস্ত্রপাঠ ও অনুধ্যান আরেকটি উপায়। যাদের ধ্যান করা কঠিন মনে হবে তাদের জন্য একটি সহজ উপায়—ভগবানের কোন সাকার মূর্তির বা ছবির সামনে বসে তাঁর চিন্তা করা। নিরাকার সর্বব্যাপী চৈতন্যেরও ধ্যান করা যায়। ধ্যানই ভক্তিলাভের প্রধান সহায়ক। নিষ্কাম কর্ম, শিব-জ্ঞানে জীবসেবা প্রভৃতির দ্বারাও ভক্তিলাভ হয়।

আমার ধারণা, ভক্তিলাভের উপায় সম্পর্কে যিনি প্রশ্নটি করেছেন তাঁর মধ্যেই ভক্তিভাব আছে, না হলে তিনি এমন প্রশ্ন করতেন না। অপরের মধ্যে ভক্তিভাব সঞ্চার করা অপেক্ষাকৃত কঠিন কাজ। যদি শুভ সংস্কারবশতঃ কারুর মধ্যে ভক্তিভাব প্রকাশিত হয় তবে সাধন-ভজনের দ্বারা তাকে বাড়ানো যায় এবং পরিণামে ঈশ্বরলাভ করাও সম্ভব হয়। যাইহোক, ভক্তিলাভের জন্য যেসব উপায়ের কথা আলোচনা করলাম সেগুলির মধ্যে এক বা একাধিক উপায় অবলম্বন করা যেতে পারে। [ক্রমশঃ]

* এখানে সানাইয়ের সঙ্গে মানবদেহের সাদৃশ্য দেখানো হয়েছে। সানাইয়ের গর্তে সঠিকভাবে আঙুল লাগিয়ে বাজালে যেমন মধুর শব্দ বের হয়, তেমনি ইন্দ্রিয়গুলিকে সংযত করে সৎপথে চালনা করলে আত্মোন্নতি সম্ভব হয়।

নিবন্ধ

# ঈশ্বরপ্রেমিকা রাবেয়া

## স্বামী চৈতন্যানন্দ

আজ থেকে সাড়ে বারোশো-তেরোশো বছর আগের কথা। তুরস্কের (বর্তমান ইরাকের) বসরানগরে একটি দরিদ্র পরিবার ছিল। তিন কন্যা-সন্তান ও স্বামী-স্ত্রী নিয়ে একটি সংসার। দারিদ্র্যের পেষণে জর্জরিত। অন্নবস্ত্রের সংস্থান নেই, রাত্রিবেলা ঘরে আলো জেবলে কোন কাজ করা তো এই পরিবারের কাছে সৌখিনতা। এহেন পরিবারে আবার একটি নবজাতকের আবির্ভাব আসন্ন হলো। জননীর প্রসববেদনা শুরু হলো অন্ধকারময় মধ্যরাত্রে। অন্ধকারের মধ্যেই তিনি প্রসব করলেন একটি কন্যা-সন্তান (৭১৭ খ্রীস্টাব্দ)। পিতা কি করবেন বুঝে উঠতে পারলেন না। প্রসূতির ঘরে যে আলো জেবলে দেবেন, তার কোন সামর্থ্য নেই। নিরুপায় হয়ে একটু তেলের জন্য তিনি প্রতিবেশীদের ঘরে ছুটলেন। কোন গৃহে সামান্যতম তেলও তিনি পেলেন না। দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করলেন, কিন্তু কোথাও পেলেন না। তিনি কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়লেন। বারবার নিজের মাথায় করাঘাত করে বলতে লাগলেন ঃ "হে খোদা, সামান্যতম তেলও ভিক্ষা পেলাম না নবজাত শিশুর মুখ দেখার জন্য।" হতাশাক্লিষ্ট অবসন্ন শরীরকে তিনি বয়ে নিয়ে এলেন জীর্ণ গৃহে। গভীর রাত্রিতে নবজাতক কি তাঁর দারিদ্র্যকে ব্যঙ্গ করতে লাগল? দারিদ্র্য যেন মুখব্যাদান করে তাঁকে গ্রাস করতে এল। তিনি ভীত হয়ে পড়লেন। বুকে একরাশ অসহ্য যন্ত্রণা নিয়ে অন্ধকার গৃহকোণে বাকি রাতটুকু জেগে জেগেই কাটাতে চাইলেন। কোন্ সময়ে একটু তন্দ্রার মতো এলো তাঁর। তিনি এক দিব্যস্বপ্ন দেখলেন। তাঁর অন্ধকার গৃহ হঠাৎ আলোর জ্যোতিতে ও দিব্য সৌরভে ভরে গিয়েছে। তার মধ্যে দাঁড়িয়ে আছেন জ্যোতির্ময় পুরুষ হজরত মহম্মদ। তাঁর চোখ দিয়ে অপার করুণা ঝরে পড়ছে। তিনি মৃদু হেসে অভয় দিয়ে তাঁকে বললেন ঃ

"বৎস, তুমি কেন এরকম বিষণ্ণ হয়েছ? তোমার এই কন্যা উত্তরকালে ধর্মজগতের বহু পুরুষসাধকের সমকক্ষা হবে এবং তার যশোসৌরভ বসরার শ্রেষ্ঠ গোলাপের ন্যায় দিকে দিকে সুগন্ধ বিতরণ করবে।... দারিদ্র্যের জন্য ম্রিয়মাণ হয়ো না, খোদাই তোমার দুঃখের অবসান করবেন। এই কন্যা থেকে তোমার বংশ চিরস্মরণীয় হবে। বসরার আমির গত শুক্রবার তাঁর নিয়মিত দরুদ পাঠ করার বিষয় ভুলে গিয়েছিলেন। তুমি তাঁকে তা স্মরণ করিয়ে দিয়ে বলবে যে, আমি তাঁর এই ভুলের প্রতিদানস্বরূপ তোমাকে চারশত স্বর্ণমুদ্রা তোমাকে দিতে বলেছি। আমির ধর্মশীল, তিনি তোমাকে কখনই প্রত্যাখ্যান করবেন না।"[১]

হজরত মহম্মদ উপরি-উক্ত কথাগুলি বলে অন্তর্হিত হলেন। পিতার ঘুম ভেঙে গেল। তিনি আশ্চর্য হয়ে স্বপ্নের কথা ভাবতে লাগলেন। খোদার করুণার কথা ভেবে তিনি অভিভূত হয়ে পড়লেন। রাত্রি প্রভাত হলেই তিনি স্বপ্নের কথা সত্য কিনা পরীক্ষা করার জন্য আমিরের গৃহে ছুটে গেলেন। স্বপ্নের কথা আমিরকে বলতেই তিনি চিন্তা করে দেখলেন—সত্যি তো, দরুদ পাঠ করতে তিনি ভুলে গেছেন। খোদা কৃপা করে তাঁর ভুল ধরিয়ে দিয়েছেন জেনে তিনি ঐ দরিদ্র ব্যক্তিকে চারশত স্বর্ণমুদ্রা দিলেন এবং দরিদ্রদের মধ্যে দরহাম বিতরণ করলেন।

১ তাপসী রাবেয়া—সৈয়দ এমদাদ আলি, ঢাকা, পৃঃ ৪-৫ [উল্লিখিত উদ্ধৃত অংশটি মূলগ্রন্থে সাধুভাষায় লিখিত। প্রবন্ধকার কর্তৃক চলিত ভাষায় রূপান্তরিত।]

এই নবজাত শিশুকন্যাই সুফী সম্প্রদায়ের বহু-মানিতা সাধিকা রাবেয়া। আরবীতে 'রাবা' শব্দের অর্থ—চতুর্থ। তিনি পিতা-মাতার চতুর্থ সন্তান ছিলেন বলেই তাঁর নাম হয় 'রাবেয়া'।

খোদার আশীর্বাদে আকস্মিক অর্থাগমে এই পরিবারের দারিদ্র্য দূর হয়। রাবেয়ার জন্মই এই অর্থাগমের কারণ বলে বাবা-মা ও বোনেদের কাছে তিনি বিশেষ ভালবাসা ও স্নেহের পাত্রী ছিলেন।

বাবা-মা ও বোনেদের স্নেহে রাবেয়া বড় হতে লাগলেন। যখন রাবেয়া কৈশোর অতিক্রম করে যৌবনে পড়েছেন তখন তাঁর মা মারা যান। সংসারে প্রথম শোকের ছায়া নেমে আসে। শোক নিরাময় হতে না হতেই তাঁর বাবাও ইহলোক পরিত্যাগ করেন। চারটি বোন সম্পূর্ণ সহায়-সম্বলহীন হয়ে পড়েন। এই সময়েই আবার তুরস্কে দারুণ দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়। করাল বিভীষিকাময় দুর্ভিক্ষে চার বোন বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েন। কারোর সঙ্গে কারোর সংযোগ রইল না। কে কোথায়, তার খবর কেউ জানে না। রাবেয়া গিয়ে পড়লেন এক দুর্বৃত্তের হাতে। সে কিছুদিন তার পরিচর্যায় রাবেয়াকে নিযুক্ত করল। তারপর সামান্য কয়েকটি মুদ্রার বিনিময়ে তাঁকে বিক্রি করে দিল এক নিষ্ঠুর ব্যক্তির কাছে। এই নিষ্ঠুর ব্যক্তিও নিজের পরিচর্যায় রাবেয়াকে নিযুক্ত করল। দাসী করে তাঁকে দিয়ে কঠোর পরিশ্রম করাতে লাগল। সারাদিন হাড়ভাঙা পরিশ্রম করেও রাবেয়া মনিবকে প্রসন্ন করতে পারতেন না। উপরন্তু মনিব তাঁর ওপর একের পর এক কাজের বোঝা চাপাতে লাগল। সারাদিনের কঠোর পরিশ্রমে রাবেয়ার শরীর-মন অবসন্ন হয়ে পড়ত। দিনের পর দিন যখন গৃহস্বামীর নির্যাতন বাড়তে লাগল তখন রাবেয়া নিরুপায় হয়ে আত্মরক্ষার জন্য এক রাত্রে গৃহ থেকে পালালেন। ভয়ে সংশয়ে দ্রুত পালাতে গিয়ে তিনি আছাড় খেয়ে রাস্তায় পড়লেন। তাঁর একটি হাত ভেঙে গেল। তিনি মাটিতে পড়ে যন্ত্রণায় কাঁদতে লাগলেন। চারদিক থেকে বিপদ এসে উপস্থিত হওয়ায় তিনি জগৎ অন্ধকারময় দেখলেন। তাঁর অন্তরের অন্তস্তল থেকে খোদার উদ্দেশে বেরিয়ে এল এক করুণ আর্ত প্রার্থনা: "হে আমার খোদা, আমি পিতা-মাতা-ভগিনী-আত্মীয়-স্বজনহীনা এক নিঃসহায়া নারী। এই সংসারে তুমি ছাড়া আমার আর কেউ নেই। বিপদে পড়ে তোমাকে ডাকছি। তুমিই আমার সব। তুমি যদি আমাকে ত্যাগ কর, প্রভো, তবে কে আমাকে গ্রহণ করবে? প্রভো, আমাকে তোমার দ্বারের ধূলায় লুটাতে দাও। হে নাথ, তোমার আশ্রয় ছাড়া আমার যে আর কোন আশ্রয় নেই। হে দয়াল খোদা, তুমি কি তোমার এই দাসীর ওপর বিরূপ হয়েছ?"[২]

রাবেয়ার আকুল প্রার্থনায় প্রেমময় খোদা সাড়া দিলেন। আকাশবাণী হলো: "রাবেয়া, তুমি দুঃখ করো না। মহাবিচারের দিনে তুমি এমন উচ্চাসন লাভ করবে যে, স্বর্গদূতেরাও তোমার গৌরব ঘোষণা করবে।"[৩]

আকাশবাণী শুনে রাবেয়ার সমস্ত দুঃখ এক নিমেষের মধ্যে দূর হলো। দেহের ও মনের সব যাতনা দূর হলো। খোদার আশ্বাসবাণীতে তাঁর শরীর-মন সতেজ হয়ে উঠল। তিনি নতুন ভাবে ও বলে সঞ্জীবিত হলেন। ঈশ্বরের শক্তিতে শক্তিমান হয়ে তিনি আবার ফিরে গেলেন নিষ্ঠুর গৃহস্বামীর কাছে। গৃহস্বামীর পরিচর্যায়, কঠোর পরিশ্রমে তাঁর সারাদিন কাটতে লাগল। আর সমস্ত রাত খোদার আরাধনায় অতিবাহিত করতে লাগলেন তিনি। কোথা দিয়ে যে রাত্রিদিন কেটে যেতে লাগল তা তাঁর হুঁশ থাকত না। সারাদিনের কঠোর পরিশ্রম আর কষ্ট বলে মনে হতো না। সবসময় তাঁর মন পড়ে থাকত প্রভুর চরণকমলে। তাঁর মন সবসময় প্রিয়তমকে পাওয়ার জন্য ব্যাকুল হয়ে উঠত। গভীর রাত্রে খোদার কাছে কেঁদে কেঁদে প্রার্থনা করতেন। এমনিভাবে দিন কাটতে লাগল।

একদিন মধ্যরাত্রে গৃহস্বামীর ঘুম ভেঙে গেল। শুনতে পেল, কে যেন ব্যাকুল হয়ে খোদার কাছে প্রার্থনা করছে। গৃহস্বামী ঘরের বাইরে বেরিয়ে এসে দেখল, রাবেয়ার গৃহ ভেদ করে এক দিব্যজ্যোতি অনন্ত আকাশের বায়ুস্তরের সঙ্গে মিশেছে। জ্যোতির প্রভায় ঘর আলোকিত। তার মধ্যে বসে রাবেয়া খোদার উদ্দেশে প্রার্থনা করছেন:

২ তাপসী রাবেয়া, পৃঃ ১৩-১৪

৩ ঐ, পৃঃ ১৪

"প্রভো! তুমি জান, তোমার আদেশ পালন করাই আমার অন্তরের একমাত্র কামনা। তোমার সেবার জন্য আমার আঁখিজ্যোতি তোমার দ্বারপথে ন্যস্ত রেখেছি। হে প্রভো! আমি যদি স্বাধীন হতাম, একমুহূর্তও তোমার সেবা ছেড়ে দূরে থাকতাম না, সর্বক্ষণই তোমার সেবায় নিজেকে নিযুক্ত রাখতাম। হে হৃদয়দেবতা! তুমি আমাকে পরাধীন করেছ, তাই আমি তোমার সেবায় নিজেকে উজাড় করে দিতে পারছি না।"[৪]

এই অলৌকিক দৃশ্য দেখে ও রাবেয়ার হৃদয়-নিংড়ানো প্রার্থনা শুনে নিষ্ঠুর গৃহস্বামীর অন্তর তাঁর প্রতি শ্রদ্ধায় ভরে গেল। নিজ কৃতকর্মের জন্য তার অনুশোচনা হলো—এরকম শ্রদ্ধেয়া নারীকে নিজের পরিচর্যা করানো ঠিক হয়নি। তার উচিত তাঁরই সেবা করা। যাই হোক, পরের দিন ভোরবেলা রাবেয়াকে দাসীত্ব থেকে মুক্তি দিয়ে সে বলল: "যদি তুমি এখানে থাক, আমি তোমার দাস হয়ে সেবা করব।"[৫]

ঈশ্বরকে পাওয়ার ব্যাকুলতায় রাবেয়া অধীর হয়ে উঠেছেন। তিনি গৃহস্বামীর অনুমতি নিয়ে বেরিয়ে পড়লেন। নিজেকে কঠোর তপস্যায় নিয়োজিত করলেন তিনি। দিনরাত পবিত্র কোরান পাঠ ও খোদার আরাধনায় তিনি কাটাতে লাগলেন। শোনা যায়, তিনি দিনে হাজারবার রাকাত নামাজ পড়তেন। তিনি কিছুদিন নির্জন অরণ্যে যোগ-সাধনাও করেছেন। কৃচ্ছ্রসাধন তাঁর সারাজীবনের ভূষণ ছিল। তাঁর উপাধান ছিল এক টুকরো পাথর এবং বিছানা একটি ছেঁড়া মাদুর মাত্র। কেউ কিছু জোর করে দিতে চাইলে তিনি দৃঢ়-ভাবে তা প্রত্যাখ্যান করতেন। সম্পূর্ণ অপরিগ্রহ এবং ঈশ্বরনির্ভরতার মূর্তপ্রতীক ছিলেন তিনি।

বসরার উন্নত এক সাধক হাসান একদিন রাবেয়ার কাছে যাওয়ার সময় তাঁর কুঠিয়ার সামনে দেখলেন, এক ধনবান ব্যক্তি বহু ধন নিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন। হাসান তাঁর দাঁড়াবার কারণ জিজ্ঞাসা করায় তিনি বলেন: "তাপসী রাবেয়ার জন্য কিছু অর্থ উপহার এনেছি, কিন্তু তিনি সংসার-বিরাগিণী। ভয় হচ্ছে, পাছে তিনি এই অর্থ গ্রহণ না করেন। আপনি যদি অনুগ্রহ করে তাঁকে অনুরোধ করেন আমার এই অর্থ গ্রহণ করার জন্য তাহলে হয়তো তিনি আপনার কথা প্রত্যাখ্যান করবেন না।"

হাসান ধনবান ব্যক্তির অনুরোধে রাবেয়ার কাছে গিয়ে সমস্ত ঘটনাটি বর্ণনা করেন এবং তাঁকে কিছু অর্থ গ্রহণ করার জন্য অনুরোধও করেন। রাবেয়া রাগান্বিতা হয়ে বললেন: "তাপস, আপনি দেখেছেন, কত লোক সারাজীবন সৃষ্টিকর্তার কথা স্মরণও করে না, কত লোক অবিরত তাঁর নিন্দা করে রসনা কলুষিত করে, আবার কেউ বা তাঁর আদেশের বিরুদ্ধে অবিরত দণ্ডায়মান হয়। তথাপি খোদা এমনই দয়ালু যে, তাদের সব ত্রুটির কথা ভুলে গিয়ে তিনি প্রতিদিন তাদের আহার যোগাচ্ছেন। আর তাঁর এই ভক্তের হৃদয়ে একমাত্র তাঁর প্রেম ছাড়া অন্য কিছু স্থান পায় না। যে নিজের যথাসর্বস্ব তাঁকেই সঁপে দিয়ে রিক্ত হয়েছে, তিনি কি তাঁর সেই প্রেমার্থিনীকে ক্ষুধায় সামান্য খাদ্য এবং পিপাসায় দু-ফোঁটা জল দিতে কুণ্ঠিত হবেন? যেদিন থেকে আমি তাঁকে জেনেছি, তাঁকে নিজ স্বামীরূপে, বিশ্বপতিরূপে ভাবতে শিখেছি, সেই-দিন থেকে তো আমার আর কোন কিছুর অভাব নেই। অতএব আমি এই ধন গ্রহণ করে খোদার নিকট দোষী হতে পারব না।"[৬] হজরত মহম্মদ বলেছেন: "দারিদ্র্যই আমার গৌরব।"[৭] তাই দারিদ্র্যকে রাবেয়া ভূষণ করে নিয়েছিলেন।

রাবেয়া ছিলেন একান্ত ঈশ্বরনির্ভরশীল। অন্য কারোর মুখাপেক্ষী হয়ে তিনি চলতেন না। তিনি তাঁর প্রেমময়ের ইচ্ছার বিরুদ্ধে কোন কাজ করতেন না। প্রেমময় যেভাবে যখন তাঁকে রাখতেন তাতেই তিনি সন্তুষ্ট থাকতেন। তাঁর দেওয়া যে-কোন দানকে রাবেয়া হাসিমুখে মেনে নিতেন। তিনি সুখে দুঃখে সদা প্রশান্ত থাকতেন। অতি তুচ্ছ ব্যাপারের মধ্যেও তাঁর ঐকান্তিক ঈশ্বর-নির্ভরতার পরিচয় পাওয়া যেত। একদিন এক

৪ তাপসী রাবেয়া, পৃঃ ১৮

৫ তাপসমালা, ১ম ভাগ, ৭ম সং, ১৯২৬, কলকাতা, পৃঃ ৫৪

৬ ঐ, পৃঃ ৩৯-৪০

৭ ঐ, পৃঃ ৫৮

যুবক মাথায় একটি কাপড়ের পট্টি বেঁধে রাবেয়ার কাছে উপস্থিত হলো। রাবেয়া তাকে জিজ্ঞাসা করলেন : "তুমি মাথায় পট্টি বেঁধেছ কেন?" উত্তরে যুবকটি বলল : "মাথাযন্ত্রণার জন্য।" রাবেয়া : "তোমার বয়স কত?" যুবক : "তিরিশ বছর।" রাবেয়া : "এতকাল তুমি সুস্থ না অসুস্থ ছিলে?" যুবক : "সর্বদা সুস্থ শরীরেই ছিলাম।" রাবেয়া : "এতকাল কৃতজ্ঞতার চিহ্ন তুমি মাথায় বাঁধলে না, একদিন যেই অসুস্থ হয়েছ অমনি গ্লানির চিহ্ন মাথায় ধারণ করেছ!"[৮]

খোদার বাণীতে তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস ছিল। দুজন সাধু ব্যক্তি রাবেয়াকে দর্শন করতে এসেছেন। তাঁরা ক্ষুধার্ত। রাবেয়ার কাছে তাঁরা কিছু খেতে চাইলেন। রাবেয়া দুখানা রুটি বের করলেন। এমন সময় একজন ভিক্ষুক এসে তাঁর কাছে ভিক্ষা চাইল। তিনি দু-খানা রুটি ভিক্ষুককে দিয়ে দিলেন। সাধু-দুজন খুব রেগে গেলেন। এই সময় এক ধনীবাড়ির দাসী এসে তাঁকে বেশ কয়েকখানি রুটি দিল। তিনি গুণে দেখেন, আঠারোখানা রুটি। তিনি রুটিগুলি তাকে ফেরত দিয়ে বললেন : "যিনি পাঠিয়েছেন, ভুল করে পাঠিয়েছেন। তুমি ফেরত নিয়ে যাও।" দাসীটি ফিরে গিয়ে সমস্ত ঘটনাটি গৃহকর্ত্রীকে বলল। গৃহকর্ত্রী আঠারোখানার সঙ্গে আরও দু-খানা রুটি যোগ করে দাসীকে পুনরায় রাবেয়ার কাছে পাঠালেন। রাবেয়া এবার গুণে দেখেন, বিশখানা রুটি আছে। তিনি দাসীকে বললেন, এবার ঠিক আছে।

সাধু-দুজন বসে বসে সবকিছু দেখছিলেন। রাবেয়া বিশখানা রুটি দু-জনকে ভাগ করে দিলেন। তাঁরা রাবেয়াকে জিজ্ঞাসা করলেন : "আঠারোখানা না নিয়ে বিশখানা নিলেন কেন?" রাবেয়া বললেন : "খোদা বলেছেন না যে, একগুণ দেবে—দশগুণ পাবে। কাজেই যখন আঠারোখানা রুটি নিয়ে এল তখন বুঝলাম, গৃহকর্ত্রী ভুল করেই পাঠিয়েছেন তাই ফেরত দিয়েছিলাম। বিশখানা নিয়ে আসাতে তবে নিলাম। খোদার বাণী তো কখনো মিথ্যা হতে পারে না।"

বাইরের সুন্দর জগৎ অন্তর্জগতের তুলনায় রাবেয়ার কাছে অতি তুচ্ছ বলে মনে হতো। তিনি মনে করতেন, অন্তর্জগতের দৃশ্য সাধারণ মানুষ দেখতে জানে না বলে বাইরের জগতের দৃশ্যাবলী দেখে চমৎকৃত হয়। যদি একবার অন্তর্জগতের দিকে মানুষ তার দৃষ্টিকে ফেরাত তাহলে সে অভিভূত হয়ে যেত। তখন বাইরের জগৎ আর তার ভাল লাগত না। অন্তর্জগৎকে নিয়েই সে মশগুল হয়ে থাকত। রাবেয়া অন্তর্জগতের মধ্যে সর্বদা তন্ময় হয়ে থাকতেন। একদিন তিনি কুটিরের ভিতরে আছেন। তাঁর সেবিকা তাঁকে বাইরে আসার জন্য ডাকছেন আর বলছেন : "একবার বাইরে এসে দেখুন, বসন্তের আগমনে প্রকৃতি আজ কী মোহন বেশে সেজেছে!" কুটিরের ভিতর থেকে রাবেয়া উত্তর দিলেন : "বাইরে গিয়ে আমি পৃথিবীর ক্ষণিকের শোভা ও সম্পদ কি দেখব? তুমি ভিতরে এসে, যিনি পৃথিবীতে এই বসন্তের সূচনা করেছেন তাঁকে দেখে যাও। সেই রূপ তুলনারহিত, বাক্য ও মনের অতীত!"[৯]

খোদার প্রতি ভালবাসা ছিল তাঁর অন্তর জুড়ে। সেখানে আর কারোর প্রবেশাধিকার ছিল না। তিনি খোদাকেই তাঁর প্রেমের বরমাল্য প্রদান করেছিলেন। একবার তাপস হাসান চিরকুমারী রাবেয়াকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, তাঁর কোন বিবাহের অভিলাষ আছে কিনা। উত্তরে তিনি বলেছিলেন : "দেহের সঙ্গেই বিবাহের সম্বন্ধ, কিন্তু আমার দেহ কোথায়? আমি যে আমার দেহ-মন সবই বিশ্বেশ্বরের চরণে উপহার দিয়েছি। দেহ এখন খোদার, তা তাঁর কার্যেই নিযুক্ত আছে।"[১০] আর একবার বসরার তদানীন্তন শাসক সুলেমন তাঁকে বিবাহের যৌতুকস্বরূপ বহু অর্থ দেওয়ার প্রস্তাব করেছিলেন। রাবেয়া কঠোর ভাষায় তাঁকে বলেছিলেন : "তোমার উচিত নয় এক মুহূর্তের জন্যও আমার মনকে ঈশ্বরের পাদপদ্ম থেকে দূরে সরিয়ে দেওয়া। তুমি আমাকে যেসব দিতে চাইছ, ঈশ্বর আমাকে সেসব দিতে পারেন—এমনকি বহুগুণ বেশি।" এইভাবে রাবেয়াকে অনেক গণ্যমান্য ব্যক্তি বিবাহের প্রস্তাব দিয়েছিলেন; কিন্তু তিনি প্রত্যেক প্রস্তাবই প্রত্যাখ্যান করেছিলেন।

৮ তাপসমালা, ১ম ভাগ, পৃঃ ৫৬

৯ ঐ, পৃঃ ৩৭

১০ ঐ, পৃঃ ২৩

কোন প্রতিদানের প্রত্যাশায় তিনি খোদাকে ভালবাসতেন না। ভালবেসেই তাঁর আনন্দ। ভালবাসার জন্যই ভালবাসা। কামনাশূন্য হয়েই তিনি ভালবাসতেন তাঁর প্রিয়তম খোদাকে। তিনি খোদার কাছে প্রার্থনা করতেন ঃ "পরমেশ্বর, তুমি ইহলোকে যাকিছু আমার জন্য নির্দিষ্ট করেছ, তা তোমার শত্রুকে দাও, পরলোকে যাকিছু তা তোমার বন্ধুকে দাও, তুমিই আমার পক্ষে যথেষ্ট, আমি আর কিছু চাই না। হে ঈশ্বর, যদি নরকের ভয়ে আমি তোমার পূজা করি, আমাকে নরকালয়ে দগ্ধ কর। যদি স্বর্গলোভে তোমার সেবা করি, আমার পক্ষে তা অবৈধ কর। যদি শুধু তোমার জন্যই তোমার পূজা করে থাকি, তবে তোমার সৌন্দর্য উজ্জ্বল-রূপে দর্শন করতে আমাকে বঞ্চিত করো না।"[১১]

তাঁর সামনে যারা কামনা-বাসনা পূরণের জন্য বা নরকের ভয়ে খোদার উপাসনার কথা আলোচনা করত, তিনি তাদের ওপর বিরক্ত হতেন। তিনি তিরস্কার করে তাদের বলতেন ঃ "তোমরা নিতান্তই অধম। তোমরা একজন নরকের যন্ত্রণা থেকে পরিত্রাণ পাবার জন্য, আরেকজন স্বর্গের অনন্ত সুখের আশায় জগৎকর্তার সেবা করে থাক, কিন্তু কেউই তো তোমরা আকাঙ্ক্ষাবিহীন হয়ে বিশ্ব-নিয়ন্তার সেবায় আত্মসমর্পণ কর না। যে-সাধনা কামনাহীন নয়, যাতে লাভের আশা থাকে, যাতে আমিত্বের সত্তা পূর্ণ বিরাজিত, তা তো সেবারূপে পরিগণিত হতে পারে না। যদি স্বর্গ ও নরক বলে কিছু না থাকত তবে কি কেউ স্রষ্টার সেবা করত না? তাঁকে সমস্ত হৃদয় দিয়ে সেবা করতে হলে নিজেকে ভুলতে হবে, নিজের সমুদয় কামনা বিসর্জন দিতে হবে, তবে তো তিনি সেবকের প্রতি সদয় হবেন। খোদার প্রেম পণ্যদ্রব্য নয়, তা সেবা দ্বারা লাভ করতে হয়। যাঁরা প্রকৃত ভক্ত তাঁরা নিবৃত্তি পথেই তাঁকে পাবার জন্য জীবনব্যাপী সাধনায় প্রবৃত্ত হন এবং যেদিন তাঁরা সিদ্ধ হন, সেদিন তাঁদের এমন কিছু থাকে না যা তাঁরা আপন বলে দাবি করতে পারেন, কারণ তখন তাঁরা সর্বস্ব বিশ্বেশ্বরে সমর্পণ করে বিশ্বেশ্বরময় হয়ে যান।"[১২]

রাবেয়া বিশ্বেশ্বরের নিকটে নিজেকে সমর্পণ করেছিলেন। তিনি বিশ্বেশ্বরের প্রেমে প্রেমময় হয়ে-ছিলেন। জগৎ-সংসারের সর্বত্র তিনি সেই প্রেমময়ের স্পর্শ অনুভব করতেন। তাই দেখি, ঈশ্বরপ্রসঙ্গ ছাড়া অন্য কোন প্রসঙ্গ তিনি সহ্য করতে পারতেন না। একবার এক সাধু তাঁর সামনে সাংসারিক দুঃখকষ্টের কথা উত্থাপন করলে তিনি বিরক্ত হয়ে বলেন ঃ "তুমি তো অত্যন্ত সংসারপ্রেমিক, তা না হলে ঈশ্বরপ্রসঙ্গ ছেড়ে অন্য প্রসঙ্গ করতে না। সংসারবিরাগী সংসারের ভালমন্দ নিয়ে আলোচনা করে না, সংসারকে স্মরণও করে না। যে যাকে ভালবাসে, সে তার প্রসঙ্গ অধিক করে থাকে।"[১৩]

বৃদ্ধ বয়সে রাবেয়া প্রায় সবসময় ব্যাকুল হয়ে কাঁদতেন। সাধারণ মানুষ ভাবত, তিনি বুঝি কোন রোগযন্ত্রণায় কাঁদছেন। আবার তাঁর শরীরে অসুখের কোন চিহ্ন না দেখতে পেয়ে তারা বুঝতে পারত না, তাঁর ঠিক কি হয়েছে। তারা কান্নার কারণ জিজ্ঞাসা করলে তিনি বলতেন ঃ "আমার রোগ আছে, সেই রোগ হৃদয়ের অভ্যন্তরে। সংসারের কোন চিকিৎসক তার ঔষধ জানে না। আমার রোগের ঔষধ তাঁর (খোদার) সান্নিধ্য।"[১৪]

রাবেয়ার মান-অভিমান, নির্ভরতা—সবকিছুই তাঁর প্রিয়তম খোদার ওপরেই। বৃদ্ধবয়সে তিনি একবার প্রতিবেশীদের সঙ্গে মক্কাতীর্থে রওনা হয়েছিলেন। গাধার পিঠে চড়ে তাঁরা যাচ্ছিলেন। রাবেয়ার গাধাটি ছিল বৃদ্ধ। মরুভূমির মধ্য দিয়ে যেতে যেতে হঠাৎ তাঁর গাধাটি মারা গেল। সঙ্গীরা প্রমাদ গুণলেন। সঙ্গীরা সাহায্যের জন্য এগিয়ে গেলেন তাঁর কাছে। তিনি বললেন ঃ "তোমাদের ওপর নির্ভর করে আমি তীর্থযাত্রা করিনি। যাঁর ওপর নির্ভর করে বেরিয়েছি, তিনিই আমাকে সাহায্য করবেন। তোমরা এগিয়ে যাও।" রাবেয়ার কথাগুলি এমন তেজস্বিতায় পূর্ণ ছিল যে, সঙ্গীরা তাঁকে ত্যাগ করে যেতে বাধ্য হলো। সবাই চলে গেলে রাবেয়া নির্জনে খোদার কাছে অভিমান করে বলছেন ঃ "হে সর্বশক্তিমান বিরাট পুরুষ, তুমি তো জান আমি একা বৃদ্ধা নারী—গুণহীনা, শক্তি-

১১ তাপসমালা, ১ম ভাগ, পৃঃ ৬০
১৩ তাপসমালা ১ম ভাগ, পৃঃ ৫৭
১২ তাপসী রাবেয়া, পৃঃ ৪৩-৪৫
১৪ ঐ, পৃঃ ৫৮

হীনা, তবে তুমি আমার সঙ্গে একি খেলা খেলছ? আমি কি তোমার খেলার যোগ্যা? আল্লা, তুমি নিজেই আমাকে তোমার গৃহের দিকে আহ্বান করেছ, আর আমি যখন এই জনহীন প্রান্তরে এসে পড়েছি, ঠিক সেই সময় তুমি আমার একমাত্র সম্বল বাহনটির প্রাণ হরণ করলে? আমাকে এইরূপ নিঃসহায় অবস্থায় ত্যাগ করতে কি তোমার একটুও কষ্ট হলো না? একি তোমার দয়া, প্রভু?"[১৫] হঠাৎ দেখা গেল, রাবেয়ার বৃদ্ধ গাধাটি পুনর্জীবিত হয়ে উঠেছে। পুনর্জীবনলাভের পর গাধাটি যেন যৌবনের শক্তি ফিরে পেয়েছে। গাধাটিকে নিয়ে রাবেয়া মক্কার উদ্দেশে পুনরায় রওনা হলেন এবং শীঘ্র তাঁর সঙ্গীদের ধরে ফেললেন।

রাবেয়া অসুস্থ। বিছানায় শুয়ে আছেন। তাঁকে দর্শন করতে কয়েকজন মহাত্মা এলেন। তাঁদের মধ্যে ছিলেন একজন সুফী সাধক। তিনি রাবেয়ার কষ্ট দেখে দুঃখ পাচ্ছিলেন। তিনি রাবেয়াকে অনুরোধ করলেন, তাঁর রোগ ভাল করে দেওয়ার জন্য খোদার কাছে প্রার্থনা জানাতে। রাবেয়া তাঁর দিকে চেয়ে ধীরে ধীরে বললেন: "তোমার কি এটা জানা নেই যে, কার আদেশে এই পীড়া হয়েছে? খোদার ইচ্ছানুযায়ীই কি আমি পীড়িত হইনি?" সাধক সম্মতিসূচক উত্তর দিলে তিনি আবার বলতে লাগলেন: "তুমি জান যে, খোদাই আমাকে এই পীড়া দিয়েছেন, তবে তুমি তাঁর ইচ্ছার বিরুদ্ধে আমাকে কেমন করে প্রার্থনা করতে বলছ? সখার যা ইচ্ছা তা-ই পূর্ণ হোক, তাঁর ইচ্ছার বিরুদ্ধে কিছু করা কর্তব্যও নয়, বাঞ্ছনীয়ও নয়।" এবার সুফী সাধক তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, তাঁর কিছু খেতে ইচ্ছা করে কিনা। রাবেয়া বললেন: "তুমি জ্ঞানবান হয়ে এরূপ কথা জিজ্ঞাসা করছ? একদিন নয়, দুদিন নয়, আজ দশ বছর ধরে আমার মনে সরস খোর্মা ফল খাওয়ার ইচ্ছা হয়েছে।... বসরায় খোর্মার অভাব নেই, তবুও আমি নিজের প্রবৃত্তিকে প্রশ্রয় দিইনি। আমি খোদার দাসী, দাসীর আবার নিজের ইচ্ছা-অনিচ্ছা কি? প্রভুর ইচ্ছাই আমার ইচ্ছা। আমি তাঁর ইচ্ছার বিরুদ্ধে কিছু করতে পারি না।"[১৬]

৮০১ খ্রীস্টাব্দ। ধীরে ধীরে অন্তিম সময় ঘনিয়ে এল। সাধুমণ্ডলী রাবেয়াকে ঘিরে বসে আছেন। তিনি তাঁদের বললেন: "আপনারা একটু সরে যান, খোদার প্রেরিত দূতেরা নিকটে আসবে, পথ ছেড়ে দিন।" উপস্থিত সাধুমণ্ডলী দরজার কপাট বন্ধ করে দিয়ে বাইরে গেলেন। বাইরে থেকে তাঁরা শুনতে পেলেন, রাবেয়ার করুণ কণ্ঠস্বর: "হে আমার মন, খোদার কাছে নিজেকে সঁপে দাও।" তারপর আর কোন শব্দ নেই। কিছু সময় পরে সাধুমণ্ডলী ঘরের ভিতর গিয়ে দেখেন, রাবেয়ার নশ্বর দেহ পড়ে রয়েছে। প্রিয়তমা তাঁর প্রিয়তমের সঙ্গে মিলিত হয়েছেন। □

১৫ তাপসী রাবেয়া, পৃঃ ৫১-৫২

১৬ ঐ, পৃঃ ৬২-৬৩

□ **স্বামীজীর ভারত-পরিক্রমা** এবং **শিকাগো ধর্মমহাসম্মেলনে স্বামীজীর আবির্ভাবের শতবার্ষিকী উপলক্ষে উদ্বোধন কার্যালয়** থেকে **স্বামী পূর্ণাত্মানন্দের** সম্পাদনায় **বিশ্বপথিক বিবেকানন্দ** শিরোনামে একটি **সংকলন-গ্রন্থ** প্রকাশের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। **'উদ্বোধন'**-এর বিভিন্ন সংখ্যায় **স্বামীজীর ভারত-পরিক্রমা** এবং **শিকাগো ধর্মমহাসভায় স্বামী বিবেকানন্দ** সম্পর্কে যেসব **প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে ও হচ্ছে** সেগুলি ঐ **সংকলন-গ্রন্থে** স্থান পাবে। এছাড়াও উভয় ঘটনার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট অন্যান্য মূল্যবান সংবাদ এবং তথ্যও ঐ গ্রন্থে অন্তর্ভুক্ত হবে।

□ **গ্রন্থটির সম্ভাব্য প্রকাশকাল: সেপ্টেম্বর ১৯৯৪।**

□ **গ্রন্থটি সংগ্রহের জন্য অগ্রিম গ্রাহকভুক্তির প্রয়োজন নেই।**

**কার্যাধ্যক্ষ**
**উদ্বোধন কার্যালয়**

**১ শ্রাবণ ১৪০০ / ১৭ জুলাই ১৯৯৩**

কবিতা

## রামকৃষ্ণদেবকে মনে রেখে

### মহীতোষ বিশ্বাস

বিশ্বাসের দুর্গগুলো বড় ম্লান হয়ে যায়
ভিত থেকে সরে যায় মাটি,
আগাপাস্তলা জমে পিচ্ছিল শৈবাল
নাভিকুণ্ড নাদহীন, স্রোত-মূল সুদূরে মিলায়।
অন্তহীন নিরর্থক পথ হাঁটাহাঁটি
গঙ্গাবক্ষে শুধু জল, ধ্বনি নেই
শুধু কোলাহল। চারিদিকে জমে শুধু
ধর্মসন্ধ ভাড়, যত মত তত পথ
ভেসে যায় হিংসার বন্যায়,
ভাইয়ের দুচোখে প্রেম নেই
বন্ধুতা, সে অলীক কল্পনা
গোপনে শাণিত ছুরি তোলে হিংস্র ফণা।

অথচ তোমার চোখে
কী গভীর প্রেম ছিল,
অম্লান পুষ্পের মতো কথাগুলো
গভীর প্রত্যয়ে বাণী হয়ে
কথামৃত হতো।
বিশ্বাসীরা পথ পেতো, অবিশ্বাসী
হতো অবনত।
মানুষী কায়াকে ঘিরে
সত্তায় দৈবীর মহিম্ন প্রকাশ।

হে তমোঘ্ন জ্যোতির্ময়,
সেই অলৌকিক সরলতা-
মণ্ডিত বিভায়
আমাদের চতুর্দিকে করো উচ্চারণ
—"তোমাদের চৈতন্য হোক"
—"তোমাদের চৈতন্য হোক।"

শান্তিমন্ত্রে অভীমন্ত্রে পূর্ণাঙ্গ জীবন।

## দ্বারকার সমুদ্রতীরে

### অনিলেন্দু চক্রবর্তী

দ্বারকার মুখোমুখি আরব সমুদ্রে অস্ত যায়
একালের ক্লান্ত সূর্য। পশ্চিম আকাশে শব্দহীন
উজ্জ্বল উৎসবে কী আশ্চর্য প্রশান্ত সুষমা,
নিঃসীম সলিলে মর্ত্য অমর্ত্য প্রচ্ছায়া।

সমুদ্রস্নানের শেষে বসে আছি পবিত্র সৈকতে
তরঙ্গিত ফেনমালা বারংবার দ্বারকাকে ছুঁয়ে সরে যায়।
স্থিতধী শংকরাচার্য সারদাম্বা মন্দিরের মধ্যে ধ্যানমগ্ন ঃ
জগন্মাতার ত্রিনয়নে কী দেখে সে ত্রিকালের পটে।

বালুবেলা থেকে উঠে যাই সুদীর্ঘ সোপান বেয়ে
দ্বারকানাথের মন্দির-মণ্ডপে,
শীর্ষদেশে দেখি, কী সুন্দর
প্রফুল্ল পতাকা কালজয়ী হোলিরঙে রাঙা।
পশ্চিমভারত মহা ইতিবৃত্তে লেখে দ্বারকানাথের
প্রণয় ও সংগ্রামের মৃত্যুঞ্জয়ী প্রাণলীলা—
বৃন্দাবন-মথুরায়, ইন্দ্রপ্রস্থ-কুরুক্ষেত্রে, দ্বারকা-প্রভাসে।

কালের প্লাবনে বারংবার নিমজ্জিত হলো দ্বারকার
কীর্তিচূড়া, দেখা দিল বারংবার নব কলেবরে।
সমুদ্রের তলা থেকে প্রোথিত অতীত লক্ষ হাতে
দ্বারকাকে তুলে ধরে ভবিষ্যের দিকে ঃ দ্বারকা নগরী
অতীত ও ভবিষ্যের অদ্বিতীয় মিলন-মণ্ডপ।

## শতাব্দীর তারা

### শান্তিকুমার ঘোষ

এধারে সূর্যাস্তে গাঢ় ফসলখেত,
ওপাশে সার-বন্দী সরল গাছের ফাঁকে ফাঁকে
ফল্গুর বিস্তার;
মাঝখানে হৃদয়ের কেটে দিয়েছে পথ।
বুদ্ধগয়ায় বড় মন্দিরের তুঙ্গ চূড়া ঘেঁষে
শতাব্দীর প্রোজ্জ্বল তারা।
বট-অশ্বত্থের মাথায়
বৈশাখী পূর্ণিমার চাঁদ।
অকিঞ্চন নুয়ে আছে মাথা।
তার আর কী-ই বা থাকে ত্যাগ করবার।
সেকি বুঝতে পারে দুঃখের স্বরূপ ঃ
যাচঞা করে দেব-করুণা॥

# আমার বুকের মধ্যে

## নচিকেতা ভরদ্বাজ

আমার বুকের মধ্যে এত আলো রাখিতে পারি না,
আমার বুকের মধ্যে এত গন্ধ বহিতে পারি না,
আমার বুকের মধ্যে আজ এত অমৃত-যন্ত্রণা,
এত সুখ, এত স্বপ্ন, এত রাত্রি, সম্পন্ন সচ্ছল দিনের
উন্মীলন, এত শব্দ, এত শান্তি,
এত দুঃখ আনন্দ অপার,
আমার বুকের মধ্যে সাত সাগর ঊর্মি-কলস্বনা।
আমার বুকের মধ্যে আজ এত অনুভূতি,
মহাজীবনের রূপোদ্ধত জয়োল্লাস,
বিদীর্ণ আলোকমালার অপরূপ অপাবৃত্তি,
এত প্রাণ-প্রীতি আর পারি না সহিতে।
আমার সমগ্র সত্তা সীমাহীন স্বপ্নে সঙ্গীতে
শতধা বিদীর্ণ হচ্ছে, সমগ্র আশা ও ইচ্ছা-বাসনার
উন্মীলনে অন্তহীন অনিবার্য হৃদয় আমার
মুক্তি চায়।
কী যেন করিতে চাই—করিতে পারি না।
কী যেন বলিতে চাই—বলিতে পারি না।
কী যেন গাহিতে চাই—গহিতে পারি না।
আমার সর্বস্ব আমি দিতে চাই—একটি অঞ্জলি।
কিন্তু কাকে দেব আমি ?
—"কস্মৈ দেবায় হবিষা বিধেমঃ ?"
কে আমার সর্বসমর্পণ
হাত পেতে তুলে নেবে ?
কে আমাকে বাজাবে যে বীণা
আমি তা জানি না।
আজ চৈতন্যের অব্যর্থ বিজলী
চমকিত হয়ে উঠছে বারবার ;
বুকের অসহ্য অনিন্দ্য বিবরণ
কার শ্রুতি-লগ্ন করব ?
আমার বুকের ব্যথা বৃষ্টি হতে চায়,
আমার সমুদ্র-ইচ্ছা লক্ষ লক্ষ দুরন্ত নদীর
হৃদয় বহাতে চায় অমল জলের শিল্পে,
হয়ে শুদ্ধ গানের চারণ।
যেখানে যে তীক্ষ্ণ রৌদ্রে সকলকে নিবিড় ছায়ায়
আবৃত করিতে চায়, অনন্ত আকাশ হ'তে
অমল শিশির হ'য়ে ঝরে যেতে চায়—
সহৃদয় শান্তি সান্ত্বনা।
আমার বুকের মধ্যে এত স্বপ্ন, এত আলো,
এত ইচ্ছা, সমুদ্র-শান্তির সম্মেলন,
বিশ্বের সবার জন্য সার্বিক সুখের প্রস্তাব
এইখানে অনুদিত হোক—
হোক সকলের সহজ স্বভাব
তোমার আমার জন্য—সকলের জন্য এক
অনির্বাণ আনন্দ আলোক।

# অনুভূতিমালা

## ব্রত চক্রবর্তী

ফুটে উঠলে তবে গন্ধের ঘরে
চলে যায় এক-একটা মুহূর্ত।

ভিড়ের সঙ্গে যাওয়া
একা নিজে ঈশ্বরের সঙ্গে
কথা বলতে বলতে ফেরা।

জীবন গড়ে উঠলে
মৃত্যুর মহিমা কমে যায়।

হাত আলগা করলেই, নদী
হাত আঁকড়ে ধরলেই, সমুদ্র।

ভাষার শরীরে এত অলঙ্কার কেন ?
একটি-দুটি করে আমি রোজ
খুলে ফেলতে থাকি।

তার সঙ্গ ছাড়ব না
দুটি খঞ্জনীর কোন একটি
যার কাছে আছে।

নিবন্ধ

# বহির্ভারতে ভারত-সভ্যতা

## সন্তোষকুমার অধিকারী

একদা বৃহত্তর ভারতবর্ষের অঙ্গ ছিল মালয় উপদ্বীপ। ভারতের পূর্ব সীমান্তে আসাম ও মণিপুর অতিক্রম করলে বর্মাদেশ। বর্মার ভূখণ্ড দক্ষিণে সমুদ্রের মধ্যে প্রবেশ করে যে-উপদ্বীপের সৃষ্টি করেছে, সেইটিই হলো মালয়।

সমুদ্রপথেও বাংলার তাম্রলিপ্ত বা উড়িষ্যার গোপালপুর, বিশাখাপত্তনম থেকে বঙ্গোপসাগর অতিক্রম করে আন্দামান সাগরে প্রবেশ করলে মালয়ে পৌঁছানো যায়। তামিলনাড়ু অথবা সিংহল থেকেও ভারত মহাসাগর পার হলে মালাক্কা প্রণালীর একদিকে সুমাত্রা, অন্যদিকে মালয়।

মালয়ের অধিবাসীরা ভারতের মূল ভূখণ্ডের মানুষ, একথা ঐতিহাসিকদের অনেকেই মনে করেন। ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদারের অভিমত—'মালয়' নামটি প্রাচীন ভারতবর্ষের মালব (বা মালয়) উপজাতির নাম থেকে এসেছে। এই মালব উপজাতির কথা মুদ্রারাক্ষস গ্রন্থে এবং পাণিনিতেও বলা হয়েছে। রাজপুতানায়, বিশেষ করে জয়পুরে 'মালব' নামাঙ্কিত মুদ্রা পাওয়া গিয়েছে। অস্ট্রোনেশিয়া গোষ্ঠীর এই মানুষেরা প্রাগৈতিহাসিক যুগে ভারত থেকে মালয়ে পৌঁছেছিল, এই অভিমত ডঃ মজুমদার তাঁর গ্রন্থে[১] ব্যক্ত করেছেন।

প্রাচীন মালয়ে যেসব উপজাতির বাস ছিল, তাদের মধ্যে সেমাং, সাকাই, জাকুন এবং নরখাদক গোষ্ঠীর বাটাক, ল্যাম্পং, গায়ো প্রভৃতির নাম উল্লেখ করা যায়। এই উপজাতি গোষ্ঠী ছাড়া প্রোটো-মালয় ও মালয় গোষ্ঠীর মানুষেরা এই উপদ্বীপের অধিবাসী ছিল। উপজাতি গোষ্ঠীগুলি জঙ্গলে ও পার্বত্য অঞ্চলে বাস করত; তারা তীরধনুকের সাহায্যে শিকার করে জীবনধারণ করত; দুহাজার বছর আগেও তারা বস্ত্রের ব্যবহার শেখেনি। মালয় ও বোর্নিও-র নরমুণ্ড-শিকারী গোষ্ঠীগুলি সভ্যমানুষের সংস্পর্শে আসার পর তাদের আদিম জীবনধারা থেকে সরে আসে।

বিভিন্ন পর্যটকদের রচনা থেকে জানা যায় যে, খ্রীস্টীয় প্রথম শতকেই মালয় উপদ্বীপ ও মালয়েশিয়ায় হিন্দুসভ্যতার বিস্তার ঘটেছিল। পেরাই নামক স্থানে চতুর্থ শতকে উৎকীর্ণ সংস্কৃতলিপির অস্তিত্ব আবিষ্কৃত হয়েছে; কেদাতে পাওয়া গিয়েছে বৌদ্ধলিপি। সপ্তম শতকে মালয়ে এক অতি শক্তিশালী হিন্দুরাজত্বের বিস্তৃতি ঘটে। সুমাত্রার শ্রীবিজয়রাজ্য মালাক্কা প্রণালী অতিক্রম করে মালয়ে বিস্তৃত হয়। শ্রীবিজয়ের মহারাজা চীন সম্রাটের করদ রাজ্য হিসাবে চীনেও প্রভাব বিস্তার করেন। কেদা (কেতহা) ছিল তাঁর উত্তরের গুরুত্বপূর্ণ ঘাঁটি। মালয়ের সমুদ্রগামী নাবিকেরাই শ্রীবিজয়ের শক্তির প্রধান উৎস ছিল।

মালয়ের এই সমুদ্রচারী নাবিকরাই যে প্রশান্ত মহাসাগরে পলিনেশীয় দ্বীপগুলিতে এশিয়ার সংস্কৃতিকে বহন করে নিয়ে গিয়েছিল, সেবিষয়ে সন্দেহ নেই। "...Man out of Asia had a major part in the migrations that gradually peopled the entire Pacific hemisphere.... It is indeed the Malaya people... that possesses rudimentary evidence of early contact with a Palaeo-Polynesia Stock".[২] (এশিয়ার সমুদ্রগামী মানুষেরাই মুখ্যতঃ সমগ্র প্রশান্ত মহাসাগরীয় গোলার্ধের জনবসতি গড়ে তুলেছিল।... এরা বস্তুতঃ

১ Ancient Indian Colonies in the Far East—Dr. Ramesh Chandra Mazumdar, Vol. II, pp. 19-25

২ The Early Man and the Ocean—Thor Heyerdahl, Doubleday & Co., New York, pp. 152-154

মালয়ের অধিবাসী··· আদিম-পলিনেশীয় মানুষের সঙ্গে প্রাচীন যুগে তাদের যোগাযোগের প্রাথমিক নিদর্শনগুলি থেকেই একথা বলা যায়।)

আরও আশ্চর্যের বিষয় এই যে, পশ্চিমে মাল-দ্বীপপুঞ্জ থেকে পূর্ব ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দ্বীপগুলির সর্বত্রই সিন্ধুসভ্যতার সংস্কৃতির নিদর্শন বর্তমান। সাংস্কৃতিক যোগাযোগের এই ধারা অব্যাহত ছিল পরবর্তী কাল পর্যন্ত এবং ভারতের হিন্দুধর্ম, বৌদ্ধধর্ম ও শিল্প-সংস্কৃতির প্রভাব উজ্জীবিত করে রেখেছিল প্রশান্ত মহাসাগরীয় দ্বীপগুলিকে।

খ্রীস্টীয় সপ্তম শতকে মালয় এবং সুমাত্রা সহ মালাক্কা উপসাগরের তীরবর্তী অঞ্চলগুলি শৈলেন্দ্র-রাজাদের সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়। সুমাত্রার প্যালেম্বাং প্রদেশে শৈলেন্দ্ররাজাদের প্রতিষ্ঠা চতুর্থ শতকেই। তাঁদের রাজ্য 'শ্রীবিজয়' রাজ্য নামে খ্যাত। আরব পর্যটকদের কাছে শ্রীবিজয় 'জাবাগ' নামে পরিচিত। পর্যটক আলবেরুনির ডায়েরিতে জাবাগ ও সুবর্ণদ্বীপের নাম উল্লিখিত। তিনি লিখেছেন, জাবাগের দ্বীপগুলিকে হিন্দুরা সুবর্ণ-দ্বীপ বলে।[৩] ইবন সইদ লিখেছেনঃ "জাবাগ একটি দ্বীপপুঞ্জ, ঐ দ্বীপগুলিতে প্রচুর সোনা পাওয়া যায়। শ্রীবিজয় ঐ দ্বীপগুলির মধ্যে শ্রেষ্ঠ।"[৪] অন্যদিকে চীন পরিব্রাজক ই-সিং (I-T-sing) লিখেছেন, শৈলেন্দ্রবংশীয় রাজা জয়নাগ প্যালেম্বাং প্রদেশকে বৌদ্ধধর্মের পীঠস্থান করে তুলেছিলেন। ই-সিং আরও বলেছেন যে, শ্রীবিজয়-রাজ্যের অর্ণবপোত নিয়মিত ভারত ও সুমাত্রার মধ্যে যাওয়া-আসা করত।[৫] শৈলেন্দ্রবংশীয় রাজাদের আদি ইতিহাস সঠিক পাওয়া শক্ত। 'হিস্টিরিওসিটি অব লর্ড জগন্নাথ' গ্রন্থের লেখক সুশীল মুখার্জী বলেনঃ "কলিঙ্গের দক্ষিণ সমুদ্রোপকূলে পঞ্চম ও ষষ্ঠ শতাব্দীতে শৈলেন্দ্র-বংশের রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত ছিল। এরা চিল্কার পার্বত্য প্রদেশের আদিবাসী··· এই রাজারাই দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় সুবর্ণদ্বীপ অধিকার করে শৈলেন্দ্ররাজত্ব স্থাপন করে।"[৬]

মালয় উপদ্বীপের বান্দোন উপসাগরের দক্ষিণে দুটি শিলালিপি আবিষ্কৃত হয়েছে। তার একটিতে রয়েছে শ্রীবিজয়েন্দ্র রাজার প্রশস্তি; অপরটিতে বৌদ্ধ দেবতাদের উদ্দেশে নৃপতি শ্রীবিজয়েশ্বরের দ্বারা তিনটি মন্দিরনির্মাণের বিবরণ। ঐ মন্দির ও বৌদ্ধস্তূপ নির্মাণের কাল ৬৯৭ শকাব্দ।[৭]

আরও একটি শিলালিপি পাওয়া গিয়েছে জাভার 'কলসন' নামক স্থানে। শিলালিপিটি ৭৭৮ খ্রীস্টাব্দের।[৮] ঐ লিপিতে বলা হয়েছে—শৈলেন্দ্ররাজাদের গুরু আর্যতারার মন্দিরটি নির্মাণ করিয়েছেন। ৭৮২ খ্রীস্টাব্দে একটি শিলালেখে প্রথমে দেওয়া হয়েছে—রত্নত্রয়ের প্রশস্তি, বৌদ্ধ দেবদেবীদের উদ্দেশে স্তোত্রগান; তারপর 'শৈলেন্দ্র-বংশতিলক' রাজা ইন্দ্রর কথা। বলা হয়েছে, তিনি 'বৈরীবর-বীর বিমর্দন'; তাঁর দেহ পবিত্র হয়েছে 'গৌর-দ্বীপ-গুরু'র পদরজঃ স্পর্শ করে।[৯]

একজন আমেরিকান বিশেষজ্ঞ লিখেছেনঃ "Sri Vijaya's Maharaja did not neglect spiritual matters and Palembung was a centre of Buddhist's studies. The Chinese pilgrim I-T-sing studied Buddhist texts there for a number of years and wrote that there was a flourishing community of 1000 Buddhist monks.··· The Indian Scholar Atisha··· studied at Palembung under Dharmakirti in the early 11th Century."[১০] [শ্রীবিজয়ের মহারাজা আধ্যাত্মিক বিষয়গুলিকে উপেক্ষা করেননি। প্যালেম্বাং বৌদ্ধধর্মচর্চার কেন্দ্র হয়ে উঠেছিল। চীনা পরিব্রাজক ই-সিং প্যালেম্বাঙেই কয়েক বছর ধরে বৌদ্ধগ্রন্থগুলি অধ্যয়ন করেন এবং লেখেন,

৩ Ancient Indian Colonies in the Far East, p. 41

৪ Ibid., p. 47. ৫ Ibid., pp 149-154

৬ Historiocity of Lord Jagannatha— Sushil Mukherjee, Minerva Associates (P) Ltd, p. 9

৭ Ancient Indian Colonies in the Far East, pp. 149-154 ৮ Ibid. ৯ Ibid.

১০ 'Malayasia': Foreign Area Studies— Ed. by B. M. Bunge, The American University, 1984, pp. 9-10

সেখানে একহাজার বৌদ্ধ সন্ন্যাসীর একটি উন্নত সংঘারাম প্রতিষ্ঠিত ছিল। ভারতীয় পণ্ডিত অতীশ (দীপঙ্কর) প্যালেম্বাঙের সংঘেই ধর্মকীর্তির কাছে বৌদ্ধধর্মের পাঠ গ্রহণ করেছিলেন একাদশ শতকের প্রথম ভাগে।]

বাংলার পালবংশের রাজা দেবপালের আমলে (দেবপালের রাজত্বের ৩৯তম বছরে) নালন্দার একটি তাম্রফলকে যে-লিপি পাওয়া গিয়েছে, তাতে বলা হয়েছে: "সুবর্ণদ্বীপের রাজা বলপুত্রদেবের অনুরোধে নালন্দায় একটি বৌদ্ধবিহারের জন্য পাঁচটি গ্রাম দান করা হলো।"[১১]

অষ্টম খ্রীস্টাব্দে মালয়, সুমাত্রা, বোর্নিও, জাভা ও বলি দ্বীপপুঞ্জ জুড়ে 'শ্রীবিজয়' বা শৈলেন্দ্র-সাম্রাজ্য গড়ে উঠেছিল। শৈলেন্দ্ররা যে একটি শক্তিশালী সাম্রাজ্যই শুধু স্থাপিত করেছিল তা নয়, তারা নতুন একটি সংস্কৃতির ধারাকে প্রবাহিত করেছিল, যা হলো মহাযান বৌদ্ধ-ধর্ম-সংস্কৃতি। এদের হাতেই গড়ে উঠেছিল যবদ্বীপ বা জাভার বিশ্বখ্যাত 'বোরোবুদুর' ও 'চণ্ডীকলসন'।

আরব ও চীন পর্যটকদের লেখা থেকে জানা যায় যে, জাবাগ (অর্থাৎ শ্রীবিজয়রাজ্য)-এর গৌরব ও প্রতিপত্তি ত্রয়োদশ শতকের আরম্ভ পর্যন্ত পূর্ণ মাত্রায় বিরাজিত ছিল। শৈলেন্দ্রবংশীয় রাজাদের শেষ নৃপতি চন্দ্রভানু সিংহল-বিজয়ের জন্য অভিযান করেন। এই অভিযানের ফল তাঁর পক্ষে অত্যন্ত অশুভকর হয়েছিল। ১২৬৪ খ্রীস্টাব্দের একটি লেখনে[১২] জানা যায় যে, যুদ্ধে চন্দ্রভানু পরাজিত ও নিহত হন এবং শৈলেন্দ্রসাম্রাজ্যেরও অবসান ঘটে।

মালয় উপদ্বীপ ও সুমাত্রা, জাভা, বলি প্রভৃতি দ্বীপগুলিতে হিন্দুরাজাদের প্রভাব পঞ্চদশ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত অক্ষুণ্ণ ছিল। ষোড়শ শতকে মুসলিম সেনাবাহিনীর দ্বারা আক্রান্ত হলে এই দ্বীপগুলিতে হিন্দুরাজত্বের অবসান ঘটে। হিন্দুরাজত্ব শেষ হলেও হিন্দু-সংস্কৃতি এবং বৌদ্ধধর্ম ও শিল্পকলার অগণিত নিদর্শন এখনো দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার সর্বত্র ছড়িয়ে আছে।

ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদারের অভিমত হলো, শৈলেন্দ্রবংশীয় রাজারা শ্রীবিজয়ে এসেছিলেন যবদ্বীপ বা জাভা থেকে। জাভা থেকেই তাঁদের রাজত্বের আরম্ভ। আরব লেখকদের হাতে এই 'জাভা'ই 'জাবাগ' শব্দে রূপান্তরিত।

খ্রীস্টীয় অষ্টম ও নবম শতকে শৈলেন্দ্রসাম্রাজ্যের খ্যাতি গৌরবের শিখরে পেঁছেছিল। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় শৈলেন্দ্রবংশীয়েরা আসে অন্য ভারতীয়দের অনেক পরে। কলিঙ্গ থেকে এসেছিল বলেই তারা মালয়েশিয়ার নাম দিয়েছিল কলিঙ্গ। জাভায় তাদের শ্রেষ্ঠ কীর্তি বোরোবুদুর ও চণ্ডীমেন্দুং-এর মন্দির। বোরোবুদুর বৌদ্ধধর্মাবলম্বীদের তো বটেই, সমগ্র ভারতবাসীর কাছে এক পবিত্র তীর্থক্ষেত্র। ধর্মচিন্তার সঙ্গে ভারতীয় শিল্প-নৈপুণ্যের সমন্বয় ঘটেছে এই বোরোবুদুরে। ১৯২৭ খ্রীস্টাব্দে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর যবদ্বীপ বেড়াতে যান। 'বোরোবুদুর' তাঁকে অভিভূত করে। 'বুদ্ধদেব' প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন:

"ভারতবর্ষের সত্যের ঐশ্বর্যকে জানতে হলে সমুদ্রপারে ভারতবর্ষের সুদূর দানের ক্ষেত্রে যেতে হয়। আজ ভারতবর্ষের ভিতরে বসে ধূলিকলুষিত হাওয়ার ভিতর দিয়ে ভারতবর্ষকে যা দেখি তার চেয়ে স্পষ্ট ও উজ্জ্বল করে ভারতবর্ষের নিত্যকালের রূপ দেখতে পাব ভারতবর্ষের বাইরে থেকে।...

"সত্যের যে বন্যা একদিন ভারতবর্ষের দুই কূল উপচিয়ে দেশে দেশে বয়ে গিয়েছিল, ভারতবর্ষের প্রবাহিণীতে আজ তা তলায় নেমে আসছে, কিন্তু তার জলসঞ্চয় আজও দূরের নানা জলাশয়ে গভীর হয়ে আছে। এই কারণেই সেই-সকল জায়গা আধুনিক ভারতবাসীর পক্ষে তীর্থ-স্থান। কেননা, ভারতবর্ষের ধ্রুব পরিচয় সেইসব জায়গাতেই।"[১৩] ☐

১১ Ancient Indian Colonies in the Far East, pp. 149-'54 ১২ Ibid, p. 198

১৩ 'বুদ্ধদেব': চারিত্রপূজা, রবীন্দ্র রচনাবলী, ১১শ খণ্ড, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, ১৩৬৮, পৃঃ ৪৯২-৪৯৩

বিশেষ রচনা

# স্বামী বিবেকানন্দের ভারত-পরিক্রমা ও ধর্মমহাসম্মেলনের

## স্বামী বিমলাত্মানন্দ

[ পূর্বানুবৃত্তি ]

পুরীর গোবর্ধন মঠের শঙ্করাচার্য এসেছিলেন পোরবন্দরে। শঙ্করাচার্যের সভাপতিত্বে লিমডি রাজভবনে স্থানীয় পণ্ডিতমণ্ডলীর এক বিচারসভা আহূত হয়েছিল। শঙ্কর পাণ্ডুরঙ্গ সহ স্বামী বিবেকানন্দ সে-বিচারসভায় উপস্থিত ছিলেন। সেই সভায় বহু পণ্ডিতের কূট প্রশ্নের উত্তর দিয়েছিলেন স্বামীজী। স্বামীজীর বিনয়, পাণ্ডিত্য, তেজস্বিতা প্রভৃতি দর্শনে পণ্ডিতমণ্ডলী মুগ্ধ হয়েছিলেন। শঙ্করাচার্যও স্বামীজীকে প্রভূত আশীর্বাদ করেছিলেন।"[১০৪]

পোরবন্দরের পর স্বামীজী এসেছিলেন মাণ্ডবীতে কচ্ছ-রাজের আমন্ত্রণে। এখান থেকে তিনি নারায়ণ সরোবর ও আশাপুরী দর্শন করেছিলেন। পরে আবার মাণ্ডবীতে প্রত্যাবর্তন করে এক ভাটিয়ার বাড়িতে তিনি অবস্থান করেছিলেন। মীরাটে স্বামীজী তাঁর গুরুভাইদের পরিত্যাগ করে যখন একাকী পরিক্রমায় বহির্গত হয়েছিলেন, তখন অখণ্ডানন্দজী প্রতিজ্ঞা করেছিলেন যে, স্বামীজী 'পাতালে' গেলেও তিনি খুঁজে বের করবেন। স্বামীজীকে খুঁজতে খুঁজতে শেষে মাণ্ডবীতে এসে অখণ্ডানন্দজী স্বামীজীর দর্শন পেয়েছিলেন। ঐ সময় তিনি স্বামীজীর মধ্যে এক অদৃষ্টপূর্ব অলৌকিক শক্তির প্রকাশ প্রত্যক্ষ করেছিলেন।[১০৫] তিনি লিখেছেন: "দেখিলাম স্বামীজীর আর পূর্বরূপ নাই। তিনি রূপলাবণ্যে ঘর আলো করিয়া বসিয়া আছেন, কিন্তু আমাকে দেখিয়াই চমকিয়া উঠিলেন। পথের বৃত্তান্ত সব শুনিলেন। শুনিয়া স্বামীজীর মনে ভয় হইল, 'গঙ্গাধর যখন এত বিপদে পড়িয়া, এত বিপদ লঙ্ঘন করিয়া, প্রাণের মমতা ছাড়িয়া আমাকে ধরিয়াছে, তখন আর আমার সঙ্গ ছাড়িবে না!' বলিলেন, 'আমি একটা মতলব করেছি, তোরা (গুরুভাইরা) কেউ সঙ্গে থাকলে তা কার্যে পরিণত করতে পারব না।' কিন্তু আমি কোন কথাই শুনি নাই। অবশেষে স্বামীজী বলিলেন, 'দেখ, আমি অসৎ হয়ে গেছি, আমার সঙ্গ ত্যাগ কর।' বলিলাম, 'হলেই বা তুমি অসৎ। আমি তোমায় ভালবাসি। তোমার চরিত্রের সঙ্গে তার সম্পর্ক কি? কিন্তু তোমার কাজের বিঘ্ন আমি করব না। তোমাকে দেখবার জন্য ব্যাকুল হয়েছিলাম, সে-আকাঙ্ক্ষা মিটেছে। এখন তুমি একলা যেতে পারো।' স্বামীজী সেকথায় আহ্লাদিত হইলেন।"[১০৬] গুরুভাইদের সঙ্গে স্বামীজীর এমনই সম্বন্ধ ছিল। ভুজে ও পোরবন্দরেও অখণ্ডানন্দজী স্বামীজীর বেশ কিছুকাল পুণ্যসঙ্গ করেছিলেন। এসব স্থানে অখণ্ডানন্দজী স্বামীজীর সঙ্গে ভারতের বর্তমান দুরবস্থা ও ভবিষ্যৎ উন্নতি সম্বন্ধে আলোচনা করেছিলেন।[১০৭]

স্বামীজী আবার একাকী। তাঁর পরবর্তী পরিক্রমা-স্থল পালিটানা। জৈনদের পবিত্র স্থান শত্রুঞ্জয় পর্বত, হনুমানজীর মন্দির প্রভৃতি দর্শন করে তিনি নাড়িয়াদে জুনাগড়ের দেওয়ান হরিদাস বিহারীদাসের বাড়িতে পদার্পণ করেছিলেন। সেখানে হরিদাসজীর সহোদরগণ স্বামীজীকে অভ্যর্থনা জানিয়েছিলেন। নাড়িয়াদ থেকে স্বামীজী যান বরোদায়। সেখানে রাজ্যের দেওয়ান মণিলাল যশভাই-এর বাড়িতে স্বামীজী অবস্থান করেছিলেন। বরোদার মহারাজা সায়াজীরাও গাইকোয়াড়েরও

১০৪ বিবেকানন্দ চরিত, পৃঃ ৮৩-৮৪

১০৫ স্বামী অখণ্ডানন্দ—স্বামী অন্নদানন্দ, ১ম সং, ১৩৬৭, পৃঃ ৮৩

১০৬ স্মৃতিকথা—স্বামী অখণ্ডানন্দ, উদ্বোধন কার্যালয়, ২য় সং, ১৩৫৭, পৃঃ ৭৯-৮০

১০৭ স্বামী অখণ্ডানন্দ, পৃঃ ৮৩

সঙ্গে স্বামীজীর পরিচয় হয়।[১০৮] বরোদা থেকে স্বামীজী হরিদাস বিহারীদাসকে লিখেছিলেন: "ভগবান আপনার পরিবারের উপর তাঁর অশেষ আশীর্বাদ বর্ষণ করুন। আমার সমস্ত পরিব্রাজক জীবনে এমন পরিবার তো আর দেখলাম না। আপনার বন্ধু শ্রীযুক্ত মণিভাই... এই অঞ্চলের শিক্ষাপ্রণালীর আলোচনা করেছিলেন। তবে আমি পুস্তকালয় ও রবি বর্মার ছবি দেখেছি।... নাড়িয়াদে শ্রীযুক্ত মণিলাল নাভুভাই-এর সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়েছিল। তিনি অতি বিদ্বান ও সাধু প্রকৃতির ভদ্রলোক। তাঁর সাহচর্যে আমি খুব আনন্দ পেয়েছি।"[১০৯]

॥ ৮ ॥

বরোদার পর স্বামীজী বোম্বাই আসেন। তবে বোম্বাইয়ে তিনি বেশিদিন ছিলেন না। স্বামীজীর আরও দুবার বোম্বাইয়ে আগমন হয়েছিল। দ্বিতীয়-বারে আর্যসমাজী ব্যারিস্টার রামদাস ছবিলদাসের গৃহে স্বামীজী প্রায় দুমাস বাস করেছিলেন। শেষবার আমেরিকা যাবার আগে বোম্বাই হয়ে তিনি খেতড়ি গিয়েছিলেন এবং খেতড়ি থেকে এসে বোম্বাই বন্দর থেকে তিনি আমেরিকা যাত্রা করে-ছিলেন। আর্যসমাজী ছবিলদাস স্বামীজীর কাছে তর্কে পরাজিত হয়ে স্বামীজীর অনুরাগী হয়ে-ছিলেন। ছবিলদাসের বাড়িতে থাকাকালীন স্বামীজী অতি অল্পকালের মধ্যে বোম্বাইয়ের বিদ্বৎ সমাজের কাছে সুপরিচিত হয়েছিলেন। বোম্বাইয়ে এক রাজনৈতিক নেতার বাড়িতে স্বামীজী সংবাদপত্রে দেখলেন, বালিকাদের সহমতির বয়স নির্ধারণার্থে (Age of Cosent Bill) একটি নতুন আইন প্রস্তাবিত হয়েছে এবং বাংলার শিক্ষিত সমাজ এই আইনের বিরুদ্ধে আন্দোলন করছে। এই সংবাদ পাঠ করে তিনি খুব লজ্জিত বোধ করেন এবং বাল্যবিবাহের বিরুদ্ধে স্বীয় মত তীব্র ও স্পষ্ট ভাষায় ব্যক্ত করেন। বোম্বাই-বাসের কথা তিনি হরিদাস বিহারীদাসকে জানিয়ে লিখেছিলেন: "আমি এখানে কিছু সংস্কৃত বই পেয়েছি এবং অধ্যয়নের সাহায্যও জুটেছে।"[১১০]

এইকালে স্বামীজীর ভারত-চিন্তার কথা হরিদাস বিহারীদাস ও খেতড়ির পণ্ডিত শঙ্কর-লালকে লিখিত চিঠিদ্বয়ের মধ্যে পাওয়া যায়: "একটি বিষয় অতি দুঃখের সহিত উল্লেখ করছি-এ-অঞ্চলে সংস্কৃত ও অন্যান্য শিক্ষার সম্পূর্ণ অভাব। এতদঞ্চলের লোকদের মধ্যে ধর্মের নামে পানাহার ও শৌচাদি বিষয়ে একরাশ কুসংস্কারপূর্ণ দেশাচার আছে—আর এগুলিই যেন তাদের কাছে ধর্মের শেষকথা। হায় বেচারারা! দুষ্ট ও চতুর পুরুতরা যত সব অর্থহীন আচার ও ভাঁড়ামি-গুলোকেই বেদের ও হিন্দুধর্মের সার বলে তাদের শেখায় (কিন্তু মনে রাখবেন যে, এসব দুষ্ট পুরুতগুলো বা তাদের পিতৃ-পিতামহগণ গত চারশো-পুরুষ ধরে একখণ্ড বেদও দেখেনি); সাধারণ লোকেরা সেগুলি মেনে চলে আর নিজেদের হীন করে ফেলে। কলির ব্রাহ্মণরূপী রাক্ষসদের কাছ থেকে ভগবান তাঁদের বাঁচান।"[১১১] পণ্ডিত শঙ্করলালকে স্বামীজী লিখেছিলেন: "আমাদিগকে ভ্রমণ করিতেই হইবে, আমাদিগকে বিদেশে যাইতেই হইবে। আমাদিগকে দেখিতে হইবে, অন্যান্য দেশে সমাজ-যন্ত্র কিরূপে পরিচালিত হইতেছে। আর যদি আমাদিগকে যথার্থই পুনরায় একটি জাতিরূপে গঠিত হইতে হয়, তবে অপর জাতির চিন্তার সহিত আমাদের অবাধ সংস্রব রাখিতে হইবে। সর্বোপরি আমাদিগকে দরিদ্রের উপর অত্যাচার বন্ধ করিতে হইবে।"[১১২]

বোম্বাই থেকে স্বামীজী পুনায় এসেছিলেন। পুনায় তিনি দুবার এসেছিলেন। একবার লিমডির রাজা স্বামীজীর মন্ত্রশিষ্য ঠাকুরসাহেবের পুনার বাড়িতে স্বামীজী ছিলেন। আরেকবার লোকমান্য বালগঙ্গাধর তিলকের গৃহে তিনি অবস্থান করেন। বোম্বাই থেকে পুনায় আসার পথে তাঁদের পরস্পরের পরিচয় হয়। তিলককে স্বামীজী তাঁর নাম

১০৮ Reminiscences of Swami Vivekananda 2nd Edn., 1964, p. 65

১০৯ স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃঃ ৩৩৬-৩৩৭ (চিঠির তারিখ—২৬ এপ্রিল ১৮৯২)

১১০ যুগনায়ক বিবেকানন্দ, ১ম খণ্ড, পৃঃ ৩৫৫-৩৫৬; বাণী ও রচনা, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃঃ ৩৩৯

১১১ বাণী ও রচনা, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃঃ ৩৪০

১১২ ঐ, পৃঃ ৩৪২

বলেননি। তিলক তখনো 'লোকমান্য' হননি, আর স্বামীজীও 'বিশ্ববিখ্যাত' বিবেকানন্দ হননি। তিলক তাঁর স্মৃতিকথায় অপরিচিত সন্ন্যাসীর রূপ-রেখা অঙ্কন করেছেন : "আমরা পুনা পেঁছিলে সন্ন্যাসী আমার সহিত আট-দশ দিন বাস করিলেন। তাঁহার নাম জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিলেন, তিনি একজন সন্ন্যাসী মাত্র।... গৃহে তিনি অদ্বৈত-দর্শন ও বেদান্ত সম্বন্ধে প্রায়ই আলোচনা করিতেন; ...আমি তখন হীরাবাগে অবস্থিত ডেকান ক্লাবের সভ্য ছিলাম; প্রতি সপ্তাহে উহার অধিবেশন হইত। স্বামীজী একবার ঐরূপ এক সভায় আমার সহিত উপস্থিত ছিলেন। সেদিন সন্ধ্যায় ৺পণ্ডিত কাশীনাথ গোবিন্দনাথ একটি দার্শনিক বিষয়ে সুন্দর বক্তৃতা দেন। ঐ বিষয়ে আর কাহারও কোন বক্তব্য ছিল না। কিন্তু স্বামীজী উঠিয়া প্রাঞ্জল ইংরেজী ভাষায় পরিষ্কারভাবে উক্ত বিষয়ের অপর দিকটা দেখাইয়া দিলেন। উপস্থিত সকলেই তাঁহার উচ্চ প্রতিভায় মুগ্ধ হইয়াছিল। ইহার অল্প পরেই স্বামীজী পুনা ত্যাগ করিয়া যান।"[১১৩]

মহাবালেশ্বরে স্বামীজী প্রথম এক সপ্তাহ অতিথি হয়ে নরোত্তম মুরারজী গোকুলদাসের গৃহে ছিলেন। এখানে স্বামীজীর প্রতিভা সকলকে মুগ্ধ করেছিল। পুনার 'মরাঠা' পত্রিকার সম্পাদক এন. সি. কেলকার তাঁর কয়েকজন উকিল বন্ধুর কাছে স্বামীজীর কথা শুনেছিলেন। তিনি সে-কথা তাঁর এক বক্তৃতায় বলেছিলেন : "গ্রীষ্মের ছুটিতে কয়েকজন উকিল মহাবালেশ্বরে গিয়েছিলেন। প্রত্যাবর্তন করে তাঁরা বললেন, এক প্রদীপ্ত-প্রতিভা বাঙালী সন্ন্যাসীর দেখা তাঁরা পেয়েছেন। চমৎকার তাঁর ইংরেজী ভাষার বাগ্মিতা, একেবারে বেঁধে রাখে এবং তাঁর দার্শনিক চিন্তা প্রজ্ঞাপূর্ণ ও সুমহান।"[১১৪] এই বাড়িতে স্বামী অভেদানন্দ স্বামীজীর দর্শনলাভ করেছিলেন। অভেদানন্দজীর স্মৃতি : "শ্রীশ্রীঠাকুরের কৃপায় নরেন্দ্রনাথের সহিত সেইখানেও দেখা হইল। গোকুলদাসজী আমাকে ... সাদরে গ্রহণ করিলেন। নরেন্দ্রনাথ আমাকে হাস্য করিয়া বলিল, 'ভাই, তুমি অযথা আমার পিছু নিয়েছ কেন? আমরা দুজনেই শ্রীশ্রীঠাকুরের নামে বার হয়েছি, স্বাধীনভাবে দুজনেরই পরিভ্রমণ করা ভাল।' আমি শুনিয়া বলিলাম, 'আমি তোমার পিছু নেব কেন? আমি ঘুরতে ঘুরতে এখানে এসে পেঁছেছি। তুমিও তাই। শ্রীশ্রীঠাকুরের ইচ্ছায় দুজনের মধ্যে আবার মিলন হলো। আমি ভাই ইচ্ছা করে তোমার পিছু নেইনি জানবে।' নরেন্দ্রনাথ উচ্চৈঃস্বরে হাস্য করিয়া উঠিল।"[১১৫]

স্বামীজীর পরবর্তী পরিক্রমা-স্থল মধ্যপ্রদেশের খাণ্ডোয়া। স্থানীয় উকিল হরিদাস চট্টোপাধ্যায়ের বাড়িতে স্বামীজী প্রায় তিন সপ্তাহ ছিলেন। প্রথম দর্শনেই হরিদাসবাবু অনুধাবন করতে পেরেছিলেন স্বামীজীর অনন্যসাধারণ পাণ্ডিত্য। তিনিই স্বামীজীকে খাণ্ডোয়াবাসীদের সঙ্গে পরিচিত করিয়ে দিয়েছিলেন, আর তাঁরাও মুগ্ধ হয়েছিলেন স্বামীজীর শাস্ত্রজ্ঞান ও ইংরেজী সাহিত্যে অসাধারণ পাণ্ডিত্যের কথা জেনে। এইকালে স্বামীজী দর্শন করেছিলেন ইন্দোর, উজ্জয়িনী ও নর্মদাতীরবর্তী তীর্থস্থানগুলি।[১১৬]

খাণ্ডোয়া ছাড়িয়ে একটু উত্তর দিকে যেতেই স্বামীজী এক অদ্ভুত অসভ্য জাতির দেখা পেয়েছিলেন। তারা না চেনে সন্ন্যাসী, না দেয় ভিক্ষা—আশ্রয় দেওয়া তো দূরের কথা। কয়েকদিন অনাহারে কাটল স্বামীজীর। কোনমতে সামান্য কিছু খেয়ে বেঁচেছিলেন। এক নীচুজাতীয় মেথর শেষ পর্যন্ত স্বামীজীকে আশ্রয় দিয়েছিলেন। কয়েকদিন তিনি ঐ মেথর-পরিবারের সঙ্গে ছিলেন। তাদের হৃদয়ের মহত্ত্বে স্বামীজী অতীব অভিভূত ও আশ্চর্যান্বিত হয়েছিলেন। তিনি লক্ষ্য করেছিলেন, দরিদ্রের জীর্ণকন্থার অন্তরালে পরদুঃখে দুঃখী, সমবেদনায় স্নিগ্ধবারি-সিঞ্চিত কোমল মানব-হৃদয়। তাঁর প্রাণ তাদের দুঃখের বোঝা দূর করবার জন্য আকুল হয়েছিল। এরূপ পতিত মানুষকে নারায়ণজ্ঞানে সেবা করার তীব্র আকুতি তিনি মর্মে মর্মে উপলব্ধি করেছিলেন।[১১৭]

১১৩ যুগনায়ক বিবেকানন্দ, ১ম খণ্ড, পৃঃ ৩৫৮
১১৪ বিবেকানন্দ ও সমকালীন ভারতবর্ষ, ১ম খণ্ড, পৃঃ ৮৬
১১৫ আমার জীবনকথা, পৃঃ ১৬৭
১১৬ যুগনায়ক বিবেকানন্দ, ১ম খণ্ড, পৃঃ ৩৫০
১১৭ স্বামী বিবেকানন্দ, ১ম ভাগ, পৃঃ ৩৫০

পুনা থেকে স্বামীজী এসেছিলেন কোলহাপুরে। কোলহাপুরের রাজার প্রাইভেট সেক্রেটারী রাওসাহেব গোলওয়ালকর স্বামীজীকে খাসবাগে রাখার ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন। এখানে তিনি রাজারাম পরিষদে মারাঠী পত্রিকা 'গ্রন্থমালা'র সম্পাদক বিজাপুরকর প্রভৃতি কর্তৃক আমন্ত্রিত হয়ে বক্তৃতা করেছিলেন।[১১৮] কোলহাপুরের ভক্তিমতী রানী স্বামীজীর শিষ্যা হয়েছিলেন। রানীর একান্ত প্রার্থনায় তাঁর কাছ থেকে স্বামীজী শুধু একটি গেরুয়া বস্ত্র গ্রহণ করেছিলেন। এখান থেকে স্বামীজী যান বেলগাঁও। বেলগাঁওয়ে প্রথমে এক মারাঠী উকিলের বাড়িতে স্বামীজী অতিথি হয়েছিলেন। ভদ্রলোকের পুত্র জি. এস. ভাটে স্বামীজীর অবস্থানের স্মৃতিচারণ করেছেনঃ "স্বামীজীর আকৃতি অনেকটা অনন্যসাধারণ ছিল এবং প্রথম দর্শনেই মনে হইত, ইনি সাধারণ মানুষ অপেক্ষা একটু অন্য ধরনের লোক।··· প্রতিভার এরূপ বৈচিত্র্য ও জ্ঞানের এরূপ বহুব্যাপিত্ব প্রকাশ করেন, যাহার ফলে অতি সুশিক্ষিত সংসারীও খ্যাতি অর্জন করিতে পারেন—এমন ধরনের সন্ন্যাসী তো আর পূর্বে কখনও দেখি নাই।··· পরন্তু পরমহংসশ্রেণীর সন্ন্যাসী।··· ধর্মনির্বিশেষে যে-কোন ব্যক্তির নিকট পরমহংস ভিক্ষাগ্রহণ করিতে পারেন। তাঁহাকে যখন প্রশ্ন করা হইল, তিনি অহিন্দুর অন্ন গ্রহণ করিবেন কিনা, তখন তিনি উত্তর দিলেন, তিনি বহুবার মুসলমানের অন্ন গ্রহণ করিয়াছেন।··· অতিথি শুধু অনন্যসাধারণ নহেন, তিনি অসাধারণ ব্যক্তিত্বশালী।··· স্বামীজীর উপস্থিতি শহরে সুবিদিত হইবার পর প্রত্যহ তাঁহার নিকট প্রচুর লোকসমাগম হইত,··· বিচারকালে যদিও স্বামীজীর পক্ষেই যুক্তি অধিক দেখা যাইত, তথাপি জয়লাভই তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল না। তিনি বরং চাহিতেন, সকলে বুঝুক যে, এখন এমন সময় আসিয়াছে যখন ভারতবাসীদের নিকট এবং বিদেশীয়দিগের নিকট দেখাইয়া দেওয়া উচিত যে, হিন্দুধর্ম মরণোন্মুখ নহে ; এতদ্ব্যতীত জগতের সম্মুখে বেদান্তের সত্যসকলও উদ্ঘোষিত হওয়া আবশ্যক।··· তাঁহার ক্ষোভ ছিল এই যে, বেদান্তের পক্ষে যেমন হওয়া উচিত ছিল, ঠিক সেভাবে উহা সকলের শাশ্বত অনুপ্রেরণার উৎস না হইয়া উহা সম্প্রদায়বিশেষের সম্পত্তিরূপে গণ্য হইতেছে।"[১১৯]

বেলগাঁওয়ের সাবডিভিসানাল ফরেস্ট অফিসার হরিপদ মিত্র ছিলেন ধর্ম ও দর্শন সম্বন্ধে যথেষ্ট সন্দেহবাদী। সেই হরিপদ মিত্র স্বামীজীর মাহাত্ম্যে আকৃষ্ট হয়ে তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেছিলেন। সেই সঙ্গে হরিপদবাবুর স্ত্রী ইন্দুমতীও একই সঙ্গে স্বামীজীর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেছিলেন। এই ভক্ত-দম্পতির আন্তরিক প্রার্থনায় স্বামীজী তাঁদের বাড়িতে নয়দিন বাস করেছিলেন। হরিপদবাবু এই সময়কার স্বামীজীর স্মৃতি অতি বিস্তৃতভাবে লিখেছেন। তিনি তাঁর স্মৃতিচারণে বলেছেনঃ "স্বামীজী বসিয়া আছেন এবং নিকটে অনেক সম্ভ্রান্ত উকিল ও বিদ্বান লোকের কথাবার্তা চলিতেছে। স্বামীজী কাহারও সহিত ইংরেজীতে, কাহারও সহিত সংস্কৃত এবং কাহারও সহিত হিন্দুস্থানীতে তাঁহাদের প্রশ্নের উত্তর একটুমাত্র চিন্তা না করিয়াই একেবারে দিতেছেন। আমার ন্যায় কেহ কেহ হাক্সলির ফিলজফিকে প্রামাণিক মনে করিয়া তদবলম্বনে স্বামীজীর সহিত তর্ক করিতে উদ্যত। তিনি কিন্তু কাহাকেও ঠাট্টাচ্ছলে, কাহাকেও গম্ভীরভাবে যথাযথ উত্তর দিয়া সকলকেই নিরস্ত করিতেছেন। আমি যাইয়া প্রণাম করিলাম এবং অবাক হইয়া বসিয়া শুনিতে লাগিলাম। ভাবিতে লাগিলাম—ইনি কি মনুষ্য, না দেবতা ?···ভাবিতে লাগিলাম, এত বৎসরের কঠোর সন্দেহ ও অবিশ্বাস স্বামীজীকে দেখিয়া ও তাঁহার দুই-চার কথা শুনিয়াই সব দূর হইল। আর জিজ্ঞাসা করিবার কিছুই নাই।··· প্রথম হইতেই স্বামীজীকে বাল্যবিবাহের উপর ভারি চটা দেখিয়াছি। সর্বদাই সকল লোককে বিশেষতঃ বালকদের সাহসে বুক বাঁধিয়া সমাজের এই কলঙ্কের বিপক্ষে দাঁড়াইতে এবং উদ্যোগী হইতে উপদেশ দিতেন।··· তিনি ( স্বামীজী ) বলিলেন, নিজে ধর্ম বুঝিবার জন্য লেখাপড়া আবশ্যক নাই। কিন্তু অন্যকে বুঝাইতে হইলে উহার বিশেষ

১১৮ বিবেকানন্দ ও সমকালীন ভারতবর্ষ, ১ম খণ্ড, পৃঃ ৮৪-৮৫

১১৯ যুগনায়ক বিবেকানন্দ, ১ম খণ্ড, পৃঃ ৩৬০-৩৬২

আবশ্যক। পরমহংস রামকৃষ্ণদেব 'রামকেষ্ট' বলিয়া সহি করিতেন, কিন্তু ধর্মের সারতত্ত্ব তাঁহা অপেক্ষা কে বুঝিয়াছিল ?··· আধুনিক পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের সকল বিভাগেই, যথা—Chemistry, Physics, Geology, Astronomy, Mixed Mathematics প্রভৃতিতে তাঁহার বিশেষ দখল ছিল এবং তৎসংক্রান্ত সকল প্রশ্নই অতি সরল ভাষায় দুই-চারি কথায় বুঝাইয়া দিতেন। আবার ধর্মবিষয়ক মীমাংসাও পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের সাহায্যে ও দৃষ্টান্তে বিশদভাবে বুঝাইতে এবং ধর্ম ও বিজ্ঞানের যে একই লক্ষ্য—একই দিকে গতি, তাহা দেখাইতে তাঁহার ন্যায় ক্ষমতা আর কাহারও দেখি নাই।··· এই অল্প সময়ের মধ্যে তিনি কত লোককে মোহিত করিয়াছিলেন, তাহা বলা যায় না। টিকিট কিনিয়া তাঁহাকে গাড়িতে বসাইয়া আমি সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করিলাম ও বলিলাম, 'স্বামীজী, জীবনে আজ পর্যন্ত কাহাকেও আন্তরিক ভক্তির সহিত প্রণাম করি নাই, আজ আপনাকে প্রণাম করিয়া কৃতার্থ হইলাম'।"[১২০] হরিপদ মিত্র বেলগাঁওয়ে স্বামীজীর একটি ফটো তুলিয়েছিলেন। এরপর স্বামীজী আসেন খ্রীস্টান-অধ্যুষিত গোয়ায়। বেলগাঁওতে ডাঃ ভি. ভি. শিরগাঁকার নামে এক ভদ্রলোকের সঙ্গে স্বামীজীর ঘনিষ্ঠতা হয়। স্বামীজীর ইচ্ছা ছিল গোয়াতে প্রাচীন ল্যাটিন ও পুঁথির সহায়তায় খ্রীস্টীয় থিয়োলজি অধ্যয়ন করার। ডাঃ শিরগাঁকার স্বামীজীর এই ইচ্ছার কথা তাঁর গোয়ার বন্ধু, সংস্কৃত ও হিন্দুশাস্ত্রে সুপণ্ডিত সুব্রেই নায়েককে জানিয়েছিলেন। সুব্রেই নায়েক স্বামীজীকে গোয়ায় সাদর আমন্ত্রণ করেছিলেন। গোয়ায় থাকাকালে পঞ্জেম প্রভৃতি কয়েকটি গ্রাম ও দেবালয় দর্শন করেছিলেন স্বামীজী। সুব্রেই নায়েক স্বামীজীর অসাধারণ বুদ্ধিমত্তায় অভিভূত হয়েছিলেন, শাস্ত্রে তাঁর অগাধ জ্ঞান দেখে তিনি মুগ্ধ হয়েছিলেন। সুব্রেই নায়েক খ্রীস্টান বন্ধু জে. পি. আলভারেসের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলেন স্বামীজীর। আলভারেসও চমৎকৃত হয়েছিলেন স্বামীজীর পাণ্ডিত্য দেখে। তিনি গোয়ার সবচেয়ে প্রাচীন থিয়োলজি কলেজ 'রেশ্চল সেমিনারী'-তে স্বামীজীর থিয়োলজি পড়বার বিশেষ ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন। সেমিনারীতে স্বামীজী ল্যাটিন ভাষায় পুঁথি ও গ্রন্থাবলী পাঠ করেছিলেন, যা ভারতে অন্য কোন স্থানে পাওয়া যায় না। ওখানকার সুপিরিয়র ফাদার ও পাদ্রীরা অবাক হয়েছিলেন খ্রীস্টীয় সাহিত্যে স্বামীজীর পারদর্শিতায়। প্রতিদিন তাঁরা স্বামীজীর সঙ্গে আলাপ করতেন। স্থানীয় হিন্দুদের দ্বারা আয়োজিত স্বামীজীর বিদায়সভাতে তাঁরা সোৎসাহে যোগদান করেছিলেন।[১২১]

॥ ৯ ॥

স্বামীজীর ভারত-পরিক্রমার শেষপর্ব দক্ষিণ-ভারতে। দাক্ষিণাত্যের ব্যাঙ্গালোর, ত্রিচুর, ত্রিবাঙ্কুর, ত্রিবান্দ্রাম (বর্তমান তিরুবন্তপুরম) পর্যটন করে অবশেষে ভারতবর্ষের দক্ষিণপ্রান্তে তামিলনাড়ুর কন্যাকুমারীর শিলাখণ্ডে স্বামীজী ধ্যানে মগ্ন হয়েছিলেন। এখানেই তাঁর ভাবনেত্রে অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যত ভারত-দর্শন হয়েছিল। কন্যাকুমারী থেকে রামনাদ, পণ্ডিচেরী, মাদ্রাজ, হায়দ্রাবাদ পরিক্রমা করে স্বামীজী পুনরায় মাদ্রাজে ফিরে এসেছিলেন। মাদ্রাজের যুবক-ভক্ত ও অনুরাগীরা স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে স্বামীজীর শিকাগো ধর্মমহাসম্মেলনে যোগদানের বাস্তব রূপ দান করেছিলেন। এখানেই তিনি লাভ করেছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণের নির্দেশ—অশরীরী বাণী—"যাও"।[১২২] মাদ্রাজেই তিনি পেয়েছিলেন সঙ্ঘজননী শ্রীশ্রীমায়ের আশীর্বাদ ও সম্মতি-সম্বলিত পত্র, যে-পত্র পেয়ে দ্বিধাগ্রস্ত বিবেকানন্দ তাঁর অনুগামীদের বলেছিলেন: "বৎসগণ। শ্রীশ্রীমায়ের আদেশ পাইয়াছি, সমস্ত সংশয়-ভাবনা দূর হইয়াছে, আমি আমেরিকা যাইবার জন্য প্রস্তুত। করুণাময়ী জননী আশীর্বাদ করিয়াছেন, আর চিন্তা কি ?"[১২৩] [ক্রমশঃ]

১২০ বাণী ও রচনা, ৯ম খণ্ড, পৃঃ ৩৬০-৩৮৯

১২১ A Comprehensive Biography of Swami Vivekananda—Sailendra Nath Dhar, Part I, 1975, Vivekananda Prakashan Kendra, Madras, pp. 357-358

১২২ যুগনায়ক বিবেকানন্দ, ১ম খণ্ড, পৃঃ ৪১৩

১২৩ সারদা-রামকৃষ্ণ—দুর্গাপুরী দেবী, ১০ম মুদ্রণ, শ্রীশ্রীসারদেশ্বরী আশ্রম, কলকাতা, পৃঃ ১৮৯

# পরিক্রমা

## পঞ্চকেদার ভ্রমণ

### বাণী ভট্টাচার্য

[ পূর্বানুবৃত্তি ]

১৫ সেপ্টেম্বর। এখান থেকে চোপতা ২৮ কি.মি.। আকাশ মেঘাচ্ছন্ন, বৃষ্টি হচ্ছে। যদি কোন জিপ বা ট্যাক্সি পাওয়া যায় চোপতা যাওয়ার জন্যে —সে-আশায় আমরা অপেক্ষা করছি। হোটেলে ছোড়দাদের পূর্ব-পরিচিত 'নেপালীবাবা'র সাথে দেখা। নাম—বৈরাগী পরমেশ্বর মহাত্যাগী। জটা-জুটধারী সন্ন্যাসী। গায়ে একটি কম্বল জড়ানো। নগ্নপদ। দেখলে ভক্তি হয়। বয়স প্রায় ৬০ বছর হবে। নেপালীবাবা বললেন: "আষাঢ় মাসে শিলিগুড়ি থেকে বেরিয়ে, হৃষীকেশ থেকে পদব্রজে কেদারখণ্ড পরিক্রমা করছি। গতকাল রাত্রিতে তুঙ্গনাথ থেকে এসেছি। অনসূয়া মাতা দর্শন করে, রুদ্রনাথ-কল্পনাথ হয়ে বদ্রীনাথে যাব। আরও মাসদুয়েক সময় লাগবে।" আমরা জিজ্ঞাসা করলাম: "এত কষ্ট করে এই পরিক্রমার উদ্দেশ্য কি?" উনি হেসে বললেন: "গুরুর আদেশ পালন করছি। দেশের ও দশের মঙ্গলের জন্য প্রতি তীর্থস্থানে প্রার্থনা করি। দেশের মানুষ বর্তমানে খুবই স্বার্থপর। নিজ স্বার্থরক্ষার্থে বিভেদ সৃষ্টি করে। আমার আশঙ্কা, দেশে আরও অরাজকতা হবে। তবে ভারতের এই দুর্দিন থাকবে না। সুদিন আসবেই।" পূর্বে এই সন্ন্যাসী ১২ বছর ভস্মাচ্ছাদিত ছিলেন। বর্তমানে আর প্রয়োজন হয় না। উনি নাকি গত ১২ বছর ধরে রাত্রিবেলা ছাদের নিচে থাকেন না। আমরা সামান্য প্রণামী দিতে চাইলে উনি কাঁধের ঝোলাতে দিতে বললেন। হাত পেতে নিলেন না।

দশটার সময় আবহাওয়া একটু ভাল হওয়ায় এবং চোপতা যাবার জন্যে একটি জিপ পেয়ে যাওয়ায় চোপতার উদ্দেশে রওনা হওয়া গেল। চারশো টাকা লাগবে যাতায়াতের জন্য। ঘন জঙ্গলের মধ্য দিয়ে অমসৃণ পথ। অল্প অল্প বৃষ্টির মধ্যে আমাদের জিপ চলল।

বেলা ১১টায় আমরা চোপতা পেঁছালাম। ছোট পাহাড়ী সুন্দর জায়গা। উচ্চতা ৭০০০ ফিট। প্রশস্ত রাস্তা। বাস, ট্যাক্সি দাঁড়ানোর জায়গা আছে। এখানে একটি হাই-অলটিচুড রিসার্চ সেন্টার রয়েছে। উত্তরপ্রদেশ পর্যটন বিভাগের একটি বাংলোও আছে। আধুনিক নিত্যপ্রয়োজনীয় প্রায় সকল জিনিসই পাওয়া যায় এখানে। দুই-বিছানাযুক্ত ঘরের ভাড়া ১২৫ টাকা। এখানে ভাল দুধ পাওয়া যায়। দুধ খেয়ে তুঙ্গনাথের উদ্দেশে পদব্রজে যাত্রা শুরু হলো আমাদের।

অল্প অল্প বৃষ্টি পড়ছে। আর্দ্র আবহাওয়া। আকাশ মেঘাচ্ছন্ন। পথ বেশ চওড়া। ৫ কি. মি. দুর্গম চড়াই পথ অতিক্রম করে তুঙ্গনাথ মন্দির দর্শন করতে হবে। উচ্চতা ১২,০৭২ ফিট। শুধু চড়াইয়ের জন্যে উঠতে শ্বাসকষ্ট হয়। খুব ধীর পদক্ষেপে আমরা এগিয়ে যাচ্ছি। শুনলাম, দুই থেকে আড়াই ঘণ্টা উঠতে লাগে।

পথের দুপাশে সবুজ ঢেউখেলানো পাহাড়। জঙ্গলের মধ্য দিয়ে শান্ত শীতল তরুচ্ছায়া—স্নিগ্ধ বনপথ। কোন প্রাণীর চিহ্ন নেই। মনে হচ্ছিল, এই 'মহাবিশ্বে' আমি একা। পথে জায়গায় জায়গায় বরফগলা ঝরনার জল অতিক্রম করতে হয়। প্রায় ৩ কি. মি. পথ আসার পর দুপাশে ঘন সবুজ নরম গালিচার মতো বিস্তীর্ণ বুগিয়াল বন। ঐ বনে মাঝে মাঝে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে লম্বা পাইনগাছের সারি। মনে হয়, যেন মানুষই এই বনকে সুসজ্জিত করার জন্য গাছগুলিকে রোপণ করেছে। এমন নিপুণভাবে রয়েছে গাছের সারি। রডোডেনড্রন, আখরোট, চিনার, সাইপ্রাস গাছের

বিপুল সমারোহ। মাঝে মাঝে নানা ফুলের সম্ভার। ৫ কি. মি. চড়াই অতিক্রম করে ডানদিকে ঘুরেই সবুজ সমতলভূমির ওপর তুঙ্গনাথের মন্দির দৃষ্টিগোচরে এল

তুঙ্গনাথের সৌন্দর্যের তুলনা হয় না। উচ্চতার জন্যে শীত খুব বেশি। মেঘ ও কুয়াশায় প্রায়ই আবৃত থাকে। যাত্রীরা এখানে রাত্রিবাস করে না।

মন্দিরটি ছোট। বাইরের চত্বর এখানেও বাঁধানো। মূল গর্ভমন্দিরে প্রবেশ করা যায়, কিন্তু বিগ্রহ স্পর্শ করার অনুমতি নেই। মন্দিরের দেবতা মহাদেব। তাঁর আকৃতি মহিষের সামনের দুটি পায়ের মতো। মহাদেবের মূর্তি দেওয়ালের সাথে লাগানো আছে বলে মনে হলো। সম্মুখ-ভাগে একটি বড় শিলা চন্দনচর্চিত। ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বরের প্রতীক। নিচেই পঞ্চকেদারের মূর্তি। রুপোর তৈরি। পিছনে ব্যাসদেব ও শংকরাচার্যের মূর্তি। বাইরের চত্বরে ছোট ছোট মন্দিরে ভৈরব, গণেশ, নারায়ণ ও হর-পার্বতীর মূর্তি রয়েছে। পূজারী আমাদের সযত্নে সর্বত্র পূজা করালেন। শীতের সময় তুঙ্গনাথের পূজা উখীমঠের নিকট মকুমঠে হয়।

এখানে মন্দির ছাড়াও চার-পাঁচটি ঘর রয়েছে। যাত্রীনিবাসও আছে। ঠান্ডার জন্যে যাত্রীরা এখানে থাকেন না। হোটেলওয়ালা বচ্চন সিং চা ও হালুয়া খাওয়ালেন।

এখান থেকে ১০০০ ফিট উঁচুতে চন্দ্রশিলা। চতুর্দিকে উন্মুক্ত ছোট সবুজ মালভূমি। সেখান থেকে পঞ্চচুলী, নন্দাদেবী, ধবলগিরি, নীলকণ্ঠ, বদ্রীনাথ ও কেদারনাথের তুষারাবৃত পর্বতশিখর দেখা যায়। প্রকৃতির বিশালতা, নিস্তব্ধতা ও হিমালয়ের ধ্যানমগ্ন রূপ দেখে মনে হয়, এ যেন প্রকৃতই স্বর্গরাজ্য। দুঃখের বিষয়, মেঘের জন্য এই দৃশ্যাবলী ক্ষণস্থায়ী। মেঘের স্বর্গরাজ্য তৃতীয় কেদারকে প্রণতি জানিয়ে অবতরণ করি ধরণীমাতার ক্রোড়ে। ফেরার পথে চোপতা থেকে ১ কি. মি. দূরে অবস্থিত কস্তুরী মৃগনাভি গবেষণাকেন্দ্র দেখলাম।

১৬ সেপ্টেম্বর। মণ্ডলের আকাশ পরিষ্কার। সূর্যালোকে গিরিশিখর স্নাত। আজ অনসূয়া মাতার মন্দির দর্শন করতে যাব। সকাল সাতটার সময় বালখিল্য নদীর সেতু অতিক্রম করে, পথের পাশে অবস্থিত অনসূয়া মাতার মন্দিরের তোরণদ্বার পেরিয়ে গ্রাম্য পথে আমাদের যাত্রা। গ্রামে ৩০।৪০টি পাথরের বাড়ি। বাড়ির পাশেই গরু ও মোষ রাখার ব্যবস্থা। ফলে খুবই অপরিচ্ছন্ন পরিবেশ। মাঝখানে পাথরে বাঁধানো উঠোন। মেয়েরা গৃহকর্মরতা। কেউ কেউ কৌতূহলের চোখে আমাদের দেখছে। একজন সুন্দরী মহিলা বাড়ি থেকে বেরিয়ে এসে হিন্দীতে জিজ্ঞাসা করলেন, অনসূয়া মাতা দর্শন করতে যাচ্ছি কিনা, কোথা থেকে এসেছি ইত্যাদি। আসাম থেকে আসছি শুনে প্রসন্ন হাসিতে মুখ ভরে গেল। ওঁর স্বামী একসময় আসামে কর্মরত ছিলেন। বর্ডার সিকিউরিটি ফোর্সে আছেন। আগে ডিমাপুরে ছিলেন, বর্তমানে ত্রিপুরাতে আছেন। খুব আনন্দের সঙ্গে আমাদের 'কাঁকরি' খেতে দিলেন। যেন আমরা ওঁর কত আপনজন।

প্রায় ৩ কি. মি. হাঁটবার পর সামান্য চড়াই পেরিয়ে বালখিল্য নদীর সেতু অতিক্রম করলাম। নদীর জল প্রচণ্ড গর্জনসহ উঁচু পাথর থেকে নিচে নেমে ঠিক সেতুর বাঁদিকে একটি গভীর খাদে সঞ্চিত হয়ে প্রবাহিত হচ্ছে। অতি স্বচ্ছ জল—সবুজ নীলাভ জলের রঙ। সত্যিই অপূর্ব দৃশ্য। দ্বিতীয় সেতু অমৃতগঙ্গার ওপর। এরপর পথ ক্রমশঃ চড়াই। দুপাশে পাইন, আখরোট গাছ, অনেক নাম-না-জানা ফুলের সমারোহ। মাঝে মাঝে বুগিয়াল বন। মণ্ডল থেকে ৫ কি. মি. দূরে অনসূয়া মাতার মন্দির অবস্থিত। বেলা দশটায় মন্দিরে এসে পেঁছালাম। চারদিকে উঁচু পাহাড়বেষ্টিত ছোট মালভূমি। একটি কাঠের দোতলা ধর্মশালা রয়েছে। ধর্মশালার পাশে একটি পাথরের বাড়ি। সেখানে মন্দিরের পুরোহিত থাকেন। আখরোট গাছের বন রয়েছে কাছেই। তবে ফল মোটেই সুস্বাদু নয়। ছোট পাথরের তৈরি মন্দির (৬৫০০ ফিট)। চারপাশে পাথরের চত্বর। পাশে একটি প্রকাণ্ড সাইপ্রাস গাছ— মন্দিরকে যেন সূর্যালোক ও বৃষ্টি থেকে রক্ষা করছে। সম্মুখভাগে পাথরের উঁচু দেওয়াল।

বাঁপাশে সারি সারি কয়েকটি পাথরের পরিত্যক্ত চালাঘর। সংস্কারের একান্ত অভাব। দেওয়ালের গায়ে অনেক সুন্দর সুন্দর দেবমূর্তি রয়েছে। হর-পার্বতী, শিব ও বিষ্ণু। এখানে বছরে দুবার মেলা হয়—শ্রাবণী রাখী-পূর্ণিমাতে ছোট এবং অগ্রহায়ণ পূর্ণিমাতে বড়।

মন্দিরের সম্মুখভাগে অনেক ঘণ্টা ঝুলছে। মন্দিরের চূড়াটি সোনার। গর্ভমন্দিরের সামনের চত্বরে একটি চতুষ্কোণ গর্ত রয়েছে। সেখানে অনবরত ধুনি জ্বলছে। পূজারী ওখানে বসে পাঠ করছিলেন। ওঁর নাম বিশালমণি পূজারী। গর্ভমন্দিরে প্রবেশের রীতি নেই। প্রদীপের স্বল্পালোকে মনে হলো পাথরের কিশোরী মূর্তি। দ্বিভুজা। নাকে নোলক রয়েছে। পিছনে অত্রি-মুনির মূর্তি। গর্ভমন্দিরে পূজারী আমাদের পূজা করালেন। খুব আন্তরিক ও ভাবময় তাঁর পূজা। দেখে মনে ভক্তি জাগে। পূজারী অনসূয়া মাতার কাহিনী শোনালেন—ব্রহ্মা লোকসৃষ্টির জন্যে অত্রি ও অনসূয়াকে আদেশ দেন। সেই আদেশ পূর্ণ করতে উভয়ে গভীর তপস্যায় মগ্ন হলেন। উদ্দেশ্য—ভগবানের নিকট সন্তানকামনা। তপস্যায় তুষ্ট হয়ে ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর মনুষ্যদেহ ধারণ করে ঋষি-দম্পতির সামনে উপনীত হন। তাঁরা ঋষি-দম্পতিকে আশীর্বাদ করলেন, জগতের সৃষ্টিশক্তির সাধনায় তাঁরা কৃতকার্য হয়েছেন। ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বরের আশীর্বাদে অনসূয়ার গর্ভে ব্রহ্মার অংশে সোম, বিষ্ণুর অংশে দত্তাত্রেয় ও মহেশ্বরের অংশে দুর্বাসার জন্ম হয়।

মর্তে এই সতীর খ্যাতি নারদমুনির মুখে শুনে ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বরের ঘরণীরা চিন্তিত হয়ে পড়লেন—পাছে নিজেদের মহিমা খর্ব হয়। ঈর্ষায় নিজ নিজ স্বামীকে তাঁরা প্ররোচিত করেন মর্তের এই সতীর অপযশ করানোর জন্যে। তিন দেবতা তিন ব্রাহ্মণের বেশ ধরে অত্রিমুনির আশ্রমে আসেন। অনসূয়াকে তাঁরা প্রথমে লোহার বল সিদ্ধ করে অতিথিসৎকার করতে বলেন। অনসূয়া লোহার বল সিদ্ধ করে অতিথিসৎকার করেন।

এরপর তাঁরা বললেন, স্তন্যপান করিয়ে তাঁদের সৎকার করতে হবে। অনসূয়া পুনরায় স্বামীর শরণাপন্ন হন এবং তাঁর ইচ্ছাশক্তিতে অতিথিরা বালকের রূপ ধারণ করতে বাধ্য হন। মাতৃরূপে সন্তানদের স্তন্যপান করাতে কোন অসুবিধা নেই। অতিথিরা তৃপ্ত হয়ে নিজরূপ ধারণ করে দেবী অনসূয়াকে আশীর্বাদ করলেন। মর্তসতী অনসূয়ার খ্যাতি ত্রিভুবনে ছড়িয়ে পড়ল। আজও বহু নারী সন্তানকামনার উদ্দেশে দেবী অনসূয়ার মন্দিরে পূজা দিতে আসে।

মন্দিরের পাশেই অত্রিনদী। রুদ্রনাথ থেকে নেমে অমৃতকুণ্ডে এর জলধারা সঞ্চিত হয়। এই কুণ্ড থেকেই অত্রি অথবা অমৃতগঙ্গার উৎপত্তি।

মন্দির থেকে ২ কি. মি. চড়াই-উতরাই পথে অত্রিমুনির আশ্রম। আশ্রম বলতে একটি গুহা এবং অমৃতকুণ্ড। গুহাতে অনেক ছোট-বড় মূর্তি রয়েছে। বৃষ্টির জন্যে গুহা-দর্শন হলো না।

পূজা শেষ হওয়ার পর ধর্মশালাতে আহার ও বিশ্রাম করলাম। ধর্মশালার মালিক প্রকাশ সিং সেমিয়াল। বাঁধাকপির তরকারি এবং পায়েসের সঙ্গে ঘি সহযোগে রুটি দিয়ে আমরা আহারপর্ব সম্পন্ন করলাম। পরদিন রুদ্রনাথে যাত্রা।

১৭ সেপ্টেম্বর। সকাল সাতটার সময় অনসূয়া মাতার মন্দির থেকে রুদ্রনাথের উদ্দেশে আমাদের যাত্রা শুরু হলো। মন্দির থেকে ১৭ কি. মি. দূরে অবস্থিত এই চতুর্থ কেদার।

১০০০ ফিট নিচে নেমে খরস্রোতা অত্রিগঙ্গার সেতু অতিক্রম করে ওপাড়ের পাহাড়ে যেতে হলো। পাহাড়ের গায়ে কাঁচা সরু রাস্তা। দুপাশে সাদা ফুলের সারি। ফুলে ধূপের মতো গন্ধ। প্রায় ২০০০ ফিট ওপরে উঠে এক বৃদ্ধ গাড়োয়ালীর সঙ্গে সাক্ষাৎ হলো। গরু-মোষ নিয়ে খাটালের মতো তৈরি করে একা রয়েছেন। দু-তিন মাস থাকেন। বাঘের জন্য বড় দু-তিনটি কুকুর পাহারায় রয়েছে। তাদের গলায় টিনের পাত বাঁধা। বৃদ্ধ দুধ থেকে ঘি তৈরি করেন। নিচের বসতিতে বিক্রি করার জন্যে ছেলে এসে নিয়ে যায়। উনি আমাদের সুস্বাদু ঘোল খাওয়ালেন।

এরপর ঘন জঙ্গল শুরু। সাইপ্রাস, পাইন

গাছের বন। এপথে যাত্রীরা বিশেষ চলাচল করে না, ফলে পথ বলে কিছুই নেই। অস্পষ্ট সরু পথের ওপর ভেজা পাতা পড়ে রয়েছে। সূর্যালোক এখানে প্রবেশ করে না। মাঝে মাঝে পথের ওপর বড় গাছ পড়ে রয়েছে। ঝরনা পথকে আরও সিক্ত করে দিয়ে যাচ্ছে। খুবই সাবধানে পথ চলতে হয়। পাখির কাকলিতে পথ মুখর।

প্রায় ৪ কি. মি. চলার পর ছোট বাঁশের ঝোপ দেখা গেল। ছোড়দা বললেন, এসব জায়গায় বাঘ থাকে। পথ ক্রমশঃ চড়াই। এভাবে সাতটি পর্বত-শৃঙ্গ অতিক্রম করে ১৭,২০০ ফিট উঁচুতে উঠতে হবে। পুনরায় ১৩,৪০০ ফিট নেমে রুদ্রনাথের মন্দির। কিছু দূর যাবার পর মাটির পথে বাঘের পায়ের ছাপ দেখে ছোড়দা বললেনঃ "বাঘ নিশ্চয়ই কাছেই কোথাও শিকারের খোঁজে আছে।" এরপর কচি বাঁশের ঝোপের কাছে হরিণের পায়ের ছাপ, বাঁশপাতা খাওয়ার চিহ্ন দেখে ছোড়দা নিশ্চিত হলেন যে, বাঘ শিকারের খোঁজে অপেক্ষমাণ। বলা বাহুল্য, ভয়ে ভয়ে ধীরে ধীরে পথ চলছি। ডানপাশে গভীর জঙ্গলাকীর্ণ খাদ। হঠাৎ ঝটপটানির আওয়াজ এলো খাদের দিক থেকে। একটু পরেই হরিণের চিৎকার। খাদের দিকে তাকাতেই দেখা গেল, বাঘটি মুহূর্তের মধ্যে হরিণের ওপর ঝাঁপিয়ে তাকে নিয়ে অন্তর্হিত হয়ে গেল। ভয়ে আমাদের শরীর তখন হিমশীতল। ছোড়দা কিন্তু নির্বিকার।

রাস্তা ক্রমশঃ ঘন জঙ্গলে আবৃত। লাঠি দিয়ে ডালপালা সরিয়ে পথ চলতে হচ্ছে। প্রচণ্ড চড়াই। দুপাশে নানা ধরনের ফুল। এক গাছ থেকে আর এক গাছে বাঁদরের দল লাফিয়ে লাফিয়ে বেড়াচ্ছে। ছোড়দা বললেনঃ "এরপর আর বাঘের ভয় নেই। তবে বন্য শূকর আছে। মাটি খুঁড়ে গাছের শিকড় খায়। খুব হিংস্র।"

চড়াই বাড়ছে। ঘন জঙ্গল ক্রমশঃ হাল্কা হয়ে আসছে। আরম্ভ হয়েছে সবুজ বুগিয়ালের বন। বনে নানা ধরনের, নানা রঙের ফুল। আমাদের মধ্যে কেউ কেউ ভূমিতে শয্যা নিয়ে প্রাণভরে ধরিত্রীমাতার পেলবতা সর্বাঙ্গে স্পর্শ করে নিল। যেন দেবতার আশীর্বাদ! এই বোধ—ধরিত্রীর এই ভয়ঙ্কর সৌন্দর্যের মধ্যেও তুমি আছ, প্রভু। এ-জায়গার নাম ফুল্কা-ঘাটি। কফি খেয়ে একটু বিশ্রামের পর আবার পথ চলা শুরু হলো আমাদের। এরপর আর জঙ্গল নেই। ন্যাড়া পাহাড়। শুধু চড়াই। মাঝে মাঝে বুগিয়াল বন। ছোট ছোট রডোডেনড্রন গাছ। ছোট সূর্য-মুখীর মতো ফুল। তারার মতো সবুজ, হলুদ, সাদা, নীল ফুল ফুটে রয়েছে। সাদা ফুলগুলির অপূর্ব গন্ধ! ছোড়দা বললেন, এ-গন্ধ বেশিক্ষণ নিলে নেশা হয়। মাঝে মাঝে মেঘ এসে সকলকে ঢেকে দিয়ে যাচ্ছে।

প্রথম চারটি শৃঙ্গে উঠতে বিশেষ কষ্ট পেতে হয়নি। পঞ্চম শৃঙ্গের পর অনবরত ইংরেজী 'Z' অক্ষরের মতো চড়াই। নানা আকারের, নানা বর্ণের পাথরের তৈরি সরু পথ। পথের কোথাও কোথাও পাথর আলগা হয়ে আছে। পথের দু-পাশে গভীর খাদ। এক-এক জায়গায় পথ এমনিই সংকীর্ণ যে, পাহাড়ের দিকে ভারসাম্য রেখে খুব সাবধানে হাঁটতে হয়।

ষষ্ঠ শৃঙ্গের পর সপ্তম শৃঙ্গে আরোহণ করছি। মনে হচ্ছে যেন 'রোপ ওয়াক'। লাঠির ওপর ভর দিয়ে অতি সন্তর্পণে পথ চলতে হচ্ছে। হিমশীতল হাওয়ার তীব্রতায় প্রতি মুহূর্তে গড়িয়ে পড়ার ভয়। শ্বাসকষ্ট, বাকরুদ্ধ, হৃৎকম্প। তবুও ঠাকুরের অপরিসীম করুণায় ঐ দুরূহ পথও একসময় শেষ হয়। প্রায় আধঘণ্টা এভাবে চলার পর সপ্তম শৃঙ্গে পৌঁছানো গেল। এই শিখরের উচ্চতা ১৭,২০০ ফিট। এখান থেকে নন্দাদেবী, নাঙ্গা পর্বত, ত্রিশূল প্রভৃতি তুষারাবৃত শিখরশ্রেণী দৃশ্যমান। অস্তায়মান সূর্যের কিরণ ঐ গিরিশিখরে নানা বর্ণের অদ্ভুত আলোর বিচ্ছুরণ করছে। চারপাশ নিস্তব্ধ। তাতে উপলব্ধি করা যায় অনন্তের সান্নিধ্য। মনে হচ্ছিল, হৃদয়ে যেন ধ্বনিত হচ্ছে অনন্তের সঙ্গীতঃ 'সোঽহম্ সোঽহম্', 'শিবোহম্ শিবোহম্'। স্বামীজীর সেই বাণী যেন অন্তরাত্মায় তখন ধ্বনিত হচ্ছিলঃ "ঈশ্বর যদি কখনো কারো কাছে এসে থাকেন, তাহলে আমার কাছেও আসবেন"।

এরপর উতরাই। মহা উৎসাহে ধীরে ধীরে অবতরণ করছি। পথের দুপাশে সবুজ ঘাসের সমারোহ। নানা বর্ণের ফুল ও ব্রহ্মকমল ফুটে রয়েছে। মুনিয়াল পাখি কখনো কখনো দেখা যাচ্ছে। সন্ধ্যা হয়ে আসছে। ছোড়দা বললেন: "সাড়ে ছটায় মন্দির বন্ধ হয়, তার আগে আমাদের পৌঁছাতে হবে।" একটি ছোট ঝরনা পেরিয়ে একটা বাঁক ঘুরতেই দেখা গেল কয়েকটি ঘর। দূর থেকে আরতির ঘণ্টা ও শিঙ্গাধ্বনি শুনতে পাওয়া গেল। পরমানন্দে সেই দিকে এগিয়ে চললাম আমরা। মন্দিরের কাছে এসে দেখা গেল, মন্দিরদ্বার বন্ধ হয়ে গেছে সেদিনের মতো। অগত্যা মন্দিরের দরজায় প্রণাম জানিয়ে আশ্রয়ের খোঁজে বেরিয়ে পড়লাম।

মন্দিরের একটু নিচে এক যোগীপুরুষ থাকেন। ওখানে রাত্রিবাসের উদ্দেশে গেলাম। সাধুর নাম প্রেমগিরি মহারাজ। পাথরের তৈরি ঘর। পাহাড়ী ঘাসে ছাওয়া আচ্ছাদন। ভিতরে ধুনি জ্বলছে। তিনি সাদরে গ্রহণ করলেন আমাদের সকলকে এবং আহারের ব্যবস্থা করলেন।

চারদিক খোলা বলে হিমেল হাওয়ার প্রকোপ। প্রচণ্ড শীত। তাই পঞ্চকেদারের মধ্যে রুদ্রনাথ সর্বাগ্রে বন্ধ হয় কার্তিক সংক্রান্তিতে। শীতের পুজো গোপেশ্বরে হয়। তার আগেই বরফ পড়তে শুরু করে।

রাত বাড়ছে। নির্মেঘ আকাশে চাঁদ হাসছে। দূরে বরফাবৃত গিরিশিখরে চন্দ্রালোক প্রতিফলিত হওয়ায় হাল্কা নীলাভ রঙ ধারণ করেছে। এ যেন প্রকৃতির স্বর্গরাজ্য! যেন রুদ্রনাথকে তুষ্ট করার জন্যে শিবালয়ের নীরব সজ্জা ও প্রার্থনা! মেঘ এসে তাঁকে বারে বারে ঢেকে দিয়ে যাচ্ছে। ক্ষণে ক্ষণে পটভূমির পরিবর্তন। দেখে মনে হয়—

"জলে হরি, স্থলে হরি, অনলে অনিলে হরি।
চন্দ্রে হরি, সূর্যে হরি, হরিময় এই ভূমণ্ডল।"

মনে পড়ল ঠাকুরের সেই কথা: "ঈশ্বর সর্বভূতে রয়েছেন। মানুষ, জীবজন্তু, গাছপালা, চন্দ্রসূর্য মধ্যে, জলে, স্থলে, সর্বভূতে তিনি রয়েছেন।" হৃদয়ে অপূর্ব আনন্দ হতে লাগল। হঠাৎ সাধুজী বললেন: "রাত হলো, শুয়ে পড়ুন। ভোরে উঠতে হবে। রুদ্রনাথজীর শৃঙ্গার বেশ দেখতে পাবেন।"

১৮ সেপ্টেম্বর। খুব ভোরে ঘুম ভেঙে গেল। সূর্যোদয় হয়নি। আকাশে হাল্কা লাল আভা। দূরের পর্বতশ্রেণী কালো লাগছে। পর্বতগাত্রে স্তরে স্তরে মেঘ। রোদ উঠলো সাতটার সময়।

রুদ্রনাথের মন্দির ১১,৬৭০ ফিট উচ্চতায় অবস্থিত। মণ্ডল থেকে ২২ কি. মি. এবং গোপেশ্বর থেকে ২৭ কি. মি. দূরে অবস্থিত। গোপেশ্বর হয়েও আসা যায়। পথ এত দুর্গম নয়। তবে পথে রাত্রিবাসের কোন ব্যবস্থা না থাকায় অসুবিধা হয়। আসলে মন্দির ও চূড়া বলে কিছু নেই। গুহার সম্মুখে পাথরবাঁধানো ঘর। ওপরে সাদা পতাকা উড়ছে। একপাশে দুটি চালাঘর। পুজারী থাকেন সেখানে। গুহার ভিতরে মহেশ্বরের মুখাবয়ব। কালো শিলা। মোটেই 'রুদ্র' নয়, সরল, সুন্দর, শান্ত, প্রেমময় মুখ। ঈষৎ বাঁদিকে হেলানো। সামনে বাহন নন্দী। গর্ভমন্দির অন্ধকার। গুহা এবং পাথরের সংযোগস্থলে একটু ফাটল। ঐ ফাটল দিয়ে সূর্যকিরণ মন্দির-মধ্যে প্রবেশ করে মন্দির আলোকিত করেছে। অপূর্ব দৃশ্য!

পুজারী পুজো করছেন। প্রথমে পঞ্চগঙ্গার জলে দেবতার স্নান। এই জল আসে মন্দির ছাড়িয়ে পাহাড়ের ওপরে 'স্বর্গদ্বার' থেকে। সেখানে 'পঞ্চগঙ্গা' নামে পাঁচটি ধারা আছে। স্নানের পর দেবতাকে বেশভূষা পরানো হয়। তারপর চন্দন লেপন, ফুলের মালা দিয়ে সাজানো হয়। পরানো হয় মুকুট এবং পিতলের মুখ। এরপর অভিষেক, পুজো ও আরতি। ব্রহ্মকমল দিয়ে পুজো হয়। নিবিড় প্রশান্তি নিয়ে আমরা প্রণতি জানাই দেবাদিদেবকে।

পুজো সমাপনান্তে প্রেমগিরি মহারাজের সঙ্গে কিছু সৎপ্রসঙ্গ হলো। উনি বললেন: "তীর্থযাত্রীরা আসেন আর চলে যান। না থাকলে স্থান-মাহাত্ম্য বোঝা যায় না।" [ক্রমশঃ]

## প্রসঙ্গ ঃ বঙ্গাব্দ

বাঙলা পনেরশো শতাব্দীর শুরুতে সকল বাঙলা পত্র-পত্রিকায় নানা প্রবন্ধ ইত্যাদি প্রকাশিত হইয়াছে। কিন্তু কোনটিতেই বাঙলা শতাব্দী কোন্ সূত্র অথবা কোন্ ঘটনাকে কেন্দ্র করিয়া প্রচলিত হইয়াছিল তাহার কোন সন্ধান পাওয়া গেল না।

ইংরেজী শতাব্দী বা ইসলামের হিজরী শতাব্দীর উৎপত্তির কারণ সবার জানা আছে। বাঙলা শতাব্দীর উৎপত্তির ও প্রচলনের কারণ উদ্বোধনের মাধ্যমে জ্ঞাত করা হইলে বড় ভাল হয়।

**পরেশচন্দ্র দত্ত**
৬৬, কমল পার্ক
বিরাটি, কলকাতা-৫১

## নতুন শতাব্দীর শুরু কবে থেকে ?

১৪০০ সালের ১ বৈশাখ বঙ্গাব্দের নতুন শতাব্দীর সূচনা করল, না বঙ্গাব্দ চতুর্দশ শতাব্দীর শেষ বছরে পড়ল—এনিয়ে বিতর্ক চলছে। তর্কটাকে একটু ছোট করে বলা যায়, একটা শতাব্দীকে আমরা (১) ০০ থেকে ৯৯ পর্যন্ত ধরব, না (২) ০১—০০ পর্যন্ত ? ১-নম্বরকে ধরলে ১৪০০ সালের ১ বৈশাখ নতুন শতাব্দী শুরু হয়ে গেছে, ২-নম্বর মতে সেটা হবে আগামী ১৪০১ সালের ঐ তারিখে। নানা জন নানা মত দিয়েছেন। ইংরেজী অভিধানে 'সেঞ্চুরী' বলতে কি লেখা আছে, তার উল্লেখও হয়েছে। এইখানেই দেখা দিয়েছে এক নতুন বিপত্তি।

শঙ্খ ঘোষ জানাচ্ছেন যে, তিনি অক্সফোর্ডের চারটি অভিধানে দু-রকম মতই পেয়েছেন। এমনকি ১৯৯২ খ্রীস্টাব্দের একটি অভিধানে বিংশ শতাব্দীর ব্যাপ্তি ১৯০০—১৯৯৯ খ্রীস্টাব্দ বলে দেখানো আছে, তার সঙ্গে রয়েছে একটি মন্তব্য 'ইন মডার্ন ইউসেজ'। অক্সফোর্ডের 'শর্টার ইংলিশ' ও 'কনসাইজ ইংলিশ' অভিধানে যা আছে তাতে শতাব্দী হওয়া উচিত ০১—০০ পর্যন্ত। ওদেরই 'অ্যাডভান্স লার্নার্স' অভিধানে পাই, বিংশ শতাব্দী—১৯০০ থেকে ১৯৯৯ এ. ডি.। 'কলিনস কোবিল্ড' অভিধানে পাই, 'বিংশ শতাব্দী শুরু হয়েছে ১৯০০ খ্রীস্টাব্দে'। স্বভাবতই তা শেষ হবে ১৯৯৯-এ। এই সব থেকে একথা প্রমাণিত হয় যে, সাহেবরাও এ-বিষয়ে নিশ্চিত নন। আমরা জানি না, তাঁরা বিংশ শতাব্দীকে বরণ করেছিলেন কোন্ খ্রীটাব্দে—১৯০০ না ১৯০১ ? যদি ১৯০১-এ করে থাকেন এবং 'মডার্ন ইউসেজ' অনুযায়ী এক-বিংশকে স্বাগত জানান ২০০০-এ, তবে তাঁদের দুটো শতাব্দী বরণের মধ্যে সময়ের ব্যবধান হবে একশ নয়, নিরানব্বই বছর। তবে এনিয়ে আমাদের মাথাব্যথা নেই—সাহেবদের ভাবনা তাঁরাই ভাবুন। কিন্তু বিষয়টাকে একটু বিশদভাবে ভেবে দেখতে ক্ষতি নেই কিছু। বলা হয় খ্রীস্টের জন্মের বছর থেকেই খ্রীস্টাব্দের শুরু। সেই বছরটা কত ছিল, ০ খ্রীস্টাব্দ, না ১ খ্রীস্টাব্দ ? যদি ০ ধরা যায়, তা হলে প্রথম শতাব্দী শেষ হয়েছে ৯৯ খ্রীস্টাব্দে। ১ ধরা হলে হয়েছে ১০০ খ্রীস্টাব্দে। যতদূর মনে হয়, শঙ্খ ঘোষ ০ ধরার পক্ষপাতী। কেননা, তা না ধরে ১ ধরলে, খ্রীস্টাব্দ ১ আর খ্রীস্টপূর্ব ১ সালের মধ্যের সময় ব্যবধান বিয়োগ করে বার করতে হলে ১ বছরের গণ্ডগোল হবে। অঙ্কটা কষলেই দেখা যাবে, তাঁর যুক্তি ও হিসাবে কোন ভুল নেই।

এবার অন্য এক দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করা হোক এই বিষয়টা। মনে করা যাক, ১৪০০ সালের ১ বৈশাখ ঠিক সূর্যোদয়ের সময় জন্ম নিল এক শিশু। অনেক শিশুই জন্মেছে সেই সময়ে, তাদেরই একজনের নাম, ধরা যাক, নব। আর সেই শিশুর জন্ম-সময় থেকেই আমরা প্রচলন করতে চাই এক

নতুন অব্দ—তার নাম নবাব্দ। এই লেখাটা লেখা হচ্ছে ১৪০০ সালের ৩ বৈশাখ। তার তারিখ আমরা নবাব্দে কি দেব? ৩. ১. ০০ না ৩. ১. ০১? ধরা যাক লিখলাম ৩. ১. ০০—এখানে সময়ের তিনটি একক পরপর লেখা—বিন্দু দিয়ে পৃথক করে। এই তারিখ দেওয়ার পদ্ধতি থেকে আমরা দুটি জিনিস পেতে পারি। কোন স্থিরবিন্দু থেকে অতিক্রান্ত কাল ও স্থিরবিন্দু সাপেক্ষে উপস্থিত কাল। প্রথমে অতিক্রান্ত কালের কথা ভাবি। ৩. ১. ০০ তারিখের প্রথম ৩ থেকে বুঝতে পারি যে, নবাব্দের ২টি দিন চলে গেছে। পরের ১ থেকে পাই, প্রথম মাসেই আছি, অর্থাৎ ০-সংখ্যক মাস অতিক্রান্ত। তাহলে দিন ও মাসের বেলায় অতিক্রান্ত কাল বার করতে হলে তারিখের দিন ও মাসের থেকে ১ বাদ দিতে হয়। এনিয়ম বছরের ক্ষেত্রে খাটাতে পারলে ভাল ছাড়া খারাপ হয় না। কিন্তু ০০ থেকে ১ বাদ দিলে হবে —১, যা ঠিক নয়। আজ ৩ বৈশাখ; কল্পিত নবাব্দের প্রথম বছরের প্রথম মাসের তৃতীয় দিন—এটা যদি সত্যি হয়, তাহলে তার তারিখ লিখতে হবে ৩. ১. ০১। অতিক্রান্ত সময় বার করতে সবগুলো থেকেই ১ বাদ দিন, পাওয়া যাবে ২ দিন, ০ মাস ও ০ বছর অতিক্রান্ত। একই নিয়মের আওতায় চলে আসছে সব। নবাব্দের তারিখ যদি হয় ২১. ১১. ১৮ তবে অতিক্রান্ত সময় ১৭ বছর ১০ মাস ২০ দিন। সব রাশি থেকে ১ বাদ দিলেই হবে।

এবার দেখা যাক, অতিক্রান্ত সময় না ভেবে অবস্থান বিচার করতে গেলে কি পাই? যে-নবাব্দ (কল্পিত) শুরু হলো ১৪০০ সালের ১ বৈশাখ, আজ ৩ বৈশাখ তার প্রথম বছরের প্রথম মাসের তৃতীয় দিন—সেখানেই আজ আমরা আছি। তৃতীয় দিনের জন্য ৩, প্রথম মাসের জন্য ১ আর প্রথম বছরের জন্য ১ শেখাই তো সঙ্গত। তাহলে তারিখটা হবে ৩. ১. ০১। উপস্থিত কাল বার করার ব্যাপারটা তারিখ থেকেই সরাসরি পাওয়া যাবে—কোন কিছু যোগ অথবা বিয়োগ করার দরকার নেই। এটা মানা হলে কোন অব্দের সূচনাব্দ ১, তাহলে বঙ্গাব্দের নতুন শতাব্দী আসবে ১৪০১ সালের বৈশাখের প্রথম দিন। গোড়ায় প্রস্তাবিত ২-নম্বর মতটাই প্রাধান্য পাচ্ছে।

বলা যেতে পারে, তারিখ ও মাস তো বারবার ঘুরে ঘুরে আসে—বছর তো শুধু এগিয়েই চলে সামনে। কিন্তু এটা শুধু গোনার একটা রীতি মাত্র, নেহাতই কিছু ব্যবহারিক সুবিধার জন্য এমন করা হয়েছে। বারোটা মাস মিলে যে-বছরটা তৈরি করল, তা যদি আর ঘুরে না আসে, তাহলে যে-মাসগুলো তার মধ্যে ঢুকে গেছে তাদের মধ্যে তারাও আর ঘুরে আসতে পারে না। মাস কিংবা দিনের নামগুলো আমরা বারবারই ব্যবহার করতে পারি, কিন্তু তাদের সময়-মান বদলে যাচ্ছে—ক্রমাগতই পরিবর্তিত হচ্ছে।

এবার সেই প্রশ্নটা। বছর গোনার কোন রীতির সঙ্গে (যেমন নবাব্দ) সেই রীতি শুরু হওয়ার আগের বছরগুলোর (ধরা যাক, নব-পূর্বাব্দ) সমন্বয় করা ও বিয়োগ-প্রক্রিয়ায় তাদের মধ্যের সময় বার করতে গেলে সন্ধিলগ্নে একটা বছরকে ০ অব্দ বা বছর বলতেই হবে। প্রশ্ন হলো, এই ০ চিহ্নিত বছরকে পিছনের দিকে নেব, না সামনের দিকে? পিছনের দিকে নিলে সব দিক বজায় থাকে। প্রথম ছবিতে তা দেখানো হলো (ছবি-১)।

ছবি – ১

এখানে বিয়োগ-চিহ্নটি 'পূর্বাব্দের' সূচক। বিয়োগ করে সময়-ব্যবধান বার করতেও কোন অসুবিধা হচ্ছে না। ছবি-১-এ তাও দেখানো হয়েছে।

০-রেখার ওপর শতাব্দীর শুরুকে স্থাপন করা চলে। তাহলে বঙ্গাব্দের সাম্প্রতিকতম বছরগুলো কেমনভাবে বসবে তা ছবি-২-তে দেখানো হলো।

ছবি – ২
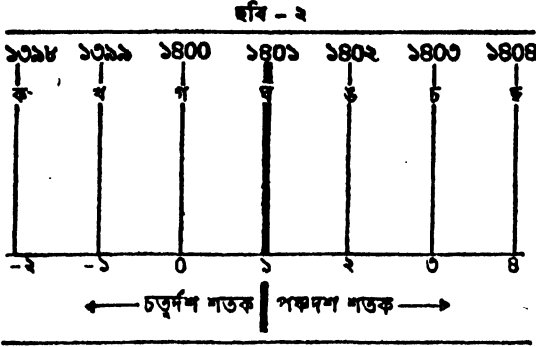
সবসময়েই ০-বিন্দুতে টানা-রেখার ওপর বসতে পারে সেই সব বছর, যাদের শেষ অংক ০।

সাহেবরা 'তাদের মডার্ন ইউসেজ'-এ যাই-ই বলুন, তাঁদের নানা অভিধানে নানান মতের অস্তিত্ব এটা প্রমাণ করে যে, তাঁরাও এবিষয়ে স্থির সিদ্ধান্তে আসেননি। মুশকিল হলো, বছরগুলো গোনা শুরু হয়েছে অনেক আগের কোন ঘটনার দিন থেকে। ১ খ্রীস্টাব্দের লোক জানতেন না যে, তাঁরা ১ খ্রীস্টাব্দে বাস করছেন। তেমনি প্রথম বঙ্গাব্দের মানুষও তাঁদের অব্দ বিষয়ে জানতেন না। পরে যখন পুরনো কোন ঘটনার দিন থেকে অব্দ গোনা শুরু হলো তখন প্রথম বছরটাকে ০ না ১ ধরেছিলেন, তা জানতে হবে। তবে লোকে গোনা শুরু করে ১ থেকেই, ০ থেকে নয়। ইতিহাস, জ্যোতির্বিদ্যা প্রভৃতি নিয়ে চর্চা করেন এমন বেশ কিছু মানুষের সঙ্গে কথা বলে জেনেছি যে, তাঁরা প্রায় সবাই ১৪০০ সালকে চতুর্দশ শতাব্দীর শেষ বছর বলেই গণ্য করছেন। তাঁদের মতে পঞ্চদশ শতাব্দী আসবে ১৪০১-এর বৈশাখের ১ তারিখে।

**অশোক মুখোপাধ্যায়**

সৌজন্য : আজকাল ( ৭ মে, ১৯৯৩ )

বাঙালী আবেগপ্রবণ ও কল্পনাপ্রবণ। তার ভাবাবেগ সহজেই উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে, কোন ধর্মীয় বা সামাজিক অনুষ্ঠানকে সে উৎসবে পরিণত করে পরিতৃপ্তি লাভ করে। সাক্ষ্য দেবার জন্য দুর্গোৎসব এবং নববর্ষকে আহ্বান করা যেতে পারে। প্রতি বছরই বিশেষ জাঁকজমক সহকারে নববর্ষ উদ্‌যাপিত হয়। তবে ১৪০০ সালের নববর্ষ একটা নতুন মাত্রা পেয়েছে। অভূতপূর্ব আড়ম্বরের সঙ্গে এবছর নববর্ষ উদ্‌যাপিত হলো। এই অভূতপূর্ব উৎসাহ ও উদ্দীপনার কারণ সম্ভবতঃ অনেকের ধারণা, একটা শতাব্দীর অবসান হলো এবং ১৪০০ সালের ১ বৈশাখ থেকে নতুন শতাব্দীর সূচনা হলো। পত্র-পত্রিকা, আকাশবাণী, দূরদর্শন, কবি, সাহিত্যিক ও বুদ্ধিজীবীদের বলতে শুনলাম, ১৩৯৯ বঙ্গাব্দের ৩০ চৈত্র চতুর্দশ শতাব্দীর অবসান হলো এবং ১৪০০ সালের ১ বৈশাখ থেকে পঞ্চদশ শতাব্দী শুরু হলো। কেউ কেউ আবার বললেন, ১৩৯৯ সালের ৩০ চৈত্র ত্রয়োদশ শতাব্দী পূর্ণ হলো এবং ১৪০০ সালের ১ বৈশাখ থেকে চতুর্দশ শতাব্দীর সূচনা হলো। ভাবতে অবাক লাগে, এমন একটা বিভ্রান্তি ঘটল কি করে! কোন কোন মহল থেকে বলা হয়েছে, রবীন্দ্রনাথের '১৪০০ সাল' কবিতাটি বিভ্রান্তি সৃষ্টি করতে সাহায্য করেছে। কবিতাটি পড়ে এই ধারণা হওয়া অসম্ভব নয় যে, কবিতাটি রচিত হয়েছিল ১৪০০ সাল আরম্ভ হবার ঠিক ১০০ বছর পূর্বে, কিন্তু চতুর্দশ বঙ্গাব্দের সূচনায় কবিতাটি লেখা হয়েছিল—একথা মনে করবার কোন হেতু নেই। উল্লেখ্য এই যে, রবীন্দ্রনাথ '১৪০০ সাল' কবিতাটি রচনা করেছিলেন ১৩০২ সালের ২ ফাল্গুন, ১৮৯৫ খ্রীস্টাব্দের ফেব্রুয়ারি মাসের মধ্য ভাগে। সুতরাং কেউ কেউ '১৪০০ সাল' পড়ে বিভ্রান্ত হয়েছেন, একথা গ্রহণযোগ্য নয়। মনে হয়, ব্যাপক হারে বিভ্রান্তির কারণ একটাই। নববর্ষ উদ্‌যাপন উপলক্ষেই শুধু বঙ্গাব্দকে আমরা একবার স্মরণ করি এবং তারপর বঙ্গাব্দকে সম্পূর্ণ ভুলে থাকি। ইংরেজ শাসন কায়েম হবার পূর্বে সরকারি, বে-সরকারি সব কাজকর্মে এবং প্রতিদিনের জীবন-যাত্রায় বঙ্গাব্দই অনুসৃত হতো। ইংরেজ শাসন সুপ্রতিষ্ঠিত হবার পরে বঙ্গাব্দের স্থান দখল করে বসে ইংরেজী বর্ষপঞ্জী। ইংরেজ শাসনের অবসান হবার ছেচল্লিশ বছর পরেও ইংরেজী বর্ষপঞ্জীর সর্বময় প্রভুত্ব রয়েছে অব্যাহত। অতএব বঙ্গাব্দ

সম্পর্কে আমাদের বিভ্রান্তি স্বাভাবিক। বস্তুতঃ চতুর্দশ শতাব্দী এখনো বিদ্যমান। চতুর্দশ বঙ্গাব্দ শুরু হয় ১৩০১ সালের ১ বৈশাখ শুক্রবার, ১৪ এপ্রিল ১৮৯৪ খ্রীস্টাব্দে; চতুর্দশ শতাব্দীর অবসান হবে ১৪০০ সালের ৩১ চৈত্র, বৃহস্পতিবার, ১৪ এপ্রিল ১৯৯৪ খ্রীস্টাব্দে। পঞ্চদশ শতাব্দী আরম্ভ হবে ১৪০১ বঙ্গাব্দের ১ বৈশাখ, ১৫ এপ্রিল ১৯৯৪ খ্রীস্টাব্দে।

বঙ্গাব্দের ইতিহাস খুব প্রাচীন নয়। অবিভক্ত বাংলায় বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন অব্দ প্রচলিত ছিল। মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠিত হবার পূর্ব পর্যন্ত বাংলায় শকাব্দ প্রচলিত ছিল। শকাব্দ প্রচলিত হয় ৭৮ খ্রীস্টাব্দে। এর ৫১৫ বছর পরে বঙ্গাব্দের আবির্ভাব।

১৫৫৬ খ্রীস্টাব্দের ৯ ফেব্রুয়ারি আকবর দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ করেন। তখন ৯৬৩ হিজরী অব্দ প্রচলিত ছিল। হিজরী সন সম্পূর্ণ চান্দ্রমাসে গণিত হতো এবং সৌর বছরের সঙ্গে সমতারক্ষার জন্য অধিমাস বা মলমাস বর্জন করা হতো না। এজন্য বৈষয়িক কাজকর্মে নানা অসুবিধা দেখা দিয়েছিল। এইসব অসুবিধা দূরীকরণার্থে আকবর ১৫৫৬ খ্রীস্টাব্দে প্রচলিত ৯৬৩ হিজরী অব্দকেই সৌরমানে গণনা করে এপ্রিল মাসে ১ বৈশাখ থেকে বঙ্গাব্দে পরিণত করেন। দেখা গেল, বঙ্গাব্দ প্রচলিত হয় মাত্র ৪৩৭ বছর পূর্বে। সম্পূর্ণ সৌরমানে গণিত নববর্ষ বাংলার হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়েরই নববর্ষ। এই নববর্ষ বাংলার হিন্দু-মুসলমানের একমাত্র ধর্মনিরপেক্ষ জাতীয় উৎসব।

**কালিদাস মুখোপাধ্যায়**
৪১, শ্রীরামপুর রোড ( উত্তর )
গড়িয়া, কলকাতা-৭০০০৮৪

## প্রচ্ছদ-পরিচিতি

প্রচ্ছদের আলোকচিত্রটি কামারপুকুরের শ্রীরামকৃষ্ণের বাসগৃহের। পাঁচের দশকের প্রথমদিকে আলোকচিত্রটি গৃহীত হয়েছিল।

বর্তমান বর্ষটি (১৯৯৩) শ্রীরামকৃষ্ণ-ভাবান্দোলনের ক্ষেত্রে একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বর্ষ। কারণ, এই বর্ষে শিকাগো ধর্মমহাসম্মেলনে স্বামী বিবেকানন্দের আবির্ভাবের শতবর্ষ পূর্ণ হচ্ছে। শিকাগো ধর্ম-মহাসভায় স্বামী বিবেকানন্দ যে-বাণী প্রচার করেছিলেন এবং যে-বাণী ধর্মমহাসভার সর্বশ্রেষ্ঠ বাণী বলে অভিনন্দিত হয়েছিল, সে-বাণী ছিল সমন্বয়ের বাণী। ধর্মের সমন্বয়, মতের সমন্বয়, সম্প্রদায়ের সমন্বয়, দর্শনের সমন্বয়, আদর্শের সমন্বয়—প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের সমন্বয়, প্রাচীন ও নবীনের সমন্বয়, অতীত বর্তমান ও ভবিষ্যতের সমন্বয়। ভারতবর্ষ সুপ্রাচীন কাল থেকে এই সমন্বয়ের বাণী ও আদর্শ প্রচার করে আসছে। আধুনিক কালে এই সমন্বয়ের সর্বপ্রধান ও সর্বশ্রেষ্ঠ প্রবক্তা শ্রীরামকৃষ্ণ। সাধারণভাবে সনাতন ভারতবর্ষের এবং বিশেষভাবে শ্রীরামকৃষ্ণের সমন্বয়ের বাণীকে স্বামী বিবেকানন্দ বহির্বিশ্বের সমক্ষে উপস্থাপিত করেছিলেন। চিন্তাশীল সকল মানুষই আজ উপলব্ধি করছেন যে, সমন্বয়ের আদর্শ ভিন্ন পৃথিবীর স্থায়িত্বের আর কোন পথ নেই। সমন্বয়ের পথই বর্তমান পৃথিবীর বহুবিধ সমস্যা ও সঙ্কটের মধ্য থেকে উত্তরণের একমাত্র পথ। কামারপুকুরের পর্ণকুটীরে যাঁর আবির্ভাব হয়েছিল দরিদ্র এবং নিরক্ষরের ছদ্মবেশে, তিনিই বর্তমান এবং আগামীকালের বিশ্বের ত্রাণকর্তা। তাঁর বাসগৃহটি তাই আজ ও আগামীকালের সমগ্র পৃথিবীর তীর্থক্ষেত্র। শিকাগোর বিশ্বধর্মসভার মঞ্চে স্বামী বিবেকানন্দের কণ্ঠে শান্তি, সমন্বয় ও সম্প্রীতির যে-বাণী বারংবার উচ্চারিত হয়েছিল—যার মধ্যে নিহিত ভারত ও পৃথিবীর রক্ষাকবচ, তার গর্ভগৃহে কামারপুকুরের এই পর্ণকুটীর।—**সম্পাদক, উদ্বোধন**

## স্মৃতিকথা

# শ্রীশ্রীমায়ের পদপ্রান্তে

## পরিতোষ মজুমদার

আজ ৫ বৈশাখ ১৩৬৮, অক্ষয়তৃতীয়া। আজ থেকে প্রায় ৬০ বছর আগের কথা। স্কুলের ছুটি। তাই সময় কাটানোর জন্য বন্ধুগৃহে গিয়েছি। বছর খানেক আগে (১৩০৯/১৯০২) স্বামীজী দেহরক্ষা করেছেন। বন্ধু একখানা বই হাতে গুঁজে দিয়েছিলেন। পড়ে দেখি, 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-কথামৃত শ্রীম কথিত'। প্রথম খণ্ড। এক নিঃশেষে বইখানা শেষ করে বন্ধুকে ফিরিয়ে দিয়ে বললাম: "চমৎকার বই।" ফিরে আসি কুমিল্লায় নিজের বাড়িতে। তারপর খাই-দাই, বেড়াই, পড়াশুনা করি। এইভাবে বেশ কিছুদিন কেটে গিয়েছে। এরমধ্যে আমার বিবাহ হয়েছে, চাকরিও হয়েছে। প্রথমে চট্টগ্রামে, পরে কক্সবাজারে চাকরিসূত্রে অবস্থান। দ্বিতীয় স্থানে সারারাত জপ-ধ্যান করতাম, আর দিনের বেলা ১০টা-৫টা অফিস চলছিল। নির্জন সমুদ্রতটে, কখনো নিস্তব্ধ পাহাড়ের পাদদেশে ঘুরে বেড়াতাম। রাত্রে বাড়ি ফিরে খেয়ে-দেয়ে শয্যাগ্রহণ। স্বপ্নে বহু সাধু-সন্ন্যাসীকে দেখতাম। একদিন স্বপ্নে দেখি, সমুদ্র-তীরে বেশ তন্ময় অবস্থায় আছি। কিছুক্ষণ পর দেখতে পেলাম, চারদিক আলোময় হয়ে গেছে, মধ্যে নারায়ণ—শ্রীরামকৃষ্ণরূপী। চারদিকে মুনিঋষিরা তাঁর স্তব-স্তুতি করছেন। এমন সময় খেতে ডাক পড়ল। কিন্তু যাব কি করে? আমি যে আমার পা খুঁজে পাচ্ছি না। শেষে টিপে টিপে তবে পা খুঁজে পাওয়া গেল।

এরপরেও বেশ কিছু দিন কেটে গেল। অফিসের কাজ তাড়াতাড়ি সেরে নিয়ে কখন পাহাড়ে বা সমুদ্রতীরে যাওয়া হবে—সেই চিন্তা। আমি ছিলাম মা কালীর ভক্ত। মাকে দেখব। তাঁর দর্শন হবে—এই ভাবনা মনকে ব্যাকুল করত। দেখতাম, তাঁর স্মরণ-মননে কি আনন্দ! মনে আনন্দ যেন ধরে না! কখনো আবার চোখে নামে অবিরাম অশ্রুধারা, সে-ধারা আর থামে না। কিন্তু জলে ডুবে প্রাণ আটুপাটু হলো কৈ? তবে তো মা দেখা দেবেন। নির্জনে ব্যাকুল হয়ে কাঁদলে তাঁর দেখা পাওয়া যায়। তিনি দয়া করেন। তবে বুঝি আমার ব্যাকুলতা নেই? তবে বুঝি আমি কাঁদতে পারিনি, তবে বুঝি কাঁদতে শিখিনি? মনে হলো, জীবন বৃথা।

একদিন এলাম কলকাতায়। তারপর দক্ষিণেশ্বর হয়ে বেলুড় মঠে। মঠে দেখা হলো স্বামীজীর শিষ্য জ্ঞান মহারাজ (ব্রহ্মচারী জ্ঞান)-এর সঙ্গে। তিনি বললেন: "ধ্যান করবে?" আমি বললাম: "হ্যাঁ, মহারাজ।" স্বামীজীর মন্দিরের কাছে বেলতলা দেখিয়ে দিতে আমি সেখানে গিয়ে বসলাম। কিছুক্ষণ পরে ধ্যান করে উঠলাম। জ্ঞান মহারাজ আমাকে সঙ্গে করে বেলুড় মঠ ঘুরে দেখালেন। পরদিন সকালে আবার মঠে গিয়েছি। জ্ঞান মহারাজ বললেন: "মাস্টার মশায়ের সঙ্গে পরিচয় আছে?" বললাম: "না, মহারাজ।" এক যুবক ব্রহ্মচারী কলকাতা যাচ্ছিলেন নৌকা করে। জ্ঞান মহারাজ তাঁকে ডেকে বললেন: "একে নিয়ে যাও সঙ্গে করে। মাস্টার মশায়ের বাড়ি দেখিয়ে দেবে।" নৌকায় উঠে পড়া গেল। তারপর বাগবাজারে নৌকা থেকে নেমে ব্রহ্মচারী আমাকে মাস্টার মশায়ের বাড়ি নিয়ে গেলেন। তাঁর কাছে গিয়ে সভয়ে তাঁর পদপ্রান্তে উপবেশন করি। ছোট্ট একটি তক্তপোশের ওপর মুসলমানরা যেভাবে নামাজ পড়তে বসে ঠিক সেইভাবে শ্রীম উপ-বিষ্ট। তিনি আমার সব কথা শুনে বললেন: "আমি দিব্যচক্ষে দেখছি, মা হাত তুলে তোমায় ডাকছেন।" খুব কম কথা বলেন। কিন্তু সদা হাস্যমুখ। মুচকি মুচকি হাসছেন আর আমার দিকে তাকাচ্ছেন। বললেন: "মা আছেন জয়রামবাটীতে।" কিভাবে সেখানে যেতে হবে তাও তিনি বলে দিলেন।

পরদিনই সকালের ট্রেনে বিষ্ণুপুর গেলাম। ট্রেন থেকে নেমে হোটেলে ভাত খেয়ে গেলাম সুরেশ্বর সেনের বাড়ি। বাড়িতে ঢুকেই দেখি, সুরেশ্বরবাবু বেলফুলের বাগান কোপাচ্ছেন। মায়ের বাড়ির যাত্রী শুনে খুব যত্ন করে রাতে খাওয়ালেন। রাত দশটা নাগাদ গরুর গাড়ির ব্যবস্থা করে দিলেন। সারারাত গাড়ি চলল। সকাল সাতটা নাগাদ কোয়ালপাড়া আশ্রমে এসে পেঁছালাম। সেখানে স্নান-খাওয়া সারা গেল।

ব্রহ্মচারীদের খুব যত্ন। খেয়ে-দেয়ে জয়রামবাটী রওনা হলাম। বিকালের দিকে শ্রীশ্রীমায়ের বাড়িতে এসে পেঁছালাম। মাকে উঠানে দেখেই তাঁর পায়ের ওপর আমি লুটিয়ে পড়লাম। চোখের জল আর বাধা মানল না। ঐ অবস্থায় মায়ের চরণে "ব্রহ্মময়ী, ব্রহ্মময়ী, কৃপা, কৃপা" বলে অজস্র অশ্রুবিসর্জন। মা আমার মাথায় হাত বুলিয়ে দিলেন আর বললেন ঃ "কৃপার পাত্রই বটে।" মা আমায় মুড়ি, বেগুনী, জিলিপি খেতে দিলেন। সন্ধ্যা হয়ে এল।

আনন্দ, আনন্দ! যেন আনন্দের হাট বসে গেছে। জলে মাছেরা যেমন আনন্দে ভেসে বেড়ায় তেমনি যেন আমারও আনন্দে ভাসতে ইচ্ছা করছিল। যেদিকে তাকাই আনন্দ বৈ আর কিছু নেই। যেন চোখে নাবা লেগে গেছে। মায়ের ভাষায়, চারিদিক যেন "আনন্দের ঘট পূর্ণ" হয়ে গিয়েছে। আমারও চারিদিক আনন্দময়। রাত্রে ভরপেট খেয়ে ঘুম। খুব ভোরে প্রাতঃকৃত্য ও হাত-মুখ ধোয়ার জন্য বাড়ির বাইরে গেলাম। মায়ের জপ-ধ্যান তার আগেই শেষ হয়ে যায়। পরে শুনেছিলাম, জনৈক ব্রহ্মচারীকে তিনি বলেছিলেন ঃ "চট্টগ্রাম থেকে গত সন্ধ্যায় যে-ছেলেটি এসেছে তাকে ঘুম থেকে তুলে দাও।" ব্রহ্মচারী আমাকে ঘরে না পেয়ে মাকে বললেন ঃ "কাউকে তো দেখছি না।" মা বললেন ঃ "আবার খোঁজ। আমি ওর জন্য অপেক্ষা এদিকে যদৃচ্ছাক্রমে ঘুরতে ঘুরতে একেবারে ভানুপিসির বাড়িতে এসে আমি উপস্থিত। পিসি দুধের কড়াই চাঁচ্ছেন ঝিনুক দিয়ে। একটা বল বানিয়েছেন চাঁছিগুলি দিয়ে। আমি ঢুকতেই তিনি বললেন ঃ "গোপাল, ছানা খাবে?" অমনি হাঁটু গেড়ে হাত পেতে বলটা নিয়ে মনের আনন্দে খাচ্ছি। পিসি বললেন ঃ "কী অনুরাগ-বাঘেই ধরেছে গো!" জ্ঞানী মানুষ। দেখেই অবস্থা বুঝে ফেলেছেন। ঠিক তখনই হরিপ্রেম মহারাজ (তখন ব্রহ্মচারী) এসে বললেন ঃ "আপনি এখানে? মা আপনাকে খুঁজছেন।" তাড়াতাড়ি হাতের বলটা গলায় পুরে দৌড় দিলাম। গিয়ে দেখি, মা পূজা সেরে অপেক্ষা করছেন। আমি যেতেই বললেন ঃ "দীক্ষা নেবে?" বললাম ঃ "মা, আমি কিছু জানি না। সব তোমার ইচ্ছা।" "যাও স্নান করে এসো"—বলে মা ডানদিকে মায়ের কুটিরের পূর্বদিকের পুকুরটা দেখিয়ে দিলেন। তাড়াতাড়ি পুকুরে ডুব দিয়ে মায়ের কাছে এসে আমি হাজির হলাম। শ্রীম আমায় বলে দিয়েছিলেন ঃ "মায়ের জন্য একখানা লাল নরুনপেড়ে কাপড়, একটি টাকা আর কয়েকটা জবাফুল নিয়ে যেও।" নিয়ে গিয়েছিলাম। স্নান করে সেগুলি মাকে দিলাম। মা আমাকে দীক্ষা দিলেন। নিজ আঙুলে জপ করে করজপ করা শেখালেন। ঠাকুরের ছবির দিকে হাত দেখিয়ে বললেন ঃ "উনিই তোমার ইষ্ট।" দীক্ষার পর মাকে প্রণাম করে ওঠার সময় স্পষ্ট দেখলাম, মা নন—মায়ের জায়গায় বসে আছেন মা কালী স্বয়ং! আবার পদপ্রান্তে লুটিয়ে পড়লাম চেতনা হারিয়ে।

আমার পরে আরেক জনেরও দীক্ষা হলো। সে শ্রীশ্রীমাকে জিজ্ঞাসা করেছিল ঃ "মা, উনি কি সন্ন্যাসী হয়ে সংসার ছেড়ে বেরিয়ে যাবেন?" তার উত্তরে মা বলেছিলেন ঃ "না, ওর কিছু ভোগ বাকি আছে।"

আনন্দ, আনন্দ, আনন্দ। সেদিন রাত্রেও আমার মাতৃগৃহে থাকার সৌভাগ্য হলো। পরদিন প্রাতে খোকা মহারাজ (স্বামী সুবোধানন্দজী মহারাজ) কামারপুকুরে যাচ্ছেন। মাকে বললাম ঃ "খোকা মহারাজের সঙ্গে যাব?" মা অনুমতি দিতেই মহারাজের সঙ্গে কামারপুকুর রওনা হলাম। কামারপুকুরে রামলালদাদা আর লক্ষ্মীদিদিকে দেখলাম। খেয়ে-দেয়ে রামলালদাদার কাছে ঠাকুর ও মায়ের কিছু গল্প শুনে মায়ের বাড়িতে ফিরে এলাম। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করি যে, ভুবনেশ্বর মঠে রাজা মহারাজের দর্শন ও সান্নিধ্য লাভ করার সুযোগও আমার পরে হয়েছিল।

তারপর আবার সেই পূর্বের মতো জীবন-যাপন। বেশ কিছুদিন পর অমৃতবাজার পত্রিকায় একদিন দেখলাম, মা দেহরক্ষা করেছেন। এগারো দিন অশৌচ পালন করলাম। বারো দিনের দিন খুব ভোরেই থালা, বাটী, ঘটি ইত্যাদি ব্রাহ্মণকে দান করলাম। শ্রীশ্রীঠাকুরকে ভোগ দিয়ে সকলকে প্রসাদ বিতরণ করলাম। পাতানো মা তো নয়, আপন মা যে! জন্মজন্মান্তরের মা যে! তাই তো এসব করা।

তারপর বহু বছর কেটে গেছে। আজ দেখছি, মরদেহে অবর্তমান হলেও মা আমার কাছে, আমার জীবনে নিত্য আরও জীবন্ত হয়ে উঠছেন। □

প্রবন্ধ

# শ্রীরামকৃষ্ণ-কথিত নারদীয় ভক্তি

## স্বামী মুক্তসঙ্গানন্দ

সমন্বয়াচার্য শ্রীরামকৃষ্ণ ভগবানলাভের পথ প্রদর্শন করতে গিয়ে ভক্তদের প্রায়ই ভক্তিযোগ অবলম্বন করার উপদেশ দিতেন। কর্ম, জ্ঞান এবং ধ্যানের কথা বললেও 'কথামৃতে' দেখা যায় যে, সাধারণ ভক্তদের জন্য তিনি ভক্তির ওপরই অধিকতর গুরুত্ব আরোপ করেছেন। শ্রীরামকৃষ্ণের নিজের জীবনে কর্ম, জ্ঞান, ভক্তি ও ধ্যানের সমন্বয় ঘটলেও বাহ্যতঃ তিনি ভক্তিভাব অবলম্বন করেই বিচরণ করেছেন।

ভক্তিশাস্ত্রসমূহে ভক্তির নানা প্রকারভেদের উল্লেখ থাকলেও ভক্তিকে প্রধানতঃ দু-ভাগে ভাগ করা হয়েছে—প্রেমা ভক্তি বা শুদ্ধা ভক্তি এবং বৈধী ভক্তি বা গৌণী ভক্তি। 'কথামৃতে' উল্লিখিত অহেতুকী ভক্তি, উর্জিতা ভক্তি, পাকা ভক্তি, রাগভক্তি, প্রেমা ভক্তি আসলে শুদ্ধাভক্তির এবং সকাম ভক্তি, কাঁচা ভক্তি প্রভৃতি গৌণী ভক্তির নামান্তর। প্রেমা ভক্তি ব্যতীত ঈশ্বরদর্শন হয় না। শ্রীরামকৃষ্ণের উক্তি: "...ভক্তি অমনি করলেই ঈশ্বরকে পাওয়া যায় না। প্রেমা ভক্তি না হলে ঈশ্বরলাভ হয় না। প্রেমা ভক্তির আর একটি নাম রাগভক্তি। প্রেম, অনুরাগ না হলে ভগবানলাভ হয় না।"[১] এই প্রেমা ভক্তি কি, তাও শ্রীরামকৃষ্ণের উক্তি থেকে স্পষ্ট বোঝা যায়: "রাগভক্তি, প্রেমা ভক্তি ঈশ্বরে আত্মীয়ের ন্যায় ভালবাসা এলে আর কোন বিধি-নিয়ম থাকে না।"[২] বৈধী ভক্তি সম্পর্কে তিনি বলেছেন: "আর একরকম ভক্তি আছে। তার নাম বৈধী ভক্তি। এত জপ করতে হবে, উপোস করতে হবে, তীর্থে যেতে হবে, এত উপচারে পূজো করতে হবে··· —এসব বৈধী ভক্তি। এসব অনেক করতে করতে ক্রমে রাগভক্তি আসে।"[৩] শ্রীরামকৃষ্ণের এসকল উক্তি থেকে সহজেই বোঝা যায়, প্রেমা ভক্তি বা রাগভক্তি সাক্ষাৎভাবে ঈশ্বরদর্শন করায় এবং বৈধী ভক্তির অনুশীলনে ক্রমশঃ রাগভক্তির উদয় হয়। এজন্য সাধারণ ভক্তিবাদী সাধকের ভক্তিসাধনা বৈধী ভক্তি বা গৌণী ভক্তির মাধ্যমেই শুরু হয়।

উক্ত দুই প্রকার ভক্তির কথা ছাড়াও শ্রীরামকৃষ্ণ আর একরকম ভক্তি অনুশীলনের কথা ভক্তদের প্রায়ই বলতেন। তার নাম নারদীয় ভক্তি। এই নারদীয় ভক্তি কোন্ শ্রেণীর ভক্তি? প্রেমা ভক্তি না গৌণী ভক্তি? নাকি কোন বিশেষ রকমের ভক্তি? এই প্রশ্ন মনে জাগে। এবিষয়ে আলোচনা করার পূর্বে 'নারদীয় ভক্তি' বলতে শ্রীরামকৃষ্ণ কি বুঝিয়েছেন তার উল্লেখ প্রয়োজন। নারদীয় ভক্তি সম্পর্কে শ্রীরামকৃষ্ণ বলেছেন: "কলিতে ভক্তিযোগ। নারদীয় ভক্তি। ঈশ্বরের নামগুণগান ও ব্যাকুল হয়ে প্রার্থনা করা; 'হে ঈশ্বর, আমায় জ্ঞান দাও, ভক্তি দাও, আমায় দেখা দাও।' "[৪] এই উক্তি থেকে বোঝা যায়, ভক্তিসাধনার ক্ষেত্রে 'নারদীয় ভক্তি' বলতে শ্রীরামকৃষ্ণ ঈশ্বরের নামগুণগান ও প্রার্থনাকেই বুঝিয়েছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ-কথিত ঈশ্বরের নামগুণগানরূপ নারদীয় ভক্তি প্রেমা ভক্তি না বৈধী ভক্তির অন্তর্গত—এই প্রশ্নের উত্তরে নারদের জীবন সংক্ষেপে আলোচনা করলে কিছুটা ধারণা হবে। শ্রীমদ্ভাগবতের প্রথম স্কন্ধের পঞ্চম ও ষষ্ঠ অধ্যায়ে নারদের দুই জন্মের জীবনবৃত্তান্ত বর্ণিত হয়েছে। সেখানে ব্যাসদেবের নিকট নারদ নিজেই তাঁর জীবন ও সাধনার কথা ব্যক্ত করেছেন। নারদের সেই জীবনবৃত্তান্ত থেকে জানা যায় যে, পূর্বজন্মে তিনি কোন এক বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণের দাসীর পুত্র ছিলেন। তাঁর বাল্যকালে

১ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত, উদ্বোধন সং, পৃঃ ১৩৯

২ ঐ, পৃঃ ১৮৩

৩ ঐ, পৃঃ ১৩৯

৪ ঐ, পৃঃ ৫৪৫

বর্ষা ঋতুতে কয়েকজন ঋষি সেই ব্রাহ্মণের গৃহে অতিথি হয়ে কিছুকাল বাস করেন। সেসময় ঋষিদের পরিচর্যার ভার পড়েছিল বালক নারদের ওপর। ঋষিগণ প্রত্যহ মধুর কৃষ্ণকথা গান করতেন এবং তাঁদের অনুগ্রহে নারদও সেসব কথা শ্রবণ করতেন। তার ফলে নারদের অন্তরে স্বাভাবিক শ্রদ্ধার উদয় হয়। ঋষিদের প্রত্যেকটি কথা শ্রদ্ধার সঙ্গে শ্রবণ করায় ভগবান শ্রীহরির প্রতি তাঁর অনুরাগ জন্মে। নারদের ভগবৎপ্রীতি ও সেবায় সন্তুষ্ট হয়ে ঋষিগণ ব্রাহ্মণগৃহ থেকে বিদায় নেওয়ার সময় তাঁকে সাধনোপদেশ দিয়ে যান। এর কিছুদিন পরে মায়ের মৃত্যু হলে নারদ বনে গিয়ে ভক্তিপূর্ণচিত্তে অশ্রুবিসর্জন করতে করতে ধ্যানে নিমগ্ন হন। ধ্যানে তিনি দেখতে পান, শ্রীহরি তাঁর হৃদয়ে আবির্ভূত হয়েছেন। কিন্তু কিছুক্ষণ পরেই শ্রীহরি অন্তর্হিত হন। তখন নারদ শ্রীহরিকে পুনর্বার দেখার জন্য যত্নপরায়ণ হন। কিন্তু শ্রীহরি দর্শন না দিয়ে আকাশবাণীর মাধ্যমে আশ্বাস দেন যে, দেহান্তে নারদ তাঁর পার্ষদ হয়ে তাঁর সান্নিধ্য লাভ করবেন। তারপর যতদিন নারদের দেহ ছিল ততদিন তিনি লজ্জাদি ত্যাগ করে শ্রীহরির নামকীর্তন এবং তাঁর মঙ্গলময় লীলা স্মরণ করে বিচরণ করতেন। দেহান্তে তিনি ভগবানের পার্ষদ হন এবং পুনরায় কল্পারম্ভে জন্মগ্রহণ করে বীণাসহায়ে হরিকথা গান করে জগতে বিচরণ করেন।

নারদের এই জীবন-কাহিনী থেকে ভগবানের প্রতি তাঁর কিরূপ ভক্তি ছিল তা বুঝতে পারা যায়। প্রথম জন্মের কাহিনীতে দেখা যাচ্ছে, সাধনার প্রথম স্তর থেকেই নারদ প্রেমা ভক্তির অধিকারী। তাঁকে কোন চেষ্টাকৃত সাধন-ভজনের মাধ্যমে এই ভক্তি অর্জন করতে হয়নি। ঋষিদের মুখে ভগবৎ-কথা শুনেই শ্রীহরির প্রতি তাঁর শ্রদ্ধা ও অনুরাগ জন্মেছিল। আবার ভগবদ্দর্শনের পর তাঁর নাম-গুণগান করে তিনি যে বিচরণ করছেন, সেই নাম-গুণগানরূপ ভক্তিও প্রেমা ভক্তিই। কারণ, শ্রীহরির দর্শন লাভের পর তাঁর আর কোন সাধনের প্রয়োজন ছিল না। তিনি শ্রীহরির প্রতি প্রীতি-বশতই তাঁর নামগুণগান করে গেছেন। আর পরবর্তী জন্মে নারদ সিদ্ধপুরুষ হয়েই জন্মেছিলেন। ভগবদিচ্ছায় লোকশিক্ষার জন্য নাম-মাহাত্ম্য প্রচারের নিমিত্তই তাঁর জন্ম। সুতরাং শ্রীরামকৃষ্ণ-কথিত নামগুণগানরূপ নারদীয় ভক্তিকে নারদের জীবনদৃষ্টে বিচার করলে দেখা যায়, তা প্রেমা ভক্তিরই অন্তর্গত।

পক্ষান্তরে এই ভক্তি সাধারণ ভক্তি-সাধকের দিক থেকে বিচার করলে তাকে প্রেমা ভক্তি বলা যায় না। কারণ, নামগুণগান আর প্রার্থনা ততদিনই প্রয়োজন যতদিন না প্রেমা ভক্তির উদয় হয়। প্রেমা ভক্তি হলো শুদ্ধা ভক্তি, নিষ্কাম ভক্তি বা অহেতুকী ভক্তি। তাই এই ভক্তির মধ্যে কোন চাওয়া-পাওয়ার বিষয় নেই। শ্রীরামকৃষ্ণ এই ভক্তির স্বরূপ সম্পর্কে বলেছেন: "রাগভক্তি—শুদ্ধা ভক্তি—অহেতুকী ভক্তি। যেমন প্রহ্লাদের।"[৫] "কোন কামনা-বাসনা রাখতে নাই। কামনা-বাসনা থাকলে সকাম ভক্তি বলে। নিষ্কাম ভক্তিকে বলে অহেতুকী ভক্তি। তুমি ভালবাস আর নাই বাস, তবু তোমাকে ভালবাসি। এর নাম অহেতুকী।"[৬] ভগবানকে শুধু ভালবাসার জন্যই ভালবাসা। সুতরাং এই ভক্তিতে প্রার্থনার প্রয়োজন নেই। নারদও তৎপ্রণীত 'নারদীয় ভক্তিসূত্র'-এ প্রেমা ভক্তির সংজ্ঞা নির্দেশ করেছেন: "সা ত্বস্মিন্ পরমপ্রেমরূপা।" "অমৃতস্বরূপা চ।" (সূত্র—২ ও ৩)—ভগবানে পরমপ্রেমই হলো ভক্তি। ভক্তি অমৃতস্বরূপ অর্থাৎ ভক্তিলাভ হলে সাধক মুক্ত হয়। আরেকটি সূত্রে নারদ বলেছেন: "যৎ প্রাপ্য ন কিঞ্চিদ্ বাঞ্ছতি ন শোচতি ন দ্বেষ্টি ন রমতে নোৎসাহী ভবতি।" (সূত্র—৫)—যা পেলে সাধক অন্য কিছু পাওয়ার আকাঙ্ক্ষা করে না, শোক করে না, ঘৃণা ও হিংসা করে না, ঈশ্বর ছাড়া অন্য কোন বস্তুতে আনন্দলাভ করে না, কোন বস্তু পাওয়ার জন্য উদ্যম করে না। প্রেমা ভক্তি লাভ হলে ঈশ্বরের নামগুণগানও বন্ধ হয়ে যায়। কারণ, ঈশ্বরপ্রেম নারদের মতে: "অনির্বচনীয়ং প্রেমস্বরূপম্।" "মূকাস্বাদনবৎ।" (সূত্র—৫১-৫২) ভক্তিরূপ প্রেম যে কি, তা বাক্যে প্রকাশ করা

৫ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত, পৃঃ ১৬২

৬ ঐ, পৃঃ ৪৪০

যায় না। এই প্রেম যেন বোবা ব্যক্তির রসাস্বাদনের অনুভব প্রকাশ করার মতো। অর্থাৎ মূক বা বোবা ব্যক্তি যেমন কোন বস্তু খেলে তার স্বাদ কিরকম তা বলবার চেষ্টা করলেও বলতে পারে না, তদ্রূপ পরমপ্রেমরূপ প্রেমা ভক্তি যার হয়েছে সে চেষ্টা করলেও এ-সম্পর্কে কিছু বলতে পারে না। কারণ, এই ভক্তি অনুভূতির বিষয়। এই জন্য তা স্বসংবেদ্য, পরসংবেদ্য নয়। আর সাধকের জীবনে যতক্ষণ নামগুণগান ও প্রার্থনাদির প্রয়োজন থাকে ততক্ষণ তাঁর প্রেমা ভক্তি হয়েছে বলা যায় না। ভক্তিবাদী সাধকের পক্ষে ঈশ্বরের নামগুণগান প্রেমা ভক্তি লাভের একটি উপায় মাত্র। নারদও প্রেমা ভক্তি লাভের একটি উপায়রূপে নাম-গুণগানের ওপর গুরুত্ব দিয়েছেন। বলেছেন: "অব্যাবৃত-ভজনাৎ"। (সূত্র—৩৬)—অবিরত ভজন-কীর্তনের দ্বারা পরা ভক্তি লাভ হয়। শ্রীরামকৃষ্ণও এই উদ্দেশ্যেই ভক্তদের নামগুণগানের উপদেশ দিয়েছেন। বলেছেন: "তাঁর (ঈশ্বরের) নামগুণ-কীর্তন করা অভ্যাস করলেই ক্রমে ভক্তি হয়।"[৭] সুতরাং নামগুণগানরূপ নারদীয় ভক্তি এক্ষেত্রে প্রেমা ভক্তি লাভের সহায়ক। অতএব এই ভক্তি গৌণী ভক্তির অন্তর্গত বলা যায়।

ঈশ্বরের নামগুণগানরূপ নারদীয় ভক্তি গৌণী বা বৈধী ভক্তি হলেও এর কিছু বিশেষত্ব আছে। প্রথমতঃ বলা যায়, ভক্তিপথের সাধককেও ভক্তি-বর্ধনের জন্য নানা কর্মানুষ্ঠান করতে হয়। এসকল কর্ম আবার শাস্ত্রবিধি রক্ষা করে অনুষ্ঠান করা কর্তব্য। নারদও 'ভক্তিসূত্র' গ্রন্থে বলেছেন: "ভবতু নিশ্চয়দার্ঢ্যাদূর্ধ্বং শাস্ত্ররক্ষণম্।" (সূত্র—১২)—ইষ্টে দৃঢ় ভক্তি না হওয়া পর্যন্ত শাস্ত্রানুসারে কর্মের অনুষ্ঠান করতে হয়। "অন্যথা পাতিত্যা-শঙ্কয়া"। (সূত্র—১৩)—তার অন্যথা করলে অর্থাৎ শাস্ত্রানুসারে ধর্মকর্ম না করলে সাধনপথ থেকে ভ্রষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। গীতায় ভগবান শ্রীকৃষ্ণও বলেছেন:

"যঃ শাস্ত্রবিধিমুৎসৃজ্য বর্তते কামকারতঃ।
ন স সিদ্ধিমবাপ্নোতি ন সুখং ন পরাং গতিম্॥"
(১৬।২৩)

—যে শাস্ত্রবিধি অনুসারে কর্ম না করে স্বেচ্ছাচারী হয়ে কর্ম করে, সে সিদ্ধিলাভ করতে পারে না, সুখও লাভ করতে পারে না, আর পরা গতি অর্থাৎ মুক্তিলাভ করা তো দূরের কথা। কিন্তু শাস্ত্রানু-যায়ী ধর্মকর্ম সম্পাদন করা বর্তমান কলিযুগের মানুষের পক্ষে বেশ কষ্টজনক। ইচ্ছা থাকলেও বাস্তব অসুবিধার জন্য অনেক ক্ষেত্রে শাস্ত্রবিধি রক্ষা করে কর্ম করা অসম্ভব হয়ে পড়ে। তাই ভগবানের নাম আশ্রয়ই একমাত্র সহজ পথ। শ্রীরামকৃষ্ণের কথায়: "কলিযুগের পক্ষে নারদীয় ভক্তি।—শাস্ত্রে যেসকল কর্মের কথা আছে, তার সময় কই? আজকালকার জ্বরে দশমূল পাঁচন চলে না। দশমূল পাঁচন দিতে গেলে রোগীর এদিকে হয়ে যায়। আজকাল ফিবার মিক্‌শ্চার।"[৮]

"কলিকালে বেদোক্ত কর্ম করবার সময় কই?
"তাই কলিতে নারদীয় ভক্তি।

"কর্মযোগ বড় কঠিন। নিষ্কাম না করতে পারলে বন্ধনের কারণ হয়। তাতে আবার অন্নগত প্রাণ—সব কর্ম বিধি অনুসারে করবার সময় নাই।"[৯]

দ্বিতীয়তঃ, পাপ বিনষ্ট করার প্রকৃষ্ট উপায় ভগবানের নামগুণগান। শাস্ত্রে পাপ-অপনোদনের জন্য নানারকম প্রায়শ্চিত্তের বিধি আছে। বিভিন্ন রকম পাপের জন্য বিভিন্ন রকম বিধি। কিন্তু ভগবন্নামগানে সকল পাপ দূরীভূত তো হয়ই, উপরন্তু নামের দ্বারা চিত্ত শুদ্ধ হয়ে ভগবানে মতি হয়। এসম্পর্কে শ্রীমদ্ভাগবতে আছে:

"সর্বেষামপ্যঘবতামিদমেব সুনিষ্কৃতম্।
নামব্যাহরণং বিষ্ণোঃ যতস্তদ্‌বিষয়া মতিঃ॥"
(৬।২।১০)

—সকল রকম পাপকারীর পক্ষে বিষ্ণুর নাম উচ্চারণ করাই শ্রেষ্ঠ প্রায়শ্চিত্ত। বিষ্ণুর নাম উচ্চারণে শুধু পাপই দূরীভূত হয় না, ভগবদ্বিষয়ে মতিও হয়ে থাকে। শ্রীরামকৃষ্ণ সুন্দর উপমার দ্বারা এই বিষয়টি ব্যক্ত করেছেন: "তাঁর নামগুণকীর্তন করলে দেহের সব পাপ পালিয়ে যায়। দেহবৃক্ষে পাপ-পাখি; তাঁর নামকীর্তন যেন হাততালি দেওয়া। হাততালি দিলে যেমন বৃক্ষের উপরের সব পাখি পালায়, তেমনি সব পাপ তাঁর নামগুণকীর্তনে চলে

৭ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত, পৃঃ ৯০ ৮ ঐ, পৃঃ ৫৬০ ৯ ঐ, পৃঃ ৭২৩

যায়।"[১০] ঈশ্বরে কি করে মন হয়—এই প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেছেন: "ঈশ্বরের নামগুণগান সর্বদা করতে হয়।"[১১] শুধু একবার নয়, বারবার শ্রীরামকৃষ্ণ একথার উল্লেখ করেছেন।

ভগবানের নামগুণগান একটি উত্তম সাধন-পদ্ধতি। ভক্তিশাস্ত্রসমূহও নামগুণগানের ওপর অধিকতর গুরুত্ব আরোপ করেছে। বৃহন্নারদীয় পুরাণে আছে:

"হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলম্।
কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা॥" *

(৩৮।১২৬)

—কলিতে কেবল হরির নাম, এছাড়া আর কোন গতি নেই। শ্রীমদ্ভাগবতে শুকদেব পরীক্ষিৎকে বলেছেন:

"কলের্দোষনিধে রাজন্নস্তি হ্যেকো মহান্ গুণঃ।
কীর্তনাদেব কৃষ্ণস্য মুক্তসঙ্গঃ পরং ব্রজেৎ॥"

(১২।৩।৫১)

—হে রাজন্, কলিযুগ দোষের আকর। কিন্তু এযুগের একটি মহান গুণ আছে। সেই গুণটি হচ্ছে—কলিযুগে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের নামকীর্তন দ্বারাই মানুষ সংসারবন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে পরমগতি (মুক্তি) লাভ করে। শুকদেব আরও বলেছেন:

"কৃতে যদ্ ধ্যায়তো বিষ্ণুং ত্রেতায়াং যজতো মখৈঃ।
দ্বাপরে পরিচর্যায়াং কলৌ তদ্ হরিকীর্তনাৎ॥"

(১২।৩।৫২)

—সত্যযুগে বিষ্ণুর ধ্যান, ত্রেতাযুগে বিষ্ণুর নিমিত্ত যাগযজ্ঞ এবং দ্বাপরযুগে তাঁর পরিচর্যার দ্বারা যে-ফল লাভ হয়েছে, কলিযুগে একমাত্র হরিকীর্তনে সে-ফল লাভ হয়। বিষ্ণুপুরাণেও (৬।২।১৭) এই একই কথা বলা হয়েছে। শ্রীমদ্ভাগবতে নারদও বলেছেন:

"এতদ্ধ্যাতুরচিত্তানাং মাত্রাস্পর্শেচ্ছয়া মুহুঃ।
ভবসিন্ধুপ্লবো দৃষ্টো হরিচর্যানুবর্ণনম্॥"

(১।৬।৩৫)

—পুনঃপুনঃ নানাবিধ বিষয়ভোগের লালসায় যাদের মন সর্বদা অত্যন্ত ব্যাকুল থাকে, তাদের পক্ষে একমাত্র হরিলীলাকীর্তনই সংসার-সাগর পার হওয়ার উপযুক্ত নৌকা।

ঈশ্বরের নামগুণগান প্রসঙ্গে একথাও মনে রাখা দরকার যে, নামগুণগান বলতে শুধু খোল-করতাল বাজিয়ে বা হাততালি দিয়ে কীর্তনই নয়; ভক্তি-সঙ্গীত গাওয়া, স্তবস্তোত্রাদি পাঠ, ভগবদ্বিষয় আলোচনা এবং নামজপও এর অন্তর্গত।

উক্ত প্রসঙ্গে যেসব শাস্ত্রবাক্য উদ্ধৃত হয়েছে, সেগুলিতে কেবল হরিনাম বা কৃষ্ণনামের কথাই বলা হয়েছে। কারণ শ্রীমদ্ভাগবত, বৃহন্নারদীয় পুরাণ, বিষ্ণুপুরাণ প্রভৃতি পুরাণশাস্ত্রগুলি ভগবান বিষ্ণুর মাহাত্ম্যজ্ঞাপক গ্রন্থ। এজন্য এসব পুরাণে বিষ্ণু এবং তাঁর বিভিন্ন অবতারের গুণ ও মাহাত্ম্য বর্ণনারই প্রাধান্য। এই জন্য এসকল গ্রন্থে বিভিন্ন কাহিনী এবং স্তবস্তুতির মাধ্যমে অন্য দেবদেবীর পরিবর্তে হরিনামের কথাই উপদিষ্ট হয়েছে। নারদ নিজেও ছিলেন হরিভক্ত। তাই তিনিও হরিনামই প্রচার করেছেন। এথেকে মনে করা ঠিক হবে না যে, ঈশ্বরের নামগুণগান-রূপ নারদীয় ভক্তি বলতে শুধু হরিনাম কীর্তনকেই বুঝায়; সুতরাং কলিযুগে হরি ব্যতীত অন্য কোন দেবদেবীর নামসাধনে কোন ফল হবে না। অনন্তমূর্তি ঈশ্বরের যেকোন রূপের অর্থাৎ শিব, কালী, দুর্গা—যে-ভক্তের কাছে যে-রূপ ভাল লাগে তাঁকে ইষ্ট ভেবে তাঁর নামগুণগানরূপ উপাসনাই কলিযুগে ফলপ্রদ। শ্রীরামকৃষ্ণ-কথিত নারদীয় ভক্তির 'নারদীয়' শব্দটি গৌণার্থ মাত্র। মুখ্যার্থ হলো নামগুণগানরূপ ভক্তি। যেহেতু নারদ সর্বদা হরির নামগুণগান করতেন এবং পুরাণ-শাস্ত্রসমূহে তিনি নামগুণগানরূপ ভক্তির প্রধান প্রচারক এইজন্য নামগুণগানরূপ ভক্তিকে 'নারদীয় ভক্তি' বলা হয়। ☐

১০ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত, পৃঃ ১৫১  ১১ ঐ, পৃঃ ২০

* পাঠান্তর: হরের্নামৈব নামৈব নামৈব মম জীবনম্।
কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা॥

বিশেষ রচনা

# শিকাগো ধর্মমহাসভায় স্বামী বিবেকানন্দের ঐতিহাসিক ভাষণ : সামাজিক তাৎপর্যসমূহ

সান্ত্বনা দাশগুপ্ত

॥ ১ ॥

**মুখবন্ধ**

শতবর্ষ পূর্বে স্বামী বিবেকানন্দের শিকাগো ধর্মমহাসভায় প্রদত্ত ভাষণসমূহ সামাজিক সমস্যা বা সমাজদর্শন বিষয়ে ছিল না। সেগুলির বিষয়-বস্তু ছিল বেদান্তের সুমহান সত্যসমূহ এবং বিজ্ঞান ও বেদান্তের মধ্যে যে সুদৃঢ় ঐক্য আছে, সেই ঐক্যের আবিষ্কার। সেই ভাষণগুলি ছিল এমন একটি ধর্ম সম্বন্ধে, আকাশের মতো অসীম, অনন্ত যার ব্যাপ্তি এবং সর্বপ্রকার জ্ঞান যার অন্তর্ভুক্ত। এছাড়া এই ভাষণগুলি ছিল সকলপ্রকার অসহিষ্ণুতা, মতান্ধতা ও গোঁড়ামির মৃত্যুঘণ্টাধ্বনি-স্বরূপ। সেইসঙ্গে এগুলি ঘোষণা করেছিল বিশ্বব্যাপী সৌভ্রাতৃত্ব, সহাবস্থান, শান্তি এবং মানবসেবার কথা; ঘোষণা করেছিল মানব-মুক্তির কথা। বস্তুতঃ, সর্বাঙ্গীণ মানবমুক্তিই ছিল সেগুলির একমাত্র বক্তব্য; সর্বপ্রকার দাসত্ব থেকে মানুষের মুক্তি—প্রকৃতির দাসত্ব থেকে, অপর মানুষের দাসত্ব থেকে, প্রথা-প্রতিষ্ঠানসমূহের দাসত্ব থেকে, অজ্ঞানতা ও মতবাদ-অন্ধতার দাসত্ব থেকে সর্বাঙ্গীণ মুক্তির বাণীই সেগুলির মধ্যে উচ্চারিত।

সেজন্য দেখা যায় যে, ঐ ভাষণগুলির গভীর সামাজিক তাৎপর্যও ছিল, আজও যা অতীব গুরুত্ব-পূর্ণ। এগুলির মধ্যে এমন একটি সমাজব্যবস্থার স্বপ্ন দেখা হয়েছে যার লক্ষ্য মানুষ,—মানুষের প্রতি সহানুভূতিতে পরিপূর্ণ এক সমাজব্যবস্থা, যেখানে সকলের সমান সুযোগ, সমান অধিকার, কারও কোন বিশেষ সুবিধার স্থান যাতে নেই।

কিন্তু প্রথমেই স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে, ঐ ভাষণগুলি কেবলমাত্র ভাষণ নয়, 'ভাল' বা 'উত্তম' বা 'সর্বোত্তম'—এ-ধরনের বিশেষণসমূহ প্রয়োগ করলেও সেগুলির সঠিক পরিচয় দেওয়া হয় না। সেগুলি হলো একজন সত্যদ্রষ্টা ঋষির প্রত্যক্ষীকৃত নিত্য শাশ্বত সত্যসমূহের উচ্চারণ। অগ্নিময় সত্যসমূহ উচ্চারিত হয়েছিল অগ্নিময় কণ্ঠে, যা শ্রোতাদের অন্তরেও এনে দিয়েছিল তার অগ্নিময় স্পর্শ।[১] আজও যদি কোন অকপটহৃদয় সত্যানু-সন্ধানী এই ভাষণগুলির গভীরে প্রবেশ করার প্রয়াস পান, তাহলে সেই অগ্নির স্পর্শ তারও মধ্যে সঞ্চারিত হয়। এক শতাব্দীর ব্যবধানেও সেগুলি তেমনিই সজীব, কারণ সেগুলি শাশ্বত, ধ্রুব, চিরন্তন—সর্বকালের সত্য।

সুতরাং ১৮৯৩ খ্রীস্টাব্দে শিকাগো ধর্মমহাসভায় বিবেকানন্দ বিশ্বের সম্মুখে দাঁড়িয়েছিলেন মানব-মুক্তির মহান উদ্গাতারূপে, প্রত্যক্ষ সত্যদ্রষ্টা ঋষি-রূপে, আধ্যাত্মিকতার জ্বলন্ত ও জীবন্ত বিগ্রহরূপে, যাঁর জ্ঞান-মনীষা ও বিদ্যাবত্তারও অন্ত ছিল না।[২] আবার তাঁর হৃদয় ছিল বুদ্ধের মতো—পৃথিবীর সকল মানুষের সর্বপ্রকার দুঃখে কাতর। মানুষের দুঃখ, বঞ্চনা, নির্যাতন, উৎপীড়িত মানুষের ক্রন্দন তাঁর হৃদয়ে অবিরাম রক্ত ঝরাতো। বিশ্বরঙ্গমঞ্চে দাঁড়িয়ে মানবপ্রকৃতির রহস্য উন্মোচন করেছিলেন মানুষের মুক্তিদাতা এই নবীনতম ঋষি। মানুষকে সম্বোধন করেছিলেন "অমৃতস্য পুত্রাঃ" বলে। এই বাণীটির সামাজিক তাৎপর্য একেবারে বৈপ্লবিক। ইতিপূর্বে পাশ্চাত্যে কোন সমাজবিপ্লবী মানব-প্রকৃতির রহস্য-উদ্ঘাটনে প্রবৃত্ত হননি। কেউ কখনো বলেননি মানবজীবনের আধ্যাত্মিক পরিণতির অবশ্যম্ভাবিতার কথা।

১ দ্রঃ Life of Vivekananda—Romain Rolland, 1979, p. 37

২ প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য যে, হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রীকভাষা ও সাহিত্যের অধ্যাপক জন রাইট স্বামী বিবেকানন্দকে ধর্মমহাসভার কর্তৃপক্ষের নিকট এই বলে পরিচিত করিয়েছিলেন : "আমাদের সমগ্র অধ্যাপকমণ্ডলীকে একত্রিত করলে যা পাণ্ডিত্য হয়, ইনি তার চেয়েও বেশি পণ্ডিত।" দ্রঃ Swami Vivekananda In the West : New Discoveries—Marie Louise Burke, Part I, 1983, pp 20, 27

বিবেকানন্দ সেখানে যা বলেছিলেন, তার সার ছিল এই দুটি কথা— (১) মানুষের দেবত্ব, (২) মানবজীবনের অবশ্যম্ভাবী আধ্যাত্মিক পরিণতি।

এদুটি সত্যের বাস্তব সামাজিক তাৎপর্য হলো : প্রত্যেক সমাজ, প্রত্যেক রাষ্ট্র, প্রত্যেক ধর্মকে মানুষের এই অন্তর্নিহিত দেবত্বের স্বীকৃতির ভিত্তিতে গড়ে তুলতে হবে এবং মানবজীবনের অবশ্যম্ভাবী এই আধ্যাত্মিক পরিণতির কথা স্মরণে রেখে মানুষের সকল স্বার্থকে নিয়ন্ত্রিত করতে হবে।[৩]

বিচার ও বিশ্লেষণ করে দেখলে দেখা যায়, এর অর্থ সমাজের আমূল রূপান্তর, এক সর্বাত্মক সমাজবিপ্লব। কারণ, প্রত্যেক মানুষের মধ্যে একই দেবত্ব নিহিত আছে—একথা যদি স্বীকার করে নেওয়া হয় তাহলে মেনে নিতেই হবে যে, সকলেরই মধ্যে বড় হবার এবং মহৎ হবার অনন্ত সম্ভাবনা আছে। সুতরাং প্রত্যেক মানুষকেই তার অন্তর্নিহিত সম্ভাবনাসমূহের পূর্ণ বিকাশের জন্য একই সুযোগ দিতে হবে, কাউকে কোন বিশেষ সুবিধা দেওয়া যেতে পারে না। রাষ্ট্রে, সমাজে, ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক জীবনে সকলে একই অধিকার ভোগ করবে। নিঃসন্দেহ এই বিশেষ সুবিধাবিহীন সমাজই হবে প্রকৃত সাম্য-সমাজ এবং এ-সমাজকে রাষ্ট্র নিয়ন্ত্রিত করবে প্রত্যেকটি মানুষের পূর্ণ-বিকাশের দিকে লক্ষ্য রেখে। এইরূপে সর্বপ্রকার অসাম্য ও বৈষম্যের মূলোচ্ছেদ ঘটাবে এই সমাজ। সুতরাং এর পরিণাম এক পরিপূর্ণ সমাজবিপ্লব, সমাজের আমূল রূপান্তর।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, শিকাগো ধর্মমহাসভায় বিবেকানন্দ প্রদত্ত ভাষণসমূহ ছিল সামাজিক দিক থেকে অগ্নিগর্ভ এক সমাজবিপ্লবের বাণী।

॥ ২ ॥

## ধর্মমহাসভার সামাজিক পটভূমিকা

ক্রিস্টোফার কলম্বাস কর্তৃক আমেরিকা-আবিষ্কারের চতুর্থ শতকপূর্তি উপলক্ষে শিকাগো শহরে ১৮৯৩ খ্রীস্টাব্দে সংগঠিত হয়েছিল এক 'বিশ্বমেলা'। তার উদ্দেশ্য ছিল—ঐহিক দিক থেকে পাশ্চাত্য-সভ্যতার ঐশ্বর্য, উৎকর্ষ, গরিমা ও উন্নতির নিদর্শনসমূহ বিশ্ববাসীর সম্মুখে তুলে ধরা। যেহেতু চিন্তার অগ্রগতি ও উৎকর্ষের ওপর ঐহিক উন্নতি নির্ভরশীল, বিশ্বমেলার সংগঠকেরা সেজন্য এই মেলার সঙ্গে চিন্তাজগতের বিভিন্ন দিকের মানুষের অগ্রগতিরও একটি সমীক্ষা করতে চেয়েছিলেন। মনে মনে তাঁদের উদ্দেশ্য ছিল—পাশ্চাত্য-সভ্যতার শ্রেষ্ঠত্ব প্রদর্শন। সেজন্য পাশাপাশি 'অনগ্রসর' প্রাচ্যসভ্যতাগুলির ওপরও আলোকপাত করার ব্যবস্থা তার মধ্যে করা হয়েছিল।

চিন্তার উৎকর্ষের সমীক্ষার উদ্দেশ্যে মোট কুড়িটি বিভিন্ন সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছিল। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল 'নারী-প্রগতি', 'গণ-মাধ্যম', 'চিকিৎসা ও শল্যবিদ্যা', 'সঙ্গীত', 'সরকার', 'আইন সংশোধন' এবং 'ধর্ম'-বিষয়ক সম্মেলনগুলি। এ-গুলির মধ্যে জনমানসে সবচেয়ে অধিক ও গভীর আগ্রহের সৃষ্টি করেছিল ধর্মমহাসভা। ধর্ম-মহাসভার সংগঠক-সমিতির সভাপতি রেভারেন্ড জন হেনরী ব্যারোজের মতে "এই আগ্রহ ছিল সর্বজনীন"।[৩]

তখনকার সময়ের পটভূমিকায় ধর্মমহাসভা সম্পর্কে এই সর্বজনীন আগ্রহ খুবই আশ্চর্যের ব্যাপার ছিল, কারণ তখন একদিকে জড়বাদ ও অপর-দিকে ধর্মীয় মতান্ধতার প্রাধান্য ছিল পাশাপাশি। উনিশ শতকে বিজ্ঞানের প্রবণতা ছিল জড়বাদের দিকে এবং বিজ্ঞানের অগ্রগতি অনেক ধর্মীয় তত্ত্বকে চুরমার করে দিয়েছিল। যার ফলে যুক্তিবাদী শিক্ষিত সম্প্রদায় ধর্মবিশ্বাস হারিয়ে ফেলেছিল। আবার জনসাধারণ ও প্রচারক সম্প্রদায় ছিল পর-ধর্ম-অসহিষ্ণু, মতান্ধ ও অত্যন্ত গোঁড়া। এই পরিস্থিতিতে অন্য ধর্মগুলির সঙ্গে একত্রে বসে এদের পক্ষে আদান-প্রদান, মত-বিনিময় অসম্ভব ও অভাবিত ছিল। সেইজন্যই ধর্মমহাসভার বিষয়ে এই বিশ্বজনীন আগ্রহ আমাদের মনে বিস্ময়ের উদ্রেক করে। মনে হয়, কি করে এটা সম্ভব হলো!

কিন্তু আসল কথা, বাহ্য মতবাদ যাই হোক-না-কেন সব মানুষেরই মনের গভীরে, অন্তরের অন্তস্তলে একটা প্রত্যাশা ছিল, একটি গভীর আকাঙ্ক্ষা ছিল। সচেতন স্তরে নয়, অবচেতনে ছিল এই প্রত্যাশা ও আকাঙ্ক্ষা—এই ধর্মমহাসভা থেকে এমন কিছু পাওয়া যাবে, যা মানুষের অন্তরের নিগূঢ় অধ্যাত্ম-পিপাসা নিবারণ করবে। কিছু মানুষের

৩ Swami Vivekananda in the West : New Discoveries, Part I, p. 66

মনে অবশ্য এ-প্রত্যাশা সচেতনতার স্তরেই ছিল। মেরী লুইস বার্ক বলছেন : "আমেরিকায় আধ্যাত্মিক সত্যের জন্য প্রকৃত অনুসন্ধানীরা খোলা মনেই সত্যের অনুসন্ধান করেছিলেন এবং যেখানেই এর সন্ধান পাওয়া যাবে সেখান থেকেই একে গ্রহণ করতে তাঁরা প্রস্তুত ছিলেন।"[৪] সঙ্গে সঙ্গে তিনি আরও বলেছেন: "অবশ্য যদিও এ-মনোভাব বর্তমান ছিল, তবুও তখনকার ধর্মযাজক-সম্প্রদায় ও সাধারণ মানুষের মনে এই ঔদার্য সামগ্রিকভাবে ছিল না।"[৫]

জীবন্ত ও জ্বলন্ত আধ্যাত্মিকতার মূর্তবিগ্রহ স্বামী বিবেকানন্দ ছিলেন আমেরিকার প্রকৃত সত্যানুসন্ধানীদের অন্তরের গভীরে যে আধ্যাত্মিক পিপাসা ছিল, তার শান্তিবারিস্বরূপ, তাদের অনুসন্ধানের উত্তর। এজন্যই মেরী লুইস বার্ক আরও বলেছেন: "ইতিপূর্বে কখনো আমেরিকা এমন কাউকে দেখেনি যিনি আধ্যাত্মিক সত্যসমূহের প্রত্যক্ষদ্রষ্টা।"[৬] ঠিক এই কারণেই ধর্ম-মহাসভায় বিবেকানন্দ প্রচণ্ড প্রভাব বিস্তার করতে পেরেছিলেন। অবশ্য মেরী লুইস বার্কের একথাও সত্য, "এরা যে সচেতনভাবে বিবেকানন্দের বিরাট আধ্যাত্মিক শক্তিকে চিনতে পেরেছিল তা নয়, কিন্তু এরা যখন তাঁর মুখের একটি-দুটি কথা শুনবার জন্য ঘণ্টার পর ঘণ্টা অপেক্ষা করত, তখন অজান্তে তাঁর আধ্যাত্মিক বিরাটত্বকেই স্বীকৃতি দিত।"[৭]

ঐতিহাসিক দিক থেকে তখন অবশ্য প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য, অতীত ও বর্তমান, বিজ্ঞান ও ধর্মের মিলনের সময় হয়েছিল; পৃথিবী সেভাবেই এগিয়ে চলছিল, বিজ্ঞানের অগ্রগতি সেইভাবেই ঘটে চলছিল। বিবেকানন্দ সেই মিলনভূমিটি উদ্ঘাটিত করে দেখালেন। সুতরাং, সবদিক থেকেই বিবেকানন্দের ভূমিকা ছিল ঐতিহাসিক। আলফ্রেড মোমরী (Alfred Momorie) ছিলেন একজন উদারমনা ইংরেজ ধর্মযাজক। তিনি বলেছিলেন: "ধর্মমহাসভা মানব-ইতিহাসে সর্বাপেক্ষা স্মরণীয় ঘটনা।"[৮] বিবেকানন্দ যখন মঞ্চে উঠে তাঁর প্রথম ভাষণটি দিচ্ছিলেন, হ্যারিয়েট মনরো প্রভৃতি আরও অনেকে তখন অনুভব করেছিলেন, ঐতিহাসিক এক মহামুহূর্ত উপস্থিত।[৯]

বিবেকানন্দ নিজেও তাঁর ঐতিহাসিক ভূমিকাটির বিষয়ে সম্পূর্ণ জ্ঞাত ছিলেন। কি করে জ্ঞাত হয়েছিলেন আমরা জানি না, কিন্তু তিনি জ্ঞাত ছিলেন—একথা সত্য। ধর্মমহাসভায় যোগদানের উদ্দেশ্যে সমুদ্রযাত্রার পূর্বে গুরুভ্রাতা স্বামী তুরীয়ানন্দকে তিনি বলেছিলেন: "এই ধর্মমহা-সভা এই এর (নিজের দিকে আঙুল দেখিয়ে) জন্য অনুষ্ঠিত হতে চলেছে। আমার মন বলছে এ-কথা। তোমরা অচিরেই তা দেখতে পাবে।"[১০] ভবিষ্যতের গর্ভে কি আছে তা তিনি যেন সুস্পষ্ট দেখতে পাচ্ছিলেন, তাঁর কণ্ঠস্বরে ছিল সেই প্রত্যক্ষ-দ্রষ্টার প্রত্যয়।

প্রকৃতপক্ষে জড়বাদী পাশ্চাত্যের সঙ্গে প্রাচ্যের জীবন্ত আধ্যাত্মিকতার এই যে মুখোমুখী সাক্ষাৎ, এর সামাজিক ও ঐতিহাসিক তাৎপর্য সুগভীর। জীবন্ত আধ্যাত্মিকতার সংস্পর্শ সমাজ-জীবনের গভীরে যে আলোড়ন আনে তাতে তার আমূল রূপান্তর অবশ্যম্ভাবী, অনিবার্য। এরকম রূপান্তরের বহু সাক্ষ্য ইতিহাস বহন করছে। বুদ্ধ, খ্রীস্ট, মহম্মদের এরূপ প্রভাবের কথা ইতিহাসে নথিবদ্ধ। তখন বিজ্ঞানের অগ্রগতিতে এবং উন্নত কলকুশলতার প্রয়োগে সারা বিশ্বে যোগাযোগ ব্যবস্থায় প্রচণ্ড পরিবর্তন ঘটেছিল। দূর দূরান্তরের ভূখণ্ডগুলি পরস্পরের সঙ্গে সংযুক্ত হয়ে পড়েছিল। পৃথিবী একক একটি ভূখণ্ডের রূপ নিতে শুরু করেছিল। এই এক দেহে এক অখণ্ড আত্মার উদ্বোধন প্রয়োজন হয়ে পড়েছিল। এই একক দেহে একক সত্তার প্রাণপ্রতিষ্ঠা তখন অপেক্ষা করছিল। একদেহপ্রাপ্ত সমগ্র বিশ্বে বিবেকানন্দের মধ্য দিয়ে সেই প্রাণপ্রতিষ্ঠা ঘটল, একক আত্মার উদ্বোধন ঘটল প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের চিন্তার মধ্যে যে-সমন্বয় তিনি ঘটালেন তারই মধ্য দিয়ে ঘটালেন একটি চিন্তার বিপ্লব, যার পরিণাম সুদূরপ্রসারী। সমাজের সর্বত্র আজও তা সক্রিয় হয়ে কাজ করে চলেছে, যার ফলে ইতিহাসের পটপরিবর্তন ঘটে চলেছে, বিরাট রূপান্তর রূপপরিগ্রহ করছে মানব-সভ্যতার ক্ষেত্রে। রুশদেশের সাম্প্রতিকতম বিপ্লব তার প্রমাণ বহন করছে। [ক্রমশঃ]

৪ Swami Vivekananda in the West: New Discoveries, Part I, p. 74  ৫ Ibid

৬ Ibid., p. 101  ৭ Ibid.  ৮ Ibid. p. 126  ৯ Ibid, p. 86

১০ Spiritual Talks of the First Disciples of Sri Ramakrishna, 1991, pp. 245-246

# কোষ্ঠবদ্ধতা

অতীন্দ্রকৃষ্ণ মিত্র

বয়স্করা অনেকেই কোষ্ঠবদ্ধতা বা কোষ্ঠ-কাঠিন্যে ( constipation ) কষ্ট পান অর্থাৎ তাদের মলত্যাগের সময় যথেষ্ট বেগ হয় না ও যথেষ্ট পরিমাণে মল-নিষ্কাশন হয় না। এই অবস্থাগুলির কারণ বুঝতে গেলে প্রথমেই শরীরের পরিপাকক্রিয়া সম্বন্ধে সকলেরই জানা কয়েকটি বিষয় সংক্ষেপে আলোচনা করা দরকার।

খাদ্যগ্রহণ করবার পর খাদ্যবস্তু মুখগহ্বর থেকে পরপর খাদ্যনালী, পাকস্থলী, ক্ষুদ্রান্ত্র হয়ে বৃহদন্ত্রে যায়। অন্ত্রের পেশী এই কার্য পরিচালনা করে। খাদ্যবস্তুর এই যাত্রার সময় নানা প্রক্রিয়ায় এর পরিপাকক্রিয়া চলতে থাকে। পরিপাকে জীর্ণ খাদ্যের বিভিন্ন অংশ ক্ষুদ্রান্ত্রের ( small intestine ) বিশেষ বিশেষ স্থানে শোষিত হয়। বৃহদন্ত্রে ( large intestine ) প্রধানতঃ জল শোষিত হয়। এইভাবে শোষিত হবার পর খাদ্যের পরিশিষ্ট ভাগ ( residue ) মলরূপে বৃহদন্ত্রের শেষভাগ মলদ্বার দিয়ে নিষ্কাষিত হয়। মলের বেশিরভাগ অংশ জল ও জীবাণু এবং বাকি অংশ খাদ্যের পরিশিষ্ট।

ক্ষুদ্র ও বৃহদন্ত্রের ভিতরের খাদ্য অন্ত্রের পেশী দ্বারা চালিত হয়। অন্ত্রের ভিতরে খাদ্য উপস্থিত হয়ে পেশীগুলিকে স্ফীত করলে পেশীগুলি সঙ্কোচনের দ্বারা সেই খাদ্যকে চালনা করে। যদি অন্ত্রের ভিতরে খাদ্য বা জল কিছুই না থাকে বা কম পরিমাণে থাকে, তাহলে অন্ত্রের পেশী তা উপেক্ষা করে এবং কাজ করে না। এর ফলে মল-নিষ্কাষণ হয় না। তাই উপোস করলে মলত্যাগ হয় না। উপোস ছাড়াও যদি এমন খাদ্য গ্রহণ করা যায়, যার প্রায় সব অংশই অন্ত্রের উপরিভাগে শোষিত হয়ে যায় তাহলেও পরিশিষ্ট কিছু না থাকায় বা কম থাকায় মলের পরিমাণ কম হয় এবং কোষ্ঠবদ্ধতার সূচনা হয়। অতএব যেসকল খাদ্যে পরিশিষ্ট থাকে সেইরকম খাদ্য গ্রহণ করলে বৃহদন্ত্রে মলের কলেবর বৃদ্ধি হয় ও নিয়মিত মলত্যাগ হয়।

সাধারণতঃ কেন কোষ্ঠবদ্ধতা হয় উপরি-উক্ত সংক্ষিপ্ত বিবরণ তা বুঝতে সাহায্য করবে। এছাড়া বিশেষ বিশেষ রোগ, জন্মগত শারীরিক বিকলতা বা টিউমার ইত্যাদি কারণেও কোষ্ঠবদ্ধতা হতে পারে। সেই জটিল বিষয়গুলি এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধের আলোচনার বাইরে রাখা হলো। কারণ, ঐসব ক্ষেত্রে চিকিৎসকের সাহায্য দরকার হয়।

কোষ্ঠবদ্ধতার কয়েকটি সাধারণ কারণ এখন নিচে আলোচিত হবে।

### আকস্মিক উদ্ভূত কোষ্ঠবদ্ধতা

(১) জায়গা বা বাসস্থান পরিবর্তন ও সেই কারণে ভিন্ন পরিবেশে গমন করলে জলবায়ুর বদলের জন্য অন্ত্রস্থিত মল শুষ্ক ও কঠিন হওয়ায় কোষ্ঠবদ্ধতার উদ্ভব হতে পারে। অল্পবিস্তর যাঁরা ভ্রমণ করেন তাঁরা নিশ্চয়ই লক্ষ্য করেছেন যে, সমতল থেকে পার্বত্য শহরে গেলে জল পান কমে গিয়ে মল শুষ্ক হয় ও কোষ্ঠবদ্ধতা দেখা দেয়। সেইভাবে আবার বিষুবরেখার নিকটবর্তী দক্ষিণ-ভারতে গেলে গরম আবহাওয়ায় অভ্যাসমত জল পানের চেয়ে অনেক বেশি জল পানের দরকার হয়, নচেৎ কোষ্ঠবদ্ধতা হয়।

(২) দূর-দূরান্তরে রেলভ্রমণেও পর্যাপ্ত জল পান হয় না। তাছাড়া খাদ্যবস্তুরও হেরফের হয় ও কখনো কখনো পরিমাণে কম হয়। সেকারণে রেলভ্রমণেও কোষ্ঠবদ্ধতা দেখা দেয়।

(৩) একইভাবে ঋতুপরিবর্তনের সময় যথেষ্ট জল পান না করায় শীতের সময় আমরা কোষ্ঠবন্ধতায় আক্রান্ত হই।

(৪) রাত্রিতে অভ্যাসমত নিদ্রা না হলে 'শরীর-ঘড়ি'র ( Body Clock ) বিকলতার ফলে অন্ত্রের পেশীর কাজও ব্যাহত হয়, ফলে অন্ত্রের মধ্যস্থিত মল চালিত না হয়ে কোষ্ঠবন্ধতার উদ্রেক করে।

(৫) মহাদেশ থেকে মহাদেশে বিমানে দ্রুত গমন করলে এই শারীরিক ব্যবস্থার বিকলতা অনুভূত হয়। ভারত থেকে ইংল্যান্ডে সাড়ে পাঁচ ঘণ্টা ও আমেরিকায় বারো ঘণ্টা সময়ের তফাত। দ্রুতগামী বিমানে ভ্রমণ করে ভালভাবে পেঁছালেও শরীরের বিভিন্ন যন্ত্রের স্বাভাবিক হতে ২/১ দিন সময় লাগে ( jet lag )। এমনকি ভারতের পূর্ব থেকে পশ্চিমে মহারাষ্ট্রে গেলেও এই বিকলতা অনুভূত হয় এবং কোষ্ঠবন্ধতা হতে পারে।

(৬) জ্বর হলে বা অসুস্থ হলে খাদ্যের পরিবর্তন হয় ও শরীরে জলের চাহিদা বাড়ে। রোগীর পথ্য প্রায়ই পরিশিষ্ট-শূন্য হয় এবং সেজন্য বৃহদন্ত্রে মলের পরিমাণ কম হওয়াতে কোষ্ঠবন্ধতা দেখা দিতে পারে।

(৭) জোলাপ বা ডুস ( Douche ) ব্যবহার করলে বৃহদন্ত্রের অন্তঃস্থ মল অনেকাংশে নিষ্কাশিত হয়, ফলে কোষ্ঠবন্ধতা দেখা দেয়।

**কিছুকাল স্থায়ী বা পুরনো কোষ্ঠবন্ধতা**

উপরি-উক্ত কারণগুলি ছাড়াও আপাতদৃষ্টিতে বিনা কারণেই অনেক সময় কোষ্ঠবন্ধতা দেখা দেয়। এমতাবস্থায় সহজে এই উপসর্গের উপশম করার কিছু সহজ উপায় নিচে দেওয়া গেল।

(ক) প্রথমেই যথেষ্ট পরিমাণ জল পান করা হচ্ছে কিনা তা দেখা উচিত এবং না হলে জল পানের মাত্রা বৃদ্ধি করা কর্তব্য।

(খ) যেসব খাদ্য হজম হওয়ার পরও পরিশিষ্ট থাকে সেইসব খাদ্য গ্রহণ করা উচিত। যেমন, যথেষ্ট পরিমাণে শাকসবজি, ফল, খোসা সহ গমের আটার রুটি, অঙ্কুরিত ছোলা, মুগকড়াই ইত্যাদি।

(গ) পাকস্থলীতে খাদ্য বা তরল পানীয় গেলে স্বতঃস্ফূর্তভাবে বৃহদন্ত্রের চলন শুরু হয় (gastro-colic reflex)। যাদের কোষ্ঠবন্ধতা কমবেশি আছে তারা প্রত্যহ প্রাতরাশের ২০/৩০ মিনিট পরে মলত্যাগের অভ্যাস করতে পারেন। কেউ কেউ চা-পান বা গরম জল পান করেও মলত্যাগ করতে পারেন।

(ঘ) এখনকার কর্মব্যস্ত জীবনেও প্রত্যহ একই সময় বেশ কিছুক্ষণ সময় দিয়ে মলত্যাগের চেষ্টা করা দরকার। তাড়াতাড়ি করলে বা পরে দরকার পড়লে আবার করা যাবে—এই ভেবে যত শীঘ্র সম্ভব শৌচাগার থেকে চলে এলে ফল ভাল হয় না। শৌচাগার-ব্যবহারের বেশি দাবিদার থাকলে সকলের আগে বা পরে যথেষ্ট সময় দিয়ে মলত্যাগের অভ্যাস করা দরকার। বেগ আসুক বা না আসুক একই সময়ে মলত্যাগের চেষ্টা করা দরকার। আবার মলত্যাগের বেগ এলে কাজের অজুহাতে তা উপেক্ষা করা ঠিক নয়।

(ঙ) পেটের পেশীসকল যাতে সবল থাকে সেইমত ব্যায়াম অভ্যাস করা দরকার।

(চ) পেট কামড়ানো, অম্লজনিত অজীর্ণতা, রক্তচাপ বৃদ্ধি ইত্যাদি রোগের ঔষধ ব্যবহারে কোষ্ঠবন্ধতা দেখা দিতে পারে। এমন হলে সংশ্লিষ্ট চিকিৎসকের পরামর্শমত রোগ-উপশমের ব্যবস্থা করা উচিত।

(ছ) ইসবগুল, পাকা বেল, দুধ, সাগু বা খৈ-দুধ ব্যবহারে কোষ্ঠবন্ধতায় সুফল পাওয়া যায়।

কোষ্ঠবন্ধতার কারণ এবং তার প্রতিকার সংক্ষেপে আলোচিত হলো। বলা বাহুল্য, উপরি-উক্ত ব্যবস্থাগুলি বৈজ্ঞানিক চিকিৎসার বিকল্প নয়। ঐগুলি সাধারণ কোষ্ঠবন্ধতায় টোটকা হিসাবে অভ্যাস করা যেতে পারে। সপ্তাহখানেকের মধ্যে কষ্টের উপশম না হলে কালবিলম্ব না করে অবশ্যই চিকিৎসকের পরামর্শ ও সাহায্য গ্রহণ করা উচিত। চিকিৎসকের পরামর্শ ব্যতীত কোন বিশেষ ঔষধ ব্যবহার না করাই ভাল। □

## গ্রন্থ-পরিচয়

# জীবন-জিজ্ঞাসা ও বঙ্কিমচন্দ্র

### হর্ষ দত্ত

**বঙ্কিম-সান্নিধ্যে :** দ্বিজেন্দ্রলাল নাথ। প্রকাশক : স্বাধীন নাথ, বি ১৫/৫৮ কল্যাণী, পিন : ৭৪১২৩৫। পৃষ্ঠা : ১৪+১৬৭। মূল্য : পঁয়ত্রিশ টাকা।

বিংশ শতাব্দী শেষ হওয়ার মুখে। স্বভাবতই যুগের প্রভাবে বাঙলাসাহিত্য-জগতে ও আমাদের জীবনাচরণে নানা পরিবর্তন ঘটে গেছে। উনবিংশ শতাব্দীর কালসীমা থেকে আমরা কেবল সময়ের বিচারেই নয়, মানসিকভাবেও অনেক দূরে সরে এসেছি। তবু বিগত শতাব্দীর বহু ভাবুক ও মনীষীকে আমরা জীবন থেকে দূরে সরিয়ে দিতে পারিনি, বরং অনেক ক্ষেত্রেই আলোর প্রভার মতো তাঁদের অস্তিত্ব আমাদের জীবনের চারপাশে অপরিহার্য হয়ে আছে। বঙ্কিমচন্দ্র সেই ভাবুক ও মনীষীদের মধ্যে একজন এবং অন্যতম প্রধান। তাঁর সৃষ্টিকর্মের বহুবর্ণী আলো এখনো আমাদের বিস্মিত করে, তাঁর সম্পর্কে নতুন পথে ভাবতে অনুপ্রাণিত করে।

দ্বিজেন্দ্রলাল নাথের **'বঙ্কিম-সান্নিধ্যে'** বইটি সেই নতুন ভাবনার একটি উল্লেখযোগ্য ফসল। প্রথম থেকে শেষ পৃষ্ঠা পর্যন্ত পড়ে মনে হয়েছে, বঙ্কিম-মনীষার রহস্য-উদ্‌ঘাটনে এমন একটি গ্রন্থের বিশেষ প্রয়োজন ছিল। বঙ্কিমচন্দ্র এবং বঙ্কিম-চন্দ্রের সৃষ্টির জগৎ নিয়ে এযাবৎ বহু গ্রন্থ রচিত হয়েছে। শ্রদ্ধেয় আলোচকরা তাঁদের নিজ নিজ দৃষ্টিভঙ্গি ও চিন্তাপ্রণালী অনুযায়ী বঙ্কিম-প্রতিভার ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করেছেন। তাঁদের প্রতি যথোচিত সম্মান প্রদর্শন করেও বলা যায়, দ্বিজেন্দ্র-লালের এই বইটি বঙ্কিমচন্দ্র সম্পর্কে একটি স্বাতন্ত্র্যচিহ্নিত নিবেদন। লেখক নিজে অবশ্য কোথাও দাবি করেননি যে, **বঙ্কিম-সান্নিধ্যে** তিনি অভিনব এবং মৌলিক চিন্তায় সমৃদ্ধ কোন বক্তব্য রেখেছেন। কিন্তু তাঁর ব্যাখ্যাত বিষয়ের যে-পরিধি ও গভীরতা, তা নিঃসন্দেহে বঙ্কিমচন্দ্র সম্পর্কে এক উল্লেখযোগ্য মূল্যায়ন।

লেখকের মতে, "বঙ্কিমের জীবন-ইতিহাস অতৃপ্ত জিজ্ঞাসা এবং সে-জিজ্ঞাসার সদুত্তর অনু-সন্ধানের ইতিহাস।" শ্রীনাথের এই মন্তব্যের সঙ্গে আমরা একমত। কেননা, সকলেই জানেন, বঙ্কিমচন্দ্র একদা নিজেকেই নিজে প্রশ্ন করেছিলেন : "অতি তরুণ অবস্থা হইতেই আমার মনে এই প্রশ্ন উদিত হইত, 'এই জীবন লইয়া কি করিব ?' 'লইয়া কি করিতে হয় ?' সমস্ত জীবন ইহার উত্তর খুঁজিয়াছি।" জীবন-জিজ্ঞাসু বঙ্কিমচন্দ্র শেষপর্যন্ত এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজে পেয়েছিলেন। দ্বিজেন্দ্রলাল তাঁর গ্রন্থে অতীব সুচারু ও তন্নিষ্ঠভাবে স্রষ্টা ও শিল্পী বঙ্কিমচন্দ্রের বহুমুখী জীবন-জিজ্ঞাসা ও তার উত্তরগুলি অন্বেষণ করেছেন এবং প্রতিটি অধ্যায়ে তিনি একটি স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হতে চেয়েছেন। যদিও গ্রন্থের উপসংহারে লেখক মন্তব্য করেছেন : "বঙ্কিমচন্দ্রের সামগ্রিক ব্যক্তিত্ব এবং জীবনচিন্তার সঙ্গে নিঃসংশয় পরিচয়লাভের পথে একটা দুস্তর বাধা আছে। সে-বাধা নিঃসন্দেহে তাঁর একটি নির্ভরযোগ্য সম্পূর্ণ জীবনী কিংবা তাঁর স্ব-লিখিত আত্মজীবনীর অনুপস্থিতি।" লেখকের এই সখেদ মন্তব্যের যৌক্তিকতা আমরা অস্বীকার করতে পারি না। তবু এই বাধা সত্ত্বেও জীবন-সায়াহ্নে বসে গ্রন্থকার যেরকম শ্রদ্ধা, পরিশ্রম ও মননের পথে আলোচনায় অগ্রসর হয়েছেন, তা সত্যিই বিস্ময়কর। ছটি অধ্যায়ে বিভক্ত এই গ্রন্থের প্রত্যেকটি আলোচনা, পাঠক-পাঠিকাকে লেখকের সহমর্মী করে তুলবে। এর মধ্যে আবার 'ইতিহাস-জিজ্ঞাসা ও স্বদেশভাবনা' এবং 'ধর্মজিজ্ঞাসা' অধ্যায়-দুটি অনবদ্য। এই আলোচক ব্যক্তিগতভাবে 'ধর্মজিজ্ঞাসা' অধ্যায়টি পড়ে বিশেষভাবে উপকৃত হয়েছে। হিন্দুধর্ম সম্পর্কে বঙ্কিমচন্দ্রের স্বচ্ছ, অসাম্প্রদায়িক ও উদার ভাবনা এবং সেসম্পর্কে তাঁর তীক্ষ্ণ যুক্তিপূর্ণ বিশ্লেষণ আজ সকলের গোচরে আসা অত্যন্ত জরুরি। শ্রীনাথ নিখুঁত পরম্পরার মাধ্যমে বঙ্কিমচন্দ্রের ধর্মজিজ্ঞাসার যে-স্বরূপটি তুলে ধরেছেন, তা সংকটাকীর্ণ বর্তমান সময়ের পরিপ্রেক্ষিতে বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ।

দ্বিজেন্দ্রলালের বুদ্ধি ও যুক্তিশাণিত আলোচনার সঙ্গে সকলে হয়তো সহমত পোষণ করবেন না,

কিন্তু একথা সকলেই স্বীকার করবেন, আধুনিক মানুষের মতো আত্মজিজ্ঞাসায় দীর্ণ এক আধুনিক বঙ্কিমচন্দ্রের প্রতিমা এই গ্রন্থের আধারে রূপ পরিগ্রহ করেছে। একালের পাঠকের কাছে এটাই সবচেয়ে বড় প্রাপ্তি এবং লেখকের সার্থকতা।

## প্রসঙ্গ বঙ্কিমচন্দ্র

### বিশ্বনাথ চট্টোপাধ্যায়

**বঙ্কিম-মনন** ঃ দিলীপকুমার দত্ত। প্রকাশিকা ঃ ছায়া দত্ত, 'শৈলছায়া গঙ্গোত্রী', মানুষপুর, ব্যান্ডেল জং, হুগলী-৭১২ ১২৩। পৃষ্ঠা ঃ ১৭৬। মূল্য ঃ প'য়তাল্লিশ টাকা।

উনিশ শতকের বঙ্গীয় তথা ভারতীয় নবজাগরণের প্রধান হোতা ছিলেন বঙ্কিমচন্দ্র। তাঁর এই ভূমিকাটি **বঙ্কিম-মনন** গ্রন্থটিতে নিপুণভাবে বিশ্লেষিত হয়েছে। প্রথম প্রবন্ধ 'স্বদেশগৌরব, সমাজচিন্তা ও মানবপূজারী বঙ্কিম'-এ দিলীপকুমার দত্ত দেখিয়েছেন যে, বঙ্কিমচন্দ্রের চিন্তায় প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য উপাদানের সমন্বয় রয়েছে বটে, কিন্তু প্রাধান্য পেয়েছে প্রেম ও ভক্তির প্রাচীন ভারতীয় ঐতিহ্য। 'গীতা'-নির্দেশিত চিত্তশুদ্ধির ও নিষ্কাম কর্মের আদর্শকেই বঙ্কিমচন্দ্র বরণ করেছেন। তাঁর স্বদেশপ্রেম ও সমাজচিন্তা কোন কূপমণ্ডূকতা দ্বারা আচ্ছন্ন নয়। বিপিনচন্দ্র পাল তাই যথার্থই বলেছেন ঃ "বঙ্কিমচন্দ্রের স্বদেশপ্রীতির আদর্শে কোন প্রকারের সংকীর্ণতা ছিল না।" বঙ্কিমচন্দ্রের লক্ষ্য ছিল সঠিকভাবে মনুষ্যত্বের পূর্ণ বিকাশ, তাই তাঁর চিন্তাধারা, লেখকের মতে, "সমকালের সীমাবদ্ধতার জাল ছিন্ন করে ডানা মেলেছে কালের মহাকাশে।" ভারতীয় ঐতিহ্যের বিশ্বজনীনতা বঙ্কিমচন্দ্রকে মুগ্ধ ও অভিভূত করেছে। তাই তিনি "দেশের অমৃত-রসের মহাসমুদ্রেই খুঁজে পেয়েছেন বিশ্বমানবের চিরন্তন মুক্তি।"

দ্বিতীয় প্রবন্ধ 'ধর্মচিন্তায় বঙ্কিমচন্দ্র ও হিন্দুধর্মের বিশ্বমুখিনতা' এবং তৃতীয় 'নবজাগরণ ঃ কৃষ্ণচিন্তা ঃ বঙ্কিম' প্রথমটির পরিপূরক। কর্ম ও জ্ঞানের সঙ্গে ভক্তির যে-মিলন বঙ্কিমচন্দ্রের কাঙ্ক্ষিত ছিল সেই সমন্বয়ের বাণী রামকৃষ্ণদেবের কণ্ঠে উচ্চারিত হয়েছে এবং স্বামী বিবেকানন্দের অক্লান্ত কর্ম-সাধনায় তা পূর্ণতা পেয়েছে। হিন্দুধর্মের গভীর অনুরাগের মুহূর্তেও বঙ্কিমচন্দ্র কখনো পাশ্চাত্য মতাদর্শগুলির গুরুত্ব ও তাৎপর্য অস্বীকার করেননি কিংবা তাদের অসত্য বা অধর্ম বলে উড়িয়ে দেননি। তাঁর কাছে সেগুলি ছিল অসম্পূর্ণ ধর্ম। তিনি নিজে সারাজীবন মহাভারত ও গীতার চর্চায় ব্যাপৃত ছিলেন এবং শ্রীকৃষ্ণের 'আদর্শ পুরুষ ও আদর্শ চরিত্র'-সত্তার অনুসন্ধানে নিজেকে নিমগ্ন রেখেছিলেন। উপন্যাস-ত্রয়ীতে তো বটেই, 'কৃষ্ণকান্তের উইলে'র মতো পূর্ববর্তী উপন্যাসের পরিমার্জনার ক্ষেত্রেও বঙ্কিমচন্দ্রের ওপর প্রাচীন ভারতীয় ভাবধারার গভীর প্রভাব লক্ষণীয়। ডঃ দত্ত 'ধর্মতত্ত্ব' গ্রন্থ সম্বন্ধে সুকুমার সেনের উক্তি উদ্ধৃত করেছেন ঃ 'পাশ্চাত্য দৃষ্টিতে কঁৎ-মতবাদের আশ্রয়ে হিন্দুধর্মের ও আচার-বিচারের সাফাই ব্যাখ্যা' এবং এ-উক্তির অযৌক্তিকতার ও অসত্যতার পর্যালোচনা করেছেন। বস্তুতঃ, বঙ্কিমচন্দ্রের অনেক বিরুদ্ধ সমালোচনারই লেখক সমুচিত উত্তর দিতে পেরেছেন।

গ্রন্থের সবগুলি প্রবন্ধই পাণ্ডিত্যপূর্ণ ও সুলিখিত, কিন্তু চতুর্থ ও শেষ 'সাহিত্যের আদর্শ ও বঙ্কিমচন্দ্র' পূর্ববর্তীগুলির তুলনায় অপেক্ষাকৃত দুর্বল। অবশ্য এটিতে তাঁর বক্তব্য স্পষ্টভাবে উচ্চারিত এবং তার যাথার্থ্য সম্বন্ধে মতভেদের সম্ভাবনা নেই। বঙ্কিমচন্দ্রের সাহিত্যের আদর্শ কোন শুষ্ক নীতিবাদ দ্বারা জর্জরিত নয়; জীবনের, সৌন্দর্যের ও অনন্তের চিরন্তন রসে তা সঞ্জীবিত। সাহিত্য প্রকৃতিভিত্তিক তো বটেই কিন্তু তা কখনই প্রকৃতির শুধু আরশি হতে পারে না। অ্যারিস্টটল তাঁর 'মাইমেসিস'-তত্ত্বে ললিতকলাকে কখনই জীবন বা প্রকৃতির 'অন্ধ অনুকরণ' মনে করেননি এবং এবিষয়ে বঙ্কিমচন্দ্র গ্রীক সমালোচকের সঙ্গে একমত।

**বঙ্কিম-মনন**-এর বৈশিষ্ট্য রচনা-কুশলতায় ও শৈলীর প্রসাদগুণে যতটা, মৌলিকতায় ততটা নয়। তবে এটি যে সাম্প্রতিক বঙ্কিম-সমালোচনায় একটি উল্লেখযোগ্য সংযোজন, সে-বিষয়ে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই। ☐

# রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশন সংবাদ

### রামকৃষ্ণ মিশনের ৯৬তম প্রতিষ্ঠা-দিবস উদ্‌যাপন

গত ১ মে বাগবাজার **বলরাম মন্দিরে** সারাদিন-ব্যাপী নানা অনুষ্ঠানের মাধ্যমে রামকৃষ্ণ মিশনের ৯৬তম প্রতিষ্ঠা-দিবস উদ্‌যাপিত হয়। প্রথম পর্বে মঙ্গলারতি, বিশেষ পূজা, হোম, ভজন, প্রসাদ-বিতরণ প্রভৃতি অনুষ্ঠিত হয়। দ্বিতীয় পর্বে এক আলোচনাসভার আয়োজন করা হয়। যে-হলঘরে বসে স্বামী বিবেকানন্দ ১৮৯৭ খ্রীস্টাব্দের ১ মে রামকৃষ্ণ মিশনের প্রতিষ্ঠা ঘোষণা করেছিলেন, সেখানে বিকাল ৪টায় ভাবগম্ভীর পরিবেশে এই আলোচনাসভা অনুষ্ঠিত হয়। স্বাগত ভাষণ দেন বলরাম মন্দিরের অধ্যক্ষ স্বামী পূতানন্দ। রামকৃষ্ণ মিশনের বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য নিয়ে আলোচনা করেন রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের সহকারী সম্পাদক স্বামী ভজনানন্দ এবং অখিল ভারত বিবেকানন্দ যুব-মহামণ্ডলের সাধারণ সম্পাদক নবনীহরণ মুখোপাধ্যায়। স্বামীজীর বাণী ও রচনা থেকে পাঠ করেন শঙ্কর বসুমল্লিক। সভায় সভাপতিত্ব করেন রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের সাধারণ সম্পাদক স্বামী আত্মস্থানন্দজী। ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন ডঃ কমল নন্দী। অনুষ্ঠানে উদ্বোধনী সঙ্গীত ও সমাপ্তি সঙ্গীত পরিবেশন করেন প্রদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়। সন্ধ্যারতির পর হাওড়ার 'সুদর্শন' নাট্যসংস্থা কর্তৃক 'কালো মায়ের পাগল ছেলে' গীতিনাট্য পরিবেশিত হয় সারাদিন ধরেই বলরাম মন্দিরে বহু সন্ন্যাসী ও ভক্তের সমাগম হয়।

### স্বামী বিবেকানন্দের ভারত-পরিক্রমা ও শিকাগো ধর্মমহাসভায় যোগদানের উদ্দেশে অভিযাত্রার শতবার্ষিকী অনুষ্ঠান

স্বামীজীর ভারত-পরিক্রমা ও শিকাগো ধর্মমহাসভায় যোগদানের শতবর্ষ উপলক্ষে **কাঁকুড়গাছি রামকৃষ্ণ যোগোদ্যান মঠে** গত ৩১ মে থেকে তিনদিন-ব্যাপী এক উৎসবের আয়োজন করা হয়। বৈদিক স্তোত্রপাঠের মধ্যে প্রদীপ জ্বালিয়ে অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের অন্যতম সহাধ্যক্ষ শ্রীমৎ স্বামী গহনানন্দজী মহারাজ। এরপর তিনি রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের অধ্যক্ষ শ্রীমৎ স্বামী ভূতেশানন্দজী মহারাজের আশীর্বাণী পাঠ করে শোনান এবং স্বামীজীর ভারত-পরিক্রমা ও বিশ্ব-ধর্মমহাসভার উদ্দেশে অভিযাত্রার তাৎপর্য ব্যাখ্যা করেন। 'স্বামী বিবেকানন্দের ভারত-পরিক্রমার তাৎপর্য' বিষয়ে বক্তব্য রাখেন অধ্যাপক শঙ্করী-প্রসাদ বসু, অধ্যাপক হোসেনুর রহমান, স্বামী পূর্ণাত্মানন্দ, স্বামী সুপর্ণানন্দ এবং স্বামী শিব-ময়ানন্দ। অনুষ্ঠানের প্রারম্ভে এই উৎসবের উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করেন উৎসব-কমিটির সম্পাদক স্বামী রমানন্দ। স্বামীজীর শিকাগো বক্তৃতা থেকে পাঠ করেন স্বামী বোধসারানন্দ। সভায় সভাপতিত্ব করেন রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের সাধারণ সম্পাদক স্বামী আত্মস্থানন্দজী মহারাজ। উদ্বোধনী সঙ্গীত ও সমাপ্তি সঙ্গীত পরিবেশন করেন স্বামী অনিমেষানন্দ ও স্বামী বেদবিদানন্দ। ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন ডাঃ অমর বসু। এই উপলক্ষে এইদিন একটি মনোজ্ঞ স্মরণিকাও প্রকাশিত হয়। সভাশেষে সরোদবাদন পরিবেশন করেন ভূপেন্দ্রনাথ শীল এবং 'নরেন্দ্রনাথের বাল্যকাল' নাটক অভিনয় করে বরানগর রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমের ছাত্রবৃন্দ। এই দিন সকালে এক বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রাও আয়োজিত হয়েছিল।

উৎসবের দ্বিতীয় দিন (১. ৬. ৯৩) শ্রীমৎ স্বামী গহনানন্দজী মহারাজের স্বাগত ভাষণের পর 'স্বামী বিবেকানন্দের পাশ্চাত্য ভ্রমণের তাৎপর্য এবং শিকাগো বক্তৃতা' বিষয়ে বক্তব্য রাখেন অধ্যাপক নিশীথরঞ্জন রায়, রেভারেন্ড সুজয় বন্দ্যোপাধ্যায়, ডঃ সুকোমল চৌধুরী, স্বামী অসক্তানন্দ এবং স্বামী গোতমানন্দ। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন স্বামী লোকেশ্বরানন্দ। রহড়া রামকৃষ্ণ মিশন বালকাশ্রমের ছাত্রবৃন্দ 'স্বামী বিবেকানন্দের জীবনের দ্বিতীয় পর্যায়' (কলেজজীবন থেকে শিকাগো) নাটকটি পরিবেশন করে।

উৎসবের তৃতীয় তথা শেষদিনের (২. ৬. ৯৩) আলোচ্য বিষয় ছিল—'ভারতবর্ষের পুনর্জাগরণে

স্বামী বিবেকানন্দের পরিকল্পনা'। সভার প্রারম্ভে স্বাগত ভাষণ দেন শ্রীমৎ স্বামী গহনানন্দজী মহারাজ। বক্তব্য রাখেন ডঃ ত্রিগুণা সেন, ডঃ অসিত-কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, স্বামী দিব্যানন্দ এবং স্বামী ভজনানন্দ। সভায় সভাপতিত্ব করেন রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের অন্যতম সহকারী সম্পাদক স্বামী প্রভানন্দ। ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন ডঃ দেবেশ মুখোপাধ্যায়। সভাশেষে সেতারবাদন পরিবেশন করেন পার্থ বসু। উৎসবের প্রতিদিনই প্রায় ৩৫০০ ভক্ত-প্রতিনিধি যোগদান করেছিলেন।

গত ২৫ এপ্রিল কেরালার **কালাডি রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম** এক সর্বধর্মসম্মেলনের আয়োজন করে। অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন কেরালার রাজ্যপাল বি. রাচাইয়া, সভাপতিত্ব করেন কেরালার মুখ্যমন্ত্রী কে. করুণাকরণ। বিভিন্ন ধর্মসম্প্রদায়ের বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ সভায় বক্তব্য রাখেন।

## উৎসব-অনুষ্ঠান

শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ১৫৮তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে গত ৫ থেকে ৭ মার্চ **জলপাইগুড়ি রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমে** এক উৎসবের আয়োজন করা হয়। এই উপলক্ষে সাধুদের জন্য নবনির্মিত কুঠিয়ার দ্বারোদ্ঘাটন করেন দিল্লী রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমের অধ্যক্ষ স্বামী গোকুলানন্দ। উৎসবের বিভিন্ন দিনের অনুষ্ঠানসূচীর মধ্যে ছিল কীর্তন, পাঠ, ধর্মসভা, বাউল গান, চলচ্চিত্র প্রদর্শন, 'যেমন খুশি সাজো', নগর-পরিক্রমা প্রভৃতি। উৎসবের তিনদিনই ধর্মসভায় সভাপতিত্ব করেন স্বামী গোকুলানন্দ। বক্তা হিসাবে উপস্থিত ছিলেন অধ্যাপক শৈলেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, শিক্ষিকা শিপ্রা গুপ্ত, রহড়া বালকাশ্রমের সম্পাদক স্বামী জয়ানন্দ প্রমুখ। উৎসবের শেষদিন প্রায় চারহাজার ভক্তকে হাতে হাতে প্রসাদ দেওয়া হয়।

## ত্রাণ

### কলকাতা অগ্নিত্রাণ

পূর্ব কলকাতার তিলজলা থানার তপসিয়া অঞ্চলে অগ্নিকাণ্ডে ক্ষতিগ্রস্ত ১৫৪টি পরিবারের মধ্যে ১৮০টি শাড়ি, ৩০০ লুঙ্গি, ৩২৬ সেট শিশুদের পোশাক, ১৫০টি মাদুর, ১৪৭টি লণ্ঠন এবং ১৫০ সেট অ্যালুমিনিয়ামের বাসন ( প্রতি সেটে ১০টি করে ) বিতরণ করা হয়েছে।

### বিহার খরাত্রাণ

গাড়োয়া জেলার রাঁকা ব্লকের সাবানে, মুরখুর, দাহো, কেরওয়া, রাউরা, উদয়পুর এবং পাঠলাদামার গ্রামে সাতটি পুকুর খনন করা হয়েছে। এই সঙ্গে ১৫৩০ জন খরাপীড়িতদের জন্য চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়েছে। আদিবাসী-অধ্যুষিত গ্রামগুলিতে বিনামূল্যে ঔষধ বিতরণের উদ্দেশ্যে পালামৌ জেলার ডালটনগঞ্জের কাছে মুণ্ডু গ্রামে চিকিৎসাশিবির খোলা হয়েছে। রামকাণ্ডায় ১৫০ জন শিশুকে দুধ ও বিস্কুট বিতরণ করা হচ্ছে।

### আসাম দাঙ্গাত্রাণ

**শিলং আশ্রমের** মাধ্যমে নওগঞ্জ জেলার ডাবুকার আশেপাশের সাতটি গ্রামের ১৯৩টি দাঙ্গাপীড়িত পরিবারের মধ্যে ৩৭৫ কিলোঃ চাল, ১০০টি শাড়ি, ৫০৫টি অ্যালুমিনিয়ামের বাসন, ১০০টি লণ্ঠন ও খাদ্যদ্রব্যাদি বিতরণ করা হয়েছে।

### অন্ধ্রপ্রদেশ অগ্নিত্রাণ

বিশাখাপত্তনম জেলার মদুগুলা ও চোদাভরম মণ্ডলের অন্তর্গত অগ্নিকাণ্ডে ক্ষতিগ্রস্ত দুটি গ্রামে **বিশাখাপত্তনম রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমের** মাধ্যমে চারটি চিকিৎসাশিবির পরিচালনা করা হয়েছে। শিবিরগুলিতে ৩৭৪ জন রোগীর চিকিৎসা করা হয়েছে। তাছাড়া ৪৬০টি ধুতি ও চাদর এবং ১৭২০টি ব্যবহৃত পোশাক ক্ষতিগ্রস্তদের মধ্যে বিতরণ করা হয়েছে।

### শ্রীলংকা উদ্বাস্তুত্রাণ

**কলম্বো** এবং **বাত্তিকোলা আশ্রমের** মাধ্যমে উদ্বাস্তু ও অনাথ শিশুদের মধ্যে কাপড়, গুঁড়ো দুধ, বাসনপত্র, স্কুলের প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি বিতরণ করা হয়েছে।

## পুনর্বাসন

### তামিলনাড়ু

**কোয়েম্বাটোর ও মাদ্রাজ মঠের** সহযোগিতায় কন্যাকুমারী জেলার বিঝাবনকোড তালুকে বন্যায় ক্ষতিগ্রস্তদের জন্য ৫০টি গৃহনির্মাণের পুনর্বাসন-প্রকল্প শুরু করা হয়েছে। মারায়াপুরম, থোট্টাভরম এবং মাদিচল গ্রামে ২৭টি গৃহনির্মাণের কাজ বিভিন্ন স্তরে রয়েছে।

**পশ্চিমবঙ্গ**

**পুরুলিয়া জেলার পুরুলিয়া ১নং ব্লকের সংসিমুলিয়া গ্রামে বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলির জন্য ৫৫টি গৃহনির্মাণের কাজ শেষ হয়েছে।**

### ভিত্তিপ্রস্তর-স্থাপন

গত ১৫ মে **নারায়ণপুর আশ্রমে** ( মধ্যপ্রদেশ ) প্রস্তাবিত পাঠাগার ও প্রার্থনাগৃহের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন সাধারণ সম্পাদক স্বামী আত্মস্থানন্দজী।

### উদ্বোধন

গত ২৭ এপ্রিল **চেরাপুঞ্জি রামকৃষ্ণ মিশনের** 'ট্রাইব্যাল কালচারাল মিউজিয়াম'-এর উদ্বোধন করেন সহাধ্যক্ষ শ্রীমৎ স্বামী গহনানন্দজী মহারাজ।

### বাহভারত

**রামকৃষ্ণ বেদান্ত সেন্টার ( বোর্ন এন্ড, ইংল্যান্ড )**-এর উদ্যোগে ম্যাঞ্চেস্টার মেট্রোপলিটান ইউনিভার্সিটির সহযোগিতায় গত ২০ মার্চ সন্ধ্যা ৭টায় ম্যাঞ্চেস্টার লেকচার থিয়েটার-এ স্বামী বিবেকানন্দের শিকাগো ধর্মমহাসভায় আবির্ভাবের শতবর্ষ উপলক্ষে এক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। ১০ এপ্রিল কার্ডিফের সিটি ইউনাইটেড রিফর্মড চার্চে অনুরূপে আরেকটি অনুষ্ঠান আয়োজিত হয়।

**হলিউড বেদান্ত সোসাইটির** শাখাকেন্দ্র সান দিয়েগো মনাসটারিতে স্বামী বিবেকানন্দের স্মরণে গত ২৫ এপ্রিল এক যন্ত্র-সঙ্গীত অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। এই অনুষ্ঠানে বেহালাবাদন পরিবেশন করেন ডঃ এল. সুব্রামনিয়াম এবং তবলা লহরায় অংশ নেন ওস্তাদ জাকির হুসেন। এই অনুষ্ঠান বহুসংখ্যক শ্রোতাকে মুগ্ধ করে। সান-ফ্রান্সিস্কোতে ভারতের কনসাল জেনারেল সুশীল দুবে এদিন উপস্থিত ছিলেন। এই উপলক্ষে 'বেদান্ত ঃ একটি ধর্ম, একটি দর্শন, একটি জীবন-পদ্ধতি' শীর্ষক পুস্তিকা প্রকাশিত হয়।

**বেদান্ত সোসাইটি অব নর্দান ক্যালিফোর্নিয়া ঃ** মেরিন কান্ট্রিতে গত ২৯ মে থেকে চারদিনের একটি বেদান্ত-শিবির অনুষ্ঠিত হয়েছে। শিবিরের অনুষ্ঠান-সূচীর মধ্যে ছিল স্তোত্রপাঠ, ভজন, ধ্যান, ধর্মপ্রসঙ্গ, পূজা, পাঠ, নাটক, প্রশ্নোত্তর সভা প্রভৃতি। বিভিন্ন দিনের আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন ডঃ ইউজিন টেলর ও মারী লুইস বার্ক। এছাড়াও বিভিন্ন বিভাগে অংশ নেন সন্ন্যাসী ও ভক্তবৃন্দ।

ভগবান বুদ্ধের জন্মদিন উপলক্ষে গত ৬ জুন সোসাইটিতে একটি বিশেষ সভা আয়োজিত হয়। আশ্রমের অধ্যক্ষ স্বামী প্রবুদ্ধানন্দ যথারীতি জুন মাসের প্রতি বুধ ও রবিবারের ক্লাসগুলি নিয়েছেন।

### দেহত্যাগ

**স্বামী জিতানন্দ** ( দীনবন্ধু ) গত ২৪ মে রাত দশটা দশ মিনিটে বারাণসী সেবাশ্রম হাসপাতালে দেহত্যাগ করেছেন। তাঁর বয়স হয়েছিল ৭৬ বছর। চোখের চিকিৎসার জন্য তিনি দিল্লী গিয়েছিলেন। সেখানেই তাঁর সেরিব্রাল স্ট্রোক হয়। তখন থেকে তাঁর প্রাথমিক চিকিৎসা শুরু হয়। তাঁর একান্ত ইচ্ছানুসারে তাঁকে বারাণসীর হাসপাতালে নিয়ে আসা হয় এবং চিকিৎসা যথারীতি চলতে থাকে। কিন্তু সকল চেষ্টা ব্যর্থ করে ২৪ মে তিনি শেষ-নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

স্বামী জিতানন্দ ছিলেন শ্রীমৎ স্বামী বিরজা-নন্দজী মহারাজের মন্ত্রশিষ্য। ১৯৪৮ খ্রীস্টাব্দে তিনি দিল্লীর রামকৃষ্ণ মিশনে যোগদান করেন এবং ১৯৫৭ খ্রীস্টাব্দে শ্রীমৎ স্বামী শঙ্করানন্দজী মহা-রাজের কাছে সন্ন্যাসগ্রহণ করেন। যোগদান-কেন্দ্র ছাড়াও তিনি বিভিন্ন সময়ে কলকাতার সেবা-প্রতিষ্ঠান, কনখল, রাজকোট এবং বৃন্দাবন আশ্রমের কর্মী ছিলেন। ১৯৬৫-১৯৬৬ খ্রীস্টাব্দে তিনি জম্মু-কাশ্মীরে ত্রাণকার্যে অংশ নিয়েছিলেন। ১৯৬৮ থেকে ১৯৮০ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত তিনি শ্যামলাতাল কেন্দ্রের অধ্যক্ষের পদে বৃত ছিলেন। সক্রিয় কর্ম-জীবন থেকে বিশ্রাম নিয়ে তিনি ১৯৯১ খ্রীস্টাব্দ থেকে বারাণসীর সাধুনিবাসে অবসরজীবন যাপন করছিলেন। ফুল-বাগান তৈরি ও পর্বতারোহণে তাঁর বিশেষ আগ্রহ ছিল। সরল, বিনম্র ও অমায়িক স্বভাবের জন্য তিনি সকলের প্রিয় ছিলেন।

## শ্রীশ্রীমায়ের বাড়ীর সংবাদ

**সাপ্তাহিক ধর্মালোচনা ঃ** সন্ধ্যারতির পর সারদানন্দ হল-এ প্রতি শুক্রবার, রবিবার ও সোমবার যথারীতি চলছে। □

# বিবিধ সংবাদ

## উৎসব-অনুষ্ঠান

গত ১৩ ও ১৪ ফেব্রুয়ারি '৯৩ **কাঁচড়াপাড়ার শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পাঠচক্রের** উদ্যোগে ওয়ার্কসপ রোডের হরিসভায় দুদিনব্যাপী শ্রীরামকৃষ্ণদেবের স্মরণোৎসব পালিত হয়। প্রথমদিন ছাত্রছাত্রীদের জন্য অঙ্কন ও বক্তৃতা-প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। ঐদিন বিকালে ভগিনী নিবেদিতা ও শ্রীমা সারদাদেবীর জীবন ও বাণী নিয়ে আলোচনা করেন প্রব্রাজিকা অজ্ঞেয়প্রাণা ও প্রব্রাজিকা প্রদীপ্তপ্রাণা। গীতি-আলেখ্য 'মাতৃসাধক রামপ্রসাদ' পরিবেশন করেন শিবপুর প্রফুল্লতীর্থ।

দ্বিতীয়দিন প্রভাতফেরী, পূজা, হোম ইত্যাদি অনুষ্ঠিত হয়। ঐদিন ৩০০০ ভক্তকে হাতে হাতে প্রসাদ দেওয়া হয়। তাছাড়া দুঃস্থদের বস্ত্র এবং দুঃস্থ ছাত্রছাত্রীদের পড়াশুনার জন্য কাগজ দেওয়া হয়। বিকালে ধর্মসভায় শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ ভাব-ধারার ওপর বক্তব্য রাখেন স্বামী পূর্ণাত্মানন্দ। সন্ধ্যারতির পর গীতি-আলেখ্য পরিবেশন করেন কলকাতার 'অর্ঘ্য'-এর ভক্তবৃন্দ।

**হালিসহর শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ ভক্তসংঘের** উদ্যোগে গত ২০ ও ২১ ফেব্রুয়ারি পঞ্চম বার্ষিক শ্রীরামকৃষ্ণ-স্মরণোৎসব অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন স্বামী ব্রজেশানন্দ। ২১ তারিখ পূর্বাহ্নে পূজা, প্রসাদ-বিতরণাদি অনুষ্ঠিত হয়। অপরাহ্নে অনুষ্ঠিত হয় ধর্মসভা। ধর্মসভায় বক্তব্য রাখেন স্বামী বৈকুণ্ঠানন্দ ও স্বামী দিব্যাশ্রয়ানন্দ। সন্ধ্যায় রহড়া রামকৃষ্ণ মিশনের সৌজন্যে চলচ্চিত্র প্রদর্শিত হয়।

**শ্রীরামকৃষ্ণ পাদতীর্থ সেবক সংঘ, ভদ্রকালী (হুগলী)** গত ২৩ ফেব্রুয়ারি '৯৩ শ্রীরামকৃষ্ণ-দেবের আবির্ভাব-তিথি উদ্‌যাপন করে। সকালে একটি সুদৃশ্য শোভাযাত্রা ভদ্রকালী থেকে বেলুড় মঠ পর্যন্ত যাত্রা করে। বিকালে সঙ্ঘের সদস্যবৃন্দ শ্রীশ্রীঠাকুরের আবির্ভাব-লীলার ওপর একটি শ্রুতি-নাটক ও ভক্তিগীতি পরিবেশন করেন।

**শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ সেবা সমিতি, প্রাচীন মায়াপুর, নবদ্বীপ (নদীয়া)** গত ২৩ ফেব্রুয়ারি শ্রীরামকৃষ্ণ-দেবের ১৫৮তম জন্মোৎসব নানা অনুষ্ঠানের মাধ্যমে উদ্‌যাপন করেছে। এ-উপলক্ষে ৫ মার্চ থেকে ৮ মার্চ পর্যন্ত এই আশ্রমে বিশেষ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছিল। ৫ মার্চ অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন নবদ্বীপ আদালতের জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট অসিতকুমার দে। এতদুপলক্ষে ধর্মসভা ও সঙ্গীতাঞ্জলি অনুষ্ঠিত হয়। ধর্মসভাগুলিতে আলোচনা করেন স্বামী সনাতনানন্দ, স্বামী ধ্যানে-শানন্দ, স্বামী বৈকুণ্ঠানন্দ, ডঃ অসিত সরকার, সাধনচন্দ্র সামুই, নচিকেতা ভরদ্বাজ, ডঃ তাপস বসু, ডঃ হংসনারায়ণ ভট্টাচার্য, বনমালী গোস্বামী প্রমুখ।

গত ২৮ ফেব্রুয়ারি **ঝাড়গ্রাম কথামৃত পাঠচক্রের** পরিচালনায় একদিনের এক সাধন-শিবির অনুষ্ঠিত হয়। গীতাপাঠ, ধ্যান, ভজন, আলোচনা প্রভৃতি ছিল অনুষ্ঠানের অঙ্গ। সকাল ৮-৩০-এ শিবির আরম্ভ হয়ে বিকাল ৫-৩০-এ সমাপ্ত হয়। শিবিরে আলোচনা করেন স্বামী ভবেশ্বরানন্দ ও স্বামী মুক্তসঙ্গানন্দ। ভজন পরিবেশন করেন প্রবাল মাইতি।

শ্রীরামকৃষ্ণ ভক্তদলের পরিচালনায় **ডোমজুড় শ্রীরামকৃষ্ণ প্রার্থনা মন্দিরে** গত ৬ ও ৭ মার্চ, '৯৩ ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ১৫৮তম জন্মমহোৎসব উদ্‌-যাপিত হয়। চণ্ডীপাঠ, বিশেষ পূজা, শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-কথামৃত পাঠ, ভক্তিগীতি, গীতিনাট্য প্রভৃতি ছিল উৎসবের অঙ্গ। প্রায় দেড়হাজার নর-নারীকে প্রসাদ দেওয়া হয়। দুঃস্থদের মধ্যে ৫১টি বস্ত্র বিতরণ করা হয়। দুইদিন ধর্মসভায় বক্তব্য রাখেন প্রব্রাজিকা অমলাপ্রাণা, স্বামী বৈকুণ্ঠানন্দ, প্রণবেশ চক্রবর্তী, অধ্যাপক প্রণবরঞ্জন ব্যানার্জী প্রমুখ। কৃতি ছাত্রছাত্রীদের বই ও খাতার কাগজ দেওয়া হয়। অনুষ্ঠানের শেষদিন সন্ধ্যায় 'ভক্ত হরিদাস' চলচ্চিত্র প্রদর্শিত হয়।

গত ১৪ মার্চ '৯৩, **জামালপুর (বিহার) শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ ভক্তসঙ্ঘের** পরিচালনায় ১৫৮তম জন্মোৎসব অনুষ্ঠিত হয়।

মাঙ্গলিকী, শান্তিপাঠ, প্রভাতফেরী, পূজার্চনা, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, আরাত্রিক-বন্দনাদি, শ্রীরামকৃষ্ণ-লীলাগীতি পরিবেশন প্রভৃতি ছিল উৎসবের প্রধান অঙ্গ। দুপুরে প্রায় পাঁচশো ভক্তকে বসিয়ে প্রসাদ দেওয়া হয়। শ্রীশ্রীঠাকুরের জীবন ও বাণী বিষয়ে আলোচনা করেন স্বামী ভাবাত্মানন্দ।

**শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম, কৃষ্ণনগর (নদীয়া)** গত ২০ ও ২১ মার্চ আশ্রমের বার্ষিক উৎসব উদ্‌যাপন করে। প্রথমদিন বিকাল ৪টায় উৎসবের সূচনার পর পূর্বে অনুষ্ঠিত নানা প্রতিযোগিতার পুরস্কার বিতরণ করা হয়। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন স্বামী দেবদেবানন্দ ও প্রধান অতিথি ছিলেন নচিকেতা ভরদ্বাজ। দ্বিতীয়দিন শোভাযাত্রা, বিশেষ পূজা, হোম, প্রসাদ-বিতরণ, ধর্মসভা প্রভৃতি অনুষ্ঠিত হয়। ধর্মসভায় বক্তব্য রাখেন স্বামী দেবদেবানন্দ, নচিকেতা ভরদ্বাজ ও ডঃ তাপস বসু। সন্ধ্যায় ধর্মপ্রসঙ্গ করেন স্বামী কমলেশানন্দ। উভয় দিনই সন্ধ্যারতির পর ভক্তিগীতি পরিবেশন করেন অমর পাড়ুই ও সহশিল্পিবৃন্দ।

**সারদা-রামকৃষ্ণ পাঠচক্র, অ্যাডকোনগর (আদি-সপ্তগ্রাম) হুগলী** গত ২৭ ও ২৮ মার্চ বার্ষিক উৎসব উদ্‌যাপন করে। প্রথমদিন মাতৃদিবসে শ্রীশ্রীমায়ের ওপর আলোচনা এবং মহিলা রচনা-প্রতিযোগীদের পুরস্কার প্রদান করেন প্রব্রাজিকা অচলাপ্রাণা। সন্ধ্যায় 'ভক্তভৈরব গিরিশচন্দ্র' গীতি-নাট্য পরিবেশন করেন 'শিবপুর প্রফুল্লতীর্থ'-এর শিল্পিবৃন্দ। দ্বিতীয়দিন বিশেষ পূজা ও প্রসাদ-বিতরণের পর ধর্মসভা অনুষ্ঠিত হয়। সভাপতিত্ব করেন নীরদবরণ চট্টোপাধ্যায়। বক্তব্য রাখেন স্বামী মুক্তসঙ্গানন্দ ও শক্তিপদ দাস। সভায় পুরুষ রচনা-প্রতিযোগীদের পুরস্কার বিতরণ করেন স্বামী মুক্তসঙ্গানন্দ। সভার শেষে সঙ্গীত পরিবেশন করেন স্থানীয় শিল্পিবৃন্দ।

## বৈজ্ঞানিকের সম্মান

কলকাতার স্কুল অফ ট্রপিক্যাল মেডিসিনের ভূতপূর্ব ডাইরেক্টর ও ভাইরোলজি বিভাগের ভূতপূর্ব অধ্যাপক এবং ভারত সরকারের অধীনস্থ ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অফ মেডিকেল রিসার্চ-এর ভূতপূর্ব এমারিটাস সায়েন্টিস্ট এবং বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থার ভূতপূর্ব ভাইরাসরোগ-বিশেষজ্ঞ কমিটির সদস্য **ডঃ জলধিকুমার সরকারকে** চিকিৎসাবিজ্ঞানে বিশেষ অবদানের জন্য কলকাতার এশিয়াটিক সোসাইটি 'বার্কলে মেমোরিয়াল পদক'দানে সম্মানিত করেছেন। ১৯৮০ খ্রীস্টাব্দে কর্ম থেকে অবসরগ্রহণের পর ডঃ সরকার 'উদ্বোধন'-এর সম্পাদকীয় বিভাগে সাম্মানিক বিজ্ঞান-বিশেষজ্ঞ হিসাবে যুক্ত আছেন।

## সাহিত্য-পত্রিকার বিশেষ সংখ্যার প্রকাশ

গত ১৪ ফেব্রুয়ারি (১৯৯৩) সকাল সাড়ে দশ-টায় 'শ্রীমহল' ভবনে (১৭/৩, কবি ভারতচন্দ্র রোড, দমদম, কলিঃ-২৮) **'জলপ্রপাত সাহিত্য'** পত্রিকার একটি বিশেষ সংখ্যা প্রকাশিত হয়। পত্রিকার যুগ্ম সম্পাদিকা নিভা দে ও শিপ্রা বন্দ্যোপাধ্যায়ের যৌথ পরিচালনায় অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন বার্ণিক রায়, সুনীল দাশ, কৃষ্ণচন্দ্র ভূঁইয়া প্রমুখ। ছড়াপাঠ করেন ভবানীপ্রসাদ মজুমদার। অনুষ্ঠানে উদ্বোধন ও সমাপ্তি সঙ্গীত পরিবেশন করেন মালা দে। উল্লেখ্য, বিগত তেরো বছর ধরে পত্রিকাটি দুর্গাপুর (২৮, ভাবা রোড) থেকে প্রকাশিত হয়ে আসছে।

## পরলোকে

গত ১৯ ভাদ্র ১৩৯৯, শনিবার রাত ১২টা ৪০ মিনিটে শ্রীমৎ স্বামী বীরেশ্বরানন্দজী মহারাজের স্নেহধন্যা **সুশীলাবালা সরদার** পরলোকগমন করেছেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮৩ বছর। তাঁর তিন পুত্র ও দুই কন্যা বর্তমান। শ্রীশ্রীমায়ের বাড়ী ও উদ্বোধন কার্যালয়ে তিনি বহুদিন ধরে যাতায়াত করতেন। তিনি 'উদ্বোধন' পত্রিকার দীর্ঘদিনের গ্রাহিকা ছিলেন।

শ্রীমৎ স্বামী মাধবানন্দজী মহারাজের কৃপাধন্যা **ছবিরানী সরদার** গত ২৮ পৌষ ১৩৯৯, বুধবার, বেলা ৯টা ৫ মিনিটে পরলোকগমন করেছেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৪৫ বছর। তাঁর স্বামী (শ্রীমৎ স্বামী মাধবানন্দজী মহারাজের কৃপাধন্য) ও তিন পুত্র বর্তমান। তিনি 'উদ্বোধন'-এর নিয়মিত পাঠিকা ছিলেন। ☐

# বিজ্ঞান-সংবাদ

## সাইকেলচালকের হেলমেট পরা প্রয়োজন

সাইকেলচালকদের হেলমেট পরার প্রয়োজনীয়তা নিয়ে আলোচনা হয়েই চলেছে। ইংল্যান্ডে হেলমেট পরার পক্ষে মত দিয়েছেন পরিবহন বিভাগ, পার্লামেন্টারি অ্যাডভাইসারি কাউন্সিল ফর ট্রান্সপোর্ট সেফটি, অনেকগুলি দুর্ঘটনা-প্রতিরোধক সমিতি এবং বহু স্বাস্থ্যবিশেষজ্ঞ। তবে ব্রিটেনের সাইকেল-প্রতিষ্ঠানগুলি এবিষয়ে বিশেষ উৎসাহ দেখায়নি। অনেক সাইকেলচালক মনে করেন যে, হেলমেট পরতে বাধ্য করলে তাতে ব্যক্তি-স্বাধীনতা খর্ব করা হবে; তাছাড়া তাঁরা এও ভাবেন যে, বেশির ভাগ দুর্ঘটনার কারণ যখন মোটরগাড়িগুলি, তখন সাইকেলচালকদের হেলমেট পরিয়ে শাস্তি দেওয়ার কোন মানে হয় না। এই ব্যাপারে কৌতূহলী অনেকে মনে করেন যে, যেগুলি আগে করা দরকার সেগুলি হচ্ছেঃ রাস্তা আরও ভাল করা, যানবাহন পরিচালন ব্যবস্থার উন্নতি-করণ, সাইকেল চালানোর জন্য রাস্তাকে আলাদা ভাগ করে দেওয়া এবং সবাইকে (বিশেষতঃ মোটর-চালকদের) রাস্তা ব্যবহার সম্বন্ধে শিক্ষা দেওয়া। হেলমেট পরলে সাইকেলচালকেরা কতটা দুর্ঘটনা থেকে রেহাই পাবেন, সেবিষয়েও মতানৈক্য রয়েছে। সাইকেলচালকদের একাংশ বলেন যে, হেলমেট পরলে পুরো মাথাটা রক্ষা পায় না, বা সরাসরি মাথায় ধাক্কা লাগলে হেলমেট বিশেষ কাজে আসে না। তাছাড়া হেলমেট পরলে দুর্ঘটনা তো বন্ধ করা যাবে না।

এই ব্যাপারে গবেষণা করে যেসব উত্তর পাওয়া গেছে সেগুলি হলোঃ হেলমেট যেভাবে তৈরি হয়, তাতে মোটরগাড়ি বা লরির সঙ্গে সরাসরি জোরে ধাক্কা লাগলে মাথায় আঘাত লাগা বন্ধ করা যাবে না। কিন্তু আমেরিকার রিপোর্টগুলিতে বলা হয়েছে যে, মারাত্মক দুর্ঘটনায় জড়িত মাথায় আঘাতপ্রাপ্তদের ৭০ শতাংশ ক্ষেত্রে বাঁচানো সম্ভব হয়েছে। দ্বিতীয়তঃ অপেক্ষাকৃত কম সাংঘাতিক দুর্ঘটনাগুলির ক্ষেত্রে হেলমেট পরা থাকলে কি কিছু উপকার হয়? এর উত্তরে বেশ জোর করেই বলা যায়, "হ্যাঁ"।

যাঁরা হেলমেট-ব্যবহার চালু হওয়ার পক্ষে, তাঁরা এখন জোর দিচ্ছেন যে, হেলমেট পরলে দুর্ঘটনায় মাথায় সাংঘাতিক ধরনের আঘাতে মৃত্যুর হার কমে; তাছাড়া দুর্ঘটনায় অল্পবয়স্ক ছেলেমেয়েদের মাথায় আঘাত পাবার সম্ভাবনা কমায়। দেখা গেছে যে, শেষোক্তদের ব্যাপারে প্রায় অর্ধেক ক্ষেত্রে দুর্ঘটনায় মোটরগাড়ি জড়িত নয় এবং অন্যভাবে দুর্ঘটনা ঘটেছে। ইতিমধ্যে হেলমেট তৈরির ডিজাইনও উন্নত থেকে উন্নততর করা হচ্ছে। এখনকার 'ব্রিটিশ স্টান্ডার্ড' উঠে গিয়ে আগামী বছরেই 'ইউরোপীয় স্টান্ডার্ড' চালু হয়ে যাবে। তাছাড়া চেষ্টা চলছে কিভাবে হেলমেট আরও সস্তা করা যায়। আইন পাশ হওয়ার পরে আমেরিকার মেরিল্যান্ডে কমবয়সীদের ৪৭ শতাংশ এবং অস্ট্রেলিয়ার ভিক্টোরিয়াতে ৮০ শতাংশ লোক হেলমেট পরে সাইকেল চালাচ্ছে।

[British Medical Journal,
10 October, 1992, pp. 843-844]

**সংশোধন**

| সংখ্যা | পৃষ্ঠা | মুদ্রিত | হবে |
|---|---|---|---|
| জ্যৈষ্ঠ, ১৪০০ | ২৬০ | অণু (Ion) | স্থূলোণু (Ion) |
| | | অণু ও যৌগগুলি | স্থূলোণু ও যৌগমূলকগুলি |
| | | আণবিক প্রাণী ও উদ্ভিদ | আণুবীক্ষণিক প্রাণী ও উদ্ভিদ |

বিশ্বব্যাপী চৈতন্যই ঈশ্বর। সেই বিশ্বব্যাপী চৈতন্যকেই লোকে প্রভু, ভগবান, খ্রীস্ট, বুদ্ধ বা ব্রহ্ম বলিয়া থাকে— জড়বাদীরা উহাকেই শক্তিরূপে উপলব্ধি করে এবং অজ্ঞেয়বাদীরা ইহাকেই সেই অনন্ত অনির্বচনীয় সর্বাতীত বস্তু বলিয়া ধারণা করে। উহাই সেই বিশ্বব্যাপী প্রাণ, উহাই বিশ্বব্যাপী চৈতন্য, উহাই বিশ্বব্যাপিনী শক্তি এবং আমরা সকলেই উহার অংশস্বরূপ।

স্বামী বিবেকানন্দ

উদ্বোধনের মাধ্যমে প্রচার হোক
এই বাণী। শ্রীসুশোভন চট্টোপাধ্যায়

# উদ্বোধন

১। স্বামী বিবেকানন্দ প্রবর্তিত, রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের একমাত্র বাঙলা মুখপত্র, চুরানব্বই বছর ধরে নিরবচ্ছিন্নভাবে প্রকাশিত দেশীয় ভাষায় ভারতের প্রাচীনতম সাময়িকপত্র


## সূচিপত্র

৯৫তম বর্ষ ভাদ্র ১৪০০ (আগস্ট ১৯৯৩) সংখ্যা



❀ ❀


সম্পাদক ☐ স্বামী পূর্ণাত্মানন্দ

৮০/৬, গ্রে স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০ ০০৬-স্থিত বসুশ্রী প্রেস থেকে বেলুড় শ্রীরামকৃষ্ণ মঠের ট্রাস্টীগণের পক্ষে স্বামী সত্যব্রতানন্দ কর্তৃক মুদ্রিত ও ১ উদ্বোধন লেন, কলকাতা-৭০০ ০০৩ থেকে প্রকাশিত।

প্রচ্ছদ মুদ্রণঃ স্বপ্না প্রিন্টিং ওয়ার্কস (প্রাঃ) লিমিটেড, কলকাতা-৭০০ ০০৯

আজীবন গ্রাহকমূল্য (৩০ বছর পর নবীকরণ-সাপেক্ষ) ☐ এক হাজার টাকা (কিস্তিতেও প্রদেয়—প্রথম কিস্তি একশো টাকা) ☐ সাধারণ গ্রাহকমূল্য ☐ শ্রাবণ থেকে পৌষ সংখ্যা ☐ ব্যক্তিগতভাবে সংগ্রহ ☐ তিরিশ টাকা ☐ সডাক ☐ চৌত্রিশ টাকা ☐ বর্তমান সংখ্যার মূল্য ☐ ছয় টাকা

# উদ্বোধন-এর গ্রাহকদের জন্য বিজ্ঞপ্তি

**উদ্বোধন : আশ্বিন ( শারদীয়া ) ১৪০০ এবং স্বামীজীর ভারত-পরিক্রমা ও শিকাগো ধর্মমহাসভায় আবির্ভাবের শতবার্ষিক সংখ্যা**

☐ যথারীতি নানা গুণিজনের রচনায় সমৃদ্ধ হয়ে এবারেও **'উদ্বোধন'-এর আশ্বিন/সেপ্টেম্বর (শারদীয়া)** সংখ্যা প্রকাশিত হবে। **এবছর এই সংখ্যাটি একই সঙ্গে স্বামীজীর ভারত-পরিক্রমা এবং শিকাগো ধর্মমহাসভায় আবির্ভাবের শতবার্ষিক সংখ্যা হিসাবেও প্রকাশিত হবে। সংখ্যাটির মূল্য : তিরিশ টাকা।**

☐ **'উদ্বোধন'-এর** গ্রাহকদের এই সংখ্যার জন্য **আলাদা মূল্য দিতে হবে না।** তাঁরা নিজের কপি ছাড়া **অতিরিক্ত প্রতি কপি বাইশ টাকায়** পাবেন ; **৩১ আগস্ট '৯৩-এর মধ্যে অগ্রিম টাকা জমা দিলে** তাঁরা প্রতি কপি **কুড়ি টাকায়** পাবেন, **রেজিস্ট্রি ডাকে** সংখ্যাটি নিলে অতিরিক্ত **সাত টাকা** জমা দিতে হবে।

☐ **সাধারণ ডাকে** যাঁরা পত্রিকা নেন, তাঁরা **ব্যক্তিগতভাবে** (By Hand) এই সংখ্যাটি সংগ্রহ করতে চাইলে **৩১ আগস্ট '৯৩-এর** মধ্যে **সেই সংবাদ** কার্যালয়ে **অবশ্যই** পৌঁছানো প্রয়োজন। **৩১ আগস্ট '৯৩-এর** মধ্যে **কোন সংবাদ কার্যালয়ে না পৌঁছালে পত্রিকা সাধারণ ডাকেই** যথারীতি পাঠিয়ে দেওয়া হবে।

☐ **সাধারণ ডাকে এই সংখ্যাটি না পেলে** আমাদের পক্ষে **দ্বিতীয়বার** দেওয়া সম্ভব নয়।

☐ **সাধারণ ডাকে** যাঁরা পত্রিকা নেন, তাঁরা ইচ্ছা করলে **রেজিস্ট্রি ডাকেও** আশ্বিন সংখ্যাটি নিতে পারেন। সেক্ষেত্রে রেজিস্ট্রি ডাক ও আনুষঙ্গিক খরচ বাবদ **সাত টাকা ৩১ আগস্ট** '৯৩-এর মধ্যে **কার্যালয়ে পৌঁছানো** প্রয়োজন। **ঐ তারিখের পরে** টাকা কার্যালয়ে পৌঁছালে সেই টাকা সংশ্লিষ্ট গ্রাহকদের **আগামী বছরের** ডাকমাশুল বাবদ জমা রাখা হবে।

☐ **ব্যক্তিগতভাবে** যাঁরা পত্রিকা সংগ্রহ করবেন তাঁদের **২৭ সেপ্টেম্বর থেকে ২ অক্টোবর ('৯৩) পর্যন্ত** কার্যালয় থেকে **আশ্বিন সংখ্যাটি** দেওয়া হবে। সংশ্লিষ্ট গ্রাহকদের কাছে অনুরোধ, তাঁরা যেন **এই সময়ের মধ্যে** তাঁদের সংখ্যাটি সংগ্রহ করে নেন। বিশেষ কারণে ঐ তারিখের মধ্যে সংগ্রহ করা সম্ভব না হলে **১ নভেম্বর থেকে ১৬ নভেম্বরের মধ্যে অবশ্যই সংগ্রহ করতে হবে।** কার্যালয়ে স্থানাভাবের জন্য **১৬ নভেম্বরের ('৯৩) পর সংখ্যাটি প্রাপ্তির নিশ্চয়তা থাকবে না।** আশা করি, সহৃদয় গ্রাহকবর্গের সানুগ্রহ সহযোগিতা আমরা এবিষয়ে পাব।

☐ কার্যালয় শনিবার বেলা ১-৩০ পর্যন্ত **খোলা** থাকে, রবিবার **বন্ধ**। অন্যান্য দিন সকাল ৯-৩০ মিঃ থেকে বিকাল ৫-৩০ মিঃ পর্যন্ত খোলা। **১৫ অক্টোবর মহালয়া উপলক্ষে এবং ২১ অক্টোবর থেকে ৩১ অক্টোবর পর্যন্ত দুর্গাপূজা উপলক্ষে পত্রিকা বিভাগ বন্ধ থাকবে।**

☐ ডাকবিভাগের নির্দেশমত **ইংরেজী মাসের ২৩ তারিখ** ( ২৩ তারিখ রবিবার কিংবা ছুটির দিন হলে ২৪ তারিখ) **'উদ্বোধন'** পত্রিকা কলকাতার জি. পি. ও.-তে ডাকে দিই। এই তারিখটি **সংশ্লিষ্ট বাঙলা মাসের** সাধারণতঃ **৮/৯ তারিখ** হয়। ডাকে পাঠানোর সপ্তাহখানেকের মধ্যে গ্রাহকদের পত্রিকা পেয়ে যাবার কথা। তবে ডাকের গোলযোগে কখনো কখনো পত্রিকা পৌঁছাতে বিলম্বও হয়। অনেক সময় গ্রাহকরা একমাস পরেও পত্রিকা পান বলে খবর পাই। সে-কারণে সহৃদয় গ্রাহকদের **একমাস পর্যন্ত অপেক্ষা** করতে অনুরোধ করি। **একমাস পরে** ( অর্থাৎ পরবর্তী ইংরেজী মাসের ২৪ তারিখ / পরবর্তী বাঙলা মাসের ১০ তারিখ পর্যন্ত ) পত্রিকা না পেলে **গ্রাহকসংখ্যা উল্লেখ করে** কার্যালয়ে জানালে **ডুপ্লিকেট বা অতিরিক্ত কপি** পাঠানো হবে।

☐ যাঁরা **ব্যক্তিগতভাবে** (By Hand) **পত্রিকা সংগ্রহ** করেন তাঁদের পত্রিকা **ইংরেজী মাসের ২৭ তারিখ** থেকে বিতরণ শুরু হয়। স্থানাভাবের জন্য **দুটি সংখ্যার** বেশি কার্যালয়ে জমা রাখা সম্ভব নয়। তাই সংশ্লিষ্ট গ্রাহকদের কাছে অনুরোধ, তাঁরা যেন সেইমত তাঁদের সংখ্যা **সংগ্রহ করে নেন।**

☐ **শ্রাবণ সংখ্যা** থেকে ( **পৌষ সংখ্যা** পর্যন্ত ) গ্রাহক হলে **গ্রাহকমূল্য : ব্যক্তিগতভাবে সংগ্রহ (By Hand)—৩০ টাকা, ডাকযোগে (By Post) সংগ্রহ—৩৪ টাকা ( মাঘ-আষাঢ় সংখ্যা নিঃশেষিত )।**

# উদ্বোধন

ভাদ্র ১৪০০ | আগস্ট ১৯৯৩ | ৯৫তম বর্ষ—৮ম সংখ্যা

## দিব্য বাণী

ভারতের দুই মহাপাপ—মেয়েদের পায়ে দলা, আর গরিবগুলোকে পিষে ফেলা।...এদের আগে তুলতে হবে।

**স্বামী বিবেকানন্দ**

## কথাপ্রসঙ্গে

# কন্যাকুমারীতে স্বামীজীর উপলব্ধি: ভারতের পুনর্জাগরণের মৌল শর্ত গণজাগরণ, নারীজাগরণ ও

আসমুদ্রহিমালয় পরিক্রমা করিয়া স্বামীজী কন্যাকুমারীর শিলাখণ্ডে ধ্যানমগ্ন হইয়াছিলেন। হিমালয়েও তিনি বহুবার ধ্যানমগ্ন হইয়াছেন। হিমালয়ে যখন তিনি ধ্যানমগ্ন হইয়াছেন তখন তাঁহার মন জুড়িয়া, হৃদয় জুড়িয়া, চিন্তা ও চেতনা জুড়িয়া রহিয়াছেন ঈশ্বর। কিন্তু কন্যাকুমারীর শিলাখণ্ডে যখন তিনি ধ্যানমগ্ন হইলেন তখন ধ্যানের বিষয় হিসাবে তাঁহার মনে, তাঁহার হৃদয়ে, তাঁহার চিন্তা ও চেতনায় ঈশ্বর কি কোথাও ছিলেন? স্বামী বিবেকানন্দের জীবনীপাঠকমাত্রেই জানেন—না, সেখানে কোথাও 'ঈশ্বর' নামক কোন কল্পলোকের অধিবাসী, কোন সর্বশক্তিমান সত্তা ছিলেন না; ছিল না ইন্দ্রিয়াতীত অনুভূতির দ্বারা লভ্য কোন অভিজ্ঞতার আকাঙ্ক্ষাও। সেখানে ছিল শুধু ভারতবর্ষ—শুধুই ভারতবর্ষ; ছিল ভারতবর্ষের মানুষকে উত্তোলন করিবার গভীরতম আকুতি। 'ভারতবর্ষ' মানে কি ভারতবর্ষ নামক ভৌগোলিক ভূখণ্ড? নিশ্চয়ই। নদী, পাহাড়, অরণ্য, জনপদ, মরুভূমি সমন্বিত আসমুদ্রহিমাচলব্যাপী যে বিশাল ভূখণ্ড সবেমাত্র তিনি পর্যটন করিয়াছেন, যে-ভূখণ্ড তাঁহার প্রিয় জন্মভূমি—সেই ভারতবর্ষ। ভারতবর্ষের অতীত, ভারতবর্ষের ভবিষ্যৎ, ভারতবর্ষের বর্তমান তাঁহার সত্তাকে অধিকার করিয়া রাখিয়াছিল।

জীবনীকার লিখিতেছেন: "মহাপুরুষের তপোমার্জিত নির্মল পবিত্র চিত্তদর্পণে মাতৃভূমির অতীত, বর্তমান, ভবিষ্যৎ চিত্রসমূহ একে একে প্রতিফলিত হইতে লাগিল। আশা-আনন্দ-উদ্বেগ-অমর্ষ-স্তম্ভিত-হৃদয় বীরসন্ন্যাসীর ধ্যানদৃষ্টির সম্মুখে 'বর্তমান ভারত' দেদীপ্যমান হইয়া উঠিল। 'এই আমার ভারতবর্ষ—আমার প্রিয় মাতৃভূমি!'—ভাবিতে ভাবিতে তাঁহার নেত্রদ্বয় অশ্রুসিক্ত হইল।" (বিবেকানন্দ চরিত—সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার, ১৩শ মুদ্রণ, ১৩৯৩, পৃঃ ৯২)

'বর্তমান ভারত'কে তো তিনি স্বয়ং চর্মচক্ষেই দেখিয়াছেন: পরপদানত ভারত, দারিদ্র্য-লাঞ্ছিত ভারত, যেখানে উচ্চবর্ণের অত্যাচারে নিষ্পেষিত নিম্নবর্ণের অগণিত মানুষ, যেখানে সমাজপতিদের সহস্র শৃঙ্খলে আবদ্ধ নারীসমাজ চূড়ান্ত অমর্যাদা ও উপেক্ষার শিকার, যেখানে সাধারণ মানুষ এবং নারীসমাজ শিক্ষার সুবিধা এবং অধিকার হইতে সম্পূর্ণ বঞ্চিত। দেবতার বংশধর, ঋষির বংশধরগণের এ কী অধঃপতন! অন্নপূর্ণার দেশে অন্নের জন্য এত হাহাকার! গার্গী, মৈত্রেয়ীর দেশের নারীর এ কী অধোগতি! বেদান্তের পীঠভূমিতে ভোগাধিকারের এ কী বিরাট তারতম্য! বুদ্ধ, রামানুজের দেশের মানুষের মধ্যে কেন এই ঘৃণিত কূপমণ্ডূকতা! যে-দেশে একদিন বৈদিক ঋষিগণ, কৃষ্ণ, বুদ্ধ প্রমুখ ধর্মাচার্যগণ ধর্মের মহৎ উদার রূপকে প্রচার করিয়াছিলেন, সেদেশে ধর্ম কেবল প্রাণহীন আচার-অনুষ্ঠানের সমষ্টিমাত্র। অর্থহীন কুসংস্কার এবং প্রেমহীন বিধিনিষেধের বেড়াজালে নিবদ্ধ ধর্মের মর্ম। জাতির মেরুদণ্ড, সংস্কৃতির প্রাণসম্পদ ধর্ম তথাকথিত শিক্ষিত মহলে নিত্য নিন্দিত ও কঠোর সমালোচনার বিষয়। সত্যই গভীর সমস্যা!

এই পতন হইতে উদ্ধারের কি কোন পথ নাই, মাতৃভূমির পুনর্জাগরণের কি কোন উপায় নাই?

বোধিদ্রুমতলে ধ্যানাসনে আসীন বুদ্ধ যেমন একদা মানুষের দুঃখে অশ্রুপাত করিয়াছিলেন, কন্যাকুমারীর শিলাখণ্ডে ধ্যানস্থ বিবেকানন্দের

হৃদয়ও তাঁহার মাতৃভূমির দুর্দশায় দ্রবীভূত হইল। তাঁহার অগণিত অসহায় ও নিপীড়িত দেশবাসীর বেদনায়—তাঁহার স্বদেশের সাধারণ মানুষের ও নারীজাতির অমর্যাদা ও উপেক্ষায় তাঁহার হৃদয় কাঁদিয়া উঠিল। তিনি ভাবিতে লাগিলেন: সন্ন্যাসীর কি কোন সামাজিক ও জাতীয় দায়বদ্ধতা নাই? সন্ন্যাসীরা যে সমাজ-সংসার হইতে বিদায় লইয়া নিভৃতে নির্জনে ঈশ্বরের সাধনায় নিরত হন, আত্মমুক্তির তপস্যায় আত্মনিয়োগ করেন, তাঁহাদের ভরণ-পোষণ তো করে সমাজ, দেশ। সমাজ এবং দেশ কাহাদের লইয়া? সমাজ ও দেশের প্রধান অংশ তো ঐ উপেক্ষিত ও অনাদৃত গণমানুষ এবং নারীসমাজ। তাহাদেরই অন্নে জীবনধারণ করিয়া তাহাদের কথা না ভাবিলে, তাহাদের জীবনকে উন্নত করিতে সাহায্য না করিলে তাহা কি চূড়ান্ত অকৃতজ্ঞতার পরিচায়ক নহে?

গভীর মনোবেদনায় ও ক্ষোভে জর্জরিত হইল তাঁহার হৃদয়। পরিক্রমার অভিজ্ঞতা এবং ধ্যানের উপলব্ধি তাঁহার সম্মুখে ভারতের উত্তরণের পথ উন্মোচিত করিয়া দিল। তাঁহার সেই 'আবিষ্কার'-এর কথা, তাঁহার বেদনার কথা কন্যাকুমারী হইতে মাদ্রাজে আসিয়া তথাকার শিক্ষিত সমাজের নিকট তিনি প্রকাশ করিয়াছিলেন। এই শিক্ষিত সমাজের উল্লেখযোগ্য অংশ অচিরেই তাঁহার প্রবল অনুরাগী ও অনুগামীরূপে আত্মপ্রকাশ করিলেন। তাঁহারা লক্ষ্য করিয়াছিলেন, সংসারত্যাগী এই সন্ন্যাসীর চেতনাকে সর্বতোভাবে আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছে তাঁহার স্বদেশ ও স্বদেশের দীন-দুঃখী নারী-পুরুষ। তাঁহারা অবাক হইয়া দেখিয়াছিলেন, স্বদেশই তাঁহার একমাত্র ভালবাসার বস্তু, স্বদেশের গৌরবে তাঁহার একমাত্র গৌরববোধ এবং স্বদেশের বর্তমান পতন তাঁহার একমাত্র বিষাদের কারণ। 'স্বদেশের পতন' তাঁহার নিকট কেন্দ্রীভূত হইয়াছিল প্রধানতঃ দুটি ক্ষেত্রে। পরবর্তী সময়ে স্বামীজী সেবিষয়ে বারবার বলিবেন, সবিস্তারে বলিবেন। কিন্তু কন্যাকুমারী-প্রত্যাগত স্বামী বিবেকানন্দ যে তাঁহার সদ্য ধ্যানলব্ধ সংকল্প ও সিদ্ধান্তকেই পরবর্তী কালে প্রচার ও প্রকাশ করিয়াছিলেন, সে-সংবাদ আমাদের অনেকেরই জানা নাই। মাদ্রাজের 'ট্রিপ্লিকেন লিটার্যারি সোসাইটি'তে স্বামীজী ১৮৯৩-এর জানুয়ারির তৃতীয় সপ্তাহে যে-ভাষণ দিয়াছিলেন সেখানেই তিনি তাঁহার উপলব্ধিকে প্রকাশ করিয়াছিলেন। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য যে, 'ট্রিপ্লিকেন লিটার্যারি সোসাইটি' ছিল তৎকালীন মাদ্রাজের প্রগতিশীল সাংস্কৃতিক চিন্তা ও কার্যাবলীর কেন্দ্রপীঠ। 'ইন্ডিয়ান সোস্যাল রিফর্মার' পত্রিকার সম্পাদক কামাক্ষী নটরাজন সেই সভায় উপস্থিত ছিলেন। তিনি পরবর্তী কালে লিখিয়াছেন: "ভারতীয় সমস্যাকে স্বামীজী [ঐ সভায়] দুটি শব্দে ধরিয়া দিয়াছিলেন—'নারী ও জনগণ'। ভারতের পতনের একেবারে মূল কারণ—নারী ও জনসাধারণের মঙ্গলে অবহেলা। এবং উভয় সমস্যা সমাধানের চাবিকাঠি—শিক্ষা।" (বিবেকানন্দ ও সমকালীন ভারতবর্ষ—শংকরীপ্রসাদ বসু, ১ম খণ্ড, ২য় সংস্করণ, ১৯৭৭, পৃ: ১০৭)

মাদ্রাজের মানুষেরা, বিশেষতঃ মাদ্রাজের যুবকবৃন্দই কুমারিকা-শিলায় ধ্যানসিদ্ধ যুবক সন্ন্যাসীকে প্রথম দর্শন করিবার সৌভাগ্য লাভ করিয়াছিল, সৌভাগ্য লাভ করিয়াছিল ধ্যানোত্থিত মহাযোগীর হৃদয়ের অগ্নিময় বেদনাকে অনুভব করিবার, সৌভাগ্য লাভ করিয়াছিল ভারতের পুনর্জাগরণ বিষয়ে তাঁহার পরিকল্পনা সম্পর্কে অবহিত হইবার। এই যুবকবৃন্দের মধ্যমণি ছিলেন আলাসিঙ্গা পেরুমল। কন্যাকুমারী-প্রত্যাগত বিবেকানন্দ ভারতের পুনর্জাগরণ বিষয়ে আলাসিঙ্গা প্রমুখকে কি বলিয়াছিলেন তাহার কোন লিখিত বিবরণ বিশেষ না পাওয়া যাইলেও আমেরিকা হইতে তিনি যেসব চিঠি আলাসিঙ্গা, জুনাগড়ের দেওয়ান, মহীশূরের মহারাজা, স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ, স্বামী ব্রহ্মানন্দ, হরিপদ মিত্র প্রমুখকে লিখিয়াছিলেন তাহাতে স্পষ্টই বুঝা যায় কুমারিকা-শিলায় ভারতের পুনর্জাগরণ সম্পর্কে স্বামীজীর উপলব্ধির রূপ। ভারত হইতে শিকাগোর উদ্দেশে যাত্রাপথে ইয়োকোহামা হইতে লেখা স্বামীজীর একমাত্র পত্রটি প্রেরিত হইয়াছিল মাদ্রাজের 'যুবক-বন্ধু'দের কাছে—আলাসিঙ্গার ঠিকানায়। আবেগতপ্ত ভাষায় স্বামীজী ঐ চিঠিতে মাদ্রাজের যুবকবৃন্দকে দেশের পুনর্জাগরণের জন্য জীবন উৎসর্গ করিতে আহ্বান জানাইয়াছিলেন: "তোমরা কি (দেশের) মানুষকে ভালবাস? তোমরা কি দেশকে ভালবাস? তাহলে এস··· পিছনে চেও না—অতি প্রিয় আত্মীয়-স্বজন কাঁদুক; পিছনে চেও না, সামনে এগিয়ে যাও।

"ভারতমাতা অন্ততঃ সহস্র যুবক বলি চান। মনে রেখ—মানুষ চাই, পশু নয়।··· এখন জিজ্ঞাসা করি,··· মাদ্রাজ এমন কতকগুলি নিঃস্বার্থ যুবক দিতে কি প্রস্তুত—যারা দরিদ্রের প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন হবে, তাদের ক্ষুধার্তমুখে

অন্নদান করবে, সর্বসাধারণের মধ্যে শিক্ষাবিস্তার করবে, আর তোমাদের পূর্বপুরুষগণের অত্যাচারে যারা পশুপদবীতে উপনীত হয়েছে, তাদের মানুষ করবার জন্য আমরণ চেষ্টা করবে ?" (বাণী ও রচনা, ৬ষ্ঠ খণ্ড, ১ম সং, ১৩৬৯, পৃঃ ৩৫৯)

আমেরিকা হইতে ভারতে প্রেরিত স্বামীজীর প্রথম চিঠিটির প্রাপকও আলাসিঙ্গা। সেই চিঠিতে (ব্রিজি মেডোজ, মেটকাফ, মাসাচুসেটস—২০ আগস্ট ১৮৯৩) স্বামীজী আগ্নেয় ভাষায় আলাসিঙ্গাকে এবং তাঁহার মাধ্যমে মাদ্রাজের যুবকবৃন্দকে অনুপ্রাণিত করিয়া চলিলেন যাহাতে তাঁহারা তাঁহার নির্দেশিত লক্ষ্য হইতে কখনও সরিয়া না আসেন। জনসমষ্টির বৃহত্তম অংশ দরিদ্র সাধারণ মানুষ ও উপেক্ষিত নারীজাতির উত্তোলন ভিন্ন যে দেশের জাগরণ ও অগ্রগতি সম্ভব নহে, সেকথা দেশের যুবসম্প্রদায়কেই বুঝাইতে হইবে। কারণ, দেশের অধঃপতনের গতিরোধ করিয়া উহাকে অন্য খাতে প্রবাহিত করিয়া দিতে একমাত্র তাহারাই সমর্থ—স্বামীজী বিশ্বাস করিতেন। পরিক্রমাকালে স্বচক্ষে দেশের জনগণ ও নারীজাতির অবস্থা দেখিয়া তিনি তাঁহার "হৃদয়ের রক্তময় অশ্রু" বিসর্জন করিয়াছেন। হৃদয়ে বেদনার "এই ভাব লইয়া ও মাথায় এই চিন্তা লইয়া" অস্থির হইয়া দেশের অনেক ধনী ও বড়লোকের দ্বারে দ্বারে তিনি ঘুরিয়াছেন তাহাদের মধ্যে তাঁহার বেদনাকে সঞ্চারিত করিয়া দিতে, তাহাদের দৃষ্টিকে দেশের ঐ গুরুতর জাতীয় সমস্যার প্রতি আকর্ষণ করিতে। কিন্তু ঐ প্রচেষ্টায় বিশেষ সাফল্য তিনি লাভ করেন নাই। গভীর বেদনার সহিত তিনি লক্ষ্য করিয়াছিলেন যে, দেশের ধনী ও অভিজাত সমাজ দেশের সাধারণ মানুষ ও নারীজাতির দুর্গতি সম্পর্কে সম্পূর্ণ উদাসীন, তাহারা তাহাদের বিলাসের স্রোতে, ভোগের সমুদ্রে বরং আরও বেশি করিয়া নিমগ্ন হইতেছেন এবং হইতেছেন ঐ দরিদ্র জনসাধারণ ও "ভগবতীর প্রতিমারূপা" নারীর উপর অধিকতর অত্যাচার ও অমর্যাদার মাত্রা বৃদ্ধি করিয়াই।

তাহা হইলে কি কোন উপায় নাই? কুমারিকা-শিলায় ধ্যানের পর তিনি আলো দেখিতে পাইলেন। তিনি বুঝিলেন, দুই-চারিজন ব্যতিক্রম ভিন্ন দেশের আত্মসন্তুষ্ট, স্বার্থপর ধনী ও অভিজাত সম্প্রদায়ের নিকট হইতে কিছু আশা করা অরণ্যে রোদন মাত্র। কন্যাকুমারী হইতে মাদ্রাজে ফিরিয়া তিনি তাই তাঁহার দৃষ্টি ফিরাইয়াছিলেন দেশের শিক্ষিত যুবসম্প্রদায়ের দিকে। তিনি স্থির করিলেন, যুবসম্প্রদায়কে দেশের সমস্যার তীব্রতা সম্পর্কে সচেতন করিতে হইবে, তাহাদের মধ্যে দেশের নিপীড়িত নরনারীর প্রতি অগ্নিময় সহানুভূতি জাগ্রত করিতে হইবে।

দেশের শিক্ষিত যুবসম্প্রদায়ের মধ্যে প্রেরণা হয়তো সঞ্চারিত করা সম্ভব হইবে, কিন্তু বাস্তববাদী সন্ন্যাসী জানিতেন—এই বিরাট কাজ সম্পন্ন করিবার পথে প্রধান প্রতিবন্ধক হইবে অর্থের সমস্যা। আবার, শিক্ষিত যুবসম্প্রদায়ের বৃহৎ অংশই দরিদ্র। তাহা হইলে প্রয়োজনীয় অর্থের সংস্থান কিভাবে হইবে? ধ্যানোত্থিত সন্ন্যাসী তাকাইলেন সমুদ্রের দিকে। তাঁহার মন বলিল, সমুদ্রপারে সমৃদ্ধ পাশ্চাত্য ভূখণ্ড হইতে অর্থ পাওয়া যাইবে, সহানুভূতি পাওয়া যাইবে, পাশ্চাত্য বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির কৌশল আয়ত্ত করিতে পারিলে ভারতবর্ষে শিল্প-বিস্তারের সম্ভাবনা ঘটিবে, সেই সঙ্গে কৃষিরও আধুনিকীকরণ সম্ভব হইবে। উহার ফলেই দেশের দারিদ্র্যমুক্তি ঘটিবে। তিনি সংকল্প গ্রহণ করিলেন, পাশ্চাত্যে যাইবেন। আমেরিকার আসন্ন ধর্মমহাসভা যেন তাঁহার কাছে মনে হইল দৈবের বিধান। তিনি উহার সুযোগ গ্রহণ করিবেন স্থির করিলেন।

কিন্তু ধ্যানোত্থিত সন্ন্যাসীর এই সংকল্প, এই ভাবনা তো সন্ন্যাসের সনাতন রীতি ও প্রথার বিরোধী। প্রথমতঃ, আত্মমুক্তিকামী সন্ন্যাসীর তো সমাজ-সংসারের ভাবনা থাকার কথা নহে। মানুষের প্রাত্যহিক সমস্যা তো তাঁহার নিকট 'ঐহিক' ব্যাপার, মানুষের রুজি ও রুটির সমস্যা তো তাঁহার নিকট একান্তভাবে 'অনাধ্যাত্মিক' বিষয়। সুতরাং দরিদ্রের উন্নতি ও দারিদ্র্যমুক্তি কিভাবে তাঁহার কর্মসূচীর অন্তর্ভুক্ত হইতে পারে? আর, অর্থের সংস্রব তো সন্ন্যাসীর পক্ষে নিন্দনীয়। তাহা হইলে অর্থসংগ্রহের পরিকল্পনা কিভাবে তিনি করিতে পারেন? তাছাড়া, সন্ন্যাসীর তো কোন দেশ নাই। সুতরাং দেশবাসীর উন্নতির প্রশ্ন কিভাবে সন্ন্যাসীর মনে আসিতে পারে?

দ্বিতীয়তঃ, নারীর উন্নতি লইয়া সন্ন্যাসী কিভাবে ভাবিতে পারেন? নারী তো তাঁহার সাধনার অন্তরায়। নারীকে বর্জন করাই তো তাঁহার সাধনার প্রথম শর্ত।

সন্ন্যাসের দীর্ঘ ঐতিহ্যে ভ্রান্তিবশতঃ সন্ন্যাস এবং সমাজ দুইটি ভিন্ন মেরু হিসাবে সুনির্দিষ্ট হওয়ায় ঐ ধারণা প্রচলিত হইয়াছিল। মানুষের দুঃখ সন্ন্যাসীকে স্পর্শ করিত না, নারীর অসম্মান

তাঁহাকে অস্থির করিত না। কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণের শিক্ষায় নরেন্দ্রনাথের জ্ঞানচক্ষু উন্মীলিত হইয়াছিল। তিনি জানিয়াছিলেন, সাধারণ মানুষের দুঃখে, বেদনায় তাহাদের পাশে দাঁড়ানোই, তাহাদের "শিবজ্ঞানে" সেবাই সন্ন্যাসীর মহান কর্তব্য; উহার গুরুত্ব আত্মজ্ঞান লাভ অপেক্ষা অধিক। আত্ম-উপলব্ধির প্রয়াসের পূর্বে উদরপূর্তি আবশ্যক। সুতরাং অর্থের প্রয়োজন আছে। শ্রীরামকৃষ্ণ বলিতেন: "খালি পেটে ধর্ম হয় না"। আগে মানুষকে অন্নদান, স্বাস্থ্যদান, বিদ্যাদান অতঃপর ধর্মদান। আগে দৈহিক উন্নতি, তাহার পর মানসিক উন্নতি, পরিশেষে আত্মিক বা আধ্যাত্মিক উন্নতি।

নরেন্দ্রনাথ শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে আরও জানিয়াছিলেন, নারীমাত্রেই আদ্যাশক্তির প্রতিমা। নারীর অবমাননা, নারীর অমর্যাদা, নারীর উপেক্ষা সেই পরমা শক্তিরই অবমাননা, অমর্যাদা এবং উপেক্ষা। একটি জাতির সুস্থ সমৃদ্ধির জন্য প্রয়োজন পুরুষের সহিত নারীরও সমান উন্নতি। নারীকে পুরুষ শুধু কামনার দৃষ্টিতে দেখে বলিয়াই নারীর এত অমর্যাদা। শ্রীরামকৃষ্ণের শিক্ষায় নরেন্দ্রনাথ জানিয়াছিলেন, নারীকে মর্যাদার দৃষ্টিতে দেখিতে হইবে, শ্রদ্ধার দৃষ্টিতে দেখিতে হইবে, পূজার দৃষ্টিতে দেখিতে হইবে। জীব যদি শিব হয়, নারী তাহা হইলে ঈশ্বরী। মানুষের সেবাকে, নারীর উন্নতিকে এবং সেই সঙ্গে মানুষের দারিদ্র্য-দূরীকরণকে শ্রীরামকৃষ্ণ এইভাবে 'আধ্যাত্মিক' কর্ম হিসাবে প্রমাণ করিয়াছিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণের শিক্ষায় নরেন্দ্রনাথ জানিয়াছিলেন, যে-সন্ন্যাসী নিজের জননীকে ভালবাসে না, সে কিভাবে ত্রিভুবনকে স্বদেশ ভাবিতে পারে? সুতরাং সন্ন্যাসের প্রথম শর্তই হইল স্বদেশকে ভালবাসা, স্বদেশের মানুষকে ভালবাসা।

শ্রীরামকৃষ্ণের শিক্ষাই ভারত-পরিক্রমাকালে নরেন্দ্রনাথের মধ্যে পরিণতির দিকে অগ্রসর হইয়াছিল। তিনি "জ্ঞানচক্ষু"র স্তরকে অতিক্রম করিয়া' "প্রাণচক্ষু" লাভ করিয়াছিলেন। কিন্তু ইহার পরেও "প্রেমচক্ষু" লাভের অভিজ্ঞতা-লাভ অবশিষ্ট ছিল। সেই প্রেমচক্ষু লাভ তাঁহার হইল কুমারিকা-শিলায় ধ্যানকালে।

বস্তুতঃ, কুমারিকা-শিলায় ধ্যান বিবেকানন্দকে যে-উপলব্ধি দান করিয়াছিল তাহার নাম প্রেম। প্রেমই তাঁহার কন্যাকুমারীর ধ্যানসিদ্ধি। সেই ধ্যানসিদ্ধির পরে তিনি যেন ভগবান তথাগতের ন্যায় উচ্চারণ করিয়াছিলেন: "হে মাদ্রাজবাসী যুবকগণ, আমি তোমাদের নিকট এই গরিব অজ্ঞ অত্যাচার-পীড়িতদের জন্য এই সহানুভূতি, এই প্রাণপণ চেষ্টা —দায়স্বরূপ অর্পণ করিতেছি। যাও, এই মুহূর্তে সেই পার্থসারথির মন্দিরে—যিনি গোকুলের দীন-দরিদ্র গোপগণের সখা ছিলেন, যিনি গুহক চণ্ডালকে আলিঙ্গন করিতে সঙ্কুচিত হন নাই, যিনি বুদ্ধ-অবতারে রাজপুরুষগণের আমন্ত্রণ অগ্রাহ্য করিয়া এক বেশ্যার নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিয়া তাহাকে উদ্ধার করিয়াছিলেন; যাও··· তাঁহার নিকট এক মহাবলি প্রদান কর; বলি—জীবন-বলি।··· তোমরা সারা জীবন এই ত্রিশকোটি ভারতবাসীর উদ্ধারের ব্রত গ্রহণ কর, যাহারা দিন দিন ডুবিতেছে।" (ঐ, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃঃ ৩৬৭)

হিন্দুর ধর্ম-ইতিহাসের সুদীর্ঘ ও সুপ্রাচীন ধারায় এক অভিনব মাত্রা সংযোগের ব্যাকুল আকাঙ্ক্ষা এবং সুচিন্তিত পরিকল্পনাই তাঁহার আহ্বানে প্রতিফলিত। বলা বাহুল্য, স্বামীজীর ঐ আকাঙ্ক্ষা ও পরিকল্পনায় নিহিত ছিল ভারতের সুদীর্ঘ ধর্ম-ইতিহাসে গতি পরিবর্তনের সুস্পষ্ট লক্ষণ।

সন্ন্যাসী বিবেকানন্দ তাঁহার 'অত্যধিক গোঁড়া' গুরুভ্রাতা স্বামী রামকৃষ্ণানন্দকে শিকাগো হইতে ১৯ মার্চ ১৮৯৪ লিখিয়াছিলেন: "আরে দাদা, 'যত্র নার্যস্তু পূজ্যন্তে রমন্তে তত্র দেবতাঃ' (যেখানে স্ত্রীলোকেরা পূজিতা হন, সেখানে দেবতারাও আনন্দ করেন।)—বুড়ো মনু বলেছে।··· আর আমরা বলছি—'দূরমপসর রে চণ্ডাল' (ওরে চণ্ডাল, দূরে সরিয়া যা), 'কেনৈষা নির্মিতা নারী মোহিনী' ইত্যাদি (কে এই মোহিনী নারীকে নির্মাণ করিয়াছে?)। ওরে ভাই,··· যে-ধর্ম গরিবের দুঃখ দূর করে না, মানুষকে দেবতা করে না, তা কি আর ধর্ম?··· যে-দেশে কোটি কোটি মানুষ মহুয়ার ফুল খেয়ে থাকে, আর দশবিশ লাখ সাধু আর ক্রোর দশেক ব্রাহ্মণ ঐ গরিবদের রক্ত চুষে খায়, আর তাদের উন্নতির কোন চেষ্টা করে না,··· সে কি দেশ না নরক! সে ধর্ম, না পৈশাচ নৃত্য!··· দাদা, এইসব দেখে··· আমার ঘুম হয় না। একটা বুদ্ধি ঠাওড়ালুম কেপ কমোরিন-এ (কুমারিকা অন্তরীপে)··· বসে।" (ঐ, পৃঃ ৪১২)

সেই 'বুদ্ধি' সন্ন্যাসকে সমাজমুখী করার। সন্ন্যাসী দরিদ্রদের সেবায় যুক্ত করিবেন নিজেকে, নারীদের উন্নতিতে যুক্ত করিবেন নিজেকে। হিন্দু-ধর্ম ও সন্ন্যাসের সুদীর্ঘ ইতিহাসে ও ঐতিহ্যে সন্ন্যাসী বিবেকানন্দ বাস্তবিক এক সমাজবিপ্লবীর ভূমিকায় আবির্ভূত হইতে চলিলেন। □

# স্বামী তুরীয়ানন্দের অপ্রকাশিত পত্র

॥ ৪১ ॥

শ্রীরামকৃষ্ণো বিজয়তে

কনখল,

৩১. ৮. (১৯)১২

প্রিয় তেজনারায়ণ[১],

তোমার ২১ তারিখের পত্র যথাসময়ে হস্তগত হইয়াছে। সমাচার অবগত হইয়া প্রীত হইয়াছি। সমস্ত জীবনই হাঙ্গামাময়। হাঙ্গামা তো থাকিবেই, তবে এই ঝঞ্ঝাট মধ্যেই ধীরভাবে আপনার কার্য যিনি সারিয়া লইতে পারেন, তাঁহারই চাতুর্য। "যা লোকদ্বয়সাধনী তনুভৃতাং সা চাতুরি চাতুরি।"

সুরেশকে[২] ব্যাঙ্গালোরে পাঠাইয়াছ, বেশ হইয়াছে। শরীরও সারিবে, নূতন দেখাশুনাও হইবে। সুরেশ বোধহয় আগেকার চাইতে এখন হুঁশিয়ার হইয়াছে। সুরেশ ছেলে ভাল। হৃদয় শুদ্ধ থাকিলে আর সব আপনি আসিয়া যায়, কিছুর জন্য বড় আটকায় না। যত গোল মনের জন্য। মনে প্যাঁচ থাকিলে সুবিধা হইয়া উঠা বড়ই কঠিন। ঠাকুর যে বলিয়া গিয়াছেন, মন মুখ এক করিতে পারিলে সকল সাধনে সুবিধা হইয়া যায়। যত দিন যাইতেছে, ততই উহা পরিষ্কার বুঝিতে পারা যাইতেছে। মন মুখ এক করাই হইতেছে মস্ত সাধনা। ভিতর বাহির দুরকম হইলেই যত অশান্তি, অসুখ। আমার শরীর একরূপ চলিতেছে। এখন ভাঙ্গাদশা কিনা, সুতরাং ভাল থাকিবে কোথা হইতে? কিছু না কিছু উপদ্রব লাগিয়াই আছে। আজ দন্তের পীড়া, কাল চক্ষুর, পরশ্ব আর কিছুর—এইরূপ চলিতেছে। ওদিকে দৃষ্টি দিলেই গোল। গাত্রদাহ প্রভৃতি উপসর্গগুলি কখনও একটু কম, কখনও বেশি—এই আর কি; রোগ সারে নাই। এখনও রাত্রিতে দুবার-তিনবার জল খাই আর চার-পাঁচবার প্রস্রাব যাই। গরম পড়িলে গাত্রদাহ খুব [বাড়ে]; ঠাণ্ডায় একটু কম থাকে। সম্প্রতি দাঁতের জন্য অত্যন্ত কষ্ট পাইতেছি। না তুলাইলে আর উপায় নাই। চার-পাঁচটা তুলাইতে হইবে। ঔষধ যাহা কলিকাতার বিপিন ডাক্তার দিয়াছিলেন, খাইয়া যাইতেছি। তোমার পত্র পাইলে বড়ই আনন্দ হয়। মাস্টার মহাশয় আর আমায় লেখেন নাই। বোধহয় আমার উত্তর মনোমত হয় নাই। কিন্তু আমি কি করিব?… বৃহদারণ্যক শেষ হইয়া গিয়াছে। বেশ আনন্দ হইয়াছিল। আবার কিছু আরম্ভ করিলে হয়। দেখা যাউক, কিরূপ হয়। সিস্টার অভ্রাবমিয়ার [?] পত্র যাহা তুমি মহারাজকে[৩] পাঠাইয়াছ, পড়িলাম। বুঝিলাম, বড়ই কষ্ট পাইয়াছে, কিছু অভিমানের ভাবও আছে। স্বামীজীকে জানিত নিশ্চয়। একটু ভয় দেখানোর ভাবও আছে যেন। তবে সে কিছুই নয়। মোটের উপর বড়ই দুঃখিত ও অপমানিত বোধ করিয়াছে। আর নিউজিল্যান্ডের কার্যের জন্যও চিন্তিত হইয়াছে, পাছে কিছু বিঘ্ন ঘটে। [কারণ,] মিশন [উহার সহিত সম্পর্ক] অস্বীকার করিয়াছে।… যেসব প্রশ্ন করিয়াছে তাহার উত্তর অতি সহজ। দেখা হইলে তুমি তাহাকে বেশ ভাল করিয়া বুঝাইয়া দিও যে, মিশন তোমার উপর কোনরূপ দোষারোপও করে নাই অথবা কোন মন্দ ভাবও পোষণ করে না। কেবল পলিটিক্যাল কোন সংস্রব মিশনের নাই, ইহা গভর্নমেন্টকে জানাইবার জন্যই ওরূপ লিখিতে হইয়াছে। একটু যত্নটত্ন করিয়া খুশি করিয়া দিও। বাস্তবিক, আমাদের তো আর উহার উপর কোন রাগ নাই বরং সহানুভূতিই আছে। কারণ, ও কিছুই খারাপ তো করে নাই এপর্যন্ত। তবে উহার আমাদের মিশনের সহিত সম্বন্ধ স্বীকার অবশ্য ওরূপভাবে করা ভাল হয় নাই। কারণ আমরা তো উহার বিষয়ে সঠিক কিছুই জানি না, উহারই কাগজে যাহা বাহির হইয়াছিল সেইমাত্রই জানি। বিদেশী বেদান্তপ্রচার ভারতবর্ষীয় মিশন হইতে স্বতন্ত্র, ইত্যাদি ইত্যাদি এইরূপ বলিয়া তাহাকে বুঝাইবে। চটাইবার প্রয়োজন নাই। নাম-যশের ইচ্ছা আছে যাহা বলিয়াছ তাহা ঠিক, কিন্তু সে-ভাব না থাকা কি চারটিখানি কথা গা? তাছাড়া এইরূপে বেদান্তপ্রচার একটা রোজগার [বা]

১ স্বামী শর্বানন্দ   ২ স্বামী যতীশ্বরানন্দকে   ৩ স্বামী ব্রহ্মানন্দকে

জীবিকা তাহাতেও সন্দেহ নাই। কিন্তু তাহাতে ক্ষতি কি ? কত লোক কত কি করিতেছে, ওতো তত খারাপ কিছু করে নাই।

আমি একটি ঘটনা জানি, এইখানে বলিতেছি। উহা আমেরিকায় থাকাকালীন প্রত্যক্ষ করিয়াছিলাম। আমি যখন মন্টক্লেয়ারে মিসেস হুইলারের ভবনে ছিলাম, শুনিলাম একটি সেইদেশীয় স্ত্রীলোক—আধাবয়সী—প্রাণায়াম শিক্ষা দিতেছে। দুটি lesson দিত। একটি lesson-এ পাঁচ ডলার চার্জ। বলিত, সে স্বামীজীর ছাত্রী। মিসেস হুইলার আমাকে দেখাইবার জন্য তাহাকে বাটীতে নিমন্ত্রণ করিয়া আনায়। আমার সহিত তাহার অনেক কথাবার্তা হয়। লোক মন্দ নয়। পরে যখন আমি নিউ ইয়র্কে স্বামীজীকে অনেকদিন পরে দর্শন করি, অনেক কথার পর এই স্ত্রীলোকটির বিষয়েও তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করি। জিজ্ঞাসা করি যে, সে কি তাঁহার ছাত্রী ? আর এরূপ করিয়া টাকা লইয়া তাঁহার নাম করিয়া ব্যবসা করে, ইহা কি ভাল ? তাহাতে তিনি বলেন যে, "তুমি ঐ একজন মাত্র দেখিয়াছ ? অমন অনেক আছে। মন্দ কি, করিয়া খাইতেছে, ইহাতে কি খারাপ ? আমার ক্লাসে অথবা লেকচারে আসিয়া থাকিবে, আমি হয়তো চেহারা দেখিলে চিনিতে পারি, নাম জানি না। অমন ঢের আছে। ভালই তো, জীবিকা করিতেছে, মন্দ কি ?" এরূপ সদয়ভাবে ও সহানুভূতির সহিত [ তিনি ] বলিলেন যে, আমার ওরূপ সঙ্কীর্ণ প্রশ্ন করাই ভাল হয় নাই মনে করিয়া লজ্জাবোধ করিলাম। স্বামীজীর উদার ভাব অতুলনীয় এবং তাই তাঁহার অত মহত্ত্ব। কেদারবাবা ভাল আছে। তাহার পূর্ববৎই চলিতেছে। মহারাজ ভাল আছেন তথা অন্যান্য সকলেই। মহারাজ বলেন যে, মঠ অথবা ৺পুরী কোথায়ও তিনি এত সুস্থবোধ করেন নাই—শারীরিক এবং মানসিক উভয়ই। মহাপুরুষ[৪] তো মঠে আর যাইতেই চাহিতেছেন না। এখানে একটি জায়গা করিবার কল্পনা-জল্পনা হইতেছে।

তোমার প্রশ্ন দুইটিই অতিশয় কঠিন। প্রথম, শ্রাদ্ধতত্ত্ব—তুমি মহাভারতের শান্তিপর্ব পাঠ করিলে এবিষয়ে অনেক তত্ত্ব জানিতে পারিবে। মহারাজ যুধিষ্ঠির প্রশ্ন করিয়াছেন ও ভীষ্মদেব তাহার যথাযথ উত্তর দিয়াছেন। পিতৃলোক বলিয়া একটা স্বতন্ত্র লোক আছে। শ্রাদ্ধাদি তাঁহাদের উদ্দেশেই কৃত হয় এবং ঐহিক সম্বন্ধী, যাঁহাদের মরণান্তে শ্রাদ্ধের ব্যবস্থা শাস্ত্রে বিধিবদ্ধ আছে, তাঁহারা এই পিতৃলোকের প্রসন্নতালাভেই আপনাদিগকে প্রসন্নবোধ করেন—তাহা জ্ঞাতসারে অথবা অজ্ঞাতসারেই হউক। কারণ, মৃত্যুর পরই পিতৃলোকবাসীদের সহিত ইহাদের এক অতি সন্নিকট সূক্ষ্ম সম্বন্ধ বন্ধন হইয়া যায়। 'শ্রদ্ধা' হইতেই 'শ্রাদ্ধ' শব্দের উৎপত্তি। পরলোকে বিশ্বাসই 'শ্রদ্ধা'। ইহলোক হইতে অপসৃত হইয়াও তাঁহারা বাস্তবিক বর্তমান থাকেন। সুতরাং তাঁহাদের প্রীতির জন্য প্রযত্ন সন্তানাদির পক্ষে স্বাভাবিক। পূর্বোক্ত পিতৃলোকের অধিবাসী যাঁহারা, তাঁহারা 'নিত্য' এবং তাঁহাদের উদ্দেশে প্রদত্ত অন্নপানাদি তাঁহারা গ্রহণ করিয়া প্রীত হইলেই প্রত্যক্ষ মৃত পিতৃ-পিতামহদিগের জীবাত্মা কর্মানুসারে যে-লোকেই থাকুন, সূক্ষ্ম সম্বন্ধ হেতু প্রসন্ন হন। আমার বোধ হয় ইহাই শাস্ত্রমর্ম। স্মৃতির শ্রাদ্ধতত্ত্ব পাঠ করিলে জানিতে পারিবে। দ্বিতীয়, বেদের অপৌরুষেয়তা। 'অপৌরুষেয়তা'র অর্থ—কোন পুরুষকৃত নহে। কেহ করে নাই। অর্থাৎ নিত্য। এখন 'বেদ' শব্দের অর্থ বুঝিলেই হয়। 'বেদ' শব্দের অর্থ জ্ঞান। এখন জ্ঞান কি ? না "আগমোত্থং বিবেকোত্থং দ্বিধা জ্ঞানং প্রবক্ষ্যতে। / শব্দব্রহ্মাগমময়ং পরং ব্রহ্ম বিবেকজম্।" তা, যদি জ্ঞান অপৌরুষেয় ও নিত্য স্বীকার করিতে পার তো শব্দব্রহ্ম আগমময়জ্ঞানও নিত্য এবং অপৌরুষেয় স্বীকার করিতে হইবে। কারণ, উহা তো পুস্তক নহে—শব্দরাশি। সঙ্কেত সম্বন্ধ মাত্র। যেমন "নাম নামী অভেদ"। নাম অনেক হইতে পারে, নামী এক। সেইরূপ শব্দরাশি বেদ পরব্রহ্মের জ্ঞাপক ও নিত্যসম্বন্ধে সম্বন্ধ। পরে পরিষ্কার করিবার চেষ্টা করিব। আজ এই পর্যন্ত। আমার ভালবাসাদি জানিবে ও রুদ্র প্রভৃতিকে জানাইবে। ইতি—

শ্রীতুরীয়ানন্দ

৪ স্বামী শিবানন্দ

ভাষণ

# শ্রীরামকৃষ্ণের বিবেকানন্দ

## স্বামী ভূতেশানন্দ

অবতারেরা যখন যুগপ্রয়োজনে নররূপে অবতীর্ণ হন তখন তাঁদের উদ্দেশ্যসিদ্ধির জন্য সঙ্গে আসেন অন্তরঙ্গ পার্ষদগণ। অবতারবরিষ্ঠ শ্রীরামকৃষ্ণ-রূপে যখন ভগবানের আবির্ভাব হলো তখন তাঁর সঙ্গে এলেন তাঁর অন্তরঙ্গ পার্ষদবর্গ, যাঁদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ স্বামী বিবেকানন্দ। "ঈশ্বরের ইতি করা যায় না", শ্রীরামকৃষ্ণকেও সম্পূর্ণভাবে বোঝা কারও পক্ষে সম্ভব নয়। তবু তারই মধ্যে যিনি সবচেয়ে বেশি তাঁর ভাব ও বাণীকে ধরতে পেরেছিলেন, তিনি হলেন স্বামী বিবেকানন্দ। তিনিই আজকের বিশ্বব্যাপী শ্রীরামকৃষ্ণ-ভাবধারা প্রসারের পুরোধা। ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর ধ্যাননেত্রে যে আধ্যাত্মিক ভারতবর্ষের রূপ দর্শন করেছিলেন, তাকে বাস্তবায়িত করার ভার নিতে হয়েছিল স্বামী বিবেকানন্দকে, তখন অবশ্য তিনি তরুণ নরেন্দ্রনাথ। শ্রীরামকৃষ্ণের বাণী বা উপদেশের ভাব-ভাষা যে অতি সহজ-সরল তা আমরা প্রায়ই বলে থাকি, কিন্তু সেই সঙ্গে তা যে কত গভীর অর্থবহ ও ব্যঞ্জনাপূর্ণ তা স্বামীজীই প্রথম অনুভব করেন। তিনি বলতেন, ঠাকুরের এক-একটি কথা অবলম্বন করে ঝুড়ি ঝুড়ি দর্শনগ্রন্থ লেখা যেতে পারে। প্রকৃতপক্ষে সুপ্রাচীন যুগে ঋষিদের উপলব্ধিতে যে-সত্য প্রতিভাত হয়ে বিশাল বৈদিক সাহিত্যের সৃষ্টি, তা বোঝবার জন্য পরবর্তী যুগে যেমন তার ভাষ্য অপরিহার্য, তেমনি শ্রীরামকৃষ্ণের জীবন ও কথামৃতরূপ বেদ বোঝবার জন্যও প্রয়োজন তাঁর ভাষ্য এবং তাঁর প্রথম ও সর্বশ্রেষ্ঠ ভাষ্যকার নরেন্দ্রনাথ। নরেন্দ্রনাথ শ্রীরামকৃষ্ণের নির্বাচিত প্রতিনিধি মাত্র নন, তিনি তাঁকে স্বহস্তে গড়েছেন এবং অন্তিমকালে নিজের 'সর্বস্ব' দিয়ে 'ফকির' হয়েছেন। ধীরে ধীরে শ্রীরামকৃষ্ণ নরেন্দ্রনাথকে গড়ে তুলেছিলেন ও নিজের ভাব তাঁর মধ্যে সঞ্চারিত করেছিলেন এবং সেই ভাবধারা জগতে ছড়িয়ে দেবার জন্য তাঁর মধ্যে তিনি শক্তিসঞ্চারও করেছিলেন।

ভেবে আশ্চর্য হতে হয় যে, শ্রীরামকৃষ্ণ এবং বিবেকানন্দ শিক্ষা-সংস্কৃতি, সামাজিক মানমর্যাদা, পরিবার-পরিবেশ সবদিক থেকেই যেন দুই বিপরীত মেরুর অধিবাসী। কলকাতা থেকে বেশ দূরে নিভৃত পল্লীগ্রামে অতি নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ বংশে শ্রীরামকৃষ্ণের জন্ম। পাঠশালায় সামান্য লেখাপড়া, সরলমতি সমবয়সী ছেলেদের সঙ্গে খেলাধুলো, কথকতা বা পুরাণপাঠ শোনা, যাত্রা দেখা, গ্রাম্য ঠাকুর-দেবতার পূজা করা, কখনো তীর্থযাত্রী সাধুসন্তের সঙ্গ—এই-ই শ্রীরামকৃষ্ণের বাল্যজীবন। যৌবনে দক্ষিণেশ্বরে সাধনা, যে-সাধনার মূলে তীব্র অনুরাগ ও 'প্রাণ আটুপাটু করা' ব্যাকুলতা। কোন দার্শনিক গ্রন্থ পাঠ বা ভূরি ভূরি শাস্ত্রপাঠের কোন ভূমিকা সেখানে ছিল না। আর তাঁর পদপ্রান্তে মাথা বিকোলেন কে? নরেন্দ্রনাথ, যিনি সমাজের মান্যগণ্য বিশ্বনাথ দত্তের পুত্র, প্রচুর ঐশ্বর্যের মধ্যে প্রতিপালিত, উচ্চশিক্ষিত, সর্বপ্রকারের সংস্কৃতিসম্পন্ন। তাছাড়া উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতে পারদর্শী, স্বাস্থ্যবান, সুপুরুষ, দৃপ্ত, তেজস্বী, মেধাবী যুবক, যিনি নব্যবঙ্গের জ্বলন্ত প্রতিনিধি। তাঁর অন্তরে তীক্ষ্ণ জিজ্ঞাসা—ঈশ্বর কি আছেন? তাঁকে দেখা যায় কি? শখের কৌতূহলমাত্র নয়—এগুলি তাঁর অন্তরের গভীর থেকে জেগে ওঠা প্রশ্ন, যা নিয়ে তিনি বারবার ছুটে গিয়েছেন তৎকালীন ব্রাহ্মসমাজের নেতা দেবেন্দ্রনাথ, কেশবচন্দ্র ও আরও অনেকের কাছে। কিন্তু কোন সদুত্তর তিনি পাননি। শেষে উত্তর মিলল সনাতন ভারতের মূর্তপ্রতীক শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে। তাঁর কাছে তিনি শুধু নিশ্চিত উত্তরই পেলেন না, নিশ্চিত আশ্বাসও পেলেন যে, ভগবান আছেন। শুধু তাই নয়, তিনি বললেন: "তাঁকে দেখেছি যেমন তোকে দেখছি, আর তুই যদি চাস তো তোকেও দেখাতে পারি।" নরেন্দ্রনাথ বিস্মিত, অভিভূত। কিন্তু এ তো সবে শুরু। এরপর কত বিস্ময় বাকি। দক্ষিণেশ্বরে সেদিন নরেন্দ্রনাথের দ্বিতীয় দর্শন। নরেন্দ্রনাথকে উত্তরের বারান্দার এক কোণে ডেকে নিয়ে সাশ্রুনয়নে করজোড়ে শ্রীরামকৃষ্ণ বললেন: "আমি কতদিন ধরে

তোমার জন্য অপেক্ষা করে আছি—এত দেরি করে কি আসতে হয়? বিষয়-কথা শুনতে শুনতে আমার কান ঝালাপালা হয়ে গেল। আমি জানি প্রভু, তুমি সেই পুরাতন ঋষি, নররূপী নারায়ণ, জীবের দুর্গতি নিবারণ করার জন্য পুনরায় শরীরধারণ করেছ।" নরেন্দ্রনাথ নির্বাক, স্তম্ভিত। ভাবছেন, এ তো দেখছি একেবারে উন্মাদ! এই অদ্ভুত পাগল সেদিন আরও যেসব কথা বলেছিলেন, স্বামীজী কোনদিন কাউকে সেসব কথা বলেননি। শ্রীরামকৃষ্ণ সেদিন স্বহস্তে তাঁকে প্রসাদ খাইয়েছেন ও আবার আসার প্রতিশ্রুতি আদায় করেছেন। এর কিছুক্ষণ পর তাঁর মুখে ঈশ্বরীয় প্রসঙ্গ শুনে স্বামীজী একথা উপলব্ধি করলেন যে, এ-ব্যক্তি অর্ধোন্মাদ হলেও মহাপবিত্র, মহাত্যাগী ও নিখিল মানবের শ্রদ্ধা, পূজা ও সম্মান পাবার অধিকারী।

সেদিন এই উপলব্ধিটুকু নিয়েই নরেন্দ্রনাথ ফিরলেন। কিন্তু এক দুর্নিবার আকর্ষণ স্বল্প-কালের মধ্যেই আবার তাঁকে দক্ষিণেশ্বরে টেনে নিয়ে এল ও পর পর কয়েকটি অভিজ্ঞতার মাধ্যমে শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁকে কলের পুতুলের মতো তাঁর প্রবল ইচ্ছাশক্তিসম্পন্ন মনের দৃঢ় সংস্কার ও গঠনকে ভেঙে-চুরে কাদার তালের মতো করে আপন ভাবে ভাবিত করে নিলেন।

নরেন্দ্রনাথ এর পর যেদিন দক্ষিণেশ্বরে এলেন, সেদিন দেখলেন, ঠাকুর ছোট তক্তাপোশটির ওপর বসে আছেন। সাগ্রহে নরেন্দ্রনাথকে তিনি ডাকলেন, কিন্তু তারপরই কেমন ভাবাবিষ্ট হয়ে অস্পষ্ট স্বরে কিছু বলতে বলতে নিজের দক্ষিণ চরণ দিয়ে তাঁকে স্পর্শ করলেন। সঙ্গে সঙ্গে নরেন্দ্রের এক অপূর্ব উপলব্ধি হলো। তিনি দেখলেন, দেওয়ালগুলির সঙ্গে ঘরের যাবতীয় বস্তু ঘুরতে ঘুরতে কোথায় লীন হয়ে যাচ্ছে এবং সমগ্র বিশ্বের সঙ্গে তাঁর আমিত্ব যেন 'এক সর্বগ্রাসী মহাশূন্যে' একাকার হয়ে ছুটে চলেছে। দারুণ আতঙ্কে তিনি অভিভূত হয়ে পড়লেন। তখন সেই অদ্ভুত পাগল 'খলখল' করে হেসে "তবে এখন থাক, একেবারে কাজ নাই, কালে হবে"—এই বলে তাঁকে স্পর্শ করা মাত্র সেই অনুভূতি আর থাকল না, নরেন্দ্রনাথ প্রকৃতিস্থ হলেন। কিন্তু এই ঘটনা এক-দিনেই শেষ হলো না, কয়েকবারই এর পুনরাবৃত্তি ঘটল। সেইসব ঘটনার মধ্য দিয়ে নরেন্দ্রনাথ ধীরে ধীরে বহু মানসিক বাধা, সমস্ত সংস্কার অতিক্রম করে গুরুর চরণে নিজের অজ্ঞাতেই নিজের সত্তাকে বিলিয়ে দেবার জন্য প্রস্তুত হতে লাগলেন।

কয়েকদিন পরেই যদু মল্লিকের উদ্যানবাটীর বৈঠক-খানা ঘরে এইরকম আরেকটি ঘটনা ঘটল। দুজনে বসেছিলেন, সহসা ঠাকুর সমাধিস্থ হয়ে পড়লেন। নরেন্দ্রনাথ পূর্বদিনের ঘটনা মনে রেখে অত্যন্ত সতর্ক ছিলেন, কিন্তু ঠাকুর স্পর্শ করা মাত্র তাঁর বাহ্যসংজ্ঞা সম্পূর্ণ লুপ্ত হলো। সেদিন তাঁর কি উপলব্ধি হয়েছিল তা জানা যায় না। কিন্তু ঠাকুর তাঁকে প্রশ্ন করে করে তাঁর সম্বন্ধে যা জানার সব জেনে নিয়েছিলেন এবং নরেন্দ্রনাথ সম্বন্ধে তাঁর নিজস্ব উপলব্ধি যে যথার্থ তা বুঝতে পেরেছিলেন। তিনি সেদিন জেনেছিলেন যে, নরেন্দ্রনাথ হলেন ধ্যানসিদ্ধ মহাপুরুষ, লোককল্যাণের জন্য তাঁর আগমন। এর অনেকদিন পরে বলরাম মন্দিরে আরেকটি ঘটনা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর যে-কাজের ভার নরেন্দ্রনাথের ওপর অর্পণ করে যাবেন, এই ঘটনা তারই সূচনা। ঠাকুরের কাছ থেকে একটু দূরে নরেন্দ্রনাথ শুয়েছিলেন, সহসা চীৎকার করে উঠলেন: "লোকটা আমার মধ্যে ঢুকে পড়ছে।" শ্রীরামকৃষ্ণ হেসে উঠলেন, শায়িত নরেন্দ্রনাথের ওপর উপবিষ্ট হয়ে বললেন: "হ্যাঁ হ্যাঁ, আমি তোর ভিতরে সম্পূর্ণভাবে ঢুকে যাব।"

শ্রীরামকৃষ্ণ ও স্বামীজীর কর্মধারা আপাত-দৃষ্টিতে মনে হয় সম্পূর্ণ ভিন্ন। কোথায় দক্ষিণেশ্বরের দিনরাত ঈশ্বরীয় প্রসঙ্গ চলছে, জাগতিক ঘটনা কোলাহলের কোন স্পর্শই সেখানে নেই, আর কোথায় বিশ্ববিজয়ী নরেন্দ্রনাথ। বক্তৃতার পর বক্তৃতা দিয়ে নিজের জীবনের দ্বারা জগদ্বাসীকে আধ্যাত্মিক ভাবে উদ্বুদ্ধ করার জন্য অহোরাত্র পরিশ্রম করে চলেছেন। নিঃসম্বল হয়ে আসমুদ্রহিমাচল তিনি পরিভ্রমণ করছেন, বিশ্ব-পরিক্রমা করছেন শ্রীরামকৃষ্ণের ভাবধারা ভারতবর্ষ ও ভারতের বাইরে প্রচার করতে। মানুষের কল্যাণের জন্য অমানুষিক পরিশ্রম করে স্থাপন করেছেন মঠ-মিশন। পীড়িত দরিদ্র-নারায়ণের সেবার জন্য

অক্লান্তভাবে তিনি আমৃত্যু কাজ করে গিয়েছেন। অথচ শ্রীরামকৃষ্ণ নিজেই বলছেন ঃ "যো সো করে আগে ঈশ্বর দর্শন কর, ভগবানলাভই জীবনের উদ্দেশ্য। তাঁর সঙ্গে দেখা হলে কি ইস্কুল হাসপাতাল করতে চাইবে? জগতের উপকার করবার তুমি কে?"

তাহলে শ্রীরামকৃষ্ণের এই উপদেশ ও স্বামীজীর কার্যধারার সামঞ্জস্য কোথায়? এই প্রশ্ন সেদিন তাঁর কোন কোন গুরুভায়ের মধ্যেও উঠেছিল। এই প্রশ্নের সমাধান দিয়েই আজকের আলোচনা শেষ করব।

এই সমাধানের সূত্র ঃ নরেন্দ্রনাথের মধ্যে ঠাকুরের 'প্রবেশ' করার ঘটনা এবং পরে আরও কয়েকটি ঘটনা, যার মধ্যে একটি-দুটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। যেমন একদিন দক্ষিণেশ্বরে বৈষ্ণব-ধর্ম সম্বন্ধে আলোচনাকালে কৃষ্ণেরই জগৎসংসার একথা হৃদয়ে ধারণা করে 'সর্বজীবে দয়া' করবে—এই কথা বলতে বলতেই ঠাকুর সহসা সমাধিস্থ হয়ে পড়লেন। কতক্ষণ পরে অর্ধবাহ্যদশায় উপস্থিত হয়ে বলতে লাগলেন ঃ "জীবে দয়া! কীটানুকীট তুই জীবকে দয়া করবি? দয়া করবার তুই কে? না, না, জীবে দয়া নয়, শিবজ্ঞানে জীবের সেবা।"

ভাবাবিষ্ট ঠাকুরের এই কথার প্রকৃত মর্ম সেদিন উপস্থিত কেউই বুঝতে পারেননি। একমাত্র নরেন্দ্র-নাথই শুধু এর গূঢ় মর্ম বুঝতে পেরে বাইরে এসে বললেন ঃ "কি অদ্ভুত আলোকই আজ ঠাকুরের কথায় দেখলাম। শুষ্ক কঠোর ও নির্মম বলে প্রসিদ্ধ বেদান্ত-জ্ঞানকে ভক্তির সঙ্গে সম্মিলিত করে কি সরস ও মধুর আলোকই না তিনি আজ প্রদর্শন করলেন।" ঠাকুরের এই উক্তির ভিত্তিতেই পরবর্তী কালে স্বামী বিবেকানন্দ 'বনের বেদান্ত'কে ঘরে এনেছিলেন—প্রাত্যহিক জীবনে বেদান্তের উপযোগিতা প্রমাণ করেছিলেন। 'শিবজ্ঞানে জীব সেবা' দ্বারাই যে চিত্তশুদ্ধ হয়, জ্ঞানী নিজেকে ঈশ্বরের অংশ বলে অথবা স্বয়ং ঈশ্বর বলে উপলব্ধি করতে পারেন, আবার ভক্ত ঈশ্বরকে সকলের ভিতর দর্শন করে কৃতার্থ হতে পারেন, এই সত্যই শ্রীরামকৃষ্ণ নামাঙ্কিত সঙ্ঘের কার্যকলাপের মূল ভিত্তি।

আর একদিনের কথা। "তুই কি চাস?"—শ্রীরামকৃষ্ণের এই প্রশ্নের উত্তরে নরেন্দ্রনাথ বললেন ঃ আমি নিরন্তর সমাধিমগ্ন হয়ে থাকতে চাই। শ্রীরামকৃষ্ণ বললেন ঃ "সে কিরে? আমি ভাবতাম তুই যে একটা মহীরুহ হয়ে উঠবি।" শ্রীরামকৃষ্ণ চেয়ে-ছিলেন, ত্রিতাপে তাপিত বিপথগামী মানুষের আশ্রয়-স্বরূপ হবেন নরেন্দ্রনাথ। কারণ, তাঁর শিষ্য, তাঁর যন্ত্র, তাঁর আদর্শের ধারক ও বাহক যে নরেন্দ্রনাথ।

শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের ভাবধারা তাই ভিন্ন নয়, যেন টাকার এপিঠ আর ওপিঠ। একদিকে মুহুর্মুহু সমাধিস্থ, ঈশ্বরীয় ভাবে সর্বদা বিভোর শ্রীরামকৃষ্ণ এবং আরেকদিকে অসাধারণ কর্মযোগী, পৃথিবীর একপ্রান্ত থেকে অপরপ্রান্ত পর্যন্ত ঘূর্ণি-ঝড়ের মতো ছুটে যাওয়া, 'জগদ্ধিতায়' আত্মোৎসর্গ-কারী জ্বলন্ত বৈরাগ্যের প্রতিমূর্তি বিবেকানন্দ। উভয়ের জীবনকে নিয়েই কিন্তু সম্পূর্ণতা। উভয়েরই ভাবনা এক, চিন্তা এক, কেবল প্রকাশের তারতম্য। অধর্মের অভ্যুত্থান রোধ ও ধর্মসংস্থাপন করার জন্য একদা যিনি রামরূপে, কৃষ্ণরূপে আবির্ভূত হয়ে-ছিলেন, তিনিই এবার শ্রীরামকৃষ্ণরূপে আবির্ভূত হয়ে বিবেকানন্দকে ডেকে এনেছিলেন ঋষিলোক থেকে। 'আত্মনো মোক্ষার্থং জগদ্ধিতায় চ'—নিজের মুক্তির জন্য এবং জগতের কল্যাণের জন্য সন্ন্যাসীর জীবন। এই-ই রামকৃষ্ণ মঠ-মিশনের আদর্শের মূলকথা। উপনিষদের ঋষিরা বেদান্তের বাণী উচ্চারণ করেছিলেন। সেই মহতী বাণীর ব্যবহারিক দিকটি জগতে প্রচার করা ছিল বিবেকানন্দের লক্ষ্য। তাঁর সমগ্র জীবন তিনি সেই প্রচেষ্টাতেই উৎসর্গ করেছেন। এর দ্বারাই অধর্মের নিবারণ ও ধর্মের সংস্থাপন হবে, যে-উদ্দেশ্য নিয়ে যুগে যুগে ভগবান পৃথিবীতে আবির্ভূত হন।

প্রার্থনা করি, ভক্তি, বিশ্বাস ও বীর্যরূপী শ্রীমা সারদাদেবী, শ্রীরামকৃষ্ণ ও স্বামী বিবেকানন্দের জীবনাদর্শ, তাঁদের অমোঘ আশীর্বাদ ও অপার করুণা যেন আমাদের জীবনকে গড়ে তোলার সহায়ক হয়। আত্মতত্ত্বের উপলব্ধি ও জগতের কল্যাণসাধনের জন্য শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীমা ও স্বামী বিবেকানন্দ যে-পথ নির্দেশ করে গিয়েছেন তা থেকে আমরা যেন বিচ্যুত না হই, এই হোক আমাদের সংকল্প।* □

* এলাহাবাদ শ্রীরামকৃষ্ণ মঠে ২১. ১. ১৯৮৪ তারিখে প্রদত্ত ইংরেজী ভাষণের বঙ্গানুবাদ।—সম্পাদক, উদ্বোধন

# শিকাগো ধর্মমহাসভায় স্বামী বিবেকানন্দের ঐতিহাসিক ভাষণ ঃ সামাজিক তাৎপর্যসমূহ

সান্ত্বনা দাশগুপ্ত

[ পূর্বানুবৃত্তি ]

॥ ৩ ॥

### ধর্মমহাসভার উদ্দেশ্যসমূহ ও সেগুলির পরিপূরণ

ধর্মমহাসভার পরিকল্পনা বিভিন্ন সম্মেলনগুলির সংগঠক-সমিতির অধিকর্তা চার্লস ক্যারল বনির ( Charles Carroll Bonney )। তিনি ছিলেন সত্যই অত্যন্ত উদারমনা। তাঁর মানসদৃষ্টিতে উদ্ভাসিত হয়েছিল এই স্বপ্ন যে, যদি বিভিন্ন ধর্মমতগুলিকে একত্রিত করে মৈত্রীভাবনায় উদ্বুদ্ধ করা যায় এবং পরস্পরের মধ্যে আদানপ্রদানে প্রবৃত্ত করা যায় তাহলে পরস্পরের প্রতি সহানুভূতি জন্ম নেবে ও তাদের মধ্যে ঐক্যসূত্রও খুঁজে পাওয়া যাবে। আগামী দিনে ঈশ্বরের প্রেমে এবং মানুষের সেবায় নিযুক্ত যে মানব-ঐক্য উদ্ভূত হবে, ধর্মমহাসভার দ্বারা তাকে এগিয়ে আনা হবে ও তার সহায়তা করা হবে।[১১]

চার্লস বনির নির্দেশনায় ধর্মমহাসভার যে-সকল উদ্দেশ্য নিরূপিত হয়েছিল, তার মধ্যে নিম্নলিখিতগুলি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য ঃ

(১) বিশ্বের ঐতিহাসিক গুরুত্বপূর্ণ ও মুখ্য ধর্মমতগুলির প্রতিনিধিবর্গকে একটি সম্মেলনে সম্মিলিত করা ;

(২) মানুষকে দেখানো—কোন্ কোন্ গুরুত্বপূর্ণ সত্য বিভিন্ন ধর্ম প্রদর্শন করছে, আবার কোন্‌গুলি সব ধর্মেই বর্তমান ;

(৩) প্রত্যেকটি ধর্মের মূল সত্য ও শিক্ষা, যার মধ্য দিয়ে তার গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্যটি উদ্ঘাটিত, তা সেই ধর্মের শ্রেষ্ঠ প্রবক্তাদের দিয়ে উপস্থাপিত করা ;

(৪) অনুসন্ধান করে জানা—এক ধর্ম অন্য ধর্মগুলির ওপর কোন্ নতুন আলোকসম্পাত করতে পারে ;

(৫) বিভিন্ন ধর্মের উপযুক্ত প্রবক্তাদের মাধ্যমে জেনে নেওয়া—ধর্ম আধুনিক জীবনের সমস্যাগুলির ( যথা মাদকাসক্তি, শ্রমিক-সমস্যা, শিক্ষা, সম্পদ সৃষ্টি ও দারিদ্র্যের সমস্যা ) কোন্ সমাধান দিতে পারে ;

(৬) পৃথিবীর বিভিন্ন জাতির মধ্যে মৈত্রীবন্ধন ঘটিয়ে স্থায়ী আন্তর্জাতিক শান্তি আনার ব্যাপারে ধর্ম কিভাবে সহায়তা করতে পারে—সেটি জেনে নেওয়া।[১২]

লক্ষ্য করে দেখলে দেখা যাবে, সামাজিক দিক থেকে উপরোক্ত উদ্দেশ্যগুলি ছিল সুমহান ও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু ধর্মমহাসভা তার এই উদ্দেশ্যগুলি পরিপূরণে সফল হয়েছিল কি? প্রশ্নটি সামাজিক দিক থেকে এবং ঐতিহাসিক দিক থেকেও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ—এবিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। খ্রীস্টান ধর্মযাজকেরা, যাঁদের নেতৃত্বে ছিলেন ধর্মমহাসভার সংগঠক-সমিতির অধ্যক্ষ রেভারেন্ড জন হেনরী ব্যারোজ, অবশ্য অন্যরকম ভেবেছিলেন। তাঁরা ভেবেছিলেন ধর্মমহাসভায় নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হবে যে, খ্রীস্টধর্মই বিশ্বের শ্রেষ্ঠ ধর্ম এবং সকলেই সেই ধর্মের প্রতি বিশেষভাবে আকৃষ্ট হবে। কিন্তু ইতিহাস যেমন চিরদিন তার নিজস্ব পথে চলে, তাই চলল—তাদের সকল প্রয়াসকে ব্যর্থ করে দিয়ে। আমরা আমাদের পরবর্তী অনুসন্ধান ও বিশ্লেষণের ফলে দেখতে পাব যে, ধর্মমহাসভার নিরূপিত উদ্দেশ্য পূর্ণ হয়েছিল আধ্যাত্মিকতার জীবন্ত ও জ্বলন্ত বিগ্রহ স্বামী বিবেকানন্দের বিশ্বজনীন ধর্মের উপস্থাপনার দ্বারা, যা তিনি সকল ধর্মের

১১ Swami Vivekananda in the West : New Discoveries, Pt. I, p. 68

১২ Ibid., pp. 69-70

সারসত্যগুলির ওপর ভিত্তি করে গঠন করেছিলেন এবং ধর্মমহাসভার মাধ্যমে বিশ্বকে দান করেছিলেন। উল্লেখ্য যে, অসীম উদার বিশ্বজনীন ধর্মমতের একমাত্র প্রতিনিধি ও প্রবক্তা ছিলেন তিনি নিজে। এই বিশ্বজনীন ধর্মমতকে শুধু একটি মতবাদ হিসাবে তিনি উপস্থাপিত করেননি, জীবন্ত সত্য হিসাবে তাকে উপস্থাপিত করেছিলেন এবং নিজে তার জীবন্ত বিগ্রহরূপে বিরাজ করেছিলেন।

॥ ৪ ॥

## ধর্মমহাসভায় স্বামী বিবেকানন্দ ঃ মনস্তাত্ত্বিক পটভূমিকা

ধর্মমহাসভায় যখন বিবেকানন্দ তাঁর প্রথম ঐতিহাসিক ভাষণটি দেবার জন্য উঠে দাঁড়ালেন, তখন তাঁর সম্মুখে ছিল প্রতীচ্য মানস, "তারুণ্য-পূর্ণ, উচ্ছল, আত্মশক্তি ও আত্মবিশ্বাসে উদ্বেল, অনুসন্ধিৎসু এবং সজাগ"। আর তাঁর পশ্চাতে ছিল আধ্যাত্মিক বিকাশের এক প্রশান্ত "মহাসাগর", বহু প্রাচীনকালে যাত্রা শুরু করেছে এরকমই এক সুপ্রাচীন প্রাচ্য মহাজাতি। তাঁর মধ্যে এই উভয় "চিত্তপ্রবাহের" প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের দুই "বিশাল চিন্তাতরঙ্গিনী"র সঙ্গম রচিত হয়েছিল।[১৩]

এই সঙ্গম থেকেই তো নতুনতর ও সমৃদ্ধতর মানবসভ্যতা গড়ে উঠবে। এই দুই মানস-গঙ্গার মিলন তাই ইতিহাসের নির্দেশেই ঘটেছিল, ঘটেছিল স্বামী বিবেকানন্দের মধ্যে। ধর্মমহাসভায় তিনি যে-ঐতিহাসিক বাণীসকল উচ্চারণ করেছিলেন, সে-গুলির উৎস ও উপাদান সম্বন্ধে আলোকপাত করে নিবেদিতা বলেছেন ঃ "ভারতের ধর্মচেতনাই তাঁহার মধ্য দিয়া বাঙ্ময় হইয়া উঠিয়াছিল—ভারতের সমগ্র অতীতের দ্বারা সুনির্দিষ্ট তাঁহার দেশের সকল মানুষের বাণী।"[১৪]

সেই বাণীটি কি ছিল ? তা ছিল ঃ "স্ব-স্বরূপ প্রাপ্তি-বিষয়ে প্রত্যেক আত্মারই পূর্ণ স্বাধীনতা" আছে।[১৫] নিবেদিতার মতে, এটি ছিল "ভারতবর্ষের স্বাধিকার-প্রতিষ্ঠার প্রমাণপত্র"।[১৬] কিন্তু আমাদের মনে হয়, কেবল ভারতের নয়, বিশ্বের সকল জাতির সকল আত্মার স্বরূপ সম্বন্ধে অনুসন্ধানী প্রতিটি মানুষেরই "মুক্তিপত্র" এই বাণী। কারণ, এর সুগভীর সামাজিক তাৎপর্য হলো পূর্ণ বিবেকের স্বাধীনতা, যা ছাড়া মানুষের অগ্রগতি কখনো সম্ভব নয়।

নিবেদিতার মতে, এই বাণীর বৈশিষ্ট্য এর "সর্বাবগাহিত্ব"। তিনি বলেছেন ঃ এই সর্বাবগাহিত্ব বা প্রত্যেককে স্বাধীনতা-দানের কোন মহিমা থাকত না, যদি না সঙ্গে সঙ্গে "মধুরতম আশ্বাসপূর্ণ" এই পরম আহ্বানটি সেখানে ধ্বনিত না হতো ঃ 'শোন অমৃতের সন্তানগণ, দিব্যধামবাসিগণ, তোমরাও শোন। আমি সেই মহান পুরুষের দর্শনলাভ করেছি—যিনি সকল অন্ধকারের পারে, সকল অজ্ঞানের ঊর্ধ্বে বিরাজ করছেন। তাঁকে জেনে তোমরাও মৃত্যুকে অতিক্রম করবে।'[১৭]

যখন স্বামীজীর কণ্ঠে এই অগ্নিময় কথাগুলি উচ্চারিত হচ্ছিল, সেগুলি যে ধ্রুবসত্য—এ-অনুভব তখন অনেকেরই মনে উদিত হয়েছিল। সকলে অভিভূত হয়ে কথাগুলি শুনেছিলেন, কারণ এরকম কথা তারা আর কখনো শোনেননি। নবীনতম ঋষির কণ্ঠে সেদিন ধ্বনিত হয়েছিল ভারতের প্রাচীনতম অথচ চিরন্তন সত্যের বাণী।

নিবেদিতা তাঁর প্রজ্ঞাদৃষ্টিতে উদ্ঘাটিত করে দেখিয়েছেন, বিবেকানন্দ যে ধর্মমহাসভায় ভারতের মর্মবাণীর উদ্গাতা হিসাবে দাঁড়াতে পেরেছিলেন তার কারণ, সেই সুমহান সত্যসমূহ তিনি স্বয়ং উপলব্ধি করেছিলেন। সেই অনুভূতির গভীরতম প্রদেশে তিনি প্রবেশ করতে পেরেছিলেন। সামাজিক দিক থেকে এটি খুবই তাৎপর্যপূর্ণ যে, তিনি অনুভূতিলাভের পর আচার্য রামানুজের পদাঙ্ক অনুসরণ করে সে-সত্যগুলি তিনি ছড়িয়ে দিয়েছিলেন সকলের মধ্যে—অন্ত্যজ, অস্পৃশ্য এবং বিদেশীদের মধ্যেও। অর্থাৎ জ্ঞানার্জনের ক্ষেত্রে ভারতে যে বিশেষ সুবিধা এতকাল ধরে কেবলমাত্র উচ্চশ্রেণীর মানুষেরা ভোগ করে আসছিলেন, তাকে তিনি ভেঙে চুরমার করে দিয়েছিলেন।

কিন্তু বিবেকানন্দ যে কেবলমাত্র প্রাচীন ভারতের

১৩ দ্রঃ ভগিনী নিবেদিতার ভূমিকা, বাণী ও রচনা, ১ম খণ্ড, ১ম সং, ১৩৬৯

১৪ ঐ　　১৫ ঐ　　১৬ ঐ　　১৭ ঐ

জ্ঞানভাণ্ডার বিশ্বের সম্মুখে উন্মুক্ত করে দিয়েছিলেন তাই নয়, নিবেদিতা দেখিয়েছেন—সেই জ্ঞানভাণ্ডার তিনি নিজ অবদানে সমৃদ্ধতরও করেছেন। দ্বৈত, অদ্বৈত ও বিশিষ্টাদ্বৈত—এই তিনটি মতবাদ, যেগুলিকে এতকাল পরস্পরবিরোধী বলে মনে হয়েছে, গুরু শ্রীরামকৃষ্ণকে অনুসরণ করে তিনি দেখালেন—সেগুলি একই সত্যানুভূতির বিভিন্ন স্তরমাত্র; অবশ্য অদ্বৈত হলো সেই অনুভূতির চরম ও শেষ কথা।[১৮] তিনটি পরস্পর-বিরোধী মতবাদের মধ্যে এই সমন্বয় চিন্তার জগতে এক বিপ্লব আনল, যার সামাজিক তাৎপর্য অপরিসীম। নিবেদিতা সেই তাৎপর্যগুলির ওপর প্রভূত আলোকসম্পাত করেছেন স্বামীজীর 'বাণী ও রচনা'য় তাঁর বিশ্লেষণাত্মক অনন্য 'ভূমিকা'য়।

নিবেদিতা বলছেন, যদি এই-ই সত্য হয় যে, দ্বৈত, অদ্বৈত ও বিশিষ্টাদ্বৈত একই সত্যানুভূতির বিভিন্ন স্তরমাত্র, তাহলে 'বহু' ও 'এক' একই সত্য—এইটাই দাঁড়ায়। তাহলে যেকথা শ্রীরামকৃষ্ণ বলেছেন তাই-ই প্রতিষ্ঠিত হয় যে, "ঈশ্বর সাকার আবার নিরাকার—দুই-ই।"[১৯] এর প্রথম গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক তাৎপর্য হলো, এই সত্যটি মেনে নিলে সাকারবাদী ও নিরাকারবাদীদের মতবিরোধের চিরতরে অবসান হয়।

এর দ্বিতীয় সামাজিক তাৎপর্য হলো, যদি একই সত্য বহুরূপে সর্বত্র, সর্বকালে থেকে থাকে তাহলে আমাদের অতীত ও বর্তমান, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য এক ও অভিন্ন হয়ে ওঠে। এর ফলে নানা দেশের নানা বিচিত্র ইতিহাস এক অখণ্ড রূপ ধারণ করে একই মানবজাতির একই লক্ষ্যের উদ্দেশ্যে জয়যাত্রার একটিই ছেদহীন কাহিনী হয়ে দাঁড়ায়।

এই সত্যটিকে বিবেকানন্দ আশ্চর্যরূপে নিজের মধ্যে ধারণ করেছিলেন। তিনি প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য, অতীত ও বর্তমানের মিলন-ভূমিরূপে নিজে প্রতিভাত হয়েছিলেন। সেজন্যই তিনি বলতে পেরেছিলেন: "সমগ্র বিশ্বই আমার মাতৃভূমি, আর সত্যই আমার একমাত্র উপাস্য।" এপ্রসঙ্গে স্মরণ করা যেতে পারে, বিবেকানন্দের জন্মশতবর্ষ উপলক্ষে ১৯৬৩ খ্রীস্টাব্দে কলকাতায় অনুষ্ঠিত ধর্মমহাসভায় শ্রুত ক্রিস্টোফার ঈশারউডের একটি উক্তি: "তোমরা ভারতীয়রা যতখানি বিবেকানন্দকে ভারতীয় মনে কর, আমরা তাঁকে ততখানিই পাশ্চাত্যের মনে করি। কারণ, পাশ্চাত্যের যেগুলি মহৎ আদর্শ সেগুলির শ্রেষ্ঠ প্রতিফলন আমরা দেখেছি তাঁর মধ্যে। সেগুলি হলো স্বাধীনতা, গণতন্ত্র ও ব্যক্তির স্বকীয় পথে স্বাধীন বিকাশের আদর্শ।"

ধর্মমহাসভায় বিবেকানন্দের বাণীসমূহের অপর একটি সামাজিক তাৎপর্যও নিবেদিতা উদ্ঘাটিত করেছেন। সেটি হলো: "'বহু' এবং 'এক' যদি যথার্থই এক সত্তা হয়, তাহা হইলে শুধু সকল উপাসনা-পদ্ধতিই নয়, সমভাবে সকল কর্মপদ্ধতি—সকল প্রকার প্রচেষ্টা, সকল প্রকার সৃষ্টিকর্মই সত্যোপলব্ধির পন্থা। তাহা হইলে আধ্যাত্মিক ও লৌকিক—এই বিভেদ আর থাকিতে পারে না।"[২০] অর্থাৎ প্রতিটি 'কর্ম'ই তখন হয়ে ওঠে 'উপাসনা'। এর পরোক্ষ সামাজিক তাৎপর্য হলো এই যে, পূজা-উপাসনা সংক্রান্ত আচার-নিয়মের প্রবর্তক পুরোহিততন্ত্রের প্রাধান্যের অবসান।

ঐহিক ও আধ্যাত্মিকের মধ্যে পার্থক্য লুপ্ত হওয়ায় 'শ্রম' হয়ে দাঁড়ায় 'প্রার্থনা', 'ত্যাগ' হয়ে দাঁড়ায় 'জয়', 'জীবন' হয়ে দাঁড়ায় 'ধর্ম'।[২১] আজকালকার 'সেকুলার' তত্ত্ব প্রতিষ্ঠার মতবাদও এর ফলে অবান্তর হয়ে যাচ্ছে। সুতরাং সামাজিক দিক থেকে স্বামীজীর এই বাণীর মূল্য অপরিসীম।

এই দুঃসাহসিক জীবনদর্শন অনুসারে "কারখানা ও পাঠগৃহ, খামার ও ক্ষেত"—সবকিছুই "সাধুর কুঠিয়া ও মন্দিরদ্বারের" মতো "মানুষের সহিত ভগবানের মিলনের উপযুক্ত ক্ষেত্র" হয়ে দাঁড়াতে পারে।[২২]

উপরোক্ত 'বহু' ও 'এক' একই সত্যের প্রকাশ—এই বাণীর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক তাৎপর্য হলো এই যে, এটি সত্য হলে প্রত্যেক ব্যক্তির কর্মই পূত-পবিত্র, সুতরাং প্রত্যেকের সামাজিক মর্যাদা হবে এক, কারো চেয়ে কারো মর্যাদা কম বা বেশি হবে না। প্রত্যেকের অধিকারও হবে এক। তাহলে যারা প্রধানতঃ ধর্মচর্চা করেন, অর্থাৎ পুরোহিত ব্রাহ্মণেরা, তাদের বিশেষ অধিকারের দাবি আর

১৮ দ্রঃ ভগিনী নিবেদিতার ভূমিকা, বাণী ও রচনা ১৯ ঐ ২০ ঐ ২১ ঐ ২২ ঐ

থাকে না। সেজন্যই স্বামীজী বলেছেন : "প্রত্যেকেই তার স্ব-স্ব ক্ষেত্রে বড়।"

নিবেদিতা আরও দেখিয়েছেন, 'বহু' ও 'এক' যদি একই সত্যের প্রকাশ হয়, তাহলে "মানুষের সেবায় ও ভগবানের পূজায় কোন প্রভেদ নাই,... পৌরুষে ও বিশ্বাসে—যথার্থ সদাচারে ও আধ্যাত্মিকতায় কোন পার্থক্য নাই।" বস্তুতঃ, স্বামীজীর 'হিন্দুধর্ম' শীর্ষক ভাষণে এক বৈপ্লবিক নতুন নীতিতত্ত্বের ভিত্তি স্থাপিত হয়েছে।

কিন্তু মানবসমাজের ভবিষ্যতের দিক থেকে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কথা হলো, বিবেকানন্দের এই ঘোষণা : "কলা, বিজ্ঞান ও ধর্ম—একই সত্যের বিভিন্ন প্রকাশ।" যেহেতু ভবিষ্যৎ সমাজের ভিত্তিতে ধর্ম, বিজ্ঞান এবং কলা—সবেরই প্রয়োজন সেজন্য তাদের সাধারণ ভিত্তি খুঁজে পাওয়া খুবই দরকার। এই সাধারণ ভিত্তিভূমির সন্ধান দিয়েছেন স্বামী বিবেকানন্দ তাঁর শিকাগো ভাষণে।

এপ্রসঙ্গে নিবেদিতা দারুণ দক্ষতার সঙ্গে দেখিয়েছেন যে, ভারতের সত্যদ্রষ্টা ঋষিদের যে-সকল অভিজ্ঞতার কথা শাস্ত্রগ্রন্থসমূহে লেখা আছে তা আকস্মিকভাবে লব্ধ নয়—সেগুলি বিচার-বিশ্লেষণের পর প্রাপ্ত সিদ্ধান্ত এবং অবশ্যই যুক্তিগত ভাবেই সংগঠিত।[২২]

বিজ্ঞানের দাবি—প্রত্যক্ষ প্রমাণ দিতে হবে। বিবেকানন্দও তাই চেয়েছিলেন—শাস্ত্রোক্ত বিষয়সমূহের প্রত্যক্ষ প্রমাণ। না হলে তাঁর যুক্তি ও বুদ্ধি কোনমতেই সন্তুষ্ট হচ্ছিল না এবং এই প্রমাণ তিনি প্রত্যক্ষ করেছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণের মধ্যে, সমাধি ছিল যাঁর নিত্য অভিজ্ঞতার বস্তু, জ্ঞানলাভের নিত্য মাধ্যম।[২৩] পরবর্তী কালে তাঁর নিজের আধ্যাত্মিক উপলব্ধিসমূহের মধ্যেও তিনি শাস্ত্রের প্রমাণ পেয়েছিলেন।

কিন্তু যখন তিনি শিকাগো ধর্মমহাসভার বক্তৃতামঞ্চে উঠে দাঁড়িয়েছিলেন, তখন তাঁর পশ্চাতে ছিল ভারত ও ভারতের অধিবাসীদের সম্বন্ধে তাঁর সুদীর্ঘ ভারত-ভ্রমণ থেকে প্রাপ্ত প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতাসমূহ। শ্রীরামকৃষ্ণের দেহত্যাগের পর তিনি ভারতবর্ষের এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্ত পরিভ্রমণ করেছেন, অনেক সময় কেবল পদব্রজে। হিমালয় থেকে কন্যাকুমারী, বঙ্গোপসাগরের তীর থেকে আরবসাগরের উপকূল পর্যন্ত বিস্তীর্ণ জনপদভূমির জনজীবনকে তিনি প্রত্যক্ষ করেছেন। তাদের দুঃখ, দারিদ্র্য, অনাহার, তাদের প্রতি অনুষ্ঠিত নিষ্ঠুর বঞ্চনা, নিপীড়ন—সকলই তিনি চাক্ষুষ দেখেছেন। বলা যায়, ঐ সময়ে তিনি "ভারতের মহা নিঃসীমতায় নিমজ্জিত" হয়েছিলেন।[২৪] এর ফলে তিনি জেনেছিলেন যে, শতসহস্র বৈচিত্র্যের মধ্যে ভারতে রয়েছে এক গভীর ঐক্য। বিবেকানন্দ বহু দেবতার মন্দির দেখেছিলেন, কিন্তু তাঁর কাছে সকল দেবতার সহস্র বাহু এক পরমদেবতারই বাহুর শৃংখল রচনা করেছিল। এই এক-কে তিনি প্রত্যক্ষ করেছিলেন সকল মানুষের মধ্যে—অন্ত্যজ-অস্পৃশ্য সকলের মধ্যেই। এরপর থেকে তাঁর কণ্ঠে কেবল এই মহান ঐক্যের কথাই শোনা যেত : "ভারতের প্রত্যেক নরনারীর ঐক্য (সেই সঙ্গে বিশ্বের ঐক্যও)... ভারতের শত জাতির এবং তাহাদের ভাষার, এবং বর্তমান ও ভবিষ্যৎ পুনর্গঠনের অন্তস্তল, এক ধর্মীয় কেন্দ্র হইতে উদ্ভূত শত সহস্র দেবতার ঐক্য। হিন্দুধর্মের সহস্র সম্প্রদায়ের ঐক্য। ধর্মীয় চিন্তায় মহাসমুদ্রের অতীত ও বর্তমান, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য, সকল স্রোতস্বতীর ঐক্য।"[২৫] 'ঐক্য' কথাটি একটি ঐন্দ্রজালিক মন্ত্রের মতো তারপর থেকে তাঁর কণ্ঠে ধ্বনিত হতো। ধর্মমহাসভাতেও তাঁর ঐ ঐন্দ্রজালিক মন্ত্রের উচ্চারণ সকলকে মুগ্ধ করেছিল।

পরিশেষে সমগ্র ভারতভূমি পরিক্রমা করে যখন তার শেষপ্রান্ত কন্যাকুমারীতে এসে তিনি উপনীত হলেন, তখন তিনি পরিণত হয়েছেন ভারতের ঐক্যমূর্তিতে, ভারতের জাগ্রত বিবেকে, ভারতের প্রাণপুরুষে এবং যখন তিনি ধর্মমহাসভায় উঠে দাঁড়ালেন তখন সমগ্র বিশ্ব তাঁকে সেইরূপেই দেখল—দেখল ভারতের ঐক্যমূর্তিরূপে, সমগ্র মানবজাতির ঐক্যমূর্তিরূপে, ভারতের যুগযুগান্তের অধ্যাত্মসাধনার মূর্তবিগ্রহরূপে, নবজাগ্রত ভারতের বিবেকরূপে। [ক্রমশঃ]

২২ দ্রঃ বাণী ও রচনা, ১ম খণ্ড, ভূমিকা
২৩ ঐ
২৪ বিবেকানন্দের জীবন—রোমাঁ রোলাঁ, ১ম প্রকাশ, ১৩৬০, পৃঃ ১০
২৫ ঐ, পৃঃ ২৬০

# অদৃশ্য বন্ধন
## মিনু সেনগুপ্ত

গেয়ে যা, গেয়ে যা, গেয়ে যা, ও মন!
মা'র নাম তুই গেয়ে যা,
শয়নে, স্বপনে, ঘুমে, জাগরণে,
সদা 'মা, মা' নাম জপে যা।
জুড়াতে চাস যদি তাপিত পরাণ,
প্রতিক্ষণে কর মা'র নাম-গান,
সংসার-সমুদ্রে জীবনতরণী
মা'র নামে তুই বেয়ে যা।
সংসার-সমুদ্রে আসে যদি ঝড়,
মা'র নাম-গানে ফেলরে নোঙর,
নাহি নাহি মন, নাহি কোন ডর
বিরাজিছে দ্যাখ হৃদে মা।
জেনে রাখ মা'র তুই যে সন্তান,
লভেছিস পদে চিরতরে স্থান,
মা-সন্তানের অদৃশ্য বন্ধন
কভু ঘুচিবার না।

# কসাই-কাঁসাই
## ব্রহ্মচারী প্রত্যক্‌চৈতন্য

খরাপ্রবণ পুরুলিয়া জেলায় গত ২৬ সেপ্টেম্বর '৯২ কাঁসাই নদীতে হঠাৎ বন্যায় বহু সম্পত্তিনাশ ও জীবনহানি হয়েছিল। এই বিধ্বংসী বন্যায় প্রাণ হারিয়েছিল পুরুলিয়া রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যাপীঠের দশম শ্রেণীর দুটি ছাত্র—অংকুশ ও শ্যামল। কবিতাটি তাদের স্মৃতিতে নিবেদিত।

কাঁসাই নদী কসাই হয়ে যায়
রাত বে-রাতে তুফান তুলে
ভালবাসার স্পর্শ ভুলে
গভীর রাতে—
ঘুমের মধ্যে, স্বপন ভেঙে যায়!

কাঁসাই নদী, কসাই নদী সর্বনাশী
পেটের খিদে এতই রে তোর!
কোথায় পেলি রাক্ষুসী জোর?
জীবন খেলি—
মুছে দিলি, মুখের হাসি!

কাঁসাই নদী কসাই নদীরে!
শুখা সময় জল না দিলি
বর্ষা শেষে বান ডাকালি,
কি স্বাদ পেলি—
পেটের ছেলের মাংস-হাড়েতে?

# তুমি বলেছিলে
## চণ্ডী সেনগুপ্ত

শ্রীরামকৃষ্ণের উপদেশ অবলম্বনে

হাজার বছর বন্ধ ঘরে প্রদীপ জ্বালো
এক নিমেষে আঁধার ঘুচে ফুটবে আলো।
হাজার জনম পাপের বোঝা এক লহমায়
অন্তর্হিত, পরমপিতার কৃপার ছোঁয়ায়॥

গান গেয়ে যায় উদাস বাউল সুধারসে
দুই হাতে দুই যন্ত্র বাজায় কী অক্লেশে!
দুটি হাতে কর্ম কর, হে সংসারী,
মুখে প্রভুর নামামৃত যাও ফুকারি'॥

তারা-দীপ জ্বলে রাতের আকাশ জুড়ে
পলকে মিলায় সূর্য উঠলে ভোরে।
জ্ঞানহীন আঁখি নাহি পেলে দরশন
ঈশ্বর তাই অমূলক বলে চেতনা-রহিত মন॥

# চিন্ময়রূপ

## রণেন্দ্রকুমার সরকার

চিন্ময়ীর সংসারে চৈতন্য যে আছে ভরে',
অচৈতন্য হয়ে সেথায় থাকবি কেন অবোধ ওরে।
পৃথ্বী যেমন ঘন বরষায়,
জরে' থাকে বারিধারায়,
তেমনিভাবে জগৎ দেখি চৈতন্যে আছে জরে',
চিন্ময়রূপ সকল আধার—ব্যাপ্ত বিশ্বচরাচরে ॥

কারে আমি করব পূজা, কারে বা দিব অঞ্জলি।
চিন্ময়রূপ দশদিকে—কারে দিব ফুলের ডালি।
শিব গড়ে পূজা আমার,
বন্ধ হলো তাই তো এবার,
আমি শুধু দেখি এখন শিবময় বিশ্বভুবন,
অন্তহীন চিৎসাগরে ভাসে আমার বিশ্বপাবন ॥

# রামকৃষ্ণ বলে

## স্বামী ভুতাত্মানন্দ

রামকৃষ্ণ বলে এগিয়ে চল ভাবনা কি ?
চলার পথে আঁধার রাতে পথ দেখাবেন স্বামীজী ॥
তাঁর নামের মহিমা—সব জানেন শ্রীশ্রীমা।
রামকৃষ্ণ-নামের ভজন শুনে হন তিনি সুখী ॥
রামকৃষ্ণ বলে এগিয়ে চল ভাবনা কি ?

সে যে বড়ই মধুর নাম, জীবের পুরায় মনস্কাম।
থাকিস না আর অন্ধ সেজে, বন্ধ করে জ্ঞান-আঁখি ॥
রামকৃষ্ণ বলে এগিয়ে চল ভাবনা কি ?

থাকতে সময় ডাক না তাঁকে, সময় কি আর বসে থাকে ?
হঠাৎ কখন ফুড়ুৎ করে উড়ে যাবে প্রাণ-পাখি ॥
রামকৃষ্ণ বলে এগিয়ে চল ভাবনা কি ?

# জীবনদেবতা

## বন্যা মজুমদার

খেলার সাথী যে ছিলে ওগো তুমি মোর
সারাপথ চলেছিনু তোমারি সাথেতে,
কত কথা কয়েছিনু তোমারে যে আমি
শুনিতে সেসব কথা হাত রাখি হাতে।

বিশাল দীঘির মাঝে সাঁতার দিতাম
ফুলবনে তুলিতাম মোরা দোঁহে ফুল,
দোলনায় দুলিতাম বসি যবে আমি
মোর পানে চাহি তুমি হাসিয়া আকুল।

তখন তুমি যে কে ভাবি নাই তাহা
সখারূপে ভাবি তোমা চলেছিনু সাথে—
কত হাসি, কত গান, মান-অভিমান,
কত স্নেহ, ভালবাসা দুটি হৃদয়েতে।

পথের প্রান্তে আসি আজ একি হেরি !—
সারা বিশ্ব মাগিতেছে তোমারি করুণা,
সাগর গাহিছে তব জয়গাথা শুধু,
তপন তারকা নত চরণে তোমারি ॥

# হর্ষবর্ধন

## পিনাকীরঞ্জন কর্মকার

প্রয়াগের পুণ্য ক্ষেত্রে হের আবির্ভূত
ভারতের ভাবধারা হয় ঘনীভূত ॥
ভোগ আসি করিয়াছে ত্যাগে আলিঙ্গন
অর্ধনারীশ্বর সম এ-মহামিলন ॥

দেখ সবে ভিক্ষুবেশে ভারতসম্রাট
সুবিশাল গৌরকান্তি মধুর বিরাট।
দুখীরে লইতে বুকে রচি তৃণাসন
স্থান দেন সর্বজীবে ত্যাজি রত্নাসন ॥

সুদূর ভারতে ব্যাপ্ত সংসার যাঁহার
বিলাসভোগের কোথা অবসর তাঁর!
পঞ্চবর্ষ রাজকোষে যা কিছু সঞ্চিত
মুক্ত হস্তে হে মহান! কর বিতরিত ॥

হৃদয়ের রাজা তুমি প্রেমিক সাজিয়া
ভারতেই রেখে গেছ প্রীতি জাগাইয়া ॥
তোমার ত্যাগের বাণী স্মরিছে জগৎ
দিয়েছ তুমি যে রাজন্—কী শিক্ষা মহৎ ॥

ত্যাগে ভোগ, ভোগে ত্যাগ—অপূর্ব সাধনা
ঘুচাতে জীবের ব্যথা মরমবেদনা ॥

# পঞ্চকেদার ভ্রমণ

## বাণী ভট্টাচার্য

[ পূর্বানুবৃত্তি ]

মহারাজ বলে চললেন : রুদ্রনাথের মুখমণ্ডল পাণ্ডবদের উপাখ্যানে বর্ণিত মহিষরূপী শিবের মুখাবয়ব। আবার অন্য মতে, শিবের তিনপ্রকার মুখমণ্ডল রয়েছে। একানন—রুদ্রনাথ, চতুরানন—পশুপতিনাথ এবং পঞ্চানন—কৈলাশপতিনাথ। কিংবদন্তী, পাণ্ডবগণের দ্বারা স্থাপিত হয়েছে পঞ্চকেদার। আদি শঙ্করাচার্য এর সংস্কার করেন। পথের দুর্গমতার জন্য যাত্রীসংখ্যা কম। অর্থাগমও কম। ফলে সংস্কারের অভাব। এক সাধু অনসূয়া মন্দির থেকে রুদ্রনাথ আসার পথ তৈরি করান ১৯৭৫ খ্রীস্টাব্দে। তারপর আর কোন সংস্কার হয়নি। খাবার, কাঠ প্রভৃতি সবই নিচে থেকে আনাতে হয়।

এখানে অষ্ট কুণ্ড রয়েছে। সূর্যকুণ্ড, নারদ-কুণ্ড, চন্দ্রকুণ্ড, তারাকুণ্ড, সরস্বতীকুণ্ড, মানসকুণ্ড, বৈতরণীকুণ্ড। অষ্টম কুণ্ডের নাম মহারাজ বললেন না। মানসকুণ্ডে নানা বর্ণের মাছ রয়েছে। সবসময় দেখা যায় না।

প্রেমগিরি মহারাজের গুরুর নাম তাখতগিরি। তিনিই এখানে বারোমাস থাকতেন। গত একবছর যাবৎ উনি কোথায় রয়েছেন তা কাউকে বলেননি। প্রেমগিরি মহারাজ এখন এখানে একাই রয়েছেন। সাধন-ভজন করেন। খুব আস্তে আস্তে কথা বলেন। শান্ত সমাহিত সরল মুখ।

রুদ্রনাথ, তুঙ্গনাথ ও কল্পনাথের পুজো কেন দক্ষিণ ভারতের রাওয়াল পুরোহিত দ্বারা হয় না তা জিজ্ঞেস করায় মহারাজ বললেন : "এই তিন কেদারের পথের দুর্গমতার জন্যে স্থানীয় পুরোহিত দ্বারা পুজোর ব্যবস্থা করা হয়েছে।" কথাপ্রসঙ্গে বললেন : "এখানে অনেক রকম ঔষধির গাছ আছে।" কয়েকটি শিকড় ও পাতা দেখালেন।

সকালে প্রায় আটটার সময় রুদ্রনাথকে প্রণাম জানিয়ে আমরা পথে নামলাম। পথে একজন ক্যানাডিয়ান মহিলার সাথে দেখা। একাই পঞ্চকেদার ভ্রমণ করছেন। গোপেশ্বরের পথ দিয়ে তিনি রুদ্রনাথে এসেছেন। পথে পাহাড়ে পাথরের চাট্টানের নিচে রাত কাটিয়েছেন। ভারতবর্ষ সম্বন্ধে উনি কিছু জানেন না। মহাত্মা গান্ধীর জীবনী পড়েছেন। নেপালেও গিয়েছেন। এটা নাকি ওঁর তীর্থভ্রমণ। দুঃসাহসিক অভিযান উনি একা করতে ভালবাসেন।

সন্ধ্যা প্রায় ছটার সময় মণ্ডলে পেঁছানো গেল। ১৯ সেপ্টেম্বর। আজ মণ্ডল থেকে বিদায়ের পালা। মন বিষণ্ণ হয়ে উঠছিল। স্থানীয় লোকদের আন্তরিক সরল ব্যবহার ভোলা যায় না। সকাল সাড়ে সাতটার বাসে রওনা দিয়ে গোপেশ্বর হয়ে চাম্বলীতে নয়টার সময় পেঁছালাম। এখানে বাস পরিবর্তন করে হেলাং পেঁছালাম বেলা প্রায় বারোটার সময়। এখানে অপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্র ছোড়দার পূর্বপরিচিত দোকানে রেখে বাকি জিনিস মালবাহকের কাছে দেওয়া হলো। কল্পনাথের উদ্দেশে এখান থেকে আমাদের পদব্রজে যাত্রা করতে হবে। এখান থেকে প্রায় ১২ কি.মি. দূরে কল্পনাথ, পঞ্চকেদারের পঞ্চম কেদার।

সরকারি পথ থেকে কিছুদূরে নেমেই অলকা-নন্দার ওপরে ঝুলন্ত সেতু পার হলাম। তারপর ডানদিকে বাঁক নিয়ে পাহাড়ের গা ঘেঁষে পাথরের তৈরি রাস্তা। রাস্তা মদমহেশ্বর অথবা রুদ্রনাথের মতো অত চড়াই নয়।

হেলাং থেকে দেড় কিলোমিটার পথ আসার পর কর্মনাশা ও অলকানন্দার সঙ্গম। এরপর কর্মনাশাকে ডানদিকে রেখে পথচলা। গভীর খাদে নদী। দুপাশে শুধু পাইনগাছের বন। এখানকার পাইন-গাছ সরল, এত লম্বা যে, মনে হয় যেন আকাশ ছুঁয়ে আছে। গাছের বাকল খুব পুরু, মাঝে মাঝে কারা কেটে রেখেছে। সেখান থেকে কষ বেরুচ্ছে। এটা দিয়ে নাকি রেসিন আঠা তৈরি হয়। খুব বড় বড় পাইনের 'কোণ' পথে পড়ে আছে।

প্রায় ৬ কি. মি. দূরে সালনা গ্রাম। ছোড়দার পূর্বপরিচিত বনীদেবীর বাড়িতে ওঠা গেল।

উনি 'চিপকো' আন্দোলনে যুক্ত এবং বর্তমানে গ্রামাধ্যক্ষা। এটা নাকি 'মডেল' গ্রাম। সমবায় পদ্ধতিতে এখানে চাষ হয়। এখানে একটি উচ্চমাধ্যমিক স্কুল রয়েছে। অবৈতনিক স্কুল। জলের ট্যাঙ্ক রয়েছে। গোবরকে সার হিসাবে ব্যবহার করার রীতি জানে এখানকার লোকেরা।

বনীদেবীর দোতালা কাঠের বাড়ি। যাত্রী থাকার ব্যবস্থা রয়েছে। একতলাতে গোয়াল, রান্নাঘর ইত্যাদি রয়েছে। এখানকার জমি খুব উর্বর। চারপাশে শুধু শস্য। উঠোন-ভর্তি বড় বড় লাল লঙ্কা। রোদে শুকিয়ে রাখার ব্যবস্থা। চা ও কাঁকড়ি খেয়ে রওনা দিলাম উর্গম গ্রামের উদ্দেশে। এখান থেকে ৪ কি. মি. দূরে উর্গম গ্রাম। ৬০০০ ফিটের ওপর উচ্চতা। বর্ধিষ্ণু গ্রাম। দূর থেকে দেখা যায়। পাহাড়ের গায়ে স্তরে স্তরে সাজানো বাড়ি। চারদিকে শুধু সবুজ আর সবুজ শষ্যক্ষেত্র। ধান, ভুট্টা, রামদানা, সিম, ঝিঙে, কাঁকড়ি, লঙ্কা পথের দুপাশে ছড়িয়ে আছে। ছবির মতো মনে হয়। ছোড়দা বললেন: "রাত কাটাতে হবে উর্গম থেকে দেড় কি. মি. দূরে দেবগ্রামে।"

প্রায় ছটা বাজে। দেবগ্রামে রাজেন্দ্র সিং নেগির 'অতিথি লজে' উঠলাম। বৃষ্টি হচ্ছে। এখানেই আজ রাত্রিবাস। ছোট গ্রাম। এই গ্রামটিও খুব বর্ধিষ্ণু। এর চতুর্দিকেও শুধুই শস্যক্ষেত্র। অতিথি লজটি পাথরের তৈরি নতুন দোতলা বাড়ি। নিচু ছাদ ও ছোট দরজা। কাঠের মেঝে। বৈদ্যুতিক আলোর ব্যবস্থা নেই। স্যানিটারি পায়খানা রয়েছে। গ্রামটি চারপাশে পাহাড় দিয়ে ঘেরা। আকাশে দশমীর চাঁদ। আকাশ জুড়ে তারা জ্বলজ্বল করছে। রাত্রিতে খাবার বলতে লাইপাতা সিদ্ধ আর ভাত। এখানেও পিশুর খুব উৎপাত।

২০ সেপ্টেম্বর। সকাল ছয়টা। আকাশ ক্রমশঃ লাল হচ্ছে। ঝরনার জল কলের মুখ দিয়ে আনার ব্যবস্থা আছে। এখানে মাছির উৎপাত খুব। এই প্রথম লাল আপেল-ভর্তি ফলন্ত গাছ দেখলাম। একটি ঘরে বস্তাভর্তি আপেল রয়েছে। গাছ থেকে পেড়ে আপেল সঙ্গে সঙ্গে নাকি খেতে নেই। বিস্বাদ লাগে। চার-পাঁচদিন রেখে খেতে হয়। এখান থেকে ঘোড়ার পিঠে বস্তাভর্তি আপেল হেলাং নিয়ে যাওয়া হয়। ওখানে আপেল সাত-আট টাকা কেজি দরে বিক্রি হয়।

নন্দাদেবীর গিরিশৃঙ্গে সূর্যালোক প্রতিফলিত হচ্ছে দেখলাম। রুদ্রনাথের শৃঙ্গও এখান থেকে দেখা যায়। সিংজীর গর্ভবতী স্ত্রী গরু নিয়ে পাহাড়ে গেল। সিংজীকে দেখলাম গৃহকর্ম করছেন এবং আমাদের পরিচর্যা করছেন।

প্রায় সাতটার সময় কল্পনাথের উদ্দেশে যাত্রা করলাম। এখান থেকে প্রায় দেড় কি. মি. দূরে কল্পেশ্বর। পথে কোন চড়াই নেই। গ্রামের মধ্য দিয়ে দুপাশে শস্যক্ষেত্র দ্বারা পরিবৃত পথ। পথের ডানদিকে খাদে কল্পগঙ্গা নদী। কল্পগঙ্গা এখানে বীরাঙ্গনা নদীর সঙ্গে মিশেছে। মন্দির থেকে প্রায় আধ কি. মি. দূরে গঙ্গার অপর তীরে উঁচু পাহাড়ের শিখরদেশে একটি গুহা থেকে প্রচন্ড বেগে জলপ্রপাত নেমে এসে একটি পাথরের ওপর পড়ছে। এই জলপ্রপাতই কল্পগঙ্গার উৎস। পাথরে আছড়ে পড়া জলকণিকার ওপর সূর্যালোক প্রতিফলিত হয়ে রামধনুর আকার ধারণ করছে। অপূর্ব সে-দৃশ্য।

একটু পথ চলার পর বীরাঙ্গনা নদীর সেতু অতিক্রম করে অল্প চড়াই উঠতে হলো। পাথর-বিছানো পথ। পথের ডানদিকে মন্দিরে কয়েকটি ভাঙা মূর্তি। পাথরের প্রবেশদ্বার। খিলানের ওপর থেকে ঘণ্টা ঝুলছে। ভিতরেও পাথরের পথ। ডানদিকে নল দিয়ে জল পড়ছে। দুপাশে পাথরের তৈরি লম্বা একতলা বাড়ি। আসলে এক-একটি কুঠরি। সাধুরা এগুলিতে বাস করেন। এখানে কোন লোকালয় নেই। একটি পাথরের তোরণ পেরিয়ে অপ্রশস্ত পাথরের চত্বর। ওপরে চাট্টান। সামনে একটি গুহা। গুহার সম্মুখভাগে পাথর দিয়ে তৈরি তথাকথিত মন্দির। মন্দিরের ভিতরে অন্ধকার। প্রদীপ জ্বলছে। কোন পূজারী নেই। গুহার ভিতরে উঁচু পাথরের ওপর অবস্থিত শিলাখন্ড, জটা-আকৃতি স্বয়ম্ভু লিঙ্গ। ওপরে পাথরের বৃষমূর্তি। নিচে বসবার জায়গা রয়েছে।

ছোড়দি শিবমহিম্ন-স্তোত্র পাঠ করতে লাগলেন। নিজেদের মনের আবেগ, শ্রদ্ধা ও প্রেম দিয়ে বনপথ থেকে তুলে আনা ফুলে নিজেরাই দেবতার

পূজো করলাম। দেবতার কোন সাজসজ্জা নেই, কোন আড়ম্বর নেই। চত্বরের পাশে পাথরের সামান্য উঁচু দেওয়াল। বসা যায়। বসে নিচে বীরাঙ্গনা নদীর গর্জন শোনা যায় ও তার স্রোতও দেখা যায়। এই নদীর গর্জন যেন শিবকে মহাসঙ্গীত শোনাচ্ছে অহর্নিশি। মন্দিরের পিছনে গৌরীকুণ্ড।

তোরণ পেরিয়ে বাইরে এলেই বাঁদিকে একটি গুহা। সেখানে একটি সাধু রয়েছেন। মাথায় জটা, লম্বা দাড়ি, রোগা, একটি চোখ নষ্ট। শান্ত চেহারা। জানা গেল ওঁর বাঙালী শরীর। সতেরো বছর ধরে কেদারখণ্ডের নানা জায়গা পরিক্রমণ করছেন। বছর চারেক আগে এখানে এসেছেন। সাধু আমাদের যত্ন সহকারে চা ও রুটি খাওয়ালেন। তিনি বললেন, কল্পনাথে নাকি নকুল শিবের জটা ধরে রেখেছেন, রুদ্রনাথে সহদেব। রুদ্রনাথের মূর্তি ঈষৎ বাঁদিকে হেলানো—তাণ্ডব নৃত্যের ভঙ্গিমায়। কল্পনাথকে ঘিরে আরও কিছু উপাখ্যান প্রচলিত আছে।

দুর্বাসার শাপে ভীত দেবরাজ ইন্দ্র কল্পবৃক্ষের নিচে হর-পার্বতীর আরাধনা করেন। দেবরাজ ইন্দ্রের ঐরাবতও নাকি এখানে ছিল। সাধু দেখালেন, মন্দিরের ওপরের অংশে যে পাথরের চাট্টান রয়েছে, দূর থেকে তাকে দেখতে অনেকটা হাতির মুখের মতো। বর্তমানে কল্পতরু নেই, তবে শিব রয়েছেন। কথাপ্রসঙ্গে বললেন: "ঈশ্বর বাইরে নেই। নিজের অন্তরে আছেন। তাঁকে খুঁজলেই পাওয়া যায়। সৎসঙ্গ, সৎগ্রন্থ পাঠ ও তীর্থদর্শন ইত্যাদি ঈশ্বরানুভূতিতে সাহায্য করে।" মনে পড়ল, ঠাকুরও বলেছেন: "খোঁজ নিজ অন্তঃপুরে।" সাধু আমাদের গান শোনালেন—

"জয় কেদার উদার মহাভয়ঙ্কর দুঃখহরণ।
জয় কেদার নমাম্যহম্।
শৈল সুন্দর অতিশুভ্র হিমালয়
কেদার নমাম্যহম্॥"

আমরা পঞ্চম কেদারকে প্রণাম করে সাধুজীর কাছ থেকে বিদায় গ্রহণ করলাম। তিনি তখন বললেন: "এখান থেকে প্রায় আড়াই কি. মি. দূরে এক উচ্চ অনুভূতিবান ঊর্ধ্ববাহু সাধু আছেন। ইচ্ছা করলে দর্শন করে যেতে পারেন।" ফেরার পথে দেখলাম, একজন জটাধারী বিদেশী সাধু এবং দুজন ভারতীয় সাধু ছাদে বসে আছেন—ধ্যানমগ্ন।

নদীর সেতু পেরিয়ে বাঁদিকের জঙ্গলের পথ দিয়ে এখন আমরা ঊর্ধ্ববাহু সাধু দেখতে যাচ্ছি। সরু পথের দুপাশে কোমর পর্যন্ত উঁচু বন্য ফুলের গাছ লাঠি দিয়ে সরিয়ে হাঁটতে হচ্ছে। পথে একটি খরস্রোতা ঝরনা পড়ল। পাথরের ওপর দিয়ে আমরা সাবধানে পার হলাম। কিছুদূর হাঁটার পর দেখা গেল, গাছের বড় ডাল ও কাঠের টুকরো দিয়ে তৈরি একটি সেতু। হাতধরার কোনরকম ব্যবস্থা নেই। এক-একজন করে পার হতে হবে। দুর্বল সেতু। ভেঙে পড়তে পারে। ঠাকুরের নাম করতে করতে কোনক্রমে সেতু পার হলাম। কিছুক্ষণ ঘন জঙ্গলের মধ্য দিয়ে গিয়ে সাধুজীর কুঠিয়া দেখতে পেলাম। গুহার চারপাশে পাথরের তৈরি ঘর। বাইরে পাথরের চত্বরে শিবলিঙ্গ। আশপাশে অনেক ফুল ফুটে রয়েছে।

হিমালয়ে ঘুরতে ঘুরতে কোন কোন জায়গায় সত্যিকারের মহাত্মার সন্ধান পাওয়া যায়। বাইরে থেকে তাঁদের বোঝা যায় না। তবে তাঁদের সান্নিধ্যে এলে মনে একটি ভক্তিভাব-মিশ্রিত অদ্ভুত অনুভূতি হয়।

বেলা প্রায় বারোটা বাজে। আমরা যাবার পর সাধুজী বাইরে বেরিয়ে এলেন। একেবার উলঙ্গ। ডানহাত সোজা মাথার ওপর রয়েছে। বড় বড় নখ। হাত মুঠো। অব্যবহারে মাংসপেশী শীর্ণ হয়ে গেছে। উনি নাকি এইভাবে একুশ বছর সাধনা করে চলছেন। গলায় রুদ্রাক্ষের মালা। গায়ের রঙ মসৃণ শ্যামবর্ণ। বয়স মনে হয়, আশি বছর হবে। শক্ত-সমর্থ চেহারা। নাম হনুমান গিরি। আগে শংপন্থে চারবছর ছিলেন। ওখানেও মানুষের উৎপাত। এখানে রয়েছেন প্রায় চার-বছর। "নমঃ শিবায়" বলে আমাদের অভিবাদন করে কুঠিয়াতে বসালেন। ধুনি জ্বলছে। গাছের গুঁড়ির ওপর কম্বলের বিছানা রয়েছে। আমাদের কাজু, কিসমিস খেতে দিলেন। রামায়ণ-মহাভারতের কথা বললেন। বললেন: "তীর্থদর্শন ও সন্তদর্শন পূর্বজন্মের সুকৃতি না থাকলে হয় না। সন্তদর্শন

বিনা জ্ঞান হয় না। সন্তের সেবা তন্-মন্-ধন দিয়ে করতে হয়। আজকাল মানুষ সহজলভ্য বস্তু কামনা করে। মানুষ মদ-মাৎসর্যে লিপ্ত। ত্যাগ স্বীকার করার, অসৎসঙ্গ ত্যাগ করার, অসাধুতো বর্জন করার ইচ্ছা ক্রমশঃ হ্রাস পাচ্ছে। শুভ কর্মে ইচ্ছার অভাবই মানুষকে অন্ধ করে। শুভকর্মে ইচ্ছার জাগরণই আলো। বিশ্বরহস্যকে যুক্তি ও বিচার দিয়ে জানাই হচ্ছে সত্যকে জানা। মনকে সংযত কর। ভাল-মন্দ বিচারের মালিক তোমার মন। বিবেককেই মনের আলোকে বিচার করতে হয়। মনকে শুদ্ধ ও পবিত্র রাখ, তবে বিচারও শুদ্ধ এবং পবিত্র হবে। মনই তোমাকে চালায়। মনকে শুদ্ধ করে তুমি তোমার মনকে চালাও। আসলে শুদ্ধ মন ও শুদ্ধ বুদ্ধি এক হয়ে যায়। তখন আর আলাদা সত্তা থাকে না। সেই মনই তখন আমাকে চালায়। ফলে মনকে যেভাবে গড়বে তোমার কর্মও সেরকম হবে।" সাধুজীর কথায় ঠাকুরের কথা মনে পড়ল: "মন নিয়ে কথা। মনেতেই বন্ধ, মনেতেই মুক্ত। মন যে-রঙে ছোপাবে সেই রঙে ছুপবে।" সাধুজীর কথা আরও শোনার ইচ্ছা ছিল, কিন্তু বেলা হওয়াতে লজের দিকে রওনা দিতে হলো।

২১ সেপ্টেম্বর। সকাল সাতটার সময় কল্পনাথ এবং ঊর্ধ্ববাহু সাধুজীর উদ্দেশে প্রণাম জানিয়ে দেবগ্রাম থেকে রওনা দেওয়া হলো হেলাং-এর উদ্দেশে। পথে 'যোগবদ্রী' মন্দির দর্শন করলাম। শুনলাম, পুরনো বড় মূর্তিটি চুরি হয়ে গিয়েছে।

১০টার সময় বনীদেবীর বাড়িতে প্রাতরাশ সেরে হেলাং পেঁছালাম বেলা বারোটায়। হেলাং থেকে জ্যোতির্মঠে একরাত্রি বাস করে বদ্রীনাথ পেঁছালাম পরের দিন (২২ সেপ্টেম্বর)।

আমাদের পঞ্চকেদার ভ্রমণ শেষ হলো। বারবার মনে পড়ছিল স্বামীজীর সেই বিখ্যাত উক্তি: "Religion, of course, is a journey; but it is never a journey from Calcutta to Kedarnath. But it is a journey from brute-man to Buddha-man." আমাদের জীবনে কি আমরা সেই 'তীর্থযাত্রা' সম্পন্ন করতে পারব? ☐ [সমাপ্ত]

## প্রচ্ছদ-পরিচিতি

**প্রচ্ছদের আলোকচিত্রটি কামারপুকুরের শ্রীরামকৃষ্ণের বাসগৃহের। পাঁচের দশকের প্রথমদিকে আলোকচিত্রটি গৃহীত হয়েছিল।**

**বর্তমান বর্ষটি (১৯৯৩) শ্রীরামকৃষ্ণ-ভাবান্দোলনের ক্ষেত্রে একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বর্ষ। কারণ, এই বর্ষে শিকাগো ধর্মমহাসম্মেলনে স্বামী বিবেকানন্দের আবির্ভাবের শতবর্ষ পূর্ণ হচ্ছে। শিকাগো ধর্ম-মহাসভায় স্বামী বিবেকানন্দ যে-বাণী প্রচার করেছিলেন এবং যে-বাণী ধর্মমহাসভার সর্বশ্রেষ্ঠ বাণী বলে অভিনন্দিত হয়েছিল, সে-বাণী ছিল সমন্বয়ের বাণী। ধর্মের সমন্বয়, মতের সমন্বয়, সম্প্রদায়ের সমন্বয়, দর্শনের সমন্বয়, আদর্শের সমন্বয়—প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের সমন্বয়, প্রাচীন ও নবীনের সমন্বয়, অতীত বর্তমান ও ভবিষ্যতের সমন্বয়। ভারতবর্ষ সুপ্রাচীন কাল থেকে এই সমন্বয়ের বাণী ও আদর্শ প্রচার করে আসছে। আধুনিক কালে এই সমন্বয়ের সর্বপ্রধান ও সর্বশ্রেষ্ঠ প্রবক্তা শ্রীরামকৃষ্ণ। সাধারণভাবে সনাতন ভারতবর্ষের এবং বিশেষভাবে শ্রীরামকৃষ্ণের সমন্বয়ের বাণীকে স্বামী বিবেকানন্দ বহির্বিশ্বের সমক্ষে উপস্থাপিত করেছিলেন। চিন্তাশীল সকল মানুষই আজ উপলব্ধি করছেন যে, সমন্বয়ের আদর্শ ভিন্ন পৃথিবীর স্থায়িত্বের আর কোন পথ নেই। সমন্বয়ের পথই বর্তমান পৃথিবীর বহুবিধ সমস্যা ও সঙ্কটের মধ্য থেকে উত্তরণের একমাত্র পথ। কামারপুকুরের পর্ণকুটীরে যাঁর আবির্ভাব হয়েছিল দরিদ্র এবং নিরক্ষরের ছদ্মবেশে, তিনিই বর্তমান এবং আগামীকালের বিশ্বের ত্রাণকর্তা। তাঁর বাসগৃহটি তাই আজ ও আগামীকালের সমগ্র পৃথিবীর তীর্থক্ষেত্র। শিকাগোর বিশ্বধর্মসভার মঞ্চে স্বামী বিবেকানন্দের কণ্ঠে শান্তি, সমন্বয় ও সম্প্রীতির যে-বাণী বারংবার উচ্চারিত হয়েছিল—যার মধ্যে নিহিত ভারত ও পৃথিবীর রক্ষাকবচ, তার গর্ভগৃহে কামারপুকুরের এই পর্ণকুটীর।—সম্পাদক, উদ্বোধন**

# প্রাসঙ্গিকী

'প্রাসঙ্গিকী' বিভাগে প্রকাশিত মতামত একান্তভাবেই পত্রলেখক-লেখিকাদের।—সম্পাদক, উদ্বোধন

## 'টনিক পরশপাথর নয়' প্রসঙ্গে

কয়েক বছর আগে প্রেসিডেন্সী কলেজে রসায়ন বিভাগের এক বিজ্ঞান প্রদর্শনীতে দেখেছিলাম— 'আপনি কি এক কিলোগ্রাম চিনির দামে একশো গ্রাম গ্লুকোজ খাবেন, মাত্র ১৮ মিনিট সময় বাঁচাবার জন্য?' '১৮ মিনিটের' ব্যাপারটা কি?—জানতে চাইলে ছাত্রটি বুঝিয়ে দিল যে, এক টেবিল-চামচ চিনি খেলে তা শক্তিতে বা ক্যালরিতে পরিণত হতে প্রায় ২০ মিনিট সময় লাগে, আর সমপরিমাণ গ্লুকোজ খেলে তা শক্তিতে রূপান্তরিত হতে সময় নেয় দুই মিনিটেরও কম। এই ১৮ মিনিটের বিলম্ব স্বীকার না করে আমরা সংসারের বাজেট কত উর্ধ্বমুখী করে তুলি। এটা শুধু গ্লুকোজ বনাম চিনির ক্ষেত্রে নয়; একথা সমভাবে প্রযোজ্য হর্লিক্স, কমপ্ল্যান বনাম দুধমেশানো চিনি দেওয়া বার্লির জল বা সাবুর জলের ক্ষেত্রেও। হর্লিক্সের সামাজিক সমাদর এখন সর্বজনস্বীকৃত; অসুস্থ আত্মীয়কে দেখতে যাবার সময় হাতে একশিশি হর্লিক্স নিয়ে তাঁদের বাড়িতে প্রবেশ করলে আমরা অনেকটা সামাজিক স্বস্তি বোধ করি। কিন্তু তার বদলে চারটে পাতিলেবু, একটি 'পিউরিটি' বা 'রবিনসন' বার্লির টিন, আর আধ কিলো চিনি নিয়ে সেই বাড়িতে প্রবেশ করলে আপনার ভাগ্যে কি ধরনের আপ্যায়ন জুটবে জানি না বা আপনার কোন আত্মীয় হয়তো মুখরোচক আলোচনাই শুরু করে দেবেন—আপনি কতটা সেকেলে কৃপণ এবং বাস্তবজ্ঞানশূন্য অসামাজিক মানুষ। সত্যিই আপনি আধুনিক হতে পারলেন না।

এই 'নির্বোধ ক্রেতা'-আকর্ষণের বিজ্ঞাপনের যুগের মুখোমুখি আমাদের দাঁড়াতে হবে। আমাদের মতো দরিদ্র দেশের পক্ষে হর্লিক্স, গ্লুকোজ, কমপ্ল্যান অভিশাপ—একথা জোর গলায় বলার সময় এসেছে। তাই 'উদ্বোধন'-এর (আষাঢ়, ১৪০০) ৯৫তম বর্ষের ৬ষ্ঠ সংখ্যায় 'টনিক পরশপাথর নয়'—সহজবোধ্য বিজ্ঞানভিত্তিক নিবন্ধটির জন্য লেখক ডঃ সন্তোষকুমার রক্ষিতকে আন্তরিক অভিনন্দন জানাই। তিনি অত্যন্ত সাবলীল ও বলিষ্ঠভাবে বলেছেনঃ "আমরা বেশি পয়সা দিয়ে টনিক (কিনে) খাই, কিন্তু অতি সস্তার প্রাকৃতিক (টাটকা শাক-সবজিতে বর্তমান) ভিটামিন, আয়রন, ক্যালসিয়াম খাই না। কারণ, টনিকের শিশির লেবেলে বিভিন্ন ভিটামিনের নাম লেখা থাকে, আর এইসব খাবারের গায়ে তা লেখা থাকে না।" ডঃ রক্ষিতের আলোচনাটি অত্যন্ত সময়োপযোগী এবং আমাদের মতো নিম্নবিত্ত ভারতবাসীর পক্ষে অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক। লেখক একথারও উল্লেখ করেছেন যে, "বিদেশে টনিকের এত রমরমা ব্যবসা নেই, কারণ সেখানকার মানুষ টনিক খায় না, আর তাদের বোকা বানানোও বোধহয় কঠিন।" অশিক্ষা, অর্ধশিক্ষাই যে এজন্য দায়ী তাতে আর সন্দেহ কোথায়? বিজ্ঞাপনের চটকদারী ভাষায় আমরা আকৃষ্ট হই, কিন্তু আমাদের বিশ্লেষণ করার সামর্থ্যের বড়ই অভাব।

লেখক মাঝেমধ্যে এই ধরনের জনসচেতনতা-মূলক নিবন্ধ লিখলে আমরা পাঠকসাধারণ বড়ই উপকৃত হব। তাঁকে অনুরোধও করি, তিনি বিভিন্ন জনপ্রিয় পত্র-পত্রিকার মাধ্যমে বিশ্লেষণধর্মী এই ধরনের লেখা নানা শহরে ও গ্রামেগঞ্জে পরিবেশন করে দিকেদিকে সহজ স্বাস্থ্য-সচেতনতা গড়ে তুলুন। প্রতি সংখ্যায় এই ধরনের প্রবন্ধ/নিবন্ধ প্রকাশের জন্য 'উদ্বোধন' কর্তৃপক্ষকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই।

**কমল নন্দী**
গ্যালিফ স্ট্রীট, বাগবাজার,
কলকাতা-৭০০ ০০৩

## প্রসঙ্গ 'উদ্বোধন'

বৈশাখ (১৪০০) সংখ্যার 'উদ্বোধন' আমাদের কাছে খুবই মনোগ্রাহী লেগেছে। প্রতিটি লেখাই অত্যন্ত তথ্যপূর্ণ, গভীর ভাবব্যঞ্জনাময়। বিশেষ করে স্বামী প্রভানন্দের লেখা 'বিবেকানন্দ-মশালের রক্তরশ্মি' বিশেষত্বের দাবি রাখে। তত্ত্বে, তথ্যে এবং উপস্থাপনে স্বামী প্রভানন্দের প্রবন্ধটি সত্যিই অসাধারণ। স্বামী বিবেকানন্দ সম্বন্ধে অন্য লেখাগুলিও বিশেষ উদ্দীপনাময়। অপর লেখাগুলি সম্পর্কেও একই কথা। আমাদের পাঠচক্রে স্বামীজী সম্বন্ধে প্রতিটি লেখা আমরা নিয়মিত পাঠ করি। অন্যান্য সভ্যারা, যাঁরা 'উদ্বোধন'-এর গ্রাহিকা নন, তাঁরা এই পাঠে খুবই আনন্দ পান, উপকৃত হন। অনেকে এইভাবে 'উদ্বোধন'-এর গ্রাহিকাও হয়েছেন।

আরেকটি কথা। 'কথাপ্রসঙ্গে' পড়ে আমরা বিশেষ আনন্দ পাই। কিছুক্ষণের জন্যও আমাদের মন থেকে সমস্ত হতাশা, নিরাশা, না-পাওয়ার ব্যথা-বেদনা সব চলে গিয়ে এক নতুন জগৎ—এক আনন্দময় জগৎ আমাদের সামনে উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে। কিছুক্ষণের জন্য হলেও আমরা এক অন্য পরিবেশের মধ্যে ডুবে যাই। সবার মন যেন তখন একসুরে বাজতে থাকে। কি যে ভাল লাগে তা বোঝাতে পারব না।

**মীরা ঘোষ**
যোধপুর পার্ক
কলকাতা-৭০০০৬৮

## প্রাক্তন সোভিয়েত রাশিয়ার পটপরিবর্তন প্রসঙ্গে

'উদ্বোধন' পত্রিকায় প্রকাশিত স্বামী ভাস্করানন্দের লেখা 'সোভিয়েত রাশিয়াতে যা দেখেছি' শীর্ষক ধারাবাহিক ভ্রমণ-কাহিনীটি খুব আগ্রহের সঙ্গে পড়েছি। বলা বাহুল্য, রচনাটি তথ্যবহুল এবং চিত্তাকর্ষক।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর পৃথিবীর অন্যতম মহাশক্তি হিসাবে এবং মানবতার সর্বোচ্চ আদর্শের শ্রেষ্ঠতম পীঠস্থানরূপে খ্যাত যে সোভিয়েত রাশিয়ার বহুল কীর্তি ও কৃতিত্বের কথা আমরা শুনে এসেছি, আজ থেকে ৭৫ বছর পূর্বে যে সোভিয়েত রাশিয়া নতুন পৃথিবী, নতুন ইতিহাস আর নতুন মানুষ গড়ার শপথ ও অঙ্গীকার নিয়ে পৃথিবী প্রকম্পিত করে নিজের আবির্ভাব ঘোষণা করেছিল, অত্যন্ত অপ্রত্যাশিত ও অচিন্তনীয়রূপে সেই সোভিয়েত রাশিয়া আজ সর্বথা ব্যর্থতার গ্লানির আবর্তে বিলুপ্ত হয়ে গেছে।

এই অভাবনীয় ঘটনা কেন, কিভাবে সংঘটিত হলো? একি ফাঁকি দিয়ে স্বর্গ-কেনার দুরাকাঙ্ক্ষার ফল? একি 'চালাকি দ্বারা মহৎ কার্য' সিদ্ধ করার দুরাগ্রহের পরিণাম? নাকি ইতিহাসের এক দুর্বোধ্য পরিহাস?

**অসীমকুমার মৈত্র**
বেরখেরা
ভুপাল-৪৬২০২১

## কবিতায় বিবেকানন্দ

আষাঢ় (১৪০০) সংখ্যায় 'উদ্বোধন'-এ 'বিবেকানন্দ' কবিতাটি পড়ে ভাল লাগল বললে কম বলা হবে। চমকে উঠলাম এই দেখে যে, আধুনিক কবিতার মোড় ঘুরে যাবার যুগে এমন কবিতা লেখার হাত তবে আছে! কবিতাটি তো শুধু বিবেকানন্দের প্রশস্তি নয়, যেন বিবেকানন্দই। কোথাও কোন গোঁজামিল নেই, আঠা আঠা দরদ নেই। পবিত্র, বলিষ্ঠ, সুন্দর। বাঃ!

কবিকে অভিনন্দন জানাবার স্পর্ধা রাখি না। তবে ভাল লেগেছে জানাতে দোষ আছে কি?

**লালী মুখার্জী**
মোহনলাল স্ট্রীট
কলকাতা-৭০০০০৪

# স্বামী বিবেকানন্দের ভারত-পরিক্রমা ও ধর্মমহাসম্মেলনের প্রস্তুতি-পর্ব

## স্বামী বিমলাত্মানন্দ

[ পূর্বানুবৃত্তি ]

গোয়া থেকে কর্নাটকের পথে স্বামীজী প্রথমে গিয়েছিলেন ধারওয়ার। তারপর স্বামীজী আসেন ব্যাঙ্গালোরে। ব্যাঙ্গালোরে মিউনিসিপ্যাল মেডিক্যাল অফিসার ডাঃ পি. পালপুর আতিথ্যগ্রহণ করেছিলেন স্বামীজী। এখানে তিনি প্রচ্ছন্নভাবে থাকলেও তাঁর খ্যাতি অচিরেই শহরে প্রচারিত হয়েছিল। মহীশূর রাজ্যের দেওয়ান কে. শেষাদ্রি আয়ার প্রথম আলাপেই বুঝতে পেরেছিলেন যে, সন্ন্যাসীর একটা অদ্ভুত আকর্ষণী শক্তি ও ঈশ্বরদত্ত ক্ষমতা আছে, যা কালে দেশের ইতিহাসে স্থায়ী রেখাপাত করবে। আয়ারের গৃহেও স্বামীজী প্রায় তিন-চার সপ্তাহ বাস করেছিলেন। আয়ার স্বামীজীকে মহীশূর-রাজ চামরাজেন্দ্র ওয়াদিয়ারের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলেন। রাজা স্বামীজীর সমবয়স্ক ছিলেন এবং উভয়ের মধ্যে প্রগাঢ় সখ্যতা গড়ে উঠেছিল। মহারাজের সঙ্গে পরিচয়ের পর স্বামীজী রাজ-অতিথিরূপে ছিলেন। মহারাজের সঙ্গে বিভিন্ন বিষয়ে স্বামীজীর আলোচনা হতো। স্বামীজীর চিন্তার অভিনবত্ব, ব্যক্তিত্বের আকর্ষণ, বিদ্যার বিপুলতা এবং ধর্মবিষয়ে সূক্ষ্মদৃষ্টি মহীশূর-রাজকে মুগ্ধ করেছিল। রাজসভায় আয়োজিত বেদান্ত সম্পর্কে একটি বড় সভায় রাজ্যের প্রধান অমাত্যের অনুরোধে স্বামীজী সংস্কৃতভাষায় ভাষণ দিয়েছিলেন। সেই ভাষণে উপস্থিত সমস্ত পণ্ডিত-বর্গ অভিভূত হয়েছিলেন। মহীশূর-রাজ কথা-প্রসঙ্গে স্বামীজীকে আমেরিকায় প্রচার করার জন্য অনুরোধ করেছিলেন। মহারাজ তাঁকে আমেরিকায় যাত্রার ব্যয়ভার বহন করার প্রতিশ্রুতিও দিয়েছিলেন।

অতঃপর স্বামীজী যান কেরলে। কেরলের ত্রিচুর, ক্র্যাঙ্গানোর, ত্রিবান্দ্রাম ইত্যাদি স্বামীজীর পাদস্পর্শে ধন্য। ত্রিচুরে শিক্ষাবিভাগের অফিসার ডি. এ. সুব্রহ্মণ্য আয়ারের বাড়িতে তিনি কিছুদিন ছিলেন। ক্র্যাঙ্গানোরের কালীমন্দিরে স্বামীজী দেবী-দর্শনের জন্য উপস্থিত হলে তাঁকে মন্দিরের পুরোহিতেরা প্রবেশ করতে দেননি। স্বামীজী বাইরে থেকে দেবীকে প্রণাম করে নিকটে এক অশ্বত্থগাছের নিচে বসেছিলেন। ক্র্যাঙ্গানোরের দুই রাজকুমার কচুন্নি থামপুরন ও ভট্টন থামপুরন স্বামীজীকে সেখানে দেখে তাঁর সঙ্গে সংস্কৃতে আলাপ করেন এবং তাঁর প্রতিভা, মনীষা ও পাণ্ডিত্যে মোহিত হন। তাঁদের মনে হয়েছিল, স্বামীজী 'দ্বিতীয় শংকরাচার্য', 'নর-শরীরে বৃহস্পতি', 'সরস্বতী পুরুষমূর্তি'তে ধরা-ধামে আবির্ভূত।[১২৪] তাঁদের আরও মনে হয়েছিল : "এই অপরিচিত সন্ন্যাসী সুষুম্না-পথে সপ্তম ভূমিতে আরোহণ করে ভূমানন্দ লাভ করবার জন্য উৎকণ্ঠিত নন—তিনি অগণিত মানুষের দুঃখকষ্টকে সহ্য করতে না পেরে স্বেচ্ছায় ধ্যানলোক থেকে নেমে এসেছেন স্বয়ং মহাদেবের মতো—জীবলোকের যন্ত্রণার গরল পান করবার জন্য।... ইনি যেন গোটা জগৎকে এখনি একসঙ্গে আলিঙ্গন করতে ব্যাকুল, আর নিজের ইচ্ছামতো তা করতে পারছেন না বলে আর্ত হয়ে আছেন। তাঁর হৃদয় যেন মানুষের প্রতি ভালবাসায় এখনি বিদীর্ণ হয়ে যাবে।

"অদ্বৈতসিদ্ধ যিনি, তিনি কেবল পর্বতের গুহায় বা গ্রাম-নগরের মন্দিরে ঈশ্বরকে দর্শন করতে ঘুরে বেড়ান না, সে-ঈশ্বরকে দেখতে চান দীনদরিদ্রের পর্ণকুটিরেও...। ঈশ্বরের পাদপূত তীর্থভূমিতে কেবল নিজেকে আবদ্ধ না করে এই সন্ন্যাসী দুঃখীর অশ্রুজলে নিজেকে ধৌত করে পবিত্র করবার জন্য ভারতের প্রান্তে প্রান্তে ঘুরে বেড়াচ্ছেন।"[১২৫]

কোচিনের এর্নাকুলামে স্বামীজী বিখ্যাত নারায়ণ গুরুর গুরু চট্টম্পি-স্বামীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছিলেন। চট্টম্পি-স্বামীর ঘনিষ্ঠ ও পরিচিত শ্রী.বোধশরণ এই সাক্ষাতের কথা বলেছেন : "চট্টম্পি-স্বামী আমাকে দেখতে পেলেই বিবেকানন্দের কথা বলতেন। স্বামীজীর কণ্ঠস্বরে তিনি মুগ্ধ। তার ধ্বনি যেন 'তাঙ্ক কুডাম', Golden pot-এর অনুরণিত ধ্বনির তুল্য। 'তিনি গান করতেন। আ-হা। তাঙ্ক কুডাম! কি মধুবর্ষী স্বর! আমি সেই স্বরতরঙ্গে

১২৪ দ্রঃ বিবেকানন্দ ও সমকালীন ভারতবর্ষ, ১ম খণ্ড, পৃঃ ৯৭

১২৫ ঐ, পৃঃ ৯৬

একেবারে বিগলিত হয়ে যেতাম।' স্বামীজীর চোখেরও বহু প্রশংসা তিনি করতেন।"[১২৬]

ত্রিবান্দ্রামে স্বামীজী ত্রিবাঙ্কুর-মহারাজের ভাগিনেয় ও রাজকুমারের গৃহশিক্ষক সুন্দররাম আয়ারের বাড়িতে নয় দিন (১৩ ডিসেম্বর, ১৮৯২ থেকে ২১ ডিসেম্বর, ১৮৯২), ছিলেন। এখানে তিনি 'মহারাজ মহাবিদ্যালয়ের' রসায়নের অধ্যাপক রঙ্গচারিয়ার সঙ্গে পরিচিত হয়েছিলেন। রঙ্গচারিয়া স্বামীজীর সঙ্গে স্পেনসার, কালিদাস, সেক্সপীয়ার, ডারউইন, ইহুদি-ইতিহাস, আর্যসভ্যতা, মুসলমানধর্ম, খ্রীস্টধর্ম প্রভৃতি আলোচনায় প্রীত হয়েছিলেন। সুন্দররাম আয়ার জাতিভেদ-প্রথা, সন্ন্যাসীর আচার-আচরণ, সামাজিক বিবাহ, খাদ্যাখাদ্য বিচার, ভারতীয় নৃতত্ত্ব প্রভৃতি বিষয়ে স্বামীজীর মনোভাব লিপিবদ্ধ করেছেন। তিনি জানিয়েছেন যে, আমেরিকা-যাত্রার চিন্তা স্বামীজীর মনে তখন ঘুরছিল।

কেরলে স্বামীজী নীচু-জাতদের ওপর উচ্চ-বর্ণের অত্যাচার লক্ষ্য করেছিলেন, লক্ষ্য করেছিলেন পাদ্রীদের সক্রিয়তা। স্বামীজী দেখেছিলেন, নীচু-জাতের লোকেরা উচ্চবর্ণের উপেক্ষার ফলে খ্রীস্টান হয়ে গেলে উঁচুজাতের লোকেরা তাদের সঙ্গে সপ্রেম ব্যবহার করে, বসবার জন্য চেয়ার দেয়। প্রসঙ্গতঃ ত্রিবান্দ্রামে স্বামীজীর দুটি ফটো তোলা হয়েছিল।

ত্রিবান্দ্রাম থেকে স্বামীজী যান তামিলনাড়ুর কন্যাকুমারীতে, ভারতের দক্ষিণে যে-প্রান্তে দেবী কন্যাকুমারীর মন্দির। স্বামীজী সেখানে পৌঁছান ২৪ ডিসেম্বর। মন্দিরদর্শনের পর স্বামীজী সাঁতার কেটে গেলেন সমুদ্রমধ্যস্থ একটি শিলাদ্বীপে। সেখানে তিনদিন তিনি মগ্ন ছিলেন গভীর ধ্যানে। তাঁর ধ্যানের বিষয় ছিল অখণ্ড ভারতবর্ষ। ভারতবর্ষের গৌরবময় অধ্যাত্মমহিমোজ্জ্বল অতীত, দুঃখ-দারিদ্র্যে নিমগ্ন, হতবীর্য, হতগৌরব, হত-অধ্যাত্মশক্তি বর্তমান এবং তিমিরাচ্ছন্ন অনিশ্চিৎ ভবিষ্যৎ। স্বামীজীর ধ্যানালোকে উদ্ভাসিত হলো একের পর এক ভারত-ইতিহাসের প্রত্যেকটি পৃষ্ঠা। উদ্বেগ, আশা, আনন্দ ও বিস্ময়ে তরুণ সন্ন্যাসীর যোগজ দৃষ্টির সম্মুখে "বর্তমান ভারত" দেদীপ্যমান হয়ে উঠল—'এই আমার ভারতবর্ষ—আমার প্রিয় মাতৃভূমি।' তাঁর পদ্মপলাশ লোচনদ্বয় হলো অশ্রুসিক্ত। তিনি দেখলেন—ধর্মক্ষেত্র ভারতবর্ষ দুর্ভিক্ষ, মহামারী, দৈন্য-দুঃখ, রোগ-শোকে জর্জরিত। একদিকে একদল মানুষ প্রবল বিলাসমোহে উন্মত্ত। অন্যদিকে মদ-গর্বিত ধনীদের দ্বারা দরিদ্ররা নিষ্পেষিত, অনাহারে জীর্ণশীর্ণ, 'ছিন্নবসন, যুগযুগান্তরের নিরাশা-ব্যঞ্জিতবদন নরনারী, বালক-বালিকাগণ'—'হা অন্ন, হা অন্ন' করে চিৎকার করছে। নীচুজাতের মানুষেরা তথাকথিত শিক্ষা-দীক্ষাহীন; হৃদয়হীন নিষ্ঠুর পুরোহিতদের ব্যবহারে সনাতন ধর্মের প্রতি সকলে বীতশ্রদ্ধ। অগণিত জনসাধারণ দুর্দশার গভীরে নিমজ্জিত। তাদের সহানুভূতি দেখাবার কেউ নেই। সামাজিক নিয়ম ও কুসংস্কারে আষ্টেপৃষ্ঠে জর্জরিত মানুষের প্রায় নাভিশ্বাস ওঠার উপক্রম। স্বামীজীর হৃদয় করুণায় দ্রবীভূত হলো। উপায়? স্বামীজীর মনে হলো: "...কতকগুলি নিঃস্বার্থ পরহিতচিকীর্ষু সন্ন্যাসী—গ্রামে গ্রামে বিদ্যা বিতরণ করে বেড়ায়, নানা উপায়ে নানা কথা, map, camera, globe (মানচিত্র, ক্যামেরা, গোলক) ইত্যাদির সহায়ে আচণ্ডালের উন্নতিকল্পে বেড়ায়, তাহলে কালে মঙ্গল হতে পারে...। গরিবের ছেলেরা যদি স্কুলে এসে লেখাপড়া শিখতে না পারে, বাড়ি বাড়ি গিয়ে তাদের শেখাতে হবে। গরিবেরা এত গরিব, তারা স্কুল পাঠশালে আসতে পারে না...। জাতীয় বিশেষত্বের বিকাশ যাতে হয়, তাই করতে হবে—নীচজাতকে তুলতে হবে। হিন্দু, মুসলমান, খ্রীস্টান সকলেই তাদের পায়ে দলেছে। আবার তাদের উঠাবার যে-শক্তি, তাও আমাদের নিজেদের ভিতর থেকে আনতে হবে।... ধর্মের দোষ নয়, ধর্ম ঠিক ঠিক পালন না করার দরুনই এই সব দোষ দেখা যায়। সুতরাং ধর্মের কোন দোষ নাই, লোকেরই দোষ।"[১২৭]

স্বামীজীর কার্যধারা স্থির হয়ে গেল—"ত্যাগ ও সেবা"। সন্ন্যাসীর চিরন্তন ধারা—ত্যাগের মহিমার জয়গান। স্বামীজী তার সঙ্গে যোগ করলেন সেবাকে। ধর্মকে মানুষের জীবনে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে, স্থাপিত করতে হবে জাতির মর্মস্থলে। সর্বস্তরে শিক্ষার বিস্তার করতে হবে। অবহেলিত

১২৬ বিবেকানন্দ ও সমকালীন ভারতবর্ষ, ১ম খণ্ড, পৃঃ ৯২

১২৭ বাণী ও রচনা, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃঃ ৪১২-৪১৩

মানুষের উত্থান ও দারিদ্র্য-দূরীকরণে জাতিরই উন্নতি হবে। নিজের মুক্তির চেয়ে অপরের দুঃখ দূর করাই হবে প্রকৃত সেবা। ধর্মকে গতিশীল কর্মে পরিণত করতে হবে। কর্মকে ভগবানলাভের উপায়ে রূপান্তরিত করতে হবে। প্রাচ্য-প্রতীচ্যের মিলন-পরিকল্পনা নিশ্চয় তাঁর মনে তখনই উদ্ভাসিত হয়েছিল। স্বামীজীর ভারত-পরিক্রমার বিশেষত্ব এখানেই, তাৎপর্য এখানেই। এই উপলব্ধিই স্বামীজীর ভারত-পরিক্রমার ফলশ্রুতি।

ধ্যানোত্থিত স্বামীজী যাত্রা করলেন রামনাদে। সেখানে পরিচয় হয় রামনাদ-রাজ ভাস্কর সেতুপতির সঙ্গে। স্বামীজীর গুণে মুগ্ধ ভাস্কর সেতুপতি তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেছিলেন। এখানেও সেতুপতির কাছে স্বামীজী অবতারণা করেছিলেন জনসাধারণের শিক্ষা, কৃষির উন্নতি, ভারতীয় জীবন-সমস্যা ও তার সমাধান ইত্যাদি প্রসঙ্গের। আলোচনা হয়েছিল আমেরিকা-যাত্রা নিয়েও। রামনাদের পর রামেশ্বর-তীর্থ দর্শন করেছিলেন স্বামীজী। এর পর স্বামীজী যান পণ্ডিচেরী।

॥ ১০ ॥

পণ্ডিচেরী থেকে স্বামীজী আসেন মাদ্রাজে (জানুয়ারি ১৮৯৩)। স্বামীজী মাদ্রাজে প্রায় দেড়মাস ছিলেন। অচিরেই চতুর্দিকে হৈচৈ পড়ে গেল—'এক অদ্ভুত ইংরেজী-জানা সন্ন্যাসী' শহরে এসেছেন। যুবা-বৃদ্ধ, ছাত্র-শিক্ষক, গোঁড়া-উদার পণ্ডিত—বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষ এসে উপস্থিত হলো স্বামীজীর পদপ্রান্তে। জনৈক প্রত্যক্ষদর্শী লিখেছেন: "তাঁর অসাধারণ মনীষা এবং বলবার ক্ষমতার রূপ স্তব্ধ বিস্ময়ে কেবল দেখে গেছি। সেইদিন থেকে শুরু করে আমেরিকার জন্য স্বামীজীর মাদ্রাজত্যাগ অবধি প্রত্যেকটি দিন, শহরের নবীন প্রবীণ সকলের কাছে মন্মথবাবুর (মন্মথনাথ ভট্টাচার্য—তখন মাদ্রাজের অ্যাসিস্ট্যান্ট অ্যাকাউন্ট্যান্ট জেনারেল। স্বামীজী তাঁর বাড়িতে অতিথি ছিলেন।) বাড়িতে প্রাত্যহিক তীর্থযাত্রার দিন।"[১২৮]

মাদ্রাজের ট্রিপ্লিকেন লিটার্যারি সোসাইটিতে প্রদত্ত স্বামীজীর বক্তৃতা তাঁকে সর্বপ্রথম জনসমাজে পরিচিত করে দিয়েছিল। পুনা, কোলাপুর, মহীশূর-রাজসভা ও ত্রিবান্দ্রাম ক্লাবে স্বামীজীর বাগ্মীতার পরিচয় কিছু পাওয়া গেলেও মাদ্রাজেই স্বামীজীর যথার্থ 'আত্মপ্রকাশ'। স্বামীজীর বক্তৃতাটি পরে 'মাদ্রাজ মেল' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল (২৮ জানুয়ারি, ১৮৯৩)। এটি অধ্যাপক শংকরী-প্রসাদ বসুর মতে—"অদ্যাবধি-প্রাপ্ত স্বামীজীর পরিব্রাজক জীবনের ভাষণের একমাত্র মুদ্রিত বিবরণ।"[১২৯] ভাষণটি ছিল 'হিন্দুধর্ম এবং সমাজতত্ত্ব' বিষয়ে। সি. রামানুজচারিয়ার তাঁর 'বিবেকানন্দ-স্মৃতি'তে লিখেছেন: "প্রথমে স্বামীজী ট্রিপ্লিকেন লিটার্যারি সোসাইটির এক ক্ষুদ্র সম্মেলনে ভাষণ দেন। কিন্তু তাতেই দারুণ একজন বক্তারূপে তিনি এমন দাগ কাটেন যে, নবীন দল তাঁর প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়ে। প্রবীণেরাও অবিলম্বে বুঝে গেলেন—এই অসাধারণ ব্যক্তির অভ্যন্তরে সঞ্চিত হয়ে আছে প্রকাণ্ড মনীষা, প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য, ঐকান্তিক দেশপ্রেমের অগ্নি, উজ্জ্বল সহাস্য বাক্‌বৈদগ্ধ্য এবং সর্বোপরি অপরাজেয় ত্যাগশক্তি।"[১৩০] মাদ্রাজে স্বামীজী তাঁর বক্তৃতা ও আলোচনায় এমন অনেক কথা বলেছিলেন যেগুলি পরে বারবার তাঁর ধর্মমহাসভার ভাষণগুলিতে ও আমেরিকায় অন্যান্য ভাষণে উচ্চারিত হয়েছে।[১৩১]

এখানে স্বামীজী একদল অনুরাগী নবীন যুবককে পেয়েছিলেন। তাঁদের মধ্যে আলাসিঙ্গা পেরুমল, রাজম আয়ার, জি.জি. নরসিংহচারিয়ার, সিঙ্গারভেলু মুদালিয়ার (কিডি) বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এঁদের মধ্যে কেউ স্বামীজীর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেছিলেন, কেউ বা অনুগত ভক্ত ছিলেন। আলাসিঙ্গা ছিলেন দলনেতা। স্বামীজীর পাশ্চাত্যগমনে আলাসিঙ্গার উদ্যোগ ও ভূমিকা স্বামীজীর জীবনী-পাঠকদের কাছে বিদিত। স্বামীজীর চিন্তা-ভাবনার রূপায়ণে তিনি ছিলেন অগ্রদূত। স্বামীজীর কমপক্ষে চুয়াল্লিশটি চিঠির প্রাপক আলাসিঙ্গা। এই অনু-রাগীর দলই তাঁকে শিকাগো ধর্মমহাসভায় পাঠাবার ব্যবস্থা করে। এঁরাই স্থির করেন "স্বামীজীকে

১২৮ বিবেকানন্দ ও সমকালীন ভারতবর্ষ, ১ম খণ্ড, পৃঃ ১১১
১২৯ ঐ, পৃঃ ১০২
১৩০ ঐ, পৃঃ ১০৯
১৩১ ঐ, পৃঃ ১০৮-১০৯

শিকাগো-কংগ্রেসে পাঠানো উচিত, কারণ স্বামীজী মহান অধ্যাত্মনীতিকে আধুনিক সভ্যতার ভাষায় ব্যাখ্যা করার বিষয়ে গভীর আগ্রহ দেখিয়েছেন।"[১৩২] ভারত-পরিক্রমাকালে স্বামীজীর মনে উদিত শিকাগো ধর্মমহাসভায় যোগদানের ইচ্ছা মাদ্রাজী অনুরাগীদের প্রার্থনায় আরও বেগবতী, পরে ফলবতী হয়েছিল। তাই তাঁদের কেউ কেউ গর্ব করে বলতেন : "মাদ্রাজই বিবেকানন্দকে আবিষ্কার করে।"[১৩৩]

এ-সময়কার স্বামীজীর চিন্তাধারার পরিচয় পাওয়া যায় মাদ্রাজী ভক্তদের স্মৃতিকথায়। কে. ব্যাসরাও স্মৃতিচারণ করেছেন : "তাঁহার অত্যুজ্জ্বল দেশপ্রেম সকলের চিত্ত জয় করিত।··· তাঁহার একটিমাত্র ভালবাসার বস্তু ছিল তাঁহার স্বদেশ এবং একটিমাত্র বিষাদের কারণ সেই স্বদেশের পতন।··· তিনি মুক্তকণ্ঠে আমাদের যুবকসম্প্রদায়ের নিবীর্যতার জন্য দুঃখপ্রকাশ করিতেন এবং উহার নিন্দা করিতেন, তাঁহার বাক্যাবলী বিদ্যুৎবেগে নিঃসৃত হইত এবং ইস্পাতের ন্যায় পথ কাটিয়া চলিত; তিনি সকলেরই প্রাণে সাড়া জাগাইতেন, অনেকেরই চিত্তে স্বীয় উদ্দীপনা সঞ্চারিত করিতেন এবং ভাগ্যবান জনকয়েকের হৃদয়ে অনির্বাণ বিশ্বাসের প্রদীপ প্রজ্বলিত করিয়াছিলেন।"[১৩৪]

মাদ্রাজেই স্বামীজীর ধর্মমহাসভার প্রাক্‌রূপ দেখা গিয়েছিল। মাদ্রাজের থিয়োজফিস্ট পত্রিকার ১৮৯৩-এর মার্চ সংখ্যায় বলা হয়েছিল : "এই সন্ন্যাসীর শ্রোতাদের মধ্যে মাদ্রাজের সর্বশ্রেষ্ঠ মনস্বী ব্যক্তিরা আছেন। তিনি যে পাশ্চাত্যদর্শন ও প্রাচ্যদর্শনের তর্কযুক্তিতে সমর্থ এবং আধুনিক বিজ্ঞান-বিষয়ে বিশেষ ব্যুৎপন্ন, তা দেখিয়ে দিয়েছেন।"[১৩৫]

স্বামীজীর শিকাগো ধর্মমহাসম্মেলনে যোগদানের ইচ্ছা জানামাত্রই আলাসিঙ্গার নেতৃত্বে তাঁর মাদ্রাজী অনুগামীবৃন্দ প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাদি করতে তৎপর হয়ে উঠলেন। কিন্তু ধর্মমহাসভার আরম্ভের তারিখ, যোগদানের নিয়মাবলী প্রভৃতি বিষয়ে তাঁদের কোন খেয়ালই ছিল না। তাঁরা ভেবেছিলেন, স্বামীজী শিকাগো গেলেই সব হয়ে যাবে। অচিরেই আলাসিঙ্গারা পাঁচশো টাকা সংগ্রহ করে ফেললেন। কিন্তু স্বামীজীর মনে তখন দ্বিধা-দ্বন্দ্ব চলছে। তিনি ভাবলেন : "আমি কি নিজের খেয়াল তৃপ্তির জন্য এসব করছি, না, এর মধ্যে বিধাতার কোন গূঢ় উদ্দেশ্য আছে?" তিনি আলাসিঙ্গাকে বললেন : "বৎসগণ! আমি অন্ধকারে ঝাঁপ দেবার আগে মার উদ্দেশ্য জানতে চাই। যদি আমার যাত্রা তাঁর অভিপ্রেত হয়, তবে তিনি তা আমাকে জানিয়ে দিন। তাঁর ইচ্ছা হলে অর্থ আপনি আসবে। অতএব তোমরা এই অর্থ দীন-দরিদ্রের মধ্যে বিতরণ করে দাও।"

স্বামীজীর গুণরাশির সংবাদ ইতিমধ্যে হায়দ্রাবাদে পৌঁছে গিয়েছিল। হায়দ্রাবাদের লোকেরা তাঁদের মাদ্রাজী বন্ধুদের মাধ্যমে হায়দ্রাবাদে আসবার জন্য স্বামীজীর কাছে অনুরোধ জানিয়েছিলেন। স্বামীজী ১০ ফেব্রুয়ারি ১৮৯৩ হায়দ্রাবাদ রেল-স্টেশনে নামলে হায়দ্রাবাদ ও সেকেন্দ্রাবাদের পাঁচশো ব্যক্তি স্বামীজীকে সাদর অভ্যর্থনা জানিয়েছিলেন। বহু খ্যাতনামা ব্যক্তি ও বহু সম্ভ্রান্ত নাগরিক স্টেশনে উপস্থিত ছিলেন। একজন প্রত্যক্ষদর্শী লিখেছেন : "কোন সন্ন্যাসীকে স্বাগত জানাইবার জন্য এরূপ লোক সমাগম আমরা পূর্বে কখনও দেখি নাই—এ ছিল এক জমকালো অভ্যর্থনা।"[১৩৬]

স্বামীজী ১৩ ফেব্রুয়ারি হায়দ্রাবাদের মহবুব মহাবিদ্যালয়ে পণ্ডিত রতনলালের সভাপতিত্বে 'আমার পাশ্চাত্যগমনের উদ্দেশ্য' ("My Mission to the West") বিষয়ে বক্তৃতা দিয়েছিলেন। স্বামীজীর ইংরেজীভাষায় অধিকার, পাণ্ডিত্য, বাগ্‌বিন্যাস-মাধুর্য ও ভাষণভঙ্গি উপস্থিত বিশিষ্ট ইউরোপীয় ব্যক্তিগণ সহ একহাজার শ্রোতাকে মন্ত্রমুগ্ধ করে রেখেছিল। হায়দ্রাবাদের প্রধানমন্ত্রী, নবাব বাহাদুর, বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ, বণিকসমাজ স্বামীজীকে পাশ্চাত্যযাত্রার ব্যয়ভার বহন করবার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন।

১৭ ফেব্রুয়ারি রেলস্টেশনে স্বামীজীকে

১৩২ দ্রঃ বিবেকানন্দ ও সমকালীন ভারতবর্ষ, ১ম খণ্ড, পৃঃ ১০৭ ১৩৩ ঐ

১৩৪ যুগনায়ক বিবেকানন্দ, ১ম খণ্ড, পৃঃ ৪০২ ১৩৫ বিবেকানন্দ ও সমকালীন ভারতবর্ষ, ১ম খণ্ড, পৃঃ ১০১

১৩৬ যুগনায়ক বিবেকানন্দ, ১ম খণ্ড, পৃঃ ৪০৭

হায়দ্রাবাদের প্রায় একহাজার মানুষ জমকালোভাবে বিদায় জানালেন। এক প্রত্যক্ষদর্শী লিখেছিলেন: "তাঁহার পবিত্রতামণ্ডিত সারল্য, সর্বাবস্থায় আত্ম-সংযম এবং গভীর অন্তর্মুখভাব হায়দ্রাবাদবাসীদের হৃদয়ে চিরজীবনের মতো স্মৃতিচিহ্ন অঙ্কিত করিয়া রাখিয়াছিল।"[১৩৭] হায়দ্রাবাদে থাকাকালীন স্বামীজীর দুটি ফটো তোলা হয়েছিল হায়দ্রাবাদ থেকে।

মাদ্রাজে প্রত্যাবর্তনের পর স্বামীজী শিকাগো ধর্মমহাসভায় যোগদানের জন্য মোটামুটি মনঃস্থির করেছিলেন। তিনি উপলব্ধি করেছিলেন—ভারতের সনাতন ধর্ম এবং শ্রীরামকৃষ্ণের উদার ও সর্বজনীন বাণীপ্রচারের উপযুক্তক্ষেত্র শিকাগো ধর্মমহাসভা।

তবুও স্বামীজীর মনে একটু দ্বিধাভাব, একটু অনিশ্চয়তার ভাবও তখন ছিল। কিন্তু আলাসিঙ্গাদের ঐকান্তিক যত্ন ও সাফল্যের পরিচয় পেয়ে তিনি ভাবলেন: "এদের এই তৎপরতাই হয়তো মায়ের অভিপ্রায়ের প্রথম ইঙ্গিত।"[১৩৮] এরপরেই স্বামীজী শ্রীরামকৃষ্ণের একটি দর্শন ও শ্রীশ্রীমায়ের আশীর্বাদ-পত্র লাভ করেছিলেন। এছাড়া আরেকটি ঘটনাও মাদ্রাজী ভক্ত আর. এ. নরসিংহচারিয়ার সূত্রে জানতে পারা যায়। মাদ্রাজে স্বামীজী ও নরসিংহ-চারিয়া পাশাপাশি ঘরে ছিলেন। নরসিংহচারিয়া এক রাত্রিতে শুনতে পেলেন—স্বামীজী কার সঙ্গে কথা-কাটাকাটি করছেন। পরে বহু অনু-রোধ-উপরোধ করার পর স্বামীজী বলেছিলেন: "আমার শিকাগো ধর্মমহাসভায় যাবার ইচ্ছা ছিল না, মনে মনে না যাওয়ার সিদ্ধান্ত করেছিলাম। কিন্তু ঠাকুর দেখা দিয়ে কয়েকদিন ধরে বারবার বলতে লাগলেন, 'আমার কাজের জন্য এসেছিস, তোকে যেতেই হবে। তোর জন্যই ঐ সভার আয়োজন জানবি। তোর কোন চিন্তা নেই। তোর কথা শুনে লোকে মুগ্ধ হবে।' আমি যতই আপত্তি জানাই, ঠাকুর ততই আমাকে যাওয়ার জন্য জিদ ধরেন। এইভাবে দু-চার দিন ধরে বাদানুবাদ হয়। শেষে ঠাকুরের আদেশ শিরোধার্য করে যাবার জন্য প্রস্তুত হয়েছি।" এ-ঘটনা নরসিংহচারিয়া বলেছিলেন রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের সপ্তম অধ্যক্ষ স্বামী শংকরানন্দকে।[১৩৯] এর পর, বিশেষতঃ শ্রীশ্রীমায়ের অনুমতিপত্র প্রাপ্তির পর আলাসিঙ্গার নেতৃত্বে মাদ্রাজের ভক্তেরা স্বামীজীর শিকাগো ধর্মমহাসভায় পাথেয়স্বরূপ প্রায় চারহাজার টাকা সংগ্রহ করে-ছিলেন।[১৪০] উল্লেখযোগ্য দাতা ছিলেন মন্মথবাবু, সুব্রহ্মণ্য আয়ার ও রামনাদের রাজা। এঁরা প্রত্যেকে পাঁচশো টাকা দিয়েছিলেন।[১৪১] আলাসিঙ্গা অর্থাভাবে স্বামীজীর জন্য জাহাজের দ্বিতীয় শ্রেণীর টিকিট ক্রয় করেছিলেন। খেতড়িরাজের আদেশ অনুসারে মুন্সী জগমোহনলাল স্বামীজীর দ্বিতীয় শ্রেণীর টিকিট প্রথম শ্রেণীতে পরিবর্তিত করেছিলেন।[১৪২]

মাদ্রাজেই কার্যতঃ স্বামীজীর ভারত-পরিক্রমার সমাপ্তি হয়েছিল। শিকাগো ধর্মমহাসভায় যোগ-দানের জন্য যখন যাত্রার সব আয়োজন শেষ, তখন শিষ্য খেতড়িরাজের সানুনয় প্রার্থনায় তাঁর নবজাত পুত্রকে আশীর্বাদ করার জন্য স্বামীজী মাদ্রাজ থেকে বোম্বাই হয়ে খেতড়ি যান (এপ্রিলের দ্বিতীয় সপ্তাহ, ১৮৯৩)। ফেরার পথে আবু রোডে দুই গুরুভাই স্বামী ব্রহ্মানন্দ ও স্বামী তুরীয়ানন্দের সঙ্গে স্বামীজীর দেখা হয়। তার কয়দিন পরেই ৩১ মে ১৮৯৩ তিনি শিকাগোর উদ্দেশে সমুদ্রযাত্রা করবেন। ঐসময় স্বামী তুরীয়ানন্দকে তিনি বলেছিলেন, ধর্মমহাসভার আয়োজন হচ্ছে তাঁর জন্যই।

॥ ১১ ॥

ভারত-পরিক্রমায় স্বামীজী বহু দেশীয় রাজন্য ও উচ্চপদস্থ ব্যক্তিদের সঙ্গে মেলামেশা করে-ছিলেন। কেন তিনি করেছিলেন, সে-সম্বন্ধে স্বয়ং স্বামীজী বলেছেন: "গরিব প্রজার ইচ্ছা থাকিলেও সৎকার্য করিবার ক্ষমতা কোথায়? কিন্তু রাজার হাতে সহস্র সহস্র প্রজার মঙ্গলবিধানের ক্ষমতা পূর্ব হইতেই রহিয়াছে, কেবল উহা করিবার ইচ্ছা

১৩৭ যুগনায়ক বিবেকানন্দ, ১ম খণ্ড, পৃঃ ৪১১

১৩৮ ঐ, পৃঃ ৪১২

১৩৯ উদ্বোধন, ৭৫তম বর্ষ, শারদীয়া সংখ্যা, ১৩৮০, পৃঃ ৫২৯-৫৩০

১৪০ মহাপুরুষ মহারাজের পত্রাবলী, ২য় সং, ১৩৮৭, পৃঃ ৩৫

১৪১ উদ্বোধন, ৭৫তম বর্ষ, শারদীয়া সংখ্যা, ১৩৮০, পৃঃ ৫৩০-৫৩১

১৪২ যুগনায়ক বিবেকানন্দ, ১ম খণ্ড, পৃঃ ৪২৩

নাই। সেই ইচ্ছা যদি কোনরূপে তাঁহার ভিতর একবার জাগাইয়া দিতে পারি, তাহা হইলে তাহার সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার অধীন সকল প্রজার অবস্থা ফিরিয়া যাইবে এবং জগতের কত বেশি কল্যাণ হইবে।"[১৪৩]

ভারত-পরিক্রমায় স্বামীজী অনুভব করেছিলেন, ধর্মই ভারতের মেরুদণ্ড, জীবন-কেন্দ্র, জীবনী-শক্তি, জাতীয় জীবনের ভিত্তি, জাতীয় জীবনের মূল উৎস। ধর্মকে জীবনে পরিণত না করার জন্য ভারতের এত অবনতি। ধর্মের কোন দোষ নেই। সর্বস্তরের মানুষকে উপনিষদের বাণী শোনাতে হবে। ভারতীয় জনগণকে ঋষিদের নির্দিষ্ট শিক্ষা দিতে হবে। ভারতবাসীর মনে দেশাত্মবোধের সঞ্চার করতে হবে। দরিদ্র ভারতীয়-দের অর্থনৈতিক ও জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন করতে হবে। কৃষিপ্রধান ভারতবর্ষের জমিতে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে চাষের প্রচলন করতে হবে। কারিগরি বিদ্যা চালু করতে হবে, যাতে মানুষ নিজের পায়ে দাঁড়াতে পারে। যন্ত্রশিল্প ও কুটিরশিল্পের সহায়তায় ভারতীয় জনগণের অর্থ-উপায়ের ব্যবস্থা করতে হবে। ভারতীয় রাজা-মহারাজা-জমিদার-ধনীলোকদের কাছে ব্যর্থ হয়ে স্বামীজী পাশ্চাত্যে পাড়ি দিয়েছিলেন। স্বামীজী স্বদেশে ফিরে বলেছিলেন: "আমেরিকায় ধর্মমহাসভা হইয়াছিল বলিয়া আমি সেখানে যাই নাই, দেশের জনসাধারণের দুর্দশা দূর করিবার জন্য আমার ঘাড়ে যেন একটা ভূত চাপিয়াছিল। আমি অনেক বৎসর যাবৎ সমগ্র ভারতবর্ষে ঘুরিয়াছি, কিন্তু আমার স্বদেশবাসীর জন্য কাজ করিবার কোন সুযোগ পাই নাই। সেই জন্যই আমি আমেরিকায় গিয়াছিলাম।"[১৪৪]

একটি চিঠিতে তিনি আলাসিঙ্গাকে লিখেছিলেন (২০ আগস্ট, ১৮৯৩): "আমি দ্বাদশ বৎসর হৃদয়ে এই ভার লইয়া ও মাথায় এই চিন্তা লইয়া বেড়াইয়াছি। আমি তথাকথিত অনেক ধনী ও বড়লোকের দ্বারে দ্বারে ঘুরিয়াছি, তাহারা আমাকে কেবল জুয়াচোর ভাবিয়াছে। হৃদয়ের রক্তমোক্ষণ করিতে করিতে আমি অর্ধেক পৃথিবী অতিক্রম করিয়া এই বিদেশে সাহায্যপ্রার্থী হইয়া উপস্থিত হইয়াছি।"[১৪৫] হরিপদ মিত্রকে ২৮ ডিসেম্বর, ১৮৯৩ তারিখে লিখেছিলেন: "আমি এদেশে এসেছি, দেশ দেখতে নয়, তামাসা দেখতে নয়, নাম করতে নয়, এই দরিদ্রের জন্য উপায় দেখতে।"[১৪৬]

ভারত-পরিক্রমায় স্বামীজী শিকাগো ধর্মমহা-সভার কথা শুনেছিলেন। ভারতের দরিদ্র, অব-হেলিত জনসাধারণের জন্য তিনি সেখানে যাবার মনস্থ করেছিলেন। অবশ্য ভারতীয় ধর্ম ও ঐতিহ্যের মহিমা প্রচার করার বাসনাও তাঁর কম ছিল না। ধীরে ধীরে তিনি নিজেকে উভয় ব্রতের জন্য প্রস্তুত করছিলেন। স্বামীজীর ভারত-পরিক্রমা ছিল শিকাগো ধর্মমহাসভায় যোগদানের প্রস্তুতি-পর্ব। সুতরাং এই প্রস্তুতি-পর্বের সূচনা হয়েছিল উত্তর ভারতে, আর তার পরিসমাপ্তি ঘটেছিল দক্ষিণ ভারতে।

স্বামীজীর ভারত-পরিক্রমার আর একটি গূঢ় তাৎপর্য আছে; আছে একটি অনন্য বৈশিষ্ট্য। স্বামীজীকে ভারতের নবজাগরণের অগ্রদূত বলা হয়। এই নবজাগরণের অগ্রদূতের পরিপূর্ণতা লাভ হয়েছিল ভারত-পরিক্রমায়। স্বামীজী ছিলেন জাতীয় সংহতির অনন্য রূপকার। ভারত-পরিক্রমায় তিনি ভারতের সংহতির রূপকে আবিষ্কার করে-ছিলেন, আয়ত্ত করেছিলেন। ভগিনী নিবেদিতা লিখেছেন: "অপরেরা যেখানে বিচ্ছিন্ন ঘটনা-সমূহ মাত্র দেখিতেন, তাঁহার বিরাট মন সেখানেও সমন্বয়সূত্র আবিষ্কার করিত।... তাঁহার মনটি ছিল সর্বাধিক সার্বভৌম অথচ পূর্ণমাত্রায় কার্যকরী সংস্কৃতি-সম্পন্ন। যিনি সর্বতোভাবে—বৈদিক, বৈদান্তিক, বৌদ্ধ, জৈন, শৈব, বৈষ্ণব এমনকি ইসলামের দিক হইতেও ধর্মমহাসভায় ভারতের প্রতিনিধিত্ব করিতে উদ্যত ছিলেন, তাঁহার পক্ষে ইহা অপেক্ষা অধিকতর কোন প্রস্তুতির প্রয়োজন ছিল? যিনি স্বীয় জীবনে সত্য সত্যই একটি ধর্মমহাসভাস্বরূপ ছিলেন, সেই মহামানবের শিষ্য এই ব্যক্তি অপেক্ষা আর কে এই কর্তব্যসম্পাদনের যোগ্যতর পাত্র ছিলেন?"[১৪৭] □ [সমাপ্ত]

১৪৩ বাণী ও রচনা, ৯ম খণ্ড, পৃঃ ৫৭৪ ১৪৪ ঐ, ৫ম খণ্ড, পৃঃ ১১৬ ১৪৫ ঐ, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃঃ ৩৬৬
১৪৬ ঐ, পৃঃ ৩৮৯ ১৪৭ উদ্ধৃত: যুগনায়ক বিবেকানন্দ, ১ম খণ্ড, পৃঃ ৪২৬-৪২৭

# স্মৃতিকথা

## ৩

## হেমলতা মোদক

প্রায় ষাট-পঁয়ষট্টি বছর আগের কথা। বয়সের জন্য স্মৃতি দুর্বল। তাই সন-তারিখ কিছুই মনে নেই। অসংলগ্নভাবে হলেও মহাপুরুষদের স্মৃতি যতটুকু মনের মণিকোঠায় ধরে রাখতে পেরেছি, তা বলার চেষ্টা করছি।

হবিগঞ্জ (বর্তমানে বাংলাদেশের অন্তর্গত) আশ্রম যখন প্রতিষ্ঠা হয়, তখন আমি ছোট। হবিগঞ্জই আমার পিত্রালয়। সেখানে থেকে সে-সময় পূর্ণ পড়াশুনা করতেন। পরবর্তী কালে তিনি শ্রীরামকৃষ্ণ সঙ্ঘে যোগ দেন। নাম হয় স্বামী সাম্যানন্দ। আমার বয়স যখন ছয় বছর তখন একদিন আমি আশ্রমে যাবার জন্য কাঁদছি। বড়দা আমার এই অবস্থা দেখে আমায় হবিগঞ্জ আশ্রমে নিয়ে গেলেন। যাবার আগে তিনি আমায় বলেছিলেনঃ "আশ্রমে গিয়ে আর কি দেখবি? একখানা ছবি মাত্র।" হবিগঞ্জ আশ্রমের উদ্যোক্তা ছিলেন স্বামী অশোকানন্দ, স্বামী গোপেশ্বরানন্দ, যশোদাবাবু প্রমুখ।

আমার বিয়ে হয় বারো-তেরো বছর বয়সে। আমার স্বামী মধুসূদন মোদকের দীক্ষা হয়েছিল পূজ্যপাদ মহাপুরুষ মহারাজের কাছে—আমাদের বিয়ের আগেই। মহাপুরুষজীর কত কথা তিনি আমায় শোনাতেন। শোনাতেন শ্রীশ্রীঠাকুরের আর সব সন্তানদের কথা, শ্রীশ্রীমায়ের কথা। আমার মধ্যে শ্রীরামকৃষ্ণ-ভাবধারার বীজ বপন করতে তিনি সর্বদা সচেষ্ট থাকতেন। তখন আমি শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম সম্পর্কে কিছুই জানতাম না। এমনকি তাঁর নামও তেমন শুনিনি। তিনি আমাকে কথামৃত পাঠ করানোর ঐকান্তিক প্রচেষ্টা চালাতেন। বলতেনঃ "আমি 'কথামৃত' পাঠ করে রাত ভোর করে দিতে পারি। আর তুমি আমায় 'কথামৃত' পড়ে শোনাবে না?"

পূজ্যপাদ রাজা মহারাজ আমার স্বামীকে দীক্ষা দেবেন বলেছিলেন। কিন্তু অনিবার্য কারণে আমার স্বামীকে সেসময় তাঁদের দেশের বাড়ি আজমিরীগঞ্জে আসতে হয়েছিল। সেখানে এসে তিনি মহারাজের দেহরক্ষার খবর পান। এই ঘটনায় তাঁর মনে এত ব্যথা লেগেছিল যে, তিনদিন আহার-নিদ্রা ত্যাগ করে দরজা বন্ধ করে ঘরে ছিলেন। তাঁর তীব্র অনুশোচনা হয়েছিল। যাহোক, পরে তিনি আবার পূজ্যপাদ মহাপুরুষজীর নিকট দীক্ষার জন্য আবেদন করেন। মহাপুরুষজী তাঁকে পূজ্যপাদ শরৎ মহারাজের নিকট পাঠান। শরৎ মহারাজ আবার তাঁকে মহাপুরুষ মহারাজজীর কাছেই পাঠান এবং বলেনঃ "বাবা, তোমায় মহাপুরুষজীই দীক্ষা দেবেন।" সেবার তাঁকে হতাশ হতে হলো। কিন্তু হাল ছাড়লেন না তিনি। আজমিরীগঞ্জ থেকে মাঝে মাঝেই বেলুড় মঠে এসে তিনি মহাপুরুষজীর নিকট দীক্ষার আবেদন জানাতে থাকেন। কিন্তু কিছুতেই মহাপুরুষজী দীক্ষা দিতে রাজি হচ্ছেন না। এদিকে ওঁর ব্যাকুলতাও বাড়তে থাকে। আরও কিছুদিন অপেক্ষা করার পর মহাপুরুষজীর সন্ধানে মঠে এসেই যখন শুনলেন যে, তিনি গদাধর আশ্রমে গেছেন, তখন তিনিও ছুটলেন সেখানে। গিয়ে দেখেন যে, মহাপুরুষজী আশ্রমের সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে আছেন। আমার স্বামীকে দেখেই মহাপুরুষজী ধমকের সুরে বললেনঃ "আবার এখানে এসেছ?" মহাপুরুষজীকে প্রণাম করে বিষণ্ণ মনে নেমে আসছেন তিনি। সিঁড়ির ওপরের ধাপে মহাপুরুষজী এবং পরবর্তী ধাপে আমার স্বামী। অভিমানে ভারাক্রান্ত হৃদয়ে মনে মনে ভাবছেন, রামকৃষ্ণ মিশনের সঙ্গে সব সম্পর্ক ত্যাগ করবেন। এই কথা যখনই ভাবছেন তখনই দেখেন মহাপুরুষজী ওপরের সিঁড়িতে দাঁড়িয়েই তাঁকে ডাকছেন। আমার স্বামী তাঁর দিকে তাকাতেই তিনি তাঁকে পরের দিনই মঠে যেতে বললেন। বহুবাঞ্ছিত সদ্‌গুরুর কৃপালাভে কৃতার্থ হলেন উনি।

তিনি অফুরন্ত স্নেহ-ভালবাসা পেয়েছেন মহাপুরুষজীর কাছ থেকে। আজমিরীগঞ্জ থেকে কোন ভক্ত মহাপুরুষজীর কাছে গেলে মহারাজ মজা করে তাদের জিজ্ঞাসা করতেনঃ "আমার 'কর'কে চেন? সে কেমন আছে?" আমাদের বিবাহ বা শ্রাদ্ধে 'কর' নামেই সংকল্প হয়। তাই তাঁর কাছে

আমরা 'কর' নামেই পরিচিত ছিলাম। আমার দীক্ষার পর আমাদের দেশ থেকে কেউ মঠে এলে, তিনি জিজ্ঞাসা করতেন : "আমার 'কর-করী' ভাল আছে তো?" আমার দেবর প্রথম মঠে গিয়ে স্বামীর নির্দেশে মহাপুরুষজীর সাথে দেখা করলে মহাপুরুষজী তাঁকে সস্নেহে বলেন : "তুমি 'কর'-এর ভাই?" বাড়ি এসে যখন ভাইয়ের মুখে তিনি ঐ কথা শুনলেন, তখন তাঁর আনন্দের আর সীমা রইল না। আমরা মঠে গেলে মহাপুরুষজী মাথায় হাত রেখে স্বামীকে যে কত স্নেহ-আশীর্বাদ করতেন তা আমি প্রত্যক্ষ করতাম।

আমাদের বিয়ের পাঁচবছর পরে (আগস্ট, ১৯২৭) পূজ্যপাদ শরৎ মহারাজ দেহরক্ষা করেন। আমি তখন পিত্রালয়ে আছি। 'মাসিক বসুমতী' পত্রিকায় শরৎ মহারাজের জীবনকথা প্রকাশিত হয়েছিল। ঐ সময় হবিগঞ্জ শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমের লাইব্রেরী থেকে সাধু নাগমহাশয়ের জীবনীগ্রন্থখানি সংগ্রহ করে পড়তে লাগলাম। কী অমূল্য সব কথা। আহা, কী ভক্তি ঠাকুরের প্রতি। তাঁর ভক্তির জোরে পতিত-উদ্ধারিণী মা গঙ্গা তাঁর গৃহের আঙিনা ভেদ করে উঠেছিলেন। সেসময় আমার মনে দীক্ষার বাসনা প্রবল হয়। স্বামীর অজান্তে আমি মহাপুরুষজীকে দীক্ষার জন্য পত্রের মাধ্যমে প্রার্থনা জানালাম। তিনি তখন মধুপুরে। মধুপুর থেকে মহাপুরুষজী পত্রের উত্তর দিলেন। লিখলেন : "তোমার সময় করিয়া মঠে আসা হইলেই হইবে।" ঐ পত্রের প্রেরকের ঠিকানা আজমিরীগঞ্জ স্বামীর প্রযত্নে দিয়েছিলাম। মহাপুরুষজীর পত্রোত্তর দেখে স্বামী আমাকে সঙ্গে সঙ্গে পিত্রালয়ে লিখলেন : "তোমার নিকট শ্রীশ্রীগুরুদেবের পত্র দেখিয়া আমার আনন্দে নাচিতে ইচ্ছা করিতেছে।" আমার শ্বশুরালয় বৈষ্ণবভাবাপন্ন। তথাপি শ্রীরামকৃষ্ণের ভাব এই বাড়িতে কোথা থেকে উদয় হলো? আমি নতুন বউ। স্বামী আমাকে পিত্রালয় থেকে চাঁদপুর, গোয়ালন্দ হয়ে কলকাতার টালায় এক আত্মীয়ের বাড়িতে নিয়ে এলেন। পরের দিন মঠে আসব। স্বামীর চিন্তা—গুরুদেব কৃপা করবেন কিনা। আমাকে বললেন : "তুমি ঠাকুরকে আকুল প্রাণে ডাক আর প্রার্থনা কর।" পরদিন বেলুড় মঠে গিয়ে মহাপুরুষজীকে আমরা দর্শন করলাম। তাঁর ঘরের বাইরে দরজায় দাঁড়িয়ে আছি। দেখি, এক যুবক তাঁর কাছে দীক্ষার জন্য প্রার্থনা জানাচ্ছে। কিন্তু কিছুতেই তিনি তাকে দীক্ষা দিতে রাজি হলেন না। যুবকটিকে তিনি বললেন : "আমি কি কথা দিয়ে রেখেছি যে, তোমায় দীক্ষা দেব?" ছেলেটি শেষে বিষণ্ণ মনে প্রণাম করে চলে গেল। সে-দৃশ্যে আমার শরীর কাঁপতে লাগল। আমরা ঘরের বাইরে দাঁড়িয়ে আছি। হঠাৎ মহারাজ আমার স্বামীকে ডেকে জিজ্ঞাসা করলেন : "কবে এসেছ? মেয়েটি কে?" উনি পরিচয় দিতে বললেন : "এসো মা, এসো মা।" সৌম্য মূর্তি, চেয়ারে বসে আছেন, খালি গা। আমিও ঘরে ঢুকে প্রণাম করে প্রার্থনা করলাম : "মহারাজ, আমি দীক্ষালাভের প্রয়াসী হয়ে এসেছি। আমায় কৃপা করুন।" "কি বলছ মা শুনতে পাচ্ছি না।"—বললেন উনি। আবার একটু জোরে বললাম : "মহারাজ, আমায় কৃপা করুন।" কিছুক্ষণ চোখদুটি মুদ্রিত অবস্থায় রেখে আমার স্বামীকে বললেন : "কাল ওকে গঙ্গাস্নান করিয়ে নিয়ে আসবে।" পরদিন রবিবার পূর্ণিমাতিথি। বৈশাখ মাস। সকালে মঠে এসেছি। আমাদের সঙ্গে আরও কয়েকজন বয়স্ক মহিলা সেদিন দীক্ষার্থী ছিলেন। ঠাকুরের পুরনো মন্দিরের ভিতরে তখন দেওয়াল ছিল না। মহারাজ এক-একজন করে দীক্ষার্থীদের দীক্ষা দিলেন। ঠাকুরের নিকট কিভাবে প্রার্থনা করতে হবে তাও বলে দিলেন। বললেন : "এই প্রার্থনা করবে—ঠাকুর, আমায় ভক্তি দাও, বিশ্বাস দাও, প্রেম দাও, বৈরাগ্য দাও।" স্বামী আমায় আগেই শিখিয়ে দিয়েছিলেন—দীক্ষার পর সাষ্টাঙ্গ হয়ে প্রণাম করতে হয়। ঠাকুরঘর থেকে বাইরের বারান্দায় এসে দাঁড়ালেন সব মহিলারা। সকলেই গুরুচরণে ফুল দিয়ে প্রণাম করলেন। আমিও করলাম।

দীক্ষার পর আমি অসুস্থ হয়ে পড়ি। চিন্তিত গুরুদেব প্রতিদিন একজন ব্রহ্মচারীকে টালার বাড়িতে (যেখানে আমি থাকতাম) পাঠাতেন আমার কুশল জানার জন্য। মহাপুরুষ মহারাজজীর ডাক্তার মাঝে মাঝে এসে আমায় দেখে যেতেন। স্বামী তখন বলতেন : "তুমি কত ভাগ্যবতী। গুরুদেব

স্বয়ং তোমার কথা ভাবছেন।" সুস্থ হয়ে একদিন মঠে এসেছি। গুরুদেবকে প্রণাম করে দেশে ফিরে যাব। দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে আছি। পূজ্যপাদ খোকা মহারাজ (স্বামী সুবোধানন্দ মহারাজ) পাশের ঘরে আরামকেদারায় বসে আছেন। তাঁর চেয়ার থেকে আমরা ছয়-সাত হাত দূরে আছি। তিনি আমার দিকে তাকিয়ে বললেনঃ "আবার কবে আসছ?" বললামঃ "কি জানি, মহারাজ।" মহারাজ মাথায় হাত রেখে বললেনঃ "আসবে, শিগ্‌গিরই আসবে।"

পরের বছর বৈশাখ মাসে ব্যবসা-সংক্রান্ত ব্যাপারে আমার স্বামী কলকাতায় আসবেন। আমি হবিগঞ্জে বাপের বাড়িতে। স্বামীর কাছে গোঁ ধরলাম কলকাতায় নিয়ে যাবার জন্য। তিনি সংসারের অশান্তির জন্য নিয়ে যেতে রাজি হচ্ছিলেন না। গত বছর কলকাতায় যাওয়াতে মা ভাই সবাই বিরক্ত। আমি খুব কাঁদছি। খোকা মহারাজের মাথায় হাত দিয়ে আশীর্বাদ তো বৃথা হবার নয়। শত বাধা-বিপত্তি সত্ত্বেও দয়াল ঠাকুর আমাকে টেনে আনলেন কলকাতায়। সকালে বেলুড় মঠে গেছি। মহাপুরুষজী আর খোকা মহারাজ স্বামীজীর ঘরের সামনে পায়চারী করছেন। দুজনে খুব হাসিখুশি, কথাবার্তা বলছেন। সিঁড়ির কাছে আমাদের দেখেই পূজ্যপাদ মহাপুরুষজী ডাকছেনঃ "এসো মা, এসো মা।" আমি স্বামীর পিছনে। তিনি আজমিরীগঞ্জ থেকে ঘি এনেছেন। ঘি-এর ভাঁড়টি দেখিয়ে বলছেনঃ "মহারাজ, আপনার জন্য ঘি এনেছি।" মহারাজ বললেনঃ "ঠাকুরের জন্য এনেছি বল, বাবা।" এর পর প্রায়ই মঠে তাঁকে দর্শন করতে যাই। একদিন নৌকাযোগে দক্ষিণেশ্বর থেকে মঠে যাই বিকাল চারটায়। তখন বালী-ব্রীজ (বিবেকানন্দ-সেতু) হয়নি। পূজ্যপাদ মহারাজ ডাকছেনঃ "এসো মা, এসো মা। কোথা থেকে এলে মা?" উত্তর দিলামঃ "দক্ষিণেশ্বর থেকে, মহারাজ।" দক্ষিণেশ্বরের নাম শোনামাত্র গড়গড়ার নল হাতে বলছেনঃ "ঐ তো মা কৈ-লা-স, ঐ তো বৈ-কু-ণ্ঠ।" বলতে বলতে গড়গড়ার নল হাতে ভাবে তন্ময় হয়ে গেলেন মহারাজ। সেই সৌম্য মূর্তি মনে যে কী অপার্থিব অনুভব যোগাল তা ভাষায় বলা যায় না। জানি না, সে-ভাব হৃদয়ে ধারণ করতে পেরেছি কিনা।

শ্রীগুরুর দর্শনের পর পূজ্যপাদ খোকা মহারাজকে দর্শন করতে গেলাম। গিয়ে দেখি, স্বামীজীর ঘরের সংলগ্ন খোলা বারান্দায় খোকা মহারাজ একটা মাদুরে শুয়ে আছেন। চারদিকে ভক্তরা যেন তাঁর বাল্যবন্ধুর মতো তাঁর সঙ্গে হাসি-তামাশা করছেন। কি কথা হচ্ছিল জানি না। তবে সবাই যে বেশ আনন্দে মশগুল সেটা বুঝতে পারছিলাম। আমাকে দেখেই খোকা মহারাজ বললেনঃ "মা, তুমি আমায় একটু বাতাস করতে পারবে?" আমি সঙ্গে সঙ্গে সম্মতিসূচক উত্তর দিয়ে বাতাস করছি, আর মহারাজ একটু পর পর বলছেনঃ "মা, তোমার হাতে কি লাগছে?" আমি বলছিঃ "না বাবা, লাগছে না।" আমার স্বামীই আমায় শিখিয়েছেন মৃদু মৃদু বাতাস করতে হয়। যুগাবতারের আদরের দুলালকে এমন বাতাস করলাম যে, গায়ে বাতাস লেগে শরীর শীতল হয়নি। মহারাজ আমাদের জিজ্ঞাসা করলেনঃ "ঠাকুরের বাগান দেখেছ?" স্বামী উত্তর দিলেন, তিনি দেখেছেন কিন্তু আমাকে দেখাননি। তাই মহারাজ "এসো মা, এসো মা" বলে আমাদের নিয়ে গেলেন ঠাকুরের বাগান দেখাতে। সব দেখা হলো। তারপর শ্রীশ্রীঠাকুরের আদরের খোকা আমাদের পুকুরের ঘাটে নিয়ে গিয়ে সিঁড়িতে বসলেন। মহারাজকে মাঝে রেখে আমরা দুজন দুদিকে বসলাম। কত ঈশ্বরীয় কথা, কত সাধারণ গল্প সব হলো। স্বামীজীর কথা বললেন অনেক। আলমবাজার মঠের 'ভূতের বাড়ি'র কথাও হলো। বাসায় ফিরলে স্বামী বললেনঃ "কি ভাগ্য তোমার! এত লোক থাকতে তোমার সেবাই গ্রহণ করলেন! মহারাজজীকে কেমন বাতাস করছিলে তুমি? আমার অসহ্য লাগছিল। আমার ইচ্ছা হচ্ছিল, তোমার হাত থেকে পাখাখানা টেনে নিই। কিন্তু মহারাজ তোমায় আদেশ দিয়েছেন। আমি নিই বা কেমন করে!"

এই জীবনে শ্রীগুরুর পাদপদ্ম শেষদর্শন করতে যাই একদিন সকালে। সময় বোধহয় সকাল ৮টা হবে। অর্ধনিমীলিত চক্ষে মহাপুরুষজী খাটে বসে আছেন। আর চতুর্দিকে গৈরিকধারী সন্ন্যাসীরা করজোড়ে দণ্ডায়মান। প্রভুর কথা শুনছেন। আমরা প্রণাম করে বিদায় নিলাম। কী অপূর্ব স্বর্গীয়

শোভাই না সেদিন দর্শন করলাম। সাধুমণ্ডলী যেন বৈকুণ্ঠধামে আনন্দে বিভোর মনে হলো।

আমি লেখাপড়া কিছুই জানি না। কিন্তু যখনই পত্র দিয়েছি, তাঁর কত আশীর্বাদ পেয়েছি। ২১. ৩. ৩০ তারিখে আদর করে মহারাজজী লিখেছেন: "মা, আমার বয়স হইয়াছে। দিন দিন শরীর খারাপ হইতেছে। এখন এইরূপই হইবে। তুমি আমার জন্য চিন্তিত হইও না। ঠাকুরকে ডাক। তিনি চিরকাল আছেন এবং থাকিবেন। তাঁহার কৃপায় তোমার মঙ্গল হইবে।"

একদিন সকালে মঠে গিয়ে দেখি, সারগাছি থেকে পূজ্যপাদ গঙ্গাধর মহারাজ (স্বামী অখণ্ডানন্দ মহারাজ) এসেছেন। স্বামীজীর ঘরের নিচের ঘরে বসে আছেন। অপূর্ব সুন্দর মহাযোগী। স্বামী বিবেকানন্দের নররূপী নারায়ণের একনিষ্ঠ সেবক। মহারাজের শ্রীচরণ স্পর্শ করে প্রণাম করলাম। মহাসৌভাগ্যের কথা যে, আজ ষাটবছর পরেও মনের মণিকোঠা থেকে সেই সৌরভ যেন জেগে ওঠে। হৃদয় উদ্বেলিত করে মনে করিয়ে দেয় সেই দর্শন-মুহূর্তগুলি।

শ্রীশ্রীঠাকুরের ভ্রাতুষ্পুত্র রামলালদাদাকেও দেখার সুযোগ হয়েছিল। দক্ষিণেশ্বরে গিয়েছি। তিনি তখন ৺মা ভবতারিণীর পূজা করেন। শ্রীশ্রীঠাকুরের ঘরে এসে দেখি, প্রত্যেক পটের সামনে তিনি ধূপ দেখাচ্ছেন। খুব অন্তর্মুখ ভাব। কোন কথা শুনলাম না। শুধু দর্শন করলাম।

শ্রীশ্রীযুগাবতারের পার্ষদ পূজ্যপাদ মাস্টার মশায়কে প্রথমবার দর্শনের সুযোগলাভ হয় তাঁর ৫০ নং আমহার্স্ট স্ট্রীটের বাড়িতে সকাল ৯টা নাগাদ। আমরা দুজনেই গিয়েছিলাম। সেখানে পৌঁছে মাস্টার মশায়ের সৌম্য মূর্তি দর্শন করলাম। শ্রীপাদপদ্মে প্রণাম করে ধন্য হলাম। মাস্টার মশায় বললেন: "যা দেবী সর্বভূতেষু লজ্জারূপেণ সংস্থিতা। নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমোঃ নমঃ। শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরানী বলতেন, লজ্জাই মেয়েদের ভূষণ।" আমার স্বামীকে মাস্টার মশায় বললেন: "তিন মাথাকে বুদ্ধি জিজ্ঞাসা করতে হয়, কুল-বংশ দেখে বিয়ে করতে হয় আর মাঝ নদীর জল খেতে হয়।" মাস্টার মশায় আরও যেসব সুন্দর সুন্দর কথা আমাদের বলেছিলেন তা অবশ্য এখন আমার মনে আসছে না।

দ্বিতীয়বার যখন আমি মাস্টার মশায়ের দর্শনে যাই তখন বিকেল চারটে। বিরাট লম্বা বারান্দায় অফিসফেরত বহু ভক্ত বসে আছেন। ধনী-দরিদ্র সবাই আছেন। তখনকার দিনে মেয়েদের জন্য সভা-সমিতি ইত্যাদিতে চিকের ব্যবস্থা থাকত। তাই আমাকে নিয়ে আমার স্বামী পুরুষভক্তদের থেকে অনেক তফাতে দাঁড়িয়েছিলেন। মাস্টার মশায় শ্রীশ্রীঠাকুরের জিলিপি প্রসাদ নিয়ে আমাদের সামনে এলেন। উপস্থিত সকলকে দুহাত ভরে জিলিপি দিলেন। আমাদের প্রসাদ খাওয়া হলে নিজ হাতে সকলকে হাত ধুতে জল ঢেলে দিলেন। পরে আপন মেয়ের মতো আমাকে ডেকে নিয়ে গেলেন অন্দরমহলে। সেখানে গিয়ে বললেন: "যাও মা, তুমি অন্দরমহলে গিয়ে মেয়েদের সাথে গল্প কর।" আমি বাইরে ছিলাম বলেই তিনি পুরুষদের কাছ থেকে আমাকে অন্দরমহলে পাঠালেন। ওঁর নাতনী আমায় অন্দরমহলে নিয়ে গেলেন। সে প্রায় আমারই সমবয়সী, তখনো বিবাহ হয়নি, নাম কনকপ্রভা। তার সঙ্গে আমার ক্ষণিক আলাপের সূত্রে প্রায় ছয়-সাত বছর পত্রালাপ চলেছিল। তারপর ঘটনাচক্রে আমি কোথায় হারিয়ে গেলাম। সেদিন কনকপ্রভা বলেছিল: "দাদু সাধারণতঃ অন্দরে আসেন না।" মাস্টার মশায়ের পুত্রবধূ রুটি বানাচ্ছিলেন। কনকপ্রভার অকৃত্রিম ভালবাসার কথা আজও মনে পড়ে। বিদায়বেলায় জড়িয়ে ধরে কত কথা। আমার স্বামী পুরুষভক্তদের সঙ্গে অমৃতময় শ্রীরামকৃষ্ণ-কথা শ্রবণ করছেন। বোধহয় একেই বলে বৈকুণ্ঠধাম। সন্ধ্যা সমাগমে কনকপ্রভার কাছ থেকে বিদায় নিলাম, যদিও ছেড়ে আসতে মন চাইছিল না।

এখন কেন জানি না, আমার মনে হয় শামুক যদি সাগরে যায়, সে শামুকই থাকে। তার ভিতরে কখনো মুক্তো হয় না। আমি এত মহাপুরুষের সঙ্গ করেছি, কিন্তু কি হয়েছে? তবে মনের মণিকোঠায় স্মৃতি যখন জাগে তখন হৃদয় আনন্দে পরিপূর্ণ হয়ে যায়। মনে হয় আমি কতই না ভাগ্যবতী। □

নিবন্ধ

# ১৪০০ সাল : কবি এক জাগে

## নিভা দে

"মরিতে চাহি না আমি সুন্দর ভুবনে,
মানবের মাঝে আমি বাঁচিবারে চাই।
এই সূর্যকরে এই পুষ্পিত কাননে
জীবন্ত হৃদয়-মাঝে যদি স্থান পাই।" ('প্রাণ')

রবীন্দ্রনাথের এই কথা শুধু রবীন্দ্রনাথের একার নয়—সব মানুষের মনেই থাকে চিরজীবনলাভের এক গোপন আকাঙ্ক্ষা। প্রতিটি মানুষ চায় কোন একভাবে চিরকাল থেকে যেতে এই পাহাড়, সমুদ্র, অরণ্যময় পৃথিবীতে—ষড়ঋতুর দোলা-লাগা রূপ থেকে রূপান্তরে যাওয়া স্নিগ্ধ সবুজ শস্যময়, নদীপ্রবাহিত ধরাতলে অথবা হেমন্ত-শীতের রুক্ষ উদাসীন প্রকৃতিতে বা বর্ষার গুরুগুরু মেঘের ধ্বনিময় ধরায়। অথচ মানুষ জানে—সে অমর নয়। তাই গায়ক তার গানে, শিল্পী তার শিল্পের ভুবনে, কবি তার কবিতায় রেখে যেতে চায় সেই অমরতার ইচ্ছার সঙ্গীত। সাধারণ মানুষও এই চাওয়াটা চায়, অন্যভাবে। কারণ সে ভাবে—

"কিন্তু কোন্ গুণ আছে—যাচিব যে তব কাছে
হেন অমরতা আমি কহ গো, শ্যামা, জন্মদে।"

মধুকবি আরও জানেন—"চিরস্থির কবে নীর হায়রে জীবন-নদে!" সাধারণ মানুষ এসবই জানে, তাই তারা সহজ পথে উত্তরাধিকার রেখে যেতে চায়—ধরায় জীবনখেলায় রেখে যায় জীবন-পরম্পরা। হ্যাঁ, এভাবেও তো উত্তরপুরুষের রক্ত-ধারায় বেঁচে থাকা যায়। স্বামী বিবেকানন্দ তবু বলেছিলেন : "পৃথিবীতে এসেছিস, একটা দাগ রেখে যা।" তিনি যা পারেন সবাই তো তা পারে না। কেউ কেউ পারে। সুতরাং এই সুন্দর পৃথিবীতে মানুষের হাসি-খেলায় চিরকাল বেঁচে থাকা-না-থাকার ইচ্ছায় ও সংশয়ে সবাই দুলে চলে। এমনকি রবীন্দ্রনাথ—আজ জানি যিনি অব্যর্থভাবে কাল সিন্ধু, আমরা প্রতি মুহূর্তে বুঝি, "তাঁকে ভুলে থাকা নয় সে তো ভোলা বিস্মৃতির মর্মে বসি রক্তে মোর দিয়াছো যে দোলা"—সেই মহাকবি, সর্বগুণে গুণান্বিত মানুষটিও কী গভীর সংশয়ে দুলেছেন। এই ১৪০০ সালে বহু আলোচিত তাঁর সেই '১৪০০ সাল' কবিতাটির কয়েকটি লাইন স্মরণ করা যাক—

"আজি হতে শতবর্ষ পরে
কে তুমি পড়িছ বসি আমার কবিতাখানি
কৌতূহল ভরে,
আজি হতে শতবর্ষ পরে।
আজি নব বসন্তের প্রভাতের আনন্দের
লেশমাত্র ভাগ,
আজিকার কোন ফুল, বিহঙ্গের কোন গান,
আজিকার কোন রক্তরাগ—
অনুরাগে সিক্ত করি পারিব কি পাঠাইতে
তোমাদের করে,
আজি হতে শতবর্ষ পরে॥...
আজিকার বসন্তের আনন্দ-অভিবাদন
পাঠায়ে দিলাম তাঁর করে।
আমার বসন্তগান তোমার বসন্তদিনে
ধ্বনিত হউক ক্ষণতরে—
হৃদয়স্পন্দনে তব, ভ্রমরগুঞ্জনে নব,
পল্লবমর্মরে
আজি হতে শতবর্ষ পরে॥"

প্রায় একশো বছর (১৩০২, ফাল্গুন) আগে কবির লেখা এই কবিতার মূল সুর কিন্তু সংশয়—"মনে রবে কিনা রবে আমারে।" আরেকটি গভীর গোপন প্রার্থনা : "তবু মনে রেখো"। এই প্রার্থনা তাঁর কত না কবিতা-গানে কতভাবে মর্মরিত আবেগে প্রকাশ পেয়েছে। তাঁর দীর্ঘ একাশি বছরের জীবনে ঘটেছে অনেক অভিজ্ঞতা। কখনো তিক্ততা ও ক্ষোভের ঢেউ উঠেছে জীবনপাত্র ভরে, তিনি দুঃখদীর্ণ কণ্ঠে হাহাকার করেছেন—এই বাংলাদেশে আর যেন তাঁর জন্ম না হয়। প্রতি মুহূর্তে ঈর্ষার বিষাক্ত বিষ তাঁকে আচ্ছন্ন করেছে, প্রতিটি প্রাপ্তিকে ঘিরে সহস্র কাঁটার জ্বালা তিনি অনুভব করেছেন। তারই কিছু প্রকাশ করেছেন '২৫শে বৈশাখ' কবিতায় :

"সেদিন জীবনের রণক্ষেত্রে
দিকে দিকে জেগে উঠল সংগ্রামের সংঘাত
গুরুগুরু মেঘমন্দ্রে।
একতারা ফেলে দিয়ে
কখনো বা নিতে হলো ভেরি।
খর মধ্যাহ্নের তাপে
ছুটতে হলো জয়পরাজয়ের আবর্তনের মধ্যে।
পায়ে বিঁধেছে কাঁটা,
ক্ষত বক্ষে পড়েছে রক্তধারা,...
ঈর্ষায় মৈত্রীতে,
সঙ্গীতে পরুষ কোলাহলে
আলোড়িত তপ্ত বাষ্পনিশ্বাসের মধ্য দিয়ে
আমার জগৎ গিয়েছে তার কক্ষপথে॥"

অথচ এরপর তিনি 'স্মরণ'-এর মতো কবিতাও লিখেছেন ঃ

"যখন রব না আমি মর্ত্যকায়ায়
তখন স্মরিতে যদি হয় মন,
তবে তুমি এসো হেথা নিভৃত ছায়ায়
যেথা এই চৈত্রের শালবন॥
হেথায় যে মঞ্জরি দোলে শাখে শাখে,
পুচ্ছ নাচায়ে যত পাখি গায়,
ওরা মোর নাম ধরে কভু নাহি ডাকে,
মনে নাহি করে বসি নিরালায়।...
যে-আমি চায়নি কারে ঋণী করিবারে,
রাখিয়া যে যায় নাই ঋণভার—
সে-আমারে কে চিনেছে মর্ত্যকায়ায়।
কখনো স্মরিতে যদি হয় মন,
ডেকো না, ডেকো না সভা, এসো এ ছায়ায়
যেথা এই চৈত্রের শালবন॥"

সেই সংশয়, সেই গোপন প্রার্থনা এখানে— "যদি দূরে যাই চলি তবু মনে রেখো।" তিনি জানেন, পরিপূর্ণ মানবাত্মার ভারবহন করা মানুষের পক্ষে অসাধ্য। দু-চারজন মানুষই সেই ক্ষমতা নিয়ে পৃথিবীতে আসেন। বুদ্ধ, যীশু, মোজেস, মহম্মদ, চৈতন্য, রামকৃষ্ণ বা বিবেকানন্দ— যাঁরা বিশ্ব-চিত্তজয়ী হয়েছেন, তাঁরা সব অন্য পথের পথিক। তাঁরা 'মানুষ' নন, তাঁরা 'মহামানব'। আর দান্তে, গ্যেটে, বায়রন, মিল্টন বা রবীন্দ্রনাথ— এঁরা মহাকবি হলেও কেউ মানুষের সীমাবদ্ধতার ঊর্ধ্বে নন। তাঁদের বিচারপর্ব গ্রহণ-বর্জন-গ্রহণের মধ্য দিয়ে চলতে থাকে—নতুন নতুন সময়ের নতুন নতুন মানুষের দরবারে। একজন কবির বাঁশিতে যে-সুর ওঠে, সে কি বিশ্ব-ঐকতান ধ্বনিত করতে পারে? বড় খণ্ডিত, বড় সীমিত তার ক্ষমতা, যদিও তার স্বপ্ন—

"আমি পৃথিবীর কবি, যেথা তা যত উঠে ধ্বনি
আমার বাঁশির সুরে সাড়া তার জাগিবে তখনি—"।

অথচ তিনি জানেন—

"আমার কবিতা, জানি আমি,
গেলেও বিচিত্র পথে হয় নাই সে সর্বত্রগামী।"
('ঐকতান')

তবে কোন্ গুণে তিনি চিরজীবী হবেন এই মধুময় পৃথিবীতে? এ-পৃথিবী অতি কঠিন স্থানও। এখানে প্রতি মুহূর্তে—

"জীবনের পিছে মরণ দাঁড়ায়ে, আশার পিছনে ভয়—
ডাকিনীর মতো রজনী ভ্রমিছে
চিরদিন ধরে দিবসের পিছে।
সমস্ত ধরাময়।
যেথায় আলোক সেইখানে ছায়া এই তো নিয়ম ভবে,
ও রূপের কাছে চিরদিন তাই এ ক্ষুধা জাগিয়া রবে॥"
('রাহুর প্রেম')

ক্ষুধা বলি বা সুধাই বলি, এই বোধ পৃথিবীর সর্বশেষ মানুষের স্তর থেকে দেবোপম মানুষের মধ্যেও সমানভাবে জাগ্রত, ক্রিয়াশীল। মৃত্যুকে 'তুঁহু মম শ্যাম-সমান' কখনো কখনো মনে হলেও তিনি চান না মৃত্যুর অতল গহ্বরে চিরহারা হতে। অথচ জানেন, মৃত্যু অনিবার্য। প্রতিদিন পায়ে পায়ে সে এগিয়ে আসে, হাতে তার দোলে অনিবার্য বরণ-মালা। তিনি যখন নেই এ-পৃথিবীটা তখন কেমন হবে? সেও তিনি কল্পনা করেছেন নানা ভাবে, কখনো অভিমান ফেনিয়ে উঠেছে বুকের গভীরে—

"আমায় তখন নাই বা মনে রাখলে,
তারার পানে চেয়ে চেয়ে নাই বা আমায় ডাকলে॥
যখন জমবে ধুলো তানপুরাটার তারগুলোয়,
কাঁটালতা উঠবে ঘরের দ্বারগুলোয়,...
তখন এমনি করেই বাজবে বাঁশি এই নাটে,...
চরবে গরু, খেলবে রাখাল ওই মাঠে।"

পর মুহূর্তেই কিন্তু আরেক গভীর রাগিণী

সুর খুঁজে পায় অন্য এক গভীর জীবনবোধে—

"তখন কে বলে গো, সেই প্রভাতে নেই আমি।
সকল খেলায় করবে খেলা এই-আমি।
নতুন নামে ডাকবে মোরে, বাঁধবে নতুন বাহুর ডোরে,
আসবে যাব চিরদিনের সেই-আমি।" ('চির-আমি')

তাহলে এই কি মানুষের শেষকথা, এই কি কবির শেষ ভরসা ?—

"নতুন নামে ডাকবে মোরে, বাঁধবে নতুন বাহুর ডোরে,
আসবে যাব চিরদিনের সেই আমি।"

নব নব জন্মান্তরে এই প্রাণময় পৃথিবীকে কোন একভাবে ছুঁয়ে থাকা—কবির এই ইচ্ছা কিন্তু সাময়িক, খুবই সাময়িক। যে দীর্ঘ কর্মময় জীবন তিনি কাটিয়ে গেলেন, দিয়ে গেলেন সহস্র কবিতা, গান, নাটক, গল্প, ছবি, গদ্য-সাহিত্য, গভীর চিন্তা-ভাবনার নানা ফসল—সে-সবই কি এই নশ্বর দেহ লীন হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই শেষ হয়ে যাবে ? মানুষের দিকে তাকালেন তিনি। জনতার স্রোতের দিকে তাকিয়ে তাদের কাছে যেন শেষ বিনীত প্রার্থনা জানালেন—

"এই কথাটি মনে রেখো, তোমাদের এই হাসিখেলায়
আমি যে গান গেয়েছিলেম···"। ( গীতবিতান )

এভাবেই রবীন্দ্রনাথ বারবার সংশয়ে দুলেছেন, পৃথিবী হয়তো তাঁকে ভুলে যাবে, পর মুহূর্তে নিবেদন রেখেছেন—"তবু মনে রেখো"। তাঁর আরও নানাবিধ দিগন্তবিস্তারী কর্মকুশলতার কথা তুলে তিনি কোন দৃঢ় দাবি রাখেননি। তিনি জানেন—পৃথিবী বড় উদাসীন। তাই তাঁর শেষ পরিচয় এভাবেই দিতে চেয়েছেন—"আমি তোমাদেরই লোক, আর কিছু নয়, এই হোক মোর শেষ পরিচয়।" 'পৃথিবী' কবিতায় তিনি শুনিয়েছেন পৃথিবীর সৃষ্টিতত্ত্বের কথা, তার উত্তালমুখর জীবনস্রোতের কথা, আর 'পৃথিবী'র মতো দৃঢ়তা-ব্যঞ্জক কবিতাতেও তিনি তাঁর সেই চিরকালের আকিঞ্চন শুনিয়েছেন, একটি মাটির ফোঁটার তিলক চেয়েছেন ; বিশাল পৃথিবীর নানা কর্মযজ্ঞে, নানা স্রোতে ক্ষুদ্র মানুষের ক্ষুদ্র কর্মপ্রয়াস ভেসে যায় কোথায় কোন্ অতলে, কে জানে!—

"জীবপালিনী, আমাদের পুষেছ
তোমার খণ্ডকালের ছোট ছোট পিঞ্জরে ;
তারই মধ্যে সব খেলার সীমা,
সব কীর্তির অবসান॥···
জীবনের কোন-একটি ফলবান খণ্ডকে
যদি জয় করে থাকি পরম দুঃখে—
তবে দিয়ো তোমার মাটির ফোঁটার একটি
তিলক আমার কপালে ;
সে চিহ্ন যাবে মিলিয়ে
যে রাত্রে সকল চিহ্ন পরম অচিনের মধ্যে যায় মিশে॥
হে উদাসীন পৃথিবী,
আমাকে সম্পূর্ণ ভোলবার আগে
তোমার নির্মম পদপ্রান্তে
আজ রেখে যাই আমার প্রণতি॥"

পৃথিবীর নির্মম পদপ্রান্তে শেষ প্রণতি রেখেও তিনি তার বিনিময়ে চেয়েছেন একটি বিস্মৃতি-বিজয়ী মাটির ফোঁটার তিলক।

১৩০০ সাল থেকে ১৪০০ সালে এসে আমরা বিগত শতকের ইতিহাসের দিকে তাকিয়ে দেখেছি—নানা ঘটনাস্রোতের ওপরে বারবারই তিনি—রবীন্দ্রনাথ নামটি ফিরে ফিরে এসেছে। তাঁর মহাপ্রয়াণের পর পঞ্চাশ বছর পার হয়ে গেল। এই ১৪০০ সালে পেঁৗছেও দেখি আমাদের জীবনের নানা দিক ছুঁয়ে প্রতিনিয়ত তিনি আবর্তিত, আলোচিত। তাঁর দীর্ঘ প্রভাবের ছায়া থেকে আজকের শিল্পী, কবি, লেখকরা বেরিয়ে এসেছেন সত্য, কিন্তু ফিরে ফিরে তাঁর দিকে তাকাতেই হয় সবাইকে—কারণ তিনিই একা এক ভারতকোষ, সাহিত্যে এক আধুনিক মহাভারতকার। তাঁর সৃষ্টিসমূহে পাই ধ্রুপদী প্রজ্ঞা, আবার আজকের আধুনিকতারও সূচনাস্পর্শ। আমরা তাঁকে ছাড়িয়ে কি বেশি দূরে এগিয়েছি, না পারব কোনদিন ?

তাই তিনি যতই দ্বিধা-সংশয়ে দুলেছেন—শতবর্ষ পরে তাঁর কবিতা কেউ এই ১৪০০ সালে পড়বে কিনা—ততই তিনি কবিতায় গানে বলেছেন—

"তবু মনে রেখো যদি দূরে যাই চলে।
যদি পুরাতন প্রেম ঢাকা পড়ে যায় নবপ্রেমজালে···।"
( গীতবিতান )

আমরা এর উত্তরে বলব—"দিকে দিকে তব বাণী নব নব তব গাথা—অবিরল রসধারা" আজও প্রবাহিত ভুবনজোড়া। ☐

শ্রীমদ্‌বিদ্যারণ্যবিরচিতঃ

# জীবন্মুক্তিবিবেকঃ

## বঙ্গানুবাদ : স্বামী অলোকানন্দ

[ পূর্বানুবৃত্তি : আষাঢ় ১৪০০ সংখ্যার পর ]

অতঃপর স্মৃতি থেকে এই ভেদ পক্ষে উক্তি উদ্ধার করা হয়েছে :

স্মৃতিষ্বপ্যয়ং ভেদ উক্ত ইতি দ্রষ্টব্যঃ।
"সংসারমেব নিঃসারং দৃষ্ট্বা সারদিদৃক্ষয়া।
প্রব্রজন্ত্যকৃতোদ্বাহাঃ পরং বৈরাগ্যমাশ্রিতাঃ ॥
প্রবৃত্তিলক্ষণো যোগো জ্ঞানং সন্ন্যাসলক্ষণম্‌।
তস্মাজ্‌জ্ঞানং পুরস্কৃত্য সন্ন্যসেদিহ বুদ্ধিমান্‌ ॥"
ইত্যাদি বিবিদিষাসন্ন্যাসঃ।

### অন্বয়

স্মৃতিষু অপি ( স্মৃতিতেও ), অয়ং ভেদঃ ( এই ভেদ ), উক্তঃ ( কথিত হয়েছে ), ইতি ( এই প্রকার ), দ্রষ্টব্যঃ ( দ্রষ্টব্য )। সংসারম্‌ ( সংসারকে ), নিঃসারং এব ( সারশূন্যই ), দৃষ্ট্বা ( জেনে ), সারদিদৃক্ষয়া ( সারবস্তু দর্শনাকাঙ্ক্ষায় ), অকৃতোদ্বাহাঃ ( অবিবাহিতেরা ), পরং বৈরাগ্যম্‌ ( পরবৈরাগ্যকে ), আশ্রিতাঃ ( আশ্রয় করে ), প্রব্রজন্তি ( প্রব্রজ্যা অবলম্বন করেন )। যোগঃ ( কর্ম ), প্রবৃত্তিলক্ষণঃ ( প্রবৃত্তি লক্ষণ ), জ্ঞানং ( জ্ঞান ), সন্ন্যাসলক্ষণম্‌ ( সন্ন্যাসাত্মক ), তস্মাৎ ( সুতরাং ), বুদ্ধিমান্‌ ( হে বুদ্ধিমান ), জ্ঞানং ( জ্ঞানকে ), পুরস্কৃত্য ( অগ্রবর্তী করে ), ইহ ( এই সংসার ), সন্ন্যসেৎ ( ত্যাগ করবে )। ইত্যাদি বিবিদিষাসন্ন্যাসঃ ( এই প্রকার বিবিদিষা সন্ন্যাসের কথা )।

স্মৃতিতেও এই ভেদ কথিত হয়েছে :

সংসারকে সারশূন্য জেনে সারবস্তু দর্শনাকাঙ্ক্ষায় অবিবাহিতেরা পরবৈরাগ্যকে আশ্রয় করে প্রব্রজ্যা অবলম্বন করেন। কর্মই প্রবৃত্তির লক্ষণ, জ্ঞানই সন্ন্যাসাত্মক। সুতরাং জ্ঞানকে অগ্রবর্তী করে এই সংসার পরিত্যাগ করবে। এই প্রকার বিবিদিষা সন্ন্যাসের কথা।

উপরোক্ত স্মৃতিবচনের আকর সম্বন্ধে সঠিক জানা যায় না। পণ্ডিত দুর্গাচরণ চট্টোপাধ্যায় বলেছেন : "পারাশর—মাধবীয় স্মৃতিতে অঙ্গিরা বচন বলিয়া উদ্ধৃত ও বিশ্বেশ্বর বিরচিত 'যতিধর্ম সংগ্রহে' বৃহস্পতিবচন বলিয়া উদ্ধৃত, দৃষ্ট হয়।"

উক্ত বচনে সুস্পষ্টভাবে নিত্যানিত্যবস্তুর বিবেক-বিচার দ্বারা চরমতম লক্ষ্য আত্মজ্ঞানকেই নির্দেশ করা হয়েছে। জগতের অসারত্বকে জেনে সারবস্তুর অন্বেষণই কর্তব্য। ঈশোপনিষদের প্রথম মন্ত্রেও বলা হয়েছে : 'ঈশার দ্বারা এই জগতের যাবতীয় আচ্ছাদিত, জগতের জগৎ ভাবটিকে পরিত্যাগ-পূর্বক আত্মাকে পালন, পোষণ কর্তব্য'। এই সেই 'মায়ার ছাল ছাড়িয়ে ব্রহ্মফল খাওয়ার' উপদেশ। সাধক জগতের মধ্যে অবস্থান করে বিচারপূর্বক অসার ভাবকে পরিত্যাগ করে সারবস্তুকে ধরবে—এইটিই শাস্ত্রের নির্দেশ।

আচার্য শঙ্কর বলেছেন : 'অবিদ্যাকামকর্ম-মূলম্‌'। কর্মই সমস্ত প্রবৃত্তির মূল। কর্মই আমাদের প্রবৃত্তি পরম্পরায় ছুটিয়ে নিয়ে যায়। অথবা প্রবৃত্তিই কর্ম করায়। প্রবৃত্তি এবং কর্ম পরস্পর ওতপ্রোতভাবে জড়িত। জ্ঞানই একমাত্র এই প্রবৃত্তি পরিহারের উপায়। জ্ঞান হলো নিত্যানিত্য বস্তুর বিবেক। এই বিবেকবলেই আমরা সংসার-সমুদ্রকে অতিক্রম করতে পারি। শ্রীরামকৃষ্ণদেব তাঁর স্বভাবসিদ্ধ ভাষায় বলেছেন : "সংসার-সমুদ্রে কামক্রোধাদি কুমির আছে। হলুদ গায়ে মেখে জলে নামলে কুমিরের ভয় থাকে না। বিবেক-বৈরাগ্য—হলুদ। সদসৎ বিচারের নাম বিবেক। ঈশ্বরই সৎ, নিত্যবস্তু। আর সব অসৎ, অনিত্য ; দুদিনের জন্য।" ( 'কথামৃত', ১ম খণ্ড, উদ্বোধন সং, পৃঃ ১০১ )

সুতরাং শাস্ত্র নির্দেশ করছেন—ঐ বিবেক-জ্ঞানকে অগ্রবর্তী করে সন্ন্যাস অবলম্বনীয়।

স্মৃতিমতে বিবিদিষা সন্ন্যাস এইপ্রকার। অতঃপর বিদ্বৎ সন্ন্যাস সম্বন্ধে বলছেন ঃ

"যদা তু বিদিতং তত্ত্বং পরং ব্রহ্ম সনাতনম্।
তত্রৈকদণ্ডং সংগৃহ্য সোপবীতং শিখাং ত্যজেৎ ॥
জ্ঞাত্বা সম্যক্ পরং ব্রহ্ম সর্বং ত্যক্ত্বা পরিব্রজেৎ।
ইত্যাদি বিদ্বৎসন্ন্যাসঃ।"

**অন্বয়**

যদা তু ( কিন্তু যখন ), সনাতনম্ ( সনাতন ), পরং ব্রহ্ম ( পরব্রহ্ম ), তত্ত্বং ( তত্ত্ব ) বিদিতং ( জ্ঞাত হয় ), তত্র ( তখন ) একদণ্ডং ( এক দণ্ড ), সংগৃহ্য ( গ্রহণ করে ), সোপবীতং ( উপবীত সহ ), শিখাং ( শিখা ), ত্যজেৎ ( ত্যাগ করবে ), পরং ব্রহ্ম ( পরব্রহ্মকে ) সম্যক্ ( যথাযথ ) জ্ঞাত্বা ( জেনে ), সর্বং ( সকল বস্তু ), ত্যক্ত্বা ( পরিত্যাগ করে ), পরিব্রজেৎ ( সন্ন্যাস গ্রহণ করবে )। ইত্যাদি বিদ্বৎ-সন্ন্যাসঃ ( এই প্রকার বিদ্বৎসন্ন্যাস )।

**বঙ্গানুবাদ**

যখন সনাতন পরব্রহ্মতত্ত্ব জ্ঞাত হয়, তখন একদণ্ড গ্রহণ করে উপবীতসহ শিখা পরিত্যাগ করবে এবং পরব্রহ্মকে যথাযথভাবে জেনে সকল বস্তু পরিত্যাগ করে সন্ন্যাস গ্রহণ করবে। এই হলো বিদ্বৎসন্ন্যাস।

বিবিদিষা সন্ন্যাসে পরব্রহ্মতত্ত্বকে জানবার জন্য, সারবস্তুর দর্শনাকাঙ্ক্ষায় সাধক নিত্যানিত্য বস্তুর বিবেক অবলম্বন করে, পরবৈরাগ্যকে আশ্রয় করে ক্রমপর্যায়ে সাধনার স্তরে পরমহংসত্ব লাভে প্রয়াসী হন। কিন্তু বিদ্বৎসন্ন্যাসে মানসিক স্তর অধিক ঊর্ধ্বে, পরবৈরাগ্যে প্রতিষ্ঠিত। বৈরাগ্যের গতি-প্রকৃতি অনুযায়ী কতকগুলি বিভাগ রয়েছে। যতমান, ব্যতিরেক, একেন্দ্রিয় ও বশীকার নামে চারপ্রকার বৈরাগ্য সাধকের প্রাথমিক পর্যায়ে সাধ্য। এগুলি অপরবৈরাগ্য নামে কথিত। (১) যতমান—নিত্যানিত্য বস্তুর বিবেক গুরু ও শাস্ত্র সহায়ে জানবার যে-উদ্যম। (২) ব্যতিরেক—চিত্তগত রাগদ্বেষাদির কতগুলি নিবৃত্ত হয়েছে, কতগুলি রয়েছে—এরূপ বিশ্লেষণকে ব্যতিরেক বলে। (৩) একেন্দ্রিয়—ঐহিক ও পারত্রিক বিষয়ে প্রবৃত্তি দুঃখাত্মক জেনে বহিরিন্দ্রিয়ের প্রবৃত্তি রোধ হলেও চিত্তগত তৃষ্ণা তখনো বিদ্যমান। এরূপ বৈরাগ্যের নাম একেন্দ্রিয় এবং (৪) সমস্ত বিষয় নশ্বর জেনে বস্তুসমূহের প্রতি আসক্তিত্যাগে প্রযত্নশীল হওয়ার নামই বশীকার বৈরাগ্য। পতঞ্জলি বশীকার বৈরাগ্যের বর্ণনায় বলছেন ঃ 'দৃষ্টানুশ্রবিকবিষয়-বিতৃষ্ণস্য বশীকারসংজ্ঞা বৈরাগ্যম্' ( পাতঞ্জল যোগ-সূত্র, সমাধি পাদ-১৫ )। কিন্তু এসকল থেকে ভিন্ন প্রকারের বৈরাগ্য, যা লাভ হলে আমরা সমস্ত গুণা-বলীতে পর্যন্ত বীতরাগ হই এবং সেই সকলকে পরিত্যাগ করি ও ফলতঃ পুরুষের প্রকৃত স্বরূপ প্রকাশিত হয়, তাকে পরবৈরাগ্য বলা হয়। "তৎপরং পুরুষখ্যাতেগুর্ণবৈতৃষ্ণ্যম্" ( ঐ, ১৬ )। বিবিদিষা সন্ন্যাসীর এই ভাব সাধ্য কিন্তু বিদ্বৎসন্ন্যাসী এই বৈরাগ্যে প্রতিষ্ঠিত, তাই তিনি তৎক্ষণাৎ সর্ব-ত্যাগপূর্বক সন্ন্যাস অবলম্বন করবেন। এইভাবে স্মৃতিবাক্য থেকেও উভয়ের অবান্তর ভেদ প্রদর্শিত হয়েছে। [ ক্রমশঃ ]

নিবন্ধ

# ভারতীয় আধ্যাত্মিকতার এক দিক

## রামবহাল তেওয়ারী

আধ্যাত্মিকতার দেশ ভারতবর্ষ। বেদ-উপনিষদের যুগ থেকেই ভারতীয় জীবনের সৃজক, ধারক-বাহক ও উৎকর্ষবিধায়িকা শক্তি আধ্যাত্মিকতাই। সে-ঐতিহ্য আজও অক্ষুণ্ণ। যথার্থ আধ্যাত্মিকতার দেশ-কাল-পাত্রের কোন ভেদাভেদ বা বাছবিচার নেই। তাই ভারতীয় চিত্ত সেই কোন্ সুদূর কাল থেকেই ধর্মসংহৃতি ও মানবমঙ্গলের সাধনা করে আসছে। শ্বেতাশ্বতর-উপনিষদে বিশ্ববাসীকে 'অমৃতের পুত্র'-রূপে এক এবং অভিন্ন হওয়ার কথা স্মরণ করানো হয়েছে ঃ

"শৃণ্বন্তু বিশ্বে অমৃতস্য পুত্রাঃ।
আ যে ধামামি দিব্যানি তস্থুঃ।" (২।৫)

রবীন্দ্রনাথ এই মন্ত্রকে অনুসরণ করে বলেছেন ঃ

"একদা এ ভারতের কোন্ বনতলে
কে তুমি মহান্ প্রাণ, কী আনন্দবলে
উচ্চারি উঠিলে উচ্চে—'শোন বিশ্বজন,
শোন অমৃতের পুত্র যত দেবগণ
দিব্যধামবাসী, আমি জেনেছি তাঁহারে,
মহান্ত পুরুষ যিনি আঁধারের পারে
জ্যোতির্ময়। তাঁরে জেনে, তাঁর পানে চাহি
মৃত্যুরে লঙ্ঘিতে পার, অন্য পথ নাহি।"

('নৈবেদ্য', ৬০)

আবার পঞ্চতন্ত্রের 'অপরীক্ষিতকারকম্' শিরোনামে বলা হয়েছে, বাইরের প্রকাশগত শত পার্থক্য সত্ত্বেও সমগ্র বসুন্ধরা এক ও অভিন্ন। যথার্থ উদারতা ও মহত্ত্বের পরিচয় এতেই নিহিত।

"অয়ং নিজঃ পরোবেতি গণনা লঘুচেতসাম্।
উদারচরিতানাং তু বসুধৈবকুটুম্বকম্॥"

(৩৮ নব,)

এই 'বসুধৈবকুটুম্বকম্' ভাবটিই প্রতিধ্বনিত ও প্রতিফলিত রবীন্দ্রনাথের 'শান্তিনিকেতন'-এর ধারণায় ঃ "শান্তিনিকেতন বা 'বিশ্বভারতী'— 'যত্র বিশ্বং ভবত্যেকনীড়ম্।' যে আত্মীয়তা বিশ্বে বিস্তৃত হবার যোগ্য, সেই আত্মীয়তার আসন এখানে আমরা পাতব।" (বিশ্বভারতী, অধ্যায়-১২)।

শুক্লযজুর্বেদের উদ্দিষ্ট পুরো মন্ত্রটি হলো ঃ

"বেনস্তৎ পশ্যান্নিহিতং গুহা সদ্যত্র
বিশ্বং ভবত্যেকনীড়ম্।
তস্মিন্নিদং সং চ বি চৈতি সর্বং
স ওতঃ প্রোতশ্চ বিভূঃ প্রজাসু।"

(শুক্লযজুর্বেদ, ৩২।৮)

দেখা যাচ্ছে, ভারতের চিন্তা কেবল ভারতকে নিয়ে নয়, বিশ্বকে নিয়েও এবং তা অতীতে যেমন ছিল, বর্তমানেও কি তেমনই আছে? রবীন্দ্রনাথ টের পেয়েছিলেন যে, ভারতের ধারায় যেন সেই চিন্তা কোথায় হারিয়ে যাচ্ছে। তাই ভারত-চিত্তের সাধনার সেই ধারা যেন কখনো ছিন্ন না হয় সেজন্য রবীন্দ্রনাথের একান্ত ব্যাকুলতা ঃ

"আরবার এ ভারতে কে দিবে গো আনি
সে মহা আনন্দমন্ত্র, সে উদাত্তবাণী
সঞ্জীবনী, স্বর্গে মর্ত্যে সেই মৃত্যুঞ্জয়
পরম ঘোষণা, সেই একান্ত নির্ভয়
অনন্ত অমৃতবার্তা।
রে মৃত ভারত,
শুধু সেই এক আছে, নাহি অন্য পথ।"

('নৈবেদ্য', ৬০)

রবীন্দ্রনাথের এই ব্যাকুলতা, এই সাবধানবাণী ও পথনির্দেশ আপাতভাবে কেবল ভারতের প্রতি ইঙ্গিত করলেও, তার ব্যঞ্জনা অতি ব্যাপক এবং বস্তুতঃ তা বিশ্ব-জাগতিক। অতীত ভারতের শিক্ষা, জ্ঞানৈশ্বর্য এবং জীবন-সাধনা এযুগেও ভারত তথা বিশ্বের সুরক্ষা, সমৃদ্ধি এবং সফলতার একমাত্র পথ। কিন্তু বিশ্বের সঙ্গে সঙ্গে আমরাও যে সেকথা ভুলে যাই। ক্ষুদ্র-সঙ্কীর্ণ স্বার্থ, স্থূল চিত্তের দৈন্য, সাময়িক সুখ-আনন্দ ও উত্তেজনা ব্যক্তি, সমষ্টি ও জাতিকে আত্মবিস্মৃত করে তোলে। অতীতের ঐতিহ্য, হৃদয়-সম্পদ এবং ঐক্যানুভূতি হারিয়ে আমরা ছিন্নমূল হয়ে পারস্পরিক ছিন্নতা ও বিচ্ছিন্নতাকে আশ্রয় করে অজ্ঞানের আঁধার-সমুদ্রে দিশাহীনের মতো ভাসতে থাকি। অশুভই তখন আমাদের কাছে চরম বাস্তব ও পরম শ্রেয় মনে হয়। এই শোচনীয় অবস্থা যখন শোচনীয়তর হয়,

আমরা যখন ডুবতে বসি, সেই মুহূর্তে করুণা বা দয়ার পাত্রের ত্রাণের জন্য পরম কারুণিকের করুণা-কিরণ সমস্ত বেড়াজাল ভেদ করে সংহত কোমল-কঠিন প্রেমার্ত রূপ নিয়ে আবির্ভূত হয়। ঘটে যায় অকল্পনীয় পরিবর্তন—দুষ্টের দমন, শিষ্টের পালন। ধর্মপ্রতিষ্ঠার আন্দোলনে তখন সাড়া পড়ে যায়। আধ্যাত্মিকতার নবীন স্পর্শে, এতদিনকার সুষুপ্ত বা আবৃত চিত্ত সঞ্জীবিত হয়ে ওঠে। প্রয়াস দেখা দেয় 'আত্মানং বিদ্ধি'র। এমন ঘটনা ঘটেছে ভারতবাসীর জীবনে বহুবার বহু যুগে এবং বহু রূপে। এই প্রসঙ্গে মধ্যযুগের সগুণ-নির্গুণ পন্থী সাধকদের আবির্ভাবের পূর্বে ভারতবর্ষের যে আত্মবিস্মৃতি, ঐতিহ্য-বিচ্যুতি, শোচনীয় অবস্থা হয়েছিল সে-কথা বিশেষভাবে স্মরণীয়। তার থেকে পরিত্রাণের জন্য নির্গুণ-সাধকরূপে কবীর, রবিদাস, দাদূদয়াল, সুন্দরদাস প্রমুখ সন্ত-কবি ভারতীয় আধ্যাত্মিকতা ও ধর্ম-ভাবনা এবং মানবকল্যাণের যে সহজ সুন্দর বাস্তব-সম্মত ব্যাখ্যা এবং সাধন-পথ তুলে ধরেছিলেন, তা যেমন যুগোপযোগী, তেমনই মনুষ্যজাতির সুরক্ষা এবং মঙ্গলের দ্যোতক ছিল। হিন্দু-মুসলমানের এই সম্মিলিত ধর্মসংহতির সাধনা কেবল ভারতেরই নয়, সমগ্র পৃথিবীর ইতিহাসে মানবমঙ্গলের মহৎ আন্দোলনরূপে উল্লেখযোগ্য। এই সাধককুল 'শিক্ষিত' ছিলেন না, শাস্ত্র বা ধর্মশাস্ত্র পড়েননি, তবে যে-বাণী তাঁরা প্রচার করতেন তা মনের বিচারে বেদ-বেদান্ত বা উপনিষদের শিক্ষারই প্রতিধ্বনি ছিল। এই জাতীয় মানবহিতের উদ্দেশ্যে সর্বধর্মসমন্বয়ের সার্থক প্রয়াস করেন আধুনিক যুগে শ্রীরামকৃষ্ণদেব। লেখা-পড়া, বলার ভাষা ও ভঙ্গি, বক্তব্য এবং উদ্দেশ্যের বিচারে মধ্যযুগের সাধকদের সঙ্গে ঠাকুরের মিল বহুলাংশে, আবার অমিলও ছিল অনেক। মধ্যযুগের কবীর প্রমুখ সাধকরা শাস্ত্র মানতেন না, অন্যকেও 'না-মানতে' বলতেন। সগুণ পন্থার সঙ্গে তাঁদের কোন সম্পর্কই ছিল না। কিন্তু রামকৃষ্ণদেব শাস্ত্রাদি এবং সগুণ উপাসনার প্রতি পূর্ণমাত্রায় আস্থাশীল ছিলেন। তাঁর সাধনা সগুণ-নির্গুণ, সাকার-নিরাকার, হিন্দু-মুসলমান, বৌদ্ধ-খ্রীস্টান প্রভৃতি সর্বধর্মানুভূতির সমন্বিত যুগোচিত রূপ। 'যত মত তত পথ' তাঁর দ্বারা শুধু স্বীকৃতই হয়নি, তাঁর মধ্যে একীভূত রূপ লাভও করেছে। ধর্মকে তিনি স্থান-কাল-পাত্রের গণ্ডির অতীত সব দেশের, সব কালের, সকলের পরম সম্পদ ও আশ্রয়রূপে প্রতিপন্ন করেছেন। রামকৃষ্ণদেবের এই সরল উদার সর্বজনহিতায় সাধনায় ভারতের আধ্যাত্মিক-চিন্তের যথার্থ পরিচয় সুপরিস্ফুট। ঠাকুর কবীর প্রমুখ সন্ত-কবির মতো নিজে লেখেননি কিছু, কেবল বলেছেন এবং বুঝিয়েছেন। কিন্তু তাঁর বিষয়ে লেখা হয়েছে এবং হচ্ছে প্রচুর। সেই রচনাসম্ভার 'রামকৃষ্ণ-সাহিত্য'রূপে আজ অভিহিত।

এই সাহিত্য বাঙলা তথা ভারতীয় ভক্তিসাহিত্যে এক নবসংযোজন। আজ ভারতীয় জীবনে যেখানেই শ্রদ্ধা, ভক্তি ও আধ্যাত্মিকতার চর্চা-অনুশীলন ও রূপায়ণ, সেখানেই রামকৃষ্ণ-সাহিত্য পঠন-চিন্তন-মনন এবং স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনার ব্যাখ্যা এবং অনুসরণ-প্রয়াস লক্ষিত হয়। কেবল ভারতই নয়, সারা বিশ্বই আজ এই নতুন অধ্যাত্মসাহিত্যের গুরুত্ব, মহত্ত্ব ও উপযোগিতা অনুধাবন করছে। ভারতীয় আধ্যাত্মিকতা যুগের ও বিশ্বের প্রয়োজনে আজ বিশ্বময় ব্যাপ্তি ও স্বীকৃতিতে ভাস্বর হয়ে উঠেছে, পর্যবসিত হয়েছে লোকধর্মে বা বিশ্বধর্মে। ভারতীয় অধ্যাত্মবাদ লোকধর্ম বা বিশ্বধর্মের সহজ এবং স্বতঃস্ফূর্ত স্বীকৃতি লাভ করেছে শ্রীরামকৃষ্ণের জীবন ও সাধনায়।

বস্তুতঃ ভারতীয় অধ্যাত্মবাদ পুষ্ট হয়েছে ভারতের বহু সাধক তথা সাধককুলের অনাবিল সাধনায়। তাঁদের অনেকের কথাই আমরা জানি, আবার কারও কারও কথা আমরা জানি না বা ভুলে গেছি। এরকম একজন সাধক গুজরাটের প্রাণনাথ (১৬১৮-১৬৯৪ খ্রীস্টাব্দ)। তাঁর পারিবারিক নাম ছিল মেহরাজ ঠাকুর। তাঁকে কারাজীবন ও দৈহিক নির্যাতন ভোগ করতে হয়েছিল। কারাগারেই তাঁর 'রাস', 'প্রকাশ', 'ষড়্ঋতু', 'কলস' প্রভৃতি পরমাধ্যাত্মিক গ্রন্থ রচিত হয়। এসব গ্রন্থের এক-একটি শব্দ ও বাক্য যেন এক-একটি মন্ত্র, যাতে মানুষের 'ভববন্ধন খণ্ডন' এবং আত্মার পরম প্রকাশের অনবদ্য সন্দেশ নিহিত।

তিনি কোরানের মূলতত্ত্বের সঙ্গে হিন্দুধর্মের মূল তত্ত্বের সাম্য নতুন করে অনুধাবন করেন। বেদ-উপনিষদে, শ্রীমদ্ভাগবতে এবং কোরানে একই সচ্চিদানন্দ ব্রহ্মের অসীম মহিমার অস্তিত্ব তাঁর ধর্মচিন্তাকে নতুন গতিপথ দান করে।

মধ্যযুগের অপরাপর সাধকগণ যেরকম সহজ ভাষাতে বাণী প্রচার করেছিলেন, প্রাণনাথও তাই করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন, বিদ্বেষ দূর না হলে শান্তি ও সম্প্রীতি কখনো সম্ভব নয়। ধর্মের প্রকাশ দয়া, ক্ষমা, সত্য, শীল, উদারতা, প্রেম, শান্তি, সহানুভূতি ও ঐক্যবোধে, যা মানুষকে দিব্যপথের দিকে নিয়ে যায়। সুতরাং তা সাধন করতে হলে হিন্দু ধর্মগ্রন্থের সঙ্গে সঙ্গে ইসলাম, খ্রীস্টান প্রভৃতি সব ধর্মের গ্রন্থই শ্রদ্ধার সঙ্গে পড়তে ও গ্রহণ করতে হবে। ভুললে চলবে না যে, আমরা আমাদের লৌকিক বুদ্ধি এবং অক্ষমতার জন্য ধর্মের গভীর তত্ত্ব বুঝতে না পেরে অপব্যাখ্যা করি, আর ভেদ-বিভেদের বেড়াজাল তুলে ধরে মহৎ ধর্মকে খর্ব, ক্ষুদ্র ও সঙ্কীর্ণরূপে খাড়া করে থাকি। এই ধারার মূলোচ্ছেদ না করলে সর্বমানবের স্থায়ী কল্যাণ অসম্ভব। কিন্তু এই মহৎ কর্ম তখনই সম্ভব, যখন আমরা নিজেদের এবং অন্যের ধর্মের বাস্তব এবং সর্বজনমঙ্গলকারী তত্ত্বগুলি সঠিকভাবে পুরোপুরি বোঝবার শক্তি, সাহস ও সহিষ্ণুতা অর্জন করতে পারব, সকল ধর্মের মধ্যে নিহিত সামঞ্জস্য অনুধাবন করে তাকে জীবনে সাকার করে তুলতে পারব। মানবপ্রেমে ঈশ্বরপ্রেমের প্রতিফলন প্রত্যক্ষ করে পরস্পর অনন্যপ্রেমের ভাবে বিভোর মানুষ নিরন্তর আত্মজ্ঞান লাভ করে, উপলব্ধি করতে পারে 'আমি কে'? 'কোথা থেকে এসেছি'? 'এই নিখিল চরাচর বিশ্ব কি'? 'এর শেষ কোথায়' এবং 'আমার জীবনের লক্ষ্য কি'?—এই ধরনের ভাবনা-চিন্তা প্রাণি-মনে জাগ্রত হলে জীবনের লক্ষ্য-প্রাপ্তিতে আর কোন বাধা অটল হয়ে দাঁড়াতে পারে না।

প্রাণনাথের অনুগামীরা 'প্রণামী' সম্প্রদায় নামে পরিচিত। তাঁরা গুরুর মধ্যে পূর্ণব্রহ্মের অবস্থানে বিশ্বাস করেন। গুরুকে তাঁরা নিজেদের আত্মার একমাত্র অধীশ্বররূপে দেখেন। তাই তাঁরা গুরুকে 'প্রাণনাথ' অভিধায় ভূষিত করেন। তাঁদের বিচারে প্রত্যেকেই প্রত্যেকের কাছে প্রেমাস্পদ ও প্রণম্য। 'প্রণাম' দিয়েই তাঁদের সম্ভাষণ শুরু হয়। তাই 'প্রণামী' সম্প্রদায় নামে তাঁদের পরিচিতি।

'প্রণামী' সম্প্রদায়ের মহাগ্রন্থ 'তারতম্য-সাগর'। তাতে বেদ, পুরাণ, উপনিষদ্, ভাগবত, কোরান প্রভৃতির প্রাণনাথ-কৃত ব্যাখ্যায় সমন্বয়ের স্বরূপ ফুটে উঠেছে। 'তারতম্য-সাগর' মোট ১৭টি শাস্ত্র-গ্রন্থ, ৫২৭টি প্রকরণ ও ১৮৭৫৮টি শ্লোক নিয়ে রচিত। তার মূল ভাব হলো ধর্মসমন্বয়, মানব-প্রেম ও ঈশ্বরপ্রেম। বড় সহজ, সুন্দর ও আকর্ষণীয় ভঙ্গিতে সেই ভাব সেখানে উপস্থাপিত। সমন্বয়, মানবপ্রেম এবং ঈশ্বরপ্রেমের শেষকথা হলো ব্রহ্মানুভূতি, যার দ্বারা মানুষমাত্রের মধ্যে প্রেম ও শান্তির বোধ জাগ্রত হবে, আত্মা ও পরমাত্মার সম্যক্ ঐক্যানুভূতি লাভ করে ব্রহ্মানন্দ-স্বাদে মানুষ ঋদ্ধ হবে। পৃথিবীতে জাতি ও ভাষার অন্ত নেই, রুচি ও ভাবনার অন্ত নেই। কিন্তু সকলের মধ্যে সাধারণ বৈশিষ্ট্য হলো অহং-বোধ। সেই বোধকে সঙ্কীর্ণ স্তর থেকে উত্তরণ ঘটিয়ে বিশ্ববোধে উন্নীত করতে হবে।

'প্রণামী' সম্প্রদায়ের মহাসাধক প্রাণনাথ যেন মধ্যযুগের ভারতীয় সাধকসম্প্রদায় ও আধুনিক যুগের মহাসাধক শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ঈশ্বরভক্তি ও মানবপ্রেমের বাস্তবসম্মত সাধনার মধ্যেকার অনন্য যোগসূত্র। এই যোগসূত্রটি আমাদের মনে করায় —শ্রীরামকৃষ্ণের আবির্ভাব আকস্মিক নয়। দেশের, জাতির ও বিশ্বের প্রয়োজনে তাঁর আগমনের ভিত্তিভূমি প্রস্তুত হয়েইছিল, যেমন হয়ে থাকে যুগে যুগে। আত্মবিস্মৃতি থেকে জাগরণ, ভ্রান্ত পথ থেকে প্রত্যাবর্তন, অমঙ্গল ও অশুভের সর্বৈব ত্যাগ, ঈশ্বরভক্তি, মানবপ্রেম ও বিশ্বপ্রেমে অনুরক্তি ঘটে অবতারপুরুষদের উপদেশ ও আশীর্বাদে। বাহ্যিক ও আভ্যন্তরিক কলুষ থেকে মুক্তি পায় মানুষ। ক্ষুদ্রতা থেকে মহত্ত্বের দিকে, সংকীর্ণতা থেকে উদারতার দিকে, ব্যষ্টি থেকে সমষ্টির দিকে, দেশ থেকে বিশ্বের দিকে এবং মানবপ্রেম থেকে ঈশ্বরপ্রেমের দিকে, ঈশ্বরভক্তির দিকে আস্থা ও বলিষ্ঠতার সঙ্গে উত্তরণ ঘটে মানবজাতির। আর তখনই চরিতার্থ হয় ভারতীয় আধ্যাত্মিকতা ও ভারত-চিন্তের অভিলক্ষ্য। □

# ভগবৎ প্রসঙ্গ

## স্বামী মাধবানন্দ

[ পূর্বানুবৃত্তি ]

**১৯৫৬ খ্রীষ্টাব্দে নিউইয়র্ক বেদান্ত সোসাইটিতে অনুষ্ঠিত এবং ডিসেম্বর ১৯৬৮ খ্রীষ্টাব্দে 'Prabuddha Bharata' পত্রিকায় প্রকাশিত প্রশ্নোত্তরমালার অবশিষ্টাংশের ভাবানুবাদ। ইংরেজী থেকে বাঙলায় অনুবাদ করেছেন স্বামী শরণ্যানন্দ।—সম্পাদক, উদ্বোধন**

প্রশ্ন—একজন উচ্চশ্রেণীর ধর্মবীরের সঙ্গে অবতারপুরুষের পার্থক্য কতখানি ?

উত্তর—দুজনের মধ্যে আধ্যাত্মিক শক্তির অনেক পার্থক্য থাকে। সাধারণ মানুষ সাধন-ভজনের দ্বারা উন্নতিলাভ করে একজন উচ্চশ্রেণীর ধর্মবীরে পরিণত হতে পারেন, কিন্তু অবতারপুরুষ জন্মাবধিই অবতার। ঈশ্বর যখন মানবদেহ বা অন্য কোন প্রাণীর দেহ অবলম্বন করে আবির্ভূত হন তখন তাঁকে অবতার বলা হয়। স্বামী বিবেকানন্দ বলতেন: "বিড়াল যদি ঈশ্বরের ধারণা করতে চায় তবে সে তাঁকে একটি বড় আকারের বিড়ালরূপেই কল্পনা করবে, অন্যান্য প্রাণীদের ক্ষেত্রেও তাই। আমরা যেহেতু মানুষ, আমরা ঈশ্বরকে মনুষ্যদেহধারী-রূপেই চিন্তা করব।" ঈশ্বর মনুষ্যশরীর ধারণ করলেই তাঁকে অবতার বলে সম্মান করা হয়। সুতরাং অবতারপুরুষের সঙ্গে একজন ধর্মবীরের পার্থক্য অসীম সমুদ্রের মতো—দুটি বিপরীত মেরুর মধ্যে যতখানি ব্যবধান, অথবা সূর্য ও জোনাকির মধ্যে যতখানি পার্থক্য প্রায় ততখানি। অবশ্য এই দৃষ্টান্তগুলিও তাঁদের আধ্যাত্মিক শক্তির তারতম্য বোঝাবার পক্ষে যথেষ্ট নয়।

প্রশ্ন—অবতারকে কিভাবে চেনা যায় ?

উত্তর—কোন মানুষের মধ্যে আধ্যাত্মিক শক্তির প্রকাশ দেখে বোঝা যায় তিনি অবতার কিনা। প্রথমতঃ, ধর্মজগতের এমন কোন বিষয় থাকবে না যা তাঁর অজানা। দ্বিতীয়তঃ, অপরের মধ্যে ধর্ম-ভাব সঞ্চার করার বিষয়ে তিনি সর্বদা সচেতন থাকবেন। কারণ, অবতাররা লোককল্যাণের জন্যই পৃথিবীতে আবির্ভূত হন, নিজেদের কোন প্রয়োজনে ( বা কর্মফলবশতঃ ) তাঁরা কখনো আসেন না। ভগবান সর্বদা আপন সাম্রাজ্যে ( সমস্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে ) বিরাজ করেন, প্রাণিজগতের অন্তরে বাহিরে সর্বত্রই তিনি থাকতে পারেন। তথাপি নিজের প্রয়োজন না থাকলেও অধর্মের প্রভাব দূর করার জন্য এবং সৎব্যক্তিদের ধর্মপথে সাহায্য করার জন্য তিনি যুগে যুগে আবির্ভূত হন।

সুতরাং কোন ব্যক্তির মধ্যে আধ্যাত্মিক শক্তির অসাধারণ প্রকাশ দেখা গেলে অনুমান করতে পারি, ঈশ্বর তাঁর মধ্যে আবির্ভূত হয়েছেন। তাছাড়া জ্ঞান, ভক্তি, পবিত্রতা, লোককল্যাণে আত্মত্যাগ প্রভৃতি গুণের প্রকাশাধিক্য দেখেও অবতারকে চেনা যায়। তাঁরা সাধারণ মানুষের মতো কখনো মন্দপথে চলেন না বা কোন প্রলোভনের বশীভূত হন না। বড় বড় ধর্মবীরেরা যেসকল সাধনায় সর্বদা কৃতকার্য হতে পারেন না, অবতারপুরুষ সহজেই সেইসকল সাধনায় সিদ্ধিলাভ করেন।

ধর্মগ্রন্থসমূহে অবতারপুরুষদের আধ্যাত্মিক শক্তি সম্বন্ধে যেসকল বিবরণ পাওয়া যায় তা সব অবতারের ক্ষেত্রে সমানভাবে প্রযোজ্য নয়। তাঁদের মধ্যে শক্তির তারতম্য থাকলেও যাঁর মধ্যে শক্তির প্রকাশ সর্বাপেক্ষা কম তিনিও একজন ধর্মবীর অপেক্ষা বহুগুণে উন্নত। অবতারপুরুষের মধ্যে যেসকল মহৎ গুণের প্রকাশ দেখা যায় তা সাধারণ মানুষের পক্ষে অর্জন করা অসম্ভব। সুতরাং পূর্বোক্ত গুণাবলীর ও আধ্যাত্মিক শক্তির প্রকাশ দেখেই অবতারপুরুষকে চিনতে পারা যায়।

প্রশ্ন—ঈশ্বরে বিশ্বাস ও দর্শনলাভের উপায় কি ?

উত্তর—পূর্বোক্ত গুণাবলীর প্রকাশ দেখে বোঝা যায় ঈশ্বর অবতীর্ণ হয়েছেন কিনা। অবতার-পুরুষের মধ্যে যে এইসব গুণ বর্তমান থাকে তা

কাল্পনিক বিষয় নয় অথবা অপরের নিকট শোনা কাহিনীও নয়, এগুলি বিশ্বাস করার পক্ষে যথেষ্ট কারণ আছে এবং আমরা নিজেরাই তা যাচাই করে দেখতে পারি। এইসব মহৎ গুণ সাধারণ মানুষের মধ্যে সচরাচর দেখা যায় না। ইতিহাস থেকে জানতে পারি, অবতারপুরুষের ওপর বিশ্বাস স্থাপন করে এবং তাঁদের পবিত্র সঙ্গলাভ করে অনেকেরই যথার্থ কল্যাণ (এমনকি ঈশ্বরদর্শন পর্যন্ত) হয়েছে। সুতরাং আমাদেরও উচিত (অবতারজ্ঞানে) তাঁদের শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস করা।

সাধারণ বিষয়ে আমরা কিভাবে বিশ্বাস করি? বৈদ্যুতিক আলো এবং বৈদ্যুতিক শক্তির অন্যান্য প্রকাশ দেখে আমরা বিদ্যুতের অস্তিত্ব অনুমান করতে পারি। তেমনি আধ্যাত্মিক শক্তি, লোক-কল্যাণে আত্মত্যাগ, জীবের অজ্ঞান দূর করার ক্ষমতা প্রভৃতি গুণের অসাধারণ প্রকাশ দেখে অবতারপুরুষকে চেনা যায়। তাঁদের সংস্পর্শে এলে পাপীরাও সাধুতে পরিণত হয়। এই ধরনের অলৌকিক কাজ দেখেই অবতারপুরুষকে চেনা যায়, কারণ প্রত্যক্ষ বিষয়কে কেউ অস্বীকার করতে পারে না।

প্রশ্ন—শ্রীমা সারদাদেবীকে কেন অবতার বলে স্বীকার করা হয় না?

উত্তর—শ্রীশ্রীমাকে অবতাররূপেই সম্মান করা হয়, সুতরাং প্রশ্নটি যথার্থ নয়। অবশ্য তিনি নিজেকে গোপন করে শ্রীরামকৃষ্ণকেই অবতার বলে প্রচার করতেন। শ্রীশ্রীমা যদিও সর্বসমক্ষে নিজের অবতারত্বের কথা প্রকাশ করেননি, কিন্তু অন্তরঙ্গ ভক্তদের কাছে কখনো কখনো তা করেছেন। ধর্ম-ইতিহাসে আমরা দেখতে পাই, ভগবান যখন পৃথিবীতে অবতীর্ণ হন তাঁর শক্তিও অনেক সময় তাঁর সঙ্গে আসেন। অবতারপুরুষ যদি বিবাহ করেন তবে তাঁর শক্তিকেই সহধর্মিণীরূপে গ্রহণ করেন। সাধারণ কোন নারী অবতারপুরুষের লীলাসঙ্গিনী হতে পারেন না। অবতারপুরুষের সহধর্মিণীকেও তাই অবতার বলা হয়, শ্রীশ্রীমাও সেরূপ একজন অবতার।

প্রশ্ন—কপিল, শঙ্করাচার্য, রামানুজ এবং অন্যান্য ধর্মের মহাপুরুষদের মধ্যে এত মতপার্থক্য কেন?

উত্তর—এটি স্বাভাবিক যে, যিনি যেভাবে সত্যকে উপলব্ধি করেন তিনি সেভাবেই তা প্রচার করে থাকেন। কপিল, শঙ্কর, রামানুজ প্রভৃতি মহাপুরুষেরাও তাই করেছেন। শ্রীরামকৃষ্ণ বিভিন্ন পথে সাধন করে সত্যকে জেনেছিলেন, তাই তিনি ঈশ্বরলাভের বিভিন্ন পথের কথা ("যত মত তত পথ") প্রচার করেছেন। পূর্বোক্ত মহাপুরুষদের উপলব্ধির তারতম্যের জন্য অথবা অন্য কারণবশতঃ তাঁদের উপদেশের মধ্যে বৈচিত্র্য ছিল। যেমন, একটি ঘরের বিভিন্ন কোণ থেকে ফটো নিলে ফটোগুলি বিভিন্ন রকম দেখাবে, যদিও আমরা জানি ফটোগুলি একই ঘরের। তেমনি ঈশ্বর এক ও অদ্বিতীয় হলেও সাধকগণ বিভিন্ন পথে সাধনা করে তাঁকে বিভিন্ন রূপে উপলব্ধি করেন। পূর্বোক্ত মহাপুরুষরাও বিভিন্ন পথে সাধনা করে আত্মদর্শন করেছেন এবং সেভাবেই জগতের কাছে তা প্রচার করেছেন। আমাদের কর্তব্য নিজ নিজ রুচি ও সংস্কার অনুযায়ী কোন নির্দিষ্ট ধর্মগুরুকে অনুসরণ করে তাঁর আদর্শ অনুসারে জীবন গঠন করা।

প্রশ্ন—বিভিন্ন মহাপুরুষের জীবনকাহিনী পড়ে দেখেছি, তাঁরা অনেকেই নিজেদের ভাবালুতা জয় করতে পারেননি এবং শান্ত ও অনাসক্ত ভাবও রক্ষা করতে পারেননি। গীতার আদর্শ পূর্ণ অনাসক্তি কি কেউ অর্জন করতে পেরেছেন?

উত্তর—পৃথিবীর ধর্ম-ইতিহাস অনুসন্ধান করে দেখা প্রয়োজন—গীতোক্ত পূর্ণ অনাসক্তি কেউ অর্জন করতে পেরেছেন কিনা। গীতার আদর্শ—বিষয়ের প্রতি সম্পূর্ণ আসক্তি ত্যাগ। কিন্তু মহাপুরুষরা সম্পূর্ণ অনাসক্ত ছিলেন কিনা তা বিচারের অধিকার আমাদের নেই। কখনো কখনো তাঁরা আসক্তির ভাব দেখাতে পারেন। যদি কেউ কখনো বিপথে যায় বা আদর্শচ্যুত হয় তাকে শাসনপূর্বক আবার সৎপথে আনার চেষ্টা করা উচিত। মহাপুরুষরা, যদি তাঁরা প্রকৃত ধর্মবীর হন, কখনো ক্রোধ, লোভ বা অন্য কোন রিপুর বশীভূত হন না যদিও তাঁরা এগুলির বহিঃপ্রকাশ মাত্র দেখিয়ে থাকতে পারেন। [ক্রমশঃ]

বিজ্ঞান-নিবন্ধ

# স্নেহ-পদার্থ ও আমরা

## অমিয়কুমার দাস

বাঙলা অভিধানে স্নেহ-পদার্থের অর্থ—'তেল জাতীয় পদার্থ', ইংরেজীতে 'ফ্যাটস অ্যান্ড অয়েলস' ( Fats and Oils )। এই নিবন্ধে যে স্নেহ-পদার্থ ঘরের সাধারণ তাপে জমে তাকে 'ফ্যাট' ও যা তরল থাকে তাকে 'তেল' বলা হয়েছে। স্নেহ-পদার্থ নিয়ে আলোচনার শুরুতে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের দুটি পরিসংখ্যান ( কয়েকটি কারণে মৃত্যুর শতকরা হিসাব ) উদ্ধৃত করছি ঃ

fat ) ও কোলেস্টেরল, শ্রমের অভাব, অধিক চিন্তা ও উদ্বেগ, অধিক ধূমপান, উচ্চ রক্তচাপ, ডায়াবেটিস মেলাইটাস, শ্বেতসার (কার্বোহাইড্রেট ) ও শাক-সবজি কম খাওয়া এবং চিনি বেশি খাওয়া, গর্ভ-নিরোধক বড়ি বহু বছর ধরে খাওয়া এবং ওভারি ( ovary ) অপারেশন করে বাদ দেওয়া প্রভৃতি।

৪৫ বছর বয়স পর্যন্ত এই রোগে আক্রান্ত পুরুষের সংখ্যা আক্রান্ত মহিলার প্রায় চার গুণ। ঋতুবন্ধের পর মেয়েরা বেশি সংখ্যায় এই রোগে আক্রান্ত হয়। ৪৫-৫৪ বছর বয়সে এই রোগে মৃত্যুহার বেশি দেখা যায়।

সুষম খাদ্যে প্রোটিন, ফ্যাট ও কার্বোহাইড্রেট বা শর্করা খাদ্য ১ঃ১ঃ৪ অনুপাতে থাকা বাঞ্ছনীয়। ফ্যাট ও তেল থেকে কি পাই ? উত্তরে বলা যায়ঃ খাদ্যকে সুস্বাদু করে; পাকস্থলীতে অনেকক্ষণ থাকে ও ক্ষুধাবোধ বিলম্বিত করে; স্নেহ-পদার্থ শর্করা ও প্রোটিনের দ্বিগুণেরও বেশি তাপ দেয়; ফ্যাট বা চর্বি কিডনি, হার্ট ইত্যাদিকে স্থানচ্যুতি ও আঘাত থেকে রক্ষা করে; ত্বকের নিচে থেকে তাপ ও দেহসৌষ্ঠব বজায় রাখে; উপবাসে ও অসুখে তাপ ও শক্তি দেয়; ভিটামিন-এ, ডি এবং

| ১৯০০ খ্রীস্টাব্দ | | | ১৯৭৬ খ্রীস্টাব্দ | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ১. | নিউমোনিয়া ও ইনফ্লুয়েঞ্জা | ... ১১·৮% | ১. | হার্টের রোগ ... | ... ৩৭·৮% |
| ২. | যক্ষ্মা ... | ... ১১·৩% | ২. | ক্যান্সার ... | ... ১৯·৭% |
| ৩. | ডায়েরিয়া ও আন্ত্রিক | ... ৮·৩% | ৩. | মস্তিষ্কে রক্তক্ষরণ ও থ্রম্বসিস | ... ৯·৯% |
| ৪. | হার্টের রোগ ... | ... ৮% | ৪. | দুর্ঘটনা ... | ... ৫·৩% |
| ৫. | মস্তিষ্কে রক্তক্ষরণ ও থ্রম্বসিস | ... ৪·৭% | ৫. | ইনফ্লুয়েঞ্জা ও নিউমোনিয়া | ... ৩·২% |
| ৬. | কিডনির রোগ ... | ... ৪·২% | ৬. | ডায়াবেটিস ... | ... ১·৮% |
| ৭. | দুর্ঘটনা ... | ... ৩·৭% | ৭. | লিভার সিরোসিস | ... ১·৬% |
| ৮. | ক্যান্সার ... | ... ৩·৬% | ৮. | আত্মহত্যা ... | ... ১·৪% |

পাশ্চাত্যে ( অধুনা ভারতেও ) করোনারি হার্টের রোগ বাড়ছে। উন্নত দেশে খাদ্যের মোট ক্যালরির প্রায় ৪৫% আসে প্রাণীজ খাদ্য, দুধ ও মাখন থেকে। করোনারি হার্ট-রোগ সাধারণতঃ বেশি দেখা যায় নিম্নলিখিত কারণে ঃ

অতিভোজন, খাদ্যে অধিক পরিমাণে প্রাণীজ খাদ্য, সম্পৃক্ত বা স্যাচুরেটেড ফ্যাট ( saturated

ই তেলে দ্রবীভূত হয়ে অন্ত্র থেকে শোষিত হয়। প্রাণীজ তেলে প্রচুর ভিটামিন 'এ' থাকে। উদ্ভিজ্জ তরল তেলে অত্যাবশ্যক ফ্যাটি অ্যাসিড বা ই. এফ. এ. ( **E. F. A.** বা **Essential Fatty Acids, PUFA** বা **Poly-Unsaturated Fatty Acids** ) বেশি থাকে যা রক্তে কোলেস্টেরল কমায় ও পদ্মকাটা রোগ বা ফ্রীনোডার্মা ( **Phryno-**

derma বা Toad skin—হাটুর সামনে, কনুই-এর পিছনে, পিঠে ও নিতম্বের ত্বকে কাঁটা ভাব, যা ই. এফ. এ. এবং ভিটামিন-'বি'-কমপ্লেক্স খেয়ে সারে ) নিবারণ করে।

**কয়েকটি খাদ্যে প্রতি ১০০ গ্রামে তাপমান ( ক্যালরি ) :** তেল, ঘি, বনস্পতি—৯০০ ; মাখন—৭৩০ ; চাল, গম, ডাল—৩৫০ ; শাক, আনাজ ও ফল—২৫-৫০ ; আলু ও কলা—১০০ ; বাদাম ও তৈলবীজ—৫৫০ ; দুধ, মাংস ও ডিম—৬০-১৮০ ; চিনি ও গুড়—৪০০।

**কয়েকটি খাদ্যে স্নেহ-পদার্থের পরিমাণ ( শতকরা হিসাবে ) :** ঘি, তেল ও বনস্পতি—১০০%, মাখন—৮১%, বাদাম ও তৈলবীজ—৪০%, সয়াবীন—২০%, গরুর দুধ—৪·১%, মহিষের দুধ—৮·৮%।

**কয়েকটি স্নেহ-খাদ্যে প্রতি ১০০ গ্রামে ভিটামিন 'এ' :** তেল—০, মাখন—৩২০০ আই. ইউ. ( I. U. বা International Unit ), ঘি—২০০০, মহিষের দুধের ঘি—৯০০, বনস্পতি—২৫০০, কর্ডলিভার তেল—৬০,০০০ থেকে ২ লক্ষ, হ্যালিবাট-লিভার তেল—৩০ লক্ষ, শার্ক লিভার তেলে—২ লক্ষ আই. ইউ.।

**কয়েকটি স্নেহ-খাদ্যে ই. এফ. এ. ( শতকরা হিসাবে ) :** মাখন—২%, নারিকেল তেল—৩%, বনস্পতি—৬%, সরষের তেল—২০%, বাদামতেল—২৮%, তিলতেল—৪৫% ; তুলাবীজ ও মকাই (maize or corn) তেল—৫০% ; কুসুম বা কাড়ি ( safflower ) তেল—৭৫%।

ঘি, মাখন ও বনস্পতি ঘরের তাপে জমে ; এগুলিতে সম্পৃক্ত ( saturated ) ফ্যাট বেশি থাকে। একজন পূর্ণবয়স্ক ব্যক্তির স্নেহ-খাদ্য থেকে প্রাপ্ত ক্যালরি মোট ক্যালরির ১৫% ( দৈনিক ৪৫-৬০ গ্রাম )-এর বেশি হওয়া উচিত নয়। মোট স্নেহ-ক্যালরি ২০%-এর বেশি সম্পৃক্ত ফ্যাট হওয়া উচিত নয়। ই. এফ. এ.-সমৃদ্ধ উদ্ভিজ্জ তেল অর্ধেকের বেশি হওয়া বাঞ্ছনীয়। দৈনিক ব্যবহৃত ৫০ গ্রাম তেল-ঘি ছাড়াও দুধ, মাছ ও বাদামে যে ফ্যাট পাই, তাতে সুষম খাদ্যে মোট প্রায় ৯০ গ্রাম ফ্যাট হয়।

**কোলেস্টেরল**

কোলেস্টেরল সকল প্রাণী ও মানুষের দেহ-কোষের আবরণী তৈরি করে। মস্তিষ্কের কাজের জন্য এটি একান্ত প্রয়োজন। এটি পিত্ত ও স্টেরয়েড হরমোন তৈরি করে। ত্বকে থেকে ডিহাইড্রো-কোলেস্টেরল তৈরি হয়, যা সূর্যের অতিবেগুনি রশ্মির প্রভাবে ভিটামিন 'ডি'-তে রূপান্তরিত হয়। কোলেস্টেরল শুধু প্রাণীজ খাদ্যেই থাকে।

**কয়েকটি খাদ্যে প্রতি ১০০ গ্রামে কোলেস্টেরল :** মাখন—২৮০, ঘি—৩১০, দুধ—১১, ডিমের কুসুম—১৩৩০, ডিমের সাদা-অংশ—০, চর্বিযুক্ত মাছ ও মাংস—১০০-১৫০, কিডনি—৩৭৫, লিভার—২৬০-৪২০, মস্তিষ্ক—২০০০ মিলিগ্রাম।

আমাদের একদিনে ৩০০ মিলিগ্রামের বেশি কোলেস্টেরল খাওয়া উচিত নয়। লিভার, ক্ষুদ্রান্ত্র ও ত্বক কোলেস্টেরল তৈরি করে। অতিভোজন, অধিক সম্পৃক্ত ফ্যাট ( ঘি, মাখন, বনস্পতি, পাম ও নারকেল তেল ), ডায়াবেটিস মেলাইটাস, অ্যানড্রোজেন ( Androgen ) বা পুং-হরমোন ও চিনি রক্তে কোলেস্টেরল বাড়ায়। উপবাস, ই. এফ. এ.-সমৃদ্ধ তেল, ইস্ট্রোজেন ( Oestrogen ) ও থাইরয়েড হরমোন, শ্বেতসার-খাদ্য, শাক-সবজি এবং দুধ, দই ও ঘোল রক্তে কোলেস্টেরল কমায়। উদ্ভিজ্জ প্রোটিনে রক্তে কোলেস্টেরল বিশেষ বাড়ে না।

সুস্থ দেহে প্রতি ১০০ মিলিলিটার রক্তে ১৫০-২৫০ মিলিগ্রাম কোলেস্টেরল থাকে। রক্তে কোলেস্টেরল বেশি হলে তা ক্যালসিয়াম সহ রক্তবাহী ধমনীর ভিতরের স্তরে জমে ও অ্যাথেরোসক্লেরোসিস ( Atherosclerosis ) রোগ সৃষ্টি করে, যাতে ধমনীর দেওয়াল শক্ত ও অভ্যন্তর সরু হয়ে রক্ত-চলাচলে ব্যাঘাত ঘটে ও রক্তচাপ বাড়ে। করোনারি ধমনীর অ্যাথেরোসক্লেরোসিস হলে হার্টের পেশীতে রক্ত-সরবরাহ কমে ও অল্প পরিশ্রমে হার্টে ( বুকের বামদিক থেকে বামহাতে ) যন্ত্রণা বা অ্যানজাইনা পেক্টোরিস ( Angina Pectoris ) হয়। করোনারি রক্তনালীর মধ্যে রক্ত ডেলা বেঁধে করোনারি থ্রম্বসিস ( Coronary Thrombosis )

হলে বুকে প্রচণ্ড যন্ত্রণা হয়, অক্সিজেনের অভাবে হার্টের ঐ অংশ বিনষ্ট বা মায়োকার্ডিয়াল ইন-ফার্কসন ( Myocardial infarction ) হয়।

তেল, ঘি ও মিষ্টি বেশি খেলে ও কায়িক শ্রম কম হলে দেহে চর্বি জমে, স্থূলত্ব বা ওবেসিটি ( Obesity ) হয় ও করোনারি হার্ট-রোগের সম্ভাবনা বাড়ে।

বাদামতেলে হাইড্রোজেন যোগ দিয়ে বনস্পতি তৈরি হয়, যা অনেকদিন ভাল থাকে। ভারত সরকারের আইনে প্রতি ১০০ গ্রাম বনস্পতিতে ২৫০০ আই. ইউ. ভিটামিন-'এ' এবং ১৭৫ আই. ইউ. ভিটামিন-'ডি' মেশানো হয়। বনস্পতিতে ৫% তিলতেল মেশানো হয়, যা বুদয়েন পরীক্ষায় ( Budoin test ) ঘিতে ভেজাল দিলে ধরা যায়।

বারবার ঠাণ্ডা খাবার গরম করলে স্নেহ-খাদ্য কিছুটা বিষাক্ত হয়। তেলেভাজার তেল সেইদিনই তরকারিতে শেষ করা উচিত। সরিষা ও রেপসীড তেলে এরিউসিক ( Erusic ) অ্যাসিড থাকে যা রক্তচাপ বাড়ায়। তবে এই তেলের ই. এফ. এ. রক্তচাপ কমায়। ☐

---

## গ্রন্থ-পরিচয়

# স্বাধীনতা-সংগ্রামের ইতিহাসে নতুন সংযোজন

### অমলেন্দু ঘোষ

**স্বাধীনতা সংগ্রামে মালদহের অবদান:** সম্পাদক—ডঃ রাধাগোবিন্দ ঘোষ। প্রকাশক: স্বাধীনতা সংগ্রামে মালদহ গ্রন্থ প্রকাশন সমিতি। পৃষ্ঠা: ৩৫৮+১৮+২০। মূল্য: একান্ন টাকা।

ভারতের স্বাধীনতা-সংগ্রামে যেসব জেলার অবদান সর্বাধিক মালদহ তার অন্তর্ভুক্ত না হলেও স্বাধীনতা-সংগ্রামের সর্বস্তরেই মালদহের অবদান একেবারে অনুল্লেখযোগ্যও নয়।

স্বাধীনতা-সংগ্রামে মালদহের অবদান গ্রন্থের সম্পাদক ডঃ রাধাগোবিন্দ ঘোষ বহু পরিশ্রম করেছেন। স্বাধীনতা-সংগ্রামের সঙ্গে যুক্ত মালদহের বিভিন্ন সময়ের বিভিন্ন ব্যক্তির সঙ্গে তিনি যোগাযোগ করে তাঁদের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা-সমৃদ্ধ বিভিন্ন রচনা সংগ্রহ করে এই সংকলন-গ্রন্থটি প্রকাশ করেছেন। এই লেখকদের মধ্যে মালদহ জেলায় যাঁদের জন্ম ও কর্ম তাঁরা তো আছেনই, অধিকন্তু জন্মসূত্রে অন্য জেলার অধিবাসী হলেও কর্মসূত্রে জীবনের কোন-না-কোন সময়ে যাঁরা মালদহের অধিবাসী হয়ে এখানে বা অন্যত্র স্বাধীনতা-সংগ্রামে অংশ নিয়েছিলেন বা বর্তমানে মালদহের বাসিন্দা, তাঁদের কর্মযজ্ঞের কথাও এখানে লিপিবদ্ধ হয়েছে। তাই মালদহের জাতীয় বিদ্যালয়ের অন্যতম প্রধান সংস্থাপক ও মালদহের 'গৃহস্থ' পত্রিকা প্রকাশনের সঙ্গে যুক্ত অধ্যাপক বিনয়কুমার সরকার থেকে শুরু করে মেদিনীপুর 'বার্জ' মার্ডার মামলা'য় দ্বীপান্তরিত শান্তিগোপাল সেন প্রমুখের সংগ্রামী জীবনের অভিজ্ঞতার কাহিনীতেও এই গ্রন্থ সমৃদ্ধ।

মালদহের সাঁওতাল বিদ্রোহ, ১৯২১ খ্রীস্টাব্দের মহাত্মা গান্ধীর অসহযোগ আন্দোলন, ১৯৩০ খ্রীস্টাব্দের লবণ সত্যাগ্রহ, ১৯৪২-এর 'ভারত ছাড়' আন্দোলন এবং ১৯১৬ খ্রীস্টাব্দে পুলিসের গুপ্তচর জনৈক হেডমাস্টার নবীন বসুর হত্যা থেকে শুরু করে সশস্ত্র বিপ্লবের পথেও মালদহের বিভিন্ন প্রচেষ্টার কাহিনী এতে স্থান পেয়েছে। স্থান পেয়েছে মালদহের কৃষক-আন্দোলনের কাহিনীও।

মালদহের একটি বৈশিষ্ট্য যে, এখানে বেশ কিছু অবাঙালীও শুধু অহিংস সংগ্রামেই নয়, বিশেষ বিপদের ঝুঁকি নিয়ে সশস্ত্র বিপ্লবের পথেও এগিয়ে এসেছিলেন। এখানকার বেশ কয়েকজন মহিলাও স্বাধীনতা-সংগ্রামের নানা বিশিষ্ট ভূমিকায় সমুজ্জ্বল।

দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ, বাসন্তী দেবী, সরোজিনী নাইডু, দেশপ্রিয় যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত ও দেশগৌরব সুভাষচন্দ্র বসুর মালদহে আগমন এবং এখানকার কংগ্রেস ও জনজীবনের সঙ্গে যোগাযোগের কথা এই সংকলনে স্থান পেয়েছে। স্থান পেয়েছে ফরোয়ার্ড ব্লক ও সুভাষচন্দ্রের অন্তর্ধান পর্বের কিছু কাহিনীও।

অখণ্ডিত মালদহ জেলার একটি মানচিত্র সহ স্বাধীনতা-সংগ্রামীদের অনেক দুষ্প্রাপ্য ছবি এই গ্রন্থটির একটি বিশেষ আকর্ষণ। মালদহের স্বাধীনতা-সংগ্রামীদের মধ্যে যাঁরা ভারত সরকার থেকে সাম্মানিক ভাতা পাচ্ছেন, তাঁদের ১১০জনের একটি তালিকাও এই গ্রন্থে সংযোজিত হয়েছে। কলকাতার মালদহ সমিতি দ্বারা আয়োজিত ১৯৩৪ থেকে ১৯৩৮ পর্যন্ত বিভিন্ন বক্তৃতাবলীর সূচীটিও (বক্তার নাম, বক্তৃতার বিষয় ও সভাপতির নামসহ) অনেক অনুসন্ধিৎসু পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করবে।

এই সংকলনের কাজে পশ্চিমবঙ্গ বাঙলা অ্যাকাডেমী সহ আরও অনেকেই ব্যক্তিগত পর্যায়ে তাঁদের সাধ্যমত আর্থিক সাহায্য করেছেন। বাঙলা অ্যাকাডেমীর সভাপতি অন্নদাশংকর রায়ের ভূমিকাটি গ্রন্থের মর্যাদা বাড়িয়েছে। এরকম একটি গ্রন্থ প্রকাশের জন্য সম্পাদক নিশ্চয়ই সফলতার দাবি করতে পারেন। তবে এজাতীয় কাজ কোন-সময়ই একবারে ঠিক সম্পূর্ণ হয় না। প্রতি সংস্করণেই নতুন নতুন তথ্য গ্রন্থকে সমৃদ্ধ ও নির্ভুল করে তোলে।

তবে একটি ব্যাপারে সম্পাদকের বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। এগ্রন্থের বেশ কিছু লেখক

সশস্ত্র বিপ্লবীদের 'সন্ত্রাসবাদী' আখ্যা দিয়েছেন। ইংরেজ এবং ইংরেজের অনুকরণে বা না বুঝে দেশের অনেকেই, এমনকি অনেক ঐতিহাসিকও বিপ্লবীদের 'টেররিস্ট' আখ্যা দিয়ে থাকেন। ইংরেজ জানত যে, ক্ষুদিরাম-পর্ব থেকে শুরু করে প্রথম বিশ্বমহাযুদ্ধের সময় রাসবিহারী বসুর নেতৃত্বে ব্রিটিশ ভারতীয় সেনার অভ্যুত্থানের প্রচেষ্টা সবই বিপ্লবী কার্যকলাপ। (যার পরিণতি দ্বিতীয় মহাযুদ্ধকালীন নেতাজি-পর্ব)। তাই ইংরেজও রাওলাট কমিটি নিয়োগের সময় প্রয়োজনে এঁদের কাজকর্মকে বৈপ্লবিক কর্ম বলেই অভিহিত করেছিলেন। কমিটির আইনানুগ 'Terms of reference'-এ ছিল : "to investigate and report on the conspiracies connected with the revolutionary movement."

বিপ্লবী শান্তিগোপাল সেনের তথ্যসমৃদ্ধ লেখাটিতে ('স্বাধীনতা যুদ্ধে অগ্নিযুগের বিপ্লবীদের স্বর্ণযুগ অধ্যায়ের যে অংশটুকু আমি দেখেছি') দার্জিলিঙ-এ বাংলার গভর্নর স্যার জন অ্যান্ডারসন-হত্যার নেপথ্য-নায়কের নামটি ভুলবশতঃ 'জ্যোতিশ গুহ' ছাপা হয়েছে, হবে যতীশ গুহ।

এজাতীয় একটি সংকলন-গ্রন্থের শেষে স্বাধীনতা-সংগ্রামীদের একটি নাম-সূচী থাকা বাঞ্ছনীয় ছিল।

## মহাপ্রভুর মহিমা

### পলাশ মিত্র

**মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্য ও পরিজন প্রসঙ্গ :** লক্ষ্মণ ঘোষ। প্রকাশিকা : দেবী ঘোষ, ৪৩ মল্লিক পাড়া, শ্রীরামপুর, হুগলী। পৃঃ ১১৬+১৬। মূল্যঃ বারো টাকা আশি পয়সা।

এই গ্রন্থকে চারটি ভাগে ভাগ করলে প্রথম তিনটি ভাগই মহাপ্রভুর জীবন-সংক্রান্ত। প্রথম ভাগে মহাপ্রভুর গার্হস্থ্যজীবন বা প্রাক্-সন্ন্যাসজীবন। দ্বিতীয় ভাগে পাই তাঁর সন্ন্যাসজীবনের আদর্শ এবং তৃতীয় পর্যায়ে বিবৃত হয়েছে মহাপ্রভুর অন্তর্ধানোত্তর পরিজনবৃন্দের প্রসঙ্গ। সবশেষে মহাপ্রভুর পরিজনবর্গের সংক্ষিপ্ত পরিচয় লিপিবদ্ধ হয়েছে সাতটি পৃষ্ঠার মধ্যে।

শ্রীচৈতন্যদেবের দিব্যজীবনের আস্বাদনে গত পাঁচশো বছর যাবৎ যে বহুমুখী প্রয়াস তথা সাধনা সক্রিয়, আলোচ্য গ্রন্থটি সেই পূজার আরেকটি নৈবেদ্য। গল্পের ভঙ্গিতে লেখা হলেও 'চৈতন্য-চরিতামৃত', 'চৈতন্যভাগবত', 'চৈতন্যমঙ্গল' প্রভৃতি গ্রন্থ থেকে নানা উদাহরণ সাজিয়ে লেখক তাঁর বক্তব্যকে প্রামাণিক করেছেন। এমন জীবনীগ্রন্থের জনসমাদর আন্তরিকভাবে কাম্য।

## গল্পে গল্পে ঈশ্বরলাভের কথা

### তাপস বসু

**গল্পে ভগবৎ প্রসঙ্গ :** হরিশ্চন্দ্র সিংহ। প্রকাশক : শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ মন্দির প্রকাশক মণ্ডলী, ৪ ঠাকুর রামকৃষ্ণ পার্ক রো, কলকাতা-২৫। পৃঃ ১৮৮। মূল্য : পনেরো টাকা।

হরিশ্চন্দ্র সিংহ ছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণ-অনুরাগী এক আধ্যাত্মিক অনুভূতিসম্পন্ন পুরুষ। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-কথামৃতের অনুসরণে সহজ-সরল ভাষায়, গল্পচ্ছলে তিনি ভগবৎ প্রসঙ্গ করেছেন। প্রসঙ্গগুলি হলো : 'ঈশ্বরলাভই মনুষ্য-জীবনের উদ্দেশ্য', 'ধ্রুব', 'স্বরূপ ভুলে সংসারে জড়ানো', 'মুক্তিদানের জন্য লীলা-বৈচিত্র্য', 'সৎসঙ্গের প্রভাব', 'বদ্ধ বদ্ধকে মুক্তি দিতে পারে না', 'সাধুবাক্য শ্রবণের কৌশল', 'সংসার-বন্ধন ও গুরুসঙ্গে স্বরূপদর্শন', 'বিশ্বাসীর সঙ্গে বিশ্বাস সঞ্চার', 'অহংকারে দুর্গতি', 'প্রেমে ঠাকুর বাঁধা', 'ভক্তিতে বাসনা নাশ', 'দেবতার বর অমোঘ', 'দেহ মন আলাদা', 'ঐশ্বর্য ও মাধুর্য', 'গুরুর নির্দেশ পালনই সাধনা', 'সমর্পণ মানেই মিশ্রণ', 'ভগবানকে চিন্তায় পেতে হবে', 'ভগবান যা করেন মঙ্গলের জন্য' ইত্যাদি। সব মিলিয়ে প্রসঙ্গ-সংখ্যা উনসত্তর।

ঈশ্বরানুভূতির কথা ছোট ছোট আকারে যেভাবে পরিবেশিত হয়েছে তা বিশেষ কৃতিত্বের পরিচায়ক। তবে আফসোস হয় যে, কোন কোন প্রসঙ্গ বড় সংক্ষিপ্ত। আরও একটু বিস্তৃতভাবে গল্পগুলি সাজানো থাকলে পাঠকচিত্তে তৃপ্তির স্বাদটুকু নিঃসন্দেহে আরও দীর্ঘায়িত হতো। ☐

# রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশন সংবাদ

## উৎসব-অনুষ্ঠান

**শ্রীশ্রীমাতৃমন্দির, জয়রামবাটী** গত ১২ জানুয়ারি সারাদিনব্যাপী নানা অনুষ্ঠানের মাধ্যমে জাতীয় যুবদিবস, স্বামী বিবেকানন্দের ১৩১তম জন্মজয়ন্তী এবং ভারত-পরিক্রমার শতবর্ষ পালন করেছে। মঙ্গলারতি ও বৈদিক স্তোত্রপাঠের পর এক বর্ণাঢ্য পদযাত্রায় প্রায় ৪০০০ যুবক-যুবতী, ভক্ত নরনারী অংশগ্রহণ করে। ১৫০টি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ও যুবসংস্থার প্রায় ৫০০জন প্রতিযোগী নিয়ে বক্তৃতা, আবৃত্তি, অঙ্কন, গল্প-লিখন ও প্রশ্নোত্তর প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। প্রতিযোগিতার শেষে পুরস্কার বিতরণ করা হয়। দুপুরে সকলকে প্রসাদ দেওয়া হয়। আশ্রমের অধ্যক্ষ স্বামী অমেয়ানন্দের সভাপতিত্বে আয়োজিত এক আলোচনাসভায় বক্তব্য রাখেন স্বামী সনাতনানন্দ এবং অমরশংকর ভট্টাচার্য। রাতে শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন সারদা বিদ্যাপীঠের ছাত্ররা 'বাঘা যতীন' নাটক অভিনয় করে।

গত ৪ এপ্রিল **পুরী রামকৃষ্ণ মঠের** হীরক জয়ন্তী উৎসবের সমাপ্তি অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের অন্যতম সহাধ্যক্ষ শ্রীমৎ স্বামী গহনানন্দজী মহারাজ। তিনি স্কুল-পড়ুয়া শিশুদের মধ্যে পোশাক এবং পড়াশোনার সরঞ্জাম বিতরণ করেন। এই উপলক্ষে একটি স্মরণিকাও প্রকাশিত হয়।

## ত্রাণ

### বিহার খরাত্রাণ

পালামৌ জেলার বরওয়াদি ও গারু ব্লকের ২০টিরও বেশি গ্রামে ৩৫৭৬জন রোগীর চিকিৎসা চলছে। এই সঙ্গে ১৩৯০জন শিশু ও তাদের মা এবং বৃদ্ধ-বৃদ্ধাদের মধ্যে ২৫০ কিলোঃ গুঁড়ো দুধ ও ৬৩টিন বিস্কুট বিতরণ করা হয়েছে। তাছাড়া ৭টি ব্লকের ৪৫টি গ্রামে ৫০০জন প্রান্তিক কৃষকের মধ্যে সার, বীজ, কীটনাশক প্রভৃতি কৃষিকার্যের প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম বিতরণ করা হয়েছে।

'খাদ্যের বিনিময়ে কার্য' প্রকল্পের মাধ্যমে গাড়োয়া জেলার ৮টি পুকুর খননের কাজ চলছে এবং রামকাণ্ড গ্রামের চিকিৎসা-শিবিরের মাধ্যমে খরাপীড়িতদের মধ্যে দুধ ও বিস্কুট বিতরণ করা হচ্ছে। এই জেলার কেরওয়া, দাহো, সাবানে ও অন্যান্য গ্রামে ৩০০জন প্রান্তিক কৃষকের মধ্যে কৃষি-কার্যের প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম বিতরণ করা হচ্ছে।

### ত্রিপুরা বন্যাত্রাণ

ত্রিপুরার বিস্তীর্ণ অঞ্চল সাম্প্রতিক বন্যায় প্রভূত পরিমাণে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, বহু মানুষ গৃহহীন হয়ে পড়েছেন। **বেলুড় মঠ** থেকে **আগরতলা কেন্দ্রের** মাধ্যমে দক্ষিণ ত্রিপুরার অমরপুর ও কাঁকড়াবন, পশ্চিম ত্রিপুরার সোনামুড়া ও মেলাগড় এবং আগরতলার রাধানগর এলাকায় প্রায় দশ হাজার লোককে প্রতিদিন খিচুড়ি বিতরণ করা হয়েছে। তাছাড়া দুর্গত মানুষের সেবার্থে বেলুড় মঠ থেকে নিত্যপ্রয়োজনীয় বাসনপত্র, শিশুদের পোশাক, ধুতি, শাড়ি, লণ্ঠন, পানীয় জল পরিশোধক হ্যালাজোন ট্যাবলেট প্রভৃতি আগরতলা কেন্দ্রের মাধ্যমে বিতরণ করা হচ্ছে।

### পশ্চিমবঙ্গ বন্যাত্রাণ

**জলপাইগুড়ি আশ্রমের** মাধ্যমে আলিপুরদুয়ার থেকে প্রতিদিন ৫০০০ বন্যার্ত মানুষকে খিচুড়ি বিতরণ ছাড়া প্রচুর হ্যালোজেন ট্যাবলেট পাঠানো হয়েছে।

## পুনর্বাসন

### পশ্চিমবঙ্গ

গত ৯ জুন, ১৯৯৩ পুরুলিয়া জেলার সং সিমুলিয়া গ্রামের ৫৫টি নবনির্মিত গৃহ বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলির হাতে তুলে দিয়েছেন পশ্চিমবঙ্গের বন ও পরিবেশমন্ত্রী ডঃ অম্বরীশ মুখার্জী। গ্রামের নতুন নামকরণ হয়েছে— 'বিবেকানন্দ পল্লী'।

### তামিলনাড়ু

**কোয়েম্বাটোর** এবং **মাদ্রাজ মঠের** সহযোগিতায় কন্যাকুমারী জেলার বিঝাবনকোড তালুকের মারায়াপুরম, থোট্টাভরম, মাদিচল ও পাণ্ডাইকল গ্রামে বন্যার্তদের জন্য ৫০টি গৃহনির্মাণের কাজ চলছে।

### চিকিৎসা-শিবির

গত ২১-২৯ '৯৩ জুন রথযাত্রা উপলক্ষে **পুরী**

**রামকৃষ্ণ মঠ** তীর্থযাত্রীদের জন্য একটি চিকিৎসা-শিবির এবং পানীয় জলদানের ব্যবস্থা করেছিল।

গত ২৪ জুন **পুরী রামকৃষ্ণ মিশন** পুরী শহর থেকে ১০০ কি. মি. দূরে খুরদা জেলার সানপদায় একটি দন্ত-চিকিৎসাশিবিরের আয়োজন করে। স্থানীয় 'স্বামী বিবেকানন্দ ক্লাব'-এর যুবকবৃন্দ এবং রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ ভাবপরিষদের সভ্য 'শ্রীরামকৃষ্ণ সেবাশ্রম, টিকাতাল' এই কার্যে সহায়তা করে। মোট ২৪০জন দন্তরোগীর চিকিৎসা করা হয়। এর মধ্যে ১৩২জনের দাঁত তোলা হয়।

## বহির্ভারত

**বেদান্ত সোসাইটি অব স্যাক্রামেন্টো ঃ** স্বামী শ্রদ্ধানন্দ জুন মাসের ১ম ও ৩য় রবিবার ধর্মপ্রসঙ্গ, ৩য় ও ৪র্থ শনিবার রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ সাহিত্য এবং ১ম ও ৪র্থ বুধবার কঠোপনিষদ্ পাঠ ও ব্যাখ্যা করেছেন। স্বামী প্রপন্নানন্দ ২য় ও ৪র্থ রবিবার ধর্মপ্রসঙ্গ, ১ম ও ২য় শনিবার রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ সাহিত্য এবং ২য়, ৩য় ও ৫ম বুধবার উদ্ধবগীতা পাঠ ও আলোচনা করেছেন।

**বেদান্ত সোসাইটি অব সেন্ট লুইস ঃ** জুন মাসের রবিবারগুলিতে আশ্রমের অধ্যক্ষ স্বামী চেতনানন্দ বিভিন্ন ধর্মীয় বিষয়ে আলোচনা করেছেন। স্যাক্রামেন্টো বেদান্ত সোসাইটির স্বামী প্রপন্নানন্দ প্রতি মঙ্গল ও বৃহস্পতিবার নিয়মিত ধর্মীয় বিষয়ে আলোচনা করেছেন। একটি রবিবার ও মঙ্গলবার তিনি বিশেষ ভাষণ দান করেছেন।

**বেদান্ত সোসাইটি অব নিউ ইয়র্ক ঃ** জুন মাসের রবিবারগুলিতে বিভিন্ন ধর্মীয় বিষয়ে ভাষণ, প্রতি শুক্রবার শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা এবং প্রতি মঙ্গলবার 'দ্য গস্পেল অব শ্রীরামকৃষ্ণ'-এর ওপর আলোচনা করেছেন এই কেন্দ্রের অধ্যক্ষ স্বামী আদীশ্বরানন্দ। গ্রীষ্মাবকাশ উপলক্ষে গত ২১ জুন থেকে সাপ্তাহিক আলোচনা বন্ধ রয়েছে। আগামী ১৯ সেপ্টেম্বর থেকে তা আবার শুরু হবে।

**বেদান্ত সোসাইটি অব টরন্টো ঃ** গত ৮ মে পূজা, ভজন, ধ্যান, পুষ্পাঞ্জলি, প্রসাদ-বিতরণের মধ্য দিয়ে বুদ্ধজয়ন্তী পালিত হয়েছে। জুন মাসের প্রতি শনি ও রবিবার বিভিন্ন ধর্মপ্রসঙ্গে আলোচনা করেছেন আশ্রমাধ্যক্ষ স্বামী প্রমথানন্দ। প্রতিদিন সকাল ও সন্ধ্যায় ধ্যান, ভজন, আলোচনা যথারীতি অনুষ্ঠিত হয়েছে। এছাড়া মাসের দ্বিতীয় রবিবার পাঠচক্র ছাত্র ও প্রাপ্তবয়স্কদের জন্য স্বামীজীর জীবন ও বাণী আলোচিত হয়েছে এবং ১৯ জুন সন্ধ্যায় রামনাম পরিবেশিত হয়েছে।

**বেদান্ত সোসাইটি অব ওয়েস্টার্ন ওয়াশিংটন ঃ** জুন মাসের প্রতি রবিবার বিভিন্ন ধর্মপ্রসঙ্গ এবং প্রতি মঙ্গলবার 'দ্য গস্পেল অব শ্রীরামকৃষ্ণ'-এর ওপর আলোচনা করেছেন আশ্রমের অধ্যক্ষ স্বামী ভাস্করানন্দ। প্রতি রবিবার সন্ধ্যায় সংস্কৃতে রামনাম এবং ইংরেজী, বাঙলা ও হিন্দীতে ভজন পরিবেশিত হয়েছে। এছাড়া ঐদিনগুলিতে শিশুদের জন্য ধর্ম বিষয়ে ক্লাস নিয়েছেন ক্যাথি টীগ। ৫ জুন আশ্রমের সদস্যদের নিয়ে একটি সাধন-শিবির অনুষ্ঠিত হয়।

## দেহত্যাগ

**স্বামী প্রসন্নানন্দ** ( কান্তরাজ ) গত ১৫ জুন বিকাল ৪টা ১৫ মিনিটে কলকাতার রামকৃষ্ণ মিশন সেবাপ্রতিষ্ঠানে মস্তিষ্কে ক্ষয়জনিত রোগে দেহত্যাগ করেছেন। তাঁর বয়স হয়েছিল ৭৯ বছর। শ্রীমৎ স্বামী বিজ্ঞানানন্দজী মহারাজের কাছে দীক্ষাগ্রহণ করে তিনি ১৯৩৬ খ্রীস্টাব্দে ব্যাঙ্গালোর আশ্রমে যোগদান করেন। ১৯৪৫ খ্রীস্টাব্দে শ্রীমৎ স্বামী বিরজানন্দজী মহারাজের কাছে তাঁর সন্ন্যাস হয়। যোগদানকেন্দ্র ছাড়াও বিভিন্ন সময়ে তিনি ইনস্টিটিউট অব কালচার, কনখল, মহীশূর এবং সেবাপ্রতিষ্ঠানের কর্মী ছিলেন। '৯২-এর মার্চ থেকে তিনি বেলুড় মঠের আরোগ্যভবনে অবসর জীবনযাপন করছিলেন। সরলতা, হৃদয়বত্তা, কর্তব্যনিষ্ঠা ও বিনম্র স্বভাবের জন্য তিনি সকলের শ্রদ্ধা অর্জন করেছিলেন।

# শ্রীশ্রীমায়ের বাড়ীর সংবাদ

**আবির্ভাব-তিথি পালন ঃ** গত ১৭ জুলাই **শ্রীমৎ স্বামী রামকৃষ্ণানন্দজী মহারাজের আবির্ভাব-তিথিতে** তাঁর জীবনী আলোচনা করেন স্বামী ইষ্টব্রতানন্দ।

**গুরুপূর্ণিমা** উপলক্ষে গত ২ জুলাই স্বামী পূর্ণাত্মানন্দ তাঁর নিয়মিত 'ভক্তিপ্রসঙ্গ' আলোচনায় 'গুরু' প্রসঙ্গ শুরু করেন। সেদিন তাঁর আলোচনার বিষয় ছিল 'হিন্দু ঐতিহ্যে গুরুর স্থান'।

**সাপ্তাহিক ধর্মালোচনা** যথারীতি চলছে। □

# বিবিধ সংবাদ

## উৎসব-অনুষ্ঠান

**শ্রীমৎ স্বামী বিবেকানন্দের শিকাগো বক্তৃতার শতবর্ষপূর্তি উদ্‌যাপন সমিতি (চুঁচুড়া, হুগলী)ঃ** গত ১৮ ডিসেম্বর, '৯২ স্বামী স্বতন্ত্রানন্দের সভাপতিত্বে এবং শহরের বিশিষ্ট চিকিৎসকের সহায়তায় বিনামূল্যে ২৫জন দরিদ্র নরনারীর চক্ষু অস্ত্রোপচার করা হয়। ছয়দিন সেবাশুশ্রূষার পর তাদের বাড়িতে পাঠানো হয়। ১৪ মার্চ, '৯৩ স্বামী অঘোরানন্দ ঐ ২৫জন ব্যক্তিকে চশমা বিতরণ করেন।

গত ১২ জানুয়ারি জাতীয় যুবদিবস উপলক্ষে এক বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা নগর পরিক্রমা করে। মধ্যাহ্নে হরিজনবাসীদের সেবার ব্যবস্থা করা হয়। রক্তদান-শিবিরে ৫৯জন যুবক-যুবতী রক্তদান করে। বেলা সাড়ে তিনটায় অনুষ্ঠিত জনসভায় ভাষণ দেন স্বামী স্বতন্ত্রানন্দ।

স্বামী বিবেকানন্দের শিকাগো বক্তৃতার শতবর্ষ উপলক্ষে গত ৭ মার্চ চুঁচুড়ার রবীন্দ্রভবনে আয়োজিত এক সভায় বক্তব্য রাখেন স্বামী বন্দনানন্দজী, স্বামী অঘোরানন্দ, অমরেন্দ্রনাথ দত্ত, প্রতুল চৌধুরী এবং স্বর্ণাভ ভট্টাচার্য। অনুষ্ঠানের প্রারম্ভে বৈদিক স্তোত্র পাঠ ও পরে সঙ্গীত পরিবেশন করেন স্বামী নরেন্দ্রানন্দ। এদিন সভায় প্রায় ৬০০ বুদ্ধিজীবী ও ছাত্রছাত্রী উপস্থিত ছিলেন।

গত ১৪ জানুয়ারি, '৯৩ স্বামী বিবেকানন্দের জন্মতিথি উপলক্ষে **হিজলাডিহা বিবেকানন্দ সেবা সমিতি (বাঁকুড়া)** এক অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন অমরশঙ্কর ভট্টাচার্য। সকালে প্রায় ১৫০জন প্রতিনিধি নিয়ে সঙ্গীত, আবৃত্তি, বক্তৃতা ও প্রবন্ধ রচনা প্রতিযোগিতা আয়োজিত হয়। সন্ধ্যায় গীতি-আলেখ্য পরিবেশন করেন তপনকুমার চৌধুরী ও সম্প্রদায়। ২৩ জানুয়ারি অপর এক অনুষ্ঠানে স্বামীজীর বিশেষ পূজাদি, শোভাযাত্রা, মধ্যাহ্নে প্রায় ১৫০০ ভক্তকে বসিয়ে প্রসাদ-বিতরণ প্রভৃতি অনুষ্ঠিত হয়। বিকালে আয়োজিত ধর্মসভায় পৌরোহিত্য করেন স্বামী কৌশিকানন্দ। প্রধান অতিথি ছিলেন স্বামী নির্বিকল্পানন্দ। এই অনুষ্ঠানে পূর্বে অনুষ্ঠিত প্রতিযোগিতায় পুরস্কার-বিতরণ এবং রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের অধ্যক্ষ শ্রীমৎ স্বামী ভূতেশানন্দজী মহারাজের আশীর্বাণী পাঠ করা হয়। স্বামীজীর জীবন ও বাণী নিয়ে আলোচনা করেন সমিতির সদস্যগণ। পরে 'ভক্ত কবীর' চলচ্চিত্র প্রদর্শিত হয়।

**শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ ভক্তসংঘ, ভাঙড় (দক্ষিণ ২৪ পরগনা)ঃ** গত ৭ ফেব্রুয়ারি ষোড়শ বার্ষিক প্রতিষ্ঠাদিবস উদ্‌যাপিত হয়। সানাই, মঙ্গলারতি, বিশেষ পূজা, হোম, শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ, কীর্তন প্রভৃতি অনুষ্ঠিত হয়। বিকালে আয়োজিত ধর্মসভায় বক্তব্য রাখেন স্বামী কমলেশানন্দ এবং কৃষ্ণকান্ত দত্ত। সভাপতিত্ব করেন স্বামী নির্জরানন্দ। সারাদিনে প্রায় ৪০০০ ভক্ত এই অনুষ্ঠানে যোগদান করেন ও হাতে হাতে প্রসাদ গ্রহণ করেন।

শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ১৫৮তম আবির্ভাব উপলক্ষে **কল্যাণী শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ সেবাসংঘ** ১১-১৪ ফেব্রুয়ারি চারদিন ধরে নানা অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। প্রতিদিনই পূজা, হোম, কথামৃতপাঠ, গীতা ও চণ্ডীপাঠ, কীর্তন প্রভৃতি অনুষ্ঠিত হয়েছে। পূজার্চনা পরিচালনা করেন স্বামী বরিষ্ঠানন্দ। উৎসবের প্রথমদিন শ্রীশ্রীমা সম্বন্ধে আলোচনা করেন প্রব্রাজিকা বেদান্তপ্রাণা এবং 'সারদা' গীতি-আলেখ্য পরিবেশন করেন কল্যাণী সারদা সমিতি। দ্বিতীয়দিন অধ্যক্ষা প্রীতিকণা আদিত্যের পরিচালনায় ডাঃ প্রদ্যোতকুমার দাসের ভাষণ ও সেবাসংঘের যোগাসন কেন্দ্রের মেয়েদের যোগাসন এবং 'ভক্ত কবীর' চলচ্চিত্র প্রদর্শিত হয়। উৎসবের তৃতীয়দিন যুবসম্মেলনে পূর্বে অনুষ্ঠিত প্রতিযোগিতায় পুরস্কার-বিতরণ ও ভাষণ দান করেন স্বামী মুক্তসঙ্গানন্দ। গীতি-আলেখ্য পরিবেশন করে সঞ্জয় ভট্টাচার্য, স্থিরচিত্র প্রদর্শন ও ভাষ্যদান করেন স্বামী বৈকুণ্ঠানন্দ। উৎসবের শেষদিন নগর-পরিক্রমা, প্রায় ৬০০০ ভক্তকে বসিয়ে প্রসাদ-বিতরণ ও ধর্মসভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় বক্তব্য রাখেন স্বামী অজয়ানন্দ ও স্বামী আত্মপ্রিয়ানন্দ। গীতি-আলেখ্য পরিবেশন করেন শঙ্কর সোম।

শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ১৫৮তম আবির্ভাব উপলক্ষে

**প্রবুদ্ধ ভারত সংঘ (পুরুলিয়া, বাঁকুড়া)** গত ১৩ ও ১৪ ফেব্রুয়ারি শ্রীশ্রীঠাকুরের বিশেষ পূজা, হোম, প্রসাদ-বিতরণ, বাউল গান ও ধর্মসভার আয়োজন করে। ধর্মসভায় সভাপতিত্ব করেন স্বামী বামনানন্দ। প্রধান বক্তা ছিলেন প্রতুলচন্দ্র চৌধুরী। ভক্তিগীতি পরিবেশন করেন শোকহরণ সিংহ।

**শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ সারদা সংঘের (রামপাড়া, হুগলী)** ব্যবস্থাপনায় গত ২১ ফেব্রুয়ারি শ্রীশ্রীঠাকুর, শ্রীশ্রীমা ও স্বামীজীর স্মরণসভার আয়োজন করা হয়। স্বাগত ভাষণ দেন শংকরপ্রসাদ মুখার্জী। বক্তব্য রাখেন সংঘের সম্পাদক নিমাইচন্দ্র মান্না ও কানাই-লাল দে। সভাপতিত্ব করেন স্বামী ধ্যানেশানন্দ। সঙ্গীত পরিবেশন করেন শ্রীঅরবিন্দ ঐক্যসাধনা আন্দোলন, চাঁড়পুর এবং শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ সংঘ, কাশীপুরের শিল্পিবৃন্দ। এই অনুষ্ঠানে প্রায় ৫০০ শ্রোতা উপস্থিত ছিল। গত ২৮ ফেব্রুয়ারি কলকাতার রোটারী ক্লাবের উদ্যোগে ও এই সংঘের ব্যবস্থাপনায় বিনামূল্যে এক স্বাস্থ্যপরীক্ষা-শিবিরে ২৮৬জনের স্বাস্থ্যপরীক্ষা করা হয়। ডাঃ সুকুমার ব্যানার্জী সহ ৬জন বিশেষজ্ঞ ডাক্তার রোগীদের স্বাস্থ্য পরীক্ষা করেন।

গত ২৩ ফেব্রুয়ারি **খড়্গপুর রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ সোসাইটি** শ্রীরামকৃষ্ণদেবের আবির্ভাব উপলক্ষে বিশেষ পূজাদির আয়োজন করে। প্রায় ৩০০০ ভক্ত এদিন প্রসাদ গ্রহণ করেন। সোসাইটির মহিলা ভক্ত-বৃন্দ গীতি-আলেখ্য পরিবেশন করেন। এই উপলক্ষে ১৯ মার্চ থেকে পাঁচদিনব্যাপী উৎসবের প্রথমদিনে ধর্মসভায় বক্তব্য রাখেন স্বামী নিবৃত্ত্যানন্দ এবং স্বামী সারদাত্মানন্দ। দ্বিতীয়দিন গীতি-আলেখ্য পরিবেশন করেন কলকাতার 'অর্ঘ্য' সম্প্রদায়। তৃতীয়দিন 'শ্রীশ্রীমায়ের কথা' আলোচনা করেন প্রব্রাজিকা বিশুদ্ধপ্রাণা এবং ডঃ সুশীলা মণ্ডল। চতুর্থদিন বাউল গান পরিবেশন করেন ঋষিবর বাউল এবং পঞ্চম তথা শেষদিন ম্যাজিক দেখান রঞ্জন কুমার।

গত ২৭ ও ২৮ ফেব্রুয়ারি **খড়ার (মেদিনীপুর) শ্রীরামকৃষ্ণ সেবাশ্রমে** চতুর্থ বার্ষিক উৎসব এবং সেইসঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীমা ও স্বামীজীর আবির্ভাব-উৎসব পালন করা হয়। প্রভাতফেরী, বিশেষ পূজা, নারায়ণসেবা, নাটিকা, ধর্মসভা প্রভৃতি ছিল উৎসবের প্রধান অঙ্গ। ধর্মসভাগুলিতে বক্তব্য রাখেন স্বামী আপ্তকামানন্দ, স্বামী বরনাথানন্দ, স্বামী দেবদেবানন্দ প্রমুখ। উৎসব উপলক্ষে প্রায় ৭০০০ ভক্তকে বসিয়ে প্রসাদ দেওয়া হয়।

শ্রীরামকৃষ্ণের ১৫৮তম আবির্ভাব উপলক্ষে গত ২৮ ফেব্রুয়ারি **রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ সোসাইটি (এ.বি.এল. টাউনশিপ, দুর্গাপুর-৬)** এক অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। অনুষ্ঠানসূচীর মধ্যে ছিল বিশেষ পূজা, কথামৃতপাঠ, প্রভাত-ফেরী, ধর্মালোচনা প্রভৃতি। শ্রীশ্রীঠাকুরের বিশেষ পূজা করেন স্বামী পরমাত্মানন্দ। ধর্মালোচনায় অংশ নেন স্বামী শ্রেয়ষানন্দ, স্বামী ধৃতাত্মানন্দ, স্বামী অধ্যাত্মানন্দ, স্বামী বামনানন্দ এবং স্বামী শেখরানন্দ। ভক্তিগীতি পরিবেশন করেন টাউন-শিপের শিল্পিগোষ্ঠী এবং শংকর সোম। এদিন নারায়ণসেবায় ১৪০০জন বসে প্রসাদ পান।

**বিবেকানন্দ পাঠচক্র (রামকৃষ্ণ আশ্রম), পাণ্ডু (আসাম)** গত ২৩ ফেব্রুয়ারি শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জন্মতিথি উপলক্ষে মঙ্গলারতি, ভজন, বিশেষ পূজা, হোম, প্রসাদ-বিতরণ প্রভৃতির আয়োজন করে। সন্ধ্যায় আরাত্রিকের পর কথামৃতপাঠ ও ভজনাদি হয়। এই উপলক্ষে ১২-১৪ মার্চ তিনদিনব্যাপী উৎসবের প্রথমদিনে স্বামীজীর বিষয়ে ভাষণ দেন অধ্যাপক কালীপদ গাঙ্গুলী, ডঃ পরাগ ভট্টাচার্য ও স্বামী রঘুনাথানন্দ। সভাপতিত্ব করেন নিখিলেশ বিশ্বাস। শ্রীরামকৃষ্ণ-লীলাগীতি পরিবেশন করেন যতীন্দ্রমোহন দত্ত ও সহশিল্পিবৃন্দ। দ্বিতীয়দিন শ্রীশ্রীমায়ের বিষয়ে আলোচনা করেন পাণ্ডু নেতাজী বিদ্যাপীঠের সহাধ্যক্ষা অঞ্জলি চক্রবর্তী, বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন উপাচার্য ডঃ শংকরীপ্রসাদ ব্যানার্জী এবং গৌহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ের বাঙলা বিভাগের প্রধান ডঃ সুধাংশুশেখর তুঙ্গ। সভাপতিত্ব করেন স্বামী রঘুনাথানন্দ। উৎসবের তৃতীয় তথা শেষদিন শ্রীশ্রীঠাকুরের বিশেষ পূজা, কথামৃতপাঠ, ভজন এবং প্রায় ৩৫০০ ভক্তকে বসিয়ে খিচুড়ি প্রসাদ দেওয়া হয়। সন্ধ্যায় শ্রীরামকৃষ্ণের জীবন ও বাণী বিষয়ে আলোচনা করেন গৌহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ডঃ নির্মলকুমার চৌধুরী, গৌহাটী

বাণীকান্ত কাকতী কলেজের প্রাক্তন অধ্যক্ষা ইন্দিরা মিরি এবং স্বামী অলোকানন্দ। এদিনও সভায় সভাপতিত্ব করেন স্বামী রঘুনাথানন্দ। সঙ্গীত পরিবেশন করেন নারায়ণচন্দ্র মণ্ডল।

শ্রীরামকৃষ্ণদেবের আবির্ভাব উপলক্ষে গত ৭ মার্চ **শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ সেবাশ্রম, গাঁভী ( ক্যানিং, দক্ষিণ ২৪ পরগনা )** আয়োজিত এক ধর্মসভায় বক্তব্য রাখেন স্বামী ইষ্টব্রতানন্দ ও প্রদীপকুমার রঞ্জিত। সভাপতিত্ব করেন স্বামী চেতসানন্দ। এদিন প্রায় ৪০০০ ভক্তকে বসিয়ে প্রসাদ দেওয়া হয়।

গত ১২ মার্চ লখনৌ-এর মতিমহলে **শ্রীসারদা সংঘের** উনত্রিশতম বার্ষিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। বক্তব্য রাখেন উত্তরপ্রদেশের রাজ্যপাল, লখনৌ রামকৃষ্ণ মঠের অধ্যক্ষ স্বামী শ্রীধরানন্দ, দমদম বিবেকানন্দ বিদ্যাভবনের অধ্যক্ষা প্রব্রাজিকা অমলপ্রাণা, শৈল পাণ্ডে, সংঘের সভানেত্রী স্নেহময়ী মহাপাত্র এবং সাধারণ সম্পাদিকা সুভদ্রা হাকসার। দেশের ১০টি শাখাকেন্দ্র থেকে মোট ৬৩জন প্রতিনিধি সম্মেলনে যোগদান করে। নানারকম সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে সম্মেলনের সমাপ্তি হয়।

গত ১২ ও ১৩ মার্চ **প্রসাদচক শ্রীরামকৃষ্ণ সেবাশ্রম ( মেদিনীপুর )** শ্রীরামকৃষ্ণদেবের আবির্ভাব ও আশ্রমের ষষ্ঠবার্ষিক উৎসব উদ্‌যাপন করে। উৎসবের অনুষ্ঠানসূচীর মধ্যে ছিল প্রভাতফেরী, বিশেষ পূজা, চণ্ডীপাঠ, ভজন, বাউল গান এবং বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। ধর্মসভায় বক্তব্য রাখেন স্বামী হরিদেবানন্দ, সুভাষ মান্না ও জগত্তারণ আচার্য। সভাপতিত্ব করেন গোপীবল্লভ গোস্বামী। প্রায় ২০০০ ভক্তকে খিচুড়ি প্রসাদ দেওয়া হয়

শ্রীরামকৃষ্ণদেবের আবির্ভাব উপলক্ষে গত ১৩ ও ১৪ মার্চ **সোদপুর শ্রীরামকৃষ্ণ সেবক সংঘ ( উত্তর ২৪ পরগনা )** বিশেষ পূজা, হোম, প্রসাদ-বিতরণ, ধর্মসভা, কৃতী ছাত্র-ছাত্রীদের পুরস্কার-প্রদান প্রভৃতির আয়োজন করে। প্রথমদিনের ধর্মসভায় পৌরোহিত্য করেন প্রব্রাজিকা বিশুদ্ধপ্রাণা। সংঘের বিবেকানন্দ বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীরা 'শাপমোচন' নৃত্যনাট্য উপস্থাপিত করে। দ্বিতীয়দিনের ধর্মসভায় বক্তব্য রাখেন স্বামী ভৈরবানন্দ এবং অধ্যাপক প্রেমবল্লভ সেন।

গত ১৪ মার্চ **হরিণডাঙ্গা শ্রীরামকৃষ্ণ সেবাসংঘ ( দক্ষিণ ২৪ পরগনা )** শ্রীরামকৃষ্ণদেবের আবির্ভাব উপলক্ষে এক উৎসবের আয়োজন করে। অনুষ্ঠান-সূচীর মধ্যে ছিল মঙ্গলারতি, বিশেষ পূজা, ভজন, কথামৃতপাঠ, শোভাযাত্রা, প্রসাদ-বিতরণ, ধর্মসভা, সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা, পুরস্কার-বিতরণ, দুঃস্থদের বস্ত্র-বিতরণ প্রভৃতি। ধর্মসভার আলোচ্য বিষয় ছিল : 'বর্তমান যুগে ধর্ম ও শ্রীরামকৃষ্ণ'।

**শ্রীরামকৃষ্ণ সারদা আশ্রম, দাঁতন (মেদিনীপুর)** গত ১৪ মার্চ বিশেষ পূজা, হোম, চণ্ডীপাঠ, প্রায় ১০০০ ভক্তকে বসিয়ে প্রসাদ-বিতরণ প্রভৃতির মাধ্যমে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের আবির্ভাব-উৎসব উদ্‌যাপন করেছে। মৃত্যুঞ্জয় ভঞ্জের সভাপতিত্বে ধর্মসভায় বক্তব্য রাখেন স্বামী দেবদেবানন্দ, স্বামী শান্তিদানন্দ এবং এই আশ্রমের সভাপতি ডাঃ শ্যামলাল সাহা।

গত ২৮ মার্চ **শ্রীরামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ সেবাশ্রম ( পাঁশকুড়া, মেদিনীপুর )** রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউট অব কালচারের সহযোগিতায় একদিনের একটি কিশোর ও যুবশিবিরের আয়োজন করে। অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন স্বামী হরিদেবানন্দ। সভায় বক্তব্য রাখেন স্বামী বলভদ্রানন্দ, দীপককুমার দত্ত এবং প্রণবেশ চক্রবর্তী। সঙ্গীত পরিবেশন করেন রেবতীভূষণ মণ্ডল ও জয়ন্তকুমার বেরা। সকাল ১০টা থেকে বিকাল ৫'৩০ পর্যন্ত তিনটি অধিবেশনে ১০২জন যুবক-যুবতী অংশগ্রহণ করে।

## পরলোকে

শ্রীমৎ স্বামী শিবানন্দজী মহারাজের মন্ত্রশিষ্য যশোহর ( অধুনা শ্যামবাজার ) নিবাসী **জগৎবন্ধু হালদার** গত ৪ ডিসেম্বর, ১৯৯২ পরলোকগমন করেছেন।

শ্রীমৎ স্বামী বিজ্ঞানানন্দজী মহারাজের মন্ত্রশিষ্য **প্রীতিবিনোদ রায়চৌধুরী** গত ২৪ মাঘ, ১৩৯৯ ৮৭ বছর বয়সে শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। কলকাতার অদ্বৈত আশ্রম ও কাশীপুর উদ্যানবাটীর সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল।

শ্রীমৎ স্বামী বীরেশ্বরানন্দজী মহারাজের মন্ত্রশিষ্য **ডাঃ দিলীপকুমার মজুমদার** গত ১ ফেব্রুয়ারি তাঁর বেহালার বাসভবনে শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। তাঁর বয়স হয়েছিল ৮০ বছর। □

## বিজ্ঞান-সংবাদ

# আজব মহাদেশ দক্ষিণমেরু

ইউরোপের চেয়ে বড়, কাজেই দক্ষিণমেরু বা অ্যান্টার্কটিকাকে একটি মহাদেশ বলতে কারো আপত্তি হবে না। গত শতাব্দীর শেষদিক থেকে বহু দেশের জাতীয় পতাকা এখানে প্রোথিত হচ্ছে। আঠারোটি দেশ দাবিদার হওয়ায় ১৯৪০ খ্রীস্টাব্দে মহাদেশটি কেক-ভাগ করার মতো ভাগ করা হয়েছিল। তবে ১৯৫৮ খ্রীস্টাব্দের পরে উড়োজাহাজ, উপগ্রহ ও অনুসন্ধানকারীদের সমবেত সাহায্যে সমগ্র মহাদেশটির মানচিত্র আঁকা সম্ভব হয়েছে। মহাদেশটি ২০০০ মিটার পুরু বরফে আবৃত, যাকে সারা পৃথিবীর জলভাগের এক-তৃতীয়াংশ বলা যেতে পারে। ১৯৮৩ খ্রীস্টাব্দে মহাদেশের সোভিয়েত এলাকায় ( Soviet Vostok base ) বরফের গভীরে তাপমাত্রা নির্ণীত হয়েছিল —৮৯.৬° সেন্টিগ্রেড। বাইরের তাপমাত্রা সে-সময় —৩৬° থেকে —৭২° সেন্টিগ্রেডের মধ্যে থাকত। কিন্তু এসব সত্ত্বেও ১৮২১ খ্রীস্টাব্দে আমেরিকান নাবিক জন ডেভিস এই মহাদেশে পদার্পণ করার পর থেকে এর আকর্ষণ বেড়েই চলেছে। ইন্টারন্যাশনাল জিওফিজিক্যাল বর্ষ ( ১৯৫৭-১৯৫৮ ) থেকে বিভিন্ন দেশ এই মহাদেশে স্থায়ী বৈজ্ঞানিক চর্চার কেন্দ্র স্থাপন করতে আরম্ভ করে। বর্তমানে প্রায় ২০০০ কর্মী এই মহাদেশে বা আশেপাশের দ্বীপে অবস্থিত ৪২টি কেন্দ্রে সারা বছর কাজ করে। আরও ২৬টি কেন্দ্রে কেবল গ্রীষ্মের সময় লোকজন কাজ করতে আসে।

প্রায় ১৪ কোটি বছর আগে এই মহাদেশের পূর্বাংশ গন্ডোয়ানাল্যান্ড ( Gondwanaland ) নামে এক বিরাট মহাদেশের অন্তর্গত ছিল। এই গন্ডোয়ানাল্যান্ডই পরে রূপান্তরিত হয়েছে আফ্রিকা, দক্ষিণ আমেরিকা, ভারতবর্ষ, অস্ট্রেলিয়া এবং নিউজিল্যান্ড-এ। গন্ডোয়ানাল্যান্ড-এর তাপমাত্রা ছিল নাতিশীতোষ্ণ ( temperate )। স্থলে ছিল বনজঙ্গল এবং এখানে বাস করত সরীসৃপ-জাতীয় প্রাণীরা। পরে ভূ-মধ্যের বিভিন্ন স্তরে নড়চড় ( Plate tectonics ) হওয়ার ফলে এই বিশাল মহাদেশে ফাটল দেখা দেয়। দক্ষিণাংশ আরও নেমে গিয়ে অ্যান্টার্কটিকা মহাদেশ আলাদা হয়ে যায়। সেখানে অত্যধিক শীতে গাছপালা নষ্ট হয়ে চিরস্থায়ী বরফে ঢাকা পড়ে।

অ্যান্টার্কটিকা মহাদেশের দক্ষিণাংশে রসদ্বীপে অবস্থিত এরিবাস পর্বতে ( Mt. Erebus on Ros island ) এখনো একটি জ্বলন্ত আগ্নেয়গিরি বর্তমান। অ্যান্টার্কটিকা নামটি দিয়েছিলেন গ্রীক দার্শনিক অ্যারিস্টটল, যিনি কল্পনা করেছিলেন—উত্তর গোলার্ধে এত বড় স্থলভাগ থাকাতে দক্ষিণেও নিশ্চয় এরকম বড় স্থলভাগ থাকবে। এই মহাদেশে উদ্ভিদ বলতে আছে স্যাওলাজাতীয় ( lichens and mosses ) এবং কিছু ফুল-ফোটা উদ্ভিদ। জন্তুদের মধ্যে আছে মেরুদণ্ডবিহীন ক্ষুদ্র প্রাণী এবং প্রচুর সামুদ্রিক প্রাণী। ১২০ শ্রেণীর মাছের মধ্যে আছে সীল ও তিমি মাছ, উনিশ প্রকার সামুদ্রিক পাখি, পেঙ্গুইনজাতীয় সাত প্রকার উড়তে না-পারা সাঁতারু পাখি ( flightless swimming birds ) প্রভৃতি। মাত্র এক শতাংশ ভূখণ্ড অনুসন্ধান করে পাওয়া গেছে কয়লা, লোহা, তামা, সোনা, টাইটেনিয়াম, ইউরেনিয়াম ও কোবাল্ট। এইগুলির পরিমাণ কত এবং খনন করে তোলার যোগ্য পরিমাণে আছে কিনা তা জানা নেই।

মহাদেশের পরিবেশ বজায় রাখার জন্য অনেক কমিশন, কনভেনশন অনুষ্ঠিত ও ট্রিটি স্বাক্ষরিত হয়েছে ; শেষটি হচ্ছে ১৯৯১-এর ম্যাড্রিড প্রোটোকল। কিন্তু এখনো সবাই নিশ্চিত নয় যে, পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ এই মহাদেশকে, যার ঊষা সব দেশের ঊষার চেয়ে সুন্দর এবং যার মহাকাশের ওজনস্তরে ফাটল দেখা দিয়েছে, তাকে তার নিজস্ব প্রাকৃতিক অবস্থায় থাকতে দেবে কিনা। □

[ Science Information Works,
Indian National Science Academy,
October 1992, pp. 4-5 ]

পরার্থে এতটুকু কাজ করলে ভিতরের শক্তি জেগে ওঠে। পরের জন্য এতটুকু ভাবলে ক্রমে হৃদয়ে সিংহবলের সঞ্চার হয়।

স্বামী বিবেকানন্দ

ISSN 097

# উদ্বোধন

"উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্ নিবোধত"
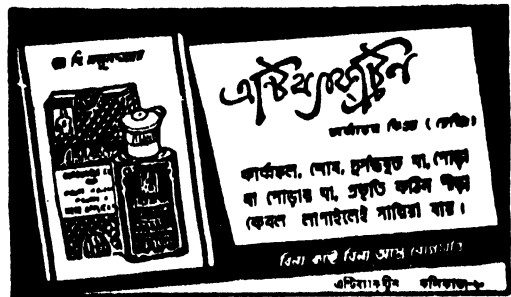
আশ্বিন ১৪০০ ৯৫তম বর্ষ ৯ম সংখ্যা

উদ্বোধন কার্যালয় কলকাতা

বাহ্য সভ্যতা আবশ্যক, শুধু তাহাই নহে—প্রয়োজনাতিরিক্ত বস্তু ব্যবহারও আবশ্যক, যাহাতে গরিবলোকের জন্য নূতন নূতন কাজের সৃষ্টি হয়। ··· ভারতকে উঠাইতে হইবে, গরিবদের খাওয়াইতে হইবে, শিক্ষার বিস্তার করিতে হইবে, আর পৌরোহিত্য, সামাজিক অত্যাচার একবিন্দুও যাহাতে না থাকে, তাহা করিতে হইবে। প্রত্যেক লোক যাহাতে আরও ভাল করিয়া খাইতে পায় এবং উন্নতি করিবার আরও সুবিধা পায়, তাহা করিতে হইবে।··· এই অবস্থা ধীরে ধীরে আনিতে হইবে—লোককে অধিক ধর্মনিষ্ঠ হইতে শিক্ষা দিয়া ও সমাজকে স্বাধীনতা দিয়া। প্রাচীন ধর্ম হইতে এই পুরোহিতের অত্যাচার ও অনাচার ছাঁটিয়া ফেল—দেখিবে এই ধর্মই জগতের সর্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম। আমার কথা কি বুঝিতেছ? ভারতের ধর্ম লইয়া সমাজকে ইউরোপের সমাজের মতো করিতে পার? আমার বিশ্বাস ইহা কার্যে পরিণত করা খুব সম্ভব, আর ইহা হইবেই হইবে।

স্বামী বিবেকানন্দ

আনন্দবাজার সংস্থা
৬ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলিকাতা-৭০০০০১

# উদ্বোধন

স্বামী বিবেকানন্দ প্রবর্তিত, রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের একমাত্র বাঙলা মুখপত্র, চুরানব্বই বছর ধরে নিরবচ্ছিন্নভাবে প্রকাশিত দেশীয় ভাষায় ভারতের প্রাচীনতম সাময়িকপত্র


## সূচীপত্র


৯৫তম বর্ষ আশ্বিন ১৪০০ (সেপ্টেম্বর ১৯৯৩) শারদীয়া সংখ্যা





[পরের পৃষ্ঠায়]


◆


সম্পাদক ☐ স্বামী পূর্ণাত্মানন্দ

৮০/৬, গ্রে স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০ ০০৬-স্থিত বসুশ্রী প্রেস থেকে বেলুড় শ্রীরামকৃষ্ণ মঠের ট্রাস্টীগণের পক্ষে স্বামী সত্যব্রতানন্দ কর্তৃক মুদ্রিত ও ১ উদ্বোধন লেন, কলকাতা-৭০০ ০০৩ থেকে প্রকাশিত।

প্রচ্ছদ মুদ্রণঃ স্বপ্না প্রিন্টিং ওয়ার্কস (প্রাঃ) লিমিটেড, কলকাতা-৭০০ ০০৯

আজীবন গ্রাহকমূল্য (৩০ বছর পর নবীকরণ-সাপেক্ষ) ☐ এক হাজার টাকা (কিস্তিতেও প্রদেয়)---প্রথম কিস্তি একশো টাকা ☐ সাধারণ গ্রাহকমূল্য ☐ শ্রাবণ থেকে পৌষ সংখ্যা ☐ ব্যক্তিগতভাবে সংগ্রহ ☐ তিরিশ টাকা ☐ সডাক ☐ চৌত্রিশ টাকা ☐ বর্তমান সংখ্যার মূল্য ☐ তিরিশ টাকা

### প্রচ্ছদ

*এবছর (১৯৯৩) সেপ্টেম্বর মাসে স্বামী বিবেকানন্দের ঐতিহাসিক শিকাগো-ভাষণের শতবর্ষ পূর্ণ হলো। সেই মহা-ঘটনার স্মরণে এবারের 'উদ্বোধন'-এর শারদীয়া সংখ্যাটি নিবেদিত।*

*স্বামী বিবেকানন্দের শিকাগো-ভাষণের কয়েকবছর আগে ১১ ফেব্রুয়ারি ১৮৮৬ শ্রীরামকৃষ্ণ স্বহস্তে লিখেছিলেন, বহির্ভারতে পৃথিবীর মানুষের কাছে নরেন্দ্রনাথ লোকশিক্ষকরূপে আহ্বান জানাবেন। (প্রচ্ছদে বাঁদিকে ওপরের আলোকচিত্র দ্রষ্টব্য)। শ্রীরামকৃষ্ণের সেই 'চাপরাস' নিয়েই স্বামী বিবেকানন্দ দাঁড়িয়েছিলেন বিশ্বধর্মমহাসভায় এবং অবিসংবাদিতভাবে অভিনন্দিত হয়েছিলেন জগতের নবীন আচার্যরূপে।*

*শিকাগোর আর্ট ইনস্টিটিউটে (প্রচ্ছদে নিচের আলোকচিত্র দ্রষ্টব্য) অনুষ্ঠিত বিশ্বধর্মমহাসভায় প্রতিনিধিরূপে স্বামী বিবেকানন্দের আবির্ভাবে (প্রচ্ছদে ডানদিকে আলোকচিত্র দ্রষ্টব্য) শ্রীরামকৃষ্ণের ভবিষ্যদ্বাণী অক্ষরে অক্ষরে প্রমাণিত হয়েছিল। এবারের প্রচ্ছদের বক্তব্য তা-ই।*

**সম্পাদক, উদ্বোধন**

শারদীয়া উদ্বোধন

আশ্বিন ১৪০০ সেপ্টেম্বর ১৯৯৩

# দিব্য বাণী

*সাম্প্রদায়িকতা, গোঁড়ামি ও এগুলির ভয়াবহ ফলস্বরূপ ধর্মোন্মত্ততা এই সুন্দর পৃথিবীকে বহুকাল অধিকার করিয়া রাখিয়াছে। ইহারা পৃথিবীকে হিংসায় পূর্ণ করিয়াছে, বারবার ইহাকে নরশোণিতে সিক্ত করিয়াছে, সভ্যতা ধ্বংস করিয়াছে এবং সমগ্র জাতিকে হতাশায় মগ্ন করিয়াছে। এই-সকল ভীষণ পিশাচগুলি যদি না থাকিত, তাহা হইলে মানবসমাজ আজ পূর্বাপেক্ষা অনেক উন্নত হইত। তবে ইহাদের মৃত্যুকাল উপস্থিত; এবং আমি সর্বতোভাবে আশা করি, এই ধর্ম-মহাসমিতির সম্মানার্থে আজ যে ঘণ্টাধ্বনি নিনাদিত হইয়াছে, তাহাই সর্ববিধ ধর্মোন্মত্ততা, তরবারি অথবা লেখনীমুখে অনুষ্ঠিত সর্বপ্রকার নির্যাতন এবং একই লক্ষ্যের দিকে অগ্রসর ব্যক্তিগণের মধ্যে সর্ববিধ অসদ্ভাবের সম্পূর্ণ অবসানের বার্তা ঘোষণা করুক।*

*সঙ্কীর্ণ ভাবই আমাদের মতভেদের কারণ। আমি একজন হিন্দু—আমি আমার নিজের ক্ষুদ্র কূপে বসিয়া আছি এবং সেটিকেই সমগ্র জগৎ বলিয়া মনে করিতেছি! খ্রীস্টধর্মাবলম্বী তাঁহার নিজের ক্ষুদ্র কূপে বসিয়া আছেন এবং সেটিকেই সমগ্র জগৎ মনে করিতেছেন! মুসলমানও নিজের ক্ষুদ্র কূপে বসিয়া আছেন এবং সেটিকেই সমগ্র জগৎ মনে করিতেছেন!*

*যদি কেহ এরূপ আশা করেন যে, প্রচলিত বিভিন্ন ধর্মের মধ্যে একটির অভ্যুদয় ও অপরগুলির বিনাশ দ্বারা এই ঐক্য সাধিত হইবে, তাহাকে আমি বলি, 'ভাই, এ তোমার দুরাশা।' আমি কি ইচ্ছা করি যে, খ্রীস্টান হিন্দু হয়? — ঈশ্বর তাহা না করুন। আমার কি ইচ্ছা যে, কোন হিন্দু বা বৌদ্ধ খ্রীস্টান হউক?—ভগবান তাহা না করুন।*

*বীজ ভূমিতে উপ্ত হইল; মৃত্তিকা, বায়ু ও জল তাহার চতুর্দিকে রহিয়াছে। বীজটি কি মৃত্তিকা, বায়ু বা জলের মধ্যে কোন একটিতে পরিণত হইয়া যায়? — না। সেই বীজ হইতে একটি চারাগাছ উৎপন্ন হয়, উহা ক্রমে নিজের স্বাভাবিক নিয়মানুসারে বর্ধিত হয় এবং মৃত্তিকা বায়ু ও জল ভিতরে গ্রহণ করিয়া সেই-সকল উপাদান বৃক্ষে পরিণত করে এবং বৃক্ষাকারে বাড়িয়া উঠে।*

*ধর্ম সম্বন্ধেও ঐরূপ। খ্রীস্টানকে হিন্দু বা বৌদ্ধ হইতে হইবে না; অথবা হিন্দু ও বৌদ্ধকে খ্রীস্টান হইতে হইবে না; কিন্তু প্রত্যেক ধর্মই অন্যান্য ধর্মের সারভাগগুলি গ্রহণ করিয়া পুষ্টিলাভ করিবে এবং স্বীয় বিশেষত্ব বজায় রাখিয়া নিজ প্রকৃতি অনুসারে বর্ধিত হইবে।... সাধুচরিত্র, পবিত্রতা ও দয়াদাক্ষিণ্য জগতের কোন একটি বিশেষ ধর্মমণ্ডলীর নিজস্ব সম্পত্তি নয় এবং প্রত্যেক ধর্মপদ্ধতির মধ্যেই অতি উন্নত চরিত্রের নরনারী জন্মগ্রহণ করিয়াছেন।*

*এই-সকল প্রত্যক্ষ প্রমাণসত্ত্বেও যদি কেহ এরূপ স্বপ্ন দেখেন যে, অন্যান্য ধর্ম লোপ পাইবে এবং তাঁহার ধর্মই টিকিয়া থাকিবে, তবে তিনি বাস্তবিকই কৃপার পাত্র; তাঁহার জন্য আমি আন্তরিক দুঃখিত, তাঁহাকে আমি স্পষ্টভাবে বলিয়া দিতেছি, তাঁহার ন্যায় ব্যক্তির বাধাপ্রদান সত্ত্বেও শীঘ্রই প্রত্যেক ধর্মের পতাকার উপর লিখিত হইবে: 'বিবাদ নয়, সহায়তা; বিনাশ নয়, পরস্পরের ভাবগ্রহণ; মতবিরোধ নয়, সমন্বয় ও শান্তি।'*

**স্বামী বিবেকানন্দ**

## কথাপ্রসঙ্গে

# ভারতপথিক বিশ্বপথিক ভারতপুরুষ বিশ্বপুরুষ

ধ্যানোত্থিত সন্ন্যাসী দণ্ডকমণ্ডলু হাতে কন্যাকুমারীর সমুদ্রশিলা হইতে নামিয়া আসিলেন তীরভূমিতে। ইতোমধ্যে একটি বিরাট পরিবর্তন হইয়া গিয়াছে সন্ন্যাসীর চিন্তা ও চেতনায়, তাঁহার ব্যক্তিত্বে ও ভূমিকায়। ভারত-পরিব্রাজক রূপান্তরিত হইয়া গিয়াছেন ভারতপথিকে, বঙ্গপুরুষ ভারতপুরুষে। নূতন প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ তিনি তখন। তাঁহার সংকল্প স্থির হইয়া গিয়াছে। ভারতের বার্তাবহরূপে তিনি যোগদান করিবেন শিকাগোর বিশ্বধর্মমহাসভায়। ভারতপথিক বাহির হইবেন বিশ্ব-পরিক্রমায়। কন্যাকুমারীতে দেবীর পদচিহ্নশোভিত সমুদ্রশিলায় যে দৈবপ্রেরণা তিনি লাভ করিয়াছেন তাহাতে উদ্বুদ্ধ হইয়া আবার তাঁহার পরিক্রমণ শুরু হইল। কিন্তু এবারের পরিক্রমার চরিত্র ভিন্ন। প্রাচ্যভূমি হইতে এবার তিনি পাশ্চাত্যভূমিতে পর্যটন করিবেন। এই প্রথম একজন হিন্দুসন্ন্যাসী 'কালাপানি' অতিক্রম করিতে যাইতেছেন। দুঃসাহসিক সেই অভিযানে 'জাতীয় দেবতার' আশীর্বাদ চাই। ভারতের জাতীয় দেবতা অর্ধনারীশ্বর—পার্বতী-পরমেশ্বর। দেবী পার্বতীর আশীর্বাদ তিনি লাভ করিয়াছেন, এবার চাই পরমেশ্বরের আশীর্বাদ। কন্যাকুমারী হইতে তাই তিনি চলিলেন 'দক্ষিণের বারাণসী' শিবক্ষেত্র রামেশ্বরে। দেবাদিদেবের আশীর্বাদ মস্তকে ধারণ করিয়া রামেশ্বর হইতে তাঁহার যে-যাত্রা শুরু হইল, উহাই ছিল প্রকৃতপক্ষে তাঁহার বিশ্ব-পরিক্রমার পথে যাত্রা। এখানে উল্লেখ্য যে, তাঁহার জীবনদেবতাও ছিলেন অর্ধনারীশ্বর—সারদা-রামকৃষ্ণ। জীবন-দেবতার আশীর্বাদও তিনি অচিরেই লাভ করিবেন। রামেশ্বর হইতে রামনাদ, মাদুরা ও পণ্ডিচেরী হইয়া তিনি আসিলেন মাদ্রাজে। তাঁহার ব্যক্তিত্বে মুগ্ধ মাদ্রাজের যুবক ও শিক্ষিত সম্প্রদায় তাঁহার অভিপ্রায় জানিয়া তাঁহার বিশ্ব-পরিক্রমার উদ্যোগ-আয়োজন শুরু করিয়া দিলেন। মাদ্রাজ হইতে তিনি যান হায়দ্রাবাদে। সেখানে মেহবুব কলেজে জনাকীর্ণ এক বিদগ্ধ সভায় ১৮৯৩ খ্রীস্টাব্দের ১৩ ফেব্রুয়ারি দিলেন ভারতবর্ষে প্রকাশ্য জনসভায় তাঁহার প্রথম ঐতিহাসিক ভাষণ। সেই ভাষণের বিষয় ছিল 'আমার পাশ্চাত্য-গমনের উদ্দেশ্য' ('My Mission to the West')। হায়দ্রাবাদ হইতে মাদ্রাজে প্রত্যাবর্তনের কিছুদিন পর খেতড়ির মহারাজের আমন্ত্রণে এপ্রিলের (১৮৯৩) দ্বিতীয় সপ্তাহে তিনি খেতড়ি রওনা হন। খেতড়ির মহারাজার অনুরোধে খেতড়ি ত্যাগের পূর্বে স্থায়িভাবে 'বিবেকানন্দ' নামটি তিনি গ্রহণ করেন—"যে বিবেকানন্দ নাম তিনি পৃথিবীর উপর ন্যস্ত করিতে যাইতেছিলেন।"

খেতড়ি হইতে ফিরিবার কয়েকদিন পর ১৮৯৩ খ্রীস্টাব্দের ৩১ মে বোম্বাই বন্দর হইতে শিকাগোয় বিশ্বধর্মমহাসম্মেলনে যোগদানের উদ্দেশে তিনি সমুদ্রযাত্রা করিলেন। যাত্রার পূর্বে গুরুভ্রাতা স্বামী তুরীয়ানন্দকে গভীরতম প্রত্যয়ের সহিত বলিয়া গেলেনঃ "ধর্মমহাসভাটা এরই (নিজের দিকে অঙ্গুলিনির্দেশ করিয়া) জন্য হচ্ছে। আমার মন তাই বলছে। শিগগিরই এর প্রমাণ দেখতে পাবে।"

সেই 'প্রমাণ' পৃথিবী অচিরেই পাইয়াছিল, কিন্তু স্বামী তুরীয়ানন্দ তাহার পূর্বেই বুঝিয়াছিলেন পৃথিবীর সামনে এবার আবির্ভূত হইতে চলিয়াছেন ইতিহাসের নূতন আচার্য। দীর্ঘ পরিক্রমা ও সাধনার ফলে তাঁহার তখন 'দ্বিজত্বলাভ' ঘটিয়াছে। সতীর্থ যে-নরেন্দ্রনাথকে তাঁহারা আগে দেখিয়াছিলেন তাঁহার সহিত বিবেকানন্দের অনেক পার্থক্য। যেন সম্পূর্ণ নূতন এক ব্যক্তি। তাঁহার সহিত কথা বলিয়া, তাঁহাকে দেখিয়া তুরীয়ানন্দজীর মনে হইয়াছিল—তাঁহার সাধনা সমাপ্ত হইয়াছে, এখন তিনি বহির্ভারতে গুরুর বাণী প্রচারের জন্য সম্পূর্ণ প্রস্তুত। সকল অসম্পূর্ণতাকে অতিক্রম করিয়া তিনি তখন পূর্ণ মানবে পরিণত। ঐতিহাসিক যুগে যে পূর্ণ মানবের সাক্ষাৎ জগৎ সর্বপ্রথম বুদ্ধের মধ্যে পাইয়াছিল, সেই বুদ্ধই বিবেকানন্দ রূপে জগতের সমক্ষে তখন আবির্ভূত।

বোম্বাই বন্দর হইতে শুরু হইল ভারতপথিকের বিশ্ব-পরিক্রমা। কলম্বো, পিনাং, সিঙ্গাপুর, হংকং, ক্যান্টন, নাগাসাকি, কোবি, ইয়াকোহামা, ওসাকা, কিয়াটো ও টোকিও দর্শনান্তে ২৫ জুলাই কানাডার ভ্যাঙ্কুভার বন্দরে তাঁহার সমুদ্রযাত্রার সমাপ্তি হইল।

প্রাচ্যদেশ হইতে তিনি পদার্পণ করিলেন পাশ্চাত্য ভূখণ্ডে। এই অভিযাত্রার মধ্যে নিহিত ছিল ভারত তথা পৃথিবীর ইতিহাসের এক যুগান্তকারী তাৎপর্য। কি সেই তাৎপর্য? শ্রীঅরবিন্দ তাহা উদ্ঘাটন করিয়াছেন। অপূর্ব ভাষায় তিনি লিখিয়াছেনঃ

"The going forth of Vivekananda, marked out by the Master as the heroic soul destined to take the world between his two hands and change it, was the first visible sign to the world that India was awake not only to survive but to conquer." শ্রীঅরবিন্দ বলিলেন, স্বামীজীর এই অভিযাত্রার ফলে ভারতের পুণর্জাগরণ ঘটিবে এবং সেই পুণর্জাগরণের সূত্রে ভারত বিশ্বজয় করিবে।

ভ্যাঙ্কুভার হইতে স্বামীজী শিকাগোয় পৌঁছান ৩০ জুলাই। জনাকীর্ণ শিকাগো রেলস্টেশন হইতে তিনি নামিয়া আসিলেন শিকাগোর রাস্তায়। কলম্বিয়ান এক্সপোজিশন বা বিশ্বমেলা উপলক্ষে তখন শিকাগোয় অগণিত মানুষের ভিড়। স্বামীজী দেখিলেন, অসংখ্য নরনারী শহরের রাস্তায় হাঁটিয়া চলিয়াছে, কিন্তু তাহাদের মধ্যে কোন মুখই তাঁহার পরিচিত নয়। অজানা, অচেনা বিশাল শিকাগো শহরে কোথায় যাইবেন, কি করিবেন বুঝিতে পারিতেছিলেন না তিনি। আশ্রয়, আহার, বিশ্রাম সর্বাগ্রে প্রয়োজন। ওদেশের অনভ্যস্ত শীতে তিনি জর্জরিত, দীর্ঘ পথশ্রমে অতিমাত্রায় ক্লান্ত। কিন্তু কে তাঁহাকে এই নির্বান্ধব, অপরিচিত ভিনদেশী বিরাট শহরে আশ্রয় দিবে? অবশেষে শহরের একটি হোটেলে উঠিলেন তিনি।

কোথায় ভারতের পথে পথে, অরণ্যে-পর্বতে পরিব্রাজক সন্ন্যাসীর ধ্যান, তপস্যা, স্বাধ্যায়, মাধুকরী ও স্বেচ্ছা-বিচরণের জীবন; আর কোথায় পোশাকী সভ্যতার পাদপীঠ আমেরিকার এক ব্যস্ততম বিশাল আধুনিক বাণিজ্যনগরী শিকাগোর কোলাহল, আড়ম্বর ও ভোগবাদের ফেনায়িত পরিমণ্ডল! দৃশ্য ও পরিবেশ, জীবনযাত্রা ও জীবনদর্শনের এই অভাবনীয় বৈপরীত্যে তাঁহার বৈরাগ্যপ্রবণ মন প্রচণ্ডভাবে বিচলিত হইল। অতঃপর তাঁহার জন্য অপেক্ষা করিতেছিল এক বিরাট আশাভঙ্গের আঘাত। অবিলম্বেই তিনি জানিলেন যে, ধর্মমহাসভা শুরু হইবার অনেক আগেই তিনি শিকাগোয় আসিয়া পৌঁছাইয়া গিয়াছেন। ধর্মমহাসভা শুরু হইবে ১১ সেপ্টেম্বর—তখনও ছয় সপ্তাহ দেরি। আমেরিকা সম্পর্কে অনভিজ্ঞ তাঁহার ভারতীয় বন্ধুরা তাঁহার যে পোশাক করাইয়া দিয়াছিলেন তাহা ছিল এখানকার প্রচণ্ড ঠাণ্ডার পক্ষে সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত এবং তাঁহারা যে-অর্থ তাঁহার সহিত দিয়াছিলেন, শিকাগোর অত্যধিক ব্যয়সাপেক্ষ হোটেলে তাহাতে অতদিন থাকাও অসম্ভব।

শুধু তাহাই নয়। তিনি জানিতে পারিলেন, ধর্মমহাসভায় তাঁহার যোগদান করা কখনই সম্ভব হইবে না। কারণ, ধর্মমহাসভায় যোগদানের জন্য আমন্ত্রিত হইতে হইবে এবং আমন্ত্রিত প্রতিনিধিকে সঙ্গে বহন করিতে হইবে সংশ্লিষ্ট ধর্মীয় সম্প্রদায় বা প্রতিষ্ঠানের পক্ষ হইতে যোগ্যতাসূচক পরিচয়পত্র। স্বামীজীর কাছে কোনটিই ছিল না। তিনি আমন্ত্রণও পান নাই এবং তাঁহার কোন পরিচয়পত্রও ছিল না। তিনি আরও জানিতে পারিলেন যে, প্রতিনিধি হিসাবে নাম নথিভুক্ত করিবার সময়সীমাও উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে।

তীরে আসিয়া কি তাহা হইলে তরী ডুবিয়া যাইবে? গভীর হতাশা ও বিষাদে ভরিয়া গেল স্বামীজীর মন। আমেরিকা তথা বিশ্বের বিভিন্ন দেশের মানুষের কাছে ভারতবর্ষের ধর্ম ও ঐতিহ্যের গৌরবগাথা, ভারতের উপর ব্রিটিশের নির্মম শোষণ ও অত্যাচারের কথা তিনি তুলিয়া ধরিতে পারিবেন না! ভারতের দরিদ্র ও উপেক্ষিত গণমানুষ ও নারী-সমাজের উন্নতির জন্য তাঁহার অর্থসংগ্রহের পরিকল্পনা তাহা হইলে অঙ্কুরেই বিনষ্ট হইয়া যাইবে! একসময় মনে হইল, ভারতে ফিরিয়া যাওয়া ভিন্ন উপায় নাই। শিষ্য আলাসিঙ্গা পেরুমলকে একটি চিঠিতে তিনি লিখিয়াছিলেনঃ "এখানে আসিবার পূর্বে যেসব সোনার স্বপন দেখিতাম, তাহা ভাঙিয়াছে। এক্ষণে অসম্ভবের সঙ্গে যুদ্ধ করিতে হইতেছে। শত শত বার মনে হইয়াছে, এদেশ হইতে চলিয়া যাই; কিন্তু আবার মনে হয়, আমি একগুঁয়ে দানা, আর আমি ভগবানের নিকট আদেশ পাইয়াছি। আমি কোন পথ দেখিতে পাইতেছি না, কিন্তু তাঁহার চক্ষু তো সব দেখিতেছে। মরি বাঁচি, উদ্দেশ্য ছাড়িতেছি না।"

গভীর অন্ধকারের মধ্যে নিষ্কম্প অগ্নিশিখার মতো তাঁহাকে পথ দেখাইল তাঁহার আধ্যাত্মিক বিশ্বাস ও উপলব্ধি। তিনি নিশ্চিতভাবে জানিতেন, এই পরিক্রমা একটি দিব্য পরিক্রমা---ঈশ্বরের প্রত্যক্ষ

আদেশে ইহা সম্পাদিত হইতেছে। বাস্তবিকই যে ঈশ্বরের চক্ষু তাঁহাকে সতত এই পরিক্রমায় অনুসরণ করিতেছিল তাহা অচিরেই প্রমাণিত হইবে।

শিকাগোতে লোকমুখে তিনি শুনিলেন যে, বস্টনে অনেক কম খরচে থাকা যায়। সেই অনুসারে সম্ভবতঃ ১২ আগস্ট বস্টনে চলিয়া যান তিনি। যাবার আগে শিকাগোর বিশ্বমেলাটি তিনি ভাল করিয়া ঘুরিয়া দেখিয়া লইলেন। পরবর্তী ঘটনাবলীতে বুঝা যাইবে বস্টনে তাঁহার আগমনের মাধ্যমে ঈশ্বর যেন শিকাগো ধর্মমহাসভায় প্রবেশের স্বর্ণকুঞ্চিকা (Golden Key) তাঁহার হাতে অর্পণ করিয়াছিলেন।

ভ্যাঙ্কুভার হইতে শিকাগো আসার সময় ট্রেনে মিস ক্যাথেরিন স্যানবর্ন নামে এক বিদুষী ও সম্ভ্রান্ত প্রৌঢ়া মহিলার সঙ্গে স্বামীজীর পরিচয় হয়। শিকাগোয় ট্রেন হইতে নামিবার আগে বস্টনের কাছে মেটকাফেতে তাঁহার খামারবাড়ি ব্রীজি মেডোজের ঠিকানা দিয়া মিস স্যানবর্ন স্বামীজীকে সেখানে আতিথ্যগ্রহণের সাদর আমন্ত্রণ জানান। বস্টনে আসিয়া স্বামীজী তাঁহার সহিত যোগাযোগ করেন এবং তাঁহার আমন্ত্রণে ব্রীজি মেডোজে তাঁহার আতিথ্যগ্রহণ করেন। ব্রীজি মেডোজে তাঁহার আগমন ১৮ আগস্টের আগেই হইয়াছিল।

ব্রীজি মেডোজে তাঁহার আগমনের সূত্র ধরিয়া বস্টন ও উহার সন্নিহিত অঞ্চলে তাঁহার পরিক্রমা শুরু হইল। মিস স্যানবর্নের সূত্রেই স্বামীজীর সহিত পরিচয় হয় হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের বিখ্যাত অধ্যাপক জন হেনরি রাইটের সঙ্গে, যিনি ধর্মমহাসভায় যোগদানের ব্যাপারে স্বামীজীকে আশ্বস্ত করেন এবং সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কাছে স্বামীজীর পরিচয়পত্র লিখিয়া দেন, যে-পরিচয়পত্রের সুবাদে ধর্মমহাসভায় তাঁহার প্রবেশাধিকার ঘটিবে। পরিচয়পত্রে তিনি লিখিয়াছিলেনঃ স্বামীজী ধর্মমহাসভায় যোগদানের জন্য সর্বগুণসম্পন্ন প্রতিনিধি। তাঁহার পাণ্ডিত্য আমেরিকার সমস্ত বিদগ্ধ অধ্যাপকের পাণ্ডিত্যের সমষ্টি অপেক্ষাও অধিক।

আগস্টের তৃতীয় সপ্তাহ হইতে সেপ্টেম্বরের ৭ তারিখ পর্যন্ত স্বামীজী বস্টন অঞ্চলে ছিলেন। এই তিন সপ্তাহ স্বামীজী বস্টন, অ্যানিস্কোয়াম, সালেম, সারাটোগা স্প্রিংস প্রভৃতি স্থানে বিশিষ্ট ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠান আয়োজিত প্রকাশ্য ও ঘরোয়া সভায় এবং চার্চে অন্ততঃপক্ষে এগারোটি বক্তৃতা ও আলোচনা করিয়াছিলেন। তুলিয়া ধরিয়াছিলেন ভারতের ধর্ম, ঐতিহ্য, সমাজ ও জীবনযাত্রা সম্পর্কে সত্য ইতিহাসকে। তুলিয়া ধরিয়াছিলেন ভারতীয় সংস্কৃতির মহান বৈশিষ্ট্যকে। তুলিয়া ধরিয়াছিলেন ভারতের উপরে ব্রিটিশ শাসনের নির্মম অত্যাচারের ইতিবৃত্তকে। এই সূত্রে আমেরিকান জনজীবনের প্রতিনিধিত্বমূলক বিভিন্ন অংশের সংস্পর্শে তিনি আসিয়াছিলেন, সংস্পর্শে আসিয়াছিলেন উদারমনা এবং রক্ষণশীল যাজকশ্রেণীর, কারাগারের বন্দীদের, বিশ্বাসী ও অবিশ্বাসী খ্রীস্টানদের, বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়ের, আমেরিকান সমাজকে যাঁহারা চালান সেই 'হাই সোসাইটি' শিক্ষিত মহিলাদের। এমনকি শিশুদের সভাতেও তিনি বলিয়াছিলেন। এইভাবে আমেরিকার সমাজ ও জীবন সম্পর্কে একটি সম্পূর্ণ চিত্র তাঁহার নিকট উন্মোচিত হইয়া গেল। ইতঃপূর্বে ভারত, সিংহল, মালয়েশিয়া, চীন ও জাপানের মাটি ও মানুষকে দেখিয়া এবং জানিয়া ভারতপথিকের উত্তরণ হইয়াছিল প্রাচ্যপথিকে। এখন তিনি হইলেন পাশ্চাত্যপথিকও। শুধু তাহাই নয়, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের সকল বিচ্ছিন্নতা ও পার্থক্যের মধ্যে হইতে সমন্বয়ের স্বর্ণসূত্রকে আবিষ্কার করিয়া তিনি তখন সার্বভৌম দৃষ্টির অধিকারীও হইয়াছিলেন। ইহার পর ৮ সেপ্টেম্বর যখন বস্টন হইতে ট্রেন ধরিয়া ৯ সেপ্টেম্বর তিনি শিকাগোয় পৌঁছাইলেন, তখন বিশ্বধর্মমহাসভায় আবির্ভূত হইবার জন্য তাঁহার প্রস্তুতি সম্পূর্ণ হইয়াছে। আপাতদৃষ্টিতে অপরিকল্পিত এবং আকস্মিক ছিল শিকাগো হইতে তাঁহার বস্টনে আগমন, কিন্তু ইহা ছিল প্রকৃতপক্ষে ধর্মমহাসভায় তাঁহার গৌরবময় আবির্ভাবের দৈবনির্ধারিত শেষ মুহূর্তের মহড়া।

১১ সেপ্টেম্বর ১৮৯৩ বিশ্ব-ইতিহাসের একটি উল্লেখযোগ্য দিন। ঐদিন বিশ্বমানবের সম্মুখে আবির্ভূত হইয়াছিলেন চিরন্তন ভারতের নবীনতম প্রতিভূ, যিনি ছিলেন ভাবীকালের মানুষের কাছে পৃথিবীর নূতন আলোকদূতও। তাঁহার মধ্যে পাশ্চাত্য আবিষ্কার করিল ভারতবর্ষকে, আবার ভারতবর্ষ আবিষ্কার করিল ভারতবর্ষকে। সেইসঙ্গে পৃথিবীও আবিষ্কার করিল বিশ্বজনীন ঐক্যের মূর্ত বিগ্রহকে। সেই ঐক্যের এক নাম সত্য, অপর নাম ধর্ম। সেই সত্য বা ধর্ম কোন দেশিক, কালিক বা সাম্প্রদায়িক সত্য বা ধর্মের কথা বলে না, বলে চিরন্তন সত্যের কথা, সর্বজনীন ধর্মের কথা। পৃথিবীর এই নূতন আলোকপুরুষ ভারত ও পৃথিবীর মৃত্তিকা হইতেই উত্থিত হইয়াছিলেন, কিন্তু মৃত্তিকার মলিনতাকে অতিক্রম করিয়া মানব কিভাবে তাহার মহিমার সমুচ্চ শিখরকে স্পর্শ করিতে পারে তাহাই বাঙ্ময় হইয়া উঠিয়াছিল তাঁহার দেহের রেখায় রেখায়, তাঁহার কণ্ঠের কম্বুধ্বনিতে, তাঁহার সুমহান ভাষণের প্রতিটি শব্দে। ভারতপথিক তখন শুধু বিশ্বপথিকরূপেই আত্মপ্রকাশ করেন নাই, ভারতপুরুষ আবির্ভূত হইয়াছিলেন বিশ্বপুরুষরূপেও। □

ভাষণ

# স্বামীজীর ভারত-পরিক্রমা এবং শিকাগো ধর্মমহাসভায় আবির্ভাবের তাৎপর্য

## স্বামী ভূতেশানন্দ

স্বামী বিবেকানন্দের আবির্ভাব মানবসভ্যতার ইতিহাসে একটি নব অধ্যায়ের সূচনা করেছে। তিনি বিশ্বকে যে-বার্তা দিতে এসেছেন, তার প্রস্তুতি বিশ্বধর্মমহাসম্মেলনে যোগ দেবার বহু আগে থেকেই চলছিল। শ্রীরামকৃষ্ণের যুগপ্রবর্তনে তাঁর সহায়করূপে স্বামীজীর প্রস্তুতি আরম্ভ হয় দক্ষিণেশ্বরে শ্রীগুরুর পদপ্রান্তে। শ্রীরামকৃষ্ণের মধ্যে স্বামীজী খুঁজে পেয়েছিলেন তাঁর ধর্মের বাস্তব রূপকে, পেয়েছিলেন নিজের মনে সযত্নে লালিত ধর্মের প্রকৃত স্বরূপকে। তাঁর চরণতলে বসেই নিজের ধর্মজীবনের সাধনাকে তিনি শতধারায় বিকশিত করেছিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণ ছিলেন সকল ধর্মের মহামিলনক্ষেত্র। এমন কোন ধর্মমত নেই, যা তাঁর মধ্যে মিলিত হয়নি। তাঁর উদার মতবাদ, পরধর্মের প্রতি সহিষ্ণুতা সমভাবে স্বামীজীর জীবনকে প্রভাবিত করে পূর্ণ রূপ দিয়েছিল।

শ্রীরামকৃষ্ণ নিজেই বিবেকানন্দকে তাঁর বার্তাবাহকরূপে চিহ্নিত করেছিলেন এবং এজন্য 'অখণ্ডের ঘর' থেকে তাঁকে নামিয়ে এনেছিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণের ভাবরাশি যা জগৎকে দেবে ধর্মের এক নবরূপ, সেটি রূপায়ণের মহাব্রত স্বামীজী গ্রহণ করেছিলেন তাঁরই প্রেরণায়। তাঁর গুরু এজন্য তাঁকে নিখুঁতভাবে নিজের হাতে গড়েছিলেন। স্বামীজী নিজে পরিকল্পনা করে কোন কর্মধারা আরম্ভ করেননি, কেবল একটা প্রবল প্রেরণা অনুভব করেছিলেন, যা তাঁকে সমস্ত ভারত পরিভ্রমণ করিয়েছিল। এই পরিক্রমার পরিণামে স্বামীজীর চিত্তপটে ফুটে উঠেছিল ভারতের একটি পূর্ণাঙ্গ রূপ—তার অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ। ভারতের উজ্জ্বল অতীত থেকে বর্তমান দুর্দশার বেদনাময় অনুভূতি তাঁর হৃদয়কে আলোড়িত করেছিল এবং মাতৃভূমিকে পুনরায় জাগ্রত করে তার ভবিষ্যৎকে এমন এক সমুজ্জ্বল স্থিতিতে তিনি প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছিলেন, যার প্রভা তার গৌরবোজ্জ্বল অতীতকেও ম্লান করে দেবে। ঠিক সেই সময়ে দৈবনির্দেশে তিনি শিকাগোর ধর্মমহাসম্মেলনে যোগদানের জন্য হৃদয় থেকে প্রেরণা অনুভব করেন। বিদেশযাত্রার প্রাক্কালে স্বামী তুরীয়ানন্দকে তিনি বলেওছিলেন: "হরিভাই, ওখানে (শিকাগোয়) যাকিছু হচ্ছে শুনছ, সব (নিজের বুকে হাত দিয়ে) এর জন্য। এর জন্যই সব হচ্ছে।" তিনি আরও বলেছিলেন: "হরিভাই, আমি এখনও তোমাদের তথাকথিত ধর্মের কিছুই বুঝি না। কিন্তু আমার হৃদয় খুব বেড়ে গেছে এবং আমি অপরের ব্যথা অনুভব করতে শিখেছি।" স্বামীজীর এই ভাবাবেগ দেখে স্বামী তুরীয়ানন্দের মনে হচ্ছিল, তিনি সাধনা শেষ করেছেন ও জগতের কাছে গুরুর বার্তা প্রচার করার জন্য যাচ্ছেন। আমরা জানি, স্বামীজীর বিদেশযাত্রার পশ্চাতে শ্রীরামকৃষ্ণের সম্মতি ও নির্দেশ যেমন ছিল, তেমনি ছিল শ্রীশ্রীমায়ের অনুমতি ও আশীর্বাদ।

৩১ মে, ১৮৯৩ স্বামীজী শিকাগোর উদ্দেশে ভারতবর্ষ থেকে বিদায় নিয়েছিলেন। এতদিন পর তাঁর স্বপ্ন বাস্তবে রূপায়িত হতে চলেছে—তিনি ভারতের বাণী প্রচার করবেন, যে-বাণী ভারত ও জগতের কল্যাণসাধন করবে। দ্বন্দ্বও ছিল তাঁর মনে। সেই দ্বন্দ্ব হলো—যে অজ্ঞাত দেশে এক অপরিচিত পরিবেশের মধ্যে তিনি পদার্পণ করতে চলেছেন, সেখানে হয়তো তাঁকে অনেক বিপদের সম্মুখীন হতে হবে।

স্বামীজীর জীবনের পরবর্তী অধ্যায় সম্বন্ধে আমরা সকলেই পরিচিত। সকল বিপদ-আপদ অতিক্রম করে স্বমহিমায় ধর্মমহাসভায় নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন তিনি। ধর্মমহাসভায় তিনিই ছিলেন সকলের মধ্যমণি। তাঁর প্রদত্ত ভাষণ শ্রোতাদের মনে নতুন ভাবের সঞ্চার করেছিল, উন্মুক্ত হয়েছিল ধর্মের প্রকৃত স্বরূপ। বিশ্বের মানুষের কাছে ধর্মের কল্যাণবাণীকে তিনি প্রচার করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন:

"সাম্প্রদায়িকতা, গোঁড়ামি ও এগুলির ভয়াবহ ফলস্বরূপ ধর্মোন্মত্ততা এই সুন্দর পৃথিবীকে বহুকাল অধিকার করে রেখেছে। এগুলি পৃথিবীকে হিংসায় পূর্ণ করেছে, বারবার তাকে নরশোণিতে সিক্ত করেছে, সভ্যতা ধ্বংস করেছে এবং জাতিসমূহকে হতাশায় মগ্ন করেছে। এইসব ভীষণ দানব যদি না থাকত তাহলে

মানবসমাজ আজ পর্বাপেক্ষা অনেক উন্নত হতো। তবে এগুলির মৃত্যুকাল উপস্থিত; এবং আমি সর্বতোভাবে আশা করি, ধর্মমহাসভার সম্মানে আজ যে ঘণ্টাধ্বনি নিনাদিত হয়েছে, তা সর্ববিধ ধর্মোন্মত্ততা, তরবারি অথবা লেখনী দ্বারা অনুষ্ঠিত সর্বপ্রকার নির্যাতনের এবং... সর্ববিধ অসদ্ভাবের সম্পূর্ণ অবসানের বার্তা ঘোষণা করুক।"

স্বামীজীর তাঁর এই উদাত্ত আহ্বান শিকাগো ধর্মমহাসভার আন্তর্জাতিক মঞ্চ থেকে জানিয়েছিলেন সমগ্র বিশ্বের উদ্দেশে ধর্মমহাসভায় তাঁর প্রথমদিনের ভাষণে। তিনি বলেছিলেন, পৃথিবীতে স্থায়ী শান্তি-প্রতিষ্ঠার ভিত্তি হতে পারে ভারতবর্ষের পথ ও আদর্শ। ভারতবর্ষ সুপ্রাচীনকাল থেকে 'পরমত-সহিষ্ণুতা' ও 'সর্ববিধ মত স্বীকার'-এর বাণী জগৎকে শিক্ষা দিয়ে আসছে। কিভাবে ভারতবর্ষ সেই বাণী ও আদর্শকে বাস্তবে রূপদান করেছে, তার ইতিহাসও স্বামীজী তাঁর ঐ সংক্ষিপ্ত ভাষণে বিবৃত করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন, প্রাচীনকালে ইহুদীরা যখন নিজভূমিতে নির্যাতিত হয়ে আশ্রয়ের সন্ধানে ভারতবর্ষে এসেছিল তখন ভারতবর্ষ তাদের সাদরে হৃদয়ে ধারণ করে রেখেছিল। প্রাচীন পারস্যে জরথুস্ট্র-পন্থীগণ নিজ দেশে অত্যাচারিত হয়ে ভারতবর্ষে এসে আশ্রয়লাভ করেছিল। যখনই পৃথিবীর অন্য কোন প্রান্তে সেখানকার মানুষ জাতি ও ধর্ম-বিদ্বেষের শিকার হয়ে আশ্রয়ের সন্ধানে বেরিয়েছে, তখন তারা নিশ্চিন্তে এসেছে ভারতবর্ষে। কারণ তারা জানত—ভারতবর্ষ চিরকাল সকল ধর্ম ও সকল জাতির নিপীড়িত ও আশ্রয়প্রার্থী জনগণের চিরবিশ্বস্ত আশ্রয়স্থল। স্বামীজী তাঁর ভাষণে বলেছিলেন, ভারতবর্ষের পবিত্র সংস্কৃত ভাষায় ইংরেজী 'এক্সক্লুশন' (exclusion) শব্দটি অনুবাদ করা যায় না। ভারতবর্ষের ঐতিহ্যে বর্জন এবং বহিষ্কার যে অস্বীকৃত তাই তার দ্বারা প্রমাণিত।

ধর্মমহাসভায় প্রদত্ত তাঁর প্রত্যেকটি ভাষণে স্বামীজী ভারতের উদার আদর্শ, ভারতের শান্তি, সমন্বয় ও সৌহার্দের বাণীকে বলিষ্ঠ ভাষায় তুলে ধরেছিলেন। কূপমণ্ডুকের মতো সঙ্কীর্ণ মনোভাবকে ত্যাগ করে উদার ও মুক্ত মনোভাব নিয়ে সকল মত ও পথকে, সকল ধর্মমত ও সম্প্রদায়কে বুঝতে, দেখতে এবং স্বীকার করতে আহ্বান জানিয়েছিলেন স্বামীজী। ধর্মমহাসভার সমাপ্তি দিবসের ভাষণেও স্বামীজী ঐ একই বাণী পুনরুচ্চারণ করেছিলেন। সেই ভাষণে স্বামীজী সকল সঙ্কীর্ণতার ঊর্ধ্বে ধর্মের মহান আদর্শকে স্থাপন করেন এবং উদাত্ত কণ্ঠে ঘোষণা করেন: "যদি কেউ এমন স্বপ্ন দেখেন যে, অন্যান্য ধর্ম লোপ পাবে এবং তাঁর ধর্মই টিকে থাকবে, তবে তিনি বাস্তবিকই কৃপার পাত্র; তাঁর জন্য আমি আন্তরিক দুঃখিত, তাঁকে আমি স্পষ্টভাবে বলে দিচ্ছি, তাঁর মতো লোকেদের বাধাপ্রদান সত্ত্বেও শীঘ্রই প্রত্যেক ধর্মের পতাকার ওপর লিখিত হবে, 'বিবাদ নয়, সহায়তা; বিনাশ নয়, পরস্পরের ভাবগ্রহণ; মতবিরোধ নয়, সমন্বয় ও শান্তি'।"

ইতিহাসের দিক থেকে বিচার করলে আমরা দেখব, ধর্মমহাসভাই প্রথম পৃথিবীতে এক ধর্মের সঙ্গে অন্য ধর্মের সম্প্রীতিমূলক আলোচনা (Dialogue) বা আধুনিক কালে যাকে 'তুলনামূলক ধর্ম' (Comparative Religion) বলা হয়, তার আলোচনার ক্ষেত্র প্রস্তুত করেছিল। কিন্তু ধর্মমহাসভায় এ-বিষয়ে সর্বাপেক্ষা বলিষ্ঠ এবং জনপ্রিয় প্রবক্তা হিসাবে আত্মপ্রকাশ করেছিলেন স্বামী বিবেকানন্দ। আজ সারা পৃথিবী জুড়েই স্থায়ী শান্তি-প্রতিষ্ঠার পক্ষে আলোচনা ও আন্দোলন সংগঠিত হচ্ছে। কিন্তু সেই আন্দোলন ও আলোচনা কতখানি আন্তরিক সে-বিষয়ে সংশয়ের অবকাশ আছে। আজ দেশে ও বিদেশে চিন্তাশীল ব্যক্তিরা বিশ্বাস করছেন, স্বামীজীর এই বাণীকে অনুসরণ করলে শান্তি ও সমৃদ্ধিময় পৃথিবী গঠন করা সম্ভব হবে। আজ জাতিতে জাতিতে, ধর্মে ধর্মে, গোষ্ঠীতে গোষ্ঠীতে যে প্রলয়ঙ্কর দ্বন্দ্ব চলছে, তার সমাধানের সমস্ত চেষ্টা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হচ্ছে। তার কারণ, অপরকে সংশোধিত করতে আমাদের যে-প্রয়াস, নিজেদের শুদ্ধির জন্য ততোধিক প্রয়াস যে সর্বাগ্রে আবশ্যক, এসম্বন্ধে আমাদের চেতনার জাগরণ এখনও হয়নি। স্বামীজী আশা করেছিলেন যে, তাঁর মহাব্রতের আহ্বানে ভারতবাসী তার দীর্ঘ নিদ্রাভঙ্গ করে তাঁর নবযুগের স্বপ্নকে সফল করতে প্রাণ থেকে সাড়া দেবে এবং সক্রিয়ভাবে এই ব্রতে অংশগ্রহণ করবে। তাঁর সে-আশা এখনও সম্পূর্ণভাবে সফল হয়নি। তবে আজ তাঁর আহ্বান শুধু ভারতে নয়, সমগ্র জগতে যে একটা আলোড়ন সৃষ্টি করেছে, সেবিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। ঠাকুর-মা-স্বামীজীর চরণে প্রার্থনা জানাই, যেন এই মহাযুগসন্ধিক্ষণে স্বামীজীর স্বপ্নকে সফল করতে প্রেরণা অনুভব করি ও আমাদের জীবনকে এই মহান কার্যে সমর্পণ করতে উৎসাহিত হই।☐ *

★ কাঁকুড়গাছি রামকৃষ্ণ যোগোদ্যান মঠ আয়োজিত বিশ্বধর্মসম্মেলনের উদ্দেশে স্বামী বিবেকানন্দের সমুদ্রযাত্রার শতবর্ষ উপলক্ষে ৩১ মে ১৯৯৩ থেকে তিনদিনের অনুষ্ঠানের প্রথমদিন উদ্বোধন-অধিবেশনে প্রেরিত আশীর্বাণী।

# স্বামী বিবেকানন্দের আহ্বান

## স্বামী গহনানন্দ

ভারত-পরিক্রমা শেষ করে যেদিন স্বামীজী শিকাগো ধর্মমহাসভায় যোগদানের উদ্দেশ্যে সমুদ্রযাত্রা করলেন সেই দিনটি—৩১ মে, ১৮৯৩—শুধু ভারতবর্ষের নয়, সমগ্র মানবজাতির পক্ষে অতি বিশিষ্ট একটি দিন। ঐ দিনটি স্বামীজীর জীবনের মহান কর্মময় অধ্যায়ের সূচনা করেছিল। সেই কর্মময় অধ্যায় চলে প্রায় একদশক—তাঁর মহাপ্রয়াণ পর্যন্ত। এই অভিযাত্রার পূর্ববর্তী অধ্যায়টি ছিল স্বামীজীর জীবনের প্রস্তুতি-পর্ব। সেই প্রস্তুতি-পর্বে তাঁকে উপযুক্ত শিক্ষা দিয়ে তৈরি করেছিলেন প্রত্যক্ষভাবে এবং অপ্রত্যক্ষভাবে শ্রীরামকৃষ্ণ। শুধু শিক্ষাই দেননি, জীবনকালে তাঁর মধ্যে তিনি শক্তিসঞ্চারও করেছিলেন। সেই শক্তি শ্রীরামকৃষ্ণের নিজস্ব সাধনালব্ধ আধ্যাত্মিক শক্তি।

স্বামীজীর ভারত-পরিক্রমা এই প্রস্তুতি-পর্বেরই অঙ্গ। এই ভারত-পরিক্রমায় তিনি আবিষ্কার করেন একদিকে তাঁর স্বদেশের আধ্যাত্মিক সম্পদ, আর অন্যদিকে তাঁর স্বদেশবাসীর চরম দারিদ্র্য এবং দুঃখ। তাঁর স্বদেশপ্রেম এবং স্বদেশবাসীর প্রতি ভালবাসাই তাঁকে পাশ্চাত্যে যেতে অনুপ্রাণিত করেছিল। তাঁর উদ্দেশ্য ছিল ধনী পাশ্চাত্যের কাছ থেকে দরিদ্র স্বদেশবাসীর জন্য অর্থসংগ্রহ, বিনিময়ে পাশ্চাত্যজগতে আধ্যাত্মিকতা বিস্তারের প্রচেষ্টা। তিনি বিশ্ব-ধর্মমহাসভায় দাঁড়িয়ে বলেছিলেন, ভারতের প্রয়োজন খাদ্য—ধর্ম নয়।

শ্রীরামকৃষ্ণ স্বামীজীর মধ্যে যে-শক্তি সঞ্চারিত করেছিলেন, সেই শক্তি নিয়ে তিনি পাশ্চাত্যে দিগ্‌বিজয়ে বেরিয়েছিলেন—সেই দিগ্‌বিজয় নতুনভাবে ভারতের আধ্যাত্মিকতার দিগ্‌বিজয়। সমগ্র পাশ্চাত্যজগৎ চমৎকৃত এবং উদ্ভাসিত নেত্রে এই উজ্জ্বল তরুণ সন্ন্যাসীর কথার মধ্যে নতুন আশার আলোক দেখতে পেল। সেই নতুন আশা—মানব-সংহতি। ধর্মীয় ভেদাভেদে দীর্ণ এবং জীর্ণ মানবসমাজ মানব-সংহতির এক নতুন পথের সন্ধান পেল। সেই পথ আধ্যাত্মিকতার পথ, বিশ্বাসের পথ এবং সেই বিশ্বাস—সব ধর্মই সত্য।

স্বামীজী শিকাগো ধর্মমহাসভায় আধ্যাত্মিকতা এবং সর্বধর্মই সত্য—এই বিশ্বাসের কথা শোনানোর পর প্রায় শতবর্ষ অতিক্রান্ত। আজও পৃথিবীতে অশান্তি, ভেদাভেদ প্রচণ্ডভাবে বিদ্যমান। তার কারণ—মানবসমাজ স্বামীজীর কথা উপেক্ষা করেছে, তাঁর কথা সম্যক্‌ভাবে উপলব্ধি করতে ব্যর্থ হয়েছে। স্বামীজী তাঁকে সম্যক্ উপলব্ধি করতে পারবেন চজন বিবেকানন্দ। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে তিনি আমাদের এই আশার বাণীও শুনিয়েছেন যে, কালে হাজার হাজার বিবেকানন্দ এই পৃথিবীতে জন্মাবে। সেই 'হাজার হাজার বিবেকানন্দ' আসবে আজ এবং আগামী দিনের তরুণসমাজের মধ্য থেকে। সুতরাং তাদের নিজেদের প্রস্তুত করতে হবে এবং সমাজকে রক্ষার জন্য এগিয়ে আসতে হবে। তবেই স্বামীজীর স্বপ্ন—মানব-সংহতি সম্ভব হবে, সব ভেদাভেদ এবং দ্বন্দ্ব মুছে গিয়ে গড়ে উঠবে এক নতুন পৃথিবী। স্বামীজীর বাণী ও ভাবধারার চর্চা এবং প্রচারে আমাদের মনোনিবেশ করতে হবে। ১৯৯৩-২০০২—এই দশকটি খুব গুরুত্বপূর্ণ দশক। এই দশককে আমরা 'মানব সংহতি দশক'-রূপে চিহ্নিত করতে পারি। ১৮৯৩-এ স্বামীজীর শিকাগোয় আবির্ভাব থেকে ১৯০২-এ তাঁর দেহান্ত পর্যন্ত এই একটি দশক ভারতবর্ষ ও পৃথিবীকে নতুন আলোর সন্ধান দিয়েছিল। যদি আমরা আগামী দশকে সেই আলোর শিখাকে চারদিকে বিস্তৃত করে দিতে পারি তাহলে স্বামীজীর স্বপ্নকে আমরা সফল করতে পারব।

শিকাগো বিশ্বধর্মমহাসভায় স্বামী বিবেকানন্দ কি আলোড়ন তুলেছিলেন তা আজ সর্বজনবিদিত এবং বহু-আলোচিত। তাঁর কাছ থেকেই পাশ্চাত্যজগৎ প্রথম জানতে পারলো ভারতের অধ্যাত্মসম্পদের কথা। ভারতের অধ্যাত্মসম্পদের কথা জানবার পর ওদেশে গুঞ্জন উঠেছিল যে, পাশ্চাত্য থেকে ধর্মপ্রচারক

ভারতবর্ষে পাঠানোর পরিবর্তে ভারত থেকেই ধর্মপ্রচারক ওদেশে যাওয়া উচিত।

স্বদেশ এবং স্বদেশবাসীর প্রতি স্বামী বিবেকানন্দের ভালবাসা ছিল অপরিসীম। এমনই ছিল এই স্বদেশপ্রেম যে, মহাত্মা গান্ধী বলেছিলেন, স্বামীজীর রচনা পাঠ করে তাঁর নিজের স্বদেশপ্রেম সহস্রগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। এই স্বদেশানুরাগেই স্বামীজী বলেছিলেনঃ "আমি যেন দিব্যচক্ষে দেখছি যে, আমাদের সেই প্রাচীনা জননী আবার জেগে উঠে আবার নতুন যৌবনশক্তিতে ভরপুর এবং আগের চেয়ে অনেকগুণ মহিমান্বিত হয়ে তাঁর সিংহাসনে বসেছেন।" স্বামীজীর এই স্বপ্ন এখনো সফল হয়নি।

ভারতের হৃতগৌরবকে পুনরায় ফিরিয়ে আনতে হলে যে-গৌরব হৃত হয়েছে তা জানা প্রয়োজন এবং সেই জন্যই দরকার ভারতবর্ষকে জানা। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, ভারতবর্ষকে জানতে হলে বিবেকানন্দকে অনুধাবন করতে হবে। অরবিন্দ বলেছেনঃ "Behold, Vivekananda still lives in the soul of his Mother and the souls of • her children" প্রত্যেক ভারতবাসীর আত্মায় নিহিত আছেন বিবেকানন্দ। আমাদের প্রচেষ্টা হবে তাকে জাগিয়ে তোলা—ব্যক্তি ও জাতীয় জীবনে তাকে চেতন করা। স্বামীজী বলেছিলেনঃ "ভারত আবার উঠবে, কিন্তু জড়ের শক্তিতে নয়, চৈতন্যের শক্তিতে; বিনাশের বিজয় পতাকা নিয়ে নয়, শান্তি এবং প্রেমের পতাকা নিয়ে।" স্বামীজীর এই ভবিষ্যদ্বাণীকে স্মরণ রেখে আমাদের প্রত্যেককে প্রচেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে—স্বামীজীকে সম্যক্ অনুধাবনের এবং তাঁর ভাবাদর্শে নিজেদের গড়ে তোলার। সেই প্রচেষ্টারই আজ সব চাইতে বড় প্রয়োজন। সেই প্রচেষ্টায় এগিয়ে আসতে হবে জাতি-ধর্ম-নির্বিশেষে সকলকে—বিশেষ করে তরুণদের।

পরাধীন ভারতে স্বামীজী নিজে ভারতবাসী বলে গর্ব অনুভব করেছেন এবং তাঁর স্বদেশবাসীদের ভারতবাসী বলে গর্ব অনুভব করতে শিখিয়েছিলেন। কিন্তু স্বাধীনতাপ্রাপ্তির পরও এ-দেশবাসীরা ভারতবাসী বলে গর্ব অনুভব করতে শেখেনি। ভারতবর্ষের পুনর্জাগরণের জন্য প্রয়োজন স্বদেশকে ভালবাসা, তার জন্য গর্ববোধ করে উন্নত শিরে দাঁড়ানো। স্বদেশপ্রেম মানে স্বদেশবাসীর প্রতি গভীর ভালবাসাও। স্বামীজী তরুণদের আহ্বান করে বলেছেনঃ "হে যুবকবৃন্দ, দরিদ্র, অজ্ঞ, অত্যাচার-পীড়িত জনগণের জন্য তোমাদের প্রাণ কাঁদুক; প্রাণ কাঁদতে কাঁদতে হৃদয় রুদ্ধ হোক। আমি তোমাদের কাছে এই গরিব অজ্ঞ অত্যাচার-পীড়িতদের জন্য এই সহানুভূতি, এই প্রাণপণ চেষ্টা দায়স্বরূপ অর্পণ করছি।" সেই দায় হলো আজ স্বামীজীর ভাবাদর্শে নিজেদের গড়ে তোলার দায়, নিজেদের গড়ে তোলার ব্রত, ভারতবর্ষের সেবায় নিজেদের সমর্পণ করার প্রয়াস।

স্বাধীনতালাভের পরে বেশ কয়েকটি দশক অতিক্রান্ত হয়েছে। বিগত কয়েক দশকে স্বাধীন ভারতবর্ষ কৃষি, শিল্প, শিক্ষা প্রভৃতি নানা ক্ষেত্রে আপাতদৃষ্টিতে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতির স্বাক্ষর রাখতে সমর্থ হয়েছে। কিন্তু যে-বিষয়ে স্বামীজী সর্বপ্রথম জাতিকে লক্ষ্য রাখার জন্য বারংবার আহ্বান জানিয়েছিলেন, সেই বিষয়টি উপেক্ষিত এবং অবহেলিত হওয়ায় ভারতবর্ষ সত্যিকারের প্রগতির পথে অগ্রসর হতে পারেনি। সেই বিষয়টি হলো 'মানুষ হয়ে ওঠা'। বস্তুতঃ, সব সমৃদ্ধি ও অগ্রগতির মূলকথা হলো মানুষের চরিত্র। জাতির চরিত্র গঠন না হলে কোন ঐহিক সমৃদ্ধিই স্থায়ী হতে পারে না। আজ তাই সর্বপ্রথম প্রয়োজন স্বামীজীর আকাঙ্ক্ষা অনুসারে নিজেদের 'মানুষ' হয়ে ওঠা। যথার্থ মানুষ যেমন দেশের কথা ভাববে, তেমনি ভাববে পৃথিবীর কথাও। দেশের ঐতিহ্যে বিশ্বাস, দেশের সংহতিতে বিশ্বাস এবং পৃথিবীর অন্যান্য দেশের ঐতিহ্যে শ্রদ্ধা এবং সংহতিতে শ্রদ্ধা আজ একই সঙ্গে একান্ত জরুরী বিষয়। স্বামীজীর ভারত-পরিক্রমা এবং শিকাগো ধর্মমহাসভায় তাঁর আবির্ভাব ভারতবর্ষ ও পৃথিবীর মানুষকে এবিষয়ে সর্বপ্রথম সচেতন করে দিয়েছিল। এই দুটি ঘটনা শুধু স্বামীজীর জীবনে নয়, শুধু ভারতবর্ষের জন্যই নয়, সারা পৃথিবীর মানুষের জীবনে এবং সারা পৃথিবীর জন্যও তাই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। একথা আজ দেশ ও বিদেশের ঐতিহাসিকরা বলছেন, সমাজবিজ্ঞানীরা বলছেন, রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বরাও স্বীকার করছেন। এই সঙ্গে আমাদের মনে রাখতে হবে যে, ভারত-পরিক্রমা করে স্বামীজী যে চিরন্তন ভারত-সত্যকে আবিষ্কার করেছিলেন, সেই ভারত-সত্যকেই তিনি উপস্থাপন করেছিলেন পৃথিবীর সামনে ধর্মমহাসভায়।* □

★ কাঁকুড়গাছি রামকৃষ্ণ যোগোদ্যান মঠ আয়োজিত বিশ্বধর্মসম্মেলনের উদ্দেশে স্বামী বিবেকানন্দের সমুদ্রযাত্রার শতবর্ষ উপলক্ষে ৩১ মে ১৯৯৩ থেকে তিনদিনের প্রথমদিন উদ্বোধন-অধিবেশনে প্রদত্ত স্বাগত ভাষণ।

# নিবন্ধ

## সীতা-রাম সীতা-রাম

### স্বামী শ্রদ্ধানন্দ

উত্তর ভারতে হিন্দুরা মৃতদেহ শ্মশানে লইয়া যাইবার সময়ে 'রাম নাম সচ্ হ্যায়'—এই কথাটি কিছু উচ্চৈঃস্বরে বলিয়া চলেন। পথিপার্শ্বের বাড়ির লোকেরা শুনিতে পায় এবং বুঝিতে পারে, একজন মারা গিয়াছে। দরদী হইলে মৃতের প্রতি মৃদু সমবেদনা প্রকাশ করে এবং হয়তো বলে 'সীতা-রাম সীতা-রাম! শ্মশানগামী খাটিয়ায় যিনি প্রাণহীন দেহে শুইয়া আছেন, তিনি কিছু শুনিতে পান না। কিন্তু তিনি যদি ভগবানের নামে বিশ্বাস করিতেন, তাহা হইলে মরিবার আগে তাঁহার মৃতদেহ-বাহকগণ যে রামনাম করিয়া তাঁহাকে শ্মশানে লইয়া যাইবে—ইহা ভাবিয়া তিনি নিশ্চয়ই সান্ত্বনা লাভ করিতেন। জীবনে রামনাম, মৃত্যুর পূর্বে রামনাম, পরপারের পথে রামনাম, পরপারে রামের চিরন্তন পদে অনন্ত বিশ্রাম! ভক্ত হিন্দু এইরূপই বিশ্বাস করেন।

রাম শ্রীভগবানের সপ্তম অবতার। একটি প্রধান পুরাণে বিষ্ণুর দশাবতারস্তোত্রে পড়ি—

"কুলে রঘূনাং সমবাপ্য জন্ম
বিধায় সেতুং জলধের্জলান্তঃ।
লঙ্কেশ্বরং যঃ শময়াঞ্চকার
সীতাপতিং তং প্রণমামি ভক্ত্যা॥"

—"রঘুকুলে জন্মগ্রহণ করিয়া, সমুদ্রের উপর সেতু বাঁধিয়া সাগরপারে লঙ্কানগরীর অধীশ্বর রাবণকে যিনি দমন করিয়াছিলেন সেই সীতাপতি রামকে সভক্তি প্রণাম নিবেদন করি।"

পৌরাণিক যুগে বৌদ্ধধর্ম ভারত হইতে বিদায় লইয়াছে। বুদ্ধ বিষ্ণুর নবম অবতাররূপে পূজিত হইতেছেন। বুদ্ধের প্রধান প্রধান উপদেশ হিন্দুধর্মের শিক্ষার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে। তবুও হিন্দুমানস মনে-প্রাণে বুদ্ধকে রামের মতো বা কৃষ্ণের মতো হৃদয় ভরিয়া ভালবাসিতে পারে না। ইহার কারণ, বুদ্ধ ভগবানের অস্তিত্ব সম্বন্ধে স্পষ্ট করিয়া কিছু বলেন নাই। শ্রীরামকৃষ্ণ বুদ্ধকে সমর্থন করিয়া বলিয়াছিলেন, ঈশ্বরের সর্বোত্তম সত্য 'অবাঙমনসোগোচরম্' —বাক্যমনের অতীত। সেইজন্যই বুদ্ধ ঈশ্বর সম্বন্ধে নীরব ছিলেন। সাধারণ মানুষ যাহা বুঝিবে এবং সাধিতে পারে তিনি তাহাই বলিতেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ-জীবনে রাম ও সীতা বিভিন্ন সময়ে বিভিন্নভাবে আসিয়াছিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণের সাধন-জীবনের প্রথমদিকে রামাইত সাধু জটাধারী তাঁহার ইষ্ট 'রামলালা'কে (বালক রামের মূর্তি) লইয়া দক্ষিণেশ্বরে উপস্থিত হন। এই মূর্তিটি তাঁহার কাছে জীবন্তরূপে প্রতিভাত হইত। তিনি তাহাকে ভোগ রাঁধিয়া খাওয়াইতেন, তাহার সহিত খেলিতেন, তাহাকে লইয়া বেড়াইতেন। এইভাবে তাঁহার বাৎসল্যভাবের সাধনা শ্রীরামকৃষ্ণ শেষ করিলেন। ক্রমশঃ তাঁহার মন 'রামলালা'র প্রতি আকৃষ্ট হইল। তাঁহার কাছেও মূর্তিটি জীবন্ত হইয়া উঠিল। ধীরে ধীরে শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতি রামলালা বেশি সময় কাটাইতে লাগিল। জটাধারী ভোগ রাঁধিয়া রামলালাকে ডাকিয়া খুঁজিয়া পান না। অবশেষে দেখিলেন, সে শ্রীরামকৃষ্ণের ঘরে দৌড়াদৌড়ি করিতেছে। জটাধারীর দক্ষিণেশ্বর ত্যাগ করিবার সময় হইল। কিন্তু রামলালা যাইতে চায় না। সে আমি এখানেই থাকিব। জটাধারী ধ্যানে উপলব্ধি করিলেন, রামলালার উপাসনা তাঁহার পক্ষে সিদ্ধ হইয়াছে। চোখের জল মুছিতে মুছিতে সাধু রামলালা বিগ্রহকে শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে রাখিয়া গেলেন।

দাস্যভক্তি-সাধনকালে সীতাদেবীর দর্শন সম্বন্ধে শ্রীরামকৃষ্ণের নিজের উক্তি ঃ

"এইকালে পঞ্চবটীতলে একদিন বসিয়া আছি— ধ্যানচিন্তা কিছু যে করিতেছিলাম তাহা নহে, অমনি বসিয়াছিলাম—এমন সময়ে নিরুপমা জ্যোতির্ময়ী স্ত্রীমূর্তি অদূরে আবির্ভূতা হইয়া স্থানটিকে আলোকিত করিয়া তুলিল। ঐ মূর্তিটিকেই তখন যে কেবল দেখিতে পাইতেছিলাম তাহা নয়, পঞ্চবটীর গাছপালা, গঙ্গা ইত্যাদি সকল পদার্থই দেখিতে পাইতেছিলাম! দেখিলাম, মূর্তিটি মানবীর, কারণ উহা দেবীদিগের ন্যায় ত্রিনয়নসম্পন্না নহে। কিন্তু প্রেম-দুঃখ-করুণা- সহিষ্ণুতাপূর্ণ সেই মুখের ন্যায় অপূর্ব ওজস্বী গম্ভীর ভাব দেবীমূর্তিসকলেও সচরাচর দেখা যায় না। প্রসন্ন দৃষ্টিপাতে মোহিত করিয়া ঐ দেবী-মানবী ধীর ও মন্থর পদে উত্তর দিক হইতে দক্ষিণে আমার দিকে অগ্রসর হইতেছেন! স্তম্ভিত হইয়া ভাবিতেছি, 'কে ইনি?'— এমন সময়ে একটি হনুমান কোথা হইতে সহসা উ-উপ্ শব্দ করিয়া আসিয়া তাঁহার পদপ্রান্তে লুটাইয়া পড়িল এবং ভিতর হইতে মন

বলিয়া উঠিল, 'সীতা, জনম-দুঃখিনী সীতা, জনক-রাজনন্দিনী সীতা, রামময়জীবিতা সীতা !' তখন 'মা', 'মা' বলিয়া অধীর হইয়া পদে নিপতিত হইতে যাইতেছি, এমন সময় তিনি চকিতের ন্যায় আসিয়া (নিজ শরীর দেখাইয়া) ইহার ভিতর প্রবিষ্ট হইলেন !—আনন্দে বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া বাহ্যজ্ঞান হারাইয়া পড়িয়া গেলাম। ধ্যান-চিন্তাদি কিছু না করিয়া এমনভাবে কোন দর্শন ইতঃপূর্বে আর হয় নাই। জনম-দুঃখিনী সীতাকে সর্বাগ্রে দেখিয়াছিলাম বলিয়াই বোধ হয় তাঁহার ন্যায় আজন্ম দুঃখভোগ করিতেছি !"[১]

"সীতার ন্যায় আমি আজন্ম দুঃখভোগ করিতেছি।"—ঠাকুরের এই কথাটি বুঝা একটু কঠিন। (১) বাল্যে পিতৃবিয়োগ (২) পিতৃস্থানীয় জ্যেষ্ঠভ্রাতা রামকুমারের মৃত্যু (৩) রামকুমারের পুত্র অক্ষয়, যিনি ঠাকুরের অত্যন্ত স্নেহপাত্র ছিলেন তাঁহার মৃত্যুশয্যার পাশে দাঁড়াইয়া তাঁহার প্রাণত্যাগ দেখা (৪) রানী রাসমণির দেহত্যাগ (৫) মথুরবাবুর মৃত্যু (৬) মথুর-পত্নী জগদম্বা দাসীর মৃত্যু (৭) নববিধান ব্রাহ্মসমাজের নেতা কেশবচন্দ্র সেনের দেহত্যাগ, এই খবর পাইয়া ঠাকুর তিনদিন শয্যায় শুইয়া কাঁদিয়াছিলেন (৮) প্রিয় গৃহী ভক্ত একান্ত অনুগত অধরলাল সেনের ঘোড়া হইতে পড়িয়া মৃত্যু—যাঁহার বাড়িতে ঠাকুর বহুবার গিয়া ভক্তসঙ্গে আনন্দোৎসব করিয়া আসিয়াছিলেন। (৯) কালীবাড়ি হইতে ভাগিনেয় হৃদয়ের বহিষ্কার। হৃদয় বহু বৎসর তাঁহার সেবা করিয়াছিলেন। কোন অস্বাভাবিক কারণে তিনি মথুরের পুত্র এবং আত্মীয়দের বিরাগভাজন হন এবং মন্দির হইতে বিতাড়িত হন। হৃদয়ের সহিত বিচ্ছেদ ঠাকুরকে খুব মনঃপীড়া দিয়াছিল। (১০) পিতার হঠাৎ মৃত্যুর পর নরেন্দ্রের সাংসারিক দুঃখ ঠাকুরকে একান্ত মর্মপীড়িত করিয়াছিল।

উপরে উল্লিখিত দশটি দুঃখ একটি সাধারণ মানুষের পক্ষে ক্লেশকর বলা চলে, কিন্তু ঠাকুরের ন্যায় পরম জ্ঞানী এবং জগন্মাতার চরণে একনিষ্ঠ প্রেমিক, যাঁহার মন অধিকাংশ সময় সমাধিস্থ থাকিয়া দুঃখের পারে অবস্থান করিত, তাঁহার মুখে 'সীতার ন্যায় আমিও আজন্ম দুঃখ ভোগ করিতেছি '—এই কথাটি ঠিক বুঝা মুশকিল।

★

নরেন্দ্র শিশুকালে মায়ের কাছে রামায়ণের গল্প শুনিতে ভালবাসিতেন। সীতা, রামের উপর তাঁহার শিশুমনে অত্যন্ত প্রীতি জন্মিল। মাটির একটি সীতা-রামের মূর্তি কিনাইয়া আনিয়া বাড়ির একটি একান্ত স্থানে রাখিয়া পূজা করিতে আরম্ভ করিলেন। বাড়ির সহিস নরেন্দ্রের খুব প্রিয় বন্ধু ছিল এবং তাঁহার সঙ্গে নানা গল্প করিত। একদিন সে নরেন্দ্রকে শুনাইল, বিয়ে করা ভাল নয়। কিন্তু রাম-সীতা যে বিবাহিত। সহিসের কথায় শিশুমনে বড় আঘাত লাগিল। ছাদের উপর হইতে রাম-সীতাকে বর্জন করিলেন। মূর্তিটি রাস্তায় পড়িয়া চুরমার হইয়া গেল। মা সান্ত্বনা দিয়া বলিলেন, রাম-সীতা যদি ভাল না লাগে তো শিবের পূজা কর। একটি শিবমূর্তি আসিল। শিশু নরেন্দ্রনাথ (তখন তাঁহার নাম বীরেশ্বর, অপভ্রংশে 'বিলে') এখন শিবমূর্তির সামনে বসিয়া 'ধ্যান' ও 'পূজা' আরম্ভ করিলেন। বালককালে নরেন্দ্রের সাথীদের সহিত 'ধ্যান ধ্যান' খেলার কথা তাঁহার জীবনীতে বর্ণিত আছে। পড়িতে বড় মিষ্ট লাগে।

শিশুকালে সীতা-রামের মূর্তি ভাঙ্গিলেও পরবর্তী কালে সীতা-রামের উপর এবং তাঁহাদের সেবক মহাবীর হনুমানের উপর বিবেকানন্দের গভীর শ্রদ্ধা তাঁহার জীবনীপাঠকের অবিদিত নয়।

মাদ্রাজে 'ভারতীয় মহাপুরুষগণ' সম্পর্কে বক্তৃতায় স্বামীজী বলিয়াছিলেন ঃ "প্রাচীন বীরযুগের আদর্শ—সত্যপরায়ণতা ও নীতির সাকার মূর্তি, আদর্শ তনয়, আদর্শ পতি ও আদর্শ পিতা, সর্বোপরি আদর্শ রাজা রামচন্দ্রের চরিত্র অঙ্কন করিয়া মহর্ষি বাল্মীকি আমাদের সম্মুখে স্থাপন করিয়াছেন। এই মহাকবি যে-ভাষায় রামচরিত্র বর্ণনা করিয়াছেন, তাহা অপেক্ষা শুদ্ধতর, মধুরতর অথচ সরলতর ভাষা আর হইতে পারে না। আর সীতার কথা কি বলিব!... মহামহিমময়ী সীতা—সাক্ষাৎ পবিত্রতা হইতেও পবিত্রতর, সহিষ্ণুতার চূড়ান্ত আদর্শ সীতা. আর্যাবর্তে সহস্র সহস্র বৎসর আবালবৃদ্ধবনিতার পূজা পাইয়া আসিতেছেন এবং চিরকালই এইরূপ পূজা পাইবেন।... সীতা আমাদের জাতির মজ্জায় মজ্জায় মিশিয়া গিয়াছেন, প্রত্যেক হিন্দুনারীর শোণিতে সীতা বিরাজমানা। আমরা সকলেই সীতার সন্তান।"

'রামায়ণ প্রসঙ্গ' নামক একটি আলোচনায় স্বামীজী বলিতেছেন ঃ

"সীতা সতীত্বের প্রতিমূর্তি ; স্বীয় পতি ব্যতীত অপর কোন পুরুষের অঙ্গ তিনি কদাচ স্পর্শ করেন নাই। রাম বলিয়াছিলেন, 'পবিত্র? সীতা স্বয়ং

[১] শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ—স্বামী সারদানন্দ, ১ম ভাগ, উদ্বোধন কার্যালয়, ১৩৮০, সাধকভাব, পৃঃ ১৪৩—১৪৪

পবিত্রতা। ভারতবর্ষে যাহা কিছু কল্যাণকর, বিশুদ্ধ ও পবিত্র—সীতা বলিতে তাহাই বুঝায়। নারীর মধ্যে নারীত্ব বলিতে যাহা বুঝায়—সীতা তাহাই। সীতা ধৈর্যশীলা, সহিষ্ণু, চিরবিশ্বস্তা, চিরবিশুদ্ধা পত্নী। তাঁহার আজীবন দুঃখের মধ্যে রামের বিরুদ্ধে একটিও কর্কশ বাক্য উচ্চারিত হয় নাই। সীতা কখনও আঘাতের পরিবর্তে আঘাত দেন নাই। 'সীতা ভব' —সীতা হও।"

★

ফলহারিণী কালিকাপূজার রাত্রে সারদাদেবীকে ত্রিপুরাসুন্দরীর (ষোড়শীর) মন্ত্রে পূজা করিয়া শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁহাকে মহাদেবীত্বে উন্নীতা করিয়াছিলেন। সারদাদেবী প্রসঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণ বলিয়াছিলেনঃ "ও জ্ঞানদায়িনী সরস্বতী।" পঞ্চবটীতে সারদাপ্রসন্নকে (স্বামী ত্রিগুণাতীতানন্দকে) শ্রীশ্রীমায়ের নিকট পাঠাইবার সময়ে শ্রীরামকৃষ্ণ একটি বৈষ্ণব কবিতা উদ্ধৃত করিয়া ইঙ্গিতে জানাইয়াছিলেন—যাঁহার নিকট যাইতেছ তিনি মহাশক্তিময়ী শ্রীরাধা। কৃষ্ণলীলার যত বৈভব, যত মাধুর্য সব তাঁহা হইতেই। বিবেকানন্দের হৃদয়ে এই তিনটি দেবীশক্তি বিশেষভাবে বসিয়া গিয়াছিল। সরস্বতী, সীতা ও শ্রীরাধা। কালীকে আগে মানিতেন না—পরে বিশেষ সঙ্কটের দিন সুকৌশলে ঠাকুর তাঁহাকে কালীঘরে পাঠাইয়া কালীকে মানাইয়াছিলেন। ঠাকুরের নিকট একটি কালীর গান শিখিয়া তিনি সারারাত্রি ঐ গান গাহিয়াছিলেন। দেহত্যাগের দিন স্বামীজী সকালে ঠাকুরঘরে গিয়া জানালা-দরজা বন্ধ করিয়া ধ্যান ও পূজা করিয়াছিলেন এবং ঠাকুরঘর হইতে নামিবার সময় কালীর একটি গান গাহিতে গাহিতে নামিয়াছিলেন। কালী এবং ঠাকুর তাঁহার নিকট এক হইয়া গিয়াছিল। ঠাকুর যেমন বলিতেনঃ ব্রহ্ম ও কালী এক। তাঁকেই আমি মা বলি। স্বামীজী আমেরিকা হইতে ফিরিলে তাঁহার গর্ভধারিণীর কথায় একদিন কালীঘাটের কালীমন্দিরে কালীমূর্তির সামনে সাষ্টাঙ্গ লুটাইয়া প্রণাম করিয়াছিলেন। ভগিনী নিবেদিতা ভারতে আসিলে তাঁহাকে কালীঘাটের কালীমন্দিরে কালী সম্বন্ধে বক্তৃতা দেওয়াইয়াছিলেন। কালীর ন্যায় দুর্গার প্রতিও তাঁহার ভক্তি এবং মঠে প্রতিমায় দুর্গাপূজার ব্যবস্থা করিবার বিবরণ স্বামীজীর জীবনীপাঠকের অবিদিত নয়।

মোট কথা, যে-মহাশক্তি ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন এবং যাঁহার নানা অভিব্যক্তিকে শ্রীরামকৃষ্ণ 'মা' বলিতেন—প্রত্যেক অবতারলীলায় সেই শক্তিরই বিলাস। রামের পিছনে সীতা, শ্রীকৃষ্ণের পশ্চাতে শ্রীরাধা—এইভাবে তাঁহারা রাম ও কৃষ্ণের নরলীলা ঘটাইয়াছিলেন। দেবতার পর্যায়ে শিব-পার্বতী, হর-গৌরী, নকুলেশ্বর-কালী, বিশ্বনাথ-অন্নপূর্ণা যুগে যুগে স্বর্গ, মর্ত্য, পাতালে নানাভাবে দেবকার্য সংসাধন করেন। নানা পুরাণে ইহার বর্ণনা পাওয়া যায়।

ঠাকুর একাধিকবার নরেন্দ্রকে ইঙ্গিত দিয়াছিলেন যে, তাঁহাকে 'মায়ের কাজ' করিতে হইবে। নরেন্দ্র বলিয়াছিলেনঃ "আমি ও-সব পারব না।" ঠাকুর বলিয়াছিলেনঃ "তোর ঘাড় করবে।" অর্থাৎ তোর ঘাড় ধরে মা করাবেন। কাশীপুরে ঠাকুরের লিখিত ও অঙ্কিত একটি লেখা ও ছবি এখন দেখা যাক। লেখাগুলি জায়গায় জায়গায় জড়ানো। শব্দগুলি এইঃ "জয় রাধে প্রেম-মোহ। নরেন শিক্ষে দিবে যখন দূরে বাহিরে হাঁক দিবে। জয় রাধে!" লেখার নিচে নরেন্দ্রের মাথা ও গলা। পিছনে একটি পাখি যেন তাড়া করিতেছে।

'জয় রাধে' বলিয়া কৃষ্ণশক্তিকে আহ্বান করিয়া (ঠাকুর প্রার্থনা জানাইতেছেন) প্রেম-দ্বারা মোহকে জয় করিয়া নরেন শিক্ষা দিবে, তাহার জন্মের স্বাভাবিক আধ্যাত্মিক শক্তি বহন করিবে উচ্চমূল্যে। পুনরায় 'জয় রাধে' বলিয়া প্রার্থনা শেষ করিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণের লেখা জড়ানো অক্ষরগুলির এইরূপ অর্থ করা যায়। পাখির ছবিটি যেন বিদ্যামায়া বা দেবী সরস্বতীর। এই শিক্ষাদানের ব্যাপারে দেবী সরস্বতী সর্বদা পরিচালনা করিবেন সেই প্রেরণায় মহাবীর নরেন্দ্র-কর্তৃক 'দূরে বাহিরে' — দূর-দূরান্তরে ভারতের সনাতন ধর্মের সত্য প্রচারিত হইবে। ইহাই শ্রীরামকৃষ্ণের ভবিষ্যদ্বাণী — স্বহস্ত লিখিত 'চাপরাস'।

শ্রীরামকৃষ্ণের দেহত্যাগের পর সাত বৎসর কাটিয়া গিয়াছে। বহু বাধা-বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া শিকাগো ধর্মমহাসভায় হিন্দুধর্মের প্রতিনিধিরূপে ত্রিশবৎসর বয়স্ক সন্ন্যাসী বিবেকানন্দ উপস্থিত হইয়াছেন। কয়েক হাজার সম্ভ্রান্ত নরনারী দর্শকের আসনে বসিয়া আছেন। মঞ্চের উপর ধর্মসম্মেলনের উদ্যোক্তারা এবং নানা ধর্মের প্রতিনিধিগণ উপবিষ্ট। নানা দেশ হইতে তাঁহারা আসিয়াছেন।

মাদ্রাজের যুবক শিষ্য আলাসিঙ্গা পেরুমলকে লিখিত পত্রে স্বামীজী লিখিয়াছেনঃ "একজন একজন করিয়া প্রতিনিধিকে সভার সমক্ষে পরিচিত করিয়া দেওয়া হইল। তাঁহারাও অগ্রসর হইয়া কিছু কিছু বলিলেন। আমার বুক দুর দুর করিতেছিল এবং

জিহ্বা শুষ্কপ্রায় হইয়াছিল। আমি এতদূর ঘাবড়াইয়া গেলাম যে পূর্বাহ্ণে বক্তৃতা করিতে ভরসা করিলাম না। মজুমদার বেশ বলিলেন, চক্রবর্তী আরও সুন্দর বলিলেন। খুব করতালি ধ্বনি হইতে লাগিল। তাঁহারা সকলেই বক্তৃতা প্রস্তুত করিয়া আনিয়াছিলেন। আমি নির্বোধ, কিছুই প্রস্তুত করি নাই।" অপরাহ্ণে আরও চারিটি লিখিত ভাষণ সমাপ্ত হইলে স্বামীজীর আহ্বান আসিল। স্বামীজী আলাসিঙ্গাকে লিখিয়াছেন: "দেবী সরস্বতীকে স্মরণ করিয়া অগ্রসর হইলাম। ডক্টর ব্যারোজ আমার পরিচয় দিলেন। আমার গৈরিক বসনে শ্রোতৃবৃন্দের চিত্ত কিঞ্চিৎ আকৃষ্ট হইয়াছিল। আমেরিকাবাসীদিগকে ধন্যবাদ দিয়া এবং আরও দু-এক কথা বলিয়া একটি ক্ষুদ্র বক্তৃতা করিলাম। যখন আমি 'আমেরিকাবাসী ভগিনী ও ভ্রাতৃবৃন্দ' বলিয়া সভাকে সম্বোধন করিলাম, তখন দুই মিনিট ধরিয়া এমন করতালিধ্বনি হইতে লাগিল যে, কানে যেন তালা ধরিয়া যায়। তারপর আমি বলিতে আরম্ভ করিলাম। যখন আমার বলা শেষ হইল, তখন হৃদয়ের আবেগে একেবারে যেন অবশ হইয়া বসিয়া পড়িলাম। পরদিন সব খবরের কাগজে বলিতে লাগিল, আমার বক্তৃতাই সেই দিন সকলের প্রাণে লাগিয়াছিল; সুতরাং তখন সমগ্র আমেরিকা আমাকে জানিতে পারিল।... সেইদিন হইতে আমি একজন বিখ্যাত লোক হইয়া পড়িলাম, আর যেদিন হিন্দুধর্ম সম্বন্ধে আমার বক্তৃতা পাঠ করিলাম সেই দিন 'হলে' এত লোক হইয়াছিল যে, আর কখনও সেরূপ হয় নাই।"

ঠাকুর যে-কথাগুলি লিখিয়াছিলেন—'নরেন শিক্ষে দিবে জয় রাধে', তাহার সূত্রপাত শিকাগো বক্তৃতায় লক্ষ্য করা যায়। স্বামীজী দেবী সরস্বতীকে স্মরণ করিয়া তাঁহার বক্তব্যের জন্য দাঁড়াইলেন। সম্মুখে শত শত স্ত্রীমূর্তিকে তাঁহার বিশ্বমাতা বলিয়া মনে হইল। সমস্ত নারীমূর্তির মধ্যে যে মহাশক্তি বিরাজমানা, তাঁহাকেই স্বামীজী অভিহিত করিলেন, 'আমেরিকাবাসী ভগিনী' বলিয়া। 'Ladies and Gentlemen' লৌকিক মামুলি অভিনন্দন। স্বামীজী তো লৌকিক কাজে আসেন নাই—তিনি আসিয়াছেন 'মায়ের কাজে'। 'আমেরিকাবাসী ভগিনী ও ভ্রাতৃবৃন্দ' —এই অভিনন্দন তাঁহার হৃদয়ের গভীর আধ্যাত্মিক দৃষ্টিভঙ্গি হইতে প্রসূত। সেইজন্যই উহা কয়েক হাজার নরনারীর হৃদয়কে প্রবলভাবে স্পর্শ করিয়াছিল।

আমেরিকা ও ইউরোপে স্বামীজীকে শত শত নারীর সহিত মিশিতে হইয়াছিল। কিন্তু কখনও তিনি নারীকে স্ত্রীভাবে লক্ষ্য করেন নাই। স্ত্রী ও পুরুষের ভেদজ্ঞান অবিদ্যা হইতে আসে। স্বামীজীর মন এই ভেদজ্ঞানের ঊর্ধ্বে অবস্থান করিত। নারীমাত্রকেই তিনি মাতা, ভগিনী ও কন্যারূপে দেখিতেন ও সেইভাবে তাঁহাদের সহিত আচরণ করিতেন।

বালককালে যে সীতা-রামের মাটির মূর্তিকে তিনি ছাদ হইতে নিচে ছুঁড়িয়া চুরমার করিয়াছিলেন, তাহা পরে আধ্যাত্মিকরূপে জোড়া লাগিয়া গিয়াছিল। শিকাগো ধর্মমহাসভায় প্রারম্ভিক ভাষণের আগে যে দেবী সরস্বতীকে তিনি স্মরণ করিয়াছিলেন, তাহা শুধু সরস্বতী নন, সেই স্মরণে মাতা সারদেশ্বরী, ব্রজেশ্বরী রাধিকা, মাতা জানকী এবং জননী কালিকা সংযুক্তা ছিলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণের সহিত সীতা-রামের একাত্মতা সম্বন্ধে স্বামীজীর সুবিখ্যাত কবিতাটি এখানে উদ্ধৃত করিয়া প্রবন্ধের শেষ করিলাম। —

"আচণ্ডালাপ্রতিহতরয়ো যস্য প্রেমপ্রবাহঃ
লোকাতীতোঽপ্যহহ ন জহৌ লোককল্যাণমার্গম্।
ত্রৈলোক্যেঽপ্যপ্রতিমমহিমা জানকীপ্রাণবন্ধঃ
ভক্ত্যা জ্ঞানং বৃতবরবপুঃ সীতয়া যো হি রামঃ॥
স্তব্ধীকৃত্য প্রলয়কলিতং বাহবোত্থং মহান্তং
হিত্বা রাত্রিং প্রকৃতিসহজামন্ধতামিস্রমিশ্রাম্।
গীতং শান্তং মধুরমপি যঃ সিংহনাদং জগর্জ
সোঽয়ং জাতঃ প্রথিতপুরুষো রামকৃষ্ণস্ত্বিদানীম্॥

প্রেমের প্রবাহ যাঁর দুর্নিবার বেগে
আচণ্ডাল সবারে ভাসায়
লোকাতীত যিনি তবু লোকহিতপথে
রহিলেন মানবসেবায়।
অতুল মহিমা যাঁর ব্যাপ্ত ত্রিভুবনে
জানকীর প্রাণপ্রিয় রাম
নররূপে আসিলেন পরম দেবতা
ভক্তি-সীতা-বৃত জ্ঞান-ধাম।
ধরিলেন বেশ পুনঃ অর্জুনসারথি
থামে মহাপ্রলয় গর্জন
কাটে ঘোর তমোময়ী সুচির রজনী
টুটে অন্ধ মোহের বন্ধন।
ছাপি রণরোল উঠে গীতা-সিংহনাদ
ললিত গম্ভীর গীতধ্বনি
যেই রাম যেই কৃষ্ণ প্রথিত-পুরুষ
সেই আজি রামকৃষ্ণ গণি॥

*(অনুবাদ: স্বামী শ্রদ্ধানন্দ)* ☐

কবিতা

# শ্রীশ্রীদুর্গাস্তবঃ

## রামপ্রসন্ন ভট্টাচার্য

জয়তি জয়তি দেবী সচ্চিদানন্দমূর্তি-
র্নিখিলভুবনকর্ত্রী শঙ্করী ছিন্নমস্তা।
অভয়বরকরস্থা সম্মুখে পূজ্যসে যা
তব পুর উপবিষ্টঃ পূজকশ্চ ত্বমেব ॥ ১ ॥

নয়নহরণশস্যশ্যামলা মৃত্তিকা ত্বং
কঠিনজলবিহীনা বালুকাতপ্তভূমিঃ।
অমৃতমধুরতৃষ্ণাহারিণী বারিধারা
সলিলনিধিতরঙ্গৈর্গর্জিতা রুদ্রকায়া ॥ ২ ॥

দিনকরকিরণে যন্ নাতিশীতোষ্ণতেজ-
স্ত্বমসি সকলকর্মপ্রেরণাকারণং তৎ
তপনদহনজাতঃ ক্লেশদশ্চণ্ডতাপো
মৃদুসুরভিসমীরঃ ক্লান্তিহা প্রাণদায়ী ॥ ৩ ॥

বহতি সবলগত্যা ধ্বংসিনী যা চ ঝঞ্ঝা
তরুণকিরণদীপ্তং স্নিগ্ধরক্তং নভো যৎ।
ঘনজলধরকৃষ্ণং বজ্রবিদ্যুদ্ভয়ালং
জগতি তব বিভেদা বেত্তি কস্তে বিভূতিম্ ॥৪॥

অসিতজলদবর্ণা কালিকা মুক্তকেশী
গিরিশিখর তুষার-শ্বেতগাত্রী চ গৌরী।
শিবকরপুট পাত্রে যাঽন্নদা দর্বিহস্তা
জলধিতটনিবাসা কন্যকা ত্বং কুমারী ॥ ৫ ॥

কুবলয় কমনীয়া ভীষণা ক্বাঽপি কান্তিঃ
কমলবসতিলক্ষ্মীশ্চণ্ডিকা মুক্তকেশী।
বিবুধজনহৃদিস্থা সর্ববিদ্যাধিদেবী
ধৃতবহুবিধরূপৈরদ্বয়ং সৎ ত্বমেকম্ ॥ ৬ ॥

ন হি তৃণমপি দগ্ধুং যে চ শক্তানহর্তু-
মসুরবিজয়গর্বাদুদ্ধতান্ দেবমুখ্যান্।
হিমগিরিদুহিতস্ত্বং ব্রহ্মণো মূর্তশক্তি-
রপহৃতমদদর্পান্ আত্তগন্ধানকার্ষীঃ ॥ ৭ ॥

সচ্চিদানন্দমূর্তি দেবীর জয়। ('জয়' শব্দের আক্ষিপ্ত অর্থ—প্রণাম) তুমি নিখিলভুবনকর্ত্রী, শঙ্করী ও ছিন্নমস্তা। বরাভয়করা যে-তুমি সম্মুখে পূজ্যরূপে অধিষ্ঠিতা—তোমার সম্মুখে উপবিষ্ট পূজকও সেই তুমি ॥ ১ ॥

তুমি নয়ন-ভুলানো শস্যশ্যামলা ভূখণ্ড, তুমিই কঠিন জলশূন্য বালুকাতপ্ত মরুভূমি। তুমি অমৃতমধুরা তৃষ্ণাহারিণী জলধারা—আবার সমুদ্রতরঙ্গগর্জিতা রুদ্রকায়াও তুমি ॥ ২ ॥

যা জীবের কর্মপ্রেরণার মূল কারণ—তুমি সূর্যের সেই নাতিশীতোষ্ণ তেজ এবং তুমিই সূর্যের ক্লেশদায়ক প্রচণ্ড উত্তাপ। তুমি ক্লান্তিহর প্রাণারাম মৃদুসুরভি সমীরণ ॥ ৩ ॥

প্রবল গতিতে প্রবাহিতা ধ্বংসকারিণী ঝঞ্ঝাও তুমি। তুমিই তরুণ সূর্যকিরণে আলোকিত স্নিগ্ধ রক্তবর্ণ গগনতল, আবার কৃষ্ণমেঘাচ্ছন্ন বজ্রবিদ্যুদ্ভয়াল ব্যোমও তুমি। জগতে এসবই তোমার বিভিন্ন মূর্তি—তোমার বিভূতি কে জানে!॥ ৪ ॥

তুমি ঘনশ্যামা মুক্তকেশী কালিকা এবং পর্বতশিখরলগ্ন তুষারশুভ্রা গৌরী। তুমি শিবের করপুটপাত্রে দর্বিহস্তা অন্নদা, আবার তুমিই সমুদ্রতটবাসিনী কন্যাকুমারী ॥ ৫ ॥

কমলকমনীয়া তোমার কান্তি কখনো অত্যন্ত ভীষণা হয়। তুমিই পদ্মালয়া লক্ষ্মী এবং মুণ্ডমালিনী চণ্ডিকা। তুমিই বিবুধজনহৃদয়স্থিতা সর্ববিদ্যাধিষ্ঠাত্রী সরস্বতী। বহুবিধ রূপধারিণী হলেও তুমিই এক অদ্বিতীয় সৎ পদার্থ ॥ ৬ ॥

হে হিমালয়কন্যা! তুমি কারণব্রহ্মের মূর্তশক্তি। যাদের তৃণমাত্র দহনের এবং বহনের শক্তি নেই—অসুরবিজয়গর্বে উদ্ধত সেই মুখ্য দেবগণের মদদর্প অপহরণ করে তুমি তাদের অহঙ্কার চূর্ণ করেছিলে ॥ ৭ ॥

দিশি দিশি দশমূর্তীর্বিভ্রতী ভায়য়িত্বা
ভ্রমমুপজনয়ন্তী সান্ত্বয়িত্বা চ পশ্চাৎ।
চরণশতদলাধো গ্রাহয়িত্বাশ্রয়ং তে,
সুরনরভয়হর্তুর্ভীতিনাশং করোষি ॥ ৮ ॥

জনমমরণদুঃখং নশ্যতেঽনুগ্রহাৎ তে
সুকৃতদুরিতভোগো লীয়তে তৎক্ষণাচ্চ।
ন শমদমযমা মে নাস্তি দুর্গে শরণ্যে
কলুষিতহৃদয়েঽস্মিন্ স্থানমাদাতু মে হি ॥ ৯ ॥

কুসুমমিদমগন্ধং কীটদষ্টং তথাপি
সুতচিতমিতি মত্বা গৃহ্যতাং পাদপদ্মে।
কুমতিনিলয়চিত্তে নাস্তি মে ভক্তিলেশঃ
শমনদমনশস্ত্রং ত্বৎ কৃপাবিন্দুমাত্রম্ ॥ ১০ ॥

দশদিকে দশমূর্তি ধারণ করে, ভয় দেখিয়ে এবং ভ্রম উৎপাদন করে পরে সান্ত্বনাপ্রদানপূর্বক নিজ চরণশতদলের নিম্নে আশ্রয় দিয়ে তুমি দেব-নরের ভয়দূরকারীরও ভয় নাশ করেছিলে ॥ ৮ ॥

জন্ম-মৃত্যু-দুঃখ তোমার অনুগ্রহে দূর হয় এবং পুণ্য-পাপের ফলও তৎক্ষণাৎ বিনষ্ট হয়। হে শরণদাত্রী দুর্গা, আমার শম-দম-যম কিছুই নেই—আমার এই কলুষিত হৃদয়ে এসে তুমি স্থান গ্রহণ কর ॥ ৯ ॥

এই ফুলটি গন্ধহীন এবং পোকায় কাটা, তবু তোমারই ছেলের দ্বারাই এটি চিত হয়েছে; তাই চরণকমলে গ্রহণ কর। কুমতির আলয় আমার হৃদয়ে লেশমাত্রও ভক্তি নেই। তোমার কৃপাবিন্দু-মাত্রই আমার শমন-দমনের একমাত্র অস্ত্র ॥ ১০ ॥

# এ কেমন সন্ন্যাসী

## নারায়ণ মুখোপাধ্যায়

মাটির অন্তর থেকে জেগে উঠছে অন্য এক দেশ
সে-দেশের মেঘমালা নদনদী গাছপালা এতকাল আনন্দে জাগেনি;
ছিল দুঃখের নিবিড়ে, অসম্মানে যন্ত্রণায়;
অভিজাত চন্দ্রবোড়া শুয়ে ছিল ঠিক তার বুদ্ধির দুয়ারে।
সন্ন্যাসীরা বনে যেতে বলে; বলে: মিথ্যা এই দুঃখকষ্ট, মিথ্যা
এই বেঁচেবর্তে থাকা। অতএব, মায়া মায়া মায়ার বন্ধন ছিঁড়ে ফেল,
যেভাবে মাতৃগর্ভ ছিঁড়ে তুমি জগতে এসেছ।
অথচ এ কেমন সন্ন্যাসী, যিনি জেগে ওঠবার মন্ত্র দেন; গভীর
মেঘের মতো গুম গুম গুম গুম স্বরে বলে যান:
ভালবাস ভালবাস, জেগে ওঠ অন্ধকার ভেদ করে
যেরকম জেগে ওঠে লক্ষ লক্ষ পাখিদের ডানা-চোখ-মন।
সন্ন্যাসীরা দূরত্বে থাকেন;
অথচ এ কেমন সন্ন্যাসী, যিনি আপন মুঠোর মধ্যে দূরত্বকে ধরে নিয়ে
জ্বলন্ত দীপের মতো একদৃষ্টে অন্তরের কাহিনী শোনেন।
মাঝে মাঝে মাঝে মাঝে মনে হয়—আমাদের এইসব ঘরবাড়ি,
আমাদের এইসব দুঃখবোধ, আমাদের এইসব হাহাকার, অশ্রু-অন্ন-মন
নিয়ে সেই সন্ন্যাসীর কাছে আছি। সমস্ত নাস্তির মুখ
বিশ্বময় অনন্ত অস্তির দিকে জীবন এবং তিনি টেনে নিয়ে চলেছেন
যেন এক সন্ধ্যার হাওয়া—
আকাশের সংসারের মননের সামগ্রী প্রদীপ্ত করে সঙ্গে যাচ্ছে আনন্দে কান্নায়

# তোমার দৃষ্টির পথ ধরে

## দীপাঞ্জন বসু

পৃথিবীর বিচিত্র সব রাজপথ,
ভূগর্ভপথ, শতসহস্র বাঁকাচোরা গলি
বড় হবার প্রথম লগ্নে
লাগামছাড়া টান ধরায়
অবাধ্য কৌতূহলে মরিয়া হয়ে উঠি।
আমার প্রলুব্ধ মন যখন
নিষেধের গণ্ডি ডিঙোতে চায়,
তোমার সস্নেহ হাতটা তখন
আমাকে আবদ্ধ করে
ভালবাসার উষ্ণতায়।
এমনি করেই একদিন আমি
তোমার দেখানো পথে
পায়ে পায়ে চলা শুরু করি।

এপথ অতি সাধারণ জনপথ
লীলাময় রাজপথ নয়,
পথের ধুলো সব উঠে আসে
হাঁটুর ওপর,
রৌদ্র, বর্ষা বা রাত্রের অন্ধকারে
ভরসা শুধু বৃক্ষের ছাদ।
ক্লান্ত, অবসন্ন ক্ষণে আজ মনে পড়ে
সেইসব ঝকঝকে লাল কার্পেটমোড়া পথ
বা অন্ধ চোরাগলি।
আমিও পারতাম যাত্রী হতে
ঐ সব পথে।
তুমি তা চাওনি,তুমি শুধু বলেছিলে,
দিগন্তের দিকে প্রসারিত বুকে
চলাই জীবন ;
তোমার সেই দৃষ্টির পথ বেয়ে
আমি চলি, আমি চলি।

আমার বিষণ্ণ ক্লান্তি উত্তপ্ত হয়
তোমার উষ্ণীষের আকর্ষণে
আমার বিশ্রাম নিয়ন্ত্রিত হয়
তোমার নিত্য শিবস্তোত্রপাঠে,
তোমার দেওয়া চলার মন্ত্রে
পার হতে হবে গিরি, মরু, দুস্তর পথ,
আমি চলি, আমি চলি।
কোন দ্বিধা নেই, প্রশ্ন নেই
অন্য কোন আকর্ষণও নেই,
তোমার দৃষ্টির পথ ধরে
আমি চলি, শুধু চলি।

এই অনন্ত চলার পথে
নেমে আসে কালো অন্ধকার
মেঘে মেঘে বজ্রপাত হয়,
সেই মসীমাখা ধুলোর আবর্তে
সজীব বৃক্ষেরা সব ভেঙে পড়ে
এমন ঝঞ্ঝা ভেদ করে
বিদ্যুৎ-আলোকে দেখি
জ্যোতির্লোকের পথ।
সেই পথ
তোমার চিরায়ত বার্তা বয়ে আনে
'সত্য, শিব, সুন্দর'।

# ভালবাসার সেই ঋষি

## পলাশ মিত্র

অজস্র গ্লানি আর কালিমার মধ্যে
অচঞ্চল সেই মহাঋষি
এখনো ধ্যানমগ্ন।
আজও কানে বাজে তাঁর কথা
বুকের ভিতরে আনে স্নিগ্ধ সুবাস।
বিরাট গতির কথা
তাঁর কণ্ঠে মন্ত্রের সুরে ধ্বনিত হয়ে
বিক্ষত মনেপ্রাণে ভালবাসার গান হয়ে যায়।
ভালবাসা শুধু ভালবাসা ঃ
ধ্যানমগ্ন সেই ছবি আমাদের একমাত্র আশা।

# তুমি পৃথিবীর সন্ন্যাসী, একদিন শিকাগোতে একশো বছর আগে

## মঞ্জুভাষ মিত্র

তুমি এ-বঙ্গদেশের নও, ভারতবর্ষের নও, তুমি পৃথিবীর সন্ন্যাসী।
একদিন শিকাগোতে একশো বছর আগে তুলেছিলে বিশ্বজয়ী ঝড়।
সে-ঝঙ্কাররেশ খুঁজে একদিন যদি যাই মিচিগান হ্রদতীরে মহানগরীতে
সেখানে দেখতে পাব মহৎ কম্পনে চারদিক পূর্ণ হয়ে আছে।
আমার হৃদয় থেকে প্রাণের নীলিমা নিয়ে মাটিতে বিছিয়ে দেব তুলব হাজার ঢেউ
( ভক্ত হৃদয়ের অভিজ্ঞতা রোমাঁ রোলাঁর মতন লিপিবন্ধ করেছেন কেউ কেউ )
'ভারতবর্ষের পরিক্রমা শেষ হলো, এবার আমাকে যেতে হবে বিশ্ব-পৃথিবীর কাছে,
ধ্যানের ভিতর দিয়ে আত্মজ্ঞান লাভ হলো, এবার শেখাতে হবে জ্ঞানযোগ কর্মযোগ
উজ্জ্বল মানুষদের ; ত্রাণকর্মে দরিদ্রসেবায় রয়েছে মানবধর্ম—
এসব বোঝাতে হবে'—ভাবছিলেন এভাবে গৈরিকবসন সেই নবীন মেধাবী
কন্যাকুমারিকাতটে ভারতবর্ষের প্রান্ত-শিলাখণ্ডে বসে, বিশ্বজগৎ তাঁকে করেছিল দাবি
'আত্মা নয় বলহীনের লভ্য'—কঠ উপনিষদের এই প্রিয় বাণী
সর্বপ্রথম প্রয়োগ তিনি করেছিলেন নিজের নির্মিত জীবনে ; পরম সাহসী যুবা
তেজস্বী সুঠাম অবয়ব, আলোকিত দুই চোখ, মহতের উপযুক্ত মধুর মুখশ্রী নিয়ে
একা প্রায় কপর্দকহীনভাবে আমেরিকায় এলেন ; যেন দৈববলে প্রবেশের অধিকার
শিকাগোর ধর্মমহাসভায় সেদিন পেয়েছেন তিনি। জীবনীর সাক্ষ্য থেকে জানি
কতজন উপহাস করেছিল, গায়ে দিয়েছিল ধুলো, গেরুয়ার প্রান্ত ধরে দিয়েছিল টান
ভ্রাম্যমাণ বুকের ভিতর তবুও গম্ভীর স্বরে সমুত্থিত হয়েছিল আত্মবিশ্বাসের স্তবগান
একজন বিবেকানন্দ যেখানে যান না কেন লোকচক্ষু অবশ্যই লক্ষ্য করে তাঁকে
( একেই চরিত্র বলে ) ; রাইট, ক্রিস্টন, শ্রীমতী হেল ও কুমারী ওয়াল্ডো, গুডউইন প্রভৃতি
একে একে কাছে এল সর্বসমর্পিত ভক্তদল, ভালবাসা সখ্য দিয়ে ঘিরেছিল যাঁকে
তিনিই বিবেকানন্দ ; তাঁর মহাকাজে নিউইয়র্ক, বস্টন, ডেট্রয়েট, আমেরিকার সে-দান
ইতিহাস হয়ে গেছে, সহস্র-উদ্যানদ্বীপে ধ্যানগৃহ কলম্বিয়াভূমি কখনো ভোলার নয়
'আমেরিকাবাসী হে আমার ভগিনী ও ভ্রাতাগণ'—এই প্রিয় সম্বোধন যুবা সন্ন্যাসীর
শিকাগোর ধর্মমহাসভায় অদ্ভুত মাহেন্দ্রক্ষণে করেছিল লহমায় সারা বিশ্বজয়
সেই বিবেকানন্দের প্রদত্ত ভাষণ। আলোকিত সোমবার, এগারোই সেপ্টেম্বর, ১৮৯৩ সাল
মানুষের ইতিহাসে সমাগত কি সুন্দর অপরূপ ব্যঞ্জনা প্রগাঢ় সন্ধিকাল
আগুনের জিহ্বার মতন তাঁর সে-বক্তৃতা মধুমন্ত্রশব্দমালা ঊর্ধ্বে আরও ঊর্ধ্বে উঠে আসে
তার দুরন্ত প্রভাব ক্রমশঃ ছড়িয়ে যায় বহু মানুষের হৃদয়ের আকাশে আকাশে
শত শত নরনারী দাঁড়িয়ে সানন্দ একসাথে করতালি দিয়ে অভিনন্দন জানাল
( আজও পৃথিবীকে পথের সন্ধান দেবে উপনিষদ্, বিবেকানন্দের বাণী ইত্যাদি স্তম্ভের আলো )।
রামকৃষ্ণ-শিষ্য প্রথমেই বললেন, ধর্ম কারো কুক্ষিগত নয়, নয় কোন জাতি বা দেশের
ধর্ম সকলের জন্য, ধর্ম প্রকৃতপক্ষে এক অখণ্ড সম্পদ সারা বিশ্ব-পৃথিবীর

মানুষকে ভালবেসে সেবা করা তার মূলকথা। "একমাত্র মানুষই তো পারে
ক্ষুদ্রতার বেড়া ভেঙে উদার বৃহৎ বিশ্বে সগর্বে দাঁড়াতে, স্বাতন্ত্র্য রেখেও এক হতে,
যুদ্ধ নয় সহায়তা, ধ্বংস নয় ভাবগ্রহণ, ভাঙচুর নয় শান্তি ও সঙ্গতি—অন্ধকারে
মানুষের মর্মবাণী হোক"—সন্ন্যাসীর প্রতিটি বাক্য তুলেছিল দশদিকে সুবর্ণঝঙ্কার।
হে শিকাগো, সভ্যতার মাতৃভূমি, আজও তুমি অধিকৃত মনে হয় চিরন্তন সেই প্রতিভার
মহাসন্ন্যাসীর আত্মা তোমার প্রান্তরপথে সৌন্দর্যের রন্ধ্রে রন্ধ্রে আজও ব্যাপ্ত করছে ভ্রমণ
আমি স্বপ্নে ঘুমে জাগরণে অনুভব করি, মনে হয় তিনি যেন আজও রয়েছেন
আর্ত পৃথিবীর জন্য, সমাপ্ত হয়নি আজও তাঁর যাত্রা, প্রিয় চংক্রমণ।

# মুক্তি

## নিমাই মুখোপাধ্যায়

তোমার নয়নভরা টলটলে জল
আজও আমি দেখতে পাই। মনটা কেঁদে ওঠে।
যখন তোমার মুখের দিকে তাকাই
তখন শান্ত হয়ে যাই।
কেন তুমি কেঁদেছিলে ?
যাক না চলে, সে যদি যেতেই চায়।
তুমি থাকতে পারনি।
একুশদিন তার সামনে হাজির হয়েছ
মুখে কোন কথা না বলে শুধু চোখের জলে
বুঝিয়ে দিয়েছ : 'তুই আমার'।
'তোমার' মানেই তো বিশ্বের।
সেই বিশ্বকেই সে যখন মাতালো
তখনো তোমার চিন্তা ঘোচেনি।
কী করে যাবে, কী খাবে
সে-সব নিয়ে তোমার চিন্তা।
যাবার আগে যখন মনের দোটানায় সে ভুগছিল
তুমি সমুদ্রের ওপর দিয়ে হেঁটে
গিয়ে পথ দেখিয়ে দিলে।
বন্ধন সে কখনো মানত না।
কেউই তাকে বাঁধতে পারেনি, তুমি ছাড়া।
তোমার ভালবাসার বন্ধনে সে বাঁধা পড়েছিল।
তোমার বিশ্বব্যাপী ভালবাসার বন্ধনে
আজ কত মানুষই না বাঁধা।
কেউ জানে না সেই বন্ধনেরই নাম মুক্তি।

# আমি-তুমি

## শান্তশীল দাশ

তোমাকে স্মরণ করে প্রতিদিন জীবন আমার
শুরু করব যত ভাবি, কোনদিন হয় নাকো আর।
সব করি কিন্তু কই, তোমাকে তো স্মরণ করি না।
কত কাজ, কত কথা, কত-না লোকের আনাগোনা।
এমনি করেই দিন কেটে যায় এক-একটি করে,
সব হয়, তোমাকে স্মরণ করা হয় নাকো শুধু।

আবার রাত্রি আসে, মনে মনে বলি বারবার,
কাল ভোরে নিশ্চয়ই তোমাকে স্মরণ করব আমি ;
তারপর অন্য কিছু ; কিন্তু হায়, সেকথা আমার
কোথায় তলিয়ে যায় পরদিন সকাল হলেই।

এমনি করেই কাটে দিন মাস বছর সব,
চেয়ে দেখি জীবনের অনেক সময় শেষ হলো ;
কিন্তু কই, করলাম নাকো আমি তোমাকে স্মরণ।
একদিনও ভাল করে, একদিনও মনের মতন।

এখন দুচোখ ভরে নামে শুধু উষ্ণ জলধারা,
বলি আমি, ক্ষমা কর, ক্ষমা কর এই অপরাধ,
মনে মনে হাস বুঝি, বল তুমি—ক্ষমা তো করেছি,
না হলে কেমন করে এতকাল ছিলি প্রাণ ধরে।

## যুগ-পরিচয়

### সৌম্যেন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়

"কলিঃ শয়ানো ভবতি সঞ্জিহানস্তু দ্বাপরঃ।
উত্তিষ্ঠংস্ত্রেতা ভবতি কৃতং সংপদ্যতে চরণ্ ॥
চরৈবেতি চরৈবেতি।" —ঐতরেয় ব্রাহ্মণ, ৩৩।৩

অজ্ঞানের পুঞ্জীভূত অন্ধকার
অবরুদ্ধ সাতরঙা চেতনার দ্বার ;
গতি নেই ছন্দ নেই সুর নেই—
সময় হারিয়ে গেছে সময়েই।
তোমার অস্তিত্ব এই তিমির গহনে
আবৃত সুপ্তির আবরণে।
অন্ধ তামসী কোলে এই ঘুম—অফলা সময়
একেই তো কলিযুগ কয়।
যখন তাকালে চোখ মেলে
সুপ্তির গহনতা থেকে উঠে এলে,
বুঝলে আকাশ নদী অরণ্য ও সময়
প্রাণময়, কথা কয় গান গায়
আলোর ভাষায়,
তখনো রইলে শুয়ে জড়তার ঘোরে—
সে হলো দ্বাপর যুগ চেতনার ভোরে।
তারপর
স্ব-বলে বিধ্বস্ত-করা জড়তার বুকের ওপর
সমস্ত বাঁধন টুটে
যখনই দাঁড়ালে তুমি উঠে,
এবং উঠলো নেচে শরীরের রক্ত-কণিকারা
অবোধ উল্লাসে আত্মহারা,
শিরার বাঁধন ছিঁড়ে তারা যেন ছুটে যেতে চায়
কে জানে কোথায়—
বেগের আবেগ নিয়ে এই যে-সময়
একে ত্রেতাযুগ কয়।
আর যে-মুহূর্তে তুমি সব বাধা ঠেলে
স্বরচিত গণ্ডি ভেঙে ফেলে
বলিষ্ঠ চরণপাতে চললে সমুখে
সময়ের নবজন্ম হলো এই সময়েরই বুকে।
এ-সময় অফলা নয়—
উজ্জ্বল উদার বিস্ময় এ-সময়
নব-নব চেতনার জন্মদাতা
মুক্তিমন্ত্রের উদ্গাতা।
তুমি এই আলোকিত সময়ের ছন্দময় সচলতা নিয়ে
চললে এগিয়ে।
শ্রান্তিহীন অনিরুদ্ধ চলায় তোমার
সত্য হলো অপাবৃত—
সত্যযুগ হলো প্রকাশিত।
এ-যুগ তো গড়ে ওঠে প্রতি পদপাতে,
গতিই সত্য তাই পদে-পদে সত্যের সাক্ষাতে
সত্যযুগ হয়।
তাই আর থামা নয়,
চল চল চল অবিরাম
চলাই অমৃত, আর চলাই আরাম।

## বিবেকানন্দ-বন্দনা

[ ১৪০০ সাল ও স্বামীজীর শিকাগো-ভাষণের শতবার্ষিকী উপলক্ষে ]

### শান্তি সিংহ

এসো শান্তির অগ্রদূত গৈরিক ধ্বজাধারী
এসো অবনত ভারতে দ্বেষদলনকারী
এসো ভরাযৌবন-কান্তি ঘুচাও মোহভ্রান্তি
এসো প্রাণবন্যাবারি হৃদয় দাও উদ্বারি।
মানুষ, নাকি ঐ মেষ ? জাগাও, জনগণেশ !
এসো পুণ্য পীযূষধারা এসো শান্তির ধ্রুবতারা
এসো সত্য শিবসুন্দর এসো বজ্রভয়ঙ্কর
এসো ধ্বান্তকলুষনাশি মানবতার পূজারী।
ধর্মান্ধতার কালো মেঘ বাড়ায় অশান্ত বেগ
উদ্ধত বিদ্বেষ-বহ্নি আনে প্রলয়ঙ্কর ঘূর্ণি
হে বিবেক-আনন্দ ঘুচাও মনের ধন্দ
এসো দ্বন্দ্বনাশন-বীর্যসাধন সত্যের কাণ্ডারী।

## আনন্দলোকে

### তাপস বসু

তিনি দুহাত বাড়িয়ে রেখেছেন—
তাপিত শ্রান্ত ক্লান্ত বঞ্চিত
রিক্ত অবসন্ন শোষিত স্খলিত
আমাদের মতো অসংখ্য মানুষের দিকে।

তিনি দুহাত বাড়িয়ে রেখেছেন—
সমস্ত লোভ লালসা মোহ কপটতা,
ধর্মের নামে মিথ্যা বেসাতির
মুখোশটাকে টান মেরে খুলে দিতে।

তিনি দুহাত বাড়িয়ে রেখেছেন—
অনন্ত নক্ষত্রবীথির নিচে দাঁড়িয়ে থাকা,
অন্ধকার থেকে আলোয় ফেরা
মানুষের মাঝে ডুব দেবার মন্ত্র নিয়ে।

তিনি দুহাত বাড়িয়ে রেখেছেন—
সমস্ত দুঃখের ভার বহন করে
নবচৈতন্যের জাগরণ ঘটিয়ে
আনন্দলোকে পৌঁছে দেবেন বলে।

## কেমন করে পাব

### কঙ্কাবতী মিত্র

কেমন করে পাব তোমার পূবের আলো?
কেমন করে আমার প্রতিটি মুহূর্তে
প্রতিটি অন্ধকারের অনুভবে দেখতে পাব
তোমার লাল আকাশের আলো?

কেমন করে ছড়িয়ে দেব তোমার মন্ত্র
আমার শিরায়?
কেমন করে হীনতার জাল থেকে
বেরিয়ে এসে
নীচতার বেড়া ভেঙে
অবিশ্বাসের দেনা চুকিয়ে
দেখতে পাব তোমার পূবের আকাশ?

কেমন করে সরিয়ে দেব
সব মোহ?
ত্যাগের দীক্ষা বুকে নিয়ে
তোমার মূর্তি সামনে রেখে
কেমন করে পাব
সেই অনন্ত আকাশের আলো?

## আসমানের ঐ আলোর মুখে

### শেখ সদরউদ্দিন

আসমানের ঐ আলোর মুখে
আমায় তুলে ধর—
এই ধরণীর বুকে তুমি আমায় 'মানুষ' কর।

চলতে গিয়ে পথটা দেখি,
শুধুই কাঁটায় ভরা—
অন্ধকারে পরিপূর্ণ আমার বসুন্ধরা।
তোমার আলোর ডঙ্কা বাজাও, শঙ্কা আমার হর-
আসমানের ঐ আলোর মুখে
আমায় তুলে ধর।

পূবের দিকে ফিরে আছি, কখন আঁধার টুটবে-
প্রাণ ভরিয়ে মন রাঙিয়ে
কখন সূর্য উঠবে।

ফুলের কলি ফুটবে কখন,
কখন গাইবে অলি—
ভোরের কল-কাকলিতে আঁধার যাবে চলি'।
মানবতার সত্তা দিয়ে হৃদয় আমার ভর—
আসমানের ঐ আলোর মুখে
আমায় তুলে ধর।

# শিকাগোর স্বামীজী, স্বামীজীর শিকাগো

## নচিকেতা ভরদ্বাজ

কোন মানচিত্রে নেই এ-শিকাগো ; স্থান-কালে বন্দী কোন ভৌগোলিক সীমারেখা দিয়ে
তাকে বাঁধা যায় না। ত্রিশ কোটি মানুষের দুঃসহ দুঃখের সঙ্গীতে, প্রার্থনায়
জন্ম এই নগরীর ঃ এ-বিশ্বজয়ের উৎস খুঁজতে হলে অনেক পিছিয়ে
যেতে হবে ঃ দক্ষিণেশ্বরের পুণ্যভূমিতে এ-বহ্নিবীজ উপ্ত হয়েছিল একদিন
সমবেত হয়েছিলেন—'রামকৃষ্ণ বিপ্লবের' সৈনিকেরা সেনাপতি শ্রীগুরুর ছত্রছায়ায়।
রচনা করলেন তাঁরা নিজেদের আলোকিত সমন্বয়ে—নবীন প্রবীণ
দশহাজার বছরের সভ্যতা ও সংস্কৃতিকে পাশ্চাত্যের আগ্নেয় প্রাণের সঙ্গীতে
মিলিয়ে দিলেন তাঁরা ঃ ক্রমশঃ সে শিশু-বৃক্ষ কাশীপুর উদ্যানবাটীতে
খাড়া হয়ে উঠল ধীরে। নীলাকাশ বিদীর্ণ করে অতঃপর সহস্র শাখা-প্রশাখায়
পল্লবে পাতায় স্নিগ্ধ শ্যামল সুন্দর হলো মহাবৃক্ষ বরাহনগরে।
এবং অতঃপর রামকৃষ্ণ-সৈনিকেরা বেরিয়ে পড়লেন পরিব্রাজনায়—
পথে ও প্রান্তরে এই ভারতের—একই সঙ্গে রাজপ্রাসাদে, দরিদ্রের পর্ণকুটীরে
আমাদের রাজার রাজা আবিষ্কার করলেন—আপন হৃৎপিণ্ডের রক্ত মোক্ষণ করে
সহস্র বছরের প্রাচীন পুণ্যভূমি—তার সব সুখ-দুঃখ-যন্ত্রণা-স্বপ্ন-সাধ নিয়ে
আর এক নতুন ভারতবর্ষ রচনা করতে তিনি প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হলেন
যবন-চণ্ডাল-ব্রাত্য—সবাইকে সঙ্গে নিয়ে—সব মানুষের স্পর্শে পবিত্র করা তীর্থনীরে
পূর্ণ করে নিয়ে মার অভিষেকের মঙ্গল কলস তাঁর বৃষস্কন্ধে নিয়ে
সবাইকে ডাক দিলেন। আকাশ-অরণ্য-নদী—যেখানেই যাকিছু শুভ সত্য পেলেন
সব দিয়ে তিল তিল করে এক তিলোত্তমা মহিমময়ী মাতৃমূর্তি নির্মাণ করে
সর্বসমর্পিত তাঁর পদতলে জীবন-যৌবন-ধন-মান সব উৎসর্গ করলেন।
পরাধীন ভারতের নির্যাতিত নিপীড়িত ত্রিশ কোটি বিপন্ন ব্যর্থ মানুষের
শতাব্দীর জমাট অশ্রু সস্নেহে গলিয়ে নিয়ে, জাগ্রত নবযৌবনের
সানুভাবী কোটি কোটি প্রজ্বলিত হৃদয়ের পুঞ্জীভূত মেঘভার মৌসুমীর মতন ঝরিয়ে
সেই পুণ্য পবিত্র জলে আলবাল পূর্ণ করে—পরিচর্যা সেবা শুশ্রূষায়
সেই শিশু-বৃক্ষটি ফুল্লকুসুমিত এক সুমহান বনস্পতি হয়ে আজ আকাশ ছাড়িয়ে
শিকড়-সন্নিধি-যুক্ত গুচ্ছ গুচ্ছ ফলভারে অপরূপ হয়ে আছে পূর্ণের প্রভায়।
সাম্রাজ্যবাদীর হিংস্র বিষবাষ্পে কলুষিত—বিপন্ন আমাদের এ-আকাশ স্বরাট বিরাট
পরিস্রুত করে তাকে—সমস্ত দূষণমুক্ত করবার প্রতিশ্রুতি ঐ বনস্পতির নিঃশ্বাস।
বনস্পতি-প্রতিভায় পরাধীন ভারতের মুকুটবিহীন রাজা, বিজয়ী সম্রাট
বেরিয়ে পড়লেন তাই মানবমুক্তির জন্য সাত-সমুদ্র তেরনদী পারে।
ত্রিশ কোটি মানুষের জন্য নিয়ে আসতে এক সার্বজন্য সুধীর আশ্বাস
এলেন এ-নগরীতে। সম্পন্ন করলেন রক্তপাতহীন বিপ্লবে বিশ্বজয় তাঁর।
ঘুম ভেঙে জেগে উঠল লেভিয়াথান ; প্রাণ-পরিক্রমা শুরু পুনর্বার উজ্জ্বল উদ্ধারে
ভুখা ভারত, নাঙ্গা ভারত—একই সঙ্গে সহস্র বছরের সুমহান ভারতের মুক্ত সিংহদ্বার ঃ
সম্রাট জানতেন সব ঃ রাজসমারোহে তাঁকে অভ্যর্থনা জানাবার জন্যই আয়োজন এ-ধর্মসভার।

এস. এস. এম্প্রেস অব ইণ্ডিয়া, ১৮৯৩
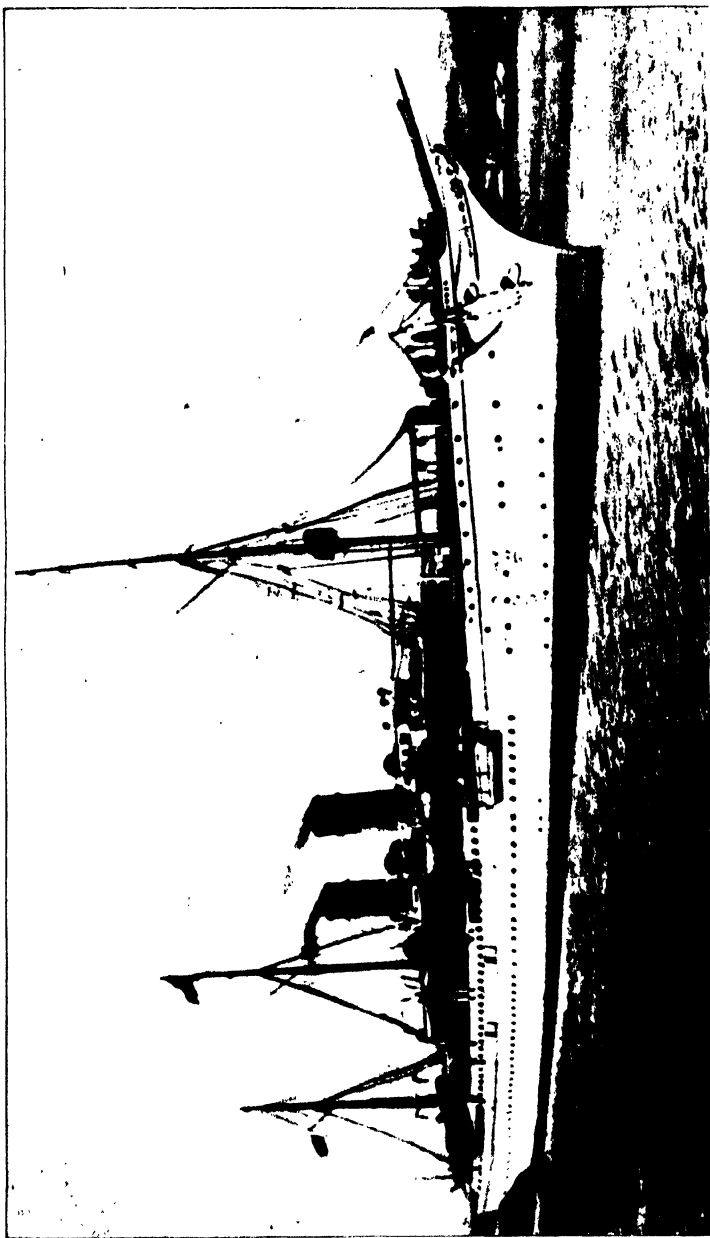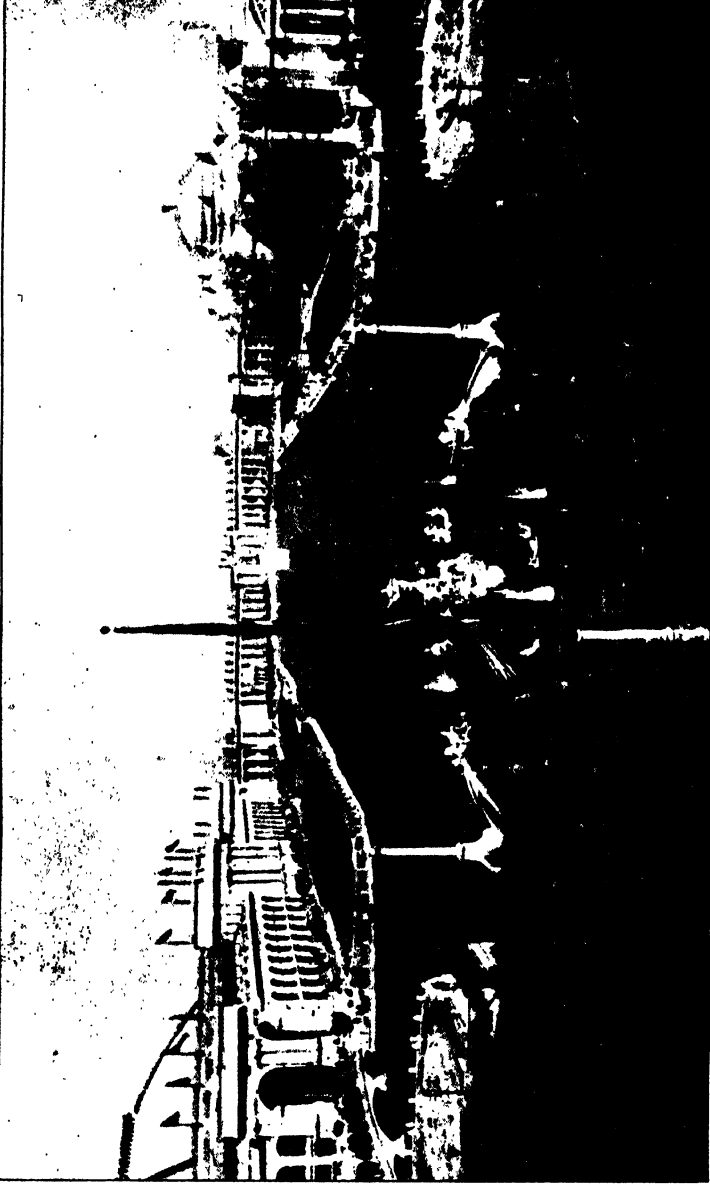
শিকাগোর কলাম্বিয়ান প্রদর্শনীর (১৮৯৩) অববাহিকা ও প্রাঙ্গণ

ধর্ম-মহাসম্মেলনের মঞ্চোপরি স্বামী বিবেকানন্দ
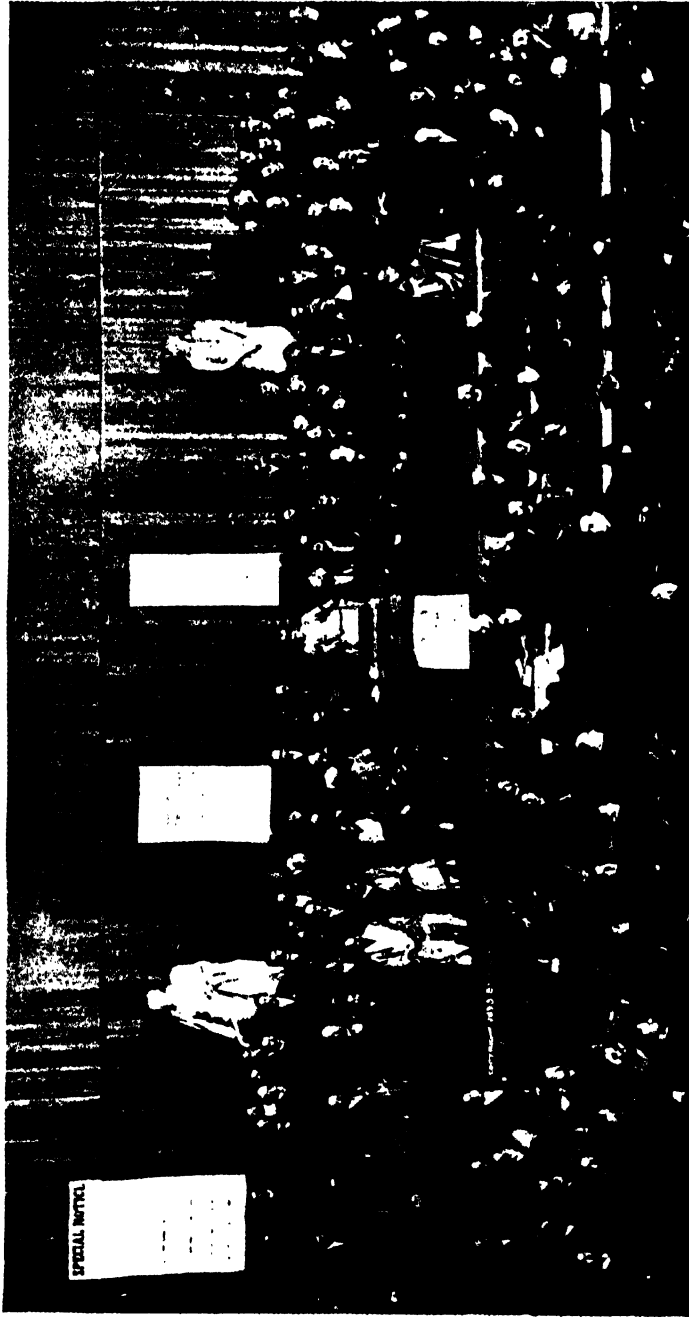
ধর্ম-মহাসম্মেলনের সমাপ্তি দৃশ্য, ২৭ সেপ্টেম্বর, ১৮৯৩

প্রবন্ধ

# স্বামী বিবেকানন্দের ভারতদর্শন এবং পাশ্চাত্য-পরিক্রমা : ভারতের ইতিহাসে গুরুত্ব

## নিশীথরঞ্জন রায়

॥ ১ ॥

উনিশ শতকের শেষ দশক। ভারতবর্ষ তখন ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের কুক্ষিগত। এই শতকের গোড়ার দিকেও নেতৃস্থানীয় ভারতীয়দের মনে সাম্রাজ্যবাদী হওয়া সত্ত্বেও গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র হিসাবে ইংল্যান্ডের প্রতি কিছু পরিমাণ সম্ভ্রমবোধ ছিল। পূর্ববর্তী শতকের সূচনা থেকে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে যে বিশৃঙ্খলা সুপরিস্ফুট ছিল, তার পরিপ্রেক্ষিতে গোটা দেশ জুড়ে প্রশাসনিক ঐক্য গড়ে ওঠার ফলে শিক্ষিত ভারতবাসীর মনে অল্পবিস্তর স্বস্তিবোধ ছিল—এই কথাটি অস্বীকার করা যায় না। অবশ্য যারা ছিল ঔপনিবেশিক স্বার্থান্ধ নীতির প্রত্যক্ষ শিকার, যারা প্রতিনিয়ত প্রত্যক্ষ করছিল অর্থনৈতিক স্বেচ্ছাচারের বল্গাহীন প্রয়োগ, সেই শোষিত হতদরিদ্র শ্রেণীর মানুষ ইংরেজ কোম্পানীর নয়া বনিয়াদ গড়ে তোলার বিষয়টি প্রথম থেকেই সন্দেহের দৃষ্টিতে দেখছিল। তাদের সন্দেহ ক্রমে পরিণত হলো সক্রিয় বিদ্বেষে। অসংগঠিত কিন্তু সশস্ত্র এই বিরোধিতার প্রতিফলন একদিকে দেখা গেল শোষিত শ্রেণীর অঙ্গীভূত খেটে-খাওয়া মেহনতী মানুষের মধ্যে; অন্যদিকে রাজনৈতিক কারণে বিক্ষুব্ধ একশ্রেণীর রাজরাজড়া, নবাব, বাদশাহ, জমিদার এবং তাদের অনুগামী সৈনিকবাহিনী কিংবা সশস্ত্র অনুচরদের মহলেও। আদিবাসী সমাজেও দেখা গেল অত্যাচারী বিদেশী শাসক এবং তাদের অনুগত গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে ক্রমবর্ধমান প্রতিবাদী আন্দোলন, উচ্চ এবং মধ্যবিত্ত শ্রেণী ছাড়া অন্যান্য শ্রেণীর নরনারীর মধ্যে ইংরেজ শাসন এবং কায়েমী স্বার্থের আসল চেহারাটি সম্পর্কে মোহভঙ্গ হতে বেশিদিন লাগেনি।

ইংরেজ-প্রভুত্ব স্থাপনের আগে থেকে অর্থনৈতিক জীবনে ফাটল ধরলেও এদেশের অর্থ এবং পণ্য-সম্পদ ক্রমশঃ বিদেশী মুনাফালোভীদের দুর্বার গতিতে স্ফীতোদর করে তুলছিল। তাছাড়া ধর্মীয় ও সমাজজীবন তখন থেকেই আবর্তিত হচ্ছিল অন্ধ কুসংস্কার আর নিষ্প্রাণ আচারসর্বস্বতাকে কেন্দ্র করে। জাতিভেদ আর বর্ণবৈষম্যের ধ্বজাধারীদের তখন প্রচন্ড প্রতাপ। পুরোহিততন্ত্র তখন অপ্রতিহত ক্ষমতার অধিকারী। তাদের মুখে শাস্ত্রগ্রন্থের অপব্যাখ্যা, কিন্তু তাদের ফতোয়াই সমাজজীবনের নিয়ামক। এর ফলে যুক্তিনির্ভর চিন্তার স্রোত তখন অবরুদ্ধপ্রায়। অথচ নতুন শাসকশ্রেণী সম্পূর্ণ নির্বিকার। অবশ্য প্রথমে সরকার পাশ্চাত্যদেশের খ্রীস্টধর্ম-প্রচারকদের আসরে সরাসরি অবতীর্ণ হতে দেয়নি, কিন্তু কোম্পানীর দ্রুত শক্তিবৃদ্ধির পর তারা প্রত্যাহার করে নেন তাদের আগেকার বিধি-নিষেধ। উনিশ শতকের দ্বিতীয় দশক থেকে শুরু হলো খ্রীস্টধর্মের অবাধ প্রচার। তাদের শাণিত আক্রমণের লক্ষ্যবস্তু সনাতন হিন্দুধর্ম এবং ভারতীয় সমাজব্যবস্থার নানা দিক।

উনিশ শতকের মাঝামাঝির পর থেকে শিক্ষিত ভারতবাসীর মনে বিদেশী শাসকশ্রেণী সম্পর্কে ক্রমশঃ মোহভঙ্গ ঘটতে শুরু করে। এইসময় থেকে তাদের মনে জাতীয়তাবাদের প্রভাব সুস্পষ্ট হয়ে উঠল। পাশ্চাত্য শিক্ষা ও সভ্যতার সঙ্গে পরিচিতির ফলে তারা একদিকে যেমন পুরনো ব্যবস্থার বদলে প্রবর্তন করতে চাইলেন নতুন প্রগতিকামী সংস্কার, অন্যদিকে তারা প্রয়াসী হলেন রাজনীতি এবং প্রশাসনের ক্ষেত্রে অধিকতর দায়িত্ব এবং ক্ষমতা অর্জনে। রামমোহন, ডিরোজিও, ব্রাহ্মসমাজের নেতৃবর্গ, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ছিলেন প্রগতিবাদী সংস্কারকামী আন্দোলনের পুরোভাগে। তাঁরা চেয়েছিলেন, সাধারণভাবে কর্তৃপক্ষের সঙ্গে সহযোগিতা-

ক্রমে সামাজিক এবং অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে সংস্কার-ভিত্তিক পরিবর্তন এবং রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক ক্ষেত্রে সংবিধান-স্বীকৃত কিছু কিছু অধিকার-অর্জন। সম্ভাব্য ক্ষেত্রে ইংরেজশাসকদের সঙ্গে সহযোগিতাই কাম্য—এই ছিল তাঁদের মনোভাব। অথচ সমাজের সংখ্যাগরিষ্ঠ দরিদ্র জনগণ বিদেশী শাসনের প্রতি ক্রমশঃ আস্থাহীন হয়ে পড়ছিল। উনিশ শতকের তৃতীয়পাদে দুর্ভিক্ষের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে দক্ষিণ ও পশ্চিম ভারতের বিস্তীর্ণ অঞ্চলের অধিবাসীরা সরকারের বিরুদ্ধে এতই বিরূপ হয়ে উঠেছিল যে, তারা শেষপর্যন্ত ব্রিটিশশক্তির বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণে এগিয়ে এল। তার প্রমাণ বাসুদেব বলবন্ত ফাড়কের নেতৃত্ব আঞ্চলিক ভিত্তিতে সশস্ত্র প্রতিরোধ। এই প্রতিরোধ সফল হতে পারেনি, হওয়া সম্ভবও ছিল না। কিন্তু এসব থেকে এই সত্যটিই প্রমাণিত হলো যে, সমস্যা এবং তার সমাধান সম্পর্কে দেশের সাবধানী নেতাদের আর অত্যাচারিত জনগণের দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে ছিল দুস্তর ব্যবধান। সাধারণ মানুষের মনে ইংরেজ-বিদ্বেষের মূলে অনেকখানি জায়গা জুড়ে ছিল প্রধানতঃ জাতি-বৈষম্যের তীব্র জ্বালা : শ্বেতাঙ্গরা ভারতীয়-দের ওপর যত অবিচারই করুক না কেন, তার বিরুদ্ধে এতদ্দেশীয়দের কোন অভিযোগ করা চলবে না ; রাজদ্বারে অত্যাচারী শ্বেতাঙ্গরা পেয়ে যাবেন বেকসুর খালাস—এই ছিল অলিখিত সাধারণ নিয়ম। অবশ্য স্বদেশবাসী নীলচাষীদের পক্ষে শিক্ষিত মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের কিছু কিছু নেতা সমর্থন জানাতে কসুর করেননি। এঁরা সক্রিয়ভাবে প্রতিবাদমুখরও হয়ে উঠেছিলেন। কিন্তু এই সত্যটি অস্বীকার করা যায় না যে, নীলবিদ্রোহ শেষপর্যন্ত জাতীয় বিদ্রোহে পরিণত হতে পারেনি। অব্যবহিত পূর্ববর্তী ১৮৫৭ খ্রীস্টাব্দের তুলনায় ১৮৬১-৬২ খ্রীস্টাব্দে ইংরেজ-বিরোধিতার ক্ষেত্র প্রশস্ততর হলেও তা সর্বব্যাপী হয়ে ওঠেনি।

ইংরেজ-প্রভুত্বের বিরুদ্ধে রাজনৈতিক দাবি-দাওয়া নিয়ে আমরা তখনো আবেদন-নিবেদনের স্তর অতিক্রম করতে প্রস্তুত ছিলাম না। অর্থ-নৈতিক বৈষম্যের মূলোচ্ছেদ করার দাবিও সেদিন ব্যাপক মাত্রায় উচ্চারিত হয়নি। সামাজিক জীবনের কৃত্রিম ভেদ এবং অসাম্যের বিরুদ্ধে শিক্ষিত জনমত সংগঠিত হওয়া সত্ত্বেও ইংরেজ সরকারের সহযোগিতার ওপর আমাদের ভরসার পরিমাণ হ্রাস পেতে চলেছে—এমন ইঙ্গিতও সেদিন অদৃশ্যপ্রায়। ধর্মীয় জীবনের ব্যবহারিক প্রয়োগের ক্ষেত্রে কিছু পরিমাণ সংস্কারকামী প্রেরণার সঞ্চার হলেও তা ব্যাপক হয়নি। পাশ্চাত্যদেশের মুক্তবুদ্ধি আন্দোলনে সাড়া দিতে যারা আগ্রহী ছিলেন, তাঁরা নিজেরা যত প্রগতিবাদীই হোন না কেন, দেশের বৃহত্তর জনগণকে তাঁরা সংস্কারপন্থী করে তুলতে পারেননি। এখানেই ছিল আমাদের সংস্কারচিন্তার স্ববিরোধিতা। সেদিন নেতৃবর্গের সঙ্গে জনমতের সম্পর্কটি ছিল নেহাৎ ক্ষীণ। তাই 'প্রতিকারহীন শক্তের অপরাধে' সেদিন 'বিচারের বাণী'র পক্ষে 'নীরবে নিভৃতে' কাঁদা ছাড়া উপায়ান্তর ছিল না। এই দুঃসহ পরিবেশের মধ্যেই আত্মপ্রকাশ করেছিল বেপরোয়া, বেহিসাবী একদল আদর্শবাদী, মুক্তিকামী যুবকদের জঙ্গী মনোভাব আর স্বাধীনতা অর্জনের তাগাদায় মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা লড়ার বহ্ন্যুৎসব। তবে তখনো তার বহিঃপ্রকাশ তেমন ঘটেনি, কিন্তু অন্তরালে তার প্রস্তুতি চলছিল।

উনিশ শতকের প্রথমার্ধে সংস্কারপন্থী আর সংস্কারবিরোধীদের মধ্যে সংগ্রাম ক্রমশঃ ঘনীভূত হচ্ছিল—এমনটি কিছুমাত্র অপ্রত্যাশিত নয়। দুটি শক্তির সংগ্রাম থেকে এটি ক্রমশঃ দিবালোকের মতো স্পষ্ট হয়ে দেখা দিচ্ছিল যে, পাশ্চাত্য-জাতির দুঃশাসন যতই অসহনীয় হোক, পাশ্চাত্য-দেশের জ্ঞানবিজ্ঞানকে এড়িয়ে চলা আসলে একটি আত্মঘাতী মনোবৃত্তির প্রতিফলন মাত্র। অবশ্য পাশ্চাত্যের ভাবধারা গ্রহণের অর্থ নিজেদের স্বাতন্ত্র্য অথবা আত্মবিলোপ ঘটানো নয়। নতুনকে গ্রহণ করতে গিয়ে পুরনোর মধ্যে যা ভাল তাকে পুরনো বলেই গণ্য করতে হবে—এমন মনোভাব কখনই সামগ্রিকভাবে আমাদের সংস্কৃতির ভাণ্ডার-সমৃদ্ধির সহায়ক হবে না—এ-বিশ্বাসটিও অনেকের মনে দৃঢ়মূল হয়ে দেখা দিয়েছিল। তারা এই কথাটিও পুরোমাত্রায় বিশ্বাস করতেন যে, আমাদের সংস্কৃতির সুস্থ এবং সুষম বিকাশের জন্য প্রয়োজন আমাদের বিস্মৃতপ্রায় প্রাচীন ধর্মীয় এবং

সমাজ-সংরক্ষণ বিষয়ক নির্দেশিকার পুনর্মূল্যায়ন। একদিকে নতুনের আবাহন, অপরদিকে পুরনোর মূল্যায়ন—এ-দুয়ের ভিত্তিতে নয়া-ভারতের বুনিয়াদ তৈরির প্রয়োজনীয়তা : এই উদারতাভিত্তিক, সহনশীল, সমন্বয়ধর্মী দৃষ্টিভঙ্গির কাছে পরিবর্তন-বিরোধী, সংরক্ষণশীল সনাতনী মতবাদের পরাভব ঘটার সম্ভাবনা ক্রমশঃ উজ্জ্বলতর হয়ে উঠেছিল।

এই সময়কার জনমানসের আরেকটি ব্যাধি ছিল—আত্মবিশ্বাস এবং আত্মমর্যাদাবোধের অভাব। এর মূলে ছিল একদিকে নিজেদের প্রাচীন ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির বৈচিত্র্য এবং গভীরতা সম্পর্কে অজ্ঞতা, অন্যদিকে বিদেশী ও বিধর্মী শাসকগোষ্ঠীর প্রচণ্ড দাপটের মুখে অসহায়তাবোধ।

এই অসহায়তাবোধ এবং ঔদাসীন্যের পটভূমিতে জনমানসে তখন বলিষ্ঠ নেতৃত্বের প্রয়োজন গভীর-ভাবে অনুভূত হচ্ছিল। প্রার্থিত বলিষ্ঠ নেতৃত্বের আবির্ভাবের আকাঙ্ক্ষার সেই মুহূর্তেই ঘটল বহু-কাঙ্ক্ষিত নেতৃত্বের আবির্ভাব। এই আবির্ভাবের লক্ষ্য রাজনীতির অভ্যস্ত পথে জনসমর্থন নয়, সরকারের সঙ্গে সহযোগিতাক্রমে সমাজসংস্কারের পরিকল্পনা নয়—এর মূলে নিহিত ছিল জাতির মননে জাতীয়ত্ববোধের স্ফুরণ ; সেই সঙ্গে আত্ম-মর্যাদাবোধের জাগরণ এবং ভারতবর্ষের নিজস্ব ভাবধারা, ঐতিহ্য ও জীবনদর্শন সম্বল করে নতুন জাগৃতির সন্ধান। এই আবির্ভাব শুধু ভারতের নয়, সারা বিশ্বের অন্যতম নেতা বীর সন্ন্যাসী বিবেকানন্দের, যিনি শুধু অসামান্য চিন্তানায়কই ছিলেন না, অনন্যসাধারণ কর্মবীরও ছিলেন।

॥ ২ ॥

সমন্বয়ের মাধ্যমে ব্যক্তি ও গোষ্ঠী-জীবনকে মহত্তর জীবনে উত্তরণের যে-উপদেশ দক্ষিণেশ্বর থেকে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ সেদিন তত্ত্বজিজ্ঞাসুদের কাছে তুলে ধরেছিলেন, তা শুধু 'কথামৃতে'র মধ্যেই নয়, তাঁর জীবনব্যাপী সাধনার অভিজ্ঞতাতেও বিধৃত ছিল। সে-আবেদন শুধু তাঁর স্বদেশবাসীদের উদ্দেশেই নিবেদিত হয়নি, তাঁর আবেদন ছিল বিশ্বজনীন।

রামকৃষ্ণদেবের প্রধান শিষ্য বিবেকানন্দ মাত্র তিরিশ বছর বয়সে যাত্রা করলেন পাশ্চাত্য মহাদেশের উদ্দেশে। সমুদ্রযাত্রা-সংক্রান্ত সামাজিক বিধি-নিষেধ অগ্রাহ্য করে সম্পূর্ণ নিজের উদ্যোগে স্বামীজীর এই যাত্রা। যথাসময়ে সংগৃহীতব্য প্রতিনিধিসভার আমন্ত্রণপত্র পর্যন্ত তাঁর সঙ্গে ছিল না। সমুদ্রযাত্রার জন্য নেহাৎই প্রয়োজন-ভিত্তিক অর্থ সংগৃহীত হলো নানা সূত্র থেকে—সেই অর্থের পরিমাণও পর্যাপ্ত নয়। পোশাক-পরিচ্ছদও শীতের দেশের উপযোগী ছিল না।

ইতিমধ্যে ঠাকুরের মহাসমাধিলাভের পর এক-এক করে প্রায় সাতটি বছর অতিক্রান্ত হতে চলেছে। স্বামীজীর উদ্যোগে শ্রীরামকৃষ্ণ-শিষ্যরা আশ্রয়লাভ করেছেন বরানগরে—একটি অতি পুরনো, ভগ্ন-প্রায় বাড়িতে। তাঁদের সামান্য গ্রাসাচ্ছাদনের প্রয়োজনটুকু মেটানোর নিশ্চিত কোন উপায় তখনো দেখা যাচ্ছে না। এরই মধ্যে ঠাকুরের আশীর্বাদপূত সন্ন্যাসীদের মনোবল অক্ষুণ্ণ, জীবসেবা তাঁদের কাছে তখনই ঈশ্বরসেবার নামান্তর। ঠাকুরের বার্তা সকলশ্রেণীর মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়াই তাঁদের প্রধান কর্তব্য। সেজন্য একদিকে চাই মানসিক প্রস্তুতি, অন্যদিকে শুধু স্বদেশবাসী নয়—বিশ্ববাসীদের সঙ্গে আত্মীয়তার বন্ধন গড়ে তোলা। এই মানসিক প্রস্তুতির জন্য শুরু হয় আসমুদ্র-হিমাচলব্যাপী স্বামীজীর অসাধারণ পরিব্রাজক জীবন। ভারতের প্রতিটি প্রান্তের মানুষের সঙ্গে ঘটল তাঁর অন্তরঙ্গ পরিচয়। পর্যটনশেষে কন্যাকুমারিকার শিলাখণ্ডে তাঁর মহান উপলব্ধি। তারপর থেকেই সহায়-সম্বলহীন আদর্শবাদী যুবক সন্ন্যাসী তাঁর অন্তরে পাশ্চাত্যদেশ ভ্রমণের তাগাদা অনুভব করলেন। সঙ্কল্প সাধু, সুতরাং শেষ-পর্যন্ত সব বাধা লঙ্ঘন করে চীন-জাপানের পথে তিনি পাড়ি দিলেন ভ্যাঙ্কুভারে। সেখান থেকে ট্রেনযোগে শিকাগোয় তাঁর পদার্পণ। বহু কষ্টকর অভিজ্ঞতার শেষে তিনি পেলেন ধর্মমহাসভায় অংশগ্রহণের দুর্লভ সুযোগ।

এই সম্মেলনের প্রতিনিধিদের মধ্যে ছিলেন পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন ধর্মের প্রবক্তারা। ভারতীয় প্রতিনিধিদের অন্যতম ছিলেন নব-বিধান সমাজের প্রতাপচন্দ্র মজুমদার, একাধারে

বৌদ্ধ ও থিয়োজফিস্ট অনাগারিক ধর্মপাল, বোম্বাইয়ের ব্রাহ্মনেতা বলন্ত ভাউ নাগরকর, স্বনামধন্যা থিয়োজফিস্ট নেত্রী অ্যানি বেসান্ত, এলাহাবাদের প্রবীণ ব্রাহ্মণ অধ্যাপক জ্ঞানেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, জৈন সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি বীরচাঁদ এ. গান্ধী এবং শ্রীরামকৃষ্ণ-শিষ্য স্বামী বিবেকানন্দ। প্রতিনিধিদের মধ্যে একমাত্র ব্যতিক্রম স্বামীজী। যথারীতি প্রতিনিধির পরিচয়পত্র পূর্বাহ্নে সংগ্রহ করে তিনি যোগদান করেননি। ভারতীয় প্রতিনিধিদের মধ্যে পদমর্যাদায় অগ্রগণ্য ছিলেন ব্রাহ্মনেতা প্রতাপচন্দ্র মজুমদার। কারণ, তিনি ছিলেন ধর্মমহাসভার উপদেষ্টা-পরিষদের সদস্যও।

ধর্মমহাসভার কার্যকরী সমিতির সভাপতি ডঃ জন হেনরী ব্যারোজ-এর মতে ধর্মসভার উদ্দেশ্য ছিল ঃ

"তুলনামূলক ধর্মমহাসভার একটি মহান প্রতিষ্ঠান স্থাপন করা ; বিভিন্ন ধর্মের মধ্যে আদান-প্রদান ও সম্মেলনের ব্যবস্থা করা এবং বিভিন্ন ধর্মের মানুষের মধ্যে ভ্রাতৃত্ববোধকে ঘনীভূত করা ; প্রত্যেক ধর্মের নিজস্ব বৈশিষ্ট্যকে আবিষ্কার করা ; মানুষ কেন ঈশ্বরে এবং উত্তরজীবনে বিশ্বাস করে তা দেখানো ; খ্রীস্টান এবং অন্য জাতিগুলির মধ্যে, বিশেষতঃ ধর্মভিত্তিক জাতিগুলির মধ্যে যে বিরাট ব্যবধান-গহ্বর রয়েছে তার ওপর সেতুনির্মাণ করা ; মানুষকে তার সাধারণ লক্ষ্যে পৌঁছে দেবার ব্রতগ্রহণের জন্য সব মানুষকে প্রণোদিত করা এবং আন্তর্জাতিক শান্তির পথ প্রশস্ত করা।"

১৮৯৩ খ্রীস্টাব্দের ১১ সেপ্টেম্বর। এই দিনটিতে সকাল দশটায় শিকাগোর আর্ট ইনস্টিটিউটে বিভিন্ন ধর্মের প্রতিনিধিদের নিয়ে শুরু হলো ধর্মমহাসভার অধিবেশন। প্রথমেই উদ্বোধনী সভায় আমন্ত্রিত প্রতিনিধিদের অভ্যর্থনা জানানো হলো। অভ্যর্থনার জবাবে স্বামীজী পাঁচ মিনিটব্যাপী একটি সংক্ষিপ্ত অথচ সারগর্ভ ভাষণ দিলেন। তাঁর ভাষণে হিন্দুধর্মের স্বরূপটি তিনি প্রাঞ্জল এবং কাব্যময় ভাষায় ব্যক্ত করেছিলেন। ইতিপূর্বে শিকাগো শহরে দু-চারটে প্রতিষ্ঠান-আয়োজিত সভায় তিনি ভাষণ দিয়েছিলেন, কিন্তু ধর্মমহাসভার প্রথমদিনে তাঁর ভাষণটি সমবেত শ্রোতৃমণ্ডলীর মনে যে গভীর রেখাপাত করেছিল, তা অভাবিতপূর্ব। মন্ত্রমুগ্ধ শ্রোতাদের মনে সেদিন স্বতঃস্ফূর্তভাবে অনুভূত হয়েছিল একই সঙ্গে গভীর শ্রদ্ধা এবং বিস্ময়বোধ। এই মহাসভায় আমন্ত্রিত প্রতিনিধিদের মধ্যে সেদিন উপস্থিত ছিলেন স্বনামধন্যা থিয়োজফিস্ট নেত্রী অ্যানি বেসান্ত। উদ্বোধনী সভায় স্বামীজীর ভাষণ সম্পর্কে তিনি লিখেছেন ঃ

"শিকাগোর ঘন আবহাওয়ার মধ্যে জ্বলন্ত ভারতীয় সূর্য, সিংহতুল্য গ্রীবা ও মস্তক, অন্তর্ভেদী দৃষ্টি, স্পন্দিত ওষ্ঠ, চকিত দ্রুত-গতি, কমলা ও হলুদ রঙের পোশাকে পরমাশ্চর্য ব্যক্তিত্ব—স্বামী বিবেকানন্দ সম্পর্কে আমার প্রথম প্রতিক্রিয়ার রূপ।… সন্ন্যাসী—তাঁর পরিচয়? নিশ্চয়ই। কিন্তু সৈনিক সন্ন্যাসী তিনি, প্রথম দর্শনে বরং সন্ন্যাসীর চেয়ে সৈনিকই বেশি মনে হয়—মঞ্চ থেকে এখন নেমে এসেছেন, দেশ ও জাতির গর্ব ফুটে আছে দেহের রেখায় রেখায়—পৃথিবীর প্রাচীনতম ধর্মের প্রতিনিধি, পরিবেষ্টিত হয়ে আছেন কৌতূহলী অর্বাচীন-দের দ্বারা, যারা কোনমতেই নিজেদের দাবি ত্যাগ করতে প্রস্তুত নয়। তারা যেন বলতে চায়, তিনি যে-সুপ্রাচীন ধর্মের প্রতীক-পুরুষ সেই ধর্ম আশেপাশে সমবেত ধর্ম-সমূহের মহিমার চেয়ে হীনতর। কিন্তু না, তা হবার নয়। ধাবমান ও উদ্ধত পাশ্চাত্য-দেশের কাছে ভারত, যতক্ষণ তার এই বাণীবহ সন্তান বর্তমান আছে ততক্ষণ লজ্জিত থাকবে না। ভারতের বাণীকে তিনি বহন করে এনেছেন—ভারতের নামে তিনি দাঁড়িয়েছেন। সকল দেশের রানীর মতো যে-দেশ থেকে তিনি এসেছেন, তাঁর মর্যাদার কথা স্মরণ রেখেছিলেন এই চারণ সন্ন্যাসী। প্রাণবন্ত, শক্তিধর, নির্দিষ্ট উদ্দেশ্যে স্থির স্বামী বিবেকানন্দ পুরুষের মধ্যে পুরুষ—নিজেকে উত্তোলন করার মতো সামর্থ্যসম্পন্ন পুরুষ।"[১]

[১] বাঙলা অনুবাদ—শঙ্করীপ্রসাদ বসু। দ্রঃ বিবেকানন্দ ও সমকালীন ভারতবর্ষ, ১ম খণ্ড, ২য় সংস্করণ, ১৯৭৭, পৃঃ ১২২

এতো গেল তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়া। এমনি ধরনের আরও প্রতিক্রিয়ার প্রমাণ পাওয়া যায় একাধিক প্রত্যক্ষদর্শীর বর্ণনায় এবং মার্কিন মুলুক থেকে প্রকাশিত সমকালীন নানা সংবাদপত্রের পৃষ্ঠায়। আমেরিকায় স্বামীজীর প্রভাব উদ্বোধনী ভাষণের মধ্যেই সীমিত ছিল না। ধর্মমহাসভায় যোগদানের আগেও তিনি একাধিক সংস্থা কর্তৃক আমন্ত্রিত হয়ে ভারতের অধ্যাত্মচর্চা এবং ভারতীয় সংস্কৃতি সম্পর্কে ভাষণ দিয়েছিলেন। ধর্মমহাসভার বিভিন্ন শাখার অধিবেশনেও তিনি ১৫ থেকে ২৪ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত অন্ততঃ আরও ৬টি বিষয়ে ভাষণ দেন। এইসব বক্তৃতার বিষয়বস্তু ছিল—'কি কারণে আমাদের মতভেদ?', 'হিন্দুধর্ম', 'ভারতবর্ষের আশু প্রয়োজন', 'বৌদ্ধধর্ম হিন্দুধর্মেরই পরিণতি' ইত্যাদি। এদের মধ্যে 'হিন্দুধর্ম' শীর্ষক ভাষণটি দীর্ঘতম এবং এটি ছিল ধর্মমহাসভার নিয়মানুসারে পঠিত ভাষণ। স্বামীজীর প্রতিটি ভাষণ জনগণকে এমনই অপ্রতিরোধ্যভাবে আকর্ষণ করতো যে, পরে ধর্মমহাসভার উদ্যোক্তারা তাঁকেই প্রতিটি অধিবেশনের শেষবক্তারূপে ঘোষণা করতেন। এর ফলে শ্রোতৃমণ্ডলী শেষপর্যন্ত অধীর আগ্রহ নিয়ে প্রতীক্ষা করতেন।

শিকাগো ধর্মমহাসভাকে উপলক্ষ করেই পাশ্চাত্যজগতের কাছে স্বামীজী তুলে ধরেছিলেন ভারতীয় দর্শন, সংস্কৃতি এবং ধর্মের প্রকৃত স্বরূপটি। মহাসভার অধিবেশন সমাপ্তির পর তিনি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন অঞ্চল পরিদর্শন করে সেখানকার জনসাধারণের কাছে তুলে ধরেন ভারতীয় ধর্মের স্বরূপ। শিকাগো ছাড়া বোস্টন, সালেম, ডেট্রয়েট, নিউ ইয়র্ক, হার্ভার্ড, ব্রুকলীন সহ বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়ে তিনি ভারতীয় দর্শন এবং ধর্ম সম্পর্কে বিশদ আলোচনা করেন। প্রথমবার যুক্তরাষ্ট্র সফরের শেষে তিনি পরিভ্রমণ করেন ইংল্যান্ড, ফ্রান্স, সুইজারল্যান্ড, ইটালী, জার্মানী ও হল্যান্ড। এরপর দ্বিতীয়বার ১৮৯৯-১৯০০ খ্রীস্টাব্দে দুবছর স্বামীজী ইংল্যান্ড, অস্ট্রিয়া, তুরস্ক, গ্রীস এবং আমেরিকার বহু স্থানের অধিবাসীদের কাছে তুলে ধরেন ভারতবর্ষের দর্শন, ধর্ম এবং সমাজ-সম্পর্কিত বহু তথ্য। এইসব বক্তৃতায় তিনি খ্রীস্টধর্মের প্রচারকদের তীব্র ভাষায় আক্রমণ করেন। এর ফলে একদিকে যেমন তাঁর স্বদেশবাসীদের মনে ফিরে এসেছিল আত্মবিশ্বাস ও মর্যাদাবোধ, অন্যদিকে ভারতীয় দর্শন, সংস্কৃতি ও ধর্মচিন্তা নিয়ে পাশ্চাত্যবাসীদের মনে সৃষ্টি হলো শ্রদ্ধাশীল মনোভাব।

স্বামীজীর ভারত-ব্যাখ্যা পাশ্চাত্যদেশের ভারততত্ত্ববিদদের অনুরূপ ছিল না। ভারততত্ত্ববিদরা প্রাচীন সংস্কৃত এবং আরবীভাষায় রচিত বহু গ্রন্থ অনুবাদের মাধ্যমে পৌঁছে দিয়েছিলেন গুণীদের মহলে। স্বাভাবিকভাবেই তাঁদের মূল উদ্দেশ্য ছিল পাশ্চাত্যদেশে প্রাচ্যবিদ্যার পরিচয় ঘটানো। স্বভাবতই তাদের দৃষ্টিভঙ্গি ছিল জ্ঞানভিত্তিক অথবা অ্যাকাডেমিক। সমসাময়িক এবং পরবর্তী কালে এদেশে বসবাসকারী ইংরেজ সিভিলিয়ানরাও ভারতীয় ভাষা এবং সাহিত্য চর্চায় নৈপুণ্য অর্জন করেছিলেন। তাঁদের প্রধান লক্ষ্য ছিল—প্রধানতঃ প্রশাসনিক স্বার্থে শাসকশ্রেণীকে এদেশের আচার-বিচার, আইন-কানুন সম্পর্কে ওয়াকিবহাল করে তোলা। কিন্তু ভাষাতত্ত্ববিদদের উদ্যম প্রশংসনীয় হলেও এদের প্রভাব সীমিত ছিল জ্ঞানানুশীলনের ক্ষেত্রে। সাধারণ স্তরের সরকারি এবং বেসরকারি বিদেশী ভাষাতত্ত্ববিদরা ভারতবর্ষের ইতিহাস এবং সংস্কৃতি সম্পর্কে শুধু অজ্ঞই ছিলেন না, খ্রীস্টধর্মের প্রচারকদের অপব্যাখ্যাও তাঁদের বিচার-বুদ্ধিকে বিপথে পরিচালিত করেছিল। তাছাড়া স্বদেশের শিক্ষাদীক্ষা, স্বদেশের সংস্কৃতি সম্পর্কে তাঁদের মানসিকতা ছিল অত্যন্ত উন্নাসিক। স্বামীজীর আবেদন ছিল পাশ্চাত্যের শিক্ষিত এবং সাধারণ নরনারীর কাছে। প্রথম পর্যায়ে মাত্র বছর তিনেক প্রচারের দ্বারা তিনি বিদেশী মহলে গড়ে তুলেছিলেন ভারতবর্ষ সম্পর্কে এক শ্রদ্ধাশীল এবং কৌতূহলী মনোভাব। অবশ্য ভারততত্ত্ববিদদের চর্চা নিঃসন্দেহে তাঁর লক্ষ্যসিদ্ধির সহায়ক হয়েছিল।

ভারতীয় রাজনীতির সঙ্গে অবশ্যই স্বামীজীর প্রত্যক্ষ যোগাযোগ ছিল না। শিকাগো ধর্মমহাসভায় স্বামীজীর যোগদানের আট বছর আগে ভারতের জাতীয় কংগ্রেস (The Indian National Congress) ভূমিষ্ঠ হয়েছিল। মহাসভার নেতারা তাঁদের যুক্তি ও বিশ্বাস অনুযায়ী স্বদেশবাসীদের

জন্য ইংরেজ সরকারের কাছ থেকে কিছু কিছু প্রশাসনিক অধিকার অর্জনে প্রয়াসী ছিলেন। স্বামীজী জাতীয় কংগ্রেসের কাজকর্মের খবরাখবর রাখতেন। ১৮৯৭ খ্রীস্টাব্দে আলমোড়ায় অশ্বিনীকুমার দত্তের সঙ্গে কংগ্রেস-আচরিত নীতি ও কার্যকলাপ নিয়ে আলোচনাপ্রসঙ্গে তিনি বলেছিলেন : "একেবারে কিছু না করার চাইতে কিছু একটা করা ভাল।" এরপরেই তিনি পাল্টা প্রশ্ন তোলেন : "সাধারণ মানুষের জন্য কংগ্রেস কি করছে? আপনার কি মনে হয় যে, কয়েকটি প্রস্তাব পাশ করলেই স্বাধীনতা আমাদের হাতের মুঠোয় চলে আসবে?"

এ-সম্পর্কে স্বামীজীর আরও একটি মন্তব্য প্রাসঙ্গিক। 'স্বামি-শিষ্য-সংবাদ'-এর বর্ণনা : তাঁকে প্রশ্ন করা হয়েছিল, "আপনি কি ভারতের জাতীয় মহাসমিতির আন্দোলনের দিকে কখনো মনোযোগ দিয়েছেন?" প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেছিলেন : "আমি ও-বিষয়ে বিশেষ মন দিয়েছি, বলতে পারি না। আমার কর্মক্ষেত্র অন্য বিভাগ, কিন্তু আমি এই আন্দোলন দ্বারা ভবিষ্যতে বিশেষ শুভ ফললাভের সম্ভাবনা আছে—মনে করি না।"

দুটি মন্তব্য থেকেই একথা পরিষ্কার যে, কংগ্রেস-আন্দোলনের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে স্বামীজী খুব আশাবাদী ছিলেন না। তিনি মনে করতেন, দেশের সমস্যার সমাধান এবং প্রয়োজনসিদ্ধির জন্য প্রয়োজন ছিল ইস্পাত-কঠিন চরিত্রের মানুষের। এই সম্পর্কে তাঁর ধারণা দিবালোকের মতোই শুধু স্পষ্ট ছিল না, এই ধারণার বাস্তব রূপায়ণের জন্য তাঁর প্রয়াস ছিল অবিরাম। ইংরেজজাতির দুঃশাসন সম্পর্কে তিনি ছিলেন পূর্ণমাত্রায় অবহিত। 'ইতিহাসের প্রতিশোধ' শীর্ষক আলোচনায় তাঁর মন্তব্য : "যত জাতি ভারতে এসেছে, তার মধ্যে সবচেয়ে খারাপ হলো এই ইংরেজ।··· ইতিহাস ইংরেজদের কৃতকার্যের প্রতিশোধ নেবেই। আমাদের গ্রামে গ্রামে, দেশে দেশে যখন মানুষ দুর্ভিক্ষে মরেছে, তখন ইংরেজরা আমাদের গলায় পা দিয়ে টিপে ধরেছে। আমাদের শেষ রক্তটুকু তারা নিজ তৃপ্তির জন্য পান করে নিয়েছে। আর আমাদের দেশের কোটি কোটি টাকা তাদের নিজেদের দেশে চালান দিয়েছে।" মিস মেরী হেল-কে লেখা একাধিক চিঠিতেও তিনি ইংরেজযুগের ত্রাস ও অত্যাচারের রাজত্ব সম্পর্কে সবিশেষ উল্লেখ করেছেন। প্রতিকারের পথও তিনি নির্দেশ করেছেন তাঁর অজস্র রচনায়।

একমাত্র সর্বভারতীয় রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের ওপর ভরসা না রাখলেও, অথবা প্রত্যক্ষভাবে রাজনৈতিক আন্দোলনে সামিল না হলেও স্বামীজীর দৃষ্টি ছিল সর্বভারতীয় এবং সকল বিষয়েই গভীর ও ব্যাপক। তিনি ছিলেন ভারতীয় জাতীয়তাবাদের প্রধান উদ্গাতা। রাজনৈতিক আন্দোলনে যুক্ত না থেকেও ভারতীয় জাতীয়তাবাদকে শক্তিসঞ্চয় করতে তিনি বহুল পরিমাণে সহায়তা করেছিলেন। ভারতের জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের চরিত্র এবং বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে আলোচনাপ্রসঙ্গে হিন্দু-জাতীয়তাবাদের উল্লেখ অনেকেই প্রাসঙ্গিক বলে মনে করেন। এদেশে হিন্দুরাই সংখ্যাগরিষ্ঠ, সুতরাং জাতীয়তাবাদের বিকাশ ও প্রসারে তাদের ভূমিকা অনেকখানি থাকবে—এমন সম্ভাবনা কোন যুক্তিতেই অগ্রাহ্য করা যায় না। কিন্তু স্বামীজী হিন্দুধর্ম এবং ভারতীয় সংস্কৃতির পুনরুজ্জীবনের প্রয়াসী হয়েও ভারতের অহিন্দু জনসাধারণ সম্পর্কে গভীরভাবে শ্রদ্ধাশীল ছিলেন। মুসলমান এবং খ্রীস্টভক্তদের সম্পর্কে তিনি অত্যন্ত উদার মতামত পোষণ করতেন। বৈদান্তিক মস্তিষ্ক আর ঐস্লামিক দেহ—দুয়েরই তিনি প্রশংসা করতেন। তাঁর চিন্তাধারায় সাম্প্রদায়িকতার লেশমাত্র ছিল না। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের উপদেশ মেনে নিয়ে তিনি বিশ্বাস করতেন সর্বধর্মসমন্বয়ের মহান আদর্শ। তাঁর সমগ্র দৃষ্টিতে উদ্ভাসিত ছিল ধর্ম-বর্ণ-নির্বিশেষে অখণ্ড ভারতবর্ষের সত্তা। সমসাময়িক যুগে অপর কোন নেতা স্বামীজীর মতো প্রাদেশিক অথবা আঞ্চলিক স্বার্থের ঊর্ধ্বে ভারতীয়ত্ববোধকে অতখানি মর্যাদা বা স্বীকৃতি দেননি। তিনি বিশ্বাস করতেন আসমুদ্রহিমাচল ভারতবর্ষ এবং আচণ্ডাল ভারতবাসীর ঐক্য ও সংহতিতে। অস্পৃশ্যতা এবং সামাজিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে বৈষম্যের তিনি ঘোর বিরোধী ছিলেন। তাঁর দৃষ্টিতে শোষিত দরিদ্র জনগণ ছিলেন 'দরিদ্রনারায়ণ'। একদিকে সংহতি-বোধ

এবং অন্যদিকে চরিত্রবল—এই দুইয়ের ওপর তিনি রচনা করতে চেয়েছিলেন জাতীয় ঐক্যের সুদৃঢ় ভিত্তি। এই কারণেই আত্মশক্তিতে বলীয়ান হওয়ার আহ্বান তাঁর কণ্ঠে বারবার ধ্বনিত হয়েছে। তাঁর নিরলস প্রচারের ফলে সর্বভারতীয় ভিত্তিতে জাতীয়তাবাদের বনিয়াদ গড়ে উঠেছিল বলেই যেমন ভারতীয় জাতীয় মহাসভার একশ্রেণীর নেতা আবেদন-নিবেদনের পথ পরিহার করে গ্রহণ করেছিলেন 'Passive Resistance'-এর কর্মসূচী, তেমনই আর একদল আদর্শবাদী দেশপ্রেমিক যুবক বেছে নিয়েছিলেন সশস্ত্র প্রতিরোধের কঠিন পথ।

তাছাড়া আধুনিক ভারতবর্ষের যে-অধ্যায়টি সাধারণভাবে 'নবজাগরণের যুগ' বলে চিহ্নিত, তা সার্থক করার ক্ষেত্রে স্বামীজীর পাশ্চাত্য-ভ্রমণের প্রভাব অনস্বীকার্য। প্রচলিত অর্থে স্বামীজী সংসারত্যাগী সন্ন্যাসী ছিলেন না, তিনি ছিলেন জ্বলন্ত দেশপ্রেমের প্রতীক। দেহের শক্তি আর মনের উদারতা—দুটি বিষয়ের ওপরেই তিনি আরোপ করতেন সমান গুরুত্ব। সর্বপ্রকার ভীরুতা এবং ক্লীবত্বের তিনি ছিলেন ঘোর বিরোধী। যুবশক্তিকে পুনরুজ্জীবিত করার উদ্দেশে পূর্ব-পুরুষদের আচরিত রীতিনীতিকে তিনি যুক্তির আলোতে যাচাই করার উপদেশ আজীবন দিয়ে গিয়েছেন। রাজনৈতিক অধিকার অর্জনের তিনি বিরোধী ছিলেন না। কিন্তু সমাজজীবন থেকে সর্বপ্রকার বৈষম্য দূর করার প্রতি তিনি আরোপ করতেন অধিকতর গুরুত্ব। সুস্থ, বলীয়ান, কর্মনিষ্ঠ নাগরিক গড়ে তোলাই ছিল তাঁর অন্যতম প্রধান লক্ষ্য। জাতীয়তার মন্ত্রে তিনি দীক্ষিত করতে চেয়েছিলেন সকলশ্রেণীর ভারতবাসীকে। তাঁর প্রতিটি রচনার পংক্তিতে প্রকাশিত তাঁর জাতীয়তাবাদ এবং আত্মমর্যাদাবোধ। সর্বভারতীয় জাতীয়তাবাদের মন্ত্র তিনিই উচ্চারিত করে গিয়েছেন সম্প্রদায়-বর্ণ-ধর্ম-নির্বিশেষে সকলশ্রেণীর স্বদেশবাসীর উদ্দেশে। বস্তুতঃ সমকালীন, এমনকি পরবর্তী যুগের আর কোন ভারতীয় নেতার নামোল্লেখ সম্ভব নয়, যিনি স্বামীজীর মতো সর্বভারতীয় চিন্তাধারা অত বিশাল মাত্রায় প্রচার করেছিলেন।

॥ ৩ ॥

বিবেকানন্দের আধ্যাত্মিক জিজ্ঞাসা এবং উপলব্ধির উদ্গাতা ছিলেন ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ। অতীন্দ্রিয় শক্তিবলে তিনি উপলব্ধি করেছিলেন কী প্রচণ্ড শক্তি আর অন্তহীন সম্ভাবনা নিহিত রয়েছে এই অসাধারণ যুবাপুরুষটির ব্যক্তিত্বে আর মননে। ঐশী শক্তির সহায়তায় তিনি জাগ্রত করেছিলেন শিষ্যের ভস্মাচ্ছাদিত প্রাণবহ্নিকে। তাঁরই নির্দেশে তরুণ গৈরিকধারী একদিন বের হয়েছিলেন ভারত-আবিষ্কারের উদ্দেশ্যে, ভারত-সত্যের সন্ধানে। শুধু দুর্গম পুণ্যভূমি কিংবা নৈসর্গিক দৃশ্যপট দর্শন করেই তিনি ক্ষান্ত থাকেননি। ধনী-নির্ধন, শিক্ষিত-অশিক্ষিত, ধর্ম-বর্ণ-নির্বিশেষে সকলশ্রেণীর স্বদেশবাসীর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ অন্তরঙ্গ পরিচয়ের মাধ্যমে তিনি সমৃদ্ধ করতে চেয়েছিলেন তাঁর উপলব্ধ জ্ঞানের ভাণ্ডার। সেদিন ভারত-পথিক এই তেজোদৃপ্ত সন্ন্যাসীর সমগ্র দৃষ্টি আচ্ছন্ন করেছিল একদিকে স্বদেশের পাহাড়, নদী, নির্ঝর, গিরিগুহা, অন্যদিকে উচ্চ-নীচ-নির্বিশেষে সকলশ্রেণীর মানুষ—তাঁর বর্ণনায় 'নারায়ণ'। আসমুদ্র-হিমাচলব্যাপী এই পরিক্রমার শেষে তাঁর ধ্যানালোকে সেদিন উদ্ভাসিত হয়েছিল ভারত-আত্মার স্বরূপ। প্রাণচাঞ্চল্যে ভরপুর এই মানুষটি সেদিন ভারত-আত্মার এই নবলব্ধ পরিচয় এবং সুপ্রাচীন ভারতের মহতী বাণী সমগ্র বিশ্বের কাছে তুলে ধরতে আগ্রহী হলেন। বৃহত্তর জগতের প্রাণকেন্দ্র তখন পাশ্চাত্য ভূখণ্ড। এখানেই শুরু হয়েছিল নতুন দৃষ্টিতে জ্ঞানানুশীলন, ঘটেছিল নতুন প্রগতিবাদী চিন্তাধারার স্ফুরণ। আবার এখানেই চলছিল একদিকে ভোগবাদী সভ্যতার দাপট, অন্যদিকে ভারতবর্ষের বিস্মৃতপ্রায় প্রাচীন সভ্যতা ও সংস্কৃতির ইচ্ছাকৃত অপব্যাখ্যা। এই অপব্যাখ্যাকারীদের পুরোভাগে ছিলেন খ্রীস্টধর্মের অত্যুৎসাহী প্রচারকদল। বিবেকানন্দ এই তথাকথিত শত্রুপুরীতেই হানা দিলেন; জড়বাদী পাশ্চাত্যের কাছে তুলে ধরলেন হিন্দুধর্ম ও ভারতীয় সংস্কৃতির আসল চেহারা। সেখানকার পত্র-পত্রিকায়, সভা-সমিতিতে স্বামীজীর উদ্দেশে উচ্চারিত হলো সশ্রদ্ধ জয়ধ্বনি।

সেপ্টেম্বর, ১৯৯৩

পাশ্চাত্য ভূখণ্ডের এই জয়যাত্রার কাহিনী ভারতবর্ষে এসে পৌঁছানোর সঙ্গে সঙ্গেই দেশের সর্বত্র শোনা গেল অনুরূপ জয়ধ্বনি। গৈরিকবস্ত্র-সম্বল সর্বত্যাগী সন্ন্যাসী হলেন ভারতবাসীর কাছে গর্বের ধন। পাশ্চাত্যজয়ের পরবর্তী অধ্যায় রচিত হলো ভারতবর্ষে। এখানকার উর্বর ভূমিতে ফসল ফলাতে বেশি সময় ব্যয় হয়নি। স্বামীজীর আবির্ভাবের একশ বছর আগে ভারতবর্ষ চরম অবক্ষয়ের গর্ভে নিমজ্জিত হতে চলেছিল। দীর্ঘকালের তমিস্রা তখন ভারতবর্ষকে গ্রাস করতে উদ্যত। তারপরেও দীর্ঘকাল এই তমিস্রার ঘোর কাটেনি, বরং একশ্রেণীর শিক্ষিত ভারতীয় সর্ববিষয়ে বিদেশের অনুকরণ করতে গিয়ে জাতির নিজস্ব ঐতিহ্য বিসর্জন দিতে আগ্রহী ছিলেন। একদিকে সংস্কারধর্মিতা, অপরদিকে সর্বপ্রযত্নে পুরনোকে আঁকড়ে ধরে রাখার নেশা—এই দুই পরস্পরবিরোধী ভাব যখন আত্মকলহে লিপ্ত, তখনই প্রয়োজন ছিল সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে প্রযোজ্য একটি নতুন ভাবাদর্শ। এর সূচনা যদি রামমোহনের প্রগতিবাদী আন্দোলনে, তবে তার পরিণতি বিবেকানন্দের স্বপ্ন ও সংগ্রামে। পুরনো আমলের রাজশক্তির গৌরবচ্ছটা তখন ম্রিয়মাণ। তখনই ভারতে ঘটে চলছে পাশ্চাত্যজাতির অভ্যুদয়। ভারতবর্ষে এই নতুন পাশ্চাত্যশক্তির ধারক ও বাহক পাশ্চাত্যের বণিকগোষ্ঠী। এই শক্তির প্রতীক মুনাফালোভীদের পিছনে ছিল নতুন সভ্যতার আলোকবর্তিকাও। শিক্ষাভিমানী ভারতীয় নেতৃবৃন্দের একটি অংশ সেদিন উপলব্ধি করেছিলেন যে, জ্ঞান-বিজ্ঞান সমৃদ্ধ, যুক্তিনির্ভর এই সংস্কৃতির সঙ্গে পরিচয় ঘটানো আমাদের বৃহত্তর জাতীয় স্বার্থের অনুকূল। এই বিষয়ে স্বামীজীর চিন্তাধারা ছিল আরও সার্থক এবং সুদূরপ্রসারী। তিনি চাইতেন যে, নতুন ভারতবর্ষ অবশ্যই পাশ্চাত্যের জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চা করবে। যুক্তির কাছে পরাভব মানবে অন্ধ কুসংস্কার, কিন্তু সেইসঙ্গে একথাটিও তিনি গভীরভাবে বিশ্বাস করতেন যে, প্রাচীন ভারতের দর্শন, অধ্যাত্ম-চিন্তা এবং সংস্কৃতিচর্চার পুনরাবিষ্কার ঘটাতে হবে, দূর করতে হবে মানুষে মানুষে কৃত্রিম ভেদ, আর তার চাইতেও যা বেশিমাত্রায় প্রয়োজনীয়, তা হলো ভারতীয় হিসাবে আত্মবিশ্বাস, আত্মমর্যাদাবোধ এবং আমাদের ঐতিহ্য সম্পর্কে গর্ববোধ।

ভারতের রেনেসাঁস বা নবজাগরণের প্রকৃতি এবং ব্যাপকতা নিয়ে পণ্ডিতদের মধ্যে পরস্পরবিরোধী নানা মত প্রচলিত রয়েছে। দৃষ্টিভঙ্গির পার্থক্যজনিত এই মতভেদ দূর করা সহজ, এমনকি, সম্ভবও নয়। পাশ্চাত্যদেশের রেনেসাঁসের সঙ্গে আমাদের নবজাগরণের হুবহু সাদৃশ্য খুঁজে পাওয়া সম্ভব নয়। এই জাগরণের ব্যাপকতা নিয়েও মতভেদের অবকাশ থাকা বিস্ময়কর নয়। কিন্তু যে-বিষয়টি নিয়ে মতভেদের কোন অবকাশ নেই, সেটি হলো আত্ম-আবিষ্কৃতির দুর্জয় নেশা—যার প্রতীক একপ্রান্তে রামমোহন, অপরপ্রান্তে বিবেকানন্দ। সেই সঙ্গে মনে রাখতে হবে আরও একটি বৈশিষ্ট্যের কথা, যে-বৈশিষ্ট্যের মূলে রয়েছে এই অভ্রান্ত উপলব্ধি—ভারতবর্ষের দর্শন এবং ধর্মীয় চিন্তা এমনই সমৃদ্ধ যে, এর সাহায্যে গোটা পৃথিবীর বিচারশীল মানুষ তাদের চিন্তা এবং মননকে সমৃদ্ধতর করে তুলতে পারে। স্বামীজীর মতে ভারতবর্ষ কখনই কৃপার পাত্র নয়। তিনি মনে করতেন, ভারতবর্ষের পক্ষে পাশ্চাত্যজগতের জ্ঞান-বিজ্ঞানচর্চা শিক্ষণীয় নিশ্চয়ই, কিন্তু তার তুলনায় জীবনচর্চার ক্ষেত্রে ভারতের আদর্শ ও মূল্যবোধ যদি বাইরের জগৎ অনুধাবন এবং গ্রহণ করতে পারে, তাতে জগতের উন্নতি ঘটবে অনেক বেশিমাত্রায়। পরাধীনতার অভিশাপ থেকে মুক্তিলাভের গুরুত্ব অবশ্যই স্বীকার্য। কিন্তু সেই স্বাধীনতা সার্থকতর এবং অধিক অর্থবহ হবে যদি প্রাচীন ভারতের বেদান্তাশ্রয়ী ধর্মবোধের উন্মেষ ঘটে সারা বিশ্ববাসীর মনে।

স্বামীজীর পাশ্চাত্য-ভ্রমণের তাৎপর্য যথাযথ অনুধাবন করতে হলে মনে রাখা প্রয়োজন যে, তার গুরুত্ব যেমন ভারতবর্ষের ক্ষেত্রেই সীমিত ছিল না, তেমনই তার আবেদন শুধু পাশ্চাত্যজগতে ভারতবর্ষের ধর্মচিন্তা এবং সামাজিক জীবন-দর্শনের প্রচারের মধ্যেই নিঃশেষিত হয়ে যায়নি, এমনকি ভারতের নবজাগরণের স্থিতি এবং ব্যাপ্তির মধ্যেই তাঁর আবেদন সীমিত থাকেনি। গভীরভাবে উপলব্ধি করলে এ-সিদ্ধান্তই অপরিহার্য হয়ে উঠবে যে,

সামগ্রিকভাবে মানব-সভ্যতার এক সঙ্কটকালে স্বামীজী গোটা মানবজাতির কাছে তুলে ধরেছিলেন এমনই এক আদর্শ, যা প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মধ্যে স্থাপন করতে পারে এক যোগসূত্র, যা রাজনৈতিক ভেদবুদ্ধি, সামাজিক বৈষম্য এবং অর্থনৈতিক অসাম্যের অবসান ঘটিয়ে পারস্পরিক সমঝোতা গড়ে তুলতে পারে ; শুধু তাই নয়, এক নতুন সার্বজনীন দৃষ্টিভঙ্গিও গড়ে তুলতে পারে, যার মূলে থাকবে প্রাচীন ভারতের শিক্ষা ও সংস্কৃতি, আর পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞানের সমন্বয়। এর লক্ষ্য হবে ক্ষুদ্র স্বার্থবুদ্ধির পরিবর্তে বিশ্বজনীন ভ্রাতৃত্ববোধ, অজ্ঞতা আর কুসংস্কারের পরাভব, যুক্তির প্রাধান্য, বুদ্ধির মুক্তি এবং দেশকালভেদে মানুষের সমান অধিকার। স্বামীজীর শিক্ষা শুধু তাঁর সমকালীন যুগ সম্পর্কেই অথবা নির্দিষ্ট কোন ভূখণ্ডের মধ্যেই প্রযোজ্য নয় ; বর্তমান যুগ সম্পর্কেও এর প্রাসঙ্গিকতা কমেনি, বরং বেড়ে গিয়েছে। আচারসর্বস্ব আনুষ্ঠানিক ধর্মের পরিবর্তে তিনি চেয়েছিলেন সমন্বয়ভিত্তিক উদার মানবতাবাদের প্রতিষ্ঠা, কুসংস্কারবর্জিত সংস্কারপন্থী মুক্ত মন, অর্থনৈতিক এবং সামাজিক জীবনে সকলশ্রেণীর মানুষের জন্য সমান অধিকার, দারিদ্র্যের অবসান এবং সর্বোপরি জীবসেবা আর ঈশ্বরসেবা অভিন্ন মনে করার মতো মনের প্রসারতা। এর মধ্যেই নিহিত নবজাগরণের প্রকৃত লক্ষ্য। নবজাগরণ শুধু একটি ভূখণ্ডের বৌদ্ধিক উন্নয়ন, একটি বিশেষ মানবগোষ্ঠীর যুক্তিসিদ্ধ আচরণ নয় ; পক্ষান্তরে সমগ্র বিশ্ববাসীর জড়তা থেকে, লোভলালসা থেকে, সামরিক দম্ভ থেকে, আগ্রাসী হিংসাশ্রয়ী মনোভাব থেকে নিবৃত্তি। দৃষ্টির স্বচ্ছতা, যুক্তির অভ্রান্ততা আর আধ্যাত্মিক মনোভাবের বিস্তার স্বামীজীকে চিহ্নিত করেছে এক মানবদরদী, যুগোত্তীর্ণ চিন্তানায়ক এবং কর্মবীররূপে।

স্বাভাবিকভাবে আজ দেশে ও বিদেশে স্বামী বিবেকানন্দের ভারত-পরিক্রমা এবং শিকাগো ধর্মমহাসভায় তাঁর আবির্ভাবের গুরুত্ব এবং তাৎপর্য সম্পর্কে নানা আলোচনা ও গবেষণা চলছে। ভারতবর্ষের ইতিহাসে এই দুটি ঘটনার যে বিরাট তাৎপর্য রয়েছে তা সকলেই স্বীকার করবেন। পাশ্চাত্যের ইতিহাসে তথা পৃথিবীর ইতিহাসেও দুটি ঘটনার বিশেষ গুরুত্ব রয়েছে তাও প্রমাণিত হয়েছে এবং ভবিষ্যতে আরো হবে। কিন্তু তুলনামূলকভাবে শিকাগো ধর্মমহাসভায় তাঁর ভাষণ, পাশ্চাত্যের কাছে শাশ্বত ভারতের সাধনা ও সংস্কৃতির মর্মবাণী তুলে ধরা এবং পাশ্চাত্য-ভ্রমণের পূর্ববর্তী কালে তাঁর ভারত-পরিক্রমা—এই দুটির মধ্যে গুরুত্বের দিক থেকে ভারত-পরিক্রমাকেই অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে হয়। এই পরিক্রমার ফলে তিনি ভারতবর্ষকে যেভাবে জেনেছিলেন—ধনী, দরিদ্র, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে সকলশ্রেণীর স্বদেশবাসীর সঙ্গে এই পর্যটনের মাধ্যমে যে নিবিড় ও প্রত্যক্ষ সান্নিধ্য তিনি লাভ করেছিলেন—এককথায়, তা ছিল ভারত-আবিষ্কার। ইতিপূর্বে অন্য কোন ভারতীয় ভারতবর্ষের জল, মাটি, মানুষকে অতখানি ব্যাপক এবং গভীরভাবে জানার অভিজ্ঞতা অর্জন করেননি। এই আবিষ্কৃতিই তাঁকে পৃথিবীর অন্যান্য দেশে ভারতের সাধনা, দর্শন ও মূল্যবোধের প্রকৃত স্বরূপটি পেঁৗছে দেবার সংকল্পগ্রহণে শুধু আগ্রহীই করে তোলেনি, তাঁকে যোগ্যতাভিত্তিক অধিকারও দিয়েছিল। নিছক শিক্ষার্থীর মনোভাব নিয়ে তিনি পাশ্চাত্যজগতের দ্বারস্থ হননি। পাশ্চাত্যের জ্ঞানভাণ্ডার থেকে শিক্ষণীয় বিষয় সম্পর্কে তাঁর আগ্রহ অবশ্যই ছিল, কিন্তু তাঁর ভূমিকায় শিক্ষাগ্রহণকারী অপেক্ষা শিক্ষাদাতার প্রাধান্যই ছিল বেশি। আধ্যাত্মিকবলে বলীয়ান এই গৈরিকধারী সন্ন্যাসী পরাধীন ভারতের অধিবাসী হলেও এই কারণেই পাশ্চাত্যের হৃদয় জয় করে আধুনিক যুগের ইতিহাসে রচনা করেছিলেন অনন্ত সম্ভাবনাময় এক নতুন অধ্যায়। আর একই সঙ্গে পরাধীনতার নাগপাশক্লিষ্ট স্বদেশবাসীর মনে জাগ্রত করেছিলেন আত্মমর্যাদাবোধ।

স্বামীজীর প্রদর্শিত পথে শুধু ভারতের কল্যাণ নয়, সমগ্র বিশ্বের কল্যাণ—এই বিশ্বাসটি সমস্যাজর্জর পৃথিবীর মানুষের কাছে ক্রমশঃ স্পষ্টতর হয়ে ধরা পড়ছে। বিশ্ববাসীর কাছে—বিভিন্ন সমস্যাপীড়িত নিখিল মানুষের কাছে স্বামীজীর বাণী ও জীবন আজ এক পরম সম্পদ। □

ভাষণ

# স্বামী বিবেকানন্দ ও ভারতীয় বিপ্লববাদ

অমলেশ ত্রিপাঠী

ভারতে, বিশেষতঃ বাংলায় বিপ্লব-প্রচেষ্টার ওপর রাওলাটের 'সিডিশন কমিটি' যে বিখ্যাত রিপোর্ট ১৯১৮ খ্রীস্টাব্দে লিখেছিলেন আমরা এখন তার উৎস ও আকর জানতে পেরেছি। বাংলার ক্ষেত্রে এফ. সি. ড্যালি, জে. সি. নিকসন, জে. ই. আর্মস্ট্রং, এল. এনবার্ড এবং এইচ. এল. সলকেল্ডের প্রতিবেদনে বারবার বলা হয়েছে, বিপ্লবীদের আখড়া অনুসন্ধান করে তিনটি বই পাওয়া যাচ্ছে—'গীতা', বঙ্কিমচন্দ্রের 'আনন্দমঠ' এবং স্বামী বিবেকানন্দের 'বর্তমান ভারত'।

স্বভাবতই প্রশ্ন জাগে, কেন এই তিনটি গ্রন্থ বিপ্লবীদের কাছে এত প্রাসঙ্গিক মনে হয়েছিল, কি প্রেরণা তাঁরা সংগ্রহ করেছিলেন এগুলি থেকে? প্রথমে গীতার কথাই ধরা যাক। বলা বাহুল্য, যুগ যুগ ধরে গীতা ভারতে সর্বাধিক পঠিত ধর্মগ্রন্থ। এর প্রবক্তা শ্রীকৃষ্ণ, যিনি পূর্ণব্রহ্ম হয়েও অবতার, অর্থাৎ মনুষ্যরূপ ধারণ করেছিলেন, সংসারের সমস্ত বিরোধের মধ্যে নির্লিপ্তভাবে কর্ম করেছিলেন, ধর্মরাজ্য প্রতিষ্ঠাকল্পে ধর্মযুদ্ধের আহ্বান জানিয়েছিলেন এবং ক্লৈব্যগ্রস্ত অর্জুনকে সে-যুদ্ধে অনুপ্রাণিত করেছিলেন।

ঘটনাটি ঘটেছিল কুরুক্ষেত্রের আসন্ন সংগ্রামের পটভূমিকায়, দুই যুযুধান দলের কেন্দ্রস্থলে। যদিও রাষ্ট্রের সাধারণ কলহ এ নয়—নিকটতম আত্মীয়ের সঙ্গে আত্মীয়ের, জাতির সঙ্গে জাতির, রাষ্ট্রের সঙ্গে রাষ্ট্রের (অবশ্য 'রাষ্ট্রে'র আজকের ধারণায় নয়) এবং বন্ধুর সঙ্গে বন্ধুর পারস্পরিক কলহ। যেকোন পক্ষের জয়ই এখানে পরাজয়ের মতো শোকাবহ। গীতায় আবার দেখা যাচ্ছে, এই যুদ্ধ শুধু বাইরে ঘটছে না, ঘটছে অন্তরেও। ন্যায়-অন্যায়, ভাল-মন্দ, ধর্ম-অধর্ম সর্বদাই পাণ্ডব-কৌরবের মতো যুযুৎসু; আর সেই বুদ্ধি-বিভ্রান্তকারী পরিস্থিতিতে ধর্মের পক্ষ, ন্যায়ের পক্ষ, মঙ্গলের পক্ষ আমাদের বেছে নিতে হবে। কৃষ্ণ বলছেন, যুদ্ধ অনিবার্য, কারণ তা ঈশ্বরের ইচ্ছা। কৃষ্ণ শুধু কিভাবে যুদ্ধ করতে হবে তার 'যোগ' শেখাচ্ছেন, কৌশল শেখাচ্ছেন। তার মধ্যে একটি হলো নিষ্কাম কর্মযোগ অর্থাৎ সর্বকর্মফল ত্যাগ, ঈশ্বরেচ্ছার কাছে পরিপূর্ণ আত্মসমর্পণ। এর মধ্যে হিংসা-অহিংসার বিচার নেই, লাভালাভ, জয়-পরাজয়, জীবন-মৃত্যুর হিসাব নেই। লক্ষ্য যদি মহৎ হয়, ধর্মরাজ্য যদি প্রতিষ্ঠিত হয় তবে তার জন্য হিংসাও গ্রহণীয়। কারণ, তা বৃহত্তর হিংসাকে প্রতিহত করবে, পরাস্ত করবে। আরো গভীরে গেলে দেখব, কে হিংসা করে? কাকে হিংসা করে? কে মারে, কে মরে? মানুষ তো শুধু দেহী নয়, তার দেহ একদিন জীর্ণ-বাসের মতো খসে পড়বে। কিন্তু আত্মা "অজো নিত্যঃ শাশ্বতোঽয়ং পুরাণো, ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে।" (গীতা, ২।২০)

"বেদাবিনাশিনং নিত্যং য এনমজমব্যয়ম্।
কথং স পুরুষঃ পার্থ। কং ঘাতয়তি হন্তি কম্॥"
(গীতা, ২।২১)

অতএব

"ময়ি সর্বাণি কর্মাণি সংন্যস্যাধ্যাত্মচেতসা।
নিরাশীর্নির্মমো ভূত্বা যুধ্যস্ব বিগতজ্বরঃ।"
(গীতা, ৩।৩০)

বিশ্বরূপ দর্শনে দেখানো হলো যে, কৃষ্ণ সবাইকে মেরে রেখেছেন—"কালোঽস্মি লোকক্ষয়কৃৎ প্রবৃদ্ধো লোকান্ সমাহর্তুমিহ প্রবৃত্তঃ।" (গীতা, ১১।৩২) "ময়ৈবৈতে নিহতাঃ পূর্বমেব নিমিত্তমাত্রং ভব সব্যসাচিন্॥" (গীতা, ১১।৩৩) এই হত্যায় যদি কোন পাপও হয়, তিনিই উদ্ধার করবেন।—

"তেষামহং সমুদ্ধর্তা মৃত্যুসংসারসাগরাৎ।
ভবামি ন চিরাৎ পার্থ ময্যাবেশিতচেতসাম্॥"
(গীতা, ১২।৭)

উনিশ শতকের শেষে বিদেশী সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে যুবচিত্তে এরকম একটা যুদ্ধ প্রাসঙ্গিক হয়ে উঠেছিল। রাজনীতিতে শুরু হয়েছিল নরমপন্থা থেকে চরমপন্থায় পালা-বদলের পালা। চরমপন্থীরা, যাঁরা পরে অনেকেই বিপ্লববাদ অঙ্গীকার করবেন তাঁরা মুষ্টিমেয় উচ্চশিক্ষিত, উচ্চবর্ণ, উচ্চবিত্ত, ব্রিটিশরাজের সহযোগী ভারতীয়দের কাছে আবেদন রাখতে চাননি। তাঁরা যেতে চেয়েছিলেন অপমানিত সর্দার, জায়গিরদার, উপেক্ষিত মাঝারি ও ছোট ব্যবসাদার, শিক্ষিত কিন্তু বেকার মধ্যবিত্ত, নিম্ন মধ্যবিত্ত, শোষিত কৃষক সম্প্রদায়ের কাছে। হিন্দু-ধর্মকে কর্মে প্রয়োগ না করলে এই আধা সামন্ত-তান্ত্রিক, দেশজ ভাষায় শিক্ষিত ও ঐতিহ্যে লালিত, সংস্কারগত ধর্মের দুর্গে আশ্রয়প্রার্থী সংখ্যা-গরিষ্ঠের সমর্থন পাওয়া যেত না। শুধু আধ্যাত্মিক নয়, রাজনৈতিক প্রয়োজনেই তিলক ও অরবিন্দকে গীতার স্বারস্থ হতে হয়েছিল। বঙ্কিমকে অনুশীলন-ধর্মের কেন্দ্রে গীতাকে প্রতিষ্ঠিত করতে হয়েছিল, লিখতে হয়েছিল কৃষ্ণচরিত্র। অনুরূপ কারণে লালা লাজপৎ রায় লিখেছিলেন উর্দুভাষায় 'কৃষ্ণ-জীবনী', অশ্বিনীকুমার দত্ত লিখেছিলেন 'ভক্তিযোগ', এমনকি ক্যাথলিক ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় লিখেছিলেন 'শ্রীকৃষ্ণ-তত্ত্ব'। আবার ধর্মের গ্লানি এবং অধর্মের অভ্যুত্থান ঘটছে, আবার শুরু হচ্ছে কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ—বিদেশী কৌরবদের সঙ্গে। সেই পুরুষোত্তম ছাড়া লক্ষ লক্ষ ক্লৈব্যগ্রস্ত অর্জুনকে কে নেতৃত্ব দেবেন?

এবার গীতার প্রাসঙ্গিকতার সঙ্গে যুক্ত হলো বঙ্কিমচন্দ্রের 'আনন্দমঠ'। সত্যানন্দ মহেন্দ্রকে মায়ের সেই ত্রিমূর্তি দেখাচ্ছেন। মা যা ছিলেন—"সর্বাঙ্গসম্পন্না সর্বাভরণভূষিতা জগদ্ধাত্রী মূর্তি", মা যা হয়েছেন—কালী।—"অন্ধকারসমাচ্ছন্না কালিমা-ময়ী। হৃতসর্বস্বা, এই জন্য নগ্নিকা", আর মা যা হবেন—দুর্গা। —"দিগ্‌ভুজা— নানাপ্রহরণধারিণী শত্রুবিমর্দিনী"। আমরা এঁর পুজা করতে শিখব, যখন বুঝব ইনি 'অবলা' নন, এঁর 'সপ্তকোটি' কণ্ঠে করাল নিনাদ, 'দ্বিসপ্তকোটি ভুজে' 'খরকরবাল'। আমরাই তাঁর কণ্ঠ, তাঁর ভুজ, তাঁর সন্তান। আমাদের মন্ত্র—বন্দেমাতরম্‌, আমাদের তন্ত্র—পত্নী, পুত্র, বিত্ত সর্বস্ব ত্যাগ করে আত্মবলিদান। দেশ-মাতা ও জগন্মাতা হবে আমাদের কাছে অভিন্ন। 'কমলাকান্তের দপ্তর'-এ 'আমার দুর্গোৎসব' ও 'একটি গীতা', 'বিবিধ প্রবন্ধে'র 'ভারতকলঙ্ক' এবং 'ভারত-বর্ষের স্বাধীনতা ও পরাধীনতা' যাঁরা পড়বেন তাঁরা করবেন আত্মসমালোচনা। সেখানে ছাপিয়ে উঠেছে দেশভক্তির তীব্র আবেগ। বিপ্লবীরা যে নিজেদের ভবানন্দ, জীবানন্দ, শান্তি, কল্যাণীর আদর্শে গড়ে তুলেছিল এতে আশ্চর্যের কিছু নেই।

এরপর এলেন স্বামী বিবেকানন্দ—'বর্তমান ভারত' নিয়ে। তিনি কোন 'অনুশীলন ধর্ম'-প্রচারী উপন্যাসের নায়ক নন, 'বহুজনহিতায় বহুজনসুখায়', 'আত্মনো মোক্ষার্থং জগদ্ধিতায় চ' উৎসর্গিত, রক্তমাংসে গড়া, নবীন সন্ন্যাসী সঙ্ঘের প্রতিষ্ঠাতা ও প্রেরণা ছিলেন তিনি। তিনি স্বপ্নমুগ্ধ কবির চোখ দিয়ে দেশকে দেখেননি কাশ্মীর থেকে কন্যাকুমারী—সমগ্র ভারতবর্ষ তাঁর চোখে দেখা দিয়েছিল কোটি কোটি শূদ্র, মুচি, মুদ্দাফরাস, চণ্ডালের রূপ ধরে—নিরন্ন, নিরক্ষর, অপমানিত, অবজ্ঞাত নারীরূপে। স্বামী রামকৃষ্ণানন্দকে স্বামীজী লিখছেন: "ভারতে দুই মহাপাপ—মেয়েদের পায়ে দলানো, আর জাতি জাতি করে গরিবগুলোকে পিষে ফেলা··· !" অথচ ঠাকুর কি বলেননি, এরা জীবরূপী শিব? বলেছিলেন। স্বামীজী বললেন: "He was the Saviour of the women, Saviour of the masses, Saviour of all high and low."

কি করে বিবেকানন্দ করলেন, নররূপী নারায়ণের পুজা? তিনি ঘোষণা করলেন:

প্রথমে তাদের 'ভাই' বলে ভালবাসতে হবে। 'বর্তমান ভারত'-এর শেষে তাই উচ্চারিত হলো স্বদেশমন্ত্র: "হে ভারত, ভুলিও না—তোমার নারী-জাতির আদর্শ সীতা, সাবিত্রী, দময়ন্তী, ···ভুলিও না—তোমার বিবাহ, তোমার ধন, তোমার জীবন ইন্দ্রিয়সুখের—নিজের ব্যক্তিগত সুখের জন্য নহে, ভুলিও না—তুমি জন্ম হইতেই 'মায়ের' জন্য বলি-প্রদত্ত,··· ভুলিও না—নীচজাতি, মূর্খ, দরিদ্র, অজ্ঞ, মুচি, মেথর তোমার রক্ত, তোমার ভাই!··· বল—মূর্খ ভারতবাসী, দরিদ্র ভারতবাসী, ব্রাহ্মণ ভারতবাসী, চণ্ডাল ভারতবাসী আমার ভাই,···

ভারতবাসী আমার প্রাণ, ভারতের দেবদেবী আমার ঈশ্বর, ভারতের সমাজ আমার শিশুশয্যা, আমার যৌবনের উপবন, আমার বার্ধক্যের বারাণসী··· ।"

ঘরে আনতে হবে বনের বেদান্তকে। এ-বেদান্ত শঙ্কর বা রামানুজের ভাষ্য অনুসরণ করে নয়। এর পিছনে রয়েছে অবতারবরিষ্ঠ শ্রীরামকৃষ্ণের বহু মত ও পথ নিয়ে জীবনব্যাপী সমন্বয়-সাধনা—যার শেষে অদ্বৈত উপলব্ধি। কিন্তু আকাশের মতো উদার, সমুদ্রের মতো গভীর, হীরকের মতো কঠিন, স্ফটিকের মতো পবিত্র তাঁর আচার্যদেবের যে-গুণ তাঁকে টেনেছিল তা হলো—জ্ঞান-বৈরাগ্যের সঙ্গে প্রেম ও লোকহিতচিকীর্ষা। "রামকৃষ্ণের জুড়ি আর নাই, সে অপূর্ব সিদ্ধি আর সে অপূর্ব অহেতুকী দয়া, সে intense sympathy বদ্ধ জীবের জন্য—এজগতে আর নাই।" স্বামী অখণ্ডানন্দকে স্বামীজী লিখছেন: "উপনিষদের ওপর বুদ্ধের ধর্ম উঠেছে, তার ওপর শঙ্করবাদ। কেবল শঙ্কর বুদ্ধের আশ্চর্য heart-এর অণুমাত্র পান নাই, কেবল dry intellect, তন্ত্রের ভয়ে mob-এর ভয়ে ফোঁড়া সারাতে গিয়ে হাতসুদ্ধ কেটে ফেললেন।" এই শঙ্কর-বেদান্তে আধুনিক যুগের দুঃখী মানুষের কোন কাজ নেই। একে অরণ্য ও গিরিগুহা থেকে ঘরে আনতে হবে। বুদ্ধদেব তাই করেছিলেন। স্বামীজীর 'Practical Vedanta' শীর্ষক রচনাগুলি অবশ্য-পাঠ্য। এগুলি না পড়লে তাঁর দেশপ্রেম, সমাজ-কল্যাণ-ভাবনা, অধ্যাত্মোপলব্ধি—কোন কিছুরই উৎস মিলবে না। প্রথমে মায়ার বন্ধন অতিক্রম করে বুঝতে হবে, যাঁকে বাইরে বোধ হচ্ছিল তিনি প্রকৃত-পক্ষে অন্তরে আছেন। দ্বিতীয়তঃ, আত্মা যদি অনন্ত হয় তবে একটিমাত্র আত্মা থাকতে পারে। আমি-তুমি ভাব চলে গেলে "তত্র কো মোহঃ কঃ শোকঃ একত্বমনুপশ্যতঃ।" তৃতীয়তঃ, আমাদের জীবন যতক্ষণ সমগ্র জগতে ব্যাপ্ত থাকে, যতক্ষণ তা অপরের মধ্যে ব্যাপ্ত থাকে ততক্ষণই আমরা জীবিত। আর এই ক্ষুদ্র সঙ্কীর্ণ জীবনযাপনই মৃত্যু এবং এইজন্যই আমাদের মৃত্যুভয় দেখা দেয়। "যতদিন একটি পরমাণু রহিয়াছে, ততদিন আমার মৃত্যুর সম্ভাবনা কি?" "ন মৃত্যুর্ন শঙ্কা ন মে জাতিভেদঃ পিতা নৈব মে নৈব মাতা ন জন্ম।/ ন বন্ধুর্ন মিত্রং গুরুর্নৈব শিষ্যশ্চিদানন্দরূপঃ শিবোহহং শিবোহহম্॥"

বহুত্ববোধ থেকেই আসে দুঃখ, ভয় ও মৃত্যু। "মৃত্যোঃ স মৃত্যুমাপ্নোতি য ইহ নানেব পশ্যতি।" (বৃহদারণ্যক উপনিষদ্, ৪।৪।১৯)। তিনি সব মানুষ, মত ও মার্গকে ধরে রেখেছেন—'সূত্রে মণিগণা ইব'। চতুর্থতঃ, শঙ্কর বলেছিলেন—জ্ঞানীর লক্ষ্য সর্বাত্মতাবদ্ধ সমষ্টিভূত এক-কে জান। চৈতন্য বললেন, ভক্তের লক্ষ্য তাঁকে ভালবেসে সমষ্টিকে ভাল-বাসা। বিবেকানন্দ যোগ করলেন, কর্মীর লক্ষ্য—সমষ্টির নিষ্কাম সেবা করে ঈশ্বরপূজা কর।

ভালবাসার পরই অভয়। বস্তুতঃ অদ্বৈতের সবচেয়ে বড় দান—অভয়মন্ত্র। এক পরাধীন, পর-মুখাপেক্ষী, পরানুকরণকারী, দাসসুলভ হীনম্মন্য-তায় দুর্বল, আত্মশক্তিতে অবিশ্বাসী, ভীত দেশকে বিবেকানন্দ উদাত্ত কণ্ঠে বললেন: "অভীঃ হও—ভয়ই মৃত্যু, ভয়ই পাপ, ভয়ই অধর্ম। আমি তৃষ্ণা নই, ক্ষুধা নই, জরা নই, মৃত্যু নই, আমিই তিনি।" বললেন: "উত্তিষ্ঠত জাগ্রত; আর তামসিকতায় নিদ্রিত ক্লীব হয়ে থেকো না। 'বীরানামেব কর-তলগতা মুক্তির্নকাপুরুষাণাম্'।" দুর্বলতাই পাপ, তার থেকে হিংসা-দ্বেষের উৎপত্তি। চাই লৌহের মতো পেশী ও ইস্পাতদৃঢ় স্নায়ু। "কদিনের জন্য জীবন? জগতে যখন এসেছিস, তখন একটা দাগ রেখে যা। আজ থেকে ভয়শূন্য হ। যা চলে—আপনার মোক্ষ ও পরার্থে দেহ দিতে।"

অভয়ের পর বিশ্ববোধ। তাঁর হিন্দুধর্ম-ব্যাখ্যা ছিল তাঁর আচার্যের সমন্বয়বাদের ওপর প্রতিষ্ঠিত। প্রাচীন ঐতিহ্যের সঙ্গে আধুনিক প্রগতির, রাষ্ট্রীয় মুক্তির সঙ্গে জনকল্যাণের, সাম্যের সঙ্গে ত্যাগের, দেশপ্রেমের সঙ্গে বিশ্বপ্রেমের এমন সমন্বয়ের কথা এমন জোরালো ভাষায় কেউ কখনো বলেননি। তাঁর শিকাগো-বিজয়কে মনেহতে পারে 'counter attack of the East', অবশেষে পশ্চিমের বস্তুবাদের ওপর ভারতের অধ্যাত্মবাদের বিজয়। অধিকাংশ ভারতবাসী এইভাবেই তার ব্যাখ্যা করে গর্বিত হয়েছিল। কিন্তু বিবেকানন্দের রচনায় বা ভাষণে সেই গর্ব বা আত্মতুষ্টির দেখা মেলে না। প্রথমতঃ, কোন অদ্বৈতবাদীর কাছে পূর্ব-পশ্চিম, ভারতীয়-ইংরেজ,

হিন্দু-ম্লেচ্ছ ভেদ মায়ার খেলা মাত্র। 'ম্লেচ্ছ' শব্দটার ওপর বিবেকানন্দের তীব্র বিরাগ ছিল। ঘর ও বাইরের মধ্যে 'ম্লেচ্ছ' শব্দের দেওয়াল তুলে দেওয়ার ফলেই ভারত এমন পিছিয়ে গেছে। স্বামী রামকৃষ্ণানন্দকে তিনি লিখছেন: "তিনি কি শুধু ভারতের ঠাকুর?" গীতার 'সর্বভূতে প্রীতি', 'সর্বভূতহিতে রত' এসব শব্দ কি ভারতের চতুঃসীমায় আবদ্ধ? স্টার্ডিকে তিনি লিখছেন: **"Doubtless I love India. But everyday my sight grows clearer. What is India or England or America to us? We are the servants of that God who by the ignorant is called MAN."**

পূর্ব ও পশ্চিম দুই জগৎকে দুই পাশে নিয়ে দাঁড়িয়ে স্বামীজী বলেছিলেন, পশ্চিমকে সত্ত্বগুণের ও ভারতকে রজোগুণের সাধনা করতে হবে: "ইউরোপের কাছ থেকে ভারতকে শিখতে হবে—বহিঃপ্রকৃতি জয়, আর ভারতের কাছ থেকে ইউরোপকে শিখতে হবে—অন্তঃপ্রকৃতি জয়।" এই সাধনা পারস্পরিক ভাব বিনিময়, আদান-প্রদানের মাধ্যমে চলবে—সংঘর্ষের মাধ্যমে নয়। পশ্চিম দেবে প্রযুক্তি, ভারত দেবে প্রজ্ঞা; পশ্চিম দেবে অর্থ, ভারত দেবে পরমার্থ; পশ্চিম দেবে উদ্যম, ভারত দেবে প্রেম। এতে লজ্জাই বা কিসের। ভয়ই বা কি? স্বামীজী বললেন: "যাহা দুর্বল দোষযুক্ত তাহা মরণশীল, তাহা লইয়াই বা কি হইবে? যাহা বীর্যবান, বলপ্রদ—তাহা অবিনশ্বর, তাহার নাশ কে করে?"

তাছাড়া ভারতে ধর্ম যে-রূপ ধারণ করেছে তা নিয়ে গর্ব বা আত্মতুষ্টির অবকাশ কই? ধর্ম এখন "ভাতের হাঁড়িতে", অর্থাৎ দেশাচার ও লোকাচারের সমার্থক। গভীর ক্ষোভে বীর সন্ন্যাসী ফেটে পড়লেন: "যেথায় মহাজড়বুদ্ধি পরাবিদ্যানুরাগের ছলনায় নিজ মূর্খতা আচ্ছাদিত করিতে চাহে, যেথায় জন্মালস বৈরাগ্যের আবরণ নিজের অকর্মণ্যতার উপর নিক্ষেপ করিতে চাহে,··· বিদ্যা কেবল কতিপয় পুস্তক-কণ্ঠস্থে, প্রতিভা চর্বিতচর্বণে এবং সর্বোপরি গৌরব কেবল পিতৃপুরুষের নামকীর্তনে—সে-দেশ তমোগুণে দিন দিন ডুবিতেছে, তাহার কি প্রমাণান্তর চাই?" [আগ্রহী পাঠককে এ-প্রসঙ্গে স্বামী রামকৃষ্ণানন্দকে লেখা স্বামীজীর পত্র (১৯ মার্চ, ১৮৯৪), 'উদ্বোধন-এর প্রস্তাবনা' ও 'ভাববার কথা' ইত্যাদি পড়ে দেখতে বলি।] "যে-ধর্ম গরিবের দুঃখ দূর করে না, মানুষকে দেবতা করে না, তা কি আবার ধর্ম? আমাদের কি আর ধর্ম? আমাদের 'ছুঁৎমার্গ', খালি 'আমায় ছুঁয়ো না।'··· আমাদের মতো কূপমণ্ডূক তো দুনিয়ায় নাই, কোন একটা নূতন জিনিস কোন দেশ থেকে আসুক দিকি, আমেরিকা সকলের আগে নেবে। আর আমরা? 'আমাদের মতো দুনিয়ায় কেউ নেই, আর্যবংশ' !!! কোথায় বংশ তা জানি না ···এক লাখ লোকের দাবানিতে ৩০০ মিলিয়ান কুকুরের মতো ঘোরে, আর তারা 'আর্যবংশ' !!!" স্বামীজী মঠে গুরুভাইদের লিখছেন: "যদি ভাল চাও তো ঘণ্টা-ফণ্টাগুলোকে গঙ্গার জলে সঁপে দিয়ে সাক্ষাৎ ভগবান নরনারায়ণের পুজো কর গে···।" স্বামী ব্রহ্মানন্দকে স্বামীজী লিখছেন: "রামকৃষ্ণের অবতারত্ব প্রচার করার দরকার নেই। তিনি পরোপকার করিতে আসিয়াছিলেন—নাম ঘোষণা করিতে নহে।" স্বামী যোগানন্দকে বলছেন: "সম্প্রদায়পূর্ণ জগতে আর একটি নূতন সম্প্রদায় করে যেতে আমার জন্ম হয়নি।"

স্বামী বিবেকানন্দের কাছ থেকে বিপ্লবীরা পেয়েছিলেন অসীম আত্মবিশ্বাস, অদম্য সাহসিকতা, প্রাণ বলিদানের অকুণ্ঠ আগ্রহ, সমষ্টি তথা দেশের স্বার্থে কর্মযোগ। স্বামীজীর বজ্রনির্ঘোষ তাঁরা বারবার শুনেছেন:

"অনন্ত বীর্য, অনন্ত উৎসাহ, অনন্ত সাহস ও অনন্ত ধৈর্য চাই, তবে মহাকার্য সাধন হবে। দুনিয়ায় আগুন লাগিয়ে দিতে হবে।"

"একটা মহান উদ্দেশ্য নিয়ে মরে যা। মরে তো যাবিই, তা ভাল উদ্দেশ্য নিয়েই মরা ভাল।"

বিবেকানন্দের বিশ্ববোধ, যুক্তিবাদ, সর্বব্যাপী প্রেম, ভারতবর্ষের দোষ-দুর্বলতা সম্বন্ধে সচেতনতা, লোকাচার-দেশাচার সম্বন্ধে সতর্কতা তাঁদের মধ্যে হৃতচেতনা ফিরিয়ে দিয়েছিল। বিবেকানন্দ কোনদিন ধর্মের সঙ্গে রাজনীতি মেশাতে চাননি। ওকাকুরা ও সুরেন ঠাকুরের (অর্থাৎ পি. মিত্রের) অনুশীলন দল সম্বন্ধে তিনি নিবেদিতাকে সতর্ক

করেছিলেন। কোন কোন বিপ্লবীর রচনায় পড়েছি, স্বামীজী পরোক্ষে, কখনো বা সোজাসুজি বিপ্লববাদে প্রেরণা দিয়েছেন। কিন্তু তাঁর সমগ্র রচনাবলী, প্রামাণ্য জীবনী ও পারিপার্শ্বিকতা বিবেচনা করে এ-ধারণা ভ্রান্ত বলে মনে হয়েছে। হয়তো কোন বিপ্লবীর, যেমন হেমচন্দ্র ঘোষের, তাই মনে হয়েছিল; কিন্তু মনে হওয়া ও সত্য হওয়া এক জিনিস নয়। আমার পূর্বপ্রকাশিত 'The Extremist Challenge' ও সদ্য প্রকাশিত 'স্বাধীনতা সংগ্রামে ভারতের জাতীয় কংগ্রেস' গ্রন্থে ব্যাপারটা ভালভাবে আলোচনা করেছি। আপাততঃ সংক্ষেপে বলি।

প্রথমে ভারতের mission নিয়ে স্বামীজীর ব্যাখ্যার কথা ধরা যাক। এবিষয়ে স্বামীজী 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য' গ্রন্থে বিশেষভাবে বলেছেন। বিবেকানন্দ বলতেন: প্রত্যেক প্রাচীন সভ্যতারই একটা বিশেষ কাজ আছে, যেমন গ্রীসের ছিল বুদ্ধিবৃত্তি ও শিল্পচর্চার মাধ্যমে পূর্ণ মানব সৃষ্টি, রোমের ছিল সাম্রাজ্যের মাধ্যমে আইন ও শৃঙ্খলার রাজত্ব প্রতিষ্ঠা, তেমনি ভারতের প্রাণপাখি তার ধর্মে, তার মিশন—পারমার্থিক স্বাধীনতা এবং নানা মতে, নানা পথে ঈশ্বর-সাধনা—সেই মিশন বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্য, অসাম্যের মধ্যে সাম্য, দ্বন্দ্বের মধ্যে সমন্বয় ও শান্তি। কিন্তু সেই ঈশ্বর-সাধনা বাহ্যসভ্যতাকে বাদ দিয়ে নয়। শ্রীরামকৃষ্ণ কি বলেননি, 'খালি পেটে ধর্ম হয় না'? 'স্বামি-শিষ্য-সংবাদে' পড়ি, "তোদের দেশে না আছে ভোগ, না আছে যোগ। ভোগের ইচ্ছা কতকটা তৃপ্ত হলে তবে লোকে যোগের কথা শোনে ও বোঝে। ধর্মকথা শোনাতে হলে আগে এদেশের লোকের পেটের চিন্তা দূর করতে হবে।" আলাসিঙ্গাকে স্বামীজী লিখছেন: "বাহ্যসভ্যতা আবশ্যক, শুধু তাহাই নহে, প্রয়োজনের অতিরিক্ত বস্তু ব্যবহারও আবশ্যক, যাহাতে গরিব লোকের জন্য নূতন নূতন কাজের সৃষ্টি হয়। অন্ন, অন্ন, যে-ভগবান এখানে অন্ন দিতে পারেন না তিনি যে স্বর্গে আমাকে অনন্ত সুখে রাখিবেন—ইহা আমি বিশ্বাস করি না। পশ্চিমের বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, অর্থ সাহায্য, রজোগুণী উদ্যম ছাড়া ভারতের দারিদ্র্য দূর হবে না।"

কলকাতার টাউন হল-এ সম্বর্ধনাসভার উত্তরে রাজা প্যারীমোহন মুখোপাধ্যায়কে স্বামীজী লিখেছিলেন: "আমার দৃঢ় ধারণা—কোন ব্যক্তি বা জাতি অপর জাতি হইতে নিজেকে সম্পূর্ণ পৃথক রাখিয়া বাঁচিতে পারে না। আদান-প্রদানই প্রকৃতির নিয়ম।" সম্প্রসারণই জীবন, সংকীর্ণতাই মৃত্যু। কিন্তু বিপ্লববাদীরা প্রথমে অরবিন্দের উগ্র জাতীয়তাবাদ দ্বারা বেশি উদ্বুদ্ধ হয়েছিলেন। অরবিন্দ আবার তাঁর আর্যশ্রেয়োমন্যতা, অন্য জাতি-ধর্ম-সভ্যতা সম্বন্ধে অসহিষ্ণুতা, নিজ মত অন্যের ওপর জোর করে চাপানোর প্রবণতা পেয়েছিলেন স্বামী দয়ানন্দের কাছ থেকে। কেউ কেউ মনে করেন, এই মানসিকতার জন্য সাম্রাজ্যবাদীর ধর্ম বলে খ্রীস্টধর্মকে এবং হিন্দুরাজত্ব-ধ্বংসকারী বলে ইসলামধর্মকে বিপ্লবীদের অনেকে পছন্দ করেননি। অরবিন্দের মনে হয়েছিল, বস্তুবাদী পাশ্চাত্যসভ্যতা মুমূর্ষু। তাকে সঞ্জীবিত করতে পারে প্রাচীন ভারতের আর্য-আদর্শ এবং তার জন্যই চাই ভারতের স্বাধীনতা। একটা বিদেশী জাতি ও সভ্যতার দ্বারা রাহুগ্রস্ত হয়ে আছে বলে ভারত তার mission বা পুণ্যব্রত পালন করতে পারছে না। "বিশ্বমানবতার কাছে ভারতবর্ষের অপরিহার্যতাই তার মুক্তি সর্বজনাকাঙ্ক্ষিত করে তুলেছে।" এ যেন বৈদিক সুরাসুরের সংগ্রাম। ভারত সুরের এবং পশ্চিম অসুরের প্রতীক। হিব্রুভাষীরা যেমন স্বয়ং ঈশ্বরকে 'Lord of the Hosts' অর্থাৎ সেনাপতি করে ফিলিস্তিনীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে যেত, তেমনি ভারতের ঈশ্বর ভারতীয় বিপ্লবীদের সেনাপতি। এ-প্রসঙ্গে অরবিন্দের 'Essays on the Gita'-র 'The Creed of the Aryan Fighter' পড়ে দেখতে পারেন আগ্রহী পাঠক।

এজন্য অবশ্যই হিন্দুধর্মকে কাজে লাগাতে হবে। স্বামী দয়ানন্দ আর্যধর্মের 'গোরক্ষা'কে এবং তিলক পৌরাণিক হিন্দুধর্মের 'গণপতিপূজা'কে হিন্দুসংহতির কাজে লাগালেন। বঙ্কিমের অনুসরণে অরবিন্দ, বিপিন পালরা শক্তিপূজার প্রচলন করেছিলেন। গণপতি গজাসুর বধ করেছিলেন, দুর্গা মহিষাসুরমর্দিনী—প্রতীকের ভাষায় উভয় অসুরই

বিধর্মী ইংরেজের সমার্থক। দেশ ও দুর্গার সমীকরণ মুসলমানদের ভাল না লাগারই কথা। শিবাজী আফজল খাঁকে হত্যা করে গীতার নির্দেশ মেনেছিলেন, একথা মুসলমানদের ভাল না লাগতেই পারে। বিবেকানন্দ মাঝে মাঝে বলতেন: "গীতা-সিংহনাদকারী শ্রীকৃষ্ণের পুজো চালা, শক্তিপুজো চালা।" তবু তিনি গোরক্ষা নিয়ে বাড়াবাড়ি ভাল চোখে দেখেননি। সাধারণতঃ তিনিও সমাজ-সংস্কারকে ব্রাহ্মদের মতো অগ্রাধিকার দেননি। তবু 'Age of Consent Bill' নিয়ে মাতামাতি তাঁর কাছে অমানবিক মনে হয়েছিল। গোরক্ষা, সহবাসবিধি, মসজিদের সামনে বাদ্যভাণ্ডসহ শোভা-যাত্রা প্রভৃতি issue তৈরি করে হিন্দুসমাজের কাছে চরমপন্থীরা ব্রিটিশ-বিরোধী আবেদন রেখেছিলেন। এককথায়, এসব হলো ধর্ম নিয়ে রাজনীতি। হয়তো আজকের মতো তুচ্ছ ভোটের জন্য নয়, তবু মনে রাখতে হবে, এর ফলে সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ বাড়তে পারে এবং তাতে স্বাধীনতা-সংগ্রাম বিচ্ছিন্ন ও দুর্বল হতে পারে—এ-বোধ অরবিন্দ বা তিলকের ছিল না। যত সহজে বিবেকানন্দ বলেছিলেন—"Vedanta brain and Islam body", তত সহজে দয়ানন্দের শিষ্যরা সাম্প্রদায়িক ঐক্যের বাণী উচ্চারণ করতে পারেননি। বিবেকানন্দ যখন জাতি-ভেদকে অজ্ঞানপ্রসূত বলে উড়িয়ে দিচ্ছিলেন তখন অরবিন্দ ব্রাহ্মণ্যশক্তির প্রশংসায় মুখর। চিৎপাবন-কুলে জন্মের দুর্লভ সৌভাগ্যে তিলক কম গর্বিত ছিলেন না। বেনিয়া ইংরেজ তাড়াতে অরবিন্দ তাঁর স্ত্রীকে লিখেছিলেন: "ক্ষত্রিয়ের বাহুবলের চেয়ে ব্রাহ্মণের প্রজ্ঞা সম্পর্কে আমি বেশি সচেতন।"

ভারতে ইংরেজ শাসনের কুফল বা অর্থনৈতিক শোষণ সম্বন্ধে বিবেকানন্দ অজ্ঞ ছিলেন না। ১৮৯৯ খ্রীস্টাব্দের ৩০ অক্টোবর মেরী হেলকে তিনি যে-চিঠি লিখেছিলেন তা এর অন্যতম প্রমাণ। স্বামীজী লিখেছিলেন: "No good can be done when the main idea is blood-sucking." কাশ্মীরে নিবেদিতার সঙ্গে স্বামাজীর বিতর্কের কথা স্বয়ং নিবেদিতাই লিখে গেছেন। তবুও তিনি সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে রাজনৈতিক মোকাবিলার কথা বলেননি। অন্যদিকে বিপ্লববাদীদের অগ্রগণ্য অরবিন্দ মনে করতেন—এছাড়া পথ নেই। যে-আধিভৌতিক উন্নতির কথা ভাবছেন স্বামীজী, তার জন্য পশ্চিমী সাহায্যের আশা করা বাতুলতা। পূর্ণ স্বরাজ ছাড়া তা হবে না। স্বরাজই সত্যযুগে প্রত্যাবর্তনের প্রথম সোপান, পূর্বশর্ত। পাশ্চাত্যের রাজনীতি সম্বন্ধে অরবিন্দের থেকেও অভিজ্ঞ বিবেকানন্দ তা মনে করতেন না। অরবিন্দ রাজনীতিকে দেখেছিলেন ফরাসী ও আইরিশ বিপ্লবীর রোমান্টিক চোখে। অন্যদিকে বিবেকানন্দ 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য' গ্রন্থে লিখছেন: "ও তোমার পার্লামেন্ট দেখলুম, সেনেট দেখলুম, ভোট ব্যালট মেজরিটি সব দেখলুম। রামচন্দ্র! সব দেশেই ঐ এককথা। শক্তিমান পুরুষরা যেদিকে ইচ্ছে সমাজকে চালাচ্ছে, বাকিগুলো ভেড়ার দল।" মানুষে আইন করে, না আইনে মানুষ করে? কিন্তু ধর্মদান যদি সত্য হয়, তবে পরমাণু-স্বরূপ আত্মার বিস্ফোরণে জাতপাত, সম্প্রদায়, সাম্রাজ্য ধুলোর মতো উড়ে যাবে। আধ্যাত্মিক জাগরণ না ঘটলে রাজনৈতিক মুক্তি হবে মুষ্টিমেয়ের জন্য, স্বামীজী মনে করতেন। এই সতর্কবাণীর নির্মম সত্য আজ আমরা হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছি।

এখন বিপ্লব-প্রচেষ্টার চরিত্রের দিকে দৃষ্টিপাত করা যাক। বিশ্লেষণের সুবিধার্থে আমি বৈপ্লবিক প্রচেষ্টাকে বাংলার মধ্যে ও ১৮৯০ থেকে ১৯৩৭ পর্যন্ত কালসীমার মধ্যে আবদ্ধ রাখছি। এর মধ্যে যথেষ্ট বিবর্তন ঘটেছে বলে এর ইতিহাসকে মোটামুটি তিন পর্বে ভাগ করা যায়। অবশ্য এই নিয়ে কড়াকড়ি চলে না। যেমন প্রথম পর্বে তিলকের অবদান স্মরণ করে মহারাষ্ট্রকে আনতেই হবে, আর দয়ানন্দ-লাজপৎ রায়কে স্মরণ করে পাঞ্জাবকে। আরও মনে রাখা দরকার, বাংলার বিপ্লবগুরু অরবিন্দ ১৮৯৩ খ্রীস্টাব্দে ছিলেন বরোদায়, সেখানেই 'ইন্দুপ্রকাশ'-এর জন্য লিখে-ছিলেন 'New Hamps for Old' ও বঙ্কিমের ওপর সাত-সাতটি অসাধারণ প্রবন্ধ। মধ্যপ্রদেশের কোন ঠাকুরসাহেবের পশ্চিম ভারতব্যাপী বৈপ্লবিক সংগঠনে তিনি শিক্ষানবিশী করেছিলেন।

প্রথম পর্বে বাংলার মূল সংগঠন ছিল অনু-শীলন সমিতি (১৯০০ বা ১৯০১)। তার অন্যতম

প্রতিষ্ঠাতা ও আনুষ্ঠানিক নেতা—পি. মিত্র। কিন্তু প্রাণপুরুষ ছিলেন অরবিন্দ। এর সঙ্গে জড়িত ছিল ছাত্রভাণ্ডার, আত্মোন্নতি, চন্দননগর গোষ্ঠী, ঢাকা ছাড়া পূর্ববঙ্গের অন্যান্য সমিতি। ঢাকার অনুশীলন সমিতিকে অরবিন্দ, বিপিন পালরা প্রেরণা দিলেও নেতা পুলিন দাস স্বতন্ত্রভাবে কাজ করতেন। তেমনি বিবেকানন্দ-অনুপ্রাণিত 'মুক্তিসঙ্ঘে'র প্রতিষ্ঠাতা বিপ্লবীনায়ক হেমচন্দ্র ঘোষ কলকাতার সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা করেননি। আবার মূল অনুশীলন সমিতির অন্তর্ভুক্ত হয়েও 'যুগান্তর' পত্রিকাকে কেন্দ্র করে বারীন্দ্রকুমার ঘোষের নেতৃত্বে 'যুগান্তর' গোষ্ঠী গঠিত হয় ১৯০৬ খ্রীস্টাব্দে। আড়ালে থেকে একে প্রেরণা যোগাতেন অরবিন্দ। তাঁর সঙ্গে তিলক, লাজপৎ রায় প্রমুখের যোগাযোগ ছিল। সুরাটের প্রেসের দক্ষযজ্ঞের পর সে-সূত্র বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। বলা বাহুল্য, সব সংগঠনের পিছনে ছিল বিবেকানন্দের আগ্নেয় প্রভাব।

এই পর্বে ধর্ম ও আধ্যাত্মিকতার সুর স্পষ্ট। এর নাম দিয়েছি 'Messianic nationalism'। আগেই দেখেছি, বঙ্কিম ও বিবেকানন্দের অনেক ধারণা গ্রহণ করলেও এঁদের আর্যগরিমা, হিন্দুর আধ্যাত্মিকতা, বর্ণাশ্রমভিত্তিক সমাজব্যবস্থা, প্রাক্-সামন্ততান্ত্রিক অর্থনীতি (যাকে এঁরা বারবার 'সত্যযুগ' আখ্যা দিয়েছেন) অতীতমুখী দৃষ্টিভঙ্গিরই পরিচয় দেয়। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে এঁরা বস্তুবাদী, ইহলোকসর্বস্ব, উপযোগবাদী (utilitarian), শিল্পবিপ্লবোত্তর পাশ্চাত্য সভ্যতাকেই চ্যালেঞ্জ জানিয়েছিলেন। কার্যপ্রণালীর মধ্যে বয়কট ও স্বদেশী ছিল প্রাথমিক। তা বিফল হলে নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ অর্থাৎ ইংরেজের অফিস, আদালত, বিধানসভা, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের সামূহিক বর্জন। তা-ও বিফল হলে সশস্ত্র বিপ্লব। 'বন্দেমাতরম্'-এ লেখা অরবিন্দের নানা সম্পাদকীয়, তাঁরই প্রেরণায় বারীনের লেখা 'ভবানী মন্দির', 'যুগান্তর'-এ প্রকাশিত 'বর্তমান রণনীতি', 'ভারত কোন্ পথে' প্রভৃতি প্রবন্ধ এবং 'সন্ধ্যা'য় প্রকাশিত প্রচণ্ড ফিরিঙ্গি-বিদ্বেষমূলক ব্যঙ্গ রচনা একধরনের populist appeal তৈরি করতে সক্ষম হয়েছিল। অরবিন্দের 'বাজীপ্রভু' ও 'বিদুলা' কবিতা এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। প্রথমে শক্তিপূজা, বীরাষ্টমী, লাঠিখেলা ও অসিশিক্ষা, সঙ্গে সঙ্গে ভগিনী নিবেদিতা, পি. মিত্র প্রভৃতির বিপ্লব বিষয়ে বক্তৃতা, শেষে মুরারিপুকুরে আগ্নেয়াস্ত্র সংগ্রহ, দেশে বোমা বানিয়ে ও প্যারিস থেকে হেমচন্দ্র কানুনগোকে বোমা তৈরি শিখিয়ে এনে এবং ক্ষুদিরাম-প্রফুল্লদের তা প্রয়োগ করতে তালিম দিয়ে ধাপে ধাপে বৈপ্লবিক প্রচেষ্টা গড়ে ওঠে। অর্থ সংগ্রহের জন্য স্বদেশী ডাকাতি শুরু হয়। ছোটলাট ফ্রেজারের ট্রেন ওড়াবার চেষ্টা, কিংসফোর্ডকে হত্যার চেষ্টা, চন্দননগরের মেয়রের ওপর আক্রমণ, ইংরেজ গোয়েন্দা ও রাজসাক্ষীদের খতম—এসবই প্রথম পর্বের কীর্তি। অ্যান্ড্রু ফ্রেজার ও পরে এডোয়ার্ড বেকার যেসব দলিল সংগ্রহ করে গেছেন তাতে প্রমাণিত হয়েছে, অরবিন্দই অবিসংবাদী নেতা—যতই চিত্তরঞ্জনের জ্বালাময়ী সওয়ালের ফলে তিনি বেকসুর খালাস পান—তিনিই ছিলেন চালক। বেকার ১৯০৮ খ্রীস্টাব্দের মে মাসে বড়লাটকে জানালেন: "To release Aurobindo is to ensure recrudescence at any time of further spread of evil." ১৯১০ পর্যন্ত তিনি এই আহ্বান জানাচ্ছিলেন। অরবিন্দ নিজেও স্বীকার করেছেন 'Aurobindo on Self and on the Mother' গ্রন্থে। কিন্তু ততদিনে অরবিন্দ রূপান্তরিত। 'কারাকাহিনী' পাঠ করলে একথা বোঝা যায়। সহিংস নীতি প্রয়োগের জন্য অত্যাবশ্যক পূর্বশর্তরূপে গীতায় যে আত্মিক উম্বর্তনের কথা বলা হয়েছে—সেই নিঃশর্ত আত্মসমর্পণ—বারীন, উপেন, উল্লাসকর এমনকি তাঁর মধ্যেও আগে ছিল না। একমাত্র কৃষ্ণের তুল্য আধ্যাত্মিক উৎকর্ষ ব্যতীত তা হয় না। আসলে অরবিন্দ রুশ পপুল্যলিস্ট ও আইরিশ বিপ্লবী কর্মপন্থাকে গীতার দর্শনের মোড়কে ঢাকতে উদ্যোগী হয়েছিলেন। রাজনীতির জগৎ থেকে অরবিন্দের নিঃশব্দ বিদায়গ্রহণ এই অসঙ্গতির পরিণাম। 'উত্তরপাড়া ভাষণ'-এ তিনি স্পষ্টই স্বীকার করলেন—জাতীয়তাবাদ আর ধর্ম নেই, সনাতন ধর্মই তাঁর কাছে জাতীয়তাবাদ। 'কর্মযোগিন'-এ (২৭ নভেম্বর, ১৯০৯) তিনি অস্বীকার করলেন সন্ত্রাসবাদ। 'ধর্ম' পত্রিকায় (১২ পৌষ, ১৩১৬) তিনি জ্যাকসন-হত্যার

তীব্র সমালোচনা করলেন। এই পর্বকে গৌরবদান করল ক্ষুদিরামের ফাঁসি, প্রফুল্ল চাকীর আত্মহত্যা, বারীনদের দ্বীপান্তর, অন্য কয়েকজনের দীর্ঘ কারাদণ্ড। ব্যক্তিগত হত্যার নীতির চেয়েও বড় হয়ে রইল তাঁদের আত্মাহুতি—আর তার ফলে দেশবাসীর জাগরণ। রবীন্দ্রনাথ অরবিন্দকে নমস্কার জানালেন, 'নৈবেদ্য'-এ লিখলেন—

"ক্ষমা যেথা ক্ষীণ দুর্বলতা,
হে রুদ্র, নিষ্ঠুর যেন হতে পারি তথা
তোমার আদেশে। ... "

এ দুর্ভাগা দেশ থেকে লোকভয়, রাজভয়, মৃত্যুভয় উধাও হলো।

॥ ২ ॥

দ্বিতীয় পর্ব ১৯১০-১৯২০-তেও 'Messianic nationalism'-এর ভাবাবেগ সম্পূর্ণ দূর হয়নি, তবে বিপ্লববাদ অনেক বেশি বাস্তব ও বিস্তৃত হয়েছিল। তার শ্রেণীগত ভিত্তি মধ্যবিত্ত, নিম্ন মধ্যবিত্ত হিন্দু-যুবকের বাইরেও গিয়েছিল। ১৯১৫ পর্যন্ত এর মহানায়ক ছিলেন যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়। আর তাঁর সুযোগ্য সহকর্মী ছিলেন নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য ( পরে মানবেন্দ্রনাথ রায় বা এম. এন. রায় ), যাদু-গোপাল মুখোপাধ্যায়, রাসবিহারী বসু। যুগান্তর গোষ্ঠী, প্রবর্তক সংঘ, ঢাকা অনুশীলন সমিতি ব্যতীত অন্যান্য উপদল যতীনের নেতৃত্বে সংহতি লাভ করে। ঢাকার হেমচন্দ্র ঘোষের অনুজোপম হরিদাস দত্ত রডা কোম্পানীর অস্ত্রলুণ্ঠনের ব্যাপারে বিশেষ সহায়তা করেছিলেন। রাসবিহারী বারাণসীর শচীন সান্যাল ও পাঞ্জাবের গদর পার্টির সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করে উত্তর ভারতে বিদ্রোহের আগুন জ্বালাতে চেয়েছিলেন। যাদুগোপালের 'বিপ্লবীজীবনের স্মৃতি', মানবেন্দ্রনাথ রায়ের 'Memoirs', ভূপেন্দ্রকুমার দত্ত এবং অরুণচন্দ্র গুহের নানা রচনা, টেগার্টের জীবনী ও গোয়েন্দা বিভাগের নথিপত্র বিশ্লেষণ করলে বোঝা যায়, ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত সন্ত্রাস, আত্মদান ও তার মাধ্যমে জনগণের মধ্যে বিপ্লবীচেতনা সৃষ্টির প্রয়াস থেকে এই পর্বের সন্ত্রাসবাদ উত্তীর্ণ হয়েছিল দলবদ্ধ প্রতিরোধের পর্যায়ে। দ্বিতীয়তঃ তার মধ্যে জন-সাধারণের সার্বিক, বিশেষ করে অর্থনৈতিক উন্নতি সম্বন্ধে একটা আগ্রহ দানা বাঁধছিল। এই পর্বের সমর-কৌশলে তিনটি নতুন মাত্রা যুক্ত হয়— (১) দেশের ভিতরে ( যেমন রডা কোম্পানীর ) ও বিদেশ থেকে ( যেমন জার্মানী ) প্রচুর আগ্নেয়াস্ত্র সংগ্রহ, (২) দেশে গেরিলা বাহিনী গঠন, (৩) ভারতীয় সৈন্যদের ( যেমন ১০ম জাঠ রেজিমেন্ট ) মধ্যে গুপ্ত প্রচার চালিয়ে বিভিন্ন স্থানে একযোগে সশস্ত্র অভ্যুত্থান। ক্যালিফোর্নিয়া থেকে সাংহাই পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল ষড়যন্ত্রের জাল। বাইরে নেতৃত্ব দেন ক্যালিফোর্নিয়ার গদর ( সোহনসিং ভাখনা ও হরদয়াল ), বার্লিনের স্বাধীনতা কমিটি ( বীরেন চট্টোপাধ্যায় ও ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত ), কাবুলে বরকতুল্লা, ওবাইতুল্লা সিন্ধি, রাজা মহেন্দ্রপ্রতাপ। গদরের সঙ্গে যোগাযোগ রাখতেন রাসবিহারী ও শচীন। এই পর্বে মুসলিমদের সম্বন্ধে অনীহা কমে। মৌলানা আজাদ বিপ্লবীদের সন্দেহ নিরসন করেন। খিলাফৎ আন্দোলন সাময়িক সেতুবন্ধন করে। যাদুগোপালকে বাঘা যতীন মনোবাসনা জানিয়েছিলেন: "বাঙালী জাতটা হীনবীর্য হয়ে গেছে। বাঙালী ছেলেদের বন্দুক ধরিয়ে তিনি লড়িয়ে দিতে চান। সবচেয়ে কমপক্ষে এইটুকু এবার করে যেতে হবে।" বুড়িবালামের তীরে তা তিনি করে গেছেন।

বসন্ত চ্যাটার্জীর হত্যার পর সরকারি দমননীতি এত তীব্র হয়েছিল যে, কয়েকজন ছাড়া সবাই গা-ঢাকা দেন। নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য ও রাসবিহারী তো দেশত্যাগ করেন। ১৯২০ খ্রীস্টাব্দে গান্ধীজীর অভ্যুদয়ের ফলে যাদুগোপালরা কৌশল বদলালেন। মুক্ত রাজবন্দীর শর্তানুসারে সত্যাগ্রহ আন্দোলনে যোগ দিতে রাজি হলেন ভূপেন্দ্রকুমার দত্ত। তিনি স্পষ্ট বলে দিলেন—অহিংসায় তাঁরা বিশ্বাস করেন না, তবে গান্ধীজী একবছরে স্বরাজ আনতে প্রতি-শ্রুতি দিয়েছেন বলে পরীক্ষামূলকভাবে বিপ্লবীরা তাঁকে সমর্থন করবেন। যাদুগোপালের ভাষায়— "যুগান্তর দল গান্ধীর আন্দোলনকে প্রাণের জিনিস করে নিল।" তবে 'স্বরাজ' শব্দের ব্যাখ্যা নিয়ে বিরোধ লাগল। বিপ্লবীরা চাইলেন—পূর্ণ স্বাধীনতা। গীতার ব্যাখ্যা নিয়ে মতবিরোধ হলো। গান্ধীজী আধ্যাত্মিকতার ওপর জোর দেওয়ায়

যাদুগোপাল বুঝলেন—বিচ্ছেদ অবধারিত। বিপ্লবী কেন্দ্রগুলিকে কংগ্রেসের বাইরে রাখা হলো।

গান্ধীজীর অহিংস অসহযোগ ব্যর্থ হলে বিপ্লবীরা চিত্তরঞ্জনের অনুরোধে কাউন্সিলে ঢুকে অসহযোগের নীতি গ্রহণ করলেন। তাঁরা বাস্তববাদী ছিলেন, তাই এই সুযোগে বি. পি. সি. সি., এ. আই. সি. সি., কর্পোরেশন প্রভৃতি প্রতিষ্ঠান দখল করতে চাইলেন। ইচ্ছা—শক্তিকেন্দ্র দখল করে কংগ্রেসকে বিপ্লবমুখী করা। বি. পি. সি. সি.-তে ঢুকলেন ভূপতি মজুমদার, সত্যেন মিত্র, বিপিন গাঙ্গুলী, অমরেন্দ্র চ্যাটার্জী প্রমুখ। এ. আই. সি. সি.-তে গেলেন উপেন ব্যানার্জীরা। সত্যেন হলেন স্বরাজ্য পার্টির অন্যতম সম্পাদক। তাঁদের সাহায্যে চিত্তরঞ্জন দাশের অনুগামীরা এমন সংখ্যাবৃদ্ধি করেছিল যে, সরকার স্বরাজ্য পার্টি ও বিপ্লববাদীদের সমার্থক মনে করত। এর ফলে হলো ১৯২৪ খ্রীস্টাব্দের অর্ডিন্যান্স। ততদিনে সুভাষচন্দ্র ও যাদুগোপালের মিলনের পথ প্রস্তুত করেছেন ভূপতি মজুমদার, সুরেন ঘোষরা। অতএব অর্ডিন্যান্স তাঁদেরও গ্রেফতার করল। কিন্তু বিপ্লববাদকে অত সহজে দমন করা গেল না। চট্টগ্রামে যখন বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস বসল তখন বিপিন গাঙ্গুলী, হরিনারায়ণ চন্দ্র, সূর্য সেন,অনন্ত সিং প্রমুখ বিপ্লবীরা 'রেড বেঙ্গল পার্টি' বা 'নিউ ভায়োলেন্স পার্টি' গঠন করলেন। অন্যদিকে জার্মানী ও মস্কো থেকে তৃতীয় আন্তর্জাতিকের চাপ পড়ল বিপ্লবীদের ওপর। এসম্বন্ধে মুজফ্ফর আহমেদ, যাদুগোপাল, সরকারি নথিপত্র—পরস্পরবিরোধী। নলিনী গুপ্ত ও অবনী মুখার্জীদের যাদুগোপাল বিশ্বাস করেননি। তাঁর ভাষায়ঃ "কম্যুনিস্ট পার্টির সঙ্গে যুক্ত হবার সঙ্গত কারণ পাওয়া যায়নি। তাদের মস্ত ত্রুটি—তারা অন্য একটি দেশের ইশারায় চলে। এদেশে যে-গণতন্ত্র সম্ভব তা হবে জাতীয়তার ছাপে।... " দ্বিতীয়তঃ, রাজনৈতিক বিপ্লব ও অর্থনৈতিক বিপ্লব একসঙ্গে হয় না। এবিষয়ে তাঁরা গান্ধীজীর মতোই প্রথমটিকে অগ্রাধিকার দেন।

দুটো মুশকিল হলো। একদল বিপ্লবী দেশবন্ধুর অনুরোধ—কিছুদিনের জন্য অহিংস থাকা—উপেক্ষা করলেন। টেগার্ট সন্দেহে ডে-হত্যা এর প্রমাণ। যুগান্তর-বন্দীরা জ্যোতিষ ঘোষের অনুগামীদের দায়ী করলেন। চিত্তরঞ্জন সিরাজগঞ্জ প্রাদেশিক সম্মেলনে গোপীনাথ সাহার দেশপ্রেমের প্রশংসা করে প্রস্তাব নিতে বাধ্য হলেও ১৯২৪ খ্রীস্টাব্দের জুনে অনুষ্ঠিত এ. আই. সি. সি.-তে গান্ধীজীর আনা ডে-হত্যার নিন্দাসূচক প্রস্তাবের বিরোধিতা করতে গিয়ে হারলেন। ভূপেন্দ্রকুমার দত্তরা গান্ধীজীকে বোঝালেন, বেঙ্গল অর্ডিন্যান্স আসলে স্বরাজ্য পার্টি ভাঙবার অপচেষ্টা। গান্ধীজী দমননীতির নিন্দা করলেও বিপ্লববাদীদের ওপর তাঁর সন্দেহ গেল না। কেন্দ্রীয় তথা গান্ধী-নেতৃত্বের বিরোধিতা শুরু হলো। দেশবন্ধুর মৃত্যু হলে বিপ্লববাদীরা দুভাগে বিভক্ত হয়ে একভাগ অনুশীলনের যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্তকে, অন্যভাগ যুগান্তরের সুভাষচন্দ্রকে সমর্থন করায় স্থানীয় রাজনীতি ঘুলিয়ে উঠল। বিপ্লবীদের মধ্যে চিরকালই দলাদলি ছিল, ছিল বিপ্লববাদের নীতির বৈপ্লবিক কর্মপন্থার ঐক্যের চেয়েও নেতার প্রতি আনুগত্য। এখন তা প্রবলাকার ধারণ করল। Agent provocateur-রা ইন্ধন জোগাচ্ছিল, সন্দেহ করার কারণ আছে। নতুন নতুন উপদল তৈরি হচ্ছিল, যেমন—(১) যতীন দাসের নেতৃত্বাধীন দক্ষিণ কলকাতার দল, (২) দক্ষিণেশ্বর বোমার মামলায় জড়িত দল, (৩) আলিপুর জেলে আই. বি. বসন্ত চট্টোপাধ্যায়কে হত্যাকারীর দল। যতীন দাসের সঙ্গে শচীন সান্যালের, রাজেন লাহিড়ীর সঙ্গে কাকোরি ষড়যন্ত্রের, সূর্য সেন-অনন্ত সিংহের সঙ্গে উত্তর ভারতের H. R. Association-এর যোগ আন্দোলনকে বিস্তৃত করলেও তার দৃঢ়বদ্ধ সংহতি নষ্ট করে। লক্ষণীয়, এযুগেই মহিলারা বিপ্লবে যোগ দিতে থাকেন, যেমন 'শ্রীসঙ্ঘে'র অনিলবরণ রায়ের প্রেরণায় 'দীপালি সঙ্ঘে'র লীলা রায়। জেরাল্ড ফোর্বস-এর গ্রন্থে আরও বহু নাম পাওয়া যাবে।

আন্দোলন বিস্তৃত হলো সাইমন কমিশনের আগমনের পর। পুলিসের লাঠির আঘাতে আহত লালা লাজপৎ রায়ের মৃত্যু হলে ভগৎ সিং, সুখদেব, রাজগুরু, চন্দ্রশেখর আজাদরা ডেপুটি সুপার সন্ডার্সকে হত্যা করে প্রতিশোধ নেন। ভগৎ সিং, ফণী ঘোষ, অজয় ঘোষের উৎসাহে H. R. Association-এর নাম বদলে হয় H. R. Army।

এঁরা নতুন এক মাত্রা যোগ করলেন সমাজতন্ত্রকে আদর্শরূপে মেনে নিয়ে।

এই সময়ে বিপ্লবী সন্ত্রাসবাদ তৃতীয় পর্বে উত্তীর্ণ হচ্ছিল। যশপালের হিন্দী রচনা 'সিংহীর লোচন', শচীন সান্যালের 'বন্দীজীবন', যোগেশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'In Search of Freedom', অজয় ঘোষের 'প্রবন্ধ ও বক্তৃতা সংকলন' এবিষয়ে আলোকপাত করে। বিধানচন্দ্রের 'ঔপনিবেশিকতাবাদ ও জাতীয়তাবাদ'-এর বিশ্লেষণ গ্রহণযোগ্য। একটা টানাপোড়েন অবশ্য চলেছে। বিপ্লবকে মহিমান্বিত করা—পুরনো ঐতিহ্যের অনুসরণ। অন্যদিকে বিপ্লবকে নিছক রাজনৈতিক ক্রিয়া বলে না দেখে নব সমাজ নির্মাণের হাতিয়াররূপে দেখাটা অভিনব। ভগৎ সিংহের মতে—"এতে প্রলেতারিয়েত শ্রেণীর ক্ষমতা স্বীকৃত হবে এবং ফলে এক বিশ্বসঙ্ঘ মানবজাতিকে পুঁজিবাদের দাসত্ববন্ধন ও সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের যন্ত্রণা থেকে মুক্ত করবে।" আরও কাছের শরৎচন্দ্রের 'পথের দাবী' পড়লে দেখব—সব্যসাচী ঠিক বাঘা যতীনের ভাষায় কথা বলছেন না। একই নতুন সুর শুনি জ্যোতিষ ঘোষের 'স্বদেশী বাজারে' প্রকাশিত রচনায়।

সব ধারাগুলি মিলিত হয়ে ১৯২৮-এর কলকাতা কংগ্রেসে পূর্ণ স্বাধীনতার প্রস্তাব সুভাষচন্দ্রকে মদত দেয়। এমনকি স্বেচ্ছায় সরে যাওয়া হেমচন্দ্র ঘোষের দলও সুভাষচন্দ্রের ভলান্টিয়ার দলে বড় ভূমিকা নেয়, যার জন্য তার নাম হলো 'বি. ভি.' বা 'Bengal Volunteers'। প্রাদেশিক কংগ্রেসে ঢোকেন অরুণ গুহ, হেমচন্দ্র ঘোষ, সূর্য সেন আর তাঁদেরই সাহায্যে সুভাষচন্দ্রের পক্ষে প্রাদেশিক কংগ্রেস ও A. I. T. U. C.-র সভাপতি হওয়া সম্ভব হয়। কিন্তু দলাদলি—যাদুগোপালের ভাষায় 'সেই পুরনো রোগ'—চাগান দেয়। গান্ধীজীর আইন অমান্য আন্দোলনের বন্যায় তা ভেসে যায়নি। প্রমাণস্বরূপ দ্রষ্টব্য লেনার্ড গর্ডনের 'Brothers against the Raj'-এর ষষ্ঠ অধ্যায়—'What is Wrong with Bengal ?', গান্ধীজীর রচনাবলীর ৪২ থেকে ৪৭ খণ্ড ও নেহরুর নির্বাচিত রচনাবলীর ৩ থেকে ৫ খণ্ড। বিবাদ তুঙ্গে ওঠে ১৯২৯-এ। বসুদের পক্ষে যান সত্যেন মিত্র (যুগান্তর), সেনগুপ্তের পক্ষে জ্যোতিষ ঘোষ, বিপিন গাঙ্গুলী, সুরেশ মজুমদাররা। ভূপতি মজুমদারের মিলনের শেষ চেষ্টা বিফল হলো, আর কেন্দ্রীয় কংগ্রেসের সঙ্গে সুভাষচন্দ্রের বিরোধ পাকা হলো। যাদুগোপালের ভাষায়—"দোষী দুদিকেই ছিল।"

॥ ৩ ॥

'যুগান্তরে'র লজ্জা ঘোচালো ঢাকা ও চট্টগ্রামের বিপ্লবী সংস্থা—বি. ভি. ও হিন্দুস্থান রিপাবলিকান আর্মি। ১৯১৯ থেকে ১৯২৯-এর মধ্যে বাংলায় মোট ৪৭টি সন্ত্রাসবাদী ঘটনা ঘটে। শুধু ১৯৩০ খ্রীস্টাব্দেই ঘটল ৫৬টি ঘটনা। এর মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠন, যার নেতা ছিলেন সূর্য সেন। সহকারী—নির্মল সেন, অনন্ত সিং, গণেশ ঘোষ, লোকনাথ বল ও অম্বিকা চক্রবর্তী। ১৯৩০-এর ১৮ এপ্রিল একই সঙ্গে পুলিস আর্মারি ও ম্যাগাজিন, Auxiliary Force, হেড কোয়ার্টার আর্মারি ও টেলিফোন এক্সচেঞ্জ আক্রমণ করে এবং চট্টগ্রামের সঙ্গে ভারতের রেল যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন করে তাঁরা বাঘা যতীনের স্বপ্নকে সফল করেছিলেন। ২২ এপ্রিলের জালালাবাদের অসমসাহসিক সংগ্রাম আজ কাহিনীতে পরিণত। পরিকল্পনায় ত্রুটি সত্ত্বেও গোয়েন্দা বিভাগের কর্তা হেল (Hale) একে 'amazing coup' আখ্যা দিয়েছিলেন আর স্বয়ং বড় লাট বলেছিলেন: "It is the first time for many years that Indians have carried out successfully a coup of this magnitude."

কড়া অর্ডিন্যান্সের বলে ১৫৫জনকে গ্রেফতার করে চট্টগ্রামের বাইরে অভ্যুত্থান ঠেকান গেল, কিন্তু টেগার্টের প্রাণনাশের চেষ্টা হলো ১৯৩০-এর ২৫ আগস্ট। তাঁর আত্মকথায় অনুজার মৃত্যু ও দীনেশ মজুমদারের গ্রেফতারের চাঞ্চল্যকর বর্ণনা মিলবে। ঐ বছর 'শ্রীসঙ্ঘে'র বিনয় বসু পুলিসের আই. জি. লোম্যানকে হত্যা ও এস. পি. হাডসনকে জখম করেন। ৮ ডিসেম্বরের রাইটার্স বিল্ডিং-এর অলিন্দ যুদ্ধ সর্বজনবিদিত। বিনয়-বাদল-দীনেশের আত্মদানের পিছনে হেমচন্দ্র ঘোষের বি. ভি. গ্রুপ, বিশেষতঃ সত্যরঞ্জন বক্সী কাজ করেছিলেন। দীনেশের প্রাণদণ্ডের পাল্টা নিলেন বিপ্লবীরা ১৯৩১

খ্রীস্টাব্দে বিচারপতি গার্লিক ও মেদিনীপুরের অত্যাচারী ম্যাজিস্ট্রেট পেডিকে হত্যা করে। ঐ খ্রীস্টাব্দের সেপ্টেম্বরে প্রীতিলতা ওয়াদেদারের নেতৃত্বে দ্বিতীয় চট্টগ্রাম অভ্যুত্থান ঘটল, ডিসেম্বরে শান্তি ও সুনীতির হাতে কুমিল্লার ম্যাজিস্ট্রেট স্টিভেন্স নিহত হলেন। ১৯৩২-এর ফেব্রুয়ারিতে বীণা দাশের গুলি থেকে অল্পের জন্য বাঁচলেন ছোট লাট জ্যাকসন। এপ্রিলে নিহত হলেন মেদিনীপুরের জেলাশাসক ডগলাস আর তার ঠিক একবছর পরে তাঁর স্থলাভিষিক্ত—বার্জ। আততায়ীরা প্রায় সবাই বি. ভি.-র অর্থাৎ হেমচন্দ্র ঘোষের লোক। লেবং রেসকোর্সে ছোট লাটের প্রাণনাশের চেষ্টাও হলো। স্বরাষ্ট্র বিভাগের সচিব এমার্সন ও পুলিস-কর্তা উইলিয়ামসন স্বীকার করেছেন যে, এর ফলে আমলাদের মনোবল ভেঙে পড়েছিল।

সেই ভয় থেকে এল ক্রোধ ও প্রতিহিংসা—হিজলী বন্দীনিবাসে গুলি চলল। প্রাণ দিলেন সন্তোষ মিত্র ও তারকেশ্বর সেন। চট্টগ্রামে চলল অ্যান্ডার্সনী 'black and tan'। যে-রবীন্দ্রনাথ 'ঘরে বাইরে'-তে বিপ্লবী সন্দীপের কঠোর ভাষায় নিন্দা করেছিলেন, তিনি লিখলেন: "যাহারা তোমার বিষাইছে বায়ু,
নিভাইছে তব আলো
তুমি কি তাদের ক্ষমা করিয়াছ ?
তুমি কি বেসেছ ভাল ?"

১৯৩০-৩৩-এর বিস্ফোরণই সন্ত্রাসবাদের শেষ বিস্ফোরণ। গান্ধীজী, নেহরু, এমনকি সুভাষচন্দ্রও বুঝলেন, এতে জাতীয় আন্দোলন বিঘ্নিত হচ্ছে। চট্টগ্রামের পুলিস ইন্সপেকটারকে হত্যা করায় সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বাধল। অ্যান্ডার্সন ও উইলিংডন প্রচণ্ড দমননীতি কায়েম করলেন। শেষে কম্যুনিস্ট মতবাদ জোরদার হয়ে বহু বিপ্লবীকে আকৃষ্ট করল। সরোজ মুখোপাধ্যায় 'ভারতের কম্যুনিস্ট পার্টি ও আমরা' গ্রন্থে এর বিস্তৃত বিবরণ দিয়েছেন। সশস্ত্র বিদ্রোহের চেয়ে রেল, চটকল, সুতাকল, ট্রাম-বাস, মেথর-গাড়োয়ানের ধর্মঘট বেশি গুরুত্ব পেতে থাকল। কৃষক আন্দোলন হলো প্রবলতর। আন্দামানে নারায়ণ রায়, দৌলিতে ভবানী সেন, শৈলেন দাশগুপ্ত, মনোরঞ্জন রায়, বক্সায় প্রমোদ দাশগুপ্ত সাম্যবাদ গ্রহণ করলেন, এমনকি বিপিন গাঙ্গুলীও গোয়েন্দা বিভাগের ডিরেক্টর জে. এম. ইউয়াটের 'Communism in India'-য় ও গোয়েন্দা দফতরের সংকলনে ১৯৩৭ থেকে ১৯৩৯ পর্যন্ত ভাঙাগড়ার বিবরণ পাই। অনুশীলন দল দুভাগ হলো। এক শাখা—Anushilan Revolted Group—সি. পি. আই.-এর সদস্য হলেও স্বতন্ত্র রইল। অন্য শাখা প্রতুল গাঙ্গুলীর নেতৃত্বে বিপ্লবের কাজ চালিয়ে গেল। অনিল রায় ও লীলা রায়ের 'শ্রীসঙ্ঘ' এবং হেমচন্দ্র ঘোষের 'বি. ভি.' গ্রুপ নিজ নীতিতে অবিচল থেকে সুভাষচন্দ্রের পক্ষ নিল। তাঁকে শেষ পর্যন্ত সাহায্য করার জন্য সত্যরঞ্জন বক্সী অমানুষিক নির্যাতন সহ্য করেন। 'যুগান্তর' দল প্রথম দিকে তা করলেও সুভাষচন্দ্রের সঙ্গে মতবিরোধ হওয়ায় নিষ্ক্রিয় হলো। ত্রিপুরীতে তাঁরা সুভাষচন্দ্রকে সমর্থন করেননি। সুভাষচন্দ্রের জীবনে, বিভিন্ন ভাষণ ও রচনায় স্বামী বিবেকানন্দ সুস্পষ্ট ছাপ ফেলে গেছেন। শুধু সুভাষচন্দ্র কেন, তাঁর পূর্বে তিলক, অরবিন্দ, বাঘা যতীন থেকে শুরু করে হেমচন্দ্র ঘোষ, সূর্য সেন সহ সমকালীন ও পরবর্তী সকল স্বাধীনতা-সংগ্রামীর জীবনেই বিবেকানন্দের বিরাট প্রভাব রয়েছে। মুক্তি-সংগ্রামীদের নিজেদের কথায়, পুলিসের গোপন রিপোর্টে—সর্বত্র তার অজস্র প্রমাণ রয়েছে।

আজ মনে হতে পারে, তাঁরা ভুল করেছিলেন, তবু একদিন বিপ্লবের আহ্বানে তারাই ভোরের পাখির মতো সাড়া দিয়েছিলেন। তার মূল্য তো কম নয়।

"ছুটেছে সে নির্ভীক পরাণে
সঙ্কট আবর্ত মাঝে, দিয়েছে সে বিশ্ববিসর্জন
নির্যাতন সয়েছে সে বক্ষপাতি ; মৃত্যুর গর্জন
শুনেছে সে সঙ্গীতের মতো। দহিয়াছে অগ্নি তারে।
বিদ্ধ করিয়াছে শূল, ছিন্ন তারে করেছে কুঠারে,
সর্বপ্রিয় বস্তু তার অকাতরে করিয়া ইন্ধন
চিরজন্ম তারি লাগি জেলেছে সে হোমহুতাশন।"

স্বাধীনতা-সংগ্রামীদের ত্যাগ, দেশপ্রেম, সাহসের কোন তুলনা নেই। ভুল হোক আর ঠিক হোক, তাঁদের সেই বীরত্বকাহিনী ভারতের স্বাধীনতা-সংগ্রামের অচ্ছেদ্য অধ্যায়, আর সেই অধ্যায়ের অন্যতম কেন্দ্রপুরুষ অবশ্যই স্বামী বিবেকানন্দ।* □

* রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউট অব কালচারে 'স্বামী বিবেকানন্দ ও ভারতীয় বিপ্লববাদ' শিরোনামে প্রদত্ত 'মহাবিপ্লবী হেমচন্দ্র ঘোষ স্মারক বক্তৃতা' (২৭ এপ্রিল, ১৯৯১)। সৌজন্য: অমলেশ ত্রিপাঠী এবং ইনস্টিটিউট কর্তৃপক্ষ।—সম্পাদক, উদ্বোধন

প্রবন্ধ

# স্বামী বিবেকানন্দের ভারত-পরিক্রমণ

শঙ্করীপ্রসাদ বসু

॥ ১ ॥

প্রথমেই স্বামীজীর ভালবাসা ও যন্ত্রণার রক্তে ভেজানো একটি চিঠির অংশ উৎকলন করা যাক। চিঠির তারিখ ২৯ জানুয়ারি ১৮৯৪, শিকাগো থেকে লেখা। স্বামীজী তার অল্প কয়েকমাস আগে ধর্ম-মহাসভায় আবির্ভাবের জন্য বিখ্যাত হয়েছেন, চিঠি লিখেছেন 'ভারতের গ্লাডস্টোন' আখ্যায় সম্মানিত জুনাগড়ের দেওয়ান হরিদাস বিহারী-দাসকে। হরিদাস বিহারীদাস কলকাতায় গিয়ে স্বামীজীর মা ও ভাইদের দেখে আসেন। ওঁরা খুবই দুর্দশায় ছিলেন। ব্যথিত হরিদাস বিহারী-দাস নিশ্চয় অনুযোগ করে বলেছিলেন—স্বামীজীর মতো উপযুক্ত সন্তান সংসারত্যাগ করার ফলেই তাঁর মা ও ভাইদের ঐ শোচনীয় অবস্থা। স্বামীজী তারই প্রসঙ্গে লেখেন :

"এই বিপুল সংসারে আমার ভালবাসার পাত্র যদি কেউ থাকেন তবে তিনি আমার মা। তবু এই বিশ্বাস আমি দৃঢ়ভাবে পোষণ করে এসেছি এবং এখনও করি যে, যদি আমি সংসারত্যাগ না করতাম তাহলে আমার মহান গুরু পরমহংস শ্রীরামকৃষ্ণদেব যে-বিরাট সত্য প্রচার করতে জগতে অবতীর্ণ হয়েছিলেন, তা প্রকাশিত হতে পারত না। আর তাছাড়া যে-সকল যুবক বর্তমান যুগের বিলাসিতা ও বস্তুতান্ত্রিকতার তরঙ্গাঘাত প্রতিহত করবার জন্য সুদৃঢ় পাষাণভিত্তির মতো হয়ে দাঁড়িয়েছে—তাদেরই বা কী অবস্থা হতো ?··· প্রভুর কৃপায় এরা এমন কাজ করে যাবে যার জন্য সমস্ত জগৎ যুগের পর যুগ এদের আশীর্বাদ করবে।

"সুতরাং একদিকে ভারত ও বিশ্বের ভাবী ধর্ম-সম্বন্ধীয় আমার পরিকল্পনা এবং উপেক্ষিত যে লক্ষ লক্ষ নরনারী দিন দিন দুঃখের তমোগহ্বরে ধীরে ধীরে ডুবছে, যাদের সাহায্য করার কিংবা যাদের বিষয়ে চিন্তা করার কেউ নেই তাদের জন্য আমার সহানুভূতি ও ভালবাসা—আর অন্যদিকে আমার যত নিকট আত্মীয়-স্বজন আছেন তাঁদের দুঃখ ও দুর্গতির হেতু হওয়া—এই দুইয়ের মধ্যে প্রথমটিকেই আমি ব্রতরূপে গ্রহণ করেছি।"

রচনাংশটি বিশেষভাবে লক্ষণীয়, কারণ স্বামীজী কদাচিৎ নিজ সন্ন্যাসগ্রহণের হেতু এইভাবে আত্ম-উন্মোচন করে দেখিয়েছেন। তাঁর ওপর শ্রীরামকৃষ্ণের যেসব অমোঘ আদেশ ছিল, তার অনেকগুলিই স্বামীজী পত্রমধ্যে উল্লেখ করেছেন। সেই আদেশগুলি প্রধানতঃ এই :

নরেন লোকশিক্ষা দেবে ; নরেন হাঁক দেবে ; নরেন এদের ( অর্থাৎ ধর্মার্থ গৃহত্যাগী যুবকদের ) দেখবে।

এই সঙ্গে আছে, খালি পেটে ধর্ম হয় না ; জীবকে শিবজ্ঞান করে সেবা করতে হবে।

ওপরের রচনাংশে পেয়েছি—শ্রীরামকৃষ্ণ-প্রদত্ত ধর্মবার্তা বহনের কথা ( নরেন 'হাঁক' দেবে ) ; সঙ্ঘ গঠনের কথা ( বিলাসিতা ও বস্তুতান্ত্রিকতার প্রচণ্ড তরঙ্গের বিরুদ্ধে যে-সঙ্ঘভুক্ত যুবকদল প্রস্তরভিত্তি-তুল্য প্রতিহতকারী শক্তি, যাঁদের রক্ষণাবেক্ষণের নির্দেশ শ্রীরামকৃষ্ণ দিয়েছিলেন এবং যাঁরা উত্তরকালে রামকৃষ্ণ সঙ্ঘকে বিশ্বসংস্থায় পরিণত করবেন ) ; জনগণের দুঃখ-দুর্দশা দূর করার ব্রতের কথা ( "খালি পেটে ধর্ম হয় না", "শিবজ্ঞানে জীবসেবা" ইত্যাদি )। শেষোক্ত প্রসঙ্গে লক্ষ্য করার বিষয়—সাধারণতঃ মনে করা হয়, স্বামীজী ব্যাপক ভারত-ভ্রমণের কালে ভারতীয় জনগণের দুঃখ-দুর্দশার রূপ দেখে তা নিরাময়ের ব্রত গ্রহণ করেছিলেন—স্বামীজী কিন্তু এখানে সেকথা বলছেন না ; এখানে

বক্তব্য, তাঁর সংসারত্যাগের অন্যতম কারণ ভারতের সাধারণ মানুষের দুর্গতি দূর করার উপায় অন্বেষণ; অর্থাৎ তিনি পরিব্রাজকের জীবন শুরু করার আগেই সে-বিষয়ে সচেতন ছিলেন এবং সেই উদ্দেশ্যসাধনকে জীবনের অন্যতম লক্ষ্য বলে গ্রহণ করেছিলেন। পরিব্রাজক জীবনের অন্তে যদি তিনি কন্যাকুমারিকার শেষশিলায় ধ্যানান্তে সিদ্ধান্ত করে থাকেন (সেবিষয়ে নিজেও বলেছেন) বুভুক্ষু ও অশিক্ষিত দেশবাসীর জন্য অন্ন ও শিক্ষার সংস্থান-চেষ্টাই হওয়া উচিত কর্তব্যকর্ম, তাহলে বলতে হবে, বহুতর অভিজ্ঞতার পরে ওখানে তাঁর পূর্বে গৃহীত সিদ্ধান্তই দৃঢ়তর ভাষায় প্রকাশিত হয়েছে।

উদ্ধৃত পত্রাংশে আরেকটি জিনিস আছে যা স্বামীজীর জীবনীসমূহে সাধারণভাবে উপেক্ষিত—সংসারত্যাগকালে তাঁর বিচ্ছেদবেদনা। গৃহত্যাগকালে বুদ্ধের পত্নীত্যাগের বেদনা নিয়ে অনেক কাব্য হয়েছে, শ্রীচৈতন্যের ক্ষেত্রেও তাই (শ্রীচৈতন্যের ক্ষেত্রে মাতৃবিরহের কাব্যও আছে—'কাঁদে শচীমাতা নিমাই নিমাই/প্রতিধ্বনি ফিরে বলে, নাই নাই নাই।') কিন্তু স্বামীজীর ক্ষেত্রে ও-ব্যাপারটি যেন খুব স্বচ্ছন্দে ঘটে গেছে—বোঁটা থেকে পাকা আমের খসে পড়ার মতোই। তাঁর আবাল্য ধর্মৈষণা ও বিবাহবন্ধন না থাকা এ-ব্যাপারে সিদ্ধান্ত করতে সাহায্য করেছে। তিনি অখণ্ডের ঘরের ঋষি কিংবা নিত্যমুক্ত শুকদেব ইত্যাদি কথাও এক্ষেত্রে সহায়ক। কিন্তু স্বয়ং স্বামী বিবেকানন্দ সর্বাংশে তা মনে করতেন না—নিজেই উদ্ধৃত অংশে তা বলেছেন। নিজ সংসারত্যাগকে তিনি আত্মীয়-স্বজনকে বলি দেওয়ার কাজ বলেছেন। এর সঙ্গে আমরা যোগ করব, পরিব্রাজক অবস্থায় এক বোনের আত্মহত্যার সংবাদে তাঁর মর্মান্তিক যন্ত্রণার কথা; আমেরিকাযাত্রার আগে খেতড়ির রাজা তাঁর মা ও ভাইদের অন্নবস্ত্রের ভার নেবেন—এই কথায় একান্ত স্বস্তির কথা; আমেরিকা থেকে ফেরার পরে নিজের মায়ের জন্য একটি বাড়ি তৈরির টাকা খেতড়ির রাজার কাছে ভিখারীর মতো চাওয়ার কথা; মায়ের মাথা গোঁজবার জায়গা করবার জন্য প্রবঞ্চক আত্মীয়দের সঙ্গে জীবনের শেষপর্বে সন্ন্যাসী হয়েও মামলা-মোকদ্দমায় জড়িয়ে পড়ার কথা। লেখকগণ ধরে নেন—এই ভারতবর্ষেও—ভালবাসা মানে শুধু নরনারীর দাম্পত্য সম্পর্কজাতীয় ভালবাসা—মায়ের বা ভাইবোনদের প্রতি ভালবাসা লেখার ক্ষেত্রে যে তেমন জমে না॥ তাই স্বামীজীর বিষয়ে অসন্ন্যাসী লেখকগণ স্বামীজীর মা ও ভাইবোনদের প্রতি ভালবাসার দিকে নজর দিতে পারেননি, আর সন্ন্যাসী লেখকগণ নিজ জীবনাদর্শ অনুযায়ী স্বামীজীর জ্বলন্ত বৈরাগ্যের দিকেই মনোযোগ অধিক নিবদ্ধ রেখেছেন।

হরিদাস বিহারীদাসকে লেখা পত্রটিতে একটি জিনিস নেই—থাকার কথাও নয়—স্বামীজীর পরিব্রাজক জীবনে ব্যক্তিগত অধ্যাত্মসাধনা ও উপলব্ধির প্রসঙ্গ। স্বামীজী বাইরের সম্মানিত মানুষকে ও-ধরনের কথা চিঠিতে লিখে জানাবেন না, ধরেই নেওয়া যায় (হরিদাস বিহারীদাস অবশ্য ইতস্ততঃ সংবাদে সেবিষয়ে অবহিত থাকতেও পারেন)। পরিব্রজ্যাকালে প্রাপ্ত নানা অভিজ্ঞতার কথাও ঐ চিঠিতে স্বামীজী স্পষ্টভাবে বলেননি—প্রয়োজন ছিল না বলেই হয়তো।

॥ ২ ॥

পরিব্রাজক জীবনে ইতিমধ্যে সূচিত রামকৃষ্ণ মঠকে দৃঢ়ভিত্তিতে স্থাপন করার চিন্তা তাঁর মাথায় সর্বদা বর্তমান ছিলই। তিনি বুঝেছিলেন, শক্তিকে কেন্দ্রীভূত করার পরে তবে তাকে বিকীর্ণ করলে উপযুক্ত ফললাভ হয়। সেই শক্তি শ্রীরামকৃষ্ণ—তার আধার রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশন—রামকৃষ্ণ সঙ্ঘ। স্বামীজীর নেতৃত্বে বরানগর মঠে তার সূচনা হয়েছে। সেই মঠবাড়ি ভাঙা এবং ভাড়া-করা। স্থায়ী আস্তানা চাই, আর চাই সেই আস্তানায় রামকৃষ্ণ-আদর্শে জীবনগঠনকারী মনুষ্যদল। স্বামীজী এই দেখে আশ্বস্ত হয়েছেন, বরানগর মঠের তরুণ সন্ন্যাসীরা ত্যাগে-বৈরাগ্যে, ঈশ্বর-উৎকণ্ঠায় এবং শ্রীরামকৃষ্ণ-প্রেমে জ্বলছেন। সেই আগুনকে নিয়ে তাঁরা ভারতের নানাদিকে ছুটে চলেছেন—তাঁরা সাধনা করছেন এবং সঞ্চয় করছেন অভিজ্ঞতা ও শক্তি। ওধারে জাগ্রৎ-প্রদীপের মতো বরানগর মঠে থেকে গেছেন স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ। স্বামীজী নিজে পরিব্রাজক, নির্মম নিঃসঙ্গ হয়ে ভ্রমণ করতে

চান, এড়াতে চান বিশেষভাবে গুরুভাইদের সংস্রব, কেননা সে বড় ভালবাসার মায়া-বন্ধন—কিন্তু সর্বাংশে তা করতে সমর্থ হন না। তরুতলে শয়ন, ভিক্ষান্ন ভোজন ইত্যাদি সুমহৎ কাজের চোটে শরীর ঝাঁঝরা হয়ে গেলে তাঁরা পথমধ্যে পরস্পরের সেবা করেন, কখনো-বা কোন শহরে কিছুদিনের জন্য একসঙ্গে জুটে পড়েন, যেমন মীরাটে। তখন ধ্যান, সাধনা, ভজন-কীর্তন, শাস্ত্রচর্চায় মাতোয়ারা দিনগুলিতে যেন ফেলে আসা 'বরানগর মঠ' নবজন্ম নেয় এবং স্বামীজী গভীর তৃপ্তিতে অনুভব করেন (যেকথা হরিদাস বিহারীদাসকে পূর্বোক্ত পত্রে তিনি লিখেছেন)—গড়ে উঠেছে "পৃথিবীতে অদৃষ্টপূর্ব অতুলনীয় একটি সমাজ—যেখানে দশজন মানুষ দশ প্রকার ভিন্ন মত ও ভাব অবলম্বন করে পরিপূর্ণ সাম্যের মধ্যে বাস করতে পারে।"

পরিব্রাজক জীবনে স্বামীজী বরানগর মঠ ও সন্ন্যাসী গুরুভাইদের চিন্তায় কতখানি উৎকণ্ঠিত ছিলেন তা একবার কলকাতায় ফেরার পরে ২৬ মে ১৮৯০ তারিখে প্রমদাদাস মিত্রকে লেখা চিঠি থেকে দেখা যায়। স্বামীজী লিখেছেন :

"আমার উপর নির্দেশ এই যে, তাঁহার [ শ্রীরামকৃষ্ণের ] দ্বারা স্থাপিত এই ত্যাগিমণ্ডলীর দাসত্ব আমি করিব, ইহাতে যাহা হইবার হইবে এবং স্বর্গ বা নরক বা মুক্তি যাহাই আসুক, লইতে রাজি আছি।"

"ত্যাগী সেবকমণ্ডলী যেন একত্রিত থাকে··· তজ্জন্য··· ভারপ্রাপ্ত" বিবেকানন্দ উক্ত জীবনোদ্দেশ্য পূরণের ব্যাপারে দুই প্রিয় ও শ্রদ্ধেয় মানুষের কাছ থেকে দারুণ আঘাত পেয়েছিলেন। ত্যাগী সেবক-মণ্ডলীকে একত্র রাখতে হলে স্থায়ী আস্তানা চাই যেখানে তাঁদের আরাধ্য গুরু, যাঁকে তাঁরা ঈশ্বরাবতার মনে করেন, তাঁর ভস্মাস্থি সংরক্ষিত থাকবে। বরানগর মঠের ভাঙাবাড়িতে শ্রীরামকৃষ্ণ-অস্থির পূজাদি চলছিল। হরিদাস বিহারীদাস তা দেখে আপত্তি জানিয়ে স্বামীজীকে চিঠি লিখেছিলেন। স্বামীজী উত্তরে পূর্বোক্ত পত্রে লেখেন :

"যে গুরু আপনাদের ইতিহাসে বর্ণিত সমুদয় অবতার-প্রথিত পুরুষগণ অপেক্ষা শত শত গুণে অধিক পবিত্র—সেই প্রকার গুরুকে যদি কেউ আনুষ্ঠানিকভাবে পূজাই করে, তবে তাতে ক্ষতি কি। যদি খ্রীস্ট, কৃষ্ণ কিংবা বুদ্ধকে পূজা করলে কোন ক্ষতি না হয় তবে যে-পুরুষপ্রবর জীবনে চিন্তায় বা কর্মে লেশমাত্র অপবিত্র কিছু করেননি, যাঁর অন্তর্দৃষ্টিপ্রসূত তীক্ষ্ণবুদ্ধি অন্য সকল একদেশদর্শী ধর্মগুরু অপেক্ষা উর্ধ্বতর স্তরে বিদ্যমান—তাঁকে পূজা করলে কোন্ ক্ষতি? দর্শন বিজ্ঞান বা অপর কোন বিদ্যার সহায়তা না নিয়ে এই মহাপুরুষই জগতের ইতিহাসে সর্বপ্রথম এই তত্ত্ব প্রচার করেছিলেন যে, 'সকল ধর্মের মধ্যে সত্য আছে—শুধু একথা বললেই চলবে না, বস্তুতপক্ষে সকল ধর্মই সত্য'। আর এই ভাব জগতের সর্বত্র প্রতিষ্ঠালাভ করছে।"

স্বামীজী এর সঙ্গে যোগ করে দিয়েছিলেন : "কিন্তু এই মতও আমরা জোর করে কারো ওপর চাপাই না।"

হরিদাস বিহারীদাসকে লেখা চিঠির প্রায় চার বছর আগে (২৬ মে ১৮৯০) প্রমদাদাস মিত্রকে লেখা এক চিঠিতে স্বামীজীর একই আকুতি। সেই পত্রে প্রমদাদাসকে তিনি আকুল আবেদন জানালেন কিছু অর্থের জন্য, যাতে গঙ্গাতীরে শ্রীরামকৃষ্ণের ভস্মাস্থি রক্ষার উপযোগী একটি মঠ তৈরি করতে পারেন। অনিকেত সন্ন্যাসীর এইরকম নিকেতনী অভিপ্রায় কেন, এই প্রশ্ন উঠতে পারে অনুমান করে স্বামীজী লিখেছেন : "যদি এই অকপট, বিদ্বান, সৎকুলোদ্ভব যুবা সন্ন্যাসিগণ স্থানাভাবে এবং সাহায্যাভাবে রামকৃষ্ণের ideal ভাব লাভ করিতে না পারেন, তাহা হইলে আমাদের দেশের 'অহো দুর্দৈবম্'। যদি বলেন, 'আপনি সন্ন্যাসী, আপনার এ-সকল বাসনা কেন',—আমি বলি, আমি রামকৃষ্ণের দাস—তাঁহার নাম তাঁহার জন্ম- ও সাধন-ভূমিতে দৃঢ়প্রতিষ্ঠিত করিতে ও তাঁহার শিষ্যগণের সাধনের অণুমাত্র সহায়তা করিতে যদি আমাকে চুরি-ডাকাতি করিতে হয়, আমি তাহাতেও রাজি।"

স্বামীজীর মাথায় আরও একটি চিন্তা বা কল্পনা ঘুরছিল—হরিদাস বিহারীদাস বা প্রমদাদাস মিত্রকে তা বলা কোনমতেই সম্ভব ছিল না, তাই বলেননি—শ্রীমা সারদাদেবীর জন্য একটি আস্তানাও করতে হবে, যেখানে তাঁকে কেন্দ্র করে ত্যাগী

নারীরা সমবেত হবেন এবং স্বাভাবিক সূচনা হয়ে যাবে তাঁর স্বপ্নের স্ত্রীমঠের, যা কোনমতেই পুরুষ-কর্তৃত্বের অধীন থাকবে না। আমেরিকায় প্রথম সাফল্যলাভের কিছুদিনের মধ্যে তিনি স্বজনমণ্ডলীতে এই অভিপ্রায়ের কথা চিঠিতে লিখে পাঠান।

॥ ৩ ॥

পরিব্রজ্যাকালে স্বামীজীর ব্যক্তিগত সাধনা ও উপলব্ধির বিষয়ে সংবাদ অল্পই মেলে। স্বামীজী বিশ্বসংসারের সমস্যার কথা পঞ্চমুখে বলতে পারেন, নিজের জাগতিক দুঃখ-কষ্টের কথাও, কিন্তু নিজের আধ্যাত্মিক উপলব্ধির কথা বলতে গেলে তাঁর মুখ যেন আটকে যেত—ওসব কথা বলা বড়ই আত্ম-মর্যাদাহানিকর!! অথচ ইতস্ততঃ যেসব সংবাদ পাই তাতে বোঝা যায়, তিনি নিরন্তর উপলব্ধির তরঙ্গে ভাসছিলেন। তাঁর বহিঃরূপেও সেই প্রমাণ অঙ্কিত ছিল। একবার তিনি কথাপ্রসঙ্গে বলেছিলেন বলে মনে পড়েঃ ঈশ্বরোপলব্ধি বোঝা যায় কিসে? —প্রাপ্তির আগে যিনি ছিলেন নাজারেথের যীশু, প্রাপ্তির পরে তিনি হয়ে গিয়েছিলেন যীশুখ্রীস্ট। এইভাবে আমরাও যোগ করিতে পারি—শাক্যসিংহ হয়ে গিয়েছিলেন গৌতম বুদ্ধ, নদীয়ার নিমাই পণ্ডিত—শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য। নরেন্দ্রনাথ কি হয়েছিলেন? স্বামীজীর পরিব্রাজক জীবনের মধ্যোত্তর-পর্বে স্বামী অখণ্ডানন্দ অনেক চেষ্টা করে গুজরাটের মাণ্ডবীতে এক ভাটিয়ার বাড়িতে স্বামীজীর সন্ধান পেলেন। সেখানে কি দেখলেন?

"দেখিলাম স্বামীজীর আর পূর্ব রূপ নাই। তিনি রূপলাবণ্যে ঘর আলো করিয়া বসিয়া আছেন… ।"[১]

আরও কিছুদিন পরের কথা। স্বামীজী ভারতের দক্ষিণাংশে নেমেছেন। মাদ্রাজে আছেন। অনুরাগী মানুষ, অধিকাংশই যুবক, তাঁর চারপাশে যথারীতি জুটেছেন। তাঁদের সঙ্গে নানা সময়ে আলোচনাদি চলছে। এমনই একদিনের কথা এক প্রত্যক্ষদর্শীর মুখেঃ

"শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ ভট্টাচার্যের সমুদ্রতীরের বাড়ি। অপরূপ চন্দ্রালোকিত রাত্রি। স্বামীজী সর্বোত্তম ভাবাবেশে আছেন। তাঁর মুখ সত্যই প্রদীপ্ত। সুস্মিত সৌম্য দেহ থেকে আলোক বিচ্ছুরিত হয়ে তাঁর চারপাশে যেন জ্যোতির্বলয় সৃষ্টি করেছে। একটু আগেই গান গাইছিলেন।…সেই স্মরণীয় সন্ধ্যায় সেখানে সমবেত সকলে নিঃশ্বাস রোধ করে সেই গান শুনছিল।… স্বামীজী… বললেন, কখনো কখনো কিভাবে যেন তাঁর ওপরে শক্তি ভর করে, তখন তিনি একেবারে বদলে যান। সেই সময়ে… যদি কেউ তাঁকে স্পর্শ করে, তার সমাধির অনুভূতিলাভ হয়, চিররহস্যের দ্বার তার কাছে খুলে যায়, তার পার্থিব আকর্ষণ ছিন্ন হয়ে যায়।… স্বামীজী যেই এইকথা শেষ করেছেন, সহসা শ্রোতাদের মধ্যে একজন উঠে পড়ে স্বামীজীর কাছে এগিয়ে এসে তাঁর দু-পা আঁকড়ে ধরলেন। ইনি পরলোকগত সিঙ্গারাভেলু মুদালিয়ার, মাদ্রাজ খ্রীস্টান কলেজের পদার্থবিদ্যার অধ্যাপক।… স্বামীজী বললেন,… 'এ তুমি কী করলে? এতখানি ঝুঁকি নিলে কেন? এর পরিণাম থেকে তোমার অব্যাহতি নেই।' ঠিক তখনি আমরা দেখলাম, সিঙ্গারাভেলুর মুখে চরম তৃপ্তির আলো।… সেদিন থেকে তিনি সম্পূর্ণ ভিন্ন মানুষ—সংসার ত্যাগ করেছিলেন—স্ত্রী-পুত্র সবকিছু—অধ্যাপনা ছেড়ে দিয়েছিলেন—তারপর শুধু স্বামীজীর কাজ করে গেছেন।"[২]

স্বামীজীর 'প্রাপ্তির' কথা বলবার সময়ে অপ্রাপ্তির যন্ত্রণার কথা যেন ভুলে না যাই। চরম সিদ্ধি কেন হচ্ছে না বলে তিনি অবিরাম ছটফট করেছেন। "আমি আদর্শ শাস্ত্র পাইয়াছি, আদর্শ মনুষ্য দেখিয়াছি, অথচ পূর্ণভাবে নিজে কিছু করিয়া উঠিতে পারিতেছি না, ইহাই অত্যন্ত কষ্ট।" [প্রমদাদাস মিত্রকে লেখা, ৪. ৭. ১৮৮৯] "আমি দিবারাত্র কী যাতনা ভুগিতেছি, কে জানিবে?" [একই ব্যক্তিকে, ৩১. ৩. ১৮৯০] শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে আগেই যিনি নির্বিকল্প সমাধির মতো সর্বোচ্চ উপলব্ধি লাভ করেছেন, তাঁর এত না-পাওয়ার কষ্ট কেন? উত্তর খুবই সহজ—পেয়েছেন বলেই তো

১ স্মৃতিকথা—স্বামী অখণ্ডানন্দ, ২য় সং, ১৩৫৭, পৃঃ ৭১

২ বিবেকানন্দ ও সমকালীন ভারতবর্ষ—শঙ্করীপ্রসাদ বসু, ১ম খণ্ড, ১ম সং, পৃঃ ১১৪-১১৬

কষ্ট—নিশিদিন কেন পাই না। শ্রীচৈতন্য কেন বছরের পর বছর 'কোথা কৃষ্ণ কোথা কৃষ্ণ' বলে আর্তনাদ করতেন—কৃষ্ণ তো তাঁরই মধ্যে অধিষ্ঠিত। এই হলো অধ্যাত্মজগতের পরম রহস্য—সুধাপানের সময়েও অতৃপ্ত তৃষ্ণা—আরও আরও আরও। স্বামীজীর ক্ষেত্রে আহত অভিমানের স্পষ্ট কারণ আছে—শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁকে আস্বাদনের সুযোগ দিয়ে তার থেকে পরে বঞ্চিত রেখেছিলেন—কিনা তাঁকে 'মায়ের কাজ করতে হবে'। সেইজন্যই তো পওহারী বাবার কাছে স্বামীজীর শান্তির আশ্রয়-সন্ধান, হিমালয়ের গুহায় তপস্যা। অদ্বৈতে নিরন্তর নিমজ্জন তাঁর চাই, অথচ তাঁকে বেঁধে রাখা হয়েছে দ্বৈতের বোধে—কেননা তাঁকে মানবসেবা করতে হবে। সাধনকালে অদ্বৈতের বোধ এসে যখন তাতে আত্মহারা হবার ক্ষণ উপস্থিত, তখনি—স্বামীজী বলেছেন—ঘটনা-পরম্পরার চাপে পড়ে তা ছাড়তে হয়েছে।[৩] আলমোড়ার নিকটবর্তী কাঁকড়িঘাটে উচ্চ উপলব্ধির পরে তিনি যে-ভাষায় তার রূপ প্রকাশ করেছেন তাকে বিশুদ্ধ অদ্বৈতানুভূতি (যার রূপ স্বামীজীর বিখ্যাত গানে পাই—'নাহি সূর্য, নাহি জ্যোতিঃ শশাঙ্ক সুন্দর' ইত্যাদি) বলা যাবে কিনা তাত্ত্বিকরা ঠিক করবেন, আপাততঃ তা বিশিষ্টাদ্বৈত বলেই মনে হয়ঃ "বিশ্বাত্মার এই বিবিধ প্রকাশ অনাদি। অতএব আমরা যাহা কিছু দেখি বা অনুভব করি, সবই সাকার ও নিরাকারের মিলনে সংগঠিত।" আলমোড়া শহর থেকে পাঁচ মাইল দূরে কাঁসারদেবী পাহাড়ের গুহায় তাঁর উচ্চ উপলব্ধি ও পরবর্তী বাধ্যতামূলক অবতরণের কাহিনী এখানে স্মর্তব্য। স্বামীজীর বিখ্যাত ইংরেজী জীবনীর প্রথম সংস্করণে লিখিত আছেঃ "এই গুহামধ্যে···তিনি দিবারাত্র কঠোর কৃচ্ছ্রসাধনা করলেন—তাঁর দৃঢ়প্রতিজ্ঞা, সত্যলাভ করতেই হবে। সেই গভীর নৈঃশব্দ্যের মধ্যে, যেখানে তাঁর ধ্যান-ভঙ্গের মতো কেউ-ই ছিল না—বোধিলাভের পথে তিনি ক্রমান্বয়ে নানা উপলব্ধি লাভ করলেন—এবং শেষে দিব্যাগ্নিতে জ্যোতির্ময় হয়ে উঠল তাঁর আনন। তারপর, আধ্যাত্মিক উপলব্ধির চরম শিখরে যখন তিনি উপনীত, তখন তাঁর পরম বাঞ্ছিত ব্যক্তিমুক্তির চির আনন্দের পরিবর্তে কাজের জন্য প্রচণ্ড প্রেরণা বোধ করলেন, তা যেন সজোরে তাঁকে ঐ সাধনভূমি থেকে টেনে বার করে আনল।"

দ্বৈতের সেবা করতে হবে অদ্বৈত বুদ্ধিতে, তারই নাম ব্যবহারিক বেদান্ত। সে-অভিজ্ঞতার শিক্ষা স্বামীজী পরিব্রাজক জীবনেই লাভ করেছেন। সেইজন্যই তাঁর মেথরের বাড়িতে অবস্থান, চামারের প্রস্তুত-করা আহার্য গ্রহণ এবং ভাঙ্গীর হুঁকো টানা। শেষোক্ত ব্যাপারে দেখা গেছে, স্বামীজীর মতো সংস্কারমুক্ত মানুষের মনের গভীরেও কিভাবে সংস্কার-শিকড় ছড়িয়ে ছিল। লোকটি ভাঙ্গী, একথা শুনে তিনি গোড়ায় তার হুঁকো টানতে পারেননি, চলে গিয়েছিলেন। তারপর ফিরেও এসেছিলেন আত্ম-তিরস্কার করতে করতেঃ 'আমি না সন্ন্যাসী! জাতি-বর্ণের পারে চলে গিয়েছি! কার্যকালে তা তো করতে পারিনি!' স্বামীজীর স্বীকারোক্তি থেকেই এসব কথা পাওয়া গেছে।

নিজেকে যাচাই করার অন্য দৃষ্টান্তও তাঁর পরিব্রাজক জীবনে ঘটেছে। সত্যকার ঈশ্বরবিশ্বাস আছে কিনা তার প্রমাণ ঈশ্বর-নির্ভরতায়। সেই পরীক্ষা স্বামীজী একাধিকবার নিজের ওপরে করেছেন। বৃন্দাবনে থাকাকালে গোবর্ধন-পরিক্রমার সময় সিদ্ধান্ত করেছিলেন, খাদ্য ভিক্ষা করবেন না, অপ্রার্থিতভাবে এলেই তা গ্রহণ করবেন। ক্ষুধায় তৃষ্ণায় যখন ছটফট করছেন তখন আকস্মিকভাবে একটি লোক তাঁর জন্য আহার্য এনেছিল। সত্যই কি তাঁরই জন্য সে এনেছে, তা পরীক্ষা করবার জন্য স্বামীজী ছুটে পালিয়েছিলেন, কিন্তু অব্যাহতি পাননি; কারণ, কেন জানি না, লোকটি তাঁকেই খাওয়াবার জন্য বদ্ধপরিকর। এধরনের অভিজ্ঞতা তাঁর আরও হয়েছে পরিব্রাজক জীবনে।

॥ ৪ ॥

পরিব্রাজক জীবনে স্বামীজী ধর্ম-ভারতকে দেখেছেন সাধারণ এবং অসাধারণ মানুষের মধ্যে। ত্রৈলঙ্গস্বামী, স্বামী ভাস্করানন্দ, পওহারী বাবাকে দেখেছেন, অল্পদিন পূর্বে লোকান্তরিত রঘুনাথ দাসের আশ্রমে গিয়ে ওঁর অপূর্ব জীবনকথা শুনে

৩ যুগনায়ক বিবেকানন্দ—স্বামী গম্ভীরানন্দ, ১ম খণ্ড, ১ম সং, ১৩৭৩, পৃঃ ২৮৮

মোহিত হয়েছেন, দেখেছেন এক মুসলমান সাধুকে, "যাঁর অঙ্গের প্রতিটি রেখা বলে দিচ্ছিল তিনি একজন পরমহংস।"[৪] জেনেছেন যে, কোন মানুষের পতন তার সম্বন্ধে শেষকথা বলে না। পওহারী বাবার বাড়িতে চুরি করতে গিয়েছিল একটি চোর, পওহারী বাবা জেগে উঠতে সে যখন জিনিসপত্র ফেলে পালাচ্ছিল, তখন দৌড়ে গিয়ে তাকে ধরে ফেলে ঐ জিনিসগুলি তাকে প্রীতিভরে অর্পণ করেন উক্ত মহাপুরুষ। এর পরে রত্নাকরের বাল্মীকি না-হয়ে উপায় ছিল না। স্বামীজী পরিবর্তিত মানুষটিকে হিমালয়ে দেখেন—"অনুভূতির অতি উর্ধ্বস্তরে সেই সাধু অবস্থিত।" আর স্বামীজীর মন কেড়েছিল হৃষীকেশের পাগল দিগম্বর সাধুটি। সেই পাগল ছেলেদের কাছে মজার খেলার জিনিস; তাঁকে ঢিল ছুঁড়ে রক্তাক্ত করে দেওয়া যায়, কিন্তু তাঁর হাসি থামানো যায় না। স্বামীজী যখন তাঁকে ছেলেদের হাত থেকে বাঁচিয়ে শুশ্রূষা করছিলেন, তখনও তিনি হাসিতে লুটোপুটি—"কেয়া মজাদার খেল্—বিলকুল বাবাকা খেল্—কেয়া আনন্দ!" এই পর্বেই স্বামীজী জেনেছিলেন সেই সাধুর বিষয়ে, যাঁকে বাঘ যখন মুখে করে নিয়ে যাচ্ছিল তখনও বলছিলেনঃ "শিবোঽহং শিবোঽহম্।"

ধর্ম-ভারতকে স্বামীজী কেবল হিন্দুদের মধ্যে দেখেননি — বৌদ্ধ-জৈন-শিখ-মুসলমান-খ্রীস্টান—সর্বমত ও সম্প্রদায়ের মধ্যে দেখেছেন এবং সকলের সঙ্গে শাস্ত্রচর্চা করেছেন। "ধর্মাচার্য হিসাবে [ নিবেদিতা লিখেছেন ] তাঁহার নিকট সমগ্র জগৎই ভারতবর্ষ এবং সর্বদেশের মানবই তাঁহার নিজ ধর্মাবলম্বী।"[৫]

স্বামীজীর অসাধারণ এক রচনা 'মাদ্রাজ-অভিনন্দনের উত্তর', যা লেখেন ১৮৯৪ খ্রীস্টাব্দে আমেরিকায় থাকাকালে—তার মধ্যে এক দীর্ঘ বাক্যে দীর্ঘ একটানে ভারতের ধারাবাহিক ধর্মের ইতিহাসধারাকে উপস্থিত করেনঃ

"হিমাচলস্থিত অরণ্যানীর হৃদয়স্তব্ধকারী গাম্ভীর্যের মধ্যে স্বর্ণদীর গভীর ধ্বনিমিশ্রিত অদ্বৈতকেশরীর অস্তি-ভাতি-প্রিয়রূপ বজ্রগম্ভীর রবই কেহ শ্রবণ করুন, অথবা বৃন্দাবনের মনোহর কুঞ্জসমূহে 'পিয়া পীতম্' কূজনই শ্রবণ করুন, বারাণসীধামের মঠসমূহে সাধুদিগের গভীর ধ্যানেই যোগদান করুন, অথবা নদীয়া-বিহারী শ্রীগৌরাঙ্গের ভক্তগণের উদ্দাম নৃত্যেই যোগদান করুন, বড়গেলে তেঙ্গেলে প্রভৃতি শাখাযুক্ত বিশিষ্টাদ্বৈতমতাবলম্বী আচার্যগণের পাদমূলেই উপবেশন করুন, অথবা মাধ্ব সম্প্রদায়ের আচার্যগণের বাক্যই শ্রদ্ধাসহকারে শ্রবণ করুন, গৃহী শিখদিগের 'ওয়া গুরুকি ফতে'-রূপ সমরবাণীই শ্রবণ করুন, অথবা উদাসী ও নির্মলাদিগের গ্রন্থসাহেবের উপদেশই শ্রবণ করুন, কবীরের সন্ন্যাসী শিষ্যগণকে সৎসাহেব বলিয়া অভিবাদনই করুন, অথবা সখীসম্প্রদায়ের ভজনই শ্রবণ করুন, রাজপুতানার সংস্কারক দাদুর অদ্ভুত গ্রন্থাবলী বা তাঁহার শিষ্য রাজা সুন্দরদাস ও তাঁহা হইতে ক্রমশঃ নামিয়া 'বিচারসাগরে'র বিখ্যাত রচয়িতা নিশ্চলদাসের গ্রন্থই ( ভারতে গত তিন শতাব্দী ধরিয়া যত গ্রন্থ লিখিত হইয়াছে, তন্মধ্যে এই বিচার-সাগর-গ্রন্থের প্রভাব ভারতীয় জনসমাজে সর্বাপেক্ষা অধিক ) পাঠ করুন, এমনকি আর্যাবর্তের ভাঙ্গী মেথরগণকে তাঁহাদের লালগুরুর উপদেশ বিবৃত করিতেই বলুন— ...দেখিবেন, এই আচার্যগণ ও সম্প্রদায়সমূহ সকলেই সেই ধর্মপ্রণালীর অনুবর্তী, শ্রুতি যাহার প্রামাণ্য গ্রন্থ, গীতা যাহার ভগবদ্বক্ত্র-বিনিঃসৃত টীকা, শারীরক ভাষ্য যাহার প্রণালীবদ্ধ বিবৃতি আর পরমহংস পরিব্রাজকাচার্যগণ হইতে লালগুরুর মেথর শিষ্যগণ পর্যন্ত ভারতের সমুদয় বিভিন্ন সম্প্রদায় যাহার বিভিন্ন বিকাশ।"

এই ইতিহাসের ধারার সঙ্গে স্বামীজীর ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার যোগ ছিল। তারই শক্তিতে তিনি বলেছেনঃ "এমনকি বৌদ্ধ বা জৈনদিগের দার্শনিক গ্রন্থাবলীতেও শ্রুতির সহায়তা পরিত্যক্ত হয় নাই" কিংবা "সমুদয় ভারতেই শ্রীচৈতন্যের প্রভাব লক্ষিত হয়" কিংবা "পাঞ্জাবকেশরী রণজিৎ সিংহের রাজত্ব-কালে ত্যাগের যে-মহিমা প্রচারিত হয়, তাহাতে অতি নিম্নশ্রেণীর লোকও বেদান্তদর্শনের উচ্চতম উপদেশ পর্যন্ত শিক্ষা পাইয়াছে ; যথোচিত গর্বের সহিত পাঞ্জাবের কৃষকবালিকা বলিয়া থাকে, তাহার চরকা পর্যন্ত 'সোঽহম্ সোঽহম্' ধ্বনি করিতেছে",

৪ দ্রঃ স্বামীজীকে যেরূপ দেখিয়াছি—ভগিনী নিবেদিতা, ১৩৬১, পৃঃ ৭৪

৫ দ্রঃ ঐ, পৃঃ ২৪৬

কিংবা—

"আমি হৃষীকেশের জঙ্গলে সন্ন্যাসিবেশধারী ত্যাগী মেথরদিগকে বেদান্ত পাঠ করিতে দেখিয়াছি। অনেক গর্বিত অভিজাত ব্যক্তিও তাঁহাদের পদতলে বসিয়া আনন্দের সহিত উপদেশ পাইতে পারেন।"[৬]

॥ ৫ ॥

ভারত ভ্রমণ করে স্বামীজী এই যে স্থির প্রত্যয়ে উপনীত হলেন—ভারত ধর্মের দেশ—সে-ধর্মের আশ্রয় কি শুধু মঠ-মন্দির, পার্বত্য গুহা, একান্তে ধর্মার্চনা? না। স্বামীজী প্রত্যক্ষ করেছেন, ধর্ম ভারতের সমগ্র জনজীবনে ওতপ্রোত। যেমন ধরা যাক, অতিথিকে নারায়ণজ্ঞানে সেবা। অতিদরিদ্র পরিবারেও ভারতের ধর্ম-প্রতিনিধি সন্ন্যাসীদের জন্য ভিক্ষা দেবার পদ্ধতি ছিল (বা আছে) বলেই পরিব্রাজক সন্ন্যাসীরা কিংবা লোকালয়-বিচ্ছিন্ন তপস্যারত সন্ন্যাসীরা দেহধারণ করতে পেরেছেন। স্বামীজীর মুখে নিবেদিতা শুনেছেন ঃ

"দরিদ্র কৃষকগৃহে যে অতিথিসৎকার হয় তা ভারতের অন্য কোন শ্রেণীর মধ্যে দেখা যায় না। সত্য বটে, গৃহকর্ত্রী অতিথিকে তৃণশয্যার বেশি ভাল শয্যা দিতে পারেন না, তাঁকে আশ্রয় দিয়েছিলেন নিচু ছাউনি-দেওয়া মাটির ঘরে, তার বেশি নয়—কিন্তু তিনিই আবার শুতে যাবার ঠিক আগে, বাড়ির অপর সকলে যখন ঘুমিয়ে পড়েছে, তখন একটি দাঁতন ও একবাটি দুধ চুপি চুপি এমন এক-স্থানে রেখে যান যাতে অতিথি প্রভাতে শয্যাত্যাগ করে তা দেখতে পান এবং চলে যাবার আগে কিছু জলযোগ করে যেতে পারেন।"[৭]

॥ ৬ ॥

স্বামীজী দেখতে চেয়েছিলেন গোটা ভারতবর্ষকে, অতীত ও বর্তমান নিয়ে যে-ভারতবর্ষ, ধর্ম যার প্রাণকেন্দ্রে আছে, আর যার দেহ বিস্তৃত হয়েছে সভ্যতার নানা উপকরণে। কিছুদিনের মধ্যে আমেরিকায় বক্তৃতাকালে তিনি বারেবারে অতীত ভারতবর্ষে শিল্প ও বিজ্ঞানের সমৃদ্ধির কাহিনী শুনিয়েছেন। কলাশিল্প সম্বন্ধে স্বামীজীর ছিল বাসনাময় ভালবাসা। পরিব্রাজক জীবনে তিনি যথাসম্ভব শিল্পনিদর্শনগুলি দেখেছেন। সে-সম্বন্ধে সংগৃহীত তথ্য যথেষ্ট না হলেও যা পাওয়া গিয়েছে তার থেকে তাঁর অভিজ্ঞতার পরিমাণ কিছুটা অনুমান করা যায়। নিবেদিতা প্রমুখের সঙ্গে ১৮৯৮ খ্রীষ্টাব্দে ভারত-ভ্রমণকালে স্বামীজী পূর্বস্মৃতিতে তন্ময় হয়ে যেতেন ঃ "রেলযোগে পূর্বদিক থেকে প্রবেশ করবার মুখে কাশীর ঘাটগুলির যে-দৃশ্য চোখে পড়ে তা জগতের দর্শনীয় দৃশ্যগুলির অন্যতম। স্বামীজী সাগ্রহে তাদের প্রশংসা করতে ভুললেন না। লখনৌ-এ যে-সকল শিল্পদ্রব্য ও বিলাসোপকরণ প্রস্তুত হয়, তাদের নাম ও গুণবর্ণনা অনেকক্ষণ ধরে চলল।"[৮] এই ভ্রমণে স্বামীজী দলবলের সঙ্গে প্রধানতঃ বড় বড় শহরের ওপর দিয়ে গিয়েছিলেন বলে সেসব স্থানের বিবরণই নিবেদিতা ইতস্ততঃ দিয়েছেন—বনজঙ্গলের মধ্যে ধ্বংসস্তূপে সন্নিহিত মন্দির ও তার ভাস্কর্যের কথা আনেননি। কিন্তু একই সঙ্গে এই কথা স্মরণ রাখতে হবে, স্বামীজীর সৌন্দর্যসন্ধান কেবল সুনির্মিত সুবিখ্যাত বস্তুতে নয়, ভারতের নিসর্গ প্রকৃতিকে এবং সাধারণ মানুষের জীবনছবিকে নিবিড় অনুরাগের সঙ্গে দর্শনের মধ্যেও দেখা যায়।—"আর্যাবর্তের সুবিস্তৃত খেত, খামার ও গ্রামবহুল সমতল প্রদেশ অতিক্রম করবার সময় তাঁর প্রেম যেমন উথলে উঠত, অথবা তন্ময়তা যেমন প্রগাঢ় হয়ে উঠত, এমন আর বোধহয় কোথাও হয়নি। এইখানে তিনি অবাধে সমগ্র দেশকে এক অখণ্ডভাবে চিন্তা করতে পারতেন। ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরে কিভাবে ভাগে জমি চাষ হয়, তা বুঝিয়ে দিতেন অথবা কৃষক-গৃহিণীর দৈনন্দিন জীবনের বর্ণনা করতেন, কোন খুঁটিনাটি বাদ যেত না। যেমন, সকালের জলখাবারের জন্য রাত্রে শেষ উনুনে খিচুড়ি চড়িয়ে রাখা হতো, তাও বলতেন। এসকল কথা বলতে বলতে তাঁর নয়নপ্রান্তে যে-আনন্দরেখা ফুটে উঠত, অথবা কণ্ঠ যে-প্রকার আবেগে কম্পিত হতো, তা নিশ্চয়ই তাঁর পূর্বের পরিব্রাজক জীবনের স্মৃতিবশতঃ।"[৯] স্বামীজী ভারতের যে-স্থান দিয়েই

৬ স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা, ৫ম খণ্ড, পৃঃ ৪৪৯-৪৫২

৭ দ্রঃ স্বামীজীকে যেরূপ দেখিয়াছি, পৃঃ ৯২ ৮ দ্রঃ ঐ, পৃঃ ৯১ ৯ দ্রঃ ঐ, পৃঃ ৯১-৯২

যেতেন, সেখানকার ইতিহাস যেন উথলে উঠত তাঁর মনে ও কণ্ঠে। মগধের কোন ভূখণ্ডকে তিনি বুদ্ধের কৈশোরজীবন ও বৈরাগ্যজীবনের লীলাক্ষেত্র বলে অনুভব করতেন, রাজপুতানার বন্য ময়ূরের নৃত্যছন্দ তাঁর মনে পড়িয়ে দিত বীরযুগের চারণসঙ্গীতের কথা, কোন একটি হস্তী তাঁর কাছে বিদেশীয় আক্রমণের বিরুদ্ধে জীবন্ত কামানের মতো প্রতীয়মান হতো। আর চিরদিনের মতো তাঁর মন কেড়ে রেখেছিল একটি আপাতসামান্য কিন্তু মায়ের ও শিশুর ভালবাসায় মাখানো অসামান্য ছবিখানি: "একবার তিনি দেখেছিলেন, এক জননী এক পাথর থেকে অন্য পাথরে পা দিয়ে পার্বত্য তটিনী পার হচ্ছেন, আর তারই ফাঁকে এক-একবার মুখ ফিরিয়ে পিঠে বাঁধা শিশুসন্তানটিকে খেলনা দিচ্ছেন আর আদর করছেন।" সজীব ভারতের চলচ্চিত্র তাঁর বিশাল নয়নের পটের ওপর দিয়ে সরে যেত: "পাশ্চাত্যে অবস্থানকালে একবার তিনি প্রদোষে কোন ভারতীয় গ্রামের বহির্ভাগে দাঁড়িয়ে ক্রীড়ারত বালক-বালিকাগণের তন্দ্রাজড়িত কোলাহল, সন্ধ্যারতির কাঁসর-ঘণ্টাধ্বনি, গোপবালকগণের চিৎকার এবং স্বল্পকালস্থায়ী গোধূলির আধো-অন্ধকারে শ্রুত অস্ফুট কণ্ঠস্বর—এই সকল সান্ধ্য শব্দ শুনবার জন্য কত উৎসুক ছিলেন, তা বলেছিলেন।" তাঁর শান্ত সুন্দর মৃত্যুকল্পনার সঙ্গেও পরিব্রাজক জীবনের স্নায়ুশিরাময় অভিজ্ঞতা জড়িয়েছিল: "তাঁর চোখে, হিমালয়ের অরণ্যমধ্যে এক পর্বতপৃষ্ঠে শয়ন করে, নিম্নে স্রোতস্বিনীর অবিরাম 'হর হর' ধ্বনি শুনতে শুনতে শরীর ছেড়ে দেওয়াই আদর্শ মৃত্যু।"[১০]

॥ ৭ ॥

স্বামীজী বিশ্বাস করতেন, নিবেদিতা জানিয়েছেন: "বিধাতা সমগ্র ভারতবর্ষকেই গলাবার পাত্রে নিক্ষেপ করতে উদ্যত—তার ফলে কোন্ নব নব আকারের শক্তি ও সমৃদ্ধির সৃষ্টি হবে, তা আগে থেকে বলা মানুষের ক্ষমতার বাইরে।" অমন একটা সুমহান কাজ কি স্বামীজী অদৃশ্য বিধাতার হাতে ফেলে রাখার পাত্র ছিলেন? না। তিনি অবশ্যই অনুভব করেছেন, বিধাতার দক্ষিণবাহু-রূপেই তাঁর আবির্ভাব। সুতরাং ভারত-পরিক্রমার কালে তিনি সমগ্র ভারতের একদেহে মিশ্রিত হবার পথে বাধা কী কী, তা গভীরভাবে চিন্তা করেছেন—প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে। নিরন্ন ভারতবর্ষ—ভারতের অন্নচিন্তা তাই তাঁর চিন্তা। সেজন্য কৃষির সঙ্গে উৎপাদনী যন্ত্রশিল্প প্রবর্তনের পরিকল্পনা তাঁর। অশিক্ষিত ভারত। সেজন্য তাঁর গণশিক্ষার পরিকল্পনা। সে-শিক্ষা এমন হবে যা ভারতবাসীকে হারানো ব্যক্তিত্ব ফিরিয়ে দেবে, জীবনধারণের পথ দেখাবে। ভারতের সাধারণ মানুষ অধিকারবঞ্চিত—অর্থে, শিক্ষায় এবং ধর্মীয় ব্যবস্থাদিতে। তিনি সিদ্ধান্ত জানালেন, বিশেষাধিকার হলো সামাজিক অগ্রগতির সবচেয়ে বড় প্রতিবন্ধক। একথা মনে করার কারণ নেই, পাশ্চাত্য-ভ্রমণের ফলেই বিবেকানন্দ সামাজিক চিন্তায় প্রগতিশীল হয়েছেন। ৭ আগস্ট ১৮৮৯ তারিখে প্রমদাদাস মিত্রকে লেখা চিঠিতে শূদ্রের বেদ-অধ্যয়নে অনধিকার সম্বন্ধে শঙ্করাচার্যের বিধানকে চ্যালেঞ্জ করেছেন—শঙ্করাচার্যের বক্তব্যের মধ্যে অসঙ্গতি দেখিয়ে। যুক্তির শেষে তীব্র এবং বেদনার্ত প্রশ্ন: "কেন শূদ্র উপনিষদ্ পড়িবে না?" কিছু সময় পরে একই জনকে আর এক চিঠিতে (১৭ আগস্ট ১৮৮৯) লিখেছেন: "স্পার্টানরা যে-প্রকার হেলট্[দের উপর ব্যবহার করিত] অথবা মার্কিনদেশে কাফ্রীদের উপর যে-প্রকার ব্যবহার হইত, সময়ে সময়ে শূদ্রেরা যে তদপেক্ষাও নিগৃহীত হইত, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই।" এর পরে কয়েক বছরের ভারত-ভ্রমণকালে বিকট অস্পৃশ্যতার রূপ তিনি দেখলেন, আগুনঝরা ভাষায় তার বর্ণনা করলেন, দক্ষিণভারতকে তাঁর মনে হলো পাগলাগারদ। ভারতে ফেরার পরে স্বামীজী বক্তৃতায় বা কথাবার্তার সময়ে সমাজ-সংস্কারকদের মুখস্থ বুলির সম্বন্ধে মাঝে মাঝে তীব্র বিরক্তি প্রকাশ করেছেন; কারণ, আমূল সংস্কারই তাঁর মূলগত পরিকল্পনা, তাঁর বিরাট আহ্বান—অবশিষ্ট ভারতীয় জনশক্তির অধঃপতিত শতকরা নব্বইভাগ অংশকে উত্তোলন করে শিক্ষিত অভিজাত অংশের সমস্তরে স্থাপন করতে হবে। সেই আহ্বানই ছিল "নতুন ভারত বেরুক—

১০ দ্রঃ স্বামীজীকে যেরূপ দেখিয়াছি, পৃঃ ৫৪-৫৫

বেরুক চাষার কুটীর ভেদ করে” ইত্যাদি অংশে। কিন্তু সমাজ-সংস্কারের বাস্তব প্রয়োজন তিনি কখনো অস্বীকার করেননি, তা আমেরিকা-যাত্রার আগে মাদ্রাজের ট্রিপলিকেন লিটার্যারি সোসাইটিতে প্রদত্ত বক্তৃতায় দেখা যায়। ঐ বক্তৃতায় তিনি প্রভৃত বিস্ফোরক কথাবার্তা বলেছিলেন: “ব্রাহ্মণরা একদা গোমাংস খেতেন এবং শূদ্রনারী বিবাহ করতেন।... জাতিভেদ সামাজিক প্রথা—ধর্মব্যাপার নয়।... একজন ব্রাহ্মণ যে-কারো সঙ্গে আহার করতে পারেন —এমনকি পারিয়ার সঙ্গেও।... পারিয়ার স্পর্শে যে-আধ্যাত্মিকতার ক্ষয় হয় তা বড় মন্দমানের আধ্যাত্মিকতা।... জাতিভেদ, বাল্যবিবাহ প্রভৃতি যেসব প্রথা শিক্ষার প্রতিবন্ধক, সেগুলির মুণ্ড অবিলম্বে ভেঙে গুঁড়িয়ে দিতে হবে। এমনকি শ্রাদ্ধকেও বর্জন করা যায় যদি তার অনুষ্ঠান করতে সময় নষ্ট হয়, যে-সময়কে আত্মশিক্ষার জন্য শ্রেয়তর কাজে লাগানো যেত।... নারীদের পড়াশোনার স্বাধীনতা দিতেই হবে, পুরুষদের মতোই তাদের শিক্ষালাভের অধিকার।... এখনকার হিন্দুরা অধিকাংশই ভণ্ড।... কলিযুগে খাঁটি ব্রাহ্মণ বলতে কিছু নেই।... পারিয়ারা আমাদেরই মতো মানুষ, তাদের শিক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে উচ্চতর শ্রেণীর মানুষদের।”[১১]

॥ ৮ ॥

হিমালয় থেকে কন্যাকুমারিকা পর্যন্ত গোটা ভারতবর্ষই বিবেকানন্দের। কেবল ভারতের ইতিহাস নয়, ভারতের ভূগোলকেও তিনি অখণ্ডরূপে ধরতে চেয়েছিলেন। কলকাতায় তাঁর জন্ম, কলকাতার উপকণ্ঠ দক্ষিণেশ্বরে তাঁর গুরুলাভ ও অধ্যাত্মশিক্ষা, হিমালয়ের গিরিগুহায় তাঁর ধ্যান, ‘বাধার বিন্ধ্যাচল’ অতিক্রম করে কন্যাকুমারিকায় তাঁর পুনশ্চ ধ্যান। এই দুই ধ্যান-শিখরের মধ্যে অগণ্য ধ্যানের মৌন পর্বত। দুই ধ্যানশিখরে অবস্থান আবার শ্রীরামকৃষ্ণেরই অমোঘ নির্দেশে। এক ধ্যানে আত্ম-সাক্ষাৎকার, অন্য ধ্যানে ক্ষুধার্ত অশিক্ষিত ভারতের উজ্জীবন-মন্ত্রলাভ।

এই ভারতের দেহের ওপর দিয়ে যেসব ভেদরেখা সেদিনও টানা ছিল, সেগুলি তাঁর চোখ এড়ায়নি। পাঞ্জাবের কথাই ধরা যাক। পাঞ্জাবে তখনই হিন্দু ও শিখের মধ্যে মানসিক সংঘাত শুরু হয়ে গেছে। (শিখ ও মুসলমানের সংঘাতের কথা বলাই বাহুল্য)। স্বামীজী ১৮৯৭ খ্রীস্টাব্দে পাঞ্জাবে গিয়ে যা বলেছিলেন, তা অবশ্যই পূর্ব-অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে স্থাপিত। তিনি নিজেকে “পূর্বদেশের ভ্রাতা”-রূপে চিহ্নিত করে বলেন: “আমি এসেছি পশ্চিমদেশের ভ্রাতৃগণের কাছে—প্রীতিসম্ভাষণ জানাতে, আলাপ ও ভাববিনিময় করতে। কোথায় আছে বিভিন্নতা, তা আবিষ্কার করতে আমি আসিনি—এসেছি মিলনভূমি সন্ধান করতে। ভাঙবার পরামর্শ দিতে আসিনি—এসেছি গড়বার প্রস্তাব নিয়ে।” স্বামীজীর কাছে পাঞ্জাব বহু আদর্শের মিলনভূমি, আর্যদের স্থান, গ্রীক-সহ বিদেশীদের প্রবেশভূমি, নানা সভ্যতার প্রয়াগস্থল। তাঁর দৃষ্টিতে গুরু নানক কেবল শিখগুরু নন, গোটা ভারতের অন্যতম প্রধান ধর্মগুরু। তাঁর মতে গুরুগোবিন্দ হিন্দু-আদর্শের এক শ্রেষ্ঠ প্রতিনিধি। তাঁর অসাধারণ সংগঠন, তেজ-বীর্য এবং অপূর্ব প্রেমের কথা বলবার সময়ে স্বামীজী উচ্ছ্বসিত। গুরুগোবিন্দের সবচেয়ে বড় কৃতিত্ব —তিনি হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে সমষ্টিস্বার্থের বোধ সৃষ্টি করতে পেরেছিলেন। তাই উভয় সম্প্রদায়ের মানুষ তাঁর অনুগামী হয়েছিল। নিবেদিতার সাক্ষ্য অনুসারে, পাঞ্জাবে অনেকেই তাঁকে গুরু নানক ও গুরুগোবিন্দের মিলিত মূর্তি-রূপে কল্পনা করেছিলেন।

দক্ষিণভারতের বিচ্ছিন্নতার প্রবণতা তাঁর চোখ এড়ায়নি। ইংরেজ-আমলে তার সূত্রপাত। মনুষ্যের মনোভেদের ওপর সাম্রাজ্যের স্থায়িত্ব নির্ভর করে—এই নীতি অনুযায়ী ইংরেজ শাসক নানা মাধ্যমে ভারতবাসীর মধ্যে ভেদসৃষ্টির চেষ্টা করেছে এবং সে-ব্যাপারে ভারতবর্ষকে উর্বর ক্ষেত্র-রূপে লাভ করেছে। তার পক্ষে সক্রিয় বহু কর্মী—প্রশাসক থেকে ধর্মযাজক, প্রত্নতাত্ত্বিক, নৃতাত্ত্বিক এবং ঐতিহাসিক—সবাই মিলে সরবে প্রচার শুরু করেছিল, উত্তরভারত থেকে আর্যরা এসে দক্ষিণে অভিযান চালিয়ে ধ্বংস করেছে প্রাচীন দ্রাবিড়

১১ বিবেকানন্দ ও সমকালীন ভারতবর্ষ, ১ম খণ্ড, পৃঃ ১০৩-১০৫

সংস্কৃতি। স্বামীজী পরিব্রাজক জীবন থেকেই এর বিরুদ্ধে সতর্ক করতে থাকেন। তার কিছুদিন পরে ১৮৯৪ খ্রীস্টাব্দের মাঝামাঝি সময়ে মাদ্রাজ-অভিনন্দনের উত্তরে তিনি আর্যাভিমানীদের স্মরণ করিয়ে দেন—উত্তরভারতে যেসব ধর্মধারা প্রবল, তার মধ্যে প্রাণশক্তি দান করেছেন দক্ষিণভারতের সুমহান আচার্যগণ। তিনি বলেছিলেন ঃ

দাক্ষিণাত্যের কাছে আর্যাবর্ত গভীরভাবে ঋণী, কারণ ভারতীয় ধর্মজগতে সক্রিয় শক্তিসমূহের অধিকাংশের মূল দাক্ষিণাত্যে;

মহাত্মা শঙ্করের নিকট সকল অদ্বৈতবাদী ঋণী;

মহাত্মা রামানুজের স্বর্গীয় স্পর্শ পদদলিত পারিয়াদের আলোয়ারে পরিণত করেছিল;

সমগ্র ভারতে শক্তিসঞ্চারকারী শ্রীচৈতন্যের অনুবর্তিগণ মহাত্মা মধ্বের ভাবানুগত্য গ্রহণ করেছিলেন;

বারাণসীধামের শ্রেষ্ঠ মন্দিরসমূহে দাক্ষিণাত্য-বাসীদিগের প্রাধান্য;

দাক্ষিণাত্যবাসীরাই সুদূর হিমালয়ের দেবালয়-সমূহ রক্ষা করছেন;

দাক্ষিণাত্য চিরদিন বেদবিদ্যার ভান্ডার; এবং দাক্ষিণাত্য সর্বাগ্রে রামকৃষ্ণ-বাণীকে গ্রহণ করেছে।

ভারতদেহের 'সহস্রার' কিন্তু হিমালয়।

ভারতের উত্তরে কয়েক সহস্র মাইলব্যাপী মহান প্রহরী দেবতাত্মা হিমালয়—নগাধিরাজ। উত্তর ও পশ্চিমাগত আক্রমণকারীদের যথাসম্ভব পথরোধ করেছে এই হিমালয়, রক্ষা করেছে উত্তরের মরুঝড় থেকে, সর্বোপরি আশ্রয় দিয়েছে অগণিত মুনি-ঋষিকে, যাঁদের মনন ও সাধনা ভারত ও পৃথিবীর মানবসমাজকে দান করেছে পরম সম্পদ—আত্মতত্ত্ব।

হিমালয় বিবেকানন্দের 'নিজ নিকেতন'।

এই হিমালয়ের ওপরে আক্রমণ এসেছে বারেবারে —অতীতে এবং বর্তমানে। ভবিষ্যতেও তা সম্ভাবিত। শেষ রক্তবিন্দুর বিনিময়ে ভারতবাসীকে রক্ষা করতে হবে হিমালয়কে। বিবেকানন্দের পরিব্রাজক জীবনপর্বকে বিস্তৃত করে যদি ১৮৯৮ খ্রীস্টাব্দে পৌঁছাই—সেখানে দেখব, ভারত-আত্মার বিগ্রহ বিবেকানন্দের দুই সমুচ্চ অধ্যাত্ম-উপলব্ধির স্থান কাশ্মীর, যাকে ভারত থেকে বিচ্ছিন্ন করার চক্রান্ত এখন চলছে।

অমরনাথে স্বামীজীর শিবদর্শন।

ক্ষীরভবানীতে—মাতৃদর্শন।

ভারতীয় জীবনে হিমালয় কী, স্বামীজী তা বর্ণনা করেছিলেন তাঁর সমস্ত অভিজ্ঞতার আবেগ নিয়ে। ১৮৯৮ খ্রীস্টাব্দে আলমোড়া অভিনন্দনের উত্তরে তিনি বলেছিলেন ঃ

"আমাদের পূর্বপুরুষগণ শয়নে স্বপনে যে-ভূমির বিষয়ে ধ্যান করিতেন—এই সেই ভূমি—ভারতজননী পার্বতীদেবীর জন্মভূমি। এই সেই পবিত্র ভূমি, যেখানে ভারতের প্রত্যেক যথার্থ সত্য-পিপাসু আত্মা শেষ অবস্থায় আসিয়া জীবনের যবনিকাপাতে অভিলাষী হয়।

"এই পবিত্রভূমির গিরিশিখরে, এর গভীর গহ্বরে, এর দ্রুতগামিনী স্রোতস্বতীসকলের তীরে সেই অপূর্ব তত্ত্বরাশির চিন্তা করা হইয়াছিল, যার কণামাত্র বৈদেশিকগণের নিকট হইতেও বিপুল শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিয়াছে।··· এই হিমালয় পর্বত বৈরাগ্য ও ত্যাগের সাকার মূর্তিরূপে দণ্ডায়মান। এই ত্যাগ ও বৈরাগ্য হইতে উচ্চতর ও মহত্তর কিছু মানবজাতিকে শিক্ষা দিবার নাই।···

"এই হিমালয়ের সহিত আমাদের জাতির শ্রেষ্ঠতম স্মৃতিসমূহ জড়িত। যদি ভারতের ধর্মেতিহাস হইতে হিমালয়কে বাদ দেওয়া হয়, তবে উহার অতি অল্পই অবশিষ্ট থাকিবে।"

আগেই দেখেছি, স্বামীজী নিজের সুন্দরতম মৃত্যুকামনা করেছিলেন হিমালয়ের ক্রোড়েই। এখানেও সেই কথা ঃ

"এই সেই ভূমি—অতি বাল্যকাল হইতে আমি যেখানে বাস করিবার কল্পনা করিয়াছি। আমার প্রাণের বাসনা, এই ঋষিগণের প্রাচীন নিবাসভূমি, দর্শনশাস্ত্রের জন্মভূমি—এই পর্বতরাজের ক্রোড়ে আমার জীবনের শেষ কয়টা দিন কাটাইব।"

একই প্রসঙ্গ এসে যাচ্ছে বারেবারে—এক অপূর্ব দ্বৈতলীলার কাণ্ড—ভারতবর্ষের ওপর দিয়ে 'স্বয়ং ভারতবর্ষ' পরিক্রমণ করছেন। দ্বিতীয় ভারতবর্ষ—বিবেকানন্দ। ভারতের যাকিছু সুখ-দুঃখ, গৌরব-অগৌরব, উত্থান-পতন—সবই তাঁর। "তাঁর কথোপকথনে রাজপুতদের বীরত্ব, শিখদের

বিশ্বাস, মারাঠাদের শৌর্য, সাধুদের ঈশ্বরভক্তি, মহীয়সী নারীদের পবিত্রতা ও নিষ্ঠা যেন পুনরুজ্জীবিত হয়ে উঠত।... হুমায়ুন, শের শাহ, আকবর, শাহজাহান—এই সকল ইতিহাসের পৃষ্ঠা-উজ্জ্বলকারীদের নামের সঙ্গে আরও কত নাম তিনি উল্লেখ করতেন। আকবরের সিংহাসন আরোহণ বিষয়ে তানসেন রচিত এবং অদ্যাপি দিল্লীর রাস্তায় গীত গানটি তানসেনেরই সুরে-লয়ে তিনি আমাদের কাছে গেয়ে শুনিয়েছেন।"[১২] নিবেদিতা এখানে ১৮৯৮ খ্রীস্টাব্দের বিবেকানন্দের কথা বলেছেন। ১৮৯৩ খ্রীস্টাব্দের গোড়ার দিকে পরিব্রাজক বিবেকানন্দের খণ্ডচিত্র পাই একটি স্মৃতিকথায়ঃ

"স্বামীজীর মনের বিশাল দিগন্তের আকার আমাকে বিমূঢ় ও অভিভূত করে ফেলল। ঋগ্বেদ থেকে রঘুবংশ, বেদান্তদর্শনের তাত্ত্বিক ঊর্ধ্বগত রূপ থেকে আধুনিককালের কান্ট ও হেগেল, প্রাচীন ও আধুনিক সাহিত্য, শিল্প, সঙ্গীত ও নীতিশাস্ত্রের পরিধি, প্রাচীন যোগের সুমহান পরিধি থেকে আধুনিক ল্যাবরেটরির জটিলতা—সবই যেন এঁর দৃষ্টির সামনে পরিষ্কার।"

শুধু এই ছবি?—

"অ্যাডেয়ার সমুদ্রতীরের কাছে একবার যখন জেলেদের কয়েকটি নগ্ন শিশুকে তাদের মায়ের পিছনে হাঁটু-কাদাজলে ঘুরতে দেখেছিলেন [তাদের মায়েরা সেখানে কাজ করছিল], তখন তাঁর দুচোখ জলে ভরে গিয়েছিল! কী যন্ত্রণায় ঐ অশ্রুপাত, তা আমরা বুঝতেই পারতাম না যদি না তাঁর গলা চিরে এই কাতরোক্তি বেরিয়ে আসত—'হে ভগবান! কেন তুমি এদের সৃষ্টি করলে! এ-দৃশ্য আমি যে আর দেখতে পারছি না'!"[১৩]

"ভারতের চতুঃসীমার মধ্যে যেকোন কাতর-ধ্বনি উঠত"—ওপরের ঘটনার কয়েক বছর পরেও নিবেদিতার প্রত্যক্ষদর্শনের বর্ণনা—"সে-সকলই তাঁর হৃদয়ে প্রতিধ্বনি-রূপে উত্তর পেত। ভারতের প্রতিটি ভীতিমূলক চিৎকার, দুর্বলতাজনিত গাত্রকম্পন, অপমানজনিত সংকোচবোধ তিনি জানতেন এবং বুঝতেন। ভারতকে তার পাপ-আচরণসমূহের জন্য তিনি তীব্র তিরস্কার করতেন, তার সাংসারিক অনভিজ্ঞতার ওপর খড়্গহস্ত ছিলেন—কিন্তু সে-সকলের মূলে ছিল এই অনুভূতি—ও তো আমারই দোষ। অপরপক্ষে কেউই তাঁর ন্যায় ভারতের ভাবী মহিমা-কল্পনায় অভিভূত হতেন না।"[১৪]

'এ-ভারত আমার'। কিন্তু এ-ভারতের আত্মগঠন কিভাবে হয়েছে! জীবনের একেবারে শেষে তাঁর চোখের সামনে গোটা ভারত ধরা দিয়েছিল এই-ভাবেঃ

"সত্যই, এ-এক নৃতাত্ত্বিক সংগ্রহশালা। হয়তো সম্প্রতি-আবিষ্কৃত সুমাত্রার অর্ধবানরের কঙ্কালটিও এখানে পাওয়া যাইবে। ডলমেনদেরও অভাব নাই। চকমকি-পাথরের অস্ত্র-শস্ত্রও যে-কোন স্থানে মাটি খুঁড়িলেই প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যাইবে। গুহাবাসী এবং বৃক্ষপত্র-পরিহিত মানুষ এখনও বর্তমান। বনবাসী আদিম মৃগয়াজীবীদের এখনও এদেশের নানা অঞ্চলে দেখিতে পাওয়া যায়। তাছাড়া নেগ্রিটো-কোলারীয়, দ্রাবিড় এবং আর্য প্রভৃতি ঐতিহাসিক যুগের নৃতাত্ত্বিক বৈচিত্র্যও উপস্থিত। ইহাদের সঙ্গে মাঝে মাঝে তাতার, মঙ্গোলবংশসম্ভূত ও ভাষাতাত্ত্বিকগণের তথাকথিত আর্যদের নানা প্রশাখা-উপশাখা আসিয়া মিলিত হয়। পারসীক, গ্রীক, ইয়ুংচি, হূন, চীন, সীথিয়ান—এমন অসংখ্য জাতি মিলিয়া মিশিয়া এক হইয়া গিয়াছে; ইহুদী, পারসীক, আরব, মঙ্গোলীয় হইতে আরম্ভ করিয়া স্ক্যান্ডিনেভীয় জলদস্যু ও জার্মান বনচারী দস্যুদল অবধি—যাহারা এখনও একাত্ম হইয়া যায় নাই এইসব জাতির তরঙ্গায়িত বিপুল মানবসমুদ্র—যুধ্যমান, স্পন্দমান, চেতনায়মান, নিরন্তর পরিবর্তনশীল—ঊর্ধ্বে উৎক্ষিপ্ত হইয়া ছড়াইয়া পড়িয়া ক্ষুদ্রতর জাতিগুলিকে আত্মসাৎ করিয়া আবার শান্ত হইতেছে—ইহাই ভারতবর্ষের ইতিহাস।"

গোটা ভারতবর্ষকে 'আমার, আমারই' বলে গ্রহণ করার সময়ে স্বামীজী খণ্ড স্বার্থের আত্মাভিমানকে শাসন করে উদার মহান স্বরধ্বনি তুললেনঃ

১২ দ্রঃ স্বামীজীকে যেরূপ দেখিয়াছি, পৃঃ ৫০
১৩ বিবেকানন্দ ও সমকালীন ভারতবর্ষ, ১ম খণ্ড, পৃঃ ১০৬-১০৮
১৪ দ্রঃ স্বামীজীকে যেরূপ দেখিয়াছি, পৃঃ ৫১-৫২

"আমরা বেদান্তবাদী সন্ন্যাসী—আমরা বেদের সংস্কৃতভাষী পূর্বপুরুষদের জন্য গর্ব অনুভব করি; এপর্যন্ত পরিচিত সর্বপ্রাচীন সভ্যজাতি তামিলভাষীদের জন্য আমরা গর্বিত, এই দুই সভ্যতার পূর্ববর্তী অরণ্যচারী মৃগয়াজীবী কোল পূর্বপুরুষগণের জন্য আমরা গর্বিত।··· যদি বিবর্তনবাদ সত্য হয়, তবে আমাদের সেই জন্তুরূপী পূর্বপুরুষদের জন্যও আমরা গর্বিত··· । জড় অথবা চেতন—সমগ্র বিশ্বজগতের উত্তরপুরুষ বলিয়া আমরা গর্বিত।"

॥ ১০ ॥

স্বামীজীর ভারতীয় অভিজ্ঞতার বিষয়ে অনেক প্রসঙ্গ আনা যায়। এখানে তা করা সম্ভব নয়। আরও দু-একটির উল্লেখ মাত্র করব। যেকোন আপাত মন্দ বা ঘৃণ্য ব্যাপারেরও এমন কোন উচিত দিক থাকতে পারে, যাকে সতর্ক বিবেচনায় আনলে দ্রুত সিদ্ধান্তের হঠকারিতা থেকে মুক্ত থাকা যায়। হিমালয়ে ভ্রমণের সময়ে এক তিব্বতী পরিবারের সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয়েছিল। সে-পরিবারে ছয় ভাইয়ের এক স্ত্রী [ পান্ডবী কান্ড ! ]। এই বীভৎস সংবাদে স্বামীজীর গা গুলিয়ে উঠেছিল। তাঁর তিরস্কারের উত্তরে এক ভাইয়ের কাছ থেকে এই প্রতি-তিরস্কার তিনি শুনেছিলেন: "সে কি, আমরা স্বার্থপর হব?" তা শুনে সমাজবিজ্ঞাত্মক এই চিন্তা তাঁকে কিছুটা সুস্থির করেছিল—ঐ পার্বত্য অঞ্চলে নারীরা সংখ্যালঘু, তাই এক নারীর একাধিক স্বামী না থাকলে সমাজরক্ষা হবে না।

তেমনি ভারতে ব্যাপক ধর্মান্তরকরণ তাঁকে হিন্দুসমাজের ক্ষয়িষ্ণু রূপ সম্বন্ধে আতঙ্কগ্রস্ত করে তুলেছিল। পূর্বকালে এই কাজ প্রধানতঃ হয়েছে আক্রমণকারী মুসলমানদের দ্বারা; স্বামীজীর কালে তা হচ্ছিল শাসকজাতির অন্তর্গত খ্রীস্টান মিশনারিদের দ্বারা। ব্রিটিশ শাসন ভারতে ব্যাপক দুর্ভিক্ষের ব্যবস্থা করে, বহুসংখ্যক অনাথ শিশু সৃষ্টি করে মিশনারিদের সুবিধা করে দিচ্ছিল। মিশনারিরা সবেগে সানন্দে 'ফেমিন ক্রীশ্চান' বানাচ্ছিলেন। স্বামীজীর দৃষ্টিতে এ অতি গর্হিত কর্ম—পয়সা ছড়িয়ে মানুষের আত্মা কেনার বাজারী চেষ্টা। তবু তিনি মূল দোষ দিয়েছেন হিন্দুসমাজকেই—যেখানে অস্পৃশ্যতার মতো বিকট ব্যাপার ধর্মের নামে চলছে, যেখানে সমাজপতি নামধারী দুরাত্মারা তাড়িয়ে বের করে দেবার দরজা খুলে রেখেছে, ভিতরে ঢোকার পথ সেখানে বন্ধ।

আরও একটি কারণে ধর্মান্তরকরণ তাঁর কাছে অপরাধ—শ্রীরামকৃষ্ণের মূল বাণীর ওপরে প্রচন্ড আঘাত ওতে ঘটে। 'যত মত তত পথ'—শ্রীরামকৃষ্ণের এই মহাবাণী হলো ধর্মসংঘাত নিবারণের উপায় এবং তা এনেছে ধর্মরাজ্যে অপূর্ব স্বাধীনতার বার্তা। প্রহারে বা প্রলোভনে ধর্মান্তরকরণ ঐ স্বাধীনতার কণ্ঠরোধ।

এ জাতি আত্মবিস্মৃত। একদা সে বিরাট সভ্যতার ঐশ্বর্যকে বহন করেছে, তার ইতিহাস এখন ভুলে গেছে। তার শক্তির মধ্যে দুর্বলতার ছিদ্র কোথায় ছিল, সে-তথ্যও সে জানে না, জানবার ইচ্ছাও নেই। স্বামীজীর চোখের সামনে ছড়িয়ে ছিল ক্ষয়িত, অর্ধলুপ্ত, অতীত সভ্যতার অজস্র উপাদান, আর তার বর্তমান দুর্গতি। তিনি চাইলেন, অতীত কাহিনীর সঙ্গে বর্তমান অবস্থানের তুলনা করুক ভারতবাসী, সেই সূত্রে জানুক নিজেদের সত্য ইতিহাস—যাতে বৃথা গৌরবাভিমানের ভাবালুতা থাকবে না—কিংবা বিদেশী-নিক্ষিপ্ত অর্ধবিকৃত কাহিনীলব্ধ হীনতাবোধ। এই ইতিহাস রচনার জন্য চাই সংস্কৃতজ্ঞান, কেননা প্রাচীন ভারতের জ্ঞানবস্তু নিহিত আছে ঐ ভাষার মধ্যে। আর চর্চা চাই বিজ্ঞানের। বিজ্ঞান আধুনিক সভ্যতার নিয়ন্ত্রী শক্তি। বিজ্ঞানকে বাদ দিয়ে পৃথিবীর অপর জাতির সঙ্গে সমতালে পদক্ষেপ সম্ভব নয়। বিজ্ঞান অধিকন্তু সেই চেতনা দিতে পারে, যার সাহায্যে কুসংস্কারের সঙ্গে লড়াই করা যায়। পরিব্রাজক জীবনে আলোয়ারে অবস্থানকালে স্বামীজী যুবকদের বলেছিলেন: "সংস্কৃত পড়, আর সঙ্গে সঙ্গে বিজ্ঞানচর্চা কর; সব জিনিসকে যথাযথভাবে দেখতে ও বলতে শেখ। এমনভাবে পড় আর খাট যে, তার দ্বারা আমাদের দেশের ইতিহাসকে বিজ্ঞানসম্মত ভিত্তিতে নতুন করে গড়ে তুলতে পার। এখন তো আমাদের দেশের ইতিহাসের কোন মাথামুণ্ডু নেই। ইংরেজরা আমাদের দেশের যে-ইতিহাস লিখেছে, তাতে আমাদের মনে দুর্বলতা

না এসে যায় না, কেননা তারা শুধু অবনতির কথাই বলে। যেসব বিদেশী আমাদের রীতিনীতির, ধর্ম ও দর্শনের সঙ্গে অতি অল্পই পরিচিত, তারা কেমন করে বিশ্বস্ত ও নিরপেক্ষভাবে ভারতের ইতিহাস লিখবে?" ভারতীয় ইতিহাসচর্চার দিঙ্‌নির্ণয়ক এই সকল গভীর প্রজ্ঞাপূর্ণ বক্তব্যের মধ্যে স্বামীজী স্বীকার করেছিলেন, ঐতিহাসিক গবেষণার সূত্রপাত বিদেশীরাই এদেশে করেছেন। কিন্তু এদেশীয় সংস্কৃতি সম্বন্ধে অজ্ঞতা অথবা অবজ্ঞার কারণে বহু অপসিদ্ধান্তও তাঁরা করেছেন। সেজন্য ভারতের সত্য ইতিহাস রচনার গুরুদায়িত্ব ভারতবাসীরই। গোটা ভারতবর্ষই যেন বিরাট যাদুঘর। সেদিকে না তাকিয়ে উদাসীন ভারতবাসী তার সামনে দিয়ে যখন পথ চেয়ে চলেছে, তখন স্বামীজীর আর্তনাদ—দাঁড়াও পথিকবর!—"…বিস্মৃতি-সাগর থেকে আমাদের লুপ্ত ও গুপ্ত রত্নরাজি উদ্ধারের জন্য বদ্ধপরিকর হও। কারো ছেলে হারিয়ে গেলে সে যেমন তাকে না পাওয়া পর্যন্ত শান্ত হতে পারে না, তেমনি যতক্ষণ ভারতের গৌরবময় অতীতকে জনমনে পুনরুজ্জীবিত না করতে পারছ ততক্ষণ তোমরা থেমো না।"[১৫]

ভারতের পথে পথে ঘুরতে ঘুরতে স্বামীজী যতই দেখছেন দেশের অবনতির রূপ, পরাধীনতার যন্ত্রণা ততই তাঁর বুকফাটা আর্তনাদ ও আহ্বান। ভারতের পরাধীনতার জ্বালায় তিনি নিরন্তর জ্বলেছেন। তাঁর মনে হয়েছে, রাক্ষসের দল তাঁর দেশমাতার রক্তপান করছে। পরিব্রাজক জীবনের অন্তে আমেরিকায় পৌঁছেই, তখনো ধর্মমহাসভায় তিনি বিখ্যাত হননি, স্বামীজী কোন্ ভয়ঙ্কর শাণিত ভাষায় ব্রিটিশ শাসনের রূপ বর্ণনা করেছিলেন, তা মেরী লুইস বার্কের গবেষণালব্ধ তথ্যাদি থেকে আমরা জানতে পেরেছি। এমনকি ধর্মমহাসভার মঞ্চে দাঁড়িয়ে যখন ক্রমাগত খ্রীস্টান মিশনারিদের মুখে শুনেছেন—পৃথিবীব্যাপ্ত ইউরোপীয় সাম্রাজ্য মহিমময়, কারণ তা খ্রীস্টানজাতির শাসন এবং তা ধর্মশাসন, তখন তিনি ক্ষোভে ফেটে পড়েছিলেন। তখন অনল-উদ্গারী তাঁর বক্তব্য ও ভাষা: "তোমরা গিয়েছ এক হাতে বাইবেল, অন্য হাতে বিজয়ীর তরবারি নিয়ে।… তোমরা আমাদের পায়ে দলেছ, পায়ের তলার ধুলোর মতোই আমাদের সঙ্গে ব্যবহার করেছ।… তোমরা মদ ধরিয়ে আমাদের জনগণকে অধঃপাতিত করেছ, মর্যাদা নষ্ট করেছ নারীর, ঘৃণা করেছ আমাদের ধর্মকে।… ইতস্ততঃ তাকিয়ে দেখি, পৃথিবীর খ্রীস্টান দেশগুলির মধ্যে সবচেয়ে ঐশ্বর্যশালী হলো ইংলন্ড—যার পা ২৫ কোটি (২৫০,০০০,০০০) এশিয়াবাসীর গলার ওপর চেপে বসে আছে। ইতিহাসের দিকে পিছন ফিরলে দেখব, খ্রীস্টান ইউরোপের সমৃদ্ধির সূচনা স্পেন দেশে—আর স্পেনের সমৃদ্ধির সূচনা মেক্সিকো অভিযানের পর থেকে।"

স্বামীজী তাই পরিব্রাজক জীবনে যেখানে সম্ভব এবং উচিত সেখানেই পরাধীনতার শোচনীয় রূপ উদ্ঘাটিত করে শ্রোতাদের উদ্বুদ্ধ করবার চেষ্টা করেছেন; উৎসাহিত করেছেন সংঘবদ্ধ প্রতিরোধের জন্য; পরাধীন মানুষের ঘৃণ্য কাপুরুষতা এবং অক্ষমের আত্মাভিমানকে ব্যঙ্গ করেছেন (পরবর্তী এক চিঠিতে তার রূপ): "এক লাখ লোকের দাবানিতে ৩০০ মিলিয়ান (ত্রিশ কোটি) কুকুরের মতো ঘোরে, আর তারা আর্যবংশ!!!"; উদ্ঘাটন করেছেন ধর্মবিকার এবং ধর্মের নামে নানা অনাচারের রূপ; সচেতন করেছেন এই বিষয়ে যে, কয়েকটি ওপর-ওপর সংস্কারচেষ্টায় দেশের উন্নতি ঘটবে না, তা সম্ভব হবে নারী ও জনগণের আর্থিক, সামাজিক ও শিক্ষাগত স্তরোন্নয়নে; এবং তিনি অবিরাম আহ্বান করেছেন—"ওঠো জাগো! যতক্ষণ না লক্ষ্যলাভ করছ অগ্রসর হও।"

॥ ১১ ॥

পরিব্রাজক জীবন স্বামী বিবেকানন্দের আত্মগঠন ও আত্মবিস্তারের প্রস্তুতি-পর্বও।

নরেনকে যদি সত্যিই 'শিক্ষে' দিতে হয় এবং সেই 'শিক্ষে'কে যদি স্বদেশে আবদ্ধ না রেখে সারা বিশ্বে 'হাঁক' দিয়ে পৌঁছে দিতে হয় তাহলে তার জন্য ভিতরে বাইরে প্রস্তুতি দরকার। স্বামীজীর অধ্যাত্মসাধনা ও উপলব্ধি এক্ষেত্রে তাঁকে শ্রীরামকৃষ্ণ-কথিত 'চাপরাশ' দিয়েছিল, তিনি ঈশ্বরের 'আদেশ'

১৫ যুগনায়ক বিবেকানন্দ, ১ম খণ্ড, পৃঃ ৩১৩

পেয়েছিলেন। এ-ই হলো ভিতরের প্রস্তুতি। বাইরের প্রস্তুতি—বিদ্যার্জনে ও বাস্তব অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ে। ছাত্রাবস্থাতেই তাঁর দর্শন ও ইতিহাসজ্ঞান অনেক বিশিষ্ট মানুষকে চমৎকৃত করেছিল। পরে তাঁর পরিব্রাজক জীবন সম্বন্ধীয় একাধিক স্মৃতি-কথায় একই সাক্ষ্য পাই। এই পর্বে, যখন পথে পথে তিনি ঘুরছেন, তখনো সময় বা সুযোগ মিললে তাঁর বিদ্যাচর্চা চলছে সবেগে। মীরাটে শেঠজীর বাগানে কয়েকজন গুরুভাইয়ের সঙ্গে অবস্থানকালে অধ্যাত্মসাধনা ও বিদ্যাচর্চা সম্বন্ধে স্বামী গম্ভীরানন্দ মন্তব্য করেছেন, স্থানটি "দ্বিতীয় বরাহনগর মঠে পরিণত হইল"। পরিব্রাজক জীবনের ভূমিকা-পর্বে বরানগর মঠে যুবক সন্ন্যাসীদের বিপুল জ্ঞানচর্চার কাহিনী স্বামীজীর জীবনীপাঠকদের কাছে সুপরিজ্ঞাত।

স্বামীজী বিশেষভাবে সংস্কৃত শিক্ষা করতে চেয়েছিলেন। ভারতের প্রাচীন জ্ঞান-বিজ্ঞানের ভান্ডার সংস্কৃত। অথচ সে-ভাষা অত্যন্ত কঠিন এবং ব্যাকরণনির্ভর। পাণিনি-ব্যাকরণ সংস্কৃতের অবয়ব-সংস্থানের নির্ণায়ক। তাই পাণিনি-ব্যাকরণ আয়ত্ত করা প্রয়োজন। স্বামীজী এই ব্যাপারে কতখানি সচেতন ও আগ্রহী ছিলেন, তা দেখা যায় ১৯. ১১. ১৮৮৮ তারিখে প্রমদাদাস মিত্রকে লেখা চিঠিতে, যার মধ্যে বরানগর মঠে "সংস্কৃত শাস্ত্রের বহুল চর্চার কথা জানিয়েছিলেন। "বঙ্গদেশে বেদশাস্ত্রের একেবারে অপ্রচার বলিলেই হয়। এই মঠের অনেকেই সংস্কৃতজ্ঞ, এবং তাঁহাদের বেদের সংহিতাদি ভাগ সম্পূর্ণরূপে আয়ত্ত করিবার একান্ত অভিলাষ।··· পাণিনিকৃত সর্বোৎকৃষ্ট ব্যাকরণ আয়ত্ত না হইলে বৈদিক ভাষায় সম্পূর্ণ জ্ঞান হওয়া অসম্ভব।" এক সপ্তাহ পরে পাণিনি-ব্যাকরণ পাওয়ার জন্য স্বামীজী প্রমদাদাসকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন। সেখানেই শেষ হয়নি। ১৮৯১ খ্রীস্টাব্দের এপ্রিল মাসে তিনি যখন জয়পুরে ছিলেন তখন "একজন সুপন্ডিত বৈয়াকরণের··· নিকট পাণিনির অষ্টাধ্যায়ী পড়িতে আরম্ভ" করেন। একইভাবে তিনি পাণিনি-ব্যাকরণের শিক্ষা নেন "রাজস্থানের বৈয়াকরণদের অন্যতম অগ্রণী পন্ডিত নারায়ণদাসজীর" নিকট, যখন খেতড়িতে ছিলেন। তারপরেও সংস্কৃতচর্চা চলতে থাকে। জুনাগড়ে থাকাকালে তিনি শঙ্কর পান্ডুরঙ্গের সাহচর্যে সংস্কৃত ভাষায় কথোপকথনে পারদর্শিতা অর্জন করেন। এঁর কাছে পাণিনির পতঞ্জলি-ভাষ্য "সমাপ্ত করার বিশেষ সুযোগ" পেয়েছিলেন। স্বামীজী শঙ্কর পান্ডুরঙ্গের ন্যায় "বেদের পন্ডিত ভারতে দেখেন নাই"। বোম্বাই শহরে অবস্থানকালেও তিনি সংস্কৃতচর্চা করেছেন। সংস্কৃত ব্যাকরণ ও ভাষা তিনি এমনই আয়ত্ত করেছিলেন যে, বেলগাঁও-এ তাঁকে পাণিনি-ব্যাকরণে গভীরভাবে ব্যুৎপন্ন দেখা গিয়েছিল (জি. এস. ভাটে-এর স্মৃতিকথায় তা পাচ্ছি) এবং আরও পরে ত্রিবান্দ্রামে ১৮৯২-এর ডিসেম্বর মাসে অধ্যাপক সুন্দররাম আয়ার স্বামীজীকে বঞ্চীশ্বর শাস্ত্রীর সঙ্গে আলোচনায় যখন ব্যাপৃত দেখেন (বঞ্চীশ্বর শাস্ত্রী "সংস্কৃতভাষায় রচিত সর্বাপেক্ষা দুরূহ শাস্ত্র ব্যাকরণে লব্ধবিদ্য"), তখন তাঁদের "আলোচ্য বিষয় ছিল ব্যাকরণের এক জটিল ও তর্কবহুল সমস্যা," এবং স্বামীজী আলোচনা-কালে "ব্যাকরণে ব্যুৎপত্তি ও সংস্কৃতভাষায় পারদর্শিতা দেখাইয়াছিলেন।"

স্বামীজীর সংস্কৃতচর্চা-বিষয়ে ওপরের তথ্যগুলি 'যুগনায়ক' গ্রন্থ থেকে গৃহীত। আমরা দেখি, শাস্ত্র-ব্যাপারে তিনি বহু পন্ডিতের সঙ্গে তর্কবিতর্কে অবতীর্ণ হয়েছিলেন। আর যেসব শিক্ষিত ভারত-বাসী সংস্কৃতে অনভিজ্ঞ, তাঁদের সঙ্গে ইংরেজীতে নানা ধরনের আলোচনা করতেন। ইংরেজী-জানা সন্ন্যাসী হিসাবে তাঁর খ্যাতি ছড়িয়েছিল। নানা ধরনের মানুষের সঙ্গে মেলামেশায় লোকচরিত্রজ্ঞানও বেড়েছিল। অভিজ্ঞতা, দীপ্ত বুদ্ধি এবং সূক্ষ্ম অনুভূতিতে সম্পন্ন তিনি, অপরের মনোভাব বা বক্তব্য পূর্বাহ্ণে অনুমান করতে পারতেন। ফলে তর্ককালে তিনি হয়ে উঠেছিলেন অপরাজেয়। ছোট-বড় সভাতে বক্তৃতাদিও করেছেন—বালগঙ্গাধর তিলকের সঙ্গী হিসাবে পুনার হীরাবাগে ডেকান ক্লাবে ঘরোয়া সভায় বিস্ময়কর পান্ডিত্যপূর্ণ বক্তৃতা, হায়দ্রাবাদে সহস্রাধিক শ্রোতার সভায় বক্তৃতা তার অন্তর্গত। সব জড়িয়ে তিনি যখন ধর্মমহাসভায় যাত্রার জন্য মনস্থির করেছেন তখন তিনি একেবারে প্রস্তুত আচার্য। কিন্তু স্মরণ রাখতে হবে, এই

অধিকার তাঁকে ক্রমাগত চেষ্টায় অর্জন করতে হয়েছে। স্বামী গম্ভীরানন্দের মতে, ১৮৯১-এর মার্চ মাসে "আলোয়ারে আমরা [ তাঁকে ] পূর্ণ আচার্যরূপে পাই।" আরও কয়েক মাস পরে "জুনাগড়ে যেন তাঁহার অসামান্য প্রতিভা কার্যকরী পূর্ণ বিকাশের পথে ধাবিত" হয়েছিল।

পরিব্রাজক জীবনের শেষপর্বে উচ্চারিত তাঁর দুটি উক্তিকে আমরা বিশেষভাবে লক্ষ্য করব। এক, মহাবালেশ্বরে তিনি স্বামী অভেদানন্দকে বলেন: "কালী, আমার ভিতর এতটা শক্তি জমেছে যে, ভয় হয় পাছে ফেটে যাই।" দুই, আবুরোড স্টেশনে শিকাগো রওনা হবার আগে স্বামী তুরীয়ানন্দকে বলেন: "হরিভাই, তোমাদের তথাকথিত ধর্মের কিছুই বুঝি না, কিন্তু আমার হৃদয় খুব বেড়ে গেছে, আমি অপরের দুঃখ feel করতে শিখেছি। বিশ্বাস করো, আমার তীব্র দুঃখবোধ জন্মেছে।"

উক্তি দুটি দেখিয়ে দিচ্ছে, জীবনোদ্দেশ্য সফল করার জন্য যা প্রয়োজন, বিবেকানন্দ তা অর্জন করে ফেলেছেন। আলোড়ন আনতে গেলে চাই শক্তি—পাঞ্চজন্য ধ্বনির সঙ্গে পৃথিবীর বুক চিরে যদি রথকে চালিয়ে নিয়ে যেতে হয়—চাই শক্তি। সেই শক্তি তাঁর মধ্যে জেগেছে। তারই নির্ঘোষ তাঁর কণ্ঠে অভেদানন্দ শুনেছিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণের বাণীস্রোতকে উৎস থেকে আকর্ষণ করে বিশ্বের সর্বত্র ছড়িয়ে দিতে হবে—সেই হলো তাঁর জীবন-ব্রত। বাণীবজ্রকে নিক্ষেপ করার মতো শক্তিধর পুরুষ তিনি এখন।

কিন্তু সে কি শুধুই বাণী? সে-বাণী কার? সে-বাণী পরম প্রেমিকের—যিনি 'প্রেম-পাথার'। সে-বাণী শোনাবেন কে? শোনাবেন সেই মানুষটি, যিনি নিশিদিন আর্তনাদ করে বলতেন: আমার সর্বনাশ করল আমার হৃদয়, আমার প্রেম। পারতাম যদি হতে বেদান্তী নিত্য নির্বিকার—তাহলে কত ভাল হতো। কিন্তু পারলাম কই—আমি যে দেখছি "ব্রহ্ম হতে কীট পরমাণু সর্বভূতে সেই প্রেমময়"। আমি ধর্ম-টর্ম বুঝি না—আমি অনুভব করতে শিখেছি—আমি অপরের জন্য feel করতে পারি।

এ হৃদয় কার? স্বামী তুরীয়ানন্দ বললেন: "বুদ্ধও কি ঠিক এমনই অনুভব করেননি, আর এমনই কথা বলেননি।... স্বামীজীর হৃদয়টা যেন প্রকাণ্ড কটাহ, যাতে মানবসংসারের দুঃখ-যন্ত্রণা দগ্ধ হয়ে তৈরি হচ্ছে নিরাময়ের প্রলেপ-ঔষধ।"

বিবেকানন্দ মহাজ্ঞানী, তাঁর অপর সকল গুণাবলীকে ছাপিয়ে উঠেছে তাঁর মনীষা—এই কথার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে আমরা বলতে পারি -বিবেকানন্দ যদি প্রেমিক না হন তবে তিনি কিছুই নন। সেই প্রেম ভারতে তাঁকে করেছে সেবাযজ্ঞের প্রবর্তক-পুরুষ; সেই একই প্রেম পাশ্চাত্যের আত্মার ক্ষুধা নিবারণের জন্য তাঁকে করেছে বেদান্তের বার্তাবহ; হয়ে উঠেছেন নিত্য মানবধর্মের মহত্তম আচার্য। আর এই সবই তিনি করেছেন একটি পরম মানবের টানে—যাঁর সম্বন্ধে মর্মরিত কণ্ঠে বলেছেন: "আমি অনুভব করেছি তাঁর অপূর্ব প্রেম।"

॥ ১২ ॥

প্রসঙ্গ শেষ করে আনি। পুনরুক্তি করি পূর্ব-কথার।

ভারতের প্রান্তে প্রান্তে ভ্রমণ করে স্বামীজী অনুভব করেন—ভারতের প্রাণপাখি ধর্ম। সে-ধর্ম জনজীবনের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে সঞ্চারিত। সাধারণ মানুষের মধ্যে ধর্মের এই ব্যাপক প্রসার তাঁকে চমৎকৃত করেছিল। পরিব্রাজক জীবনে ব্যাপক সংস্কৃতচর্চা করে, বেদ-বেদান্ত পুরাণাদির মধ্যে প্রবেশ করে, অগণিত সাধু-সন্ন্যাসীর সংস্পর্শে এসে ভারতের ধর্ম-সংস্কৃতির উত্তুঙ্গ মহিমার রূপ যেমন তিনি উপলব্ধি করেন, অন্যদিকে তেমনি পথে পথে ঘুরবার সময়ে ভিক্ষাপাত্র হাতে দীন-দরিদ্রের আবাসে দাঁড়িয়ে অনুভব করেছিলেন—ধর্মের শিকড় ছড়িয়েছে কুটিরে কুটিরে। ভারতের দরিদ্র কুটির-বাসীরা হয়ে উঠেছিলেন বিবেকানন্দের প্রত্যক্ষ নারায়ণ। ইতিহাসজ্ঞানে এবং প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতায় তিনি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছিলেন—ভারত-বর্ষ পৃথিবীর ইতিহাসে বিশেষ এক সাধনায় সর্বাধিক ও সর্বোচ্চ শক্তি নিয়োজিত করেছে—অন্তর্জীবন গঠনের সাধনা। এরই নাম ধর্মের সাধনা। পৃথিবীর অপরাপর জাতি যখন বহি-র্জীবনের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য সৃষ্টির সংগ্রামে নিরত, বড়জোর মনোজীবনের সন্ধানে কিছুটা তৎপর,

ভারতবর্ষ তখন আরও গভীরে নেমে আত্মদর্শন করতে চেয়েছে। ফল তার পক্ষে সর্বাংশে ভাল হয়নি। বহির্দেহে দুর্বল হয়ে তাকে অপরের স্বচ্ছন্দ শিকারের বস্তু করেছে। কিন্তু পৃথিবীর ইতিহাসে আত্মদর্শনের এত বড় চেষ্টাও তো আর কোথাও হয়নি। এই সাধনা যদি ভারতবর্ষ থেকে লুপ্ত হয়ে যায় তাহলে কেবল ভারতের নয়, পৃথিবীর সর্বনাশ। স্বামীজী আতঙ্কের সঙ্গে বলেছেন :

"ভারতবর্ষ কি মরবে—মরতে পারে ? ভারতবর্ষ যদি মরে যায় তাহলে পৃথিবী থেকে বিনষ্ট হবে আধ্যাত্মিকতা, বিলুপ্ত হয়ে যাবে নৈতিক আদর্শের চরম প্রকাশগুলি এবং সকল ধর্মের প্রতি মধুর সহানুভূতির ভাব, মৃত্যু হবে ভাবুকতার। আর তার স্থানে দেব-দেবীরূপে রাজত্ব করবে কাম ও বিলাস, অর্থ হবে তার পুরোহিত, তার পূজানুষ্ঠান হবে প্রতারণা, পশুবল ও নিষ্ঠুর প্রতিযোগিতা, এবং বলির বস্তু হবে—মানবাত্মা।"

এই ভারতবর্ষ কি 'সত্য' ভারতবর্ষ, নাকি স্বামীজীর স্বপ্ন-কল্পনার ভারতবর্ষ ?—সন্দিগ্ধ মন এই প্রশ্ন এখন অন্ততঃ করবেই। তার উত্তর—এই ভারতবর্ষকে বিবেকানন্দ পেয়েছেন নিজের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতায়। তাঁর তুল্য বিরাট মনের সত্যবোধের সঙ্গে ক্ষুদ্র মনের সত্যবোধের পার্থক্য হয়ই। বিবেকানন্দের সংস্পর্শে যাঁরা এসেছেন তাঁরা সেই বিরাট মনের আকাশবিস্তার দেখে অভিভূত হয়েছেন। সিস্টার ক্রিস্টিন যখন স্বামীজীকে INDIA (ইন্ডিয়া)—এই পাঁচ অক্ষরের শব্দটি অপূর্ব স্বরে উচ্চারণ করতে শুনেছিলেন, তখনই তাঁর ভারতপ্রেমের জন্ম হয়েছিল। "একেবারে অবিশ্বাস্য মনে হয় যখন ভাবি—পাঁচ অক্ষরের একটি ক্ষুদ্র শব্দে অতকিছু ধরিয়ে দেওয়া যায়! তাতে ছিল—ভালবাসা, জ্বালাময় বাসনা, গর্ব, তীব্র আকাঙ্ক্ষা, পূজা, গভীর বিষাদ, উদ্দীপ্ত শৌর্য, ঘরে ফেরার ব্যাকুলতা—এবং পুনশ্চ ভালবাসা।··· অন্যের অন্তরে প্রেমসঞ্চারের যাদুশক্তি ওর মধ্যে ছিল। যে-ই শুনত, তার কাছে ভারত হয়ে উঠত প্রাণের আকাঙ্ক্ষা। তখন সবকিছুই তাঁর আগ্রহের বস্তু—তার জনগণ, ইতিহাস, শিল্প-সভ্যতা, আচার-ব্যবহার, নদী-পর্বত-উপত্যকা-সমভূমি, তার শিক্ষা-সংস্কৃতি, ধর্মধারণা, শাস্ত্রাদি—সবকিছুই জীবন্ত।"

১৮৯৫ খ্রীষ্টাব্দের নভেম্বর মাসের এক রবিবারের অপরাহ্নে লন্ডন শহরের ওয়েস্ট-এন্ড অঞ্চলের এক বৈঠকখানায় স্বামীজীকে প্রথম দেখেছিলেন লন্ডনের এক শিক্ষয়িত্রী—মিস মার্গারেট নোবল। স্বামীজীর মুখে তিনি দেখেন খুব ধ্যানপ্রবণ মানুষের মুখের কোমলতা, যার রূপ রাফায়েল তাঁর শিশু যীশুর আননে অঙ্কিত করেছেন। আর স্বামীজীকে তিনি মাঝে মাঝে সংস্কৃত স্তোত্র সুর করে আবৃত্তি করতে শুনেছিলেন। স্বামীজীর মনে কি তখন সূর্যাস্তকালে ভারতবর্ষের কোন উদ্যান বা তরুতল বা গ্রামসীমার কূপপার্শ্বে উপবিষ্ট কোন সাধুর চারপাশে ঘিরে বসে থাকা গ্রামবাসীদের স্মৃতি জেগেছিল ? ধরে নিতে পারি, নিবেদিতা কল্পনায় সেই ছবি দেখেছিলেন। তারপর মিস মার্গারেট নোবল হয়েছেন ভগিনী নিবেদিতা। নিবেদিতা কয়েক বছর স্বামীজীর সান্নিধ্যে কাটিয়েছেন, স্বামীজীর সঙ্গে উত্তরভারত ও হিমালয়-ভ্রমণের অনবদ্য স্মৃতিকথা লিখেছেন (বঙ্গানুবাদ—'স্বামীজীর সহিত হিমালয়ে') এবং স্বামীজীর সামগ্রিক রূপ যথাসম্ভব ধরতে চেষ্টা করেছেন এক অমর গ্রন্থে (বঙ্গানুবাদ—'স্বামীজীকে যেরূপ দেখিয়াছি')। নিবেদিতা উপলব্ধি করেছেন—বিবেকানন্দ আর কেউ নন, দেহধারী ভারতবর্ষ। সেই ভারতবর্ষের জন্য নিবেদিতা সর্বস্ব ত্যাগ করেছিলেন। তাঁরও জপমন্ত্র হয়েছিল—'ভারতবর্ষ'।

ভারত-পরিক্রমার শেষপর্বে কন্যাকুমারিকার শিলার ওপরে ধ্যানান্তে স্বামীজীর উচ্চারণ—ভারতবর্ষ!

আর তাঁর শিষ্যা ও কন্যা নিবেদিতার উচ্চারণ ?

"ভারতবর্ষের কথা উঠিলেই তিনি [নিবেদিতা] একেবারে ভাবমগ্না হইয়া যাইতেন। মেয়েদের বলিতেন : 'ভারতবর্ষ, ভারতবর্ষ, ভারতবর্ষ! মা, মা, মা! ভারতের কন্যাগণ, তোমরা সকলে জপ করিবে—ভারতবর্ষ, ভারতবর্ষ, ভারতবর্ষ! মা, মা, মা!' এই বলিয়া নিজের জপমালা হাতে লইয়া নিজেই জপ করিতে লাগিলেন, মা, মা, মা!"[১৬]

আবার বলি, নিবেদিতা ও অন্য অনেকের কাছে বিবেকানন্দ ছিলেন দেহধারী ভারতবর্ষ। □

১৬ নিবেদিতাকে যেমন দেখিয়াছি—সরলাবালা সরকার, সিস্টার নিবেদিতা গার্লস স্কুল, ১৬শ সং, ১৩৭৪, পৃঃ ২২-২৩

## স্মৃতিকথা

# শিকাগো-যাত্রার আগে মাদ্রাজে স্বামী বিবেকানন্দ

### এম. সি. নাঞ্জুণ্ডা রাও

ধন্য সেই কতিপয় ব্যক্তি, যাঁরা দুর্লভ ভাগ্যে অন্ততঃ কয়েকদিনের জন্যও সুমহান স্বামীজীর পায়ের তলায় বসে আমাদের ধর্ম, ইতিহাস, সমাজ-ব্যবস্থা (যে-ব্যবস্থা পাশ্চাত্যের থেকে পৃথক) ইত্যাদি সম্বন্ধে হৃদয়মন্থনকারী শিক্ষা গ্রহণ করতে পেরেছেন। বস্তুতঃপক্ষে সেইসব শান্ত অথচ অত্যন্ত উৎসাহপূর্ণ সম্মিলনগুলি ভোলা সম্ভব নয়, যখন মাদ্রাজ-সমুদ্রতটে সানথোমের নিকটে একটি বাংলোয় [এখন নাম—রমত বাগ] স্বামীজীর কাছে উপস্থিত হতো অগণিত গুণমুগ্ধ বন্ধু এবং কলেজের ছাত্ররা।··· বাংলোর সামনে নীলজলের বিরাট বিস্তার, ওপরে নীলতর আকাশ। ১৮৯৩, মার্চ কি এপ্রিলের কোন এক সময়, মুক্ত আকাশতলে যখন সকলে সমবেত, তখন তাঁকে প্রশ্ন করা হয়েছিল: "স্বামীজী, কৃষ্ণকে নীলবর্ণ করা হয়েছে কেন?" স্বামীজী তখন স্থির গম্ভীর দৃষ্টিতে বিশাল জলরাশির দিকে তাকিয়েছিলেন, সহসা ফিরে বললেন: "কারণ, নীল হলো অনন্তের বর্ণ।"

তারপর প্রসঙ্গ ঘুরে গেল প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দার্শনিকদের আলোচনায়। ছাত্রদের মধ্যে অনেকেই স্পেনসারের দর্শনের বিষয়ে উচ্চ মন্তব্য করলেন। স্বামীজী স্পেনসারের প্রতি আরোপিত প্রশংসাকে উদারভাবে স্বীকার করলেন, এমনকি যোগ করে দিলেন: "স্পেন্সারের 'আননোয়েবল' কী?—ও-তো আমাদের মায়া।" কিন্তু তৎক্ষণাৎ আবার তীক্ষ্ণভাবে প্রত্যুত্তরও দিলেন: "এইসব পাশ্চাত্য দার্শনিকেরা 'অজ্ঞেয়'-কে নিয়ে ভীত। অপরদিকে আমাদের দার্শনিকেরা অজ্ঞাতের মধ্যে বিরাট লাফ দিয়ে পড়েছেন এবং তাকে জয় করেছেন। এই হলো, দর্শন সম্বন্ধে পাশ্চাত্যের লম্বা বচনের সঙ্গে প্রাচ্যের উপলব্ধ-জীবনের পার্থক্য। তোমাদের পাশ্চাত্য দার্শনিকেরা শকুনের মতো, আকাশের অনেক উঁচুতে উড়ে বেড়ায়, কিন্তু সর্বসময়ে তাদের চক্ষু নিবদ্ধ থাকে নিচের পচা মড়ার দিকে। অজ্ঞেয়কে তারা অতিক্রম করতে পারে না, তাই তারা পিছিয়ে আসে এবং কদাপি সর্বশক্তিমান ডলারের উপাসনা ত্যাগ করতে পারে না। পাশ্চাত্যদেশে যথার্থ ত্যাগের ধর্ম নেই। একথা সত্য, অনেকে ত্যাগ করে—দারুণ আত্মত্যাগ, কিন্তু সে-কাজ করবার সময়ে সর্বদাই প্রশংসা ও পূজাপ্রাপ্তির দিকে মন পড়ে থাকে, যাতে করে অধিকতর মার্জিত, বৃহত্তর শক্তি-লাভ করতে পারে। যথার্থ আত্মত্যাগ থাকে বলে—একেবারে আত্মবিলয়, সে-বস্তু কেবল দেখা যাবে আমাদের কিছু শ্রেষ্ঠ মুনি-ঋষিদের জীবনে। একথা ঠিক, অনেকে পার্থিব বস্তু ত্যাগ করে, কিন্তু তা করে তথাকথিত অতিপ্রাকৃত সূক্ষ্ম শক্তি, সিদ্ধাই ইত্যাদি পাবার জন্য।"

"তাহলে হিন্দুধর্মের মূলকথা কি?"—কলেজের এক অধ্যাপক জিজ্ঞাসা করলেন। স্বামীজী তৎক্ষণাৎ উত্তর দিলেন: "হিন্দুধর্মের মূলবস্তু হলো—ঈশ্বরে বিশ্বাস, নিত্যসত্যরূপে বেদে বিশ্বাস এবং কর্ম ও জন্মান্তরবাদে বিশ্বাস।"

"হিন্দুধর্ম ও অপর ধর্মসমূহের মধ্যে এক পার্থক্য এই—হিন্দুধর্ম বলে, মানুষ সত্য থেকে সত্যে অগ্রসর হয়, নিম্নতর সত্য থেকে উর্ধ্বতর সত্যে—মিথ্যা থেকে সত্যে নয়। কেউ যদি খুঁটিয়ে বেদ পড়েন দেখবেন যে, সেখানে কেবল সমন্বয়ের ধর্মই আছে। বিবর্তন-তত্ত্বের আলোকেই বেদ পড়া উচিত। বেদের মধ্যে ধর্মীয় বিবর্তনের সমগ্র ইতিহাস রয়েছে—যার চরম পরিণতি অদ্বৈতবাদ। হিন্দুধর্মে নেই এমন কোন নতুন ধর্মীয় ভাবনা সম্ভব নয়।"

এই বিষয়টির দৃষ্টান্ত দিতে স্বামীজী পুনশ্চ বললেন: "রসায়ন যেমন অগ্রসর হতে পারে না যখন সে এমন একটি মূলদ্রব্যে পেঁৗছে যায় যার থেকে অপর মূলদ্রব্যগুলি বিভক্ত করা সম্ভবপর; পদার্থ-বিদ্যা যেমন অগ্রসর হতে পারে না যখন মূল-শক্তিতে সে পেঁৗছে গেছে, অপর সমস্তই যার বিকাশ ভিন্ন আর কিছু নয়, তেমনি অদ্বৈতে পেঁৗছাবার

পরে আর ধর্ম অগ্রসর হতে পারে না, এবং হিন্দুধর্ম সেই ধর্ম।"

"আপনার ধর্ম কী?"—এই প্রশ্ন যখন তাঁকে করা হলো তখন এই মহিমান্বিত উত্তর এসেছিলঃ "আমার ধর্ম হলো তা-ই—খ্রীস্টানধর্ম যার প্রশাখা এবং বৌদ্ধধর্ম বিদ্রোহী সন্তান।" সেকথা বলার পরে স্বামীজী হিন্দু ও পৃথিবীর অপরাপর জাতির পার্থক্যের প্রশ্নটি তুলে ধরেছিলেনঃ "পৃথিবীতে প্রগতির দুই ধারা দেখতে পাওয়া যায়; এক, রাজনৈতিক; দুই, ধর্মীয়। প্রথম ক্ষেত্রে গ্রীকরাই সবকিছু করে গেছে; আধুনিক রাজনৈতিক সংগঠন ও ধারণাসমূহ গ্রীক-চিন্তারই বিকাশ। দ্বিতীয় ক্ষেত্রে সবকিছু করেছে হিন্দুরা। হিন্দুদের মধ্যে খুবই প্রাচীন যুগে ধর্মের ক্ষেত্রে অত্যন্ত অগ্রগতি হয়েছিল। প্রত্যেক বস্তুর মধ্যে অতি সূক্ষ্মকে উপলব্ধি করবার যে তীক্ষ্ণ অনুভূতি তাদের মধ্যে জেগেছিল, তার জন্য তারা জীবনের ক্ষেত্রে উর্ধ্বতর যে দ্বিতীয় দিকটি আছে তাকেই সর্বদা গ্রহণ করেছিল, ফলে হিন্দুদের এই অবস্থা। এখন সময় এসেছে—হিন্দুদের উচিত পাশ্চাত্যজগৎ থেকে কিছু বর্বরতা শিখে নিয়ে বিনিময়ে তাদের কিছু মানবতার শিক্ষা দেওয়া।"

"বর্তমান হিন্দুধর্ম কেবল ছুৎমার্গ। এবং এদেশে পাশ্চাত্য সম্বন্ধে হয় উদাসীনতা, নয় নকল-প্রবণতা—সামাজিক ব্যাপারে কেবল নয়, ধর্ম-ব্যাপারেও। পাশ্চাত্যের লোক হিন্দুধর্মের ছিটে-ফোঁটা নিয়ে তাকে বিকৃত করে যেভাবে হাজির করেছে [ অর্থাৎ থিয়জফি ]—তাকে অনুসরণ করার ইচ্ছা দেখলেই শেষোক্ত ব্যাপারটি বোঝা যায়।"

স্বামীজী আলোচনা শেষ করলেন এই সতর্ক-বাণী করে, "যদি প্রয়োজন হয়, সমাজব্যবস্থার উন্নতি করো, বিধবাদের বিয়ে দাও, জাতিপ্রথার মাথায় বাড়ি মারো, কিন্তু ধর্মকে ত্যাগ করো না। সামাজিক ব্যাপারে প্রগতিশীল হও কিন্তু ধর্ম-ব্যাপারে রক্ষণশীলতা রেখো।"

"তিনটি বই আমি অত্যন্ত ভালবাসি এবং প্রায়ই তাদের সঙ্গে নিয়ে ফিরি—'গীতা', এডউইন আর্নল্ডের 'লাইট অব এশিয়া' এবং টমাস আ কেম্পিসের 'ইমিটেশন অব ক্রাইস্ট'।"

"এই পৃথিবীতে তিন দেহধারী দেবতা—শ্রীকৃষ্ণ, বুদ্ধ এবং খ্রীস্ট। এঁরা সকলেই খাঁটি, কারণ প্রত্যেকেই একটি বিরাট ভাব প্রচার করতে এসে-ছিলেন। এঁদের মধ্যে প্রাচীনতম শ্রীকৃষ্ণ। অমর গীতায় ব্যক্ত তাঁর শিক্ষা মহত্তম, বৃহত্তম, সর্বভাব অঙ্গীকারকারী। গীতার কেন্দ্রীয় ভাব হলো, পার্থিব বিষয়ে নির্লিপ্তি। যদি এই পৃথিবীর কোন-কিছুকে ভালবাসা যায়—পিতামাতা, স্ত্রী-পুত্র, স্বামী-পুত্র, ধনসম্পদ, নাম-যশ—সে-ভালবাসায় আসক্তি থাকলে কেবলই দুঃখ আসবে। তাই ঈশ্বরই হোন একমাত্র আকাঙ্ক্ষার বস্তু, আর কিছু নয় এবং সর্বকর্মফল অর্পিত হোক তাঁর ওপরে। সর্বং শ্রীকৃষ্ণার্পণমস্তু। ঈশ্বরের প্রতি এই সম্পূর্ণ বিশ্বাস নিয়ে কাজ করা উচিত। কাজ, কাজ, কাজ, দিবা-রাত্র কাজ করো—গীতা বলেছেন। কাজ ছেড়ে পালানো শান্তির পথ নয়।"... স্বামীজী আরও বললেনঃ "কাজের চরিত্র নিয়ে মাথা ঘামিও না। মনকে কেবল জিজ্ঞাসা করো, তুমি নিঃস্বার্থ কিনা? তা যদি হও কোনকিছুতে ভ্রূক্ষেপ করো না, কাজে ঝাঁপিয়ে পড়ে সামনে যে-কর্তব্য আছে তা যদি পালন করে যাও, তাহলেই তুমি গীতার সত্য উপলব্ধি করবে।"... স্বামীজী আরও বললেনঃ "প্রত্যেক কাজই পবিত্র। পৃথিবীর কোন কাজকে নীচ কাজ বলার অধিকার তোমার নেই। ঝাড়ুদারের কাজের সঙ্গে সম্রাটের রাজ্যচালানোর কাজের মধ্যে ভাল-মন্দ কোন পার্থক্য নেই।"

"একদিন ডাঃ [মহেন্দ্রলাল] সরকার ও তাঁর এক বন্ধু কলকাতার রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিলেন, এমন সময়ে মলভর্তি টব মাথায় নিয়ে এক মেথর সামনের দিক থেকে এসে তাঁদের কাটিয়ে উল্টোদিকে চলে গেল। এমনই বিশ্রী দুর্গন্ধ ছড়াল যে, ডাঃ সরকারের বন্ধু নাকে কাপড় চাপা দিলেন, কিন্তু ডাঃ সরকার কোন প্রকার বিকার না দেখিয়ে পথ চলতে লাগলেন। বন্ধুটি অবাক হয়ে গেলেন, কারণ ডাঃ সরকারের খুঁতখুঁতে শুচিবাই স্বভাবের কথা তিনি জানতেন—যিনি, তাঁর স্ত্রী প্রতিটি গম বেছে পরীক্ষা করে ভাঙতে দিলে তবে রুটি খেতেন। বন্ধুটি তাই প্রশ্ন করলেন, 'কি ব্যাপার, তোমার ঘ্রাণশক্তি কি নষ্ট হয়ে গেছে?' ডাঃ সরকার উত্তর দিলেন, 'মশায়,

আমরাই লোকটিকে ঐ অবস্থায় নিয়ে গেছি। সে যখন আমারই পরিত্যক্ত জিনিস মাথায় করে নিয়ে যাচ্ছে, তখন আমি নাকে চাপা দিয়ে সরে দাঁড়াব' ?"

স্বামীজী বলেছিলেন, ভগবান বুদ্ধের বাণীও একই প্রকার, যদিও নিজ কালের উপযোগী করে ভিন্ন ভাষায় ব্যক্ত। তাঁর শিক্ষা ছিল, স্বার্থপরতা ত্যাগ করো ; যা-কিছু তোমাকে স্বার্থপর করে তাকে ত্যাগ করো ; প্রেমের চতুরাঙ্গ পথে অগ্রসর হও। স্বামীজী বললেন : "যখনই তুমি স্বার্থের পথ ধরলে, অমনি তোমার মধ্যেকার খাঁটি লোকটি সরে গেল—তুমি দাস হয়ে পড়লে। সময় বয়ে যাচ্ছে। এ-পৃথিবী সান্ত এবং দুঃখময়। শিশু এই পৃথিবীতে প্রথম প্রবেশের কালে কোন্ উচ্চারণ করে স্মরণ কর —সে কাঁদে। হ্যাঁ, শিশু প্রথমেই কাঁদে। তাই সত্য। এই পৃথিবী কাঁদবারই জন্য। যখন এই মহাসত্য জানব, তখন আর স্বার্থপর হতে পারব না।"

স্বামীজী বললেন : "অপর একজন মহান বার্তাবহ হলেন নাজারেথের যীশু। তাঁর বাণীও একই প্রকার—দেখো, নিকটেই ঈশ্বরের রাজ্য ; অনুতপ্ত হও ; আমাকে অনুসরণ কর। যে নিজ পিতা-মাতাকে আমার অপেক্ষা ভালবাসে, সে আমার যোগ্য নয়। যে নিজ পুত্র-কন্যাকে আমার অপেক্ষা ভালবাসে, সে আমার যোগ্য নয়। এবং যে তাঁর ক্রুশকাষ্ঠ গ্রহণ করে আমার অনুগমন না করে, সে আমার যোগ্য নয়। খ্রীস্ট আরও বলেছিলেন, সিজারের পাওনা মিটিয়ে দাও সিজারকে, ঈশ্বরের পাওনা দাও ঈশ্বরকে। সাংসারিক নাগরিক দায়-দায়িত্ব পালন কর, কিন্তু হৃদয় রেখো ঈশ্বরে।"

প্রশ্ন করা হলো : "আর কি কোন শিক্ষক নেই ?" "নিশ্চয় আছে", স্বামীজী বললেন : "কেন, মহম্মদ —সাম্যের মহান আচার্য যিনি। নিজ ধর্মসম্প্রদায়ের মধ্যে অন্ততঃ বাস্তবে এই সাম্যাদর্শ তিনি কার্যকরী করেছিলেন। নিজ জীবনের দৃষ্টান্তে মহম্মদ দেখিয়ে গেছেন, মুসলমানদের মধ্যে পুরো সাম্য ও ভ্রাতৃত্ববোধ থাকবে, জাতি-সম্প্রদায়-বর্ণ কোন কিছুর পার্থক্য থাকবে না। কোন হিন্দুকে কিংবা আফ্রিকার নিগ্রোকে মুসলমানেরা কাফের বলে ঘৃণা করে, কিন্তু যে-মুহূর্তে সে মুসলমান হয়ে গেল, তখনি যতবড় সম্ভ্রান্ত মুসলমানই হোক তার থালা থেকে আহার্য তুলে সে খেতে পারে। আর আমরা, হিন্দুরা, কি করি ?" স্বামীজী আর্তনাদ করে বললেন : "আমাদের ছোট সম্প্রদায়টির বাইরে যদি কেউ আমাদের খাদ্য স্পর্শ করে, তখনি তাকে ছুঁড়ে ফেলে দিই। আমাদের দর্শনে মহান তত্ত্ব আছে, কিন্তু আমাদের দুর্বলতা হলো তাকে বাস্তব জীবনে আমরা প্রয়োগ করি না। মহম্মদের মহিমা এইখানে, জাতি-বর্ণ-নির্বিশেষে [ নিজ সম্প্রদায়ের মধ্যে ] তিনি পুরো সাম্য বলবৎ করেছিলেন। কেউ তাঁর ধর্ম গ্রহণ করলে তাকে বর্ণ-পার্থক্যের জন্য ভাই বলতে তাঁর বাধা হয়নি।"

প্রশ্ন করা হলো : "পৃথিবীতে কি আরও মহান আচার্য আসবেন না ?" "নিশ্চয় আসবেন", স্বামীজী উত্তর দিলেন : "আরও অনেক আচার্য ইতিমধ্যে হয়েছেন, আরও অনেক হবেন। কিন্তু তাতে কি এসে যায় ? ওসব নিয়ে মাথা ঘামিও না। আমি বরং চাই, তোমাদের প্রত্যেকেই আচার্য হয়ে ওঠ, কারণ তোমাদের প্রত্যেকের মধ্যেই সেই সম্ভাবনা আছে। পূর্বের বিরাট আচার্যেরা সকলেই মহান ছিলেন। প্রত্যেকেই কিছু-না-কিছু আমাদের জন্য দিয়ে গেছেন। তাঁরা আমাদের কাছে ঈশ্বর। আমরা তাঁদের নমস্কার করি। আমরা তাঁদের দাস। এইসকল আচার্যকে শ্রদ্ধা করতে হবে। কিন্তু তাঁদের শিক্ষার সঙ্গে অবশ্যই যুক্ত করতে হবে নিজেদের উপলব্ধি—স্বয়ং তোমাকে প্রফেট হতে হবে। এ-কাজ অসম্ভব কিছু নয়, কারণ এইসকল মহান আচার্যরা যদি ঈশ্বরের পুত্র হন, আমরাও তো তাই। তাঁরা সিদ্ধিলাভ করেছেন, আর আমরা এখন সেই পথে চলেছি। যীশু-বাক্য স্মরণ কর— ঈশ্বরের রাজ্য নিকটেই। এসো, এই মুহূর্তে আমরা প্রত্যেকে এই দৃঢ়প্রতিজ্ঞা করি—আমরা প্রফেট হব ; আমরা আলোকের দূত হব ; আমরা ঈশ্বরতনয় হব ; আমরা ঈশ্বর হব।

"সেন্ট পল বলেছেন, দুরকম শক্তি রয়েছে ঈশ্বরের—Graces of the Spirit এবং Powers of the Spirit। উচ্চ আধ্যাত্মিকতা নেই, এমন মানুষও মনঃসংযোগের জোরে Powers of the Spirit অর্জন করতে পারেন, কিন্তু ধর্মানুভূতি, পরিত্রাণ বা মুক্তি Graces of the Spirit ভিন্ন

পাওয়া সম্ভব নয়। সেই ঈশ্বর-করুণায় অভিষিক্ত যাঁরা, তাঁরা জ্যোতির্ময় পুরুষ; তাঁদের মধ্য দিয়ে বিচ্ছুরিত হয় প্রেম আলোক আনন্দ অমৃত।”

শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ ভট্টাচার্যের সমুদ্রতীরের বাড়ি। অপরূপ চন্দ্রালোকিত রাত্রি। স্বামীজী সর্বোত্তম ভাবাবেশে আছেন। তাঁর মুখ সত্যই প্রদীপ্ত; সুস্মিত সৌম্য দেহ থেকে আলোক বিচ্ছুরিত হয়ে তাঁর চারপাশে যেন জ্যোতির্বলয় সৃষ্টি করেছে। একটু আগেই গান গাইছিলেন, যা প্রাণের ভিতরকে পর্যন্ত নাড়িয়ে দিয়েছে।... মহামায়ার কাছে পরিপূর্ণ আত্মসমর্পণের সুমহান সঙ্গীত। ভাববিহ্বল কণ্ঠে গানটি একটু একটু করে অনুবাদ করে শোনাচ্ছিলেন। সেই স্মরণীয় সন্ধ্যায় সেখানে সমবেত সকলে নিঃশ্বাস রোধ করে সেই গান শুনছিল। গান শেষ হলে অসীম স্তব্ধতা, যা সকলকে সন্ত্রস্ত সম্ভ্রমে অভিভূত করে দিয়েছিল। স্বামীজী আবার যখন কথা আরম্ভ করলেন, তখনই নীরবতা ভাঙল। তিনি বললেন, কখনো কখনো কিভাবে তাঁর ওপরে শক্তি ভর করে, তখন তিনি একেবারে বদলে যান; সেই সময়ে যারা তাঁর সংস্পর্শে আসে কিভাবে তিনি তাদের বদলে দেন। তিনি বলে চললেন, ঐসব সময়ে তাঁর মনে হয়, একটা বিরাট শক্তি তাঁর দেহের অণু-পরমাণুর মধ্যে শিহরিত হয়ে ছড়িয়ে পড়ে চারপাশে—প্রভাবিত করে সমস্ত কিছুকে। যদি তখন কেউ তাঁকে স্পর্শ করে, তার সমাধির অনুভূতিলাভ হয়, চিররহস্যের দ্বার তার কাছে খুলে যায়, পার্থিব আকর্ষণ ছিন্ন হয়ে যায়, সহস্র বর্ষের সাধনার ফল সে এক মুহূর্তে লাভ করে। স্বামীজী যেই এই কথা শেষ করেছেন, সহসা শ্রোতাদের মধ্য থেকে একজন উঠে পড়ে স্বামীজীর কাছে এগিয়ে এসে তাঁর দুই পা আঁকড়ে ধরলেন। ইনি পরলোকগত পি. সিঙ্গারাভেলু মুদালিয়র; তখন মাদ্রাজ ক্রীশ্চান কলেজের পদার্থবিদ্যার অধ্যাপক; স্বামীজী এঁকে আদর করে 'কিডি' বলে ডাকতেন। সেই নামেই ইনি বেশি পরিচিত। মহাপ্রাণ মানুষ, ঐকান্তিকতার প্রতিমূর্তি। নিজ বিশ্বাসকে কর্মে পরিণত করতেন নির্ভয় সাহসে। সিঙ্গারাভেলু স্বামীজীর পদধারণ করলে স্বামীজী দুই হাতে তাঁকে স্পর্শ করে আশীর্বাদ করলেন। কিন্তু বললেনঃ “এ তুমি কী করলে? এতখানি ঝুঁকি নিলে কেন? সে যাই হোক, এর পরিণাম থেকে তোমার অব্যাহতি নেই।”[১] ঠিক তখনি আমরা সকলে দেখলাম, সিঙ্গারাভেলুর মুখে চরম তৃপ্তির আলো। সেই মুহূর্তে তিনি কী অনুভব করেছিলেন কেউ জানে না, কারণ বহু অনুরোধেও এবিষয়ে কিছু বলেননি, কিন্তু এটি অন্ততঃ স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল—সেদিন থেকে তিনি সম্পূর্ণ ভিন্ন মানুষ। তিনি সংসার ত্যাগ করেছিলেন—স্ত্রী-পুত্রাদি সবকিছু—অধ্যাপনা ছেড়ে দিয়েছিলেন—অতঃপর শুধু স্বামীজীর কাজই করে গেছেন। তাঁকে যাঁরা জানতেন তাঁদের সকলেরই মনে আছে, জীবনের শেষ পর্যন্ত তিনি সন্ন্যাসীর জীবনযাপন করে গেছেন—ঘণ্টার পর ঘণ্টা নিমজ্জিত থেকেছেন সাধনায় ও ধ্যানে।* □

১ অধ্যাপক শংকরীপ্রসাদ বসুর সংযোজনঃ স্বামীজীকে দিব্য ভাবানুভূতির ক্ষণে স্পর্শ করার 'ভয়ংকর' অর্থ স্বামীজী জানতেন। তিনি সভয়ে ভেবেছিলেন—কোন্ প্রেরণায় বিষদংশন কিডি স্বেচ্ছায় গ্রহণ করলেন। স্বামীজীর সানন্দ ভীতি ফুটে উঠেছে কিডিকে লেখা ১৮৯৪-এর ২১ সেপ্টেম্বরের পত্রে।

“তোমার এত শীঘ্র সংসারত্যাগের সংকল্প শুনে দুঃখিত হলাম। ফল পাকলে আপনি গাছ থেকে পড়ে যায়। অতএব সময়ের অপেক্ষা কর। তাড়াতাড়ি করো না। বিশেষতঃ কোন আহাম্মকি করে অপরকে কষ্ট দেবার অধিকার কারো নেই, সবুর কর। ধৈর্য ধর, সময়ে সব ঠিক হয়ে যাবে।”

স্বামীজীর সদুপদেশ শুনে কিডি কি বলেছিলেন জানি না। কিডির ভিতরকার চোরকে চুরি করতে বলে, কিডির বাইরের গৃহস্থকে সাবধান হতে বলার রসিকতা তিনি কতদূর উপভোগ করেছিলেন তাও জানি না। কিংবা জানি না, কিডি দ্বিতীয়ভাগের ভুবনের মতো মৃত্যুর আগে (এখানে অমর মরণ সগৌরবে) বলেছিলেন কিনা—পিতঃ, তুমিই আমার ফাঁসির কারণ!!

* 'বেদান্ত কেশরী' পত্রিকার ১৯১৪-১৯১৬-এর মধ্যে কয়েকটি সংখ্যায় ডঃ নাঞ্জুণ্ডা রাও স্বামীজীর স্মৃতিচারণ করেছিলেন। তার কিছু অংশ এখানে অনুবাদ করেছেন অধ্যাপক শংকরীপ্রসাদ বসু।—সম্পাদক, উদ্বোধন

নিবন্ধ

# 'যখন কেউটে গোখরোতে ধরে'

## স্বামী প্রমেয়ানন্দ

"রামকৃষ্ণ-লীলাকথা অমৃত-লহরী,
শুনিলে সহজে যায় ভবসিন্ধু তরি।"[১]

পূর্ব সংস্কারের প্রবল প্রতাপ স্মরণ করে বকলমা-লাভে ধন্য গিরিশের মতো ভক্তও যখন সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত ও ভয়শূন্য হতে পারছেন না, তখন একদিন শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁকে বলছেন: "এ-কি ঢোঁড়া সাপে তোকে ধরেছে রে শালা? জাতসাপে ধরেছে—পালিয়ে বাসায় গেলেও মরে থাকতে হবে! দেখিস নে? ব্যাঙগুলোকে যখন ঢোঁড়া সাপে ধরে, তখন ক্যাঁ-ক্যাঁ-ক্যাঁ-ক্যাঁ করে হাজার ডাক ডেকে তবে ঠাণ্ডা হয় (মরে যায়), কোনটা বা ছাড়িয়ে পালিয়েও যায়; কিন্তু যখন কেউটে গোখরোতে ধরে, তখন ক্যাঁ-ক্যাঁ-ক্যাঁ তিন ডাক ডেকেই আর ডাকতে হয় না, সব ঠাণ্ডা। যদি কোনটা দৈবাৎ পালিয়েও যায় তো গর্তে ঢুকে মরে থাকে।—এখানকার সেইরূপ জানবি।"[২] আমরা এখানে 'কেউটে গোখরোতে' ধরলে কি হয় তার কয়েকটি ঘটনার কথা উল্লেখ করছি।

১৯০৮ খ্রীস্টাব্দ। স্বামী ব্রহ্মানন্দ ব্যাঙ্গালোরে গেছেন শশী মহারাজের (স্বামী রামকৃষ্ণানন্দের) সঙ্গে। ওখানে যাওয়ার পর ব্রহ্মানন্দজীর সেবক স্বামী উমানন্দ হঠাৎ বসন্ত রোগে আক্রান্ত হন। চিকিৎসার জন্য তাঁকে স্থানীয় হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। শশী মহারাজ রোজই উমানন্দকে দেখতে হাসপাতালে যেতেন। উপযুক্ত চিকিৎসা ও সেবা-শুশ্রূষা সত্ত্বেও রোগ ক্রমশঃ বৃদ্ধি পেতে থাকে এবং শেষ পর্যন্ত ডাক্তাররাও রোগীর আরোগ্যের আশা ছেড়ে দেন। রোগীও তা বুঝতে পেরে স্বামী ব্রহ্মানন্দকে একটিবার দর্শন করবার ঐকান্তিক ইচ্ছা শশী মহারাজের নিকট নিবেদন করলেন। মুমূর্ষু রোগীর কাতর প্রার্থনার কথা শশী মহারাজ ব্রহ্মানন্দজীকে জানালেন। তা সত্ত্বেও ব্রহ্মানন্দজী কিন্তু রোগীকে দেখতে গেলেন না। কয়েকদিনের মধ্যেই উমানন্দের জীবনাবসান ঘটল। শশী মহারাজ গম্ভীর মুখে সেই সংবাদ ব্রহ্মানন্দজীকে দিলেন; কিন্তু মনের মধ্যে যে অভিমান সুপ্ত ছিল তা তখনই ব্যক্ত করলেন না। দু-একদিন পরে মর্মবেদনা আর চেপে রাখতে না পেরে তিনি ব্রহ্মানন্দজীকে জিজ্ঞাসা করলেন: "মহারাজ, সেবকের প্রতি আপনি এত নিষ্ঠুর হলেন কেন?" উত্তরে ব্রহ্মানন্দজী বললেন: "শশী, তুমি কি মনে কর চোখের দেখাই একমাত্র দেখা? উমানন্দের জন্য আমার প্রাণ কেমন করছিল তা কি তুমি জান? আর সে আমার দেখা পায়নি তা-ও বা তুমি কি করে জানলে?" শশী মহারাজ বুঝলেন, ঈশ্বরকোটি গুরু শিষ্যকে শেষ সময়ে সূক্ষ্মদেহে দর্শনদানে কৃতার্থ করেছিলেন।[৩]

প্রাকৃত জনের দৃষ্টিতে এমন ঘটনা অস্বাভাবিক বলে মনে হলেও আধ্যাত্মিক পুরুষদের কাছে নয়। তাঁরা যেখানেই অবস্থান করুন না কেন আধ্যাত্মিক শক্তিবলে স্থানান্তরে আসীন যেকোন ব্যক্তি, এমনকি সমাজকে পর্যন্ত তাঁর ভাবে ভাবিত করতে, তাঁর শক্তি দ্বারা শক্তিমান করতে সক্ষম। শুধু তাই নয়, গুরুপদে আরূঢ় এমন মহামানব বহু দূরে থেকেও তাঁর শিষ্যের বা শিষ্যস্থানীয় জনের সর্বাঙ্গীণ কল্যাণ, এমনকি ভবসমুদ্র পারের ক্ষমতা প্রদান করতেও সমর্থ। স্বামী ব্রহ্মানন্দ ছিলেন তেমনি এক অলোকসামান্য মহাপুরুষ। তাই প্রিয়তম শিষ্যের অন্তিমকালে তাঁর পাশে সশরীরে উপস্থিত না হয়েও সূক্ষ্মদেহে এসে তাঁকে হাত ধরে অমৃত-লোকে নিয়ে গেছেন।

স্বামী পুরুষোত্তমানন্দ শ্রীশ্রীমায়ের সন্তান। অতি সরল ও সহৃদয় সাধু। সমস্ত জীবনই শ্রীশ্রীঠাকুরের কাজের জন্য কঠোর পরিশ্রম করেছেন বয়স হয়েছিল প্রায় সত্তরের কাছাকাছি। দুরারোগ্য ব্যাধিতে ভুগছেন। চিকিৎসার জন্য কলকাতায় এক হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। কিন্তু এমনই এক অসুখ যে, চিকিৎসায় সুফল হওয়া তো দূরের কথা, অবস্থা দিন দিন খারাপই হচ্ছে। কিন্তু রোগী তা নিয়ে কখনো কোন অভিযোগ করেননি

১ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পুঁথি—অক্ষয়কুমার সেন, উদ্বোধন কার্যালয়, ৯ম সং, ১৩৮৩, পৃঃ ৪২২
২ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ—স্বামী সারদানন্দ, উদ্বোধন কার্যালয়, ২য় ভাগ, ১৩৮৩, গুরুভাব-উত্তরার্ধ, পৃঃ ১১৮-১১৯
৩ উদ্বোধন, ৫২তম বর্ষ, ৬ষ্ঠ সংখ্যা, পৃঃ ২১৪-২১৫

বা শারীরিক যন্ত্রণার কথা পর্যন্ত প্রকাশ করেননি। মুখে সর্বদাই পরিতৃপ্তির হাসি। প্রায় ছমাস হাসপাতালে থাকবার পর ওখানেই তাঁর দেহান্ত হয়। তাঁর অন্তিম মুহূর্ত খুবই উদ্দীপনাপূর্ণ। মৃত্যুর প্রাক্‌কালে তাঁর অদ্ভুত এক দিব্যদর্শন হয়। অসুস্থতার জন্য ঐ সময় যদিও তিনি অত্যন্ত দুর্বল হয়ে পড়েছিলেন, এমনকি ওঠা-বসার ক্ষমতা পর্যন্ত ছিল না, তথাপি মৃত্যুর কয়েক মিনিট আগে হঠাৎ তিনি বিছানায় উঠে বসলেন এবং শ্রীশ্রীঠাকুরের নাম করতে লাগলেন। তার কিছুক্ষণ পরই তিনি বলে উঠলেনঃ "মা, তুমি এসেছ! দাঁড়াও আমি আসছি।" এই বলেই পার্শ্ববর্তী বিছানার রোগীদের সম্বোধন করে বললেনঃ "আপনারা কি জেগে আছেন? আমার সময় এসেছে, আমি চললাম।" এই কথা বলতে বলতে তিনি স্থিরভাবে হৃষ্টচিত্তে নশ্বর দেহ ত্যাগ করলেন। শ্রীশ্রীমা একদা তাঁর জনৈক সন্তানকে অভয় দিয়ে বলেছিলেনঃ "আমার ওপর ভার দিয়ে নিশ্চিন্ত থাক। আর এটা সর্বদা স্মরণ রেখো যে, তোমাদের পেছনে এমন একজন রয়েছেন যিনি সময় আসলে তোমাদের সেই নিত্যধামে নিয়ে যাবেন।"[৪] স্বামী পুরুষাত্মানন্দের অন্তিম মুহূর্তের এই দিব্যদর্শন সন্তানকে অমৃতধামে নিয়ে যাওয়ার জন্য ভবভয়হারিণী শ্রীশ্রীমায়ের আবির্ভাবই সূচনা করে। গ্রন্থাদিতে আমরা শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীশ্রীমা ও স্বামীজীর আশ্বাসবাণী পড়ে ক্ষণিক স্বস্তি পাই বটে, কিন্তু আমাদের মধ্যে কারও জীবনে যদি সে-সব আশ্বাসের সত্যতা প্রতিফলিত হতে দেখি, তবে আমাদের মতো সাধারণ মানুষের সন্দেহপ্রবণ মন খুব স্বাভাবিকভাবেই দৃঢ়প্রত্যয়ে প্রত্যয়িত হয়, দৃঢ় পদক্ষেপে এগিয়ে যাওয়ার অনুপ্রেরণা লাভ করে।

মনে পড়ছে স্বামী নিত্যস্থানন্দের কথা। বয়স মাত্র তেত্রিশ বছর। সঙ্ঘগুরু স্বামী শঙ্করানন্দজীর মন্ত্রশিষ্য। স্বামীজীর জন্মশতবর্ষ-জয়ন্তী উপলক্ষে তিনি সুদূর কালাডি থেকে বেলুড় মঠে এসেছিলেন। উৎসব শেষে ফেরার পথে নাগপুর আশ্রমে নেমেছেন, কয়েক দিন ওখানে থাকবেন বলে। ওখানে থাকাকালীন একদিন আশ্রমবাড়ির দোতালার বারান্দায় দাঁড়িয়ে তিনি প্রাচীন একজন সাধুর সঙ্গে কথা বলছিলেন। কথা বলতে বলতে হঠাৎ অসাবধানতাবশতঃ হোক বা অন্য কোন কারণে হোক, দোতালা থেকে তিনি নিচে পড়ে যান। ফলে মাথার খুলি এবং ডান দিকের 'কলার বোন' (Collar bone)-এ ফ্র্যাকচার (fracture) হয়। চিকিৎসার জন্য অবিলম্বে তাঁকে হাসপাতালে নিয়ে গিয়ে ভর্তি করা হলো। কিন্তু চিকিৎসকদের সব রকমের চেষ্টা ব্যর্থ করে দশদিন পর হাসপাতালেই তাঁর মৃত্যু হয়। যদিও পড়ে যাওয়ার পর থেকে জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত তাঁর কোন বাহ্যিক জ্ঞান ছিল না, কিন্তু সর্বক্ষণই তিনি তাঁর ইষ্টমন্ত্রটি স্পষ্টভাবে উচ্চারণপূর্বক জপ করে যাচ্ছিলেন।

স্বামী নিত্যস্থানন্দের প্রয়াণকালে সংঘটিত আশ্চর্য ঘটনাটি আমাদের বিস্মিত করে একটানা দশদিন তাঁর সংজ্ঞাহীন অবস্থায় থাকার কালে স্বতঃস্ফূর্তভাবে হৃদয়োৎসারিত ইষ্টমন্ত্রের স্পষ্ট উচ্চারণ সাধারণের বুদ্ধির অগম্য। বাইরে যিনি সংজ্ঞাহীন, অন্তরের অন্তস্তলে তাঁর চলেছিল ইষ্টমন্ত্রের রণন। বাহ্যিক উচ্চারণ ছিল তারই অনুরণনমাত্র। স্বামী নিত্যস্থানন্দের স্বল্প পরিসর জীবনে এমন কী সুকৃতি ছিল, তা আমাদের জানা নেই। কিন্তু যেটি জানা আছে সেটি হলো জীবন-প্রভাতে তিনি এমন এক সদ্‌গুরুর কৃপালাভে ধন্য হয়েছিলেন যে, জীবনাবসানকালে অচৈতন্য অবস্থাতেও চৈতন্যালোকে হৃদয়গহ্বর হয়ে উঠেছিল আলোকিত। সেই আলোকপথ বেয়ে অমৃতলোকে উত্তরণের ব্যবস্থা করে রেখেছিলেন ভবসমুদ্রপারের কাণ্ডারী এক সদ্‌গুরু।

আমরা এখন এমন আরও দুটি ঘটনার উপস্থাপনে প্রয়াসী হব যাতে দেখব কিভাবে জীবন-মৃত্যুর সামনে দাঁড়িয়ে ভগবৎ-স্মরণ করতে করতে নির্ভীক চিত্তে ভক্ত ভাবতে পারেন—মৃত্যু, তোমাকে আমি ভয় পাই না। যোগকর্ণধার আমার হাত ধরেছেন, এবার আমি অমৃতসাগরে ডুব দেব।

বলরাম বসুর পরিবার পুরুষানুক্রমে শ্রীরামকৃষ্ণ-ভক্ত। গোটা পরিবারের জীবন চলে শ্রীরামকৃষ্ণকে কেন্দ্র করে। চিন্ময়ী মিত্র বলরামবাবুর নাতনী—ছোট মেয়ে কৃষ্ণময়ীর কন্যা। জীবনে শ্রীরামকৃষ্ণ সঙ্ঘের প্রাচীন-নবীন বহু সাধু-সন্ন্যাসীর সংস্পর্শে এসেছেন, তাঁদের পুণ্যসঙ্গও করেছেন। শেষ বয়সে বার্ধক্যজনিত নানা অসুখে ভুগছিলেন। চিকিৎসার

৪ শ্রীশ্রীমায়ের কথা, উদ্বোধন কার্যালয়, ১৫শ সং, পৃঃ ১১৬

জন্য তাঁকে রামকৃষ্ণ মিশন সেবাপ্রতিষ্ঠানে ভর্তি করা হয়। একদিন তাঁর পরিচিত মঠের কয়েকজন সাধু তাঁকে দেখতে হাসপাতালে গেছেন। তাঁদের দেখে চিন্ময়ীর সে কী আনন্দ। বাড়ি থেকে যাঁরা তাঁকে দেখতে এসেছিলেন, তাঁদের বললেন: "যা যা, তোরা বাইরে যা। আমি মহারাজদের সঙ্গে কথা বলব।" দুর্বলতার জন্য ঠিকমতো কথাও বলতে পারছেন না, হাঁপাচ্ছেন। তখন তাঁর নাকে অক্সিজেনের নল, হাতে ড্রিপ ( drip ), অর্ধশায়িত অবস্থা। এই অবস্থায়ই হাঁপাতে হাঁপাতে মহারাজদের সঙ্গে কথা বলবার চেষ্টা তাঁর। আনন্দে শরীরের চেহারাই যেন পাল্টে গেছে। উচ্ছ্বাসে হঠাৎ বলে উঠলেন: "মহারাজ, একটা গান শুনবেন?" এই বলে সুর করে গান করতে চেষ্টা করলেন, একটু করলেনও। গানটি একটি সুপ্রচলিত কালী-কীর্তন —"গয়া গঙ্গা প্রভাসাদি···।" গানের এক-একটি শব্দ গাইতে চেষ্টা করছেন আর হাঁপাচ্ছেন। কিন্তু দেখেই বোঝা যাচ্ছিল, তাঁর শরীর-মন আনন্দে আকুলিত, ভরপুর। এই ঘটনার কয়েক দিন পরেই ঠাকুরের নাম করতে করতে হাসপাতালেই তিনি দেহত্যাগ করেন।

ঠিক এমনই আরও একজনের ঘটনা বলে আমাদের প্রসঙ্গের ইতি টানব।

শ্রীশ্রীরাজা মহারাজের ( স্বামী ব্রহ্মানন্দের ) সময় ভুবনেশ্বর মঠে উদি নামে অল্পবয়স্ক একটি পাচক ছিল। উদিকে শ্রীশ্রীমহারাজও খুব স্নেহ করতেন। সে একবার কলকাতায় বেড়াতে আসে। বিশাল কলকাতা মহানগরী ও তার চাকচিক্য উদির মনে বিস্ময় সৃষ্টি করে এবং ফলে ভুবনেশ্বরের মতো ছোট জায়গা তার কাছে তখন তুচ্ছ মনে হয়। ঠিক ঠিক ধ্যান হলে যে অনুভূতি হয় তা বোঝাতে গিয়ে শ্রীশ্রীরাজা মহারাজ একদিন বলেছিলেন: "এ জগৎটা যেন তা ছাড়া, এটা তখন তুচ্ছ হয়ে যায়— যেমন উদি কলকাতায় এসে শহরের ঐশ্বর্য ও সৌন্দর্য দেখে বললে, 'ভুবনেশ্বরটা কিছুই না'।"[৫]

যাহোক, শ্রীশ্রীরাজা মহারাজের দেহত্যাগের পরও উদি দীর্ঘকাল ভুবনেশ্বর মঠে ছিল এবং যথাসাধ্য মঠের কাজকর্ম করত। শেষের দিকে বয়সের জন্য শরীর অপটু হয়ে পড়লে সে বাড়িতে চলে যায়। কিন্তু ভুবনেশ্বর মঠের ওপর তার বরাবর একটা টান ছিল, তাই বাড়ি চলে গেলেও মাঝে মাঝেই ভুবনেশ্বর মঠে আসত। সে যেদিন মঠে আসত সাধুরা সেদিন তাকে নিয়ে খুব আনন্দ করতেন এবং তাকে খুব খাওয়া-দাওয়া করাতেন। কাপড়-চোপড় নানা জিনিস উপহার দিতেন। ক্রমে শারীরিক কারণে তার মঠে যাতায়াত কমতে থাকে। কিন্তু শ্রীশ্রীরাজা মহারাজের জন্মতিথিতে সে কোনবারই অনুপস্থিত থাকত না। যেভাবেই হোক মঠে আসত। বছর কয়েক আগে রাজা মহারাজের জন্ম-তিথির কয়েক দিন আগে সে একবার মঠে আসে। ঐদিন তাকে আসতে দেখে সকলেই অবাক। কেননা, ইদানীংকালে বছরে একদিনই—শ্রীশ্রীরাজা মহারাজের জন্মতিথির দিন—সে মঠে আসত। যাহোক, উদিকে যথারীতি সমাদর করা হলো। কিন্তু সে বারবারই সাধুদের জিজ্ঞাসা করছিল: "তাহলে মহারাজের জন্মদিন কবে?" তারিখটি ভাল করে জেনে নিয়ে সেদিন খাওয়া-দাওয়া করে সে বাড়িতে ফিরে যায়। পরে জানা গেল, শ্রীশ্রীরাজা মহারাজের জন্মদিনেই উদি তার বাড়িতে দেহত্যাগ করে।

আধ্যাত্মিক মহামানবদের জীবনে মৃত্যুটা একটা অতি সাধারণ ব্যাপার মাত্র—'পুরনো কাপড় ছেড়ে নতুন কাপড় পরার' মতো। কারণ, জন্ম-মৃত্যু প্রহেলিকার পারে দাঁড়িয়ে তাঁরা দেখেন জগৎকে অন্য দৃষ্টিতে, অন্য অনুভবের আলোকে। কিছু কিছু মানুষ আছেন যাঁরা এ-হেন মহামানবের কৃপাকণা লাভ করে ধন্য হন, মৃত্যুকে সাধারণভাবে বরণ করতে পারেন। উদি নিশ্চয়ই এই 'কিছু কিছু মানুষ'-এর মধ্যে পড়ে। বাহ্যিক দৃষ্টিতে তার জীবন ছিল অন্য আর দশজন সাধারণ মানুষের মতোই। তথাপি তার মহাপ্রয়াণের দিনটি সে নিজেই নির্দিষ্ট করে নিয়েছিল। সেই নির্দিষ্ট দিনটি ছিল শ্রীশ্রীরাজা মহারাজের শুভ জন্মতিথি-দিবস। সেই দিনটি কবে, তা-ই নিশ্চিতভাবে জানতে ভুবনেশ্বরের মঠে সে এসেছিল। তারপর সেই শুভ দিনে সে দেহত্যাগ করেছিল। উদির জীবন আপাতদৃষ্টিতে যতই সাধারণ হোক না কেন, তার হাত ধরেছিলেন এক অসাধারণ মহা-শক্তিধর আধ্যাত্মিক পুরুষ। তিনি 'জাতসাপ'— শ্রীশ্রীরাজা মহারাজ—স্বামী ব্রহ্মানন্দ। □

৫ ধর্মপ্রসঙ্গে স্বামী ব্রহ্মানন্দ, উদ্বোধন কার্যালয়, ১১শ সং, ১৩৮৯, পৃঃ ৯৩

প্রবন্ধ

# শিকাগোর দীপ্ত মশাল, শিখা তার বিবেকানন্দ

## স্বামী প্রভানন্দ

সুনীল আকাশের নিচে বিশাল নীল মিশিগান সরোবর। একশো বছর আগে সমুদ্রসদৃশ এই সরোবরের তীরে দপ্ করে জ্বলে উঠেছিল বিশাল একটি মশাল। বিশাল মশালটিকে দেখে মনে হচ্ছিল একটি আলোকস্তম্ভ। আমেরিকাবাসী তথা বিশ্ববাসীর দৃষ্টি কেড়ে নিয়েছিল এই মশালের উজ্জ্বল আলো, বিশেষতঃ মশালটির শিখা। ক্রিস্টোফার কলম্বাসের নতুন বিশ্ব-আবিষ্কারের চারশো বছরপূর্তি উপলক্ষে রমরমা এক মহোৎসবে আমেরিকাবাসী মেতে উঠেছিল। এই উৎসব অতীতেও হয়েছিল, হয়তো ভবিষ্যতেও হবে ; কিন্তু ১৮৯৩ খ্রীস্টাব্দে আয়োজিত এই উৎসব বিশালতায়, বৈচিত্র্যে ও তাৎপর্যে এক বিশেষ ঐতিহাসিক মর্যাদা-লাভ করেছে। সরোবরের তীরে গড়ে উঠেছিল বিশাল অট্টালিকাসকল, তার মধ্যে ছিল কলম্বাস হল, ওয়াশিংটন হল প্রভৃতি। আর বিশ্বমেলার অন্যান্য সবকিছু স্থান পেয়েছিল ছয় মাইল দূরে হাইড পার্কে। বিশ্বমেলা উপলক্ষে হাইড পার্ক অঞ্চলে তৈরি বাড়িঘরের অধিকাংশ ভস্মীভূত হয়েছিল ১৮৯৩-৯৪-এর শীতকালে একটি ভয়ংকর অগ্নিকাণ্ডে। মহোৎসবের প্রধান আকর্ষণ ছিল বিশ্বমেলা ; আধুনিক সভ্যতার প্রগতির পরিচায়ক শিল্প, বিজ্ঞান, প্রযুক্তিবিদ্যা, ধর্ম, দর্শন, সাহিত্য, শিল্পকলা ইত্যাদির বিশাল প্রদর্শনী[১] দেখে মনে হয়েছিল রাজসূয় যজ্ঞও এর তুলনায় একটি তুচ্ছ ব্যাপার।[২] দেড় হাজার মানুষকে নিয়ে ঘূর্ণায়মান ২০০ ফিট উঁচু ফেরির চক্র, সরোবরে চলমান বিদ্যুৎ-চালিত নৌকা, নিকোলাস টেসলার বৈদ্যুতিক ভোজবাজি ছিল বিশেষ আকর্ষণীয়। মেলা-প্রাঙ্গণের আকাশে যেন উড়ছিল আধুনিক মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষা ও গর্বের বিচিত্র ফানুস-সকল। অনুমান, আমেরিকার এক-তৃতীয়াংশ অধিবাসী এই মহোৎসবে যোগদান করেছিল।[৩] কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, কিছুদিনের মধ্যেই দেখা গিয়েছিল যে, বিশ্বমেলার অঙ্গ হিসাবে আয়োজিত ধর্মমহাসম্মেলন জনপ্রিয়তার শীর্ষে। এই মহাসম্মেলনই সারা বিশ্বের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। অংশগ্রহণকারী আমেরিকানদের ওপর এই মহাসম্মেলনের প্রভাবের গভীরতা সম্বন্ধে কতকটা আঁচ করা যাবে এই সম্মেলনের অন্যতম ইতিহাসগ্রন্থের সম্পাদকের লেখা থেকে। সংক্ষিপ্তাকারে তাঁর বক্তব্য ঃ আবিষ্কারক কলম্বাস বিশ্বাস করতেন যে, তাঁর নবাবিষ্কৃত ভূদেশ স্বর্গের নিকটতম ভূখণ্ড। সে-দেশই আদি মানবের বাসস্থান। সে-দেশে বিরাজমান পবিত্রতা ও চিরস্থায়ী সর্বপ্রকারের সুখ ও শান্তি। সে-দেশে দুঃখের প্রবেশাধিকার নিষিদ্ধ। সর্বদাই সুগন্ধ ফুলে পরিপূর্ণ সে-দেশ। বাষ্প, মেঘপুঞ্জ, ঝড়ঝাপটার ঊর্ধ্বে এই আনন্দ-ভূমিতে বিরাজ করছে এক স্বর্গীয় বাতাবরণ। অতঃপর লেখক মন্তব্য করেছেন ঃ "The nearest approach to its reality, but from a stand-point higher than the material, was

১ স্বামী বিবেকানন্দ বারো দিন ঘুরে ফিরে বিশ্বমেলা দেখেছিলেন, শিষ্য আলাসিঙ্গাকে লিখেছিলেন ঃ "It is a tremendous affair."

২ লন্ডন থেকে যোগদানকারী প্রতিনিধি ডঃ আলফ্রেড ডবলিউ. মোমেরি (Dr. Alfred W. Momerie) সমাপ্তি-ভাষণে বলেছিলেন ঃ "I have seen all the Expositions of Europe during the last ten or twelve years, and I am sure I do not exaggerate when I say that your Exposition is greater than all the rest put together. But your Parliament is far greater than your Exposition."

৩ পরবর্তী যে ধর্মসম্মেলন ১৯৩৩ খ্রীস্টাব্দে অনুষ্ঠিত হয়েছিল, সেখানে জনসমাগম হয়েছিল অতি সামান্য সংখ্যক।

found in the Parliament of Religions."[৪] বিশ্বমেলার পরিপ্রেক্ষিতে ধর্মমহাসম্মেলন সম্বন্ধে একটা ধারণা করা যায় ধর্মমহাসম্মেলনের সভাপতি চার্লস বনির একটি ভাষণাংশ থেকে। তিনি বলেছিলেন : "Religion is but one of the 20 departments of the World Congress Work. Besides this august Parliament of World's Religions, there are nearly 50 other congresses in this department, besides a number of special conferences on important subjects. In the preceding departments 151 congresses have held 926 sessions. In the succeeding departments more than 15 congresses will be holden. Thus the divine influence of religions are brought into contact with women's progress, the public press, medicine and surgery, temperence, moral and social reform, commerce and finance, music, literature, education, engineering, art, government, science and philosophy, labour and social and economic science, Sunday rest, public healh, agriculture and other important subjects embraced in a general department."[৫]

শুধু কলম্বিয়ান এক্সপোজিশনে নয়, সমগ্র বিশ্ব-ইতিহাসে এই ধর্মমহাসম্মেলন অভূতপূর্ব। বিশালতায় ও বৈচিত্র্যে তো বটেই তদানীন্তন চিন্তাজগতে এই সম্মেলনে আলোচিত বিষয়গুলি ছিল অপ্রত্যাশিতভাবে অভিনব। সমসাময়িক সম্প্রদায়সকলের মধ্যে পরিব্যাপ্ত বিদ্বেষ, বিরোধ ও বিসংবাদের সঙ্গে পরিচিত সম্মেলনের সংগঠকগণ চেয়েছিলেন বিশ্বের বিভিন্ন ধর্মমতের নেতাদের সমবেত করতে একটি মিলন-অনুষ্ঠানে, যেখানে ধর্মে ধর্মে পার্থক্য, প্রত্যেক ধর্মের নিজস্ব বৈশিষ্ট্য ইত্যাদি সহৃদয়তার সঙ্গে আলোচনা করা সম্ভব হয়। শেষপর্যন্ত মহাসম্মেলনে সত্যসত্যই আশাতীতভাবে সৃষ্টি হয়েছিল এক অনুপম সৌহার্দ্যের বাতাবরণ। মহাসম্মেলনের সভাপতি মিঃ বনি তাঁর প্রারম্ভিক ভাষণে বলেছিলেন : "বিশ্বপিতাকে সকল মানুষ ভালবাসতে ও সেবা করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। তাঁর সন্তানগণ বিশ্বের বিভিন্ন ধর্মাবলম্বীকে ভ্রাতৃবোধে গ্রহণ করতে পারলেই বিশ্বের সকল জাতি মৈত্রীর মেলবন্ধনে মিলিত হবে, তারা আর কখনো যুদ্ধে লিপ্ত হবে না।" আর মহাসম্মেলনের পরম সাফল্যে উৎফুল্ল মিঃ বনি তাঁর সমাপ্তি ভাষণে বলেছিলেন : "বিশ্বের যাবতীয় ধর্ম একটি মহান ও মনোরম সম্মেলনে বাস্তবিকই যে মিলিত হয়েছিল, একথা অস্বীকার করার উপায় নেই।... প্রতিনিধিগণ পরস্পরের প্রতি উষ্ণ প্রীতি ও শ্রদ্ধা প্রকাশের পর বিদায় নিয়েছিলেন।" যদিও প্রতিনিধিগণের পরস্পরের প্রতি কটূক্তি বা বাকযুদ্ধ বিধিবদ্ধভাবেই নিষিদ্ধ ছিল, তথাপি কয়েকবার কয়েকজন প্রতিনিধির কণ্ঠে শোনা গিয়েছিল বিষোদ্গার, কিন্তু কোনসময়েই তা বেশিদূর এগোতে পারেনি।[৬] আলোচ্য বিষয়ে স্বামী বিবেকানন্দের ভাবব্যঞ্জক মন্তব্য উজ্জ্বলতর করে তুলে ধরেছিল মহাসম্মেলনের মুখ্য ভাবটি। স্বামীজী বলেছিলেন : "এই সভামঞ্চ হইতে পরিবেশিত উদার ভাবগুলির জন্য আমি কৃতজ্ঞ।... এই ঐকতানের মধ্যে সময় সময় কিছু শ্রুতিকটু ধ্বনি শোনা গিয়াছে, ঐগুলির জন্য বিশেষভাবে কৃতজ্ঞতা জানাইতেছি, কারণ বিশেষ বৈষম্যদ্বারা উহারা আমাদের মনোযোগ আকর্ষণ করিয়াছে এবং আমাদের মধ্যে যে সাধারণ সামঞ্জস্য রহিয়াছে, তাহা মধুরতর করিয়া তুলিয়াছে।"

৪ Neely's History of the Parliament of Religions—Walter R. Houghon (Ed.), 1893, p. 12

৫ The World's Parliament of Religions—Rev. John Henry Barrows (Ed.), Vol. I, 1893, p. 186.

৬ এবিষয়ে মিঃ বনির মন্তব্য উপভোগ্য। তিনি বলেছিলেন : "They even served the useful purpose of timely warnings against the unhappy tendency to indulge in intellectual conflict. If an unkind hand threw a fireband in the assembly, let us be thankful that a kinder hand plunged it in the waters of forgiveness and quenched its flame." 'Neely's History', p. 185

ফলতঃ এই ধর্মমহাসম্মেলন উপলক্ষ করে বিশ্বের ধর্মমতগুলির সমন্বয়ের এবং বিশ্বভ্রাতৃত্বের একটি ভিত্তিভূমি স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল। উন্মুক্ত হয়েছিল বিশ্বশান্তি এবং তা লাভ করবার সদিচ্ছার পথ। পরিণতিতে আন্তর্ধর্ম আন্দোলন, ধর্মীয় নেতাগণের মধ্যে ভাবের আদানপ্রদান ইত্যাদির শুভারম্ভ হয়েছিল। শিকাগোর অধ্যাপক পল ক্যারাস (Paul Carus) যথার্থই লিখেছেন: "The Parliament has created a movement that will both increase and endure." ইতঃপূর্বে প্রাচীনযুগে বৌদ্ধসম্রাট অশোক, মধ্যযুগে সম্রাট আকবর ও কুসার (Cusa) কার্ডিন্যাল নিকোলাই প্রমুখ সামান্য কয়েকজনই বিভিন্ন ধর্মসেবিগণের মধ্যে পরমত-সহিষ্ণুতা চর্চার জন্য বিশেষ উদ্যোগী হয়েছিলেন। কোন কোন স্থানে আন্তর্ধর্মীয় বিচার-বিতণ্ডাও অনুষ্ঠিত হয়েছিল। কিন্তু মিশিগান সরোবরের তীরেই সর্বপ্রথম বিশ্বের সকল ধর্মের নেতৃবৃন্দের এক মহামিলন ঘটেছিল। ধর্মসম্মেলনের অধিকাংশ প্রতিনিধি ছিলেন উত্তর আমেরিকার প্রোটেস্টান্ট ধর্মের, অবশ্য সে-দেশের রোমান ক্যাথলিক ও ইহুদীগণের সহযোগিতাও ছিল উল্লেখযোগ্য। এশিয়া ভূখণ্ড থেকে এসেছিলেন ১২জন বৌদ্ধনেতা, জাপান থেকে এসেছিলেন সাকু সোয়েন, ভারতবর্ষ থেকে হিন্দু, ব্রাহ্ম, জৈন ও ব্রাহ্মধর্মের প্রতিনিধি-গণ। শিখধর্মের কেউই উপস্থিত ছিলেন না। ধর্মান্তরিত জনৈক আমেরিকান মুসলিম ইসলাম-ধর্মের প্রতিনিধিত্ব করেছিলেন।

সতেরো দিনের মহাসম্মেলন বিদগ্ধজনের ভাষণে ভাষণে ছয়লাপ হয়েছিল। প্রত্যেক ধর্মের প্রতিনিধি সগর্বে নিজ নিজ ধর্মের বৈশিষ্ট্য এবং সামাজিক সমস্যার পরিপ্রেক্ষিতে স্বধর্মের উপযোগিতা ও মাহাত্ম্য প্রচার করতে উদ্যোগী হয়েছিলেন। কোন ধর্মসম্প্রদায় দাবি করে বসলেন, তাঁদের ধর্মই ভবিষ্যতের মানুষের একক ধর্ম হবে। আবার একদলের মতে, সব ধর্ম মিলেমিশে এক নতুন ধর্মমতের জন্ম দেবে। অপর অন্য একদলের মতে প্রত্যেকটি ঐতিহাসিক ধর্মমত নিজস্ব স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করেও পরস্পরের মধ্যে গড়ে তুলবে হৃদ্যতা ও সম্প্রীতি। ধর্মমতগুলির মধ্যে অত্যধিক অসঙ্গতি থাকা সত্ত্বেও অধিকাংশ প্রতিনিধিই ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে সম্প্রীতির সম্পর্ক গড়ে তুলতে আগ্রহী ছিলেন। প্রত্যেকেরই লক্ষ্য ছিল মানব-সভ্যতার প্রগতি ও শান্তির পারাবারে পৌঁছানো। তাঁদের সকলের অন্তরের আকুতি গড়ে তুলেছিল একটি অনুকূল পরিবেশ। এবিষয়ে সম্মেলনের অন্যতম প্রধান সংগঠক ডাঃ ব্যারোজের আত্মতৃপ্তি-সূচক মন্তব্যটি স্মরণ করা যেতে পারে। তিনি বলেছিলেন: "আমাদের সর্বজনীন পিতার সন্তান-গণের কোন সম্মেলনে ইতঃপূর্বে এরূপ প্রীতি, ভ্রাতৃত্ব, আশাব্যঞ্জক ধর্মীয় উৎসাহের প্রকাশ কখনো কেউ দেখেনি।" সম্মেলন সম্বন্ধে ভগিনী নিবেদিতার অভিমত: "বহুকাল ধরে শিকাগো ধর্মমহাসভার অধিবেশন ইতিহাসে একক স্থান অধিকার করে থাকবে।" অপরপক্ষে স্বামী বিবেকানন্দের মূল্যায়ন সংযত ও সংক্ষিপ্ত। তাঁর মন্তব্য ছিল: "পৃথিবীতে এ-যাবৎ অনুষ্ঠিত সম্মেলনগুলির মধ্যে অন্যতম শ্রেষ্ঠ এই ধর্ম-মহাসভা।"

এই ধর্মমহাসম্মেলনের সংগঠকগণ ছিলেন উদারপন্থী খ্রীস্টান। 'WASP' বা 'White Anglo-Saxon Protestant' নামে পরিচিত উদারপন্থী খ্রীস্টানগণ এই সম্মেলনের সংগঠনের কাজে এগিয়ে এসেছিলেন। রাবাই এমিল গুস্তভ হির্স্ক (Rabbi Emil Gustav Hirsch কমিটিতে ছিলেন একমাত্র অখ্রীস্টান সদস্য। কিন্তু কোন নিগ্রো, আমেরিকার আদিবাসী বা অন্য জাতের লোক বা স্ত্রীলোক কমিটিতে স্থান পায়নি। সংগঠকদের অধিকাংশই ছিলেন স্বপ্নচারী, তবুও এঁদের দৃষ্টিতে গোঁড়ামি ছিল যথেষ্ট। অপর ধর্মমতসকল "little bits of a pre-historic evolution" আর খ্রীস্টধর্ম হলো "the fulfilment of things", অর্থাৎ অপর সকল ধর্মমত সম্বন্ধে খ্রীস্টান যাজকদের ছিল মুরুব্বিয়ানার ভাব, তদুপরি অপর ধর্মমত সম্বন্ধে তাদের অনীহা ও তুচ্ছতাচ্ছিল্য ছিল অতি দৃষ্টিকটু। ধর্মমহাসম্মেলনে বক্তাদের তিন-চতুর্থাংশ ছিলেন খ্রীস্টান। মহাসম্মেলনের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে মিঃ বনি ১৮৯০ খ্রীস্টাব্দে যদিও বলেছিলেন, সকল ধর্মকে যাবতীয় অধর্মের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ করা; ঐক্যের সূত্র হবে স্বর্ণকানুন

( Golden Rule )। ধর্মজীবনের শুভকর্মসমূহে অনেক ধর্মের মধ্যে যে বহুলাংশে ঐক্য বিদ্যমান, সেই ঐক্য-ভাবনা বিশ্ববাসীর নিকট উপস্থাপিত করা।" কিন্তু সাধারণ মানুষ বিশেষতঃ গোঁড়া খ্রীস্টানগণ আশা করেছিলেন যে, ধর্মমহাসম্মেলন প্রতিপাদিত করবে খ্রীস্টধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব। ধর্ম-কংগ্রেসের সভাপতি ডঃ হেনরি ব্যারোজের উদারতা ছিল সীমিত। তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস, খ্রীস্টধর্মই একমাত্র খাঁটি ধর্ম। ১৮৯৭ খ্রীস্টাব্দে প্রকাশিত হয়েছিল তাঁর বক্তৃতামালা নিয়ে একটি গ্রন্থ; নাম—'The Christian Conquest of Asia'। গোঁড়া ক্যাথলিকগণ আলোচ্য ধর্মমহাসম্মেলনে খ্রীস্টধর্মের ভাবমূর্তি ক্ষুন্ন হয়েছে মনে করেছিলেন। নিজেদের ঘর সামলাবার জন্য ১৮৯৫ খ্রীস্টাব্দে পোপ ত্রয়োদশ লিও ( Pope Leo XIII ) ঘোষণা করেছিলেন যে, অতঃপর ক্যাথলিকগণ 'বাছ-বিচারহীন' সভাদিতে যোগদান করবে না। মহাসম্মেলনে একজন মুরুব্বির ভূমিকা নিয়েছিলেন যে ফাদার জন. জে. কিন ( John J. Keane ), তাঁকে পদচ্যুত করা হয়েছিল পরের বছর।

ধর্মমহাসম্মেলনের শুভারম্ভ হয়েছিল ১৮৯৩ খ্রীস্টাব্দের ১১ সেপ্টেম্বর। কলম্বাস হলে সুশিক্ষিত সমাজের চারহাজার নরনারী ঘেঁষাঘেঁষি করে উপবিষ্ট। সম্মুখে সুশোভিত মঞ্চ—লম্বায় প্রায় একশো ফুট আর চওড়াতে প্রায় পনেরো ফুট। পশ্চাৎপটে ছিল জাপানী ও হিব্রু ভাষায় লেখা দুটি দোদুল্যমান লিপি; দুই গ্রীক দার্শনিকের বিশাল মূর্তি, উত্তোলিত হস্তে দণ্ডায়মান একটি দেবী সরস্বতী-সদৃশ মূর্তি। অংশগ্রহণকারী দশটি[৭] প্রধান ধর্মের স্বীকৃতিসূচক দশটি ঘণ্টা বেজে উঠেছিল ঠিক সকাল দশটায়। পুরোগামী কার্ডিন্যাল গিবনস[৮] ও প্রেসিডেন্ট বনির পরেই শ্রেণীবদ্ধ প্রতিনিধিগণ হলের মধ্যকার পথ অতিক্রম করে বিশ্বের সকল জাতির পতাকার নিচে পৌঁছাতেই তুমুল হাততালি তাঁদের অভিনন্দিত করেছিল। তাঁরা মঞ্চের ওপর উঠে একে একে আসন গ্রহণ করলেন। কার্ডিন্যাল গিবনস বসলেন মঞ্চের মধ্যস্থলে উঁচু একটি কারুকার্যমণ্ডিত লোহ সিংহাসনে, তাঁর পোশাক টকটকে লালরঙের; তাঁর দুপাশে তিন সারিতে বসলেন প্রতিনিধিগণ ও সম্মেলনের কর্মকর্তাদের কয়েকজন।[৯] বক্তৃতার জন্য ছিল একটি রোস্ট্রাম। পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্ত থেকে সমাগত ধর্মের প্রতিনিধিগণের চেহারা ও বিবিধ বেশভূষা একটি বৈচিত্র্যের মেলা খুলে বসেছিল যেন। অবশ্য এদের মধ্যে সকলের দৃষ্টি কেড়ে নিয়েছিলেন ভারতের পাগড়ী-পরিহিত সন্ন্যাসী স্বামী বিবেকানন্দ।[১০] কিছুক্ষণ নিস্তব্ধতার পর বেজে উঠল অর্গান, তাকে অনুসরণ করল সমবেতকণ্ঠে ভগবানের স্তুতিগান। কার্ডিন্যাল গিবনস হাত তুলে উপস্থিত সকলকে অভিনন্দন জানালেন, তারপর তিনি সর্বজনীন প্রার্থনা পাঠ করলেন।

কর্মকর্তাদের স্বাগত ভাষণের পর বিভিন্ন ধর্মের প্রতিনিধিগণ একের পর এক সংক্ষিপ্ত প্রত্যুত্তর-সূচক ভাষণ দিতে থাকেন। প্রথম প্রতিনিধি-বক্তা ছিলেন বিশপ অব জান্তে। পূর্বাহ্নে আটজন প্রতিনিধি বলেছিলেন। অপরাহ্নে চারজন প্রতিনিধির লিখিত ভাষণপাঠের পর রোস্ট্রামের সামনে গিয়ে দাঁড়ালেন স্বামী বিবেকানন্দ। তেজঃপুঞ্জে বিমণ্ডিত তাঁর ব্যক্তিত্ব। মুখ খোলার পূর্বক্ষণ পর্যন্ত তিনি ছিলেন দ্বিধাসঙ্কুল।[১১] অচিরেই তাঁর দ্বিধামুখিক চম্পট দিল, উপস্থিত হলো আত্মশ্রদ্ধার সিংহ। তাঁর কণ্ঠে উচ্চারিত 'আমেরিকাবাসী ভগিনী ও ভ্রাতৃবৃন্দ' সম্বোধন শুনে মহাসম্মেলন উদ্বেলিত। শ্রোতাদের চোখেমুখে আবেগ ও উত্তাপ। তাদের ভাবোচ্ছ্বাস

৭ দশটি ধর্ম হচ্ছে—ইহুদীধর্ম, ইসলামধর্ম, হিন্দুধর্ম, বৌদ্ধধর্ম, তাওধর্ম, কনফুসীয় ধর্ম, শিন্টোধর্ম, পারসীক ধর্ম, ক্যাথলিক ধর্ম, গ্রীক চার্চ ও প্রোটেস্টান্ট ধর্ম।

৮ আমেরিকার ক্যাথলিক চার্চের সর্বোচ্চ পদাধিকারী ব্যক্তি।

৯ মঞ্চে বসেছিলেন মোট ৪২জন ( ২জন জাপানী অনুবাদক সমেত )। দ্রঃ The World's Congress of Religions—J. W. Hansom, D. D. Ed., 1894, p. 16.

১০ রেজিস্ট্রেশনের সময় তিনি ঠিকানা দিয়েছিলেন—বোম্বাই, ভারতবর্ষ। তাঁর আসনের নম্বর ছিল ৩১।

১১ স্বামীজী আলাসিঙ্গাকে লিখেছিলেন ঃ "আমার বুক দুরদুর করিতেছিল ও জিহ্বা শুষ্কপ্রায় হইয়াছিল ...."

প্রকাশিত হলো করতালিধ্বনিতে। মিঃ ব্যারোজের বিবরণী অনুসারে শ্রোতৃবৃন্দের ঘন ঘন করতালি কয়েক মিনিট সভার কাজ স্তব্ধ করে দিয়েছিল।[১২] হর্ষোৎফুল্ল শ্রোতাদের করধ্বনি শান্ত হলে স্বামী বিবেকানন্দ একটি সংক্ষিপ্ত তাৎক্ষণিক ভাষণ দেন। মাঝে মাঝে শ্রোতাদের সমর্থনসূচক করতালি ভাষণ সমাপ্তির পর তুমুল হয়ে উঠেছিল। ধর্ম-মহাসম্মেলনের মর্মবাণী তাঁর ভাষণে যেরূপ সুস্পষ্ট ও সরসভাবে উচ্চারিত হয়েছিল, তা অপর কারুরই ভাষণে শোনা যায়নি।[১৩] তিনি বলেছিলেন, ধর্মমহাসভার প্রতিপাদিতব্য বাণী গীতোক্ত বাণীর পুনরাবৃত্তি মাত্র। গীতামুখে শ্রীভগবান বলেছেন: "যে যে-ভাব আশ্রয় করে আসুক না কেন, আমি তাকে সে-ভাবেই অনুগ্রহ করে থাকি। হে অর্জুন, মনুষ্যগণ সর্বতোভাবে আমার পথেই চলতে থাকে।" এ-বাণীই তাঁর গুরুদেবোক্ত সর্বধর্মসমন্বয়ের বাণী। উপরন্তু তাঁর সুস্পষ্ট ঘোষণা "আমরা শুধু সকল ধর্মকে সহ্য করি না, সকল ধর্মকেই আমরা সত্য বলিয়া বিশ্বাস করি" শ্রোতাদের প্রাণে শিহরণ জাগিয়েছিল। তাঁর ঋজু ও মর্মস্পর্শী ভাষণ শ্রোতাদের মন জয় করেছিল। সন্ন্যাসীর পাশে উপস্থিত অন্যান্য প্রতিনিধিদের কথা শ্রোতাগণ যেন সাময়িকভাবে ভুলে গিয়েছিল। সন্ন্যাসীর দেহের শক্তি ও প্রশান্ত মহিমা, তাঁর সম্ভ্রম-জাগানো ব্যক্তিত্ব, তাঁর কালো চোখের উজ্জ্বল জ্যোতি এবং বক্তৃতা-কালীন তাঁর সুগভীর সুমিষ্ট কণ্ঠস্বরের সঙ্গীতময় মূর্ছনা শ্রোতৃবৃন্দকে মুগ্ধ করে ফেলেছিল।[১৪] অচেনা অজানা অনাহূত রবাহূত সন্ন্যাসী অকস্মাৎ বিখ্যাত ও গণ্যমান্য হয়ে উঠলেন। তিনি স্বয়ং একটি চিঠিতে লিখেছিলেন: "সেইদিন হইতে আমি একজন বিখ্যাত লোক হইয়া পড়িলাম।"[১৫] সন্ন্যাসীর তিনরঙা পূর্ণাবয়ব ছবি রাস্তায় রাস্তায় টাঙানো হলো। রোমাঁ রোলাঁর মন্তব্য: "ভারত-বর্ষের এই সৈনিক সন্ন্যাসীর চিন্তাধারা আমেরিকার বুকে গভীরভাবে দাগ কেটে রাখল।"

ধর্মমহাসভা অনুষ্ঠিত হয়েছিল ১১ থেকে ২৭ সেপ্টেম্বর। রবিবারে দুটি এবং সপ্তাহের অন্যদিনে প্রতিদিন তিনটি করে অধিবেশন বসেছিল। ক্রম-বর্ধমান শ্রোতাদের দাবিপূরণের জন্য পার্শ্ববর্তী ওয়াশিংটন হল-এ চতুর্থদিন থেকে একই সময়ে অধিবেশন বসেছিল। এই হলের আসন-সংখ্যা ছিল তিন হাজার। প্রত্যেক বক্তাকেই দুই হলে একই বিষয়ে পড়তে বা বলতে হয়েছিল। তৃতীয় একটি হলে ১৫ থেকে ২৭ সেপ্টেম্বর বিজ্ঞানশাখার অধিবেশন বসেছিল। এই হলেই স্বামীজী 'হিন্দু-ধর্ম' শীর্ষক লিখিত ভাষণ পাঠ করেছিলেন। তাছাড়াও স্বামীজীর গবেষক মেরী লুইস বার্কের মতে, তিনি আরও আটটি বক্তৃতা দিয়েছিলেন। উপরন্তু বিভিন্ন গোষ্ঠী আয়োজিত অভ্যর্থনা-সভায় তাঁকে বক্তৃতা করতে হয়েছিল। তাঁর ভাষণের প্রচণ্ড চাহিদা হয়েছিল। শ্রোতাদের ধারণা হয়েছিল, তিনি একজন 'Orator by Divine right'—দিব্য অধিকারপ্রাপ্ত বাগ্মী।

ধর্মমহাসম্মেলনের প্রারম্ভিক ভাষণে সভাপতি মিঃ বনি বলেছিলেন: "এই মহাসম্মেলনে 'ধর্ম' শব্দদ্বারা আমরা বুঝব ঈশ্বরকে ভালবাসা ও আরাধনা করা এবং মানুষকে ভালবাসা ও সেবা করা।"[১৬] কিন্তু সম্মেলনে মত-পথগুলির মন্থনের ফলে বিভিন্ন ধর্মের প্রবক্তাদের বক্তৃতা শ্রোতাগণ নতুন লব্ধ আলোকে বিচার করতে থাকলেন। সম্মেলনের তৃতীয়দিনে ডঃ বায়র্ন বলেন খ্রীস্টধর্ম সম্বন্ধে। পঞ্চমদিনে কাও সিয়েন হো বলেন কনফুসিয়ানিজম সম্বন্ধে। সেদিনই ডঃ জর্জ ওয়াসবার্ন বলেন ইসলামধর্ম সম্বন্ধে। অষ্টমদিনে ধর্মপাল বলেন বৌদ্ধধর্ম সম্বন্ধে এবং জাপানের বৌদ্ধ সাকু সোয়েন বলেন সেদেশে প্রচলিত বৌদ্ধধর্ম সম্বন্ধে। আর নবমদিনে বলেন স্বামী বিবেকানন্দ। তাঁর বিষয় ছিল 'হিন্দুধর্ম'। এই বক্তৃতাটির বিচার-বিশ্লেষণ

১২ "There arose a peal of applause that lasted for several minutes". ('Neely's History', p. 64)

১৩ 'Critic' পত্রিকার মন্তব্য: "No one expressed so well the spirit of the Parliament... as did the Hindoo monk." ( 7 October, 1893 )

১৪ রোমাঁ রোলাঁর মন্তব্যের অংশবিশেষ।

১৫ বাণী ও রচনা, ৬ষ্ঠ খণ্ড, ১ম সং ১৩৬৯, পৃঃ ৩৮১

১৬ 'Neely's History', p. 68

করে ভগিনী নিবেদিতা 'স্বামীজীর বাণী ও রচনা'র ভূমিকায় যথার্থই মন্তব্য করেছিলেন ঃ "যখন তিনি বক্তৃতা আরম্ভ করিলেন তখন তাঁহার বিষয়বস্তু ছিল 'হিন্দুদের ধর্মভাবসমূহ', কিন্তু যখন তিনি শেষ করিলেন, তখন হিন্দুধর্ম নতুন রূপলাভ করিয়াছে।" স্বামী বিবেকানন্দের উপস্থাপিত হিন্দুধর্মের 'সর্ববিগাহিত্ব' শ্রোতাদের মনে নতুন দিগন্ত উন্মোচিত করেছিল। পাশ্চাত্যবাসীর ধর্ম সম্বন্ধে ধ্যান-ধারণায় বোধ করি একটি নতুন মাত্রা সংযোজিত হয়েছিল, বিশেষতঃ যখন তাঁরা স্বামী বিবেকানন্দের মুখে শুনেছিলেন ঃ "হিন্দুর দৃষ্টিতে মানুষ অসত্য হইতে সত্যে গমন করে না, বরং সত্য হইতে সত্যে আরোহণ করে—নিম্নতর সত্য হইতে উচ্চতর সত্যে।"

২৭ সেপ্টেম্বর অনুষ্ঠিত হয়েছিল মহাসম্মেলনের সমাপ্ত অধিবেশন। সেদিন ছিলেন মোট চব্বিশজন বক্তা। বীরচাঁদ গান্ধীর 'অন্ধদের হাতিদর্শনের কাহিনী' শ্রোতাদের মনে সাড়া তুলছিল। রাশিয়ার রাজকুমার সার্জ ওলকোনস্কি বলছিলেন যে, ধর্ম-মহাসভা প্রত্যেককে শিখিয়েছে মানুষকে শ্রদ্ধা করতে। ইংরেজ Rev. George T. Candlin বলছিলেন ঃ "The conventional idea of religion which obtains among the Christian world over is, that Christianity is true, all other religions false; that Christianity is light, and other religions dark.... You know better, and with clear light and strong assurance you can testify that there may be friendship instead of antagonism between religion and religion." সম্মেলনের সম্পাদক রেভারেন্ড জেনকিন লয়েড জোন্স প্রস্তাব করেন যে, পরবর্তী মহাসম্মেলন যেন ভারতবর্ষে গঙ্গাতীরবর্তী কাশী-ধামে অনুষ্ঠিত হয়। এইদিনের নবম বক্তা স্বামী বিবেকানন্দ ধর্মমহাসম্মেলনের উদ্দেশ্য, সাফল্য ও ভূমিকা বলিষ্ঠ ভাষায় উপস্থাপিত করেছিলেন। তিনি যখন ঘোষণা করেছিলেন ঃ "যদি এই ধর্মমহা-সমিতি জগতে কিছু প্রমাণ করিয়া থাকে, তাহা এই, ইহা প্রমাণ করিয়াছে—সাধুচরিত্র, পবিত্রতা, দয়া-দাক্ষিণ্য জগতের কোন একটি বিশেষ ধর্মমণ্ডলীর নিজস্ব সম্পত্তি নয়, প্রত্যেক ধর্মপদ্ধতির মধ্যে অতি উন্নত চরিত্রের নরনারী জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। এই সকল প্রত্যক্ষ প্রমাণ সত্ত্বেও যদি কেহ এরূপ স্বপ্ন দেখেন যে, অন্যান্য ধর্ম লোপ পাইবে এবং তাঁহার ধর্মই টিকিয়া থাকিবে, তবে তিনি বাস্তবিকই কৃপার পাত্র।" উদার-হৃদয় সকল শ্রোতা স্বামীজীকে সাধুবাদ জানিয়েছিলেন ; অপরপক্ষে গোঁড়া ধর্মান্ধ উদ্ধত ব্যক্তিগণ তেলে-বেগুনে জ্বলে উঠছিলেন।[১৭] কিন্তু বিভিন্ন ধর্মের ধর্মধ্বজীদের অপরাপর ধর্মের প্রতি সংকীর্ণতা ও বিদ্বেষের মূলে স্বামী বিবেকানন্দের এই সকল কুঠারাঘাত উদার ভাবাদর্শনের পথ উন্মুক্ত করে দিয়েছিল। সমাপ্তি অধিবেশনের সর্বশেষ অনুষ্ঠান ছিল 'আপলো ক্লাব' পরিবেশিত 'আমেরিকা' সঙ্গীত, যাতে শ্রোতৃমণ্ডলীও যোগদান করেছিলেন। তার অব্যবহিত পূর্বে রাবাই হির্শ (Rabbi Hirsch) সর্বজনীন প্রার্থনা পরিচালনা করেছিলেন এবং তাঁকে অনুসরণ করে বিশপ কিন শেষ প্রার্থনা—"হে স্বর্গস্থ পিতা,..." উচ্চারণ করেছিলেন।[১৮]

কলম্বিয়ান এক্সপোজিশনের অঙ্গ হিসাবে ধর্ম-মহাসভা আরম্ভ হয়েছিল এবং শ্রোতা ও সংগঠকগণের মধ্যে উৎসাহ ও উদ্দীপনা সঞ্চার করে সমাপ্ত হয়েছিল। এসকলের মধ্য থেকে আত্মপ্রকাশ করেছিলেন এক দিব্যশক্তিসম্পন্ন আচার্য—ভারতীয় সন্ন্যাসী স্বামী বিবেকানন্দ ; উদ্ভাসিত হয়েছিলেন বিশ্ব-বিবেকানন্দরূপে। পত্রপত্রিকা তাঁকে নিয়ে মেতে উঠেছিল। বিখ্যাত পত্রিকা 'হেরাল্ড'-এর মতে —"ধর্মসভায় বিবেকানন্দই অবিসংবাদিরূপে সর্ব-শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি।" 'নিউইয়র্ক ক্রিটিক'-এর মতে—"তাঁহার অকপট উক্তিগুলি যে মধুর ভাষার মধ্য দিয়া তিনি

১৭ স্বামীজীর বক্তব্যে সাধারণ শ্রোতৃবৃন্দ উৎসাহিত বোধ করলেও একদেশদর্শী ডঃ ব্যারোজ তা করতে পারেননি। তিনি লিখেছিলেন ঃ "Swami Vivekananda was always heard with interest by the Parliament, but very little approval was shown to some of the sentiments expressed in his closing address." (দ্রঃ 'Neely's History', p. 171)

১৮ The Worlds' Congress of Religions—J. W. Hanson, D. D. (Ed.), 1894, p. 951

প্রকাশ করেন, তাহা তাঁহার গৈরিকবসন এবং বুদ্ধিদৃপ্ত মুখমণ্ডল অপেক্ষা কম আকর্ষণীয় নয়।" বিবেকানন্দ সেসময়ে জনপ্রিয়তার তুঙ্গে, একথা বোঝাবার জন্য 'The Boston Evening Transcript' লিখেছিল: "তিনি শুধু মঞ্চের একদিক হইতে অপরদিকে অগ্রসর হইলেই করতালি পাইয়া থাকেন এবং বহু সহস্র ব্যক্তির এরূপ সুব্যক্ত প্রশংসায় তিনি কিছুমাত্র গর্ব প্রকাশ না করিয়া উহা শিশুসুলভ সন্তোষ সহকারে গ্রহণ করিয়া থাকেন।··· মহাসভার কর্তৃপক্ষ বিবেকানন্দকে একেবারে সর্বশেষের জন্য ঠিক করিয়া রাখিতেন, যাহাতে শ্রোতারা শেষপর্যন্ত বসিয়া থাকেন। কোন গরম দিনে যখন কোন বক্তার নীরস প্রাণহীন দীর্ঘ বক্তৃতার ফলে শত শত ব্যক্তি কক্ষ ত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইতে থাকিত; তখন সভাপতি উঠিয়া ঘোষণা করিতেন, সভান্তে ভগবানের আশীর্বাদ-প্রার্থনার ঠিক পূর্বে স্বামী বিবেকানন্দ কিছু বলিবেন। অমনি শত শত শ্রোতা শান্তভাবে বসিয়া থাকিত।"[১৯] প্রকৃতপক্ষে বিবেকানন্দ-যাদু নবীন-প্রবীণ, পুরুষ-নারী সকলকেই মোহিত করেছিল। কংগ্রেসের সাধারণ সমিতির সভাপতি মিঃ জে. এইচ. ব্যারোজের স্বীকৃতি: "স্বামী বিবেকানন্দ শ্রোতাদের ওপর এক অত্যাশ্চর্য প্রভাব বিস্তার করেছিলেন।" কবি মিস হ্যারিয়েট মনরো তাঁর আত্মজীবনীতে লিখেছেন তাঁর উপলব্ধি: "এই সুমহিম বিবেকানন্দই ধর্মসভাকে গ্রাস করিয়াছিলেন, গোটা শহরটাকে তিনি আত্মসাৎ করিয়া লইয়াছিলেন।" বোধ করি এসকল মন্তব্যের চাইতে গুরুত্বপূর্ণ ১সেপ্টেম্বর ১৮৯৪ তারিখের 'Chicago Inter Ocean' পত্রিকার মন্তব্য: "There was no delegate to the Parliament of Religions who attracted more courteous attention in Chicago ···than Swami Vivekananda···. This distinguished Hindu was... earnest in his desire to recognise the religions of all people as related to each others and all sincere efforts on behalf of virtue and holiness but at the same time he defended the Hindu religion and philosophy with an elequence and power that not only won admiration for himself but consideration for his own teachings." সত্যসত্যই ধর্মমহাসম্মেলনের মূলভাব যে হওয়া উচিত—নিজের ধর্মে শ্রদ্ধাশীল থেকে অন্য ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধা ও মর্যাদাদান, তা সুস্পষ্ট ও বলিষ্ঠভাবে হিন্দুসন্ন্যাসী স্বামী বিবেকানন্দের কণ্ঠেই উচ্চারিত হয়েছিল। হিন্দুধর্মের প্রতিনিধির দায়িত্ব সুচারুরূপে পালন করেই তিনি নিশ্চিন্ত হননি, বিশ্বের সকল ধর্মের প্রতিনিধিদের নিকট সনাতন ধর্মের গ্রহিষ্ণুতা, সহিষ্ণুতা, উদারতা প্রভৃতি সর্বজনীন ভাব এমন নিপুণতার সহিত তুলে ধরেছিলেন যে, তাঁকে মনে হচ্ছিল বিশ্বধর্মের প্রতিনিধি, ধর্মমহাসম্মেলনের একখানি জীবন্ত ভাবপ্রতিমা। তাঁর ভাষণের মধ্য দিয়ে মহাসম্মেলনের আকুতি বিকশিত ও পুষ্পিত হয়ে উঠেছিল। বিশ্বচেতনায় ভরপুর বিবেকানন্দ তখন পূর্ণায়িত লোকশিক্ষক, জগদাচার্য। বিশ্ববাসী শ্রদ্ধাবনতচিত্তে শুনল তাঁর সিদ্ধান্ত: "খ্রীস্টানকে হিন্দু বা বৌদ্ধ হইতে হইবে না; অথবা হিন্দু ও বৌদ্ধকে খ্রীস্টান হইতে হইবে না; কিন্তু প্রত্যেক ধর্মই অন্যান্য ধর্মের সারভাগগুলি গ্রহণ করিয়া পুষ্টিলাভ করিবে এবং স্বীয় বিশেষত্ব বজায় রাখিয়া নিজ প্রকৃতি অনুযায়ী বর্ধিত হইবে।" তাঁকে দেখে মনে হচ্ছিল নব শংকরাচার্য। আদি শংকরাচার্য অষ্টম শতাব্দীতে শতধাবিভক্ত সনাতন ধর্মের মনুষ্যগণের মধ্যে এনেছিলেন এক নিটোল সংহতি আর 'হিংসায় উন্মত্ত পৃথ্বী'র বহুধা-বিভক্ত ধর্মানুসারিগণের মধ্যে সাম্য ও সংহতি আনতে সচেষ্ট হলেন বিশ্ববন্ধু বিবেকানন্দ। তাইতো তিনি নব শংকরাচার্য। জগদ্হিতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ নব শংকরাচার্য উন্মোচিত করলেন তাঁর ভবিষ্য-দৃষ্টি। তিনি এই বলে বিশ্ববাসীকে আশ্বস্ত করলেন যে, ধর্মান্ধগণের বর্ধমান বাধাপ্রদান সত্ত্বেও ভবিষ্যতে

১৯ একটা দৃষ্টান্ত দেওয়া যাক। পঞ্চমদিনে (১৫ সেপ্টেম্বর) অপরাহ্ণের অধিবেশনের সমাপ্তির পূর্বমুহূর্তে সভাপতি আহ্বান করলেন স্বামী বিবেকানন্দকে। শ্রোতৃবৃন্দ করতালিধ্বনি দিয়ে অভিনন্দন জানাল। স্বামী বিবেকানন্দ একটি সংক্ষিপ্ত ভাষণে কুয়োর ব্যাঙের গল্প বললেন। (দ্রঃ 'Neely's History', p. 258)

প্রত্যেক ধর্মের পতাকার ওপর লিখিত হবে— "বিবাদ নয়, সহায়তা ; বিনাশ নয়, পরস্পরের ভাবগ্রহণ ; মতবিরোধ নয়, সমন্বয় ও শান্তি।" সকল ধর্মের শুভশক্তিসমূহকে সংহত এবং এক উদ্দেশ্যমুখীন করে মানবসমাজের সার্বিক জাগরণের এক বর্ণাঢ্য ভবিষ্যতের চিত্র তিনি তুলে ধরলেন। নবজাগরণের মধুচ্ছন্দ উচ্চারিত হলো তাঁর কণ্ঠে। তিনি আহ্বান জানালেন, মানুষকে 'মানহুঁশ' হতে হবে। তাঁর এ-ধরনের বাণী সম্পর্কেই ভগিনী নিবেদিতা লিখেছিলেনঃ "এই তো সেই বাণী, যাহার জন্য বাকি সবকিছু আছে এবং চিরদিন রহিয়াছে। ইহাই হইতেছ সেই পরম উপলব্ধি, যাহার মধ্যে অন্য সব অনুভূতি মিশিয়া যাইতে পারে।"[২০]

বিশ্বমঞ্চে স্বামী বিবেকানন্দের অনন্য ভূমিকার এবং তাঁর অসামান্য সাফল্যের কারণ অনুসন্ধানে রত বুদ্ধিজীবিগণ স্বামীজীর চেহারা, পোশাক-আশাক, ব্যক্তিত্ব, বাগ্মিতা, বক্তৃতার ভাবসম্পদ ইত্যাদির নির্দেশ করেছেন ; কেউ বা এসকলের অতিরিক্ত অলৌকিক শক্তির সন্ধান করেছেন। এবিষয়ে অনুসন্ধানের অলিগলিতে ঘুরে বেড়ালে চোখে পড়বে বেশ কিছু চমক-জাগানো ঘটনা। স্বামীজীর স্বমুখে কথিত সেরূপ একটি ঘটনাঃ বিদেশ থেকে ফিরে এসে স্বামীজী একদিন যোগীন-মা প্রমুখ ভক্ত-মহিলাদের বলেছিলেনঃ "ওগো, অতো নাম-রূপ, সম্মান-খ্যাতি কি আমার শক্তিতে হয়েছে? না, ওসব হজম করা আমার ক্ষমতা? আমি সেই মস্ত সভায় বলতে দাঁড়িয়েই—অতো লোক একসঙ্গে, গিস্‌গিস্ করছে দেখে কি যে বলব কিছুই বুঝতে পারিনি। কখনো অতো লোকের সামনে কথা বলা অভ্যেস ছিল না। একদম তৈরি ছিলাম না। আমার বাহ্যজ্ঞান চলে গেল। আর দেখি কি, এই শরীরটার ভিতর ঠাকুর এসে যা বলবার বলে যাচ্ছেন। যখন বলা শেষ করে বসে পড়লাম তখনো আমি জানি না, আমি কি বললাম।"[২১] স্বামীজী-কথিত এর সাত বছর পূর্বেকার চমৎকার আরেকটি ঘটনা। শ্রীরামকৃষ্ণের মহাসমাধির আর তিন-চার দিন মাত্র বাকি। একদিন নরেন্দ্রকে তাঁর সম্মুখে বসিয়ে একদৃষ্টে তাঁর দিকে দেখতে দেখতে তিনি গভীর সমাধিস্থ হয়ে পড়লেন। "নরেন্দ্রনাথ পরে বলিতেন, তখন তাঁহার অনুভব হইয়াছিল যেন, ঠাকুরের দেহ হইতে তড়িৎ-কম্পনের মতো একটা সূক্ষ্ম তেজোরশ্মি তাঁহার দেহমধ্যে প্রবেশ করিতেছে। পরিশেষে তিনিও বাহ্যজ্ঞান হারাইয়াছিলেন। কতক্ষণ এই-ভাবে কাটিয়াছিল, তাহা তিনি বুঝিতে পারেন নাই। চেতনালাভ করিয়া তিনি দেখিলেন, ঠাকুরের চক্ষে অশ্রুবর্ষণ হইতেছে। ইহাতে অতীব চমৎকৃত হইয়া এইরূপ করার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে ঠাকুর বলিলেন, 'আজ যথাসর্বস্ব তোকে দিয়ে ফকির হলুম। তুই এই শক্তিতে জগতের কাজ করবি। কাজ শেষ হলে পরে ফিরে যাবি।' শুনিয়া নরেন্দ্রনাথও বালকের ন্যায় কাঁদিতে লাগিলেন—উদ্বেলিত ভাবাবেগে কণ্ঠরুদ্ধ হওয়ায় তাঁহার বাক্যস্ফূর্তি হইল না।"[২২] এ-ধরনের লৌকিক-অলৌকিক ব্যাখ্যাদির অতিরিক্ত শ্রীরামকৃষ্ণের একটি আদেশ তথা ভবিষ্যদ্বাণী এ-প্রসঙ্গে স্মরণ করা প্রয়োজন। অদ্ভুত এক কাহিনী। শনিবার সন্ধ্যাবেলা, ১১ ফেব্রুয়ারি ১৮৮৬। শ্রীরামকৃষ্ণ কাশীপুরে তাঁর ঘরে বসে একটি কাগজে লিখে দিয়েছিলেনঃ "জয় রাধে, প্রেমময়ী। নরেন [লোক-]শিক্ষা দিবে, যখন ঘুরে (ঘরে?) বাইরে হাঁক দিবে। জয় রাধে।"[২৩]

শ্রীরামকৃষ্ণ-বাণীর দুটি তাৎপর্যার্থ লক্ষণীয়। দেখা গেল, শিকাগোতে আয়োজিত বিশ্বমঞ্চে সর্বজনসমাদৃত বিবেকানন্দকে নিয়ে যখন সোরগোল উঠেছে, তখন তিনি শুধুমাত্র ভারতের বা হিন্দুধর্মের প্রতিনিধিমাত্র নন, তিনি সেসময়ে 'বহুজনহিতায় বহুজনসুখায়' লোকশিক্ষক। অপরপক্ষে শ্রীরামকৃষ্ণ আদিষ্ট একজন লোকশিক্ষক হিসাবেই

২০ ভূমিকা—স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা, ১ম খণ্ড

২১ রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের জীবনালোকে স্বামী নির্লেপানন্দ, ১৩৭১, পৃঃ ৮৯-৯০

২২ যুগনায়ক বিবেকানন্দ—স্বামী গম্ভীরানন্দ, ২য় খণ্ড, ২য় সং, পৃঃ ১১৫

২৩ আদিষ্ট নরেন্দ্রনাথ বিদ্রোহ করেছিলেন, বলেছিলেনঃ "আমি ও-সব পারব না।" শ্রীরামকৃষ্ণ স্থিরকণ্ঠে মৃদু হেসে বলেছিলেনঃ "তোর ঘাড় করবে।" পরবর্তী কালে নরেন্দ্র গুরুর আদেশ নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করেছিলেন।

তিনি বিশ্বধর্মসভায় যোগদান করেছিলেন। স্বামী বিবেকানন্দ 'চাপরাশ-প্রাপ্ত' লোকশিক্ষক। অসাধারণ শক্তিমান আচার্য। শ্রীরামকৃষ্ণ বলতেন: "হেঁজি পেঁজি লোক লেকচার দিলে কিছু কাজ হয় না। চাপরাশ থাকলে তবে লোক মানবে। ঈশ্বরের আদেশ না থাকলে লোকশিক্ষা হয় না। যে লোক-শিক্ষা দিবে তার খুব শক্তি চাই।"[২৪] পরিণতিতে, স্বামী বিবেকানন্দ অসম্ভবকে যেন সম্ভব করে তুললেন। স্বামীজীর ভাষণগুলির বস্তুগত বিচার করলে দেখা যাবে, তাতে যুক্তিতর্কের সূক্ষ্ম মার-প্যাঁচ ছিল না, ছিল না পাণ্ডিত্যের কারুকার্য, ছিল না বাগ্মিতার জন্য অনুশীলিত বলাকৌশল। অলোকসামান্য ব্যক্তিত্বের অধিকারী বিবেকানন্দের প্রাঞ্জল ভাষায় কথিত বলিষ্ঠ ভাবনাসকল শ্রোতাদের মনে গেঁথে যেত, অনুপ্রেরণায় তাদের প্রাণ ভরে উঠত।

শিকাগো ধর্মমহাসম্মেলনের বিবরণী কয়েকটি ইতিহাসগ্রন্থে লিপিবদ্ধ। একটি গ্রন্থের ভূমিকায় লেখা হয়েছে: "It is the story of a meeting such as the world never knew before."[২৫] এই অনন্য মহাসম্মেলনে বিবেকানন্দ-শঙ্খের নির্ঘোষ বিশ্ববাসীর দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল: "সাম্প্রদায়িকতা, গোঁড়ামি ও এগুলির ভয়াবহ ফলস্বরূপ ধর্মোন্মত্ততা··· পৃথিবীকে হিংসায় পূর্ণ করিয়াছে, বারবার ইহাকে মানবশোণিতে সিক্ত করিয়াছে, সভ্যতা ধ্বংস করিয়াছে এবং সমগ্র জাতিকে হতাশায় মগ্ন করিয়াছে।"—এই পটভূমিকা উল্লেখপূর্বক লোকশিক্ষক বিবেকানন্দ ধর্মের পাবনী শক্তিতে মানবসমাজে যে কল্যাণ সাধিত হয়েছে এবং ভবিষ্যতে হতে পারে তার ইঙ্গিত করেন। তিনি শাস্ত্র ও যুক্তির সাহায্যে বোঝাতে চাইলেন, সকল মত-পথের মানুষ জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে একই শ্রীভগবানকে লক্ষ্য করেই অগ্রসর হচ্ছে। তবুও প্রশ্ন ওঠে, ধর্মসেবীদের মধ্যে এত দ্বেষ-দ্বন্দ্ব, এত পরমত-অসহিষ্ণুতা দেখা দেয় কেন? এই প্রশ্নের প্রাথমিক উত্তরটি লোকশিক্ষক বিবেকানন্দ দিয়েছিলেন কুয়োর ব্যাঙের কাহিনীর মাধ্যমে। ২৪ সেপ্টেম্বরের ভাষণে স্বামীজী বলেছিলেন যে, মানুষের ভ্রাতৃত্বই বহু-আকাঙ্ক্ষিত উদ্দেশ্য। তিনি বলেছিলেন: "ভাইকে আমাদের ভালবাসিতেই হইবে, কারণ প্রত্যেক ধর্ম ও প্রত্যেক মত মানুষের দিব্যভাব স্বীকার করে; কাহারও অনিষ্ট করিও না, তাহা হইলে তাঁহার অন্তর্নিহিত দিব্যভাবকে ক্ষুণ্ণ করা হইবে না।"[২৬] মানুষের অন্তর্নিহিত দিব্যভাবকে স্বীকার করে বিশ্বভ্রাতৃত্ব উপলব্ধির জন্য তিনি আহ্বান জানালেন। স্বামীজীর এই মহৎ আহ্বান বোমা-বিস্ফোরণের মতো প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছিল। স্বামী বিবেকানন্দ বলেছিলেন যে, তিনি ফিরে এসে "সমাজের ওপর বোমার মতো ফেটে" পড়বেন। তিনি স্বদেশে প্রত্যাবর্তনের পূর্বেই পাশ্চাত্যদেশে শিকাগোতে বোমা-বিস্ফোরণের মতোই আলোড়ন তুলেছিলেন। প্রচলিত বোমার মতো এই বোমা মানুষের ক্ষয়ক্ষতি করেনি, ক্ষয়ক্ষতি থেকে রক্ষা পাবার পথ দেখিয়েছিল, মানুষের সার্বিক কল্যাণের পথ উন্মোচিত করেছিল। বোমার টুকরো-গুলি ছিল বিবেকানন্দের বেদান্ত-উপলব্ধি—তাঁর আত্মপ্রত্যয়ের ধাতুপ্রলেপ দ্বারা গিলটি করা জীব-ব্রহ্মৈক্য উপলব্ধি। প্রচণ্ড শক্তিবলে সেগুলি চারদিকে আগুনের মতো ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়েছিল; তা থেকে ভাবের অগ্নিস্ফুলিঙ্গ শ্রোতাদের হৃদয়-অঙ্গারে সঞ্চারিত হয়েছিল—দপ্ করে জ্বলে উঠেছিল মহৎ ভাবের একটি দাবানল। ধর্মমহাসম্মেলনে উদ্ভূত ভাবসম্পদ যেন জ্বলে উঠেছিল একটি বিশাল মশালের মতো।[২৭] ভাবের তরঙ্গ উদ্বেল সকল মানুষ বিস্ফারিত নয়নে বিস্ময়ের সঙ্গে লক্ষ্য করল সেই দীপ্ত মশালের শিখায় উদ্ভাসিত মহাসম্মেলনের সর্বজনাদৃত দেবদূতসদৃশ বিবেকানন্দের উজ্জ্বল ভাবমূর্তি। সে-ভাবমূর্তি সমবেত ধর্মনেতাগণের ভাবসমুদ্রমন্থনজাত অমৃতমূর্তি, অথবা বলা যেতে পারে, ধর্মপ্রতিনিধিবর্গের অনুষ্ঠিত মহাযজ্ঞে

২৪ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত, ১।১।১০

২৫ 'Neely's History', Introduction, p. 27

২৬ বাণী ও রচনা, ১ম খণ্ড, ১ম সং, পৃঃ ৩৭

২৭ স্বামীজী একটি চিঠিতে লিখেছিলেন: 'দুনিয়ায় আগুন লাগিয়ে দিতে হবে।' তিনি নিজেই আগুন লাগিয়ে-ছিলেন। সম্ভবতঃ তাই বিবেকানন্দের ভাষণে ধর্মমহাসম্মেলনে উপস্থিত শ্রোতাদের হৃদয় অগ্নিময় হয়ে উঠেছিল।

উদ্ভূত ভবিষ্যৎ মানুষের আলোর দিশারী। এই অপূর্ব দর্শনের সঙ্গে সঙ্গে মরমী ব্যক্তিমাত্রেই শুনতে পাচ্ছিল আশার বাণী—মানুষ স্বরূপতঃ "অমৃতের সন্তান", অমৃতত্বে মানুষের মৌল অধিকার, অমৃতত্ব তাকে এ-জীবনেই লাভ করতে হবে।

সেই প্রদীপ্ত মশালের শিখায় ভাস্বর বিবেকানন্দ জগদাচার্য, স্বাধিকারে তিনি আচার্যোত্তম। বিজ্ঞান-শাখার সভাপতি মিঃ মারউইন-মেরী স্নেলের অভিমত ঃ "তিনিই (স্বামী বিবেকানন্দ) ছিলেন নিঃসন্দিগ্ধরূপে মহাসভার সর্বাপেক্ষা জনপ্রিয় ও প্রভাবশালী ব্যক্তি।" বিবেকানন্দ-ভাবাগ্নির আলো ও উত্তাপে সাময়িকভাবে হলেও গোঁড়ামি, ধর্মান্ধতা ইত্যাদি পতঙ্গের মতো দগ্ধ হলো, উজ্জ্বল হয়ে উঠল ধর্মসকলের উদ্দেশ্যের একমুখীনতা ; ধর্ম-যাজকদের বাক্যচ্ছটা, ধর্মব্যবসায়ীগণের তুকতাক ভস্মীভূত হলো এবং স্পষ্টতর হয়ে উঠল যে, অপরোক্ষানুভূতিই ধর্মের সার—হৃদয়ের গ্রন্থি ও সংশয়ের ছেদনই তার লক্ষ্য। সেই ভাবাগ্নিতে উদ্দীপ্ত হয়েই স্বামীজী ঘোষণা করেছিলেন পাশ্চাত্য-দেশে তাঁর জীবনের 'মিশন'। যদিও তিনি নিজেকে "বুদ্ধের দাসানুদাসগণের দাস"[২৮] জ্ঞান করতেন, তিনিই নির্দ্বিধায় বলেছিলেন ঃ "বুদ্ধ যেমন প্রাচ্যদেশের জন্য একটি বিশেষ বাণী লইয়া আসিয়াছিলেন, আমিও তেমনি পাশ্চাত্যের জন্য একটি বিশেষ বাণী লইয়া আসিয়াছি।"[২৯]

এই 'বাণী' বেদান্তের বিশুদ্ধ বাণী। বেদান্ত-বাণীর বাহক বিবেকানন্দ স্বয়ং বেদান্ত-শিরোমণি। তাঁর ভাষায় খাঁটি বৈদান্তিকের সংজ্ঞা ঃ "যখন নর-নারীর ভেদ, লিঙ্গভেদ, মতভেদ, বর্ণভেদ, জাতিভেদ প্রভৃতি কোন ভেদ তাহার নিকট প্রতিভাত হয় না, যখন সে এই সকল ভেদবৈষম্যের ঊর্ধ্বে উঠিয়া সর্বমানবের মিলনভূমি মহামানবতা বা একমাত্র ব্রহ্মসত্তার সাক্ষাৎকার লাভ করে, কেবল তখনই সে বিশ্বভ্রাতৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়। একমাত্র এরূপ ব্যক্তিকেই প্রকৃত বৈদান্তিক বলা যাইতে পারে।"[৩০] সত্যি-কথা, বিবেকানন্দ প্রকৃত বৈদান্তিক, কিন্তু তিনি আবার, কবি বনফুলের ভাষায়, "ভারতবর্ষের আত্মার অভিব্যক্তি"-ও। তাঁর দৃষ্টিতে ভারতবর্ষ সেই দেশ, "যেখানে মানুষের ভিতর ক্ষমা, দয়া, পবিত্রতা, শান্তভাব প্রভৃতি সদ্‌গুণের বিকাশ সবচেয়ে অধিক পরিমাণে হয়েছে" ; "যেখানে সর্বাপেক্ষা অধিক আধ্যাত্মিকতা ও অন্তর্দৃষ্টির বিকাশ হয়েছে"। "পূর্বপুরুষদের কাছ থেকে ভারতবর্ষ উত্তরাধি-কারসূত্রে যে অপূর্ব আধ্যাত্মিক চিন্তা লাভ করেছে, যাকে বহু শতাব্দীর অবনতি ও দুঃখ-দুর্বিপাকের মধ্যে এই জাতি সযত্নে বক্ষে ধারণ করে আছে—জগৎ সেই রত্নের জন্য তৃষ্ণাতুর হয়ে রয়েছে।" এই অমর ভারতের "আত্মার অভিব্যক্তি" স্বামী বিবেকানন্দ।

কিন্তু বিবেকানন্দ ছিলেন যুক্তিনিষ্ঠ ও বিস্ময়-করভাবে আধুনিক। পরাধীন জীর্ণদীর্ণ ভারতবর্ষ থেকে তিনি স্বাধীন নবীন আমেরিকাতে পৌঁছে বিভ্রান্ত হয়ে পড়েননি। তিনি যেমন প্রাচ্যদেশে জীবন ও মননের মর্ম অনুধাবন করেছিলেন, তেমনি করেছিলেন পাশ্চাত্যদেশের জীবন ও মননের বৈশিষ্ট্যও। তাঁর মননে রচিত হয়েছিল প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের সেতুবন্ধ, সুগম হয়ে উঠেছিল ভাবের আদানপ্রদান। স্বামীজী বলতেন ঃ "[পাশ্চাত্য থেকে] আমরা শিখব সঙ্ঘ গড়তে, কর্মতৎপরতা—efficiency—আর ওরা আমাদের কাছে শিখবে ধ্যান, তপস্যা, যোগ, বেদান্ত।" প্রাচ্যের আধ্যাত্মিকতার সাথে পাশ্চাত্যের কর্মোদ্যমের সমন্বয়ে উভয়েরই কল্যাণ, এই ছিল স্বামীজীর নিদান।

আধ্যাত্মিক মানবতাবাদের উদ্গাতা, বিশ্বভ্রাতৃত্বের আদর্শস্বরূপ, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মিলন-সেতু লোকশিক্ষক বিবেকানন্দ ভারতের উদ্ধারকর্তা হলেও জগৎকল্যাণে নিবেদিতপ্রাণ। তিনি 'বিশ্বমানব-সভায়' উপস্থিত হয়েছিলেন ভারতের সর্বোত্তম রত্নরাজির উপহার নিয়ে। অকাতরে সেই রত্নরাজি তিনি বিতরণ করেছিলেন। যুগযুগান্ত ধরে গচ্ছিত ভারতের সম্পদের তিনিই পুনঃপ্রকাশক, তিনিই বন্টক। সেসময়ে স্বামীজীর উজ্জ্বল ভাবমূর্তি-খানি দেখে মনে হচ্ছিল একটি জ্যোতির আবর্ত—তা থেকে বিচ্ছুরিত হচ্ছিল নীলাভ আলোর দ্যুতি, স্বামীজীর মহিমার খ্যাতি। এই আলোর দ্যুতিই

২৮ যুগনায়ক বিবেকানন্দ, ৩য় খণ্ড, ২য় সং পৃঃ ১১৬

৩০ বাণী ও রচনা, ৩য় খণ্ড ১ম সং. পৃঃ ৩৩০

২৯ ঐ, ২য় খণ্ড পৃঃ ১৭১

শোভা পাচ্ছিল শিকাগোর দীপ্ত মশালের উজ্জ্বল শিখারূপে।

স্মরণ করা যেতে পারে স্বামীজীর দিব্যপ্রেরণা-জাত একটি ভবিষ্যদ্বাণী। ভারত ত্যাগের পূর্বে তিনি গুরুভাই তুরীয়ানন্দজীকে বলেছিলেনঃ "হরি ভাই, ধর্মমহাসভাটা এরই (নিজের দিকে অঙ্গুলি-নির্দেশ করে) জন্য হচ্ছে। আমার মন তাই বলছে। শিগগিরই এর প্রমাণ দেখতে পাবে।"[৩১] তখন বুঝতে না পারলেও অল্পকালের মধ্যেই এর সত্যতা দেখে স্বামী তুরীয়ানন্দ স্তম্ভিত হয়েছিলেন। স্বামী তুরীয়ানন্দ ও অন্যান্যদের মনে হয়েছিল, শ্রীরামকৃষ্ণ-নির্বাচিত লোকশিক্ষককে বিশ্ববাসীর সম্মুখে পরিচয় করিয়ে দেবার জন্যই, তাঁর কর্মক্ষেত্র প্রস্তুতির জন্যই যেন সংগঠিত হয়েছিল ঐ বিশ্বধর্ম-মহাসম্মেলন। তাঁদের মনে পড়েছিল শ্রীরামকৃষ্ণের তাৎপর্যপূর্ণ একটি মন্তব্যঃ "ওর (নরেন্দ্রর) জন্যই তো সব গো!"

আরও একটি কথা। শিকাগো ধর্মমহাসভার ইতিহাসের বস্তুবাদী পাঠকমাত্রেরই মনে প্রশ্ন ওঠা স্বাভাবিক—স্বামী বিবেকানন্দকে বাদ দিলে ধর্ম-মহাসম্মেলন যে মহান সাফল্য অর্জন করেছিল, তা সম্ভব হতো কি?[৩২] জেনারেল কমিটির চেয়ারম্যান ডঃ ব্যারোজ বলতে পারতেন কিঃ "Our hopes have been more than realized"? এই প্রশ্নের উত্তর দেবার দায়িত্ব পাঠকের জন্য তোলা রইল।

শতবর্ষ পরে শিকাগোর সেই বিশ্বমেলাভূমির দিকে তাকালে চোখে পড়ে কংক্রিটের জঙ্গল। চোখে পড়ে না আলোকস্তম্ভের মতো সেই দৃপ্ত মশালটি। তবে কি নতুন আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতীক মশালটি নিভে গেছে? মনে পড়ে ধর্মমহাসভার সমাপ্তি অধিবেশনে মিঃ বনির সগর্ব ঘোষণা। তিনি মহাসম্মেলনের সাফল্যের তৃপ্তিতে ভরপুর হয়ে বলেছিলেনঃ "বিশ্বকংগ্রেস বিশ্বব্যাপী শান্তি ও সমৃদ্ধির ওপর যে বিপুল প্রভাব বিস্তার করবে তা ভাষায় বর্ণনা করা অসম্ভব।... বাহ্য পরিবর্তনের ক্ষেত্রে এই প্রভাব অবিলম্বে সুবোধ্য না হলেও চিন্তা, সংবেদন, কর্ম ও দাতব্যক্ষেত্রে এর প্রভাব অচিরেই পরিস্ফুট হয়ে উঠবে। মতবাদ বা প্রতিষ্ঠানসমূহ চেহারায় অপরিবর্তিত থাকলেও সে-সকলের মধ্যে একটি নতুন আলো ও শান্তি বিরাজ করবে।" ধর্মমহাসম্মেলনের মূল সংগঠক মিঃ বনির প্রত্যাশা কতটুকু পূরণ হয়েছে হিসাব নিতে গেলেই চোখে পড়ে ইতিহাসের বিদ্রূপাত্মক হাসি। বিগত একশো বছরে সারা বিশ্বে বিভিন্ন ক্ষেত্রে যে বিরাট পরিবর্তন ঘটেছে তার নজির অতীতের কোন শতাব্দীতে পাই না। এই পরিবর্তনের প্লাবন থেকে মতবাদ, প্রতিষ্ঠান, ব্যক্তি—কোন কিছুই রেহাই পায়নি। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার জয়যাত্রাতে মানুষের চোখ ধাঁধিয়ে গেছে। রাজনৈতিক মতবাদগুলির পরস্পরের মধ্যে সংঘর্ষ ও কম্যুনিজমের পরাভব মানুষকে বিভ্রান্ত করেছে। আর্থসামাজিক বিবর্তন ব্যক্তি ও পারিবারিক জীবনের মূল্যবোধ ভাঙচুর করেছে। চতুর্দিকে তথাকথিত অগ্রগতির দামামা বাজছে, কিন্তু একটি ক্ষেত্র অগ্রগতি অবরুদ্ধপ্রায়। মানুষের নিজের এবং মানুষে-মানুষে সম্পর্ক-বিষয়ে উন্নতি বিগত একশো বছরে নগণ্য বা শূন্যমাত্র। আলোচ্য শতবর্ষকালে মানবপ্রগতির এই সামগ্রিক পটভূমিতে লক্ষ্য করি, উৎসাহ ও উদ্দীপনায় প্রোজ্জ্বল ধর্মমহা-সম্মেলনের স্মৃতি কয়েক বছরের মধ্যেই আমেরিকার জীবনের মূলস্রোত থেকে হারিয়ে গেছে। উক্ত মহাসম্মেলনের উৎসাহী সংগঠক স্বপ্নচারী মিঃ বনি, বাস্তববাদী ডঃ ব্যারোজ ও তাঁদের সহকর্মিগণ একথা শুনে আঁতকে উঠতেন যে, তাঁদের প্রিয় 'শ্বেত শহরে' (White City) শিকাগো শতবর্ষ-পূর্বেকার ঐতিহাসিক ঘটনাটি আনুষ্ঠানিকভাবে স্মরণ করতেও অনাগ্রহী। বর্তমানে পণ্ডিতগণ বিচার-বিশ্লেষণ করে বলছেন যে, তদানীন্তন ধর্মীয় সঙ্কীর্ণতা ও নিছক জড়বাদে 'জরে' থাকা আমেরিকান জীবনে

৩১ যুগনায়ক বিবেকানন্দ, ২য় খণ্ড, পৃঃ ২৬

৩২ এ-প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, অপরিচিত সন্ন্যাসী স্বামী বিবেকানন্দ বিশ্বমেলাতে বারোদিন ঘোরাঘুরি করেও সম্মেলনে প্রতিনিধি হিসাবে যোগদানের অধিকার অর্জন করতে পারেননি। যোগদানের আশা ত্যাগ করে চলে গিয়েছিলেন বস্টন অঞ্চলে। জহুরী জহর চেনে। হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক রাইটের সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয়। তাঁর সুপারিশে স্বামীজী সম্মেলনে যোগদান করেছিলেন।

এবং ব্যবসাকেন্দ্র শিকাগো শহরে ঐরূপ ধর্মমহাসম্মেলনের অনুষ্ঠানটি ছিল একটি অস্বাভাবিক ঘটনা।[৩৩] তদানীন্তনকালে এটা ছিল সত্যই দুঃসাহসিক এক প্রচেষ্টা। কয়েকজন আদর্শবাদী শিকাগোবাসীর উৎসাহ ও কঠোর পরিশ্রমে সম্মেলনটি সংঘটিত হয়েছিল। কিন্তু বর্তমান শিকাগো শহরবাসীদের নিকট ঐ সম্মেলন একটি উপকথামাত্র। অপরপক্ষে ১৮৯৩ খ্রীস্টাব্দের ঐ ঐতিহাসিক ঘটনাটি ভারতবর্ষের মানুষ শ্রদ্ধাসহকারে স্মরণ করছে, তার কারণ ঐ মহাসম্মেলনের মঞ্চেই ভারতবর্ষ ও প্রাচ্যের দেশগুলি সর্বপ্রথম আধুনিক জগতে স্বীকৃতি ও মর্যাদালাভ করেছিল।

ইতোমধ্যে দুটি বিশ্বযুদ্ধের ঝড় অতিক্রান্ত। মানুষের সুস্থ জীবনযাপনের মৌল অধিকার আজও দুষ্প্রাপ্য বস্তু। ক্ষমতার দাপাদাপি ও মারণাস্ত্রের সঞ্চয় সর্বকালীন অনতিক্রান্ত সীমাতে পৌঁছেছে। যুদ্ধ-ক্ষমতার পরিমাপে আমেরিকা আজ পৃথিবীর অপ্রতিদ্বন্দ্বী। এই আমেরিকায় শিকাগোর মাটিতে দাঁড়িয়ে স্বামী বিবেকানন্দ বলেছিলেন: "স্বাধীনতার মাতৃভূমি কলম্বিয়া, তুমি কখনও প্রতিবেশীর শোণিতে নিজ হস্ত রঞ্জিত কর নাই, প্রতিবেশীর সর্বস্ব অপহরণরূপে ধনশালী হইবার সহজ পন্থা আবিষ্কার কর নাই। সভ্যতার পুরোভাগে সমন্বয়ের পতাকা বহন করিয়া বীরদর্পে অগ্রসর হইবার ভার তাই তোমার উপর ন্যস্ত হইয়াছে।" ইতিহাসের ছাত্রমাত্রেরই জানা আছে, স্বামীজীর অভিনন্দিত আমেরিকার ভাবমূর্তি আজ ম্লান ও ক্ষীণ। বহির্বিশ্বের সঙ্গে সম্পর্কের ক্ষেত্রেই নয়, অন্তর্দেশীয় প্রেক্ষাপটেও আমেরিকা সভ্যতার পুরোভাগে আলোকবর্তিকা বহনের অধিকার হারিয়েছে। সমাজের একাংশের প্রাচুর্যের পাপ সমাজের রন্ধ্রে রন্ধ্রে প্রবেশ করে সমাজকে করে তুলেছে বিভীষিকাময়। ইঙ্গিতবহ দু-একটি তথ্য উপস্থাপিত করলেই আমাদের বক্তব্য স্পষ্ট হয়ে উঠবে। 'Time' পত্রিকায় প্রকাশিত একটি প্রতিবেদনে জানা যায়—"শিল্পোন্নত দুনিয়াতে আমেরিকাই সবচেয়ে হিংসাত্মক জাতি। ১৫ বছর থেকে ২৪ বছর বয়সের আমেরিকানদের মৃত্যুর মুখ্য কারণ দুর্ঘটনা, তারপরই নরহত্যা। প্রতিবছর বিশ লক্ষাধিক আমেরিকান মারামারি, ছুরিকাঘাত, গুলিদ্বারা আঘাত বা অন্যান্য আক্রমণের শিকার হয়, আর তাদের মধ্যে ২৩,০০০ মৃত্যুমুখে পতিত হয়।"[৩৪] আমেরিকার সঙ্গে সঙ্গে পৃথিবীর অন্যান্য কয়েকটি দেশেও হিংসা-সম্পৃক্ত সংস্কৃতি গড়ে উঠেছে।

ধর্মমহাসম্মেলনের ইতিহাসে সগৌরবে লেখা হয়েছে বিভিন্ন ধর্মপ্রতিনিধি-কীর্তিত মানুষের মহিমা। প্রতিনিধিগণের মধ্যে স্বামী বিবেকানন্দের বক্তব্য ছিল সবচেয়ে হৃদয়-আলোড়নকারী। গোঁড়া খ্রীস্টান ডঃ ব্যারোজও তাঁর কথা শুনে মুগ্ধ হয়েছিলেন। স্বামী বিবেকানন্দ শ্রোতাদের লক্ষ্য করে বলেছিলেন: "তোমরা ঈশ্বরের সন্তান, অমৃতের অধিকারী—পবিত্র ও পূর্ণ। মর্ত্যভূমির দেবতা তোমরা!... তোমরা অমর আত্মা, মুক্ত আত্মা—চির আনন্দময়। তোমরা জড় নও, তোমরা দেহ নও; জড় তোমাদের দাস, তোমরা জড়ের দাস নও।" বিপ্লবাত্মক এই বেদান্ত-ভাবনা শ্রোতাদের, বিশেষতঃ খ্রীস্টধর্মাবলম্বী শ্রোতাদের প্রচণ্ড ঝাঁকুনি দিয়েছিল। মুক্তমনা বুদ্ধিজীবিগণ স্বামীজীর চিন্তা-ভাবনার মধ্যে দেখতে পেয়েছিলেন নতুন ঊষার আলো। মানবতাবাদিগণ বক্তাকে ধন্য ধন্য করেছিলেন।

কিন্তু একশো বছর পরে দেখছি—মানুষের অবস্থার উন্নতি হয়নি, বরং তার দুরবস্থা আজ সত্যসত্যই চরমে। সারা বিশ্বের অর্ধসংখ্যক মানুষ মৌল মানবাধিকার থেকে বঞ্চিত। রাষ্ট্রপুঞ্জের

৩৩ এবিষয়ে কিঞ্চিৎ ধারণা করা যাবে তদানীন্তন আমেরিকার বিখ্যাত বাগ্মী রবার্ট গ্রীন ইঙ্গারসোল (Robert Green Ingersoll)-এর কথা থেকে। তিনি স্বামীজীর উদারবাণী শুনে মন্তব্য করেছিলেন: "Fifty years ago you would have been hanged in this country if you had come to preach in this country or you would have been burnt alive. You would have been stoned out of the villages if you had come even much later."

৩৪ "The U. S. is the most violent nation in the industrialized world. Homicide is the second most frequent cause of death among Americans between the age of 15 and 24 (after accident). More than two million people are beaten, knifed, shot or otherwise assaulted each year, 23000, of them fatally. ('Time', April 19, 1993, p. 48)

মানবাধিকার কেন্দ্রের প্রতিবেদন অনুসারে, পৃথিবীর ১'৪ লক্ষ কোটি মানুষ আজ চরম দারিদ্র্যের মধ্যে কালাতিপাত করছে। অপর এক লক্ষ কোটি মানুষ অর্থনৈতিক অধিকার থেকে বঞ্চিত এবং ধ্বংসের দিকে ধাবমান। ১৯৯৩ খ্রীস্টাব্দের প্রথম তিনমাসের মধ্যে পাঁচ হাজার মানুষ নিখোঁজ। পঞ্চাশাধিক সংখ্যক দেশে ১৫ লক্ষ কোটি থেকে ২০ লক্ষ কোটি শিশু আন্তর্জাতিক আইনকে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখিয়ে শ্রমিকের কাজ করতে বাধ্য হচ্ছে। গত বিশ বছরের মধ্যে ১২৫,০০০টি রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে মানবাধিকার-ভঙ্গের অভিযোগ এসেছে রাষ্ট্রপুঞ্জের কাছে।[৩৫] এই পটভূমিকায় স্বভাবতই মনে প্রশ্ন জাগে, বিশ্বধর্ম-মহাসম্মেলন বহুবন্দিত ভ্রাতৃত্ববোধ কোথায়? যে-স্বামী বিবেকানন্দ তাঁর অস্থিমজ্জায় মানুষের দুঃখ-কষ্ট অনুভব করতেন, তিনি বর্তমান মানব-দেবতার দুর্গতি, মানবতার চরম অবমাননা দেখে কি করতেন, কি বলতেন?

ধর্মমহাসম্মেলনের বক্তাদের বক্তব্যসকল শুনে অনেকের মনে হয়েছিল যে, ধর্মে ধর্মে দীর্ঘকাল-ব্যাপী বিরোধের অবসান আসন্নপ্রায়। সমাপ্তি অধি-বেশনে স্বামী বিবেকানন্দ যেন সকল প্রতিনিধির মুখপাত্র হয়ে বিশ্ববাসীকে আশ্বস্ত করেছিলেন এই বলেঃ "শীঘ্রই প্রত্যেক ধর্মের পতাকার উপর লিখিত হইবে—'বিবাদ নয়, সহায়তা; বিনাশ নয়, পরস্পরের ভাবগ্রহণ; মতবিরোধ নয়, সমন্বয় ও শান্তি'।" মহাসম্মেলনের শতবর্ষ পরে বর্তমানে আমরা কি দেখছি? সত্য কথা, বিভিন্ন মতা-বলম্বীদের মধ্যে মিলনের আকাঙ্ক্ষার হাওয়া মৃদুমন্দ গতিতে প্রবাহিত হচ্ছে, বিগত প্রায় একশো বছর আমরা বিভিন্ন ধর্মনেতাদের বক্তব্যের মধ্যে প্রায়ই বিবেকানন্দের শান্তির বাণীর প্রতিধ্বনি শুনতে পাচ্ছি। কিন্তু পরিতাপের বিষয়, এ-সকল মিঠে বুলি, শ্রীশ্রীমায়ের ভাষায়, "মুখস্থ মাত্র, অন্তঃস্থ নয়"। আশা করা গিয়েছিল, বিশ্বের যাবতীয় ধর্ম-অধর্মের বিরুদ্ধে বিপরীত মেরুভুক্ত হবে, তা না হয়ে, একটি ধর্ম তার 'বিধর্মের' সঙ্গে সরাসরি বৈপরীত্যে তথা বৈরিতায় মেতে উঠছে। নির্বিচারে ধর্ম ব্যবহৃত হচ্ছে নোংরা রাজনীতির হাতিয়ার-রূপে। ধর্মের মুখোশ পরে অধর্ম ও কুধর্ম যথেচ্ছ চার করে চলছে। ধর্ম ও রাজনীতি সোনা ও সোহাগার মতো মিলেমিশে বর্তমানে সৃষ্টি করেছে রুমানিয়া, আয়ারল্যান্ড, গাজা স্ট্রীপ, কাশ্মীর ইত্যাদি সমস্যা। স্বামীজী তাঁর শিকাগোভাষণে সগর্বে বলেছিলেন, ভারতবর্ষ সুপ্রাচীনকাল থেকে অপরা-পর মতাবলম্বীদের প্রতি সর্বদা সহিষ্ণু ও গ্রহিষ্ণু, সেই ভারতবর্ষে ধর্মের দোহাই দিয়ে অযোধ্যায় লঙ্কাকাণ্ড ঘটছে, বোম্বাইতে হয়েছে 'লঙ্কাদহন'। বিবেকানন্দ-তিরস্কৃত মতবিরোধ, বিবাদ ও বিনাশ উৎকটভাবে মাথাচাড়া দিয়ে উঠছে। আজকের মানুষ ভুলতে বসেছে ধর্মমহাসম্মেলনে বিবেকানন্দ-উচ্চারিত ধর্ম সম্বন্ধে দিঙ্‌নির্দেশ—"শুধু বিশ্বাস করা নয়, আদর্শস্বরূপ হইয়া যাওয়াই—উহা জীবনে পরিণত করাই ধর্ম।" ভুলতে বসেছে যে, ধর্ম হচ্ছে মানুষের আত্মবিকাশের বিজ্ঞান, মানুষের অন্ত-র্নিহিত আত্মশক্তি উন্মোচনের প্রযুক্তিবিদ্যা। সার্থক ধর্মমার্গই সুনিশ্চিত পথ দেখিয়ে দেয়, যাতে "মানবাত্মা ঈগল-পক্ষীর শাবকের মতো ক্রমশঃ উচ্চ হইতে উচ্চতর স্তরে উঠিতে থাকে এবং ক্রমশঃ শক্তি সঞ্চয় করিয়া শেষে সেই মহান সূর্যে উপনীত হয়।"[৩৬] আচার্য বিবেকানন্দ-প্রদর্শিত ধর্মের এই মহান ভূমিকা ভুলে গিয়ে মানুষ মন্দির-মসজিদ, দেববিগ্রহ-ধর্মশাস্ত্র, বিধি-নিষেধের অছিলায় খেয়ো-খেয়ি করে মরছে।

এসব দেখেশুনে মনে প্রশ্ন ওঠা স্বাভাবিক, তবে কি অভাবনীয় ধুমধাম করে একশো বছর পূর্বে অনুষ্ঠিত ধর্মমহাসম্মেলন ইতিহাসের পাতায় একটি তাৎপর্যহীন ঘটনামাত্রে পর্যবসিত হতে যাচ্ছে? তবে কি সম্মেলনটি হাউই-এর মতো আকাশপটে আশা-আকাঙ্ক্ষার রঙ ও আলোর খেলা দেখিয়েই হাওয়ায় মিলিয়ে গেল? অবশ্য যাঁরা মনে করেছিলেন—মহাসম্মেলন দুর্দম একটি আন্দোলনের জন্ম দেবে, তাঁরা হতাশ হয়েছিলেন এই মহাসম্মেলনের কাঠামো আশ্রয় করে প্যারিস শহরে সাত বছর পরে

৩৫ ২০ এপ্রিল ১৯৯৩ তারিখে কলকাতা থেকে প্রকাশিত 'The Statesman' পত্রিকা দ্রষ্টব্য।

৩৬ বাণী ও রচনা, ১ম খণ্ড, পৃঃ ২৫

অনুষ্ঠিত 'Congress of the History of Religions' দেখে। দ্বিতীয়তঃ নিরপেক্ষ ইতিহাস বলে, ধর্মমহাসম্মেলনের মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল খ্রীস্টধর্মের প্রাধান্য প্রদর্শন। স্বামী বিবেকানন্দ স্বয়ং একটি চিঠিতে লিখেছিলেন : "ধর্মসভার ব্যবস্থা হয়েছিল খ্রীস্টধর্মকে অন্য ধর্মের চেয়ে মহান করে দেখাবার উদ্দেশ্য নিয়ে।"[৩৭] অবশ্য সে-উদ্দেশ্য ব্যর্থ হয়েছিল। অপরপক্ষে ধর্ম-মহাসম্মেলনের ভাবাদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে বিভিন্ন দেশে আন্তর্ধর্মের আলোচনা (interfaith dialogue), বেশ কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয়ে তুলনা-মূলক ধর্মমতের (Comparative Religion) আলোচনা, একটি ধর্মমতের দ্বারা আয়োজিত রিট্রিটে অপর ধর্মমতের আলোচনা ও আচার-অনুষ্ঠানের প্রদর্শন, বিভিন্ন ধর্মসম্প্রদায়ের মধ্যে জানাশুনার আগ্রহ বৃদ্ধি পেয়েছে। তবুও একথা অনস্বীকার্য, ধর্মসম্পর্কিত সাম্প্রদায়িকতা, গোঁড়ামি, পরমত-অসহিষ্ণুতা ইত্যাদি 'ভাইরাস'-এর আক্রমণে মানবসমাজের অধিকাংশ আজ জর্জরিত। অবশ্য ইদানীংকালের জাতিভিত্তিক যুদ্ধবিগ্রহ, দুর্ভিক্ষ, এইডস ও প্লাগের বিভীষিকা, শহরগুলিতে ক্রমবর্ধমান অপরাধপ্রবণতা ইত্যাদির সম্মুখীন হয়ে বিভ্রান্ত ধর্মনেতাগণ নিজ নিজ ধর্মমতের স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করেও সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিচ্ছেন, শান্তিতে সহাবস্থানের উপায় খুঁজছেন। একদল বুদ্ধিজীবির অভিমত এই যে, সমসাময়িক মৌলবাদ, সংগ্রামপ্রিয় দেশপ্রেম, উগ্র জাতীয়তাবাদসমূহ সাময়িক প্রতি-সরণকারী স্রোত বৈ তো নয়।[৩৮] কিন্তু শিকাগো ধর্মমহাসম্মেলনে পরিকল্পিত ধর্মসমন্বয় ও বিশ্ব-ভ্রাতৃত্ব অথবা স্বামীজী-প্রস্তাবিত সকল ধর্ম-সম্প্রদায়ের গ্রাহ্য একটি সর্বজনীন ধর্মের[৩৯] বাস্তবায়ন এখনো 'দূর অস্ত্'।

আধুনিক পাশ্চাত্যের সভ্যতা তিনটি গ্রীক আদর্শের ওপর সংস্থাপিত। সে-তিনটি হচ্ছে—যুক্তি-প্রধান দর্শন, মানবিক নীতিশাস্ত্র ও জাতীয়তাবাদী রাজনীতি।[৪০] একশো বছর পূর্বে স্বামী বিবেকানন্দ পাশ্চাত্যের বুধমণ্ডলীর সম্মুখে উপরোক্ত আদর্শের চেয়ে উঁচু এক আদর্শ—আধ্যাত্মিক জীবনের আদর্শ তুলে ধরেছিলেন। আধ্যাত্মিকতাই মানুষের আন্তর পরিবর্তন আনতে এবং আত্মশক্তির প্রবোধন ঘটাতে সক্ষম। আধ্যাত্মিকতার সঞ্জীবনী সুধায় জীবন ও সমাজ সিঞ্চিত করতে পারলে মানুষের যাবতীয় ক্লেশের নিরাকরণ সম্ভবপর। এই ভাবনা দ্বারা প্রেরিত হয়েই স্বামীজী নিবেদিতাকে লিখেছিলেন (৭ জুন, ১৮৯৬) : "আমার আদর্শ বস্তুতঃ অতি সংক্ষেপে প্রকাশ করা চলে. আর তা এই—মানুষের কাছে তার অন্তর্নিহিত দেবত্বের বাণী প্রচার করতে হবে এবং সর্বকার্যে সেই দেবত্ব-বিকাশের পন্থা নির্ধারণ করে দিতে হবে।"[৪১] এই মহান আদর্শের প্রচারই ছিল পাশ্চাত্যে স্বামীজীর কর্মসূচীর মুখ্য অঙ্গ এবং এই প্রচারকার্য তিনি আনুষ্ঠানিকভাবে শুভারম্ভ করেছিলেন শিকাগো ধর্মমহাসম্মেলনের মঞ্চে। স্বামীজীর তেজোদীপ্ত বাণী শুনে কারও কারও মনে হয়েছিল, ভারতের অধ্যাত্মসূর্য বুঝি পাশ্চাত্যগগনে উদিত হয়েছেন। সেই সূর্যের কিরণে 'মানুষ মাত্রই আজন্ম পাপী'—একথা শুনে অভ্যস্ত পাশ্চাত্যের মানুষের মনের পুঞ্জীভূত গ্লানি দূর হলো, তারা যেন নতুন প্রাণ পেল। তারা

৩৭ আমেরিকায় থাকাকালীন স্বামীজী একটি সাক্ষাৎকারে বলেছিলেন : "আমার বোধ হয়, বিশ্বের সামনে একটা heathen show করার অভিপ্রায়েই ধর্মসম্মেলন আহূত হয়েছিল।"

৩৮ "...Fundamentalism, jingoism, and nationalism are patterns of backlash for the moment". ('Reader', Oct. 27, 1989, Vol. 19, No. 5)

৩৯ এই সর্বজনীন ধর্মের চেহারা কি হবে তা সুস্পষ্ট করে স্বামীজী বলেছিলেন ১৯ সেপ্টেম্বর ১৮৯৩ তাঁর 'হিন্দুধর্ম' শীর্ষক ভাষণে তিনি বলেছিলেন : "It will be a religion which will have no place for persecution or intolerance in its polity, which will recognize divinity in every man or woman, and whose whole scope whose whole force, will be centred in aiding humanity to realize its own true, divine nature." (Complete Works of Swami Vivekananda, Vol. I, 14th Edn., 1972, p. 19)

৪০ Radhakrishnan Reader, 1988, p. 611

৪১ বাণী ও রচনা, ৭ম খণ্ড, ১ম সং, ১৩৬১, পৃঃ ২৫১

স্বামীজীকে হার্দিক স্বাগত জানাল। আজকের প্রশ্ন, আমেরিকা ও ইংল্যান্ড স্বামীজীর এই প্রাণে শিহরণ-জাগানো বাণী গ্রহণ করতে পারল না কেন ?

ভারতবর্ষের দিকে দৃষ্টি ফেরালে প্রথমেই মনে পড়ে 'ইন্ডিয়ান মিরর' পত্রিকায় দেশবাসীকে উদ্দেশ করে স্বামীজীর লেখাটি। স্বামীজী লিখেছিলেন ঃ "বিস্ময়কর শিকাগো মহাসভাকে অবলম্বন করেই ভারতবর্ষ, ভারতবাসী ও ভারতীয় চিন্তা জগৎসমক্ষে আগের চেয়ে অনেক উজ্জ্বলভাবে প্রকটিত হয়েছে।"[৪২] প্রাচীন ভারতীয় ঋষি থেকে পরম্পরাগত প্রজ্ঞা, তেজ ও শক্তি স্বামী বিবেকানন্দের মধ্যে প্রবলাকারে আবির্ভূত হয়ে 'পরানুবাদ, পরানুকরণ, পরমুখাপেক্ষা, এই দাসসুলভ দুর্বলতা'-সম্বলমাত্র ভারতবর্ষকে বিশ্বসভায় উচ্চ মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করেছিল। অসম্ভব সম্ভব হয়েছিল। এই ঐতিহাসিক ঘটনার আংশিক স্বীকৃতি পাওয়া যায় ঐতিহাসিক ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদারের লেখায়। তিনি লিখেছেন ঃ "একথা বললে অত্যুক্তি হবে না যে, বিশ্বসংস্কৃতির আধুনিক মানচিত্রে সেদিন তিনি [ স্বামীজী ] হিন্দুধর্মের জন্য একটি নির্দিষ্ট স্থান নির্ধারণ করে গিয়েছিলেন।"[৪৩] বিপিনচন্দ্র পাল ( ১৮৫৮-১৯৩২ ) পাশ্চাত্যদেশে গিয়ে দেখেছিলেন ঃ "বিবেকানন্দের প্রভাবে এখানে অনেকের চোখ খুলে গিয়েছে।… তাঁর শিক্ষার গুণেই এখানকার অধিকাংশ লোক আজকাল বিশ্বাস করে যে, প্রাচীন হিন্দুশাস্ত্রগুলির মধ্যে বিস্ময়কর আধ্যাত্মিক তত্ত্বগুলি নিহিত আছে।"[৪৪] স্বামীজী চেয়েছিলেন সেই মহান তত্ত্বগুলি সমাজজীবনে প্রয়োগ করে সমাজের মধ্যে আমূল পরিবর্তন আনতে, উপযুক্ত শিক্ষার মাধ্যমে জনসাধারণের হারিয়ে যাওয়া স্বাতন্ত্র্য বিকশিত করতে, স্বদেশের দুর্লভ আধ্যাত্মিক সম্পদের বিনিময়ে পাশ্চাত্যের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যা আমদানী করতে এবং এসকলের দ্বারা ভারতীয় সমাজের পুনর্জাগরণ ঘটাতে। স্বামীজীর অতুল প্রভাবের সামান্য স্বীকৃতি দেখতে পাই সি. রাজাগোপালাচারীর ( ১৮৭৯-১৯৭২ ) কথায়। তিনি বলেছিলেন ঃ "আমরা অন্ধ ছিলাম. তিনি আমাদের দৃষ্টি দিয়েছেন।… আমাদের রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও আধ্যাত্মিক স্বাধীনতার তিনি পিতা।"[৪৫] তিনি যে 'দৃষ্টিশক্তি' আমাদের দিয়েছিলেন তার দ্বারা আমরা আমাদের রাজনৈতিক স্বাধীনতা আয়ত্ত করেছি বটে, কিন্তু সাংস্কৃতিক ও আধ্যাত্মিক স্বাধীনতালাভের দিকে এখনো যথেষ্ট অগ্রসর হতে পারিনি। অথচ আমরা স্বামীজীকে স্মরণ করে বিভিন্ন শতবর্ষজয়ন্তীতে মেতে উঠেছি। রাস্তার মোড়ে, পার্কে, ময়দানে বিবেকানন্দ-মূর্তি স্থাপন করছি, স্বামীজীর নামে রাস্তা-ঘাটের নাম পাল্টাচ্ছি, তাঁর স্তব-স্তুতি রচনা করছি, স্বামীজীর জীবন ও বাণী অবলম্বনে নাটক মঞ্চস্থ করছি। এসকল উৎসবের জৌলুস অধিকাংশ সময়েই তুবড়ির মতো জ্বলে উঠে নিভে যাচ্ছে। এসকল যতই দেখছি, ততই চোখের সামনে সুস্পষ্ট হয়ে উঠছে স্বামীজীর দৃপ্ত আনন, কিন্তু দেখছি তাঁর চোখে অশ্রু। তাঁর দুঃখ—তাঁকে আমরা চিনতে পারিনি, তাঁর পরিকল্পনা আমরা বুঝতে পারিনি।[৪৬] তিনি চেয়েছিলেন, তাঁর নাম-ধাম রসাতলে যাক, শুধু ভবিষ্যতের যুবকগণ তাঁর ভাবাদর্শকে ব্যক্তি ও সমাজ-জীবনে রূপায়িত করে তাঁর 'মিশন'কে সম্পূর্ণ করুক। মনে পড়ছে, জীবনসায়াহ্নে তাঁর মনের খেদ—আরেকজন বিবেকানন্দ এলে বুঝতে পারত এই বিবেকানন্দ কি দিয়ে গেলেন।

মূল্যবোধের অবক্ষয়, মানবতাবোধের অবনমন, হিংস্রতার বীভৎসতা ইত্যাদিতে আধুনিক সংস্কৃতি দূষিত। বর্তমানকালে নৈরাশ্য ও ব্যর্থতার পুঞ্জ পুঞ্জ মেঘ চারিদিকে ভেসে বেড়াচ্ছে। এ-সময়টাতেই আমাদের সর্বাধিক প্রয়োজন বিবেকানন্দ-রশ্মির রক্তরাগ। বর্তমানের বিপদসঙ্কুল পথ-অতিক্রম করতে প্রয়োজন সঙ্কটমোচন বিবেকানন্দকে। বিবেকানন্দ অনির্বাণ জ্যোতি, তা লুপ্ত হতে পারে না। তাছাড়াও

৪২ লন্ডন থেকে ২৮ অক্টোবর ১৮৯৬ তারিখে স্বামীজী লিখেছিলেন।

৪৩ চিন্তানায়ক বিবেকানন্দ, ১৩৯৫, পৃঃ ১০০৮

৪৪ উদ্ধৃতঃ ঐ, পৃঃ ৯৮৯

৪৫ ঐ, পৃঃ ৯৯৯

৪৬ হরিদাস বিহারীদাস দেশাইকে স্বামীজী লিখেছিলেন—তাঁকে দেশের অধিকাংশ মানুষই চিনতে পারেনি।

বিবেকানন্দ যে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। ভাল করে লক্ষ্য করে দেখি, শতবর্ষ পূর্বে বিশ্বধর্মমহাসম্মেলনের মঞ্চ থেকে যেসকল মহৎ ভাবনার উদ্ভব হয়েছিল, যে-ভাবাগ্নিসকল প্রকাণ্ড একটি মশালের মতো জ্বলে উঠেছিল, তা এখনো অনির্বাপিত; সেই মশালের শিখাতে ভাসমান বিবেকানন্দও অদৃশ্য নন। অবশ্য সেই মশাল ও তার শিখা এখন ক্ষীণ—অতি ক্ষীণ। ভারতভূমির দিকে ভাল করে চাইলে দেখা যাবে, স্বদেশে প্রত্যাবৃত বিবেকানন্দ যে আগুন কলম্বো থেকে আলমোড়া, কাশ্মীর থেকে শিলঙ-এ ছড়িয়ে ছিটিয়ে দিয়েছিলেন, তা নিভে যায়নি। শিকাগো ধর্মমহাসম্মেলনের একবছর পরে (২৫ সেপ্টেম্বর, ১৮৯৪) তিনি ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন: "আগুন ধরে গেছে বাবা। গুরুর কৃপায় যে আগুন ধরে গেছে, তা নিভবার নয়।"[৪৭] সেই আগুনই তিনি ভারতময় ছড়িয়ে দিয়েছিলেন। কিন্তু লক্ষ্য করেছিলেন, স্বদেশের যুবকগণ সেই ভাবাগ্নিতে অগ্নিময় হতে সময় নিচ্ছে। তিনি যুবকগণের উদ্দেশে বলেছিলেন: "আমার ভেতর যে কি আগুন জ্বলছে, তার সংস্পর্শে এখনো তোমাদের হৃদয় অগ্নিময় হয়ে ওঠেনি। তোমরা এখনো পর্যন্ত আমায় বুঝতে পারনি।... আগুনে গিয়ে ঝাঁপ দাও এবং লোককে ভগবানের দিকে নিয়ে এস।

"ভগবৎসমীপে প্রার্থনা করি, আমার ভেতরে যে আগুন জ্বলছে, তা তোমাদের ভেতর জ্বলে উঠুক।"[৪৮] স্বামীজীর এই আশীর্বাণী স্মরণ করে আমাদের প্রত্যেকের হৃদয়ে সঞ্চারিত করতে হবে বিবেকানন্দ নামক অনির্বাণ অগ্নি। আমাদের হৃদয় বিবেকানন্দ-অগ্নিতে উজ্জ্বল হয়ে উঠবে, আমাদের শিরায় শিরায় বিদ্যুৎ ছুটবে, আমাদের পেশীতে পেশীতে শক্তির বিকাশ ঘটবে। তখনই আমরা স্বামী বিবেকানন্দের আরব্ধ 'মিশন' সুসম্পন্ন করতে সক্ষম হব, তাহলেই বিবেকানন্দ শতবর্ষ-জয়ন্তী সার্থক হয়ে উঠবে, নতুবা নয়। □

৪৭ বাণী ও রচনা, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃঃ ৪৮৪

৪৮ ঐ, পৃঃ ৬৮

নিবন্ধ

# বস্টন ও সন্নিহিত স্বামী বিবেকানন্দ

## স্বামী সর্বাত্মানন্দ

বস্টন রামকৃষ্ণ বেদান্ত সোসাইটির সুবর্ণজয়ন্তী (১৯৪২-১৯৯২) উপলক্ষে নিবন্ধটি প্রকাশিত হলো। লেখক সোসাইটির সহকারী অধ্যক্ষ।—সম্পাদক, উদ্বোধন

একথা আজ প্রায় সকলেই জানেন—স্বামী বিবেকানন্দ প্রথম ভারতীয় সন্ন্যাসী, যিনি মহাসাগর পাড়ি দিয়ে আমেরিকার শিকাগো ধর্মমহাসভায় বেদান্তের সমন্বয়বাণী প্রচার করেছিলেন। সেই ধর্মমহাসভার আয়োজন হয়েছিল সম্ভবতঃ খ্রীস্টান ধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব প্রচারের দুন্দুভি বাজানোর উদ্দেশ্যে, কিন্তু বিধির বিধানে মাত্র ত্রিশ বছরের এই প্রায় অজ্ঞাত ও অপরিচিত যুবক সন্ন্যাসী জগৎসভায় ভারতকে ধর্মে শ্রেষ্ঠ আসনলাভে উন্নীত করেছিলেন। সাধারণ লোকের ধারণা, স্বামী বিবেকানন্দ এদেশে আসার পর শিকাগোর ধর্মমহাসভাতেই প্রথম বক্তৃতা দিয়েছিলেন। কিন্তু মেরী লুইস বার্কের 'Swami Vivekananda in the West: New Discoveries' নামক গ্রন্থ থেকে আমরা জানি, শিকাগো ধর্মমহাসভায় বক্তৃতাদানের আগে স্বামীজী বস্টনে ও কাছাকাছি অঞ্চলে কিছু বক্তৃতা করেছিলেন এবং তাঁর বক্তৃতা সেখানকার মানুষের মধ্যে সাড়া ফেলেছিল। সংবাদপত্রেও তার বিবরণ প্রকাশিত হয়েছিল। ধর্মমহাসভায় তাঁর যোগদানের পরিচয়-পত্র বস্টন থেকেই সংগৃহীত হয়েছিল। হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক জন হেনরী রাইট স্বামীজীকে পরিচয়পত্র দিয়েছিলেন। বস্তুতঃ, স্বামীজীর শিকাগো বক্তৃতার প্রস্তুতি-পর্ব অনেকটা বস্টন থেকেই সম্পন্ন হয়েছিল। সুতরাং ধর্ম-

মহাসভায় স্বামীজীর আবির্ভাবের পশ্চাতে বস্টনের অবদান অনস্বীকার্য। বস্টন বেদান্ত সোসাইটির সুবর্ণজয়ন্তী ( ১৯৪২-১৯৯২ ) উপলক্ষে প্রকাশিত স্মারক-পত্রিকা অবলম্বনে এই প্রবন্ধে সেই বিষয় সংক্ষেপে কিছু আলোচনা করার চেষ্টা করছি।

স্বামীজী ১৮৯৩ খ্রীস্টাব্দের ৩১ মে বোম্বাই বন্দর থেকে জাহাজে রওনা হয়ে চীন ও জাপান দেখে প্রশান্ত মহাসাগর অতিক্রম করে আমেরিকার উত্তর-পশ্চিমে অবস্থিত কানাডার ভ্যাঙ্কুভারে অবতরণ করেন ২৫ জুলাই মঙ্গলবার সন্ধ্যায়। সেখান থেকে পরদিন সকালে ট্রেনে ক্যানাডিয়ান প্যাসিফিক রেলপথে শিকাগো রওনা হন। গাড়িতে মিস কেট স্যানবর্ন নামে জনৈক প্রৌঢ়া ভদ্রমহিলার সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয়। স্বামীজীর ব্যক্তিত্ব ও পাণ্ডিত্যে মুগ্ধ হয়ে ভদ্রমহিলা বস্টনের কাছে তাঁর খামার-বাড়িতে আতিথ্যগ্রহণ করার জন্য তাঁকে আমন্ত্রণ জানান। তারপর ৩০ জুলাই রাত্রে তাঁরা শিকাগোর রেলস্টেশনে পৌঁছান। কলম্বিয়ান এক্সপোজিশন তথা বিশ্বমেলা দেখার উদ্দেশ্যে তখন শিকাগো শহরে দেশ-বিদেশের বহু লোকের ভিড়। বিদায় নেবার প্রাক্কালে ভদ্রমহিলা স্বামীজীকে বস্টনের নিকটবর্তী তাঁর 'ব্রীজি মেডোজ' বাড়ির ঠিকানা দিতে ভোলেননি। আলোঝলমলে সেই বিশ্বমেলার বিরাট আয়োজন স্বামীজীকে বিশেষভাবে মুগ্ধ ও প্রভাবিত করেছিল। তিনি এক হোটেলে অবস্থান করে বারো-দিন ধরে ঘুরে ঘুরে মেলা দেখেন। খোঁজ-খবর নিয়ে জানলেন, ধর্মসভার অধিবেশন শুরু হতে তখনো মাসখানেকের ওপর দেরি। আরও জানলেন যে, কোন ধর্মসংস্থার মনোনয়নপত্র বা পরিচয়পত্র ছাড়া ধর্মসভার প্রতিনিধি হওয়া সম্ভব নয়। ভারত ছাড়ার পূর্বে তাঁর এসম্বন্ধে কিছুই ধারণা না থাকায় তিনি কোন পরিচয়পত্র ছাড়াই বিদেশযাত্রা করেন। এদিকে তাঁর খুব ইচ্ছা—এত টাকা খরচপত্র করে এত দূরে যখন এসেছেন তখন ব্যাপারটা শেষ পর্যন্ত কি দাঁড়ায় দেখেই তবে দেশে ফিরবেন। ধর্মসভার প্রতিনিধি হিসাবে যোগ দিতে না পারলেও অন্ততঃ দর্শক ও শ্রোতা হিসাবে যোগ দেবার মনস্থ করলেন। কিন্তু আর্থিক সমস্যা তাঁকে বিচলিত করল। হোটেলে প্রতিদিনের যা খরচ তাতে তাঁর কাছে যে কয়েক পাউণ্ড ছিল তাতে আরও মাস-খানেক থাকা সম্ভব নয়। তিনি তখন শিকাগো শহরে সম্পূর্ণ অপরিচিত—কে তাঁকে টাকা দিয়ে সাহায্য করবে? ডানপিটে স্বভাব তাঁর বরাবরই; তিনি কিছুতেই দমবার পাত্র নন। শুনলেন, বস্টন অঞ্চলে গ্রামের দিকে অল্প খরচে থাকার ব্যবস্থা হতে পারে। তাই বস্টনে এসে উঠলেন ব্যাটল স্ট্রীটের এক হোটেল—কুইন্সী হাউস-এ। মনে পড়ল ট্রেনে পরিচিত ভদ্রমহিলার কথা। ব্রীজি মেডোজ-এর ঠিকানায় তাঁকে একটি তার পাঠালেন তিনি। তখন আগস্ট মাসের মাঝামাঝি। অনতি-বিলম্বে মিস স্যানবর্নের টেলিগ্রাম পেলেন তিনি: "Yours received. Come today: 4-20 train." গুজভিলে রেলওয়ে স্টেশনে ভদ্রমহিলা স্বয়ং স্বামীজীকে স্বাগত জানিয়ে তাঁকে তাঁর ব্রীজি মেডোজ-এ নিয়ে গেলেন। ব্রীজি মেডোজ সাজানো-গোছানো একটি খামারবাড়ি। বাড়িটিতে অনেক জ্ঞানিগুণিজনের সমাবেশ হতো। অবি-বাহিতা সুশিক্ষিতা এই মধ্যবয়স্কা ভদ্রমহিলা আতিথেয়তার জন্য এই অঞ্চলে খুবই সুপরি-চিতা ছিলেন। একসময় কয়েকবছর তিনি বস্টনের স্মিথ কলেজে সাহিত্যের অধ্যাপিকা হিসাবে কাজ করেছেন। এই ভদ্রমহিলাই হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের খ্যাতনামা অধ্যাপক জন হেনরী রাইটের সঙ্গে স্বামীজীর পরিচয় করিয়ে দেন। স্বামীজীকে শিকাগো ধর্মমহাসভার প্রতিনিধিত্বের পরিচয়পত্র দিতে গিয়ে অধ্যাপক রাইট লিখেছিলেন: "এই অল্প-বয়স্ক হিন্দুসন্ন্যাসীর জ্ঞান আমাদের সমস্ত বিদ্বান অধ্যাপকদের জ্ঞানের সমষ্টির চেয়েও বেশি।"

ব্রীজি মেডোজ-এ থাকাকালীন মিস স্যানবর্ন তাঁর বন্ধুবান্ধব মহলে স্বামীজীকে পরিচয় করিয়ে দেন এবং নিজে সঙ্গে করে স্বামীজীকে নিয়ে ঘোড়ার গাড়িতে বিভিন্ন দর্শনীয় স্থানসমূহ দেখান। তাছাড়া স্বামীজী ব্রীজি মেডোজ থেকে একদিন বস্টনে রমাবাঈ-এর কাজে সাহায্যকারী একটি বড় লেডিস ক্লাবে বক্তৃতা দেন এবং ২২ আগস্ট শেরবর্ন রিফরমেটরির মহিলা আবাসিকদের কাছে ভারতীয় আচার-ব্যবহার ও সামাজিক জীবনযাত্রা বিষয়ে বক্তৃতা দেন।

ব্রীজি মেডোজ থেকে স্বামীজী ২৪ আগস্ট বৃহস্পতিবার ফ্রাঙ্কলিন বেঞ্জামিন নামে কেট স্যানবর্নের এক আত্মীয়ের বাড়িতে অবস্থান করেন। সেখান থেকে অধ্যাপক রাইটের আমন্ত্রণে বস্টন থেকে ৩০ মাইল দূরে অ্যানিস্কোয়ামে তাঁর গ্রামের বাড়িতে যান পরদিন শুক্রবার সন্ধ্যা নাগাদ। সেখানে মিস লেন-এর বোর্ডিং হাউস স্বামীজীর থাকার ব্যবস্থা হয়েছিল। বোর্ডিং হাউসের লোকেরা স্বামীজীর চেহারা ও বেশভূষাদি দেখে খুব আকৃষ্ট হয়েছিল। রবিবার সন্ধ্যায় স্বামীজী স্থানীয় চার্চে বক্তৃতা দেন। বিষয়বস্তু ছিল—'ভারতীয় আচার-ব্যবহার'। তাঁর নিজের ভাষায়, "এইটিই তাঁর বিদেশে প্রথম সাধারণ জনসভায় বক্তৃতা"। ২৮ আগস্ট সোমবার স্বামীজী এখান থেকে সালেম রওনা হন ট্রেনে—প্রায় আধঘণ্টার পথ।

সালেম-এ তিনি মিসেস কেট ট্যানাট উডস নামে এক ভদ্রমহিলার অতিথি হন। মিসেস উডস ছিলেন সালেমের থট অ্যান্ড ওয়ার্ক ক্লাব-এর প্রেসিডেন্ট। তাঁর সঙ্গে স্বামীজীর ব্রীজি মেডোজ-এ থাকাকালীন পরিচয় হয়েছিল। ২৮ আগস্ট বিকাল চারটায় ওয়েসলি চ্যাপেল-এ ক্লাবের সভ্য ও অতিথিদের সভায় তিনি প্রধানতঃ 'বেদোক্ত হিন্দুধর্ম" বিষয়ে বক্তৃতা দেন। বক্তৃতাকালে তাঁকে কিছু গোঁড়া ধর্মযাজকের বিরোধিতার সম্মুখীন হতে হয়। পরের রবিবার ৩ সেপ্টেম্বর সন্ধ্যায় স্বামীজী ইস্ট চার্চে 'ভারতের ধর্ম ও দরিদ্র জনগণ' বিষয়ে বক্তৃতা করেন। তিনি বলেন: ভারতের প্রয়োজন ধর্ম নয়, সুতরাং সেখানে মিশনারি না পাঠিয়ে শিল্প বিষয়ে প্রচারক পাঠানো ভাল। তিনি আরও বলেন যে, হিন্দুধর্ম পৃথিবীর সবচেয়ে প্রাচীন ধর্ম।

বেঞ্জামিন ফ্র্যাংকলিন স্যানবর্নের আমন্ত্রণে ৪ সেপ্টেম্বর স্বামীজী সালেম থেকে সারাটোগা স্প্রিংস রওনা হন। সেখানে তিনি আমেরিকান সোস্যাল সায়েন্স অ্যাসোসিয়েশন-এর কনভেনশনে বক্তৃতা দিতে আমন্ত্রিত হয়েছিলেন। সালেমে যে-বাড়িটিতে তিনি ছিলেন সেটি এখনো রয়েছে। সালেমে তিনি মোট পাঁচটি বক্তৃতা দিয়েছিলেন। শেষ বক্তৃতাটি তিনি দিয়েছিলেন ৬ সেপ্টেম্বর। তারপর সালেম হয়ে বস্টনে ফিরে এসে ৮ সেপ্টেম্বর ট্রেনে শিকাগো রওনা হন। ৯ সেপ্টেম্বর শিকাগো পৌঁছান। উদ্দেশ্য ১১ সেপ্টেম্বর শিকাগো ধর্মমহাসভায় যোগদান। পরের ঘটনা সকলের জানা।

॥ ২ ॥

বস্টনে আমরা স্বামীজীকে দেখি পুনরায় পরের বছর (১৮৯৪) এপ্রিল মাসে। ১৪ এপ্রিল শনিবার তিনি বস্টনের নর্দামটন সিটি হল-এ বক্তৃতা দেন। তখন অবশ্য তিনি সারা আমেরিকায় বক্তা হিসাবে খুব প্রসিদ্ধ। ১৫ এপ্রিল বিকেলে স্মিথ কলেজে তিনি বক্তৃতা দেন। তারপর মিসেস ব্রীড-এর আমন্ত্রণে বস্টনের প্রায় দশ মাইল উত্তরে অবস্থিত লীন শহরে আসেন। ভদ্রমহিলা সালেমের মিসেস উডসের (শিকাগো যাবার আগে স্বামীজী এঁর বাড়িতে অতিথি হয়েছিলেন।) ঘনিষ্ঠ বন্ধু এবং গ্রীন একরের একজন ট্রাস্টী। এই অঞ্চলে উনি খুবই পরিচিত ছিলেন। মিসেস ব্রীড সম্ভবতঃ স্বামীজীকে প্রথম শিকাগো ধর্মমহাসভায় দেখেন। ১৭ এপ্রিল বিকালে এখানকার নর্থ শোর ক্লাবে স্বামীজী প্রথম বক্তৃতা দেন এবং পরদিন সন্ধ্যায় অক্সফোর্ড হল-এ দ্বিতীয় বক্তৃতা দেন।

এরপর স্বামীজী নিউ ইয়র্ক চলে যান। সেখান থেকে পুনরায় বক্তৃতা দিতে বস্টনে আসেন ৬ মে রবিবার। তাঁর চিঠিতে স্বামীজী ছয়টি বক্তৃতার কথা উল্লেখ করেছেন। এবার তিনি সম্ভবতঃ হোটেল বেলভিউ-তে উঠেছিলেন। পরদিন ৭ মে তিনি উইমেন্স ক্লাবে বক্তৃতা দেন। ৮ মে র‍্যাডক্লিফ কলেজে, ১০ মে বস্টনের মিঃ কলিন্সের গোলটেবিলে, ১৪ মে অ্যাসোসিয়েশনে, ১৫ মে লরেন্সের মহিলা সমিতি আয়োজিত সভায় সেখানকার লাইব্রেরী হল-এ এবং ১৬ মে হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের সেভার হল-এ তিনি বক্তৃতা দেন।

জুলাইয়ের শেষার্ধে গ্রীষ্মের অবকাশে স্বামীজী পুনরায় বস্টনের নিকটবর্তী সোয়াম্পস্কটে এসে কিছুদিন থাকেন। সমুদ্রতীরবর্তী এই স্থানটি খুবই মনোরম। এখানে স্বামীজী প্রতিদিন সমুদ্রে সাঁতার কাটতেন। জুলাইয়ের শেষ সপ্তাহ থেকে আগস্টের মাঝামাঝি পর্যন্ত প্রায় তিন সপ্তাহ স্বামীজী গ্রীন একর-এ অবস্থান করেন। বস্টন থেকে এখানকার দূরত্ব প্রায় ৭০ মাইল। মিস সারা ফার্মার

নামে এক মহিলা এই মনোরম নির্জন স্থানটি নির্বাচন করেন তাঁর উদারনৈতিক ভাবপ্রচারের জন্য এবং তিনি ঐ উদ্দেশ্যে একটি সমিতি গঠন করেন। তিনি স্বামীজীকে আতিথ্যগ্রহণের জন্য আমন্ত্রণ জানালে স্বামীজী সাদরে গ্রহণ করেন। ঐ সময় সেখানকার অনুষ্ঠিত ক্যাম্পে যোগদানকারী আগ্রহী নর-নারীকে তিনি হিন্দুধর্মের উদার ভাবের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেন। প্রতিদিন একটি পাইন গাছের তলায় তৃণাচ্ছাদিত মাটির ওপর সকলে তাঁর সঙ্গে বসতেন এবং তিনি তাঁদের রাজযোগ প্রভৃতি বিষয়ে শিক্ষা দিতেন। তাঁর সঙ্গে সকলে কখনো কখনো 'শিবোঽহম্, শিবোঽহম্' সমস্বরে উচ্চারণ করতেন। তারকামণ্ডিত আকাশের তলে খোলা মাঠে উপবেশন করে রাত্রিকালেও তাঁর শিক্ষাদান চলত। কোনদিন হয়তো ৭/৮ ঘণ্টা তিনি সমানে বলে চলতেন। মিসেস সারা ওলি বুল আমন্ত্রিত হয়ে এখানে আসেন এবং স্বামীজীর সাক্ষাৎলাভ করেন। এই ধীর স্থির প্রত্যুৎপন্নমতিসম্পন্না ভদ্রমহিলা স্বামীজীর খুব ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে আসেন এবং পরে তাঁর কাজে বিশেষভাবে সাহায্য করেন। স্বামীজী চিঠিপত্রে তাঁকে 'Dear Mother', 'ধীরা মাতা' প্রভৃতিতে সম্বোধন করতেন। বেলুড় মঠের জমি ক্রয় ও সংস্কারাদির কাজে এঁর আর্থিক সাহায্য বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

এখান থেকে ১৩ আগস্ট স্বামীজী প্লাইমাউথ গিয়েছিলেন ফ্রী রিলিজিয়াস অ্যাসোসিয়েশন-এর কনভেনশনে যোগ দিতে। সেখানে তিনি দুটি বক্তৃতা দেন। সকল ধর্মের সহযোগিতা, মহান উদার ভাব ও সমন্বয়বাণী তাঁর মূল বক্তব্য ছিল। পরের বছর গ্রীষ্মে গ্রীন একর ক্যাম্পে স্বামীজী পুনরায় আমন্ত্রিত হয়েছিলেন, কিন্তু সময়াভাবে তিনি যেতে পারেননি।

স্বামীজী দ্বিতীয়বার অ্যানিস্কোয়ামে আসেন আগস্ট মাসের শেষদিকে ডেট্রয়েটের গভর্নরের স্ত্রী মিসেস ব্যাগলীর অতিথি হয়ে। এবার তিনি প্রায় তিন সপ্তাহ এখানে ছিলেন। হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক রাইট এবারেও সপরিবারে এখানে আসেন। তাঁরা ওঠেন মিস লেন-এর বোর্ডিং হাউসে। এঁদের সঙ্গে কথাবার্তা বলে স্বামীজীর সময় খুব ভালভাবে কাটে এখানেই জনৈক মহিলা চিত্রশিল্পীর অনুরোধে স্বামীজী তাঁর ছবি আঁকানোর জন্য কয়েকদিন বসেন। একদিন সন্ধ্যায় নৌকাভ্রমণে গিয়ে নৌকা উল্টে তিনি জলে পড়ে যান। এরপর নিকটবর্তী ম্যাগনোলিয়া গ্রামে গিয়ে স্বামীজী তিনদিন কাটিয়ে আসেন। সেখানে তিনি একটি বক্তৃতাও দিয়েছিলেন। সমুদ্রতীরবর্তী এই স্থানটির প্রাকৃতিক সৌন্দর্য তাঁকে অভিভূত করে।

সেপ্টেম্বরের প্রথম সপ্তাহের মঙ্গলবার সন্ধ্যা আটটায় স্বামীজী অ্যানিস্কোয়ামে মেকানিক্স হল-এ 'ভারতীয় জীবন ও ধর্ম' বিষয়ে বক্তৃতা দেন। অধ্যাপক রাইট শ্রোতৃগণের কাছে তাঁর পরিচয় করিয়ে দেন। সপ্তাহের শেষে তিনি বস্টন যান এবং বেলভিউ হোটেলে ওঠেন। সেপ্টেম্বরের বেশির ভাগ সময় তাঁর বস্টনেই কাটে।

বস্টন থেকে তিনি মেলরোজ যান দু-তিনদিনের জন্য। ট্রেনে মাত্র বারো মিনিটের পথ। ২২ সেপ্টেম্বর সন্ধ্যা আটটায় মেলরোজের রগার্স হল-এ তিনি 'ভারতীয় ধর্ম' বিষয়ে বক্তৃতা দেন। সেখানকার নাগরিকদের বিশেষ অনুরোধে পুনরায় তিনি ১ অক্টোবর সোমবার সন্ধ্যা আটটায় 'ভারতীয় ধর্ম ও সামাজিক আচার-অনুষ্ঠান' বিষয়ে বক্তৃতা দেন।

বস্টনে থাকাকালীনই মিসেস ওলি বুলের সঙ্গে স্বামীজীর ভালভাবে পরিচয় হয়, যদিও এর আগে গ্রীন একর-এ উভয়ের সাক্ষাৎ হয়েছিল। এই সময় স্বামীজী অতিরিক্ত বক্তৃতার চাপে অবসন্ন বোধ করতে থাকেন এবং কিছুদিন নিরিবিলিতে থাকার কথা ভাবছিলেন। কেম্ব্রিজে সারা বুলের প্রশস্ত বাড়িতে সাদরে আমন্ত্রিত হয়ে তিনি সেই সুযোগ পান। ১১ অক্টোবর স্বামীজী কেম্ব্রিজ থেকে বাল্টিমোর ও ওয়াশিংটন রওনা হন। বিদায়কালে মিসেস বুল তাঁকে একটি নতুন পোশাক ও পাঁচশো ডলার সহ একটি সুন্দর চিঠি দেন। আগেই বলেছি, এই উদারহৃদয়া মহিলাকে স্বামীজী মায়ের মতো দেখতেন, মিসেস বুলও স্বামীজীকে নিজ পুত্রের ন্যায় স্নেহ করতেন।

মাস দুয়েকের মধ্যে স্বামীজী পুনরায় ডিসেম্বরের প্রথম সপ্তাহে বস্টনে আসেন এবং কেম্ব্রিজে

মিসেস বুলের বাড়িতে তিন সপ্তাহ থাকেন। এই সময় প্রতিদিন তিনি গীতা, উপনিষদ্ প্রভৃতি বিষয়ে দুটি ক্লাস নিতেন। ঐ সময় সর্বসাধারণের জন্য তিনি তিনটি বক্তৃতা দিয়েছিলেন। ১৭ ডিসেম্বর 'ভারতে মাতৃত্বের আদর্শ' বিষয়ে তাঁর বক্তৃতা সকল শ্রোতার মনে গভীর রেখাপাত করে। ঐ বাড়িতে ২৫ ডিসেম্বর বড়দিনের উৎসবে স্বামীজী সংস্কৃত শ্লোক আবৃত্তি করে অতিথিদের মুগ্ধ করেন।

নিউ ইয়র্ক শহরে স্বামীজীর অনুরাগী ব্যক্তিদের আগ্রহে এর মধ্যে সেখানে একটি স্থায়ী বেদান্ত সোসাইটি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। সেখানে নিয়মিত ক্লাস ও বক্তৃতাদিতে স্বামীজীর অধিকাংশ সময় ব্যয়িত হতো। গরমের সময় তিনি সাধারণতঃ শহর ছেড়ে অন্যত্র চলে যেতেন।

১৮৯৫ খ্রীস্টাব্দে ১০ মার্চ পুনরায় আমরা তাঁকে বস্টন থেকে কিছু দূরে হার্টফোর্ড শহরে বক্তৃতা দিতে দেখি। ঐ বক্তৃতার বিষয়বস্তু ছিল—'ঈশ্বর ও আত্মা'। এখানে তিনি দ্বিতীয় বক্তৃতাটি দেন পরের জানুয়ারি মাসের ৩১ তারিখ। বিষয় ছিল—'সর্বজনীন ধর্মের আদর্শ'।

নিউ ইয়র্কের বিশিষ্ট ব্যবসায়ী ও স্বামীজীর ঘনিষ্ঠ অনুরাগী বন্ধু মিঃ ফ্রান্সিস লেগেটের আমন্ত্রণে তিনি ১৮৯৫ খ্রীস্টাব্দের জুন মাসে ক্যাম্প পার্সিতে গিয়ে প্রায় দু-সপ্তাহ সেখানে তাঁদের বাড়িতে আনন্দে কাটান। এই স্থানটির প্রাকৃতিক সৌন্দর্য অতীব মনোরম। বস্টন থেকে এখানকার দূরত্ব কমপক্ষে প্রায় দুশো মাইল। লেক ক্রিস্টিনের ধারেই পাইনগাছ-বেষ্টিত নির্জনতায় স্বামীজীর মধুময় স্মৃতি বহন করে আজও সেই বাড়িটি রয়েছে। এখানে পাইনগাছের নিচে একদিন সকালে স্বামীজী গভীর ধ্যানে সমাহিত হন। তাঁকে এই অবস্থায় দেখে সকলে খুব বিচলিত হয়ে পড়েন। সমাধি থেকে বুত্থিত হয়ে ভীত সন্ত্রস্ত বন্ধুদের তিনি এই বলে আশ্বস্ত করেন: "তোমাদের দেশে আমার শরীর যাবে না।" এখান থেকে স্বামীজী সহস্রদ্বীপোদ্যান রওনা হন।

স্বামীজী আমন্ত্রিত হয়ে পুনরায় বস্টনে আসেন পরের বছর (১৮৯৬) মার্চ মাসে। মিসেস বুল প্রভৃতি কয়েকজন অনুরাগীর সঙ্গে তিনি ১৯ মার্চ বস্টনের প্রস্কোপিয়া ক্লাব আয়োজিত সঙ্গীতানুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। তিনি এই ক্লাবের ব্যবস্থাপনায় কমপক্ষে পাঁচটি বক্তৃতা দেন। উৎসাহী শ্রোতৃবৃন্দের স্থান সঙ্কুলানের জন্য নিকটস্থ অ্যালেন জিমনাসিয়াম-এর বাড়িটি ভাড়া নেওয়া হয়। ২১ মার্চ, ২৩ মার্চ, ২৭ মার্চ এবং ২৮ মার্চ কর্মযোগ, ভক্তিযোগ, রাজযোগ ও জ্ঞানযোগের ওপর তিনি চারটি ক্লাস নেন। ২৬ মার্চ সন্ধ্যায় সর্বসাধারণের জন্য 'সর্বজনীন ধর্মের আদর্শ' বিষয়ে তিনি বক্তৃতা দেন। অ্যালেন জিমনাসিয়াম-এ তাঁর সর্বশেষ বক্তৃতার বিষয়বস্তু ছিল—'অপরোক্ষানুভূতি'। চার শতাধিক শ্রোতা এখানে উপস্থিত ছিলেন। এছাড়া মিসেস বুলের বাড়িতে তিনি আরও দুইটি বক্তৃতা দিয়েছিলেন এবং ২৫ মার্চ হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শনের স্নাতক ছাত্রছাত্রীদের কাছে তিনি একটি বক্তৃতা দেন। তাঁর বক্তৃতায় মুগ্ধ হয়ে তাঁকে হার্ভার্ডের 'Chair of Philosophy' সম্মানিত পদটি গ্রহণ করতে অনুরোধ করা হয়। কিন্তু সন্ন্যাসী হিসাবে তিনি তা প্রত্যাখ্যান করেন। সেবার তিনি একদিন (১৯ মার্চের আগে) বস্টনের নিকটবর্তী মেডফোর্ড-এ একটি বক্তৃতা দেন। বস্টনের টোয়েন্টিয়েথ সেঞ্চুরী ক্লাবেও তিনি একটি বক্তৃতা দিয়েছিলেন।

বক্তৃতাদি ছাড়া মিসেস বুলের বাড়িতে থাকাকালীন সারা ফার্মার, এলেন ওয়াল্ডো, অধ্যাপক রাইট, অধ্যাপক উইলিয়াম জেমস্ প্রমুখ অনুরাগী বিশিষ্ট বন্ধুবর্গের সঙ্গে স্বামীজীর প্রায়ই আলোচনাদি হতো। এবারই তিনি শেষবারের মতো বস্টনে আসেন। স্বামীজীর দুজন গুরুভ্রাতা স্বামী সারদানন্দ এবং স্বামী অভেদানন্দ বস্টন অঞ্চলে বেশ কিছু বক্তৃতাদি দিয়েছিলেন। গ্রীনএকর-সম্মেলনেও আমন্ত্রিত হয়ে তাঁরা যোগ দিয়েছিলেন।

একশো বছরের ব্যবধানে স্বামীজীর স্মৃতি-বিজড়িত ব্রীজি মেডোজ বাড়িটি এখনো দাঁড়িয়ে রয়েছে, তবে এখন তা প্রায় ভগ্নদশাপ্রাপ্ত। অ্যানিস্কোয়াম গীর্জা, মিস লেনের বোর্ডিং হাউস, গ্রীন একর ইন প্রভৃতি বাড়িগুলি এখনো রয়েছে। কেম্ব্রিজে মিসেস বুলের বাড়িটি বেশ কয়েকবার হস্তান্তরিত হয়ে আজও সগৌরবে দণ্ডায়মান। □

**পরিক্রমা**

# পশ্চিম ইউরোপের পথে লণ্ডনে

## স্বামী গোকুলানন্দ

২১ সেপ্টেম্বর ১৯৯২ রাত আড়াইটাতে লন্ডন-গামী ব্রিটিশ এয়ারওয়েজের ফ্লাইট BA 0036 পালাম ইন্দিরা গান্ধী ইন্টারন্যাশনাল এয়ারপোর্ট থেকে আকাশে উড়ল। বিমানটি নির্দিষ্ট সময় থেকে দু-ঘণ্টা দেরি করে ছাড়ল। একটানা সাত ঘণ্টার উড়ান—দিল্লী থেকে লন্ডন। আমরা যখন হিথরো বিমানবন্দরে পৌঁছাব, তখন ভারতীয় সময় সকাল ৯টা ৩০ মিনিট হলেও লন্ডনের সময় হবে সকাল সাড়ে সাতটা। আমার টিকিট ছিল ইকনমিক ক্লাসের। এয়ারপোর্টে এসে দিল্লী মিশনের ম্যানেজিং কমিটির সদস্য আর. পি. খৈতানের সঙ্গে দেখা। তিনিও একই বিমানে লন্ডন যাচ্ছেন। তিনি আমার হাত থেকে টিকিটটা নিয়ে কাউন্টারে চলে গেলেন এবং আমার টিকিটখানা এক্সিকিউটিভ ক্লাসে পরিবর্তিত করিয়ে নিয়ে এলেন। প্লেনে উঠে দেখলাম ওপরের ডেকে মিঃ খৈতানের পাশের আসনেই আমার বসার ব্যবস্থা। প্লেন আকাশের উচ্চতার একটা স্তরে এসে উড়তে থাকলে সীট-বল্ট খোলার অনুমতিসূচক আলো জ্বলে উঠল। একটা ঘোষণা হলো, আর সঙ্গে সঙ্গে বিমানসেবিকারা সেই গভীর রাত্রিতে ট্রলি নিয়ে ঘুরে ঘুরে নৈশাহারের প্যাকেট বিলোতে শুরু করলেন। ঘনান্ধকার আকাশে সমস্ত রাতটুকু প্লেন উড়ে চলল। লন্ডনে যখন বিমান নামছে তখনও সেখানে ভোরের আলো ফোটেনি। আমাদের বিমান হিথরো বিমানবন্দরে না নেমে নামল গ্যাটউইক বিমানবন্দরে। বিমান থেকে নেমে এয়ারওয়েজের বাসে করেই রানওয়ের ভিতর দিয়ে টারমিনাল বিল্ডিং-এ এলাম। প্রবেশ-দ্বারে আমাদের বোর্ন এন্ড রামকৃষ্ণ বেদান্ত সেন্টারের স্বামী দয়াত্মানন্দ এবং ব্রহ্মচারী আত্মচৈতন্য আমাকে স্বাগত জানালেন। আমি চেরাপুঞ্জী থাকাকালে স্বামী দয়াত্মানন্দ ঐ আশ্রমের কর্মী ছিলেন। ব্রহ্মচারী মহারাজের ব্রিটিশ শরীর, বোর্ন এন্ড সেন্টারেই তিনি যোগদান করেছেন। বলা বাহুল্য, ওঁদের দেখে আনন্দ হলো। ওঁরা আশ্রমের গাড়ি নিয়ে এসেছেন আমাকে নিয়ে যেতে। আমার একটা লাগেজ বুক করা ছিল। সেটা সংগ্রহ করে আশ্রমে রওনা হলাম। ব্রহ্মচারী আত্মচৈতন্য ড্রাইভ করে নিয়ে এলেন। আমরা যখন বোর্ন এন্ড রামকৃষ্ণ বেদান্ত সেন্টারে পৌঁছালাম তখন লন্ডনের সময় সকাল নয়টা (২২ সেপ্টেম্বর)। আশ্রমের অধ্যক্ষ স্বামী ভব্যানন্দ সোচ্ছ্বাসে আমাকে স্বাগত জানালেন। আশ্রমের পরিবেশ অতি মনোরম। বিরাট প্রশস্ত লন, মনোমুগ্ধকর পুষ্পোদ্যান, সুন্দর ঝকঝকে বাড়িঘর এবং অতি সুন্দর মন্দিরগৃহ মনকে মুগ্ধ করল। সুবিস্তীর্ণ জায়গা জুড়ে সবুজ গাছ-পালা আর একটা মধুর নীরবতা আশ্রমের আধ্যাত্মিক পরিবেশটা আকর্ষণীয় করে রেখেছে। মনে হচ্ছিল, লন্ডন শহর থেকে মাত্র ত্রিশ কি. মি. দূরে এই আশ্রমে যেন হিমালয়ের গভীর নীরবতা বিরাজ করছে, যা আমরা মায়াবতী আশ্রমে অনুভব করে থাকি। আমার থাকবার জন্য দোতলার একটি ঘর নির্দিষ্ট ছিল। স্নানাদি সেরে ব্রহ্মচারী জো আশ্রমের বিস্তীর্ণ চত্বরে খানিকক্ষণ আমাকে সঙ্গে করে বেড়িয়ে এলেন। দুপুরের আহার-বিশ্রামাদি হয়ে গেলে আশপাশে একটু ঘুরে দেখে আসব ভেবে স্বামী দয়াত্মানন্দকে নিয়ে বোর্ন এন্ড রেলস্টেশনের দিকে গেলাম। এটা বাকিংহামশায়ারের মধ্যে পড়ে। রাস্তাঘাট পরিচ্ছন্ন। রাস্তার দুপাশে একই ধরনের ভিলা যেন ছবির মতো দেখাচ্ছিল। স্টেশন থেকে ফেরার পথে একটি বাজার পেয়ে দাঁড়ালাম। গাড়ি থেকে নেমে দোকানে ঢুকলাম। দোকানগুলি কি সুন্দর সাজানো। কি পরিচ্ছন্ন। কোথাও কোন ময়লা নেই। পেভমেন্টে কোন নোংরা কাগজ কিংবা ফলের খোসা পড়ে থাকতে দেখলাম না।

সন্ধ্যায় মন্দিরে আরতি ও প্রার্থনাতে যোগ দিলাম। আশ্রমের শান্ত, গম্ভীর, নিস্তব্ধতার মধ্যে সান্ধ্য প্রার্থনার মধুর সুর আর ঘণ্টার মিষ্টি আওয়াজ মনকে সহজেই এক অপূর্ব আনন্দরাজ্যে নিয়ে যায়।

বেলুড় বিদ্যামন্দিরের প্রাক্তন ছাত্র ডাঃ নব-গোপাল সামন্ত (চক্ষু-বিশেষজ্ঞ) লন্ডন থেকে এলেন আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে সন্ধ্যা সাতটায়।

লন্ডনে বেলুড় বিদ্যামন্দিরের কয়েকজন প্রাক্তন ছাত্র আছেন। তাঁরা প্রত্যেকেই সুপ্রতিষ্ঠিত। আমি বেশ কয়েক বছর বিদ্যামন্দিরে পড়িয়েছিলাম। আমার প্রাক্তন ছাত্রদের কেউ কেউ আজও আমার সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করে। আমি তিনদিন বোর্ন এন্ড আশ্রমে থাকব সংবাদ পেয়ে লন্ডন-প্রবাসী বিদ্যামন্দিরের ছাত্রদের কয়েকজন আমার সঙ্গে পত্রে যোগাযোগ করে আমাকে লন্ডন শহরের দ্রষ্টব্য স্থানগুলি ঘুরিয়ে দেখানোর ভার নেয়। নবগোপাল সেজন্যেই এসেছিল আমার প্রোগ্রাম তৈরি করতে।

রাত্রিতে নৈশাহারের পর স্বামী ভব্যানন্দ আমাদের এপিডায়াস্কোপে কিছু স্লাইড দেখালেন। তিনি সম্প্রতি মস্কো গিয়েছিলেন। সেখানে রামকৃষ্ণ মিশনের একটি নতুন সেন্টার খোলা হয়েছে। স্লাইডের ছবিগুলো মহারাজ মস্কো থেকে তুলে এনেছিলেন।

পরদিন ২৩ সেপ্টেম্বর ১৯৯২, বুধবার ভোর সাড়ে চারটাতে উঠে পড়লাম। স্নানাদি সেরে মন্দিরে মঙ্গলারতিতে এলাম। কর্পূরের আরতি হয়ে যাওয়ার পর "হরি ওঁ রামকৃষ্ণ" গানটি গাওয়া হলো। মন্দিরের পরিবেশ-মাধুর্য অতুলনীয়। প্রাতরাশের পর ভব্যানন্দজীর সঙ্গে আশ্রমচত্বরে বেড়াতে বেড়াতে অনেক কথা হলো।

স্বামী বিবেকানন্দ লন্ডনে প্রথম আসেন ১৮৯৫ খ্রীস্টাব্দে। মিস হেনরিয়েটা মুলার স্বামীজীকে লন্ডনে আসবার নিমন্ত্রণ করেছিলেন। মিঃ ই. টি. স্টার্ডিও তাঁকে সাদর আহ্বান জানিয়েছিলেন। স্বামীজীরও আকাঙ্ক্ষা ছিল, নবীন মহাদেশ আমেরিকায় বেদান্ত প্রচার করে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের রাজধানী লন্ডন নগরীতে খাস ইংরেজদের মধ্যে বেদান্তের বীজ ছড়ানোর। ১৮৯৫ খ্রীস্টাব্দে আগস্টের শেষ দিকে স্বামীজী আমেরিকা থেকে প্যারিসে এসেছিলেন। প্যারিস থেকে ১০ সেপ্টেম্বর লন্ডনে এসে স্বামীজী প্রথমে মিস মুলারের কেম্ব্রিজের রিজেন্ট স্ট্রীটের বাড়িতে উঠলেন। সেখান থেকে স্টার্ডির হাই ভিউ ক্যাভার্শ্যাম, রিডিং-এর বাড়িতে চলে যান। সেসময় ভারতবর্ষ ছিল ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের একটি উপনিবেশ। প্রায় দেড়শ বছর যাবৎ তখন ভারত ইংরেজ-শাসনাধীন। স্বামীজী বুঝেছিলেন, ভারতবর্ষের তৎকালীন দুরবস্থার প্রধান কারণ তার ব্রিটিশের শাসনাধীন হয়ে থাকা। ভারতে যেসব ইংরেজ বিলেত থেকে যেতেন, তাঁদের অনেকের ঔদ্ধত্য ছিল আকাশচুম্বী। এসব কারণে স্বামীজী যখন ব্রিটেনের মাটিতে পা দেন তখন তাঁর মন ইংরেজদের প্রতি বন্ধুভাবাপন্ন ছিল না। স্বামীজীর মনে প্রথমে একটা সন্দেহ ছিল, তিনি নিজেকে ভারতের আধ্যাত্মিকতার প্রতিনিধি হিসাবে ইংল্যান্ডে প্রতিষ্ঠিত করতে পারবেন কিনা, ইংরেজরা ভারতের ধর্ম ও দর্শন সম্বন্ধে তাঁর কথা মন দিয়ে শুনবে কিনা। তিন সপ্তাহের মধ্যেই দেখা গেল, বিবেকানন্দের নাম লন্ডনের চারদিকে ছড়িয়ে পড়েছে। বিভিন্ন ক্লাব ও সোসাইটি তাঁকে বক্তৃতা দেওয়ার জন্য আমন্ত্রণ করছে। লন্ডনের শিক্ষিত সমাজ, অভিজাত শ্রেণী এবং ধর্মযাজকদেরও একটি অংশ বিবেকানন্দের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে উঠেছেন। স্বামীজী প্রথমবারে মাত্র তিনমাস লন্ডনে ছিলেন। দ্বিতীয়বারে ১৮৯৬ খ্রীস্টাব্দের এপ্রিলের মাঝামাঝি এসে তিনমাস ছিলেন এবং পরে ঐ বছরেরই শেষের দিকে এসে আবার তিনমাস ছিলেন। ইংল্যান্ডে স্বামীজীর বেদান্ত প্রচার যে কতখানি সফল হয়েছিল, তার সাক্ষ্য হিসাবে আমরা পাই স্বামীজীর আহ্বানে কয়েকজন ইংরেজ নিজেদের পেশা ও গৃহ ত্যাগ করে তাঁর কাজে আত্মনিয়োগ করলেন এবং ভারতবর্ষের সেবাতে নিজেদের জীবন উৎসর্গ করলেন। এঁরা হলেন জে. জে. গুডউইন, মিস মার্গারেট নোবল এবং ক্যাপ্টেন ও মিসেস সেভিয়ার।

২৩ সেপ্টেম্বর ১৯৯২। সকাল দশটায় নবগোপালের সঙ্গে লন্ডন দেখতে বের হলাম। লন্ডনের সুরাজ কর এবং মনোজ চৌধুরী (উভয়েই বিদ্যামন্দিরের ছাত্র) আমাদের সঙ্গে যোগ দিলেন। আমরা লন্ডনের যেসব দ্রষ্টব্য স্থান ঘুরে দেখলাম তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছেঃ হাইড পার্ক, বাকিংহাম প্যালেস, ডাউনিং স্ট্রীটে প্রধানমন্ত্রীর সরকারি বাসগৃহ, পার্লামেন্ট ভবন, ওয়েস্ট মিনিস্টার অ্যাবি, ম্যাডাম টুসোর গ্যালারি (মোমের কাজের জন্য বিখ্যাত), ট্রাফালগার স্কোয়ার ইত্যাদি। টিউব

রেল চড়বার অভিপ্রায়ে আমরা ইস্টন ( Euston ) স্টেশনে এসে গাড়ি চাপলাম। হোবর্ন ( Holborn) স্টেশনে নেমে পড়লাম। আমরা Travel Card করেছিলাম। মূল্য মাথাপিছু আড়াই পাউন্ড। হোবর্ন স্টেশনে নেমে আমরা ব্রিটিশ মিউজিয়াম দেখতে গেলাম। সারাদিন লন্ডন শহরে ঘুরে সন্ধ্যায় সরোজের বাড়িতে এলাম। সরোজের ৩৯নং টরিংটন রোড, গ্রীনফোর্ড মিডলসেক্সের বাড়িতে বিদ্যামন্দিরের ইংল্যান্ড-প্রবাসী প্রাক্তন ছাত্রদের একটা প্রীতিসম্মেলন ডাকা হয়েছিল। সে-সম্মেলনে অনেকেই এসেছিলেন সপরিবারে। সম্মেলনের শুরুতে প্রাথমিক স্বাগত ভাষণের পর উপস্থিত প্রত্যেক নিজ নিজ পরিচয় দিলেন। এরপর কিছুক্ষণ সমবেত ধ্যান হলো, ভজন হলো। কেউ কেউ বিদ্যামন্দিরের ছাত্রাবস্থার দিনগুলির স্মৃতিচারণা করলেন। আমিও একটু বললাম। তারপর 'রামকৃষ্ণ শরণম্'-এ অনুষ্ঠানের সমাপ্তি। সম্মেলনের উদ্যোক্তারা আমন্ত্রিতদের জন্য বাঙালী-নৈশভোজের ব্যবস্থা করেছিলেন।

২৪ সেপ্টেম্বর লন্ডনের বাইরে গ্রাম দেখাতে নিয়ে গেল ভানু ঘোষ। বিগিন হিলের ফ্লাইং ক্লাব পর্যন্ত গিয়ে আমরা ফিরে এলাম। বেলা বারোটায় ভানুর বাড়িতে এসে আমার সঙ্গে দেখা করল রাহুল এবং ওর স্ত্রী সুরভি। রাহুলের বাবা দিল্লীর কাছে নয়দাতে সুন্দর বাড়ি করেছেন। বাড়ির নাম রেখেছেন 'সারদা কুটীর'। বাড়ির বেসামেন্টে একটি সুন্দর ঠাকুরমন্দির রয়েছে। প্রতিমাসে সে-মন্দিরে একবার করে ভক্তসমাগম হয়। আমাকেও ওঁরা নিয়ে গেছেন ভক্তদের কাছে ধর্মপ্রসঙ্গ করবার জন্য। রাহুলকে তার বাবা-মা দিল্লী থেকে খবর দিয়েছেন আমার সঙ্গে লন্ডনে দেখা করতে। রাহুল কর্মব্যপদেশে লন্ডনেই থাকে। রাহুলেরা আমাকে টাওয়ার অব লন্ডন ঘুরিয়ে দেখাল। ওদের বাড়িতেই দুপুরে খাওয়া হলো।

বিকালে ভানুকে নিয়ে অক্সফোর্ড ইউনি-ভার্সিটি দেখতে গেলাম। ভানুর একমাত্র মেয়ে অক্সফোর্ডে পড়ে। এই অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে পৃথিবী-বিখ্যাত পণ্ডিত ম্যাক্সমুলার প্রাচ্যবিদ্যা বিষয়ের অধ্যাপক ছিলেন। তিনি শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতি অতীব শ্রদ্ধাসম্পন্ন ছিলেন, সেকথা আমরা সবাই জানি। জানি, শ্রীরামকৃষ্ণ সম্পর্কে লেখা তাঁর বইটির কথাও। স্বামীজীর সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ হয় ১৮৯৬ খ্রীষ্টাব্দের ২৮ মে। স্বামীজীর সঙ্গে দেখা হবার আগেই তিনি ঠাকুরের জীবন ও বাণী সম্বন্ধে যেটুকু তথ্য সংগ্রহ করতে পেরেছিলেন, তার ভিত্তিতে 'A real Mahatman' নামে 'নাইনটিন্থ সেঞ্চুরী' পত্রিকায় একটি প্রবন্ধ প্রকাশ করেছিলেন। প্রবন্ধটি ইংল্যান্ডের পণ্ডিতমহলে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করেছিল। শ্রীরামকৃষ্ণের প্রধান শিষ্য হিসাবে স্বামী বিবেকানন্দও ম্যাক্সমুলারের বিশেষ শ্রদ্ধার পাত্র ছিলেন। স্বামীজী প্রসঙ্গক্রমে ম্যাক্সমুলারকে বলেছিলেন: "আজকাল সহস্র সহস্র নরনারী রামকৃষ্ণদেবের পুজো করছে।" ম্যাক্সমুলার তখন আবেগের সঙ্গে বলেছিলেন: "ওঁর মতো লোকের যদি পুজো না করে তো কার পুজো করবে?" ম্যাক্সমুলার স্বামীজীকে বলে-ছিলেন, যদি প্রয়োজনীয় উপাদান তাঁকে দেওয়া যায় তবে তিনি সানন্দে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের একখানি জীবনী লিখতে প্রস্তুত আছেন। স্বামীজী তখন ভারতবর্ষে স্বামী রামকৃষ্ণানন্দকে চিঠি লিখে ম্যাক্সমুলারকে ঠাকুরের সম্পর্কে তথ্যাদি পাঠানোর ব্যবস্থা করেন। স্বামীজীর উপদেশে স্বামী সারদানন্দ ঠাকুরের উপদেশাদি সংগ্রহ করে ম্যাক্সমুলারকে পাঠিয়েছিলেন। ঐ সমস্ত উপাদানের ওপর নির্ভর করে ম্যাক্সমুলার 'Life and Sayings of Ramakrishna' নামে বিখ্যাত গ্রন্থটি রচনা করেছিলেন। স্বামীজীকে বিদায় জানাতে রাত্রিতে ঝড়-জল উপেক্ষা করে বৃদ্ধ অধ্যাপক স্টেশনে গিয়েছিলেন। এই সম্মানিত প্রৌঢ় পণ্ডিত মানুষটি স্টেশনে চলে এসেছেন দেখে স্বামীজী খুবই সংকোচবোধ করছিলেন। একথা তাঁকে বললে ম্যাক্সমুলার বলেছিলেন: "শ্রীরামকৃষ্ণের একজন যোগ্যতম শিষ্যের দর্শনলাভের সৌভাগ্য তো প্রতিদিন হয় না!"

পরদিন অর্থাৎ ২৫ সেপ্টেম্বর আমি লন্ডন ত্যাগ করে হেলসিঙ্কি যাব। সকাল ৯-১৫ মিনিটে আমাকে হিথরো বিমানবন্দরে যেতে হবে পশ্চিম ইউরোপের উদ্দেশে। বারান্তরে আমার পরবর্তী ভ্রমণের কথা বলার ইচ্ছা রইল। □

# দেশান্তরের পত্র

# রাশিয়ায় রামকৃষ্ণ মিশন

## স্বামী জ্যোতীরূপানন্দ

**স্বামী জ্যোতীরূপানন্দ মস্কোতে রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের প্রতিনিধি। সংস্কৃতে সুপণ্ডিত এই সন্ন্যাসীর ভাষণ এবং ব্যক্তিগত আলাপচারিতা সেখানে ভক্তদের কাছে খুব জনপ্রিয় হয়েছে।—সম্পাদক, উদ্বোধন**

স্বামী বিবেকানন্দ যখন আমেরিকা ও ইউরোপে বেদান্ত প্রচারে ব্যাপৃত, সেই সময় থেকেই রাশিয়ার পণ্ডিতমহলে তাঁর বক্তৃতাবলীর অভিনবত্বে কৌতূহলের সৃষ্টি হয়। লেভ টলস্টয় বিবেকানন্দের রচনাবলীর মৌলিকত্বে বিশেষভাবে আকৃষ্ট হয়েছিলেন। ১৯০৬ থেকে ১৯১৪ খ্রীস্টাব্দের মধ্যে স্বামীজীর যোগগ্রন্থগুলি রুশভাষায় অনুবাদ করেন মিঃ পোপভ নামে একজন সামরিক উচ্চপদস্থ ব্যক্তি। স্বামী অভেদানন্দের অনূদিত কথামৃতের ক্ষুদ্র সংস্করণও ১৯১৪ খ্রীস্টাব্দে রুশভাষায় প্রকাশিত হয়। পরবর্তী কালে বিশিষ্ট চিত্রকর নিকোলাস রোয়েরিখ তাঁর ক্ষুদ্র রচনায় শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করেছিলেন। রোমাঁ রোলাঁ রচিত শ্রীরামকৃষ্ণ ও স্বামী বিবেকানন্দের জীবনী রুশভাষায় অনূদিত হয়ে ব্যাপক প্রচারলাভ করে।

যখন এভাবে এদেশে ক্ষেত্র প্রস্তুত হলো তখন দেশে কম্যুনিস্ট শাসন, ধর্মীয় ব্যাপারে উৎসাহ প্রকাশ বারণ। কিন্তু ঐ দেশ দর্শনমানসে রামকৃষ্ণ মিশনের তিনজন সন্ন্যাসী রাশিয়ায় এসেছিলেন। প্রথমে স্বামী দয়ানন্দ আমেরিকা থেকে ভারতে ফেরার পথে, স্বামী নিত্যস্বরূপানন্দ ইউনেস্কোর পরিকল্পনায় এবং স্বামী রঙ্গনাথানন্দ তাঁর বিশ্ব-পরিক্রমায়। স্বামী রঙ্গনাথানন্দের বক্তৃতা এখানকার লোকজনদের আকৃষ্ট করেছিল। স্বামী হিরণ্ময়ানন্দ, স্বামী গীতানন্দ, স্বামী স্বাহানন্দ এবং স্বামী গহনানন্দও রাশিয়ার আমন্ত্রণে এসেছিলেন পরবর্তী পর্যায়ে। স্বামী ভাস্করানন্দ আমেরিকা থেকে একবার এদেশে বেড়াতে এসেছিলেন। স্বামী লোকেশ্বরানন্দ কয়েকবার এদেশে এসেছেন, এদেশে কয়েক জায়গায় তিনি বক্তৃতাও করেছেন। এসবের ফলে ভারত ও রামকৃষ্ণ মিশনের সঙ্গে এদেশের একটা দৃঢ় যোগসূত্র স্থাপিত হয়। বিশেষ করে ঐ সময় রাশিয়া থেকে অনেকে রামকৃষ্ণ মিশনে আসতে আরম্ভ করে এবং সভা-সমিতিতে যোগদান করে তাঁরা তাঁদের অন্তরের শ্রদ্ধা প্রকাশ করে ভারতের ধর্মের প্রতি, শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের প্রতি। কিভাবে শ্রীরামকৃষ্ণের ভাবধারাকে, বিবেকানন্দের কর্মযজ্ঞকে নিজদেশের প্রয়োজনে প্রয়োগ করা যায় সেবিষয়েও চিন্তা-ভাবনা শুরু হয়ে যায়।

বেলুড় মঠে অ্যাকাডেমী অব সায়েন্সের পক্ষ থেকে আবেদন আসতে থাকে মস্কোতে একজন প্রচারক সন্ন্যাসী পাঠাবার জন্য। স্বামী লোকেশ্বরানন্দ দেখে গেছেন ধর্মের প্রতি, শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতি এদেশের মানুষের আকুলতা। এরই মধ্যে ধর্মপ্রচারের কাজ শুরু করে দিয়েছে বিভিন্ন ভারতীয় সংস্থা। এখানকার শিক্ষিত সমাজ চান ভারতের কোন নির্ভরযোগ্য সংস্থা এখানে ধর্মপ্রচার করুক। তাঁদের আবেদনে সাড়া দিয়ে ১৯৯১ খ্রীস্টাব্দের মে মাসে আমাকে বেলুড় মঠ কর্তৃপক্ষ পাঠালেন মিশনের কাজকর্ম স্থায়িভাবে আরম্ভ করার জন্য। ২৫ মে সকালে আমি মস্কোতে উপস্থিত হলাম।

১৯৮৬ খ্রীস্টাব্দের ঘোষণা থেকে পর্যায়ক্রমে সোভিয়েত দেশের লোকেরা ব্যক্তি-স্বাধীনতার আস্বাদ, ধর্মীয় স্বাধীনতার আস্বাদ পেতে আরম্ভ করেছে; কিন্তু তারই মধ্যে শুরু হয়ে গেল রাজনীতির আবর্তন। ব্যর্থ অভ্যুত্থান হলো

১৯৯১-এর আগস্টে। তারপর একে একে বিভক্ত হয়ে গেল সোভিয়েত দেশ, দাঁড়িয়ে রইল রাশিয়া স্বতন্ত্রভাবে সমস্যাবলীর পাহাড় মাথায় নিয়ে। নানা অনিশ্চয়তার মধ্যেও আমার কাজ কিন্তু পরিকল্পিতভাবে এগিয়ে চলল, ব্যাহত হয়নি একবারও। মস্কোর ইনস্টিটিউট অব ওরিয়েন্টাল স্টাডিজে চলল সাপ্তাহিক বক্তৃতা—বেদান্ত, শ্রীরামকৃষ্ণ, বিবেকানন্দ ও ভারতের ধর্ম বিষয়ে শুরু হলো সংস্কৃতভাষায় শিক্ষাদান। এদেশে সংস্কৃতভাষার খুব সম্মান। নিজেদের ভাষার জননী-স্বরূপা সংস্কৃত ও ল্যাটিন এই দুই মহিমামণ্ডিত প্রাচীনতম ভাষা, ধর্মীয় কৃষ্টিতে দীপ্তিমতী এই ভাষা রাশিয়ার মানুষের অন্তরে আলোড়ন জাগায়। ক্রমে মস্কো স্টেট ইউনিভার্সিটির অ্যাফ্রো-এশিয়ান বিভাগে সাপ্তাহিক বক্তৃতার আয়োজন হলো। মস্কো মহানগরীর অনেক প্রতিষ্ঠানই বক্তৃতার জন্য আমাকে এখন আমন্ত্রণ জানাচ্ছে এবং আমার কাজের পরিধিও দ্রুত বাড়ছে।

সেন্ট পিটার্সবার্গে (পূর্বতন লেনিনগ্রাদ, অবশ্য প্রাচীন নাম সেন্ট পিটার্সবার্গ-ই) জুলাই ১৯৯১-তে রামকৃষ্ণ সোসাইটির প্রতিষ্ঠা হলো। ঐ বছরের গোড়ার দিকে দুজন ভক্ত বেলুড় মঠে এসে দীক্ষিত হলো এবং দেশে ফিরে গিয়ে তাঁরাই উদ্যোগ নিল রামকৃষ্ণ-ভাবধারা প্রচারের। লিথুয়ানিয়ার বিলনুস শহর থেকে কয়েকজন এসেছিলেন কলকাতার রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউট অব কালচারে। তাঁরাও দেশে ফিরে গিয়ে সংস্থা তৈরি করেছেন এবং শ্রীরামকৃষ্ণ, বিবেকানন্দ ও ভগবদ্গীতা প্রচারে আত্মনিয়োগ করেছেন। এদিকে অন্য দুটি শহর থেকে লোকজনেরা মস্কোতে আমার সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করে গত বছর থেকে নিয়মিত বক্তৃতাদির আয়োজন করেছেন। ভলগা নদীর তীরে ঐ দুটি শহর—ইয়ারোশ্লাভল এবং রিভিনস্ক প্রাচীন ঐতিহ্যে মহিমান্বিত। অতএব মস্কোর কাজকর্ম ছাড়াও সেন্ট পিটার্সবার্গ, বিলনুস, ইয়ারোশ্লাভল এবং রিভিনস্ক শহরে আমাকে ঘন ঘন যাতায়াত করে ঐ সকল সংগঠনের জন্য ও ব্যক্তিগত প্রয়োজনে কাজে ব্যাপৃত হতে হচ্ছে এবং অন্ততঃ তিনটি শহরে প্রতি মাসে একবার করে উপস্থিত হয়ে বক্তৃতাদি চালিয়ে যেতে হচ্ছে

১৯৯৩-এর মে মাসে মস্কোতে আমার অবস্থানের দুবছর পূর্ণ হয়েছে। এরই মধ্যে তিনবার আমাকে বাসস্থান পরিবর্তন করতে হয়েছে। পরিশেষে আমাদেরই একটি বিখ্যাত কেন্দ্রের আনুকূল্যে মস্কোতে এবং পরে সেন্ট পিটার্সবার্গে দুটি ফ্ল্যাট কেনা হলো মিশনের কাজকর্ম স্থায়িভাবে রূপদানের জন্য। এদেশের আইন-কানুন এখনো ঠিকভাবে নতুন রূপ পায়নি। বাড়ি-ঘর, জমি সরকারের হাত থেকে ব্যক্তিগত মালিকানায় আসতে অনেক সময় নিচ্ছে। ভাগ্যের জোরে এরই মধ্যে অন্ততঃ মিশনের নিজস্ব ফ্ল্যাট পাওয়া গেল—মুক্ত পারিপার্শ্বিকতার মধ্যে দুইপাশের সুদীর্ঘ বৃক্ষরাজি, শিশুদের পরিচ্ছন্ন ক্রীড়াঙ্গন অথচ শান্ত স্নিগ্ধ নিরবতা তপোবন-মধ্যগত একটি ক্ষুদ্র আশ্রমের পরিবেশকে মনে করিয়ে দেয়। চারটি কক্ষের একটি শ্রীরামকৃষ্ণের প্রার্থনাগৃহ—এখানকার লোকজনের শান্তির উৎস। প্রতিদিন প্রাতে ও সন্ধ্যায় শ্রীরামকৃষ্ণবন্দনা হয় সঙ্গীত সহকারে। সন্ধ্যায় কিছু লোকজন আসেন, এমনকি প্রাতেও দু-চারজন আসেন—এই শীতের দেশে যা আশা করা যায় না। কারণ, সেখানে শয্যাত্যাগের সময় আমাদের দেশ থেকে ভিন্ন। প্রতি মঙ্গলবার একটি কক্ষে সংস্কৃত পাঠদান করা হয়। লোকজন কাজকর্ম সেরে সন্ধ্যা সাতটায় আসে প্রার্থনা ও ধ্যানে যোগদান করতে, তারপর একঘণ্টা চলে শিক্ষাদান। আমাদের দেশে এখন তো এই তপোবনের পরিবেশে শিক্ষাদান উঠে গেছে। প্রতি বৃহস্পতিবার অনেকে আসে শ্রীরামকৃষ্ণের 'কথামৃত' শুনতে। ইংরেজীতে পাঠ ও ব্যাখ্যা একজন রুশভাষায় অনুবাদ করে শোনান। পাঠের পর প্রার্থনা ও ধ্যান। প্রতি শনিবার ইউনিভার্সিটিতে বেদান্ত বিষয়ে অথবা ভগবদ্গীতার ওপর বক্তৃতা হয়।

লন্ডন থেকে স্বামী ভব্যানন্দ এই নতুন ফ্ল্যাটে এসেছিলেন। তার আগের বছরও তিনি এসে কয়েকদিন থেকেছিলেন। বক্তৃতা করেছেন এখানে, সেন্ট পিটার্সবার্গে, এমনকি ইয়ারোশ্লাভল ও

রিভিনস্কেও। তিনি সর্বতোভাবে আমাকে উৎসাহ, অনুপ্রেরণা ও সহায়তা দিয়ে চলেছেন। আমেরিকার হলিউড সেন্টারও আমার সঙ্গে যোগাযোগ রাখে। তাঁরা বইপত্র পাঠান মাঝে মাঝে। মস্কোর কাজকর্ম যাতে ভালভাবে চলতে পারে তার জন্য লন্ডনের স্বামীজীর চেষ্টার অন্ত নেই। এখানকার ভক্ত ও বন্ধুদের সঙ্গেও তিনি যোগাযোগ রাখছেন এবং রাশিয়ার দুর্দিনে সহানুভূতি-প্রকাশের আগ্রহে ভক্তদের মাধ্যমে পোশাক-পরিচ্ছদাদি উপহার পাঠিয়ে চলেছেন। উল্লেখযোগ্য যে, বেলুড় মঠ বিমান-যোগে ১০ টন শিশুখাদ্য, গুঁড়ো দুধ, চিনি প্রভৃতি পাঠিয়ে এখানকার বিপন্ন মানুষের প্রতি ভারত ও রামকৃষ্ণ মিশনের সহানুভূতি প্রকাশ করেছেন।

রাশিয়ার অর্থনৈতিক অবস্থা বর্তমানে খুবই দুঃসহ, আবার রামকৃষ্ণ মিশনের কাজকর্ম দৈবক্রমে শুরু হলো এই রকমই এক সময়ে। সুতরাং সব রকম পরিস্থিতিকে স্বীকার করে নিয়ে আমাকে এখানে ধৈর্যের সঙ্গে চলতে হচ্ছে। কোন মহৎ কাজের সূচনা খুব মসৃণ হয় না। সন্ন্যাসীর ঈশ্বরই একমাত্র অবলম্বন। প্রতিদিনের প্রয়োজনের জন্য তাঁরই মুখাপেক্ষী হওয়া সন্ন্যাসীর নীতি। এখানকার লোকেরা অন্তরের মমতা নিয়ে সকল কাজে এগিয়ে আসছেন। যদিও দৈনন্দিন সহায়তার জন্য কোন কার্যসূচী তৈরি হয়নি, তা সত্ত্বেও সকল কাজে, রান্নাবান্নায়, বাজার করায়, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখায় যাতে আমাকে বিব্রত হতে না হয়, সেবিষয়ে চিন্তা করার ও কাজ করার লোকের অভাব হচ্ছে না। এটি ভগবানের অসীম করুণা। একা একা কোথাও চলার প্রয়োজন হয় না, কারণ সর্বদাই কেউ না কেউ সঙ্গে থাকে যাতে কোন অসুবিধায় পড়তে না হয়।

পরিশেষে কয়েকটি ঘটনার বিবরণ দিয়ে আপাততঃ চিঠিটি শেষ করছি। ১৯৯২ খ্রীস্টাব্দের আগস্ট মাসে সেন্ট পিটার্সবার্গ রামকৃষ্ণ সোসাইটির উদ্যোগে 'ঈশ্বারা' নামক এক সুন্দর গ্রামে একটি তিনদিনের সম্মেলন হয়। এই নামের সঙ্গে ভারতের অতীত দিনের কিছু কাহিনী জড়িত আছে। লন্ডন থেকে স্বামী ভব্যানন্দ এবং মস্কো থেকে আমি তাতে অংশগ্রহণ করি। বিভিন্ন শহরের যাঁরা শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ ভাবপ্রচারের উদ্যোক্তা, তাঁরা তাতে যোগ দেন। লিথুয়ানিয়া, লাটভিয়া এবং একাতেরিনবার্গ, ইয়ারোস্লাভল ও মস্কো থেকে ২৫জন প্রতিনিধি তাতে যোগদান করেন। প্রার্থনা, ধ্যান, বক্তৃতা ও আলোচনার মধ্য দিয়ে দিনগুলি খুব আনন্দ ও উৎসাহের সঙ্গে অতিবাহিত হয়। প্রতিনিধিরা কিভাবে শ্রীরামকৃষ্ণের ভাবধারাকে এই দেশে রূপায়িত করবেন সে-সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা হয় স্বামী ভব্যানন্দের নেতৃত্বে।

পরের অক্টোবর মাসে কাজাকিস্তানের 'আলমা-আটা' শহরে ধর্মসমন্বয়ের একটি সপ্তাহব্যাপী আন্তর্জাতিক সম্মেলন হয়। ইউরোপ, আমেরিকা ও এশিয়ার বহু দেশ থেকে প্রতিনিধিরা আসেন। চীন, উরুগুয়ে থেকেও প্রতিনিধিরা যোগদান করে-ছিলেন। ভারতের প্রতিনিধিদের বিশেষ সম্মান দেওয়া হয় ঐ সম্মেলনে। খ্রীস্টান, হিন্দু, মুসলমান, বৌদ্ধ ও জরথুস্ত্রীয় প্রতিনিধিরা তাতে বক্তৃতা করেন। সেখানে শ্রীরামকৃষ্ণের সমন্বয়ের বাণী বিশেষ রেখাপাত করে শ্রোতাদের মনে। প্রতিদিনের সভায় সহস্রাধিক শ্রোতার জন্য পার্লামেন্ট ভবন ও প্রেসিডেন্টের সভাগৃহ উন্মুক্ত ছিল। আমি তাতে অংশগ্রহণ করেছিলাম। টেলিভিশন ও রেডিও মারফৎ সমস্ত সোভিয়েত দেশে ঐ সম্মেলনকে বিশেষভাবে প্রকাশ করা হয়। গত জুন মাসেও (১৯৯৩) আর একটি আন্তর্জাতিক সম্মেলন রাশিয়ার আলতাই পর্বতে হয়ে গেল। তাতারস্তান সরকার, আমেরিকার রোয়েরিখ সোসাইটি ও মস্কোর স্পেস ক্লাব ( Space Club )-এর উদ্যোগে হলো বিজ্ঞান-সম্মেলন। ধর্ম ও দর্শন তার অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল। আমাকে তাঁরা আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন ধর্ম-সম্মেলনের নেতৃত্ব দেওয়ার জন্য।

এই সমস্ত ঘটনাবলী প্রমাণ করে শ্রীরামকৃষ্ণের ভাবধারা রাশিয়ার জনজীবনের সর্বস্তরে বিশেষ কৌতূহল সঞ্চার করছে এবং রুশভাষায় রামকৃষ্ণ মিশনের পুস্তকাবলী প্রকাশিত হলে এদেশের কল্যাণসাধনে তা দ্রুত কার্যকর হবে। □

নিবন্ধ

# চিঠিপত্রে ভারত-পরিব্রাজক স্বামী বিবেকানন্দ

## প্রণবেশ চক্রবর্তী

স্বামী বিবেকানন্দের ঐতিহাসিক ভারত-পরিক্রমার শতবর্ষে উপনীত হয়ে আমরা যখন ধর্ম, সমাজ ও রাষ্ট্রিক সংহতির সংকটে বিপন্ন, বিপন্ন মূল্যবোধ ও বিশ্বাসের সংকটে, তখন বারবার পরিব্রাজক বিবেকানন্দের অগ্নিগর্ভ এবং হৃদয়মথিত চিঠিগুলি আমাদের সামনে খুলে দেয় ভারত-আবিষ্কারের নতুন দিগন্ত।

পরিব্রাজক অবস্থায় তিনি তাঁর গুরুভাই, শিষ্য বা সুহৃদদের যে-চিঠিগুলি লিখেছেন, সেই চিঠিগুলির মূল লক্ষ্যই ছিল বিস্মৃতকে স্মরণের পথে টেনে আনা, হারানো কুল-পরিচয়কে উদ্ধার করা এবং আত্মবিস্মৃত, মূঢ় দেশবাসীকে অতীত ও বর্তমান জীবনচর্যা সম্পর্কে অবহিত করা।

১৮৮৬ খ্রীস্টাব্দের ১৬ আগস্ট অবতারবরিষ্ঠ শ্রীরামকৃষ্ণ কাশীপুর উদ্যানবাটিতে মহাসমাধিতে লীন হয়ে যান। ১৮৮৭ খ্রীস্টাব্দের জানুয়ারি মাসের তৃতীয় সপ্তাহে স্বামীজী এবং তাঁর দশজন ত্যাগী গুরুভাই বিরজা হোম করে শ্রীরামকৃষ্ণের নামে "বহুজনহিতায় বহুজনসুখায়" সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। স্বামীজীর এই নতুন জীবনে নতুন নাম হলো স্বামী বিবিদিষানন্দ।

কথায় বলে, "রমতা সাধু, বহতা পানি।" সন্ন্যাসী নরেন্দ্রনাথও যেন অন্তরের গভীরে এই বিশাল ও প্রাচীন ভারতের অবগুণ্ঠিত আত্মার আহ্বান শুনতে পাচ্ছিলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণের বর্তমানেই একবার তিনি বুদ্ধ-গয়ায় যাত্রা করেছিলেন। সঙ্গে ছিলেন স্বামী অভেদানন্দ ও স্বামী শিবানন্দ। এটা ১৮৮৬ খ্রীস্টাব্দের এপ্রিল মাসের প্রথমদিকের ঘটনা।

এরপর শ্রীরামকৃষ্ণের অবর্তমানে বরানগর মঠ থেকে স্বামীজী পরিব্রাজকের বেশে পথে নামেন। অনন্ত পথ। চিরন্তন ভারতের পথ। এটা ১৮৮৮ খ্রীস্টাব্দের আগস্ট মাসের ঘটনা। সেবার কাশী ও অযোধ্যা হয়ে তিনি বৃন্দাবনে গিয়েছিলেন। সেখান থেকে হৃষীকেশ হয়ে বছরের শেষ দিকে বরানগর মঠে ফিরে আসেন।

এই পরিক্রমা তেমন দীর্ঘ ছিল না। এরপর ১৮৯০ খ্রীস্টাব্দের জানুয়ারি মাসে তিনি তিন মাসের জন্য দ্বিতীয়বার ভারত-পরিক্রমায় বের হন। এই সময় তিনি এলাহাবাদ, গাজীপুর, কাশী হয়ে কলকাতায় ফিরে আসেন এপ্রিল মাসে। এই যাত্রায় ২২ জানুয়ারি তিনি গাজীপুরে উপনীত হয়ে বিখ্যাত যোগিপুরুষ পওহারী বাবার সান্নিধ্যে আসেন।

মাস দুয়েক পর বরানগর মঠে ফিরে এসে কিছুদিন পরেই স্বামীজী হিমালয়ের অদম্য আকর্ষণে আবার চঞ্চল হয়ে উঠলেন। ১৮৯০ খ্রীস্টাব্দের জুলাই মাসের মাঝামাঝি তিনি আবার ভারত-পরিক্রমায় বেরিয়ে পড়েন। সেবার প্রথমদিকে গুরুভাই স্বামী অখণ্ডানন্দ ছিলেন তাঁর যাত্রাসঙ্গী। এবারকার অভিযাত্রাই ছিল সবথেকে ব্যাপক ও দীর্ঘস্থায়ী, ছিল ভয়ঙ্কর রোমাঞ্চক এবং নিঃসীম কষ্টকর।

এই যাত্রায় ভাগলপুর, বৈদ্যনাথ ধাম, গাজিপুর, কাশী, অযোধ্যা, নৈনীতাল, আলমোড়া, মীরাট, দিল্লী ইত্যাদি হয়ে তিনি রাজপুতানায় উপনীত হন এবং সেখান থেকে পশ্চিম ভারত ও দক্ষিণ ভারতে নিঃসম্বল ভারত-পথিকের বেশে তিনি পরিক্রমা করেন। ১৮৯১ খ্রীস্টাব্দের জানুয়ারি মাস পর্যন্ত তাঁর সঙ্গে কেউ না কেউ সহযাত্রী ছিলেন। কিন্তু ১৮৯১-এর ফেব্রুয়ারি থেকে

তিনি নিঃসঙ্গ এবং সেই থেকে শুরু হলো তাঁর ঐতিহাসিক পরিক্রমা।

১৮৯২ খ্রীস্টাব্দের নভেম্বর মাসে তিনি এসে পৌঁছালেন দক্ষিণ ভারতে। তখন তাঁর বয়স প্রায় ত্রিশ বছর। ঐ বছরের শেষদিকে তিনি ত্রিবান্দ্রাম থেকে কন্যাকুমারী যান এবং ২৪ ডিসেম্বর দক্ষিণ ভারতের শেষ প্রান্ত উত্তাল সমুদ্রবক্ষে ঐতিহাসিক শিলাখণ্ডে উপনীত হয়ে তিনি ধ্যানমগ্ন হন। প্রত্যক্ষ করেন ভারতের অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ। তাঁর এই পরিব্রাজক জীবনের সাধনা, আরাধনা ও উপলব্ধির পূর্ণ প্রকাশ ঘটল ১৮৯৩ খ্রীস্টাব্দের ১১ সেপ্টেম্বর শিকাগো ধর্মমহাসম্মেলনে।

স্বামী বিবেকানন্দের মানবপ্রেমিক সংবেদনশীল হৃদয়, তীব্র অনুভূতি, অনন্যসাধারণ প্রজ্ঞা, হিমালয়সদৃশ আত্মবিশ্বাস এবং অতলান্ত ভারত-প্রেমের পরিচয় বারবার ফুটে উঠেছে তাঁর চিঠিপত্র-গুলিতে।

বই পড়ে দেশকে জানা নয়, দোতলায় দাঁড়িয়ে মানুষকে চেনা নয়, মন্দিরে-মসজিদে বসে ধর্মের বাণীপ্রচার নয়—পরিব্রাজক বিবেকানন্দ জীবনে জীবন মিশিয়ে বুকের রক্ত মোক্ষণ করে, চোখের জলে বুক ভাসিয়ে মানুষকে তিনি চিনেছিলেন, চিনেছিলেন এই মহান দেশের সত্য-স্বরূপকে। তারই প্রত্যক্ষ পরিচয় পাই পরিব্রাজক বিবেকানন্দের চিঠিপত্রে।

১৮৯০ খ্রীস্টাব্দের ৫ জানুয়ারি থেকে ২ এপ্রিল —এই সময়ের মধ্যে তিনি ২৮টি চিঠি লেখেন।

এই চিঠিগুলি প্রধানতঃ তিনি লেখেন এলাহাবাদ ও গাজীপুর থেকে। চিঠিগুলির প্রাপক হচ্ছেন শ্রীরামকৃষ্ণর গৃহী ভক্ত বলরাম বসু ও তাঁর পুত্র রামবাবুর গৃহশিক্ষক যজ্ঞেশ্বর ভট্টাচার্য (ফকির), কাশীর প্রমদাদাস মিত্র, স্বামী সদানন্দ, স্বামী অখণ্ডানন্দ, নাট্যকার গিরিশচন্দ্রের ভাই অতুলচন্দ্র ঘোষ, স্বামী প্রেমানন্দের ভাই তুলসীরাম, স্বামী অভেদানন্দ প্রমুখ। এই চিঠিগুলির মধ্যে বেশির ভাগটাই জুড়ে আছে গাজীপুরের বিখ্যাত যোগি-পুরুষ পওহারী বাবার প্রসঙ্গ।

বলরাম বসুকে স্বামীজী লিখেছেন: "পওহারী বাবার সহিত আলাপ—অতি আশ্চর্য মহাত্মা। বিনয়, ভক্তি এবং যোগমূর্তি। আচারী বৈষ্ণব, কিন্তু দ্বেষবুদ্ধি রহিত। মহাপ্রভুতে বড় ভক্তি। পরমহংস মহাশয়কে বলেন, 'এক অবতার থে।' আমাকে বড় ভালবাসিয়াছেন। তাঁহার অনুরোধে কিছুদিন এস্থানে আছি। ইনি ২/৬ মাস একক্রমে সমাধিস্থ থাকেন। বাঙলা পড়িতে পারেন। পরমহংস মশায়ের photograph রাখিয়াছেন।" এই চিঠিটির তারিখ ৬.২.১৮৯০।

লক্ষ্য করার বিষয় হচ্ছে চিঠিটির ভাষা। ক্রিয়া-পদের আধিক্য কমিয়ে ভাষাকে কতটা সাবলীল এবং ইস্পাতের মতো সবল করা যায়, তারই প্রমাণ। অথচ এরই মাধ্যমে কত সংক্ষেপে একটি পূর্ণ বিবরণ তুলে ধরা যায়। বাঙলাভাষাকে আধুনিক প্রগতিশীল করার ব্যাপারে স্বামী বিবেকানন্দ যে ঐতিহাসিক ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন, এই চিঠি-গুলির মধ্য দিয়ে তা পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে।

পরিব্রাজক জীবনে কাশীর প্রমদাদাস মিত্রকে লেখা চিঠিতে স্বামীজী সাধুভাষার ব্যবহার করেছেন। যদিও চিঠিগুলি সাধুভাষায় লিখিত, তবু লক্ষ্য করলেই দেখা যাবে ভাষার সতেজ শক্তি। এই বয়োজ্যেষ্ঠ সুপণ্ডিত ব্যক্তিকে লেখা চিঠিতে স্বামীজী আগাগোড়াই সংযত এবং আন্তরিক, কিন্তু তাই বলে তাঁর স্বভাবসিদ্ধ যুক্তি এবং আবেগ কখনো হারিয়ে যায়নি। এইসব চিঠিতে তিনি মূলতঃ শাস্ত্রীয় প্রসঙ্গ এবং ধর্মসাধনার কথাই বলেছেন।

আবার কোন কোন চিঠিতে দেখি, পরিচিতজনের মানসিকতা সম্পর্কে বিরক্তি ও কৌতুক প্রকাশ করছেন। বলরাম বসু ধনী কিন্তু নিজের স্বাস্থ্যরক্ষা সম্পর্কেও অতিমাত্রায় মিতব্যয়ী। এই ঘটনা স্মরণে রেখে স্বামীজী ১৮৯০ খ্রীস্টাব্দের ৫ জানুয়ারি বলরাম বসুকে লিখছেন: "আমি বলি Change (বায়ুপরিবর্তন) করিতে হয়তো শুভস্য শীঘ্রং।... আপনি খালি টাকা বাঁচাতে চান, Lord (ভগবান) কি বাবার ঘর হইতে টাকা আনিয়া আপনাকে Change (বায়ুপরিবর্তন) করাইবেন?"

এই পত্রে ব্যবহৃত ক্রিয়াপদ যদিও সাধু, কিন্তু পত্রের উপস্থাপনায় চলিত ভাষারই স্বচ্ছন্দ প্রকাশ।

আবার দেখি, তাঁর চিঠিতে অগ্নিময় উৎসাহবাণী। ১৮৯০ খ্রীস্টাব্দের ৫ জানুয়ারি এলাহাবাদ থেকে যজ্ঞেশ্বর ভট্টাচার্যকে লিখছেন: "কাপুরুষেরাই পাপ করিয়া থাকে, বীর কখনও পাপ করে না—মনে পর্যন্ত পাপচিন্তা আসিতে দেয় না। সকলকেই ভালবাসিবার চেষ্টা করিবে।··· হে বৎসগণ, তোমাদের জন্য নীতিপরায়ণতা ও সাহস ব্যতীত আর কোন ধর্ম নাই, ইহা ব্যতীত ধর্মের আর কোন মতামত তোমাদের জন্য নহে।"

প্রমদাদাস মিত্র বা বলরাম বসুকে যখন তিনি চিঠি লেখেন, তখন পত্রের শেষে নিজেকে "দাস নরেন্দ্র" বলে উল্লেখ করেন। গুরুভাইদের কাছে লেখেন শুধু "নরেন্দ্র"।

আমরা জানি, বরানগর মঠে স্বামীজী যখন বিরজা হোম করে সন্ন্যাস গ্রহণ করেন, তখন তাঁর নাম হয়েছিল স্বামী বিবিদিষানন্দ। ঐ নাম নিয়েই তিনি পরিব্রাজক হন। আবার এই পরিব্রাজক জীবনেই তিনি লোকচক্ষুর অন্তরালে থাকার জন্য নাম পরিবর্তন করে কিছুদিন স্বামী সচ্চিদানন্দ এবং সবশেষে স্বামী বিবেকানন্দ নাম গ্রহণ করেন। পরিব্রাজক জীবনে তিনি যে-সকল চিঠিপত্র লেখেন, তাতে যেমন নিজেকে "নরেন্দ্র" বলে উল্লেখ করেন, তেমনি বিবিদিষানন্দ, সচ্চিদানন্দ ও বিবেকানন্দ নামেও উল্লেখ করেছেন। শেষপর্যন্ত বিবেকানন্দ নাম নিয়েই তিনি বিশ্ববিজয় করেন এবং ঐ নামটাই তাঁর স্থায়ী হয়ে যায়।

স্বামীজী হিমালয়-ভ্রমণে অভিজ্ঞ তাঁর গুরুভাই স্বামী অখণ্ডানন্দের সঙ্গে হিমালয়ের পথে যাত্রা করার আগে জননী সারদাদেবীর কাছে গিয়েছিলেন আশীর্বাদ প্রার্থনা করতে। সারদাদেবী তখন থাকেন বেলুড়ের কাছে ঘুষুড়িতে শ্মশানের ধারে এক ভাড়াবাড়িতে।

স্বামীজী মাকে প্রণাম নিবেদন করে একটি গান শোনালেন, তারপর বললেন: "মা, যদি মানুষ হয়ে ফিরতে পারি তবেই ফিরব; নতুবা এই-ই।"

মা সচকিতে বললেন: "সে কি?"

স্বামীজী অমনি কথাটা সংশোধন করে বললেন: "না, না, আপনার আশীর্বাদে শীঘ্রই আসব।"

স্বামীজী ও স্বামী অখণ্ডানন্দের এইকালের ভ্রমণের ক্রমিক ও সম্পূর্ণ বৃত্তান্ত পাওয়া যায়নি। স্বামীজী যদিও বহু সময়ে বহু ব্যাপারে চিঠি লিখেছেন, তথাপি ১৮৯০ খ্রীস্টাব্দের ৬ জুলাই-এর পর থেকে ১৮৯১ খ্রীস্টাব্দের ১৩ এপ্রিল পর্যন্ত তাঁর কোন চিঠি এযাবৎ পাওয়া যায়নি। ফলে সেই সময়কার রোমাঞ্চকর পরিক্রমার অনেক ঘটনাই রয়ে গেছে অজ্ঞাত। অথচ হিমালয়ের বুকে স্বামীজী দেখেছিলেন শাশ্বত ভারতের এক মহিমান্বিত রূপ।

তেমনি আবু পাহাড় বা আলোয়ারের ঘটনাবলী সম্পর্কেও স্বামীজী তেমন কিছু চিঠি লেখেননি। বিশেষ করে জাতপাতের স্বর্গরাজ্য রাজস্থানের আবু পাহাড়ে তিনি এক মুসলমান উকিলের বাড়িতে অতিথি হয়েছিলেন এবং তাদের রান্না-করা খাবারই খেয়েছিলেন। এমন একটা রোমহর্ষক খবর শুনে খেতড়ির দেওয়ান জগমোহন গিয়েছিলেন স্বচক্ষে ব্যাপারটা দেখতে। সেই সূত্রে স্বামীজীর সঙ্গে খেতড়ির মহারাজা অজিত সিংহ-এর ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক স্থাপিত হয়।

১৮৯১ খ্রীস্টাব্দের ৩০ এপ্রিল। স্বামী বিবেকানন্দ এসেছেন রাজস্থানের আবু পাহাড়ে। সেখান থেকে আলোয়ারের লালা গোবিন্দ সহায় নামে জনৈক ভক্তকে প্রকৃত ধর্ম ও ধার্মিকের সংজ্ঞা দিয়ে এক চিঠি লিখছেন। চিঠিতে তিনি লিখছেন: "বৎসগণ, ধর্মের রহস্য শুধু মতবাদে নহে, পরন্তু সাধনার মধ্যে নিহিত। সৎ হওয়া এবং সৎ কর্ম করাতেই সমগ্র ধর্ম পর্যবসিত। যে শুধু 'প্রভু প্রভু' বলিয়া চিৎকার করে সে নহে, কিন্তু যে সেই পরমপিতার ইচ্ছানুসারে কার্য করে, সে-ই ধার্মিক।"

আবার আমরা দেখছি, আত্মগোপন করে যে বৈদান্তিক সন্ন্যাসী পরিব্রাজকের বেশে ভারত-আত্মার সন্ধান করছেন ক্লান্তিহীন অন্বেষণে, সেই তিনিই জনৈক অক্ষয়কুমার ঘোষের জন্য একটি চাকরির

ব্যবস্থা করতে অনুরোধ জানাচ্ছেন হরিদাস বিহারী-দাস দেশাইকে। ১৮৯২ খ্রীস্টাব্দে বোম্বাই থেকে এক চিঠিতে স্বামীজী লিখছেন: "এই পত্রের বাহক বাবু অক্ষয়কুমার ঘোষ আমার বিশেষ বন্ধু। সে কলকাতার একটি সম্ভ্রান্ত বংশের সন্তান। তার পরিবারকে আমি যদিও পূর্ব হতেই জানি; তবু তাকে দেখতে পাই খাণ্ডোয়াতে এবং সেখানেই আলাপ-পরিচয় হয়।

"সে খুব সৎ ও বুদ্ধিমান ছেলে এবং কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আন্ডার-গ্রাজুয়েট। আপনি জানেন যে, আজকাল বাংলাদেশের অবস্থা কি কঠিন; তাই এই যুবকটি চাকরির অন্বেষণে বেরিয়েছে। আমি আপনার স্বভাবসুলভ সহৃদয়তার সহিত পরিচিত আছি; তাই মনে হয় যে, এ-যুবকটির জন্য কিছু করতে অনুরোধ করে আমি নিশ্চয়ই আপনাকে উত্যক্ত করছি না।"

লক্ষ্য করার বিষয়, সংসারত্যাগী সন্ন্যাসী কত সহজে একটি বেকার বাঙালী যুবকের চাকরির জন্য সুপারিশ করছেন। আর এই চিঠিটি থেকেই বোঝা যায়, বঙ্গভূমিতে বেকারসমস্যা শুধু আজই নয়, একশো বছর আগেও ছিল। শুধু তীব্রতার তারতম্য ঘটেছে।

স্বামী বিবেকানন্দের 'পত্রাবলী'তে সংযোজিত চিঠিপত্রগুলিতে দেখি, ১৮৯০ খ্রীস্টাব্দের ৬ জুলাই তিনি একটি চিঠি লিখেছেন তাঁর গুরুভাই স্বামী সারদানন্দকে। কয়েকদিন পর স্বামী অখণ্ডানন্দের সঙ্গে তিনি হিমালয়ের পথে যাত্রা করেন। আমরা আগেই বলেছি, এই দুর্গম ও ভয়ংকর পরিক্রমার প্রথম একটি বছর তিনি কোন চিঠিপত্র লিখেছেন বলে জানা যায় না। সম্ভবতঃ চিঠিলেখার মতো সুযোগ এবং মানসিকতা তখন তাঁর ছিল না। কারণ, তিনি তখন অশ্রু ও রক্ত দিয়ে ভারতাত্মাকে প্রত্যক্ষ করছেন, নিজের যন্ত্রণাবিদ্ধ হৃদয়ে অনুভব করছেন। এই পরিক্রমাকালে তাঁর প্রথম চিঠিটি দেখি রাজস্থানের আজমীর থেকে লেখা। লিখেছেন লালা গোবিন্দ সহায়কে। তারিখ ১৪ এপ্রিল, ১৮৯১। তিনি হিমালয় থেকে নেমে হরিদ্বার ও সাহারানপুর হয়ে মীরাটে এসেছিলেন। মীরাট থেকে তিনি যাত্রা করেন ১৮৯১ খ্রীস্টাব্দের জানুয়ারির শেষে অথবা ফেব্রুয়ারির প্রথমে। দিল্লী হয়ে তিনি এলেন রাজস্থানে। রাজস্থানে আসার পর আবার তিনি কয়েকটি চিঠি লেখেন। 'পত্রাবলী' অনুসরণ করলে সেটাই দেখা যায়।

উত্তর ভারত থেকে স্বামীজী এলেন পশ্চিম ভারতে। দেখলেন সেখানকার জনজীবনের মর্মান্তিক চেহারা। রাজপ্রাসাদ থেকে দরিদ্রের ঝুপড়ি, ব্রাহ্মণের আলয় থেকে অস্পৃশ্যের কুটির, পণ্ডিতের সভা থেকে নিরক্ষরের সমাজ—সর্বত্র তিনি অবাধে ঘুরেছেন। প্রকৃতপক্ষে তিনি ভারত-আবিষ্কারে যেমন পরিক্রমা করেছেন, তেমনি এই ভারতও আবিষ্কার করেছে তাঁকে।

১৮৯২ খ্রীস্টাব্দের ২২ আগস্ট বোম্বাই থেকে এক চিঠিতে তিনি লিখছেন: "একটি বিষয় অতি দুঃখের সহিত উল্লেখ করছি—এ-অঞ্চলে সংস্কৃত ও অন্যান্য শিক্ষার সম্পূর্ণ অভাব। এতদঞ্চলের লোকদের মধ্যে ধর্মের নামে পানাহার ও শৌচাদি বিষয়ে একরাশ কুসংস্কারপূর্ণ দেশাচার আছে—আর এগুলিই যেন তাদের কাছে ধর্মের শেষকথা।

"হায় বেচারারা! দুষ্ট ও চতুর পুরুতেরা যত সব অর্থহীন আচার ও ভাঁড়ামিগুলোকেই বেদের ও হিন্দুধর্মের সার বলে তাদের শেখায় (কিন্তু মনে রাখবেন যে, এসব দুষ্ট পুরুতগুলো বা তাদের পিতৃ-পিতামহগণ গত চারশোপুরুষ ধরে একখণ্ড বেদও দেখেনি); সাধারণ লোকেরা সেগুলি মেনে চলে আর নিজেদের হীন করে ফেলে। কলির ব্রাহ্মণরূপী রাক্ষসদের কাছ থেকে ভগবান তাদের বাঁচান।" পুরোহিততন্ত্রের কবল থেকে অসহায় মানুষকে রক্ষা করার এক করুণ আর্তি প্রকাশিত এই চিঠিটির মধ্যে। এরকম চিঠি আরও আছে।

ভারত-আবিষ্কার করতে গিয়ে ঘনীভূত ভারতের প্রতিমূর্তি স্বামী বিবেকানন্দ লক্ষ্য করছেন, সমগ্র দেশ ও জাতি কেমন যেন সুপ্তিমগ্ন, আত্মবিশ্বাসহারা। ১৮৯২ খ্রীস্টাব্দের ২০ সেপ্টেম্বর খেতড়িনিবাসী পণ্ডিত শঙ্করলালকে এক চিঠিতে তিনি লিখছেন: "...আমাদের স্বাধীন চিন্তা একরূপ নাই বলিলেই হয়। সেইজন্যই আমাদের দেশে পর্যবেক্ষণ ও সামান্যীকরণ

( generalization ) প্রক্রিয়ার ফলস্বরূপ বিজ্ঞান-সমূহের অত্যন্ত অভাব দেখিতে পাই। ইহার কারণ কি? ইহার দুইটি কারণ: প্রথমতঃ এখানে গ্রীষ্মের অত্যন্ত আধিক্য আমাদিগকে কর্মপ্রিয় না করিয়া শান্ত ও চিন্তাপ্রিয় করিয়াছে। দ্বিতীয়তঃ পুরোহিত ব্রাহ্মণেরা কখনই দূরদেশে ভ্রমণ অথবা সমুদ্রযাত্রা করিতেন না।"

স্বামীজী বলছেন, সমুদ্রযাত্রা করতেন বণিকরা—যারা নিজেদের লাভ বুঝতেন, কিন্তু জ্ঞানভাণ্ডার বাড়াবার জন্য কোনরকম পর্যবেক্ষণ করতেন না। সেইজন্য ঐ চিঠিতে তিনি দৃঢ়প্রত্যয় হয়ে লিখছেন: "...আমাদিগকে ভ্রমণ করিতেই হইবে, আমাদিগকে বিদেশে যাইতেই হইবে।" এই চিঠিতেই যেন স্বামীজীর বিদেশযাত্রার সুস্পষ্ট ইঙ্গিত ফুটে উঠেছে। মনে রাখা দরকার, ১৮৯২ খ্রীস্টাব্দের মাঝামাঝি সময়েই শিকাগো ধর্মমহাসম্মেলনের খবর ভারতের পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হতে থাকে এবং সেই খবর নিশ্চয়ই স্বামীজীও পেয়েছিলেন।

১৮৯৩ খ্রীস্টাব্দের ২১ ফেব্রুয়ারি হায়দ্রাবাদ থেকে তিনি একটি চিঠি লেখেন মাদ্রাজের ভক্ত আলাসিঙ্গা পেরুমলকে। সবাই জানেন, আলাসিঙ্গা পেরুমল স্বামীজীকে শিকাগো পাঠাবার ব্যাপারে জীবনপণ উদ্যোগ গ্রহণ করেছিলেন। স্বামীজী তাঁকে লিখছেন: "...আমি এখন আর রাজপুতানায় ফিরে যেতে পারব না—এখানে এখন থেকেই ভয়ঙ্কর গরম পড়েছে; জানি না রাজপুতানায় আরও কি ভয়ানক গরম হবে, আর গরম আমি আদপে সহ্য করতে পারি না।...

"তাই আমার সব মতলব ফেঁসে চুরমার হয়ে গেল; আর এই জন্যই আমি গোড়াতেই মাদ্রাজ থেকে তাড়াতাড়ি বেরিয়ে পড়বার জন্য ব্যস্ত হয়েছিলাম। সেক্ষেত্রে আমায় আমেরিকা পাঠাবার জন্য আর্যাবর্তের কোন রাজাকে ধরবার যথেষ্ট সময় হাতে পেতাম। কিন্তু হায়, এখন অনেক বিলম্ব হয়ে গেছে।"

স্বামীজী তখন শিকাগো যাওয়ার জন্য প্রস্তুত, কিন্তু দেখা দিয়েছে ভয়ঙ্কর অর্থসংকট। তাই বলে তিনি কি রাজা-মহারাজাদের ওপর ভরসা করে-ছিলেন? ঐ চিঠিতেই তিনি জনৈক রাজার কথা উল্লেখ করে বলছেন, ঐ "রাজার অঙ্গীকারবাক্যে বড় নিশ্চিত ভরসা রাখি না।"

এরপর ১৮৯৩ খ্রীস্টাব্দের ২৭ এপ্রিল তিনি মাদ্রাজের ডাঃ নাঞ্জুণ্ডা রাওকে লিখছেন: "মাদ্রাজ হইতে জাহাজে উঠিবার প্রস্তাব সম্বন্ধে আমার বক্তব্য এই যে, উহা এক্ষণে আর হইবার জো নাই, কারণ আমি পূর্বেই বোম্বাই হইতে উঠিবার বন্দোবস্ত করিয়াছি।" অর্থাৎ, ঐ সময় শিকাগো যাওয়ার প্রস্তুতি সম্পূর্ণ এবং তিনি জাহাজে বোম্বাই থেকে যাত্রা করবেন, সেটাও ঠিক হয়ে গেছে।

এই সময় তিনি বালাজী রাওকে যে-চিঠিটি লেখেন, সেটি কবি ও দার্শনিক বিবেকানন্দের এক অপূর্ব পরিচয় ধারণ করে রেখেছে। তিনি লিখছেন: "সমুদ্রের উপরিভাগে উত্তালতরঙ্গ-মালা নৃত্য করিতে পারে, প্রবল ঝটিকা গর্জন করিতে পারে, কিন্তু উহার গভীরতম প্রদেশে অনন্ত স্থিরতা, অনন্ত শান্তি, অনন্ত আনন্দ বিরাজমান। ...যখন দুঃখ বিপদ নৈরাশ্যের ঘনান্ধকারে চারিদিক একেবারে আচ্ছন্ন বোধ হয়, তখনই যেন সেই নিবিড় অন্ধকারের মধ্য হইতে হঠাৎ জ্যোতিঃ ফুটিয়া উঠে, স্বপ্ন যেন ভাঙ্গিয়া যায়, আর তখন আমরা প্রকৃতির মহান রহস্য সেই অনন্ত সত্তাকে দিব্যচক্ষে দেখিতে থাকি।"

এক অনিশ্চিতের পথে অভিযাত্রী তরুণ সন্ন্যাসীর হৃদয়ে তখন ঝড়, কিন্তু অন্তরে অনন্ত শান্তি। তাই তিনি ঐ চিঠিতে লিখলেন:

" 'কেন' প্রশ্নে আমাদের নাই অধিকার।
কাজ কর, করে মর—এই হয় সার॥"

চিঠিতে কোন তারিখ নেই। তবে 'পত্রাবলী'তে ২৮ এপ্রিল ১৮৯৩-এর আগে তার স্থান হয়েছে।

শিকাগো-যাত্রার আগে স্বামীজী এলেন রাজ-স্থানের খেতড়িতে। সেখান থেকে বোম্বাই। বোম্বাই থেকে ২২ মে স্বামীজী জুনাগড়ের দেওয়ানজীকে লিখছেন: "কয়েকদিন হইল বম্বে পৌঁছিয়াছি। আবার দুই-চারদিনের মধ্যেই এখান হইতে বাহির হইব।" ১৮৯৩ খ্রীস্টাব্দের ৩১ মে স্বামীজী বোম্বাই থেকে আমেরিকা যাত্রা করেন। পরিব্রাজক বিবেকানন্দ তাঁর দুর্জয় মেধা ও হৃদয় নিয়ে বিশ্বজয়ের অভিযাত্রায় তখন নিঃশঙ্ক যাত্রী। □

# স্বামী বিবেকানন্দ এবং আজকের আমরা

আশাপূর্ণা দেবী

স্বামীজীর শিকাগো ধর্মমহাসভার বক্তৃতা আমাদের জাতীয় জীবনে একটি বিশেষ ঐতিহাসিক ঘটনা—এই প্রতিষ্ঠিত সত্যটি নতুন করে প্রতিষ্ঠালাভ করছে দেশ জুড়ে বর্ষব্যাপী তার শতবর্ষ জয়ন্তী-উৎসব পালিত হওয়ার মধ্য দিয়ে।

মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত বিগ্রহ নিত্য পূজিত হয়ে থাকেন। তেমন নিষ্ঠাবান পূজারী থাকলে হয়তো সে-পূজায় কিছুমাত্র ত্রুটি বা শৈথিল্য ঘটে না। তবু মাঝে মাঝেই পঞ্জিকা-নির্দিষ্ট 'দিন', 'তিথি', 'লগ্নে' সেই বিগ্রহকে মাধ্যম করেই 'বিশেষ পূজা' আর উৎসবের আয়োজন হয়ে থাকে। তার কারণ—উৎসব উৎসাহদাতা এবং চেতনাদাতাও। উৎসব যেন নতুন করে চেতনা জাগিয়ে দেয়, এ-মন্দিরে দেববিগ্রহ বর্তমান—যার মধ্যে দেবতার অবস্থান। উৎসবই ডাক দেয় নিত্যদিনের ধুলো ঝেড়ে বিস্মৃতির নিরুদ্যম শয্যা ছেড়ে উঠে আসবার।

তাই আজ স্বামীজীর শিকাগো বক্তৃতার শতবর্ষ জয়ন্তী-উৎসবে দিকে দিকে ডাক। এ যেন সেই মন্ত্রধ্বনি : "সবারে করি আহ্বান"। সে-আহ্বানে যে অধিকারী-অনধিকারীর ভেদাভেদের প্রশ্নও থাকছে না, তার প্রমাণ—এই এক অতি 'অনধিকারী'র কলম হাতে ধরতে বসা।

স্বামীজীর বিশাল বিরাট মহিমা আর স্বামীজীর অনন্ত কর্মকাণ্ডের পরিধি সম্পর্কে এই প্রতিবেদকের জ্ঞান কতটুকু? কতটুকু তার জানার সীমানা? তাঁর সম্পর্কে 'এতটুকু' কিছু বলতে বসাটা তো তার পক্ষে ধৃষ্টতা। এ যেন সেই "হাত দিয়ে হাতি ধরার", "ঝিনুক নিয়ে সমুদ্র মাপার" মতোই হাস্যকর। তবে কিনা অনবরতই তো আমরা শত শত হাস্যকর কাজ করে চলি, করে চলি অনধিকার-চর্চা। এও তার একটি নমুনা।

স্বামীজীর শিকাগো-অভিযানের পটভূমিকা ও সেই দুরূহ অভিযানের আশ্চর্য রকমের সার্থকতার কাহিনী তো শুনে আসছি, জেনে আসছি, পড়েও আসছি জ্ঞান অবধিই। এখনো সে-কাহিনী বর্ণিত হয়ে আসছে কত কত গবেষকের তথ্যসমৃদ্ধ অনুপুঙ্খ বিবরণের মাধ্যমে, কত কত একনিষ্ঠ অনুসন্ধানীর টুকরো টুকরো চকিত আলোকপাতের মধ্য দিয়েও।

সবই সমান আনন্দ আর সমান বিস্ময় জাগায়। সমান আকর্ষকও তো বটেই। তবে ঐ লাভটি ততটুকুই, যতটুকু কেবলমাত্র মাতৃভাষার মধ্য দিয়েই পাই। তার বাইরের এতটুকুও নয়।

এই বিরাট শূন্যতার ওপর দাঁড়িয়েই আমার উপলব্ধির সঞ্চয়।

তাই বিস্ময়টাই যেন প্রধান। সেই কাহিনী ভাবতে বসলেই ভাবতে হয়—আমাদের দেশের শতবর্ষ পূর্বের সামাজিক, মানসিক, পারিবারিক এবং তীব্র বাস্তব অবস্থাটির কথা। চারিদিকেই দুর্লঙ্ঘ্য বাধা। সবদিকেই প্রতিকূলতা। তাই এই 'অভিযান' সত্যিই অগাধ বিস্ময় এনে দেয়। আর অত্যন্ত অভিভূত-ভাবে ভাবতে ইচ্ছা হয়, তিনি এই আমাদেরই মতো কোন একটি ঘরের ছেলে। তবে কিনা—আবার ভাবলে সম্বিত ফেরে—মনে পড়ে যায়, 'ছেলে' মাত্র তো নয়, "পাতাল ফোঁড়া শিব" যে।

সেই 'শিবশক্তি'র বলেই না এক সহায়-সম্বল-হীন, অজ্ঞাত পরিচয় নিজের দেশ থেকে বহু দূরে বিদেশে-বিভূঁইয়ে গিয়ে পড়া—"অনির্দিষ্ট ভবিষ্যৎ", আশ্রয় লাভের আশাবিহীন, নিঃস্ব, কপর্দকশূন্য, ক্ষুধার্ত, শীতার্ত, তরুণ সন্ন্যাসী অনায়াস মহিমায় একটা প্রভূত ঐশ্বর্যশালী সভ্যতার মদগর্বে গর্বিত দেশের প্রতিনিধিদের সামনে তর্জনী তুলে বলে উঠতে সাহস করেন : হ্যাঁ,

ভারতবর্ষ আজ অর্থসম্পদে ধনী নয়, ভারতবর্ষের পরিচয় আজ-দরিদ্র বটে, তবু সেই দরিদ্র ভারতবর্ষই তার বহু প্রাচীন ঐতিহ্যের ধ্যান-ধারণা, আর চিন্তার ঊর্ধ্বগামী ফসলের সম্ভার নিয়ে জগতের দরবারে মাথা তুলে দাঁড়াবার দাবি রাখে। সেই ভারতবর্ষের চিন্তার ঐশ্বর্যের কাছে, উপলব্ধির ঐশ্বর্যের কাছে আজ পাশ্চাত্যের ধনসম্পদে ঐশ্বর্যশালী দেশগুলির অনেক কিছু শিখবার আছে।

স্বামীজী বললেন: জেনে রেখো—প্রাচ্যের সভ্যতা ত্যাগের—ভোগের নয়, কেবলমাত্র ঐহিক সুখই তার লক্ষ্যবস্তু নয়, তার লক্ষ্য আরও অনেক ঊর্ধ্বে। ভারতবর্ষ কেবলমাত্র 'সাপুড়ে', 'বেদে', 'জাঁড় বুটি' আর নাগা সন্ন্যাসীর দেশ নয়। 'অজ্ঞতার কালো চশমা পরে' তোমরা পৃথিবীর প্রথম আলোকপ্রাপ্ত সভ্য প্রাচ্যভূমির অধিবাসী ভারতীয়ের যে মূল্যায়ন করে এসেছ—এখন তার অবসানের প্রয়োজন। আর সে-প্রয়োজন যে কেবলমাত্র ভারতের জন্যই তা নয়, সভ্যতা-মদগর্বে গর্বিত অতি অহঙ্কারী তোমাদের দেশগুলির জন্যও।

সেই সত্যটি ভারতীয় সন্ন্যাসী বলিষ্ঠ ভাষায় ও উদাত্ত স্বরে জানিয়ে দিলেন। মঞ্চের ওপর দীপ্যমান যেন একখানি জলন্ত মশাল! তাঁর বাণী অগ্নিগর্ভ, সে-বাণীর যুক্তি আর বক্তব্য যেন শান দেওয়া তরোয়াল!

সেই দৃপ্ত ভাষণ 'শিক্ষা সংস্কৃতি আর সভ্যতার মূল কথা' কী তা তুলে ধরে অগণিত শ্রোতাকে বুঝিয়ে দিল, প্রাচ্যের—বহু প্রাচীন প্রাচ্যের মহান সভ্যতা আর অপেক্ষাকৃত অর্বাচীন পাশ্চাত্যের শিক্ষা-সংস্কৃতি ও সভ্যতার তফাৎটা কোথায়?

তিনি তাঁর সেই ভাষণে বললেন: অর্বাচীন পাশ্চাত্য। সভ্যতার ধাত্রী ভারতকে জানো। তাকে বুঝতে শেখ।

একশো বছর আগের সেই ধর্মমহাসভার বক্তৃতাটি আমাদের কাছে এইজন্যেই বিশেষ তাৎপর্য-পূর্ণ যে, সেই বক্তৃতা থেকেই তিনি পৃথিবীর অপর গোলার্ধের ভারত সম্পর্কে অজ্ঞ নিরুৎসুক এক অহঙ্কারী দেশে ভারতের জন্য জমি কিনে রেখে এলেন। আর সেখানে বীজ বপন করে এলেন তাঁর তপস্যা আর ধ্যানের মন্ত্রের। সে-জমি ক্রমশই হয়ে উঠেছে সবুজে শ্যামলে ফলে ফুলে সমৃদ্ধ। যার ফসল এখন পৃথিবীর দিকে দিকে আগ্রহ আর উৎসুক্য এনে দিয়ে চলেছে।

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ ও মা সারদাদেবীর মানসপুত্র বীরসন্ন্যাসী বিবেকানন্দের একদার সেই শিকাগো-অভিযান শুধু ভারতের পক্ষেই নয়, সমগ্র বিশ্বের পক্ষেই একটি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা।

ঈশ্বরের নিয়মে যুগে যুগে, কালে কালে আত্ম-বোধহীন, সত্যবোধ হারিয়ে ফেলা কোন অধঃপতিত যুগকে পরিত্রাণ করতে পরিত্রাতার আবির্ভাব ঘটে। সে-আবির্ভাব যেন কাদায় বসে যাওয়া কালের নৌকাখানাকে কাদা থেকে টেনে তুলে ধাক্কা মেরে ঠেলে পৌঁছে দিয়ে যায় প্রবাহিত স্রোতের মুখে। অতএব অন্ততঃ কিছুকালের জন্যও সেই নৌকা গতিহীনতার দুর্গতি থেকে উদ্ধার পেয়ে গতি লাভ করে। এটাই জাগতিক ইতিহাস। তেমন ইতিহাস থেকেই কখনো কখনো—"শান্তিপুর ডুবু ডুবু, নদে ভেসে যায়।" তার ফলেই—"যত সব নাড়া বুনে, সব হলো কীর্তুনে, কাস্তে ভেঙে গড়ানো করতাল।"

যে-যুগে যেমন আবির্ভাবের প্রয়োজন, সেই যুগে তাঁর তেমনই আবির্ভাব। যেমন সন্তানের হিতকারিণী স্নেহময়ী মা রান্না করেন, যার পেটে যেমন সয়। একই মাছ থেকে কারো জন্যে ভাজা, ঝাল, আবার পেটরোগাটির জন্যে কাঁচকলা দেওয়া ঝোল।—যার যেমন পথ্যি দরকার। মা তো আছেন একজন—অলক্ষ্যে কোথাও। সমগ্র বিশ্বচরাচরের সর্বব্যাপিনী রক্ষয়িত্রী 'মা'। একথা তো মানতেই হবে।

'মা' শব্দটি থেকেই তো 'মানুষ' শব্দটির সৃষ্টি। আর 'মানুষ' শব্দটির তাৎপর্য ব্যাখ্যা করতে যে আত্মজ্ঞানের 'মান' সম্পর্কে 'হুঁশ' থাকা দরকার, তার অগ্রভাগেও ঐ 'মা'। তাই হয়তো—'পেটরোগা' এই যুগের জন্যে পরিত্রাতার অবতরণ—আপাত 'আলাভোলা, পাগল' এক মাতৃসাধকরূপে। কিন্তু শুধু পথ্যিটুকু হলেই তো চলবে না? পুষ্টিও তো চাই, চাই ওষুধ।

তাই বিবেকানন্দ।

তাই সিমলার বিশ্বনাথ দত্তের ঘরে শিবের ধান "পাতাল ফুঁড়ে"।

যুবশক্তির পরম প্রতীক, বীরসন্ন্যাসী বিবেকানন্দ ই ভারতের বহু সংস্কারের জালে আবদ্ধ তদানীন্তন লের অন্ধকারাচ্ছন্ন অন্তঃপুরের দিকে তাকিয়ে বারবরই ভেবে এসেছেন, নারীশক্তির কী অপচয়! ভেবেছেন, কিভাবে এই মহাশক্তিকে দেশের কাজে লাগানো যাবে, কিভাবে অন্তঃপুরের অন্ধকারে আলো পেঁছে দিতে পারা যাবে। কি করে আমাদের মেয়েরা জড়তার বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে আলোয় এসে দাঁড়াবে।

সেই আকুল মানসিকতার সময় গিয়ে পড়লেন এমন একটি দেশে, যেখানে মুক্ত সমাজের পটভূমিতে নারীজাতির কী সাবলীল বিচরণ! নারীশক্তির বিকাশের কী উন্মুক্ত ক্ষেত্র। দেখে তিনি ব্যাকুল হয়ে উঠলেন, বিচলিত হলেন আপন দেশের মেয়েদের সকল বিষয়ে বন্দিদশা আর জড়তার অবস্থার কথা ভেবে। আবার আহ্লাদে আটখানাও হলেন। সেই আহ্লাদে তিনি তাই মঠের গুরুভাইদের চিঠিতে লিখে ফেলেন: "এদের মেয়েদের দেখে আমার আক্কেল গুড়ুম বাবা!! এরা যা সব কাজ করতে পারে, আমি তার সিকির সিকিও পারি না।"

আবার কোন এক পত্রে তিনি লিখছেন: "পৃথিবীর আর কোথাও স্ত্রীলোকের এত অধিকার নাই।"

তাদের যে অধিকার দরকার, এটা ভেবেছেন তিনি একশো বছর আগে। আর ভেবেছেন, "দুটি ডানা ব্যতীত পাখি আকাশে উড়তে পারে না।" সুতরাং কেবলমাত্র দেশের পুরুষদের শিক্ষিত করলেই হবে না, নারীদেরও সমান শিক্ষায় শিক্ষিতা করে তুলতে হবে।

স্বামীজী কি অধ্যাত্মজগতের সন্ধানের পথ বাতলে দেবার জন্যে প্রত্যক্ষ কোন চেষ্টা করতে বসেছিলেন? অথবা সমাজ-সংস্কার করতে? তা তেমন লক্ষ্যে পড়ে না। তিনি চেয়েছিলেন, মানুষের মধ্যে মনুষ্যত্ববোধকে জাগ্রত করতে। এবং তা নারী-পুরুষ-নির্বিশেষে। ভারতীয় জীবনে তথা বাঙালি সমাজজীবনে যেসব [illegible] যুগান্তর ধরে, [illegible] বিবাহ, বহুবিবাহ, [illegible]সন্তান, বাল্য মাতৃত্ব—সমস্তগুলিই তাঁর মনকে [illegible]ভাবে নাড়া দিয়েছে এবং তাদেরকে শিকড় সুদ্ধ উপড়ে ফেলার পথ চিন্তা করেছেন! চিন্তা করেছেন···

[illegible]

এই অকৃতজ্ঞ দেশের জন্যে আরও কত কি করেছেন তিনি, সে-তালিকা রচনা করতে বসা আমার সাধ্য নয়। সাহসও নেই। আমার জানার পরিধির স্বল্পতা আমি জানি। তবে এইটুকুই বারবার মনে আসে, দেশের নারীসমাজের কাছে তাঁর অনেক প্রত্যাশা ছিল। নারীশক্তিকে উদ্বুদ্ধ করে তুলতেই যেন তাঁর বেশি প্রেরণা ছিল। তাঁর এই বিশ্বাসটি স্থির ছিল—নারীশক্তিই দেশের যথার্থ মঙ্গলকর উন্নতি সাধন করতে পারে।

আর যুবশক্তির কাছে? সে তো শুধু প্রত্যাশা-মাত্র নয়, উদাত্ত আহ্বান! বারবার তিনি মনে পাড়িয়ে দিয়েছেন, দেশমাতার পূজায় বলি প্রদত্ত হবার জন্যেই তাদের জন্ম।

কিন্তু চেতনা সঞ্চার করিয়ে দিলেও আত্মবিস্মৃত অকৃতজ্ঞ সমাজের সে-চেতনা কতদিন আর থাকে?

তাই আমাদের আজকের যুবসমাজের যে চেহারা, তা দেখে বিশ্বাস হয় না, একদা এবং খুব বেশি দিন আগেও নয়, এখানে স্বামী বিবেকানন্দ এসে-ছিলেন। এই সেদিনও ছিলেন। অবশ্য অধিকাংশকে দেখেই এই সিদ্ধান্ত। সবাই একরকম নয়। ব্যতিক্রম তো থাকেই। না থাকলে পৃথিবীর ভারসাম্য রক্ষা হতো না।

যদিও যুগাবতারদের ভূমিকা যেন ব্যস্ত এক বড় ডাক্তার-বদ্যির মতো—মরণ-বাঁচন রোগীকে দু-এক মাত্রা মৃতসঞ্জীবনী সুধা অথবা স্বর্ণভস্ম মকরধ্বজ খাইয়ে মরণের সাগর থেকে বাঁচার কূলে টেনে এনে বসিয়ে দিয়ে যাওয়াটুকুই যাঁদের কাজ। 'চিরজীবী' হওয়ার 'গ্যারান্টি' দিয়ে যাওয়া তাঁদের করণীয় নয়। তবে সেই মহাবৈদ্য রোগীকে অন্ততঃ যাবজ্জীবেৎ নীরোগ থাকবার মতো কিছু ব্যবস্থাপত্র রেখে যান। সেই ব্যবস্থাপত্রমত চলতে পারলে হয়তো চট করে আবার ব্যাধিগ্রস্ত হতে হয় না।

কিন্তু সে-নির্দেশপত্র মেনে চলছে কে? আবার রোগে পড়ে, আবার 'ত্রাহি ত্রাহি' ডাক ছাড়ে এবং হয়তো আবার পরিত্রাতার আসনটি টলিয়ে ছাড়ে।

যে-নির্দেশনামাগুলি রেখে যান সেই মহাবৈদ্যরা, সেগুলি হচ্ছে তাঁদের অমরবাণী। সে-হিসাবে ভারতবর্ষ তো সবচেয়ে ধনীর দেশ। ভারতবর্ষে যেমন ( আমার অতি সামান্য সীমিত জ্ঞান থেকেই বলছি ) যুগে যুগে, কালে কালে, বারে বারে এমন মহান আবির্ভাব ঘটেছে, তেমন বোধকরি পৃথিবীর আর কোথাও দেখা যায় না। সেখানে তেমন পরম-প্রাপ্তির হিসাব করতে বসলে দু-পাঁচ হাজার বছরের পথ অতিক্রম করতে হবে। ভারতবর্ষের কালচক্রের মোড়ে মোড়ে আলোকস্তম্ভ। বাঁকে বাঁকে মহান বাণীর উদাত্ত সুর।

ভারতবর্ষে আর যাই হোক, যত কিছুরই অভাব থাকুক 'বাণী'র অভাব নেই। 'শ্রেয়' আর শুভবোধ-উদ্রেককারী মহতী বাণীর সমারোহময় সমাবেশ তাঁদের অমরবাণী—অমরত্বের 'আশ্বাস-বাহী বাণী'তে।

তবে ধনীর দুলালদের যা হয়।

বড়লোকের ঘরের ছেলেরা যেমন "আমার ভাঁড়ারে অনেক সম্পদ মজুত আছে"—এই নিশ্চিন্ততায় কাজে গা লাগায় না, হাত গুটিয়ে নিশ্চেষ্ট হয়ে বসে থাকে। ভারতও তেমনি তার ভাঁড়ারে মজুত বাণীগুলির মর্মবাণীটি মর্মে গ্রহণ করবার চেষ্টা না করে, কেবলমাত্র সেই বাণীগুলি ধুয়ে জল খেয়ে চলে আসছে।

বাণীগুলির 'মর্মবাণী'টি মর্মে গ্রহণ করবার চেষ্টা থাকলে তো একটিমাত্র বাণী থেকেই একটি অধঃপতিত জাতির উদ্ধার হয়ে যেতে পারে।

কিন্তু তেমনটি হয় কই?

"তোমার পূজার ছলে তোমায় ভুলেই থাকি"।

অতএব সেই 'বাণীবিগ্রহের' পূজা হয় মহা আড়ম্বরে, অগাধ উপচারে। বিগ্রহ চাপা পড়ে যান ফুল, তুলসী, বেলপাতার আড়ালে। সেগুলি বাসি হয়ে গেলে পরিণত হয় জঞ্জালে। অবশেষে নিক্ষিপ্ত হয় পথে, প্রান্তরে, নদীজলে। আর অর্ঘ্য হাতে নিয়ে যে-সংকল্প মন্ত্রটি পাঠ করা হয়? তার রেশটুকু পর্যন্তও ভুলে যেতে দেরি হয় না।

কিন্তু বিবেকানন্দ তো এখনো কেবলমাত্র সঞ্চিত বাণীর ভাঁড়ার মাত্র হয়ে যাননি। তিনি তো 'অতীত' নন, তিনি যে 'বর্তমান', তিনি যে 'ভবিষ্যৎ'-ও।

তাঁর বাণীগুলি তো এখনো ভারতের আকাশে বাতাসে যেন তাঁরই জলদগম্ভীর কণ্ঠে উচ্চারিত হয়ে চলেছে—যেন সত্যিই শোনা যাচ্ছে ঃ

"হে ভারত ভুলিও না—ভারতবাসী আমার ভাই।… মূর্খ ভারতবাসী, দরিদ্র ভারতবাসী, ব্রাহ্মণ ভারতবাসী, চণ্ডাল ভারতবাসী আমার ভাই।…"

"বহুরূপে সম্মুখে তোমার,<br>ছাড়ি কোথা খুঁজিছ ঈশ্বর?<br>জীবে প্রেম করে যেই জন,<br>সেই জন সেবিছে ঈশ্বর॥"

এসব কথা তো প্রবাদবচনের তুল্য হয়ে রয়েছে।

এমন অজস্র 'বিবেকবাণী' আমাদের পকেটে পকেটে রয়েছে। চাবি খুলে ভাঁড়ার থেকে বার করতে হয় না। তাই এখন যেখানে যত প্রচার-মাধ্যম আছে, সেগুলিকে নিয়মিত কাজে লাগানো হচ্ছে জাতির প্রতি 'বিবেকবাণী' বিতরণ করতে। কারণ, এখন দেশে রাজ্যে—সমগ্র ক্ষেত্রে 'অ-বিবেকের' উত্তাল ঢেউ। তাকে সামাল দেওয়ার আপ্রাণ চেষ্টায় এই বাণীপ্রচারের ধুম!

কিন্তু অবস্থাটি যে এখন প্রায় সেই—"শিরে কৈল সর্পাঘাত, কোথা বাঁধিব তাগা?" গোছের।

সত্যিই কি আজ আমাদের জাতীয় জীবনে 'শিরে সর্পাঘাত' নয়? যত বিষের সঞ্চয় তো শিরোভূমিতেই। তাগা বাঁধবার জায়গা কোথায়?—

"নাগিনীরা দিকে দিকে ফেলিতেছে বিষাক্ত নিঃশ্বাস।/শান্তির ললিত বাণী, শুনাইবে ব্যর্থ পরিহাস।"

এ 'পরিহাস' তো ক্রমশই আরও প্রবল হয়ে উঠছে। দূরদ্রষ্টা ঋষিকবি এতদূর পর্যন্তই কি 'দর্শন' করে উঠতে পেরেছিলেন? দুঃস্বপ্নেও বোধহয় নয়।

হিংসা, বিদ্বেষ, বিভেদ আর বিচ্ছিন্নতাবাদের যে ক্ষুধার্ত হাঙর হাঁ করে এগিয়ে আসছে সমস্ত শুভকে গ্রাস করতে, ভাঁড়ারে সঞ্চিত 'বিবেক-বাণী'কে বার করে এনে তার কতটা সামাল দেওয়া যাবে?

পৃথিবী অবশ্যই কোনদিনই এই বিষমুক্ত ছিল না। জন্মলগ্ন থেকেই তো তার জীবন শুরু— লড়ালড়ি, হানাহানি, মারামারি, রক্তারক্তি আর ক্ষমতা দখলের বিষাক্ত অভিশাপ নিয়ে। লড়াই দিয়েই শুরু করা জীবনের লড়াইটা শেষ তো হচ্ছেই না, বরং বেড়েই চলেছে—নতুন নতুন হাতিয়ারের সঞ্চয়ে। প্রথম লড়াইটা শুরু হয়েছিল বোধ হয় মানুষে মানুষে—ভূমির দখলদারী নিয়ে। তারপর ক্রমশঃ লড়াই বেঁধে গেল মানুষে আর প্রকৃতিতে। প্রকৃতিকে হাতের মুঠোয় পুরে ফেলে মানুষ দ্বিতীয় বিধাতা হয়ে উঠছে। এখন তার কাছে 'অসাধ্য' বলে যেন আর কিছুই নেই।

আবার এক হিসাবে—মানুষ আজ বিধাতার থেকেও শক্তিশালী। বিধাতা তো নিজের নিয়মের কাছে হাত-পা বাঁধা। তার ওপরে উঠে কিছু করার ক্ষমতা তাঁর নেই। তিনি দরকারমত তাঁর 'সংবিধান'কে বদলে দিতে পারেন না। মানুষ তা পারে। মানুষ অতি অনায়াসেই নিজের তৈরি নিয়মকে ধূলিসাৎ করে দিয়ে বীরদর্পে 'ইচ্ছার রথ'টি চালিয়ে চলতে পারে। কোনখানে তার হাত-পা বাঁধা নেই। মানুষ আজ প্রকৃতিকে পরাজিত করে মহাশক্তিমান।

এই শক্তিটি সঞ্চয় করতে, প্রকৃতির সঙ্গে এই নিরন্তর লড়াই চালিয়ে যাবার রসদ সংগ্রহ করতে বিজ্ঞানের অসামান্য সাফল্যে উল্লসিত, উন্মত্ত বিজ্ঞানীরা লক্ষ লক্ষ বছরের পৃথিবীর জঠরে সঞ্চিত সমস্ত সঞ্চয় নিঃশেষ করে ফেলে তাকে সর্বস্বান্ত করে দুহাত তুলে নৃত্য করে ভাবছে—"ওঃ! কি অগাধ ঐশ্বর্যের অধিকারী হচ্ছি আমরা! এখন আমরা ইচ্ছা করলেই এক মুহূর্তে একটি বিশাল জনপদকে এক মুষ্ঠি ভষ্মস্তূপে পরিণত করে ফেলতে পারি। একটিমাত্র অস্ত্রাঘাতে কোটি কোটি প্রাণকে বিনষ্ট করতে পারি। আরও কতই পেরে চলেছি এবং চলব!"

যদিও এক মুহূর্তে কোটি প্রাণ ধ্বংস করে ফেলতে পারার গৌরব অর্জন করতে পারলেও এখনো পর্যন্ত আধুনিক বিজ্ঞান তার অসামান্য অবিশ্বাস্য সাফল্যেও একটিমাত্র মৃতকে জীবিত করে তোলার দৃষ্টান্ত দেখাতে পেরে ওঠেনি।

অপর দিকে—মানুষে আর প্রকৃতির এই লড়াইয়ে রুষ্ট ক্ষুব্ধ প্রকৃতি তার চিরকালীন অস্ত্রগুলি দিয়েই ঘায়েল করে চলেছে মানুষকে, দেখিয়ে দিচ্ছে তার সেই পুরনো হাতিয়ারের কাছেই মানুষ কত অসহায়।

তবু দুপক্ষের এই নিরন্তর লড়াইয়ের মধ্যেও 'সাধারণ মানুষ' নামের একটা জাত কেবলমাত্র 'টিকে থাকবার' প্রবল শক্তিতেই পৃথিবীর জীবন-লীলা অব্যাহত রেখে চলেছে। এরা প্রায় দুর্বাঘাসের মতো। 'সবুজ বিপ্লবের' গালভরা নামটা কখনো তাদের কানে পৌঁছায়নি, বন মহোৎসবের সৌখীন উৎসবে তাদের কখনো ডাক পড়েনি; তবু তারা পৃথিবীকে 'সবুজ' রাখবার দায়িত্বভার নীরবে বহন করে চলেছে যুগ যুগ ধরে।

এই সাধারণ মানুষরা এযাবৎ কখনো রাজা-রাজড়া আর বিজ্ঞান এবং অজ্ঞানের লড়াই নিয়ে মাথা ঘামায় না। মাথা ঘামায় না বৃহৎ পৃথিবীর মঞ্চে রাষ্ট্রের উত্থান-পতনে কোথায় কি ঘটছে তা নিয়েও। নিজের ক্ষুদ্র গণ্ডির মধ্যে, ক্ষুদ্র তুচ্ছ কর্তব্যভারটুকু নিয়ে চলতে চলতে বড়জোর উলুখড়ের ভূমিকাতে তারা মারা পড়ে। তবে তা নিয়েও প্রতিবাদ তুলতে তারা জানে না। তারা জানে, "জন্মিলে মরিতে হবে অমর কে কোথা কবে?"

তবে একটা অবোধ আশ্বাস (মূর্খ তো!) মনে মনে তারা পোষণ করে—মরার পরেও আর একটা ঠাঁই আছে, সেখানে আর একটা 'বাঁচা' আছে। সেই বাঁচাটুকুর জন্যে কিছু সম্বল রাখা দরকার। সেই দরকারবোধেই তারা বেঁচে মরে থাকাকালেও 'ধর্ম-অধর্ম', 'পাপ-পুণ্য', 'ন্যায়-অন্যায়', 'সত্য-অসত্য' ইত্যাদি শব্দগুলোর অর্থ হৃদয়ঙ্গম করতে চেষ্টা করে, হৃদয়ে বহন করে চলতে চেষ্টা করে। করে, নেহাৎ সাধারণ বলেই হয়তো।

তারা কোনদিন কোন 'লড়াইয়ের' সামিল হতে যায় না বলেই দুঃসাহসের ভরে ভাবতে বসে না— এ-পৃথিবীতে আমিই হচ্ছি সর্বাপেক্ষা দামী, বেঁচে থাকবার অধিকার একমাত্র আমারই আছে। অতএব এমন ক্ষমতার চূড়ায় উঠে বসতে হবে

যাতে 'অমর' হওয়াটা হবে হাতের মুঠোয়, কেবলমাত্র নিশ্ছিদ্র নিরাপত্তাবাহিনীর মহাশক্তির জোরেই অমরত্বলাভ করতে পারা যাবে। ছিদ্রমাত্র না থাকলে যমরাজ আসবেন কোন্ পথ দিয়ে? "জন্মিলে মরিতে হবে"—একথা তাদের জন্যই কি লেখা?

প্রতিনিয়ত লক্ষ লক্ষ মানুষ মরছে। হয়তো বা অনাহারে, অর্ধাহারে, প্রকৃতির অত্যাচারে, বা রোগ-ব্যাধিতে বিনা চিকিৎসায়।

তা মরুক না। ওরা তো মরবার জন্যেই জন্মেছে। তা বলে, আমি মরতে যাব নাকি? আমার চারপাশের 'নিরাপত্তা বাহিনী'রা কি নেই? তাদের জানা নেই, আমার প্রাণটা কতখানি দামী?

তবে? মরতেই যখন হবে, তখন আর পর-কালের বৃথা চিন্তায় ঐসব 'ধর্ম-অধর্ম', 'পাপ-পুণ্য', 'ন্যায়-অন্যায়', 'মানবিকতা-অমানবিকতা', 'বিবেক-অবিবেক' নিয়ে মাথা ঘামিয়ে মরার কি দরকার? ওসব নিয়ে মাথা ঘামাক গে ঐ বিশ্বের ওরা—সাধারণ মানুষেরা। তবে 'নির্বাচনে'-এর দিনটা পর্যন্ত বেঁচে থাকলেই হলো। অথবা 'রাজস্ব' দেওয়ার দিনটা পর্যন্ত।

তা এইভাবেই কোটি বছরের পৃথিবীর চলার ছন্দটিকে টিকিয়ে রেখে এসেছে এরাই—এই সাধারণজনেরা।

কিন্তু মুশকিল এই, আমাদের আজকের সমাজে এই সাধারণজনেরা আর 'সাধারণ' থাকতে চাইছে না। সবাই 'অ-সাধারণ' হয়ে ওঠার আশায় তথাকথিত সেইসব ক্ষমতার ছত্রছায়ায় আশ্রয় নিতে যাবার জন্যে মরি-বাঁচি করে অশ্বের মতো ছুটছে। কারণ তারাও 'অমর' হতে চাইছে।

ভাবটা এই—ঐ 'নিরাপত্তা'র ঘেরাটোপের মধ্যে গিয়ে আশ্রয় নিতে পারলে আর আমায় মারে কে? 'মহা জনের' আশ্রয় বলে কথা।

কিন্তু সাধারণ জনকেও অসাধারণ করে তোলার চাবিকাঠিটি হাতে আছে, এমন 'মহাজন' আজ আর দেশে কোথায়—যে-চাবিকাঠিটির স্পর্শে "জীবন-মৃত্যু পায়ের ভৃত্য হয়ে যায়"? "আগে কে বা প্রাণ করিবেক দান তারই তরে কাড়াকাড়ি" পড়ে যায়, তাকিয়ে দেখে কোথাও খুঁজে পাওয়া যায় না তেমন মহাজন।

আজকের পৃথিবীর পরম সঙ্কট এইখানেই।

একদিকে বৃহৎ বিশ্বের মঞ্চে পারমাণবিক শক্তির দাপট যেন 'মানবিক' শব্দটাকেই মুছে ফেলতে চাইছে। অপর দিকে ক্ষুদ্র সংসার-মঞ্চেও 'মনুষ্যত্ব' শব্দটাকে নির্মূল করতে চাইছে লোভ আর স্বার্থ-বোধের চোরা স্রোতের প্রবল টান। 'সৎ', 'সততা'—এই শব্দগুলো যেন মূল্যহীন হয়ে যাচ্ছে।

নৈতিকতার এই অবক্ষয়ের কারণ—আজ দেশে প্রকৃত 'নেতা' বলে কোথাও কেউ নেই। যাঁরা নিজেদেরকে 'জননেতা' বলে দাবি করে সগর্বে টেবিল চাপড়ান, তাঁরা সবাই অভিনেতা। তাই তাঁরা রণজয়ের হাতিয়ার হিসাবে 'আদর্শ' অথবা 'যুবশক্তি'র কাছে হাত পাততে যান না। সেই সত্যিকার প্রচণ্ড শক্তিকে কাজে লাগাবার চিন্তা তাঁরা করেন না। তাঁরা শরণ নিতে যান রঙ্গমঞ্চ আর রুপোলী পর্দার অভিনেতাদের কাছে। ভরসা তাঁদের রাংতা-মোড়া গ্ল্যামারটুকু। সেইটুকুই তাদের লড়াইয়ে জিতিয়ে দেবে।

'শিরে সর্পাঘাত' আর কাকে বলে?

তবে দেশের যুবশক্তিকে কি আর কাজে লাগানো হয় না? হয়। তাদের কাজে লাগানো হয় অন্ধকার-জগতের কাজে, 'মহান' নেতাদের অনেক অপকর্মের সহায়ক হতে, অপকীর্তি আড়াল করতে।

রাজনীতির অপর নাম 'কূটনীতি'—এতো চির-কালই। এখন তার অপর নাম হচ্ছে 'দুর্নীতি'। সে-রাজনীতি আজ রাজভাণ্ডের গণ্ডি ছেড়ে বেরিয়ে এসে ভাতের হাঁড়ির মধ্যেও ঢুকে পড়েছে, যা আজ দেশকে ধ্বংসের পথে নিয়ে যাচ্ছে।

একদা পরাধীন দেশে যে শক্তিমান 'হাত'দের কাজে লাগানো হয়েছে শৃঙ্খলিতা দেশমাতার পায়ের শৃঙ্খল ভাঙতে, সেই 'হাত'দের আজ কাজে

লাগানো হচ্ছে দেশের শৃঙ্খলা ভাঙতে। যে-'সমিধ' কাজে লাগানো হয়েছে যজ্ঞের হোমাগ্নি জ্বালতে, তাকেই আজ কাজে লাগানো হচ্ছে ঘর পোড়াতে।

সে-ঘর কার?

খেয়াল নেই, নিজেদেরই।

যুবশক্তির কী অপচয় আজ। 'শিব' গড়ার মাটি দিয়ে গড়া হচ্ছে 'বাঁদর'।

এই হচ্ছে আমাদের আজকের দেশ! ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ, মা সারদাদেবী, তাঁদের মানসপুত্র বীরসন্ন্যাসী বিবেকানন্দের দেশ।

অনেক প্রত্যাশা, আর অনেক প্রত্যাশাভঙ্গের বেদনা পেতে পেতে আজ যেন আর তেমন কোন প্রত্যাশাবোধ নেই। শুধু মন হয়ে উঠেছে প্রশ্ন-মুখর।

অহরহই প্রশ্ন আসে: এমনই যদি হবে তবে কেন ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ? কেন মা সারদাদেবী? কেন তাঁদের মানসপুত্র বীরসন্ন্যাসী বিবেকানন্দ? কেন রবীন্দ্রনাথ?

এইসব পরম আবির্ভাব কী ব্যর্থ হয়ে যাবে?

কে এইসব প্রশ্নের উত্তর দেবে?

তবু আবার কোন একসময় নিজের মধ্যেই আসে সান্ত্বনাবাহী উত্তর। মনে হয়, সব ব্যর্থ হয়ে যাবে? কিন্তু তা কি সম্ভব? স্বামীজীর স্বপ্ন, তাঁর আশা, তাঁর ভবিষ্যদ্বাণী সব ব্যর্থ হয়ে যাবে? এ হয়তো শুধু সাময়িক দুর্যোগের কালো মেঘ। আবার কেটে যাবে এই আকাশ-অন্ধকার-করা মেঘ। নির্মল নীল আকাশে ফুটে উঠবে ধ্রুবতারা—দিগ্‌ভ্রান্ত নাবিককে 'দিক' দেখিয়ে দিতে।

ভারত তার হাজার হাজার বছরের পথ-পরিক্রমায় এমন কত সঙ্কটই তো পার হয়ে এসেছে। তার আকাশের 'ধ্রুবতারা' কোনদিন মুছে যায়নি। শুধু হয়তো কিছুকালের জন্য মেঘে ঢাকা পড়ে যুগকে কিছুকালের জন্য দিশেহারা করে তুলে অস্থির ও হতাশ করেছে।

আজ আমাদের মধ্যে এসেছে তেমনি এক হতাশা, অস্থিরতা। যেন সামনে 'ধ্বংসের দুঃস্বপ্ন'।

তাই আজ আমাদের কাছে স্বামী বিবেকানন্দ বড় বেশি প্রাসঙ্গিক, বড় বেশি প্রয়োজনীয়। আমাদের বাঁচার জন্য, আমাদের হতাশা থেকে উদ্ধারের জন্য, আমাদের অস্থিরতা থেকে মুক্তির জন্য, আমাদের ধ্বংস থেকে পরিত্রাণের জন্য স্বামী বিবেকানন্দ উজ্জ্বলতম আলোকস্তম্ভ। তিনি আজ ভারত ও পৃথিবীর মুক্তির আলোকদূত। ☐

কালপঞ্জী

# কন্যাকুমারী থেকে শিকাগো বিশ্বধর্মমহাসভা: কালপঞ্জী

প্রামাণ্য গ্রন্থের ভিত্তিতে কালপঞ্জীটি প্রস্তুত করেছেন লক্ষ্মীকান্ত মিত্র।—সম্পাদক উদ্বোধন

**১৮৯২ খ্রীস্টাব্দ:** ২২ ডিসেম্বর স্বামী বিবেকানন্দ ত্রিবান্দ্রাম থেকে মাদ্রাজের সহকারী অ্যাকাউন্ট্যান্ট জেনারেল মন্মথনাথ ভট্টাচার্যের সঙ্গে ঘোড়ার গাড়িতে কন্যাকুমারীর উদ্দেশে যাত্রা করেন।

২৪ ডিসেম্বর স্বামীজী সমুদ্রে সাঁতার কেটে শিলাখণ্ডে উপস্থিত হন এবং সেখানে তিনদিন ধ্যান করেন। তিনদিন পর ধ্যান থেকে উঠে স্বামীজী পদব্রজে রামনাদে যান এবং রামনাদের রাজা ভাস্কর সেতুপতির সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়। রামনাদ থেকে স্বামীজী যান রামেশ্বরে।

**১৮৯৩ খ্রীস্টাব্দ:** জানুয়ারির প্রথম দিকে স্বামীজী মাদ্রাজ অভিমুখে রওনা হয়ে প্রথমে পদব্রজে রামনাদে আসেন। তারপর মাদুরা প্রভৃতি তীর্থ দর্শন করে তিনি পণ্ডিচেরীতে উপস্থিত হন। সেখানে মন্মথনাথ ভট্টাচার্যের সঙ্গে সাক্ষাৎ হয় এবং তাঁর সঙ্গে ট্রেনে করে স্বামীজী মাদ্রাজে আসেন।

মাদ্রাজে তিনি তিন সপ্তাহকাল থাকেন। ঐ সময় তিনি মাদ্রাজ ট্রিপ্লিকেন সাহিত্য সমিতির অনেকগুলি অধিবেশনে যোগদান করেন। দেওয়ান বাহাদুর রঘুনাথ রাওয়ের সভাপতিত্বে ঐ সমিতি স্বামীজীকে আমেরিকা পাঠাবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে।

১০ ফেব্রুয়ারি স্বামীজী হায়দ্রাবাদে পৌঁছান।

১১ ফেব্রুয়ারি স্বামীজী গোলকুণ্ডার ইতিহাস-প্রসিদ্ধ দুর্গ দেখেন। ১২ ফেব্রুয়ারি হায়দ্রাবাদাধিপতির শ্যালক নবাব বাহাদুর স্যার খুরশিদ জা, আমির-ই-কবিরের সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়।

১৩ ফেব্রুয়ারি সকালে স্বামীজী প্রধানমন্ত্রী ও আরও কয়েকজন উচ্চপদস্থ ব্যক্তির সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন এবং বিকালে মহবুব কলেজে তিনি 'আমার পাশ্চাত্য গমনের উদ্দেশ্য' বিষয়ে বক্তব্য রাখেন।

১৪ ফেব্রুয়ারি বেগমবাজারের বণিকগণ, থিওজফিক্যাল সোসাইটি এবং সংস্কৃত ধর্মমণ্ডল সভার প্রতিনিধিরা স্বামীজীকে সাহায্য করার আশ্বাস দেন।

১৫ ফেব্রুয়ারি পুনাতে যাওয়ার জন্য গণ্যমান্য নাগরিকবৃন্দ স্বামীজীকে টেলিগ্রামে অনুরোধ করেন।

১৬ ফেব্রুয়ারি স্বামীজী হিন্দুমন্দিরের ধ্বংসাবশেষ, বাবা সফিউদ্দিনের কবর ও স্যার সালারজঙ্গের প্রাসাদ দেখেন।

১৭ ফেব্রুয়ারি স্বামীজী হায়দ্রাবাদ থেকে ট্রেনে পুনরায় মাদ্রাজে আসেন। এসময় একদিন স্বপ্নে তিনি শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে সমুদ্র-যাত্রার ইঙ্গিত উপলব্ধি করেছিলেন। তাছাড়া শ্রীশ্রীমায়ের কাছ থেকেও তিনি বিদেশ-যাত্রার অনুমতি ও আশীর্বাদ পেয়ে যান।

পুরো মার্চ মাস এবং এপ্রিল মাসের মধ্যে আলাসিঙ্গা পেরুমলের নেতৃত্বে মাদ্রাজের যুবকবৃন্দ চার হাজার টাকা সংগ্রহ করেন।

এপ্রিল মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে খেতড়ির রাজা অজিত সিংহের নবজাতক পুত্রকে খেতড়ি গিয়ে আশীর্বাদ জানানোর জন্য স্বামীজীর কাছে আহ্বান আসে। রাজার সনির্বন্ধ অনুরোধে স্বামীজী খেতড়ি-যাত্রা করেন। খেতড়ি যাওয়ার পথে স্বামীজী ও খেতড়ির দেওয়ান মুন্সি জগমোহনলাল বাপিঙ্গানা হয়ে বোম্বাই পৌঁছান। বোম্বাইতে কালীপদ ঘোষ বা দানাকালীর গৃহে স্বামী ব্রহ্মানন্দ ও স্বামী তুরীয়ানন্দের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ হয়। দু-চারদিন বোম্বাইতে বাস করে তিনি সকালের ট্রেনে জয়পুর যাত্রা করেন।

১৫ এপ্রিল নাগাদ স্বামীজী ও মুন্সীজী জয়পুর হয়ে বেওয়ারি পৌঁছান।

২১ এপ্রিল তাঁরা খেতড়ি পৌঁছান।

৯ মে স্বামীজী খেতড়ি-রাজের পুত্রকে আশীর্বাদ করেন এবং সে-উপলক্ষে আয়োজিত উৎসবে যোগদান করেন।

১০ মে মুন্সীজীর সঙ্গে স্বামীজী খেতড়ি ত্যাগ করেন রাজকীয় গো-যানে চড়ে। তারপর তাঁরা আবুরোডে পূর্বপরিচিত এক রেলকর্মচারীর গৃহে রাত্রিযাপন করেন। সেখানে ব্রহ্মানন্দজী ও তুরীয়ানন্দজীর সঙ্গে তাঁর পুনরায় সাক্ষাৎ হয়।

আবু রোড থেকে বোম্বাই।

৩১ মে বুধবার পেনিনসুলার অ্যান্ড ওরিয়েন্ট

কোম্পানীর 'পেনিনসুলার' নামক জাহাজে চেপে স্বামীজী আমেরিকার উদ্দেশে যাত্রা করেন।

জুন মাসের প্রথম সপ্তাহে তিনি কলম্বো পৌঁছান এবং গাড়ি করে শহরের কিছু অংশ ঘুরে দেখেন। তারপর মালয়ের অন্তর্গত সমুদ্রের ওপর অবস্থিত পেনাঙ্ নামক ভূখণ্ডে আসেন। তারপর সিঙ্গাপুর। সিঙ্গাপুরে তিনি বিশেষ বিশেষ স্থানগুলি ঘুরে দেখেন। তারপর হংকং। এখানে জাহাজ তিনদিন থেমেছিল। এখানে ক্যান্টন ও বৌদ্ধ-মন্দির ও চীনাদের মন্দির দর্শন করেন।

স্বামীজী নাগাসাকিতে পৌঁছান জুলাই মাসে। এখানে কিছুক্ষণ বিশ্রাম করে তিনি কোবি যান এবং জাহাজ ছেড়ে দিয়ে স্থলপথে ১০ জুলাইয়ের পূর্বেই তিনি ইয়াকোহামা পৌঁছান। এখান থেকে তিনি জাপানের তিনটি বড় শহর ওসাকা, কিয়োটো ও টোকিও ঘুরে দেখেন।

১৪ জুলাই শুক্রবার ক্যানাডিয়ান প্যাসিফিক রুটের 'এম্প্রেস অব ইন্ডিয়া' নামক জাহাজে চেপে স্বামাজী ইয়োকোহামা ত্যাগ করেন।

এগারদিন পরে ২৪ জুলাই মঙ্গলবার সন্ধ্যা সাড়ে সাতটায় স্বামীজী কানাডার সন্নিকটে প্রশান্ত মহাসাগরের ওপরে একটি ক্ষুদ্র বন্দরদ্বীপ ভ্যাঙ্কুভারে পৌঁছান। জাহাজে তাঁর সহযাত্রী ছিলেন দুজন ভারতীয় জামসেদজী টাটা ও লালুভাই।

২৬ জুলাই বুধবার সকালের ট্রেনে স্বামীজী উইনিপেগে পৌঁছান। সেখানে ট্রেন পরিবর্তন করে তিনি আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের সেন্ট পলে আসেন। সেন্ট পল থেকে আবার ট্রেন পরিবর্তন করে স্বামীজী ৪০০ মাইল পূর্বে অবস্থিত শিকাগোতে ৩০ জুলাই রবিবার রাত্রি প্রায় এগারোটায় পৌঁছান। ট্রেনে আলাপ হয় মিস ক্যাথারিন এবট স্যানবর্নের (কেট স্যানবর্ন) সঙ্গে। তিনি স্বামীজীকে ম্যাসাচুসেটস প্রদেশে তাঁর খামারবাড়ি ব্রীজি মেডোজের ঠিকানা দেন।

শিকাগোতে স্বামীজী প্রথমাবারে বারোদিন ছিলেন। ৩১ জুলাই থেকে তিনি ঘুরে ঘুরে বিশ্ব-মেলা দেখেন। অনুসন্ধানে তিনি জানতে পারেন—ধর্মসভা শুরু হবে ১১ সেপ্টেম্বর, উপযুক্ত পরিচয়পত্র না থাকলে ঐ সভায় কাউকে প্রতিনিধিরূপে গ্রহণ করা হবে না; অধিকন্তু প্রতিনিধি গ্রহণের সময়-সীমা উত্তীর্ণ হয়ে গেছে, এখন আর নেওয়া হচ্ছে না। তাছাড়া শিকাগো অত্যন্ত ব্যয়বহুল জায়গা।

১২ আগস্ট শনিবার স্বামীজী ট্রেনে আমেরিকার পূর্বকূলে বস্টন শহরে যান। দু-এক দিনের মধ্যে মিস স্যানবর্নের আমন্ত্রণে তিনি ব্রীজি মেডোজে যান।

১৮ আগস্ট শুক্রবার স্বামীজী মিস স্যানবর্নের সঙ্গে ঘোড়ার গাড়িতে চেপে ১০ মাইল দূরে হুস্নে-ওয়েলে বক্তৃতা দিতে যান।

২২ আগস্ট মঙ্গলবার শেরবোর্ন নারী-সংশোধনাগারে ভারতবর্ষে প্রচলিত রীতি-নীতি ও জীবনধারণ-প্রণালী সম্বন্ধে তিনি বক্তৃতা দেন।

২৪ আগস্ট বৃহস্পতিবার মিস স্যানবর্নের জ্ঞাতিভাই মিঃ ফ্রাঙ্কলিন বেঞ্জামিন স্যানবর্নের সঙ্গে স্বামীজী বস্টনে ফিরে আসেন। হার্ভার্ড বিশ্ব-বিদ্যালয়ের অধ্যাপক জন হেনরি রাইট তাঁর সঙ্গে দেখা করতে এসে দেখা না পেয়ে তাঁর বাড়িতে যাওয়ার জন্য আমন্ত্রণপত্র রেখে যান।

২৫ আগস্ট শুক্রবার বস্টন থেকে ৪০ মাইল দূরবর্তী অ্যানিস্কোয়ামে গিয়ে স্বামীজী রাইট-পরিবারদের সঙ্গে মিলিত হন এবং ২৮ আগস্ট সোমবার পর্যন্ত একসঙ্গে কাটান। ধর্মসম্মেলনের প্রতিনিধি নির্বাচক কমিটির সেক্রেটারীকে স্বামীজীর সম্বন্ধে পরিচয়পত্র লিখে দেন জন রাইট। সেইসঙ্গে তাঁর বাসস্থানের ব্যবস্থা করার জন্য সংশ্লিষ্ট কমিটির কাছেও তিনি চিঠি লিখে দেন। স্বামীজী অ্যানি-স্কোয়াম চার্চে বক্তৃতা দেন ২৭ আগস্ট রবিবার।

২৮ আগস্ট সোমবার স্বামীজী এখান থেকে ১৫ মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে অবস্থিত সালেমে আসেন। সালেমে ১৬৬নং নর্থ স্ট্রীটে মিসেস কেট ট্যানাট উড্সের বাড়িতে স্বামীজী এক সপ্তাহ থাকেন, ওয়েসলি চ্যাপেলে 'হিন্দুধর্ম ও হিন্দুপ্রথা' বিষয়ে বক্তৃতা দেন।

২৯ আগস্ট মঙ্গলবার উডসের বাগানে একদল বালক-বালিকার সামনে তিনি ভারতীয় বালক-বালিকাদের জীবনরীতি, খেলাধুলা, লেখাপড়া ইত্যাদি বিষয়ে বক্তৃতা দেন।

৩ সেপ্টেম্বর রবিবার তিনি সালেমের ইস্ট চার্চে 'ভারতের ধর্ম ও দরিদ্র স্বদেশবাসী' বিষয়ে বক্তৃতা দেন।

৪ সেপ্টেম্বর সোমবার রাত্রে স্বামীজী মিঃ স্যানবর্নের সঙ্গে সারাটোগা স্প্রিংস যান এবং সেখানকার 'স্যানাটোরিয়াম' নামক বোর্ডিং হাউসে থাকেন।

৫ সেপ্টেম্বর মঙ্গলবার সারাটোগা স্প্রিংসে আমেরিকান সোস্যাল সায়েন্স অধিবেশনে স্বামীজী তিনটি বক্তৃতা দেন। আলোচ্য বিষয় ছিল 'জাগতিক সমস্যা'। আবার ঐদিন সন্ধ্যায় টাউন হল-এর কোর্ট অব অ্যাপীল কক্ষে তিনি 'ভারতে মুসলিম শাসন' সম্বন্ধে বক্তৃতা দেন।

৬ সেপ্টেম্বর বুধবার সকালে তিনি 'ভারতে রৌপ্যের ব্যবহার' বিষয়ে বক্তৃতা দেন। ঐদিন সন্ধ্যায় এক ভদ্রলোকের বাড়িতে স্বামীজী বক্তব্য রাখেন। যতদূর জানা যায়, এই বক্তৃতাই ধর্মসম্মেলনে যোগদানের পূর্বে তাঁর শেষ বক্তৃতা।

৮ সেপ্টেম্বর শুক্রবার সন্ধ্যায় আলবানি অথবা বস্টন থেকে ট্রেনে স্বামীজীর শিকাগোর উদ্দেশে পুনর্যাত্রা।

৯ সেপ্টেম্বর শনিবার সন্ধ্যা ৭টা ৫৫ মিনিটে তিনি শিকাগো পৌঁছান। ডঃ জন হেনরি ব্যারোজের ঠিকানাটি তিনি হারিয়ে ফেলেন। উপায়ান্তর না দেখে স্বামীজী একটি খালি 'বক্স কারে' কোনমতে সেই রাত্রিটি কাটান।

১০ সেপ্টেম্বর রবিবার দ্বারে দ্বারে সন্ন্যাসীর ভিক্ষাবৃত্তি গ্রহণ। অবশেষে ডিয়ার বর্ন অ্যাভেনিউ-এর মিসেস জর্জ ডবলিউ. হেলের মহানুভবতায় তাঁর গৃহে স্বামীজীর আশ্রয়লাভ। পরে স্বামীজীকে সঙ্গে করে তিনি মহাসভার অফিসে যান এবং স্বামীজীকে প্রতিনিধি হিসাবে গ্রহণ করা হয়। তাঁর থাকবার ব্যবস্থা হয় ২৬২নং মিশিগান অ্যাভিনিউয়ে জে. বি. লায়নের বাড়িতে।

১১ সেপ্টেম্বর সোমবার ধর্মমহাসভা শুরু হয়। অপরাহ্নের অধিবেশনে স্বামীজী 'আমেরিকাবাসী ভগিনী ও ভ্রাতৃবৃন্দ' সম্বোধন করে বক্তৃতা দেন। প্রচণ্ড করতালির (প্রায় দুই মিনিট ধরে) মধ্যে তাঁকে অভিনন্দন জানান শ্রোতৃবৃন্দ। ঐদিন রাত্রে ডঃ ব্যারোজ প্রতিনিধিগণকে মিঃ এস. টি. বার্টলেটের গৃহে সম্বর্ধনা জানান। ধর্মসভায় স্বামীজীর চেয়ারের নম্বর ছিল ৩১। ঐ সময় তাঁর বয়সও ছিল ৩১ বছর।

১২ সেপ্টেম্বর মঙ্গলবার সম্মেলনের প্রেসিডেন্ট চার্লস সি. বনি আর্ট ইনস্টিটিউটের হল-এ প্রতিনিধিদের ভোজসভায় আপ্যায়িত করেন।

১৩ সেপ্টেম্বর বুধবারের সান্ধ্য অধিবেশনে স্বামীজী সভাপতিত্ব করেন।

১৪ সেপ্টেম্বর বৃহস্পতিবার রাত্রে বিশ্বমেলার মহিলা ম্যানেজার অধ্যক্ষা মিসেস পটার পামার জ্যাকসন পার্কের মহিলাভবনে প্রতিনিধিবর্গের প্রীতিসম্মেলনে আহ্বান করেন। এখানে স্বামীজী ভারতীয় নারীসমাজ সম্বন্ধে বক্তৃতা দেন।

১৫ সেপ্টেম্বর শুক্রবার অপরাহ্নে পঞ্চমদিনের অধিবেশনে স্বামীজী সাম্প্রদায়িকতার প্রসঙ্গে কূপমণ্ডূকের গল্পটি বলেন।

১৯ সেপ্টেম্বর মঙ্গলবার অপরাহ্নে নবমদিনের অধিবেশনে স্বামীজী 'হিন্দুধর্ম' সম্বন্ধে একটি লিখিত বক্তৃতা পাঠ করেন।

২০ সেপ্টেম্বর বুধবার সন্ধ্যায় দশমদিনের অধিবেশনে স্বামীজী খ্রীস্টান ধর্মপ্রচারকদের অশোভন কার্যকলাপ সম্বন্ধে বিরুদ্ধ মন্তব্য প্রকাশ করেন।

২২ সেপ্টেম্বর শুক্রবার সকাল সাড়ে দশটায় দ্বাদশদিনের অধিবেশনে স্বামীজী 'শাস্ত্রনিষ্ঠ হিন্দুধর্ম এবং বেদান্ত দর্শন' সম্বন্ধে এবং অপরাহ্নের অধিবেশনে 'ভারতের বর্তমান ধর্মসমূহ' সম্বন্ধে বক্তৃতা দেন। ঐদিন সন্ধ্যায় আর্ট ইনস্টিটিউটের ৭নং হল-এ মিসেস পটার পামার আয়োজিত বিশেষ অধিবেশনে 'প্রাচ্যধর্মে নারী' সম্পর্কে তিনি আলোচনা করেন।

২৩ সেপ্টেম্বর শনিবার ইউনিভার্সাল রিলিজিয়াস ইউনিটি কংগ্রেস-এ পূর্বপ্রদত্ত বিষয়গুলি সম্বন্ধে স্বামীজী পুনরায় কিছু বলেন।

২৪ সেপ্টেম্বর রবিবার ধর্মসম্মেলনের বাইরে শিকাগোর তৃতীয় ইউনিটেরিয়ান চার্চ-এ 'দ্য লাভ অব গড' বিষয়ে তিনি বক্তৃতা দেন।

২৫ সেপ্টেম্বর সোমবার তিনি বিজ্ঞানসভায় 'হিন্দুধর্মের সারাংশ' বিষয়ে বক্তব্য রাখেন।

২৬ সেপ্টেম্বর মঙ্গলবার সন্ধ্যায় ষোড়শ অধিবেশনে স্বামীজী 'বৌদ্ধধর্মের সঙ্গে হিন্দুধর্মের সম্বন্ধ' বিষয়ে বক্তৃতা দেন।

২৭ সেপ্টেম্বর বুধবার সকালে সপ্তদশ ও সমাপ্তি অধিবেশনে স্বামীজী বিদায় অভিভাষণ প্রদান করেন। □

নিবন্ধ

# স্বামীজীর শিকাগো-ভাষণাবলী ঃ পটভূমিতে ভারতের লোকসংস্কৃতি

## সুভাষচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

স্বামী বিবেকানন্দের মানবপ্রেম, স্বদেশানুরাগ, ঐতিহ্যপ্রীতি, দরিদ্রের প্রতি সহমর্মিতা, ক্ষুধার্তকে অন্নদানের স্পৃহা, শিক্ষাদ্বারা সর্বসাধারণের উন্নতি-প্রচেষ্টা—এই সমস্ত কিছুরই মূলে আছে তাঁর গুরু শ্রীরামকৃষ্ণের লোকায়ত শিক্ষারীতির প্রভাব, যা তাঁকে অসাধারণভাবে মানব-সুহৃদ ও মূলের সন্ধানী করে গড়ে তুলেছিল। ক্ষুধা, দারিদ্র্য, অশিক্ষা, জাতিভেদ, ছুঁৎমার্গ ইত্যাদির অন্ধকারে নিমজ্জিত ভারতবর্ষের সমস্ত কিছুকে তিনি প্রাণ দিয়ে অনুভব করেছিলেন। আর এইভাবেই তিনি লোকায়ত ভারতবর্ষকে প্রত্যক্ষ করতে পেরেছিলেন শিকড়ের ভিতরেই। তাঁর জীবনের দ্বিতীয়পর্ব শুরু হয়েছে গুরু শ্রীরামকৃষ্ণের মহাসমাধির পর ভারত-পরিক্রমার মাধ্যমে। তাঁর গুরু তাঁকে 'বটবৃক্ষ' হতে বলেছিলেন, হয়ে উঠতে বলেছিলেন 'লোকশিক্ষক'। তাই গুরুর মহাপ্রয়াণের অল্পকাল পর তিনি বেরিয়ে পড়েছিলেন ভারত-পর্যটনে। দেশের সর্বত্র ঘুরে তিনি দেখলেন ভারতবর্ষকে, চিনলেন ভারতবর্ষকে, বুঝলেন ভারতবর্ষকে। কৃষকের কুটিরে, শ্রমিকের ঝুপড়িতে, রাজার প্রাসাদে, সাধারণ মানুষের দরজায় দরজায় তিনি গিয়েছেন। হেঁটেছেন ধুলোপায়ে গ্রামের রাস্তায় রাস্তায়, বনপথের ধার ঘেঁষে, ক্ষেতের আলপথ ধরে। নদীর তীর ধরে, পাহাড়ের চড়াই-উতরাই বেয়ে ঘুরেছেন তিনি গোটা ভারতবর্ষ। বস্তুতঃ এই ভারতদর্শন তাঁকে ভারতবর্ষের লোকায়ত জীবন চেতনার মর্মমূলে যে কতখানি পেঁাছে দিয়েছিল, তার নিবিড় পরিচয় ফুটে উঠেছে ভগিনী নিবেদিতার একটি লেখার মধ্যে। নিবেদিতা লিখেছেন ঃ

"আর্যাবর্তের সুবিস্তৃত খেত-খামার ও গ্রাম-বহুল সমতল প্রদেশ অতিক্রম করিবার সময় তাঁহার প্রেম যেরূপ উথলিয়া উঠিত, অথবা তাঁহার তন্ময়-ভাব যেরূপ প্রগাঢ় হইত, এমন আর বোধহয় কোথাও হয় নাই। এইখানে তিনি অবাধে সমগ্র দেশকে অখণ্ডভাবে চিন্তা করিতে পারিতেন। ঘণ্টার পর ঘণ্টা তিনি বুঝাইবার চেষ্টা করিতেন, কিরূপে ভাগে জমি চাষ করা হয় ; অথবা প্রত্যেক খুঁটিনাটি-সহ কৃষক-গৃহিণীর দৈনন্দিন জীবন বর্ণনা করিতেন, যেমন সকালের জলখাবারের জন্য যে খিচুড়ি রাত্রি হইতে উনানে চাপানো থাকিত, তাহার কথাও উল্লেখ করিতেন। এবিষয়ে সন্দেহ নাই যে, এইসব কথা আমাদের নিকট বর্ণনাকালে তাঁহার নয়ন যে প্রদীপ্ত হইয়া উঠিত, অথবা কণ্ঠ যে আবেগভরে কম্পিত হইত, তাহা নিশ্চিত তাঁহার পরিব্রাজক জীবনের স্মৃতিবশতঃ। কারণ, সাধুদের নিকট শুনিয়াছি, ভারতের আর কোথাও দরিদ্র কৃষক কুটিরের ন্যায় অতিথি-সৎকার হয় না। সত্য বটে, তৃণশয্যা অপেক্ষা কোন উৎকৃষ্টতর শয্যা এবং মাটির চালাঘর ব্যতীত কোন ভাল আশ্রয় গৃহস্বামিনী অতিথিকে দিতে পারেন না ; কিন্তু তিনিই আবার বাটীর অপর সকলে যখন নিদ্রিত, নিজে শেষ মুহূর্তে শয়ন করিতে যাইবার পূর্বে একটি দাঁতন ও একবাটি দুধ এমন জায়গায় রাখিয়া দেন, যাহাতে অতিথি নিদ্রাভঙ্গে সকালবেলা উহা দেখিতে পান এবং অন্যত্র যাত্রা করিবার পূর্বে যথাযথ ঐগুলির সদ্ব্যবহার করিতে পারেন।"[১]

নিবেদিতার দৃষ্টিতে প্রতিভাত স্বামীজীর এই সকল বিশ্লেষণ আমাদের স্পষ্ট করে জানিয়ে দেয় যে, স্বামীজীর দেখা ভারতবর্ষ কেবল স্বপ্ন ও স্মৃতির ভারতবর্ষ নয়—সে-ভারতবর্ষ গ্রামের ভারত-বর্ষ, জমির আলের ওপর দিয়ে, কৃষকের কুটিরের পাশ দিয়ে পায়ে হেঁটে পথ-চলার অবকাশে, চাষ-বাসের কাজ দেখতে দেখতে, কৃষক রমণীর কুটিরের গৃহস্থালির কাহিনী শুনতে শুনতে, হৃদয় দিয়ে উপলব্ধি করা ভারতবর্ষ। প্রকৃত 'দরিদ্র' ভারতবর্ষ কি, 'চণ্ডাল' ভারতবর্ষ কি, 'মূর্খ' ভারতবর্ষ কি, ভারতবর্ষের অভিশাপ কোথায় লুকিয়ে আছে, কোথায়ই বা রয়েছে তার গৌরব ; বাইরে দারিদ্র্য, অস্পৃশ্যতা, অজ্ঞানের অন্ধকারে নিমজ্জিত কিন্তু তার মধ্যেও ভারতের গ্রামীণ মানুষ কী গভীর সহজ সরল বিশ্বাসে ভালবাসায়, আতিথেয়তার ঐশ্বর্যে পূর্ণ—তিনি তার সাক্ষাৎ পরিচয় লাভ করেছিলেন।

১ স্বামীজীকে যেরূপ দেখিয়াছি—ভগিনী নিবেদিতা, উদ্বোধন কার্যালয়, ৬ষ্ঠ সং, পৃঃ ৭৩-৭৪

ভারতবর্ষের মাটি এবং ভারতবর্ষের মানুষের প্রতি পূর্ণ মমত্ববোধকে সঙ্গে নিয়ে স্বামীজী সাগর-পারে গিয়েছিলেন। সেখান থেকে ভারতবর্ষকে আবার নতুনভাবে উপলব্ধি করেছিলেন। শিকাগো ধর্মমহাসম্মেলনের সূচনাতেই তিনি ভারতবর্ষের মহান ঐতিহ্যের কথা তাঁর সংক্ষিপ্ত ভাষণে তুলে ধরবার চেষ্টা করেছেন। অত্যন্ত নম্রতা এবং সৌজন্যবোধের সঙ্গে, অথচ প্রবল যুক্তিতে ও বলিষ্ঠ ভাষায় তিনি ভারতবর্ষের সনাতন সংস্কৃতির গভীর বৈশিষ্ট্যকে, তার মর্মমূলটিকে সর্বজন-সমক্ষে তুলে ধরেছিলেন। একটি জাতির সংস্কৃতির সত্য রূপটি নিহিত থাকে তার শিকড়ের গভীরে অর্থাৎ লোকসংস্কৃতির কেন্দ্রমূলে। সেখান থেকেই একটি জাতি ও তার সংস্কৃতি তার রস সংগ্রহ করে চলে, যেমন একটি মহীরূহ মাটির গভীর থেকে রস আহরণ করে তাকে তার শাখা-প্রশাখায় বিস্তৃত করে দেয়, তার ফল-ফুলকে পুষ্ট করে তোলে। ভারতের লোকায়ত সংস্কৃতির অন্তর্মূল থেকে যে-সত্য উঠে আসে, তা হলো সহিষ্ণুতা আর গ্রহিষ্ণুতার আদর্শ। স্বামীজী সেদিন বিশ্বধর্মসম্মেলনে ভারতের সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্যের কথা উল্লেখ করতে গিয়ে যা বলেছিলেন তার পিছনে ছিল তাঁর পরিব্রাজকরূপে পায়ে হেঁটে ভারতবর্ষকে, লোকায়ত ভারতবর্ষকে, গ্রামীণ ভারতবর্ষকে চেনা, দেখা, জানা ও উপলব্ধির পটভূমিকা। তাই তিনি বলেছিলেন: "যে-ধর্ম জগৎকে চিরকাল পরমত-সহিষ্ণুতা ও সর্ববিধ মতস্বীকার করার শিক্ষা দিয়া আসিতেছে, আমি সেই ধর্মভুক্ত বলিয়া নিজেকে গৌরবান্বিত মনে করি। আমরা শুধু সকল ধর্মকে সহ্য করি না, সকল ধর্মকেই আমরা সত্য বলিয়া বিশ্বাস করি।"

এই গুণ ও বৈশিষ্ট্যটি ভারতবর্ষের মানুষ অর্জন করেছে বহুশতবর্ষব্যাপী একান্নবর্তী পারিবারিক জীবন, গার্হস্থ্য আশ্রমের লোকায়ত জীবনধারা, ব্যক্তি ও সামাজিক জীবনের নানা রীতিনীতির মধ্য দিয়ে। ভারতবর্ষের জীবনধারার মূল বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে গভীর পরিচয়ের ভিত্তিতে দাঁড়িয়ে তিনি বিশ্বমানবকে সাম্প্রদায়িকতা, গোঁড়ামি ও ধর্মান্ধতার গণ্ডি ভেঙে বেরিয়ে আসার জন্য আহ্বান জানিয়েছিলেন। ১৫ সেপ্টেম্বর শুক্রবার অপরাহ্ণে ধর্মমহাসমিতির পঞ্চমদিবসের অধি-বেশনে ভিন্ন ভিন্ন ধর্মাবলম্বিগণকে পুনরায় স্ব-স্ব ধর্মের প্রাধান্য প্রতিপাদনের জন্য বাগ্বিতণ্ডায় ব্যাপৃত দেখে স্বামীজী ভারতবর্ষের লোকায়ত সংস্কৃতির মর্মমূল থেকে গ্রহণ করা একটি লোককথা উপস্থিত করে সকলের মুখ বন্ধ করে দেন।

"একটি ব্যাঙ একটি কুয়ার মধ্যে বাস করিত।... একদিন ঘটনাক্রমে সমুদ্রতীরের একটি ব্যাঙ আসিয়া সেই কূপে পতিত হইল। কূপমণ্ডুক জিজ্ঞাসা করিল, 'কোথা থেকে আসা হচ্ছে?' 'সমুদ্র থেকে আসছি।' 'সমুদ্র? সে কত বড়? তা কি আমার এই কুয়োর মতো বড়?' এই বলিয়া কূপমণ্ডুক কূপের এক প্রান্ত হইতে আর এক প্রান্তে লাফ দিল। তাহাতে সাগরের ব্যাঙ বলিল, 'ওরে ভাই, তুমি এই ক্ষুদ্র কূপের সঙ্গে সমুদ্রের তুলনা করবে কি করে?' ইহা শুনিয়া কূপমণ্ডুক আর একবার লাফ দিয়া জিজ্ঞাসা করিল, 'তোমার সমুদ্র কি এত বড়?' 'সমুদ্রের সঙ্গে কুয়োর তুলনা করে তুমি কি মূর্খের মতো প্রলাপ বকছ?'

"ইহাতে কূপমণ্ডুক বলিল, 'আমার কুয়োর মতো বড় কিছুই হতে পারে না, পৃথিবীতে এর চেয়ে বড় আর কিছুই থাকতে পারে না; এ নিশ্চয়ই মিথ্যাবাদী, অতএব একে তাড়িয়ে দাও'।"

ভারতীয় লোকসংস্কৃতির মর্মমূল থেকে সংগৃহীত একটি সাধারণ লোককথাকে স্বামীজী অসাধারণভাবে ব্যবহার করলেন পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ ধর্মপ্রবক্তাদের সামনে—তাদের সংকীর্ণতা ও ক্ষুদ্রতার পরিচয়কে উদ্ঘাটিত করতে। সেদিন কুয়োর ব্যাঙ ও সমুদ্রের ব্যাঙের লোককাহিনীটি উপস্থাপিত করে তিনি বলেছিলেন, এরূপ সংকীর্ণ ভাবই আমাদের মত-ভেদের কারণ। আমরা এক-একজন নিজের নিজের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কূপে বসবাস করে সেটিকেই সমগ্র জগৎ বলে মনে করছি। হিন্দুই হোক আর খ্রীস্টানই হোক অথবা মুসলমান—সকলেই নিজ নিজ গণ্ডির মধ্যে থেকে তাকেই সমগ্র জগৎ বলে কল্পনা করছেন। আজ প্রয়োজন এই সমস্ত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মনুষ্যসৃষ্ট জগৎগুলির গণ্ডিসমূহকে ভেঙে বেরিয়ে আসার।

কোন গভীর তত্ত্বকে মানুষের কাছে সহজে

বোধগম্য করার জন্য যেমন ভারতের লোককথা থেকে স্বামীজী গল্প উদ্ধার করেছেন, তেমনি আবার গিয়েছেন পুরাণ, রামায়ণ, মহাভারতের উপাখ্যানে। ১৯ সেপ্টেম্বর 'হিন্দুধর্ম' নামক ভাষণে স্বামীজী বলেছিলেন, আমাদের দেশে বেদ-বেদান্ত, গীতা-উপনিষদ, কাব্য-পুরাণাদি সবসময় মানুষকে শিখিয়েছে যে, ইহলোকে ও পরলোকে পুরস্কারের প্রত্যাশায় ঈশ্বরকে ভালবাসা ভাল, কিন্তু ভালবাসার জন্যই তাকে ভালবাসা আরও ভাল। এই তত্ত্বটিকে বোঝাবার জন্যে পুরাণে উল্লিখিত একটি ঘটনাকে তিনি তুলে ধরেছিলেন। কাহিনীটি এই : "শ্রীকৃষ্ণের এক শিষ্য তৎকালীন ভারতের সম্রাট [যুধিষ্ঠির]··· সিংহাসনচ্যুত হইয়া রানীর সহিত হিমালয়ের অরণ্যে আশ্রয় লইয়াছিলেন। সেখানে রানী একদিন তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করেন, 'আপনি সর্বাপেক্ষা ধার্মিক ব্যক্তি, আপনাকে কেন এত কষ্ট যন্ত্রণা ভোগ করিতে হইতেছে?' যুধিষ্ঠির উত্তর দেন, 'প্রিয়ে, দেখ দেখ, হিমালয়ের দিকে চাহিয়া দেখ, আহা! কেমন সুন্দর ও মহান! আমি হিমালয় বড় ভালবাসি। পর্বত আমাকে কিছুই দেয় না, তথাপি সুন্দর ও মহান বস্তুকে ভালবাসাই আমার স্বভাব, তাই আমি হিমালয়কে ভালবাসি। ঈশ্বরকেও আমি ঠিক এই জন্য ভালবাসি। তিনি নিখিল সৌন্দর্য ও মহত্ত্বের মূল, তিনিই ভালবাসার একমাত্র পাত্র। তাঁহাকে ভালবাসা আমার স্বভাব, তাই আমি ভালবাসি। আমি কোন কিছুর জন্য প্রার্থনা করি না, আমি তাঁহার নিকট কিছুই চাই না, তাঁহার যেখানে ইচ্ছা আমাকে তিনি সেখানে রাখুন, সর্ব অবস্থাতেই আমি তাঁহাকে ভালবাসিব। আমি ভালবাসার জন্য তাঁহাকে ভালবাসি। আমি ভালবাসার ব্যবসা করি না'।"

হিমালয়ের সঙ্গে ভারতের লোক-ঐতিহ্যের নাড়ীর যোগ। পুরাণে, লোককাহিনীতে দেখি, হিমালয় স্পর্শ করে রয়েছে আমাদের আত্মাকে। সেই সত্যটিও এখানে তুলে ধরলেন স্বামীজী।

লোকায়ত জনসাধারণের যে-ভাষা, তাতেই শিক্ষা ও জ্ঞানের বিষয়কে প্রচার করা উচিত বলে স্বামীজী মনে করতেন। পৃথিবীর বিভিন্ন ধর্মসম্প্রদায় ও তাঁদের শ্রেষ্ঠ ধর্মাচার্যদের প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে তিনি এমনই একটি সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছিলেন যে, তাঁকে লোকসংস্কৃতির একজন অন্যতম শ্রেষ্ঠ গবেষক হিসাবে নিঃসংশয়ে চিহ্নিত করা যেতে পারে। বৌদ্ধধর্মের সঙ্গে হিন্দুধর্মের সম্বন্ধ বিচার করতে গিয়ে ২৬ সেপ্টেম্বর ষোড়শ দিবসের অধিবেশনে তিনি বলেছিলেন : শাক্যমুনি বেদের মধ্যে লুকাইত সত্যকে সাধারণ মানুষের মধ্যে ছড়িয়ে দিয়েছিলেন। তিনি বলেছিলেন, বৌদ্ধধর্মকে নিপুণভাবে অনুধাবন করতে গেলে হিন্দুধর্মের মধ্যেই তার শিকড়ের সন্ধান করতে হবে। বুদ্ধদেবই প্রথম হিন্দুধর্মের তথা বেদান্তের মূল সত্যকে আবিষ্কার করে বলতে পেরেছিলেন যে, হিন্দুধর্মে জাতিভেদ নেই—জাতিভেদ কেবল সামাজিক ব্যবস্থা। বুদ্ধদেবের ধর্ম-প্রচারের রীতি বা বৈশিষ্ট্যটি যে একান্তভাবে লোকশিক্ষামূলক ছিল—সেটিও তিনি সহজভাবে ধরতে পেরেছিলেন। প্রেরণাদীপ্ত আবেগময় ভাষায় স্বামীজী সেদিন বলেছিলেন :

"সকলের প্রতি—বিশেষতঃ অজ্ঞান ও দরিদ্রগণের প্রতি অদ্ভুত সহানুভূতিতেই তাঁহার গৌরব প্রতিষ্ঠিত। তাঁহার কয়েকজন শিষ্য ব্রাহ্মণ ছিলেন। যেসময়ে বুদ্ধ শিক্ষা দিতেছিলেন, সেসময়ে সংস্কৃত আর ভারতের কথ্য ভাষা ছিল না। ইহা সেসময়ে পণ্ডিতদের পুস্তকেই দেখা যাইত। বুদ্ধদেবের কোন কোন ব্রাহ্মণ শিষ্য তাঁহার উপদেশগুলি সংস্কৃতে অনুবাদ করিতে চান, তিনি কিন্তু স্পষ্ট ভাষায় বলিয়াছেন, 'আমি দরিদ্রের জন্য—জনসাধারণের জন্য আসিয়াছি, আমি জনসাধারণের ভাষাতেই কথা বলিব।' আজ পর্যন্ত তাঁহার অধিকাংশ উপদেশ সেই সময়কার চলিত ভাষাতেই লিপিবদ্ধ।" বুদ্ধদেব কিভাবে লোকসংস্কৃতির গভীরে প্রবেশ করে লোকায়ত জনসাধারণকে উপলব্ধি করেছিলেন, তার পরিচয় স্বামী বিবেকানন্দই প্রথম উপস্থিত করতে পেরেছিলেন। সমকালীন সাধারণ মানুষের কথ্য ভাষা পালিতে বৌদ্ধধর্ম প্রচারের ফলে বৌদ্ধধর্ম এত প্রসারলাভ করেছিল—স্বামীজী একথা উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন। তাই লোকায়ত জনসাধারণের ভাষা চলিত ভাষার সপক্ষে সর্বক্ষেত্রেই তিনি তাঁর বক্তব্যকে উপস্থাপন করেছিলেন। আমেরিকা থেকে উদ্বোধন পত্রিকার সম্পাদককে ১৯০০

খ্রীস্টাব্দের ২০ ফেব্রুয়ারি একটি চিঠিতে তিনি লিখেছিলেন : "আমাদের দেশে প্রাচীনকাল থেকে সংস্কৃতয় সমস্ত বিদ্যা থাকার দরুন বিদ্বান এবং সাধারণের মধ্যে একটা অপার সমুদ্র দাঁড়িয়ে গেছে। বুদ্ধ থেকে চৈতন্য রামকৃষ্ণ পর্যন্ত—যাঁরা 'লোকহিতায়' এসেছেন, তাঁরা সকলেই সাধারণ লোকের ভাষায় সাধারণকে শিক্ষা দিয়েছেন। পাণ্ডিত্য অবশ্য উৎকৃষ্ট; কিন্তু কটমট ভাষা—যা অপ্রাকৃতিক, কল্পিত মাত্র, তাতে ছাড়া কি আর পাণ্ডিত্য হয় না?" অকাট্য ও অনিবার্য যুক্তি সহযোগে তিনি বলেছিলেন :

"স্বাভাবিক যে-ভাষায় মনের ভাব আমরা প্রকাশ করি, যে-ভাষায় ক্রোধ দুঃখ ভালবাসা ইত্যাদি জানাই, তার চেয়ে উপযুক্ত ভাষা হতে পারেই না; সেই ভাব, সেই ভঙ্গি, সেই সমস্ত ব্যবহার করে যেতে হবে। ও ভাষার যেমন জোর, যেমন অল্পের মধ্যে অনেক, যেমন যে-দিকে ফেরাও সে-দিকে ফেরে, তেমন কোন তৈরি ভাষা কোনও কালে হবে না। ভাষাকে করতে হবে—যেমন সাফ ইস্পাত, মুচড়ে মুচড়ে যা ইচ্ছে কর—আবার যে-কে-সেই, এক চোটে পাথর কেটে দেয়, দাঁত পড়ে না। আমাদের ভাষা—সংস্কৃতের গদাই-লস্করি চাল—ঐ এক-চাল নকল করে অস্বাভাবিক হয়ে যাচ্ছে।"

এসম্পর্কে তাঁর শেষ বক্তব্য ছিল : "সমস্ত দেশের যাতে কল্যাণ, সেথা তোমার জেলা বা গ্রামের প্রাধান্যটি ভুলে যেতে হবে। ভাষা ভাবের বাহক। ভাবই প্রধান; ভাষা পরে। হীরে-মতির সাজ-পরানো ঘোড়ার উপর বাঁদর বসালে কি ভাল দেখায়?... এখন ক্রমে বুঝবে যে, যেটা ভাবহীন প্রাণহীন—সে-ভাষা, সে-শিল্প, সে-সঙ্গীত কোনও কাজের নয়। এখন বুঝবে যে জাতীয় জীবনে যেমন যেমন বল আসবে, তেমন তেমন ভাষা শিল্প সঙ্গীত প্রভৃতি আপনা-আপনি ভাবময় প্রাণপূর্ণ হয়ে দাঁড়াবে।"—এই 'ভাবহীন', 'প্রাণহীন'-এর মধ্যে জাতীয় সত্তা কিভাবে আপনা-আপনি 'ভাবময় প্রাণপূর্ণ' হয়ে দাঁড়ায়—তার রহস্য স্বামীজী আবিষ্কার করেছিলেন তাঁর ভারত-পরিক্রমা পর্বে।

২৭ সেপ্টেম্বর ১৮৯৩ সপ্তদশ তথা শেষ দিবসের অধিবেশনে স্বামী বিবেকানন্দ ধর্মের স্বাভাবিক বিকাশ প্রসঙ্গে শেষ যে-বক্তব্যটি আমাদের সামনে উপস্থিত করেছিলেন সেটি অনুধাবন করলে বোঝা যাবে যে, তিনি মানব-কল্যাণের উৎসটিকে উপস্থাপন করেছেন একান্তভাবে গ্রামীণ লোকজীবনের উপমায় :

"বীজ ভূমিতে উপ্ত হইল; মৃত্তিকা, বায়ু ও জল তাহার চতুর্দিকে রহিয়াছে। বীজটি কি মৃত্তিকা, বায়ু বা জলের মধ্যে কোন একটিতে পরিণত হইয়া যায়?—না। সেই বীজ হইতে একটি চারাগাছ উৎপন্ন হয়, উহা ক্রমে নিজের স্বাভাবিক নিয়মানুসারে বর্ধিত হয় এবং মৃত্তিকা বায়ু ও জল ভিতরে গ্রহণ করিয়া সেই-সকল উপাদান বৃক্ষে পরিণত করে এবং বৃক্ষাকারে বাড়িয়া উঠে।" এই উপমার সাহায্যে তিনি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন তাঁর মহান ও উদার উপলব্ধিকে : "খ্রীস্টানকে হিন্দু বা বৌদ্ধ হইতে হইবে না; অথবা হিন্দু ও বৌদ্ধকে খ্রীস্টান হইতে হইবে না; কিন্তু প্রত্যেক ধর্মই অন্যান্য ধর্মের সারভাগগুলি গ্রহণ করিয়া পুষ্টিলাভ করিবে এবং স্বীয় বিশেষত্ব বজায় রাখিয়া নিজ প্রকৃতি অনুসারে বর্ধিত হইবে।" তাই শেষকথা তিনি ঘোষণা করলেন : "সাধুচরিত্র, পবিত্রতা ও দয়াদাক্ষিণ্য জগতের কোন একটি বিশেষ ধর্মমণ্ডলীর নিজস্ব সম্পত্তি নয় এবং প্রত্যেক ধর্মপদ্ধতির মধ্যেই অতি উন্নত চরিত্রের নরনারী জন্মগ্রহণ করিয়াছেন।" সুতরাং সমস্ত বাধা সত্ত্বেও প্রত্যেক ধর্মের প্রবক্তাদের তাঁদের ধর্মের পতাকার ওপর স্বর্ণাক্ষরে লিখতে হবে—"বিবাদ নয়, সহায়তা; বিনাশ নয়, পরস্পরের ভাবগ্রহণ; মতবিরোধ নয়, সমন্বয় ও শান্তি।"

অনেক পথ হেঁটে, মানুষের সংসারে অগণিত লোকায়ত জনগণের সঙ্গে একাত্ম হয়ে তাদের আচার-বিচার, সংস্কার-ভাবধারা, দুঃখ-দারিদ্র্য, সম্ভ্রমবোধ ও মহত্ত্ব—সবকিছুই বিচার ও পর্যালোচনা করে কেবল ভারত নয়, বিশ্বমানবের 'বাঁচা ও বাড়া'র শিকড়টিকে তিনি আবিষ্কার করতে পেরেছিলেন। এই সন্ধান ও আবিষ্কারের প্রেরণাদাতা ছিলেন তাঁর গুরু শ্রীরামকৃষ্ণ, ভারতবর্ষের সনাতন গ্রামীণ লোকজীবনের ভূমি থেকে যিনি উঠে এসেছিলেন। পরবর্তী কালে প্রমাণিত হয়েছিল, তাঁর ও তাঁর প্রধান শিষ্যের মধ্যে বিগ্রহায়িত হয়েছে ভারতের আত্মা, ভারতের চৈতন্য, ভারতের বিবেক। ☐

# প্রসঙ্গ স্বামীজীর শিকাগো বক্তৃতা

চিত্তরঞ্জন ঘোষ

ঠিক একশো বছর আগে বাঙলা ক্যালেন্ডারে একটি শতাব্দীর সূচনা এবং বিশ্বের কাছে পরাধীন ভারতের প্রথম সসম্মান উপস্থাপনা। স্বামী বিবেকানন্দ এই বছর শিকাগোর ধর্মমহাসভায় বক্তৃতা করেন। 'নিউ ইয়র্ক হেরাল্ড' মন্তব্য করেছিল ঃ "[Swami Vivekananda] was undoubtedly the greatest figure in the Parliament of Religions." 'বস্টন ইভনিং ট্রান্সক্রিপ্ট' লিখেছিল ঃ "[ When Vivekananda ] merely crosses the platform, he is applauded."

স্বামী বিবেকানন্দ "দিব্য-অধিকারপ্রাপ্ত" বাগ্মী ছিলেন। তাঁর ব্যক্তিত্ব ছিল সম্মোহনী। এসবই মানুষকে মুগ্ধ করতে পারে। কিন্তু আরও একটি কারণ হয়তো ছিল। ভারত তখন ইংরেজের অধীন। দাসদের দেশ একটা। সেই দাসদের একজন এই নবীন সন্ন্যাসী বিবেকানন্দ। তিনি গিয়েছেন শ্বেত প্রভুদের দেশে আহূত এক বিশ্বসভায়। ওখানে গিয়ে হীনম্মন্যতার ভাব জাগবার কথা যেকোন ভারতীয়ের। বিবেকানন্দের তা তো ছিলই না, বরং সমান ভূমিতে দাঁড়িয়ে অকম্পিত বলিষ্ঠ কণ্ঠে তিনি ভারত-ধর্মের ব্যাখ্যা করেছিলেন। ভারতবাসীর আত্মবিশ্বাস বাড়িয়ে দিয়েছিলেন তিনি।—পরাধীন হলেও সে মনের ক্ষেত্রে দাস নয়, দীর্ঘকালের সুমহান ঐতিহ্যের সে অধিকারী।

নানা পক্ষের নানা নিন্দা ছিল। অর্থাভাব ছিল। ধর্মমহাসভায় প্রতিনিধিত্বের যোগ্যতা বা অধিকার নিয়ে প্রশ্নও ছিল। সেই সভায় বহু মানুষ হয়তো ভারতবর্ষ সম্পর্কে ওয়াকিবহাল বা অনুকূল ছিলেন না। এই অবস্থায় সেখানে ব্যর্থ হওয়ার প্রভূত আশঙ্কা ছিল এবং ব্যর্থ হলে ভারত থেকে যাঁরা তাঁকে পাঠিয়েছিলেন, তাঁদের কত কষ্ট হবে তাও তিনি জানতেন। তা সত্ত্বেও এত বড় ঝুঁকি তিনি কেন নিলেন? কী সেই প্রেরণা, যার জন্য তিনি সমুদ্র-লঙ্ঘনে উদ্যোগী হলেন? এই প্রেরণা ছিল তাঁর ভারতপ্রেম, তাঁর স্বদেশপ্রেম।

তখনকার দিনে আত্মসচেতন ব্যক্তিরা পরাধীনতার জ্বালা বোধ করতেন। স্বামীজীও বাল্য বয়স থেকে এই জ্বালায় জ্বলতেন। দেশের চারদিকে তখন 'ন্যাশন্যালে'র হাওয়া। পত্রিকা, থিয়েটার, শিক্ষা, সাহিত্য—সবকিছুকেই 'ন্যাশন্যাল' হতে হবে। ইংরেজের যা যা আছে, আমাদেরও সব তাই আছে। আমরা পিছিয়ে-পড়া দাস নই, আমরা ইংরেজের সমকক্ষ। সবদিকে এই প্রচেষ্টা। এই প্রয়াসের একটা প্রকাশ—এই কালাপানি-পার-হওয়া।

বিপিনচন্দ্র পাল দেশনেতা এবং ব্রাহ্মসমাজেরও একজন বিশিষ্ট নেতা। তিনি স্বামীজীর শিকাগো-ভাষণ সম্পর্কে বললেন ঃ "...আশ্চর্যজনক কৃতকার্যতা...। ...এতদ্বারা আমাদের মধ্যে শিশু-সদৃশ চেতনাতে একটা নূতন শক্তি ও অনুপ্রেরণা প্রদান করে। বস্তুতপক্ষে ইহা আমাদের ধর্মোদ্দেশ্যে বা জনকল্যাণে প্রেরিত প্রথম বিদেশযাত্রা।... বিবেকানন্দ... আমেরিকান কল্পনাকে তাঁহার 'দম্ভপূর্ণ সাহস' দ্বারা জয় করেন... বিবেকানন্দের সাহসিকতাপূর্ণ বাণী যেন সভ্যজগতের অহঙ্কারের প্রতি প্রতিদ্বন্দ্বিতায় আহ্বান; তাতে কোন দ্বিধা ছিল না, কোন মাফ চাওয়ার ভাব ছিল না, কোন গোঁজামিল ব্যাখ্যার চেষ্টা ছিল না, কোন দীনতা ভীরুতার ভাবও ছিল না। বিবেকানন্দ কোন কারণ প্রদর্শন করেন নাই, তাঁহার বক্তব্য বিষয়ে কোন যুক্তিও প্রদর্শন করেন নাই। ...প্রাচীন ঋষিদের ন্যায় বা... বাইবেলের প্রেরিত পুরুষদের ন্যায় সোজাসুজি এবং সরলভাবে বলিয়াছিলেন, যাহা লোকের আত্মা শুনিতে বাধ্য, কারণ সত্য লইয়া ঝগড়া বা বিতর্ক চলে না, ইহাই... বিবেকানন্দের কৃতকার্যতার গুপ্ত রহস্য।"

এতগুলি সপ্রশংস উক্তির পরে একটি পঙ্ক্তি লিখেছেন বিপিনচন্দ্র পাল। সেই পঙ্ক্তিটি এই ঃ "আর এই কৃতকার্যতার অবশ্যম্ভাবী প্রতিক্রিয়া

ভারতে হয়··· দেশে হিন্দুধর্মের পুনরুত্থানে নূতন শক্তি প্রদান করে।" এই কথা আজও বহু স্থানে উচ্চারিত হয়। কিন্তু এর যথার্থতা বিচারে আপাততঃ আমরা প্রবেশ করছি না, শুধু একটা কথা বলছি। ঘটনা ঘটায় একজন, দশজনে তার ব্যাখ্যা করে দশরকম। বিপিনচন্দ্র পাল একটা ব্যাখ্যা দিয়েছেন, আরেক ব্যাখ্যা দিয়েছেন বাংলার তরুণ অগ্নিবিপ্লবীরা তাঁদের রক্তের স্বাক্ষরে। পরবর্তী কালে বাংলার অগ্নিবিপ্লবীদের প্রধান এক প্রেরণা ছিলেন স্বামী বিবেকানন্দ। প্রতিকূলে এক বিশ্বমঞ্চে স্বামীজী দাঁড়িয়েছিলেন একাকী। পরাধীন প্রবলতম শাসক-শক্তির বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছিল মুষ্টিমেয় কিছু তরুণ। আবেদন-নিবেদনের নতজানু এক রাজনীতি দপ করে জ্বলে উঠলো দীপ্ত এক দেশপ্রেমে। নৈতিক শক্তি ও প্রবল সাহসের জোরেই তরুণদের এই অসাধ্যসাধনের প্রয়াস। তারা স্বামীজীর কাজকে হিন্দু-সংকীর্ণতার দৃষ্টি দিয়ে দেখেনি, দেখেছে দেশপ্রেমের প্রজ্বলিত আলোয়।

বিশ্বধর্মসভায় স্বামীজী হিন্দুদের সংকীর্ণতাকে উস্কে তোলার মতো কিছু বলেননি। বলেছেন বেদান্তের সারকথা। শিকাগো ধর্মমহাসভার প্রায় একশো বছর আগে উপনিষদ্ ল্যাটিন ভাষায় অনূদিত হয়। আর ধর্মমহাসভার চল্লিশ বছর আগে শোপেনহাওয়ার বলেছিলেন: "উপনিষদ্ আমার জীবনের সান্ত্বনা, মরণেও তা আমার সান্ত্বনা হবে।" এই রকম দু-একজন হয়তো উপনিষদের কথা জানতেন। কিন্তু পাশ্চাত্যের সাধারণ লোকেরা এবিষয়ে কিছুই জানতেন না। কিন্তু বিবেকানন্দের বাণী বা বক্তৃতা মোটেই কেতাবী বা পাণ্ডিতী ব্যাপার ছিল না, ছিল জীবন্ত, অতিমাত্রায় জীবন্ত। আর তাঁর ব্যাখ্যায় ছিল গভীর এক ঔদার্য। তাই পাশ্চাত্যে তাঁর ভাষণে সাড়া জেগেছিল। ধর্ম বলতে এতদিন পাশ্চাত্য যা জানতো তার থেকে আলাদা একটা কথা তারা শুনলো। কী সেই পার্থক্য?

এটি বোঝবার জন্য রবীন্দ্রনাথের একটি উক্তির সাহায্য নিই। রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন: "'ধর্ম' বলিতে 'রিলিজিয়ন' নহে, সামাজিক কর্তব্যতন্ত্র; তাহার মধ্যে যথাযোগ্যভাবে রিলিজিয়ন, পলিটিক্স সবই আছে।··· 'ধর্ম' শব্দের প্রতিশব্দ ইয়োরোপীয় ভাষায় খুঁজিয়া পাওয়া অসাধ্য। এজন্য ধর্মকে ইংরেজী রিলিজিয়ন-রূপে কল্পনা করিয়া অনেক সময় ভুল করিয়া বসি।"

তাহলে দেখা যাচ্ছে, ধর্ম দু-রকমের: একরকমের ধর্ম হিন্দু, মুসলিম, খ্রীস্টান ইত্যাদি; এই ধর্ম সম্প্রদায়গত। আরেক রকমের ধর্ম রয়েছে—যেমন আমরা বলি, তৃষ্ণার্তকে জল দেওয়া মানুষের ধর্ম, রোগীকে সেবা করা মানুষের ধর্ম। একটি ধর্ম সম্প্রদায়গত, অন্যটি সর্বজনীন বা মানবিক। একটি মানুষকে গণ্ডিবদ্ধ রাখে, অন্যটি মানবতীর্থে মুক্তি দেয়। একটির বিশ্বাস অলৌকিকে, দেবতায়; অন্যটির আস্থা লৌকিকে, মানুষে। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য, তথাকথিত অলৌকিকত্বকে বাদ দিয়ে শ্রীরামকৃষ্ণের একটি জীবনী রচনা করতে বলতেন স্বামী বিবেকানন্দ। একটি সম্প্রদায়ের মধ্যেই মানুষ জন্মায়। কিন্তু তাকে এগোতে হবে ঐ সর্বজনীন ধর্মের দিকে। এগুলি পথ মাত্র, মনে রাখতে হবে গন্তব্যের কথা। যতই মানুষ সেদিকে এগোবে, ততই মানুষ নিজেকে আবিষ্কার করবে এবং জনহিতে জীবন উৎসর্গ করবে, নিজেকে দেবত্বে উত্তীর্ণ করবে।

স্বামীজী তাঁর এক মুসলমান বন্ধুকে লিখেছিলেন: আমরা মানবসমাজকে এমন লক্ষ্যে নিয়ে যেতে চাই যে, যেখানে বেদ নেই, বাইবেল নেই, কোরানও নেই। মানবসমাজকে এই শিক্ষা দিতে হবে যে, ধর্মমতসমূহ হলো একই ধর্মের বহুবিধ প্রকাশ যা প্রত্যেকে স্ব-স্ব ইচ্ছানুযায়ী ধর্মাচরণ করতে পারে।

১৮৯৪ খ্রীস্টাব্দে স্বামীজী একটি চিঠিতে লিখছেন: "আমরা কাউকেই বর্জন করি না, আস্তিক, নাস্তিক, ব্রহ্মবাদী, একেশ্বরবাদী, বহুদেববাদী, অজ্ঞেয়তাবাদী—কাউকেই না। শিষ্যত্ব গ্রহণের একমাত্র শর্ত হলো উদার চরিত্র গঠন করা —আমরা প্রত্যেককেই জানবার ও নিজের ইচ্ছামত পথ বেছে নেবার পূর্ণ সুযোগ দিয়ে থাকি। আমরা বিশ্বাস করি যে, প্রত্যেক জীবই স্বর্গীয়, প্রত্যেকেই ভগবান।··· "

সকলেই ভগবান, তাই ধর্মে ধর্মে কোন ভেদ নেই। স্বামীজী বলেছেন: "এই বেদান্ত-

মহাসাগরে একজন প্রকৃত যোগী—একজন পৌত্তলিক বা এমনকি একজন নাস্তিকের সহিতও সহাবস্থান করিতে পারেন। শুধু তাহাই নয়। বেদান্ত-মহাসাগরে হিন্দু, মুসলমান, খ্রীস্টান, পার্সী সব এক—সকলেই সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের সন্তান।"

সকলেই ঈশ্বরের সন্তান। প্রত্যেকেই ভগবান।—এই বিবেকানন্দের বিশ্বাস, এই তাঁর ধর্ম। এর ফলে বিবাদ-বিরোধেরও কিছু থাকবার কথা নয়। শিকাগো যাওয়ার আগে স্বামীজী একবার দেশ-ব্যাপী এই ভগবানদের দেখতে বেরিয়েছিলেন। তাঁর সেই বিখ্যাত ভারত-পরিক্রমায় কি দেখেছিলেন তিনি? দেখেছিলেন মানুষের দুঃখ, দুর্দশা, অপমান, লাঞ্ছনা। হাহাকার করে উঠেছিল তাঁর মন। দেখেছিলেন উচ্চ বর্ণের মানুষের অসাড় মনোভাব ও অত্যাচার, ধিক্কার দিয়েছেন তাদের। বলেছেন, 'দেশদ্রোহী'। এই অভিজ্ঞতা তাঁকে কাঁদিয়েছিল, ভাবিয়েছিল, রাগিয়েছিল।

আমেরিকায় গিয়ে তিনি দেখেছিলেন, কৃষ্ণাঙ্গ মানুষেরা দাসের অধম জীবনযাপন করে। কৃষ্ণাঙ্গ বলে স্বয়ং বিবেকানন্দকেও অনেক অন্যায় সহ্য করতে হয়েছিল। অনেক হোটেলের প্রবেশপথেই তাঁকে বিতাড়িত হতে হয়েছিল।

শিকাগোয় তাঁর মধ্য দিয়ে কথা বলেছিল তাঁর স্বদেশপ্রেম ও এক মহৎ মানবধর্ম। কথা বলেছিল পরাধীন ভারত ও দলিত মানব। মানুষের অধিকার-বঞ্চিত মানুষকে তিনি ঈশ্বরের পদে আসীন করেছিলেন।

ধর্মজীবনের দুটি দিক আছে—একটা আত্মমুখী, অন্যটি জনমুখী। একজন নিজের সাধন-ভজন নিয়ে থাকে, নিজের আধ্যাত্মিক উন্নতিই একমাত্র লক্ষ্য। অন্যজনও আধ্যাত্মিক উন্নতি চায় সন্দেহ নেই, কিন্তু অন্য মানুষের দুঃখে তাঁর প্রাণ কাঁদে। স্বামীজীর মধ্যে দুটো দিকই ছিল। হয়তো তাঁর মনে দুয়ের দ্বন্দ্বও ছিল। অধ্যাত্মতৃষ্ণা তো তাঁর ছিলই, আবার দেশের পরাধীনতা ও মানুষের দুঃখ-দুর্দশা তাঁকে অতিমাত্রায় ব্যথিত করত। তাঁর পত্রে, ভাষণ ও রচনার ছত্রে ছত্রে তার প্রমাণ আছে। ভারত-পরিক্রমা ও শিকাগো-যাত্রা—এই ঘটনা-দুটি স্বামীজীর জনমুখী কর্মপ্রেরণাকে বিশেষভাবে তীব্র করে। পরবর্তী জীবনে তার প্রকাশ আছে। এই দুয়ের দ্বন্দ্ব থেকে হয়তো তিনি কোনদিনই সম্পূর্ণ মুক্তি পাননি। যাই হোক, ভারত-পরিক্রমায় তিনি এসে দাঁড়িয়েছিলেন জনসাধারণের ভিতর-অঙ্গনে। এখানে তিনি দেখলেন, মানুষের দুরবস্থা, আর শিকাগোয় শুভ্র সভ্য 'প্রভু'দের দেশে গিয়ে বললেন, সব মানুষের মধ্যে ভগবান আছেন, তাঁকে উপযুক্ত সম্মান দাও। তাঁর শিকাগো-বক্তৃতা শুধু ধর্মীয় নয়, সামাজিক এবং স্বাদেশিকও। এই দিক থেকে দেখলে, তিনি সেখানে কোন বিশেষ ধর্মের প্রতিনিধি হিসাবে যাননি। তিনি গিয়েছিলেন ভারতের প্রতিনিধি হিসাবে। অথবা নিপীড়িত, অপমানিত মানুষের প্রতিনিধি তিনি—শিকাগোতে এবং পরবর্তী কালে সারা জীবন, সারা বিশ্বের সভায়। □

---

গত বৈশাখ ১৪০০ সংখ্যা থেকে 'পরমপদকমলে' বিভাগে সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়ের লেখা প্রকাশিত হচ্ছে না। অনেক পাঠক আগ্রহ ও ব্যগ্রতার সঙ্গে কেন তাঁর লেখা তাঁরা দেখতে পাচ্ছেন না জানতে চেয়ে আমাদের কাছে চিঠি দিয়েছেন।

সকলের অবগতির জন্য জানাই যে, সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়কে গত কয়েকমাস যাবৎ নিদারুণ পারিবারিক সঙ্কটের মধ্য দিয়ে যেতে হয়েছে। ওঁর স্ত্রী কয়েকমাস যাবৎ দুরারোগ্য ব্যাধিতে ভুগছিলেন। তাঁর চিকিৎসা ইত্যাদির জন্য সঞ্জীববাবুকে খুব ব্যস্ত থাকতে হচ্ছিল। অবশেষে ওঁর স্ত্রী গত ১৪ আগস্ট শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন। সঞ্জীববাবুকে 'উদ্বোধন'-এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সকলের সমবেদনা জানাচ্ছি।

আমরা আশা করছি, আগামী অগ্রহায়ণ সংখ্যা থেকে তাঁর লেখা যথারীতি পাঠকবর্গ 'উদ্বোধন'-এ দেখতে পাবেন।—**সম্পাদক, উদ্বোধন**

## গ্রন্থ-পরিচয়

# চিরন্তনের আরেক নাম বিবেকানন্দ

### মণিকুন্তলা চট্টোপাধ্যায়

**শাশ্বত বিবেকানন্দ ঃ** সম্পাদনা—নিমাইসাধন বসু। প্রকাশক ঃ আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড। ৪৫ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা-৭০০০০৯। পৃষ্ঠা ঃ ২৮১। মূল্য ঃ আশি টাকা।

স্বামী বিবেকানন্দ অবশ্যই এমন এক ব্যক্তিত্ব, যিনি সর্ব অর্থেই কালোত্তীর্ণ। তাঁর সমকালে তিনি ছিলেন প্রবলভাবে প্রাসঙ্গিক, আবার এখনো তিনি সমানভাবে প্রাসঙ্গিক। এবং জানি, আগামীকালেও তিনি একইভাবে প্রাসঙ্গিক থাকবেন—হয়তো আরও বেশি প্রাসঙ্গিক হয়ে উঠবেন। হার্ভার্ড ইউনিভার্সিটির বিখ্যাত অধ্যাপক জন হেনরি রাইটের স্ত্রী মিসেস মেরী রাইট লিখেছিলেন ঃ "About thirty years old in time, ages in civilisation."—বয়স মাত্র বছর তিরিশ, কিন্তু সভ্যতার বিচারে যুগ-যুগান্তরব্যাপী তাঁর আয়ুষ্কাল।

তিনি যে চিরন্তন এক ব্যক্তিত্ব—তিনি যে মৃত্যুহীন, অমর, শাশ্বত—সেকথা স্বয়ং স্বামীজীই বলেছেন ঃ "আমি কোনদিন কর্ম থেকে ক্ষান্ত হব না। যতদিন না জগৎ ঈশ্বরের সঙ্গে একত্ব অনুভব করছে, ততদিন আমি পৃথিবীর সর্বত্র সকল মানুষের মনে প্রেরণা যোগাতে থাকব।"

এই 'শাশ্বত বিবেকানন্দের' পরিচয় বিধৃত হয়ে আছে আলোচ্য সম্পাদিত গ্রন্থটিতে। কলম ধরেছেন সমকালের বিশিষ্ট কয়েকজন লেখক, প্রাবন্ধিক ও বুদ্ধিজীবী এবং রামকৃষ্ণ মঠ ও সারদা মঠের কয়েকজন সুপরিচিত সন্ন্যাসী ও সন্ন্যাসিনী। তাঁদের মধ্যে ভিনদেশী গবেষকও আছেন কয়েকজন। তাঁরা প্রমাণ করেছেন, স্বামী বিবেকানন্দ শুধু আধুনিক ভারতের ইতিহাসেরই নন, "পৃথিবীর সর্বকালের ইতিহাসের এক অত্যাশ্চর্য মানুষের নাম"। তাঁর বর্তমান যুগের সর্বশ্রেষ্ঠ অধ্যাত্মপুরুষ শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে শিষ্যত্বগ্রহণ, দীর্ঘ ছয়বছরের আসমুদ্রহিমাচল ভারত-পরিক্রমা, শিকাগোর বিশ্ব-ধর্মসম্মেলনের আন্তর্জাতিক মঞ্চভূমিতে অবিস্মরণীয় আবির্ভাব এবং রোমহর্ষক স্বদেশে প্রত্যাবর্তন—এসমস্তই আধুনিক ভারতের ইতিহাসের সুপরিচিত ঘটনা। কিন্তু এই প্রত্যেকটি ঘটনা ভারতবর্ষকে এককভাবে এবং সমগ্র বিশ্বকে সাধারণভাবে যে-ঐশ্বর্যে ঐশ্বর্যবান করেছে তার বিচার-বিশ্লেষণ কিছু কিছু হলেও আরও গভীর আলোচনা ও গবেষণার অবকাশ রয়েছে। সেজন্য দেশে ও বিদেশে তাঁর জীবন, কর্ম ও রচনাদি নিয়ে নানা আলোচনা ও অন্বেষণ চলছে এবং ভবিষ্যতেও চলবে। শতবর্ষের আলোয় তাঁর ভারত-পরিক্রমা ও শিকাগো-ভাষণের তাৎপর্য অন্বেষণ যেমন চলছে, তেমনি চলবে সহস্র বছরের আলোতেও।

স্বামীজীর জীবন ও সাধনফলকে ইতিহাসের কোন এক বিশেষ যুগের বা বিশেষ অধ্যায়ের অংশ মাত্র বলে বিচার করা যাবে না। তাঁর জীবন ও কীর্তিকে খণ্ডিত করে দেখা সম্ভব নয়। তাঁর জীবন ও চিন্তা বাস্তবিকই অনন্তের মাত্রায় মণ্ডিত। এটি ভক্তের দৃষ্টি নয়, গবেষকরাও দেখছেন—তাঁর জীবনের অনেক দিকই এখনো অনাবিষ্কৃত, তাঁর চিন্তার অনেক তাৎপর্যই এখনো অনুদ্ঘাটিত। এই 'শাশ্বত' পুরুষের জীবন ও চিন্তার নানা দিক থেকে, নানা দৃষ্টিকোণ থেকে **শাশ্বত বিবেকানন্দ** গ্রন্থে মনস্বী লেখক-লেখিকাবৃন্দ পাঠকসাধারণের কাছে অত্যন্ত যুক্তিনিষ্ঠভাবে এবং প্রাঞ্জল ভাষায় উপস্থাপিত করেছেন। লেখাগুলির মধ্যে সমাজতন্ত্র বিষয়ে আলোচনা বিচ্ছিন্নভাবে বা সামগ্রিকভাবে অপেক্ষকৃত বেশি এসেছে। কারণ, এতদিন মার্কসীয় দর্শন বা কম্যুনিস্ট সমাজদর্শনকে 'শাশ্বত' বলে মনে করা হতো, কিন্তু এখন আর তা মনে করা হচ্ছে না। সমাজতান্ত্রিক দেশগুলিতে মার্কসীয় দর্শন হয় আজ সংশোধিত হচ্ছে, পরিমার্জিত হচ্ছে অথবা পরিত্যক্ত বা প্রত্যাখ্যাত হচ্ছে। এই পরিপ্রেক্ষিতে বিবেকানন্দের চিন্তা ও দর্শনের কালোত্তীর্ণতা আরও বেশি করে প্রমাণিত।

এই সুন্দর গ্রন্থটি প্রকাশের জন্য সম্পাদক অধ্যাপক নিমাইসাধন বসু এবং প্রকাশক আনন্দ পাবলিশার্স সকলের কৃতজ্ঞতাভাজন হয়েছেন। ☐

# রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশন সংবাদ

## শতবর্ষপূর্তি অনুষ্ঠান : স্বামীজীর ভারত-পরিক্রমা ও শিকাগো-ভাষণ

গত ২৯ ও ৩০ জুন **রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউট অব কালচারে** দুদিনের এক আলোচনা-চক্রের আয়োজন করা হয়েছিল। আলোচনার বিষয়বস্তু ছিল 'স্বামী বিবেকানন্দ ও জাতীয় সংহতি'। শান্তিনিকেতন বিশ্বভারতী থেকে আটটি বিদ্যালয় এই অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করে। আলোচনা-চক্রের উদ্বোধন করেন বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য সব্যসাচী ভট্টাচার্য। বিভিন্ন বিষয়ে চল্লিশ জন পণ্ডিত ব্যক্তি ছাড়াও বহু বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ্ আলোচনা-চক্রে অংশগ্রহণ করেছিলেন।

গত ২২ মে **জলপাইগুড়ি রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম:** জলপাইগুড়ি রেলওয়ে প্ল্যাটফর্মে আয়োজিত জনসভায় উদ্বোধন সঙ্গীত পরিবেশন করেন কলকাতার সুরপীঠ গোষ্ঠীর অরুণকৃষ্ণ ঘোষ ও সুশান্ত দত্ত। স্বাগত ভাষণ দেন দিলীপ রথ, বক্তব্য রাখেন সমরনাথ চট্টোপাধ্যায় এবং ডঃ ক্ষেত্রপ্রসাদ সেনশর্মা। সভাপতিত্ব করেন স্বামী রুদ্রাত্মানন্দ। ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন মুকুলেশ সান্যাল। সভায় সঙ্গীত পরিবেশন করে স্থানীয় বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীবৃন্দ। এই অনুষ্ঠানে সহস্রাধিক শ্রোতার সমাগম হয়। পরদিন রবীন্দ্রভবনে আয়োজিত হয় 'শিকাগো বক্তৃতার আলোকে সর্বধর্মসম্মেলন'। অসিত সেনের স্বাগত ভাষণের পর বিভিন্ন ধর্মসম্প্রদায়ের পক্ষ থেকে বক্তব্য রাখেন অবতার সিং বেইন্স, ডঃ ইছামুদ্দিন সরকার, সিস্টার রিজিনাল্ডা, ধর্মপাল ভিক্ষু এবং ডঃ ক্ষেত্রপ্রসাদ সেনশর্মা। সভাপতিত্ব করেন স্বামী রুদ্রাত্মানন্দ। ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন অশোকপ্রসাদ রায়। সভায় সঙ্গীত পরিবেশন করেন সুরপীঠ গোষ্ঠী এবং স্থানীয় বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীবৃন্দ। আটশোর বেশি শ্রোতা এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিল। এদিন স্বামী বিবেকানন্দের প্রতিকৃতি নিয়ে একটি শোভাযাত্রা শহর পরিক্রমা করে।

**বোম্বাই আশ্রম** গত ৩১ মে 'গেটওয়ে অব ইন্ডিয়া'তে এক অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের অন্যতম সহাধ্যক্ষ শ্রীমৎ স্বামী রঙ্গনাথানন্দজী মহারাজ, মহারাষ্ট্রের রাজপাল ডঃ পি. সি. আলেকজান্ডার, কেন্দ্রীয় মানবসম্পদ উন্নয়নমন্ত্রী অর্জুন সিং ও অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ। এদিন এক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানও আয়োজিত হয়।

**রামকৃষ্ণ মিশন আগরতলা** গত ৩১ মে এক বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রার আয়োজন করে। ত্রিপুরার শিক্ষা, সংস্কৃতি ও পর্যটনমন্ত্রী অনিল সরকার এই শোভাযাত্রায় অংশগ্রহণ করেন।

গত ১০ মে **খেতড়ি রামকৃষ্ণ মিশন** সারাদিনব্যাপী এক অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। ছাত্রছাত্রী ও স্থানীয় ভক্তবৃন্দকে নিয়ে শোভাযাত্রা, স্বামীজী বিষয়ক প্রদর্শনী, জনসভা, ভজন-সন্ধ্যা প্রভৃতি ছিল অনুষ্ঠানের প্রধান অঙ্গ। এই উপলক্ষে 'স্বামী বিবেকানন্দ এবং একবিংশ শতকের ভারত' শীর্ষক একটি স্মরণিকাও প্রকাশ করা হয়।

**মহীশূর রামকৃষ্ণ আশ্রম** গত ৩০ মে থেকে ৬ জুন সপ্তাহব্যাপী জাতীয় সংহতি শিবির পরিচালনা করে। ১৬টি রাজ্যের ১৫০জন যুব প্রতিনিধি এই শিবিরে যোগদান করে। বক্তৃতা, প্রশ্নোত্তর, প্রবন্ধ-লিখন, যোগাসন, শোভাযাত্রা, পুরস্কার-বিতরণ প্রভৃতি ছিল শিবিরের প্রধান অঙ্গ।

### রথযাত্রা উৎসব

গত ২১ জুন শ্রীরামকৃষ্ণের 'দ্বিতীয় কেল্লা' **বলরাম মন্দিরে** সারাদিনব্যাপী বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে রথযাত্রা উৎসব পালিত হয়। ভোরে মঙ্গলারতি, সকালে বিশেষ পূজা, হোম, ভজন প্রভৃতি অনুষ্ঠিত হয়। বিকালে শ্রীরামকৃষ্ণ-স্পর্শধন্য রথরজ্জু প্রথম আকর্ষণ করে রথযাত্রার সূচনা করেন রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের অন্যতম সহাধ্যক্ষ শ্রীমৎ স্বামী গহনানন্দজী মহারাজ। কীর্তন পরিবেশন করেন দক্ষিণেশ্বরের সন্তোষ চৌধুরী ও তাঁর সম্প্রদায়। প্রায় ৪-৫ হাজার ভক্ত সারিবদ্ধভাবে রথরজ্জু আকর্ষণ করে। প্রত্যেককে

হাতে হাতে প্রসাদ দেওয়া হয়। ২৯ জুন বিকালে রথের পুনর্যাত্রার সূচনা করেন স্বামী নির্জরানন্দ। এদিনও বহু ভক্ত রথরজ্জু আকর্ষণ করেন।

## বহির্ভারত

**বেদান্ত সোসাইটি অব ওয়েস্টার্ন ওয়াশিংটন (সিয়াটল):** জুলাই ও আগস্ট মাসের রবিবারগুলিতে বিভিন্ন ধর্মীয় বিষয়ে আলোচনা হয়েছে। মঙ্গলবারগুলিতে 'গস্পেল অব শ্রীরামকৃষ্ণ'-এর ক্লাস নিয়েছেন এই কেন্দ্রের অধ্যক্ষ স্বামী ভাস্করানন্দ। গত ৩০ জুলাই এক সঙ্গীত-সন্ধ্যার আয়োজন করা হয়েছিল। অনুষ্ঠানে যন্ত্রসঙ্গীতে পাশ্চাত্য ও ভারতীয় সুর পরিবেশিত হয়। ১ আগস্ট বিবেকানন্দ শতবার্ষিকী হল, গদাধর হল, শ্রীশ্রীমায়ের গৃহ ও শ্রীরামকৃষ্ণ উদ্যানের উৎসর্গ-অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। এ-উপলক্ষে শিশুদের নাট্যাভিনয়, যন্ত্রসঙ্গীত পরিবেশন প্রভৃতি অনুষ্ঠিত হয়।

৩ আগস্ট সন্ধ্যা ৭-৩০ মিনিটে ভাষণ দেন রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের অন্যতম সহাধ্যক্ষ শ্রীমৎ স্বামী গহনানন্দজী মহারাজ ও দক্ষিণ ক্যালিফোর্নিয়ার লস অ্যাঞ্জেলস বেদান্ত সোসাইটির অধ্যক্ষ স্বামী স্বাহানন্দ। ৮ আগস্ট সকাল ১১-৩০ মিনিটে ভাষণ দেন টরন্টো বেদান্ত সোসাইটির অধ্যক্ষ স্বামী প্রমথানন্দ, উত্তর ক্যালিফোর্নিয়ার সানফ্রান্সিস্কো বেদান্ত সোসাইটির অধ্যক্ষ স্বামী প্রবুদ্ধানন্দ ও লস অ্যাঞ্জেলস বেদান্ত সোসাইটির স্বামী বিপ্রানন্দ।

**বেদান্ত সোসাইটি অব স্যাক্রামেন্টো:** গত জুলাই মাসের রবিবারগুলিতে বিভিন্ন ধর্মীয় বিষয়ে ভাষণ দিয়েছেন এই কেন্দ্রের অধ্যক্ষ স্বামী শ্রদ্ধানন্দ ও স্বামী প্রপন্নানন্দ। প্রতি বুধবার ও শনিবার তাঁরা যথাক্রমে বেদান্তশাস্ত্র ও রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ সাহিত্যের ক্লাস নিয়েছেন। ১০ আগস্ট ভগবান শ্রীকৃষ্ণের জন্মাষ্টমী পূজা, পাঠ, ধ্যান-জপ, ভক্তিগীতি প্রভৃতির মাধ্যমে উদ্‌যাপিত হয়েছে। অনুষ্ঠান-শেষে উপস্থিত সকলকে প্রসাদ দেওয়া হয়।

**বেদান্ত সোসাইটি অব সেন্ট লুইস:** জুলাই ও আগস্ট মাসের রবিবারগুলিতে নানা ধর্মীয় ভাষণ হয়েছে।

**বেদান্ত সোসাইটি অব পোর্টল্যান্ড:** গত জুলাই ও আগস্ট মাসের প্রতি রবিবার বিভিন্ন ধর্ম প্রসঙ্গ এবং 'গস্পেল অব শ্রীরামকৃষ্ণ'-এর ক্লাস হয়েছে। তাছাড়া ৩ জুলাই গুরুপূর্ণিমা এবং ২, ১০ ও ১৬ আগস্ট যথাক্রমে শ্রীমৎ স্বামী নিরঞ্জনানন্দ, ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীমৎ স্বামী অদ্বৈতানন্দর জন্মতিথি পালিত হয়েছে।

১০ জুলাই এই আশ্রমের ব্যবস্থাপনায় স্বামী বিবেকানন্দের আমেরিকা-ভ্রমণের শতবর্ষপূর্তি উৎসবের প্রথম পর্যায় অনুষ্ঠিত হয়েছে। শ্রীশ্রীঠাকুর, শ্রীশ্রীমা ও স্বামীজীর পূজার মাধ্যমে উৎসবের সূচনা হয়। স্বাগত ভাষণ দেন স্বামী শান্তরূপানন্দ। মূল ভাষণ দেন বার্কলে বেদান্ত সোসাইটির অধ্যক্ষ স্বামী অপর্ণানন্দ। তাছাড়া স্বামী বিবেকানন্দের ওপর স্লাইড শো, শিশুদের অভিনয়, আবৃত্তি প্রভৃতি অনুষ্ঠিত হয়। সঙ্গীত পরিবেশন করেন ছন্দা রায়, সুভাষ মুখার্জী ও সুমিতা চক্রবর্তী।

**বেদান্ত সোসাইটি অব নর্দান ক্যালিফোর্নিয়া (সানফ্রান্সিস্কো):** গত ৩ জুলাই পূজা, পুষ্পাঞ্জলি প্রদান, ভক্তিগীতি প্রভৃতির মাধ্যমে গুরুপূর্ণিমা-তিথি পালন করা হয়েছে। ১০ আগস্ট অনুরূপ অনুষ্ঠানের মাধ্যমে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের জন্মাষ্টমী তিথিও উদ্‌যাপন করা হয়েছে।

## শ্রীশ্রীমায়ের বাড়ীর সংবাদ

**আবির্ভাব-তিথি পালন:** গত ১০ আগস্ট ভগবান শ্রীকৃষ্ণের জন্মাষ্টমী উপলক্ষে তাঁর জন্ম-কাহিনী আলোচনা করেন স্বামী কমলেশানন্দ। গত ২ আগস্ট ও ১৬ আগস্ট যথাক্রমে শ্রীমৎ স্বামী নিরঞ্জনানন্দজী মহারাজ এবং শ্রীমৎ স্বামী অদ্বৈতানন্দজী মহারাজের জন্মতিথি উপলক্ষে তাঁদের জীবনী আলোচনা করেন স্বামী ইষ্টব্রতানন্দ।

**সাপ্তাহিক ধর্মালোচনা:** প্রতি শুক্রবার, রবিবার ও সোমবার সন্ধ্যারতির পর যথারীতি চলছে। □

# বিবিধ সংবাদ

## স্বামীজীর শিকাগো-ভাষণের শতবার্ষিকী

গত ২০ ও ২১ আগস্ট **বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয় ইউনিভার্সিটি গ্রান্টস কমিশনের** সহযোগিতায় স্বামীজীর শিকাগো-ভাষণের শতবর্ষ উপলক্ষে 'স্বামী বিবেকানন্দের দর্শন' শীর্ষক একটি জাতীয় আলোচনা-চক্রের আয়োজন করেন। আলোচনা-চক্রের উদ্বোধন করেন বিশ্বভারতীর উপাচার্য সব্যসাচী ভট্টাচার্য। দুদিনের এই আলোচনা-চক্রে কয়েকজন সন্ন্যাসী এবং ভারতবর্ষের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের বিশিষ্ট অধ্যাপক যোগদান করেন। তাঁদের মধ্যে ছিলেন স্বামী লোকেশ্বরানন্দ, স্বামী পূর্ণাত্মানন্দ, অধ্যাপক শিবজীবন ভট্টাচার্য, শঙ্করীপ্রসাদ বসু, ডঃ অনিলবরণ রায়, ডঃ পি. বি. বিদ্যার্থী (রাঁচি বিশ্ববিদ্যালয়), ডঃ বি. এন. কর (উৎকল বিশ্ববিদ্যালয়), ডঃ জি. সি. নায়ক (নাগার্জুন বিশ্ববিদ্যালয়), সান্ত্বনা দাশগুপ্ত, অমিয়কুমার মজুমদার, ডঃ মার্টিন কেম্পশেন, ডঃ সবুজকলি মিত্র (বিশ্বভারতী) প্রমুখ।

## উৎসব-অনুষ্ঠান

**বাগআঁচড়া রামকৃষ্ণ সারদা আশ্রম (শান্তিপুর, নদীয়া):** গত ৭ মার্চ আশ্রমের বার্ষিক উৎসবে শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীমা এবং স্বামীজীর বিশেষ পূজা, প্রসাদ-বিতরণ ও সারাদিনব্যাপী ভক্ত-সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। ধর্মসভায় স্বামী বিশ্বনাথানন্দ, স্বামী দিব্যাশ্রয়ানন্দ ও অধ্যাপক প্রেমবল্লভ সেন প্রমুখ ভাষণ দেন। সারদা সঙ্গীতায়নের শিল্পিবৃন্দ লীলাগীতি পরিবেশন করেন।

**পুন্ডুড়া শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম:** শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ১৫৮তম জন্মতিথি উপলক্ষে গত ১৪ মার্চ আয়োজিত উৎসবে পূজার্চনা করেন স্বামী কমলেশানন্দ। এছাড়া গীতা ও চণ্ডীপাঠ, দরিদ্র-নারায়ণ সেবা, ধর্মসভা, ভজন, শ্রুতিনাটক প্রভৃতি অনুষ্ঠিত হয়।

**পশ্চিম রাজাপুর শ্রীরামকৃষ্ণ সংঘ (কলকাতা-৩২)** গত ১৪ মার্চ মঙ্গলারতি, শ্রীরামনাম-সংকীর্তন, বিশেষ পূজা, পাঠ, নগর-পরিক্রমা, সহস্রাধিক ভক্তকে প্রসাদ-বিতরণ প্রভৃতির মাধ্যমে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের আবির্ভাব-উৎসব উদ্‌যাপন করেছে। ধর্মসভায় বক্তব্য রাখেন ডঃ সচ্চিদানন্দ ধর, সভাপতিত্ব করেন স্বামী মুমুক্ষানন্দ।

**শ্রীরামকৃষ্ণ-সারদা আশ্রম, দাঁতন (মেদিনীপুর):** শ্রীরামকৃষ্ণের জন্মতিথি উপলক্ষে গত ১৪ মার্চ পূজা, পাঠ, হোম, প্রভাতফেরী, দরিদ্রনারায়ণ সেবা প্রভৃতির আয়োজন করা হয়। ধর্মসভায় বক্তব্য রাখেন স্বামী দেবদেবানন্দ এবং স্বামী শান্তিদানন্দ।

**শ্রীসারদা সংঘ (চিত্তরঞ্জন পার্ক, নিউ দিল্লী):** গত ১৪ মার্চ শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীমা এবং স্বামীজীর জন্মতিথি উপলক্ষে পূজা, ভজন, প্রসাদ-বিতরণ প্রভৃতি অনুষ্ঠিত হয়। প্রায় সহস্রাধিক ভক্তের সমাবেশে ভাষণ দেন স্বামী গোকুলানন্দ। কলকাতার শ্রীসারদেশ্বরী আশ্রমের অধ্যক্ষা সহ কয়েকজন সন্ন্যাসিনী এদিন উপস্থিত ছিলেন।

**শ্রীরামকৃষ্ণ ভাবপ্রচার কেন্দ্র, বহড়াগোড়া (পূর্ব সিংভূম, বিহার):** গত ১৪ ও ১৫ মার্চ শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জন্মোৎসব উপলক্ষে পূজার্চনা, ভজন, পাঠ, চলচ্চিত্র প্রদর্শন, ধর্মসভা প্রভৃতি অনুষ্ঠিত হয়েছে। ধর্মসভায় বক্তব্য রাখেন স্বামী বৈকুণ্ঠানন্দ ও বিনায়ক ঝা। এই উপলক্ষে প্রায় দুহাজার ভক্তকে বসিয়ে প্রসাদ দেওয়া হয়েছে।

**স্বামী বিবেকানন্দ বাণীপ্রচার সমিতি (বিদ্যাসাগর অ্যাভিনিউ, দুর্গাপুর-৫):** স্বামী বিবেকানন্দের ১৩১তম আবির্ভাব ও ভারত-পরিক্রমার শতবর্ষপূর্তি উপলক্ষে গত ১৪ ও ১৫ মার্চ মঙ্গলারতি, গীতাপাঠ, বিশেষ পূজা, ভক্তিগীতি প্রভৃতি অনুষ্ঠিত হয়। 'কথামৃত' পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন স্বামী অধ্যাত্মানন্দ। ধর্মসভায় বক্তব্য রাখেন স্বামী সনাতনানন্দ, স্বামী অধ্যাত্মানন্দ এবং স্বামী বলভদ্রানন্দ। বাউলগান পরিবেশন করেন সুকুমার বাউল। এদিন প্রায় আটশো ভক্তকে প্রসাদ দেওয়া হয়। উক্ত বক্তাগণ পরদিন যুবসম্মেলনেও বক্তব্য রাখেন।

**ঈশ্বর প্রীতি সংসদ (৬১, রাজা নবকৃষ্ণ স্ট্রীট, কলকাতা):** শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ১৫৮তম আবির্ভাব উপলক্ষে গত ২০ ও ২১ মার্চ দুদিনব্যাপী উৎসবের আয়োজন করা হয়। বিশেষ পূজা, ভক্তিগীতি, গীতি-আলেখ্য, ধর্মসভা, বস্ত্রবিতরণ প্রভৃতি ছিল অনুষ্ঠানের প্রধান অঙ্গ। উৎসব উপলক্ষে প্রায় দেড়হাজার ভক্তকে হাতে হাতে প্রসাদ দেওয়া হয়।

**রামকৃষ্ণ সেবা সংঘ (দালু, মেঘালয়) :** বাংলাদেশ-সীমান্তের কাছে গারো পাহাড়ের এক প্রত্যন্ত গ্রামে স্থাপিত এই আশ্রমে গত ২০ মার্চ রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের অন্যতম সহাধ্যক্ষ শ্রীমৎ স্বামী গহনানন্দজী মহারাজ আগমন করেন। পরের দুদিনে মোট ২৫৬জন ভক্তকে তিনি মন্ত্রদীক্ষা দান করেন। এই আশ্রমে আসার পথে ২০ মার্চ কুদাল বঙ্গায় এক পাহাড়ের শৃঙ্গে মনোরম পরিবেশে তিনি শ্রীরামকৃষ্ণ-মন্দিরের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন। এরপর তিনি তারু গ্রামে স্থানীয় ভক্তদের কাছে ধর্মীয় বিষয়ে আলোচনা করেন।

**শ্রীরামকৃষ্ণ সেবাশ্রম, (বঙ্গাইগাঁও, আসাম) :** গত ২৫-২৭ মার্চ শ্রীরামকৃষ্ণদেবের আবির্ভাব-উৎসব উপলক্ষে আয়োজিত এক ধর্মসভায় সভাপতিত্ব করেন শ্রীমৎ স্বামী গহনানন্দজী মহারাজ। ভাষণ দান করেন স্বামী মুমুক্ষানন্দ এবং স্বামী মঙ্গলানন্দ। ২৭ মার্চ প্রায় পাঁচ হাজার ভক্তকে বসিয়ে খিচুড়ী প্রসাদ দেওয়া হয়।

**শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম (পূর্ণিয়া, বিহার) :** গত ২৬-২৮ মার্চ শ্রীরামকৃষ্ণের জন্মোৎসব এবং ২৯ মার্চ-১ এপ্রিল শ্রীশ্রীবাসন্তী দুর্গাপূজা অনুষ্ঠিত হয়েছে। এই উপলক্ষে আয়োজিত ধর্মসভায় স্বামী শশাংকানন্দ, স্বামী কমলেশানন্দ, স্বামী দেবময়ানন্দ, স্বামী লোকেশানন্দ, পাটনা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি বি.কে. বক্সী, পূর্ণিয়া ডিভিশনের কমিশনার কে.সি. সাহা ভাষণ দেন। শ্রীমতী সাহা স্কুল-কলেজের ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে পারিতোষিক বিতরণ করেন। রামনবমীর দিন প্রায় আটহাজার ভক্ত বসে প্রসাদ পান।

**জাজপুর শ্রীরামকৃষ্ণ পাঠচক্র (কটক, উড়িষ্যা)** গত ২৭ মার্চ কোল্টাবানিয়া মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে অষ্টম বার্ষিক উৎসবে পৌরোহিত্য করেন ভারতের প্রাক্তন প্রধান বিচারপতি রঙ্গনাথ মিশ্র। পাঠচক্র আয়োজিত বার্ষিক প্রতিযোগিতার কৃতী প্রতিযোগীদের তিনি পুরস্কার বিতরণ করেন। বার্ষিক কার্যবিবরণী পাঠ করেন পাঠচক্রের সম্পাদক শরৎচন্দ্র জেনা।

গত ২৭ মার্চ, ১৯৯৩ **সাঁকতোড়িয়া ডিসেরগড় বিবেকানন্দ যুবমহামণ্ডলী :** স্বামী বিবেকানন্দের ভারত-পরিক্রমার শতবর্ষপূর্তি উপলক্ষে সারাদিন-ব্যাপী এক যুবসম্মেলনে প্রায় আড়াইশো জন যুবক-যুবতী অংশগ্রহণ করে। অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন স্বামী উমানন্দ। ভাষণ দেন স্বামী গিরিশানন্দ, স্বামী অধ্যাত্মানন্দ এবং স্বামী পূর্ণাত্মানন্দ। প্রশ্নোত্তর-পর্ব পরিচালনা করেন প্রণবেশ চক্রবর্তী। যুবসম্মেলনের পরে প্রকাশ্য ধর্মসভায় ভাষণ দেন স্বামী পূর্ণাত্মানন্দ।

**শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ সারদা সেবাশ্রম (বিজয়গড়, কলকাতা-৯২)** গত ২৭-২৯ মার্চ শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীমা এবং স্বামী বিবেকানন্দের জন্মোৎসব উপলক্ষে শোভাযাত্রা, বিশেষ পূজা, দুঃস্থদের মধ্যে বস্ত্র-বিতরণ প্রভৃতির আয়োজন করে। প্রথম দিন ধর্মসভায় সভাপতিত্ব করেন স্বামী তত্ত্বস্থানন্দ, ভাষণ দেন ডঃ সচ্চিদানন্দ ধর। "শ্রীশ্রীমা সারদাদেবী" গীতি-আলেখ্য পরিবেশন করেন আশ্রমের সদস্যবৃন্দ। দ্বিতীয় দিন ধর্মসভায় সভাপতিত্ব করেন স্বামী পূর্ণাত্মানন্দ। ভাষণ দেন অধ্যাপক হোসেনুর রহমান। তৃতীয় তথা শেষদিন স্বামী ভৈরবানন্দের সভাপতিত্বে ভাষণ দেন নচিকেতা ভরদ্বাজ। এছাড়া বিভিন্ন দিনে 'নটী বিনোদিনী', 'রামদাস তুলসীদাস' গীতি-আলেখ্য এবং 'ঠাকুর শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ' যাত্রাভিনয় পরিবেশিত হয়েছে।

**কল্যাণী শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ সেবাসংঘ :** গত ২৮ মার্চ স্বামী জয়ানন্দের পরিচালনায় শতাধিক ভক্তকে নিয়ে শ্রীরামকৃষ্ণ-পাঠচক্র অনুষ্ঠিত হয়েছে। পাঠচক্রে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ পাঠ ও আলোচনা হয়।

**শ্রীরামকৃষ্ণ পাদতীর্থ সেবক সংঘ (ভদ্রকালী, হুগলী)** গত ২৮ মার্চ-৪ এপ্রিল স্বামী বিবেকানন্দের স্মৃতিধন্য উত্তরপাড়া জয়কৃষ্ণ সাধারণ গ্রন্থাগার-প্রাঙ্গণে আয়োজিত নবম হুগলী জেলা গ্রন্থমেলায় শ্রীরামকৃষ্ণ ও বেদান্ত সাহিত্যের একটি স্টল দিয়েছিলেন। বিভিন্ন দিনে স্টলে বহু পাঠকের সমাগম হয়।

**প্রবুদ্ধ ভারত সংঘ (ছোটসরসা, হুগলী)** শ্রীরামকৃষ্ণদেবের আবির্ভাব উপলক্ষে গত ১৮ এপ্রিল শোভাযাত্রা, বিশেষ পূজা, প্রসাদ-বিতরণ প্রভৃতির আয়োজন করে। ধর্মসভায় সভাপতিত্ব করেন স্বামী মুক্তসঙ্গানন্দ। প্রধান অতিথি ছিলেন প্রতুলচন্দ্র চৌধুরী। বাউলগান পরিবেশন করেন বিল্বমঙ্গল দাস। ☐

**বিশ্বব্যাপী চৈতন্যই ঈশ্বর। সেই বিশ্বব্যাপী চৈতন্যকেই লোকে প্রভু, ভগবান, খ্রীষ্ট, বুদ্ধ বা ব্রহ্ম বলিয়া থাকে—জড়বাদীরা উহাকে শক্তিরূপে উপলব্ধি করে এবং অজ্ঞেয়বাদীরা ইহাকেই সেই অনন্ত অনির্বচনীয় সর্বাতীত বস্তু বলিয়া ধারণা করে। উহাই সেই বিশ্বব্যাপী প্রাণ, উহাই বিশ্বব্যাপী চৈতন্য, উহাই বিশ্বব্যাপিনী শক্তি এবং আমরা সকলেই উহার অংশস্বরূপ।**

**স্বামী বিবেকানন্দ**

**উদ্বোধনের মাধ্যমে প্রচার হোক**
**এই বাণী।** **শ্রীসুশোভন চট্টোপাধ্যায়**

উদ্বোধন : ভগিনী নিবেদিতার ১২৫তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে তাঁর ১২৬তম জন্মবর্ষে বর্তমান সংখ্যাটি (কার্তিক / অক্টোবর) নিবেদিত। ১৮৬৭ খ্রীস্টাব্দের ২৮ অক্টোবর ভগিনী নিবেদিতার জন্মদিন।

# সূচিপত্র

৯৫তম বর্ষ কার্তিক ১৪০০ (অক্টোবর ১৯৯৩) সংখ্যা



ব্যবস্থাপক সম্পাদক
স্বামী সত্যব্রতানন্দ

সম্পাদক
স্বামী পূর্ণাত্মানন্দ

৮০/৬, গ্রে স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০ ০০৬-স্থিত বসুশ্রী প্রেস থেকে বেলুড় শ্রীরামকৃষ্ণ মঠের ট্রাস্টীগণের পক্ষে স্বামী সত্যব্রতানন্দ কর্তৃক মুদ্রিত ও ১ উদ্বোধন লেন, কলকাতা-৭০০ ০০৩ থেকে প্রকাশিত।
প্রচ্ছদ মুদ্রণ ঃ স্বপ্না প্রিন্টিং ওয়ার্কস (প্রাঃ) লিমিটেড, কলকাতা-৭০০ ০০৯

আজীবন গ্রাহকমূল্য (৩০ বছর পর নবীকরণ-সাপেক্ষ) ☐ এক হাজার টাকা (কিস্তিতেও প্রদেয়)—প্রথম কিস্তি একশো টাকা ☐ আগামী বর্ষের সাধারণ গ্রাহকমূল্য ☐ মাঘ থেকে পৌষ ☐ ব্যক্তিগতভাবে সংগ্রহ ☐ আটচল্লিশ টাকা ☐ সডাক ☐ ছাপান্ন টাকা ☐ বর্তমান সংখ্যার মূল্য ☐ ছয় টাকা।

# গ্রাহকপদ নবীকরণের জন্য বিজ্ঞপ্তি

## উদ্বোধন

স্বামী বিবেকানন্দ প্রবর্তিত, রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের একমাত্র বাঙলা মুখপত্র, চুরানব্বই বছর ধরে নিরবচ্ছিন্নভাবে প্রকাশিত দেশীয় ভাষায় ভারতের প্রাচীনতম সাময়িকপত্র

**৯৬তম বর্ষ : মাঘ ১৪০০—পৌষ ১৪০১/জানুয়ারি ১৯৯৪—ডিসেম্বর ১৯৯৪**

☐ আগামী মাঘ / জানুয়ারি মাস থেকে পত্রিকা-প্রাপ্তি সুনিশ্চিত করার জন্য ৩১ ডিসেম্বর ১৯৯৩-এর মধ্যে আগামী বর্ষের ( ৯৬তম বর্ষ : ১৪০০-১৪০১/১৯৯৪ ) গ্রাহকমূল্য জমা দিয়ে গ্রাহকপদ নবীকরণ করা বাঞ্ছনীয়। নবীকরণের সময় গ্রাহক-সংখ্যার উল্লেখ আবশ্যিক।

**বার্ষিক গ্রাহকমূল্য**

☐ ব্যক্তিগতভাবে ( By Hand ) সংগ্রহ : ৪৮ টাকা ☐ ডাকযোগে ( By Post ) সংগ্রহ : ৫৬ টাকা

☐ বাংলাদেশ ভিন্ন বিদেশের অন্যত্র—২৭৫ টাকা ( সমুদ্র-ডাক ), ৫৫০ টাকা ( বিমান-ডাক )।

☐ বাংলাদেশ—১০০ টাকা।

**আজীবন গ্রাহকমূল্য ( কেবলমাত্র ভারতবর্ষে প্রযোজ্য ) : এক হাজার টাকা**

☐ আজীবন গ্রাহকমূল্য ( ৩০ বছর পর নবীকরণ-সাপেক্ষ ) কিস্তিতেও ( অনূর্ধ্ব বারোটি ) প্রদেয়। কিস্তিতে জমা দিলে প্রথম কিস্তিতে কমপক্ষে একশো টাকা দিয়ে পরবর্তী এগারো মাসের মধ্যে বাকি টাকা ( প্রতি কিস্তি কমপক্ষে পঞ্চাশ টাকা ) জমা দিতে হবে।

☐ ব্যাঙ্ক ড্রাফট/পোস্টাল অর্ডার যোগে টাকা পাঠালে **"Udbodhan Office, Calcutta"** এই নামে পাঠাবেন। **পোস্টাল অর্ডার "বাগবাজার পোস্ট অফিস"-এর ওপর পাঠাবেন।** চেক পাঠাবেন না। **বিদেশের গ্রাহকদের** চেক গ্রাহ্য। তবে **তাঁদের চেক যেন কলকাতাস্থ রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কের ওপর হয়।** প্রাপ্তি-সংবাদের জন্য **দেশ ও বিদেশের গ্রাহকদের** প্রয়োজনীয় ডাকটিকিট পাঠানো বাঞ্ছনীয়।

**কার্যালয় খোলা থাকে :** বেলা ৯.৩০—৫.৩০ ; শনিবার বেলা ১.৩০ পর্যন্ত ( রবিবার বন্ধ )।

☐ ডাকবিভাগের নির্দেশমত **ইংরেজী মাসের ২৩ তারিখ** ( ২৩ তারিখ রবিবার কিংবা ছুটির দিন হলে ২৪ তারিখ ) 'উদ্বোধন' পত্রিকা কলকাতার জি.পি.ও.-তে ডাকে দিই। এই তারিখটি **সংশ্লিষ্ট বাঙলা মাসের** সাধারণতঃ ৮/৯ **তারিখ** হয়। ডাকে পাঠানোর সপ্তাহখানেকের মধ্যে গ্রাহকদের পত্রিকা পেয়ে যাবার কথা। তবে ডাকের গোলযোগে কখনো কখনো পত্রিকা পৌঁছাতে বিলম্বও হয়। অনেক সময় গ্রাহকরা একমাস পরেও পত্রিকা পান বলে খবর পাই। সে-কারণে সহৃদয় গ্রাহকদের **একমাস পর্যন্ত অপেক্ষা করতে অনুরোধ করি।** একমাস পরে ( অর্থাৎ পরবর্তী ইংরেজী মাসের ২৪ তারিখ / পরবর্তী বাঙলা মাসের ১০ তারিখ পর্যন্ত ) **পত্রিকা না পেলে গ্রাহকসংখ্যা উল্লেখ করে কার্যালয়ে জানালে ডুপ্লিকেট বা অতিরিক্ত কপি পাঠানো হবে।**

☐ যাঁরা **ব্যক্তিগতভাবে ( By Hand ) পত্রিকা সংগ্রহ** করেন তাঁদের পত্রিকা **ইংরেজী মাসের ২৭ তারিখ** থেকে বিতরণ শুরু হয়। **স্থানাভাবের জন্য দুটি সংখ্যার বেশি** কার্যালয়ে জমা রাখা সম্ভব নয়। তাই **সংশ্লিষ্ট** গ্রাহকদের কাছে অনুরোধ, তাঁরা যেন সেইমত তাঁদের সংখ্যা **সংগ্রহ করে নেন।**

☐ **গত জ্যৈষ্ঠ, আষাঢ়, শ্রাবণ এবং ভাদ্র সংখ্যায় প্রতিবারের মতো আমরা জানিয়েছিলাম যে, আশ্বিন বা শারদীয়া সংখ্যার ডুপ্লিকেট কপি দেওয়া সম্ভব নয়।** সহৃদয় গ্রাহকগণের জ্ঞাতার্থে জানানো যাচ্ছে যে, সাধারণ সংখ্যার দ্বিগুণ এই বিশেষ সংখ্যাটির জন্য গ্রাহকদের কাছ থেকে অতিরিক্ত মূল্য নেওয়া হয় না। কাগজ ও মুদ্রণাদির অতি-দুর্মূল্যের পরিপ্রেক্ষিতে সংখ্যাটির ডুপ্লিকেট কপি বিনামূল্যে দেওয়া অসম্ভব। তাছাড়া এবছর শারদীয়া সংখ্যার অত্যধিক চাহিদায় মুদ্রিত অতিরিক্ত কপিগুলিও সম্পূর্ণ নিঃশেষিত হয়ে গিয়েছে।

☐ **শারদীয়া সংখ্যা ব্যক্তিগতভাবে সংগ্রহ করবেন বলে জানিয়ে যাঁরা নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বিশেষ কারণে সংগ্রহ করতে পারেননি, তাঁরা ১ নভেম্বর ('৯৩) থেকে ১৬ নভেম্বরের মধ্যে সংগ্রহ না করলে, পরে তা পাবার আর নিশ্চয়তা থাকবে না।**

**সৌজন্যে : আর. এম. ইণ্ডাস্ট্রিস, কাঁটালিয়া, হাওড়া-৭১১ ৪০৯**

# উদ্বোধন

কার্তিক ১৪০০ | অক্টোবর ১৯৯৩ | ৯৫তম বর্ষ—১০ম সংখ্যা


## দিব্য বাণী

স্বামীজীর আসার জন্য প্রতীক্ষা করতে লাগলাম। এক বিরাট স্পন্দন, শিহরণ ছেকে দিল আমায়। কারণ আমি অনুভব করলাম, বাইরে বিশেষ কিছু মনে না হলেও আমার জীবনের এক পরীক্ষা-মুহূর্ত সমুপস্থিত। শেষবার যখন এইভাবে বসেছিলাম, তারপরে কত কি এল গেল, কত কি ঘটল। আমার ব্যক্তিগত জীবন—দাঁড়িয়ে কোথায়? হারিয়ে গেছে। পরিত্যক্ত পরিচ্ছদের মতো ছুঁড়ে ফেলে দেওয়া হয়েছে তাকে, যাতে করে এই মানুষটির চরণতলে নতজানু হতে পারে। ভুল হয়ে দাঁড়াবে কি তা—মরীচিকা? নাকি তা হবে পরম নির্বাচন?—কয়েক মুহূর্ত বাকি, তারপরেই তা ঘোষিত হবে।

তিনি এলেন। তিনি দাঁড়িয়ে আছেন। তাঁর আগমন, শুরু করার আগে তাঁর নীরবতা—সমস্তই অতি মহান এক স্তোত্রসঙ্গীত। এক সুবিশাল আরাধনা।

অবশেষে কথা বললেন। খুশিতে হাসিতে তাঁর নীরবতা ভঙ্গ। জিজ্ঞাসা করলেন: বক্তৃতার বিষয়বস্তু কি হবে? কে একজন বলল, বেদান্ত-দর্শন। তিনি আরম্ভ করলেন:

অভেদ, সর্ববস্তুর একত্ব।... সুতরাং সকল জিনিসের পরিণতি একত্বে। যাকে বহুরূপে দেখি,—কাঞ্চন, প্রেম, দুঃখ, পৃথিবী—সবই আসলে ঈশ্বর।... বহুকে দেখি আমরা, যদিও যথার্থতঃ বর্তমান আছেন সেই এক বস্তুই।... অভিব্যক্তির মাপের পার্থক্য অনুযায়ী নামগুলির পার্থক্য হয়। আজকের জড়, আগামীকালের চেতনা। আজকের কীট, কালকের ঈশ্বর। এই যেসব পার্থক্যকে এত সমাদরে আমরা বরণ করি, এসবকিছুই পরম ও চরম এক অস্তিত্বের অংশমাত্র—সেই চরম ও পরম অস্তিত্বের নাম—মুক্তি।...

অপরূপ বাক্যগুলি, তরঙ্গের পর তরঙ্গের মতো আছড়ে পড়তে লাগল, আমরা উত্থিত হলাম অনন্তে, সাধারণ মানুষ আমরা, হয়ে গেলাম আশ্চর্য শিশুর মতো, যে-শিশু আকাশের সূর্য-চন্দ্র-তারকার দিকে হাত বাড়িয়ে আছে—সেগুলিকে শিশুর খেলনা ভেবে।

অসাধারণ কণ্ঠ বেজেই চলল।...

আহা, কী ভুল তারা করে যারা বলে কণ্ঠস্বর কিছু নয়—ভাবই সব। স্বরের উত্থান-পতনেই শব্দের কবিতায় সঙ্গীতের সঞ্চার হয়। জীবনের হাটের কোলাহলে আসে মাত্রা ও যতি। সেই সঙ্গে যেন ধ্বনিত হয় গির্জার অর্ধালোকিত পার্শ্বদেশে কোন এক স্তব-মন্ত্র-গান—সে-সুর এসেছে, সে-গান বেজেছে আজ এই প্রহরে।

অবশেষে সবকিছু নেমে এল—থেমে এল—আর মিলিয়ে গেল একটি ভাবনায়: 'যদি এই অনন্ত একত্ব মুহূর্তের জন্যও বিঘ্নিত হয়, যদি একটি পরমাণুকেও চূর্ণ করে স্থানচ্যুত করা হয়—তাহলে আমি দেখতে পাব না, কথা বলতে পারব না তোমাদের সঙ্গে, যে-আমি এখানে দাঁড়িয়ে আছি, কথা বলছি... হরি ওঁ তৎ সৎ।'

আর আমি। জীবন যে অনন্ত গভীর জিনিস আমাদের জন্য ধরে আছে তার সাক্ষাৎ পেলাম।...

ঐ যে-মানুষটি দাঁড়িয়ে আছেন—ওঁর মুঠিতে ধরা আমার জীবন। তিনি একবার যখন আমার দিকে তাকালেন, তাঁর দৃষ্টিতে দেখলাম লেখা আছে—যে-লেখা আমার হৃদয়েও: পরিপূর্ণ বিশ্বাস, আদর্শের স্থায়ী বোধ,—ভাবাবেগ নয়।

ভগিনী নিবেদিতা

১৯০০ খ্রীস্টাব্দের ৪ জুন নিউ ইয়র্কে স্বামীজীর বক্তৃতার স্মৃতি।

উদ্বোধন-এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সকলকে জানাই আমাদের শুভ বিজয়ার আন্তরিক অভিনন্দন, প্রীতি ও শুভেচ্ছা।—সম্পাদক, উদ্বোধন

# ভগিনী নিবেদিতা : স্বামীজীর বজ্র

স্বামীজী সম্পর্কে একটি কবিতায় একজন এই অপূর্ব কথাগুলি লিখিয়াছেন :

"ঠাকুরের দুরন্ত তনয় !

তুমি যে চঞ্চল বড় বজ্র লয়ে খেলা কর !"

বাস্তবিক, দুরন্ত বিবেকানন্দের আবির্ভাব যেন বজ্রহস্তা দেবেন্দ্রের মতোই। বজ্র অশুভের প্রতীক, স্বার্থপরতার বিগ্রহ, ভোগের মূর্তি। অশুভকে ধ্বংস করিতে হইলে, স্বার্থপরতাকে নির্মূল করিতে হইলে, ভোগলিপ্সাকে উৎপাটন করিতে হইলে প্রয়োজন এমন চরিত্র, যাহা "বজ্রের উপাদানে গঠিত"। 'বজ্রের উপাদান' অর্থাৎ যাহা বজ্রের মতো অপরাজেয়, বজ্রের মতো দুর্নিবার, বজ্রের মতো চূড়ান্ত আত্মবিলয় হইতে যাহা উদ্ভূত। স্বামী বিবেকানন্দ কখনও কখনও নিজেকে বজ্র বলিতেন। তিনি চাহিতেন, তাঁহার দেশের মানুষেরা যেন সকলে বজ্র হইয়া উঠে। তাঁহার দেশের কিছু মানুষ অবশ্যই তাঁহার সেই আকাঙ্ক্ষাকে পূর্ণ করিয়াছিলেন ; কিন্তু যিনি তাঁহার দেশের মানুষ নহেন, বহুদূর বিদেশের এক নারী, তিনি স্বামীজীর দেশের মানুষকে ভালবাসিয়াছিলেন ; ভালবাসিয়াছিলেন তাঁহার দেশকে, তাঁহার দেশের মাটিকে, তাঁহার দেশের ধর্ম, ঐতিহ্য ও সংস্কৃতিকে—তাঁহার দেশের সকলকিছুকে। স্বামীজীর বজ্র হইয়া উঠিবার আগ্নেয় আহ্বানে সেই নারী অক্ষরে অক্ষরে নিজের জীবন দিয়া সাড়া দিয়াছিলেন। তিনি শুধু স্বয়ং বজ্র হইয়া উঠেন নাই, নিজেকেও 'স্বামীজীর বজ্র' করিয়া তুলিয়াছিলেন। সেই বিদেশিনী বিবেকানন্দের মানসকন্যা ভগিনী নিবেদিতা—পূর্বজীবনে মিস মার্গারেট এলিজাবেথ নোবল।

স্বামীজীর সহিত তাঁহার পরিচয়ের কিছুকাল পরের কথা। লন্ডনে স্বামীজীর একটি ক্লাসে আরও অনেকের সহিত মার্গারেটও উপস্থিত আছেন। শ্রোতারা নানা প্রশ্ন করিতেছেন স্বামীজীকে। মার্গারেটও করিতেছেন। স্বামীজী উত্তর দিতেছেন। সহসা স্বামীজী বলিয়া উঠিলেন : "জগতে আজ কিসের অভাব জানো ? জগৎ চায় এমন বিশজন নরনারী যাহারা সদর্পে পথে দাঁড়াইয়া বলিতে পারে, 'ঈশ্বরই আমাদের একমাত্র সম্বল।' কে কে যাইতে প্রস্তুত ?" বলিতে বলিতে স্বামীজী আসন ছাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন। শ্রোতৃমণ্ডলীর দিকে দাঁড়াইয়া তিনি যেন বিশেষ কাহারও নিকট হইতে তাঁহার প্রশ্নের উত্তর প্রত্যাশা করিতেছিলেন। মার্গারেটের মনে হইল—স্বামীজী কি তাঁহার নিকট হইতে উত্তর প্রত্যাশা করিতেছেন ? তাঁহার ধর্মযাজক পিতা মৃত্যুর পূর্বে তাঁহার সহধর্মিণীকে বলিয়াছিলেন, তাঁহাদের জ্যেষ্ঠ সন্তান মার্গারেটের নিকট একদিন ঈশ্বরের আহ্বান আসিবে। সেই আহ্বানে সাড়া দিবার জন্য তিনি যেন মার্গারেটকে সাহায্য করেন। মার্গারেটের তখন বয়স দশ বৎসর মাত্র। আটাশ বৎসরের মার্গারেটের কি তখন মনে পড়িতেছিল, তাঁহার পিতার সেই অন্তিম বাক্যগুলি ? মনে পড়িতেছিল কি তাঁহার জন্মের পূর্বে ঈশ্বরের নিকট তাঁহার গর্ভধারিণীর প্রার্থনা—সন্তানকে তিনি ঈশ্বরের কাজেই উৎসর্গ করিবেন ? সেই আহ্বানই কি তিনি শুনিতেছেন ভারতীয় সন্ন্যাসীর বজ্রগম্ভীর শব্দগুলিতে ? মার্গারেটের মনে হইল—তিনি উঠিয়া দাঁড়ান এবং স্বামীজীকে বলেন, 'হ্যাঁ, আমি প্রস্তুত'। শুনিলেন, স্বামীজীর বজ্রগম্ভীর কণ্ঠ আবার সরব হইয়াছে। স্বামীজী বলিলেন : "কিসের ভয় ?" এবারও কি তাঁহার ইঙ্গিত মার্গারেটের প্রতিই ? অতঃপর গম্ভীরতর হইল স্বামীজীর কণ্ঠ। দৃঢ়তর প্রত্যয়ের সহিত স্বামীজী বলিলেন : "যদি ঈশ্বর আছেন, একথা সত্য হয় তবে জগতে আর কিসের প্রয়োজন ? আর যদি একথা সত্য না হয়, তবে আমাদের জীবনেই বা ফল কি ?"

মার্গারেট কথাগুলি শুনিলেন। তাঁহার সত্তায় উথালপাতাল শুরু হইল, কিন্তু তখনই সেই রুদ্র আহ্বানে সাড়া দেওয়া হইল না। সেদিনের মতো ক্লাস শেষ হইল। কিন্তু স্বামীজীর কথাগুলি মার্গারেটের কানে অবিরত ঝঙ্কৃত হইতে লাগিল। ভগিনী নিবেদিতার অন্যতম শ্রেষ্ঠ জীবনীকার প্রব্রাজিকা মুক্তিপ্রাণা অনবদ্য ভাষায় লিখিয়াছেন : "মার্গারেট নিরন্তর দগ্ধ হইতে লাগিলেন।"

এই দহনজ্বালা ভয়ঙ্কর। এ সাধারণ অগ্নির দহনজ্বালা নয়, এ নাগরাজের অমোঘ দংশনজ্বালা। অগ্নিদহনজ্বালা হইতে উদ্ধার পাওয়া যায়, কিন্তু এই দংশনের অভিজ্ঞতা হইলে পুনরায় পূর্বের অবস্থায় প্রত্যাবর্তন অসম্ভব। মার্গারেটেরও তাহাই হইল। তাঁহার কানে সর্বদা বাজিতে লাগিল স্বামীজীর বজ্রনাদ ঃ "ওঠো, জাগো, শ্রেষ্ঠ আচার্যগণের সমীপে উপনীত হইয়া পরম সত্যকে উপলব্ধি কর।"

মার্গারেট যেদিন প্রথম স্বামীজীকে দর্শন করিয়াছিলেন সেদিন তিনি স্বামীজীর মুখে শুনিয়াছিলেন ঃ "একটি সম্প্রদায়ের মধ্যে জন্মানো ভাল, কিন্তু উহারই গণ্ডির মধ্যে মৃত্যু অতি ভয়ংকর।" মার্গারেটের কি মনে হইয়াছিল যে, ইহা তাঁহারই উদ্দেশে উচ্চারিত? আরেকদিন স্বামীজী বলিলেন ঃ "ইংরেজরা একটি দ্বীপে জন্মগ্রহণ করে এবং চিরকাল ঐ দ্বীপেই বাস করিতে চায়।" সেদিন মনে হয়, মার্গারেটের আর বুঝিতে বিলম্ব হয় নাই যে, এবার স্বামীজীর উদ্দিষ্ট সরাসরি তিনিই, আহ্বান তাঁহাকেই। এই আহ্বান তাঁহার স্বদেশের গণ্ডিকে অতিক্রম করিবার, নিজের ধর্মবিশ্বাসের সীমাকে অতিক্রম করিবার, তাঁহার নিজের জীবন, নিজের ভবিষ্যৎকে নিঃশেষে নিবেদন করিবার। এই আহ্বান নিছক বিশ্বাস (faith) হইতে প্রত্যক্ষ উপলব্ধিকে (realization) বরণ করিবার। তাঁহার নিশ্চয়ই মনে পড়িতেছিল প্রথম দর্শনের সময় স্বামীজীর মুখে তিনি শুনিয়াছিলেন, 'বিশ্বাস' শব্দটি তাঁহার পছন্দ নয়, তাঁহার বিশেষ পছন্দ 'উপলব্ধি' শব্দটি।

দংশনের অব্যর্থ প্রতিক্রিয়ায় মার্গারেট তখন চূড়ান্ত অস্থিরতার মধ্যে কাটাইতেছিলেন। এই অস্থিরতার মধ্যে স্বামীজীর আহ্বানে তাঁহার নবজন্ম গ্রহণের আর্তি নিহিত ছিল। যখন তাঁহার প্রত্যেক দিন, প্রত্যেক রাত্রি, প্রতিটি মুহূর্তে সেই আর্তিতে উদ্বেল হইয়া উঠিয়াছে তখনই আসিল স্বামীজীর নিকট হইতে একটি পত্র। সেন্ট জর্জেস রোড, লন্ডন হইতে লিখিত ৭ জুন, ১৮৯৬ তারিখের সেই পত্রে স্বামীজী মার্গারেটকে লিখিলেন ঃ

"কল্যাণীয়া মিস নোবল,

"...জগৎকে আলো দিবে কে? আত্মোৎসর্গই ছিল অতীতের নীতি, এবং, হ্যাঁ—যুগ যুগ ধরিয়া তাহাই চলিতে থাকিবে। যাঁহারা জগতে সর্বাপেক্ষা সাহসী ও বরেণ্য, তাঁহাদের চিরদিন 'বহুজনহিতায় বহুজনসুখায়' আত্মোৎসর্গ করিতে হইবে। অনন্ত প্রেম ও করুণায় পূর্ণ শত শত বুদ্ধের আবির্ভাবের প্রয়োজন।

"জগতের ধর্মগুলি আজ প্রাণহীন ব্যঙ্গমাত্রে পর্যবসিত। জগৎ চায় চরিত্র। জগতে আজ সেইরূপ লোকেদেরই প্রয়োজন, যাহাদের জীবন প্রেম-প্রদীপ্ত এবং সম্পূর্ণ স্বার্থশূন্য। সেই প্রেম প্রতিটি বাক্যকে বজ্রের মতো শক্তিশালী করিয়া তুলিবে।...

"তোমার মধ্যে একটা জগৎ-আলোড়নকারী শক্তি রহিয়াছে, ধীরে ধীরে আরও অনেক শক্তি আসিবে। আমরা চাই—জ্বালাময়ী বাণী এবং তাহার অপেক্ষা অধিকতর জ্বলন্ত কর্ম।

"হে মহাপ্রাণ, ওঠো, জাগো। জগৎ যন্ত্রণায় দগ্ধ হইতেছে, তোমার কি নিদ্রা সাজে? এসো, আমরা আহ্বান করিতে থাকি, যতক্ষণ পর্যন্ত নিদ্রিত দেবতা জাগ্রত না হন, যতক্ষণ পর্যন্ত অন্তরের দেবতা এই আহ্বানে সাড়া না দেন। জীবনে ইহা অপেক্ষা বড় আর কী আছে, ইহা অপেক্ষা মহত্তর আর কোন্ কাজ আছে?..."

এ কী পত্র, না রণভেরী! প্রত্যেকটি শব্দের মধ্যে যেন দ্রিমি দ্রিমি করিয়া বাজিয়া চলিয়াছে ত্রিপুরান্তক মহাকালের ডমরুধ্বনি। যে-ধ্বনিতে উঠিতেছে সেই আহ্বান—না, আর নিদ্রা নয়, ওঠো, জাগো। দানব তোমার দুয়ারে সমাগত। সেই দানব তোমার মায়া, তোমার সুখস্বপ্ন, তোমার স্বার্থপরতা, তোমার আত্মমগ্নতা। ছিঁড়িয়া ফেল তোমার অবিদ্যার শৃঙ্খল। বীর্যের মন্ত্রে, শৌর্যের প্রেরণায় তোমার ক্ষুদ্র গণ্ডি ভাঙ্গিয়া তুমি বাহিরে আসিয়া দাঁড়াও। নিজের ক্ষুদ্র অহং-কে নিবেদন করিয়া দাও বৃহৎ অহং-এর নিঃসীমতায়।

মার্গারেটের সংকল্প স্থির হইয়া গেল—তিনি আত্মোৎসর্গ করিবেন। 'শিবগুরু'র ডমরুধ্বনি তাঁহার হৃদয়ে প্রতিধ্বনিত হইতে শুরু করিল। একদিন স্বামীজী তাঁহাকে মন্ত্রদীক্ষা দান করিলেন।

কয়েকমাস পর (১৬ ডিসেম্বর, ১৮৯৬) স্বামীজী লন্ডন হইতে ভারতাভিমুখে যাত্রা করিলেন। ভারতে প্রত্যাবর্তনের পর তিনি তাঁহার গুরুদেবের ভাব ও আদর্শকে কর্মপরিণত রূপ দিতে পূর্ণোদ্যমে নামিয়া পড়িলেন। ইংল্যান্ডের কাজের ব্যাপারে ভারত হইতে মার্গারেটকে তিনি পত্রদ্বারা উৎসাহ ও প্রেরণা দিয়া চলিলেন। কিন্তু মার্গারেট যে অধীরভাবে চাহিতেছেন ভারতে আসিয়া স্বামীজীর কাজে পূর্ণভাবে আত্মনিয়োগ করিতে!

স্বামীজীকে সেকথা তিনি বারম্বার জানাইলেও স্বামীজীর কোন পত্রেই সেবিষয়ে কোন উৎসাহ-ব্যঞ্জক কিছু না থাকায় মার্গারেটের আশাভঙ্গ হইতেছিল। একটি পত্রে তো স্বামীজী স্পষ্টভাবেই তাঁহাকে লিখিলেন: "তুমি এখানে না আসিয়া ইংল্যান্ড হইতেই আমাদের জন্য বেশি কাজ করিতে পারিবে।" (২৩ জুলাই, ১৮৯৭) স্বামীজীর এই নীরবতা বা নিরুৎসাহিতার কারণ ছিল। ভারতের শাসকশ্রেণীর দেশবাসী হইয়া মার্গারেট কতখানি ভারতবর্ষের কাজের সহিত নিজেকে একাত্ম করিতে পারিবেন, ভারতের উষ্ণ জলবায়ু তাঁহার স্বাস্থ্যের পক্ষে কতখানি অনুকূল হইবে, ভারতের দারিদ্র্য, ভারতের মানুষের কুসংস্কার, সঙ্কীর্ণতাকে অতিক্রম করিয়া তাঁহার ভারতপ্রীতি এবং ভারতসেবা কতখানি অগ্রসর হইতে পারিবে—এইসব ভাবনা তো ছিলই। তাহা ছাড়া ছিল নিবেদিতার উৎসাহ, অনুরাগ এবং আগ্রহের দৃঢ়তা ও গভীরতার পরিমাপ করিবার অভিপ্রায়ও। ভারতে আসিয়া কর্মে যুক্ত হইবার পথে উৎসাহ এবং আবেগই যথেষ্ট নয়, যাহাদের জন্য তিনি নিজেকে উৎসর্গ করিতে চাহিতেছেন তাহাদেরই নিকট হইতে আসিবে উপেক্ষা, ঘৃণা এবং নির্মম সমালোচনা। উহাকে সহ্য করার জন্য যে প্রচণ্ড মানসিক দৃঢ়তা ও উদার প্রেমদৃষ্টির প্রয়োজন, তাহার জন্যও স্বামীজী মার্গারেটকে অবহিত ও প্রস্তুত রাখিতে প্রয়াস পাইতেছিলেন। যখন তিনি দেখিলেন, মার্গারেট তাঁহার সকল পরীক্ষাতেই অসাধারণ কৃতিত্বের সহিত উত্তীর্ণ হইয়াছেন তখনই মার্গারেটের কাছে আসিল তাঁহার স্বার্থহীন আহ্বান। ১৮৯৭ খ্রীস্টাব্দের ২৯ জুলাই স্বামীজী মার্গারেটকে লিখিলেন: "তোমাকে অকপটভাবে বলিতেছি ... ভারতের জন্য, বিশেষতঃ ভারতের নারীসমাজের জন্য পুরুষ অপেক্ষা নারীর—একজন প্রকৃত সিংহিনীর প্রয়োজন।... তোমার শিক্ষা, ঐকান্তিকতা, পবিত্রতা, অসীম প্রীতি, দৃঢ়তা এবং সর্বোপরি তোমার ধমনীতে প্রবাহিত কেল্টিক রক্তই তোমাকে সর্বতোভাবে সেই উপযুক্ত নারীরূপে গঠন করিয়াছে।"

মার্গারেট ভারতবর্ষে আসিলেন। ভারতবর্ষে তাঁহার জন্মান্তর ঘটিল। মার্গারেট হইলেন 'ভগিনী নিবেদিতা'। ১৮৯৮ খ্রীস্টাব্দের ২৮ জানুয়ারি হইতে ১৯১১ খ্রীস্টাব্দের ১৩ অক্টোবর পর্যন্ত এই দীর্ঘ তের বৎসরকালে নিবেদিতা কি হইয়াছেন এবং ভারতবর্ষের জন্য কি করিয়াছেন তাহা এক অসাধারণ বীরত্ব ও অতুলনীয় আত্মদানের অনবদ্য উপাখ্যান। পাশ্চাত্য হইতে অনেক মনীষী ও মহীয়সী ভারতবর্ষে আসিয়াছেন, ভারতবর্ষকে ও ভারতবর্ষের মানুষকে তাঁহারা গভীরভাবে ভালও বাসিয়াছেন, কিন্তু নিবেদিতার মতো কোন পাশ্চাত্যবাসী নিজের দেহ-মন-প্রাণকে, নিজের ধর্মকে, নিজের চিন্তা, জ্ঞান, কর্মশক্তি, প্রতিভা ও মনীষাকে, নিজের স্বপ্ন, নিদ্রা ও জাগরণকে নিঃশেষে ভারতের জন্য নিবেদন করেন নাই। পরিণামে এদেশের মানুষের কাছে, এদেশের সরকারের কাছে, এদেশের সমাজের কাছে তিনি কী পাইয়াছেন? কিছু লোক অবশ্যই তাঁহাকে শ্রেষ্ঠ মর্যাদা ও শ্রদ্ধা অর্পণ করিয়াছেন, কিন্তু যাহা তিনি দিয়াছেন তাহার তুলনায় তাঁহার সেই প্রাপ্তি নিতান্তই অকিঞ্চিৎকর। অবশ্য প্রাপ্তির প্রত্যাশা তিনি কখনও করেন নাই, গুরুর আহ্বানে তিনি শুধু দিবার জন্যই আসিয়াছিলেন এবং নিজেকে উজাড় করিয়াই তিনি দিয়াছিলেন। তাঁহার সেই দানের কথা মনে হইলে পুরাণের মহর্ষি দধীচির কথাই মনে পড়ে। অম্লানবদনে নিজের পঞ্জরাস্থি তিনি দান করিয়াছিলেন, যে-পঞ্জরাস্থি হইতে নির্মিত হইয়াছিল দেবরাজের অমোঘ বজ্র যাহার আঘাতে চূর্ণ-বিচূর্ণ হইয়াছিল দানবের অত্যাচার ও নিপীড়নের দুর্ভেদ্য দুর্গ, ধ্বংস হইয়াছিল দেবগণের শত্রু দানবকুল। বজ্র তাই বীরত্ব ও আত্মদানের সর্বশ্রেষ্ঠ প্রতীক। স্বামীজীর খুব প্রিয় ছিল বজ্রের উপমা, নিবেদিতারও। নিজেকে নিঃশেষে নিবেদন করিয়া ভারতকে রাহুমুক্ত করিতে, ভারত-সন্তানদের হৃদয়ে শৌর্য ও আত্মত্যাগের প্রেরণা জাগাইতে নিবেদিতা নিজেকে করিয়া তুলিয়াছিলেন স্বামীজীর বজ্র। দার্জিলিঙের শ্মশানে যেখানে চিতায় তাঁহার দেহকে অগ্নিতে উৎসর্গ করা হইয়াছিল সেখানে তাঁহার স্মৃতিস্তম্ভে এই কথাগুলি উৎকীর্ণ রহিয়াছে: "এখানে ভগিনী নিবেদিতা শান্তিতে নিদ্রিত—যিনি ভারতবর্ষকে তাঁহার সর্বস্ব অর্পণ করিয়াছিলেন।" এই ভারতবর্ষ যেমন ভারতবর্ষ, তেমন বিবেকানন্দও।

ইতিহাসের নারী-দধীচি নিবেদিতা সম্পর্কে ইহাই বোধহয় শেষকথা। □

অতীতের পৃষ্ঠা থেকে

# ভগিনী নিবেদিতা ও জাতীয়তা

## প্রব্রাজিকা মুক্তিপ্রাণা

বিংশ শতাব্দীর প্রথম দশকে ভারতের প্রায় সর্বত্র বিশেষ করে বাংলাদেশে যাঁরা ভগিনী নিবেদিতা কর্তৃক প্রভাবিত হয়েছেন, তাঁদের মধ্যে ছিলেন কবি, শিল্পী, বৈজ্ঞানিক, রাজনীতিবিদ্, সাহিত্যিক, সাংবাদিক, বিপ্লবী প্রভৃতি দেশ ও সমাজের সর্বস্তরের নেতৃস্থানীয় শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিগণ। কিন্তু বাংলাদেশে বিশেষতঃ কলকাতা শহরে বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ ব্যতীত শিক্ষিত সম্প্রদায়ের ওপরেও তাঁর বিশেষ প্রভাব ছিল। নিবেদিতার আকাঙ্ক্ষা ছিল দেশের জনসাধারণের সঙ্গে সাক্ষাৎ যোগাযোগ স্থাপন, যাদের তিনি অভিহিত করতেন 'Our people' বলে। ভাষাগত ব্যবধানের ফলে তা সম্ভব হয়নি, যদিও বুদ্ধি ও হৃদয়ের দিক থেকে তাদের সঙ্গে একাত্মবোধ তাঁর সম্পূর্ণভাবেই ঘটেছিল। আর যে বাগবাজার পল্লীতে তিনি কর্মক্ষেত্র নির্বাচন করেছিলেন, সেখানকার স্ত্রী-পুরুষ, ছোট-বড়, ধনী-দরিদ্র নির্বিশেষে সকলের সঙ্গেই তাঁর বিশেষ সৌহার্দ্য ছিল। এই সম্পর্কে তাঁর ইংরেজ বন্ধু স্টেট্‌সম্যান পত্রিকার তদানীন্তন সম্পাদক র‍্যাটক্লিফ লিখেছেনঃ "পারিপার্শ্বিক অবস্থার সঙ্গে তিনি আশ্চর্যভাবে মিশে গিয়েছিলেন। হিন্দু প্রতিবেশিগণ তাঁকে একান্ত আত্মীয় জ্ঞান করত। বাজারে, পথে, গঙ্গাতীরে প্রত্যেকের সঙ্গে তাঁর পরিচয় ছিল এবং পথ দিয়ে চলবার সময় সকলেই তাঁকে যে শ্রদ্ধা ও প্রীতির সঙ্গে অভিবাদন করত, তা সত্যই সুন্দর ও হৃদয়স্পর্শী।"

বক্তৃতা তাঁকে ইংরেজীতেই দিতে হতো এবং সে-বক্তৃতার মর্ম অনুধাবন কেবল ইংরেজীশিক্ষিত ব্যক্তির পক্ষেই সম্ভব ছিল। তাঁর বক্তৃতাগুলি ছিল প্রাণস্পর্শী, কারণ হৃদয়ের আবেগের সঙ্গে বিদ্যমান ছিল তাঁর অনন্যসাধারণ চরিত্র। কলকাতার শিক্ষিত সমাজ অল্পকালের মধ্যেই জেনেছিল, ভারতের নবজাগরণের স্রষ্টা স্বামী বিবেকানন্দের শিষ্যা সিস্টার নিবেদিতা এদেশকে ভালবেসেছেন এবং তার সেবায় জীবন উৎসর্গ করেছেন।

এই শিক্ষিত সম্প্রদায় বিশেষতঃ ছাত্র-যুব-সম্প্রদায়ের ওপর নিবেদিতার প্রথমাবধি বিশেষ দৃষ্টি ছিল। তিনি জানতেন, ভারতের স্বাধীনতা-সংগ্রামে এবং তার নবরূপ-সংগঠনে এরাই হবে প্রধান সহায়। ভারতের জাতীয় জীবনে নিবেদিতার দান কতখানি তার মাত্রা নিরূপণ করা কঠিন। সাধারণতঃ তিনি বিপ্লবীরূপে পরিচিত, ভারতের মুক্তি-সংগ্রামের অন্যতম যোদ্ধারূপে অভিহিত। যেকোন উপায়ে বিদেশী শাসনের অবসান ছিল তাঁর একান্ত কাম্য। কিন্তু তিনি কেবল রাজনীতিক স্বাধীনতার স্বপ্ন দেখেননি। স্বমহিমায় সুপ্রতিষ্ঠিত নবীন ভারতের স্বপ্নও দেখেছিলেন। "ভাবী ভারত তার প্রাচীন গৌরবময় অতীতকে অতিক্রম করবে"—স্বামী বিবেকানন্দের এই ভবিষ্যদ্বাণী নিবেদিতা মনে-প্রাণে গ্রহণ করেছিলেন। বিশ্বসভায় ভারতের স্থান সর্বোচ্চে এবং পৃথিবীর নরনারীকে উচ্চতম জীবনের সন্ধান দিতে পারে ভারত—এবিষয়ে তাঁর ধারণা অতিশয় দৃঢ় ছিল।

এক প্রবন্ধে নিবেদিতা লিখেছেন, গুরু যে-আদর্শে অনুপ্রাণিত সেই আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে যিনি জীবন উৎসর্গ করতে পারেন, তিনিই প্রকৃত শিষ্য। যদিও সেই আদর্শের রূপদান করতে হবে শিষ্যকে সম্পূর্ণ নিজের ভাবে। নিবেদিতা নিজেই ছিলেন সেই প্রকৃত শিষ্য। "আমি যেন দিব্যচক্ষে দেখছি, আমাদের সেই প্রাচীনা মাতা আবার জাগরিতা হয়েছেন, পূর্বাপেক্ষা অধিক মহিমান্বিতা ও পুনর্বার নবযৌবনশালিনী হয়ে তাঁর সিংহাসনে আরোহণ করেছেন; শান্তি ও আশীর্বাণী প্রয়োগ সহকারে তাঁর নাম সমগ্র জগতে ঘোষণা কর।" ভারত সম্বন্ধে এই দিব্যদর্শনের ফলেই অদ্বৈতবাদী ও মানবপ্রেমিক স্বামীজী ভারতের সেবায় জীবন

সমর্পণ করেছিলেন। তাঁর কাছে ভারতের কল্যাণের অর্থ সমগ্র জগতের কল্যাণ; কারণ, ভারতই সমগ্র জগৎকে আধ্যাত্মিক ভাবরাজি প্রদান করতে সমর্থ, আর তার দ্বারাই মানবজীবন-সমস্যার প্রকৃষ্ট সমাধান সম্ভব। ভারত সম্বন্ধে গুরুর এই দিব্য-দর্শনই নিবেদিতাকে অনুপ্রাণিত করেছিল। তিনি লিখেছেন, স্বামী বিবেকানন্দের দৃষ্টির সামনে ছিল এক বিরাট ভারতীয় জাতীয়তা—যে-জাতীয়তা নবীন, অশেষ শক্তিসম্পন্ন, পৃথিবীর অন্যান্য যে-কোন দেশের জাতীয়তার সমকক্ষ। তাঁর (স্বামীজীর) মতে নিজ শক্তি সম্বন্ধে পূর্ণ অবহিত এই জাতীয়তা বৌদ্ধিক, জাগতিক, সামাজিক প্রভৃতি জীবনের সর্বস্তরে প্রতিষ্ঠালাভের উদ্দেশ্যে অসংকোচে এগিয়ে চলেছে। জাতীয় ধর্মের (national righteousness) সুদৃঢ় প্রতিষ্ঠাই হলো জাতীয়তা। নিবেদিতা আরও লিখেছেন, স্বামীজীকে যাঁরা ভালবাসেন, তাঁদের আন্তরিক বিশ্বাস, এই জাতীয় ধর্ম-সংস্থাপনের জন্যই স্বামীজীর দেহ-পরিগ্রহণ।

স্বামী বিবেকানন্দ 'জাতীয়তা' শব্দটি বিশেষ ব্যবহার করেননি। প্রকৃতপক্ষে ১৯০৫ খ্রীস্টাব্দে বঙ্গভঙ্গ উপলক্ষে স্বদেশী আন্দোলনের সূত্রপাত। সেটিই পরে জাতীয় আন্দোলনে (national movement) পরিণত হয় এবং তখন থেকেই 'জাতীয়তা' শব্দের বহুল প্রচলন। নিবেদিতার নিকট জাতীয়তা শব্দটি ছিল বিশেষ প্রিয়, তার অর্থও ছিল গভীর ও ব্যাপক। "আমি বিশ্বাস করি, বেদ ও উপনিষদের বাণীতে, ধর্ম ও সাম্রাজ্যসমূহের সংগঠনে, মনীষিবৃন্দের বিদ্যাচর্চায় ও মহাপুরুষগণের ধ্যানেতে যে-শক্তি প্রকাশ পেয়েছিল, তাই আর একবার আমাদের মধ্যে উদ্ভূত হয়েছে, আর আজকের দিনে তারই নাম জাতীয়তা।" এই জাতীয়তার মন্ত্রেই তিনি ছাত্র-যুবসম্প্রদায়কে উদ্বুদ্ধ করতে চেয়েছিলেন। তিনি বলতেন, জাতীয়তার আদর্শ সৃষ্টি করাই বর্তমান ভারতের প্রধান সমস্যা। তাঁর মতে ভারতীয় ঐক্যের মধ্যেই এই জাতীয়তাবাদ নিহিত। বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্য। বৈচিত্র্যই ঐক্যের প্রাণ। এই ঐক্য যান্ত্রিক নয়, জীবনধর্মী।

ভারত সম্বন্ধে গুরুর দিব্যদর্শন নিবেদিতার সমগ্র মন-প্রাণ অধিকার করেছিল। তাই একদিকে যেমন স্বাধীনতার জন্য সর্বপ্রকার সংগ্রামে ছিল তাঁর সহানুভূতি, সমর্থন ও সহযোগিতা, অপরদিকে তেমনি ধর্ম, শিক্ষা, সাহিত্য, শিল্প, বিজ্ঞান প্রভৃতি সর্ববিষয়ে ভারতের অগ্রগতির জন্য ছিল আন্তরিক প্রচেষ্টা। বস্তুতঃ, গভীরভাবে চিন্তা করলে নিবেদিতার বহুবিধ কার্যকলাপের এই মূল সূত্রটি আবিষ্কার করা যায়। তাঁর লক্ষ্য ছিল ভারতের মুক্তিসাধন ও পূর্ণ মর্যাদার সঙ্গে জগৎসমক্ষে তার প্রতিষ্ঠা। দেশের রাজনীতিক মুক্তি-আন্দোলনের যাঁরা সাধক, তাঁদের একমাত্র লক্ষ্য ছিল যেকোন উপায়ে দেশমাতৃকার পরাধীনতার শৃঙ্খলমোচন। আবার কবি, সাহিত্যিক, বৈজ্ঞানিক, শিল্পী প্রভৃতি মনীষিগণ ছিলেন নিজ নিজ সাধনায় তন্ময়, যদিও ভারতের পরাধীনতা তাঁদের বিচলিত করেছিল এবং স্বাধীনতা-সংগ্রামে তাঁদের অবদানও কম নয়। কিন্তু যে-সত্যের আভাস তাঁদের অন্তরলোক উদ্ভাসিত করেছিল, তারই পরিপূর্ণ উপলব্ধির সাধনায় তাঁরা প্রয়োগ করেছিলেন সর্বশক্তি। বলা বাহুল্য, তাঁদের সাধনলব্ধ ফল নিঃসন্দেহে ভারত-মাতার মুখ উজ্জ্বল করে বিশ্বসভায় মর্যাদা দান করেছে। ভগিনী নিবেদিতা এই দুই সাধনার সংযোগ করতে প্রাণপণ চেষ্টা করেছিলেন বললে বিন্দুমাত্র অত্যুক্তি হবে না। একই সঙ্গে তিনি দেশের মুক্তি-সাধন ও নবদেশ-সংগঠনের স্বপ্ন দেখেছিলেন। প্রথমাবধি যাঁরা স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম করেছেন তাঁদের অধিকাংশের মধ্যেই এই অখণ্ড স্বপ্নের স্থান ছিল না। স্বাধীনতালাভের পর তার সংরক্ষণ ও নব সংগঠনের মূলেও সেই স্বপ্নের অভাব।

স্বামী বিবেকানন্দের দিব্যদৃষ্টিতে ভারতের যে মহিমময় রূপ উদ্ভাসিত হয়েছিল তার বাস্তব রূপায়ণ করবে কারা? উদীয়মান তরুণ-সম্প্রদায়—যারা উৎসাহে মত্ত, প্রাণের আবেগে পূর্ণ; যারা নিরন্তর পথ খুঁজছে আত্মপ্রকাশের। কিন্তু আত্মপ্রকাশের পথ কি ধ্বংসে? নব নব সৃজনের মধ্যেই কি মানুষ তার জীবনের সার্থকতা খুঁজে পায় না? সৃষ্টির পথ রুদ্ধ হলেই সৃজনীশক্তির অপচয় ঘটে ধ্বংসে। সৃষ্টির পূর্বে পিতামহ ব্রহ্মা

ছিলেন তপস্যায় মগ্ন। তাঁর মানস-আকাশেই সৃষ্টির রূপটি প্রথম উজ্জ্বল হয়ে ফুটে ওঠে। সুদক্ষ কারিগর যে-মূর্তির রূপপ্রদান করে, তার পূর্বে তাকে সেই রূপের আরাধনায় তন্ময় হতে হয়। কে এই তরুণদের ভারতের মহিমময় মূর্তির ধ্যানে তন্ময় হতে শেখাবে? আর সেই ধ্যানের মূর্তিকে রূপপ্রদানের কাজেই বা সাহায্য করবে কে? যুবশক্তিকে উদ্বুদ্ধ ও নির্দিষ্ট লক্ষ্যে পরিচালিত করবার জন্য প্রয়োজন অসীম ব্যক্তিত্ব ও অসাধারণ হৃদয়বত্তা। নিবেদিতা এই দুই সম্পদেরই অধিকারিণী ছিলেন। তিনি নিজে ভারতকে প্রাণ দিয়ে ভালবেসেছিলেন, মহিমময় ভাবী ভারতের স্বপ্নে বিভোর হয়েছিলেন, তার সেবায় জীবন উৎসর্গ করেছিলেন। তাই তাঁর কণ্ঠে ভারতের জাতীয়তার রাগিণী শতধারে ঝঙ্কৃত হয়ে উঠত। তাঁর অগ্নিময় বাণী সকলকে উদ্দীপিত করত। তাঁর আত্মোৎসর্গ সকলকে দেশসেবায় জীবন-উৎসর্গে অনুপ্রাণিত করত।

১৯০২ খ্রীস্টাব্দ থেকে নিবেদিতা কলকাতার গীতা সোসাইটি, বিবেকানন্দ সোসাইটি, ডন সোসাইটি, ইয়ংমেনস হিন্দু ইউনিয়ন কমিটি, অনুশীলন সমিতি প্রভৃতি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। ঐ সকল প্রতিষ্ঠানে তিনি নিয়মিত যাতায়াত করতেন, তরুণ-সম্প্রদায়ের নিকট ধর্মোপদেশ দিতেন, গীতার ব্যাখ্যা করতেন, স্বামীজীর আদর্শ ও বাণী জ্বলন্ত ভাষায় বর্ণনা করতেন। কলকাতার বাইরে বাংলাদেশের অন্যত্র অথবা বিভিন্ন প্রদেশে যখন যেখানে গেছেন, সেখানেই তরুণ-সম্প্রদায়ের সঙ্গে সংযোগস্থাপন ছিল তাঁর মূল লক্ষ্য। তাঁর প্রত্যেকটি সুচিন্তিত ভাষণে প্রকাশ পেয়েছে ভারত-জীবন সম্বন্ধে গভীর জ্ঞান, অকপট অনুরাগ ও শ্রদ্ধা। বারবার তিনি বলতেন: "My task is to awake the nation."—সমগ্র জাতির মধ্যে জাগরণ আনয়ন হলো আমার কাজ। এক অখণ্ড জাতীয়তাবোধ-সঞ্চার দ্বারাই তা সম্ভব। ভাবের সঙ্গে তিনি যখন ভারতের মহিমা ব্যাখ্যা করতেন, ধর্ম সম্বন্ধে স্বামীজীর উদার দৃষ্টিভঙ্গি ও গভীর স্বদেশপ্রেম বর্ণনা করতেন তখন শ্রোতৃবর্গের চিত্ত অভিভূত হতো। সিংহীর ন্যায় তেজোদৃপ্ত কণ্ঠে তিনি যখন দেশমাতৃকার শৃঙ্খলমোচনের জন্য সকলকে জীবনপণে আহ্বান করতেন, সকলে হৃদয়ে প্রবল অনুপ্রেরণা বোধ করত। অনুরাগের সঙ্গে তিনি যখন সর্ববিধ কল্যাণকর কার্যে অগ্রসর হতে বলতেন, তখন হৃদয়ে উৎসাহের সঞ্চার হতো।

স্বামীজীর দেহত্যাগের অব্যবহিত পরে ১৯০২ খ্রীস্টাব্দের ২৩ আগস্ট কলকাতায় বিবেকানন্দ সোসাইটি স্থাপিত হয়। নিবেদিতা ছিলেন ঐ সোসাইটি-স্থাপনের উদ্যোক্তা। স্বামীজীর জীবনাদর্শের প্রচার ও অনুধ্যান ছিল সমিতির লক্ষ্য। নিবেদিতা বহুবার ঐ সমিতির সদস্যগণের নিকট বক্তৃতা দিয়েছেন। ১৯০২ খ্রীস্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে তিনি মাদ্রাজে গমন করেন। স্বামী রামকৃষ্ণানন্দের তত্ত্বাবধানে মাদ্রাজের দূরবর্তী অঞ্চলে কয়েকটি বিবেকানন্দ সোসাইটি প্রতিষ্ঠিত হয়। ঐসকল সোসাইটির কাজ ছিল সাময়িক বক্তৃতা ও ক্লাসের সঙ্গে পূজা, ভজন ও দরিদ্র ছাত্রদিগকে সাহায্যদান। নিবেদিতার আকাঙ্ক্ষা ছিল—ভারতের সর্বত্র ঐরূপ বিবেকানন্দ সোসাইটি স্থাপিত হোক। ঐসকল সমিতির মাধ্যমেই ভারতের যুবশক্তি উদ্বুদ্ধ হবে জাতীয়তার মন্ত্রে—এই আশা তিনি অন্তরে পোষণ করতেন। "বর্তমানে প্রকৃত কাজ হচ্ছে সর্বপ্রকার তাৎপর্য ও অর্থবোধের সঙ্গে ভারতের সর্বত্র 'জাতীয়তা' শব্দটি প্রচার করা। এই বিরাট চেতনা সর্বদা ভারতকে পূর্ণরূপে অধিকার করে থাকা চাই। এই জাতীয়তা দ্বারাই হিন্দু ও মুসলমান দেশের প্রতি এক গভীর অনুরাগে একত্র হবে। এর অর্থ—ইতিহাস ও প্রচলিত রীতিনীতিকে এক নতুন দৃষ্টিতে দেখা; ধর্মের মধ্যে সমগ্র রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দরূপ ভাবনার সমাবেশ—সর্বধর্মসমন্বয়। বুঝতে হবে যে, রাজনীতিক প্রণালী ও আর্থনীতিক দুর্বিপাক গৌণমাত্র। পরন্তু ভারতবাসী কর্তৃক ভারতের জাতীয়তা উপলব্ধিই প্রকৃত কাজ।"

নিবেদিতা একদিকে যেমন ভারতের ধর্ম, ইতিহাস, সংস্কৃতি, শিল্প প্রভৃতি অনুশীলনের মধ্যে তার আধ্যাত্মিক রূপটি হৃদয়ঙ্গম করেছিলেন, তার পারিবারিক ও সামাজিক দৈনন্দিন জীবনযাত্রা, পালা-পার্বণ, উৎসবাদি গভীর মনোনিবেশ সহকারে

পর্যবেক্ষণ করে তার মর্ম অনুধাবন করেছিলেন, অপরদিকে তার জাতীয় জীবনের জটিল সমস্যাগুলির প্রত্যেকটির বিশ্লেষণ, চিন্তা ও আলোচনা দ্বারা সমাধানের ইঙ্গিতও দিয়ে গিয়েছেন। প্রকৃতপক্ষে তিনি যতখানি অধীর ছিলেন ভারতের রাজনীতিক মুক্তিলাভের জন্য, ততখানি ব্যগ্র ছিলেন তার সর্ববিধ উন্নতির জন্য। স্বভাবতই ছাত্রসম্প্রদায়ের বিশেষতঃ বিবেকানন্দ সোসাইটির সদস্যগণের জন্য নির্দিষ্ট কার্যসূচীর কথাও তিনি চিন্তা করেছিলেন। 'ভারতীয় বিবেকানন্দ সমিতিগুলির জন্য কার্যের ইঙ্গিত' নামক প্রবন্ধে তার বিবরণ পাওয়া যায়।[১] আপাতদৃষ্টিতে সমাজকল্যাণকর কার্যে ব্রতী হওয়াই ছাত্রগণের পক্ষে সঙ্গত বলে মনে হতে পারে। কিন্তু নিবেদিতা জানতেন, অধিকাংশ ছাত্র দরিদ্র মধ্যবিত্ত-পরিবারভুক্ত। তাদের প্রথম ও প্রধান উদ্দেশ্য একাগ্রচিত্তে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক নির্দিষ্ট পাঠ্যপুস্তক অধ্যয়নপূর্বক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়া ; কারণ, শীঘ্রই তাদের সম্পূর্ণ অথবা আংশিকভাবে পরিবারের দায়িত্ব বহন করতে হবে। তাছাড়া তখনো পর্যন্ত সমাজকল্যাণকর কার্যগুলি অধিকাংশ গৃহস্থ অতি নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করতেন। অতএব অধ্যয়নরূপ তপস্যার সঙ্গে স্বামীজীর আদর্শানুযায়ী চরিত্রগঠন করা ও জাতীয়ভাবে উদ্বুদ্ধ হওয়াই ছাত্রগণের একান্ত কর্তব্য। প্রয়োজন—ব্যায়ামাদি দ্বারা শরীরচর্চা ও নানারকম পুস্তকাদি পাঠের দ্বারা মনের উৎকর্ষসাধন, বুদ্ধিবৃত্তির অনুশীলন। জাতীয়তাবোধের সঞ্চার তখনই সম্ভব যখন দেশমাতৃকার অখণ্ড রূপটি আমাদের মানসনেত্রে প্রতিভাত হয়। ভারতের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত পর্যটন করে স্বামীজী দেশমাতৃকার এই অখণ্ড রূপ দর্শন করেছিলেন, তাই তিনি মহাজাতীয়তার উদ্বোধক। পৃথিবীর অন্যান্য দেশ পরিভ্রমণের অভিজ্ঞতা তাঁকে সাহায্য করেছিল স্বদেশের কল্যাণকর কার্যের অনুষ্ঠানে। তাই ছাত্রবৃন্দের অন্যতম কর্তব্য হবে অবকাশ সময়ে তীর্থ-পর্যটন। সুদূর হিমালয় থেকে কন্যাকুমারী, কামাখ্যা থেকে দ্বারকা, ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের অন্তর্গত সকল তীর্থস্থানই জনসাধারণের মিলনভূমি। কেদার-বদরী মহাতীর্থে নিবেদিতা এসত্য প্রত্যক্ষ করেছিলেন। তিনি স্বয়ং উদ্যোগী হয়ে একদল ছাত্রকে সুদূরে হিমালয়ে তীর্থ-পর্যটনে প্রেরণ করেন। রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর ছিলেন ঐ দলের অন্যতম যাত্রী। দরিদ্র মধ্যবিত্ত ঘরের ছেলেদের পক্ষে এই ব্যয়ভার-বহন অধিকাংশ স্থলেই অসম্ভব। অর্থাভাবে প্রতি বছর ছাত্রদলকে তীর্থ-পর্যটনে প্রেরণের পরিকল্পনা তাঁকে বাধ্য হয়ে পরিত্যাগ করতে হয়। স্বদেশের ইতিহাস এবং মহামানবগণের চরিত্র-অধ্যয়ন জাতীয়তাবোধ জাগ্রত করবার অন্যতম সহায়। ভারতে বিভিন্ন যুগে বিভিন্ন প্রদেশে যেসকল মহত্তম চরিত্রের আবির্ভাব হয়েছে, সেই সব চরিত্রের অধ্যয়ন ও অনুশীলন হৃদয়ে প্রেরণা সঞ্চার করবে মহৎ জীবনযাপনে। কেবল স্বদেশের নয়, বিদেশের ইতিহাস-অধ্যয়নও প্রয়োজন। বিভিন্ন জাতির উত্থান-পতনের মধ্য দিয়ে মানব-সভ্যতার অগ্রগতির ইতিহাস জাগাবে আত্মপ্রত্যয়। একদিকে স্বাধীনতা-রক্ষার জন্য প্রাণ-বিসর্জনের আকাঙ্ক্ষা, অপরদিকে বিশ্বমানব-কল্যাণে মনীষিগণের অনলস সাধনায় আত্মোৎসর্গ। তারপর গভীরভাবে চিন্তা করতে হবে দেশের বিভিন্ন সমস্যা সম্পর্কে। সুগভীর চিন্তার মধ্যেই নিহিত থাকে সমাধানের ইঙ্গিত। সর্বোপরি, শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের অনুধ্যান। তিনি লিখেছেন : "শ্রীরামকৃষ্ণের জীবন যেন বর্তমানে আমি বিশেষভাবে অনুধাবন করছি। আমি দেখতে চাই, আমাদের জনসাধারণ ভারতের সর্বত্র দলে দলে সমবেত হয়েছেন এবং তাঁদের উদ্দেশ্য কর্ম নয়, কেবল প্রার্থনা আর শ্রীরামকৃষ্ণ ও স্বামী বিবেকানন্দের জীবন-অনুধ্যান। এই দুই মহাজীবনের মধ্যেই সমগ্র ভারতের ঐক্য নিহিত। ভারতবর্ষ এই দুই মহাপুরুষকে হৃদয়ে ধারণ করবে, এইটিই সবচেয়ে প্রয়োজন।"

তদানীন্তন যুবক-সম্প্রদায়ের হৃদয়ে নিবেদিতার বাণী কীভাবে অনুরণিত হয়েছিল, তার প্রতিধ্বনি পাওয়া যায় বিনয় সরকারের কথায় : "…সেই চিত্ত আর ব্যক্তিত্ব তিনি ( নিবেদিতা ) ঢেলে দিয়েছিলেন রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের মারফত ভারতীয় জনসাধারণ আর ভারতীয় সংস্কৃতির পায়ে। ভারতীয় নরনারীর

১ Hints on National Education in India, p. 85

অতীত ব্যাখ্যা করা, বর্তমান বিশ্লেষণ করা আর ভবিষ্যৎ বাতলানো তাঁর পক্ষে মুড়িমুড়কি খাওয়ার মতো সোজা কাজ ছিল। ঠিক যেন আদর্শনিষ্ঠ ও ভাবুক ভারতীয় স্বদেশ-সেবকের দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে নিবেদিতা সমগ্র ভারতের বিকাশ-ধারা দেখতে অভ্যস্ত ছিলেন।"

দেশের সর্বত্র জাতীয়তাবোধ-সঞ্চারের চিন্তা সর্বক্ষণ নিবেদিতার মন-প্রাণ অধিকার করে থাকত। "পত্রিকাই এই জাতীয়তাবোধ জাগ্রত করবার শ্রেষ্ঠ উপায়।" সুতরাং একসময়ে তিনি একখানি পত্রিকা বার করবার জন্য বহু চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু অসংখ্য প্রতিবন্ধক ও প্রয়োজনের তুলনায় নিতান্ত অল্প অর্থসাহায্যে তা সম্ভব হয়নি। বাধ্য হয়ে তদানীন্তন জাতীয়তাবাদী পত্রিকাগুলিতে লিখেই মনের আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করতে হয়েছিল।

১৯০৫ খ্রীস্টাব্দে কাশী কংগ্রেস অধিবেশনের পরে 'ভারতের জাতীয় মহাসভা' নামক প্রবন্ধে তিনি লিখেছিলেন: "কংগ্রেসের কাজ রাজনীতিক অথবা দলীয় আন্দোলনের প্রতিনিধিত্ব করা নয়; কংগ্রেস হচ্ছে জাতীয় আন্দোলনের রাজনীতিক দিকমাত্র।... বর্তমানে কংগ্রেসের যথার্থ কাজ শিক্ষাসংস্কাররূপে সমগ্র দেশের মধ্যে জাতীয়তাবোধ সঞ্চার করা, যাতে জাতীয়তাবোধের ভিত্তি সুদৃঢ় হয়; সেজন্য কংগ্রেসের সদস্যগণকে নতুনভাবে, নতুন চিন্তায় অভ্যস্ত করতে হবে।" নিবেদিতার এই উক্তির মূল্য কতখানি তা সহজেই হৃদয়ঙ্গম হয়।

ভারতীয় শিল্পের পুনরভ্যুদয়ে তাঁর অসামান্য দানের কথা উল্লেখ করা নিষ্প্রয়োজন। অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, নন্দলাল বসু, অসিত হালদার প্রভৃতি শ্রেষ্ঠ শিল্পিগণের ভাষণে তার অকুণ্ঠ স্বীকৃতি রয়েছে। তিনি বলতেন: "শিল্পের পুনরভ্যুদয়ের ওপরেই ভারতবর্ষের ভবিষ্যৎ আশা নিহিত। অবশ্য ঐ শিল্প জাতীয় চেতনা ও জাতীয় ইতিহাসের ওপর প্রতিষ্ঠিত হওয়া আবশ্যক।"

নিবেদিতার আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হয়নি। জাতীয় জীবনগঠনের সমস্ত পরিকল্পনা অসমাপ্ত রেখে অসময়ে তাঁকে যাত্রা সমাপ্ত করতে হয়েছিল। যত সাধ ছিল তত সময় ছিল না। অশেষ মূল্যে দিয়ে আমরা আকাঙ্ক্ষিত স্বাধীনতা লাভ করেছি, যদিও ভারত-মাতার অখণ্ড রূপ আর নেই। ভারত আজ নানা বাদভূমিতে পরিণত। প্রতিদিন বিরাট প্রাণশক্তির অপচয় ঘটছে নানাভাবে। মনে হয়, নিবেদিতা যদি এই সঙ্কটমুহূর্তে এসে দাঁড়াতেন! জাতীয় জীবনের এক সঙ্কটকালেই তাঁর আবির্ভাব ঘটেছিল।

নিবেদিতা চলে গেছেন, কিন্তু রেখে গেছেন অমূল্য চিন্তারাজি, যার মধ্যে রয়েছে জীবনগঠনের সন্ধান, সমস্যার সমাধানের ইঙ্গিত। নিবেদিতার উৎসবানুষ্ঠান প্রভৃতির মাধ্যমে যেমন তাঁর প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করা আমাদের কর্তব্য, তেমনি তাঁর গ্রন্থরাজির অধ্যয়ন ও তাঁর মহৎ জীবনের অনুধ্যানও প্রয়োজন, যা আমাদের অন্তরে প্রেরণা সঞ্চার করবে আদর্শ জীবনযাপনে।* □

* উদ্বোধন, ৭১তম বর্ষ, ১১শ সংখ্যা, অগ্রহায়ণ, ১৩৭৬, পৃঃ ৬১১-৬২৪

নিবন্ধ

# বিবেক-তনয়া নিবেদিতা

## প্রব্রাজিকা শ্রদ্ধাপ্রাণা

মিস মার্গারেট এলিজাবেথ নোবল, পরবর্তী কালে স্বামী বিবেকানন্দের মানসকন্যা 'নিবেদিতা'র জন্ম আয়ারল্যান্ডের ডানগ্যানন পল্লীতে ১৮৬৭ খ্রীস্টাব্দের ২৮ অক্টোবর। ভগিনীর ১২৬তম জন্মজয়ন্তী উপলক্ষে প্রথম প্রণাম নিবেদন করি তাঁর পুণ্যশ্লোকা জননী মেরী হ্যামিল্টনকে, যিনি গর্ভেই সন্তানকে দেবতার উদ্দেশে নিবেদন করেন। তখনো তিনি জানতেন না যে, তিনি একটি কন্যারত্ন লাভ করবেন। এখন বুঝতে পারি, রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ-লীলায় মার্গারেটের ভূমিকাটি ছিল পূর্বনির্দিষ্ট। মার্গারেটের কৈশোর, যৌবন অতিক্রান্ত হয়েছে ইংল্যান্ডে। বাল্যকাল থেকেই তিনি আর পাঁচজন বালিকার মতো ছিলেন না।

১৮৯৫-এর নভেম্বরে স্বামীজীর সঙ্গে তাঁর প্রথম সাক্ষাৎকার হয়। সেই দিনটি তাঁর জীবনের এক পরমলগ্ন। সেই দিনটিকে বলা যায় তাঁর দ্বিতীয় জন্মদিন। মনস্বিনী, অসাধারণ ব্যক্তিত্বসম্পন্না মার্গারেট জন্মসূত্রে ছিলেন ধর্মযাজকের কন্যা। সুতরাং ধর্মানুরাগ তাঁর স্বাভাবিক। কিন্তু যে-পরিমণ্ডলে তিনি ছিলেন, সেখানে ধর্মানুষ্ঠানগুলি ছিল প্রাণহীন। প্রকৃত ধর্ম কোথায়? তিনি দেখেছেন ধর্মমতেই অসঙ্গতি। সুতরাং মার্গারেটের মন ছিল সংশয়ক্ষুব্ধ। সত্যে যিনি প্রতিষ্ঠিত হতে চান, সত্য তাঁর কাছে আসবেই। এল সেই মহালগ্ন। স্বামীজীর সঙ্গে প্রথম সাক্ষাৎকারের দিনে তিনি বুঝলেন, মন যেন এতদিনে নির্ভরযোগ্য সেই আশ্রয় পেয়েছে যা নিশ্চিতরূপে তাঁর জীবনের গতি নির্ধারণ করে দিতে পারবে। কিন্তু এই বিশ্বাসে উপনীত হতে মার্গারেটকে দীর্ঘ অপেক্ষা করতে হয়েছে। তিনি মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে স্বামীজীর বক্তৃতা শুনতেন, প্রশ্ন করতেন, তর্ক করতেন। তাঁর মনের মধ্যে আলোড়ন উঠত। আভাস পেতেন অস্পষ্ট একটা আহ্বানের। তখন মার্গারেটের মনের অবস্থা—'নাহি জানি কে ডাকিল মোরে, দুর্নিবার তবু সে আহ্বান'। একদিন শুনলেন, স্বামীজী বলছেন: "...জগৎ চায় এমন বিশজন নরনারী, যারা সদর্পে পথে দাঁড়িয়ে বলতে পারে 'ঈশ্বরই আমাদের একমাত্র সম্বল'। কে কে যেতে প্রস্তুত?"[১] বলতে বলতে তিনি আসন ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়েছেন। শ্রোতাদের মধ্যে কারোকে যেন ইঙ্গিত করে বলছেন: "কিসের ভয়? যদি ঈশ্বর আছেন একথা সত্য হয় তবে জগতে আজ কিসের প্রয়োজন? আর যদি তা সত্য না হয় তবে আমাদের জীবনেই বা ফল কি?"[২] মার্গারেটের সমস্ত অন্তর সেদিন সাড়া দেবার জন্য অধীর, বুঝতে পেরেছেন জগতে যাকিছু মহত্তম তারই নামে স্বামীজী আহ্বান করছেন। কিন্তু তখনো প্রত্যক্ষ আদেশ তো আসেনি স্বামীজীর কাছ থেকে।

মার্গারেট স্বামীজীকে চিঠি লিখে জানতে চাইলেন স্বামীজীর কাজের যথার্থ স্বরূপ কি আর তিনি কিভাবে তাঁকে সাহায্য করতে পারেন। শুনলেন সেই সত্য—তাঁর কাজ মানুষের অন্তর্নিহিত দেবত্বের প্রচার এবং জীবনের প্রতি ক্ষেত্রে সেটি প্রকাশের পথ-নির্ধারণ। তাঁর ৭ জুন ১৮৯৬ তারিখের পত্রে দ্ব্যর্থহীন ভাষায় স্বামীজী ঘোষণা করলেন: "যাঁরা জগতে সর্বাপেক্ষা সাহসী ও বরেণ্য, তাঁদের আত্মোৎসর্গ করতে হবে বহুজন-হিতায়, বহুজনসুখায়। অনন্ত প্রেম ও করুণায় পূর্ণ শত শত বুদ্ধের আবির্ভাব প্রয়োজন।... জগৎ চায় চরিত্র। জগতে আজ সেইরূপ লোকেদের প্রয়োজন, যাদের জীবন প্রেম-প্রদীপ্ত, যারা সম্পূর্ণ স্বার্থশূন্য। সেই প্রেম প্রতিটি বাক্যকে বজ্রের মতো শক্তিশালী করে তুলবে।" এই পত্রেই এল স্বামীজীর সুস্পষ্ট ইঙ্গিত: "তোমার মধ্যে একটা

১ ভগিনী নিবেদিতা—প্রব্রাজিকা মুক্তিপ্রাণা, ২য় সং, পৃঃ ৪১

২ ঐ, পৃঃ ৪১-৪২

জগৎ-আলোড়নকারী শক্তি প্রচ্ছন্ন রয়েছে। আর ধীরে ধীরে আরও অনেকে আসবে। আমরা চাই সাহসপূর্ণ বাণী, আর তার অপেক্ষা অধিক সাহসিক কর্ম। হে মহাপ্রাণ, ওঠো, জাগো। জগৎ যন্ত্রণায় দগ্ধ হচ্ছে, তোমার কি নিদ্রা সাজে?"

মার্গারেটের অন্তর মথিত হলো এই বজ্র-আহ্বানে। তিনি বুঝতে পারলেন, তাঁকে সর্বস্ব ত্যাগ করতে হবে। স্বামীজীর কাছ থেকে মার্গারেট সুস্পষ্টভাবে ভারতের কাজে জীবন উৎসর্গ করার নির্দেশ পেলেন ১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দের ২৯ জুলাই: "তোমাকে খোলাখুলি বলছি, এখন আমার বিশ্বাস হয়েছে যে, ভারতের কাজে তোমার এক বিরাট ভবিষ্যৎ রয়েছে। ভারতের জন্য, বিশেষতঃ ভারতের নারীসমাজের জন্য পুরুষের চেয়ে নারীর—একজন প্রকৃত সিংহীর প্রয়োজন। ভারতবর্ষ এখনও মহীয়সী মহিলার জন্মদান করতে পারছে না, তাই অন্য জাতি থেকে তাকে ধার করতে হবে। তোমার শিক্ষা, ঐকান্তিকতা, পবিত্রতা, অসীম ভালবাসা, দৃঢ়তা—সর্বোপরি তোমার ধমনীতে প্রবাহিত কেল্টিক রক্তের জন্য তুমি ঠিক সেইরূপ নারী, যাকে ভারতের প্রয়োজন।"

স্বামীজী কিন্তু কখনো মার্গারেটের সামনে তাঁর ভারত-বাসের কোন উজ্জ্বল চিত্র আঁকেননি বরং তার দুঃসহ সংগ্রামের ইঙ্গিতই দিয়ে লিখেছেন: "...এসব সত্ত্বেও যদি তুমি কর্মে প্রবৃত্ত হতে সাহস কর, তবে তোমাকে শতবার স্বাগত জানাচ্ছি।..."

"কর্মে ঝাঁপ দেবার পূর্বে বিশেষভাবে চিন্তা করো এবং কাজের পরে যদি বিফল হও কিংবা কখনো কর্মে বিরক্তি আসে, তবে আমার দিক থেকে নিশ্চয় জেনো যে, আমাকে আমরণ তোমার পাশেই পাবে—তা তুমি ভারতবর্ষের জন্য কাজ কর আর নাই কর, বেদান্ত-ধর্ম ত্যাগই কর আর ধরেই থাক।"

৩ নভেম্বর, ১৮৯৭ স্বামীজী মার্গারেটকে লিখলেন: "অতিরিক্ত ভাবপ্রবণতা কাজের বিঘ্ন করে।" আবার আশ্বাসও দিলেন: "...বিপদে-আপদে আমি তোমার পাশে দাঁড়াব। ভারতে আমি যদি এক টুকরো রুটি পাই, নিশ্চয় জেনো, তুমি তার সবটুকুই পাবে।"

কিন্তু আমরা দেখব, ভারতে আগমনের পূর্বে স্বামীজীর কাজের সঠিক ধারণা করা মার্গারেটের পক্ষে সম্ভব হয়নি। তিনি যা আশা করে ভারতবর্ষে এসেছিলেন, তা সময়ে সময়ে মরীচিকা মনে হয়েছে।

মার্গারেট কলকাতায় এসে পৌঁছালেন ১৮৯৮ খ্রীষ্টাব্দের ২৮ জানুয়ারি। ১৭ মার্চ শ্রীশ্রীমায়ের সঙ্গে সাক্ষাৎকারের দিনটিকে তাঁর তৃতীয় জন্মদিবস বলা যায়। সে এক ঐতিহাসিক মুহূর্ত। শ্রীশ্রীমা তাঁকে সাদরে গ্রহণ করলেন, সেযুগে যা ছিল অকল্পনীয়। আরও আশ্চর্যের কথা, এত অল্প সময়ের মধ্যে মার্গারেট শ্রীশ্রীমায়ের মহিমা কি করে বুঝতে পারলেন। শ্রীশ্রীমাও তাঁকে চিনে নিয়েছিলেন, বলেছিলেন: "আহা, কি সরল বিশ্বাস। যেন সাক্ষাৎ দেবী। নরেনকে কি ভক্তিই করে। সে এই দেশে জন্মেছে বলে সর্বস্ব ছেড়ে এসে প্রাণ দিয়ে তার কাজ করছে। কি গুরুভক্তি। এদেশের উপরই বা কি ভালবাসা।"[৩] শ্রীশ্রীমায়ের সঙ্গে সাক্ষাতের পর মার্গারেট তাঁর গর্ভধারিণীকে উল্লেখ করতেন 'Little Mother' ('ছোট মা') বলে।

২৫ মার্চ ১৮৯৮, মার্গারেটের জন্মান্তর ঘটল। নীলাম্বরবাবুর বাড়িতে অবস্থিত মঠের ঠাকুরঘরে পূজার আয়োজন করা ছিল। স্বামীজী প্রথমে মার্গারেটকে দিয়ে সংক্ষেপে শিবপূজা করিয়ে পরে তাঁকে ব্রহ্মচর্যব্রতে দীক্ষিত করেন। ভগবান বুদ্ধের চরণে পুষ্পাঞ্জলি প্রদানপূর্বক শুভ অনুষ্ঠান শেষ হলো। স্বামীজী আবেগপূর্ণ কণ্ঠে বললেন: "যাও, যিনি বুদ্ধত্বলাভের পূর্বে পাঁচশতবার অপরের জন্য জন্মগ্রহণ ও প্রাণ বিসর্জন করেছিলেন, সেই বুদ্ধকে অনুসরণ কর।"[৪] মার্গারেটের নতুন নাম হলো 'নিবেদিতা'। শিষ্যাও এই গুরুদত্ত নামটি সার্থক করেছেন ভারত-কল্যাণে নিজেকে নিঃশেষে নিবেদন করে। মাতৃগর্ভে জননী কর্তৃক নিবেদিত কন্যার উৎসর্গ-অনুষ্ঠান যেন এতদিনে সম্পূর্ণ হলো। ঐ দীক্ষার দিনটি স্বামীজী তাঁর প্রিয় শিষ্যার জন্যই বিশেষভাবে যেন নির্দিষ্ট রেখেছিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর ওপর যে-কার্যভার অর্পণ করেছিলেন, সেদিন তিনি অকপটভাবে নিবেদিতার কাছে সেটি ব্যক্ত করলেন। সঙ্ঘ

৩ নিবেদিতা লোকমাতা—শংকরীপ্রসাদ বসু, ১ম খণ্ড, ১ম সং, পৃঃ ১৯৬

৪ ভগিনী নিবেদিতা, পৃঃ ৭৫

স্থাপনের মহৎ দায়িত্ব শ্রীরামকৃষ্ণ ন্যস্ত করেছিলেন স্বামী বিবেকানন্দের ওপর। পুরুষদের জন্য কাজ আরম্ভ হয়ে গিয়েছিল। কাশীপুরে শ্রীরামকৃষ্ণ নিজে যে-সঙ্ঘের সূচনা করেছিলেন, বরানগর ও আলমবাজার হয়ে সে-মঠ তখন বেলুড়ে নিজস্ব জমিতে অবস্থিত। স্বামীজীর বিশেষ আগ্রহ ছিল অনুরূপ একটি স্ত্রীমঠ স্থাপন করে মেয়েদের সামনেও তুলে ধরতে হবে ত্যাগ ও সেবার আদর্শ। তার জন্য প্রয়োজন এমন একজন নারী, যিনি ভারতের প্রাচীন ভাব-সম্পদের বিষয়ে অবহিত এবং নিজেও ত্যাগ ও সেবার আদর্শে অনুপ্রাণিত।

কিন্তু স্বামীজী তখনো মনে করছেন না যে, তাঁর পরিকল্পিত স্ত্রীশিক্ষার কাজে নিবেদিতার যোগ দেবার সময় হয়েছে। যে ভারতীয় রমণীদের জন্য নিবেদিতা কাজ করবেন, তাদের সামাজিক ও পারিবারিক পরিবেশকে অন্তরঙ্গভাবে জানার প্রয়োজন রয়েছে। তারই জন্য ভারতবর্ষের সাংস্কৃতিক ও আধ্যাত্মিক ইতিহাসের সঙ্গে প্রত্যক্ষ পরিচয় আবশ্যক।

স্বামীজী তাঁর পাশ্চাত্য শিষ্যদের নিয়ে ভারত-ভ্রমণে বের হলেন। স্বামীজীর সঙ্গে এই ভারত-ভ্রমণ নিবেদিতার জীবনের প্রস্তুতিকাল। কাশ্মীরে একদিন স্বামীজী নিবেদিতাকে হঠাৎ জিজ্ঞাসা করলেন যে, তিনি তাঁর ভাবী স্কুল সম্বন্ধে কি চিন্তা করছেন? নিবেদিতা নিজে একজন প্রতিভাময়ী শিক্ষাবিদ্। প্রয়োজন ছিল ভারতবর্ষের পরিপ্রেক্ষিতে ভারতীয় নারীসমাজ সম্পর্কে সঠিক অভিজ্ঞতার। নিবেদিতার ইচ্ছা ছিল, শিক্ষাদানের প্রচেষ্টার মধ্যে ধর্মভাব থাকবে; সেজন্য তিনি শ্রীরামকৃষ্ণ-পূজাকে প্রাধান্য দেবার সংকল্প করেছেন। তিনি স্বামীজীকে অনুরোধ করলেন, তাঁর শিক্ষা-পরিকল্পনাটি চিন্তা করে সমালোচনা করতে। স্বামীজী কিন্তু সম্মত হলেন না। বললেন, তুমি আমাকে সমালোচনা করতে বলছ, কিন্তু তা কিছুতেই সম্ভব নয়। আমার ধারণা—তুমিও আমার মতো ঐশী শক্তি দ্বারা অনুপ্রাণিত। সব ধর্মের লোকই বিশ্বাস করে, তাদের ধর্মের সংস্থাপকগণ ঐশী শক্তিদ্বারা পরিচালিত। আমাদেরও তাই বিশ্বাস। সুতরাং তুমি যা সবচেয়ে ভাল বলে বিবেচনা করেছ, সেই কাজে আমি তোমাকে সাহায্য করব।

স্বামীজী মাঝে মাঝে পরিকল্পিত স্ত্রীশিক্ষার বিষয়ে নিবেদিতাকে যে-কথাগুলি বলতেন তার মধ্যে কতকগুলির ওপর বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছেন। যেমন, 'স্বদেশ এবং ধর্মের মধ্যে যেন সমন্বয় ঘটে', 'হিন্দুধর্ম যেন সক্রিয় এবং অপরের ওপর প্রভাবশালী হয়', 'ভারতের অভাব বাস্তব কর্মতৎপরতা, কিন্তু সেজন্য ভারতের ধ্যানধারণার জীবন যেন উপেক্ষিত না হয়'। স্বামীজী নিবেদিতাকে মনে করিয়ে দিয়েছেন শ্রীরামকৃষ্ণের আদর্শ ছিল সমুদ্রের মতো গভীর ও আকাশের মতো উদার।

নিবেদিতার আগ্রহ ছিল—শ্রীরামকৃষ্ণ-পূজার প্রবর্তন করবেন তাঁর বিদ্যালয়ে। স্বামীজী স্বীকার করলেন—তাঁর নিজের জীবনে সেই মহাপুরুষের প্রভাব গভীরভাবে বর্তমান, কিন্তু সেটা অপরের পক্ষে সমানভাবে সার্থক নাও হতে পারে। আমরা দেখব ১৩ নভেম্বর, ১৮৯৮, রবিবার, কালীপূজার দিন ১৬ নং বোসপাড়া লেন-এ শ্রীশ্রীমা স্বয়ং উপস্থিত হয়ে স্কুলটির প্রতিষ্ঠাকার্য সম্পন্ন করলেন। স্বামী ব্রহ্মানন্দ, স্বামী সারদানন্দ প্রমুখ গুরুভাইদের সঙ্গে নিয়ে স্বামীজী সেই অনুষ্ঠানে যোগদান করেন। পূজাশেষে শ্রীশ্রীমায়ের আশীর্বাণীর তাৎপর্য কি গভীর! শ্রীশ্রীমা বিদ্যালয়ের ওপর জগন্মাতার আশীর্বাদ প্রার্থনা করলেন। এখানেই শেষ নয়। তিনি আরও প্রার্থনা করলেন: "এখান থেকে শিক্ষাপ্রাপ্ত মেয়েরা যেন আদর্শ বালিকা হয়।"[৫] একটি কথা এখানে উল্লেখযোগ্য। নিবেদিতা কেবলমাত্র সামান্য ভাষা ও গণিত শিক্ষার জন্য একটি গতানুগতিক বিদ্যালয় কখনই চাননি। তাঁর লক্ষ্য ছিল গভীর ও সুদূরপ্রসারী। বিদ্যালয়-স্থাপন একটি বিরাট সম্ভাবনার বীজ-বপনমাত্র ছিল।

ইতিমধ্যে আমরা দেখেছি, স্বামীজী নানাভাবে নিবেদিতার সঙ্গে ভারতের অন্তরঙ্গ পরিচয় ঘটাচ্ছেন। বোসপাড়া অঞ্চলের খুব কাছাকাছি থেকে নিবেদিতা ভারতীয় গার্হস্থ্য জীবনের খুঁটিনাটি লক্ষ্য করেছেন। গুরুর আশীর্বাদে নিবেদিতা এক আশ্চর্য দিব্যদৃষ্টি লাভ করেছিলেন। অতি সাধারণ ঘটনাও তাঁর কাছে দেখা দিত অসাধারণভাবে। সুতরাং তাঁর বহু লেখার মধ্য দিয়ে তিনি আমাদের নতুন করে

৫ ভগিনী নিবেদিতা, পৃঃ ১৩৫

ভারতকে চিনিয়েছেন। এসব অভিজ্ঞতার ফলস্বরূপ প্রকাশিত হলো তাঁর 'The Web of Indian Life', যা ইংল্যান্ড ও ইউরোপে সেযুগে আলোড়ন তুলেছিল, ধাক্কা দিয়েছিল তাদের প্রচলিত ধারণায়। ইতিহাসের এক আশ্চর্য পরিহাস যে, ভারতের উন্নত সভ্যতার পরিচয় পাশ্চাত্যদেশ লাভ করল এক ইংরেজ নারীর কাছ থেকে। প্রকৃতপক্ষে নিবেদিতাকে উপলক্ষ করে ভারতের স্বরূপ উদ্ঘাটিত করেছেন স্বামীজী স্বয়ং।

অর্থসংগ্রহের জন্য যখন নিবেদিতা ১৮৯৯ খ্রীস্টাব্দের জুন মাসে স্বামীজীর সঙ্গে পাশ্চাত্যে গেলেন, সেই মাসখানেকের সমুদ্রযাত্রায় স্বামীজী অবিরাম তাঁর কাছে চিন্তাপ্রবাহ ঢেলে দিয়েছেন। নিবেদিতাও সেসব গ্রহণ করতে সমর্থ হন তাঁর ধারণাশক্তির সহায়তায়। স্বামীজীর বিভিন্ন আলোচনার মধ্যে যীশুখ্রীস্ট, বুদ্ধদেব, শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীরামকৃষ্ণ প্রমুখ মহাপুরুষদের প্রসঙ্গ যেমন থাকত, তেমনি থাকত ইতিহাস, ধর্ম, দর্শন ও সাহিত্য। নিবেদিতা পূর্ণ মনোযোগের সঙ্গে তাঁর প্রত্যেকটি কথা লিখে রাখতেন। ভারত তাঁর কাছে এজন্য ঋণী। এসময় তিনি 'Cradle Tales of Hinduism' বইটির উপাদানও সংগ্রহ করতে পেরেছিলেন। স্বামীজীর সঙ্গে সমুদ্রযাত্রাকে তিনি শ্রেষ্ঠ তীর্থযাত্রার সঙ্গে তুলনা করতেন। ভারতের নারীগণের শিক্ষার দায়িত্ব স্বামীজী দিয়েছিলেন নিবেদিতাকে। তিনি একবারও সেকথা বিস্মৃত হননি। যেকোন কাজে নামবার আগে ধ্যানের দ্বারা অন্তর্মুখ ভাবকে আয়ত্ত করতে হয়, স্বামীজীর এই শিক্ষা তাঁকে প্রভাবিত করেছিল। স্বামীজী নিবেদিতাকে মনে করিয়ে দিলেন—কারও ওপর নির্ভর না করে একাই নিজের কাজে এগিয়ে যেতে হবে। নিবেদিতা তাঁর বিদ্যালয়ের কাজে অর্থসংগ্রহের জন্য পাশ্চাত্যে যথোচিত সাড়া পাননি। বহু স্থানে বছরে একটি মাত্র ডলারের প্রত্যাশাও তাঁর পূর্ণ হয়নি। নিবেদিতার চোখের সামনে কতকগুলি অসহায় বালিকার মুখ ভেসে উঠত, যাদের জীবন তিনি বদলে দিতে পারতেন বছরে মাথাপিছু মাত্র একটি ডলার পেলে।

নিবেদিতাকে অবসন্ন জেনে স্বামীজী তাঁকে এক পত্র দেন। স্বামীজী বুঝেছিলেন, যে-কাজে নিবেদিতা হাত দিয়েছেন তাতে বহু ব্যর্থতা ও নৈরাশ্য অবশ্যম্ভাবী। যাদের জন্য তিনি প্রাণপাত করবেন, তারাই হয়তো নিবেদিতার আন্তরিকতার প্রতি সন্দেহ ও বিদ্রূপ বর্ষণ করবেন। সুতরাং প্রয়োজন মানসিক প্রস্তুতির। তাই স্বামীজীর কাছ থেকে নিবেদিতার কাছে এল এক অপূর্ব পত্র। ৬ ডিসেম্বর ১৮৯৯ তারিখে লেখা সেই পত্রে স্বামীজী লিখলেন: "যদি সত্যই জগতের বোঝা কাঁধে নিতে প্রস্তুত থাক, তবে সর্বতোভাবে তা গ্রহণ কর, কিন্তু তোমার বিলাপ ও অভিশাপ যেন আমাদের শুনতে না হয়। তোমার নিজের জ্বালা-যন্ত্রণা দ্বারা আমাদের এরূপ ভীত করে তুলো না যে, শেষে আমাদের মনে করতে হয়, তোমার কাছে না এসে আমাদের নিজেদের বোঝা নিয়ে থাকাই বরং ভাল ছিল।

"যে-ব্যক্তি সত্য সত্যই জগতের দায় ঘাড়ে নেয়, সে জগৎকে আশীর্বাদ করতে করতে আপন পথে চলতে থাকে। তার মুখে একটিও নিন্দার কথা, সমালোচনার কথা থাকে না। অবশ্য তার কারণ এই নয় যে, জগতে পাপ নেই; প্রত্যুত: তার কারণ এই যে, সে এটি নিজ স্কন্ধে তুলে নিয়েছে—স্বেচ্ছায় স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে।

"আজ প্রাতে এই তত্ত্বটি আমার সম্মুখে উদ্ঘাটিত হয়েছে।...

"দুঃখভার জর্জরিত যে যেখানে আছ, সকলেই এস, তোমাদের সকল বোঝা আমার ওপর ফেলে দিয়ে নিশ্চিন্ত মনে চলতে থাক,... অনন্ত ভালবাসা জানবে।" পত্রের শেষ হয়েছে এই বলে: "ইতি

তোমার পিতা

বিবেকানন্দ"

পত্রটি নিবেদিতাকে নতুনভাবে উদ্দীপিত করে। তিনি কেন হতাশ হবেন? তিনি তো স্বেচ্ছায় সাগ্রহে স্বামীজীর কাজের ভার নিয়েছেন। যে-দেশের জন্য তিনি নিজেকে উৎসর্গ করেছেন, সেই দেশের মানুষের বিরুদ্ধে একদিনের জন্যও তাঁর মুখে কোন অভিযোগ শোনা যায়নি। পাশ্চাত্যে আরেকটি আঘাতও তাঁকে পেতে হয়েছিল। নিবেদিতা এই আশা করে পাশ্চাত্য দেশে এসেছিলেন যে, এখানে স্বামীজীর

শিষ্য ও বন্ধুরা তাঁকে অজস্র সাহায্য করবেন। কিন্তু দেখা গেল, মিসেস বুল, মিসেস লেগেট ও মিস ম্যাকলাউড ভিন্ন কারও কাছে নিবেদিতা প্রত্যাশিত সাহায্য বা সহানুভূতি লাভ করেননি। অর্থ-সংগ্রহের ব্যাপারে কিছুটা সাফল্যলাভ করলেও তাঁকে তীব্র প্রতিকূলতার ভিতর দিয়ে যেতে হচ্ছিল। যখনই নিবেদিতা কাতর হতেন, স্বামীজীর আশ্বাস-পূর্ণ পত্র আসত। এবারেও ২৪ জানুয়ারি ১৯০০, স্বামীজী লিখলেন: "আমরা সকলেই নিজের নিজের ভাবে উৎসর্গীকৃত। মহাপূজা চলছে; একটা বিরাট বলি ভিন্ন অন্য কোন প্রকারে এর অর্থ পাওয়া যায় না। যারা স্বেচ্ছায় মাথা পেতে দেয় তারা অনেক যন্ত্রণা থেকে অব্যাহতি পায়। আর যারা বাধা দেয়, তাদের জোর করে নামানো হয় এবং তাদের দুর্ভোগ হয় বেশি। আমি এখন আত্মসমর্পণ করতে বদ্ধপরিকর।"

আবার দেখছি ২৬ মে, ১৯০০ তারিখে স্বামীজী লিখছেন: "আমার অনন্ত আশীর্বাদ জেনো এবং কিছুমাত্র নিরাশ হয়ো না, শ্রী ওয়া গুরু, শ্রী ওয়া গুরু। ক্ষত্রিয় শোণিতে তোমার জন্ম। আমাদের অঙ্গের গৈরিক বাস তো যুদ্ধক্ষেত্রের মৃত্যুসজ্জা। ব্রত উদ্‌যাপনে প্রাণপাত করাই আমাদের আদর্শ, সিদ্ধির জন্য ব্যস্ত হওয়া নয়।··· দৃঢ় হও মা। কাঞ্চন কিংবা অন্য কিছুর দাস হয়ো না, তবেই সিদ্ধি আমাদের সুনিশ্চিত।"

১৯০২ খ্রীস্টাব্দে ৯ ফেব্রুয়ারি পাশ্চাত্যদেশ থেকে নিবেদিতা ১৭নং বোসপাড়া লেনের স্কুলবাড়িতে ফিরে এলেন। সরস্বতীপূজার পর স্কুলটি খুলে দিলে বালিকারা স্কুলে আসতে আরম্ভ করে। তিনি নিজে তখনও বিদ্যালয়ের কাজে সম্পূর্ণ মনোযোগ দিতে পারছিলেন না। ভগিনী ক্রিস্টিন এসে স্কুলটির ভার নেওয়ায় তিনি অনেকটা নিশ্চিন্ত বোধ করেন। ধীর স্থির শান্ত মধুরভাষিণী ক্রিস্টিন ছিলেন স্বামীজীর আস্থাভাজন।

স্বামীজী সেসময় কাশীতে। সেখান থেকে ১০ ফেব্রুয়ারি মিসেস বুলকে তিনি একটি পত্রে লেখেন: "প্রিয় মাতা ও কন্যাকে [ নিবেদিতা ] আরেকবার ভারতভূমিতে স্বাগত জানাচ্ছি।" ঐ পত্রে মিসেস বুলকে তাঁর আরেকটি ইচ্ছার কথাও স্বামীজী জানান—মিসেস বুল ও নিবেদিতা যেন কলকাতার পশ্চিমে কয়েকটি গ্রাম ঘুরে দেখে আসেন। সেখানে তাঁরা বাঁশ, বেত, খড়-নির্মিত বাঙালী বাসগৃহের নমুনা দেখতে পাবেন। আক্ষেপ করেন—আহা, নিবেদিতার সমগ্র বিদ্যালয়টি যদি ঐভাবে নির্মাণ করে দিতে পারতেন। নিবেদিতার বিদ্যালয়টি সম্বন্ধেও স্বামীজীর কত না আগ্রহ। ১৪ ফেব্রুয়ারি নিবেদিতাকে লিখছেন: "সর্বপ্রকার শক্তি তোমাতে উদ্বুদ্ধ হোক, মহামায়া স্বয়ং তোমার হৃদয়ে এবং বাহুতে অধিষ্ঠিতা হোন, অপ্রতিহত মহাশক্তি তোমাতে জাগ্রত হোক এবং সম্ভব হলে সঙ্গে সঙ্গে অসীম শান্তিও তুমি লাভ কর, এই আমার প্রার্থনা।··· যদি শ্রীরামকৃষ্ণ সত্য হন তবে যেভাবে তিনি আমাকে জীবনে পথ দেখিয়েছেন, ঠিক সেইভাবে কিংবা তার চেয়ে অনেক স্পষ্টভাবে তোমাকেও তিনি পথ দেখিয়ে নিয়ে যান।"

ইতিমধ্যে নিবেদিতার মনের মধ্যে বিপুল পরিবর্তন ঘটে গিয়েছে। বিদেশী শাসনের ভয়ঙ্কর রূপ হৃদয়ঙ্গম করবার পর এক মুহূর্তও ভারতের ওপর ইংরেজ আধিপত্য তাঁর সহ্য হচ্ছিল না। তাঁর ধমনীর আইরিশ রক্ত সাংঘাতিকভাবে মানসিক প্রতিক্রিয়া এনেছে। স্বামীজীর কাছে বিদেশী শাসনের ভয়াবহ পরিণাম অজ্ঞাত ছিল না এবং পরাধীনতার শৃঙ্খলমোচন না হলে জাতির মঙ্গল সম্ভব নয়—তাও তিনি জানতেন। তবু রাজনৈতিক সংগ্রামকে স্বামীজী তাঁর কর্মসূচীর অন্তর্গত রাখেননি। কিন্তু নিবেদিতাকে তিনি পূর্ণ স্বাধীনতা দিয়েছিলেন। নিবেদিতার আশঙ্কা ছিল, তাঁর রাজনৈতিক কার্যপ্রণালী স্বামীজী হয়তো অনুমোদন করবেন না। কোন কাজে স্বামীজীর সমর্থন না পাওয়া যে নিবেদিতার পক্ষে কত মর্মান্তিক। নিবেদিতা নিজেই লিখেছেন ( ১০ জুন, ১৯০১ ): "এখন আমার বিশ্বাস হচ্ছে ভারত এবং ভারতীয়দের জন্য আমার কিছু করবার আছে। কিন্তু কেমন করে সম্পন্ন হবে, সে-ভার মায়ের ওপর।" আরেকটি চিঠিতে তিনি লিখেছেন ( ৩ অক্টোবর, ১৯০১ ): "আমার পক্ষে ভুলে যাওয়া অসম্ভব স্বামীজীর মহৎ বাণী কি অতুলনীয়। আমি গত বছর এমন সব অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে গেছি যা

আমার জন্য তাঁর নির্দিষ্ট করে দেওয়া পথের বাইরে। কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণকে আমি এত দৃঢ়ভাবে ধরেছি যে, যদি কোন জায়গায় আমার ভুল হয়ে থাকে তবে সে ভুল তাঁর, আমার নয়।"

নিবেদিতা ১১ মে, ১৯০২ তারিখে ক্রিস্টিনকে নিয়ে মায়াবতী চলে গেলেন এবং ফিরে এলেন ২৬ জুন রাত্রে। ২৮ জুন স্বামীজী এলেন বোসপাড়া লেনে নিবেদিতার স্কুলবাড়িতে। কেউ কল্পনা করতে পারেনি এটিই তাঁর শেষ আগমন। নিবেদিতা বেলুড় মঠে গিয়ে সাক্ষাত করেন ২ জুলাই। স্বামীজীর কথাবার্তা বা ব্যবহারে কোথাও কোন বিষণ্ণতা ছিল না বরং একটা জ্যোতির্ময় সত্তার আবির্ভাব তিনি অনুভব করেছেন। তিনি য়ুমকে [ ম্যাকলাউডকে ] লিখলেন: "...আমার মনে হয় তিনি জানতেন আমি তাঁকে আর দেখতে পাব না। এত আশীর্বাদ!... কেবল আমি যদি জানতে পারতাম প্রত্যেকটি মুহূর্ত কত মূল্যবান!"[৬]

৪ জুলাই স্বামীজীর মহাপ্রয়াণের সংবাদ যেন নিবেদিতার কাছে বিনা মেঘে বজ্রপাত! নিবেদিতার সামনে সেদিন জীবনের চরম সঙ্কট উপস্থিত। এক মুহূর্তে সবকিছু বদলে গেল। স্বামীজীর প্রাণের বস্তু মঠকে বাঁচাতে হলে রাজনীতির সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত নিবেদিতাকে সঙ্ঘ থেকে সরে দাঁড়াতেই হবে। অথচ সেটিও তাঁর কাছে কম বেদনাদায়ক নয়। তিনি নিজেও প্রাণে প্রাণে উপলব্ধি করেছিলেন তাঁর কর্মপরিধি বহু-বিস্তৃত। দশ-বারোটি মেয়ের মধ্যে শিক্ষা ও আদর্শপ্রচারে ফল কিছু হবে না। দেশবাসীর মধ্যে আনতে হবে জাতীয় চেতনা, তখন তারা নিজেরাই বুঝতে পারবে তাদের কি প্রয়োজন। নিবেদিতার নিজের কথায়: "আমার কাজ জাতিকে উদ্বুদ্ধ করা, কয়েকটি মেয়েকে প্রভাবিত করা নয়।" (২৪ জুলাই, ১৯০২ তারিখের পত্র) তিনি লিখেছেন: "আমাদের কর্তব্য মহাশক্তির তরঙ্গে ঝাঁপ দেওয়া, তীরে উত্তীর্ণ হব কিনা সে-ভার মহামায়ার ওপর।"[৭]

তখন আমরা নিবেদিতাকে দেখব ভারতের এক-প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্তে অক্লান্তভাবে স্বামীজীর বাণীকে তিনি যেমন বুঝেছেন সেভাবে প্রচারে নিযুক্ত। প্রধানতঃ তিনি ভারতের একতার ওপরই বক্তৃতা দিতেন। নিবেদিতা স্পষ্ট প্রত্যক্ষ করেছেন ভারতবর্ষে এক অখণ্ড শক্তিশালী মহান ঐক্য বিরাজ করছে। আর তাকে প্রত্যক্ষরূপে অনুভব করে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার সময় উপস্থিত। সাময়িক উত্তেজনাসৃষ্টিকারী স্বদেশপ্রেম নয়, ভারতের নিঃশ্বাসে প্রশ্বাসে যেন উচ্চারিত হয় একটিমাত্র শব্দ—"জাতীয়তা"। কিন্তু নিবেদিতা সেইসঙ্গে স্মরণ করিয়ে দিলেন, ভারতবাসী কোনমতেই যেন ধর্মকে পরিত্যাগ না করে। তিনি দৃঢ় প্রত্যয়ের সঙ্গে বলেছিলেন: "আমি বিশ্বাস করি বেদ ও উপ-নিষদের বাণীতে, ধর্ম ও সাম্রাজ্যসমূহের সংগঠনে, মনীষিবৃন্দের বিদ্যাচর্চায় ও মহাপুরুষগণের ধ্যানে যে-শক্তি প্রকাশ পেয়েছিল, তাই আরেকবার আমাদের মধ্যে উদ্ভূত হয়েছে এবং আজকের দিনে তারই নাম 'জাতীয়তা'।" যেখানেই তিনি গেছেন নিজেকে নিঃশেষ করে প্রেরণা ঢেলে দিয়েছেন। সকলকে অনুপ্রাণিত করে বলেছেন: "তোমাদের লক্ষ্য হোক মাতৃভূমির কল্যাণ। সর্বদা মনে রেখো, সমগ্র ভারতই তোমার দেশ, আর এই দেশের বর্তমান প্রয়োজন হলো কর্ম।... স্বদেশী আন্দোলনের মাধ্যমে ভারতের জনগণ জগতে শ্রদ্ধার আসন লাভ করবার এক সুযোগ পেয়েছে।"

একই সঙ্গে নিবেদিতা ভারতবর্ষের মেয়েদেরও অনুপ্রাণিত করতে চেয়েছেন। মাদ্রাজে এক মহিলা-সভায় প্রদত্ত তাঁর সর্বশ্রেষ্ঠ বিবৃতি 'খোলা চিঠি'-তে (২০ ডিসেম্বর, ১৯০২) তিনি লেখেন: "...তাঁর (স্বামী বিবেকানন্দের) দৃঢ় বিশ্বাস ছিল, ভারতের ভবিষ্যৎ ভারতের পুরুষের চেয়ে নারীর ওপর বেশি নির্ভর করছে। আর আমাদের ওপর তাঁর বিশ্বাস ছিল অগাধ।..."[৮] তিনি আরও লেখেন—সকল দেশই, জাতির মহান সম্পদ পবিত্রতা ও বীর্য রক্ষার ভার নারীর ওপরই দিয়ে এসেছে। পুরুষের শ্রদ্ধা, অন্তর্দৃষ্টি ও মহত্ত্বের উৎস গৃহ—আর তা নারীর তপস্যার মধ্যেই নিহিত। তিনি প্রাণে প্রাণে অনুভব করেন, "ভারতমাতা এই মুহূর্তে তাঁর মেয়েদের বিশেষভাবে আহ্বান করছেন—তাঁরা যেন প্রাচীনকালের মতো শ্রদ্ধাপূর্ণ হৃদয়ে তাঁকে সাহায্য

৬ ভগিনী নিবেদিতা, পৃঃ ২৩৫

৭ ঐ, পৃঃ ২৪৩

৮ ঐ, পৃঃ ২১৪

করতে অগ্রসর হন। কী করে তা সম্ভব হবে ?...

"প্রথমতঃ, হিন্দুমাতা তাঁর ছেলেদের মধ্যে ব্রহ্মচর্যের তৃষ্ণা ফের জাগিয়ে তুলুন।... ব্রহ্মচর্যের মধ্যেই সমস্ত শক্তি ও মহত্ত্ব প্রচ্ছন্ন রয়েছে। প্রত্যেক জননী যেন দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করেন যে, তাঁর সন্তানেরা মহৎ হবে।

"দ্বিতীয়তঃ, আমরা কি নিজেদের এবং সন্তান-সন্ততির মধ্যে পরদুঃখকাতরতা ফুটিয়ে তুলতে পারি না?" যার ফলে সৃষ্টি হবে শক্তিশালী কর্মী—"যারা কর্মের জন্যই কর্ম করবে এবং স্বদেশ ও স্বদেশবাসীর সেবার জন্যই মৃত্যু পর্যন্ত বরণ করতে প্রস্তুত থাকবে।"[৯] ভারত-সন্তানের জন্য জননীর এই আদর্শ আজকের দিনে আরও অনেক বেশি প্রয়োজনীয় নয় কি?

দেশকে জাগ্রত করবার কাজ স্বামীজী আরম্ভ করে গিয়েছিলেন। নিবেদিতা মনে করতেন, তাঁর দায় তাকে সঞ্জীবিত রাখা। সর্বক্ষণ তাঁর আপ্রাণ প্রচেষ্টা ছিল রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের আদর্শ ও মহিমা প্রচার। তিনি বিশ্বাস করতেন, এই দুই মহাজীবনের মধ্যেই সমগ্র ভারতের ঐক্য নিহিত। কেবল তাঁদের আদর্শ অনুসরণই ভারতমাতাকে আরও একবার জগৎসভায় শ্রেষ্ঠ আসনে প্রতিষ্ঠিত করবে।

নিবেদিতাকে তাঁর আরব্ধ কাজ অসমাপ্ত রেখেই চলে যেতে হয়েছিল। এক যুগসন্ধিক্ষণে নিবেদিতার আগমন ও অবস্থান ঘটেছিল ভারতে। সেদিন ভারতের প্রয়োজন ছিল জাতীয়তা-উদ্বোধনকারী প্রাণশক্তির। আকাঙ্ক্ষিত স্বাধীনতালাভের পর চার দশকের বেশি অতিক্রান্ত। বর্তমানে ভারতের সংহতি বিপন্ন। আজ একান্ত অভাব জাতীয় চেতনার। ভারতের বিপুল জনশক্তি দিগ্‌ভ্রান্ত, দ্বিধাগ্রস্ত। কিন্তু আজও নিবেদিতা মূর্তিমতী প্রেরণারূপে বর্তমান। এই সঙ্কট-মুহূর্তে তাই রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের নিবেদিতার কাছে আন্তরিক প্রার্থনা—তাঁর আহ্বানে দলে দলে ভারত-সন্তানেরা পুনরায় সমবেত হোক—নতজানু হয়ে দৃঢ়চিত্তে পরম শ্রদ্ধায় উচ্চারণ করুক তাঁরই প্রিয় মন্ত্র—"হে জাতীয়তা! সুখ বা দুঃখ, মান বা অপমান যে-বেশে ইচ্ছা আমার কাছে এসো, আমাকে তোমার করে নাও।" □

৯ ভগিনী নিবেদিতা, পৃঃ ২৫৫

## প্রচ্ছদ-পরিচিতি

প্রচ্ছদের আলোকচিত্রটি কামারপুকুরের শ্রীরামকৃষ্ণের বাসগৃহের। পাঁচের দশকের প্রথমদিকে আলোকচিত্রটি গৃহীত হয়েছিল।

বর্তমান বর্ষটি (১৯৯৩) শ্রীরামকৃষ্ণ-ভাবান্দোলনের ক্ষেত্রে একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বর্ষ। কারণ, এই বর্ষে শিকাগো ধর্মমহাসম্মেলনে স্বামী বিবেকানন্দের আবির্ভাবের শতবর্ষ পূর্ণ হচ্ছে। শিকাগো ধর্ম-মহাসভায় স্বামী বিবেকানন্দ যে-বাণী প্রচার করেছিলেন এবং যে-বাণী ধর্মমহাসভার সর্বশ্রেষ্ঠ বাণী বলে অভিনন্দিত হয়েছিল, সে-বাণী ছিল সমন্বয়ের বাণী। ধর্মের সমন্বয়, মতের সমন্বয়, সম্প্রদায়ের সমন্বয়, দর্শনের সমন্বয়, আদর্শের সমন্বয়—প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের সমন্বয়, প্রাচীন ও নবীনের সমন্বয়, অতীত বর্তমান ও ভবিষ্যতের সমন্বয়। ভারতবর্ষ সুপ্রাচীন কাল থেকে এই সমন্বয়ের বাণী ও আদর্শ প্রচার করে আসছে। আধুনিক কালে এই সমন্বয়ের সর্বপ্রধান ও সর্বশ্রেষ্ঠ প্রবক্তা শ্রীরামকৃষ্ণ। সাধারণভাবে সনাতন ভারতবর্ষের এবং বিশেষভাবে শ্রীরামকৃষ্ণের সমন্বয়ের বাণীকে স্বামী বিবেকানন্দ বহির্বিশ্বের সমক্ষে উপস্থাপিত করেছিলেন। চিন্তাশীল সকল মানুষই আজ উপলব্ধি করছেন যে, সমন্বয়ের আদর্শ ভিন্ন পৃথিবীর স্থায়িত্বের আর কোন পথ নেই। সমন্বয়ের পথই বর্তমান পৃথিবীর বহুবিধ সমস্যা ও সঙ্কটের মধ্য থেকে উত্তরণের একমাত্র পথ। কামারপুকুরের পর্ণকুটীরে যাঁর আবির্ভাব হয়েছিল দরিদ্র এবং নিরক্ষরের ছদ্মবেশে, তিনিই বর্তমান এবং আগামীকালের বিশ্বের ত্রাণকর্তা। তাঁর বাসগৃহটি তাই আজ ও আগামীকালের সমগ্র পৃথিবীর তীর্থক্ষেত্র। শিকাগোর বিশ্বধর্মসভার মঞ্চে স্বামী বিবেকানন্দের কণ্ঠে শান্তি, সমন্বয় ও সম্প্রীতির যে-বাণী বারংবার উচ্চারিত হয়েছিল—যার মধ্যে নিহিত ভারত ও পৃথিবীর রক্ষাকবচ, তারও গর্ভগৃহে কামারপুকুরের এই পর্ণকুটীর'—সম্পাদক, উদ্বোধন

শ্রীমা সারদা দেবী ও নিবেদিতা, বাগবাজার (কলকাতা), ১৮৯৮

বাঁদিক থেকে □ পঙ্কজিনী, সিস্টার বেট? (সিস্টার নিবেদিতার সহকারিণী), সরোজিনী মুখোপাধ্যায় (পঙ্কজিনীর মামাতো বোন)। □ ১৯১০? বাগবাজার (কলকাতা),

To ? Sett.. Esq.
Goregaon.
Bombay. Sept. 26.

My dearest Pankojini,

It has been such a rapid time that I was unable to come over you again before leaving. But I had so much to do, so many anxieties to deal with, that every moment was taken up.

I want to tell you, however, that I am so very happy to have seen your Husband. Everything about him, as well as the sweet things he said, told me how very happy you make each other. I am so glad. There is no one who can help a man so much as his own wife. I always thought that Mrs Pankojini's husband, whoever he might be, would have reason to thank GOD for the wife given to him!

You know in Europe, we believe that everything in a marriage depends on the wife, but as you here, think it does on the husband. I think — don't you? — that there is some truth in both ideas. It is lovely where both are good friends as well as everything else. And I am sure that your mind will always stand open to find the truths and the power that may help you to make his life & home always beautiful, while he will do the same for you.

They will tell you how very badly I still speak Bengali. But I try to do better. There are so many things I want to say!

Ever dear Pankojini..
Your loving sister
Nivedita
of Ramakrishna-V.

পঙ্কজিনীকে লেখা ভগিনী নিবেদিতার চিঠি।

স্বামীজী এবং নিবেদিতা, কাশ্মীর, ১৮৯৮

প্রাসঙ্গিকী

# ভগিনী নিবেদিতার একটি অপ্রকাশিত পত্র

C/o Mr. Setlur Esq.
Gurgaon, Bombay
Sept. 24 [1902]

My dearest Ponkojini,

It has been such a regret to me that I was unable to come to see you again before leaving. But I had so much to do and so many anxieties to deal with that every moment was taken up.

I want to tell you, however, that I am so very happy to have seen your husband. Everything about him as well as the sweet things he said, told me how very happily you match each other. I am so glad. There is no one who can help a man so much as his own wife. I always thought that our Ponkojini's husband, whoever he might be, would have reason to thank God for the wife given to *him* ! [ Underlined by Sister Nivedita ]

You know in Europe we believe that everything in a marriage depends on the *wife* [ underlined by Sister Nivedita ], just as you here think it does on the husband. I think—don't you ?—that there is some truth in both ideas. It is lovely where both are good friends as well as everything clear [?]—and I am sure that your mind will always stand open to find new truths and new power that may help you to match his life and home always beautiful, while he will do the same for you.

They will tell you how very badly I still speak Bengali. But I long to do better. There are so many things I want to say !

Ever dear Ponkojini,
Your loving Sister
**Nivedita of Ramakrishna**

**বঙ্গানুবাদ**

প্রযত্নে এস. সেটলুর মহাশয়
গুরগাঁও, বোম্বাই
২৪ সেপ্টেম্বর [১৯০২]

আমার প্রিয়তমা পংকজিনী,

[কলকাতা] ছাড়ার আগে আমি তোমার সঙ্গে আবার দেখা করে আসতে পারিনি বলে আমার যে কি খারাপ লেগেছে, কি বলব। কিন্তু আমার অনেক কাজ পড়েছিল এবং বেশ কিছু জরুরী বিষয় সামলাতেই আমার সব সময়টা যায়।

যাই হোক, আমি তোমাকে বলতে চাই যে, তোমার স্বামীকে দেখে আমি খুব খুশি হয়েছি। তার সবকিছুই, এমনকি যে মিষ্টি কথাগুলি সে বলেছে, তা থেকেই আমি বুঝেছি, তোমরা কত সুখী হয়েছ। আমি সত্যিই খুব খুশি হয়েছি। পৃথিবীতে একজন স্ত্রী তার স্বামীকে যতটা সাহায্য করতে পারে তেমন আর কেউই পারে না। আমি সব সময়ই জানি যে, আমাদের পংকজিনীর স্বামী, সে যেই হোক না কেন, অবশ্যই পংকজিনীর মতো স্ত্রী [ ভগিনী নিবেদিতা শব্দটির নিচে দাগ দিয়েছেন। ] পেয়ে ভগবানকে ধন্যবাদ দেবে।

ইউরোপে আমরা বিশ্বাস করি, একটা বিবাহের ( সংসারের ? ) সবকিছু নির্ভর করে স্ত্রীর [ ভগিনী নিবেদিতা শব্দটির নিচে দাগ দিয়েছেন। ] ওপর ; যেমন এদেশে মনে করা হয়, সবকিছু নির্ভর করে স্বামীর ওপর। আমার মনে হয়, দুটো ভাবনার মধ্যেই কিছু সত্য আছে। তাই না ? জীবন সুন্দর হয়ে ওঠে সেখানেই যেখানে স্বামী এবং স্ত্রী পরস্পরের বিশস্ত বন্ধু এবং তাদের সম্পর্কে কোন অস্পষ্টতা [?] থাকে না। আমি নিশ্চিত যে, তুমি সবসময়ই খোলা মনে থাকবে। তাহলেই জীবনের অনেক সত্য ও শক্তির বিষয় জানতে পারবে, যা তোমাকে তার জীবন ও গৃহকে সর্বদা সুন্দর করতে সাহায্য করবে। অবশ্য তোমার স্বামীকেও তোমার জন্য এরূপ করতে হবে।

তোমাকে ওরা বলবে, বাঙলা বলতে আমি কত অপটু ; অবশ্য ভাল করে বলতে আমার খুব ইচ্ছা হয়। তোমাকে বলার জন্য আরও কত কথা যে ছিল।

আমার চিরদিনের প্রিয় পঙ্কজিনী,
তোমার প্রিয় ভগিনী
**রামকৃষ্ণের নিবেদিতা**

চন্দননগরের গোন্দলপাড়া-নিবাসী প্রাক্তন বিপ্লবী ও 'মানিকতলা বোমা-মামলা'র আসামী উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভ্রাতৃবধূ পঙ্কজিনী দেবীর পিত্রালয় ছিল কলকাতার বাগবাজারে ৩৩নং বোসপাড়া লেন-এ। পঙ্কজিনী দেবীর বাবা ছিলেন নারায়ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায়। পঙ্কজিনী ছিলেন ভগিনী নিবেদিতার বিদ্যালয়ের প্রথম যুগের ছাত্রী। স্বামী বিবেকানন্দের প্রেরণায় স্ত্রী-শিক্ষা বিস্তারের উদ্দেশ্যে নিবেদিতা ১৭নং বোসপাড়া লেন-এ যে-বিদ্যালয় পরিচালনা করতেন, যেখানে অনেক প্রাচীনপন্থী মানুষের বাধাপ্রদান সত্ত্বেও কিছু আধুনিক মানসিকতার মানুষ তাঁর কাজে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেন। তাঁরা নিজ কন্যা ও পরিবারের অন্যান্য বালিকাদের লেখাপড়া ও সর্বাঙ্গীণ উন্নতির ভার বিদেশিনী নিবেদিতার হাতে নির্দ্বিধায় তুলে দেন। এই সমস্ত বালিকারা ছিল নিবেদিতার আত্মজার মতো। নিবেদিতার বিদ্যালয়ে কিছুকাল শিক্ষালাভের পর তখনকার দিনের রীতি অনুসারে ১৯০০ খ্রীস্টাব্দে অল্প বয়সেই পঙ্কজিনীর বিয়ে হয়ে যায় ( পঙ্কজিনীর জন্ম : ৮.১.১৮৮৮ )। বিয়ে হয় চন্দননগরের গোপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে। গোপেন্দ্রনাথের সঙ্গেও নিবেদিতার পরিচয় হয়েছিল এবং তিনি নিজের হাতে একটি পাঞ্জাবি তৈরি করে গোপেন্দ্রনাথকে উপহার দেন। নিবেদিতার নিজের হাতে তৈরি পাঞ্জাবিটি পঙ্কজিনীর পুত্র জিতেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে এখনো সযত্নে রক্ষিত আছে। পঙ্কজিনী দেবী দীর্ঘায়ু ছিলেন। কিছুকাল আগে ( ৯. ১. ১৯৭৫ ) সাতাশি বছর বয়সে তিনি দেহত্যাগ করেন।

পঙ্কজিনী দেবী তাঁর পুত্রবধূ নমিতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে প্রায়ই ভগিনী নিবেদিতার প্রসঙ্গে নানা কথা বলতেন। নমিতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের মুখে শুনেছি, পঙ্কজিনীর মা একদিন ভগিনী নিবেদিতার বিশেষ আগ্রহে তাঁকে বাঙালী মেয়েদের মতো শাড়ি পরিয়ে দেন। আরেক দিন তাঁকে ভাজা মাছের কাঁটা বেছে খেতে সাহায্য করেন। অবশ্য এই দুটি কাজ করতে গিয়ে পঙ্কজিনীর মা 'মেমসাহেব'কে ছুঁয়েছিলেন বলে পঙ্কজিনীর ঠাকুরমা ও বিধবা পিসিমা তাঁকে গঙ্গাস্নানে বাধ্য করেছিলেন।

পঙ্কজিনীর বিয়ের বছর দুয়েক পর নিবেদিতা তাঁকে উপরোক্ত চিঠিটি লেখেন। চিঠিটি তাঁর পুত্র জিতেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে সুরক্ষিত রয়েছে। ভগিনী নিবেদিতার এই অপ্রকাশিত চিঠিটি এবং সিস্টার বেটের (?) সঙ্গে পঙ্কজিনীর ছবি জিতেনবাবুর সৌজন্যে প্রাপ্ত। চিঠিটির প্রতিটি ছত্রে নিবেদিতার গভীর আন্তরিকতা ও প্রীতির পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি একাধারে পঙ্কজিনীর শিক্ষিকা এবং মমতাময়ী মাতারূপে এখানে ধরা দিয়েছেন। চিঠিটির বঙ্গানুবাদ আমি করেছি। এই প্রসঙ্গে জানাই যে, গোন্দলপাড়ার বাসন্তী বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে আমি ভগিনী নিবেদিতার সঙ্গে পঙ্কজিনীর সম্পর্কের কথা প্রথম শুনি।

**আরতি ঘোষ**
গোন্দলপাড়া, চন্দননগর
জেলা : হুগলী

## কবিতা

### মণিময় চক্রবর্তী

নিবেদিতা মা আমার, শুচি শুভ্র পূত ভক্তিময়ী—
বিবেক-করুণা-স্পর্শে প্রজ্বলিত চৈতন্যপ্রবাহে
নিবেদিতা লোকমাতা অগ্নিশুদ্ধা তেজস্বিনী শিখা।
নিমজ্জিত জড়শক্তি অতলান্ত গুহা অন্ধকারে
অভীঃমন্ত্রে এনেছিলে ভারতীয় নারীর প্রগতি।
সংগ্রামে মুখর দিন মাতৃমন্ত্রে উদ্বুদ্ধ যৌবন
শাসকের রক্তচোখে ক্রমাগত দৃঢ় নিষ্পেষণ,
গৈরিক পতাকাতলে ছুটে আসে রক্তাক্ত মিছিল।
নিবেদিতা, তুমি তার পশ্চাতে প্রেরণাদাত্রী মাতা—
নিবেদিতা, তুমি তার সম্মুখে দিশারী ধ্রুবতারা ॥

## ভগিনী নিবেদিতা

### রমলা বড়াল

পশ্চিম আকাশের প্রচ্ছন্ন বিদ্যুৎশিখা
কান পেতে শুনছিল
পূব আকাশের ডমরুর দ্রিমি দ্রিমি ধ্বনি।
এ যে তাকেই ডাকছে।
পূবের মেঘাচ্ছন্ন আকাশে সূচিত হচ্ছে
নবযুগের সৃষ্টিবিপ্লব—
এই তো তার লীলাক্ষেত্র।
ভারতের অন্ধকার আকাশে
স্বামীজী বাজালেন তাঁর নবশক্তির ডমরু,
জমে উঠল সৃষ্টিদায়িনী মেঘ;
নিবেদিতা এলেন বিদ্যুৎরূপিণী
আলোকদায়িনী হয়ে।
অন্ধকার পথিকের সামনে
ঝলসে উঠল নব নব পথের ইঙ্গিত।
ভারতবর্ষ মায়ের পাশে পেল ভগিনীকে,
পেল হৃদয়ে নব তেজ, বাহুতে নব শক্তি;
আর ভারতের মেয়েরা পেল
জাগ্রত নারীশক্তির এক প্রত্যক্ষ প্রতিমাকে,
যে তাদের প্রতিনিয়ত ডাকছে
অন্য এক আলোর জগতে ॥

## 'নিবেদিতা—কর্মযোগে কমলিনী

স্বামী বিবেকানন্দকে মার্গারেট নোবল যখন
প্রথম চোখের দেখা দেখলেন, নব জন্মান্তর
ঘটবে কি জানতেন ইংরেজ কুমারীরতন?
১৮৯৫ নভেম্বর, মধ্যে মোটে তিনটি বছর,
তারপর মার্গারেট এলেন ভারতবর্ষে; মন
স্থির সিদ্ধান্ত নিয়েছে বৈরাগ্য ও কর্মের প্রখর
ব্রত হবে উদ্‌যাপিত বঙ্গদেশে; দীপ্ত হুতাশন
বুকে জেলে স্বামীজীর ভাবশিষ্যা দেখি অতঃপর
কর্মযোগে কমলিনী সেজেছেন—ধন্য কলকাতা।
গুরু নাম রেখেছেন নিবেদিতা; তিনি মানবসেবিকা।
স্বামীজীর আবিষ্কৃত মণিমালা তিনি, লোকমাতা
ইংল্যান্ডের হয়ে যেন ক্ষমাপ্রার্থী এই অগ্নিশিখা
ভারতবর্ষের কাছে। ক্লারা, সেণ্ট ফ্রান্সিসে যেমন
নিবেদিতা প্রভুর কাছে করেছেন সর্বসমর্পণ।

## অভিষিক্ত হলে পুনর্জন্মে

### রীতা বন্দ্যোপাধ্যায়

মোহের আবরণে, অজ্ঞানে, নিষ্ফল অন্বেষণে
ক্রমাগত ক্ষত-বিক্ষত হচ্ছিল হৃদয়—
অনন্ত নক্ষত্রবীথির নিচে কোন্ পথে যাবে তুমি?

গুরুদেব গৈরিকবসনে দেখালেন পথ
সেই তাম্রিষ্ঠ শীতার্ত সন্ধ্যায়, ধূপের ধোঁয়ায়;
প্রথম দর্শনেই জেগে উঠল আত্মা
সমস্ত সত্তায় ছড়িয়ে পড়ল তার রেখা—
যুক্তি, বিচার, সংস্কার
সলমা চুমকির মতো সব আবরণ পড়ল খসে।

জল থৈথৈ আকাশের মতো চিত্ত নিয়ে
গুরুদেবের পায়ে করলে নিজেকে নিবেদন
মাথা পেতে মেনে নিলে সমস্ত আদেশ
কর্তব্যের কঠিন কঠোর নির্দেশ
এদেশে মানুষের সাথে মিলেমিশে
'নিবেদিতা' নামে অভিষিক্ত হলে পুনর্জন্মে
আপন অনুভবে সমস্ত কিছু বুঝে নিলে মর্মে মর্মে।

## জনগণে দিলে আলো

### পিনাকীরঞ্জন কর্মকার

শিখাময়ী নিবেদিতা—
একাধারে তুমি ভগিনী, দুহিতা, মাতা।
লয়ে স্বামীজী-র দীক্ষা
ছড়ালে এদেশে শিক্ষা,
জনগণে দিলে আলো।
ঘুচালে মনের কালো ॥
মানবসেবার তরে
নিলে ভার নিজ করে,
দিলে সেবা জনে জনে।
সঁপিলে নিজেরে মনে-প্রাণে ॥
ব্যথিতে করিতে মুক্ত
নিলে পথ উপযুক্ত,
সকল প্রাণের মাঝে
তব সুর আজও বাজে ॥
ভেসে চলে তারই রেশ
জেগে ওঠে গোটা দেশ,
তোমারই আহ্বানে
সাড়া দিয়ে সবখানে ॥

## নিবেদিত মহাপ্রাণ

### গীতি সেনগুপ্ত

ভগিনী নিবেদিতা—
ভারতের তরে তনুপ্রাণমন নিঃশেষে সমর্পিতা ॥
সাগর পেরিয়ে ভালবেসে তুমি এসেছ ভারতবর্ষে,
নতুন প্রেরণা লভেছিলে তুমি স্বামীজীর আদর্শে।
ভারতের নিবেদিতা—
তোমার হৃদয়ে মিশে একাকার বেদ বাইবেল গীতা।
সেবার প্রতিমা, কত পীড়িতেরে তুলেছ সারিয়ে,
মুক্তিযুদ্ধে দাঁড়িয়েছ পাশে প্রেরণা-প্রদীপ নিয়ে।
নারীদের মন বিকশিত করে ফোটাতে চেয়েছ ফুল,
শ্রীমায়ের হাতে হয়েছে স্থাপিত তোমার ধ্যানের স্কুল।
স্নেহময়ী তুমি, তুমি যে শ্রীময়ী, আমাদের নিবেদিতা,
আমাদের প্রাণে চিরকাল রবে শিখাময়ী, লোকমাতা।

## মন্ত্রের পবিত্রতায়

### নন্দিতা ভট্টাচার্য

লোকমাতা।—অমৃতা তুমি।
তুমি অনন্যা, চিরবরেণ্যা
ভারতমাতার পায়ে আত্ম-নিবেদিতা।
সেবাব্রতের কঠোর তপস্যায় যৌবন-যোগিনী তুমি;
ধ্যানমগ্না সুদূর ধ্রুবলোকের যাত্রী।
স্বামীজীর বীরবাণী
মন্ত্রের পবিত্রতায় সুকঠোর নিষ্ঠায়
রূপ দিতে সারাটা জীবন
তুমি করে গেলে দান।
ধূপের মতো তিলে তিলে সেবা-প্রেম
ভালবাসার সৌরভে
আমাদের শোনালে তুমি অমৃতের গান।

## আত্মার আত্মীয়

### পলাশ মিত্র

যেকোন বিশেষণই বুঝি তোমার নামের পাশে
বিনত নম্র হয়ে সঙ্কোচে থাকে জড়সড়:
যে-নামে ডাকি না কেন—বীর নারী মহীয়সী মহান সাধিকা
তবু জানি, তার চেয়ে তুমি আরও বেশি বড়।

ভারতসাধিকা তুমি ভারতের উপাসিকা
ভারতই তোমার স্বদেশ:
তোমার বজ্রবাণী মর্মমূলে সুর এনে
মুছে দিল দীনতার বেশ।

তুমি ভগ্নী, মাতা তুমি, ভারতের আত্মার আত্মীয়
ভারতকে সব দিয়ে ভারতের বুকে তুমি চিরস্মরণীয়।

## নিবেদিতা

### শুভ্রা মজুমদার

জগৎ-আলোড়নকারী শক্তি
জমাট বেঁধে আছে ;
জমাট বেঁধে আছে তোমার মধ্যে ;
তাকে ছড়িয়েছ, পূবে-পশ্চিমে, উত্তরে-দক্ষিণে
তাকে ছড়িয়ে দিয়েছ সম্মুখে-পশ্চাতে
ডাইনে-বামে, চতুর্দিকে।

ভারতবর্ষকে ভালবেসে
অন্ধ-তমোনিশায় আঘাত হেনে
সহস্র আলোর দীপ জ্বালিয়েছ মানুষের অন্তরে
বিপ্লবের আগুনকে মন্ত্র দিয়ে
দুর্বার শক্তিতে জ্বলে ওঠার পথ দেখিয়েছ ;
সাহিত্য, বিজ্ঞান, শিল্পকলায়
নবতম গতি যুক্ত করে
স্বর্ণবিভায় উজ্জ্বল পথে তাকে প্রসারিত করেছ ;
আর
মানুষের সেবায়, পরম মমতায়
নিবেদন করেছ নিজেকে।
সহস্র গোলাপের কাঁটায়
নরম দুখানি পা থেকে ঝরে পড়েছে
অজস্র রক্তবিন্দু।
তবু
এই ভারতবর্ষে
'সিংহী'র গর্জনে দুর্বার আলোড়ন তুলে
স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত করেছ নিজেকে।

## শাশ্বতী নিবেদিতা

### কাঞ্চনকুন্তলা মুখোপাধ্যায়

পশ্চিম সমুদ্রপারে শিলাপটে বসেছিলে
মহাশ্বেতা তুমি—
ধ্যানরতা ; হঠাৎ অন্তরক্ষেত্রে জেগে ওঠে
প্রজ্বলিত বিবেকের ডাক—
'হে তাপসী, ওঠো, জাগো,
দুঃখের আগুনে পুড়ে খাক
সুদূরে ভারতবর্ষ। কোটি কোটি সন্তান তোমার
অন্নহীন, শিক্ষাহীন, মাতৃহীন অনাথের মতো ;
তোমার অস্তিত্ব দিয়ে ভরে দাও সেই ঊনভূমি।
সে যে স্নিগ্ধ সুদিনের আন্তরিক সাধনায় রত
স্নেহের চন্দনস্পর্শে মুছে দাও গ্লানি তার যত।
লোকমাতা হয়ে এলে স্নাতক ঋত্বিক
সেই বিবেক-আহ্বানে ;
মলিন অন্তর কত আলো হলো
তোমার সে অকৃপণ দানে।
বিবেক-বিস্মৃত আজও এ-ভারত ; দাম্ভিক হুঙ্কারে
আস্ফালন সার শুধু ; তবু তুমি জননী, তোমারে
সন্তান নাই-বা ডাকে ? জেনো তার কল্যাণের ভার
তোমারই পবিত্র হাতে। অন্তর-বাহিরে নিঃস্ব সে-ও
প্রেয়কে কেবলই টানে, অনুজ্জ্বল তার কাছে শ্রেয়।
কে কাঁদে বুকের মধ্যে আর্তকণ্ঠে,
আজও বোঝনি তা ?
ভারতের দুঃসময়ে নিয়ে এসো ফের সেই সুমঙ্গল-ব্রত,
চিরায়মানা যে তুমি, হে শাশ্বতী,
কল্যাণমন্ত্রে নিবেদিতা।

## আছ চিরকাল

### কঙ্কাবতী মিত্র

প্রকৃতই নিবেদিত, যথার্থই নিবেদিতা তুমি
অন্ধকারে দুর্যোগে আলো পেল এ-ভারতভূমি।
মহীয়সী বীরাঙ্গনা, লোকমাতা ভারত-ভগ্নী :
স্বামীজীর কাছে পেলে সূর্যসম প্রলয়-অগ্নি।
এ-প্রলয়ে ঘুচে গেল কত বাধা, মিথ্যার জাল
লোকমাতা নিবেদিতা জানি তুমি আছ চিরকাল।

## ভগিনী নিবেদিতা

### নক্ষত্র রায়

কখনো ভগিনী তুমি, কখনো বা তুমি লোকমাতা
'জীবে সেবা'-ব্রতে নিবেদনে তুমি নিবেদিতা।
পরাধীন কুণ্ঠিত আমাদের দেশ
রাহুগ্রাসে লুণ্ঠিত যখন নিঃশেষ—
এলে মাতা, করে নিলে জয়
প্রেম সেবা মমতায় এ-দেশের সকল হৃদয়।

প্রবন্ধ

# ভগিনী নিবেদিতা পরিকল্পিত জাতীয় উৎসব, জাতীয় পুরস্কার, জাতীয় প্রতীক ও জাতীয় পতাকা

শঙ্করীপ্রসাদ বসু

ইংল্যান্ডের এক শিক্ষয়িত্রী মার্গারেট এলিজাবেথ নোবলকে ভারতের সেবায় আত্মনিয়োগ করার জন্য আহ্বান করে স্বামীজী লিখেছিলেন: "তোমার মধ্যে আছে জগৎ-আলোড়নকারী শক্তি।" অভ্রান্ত দৃষ্টি। নিবেদিতা সত্যই আলোড়ন সৃষ্টি না করে পারতেন না—যত অন্তরালে থেকে কাজ করার চেষ্টা করুন না কেন। যখন তিনি শান্ত তখনও তা জলস্তম্ভিত মেঘের স্তব্ধতা; যখন স্থির তখন উত্থিত তরঙ্গের ভেঙে-পড়ার পূর্বক্ষণের স্থিরতা। তাঁর ছিল ধাবিত হওয়ার পূর্বে অগ্নিশিখার নিবাত সমাহিতি। নিবেদিতাকে তো জগতের যুদ্ধক্ষেত্রে ধাবমান জ্বলন্ত তলোয়ার বলেই চিহ্নিত করেছিলেন এক মানবতাবাদী সংগ্রামী পাশ্চাত্য লেখক। ভারতীয় জীবনের নানা পর্যায়ে নিবেদিতা যেসব আলোড়ন সৃষ্টি করেছিলেন, তাদের মধ্যে জাতীয় আন্দোলনের ক্ষেত্রে আলোড়ন অবশ্য অন্যতম প্রধান। নিবেদিতার ক্ষেত্রে জাতীয় আন্দোলন নিছক রাজনৈতিক আন্দোলন নয়, তা সর্বাত্মক দেশাত্মবোধের উদ্বোধনী সাধনা। নিবেদিতা এই দেশাত্মবোধের নাম দিয়েছিলেন 'জাতীয়তা'—যার অন্তর্ভুক্ত শিল্প, সাহিত্য, বিজ্ঞান, শিক্ষা, ইতিহাস, সমাজতত্ত্ব, লোকসংস্কৃতি—সবকিছু। এককথায় নিবেদিতার দৃষ্টিতে জাতীয়তা মানে জাতীয় রেনেসাঁস। দেশীয় ঐতিহ্যের ভিত্তিতে প্রগতিশীল চিন্তা ও চেতনাসম্পন্ন ভারতবর্ষ গঠনের যে-প্রেরণা নিবেদিতা স্বামী বিবেকানন্দের কাছ থেকে লাভ করেছিলেন, তাকে প্রায় এক দশকের কার্যকালে ক্রিয়াশীল বাস্তব রূপ দিতে চেষ্টা করেছেন। এক্ষেত্রে কর্মসাফল্য অপেক্ষা তাঁর মনন-নেতৃত্ব কম গুরুত্বপূর্ণ ছিল না। শেষোক্ত বিষয়ে অগ্রণী ভূমিকার জন্য তিনি জাতীয়তা-দর্শনের অন্যতম শ্রেষ্ঠ প্রবক্তা বলা যায়, শ্রেষ্ঠ স্থানটি অবশ্যই স্বামী বিবেকানন্দের। নিবেদিতার গভীর ও ব্যাপক মনস্বিতার দ্বারা নির্মিত জাতীয়তা-দর্শন ভাব-বিশৃঙ্খলার মধ্যে দেশ ও সমাজগঠনে যোগ্য সহায়তা করতে আজও সমর্থ।

১৯০২ খ্রীস্টাব্দের ৪ জুলাই তারিখে স্বামী বিবেকানন্দের দেহান্তের পরে ভগিনী নিবেদিতার নয় বছরব্যাপী কার্যাবলীর চরিত্র বিশ্লেষণ করলে আমাদের স্বীকার করতে হবে—ভারতীয় জাগরণের চরিত্র অনুধাবনে এবং সেই জাগরণকে সর্বমুখী করার ব্যাপারে (অর্থাৎ জাগরণকে 'রেনেসাঁস' করে তোলার ব্যাপারে) নিবেদিতার তুল্য চেষ্টা অন্য কারো মধ্যে দেখা গিয়েছে কিনা সন্দেহ। কথাটা বিস্ময়কর হলেও প্রমাণসিদ্ধ। এখানে স্মরণীয় ব্যতিক্রম স্বামী বিবেকানন্দ। কিন্তু তিনি তাঁর কর্মজীবনের সংক্ষিপ্ততার জন্য চিন্তাকে সর্বথা কার্যে পরিণত করতে পারেননি, যার দায়ভার তিনি বহুলাংশে নিবেদিতার ওপর দিয়ে গিয়েছিলেন। পরবর্তী কালে নিবেদিতা তাঁর প্রধান গ্রন্থগুলিকে তাঁর মারফত স্বামীজীর রচনা বলেই মনে করেছেন।

ভারতীয় নবচেতনার তাৎপর্য বুঝে তাকে কর্ম-মুখী করার মতো মানসিক সম্পন্নতা যে নিবেদিতার ছিল, তা সমকালের মনীষীদের দৃষ্টি এড়ায়নি, বিশেষতঃ তাঁর পাশ্চাত্য-বন্ধুরা এবিষয়ে অধিক অবহিত ছিলেন, কারণ তাঁরা কিছুটা নির্লিপ্তভাবে ভারতীয় প্রেক্ষাপটে দেখতে পারতেন। জাতীয় আলোড়নের অন্তর্গত ভারতীয়দের পক্ষে এক্ষেত্রে নিরপেক্ষ বিচার করা কিছু কঠিন ছিল।

নিবেদিতা উপযুক্তভাবে পূর্বোক্ত ভূমিকা গ্রহণ করতে পেরেছিলেন, যেহেতু তাঁর মধ্যে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য উভয় শিক্ষার সম্মিলন ঘটেছিল। এই দুই শিক্ষাকে ধারণ করার মতো মনস্বিতা তাঁর ছিল এবং তাকে কার্যকর করার মতো চারিত্রশক্তির অধিকারীও তিনি ছিলেন।

নিবেদিতার মনীষার প্রসঙ্গে এইটুকু বলে নেওয়া যায়—আমরা তাঁর বিষয়ে যেসব স্মৃতিকথা পেয়েছি

তাদের কোন একটিতেও তাঁর আশ্চর্য মনস্বিতার অনুল্লেখ আছে কিনা সন্দেহ। এবিষয়ে সম্ভ্রমপূর্ণ মন্তব্য যাঁরা করেছেন তাঁদের মধ্যে বিবেকানন্দ, রবীন্দ্রনাথ, জগদীশচন্দ্র থেকে প্যাট্রিক গেডেস পর্যন্ত বিরাট মনীষীরা আছেন।

॥ ১ ॥

### জাতীয় উৎসব

তাঁর মনস্বিতা, তাঁর ভারতপ্রেম, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য জীবনদর্শন ও জীবনধারা সম্পর্কে তাঁর নিজস্ব জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা, 'জাতীয়তা' সম্পর্কে তাঁর ধারণা এবং এসমস্ত কিছুর ওপরে স্বামীজীর প্রভাব নিবেদিতাকে এক অপূর্ব রাষ্ট্রনৈতিক দর্শনের অধিকারী করেছিল। ভারতে জাতীয়তা সৃষ্টির অঙ্গ হিসাবে নিবেদিতার একটি বিশেষ পরিকল্পনা ছিল। তা ছিল একটি জাতীয় উৎসব, একটি জাতীয় পুরস্কার, একটি জাতীয় প্রতীক এবং একটি জাতীয় পতাকার পরিকল্পনা। ইউরোপের পরাধীন দেশগুলির স্বাধীনতা-আন্দোলন এবং জাতীয়তা-আন্দোলনের কিছু শিক্ষা নিবেদিতা ভারতের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করতে ইচ্ছুক ছিলেন। সেইসব দেশে প্রচলিত 'জাতীয় পুরস্কার', 'জাতীয় শোভাযাত্রা', 'জাতীয় দিবস', 'জাতীয় প্রতীক', 'জাতীয় পতাকা' ইত্যাদির অনুরূপ ব্যাপার তিনি এদেশে প্রবর্তন করতে চেয়েছিলেন।

স্বদেশী আন্দোলনকালে বঙ্গভঙ্গ দিবস ও রাখী-বন্ধন দিবস ১৬ অক্টোবরকে 'সর্বভারতীয় দিবস' বলে ঘোষণা করা হয়েছিল। ১৯০৪ খ্রীস্টাব্দ থেকেই নিবেদিতা এই ধরনের একটি দিবসে সমারোহপূর্ণ প্রদর্শনী ও শোভাযাত্রার ( pageant ) কথা ভেবে আসছিলেন। মিস ম্যাকলাউড 'ওয়ারউইক পেজান্ট' দেখে পত্রে তার উল্লেখ করায় নিবেদিতা উৎসাহের সঙ্গে ২৫ জুলাই, ১৯০৬-এ লেখেন ঃ

"দুবছর আগে সরবোন-শোভাযাত্রা দেখার পর থেকে সেই ভাবটি আমি এখানে ঢুকিয়ে দেবার চেষ্টা করছি। তোমার চিঠি নতুনতর প্রেরণা এনে দিল—আমি ১৬ অক্টোবর 'সর্বভারতীয় দিবস' উপলক্ষে ভারতীয় ইতিহাস সংক্রান্ত একটি নাগরিক শোভাযাত্রার কথা বলছি বা লিখছি। আশা করি ব্যাপারটি এগোবে। ওয়ারউইক পেজান্ট-এর সঙ্গে তুলনা করা হলে স্বীকার করতে হবে, আমাদের সামর্থ্য খুবই সামান্য, আয়োজন সাদামাটা। কিন্তু এসব ক্ষেত্রে আসল হলো প্রাণ—বহিরঙ্গ-সজ্জা নয়। এখানকার গলিতে তুমি পুজা বা বিবাহের শোভা-যাত্রা দেখেছ। ওগুলি হলো মধ্যযুগীয় নাগরিক শোভাযাত্রা। এই সকলের দ্বারা ভারতীয় জনগণ যে অভ্যস্ত নৈপুণ্য অর্জন করেছে—তাই দিল্লীর দরবারকে ওহেন অপূর্ব করে তুলেছিল। আহা, এখানকার জীবন নিজ মৌল পদার্থে কিনা সমৃদ্ধ, সুন্দর এবং মহান—শিল্প-নাটক-জাতীয়তা—সব-কিছু। আহা, যদি বিরাট কেউ উঠে পড়ে এই সবকিছুকে সংগঠিত করতে পারে। আমি অবশ্য ব্যাপারটা দর্শন করতে পারছি, কিন্তু আমার কাজের ও কথার শক্তি আগের থেকে [ অসুস্থতার জন্য ] এত হ্রাস পেয়েছে যে, আমি যা দেখছি তার অর্ধেকও প্রকাশ করতে পারছি না।"

নিবেদিতা প্রসঙ্গটি নিয়ে অবিলম্বে একটি প্রবন্ধ লিখেছিলেন 'ইন্ডিয়ান ওয়ার্ল্ড' পত্রিকায় জুলাই-ডিসেম্বর, ১৯০৬ সংখ্যায় ( নিবেদিতা রচনাবলী, ৫ম খণ্ড, পৃঃ ২০-২৩ )—'নোট অন ইন্ডিয়ান হিস্টরিক পেজান্ট'। লেখাটিতে নিবেদিতার অগ্রণী দৃষ্টির আর একটি নিদর্শন পাওয়া যায়।

জাতীয়তাকে সর্বাত্মক করে তুলতে ইচ্ছুক নিবেদিতা চেয়েছেন, ভারতবাসী ব্যাপক ইতিহাস-চেতনা লাভ করুক, যার দ্বারা তারা সৃষ্টিশীল ও গতিশীল ভারতীয় জীবনধারার সঙ্গে সাক্ষাৎভাবে যুক্ত হয়ে উঠতে পারে। তাঁর আকাঙ্ক্ষা ঃ একদিকে আসবেন নতুন ভারতীয় ঐতিহাসিকগণ প্রেমে ও প্রেরণায় পূর্ণ হয়ে, যাঁরা সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থসন্ধ ইউরোপীয় ঐতিহাসিকদের দাসত্ব না করে সত্যের সন্ধানে একান্ত শ্রমে উদ্ধার করবেন অজ্ঞাত উপাদান এবং মানুষের প্রতি দায়িত্ববোধে উদ্বুদ্ধ হয়ে সজীব দৃষ্টিতে করবেন ঐসব তথ্যের পর্যালোচনা। কিন্তু একই সঙ্গে স্বীকার্য, এই সকল ঐতিহাসিকের গবেষণা ও আবিষ্কারের ফলভোগ তো সাধারণ মানুষ করতে পারবে না—ওসব নিবদ্ধ থাকবে শিক্ষিত শ্রেণীর পাঠকক্ষে। অশিক্ষিত বা নাতিশিক্ষিত জনসাধারণকে ভারতীয় ইতিহাসের প্রবহমান ধারায় সম্মুখীন করার উপায় কি ? এই সাধারণ মানুষেরা

ধর্মীয় উৎসব ও শোভাযাত্রাদির মাধ্যমে ভারতের ধর্মধারার রূপ সম্বন্ধে অবহিত। নিবেদিতা চাইলেন—ঐ ধরনের মাধ্যমগুলি ব্যবহার করা হোক জাতীয় চেতনাসৃষ্টির ক্ষেত্রে। এক্ষেত্রে অগ্রণী চিন্তাবিদ্ তিনি। পূর্বেই অবশ্য এই প্রকার প্রয়োজন অনুভব করে তিলক পুনায় গণপতি উৎসব ও শিবাজি উৎসবের প্রবর্তন করেছিলেন। ওর প্রথম উৎসবটি ছিল সম্পূর্ণ হিন্দুধর্মীয়, দ্বিতীয়টি ঐতিহাসিক হলেও মুসলমানদের সন্দেহ-লক্ষ্য। নিবেদিতা ঐতিহাসিক শোভাযাত্রার প্রস্তাব করার সময়ে বিশেষ সতর্ক ছিলেন, যাতে এই অনুষ্ঠান ধর্মীয় বা সাম্প্রদায়িক হয়ে না ওঠে। তাছাড়া ব্যবহারিক অন্য অসুবিধার কথাও তিনি জানতেন। দরিদ্র পরাধীন দেশ, সঙ্কুচিত তার সামর্থ্য, জনগণও নানা বিষয়ে আবদ্ধদৃষ্টি। সেসব মনে রেখেই তিনি তাঁর পরিকল্পনা উপস্থিত করেছিলেন। সেখানে তাঁর এই ব্যাকুল কামনাই উন্মোচিত হয়েছিল—প্রতিটি ভারতীয়ের কাছে জীবন্ত হয়ে উঠুক তার দেশ ও তার মানুষ।

প্রবন্ধটির গোড়ায় ছিল ওয়ারউইক পেজান্ট-এর মনোহারী বর্ণনা। পশ্চাদ্পটে অ্যাভন নদী, মুক্ত আকাশ, বিস্তীর্ণ শ্যামল প্রান্তর। হাজার হাজার মানুষের শোভাযাত্রা, প্রাচীনকালের সাজ-পোশাকে, অনুকৃত ভঙ্গিতে। হাজার হাজার দর্শক, তাদের আনন্দধ্বনি সর্বাধিক উত্তাল হয়েছে যখন সবশেষে দেখা গিয়েছিল—অ্যাভন নদীতে রাজ-তরণীতে আসীনা কুইন এলিজাবেথকে।

নিবেদিতা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলেছেন: "কখন আমরা ভারতবর্ষের ইতিহাসকে ঐভাবে প্রদর্শিত দেখতে পাব?" "হ্যাঁ, এই প্রকারের শোভাযাত্রাই ভারত-ইতিহাসের বিপুল ধারাকে বাস্তব রূপদান করতে সমর্থ।"—নিবেদিতা লিখেছেন। ইতিহাস কাকে বলে? "জাতীয় চৈতন্যই আত্মপ্রকাশিত হয় ইতিহাসের মধ্যে, যেমন মানুষের আত্মবোধ ঘটে নিজ জীবনের স্মৃতি ও অনুষঙ্গের মধ্যে।" স্বদেশী যুগে ভারতীয়দের মধ্যে ইতিহাসচেতনার স্ফুরণ নিবেদিতা লক্ষ্য করেছিলেন। সানন্দে তিনি লিখেছেন: "ইতিমধ্যেই আমাদের মধ্যে দ্রুতগতিতে ঐতিহাসিক নাটকের আগমন ঘটছে; আমাদের এই শহর অনুভব করছে যে, থিয়েটারগুলি জগৎ-পরিবর্তনকারী ভাবসমূহের দর্শন ও বিস্তারের সর্বোচ্চ ও সর্বমহৎ কর্তব্য গ্রহণ করতে পারে।"

নিবেদিতা ভারতের ঐতিহাসিক নগরীগুলির ট্যাব্লো-র পরিকল্পনাও উপস্থিত করেছিলেন। দিল্লী, চিতোর, বারাণসী, অমৃতসর, পুনা প্রভৃতি নগরীর ভূমিকায় অবতীর্ণ হবে এক-একটি মূক অভিনেতা-দল। তাদের সাজপোশাক হবে বর্ণময় —নাটকীয় বাস্তবতা সৃষ্টির ক্ষেত্রে যার গুরুত্ব সবিশেষ। ইতিহাসের বিভিন্ন পর্বে যেসব নগরী প্রাধান্য পেয়েছে তারা আসবে ক্রমান্বয়ে, কিন্তু কেন্দ্রে অবশ্যই থাকবে দিল্লী।

এই সকলের তুলনায়, নিবেদিতা বললেন, ঐতিহাসিক শোভাযাত্রা ভারতের ক্ষেত্রে সহজতর ব্যাপার। কারণ সামাজিক ও ধর্মীয় শোভাযাত্রায় অভ্যস্ত এই দেশ। বিবাহ, পূজা প্রভৃতির সময়ে মুহুর্মুহু শোভাযাত্রা। এক্ষেত্রে প্রচুর পরিমাণে বলবৎ রয়েছে যে-প্রেরণা ও শিক্ষা—তাকে প্রচুর পরিমাণে প্রবাহিত করতে হবে জাতীয়তার খাতে। সমস্যাও আছে। এই ধরনের শোভাযাত্রায় নারীর উপস্থিতি অতীব প্রয়োজন, অথচ ভারতীয় মন ঐক্ষেত্রে নারীকে দেখতে অনিচ্ছুক। নিবেদিতা বললেন, বিতর্কে শক্তিক্ষয় করার প্রয়োজন নেই। অ্যাসকাইলাস ও শেক্সপীয়ারের কালে তাঁদের নাটকে তো নারীর ভূমিকা বালকেরা নিত। এখানেও তেমন হতে পারে।

দৈন্য আছে অবশ্যই, উৎকৃষ্ট সাজসজ্জার সঙ্গতি নেই, কিন্তু হতাশ হবার কারণও নেই। "সাজ-পোশাক, দৃশ্যপটের দ্বারা নাটক মহৎ হয় না, তা মহৎ হয় ভাবময়তার প্রকাশে। ধরা যাক, গ্রামে, গোলাবাড়িতে অভিনয় হচ্ছে, সেখানে যদি কোন প্রতিভাবান অভিনেতা থাকেন তাহলে সেই নাটক লন্ডন বা প্যারিসের নাট্যাভিনয়ের চেয়ে অনেক বেশি সংবেদনশীল হয়ে উঠতে পারে।"

এখনি আরম্ভ করে দাও ঐতিহাসিক শোভা-যাত্রা, যে-অবস্থায় আছ সেখান থেকেই—নিবেদিতা আহ্বান জানালেন। জনগণ ক্রমে যতই ঐতিহাসিক ভাবাবহের সান্নিধ্যলাভ করবে ততই উন্নত হয়ে উঠবে এই প্রদর্শনী। গ্রামে-গ্রামে, বিদ্যালয়ে-

বিদ্যালয়ে, হাটে-বাটে-খেলার মাঠে—সর্বত্র হোক এর অনুষ্ঠান। "আমরা চাই শিশুরা, অশিক্ষিতরা স্বতঃস্ফূর্তভাবে জোট বেঁধে এইসব ভূমিকায় অংশ নিক, যাতে তারা স্বদেশের ইতিহাসচেতনা লাভ করে। এটা তাদের কাছে হয়ে উঠুক প্রবল বাসনার ধন—যেমন পাঞ্জাবের শিশু ও কৃষকদের কাছে রামলীলা-উৎসব, উত্তর-পশ্চিম ভারতে শিয়াদের কাছে মহরম, হিন্দু দেশীয় রাজ্যসমূহের বীরাষ্টমী শোভাযাত্রা, ঢাকায় জন্মাষ্টমী। তেমন বাসনা যদি জাগে তাহলে আমরা আশা করতে পারব—নিজেদের মহা শক্তিশালী জাতিতে সংগঠিত করবার জন্য যারা মাতার আহ্বানে সাড়া দিয়েছে, তাদের হৃদয়-মন এখন উদ্বেলিত হয়েছে সক্রিয় জাতি-চৈতন্যে। জাতীয়তাকে বাস্তব রূপ দিতে গেলে সকল শিশুসন্তানের কাছে তার দেশের ইতিহাসকে প্রত্যক্ষ ভাব-মাধ্যম করে তোলা অত্যাবশ্যক।"

নিবেদিতা তাই প্রস্তাব করলেন, পরবর্তী (১৯০৬) ১৬ অক্টোবরের 'জাতীয় দিবসে' ছাত্ররা যেন রাখীবন্ধনের ধর্মীয় উৎসবের (লক্ষণীয়, নিবেদিতা রাখীবন্ধনকে ধর্মীয় উৎসবরূপে চিহ্নিত করেছেন) অতিরিক্ত হিসাবে ঐতিহাসিক শোভাযাত্রা পথে পথে সংগঠন করে। বারো থেকে কুড়িটি 'দৃশ্য' গাড়ি করে অগ্রসর হবে, সামনে শঙ্খবাদকেরা, পিছনে যন্ত্র-সঙ্গীত, সঙ্গে ধ্বজপতাকা। সর্বশেষ দৃশ্যটিতে দেখা যাবে, আধুনিক ভারত—শোকাভিভূত আকারে। শোভাযাত্রা দিবসকালেও হতে পারে, কিন্তু রাত্রেই সুন্দর—সার সার জ্বলন্ত মশাল, মাঝে মাঝে তাতে ইন্ধন নিক্ষেপ, আর উচ্ছ্বসিত অগ্নিঝলক।

এই প্রসঙ্গে নিবেদিতা বিশেষ জোর দিয়েছিলেন 'ঐতিহাসিক' কথাটিতে—'ধর্মীয়' নয়। রামায়ণ-মহাভারতকে যদি শোভাযাত্রায় আনা হয়—ইতি-হাসের অংশ হিসাবেই আনা হবে। মুসলিম যুগের গৌরবোজ্জ্বল অংশও আনা যায়, স্থানীয় ইতিহাসের উল্লেখযোগ্য অংশও।

নিবেদিতা শেষ করলেন এই বলে:

"স্পষ্টই দেখা গেল, এখানে আমরা কেবল আমোদ-আহ্লাদের বস্তু সরবরাহ করতেই চাইনি—চেয়েছি সংস্কৃতির এক নতুন মহান বাহনকে হাজির করতে। এই উপলক্ষে দেশীয় ভাষায় অনুষ্ঠানসূচী মুদ্রিত করে বিতরণ করা হোক—তাতে থাক প্রতিটি দৃশ্যের নাম ও সেবিষয়ে সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যাত্মক বিবরণ। গৃহছাদ, বারান্দা, ফুটপাত হোক দর্শক-আসন। কেবল মহিলা আছেন এমন প্রতিটি বাড়িতে কিছু পুরুষ উপস্থিত থাকবেন অভিভাবক হিসাবে, তাঁরা প্রতিটি উৎসুক প্রশ্নের উত্তর দিয়ে ব্যাপারটিকে অধিকতর স্পষ্ট করে তুলবেন। এই ভাবে শোভাযাত্রার সময়টিতে সমস্ত শহরটি যেন একটি বিদ্যালয়ে পরিণত হয়, সে এমন বিদ্যালয় যার আছে হৃদয়—সেই সঙ্গে মস্তিষ্ক।"

জনমুখী অসাধারণ একটি পরিকল্পনা, যার মধ্যে অতীতকে বর্তমানের মধ্যে আহ্বান করে ভবিষ্যতের দিকে প্রসারিত করার অভিপ্রায় ঘোষিত এবং এই প্রণালীর প্রতিটি অংশে গতি ও প্রগতির প্রাণাবেগ সংযোজিত।

॥ ২ ॥

## জাতীয় পুরস্কার: বিবেকানন্দ মেড্যাল

অন্যতম জাতীয় পুরস্কার হিসাবে নিবেদিতা 'বিবেকানন্দ গোল্ড মেড্যাল' প্রবর্তন করতে চেয়ে-ছিলেন। 'ডন' পত্রিকায় তার বিজ্ঞপ্তি এবং 'রিভিউ অব রিভিউজ' পত্রিকায় তার প্রথম বছরের প্রাপকের নাম ও রচনার বিবরণ আগে দিয়ে এসেছি।

বিবেকানন্দ মেড্যালের আকার নিয়ে নিবেদিতা বিখ্যাত ফরাসি এনগ্রেভার মঁসিয়ে লালীক-এর সঙ্গে আলোচনা চালিয়েছেন। মেড্যাল ব্যাপারটির একটা অনুষঙ্গ আছে, যা-তা ভাবে তাকে তৈরি করা যায় না; সেটি ভাববহ এবং শিল্পসম্মত হবে—এসব দিকে তাঁর বিশেষ সচেতনতা ছিল। মিস ম্যাকলাউডকে ২৮ ফেব্রুয়ারি ১৯০৬-এ লেখেন, তিনি যেন মঁসিয়ে লালীকের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে নিবেদিতার হয়ে কয়েকটি কথা জেনে নেন—মেড্যালকে গোল হতেই হবে এমন বাধ্যবাধকতা আছে কিনা, মেড্যালে এনগ্রেভ না রিলিফ কোনটি করা উচিত, যোদ্ধার ঢালের আকারে সেটি তৈরি করলে কেমন হয়, কিংবা গলার পেনডেন্ট-এর আকারে ইত্যাদি ইত্যাদি। নিবেদিতা পত্রের সঙ্গে মেড্যালের প্রস্তাবিত বিভিন্ন আকার স্কেচ করে পাঠিয়েছিলেন। লালীকের অভিমত তিনি জেনেছিলেন—মেড্যালকে অবশ্যই গোলাকার হতে হবে এবং তাতে অনুচ্চ রিলিফ

থাকবে। [ ২. ৫. ১৯০৬ ] লালীককে তিনি আরও প্রশ্ন করে পাঠিয়েছিলেন মেড্যালের বিষয়ে। মেড্যাল-বিজয়ীর নাম মেড্যালে মুদ্রিত থাকাকে তিনি আবশ্যিক মনে করেছিলেন এবং টাঁকশালে অথবা কোন ইঞ্জিনীয়ারিং ফার্মে সেটি কিভাবে করিয়ে নিতে পারবেন, তার চিন্তাও করেছেন। [ ২৫. ৭. ১৯০৬ ]

বিবেকানন্দ মেড্যাল এবং জাতীয় প্রতীকের আলোচনা নিবেদিতা অনেক সময়ে একত্রে করেছেন। জাতীয় প্রতীকচিহ্ন অবশ্য কেবল বিবেকানন্দ মেড্যালে নয়, অন্যত্রও থাকবে, যেমন জাতীয় পতাকায়। বিবেকানন্দ মেড্যাল-সূত্রে তিনি লিখেছেন: "মেড্যালে আড়াআড়িভাবে বজ্রচিহ্ন স্থাপন করব। আমরা বজ্রকে ভারতের জাতীয় প্রতীক বলে গ্রহণ করছি।... জাতীয়তা নামক ভাবটিকে আমি সর্বপ্রকারে জনপ্রিয় করতে চাইছি। সুতরাং আমি নিশ্চিত যে, মঁসিয়ে লালীক আমাকে উপদেশাদি দেবেন। আমি চেয়েছি, সর্বদাই চেয়েছি কিন্তু সফল হইনি—বিবেকানন্দের প্রতীকরূপে একটি মশাল তৈরি করতে যাতে শিখাগুলি পার্শ্বে ও ঊর্ধ্বে উচ্ছ্রিত। জানি না তার সঙ্গে ভারতীয় ত্রিশূলকে যুক্ত করে দেওয়া যাবে কিনা, বোধহয় না। যদি বাঙালী নারীকে মেড্যাল দিতাম তাহলে ত্রিশূলটিকে একটি তারকাযুক্ত করতাম, সেই সঙ্গে বাঙলা বা সংস্কৃত বাণী—'ধ্রুবতারকা দেখো'।—কারণ ঐ কথাগুলি শিব বিবাহকালে উমাকে বলেছিলেন।... ইউরোপীয়রা সাধারণতঃ যেভাবে মশাল আঁকে—ছাগশৃঙ্গের আকারে নির্মিত পাত্রে এলোমেলো পুষ্পসজ্জা—ও-জিনিসটিকে আমি অত্যন্ত অপছন্দ করি। অপর পক্ষে প্রাচ্যে নানা ধরনের মশালের আকার সর্বদা দেখা যায়, তাদের মধ্যে সবচেয়ে সুন্দর হলো যথেচ্ছ-বাঁধা আঁটি কিংবা পাকানো দড়ির আকার। মঁসিয়ে লালীক যাতে কিছু উপদেশ-নির্দেশ পাঠিয়ে দেন, তাঁকে অবশ্যই সে-অনুরোধ করো। তাঁকে বলো, আমি নিতান্ত অজ্ঞ, আঁকতে জানি না, তবু কখনো কখনো সুন্দর চিন্তা মাথায় আসে, আর আমি কোন বিষয়ে অনিয়ন্ত্রিত কল্পনাকে ঘৃণা করি।" [ ২৮. ২. ১৯০৬ ]

বিবেকানন্দ মেড্যালের আকার নিয়ে আরেকটি চিঠিতে [ ২. ৫. ১৯০৬ ] আলোচনার পরে নিবেদিতা লিখলেন: "আমি এখন বুঝতে পেরেছি, ঠিক মেড্যালের সঙ্গে ভুল মেড্যালের পার্থক্য কোথায়। সেক্ষেত্রে মনে হচ্ছে, গোল্ড মেড্যাল অত্যন্ত খরচ-সাপেক্ষ জিনিস, নয় কি? সেদিন বিবেকানন্দ মেড্যাল দিয়েছি জাতীয়তা-তত্ত্বের জন্য—একটি সর্বভারতীয় প্রতিযোগিতায়। কিন্তু সেটি দীন ব্যাপার—আর মেড্যালই নয়। যদি মঁসিয়ে লালীক অথবা কোন ইউরোপীয় শিল্পীর সঙ্গে দেখা করার সুযোগ হয়, মঁসিয়ে লালীকই অবশ্য সর্বোচ্চ অর্থারিটি, তাহলে তাঁকে অনেক প্রশ্নই করব। দু-বছর পরে আমাকে আরেকটি মেড্যাল দিতে হবে—ঘোষিত ৬-৭টি বিষয়ের ওপরে প্রবন্ধের জন্য—সেটি সর্বভারতীয় প্রতিযোগিতাই হবে—এবং পুনশ্চ বিবেকানন্দ মেড্যাল।"

বিবেকানন্দ মেড্যালের গায়ে নিবেদিতা বজ্রচিহ্ন ছাড়াও উৎকীর্ণ করতে চেয়েছিলেন দুটি অনুশাসন দেবনাগরী অক্ষরে: " 'বন্দেমাতরম্'—যা এখন হয়ে উঠেছে রণধ্বনি এবং 'ওয়া গুরু কি ফতে'—যে-ধ্বনি স্বামীজীর অত্যন্ত প্রিয় ছিল।" [ ২৫.৭.১৯০৬ ]

॥ ৩ ॥

## জাতীয় প্রতীক

ভারতের জাতীয় প্রতীকের চিন্তা নিবেদিতার মনকে অত্যন্ত অধিকার করেছিল। ১৯০৪ খ্রীস্টাব্দে বুদ্ধগয়ায় ভ্রমণকালে তিনি বজ্রচিহ্নকে দেখেন ( সঙ্গে ছিলেন জগদীশচন্দ্র বসু, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, যদুনাথ সরকার প্রভৃতি ) এবং উদ্দীপ্ত হয়ে অবিলম্বে তাকে জাতীয় প্রতীক করতে চান। ১ ডিসেম্বর, ১৯০৪-এ তিনি মিস ম্যাকলাউডকে লেখেন:

"আমরা বজ্রকে জাতীয় প্রতীক হিসাবে গ্রহণ করেছি। ফরাসিরা যেমন নেপোলিয়ান বোঝাতে কেবল L'homme [ The man ] বলে, তেমনি পুরনোকালে বুদ্ধ না লিখে বজ্র বললেই চলে যেত। এবিষয়ে অনেক কাহিনী আছে, যেগুলি এখন বলে উঠতে পারব না। কিন্তু তুমি নিশ্চয় স্মরণ করতে পারবে, স্বামীজী মাঝে মাঝে নিজেকে বজ্র বলতেন।"

বজ্র-প্রতীকের গ্রহণযোগ্যতা সম্বন্ধে নিবেদিতা ২৫ জুলাই, ১৯০৬-এ লিখেছিলেন:

"আমি বজ্রকে ভারতের প্রতীক করতে চাই, তা তুমি জানো। ওটি বুদ্ধের চিহ্ন। ওটি শিবের ত্রিশূলের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত। স্বামীজী নিজেকে বজ্র বলতেন। তদুপরি এটি 'প্রতিমা' নয়, সুতরাং মুসলমানদের পক্ষে এটিকে প্রত্যাখ্যান করা উচিত হবে না। দুর্গা বজ্রকে তাঁর এক হস্তে ধারণ করেন।"

এই বজ্র-তত্ত্বকে তিনি পতাকা প্রসঙ্গে আরও ব্যাখ্যা করেছেন।

॥ ৪ ॥

## জাতীয় পতাকা

জাতীয় আন্দোলনের ইতিহাসে জাতীয় পতাকার সবিশেষ গুরুত্ব। স্বাধীনতা-আন্দোলনের নানা পর্যায়ে নানা প্রকার জাতীয় পতাকা প্রস্তাবিত হয়েছে। সেই সকল পতাকার রূপ ও ভাব সম্বন্ধে অনেক আলোচনা আমরা দেখেছি। কিন্তু খুবই দুঃখের বিষয়, তাদের মধ্যে নিবেদিতা-কৃত জাতীয় পতাকার উল্লেখ দেখা যায় না, যদিও 'মডার্ন রিভিউ'-এর মতো বিখ্যাত পত্রিকায় নভেম্বর ১৯০৯ সংখ্যায় তিনি ঐ বিষয়ে বহু চিত্র-সম্বলিত একটি উৎকৃষ্ট প্রবন্ধ ছদ্ম-নামে লিখেছিলেন—'The Vajra as a National Flag' এবং তাতে পতাকার যে-ছবি দিয়েছিলেন সেটি রূপসৌন্দর্যে অনবদ্য—আর তার ব্যাখ্যা একেবারে প্রথম শ্রেণীর। কোন পরিকল্পিত ভারতীয় পতাকা সম্বন্ধে সমতুল ব্যাখ্যা এখনো আমাদের চোখে পড়েনি।

উক্ত প্রবন্ধ প্রকাশের বেশ কয়েক বছর আগে থেকেই নিবেদিতা জাতীয় পতাকা নিয়ে চিন্তা-ভাবনা শুরু করেছেন এবং পতাকা প্রস্তুত করে রাজনৈতিক মহলে সেটি দেখিয়েছেন। ৮ ফেব্রুয়ারি, ১৯০৫ তারিখের চিঠিতে তিনি লিখেছেন:

"আমরা জাতীয় পতাকার জন্য একটা ডিজাইন বেছেছি—বজ্র এবং তা দিয়ে ইতিমধ্যে পতাকা তৈরি করেছি। দুঃখের বিষয়, আমি চীনা যুদ্ধ-পতাকাকে আদর্শ হিসাবে গ্রহণ করেছিলাম—রক্ত-প্রচ্ছদের ওপরে কৃষ্ণবর্ণ নক্সা। ভারতের মনে এটা সাড়া জাগায়নি, সুতরাং পরেরটা হবে লালের ওপর পীত নক্সা।"

পতাকা কিভাবে প্রস্তুত করবেন, তার সম্বন্ধে আরও কিছু কথা এই চিঠিতে আছে।

প্রব্রাজিকা আত্মপ্রাণা লিখেছেন:

"নিবেদিতা আর একটি পতাকা তাঁর ছাত্রীদের দ্বারা প্রস্তুত করান—লাল হলুদে মিশিয়ে এবং সেটি ১৯০৬ কংগ্রেস প্রদর্শনীতে রাখেন।"[১]

তারিখের দিক থেকে নিবেদিতার পরিকল্পিত পতাকা যদিও সর্বাগ্রণী, তবু ঐতিহাসিকরা সে-বিষয়ে সযত্নে উদাসীন থেকেছেন। মাদাম কামা-র বহুকথিত জাতীয় পতাকা প্রথম ব্যবহৃত হয়েছে আগস্ট ১৯০৭-এ—নিবেদিতার পতাকা প্রদর্শিত হবার প্রায় বছরখানেক পরে।[২]

মডার্ন রিভিউ এর পূর্বোক্ত প্রবন্ধে নিবেদিতা জানিয়েছেন: "পত্র-পত্রিকায় ভারতের জাতীয় পতাকা উদ্ভাবনের বিষয়টি যেহেতু আলোচিত হতে

১ Sister Nivedita—Pravrajika Atmaorana, p. 189

২ চিন্মোহন সেহানবিশ তাঁর "রুশবিপ্লব ও প্রবাসী ভারতীয় বিপ্লবী" (১৯৭৩) গ্রন্থে জাতীয় পতাকার উদ্ভব নিয়ে আলোচনা করেছেন। স্বদেশী আন্দোলনের সময় জাতীয় পতাকার পরিকল্পনা সম্বন্ধে তিনি সুরেন্দ্রনাথ ঘোষ-লিখিত শচীন্দ্রপ্রসাদ বসুর একটি জীবনী থেকে প্রাপ্ত সংবাদ অনুযায়ী জানিয়েছেন: শচীন্দ্রপ্রসাদ, সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সমর্থনে একটি ত্রিবর্ণরঞ্জিত জাতীয় পতাকা প্রস্তুত করেন যেটি ৭ আগস্ট ১৯০৬, গ্রীয়ার পার্কে বয়কট দিবসে উত্তোলন করা হয় এবং নরেন্দ্রনাথ সেন, ভূপেন্দ্রনাথ বসু, আশুতোষ চৌধুরী, স্যার আবদুল হালিম গজনবী প্রমুখ মডারেট নেতারা সেটি অনুমোদন করেন। পতাকাটি নাকি ১৯০৬ কলকাতা কংগ্রেসে সভামণ্ডপের ওপরে ওড়ানো হয়েছিল। এই পতাকা মডারেটদের সমর্থন পেলেও এক্সট্রিমিস্টদের ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের লক্ষ্য হয়, যদিও ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত যুগান্তর পত্রিকায় তাকে স্বাগত জানিয়েছিলেন। মডারেট গোষ্ঠীর পতাকা কিভাবে বিপ্লবীগোষ্ঠীর একাংশের সমর্থন পেল, তার গোপন কথা সুকুমার মিত্র খুলে বলেছিলেন। বাইরে পতাকার ত্রিবর্ণের অন্য ব্যাখ্যা দিলেও ভিতরে ভিতরে তাঁরা ফরাসি বিপ্লবের ত্রিবর্ণ পতাকার অনুকরণই করতে চেয়েছিলেন। এইভাবে মডারেটীয় শীতল আচ্ছাদনের নিচে বৈপ্লবিক উত্তাপ গা-ঢাকা দিয়ে অবস্থিত ছিল। সেহানবিশ এই আলোছায়াঘন সংবাদ দেবার পরে নানা যুক্তির দ্বারা বোঝাতে চেয়েছেন—এই পতাকাই হাজির হয়েছিল মাদাম কামা-র কাছে, যা তিনি ঈষৎ রূপান্তরে ১৯০৭ স্টুটগার্টে দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকের সপ্তম কংগ্রেসে উত্তোলনের ব্যবস্থা করেন।

সেহানবিশ-রচিত এই কাহিনী পড়বার আনন্দের সঙ্গে দুঃখ এই—এঁদের কাছে নিবেদিতার পতাকা কালানুচিত মর্যাদা পেল না, যদিও প্রব্রাজিকা আত্মপ্রাণার ইংরেজিতে লেখা নিবেদিতা-জীবনী এঁর গবেষণার আগেই ১৯৬১ খ্রীস্টাব্দে

আরম্ভ করেছে", তাই তিনি বজ্র-চিহ্নিত পতাকাটির প্রস্তাব উত্থাপন করছেন। নিবেদিতা বলতে চেয়েছেন, জাতীয় পতাকাকে চাপিয়ে দেওয়া যায় না; "তা কেবল একটি জাতির প্রাণ ও ইতিহাস থেকে আবির্ভূত হতে পারে।" "পতাকা—আশীর্বাদ ও উৎসর্গের আহ্বান নিয়ে জন্মলাভ করবে জাতির আত্মলোকে।" প্রস্তাবিত পতাকার বজ্রচিহ্নকে ইতোমধ্যেই জাতীয় প্রতীক হিসাবে বহু মানুষ গ্রহণ করেছেন, ব্যবহারও করছেন [ যাঁদের অন্যতম জগদীশচন্দ্র বসু ]—এমন ঘটনার কারণ, এই চিহ্নের সঙ্গে ভারতীয় ইতিহাসের সুচিরকালের সংযোগ এবং পৃথিবীর অন্যত্রও চিহ্নটি বিভিন্ন সময়ে স্বীকৃত।

ইতিহাসের পৃষ্ঠা উল্টে নিবেদিতা গ্রীক ও রোমানদের ব্যবহৃত বজ্রের রূপ দেখিয়েছেন। "গ্রীকদের জিউস, রোমানদের জুপিটার এবং ভারতের আর্যদের ইন্দ্র—বজ্রধারী। ঐসকল বজ্র দেবতার ধ্বংসাস্ত্র।" মহাভারতে আছে, ঋষি দধীচি লোকরক্ষার জন্য বজ্র নির্মাণে নিজের অস্থি স্বেচ্ছায় দান করেছিলেন। "তাই স্বার্থশূন্য মানুষই বজ্র"। "বৌদ্ধযুগে বজ্র হলো বুদ্ধের প্রতীক।" শিবের ত্রিশূল এবং দুর্গার বজ্রের কথাও নিবেদিতা বলেছেন। ভারতীয় বজ্রের সঙ্গে পাশ্চাত্য বজ্রের শিল্পরূপের তুলনাও তিনি করেছেন। তাঁর মতে "রোমক বজ্র স্থূল বাস্তবতার নিদর্শন; ভারতীয় বজ্র শুরু থেকেই রূপময় এবং কাব্যে পূর্ণ"।

রক্তবর্ণ প্রচ্ছদে স্বর্ণবর্ণ বজ্র-আঁকা পতাকা প্রস্তুত করে নিবেদিতা তার উদ্দেশে লিখেছেন:

"এর রক্ত-রূপ অনূদিত হবে সংগ্রামের ভাষায়; স্বর্ণবর্ণ—আরব্ধ বিজয়ে; শ্বেত-অংশ—পবিত্রতায় এবং স্বদেশে ও স্বজাতির প্রতি প্রেমাবেগে।"

ভারতের পতাকা মানে ভারতবর্ষ।

"এ হলো ভারত—তার কোটি কোটি সন্তান নিয়ে।... ভারত—ভ্রাতৃত্বের শক্তিতে স্ফুরিত; ভারত—ঐক্যে আবদ্ধ; ভারত—সমষ্টিরূপে সংহত। সে-ভারতকে গভীরে, আরও গভীরে, আরও গভীরে অবতরণ করতে হবে, যার দ্বারা সে পূর্ণ শক্তির শিখরে উত্থিত হতে পারে এবং দৃষ্টিপাত করতে পারে কামনার মোক্ষধামের দিকে।"

নিবেদিতা কল্পনায় দেখলেন, পাশ্চাত্যে যেমন ঘটে থাকে তেমনি ভারতেও ঘটবে: বীরের রক্ত-স্রোতে সিক্ত পতাকাকে রণক্ষেত্র থেকে বন্দুকের গুলিতে শতচ্ছিন্ন আকারে ফিরিয়ে এনে স্থাপন করা হয়েছে দেশমাতৃকার পূজাবেদিতে।

"পতাকা একই সঙ্গে আশীর্বাদ ও সতর্কতার ঘোষণা; আত্মোৎসর্গ এবং যুদ্ধধ্বনি। এ সেই বেদি-প্রস্তর, যার মূলদেশে—আক্রমণ বা আত্মরক্ষা, যেকোন কারণেই হোক—মানুষের জীবন স্বচ্ছন্দে অর্পিত।"[৩] □

বেরিয়ে গিয়েছিল, যার মধ্যে নিবেদিতার (১৯০৬) পতাকার ওপর সচিত্র বিবরণ ছিল এবং তারও দুবছর আগে মুক্তিপ্রাণার বাঙলায় নিবেদিতা-জীবনী বেরিয়েছে, একই সংবাদসহ।

দেশ পত্রিকায় প্রকাশিত বর্তমান লেখকের ধারাবাহিক প্রবন্ধের ওপর আলোচনাসূত্রে শেখর চক্রবর্তী জানিয়েছিলেন (দেশ, ৩০. ১০. ১৯৮২), ডঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় মডার্ন রিভিউ পত্রিকায় (১৯৩১) ভারতের জাতীয় পতাকার ইতিহাসকথায় নিবেদিতার প্রস্তাবিত পতাকার উল্লেখ করেছিলেন। তিনি আরও বলেছেন, পতাকা-চর্চার বিশ্বসংস্থায় "নিবেদিতার অবদান নথিভুক্ত করার উপযুক্ত ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে।"

৩ দেশ পত্রিকায় নিবেদিতার পতাকা বিষয়ে আমার রচনার ওপর আলোচনাকালে শ্রীমতী রত্নাবলী রায় মূল্যবান সংযোজনী সংবাদ দিয়েছিলেন (৩০. ১০. ১৯৮২)। তিনি বজ্র প্রসঙ্গে নিবেদিতার বক্তব্যের সমর্থনে তথ্যসহ জানিয়েছিলেন: "বৌদ্ধ শিল্পে বুদ্ধকে বোঝাতে চক্র প্রতীক ব্যবহৃত হয়েছে", "বুদ্ধের সঙ্গে ইন্দ্রের যোগাযোগ সাহিত্যে ও শিল্পে প্রাধান্য পেয়েছে", "বজ্রযান বৌদ্ধতন্ত্রে আদিবুদ্ধ বজ্রধর অথবা বজ্রসত্ত্ব", "বুদ্ধ ও বজ্র সমসংজ্ঞক", "শিবের ত্রিশূলের সঙ্গে বৌদ্ধ বজ্রের সাদৃশ্য লক্ষণীয়"। বজ্র যে প্রতীক হিসাবে এখনো স্থানে স্থানে গৃহীত হয় বা হয়েছে তার প্রসঙ্গে বলেছেন, আমাদের জাতীয় পতাকায় বজ্র না থাকলেও বৌদ্ধ চক্র আছে, আর উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতীক বজ্রই, যার রচনা করেছেন শান্তিনিকেতনের সুরেন্দ্রনাথ কর। শ্রীমতী রায় রবীন্দ্রনাথের কল্পনায় বজ্র প্রসঙ্গে তাৎপর্যপূর্ণ মন্তব্য করেছিলেন:

"শিবের ত্রিশূল ও ইন্দ্রের বজ্রের সংযোগ একেবারে অযৌক্তিক নয়। রবীন্দ্রনাথের কল্পনায় তা ধরা পড়েছিল। 'মৃত্যুঞ্জয়' কবিতায় রয়েছে, 'দক্ষিণ হাতের শেল উঠেছে ঝড়ের মেঘপানে/সেথা হতে বজ্র টেনে আনে।' অথবা 'রাজা' নাটকের সেই পতাকাটির কথা ভোলা উচিত হবে না, যাতে 'পদ্মের মাঝখানে বজ্র' আঁকা রয়েছে। এই কল্পনার মূলে কি নিবেদিতার কোন ভূমিকা ছিল?"

নিবন্ধ

# ভারতভগিনী নিবেদিতা

## স্বামী বিমলাত্মানন্দ

শান্ত সমাহিত শিব-পার্বতীর লীলাভূমি হিমালয়ের কোলে শৈলশহর দার্জিলিঙ। পাইন বৃক্ষের মর্মর ধ্বনি, মরসুমী ফলের পূর্বাভাস শাখা-প্রশাখায়, জানা-অজানা ফুলের গন্ধে আমোদিত বাতাস। প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে অতুলনীয় সূর্যকরোজ্জ্বল কাঞ্চনজঙ্ঘা। আনন্দের ফোয়ারা চতুর্দিকে—কৈলাসবাসিনীর মর্ত্যে আগমনোৎসব।

হঠাৎ ছেদ পড়ল আনন্দ-সানাই-এর। সবেমাত্র গম্ভীর কাঞ্চনজঙ্ঘার শিখরদেশে সূর্যদেব উঁকি মারছেন। 'রায় ভিলা'য় বেজে উঠল সানাই-এর বিষাদের সুর। প্রকৃতিও যেন তাল মিলিয়ে শোক-স্তব্ধ। আকাশ গোমড়া মুখে বসে আছে। 'রায় ভিলা'য় বহু মানুষের ভিড়। এক শ্বেতাঙ্গিনীর মরদেহ বাইরে এল। আরম্ভ হলো শোকযাত্রা। অসংখ্য মানুষের মস্তক শ্রদ্ধায় অবনত। শোক-যাত্রায় শহরের বিশিষ্ট মানুষের দল। তাঁরা পুজাবকাশে দার্জিলিঙ-এ আনন্দ করতে এসে-ছিলেন। পেলেন রূঢ় আঘাত—তাঁদের আপন-জনের দেহাবসান। শোকযাত্রায় ছিলেন বৈজ্ঞানিক জগদীশচন্দ্র বসু ও তাঁর পত্নী অবলা বসু, ডাঃ নীলরতন সরকার, অধ্যক্ষ শশীভূষণ দত্ত, অধ্যাপক সুবোধচন্দ্র মহলানবীস, ব্যারিস্টার শৈলেন্দ্রনাথ ব্যানার্জী, উদ্ভিদ্‌বিদ্ বশীশ্বর সেন, সাংবাদিক রাজেন্দ্রনাথ দে, রায় বাহাদুর নিশিকান্ত সেন প্রমুখ ব্যক্তিরা। শোকমিছিল দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর হতে লাগল। হিল কার্ট রোড হয়ে বাজারের মধ্য দিয়ে সন্ধ্যার কিছু পূর্বে শোকমিছিল থামল হিন্দু শ্মশানভূমিতে। হিন্দুমতে সৎকার হলো শ্বেতাঙ্গিনীর। সৎকারের পর অশ্রুসজল আঁখিতে একে একে সবাই পরিত্যাগ করলেন শ্মশানভূমি। প্রায় বিরাশি বছর পূর্বের ঘটনা।

কে এই শ্বেতাঙ্গিনী, যাঁর মৃত্যুতে দার্জিলিঙ শহর শোকে ভেঙে পড়েছিল? সম্ভ্রান্ত মানুষেরা শবানুগমন করেছিলেন? মৃতদেহ হিন্দুমতে সৎকার হয়েছিল? শ্বেতাঙ্গিনী হলেন—ভারতকে স্বামী বিবেকানন্দের অনুপম উপহার—ভগিনী নিবেদিতা। লোকমাতা নিবেদিতা স্বামী বিবেকানন্দের সঙ্গে সাক্ষাতের পর থেকে ভারত-সেবায়, ভারত-চিন্তায় নিজের জীবনকে উৎসর্গ করেছিলেন। দার্জিলিঙে স্মৃতিস্তম্ভে খোদিত হয়েছিল তাঁর চরম আত্মোৎসর্গের কথা: "এখানে ভগিনী নিবেদিতা শান্তিতে নিদ্রিতা—যিনি ভারতবর্ষকে তাঁহার সর্বস্ব অর্পণ করেছিলেন।"

জন্মসূত্রে আইরিশ, ইংল্যান্ডে শিক্ষিতা তীক্ষ্ণধী ও স্বাধীনচেতা নিবেদিতা চিরতরে স্বদেশভূমি ত্যাগ করে ভারতবর্ষকে স্বদেশরূপে মনে-প্রাণে গ্রহণ করেছিলেন। ভারতের নারীশিক্ষায়, সাহিত্যে, বিজ্ঞানে, শিল্পে ও স্বাধীনতা-সংগ্রামে বিবিধ গুণসম্পন্না নিবেদিতা নিজেকে উজাড় করে দিয়ে-ছিলেন। তাঁর ভারত-চিন্তা ও ভারত-সেবা অতুলনীয়। সাহিত্যিক মোহিতলাল মজুমদার বলেছেন: "স্বামীজী যে-দৃষ্টিতে তাঁহার দেশকে দেখিয়াছিলেন, শিষ্যা নিবেদিতার চক্ষে সেই দৃষ্টি তিনি পরাইয়া দিয়াছিলেন, তাঁহার নিজের হৃদয়-খানিকেই এই শিষ্যার বক্ষগহ্বরে যেন বসাইয়া দিয়াছিলেন। নতুবা, এমন অভাবনীয় ঘটনা ঘটিত না। গুরুর সহিত একাত্ম হইয়া, সেই গুরুর হৃদয়ে আপনার হৃদয় নিঃশেষে গলাইয়া মিলাইয়া দিয়া, তিনি যে সেবাব্রত উদ্‌যাপন করিয়াছিলেন, তাহা একাধারে এই দেশের এবং তাঁহার গুরুর সেবা।"[১]

১ নিবেদিতা বিদ্যালয় পত্রিকা শতবর্ষ-জয়ন্তী স্মারক সংখ্যা, রামকৃষ্ণ সারদা মিশন সিস্টার নিবেদিতা বালিকা বিদ্যালয়, বাগবাজার, কলকাতা, ১৯৬৭, পৃঃ ১৩০

॥ ২ ॥

লন্ডনে প্রথম সাক্ষাতেই স্বামীজী তাঁর অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে জানতে পেরেছিলেন, নিবেদিতার মতো 'সিংহিনী'র প্রয়োজন ভারতের নারীশিক্ষার কাজের জন্য। সহজে নিবেদিতাকে গ্রহণ করেননি স্বামীজী। তাঁকে বাজিয়ে নিয়েছিলেন। ভারতের কুসংস্কার, দাসত্ব, দারিদ্র্য, বিদেশীদের সম্পর্কে গোঁড়া হিন্দুদের শুচিবায়ুগ্রস্ততা—সব তিনি তাঁকে বলেছিলেন। জানিয়েছিলেন ভারতীয়দের প্রতি শ্বেতাঙ্গদের ঘৃণার কথাও। দৃঢ়চেতা নিবেদিতা এসকল তুচ্ছ করে ভারতবর্ষে এসে গুরুর চরণপ্রান্তে উপনীত হয়েছিলেন। স্বামীজীও নিবেদিতার পাশ্চাত্য সংস্কার ও সংস্কৃতিকে দুমড়ে-মুচড়ে দিয়ে ভারতীয় ছাঁচে ঢেলে একেবারে নতুন করে তাঁকে গড়ে তুললেন 'যথার্থ' নিষ্ঠাবতী হিন্দু ব্রাহ্মণ ব্রহ্মচারিণী'র মতো। স্বামীজীর শিক্ষাগুণে নিবেদিতা যেমন ভারত-আবিষ্কার করেছিলেন, তেমনি ভারতাত্মাতে একীভূত হয়েছিলেন। নিবেদিতার ভারত-ভালবাসা ঘনীভূত হয়েছিল শ্রীরামকৃষ্ণসঙ্ঘের জননী শ্রীমা সারদাদেবীর পবিত্র সাহচর্যে, শ্রীরামকৃষ্ণ-পার্ষদদের পুণ্য সান্নিধ্য, স্বামীজী-শিষ্যদের সঙ্গে পরিচয়ে। বিশেষ করে ভারতের প্রাচীনত্বের পাঠ তিনি গ্রহণ করেছিলেন শ্রীমা, গোপালের মা এবং শ্রীমার সঙ্গিনীদের কাছে। নিবেদিতার কৃতিত্ব—তিনি নিজেকে সম্পূর্ণ ভারতীয় আদর্শের সঙ্গে একীভূত করে নিয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেনঃ "নিজেকে এমন করিয়া সম্পূর্ণ নিবেদন করিয়া দিবার আশ্চর্য ক্ষমতা আর কোন মানুষে প্রত্যক্ষ করি নাই। সে-সম্বন্ধে তাঁহার নিজের মধ্যে যেন কোন বাধাই ছিল না। তাঁহার শরীর, তাঁহার আশৈশব ইউরোপীয় অভ্যাস, তাঁহার আত্মীয়-স্বজনের স্নেহ-মমতা, তাঁহার স্বদেশীয় সমাজের উপেক্ষা এবং যাহাদের জন্য তিনি প্রাণ সমর্পণ করিয়াছেন তাহাদের ঔদাসীন্য, দুর্বলতা ও ত্যাগ-স্বীকারের অভাব—কিছুই তাঁহাকে ফিরাইয়া দিতে পারে নাই।"[২]

স্বামীজী নিবেদিতাকে বলেছিলেন যে, ভারতবর্ষের বর্তমান রূপকে ভালবাসতে হবে, কল্পনার চোখে ভারতকে ভালবাসলে চলবে না। নিবেদিতা তাঁর গুরুর বাক্য অক্ষরে অক্ষরে পালন করেছিলেন। প্রায় তের বছর ধরে ঋষি দধীচির মতো তিলে তিলে নিজের অস্থি বিসর্জন দিয়েছিলেন তিনি ভারতের সেবায়। নিবেদিতা নিজেই বলতেন, তিনি যে ভারতকে ভালবাসেন, তার কতকগুলি কারণ আছে। তাঁর মতে ভারত পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ ধর্মচিন্তার জন্মদাত্রী ; তার চির-তুষারমণ্ডিত হিমালয় সহজে অন্তরে গম্ভীর ও উচ্চভাবের উদ্রেক করে। ভারতের পারিবারিক জীবন সহজ, সরল ও সুন্দর ; ভারতই বিশেষভাবে পৃথিবীর মহীয়সী নারীকুলের জন্মদাত্রী। ভারত একমাত্র দেশ, যেখানে ছাত্রজীবনের মহান আদর্শ ব্রহ্মচর্য-পালন।[৩] দার্শনিক আচার্য ব্রজেন্দ্রনাথ শীল লিখেছেনঃ "নিবেদিতার চরিত্রে এবং চিন্তায় দেখিয়াছি জাতীয় ভাবধারা এবং সাংস্কৃতিক মহিমার সহিত আধুনিক ভাবধারাও উজ্জ্বলরূপে ফুটিয়া উঠিয়াছিল। ভারতবর্ষে জন্মগ্রহণ না করিয়াও নিবেদিতা ভারতীয় সভ্যতার শ্রেষ্ঠ উত্তরাধিকারী হইয়াছিলেন—ইহা তাঁহার পক্ষে কম গৌরবের কথা নহে।"[৪]

॥ ৩ ॥

নিবেদিতার ভারত-চিন্তা তাঁর আলাপচারী, বক্তৃতা, রচনা ও পত্রাবলীতে পাওয়া যায়। শুধু ভারতে নয়, বিদেশেও তিনি ভারতের ধর্ম ও জীবন সম্পর্কে ভাষণ দিয়েছেন। ভারতবর্ষ সম্পর্কে তাঁর প্রত্যেকটি বক্তৃতা, প্রত্যেকটি প্রবন্ধ গভীর ভালবাসায় মণ্ডিত। ভারতের অন্তরাত্মাকে তিনি মর্মে মর্মে উপলব্ধি করেছিলেন, জাতীয় জীবনের মর্মকথা তাঁর কাছে উদ্ঘাটিত হয়েছিল। তাই ভারত সম্পর্কে তাঁর বক্তব্যে এত শক্তি, উৎসাহ ও আন্তরিকতা দেখি। তিনি যেখানেই যেতেন, সেখানেই ভারত-মহিমার জয়গান করতেন। ভারতের ঐতিহ্য, আদর্শ ও সমাজ সম্পর্কে তাঁর অপূর্ব ব্যাখ্যা শ্রোতাদের হৃদয় জয় করত। কেউ ভারতের বিরুদ্ধে একটিও নিন্দা-সূচক বাক্য বললে বা বিন্দুমাত্র অশ্রদ্ধা প্রকাশ করলে নিবেদিতা সহ্য করতে পারতেন না। তৎক্ষণাৎ বলিষ্ঠ অকাট্য যুক্তিসহকারে প্রতিবাদ করে

২ উদ্ধৃতঃ ভগিনী নিবেদিতা—প্রব্রাজিকা মুক্তিপ্রাণা, সিস্টার নিবেদিতা গার্লস স্কুল, ১৯৬৮, পৃঃ ৭৮

৩ নিবেদিতা শতবর্ষ-জয়ন্তী স্মারক সংখ্যা, পৃঃ ২৫

৪ ঐ, পৃঃ ১০১

ভারতের গৌরবকে তিনি প্রতিষ্ঠিত করতেন। নিবেদিতা বারংবার বলতেনঃ "ভারতবর্ষ এক বিশাল বিশ্ববিদ্যালয়। তার চতুঃসীমানার মধ্যে জন্মগ্রহণ করেছে যেসব সন্তান তাদের প্রত্যেকের দায়িত্ব—ভারতমাতার সেবায় আত্মনিয়োগ।"[৫]

নিবেদিতা তাঁর ভারতপ্রেমের প্রথম বাস্তব পরীক্ষার সম্মুখীন হন কলকাতায় প্লেগ সেবা-কার্যে (১৮৯৯)। সে-পরীক্ষায় তিনি শুধু সসম্মানে উত্তীর্ণ হননি, বিস্ময়কর কাজও করে-ছিলেন। প্লেগাক্রান্ত অপরিচ্ছন্ন বস্তি নিজে ঝাঁটা হাতে করে পরিষ্কার করেছেন, নিজের আহারের পরিবর্তে রোগীর ওষুধপত্র কিনে দিয়েছেন, প্লেগরোগীদের ঘরে ঘরে গিয়ে স্বহস্তে তাদের সেবাশুশ্রূষা করেছেন। কিভাবে স্বহস্তে প্লেগাক্রান্ত রোগীর সেবা করেছেন সেসম্পর্কে প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণঃ "সেই অস্বাস্থ্যকর পল্লীতে, সেই আর্দ্র-জীর্ণ কুটিরে নিবেদিতা রোগগ্রস্ত শিশুকে ক্রোড়ে লইয়া বসিয়া আছেন। দিনের পর রাত্রি, রাত্রির পর দিন তিনি স্বীয় আবাস পরিত্যাগ করিয়া সেই কুটিরে রোগীর সেবায় নিযুক্তা রহিলেন।"[৬] পরবর্তী কালেও ত্রাণ-সেবাকার্যে তিনি জীবনপণ করে ঝাঁপিয়ে পড়তেন। স্বামী সারদানন্দজী লিখেছেনঃ "দুর্ভিক্ষের তাড়না হইতে গ্রামবাসী-দিগকে রক্ষা করিতে কৃতসংকল্প হইয়া তিনি অনশন, অনিদ্রা প্রভৃতি শারীরিক কঠোরতা স্বেচ্ছায় স্বীকার করিয়া পদব্রজে বন্যার জল ভাঙ্গিয়া গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে গমনকরতঃ তাহাদিগের প্রকৃত অবস্থার সংবাদ সাধারণের অবগতির জন্য আনয়ন করিয়াছিলেন।"[৭]

স্বামীজী নিবেদিতাকে দিয়ে রামকৃষ্ণ মিশনের প্রথম নারীশিক্ষার কর্মসূচী আরম্ভ করিয়ে-ছিলেন। সম্পূর্ণ ভারতীয়ভাবে শ্রীরামকৃষ্ণ বালিকা বিদ্যালয়[৮] পরিচালনা করতেন নিবেদিতা। স্বামীজী-সংকল্পিত বিদ্যালয়ে নিবেদিতার আত্মত্যাগ, তিতিক্ষা, ধৈর্যের কথা রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে। নিবেদিতার ছাত্রী, পরবর্তী কালে সারদা মঠের অধ্যক্ষা প্রব্রাজিকা ভারতীপ্রাণা লিখেছেনঃ "ভবিষ্যৎ ভারতের জন্য তিনিই প্রথম আদর্শ জাতীয় বিদ্যালয়ের বীজ বপন করিয়া গিয়াছেন। পরাধীন ভারতে জাতীয় আদর্শকে ভিত্তি করিয়া শিক্ষায়তন স্থাপন সহজ ছিল না। কেমন করিয়া নিবেদিতা সর্বপ্রকার সামাজিক, অর্থনৈতিক বাধা উপেক্ষা করিয়া তাঁহার অপরিসীম ত্যাগ ও অক্লান্ত পরিশ্রম দিয়া এই বিদ্যালয় গড়িয়া তুলিয়াছেন তাহা আমাদের শৈশবে আমরা চোখের সম্মুখে ঘটিতে দেখিয়াছি।"[৯] নিবেদিতার ভারতীয়বোধের শিক্ষা দেওয়ার কথা উল্লেখ করে তাঁর আরেক ছাত্রী নির্ঝরিণী সরকারের স্মৃতিচারণঃ "আমাদের পূর্বকালের হিন্দুরমণীদের ত্যাগ, নিষ্ঠা, ভক্তি, সেবাপরায়ণতা, আশ্রিত-বৎসলতা ও সরলতা যেন আমরা কখনো হারিয়ে না ফেলি, সেজন্য বারবার আমাদের বলতেন। তিনি বলতেন, আমাদের মাতামহী ও পিতামহীদের অনেকে বহু পরিজনের মধ্যে সংসারের সেবা-কার্যের ভিতরে ডুবে থেকেও অনায়াসে এত উচ্চ আধ্যাত্মিক অবস্থায় পৌঁছাতে পেরেছিলেন, যা তপস্যা দ্বারাও সম্ভব হয় না।"[১০] তরুণ ও যুবক ছাত্রদের কাছে নিবেদিতা ভারত-কল্যাণমন্ত্র প্রচার করতেন অক্লান্তভাবে। তিনি তাদের বলতেন, তারা নিজেদের কল্যাণচিন্তার চেয়ে দেশের কল্যাণ-চিন্তাই বেশি করবে। তিনি তাঁর ওজস্বী ভাষণে ছাত্রদের স্মরণ করিয়ে দিতেনঃ "তোমাদের লক্ষ্য হোক মাতৃভূমির কল্যাণ। মনে রেখো, অখণ্ড ভারতই তোমার দেশ এবং এই দেশের বর্তমান

৫ নিবেদিতা শতবর্ষ-জয়ন্তী স্মারক সংখ্যা, পৃঃ ৩৩

৬ দ্রঃ ভগিনী নিবেদিতা, পৃঃ ১৪২

৭ নিবেদিতা শতবর্ষ-জয়ন্তী স্মারক সংখ্যা, পৃঃ ৫-৬

৮ বাগবাজারে প্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয় সাধারণের মধ্যে 'সিস্টার নিবেদিতার স্কুল' বা শুধু 'সিস্টারের স্কুল' বলে পরিচিত ছিল। কেউ কেউ অবশ্য 'স্বামীজীর স্কুল'ও বলতেন। নিবেদিতার মৃত্যুর পর রামকৃষ্ণ মিশন এই বিদ্যালয়ের নামকরণ করেন 'নিবেদিতা বালিকা বিদ্যালয়'। বিদ্যালয়ের পরিচালনার ভার রামকৃষ্ণ মিশনেরই ছিল। শ্রীশ্রীমায়ের জন্মশত-বার্ষিকীতে রামকৃষ্ণ সারদা মিশন প্রতিষ্ঠিত হয়। রামকৃষ্ণ মিশন এই বিদ্যালয় পরিচালনার ভার রামকৃষ্ণ সারদা মিশনকে অর্পণ করেন ১৯৬৩ খ্রীস্টাব্দে।

৯ নিবেদিতা শতবর্ষ-জয়ন্তী স্মারক সংখ্যা, পৃঃ ৪

১০ ঐ, পৃঃ ১২৯

প্রয়োজন কর্ম। জ্ঞান, শক্তি, সুখ ও ঐশ্বর্য লাভের জন্য চেষ্টা কর। ঐগুলিই যেন তোমাদের জীবনের লক্ষ্য হয়। আর যখন সংগ্রামের আহ্বান আসবে, তখন যেন তোমরা নিদ্রায় মগ্ন থেকো না।"[১১] তিনি ছাত্রদের ভারত-ভ্রমণে উৎসাহ দিতেন। অর্থ সংগ্রহ করে তিনি মধ্যবিত্ত ছাত্রদের ভারত-ভ্রমণে পাঠাতেন। তিনি বলতেন: "তোমরা তোমাদের এই প্রাচীনা, তপোবৃদ্ধা জন্মভূমিকে ভাল করে দেখ। এর এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত পরিভ্রমণ করে এর তীর্থ-মহিমা উপলব্ধি কর, এর ঐতিহাসিক উত্থান-পতনের প্রত্যক্ষ জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা অর্জন কর। এদেশের নাড়ী-স্পন্দনের সঙ্গে তোমাদের হৃদ্‌স্পন্দনও সমতালে স্পন্দিত হোক।"[১২]

নিবেদিতা চাইতেন, ভারতীয়রা নিজেদের ইতিহাস নিয়ে গবেষণা করুক, চর্চা করুক। যদুনাথ সরকার, রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায়, দীনেশচন্দ্র সেন প্রমুখ ঐতিহাসিকদের গবেষণায় তিনি উৎসাহ ও সাহস দিয়েছিলেন। যদুনাথ সরকারের গবেষণার উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করে নিবেদিতা বলেছিলেন: "বিদেশীর কাছে আপনার পতাকা কখনো নিচু করবেন না। যে বিশেষ বিভাগ আপনি গবেষণার জন্য বেছে নিয়েছেন, তাতে জগতে শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করবার চেষ্টা করুন। ভারতবর্ষ যেন এবিষয়ে প্রথম বলে স্বীকৃতি লাভ করে।"[১৩] রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায়কে তিনি মূল্যবান লিখিত নির্দেশও দিয়েছিলেন। এই নির্দেশনামা পরে প্রবন্ধাকারে প্রকাশিত হয় 'A Note on Historical Research' নামে। দীনেশচন্দ্র সেনের ইংরেজী ভাষায় লেখা সুবৃহৎ গ্রন্থ 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের ইতিহাস'-এর পাণ্ডুলিপি আদ্যোপান্ত তিনি সংশোধন করে দিয়েছিলেন। নিবেদিতার 'Footfalls of Indian History' গ্রন্থ ভারত-ইতিহাসের অমূল্য সম্পদ। ভারতের প্রাচীন কাহিনী অবলম্বনে তিনি রচনা করেছিলেন 'Cradle Tales of Hinduism'। ভারতীয় নারীদের জীবনচিত্র তিনি অঙ্কন করেছিলেন 'The Web of Indian Life' গ্রন্থে। প্রত্যেকটি গ্রন্থই পাশ্চাত্যের বুদ্ধিজীবী মহলে আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল। নিবেদিতার সমগ্র রচনাই ছিল ভারত-কেন্দ্রিক। তাঁর গ্রন্থগুলি তাঁর ভারতপ্রেমের, ভারত-চিন্তার সফল ফসল। তাঁর সম্পর্কে যথার্থই বলা হয়েছে: "তাঁহার লেখনীমুখে ভারতের মর্মকথা কী আশ্চর্যভাবেই না উদ্ঘাটিত হইয়াছে। ভারতের আদর্শ, ধর্ম, ইতিহাস, তাহার দৈনন্দিন জীবনযাত্রা, পালা-পার্বণ প্রভৃতি গভীর অভিনিবেশ সহকারে পর্যবেক্ষণ ও অনুধাবন করিয়া তিনি বিশ্বের দরবারে উহাদের সুন্দরভাবে প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার গভীর আধ্যাত্মিকতা ও সূক্ষ্ম সৌন্দর্যবোধ ভারতের পৌরাণিক কাহিনী, প্রাকৃতিক দৃশ্য ও ভারতীয় সমাজব্যবস্থার মধ্যে যেসব তত্ত্ব ও অন্তর্নিহিত তাৎপর্য আবিষ্কার করিয়াছে তাহার মূল্য অপরিসীম। বস্তুতঃ তাঁহার রচনা পাঠ করিবার পর আমরা যেন নূতন দৃষ্টিতে ভারতকে দেখিতে ও তাহার স্বরূপ উপলব্ধি করিতে শিখি।"[১৪]

লেখালেখির সূত্রে নিবেদিতার সঙ্গে 'মডার্ন রিভিউ' ও 'প্রবাসী' পত্রিকার সম্পাদক রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়, দ্য স্টেট্‌সম্যান পত্রিকার সম্পাদক কে. এস. র‍্যাটক্লিফ প্রভৃতি সাংবাদিক-লেখকদের সঙ্গে পরিচয় ছিল। ইংরেজ সরকারের মুখপত্র দ্য স্টেট্‌সম্যান পত্রিকার সম্পাদককে নিবেদিতা ভারত-প্রেমিকে রূপান্তরিত করেছিলেন। রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় নিবেদিতার মনস্বিতা ও প্রজ্ঞার পরিচয় দিতে গিয়ে লিখেছেন: "ভারতীয় অনেক রীতিনীতি আমরা জন্মাবধি দেখিয়া আসিতেছি বলিয়া অভ্যাসবশতঃ উহার ভিতরকার গূঢ় তত্ত্ব ধরিতে পারি না, উহার প্রাণ ও অর্থ খুঁজিয়া পাই না, এসব বিষয়ে তাঁহার [নিবেদিতার] অন্তর্দৃষ্টি ছিল।"[১৫] অরবিন্দের কর্মযোগিন পত্রিকায় নিবেদিতা তাঁর অন্তরের দৃঢ় আকুতি ব্যক্ত করে লিখেছিলেন: "আমি বিশ্বাস করি, ভারতবর্ষ

১১ নিবেদিতা শতবর্ষ-জয়ন্তী স্মারক সংখ্যা, পৃঃ ২৮

১২ ঐ, পৃঃ ৩০

১৩ ভগিনী নিবেদিতা, পৃঃ ৩৫৭-৩৫৮

১৪ ভারত-তীর্থে নিবেদিতা ( ১৯৬৭ ), সিস্টার নিবেদিতা গার্লস স্কুল, প্রকাশিকার নিবেদন।

১৫ নিবেদিতা শতবর্ষ-জয়ন্তী স্মারক সংখ্যা, পৃঃ ১১৬

এক, অখণ্ড, অবিভাজ্য। এক আবাস, এক স্বার্থ ও এক সম্প্রীতির উপরেই জাতীয় ঐক্য গঠিত।… ভারতের বর্তমান তাহার অতীতের সহিত দৃঢ়সংবদ্ধ, আর তাহার সামনে জ্বলজ্বল করিতেছে এক গৌরবময় ভবিষ্যৎ।"[১৬] নিবেদিতা যখনই কোন সংবাদপত্রে বা মাসিক পত্রিকার জন্য কলম ধরেছেন, সেখানে ভারত-কল্যাণচিন্তা ব্যতীত অন্য কিছু স্থান পায়নি।

ভারতের অর্থনীতি নিয়েও তাঁর আগ্রহ কিছু কম ছিল না। অর্থনীতিবিদ্ রমেশচন্দ্র দত্তের কাছে পাঠ নিয়েছিলেন ভারতীয় অর্থনৈতিক ইতিহাসের। পরাধীন ভারতবর্ষে বিজ্ঞান-গবেষণা জয়যুক্ত হোক—স্বামীজীর মানসকন্যা নিবেদিতা মনে-প্রাণে চাইতেন। তার কারণ তাঁর আধ্যাত্মিক পিতা,তাঁর গুরুর সেটিই ছিল এক গভীর আকাঙ্ক্ষা। নিবেদিতা বলেছেন ঃ "এই গবেষণার উৎস অনুভূতি বা প্রত্যক্ষ দর্শন, যাহা ভারতীয় আধ্যাত্মিক তত্ত্বের মূল কথা—যাহার উপর ভারতীয় সমুদয় দর্শনশাস্ত্র প্রতিষ্ঠিত।"[১৭] তাই বিজ্ঞানসাধক আচার্য জগদীশচন্দ্র বসুর সঙ্গে নিবেদিতার পরিচয় গভীর শ্রদ্ধা ও ভালবাসায় পর্যবসিত হয়েছিল। আচার্য বসুর বিজ্ঞান-গবেষণায় নিবেদিতার বিভিন্ন প্রকারের সহায়তা জগদীশচন্দ্র বসু ও তাঁর পত্নী অবলা বসু মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করেছেন। বসুর 'Living and Non Living' এবং 'Plant Response'-এর সম্পাদনা নিবেদিতাই করেছিলেন। নিবেদিতার ইচ্ছা ছিল, ভারতীয় বিজ্ঞান গবেষণা জগতের বিজ্ঞানের দরবারে সুপ্রতিষ্ঠিত হোক ; তা বসুর গবেষণায় পূরণ হয়েছিল। নিবেদিতার জীবনীকার প্রব্রাজিকা মুক্তিপ্রাণা লিখেছেন ঃ "শ্রীযুক্ত বসুর বৈজ্ঞানিক সাধনা জয়যুক্ত হইলে বিজ্ঞানজগতে যে বিরাট পরিবর্তন ঘটিবে, তাহার ফলে ভারতবর্ষ গভীর মর্যাদা লাভ করিবে বিশ্বের দরবারে। ভারতের অদ্বৈত তত্ত্ব বিজ্ঞানের মধ্য দিয়া পুনরায় প্রমাণিত ও প্রতিষ্ঠিত হইবে। বিশেষতঃ বিজ্ঞানচর্চা ব্যতীত বর্তমান ভারতের ব্যবহারিক জীবনের উন্নতি অসম্ভব। এইসকল কারণেই তাঁহার বিজ্ঞান-গবেষণায় নিবেদিতার ঐকান্তিক আগ্রহ ও সাহায্য।"[১৮]

নিবেদিতা ছিলেন ভারতীয় শিল্পেরও ধাত্রী-জননী। তৎকালীন কলকাতার আর্ট স্কুলের অধ্যক্ষ মিঃ ই. বি. হ্যাভেলের সহায়তায় নিবেদিতা ভারতীয় শিল্পের পুনর্জাগরণ ঘটিয়েছিলেন। অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, নন্দলাল বসু, সুরেন্দ্রনাথ গাঙ্গুলী, অসিতকুমার হালদার প্রমুখ তদানীন্তন কালের শিল্পীদের হৃদয়ে ভারতীয় শিল্পপ্রীতি জাগ্রত করেছিলেন নিবেদিতা। ভারতীয় শিল্পীরা তখন পাশ্চাত্য শিল্পের অনুকরণে ব্যস্ত। নিবেদিতা বলতেন ঃ "শিল্পের পুনরভ্যুদয়ের উপরেই ভারতবর্ষের ভবিষ্যৎ আশা নিহিত। অবশ্য ঐ শিল্প জাতীয় চেতনা ও জাতীয় ইতিহাসের উপর প্রতিষ্ঠিত হওয়া আবশ্যক।"[১৯] অসিতকুমার হালদার লিখেছেন ঃ "আমাদের ছিল তখন দেশী শিল্পের গবেষণাকাল… ভগিনী নিবেদিতা সর্বদা আমাদের এই জাতীয় জাগৃতি প্রীতির চক্ষে দেখিতেন।… আমাদের হাতে দেশের অবলুপ্ত আর্টের নবজাগরণ নির্ভর করছে—সেটাও দেশের জাগৃতি ও স্বাধীনতার পক্ষে খুব বড় কাজ। সেই কথাই ভগিনী নিবেদিতা আমাদের বোঝাতেন।… আমাদের বারবার উপদেশ দিতেন, জাতীয় শিল্পকলার ঐশ্বর্যকে জাগিয়ে ও বাঁচিয়ে রাখার জন্য আপ্রাণ কাজ করতে। যতদিন তিনি বেঁচে-ছিলেন, আমাদের ওরিয়েন্টাল আর্ট সোসাইটির প্রদর্শনীতে আসতেন এবং শিল্পীদের উৎসাহিত করতেন।"[২০]

ভারতের মুক্তি-সংগ্রামে নিবেদিতার প্রেরণার কথা সর্বজনবিদিত। অরবিন্দ, বাঘা যতীন, হেমচন্দ্র প্রমুখ তাঁর কাছে অনুপ্রেরণা পেয়েছেন। গোখেল প্রমুখ নেতারাও তাঁর দ্বারা প্রভাবিত হয়েছেন। ভারতের স্বাধীনতা-আন্দোলনে, বিপ্লব-আন্দোলনে ও জাতীয়তার উন্মেষে নিবেদিতার প্রত্যক্ষ ও অপ্রত্যক্ষ অবদান ভারতের ইতিহাসের উল্লেখযোগ্য বিষয় হিসাবে চিহ্নিত হয়ে থাকবে। স্বামী বিবেকানন্দের মহাসমাধির পর নিবেদিতা

১৬ ভগিনী নিবেদিতা, পৃঃ ৪১৯
১৭ ঐ, পৃঃ ৩৩৭
১৮ ঐ
১৯ ঐ, পৃঃ ৪০৮
২০ ঐ, পৃঃ ৪৪২-৪৪৩

ভারতের জাতীয় আন্দোলনে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেছিলেন এবং করেছিলেন এই উপলব্ধি থেকে যে, ভারতের স্বাধীনতা স্বামীজীর পরম কামনার ধন। এইকালে নিবেদিতার কার্যপ্রণালী ছিল: "প্রথমতঃ বক্তৃতা ও লেখার মাধ্যমে দেশের সাধারণ মানুষকে পরাধীনতা সম্পর্কে সচেতন করে তোলা এবং ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে দেশের যুব-শক্তিকে জাগানো। দ্বিতীয়তঃ চরম ও নরমপন্থী উভয় দলের রাজনৈতিক নেতাদের সঙ্গে সহযোগিতা এবং সর্বপ্রকার রাজনৈতিক পরামর্শদান। তৃতীয়তঃ দেশের বিপ্লবী সংস্থাগুলিকে সর্বপ্রকার সাহায্য দান।"[২১] রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় নিবেদিতার এই কার্যাবলী সম্বন্ধে বলেছেন: "তিনি ( নিবেদিতা ) ভারতবর্ষের পূর্ণ স্বাধীনতার প্রয়াসী ছিলেন। স্বাধীনতার পতাকা নামাইতে বা ঢাকা দিতে তাঁহার প্রাণে লাগিত, তবে আপাততঃ ঔপনিবেশিক স্বরাজ বা আভ্যন্তরীণ জাতীয় আত্মকর্তৃত্বে তাঁহার আপত্তি ছিল না। কিন্তু তাহাকে উচ্চতম বা চরম লক্ষ্য বলিতে তিনি রাজি ছিলেন না।"[২২]

॥ ৪ ॥

একদা বালিকা নিবেদিতাকে তাঁর পিতৃবন্ধু এক ধর্মযাজক আশীর্বাদ করে ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন: "ভারতবর্ষ একদিন তোমায় ডাক দেবে।"[২৩] তখন নিবেদিতা ভারতবর্ষের নাম পর্যন্ত জানতেন না। যৌবনে বুদ্ধজীবনী 'Light of Asia' পড়ে তাঁর একটা ধারণা হয়েছিল ভারতবর্ষ সম্বন্ধে। আটাশ বছর বয়সে লন্ডনে স্বামীজীর সঙ্গে সাক্ষাতের পর নিবেদিতার মানসপটে অঙ্কিত হয়েছিল ভারতবর্ষের চিত্র—"ভারতীয় উদ্যানে অথবা সূর্যাস্তকালে কূপের সমীপে কিংবা গ্রামের উপকণ্ঠে বৃক্ষতলে উপবিষ্ট সাধু এবং তাঁহার চারিপার্শ্বে সমবেত শ্রোতৃবৃন্দ।"[২৪]

এরপর নিবেদিতা স্বামীজীর কাছে জানতে পেরেছিলেন ভারতবর্ষের কথা। সেসময় থেকে নিবেদিতার শিরায় শিরায় অবিরাম ধ্বনিত-প্রতিধ্বনিত হয়েছিল পাঁচটি অক্ষর—'India'—'ভারতবর্ষ'। তিনি আমৃত্যু জপ করেছিলেন 'ভারতবর্ষ' নামক পঞ্চাক্ষর মন্ত্রটি। নিবেদিতা নিজেই বলেছিলেন: "ধন্য ভারতবর্ষ! কী অশেষ ঋণী আমি তাহার নিকট! আমার মধ্যে এমন কিছু যোগ্যতা আছে কি, যাহা আমি প্রত্যক্ষ অথবা পরোক্ষভাবে তাহার নিকট লাভ করি নাই।"[২৫] তাঁর নিরন্তর প্রার্থনা ছিল: "…আমি যেন জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত ভারতবর্ষেই অবস্থান করিতে পারি। অর্থাভাবে বা কোন ব্যক্তিগত কারণে আমাকে যেন এদেশ পরিত্যাগ করিতে না হয়।"

নিবেদিতার এ-প্রার্থনা পূর্ণ হয়েছিল। ভারতের চিন্তা করতে করতেই নিবেদিতা ভারতের মাটিতে শেষ শয্যা নিয়েছিলেন। শুধু তাই নয়, ভারতীয়দের দ্বারা বাহিত হয়ে হিন্দুর শ্মশানঘাটে তাঁর মরদেহের হিন্দুমতে সৎকার করা হয়েছিল।

অধ্যাপক শঙ্করীপ্রসাদ বসু লিখেছেন: "স্বামীজী নিবেদিতাকে বলেছিলেন—'ভারতবর্ষকে জানো, ভারতবর্ষকে ভালবাস।' ভারতবর্ষকে জানা ও ভালবাসার আনন্দ ও যন্ত্রণা নিবেদিতা বহন করেছেন। তখন ছিল পরাধীন ভারতবর্ষ। মুক্তিদিনের আলোকলাভের তপস্যায় নিবেদিতা নিজেকে উৎসর্গ করেছিলেন। স্বাধীন ভারতবর্ষে কিন্তু ভারতকে জানা ও ভালবাসার প্রয়োজন বিন্দু-মাত্র কমেনি। গৃহে-পথে-প্রান্তরে অন্ধকার ক্রমেই গাঢ়তর। ভারতবাসী যেন নিবেদিতার আলোকিত জীবনের দীপ ধরে অগ্রসর হতে পারে—এই আশায় আচার্য জগদীশচন্দ্র একদা তাঁর বিজ্ঞানাগারের দ্বারপথে 'আলোকদূতী' নিবেদিতার মূর্তি স্থাপন করেছিলেন। সেই মূর্তি এখনো দীপধারিণী—ভারতবর্ষের জন্য।"[২৬] ☐

২১ নিবেদিতা শতবর্ষ-জয়ন্তী স্মারক সংখ্যা, পৃঃ ৭০ ২২ ঐ, পৃঃ ১১৬

২৩ ভগিনী নিবেদিতা, পৃঃ ৬ ২৪ ঐ, পৃঃ ২৮ ২৫ ঐ, পৃঃ ২২১

২৬ নিবেদিতা লোকমাতা—শঙ্করীপ্রসাদ বসু, ৩য় খণ্ড, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, ১৩৯৫, ভূমিকা

# বিবেকানন্দ ও লোকমাতা নিবেদিতা

মোহিতলাল মজুমদার

রবীন্দ্রনাথ 'কাব্যের উপেক্ষিতা' নাম দিয়া যে একটি অপূর্ব প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন, তাহার ঐ নামটাও যেমন, তেমনই তাহার অন্তর্গত ভাবটি আমাদের মধ্যে একটি সাহিত্যিক প্রবাদের মতো হইয়া উঠিয়াছে। কাব্যের ক্ষেত্রেও যেমন, জীবনের ক্ষেত্রেও তেমনি, জাতির ইতিহাসে এমন অনেক 'উপেক্ষিতা' আছেন, যাঁহাদের নাম বিখ্যাতগণের আড়ালে পড়িয়া আমাদের স্মৃতিতে তেমন উজ্জ্বল হইয়া উঠে না। গত পঞ্চাশ বৎসরের বাংলার তথা হিন্দু-ভারতের ইতিহাস যখন চিন্তা করি তখন এমনই একজনের কথা মাঝে মাঝে স্মরণ হয়, আবার ভুলিয়া যাই; আমরা শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের সকলই স্মরণ করি, কীর্তন করি—তাঁহাদের স্মৃতিমন্দির নির্মাণ ও স্মৃতিকথা রচনা করিয়া এই নিত্য বিস্মৃতি-পরায়ণ জাতির স্মৃতিভ্রংশ নিবারণ করি; কিন্তু তাঁহাদের সঙ্গে, বিশেষ করিয়া স্বামীজীর সঙ্গে অবিচ্ছেদ্য হইয়া আছে যে একটি অনন্যসাধারণ নারী-চরিত্রের মহিমা তাহাকে তেমন করিয়া আর স্মরণ করি না; এমনকি, যে মুক্তি-মন্দিরের নবনির্মিত চত্বরের একপ্রান্তে তিনি তাঁহার অন্তরের পূজা-প্রদীপ জ্বালাইয়া, নিজের সমগ্র দেহমন লুটাইয়া দুই করপুটে সেবার পুষ্পাঞ্জলি নিবেদন করিয়া-ছিলেন, সেখানেও তাঁহার নামটি তেমন করিয়া কেহ স্মরণ করে না। এ-যুগের বাঙালী সন্তানকে সেই নিবেদিতার অপূর্ব আত্মনিবেদনের কথা ভাল করিয়া স্মরণ করাইবার জন্য কোনরূপ স্মৃতি-পূজার আয়োজন হয় না, হইলেও বাহিরে তাহার তেমন প্রচার নাই।

জানি, তাহাতে সেই কল্যাণময়ী তপস্বিনীর—সেই সত্য-শিব-সুন্দর-নন্দিনীর জন্য কিছুমাত্র আক্ষেপের কারণ নাই, যিনি নিজেই "নিবেদিতা", তাঁহাকে নিবেদন করিবার তো কিছুই নাই। আমাদের মতো যাহারা তাঁহাকে দেখিয়াছিল, তাঁহার সেই পুণ্য জীবনের, সেই অতুল আত্মোৎসর্গের চাক্ষুষ পরিচয় পাইয়াছিল—এই জাতির দুর্গতি-মোচনের জন্য তাঁহার সেই সরব আকুলতা ও নীরব কর্মযোগের কথা জানিত, তাহাদের হৃদয় দুর্বল বলিয়াই ক্ষুব্ধ হয়, মনে হয়, এত স্মৃতি-উৎসব বারো মাসে চুরাশি পার্বণের মতো ছোট-বড়-মাঝারি কত জনের উদ্দেশে কত অনুষ্ঠান হইয়া থাকে—কই, ভগিনী নিবেদিতাকে তাহার কোনটাতেই তেমন করিয়া আমরা শ্রদ্ধাঞ্জলি দান করি না। অ্যানি বেসান্তকে আমরা স্মরণ করি, নিবেদিতাকে করি না। সেকালের এক কবি লিখিয়াছিলেন—"হৈমবতী উমার অর্ঘ্য কাড়বে ওলাইচণ্ডী কি হায়? বেসান্ত নেবে সে-নৈবেদ্য অর্পিত যা' নিবেদিতায়!" —ইহার কারণ কি? কারণ কি এই নয় যে, আমাদের দৃষ্টি আচ্ছন্ন হইয়াছে, আমরা যে-মন্ত্রে দীক্ষিত হইয়াছি, সেই মন্ত্রই অন্যরূপ; তাহাতে সেই হৃদয়ের সাড়ার প্রয়োজন আর নাই, যাহাতে খাঁটি মনুষ্যধর্মের প্রেরণা আছে, যাহাতে প্রাণের সত্যই আর সকল সত্যের উপরে।

নিবেদিতার পরিচয় আশা করি দিতে হইবে না। স্বামী বিবেকানন্দের জীবন ও তাঁহার অলৌকিক কীর্তিকথা যাঁহারাই অবগত আছেন, তাঁহারা তাঁহার এই আত্মসৃষ্ট কন্যাটির কথাও না জানিয়া পারিবেন না। বিবেকানন্দের চরিতকার মহামনীষী র্মাসয়ে রোলাঁ বলিয়াছেন:

"The future will always write her name of initiation, Sister Nivedita, to that of her beloved Master··· as St. Clara to that of St. Francis."

গুরুর সহিত এই শিষ্যার যে-সম্পর্ক—অধ্যাত্ম-জীবনের সেই এক অভিনব আত্মীয়তার তত্ত্ব পরে

কিছু আলোচনা করিব, তেমন আত্মনিবেদন-কাহিনী আমাদের কোন ভক্তমাল-গ্রন্থে কোথাও আছে বলিয়া মনে হয় না। তিনি কেমন করিয়া এই গুরুলাভ করিয়াছিলেন, তাহার অতি সংক্ষিপ্ত বৃত্তান্ত নিজেই তাঁহার অমূল্য গ্রন্থে ( The Master as I Saw Him ) লিখিয়া গিয়াছেন। ভারতীয় গুরুবাদের একটা নূতন ভাষ্যও তাঁহার ঐ গুরুপরিচয়-গ্রন্থে পাওয়া যাইবে। সে যেন একটি শাণিত খড়্গ—যেমন দিব্য প্রভাসমুজ্জ্বল, তেমনই নির্মম; সেই খড়্গের নিচে নিবেদিতা তাঁহার আত্মাভিমানী দেহটাকে—তাঁহার যতকিছু পূর্বসংস্কার এবং প্রাণ ও মনের যতকিছু কামনাকে—বলিস্বরূপ সমর্পণ করিয়াছিলেন। গুরু তাঁহাকে ভারতের হিতার্থে উৎসর্গ করিবার কালে বলিয়াছিলেন ঃ "যদি আমার নিজের কোন অভিপ্রায়-সিদ্ধির জন্য তোমাকে আমি বলিরূপে গ্রহণ করিয়া থাকি, তবে এই বলি বৃথা হউক; আর যদি ইহার মূলে সেই পরমা শক্তির ইচ্ছা থাকে, তবে তুমি সার্থক হও, তোমার জয় হউক।"

ইহার পর নিবেদিতার যে-জীবন আরম্ভ হইল, তাহা এমনই সেবা ও আত্মদানমূলক তপস্যার জীবন যে, বাহিরের শোভাযাত্রায়, ধ্বজ-পতাকায় তাহার জয়-ঘোষণা হয় নাই। গুরুর নিকট হইতে যে অগ্নি তিনি আপন হৃদয়পাত্রে চয়ন করিয়াছিলেন, তাহার তেজ তিনি সযত্নে নিজের মধ্যে ধারণ করিয়াছিলেন—সেই অপরিমেয় শক্তিকে সংবরণ করিয়া, তাহার পাবক শিখায় আপনাকেই নিরন্তর দগ্ধোজ্জ্বল করিয়া তিনি কেবল তাহার আলোক-টুকুই বিকিরণ করিয়াছিলেন। ভগিনী নিবেদিতার কর্মযোগ, গুরু-নির্ধারিত তাঁহার সেই ব্রত ও তাহার উদ্‌যাপন-পদ্ধতির কথা এখানে বলিব না, আমি তাহার উদ্দেশ্য ও ফলাফল বিচারের অধিকারী নই। বাংলার মাটিতে হলকর্ষণের পর যখন নবজীবনের বীজবপন ও বারিসেচন আরম্ভ হইয়াছে, তখন দিকে দিকে কত অঙ্কুর দেখা দিয়াছিল; তাহারই মধ্যে এই আর একটি বীজ যেন সকলের দূরে, এক কোণে—নিজেকেই ফলে-পুষ্পে বিকশিত করিবার জন্য নয়—অপরগুলির সাররূপে ব্যবহৃত হইবার জন্য এমন ফসলের আকাঙ্ক্ষা করিয়াছিল, যাহা বাজার পর্যন্ত পৌঁছায় না; সে কেবল সার হইবার ফসল। বাংলার মাটিতে তাহা মিলাইয়া গিয়াছে; সেই কালের অব্যবহিত পরে আমরা বাংলার উদ্যানে ফলফুলের যে আকস্মিক বাসন্তী শোভা দেখিয়াছিলাম, ভগিনী নিবেদিতার এই নীরব আত্মোৎসর্গ তাহার মৃত্তিকা-তলে কোন্ রসধারা গোপনে সঞ্চারিত করিয়াছিল, তাহা নির্ণয় করিবে কে?

এমন কত মহাজীবনের মহান আত্মোৎসর্গ যুগে যুগে সকল জাতির সাধনাকে সম্বর্ধিত ও সঞ্জীবিত করিয়াছে। ইতিহাস তাহার সন্ধান রাখে না, সন্ধান চায়ও না; তাহার কারণ, ইতিহাসের লক্ষ্যই অন্যরূপ। যাহারা ইতিহাসকে গড়িয়া তোলে তাহাদের পরিচয় করা সহজ; যাহারা সেই গড়ার উপাদান হইয়া বা সেই গঠনশিল্পীর যন্ত্র হইয়া শিল্পীর কীর্তিকে সম্ভব করিয়া তোলে তাহা-দিগকে চিনিয়া লওয়া দুষ্কর। যে গড়ে তাহার একরূপ আত্মাভিমান যেমন অত্যাবশ্যক, তেমনই যাহাকে সেই গঠনের উপাদান, উপকরণ বা যন্ত্র হইতে হয়, তাহার কিছুমাত্র অভিমান না থাকাই আবশ্যক। স্বামী বিবেকানন্দ সেই গঠনশিল্পী; ভগিনী নিবেদিতা আপনাকে তাঁহার হাতে যন্ত্র-স্বরূপ সমর্পণ করিয়াছিলেন—একজনকে যেমন দুর্ধর্ষ আত্মপ্রত্যয় ও আত্মনিষ্ঠা রক্ষা করিতে হইয়াছিল, অপরকে তেমনি সম্পূর্ণভাবে আত্ম-বিলোপ করিতে হইয়াছিল।

সেই আত্মবিলোপের কথা ভাবিলে আশ্চর্য হইতে হয়। গুরুর নিকটে শিষ্যের আত্মনিবেদন একটা অসামান্য কিছু তো নয়ই, বরং অতিশয় সাধারণ। ভক্তির অর্থ তাহাই। কিন্তু সাধারণ-ভাবে, যেসকল কারণে এইরূপ আত্মবিলোপ দুঃসাধ্য নয়—নিবেদিতার পক্ষে তাহার বিপরীতগুলিই প্রবলরূপে বিদ্যমান ছিল। তাঁহার জাতি ও দেশ, ধর্ম ও শিক্ষা-দীক্ষা, রুচি ও সংস্কার এমনই ভিন্ন এবং বয়োধর্মে এমনই দৃঢ় ও দুশ্ছেদ্য হইয়াছিল যে, শুধু মনে বা ভাবজীবনে নয়—একেবারে কায়মনোবাক্যে এমন গোত্রান্তরিত হওয়া প্রায় অনৈসর্গিক বলিয়া মনে হইবে। ধর্মান্তরিত হওয়ার জন্য যে আচার-অনুষ্ঠানগত পরিবর্তন মানুষের

জীবনে হইয়া থাকে, তাহার শতসহস্র দৃষ্টান্ত আছে; কিন্তু একই দেহে জন্মান্তরগ্রহণ যে সম্ভব তাহা ভগিনী নিবেদিতাকে না দেখিলে কেহ কখনও বিশ্বাস করিত না। এই একটা দিক দিয়াও তাঁহার জীবন অনন্যসাধারণ—এমন বোধ হয় আর কুত্রাপি দেখিতে পাওয়া যায় না। যেন জাতিটাই বদলাইয়া গিয়াছে, তাঁহার রক্তেও যেন বাঙালী হিন্দুর জন্ম-জন্মান্তরগত সংস্কৃতির অবচেতন ভাবধারা পূর্ণ প্রবাহিত হইয়াছে। ভারতের সেবায় এই শিষ্যাকে উৎসর্গীকৃত করিবার সময়ে গুরু তাঁহাকে বলিয়াছিলেন: "তোমাকে তোমার পূর্ব জীবন, পূর্ব সংস্কার, পূর্ব অভ্যাসের স্মৃতি পর্যন্ত সম্পূর্ণ মুছিয়া ফেলিতে হইবে, দেহের ও প্রাণের প্রতি তন্তুতে অনুভব করিতে হইবে যে, তুমি এই দেশের সন্তান, এই জাতিই তোমার জাতি।" গুরুর ঐ বাক্য এমন অক্ষরে অক্ষরে পালন করা সম্ভব হইয়াছিল কেমন করিয়া? এ কোন্ যাদুশক্তির খেলা! নিবেদিতার বয়স তখন আটাশ [?] বৎসর। তিনি ইউরোপীয় ভাব-চিন্তা, দর্শন ও ধর্মতত্ত্ব উত্তমরূপে অধিগত করিয়াছেন, আশ্চর্য ধীশক্তি ছিল তাঁহার; সেই ধীশক্তি, চরিত্রবল ও স্বাধীন চিন্তা এবং অধ্যয়নশীলতার বলে তিনি তৎপূর্বেই একটা তত্ত্ব ও তাহার সাধনপন্থা স্থির করিয়া লইয়াছিলেন। অতএব জন্মান্তরগ্রহণের রহস্যভেদ করিতে হইলে প্রথমেই তাঁহার গুরুর দিকে দৃষ্টিপাত করিতে হয়। সেকথাও পরে।

এই দেশ, এই জাতি ও এই সমাজে নিজেকে এমন করিয়া বিলাইয়া দেওয়া তো কেবল ইচ্ছা ও সংকল্পমাত্রেই—সে যত দৃঢ় হউক—একতরফা সম্পন্ন হইতে পারে না। বাঙালী হিন্দুসমাজ তাঁহাকে গ্রহণ করে নাই, তিনি তাহার উঠানের একপাশে একটা স্থান করিয়া লইয়াছিলেন; তজ্জন্য নিজেকে কিছুমাত্র পর বা পৃথক মনে করিতেন না; সমাজ তাঁহাকে গ্রহণ না করিলেও তিনি তাহাকে সর্বান্তঃকরণে গ্রহণ করিয়াছিলেন। এবিষয়ে অধিক কিছু না বলিয়া আমি এখানে কেবল একটি ঘটনা—সহস্রের একটি উল্লেখ করিব। বাগবাজারে তাঁহার যে-স্কুলটি ছিল তাহাতে বালিকা, কিশোরী, কুমারী ও বিধবা—নানা বর্ণের কন্যারা শিক্ষালাভ করিত। ভগিনী তাহাদিগকে সেকালের প্রথা অনুযায়ী একখানি ঢাকাগাড়িতে করিয়া নানা দর্শনীয় স্থানে শিক্ষার্থে লইয়া যাইতেন। একবার তিনি কয়েকজনকে কলিকাতার যাদুঘর দেখাইতে লইয়া যান। প্রকাণ্ড বাড়ির সর্বত্র ঘুরিয়া দেখিবার পর কন্যাগুলি একটু শ্রান্ত ও পরে পিপাসার্ত হওয়ায় তিনি তাহাদিগকে জলের কলটির নিকটে লইয়া গিয়া নিজের বসন-মধ্য হইতে একটি গেলাস বাহির করিলেন—গেলাসটি তিনি যাত্রাকালেই সকলের অগোচরে সঙ্গে লইয়াছিলেন। এক্ষণে গেলাসটি ধুইয়া স্বহস্তে জলপূর্ণ করিয়া মেয়েদের ডাকিয়া পান করিতে বলিলেন। তাহাদের মধ্যে ব্রাহ্মণাদি উচ্চবর্ণের কয়েকটি বয়স্কা কন্যাও ছিল,—তাহারা ঐ জল গ্রহণ করিতে ইতস্ততঃ করিতেছিল। তখন একজন—বোধ হয়, ততখানি জাত্যভিমানের কারণ তাহার ছিল না—অগ্রসর হইয়া সেই গেলাস তাঁহার হাত হইতে লইয়া, অসঙ্কোচে সেই জল পান করিল। ভগিনী নিবেদিতা তৎক্ষণাৎ তাহার হস্ত হইতে গেলাসটি লইয়া নিজে তাহা ধৌত করিয়া শূন্য গেলাসটি মাটিতে রাখিয়া দিলেন এবং প্রত্যেককে পর পর আপন হাতে তাহা ভরিয়া পান করিতে বলিলেন। মুখে এতটুকু ব্যথার বা অসন্তোষের চিহ্নমাত্র নাই; সে-মুখ তেমনই স্নেহোদ্ভাসিত, তেমনই প্রসন্ন ও প্রীতিপূর্ণ। এই জাতি ও এই সমাজের সেবা ও কল্যাণ-কামনায় ভগিনী নিবেদিতার আত্মোৎসর্গ যে কিরূপ ছিল, তাহা উপরের ঐ একটি কাহিনী হইতে যিনি বুঝিয়া লইতে না পারিবেন, তাঁহাকে বুঝাইবার জন্য এপ্রসঙ্গ আরও দীর্ঘ করিবার প্রয়োজন নাই।

এইবার আমি ভগিনী নিবেদিতার কিছু পরিচয় সেকালের সাহিত্য হইতে উদ্ধৃত করিব। তাঁহার উদ্দেশে কবি সত্যেন্দ্রনাথ লিখিয়াছিলেন:

"প্রসূতি না হ'য়ে কোলে পেয়েছিল পুত্র যশোমতী,
তেমনি তোমারে পেয়ে হৃষ্ট হয়েছিল বঙ্গ অতি—
বিদেশিনী নিবেদিতা!..."

ঐ একটি উপমা ব্যতীত আর কোন যথার্থ উপমা কবির মনেও উদয় হয় নাই। নিবেদিতার মৃত্যুসংবাদে সত্যেন্দ্রনাথ এই কবিতাটি সদ্য রচনা করিয়াছিলেন। দার্জিলিঙে হিমালয়ের কোলে

অতিশয় অকালে তিনি দেহত্যাগ করেন, তাই কবিতার এই শেষ চারিটি পঙ্‌ক্তিও সত্যভাষণে যথার্থ হইয়াছে ঃ

"এসেছিলে না ডাকিতে, অকালে চলিয়া গেলে, হায়,
চ'লে গেলে অল্প আয়ু দুর্ভাগার সৌভাগ্যের প্রায়
দেহ রাখি' শৈলমূলে—শঙ্করের অঙ্কে মৃতা সতী।
ওগো দেবতার দেওয়া ভগিনী মোদের পুণ্যবতী।"

এইবার নিবেদিতার সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের যে একটি প্রবন্ধ আছে, তাহা হইতে কয়েকটি স্থান উদ্ধৃত করিব। স্বদেশী আন্দোলনের সময় আমরা রবীন্দ্রনাথকে ভগিনী নিবেদিতার সঙ্গে কোন কোন সভায় যাতায়াত করিতে দেখিয়াছি। পরে এই প্রবন্ধে নিবেদিতার সহিত তাঁহার সেই ঘনিষ্ঠ পরিচয় এবং তাঁহার প্রতি রবীন্দ্রনাথের গভীর শ্রদ্ধার কারণ বিশেষরূপেই অবগত হইয়াছি। রবীন্দ্রনাথ লিখিয়াছেন ঃ

"নিজেকে এমন করিয়া সম্পূর্ণ নিবেদন করিয়া দিবার আশ্চর্য শক্তি আর কোন মানুষে প্রত্যক্ষ করি নাই। সে-সম্বন্ধে তাঁহার নিজের মধ্যে যেন কোন প্রকার বাধাই ছিল না। তাঁহার শরীর, তাঁহার আশৈশব ইউরোপীয় অভ্যাস, তাঁহার আত্মীয়-স্বজনের স্নেহ মমতা, তাঁহার স্বদেশীয় সমাজের উপেক্ষা এবং যাহাদের জন্য তিনি প্রাণ সমর্পণ করিয়াছেন তাহাদের ঔদাসীন্য, দুর্বলতা ও ত্যাগ-স্বীকারের অভাব—কিছুতেই তাঁহাকে ফিরাইয়া দিতে পারে নাই।

*

"বস্তুতঃ তিনি ছিলেন লোকমাতা। যে মাতৃ-ভাব পরিবারের বাহিরে একটি সমগ্র দেশের উপরে আপনাকে ব্যাপ্ত করিতে পারে তাহার মূর্তি তো ইতিপূর্বে আমরা দেখি নাই। এ-সম্বন্ধে যে কর্তব্যবোধ তাহার কিছু কিছু আভাস পাইয়াছি, কিন্তু রমণীর যে পরিপূর্ণ মমত্ববোধ তাহা প্রত্যক্ষ করি নাই। তিনি যখন বলিতেন 'our people', তখন তাহার মধ্যে যে একান্ত আত্মীয়তার সুরটি লাগিত আমাদের কাহারো কণ্ঠে তেমনটি তো লাগে না। ভগিনী নিবেদিতা দেশের মানুষকে যেমন সত্য করিয়া ভালবাসিতেন তাহা যে দেখিয়াছে সে নিশ্চয়ই ইহা বুঝিয়াছে যে, দেশের লোককে আমরা হয়তো সময় দিই, অর্থ দিই, এমনকি জীবনও দিই, কিন্তু তাহাকে হৃদয় দিতে পারি নাই—তাহাকে তেমন অত্যন্ত সত্য করিয়া নিকটে করিয়া জানিবার শক্তি আমরা লাভ করি নাই।

*

"কত লোকের কাছ হইতে তিনি কত নীচতা, বিশ্বাসঘাতকতা সহ্য করিয়াছেন; কত লোক তাঁহাকে বঞ্চনা করিয়াছে, তাঁহার অতি সামান্য সম্বল হইতে কত নিতান্ত অযোগ্য লোকের অসঙ্গত আবদার তিনি রক্ষা করিয়াছেন, সমস্তই তিনি অকাতরে সহ্য করিয়াছেন, কেবল তাঁহার একমাত্র ভয় এই ছিল, পাছে তাঁহার নিকটতম বন্ধুরাও এই সকল হীনতার দৃষ্টান্তে তাঁহার 'পীপল'-দের প্রতি অবিচার করে। ইহাদের যাহা কিছু ভাল তাহা যেমন তিনি দেখিতে চেষ্টা করিতেন, তেমনি অনাত্মীয়ের অশ্রদ্ধার দৃষ্টিপাত হইতে ইহাদিগকে রক্ষা করিবার জন্য তিনি যেন তাঁহার সমস্ত ব্যথিত মাতৃহৃদয় দিয়া ইহাদিগকে আবৃত করিতে চাহিতেন।

*

"শিবের প্রতি সতীর সত্যকার প্রেম ছিল বলিয়াই তিনি অর্ধাশনে অনশনে অগ্নিতাপ সহ্য করিয়া আপনার অত্যন্ত সুকুমার দেহ ও চিত্তকে কঠিন তপস্যায় সমর্পণ করিয়াছিলেন। এই সতী নিবেদিতাও দিনের পর দিন যে তপস্যা করিয়া-ছিলেন তাহার কঠোরতা অসহ্য ছিল—তিনিও অনেক দিন অর্ধাশন, অনশন স্বীকার করিয়াছেন, তিনি গলির মধ্যে যে-বাড়িতে বাস করিতেন সেখানে বাতাসের অভাবে গ্রীষ্মের তাপে বীতনিদ্র হইয়া রাত কাটাইয়াছেন, তবু ডাক্তার ও বান্ধবদের সনির্বন্ধ অনুরোধেও সে-বাড়ি পরিত্যাগ করেন নাই; এবং আশৈশব তাঁহার সমস্ত সংস্কার ও অভ্যাসকে মুহূর্তে মুহূর্তে পীড়িত করিয়া তিনি প্রফুল্লচিত্তে দিন যাপন করিয়াছেন—ইহা যে সম্ভব হইয়াছে এবং এই সমস্ত স্বীকার করিয়াও শেষ পর্যন্ত তাঁহার তপস্যা ভঙ্গ হয় নাই, তাহার একমাত্র কারণ, ভারতবর্ষের মঙ্গলের প্রতি তাঁহার প্রীতি একান্ত সত্য ছিল, তাহা মোহ ছিল না; মানুষের মধ্যে যে শিব আছেন সেই শিবকেই এই সতী সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণ করিয়া-ছিলেন। এই মানুষের অন্তর-কৈলাসের শিবকেই

যিনি আপন স্বামিরূপে লাভ করিতে চান তাঁহার সাধনার মতো এমন কঠিন সাধনা আর কার আছে?"

এইবার আমরা এই অপূর্ব আত্মোৎসর্গের—এই পরিপূর্ণ আত্মবিলোপের রহস্য সন্ধান করিব। রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধে ভগিনী নিবেদিতার সেই আত্মবিলোপ-কাহিনী যেমন বর্ণিত হইয়াছে, তেমন করিয়া বর্ণনা আর কেহ করিতে পারিতেন না। কিন্তু তাহাতে তিনি ভগিনীর প্রতি যে-শ্রদ্ধা নিবেদন করিয়াছেন, সেই শ্রদ্ধা একান্ত তাঁহারই প্রতি; রবীন্দ্রনাথ বিশেষ করিয়া ভগিনী নিবেদিতার অর্চনা করিয়াছেন। এই অর্চনায় একটা ফাঁক আছে, রবীন্দ্রনাথ ইহাতে নিবেদিতার গুরুকে একবারও স্মরণ করেন নাই। তাহার কারণ বোধ হয় এই যে, রবীন্দ্রনাথ গুরুবাদকেই চিরজীবন অস্বীকার করিয়াছেন। সে যাহাই হউক, নিবেদিতার জীবনে ঐ গুরুবাদ কোন্ অর্থে সত্য—গুরুবাদের তত্ত্বটাই ভ্রান্ত কিনা, সে-বিচার নিষ্প্রয়োজন; কারণ, নিবেদিতার ঐ নামটাও যেমন গুরুদত্ত, তেমনই তাঁহার সেই সমগ্র নিবেদিতা-জীবনই নিরবচ্ছিন্ন গুরুমন্ত্রের সাধনা; তাঁহার সেই আত্মবিলোপও গুরুতেই আত্মবিলোপ। ইহার প্রমাণ নিতান্তই অনাবশ্যক। তাঁহার ভিতরে যে সত্য ছিল, যে অসামান্য ত্যাগ ও প্রেমের শক্তি ছিল—যাহা রবীন্দ্রনাথকেও বিস্মিত ও শ্রদ্ধান্বিত করিয়াছে, সেই শক্তি এমনভাবে উদ্বুদ্ধ করিতে তাঁহার গুরুই পারিয়াছিলেন, গুরুবাদের যদি কোন অর্থ থাকে তবে তাহা ইহাই। ভিতরে সেই বস্তু থাকা চাই; কিন্তু এক-একটি ক্ষণে মানুষের জীবনে এক-একটি দর্শনলাভ হয়; বাহিরে ব্যক্তির রূপেও হয়, আবার অন্তরের একটা দিব্য উপলব্ধির ( revelation ) মতোও হয়, যাহাতে মানুষ যেন দ্বিজত্ব লাভ করে। যাহার প্রকৃতি এবং প্রয়োজন যেমন, তাহার সেইরূপ হইয়া থাকে। কিন্তু বাহিরের কোন অসাধারণ ব্যক্তি-পুরুষের সংস্পর্শেই অধিকাংশ ভাগ্যবান নর বা নারীর জীবনে আশ্চর্য রূপান্তর হইয়াছে, তাহা আমরা জানি। আমাদের শাস্ত্রেও তাই শুধুই 'মনুষ্যত্ব' অর্থাৎ মনুষ্য-জন্ম এবং 'মুমুক্ষুত্ব' অর্থাৎ পরমের পিপাসাই যথেষ্ট বলিয়া স্বীকৃত হয় নাই, তাহার সঙ্গে 'মহাপুরুষ-সংশ্রয়' অত্যাবশ্যক বলা হইয়াছে। ভগিনী নিবেদিতার জীবন-কাহিনী যিনি সম্পূর্ণ জানিবার সুযোগ পাইয়াছেন, তিনি স্বামীজীর সঙ্গে তাঁহার সাক্ষাতের পূর্ব ও পরবর্তী জীবন তুলনা করিলেই বুঝিতে পারিবেন—তাঁহার কেবল ঐ মহাপুরুষের সংশ্রয়টাই যেন বাকি ছিল; যেমন তাহা ঘটিল, অমনি তাঁহার পূর্ববর্তী জীবনের খোলসটি বিদীর্ণ করিয়া আত্মার স্বরূপ প্রকাশ পাইল। সেই লগ্নের সেই অনির্বচনীয় আনন্দের প্লাবন বেগ তাঁহাকে কিরূপ বিহ্বল করিয়াছিল—তাহাও তিনি লিখিয়া গিয়াছেন। যে-মুহূর্তে সর্বত্যাগ—সেই মুহূর্তেই সর্বপ্রাপ্তি। সে-প্রাপ্তি যে কেমন, তাহার পরিচয় আমরা পাইয়াছি—সেই প্রাপ্তির অফুরন্ত ভাণ্ডার হইতেই ভগিনীর সেই অফুরন্ত দান। তেমন করিয়া না পাইলে, এমন করিয়া দান করিতে কেহ পারে না। কিন্তু তিনি পাইয়াছিলেন কোথায়, কাহার নিকটে?

সেকথা তিনিও বলিয়া শেষ করিতে পারেন নাই। স্বামীজীর নিকটে তিনি কি পাইয়াছিলেন এবং স্বামীজী তাঁহার কি ছিলেন, তাহাই বলিবার জন্য তিনি একখানি গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন; সেই গ্রন্থ ( The Master as I Saw Him ) জগৎ-সাহিত্যে মানবাত্মার এক অপূর্ব আত্মকাহিনী হিসাবে অমর হইয়া থাকিবে। এই কাহিনীতে এবং অন্যত্র গুরু ও শিষ্যের মধ্যে যে একটি আত্মিক সম্পর্ক ফুটিয়া উঠিতে দেখি—আমাদের জ্ঞানে তাহার কোন নাম-নির্দেশ করিতে পারি না। গুরু-শিষ্য সম্পর্ক আমাদের দেশে নূতন নয়; সেই সম্পর্কের যত প্রকারভেদ আছে—সাধনমার্গ, অধিকার এবং শিষ্যের ব্যক্তিগত বিশিষ্ট চরিত্র অনুসারে তাহাতে যে বৈচিত্র্য ঘটে তাহাও কিছু কিছু বুঝিতে পারি; কিন্তু স্বামীজীর সহিত ভগিনী নিবেদিতার ঐ সম্পর্ক এমনই অপূর্ব যে, তাহা চিন্তা করিলে দেহধারী আত্মার অনন্ত লীলা একটা নূতন রসরূপে আমাদের হৃদয়গোচর হয়। একদিকে স্বামীজীর সেই দৃপ্ত পৌরুষ—যে-পৌরুষ সকল মমতা, সকল দুর্বলতাকে নিমেষে ভস্মীভূত করিয়া দেয়, আর একদিকে তেমনই তেজস্বিনী নারী; সে-তেজও যজ্ঞবেদির হোমানল শিখার মতো। স্বামী বিবেকানন্দের সেই প্রজ্বলন্ত পৌরুষই যে তেজস্বিনী

নিবেদিতাকে আকর্ষণ করিয়াছিল তাহাতে সন্দেহ নাই—ভগিনী নিবেদিতার চরিত্রে এই তেজ যে কি পরিমাণ ছিল, তাহা অন্তরঙ্গগণ সকলেই জানিতেন। রবীন্দ্রনাথও তাহার উল্লেখ করিয়াছেন, এমনও বলিয়াছেন যে, এই তেজ তিনি সহ্য করিতে পারিতেন না, তিনি লিখিয়াছেন ঃ

"...নিতান্ত মৃদুস্বভাবের লোক ছিলেন বলিয়াই যে নিতান্ত দুর্বলভাবে তিনি আপনাকে বিলুপ্ত করিয়াছিলেন তাহা নহে। তাঁহার মধ্যে একটা দুর্দান্ত জোর ছিল এবং সে জোর যে কাহারো প্রতি প্রয়োগ করিতেন না তাহাও নহে। তিনি যাহা চাহিতেন তাহা সমস্ত মন-প্রাণ দিয়াই চাহিতেন এবং ভিন্ন মতে বা প্রকৃতিতে যখন তাহা বাধা পাইত তখন তাঁহার অসহিষ্ণুতাও যথেষ্ট উগ্র হইয়া উঠিত।"

এই যে তেজ, চিত্তের এই দুর্দমনীয়তা ইহাই ছিল তাঁহার জন্মগত, প্রকৃতিগত সম্পদ ; ইহাই ছিল তাঁহার নিজ আত্মার মূলধন। গুরু বিবেকানন্দ তাঁহার অন্তর্দৃষ্টির বলে এই বস্তুটিকে তাঁহার মধ্যে আবিষ্কার করিয়াছিলেন এবং ইহা যে হোমাগ্নির মতই পবিত্র তাহা বুঝিয়াছিলেন। কিন্তু ঠিক সেই কারণেই ইহা তো কাহারও বশ্যতা স্বীকার করিবে না। যুবক নরেন্দ্রের মধ্যেও ঠাকুর রামকৃষ্ণ ঠিক এই বস্তুই দেখিয়াছেন এবং নরেন্দ্রও ঠিক সেই কারণে বশ্যতা স্বীকার করিতে চাহে নাই। অতএব গুরু ও শিষ্যের প্রথম দর্শনে যে-অবস্থা দাঁড়াইয়াছিল—উভয়ক্ষেত্রে তাহা প্রায় এক। শেষে নরেন্দ্র যেমন বলিয়াছিলেন ঃ "আমাকে জয় করিয়াছিল তাঁহার (শ্রীরামকৃষ্ণের) সেই অদ্ভুত প্রেম", ভগিনী নিবেদিতাও ঠিক তাহাই বলিয়াছেন। স্বামী বিবেকানন্দের সেই দুর্ধর্ষ বীর বৈদান্তিকের প্রেম যে কিরূপ ছিল তাহা আমি পূর্বেই সবিস্তারে বলিয়াছি—পর্বতের মতো অটল এবং পাষাণের মতো কঠিন সেই পুরুষের অন্তরে যে প্রেমের সুধানিস্যন্দিনী নিত্য প্রবাহিত ছিল তাহা সকলের বোধগম্য হইত না। ভগিনী নিবেদিতা এই প্রেমের স্পর্শ লাভ করিয়াছিলেন—তেমন করিয়া বোধ হয় আর কেহ করে নাই ; কারণ সে-প্রেম এমনই যে, তাহাকে অনুভব করিতে হইলে অগ্নিশিখায়-দেহ সমর্পণ করিয়া তাহার জ্বালা সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করিতে হয়।

ভগিনী নিবেদিতা তাঁহার গুরুর প্রতি যে-প্রেমে আকৃষ্ট হইয়াছিলেন তাহার মূলে যদি নারীপ্রকৃতিসুলভ কোন আকুতি মর্মান্তিকরূপে বিদ্যমান থাকিয়া থাকে, গুরু বিবেকানন্দ তাহা সমূলে উৎপাটিত করিয়াছিলেন ; নিবেদিতা নিজেরই পুণ্যবলে তাঁহার গুরুর সেই ব্যক্তি-সম্পর্কহীন মহাপ্রেমের (যে-প্রেমের আমরা ধারণাই করিতে পারি না) অপূর্ব রস আস্বাদন করিতে পারিয়াছিলেন। আমরা জানি, স্বামীজীর পুরুষ-আত্মা প্রকৃতির বশ্যতা আদৌ স্বীকার করে নাই ; মায়াকে একেবারে উড়াইয়া না দিলেও তাহাকে জয় করিয়া, বশ করিয়া তিনি সেবায় নিযুক্ত করিয়াছিলেন, তাহাকেই কল্যাণীমূর্তিতে প্রতিষ্ঠিত করিতে চাহিয়াছিলেন। ভগিনী নিবেদিতার মধ্যে যে নারীপ্রকৃতি ছিল, তাহাকেও তিনি কন্যারূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন, পরম স্নেহে তাঁহাকে সেবার অধিকার দিয়াছিলেন। সেই যে স্নেহ—ভগিনী নিবেদিতা তাহাতেই তাঁহার নারীহৃদয়ের গভীরতম পিপাসা নিবৃত্তি করিয়াছিলেন।

মঃ রোমাঁ রোলাঁ লিখিয়াছেন ঃ

"But her love was so deep that Nivedita does not seem to have kept any memory of the harshness from which she suffered to the point of the great dejection. She only kept the memory of his sweetness. Miss Macleod tells us :

"I said to Nivedita : 'He was all energy'. She replied : 'He was all tenderness'. But I replied : 'I never feel it'. 'That was because it was not shown to you. For he was to each person according to the nature of that person and his way to the Divine'."

সর্বত্যাগিনী তপস্বিনী নারী গুরুর চরণমূলে কেবলমাত্র সেইটুকুর আশ্বাসে নিজের জীবনটাকে পুষ্পাঞ্জলির মতো নিবেদন করিয়া দিয়াছিলেন।

তিনি গুরুর সাক্ষাৎ সাহচর্য বা সঙ্গ খুব অল্পই

পাইয়াছিলেন—তাঁহার ভারতবর্ষে আগমনের পর মাত্র চারি বৎসর স্বামীজী বাঁচিয়াছিলেন, তাহার মধ্যে একবার কয়েক মাসের জন্য অপর কয়েকজন গুরুভগ্নীর সঙ্গে কাশ্মীর-ভ্রমণ উপলক্ষে তিনি স্বামীজীর কিঞ্চিৎ নিকটে অবস্থান করিতে পাইয়াছিলেন। গুরুর নিকটে থাকিবার কোন সুযোগই ছিল না। প্রথম কিছুদিন স্বামীজী তাঁহার এই শিষ্যার প্রতি এমন অতিরিক্ত কঠোর ছিলেন যে, নিবেদিতার সে ছিল একরূপ অগ্নিপরীক্ষা ; শুনা যায়, সেই কঠোরতায় তিনি প্রায় ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছিলেন। তারপর তিনি প্রাণে যে কি বস্তু লাভ করিয়াছিলেন, তাহা আমাদের মতো মানুষের পক্ষে ধারণা করিতে যাওয়া স্পর্ধা মাত্র ; আমি চেষ্টা করিয়াছি, পারি নাই। আমার মনে হইয়াছে, সেই প্রেম মানবীয় ভাষায় প্রকাশ করা সম্ভব নয়—প্রকাশ করিতে গেলেই তাহাকে অশুচি করা হইবে। বোধ হয়, তাহা জগতে একটি মাত্র কবির কাব্য-কল্পনায় কিঞ্চিৎ অভিব্যক্তি লাভ করিয়াছে ; সেখানে দেহ ও মনের সমস্ত মলিনতামুক্ত হইয়া, অথচ মানবহৃদয়ের আকুল রোদনরবে বন্দিত হইয়া সেই প্রেম অতি উর্ধ্বলোক হইতেও আমাদের চক্ষে দীপ্তি দান করে। বিয়াত্রিচের প্রতি মহাকবি দান্তের সেই যে প্রেম, তাহার নাম কি ? তাহা ভগবদ্ভক্তির নিচে, না উপরে, না একই পদবীর ? সেখানে প্রেমের বিষয় ও আশ্রয় অন্যরূপ বটে, কিন্তু ঐরূপ প্রেমে কি নারী-পুরুষ ভেদ আছে ? বৈষ্ণব বলিবেন, আছে, কারণ প্রেমের আশ্রয় মাত্রেই নারী-জাতীয়। তাহা হইলে দান্তেও সেখানে পুরুষ নহেন—নারী। আমি ভগিনী নিবেদিতার এই গুরুভক্তির মধ্যেই নারীহৃদয়ের স্বাভাবিক মমতা কোন্ রূপে রূপান্তরিত হইয়াছিল তাহার একটা অক্ষম অসম্পূর্ণ পরিচয়ের চেষ্টা করিয়াছি ; মানুষের ভাষায় তাহার অধিক অসম্ভব। আবার, আমার মতো মানুষের সাধ্য কি যে, তাঁহার মতো মহীয়সী নারীর তপোবীর্য-মহৎ সেই অন্তরের অন্তস্তলে প্রবেশলাভ করি। তথাপি সেই প্রেমের যে-দিকটি একান্ত ব্যক্তিগত সে-দিকটি—অপর কেহ দূরে থাক—গুরুকেও তিনি দেখিতে দেন নাই, সে-অধিকার গুরুরও ছিল না। তাঁহার সম্পর্কে তিনি শেষ পর্যন্ত কি কঠিন মৌন রক্ষা করিয়াছিলেন, তাহা ভাবিলে বিস্মিত হইতে হয়। তাঁহার গ্রন্থে ( My Master as I Saw Him ) তিনি গুরুর শেষ জীবনের শেষ দিনকয়টির কাহিনীও লিপিবদ্ধ করিয়াছেন ; সর্বশেষে স্বামীজীর তিরোধান-কথাও লিখিয়াছেন। কিন্তু সেই দিনের সেই ঘটনার একটি সংক্ষিপ্ত ও যথার্থ বিবৃতি ছাড়া এমন একটি কথাও তাহাতে নাই, যাহাতে তাঁহার নিজ প্রাণের এতটুকু হাহাকারও শুনিতে পাওয়া যায়। সমগ্র গ্রন্থখানি পাঠ করিবার পর পাঠকমাত্রেই ঐখানে পেঁাছিয়া যতটুকু উদ্বেল না হইয়া পারে না এবং সেই জন্য যে-সহানুভূতি আকাঙ্ক্ষা করে, লেখিকা তাহাতেও বিমুখ। আমারও রীতিমত আশাভঙ্গ হইয়াছিল। তারপর যখন স্বামীজীর পৃথক জীবন-কাহিনীতে তাঁহার সেই তিরোধানের বিস্তৃত বিবরণ-প্রসঙ্গে ভগিনী নিবেদিতার একটি আচরণের কথা অবগত হইলাম, তখন নিজের বিমূঢ়তাকেই ধিক্কার দিলাম। মৃত্যুর পরদিন বেলা ১টা-২টা পর্যন্ত স্বামীজীর শবদেহ একটি কক্ষে শয্যার উপরে সযত্নে শায়িত করিয়া রাখা হইয়াছিল ; নিকটে ও দূরে তাঁহার সেই আকস্মিক দেহত্যাগের সংবাদ প্রেরিত হওয়ায় এবং অন্ত্যেষ্টিকালে সকলের উপস্থিতির যথাসম্ভব সুযোগ দিবার জন্যই এইরূপ বিলম্ব হইয়াছিল। ভগিনী নিবেদিতাও সংবাদ পাইলেন। তাঁহার পক্ষে সে কেমন সংবাদ ? কে তাহা বুঝিবে ? বুঝাইবার প্রয়োজনই বা কি ? পরে কেবল ইহাই দেখি যে, স্বামীজীর সেই শবদেহের পার্শ্বে উপবেশন করিয়া একখানি পাখা হাতে লইয়া তিনি তাঁহাকে ব্যজন করিতেছেন। সে-মূর্তি ধীর-স্থির, একেবারে নিস্তরঙ্গ ; চক্ষে অশ্রু নাই, অধরোষ্ঠও একটু কাঁপিতেছে না। তিনি কেবল একমনে গুরুর দেহে ব্যজনী সঞ্চালন করিতেছেন। তখনও সেই সেবার অধিকারটি ত্যাগ করিবেন না। বুদ্ধের পরম স্নেহাস্পদ ও নিত্যসহচর আনন্দের কথা মনে পড়িল। তিনিও তাঁহার গুরুর মহাপরিনির্বাণ সময়ে শোকাভিভূত হইয়া ক্রন্দন করিয়াছিলেন। বুঝিলাম, সেই পুরুষ অপেক্ষা এই নারীর প্রকৃতি আরও কঠিন, এ-ধাতু অগ্নিতেও গলে না। তাঁহার অন্তরে কি হইতেছিল, তাহা কল্পনা করিতে পারে

কোন্ কবি, কোন্ সাধক তাহা আমি জানি না।

উপরে আমি যে-প্রসঙ্গ একটু সবিস্তারে করিয়াছি, তাহার প্রয়োজন ছিল। ভগিনী নিবেদিতার এই যে আত্মোৎসর্গ—এই জাতিকে তিনি যে এমন চক্ষে দেখিয়াছিলেন এবং তাহাকে এমন করিয়া বক্ষে তুলিয়া লইয়াছিলেন, তাহার কারণ সন্ধান করিতে হইলে কেবল ব্যক্তির ব্যক্তিগত চরিত্র বা প্রকৃতির মধ্যে তাহা পাওয়া যাইবে না। পদ্ম-ফুল খুব বড় ফুলই বটে, তথাপি সূর্যের আলোক ব্যতিরেকে তাহা প্রস্ফুটিত হয় না। ভগিনী নিবেদিতা এই দেশকে যে এত ভালবাসিয়াছিলেন, এমন করিয়া তাঁহার জীবনটাকে তাহার সেবায় বিলাইয়া দিয়াছিলেন, তাহা আদৌ সেই গুরুরই প্রীত্যর্থে। তাঁহার গুরু যাহাকে ভালবাসিয়া-ছিলেন, তিনিও তাহাকে ভাল না বাসিবেন কেমন করিয়া? স্বামীজী যে-দৃষ্টিতে তাঁহার দেশকে দেখিয়াছিলেন, শিষ্যা নিবেদিতার চক্ষে সেই দৃষ্টি তিনি পরাইয়া দিয়াছিলেন, তাঁহার নিজের হৃদয়-খানিকেই এই শিষ্যার বক্ষগহ্বরে যেন বসাইয়া দিয়াছিলেন। নতুবা, এমন অভাবনীয় ঘটনা ঘটিত না। গুরুর সহিত একাত্ম হইয়া, সেই গুরুর হৃদয়ে আপনার হৃদয় নিঃশেষে গলাইয়া মিলাইয়া দিয়া, তিনি যে সেবাব্রত উদ্যাপন করিয়াছিলেন তাহা একাধারে এই দেশের এবং তাঁহার গুরুর সেবা। এমনই হয়; জগতের ইতিহাসে নর-নারীর যত মহাবস্ত্ববদান-কাহিনী আছে—প্রেমই তাহার একমাত্র প্রেরণা। ঐ প্রেমের তত্ত্বই একমাত্র তত্ত্ব—আর সকলই জগতের পক্ষে মিথ্যা। সেই প্রেমকে আমরা একটা সাধারণ বস্তুরূপেই জানি, কখনও বা সেই সাধারণ বস্তুর একটা বিশেষ রূপ দেখিয়া চমৎকৃত হই; কিন্তু তাহার পরমরূপ—সেই অপর রূপ—আমাদের বুদ্ধি ও সংস্কারের অতীত; ভগবদ্প্রেমই বল, আর গুরুভক্তিই বল, কোন নামেই তাহাকে বিশেষিত করা যায় না। নারী-পুরুষ, গুরু-শিষ্য—এসকল সম্পর্ক আমাদের সংস্কারের পোশাক-মাত্র; প্রেম এক রূপ, তাহার দুই রূপ নাই। যাহার অন্তরে এই প্রেম নাই, সেই ব্যক্তি ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের মহিমা কীর্তন করে, তাই গুরুবাদ তাহার নিকটে আর কিছুই নয়—সেই ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের অবমাননা। আসলে গুরু যে আর কিছুই নয়—বৃহতের বেদিমূলে মানুষের ক্ষুদ্র অহংকে বলি দিবার যজ্ঞ-যূপ, প্রেমের অমৃতপানে আত্মাকে আনন্দস্বরূপে অধিষ্ঠিত করিবার পানপাত্র এবং তাহারই প্রয়োজনে অদ্বৈতের একরূপ দ্বৈতবিলাস ইহা যাঁহারা মানেন না, তাঁহারা মানবতার ঊর্ধ্বে উঠিয়াছেন, তাঁহাদের কথা স্বতন্ত্র; কিন্তু যতদিন মানুষ মানুষমাত্র, ততদিন ঐ হীনযান অপেক্ষা এই মহাযানই তাহার প্রশস্ততর পন্থা হইয়া থাকিবে এবং "ক্ষুরস্য ধারা নিশিতা দুরত্যয়া" নয়—ভগিনী নিবেদিতার ঐ জীবন এবং তাঁহার ঐ অপূর্ব সাধনাই মানুষকে সেই আশ্বাসে চিরদিন আশ্বস্ত করিবে। * ☐

* বীর-সন্ন্যাসী বিবেকানন্দ—মোহিতলাল মজুমদার, জেনারেল প্রিন্টার্স অ্যান্ড পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, কলকাতা, ১৩৬৯, পৃঃ ১৪৬-১৬০

**নিবন্ধ**

# রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের নিবেদিতা


## প্রব্রাজিকা প্রবুদ্ধমাতা


'রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের নিবেদিতা'কে জানতে হলে প্রথমে শ্রীরামকৃষ্ণের প্রসঙ্গ আসবে। যদিও নিবেদিতা শ্রীরামকৃষ্ণকে নিজে দর্শন করেননি, কিন্তু গুরু স্বামী বিবেকানন্দের মুখে তাঁর প্রসঙ্গ অসংখ্যবার শুনেছেন। তাঁর মনে হয়েছে, শ্রীরামকৃষ্ণ ও স্বামী বিবেকানন্দ এক অখণ্ড আত্মা, তাঁদের ব্রত-সাধনের প্রয়োজনে দ্বিধাবিভক্ত হয়েছেন। শ্রীরামকৃষ্ণ ও স্বামী বিবেকানন্দের পরিচয় ও সম্পর্ক প্রসঙ্গ আমাদের সকলেরই জানা, কিন্তু নিবেদিতা স্বয়ং স্বামীজীর কাছে, শ্রীশ্রীমায়ের কাছে এবং অন্যান্য শ্রীরামকৃষ্ণ-পার্ষদদের কাছে সে-সম্পর্কে যা শুনেছেন ও জেনেছেন তা তাঁর রচনায় লিপিবদ্ধ করেছেন। নিবেদিতা তাঁর 'মাস্টার অ্যাজ আই স হিম' গ্রন্থে লিখেছেন : এক অপরাহ্ণে কয়েকজন কলেজের যুবক দক্ষিণেশ্বরের কালীবাড়ি দর্শন করতে গিয়ে একটি ঘরে এক সাধুর দর্শন পেলেন। যুবকদের মধ্যে একজন একটি গান গাইলেন, যে-গানে সাধু তাঁকে চিনে নিলেন, এবং এত দেরি করে আসার জন্য অনেক অনুযোগও করলেন। বললেন, 'তোমাকে এই তিন বছর ধরে আমি খুঁজে বেড়াচ্ছি।'

বলা বাহুল্য, সেই সাধু হলেন শ্রীরামকৃষ্ণ এবং সেই যুবক নরেন্দ্রনাথ। শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁকে 'নরঋষি' এবং 'তাঁর কাজে সাহায্য করতে এসেছে' বলায় নরেন্দ্র তাঁকে বদ্ধ পাগল বলে ধারণা করেছিলেন। কিন্তু যে পরম পবিত্রতা ও ঐকান্তিকতা তাঁর মধ্যে তিনি সেদিন দেখেছিলেন, তাঁর মনে হয়েছিল, তা যথার্থই দুর্লভ। প্রাচীনকালে শিষ্য যে-শ্রদ্ধা ও পূজার ভাবে গুরুর কাছে যেত, নরেন্দ্রও তেমনি গুরুর অপার্থিব ও অহৈতুকী প্রেমের আকর্ষণে গৃহ-পরিজন ত্যাগ করে তাঁর চরণপ্রান্তে বছরের পর বছর বসে তাঁর দিব্যশক্তিকে বরণ করেছেন, ধারণ করেছেন। আর গুরু তাঁর মধ্যে তাঁর অতি গুহ্য সাধনসম্পদ ঢেলে দিয়েছেন। চিরকালের এ এক মহৎ ভাবোদ্দীপক ছবি।

নরেন্দ্রনাথের ভারতীয় মননশক্তির সঙ্গে ছিল পাশ্চাত্য বিজ্ঞানমনস্কতার সংমিশ্রণ। ফলে সন্দেহ ও অবিশ্বাস থাকলেও সত্যলাভের প্রতি তাঁর ছিল দৃঢ় ও অবিচল আগ্রহ। সে-কারণে শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর অসাধারণ শক্তিধর শিষ্যের স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ না করেও ওস্তাদ প্রশিক্ষকের মতো নরেন্দ্রকে নিজের ভাবে খেলতে দিয়েছিলেন এবং খেলতে খেলতেই তিনি স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছিলেন কালীকে। কালী ও ব্রহ্ম অভেদ—এ-তত্ত্বটি না জানলে ব্রহ্মের সমগ্র রূপটি অধরা থেকে যায়। শ্রীরামকৃষ্ণের দর্শনাদি যা নরেন্দ্র এতদিন তাঁর মাথার খেয়াল বলে উড়িয়ে দিয়েছিলেন, কিন্তু এখন আর তা পারলেন না। বরং নরেন্দ্র বুঝলেন, শ্রীরামকৃষ্ণের কালী যথার্থই চিন্ময় সত্তা। ব্রাহ্মভক্ত নরেন্দ্রের কালীকে মানা এক অসম্ভব সম্ভব করা। সেজন্য সেদিন নরেন্দ্র কালীকে মেনেছিলেন, শ্রীরামকৃষ্ণ আনন্দে উদ্বেল হয়েছিলেন।

নিবেদিতা লিখেছিলেন, শ্রীরামকৃষ্ণের শক্তি ছিল বর্ণনাতীত। তাঁর পবিত্র স্পর্শে সাধারণ মানুষও সাধু হয়ে গেছেন। ভূরি ভূরি দৃষ্টান্ত আছে তার। পাপাচারী ও তাপত্রয়ে তাপিত মানুষের কাছে তাঁর বাণী ছিল পবিত্র জাহ্নবীধারার মতো স্নিগ্ধ। তাঁর আশীর্বাদ ছিল অমোঘ। নিবেদিতার দৃষ্টিতে শ্রীরামকৃষ্ণ প্রাচীন ভারতীয় প্রজ্ঞার ঘনীভূত বিগ্রহ। স্বামীজীর মতে, শাস্ত্রাদি জ্ঞানের একমাত্র উৎস নয়। শ্রীরামকৃষ্ণের যে ত্যাগময় মহাজীবন তিনি দিনের পর দিন প্রত্যক্ষ করেছেন, তা ছিল শাস্ত্রের জীবন্ত ভাষ্যস্বরূপ। নিবেদিতার মতে, তাঁর জীবনে শংকরাচার্যের অদ্বৈততত্ত্ব প্রমাণিত হয়েছে। শ্রীরামকৃষ্ণ সম্পর্কে এই ছিল স্বামীজীর উপলব্ধি, নিবেদিতা বলেছেন।

নিবেদিতা লিখেছেন, পুণ্যভূমি ভারত ভিন্ন অন্য কোথাও শ্রীরামকৃষ্ণদেবের আবির্ভাব সম্ভব ছিল না একথা যেমন সত্য, তেমনি একথা ঠিক নয় যে,

তিনি কেবলমাত্র ভারতীয় জনমানসের প্রতিনিধি, তাঁর মধ্যে বিশ্বজগৎ—জগতের নিখিল মানব প্রতিবিম্বিত হয়েছে।

এইভাবে নিবেদিতার লেখার ছত্রে ছত্রে আধ্যাত্মিকতার ঘনীভূত বিগ্রহ, ত্যাগ ও পবিত্রতার জমাট রূপ শ্রীরামকৃষ্ণের আবির্ভাব হয়েছে, যা তাঁর অন্তরের শ্রদ্ধা ও পূজা দিয়ে গড়া। সেই দিব্য শিশুর দিব্য সত্তার কাছে নিবেদিতা নিজেকে সমর্পণ করেছিলেন। সেজন্য তিনি 'শ্রীরামকৃষ্ণের নিবেদিতা'।

শ্রীরামকৃষ্ণের দেহান্তের পর তাঁর ন্যস্ত 'দায়' মাথায় বহন করে স্বামী বিবেকানন্দ স্বদেশ পরিক্রমা শুরু করেন। অতঃপর তিনি আমেরিকার বিখ্যাত ধর্মমহাসভায় পৌঁছালেন। সে-সভায় উপস্থিত ব্যক্তিরা হিন্দুধর্ম সম্বন্ধে অল্পই জানতেন। বিবেকানন্দ কয়েক বছর ধরে ভারতের গ্রামে গ্রামে, জনপদে জনপদে ঘুরে বেড়িয়েছেন, ভারতবাসীর সঙ্গে কথোপকথনে যে 'ভারতদর্শন' তাঁর হয়েছিল তা যেমন ছিল নির্ভুল, তেমনই সূক্ষ্ম ও ব্যাপক। এই দৃষ্টিলাভের ফলেই ধর্মমহাসভায় তাঁর দৃপ্তকণ্ঠে ঘোষণাঃ হিন্দুর মহামিলন ক্ষেত্র হলো মুক্তি। হিন্দু শুধু সহিষ্ণুতায় বিশ্বাসী নয়, সে একই সঙ্গে বিশ্বাসী গ্রহিষ্ণুতায়।

নিবেদিতার মতে, পাশ্চাত্যে তাঁর বিরাট সাফল্যের তিনটি প্রধান কারণ ছিল—প্রথমতঃ তিনি ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষিত হলেও পাশ্চাত্যের ইংরেজীশিক্ষায় পারদর্শী ছিলেন। দ্বিতীয়তঃ আধুনিক জগৎ সম্বন্ধে সম্পূর্ণভাবে তিনি অবহিত ছিলেন। সবশেষে, সংস্কৃতে তাঁর অগাধ ব্যুৎপত্তি ছিল। এই সকলের সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল তাঁর গুরুর প্রতি অপরিমেয় শ্রদ্ধা এবং ভারত ও ভারতবাসীর অখণ্ডতা সম্বন্ধে একান্ত বিশ্বাস। কি প্রাচ্য, কি পাশ্চাত্য, ধর্মের গোঁড়ামি নাশ করে তার সারবস্তুকে স্বীকার করার জন্য তিনি ছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণের আকাঙ্ক্ষিত সমন্বয়-পুরুষ।

নিবেদিতা বলেছেন, স্বামীজীর চিন্তাধারায় দুটি ভাব বিশেষভাবে প্রকটিত। তিনি দৃঢ়ভাবে বলেছেন, সর্বোচ্চ অর্থে সব ধর্মই সত্য। মানুষ সত্য থেকেই সত্যের দিকে অগ্রসর হয়। মানুষের মধ্যে অন্তর্নিহিত দেবত্বই তাকে উচ্চ থেকে উচ্চতর সত্যের পথে পরিচালিত করে। অপরটি হলো—অদ্বৈতদর্শন। পাপ-পুণ্য, সুখ-দুঃখ, রূপ-অরূপের পশ্চাতে আত্মস্বরূপে যিনি আছেন, 'তিনিই সেই', 'তিনিই আমি'।

নিবেদিতা বলেছেন, স্বামীজী বিশ্বাস করতেন, প্রতীচ্যের কাছে প্রাচ্যের ভূমিকা হবে আধ্যাত্মিক গুরুর, আচার্যের। তিনি নিজেকে পাশ্চাত্যের মানুষের কাছে কখনো হীন ভাবেননি। স্বামীজীর বিরাট প্রতিভার মূলে আছে তাঁর মর্যাদাবোধ এবং তা রাজকীয়।

নিবেদিতা বলেছেন, ইংরেজ ও আমেরিকা স্বামীজীর ধর্মমত ব্যাখ্যাকে সর্বোচ্চ সংস্কৃতির অবদানরূপে গ্রহণ করেছিল। হিন্দুধর্মকে যে গৌরবের আসনে তিনি প্রতিষ্ঠিত করেছেন, প্রকৃতপক্ষে তা দক্ষিণেশ্বরের সেই সাধারণ মানুষটির কাছ থেকেই এসেছে। তাঁর শক্তিতেই ভাবরাজ্যে এশিয়ার নেতৃত্বের পুনরুদ্ধার করেছিলেন স্বামীজী।

শ্রীরামকৃষ্ণের বাণী বিশ্বময় ছড়িয়ে দেবার জন্য স্বামীজী পাশ্চাত্যে ঘুরেছেন। ১৮৯৫ খ্রীস্টাব্দে লণ্ডনে এক শীতল অপরাহ্ণে স্বামীজীর সঙ্গে নিবেদিতার প্রথম সাক্ষাতের দিনেই নিবেদিতার মনে হয়েছিল, পাশ্চাত্যের জন্য এক মহান বাণী তিনি দূর দেশ থেকে বহন করে এনেছেন। নিবেদিতার পূর্বজীবন বিশ্লেষণ করলে বোঝা যায় যে, শ্রীরামকৃষ্ণ ও স্বামী বিবেকানন্দের ভাবাদর্শে উৎসর্গের জন্যই তাঁর জীবনের প্রস্তুতি অলক্ষ্যে চলেছিল সর্বপ্রকারে। মার্গারেট এলিজাবেথ নোবলের ১৮৬৭ খ্রীস্টাব্দের ২৮ অক্টোবর জন্মের সঙ্গে সঙ্গেই তাঁর জননী তাঁকে ভগবচ্চরণে নিবেদন করেন। ধর্মযাজক পিতার ধর্মসম্বন্ধীয় ভাষণ শুনতে শুনতে শিশুর মন যেমন স্বভাবতই ধর্মপ্রবণ হয়েছিল, আবার তাঁর বাগ্মিতা, নেতৃত্বের ভাব, চরিত্রের বলিষ্ঠতা ঐ শৈশবেই তিনি আয়ত্ত করে নিয়েছিলেন। মার্গারেটের যখন দশ বছর বয়স তখন তাঁর পিতার মৃত্যু হয়। কন্যার মধ্যে এক অসামান্য প্রতিভার দ্যুতি দেখেছিলেন পিতা। "সম্ভবতঃ কোন দূর দেশ থেকে কোন মহৎ উদ্দেশ্যসাধনের জন্য তার কাছে আহ্বান আসবে। সে-আহ্বানে সাড়া দেবার জন্য যেন প্রস্তুত থাকে মার্গারেট"—এই ছিল

মার্গারেটের মায়ের কাছে তাঁর পিতার অন্তিম অনুরোধ।

চার্চের যে-স্কুলে তিনি পড়েছিলেন, তাতে ধর্ম বলতে নৈতিক শিক্ষা ও কৃচ্ছ্রসাধনই ছিল প্রধান। স্বাভাবিকভাবেই মার্গারেটের আধ্যাত্মিক ক্ষুধা এই ধর্মে তৃপ্ত হতে পারেনি। ঠিক এমনই সন্ধিক্ষণে মার্গারেট স্বামীজীর দর্শনলাভ করেন—যে পরম ক্ষণটির জন্য জন্মলগ্ন থেকেই চলছিল তাঁর তপস্যা।

স্বামীজীর লণ্ডনের বক্তৃতাবলী মার্গারেট মনোযোগ দিয়ে শুনতেন। তাঁর বীরত্বব্যঞ্জক ব্যক্তিত্ব মার্গারেটকে মুগ্ধ করেছিল। স্বামীজীর বেদান্তের আলোচনা তাঁকে অভিভূত করেছিল। সে-প্রসঙ্গে নিবেদিতা বলেছেন: মায়া বা প্রকৃতির মোহাবরণ খসিয়ে আত্মলোকে পৌঁছে যাওয়াই বন্ধনমুক্তি। বেদান্তের বজ্রনির্ঘোষ হলো—প্রকৃতির জন্য আত্মা নয়, আত্মার জন্যই প্রকৃতি। আত্মলাভের জন্য প্রয়োজন সম্পূর্ণ অনাসক্তি বা ত্যাগ। ভোগ কখনই সে-পথে সাহায্য করতে পারে না। মার্গারেট বলেছেন, তাঁর গুরুর কাছে তিনি বীরত্বের সঙ্গে ত্যাগ এবং শরণাগতির কথা সবচেয়ে বেশি শুনেছেন।

মার্গারেটের তীক্ষ্ণ মেধা ও বুদ্ধি স্বামীজীর কোন বক্তব্যই বিনা বিচারে গ্রহণ করতে চায়নি। যেমন স্বামীজী চাননি তাঁর গুরুর কথা নির্বিচারে গ্রহণ করতে। নিবেদিতাও তাই করবেন, স্বামীজী চেয়েছিলেন। আর ঠিক সেই কারণেই মার্গারেট উত্তরোত্তর স্বামীজী ও তাঁর মতবাদের প্রতি প্রবল আকর্ষণ বোধ করেছিলেন। স্বামীজীও মার্গারেটের অসীম বুদ্ধিমত্তা, তেজস্বিতা ও সত্যানুরাগ দেখে মুগ্ধ হয়েছিলেন। স্বামীজীর আহ্বান মার্গারেট প্রাণে প্রাণে অনুভব করছিলেন। স্বামীজী তাঁকে লিখেছিলেন: "জগৎ চায় চরিত্র, জ্বলন্ত নিঃস্বার্থ প্রেম। হে মহাপ্রাণ, ওঠো, জাগো! জগৎ দুঃখে পুড়ে খাক হয়ে যাচ্ছে—তোমার কি নিদ্রা সাজে?"

মার্গারেটের সঙ্কল্প স্থির হয়ে গেল। তিনি ভারতের সেবায় নিজেকে উৎসর্গ করার আকাঙ্ক্ষা স্বামীজীকে বারবার জানালেন। স্বামীজী তাঁকে ভেবে দেখতে বললেন, অবশেষে যখন বুঝলেন মার্গারেটের চাওয়ায় কোন ফাঁকি নেই তখন তিনি লিখলেন:

"তোমাকে খোলাখুলি বলছি, এখন আমার বিশ্বাস হয়েছে যে, ভারতের কাজে তোমার এক বিরাট ভবিষ্যৎ রয়েছে। ভারতের জন্য, বিশেষতঃ ভারতের নারীসমাজের জন্য, পুরুষের চেয়ে নারীর—একজন প্রকৃত সিংহীর প্রয়োজন। ভারতবর্ষ এখনও মহীয়সী মহিলার জন্মদান করতে পারছে না, তাই অন্য জাতির থেকে তাকে ধার করতে হবে। তোমার শিক্ষা, ঐকান্তিকতা, পবিত্রতা, অসীম ভালবাসা, দৃঢ়তা—সর্বোপরি তোমার ধমনীতে প্রবাহিত কেল্টিক রক্তের জন্য তুমি ঠিক সেইরূপ নারী, যাকে ভারতের প্রয়োজন।"

মার্গারেট স্বদেশ, স্বজন ত্যাগ করে চিরতরে ভারতের পথে পাড়ি দিলেন। ভারতে এসে দেখলেন গুরুকে তাঁর স্বদেশভূমিতে, দেখলেন ভারতবর্ষকে। এলেন শ্রীমা সারদাদেবীর পদপ্রান্তে। পল্লীনারী হলেও তিনি ছিলেন সংস্কারমুক্ত বিশাল মনের অধিকারিণী। তিনি সহজেই বিদেশিনী মার্গারেটকে কাছে টেনে নিলেন। তাঁর সহজ-সরল-স্নিগ্ধ-দিব্য জীবন মার্গারেটের মনে গভীর রেখাপাত করল।

কিছুদিন পর স্বামীজী মার্গারেটকে যথাবিধি ব্রহ্মচর্য দীক্ষা দিলেন। তিনি হলেন ভারতসেবায় নিবেদিত-প্রাণ 'নিবেদিতা'। স্বামীজী স্ত্রীশিক্ষার পরিকল্পনার কথা নিবেদিতাকে অবহিত করলেন, নিজে সঙ্গে করে নিয়ে গেলেন ভারতদর্শনে। পরিচয় হলো ভারতের মাটির সঙ্গে, ভারতের মানুষের সঙ্গে, ভারতের আত্মার সঙ্গে। 'মার্গারেট থেকে নিবেদিতা' একটি যথার্থই দীর্ঘ মানসিক পরিক্রমা, যার অনেকটাই সম্পন্ন হয়েছিল স্বামীজীর সঙ্গে হিমালয়-ভ্রমণকালে। নিবেদিতা উপলব্ধি করলেন, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের তুলনামূলক ধর্ম, দর্শন, ইতিহাস, শিল্প, বিজ্ঞান, স্থাপত্য প্রভৃতি বহুতর বিষয়ে স্বামীজী ছিলেন জীবন্ত বিশ্বকোষ।

শুধু ভারতদর্শনের সময় নয়, স্বামীজীকে প্রথম দর্শনের দিন থেকে স্বামীজীর সঙ্গে তাঁর সাক্ষাতের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত স্বামীজীর মুখে তিনি যা শুনেছেন এবং স্বামীজীর সান্নিধ্যে যা তিনি অনুভব করেছেন সমস্ত কিছুই তাঁর

নিজের অসাধারণ শক্তিশালী লেখনীমুখে শুধু যে ধরে রেখেছেন তাই নয়, সমস্ত কিছুকে তিনি সম্পূর্ণ আত্মসাৎও করেছেন। স্বামী বিবেকানন্দ সম্বন্ধে রোমাঁ রোলাঁ থেকে শুরু করে বহু বিদগ্ধ দেশী ও বিদেশী মনীষী, কবি ও সাহিত্যিক কলম ধরেছেন; কিন্তু এখনও পর্যন্ত কেউই তাঁদের রচনায় এবং বর্ণনায় নিবেদিতার অমর গ্রন্থ 'The Master as I Saw Him'-কে অতিক্রম করতে পারেননি। বিবেকানন্দের জীবন ও সাহিত্যে নিবেদিতার এই গ্রন্থটি একটি অসাধারণ সংযোজন। এই গ্রন্থে নিবেদিতা তাঁর গুরুর প্রতি গভীরতর শ্রদ্ধা ও নিবিড়তম প্রেম উজাড় করে দিয়েছেন। কিন্তু কোন সময়েই তাঁর যুক্তি, বুদ্ধি এবং সংযম ভাবালুতায় আচ্ছন্ন হয়নি। জীবনীগ্রন্থ রচনায় এই কৃতিত্ব বাস্তবিকই দুর্লভ। তাঁর মহান গুরুর অসাধারণ চরিত্র চিত্রণ করতে গিয়ে তিনি বিনয়-নম্রভাবে লিখেছেন: তাঁর এই প্রয়াস স্বামীজীর জীবনের খণ্ডাংশের বিবরণ মাত্র হবে। তবে এই খণ্ড সুরের মধ্যে তাঁর মহান জীবনের দু-চারটি কথাও যদি প্রকাশিত হয় তাই হবে তাঁর সার্থকতা। শুধু এই গ্রন্থটিই নয়, নিবেদিতা-রচিত সকল গ্রন্থের সমস্ত অংশই জুড়ে রয়েছেন তাঁর গুরু স্বামী বিবেকানন্দ এবং বলাবাহুল্য, তাঁর পিছনে পরমগুরু শ্রীরামকৃষ্ণ।

ক্রমে নিবেদিতার মধ্যে স্বামীজী জাগ্রত করেছিলেন গভীর ভারতপ্রেম। নিবেদিতা ভুলে গেলেন, তিনি ইংরেজ। ভুলে গেলেন, তিনি খ্রীস্টান। স্বামীজী তাঁকে কাদার তালের মতো ভেঙে ভেঙে গড়লেন। নির্মিত হলেন নিবেদিতা। নিখুঁত নিবেদনের প্রতিমা। এরপর নিবেদিতার কালী-ভাবনা। নিবেদিতার 'কালী দ্য মাদার' গ্রন্থ ভাব ও ভাষার সরলতায় অপূর্ব। নিবেদিতা বিশ্বাস করতেন, স্বামীজী গভীর ভাবমুখে তাঁর 'কালী দ্য মাদার' কবিতা লিখেছিলেন। একবার তিনি নিবেদিতাকে বলেছিলেন: "আমি বিশ্বাস করি, শ্রীরামকৃষ্ণ একজন প্রেরিত পুরুষ। আমি নিজেও একজন প্রেরিত পুরুষ এবং তুমিও প্রেরিত।" 'প্রেরিত' না হলে এরকম দিব্য অনুভূতি-ভরা লেখা হয় না। নিবেদিতার 'Voice of the Mother' প্রবন্ধ ('কালী দ্য মাদার'-এর অন্তর্গত) থেকে কয়েক ছত্র:

"কিছু চেয়ো না, কিছু খুঁজো না, পরিকল্পনা করো না, আমার ইচ্ছা (কালীর) তোমার মধ্যে প্রবাহিত হোক, ঠিক যেমন বিশাল বারিধি শঙ্খের মধ্যে দিয়ে প্রবাহিত হয়।... আমার বিরোধী স্বার্থের শিকড় উপড়ে ফেলো। আমি যখন কথা বলব তখন প্রেম, বন্ধুত্ব, সুখ, আশ্রয়—কোন কিছুর সুর যেন শোনা না যায়।..." স্বামীজীই যেন ভাবরূপে ফুটে উঠেছেন নিবেদিতার 'কালী দ্য মাদার'-এ।

প্রথমে 'রামকৃষ্ণের নিবেদিতা', পরে 'রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের নিবেদিতা' বলে তিনি নিজের পরিচয় দিতেন। নিবেদিতার লেখায় স্বামীজীর চিন্তার প্রতিফলন সর্বাগ্রে চোখে পড়ে, ছত্রে ছত্রেই স্বামীজী। গুরুময় নিবেদিতার ভাবটি বাস্তবিকই অতুলনীয়। অনবদ্য ভাষায় তিনি লিখেছেন: "জীবন তখন মুণ্ডহীন কবন্ধ হয়ে যেত, যদি তিনি (স্বামীজী) না আসতেন। কারণ আমার মধ্যে সর্বদাই এই জ্বলন্ত কণ্ঠ ছিল—ছিল না উচ্চারণ। কতবার—কতবার কলম হাতে নিয়ে বসেছি কিছু বলবার জন্য—কিন্তু বাণীশূন্য। আর এখন তার কোন শেষ নেই। কিন্তু যদি তিনি না আসতেন—যদি তিনি হিমালয়ের শিখরে বসে ধ্যান করতেন তাহলে আমি অন্ততঃ কখনো এখানে আসতাম না।"

নিবেদিতা একটি রুদ্রাক্ষের মালা গলায় পরতেন। সেই মালায় জপ করতেন ভারতবর্ষ, ভারতবর্ষ, ভারতবর্ষ। ভারতই তাঁর ইষ্ট, ভারতই জপের মন্ত্র। ভারতের সবকিছুই তাঁর কাছে বরণীয়, মহৎ, শ্রেষ্ঠের মধ্যেও শ্রেষ্ঠ। ভারতে জন্মগ্রহণ না করার জন্য তিনি দুঃখ করেছেন। নিবেদিতা এই অপার্থিব প্রেমদৃষ্টি স্বামীজীর কাছে লাভ করেছিলেন। স্বামীজীর সঙ্গে তাঁর পরিচয়ের কাল একত্রিত করে মাত্র বছর দুয়েক দাঁড়ায়। কিন্তু এই স্বল্প সময় নিবেদিতার কাছে যেন চিরন্তন কালের অবিনশ্বর সম্পদ। তাই তিনি 'বিবেকানন্দের নিবেদিতা'।

এবং যেহেতু রামকৃষ্ণ ও বিবেকানন্দ দুটি পৃথক সত্তা নন; বিবেকানন্দই রামকৃষ্ণ এবং রামকৃষ্ণই বিবেকানন্দ, তাই তিনি 'রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের নিবেদিতা'। □

গ্রন্থ-পরিচয়

# ভারতের আলোকদূতী ভগিনী নিবেদিতা

## স্বামী পূর্ণাত্মানন্দ

**নিবেদিতা লোকমাতা** (২য় ও ৩য় খণ্ড): শঙ্করীপ্রসাদ বসু। আনন্দ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, কলকাতা-৯। মূল্য: পঞ্চাশ টাকা এবং চল্লিশ টাকা।

রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ ভাবান্দোলন নিয়ে আজ শুধু ভারতেই নয়, সারা পৃথিবীতেই প্রচুর আলোচনা, গবেষণা ও অন্বেষণ চলছে। বিগত তিন দশক ধরে দেশে এবং বিদেশে প্রধানতঃ যে দুজন এ-বিষয়ে সুধীমণ্ডলীর দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন তাঁরা হলেন মেরী লুইস বার্ক এবং শঙ্করীপ্রসাদ বসু।

শঙ্করীপ্রসাদ বসুর সাম্প্রতিক গবেষণার ফসল **নিবেদিতা লোকমাতা**র দ্বিতীয় এবং তৃতীয় খণ্ড। প্রায় তিরিশ বছর আগে এই কালজয়ী গ্রন্থের প্রথম খণ্ডটি প্রকাশিত হয়েছিল। বলা বাহুল্য, আলোচ্য গ্রন্থটি রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ ভাবান্দোলনের ক্ষেত্রে একটি উল্লেখযোগ্য মাইলপ্রস্তর। শঙ্করীপ্রসাদ বসু তাঁর গ্রন্থে দেখিয়েছেন, আধুনিক ভারতের এমন কোন ক্ষেত্র নেই যেখানে ভগিনী নিবেদিতার ভূমিকা ও অবদান নেই। তাঁর গুরু স্বামী বিবেকানন্দের যথার্থ শিষ্যার পরিচয় তিনি সেক্ষেত্রে রেখেছেন। শঙ্করীপ্রসাদ বসু দেখিয়েছেন, ভারতের নবজাগরণের প্রত্যেক ক্ষেত্রে নিবেদিতা বিচরণ করেছেন তাঁর অপ্রতিরোধ্য উপস্থিতি নিয়ে। এবং তা একটিমাত্র উদ্বেল প্রেরণায়। তা হলো স্বামীজীর ভাব, চিন্তা, স্বপ্ন ও আকাঙ্ক্ষাকে পূর্ণ করা।

**নিবেদিতা লোকমাতা** গ্রন্থের দ্বিতীয় এবং তৃতীয় খণ্ডের প্রতিপাদ্য বিষয় 'নিবেদিতা ও জাতীয় আন্দোলন' (১ম এবং ২য় পর্ব)। লেখক দেখিয়েছেন ভারতীয় নবজাগরণে নিবেদিতার ভূমিকার আকার। দেখিয়েছেন ভারতের জাতীয় আন্দোলনকে ভগিনী নিবেদিতা কি বিপুল পরিমাণ গতি ও অসাধারণ মাত্রা দান করেছিলেন। ভারতের শিক্ষাদর্শ, শিল্প-চিন্তা, বিজ্ঞানসাধনা, ইতিহাসচর্চা, জাতীয় ঐতিহ্য ও কৃষ্টির নবমূল্যায়ন এবং সাহিত্যসৃষ্টিতে নতুন দিগন্ত উন্মোচনে নিবেদিতা যে অসাধারণ প্রভাব রেখে-ছিলেন তৎসম্পর্কিত তথ্য অত্যন্ত যত্ন এবং প্রভূত নিষ্ঠা ও পরিশ্রমের সঙ্গে শঙ্করীপ্রসাদ বসু তুলে ধরেছেন। সেইসঙ্গে নিবেদিতার মূল্যায়নে সমকালীন এবং পরবর্তী কালের ঐতিহাসিকদের অসামর্থ্য এবং বিচিত্র ঔদাসীন্যকেও তিনি দেখাতে ভোলেননি। প্রথম খণ্ডে আমরা পাই স্বদেশী আন্দোলনে নিবেদিতার প্রেরণাদাত্রীর ভূমিকার কথা—অরবিন্দ, বাঘা যতীন, গোপালকৃষ্ণ গোখলে প্রমুখ যে-ভূমিকা মুক্তকণ্ঠে ও সমুচ্চ শ্রদ্ধায় স্বীকার করেছেন।

স্বদেশী আন্দোলনের বিষয়টি বিস্তৃত হয়েছে গ্রন্থের **তৃতীয় খণ্ডে**। এখানে আমরা পাচ্ছি নিবেদিতার পিছনে ব্রিটিশ গোয়েন্দার সতর্ক দৃষ্টির কাহিনী, সেই সঙ্গে পাচ্ছি অসামান্য দক্ষতায় ব্রিটিশ গোয়েন্দা পুলিসকে নিবেদিতার পর্যুদস্ত করার কাহিনীও। পাচ্ছি বিপিনচন্দ্র পাল, শ্যামজী কৃষ্ণবর্মা, চিত্তরঞ্জন দাশ, সুব্রহ্মণ্য ভারতী প্রমুখের সঙ্গে নিবেদিতার বিপ্লব-সম্পর্কের কথা। শাসক শ্রেণীর প্রভাবশালী ইংরেজী পত্রিকা 'স্টেটসম্যান'-এ নিবেদিতার প্রভাবে জাতীয়তার অনুপ্রবেশের কথাও আছে এখানে, আছে নিবেদিতার প্রভাবে ও প্রেরণায় 'স্টেটসম্যান'-এর তৎকালীন সম্পাদক র‍্যাটক্লিফের ভারতপ্রেমে দীক্ষা এবং তার প্রতিক্রিয়ার কাহিনী।

শঙ্করীপ্রসাদ বসু তাঁর **নিবেদিতা লোকমাতা** গ্রন্থের আলোচ্য খণ্ডদুটিতে শুধু যে বিপুল তথ্যের, যে-তথ্যের অনেকাংশই এযাবৎ অনাবিষ্কৃত ও অজ্ঞাত ছিল, সমাবেশ ঘটিয়েছেন তাই নয়, অসামান্য দক্ষতায় সেই বিপুল তথ্যাবলীকে বিন্যস্ত করেছেন এবং অনবদ্য ভাষায় উপস্থাপন করেছেন। তাঁর ভাষার প্রসাদগুণে তথ্যের ভার কখনো পাঠককে ক্লিষ্ট করে না, বরং পরবর্তী পর্যায়ের জন্য এক ব্যাকুল অনুসন্ধিৎসা সঞ্চার করে চলে। ফলে গবেষণা-গ্রন্থের আবেদন উপন্যাসের আকর্ষণকেও অনিবার্যভাবে অতিক্রম করে যায়। বাস্তবিক, বর্ণনার সৌন্দর্যে, ভাষার ঐশ্বর্যে যুক্তি ও তথ্যে ঠাসা একটি বিশাল গবেষণা-গ্রন্থ কখনো হয়ে উঠেছে অসাধারণ একটি ছবি, কখনো অনুপম এক কবিতা। □

# রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশন সংবাদ

## উৎসব-অনুষ্ঠান

### স্বামী বিবেকানন্দের ভারত-পরিক্রমা ও শিকাগো ধর্মমহাসভায় যোগদানের শতবর্ষপূর্তি উৎসব

**কাঁথি আশ্রম** গত ১৫, ১৬ ও ১৭ মে '৯৩ শতবর্ষপূর্তি উৎসব উপলক্ষে যুবসম্মেলন ও ভক্ত-সম্মেলনের আয়োজন করেছে। যুবসম্মেলনে পাঁচশো যুবপ্রতিনিধি এবং ভক্তসম্মেলনে প্রায় চারশো ভক্ত নরনারী যোগদান করেন। উৎসবের দ্বিতীয় দিন এক বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা কাঁথি শহরের বিভিন্ন পথ পরিক্রমা করে। শহরের সকল বিদ্যালয় ও মহাবিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রী এবং বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সদস্যাবৃন্দ শোভাযাত্রায় অংশগ্রহণ করেন। ঐদিন প্রায় সাড়ে পাঁচহাজার ভক্তকে বসিয়ে খিচুড়ি প্রসাদ দেওয়া হয়। উৎসবের ধর্মসভাগুলিতে সভাপতিত্ব করেন স্বামী গৌতমানন্দ। ভাষণ দেন স্বামী তত্ত্বস্থানন্দ ও স্বামী সনাতনানন্দ। এই উপলক্ষে আশ্রম কর্তৃপক্ষ একটি স্মরণিকাও প্রকাশ করেছেন। উৎসবের অঙ্গ হিসাবে গত মার্চ মাসে কাঁথি ময়দানে অনুষ্ঠিত গান্ধীমেলায় আশ্রমের পক্ষ থেকে একটি আকর্ষণীয় প্রদর্শনী খোলা হয়েছিল।

**ভুবনেশ্বর আশ্রম** গত ৩০ জুলাই এক কবি-সম্মেলনের আয়োজন করেছিল। বিশিষ্ট কবি ও উড়িষ্যা সরকারের মন্ত্রী প্রসন্নকুমার পট্টসানি সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন। তিনি ছাড়া আরও নয়জন কবি সম্মেলনে যোগদান করেছিলেন।

**পুরী মঠ** গত ১২-১৫ আগস্ট চারদিনব্যাপী এক ভক্তসম্মেলনের আয়োজন করেছিল। মঠ-কর্তৃপক্ষ কলেজ-ছাত্রদের জন্য একটি বার্ষিক স্কলারশিপ প্রবর্তন করেন। প্রতি বছর এই স্কলারশিপ থেকে পাঁচজন কলেজ-ছাত্রের প্রত্যেককে ছয়শো টাকা করে দেওয়া হবে।

**তমলুক আশ্রম** গত ২৫-২৭ জুন তিনদিনের একটি ভক্তসম্মেলনের আয়োজন করে। ২৫ জুন সম্মেলনের উদ্বোধন করেন স্বামী আপ্তকামানন্দ। সম্মেলনে পাঠ, আলোচনা, প্রশ্নোত্তর, সঙ্গীত, সমবেত ধ্যান ও ভজন অনুষ্ঠিত হয়। বিভিন্ন অধিবেশনে ভাষণ দেন স্বামী স্বতন্ত্রানন্দ, স্বামী একরূপানন্দ, স্বামী হরিদেবানন্দ, দীপককুমার দত্ত প্রমুখ। সঙ্গীত পরিবেশন করেন স্বামী একরূপা-নন্দ, শচীকান্ত বেরা ও নিশীথকুমার চট্টোপাধ্যায়। সম্মেলনে মোট ২২৪জন ভক্ত যোগদান করেছিলেন।

## উদ্বোধন

গত ১৬ আগস্ট **বেলুড় মঠের** সংলগ্ন নীলাম্বর-বাবুর বাগানবাড়িতে বহু সাধু-ব্রহ্মচারী ও ভক্ত-বৃন্দের উপস্থিতিতে **বেদবিদ্যালয়ের** উদ্বোধন করেন রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের অধ্যক্ষ শ্রীমৎ স্বামী ভূতেশানন্দজী মহারাজ। উল্লেখ্য, স্বামীজীর একটি প্রিয় আকাঙ্ক্ষা ছিল মঠে বেদবিদ্যালয় স্থাপন।

স্বামী বিবেকানন্দের ভারত-পরিক্রমা ও শিকাগো ধর্মমহাসভায় যোগদানের শতবর্ষ উপলক্ষে গত ১০ আগস্ট **নরোত্তমনগর (অরুণাচল প্রদেশ) আশ্রম** পরিচালিত উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে একটি ব্যায়ামাগার-সহ একটি হলঘরের উদ্বোধন করা হয়। উদ্বোধন করেন রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের সাধারণ সম্পাদক স্বামী আত্মস্থানন্দজী মহারাজ।

## দন্তচিকিৎসা-শিবির

**নট্টরামপল্লী (তামিলনাড়ু) আশ্রম:** গত ১২ থেকে ১৫ জুলাই বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের জন্য একটি দন্তচিকিৎসা-শিবির পরিচালনা করে। শিবিরে ৪৩০১জন ছাত্রছাত্রীর দাঁত পরীক্ষা করা হয় এবং প্রয়োজনীয় চিকিৎসা করা হয়।

গত ২৬ আগস্ট **পুরী রামকৃষ্ণ মিশন** খুরদা জেলার কাপাসিয়াতে একটি দন্তচিকিৎসা-শিবির পরিচালনা করে। শিবিরে মোট ১৬৮জন রোগীর চিকিৎসা করা হয়। এর মধ্যে ৫৭জনের দাঁত তোলা হয়। স্থানীয় রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ পাঠাগারের সভ্যবৃন্দ এবং রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ সেবাশ্রম, টিকিয়া-তাল এই শিবির পরিচালনায় সহায়তা করে।

## ছাত্র-কৃতিত্ব

পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদ কর্তৃক পরিচালিত ১৯৯৩ খ্রীস্টাব্দের মাধ্যমিক পরীক্ষায় রামকৃষ্ণ মিশন-পরিচালিত বিভিন্ন বিদ্যালয়ের ছাত্ররা **একশো শতাংশ** উত্তীর্ণ হয়েছে। প্রতিটি বিদ্যালয়ের স্টার মার্কস (শতকরা ৮০ ও তার ওপরের নম্বর) প্রাপকদের সংখ্যা নিম্নে দেওয়া হলো: **আসানসোল**—১১৭জনে ৩৯জন, **বরানগর**—১৫৪জনে ৫২জন, **কামারপুকুর**—৫৩জনে ১৪জন, **মালদা**—১১৮জনে ১৯জন, **মনসাদ্বীপ**—৬০জনে ৪জন, **মেদিনীপুর**—৬৭জনে ৭জন, **নরেন্দ্রপুর**—১২৫জনে ১১২জন, **পুরুলিয়া**—৯৯জনে ৮৭জন, **রহড়া**—১৯৭জনে ৮৫জন, **রামহরিপুর**—২৭জনে ১জন, **সরিষা**—১৮৪জনে ৭জন, **সারগাছি**—৮৬জনে ২জন এবং **টাকী**—৪৮জনে ২জন।

১৯৯৩ খ্রীস্টাব্দের বি.এ., বি.এসসি. (ষান্মাসিক) পরীক্ষায় **নরেন্দ্রপুর মহাবিদ্যালয়ের** ছাত্ররা নিম্নলিখিত স্থানগুলি অধিকার করেছে:

রসায়ন: ১ম, ২য়, ৩য় ও ৬ষ্ঠ (দু'জন);
স্ট্যাটিস্টিক্স: ১ম ও ২য়।

নয়াদিল্লী রাষ্ট্রীয় সংস্কৃত সংস্থান-পরিচালিত ১৯৯৩ খ্রীস্টাব্দের শাস্ত্রী ও প্রাক্‌শাস্ত্রী পরীক্ষায় **পালাই (তামিলনাড়ু)** আশ্রম-পরিচালিত সংস্কৃত কলেজের ছাত্ররা নিম্নলিখিত স্থান অধিকার করেছে:

প্রাক্‌শাস্ত্রী: ১ম ও ২য়; শাস্ত্রী: ২য়।

## ত্রাণ

### পশ্চিমবঙ্গ বন্যাত্রাণ

**জলপাইগুড়ি** জেলার আলিপুরদুয়ার মহকুমার ২০টি গ্রামের বন্যাপীড়িতদের মধ্যে তিন সপ্তাহ ধরে খিচুড়ি বিতরণ করা হয়েছে। প্রত্যহ ৫০০০ মানুষকে খিচুড়ি খাওয়ানো হয়েছে। তাছাড়া ৬ আগস্ট থেকে ভ্রাম্যমাণ চিকিৎসাকেন্দ্রের মাধ্যমে চিকিৎসাত্রাণ পরিচালিত হচ্ছে। ত্রাণের জন্য প্রচুর বস্ত্র, বাসনপত্র, লণ্ঠন ইত্যাদি বেলুড় মঠ থেকে আলিপুরদুয়ারে পাঠানো হয়েছে।

**কাঁথি আশ্রমের** সহযোগিতায় মেদিনীপুর জেলার কাঁথি মহকুমার পটাশপুরে গত ২১ আগস্ট থেকে প্রতিদিন ৪০০০ বন্যাপীড়িতকে এক সপ্তাহ ধরে খিচুড়ি খাওয়ানো হয়েছে।

**তমলুক আশ্রমের** সহযোগিতায় মেদিনীপুরের ঘাটাল মহকুমার বন্যাকবলিত ৮টি গ্রামের ১১৫৪জনকে চাল ও ডাল দেওয়া হয়েছে।

**মেদিনীপুর আশ্রমের** মাধ্যমে এই জেলার সদর মহকুমায় হাতিহালকা ও বিগ্রীপৎ গ্রামে ২৪০জন শিশুকে দুধ ও বিস্কুট দেওয়া হয়েছে।

### ত্রিপুরা বন্যাত্রাণ

**আগরতলা আশ্রমের** সহযোগিতায় দক্ষিণ ও পশ্চিম ত্রিপুরার ৬৯টি গ্রামের ৭১,৬৩০জন বন্যাপীড়িতকে খিচুড়ি এবং ১৯৭৫জন শিশুকে শিশুখাদ্য দেওয়া হয়েছে। তাছাড়া উত্তর ত্রিপুরার কৈলাশহর, কমলপুর ও কুমারঘাটে ৫০২টি ধুতি, ৫০২টি শাড়ি, ৪৯০৪টি শিশুদের পোশাক, ৫০২ সেট অ্যালুমিনিয়ামের বাসনপত্র (প্রতি সেটে ৪টি করে বাসন), ৩০০ লণ্ঠন, ১৬৬৪টি টুথব্রাশ, ১৫৪০টি টুথপেস্ট নল, ৬৭৬টি টুথপাওডার টিন, ২০,০০০ হ্যালাজোন বড়ি প্রভৃতি বিতরণ করা হয়েছে।

### পাঞ্জাব বন্যাত্রাণ

**চণ্ডীগড় আশ্রমের** মাধ্যমে রোপার, ফতেগড়, সাহিব ও চণ্ডীগড়ের ২০টি গ্রামের ১৭৯০টি বন্যার্ত পরিবারের মধ্যে ১৪,৭১৫ কিলোঃ আটা, ৩১২৪ কিলোঃ কলাই, ৫৯৩ কিলোঃ ছোলাভাজা, ৮২ কিলোঃ চাল, ৮৪৩ কিলোঃ চিনি, ১৪০ কিলোঃ ঘি, ১৩৭১ প্যাকেট লবণ, ৪৮০৬টি মোমবাতি, ১৭৮৭টি দেশলাই বাক্স, ৬০০ খাতা, ২৭৫টি কলম এবং ৬২৯২টি পুরনো পোশাক-পরিচ্ছদ বিতরণ করা হয়েছে।

### বিহার খরাত্রাণ

'খাদ্যের বিনিময়ে কাজ' প্রকল্পের মাধ্যমে ৮টি পুকুর ও ৫টি কূপ খনন এবং শিশু ও মায়েদের মধ্যে ৫০০ কিলোঃ গুঁড়ো দুধ, ১৯২ টিন বিস্কুট, ১৫৮৪ টিন (৭৯২ কিলোঃ) শিশুখাদ্য (ল্যাক্টোজেন) বিতরণ ও ২৫৯১জন খরাক্লিষ্ট রোগীর চিকিৎসা করার পর ত্রাণকার্য সমাপ্ত হয়েছে।

### অন্ধ্রপ্রদেশ অগ্নিত্রাণ

**বিশাখাপত্তনম আশ্রমের** মাধ্যমে বিশাখাপত্তনম জেলার দিব্বাপলেম ও গোরাপল্লী গ্রামে অগ্নিকাণ্ডে ক্ষতিগ্রস্তদের চিকিৎসার জন্য দুটি চিকিৎসা-শিবির পরিচালনা করা হয়। তাছাড়া ৩৫০টি জামা ও

প্যান্ট, ২০০ শাড়ি ও ব্লাউজ এবং ১৫০০ শিশুদের পুরনো পোশাক বিতরণ করা হয়েছে।

## পুনর্বাসন

### তামিলনাড়ু

**কোয়েম্বাটোর আশ্রম** এবং **মাদ্রাজ মঠের** সহযোগিতায় কন্যাকুমারী জেলার তিনটি গ্রামে নবনির্মিত ৬৫টি বাড়ি গত ২৫ আগস্ট প্রাপকদের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে।

## বহির্ভারত

**বেদান্ত সোসাইটি অব সেন্ট লুইস:** গত সেপ্টেম্বর মাসের রবিবারগুলিতে বিভিন্ন ধর্মীয় বিষয়ে ভাষণ হয়েছে। তাছাড়া ৬, ১২ ও ২৬ সেপ্টেম্বর বিশেষ ভাষণ দিয়েছেন যথাক্রমে ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের এমিরিটাস অধ্যাপক ডঃ রাইমন পানিক্কর, স্বামী সর্বগতানন্দ ও স্বামী অপর্ণানন্দ। ৫ সেপ্টেম্বর 'সর্বজনীন ধর্ম' বিষয়ে ভাষণ দিয়েছেন রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের অন্যতম সহাধ্যক্ষ শ্রীমৎ স্বামী গহনানন্দজী মহারাজ।

**বেদান্ত সোসাইটি অব নিউ ইয়র্ক:** সেপ্টেম্বর মাসের রবিবারগুলিতে ধর্মপ্রসঙ্গ ছাড়াও প্রতি মঙ্গলবার 'শ্রীরামকৃষ্ণ দ্য গ্রেট মাস্টার' এবং প্রতি শুক্রবার ভগবদ্গীতার ক্লাস নিয়েছেন স্বামী তথাগতানন্দ। তাছাড়া প্রতি শনিবার ও রবিবার সন্ধ্যায় ভক্তিগীতি পরিবেশিত হয়েছে।

**রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ সেন্টার অব নিউ ইয়র্ক:** সেপ্টেম্বর মাসের রবিবারগুলিতে বিভিন্ন ধর্মীয় বিষয়ে ভাষণ হয়েছে। ২৬ সেপ্টেম্বর রবিবার ভাষণ দিয়েছেন স্বামী গহনানন্দজী মহারাজ। প্রতি শুক্রবার কঠ উপনিষদ্ ও প্রতি মঙ্গলবার 'গস্পেল অব শ্রীরামকৃষ্ণ'-এর ক্লাস নিয়েছেন স্বামী আদীশ্বরানন্দ।

**বেদান্ত সোসাইটি অব নর্দর্ন ক্যালিফোর্নিয়া, সানফ্রান্সিস্কো:** গত ১১ ও ১২ সেপ্টেম্বর স্বামী বিবেকানন্দের ধর্মমহাসভায় যোগদানের শতবর্ষ উদ্‌যাপন করে। প্রথমদিন ভাষণ, স্লাইড শো এবং সঙ্গীত পরিবেশিত হয়। ১২ সেপ্টেম্বর ভাষণ দেন শ্রীমৎ স্বামী গহনানন্দজী মহারাজ। ঐদিন স্বামী বিবেকানন্দের বিভিন্ন চিত্রসম্বলিত একটি অ্যালবাম প্রকাশ ও এই বেদান্ত সোসাইটির নতুন মন্দিরের বর্ধিতাংশের ভিত্তিখনন অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। সভাপতিত্ব করেন স্বামী গহনানন্দজী। তাছাড়া ক্লাস ও সাপ্তাহিক ভাষণ যথারীতি হয়েছে।

**বেদান্ত সোসাইটি অব ওয়েস্টার্ন ওয়াশিংটন, সিয়াটল:** সেপ্টেম্বর মাসের রবিবারগুলিতে বিভিন্ন ধর্মীয় বিষয়ে ভাষণ হয়েছে। ২১ ও ২৮ সেপ্টেম্বর মঙ্গলবার 'গস্পেল অব শ্রীরামকৃষ্ণ'-এর ক্লাস নিয়েছেন এই কেন্দ্রের অধ্যক্ষ স্বামী ভাস্করানন্দ।

**বেদান্ত সোসাইটি অব টরন্টো:** ১১ সেপ্টেম্বর এই বেদান্ত সোসাইটির ব্যবস্থাপনায় টরন্টো বিশ্ববিদ্যালয়ে স্বামী বিবেকানন্দের বিশ্বধর্মসম্মেলনে যোগদানের শতবর্ষ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানের আলোচ্য বিষয় ছিল—'বিভিন্ন ধর্মের সমন্বয়ের সূত্র'।

গত ৩ জুলাই গুরুপূর্ণিমা উপলক্ষে **ময়মনসিংহ রামকৃষ্ণ আশ্রমে** আয়োজিত ভক্তসম্মেলনে ২৬৫জন ভক্ত যোগদান করেন। বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মধ্যে ছিল স্তোত্রপাঠ, প্রার্থনা, সঙ্গীত, জপ, আলোচনা, শ্রীমৎ স্বামী ভূতেশানন্দজী মহারাজ ও স্বামী অক্ষরানন্দের ধারণকৃত ভাষণ পাঠ, কথামৃত পাঠ, রামনামসংকীর্তন, রামায়ণ-কাহিনী প্রদর্শন ইত্যাদি। সম্মেলনে আশ্রমাধ্যক্ষ স্বামী সর্বেশ্বরানন্দ, চন্দ্রশেখর সাহা, ইতি ঘোষ, নির্মল চক্রবর্তী, শুকলাল সাহা প্রমুখ বক্তব্য রাখেন।

## শ্রীশ্রীমায়ের বাড়ীর সংবাদ

**সাপ্তাহিক ধর্মালোচনা:** সন্ধ্যারতির পর সারদানন্দ হল-এ স্বামী দিব্যাশ্রয়ানন্দ প্রত্যেক সোমবার শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত, স্বামী পূর্ণাত্মানন্দ ইংরেজী মাসের প্রথম শুক্রবার ভক্তিপ্রসঙ্গ ও অন্যান্য শুক্রবার স্বামী কমলেশানন্দ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ এবং প্রত্যেক রবিবার স্বামী সত্যব্রতানন্দ শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা আলোচনা ও ব্যাখ্যা করছেন। □

# বিবিধ সংবাদ

## উৎসব-অনুষ্ঠান

**বালুরঘাট (দক্ষিণ দিনাজপুর) শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমে** গত ২৪-২৬ বৈশাখ তিনদিনব্যাপী আশ্রমের অষ্টাদশ বার্ষিক উৎসব নানা অনুষ্ঠানের মাধ্যমে উদ্‌যাপন করা হয়েছে। উৎসবে বিশেষ পূজা, প্রসাদ-বিতরণ, ধর্মসভা প্রভৃতি ছাড়াও ছাত্রছাত্রীদের জন্য প্রতিযোগিতামূলক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছিল। ধর্মসভাগুলিতে ভাষণ দিয়েছেন কামারপুকুর আশ্রমের অধ্যক্ষ স্বামী দেবদেবানন্দ ও মালদা আশ্রমের অধ্যক্ষ স্বামী মঙ্গলানন্দ। ২৫ ও ২৬ বৈশাখ সন্ধ্যায় 'কথায় ও গানে শ্রীরামকৃষ্ণ-কথামৃত' পরিবেশন করেন স্বামী দেবদেবানন্দ।

**বলাইচক রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ গ্রন্থাগার ও সেবাশ্রম (হুগলী)** গত ৮ ও ৯ মে বার্ষিক উৎসব এবং স্বামী বিবেকানন্দের ভারত-পরিক্রমা ও শিকাগো বক্তৃতার শতবর্ষ উৎসব উদ্‌যাপন করে। নানা অনুষ্ঠানের সঙ্গে ছাত্রছাত্রীদের জন্য বিভিন্ন প্রতিযোগিতামূলক অনুষ্ঠানেরও আয়োজন করা হয়েছিল। প্রথমদিনের ধর্মসভায় বক্তব্য রাখেন আঁটপুর মঠের অধ্যক্ষ স্বামী স্বতন্ত্রানন্দ ও অধ্যাপক অমরেন্দ্রনাথ আদক। দ্বিতীয়দিন ধর্মসভায় বক্তব্য রাখেন স্বামী জ্ঞানলোকানন্দ। এদিন ছয়হাজার ভক্তকে বসিয়ে খিচুড়ি প্রসাদ দেওয়া হয়।

**শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম, গৌরহাটী (হুগলী):** গত ২৫ ও ২৬ এপ্রিল ১৯৯৩ দুইদিনব্যাপী নানা অনুষ্ঠানের মাধ্যমে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ১৫৮তম শুভ জন্মোৎসব পালিত হয়। এই উপলক্ষে বিশেষ পূজা, হোম, শ্রীশ্রীচণ্ডীপাঠ, প্রভাতফেরী, ভজন, ধর্মসভা ও গীতিনাট্য অনুষ্ঠিত হয়। ধর্মসভায় আলোচনা করেন স্বামী দেবদেবানন্দ, স্বামী স্বতন্ত্রানন্দ ও স্বামী সনাতনানন্দ। এদিন দুপুরে প্রায় আটহাজার ভক্তকে বসিয়ে খিচুড়ি প্রসাদ দেওয়া হয়। ২৬ তারিখ শংকর সোমের পরিচালনায় শ্রীরামকৃষ্ণ বাণীপ্রচার সঙ্ঘ 'শ্রীরামকৃষ্ণ-মা সারদা' গীতিনাট্য পরিবেশন করে।

গত ১ ও ২ মে **তেঁতুলিয়া শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ সেবা সমিতি (মুর্শিদাবাদ)** আয়োজিত শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জন্মোৎসব শোভাযাত্রা, পূজা-পাঠ-ভজন, প্রসাদ-বিতরণ এবং ছাত্রছাত্রীদের আবৃত্তি, বক্তৃতা, কুইজ, চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতা ও ধর্মসভার মাধ্যমে সম্পন্ন হয়। দুই দিনের ধর্মসভায় বক্তা ছিলেন স্বামী ভৈরবানন্দ, ডঃ হোসেনুর রহমান, মধুসূদন ভট্ট ও সমীরকুমার ঘোষ। ভজন পরিবেশন করেন রেবতীভূষণ মণ্ডল। সভাশেষে মোঃ ইয়াসিন শেখের পরিচালনায় পিয়ারাপুর নবীন সঙ্ঘের (জঙ্গীপুর) ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা জিম্‌ন্যাস্টিকস্ প্রদর্শন করে।

**শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ পাঠচক্র, জগৎবল্লভপুর (হাওড়া):** গত ২ মে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জন্মোৎসব পালন করে। এ-উপলক্ষে পূজা, পাঠ, হোম, ধর্মসভা প্রভৃতির আয়োজন করা হয়। ধর্মসভায় শ্রীরামকৃষ্ণের জীবন ও বাণী নিয়ে আলোচনা করেন স্বামী সাংখ্যানন্দ, প্রণবেশ চক্রবর্তী ও নিরঞ্জন হাজরা। মানবেন্দ্র চক্রবর্তী ও অঞ্জলি রায় সম্প্রদায় ভক্তিগীতি পরিবেশন করেন। গীতি-আলেখ্য পরিবেশন করে শিবপুর শিল্পীতীর্থ ও কলকাতার ঈশ্বরপ্রীতি সংসদ।

**তুফানগঞ্জ শ্রীরামকৃষ্ণ সেবাশ্রম (কোচবিহার):** গত ১১ এপ্রিল এই আশ্রমের বার্ষিক উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। এ-উপলক্ষে পূজা, পাঠ, প্রসাদ-বিতরণ ও ধর্মসভা অনুষ্ঠিত হয়। ধর্মসভায় ভাষণ দেন স্বামী মঙ্গলানন্দ ও স্বামী বিজয়ানন্দ।

**বীকিহাকোলা শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ সেবাকেন্দ্র, আন্দুল-মৌড়ী, (হাওড়া):** গত ২১-২৩ এপ্রিল তিনদিন-ব্যাপী নানা অনুষ্ঠানের মাধ্যমে এই আশ্রমের দ্বাদশ বার্ষিক উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। উৎসবে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন স্বামী ধ্যানেশানন্দ। উল্লেখ্য, গত ১ মে স্বামী ধ্যানেশানন্দের উপস্থিতিতে এই সেবাকেন্দ্রের পাঠচক্রের উদ্বোধন হয়।

**শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম, কোচবিহার** গত ১৭-১৯ এপ্রিল শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জন্মোৎসব উদ্‌যাপন করেছে।

অনুষ্ঠানের দ্বিতীয়দিন বিশেষ পূজা, ভজন-কীর্তন, প্রসাদ-বিতরণ প্রভৃতি অনুষ্ঠিত হয়। উৎসবের তিনদিনই সন্ধ্যায় ধর্মসভা এবং পরে মালদা জেলার গম্ভীরা শিল্পিবৃন্দ কর্তৃক 'গম্ভীরা' পরিবেশিত হয়। ধর্মসভাগুলিতে ভাষণ দিয়েছেন স্বামী কমলেশানন্দ।

**চাতরা ভক্তাশ্রম, শ্রীরামপুর ( হুগলী )** গত ৬ মার্চ শ্রীরামকৃষ্ণের আবির্ভাবোৎসব পালন করেছে। ধর্মসভায় 'যুগাবতার শ্রীরামকৃষ্ণ' বিষয়ে ভাষণ দেন স্বামী কমলেশানন্দ।

গত ২৫ এপ্রিল **রাজঘাট শ্রীরামকৃষ্ণ সর্বধর্ম-সমন্বয়ী আশ্রম ( উড়িষ্যা )** সারাদিনব্যাপী নানা অনুষ্ঠানের মাধ্যমে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জন্মোৎসব পালন করে। ধর্মসভায় বক্তব্য রাখেন স্বামী শশধরানন্দ, নচিকেতা ভরদ্বাজ ও ডঃ সচ্চিদানন্দ ধর। ঐদিন স্বামী বিবেকানন্দের ভারত-পরিক্রমা ও শিকাগো ধর্মমহাসভায় যোগদানের শতবর্ষপূর্তি উপলক্ষে ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে এক বক্তৃতা-প্রতি-যোগিতার আয়োজন করা হয়। দুপুরে প্রায় দুহাজার ভক্তকে প্রসাদ দেওয়া হয়।

গত ২৫ এপ্রিল **দাঁতন শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম ( মেদিনীপুর )** অক্ষয় তৃতীয়া উপলক্ষে দুঃস্থদের মধ্যে ধুতি, শাড়ি ও ছোট ছেলেমেয়েদের জামা, প্যান্ট ইত্যাদি বিতরণ করেছে। বিতরণ করেন অধ্যাপিকা ইলা গুহ। দুপুরে বিশেষ পূজানুষ্ঠান ও দুঃস্থদের বসিয়ে প্রসাদ দেওয়া হয়।

উত্তর ২৪ পরগনা রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ ভাব-প্রচার পরিষদের দ্বিতীয় বার্ষিক সম্মেলন গত ১৫ এবং ১৬ মে **রামকৃষ্ণ সেবাশ্রম, বামুনমুড়ায়** অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন স্বামী অমলানন্দ। বেলুড় মঠের কেন্দ্রীয় ভাবপ্রচার পরিষদের প্রতিনিধি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন স্বামী নিবৃত্যানন্দ। উত্তর ২৪ পরগনার ২৪টি আশ্রমের ৪২জন প্রতিনিধি সম্মেলনে যোগ দেন।

গত ১৬-১৮ এপ্রিল উত্তর-পূর্বাঞ্চল রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ ভাবপ্রচার পরিষদের নবম বার্ষিক সম্মেলন **হোজাই রামকৃষ্ণ সেবাশ্রমে ( আসাম )** অনুষ্ঠিত হয়। ২৮টি আশ্রম থেকে ৭২জন প্রতিনিধি সম্মেলনে যোগদান করেছিলেন। সম্মেলনে আলোচনায় অংশগ্রহণ করেছেন স্বামী তত্ত্বজ্ঞানন্দ, স্বামী রঘুনাথানন্দ ও স্বামী ইষ্টানন্দ। সম্মেলনের শেষদিন বিশেষ পূজাদি অনুষ্ঠিত হয়। ঐদিন প্রায় আড়াইহাজার ভক্তকে বসিয়ে খিচুড়ি প্রসাদ দেওয়া হয়।

## রক্তদান শিবির

গত ১১ এপ্রিল **স্যান্ডেলের বিল শ্রীরামকৃষ্ণ সেবাশ্রম ( উত্তর ২৪ পরগনা )** রামকৃষ্ণ মিশন সেবা-প্রতিষ্ঠানের সহযোগিতায় এক রক্তদান শিবিরের আয়োজন করে। স্বামী বিবেকানন্দের ভারত-পরিক্রমা ও শিকাগো-বক্তৃতার শতবর্ষ-স্মরণে এই শিবির পরিচালিত হয়। শিবির পরিচালনা করেন স্বামী সর্বলোকানন্দ।

## পরলোকে

শ্রীমৎ স্বামী শঙ্করানন্দজী মহারাজের মন্ত্রশিষ্য, দমদম-নিবাসী **তারাশঙ্কর ঘোষ** গত ১৪ জানুয়ারি ৭৮ বছর বয়সে পরলোকগমন করেন। তাঁর পরি-চালিত 'মন সংযম কেন্দ্র'-এ বহু মানুষ উপকৃত হয়েছেন। তিনি উদ্বোধন-এর গ্রাহক ছিলেন।

শ্রীমৎ স্বামী বিরজানন্দজী মহারাজের মন্ত্রশিষ্য, মেদিনীপুরের কল্যাচক গ্রামনিবাসী **জিতেন্দ্রনাথ বেরা** গত ১৪ ফেব্রুয়ারি ৭১ বছর বয়সে শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। অকৃতদার জিতেন্দ্রনাথবাবু তাঁর পৈত্রিক ভিটাতে 'শ্রীরামকৃষ্ণ সেবাসমিতি'র মাধ্যমে বিভিন্ন সমাজসেবায় ব্যাপৃত থাকতেন। তিনি উদ্বোধন-এর আগ্রহী পাঠক ছিলেন।

শ্রীমৎ স্বামী যতীশ্বরানন্দজী মহারাজের মন্ত্র-শিষ্য, বর্ধমান জেলার অন্তর্গত পুতুন্ডা ( পোঃ শক্তিগড় ) গ্রামনিবাসী **অনিলকুমার চৌধুরী** হৃদ্‌রোগে আক্রান্ত হয়ে গত ১৭ এপ্রিল পরলোক-গমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৬৫ বছর। আজন্ম শ্রীরামকৃষ্ণ-ভাবধারায় লালিত, ভক্তি-মান প্রয়াত অনিলবাবু ছিলেন পুতুন্ডা শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা। আশ্রমের নানা জনহিতকর কাজের বিশেষ পৃষ্ঠপোষকও ছিলেন তিনি। অমায়িক, নিরভিমানী অনিলবাবু গ্রাম-বাসিদের বিশেষ শ্রদ্ধাভাজন ছিলেন। □

বিশ্বব্যাপী চৈতন্যই ঈশ্বর। সেই বিশ্বব্যাপী চৈতন্যকেই লোকে প্রভু, ভগবান, খ্রীষ্ট, বুদ্ধ বা ব্রহ্ম বলিয়া থাকে—জড়বাদীরা উহাকে শক্তিরূপে উপলব্ধি করে এবং অজ্ঞেয়বাদীরা ইহাকেই সেই অনন্ত অনির্বচনীয় সর্বাতীত বস্তু বলিয়া ধারণা করে। উহাই সেই বিশ্বব্যাপী প্রাণ, উহাই বিশ্বব্যাপী চৈতন্য, উহাই বিশ্বব্যাপিনী শক্তি এবং আমরা সকলেই উহার অংশস্বরূপ।

স্বামী বিবেকানন্দ

উদ্বোধনের মাধ্যমে প্রচার হোক
এই বাণী। শ্রীসুশোভন চট্টোপাধ্যায়

# উদ্বোধন

স্বামী বিবেকানন্দ প্রবর্তিত, রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের একমাত্র বাঙলা মুখপত্র, পঁচানব্বই বছর ধরে নিরবচ্ছিন্নভাবে প্রকাশিত দেশীয় ভাষায় ভারতের প্রাচীনতম সাময়িকপত্র

## সূচিপত্র ৯৫তম বর্ষ অগ্রহায়ণ ১৪০০ (নভেম্বর ১৯৯৩) সংখ্যা



ব্যবস্থাপক সম্পাদক
স্বামী সত্যব্রতানন্দ

সম্পাদক
স্বামী পূর্ণাত্মানন্দ

৮০/৬, গ্রে স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০ ০০৬-স্থিত বসুশ্রী প্রেস থেকে বেলুড় শ্রীরামকৃষ্ণ মঠের ট্রাস্টীগণের পক্ষে স্বামী সত্যব্রতানন্দ কর্তৃক মুদ্রিত ও ১ উদ্বোধন লেন, কলকাতা-৭০০ ০০৩ থেকে প্রকাশিত।

প্রচ্ছদ মুদ্রণ : স্বপ্না প্রিন্টিং ওয়ার্কস (প্রাঃ) লিমিটেড, কলকাতা-৭০০ ০০৯

আজীবন গ্রাহকমূল্য (৩০ বছর পর নবীকরণ-সাপেক্ষ) ☐ এক হাজার টাকা (কিস্তিতেও প্রদেয়)— প্রথম কিস্তি একশো টাকা ☐ আগামী বর্ষের সাধারণ গ্রাহকমূল্য ☐ মাঘ থেকে পৌষ ☐ ব্যক্তিগতভাবে সংগ্রহ ☐ আটচল্লিশ টাকা ☐ সডাক ☐ ছাপান্ন টাকা ☐ বর্তমান সংখ্যার মূল্য ☐ ছয় টাকা।

# গ্রাহকপদ নবীকরণের জন্য বিজ্ঞপ্তি

## উদ্বোধন

**স্বামী বিবেকানন্দ প্রবর্তিত, রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের একমাত্র বাঙলা মুখপত্র, পঁচানব্বই বছর ধরে নিরবচ্ছিন্নভাবে প্রকাশিত দেশীয় ভাষায় ভারতের প্রাচীনতম সাময়িকপত্র**

## ৯৬তম বর্ষ ঃ মাঘ ১৪০০—পৌষ ১৪০১/জানুয়ারি ১৯৯৪—ডিসেম্বর ১৯৯৪

☐ **আগামী মাঘ / জানুয়ারি মাস থেকে পত্রিকা-প্রাপ্তি সুনিশ্চিত করার জন্য ৩১ ডিসেম্বর ১৯৯৩-এর মধ্যে আগামী বর্ষের ( ৯৬তম বর্ষ ঃ ১৪০০-১৪০১/১৯৯৪ )** গ্রাহকমূল্য জমা দিয়ে **গ্রাহকপদ নবীকরণ করা বাঞ্ছনীয়। নবীকরণের সময় গ্রাহক-সংখ্যার উল্লেখ আবশ্যিক।**

বার্ষিক গ্রাহকমূল্য

☐ **ব্যক্তিগতভাবে ( By Hand ) সংগ্রহ ঃ ৪৮ টাকা** ☐ **ডাকযোগে ( By Post ) সংগ্রহ ঃ ৫৬ টাকা**

☐ **বাংলাদেশ ভিন্ন বিদেশের অন্যত্র—২৭৫ টাকা ( সমুদ্র-ডাক ), ৫৫০ টাকা ( বিমান-ডাক )।**

☐ **বাংলাদেশ—১০০ টাকা।**

**আজীবন গ্রাহকমূল্য ( কেবলমাত্র ভারতবর্ষে প্রযোজ্য ) ঃ এক হাজার টাকা**

☐ **আজীবন গ্রাহকমূল্যে** ( ৩০ বছর পর নবীকরণ-সাপেক্ষ ) কিস্তিতেও ( অনূর্ধ্ব বারোটি ) প্রদেয়। কিস্তিতে জমা দিলে প্রথম কিস্তিতে কমপক্ষে একশো টাকা দিয়ে পরবর্তী এগারো মাসের মধ্যে বাকি টাকা ( প্রতি কিস্তি কমপক্ষে পঞ্চাশ টাকা ) জমা দিতে হবে।

☐ ব্যাংক ড্রাফট / পোস্টাল অর্ডার যোগে টাকা পাঠালে **"Udbodhan Office, Calcutta"** এই নামে পাঠাবেন। **পোস্টাল অর্ডার "বাগবাজার পোস্ট অফিস"-এর ওপর পাঠাবেন। চেক পাঠাবেন না। বিদেশের গ্রাহকদের চেক গ্রাহ্য। তবে তাঁদের চেক যেন** কলকাতাস্থ **রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকের ওপর হয়।** প্রাপ্তি-সংবাদের জন্য **দেশ ও বিদেশের গ্রাহকদের** প্রয়োজনীয় ডাকটিকিট পাঠানো বাঞ্ছনীয়।

**কার্যালয় খোলা থাকে ঃ** বেলা ৯.৩০—৫.৩০ ; শনিবার বেলা ১.৩০ পর্যন্ত ( রবিবার বন্ধ )।

☐ ডাকবিভাগের নির্দেশমত **ইংরেজী মাসের ২৩ তারিখ** ( ২৩ তারিখ রবিবার কিংবা ছুটির দিন **হলে ২৪ তারিখ** ) 'উদ্বোধন' পত্রিকা কলকাতার জি.পি.ও.-তে ডাকে দিই। **এই** তারিখটি **সংশ্লিষ্ট বাঙলা মাসের সাধারণতঃ ৮/৯ তারিখ** হয়। ডাকে পাঠানোর সপ্তাহখানেকের মধ্যে গ্রাহকদের পত্রিকা পেয়ে যাবার কথা। তবে ডাকের গোলযোগে কখনো কখনো পত্রিকা পৌঁছাতে বিলম্বও হয়। অনেক সময় গ্রাহকরা **একমাস পরেও পত্রিকা পান বলে** খবর পাই। সে-কারণে সহৃদয় গ্রাহকদের **একমাস পর্যন্ত অপেক্ষা করতে অনুরোধ করি। একমাস পরে ( অর্থাৎ** পরবর্তী ইংরেজী মাসের ২৪ তারিখ / **পরবর্তী বাঙলা** মাসের ১০ তারিখ পর্যন্ত ) **পত্রিকা না পেলে গ্রাহকসংখ্যা উল্লেখ করে কার্যালয়ে জানালে ডুপ্লিকেট বা অতিরিক্ত কপি পাঠানো** হবে।

☐ যাঁরা **ব্যক্তিগতভাবে ( By Hand ) পত্রিকা সংগ্রহ** করেন তাঁদের পত্রিকা **ইংরেজী মাসের ২৭ তারিখ থেকে** বিতরণ শুরু হয়। **স্থানাভাবের জন্য দুটি সংখ্যার** বেশি কার্যালয়ে **জমা রাখা সম্ভব নয়। তাই সংশ্লিষ্ট গ্রাহকদের কাছে অনুরোধ,** তাঁরা যেন সেইমত তাঁদের সংখ্যা **সংগ্রহ করে নেন।**

☐ **রামকৃষ্ণ-ভাবান্দোলন ও রামকৃষ্ণ-ভাবাদর্শের** সঙ্গে সংযুক্ত ও পরিচিত হতে হলে **স্বামী বিবেকানন্দ** প্রবর্তিত রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের একমাত্র বাঙলা মুখপত্র **উদ্বোধন** আপনাকে পড়তে হবে।

☐ **স্বামী বিবেকানন্দের ইচ্ছা** ও নির্দেশ অনুসারে **উদ্বোধন** নিছক একটি ধর্মীয় পত্রিকা নয়। **ধর্ম,** দর্শন, সাহিত্য, ইতিহাস, সমাজতত্ত্ব, বিজ্ঞান, শিল্প সহ জ্ঞান ও কৃষ্টির নানা বিষয়ে গবেষণামূলক ও ইতিবাচক আলোচনা **উদ্বোধন**-এ প্রকাশিত হয়।

☐ **উদ্বোধন-এর গ্রাহক হওয়ার অর্থ** একটি পত্রিকার গ্রাহক হওয়া নয়, একটি মহান ভাবাদর্শ ও ভাবান্দোলনের সঙ্গে যুক্ত হওয়া।

☐ **স্বামী বিবেকানন্দের** আকাঙ্ক্ষা ছিল প্রত্যেক বাঙালীর ঘরে **উদ্বোধন** যেন থাকে। সুতরাং আপনার নিজের গ্রাহক হওয়াই যথেষ্ট নয়। অন্যদের গ্রাহক করাও আপনার কাছে স্বামীজীর প্রত্যাশা।

অগ্রহায়ণ ১৪০০ নভেম্বর ১৯৯৩ ৯৫তম বর্ষ—১১শ সংখ্যা

## দিব্য বাণী

সিদ্ধিলাভ করিতে হইলে বৃথা শক্তিক্ষয় নিবারণ করিতে হইবে, সর্বশক্তির আকর অন্তরস্থ আত্মার সহিত সংযুক্ত হইয়া তাহা হইতে শক্তি-অবতরণের পথ পরিষ্কার রাখিতে হইবে এবং পরে সম্যক্ শ্রদ্ধার সহিত আবাহন, পূজা এবং আত্মবলিদান করিয়া মহাশক্তির প্রসন্নতা লাভ করিতে হইবে।...

বিঘ্নোৎসারণ, ভূতবলি, ভূতশুদ্ধি, ন্যাস, প্রাণায়াম প্রভৃতি পূজার পূর্বে করণীয় বিষয়গুলির উদ্দেশ্যই সাধকের বৃথা শক্তিক্ষয়-নিবারণ। যে-উপায়েই হউক বৃথা শক্তিক্ষয় নিবারিত হইলেই তুমি উদ্দিষ্ট বিষয়লাভের প্রথম সোপানে আরোহণ করিলে; অন্তর্নিহিত পরমাত্মার ধ্যানে উদ্দিষ্ট বিষয়লাভের জন্য যে বিশেষ শক্তির প্রয়োজন, তাহা তোমাতে উদ্বোধিত হইল; পূজা ও স্বার্থত্যাগে সেই শক্তি সঞ্চিত, ঘনীভূত ও মূর্তিপরিগ্রহ করিয়া প্রকাশিত হইল; এবং পরিশেষে সেই নবশক্তির নিয়োগে অভীষ্ট ফল করতলগত হইল। সর্বদেশে সর্বকালে সর্বফলসিদ্ধির সম্বন্ধেই এই নিয়ম প্রবর্তিত। শক্তিক্ষয়-নিবারণ আত্মনিহিত মহাশক্তির ধ্যান এবং আত্মবলিদান। শঙ্খ, ঘণ্টা, ধূপ, দীপাদির আড়ম্বর থাকুক আর নাই থাকুক, সর্বপ্রকার শক্তি সাধকের অন্তরেই নিহিত রহিয়াছে—একথা জানুক আর নাই জানুক এবং শক্তিবিশেষের আপনাতে প্রকাশিত করিবার পূর্বোক্ত ক্রমোপায় জ্ঞাত বা অজ্ঞাত থাকুক, তথাপি অভীষ্ট বিষয়ের প্রতি তীব্র অনুরাগ ও ধ্যানই যে একমাত্র সর্বকালে সর্বসাধককে পূর্বোক্ত ক্রমের ভিতর দিয়া ফলসিদ্ধি প্রদান করিয়াছে, একথা একটু চিন্তা করিলেই বুঝিতে পারা যায়।

**স্বামী সারদানন্দ**

## কথাপ্রসঙ্গে

# "দেবো ভূত্বা দেবং যজেৎ"

কেহ কেহ বলেন, আমরা যে পূজা করি তাহার উদ্দেশ্য আরাধ্য দেবতা বা দেবীকে প্রসন্ন করিয়া পার্থিব জগতে সমৃদ্ধি ও অভ্যুদয় লাভ করা। তাঁহারা আরও বলেন, পূজা যেন দোকানদারি: আমি তোমাকে দিতেছি, বিনিময়ে তুমি আমাকে দাও। পূজা যেন এই দেওয়া-লওয়ার ব্যাপার। এমনকি একথাও বলিতে শুনা যায় যে, পূজা আর কিছুই নহে—দেবতাকে উৎকোচ প্রদান। পূজা-উপচারে দেবতা খুশি হইবেন, তখন তাঁহার নিকট হইতে অভীষ্ট বস্তুলাভ হইবে—মামলায় জয়লাভ হইবে, পুত্র-কন্যার পরীক্ষায় সাফল্যলাভ হইবে, বেকার থাকিলে চাকুরি হইবে, ব্যাধিগ্রস্ত প্রিয়জন ব্যাধিমুক্ত হইবে, মুমূর্ষু প্রিয়জন মৃত্যুর কবল হইতে ফিরিয়া আসিবে ইত্যাদি ইত্যাদি। উদাহরণ হিসাবে বলা হয় যে, দেবতার উদ্দেশে আমরা যে স্তবগান করি, যে প্রার্থনা উচ্চারণ করি তাহা তো শুধু 'দেহি' 'দেহি'রই দীর্ঘ তালিকা:

"ভার্যাং মনোরমাং দেহি মনোবৃত্তানুসারিণীম্।
রূপং দেহি জয়ং দেহি যশো দেহি দ্বিষো জহি॥"

—[হে দেবি] আমার মনোবৃত্তির অনুসারিণী অর্থাৎ আমার প্রতি একান্ত অনুরাগিণী সুন্দরী ভার্যা দাও। আমাকে রূপ দাও, জয় দাও, যশ দাও এবং আমার প্রতি যাহারা বিদ্বেষপূর্ণ অর্থাৎ যাহারা আমার শত্রু তাহাদের নাশ কর।

সাধারণভাবে এখন পূজার তাৎপর্য প্রায় ইহাই দাঁড়াইয়াছে, আপাতদৃষ্টিতে দেবতার উদ্দেশে স্তব-স্তোত্রাদি বাচ্যার্থে ইহাই বুঝায়। কিন্তু পূজার প্রকৃত তাৎপর্যের সহিত স্তব-স্তোত্রাদির প্রকৃত মর্মার্থ জ্ঞাত হইলে বুঝা যায় এইরূপ ধারণা কত ভ্রান্ত। বস্তুতঃ, পূজার তাৎপর্যে কোথাও পার্থিব প্রাপ্তির ব্যাপার নাই। পূজার সমস্ত অঙ্গ, আনুষাঙ্গিক অনুষ্ঠানাদি ও মর্ম জুড়িয়া শুধু একটিই ভাব রহিয়াছে। সেই ভাব একান্তভাবেই আধ্যাত্মিক। পূজার সমগ্র প্রক্রিয়াটি সম্পূর্ণভাবেই আধ্যাত্মিক প্রক্রিয়া। ভূমির মানুষ কিভাবে ভূমাকে স্পর্শ করিতে পারে, ধরণীর ধূলিমলিন মানব কিভাবে স্বর্গের দেবতায় রূপান্তরিত হইতে পারে পূজার মধ্যে রহিয়াছে সেই পরম আকুতি। পূজা সান্ত মানুষকে অনন্তে উত্তরণ করাইবার একটি পদ্ধতি। পূজার প্রক্রিয়ার মধ্যে আমাদের প্রাজ্ঞ পূর্বপুরুষগণ অনন্তে উন্নীত হইবার আকাঙ্ক্ষাকে রূপ দিতে প্রয়াস পাইয়াছিলেন। এই প্রয়াসের পশ্চাতে ছিল তাঁহাদের নিজেদের অভিজ্ঞতার সম্পদ। পূজার মন্ত্র, অনুষ্ঠানাদি ও দর্শনের মধ্যে তাঁহারা তাঁহাদের অভিজ্ঞতাকে বিধৃত করিয়া গিয়াছেন। সাধারণ মানুষও যাহাতে উত্তরণের এই 'বিজ্ঞান'-এর প্রতি আকৃষ্ট হয় সেইজন্য তাঁহারা পূজার অনুষ্ঠানাদির মধ্যে একটি আপাত ও লোকপ্রিয় রূপ সংযুক্ত করিয়াছিলেন। সাধারণ মানুষ প্রথমেই উচ্চ দর্শনকে গ্রহণ করিতে পারে না, তাহাদের সেই মানসিক প্রস্তুতিও থাকে না। পূজার মধ্যে সন্নিবিষ্ট 'শুদ্ধি', 'ন্যাস' প্রভৃতি অনুষ্ঠানাদির যে একটি লোকপ্রিয় আবেদন আছে তাহা অনস্বীকার্য। আবার পূজার সহিত যুক্ত স্তব-স্তোত্রাদির মধ্যে যে পার্থিব প্রাপ্তির অঙ্গীকার রহিয়াছে তাহা সাধারণ মানুষকে সহজেই আকর্ষণ করে। কিন্তু মনে রাখিতে হইবে—"এহ বাহ্য"। এই সমস্ত অনুষ্ঠানাদি এবং প্রার্থনার দুইটি তাৎপর্য রহিয়াছে—একটি বাচ্যার্থ, অপরটি লক্ষ্যার্থ। 'রূপং দেহি' ইত্যাদিতে 'রূপ' প্রভৃতি প্রত্যেক শব্দের একটি আপাত অর্থ আছে, আবার একটি মর্মার্থ বা নিগূঢ় অর্থও রহিয়াছে। যথা 'রূপ' মানে যেমন বাহ্যিক সৌন্দর্য, তেমনই অন্তরের সৌন্দর্যও। 'জয়' মানে যেমন জীবন-সংগ্রামে জয়লাভ, তেমনি অন্তরের সংগ্রামেও অর্থাৎ প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তির মানস সংগ্রামেও জয়লাভ। 'ভার্যা' মানে যেমন স্ত্রী, তেমনি আবার যাহা ভরণীয়—অন্তরে একান্ত লালনীয় অর্থাৎ ভক্তি—ঈশ্বরের প্রতি অব্যাভিচারিণী অনুরক্তি। 'শুদ্ধি' ও 'ন্যাস' প্রভৃতি পূজার বিভিন্ন অঙ্গ সম্পর্কেও একই কথা। 'শুদ্ধি'র অর্থ শুদ্ধিকরণ এবং 'ন্যাস'-এর অর্থ স্থাপন বা সমর্পণ। প্রথমে 'শুদ্ধি', তাহার পর 'ন্যাস'। প্রথমে আচমনাদির দ্বারা পূজকের 'দেহশুদ্ধি' করিতে হয়। পূজক প্রথমে নানা অশুদ্ধ উপাদান ও পদার্থে নির্মিত ও পূর্ণ তাঁহার দেহভাণ্ডটিকে মন্ত্রপূত জল দ্বারা শুদ্ধ করেন। 'দেহশুদ্ধি'র সময় তিনি ভাবেন তাঁহার দেহ সমস্ত মালিন্যরহিত হইয়া উঠিতেছে, তাঁহার মন অশুদ্ধ চিন্তারাশি হইতে মুক্ত হইয়া উঠিতেছে এবং তাঁহার আত্মা দেবময় হইয়া যাইতেছে। এইভাবে "বাহ্য-অভ্যন্তর" বা দেহ-মন-আত্মার শুদ্ধিকরণের পর 'জলশুদ্ধি'। গঙ্গা,

যমুনা, গোদাবরী, সরস্বতী, নর্মদা, সিন্ধু ও কাবেরী—এই সপ্তনদী হিন্দু ঐতিহ্যে পবিত্রতম নদী বলিয়া প্রসিদ্ধ। নদীমাতৃক ভারতবর্ষে এই নদীগুলি শুধু পবিত্র নদীই নহে, উহারা দেবী হিসাবেও বন্দিতা। 'জলশুদ্ধি'র সময় পূজক যে অপূর্ব মন্ত্রটি উচ্চারণ করেন উদাহরণস্বরূপ এখানে তাহা উল্লেখ করা যাইতে পারে :

"ওঁ গঙ্গে চ যমুনে চৈব গোদাবরি সরস্বতি।
নর্মদে সিন্ধু কাবেরি জলেঽস্মিন্ সন্নিধিং কুরু ॥"

—"হে নদীতমা, দেবীতমা গঙ্গা, যমুনা, গোদাবরি, সরস্বতি, নর্মদা, সিন্ধু ও কাবেরি, তোমরা এই জলপাত্রে (জলপূর্ণ কোশাকুশিতে) অধিষ্ঠান কর।"

এই আহ্বানের দ্বারা পূজার জলপূর্ণ পাত্রটি যেন পবিত্রতম সপ্তনদীর ক্ষুদ্র সঙ্গমে পরিণত হয়। ইহার পর সেই পবিত্র জল পূজার সমস্ত উপকরণে ও উপচারে সিঞ্চন করিয়া উহাদের পরিশুদ্ধ করিয়া লওয়া হয়।

জলশুদ্ধির মন্ত্রটি আর একদিক দিয়াও লক্ষণীয়। এই মন্ত্রটির মধ্যে রহিয়াছে আমাদের পূর্বপুরুষগণের জাতীয় সংহতির উদার উপলব্ধি। ভারতবর্ষের পূর্ব, পশ্চিম, উত্তর, দক্ষিণ বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়িয়া এই সাতটি নদী প্রবাহিত। সাংস্কৃতিক প্রেরণা ও ভাবের দিক হইতে সহস্র সহস্র বৎসর ধরিয়া এই সপ্তনদী হিন্দু ভারতবর্ষকে এক অপূর্ব ঐক্যের প্রেরণার মন্ত্রে সংবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে। বস্তুতঃ, সাংস্কৃতিক ঐক্যের প্রেরণাই ভৌগোলিক ও রাষ্ট্রনৈতিক ঐক্যবোধকে সঞ্জীবিত করে। আমাদের পূর্বপুরুষগণ শুধু যে পূজার অনুষ্ঠানাদির মাধ্যমে নিজ দেহকে দেবময় করিতে চাহিয়াছিলেন তাহা নহে, আমাদের মাতৃভূমির ভৌগোলিক, রাষ্ট্রনৈতিক ও সাংস্কৃতিক দেহকেও তাঁহারা দেবময় বলিয়া ভাবিয়াছেন। স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে, আমাদের পূর্বপুরুষগণের নিকট ভারতবর্ষ শুধু মাতৃভূমিই ছিল না, ভারতবর্ষকে তাঁহারা দেখিয়াছেন পুণ্যভূমিরূপে, দেবাত্মভূমিরূপে। এইভাবে ভারতবর্ষ তাঁহাদের নিকট প্রতিভাত হইয়াছে একটি আধ্যাত্মিক সত্তা হিসাবে। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ্য যে, পূজাকালে পূজকও ভাবেন তাঁহার আধিভৌতিক দেহটি ক্রমে দেবময় হইয়া একটি আধ্যাত্মিক সত্তা প্রাপ্ত হইয়াছে।

'জলশুদ্ধি'র পর চতুষ্পার্শ্বের পরিমণ্ডলকে শুদ্ধ করিবার বিধি। সে-কারণেই 'আসনশুদ্ধির' বিধান। যে-আসনে বসিয়া পূজক পূজা করেন সেই আসনটিকে শুদ্ধ করিবার জন্য পূজক ভূমির অধিষ্ঠাত্রী দেবী বসুন্ধরার নিকট প্রার্থনা করেন :

"ওঁ পৃথ্বি ত্বয়া ধৃতা লোকা দেবি ত্বং বিষ্ণুনা ধৃতা।
ত্বঞ্চ ধারয় মাং নিত্যং পবিত্রং কুরু চাসনম্ ॥"

—"হে পৃথিবি, তুমি লোকসমূহকে ধারণ করিয়াছ। তুমি বিষ্ণুর দ্বারা ধৃতা। তুমি আমার আসনকে পবিত্র কর।"

পৃথিবী স্থৈর্য ও ধৈর্যের অধিষ্ঠাত্রী দেবী। তাঁহার আশীর্বাদে পূজকের স্থৈর্য ও ধৈর্য সুদৃঢ় হইবে, তিনি সংকল্পের দৃঢ়তাও লাভ করিবেন। মনে কোন চাঞ্চল্য আসিলে একাগ্রতা অসম্ভব। সেই কারণে স্থৈর্য, ধৈর্য ও সংকল্পের দৃঢ়তা একান্ত আবশ্যক। সে-কারণেই ঐ প্রার্থনা।

পূজার অন্য অনুষ্ঠানাদির মধ্যে উল্লেখযোগ্য 'ন্যাস'। জীবন্যাস, মাতৃকান্যাস, করন্যাস, অঙ্গন্যাস ইত্যাদির মাধ্যমে পূজকের দেহের প্রতিটি অঙ্গে পঞ্চাশৎ বর্ণের মাধ্যমে পঞ্চাশৎ বর্ণময়ী মাতৃশক্তিকে 'ন্যাস' অর্থাৎ স্থাপন করা হয়। বর্ণমালার পঞ্চাশটি বর্ণ আদ্যাশক্তির মন্ত্রময় অঙ্গ। এই ন্যাস-এর অপর উদ্দেশ্য হইল পূজক তাঁহার ভৌতিক দেহের প্রতিটি অঙ্গকে ইষ্টসত্তায় 'ন্যাস' অর্থাৎ সমর্পণ করিবেন। ইহার তাৎপর্য হইল, পূজক যেন তাঁহার ভৌতিক দেহকে ত্যাগ করিয়া চিন্ময়ত্ব প্রাপ্ত হইলেন। বস্তুতঃ, পূজার সকল অনুষ্ঠান ও অঙ্গাদির এই একতম উদ্দেশ্য—বহির্মুখী সত্তাকে ক্রমে অন্তর্মুখী করিয়া নিজের অন্তর্নিহিত চৈতন্য-সত্তার জাগরণ ঘটানো এবং অবশেষে চৈতন্য-সত্তায় উন্নীত ও প্রতিষ্ঠিত হওয়া।

প্রকৃতপক্ষে পূজা সেই পরম জাগরণেরই একটি প্রক্রিয়া। পূজাদর্শন সেই পরম প্রতিষ্ঠার একটি বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি। পূজার প্রধান উদ্দেশ্যই হইল নিজের 'কাঁচা আমি'-কে বিসর্জন দিয়া 'পাকা আমি'-তে উত্তীর্ণ হওয়া। 'পাকা আমি'-তে উত্তীর্ণ হইবার অর্থ—পূর্ণ মনুষ্যত্বে উত্তরণ। মানুষের যখন পূর্ণ মনুষ্যত্বে উত্তরণ ঘটে তখনই তাহার জীবনের চরিতার্থতা লাভ হয়। এই অবস্থারই অপর নাম দেবত্বে উত্তরণ। পূজায় রহিয়াছে মরমানুষের দেবময় হইয়া যাইবার পূর্ণ প্রতিশ্রুতি। পূজার মূলকথাই হইল দেবতা হইয়া দেবতার আরাধনা করা—"দেবো ভূত্বা দেবং যজেৎ"। পূজার প্রত্যেকটি অনুষ্ঠান ও স্তরের মধ্যে রহিয়াছে সেই সাধনার কথা, সেই উত্তরণের আহ্বান, সেই প্রতিষ্ঠার ইঙ্গিত। পূজায় প্রত্যেক অনুষ্ঠান পূজককে দেবময় করিয়া তুলিবার

সেই তাৎপর্যই বহন করে। বিগ্রহের 'প্রাণপ্রতিষ্ঠা'-র পূর্বে পূজক নিজেকে শুদ্ধ করিয়া নিজের চৈতন্য-সত্তায় নিজেকে প্রতিষ্ঠা করেন। অতঃপর তিনি বিগ্রহের 'প্রাণপ্রতিষ্ঠা' করেন। কারণ, স্বয়ং দেবময় হইয়া তবেই দেবতার আরাধনার বিধি। তখন পূজ্য ও পূজক উভয়ের মধ্যে আর কোন ভেদ থাকে না। ইহার তাৎপর্য হইল: আমি তখন আমারই পূজা করিতেছি। পূজার মূল উদ্দেশ্য তাহাই—অদ্বৈতের উপলব্ধি।

মানুষ স্বরূপতঃ ব্রহ্ম। দেবত্বই তাহার অন্তর্নিহিত স্বরূপ। কিন্তু সেই স্বরূপকে প্রকাশ করিতে হইবে। সেই প্রকাশের জন্য প্রয়োজন সাধনা, প্রয়োজন সংগ্রাম। পূজার মধ্যে নিহিত রহিয়াছে সেই সাধনা, সেই সংগ্রামের তাৎপর্য। কিসের সাধনা, কিসের সংগ্রাম? সাধনা পূর্ণতার জন্য, সংগ্রাম নিজের মালিন্যের আবরণকে অপসারণ করিবার জন্য, যে-মালিন্য আমার যথার্থ সত্তাকে, আমার প্রকৃত স্বরূপকে আবৃত করিয়া রাখিয়াছে। সাধনা ও সংগ্রাম সেই অজ্ঞানকে নাশ করিবার এবং অবশেষে আমার ও আমার অন্তর্নিহিত ঈশ্বর—উভয়ের মধ্যে অভিন্নতাকে আবিষ্কার করিবার। অতএব পূজা নিছক অনুষ্ঠান নহে, পূজা একটি বিজ্ঞান। ভৌতিক মানবদেহ কিভাবে চিন্ময় দেবদেহ প্রাপ্ত হইতে পারে পূজা হইল তাহার বিজ্ঞান। 'পূজা-বিজ্ঞান'-এর মর্মকথাটি স্বামী সারদানন্দ সংক্ষেপে অথচ অনবদ্যভাবে 'লীলাপ্রসঙ্গ' বলিয়াছেন: "তুমি কোনও দেবতার পূজা করিতে বসিলে অগ্রই কুলকুণ্ডলিনীকে মস্তকস্থ সহস্রারে উঠাইয়া ঈশ্বরের সহিত অদ্বৈতভাবে অবস্থানের চিন্তা তোমায় করিতে হইবে; পরে পুনরায় তুমি তাঁহা হইতে ভিন্ন হইয়া জীবভাব ধারণ করিলে এবং ঈশ্বর-জ্যোতিঃ ঘনীভূত হইয়া তোমার পূজ্য দেবতারূপে প্রকাশিত হইলেন এবং তুমি তাঁহাকে তোমার ভিতর হইতে বাহিরে আনিয়া পূজা করিতে বসিলে—ইহাই চিন্তা করিতে হইবে।" (২য় ভাগ, ১৩৫৮ গুরুভাব: উত্তরার্ধ, পৃঃ ২৬)

ভারতবর্ষের সনাতন ধর্ম কখনও 'জড়' বলিয়া কোনকিছুর অস্তিত্ব স্বীকার করে নাই। ভারতবর্ষের সনাতন ধর্ম জগতে সমস্ত কিছুর মধ্যেই চৈতন্যের অস্তিত্ব প্রত্যক্ষ করিয়াছে। 'জড়' বলিয়া যাহাকে অন্যেরা অভিহিত করে, সনাতন ধর্মের মতে উহা চৈতন্যেরই প্রকাশভেদ মাত্র আধুনিক বিজ্ঞানও আজ ইহা বলিতেছে। একই-ভাবে ভারতের সনাতন ধর্ম কখনও কোন জীবকেই 'জীব' বলিয়া দেখে নাই। জীব আসলে ব্রহ্মই, অজ্ঞানবশতঃ জীব জানে না যে, সে ব্রহ্ম। "জীব শিব"—এই অদ্ভুত সমীকরণ পৃথিবীকে ভারতবর্ষই প্রথম উপহার দিয়াছে। বর্তমানে ধর্ম যেমন নানা মহলে সমালোচিত এবং নিন্দিত, তেমনি পূজাদির ন্যায় অনুষ্ঠানাদিও তথাকথিত আধুনিক শিক্ষিত মহলে উপহসিত। সমালোচনা ও উপহাস যথার্থ হইলে কথা ছিল না, কিন্তু আজ তথাকথিত ধর্ম-নিরপেক্ষতা ও প্রগতিশীলতার নামে ভারতের সনাতন ঐতিহ্যের সমস্তকিছুকেই একদল মানুষ নির্বোধের মতো, তোতাপাখির শিখানো বুলির মতো সমালোচনা, অবজ্ঞা ও উপহাস করিয়া থাকে। ইহারা আমাদের ঐতিহ্যের মূল্য ও তাৎপর্য সম্পর্কে কিছুমাত্র অবহিত না হইয়া আমাদের ঐতিহ্যকে, আমাদের ধর্মকে, আমাদের আধ্যাত্মিক অনুষ্ঠানকে আক্রমণ করে। সত্য বটে কালের গতিতে আমাদের ঐতিহ্যে, আমাদের ধর্মে, আমাদের আধ্যাত্মিক অনুষ্ঠানাদিতে নানা বিকৃতি আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে, কিন্তু তাই বলিয়া আমাদের ঐতিহ্য, আমাদের ধর্ম, আমাদের আধ্যাত্মিক অনুষ্ঠানাদি প্রাসঙ্গিকতা হারাইয়া ফেলে নাই। প্রয়োজন অন্তর্দৃষ্টির, প্রয়োজন মুক্ত মন, উদার বোধ ও সূক্ষ্ম বিচারবুদ্ধির, যাহাতে আমরা বুঝিব আমাদের পূর্বপুরুষগণ কত বড় বিজ্ঞানদৃষ্টির, কত গভীর প্রজ্ঞা ও লোকদৃষ্টির অধিকারী ছিলেন। বস্তুতঃ, আজ তাঁহাদেরই সৃষ্ট ভিত্তিভূমিতেই নিহিত ভারতবর্ষ নামক দেশটির মূল প্রাণরস। সেই আদি প্রাণরস হইতেই উদ্ভূত ভারতবর্ষের সকল গৌরব, সকল মহিমা। ভারতবর্ষ যে স্থূল হইতে সূক্ষ্মের দিকে তাহার অধিবাসীদের চেতনাকে অগ্রসর করাইতে চাহিয়াছে, জড়ের শক্তিকে অস্বীকার করিয়া চৈতন্যের শক্তিকে আবিষ্কার করিতে সর্বতোভাবে প্রণোদিত করিয়াছে, ভূলোকের ধূলিকে ঝাড়িয়া ফেলিয়া দ্যুলোকের সৌরভকে অঙ্গে মাখিতে অনুপ্রাণিত করিয়াছে—পূজাবিজ্ঞানের কিছু অনুষ্ঠানের আলোচনার মাধ্যমে তাহা আমরা দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছি। বিজ্ঞান এবং ধর্ম উভয়ের পরিসমাপ্তি একত্বের আবিষ্কারে, একত্বের উপলব্ধিতে। পূজার মতো একটি লোকপ্রিয় অনুষ্ঠানের মাধ্যমে হিন্দুর ধর্ম সেই একত্বকে, সেই অদ্বৈতকেই আবিষ্কার করিতে, উপলব্ধি করিতে মানুষকে উদ্বুদ্ধ করিয়াছে। পূজাবিজ্ঞানের এই তত্ত্বটি আমাদের সকলেরই জানা একান্ত প্রয়োজন। □

বিশেষ রচনা

# পরিব্রাজক স্বামী বিবেকানন্দ

## মহেন্দ্রনাথ দত্ত

স্বামী বিবেকানন্দের দ্বিতীয় সহোদর মহেন্দ্রনাথ দত্ত। এবছর তাঁর ১২৫তম জন্মদিবস। তাঁর জন্ম ১৮৬৯ খ্রীস্টাব্দের ১ আগস্ট। বাল্যকালেই তিনি শ্রীরামকৃষ্ণের সান্নিধ্যলাভ করেছেন। শ্রীরামকৃষ্ণের সকল পার্ষদদের সঙ্গে ছিল তাঁর গভীর অন্তরঙ্গতার সম্পর্ক। শ্রীরামকৃষ্ণের শ্যামপুকুরবাটী ও কাশীপুরে অবস্থানকালে তিনি প্রায়ই তাঁর দর্শনে যেতেন। পরে বরানগর ও আলমবাজার মঠেও প্রায় নিত্যই তাঁর যাতায়াত ছিল। বেলুড় মঠের আদিযুগে সেখানেও তিনি বহুবার থেকেছেন এবং স্বামী ব্রহ্মানন্দ প্রমুখের স্নেহ-সান্নিধ্য লাভ করেছেন। বস্তুতঃ, বরানগর মঠ, আলমবাজার মঠ এবং বেলুড় মঠে রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের আদি ইতিহাস সম্পর্কে তাঁর ছিল নিবিড় প্রত্যক্ষদর্শীর অভিজ্ঞতা। লন্ডনে স্বামীজীর অবস্থান এবং রামকৃষ্ণ-ভাবান্দোলন প্রসারে স্বামীজীর অবদান সম্পর্কে অনেক অজ্ঞাত তথ্য তাঁর সূত্রে জানা গিয়েছে। এছাড়া স্বামীজীর বাল্যজীবন, প্রাক্-সন্ন্যাসজীবন, পরিব্রাজকজীবন সম্পর্কেও বহু তথ্য জানা গিয়েছে তাঁর নানা গ্রন্থ থেকে। শ্রীরামকৃষ্ণ সম্পর্কেও তাঁর মূল্যবান গ্রন্থ আছে। স্বামী ব্রহ্মানন্দ, স্বামী শিবানন্দ, স্বামী সারদানন্দ, স্বামী অদ্ভুতানন্দ, রামচন্দ্র দত্ত, গিরিশচন্দ্র ঘোষ, দুর্গাচরণ নাগ, শ্রীম, গোপালের মা, গৌরী মা প্রমুখ শ্রীরামকৃষ্ণ-পার্ষদগণ সম্পর্কে এবং স্বামী সদানন্দ, স্বামী নিশ্চয়ানন্দ এবং গুডউইন প্রমুখ স্বামীজীর শিষ্যগণ সম্পর্কে তাঁর গ্রন্থগুলিও অনেক অজ্ঞাত তথ্যে পূর্ণ। অকৃতদার, জ্ঞানতাপস, উন্নতমনা এই মানুষটি সম্পর্কে স্বামী ব্রহ্মানন্দ বলেছিলেন: "মহীন সাদা কাপড়ে সন্ন্যাসীর বাড়া।" তাঁর সম্পর্কে স্বামীজীরও খুব উঁচু ধারণা ছিল।

তাঁর ১২৫তম জন্মদিবস উপলক্ষে আমরা আমাদের বিনম্র শ্রদ্ধা নিবেদন করছি।—সম্পাদক, উদ্বোধন

নরেন্দ্রনাথের পরিক্রমা শুরু তাঁর বাল্যবয়সেই। ১৮৭৭ খ্রীস্টাব্দে নরেন্দ্রনাথ মা-ভাই-বোনদের সঙ্গে তাঁর পিতার কাছে সেন্ট্রাল প্রভিন্সের রায়পুরে যান, যেখানে কোন স্কুল ছিল না। নাগপুর থেকে গরুর গাড়ি করে যেতে প্রায় একমাস লেগেছিল। ভাষাতত্ত্ববিদ্ হরিনাথ দে-র পিতা রায়বাহাদুর ভূতনাথ দে সেখানে ওকালতি করতেন। রায়পুর-যাত্রাকালে একটা বিশেষ উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটেছিল। চারখানা গরুর গাড়ি যাচ্ছে; বাঘ, ডাকাতের ভয়ে একজন বন্দুকধারী সেপাই নেওয়া হয়েছিল। জঙ্গল দিয়ে যেতে যেতে গাড়িগুলি একটি উপত্যকায় প্রবেশ করল। উভয় পার্শ্বে পাহাড় ও জঙ্গল, হিংস্র জন্তুর উপনিবেশ। সেখানটা কোনরকমে দ্রুতবেগে যাওয়া আবশ্যক। দিন থাকতে থাকতে কোন সরাইতে পৌঁছাতে হবে। গাড়োয়ানরা ও ভূতনাথবাবু—সকলে বাঘের কথা বলছিলেন। সকলেই উদ্বিগ্ন ও ভীত। তাঁরা হঠাৎ দেখলেন, নরেন্দ্রনাথ গাড়িতে নেই। সকলেই ত্রস্ত হয়ে উঠলেন। এদিক-ওদিক ছোটাছুটি করতে লাগলেন। কিছুক্ষণ পরে (তাঁরা) দেখেন যে, পাহাড়ের মধ্যে একটি গুহার ভিতর নরেন্দ্রনাথ স্থির হয়ে বসে আছেন। বিভীষিকা বা চাঞ্চল্যের কোন লেশমাত্র নেই, যেন স্ব-ভবনে সোৎফুল্ল বদনে স্থির হয়ে তিনি গুহার ভিতর বসে আছেন। সকলে জিজ্ঞাসা করতে তিনি বললেন: "স্থানটি বড় সুরম্য। গরুর গাড়িতে অনেকক্ষণ বসেছিলাম, তাই এখানে একটু বসে আছি।" কথা যেন তিনি আর বলতে পারছেন না। চোখগুলো বিভোর। তারপর গাড়িতে এসে বসলেন, কিন্তু অনেকক্ষণ নিস্তব্ধ ও স্থিরভাবে রইলেন, যেন অন্যমনস্ক, অন্য কিছু ভাবছিলেন।

দুখানা নৌকাযোগে (একত্র করে) বানগঙ্গা পার হয়ে সবাই একটি মুদির দোকানে আশ্রয় নিলেন। সকালবেলা যখন সকলে মুদির দোকানে বসে আছেন, ভূতনাথ দে তখন নানা বিষয়ে গ্রন্থ ও গ্রন্থকারদের কথাবার্তা উত্থাপন করলেন। নরেন্দ্রনাথ তখন স্কুলের থার্ড ক্লাস পর্যন্ত পড়েছেন, কিন্তু একজন প্রবীণ লোকের সঙ্গে তর্ক-যুক্তি করে ও পুস্তক থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে এমন বাক্যালাপ করতে লাগলেন যে, ভূতনাথবাবু বিস্ময়াম্বিত হয়ে গেলেন। অতটুকু ছেলের

এত বই পড়া। তিনি বারংবার এই কথা বলতে লাগলেন। রায়পুরে অবস্থানকালে নরেন্দ্রনাথ তাঁর পিতার সঙ্গে প্রায়ই বাগ্‌বিতণ্ডায় প্রবৃত্ত হতেন এবং ঘোর তর্ক করতেন। কখনো একের বা অপরের জিত হতো। কিন্তু পুত্রের জয় হলে নরেন্দ্রনাথের মাতা বিশেষ হর্ষিত হতেন, স্বামীর জয় ও পুত্রের পরাজয় হলে তিনি একটু বিরক্ত ভাব প্রকাশ করে কার্য উপলক্ষ করে বাগ্‌বিতণ্ডা বন্ধ করে দিতেন।

*

কাশীপুরে অবস্থানকালে [ শ্রীরামকৃষ্ণের ভক্ত-সন্তানদের মধ্যে ] বুদ্ধদেবের বই খুব পড়া হতো। নরেন্দ্রনাথ, কালী ও তারকনাথ তিনজনে একবার বুদ্ধগয়ায় চলে গেলেন। সেখানে বুদ্ধদেবের সিদ্ধ প্রস্তরের ওপরে বসে তাঁরা খুব ধ্যান করতেন ও 'ললিতবিস্তর' থেকে এই শ্লোকটি পাঠ করতেন :

"ইহাসনে শুষ্যতু মে শরীরং
ত্বগস্থিমাংসং প্রলয়ঞ্চ যাতু।
অপ্রাপ্য বোধিম্ বহুকল্পদুর্লভাং
নৈবাসনাৎ কায়মতশ্চলিষ্যতে॥"

১৮৮৭ খ্রীস্টাব্দের শেষে [ডিসেম্বরে ?] নরেন্দ্রনাথ বরানগর মঠ থেকে পশ্চিমদিকে চলে যান। সঙ্গে ছিলেন বাবুরাম মহারাজ (স্বামী প্রেমানন্দ) এবং ফকির (যজ্ঞেশ্বর ভট্টাচার্য)। দিন সাতেক কাশীতে থেকে তাঁরা মঠে ফিরে আসেন। পরের বছর (১৮৮৮) আবার বেরোন জুলাই-আগস্টে। পথে কেউ একখানি টিকিট কিনে দিয়েছিল, কিন্তু খাবারের কোন বন্দোবস্ত করে দেয়নি। যাই হোক, হাতরাস স্টেশনে গাড়ি থামলে নরেন্দ্রনাথ নেমে পড়লেন। কিছু পরে যাত্রীরা স্টেশন ত্যাগ করে যে যার গন্তব্যস্থলে চলে গেল। নরেন্দ্রনাথ একখানি বেঞ্চের ওপর চুপ করে বসে আছেন। বাইরের কোনদিকেই যেন মন নেই। একটা কি গভীর চিন্তায় যেন মগ্ন। কিছুক্ষণ পরে স্টেশনের একটি কর্মচারী এসে বলল : "কেয়া বাবাজী। ইহাঁ পর কিঁউ বৈঠা হ্যায় ? যাওগে নেহী ?" নরেন্দ্রনাথ উত্তরে বললেন : "হাঁ মহারাজ, জায়েঙ্গে। লেকিন কাঁহা জায়েঙ্গে, নেহি জানতা।" এই বলে তিনি আবার যেন গভীর চিন্তায় মগ্ন হতে লাগলেন। উপস্থিত কর্মচারীটি আবার বলল : "বাবাজী, তামাকু পিওগে ?" নরেন্দ্রনাথ উত্তর করলেন : "হাঁ মহারাজ। পিলাও তো পিয়েঙ্গে।" কর্মচারীটি জৌনপুরী বাঙালী। হিন্দুস্থানীর স্বাভাবিক হিন্দী উচ্চারণ ও বাঙালীর শেখা হিন্দী উচ্চারণ অনেক তফাৎ। এই কারণে কর্মচারীটি বলল : "আপনি কি বাঙালী ?" নরেন্দ্রনাথ বললেন : "হ্যাঁ, আমি বাঙালী।" কর্মচারীটি বলল : "তবে আর কোথায় যাবেন, আমি বাসায় একা থাকি, আমার বাসায় চলুন।" স্টেশনের কাছে এই কর্মচারী শরৎচন্দ্র গুপ্তের বাসা। সে ইঁদারা থেকে জল তুলে দিলে নরেন্দ্রনাথ স্নান করলেন। তারপর সে কিছু খেতে দিল। নরেন্দ্রনাথ দেখলেন, এই যুবকটি স্টেশনের কর্মচারী, পশ্চিমের বাঙালী। শরীর খুব হৃষ্ট-পুষ্ট, বিবাহ করেনি ; মনটা বড় সরল। নরেন্দ্রনাথ আপন মনে গান করতে লাগলেন : "মন চল নিজ নিকেতনে, সংসার-বিদেশে বিদেশীর বেশে ভ্রম কেন অকারণে…"। তাঁর মুখে গানটি শুনে উক্ত কর্মচারীর সব ভাব যেন মুহূর্তে বদলে গেল, তার চাকরি করা বা বাড়ি-ঘরদোরের কথা যেন একেবারে মন থেকে দূর হয়ে গেল। বাবা, মা, ভাই, বোন—সকলই তার ছিল ; কিন্তু সে তখন যেন অন্যপ্রকার হয়ে উঠল। সংসারের কোন বিষয়ই যেন তার আর আকর্ষণীয় বোধ হলো না।

সংসারের মায়া-মমতা বিস্মৃত হয়ে শরৎচন্দ্র নরেন্দ্রনাথকে গিয়ে সরল প্রাণে বলল : "আমার কি হবে ? আমাকে আপনি সঙ্গে করে নিয়ে চলুন।" নরেন্দ্রনাথ ঠাট্টা করে আরেকটি গান গাইতে লাগলেন : "বিদ্যা পেতে চাও যদি চাঁদ, চাঁদমুখে ছাই মাখ, নইলে এইবেলা পথ দেখ।" 'বিদ্যা-সুন্দরে' হীরে মালিনী সুন্দরের কাছে হাত নেড়ে, মুখ নেড়ে যেমন বলেছিল নরেন্দ্রনাথও সেইরূপ নকল করে দেখাতে লাগলেন। গুপ্ত বাঙলা ভাল জানত না ; 'বিদ্যাসুন্দর' যে কী তাও জানত না। সরল প্রাণ, তাই তাড়াতাড়ি উনুন থেকে কতকটা ছাই নিয়ে মুখে মেখে কিম্ভূতকিমাকার সেজে একেবারে নরেন্দ্রনাথের কাছে হাজির। নরেন্দ্রনাথ

হেসে বললেনঃ "দূর শালা, মুখে ছাই মেখে এলি কেন?" গুপ্ত বলল: "এই যে তুমি মাখতে বললে।" দুজনকার বয়স একই, তাই কিছু সময় ঐরূপ ঠাট্টা চলল। তারপর গুপ্ত স্থির করলে—কাজকর্ম ছেড়ে সন্ন্যাস নিতে হবে; স্টেশন-অফিস থেকে নিজের মাইনে ও যে-টাকা জমা ছিল তা বুঝে নিল। কাপড় গেরুয়া রঙে ছুপিয়ে সন্ন্যাস নিল এবং হরিদ্বার, হৃষীকেশে যাওয়া হবে—দুজনের মধ্যে এইরূপ স্থির হলো।

গুপ্ত সন্ন্যাসী হলো বটে (তাঁর সন্ন্যাসনাম স্বামী সদানন্দ), কিন্তু বরাবর 'অ্যামিউনিশন বুট' (ammunition boot) পরত, এইজন্য মোটা বুটজোড়াটাও সঙ্গে নিল। ট্রেনে উঠে সাহারানপুরে নামা হলো। তখন আর রেল চালু হয়নি। সাহারানপুর থেকে হরিদ্বারের দিকে দুজনে হেঁটে চলতে লাগলেন। একটা পুঁটলিতে কাপড়, কম্বল ও পুরনো বুটজোড়াটা আছে; গুপ্ত মনে করল, সামান্য ভার, পুঁটলিটি হাতে ঝুলিয়ে নিয়ে যাবে। অনভ্যাসবশতঃ কিছু পরেই হাতে বেদনা অনুভব হতে লাগল, তখন পুঁটলিটি বগলে নিয়ে হাতকে বিশ্রাম দিল। ক্রমে ডান বগল, বাঁ বগল করে অবশেষে পুঁটলিটি তার অত্যন্ত বোঝা বলে মনে হতে লাগল। নরেন্দ্রনাথ তখন গুপ্তর হাত থেকে পুঁটলিটি নিলেন এবং এহাত-ওহাত করে অবশেষে মাথায় রেখে পথ চলতে লাগলেন। পথ চলতে চলতে স্বামীজী শরৎচন্দ্রকে 'বানিয়ানস পিলগ্রিমস প্রগ্রেস' (Bunyan's Pilgrim's Progress) বই থেকে 'স্লাও অব ডেস্‌পন্ডেন্সি' (Slough of Despondency), 'ক্যাস্‌ল অব ডাউট' (Castle of Doubt), 'জায়ান্ট ডেস্‌-পেয়ার' (Giant Despair) প্রভৃতি উপাখ্যান-গুলি বলতে লাগলেন। ধীরে ধীরে হরিদ্বার হয়ে হৃষীকেশে দুজনে এসে পৌঁছালেন। বহু বছর পরে গুপ্ত আহ্লাদ ও অভিমান করে বলত: "আরে, তা না হলে কি স্বামীজী আমার গুরু হতে পারেন? অম্লানবদনে আমার পরা জুতো মাথায় করে নিয়ে চললেন। আর আমিও তখন এমনই হাবাগোবা যে, স্বামীজীর কথায় অতদূর অন্য-মনস্ক হয়ে পড়েছি, স্বয়ং গুরু যে আমার পরা জুতো মাথায় করে নিয়ে যাচ্ছেন তা আমার কিছুমাত্র খেয়ালই ছিল না। একমাত্র তাঁর কথার ওপরই আমার ষোল আনা মনটা পড়েছিল। একেই বলে স্বামীজীর অকপট ভালবাসা। আমি জন্মেছি স্বামীজীর সেবা করবার জন্য। আমি আর কিছু জগতে জানি না।"

গুপ্ত বলত: "হৃষীকেশে গিয়ে একটা ঝুপড়িতে বসলাম। স্বামীজী বললেন, 'ওরে, চলে চলে বড় ক্লান্ত হয়ে পড়েছি; কিছু খেতে দিবি কি?' আমার সঙ্গে তখন কিছু টাকা ছিল; আমি বললাম, 'হাঁ মহারাজ, খিচুড়ি পাকায়গা।' আমি খিচুড়ির বন্দোবস্ত করতে লাগলাম, স্বামীজী গঙ্গার দিকে গেলেন। খানিকটা পরে ফিরে এলেন। তখন যেন আর এক মূর্তি! বললেন, 'শালা, তুই আমার পায়ের বেড়ি হলি। আমি সব ছেড়ে একা বেড়াচ্ছি, আবার তুই এক উৎপাত জুটলি; যাঃ শালা, আমি আর থাকব না, চললাম।' এই বলে স্বামীজী লছমনঝোলার দিক হয়ে পাহাড়ের দিকে চলে গেলেন। জঙ্গলের ভিতর আর মানুষটিকে দেখা গেল না। আমিও ভ্যাবাচ্যাকা হয়ে বসে রইলাম। খিচুড়িও যেমন উনুনে বসানো ছিল, সেইরূপই পড়ে রইল। আমি স্থির হয়ে বসে ভাবছি। ঘণ্টা তিনেক পরে দেখি যে, স্বামীজী আবার ফিরে আসছেন, এসে বললেন, 'বড় খিদে পেয়েছে। কিছু আছে রে?' আমি বললাম, 'খিচুড়ি তো বসানোই রয়েছে।' স্বামীজী বললেন, 'তুই এখনও খাসনি?' আমি বললাম, 'আপনি না এলে আমি কি করে খাব?' স্বামীজী বললেন, 'দূর শালা, তুই এক পায়ের বেড়ি হয়েছিস। আরে আমি চলে গেলাম—পাহাড়, জঙ্গল পার হলাম, তারপর মনে হলো, তোকে একা ফেলে এসেছি; তুই বোকা হাবা, কি করতে কি করে বসবি, তাইতো আবার ফিরে এলাম।' আমরা দুজনে খাচ্ছি আর এইসব কথা হচ্ছে। আমি আহ্লাদ করে বললাম, 'আপনি যাবেন কি, আমি তো আপনাকে টেনে নিয়ে এলাম।' স্বামীজী এক-দৃষ্টিতে আমার দিকে খানিকক্ষণ চেয়ে রইলেন, মনে মনে কী ভাবতে লাগলেন, তারপর একটু হেসে বললেন, 'যাঃ শালা!'"

গুপ্ত মহারাজ স্বামীজীর সেবা করবার জন্যই যেন জন্মেছিলেন। তিনি বলতেন: "আমি স্বামীজীর সেবা করবার জন্য জন্মেছি, স্বামীজী চলে গেছেন, আমার দেহ রাখবার আর আবশ্যক নেই।" অনেক সময় তিনি বলতেন: "আমি স্বামী বিবেকানন্দকে বুঝতে পারিনি; তিনি বড়লোক, যশস্বী, শক্তিমান ও পণ্ডিত লোক—আমার সে-লোককে ভয় করে। আমি বুঝি আমার পুরনো গরিব নরেন্দ্র দত্ত, যে খালি পায়ে হেঁটে হেঁটে বেড়াত, আর দুজনে মিলে গাছের তলায় শুয়ে থাকতাম, আর যেদিন যা জুটত, তা-ই খেতাম। আমার নরেন্দ্রনাথকে মিষ্টি লাগে—বিবেকানন্দকে ভয় করে।"

গুপ্ত মহারাজ একটি ঘটনা বলতেন, কিন্তু সেটি কোন্ সময়কার তা বিশেষ স্মরণ নেই। তিনি বলতেন: "স্বামীজী ও আমি একসময়ে কাশীতে বাস করতাম। একটা লেবুবাগানে পড়ে থাকতাম আর মাধুকরী করতাম। স্বামীজী কঠোর জপ-ধ্যান শুরু করলেন। একদিন স্বামীজী আগে আগে যাচ্ছেন ও আমি পিছনে। একজন গৃহস্থের বাড়িতে ভিক্ষা করতে গেছি। আমাদের ওপর থেকে দেখে কিছু চাল নিয়ে একটা ছোট মেয়ে এসেছে। কিন্তু স্বামীজী তখন অন্যভাবে রয়েছেন, মনটা খুব উঁচুতে ও তন্ময় অবস্থা। স্বামীজী বাড়িতে প্রবেশ করে 'নারায়ণ হরি'—এই কথা বললেন। শব্দটা এত গম্ভীর ও সিংহগর্জনের মতো হয়েছিল যে, সমস্ত বাড়িটা কেঁপে উঠল। যে ছোট মেয়েটা চাল হাতে করে এসেছিল, সে ভয়ে দুরদুর করে ভিতরে পালিয়ে গেল। আমিও যেন কেঁপে উঠলাম। শব্দটা এমন শক্তিপূর্ণ, এমন শ্রুতিমধুর যে, কখনো এমন রব শুনিনি। পরক্ষণেই স্বামীজী যখন দেখলেন যে, মেয়েটা আঁতকে উঠেছে আর বাড়ির ভিতরে সবাই চঞ্চল হয়ে উঠেছে, তখন তিনি ভাব গোপন করে সাধারণের মতো হলেন। তখন আবার মেয়েটি ধীরে ধীরে এসে যা দেবার দিয়ে গেল। এই সময়ে স্বামীজী কী একটা ভাবে থাকতেন তা বলা যায় না। সর্বদাই বিভোর, যেন মনটা দেহ ছেড়ে কোথায় উচ্চে চলে গেছে। মুখ এত গম্ভীর, নেত্রদ্বয় এত জ্যোতিঃপূর্ণ যে, মুখের দিকে চাওয়া যেত না এবং সবসময়ে কাছে যেতে সঙ্কোচবোধ হতো। স্বামীজীর এরূপ ভাব কয়েক মাস ছিল।"

গুপ্ত মহারাজ আরও একটি ঘটনা বলেছিলেন, কিন্তু সেটি কোন্ স্থানে ঘটেছিল তা ঠিক স্মরণ নেই। পরিব্রাজক অবস্থায় স্বামীজী একবার এক ছোট রাজ্যে গিয়ে উপস্থিত হন। অনেক লোক এসে স্বামীজীর সঙ্গে কথা বলতে লাগল। সারাদিনই লোক আসছে, সারাদিনই লোক কথা বলে চলে যাচ্ছে। দুপুর গেল, বিকাল গেল, সন্ধ্যা গেল,—তবুও লোকের ভিড় কমল না এবং খাবার কথাও কেউ একবারও জিজ্ঞাসা করল না বা কেউ কিছু দিলও না। এইভাবে দু-একদিন গেল। স্বামীজী তখন একরকম অজগরবৃত্তি অবলম্বন করেছিলেন অর্থাৎ স্বেচ্ছায় কেউ আহার না দিলে তিনি চেয়ে খাবেন না। একটি ভাঙ্গী বা মেথর রাস্তা ঝাড়ু দিত আর সমস্ত ব্যাপারটা দেখত। যদিও জাতিতে সে ভাঙ্গী, কিন্তু তার ভিতর দয়ার ভাব ছিল। সে দেখল যে, একটি সাধুর কাছে দলে দলে লোক আসে-যায়, কিন্তু সাধু খেল কি না খেল সে-বিষয়ে তো কেউ একবারও জিজ্ঞসা করে না। দুই-তিনদিন এইভাবে গেল, অথচ কাউকে কিছু আহার্য আনতে না দেখে একটু অবসর পেয়ে ভাঙ্গী স্বামীজীকে বলল: "এইতো এত লোকজন আসছে যাচ্ছে, কিন্তু আপনি কিছু খেয়েছেন কি?"

স্বামীজী সেই ভাঙ্গীকে স্পষ্ট বললেন যে, এই কদিন তিনি প্রায় অনাহারে রয়েছেন। সেই কথা শুনে ভাঙ্গী তখন চঞ্চল ও ব্যথিত হয়ে স্বামীজীকে বলল: "আমি জাতে ভাঙ্গী, তা না হলে আপনাকে রুটি এনে দিতাম।" স্বামীজী তার দয়ার ভাব শুনে বললেন: "আচ্ছা, তুমি আটা নিয়ে এস, রুটি করে নেওয়া যাবে।" ভাঙ্গী সেইরূপ করলে স্বামীজী তার দেওয়া আটার রুটি খেয়েছিলেন। এই কথা সেখানকার রাজার কানে গেল। রাজা ভাঙ্গীকে দণ্ড দিতে মনস্থ করলেন, কিন্তু সেই সময় স্বামীজী সেখানে উপস্থিত হয়ে রাজাকে মিষ্টভাবে তীব্র ভর্ৎসনাসূচক কথা বলতে লাগলেন। রাজা সেই সকল কথা শুনে অপ্রতিভ হয়ে স্বামীজীর প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলেন। গুপ্ত মহারাজ ঐ ঘটনাটি বলার সময় বলতেন:

"জামা, জুতো-পরা লোকের চেয়ে মেথর ভাঙ্গীর ভিতর প্রাণ আছে।"[১]

১৮৯০ খ্রীস্টাব্দে গ্রীষ্মের শেষ বা বর্ষার প্রারম্ভে নরেন্দ্রনাথ তীর্থ-পর্যটনে গেলেন।[২] গঙ্গাধর মহারাজ আগ্রহ করে সেবা করবার জন্য সঙ্গে চললেন। নরেন্দ্রনাথের সঙ্গে গিয়েছিলেন বলে অনেকেই গঙ্গাধর মহারাজকে 'কেশব ভারতী' বলতেন। হরমোহন মিত্র ও বসুমতীর উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় তাঁদের স্টেশনে পৌঁছে দিয়ে এলেন। সেদিন রবিবার, সকালের ট্রেনে উভয়ে পশ্চিমে যাত্রা করলেন। নরেন্দ্রনাথ এইবার যে বহির্গত হয়েছিলেন, একেবারে আমেরিকা ও ইংল্যান্ড হয়ে বহুদিন পর তিনি কলকাতা ফিরে আসেন প্রথমে দেওঘরে তাঁরা দু-একদিন ছিলেন, সেখানে সুবিখ্যাত রাজনারায়ণ বসুর সঙ্গে নরেন্দ্রনাথের সাক্ষাৎ হয়। রাজনারায়ণ বসু মহাশয় অতি সরল ও উচ্চমনের লোক ছিলেন। বৃদ্ধের সঙ্গে ইংরেজীতে কথা বলা অসঙ্গত বিবেচনা করায় নরেন্দ্রনাথ স্বাভাবিক বাঙলাভাষায় কথা বলতে লাগলেন এবং একটিও ইংরেজী শব্দ ব্যবহার করলেন না। বসু মহাশয়ের সঙ্গে নরেন্দ্রনাথের সেকাল ও একালের কথা, ব্রাহ্মসমাজের কথা ইত্যাদি নানারূপ আলোচনা হতে লাগল। কথাপ্রসঙ্গে নরেন্দ্রনাথ বসু মহাশয়কে জিজ্ঞাসা করলেনঃ "আপনার শরীর এত ভগ্ন হলো কী করে?" বসু মহাশয় সরল অকপটভাবে বললেনঃ "মদে মদে; নতুন ইংরেজী চাল দেশে ঢুকলে, তার সঙ্গে সঙ্গে একটা ধারণা ঢুকল যে, মদ না খেলে পড়াশুনো হবে না, দেশের কল্যাণকর কাজ হবে না; তাই সবাই মদ খেতে আরম্ভ করেছিলাম। বাঙালীর পেটে সইবে কেন? তাই শরীর ভেঙে গেল।" কথাবার্তায় বৃদ্ধ রাজনারায়ণ বসু মহাশয়ের ধারণা হলো যে, যুবক নরেন্দ্রনাথ ইংরেজী জানেন না, সেইজন্য তিনি যখন ইংরেজী বলে ফেলছিলেন, তখন আবার তার তর্জমা করে নরেন্দ্রনাথকে বুঝিয়ে দিচ্ছিলেন। কথাপ্রসঙ্গে তিনি ইংরেজী প্লাস (plus) কথাটি ব্যবহার করে আঙুলের সাহায্যে তা নরেন্দ্রনাথকে দেখিয়ে দিলেন। বৃদ্ধ বসুর ব্যবহার দেখে নরেন্দ্রনাথের খুব হাসি পেল। তিনি গম্ভীরভাবে তা চেপে রাখলেন পাছে গঙ্গাধর মহারাজ হেসে ফেলেন এবং তাঁকে ইশারা করে হাসতে বারণ করলেন। কথা শেষ হলে উভয়ে উঠে এসে পথে খুব হাসতে লাগলেন। আত্মসংযম ও আত্ম-গোপন শ্রেষ্ঠ লোকদের যে বিশেষ গুণ হয়ে থাকে, এটিই তার একটি উদাহরণ।

নরেন্দ্রনাথ, শিবানন্দ স্বামী ও কালী বেদান্তী[৩] এলাহাবাদে গোবিন্দ ডাক্তারের[৪] বাড়িতে কিছুদিন ছিলেন। ১৯২৩ খ্রীস্টাব্দে শিবানন্দ স্বামী যখন প্রয়াগে যান তখন গোবিন্দবাবু শিবানন্দ স্বামীর সঙ্গে দেখা করতে এসে পূর্বস্মৃতির অনেক কথা বলতেন। নরেন্দ্রনাথ, শিবানন্দ স্বামী ও কালী বেদান্তী অল্পদিন তাঁর বাড়িতে ছিলেন এবং তাঁর সঙ্গে আলাপ হয়েছিল। গোবিন্দবাবু বলতেন যে, এরূপ উচ্চ অবস্থার সাধু এর পূর্বে কখনো তিনি দেখেননি।

একদিন তাঁরা সকলে মিলে 'সিন্দুক সা' নামক জনৈক সাধুকে ত্রিবেণীতে দর্শন করতে যান। একটি প্রকাণ্ড সিন্দুকের ওপর সেই সাধু বসে থাকতেন এবং তার ওপরই নিদ্রা যেতেন। ত্রিবেণী ও প্রয়াগে সকলেই তাঁকে শ্রদ্ধাভক্তি করত। নরেন্দ্রনাথ তাঁকে দর্শন করে তাঁর প্রতি বিশেষ সন্তুষ্ট হলেন না। গোবিন্দবাবু জিজ্ঞাসা করায় নরেন্দ্রনাথ উত্তর করলেনঃ "লোকটা যথাসর্বস্ব সিন্দুকের ভিতর রেখে তার ওপর বসে থাকে। ওর ধর্মকর্ম, ঈশ্বর, তপস্যা সমস্তই এই সিন্দুকের ভিতর রেখেছে; সেইজন্য মনটা উচ্চদিকে যেতে পারছে না। এইটাই হচ্ছে তার মুদিখানার দোকান।"

এই সময় প্রয়াগধামে গুরুজী অমূল্য নামে জনৈক বাঙালী সাধু থাকতেন। তিনি মেডিকেল কলেজে কয়েক বছর পড়েছিলেন এবং নরেন্দ্রনাথের

১ স্বামীজীর প্রামাণিক জীবনীতে ঘটনাটি অন্যরকম।—সম্পাদক

২ স্বামীজী সেবার বেরিয়েছিলেন জুলাই-আগস্টের মাঝামাঝি।—সম্পাদক

৩ স্বামী অভেদানন্দ

৪ ডাঃ গোবিন্দচন্দ্র বসু

সঙ্গে পূর্বপরিচয় ছিল। নরেন্দ্রনাথ গৃহত্যাগ করার পর অমূল্য সন্ন্যাসী হয়ে প্রয়াগে বাস করতে লাগলেন। নরেন্দ্রনাথের প্রতি তাঁর বিশেষ শ্রদ্ধাভক্তি থাকায় তিনি গোবিন্দ ডাক্তারের বাড়িতে সাক্ষাৎ করতে আসতেন ও একত্র বসে আহার করেছিলেন। একদিন রাত্রে সকলে একত্র আহার করছেন। নরেন্দ্রনাথ একটি লংকা চেয়ে নিলেন, গুরুজী অমূল্য জিদ দেখাবার জন্য দুটি কাঁচা লংকা নিয়ে খেলেন। নরেন্দ্রনাথ কৌতুক করে তিনটি লংকা খেলেন, কারণ তিনি হটবার ছেলে নন। অমূল্যকে হারাবার জন্য তিনি পরে অধিক সংখ্যায় লংকা খেতে লাগলেন; অবশেষে অমূল্য পরাস্ত হলো এবং সকলে এই ব্যাপার দেখে হাসতে লাগল। এই সামান্য কাজটির ভিতরও নরেন্দ্রনাথ এমন ছেলে-মানুষী, সরল ভাব ও সর্বোপরি নিজের প্রাধান্য দেখালেন যে, সকলেই তা দেখে মহা আনন্দিত হলেন। কথায় যত না হোক, মুখভঙ্গি ও দৃষ্টিতে তাঁর মনোভাব সমস্ত প্রকাশ পেতে লাগল। তাঁর চোখ থেকে যেন একটা ভাবরাশি বহির্গত হয়ে বলতে লাগল যে, আমি অজেয়। সামান্য বিষয়েও আমার সমকক্ষ কেউ থাকবে না বা আমায় কেউ পরাজিত করতে পারবে না। কেবল ভালবাসা ও কৌতুক দিয়ে আমি সকলকে আপনার ভিতর আকর্ষণ করে রেখেছি। আহারান্তে নরেন্দ্রনাথ ডাক্তার গোবিন্দবাবুকে একান্তে বললেন: "অমূল্য যদি মঠে যেতে চায় তাহলে তুমি তাকে বরানগর মঠে পাঠিয়ে দিও।"

একদিন কালী বেদান্তী গোবিন্দবাবুকে বললেন: "দেখুন ডাক্তারবাবু, তিনি (শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব) বলতেন, নরেনকে ভোজন করালে লক্ষ ব্রাহ্মণভোজন করানোর ফল হয়।" নরেন্দ্রনাথ তা শুনে কৌতুক করে কালী-বেদান্তীকে বললেন: "কিরে শালা, দোকান খুলেছিস নাকি? তোর বুঝি কিছু রেস্ত করতে হবে।"—এই কথা বলে হাসতে লাগলেন। কালী-বেদান্তী যথার্থ সরলভাবে আন্তরিক ভাল-বাসার সঙ্গে নরেন্দ্রনাথের প্রশংসা করেছিলেন, কারণ তাঁর উচ্চ অবস্থা ও শ্রীরামকৃষ্ণদেব নরেন্দ্রনাথকে কিরূপ স্নেহ করতেন তাই তিনি সাধারণের সমক্ষে প্রকাশ করতে চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু নরেন্দ্রনাথ আত্মপ্রশংসা বা আত্মপরিচয় দিতে একেবারেই ভালবাসতেন না, সেইজন্যই কালী-বেদান্তীকে মৃদুভাবে ভর্ৎসনা করে কথা চেপে যেতে বললেন। এই ঘটনাটিতে উভয়েরই মহত্ত্ব প্রকাশ পেয়েছিল।

এই সময় শ্রীশচন্দ্র বসু (গাজীপুরে মুনসেফ ছিলেন ও পরে এলাহাবাদে ডিস্ট্রিক্ট জজ হয়েছিলেন) একদিন গোবিন্দবাবুর বাড়িতে নরেন্দ্রনাথের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে আসেন। শ্রীশচন্দ্র বসুর বাড়ি এলাহাবাদে এবং বর্তমান পাণিনি অফিসই তাঁর বাড়ি। তিনি এই সময় থিয়জফিস্টদের সঙ্গে মিশতেন এবং থিয়জফিস্টভাবে সাধন-ভজন করতেন। নরেন্দ্রনাথ শ্রীশচন্দ্রের সঙ্গে এমন সুযুক্তি দিয়ে তর্ক করেছিলেন যে, শ্রীশচন্দ্রের নিজের সমস্ত মতই উল্টে যায়। ফিরে যাওয়ার সময় শ্রীশচন্দ্র বলে গেলেন: "আমার একবছরের সঞ্চিত ভাব-সকল আজ সব উড়ে গেল।" নরেন্দ্রনাথ তা শুনে বললেন: "তোমার দশবছরের ভাব থাকল বা উড়ে গেল, তাতে কার কী এসে যায়?"

শ্রীশচন্দ্র আর একদিন গেরুয়া পরে সকলের সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলেন। নরেন্দ্রনাথ বিরক্ত হয়ে তাঁকে বললেন: "গৃহীর আশ্রমে থেকে সন্ন্যাসীর ভেক করো না, এতে তোমার অধিকার নেই, অনিষ্ট হতে পারে।" যাই হোক, সেইদিন থেকে শ্রীশচন্দ্র শ্রীরামকৃষ্ণদেবের প্রতি বিশেষ আকৃষ্ট হলেন এবং নিত্য প্রাতে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ছবিখানি পূজা করতেন। যদিও শ্রীশচন্দ্র পরে আবার থিয়জফিস্ট হয়েছিলেন এবং কার্যতঃ শ্রীরামকৃষ্ণ-সঙ্গ ত্যাগ করেছিলেন, কিন্তু পূর্ব-পরিচিত লোকের সঙ্গে সাক্ষাৎ হলে আবার সেই পূর্বভাব জেগে উঠত এবং অতি সাদরে বাক্যালাপ করতেন।

নরেন্দ্রনাথ, তাঁর গুরুভাই ও গোবিন্দ ডাক্তার ঝাঁসি দর্শন করতে একদিন দয়ারামের আশ্রমে যান। সেখানে নানারূপ সৎপ্রসঙ্গে ও মাঝে মাঝে হাস্যোদ্দীপক কৌতুক-রহস্যে দিনটা অতিবাহিত করে সকলে সন্ধ্যার সময় ফিরে আসেন।

[ ক্রমশঃ ]

কবিতা

# দৈব মুহূর্ত

### অরুণকুমার দত্ত

আঠারশো তিরানব্বই সালের
এগারোই সেপ্টেম্বর
সকাল দশটা,
শিকাগোর কলম্বাস হল।
চতুর্দিকে বিরাজ করছে
এক ভাবগম্ভীর পরিবেশ।
অনুষ্ঠানের শুরুতেই
স্বাগত সংবর্ধনা জানান হলো
মঞ্চে উপবিষ্ট অতিথিদের ;
সমস্ত ভারতবাসী ও
সুপ্রাচীন ভারতীয় ধর্মের পক্ষে
ধন্যবাদ জানাতে উঠলেন
উজ্জ্বল গৈরিকভূষণে দিব্যকান্তি
এক যুবক সন্ন্যাসী,
দৃপ্ত ভঙ্গিমায় দাঁড়িয়ে
আয়ত গভীর দৃষ্টি মেলে বললেন :
'আমেরিকাবাসী ভগিনী ও ভ্রাতাগণ,
আপনাদের আন্তরিক অভ্যর্থনায়
আমি গভীরভাবে অভিভূত।
আমি এমন এক দেশে জন্মেছি,
এমন এক ধর্মে আমি বিশ্বাস করি
যার আদর্শ
পরমতসহিষ্ণুতা ও সর্বজনীন উদারতা ;
অগণিত দেশবাসীর মতো
শিশুকাল থেকে একটি স্তোত্র
আবৃত্তি করতে আমি শিখেছি :
'সকল নদী বিভিন্ন উৎস থেকে বেরিয়ে
যেমন সমুদ্রে বিলীন হয়,
আমরা সকল মানুষ তেমনি
আলাদা আলাদা স্বভাব নিয়েও
শেষে প্রভুর কাছে পেঁছাবই।
আমি আশা করব,
যে-ঘণ্টাধ্বনি দিয়ে
আজকের সভার সূচনা হয়েছে,
তা যেন মৃত্যুঘোষণা করে
সর্বরকমের সংকীর্ণতা, গোঁড়ামি,
জঘন্য সাম্প্রদায়িকতার।'
চক্ষের নিমিষে ঘটে গেল
এক প্রচণ্ড আলোড়ন,
করতালিধ্বনিতে
মুখরিত, অনুরণিত হলো
বিস্তীর্ণ সভাগৃহ,
শত সহস্র শ্রোতা অনুভব করল
এক বিশাল চুম্বকের আকর্ষণ,
শ্রদ্ধা ও সম্মান জানাতে
সম্মোহিতের মতো ছুটে চলল
তাঁর দিকে।
এতদিন যিনি ছিলেন
অজ্ঞাতপরিচয় ব্যক্তি
মুহূর্তে হয়ে উঠলেন
সকলের চোখের মণি—
এক বিপ্লবী সন্ন্যাসী
ঐশীশক্তিসম্পন্ন বাগ্মী
এক দেবদুর্লভ ব্যক্তিত্ব।

### ভ্রম-সংশোধন

গত শারদীয়া সংখ্যায় ( আশ্বিন, ১৪০০ ) প্রকাশিত 'যুগ-পরিচয়' কবিতায় ঐতিরেয় ব্রাহ্মণ থেকে উদ্ধৃতির প্রথম পংক্তির 'সজ্জিহানস্তু' শব্দের স্থলে 'সঞ্জিহানস্তু' হবে।

## খুঁজে ফেরা

### শিপ্রা বন্দ্যোপাধ্যায়

এ-জীবন কি কক্ষহীন ভ্রষ্ট ভুল স্ফুলিঙ্গ মাত্র ?
নাকি সমস্ত কুণ্ঠিত অন্ধকারে আলোর পথ
খুঁজে ফেরা ?
পথ খুঁজতেই চলে যায় একটি জীবন—
সত্যপথ নির্ভুল পথ
কক্ষপথ না পেলে কক্ষচ্যুত হয় জীবন,
সত্যপথের খোঁজে একহাজার চেষ্টা ব্যর্থ হলে
তবে একটি সার্থকতা আসে।
তুমি যদি সত্যকে খুঁজে পাও
তবে তুমিই হবে নির্মাতা
আর তোমার নির্মাণকাজে হাতিয়ার হবে
মানুষের ভালবাসা ;
তোমারই অলক্ষ্যে তুমি এগিয়ে যাবে
পরিপূর্ণতার দিকে।

## উপনিষদের দুই পাখি

### প্রসিত রায়চৌধুরী

প্রথম পাখিটা ঠোকরায় ফল—
বাড়ি, গাড়ি, টাকা সবই তার চাই।
নোংরা-নালার কৃমির মতন
পরম তৃপ্তি তার তাই।

ক্রমে রক্তের চাপ বাড়ে, পাকে চুল, দাঁত নড়ে
যমকিংকর দাঁড়িয়ে শিয়রে
সেদিকে খেয়াল নাই।

দ্বিতীয় পাখিটা তাই
কৌতুক-চোখে নির্বিকার
দেখছে জীবের
নির্বোধ লালসাই।
সে জানে, জীবন অনিত্য
দেহ অনিত্য
তিনহাত খাঁচার
শ্মশান-ছাই।

## নিবেদিতাকে নিবেদিত

### কৃষ্ণা বসু

আয়ারল্যান্ডের কন্যা, বিদেশিনী, তুমি
কতখানি ভালবাসা নিয়ে এসেছিলে
আমাদের ভাঙাচোরা দুঃস্থ ম্লান ঘরে।
তোমার হৃদয়-প্রদীপ থেকে আলো
এসে পড়েছে অন্ধকার স্বদেশে আমার।
কে বলেছে বিদেশিনী ? তোমার চেয়ে
ভারতীয় কে রয়েছে অদ্ভুত এদেশে ?
সুপ্রাচীন সভ্যতার করুণ স্বদেশ
পরাধীনতার বিষে জর্জর হয়েছে ;
সেই বিষমোচনের, তাপমোচনের
মন্ত্র কণ্ঠে নিয়ে তুমি নারী অপরূপা
বিবেকানন্দের শিষ্যা এসেছিলে
প্রেমে প্রীতিতে ও ভালবাসার গানে
ভরে উঠেছিল প্রাণের শস্যের ক্ষেত,
এই দুঃখী বর্ষীয়সী স্বদেশ আমার
তোমার আলোয় দীপ্তি পেয়েছিল খুব।
আজ শতাব্দীর জমা শ্রদ্ধা তোমার জন্যই
শব্দের ডালায় সাজিয়ে দিলাম নম্র।

## ভয়

### অমলকান্তি ঘোষ

হঠাৎ বিষম কোন সঙ্কটের সম্মুখীন হলে
রুপোলী চুলের নিচে চিন্তায় কম্পমান শিরা।
পরিচিত এ-পৃথিবী, যার প্রতি এত নির্ভরতা
মনে হয়, সে-ও যেন গোপন গর্বে গম্ভীরা।

দৃশ্যের রূপ ম্লান, সঙ্গীত শব্দের মৃত্যু হয়,
উজ্জ্বলতা হতবাক্, অন্ধকার নামে উৎসবে।
আমাদের উচ্ছল জীবনযাত্রার অন্তরালে
এক ফল্গু জলধারা বহমান—কী হবে। কী হবে

## বিশেষ রচনা

# শিকাগো ধর্মমহাসভায় স্বামী বিবেকানন্দের ঐতিহাসিক ভাষণঃ সামাজিক তাৎপর্যসমূহ

সান্ত্বনা দাশগুপ্ত

[ পূর্বানুবৃত্তিঃ ভাদ্র ১৪০০ সংখ্যার পর ]

॥ ৫ ॥

### ধর্মমহাসভায় প্রদত্ত স্বামীজীর বিভিন্ন ভাষণে নতুন সমাজগঠনের আহ্বান

ধর্মমহাসভার মুখ্য অধিবেশনে স্বামীজী মোট ছয়টি ভাষণ দিয়েছিলেন, যার সবগুলিই লিপিবদ্ধ-রূপে পাওয়া গিয়েছে। অবশ্য 'হিন্দুধর্ম' ছাড়া তাঁর প্রতিটি বক্তৃতাই ছিল তাৎক্ষণিক। ('হিন্দুধর্ম' বিষয়ে ভাষণটি তিনি পাঠ করেছিলেন।) জানা যায়, ধর্মমহাসভার বৈজ্ঞানিক শাখায় (যার উদ্বোধন পঞ্চমদিনে হয়েছিল) তিনি আরও চারটি ভাষণ দিয়েছিলেন, যেগুলির শিরোনাম পাওয়া যায়, কিন্তু ভাষণগুলির প্রতিলিপি পাওয়া যায় না। এছাড়া কখনো সভা-পরিচালনাকালে, পার্শ্বসভায় পঠিত প্রবন্ধসমূহের মন্তব্য ও সমালোচনা করার সময় এবং প্রশ্নোত্তর উপলক্ষে আরও কয়েকবার স্বামীজী ভাষণ দিয়েছেন। এর মধ্যে কয়েকটি সংবাদপত্রের প্রতিবেদন থেকে উদ্ধার করে মেরী লুইস বার্ক তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থে সন্নিবিষ্ট করেছেন, বাকিগুলির কোন বিবরণ পাওয়া যায় না।

### ধর্মমহাসভার প্রথমদিনে অভ্যর্থনার উত্তরে স্বামীজীর ভাষণ

১১ সেপ্টেম্বর ১৮৯৩-এর অপরাহ্ণে সংগঠকগণের অভ্যর্থনার উত্তরে স্বামী বিবেকানন্দ যে-ভাষণটি দেন, তা ছিল মাত্র তিন মিনিটের। সময়ের বিচারে ভাষণটি ছিল অতি ক্ষুদ্র কিন্তু শাশ্বত সনাতন সত্যের উচ্চারণে সমগ্র কাল তারই মধ্যে আবদ্ধ হয়েছে। মেরী লুইস বার্কের ভাষায়, "কাল যতদিন থাকবে মহাকালের কক্ষে কক্ষে তা ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হয়ে ফিরবে।" তিন মিনিটের এই অসাধারণ ভাষণটি তাঁকে বিশ্বখ্যাতি এনে দিয়েছিল। তাঁর মধ্যে প্রজ্বলন্ত আধ্যাত্মিকতার বিগ্রহমূর্তি দর্শনমাত্র দর্শকদের মনে প্রচণ্ড প্রভাব সঞ্চারিত হয়েছিল, জীবন্ত সত্যসমূহের অগ্নিময় উদ্গীরণ শ্রোতাদের মনেও সেসময় অগ্নিসঞ্চার করেছিল। তাদের মধ্যে অনেকেই অনুভব করে-ছিল, তিনি "প্রেরণাদৃপ্ত বক্তা—কোন গ্রন্থ থেকে বলছেন না, যদিও গ্রন্থসমূহ তাঁর ভালভাবেই আয়ত্তে ছিল। তিনি বলছিলেন তাঁর প্রত্যক্ষ অভি-জ্ঞতার কথা।" এ ধরনের মন্তব্য করেছেন রাশিয়ার প্রতিনিধি প্রিন্স উলকোনস্কি, পরবর্তী কালে দার্শনিক হিসাবে খ্যাত আর্নেস্ট হকিং এবং কবি হ্যারিয়েট মনরো ও সাংবাদিক লুসী মনরো। হ্যারিয়েট মনরো তাঁর আত্মজীবনীতে লিখেছেনঃ "মানুষের ভাষণ-প্রতিভার সেটাই ছিল সর্বোচ্চ শিখর।" লুসী মনরো ধর্মমহাসভা চলাকালে একটি সংবাদপত্রের প্রতিবেদনে লিখেছিলেনঃ "ইনি বিধিদত্ত দিব্য অধিকারে বাগ্মী।"[২৬]

যখন তাঁর সঙ্গীতের মতো কণ্ঠস্বরে ধ্বনিত হলো "আমরা কেবলমাত্র বিশ্বজনীন সহনশীল-তাতেই বিশ্বাস করি না, আমরা সব ধর্মকেই সত্য বলে গ্রহণ করি", তখন শ্রোতৃবৃন্দ গভীরভাবে অভিভূত হয়েছিল। এও কি সম্ভব? এরকম অসম্ভব অকল্পনীয় কথা ইতিপূর্বে তারা আর কখনও শোনেনি। সত্যিই তো, 'সহনশীলতা' কথাটির মধ্যে একটি 'করুণা'র ভাব আছে, যেন সত্য না হলেও একটি ধর্মকে কোনরকমে সয়ে নেওয়া হচ্ছে। 'গ্রহণশীলতা'র মধ্যে সে-ভাব নেই, সত্য বলেই তাকে গ্রহণ করা হচ্ছে। এর মধ্যে একটি সাম্যভাব ও অসীম মনোভাব আছে—সব ধর্মই সমান সত্য, ধর্মে কোন ছোট-বড় ভেদ নেই। তাঁর এই আশ্চর্য বাণীর সমর্থনে বিবেকানন্দ গীতা থেকে উদ্ধৃত করেছিলেন একটি শ্লোক, যাতে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলেছেনঃ "যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাং স্তথৈব ভজাম্যহম্। / মম বর্ত্মানুবর্তন্তে মনুষ্যাঃ পার্থ সর্বশঃ॥" অর্থাৎ যে যে-ভাব আশ্রয় করে

২৬ বিভিন্ন প্রত্যক্ষদর্শী ও সংবাদপত্রের উদ্ধৃতি মেরী লুইস বার্কের পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থ থেকে নেওয়া হয়েছে।

আসুক না কেন, আমি তাকে সেই ভাবেই অনুগ্রহ করে থাকি। হে পার্থ, মানুষেরা সর্বতোভাবে আমার পথেই চলে থাকে। আরও একটি সমভাবার্থক শ্লোক তিনি উদ্ধৃত করেছিলেন 'শিবমহিম্নস্তোত্র' থেকে, যাতে বলা হয়েছে—"রুচীনাং বৈচিত্র্যাদৃজুকুটিল নানাপথজুষাং। / নৃণামেকো গম্যস্ত্বমসি পয়সার্ণব ইব।" অর্থাৎ বিভিন্ন নদীর উৎস বিভিন্ন স্থানে, কিন্তু তারা সকলেই যেমন এক সমুদ্রে তাদের জলরাশি মিলিয়ে দেয়, তেমনি হে ভগবান, নিজ নিজ রুচির বৈচিত্র্যবশতঃ সরল ও কুটিল নানাপথে যারা চলেছে, তুমিই তাদের সকলের একমাত্র লক্ষ্য।

এইভাবে আকাশের মতো অসীম উদার, সর্বধর্মের সত্য নিয়ে সংগঠিত একটি বিশ্বজনীন ধর্মের কথা তিনি সেদিন শোনালেন বিশ্ববাসীকে। পরে এবিষয়ে হ্যারিয়েট মনরো তাঁর আত্মজীবনীতে লিখেছিলেনঃ "মনে হয়েছিল এক ঐতিহাসিক মহামুহূর্ত সমুপস্থিত, যখন আমরা সহনশীলতা ও শান্তির নবযুগের সূচনার অমোঘ ভবিষ্যদ্বাণী শুনছিলাম।"

স্বামীজীর ঐতিহাসিক ভাষণের পরবর্তী কথাগুলি এই অমোঘ ভবিষ্যদ্বাণীর অগ্নিময় উচ্চারণ, ভবিষ্যৎ সমাজের পথ-নির্দেশক। কথাগুলি হলোঃ "সাম্প্রদায়িকতা, গোঁড়ামি এবং এগুলির ভয়াবহ ফলস্বরূপ ধর্মোন্মত্ততা এই সুন্দর পৃথিবীকে বহুকাল ধরে অধিকার করে রেখেছে। এগুলি পৃথিবীকে হিংসায় পরিপূর্ণ করেছে, সভ্যতা ধ্বংস করেছে এবং সমগ্র জাতিকে হতাশায় মগ্ন করেছে। এই সকল ভীষণ পিশাচ যদি না থাকত, তাহলে মানবসমাজ অনেক উন্নত হতো। তবে এদের মৃত্যুকাল উপস্থিত এবং আমি সর্বতোভাবে আশা করি, এই ধর্মমহাসমিতির সম্মানার্থে আজ যে-ঘণ্টাধ্বনি নিনাদিত হয়েছে তা সর্ববিধ ধর্মোন্মত্ততা, তরবারি বা লেখনীমুখে অনুষ্ঠিত সর্বপ্রকার নির্যাতনের এবং একই লক্ষ্যের দিকে অগ্রসর ব্যক্তিগণের মধ্যে সর্ববিধ অসদ্ভাবের সম্পূর্ণ অবসানের বার্তা হয়ে উঠবে।" প্রকৃতপক্ষে তাঁর কথাগুলিই মানবসভ্যতার এই শত্রুসকল—সাম্প্রদায়িকতা, গোঁড়ামি, ধর্মোন্মত্ততা এবং হিংসার মৃত্যুঘণ্টাধ্বনি ধ্বনিত করেছিল। এর মধ্যে ছিল সুস্পষ্ট নতুন এক সমাজ-সংগঠনের আহ্বান, যে-সমাজে সভ্যতার এই শত্রুগুলি আর থাকবে না।

**দ্বিতীয় ভাষণঃ কেন আমাদের মতান্তর ঘটে**

১৫ সেপ্টেম্বর শুক্রবার অপরাহ্ণে ধর্মমহাসভার পঞ্চমদিবসের অধিবেশনে ভিন্ন ভিন্ন ধর্মাবলম্বিগণ স্ব-স্ব ধর্মের প্রাধান্য প্রতিপাদনের জন্য বাগ্‌-বিতণ্ডায় নিযুক্ত হন। তখন স্বামী বিবেকানন্দ যে-ভাষণটি দেন, তিনি তার সূচনা করেন একটি রূপক কাহিনী দিয়ে। কাহিনীটি হলোঃ একটি কুয়োর মধ্যে একটি ব্যাঙ বসবাস করত। একদিন সমুদ্র থেকে অপর একটি ব্যাঙ সেখানে এসে পড়ল। সমুদ্রের বিরাটত্ব কুয়োর ব্যাঙ কিছুতেই মানতে রাজি হলো না, তার মতে তার কুয়োর চেয়ে আরও বড় কোন কিছু হতে পারে না।

কাহিনীটি বলে স্বামীজী মন্তব্য করলেনঃ "হে ভ্রাতৃগণ, এইরূপ সংকীর্ণ ভাবই আমাদের মতভেদের কারণ। আমি একজন হিন্দু—আমি আমার নিজের কূপে বসে আছি এবং সেটিকেই সমগ্র জগৎ মনে করছি। খ্রীস্টধর্মাবলম্বী তাঁর নিজের কূপে বসে আছেন এবং তাকেই সমগ্র জগৎ মনে করছেন। হে আমেরিকাবাসিগণ, আপনারা যে আমাদের এই ক্ষুদ্র জগতের বেড়াগুলি ভাঙবার জন্য যত্নশীল হয়েছেন, সেজন্য আপনাদের ধন্যবাদ।"

এই সংক্ষিপ্ত ভাষণটি মতান্ধ মিশনারীদের ক্ষিপ্ত করে তুলেছিল। এর পর থেকে তাঁরা বাহ্য ভদ্রতার আবরণ অপসৃত করেই তাঁদের ভাষণে বিবেকানন্দকে আক্রমণ করতে থাকেন। রেভারেন্ড থমাস স্লেটার (Reverend Thomas Slater) নামে একজন খ্রীস্টধর্মপ্রচারক তাঁর 'নেটিভদের প্রতি—বিশেষ করে হিন্দুধর্মের প্রতি ঔদার্য' শীর্ষক ভাষণে হিন্দুদের পবিত্র গ্রন্থ 'বেদ'কে তীব্র সমালোচনা করে বলেনঃ "আমরা এর মধ্যে এমন একটি শ্লোকও দেখি না, যাকে প্রার্থনার ফলশ্রুতিস্বরূপ ভগবৎ-উত্তর বলে মনে করা যেতে পারে, যার মধ্যে শান্তি এবং ঈশ্বরের সঙ্গে যুক্ত হওয়ার আনন্দের অভিব্যক্তি আছে, যার মধ্যে তাঁর ক্ষমার প্রকাশ বা তাঁর প্রেমের অভিব্যক্তি দেখা যায়।" তিনি আরও দাবি করেন যে, বাইবেলই হলো একমাত্র প্রামাণ্য পুস্তক, যার মধ্যে

ঈশ্বরের অপার করুণার ঐশ্বর্য প্রকাশ পেয়েছে··· এবং এই কারণেই গ্রন্থখানি তুলনারহিত।

চতুর্থদিবসে রেভারেন্ড মিঃ কুক 'তুলনামূলক ধর্ম' বিষয়ে ভাষণ প্রসঙ্গে এমন সকল কথা বলেন যে, একটি সংবাদপত্র তার প্রতিবেদনে লেখে : "মিঃ কুকের সমগ্র ভাষণটি অনাবৃত ধর্মান্ধতার তাণ্ডব ছাড়া আর কিছুই নয়।" অপর একটি সংবাদপত্রে মন্তব্য করা হয় : "রেভারেন্ড কুক তাঁর তিনশত পাউন্ড গোঁড়ামির দ্বারা সমস্ত বক্তৃতামঞ্চটি প্রকম্পিত করে তোলেন।" মেরী লুইস বার্ক এপ্রসঙ্গে তাঁর মন্তব্যে বলেন : "রেভারেন্ড মিঃ কুকের পাপতত্ত্ব এবং পাপের প্রাপ্য অমোঘ দণ্ডবিষয়ক ধ্যান-ধারণাই তখনকার খ্রীস্টীয় ধর্মযাজকদের সাধারণভাবে ধর্ম সম্বন্ধীয় ধ্যান-ধারণা ছিল।"

### স্বামীজীর প্রতিক্রিয়া

১৯ সেপ্টেম্বর তারিখে তাঁর ঐতিহাসিক 'হিন্দুধর্ম' বিষয়ক প্রবন্ধটি পাঠের প্রাক্ মুহূর্তে এরকম একটি আক্রমণাত্মক ভাষণের প্রত্যুত্তরে স্বামীজী বলেন : "আমরা যারা প্রাচ্য ভূখণ্ড থেকে এসেছি—তাদের দিনের পর দিন বলা হয়েছে যে, খ্রীস্টধর্ম গ্রহণ করাই আমাদের উচিত। কারণ, খ্রীস্টধর্মাবলম্বী জাতিগুলিই উন্নত জাতি। আমরা আমাদের চারপাশে তাকালেই দেখি, ইংল্যান্ডই হলো সবচেয়ে উন্নত দেশ, যে ২৫০ কোটি এশিয়াবাসীর কাঁধের ওপর পা রেখে দাঁড়িয়ে আছে। খ্রীস্টান জাতি উন্নতিলাভ করেছে অপর মানুষের গলা কেটে। এরূপ মূল্যে কোন হিন্দু উন্নতি চায় না।"

এখানে আমরা সুস্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি, বিবেকানন্দ পশ্চিমী সাম্রাজ্যবাদের শোষণের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদী, এবং তিনি এই প্রতিবাদ করেছিলেন এককভাবে পশ্চিমের বুকের ওপর দাঁড়িয়ে অত্যন্ত বলিষ্ঠ ও নির্ভীক ভাষায়। স্পষ্টতই তিনি এমন একটি সমাজব্যবস্থা চেয়েছিলেন, যেখানে কোন জাতি অপর জাতিকে শোষণ করে উন্নতিলাভ করবে না, করবে পারস্পরিক সহযোগিতার দ্বারা।

### 'হিন্দুধর্ম' সম্বন্ধে স্বামীজীর ঐতিহাসিক ভাষণ

খ্রীস্টান পাদ্রীদের মতান্ধতা এবং স্থূল জড়বাদীদের সংশয়ের সবচেয়ে সুষ্ঠু প্রত্যুত্তর পাওয়া যায় বিবেকানন্দের 'হিন্দুধর্ম' বিষয়ক বক্তৃতার মধ্যে, যেখানে তিনি কেবলমাত্র নিজ ধর্মের শিক্ষার কথাই ব্যক্ত করেননি, সেগুলিকে শাশ্বত সত্যরূপে, জীবন্তরূপে সর্বসমক্ষে উপস্থাপন করেছিলেন। স্বামীজীর এই ভাষণ সম্পর্কে রোমাঁ রোলাঁ বলেছেন : "অন্য বক্তারা প্রত্যেকে নিজ নিজ ঈশ্বরের কথা বলেছেন, নিজ সম্প্রদায়ের ঈশ্বরের কথা বলেছেন। কেবল বিবেকানন্দ একা তাদের প্রত্যেকের ঈশ্বরের কথা বলেছেন এবং বিশ্বজনীন সেই সত্তার কথা বলেছেন, যিনি তাদের সকলকে আবৃত করে রয়েছেন।"[২৭]

নিঃসন্দেহে সেদিন ধর্মমহাসভার অধিবেশনে যে বিপুল জনসমাবেশ হয়েছিল, তাদের মধ্যে একাংশ আশা করছিল, তারা " 'উদ্ভট' সব বিশ্বাস ও প্রতিমা-পূজার কথা শুনবে।" কারণ, তারা খ্রীস্টধর্মপ্রচারকদের মিথ্যাপ্রচারের দ্বারা পুষ্ট ছিল। তারা বিশ্বাস করত ভারত, চীন, জাপান প্রভৃতি প্রাচ্যদেশগুলি মূর্তি-উপাসক, অসভ্য, বর্বরদের দেশ। তারা বিবেকানন্দের সঙ্গীতময় কণ্ঠে এই উদাত্ত ঘোষণা শুনল—"মর্ত্যবাসী দেবতাগণ। তোমরা পাপী? মানুষকে পাপী বলাই মহাপাপ, মানবের যথার্থ স্বরূপের ওপর মিথ্যা কলঙ্কারোপ। ওঠ, এস, সিংহস্বরূপ হয়ে তোমরা নিজেদের মেষস্বরূপ মনে করছ। এই ভ্রমজ্ঞান দূর করে দাও। তোমরা অমর আত্মা, মুক্ত আত্মা—চির-আনন্দময়।" এমন কথা তারা যে শুনবে তা তাদের স্বপ্নেরও অগোচর ছিল।

তারা আনন্দে হর্ষধ্বনি করে বিবেকানন্দের উচ্চারিত অমৃতময় বাণীকে স্বাগত জানাল। এতে কিন্তু খ্রীস্টধর্মপ্রচারকেরা ভয় পেয়ে গেলেন। তাঁরা অচিরেই উচ্চকণ্ঠে প্রচার করতে লাগলেন—"স্বামীজী পাপকে অস্বীকার করে প্রমাণ করলেন, ধর্মের তিনি কিছুই জানেন না?"

বস্তুতঃ, স্বামীজী সেদিন পরিপূর্ণ বিবেকের স্বাধীনতার কথাই ঘোষণা করেছিলেন। তার ফলে তাঁকে সম্মুখীন হতে হলো প্রচণ্ড অসহযোগিতার। মিশনারীরা ও গোঁড়ারা তাঁর জীবনকে দুর্বিসহ করে তোলার চেষ্টা করতে লাগল। কিন্তু সত্যের পক্ষে এই সাহসী যোদ্ধা খ্রীস্টীয় ও অন্যান্য সর্বপ্রকার

২৭ Life of Vivekananda—Romain Rolland, p. 38

মতান্ধতার বিরুদ্ধে একক সংগ্রাম চালিয়ে গেলেন। অবশ্য সেটাই তাঁর ইতিহাস-নির্দেশিত ভূমিকা ছিল।

**বিশ্বজনীন ধর্ম**

হিন্দুধর্ম বিষয়ে বিবেকানন্দের অসাধারণ ভাষণটি সম্পর্কে নিবেদিতা বলেছেনঃ তিনি যখন হিন্দুধর্ম সম্পর্কে বলতে আরম্ভ করেছিলেন, তখন হিন্দুধর্মের ধারণাসমূহ নিয়ে বলছিলেন, কিন্তু যখন শেষ করলেন তখন হিন্দুধর্মকে তিনি নতুন করে সৃষ্টি করলেন।[২৮] মেরী লুইস বার্ক মনে করেন, "শুধু হিন্দুধর্ম কেন, তিনি সৃষ্টি করলেন সারা বিশ্বের মানুষের জন্য একক একটি সাধারণ ধর্মের (তিনিই তার প্রথম প্রবক্তা), যার মধ্যে সমগ্র অতীতের ধর্মের পরিপূর্ণতা ঘটেছে, আর ভবিষ্যতের ধর্মের ওপরও আলোকসম্পাত ঘটেছে।"[২৯] সত্যই বিবেকানন্দ হিন্দুধর্মকে যেন নতুন করে সৃষ্টি করলেন এবং তা করতে গিয়ে শাশ্বত বিশ্বজনীন মানবধর্মও উদ্ঘাটন করলেন। শুধু তাই নয়, তাকে করে তুললেন "প্রেরণাপ্রদ, জীবন্ত এক ধর্ম, যা নিত্যকাল ধরে মানুষের আত্মার অন্তস্তল থেকে উৎসারিত হচ্ছে"। সামাজিক দিক থেকে এর গুরুত্ব অপরিসীম, কারণ নিঃসন্দেহে ভবিষ্যতের সমাজের ভিত্তি হবে এই শাশ্বত নিত্যসত্যের ধারক বিশ্বজনীন মানবধর্ম, অন্য কোন সাম্প্রদায়িক ধর্ম নয়।

এখনও পর্যন্ত আমরা যখন বিবেকানন্দের এই 'হিন্দুধর্ম'-বিষয়ক বক্তৃতাটি পাঠ করি তখন আমরা অবাক হয়ে যাই, কি আশ্চর্যভাবে বিচিত্র ধর্মের সমন্বয় তিনি ঘটিয়েছেন তাঁর এই বিশ্বজনীন ধর্মের মধ্যে। সত্যই অত্যন্ত আশ্চর্য তাঁর এই কথাগুলিঃ বিজ্ঞানের অতি আধুনিক আবিষ্ক্রিয়াসমূহ বেদান্তের যে মহোচ্চ আধ্যাত্মিক ভাবের প্রতিধ্বনি মাত্র, সেই সর্বোৎকৃষ্ট বেদান্তজ্ঞান থেকে নিম্নস্তরের মূর্তিপূজা ও আনুষঙ্গিক নানাবিধ পৌরাণিক গল্প পর্যন্ত, এমনকি বৌদ্ধদের অজ্ঞেয়বাদ, জৈনদের নিরীশ্বরবাদ—হিন্দুধর্মে এগুলির প্রত্যেকটিরই স্থান আছে।[৩০]

এসময় ইতিহাসের প্রয়োজনেই এই ধর্মসমন্বয় বা ধর্মীয় সুরসঙ্গতি সৃষ্টির একান্ত প্রয়োজন হয়ে পড়েছিল। আগেই বলা হয়েছে যে, বিজ্ঞানের উন্নতিতে উদ্ভূত যোগাযোগব্যবস্থার ফলে সমগ্র পৃথিবী যেন একটি দেহের মতো হয়ে পড়ছিল। সেজন্য প্রয়োজন হয়ে পড়েছিল তাতে প্রাণপ্রতিষ্ঠা করবার এবং বিভিন্ন মানুষের মধ্যে আত্মিক ঐক্যের অনুভূতি ব্যতীত এই প্রাণপ্রতিষ্ঠা সম্ভব ছিল না। বিভিন্ন ধর্মের ঐক্যের মধ্য দিয়ে সেই এক বিশ্বাত্মা যেন বিশ্বের একীভূত দেহে সঞ্জীবিত হয়ে উঠলেন। প্রতিটি মানুষের মধ্যে এক বিশ্বাত্মা বর্তমান—এই ঘোষণার সময় আসন্ন হয়েছিল; মানুষে মানুষে ধর্ম নিয়ে সংঘর্ষ ও বিরোধের কাল অতীত—এই ঘোষণা যাঁর কণ্ঠে প্রথম ধ্বনিত হলো সেই বিবেকানন্দ স-কারণেই যুগন্ধর ঐতিহাসিক পুরুষ।

অতি সরল ভাষায় বিবেকানন্দ একের পর এক উদ্ঘাটিত করেছেন হিন্দুধর্মের মধ্যে নিহিত বিশ্বজনীন সত্যগুলি। পৃথিবীর সব ধর্মেরই সত্য সেগুলি। তাঁর প্রতিটি বাক্য, প্রতিটি শব্দ অগ্নিক্ষরা, নব নব সত্যের উদ্ঘাটন। তাই সেগুলি পাঠ করলে পাঠক বিস্ময়াহত হয়ে উপলব্ধি করেন, এইতো সত্য—ধ্রুব সত্য, সত্য ছাড়া তা আর কিছু নয়।

স্বামীজীর 'হিন্দুধর্ম' ভাষণের কয়েকটি কথা এখানে প্রমাণস্বরূপ উদ্ধৃত করা যেতে পারেঃ

১. হিন্দু কেবল মতবাদ ও শাস্ত্রবিচার নিয়ে থাকতে চায় না; সাধারণ ইন্দ্রিয়ানুভূতির পারে যদি অতীন্দ্রিয় সত্তা কিছু থাকে, হিন্দু সাক্ষাৎভাবে তার সম্মুখীন হতে চায়। যদি তার মধ্যে আত্মা বলে কিছু থাকে—যা আদৌ জড় নয়, যদি করুণাময় বিশ্বব্যাপী পরমাত্মা বলে কিছু থাকেন, হিন্দু সোজা তাঁর কাছে যাবে, অবশ্যই তাঁকে দর্শন করবে। তবেই তাঁর সকল সন্দেহ দূর হবে। অতএব আত্মা ও ঈশ্বর সম্বন্ধে সর্বোৎকৃষ্ট প্রমাণ দিতে গিয়ে জ্ঞানী হিন্দু বলেন, 'আমি আত্মাকে দর্শন করেছি।' সিদ্ধি বা পূর্ণত্বের এই-ই একমাত্র নিদর্শন। কোন মতবাদ অথবা বদ্ধমূল ধারণায় বিশ্বাস করার চেষ্টাতেই হিন্দুধর্ম নিহিত নয়, অপরোক্ষানুভূতিই তাঁর মূলমন্ত্র; শুধু

২৮ বাণী ও রচনা, ১ম খণ্ড, ভূমিকা দ্রষ্টব্য।

৩০ দ্রঃ বাণী ও রচনা, ১ম খণ্ড, পৃঃ ১৩

২৯ New Discoveries, Pt. I, p. 104

বিশ্বাস করা নয়, আদর্শস্বরূপ হয়ে যাওয়াই—তাকে জীবনে পরিণত করাই—ধর্ম।

২. ক্রমাগত সংগ্রাম ও সাধনা দ্বারা সিদ্ধিলাভ করা—দিব্যভাবে ভাবান্বিত হয়ে ঈশ্বর-সান্নিধ্যে যাওয়া ও তাঁর দর্শনলাভ করে সেই স্বর্গস্থ পিতার মতো পূর্ণ হওয়াই হিন্দুর ধর্ম।

৩. পূর্ণ হলে মানুষের কি অবস্থা হয়? তিনি অনন্ত আনন্দময় জীবনযাপন করেন। আনন্দের একমাত্র উৎস ঈশ্বরকে লাভ করে তিনি পরমানন্দের অধিকারী হন এবং ঈশ্বরের সঙ্গে সেই আনন্দ উপভোগ করেন—সকল হিন্দু এবিষয়ে একমত। ভারতের সকল সম্প্রদায়ের এই-ই সাধারণ ধর্ম।

৪. যখন আত্মা এই পূর্ণ ও পরম অবস্থায় উপনীত হন তখন ব্রহ্মের সঙ্গে এক হয়ে যাবেন এবং একমাত্র ব্রহ্মকেই নিত্য ও পূর্ণরূপে উপলব্ধি করবেন। তিনিই আত্মার স্বরূপ—নিরপেক্ষ সত্তা, নিরপেক্ষ জ্ঞান, নিরপেক্ষ আনন্দ—সৎ-চিৎ-আনন্দ-স্বরূপ।

৫. যখন আমি প্রাণস্বরূপ হয়ে যাব, তখনই মৃত্যু থেকে নিষ্কৃতি পাব, যখন আনন্দস্বরূপ হয়ে যাব, তখনই দুঃখ থেকে নিষ্কৃতি পাব; যখন বিজ্ঞানস্বরূপ হয়ে যাব, তখনই ভ্রমের নিবৃত্তি।[৩১]

বিবেকানন্দের সিদ্ধান্ত সম্পূর্ণ বৈজ্ঞানিক। তিনি বলছেন: এটি যুক্তিসঙ্গত বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্ত। বিজ্ঞানের প্রমাণে জেনেছি—দেহগত ব্যক্তিত্ব ভ্রান্তিমাত্র। প্রকৃতপক্ষে আমার এই শরীর নিরবচ্ছিন্ন জড়সমুদ্রে অবিরাম পরিবর্তিত হচ্ছে। সুতরাং আমার চৈতন্যাংশ সম্বন্ধে এই অদ্বৈত (একত্ব) জ্ঞানই কেবল যুক্তিযুক্ত সিদ্ধান্ত।

### বিজ্ঞান ও ধর্ম

আশ্চর্য প্রতিভা স্বামী বিবেকানন্দের। যে-সময়ে মনে করা হতো বিজ্ঞান ও ধর্ম পরস্পর-বিরোধী, মনে করা হতো বিজ্ঞান প্রমাণিত সত্য আর ধর্ম অপ্রমাণিত, সেই সময় তিনি বললেন: "ধর্মের প্রমাণ বিজ্ঞান"।

আগাগোড়া তাঁর 'হিন্দুধর্ম'-বিষয়ক আলোচনায় বিজ্ঞান ও ধর্মের মধ্যে তুলনামূলক আলোচনা করা হয়েছে। এই আলোচনায় তিনি বলছেন: একত্বের আবিষ্কার ব্যতীত বিজ্ঞান আর কিছুই নয়; এবং যখনই কোন বিজ্ঞান সেই পূর্ণ একত্বে উপনীত হয়, তখন তার অগ্রগতি থেমে যাবেই, কারণ ঐ বিজ্ঞান তার লক্ষ্যে উপনীত হয়েছে। যেমন, রসায়নশাস্ত্র যদি এমন একটি মূল পদার্থ আবিষ্কার করে, যা থেকে অন্যান্য সকল পদার্থ প্রস্তুত করা যেতে পারে, তাহলে সে চরম উন্নতি লাভ করে। যদি পদার্থবিদ্যা এমন একটি শক্তি আবিষ্কার করতে পারে, যা অন্যান্য শক্তির রূপান্তর মাত্র, তাহলে ঐ বিজ্ঞানের কার্য শেষ হয়ে গেল। ধর্ম-বিজ্ঞানও তখনই পূর্ণতা লাভ করে যখন তা তাঁকে আবিষ্কার করে, যিনি এই মৃত্যুময় জগতে একমাত্র জীবনস্বরূপ, যিনি নিত্যপরিবর্তনশীল জগতের একমাত্র অচল, অটল ভিত্তি, যিনি একমাত্র পরমাত্মা—অন্যান্য আত্মা তাঁর ভ্রমাত্মক প্রকাশ। এইভাবে বহুবাদ, দ্বৈতবাদ প্রভৃতির ভিতর দিয়ে শেষে অদ্বৈতবাদে উপনীত হলে ধর্মবিজ্ঞান আর অগ্রসর হতে পারে না। এই-ই সর্বপ্রকার জ্ঞান বা বিজ্ঞানের চরম লক্ষ্য।[৩২] বিজ্ঞানের অগ্রগতিকে বিবেকানন্দ অভিনন্দন জানান। কারণ, তাঁর মতে: হিন্দু যুগ যুগ ধরে যে-ভাব হৃদয়ে পোষণ করে আসছে, সেই ভাব আধুনিক বিজ্ঞানের নতুনতর আলোকে আরও জোরালো ভাষায় প্রচারিত হবার উপক্রম দেখে তাঁর হৃদয়ে আনন্দের সঞ্চার হচ্ছে।

বিবেকানন্দের সিদ্ধান্ত: বিজ্ঞান ও ধর্মের লক্ষ্য এক, অনুসন্ধান-পদ্ধতিও এক। উভয়ের এই ঐক্যসাধন ঐতিহাসিক দিক থেকে অতীব গুরুত্বপূর্ণ। চিন্তার জগতে এত বড় বিপ্লব আর নেই। বিবেকানন্দ এও উদ্ঘাটিত করেছেন যে, ধর্ম একটি পরীক্ষা-নিরীক্ষার বিজ্ঞান। ধর্ম মতবাদ নয়, কথার কথা নয়, আচার-অনুষ্ঠান নয়; ধর্ম হলো 'হওয়া', মানুষের মধ্যে দেবত্বের বিকাশই ধর্ম। সুতরাং এই বিজ্ঞান বাস্তব ফলপ্রসূ। মানুষের পশুত্ব থেকে দেবত্বে উত্তরণই ধর্ম।

এই প্রসঙ্গে একথাও বলেছেন তিনি—ধর্ম যে বিকাশের কথা বলে, আজকের বিজ্ঞানও সেই 'বিকাশে'র কথাই বলছে, 'সৃষ্টি'র কথা নয়।

বিজ্ঞানই ধর্মের প্রমাণ বহন করছে—বিস্ময়াহত জড়বাদীদের সম্মুখে এই প্রবল ঘোষণা বিবেকানন্দই সর্বপ্রথম করেন। [ক্রমশঃ]

৩১ দ্রঃ বাণী ও রচনা, ১ম খণ্ড, পৃঃ ২১-২২

৩২ ঐ

নিবন্ধ

# নিরীশ্বরবাদ

## সচ্চিদানন্দ কর

"আমি নাস্তিক বা নিরীশ্বরবাদী, অর্থাৎ ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাস করি না"—একথা কেউ উচ্চারণ করলেই শ্রোতাদের মনে তিন রকম প্রতিক্রিয়া হয়। একদল ভাবেন, এটি বক্তার একটা দৃষ্টি আকর্ষণ করার ভঙ্গি বা 'পোজ', যাতে লোকে তাকিয়ে দেখে অথবা শোনে। আর একদল ভাবেন, বক্তা আসলে উঁচুদরের ভগবদ্বিশ্বাসী, বাইরে একটা ছদ্ম আবরণ, আসলে হৃদয়ের গভীরে ঈশ্বরকে বিশ্বাস করেন এবং তাঁর ওপর নির্ভর করেন। আর একদল কথাটাকে সাধারণ অর্থে নিয়ে ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রমাণ করতে বসেন—'আরে ঈশ্বর নেই তো জগৎ সৃষ্টি হলো কোথা থেকে, তুমিই বা এলে কোথা থেকে' ইত্যাদি।

এই তিন দলই বোধ হয় বক্তার উক্তির প্রকৃত তাৎপর্য ঠিকমত গ্রহণ করতে পারেন না। ঈশ্বর আছে কি নেই একথা আলোচনা করতে হলে প্রথমে ঈশ্বর বলতে কি বোঝা যায় সেটা জানা দরকার। সাধারণভাবে ঈশ্বরের দুটি ধারণা আছে, প্রথমটি—ব্যক্তিগত ঈশ্বর ; তাঁর অনেক রূপ, অনেক নাম। আমরা তাঁকে বা তাঁদের পূজা করি, ভোগ নিবেদন করি, তাঁর বা তাঁদের কাছে প্রার্থনা করি এবং কখনো কখনো তাঁর বা তাঁদের ওপর অভিমানও করি। সব দেশেই ঈশ্বরের এই ধারণাই সবচেয়ে বেশি প্রচলিত।

ঈশ্বরের দ্বিতীয় ধারণাটি হলো—তিনি এক এবং অদ্বিতীয়। তিনি ছাড়া দ্বিতীয় কেউ নেই এবং তাঁর কোন রূপ বা মূর্তি নেই। রূপ না থাকলেও তাঁর গুণ আছে। কোথাও ইনি কঠিন ন্যায়বান, ভাল কাজ করলে পুরস্কার দেন, কিন্তু অন্যায় করলে অমোঘ শাস্তি দেন। তিনি দয়াবান, তাঁর কাছে পৃথিবীর মানুষ সন্তানস্বরূপ—অন্যায় করে স্বীকার করলে এবং ক্ষমা প্রার্থনা করলে তিনি ক্ষমা করেন।

এছাড়া আছেন বেদান্তের ব্রহ্ম। তিনি নিরাকার, নির্গুণ, অনাদি ও অনন্ত। তিনি পুরুষও নন, স্ত্রীও নন। আবার সব ধর্মেই যে ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকৃত তাও নয়, যেমন জৈনরা স্পষ্টতঃ নিরীশ্বরবাদী। বৌদ্ধরাও ঈশ্বর আছেন কি নেই তা নিয়ে মাথা ঘামায় না, চীনদেশে কনফুসিয়ানরা এবং তাও-মতাবলম্বীরাও ( Taoism ) তাই।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে, ঈশ্বরের স্বরূপ বা তাঁর সম্বন্ধে ধারণা সকলের এক নয় এবং ধার্মিক হতে হলে ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাস করতেই হবে এমন কোন কথা নেই। অথচ ঈশ্বরের এই বিভিন্ন ধারণা বা স্বরূপ নিয়ে পৃথিবীতে কত বিবাদ-বিসম্বাদ, লড়াই, রক্তপাত হয়ে গেছে এবং এখনো হচ্ছে তার ইয়ত্তা নেই। ধর্ম নিয়ে যুদ্ধ এবং হত্যা অবশ্য খ্রীস্টানরাই বেশি করেছে—মধ্যযুগে মুসলমানদের বিরুদ্ধে ধর্মযুদ্ধ ( Crusade ), তার পরের যুগে ফ্রান্স এবং ইংল্যান্ডে ক্যাথলিক ও প্রোটেস্টান্টদের মধ্যে বহু বছর ধরে যুদ্ধ ও নরহত্যা চলে। মজার কথা, এসবই ধর্ম এবং ঈশ্বরের নামে হয়েছে এবং হচ্ছে। আমাদের দেশে ধর্ম নিয়ে লড়াই ও রক্তপাতের দৃষ্টান্ত খুব কম। বর্তমানকালের হিন্দু-মুসলমানের দাঙ্গা ঠিক এই পর্যায়ে পড়ে না ; এর মূলে রাজনৈতিক কারণই বেশি।

আমাদের দেশে 'যত মত তত পথ'-এর আদর্শই প্রধান আদর্শ। সাধারণতঃ এখানে লোকেরা মনে করে যে, একই ঈশ্বরকে লোকে নানা ভাবে, নানা রূপে ডাকে, পূজা করে এবং যেভাবেই তাঁকে ডাকা হোক, ভক্তি ও প্রাণের আকুলতা থাকলে ঈশ্বরলাভ হবে।

এখন কথা হলো, সত্যকারের ঈশ্বর বলে যদি কোনকিছুর অস্তিত্ব থাকে তাহলে তার সম্বন্ধে জ্ঞান বা ধারণা মোটামুটি সকলের একই রকমের হবে অথবা হওয়া উচিত। আমরা অনেক কিছুই হয়তো চোখে দেখতে পাই না, যেমন পরমাণু, রেডিও তরঙ্গ অথবা সুদূর নীহারিকা, কিন্তু তবু

বিশেষ প্রক্রিয়া অথবা যন্ত্রের সাহায্যে এদের অস্তিত্ব ও গুণ সম্বন্ধে আমাদের মোটামুটি একই রকমের ধারণা হয় এবং তা ব্যক্তিভেদে বদলায় না। একথা শুনে অনেকেই হয়তো বলবেন—আরে, তাই কি হয়। ঈশ্বর কি একটি বস্তু বা ব্যক্তি যে তাঁর স্বরূপ এত সহজেই নির্দিষ্টভাবে জানা যাবে। তিনি সকল ইন্দ্রিয় ও জ্ঞানের অতীত, তাঁকে হৃদয় দিয়ে জানতে হয়। অর্থাৎ পরোক্ষভাবে তাঁরা এই কথা বলতে চান যে, ঈশ্বর একটা ধারণা, একটা বিশ্বাস, একটা উপলব্ধি। মানুষ নিজের মনের শান্তির জন্য ঈশ্বরের একটা কল্পনা করতে পারে; কিন্তু অধিকাংশ মানুষের কাছে ঈশ্বর কোন কল্পনার বিষয় নয়, এক বাস্তব অস্তিত্ব। সুতরাং ঈশ্বরকে শুধু একটা ধারণা বা কল্পনার বিষয় বললে চলবে না। এখন এই বাস্তব অস্তিত্বের কোন ভিত্তি আছে কিনা সেটা বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে বিচারবুদ্ধি দ্বারা জানতে হবে।

এখানে আত্মা সম্বন্ধে কিছু বলা দরকার, কেননা আত্মা এবং ঈশ্বরের স্বরূপ বা গুণাগুণের মধ্যে অনেক মিল আছে এবং এক থেকে অন্যের ধারণায় উপনীত হওয়া যায়। সাধারণ প্রচলিত অর্থে আত্মা হচ্ছে দেহ ও মনের অতীত এমন একটি সত্তা যা অবিনশ্বর, যা ব্যক্তির জন্মের আগেও ছিল এবং মৃত্যুর পরেও থাকবে। এথেকেই আসে জন্মান্তরের ধারণা। এই জগতে এইরূপ কোটি কোটি আত্মা মানুষের দেহকে আশ্রয় করে আছেন, আবার কেউ কেউ দেহহীন নিরলম্ব অবস্থায় আছেন। এখানে একটা প্রশ্ন আসে—আত্মা কি শুধু মনুষ্যদেহই আশ্রয় করে, না মনুষ্যেতর প্রাণীরও আত্মা আছে? হিন্দুদের মতে, সব প্রাণীরই—পশু-পাখি, কীট-পতঙ্গ, জীবাণুর আত্মা আছে।

আত্মার অস্তিত্ব শুধু হিন্দুরাই যে বিশ্বাস করে তাই নয়; প্রাচীন গ্রীক, খ্রীস্টান, ইহুদী, মুসলমানরাও আত্মার অস্তিতে বিশ্বাসী, যদিও আত্মার স্বরূপ সম্বন্ধে সকলের ধারণা সমান নয়। তবে আত্মার প্রকৃষ্ট পরিচয়লাভের জন্য হিন্দুদের যে দীর্ঘ এবং বিরাট প্রচেষ্টা, তা আর কোন সম্প্রদায়ের মধ্যে দেখা যায় না। এখন দেখা যাক, এই আত্মা বস্তুটি কি? সাধারণতঃ একে দেহহীন বিশুদ্ধ spirit অথবা বায়বীয় পদার্থরূপে কল্পনা করা হয়। 'বায়বীয়' কথাটি এখানে প্রচলিত অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে, বৈজ্ঞানিক অর্থে নয়। কেননা বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে বায়ু অথবা ঐরূপ কোন পদার্থ (অর্থাৎ গ্যাস) সম্পূর্ণ অবয়বহীন নয়—সূক্ষ্ম হলেও তার আকার আছে এবং ওজনও আছে। আত্মার কিন্তু সেসবা কিছুই নেই, সম্পূর্ণ শূন্য। অথচ সম্পূর্ণ দেহ-হীন, আকারহীন এই আত্মার নিজস্ব একটি সত্তা আছে এবং মানুষের মৃত্যুর পর এই সত্তা বিলুপ্ত হয়ে যায় না, দেহহীন অবস্থায় কিছুকাল অথবা বহু যুগ থাকার পর আবার অন্য দেহ পরিগ্রহ করে ভূমিষ্ঠ হয় এবং আরেকটি জীবন গ্রহণ করে। এইভাবে একের পর এক জীবন গ্রহণ করার পর যদি আত্মা উত্তরোত্তর কর্ম দ্বারা নিজের উন্নতি অথবা অবনতি সাধন করে চলে এবং শেষপর্যন্ত সে এমন এক অবস্থায় এসে উপনীত হয় যখন সে পুনঃপুনঃ জীবনধারণ থেকে মুক্তি পায় এবং পরমব্রহ্মের সঙ্গে চিরকালের জন্য লীন হয়।

এখন কথা হচ্ছে, আত্মা সম্বন্ধে হিন্দুদের এই যে প্রচলিত ধারণা তার কোন বৈজ্ঞানিক অথবা সাধারণ জ্ঞানগ্রাহ্য ভিত্তি আছে কি? উত্তরে বলতেই হবে যে, আমাদের তথাকথিত বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়ায় বা সাধারণ জ্ঞানের ভিত্তিতে বা সর্বজনগ্রাহ্য প্রমাণের দ্বারা আত্মার অস্তিত্বকে বা আত্মার ধারণা প্রমাণ করা যায় না।

কিন্তু আত্মা সম্বন্ধে যা খাটে ঈশ্বর সম্বন্ধে তা নয়। ব্যক্তি ঈশ্বরের ধারণা বাদ দিলেও প্রচলিত অর্থে ঈশ্বর হচ্ছেন সেই শক্তি যিনি এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি করেছেন এবং যাঁর ইচ্ছায় ও নির্দেশে এই সমস্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ড—অন্তহীন নীহারিকাসমূহ থেকে আরম্ভ করে ক্ষুদ্রতম কীট পর্যন্ত সকলের কার্যকলাপ পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে। এরূপে শক্তি সম্বন্ধে ধারণা করা খুবই কঠিন।

প্রথমতঃ বিশ্বব্রহ্মাণ্ড সম্বন্ধে আজ পর্যন্ত যা জানা গেছে তা এত বিশাল যে, মানুষের ধারণায় আসা বেশ কঠিন। পৃথিবী কত বড় সে-সম্বন্ধে আমাদের ধারণা আছে, কিন্তু সূর্যের তুলনায় এই বিরাট পৃথিবীও খুবই ছোট। সূর্যকে যদি

১০ ফুট ব্যাসের একটি গোলক বলে মনে করা যায় তবে তার তুলনায় পৃথিবী হবে এক ইঞ্চিরও কম ব্যাসের (অর্থাৎ একটি লিচুর মতো) একটি গোলক। সৌরমণ্ডলের নিকটতম তারার (সেটিও যেন এক-একটি সূর্য এবং হয়তো তারও চারদিকে পৃথিবীর মতো বহু গ্রহ-উপগ্রহ আছে) দূরত্ব হবে ৪৭,০০০ মাইল। এই রকম পরস্পর-বিচ্ছিন্ন প্রায় দশ হাজার কোটি তারা নিয়ে 'ছায়াপথ' নীহারিকা, যার মধ্যে আমাদের সূর্য এবং পৃথিবী বিরাজ করছে।

অন্য আরেকভাবে ব্রহ্মাণ্ডের পরিমাপ করা হয়, সেটা হলো আলোর গতিবেগ দিয়ে। আলো এক সেকেন্ডে ১,৮৬,০০০ মাইল বেগে ছুটে চলে। ঐ বেগে চলে সূর্য থেকে পৃথিবীতে আসতে আলোর লাগে ৮ মিনিট। আবার সূর্য থেকে তার নিকটতম আরেকটা তারাতে যেতে লাগে চার বছর, আর যে তারকামালার সমষ্টি নিয়ে আমাদের এই ছায়াপথ নীহারিকা, তার এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্তে যেতে আলোর লাগে এক লক্ষ বছর।

আগেই বলেছি, আমাদের এই ছায়াপথ নীহারিকায় আছে প্রায় দশ হাজার কোটি তারা— তাদের কেউ সূর্য থেকে বড় আবার কেউ ছোট। এই ছায়াপথ নীহারিকার বাইরে আরও অসংখ্য নীহারিকা আছে, যাদের আনুমানিক সংখ্যা হলো দশ হাজার কোটি। একটি নীহারিকা থেকে তার নিকটতম নীহারিকায় যেতে আলোর লাগে প্রায় দশ লক্ষ বছর। এছাড়া দূরতম নীহারিকার পরও 'কোয়াসারস' নামে একপ্রকার তারা বা জ্যোতিষ্ক আছে, যারা আয়তনে বা ভারে নীহারিকা থেকে অনেক ছোট হলেও উজ্জ্বলতায় বহুগুণ বেশি। এর পরে আরও কত বিস্ময় আছে তা কে জানে।

এই যে বিরাট ব্রহ্মাণ্ড, যার আয়তন বা বিস্তার সম্বন্ধে অনুমান করাই কঠিন এবং যা সত্যই অনন্ত (কেননা এর অন্ত বা সীমানা এখনো পর্যন্ত জানা যায়নি), তা কোথা থেকে এলো? সত্যিই কি কেউ একে সম্পূর্ণ শূন্য অথবা 'কিছু না' থেকে সৃষ্টি করেছেন? সেটা কি কল্পনা করা সম্ভব? বৈজ্ঞানিকেরা কিন্তু ইতিহাস পর্যালোচনা করে এর আরম্ভ যতটা জানতে বা অনুমান করতে পেরেছেন তা হচ্ছে এই:

প্রায় দুহাজার কোটি বছর আগে সৃষ্টির আদিম অবস্থায় এই ব্রহ্মাণ্ডের সব তারা, নীহারিকা, কোয়া-সারস ইত্যাদি সব একসঙ্গে ঘনসন্নিবিষ্ট ছিল—এত ঘন ছিল যে, এক কিউবিক সেন্টিমিটারের (অর্থাৎ একটি চিনির কিউবের মতো) ওজন কয়েক হাজার কোটি টন। অর্থাৎ এই অবস্থায় পদার্থের আদিমতম কণাসমূহ (ইলেকট্রন, পজিট্রন, প্রোটন, নিউট্রন ইত্যাদি) একেবারে ঠাসাঠাসি অবস্থায় ছিল। (সাধারণতঃ আমাদের জানা সবচেয়ে কঠিন বস্তু লোহার পরমাণুর মধ্যেও এই কণাগুলো এত ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকে যে, তার দিকে একটি নিউট্রন কণাকে জোরে ধাবিত করলে অনায়াসে তারা ঐসব ফাঁক দিয়ে অন্যদিকে বেরিয়ে যেতে পারে।)

সৃষ্টির আদিম অবস্থায় এই ক্ষুদ্রতম কণা-গুলো প্লাজমা অবস্থায় এত ঠাসাঠাসি থাকার দরুন যে প্রচণ্ড তাপ ও চাপ সৃষ্টি হয় তার ফলে এক বিরাট বিস্ফোরণ হয়। একে বৈজ্ঞানিকরা আখ্যা দিয়েছেন—'**Big Bang**' বা বৃহৎ বিস্ফোরণ। এই বিস্ফোরণের ফলে ঘনীভূত তেজগোলক ভেঙে মেঘের আকারে চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে। তারপর সেই ছড়িয়ে পড়া প্লাজমাগুলো ধীরে ধীরে ঠাণ্ডা হয়ে আবার অ্যাটম বা পরমাণু তৈরি হয়। তা থেকে ধীরে ধীরে এক-একটি নীহারিকা এবং অন্যান্য নভোচারী বস্তুর সৃষ্টি হয়েছে। সেই বিরাট বিস্ফোরণের ফলে এইসব নীহারিকাগুলি এখনো পরস্পর থেকে আরও দূরে ধাবমান। এই সব নীহারিকার মধ্যে ক্রমে তারাসমূহের এবং তারাসমূহ থেকে গ্রহ-উপগ্রহের জন্ম হয়েছে। এই সবই হয়েছে দুহাজার কোটি বছর ধরে। আমাদের এই পৃথিবীও এইভাবে ছায়াপথ নীহারিকার অন্তর্গত সূর্য থেকে জন্ম নিয়েছে আনুমানিক তিন-চারশো কোটি বছর আগে। আরও কত সূর্যের চারিদিকে অসংখ্য গ্রহের মধ্যে আমাদের মতো কত পৃথিবী বিরাজ করছে এবং তার কতগুলির মধ্যে আমাদের মতো প্রাণিজগৎ ও মানুষ আছে তা কে জানে। সংখ্যা-শাস্ত্র এবং সম্ভাবনার নিয়ম অনুযায়ী এরকম বহু পৃথিবী থাকারই কথা।

এই ক্রমবিস্তারণশীল বিশ্বজগৎ কিন্তু চিরকালই বিস্তারলাভ করবে না। এমন এক সময় আসবে

যখন সেই আদি বিস্ফোরণের বেগশক্তি ক্রমশঃ কমীভূত হবে এবং কিছুকালের জন্য একটা স্থিতাবস্থা আসবে। তারপর এই বিরাট ব্রহ্মাণ্ডের মাধ্যাকর্ষণ শক্তির প্রভাবে বিক্ষিপ্ত নীহারিকাগুলি আবার ধীরে ধীরে পরস্পরের দিকে এগিয়ে আসবে। ক্রমেই এদের গতি বাড়বে এবং শেষে সবাই আবার একসঙ্গে মিলিত হয়ে আগের মতো ঘনীভূত অবস্থা প্রাপ্ত হবে। তারপর হয়তো আবার একটা বৃহৎ বিস্ফোরণ হয়ে বিশ্বসৃষ্টির আরেকটি অধ্যায় আরম্ভ হবে। এইভাবে একবার বিস্তার এবং তারপর সংকোচন। তাই এর নাম দেওয়া হয়েছে "pulsating universe" বা "স্পন্দনশীল জগৎ"। বৈজ্ঞানিকদের অনুমান, এই একটি অধ্যায়ের সময়ের পরিমাপ হলো প্রায় চারহাজার কোটি বছর।

এখানে একটা কথা উঠতে পারে যে, আগে যে-সব তথ্য বলা হলো সেসবই তো অনুমানের ওপর নির্ভর—কেউ তো আর লক্ষ লক্ষ বছর ধরে আলোর বেগে ছুটে চলে দূরের নীহারিকা বা তারা দেখে আসেনি। অথবা দুহাজার কোটি বছর আগে বৃহৎ বিস্ফোরণ দেখে তার নজির রেখে যায়নি। একথা খুবই সত্য। তবে ওপরে যা বলা হলো তার কিছুটা জানা সত্য ঘটনা বা তথ্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত এবং বাকিটা সেইসব জানা তথ্যকে ভিত্তি করে নানা বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্ত বা নিয়মানুসারে অংক কষে ঠিক করা হয়েছে। অবশ্য এসবই যে ধ্রুবসত্য তা নিশ্চয় করে বলা যায় না। অনেক বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্ত বা আনুমানিক নিয়ম যা এককালে স্বীকৃত হয়েছিল, তা পরবর্তী কালে নতুন তথ্য আবিষ্কারের ফলে পরিবর্তিত বা পরিত্যক্ত হয়েছে। যেমন, এককালে মনে করা হতো যে, বস্তু এবং তেজ আলাদা। তখন বলা হতো—বস্তুর ক্ষয় নেই, কেবল রূপান্তর আছে। তেমনি তেজেরও ক্ষয় নেই, কেবল রূপান্তর হয়। কিন্তু পরে আইনস্টাইন অংক কষে দেখালেন যে, বস্তু ক্ষয় হয়ে তেজে রূপান্তরিত হতে পারে, 'matter' 'energy'-তে রূপান্তরিত হতে পারে। পরে লর্ড রাদারফোর্ড ল্যাবরেটরীতে পরীক্ষা করে বাস্তবে দেখালেন যে, বস্তুর মধ্যে বহু পরিমাণ তেজ পুঞ্জীভূত হয়ে আছে এবং উপযুক্ত প্রক্রিয়া দ্বারা বস্তুকে তেজে রূপান্তরিত করা যায়। কাজেই এখন বলা হয়, বস্তু এবং তেজ একই মৌলিক পদার্থে গঠিত। পরমাণুকে ভেঙে ফেললে যেসব মৌলিক পদার্থ পাওয়া যায় তা বস্তু বা তেজ দুইয়েরই মৌলিক উপাদান।

আধুনিক পদার্থবিজ্ঞান, অংকশাস্ত্র এবং জ্যোতির্বিজ্ঞান যে কেবল কতকগুলি অনুমানের ওপর প্রতিষ্ঠিত নয়, তার প্রমাণ হলো বর্তমানকালের পরমাণু বোমা অথবা পরমাণু বিদ্যুৎ উৎপাদন-কেন্দ্রগুলি এবং চন্দ্রে মানুষের পদার্পণ অথবা অন্যান্য গ্রহ-উপগ্রহে রকেট পাঠিয়ে তাদের ছবি ও অন্যান্য তথ্যসংগ্রহ। চন্দ্রে পদার্পণ করে মানুষ নিজের চোখে যা দেখে এসেছে তা বিজ্ঞান আগে যা অনুমান করেছিল তার প্রায় সবই সমর্থিত হয়েছে। অন্যান্য গ্রহ সম্বন্ধেও মোটামুটি সেকথা খাটে। সুতরাং সুদূর নীহারিকা বা অন্যান্য জ্যোতিষ্ক সম্বন্ধে বিজ্ঞান যা বলেছে তা মোটামুটি সত্য হবে ধরে নেওয়া বোধ হয় অযৌক্তিক হবে না।

এই যে মহাবিশ্বের সদাপরিবর্তনশীল অবস্থা, এসবই হচ্ছে একটা স্বাভাবিক নিয়মের ফলে। সে-নিয়ম বিশ্ব যা দিয়ে গঠিত তার মধ্যেই নিহিত আছে। আমরা দেখেছি যে, আদিম বিশ্ব কতগুলি মৌলিক, পরমাণু অপেক্ষা ক্ষুদ্রতর উপাদান দিয়ে গঠিত ছিল। পরে যখন সব ধীরে ধীরে ছড়িয়ে পড়ে ঠাণ্ডা হতে আরম্ভ করল তখন এইসব মৌলিক উপাদানগুলি পরস্পরের সঙ্গে যুক্ত হয়ে কতগুলো অবিমিশ্র মৌলিক পদার্থ তৈরি করল, যাদের 'elements' বলা হয়; এরকম 'elements'-এর সংখ্যা প্রায় ৯০। এদের প্রত্যেকের প্রকৃতি ভিন্ন এবং এরা কতগুলো নিজস্ব নিয়ম মেনে চলে। সেইসব নিয়মে চালিত হয়ে এরা পরস্পরের সঙ্গে মিলিত হয়ে বিশ্বের নানা বস্তু তৈরি করে, যা আমরা এই পৃথিবীতে দেখতে পাই। এরাই নানা অবস্থার ঘাত-প্রতিঘাতে পরিবর্তিত হয়ে নতুন নতুন পদার্থ তৈরি করেছে এবং ক্রমশঃ বস্তু থেকে প্রাণের উৎপত্তি হয়েছে। সেই আদিম প্রাণ বা প্রাণী থেকে ক্রমবিবর্তনের ধারা বেয়ে পরে অন্যান্য প্রাণীরা এই পৃথিবীতে জন্ম নিয়েছে, যাদের কেউ কেউ আবার নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে অবস্থার

পরিবর্তনে। এইভাবে ক্রমশঃ নিম্নশ্রেণীর প্রাণী থেকে উচ্চতর শ্রেণীর প্রাণীর উদ্ভব হয়ে শেষে মানুষরূপ নিয়েছে। এটা কোটি কোটি বছর ধরে হয়েছে, যার প্রমাণ আমরা কিছু কিছু পাই এইসব জীবের প্রস্তরীভূত কঙ্কাল থেকে।

এর মধ্যে ঈশ্বরের অবদান বা কর্ম কোথায়? কেউ হয়তো বলবেন, সবই ঈশ্বরের সৃষ্টি। যদি তর্কের খাতিরে ধরে নেওয়া যায় যে, ঈশ্বর নামক কোন মহাশক্তিমান শুধু শূন্য থেকে সেই আদিম তেজগোলক সৃষ্টি করেছিলেন তাহলেও একবার সেই আদিম সৃষ্টির পর তাঁর আর করবার কিছু নেই। কেননা আমরা দেখছি যে, এই বিশ্ব এবং তার অন্তর্গত সব পদার্থ, তেজ এবং অণুপরমাণু তাদের নিজস্ব নিয়ম মেনে চলে। সেই নিয়ম অমোঘ, কখনো তা বদলায় না এবং কেউ তা বদলাতেও পারে না। কাজেই আদিতে বিশ্ব-সৃষ্টিকারী একজন ঈশ্বর বলে কেউ ছিলেন বা ছিলেন না, তা নিয়ে মাথা ঘামানোর কোনই প্রয়োজন এখন দেখা যায় না। কেননা বর্তমানে তাঁর আর কিছু করার নেই এবং তাঁকে স্তবস্তুতি, পূজা ইত্যাদি করা নিতান্তই নিরর্থক।

এই হলো স্থূল অর্থে ঈশ্বর সম্বন্ধে নিরীশ্বর-বাদীর বক্তব্য। এছাড়া ঈশ্বর সম্বন্ধে একটা সূক্ষ্ম দার্শনিক ব্যাখ্যা আছে, তা হচ্ছে বেদান্তের ব্রহ্মের ধারণা। সে-অর্থে ব্রহ্ম অথবা সাংখ্যের পুরুষ বা দ্রষ্টা একই সত্তার বিভিন্ন সংজ্ঞা। আবার এঁকেই আত্মা বলা হচ্ছে। কেউ কেউ বলেন, আত্মা হলো প্রত্যেক মানুষের মধ্যে যে উচ্চতম বা গভীরতম চেতনা আছে তা-ই। আত্মা বাইরের কোন বস্তু নয়—মানুষের অন্তর্নিহিত একটি অবস্থা। প্রত্যেক মানুষের মধ্যে চেতনার বিভিন্ন স্তর আছে। প্রাথমিক স্তর হচ্ছে বহিরিন্দ্রিয়, তারা বাইরে থেকে নানা অনুভূতি প্রবেশের দ্বার মাত্র। তারপর এই-সব অনুভূতিগুলি স্নায়ুমণ্ডলীর দ্বারা মস্তিষ্কের বিশেষ জায়গায় নীত হয়। তখন মস্তিষ্ক অনু-ভূতিগুলি সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ করতে পারে। যদি বহিরিন্দ্রিয় প্রথম স্তর হয় তবে স্নায়ুমণ্ডলী এবং মস্তিষ্কের ঐ অংশগুলিকে দ্বিতীয় স্তর ধরা যেতে পারে। এর পরের স্তর হলো বুদ্ধি, যার মাধ্যমে মস্তিষ্ক এই অনুভূতিগুলি বিশ্লেষণ করে একটা ধারণায় উপনীত হয়। যেমন ধরা যাক, আমাকে একটা মশা কামড়াচ্ছে। ত্বক এবং স্নায়ুর সাহায্যে এই জ্ঞান মস্তিষ্কে নীত হলো এবং আমি জানতে পারলাম যে, আমাকে মশা কামড়াচ্ছে। সেই সঙ্গে বুদ্ধি সিদ্ধান্ত করল যে, ওটাকে মারতে হবে। বুদ্ধির ওপরে হলো মন। মন রাজি হলে তখন আবার স্নায়ুমণ্ডলীর সাহায্যে হাতকে আদেশ দেওয়া হলো এবং হাত মশা মারতে উদ্যত হলো। কিন্তু মন রাজি নাও হতে পারে। ব্যক্তি যদি জৈনধর্মাবলম্বী হয়, তবে মন কিছুতেই মশা মারতে রাজি হবে না এবং মশা পেটভরে রক্ত খেয়ে উড়ে যাবে।

মনের ওপরও আর একটি চেতনার স্তর আছে—বিবেক। যেমন, কারুর পেটের অসুখ হয়েছে; তার সামনে কিছু ভাল মিষ্টান্ন রাখা আছে। তার খুব খেতে ইচ্ছে করছে এবং মনও চাইছে খেতে। কিন্তু বিবেক বলছে—খেলে অসুখ বাড়বে, কাজেই খাওয়া ঠিক হবে না। মন কিন্তু সবসময় বিবেকের কথা শোনে না এবং হয়তো প্রলোভনে পড়ে মিষ্টান্ন খেয়ে ফেলে। পরে অসুখ বাড়লে বিবেক তখন তাকে বলে যে, আগেই সে সতর্ক করে দিয়েছিল কিন্তু মন তা শোনেনি। হয়তো ভবিষ্যতে মন সহজে বিবেকের নির্দেশ অবহেলা করবে না।

বিবেকের পরেও চেতনার উচ্চতর বিভিন্ন স্তর আছে বা থাকতে পারে। যেমন—মানবতাবোধ, আধ্যাত্মিক আকাঙ্ক্ষা ইত্যাদি। চেতনার যে সর্বোত্তম স্তর তাকে জানতে হলে অর্থাৎ সক্রিয় করতে হলে গভীর চিন্তা এবং মননশক্তির প্রয়োজন; তাকে আত্মা, পুরুষ বা দ্রষ্টা বলা যেতে পারে। এটা সাংখ্যদর্শন অনুসারে। বেদান্তে কি একেই ব্রহ্ম বলা হয়েছে? অদ্বৈত বেদান্ত অনুসারে ব্রহ্ম এবং আমি বা জীবাত্মা পৃথক নয়। শুধু তাই নয়, ব্রহ্ম সর্বত্র বিদ্যমান—প্রাণী, বস্তু ইত্যাদি সবের মধ্যেই ব্রহ্ম আছেন। অর্থাৎ বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের সবকিছুর মধ্যে ব্রহ্ম, সবই ব্রহ্ম। এটা আমার কাছে খুব বিজ্ঞানসম্মত মনে হয়। এই মতানুসারে সমস্ত বিশ্ব অর্থাৎ অনন্ত আকাশ এবং সেই আদি তেজগোলক থেকে আরম্ভ করে

বর্তমানের কোটি কোটি নীহারিকা এবং অন্য সব জ্যোতিষ্ক-সম্বলিত যে-বিশ্ব, সে-সবই ব্রহ্মের অংশ এবং স্বরূপ। এই ব্রহ্মের আদি নেই, অন্তও নেই—আজ পর্যন্ত এর অন্ত পাওয়া যায়নি এবং কোনদিন যে পাওয়া যাবে তার সম্ভাবনাও কম। সর্বোপরি ব্রহ্ম নির্গুণ ও নির্লিপ্ত। বিশ্বের ক্রিয়াকলাপ অর্থাৎ তার সদাপরিবর্তনে ব্রহ্ম নিরপেক্ষ দ্রষ্টা মাত্র।

অন্যদিক দিয়ে দেখতে গেলে, এই যে বিরাট বিশ্ব এবং অনন্ত আকাশ—এসবেরই অস্তিত্ব আমরা জানতে পারি আমাদের চোখ, কান এবং মনন-শক্তি দ্বারা। মানুষ চোখ দিয়ে দেখে; বুদ্ধি, মন ও ধারণাশক্তি দ্বারা এর স্বরূপ বুঝতে পারে বলেই এর অস্তিত্ব আছে। ক্ষুদ্র কীট বা নিম্নশ্রেণীর জীবের কাছে এর অস্তিত্ব নেই। অথবা কোন মানুষ যদি তার মস্তিষ্কের ক্রিয়া হারায় তবে তার কাছেও এর অস্তিত্ব থাকে না। সেই হিসাবে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকে মনোময় জগৎ বলা যেতে পারে। কাজেই মানুষের মনের স্বরূপ এবং তার গভীরতম বা চেতনার সন্ধান করা আর ব্রহ্মের সন্ধান করা একই কথা। সেই অর্থে সাংখ্যের পুরুষ বা দ্রষ্টা এবং অদ্বৈত বেদান্তের ব্রহ্মের অধিষ্ঠান আমাদের নিজেদের চেতনার মধ্যেই আছে। তাঁর ধ্যান ও ধারণা করা বা তাঁর সন্ধানে মন-প্রাণ একাগ্র করা মানুষের উন্নতির এক প্রধান উপায়। এর দ্বারা আমাদের মস্তিষ্কে যে প্রচণ্ড শক্তি আছে, যার খুব অল্প অংশই আমরা সাধারণতঃ ব্যবহার করে থাকি, তার সর্বাধিক বিকাশ করা সম্ভব।

সুতরাং আমরা যদি নিজেদের মধ্যেই সেই উচ্চতম চেতনার সন্ধান করার চেষ্টা করি, যার জন্য আমাদের দেশেই ঋষি-প্রদর্শিত পন্থা আছে, বোধহয় তাহলে অনেক বিড়ম্বনা ও বিপত্তির হাত থেকে আমরা রেহাই পেতে পারি এবং আমাদের ব্যক্তিজীবন, পরিবারজীবন, সমাজজীবন, জাতীয় জীবন এবং আন্তর্জাতিক জীবনকে সমৃদ্ধতর করতে পারি। □

## প্রচ্ছদ-পরিচিতি

প্রচ্ছদের আলোকচিত্রটি কামারপুকুরের শ্রীরামকৃষ্ণের বাসগৃহের। পাঁচের দশকের প্রথমদিকে আলোকচিত্রটি গৃহীত হয়েছিল।

বর্তমান বর্ষটি (১৯৯৩) শ্রীরামকৃষ্ণ-ভাবান্দোলনের ক্ষেত্রে একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বর্ষ। কারণ, এই বর্ষে শিকাগো ধর্মমহাসম্মেলনে স্বামী বিবেকানন্দের আবির্ভাবের শতবর্ষ পূর্ণ হয়েছে। শিকাগো ধর্ম-মহাসভায় স্বামী বিবেকানন্দ যে-বাণী প্রচার করেছিলেন এবং যে-বাণী ধর্মমহাসভার সর্বশ্রেষ্ঠ বাণী বলে অভিনন্দিত হয়েছিল, সে-বাণী ছিল সমন্বয়ের বাণী। ধর্মের সমন্বয়, মতের সমন্বয়, সম্প্রদায়ের সমন্বয়, দর্শনের সমন্বয়, আদর্শের সমন্বয়—প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের সমন্বয়, প্রাচীন ও নবীনের সমন্বয়, অতীত বর্তমান ও ভবিষ্যতের সমন্বয়। ভারতবর্ষ সুপ্রাচীন কাল থেকে এই সমন্বয়ের বাণী ও আদর্শ প্রচার করে আসছে। আধুনিক কালে এই সমন্বয়ের সর্বপ্রধান ও সর্বশ্রেষ্ঠ প্রবক্তা শ্রীরামকৃষ্ণ। সাধারণভাবে সনাতন ভারতবর্ষের এবং বিশেষভাবে শ্রীরামকৃষ্ণের সমন্বয়ের বাণীকে স্বামী বিবেকানন্দ বহির্বিশ্বের সমক্ষে উপস্থাপিত করেছিলেন। চিন্তাশীল সকল মানুষই আজ উপলব্ধি করছেন যে, সমন্বয়ের আদর্শ ভিন্ন পৃথিবীর স্থায়িত্বের আর কোন পথ নেই। সমন্বয়ের পথই বর্তমান পৃথিবীর বহুবিধ সমস্যা ও সংকটের মধ্য থেকে উত্তরণের একমাত্র পথ। কামারপুকুরের পর্ণকুটীরে যাঁর আবির্ভাব হয়েছিল দরিদ্র এবং নিরক্ষরের ছদ্মবেশে, তিনিই বর্তমান এবং আগামীকালের বিশ্বের ত্রাণকর্তা। তাঁর বাসগৃহটি তাই আজ ও আগামীকালের সমগ্র পৃথিবীর তীর্থক্ষেত্র। শিকাগোর বিশ্বধর্মসভার মঞ্চে স্বামী বিবেকানন্দের কণ্ঠে শান্তি, সমন্বয় ও সম্প্রীতির যে-বাণী বারংবার উচ্চারিত হয়েছিল—যার মধ্যে নিহিত ভারত ও পৃথিবীর রক্ষাকবচ, তার গর্ভগৃহ কামারপুকুরের এই পর্ণকুটীর।—সম্পাদক, উদ্বোধন

স্মৃতিকথা

# মহারাজের স্মৃতিচয়ন

## স্বামী অপর্ণানন্দ

স্বামী ব্রহ্মানন্দকে প্রথমবার দর্শন করবার সপ্তাহখানেক পরে একদিন বিকেল চারটা নাগাদ আমি বেলুড় মঠে যাই। তাঁকে দর্শন করবার পর থেকেই তাঁকে আবার দেখবার জন্য আকুলতা বোধ করছিলাম।

মঠে পেঁছেই আমি মন্দিরে যাই। মন্দির থেকে বেরিয়ে আসছি, স্বামী প্রেমানন্দের সঙ্গে দেখা। তিনি আমায় বললেন: "তুমি কি মহারাজকে দেখেছ? যাও—তাঁকে দর্শন কর। তিনি শ্রীরামকৃষ্ণের মানসপুত্র এবং তাঁর জীবন্ত বিগ্রহ। মহারাজের কৃপা ও আশীর্বাদ পেলে জানবে যে, তা শ্রীশ্রীঠাকুরের কাছ থেকেই আসছে।" যুক্তকরে নতমস্তকে প্রেমানন্দজী বারবার বলতে লাগলেন: "জয় মহারাজ, জয় মহারাজ।"

প্রেমানন্দজীর অনুমতিক্রমে অন্যান্য ভক্তরা ও আমি মঠের দোতলায় উঠে গেলাম। দেখলাম, মহারাজকে দর্শন করার জন্য আরও অনেকে সেখানে এসেছেন। মহারাজ দোতলায় তাঁর ঘরে বসেছিলেন। জনৈক খ্যাতনামা সঙ্গীতশিল্পী এবং স্বামীজীর শিষ্য পুলিন মিত্রও সেদিন উপস্থিত ছিলেন। মহারাজ বললেন: "পুলিন, অনেকদিন তোমার গান শুনিনি। একটু গাও।" পুলিনবাবু গাইলেন—

"নিবিড় আঁধারে মা তোর চমকে ও রূপরাশি।
তাই যোগী ধ্যান ধরে হয়ে গিরিগুহাবাসী॥..."

এরপর তিনি গাইলেন—

"নাহি সূর্য, নাহি জ্যোতিঃ, নাহি শশাঙ্কসুন্দর...।"

তারপর—

"ঐ দেখা যায় আনন্দধাম, অপূর্ব শোভন,
ভবজলধির পারে জ্যোতির্ময়... ।"

এই গানগুলি শুনতে শুনতে মহারাজ ভগবৎ চিন্তায় তন্ময় হয়ে গেলেন। তখন সূর্যাস্ত হচ্ছে। ক্রমে মহারাজ স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে এলেন। উপস্থিত সবার মনে মহারাজের ধ্যানমগ্ন অপরূপ রূপটি ও সেই দিব্য পরিবেশের রেশ চির-অম্লান একটি ছাপ রেখে দিল।

*

এর পরের বার মঠে এসে ওপরের বারান্দায় দেখতে পেলাম মহারাজ আরামকেদারায় গঙ্গামুখী হয়ে বসে রয়েছেন। তাঁর মন অন্তর্মুখী ছিল, তবুও মাঝে মাঝে তিনি জোর করেই আমাদের সাথে কথা বলছিলেন।

**সেদিনের তাঁর কথার কিছু স্মৃতি**

মহারাজ: তাঁর করুণা ও আশীর্বাদের অভাব নেই। কিন্তু তাঁর সেই কৃপাপবনটি পাওয়ার জন্য পাল খাটায় এমন আছে কজন? কজন তাঁর আশীর্বাদপ্রার্থী হয়ে মাথা নত করে? লোকের মন তুচ্ছ বিষয়ে ব্যস্ত থাকে। খাঁটি সম্পদটি কে চায়? এরা বড় বড় কথা বলে, কিন্তু কিছু পাবার জন্য কোন চেষ্টা করে না। এরা চেষ্টা ছাড়াই সবকিছু পেতে চায়। পার্থিব যাবতীয় কাজ লোকে করে উঠতে পারে কিন্তু ঈশ্বরের চিন্তা করার বেলায় বলে, এসব করার সময় কোথায়?

শ্রীরামকৃষ্ণ বলতেন, "গুরু হাজারে হাজারে মিলবে, কিন্তু শিষ্য দুর্লভ।" উপদেশ দেবার জন্য বহু লোক রয়েছে, কিন্তু তা শোনে কজন? যদি কারো গুরুবাক্যে বিশ্বাস থাকে এবং তা পালন করে, তার সকল সন্দেহ ও বিপদ দূর হয়ে যায়। গুরুবাক্যে শ্রদ্ধা থাকলে ভগবান তার সব দৈন্য দূর করে দেবেন। তার হাত ধরে তিনি ঠিক পথে চালিত করবেন। তাঁর কৃপাকণা যে পেয়েছে তার কিসের চিন্তা? প্রভুর অসীম জ্ঞানভাণ্ডার থেকে চিরকাল ধরে যোগান আসতে থাকবে। ভগবানের জন্য আকুলতা জেগেছে যার মনে তাকে উঠে দাঁড়াতে দাও, চেষ্টা করতে দাও। শয়নে-স্বপনে, আহারে-বিহারে তাঁর শ্রীচরণে তাকে সকাতরে প্রার্থনা জানাতে দাও, 'হে প্রভু, আমায় কৃপা কর। তোমার করুণা বুঝবার সামর্থ্য দাও।'

তিনি করুণাস্বরূপ। তাঁর করুণা তিনি প্রকাশ করেন তারই কাছে, যে আন্তরিকভাবে তা খোঁজে।

তাঁর কাছে প্রার্থনা করলে তিনি আমাদের দেন নির্বাসনা, তাঁর প্রতি ব্যাকুলতা এবং উচিত বুদ্ধি। হাজারে হয়তো একজন বহু ভাগ্যবলে ঈশ্বরকে কামনা করে।

ঠাকুর ধনীগৃহের দাসীর কথা বলতেন। সে তার প্রভুর গৃহ ও সম্পত্তির কথা এমনভাবে বলত যেন সেসবই তার এবং প্রভুর ছেলে-মেয়েদের লালন-পালন সে এমনভাবে করত যেন তারা তার কত আপনার, কিন্তু মনে মনে সে ঠিক জানত যে, এর কিছুই তার নয়। আমাদেরও এই পৃথিবীতে থাকতে হবে ও নিজের কর্তব্যটি করতে হবে; কিন্তু মনে-প্রাণে আমাদের এটি বুঝতে হবে, অনুভব করতে হবে যে, এসব কিছুই আমাদের নয়। আমাদের সত্যিকার একমাত্র আশ্রয় হলো প্রভুর পাদপদ্ম এবং সেখানেই আমাদের একমাত্র গতি। সর্বপ্রকার অহমিকা ও আত্মসচেতনতা পরিত্যাগ করে তাঁর চরণে শরণ নিতে হবে। কিন্তু ক'জন তাঁর চরণে এবং সত্যে শরণ নিতে চায়? সবাই ভাবে যে, সে সকল ভুলের ঊর্ধ্বে। আত্মদম্ভে প্রতারিত মানুষ নিজেকে খুব দামী বলে মনে করে। এমনকি ঈশ্বরের অস্তিত্বেও সে বিশ্বাস করতে চায় না। সে কখনো গভীরভাবে ভেবে দেখে না, তার বুদ্ধি দ্বারা সে কতটুকু মাত্র বুঝতে পারে। একমাত্র মহামায়াই জানেন যে, তিনি কতভাবে মানুষকে ভুলিয়ে রেখেছেন।

আমরা শুধুমাত্র এটুকু জানি যে, ভগবানকে কখনো সীমাবদ্ধ করা যায় না। তাঁর ইচ্ছা ও স্বরূপ-প্রকাশ অসীম। তিনি আমাদের মন ও বুদ্ধির অগম্য। আবার তবুও যদি কেউ আন্তরিক-ভাবে তাঁর কাছে প্রার্থনা করে, তিনি সেই নির্মল চিত্তের কাছে সহজলভ্য হন।

তাঁর কৃপা ভিন্ন কিছুই পাওয়া সম্ভব নয়। তাঁর শরণ নাও, তিনিই সেই অসীম জ্ঞানরাশির দুয়ার খুলে দেবেন। তাঁর শরণাগত হয়ে পার্থিব সকল কর্তব্য করে যাও।

প্রথমে তাঁকে জান। ঈশ্বরানুভূতির পর পৃথিবীতে থাকলেও তুমি ভুলপথে কখনই যাবে না। পৃথিবীর মায়া তোমাকে বাঁধতে পারবে না। তখন জ্ঞানযোগ, ভক্তিযোগ, কর্মযোগ—যে-পথেই যাও না কেন তুমি এবং অন্যরাও অশেষ উপকার পাবে এবং তোমার নরজীবন ধন্য হবে।

মহারাজ তারপর আবার অন্তর্মুখ হয়ে গেলেন।

-

আরেক দিনের কথা। আমরা বিকালে বেলুড় মঠে গিয়েছি। প্রথমেই আমরা পুরনো মন্দিরে গেলাম। নেমে এসে একটি আমগাছের নিচে প্রেমানন্দজীকে জনকয়েক ভক্তের সঙ্গে আলাপরত দেখতে পেলাম।

স্বামী প্রেমানন্দ: ঠাকুর বলতেন, "একবার একজন একটি ময়ূরকে আফিমের গুলি খাওয়ায়। তারপর থেকে ময়ূরটি প্রত্যেকদিন আফিমের জন্য ফিরে আসত।" ঠাকুরও সেরকম এসব ছেলেদের (ঈশ্বরপ্রেমের) আফিম খাইয়েছেন। তাই ওরা বাড়িতে থাকতে পারে না। ওরা সুযোগ পেলেই এখানে চলে আসে। যাদের তিনি (তাঁর প্রতি) আকর্ষণ করেছেন তারাই ধন্য। যাকে ঈশ্বর বেছে নেন, সেই তাঁকে পায়। কেবল তাঁরই কৃপাবলে মায়ায় গড়া ভ্রান্তি ও বন্ধন খুলে যায়।

প্রেমানন্দজীকে প্রণাম করে গেলাম মহারাজের দর্শনে। এবারও আমরা মহারাজকে দোতলার বারান্দায় আরামকেদারায় উপবিষ্ট দেখতে পেলাম। তাঁর সামনে মেঝেয় কয়েকজন ভক্ত বসেছিলেন।

জনৈক ভক্ত: মহারাজ, আমি মন একাগ্র করতে পারি না। অনেক চিত্তচাঞ্চল্যকারী চিন্তার উদয় হয়। আমি কি করব? আমি কি কোনও আধ্যাত্মিক জীবনের কঠোরতার সাধনা করতে পারব? আমি কিভাবে পূজা ও ধ্যান করতে পারি?

মহারাজ: তাঁর কাছে প্রার্থনা কর। নিয়মিত-ভাবে জপ-ধ্যান কর। ক্রমে মনে পূজা ও ধ্যান করবার আগ্রহ জন্মাবে। গোড়ার দিকে মন স্ববশে আসতে চাইবে না, কিন্তু তাকে জোর করে, আকুতি-মিনতি করে ধ্যানমগ্ন কর। বিশ্বাস এবং নিয়মিত সাধনা অত্যন্ত প্রয়োজনীয়; এদুটি ছাড়া কেউই কোন কাজ করতে সক্ষম হয় না।

আধ্যাত্মিক কঠোরতাদির সাধনা এমনভাবে করা উচিত যে, পরিস্থিতি যেরকমই হোক না কেন তুমি নিয়মিত অভ্যাসটি ঠিকভাবে পালন করে যাবে। ঐশ্বরিক চিন্তায় মধুর সন্ধান একবার যদি মন

পায়, তবে আর কোন ভয় নেই। সেই রসের রসিক হবার জন্য সৎসঙ্গ করবে। ঈশ্বরের নামামৃত যে আস্বাদন করেছে, তার পক্ষে সেই নাম-জপ ত্যাগ করা কি সম্ভব? তাঁর নামের এমনি শক্তি যে, আন্তরিকভাবেই হোক অথবা যান্ত্রিকভাবেই হোক জপের প্রভাব অনুভূত হবেই। ঠাকুর বলতেন, "ধর একটি মানুষ গঙ্গার ধারে বেড়াচ্ছে। সে স্বেচ্ছায় নদীতে স্নান করতে পারে অথবা দুর্ঘটনা-বশতঃ ওতে পড়ে যেতে পারে, আবার অন্য কেউ তাকে নদীতে ঠেলে দিতেও পারে। তার গঙ্গাস্নান তো হবেই।"

তাঁর নামের মহিমা অপার বইকি! মৃত্যুপথ-যাত্রী অজামিল তৃষ্ণার্ত হয়ে পুত্র 'নারায়ণ'কে জল এনে দিতে বললেন। এভাবেই তিনি মৃত্যুর মুহূর্তে মোক্ষলাভ করলেন। (শুধুমাত্র তাঁর নামটুকু অন্তিমে স্মরণ করলেই মুক্তি—হিন্দুদের এই বিশ্বাস।)

মানুষের মন সদাই চঞ্চল। নানা কারণেই তা বিক্ষিপ্ত থাকে। সৎসঙ্গ একে বশে আনে। সজ্জনের সহবাস কর ও তাঁদের কথামত চল। এটি করতে পারলে বহু দুঃখকষ্ট থেকে মুক্তি পাবে। যদি তোমার মন ঈশ্বরে নিবিষ্ট না হয়, তোমার পক্ষে নিজেকে বহু জাগতিক প্রলোভন থেকে রক্ষা করা অসম্ভব হয়ে পড়বে। তাঁর করুণায় তোমার মন সত্যের প্রতি ধাবিত হোক। তাঁর বলে বলীয়ান না হয়ে নিজেকে মায়াজাল থেকে কেউ রক্ষা করতে পারে না। তাঁর শক্তিতে শক্তিমান হও।

জীবন নদীর ন্যায় বহমান। যে-দিন চলে যায় তা আর ফিরে আসে না। যে সময়কে সার্থক-ভাবে ব্যয় করে, সে ধন্য। বিগত বহু জন্মের বহু পুণ্যকর্মের দ্বারা তুমি মানুষ হয়ে জন্মেছ। প্রভুর পূজা ও ধ্যানদ্বারা এই নরজীবন সার্থক করে তোল। শঙ্করাচার্যের উক্তি—'মনুষ্যজন্ম, মোক্ষ-লাভের আকুলতা ও সৎসঙ্গ—কেবলমাত্র ভগবৎকৃপায় আমরা এই তিনটি দুর্লভতম সুযোগলাভ করতে পারি।' ঠাকুরের কৃপায় তোমার এই তিনটিই রয়েছে। তাঁকে পাবার জন্য চেষ্টা কর, মনুষ্যজন্ম ধন্য কর। জীবন অচিরস্থায়ী। এর শেষ কখন তা কেউ জানে না। যা তোমাকে অমরত্ব দান করবে সেই সম্পদ লাভ করতে চেষ্টান্বিত হও। অল্পবয়সে ভগবানকে পাওয়ার জন্য বেশি চেষ্টা করা সম্ভব। তাঁকে পেতে হলে কঠিন সাধনার প্রয়োজন। খুঁটি দৃঢ় করে ধরে রাখলে, তার চারিপাশে বেগে ঘুরলেও পড়ে যাবার কোনই ভয় থাকে না।

ঠাকুর বলতেন, "মন্দিরে যখন দেবদর্শনে যাও, ভিখারীদের ভিক্ষা বিতরণ করতেই যদি সময় ফুরিয়ে যায় তাহলে কখনই তুমি প্রতিমা-দর্শন করতে পারবে না। ভিড় ঠেলে মন্দিরে প্রবেশ করতে হবে, বিগ্রহকে পূজা করে নিয়ে তারপর তুমি যা খুশি করতে পার।"

এরপর যেদিন মঠে গেলাম, স্বামী প্রেমানন্দ বললেন: "মহারাজ 'বলরাম মন্দিরে' আছেন। যতদিন মঠে ছিলেন মঠ যেন আলো হয়েছিল। এখন তিনি চলে যাওয়ায় মঠ অন্ধকার বোধ হচ্ছে। বলরাম মন্দিরে গিয়ে তাঁকে দর্শন করবে। মহারাজ বৃন্দাবনের রাখালবালক, শ্রীরামকৃষ্ণের অন্তরঙ্গ। ঠাকুরের দিব্যলীলায় তাঁর ভূমিকাটিতে অভিনয় করতে পৃথিবীতে এসেছেন। বহু জীবনের অশেষ সুকৃতিবলেই মহারাজের মতো একজন মহাত্মার কৃপালাভ সম্ভব। তোমরা ধন্য!"

কদিন পর মহারাজের দর্শনার্থী হয়ে বলরাম মন্দিরে গেলাম। পরম স্নেহভরে তিনি আমাদের গ্রহণ করলেন। তারপর প্রশ্ন করলেন: "আমি যে এখানে রয়েছি কি করে জানলে?"

আমি উত্তর দিলাম: "আমরা মঠে গিয়ে আপনাকে দেখতে পেলাম না। প্রেমানন্দজী বললেন যে, আপনি বলরাম মন্দিরে রয়েছেন এবং এখানে এসে আপনাকে দর্শন করতে বললেন।"

মহারাজ মৃদু হেসে বললেন: "বুঝেছি, বাবুরামদা তোমাদের ভার আমার ওপর চাপিয়ে দিচ্ছেন।"

কিছু পরেই ঠাকুরের ভ্রাতুষ্পুত্র রামলালদাদা এলেন। বোঝা গেল যে, 'দাদা' আসাতে মহারাজ খুব খুশি হয়েছেন। তিনি তাঁকে বসবার ঘরে নিয়ে গেলেন, বসতে আসন দিলেন এবং নিজে তাঁর পাশে বসলেন। ক্রমে ভক্তরা এসে জড়ো হলেন। এসেই সবাই রামলালদাদা ও মহারাজকে

প্রণাম করছেন। যদি কেউ কখনো মহারাজকে প্রথমে প্রণাম করছেন তখনই মহারাজ বারণ করছেনঃ "না না, প্রথমে দাদাকে প্রণাম কর। ইনি আমাদের গুরুবংশের এবং গুরু ও ঈশ্বর অভিন্ন। আমাদের ঠাকুরের বংশের রক্তধারা দাদার ধমনীতে প্রবাহিত।"

আমার দৃঢ় বিশ্বাস, মহারাজ শ্রীরামকৃষ্ণ ও তাঁর পরিবারের সবার প্রতি ভক্তদের গভীরতর বিশ্বাসে উদ্বুদ্ধ করবার জন্যই এই কথাকয়টি বলেছিলেন। (রামলালদাদা মহারাজকে কয়েকবার দেখতে যাবার সময় আমরা এও লক্ষ্য করেছি যে, মহারাজ যুক্তকরে দাঁড়িয়ে প্রথমে তাঁকে বসতে দিয়ে তবে নিজে বসতেন।) এই দিনটিতে মহারাজকে যেন বিশেষ-রূপে ভাবরাজ্যে আরূঢ় মনে হলো। কারণ, রামলালদাদার উপস্থিতি তাঁকে দক্ষিণেশ্বরের পুরনো দিনের কথা স্মরণ করিয়ে দিচ্ছিল।

মহারাজঃ দাদা, ঠাকুরের সম্বন্ধে আমাদের কিছু বলুন।

রামলালদাদাঃ তা ভাই, সেসময় অন্ততঃ আমি তো তাঁর বিরাট স্বরূপ উপলব্ধি করতে পারিনি। আমি ভাবতাম তিনি আমাদের খুড়ো। তিনি জগন্মাতার বিশেষ কৃপাপ্রাপ্ত; তাই অত লোক তাঁর কাছে আসে।

সত্যি ভাই, তোমরাই তো সেই মহাপুরুষকে যথার্থ চিনলে। তাঁর ত্যাগের আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে তুমি পত্নী, পরিবার সর্বস্ব ত্যাগ করলে। সেজন্যই তো তাঁর করুণায় সেই স্পর্শমণির ছোঁয়া পেয়ে তুমি অমৃতের অধিকারী হয়েছ এবং এখন সবাইকে দুহাতে অমরত্বের আশীর্বাদ বিলোচ্ছ। আমরা, জাগতিক অর্থে যারা তাঁর আত্মীয়, তিনি যে কে তা বুঝতে পারিনি। কিন্তু তাঁর কৃপায় আমার এটুকু বিশ্বাস হয়েছে যে, আমরা যারা তাঁর পরিবারে জন্মেছি—তাঁর পাদপদ্মে অবশ্যই আশ্রয়-লাভ করেছি। তাঁর মুখে আমি শুনেছি যে, যখন কেউ সত্যলাভ করেন তাঁর পূর্বের এবং পরের সাত পুরুষ মুক্ত হয়ে যায়। আর ভগবান স্বয়ং আমাদের বংশে মনুষ্যদেহে অবতীর্ণ হয়েছিলেন। তাঁর কৃপাবলে ও পূতসঙ্গলাভে আমাদেরও বহু দর্শনাদি ও আধ্যাত্মিক অনুভূতি হয়েছিল। এভাবেই তিনি তাঁর প্রতি আমাদের মনে বিশ্বাস ও ভক্তি জন্মালেন।

কাশীপুর উদ্যানবাটীর সেই দিনটিতে (১ জানুয়ারি, ১৮৮৬) তিনি অন্যান্যদের মতো আমাকেও স্পর্শ করেছিলেন। তাঁর স্পর্শজনিত অপূর্ব অনুভূতি স্মরণ করলেই আমি রোমাঞ্চিত হই। (এই ঘটনাটি সম্পর্কে রামলালদাদা পরে বলেছিলেন, "সেদিন তাঁর স্পর্শদ্বারা তিনি আমাকে সুস্পষ্ট-রূপে আমার ইষ্টরূপের দর্শন করিয়েছিলেন।") এছাড়া তাঁর সঙ্গে কীর্তন গাইবার সময় তিনি আমাকে যে তন্ময়তা দিতেন তা ভাষায় প্রকাশ করা যায় না। যে জানে, সেই জানে।

তিনি ছিলেন অসাধারণ। সবাইকে সম্মান করা—এই গুণটি তিনি নিজে আচরণ করে দেখিয়ে গিয়েছেন। আমাদের তুচ্ছতম কাজটুকুও করতে বলার সময় এই বিবেচনাবোধের দরুন তিনি অত্যন্ত দ্বিধান্বিত হতেন।

মহারাজঃ তা দাদা, গোড়ার দিকে ঠাকুরকে আমরাও বুঝতে পারিনি। বহুবার আমরা তাঁর যথাযথ সম্মান করিনি। কিন্তু তিনি অহেতুক করুণাসাগর। তিনি আমাদের বহু ত্রুটি ক্ষমা করেছেন এবং তাঁর স্নেহ-ভালবাসা দিয়েই আমাদের আপনার করে নিয়েছেন।

সেসময় আমি অত্যন্ত অহঙ্কারী ছিলাম এবং তুচ্ছ বিষয়ে ধৈর্য হারাতাম। ঠাকুর আমায় বললেন, "ক্রোধ হলো আসুরিক। দম্ভ ও ক্রোধ আধ্যাত্মিকতার পথে বিরাট বাধাস্বরূপ। তুমি এখানে পবিত্র জীবনযাপন করতে এসেছ। ক্রোধ ও ঈর্ষা ত্যাগ কর।"

একা তাঁর মধ্যেই আমরা আমাদের মা, বাবা, ভাই, বন্ধু—সবকিছু পেয়েছি। কথাগুলি বলে মহারাজ যুক্তকরে এই মন্ত্রটি উচ্চারণ করলেন-

"ত্বমেব মাতা চ পিতা ত্বমেব
ত্বমেব বন্ধুশ্চ সখা ত্বমেব।
ত্বমেব বিদ্যা দ্রবিণং ত্বমেব
ত্বমেব সর্বং মম দেবদেব॥"

মহারাজ চোখ বন্ধ করলেন। কিছু পরে তিনি বললেনঃ "এমন অকূল করুণাপাথার পৃথিবীতে আর দ্বিতীয় কেউ কখনো আসেনি। যারা এই সত্য বুঝেছে ও যাদের তিনি কৃপা করে বুঝিয়েছেন,

কেবলমাত্র তারাই তাঁকে জানতে ও বুঝতে পারে। তারা ধন্য।" এই কথা বলে মহারাজ হনুমানের সেই উক্তির উদ্ধৃতি করলেন: "ওরে কুশীলব, করিস কি গৌরব, / ধরা না দিলে কি পারিস ধরিতে?"

মহারাজ: শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর ভক্তদের প্রতি আসক্ত। তাঁর কৃপাপবন বইছে। একটু কষ্ট করে তোমাদের পালটি তুলে দাও। তারপর সেই করুণা-বাতাসের ছোঁয়া পেয়ে তোমাদের জীবনতরী তাঁর পায়ে গিয়ে কূল পাবে।

ঠাকুর প্রায়ই আত্মপ্রচেষ্টা ও আন্তরিকতার কথা বলতেন। আধ্যাত্মিক জীবনে আগ্রহ এবং আত্মোদ্যম ছাড়া কিছুই করা যায় না। তিনি বলতেন, "আমি ভাত রান্না করে তোদের সামনে রেখে দিয়েছি। এখন তোরা এই বাড়া ভাতে বসে যা। নিজের হাতে মুখে পুরে দে।" এটুকু উদ্যমের প্রয়োজন।

তাঁর কাছে সমস্ত মন দিয়ে প্রার্থনা কর। একমাত্র তবেই তোমরা তাঁর জন্য আকুল হবে। ক্ষুধা থাকলে আহার্য উপভোগ করা যায়। ক্ষুধার অভাবে স্বাদু ভোজ্যদ্রব্যেরও আমরা সম্মান রাখি না। এজন্যই লোকে তাঁর নামামৃত আস্বাদন করে না।

এখন যদি ভাব তোমাদের মন ভগবানের দিকে একটু যাচ্ছে, তবে তাঁর প্রতি তোমাদের চিত্ত নিবিষ্ট কর ও সাধন কর। সাধনা করতে থাকলে সাহায্য পাবে। ঠাকুর বলতেন, "মা তাঁর জ্ঞানভাণ্ডার থেকে রসদ জোগান।" যদি তুমি আগুনের উত্তাপ অনুভব করতে চাও, অনেক দূরে সরে থাকলে চলবে না। উত্তাপ বোধ করতে হলে আগুনের কাছে আসতে হবে।

পুণ্যাত্মাদের সঙ্গ করবে। এমন কারো কাছে যাও যিনি রাস্তা চেনেন। তাঁর কাছে পথের সন্ধান নাও এবং সেই পথে চল। কেবলমাত্র তবেই তুমি তোমার গন্তব্যে কোনদিন পৌঁছাবে। একমাত্র তাহলেই ভক্তি ও বিশ্বাস জাগবে।

রামলালদাদা বিদায় নিলেন। তিনি দক্ষিণেশ্বরে ফিরে যাবেন। আমরা তাঁকে ও মহারাজকে প্রণাম করলাম। তাঁদের কথা এবং শ্রীরামকৃষ্ণের অসীম কৃপার কথা ভাবতে-ভাবতে সেদিনের মতো বলরাম মন্দির ত্যাগ করলাম।

আবার মহারাজকে দর্শন করতে বলরাম মন্দিরে গিয়েছি। কথোপকথনকালে আমাদের 'মিশনের' কাজের কথা উঠল। মহারাজ বললেন: কেউ যদি কর্মফলের প্রত্যাশা না করে নিঃস্বার্থভাবে কাজ করে তাহলে কর্মে আসক্ত হয় না। স্বামীজী বলতেন, 'কাজই পূজা।' সবার পক্ষে কি সবসময় ধ্যান বা ঈশ্বরচিন্তা করা সম্ভব? সেজন্যই ঈশ্বরের সাথে একত্ববোধে পৌঁছানো সহজ করার জন্য স্বামীজী নিঃস্বার্থ সেবার শিক্ষা দিলেন। জানবে যে, সকল কর্মই প্রভুর কর্ম। কাজ করবার সময় নিজেকে ভুলতে শেখ। সকল আধ্যাত্মিক সাধনারই লক্ষ্য হচ্ছে অহংবোধটি বিনষ্ট করা। ঠাকুর বলতেন, "আমি ম'লে ঘুচিবে জঞ্জাল।" যতক্ষণ আমরা অহংভাবাপন্ন থাকি, তিনিও দূরে সরে থাকেন। ঠাকুর এই উদাহরণটি দিতেন—"ভাঁড়ারে যতক্ষণ সরকারমশাই রয়েছেন, গৃহকর্তা সেখানে যান না। এমনকি যদি কেউ তাঁর কাছে কিছু চায়, তিনি তাকে সরকারমশাইয়ের কাছে পাঠিয়ে দেন।"

কর্ম, ভক্তি ও বিচারবুদ্ধি—প্রত্যেকটিই ঈশ্বর-লাভের এক-একটি পথ। সম্পূর্ণ হৃদয়ভরা যে-ভক্তি দিয়ে ভক্ত মন্দিরে তাঁর পূজা করে, সেই আন্তরিক ভক্তি-ভালবাসার সাথে তাকে হীন, দরিদ্র ও আর্তের মাঝে নারায়ণের সেবা করতে হবে। তুমি অপরকে সাহায্য করার কে? কেবলমাত্র যখন প্রভু তোমায় শক্তি দেন তখনই তুমি বাস্তবিক সেবা করতে পার।

তিনি সকল জীবের মধ্যে আছেন—একথা সত্য তবে নরদেহে তাঁর বিশেষ প্রকাশ। সেজন্যই স্বামীজী আমাদের মনুষ্যজাতির সেবায় অনুপ্রাণিত করেছেন। সেই একই ব্রহ্ম নর-নারী ও সব প্রাণীর মাঝে রয়েছেন—এই বিশ্বাস মনে রাখতে হবে এবং সেই বিশ্বাস সঙ্গে নিয়ে জীবরূপী শিবের সেবা করতে শিখতে হবে। এই সাধনা করতে করতে অকস্মাৎ একদিন অজ্ঞানাবরণ উন্মোচিত হবে এবং তুমি দেখবে যে, তিনিই মানুষ ও ব্রহ্মাণ্ড

—এই সবকিছু হয়েছেন। তিনিই এই বিশ্বে এত বিভিন্ন রূপে প্রকাশিত ও পরিব্যাপ্ত। তুমিও সেই সর্বময় শিব এবং এভাবে জীবের মাঝে শিবের সেবা করতে পার।

একবার ঠাকুর মণি মল্লিকের মেয়েকে প্রশ্ন করেছিলেন, "কাকে তুমি সবচাইতে বেশি ভালবাস?" সে উত্তর দিল, "আমার একটি ভাইপো আছে। আমি তাকেই সবচেয়ে বেশি ভালবাসি।" ঠাকুর তাকে বললেন, "খুব ভাল। তোমার ভাইপোকেই গোপাল জ্ঞানে সেবা কর, স্নান করাও, আহার করাও।" সে ঠাকুরের আদেশ পালন করেছিল এবং কালে সেই ভাইপোর মধ্যেই তার গোপাল-দর্শন হয়েছিল। বিশ্বাস ও ভক্তির সঙ্গে যেকোন আধ্যাত্মিক সাধনা কর; শেষে তা তোমাকে সেই একই লক্ষ্যে পৌঁছে দেবে।

*

সপ্তাহখানেক পরে আমি উদ্বোধনে গিয়ে স্বামী সারদানন্দকে প্রণাম করলাম। জনৈক যুবা সন্ন্যাসী কোন কাজের বিষয়ে তাঁর উপদেশ প্রার্থনা করছিলেন। স্বামী সারদানন্দ নিজের মতামত দিয়ে বললেন: "বলরাম মন্দিরে গিয়ে মহারাজকে এবিষয়ে জিজ্ঞাসা কর। মহারাজের কথা ঠাকুরের কথা। মহারাজ আমাদের যাকিছু বলেন তা আমরা ঠাকুরের নিজের নির্দেশ বলেই মনে করি। ঠাকুর ও তাঁর মানসপুত্র এক এবং অভিন্ন।"

আমরা বলরাম মন্দিরে গেলাম। মহারাজ তাঁর ঘরে বসে। ভক্তরাও বসে আছেন। তাঁর চক্ষু অর্ধমুদ্রিত। কিছুক্ষণ পরে তিনি বললেন:

আধ্যাত্মিক সাধনার লক্ষ্য কী? তাঁকে জানা, তাঁর সঙ্গে একীভূত হওয়া। তাঁর কৃপায় অজ্ঞান-রূপ হৃদয়গ্রন্থি খুলে যায়, সব সংশয় দূর হয়, যত কর্মফল সব নষ্ট হয়ে যায় যখন তাঁকে, যিনি সাকার আবার নিরাকার, জানা যায়। তাঁর শরণাগত হও ও আন্তরিকভাবে তাঁর কৃপালাভের জন্য প্রার্থনা কর। তোমরা বাড়িঘর, আরাম—এসব ছেড়ে কেন এখানে এসেছ? আহারে, শয়নে, দাঁড়িয়ে, বসে (সবসময়ই) তাঁর কাছে প্রার্থনা জানাও—'প্রভু, তোমার করুণা অনুভব করার ও বোঝার শক্তি আমায় দাও!'

আমরা এই পৃথিবীতে সবাই পথিক। আমাদের চিরধাম প্রভুপাদপদ্মে। গীতায় শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন:

"গতির্ভর্তা প্রভুঃ সাক্ষী নিবাসঃ শরণং সুহৃৎ।
প্রভবঃ প্রলয়ঃ স্থানং নিধানং বীজমব্যয়ম্॥"

ভাগ্যহীন সেই ব্যক্তি, যে ঈশ্বরের শরণাগত হওয়ার পরিবর্তে ভবজালে জড়িয়ে পড়ে। প্রভুর শ্রীচরণেই আমাদের নিত্যধাম। যে করেই হোক না কেন সেখানে আমাদের পৌঁছাতে হবেই। তিনিই একমাত্র সত্য। সেই সত্য লাভ করতেই হবে। তোমার জীবন যেন হেলায় না কেটে যায়। প্রায় সকলেই ভাবে যে, সে নিজে যা সত্য বলে বোঝে সেটিই সবার পক্ষে অনুকরণীয় পন্থা। কখনও বা মানুষ এত আত্মকেন্দ্রিক হয়ে পড়ে এবং নিজেকে এত বিশিষ্ট বলে ভাবে যে, সে ঈশ্বরের অস্তিত্বও স্বীকার করে না। এই 'অহং'-এর ভাবই মানুষকে মায়ার বাঁধনে জড়ায়। এর থেকে মুক্তি নেই, যতক্ষণ না সে অনুভব করছে—'নাহং নাহং, তুঁহু তুঁহু'।

স্বামীজী এই গানটি গাইতেন:

"প্রভু ম্যায় গুলাম, ম্যায় গুলাম, ম্যায় গুলাম তেরা।
প্রভু তু দীওয়ান, তু দীওয়ান, তু দীওয়ান মেরা॥"

তিনি আরও গাইতেন, "যো কুছ হ্যায় সো তু হী হ্যায়।" যার ওপর তাঁর কৃপা বর্ষিত হয় সে-ই ভগবানকে জানে। তোমার আদর্শ যে ঈশ্বর-লাভ, এ কখনও ভুলো না। তাঁকে জান, তাহলেই অসীম জ্ঞানের ভাণ্ডার খুলে যাবে। তখনই অনুভব করবে, 'ঈশ্বর আমার, আমি তাঁর'।

শ্রীকৃষ্ণ গীতায় বলেছেন:

"সর্বধর্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।
অহং ত্বাং সর্বপাপেভ্যঃ মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ॥"

—এই তাঁর আশার বাণী।

ঠাকুর বারবার প্রার্থনা করতেন, "হে প্রভু, আমার আশ্রয়। আমি কোনরূপ শারীরিক বা পার্থিব সুখ চাই না। আমাকে বিশ্বাস দাও ও তোমার পাদপদ্মে শুদ্ধা ভক্তি দাও। আমার অহং নষ্ট করে দিয়ে আমাকে তোমার করে নাও।"

এই যুগে তাঁর চরণে শরণ ভিন্ন অন্য গতি নেই। এই কলিযুগে মানুষের জীবনের সীমা

অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত। আবার এই সংক্ষিপ্ত জীবনেই তাঁকে লাভ করতে হবে। প্রাচীনকালের ন্যায় কঠোর সাধনার সময় এখন নেই। মন দুর্বল। এই কারণেই মানুষ জাগতিক সুখের প্রতিই অধিক আকৃষ্ট।

সকল দুর্বলতা সত্ত্বেও ঈশ্বরলাভের সহজতম পন্থা হলো তাঁর শরণাগত হওয়া। এর অর্থ কি? আমরা কি কিছু করব না? আমরা কি চুপ করে বসে থাকব? না। আমরা প্রার্থনা জানাব; ভগবানের কাছে কেঁদে বলব যে, তিনি যেন আমাদের হৃদয়ে তাঁর জন্য আকুলতা জাগিয়ে তোলেন এবং সুখভোগের সকল স্পৃহা যেন আমাদের হৃদয় থেকে দূর করেন। প্রার্থনা কর—'হে বিশ্বপিতা, তোমার করুণা আমার সম্মুখে প্রকাশ কর। আমি অসহায়। তোমায় ছাড়া আমার অন্য শরণ নেই। তুমি দুর্বলের একমাত্র শরণ। তোমাকে সর্বদা স্মরণ করার শক্তি আমায় দাও।' যদি কেউ বাস্তবিক তাঁর কাছে আত্ম-সমর্পণ করতে পারে তবে সবকিছুই সহজ হয়ে যায়; কিন্তু এটি করাই খুব কঠিন। তাঁর কৃপা ভিন্ন তাঁর চরণে শরণাগতি হওয়া অসম্ভব এবং এই কৃপাকণা অনুভব করতে হলে পুণ্যাত্মাদের সঙ্গ করতে হবে, শাস্ত্রাদির অধ্যয়ন ও আন্তরিক প্রার্থনা করতে হবে।

মন আমাদের বহুভাবে বিপথগামী (পথভ্রষ্ট) করে। আমাদের মনকে সংযত করতে হবে এবং তাকে ঠিক পথে পরিচালিত করতে হবে। তপস্যার অর্থ কি? তপস্যা হলো দিব্যানন্দ অনুভব করবার জন্য মনকে ঈশ্বরের প্রতি চালিত করা। এযুগে শারীরিক কঠোরতা অভ্যাস করবার প্রয়োজন নেই, যেমন কিনা হেঁটমুণ্ড উর্ধ্বমুখ হয়ে থাকা। এই যুগের পন্থা হলো—প্রভুর নামোচ্চারণ করবার আকুলতা, সর্বজীবে করুণা ও মমত্ববোধ এবং সাধুসঙ্গ, সাধুসেবা। নারদমুনি পুণ্যাত্মাদের সেবার দ্বারা ভক্তি ও ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করেছিলেন। সেবার মাধ্যমে অহংবোধ বিনষ্ট হয়।

এযুগে শ্রীরামকৃষ্ণের বাণী হলো কাম ও কাঞ্চন-ত্যাগ। যারা সাধু হবার জন্য এই সংঘে যোগ দিয়েছে, কাম ও কাঞ্চন ত্যাগই তাদের ভূষণ এবং এটিই ঈশ্বরলাভের একমাত্র উপায়। আধ্যাত্মিকতার পথে অগ্রসর হওয়ার কালে চিত্ত বহুবিধ প্রলোভনের সম্মুখীন হয়। কাম ও কাঞ্চন, নাম ও যশ চিত্তে বারবার উদিত হয় এবং মানুষকে ঈশ্বর থেকে দূরে নিয়ে যায়। কামনারূপী এই চোরের সম্পর্কে সাবধান না হলে সে তোমার সকল শুভ বুদ্ধি চুরি করে নিয়ে যাবে এবং তুমি সাংসারিকতার অতল সাগরে তলিয়ে যাবে। কিন্তু অন্যদিকে ঐশী কৃপার সাগর রয়েছে—তাঁকে একবার মাত্র আন্তরিকভাবে ডাকার অপেক্ষা। ঠাকুর বলতেন, "যদি তুমি তাঁর দিকে এক পা এগোও, তিনি তোমার দিকে দশ পা এগিয়ে আসবেন।"

ভগবান কল্পতরু। তিনি তাঁর ভক্তের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করেন। আন্তরিক হও, মন ও মুখ এক কর। ঈশ্বরের সাম্রাজ্যে কোন অবিচার নেই। ঠাকুর আমাদের বলেছিলেন, "আমি ষোল টাং করেছি, তোরা এক টাং কর একটু।" কী কঠোর সাধনাই না তিনি করেছেন, যাতে আমাদের পথ সহজ হয়। তাঁর চরণে আশ্রয় নাও। এই জীবনেই অমৃতানন্দের অধিকারী হও। তোমার মনুষ্যজন্ম সার্থক করো।

*

আরেক দিনের কথা। মহারাজ সেবক বরদা-নন্দকে কয়েকটি গান গাইতে বললেন। গান শেষ হলে মহারাজ বললেন:

ঈশ্বরের নামোচ্চারণ ও মহিমাকীর্তন করতে করতে যার চিত্তে আনন্দধারা অনুক্ষণ প্রবাহিত হয়, সে-ই ধন্য। তাঁকে সর্বদা স্মরণ কর এবং তোমাদের জীবন সার্থক কর; নয়তো এই মানব-জন্ম বৃথা। ঠাকুর বলতেন, "হে প্রভু, তোমার মায়ায় লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়ে তোমার সন্তানেরা মৃতপ্রায়—এদের তোমার সঞ্জীবনী শক্তি দাও, দাও তোমার অমৃতত্ব।" সাধুদের বলি, তোমরা গৃহ ও গৃহের সকল স্বাচ্ছন্দ্য-সুখ ত্যাগ করেছ। এখন সকল শারীরিক আরাম ভুলে প্রার্থনা জানাও, 'প্রভু তুমিই আমার সব, আমার ভরসা ও আমার একমাত্র সম্পদ।' ভক্তদের বলি, তোমাদের ভয় নেই। তোমরা সংসারে থাক কিন্তু জেনো, তিনিই একমাত্র তোমাদের আপনার ধন। তাঁর স্মরণ-মনন কর। তাঁর শরণাগত হও। □

## সৎসঙ্গ-রত্নাবলী

# ভগবৎপ্রসঙ্গ

## স্বামী মাধবানন্দ

[ পূর্বানুবৃত্তি : ভাদ্র ১৪০০ সংখ্যার পর ]

**ইংরেজী থেকে বাঙলায় অনুবাদ : স্বামী শরণ্যানন্দ**

**প্রশ্ন :** স্বামীজী বলেছেন, "তুমি যদি নিজেকে মুক্ত বলে মনে কর তাহলে মুক্ত হয়ে যাবে।" বিষয়টি অনুগ্রহ করে ব্যাখ্যা করে বলুন।

**উত্তর :** বেদান্ত-মতে এই বিশ্বজগৎ আমাদের মনের বহিঃপ্রকাশ মাত্র। আমরা যেরূপ চিন্তা করি সেইরূপ দেখি, সেরূপ অনুভব করি ; আমাদের দেহ, ইন্দ্রিয় প্রভৃতিও সেরূপভাবে গঠিত হয়। এই মুহূর্তে আমরা নিজেদের দেশ-কালের দ্বারা সীমাবদ্ধ জীবরূপে কল্পনা করছি, তাই ঈশ্বরের থেকে নিজেদের পৃথক বলে মনে করি। যদি অন্যভাবে চিন্তা করা যায় যে, আমরা ঈশ্বরের সঙ্গে অভিন্ন, তিনি আমাদের সঙ্গে লুকোচুরি খেলছেন, বস্তুতঃ তিনি আমাদের অন্তর-বাহির সর্বত্র বিরাজ করেন। প্রত্যেক অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে আমরা তাঁরই দিকে ধীরে ধীরে এগিয়ে চলেছি—তাহলে আমরা মুক্তিলাভের পথে এগোতে পারব। ঈশ্বর নিত্য-মুক্তস্বরূপ, আমরাও যদি নিজেদের মুক্তস্বরূপ বলে মনে করতে পারি, তাহলে যতখানি বিশ্বাসের সঙ্গে তা মনে করব ততখানিই মুক্তির পথে এগিয়ে যেতে পারব। শরীরের ওপর এবং কর্মের ওপর মনের বিরাট প্রভাব থাকে। নিজেকে দুর্বল, পতিত ও অসহায় মনে না করে যা প্রকৃত সত্য কিন্তু অজ্ঞানবশতঃ আমরা বিস্মৃত হয়েছি ( জীব ও ঈশ্বরের অভিন্নতা-রূপ) সেই বিপরীত চিন্তা মনের মধ্যে সঞ্চার করতে হবে। স্বামীজীর উক্তির এই-ই তাৎপর্য। ভ্রমবশতঃ আমরা নিজেদের দুর্বল, অসহায় ও দেশ-কালের দ্বারা সীমাবদ্ধ জীবরূপে কল্পনা করি। যদি নিজেদের ঈশ্বরের অংশস্বরূপ অথবা যথার্থ-ভাবে বলতে হলে, ঈশ্বরের সঙ্গে অভিন্নরূপে চিন্তা করি এবং মনের মধ্যে এই চিন্তা দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত করতে পারি তবে নিশ্চয়ই আমরা মুক্তির পথে অগ্রসর হতে পারব।

**প্রশ্ন :** যখন 'Eternal companion' বইখানি পড়ি তখন দেখি স্বামী ব্রহ্মানন্দ ধ্যান-ভজনের ওপর গুরুত্ব দিয়েছেন, আবার যখন স্বামীজীর বই পড়ি তখন দেখি তিনি কর্মযোগ বা জীবসেবার ওপর জোর দিয়েছেন। এবিষয়ে আপনার মতামত কি ?

**উত্তর :** ঈশ্বরলাভের পথ বিভিন্ন, কেবল একটি-মাত্র নয় যে, সকলেই তা অনুসরণ করবে। স্বামী বিবেকানন্দ ও স্বামী ব্রহ্মানন্দের চিন্তাধারার মধ্যে আপাত-পার্থক্য ছিল। তাঁরা উভয়েই ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষ ছিলেন। ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষেরাও মনে করেন, যে-পথে সাধন করে তাঁরা লক্ষ্যে পৌঁছেছেন সে-পথ অনুসরণ করাই সাধারণ মানুষের পক্ষে কল্যাণকর। তাছাড়া, স্বামী ব্রহ্মানন্দ সাধারণতঃ মুষ্টিমেয় ধর্মার্থীদের কাছে সৎপ্রসঙ্গ করতেন, যাদের পক্ষে জপ-ধ্যানই আদর্শ পথ। অন্যদিকে স্বামীজী সাধারণতঃ বহু-লোকের সমাবেশে বক্তৃতা দিতেন, যা মহারাজ ( স্বামী ব্রহ্মানন্দ ) কদাচিৎ করতেন। সেজন্য তাঁদের বক্তব্য-বিষয়ের মধ্যে পার্থক্য থাকত। যেখানে বহুলোকের সমাবেশ, বিশেষতঃ যেখানে অধিকাংশ শ্রোতা সাধারণ স্তরের, সেখানে কর্মযোগ, জীবসেবা প্রভৃতি বিষয় আলোচনা করাই শ্রেয়। মহারাজ কখনো কর্মযোগের বিরোধী ছিলেন না, কিন্তু তিনি জপ-ধ্যানের ওপর বেশি গুরুত্ব দিতেন, কারণ তাঁর মতে জপ-ধ্যানের দ্বারা মন শুদ্ধ হলে বেশি পরিমাণে কর্মযোগের অনুষ্ঠান করা যায়। নতুবা কেবল কর্ম করে গেলে বিভিন্ন প্রকার মানুষ, বিভিন্ন প্রকার পরিস্থিতি ও সমস্যার সম্মুখীন হবে এবং তাতে তাদের পক্ষে মনের ভার-সাম্য ( balance ) রক্ষা করা কঠিন হয়ে পড়বে। তখন কর্মও নিষ্কামভাবে করা সম্ভব হবে না। তাই যথার্থ কর্মযোগ অনুষ্ঠানের জন্য মহারাজ জপ-ধ্যানের দ্বারা মনকে শুদ্ধ ও একাগ্র করার পরামর্শ দিতেন। ধ্যানের সময় আমরা মনকে পর্যবেক্ষণ করতে পারি, বুঝতে পারি আমরা ধর্মজীবনে কতটা উন্নতিলাভ করেছি। সাধন-ভজনের উদ্দেশ্য অলৌকিক শক্তি বা উচ্চ আধ্যাত্মিক শক্তিলাভ নয়, উদ্দেশ্য—আমরা ধর্মজীবনে কতটা অগ্রসর হয়েছি

এবং লক্ষ্যে পৌঁছাতে আরও কত দেরি তা বোঝার চেষ্টা করা। তখনই আমরা ভবিষ্যৎ সাধন-ভজন ও কর্মযোগের জন্য মানসিক প্রস্তুতি নিতে পারব। সুতরাং জপ-ধ্যান ও কর্মযোগের মধ্যে কোন বিরোধ নেই, উভয়ই ঈশ্বরলাভের বিভিন্ন পথ। স্বামীজী যে কর্মযোগ বা জীবসেবার কথা বলেছেন তা জপ-ধ্যান সহযোগে অনুষ্ঠিত হলে আরও বেশি কার্যকরী হবে, এবিষয়ে সন্দেহ নেই। তবে যারা জপ-ধ্যান করতে অসমর্থ তাদের পক্ষে কর্মযোগ বা শিবজ্ঞানে জীবসেবা করাই কল্যাণকর।

প্রশ্নঃ আমেরিকায় বেদান্তকেন্দ্রগুলির উপযোগিতা সম্বন্ধে আপনার মতামত কি?

উত্তরঃ বেদান্তকেন্দ্রগুলি নিজেদের সামর্থ্য অনুযায়ী ভালই কাজ করছে। ওখানকার পরিবেশ ও সমস্যা ভিন্ন রকমের এবং সন্ন্যাসীরাও সেগুলির সম্মুখীন হতে বা সমাধান করতে সমর্থ। সুতরাং ওখানকার কেন্দ্রগুলি সম্পর্কে আমার ধারণা ভালই। প্রত্যেক সন্ন্যাসী আন্তরিকভাবে নিজ নিজ দায়িত্ব পালন করছেন। এইভাবে কর্ম করতে থাকলে তাঁরা বহু লোকের কল্যাণসাধন করতে পারবেন। যাঁরা ওখানে ভাবধারা প্রচার করছেন এবং যাঁরা তা গ্রহণ করছেন তাঁদের মধ্যে একটা সহযোগিতার ভাব দেখে আমি আনন্দিত হয়েছি। সুতরাং ওখানকার কেন্দ্রগুলির ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল।

প্রশ্নঃ ধর্মসাধনার জন্য ভারতবর্ষে অনুকূল পরিবেশ আছে। আমেরিকায় কি কেউ নিষ্ঠার সঙ্গে ধর্মজীবন যাপন করতে পারে?

উত্তরঃ পৃথিবীর যেকোন স্থানেই ধর্মজীবন গড়ে তোলা যায়, অবশ্য প্রশ্নকর্তার বক্তব্য অনুসারে ভারতবর্ষে সম্ভবতঃ ধর্মসাধনার অনুকূল পরিবেশ আছে। যেমন, কোন জমি বেশি উর্বর, অল্প পরিশ্রমে সেখানে বেশি ফসল তৈরি করা যায়। আবার অনুর্বর জমিতে বেশি পরিমাণে জল ও সার দিলে ফসল উৎপন্ন হয়। আমেরিকার মতো দেশে ধর্মজীবন গড়ে তুলতে হলে বেশি পরিমাণে সাধন-ভজন করা দরকার এবং তার জন্য মানসিক প্রস্তুতি চাই।

এই প্রসঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণের অন্যতম শিষ্য স্বামী তুরীয়ানন্দের একটি গল্প মনে পড়ছে, গল্পটি সম্ভবতঃ তিনি অন্যের কাছে শুনেছিলেন। সম্রাট আলেকজান্ডার যখন বালক ছিলেন তাঁর একটি ছোট তলোয়ার ছিল। তিনি তাঁর বাবার কাছে একটি বড় তলোয়ার চেয়েছিলেন। তাঁর বাবা উত্তর দিয়েছিলেনঃ "যুদ্ধ করার সময় এক পা বেশি এগিয়ে যুদ্ধ করবে।" অর্থাৎ তলোয়ার ছোট হলেও এক পা বেশি এগিয়ে যুদ্ধ করলে শত্রুকে আঘাত করা যায়। সেরূপ ভারতবর্ষের তুলনায় আমেরিকায় আধ্যাত্মিক পরিবেশ কম অনুকূল—প্রশ্নকর্তার এই ধারণাকে সত্য বলে মেনে নিয়েও বলা যায় যে, এখানে বেশি সাধনার প্রয়োজন। অধিক সাধনার দ্বারা এখানেও সিদ্ধিলাভ করা যায়, অধিক সাধনার ফলে আধ্যাত্মিক উন্নতি যে দ্রুত হবে, এতে কোন সন্দেহ নেই।

প্রশ্নঃ সাধারণ মানুষ কি সত্যই ঈশ্বরলাভ করতে পারে অথবা এটা নিছক কল্পনা মাত্র?

উত্তরঃ ঈশ্বরদর্শন কল্পনার বিষয় নয়, বাস্তব সত্য। বর্তমান যুগেই যে ঈশ্বরলাভের বিষয় নতুন শোনা যাচ্ছে তা নয়, বহু শতাব্দী পূর্বে, এমনকি হাজার হাজার বছর পূর্বেও বিভিন্ন ধর্মের মহাপুরুষেরা ঈশ্বরদর্শন করেছেন। সাধারণ মানুষও নিষ্ঠার সঙ্গে সাধনা করলে ঈশ্বরদর্শন করতে পারে যদি দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হয়ে শেষ অবধি সাধনা করে যেতে পারে। অল্পকালের জন্য সাধন করে ছেড়ে দিলে কিছু লাভ হয় না। ঈশ্বর কারোর আজ্ঞাবহ দাস নন যে তাঁকে ডাকলেই তিনি সামনে এসে উপস্থিত হবেন এবং আমাদের নির্দেশ মতো কর্ম করবেন। মনে রাখা দরকার, জগতের সর্বশ্রেষ্ঠ বস্তুলাভের জন্য আমরা সাধন করছি, সীমিত শক্তির সাহায্যে আমরা অসীম বস্তুকে লাভ করতে চাইছি। এটি সম্ভব হবে যদি আমরা ঈশ্বরের নিকট সম্পূর্ণরূপে আত্মসমর্পণ করতে পারি এবং আমাদের ভক্তি আন্তরিক হয়, তখন ঈশ্বরও আমাদের প্রতি প্রসন্ন হয়ে তাঁর স্বরূপ প্রকাশ করবেন। সাধারণ মানুষও নিষ্ঠা ও যত্নের সঙ্গে সাধন করলে ঈশ্বরদর্শন করতে পারে, তবে যেন তার মন-মুখ এক হয়। এটিই প্রয়োজনীয় বিষয়। যদি চিত্ত শুদ্ধ না থাকে তবে সাধককে তার জন্য প্রাণপণ যত্ন করতে হবে, তখন ঈশ্বরও তার

সহায় হবেন। সুতরাং ঈশ্বরদর্শন সকলেই করতে পারে। শ্রীরামকৃষ্ণ এজন্যই এসেছিলেন। যুগে যুগে মহাপুরুষরা এই সত্যই প্রচার করে গিয়েছেন। শ্রীরামকৃষ্ণ বিশেষ করে বলতেন: "ঈশ্বর সকলের আপনার জন, তাঁকে আন্তরিকভাবে চাইলে তিনি দেখা দেন।" প্রয়োজন—প্রাণপণ চেষ্টা ও অধ্যবসায়ের সঙ্গে সাধন-ভজন করা। আমরা যদি যত্নশীল না হই তবুও ঈশ্বর আমাদের প্রতি প্রসন্ন হয়ে তাঁর স্বরূপ প্রকাশ করবেন এমন আশা আমরা করতে পারি না এবং সেই সঙ্গে এটাও সত্য যে, ঈশ্বরদর্শন কাল্পনিক বিষয় নয়।

**প্রশ্ন:** ধর্ম ও বিশ্বাসের সঙ্গে অলৌকিকতার কি সম্পর্ক?

**উত্তর:** ধর্ম ও বিশ্বাসের সঙ্গে অলৌকিকতার কোন সম্পর্কই নেই, সাধনার সময় এটি আপনা-আপনি আসে। আমরা যখন ভ্রমণে যাই, পথের মধ্যে দূরত্বজ্ঞাপক চিহ্ন (mile stone) অনেক সময় দেখতে পাই। তা ছাড়াও আরও অনেক বস্তু দেখা যায়, যেগুলি দেখে বোঝা যায় আমরা কতটা পথ অতিক্রম করেছি। কিন্তু এই জিনিসগুলি না থাকলেও দূরত্বের কোন হেরফের হয় না এবং আমাদের যাত্রাও নিষ্ফল হবে না। যতই এগোতে থাকব ততই গন্তব্যস্থানের কাছাকাছি পৌঁছাব। অলৌকিক বিষয় (যা সাধনকালে উপস্থিত হয়) ধর্মজীবনের বিঘ্নস্বরূপ। যদি সাধনকালে আমরা অলৌকিক বিষয়কে গুরুত্ব দিই এবং তাকে ধর্মজীবনের অঙ্গ বলে মনে করি তাহলে তা ধর্মপথে সাহায্য না করে ক্ষতিই করবে। অতএব অলৌকিক বস্তুকে পরিহার করে নিজেদের সাধ্যমত সাধন-ভজন করাই আমাদের কর্তব্য। অলৌকিক জ্যোতি দেখে বা অলৌকিক শব্দ শুনে আমরা যেন মুগ্ধ না হই, এগুলি ধর্মজীবনের প্রয়োজনীয় বিষয় নয়।

**প্রশ্ন:** ত্যাগের সাধন করতে হলে পরলোক বা জন্মান্তরে কি বিশ্বাস করার প্রয়োজন আছে?

**উত্তর:** না, তার কোন প্রয়োজন নেই। ধর্ম-জীবনে এগুলির কোনই গুরুত্ব নেই। গভীরভাবে আলোচনা করলে পরলোক বা জন্মান্তরবাদ সম্পর্কে সিদ্ধান্তে আসা যায়। কিন্তু ত্যাগের সাধনের জন্য ঐ বিষয়ে বিশ্বাস না করলেও কোন ক্ষতি নেই। ত্যাগের প্রকৃত অর্থ—আমাদের চারপাশে যে-সমস্ত ভোগ্য বিষয় আছে তাদের প্রতি আসক্ত না হওয়া। উচ্চতর বিষয়লাভের (আত্মদর্শন) জন্য নিম্নতর বিষয়কে পরিহার করা উচিত। জন্মান্তর বা পরলোকে বিশ্বাস থাকুক বা না থাকুক ত্যাগের সাধন সর্বদাই করা যায়, কারণ ত্যাগ হলো সাধনার বিষয়, বিচারের বিষয় নয়। উচ্চতর আদর্শলাভের জন্য নিম্নতর ভোগ্য বিষয়কে সম্পূর্ণ ত্যাগ করতে পারলে এবং এতে প্রতিষ্ঠিত হতে পারলেই ত্যাগের সাধন পরিপূর্ণ হয়। সুতরাং পরলোক, জন্মান্তর প্রভৃতির সঙ্গে এর কোন সম্পর্কই নেই।

**প্রশ্ন:** ধর্মজীবনে অন্যতম প্রধান বিঘ্ন—আলস্য বা জড়তা, তাকে জয় করার উপায় কি?

**উত্তর:** জড়তা বা আলস্য মনুষ্যশরীরের একপ্রকার স্বাভাবিক ধর্ম। আমাদের প্রকৃতি সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ—এই তিনটি গুণের সমন্বয়ে গঠিত। সত্ত্বগুণের ধর্ম শান্ত বা সাম্যভাব, রজোগুণের কর্ম-প্রবণতা এবং তমোগুণের জড়তা। সুতরাং জড়তা মানুষের নিম্নস্তরের প্রকৃতি, তাকে সাম্যভাব ও কর্মের দ্বারা জয় করা উচিত। 'বিবেকচূড়ামণি' গ্রন্থে আচার্য শঙ্কর বলেছেন, সত্ত্বগুণের দ্বারা তমোগুণকে জয় করা যায় এবং সত্ত্বগুণও বর্ধিত হয়ে আপনা-আপনি লয়প্রাপ্ত হয় অর্থাৎ তার কোন মন্দ প্রভাব থাকে না।[১] সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ—এই তিনটি গুণকে অতিক্রম করতে পারলে জড়তাকে জয় করা যায়। সাধন-ভজন ধীরে ধীরে করা উচিত নয়, কারণ আমাদের উদ্দেশ্য এই জীবনেই ঈশ্বরলাভ করা। জীবন ক্ষণস্থায়ী, মাত্র কিছু-কালের জন্যই আমরা জীবিত থাকব। তাই জাগতিক বস্তুলাভের জন্য অযথা সময় বা শক্তি ব্যয় না করে যে-বস্তু আমাদের সর্বাপেক্ষা কাম্য, সর্বাপেক্ষা প্রিয় কেবল তারই জন্য প্রাণপণ যত্নশীল হওয়া সকলের কর্তব্য। ☐ [সমাপ্ত]

১ "তমো দ্বাভ্যাং রজঃ সত্ত্বাৎ সত্ত্বং শুদ্ধেন নশ্যতি।
তস্মাৎ সত্ত্বমবষ্টভ্য স্বাধ্যাসাপনয়ং কুরু॥" (বিবেকচূড়ামণি, ২৭৮)
—তমোগুণ রজঃ ও সত্ত্বগুণের দ্বারা, রজোগুণ সত্ত্বগুণের দ্বারা এবং সত্ত্বগুণ শুদ্ধ চৈতন্যের দ্বারা বিনষ্ট হয়। অতএব সত্ত্বগুণ অবলম্বন করে অধ্যাস নিবৃত্ত কর।

## প্রাসঙ্গিকী

### আমার জীবনে 'উদ্বোধন'

আমি বর্তমান বর্ষ থেকে 'উদ্বোধন'-এর গ্রাহক হয়েছি। পত্রিকা নিয়মিতভাবে পাচ্ছি। দেখছি, 'উদ্বোধন' পত্রিকা জ্ঞানের ভাণ্ডার, নানারকম মণি-মাণিক্যের খনি, নানা ধরনের রচনায় সমৃদ্ধ। আমার এখন অনুতাপ হচ্ছে, কেন এতদিন 'উদ্বোধন' পত্রিকার গ্রাহক হইনি। এতদিন আমি কত রত্নই না হারিয়েছি। গত বৈশাখ (১৪০০) সংখ্যায় স্বামী প্রভানন্দের প্রবন্ধ, জ্যৈষ্ঠ ও আষাঢ় সংখ্যায় নিমাইসাধন বসুর প্রবন্ধ, স্বামী বিমলাত্মানন্দের ধারাবাহিক প্রবন্ধ, শ্রাবণ ও ভাদ্র সংখ্যায় স্বামী মাধবানন্দের ভগবৎ প্রসঙ্গ, সন্তোষকুমার অধিকারী, সান্ত্বনা দাশগুপ্ত, রামবহাল তেওয়ারীর প্রবন্ধ ও অন্যান্য রচনা পাঠ করে শুধু যে অনেক তথ্য জেনেছি তাই নয়, আমার মনের আনন্দের অনেক খোরাকও পেয়েছি। প্রতি সংখ্যার 'কথাপ্রসঙ্গে' আমাকে নতুন করে ভাবায়, পড়ে অভিভূত হই। স্বামীজীর ভারত-পরিক্রমার এত তাৎপর্য আগে জানা ছিল না।

আমার বয়স এখন ৮৫ বছর। আমি একটি উচ্চবিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক ছিলাম। জীবনের শেষপ্রান্তে পেঁাছে হঠাৎ 'উদ্বোধন'-এর সঙ্গে আমার পরিচয়। 'উদ্বোধন' শুধু আমাকে নতুন আলোই দেয়নি, নতুন জীবনও দিয়েছে।

**অজিতকুমার দত্ত**
রবীন্দ্রপল্লী, ভদ্রেশ্বর
জেলা—হুগলী

### লেখকের কথা

'উদ্বোধন'-এর শ্রাবণ, ১৪০০ সংখ্যা যথাসময়ে পেয়েছি। পত্রিকা পাঠাবার জন্য কৃতজ্ঞতা জানাই। উদ্বোধন-এ লেখার আনন্দ আলাদা। তার সঙ্গে অন্য অনেক আনন্দকে মিশিয়ে ফেলা যায় না। এবারের প্রচ্ছদ অসাধারণ তৃপ্তি দিয়েছে চোখকে। এ-সংখ্যায় দুটি রচনা বিশেষ প্রীতি অর্জন করেছে আমার—নচিকেতা ভরদ্বাজের কবিতা 'আমার বুকের মধ্যে' ও স্বামী মুক্তসঙ্গানন্দের প্রবন্ধ 'শ্রীরামকৃষ্ণ-কথিত নারদীয় ভক্তি'। অন্য রচনাগুলি আস্তে আস্তে পড়ছি।

**রত চক্রবর্তী**
আজকাল পত্রিকা
৯৬, রাজা রামমোহন রায় সরণি,
কলকাতা-৯

### প্রসঙ্গ বঙ্গাব্দ

শ্রাবণ ১৪০০ সংখ্যার প্রাসঙ্গিকী অধ্যায়ে (পৃঃ ৩৪২-৩৪৫) পরেশচন্দ্র ঘোষের জিজ্ঞাসা বঙ্গাব্দের উৎপত্তির বিষয়ে আমারও কৌতূহল রহিয়াছে। আনন্দবাজার পত্রিকার রবিবাসরীয়তে ২০ মে, ১৯৯০ 'নববর্ষে নবপঞ্জী' নামে অনিশা দত্তের একটি লেখা বেরিয়েছিল। তাতে অনিশা দত্ত লিখেছিলেন: "বাংলা সন ও হিজরী সন একই সময় আরম্ভ হয় এবং চান্দ্রমাসে বছর গণিত হতো। রাজনীতিগতভাবে বাঙলা সন চালু হয় সম্রাট আকবরের সিংহাসনে আরোহণের সময়, সেটা ১৫৫৬ খ্রীস্টাব্দ আর তখনো হিজরী সন ও বাঙলা সন সমবয়সী, বয়স ৯৬৩ চান্দ্রবছর। হিজরী সনের গণনা শুরু হয়েছিল ৬২২ খ্রীস্টাব্দে, যখন কুরাইশদের অত্যাচারে হজরত মহম্মদ মক্কা থেকে মদিনায় গমন করেন। বাঙলা সনেরও সূচনা ১৬ জুলাই একই সময়। ৬২২ খ্রীস্টাব্দ থেকে ১৫৫৬ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত হলো ৯৩২ সৌরবছর, চান্দ্রবছর হিসাবে দাঁড়ায় ৯৬৩। বঙ্গাব্দকে ঐ ৯৬৩ হিজরী বা বঙ্গাব্দের ১১ এপ্রিল থেকে বদলিয়ে নিয়ে যাওয়া হলো সৌর-বছর হিসাবে। কিন্তু হিজরী সন রয়ে গেছে চান্দ্রবছর অনুযায়ী।"

শ্রাবণ সংখ্যায় 'প্রাসঙ্গিকী' বিভাগে অশোক মুখোপাধ্যায়ের সুচিন্তিত লেখাটি পড়লাম। তিনি শঙ্খ ঘোষের মতের বিষয় উল্লেখ করেছেন। আমি তো মনে করি, খ্রীস্টাব্দের গণনা ০ খ্রীস্টাব্দ থেকেই সাহেবেরা আরম্ভ করেছে। বঙ্গাব্দের আরম্ভ যদি

কারুর জন্ম থেকে হয়ে থাকে তবে ০ থেকেই গণনা করতে হবে। শিশুর জন্ম হলেই ১ বছর বলা হয় না, ১২ মাস পূর্ণ হলেই ১ বছর হবে। এই ভাবে দেখতে গেলে ১৪০০ সালের ১লা বৈশাখ বঙ্গাব্দের নতুন শতাব্দী। কিন্তু কালিদাস মুখোপাধ্যায় কোন যুক্তি না দেখিয়েই "চতুর্দশ শতাব্দী এখনো বিদ্যমান" বলছেন। পরে তিনি বঙ্গাব্দের ইতিহাস দিয়ে আমাদের গোলমালে ফেলেছেন।

**জিতেন্দ্রমোহন গুহ**
চিত্তরঞ্জন পার্ক
নিউ দিল্লী-১১০০১৯

## উদ্বোধন-এর প্রচ্ছদ

'উদ্বোধন'-এর চলতি বর্ষের প্রতি সংখ্যার প্রচ্ছদপটে কামারপুকুরে শ্রীরামকৃষ্ণের বাসগৃহের আলোকচিত্র অতি মনোরম। প্রতিদিন সকাল-সন্ধ্যায় শ্রীশ্রীঠাকুরের বাসগৃহকে আমি ঘরে বসে প্রণাম করি। এই চিত্র যে কত পবিত্র আর ঐ গৃহ যে কত শান্তির স্থান তা নিজে বুঝি এবং অনুভব করি। সত্যিই কামারপুকুরের ঐ চিত্রটি আমাদের মনে পরম শান্তি ও স্নিগ্ধতার রেশ ছড়িয়ে দেয়। 'উদ্বোধন' ভক্তদের ঘরে ঘরে ছড়িয়ে পড়ুক, এই কামনা।

**পুষ্প সরকার**
'সুষমা নিবাস'
কুচবিহার

## পাঠকের মত

'উদ্বোধন' পত্রিকার বিগত সংখ্যাগুলির প্রতিটি রচনা ভাল লেগেছে।

জ্যৈষ্ঠ মাসের 'স্মৃতিকথা'য় হরিপ্রেমানন্দজীর 'ঐশ্বর্যময়ী মা' পড়ে অভিভূত হয়েছি। চন্দ্রমোহন দত্তের 'পুণ্যস্মৃতি'তে মা সারদা আর স্বামী সারদানন্দের অহেতুকী দয়ার প্রকাশ পাঠ করে পরম আনন্দ পেয়েছি। 'পরিক্রমা' যত বাড়ে তত ভাল লাগে। ভাদ্র সংখ্যায় সমাপ্ত বাণী ভট্টাচার্যের 'পঞ্চকেদার ভ্রমণ' পড়ে যেন আমারও পঞ্চকেদারে মানস-ভ্রমণ হলো।

বাণী মার্জিতের বিজ্ঞান-নিবন্ধে সাধারণ দেহের বিভিন্ন প্রত্যঙ্গ ও ক্রিয়ার সঙ্গে সাধক দেহের পরিবর্তিত ক্রিয়া, অবস্থা এবং তার বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা পেয়ে খুব ভাল লেগেছে। শ্রীমতী মার্জিতকে অনুরোধ, তিনি যেন এই ধরনের লেখা মাঝে মাঝে 'উদ্বোধন'-এ লিখে আমাদের জ্ঞান ও আনন্দ বৃদ্ধি করেন।

**অমিত হালদার**
বোসপাড়া, রানাঘাট
নদীয়া-৭৪১ ২০১

আমি 'উদ্বোধন'-এর একান্ত অনুরাগী পাঠক। গভীর আগ্রহের সঙ্গে স্বামী বিমলাত্মানন্দের বিশেষ রচনা "স্বামী বিবেকানন্দের ভারত-পরিক্রমা ও ধর্মমহাসম্মেলনের প্রস্তুতি-পর্ব" পড়তে পড়তে হঠাৎ একটা অভাব মনে হয়েছে—একটি মানচিত্রের। আহা—স্বামীজী তো ভারতাত্মা তথা বিশ্বাত্মারই মূর্ত বিগ্রহ! কত ভাল হয় যদি কেউ এই মানচিত্র অঙ্কনের দায়িত্ব নিয়ে আমাদের আকাঙ্ক্ষা পূরণে সক্ষম হতে পারেন। স্বামীজীর পাদস্পর্শপূত স্থান তো তীর্থই!

'উদ্বোধন'-এর আষাঢ় সংখ্যায় স্বামীজীর রাজপুতানা ভ্রমণের পর গুজরাট পরিক্রমার কথা আরম্ভ হয়েছে। জ্যৈষ্ঠ সংখ্যায় (পৃঃ ২৪৪) স্বামীজীর জয়পুরে নিবাসের বিবরণ প্রসঙ্গে আমার বিনম্র নিবেদন জানাই যে, জ্যোতির্ময়ী দেবীর একটি পুস্তকের লেখিকা-পরিচিতি এইরকম ঃ

"জন্ম ৯ মাঘ ১৩০০ সাল, জয়পুরে। জয়পুরে সামন্তরাজার সর্বোচ্চ প্রশাসনের পদে আসীন স্বর্গত সংসারচন্দ্র সেন তাঁর পিতামহ। পিতা স্বর্গত অবিনাশচন্দ্র সেনও ছিলেন জয়পুর রাজ্যের দেওয়ান।" (পুস্তকটির নাম 'সোনা রূপা নয়', প্রকাশক—আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা-৯) এই পরিচিতি অনুসারে অবিনাশচন্দ্র সেনেরই কন্যা জ্যোতির্ময়ী দেবী।

কোনরূপ সংশোধনের প্রয়োজন রয়েছে কিনা দ্বিধান্বিত হয়ে লিখছি।

**কেদারেশ্বর চক্রবর্তী**
সি. আই. টি. বিল্ডিং, রাজেন্দ্র মল্লিক স্ট্রীট
কলকাতা-৭০০ ০০৭

॥মদ্‌বিদ্যারণ্যবিরচিতঃ

# জীবন্মুক্তিবিবেক

## বঙ্গানুবাদ ঃ স্বামী অলোকানন্দ

[ পূর্বানুবৃত্তি ঃ ভাদ্র ১৪০০ সংখ্যার পর ]

অতঃপর এই প্রসঙ্গে শঙ্কা প্রদর্শন করে বলা হচ্ছে—

ননু কলাবিদ্যাস্বিব কদাচিদৌৎসুক্যমাত্রেণাপি বেদিতুমিচ্ছা সম্ভবত্যেব বিদ্বত্তাহপ্যাপাতদর্শিনঃ পণ্ডিতম্মন্যমানস্যাপ্যবলোক্যতে, ন চ তৌ প্রব্রজন্তৌ দৃষ্টৌ। অতো বিবিদিষাবিদ্বত্তে কীদৃশে বিবক্ষিতে ইতি চেৎ।

**অন্বয়**

ননু ( আচ্ছা, প্রশ্নে ), কদাচিৎ ( কখনো ), কলাবিদ্যাসু ( চিত্রাঙ্কনাদি কলাবিদ্যায় ), ঔৎসুক্যমাত্রেণ অপি ( ঔৎসুক্যবশতই ), বেদিতুম্ ( জানতে ), ইচ্ছা ইব ( ইচ্ছা হওয়ার ন্যায় ), [ ব্রহ্মবিদ্যা জ্ঞাতুম্ ইচ্ছা=ব্রহ্মবিদ্যা জানবার ইচ্ছা ], সম্ভবতি এব (সম্ভব হয়), আপাতদর্শিনঃ ( আপাতজ্ঞানী ), পণ্ডিতম্মন্যমানস্য অপি ( পাণ্ডিত্যাভিমানীরও ). বিদ্বত্তা অপি ( বিজ্ঞতা ), অবলোক্যতে ( দেখা যায় ), তৌ চ ( তাদেরকে কিন্তু ), প্রব্রজন্তৌ ( প্রব্রজ্যা অবলম্বন করেন ), ন দৃষ্টৌ ( দেখা যায় না ), অতঃ ( অতএব ), বিবিদিষা-বিদ্বত্তে (বিবিদিষা ও বিদ্বত্তার মধ্যে ), কীদৃশে ( কিরূপ অর্থ ), বিবক্ষিতে ( আকাঙ্ক্ষিত হয় ), ইতি চেৎ ( এইরূপ যদি বলা হয় )।

**বঙ্গানুবাদ**

(শঙ্কা) আচ্ছা, কখনো চিত্রাঙ্কনাদি কলাবিদ্যায় কৌতূহলবশতই জানবার ইচ্ছা হয়, সেরূপ যদি ব্রহ্মবিদ্যা জানবার ইচ্ছা জাগ্রত হয় ? আপাতজ্ঞানী পাণ্ডিত্যাভিমানীরও [ ব্রহ্ম-বিষয়ে জানবার ও বোঝবার ] বিজ্ঞতা দেখা যায়, কিন্তু তাদের প্রব্রজ্যা অবলম্বন করতে দেখা যায় না। অতএব বিবিদিষা ও বিদ্বত্তার ( জ্ঞানের ) মধ্যে কিরূপ অর্থ করা যেতে পারে ?

উচ্যতে। যথা তীব্রায়াং বুভুক্ষায়ামুৎপন্নায়াং ভোজনাদন্যো ব্যাপারো ন রোচতে, ভোজনে চ বিলম্বো ন সোঢ়ুং শক্যতে। তথা জন্মহেতুষু কর্মস্বত্যন্তমরুচির্বেদনসাধনেষু চ শ্রবণাদিষু ত্বরা মহতী সম্পদ্যতে তাদৃশী বিবিদিষা সন্ন্যাসহেতুঃ।

**অন্বয়**

উচ্যতে ( বলা হচ্ছে )। যথা ( যেরূপ ), তীব্রায়াং ( তীব্র ), বুভুক্ষায়াম্ ....... (ভোজনেচ্ছা জাগ্রত হলে), ভোজনাৎ অন্যঃ ( ভোজন ভিন্ন অন্য ), ব্যাপারঃ ( বিষয়ে ), ন রোচতে ( রুচি হয় না ), চ ( এবং ), ভোজনে ( ভোজন-বিষয়ে ), বিলম্বঃ ( অপেক্ষা ), সোঢ়ুং ( সহ্য করতে ), ন শক্যতে ( সমর্থ হয় না )। তথা ( তদ্রূপ ), জন্মহেতুষু ( জন্মলাভের কারণ ), কর্মসু ( কর্মসকলে ), অত্যন্তম্ ( নিরতিশয় ), অরুচিঃ (অরুচি), চ ( এবং ), বেদনসাধনেষু ( জ্ঞানলাভের সাধন ), শ্রবণাদিষু ( শ্রবণাদিতে ), মহতী ত্বরা ( অত্যন্ত তীব্রতা ), সম্পদ্যতে ( উৎপন্ন হয় )। তাদৃশী ( সেইপ্রকার ), বিবিদিষা ( বিবিদিষা ), সন্ন্যাসহেতুঃ ( সন্ন্যাসের হেতু )।

**বঙ্গানুবাদ**

( সমাধান ) উত্তরে বলা হচ্ছে। যেরূপ তীব্র ভোজনেচ্ছা জাগ্রত হলে ভোজন ভিন্ন অন্য বিষয়ে রুচি হয় না এবং ভোজনে বিলম্ব সহ্য হয় না, তদ্রূপ জন্মলাভের কারণস্বরূপ কর্মসকলে অত্যন্ত বিরক্তি এবং জ্ঞানলাভের সাধন শ্রবণাদিতে অত্যন্ত আগ্রহ উৎপন্ন হয়। সেই প্রকার বিবিদিষা অর্থাৎ [ব্রহ্মকে] জানবার ইচ্ছাই সন্ন্যাসের হেতু।

বিদ্বত্তায়া অবধিরুপদেশসাহস্র্যামভিহিতঃ—
"দেহাত্মজ্ঞানবজ্‌জ্ঞানং দেহাত্মজ্ঞানবাধকম্।
আত্মন্যেব ভবেদ্‌যস্য স নেচ্ছন্নপি মুচ্যতে" ইতি।

**অন্বয়**

বিদ্বত্তায়াঃ ( জ্ঞানের ), অবধিঃ ( সীমা ), উপদেশসাহস্র্যাম্ ( উপদেশসাহস্রী গ্রন্থে ), অভিহিতঃ ( বলা হয়েছে ), যস্য ( যাঁর ), দেহাত্মজ্ঞানবৎ ( দেহাত্মজ্ঞানের ন্যায় ), দেহাত্মজ্ঞানবাধকম্ (দেহাত্মজ্ঞানের বাধক ), জ্ঞানম্ ( জ্ঞান ), আত্মনি এব ( আত্মাতেই ), ভবেৎ ( হয় ), সঃ ( তিনি ), ন ইচ্ছন্

অপি (অনিচ্ছুক হয়েও), মুচ্যতে (মুক্ত হয়ে যান)।

বঙ্গানুবাদ

জ্ঞানের সীমা সম্বন্ধে উপদেশসাহস্রী গ্রন্থে বলা হয়েছে ঃ

(অজ্ঞানীর) যেমন দেহে 'আমি'-বুদ্ধি দৃঢ় হয়, সেরূপ আত্মাতে যখন কারও 'আমি'-বুদ্ধি দৃঢ় হয় তখন সে-ব্যক্তির দেহাত্মবুদ্ধির বাধকজ্ঞান উৎপন্ন হয় অর্থাৎ তাঁর 'দেহই আমি'—এই বুদ্ধির নাশ হয়ে যায়। তখন সে-ব্যক্তি মুক্তির ইচ্ছা না করলেও মুক্ত হয়ে যান।

শ্রুতাবপি—

"ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থিশ্ছিদ্যন্তে সর্বসংশয়াঃ।
ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্মাণি তস্মিন্ দৃষ্টে পরাবরে॥"

অন্বয়

শ্রুতৌ অপি (শ্রুতিতেও বলা হয়েছে)—তস্মিন্ (সেই), পর-অবরে (পর-অবর, কার্য ও কারণ), দৃষ্টে (দৃষ্ট হলে), অস্য (সাধকের), হৃদয়গ্রন্থিঃ (অন্তর্স্থিত বাসনার গ্রন্থি), ভিদ্যতে (বিনষ্ট হয়), সর্বসংশয়াঃ (আত্মবিষয়ক সকল প্রকার সংশয়), ছিদ্যন্তে (ছিন্ন হয়), চ (এবং), কর্মাণি (কর্মসকল), ক্ষীয়ন্তে (ক্ষয় হয়ে যায়)।

বঙ্গানুবাদ

শ্রুতিতেও বলা হয়েছে—

"সেই কার্য ও কারণস্বরূপ ব্রহ্মসত্তার অনুভব হলে সাধকের অন্তর্স্থিত বাসনা-গ্রন্থি বিনষ্ট হয়, আত্ম-বিষয়ক সংশয়সকল ছিন্ন হয় এবং (প্রারব্ধ ব্যতীত) কর্মসকল ক্ষয় হয়ে যায়।"

(মুণ্ডক উপনিষদ্, ২।২।৮)।

পরমপি হৈরণ্যগর্ভাদিকং পদমবরং যস্মাদসৌ পরাবরঃ, হৃদয়ে বুদ্ধৌ সাক্ষিণস্তাদাত্ম্যাধ্যাসোঽনাদ্যবিদ্যানির্মিতত্বেন গ্রন্থিবদ্ দৃঢ়সংশ্লেষরূপত্বাদ্ গ্রন্থিরিত্যুচ্যতে। আত্মা সাক্ষী বা কর্তা বা, সাক্ষিত্বেঽপ্যস্য ব্রহ্মত্বমস্তি বা ন বা, ব্রহ্মত্বেঽপি তদ্ বুদ্ধ্যা বেদিতুং শক্যং বা ন বা, শক্যত্বেঽপি তদ্বেদনমাত্রেণ মুক্তিরস্তি ন বা, ইত্যাদয়ঃ সংশয়াঃ কর্মাণ্যনারব্ধান্যাগামিজন্মকারণানি, তদেতদ্ গ্রন্থ্যাদিত্রয়মবিদ্যানির্মিতত্বাদাত্মদর্শনেন নিবর্ততে।

অন্বয়

হৈরণ্যগর্ভাদিকং পদম্ (হিরণ্যগর্ভ প্রভৃতি পদ), পরম্ অপি (শ্রেষ্ঠ হয়েও), যস্মাৎ (যে-অবস্থা থেকে), অবরং (নিকৃষ্ট), অসৌ পরাবরঃ (সেই পরাবরস্বরূপ), হৃদয়ে বুদ্ধৌ (হৃদয়ে অর্থাৎ বুদ্ধিতে), সাক্ষিণঃ (সাক্ষী আত্মার), অনাদি-অবিদ্যানির্মিতত্বেন (অনাদি অবিদ্যাসৃষ্ট), তাদাত্ম্য-অধ্যাসঃ (একাত্ম অধ্যারোপ), গ্রন্থিবৎ (গ্রন্থির ন্যায়), দৃঢ়সংশ্লেষরূপত্বাৎ (দৃঢ় সংযোগহেতু), গ্রন্থিঃ (গ্রন্থি), ইতি উচ্যতে (এইরূপ বলা হয়েছে), আত্মা (আত্মা), সাক্ষী বা (সাক্ষী), কর্তা বা (অথবা কর্তা), সাক্ষিত্বে অপি (সাক্ষিত্ব হলে), অস্য (এর), ব্রহ্মত্বম্ (ব্রহ্মত্ব), অস্তি বা (আছে), বা (অথবা), ন (নেই), ব্রহ্মত্বে অপি (ব্রহ্মত্ব থাকলে), বুদ্ধ্যা (বুদ্ধি দ্বারা), তৎ (তা), বেদিতুম্ (জানতে), শক্যম্ বা (সমর্থ), বা (অথবা), ন (নয়), শক্যত্বে অপি (সমর্থ হলেও), তৎ (তা), বেদনমাত্রেণ (জ্ঞাত হওয়া মাত্র), মুক্তিঃ (মুক্তি), অস্তি (হয়), ন বা (অথবা হয় না), ইত্যাদয়ঃ (এরূপ), সংশয়াঃ (সংশয়সকল), অনারব্ধানি (অনারব্ধ), আগামিজন্মকারণানি (আগামী জন্মের কারণস্বরূপ), কর্মাণি (কর্মসকল), তৎ (সেই), এতৎ (এই), গ্রন্থ্যাদিত্রয়ম্ (গ্রন্থি, সংশয় ও কর্ম-ত্রয়ী), অবিদ্যানির্মিতত্বাৎ (অবিদ্যা থেকে উদ্ভূত বলে), আত্মদর্শনেন (আত্মসাক্ষাৎকার দ্বারা), নিবর্ততে (নিবৃত্ত হয়)।

বঙ্গানুবাদ

হিরণ্যগর্ভ প্রভৃতি পদ পর অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ হয়েও যে-অবস্থার নিকট অবর অর্থাৎ নিকৃষ্ট তা হলো পরাবরস্বরূপ ব্রহ্ম। হৃদয়ে অর্থাৎ বুদ্ধিতে সাক্ষি-স্বরূপ আত্মার তাদাত্ম্যাধ্যাস অর্থাৎ 'আমিই বুদ্ধি' এরূপ ভ্রমজ্ঞান তা অনাদি-অবিদ্যার সৃষ্ট বলে গ্রন্থির ন্যায় অত্যন্ত দৃঢ়ভাবে বর্তমান, এজন্য একে গ্রন্থি বলা হয়েছে। আত্মা সাক্ষী অথবা কর্তা, সাক্ষী হলে তার ব্রহ্মত্ব আছে অথবা নেই, ব্রহ্মত্ব থাকলে বুদ্ধি দ্বারা জানা যায় অথবা জানা যায় না, বুদ্ধি দ্বারা জানতে সমর্থ হলেও তা জ্ঞাত হওয়া মাত্র মুক্তি হয় অথবা হয় না—এরূপ সংশয়সকল; এবং অনারব্ধ আগামী জন্মের কারণস্বরূপ কর্মসকল—এই ত্রয়ী অর্থাৎ গ্রন্থি, সংশয় ও কর্ম অবিদ্যা থেকে উৎপন্ন বলে আত্মসাক্ষাৎকার দ্বারা এর নিবৃত্তি হয়। [ক্রমশঃ]

বিশেষ রচনা

# তত্র সর্বাণি তীর্থানি

## সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়

বর্তমান নিবন্ধটি লোকমাতা রানী রাসমণির জন্মের দ্বিশতবার্ষিকী উপলক্ষে প্রকাশিত হলো।—সম্পাদক, উদ্বোধন

ঠাকুর বলেছিলেন, রানী রাসমণি জগদম্বার অষ্ট সখীর এক সখী; তাঁর পূজার প্রচারের জন্যে এসেছিলেন, এসেছিলেন তাঁর মহিমা প্রচারের জন্যে। দুশো বছরের পারে এসে আমরা যোগ করছি—ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ যা বলেছেন তা যথার্থ এবং অভ্রান্ত; এছাড়াও আরও কিছু, তা হলো—রাসমণি ছিলেন নারীর আধুনিক রূপের এক আদর্শ, চির-কালের অনুকরণযোগ্য একটি মডেল। ঠাকুর দেখিয়ে গেলেন, ধর্ম কি। সমস্ত সংস্কারমুক্ত আদর্শ হিন্দুধর্মকে পুনঃপ্রতিষ্ঠা করে গেলেন। জীবের মধ্যে শিবকে প্রত্যক্ষ করতে বললেন। বললেন: "যত মত তত পথ"। বেদান্তের আধুনিক রূপ তিনি খুলে দিলেন। সেই আলো-হাতে স্বামীজী উঠে দাঁড়ালেন বিশ্বধর্মমহাসম্মেলনের মঞ্চে। ভারতধর্ম হয়ে গেল বিশ্বধর্ম।

আর এই ধর্ম যে-বেদিতে প্রতিষ্ঠিত হবে, সেই বেদিটি নির্মাণ করে মার্জনা করেছিলেন রানী রাসমণি। সাড়ম্বরে সামান্য একটি মন্দির তিনি প্রতিষ্ঠা করেননি। তিনি ইতিহাসের প্রয়োজনে ইতিহাস রচনা করতে এসেছিলেন। তিনি মানবী; কিন্তু তাঁকে এখানে পাঠিয়েছিলেন মহাকালের কর্ত্রী। তাঁকে আমরা কালীও বলতে পারি; কারণ কালকে যিনি কলন করেন তিনিই কালী। তা না হলে দুশো বছর আগে বাংলার অখ্যাত এক গ্রামে, অখ্যাত এক পরিবারে তাঁর আবির্ভাব, তাঁর বিকাশের ধারার কোন ব্যাখ্যা খুঁজে পাওয়া কঠিন।

মহাকালের ঐ পাদে ইতিহাস যে-পথে মোড় নেবে তা ঠিক করাই ছিল। প্রয়োজনীয় চরিত্রগুলি একে একে এসে গেল। আদর্শ গ্রন্থে নেই, উপদেশে নেই। আদর্শ আছে জীবনে। কর্মে তার প্রতিফলন। জীবনকে অনুসরণ করে গ্রন্থ। ধর্মও মানুষকে কেন্দ্র করে, ইতিহাসও তাই। যেমন মূর্তি দেবতা নয়, দেবতা হলেন মানুষের মন, মানুষের ভাবনা, মানুষের জীবনদর্শন। দেব অথবা দেবীমূর্তিতে ঘনীভূত হয়ে আছে ইতিহাস, জীবনমুখী আদর্শ, ত্যাগ, বৈরাগ্য, তিতিক্ষা, নির্ভরতা, শান্তি, সভ্যতা। সভ্যতার ইতিহাসকে হাজার হাজার বছর গড়াতে দিয়ে কাল হঠাৎ থমকে দাঁড়াল পর্যালোচনার জন্যে। এইবার মানুষকে ভাবতে হবে—জীবনের সঙ্গে ধর্মের সমন্বয় কিভাবে হবে, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির সঙ্গে ধর্মের মিলন হবে মানবজীবনের কোন্ ভূমিতে দাঁড়িয়ে। এই পরীক্ষা হবে কোথায়? হবে প্রাচ্যে। গঙ্গাতীর-বর্তী অখ্যাত এক গ্রামে। এই সমন্বয়কারী ধর্মের ভিত্তি কে নির্ধারণ করবেন? অখ্যাত এক রমণী।

শ্রীচৈতন্য এসেছিলেন নবদ্বীপে। মানবকল্যাণে সেই কালে প্রয়োজন ছিল দুটি অস্ত্রের—প্রেমভক্তি ও বিদ্রোহের। বিদ্রোহ কেন? অত্যাচারীর অশুভ শক্তির নিয়ন্ত্রণে প্রেম নয়, প্রয়োজন বিদ্রোহের। সংস্কার যদি বন্ধনের কারণ হয়, নিপীড়নের কারণ হয়—সে শাস্ত্রের অনুশাসনই হোক আর রাজাদেশই হোক, বিদ্রোহে চুরমার করে দিতে হবে। সংস্কার না হলে প্রতিষ্ঠা হয় না। এই প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথকে উদ্ধৃত না করে পারা যাবে না—

> "দেবতা এলেন পর-যুগে
> মন্ত্র পড়লেন দানব দমনের
> জড়ের ঔদ্ধত্য হলো অভিভূত
> জীবধাত্রী বসলেন শ্যামল আস্তরণ পেতে।
> উষা দাঁড়ালেন পূর্বাচলের শিখরচূড়ায়,
> পশ্চিমসাগরতীরে সন্ধ্যা নামলেন মাথায়
> নিয়ে শান্তিঘট।" ['পৃথিবী']

মহাপ্রভু বলছেন: "পাষণ্ডী সংহারিতে মোর এই অবতার / পাষণ্ডী সংহারি ভক্তি করিমু প্রচার॥" বিশাল শরীর, সিংহের মতো বিক্রম, প্রবল হুঙ্কার, আবার কুসুমের মতো কোমল, সংকীর্তনানন্দে বিভোর, দরবিগলিতাশ্রু। সংকীর্তন-মণ্ডপে প্রবেশ করে কাজি মৃদঙ্গ ভেঙে, সব লণ্ডভণ্ড করে ফতোয়া জারি করলেন—নবদ্বীপে তাঁর চৌহদ্দিতে নাম-সংকীর্তন চলবে না। নিষেধ অমান্যকারীকে বেত্রাঘাত করা হবে। হিন্দুরাও এসে নালিশ করে গেল—এ কি বিধর্মিতা! ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর, কালী, তারা, দুর্গা ভেসে গেল, দিবারাত্র কেবল কৃষ্ণ কৃষ্ণ। এ পাপ কবে যাবে! গয়া থেকে ফিরে

এসে এ যে বড় বাড়াবাড়ি করছে, কাজিসাহেব।

মহাপ্রভু সব শুনে হুংকার ছাড়লেন, তাই না কি। তাহলে চলো সবাই, পাষণ্ডী সংহারি। নবদ্বীপের সমস্ত গৃহে আজ রাতে জ্বলবে আলো। যেখানে যত খোল আর করতাল আছে নিয়ে এসো। জ্বালাও মশাল।

"লক্ষকোটি দীপ সব চতুর্দিকে জ্বলে।
লক্ষকোটি লোক চারিদিগে হরি বোলে ॥

*

করতাল মন্দিরা সভার শোভে করে।
কোটি সিংহ জিনিয়া সভেই শক্তি ধরে ॥"

বৃন্দাবনদাস লিখছেন: "ক্রোধে হইলেন প্রভু রুদ্রমূর্তিধর।" আজ আমি কাজির ঘরদ্বার সব পুড়িয়ে দেব। মহামিছিল। মহাকীর্তন। সমগ্র নবদ্বীপবাসী নেমে পড়ছেন পথে। আলোয় আলোময়। নেতা শ্রীচৈতন্য। বৃন্দাবনদাস বলছেন: "কি শোভা হইল সে বলিতে শক্তি কার।" প্রবল বন্যায় কাজি ভেসে গেলেন। পরাভূত হলেন।

মহাপ্রভু এক হাতে প্রেম অন্য হাতে আধ্যাত্মিক শক্তি বিকিরণ করেছেন। আধ্যাত্মিক শক্তির দুটি দিক—দুটি ফলা। এক ফলায় নিজের তামস কাটে, তমোগুণ নাশ করে। আর এক ফলায় বাইরের অশুভ, বিরোধী শক্তিকে খানখান করে। সেখানে অদ্ভুত এক অহংকারের প্রকাশ যাকে অনেক সময় রজোগুণ বলে ভুল হতে পারে, ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ যাকে বলছেন, সত্ত্বের অহঙ্কার। অহঙ্কার খারাপ। অহঙ্কারেরও তিনটে সত্তা। তম, রজ এবং সত্ত্ব। ঠাকুর বলছেন, সাত্ত্বিক আমি-র যে অহঙ্কার, সেই অহঙ্কার ভাল। মাথা নত করব একমাত্র তাঁর কাছে, আর কারো কাছে নয়। ঠাকুরের সেই সাপের গল্প। ছোবল মারতে বারণ করেছি, ফোঁস করতে তো বারণ করিনি। আধ্যাত্মিকতা মানুষকে ক্লীব করবে না, করবে চাবুক। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীরাম, মহাপ্রভু, শ্রীরামকৃষ্ণ, যীশু, স্বামীজী সব একধারা। অনন্য শক্তির আণবিক বিস্ফোরণ। জীবসত্তার নিউক্লিয়াসকে আধ্যাত্মিক শক্তি দিয়ে বিদ্ধিণ্ট করতে পারলেই সেই ভয়ংকর শক্তির উন্মোচন। গীতায় বর্ণনা আছে। অর্জুন দেখেছিলেন, ভগবান দর্শন করিয়েছিলেন কৃপা করে—

"অনাদিমধ্যান্তমনন্তবীর্য-
মনন্তবাহুং শশিসূর্যনেত্রম্।
পশ্যামি ত্বাং দীপ্তহুতাশবক্ত্রং
স্বতেজসা বিশ্বমিদং তপন্তম্ ॥"

পরীক্ষামূলক প্রথম আণবিক বিস্ফোরণ দেখে বৈজ্ঞানিকেরা অভিভূত হয়ে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় এর উপমা খুঁজেছিলেন—"ব্রাইটার দ্যান থাউজ্যান্ড সানস"।

রাসমণির প্রসঙ্গে এত কথা আসছে কেন? তিনি কি অবতার ছিলেন? না। তিনি ছিলেন সামান্য এক নারী। হালিশহরের দরিদ্র এক পরিবারে তাঁর আবির্ভাব। কিন্তু যে-শক্তি শ্রীরামকৃষ্ণ-অবতার হিসাবে আবির্ভূত হবেন, তিনি ছক সাজাচ্ছিলেন। ছকটা এত বড়, খেলাটা এত জমজমাট হবে যে, প্রথমদিকে বোঝার উপায় ছিল না কোন্ চরিত্র কোথায় কেন আসছেন। ঝড় আসার আগে একটা নিম্নচাপ তৈরি হয়। আকাশ মেঘাচ্ছন্ন, দ্রুত বাতাস, অবশেষে প্রবল ঝড়। সেই ঝড় তার গতিপথে কাকে কাকে সঙ্গী করবে, ঝড় চলে না গেলে খতিয়ে দেখা অসম্ভব।

মহাপ্রভু নবদ্বীপে অবতরণ করলেন। পুঞ্জীভূত হতে থাকল শক্তি। নবদ্বীপ তুলকালাম করে বেরিয়ে পড়ল চৈতন্যের রেলগাড়ি। মানুষের দীনতা, ক্ষীণতা, সংকীর্ণতা, সংস্কার, বিশ্বাস সব উড়ে গেল ঝড়ে এঁটোপাতার মতো। সব বেবাক উড়ে চলে গেল। প্রসন্নপ্রাতে মানুষ বেরিয়ে এল দাওয়ায়। "নবাঙ্কুর ইক্ষুবনে এখনো ঝরিছে বৃষ্টিধারা।" সেই ধারা হলো নতুন ধর্ম, নতুন বিশ্বাস, সাহিত্য, শিল্প, সংস্কৃতি, প্রেম, ভক্তি। সেই প্রবল বাতাসে প্রকৃতি হলো দূষণমুক্ত। এই ঝড়ের আরোহী কারা ছিলেন। হোমড়াচোমড়া তেমন কেউ নয়। শ্রীদাম, সুদাম, বলরামের মতোই সামান্য মানুষ। রাঢ়ের একচাকা গ্রামের নিত্যানন্দ। শ্রীবাস দিলেন তাঁর অঙ্গন খুলে। গৌরাঙ্গের দরবার।

এইখানে একটা কথা আছে, মহাপ্রভু অবতার। তিনি শক্তিপুঞ্জ। সেই শক্তির প্রকাশ বৃন্দাবনদাস বর্ণনা করেছেন:

"মধ্যখণ্ডে কাজির ভাঙ্গিয়া ঘরদ্বার।
নিজশক্তি প্রকাশিয়া কীর্তন অপার ॥

পলাইলা কাজি প্রভু গৌরাঙ্গের ডরে।
স্বচ্ছন্দে কীর্তন করে নগরে নগরে ॥"

কিন্তু যবন হরিদাসের শক্তি কোথা থেকে এল? কোন্ গোমুখী থেকে? সেই একই ফাউণ্টেন হেড। আধ্যাত্মিকতা। তোমারি নাম নিতে নিতে।

"কৃষ্ণের প্রসাদে হরিদাস মহাশয়।
যবনের কি দায় কালের নাহি ভয় ॥
কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলিয়া চলিলা সেইক্ষণে
মুলুকপতির আগে দিল দরশনে ॥"

মুলুকপতি কাজী বললেন: "কৃষ্ণ নাম ছাড়। তুমি যবন। তোমার ধর্ম আলাদা।" ধর্ম আবার আলাদা হয় কি করে। রঙ-বেরঙের জামা, হরেক কায়দায় কাটা। কাপড় তো সেই একই সুতোয় বোনা। মূলে সেই তুলা। শোন কাজী, সারকথা—

"শুন বাপ সবারই একই ঈশ্বর ॥
নাম মাত্র ভেদ কহে হিন্দুয়ে যবনে।
পরমার্থে এক কহে কোরানে পুরাণে ॥
এক শুদ্ধ নিত্যবস্তু অখণ্ড অব্যয়।
পরিপূর্ণ হৈয়া বৈসে সবার হৃদয় ॥"

ভোলা ময়রা আসরে অ্যান্টনিকে আক্রমণ করেছেন জাত তুলে—"ওরে ফিরিঙ্গি জবরজঙ্গি পারবে না মা তরাতে।/তুই যীশুখ্রীষ্ট ভজগে যারে শ্রীরামপুরের গির্জেতে ॥" অ্যান্টনি হেসে হেসে উত্তর দিচ্ছেন: "শুরুতে সব ভিন্ন ভিন্ন, অন্তিমে সব একাঙ্গী।" আর লালন? তিনিও বললেন সেই এক কথা:

"সব লোকে কয় লালন কি জাত সংসারে।

*

ছুন্নত দিলে হয় মুসলমান,
নারীলোকের কি হয় বিধান?
বামন যিনি পৈতার প্রমাণ,
বামনী চিনি কি ধরে ॥
কেউ মালা, কেউ তসবি গলায়,
তাইতে কি জাত ভিন্ন বলায়,
যাওয়া কিংবা আসার বেলায়
জেতের চিহ্ন রয় কার রে ॥"

হরিদাসের কথায় কাজীর বোধোদয় সম্ভব নয়। সেই পরশমণির ছোঁয়া তিনি পাননি। সেই কৃপা। "যৎকৃপা তমহং বন্দে পরমানন্দমাধবম্।" কাজী বলেছিলেন: "বাইশ বাজারে বেড়ি মারি।/প্রাণ লহ আর কিছু বিচার না করি ॥" পাইকরা চাবুক মারছে। "দুই তিন বাজারে মারিলে লোক মরে।/ বাইশ বাজারে মারিলাম যে ইহারে ॥ মরেও না আরও দেখি হাসে ক্ষণে ক্ষণে।"

ধর্ম মানুষকে এই সহনশীলতা, এই সাহস, উপেক্ষার এই শক্তি যোগায়। জীবশরীরে আলাদা একটা মেরুদণ্ডের সংযোগ ঘটায়। যীশুও তাঁর অনুগামীদের এই কথাই বলতেন। অতুলনীয় সেই উপদেশ। দেওয়ালে লিখে রাখার মতো: "They were to die to live, lose to find, give to gain." আর এই সত্যেরই প্রতীক আমার 'Cross'। "If any man will come after me, let him deny himself and take up his cross daily and follow me."

হরিদাস সেই পথেই মহাপ্রভুকে অনুসরণ করেছিলেন, নিবেদিতা করেছিলেন স্বামী বিবেকানন্দকে। রাসমণি সেই পথেই এসেছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণের বৃত্তে। আগে-পরের প্রশ্ন সম্পূর্ণ অবান্তর। এ কোন সাধারণ জাগতিক ব্যাপার নয়। এখানে কাল অচল। এলিয়টকে উদ্ধৃত করা যায়, বড় চমৎকার সহজবোধ্য কয়েকটি লাইনে:

"Time present and time past
Are both perhaps present in time future
And time future contained in time past
If all time is eternally present
All time is unredeemable."

বিশ্বরূপ দর্শন করে অর্জুন শ্রীকৃষ্ণকে জিজ্ঞেস করছেন: 'আপনি কে?'

'আমি কে? "কালোঽস্মি লোকক্ষয়কৃৎ প্রবৃদ্ধো।" আমি প্রবৃদ্ধ কাল।'

'তাহলে তো আপনি "অনাদিমধ্যান্তম্"। আদি, মধ্য, অন্ত কোনটাই নন।'

সেই একই বিশেষে নিত্যানন্দ মহাপ্রভুর আট বছর আগে এসেছিলেন। প্রথম জীবনে ছিলেন তান্ত্রিক সন্ন্যাসী। হয়ে গেলেন পরম বৈষ্ণব। শুধু বৈষ্ণবই হলেন না, মহাপ্রভুর ভাবধারার একটা জোয়ার এনে দিলেন বঙ্গদেশে। রাসমণি শ্রীরামকৃষ্ণের প্রায় ৪৩ বছর (রানী রাসমণির জন্ম ২৬ সেপ্টেম্বর ১৭৯৩; শ্রীরামকৃষ্ণের ১৮ ফেব্রুয়ারি, ১৮৩৬) আগে এসেছিলেন। সুন্দরী মেয়ের বড়লোকের

নজরে পড়ে পুত্রবধূ হওয়ার ঘটনাকে আমাদের সংস্কারে বলে ভাগ্য। আগে এমন হতো। এখনো এমন হয়। তাঁর আবির্ভাবের ৬২ বছর পরে জানা গেল কে তিনি, কেন তিনি এবং কোন্ লীলার তিনি সহচরী। এই ৬২ বছরের সময়সীমায় তিনি আরও ধনী হয়েছেন। স্বামীকে হারিয়েছেন, আবার জামাতা হিসাবে এমন একজনকে পেয়েছেন যিনি রামকৃষ্ণদেবের 'রসদ্দার' হবেন। দুজনের কেউই জানেন না, মধ্য ঊনবিংশ শতাব্দীতে কোন্ ঘূর্ণীতে তাঁরা আকৃষ্ট হবেন, কোন্ বাতাস লাগবে তাঁদের মহাজনী পালে। যতক্ষণ না মঞ্চে শ্রীগদাধর চট্টোপাধ্যায় আসছেন, ততক্ষণ পর্যন্ত তাঁরা জমিদার। ইংরেজের কলকাতায় তাঁরা চকমেলানো বাড়িতে—লোকজন, পাইক, বরকন্দাজ নিয়ে বসে আছেন। আর জানা যাচ্ছে, রাসমণি ধার্মিক, তেজস্বিনী, সৎক্রিয়াশীলা, একজন 'এবল অ্যাডমিনিস্ট্রেটার'। স্বামী রাজচন্দ্রের অকালমৃত্যুর পর আশঙ্কা জেগেছিল—রাসমণি কি পারবেন এই অতুল বৈভব সামলাতে? প্রিন্স দ্বারকানাথ প্রস্তাব দিলেন, 'রানীর ইচ্ছা থাকলে রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব আমি নিতে পারি'। 'কালীপদ-অভিলাষী' রানী রাসমণি জানালেন, যা সামান্য বিষয়কর্মাদি আছে, তা তাঁর জামাতা মথুরামোহনের সাহায্যেই তিনি চালাতে পারবেন। এ হলো তাঁর আত্মবিশ্বাস, দৃঢ়তা আর দূরদর্শিতার একটি দিক।

দ্বিতীয় দিক—তাঁর চরিত্রের অনমনীয়তা, সততা আর আধ্যাত্মিকতা। সাত্ত্বিকতার আধারে রজোগুণের ফোঁস। প্রকাশ—ইংরেজ সরকারের দলননীতির সামনে তিনি মাথা তুলে দাঁড়ান। ফণা বিস্তার। নিজের আত্মগরিমাকে খাটো না করা। তোমার হাতিয়ার ক্রাউন, আমার হাতিয়ার ন্যায়নীতি। যা অন্যায়, যা অত্যাচারের সামিল তার বিরুদ্ধে আমি দাঁড়াব। কিভাবে লড়াইটা হবে? হাতিয়ার? বুদ্ধি। ইংরেজীতে বললে বলতে হবে—'কানিং'। তোমার আইন দিয়েই তোমাকে পরাস্ত করব। ইংরেজ সরকার রানীর কূটচালে পরাভূত হয়েছিলেন। গঙ্গার বিস্তীর্ণ এলাকায় মৎস্যজীবীরা রানীর কৃপাতেই বিনা করে মাছ ধরার সুযোগ পেয়েছিলেন। সবাই বলতে লাগলেন:

"ধন্য রানী রাসমণি রমণীর মণি।
বাঙ্গলায় ভাল যশ রাখিলেন আপনি॥
দীনের দুঃখ দেখে কাঁদিলে জননী।
দিয়ে ঘরের টাকা পরের জন্যে বাঁচালে পরাণি॥"

যেখানে আইনের কূটচাল অচল, সেখানে রানী খড়্গহস্ত। ফ্রী-স্কুল স্ট্রিটের গোরা সৈন্যরা মত্ত অবস্থায় রাসমণির বাড়ি আক্রমণ করেছিল। রানী হাতে খাঁড়া তুলে নিয়েছিলেন। স্বামীজী হিন্দু-রমণীর মধ্যে এই বীরত্ব, এই স্বয়ম্ভরতাই দেখতে চেয়েছিলেন। বিজ্ঞান বলছে 'কজ অ্যান্ড এফেক্ট'। অর্থাৎ কী কারণে কী ঘটছে। রাসমণি প্রকৃতই 'কালীপদ-অভিলাষী' হয়েছিলেন। তা না হলে চরিত্রে এমন বিচক্ষণতা ও বীর্যের সমন্বয় ঘটত না। স্বামীজী বলছেন, সর্বশক্তিমত্তা, সর্বব্যাপিতা, অনন্ত দয়া—সেই জগজ্জননী ভগবতীর গুণ। তিনিই কালী। তাঁকে আরাধনা করলে সেই গুণাবলীর অংশীদার হওয়া যায়। রানী রাসমণির চরিত্রে সেই লক্ষণ প্রস্ফুটিত।

রাজশক্তিকে অর্থে, প্রতিরোধে বশীভূত করা যায়; কিন্তু হিন্দু পুরোহিতদের কুসংস্কার আর সেই সংস্কারজনিত নিপীড়ন হাত থেকে মুক্তির উপায়। ইংরেজীতে বলে, 'কাস্টমস ডাই হার্ড'। মরতে চায় না, সরতে চায় না। হিন্দুধর্মের এই অচলায়তন মহাপ্রভু ও স্বামীজী ভাঙতে চেয়েছিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণ উপেক্ষা করেছিলেন। পাত্তা দেননি। তিনি ভগবান শ্রীকৃষ্ণের মতো বলতে চেয়েছিলেন:

"মন্মনা ভব মদ্ভক্তো মদ্‌যাজী মাং নমস্কুরু।
মামেবৈষ্যসি সত্যং তে প্রতিজানে প্রিয়োঽসি মে॥"

আমার কাছে এস, আমাকে দেখ, অনুসরণ কর, আমার কথা শোন। নতুন বিশ্বাস, ধর্ম, অনুশাসন আপনিই তৈরি হবে। আলো আসতে দাও। একটা দেশলাই কাঠি জ্বাললে হাজার বছরের অন্ধকার নিমেষে চমকে উঠবে। বলেছিলেন: "হাটে হাঁড়ি ভেঙে দিয়ে যাব।" জীবনের শেষ বেলায়, জলের বিম্ব জলেতে মেলাবার প্রাক্‌মুহূর্তে বলেছিলেন: "যিনি রাম, যিনি কৃষ্ণ, তিনিই ইদানীং এই দেহে রামকৃষ্ণ।"

রাসমণি আর মাত্র ছয়বছর পরে চলে যাবেন। স্বপ্নাদিষ্ট মন্দির নির্মিত হয়েছে। ভবতারিণী

বেদিতে স্থাপিত। কে প্রতিষ্ঠা করবে? মৃন্ময়ীকে চিন্ময়ী করবে কে? পুরোহিতকুল এক দুর্লঙ্ঘ্য বাধা। হিন্দুধর্মের জাতিভেদ প্রথা পথ আগলে আছে। ব্রাহ্মণ পুজারী সেবার ভার নেবে না, অন্নভোগ হবে না।

গদাধর বসে আছেন ঝামাপুকুরে, দাদার টোলে। পূর্ণ যুবক। রানীর সমস্যার সমাধান দিলেন রামকৃষ্ণাগ্রজ রামকুমার। মঞ্চে প্রবেশ করলেন গদাধর। এই ভূমিতেই তিনি হবেন শ্রীরামকৃষ্ণ। প্রথমে তিনি দর্শক। সংশয়ান্বিত। দেখছেন, পরীক্ষা করছেন—এই সেই সাধনপীঠ কিনা। এই রাসমণিই কি সেই অষ্ট সখীর এক সখী। এই কি সেই শ্রীবাস-অঙ্গন। বিত্ত-বৈভব দেখছেন। বড় মানুষের জামাইটিকে দেখছেন। অগ্রজ রামকুমারের বৈধী সেবা দেখছেন। তিনি যেমন দেখছেন, মা ভবতারিণীও তাঁকে দেখছেন। তখনো তিনি রাসমণির কালী। রামকৃষ্ণ তাঁর কোলে চড়ে বসেননি।

ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ হিন্দুর দশবিধ সংস্কারে বিশ্বাসী ছিলেন। ব্রাহ্মণের পালনীয় কর্মাদি সম্পর্কে তখনো তিনি সচেতন। সর্বাধিক যা মানতেন তা হলো আহারশুদ্ধি। সেই কারণে দাদা রামকুমার জগদম্বার অন্নভোগ গ্রহণ করলেও প্রথমে তিনি তা করেননি। পিতার সংস্কার তখনো তাঁর মনে—অশূদ্রযাজিত্ব, অপরিগ্রাহিত্ব।

মা ভবতারিণী দেখছেন, যুবক গদাধর দূরে সরে আছে। বাগানে আছে, মন্দির-চাতালে আছে, গঙ্গার ধারে আছে। চিন্তায় আছে, সংশয়ে আছে। ঝামাপুকুরের টোল উঠে যাবার দুশ্চিন্তায় আছে। মা ভবতারিণী তাঁকে লম্বা সুতো দিয়ে রেখেছেন। বড় মাছ একটু খেলিয়ে তুলতে হয়।

ঘটনার যদি ব্যাখ্যা খুঁজতে হয়, তাহলে দুটো পথ আছে—স্থূল এবং সূক্ষ্ম। স্থূলমার্গে দুটি মাত্রা—কার্য এবং কারণ। সূক্ষ্ম ব্যাখ্যা অন্য রকম, জড়বাদীদের পছন্দ হবে না। সেখানে আছে—"সকলি তোমারি ইচ্ছা, ইচ্ছাময়ী তারা তুমি, / তোমার কর্ম তুমি করো মা, লোকে বলে করি আমি।" আছে খুব বিশ্বাসের কথা—

"মূকং করোতি বাচালং পঙ্গুং লঙ্ঘয়তে গিরিম্।
যৎকৃপা তমহং বন্দে পরমানন্দমাধবম্॥"

তুলসীদাস এই সত্যকে তাঁর একটি দোঁহায় কাব্য-সুষমামণ্ডিত করেছেন। উদ্ধৃতির আনন্দ সংবরণ করা যায় না—

"রাম ঝরোখে বয়েঠ্ কর, সব্‌কো মুজরা লে।
জ্যায়সা যাকে চাক্‌রি, অ্যায়সা উকো দে॥"

এই জগৎকে যদি একটা গৃহ ধরা যায়, তার উচ্চতম বাতায়নে বসে আছেন ভগবান শ্রীরাম। তিনি দেখছেন, তিনি দিচ্ছেন, তিনি করাচ্ছেন। ভবতারিণী জমিদার মথুরামোহনকে বলছেন, আমার চোখে তুমি ঐ আত্মমগ্ন সুদর্শন যুবকটিকে দেখ। ও কালের নায়ক হবে। আমি পাষাণী, ও আমাকে জাগাবে। শুধু আমাকে নয়, এই দেবালয় শুধু এক জমিদারের খেয়াল হয়ে থাকবে না, হবে ইতিহাসের প্রাণকেন্দ্র। এখান থেকে নতুন ভাবরাশি বিস্ফোরিত হবে। সম্পূর্ণ নতুন এক ধর্ম তৈরি হবে আগত কালের মানসিকতার প্রয়োজন মেটাতে। সংস্কার সব খুলে পড়ে যাবে। পুরোহিতরা সঙ্কুচিত হবেন। বিধান সব পাল্টে যাবে। যুক্তি, তর্ক, বুদ্ধি, বিশ্লেষণ, বিজ্ঞান মিলিত হবে একাধারে। "ধ্বংস ভ্রংশ করি বাহিরিবে" শাশ্বত বিশ্বাস। তোমাদের ঐ বেশকারী সেবকটিকেই দিনকয়েক পরে সেবা করতে হবে। রামকুমার নিমিত্তমাত্র। সে তোমার বৈষয়িকতাকে মুচড়ে দেবে। লাল জবার গাছে সাদা জবা ফুটিয়ে দেখিয়ে দেবে, 'উয়ো ভি হো সকতা'। তোমাদের রানীর গালে সপাটে এক চড় মেরে বুঝিয়ে দেবেন, একমনের আধ ছটাক কম হলেও রাধারানী পার করেন না। "কায়েন মনসা বুদ্ধ্যা।" সামান্য একটু ফেঁসো থাকলে ছুঁচে সুতো ঢুকবে না। আমি, তোমরা, তাঁরা সবাই তাঁরই জন্য। কালের মাটিতে বীজ অপেক্ষা করেছিল। বারকোশে চিনির রস। সব এসে পড়বে তাতে। মন্দির, মসজিদ, গির্জা, দ্বৈত, অদ্বৈত, ব্রাহ্ম, বৈদান্তিক, টিকিনাড়া পণ্ডিত; তারপর যিনি একটিমাত্র বিশ্বাসের সুতো ফেলে মিছরি-খণ্ডটি চিরকালের মতো জমিয়ে দিয়ে যাবেন, তিনি শ্রীরামকৃষ্ণ, কালে যিনি অভিহিত হবেন 'অবতার বরিষ্ঠ' বলে। 'রামকৃষ্ণ ক্যারাভ্যানের' সদস্য তোমরা। বল—"স্থাপকায় চ ধর্মস্য সর্বধর্মস্বরূপিণে।" বল—"তত্র সর্বাণি তীর্থানি প্রয়াগাদীনি তত্র বৈ।" ❑

বিজ্ঞান-নিবন্ধ

# মানবদেহকে অমর করার প্রচেষ্টা

মর্টন সাজম্যান

ভাষান্তর : জলধিকুমার সরকার

হিমকরণ-বিশেষজ্ঞ (cryonicist) পল সেগ্যালের মতে মৃত্যুর পরে দেহকে ঠাণ্ডায় জমিয়ে রাখা একটা ভয়ঙ্কর ব্যাপার, কিন্তু দেহকে না জমিয়ে রাখা আরও সাংঘাতিক। তিনি আশা করেন যে, জৈব প্রযুক্তিবিদ্যা (biotechnology) ঠাণ্ডায় জমিয়ে রাখা দেহে ভবিষ্যতে প্রাণসঞ্চার করতে সক্ষম হবে। জীববিজ্ঞানীদের (biologists) মতে এটি একটি উদ্ভট কল্পনা মাত্র। অন্যদিকে কিছু লোক আছেন যাঁরা পুনর্জীবিত হবার আশায় মৃতদেহ তরল (liquid) নাইট্রোজেনে —১৯৬° তাপমাত্রায় (অর্থাৎ বরফের তাপমাত্রার চেয়ে ১৯৬° ডিগ্রি নিচের তাপমাত্রায়) রেখে দেওয়ার জন্য প্রচুর খরচ করতে প্রস্তুত। মৃত্যুর পরে দেহকে কবর দেওয়া সম্বন্ধে গণিত-বিশেষজ্ঞ আর্ট কোয়েফ বলেন : "মৃতের মুখে মাটি ছোঁড়া খুবই অপমানের ব্যাপার।" তিনি আরও বলেন : "আমি মরতে একেবারেই চাই না, কিন্তু মনে হচ্ছে মৃত্যু আমার কাছাকাছি এসে গেছে। সেজন্য আমি মৃত্যুর পরে 'তরল নাইট্রোজেন ট্যাঙ্ক'-এ কিছুদিন বরং দম নিতে পারি।" এই ট্যাঙ্ক হচ্ছে স্টেনলেস স্টীল-নির্মিত তিন ফুট উঁচু গুদাম ঘর, যেগুলিকে বলা হয় 'ক্যাপসুল' (capsule)। এই ধরনের ক্যাপসুলে ১১টি দেহ রক্ষিত আছে, যাদের এখানে বলা হয় 'রোগী' (patient)। এই ১১টির মধ্যে ৭টি হচ্ছে সম্পূর্ণ দেহ, বাকি চারটি হলো মাথা বা মস্তিষ্ক, যেগুলিকে হিমকরণ-বিশেষজ্ঞরা বলেন 'নিউরো'। মস্তিষ্কের দেহকোষ পরে সম্পূর্ণ দেহগুলির পরীক্ষা-নিরীক্ষায় কাজে লাগাবে। যে-বাড়িতে এইসব কাজ চলছে, সে-বাড়িটির বাইরে লাগান নাম 'ট্রান্স টাইম' (Trans Time) থেকে বাড়িটির ভিতরে কি ধরনের কাজকর্ম হচ্ছে তার কিছুই বুঝা যাবে না। 'ট্রান্স টাইম' একটি মুনাফা করার কর্পোরেশন। এখানে ৮৭জন শেয়ার হোল্ডার আছেন। শরীর হিমকরণের এই ধরনের আরও দুটি প্রতিষ্ঠান পৃথিবীতে আছে। সবগুলিই অবশ্য আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে। এই তিনটির মধ্যে সবচেয়ে বড়টি হচ্ছে 'অ্যালকর লাইফ এক্সটেনশন ফাউন্ডেশন'; এটি লস এঞ্জেলসের রিভার সাইড শহরে অবস্থিত। তবে এটি মুনাফা করার প্রতিষ্ঠান নয়। এর শাখা ৪টি, তার মধ্যে ১টি আছে ব্রিটেনে। সবচেয়ে ছোটটি আমেরিকার মিশিগান শহরে।

প্রথমে হিমকরণের ধারণা আসে মিশিগানের পদার্থবিজ্ঞানের শিক্ষক রবার্ট এটিনজার-এর মনে। ১৯৬৪-তে প্রকাশিত তাঁর বই 'দ্য প্রসপেক্ট অব ইমমর্টালিটি'-তে তিনি লিখেছেন : "হিমঘরে রক্ষিত মৃতের দেহ আমরা কেবল সেইদিন পর্যন্ত চাই, যেদিন বিজ্ঞান আমাদের সাহায্যে আসবে। আমরা কিভাবে মারা গেছি—অসুখে না বার্ধক্যে, তাতে কিছু এসে যায় না; এমনকি মৃত্যুকালে হিমকরণের জানা পদ্ধতি যদি সঠিকভাবে নাও প্রযুক্ত হয়ে থাকে, তাহলেও কিছু এসে যায় না। ভাবী বন্ধুরা সেসময় উন্নত পদ্ধতির জ্ঞান নিয়ে আমাদের বাঁচিয়ে তুলতে পারবে।"

বর্তমানে অ্যালকর-এ ২৪জন 'রোগী' আছেন (কতকগুলি সম্পূর্ণ দেহ, কতকগুলি 'নিউরো'), যাঁরা উপরি উক্ত মতে বিশ্বাস করতেন। এই ২৪জনের মধ্যে প্রথম রোগী (মনস্তত্ত্ববিদ্ অধ্যাপক) ক্যান্সারে মারা গিয়েছিলেন। অ্যালকর প্রতিষ্ঠানের অধ্যক্ষের মতে ৩২৫জন এইভাবে দেহ রক্ষিত হবার জন্য সই করেছেন এবং সই করা লোকের সংখ্যা ক্রমশঃ বেড়েই চলেছে। সই করতে প্রথমে লাগে ১০০ পাউন্ড এবং তারপরে মৃত্যু পর্যন্ত বছরে ২৮৮ পাউন্ড। অ্যালকর-এ একটি অ্যাম্বুলেন্স সব সময়েই অপেক্ষা করে রোগী আনবার জন্য।

খবর পেয়েই অল্প সময়ের জন্য মস্তিষ্কে হৃৎপিণ্ড-ফুসফুস যন্ত্র (heart-lungs machine) চালিয়ে অক্সিজেন ও পুষ্টিবিধায়ক দ্রব্য 'nutrient) দেওয়া হয়; এর উদ্দেশ্য—যদি কিছু দেহকোষ তখনও বেঁচে থাকে সেগুলিকে ভাল অবস্থায় রাখা। এই সময় দেহকে ২° বা ৩° সেন্টিগ্রেড রাখা হয়। অ্যালকরের প্রধান কার্যালয়ে দেহ আনার পর দেহের তাপমাত্রা প্রথম দুদিনে —৭৯° সেন্টিগ্রেডে এবং পরে তরল নাইট্রোজেনে রাখা হয়। হিমকরণ-বিশেষজ্ঞ জীববিজ্ঞানীরা (Cryo biologists) অবশ্য বলেন, এতে দেহকোষ ঠিক থাকতে পারে না; দেহকোষের মধ্যে বরফ তৈরি হয়ে দেহকোষ-গুলিকে নষ্ট করে। স্তন্যপায়ী জীবের দেহকোষকে ঠাণ্ডায় জমিয়ে বাঁচিয়ে রাখতে হলে দেহকোষের মধ্যে যতটা সম্ভব বরফ তৈরি না হতে দেওয়াই বাঞ্ছনীয়। তাছাড়া বরফ তৈরি খুব ধীর গতিতে হতে হবে। এভাবে কিছু দেহাংশকে বাঁচিয়ে রাখা সম্ভব। দেহাংশকে ঠাণ্ডায় জমিয়ে রাখার প্রচেষ্টা প্রথম শুরু হয়েছিল ১৯৫৯ খ্রীস্টাব্দে লণ্ডনের 'ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব মেডিক্যাল রিসার্চ'-এ, যখন গবেষকরা গ্লিসারিনে জমে যাওয়া শুক্রাণুকে বাঁচিয়ে তুলতে সমর্থ হয়েছিলেন। বর্তমানে দেহাংশ-বিশেষকে যেমন চামড়া, চোখের কর্নিয়া, শুক্রাণু, স্ত্রীজননকোষ প্রভৃতিকে জমতে না দিয়ে বাঁচিয়ে রাখতে পারা যায়। বৃক্ক (kidney) দুদিন এবং হৃৎপিণ্ড (heart) বা যকৃৎকে (liver) না জমিয়ে ঠাণ্ডায় রেখে সামান্য সময় বাঁচিয়ে রাখা যায়; কিন্তু নানা ধরনের কোষসমন্বিত দেহকে এভাবে রাখা সম্ভব নয়। স্তন্যপায়ীদের বড় আকারের দেহাংশকে এভাবে বাঁচিয়ে রাখতে গেলে কতকগুলি সমস্যা দেখা যায়। প্রথমতঃ, রক্ত ও অক্সিজেনের অভাবে দেহকোষগুলি নষ্ট হতে আরম্ভ করে। দ্বিতীয়তঃ, শরীরের স্বাভাবিক তাপমাত্রা ৩৭° সেন্টিগ্রেডের চেয়ে অনেক বেশি নিচে নামালে দেহকোষের ক্ষতি হয়। তৃতীয়তঃ, দেহাংশ আকারে বড় হলে এর সব অংশকে সমানভাবে গরম বা ঠাণ্ডা করা সম্ভব হয় না।

হিমকরণ-বিশেষজ্ঞরা অবশ্য জানেন যে, কয়েকটি প্রাণী খুব কম তাপমাত্রায় বেঁচে থাকতে পারে। এদের মধ্যে কেউ কেউ যেমন—মাকড়সা, টিককীট ও মাইটকীট ঠাণ্ডায় জমে যাওয়া বন্ধ করার জন্য শরীরের মধ্যে একরকম রস সৃষ্টি করতে পারে, যার ফলে —১৫° সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রাতেও বরফ সৃষ্টি হয় না। কয়েক প্রকার ঠাণ্ডা রক্তযুক্ত (cold blooded) প্রাণী সরাসরি নিজে জমে গিয়ে রক্ষা পায়। চার প্রজাতির ব্যাঙ তাদের শরীরের অর্ধেক জলীয় পদার্থকে বরফ করে ফেলে। জমে যাওয়া অবস্থায় এইসব প্রাণী শ্বাসপ্রশ্বাস নেয় না এবং তাদের হৃৎপিণ্ড অচল অবস্থায় থাকে। হিমকরণ-বিশেষজ্ঞগণ এইসব প্রাণী থেকে শিক্ষা নেবার চেষ্টা করছেন।

কিন্তু এসব করে কি লাভ হচ্ছে? এখানে তো শুধু দেহকোষ বা টিস্যুকে বাঁচিয়ে রাখা নয়, এখানে মৃত লোককে অবিকৃত রাখার ব্যাপার। ব্রিটেনের 'মেডিক্যাল রিসার্চ কাউন্সিল'-এর একজন হিমকরণ-বিশেষজ্ঞ ডেভিড পেগ বলেছেন: "এসব উদ্ভট কল্পনা। ওদের আগে শিখতে হবে, কি করে একজন স্তন্যপায়ী জন্তুকে অনেকদিন জমিয়ে রাখা যেতে পারে, তারপরে তাকে বাঁচিয়ে তোলা, যেসব অসুখে ট্রান্স টাইমের রোগীরা মারা গেছে তাদের আরোগ্য করার ক্ষমতা অর্জন করা এবং সবশেষে মৃতকে বাঁচিয়ে তুলতে পারা।"

সবশেষে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, ১৯৯০ খ্রীস্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে ৪৬ বছর বয়স্ক টমাস ডোনাল্ডসন (গণিত ও কম্পিউটার-বিশেষজ্ঞ এবং অলীক কাহিনী লেখক) মস্তিষ্কে অস্ত্রোপচার করা সম্ভব নয় inoperable) এমন টিউমার হবার পরে আদালতের রায় চেয়েছিলেন যে, জীবিত অবস্থায় তাঁকে ঠাণ্ডায় জমে যেতে দেওয়া হোক। আদালত অভিমত দেয়: "এরকম কোন আইন নেই, যদিও বিশেষ ক্ষেত্রে মৃত্যুপথযাত্রীকে চিকিৎসা বন্ধ করে মারা যেতে দেওয়া হয়।" আপীল আদালতও ডোনাল্ডসনের এই আপীলকে অগ্রাহ্য করেছে।* □

* কৃতজ্ঞতা স্বীকার: New Scientist, 26 September, 1992

## গ্রন্থ-পরিচয়

# 'সাক্ষাৎ বৈকুণ্ঠ'-এর কিছু পরিচয়

## চিন্ময়ীপ্রসন্ন ঘোষ

**শ্রীরামকৃষ্ণ সঙ্ঘের হোমকুণ্ড বরাহনগর মঠ :** স্বামী বিমলাত্মানন্দ। বরাহনগর মঠ সংরক্ষণ সমিতি, ১২৫/১, প্রামাণিক ঘাট রোড, কলকাতা-৭০০ ০৩৬। পৃষ্ঠা : ১০+৬০, মূল্য : দশ টাকা।

আনুষ্ঠানিক অর্থে বরানগর মঠ শ্রীরামকৃষ্ণ সঙ্ঘের আদি মঠ। কাশীপুর উদ্যানবাটীতে প্রকৃতপক্ষে উপ্ত হয়েছিল সঙ্ঘবীজ। পীড়িত শ্রীরামকৃষ্ণের ভাগবতী তনুর সেবাকে কেন্দ্র করে শ্রীরামকৃষ্ণের ত্যাগী ভক্তের দল সংগঠিত হয়েছিল কাশীপুরে। কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণের মহাসমাধির কিছু-কাল পরে প্রথম মঠের বাস্তব রূপ দেখা গেল বরানগরের ভগ্ন, জীর্ণ, অন্ধকারাচ্ছন্ন এক পোড়ো বাড়িতে। সন্ন্যাসব্রত গ্রহণের মাধ্যমে আঁটপুরের সংকল্পের পরিপূর্ণ রূপ দেখা গেল প্রথম এখানেই। স্বামীজী ও তাঁর গুরুভাইদের দুশ্চর তপস্যা, কঠোর সাধনা, কৃচ্ছ্রসাধন, গভীর ভালবাসাপূর্ণ ভ্রাতৃত্ববোধ—এককথায় সঙ্ঘের ইতিহাসের এক উজ্জ্বল অধ্যায় এই বরানগর মঠ। আজ সঙ্ঘের বিশাল মহীরুহ রূপ। কথামৃতকার শ্রীম বরানগর মঠকে বলেছেন "সাক্ষাৎ বৈকুণ্ঠ"। এই বৈকুণ্ঠরূপ মঠের জীবনচর্যাকে অনুপম ভাষায় ফুটিয়ে তুলেছেন বেলুড় মঠের সন্ন্যাসী স্বামী বিমলাত্মানন্দ তাঁর আলোচ্য গ্রন্থে। এ যেন নানা রঙবাহারী ফুলে গাঁথা অনুপম একটি মালা। লেখক বইটির শেষে তথ্যপঞ্জী দিয়েছেন। বিষয়বস্তুক কতকগুলি পৃথক পৃথক বিভাগে তিনি ভাগ করে নিয়েছেন, যেমন—শ্রীরামকৃষ্ণের আবির্ভাব, শ্রীরামকৃষ্ণ সঙ্ঘ প্রতিষ্ঠা, বরানগর মঠের পত্তন, বরানগর মঠবাড়ির বর্ণনা, ত্যাগী শিষ্যদের সন্ন্যাসগ্রহণ, মঠবাসীদের জীবনচর্যা ইত্যাদি। মঠবাসী সন্ন্যাসব্রতধারীদের কঠোর জীবনচর্যার এরকম একটি গ্রন্থ সাধারণ পাঠকের দৃষ্টি ও মন কেড়ে নেবে তার রসসিক্ত পরিবেশনার গুণে। মঠবাসীদের জীবন যে কত কঠিন ও কঠোর হতে পারে বইটি না পড়লে তা চিন্তাই করা যায় না। কখনো তাঁদের কাটে অর্ধাহারে, কখনো তাঁদের থাকতে হয় প্রায় অনাহারে। তবুও তাঁদের মধ্যে কোন সময়েই আনন্দের কমতি ছিল না। তাঁরা ছিলেন 'আনন্দের সন্তান'। স্বামী বিমলাত্মানন্দ লিখেছেন : "হল-ঘরটিতে বিছানো থাকত তাঁদের দুটো বড় মাদুর। সেখানেই উপবেশন ও শয়ন। উপাধান ছিল ইঁট। নরেন্দ্র রহস্য করে বলতেন, 'দে তো নরম দেখে একখানা ইঁট, মাথায় দিয়ে একটু শুই।'... একত্রে শয়ন করতেন দশ-বারোজন। শিবানন্দজী রহস্য করে বলতেন, 'ঠিক যেন অণ্ডেলি তপ্‌সিমাছ সাজানো হয়েছে।'... একটিমাত্র কাপড় ছিল বাইরে যাবার। যার যখন বাইরে যাবার দরকার হতো তিনি এটি ব্যবহার করতেন।" (পৃঃ ২৮)

"মহাপুরুষ মহারাজ অন্য লোকের নকল করতে পারতেন খুব। একদিন তিনি কোন দুজন লোকের প্রতি কৌতুক কটাক্ষ করে রসিকতা করেছিলেন। লাটু মহারাজ মাঝখান হতে দু-একটি কথা শুনে বললেন, 'দেখো শরোট! হামি তো আগেই বলেছি, শালারা মাসতুতোয় মাসতুতোয় চোরে ভাই।' এই শুনেই সকলে হেসে লুটোপুটি। আর এই নিয়ে তাঁকে সকলে মিলে ক্ষেপাতে লাগলেন।" (পৃঃ ৩৬)

পুস্তিকাটি আমাদের জানিয়ে দেয় নরেন্দ্রনাথের সন্ন্যাসগ্রহণের পর বিভিন্ন সময়ে ব্যবহৃত তিনটি নামের কথা—বিবিদিষানন্দ, সচ্চিদানন্দ ও বিবেকানন্দ। আমেরিকা যাবার প্রাক্কালে তিনি বিবেকানন্দ নামটি স্থায়িভাবে গ্রহণ করেন। বইটি পড়ে জানতে পারি, বরানগর মঠেই স্বামীজী দুর্গাপূজা আরম্ভ করেন। জানতে পারি, একবার শ্রীশ্রীমা এই মঠে এসেছিলেন। এখানেই স্বামীজী রচনা করেছিলেন সমাধি সঙ্গীত—'নাহি সূর্য নাহি জ্যোতিঃ'। 'Imitation of Christ'-এর ছয়টি অধ্যায়ও অনূদিত হয়েছিল এখানে।

বইটির প্রচ্ছদপট সহজেই নজর কাড়ে তার হোমকুণ্ডের অনির্বাণ শিখায়। বরানগর মঠের

প্রবেশপথের দুই পার্শ্বে দণ্ডায়মান দুই স্তম্ভ আর তার মধ্যে এই প্রজ্বলন্ত লেলিহান হোমশিখা বিষয়বস্তুর দ্যোতক। অন্তিম পৃষ্ঠার সংযোজিত বরানগর মঠের পথ-নির্দেশিকা ভ্রমণোৎসাহীদের যথেষ্ট সাহায্য করবে সন্দেহ নেই। মঠের প্রবেশদ্বার, জীর্ণবাড়ি শ্রীরামকৃষ্ণ, মা সারদা, পরিব্রাজক স্বামীজী এবং ঠাকুরের শিষ্যবৃন্দের ছবি বইটিকে যথেষ্ট আকর্ষণীয় করেছে। বইটি শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ অনুরাগীদের কাছে এক মূল্যবান সম্পদ।

## মহিমময় মনস্বীর মনোজ্ঞ জীবনালেখ্য

### অসীম মুখোপাধ্যায়

**পুণ্যদর্শন মহেন্দ্রনাথ দত্ত ও গুডউইন**: প্রশান্তকুমার রায়। প্রকাশিকা: বেদানা রায়। ৩৩৯, যোধপুর পার্ক, কলকাতা-৭০০০৬৮। পৃষ্ঠা ৮+৫৩। মূল্য: কুড়ি টাকা।

শ্রীরামকৃষ্ণের বিশ্ববাণীকে বৃহত্তর বিশ্বে প্রচার করেছেন স্বামী বিবেকানন্দ। তাঁর মহান আচার্যের মানবপ্রেমের উদার আদর্শ প্রচারের মাধ্যমে তিনি যেমন সমন্বয়ের সনাতন ভারতীয় ঐতিহ্যকে স্বমহিমায় সমুজ্জ্বল করেছেন, তেমনি মহার্হ মেলবন্ধনে আবদ্ধ করেছেন প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যকে। বহু আলোচিত এই ঐতিহাসিক ঘটনা কোন ভারতবাসীর অজানা নয়। কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণের জীবন-উপান্তের উজ্জ্বল কিছু উপদেশাবলী, সিমলাপাড়ার নরেন্দ্রনাথের বিবেকানন্দে উত্তরণের ঘটনাসমূহ, বিবেকানন্দের উপলব্ধির উদ্ঘাটন, উত্তুঙ্গ জনপ্রিয়তা, বরানগর ও আলমবাজার মঠে শ্রীরামকৃষ্ণের সন্ন্যাসী শিষ্যদের স্বতঃস্ফূর্ত সাধনা এবং রামকৃষ্ণ মিশনের ক্রমোন্নতির দুষ্প্রাপ্য তথ্য দুর্লভ দক্ষতায় ও স্মৃতিচারণের আলো-ছায়ায় যিনি জিজ্ঞাসু পাঠকের কাছে পরিবেশন করেছেন, সেই স্থিতপ্রজ্ঞ মানুষটির সৃজনশীলতার সংবাদ দুঃখজনকভাবে আমাদের অনেকেরই অজানা। রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ ভাবান্দোলনের প্রত্যক্ষদ্রষ্টা, প্রখর স্মৃতিশক্তির অধিকারী এই জ্ঞানতাপস হলেন স্বামী বিবেকানন্দের মধ্যম ভ্রাতা মহেন্দ্রনাথ দত্ত। স্বামী বিবেকানন্দের কনিষ্ঠ ভ্রাতা, বিখ্যাত স্বাধীনতা-সংগ্রামী, চিন্তা-নায়ক গবেষক ও লেখক ভূপেন্দ্রনাথ দত্তের সঙ্গে বিদ্বৎসমাজের বিশেষ পরিচয় থাকলেও মহেন্দ্রনাথের মহিমান্বিত জীবনকাহিনী তাঁর আত্মপ্রচার-বিমুখতার কারণেই অনেকের কাছেই অজ্ঞাত রয়ে গেছে। প্রশান্তকুমার রায় তাঁর **পুণ্যদর্শন মহেন্দ্রনাথ দত্ত ও গুডউইন** নামে ৫৩ পৃষ্ঠার পুস্তিকায় আমাদের জ্ঞানের সেই দৈন্যপূরণের দায়িত্ব দক্ষতার সাথে পালন করেছেন।

উল্লিখিত পুস্তিকাটির উপজীব্য বিষয় মহেন্দ্র-নাথ দত্তের সৃষ্টিশীল, কর্মমুখর জীবনসাধনা এবং গুরুগতপ্রাণ গুডউইনের অপার গুরুভক্তির সংক্ষিপ্ত সমীক্ষা। সহজ-সরল এবং অবশ্যই সরস ভাষায় মহেন্দ্রনাথ দত্তের ঘটনাবহুল জীবনকাহিনী বর্ণনার পাশাপাশি শ্রীরায় স্বামীজীর বাণী-প্রচারে গুডউইনের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার কথা দক্ষতার সঙ্গে উপস্থাপন করেছেন। কথোপকথনের আদলে ও গল্পের ঢঙে লিখিত এই জীবনকাহিনী সহজেই সমঝদার পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করবে। গল্পের অমোঘ টানে ভেসে পাঠক অল্প সময়েই পৌঁছে যাবেন শেষ পৃষ্ঠায়। পুস্তিকাটির প্রতি পাঠকের প্রবল আকর্ষণ সৃষ্টির মধ্যেই নিহিত রয়েছে লেখকের মুন্সিয়ানা ও রচনার প্রসাদগুণ। কিন্তু ৫৩ পৃষ্ঠার নিতান্ত সংক্ষিপ্ত পরিসরে মহেন্দ্রনাথের সুদীর্ঘ জীবনালোচনা এককথায় অসম্ভব। ফলতঃ শুধু ছুঁয়ে ছুঁয়ে যাওয়া, বাঁকগুলি দেখা ছাড়া এই পুস্তিকায় পাঠকের অত্যুগ্র আগ্রহ অতৃপ্তই থেকে যায়। মহেন্দ্রনাথের সান্নিধ্যধন্য শ্রীরায়ের কাছে সঙ্গত কারণেই মহেন্দ্র-নাথের তথ্যসমৃদ্ধ একটি পূর্ণাঙ্গ জীবনীর দাবি থেকে যায়। এছাড়া, প্রিয় মানুষের জীবনী রচনার ক্ষেত্রে প্রাথমিক প্রয়োজন—একটি নির্মোহ দূরত্ব। তা না হলে ভক্তির অমরাবতীতে যুক্তি হারিয়ে যাওয়ার আশংকা থেকে যায়। আলোচ্য পুস্তিকাটি সেই দুর্বলতাকে অতিক্রম করতে পারেনি। ফলতঃ, মরমী মহেন্দ্রনাথের মানবিক দিকগুলি পুস্তিকায়

সুস্পষ্টভাবে রেখায়িত হয়নি। পরিশেষে পুস্তিকাটির প্রাসঙ্গিক কয়েকটি তথ্যঘাটতির উল্লেখ বাঞ্ছনীয়। যেমন, মহেন্দ্রনাথ-লিখিত পুস্তকের সংখ্যানির্দেশপ্রসঙ্গে লেখক পুস্তিকাটির ৭ পৃষ্ঠায় লিখছেন—৮৮টি। আবার ৩৯ পৃষ্ঠায় জানাচ্ছেন—৯০টি। কোন্ সংখ্যাটি সঠিক ? এছাড়াও স্বামীজীর আমেরিকাযাত্রার সংবাদ প্রসঙ্গে পুস্তিকাটির ৩৩ পৃষ্ঠায় লেখক জানাচ্ছেন যে, শ্রীশ্রীমা, শরৎ মহারাজ, সান্যাল মহাশয় ও মহেন্দ্রনাথ ছাড়া আর কেউই এ-সংবাদ জানতেন না। শ্রীরায়-প্রদত্ত এই তথ্যটি যে সঠিক নয় তার সুস্পষ্ট সাক্ষ্য মেলে অধ্যাপক শঙ্করীপ্রসাদ বসুর "বিবেকানন্দ ও সমকালীন ভারতবর্ষ" নামক আকরগ্রন্থের প্রথম খণ্ডের ৬১-৬৪ পৃষ্ঠায়। উল্লেখিত ব্যক্তিরা ছাড়াও স্বামী বিবেকানন্দের মা, দিদিমা, স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ, স্বামী সারদানন্দ, স্বামী ব্রহ্মানন্দ ও স্বামী তুরীয়ানন্দ স্বামীজীর আমেরিকাযাত্রার সংবাদ জানতেন। স্বামীজী সংক্রান্ত তথ্য পরিবেশনে সামান্য ঘাটতিও সচেতন পাঠকের কাছে অধিক পীড়ার কারণ হয়ে ওঠে। কারণ, স্বামীজী শুধু একজন প্রাতঃস্মরণীয় ব্যক্তিই নন, তাঁর জীবনের সমস্ত কিছুই স্বতন্ত্র ও স্বয়ংপ্রভ জাতীয় সম্পদ।□

## বিজ্ঞান প্রসঙ্গ

# কোষ্ঠবদ্ধতা সম্বন্ধে কয়েকটি কথা

[ 'উদ্বোধন'-এর শ্রাবণ, ১৪০০ সংখ্যায় 'কোষ্ঠবদ্ধতা' শিরোনামে অতীন্দ্রকুমার মিত্রের একটি সুচিন্তিত প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছিল। এর মধ্যে পত্রিকার বিজ্ঞানবিভাগে ঐ বিষয়ে আরও কিছু জ্ঞাতব্য তথ্য সংগৃহীত হওয়ায় তা প্রকাশ করা হলো। প্রসঙ্গতঃ, গত শ্রাবণ ১৪০০ সংখ্যায় ভ্রমবশতঃ লেখকের নাম 'অতীন্দ্রকৃষ্ণ' মুদ্রিত হয়েছিল।

—সম্পাদক, উদ্বোধন ]

১. মানুষে মানুষে মলত্যাগের অভ্যাস তফাৎ হয়। সেজন্য রোগী যখন কোষ্ঠবদ্ধতার কথা বলে, তখন সে বিভিন্ন অর্থে তা বলতে পারে, যেমন—মলত্যাগ কম হয়, মল পরিমাণে কম হওয়াতে 'পরিষ্কার হলো না' ভাব থেকে যায়, অথবা মল শক্ত হওয়ার জন্যে কোঁত দিয়ে মলত্যাগ যন্ত্রণাদায়ক হয়। একদিন কোষ্ঠ পরিষ্কার না হলেই কেউ কেউ ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়েন অথবা একবার হলেও আরও দু-একবার সহজে না হলে মানসিক স্বস্তি পান না এবং বিভিন্ন চিকিৎসকের দ্বারস্থ হন। দেখা গেছে যে, কেউ কেউ দিনে দুবার বা তিনবার মলত্যাগ করেও সুস্বাস্থ্যের অধিকারী, আবার কেউ কেউ এক বা দুদিন অন্তর মলত্যাগ করেও বেশ ভাল থাকেন।

২. খাদ্যের প্রায় সমস্ত পরিপাক ও শোষণক্রিয়াই ক্ষুদ্রান্ত্রে হয়; বৃহদন্ত্রে প্রতিদিন এক লিটার পরিমাণ অবশিষ্টাংশ ঢোকে, সেখানে অন্ত্রের কাজই হলো জলীয় অংশকে টেনে নিয়ে তাকে শক্ত করে মলে পরিণত করা। সেটি তখন যায় মলাশয়ে।

৩. মলদ্বারে কাটা, ঘা বা অর্শ থাকলে মলত্যাগে ভয় হয় এবং সেক্ষেত্রে অন্য কোন কারণ না থাকলেও কোষ্ঠবদ্ধতা হতে পারে।

৪. শিশুকাল থেকে সকালে মলত্যাগের অভ্যাস করান দরকার। অভ্যাস হলে তা চিরদিন থাকে।

৫. যাঁরা ঘরে বসে কাজ করেন বা লেখাপড়া নিয়ে থাকেন (sedentary habits), তাঁদের সকালে ও সন্ধ্যায় ব্যায়াম করলে কোষ্ঠবদ্ধতায় সুফল পাওয়া যায়।

৬. পায়খানা ঠিকমত না হওয়ার জন্য ক্লান্তি, জিহ্বা ময়লা ও শুষ্ক, মাথা ধরা—এসব হতে পারে না যে তা নয়, তবে বেশির ভাগ ক্ষেত্রে দেখা গেছে, শারীরিক অন্য কারণে ঘুসঘুসে জ্বর প্রভৃতি উপসর্গগুলি হয়েছে। কোষ্ঠবদ্ধতা হলে পেটে গ্যাস হতে পারে বা পেটব্যথা করতে পারে, জিহ্বা অপরিষ্কার এবং শারীরিক অস্বস্তিবোধ হতে পারে; তাছাড়া মেজাজও একটু খারাপ হয়। □

# রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশন সংবাদ

## স্বামী বিবেকানন্দের শিকাগো-ভাষণের শতবর্ষপূর্তি-উৎসব

**বেলুড় মঠ** কর্তৃক গত ১১, ১২, ১৮ ও ১৯ সেপ্টেম্বর কলকাতার নেতাজী ইন্ডোর স্টেডিয়ামে স্বামী বিবেকানন্দের শিকাগো-ভাষণের শতবর্ষ স্মরণে ধর্মসম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলনের প্রতিদিনের কার্যসূচী তিনটি অধিবেশনে ভাগ করা হয়েছিল। বৈদিক মন্ত্রপাঠ ও বৌদ্ধধর্মের প্রার্থনা দিয়ে উদ্বোধন অধিবেশন আরম্ভ হয়। আশীর্বাণী প্রদান করেন রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের অধ্যক্ষ শ্রীমৎ স্বামী ভূতেশানন্দজী মহারাজ। মঠের বহুসংখ্যক সন্ন্যাসী, ব্রহ্মচারী, সারদা মঠের সন্ন্যাসিনী ও ব্রহ্মচারিণী সহ বারোহাজার প্রতিনিধি এই অধিবেশনে যোগদান করেন। রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের সাধারণ সম্পাদক স্বামী আত্মস্থানন্দজী মহারাজ স্বাগত ভাষণ দেন। মূল ভাষণ দেন রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের অন্যতম সহাধ্যক্ষ শ্রীমৎ স্বামী রঙ্গনাথানন্দজী মহারাজ। স্বামী বিবেকানন্দের একটি বৃহৎ প্রতিকৃতির আবরণ উন্মোচন করে সম্মেলনের উদ্বোধন করেন পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল কে. ভি. রঘুনাথ রেড্ডি। ভারত সরকারের ডাকবিভাগ কর্তৃক স্বামী বিবেকানন্দের শিকাগো-ভাষণ স্মরণে স্বামীজীর প্রতিকৃতি-সম্বলিত ডাকটিকিট 'ফার্স্ট ডে কভার' প্রকাশিত হয়। কেন্দ্রীয় মানবসম্পদমন্ত্রী অর্জুন সিং ছিলেন এই অধিবেশনের সভাপতি। ধন্যবাদ দেন শতবর্ষ উৎসব কমিটির আহ্বায়ক স্বামী লোকেশ্বরানন্দজী। দ্বিতীয় দিনের অনুষ্ঠান আরম্ভ হয় খ্রীস্টান ও ইহুদীধর্মের প্রার্থনা দিয়ে এবং তৃতীয় দিনের অধিবেশন আরম্ভ হয় ইসলামধর্মের প্রার্থনার মাধ্যমে। চতুর্থ দিনের সমাপ্তি অধিবেশনে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন ভারতের রাষ্ট্রপতি ডঃ শঙ্করদয়াল শর্মা। পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল কে. ভি. রঘুনাথ রেড্ডিও এই অধিবেশনে উপস্থিত ছিলেন। এই অধিবেশনে সংক্ষিপ্ত ভাষণ দেন স্বামী রঙ্গনাথানন্দজী, স্বামী আত্মস্থানন্দজী ও স্বামী প্রভানন্দজী। ধন্যবাদ দেন স্বামী লোকেশ্বরানন্দজী। সম্মেলনের চারদিনে একশোরও বেশি দেশ-বিদেশের পণ্ডিত ও বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ, সন্ন্যাসী ও সন্ন্যাসিনী বক্তব্য রেখেছেন। সম্মেলনে আলোচ্য বিষয় ছিল 'স্বামী বিবেকানন্দের সমন্বয় ভাবনা সম্ভাবনা ও সমস্যা'। প্রতিদিন সন্ধ্যায় বিশিষ্ট শিল্পীদের কণ্ঠ ও যন্ত্রসঙ্গীতের অনুষ্ঠান হয়েছে। উদ্বোধন এবং সমাপ্তি অধিবেশন দূরদর্শনের জাতীয় কার্যক্রমে প্রদর্শিত হয়।

**গৌহাটি আশ্রম** গত ২৫-২৭ সেপ্টেম্বর উক্ত উৎসব উদ্‌যাপন করে। প্রথম দিন ১৯০১ খ্রীস্টাব্দে কামাখ্যা মন্দিরের নিকট যে-বাড়িতে স্বামী বিবেকানন্দ বাস করেছিলেন, সে-বাড়িটিতে একটি প্রস্তরফলকের আবরণ উন্মোচন করেন রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের সাধারণ সম্পাদক স্বামী আত্মস্থানন্দজী। পরের দিন তিনি আশ্রমের নবনির্মিত প্রেক্ষাগৃহ-সহ গ্রন্থাগারের উদ্বোধন করেন। ঐদিন তিনি এক যুবসম্মেলনেও পৌরোহিত্য করেন। ২৭ তারিখ গৌহাটি আশ্রমে অনুষ্ঠিত উত্তর-পূর্বাঞ্চল ভাবপ্রচার পরিষদের সম্মেলনেরও উদ্বোধন করেন স্বামী আত্মস্থানন্দজী।

**পুরী মিশন আশ্রম** উক্ত উৎসবের প্রথম পর্যায় উদ্‌যাপন করে গত ২৫ ও ২৬ সেপ্টেম্বর। এই উপলক্ষে শোভাযাত্রা, বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে বক্তৃতা-প্রতিযোগিতা, জনসভা প্রভৃতি অনুষ্ঠিত হয়। শোভাযাত্রায় ছাত্রছাত্রী ও ভক্তবৃন্দ-সহ প্রায় ১২০০ লোক অংশগ্রহণ করে। শোভাযাত্রার শেষে সকলকে টিফিন-প্যাকেট দেওয়া হয়। প্রথম দিনের জনসভায় প্রধান অতিথি ছিলেন উড়িষ্যার উচ্চ শিক্ষামন্ত্রী চৈতন্যপ্রসাদ মাঝি। উভয় দিনের জনসভায়ই বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ ভাষণ দিয়েছেন। উভয় সভায়ই সভাপতিত্ব করেন স্বামী শিবেশ্বরানন্দ। আশ্রম-সম্পাদক স্বামী দীনেশানন্দ দুইদিনই সভায় প্রারম্ভিক ভাষণ দেন।

**হায়দ্রাবাদ আশ্রম** স্থানীয় রোটারি ক্লাবের সহযোগিতায় গত ১১ সেপ্টেম্বর এক যুবসমাবেশের

আয়োজন করেছিল। সমাবেশে প্রায় দশহাজার যুবপ্রতিনিধি যোগদান করে। ১৩ ও ১৪ সেপ্টেম্বর কেন্দ্রীয় মানবসম্পদ উন্নয়ন বিভাগের সহযোগিতায় দুদিনের এক যুবসম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। প্রায় দেড়শো জন প্রতিনিধি আলোচনায় অংশগ্রহণ করে।

**আলং ও ইটানগর আশ্রম** অরুণাচল প্রদেশের রাষ্ট্রীয় চেতনাবর্ষ কমিটির সহযোগিতায় বিদ্যালয়, জেলা ও রাজ্যস্তরে ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে প্রবন্ধ, ক্যুইজ, বক্তৃতা, বসে আঁকো প্রভৃতি প্রতিযোগিতার আয়োজন করেছিল। হাজার হাজার ছাত্রছাত্রী বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে। সফল প্রতিযোগীদের পুরস্কার দেওয়া হয়। প্রতিটি জেলার প্রধান কার্যালয়ে যুবসমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। 'বর্তমান ভারতে স্বামী বিবেকানন্দের প্রাসঙ্গিকতা' বিষয়ে এক আলোচনা-চক্রের উদ্বোধন করেন অরুণাচল প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী। পৌরোহিত্য করেন রাজ্যের শিক্ষামন্ত্রী এবং সম্মানিত অতিথি ছিলেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী। এই আলোচনা-চক্রে বহু সাংসদ, শিক্ষাবিদ্ এবং বিশিষ্ট নাগরিকবৃন্দ অংশগ্রহণ করেন। ২৪ থেকে ২৬ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত তিনদিনের অনুষ্ঠানে আলোচনা-চক্র ছাড়াও আলং আশ্রম-পরিচালিত বিদ্যালয়ের শিশুদের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান এবং বিশিষ্ট শিল্পীদের ঐকতানবাদ্য অনুষ্ঠিত হয়।

গত ১৭ সেপ্টেম্বর কলকাতার **গদাধর আশ্রম** পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের ছেলেদের নিয়ে স্বামী বিবেকানন্দের ওপর একটি নাটক মঞ্চস্থ করে। ঐদিনের সভায় একটি স্মারকগ্রন্থও প্রকাশ করা হয়।

**ব্যাঙ্গালোর আশ্রম** ( কর্ণাটক ) গত ৫ সেপ্টেম্বর এক আলোচনা-চক্রের আয়োজন করেছিল। স্বেচ্ছাসেবী সংস্থাগুলি কিভাবে স্বামীজীর সর্বজনীন বাণীগুলিকে বাস্তবে রূপায়ণ করতে পারে—এই নিয়ে সেখানে আলোচনা হয়।

এই উৎসবের অঙ্গ হিসাবে **রাঁচি স্যানাটোরিয়াম** গত ২৯ আগস্ট একটি ভ্রাম্যমাণ চিকিৎসাকেন্দ্রের সূচনা করেছে।

## উদ্বোধন

গত ১ সেপ্টেম্বর **বেলুড় মঠে** একটি সাধুনিবাসের উদ্বোধন করেন রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের অধ্যক্ষ শ্রীমৎ স্বামী ভূতেশানন্দজী মহারাজ।

## ছাত্র-কৃতিত্ব

কেন্দ্রীয় মাধ্যমিক পর্ষদ কর্তৃক পরিচালিত সর্বভারতীয় মাধ্যমিক পরীক্ষায় **আলং আশ্রম**-পরিচালিত বিদ্যালয়ের তিনজন ছাত্র রাজ্য মেধা তালিকায় ৩য়, ৯ম, ২০শ স্থান অধিকার করেছে।

## দন্তচিকিৎসা-শিবির

**পুরী মঠ** পরিচালিত গত ১৭ ও ১৮ সেপ্টেম্বর দুদিনের এক দন্তচিকিৎসা-শিবিরে মোট ২৪০জনের চিকিৎসা করা হয়।

## ত্রাণ

### পশ্চিমবঙ্গ বন্যাত্রাণ

**কামারপুকুর আশ্রমের** সহযোগিতায় স্বামী রামকৃষ্ণানন্দজী মহারাজের জন্মস্থান ময়াল-ইছাপুরে একটি ত্রাণশিবির খোলা হয়েছে। শিবির থেকে হুগলী জেলার খানাকুল ১নং ব্লকের ছয়টি গ্রামের বন্যাপীড়িতদের প্রত্যহ খিচুড়ি বিতরণ করা হচ্ছে।

**তমলুক আশ্রমের** সহযোগিতায় মেদিনীপুর জেলার ঘাটাল মহকুমার ইরপালা ও মানসুকা ১নং ও ২নং অঞ্চলের ১৬টি গ্রামের ১৫০৫টি পরিবারকে ৫২৬৯ কিলোঃ চাল, ৩০১ কিলোঃ ডাল, ৬৩ কিলোঃ চিড়া, ১৯ কিলোঃ গুড়, ২৪৩৯টি পুরনো কাপড় বিতরণ করা হয়েছে। ঐ অঞ্চলে নতুন করে বন্যা হওয়ায় মানসুকা অঞ্চলের প্রকাশচক গ্রামে গত ১৯ সেপ্টেম্বর থেকে খাদ্য-বিতরণকেন্দ্র খোলা হয়েছে।

**কাঁথি আশ্রমের** মাধ্যমে মেদিনীপুর জেলার পটাশপুর ব্লকের ২৪টি গ্রামে বন্যাদুর্গতদের মধ্যে রান্নাকরা খাদ্য-বিতরণ কর্মসূচীর পর তাদের মধ্যে ধুতি, শাড়ি ও অন্যান্য পোশাক-পরিচ্ছদ বিতরণ করা হয়েছে।

মেদিনীপুরের **গড়বেতা আশ্রমের** সহযোগিতায় বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত আশপাশের কয়েকটি গ্রামে গত ১৫ সেপ্টেম্বর থেকে খিচুড়ি বিতরণ করা হচ্ছে।

**রহড়া আশ্রম** উত্তর ২৪ পরগনা জেলার খড়দা পৌরসভার অধীন রহড়া ও বন্দিপুর অঞ্চলের জলবন্দী মানুষের মধ্যে গত ২২ সেপ্টেম্বর থেকে রুটি ও খিচুড়ি বিতরণ করেছে।

জলপাইগুড়ি জেলার আলিপুরদুয়ার ও খোলতায় এবং কোচবিহার জেলার মরিচবাড়িতে বন্যায় ক্ষতিগ্রস্তদের মধ্যে ২০০০ ধুতি, ১৬০০

শাড়ি, ২৫০ লুঙ্গি, ৪০০০ শিশুদের পোশাক, ৯৩৬৭টি পুরনো কাপড়, ১০০০ সেট অ্যালুমিনিয়ামের বাসনপত্র (প্রতি সেটে ৭টি করে), ৩৭২টি লণ্ঠন ও ১০৫টি ত্রিপল বিতরণ করা হয়েছে।

**আসাম বন্যাত্রাণ**

**করিমগঞ্জ কেন্দ্রর** মাধ্যমে করিমগঞ্জের আশপাশের বিভিন্ন ত্রাণশিবিরগুলিতে যেসকল বন্যাপীড়িত মানুষ আশ্রয় নিয়েছে তাদের মধ্যে ২৩০ কিলোঃ চাল, ১১ টিন গুঁড়ো দুধ (১২,৭৫,৬০০ লিটার), ১৬ টিন বিস্কুট, ৬৪টি শাড়ি ও ধুতি বিতরণ করা হয়েছে।

## পুনর্বাসন

**পশ্চিমবঙ্গ**

**মনসাদ্বীপ আশ্রম** দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার সাগরদ্বীপে বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত মাটির বাড়িগুলির পুনর্নির্মাণ ও মেরামত করার এক পরিকল্পনা নিয়েছে।

## বহির্ভারত

**স্বামী বিবেকানন্দের শিকাগো ধর্মমহাসভায় যোগদানের শতবর্ষপূর্তি-উৎসব**

**হলিউড কেন্দ্র** গত ১৭ আগস্ট এক সাধন-শিবিরের আয়োজন করেছিল। বিভিন্ন ধর্মের প্রতিনিধিগণ তাতে যোগদান করেন এবং 'দ্য হারমনি অব রিলিজিয়ন' বিষয়ে ভাষণ দেন। বিকালে যন্ত্রসঙ্গীতের ঐকবাদন, বিভিন্ন ধর্মের প্রার্থনা, ভক্তিগীতি, স্বামী বিবেকানন্দের ওপর রচিত গীতি-আলেখ্য প্রভৃতি অনুষ্ঠিত হয়। 'স্বামী বিবেকানন্দের বাণী' বিষয়ে চারটি সংক্ষিপ্ত ভাষণের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি হয়।

**পোর্টল্যান্ড কেন্দ্র** গত ১০ আগস্ট উক্ত উৎসব পালন করে। 'বেদান্ত অ্যান্ড দ্য ওয়েস্ট' বিষয়ে ভাষণ দেন রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের অন্যতম সহাধ্যক্ষ শ্রীমৎ স্বামী গহনানন্দজী মহারাজ। এই উপলক্ষে তিনি একটি পুস্তিকারও প্রকাশ করেন। অনুষ্ঠানে অন্যান্য সন্ন্যাসীরাও ভাষণ দেন। তাছাড়া আবৃত্তি, শিশু ছাত্রছাত্রীদের সংক্ষিপ্ত নাটক, স্লাইড শো প্রভৃতি অনুষ্ঠিত হয়।

**শিকাগো কেন্দ্র** শিকাগোর আর্ট ইনস্টিটিউট-এর যে-হলঘরে ১৮৯৩ খ্রীস্টাব্দে ধর্মমহাসভা অনুষ্ঠিত হয়েছিল, সেখানে গত ১১ সেপ্টেম্বর এক অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছিল। অনুষ্ঠানে ভারতের কনসাল জেনারেল কে. এন. সিংহ প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন। ভাষণ, স্বামী বিবেকানন্দের শিকাগো-ভাষণ থেকে পাঠ, স্বামীজীর জীবনের ওপর নাটক, ভক্তিগীতি পরিবেশন প্রভৃতি ছিল অনুষ্ঠানসূচীর অঙ্গ। উক্ত উৎসবের অঙ্গ হিসাবে গত ২৭ ও ২৯ আগস্ট শিকাগো কেন্দ্রে সন্ন্যাসীদের ভাষণের ব্যবস্থা করা হয়েছিল। গত ২৯ আগস্ট মূল ভাষণ দিয়েছেন শ্রীমৎ স্বামী গহনানন্দজী মহারাজ।

## দেহত্যাগ

**স্বামী উদ্ধবানন্দ** (সীতারাম) গত ৩০ সেপ্টেম্বর ভোর ৪টা ৪৫ মিনিটে মাদ্রাজের বিজয় হেল্থ সেন্টারে দেহত্যাগ করেছেন। তাঁর বয়স হয়েছিল ৬৫ বছর। তিনি পাকস্থলীর ক্যান্সারে ভুগছিলেন। জীবনের শেষমুহূর্ত পর্যন্ত তিনি সচেতন, প্রফুল্ল ও পরিতৃপ্ত ছিলেন।

স্বামী উদ্ধবানন্দ ছিলেন শ্রীমৎ স্বামী যতীশ্বরানন্দজীর মন্ত্রশিষ্য। ১৯৫৪ খ্রীস্টাব্দে তিনি মাদ্রাজ মঠে যোগদান করেন এবং ১৯৬৪ খ্রীস্টাব্দে শ্রীমৎ স্বামী মাধবানন্দজী মহারাজের নিকট সন্ন্যাসলাভ করেন। যোগদান-কেন্দ্র ছাড়াও তিনি বিভিন্ন সময়ে ব্যাঙ্গালোর, বৃন্দাবন ও মাদ্রাজ স্টুডেন্টস হোমের কর্মী ছিলেন। ১৯৭৬ খ্রীস্টাব্দ থেকে তিনি মাদ্রাজ মিশন আশ্রমের প্রধান নিযুক্ত হন এবং এবছরের জুলাই মাস পর্যন্ত যোগ্যতার সঙ্গে দায়িত্ব পালন করেন। তাঁর কার্যকালে আশ্রমের বিশেষ উন্নতি সাধিত হয়। অন্ধ্রপ্রদেশ, তামিলনাড়ু এবং শ্রীলঙ্কার শরণার্থীদের মধ্যে তিনি ব্যাপক ত্রাণকার্য করেন। অপরের প্রতি ভালবাসা, অকৃপণ আতিথেয়তা, সরলতা, সহৃদয়তা প্রভৃতি গুণের জন্য তিনি সকলের প্রিয় ছিলেন।

# শ্রীশ্রীমায়ের বাড়ীর সংবাদ

**আবির্ভাব-তিথি পালন :** গত ১০ অক্টোবর শ্রীমৎ স্বামী অভেদানন্দজী মহারাজের এবং ১৫ অক্টোবর শ্রীমৎ স্বামী অখণ্ডানন্দজী মহারাজের জন্মতিথি উপলক্ষে তাঁদের জীবনী আলোচনা করেন যথাক্রমে স্বামী সত্যব্রতানন্দ ও স্বামী কমলেশানন্দ।

**সাপ্তাহিক ধর্মালোচনা :** প্রতি শুক্রবার, রবিবার ও সোমবার সন্ধ্যারতির পর যথারীতি চলছে। ☐

# বিবিধ সংবাদ

## বহির্ভারত

### শিকাগো বিশ্বধর্মমহাসম্মেলনের শতবর্ষ উদ্‌যাপন

**বিশেষ সংবাদদাতা:** ১০০ বছর আগে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের শিকাগো শহরে যে বিশ্বধর্মমহাসম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছিল এবং স্বামী বিবেকানন্দের স্মরণীয় বক্তৃতা ভারতবর্ষ তথা হিন্দুধর্মকে বিশ্বের দরবারে উচ্চতম মর্যাদার আসনে প্রতিষ্ঠিত করেছিল ও যেখানে তিনি নব বিশ্বমানবতার বাণী উচ্চারণ করেছিলেন, সেখানে গত ২৮ আগস্ট ১৯৯৩ থেকে ৪ সেপ্টেম্বর ১৯৯৩ পর্যন্ত বিশ্বধর্মসম্মেলনের শতবর্ষপূর্তি অনুষ্ঠান সম্পন্ন হলো। এই বিশ্বধর্মসম্মেলনে পৃথিবীর ১২৫টি ধর্মগোষ্ঠীর ছয়হাজারেরও বেশি প্রতিনিধি যোগদান করেছিলেন। ধর্মসঙ্গীত এবং ধর্মীয় স্তোত্রাদি আবৃত্তির মাধ্যমে শিকাগোর 'পামার হাউস' হিল্টনের গ্র্যান্ড বলরুমে ধর্মসম্মেলনের সূচনা হয় বিভিন্ন ধর্মের প্রতিনিধিস্থানীয় ব্যক্তিদের শোভাযাত্রার মধ্য দিয়ে। তারপর বিভিন্ন ধর্মের নেতৃবর্গ তাঁদের বক্তব্য রাখেন। হিন্দুধর্মের পক্ষ থেকে সন্ত কেশব দাস, রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের অন্যতম সহাধ্যক্ষ শ্রীমৎ স্বামী গহনানন্দজী মহারাজ এই সম্মেলনে বক্তব্য রাখেন। 'কাউন্সিল ফর পার্লামেন্ট ওয়ার্ল্ড রিলিজিয়ানে'র কার্যনির্বাহী পরিচালক ড্যানিয়েল গোমেজ ইবাসেট তাঁর স্বাগত ভাষণে এই সম্মেলনের মাধ্যমে বিভিন্ন ধর্মের মধ্যে যে ঐক্যবোধ জেগে উঠবে—এই আশা প্রকাশ করেন। ভারত থেকে সরকারি প্রতিনিধিদলের নেতৃত্ব করেন ডঃ করণ সিং এবং সিংভি। কলকাতার এশিয়াটিক সোসাইটি থেকে এই সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন ডঃ চন্দন রায়চৌধুরী, ডঃ সুভাষ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং ডঃ প্রতিমা রায়চৌধুরী। প্রায় আটদিন ধরে নানা ধরনের বৈঠক, ওয়ার্কশপ, বক্তৃতা, প্রার্থনাসভা ইত্যাদির মধ্য দিয়ে এই সম্মেলন হাজার হাজার মানুষের সামনে ধর্মের বৈচিত্র্য এবং বিশ্বমানবের মিলনক্ষেত্রে ধর্মের ভূমিকা নিয়ে আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়। ধর্মসম্মেলনের উদ্বোধন করেন কাউন্সিলের বোর্ড অব ট্রাস্টীর চেয়ারপার্সন ডঃ ডেভিড র‍্যামেজ।

ধর্মসম্মেলনের একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ছিল—বেদান্ত ও স্বামী বিবেকানন্দ। সম্মেলনের বিভিন্ন কক্ষে, মূলমঞ্চে ও বিভিন্ন আলোচনাসভায় স্বামী বিবেকানন্দ ও বেদান্ত-দর্শনের মহিমা বারবার উচ্চারিত হচ্ছিল। ১০০ বছর আগে যে অনিমন্ত্রিত ভারতীয় সন্ন্যাসী ভারতবর্ষের বেদান্তের মূল সত্যকে জগৎসভায় তুলে ধরেছিলেন তা যে ১০০ বছর ধরে বিশ্বের প্রান্তরে প্রান্তরে গভীর প্রতিক্রিয়া এবং প্রভাব সৃষ্টি করেছিল তার পরিচয় পাওয়া গেল এই বিশ্বধর্মসম্মেলনে উপস্থিত থেকে।

১৮৯৩ খ্রীস্টাব্দের ধর্মমহাসভার মাধ্যমে পৃথিবীর বিভিন্ন ধর্মসম্প্রদায়ের মধ্যে প্রথম ভাবগত আদানপ্রদান শুরু হয়। ইলিনয়ের জরথুস্ট্রবাদী সংগঠনগুলির সভাপতি রোহিনটনরিভতনা বলেন, প্রথম ধর্মমহাসভার সংগঠকরা ভেবেছিলেন, ঐ সম্মেলন পৃথিবীর মানুষের মধ্যে সমঝোতা বাড়াতে সাহায্য করবে। কিন্তু বাস্তবে তা হয়নি। সেদিন পৃথিবীর মানুষের সামনে যেসমস্ত সমস্যা ছিল, আজও তা একইভাবে রয়ে গেছে। মানুষের বিভিন্ন সমস্যা সমাধানের কাজে ধর্মকে এখনো সেভাবে ব্যবহার করা হয়নি। সেই চেষ্টাই এখন আমাদের করতে হবে। সম্মেলনের সংগঠকদের অন্যতম বারবারা বার্নস্টাইন বলেছেন, এই উদ্দেশ্য সামনে রেখেই দারিদ্র্য, বর্ণবৈষম্য, পরিবেশ, বাণিজ্য, সামাজিক দায়িত্বসহ বিভিন্ন বিষয় আলোচ্যসূচীতে রাখা হয়েছে। এই সম্মেলনে যাঁরা ভাষণ দেন তাঁদের মধ্যে ডেভিড রথ, টনি লারসেন, গোওমে কাবুনো, ইরফান খান, সিস্টার প্রতিমা, উইলমা অ্যালিস প্রমুখের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

মূল ধর্মমহাসভার বিভিন্ন অধিবেশনে হিন্দু-বৌদ্ধ-খ্রীস্টান-ইহুদী-মুসলিম-শিখ-বাহাই-জরথুস্ট্র ইত্যাদি বিভিন্ন ধর্মগোষ্ঠীর নিজস্ব আলোচনা যেমন অনুষ্ঠিত হয়েছে, ঠিক তেমনি বিভিন্ন ধর্মীয় মতাদর্শের মধ্যে কিভাবে সমন্বয় আনা যায় সে-বিষয়েও আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়। পরিবেশ ও লোকধর্ম

সম্বন্ধে যাঁরা বক্তব্য রাখেন তাঁদের মধ্যে ছিলেন কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়ের ডঃ তুষার চট্টোপাধ্যায় এবং কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ডঃ সুভাষ বন্দ্যোপাধ্যায়। মানবিক মূল্যবোধের ওপর বক্তব্য রাখেন কলকাতা হাইকোর্টের প্রাক্তন প্রধান বিচারপতি পদ্মা খাস্তগীর। সারদা মিশনের প্রব্রাজিকা অমলপ্রাণা এবং প্রব্রাজিকা বিবেকপ্রাণাও বক্তব্য রাখেন।

সমাপ্তি দিবসে বিশ্বশান্তি ও বিভিন্ন ধর্ম সম্প্রদায়ের মধ্যে সমঝোতা এবং সম্ভ্রমবোধের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তার কথা উল্লেখ করে ভাষণ দেন তিব্বতের ধর্মগুরু দালাই লামা। উৎসবের আটদিনই নানা ধরনের ধর্মীয় সঙ্গীত, নৃত্য, ক্রিয়াপদ্ধতি, চিত্রপ্রদর্শনী, যোগ, ধ্যান, সমবেত প্রার্থনা অনুষ্ঠিত হয়। বাইশতলা হিলটন হোটেলের পুরো পরিবেশটি জাঁকজমক, উৎসব ও আনন্দে মুখর হয়ে উঠেছিল। বিভিন্ন ধর্ম, বিবিধ বর্ণ, নানা বর্ণবহুল সাজসজ্জা ইত্যাদিতে একটি মহান মিলনের সুরই প্রতিধ্বনিত হয়েছে—'যত মত তত পথ'। এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে, শিকাগোর ভারতীয় কনসাল জেনারেল কে. এন. সিংহ বিশ্বধর্মসম্মেলন অনুষ্ঠানের ব্যাপারে সক্রিয় সহযোগিতা করেছেন।

প্রসঙ্গতঃ, ২৯ আগস্ট সকাল এগারোটায় শিকাগোর হাইড পার্কে বুলেভার্ডে অবস্থিত বিবেকানন্দ বেদান্ত সোসাইটিতে 'ভিসান অব স্বামী বিবেকানন্দ' নামে একটি আলোচনাচক্র অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানের সূচনায় সঙ্গীত এবং মন্ত্রোচ্চারণের মাধ্যমে সভার কাজ শুরু করেন ঐ সোসাইটির অধ্যক্ষ স্বামী চিদানন্দ। মূলভাষণ দেন শ্রীমৎ স্বামী গহনানন্দজী মহারাজ। এছাড়া বক্তব্য রাখেন স্বামী স্বাহানন্দ, স্বামী প্রমথানন্দ, স্বামী আদীশ্বরানন্দ, স্বামী তথাগতানন্দ, স্বামী শান্তরূপানন্দ, স্বামী চিদ্ভাবানন্দ, স্বামী প্রপন্নানন্দ প্রমুখ মঠ ও মিশনের পাশ্চাত্যের বিভিন্ন কেন্দ্রের সন্ন্যাসিবৃন্দ।

## পরলোকে

শ্রীশ্রীমা সারদাদেবীর মন্ত্রশিষ্যা, শ্রীরামকৃষ্ণ আনন্দ আশ্রমের প্রবীণা সদস্যা **ব্রহ্মচারিণী গীতা দেবী** (আশ্রমে 'গীতামা' নামে পরিচিতা) গত ৭ মার্চ ৯২ বছর বয়সে শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। তাঁর পূর্বনাম ছিল মালতী দাশগুপ্ত। তাঁর পিতা অধুনা বাংলাদেশের বিক্রমপুরের কলমা গ্রামের জমিদার ভূপতিচরণ দাশগুপ্তও সস্ত্রীক শ্রীশ্রীমায়ের কৃপালাভ করেন। অতি অল্প বয়সেই তিনি নিবেদিতা বিদ্যালয়ের ছাত্রীনিবাসে স্থান পান ও স্বল্পকাল মধ্যেই শ্রীশ্রীমায়ের কৃপালাভ করে ধন্য হন। সেই সুবাদে তিনি মাতৃসেবার সুযোগ পান এবং ব্যক্তিগতভাবে তাঁর সেবা করে কৃতার্থ হন। সম্ভবতঃ ১৯২৭ খ্রীস্টাব্দে শ্রীমৎ স্বামী শিবানন্দজী মহারাজ তাঁকে ব্রহ্মচর্যব্রত ধারণের নির্দেশ দান করেন।

মহাপুরুষ মহারাজ ভিন্ন আরও কয়েকজন শ্রীরামকৃষ্ণ-পার্ষদের দুর্লভ দর্শন ও সঙ্গলাভ তিনি করেছিলেন। ১৯৩৭ খ্রীস্টাব্দ থেকে তিনি শ্রীরামকৃষ্ণ আনন্দ আশ্রমের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগে আসেন ও সেখানেই বসবাস শুরু করেন। আদিতে আশ্রমের মূলকেন্দ্র ঢাকা ও দেশভাগের পর ক্রমান্বয়ে দমদম ও বনহুগলী হয়ে অবশেষে নাকতলা কেন্দ্রে তাঁর জীবনান্ত পর্যন্ত বসবাস করেন।

তাঁর অতি সরল স্বভাব, সহজ ও নিরভিমান ব্যবহারে সকলেই মুগ্ধ হতেন। সুদীর্ঘ বিরানব্বই বছর বয়স পর্যন্ত তিনি স্বাভাবিকভাবেই চলাফেরা করার ক্ষমতা রাখতেন। শেষ কয়েক মাস সামান্য অসুস্থবোধ করায় তিনি বড় একটা বাইরে যেতে পারতেন না। শ্রীশ্রীমায়ের অনেক কথা তাঁর মুখে শুনে ভক্তরা আনন্দ লাভ করতেন।

গত ২৩ ফেব্রুয়ারি ১৯৯৩ গীতাদেবী হঠাৎ মস্তিষ্কের রক্তক্ষরণে আক্রান্ত হয়ে পড়ায় তাঁকে অবিলম্বে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। বারোদিন একইভাবে কাটার পর ৭ মার্চ ভোর ৫টা ২০ মিনিটে তিনি মাতৃচরণে আশ্রয়লাভ করেন।

নিবেদিতা মহিলা সমিতির প্রথম সদস্যা গীতাদেবী টালীগঞ্জ কথামৃত সংঘের প্রেরণা স্বরূপা ছিলেন।

শ্রীমৎ স্বামী বীরেশ্বরানন্দজী মহারাজের মন্ত্রশিষ্যা **সুকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়** গত ২১ মার্চ '৯৩ তাঁর পুনার বাসভবনে সজ্ঞানে পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৭২ বছর। ☐

বিশ্বব্যাপী চৈতন্যই ঈশ্বর। সেই বিশ্বব্যাপী চৈতন্যকেই লোকে প্রভু, ভগবান, খ্রীস্ট, বুদ্ধ বা ব্রহ্ম বলিয়া থাকে—জড়বাদীরা উহাকে শক্তিরূপে উপলব্ধি করে এবং অজ্ঞেয়বাদীরা ইহাকেই সেই অনন্ত অনির্বচনীয় সর্বাতীত বস্তু বলিয়া ধারণা করে। উহাই সেই বিশ্বব্যাপী প্রাণ, উহাই বিশ্বব্যাপী চৈতন্য, উহাই বিশ্বব্যাপিনী শক্তি এবং আমরা সকলেই উহার অংশস্বরূপ।

স্বামী বিবেকানন্দ

উদ্বোধনের মাধ্যমে প্রচার হোক
এই বাণী। শ্রীসুশোভন চট্টোপাধ্যায়

উদ্বোধন

স্বামী বিবেকানন্দ প্রবর্তিত, রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের একমাত্র বাঙলা মুখপত্র, পঁচানব্বই বছর ধরে নিরবচ্ছিন্নভাবে ভাষায় ভারতের প্রাচীনতম সা[illegible]



## সূচিপত্র ৯৫তম বর্ষ পৌষ ১৪০০ (ডিসেম্বর ১৯৯৩) সংখ্যা



ব্যবস্থাপক সম্পাদক
স্বামী সত্যব্রতানন্দ

সম্পাদক
স্বামী পূর্ণাত্মানন্দ

৮০/৬, গ্রে স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০ ০০৬-স্থিত বসুশ্রী প্রেস থেকে বেলুড় শ্রীরামকৃষ্ণ মঠের ট্রাস্টীগণের পক্ষে স্বামী সত্যব্রতানন্দ কর্তৃক মুদ্রিত ও ১ উদ্বোধন লেন, কলকাতা-৭০০ ০০৩ থেকে প্রকাশিত।
প্রচ্ছদ মুদ্রণ : স্বপ্না প্রিন্টিং ওয়ার্কস (প্রাঃ) লিমিটেড, কলকাতা-৭০০ ০০৯

আজীবন গ্রাহকমূল্য (৩০ বছর পর নবীকরণ-সাপেক্ষ) ☐ এক হাজার টাকা (কিস্তিতেও প্রদেয়)— প্রথম কিস্তি একশো টাকা ☐ আগামী বর্ষের সাধারণ গ্রাহকমূল্য ☐ মাঘ থেকে পৌষ ☐ ব্যক্তিগতভাবে সংগ্রহ ☐ আটচল্লিশ টাকা ☐ সডাক ☐ ছাপান্ন টাকা ☐ বর্তমান সংখ্যার মূল্য ☐ ছয় টাকা।

# গ্রাহকপদ নবীকরণের জন্য বিজ্ঞপ্তি

**উদ্বোধন**

স্বামী বিবেকানন্দ প্রবর্তিত, রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের একমাত্র বাঙলা মুখপত্র, পঁচানব্বই বছর ধরে নিরবচ্ছিন্নভাবে প্রকাশিত দেশীয় ভাষায় ভারতের প্রাচীনতম সাময়িকপত্র

## ৯৬তম বর্ষ ঃ মাঘ ১৪০০—পৌষ ১৪০১/জানুয়ারি ১৯৯৪—ডিসেম্বর ১৯৯৪

☐ **আগামী মাঘ / জানুয়ারি মাস থেকে পত্রিকা-প্রাপ্তি সুনিশ্চিত করার জন্য ৩১ ডিসেম্বর ১৯৯৩-এর মধ্যে আগামী বর্ষের ( ৯৬তম বর্ষ ঃ ১৪০০-১৪০১/১৯৯৪ ) গ্রাহকমূল্য জমা দিয়ে গ্রাহকপদ নবীকরণ করা বাঞ্ছনীয়। নবীকরণের সময় গ্রাহক-সংখ্যার উল্লেখ আবশ্যিক।**

### বার্ষিক গ্রাহকমূল্য

☐ **ব্যক্তিগতভাবে ( By Hand ) সংগ্রহ ঃ ৪৮ টাকা** ☐ **ডাকযোগে ( By Post ) সংগ্রহ ঃ ৫৬ টাকা**
☐ **বাংলাদেশ ভিন্ন বিদেশের অন্যত্র—২৭৫ টাকা ( সমুদ্র-ডাক ), ৫৫০ টাকা ( বিমান-ডাক )**
☐ **বাংলাদেশ—১০০ টাকা।**

### আজীবন গ্রাহকমূল্য ( কেবলমাত্র ভারতবর্ষে প্রযোজ্য ) ঃ এক হাজার টাকা

☐ **আজীবন গ্রাহকমূল্য** ( ৩০ বছর পর নবীকরণ-সাপেক্ষ ) কিস্তিতেও ( অনূর্ধ্ব বারোটি ) প্রদেয়। কিস্তিতে জমা দিলে প্রথম কিস্তিতে কমপক্ষে একশো টাকা দিয়ে পরবর্তী এগারো মাসের মধ্যে বাকি টাকা ( প্রতি কিস্তি কমপক্ষে পঞ্চাশ টাকা ) জমা দিতে হবে।

☐ ব্যাংক ড্রাফট / পোস্টাল অর্ডার যোগে টাকা পাঠালে **"Udbodhan Office, Calcutta"** এই নামে পাঠাবেন। **পোস্টাল অর্ডার "বাগবাজার পোস্ট অফিস"-এর ওপর পাঠাবেন। চেক পাঠাবেন না। বিদেশের গ্রাহকদের চেক গ্রাহ্য। তবে তাঁদের চেক যেন কলকাতাস্থ রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকের ওপর হয়।** প্রাপ্তি-সংবাদের জন্য **দেশ ও বিদেশের গ্রাহকদের** প্রয়োজনীয় ডাকটিকিট পাঠানো বাঞ্ছনীয়।

**কার্যালয় খোলা থাকে ঃ** বেলা ৯.৩০—৫.৩০ ; শনিবার বেলা ১.৩০ পর্যন্ত ( রবিবার বন্ধ )।

☐ ডাকবিভাগের নির্দেশমত **ইংরেজী মাসের ২৩ তারিখ** ( ২৩ তারিখ রবিবার কিংবা ছুটির দিন হলে ২৪ তারিখ ) 'উদ্বোধন' পত্রিকা কলকাতার জি.পি.ও.-তে ডাকে দিই। এই তারিখটি **সংশ্লিষ্ট বাঙলা মাসের সাধারণতঃ ৮/৯ তারিখ** হয়। ডাকে পাঠানোর সপ্তাহখানেকের মধ্যে গ্রাহকদের পত্রিকা পেয়ে যাবার কথা। তবে ডাকের গোলযোগে কখনো কখনো পত্রিকা পৌঁছাতে বিলম্বও হয়। অনেক সময় গ্রাহকরা একমাস পরেও পত্রিকা পান বলে খবর পাই। সে-কারণে সহৃদয় গ্রাহকদের **একমাস পর্যন্ত** অপেক্ষা করতে অনুরোধ করি। **একমাস পরে ( অর্থাৎ পরবর্তী** ইংরেজী মাসের ২৪ তারিখ / **পরবর্তী** বাঙলা মাসের ১০ তারিখ পর্যন্ত ) **পত্রিকা না পেলে গ্রাহকসংখ্যা উল্লেখ করে** কার্যালয়ে **জানালে** ডুপ্লিকেট বা অতিরিক্ত কপি পাঠানো হবে।

☐ যাঁরা **ব্যক্তিগতভাবে** ( By Hand ) **পত্রিকা সংগ্রহ** করেন তাঁদের পত্রিকা **ইংরেজী মাসের ২৭ তারিখ** থেকে বিতরণ শুরু হয়। **স্থানাভাবের জন্য দুটি সংখ্যার** বেশি কার্যালয়ে জমা রাখা সম্ভব নয়। তাই সহৃদয় গ্রাহকদের কাছে অনুরোধ, তাঁরা যেন সেইমত তাঁদের সংখ্যা **সংগ্রহ করে নেন।**

☐ **রামকৃষ্ণ-ভাবান্দোলন** ও **রামকৃষ্ণ-ভাবাদর্শের** সঙ্গে সংযুক্ত ও পরিচিত হতে হলে স্বামী বিবেকানন্দ প্রবর্তিত রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের একমাত্র বাঙলা মুখপত্র **উদ্বোধন** আপনাকে পড়তে হবে।

☐ **স্বামী বিবেকানন্দের** ইচ্ছা ও নির্দেশ অনুসারে **উদ্বোধন** নিছক একটি ধর্মীয় পত্রিকা নয়। ধর্ম, দর্শন, সাহিত্য, ইতিহাস, সমাজতত্ত্ব, বিজ্ঞান, শিল্প সহ জ্ঞান ও কৃষ্টির নানা বিষয়ে গবেষণামূলক ও ইতিবাচক আলোচনা **উদ্বোধন**-এ প্রকাশিত হয়।

☐ **উদ্বোধন-এর গ্রাহক হওয়ার অর্থ** একটি পত্রিকার গ্রাহক হওয়া নয়, একটি মহান ভাবাদর্শ ও ভাবান্দোলনের সঙ্গে যুক্ত হওয়া।

☐ **স্বামী বিবেকানন্দের** আকাঙ্ক্ষা ছিল প্রত্যেক বাঙালীর ঘরে **উদ্বোধন** যেন থাকে। সুতরাং আপনার নিজের গ্রাহক হওয়াই যথেষ্ট নয়। অন্যদের গ্রাহক করাও আপনার কাছে স্বামীজীর প্রত্যাশা।

---

# উদ্বোধন

পৌষ ১৪০০ ডিসেম্বর ১৯৯৩ ৯৫তম বর্ষ—১২শ সংখ্যা

## দিব্য বাণী

দেখ, সব বলে কিনা আমি 'রাধু রাধু' করেই অস্থির, তার ওপর আমার বড় আসক্তি! এই আসক্তিটুকু যদি না থাকত তাহলে ঠাকুরের শরীর যাবার পর এই দেহটা থাকত না। তাঁর কাজের জন্যই না 'রাধু রাধু' করিয়ে এই শরীরটা রেখেছেন।

□

লোকে আমাকে ভগবতী বলে, আমিও ভাবি—সত্যিই বা তা-ই হব। নইলে আমার জীবনে অদ্ভুত অদ্ভুত যা সব হয়েছে।

□

এ শরীর দেবশরীর জেনো। ·· ভগবান না হলে কি মানুষ এত সহ্য করতে পারে?

□

আমিই সেই চিরপুরাতন আদ্যাশক্তি জগন্মাতা, জগৎকে কৃপা করতে আবির্ভূত হয়েছি। যুগে যুগে এসেছি, আবার আসব।

শ্রীশ্রীমা সারদাদেবী

□

স্বামী অরূপানন্দ। কালে তোমার জন্য লোকে কত সাধন করবে।

শ্রীমা (সহাস্যে)। বল কি? সকলে বলবে, আমার মায়ের এমনি বাত ছিল, এমনি খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে হাঁটত।

□

জয়রামবাটীতে একদিন মা রুটি বেলছেন। মায়ের ভাইঝি নলিনী রুটি সেঁকছেন। মায়ের সঙ্গে রুটি বেলছেন বালক-ভক্ত রামময়।

নলিনী-দি। পিসীমা, তোমার চেয়ে রামময়ের রুটি ভাল ফুলছে।

শ্রীমা (অভিমানভরে)। আমি রুটি বেলতে বেলতে বুড়ি হয়ে গেলাম, আর রামময় দুধের ছেলে, গলা টিপলে মুখ দিয়ে দুধ বেরোবে—সে আমার চেয়ে ভাল রুটি বেলছে! আমি আর বেলব না। ও-ই বেলুক।

[এইকথা বলে বেলুন-চাকি সরিয়ে দিয়ে মা বসে রইলেন।]

রামময় [বেলুন-চাকি সরিয়ে দাঁড়িয়ে উঠে] আপনি যদি না বেলেন, তবে আমিও বেলব না। আমিও চললাম। [নলিনী-দিকে] আমরা দুজনে একসঙ্গে দিচ্ছি, তুমি কি করে চিনলে কোনটি পিসীমার আর কোনটি রামময়ের? আমি কখনো মা-র চেয়ে ভাল রুটি বেলতে পারি? তুমি কেন অনর্থক তুলনা করছ?

[মায়ের মুখে এতক্ষণে হাসি দেখা গেল। যে-বেলুন-চাকি তিনি সরিয়ে দিয়েছিলেন বালিকার মতো, হাসিতে মুখ ভরে আবার সেই বেলুন-চাকি টেনে নিয়ে রুটি বেলতে বসলেন।]

## কথাপ্রসঙ্গে

# শ্রীমা সারদাদেবী ঃ দেবী ও মানবী

পৃথিবীর সর্বদেশে সর্বকালে স্মরণাতীত কাল হইতে মানুষ অতি-জাগতিক এক লোকে অতি-মানবিক এক পরম শক্তির অস্তিত্ব কল্পনা করিয়া আসিতেছে। সেই ঐশী শক্তিকে মানুষ পুরুষ বা নারী, অথবা পুরুষ এবং নারী, কিংবা তদতিরিক্ত কোন সত্তা হিসাবে ভাবিয়াছে। সেই শক্তি—তিনি পুরুষ অথবা নারী হউন, অথবা পুরুষ-নারী কিছুই না হউন—এই জগৎপ্রপঞ্চকে পরিচালনা করেন। তাঁহার ইচ্ছায় এই জগৎপ্রপঞ্চ একটি নিয়মের মধ্যে, একটি শৃঙ্খলার মধ্যে চলিতেছে। এই জগতের উৎস তিনি, এই জগৎ রক্ষা ও পালনও করেন তিনি, আবার এই জগতের সংহারকও তিনি।

হিন্দুরা বিশ্বাস করেন যে, সেই ঐশী শক্তি মানব-শরীর গ্রহণ করিয়া সেই অতি-জাগতিক লোক হইতে আমাদের এই জাগতিক লোকে—আমাদের এই পৃথিবীতে 'অবতরণ' করেন। 'অবতরণ' করেন বলিয়া তিনি 'অবতার' বলিয়া অভিহিত হন। আবার জগৎকে 'ত্রাণ' বা 'তারণ' করেন বলিয়াও তিনি 'অবতার'। তাঁহার অবতরণের উদ্দেশ্য জগৎ-কল্যাণ, ধর্ম-সংস্থাপন, দুষ্টের দমন, শিষ্টের রক্ষণ। অবতারের পুরুষ-শরীর হইতে পারে, নারী-শরীরও হইতে পারে। আবার কখনও কখনও একই শক্তি দ্বিধাবিভক্ত হইয়া অগ্নি ও তাহার দাহিকা-শক্তির মতো অবতার ও অবতারসঙ্গিনীরূপে মানব-শরীরে জগতে অবতীর্ণ হইতে পারেন। যেভাবেই তাঁহার বা তাঁহাদের অবতরণ ঘটুক, আমাদের শাস্ত্রে বলা হইয়াছে যে, সেই অচিন্ত্য শক্তি মানব-শরীর গ্রহণ করিলে সকল মানবিক সীমাবদ্ধতা, সকল মানবিক আচার-আচরণকেও তিনি বা তাঁহারা স্বীকার করেন। আপাতদৃষ্টিতে সাধারণ মানব-মানবীর মতোই তাঁহার বা তাঁহাদের সমস্ত কিছুই। অন্য যেকোন নর-নারীর সহিত যেন কোন পার্থক্যই তাঁহাদের নাই। মহারাজ পরীক্ষিতকে মহর্ষি শুকদেব বলিয়াছিলেন ঃ

> অনুগ্রহায় ভূতানাং মানুষং দেহমাস্থিতঃ।
> ভজতে তাদৃশীঃ ক্রীড়া যৎ শ্রুত্বা তৎপরো ভবেৎ॥
> (ভাগবত, ১০।৩৩।৩৭)

—প্রাণিসমূহের প্রতি করুণাপরবশ হইয়া তিনি মানুষের শরীর গ্রহণ করেন এবং মানুষের মতোই আচরণ করেন যাহাতে সেই সকল আচরণের কথা শুনিয়া বা সেইসকল আচরণ দেখিয়া বা অনুসরণ করিয়া মানুষ 'তৎপর' অর্থাৎ ঈশ্বরপরায়ণ হয়।

বস্তুতঃ, জীবের কল্যাণের জন্যই ঐশী সত্তার মানবদেহ-ধারণ। হিন্দুরা বিশ্বাস করেন, রামচন্দ্র ও সীতা, কৃষ্ণ ও রাধা, বুদ্ধ ও যশোধরা, চৈতন্য ও বিষ্ণুপ্রিয়া ঐ ঐশী শক্তির লীলাবিগ্রহ। বর্তমান যুগে রামকৃষ্ণ ও সারদার আবির্ভাবে ঐ লীলারই পুনরাবৃত্তি। সাধারণ মানব-মানবীর শরীর অবলম্বন করিয়া জগৎনিয়ন্তা ঈশ্বর পৃথিবীতে আবির্ভূত হন, সাধারণ মানুষের পক্ষে ইহা বিশ্বাস করা কঠিন, বিশেষতঃ সংশ্লিষ্ট অবতার বা অবতার-সঙ্গিনীর জীবনকালে ইহা অধিকতর কঠিন। অবশ্য ইহাই স্বাভাবিক। তাহারই মতো দেখিতে, তাহারই মতো ক্ষুৎ-পিপাসা-নিদ্রার অধীন একজনকে মানুষ কিভাবে জগৎকর্তা বা জগৎকর্ত্রী বলিয়া ভাবিতে পারে? কৃষ্ণ অর্জুনকে বলিয়াছিলেন ঃ

> অবজানন্তি মাং মূঢ়া মানুষীং তনুমাশ্রিতম্।
> পরম্ ভাবমজানন্তো মম ভূতমহেশ্বরম্॥
> (গীতা, ৯।১১)

—আমি যে সর্বভূতের নিয়ন্তা আমার এই পরম স্বরূপ বা তত্ত্ব সম্পর্কে অজ্ঞগণ মানবদেহধারী বলিয়া আমাকে অবজ্ঞা করে।

অবশ্য রামায়ণ, মহাভারত, ভাগবত ও অন্যান্য পুরাণ এবং চৈতন্যভাগবত প্রভৃতি সূত্রে জানা যায় যে, জীবনকালেই রাম, কৃষ্ণ ও চৈতন্যকে ঈশ্বরাবতার বলিয়া কেহ কেহ দেখিয়াছেন, কিন্তু তুলনায় সীতা, রাধা ও বিষ্ণুপ্রিয়া অনেক নিষ্প্রভ। রামকৃষ্ণও তাঁহার জীবনকালে কাহারও কাহারও চোখে ঈশ্বরাবতার বলিয়া প্রতিভাত হইয়াছেন। লক্ষ্য করিবার বিষয়, তাঁহার জীবনকালেই অবতারসঙ্গিনী এবং জগন্মাতা-রূপে কাহারও কাহারও নিকট প্রতিভাত হইয়াছেন সারদাও। যুক্তিবাদীর চোখে রামায়ণ, মহাভারত, পুরাণ প্রভৃতি সূত্র অবশ্য খুব বেশি প্রামাণ্য বলিয়া গ্রাহ্য নয়, এমনকি রাম ও কৃষ্ণের সমকালে যে ঐগুলি রচিত হয় নাই সেবিষয়েও আজ আর কোন সন্দেহ নাই। একথা চৈতন্যভাগবত, চৈতন্যমঙ্গল প্রভৃতি সম্পর্কেও প্রযোজ্য। কিন্তু রামকৃষ্ণ এবং সারদা সম্পর্কে এই যুক্তি চলিবে না। 'কথামৃত', 'মায়ের কথা'-র কথা ছাড়িয়া দিলেও সমকালীন পত্র-পত্রিকার সূত্রে, প্রত্যক্ষদর্শীদের বিবরণের মাধ্যমে

এবং স্বামী বিবেকানন্দ প্রমুখের কথোপকথন ও পত্রাবলী প্রভৃতি প্রামাণ্য সূত্র হইতে দেখা যায় যে, রামকৃষ্ণ ও সারদার ঐশ সত্তা তাঁহাদের জীবনকালেই প্রতিষ্ঠিত ও স্বীকৃত হইয়াছে।

আমাদের বর্তমান আলোচনা শ্রীমা সারদাদেবী সম্পর্কে। লক্ষণীয় ব্যাপার হইল, কেহ কেহ তাঁহাকে দেবী বলিয়া দেখিলেও তিনি নিজে কিন্তু সেবিষয়ে একান্তভাবে অনাগ্রহী থাকিতেন; পরন্তু কেহ তাঁহাকে ঐভাবে প্রকাশ্যে দেখিতে চাহিলে তিনি তাহাকে নিরুৎসাহ করিতেন অথবা অতি যত্নে ঐ প্রসঙ্গ এড়াইয়া চলিতেন, এমনকি কখনও কখনও ঐ আলোচনা ও দৃষ্টিভঙ্গির মূলে নির্মমভাবে আঘাত করিতেও তাঁহাকে দেখা গিয়াছে। বলা বাহুল্য, ইহা শ্রীরামকৃষ্ণ সম্পর্কেও একইভাবে বলা চলে। তবে শ্রীরামকৃষ্ণের একটি 'অসুবিধা' ছিল। তিনি না চাহিলেও তাঁহার অপরিমেয় ঐশ 'ঐশ্বর্য' প্রকাশিত হইয়া পড়িত। তাঁহার সমাধির ঐশ্বর্য, তাঁহার বিদ্যার ঐশ্বর্য দেখিয়া সমকালীন বিদগ্ধ জনমণ্ডলী অভিভূত হইয়াছেন। কিন্তু সারদাদেবীর অনুরূপ ঐশ্বর্য-প্রকাশ দুর্লভ—অতি দুর্লভ ঘটনা। দুরারোগ্য গলরোগে আক্রান্ত হইবার পূর্বে শ্রীরামকৃষ্ণের রূপের ঐশ্বর্যও ছিল, কিন্তু সারদাদেবীর সে-ঐশ্বর্যও ছিল অবলুপ্ত। আপাতদৃষ্টিতে তিনি ছিলেন সেযুগের আর পাঁচজন সাধারণ পল্লীনারীর মতোই। শুধু আকৃতিতেই নয়, শিক্ষা, বেশভূষা, আচার-আচরণ সর্বদিক দিয়াই তাঁহার সহিত জয়রামবাটীর বা বাংলার যেকোন গণ্ডগ্রামের বধূ বা বিধবার কোন পার্থক্য ছিল না।

কাশীর সেই সুপরিজ্ঞাত ঘটনাটি মনে পড়িতেছে। সেদিন তিন-চারজন মহিলা তাঁহাকে দর্শন করিতে আসিয়াছেন। তাঁহারা পূর্বে কখনও তাঁহাকে দেখেন নাই, কিন্তু কাশীতে তাঁহার আগমন-সংবাদ পাইয়া তাঁহাকে দেখিতে আগ্রহী হইয়াছেন। ধরিয়া লইতে পারি যে, তাঁহাকে অসাধারণ ভাবিয়াই তাঁহারা তাঁহার দর্শন-প্রত্যাশী হইয়াছিলেন। শ্রীমা বারান্দায় বসিয়া আছেন, পাশে গোলাপ-মা প্রমুখ তাঁহার সঙ্গিনী ও অন্য মহিলাভক্তরাও আছেন। আগন্তুক মহিলাদের মধ্যে একজনের গোলাপ-মাকে দেখিয়া ধারণা হয় যে, তিনিই শ্রীমা। গোলাপ-মার আকৃতিগত বৈশিষ্ট্য, বয়স এবং রাশভারী ব্যক্তিত্বের নিরিখে মহিলাটির ঐরূপ ভাবনায় কোন অস্বাভাবিকতা ছিল না নিশ্চয়ই। সুতরাং মহিলাটি শ্রীমা-জ্ঞানেই গোলাপ-মাকে প্রণাম করিলেন। গোলাপ-মা বুঝিলেন যে, মহিলাটি তাঁহাকে শ্রীমা ভাবিয়াছেন। তাই সঙ্গে সঙ্গে মাকে দেখাইয়া মহিলাটিকে তিনি বলিলেন: "উনিই মা-ঠাকরুন।" মায়ের দিকে তাকাইয়া মহিলাটির মনে হইল, গোলাপ-মা রহস্য করিতেছেন। কারণ, মায়ের চেহারায় তিনি কোন বিশেষত্ব দেখিতে পাইলেন না। তবু গোলাপ-মার কথায় অগত্যা মাকে প্রণাম করিতে অগ্রসর হইতেই মা হাসিতে হাসিতে গোলাপ-মাকে দেখাইয়া বলিলেন: "না, না, উনিই মা-ঠাকরুন।" বিভ্রান্ত মহিলা আবার গোলাপ-মার দিকে ফিরিতেই গোলাপ-মা তাঁহাকে ধমক দিয়া বলিলেন: "তোমার কি বুদ্ধি-বিবেচনা নেই। দেখছ না—মানুষের মুখ কি দেবতার মুখ? মানুষের চেহারা কি অমন হয়?" (দ্রঃ শ্রীমা সারদাদেবী—স্বামী গম্ভীরানন্দ, ১৯৮৪, পৃঃ ২৯৬)

ঠিক, খুবই ঠিক কথা। মায়ের সরল ও সাধারণ মুখে নিশ্চয়ই এমন একটি অসাধারণ বৈশিষ্ট্য ছিল যা দেখিলে বুঝা যাইত যে, উহা মানুষের মুখ নয়, দেবতারই মুখ। কিন্তু মুখ দেখিতে পাইলে তো। মুখই যদি দেখিতে না পাই তাহা হইলে কেমন করিয়া বুঝিব? তিনি যে তাঁহার মুখ বহু যত্নে ঢাকিয়া রাখিতেন দীর্ঘ অবগুণ্ঠনে। ঐ অবগুণ্ঠনের দ্বারা তিনি যে শুধু নিজের বাহ্য রূপকেই ঢাকিয়া রাখিতেন তাহা নয়, ঢাকিয়া রাখিতেন তাঁহার প্রকৃত স্বরূপকেও। নিজেকে গোপন করিবার ঐ নিরন্তর সযত্ন প্রয়াসের ফলে তিনি নিজেকে সাধারণের কাছে করিয়া তুলিয়াছিলেন দুর্বোধ্য এবং দুর্জ্ঞেয়। অপ্রাসঙ্গিক হইলেও এখানে অনেকের মনে পড়িবে রবীন্দ্রনাথের 'কর্ণ-কুন্তী সংবাদ'-এ কর্ণের সেই মর্মস্পর্শী আর্তি: "জননী, গুণ্ঠন খোল, দেখি তব মুখ।" স্বামী অভেদানন্দ তাঁহার সুবিখ্যাত মাতৃ-স্তোত্রে মায়ের সম্পর্কে লিখিয়াছেন: "লজ্জা-পটাবৃতে নিত্যম্"। সর্বদা তিনি নিজেকে 'লজ্জা-পটাবৃতা' করিয়া, যেন নববধূর 'লজ্জাবস্ত্র' দ্বারা নিজেকে আবৃত করিয়া রাখিতেন। বস্তুতঃ, এই আবরণ যেন তাঁহার স্বভাবেরই বৈশিষ্ট্য। তিনি ধরা দিতে চাহেন, কিন্তু অধরা থাকিতেই যেন তিনি ভালবাসেন। উপনিষদের ঋষিরা ব্যাকুলভাবে ব্রহ্মের স্বরূপকে আবিষ্কার করিতে প্রয়াসী হইতেন, কিন্তু অজ্ঞানের আবরণকে ছিন্ন করিয়া ব্রহ্মের সত্য স্বরূপের দর্শনলাভ খুব কম ঋষির ভাগ্যেই ঘটিত। কারণ, ব্রহ্ম যে সতত তাঁহার স্বরূপের সম্মুখে 'মায়া'র আবরণ দিয়া রাখিয়াছেন। সেই জন্যই তো

এই আর্তি আমরা শুনি ঈশোপনিষদের মন্ত্রে (১৬):
হিরণ্ময়েন পাত্রেণ সত্যস্যাপিহিতং মুখম্।
তত্ত্বং পূষন্নপাবৃণু সত্যধর্মায় দৃষ্টয়ে ॥
—জ্যোতির্ময় পাত্রের দ্বারা সত্যের মুখ অর্থাৎ স্বরূপ আবৃত। হে পূষণ, হে জগৎপরিপোষক সূর্য, আমি যাহাতে সত্যধর্মের উপলব্ধি করিতে পারি সেজন্য তুমি ঐ আবরণকে অপনীত কর।

সত্যের মুখ সোনালী কুয়াশাতেই তো ঢাকা থাকে। সত্য যদি স্বয়ং কৃপা করিয়া সেই আবরণটি সরাইয়া না দেয়, যদি অপাবৃত অর্থাৎ উন্মোচন করিয়া না দেয় তাহা হইলে সত্যের স্বরূপকে দর্শন করিবার কাহারও সাধ্য নাই। মায়ের সম্পর্কেও একই কথা আমাদের। তিনি যদি দয়া করিয়া আমাদের কাছে ধরা না দেন তাহা হইলে আমাদের সাধ্য কি যে তাঁহাকে ধরি? এই প্রসঙ্গে আবার সেই কাশীরই একটি ঘটনা মনে পড়িতেছে।

সেদিন কাশীতে মায়ের অবস্থানকালে কয়েকটি মহিলা আসিয়া দেখেন, মা রাধু, ভূদেব প্রভৃতি ভাইপো-ভাইঝিকে লইয়া খুব ব্যস্ত; উহারই মধ্যে গোলাপ-মাকে নিজের পরিধেয় বস্ত্রের ছিন্ন অংশটি সেলাই করিয়া দিতে বলিতেছেন। আগন্তুক মহিলারা দেখিলেন, এ কাহাকে তাঁহারা দেখিতে আসিয়াছেন। ইনিও তো তাঁহাদের মতো ঘোরতর সংসারী। এখানেও সেই চিরপরিচিত ঘরকন্নার, সেই সংসারলীলারই পুনরাবৃত্তি চলিতেছে। তাই তাঁহারা মাকে বলিয়াই ফেলিলেন: "মা, আপনিও দেখছি মায়ায় ঘোর বন্ধ।" অস্ফুটস্বরে মা উত্তর দিলেন: "কি করব মা, নিজেই মায়া।" (ঐ, পৃঃ ২৯৫) বলা বাহুল্য, আগন্তুক মহিলারা এই কথার তাৎপর্য অনুধাবন করিতে পারেন নাই। আর, তাহাদেরই বা দোষ কী? যাঁহার অনির্বচনীয় মায়ায় মুগ্ধ বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সকল জীব, সেই মহামায়া স্বয়ং সশরীরে আসিয়াও যদি নিজেকে আড়াল করিয়া রাখেন, কার সাধ্য তাঁহাকে চেনে? এই খেলা এবং খেলানোতেই যে তাঁহার আনন্দ। অত সহজেই যদি তিনি ধরা দিয়া ফেলেন তাহা হইলে খেলা জমিবে কেমন করিয়া? তাই কুটনো কুটিয়া, বাসন মাজিয়া, ঘর ঝাঁট দিয়া, ধান সিদ্ধ করিয়া, ভাত রান্না করিয়া, রুটি বেলিয়া, বাতের ব্যথায় অচল হইয়া দেখাইলেন, তিনি মানবীই এবং মানবীর মধ্যেও আবার অতি সাধারণ। কাশীতে মাকে যে-প্রশ্নটি ঐ মহিলারা করিলেন ঐরূপ প্রশ্নের সম্মুখীন তাঁহাকে বহুবার হইতে হইয়াছে। যেমন একজন ভক্তই একদিন মাকে মুখের উপর বলিয়া দিলেন: "মা, আপনার কেন এত আসক্তি? রাতদিন 'রাধী, রাধী' (ভাইঝি রাধুকে মা আদর করিয়া 'রাধী' বলিতেন।) করছেন, ঘোর সংসারীর মতো।... এত আসক্তি? এগুলো কি ভাল?"

সাধারণতঃ এইরূপ প্রশ্ন শুনিতে অভ্যস্ত মা বিনম্রভাবে বলিতেন: "আমরা মেয়েমানুষ, আমরা এই রকমই।" সেদিন কিন্তু বিদ্যুৎঝলকের একটি উত্তর তাঁহার কণ্ঠে ঝলসাইয়া উঠিল। উত্তেজিত কণ্ঠে বলিলেন: "তুমি এরকম কোথায় পাবে? আমার মতো একটি বের কর দেখি। কি জান, যারা পরমার্থ খুব চিন্তা করে, তাদের মন খুব সূক্ষ্ম হয়ে যায়। সেই মন যা ধরে, সেটাকে খুব আঁকড়ে ধরে। তাই আসক্তির মতো মনে হয়। বিদ্যুৎ যখন চমকায় তখন শার্সিতেই লাগে, খড়খড়িতে লাগে না।" (ঐ, পৃঃ ২০৯)

বাস্তবিকই ইহা ছিল একটি বিদ্যুৎঝলক। কিন্তু বিদ্যুৎঝলক যেমন অকস্মাৎ ঘনান্ধকার বিদীর্ণ করিয়া দৃশ্য হয় এবং মুহূর্তের জন্য সুতীব্র আলোক বিকিরণ করিয়া মুহূর্তেই অদৃশ্য হইয়া যায়, মায়ের ঐরূপ অকস্মাৎ আত্মপ্রকাশও অতি দ্রুত অন্তর্হিত হইত। পরমুহূর্তেই আবার সেই আগের সাধারণ মানবী রূপকেই তিনি আরও বেশি করিয়া প্রকট করিয়া দিতেন। হয়তো কখনও আপন মনে বলিয়া ফেলিয়াছেন: "আমি আর অনন্ত হাতেও কাজ শেষ করতে পারছি না।" বলার পরেই দেখিলেন তাঁহার কথা একজন শুনিয়া ফেলিয়াছে, অমনি যেন বেফাঁস কিছু বলিয়াছেন, সেই ভাবে সহাস্যে তাহাকে শুনাইলেন: "দেখ, আমার দুটো হাত, আমি কিনা আবার বলছি, আমার অনন্ত হাত।" (ঐ, পৃঃ ৪৬০)

বাস্তবিক এই আলো-আঁধারির মধ্যে তিনি নিজেকে জগতের সামনে রাখিয়াছিলেন। তাই দেবী অথবা মানবী—কি বলিব তাঁহাকে? তিনি যে মানবী নহেন—দেবীই, তাহা তো তাঁহার আচরণে, কথায় এবং তাঁহার সম্পর্কে শ্রীরামকৃষ্ণ, স্বামী বিবেকানন্দ প্রমুখের উক্তি ও আচরণে আমরা জানিয়াছি। আবার তিনি যে মানবী—সুখে, দুঃখে, ব্যাধিতে, শোকে, সাংসারিক সমস্যায়, আসক্তি ও রঙ্গ-রসিকতায় তাহার ভূরি ভূরি প্রমাণ পাইয়াছি। তাহা হইলে তিনি কি? তিনি দেবী, আবার তিনি মানবীও। তিনি উভয়ই। আবার দেবী ও মানবীর মধ্যে ও বাহিরে কিছু থাকলে তিনি তাহাও। □

# স্বামী সারদানন্দের অপ্রকাশিত পত্র

৪ এপ্রিল, ১৮৯৯
মোরভি ( গুজরাট )

প্রিয় ডক্টর*

উপরোক্ত ঠিকানা দেখে বুঝতে পারছেন যে, আমি তখনও পশ্চিম ভারতে ভ্রমণরত।[১] শ্রীযুত গান্ধীর জন্মস্থানের খুবই নিকটবর্তী এই স্থান। কয়েকদিনের মধ্যে আমাদের সেখানে যাবার ইচ্ছা।

আপনার ২০ ফেব্রুয়ারি তারিখের চিঠিখানি মঠ থেকে এখানে পাঠিয়ে দিয়েছে। সেই সঙ্গে এসেছে একটি আবাঁধা পুস্তিকা ( pamphlet ) এবং আপনার লিখিত নিবন্ধগুলি সমেত একখানি পত্রিকা। এইমাত্র নিবন্ধগুলি পড়ে শেষ করলাম। রচনাগুলি অতি চিত্তাকর্ষক ও শিক্ষামূলক হয়েছে। আপনাকে অনেক ধন্যবাদ।

প্রাচ্যদর্শন হতাশাব্যঞ্জক—এই অভিযোগ সত্যও বটে, অসত্যও বটে। ভারতীয় দর্শনসমূহ বেদ-উপনিষদের যুগে যে হতাশাপূর্ণ ছিল না, একথা ঐ সকল গ্রন্থের পাঠকমাত্রেই নিশ্চিতভাবে জানেন। কিন্তু বুদ্ধ-দর্শনে ও বুদ্ধোত্তর যুগে দুঃখদ্যোতক ভাবনার প্রাবল্য অনস্বীকার্য। সেই মহামানবের বিশাল প্রতিভা, অপরিসীম করুণা ও শুদ্ধ জীবন সশ্রদ্ধভাবে স্মরণ করেও বলতে পারি, ভারতবর্ষে দুঃখবাদের তিনিই অন্যতম প্রধান প্রবর্তক। তিনি মাংসভোজন নিষেধ করেছিলেন, তাঁর নিজ পরিবারের সকলকে সন্ন্যাসগ্রহণ করিয়েছিলেন; পুরুষ ও নারীগণের জন্য বড় বড় মঠ গড়ে তুলেছিলেন। তদানীন্তন সমাজের সেরা মানুষগুলিকে সন্ন্যাসধর্মে দীক্ষিত করে সমাজের অবশিষ্ট অংশকে পঙ্গু করে ফেলেছিলেন; স্বাভাবিক কারণেই যারা সংসারে ও পারিবারিক জীবনে থেকে গিয়েছিল, তারা নিজেদের দুর্বল ও আত্মসংযমহীন ভাবতে থাকল। এসকল ভাবনা সমাজের মধ্যে একেবারে সেঁধিয়ে যাওয়াতে বিবাহের মহৎ আদর্শ মর্যাদাচ্যুত হয়েছিল, সমাজজীবন দুর্বল হয়ে পড়েছিল। বুদ্ধপূর্বকালে বেদান্তের মহান আচার্যগণ জন্মসূত্রে ব্রাহ্মণ ছিলেন না। বেদান্তাচার্যগণ ছিলেন মুকুটধারী নৃপতি, যাঁরা সংসারান্তর্গত প্রচণ্ড কর্মময় জীবনযাপন করতেন এবং তাঁদের কেউ কেউ জীবনের শেষভাগে সন্ন্যাসগ্রহণ করতেন। কিন্তু বিদ্রোহী বুদ্ধ জনসাধারণের মধ্যে সর্বোচ্চ স্থান-বিতরণের উদ্দেশ্যে সন্ন্যাসের প্রাতিষ্ঠানিক মর্যাদাদান করেছিলেন। ফলে সমাজে ভিক্ষুক ও ভিক্ষুণীদের উঁচু স্থান নির্দেশিত হয়েছিল। পরিণতিতে সমাজের বন্ধন শিথিল হয়েছিল, সমাজের অধঃপতন ঘটেছিল।

মনে হয়, দুঃখবাদের জন্য দ্বিতীয় একটি সহজাত কারণও দায়ী। সেটি হচ্ছে, দেশের সম্পদের অভ্যুদ্ভূত উন্নয়ন। সে-উন্নয়ন হয়তো বর্তমানের তুলনায় নেহাতই তুচ্ছ, কিন্তু সমকালীন বিশ্বের যেকোন দেশ বা সমাজে সেটাই ছিল সর্বোচ্চ মানের। সামাজিক উন্নয়নও সর্বোচ্চ শীর্ষে উঠেছিল। মানুষ নিয়ত ভোগ করতে করতে বিরক্ত হয়ে উঠেছিল। সঞ্চিত সম্পদ তাদের নিকট বোঝা-স্বরূপ হয়ে উঠেছিল এবং স্বাভাবিকভাবেই বৌদ্ধধর্ম উন্মোচিত করে দিয়েছিল এক নৈতিক ও ধর্মীয় মহৎ পথ। মানুষ ও পশুদের জন্য চিকিৎসালয়, বৃহৎ বাড়ি ও স্তূপ এবং পরবর্তী কালে মন্দির ইত্যাদি গড়ে উঠেছিল। গরিবদের মধ্যে ধনসম্পদ সর্বস্ব বিতরণ করে নাগরিকগণ মঠের

* চিঠিটি উইলিয়ম জেমসকে লেখা। মূল চিঠিটি ইংরেজীতে লেখা। বঙ্গানুবাদ ও পাদটীকা সংযোজন করেছেন স্বামী প্রভানন্দজী।—সম্পাদক, উদ্বোধন

১ ৭।২।১৮৯৯ তারিখে কলকাতা থেকে যাত্রা করে স্বামী সারদানন্দ ও স্বামী তুরীয়ানন্দ রাজস্থান ও গুজরাটে বেদান্তপ্রচার ও অর্থসংগ্রহ করতে বেরিয়েছিলেন। কলকাতায় ফিরেছিলেন ৩ মে।

সন্ন্যাসীর জীবন বরণ করে নিল। বৌদ্ধধর্মের অধঃপতনকালে লিখিত পুরাণসমূহের মধ্যে প্রাচীন বৈদিক ধর্ম অবর্তমান বা ছিটে-ফোঁটামাত্র বিদ্যমান ছিল এবং তার মধ্যে স্থান পেয়েছিল প্রাচীন ধর্মে প্রচলিত নিম্নজাতীয় পশুহিংসার পরিবর্তে অহিংসার অস্ফুট ধ্বনি। তার সঙ্গে মিশে গিয়েছিল কিছু আচার-অনুষ্ঠান। অবশ্য, সেসকল আচার-অনুষ্ঠান বৌদ্ধগণ-প্রবর্তিত প্রতীকের সম্মুখে অনুষ্ঠিত হতো না। সৃষ্টি ও মুক্তির প্রতীকস্বরূপ মা-কালী বা শিবলিঙ্গের পূজা প্রবর্তিত হয়েছিল। তদানীন্তন পুনরুজ্জীবনের সমর্থকগণের চেষ্টায় এসকল প্রতীক অনেক সময় বৌদ্ধদের মন্দির বেদখল করে সেখানে অথবা বৌদ্ধমন্দিরের নিকটবর্তী নবনির্মিত কোন মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। এধরনের উপাসনাদির প্রবর্তন সহজ হয়ে উঠেছিল, কারণ বৌদ্ধধর্ম কখনই (হিন্দুদের) প্রচলিত উপাসনা ও অনুষ্ঠানাদি সম্পূর্ণ নির্মূল করেনি, অথবা বৌদ্ধধর্মের পাশাপাশি এসকলের সহাবস্থান সম্বন্ধে প্রতিবাদ বা প্রতিরোধ করেনি। বর্তমানে ভারতবর্ষে যে হিন্দুধর্ম দেখতে পাওয়া যায় তা বৌদ্ধমতবাদের কিছু অংশের সহিত বৈদিক মতবাদের কিছু সংমিশ্রন-মাত্র। পুনরুজ্জীবনকালে যে-সকল উপাসনা, আচার ও অনুষ্ঠানের প্রবর্তন হয়েছিল তাদের অধিকাংশই বেদে অনুপস্থিত। সে-কারণে গোঁড়া হিন্দুধর্ম নামে পরিচিত বর্তমানের হিন্দুধর্মে দুঃখবাদের আবহাওয়া দেখা যায়। অবশ্য পাশ্চাত্য চিন্তাভাবনার সংস্পর্শে এসে সেসকল দ্রুত উবে যাচ্ছে।

আপনার ছোট দুটি মেয়েই অসুস্থ জেনে আমি খুবই দুঃখিত। আশা করি এ-চিঠি পৌঁছাবার পূর্বেই তারা সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে উঠবে। তাদের সতত জানাই আমার প্রীতি ও আশীর্বাদ।

স্বামী বিবেকানন্দের স্বাস্থ্য অনেকাংশে ভাল। যদিও তিনি পূর্বেকার স্বাস্থ্য ফিরে পাননি, তবুও তিনি মঠে [ সাধু-ব্রহ্মচারিদের ] ক্লাস নিতে আরম্ভ করেছেন। কলকাতার চিঠি থেকে জানতে পেরেছি, তিনি সুস্থ আছেন এবং কিছু হালকা কাজকর্ম করছেন। আশা করি তিনি অচিরেই সম্পূর্ণ নিরাময় হয়ে উঠবেন।

আমাদের প্রয়াত বন্ধুর পুরো নামটি আমার অজ্ঞাত। তাঁর নামের আদ্যক্ষরসমূহ হচ্ছে জে. জে. গুডউইন। সম্ভবতঃ ইংল্যান্ডের শ্রীযুত স্টার্ডি তাঁর পুরো নামটি জানেন।

গ্রীনএকর কনফারেন্সকে সুপ্রতিষ্ঠিত করবার আকাঙ্ক্ষা থাকলে তারা আপনাকে বাদ দিতে পারবে না। তাদের খবরাখবর শুনে আমি খুবই দুঃখিত।

বারাণসী সম্মেলন সম্বন্ধে আমি এ-পর্যন্ত কিছু শুনিনি। কলকাতায় ফিরে এবিষয়ে সত্বর খোঁজখবর নেব।

এখানকার অনেকের ধারণা, আপনাদের দেশ একটি সুমহান আদর্শ বর্জন করতে চলেছে। অবশ্য, ফিলিপিন্স দ্বীপপুঞ্জ স্বাধিকারে রেখে শাসন করলে আপনাদের সামাজিক, রাজনৈতিক ও শৈল্পিক জীবনে বিপুল পরিবর্তন উপস্থিত হবে। বোধ করি, এটা বেদান্তাচার্যগণ উপদিষ্ট অপর একটি দৃষ্টান্ত। তাঁরা বলেন, একটি নিখুঁত সমাজ-গঠন অথবা কি পৃথিবীতে, কি অন্য লোকে একনাগাড়ে স্থায়ী উন্নয়ন অসম্ভব। সম্ভবতঃ ভারতীয় দুঃখবাদের কারণ পূর্ণাঙ্গ সমাজসৃষ্টি ও নিয়ত সামাজিক উন্নয়ন সম্বন্ধে দীর্ঘকালব্যাপী পুনঃপুনঃ প্রচেষ্টার ফলশ্রুতি। ভারতবর্ষ অতীতে এবিষয়ে বিফল হয়েছে, আমেরিকা যদি সেবিষয়ে সফল হয় তাহলে আমরা আমাদের হতাশাব্যঞ্জক ভাবনার এ-কালটি পরিবর্তিত করব। আমার আশা ও প্রার্থনা, এটি সত্যে পরিণত হোক।

অতঃপর আপনার সঙ্গে মিসেস ফারওয়েল ও মিসেস উইর ( Wyre )-এর সাক্ষাৎ হলে তাঁদের এবং অন্যান্য বন্ধুদের অনুগ্রহপূর্বক আমার কথা বলবেন।

'দি এরেনা' পত্রিকার জানুয়ারি সংখ্যায় প্রকাশিত মিঃ ডয়সনের লেখা 'নতুন ভাবনা' ('The New Thought') শীর্ষক প্রবন্ধটি পড়েছেন কি? এক জায়গায় তিনি বলেছেন: "দুটি চিন্তাধারা সতর্কভাবে বিচার করে আমি আশা করছি এবং এটা আমি সুবিবেচনা করেই বলছি যে, প্রাচ্যবাদের

প্রতি ব্দ্‌কে পড়ার প্রয়াস আর থাকবে না।" প্রবন্ধের পূর্বেকার পঙ্‌ক্তি থেকে বোঝা যায়, 'প্রাচ্যবাদ' দ্বারা বেদান্তকে বোঝানো হয়েছে। তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ হলে অনুগ্রহ করে তাঁকে বলবেন যে, বেদান্তের যদি জগৎকে কিছু দেবার না থাকে তাহলে আমরাই সর্বাগ্রে তাকে বর্জন করব এবং তাকে সরিয়ে দিয়ে মহত্তর ও উচ্চতর সত্যের জন্য স্থান করব। কিন্তু যেহেতু তথাকথিত এই নতুন ভাবনা মানুষের কৌতূহলকে উদ্দীপিত করে, কারণ তার দ্বারা দু-চারটি মাথাব্যথা সারানো যায় অথবা রোগাক্রান্ত মানুষের অতি স্পর্শকাতরতাজনিত রোগের অর্থাৎ মানসিক সমস্যার নিরাময় করা যায়, সেহেতু আমরা বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ চিন্তাপ্রণালীকে বর্জন করতে পারি না। আমাদের এই চিন্তারাশি পরমতসহিষ্ণুতার মাপকাঠিতে অসাধারণ। অবিচ্ছেদ্য একটি শিকলের মতো এই চিন্তারাশি অতুলনীয়। এই শিকলের প্রান্তে রয়েছে অনন্ত ও করুণাঘন ঈশ্বর। এই শিকলের পাব বা যোগসূত্রগুলি জীবনের যাবতীয় স্তরে সশ্রদ্ধভাবে ব্যবহারের উপযোগী।

মিসেস জেমস এবং আপনাকে সহৃদয় শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করছি। ইতি

আপনাদের চিরবন্ধু
**সারদানন্দ**

[হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শন বিভাগের প্রধান এবং কয়েকটি মূল্যবান মনোবিজ্ঞান ও দর্শন-বিষয়ক গ্রন্থের লেখক ডঃ উইলিয়ম জেমসের (১৮৪২-১৯১০) সঙ্গে স্বামী সারদানন্দের পরিচয় হয়েছিল গ্রীনএকর কনফারেন্স ও মিসেস ওলি বুলের সূত্রে। সে-পরিচয় বন্ধুত্বে পরিণত হয়েছিল। ডঃ জেমস এবং তাঁর মৃত্যুর পরে মিসেস জেমসের সঙ্গে স্বামী সারদানন্দের পত্রালাপ ছিল।—স্বামী প্রভানন্দ]

---

## প্রচ্ছদ-পরিচিতি

প্রচ্ছদের আলোকচিত্রটি কামারপুকুরের শ্রীরামকৃষ্ণের বাসগৃহের। পাঁচের দশকের প্রথমদিকে আলোকচিত্রটি গৃহীত হয়েছিল।

বর্তমান বর্ষটি (১৯৯৩) শ্রীরামকৃষ্ণ-ভাবান্দোলনের ক্ষেত্রে একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বর্ষ। কারণ, এই বর্ষে শিকাগো ধর্মমহাসম্মেলনে স্বামী বিবেকানন্দের আবির্ভাবের শতবর্ষ পূর্ণ হয়েছে। শিকাগো ধর্ম-মহাসভায় স্বামী বিবেকানন্দ যে-বাণী প্রচার করেছিলেন এবং যে-বাণী ধর্মমহাসভার সর্বশ্রেষ্ঠ বাণী বলে অভিনন্দিত হয়েছিল, সে-বাণী ছিল সমন্বয়ের বাণী। ধর্মের সমন্বয়, মতের সমন্বয়, সম্প্রদায়ের সমন্বয়, দর্শনের সমন্বয়, আদর্শের সমন্বয়—প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের সমন্বয়, প্রাচীন ও নবীনের সমন্বয়, অতীত বর্তমান ও ভবিষ্যতের সমন্বয়। ভারতবর্ষ সুপ্রাচীন কাল থেকে এই সমন্বয়ের বাণী ও আদর্শ প্রচার করে আসছে। আধুনিককালে এই সমন্বয়ের সর্বপ্রধান ও সর্বশ্রেষ্ঠ প্রবক্তা শ্রীরামকৃষ্ণ। সাধারণভাবে সনাতন ভারতবর্ষের এবং বিশেষভাবে শ্রীরামকৃষ্ণের সমন্বয়ের বাণীকে স্বামী বিবেকানন্দ বহির্বিশ্বের সমক্ষে উপস্থাপিত করেছিলেন। চিন্তাশীল সকল মানুষই আজ উপলব্ধি করছেন যে, সমন্বয়ের আদর্শ ভিন্ন পৃথিবীর স্থায়িত্বের আর কোন পথ নেই। সমন্বয়ের পথই বর্তমান পৃথিবীর বহুবিধ সমস্যা ও সংকটের মধ্য থেকে উত্তরণের একমাত্র পথ। কামারপুকুরের পর্ণকুটীরে যাঁর আবির্ভাব হয়েছিল দরিদ্র এবং নিরক্ষরের ছদ্মবেশে, তিনিই বর্তমান এবং আগামীকালের বিশ্বের ত্রাণকর্তা। তাঁর বাসগৃহটি তাই আজ ও আগামীকালের সমগ্র পৃথিবীর তীর্থক্ষেত্র। শিকাগোর বিশ্বধর্মসভার মঞ্চে স্বামী বিবেকানন্দের কণ্ঠে শান্তি, সমন্বয় ও সম্প্রীতির যে-বাণী বারংবার উচ্চারিত হয়েছিল—যার মধ্যে নিহিত ভারত ও পৃথিবীর রক্ষাকবচ, তার গর্ভগৃহ কামারপুকুরের এই পর্ণকুটীর।—সম্পাদক, উদ্বোধন

বিশেষ রচনা

# মহীয়সীর পদপ্রান্তে মনস্বিনী

## প্রব্রাজিকা বেদান্তপ্রাণা

শ্রীরামকৃষ্ণলীলা ইতিহাসে সদ্য-ঘটে-যাওয়া কাহিনী। বহু প্রত্যক্ষদর্শীর রচনা ও স্মৃতিচারণে তা মানবসভ্যতার মূলধন হয়ে আছে। সেই লীলার পরিসর শুধু রানী রাসমণিই রচনা করেননি, ভিন্ন দেশ-কাল-পরিবেশেও তা ব্যাপ্ত হয়েছিল। মিলিত করেছিল প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের দুই ভাবতরঙ্গিণীকে। সুপরিকল্পিতভাবে সমগ্র মানবজাতির মধ্যে এক মেলবন্ধন গড়ে তোলার জন্য যে কয়েকটি জীবন যুক্ত হয়েছিল—ভগিনী নিবেদিতা তাঁদের অন্যতম। ভারতের নবজাগরণকালে তাঁর আগমন। সেই জাগরণকে জাতীয় চেতনায় সঞ্চারিত করে তাঁর আত্ম-বিলুপ্তি। অন্যদিকে প্রাচ্যের পরিমণ্ডলে ছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণ-আরাধিতা, বিবেকানন্দ-বন্দিতা, নিখিল মাতৃশক্তির সাকার প্রতিমা সারদাদেবী। গ্রহিষ্ণুতার বিগ্রহ, স্বভাবশান্ত প্রাচ্যের মহীয়সী অলক্ষ্যেই 'ধ্রুবমন্দির' হয়েছিলেন তারুণ্যপূর্ণ, 'উচ্ছল আত্মশক্তি ও আত্মবিশ্বাসে উদ্বেল', 'অনুসন্ধিৎসু ও সজাগ' মনস্বিনী পাশ্চাত্য প্রতিনিধির। প্রাচ্য-পাশ্চাত্যের সেই মাতা ও কন্যার মিলন ছিল এককথায় অভূতপূর্ব।

সেকালের ইংরেজ-রাজধানী কলকাতার অনেক ঐতিহ্য আছে। বহু মহামানবের আবির্ভাব ও অবদানে তার গরিমা, বিশেষ করে উনিশ শতকে নবজাগরণের আলো ঐ মহানগরীর ওপরেই কেন্দ্রীভূত হয়। কলকাতা তখন দুই সংস্কৃতির দোলাচলে। ঘুণধরা প্রাচীন সমাজে অন্ধকার ঘনীভূত, একটা সংস্কৃতির অবক্ষয়ের অন্তিম মুহূর্তে এসেছে 'কলকাতার বাবু কালচার'। অন্যদিকে ইংরেজী শিক্ষার যাদুস্পর্শে এবং ব্রাহ্ম-সমাজের প্রভাবে নতুন কিছু আনার স্বপ্নে বিভোর 'ইয়ং বেঙ্গল'। পাশ্চাত্যের ভোগবাদের তরঙ্গ তখন সমাজে বইতে শুরু করেছে—ওদেশের সংস্কৃতির সঙ্গে একীভূত হয়েই তা মানুষকে করছে প্রলুব্ধ। শিক্ষিত মানুষের যুক্তি-বুদ্ধি-মননশীলতা ইংরেজী সাহিত্য, দর্শন ও বিজ্ঞানশাখায় প্রসারিত। নবচেতনার উন্মেষে গোঁড়া সমাজকে তারা মানতে ও মান দিতে নারাজ।

মেয়েদের কথা না বললেই ভাল। তারা অন্তঃপুরে রুদ্ধ, শিক্ষার সুযোগ থেকে ছিল বঞ্চিত। সংসারের ঘানিতে ক্লান্ত এবং নিষ্প্রাণ হলে অন্দর-মহলের প্রতিমাগুলির বিসর্জন হতো। পুজো নেই, আবাহন নেই, শুধু বিসর্জন। বিদ্যাসাগর ও অন্যান্য সমাজসংস্কারকগণ মেয়েদের জন্য চিন্তা করেছিলেন, বিদ্যালয় স্থাপনও হয়েছিল, কিন্তু সমাজের মন তৈরি ছিল না। ঠাকুরবাড়ির অন্দরমহল থেকে প্রগতির ক্ষীণ আলো দেখা গেল, তবে তা স্বাধীনভাবে নয়, অনেক রকম সাবধানতার হাত ধরে। বরং সেদিক থেকে পল্লীগ্রামের মেয়েদের যাত্রা, পালাগান ও নানান ধর্মীয় অনুষ্ঠানের মাধ্যমে একটা সহজ শিক্ষা হতো। শ্রীরামকৃষ্ণ ও শ্রীমা সারদাদেবী জন্ম নেন অজ প্রাচীন ও গ্রামীণ সংস্কৃতির পরিমণ্ডলে। সেখান থেকে তাঁরা এসেছিলেন কলকাতার উপকণ্ঠে দক্ষিণেশ্বরে। দক্ষিণেশ্বরও তখন বর্ধিষ্ণু গ্রাম। বারোমাসে গৃহে গৃহে পালপার্বণ, মন্দিরে মন্দিরে পুজার্চনা, শঙ্খ-ঘণ্টার ধ্বনি। পুজা-পাঠ-গঙ্গাস্নান টোলে শাস্ত্রপাঠের পাশাপাশি রয়েছে ইংরেজী নব্য আবহাওয়া। শূদ্র-প্রতিষ্ঠিত দক্ষিণেশ্বর মন্দিরে মা কালীর অন্নভোগ গঙ্গায় দেওয়া হয়—জাত খোয়াবার ভয়ে সে-অন্ন গ্রহণ করে না স্থানীয় বহু দরিদ্র মানুষও। এমনই কুসংস্কারের দাপট। অথচ সমাজে অর্থবান চিরকালই প্রভাবশালী। রানী রাসমণি ও তাঁর জামাই মথুরানাথ বিশ্বাস উভয়েই

মান্যগণ্য। বিশেষ করে রানীর দয়া, দেবভক্তি ও দানের খ্যাতি প্রবাদে পরিণত। এই বিচিত্র পরিবেশেই শ্রীরামকৃষ্ণদেবের আবির্ভাব। গ্রাম-বাংলার সরলতা ও সহজ বুদ্ধিমত্তায় উজ্জ্বল অথচ গভীর সেই দিব্যপুরুষ অতি দ্রুত ধর্মের জট ছাড়িয়ে একাগ্র সাধনায় মিলিয়ে দিলেন বহু যুগের অধ্যাত্মসাধনার সূত্র। স্বামী বিবেকানন্দ সেই মহাসমন্বয়ী ভাব বহন করে শতাব্দীর সিংহদ্বারে পৃথিবীর অপর প্রান্তে পৌঁছে দিলেন। মহামনীষী রোমাঁ রোলাঁ সে-কথা উল্লেখ করে বলেছেন ঃ "হৃদয় ও মস্তিষ্কের মধ্যে, পরমহংসের পরম প্রেমে ও বিবেকানন্দের বলিষ্ঠ বাহুতে মানব-জাতির মধ্যে বিদ্যমান সকল দেবতার, সত্যের সকল দিকের, মানবস্বপ্নের সমগ্র রূপের যে উদ্‌ঘাটন হইয়াছিল, তাহা অপেক্ষা নূতনতর, সজীবতর, বলিষ্ঠতর আর কিছু আমি সকল কালের সকল ধর্মীয় ভাবের মধ্যে দেখি নাই।"[১] শ্রীরামকৃষ্ণের এই বিপুল সাধনার স্বরূপ ও আগামী দিনে তার দায় বুঝে নিয়েছিলেন শ্রীমা। বাইরে স্কুল-কলেজের শিক্ষা তাঁর ছিল না, ছিল শ্রীরামকৃষ্ণের অধ্যাত্মশিক্ষার পরিপূর্ণতা। নহবতের ছোটঘরে তিনি সত্যিই বিন্দুবাসিনী। তাঁর সাধনা ছিল নীরব ও লোকচক্ষুর অগোচর। তাঁরই কাছে কাশীপুরের বাগানবাড়িতে শ্রীরামকৃষ্ণ কলকাতার মানুষের দায় অর্পণ করেছিলেন। কলকাতার মানুষের অস্থিরতার অনেক ছবিই মহানগরীর দর্পণে ধরা আছে। অগণিত দিশাহারা মানুষ 'অন্ধকারে কিলবিল' করছে—একথা শ্রীরামকৃষ্ণ স্বয়ং বলেছিলেন মাকে। আরেকটি 'দায়'-এর কথা তিনি বলেননি, কিন্তু ইঙ্গিত দিয়েছেন। ভাবসমাধিতে এক ভিন্ন পরিবেশে তিনি দর্শন করেন 'সাদা সাদা' মানুষদের। সাদা-কালোর সংযোগ ঘটবে, বর্ণবৈষম্য বিভেদের প্রাচীর গড়বে না—আগামী দিনের এই দুর্লভ স্বপ্ন আজও রূপায়িত হয়নি। তবে স্বামীজী সত্যসত্যই ঐ অপূর্ব বাণী, মানবাত্মার মহান ঐক্যের গাথা বহন করে নিয়ে গিয়েছিলেন পাশ্চাত্যে এবং সাদা মানুষদের দেশে যাবার জন্য কালাপানি পার হবার অনুমতি দিয়েছিলেন স্বয়ং সঙ্ঘজননী শ্রীমা। মায়ের অনুমোদনে স্বামীজী নিশ্চিন্ত হয়েছিলেন। প্রাচ্যের সঙ্গে তখনি প্রতীচ্যের মিলন-সূচনা।

আমেরিকার ধর্মমহাসভা—যেখানে স্বামীজী বর্ষণ করেছিলেন প্রাচ্যের অমৃতবাণী, সেখানে জীবন ছিল নিবেদিতার ভাষায়—"ব্যগ্র, সৃজনশীল", "নিঃসন্দিগ্ধভাবে মানবের মহিমায় পূর্ণ"। আধুনিককালের সর্বোত্তম প্রযত্ন ও কৃষ্টির গৌরবে ও অভ্যুদয়ে দীপ্ত সেই নগরী। স্বামীজী ছিলেন প্রাচীন এক সভ্যতা, সংস্কৃতি এবং ধর্মের প্রতিভূ। নানা দেশ ও জাতির সঙ্গে মেলামেশা নেই বলে ভারত বিচ্ছিন্ন ও অনুন্নত হয়ে আছে দীর্ঘকাল—এ-সত্য স্বামীজী অনুভব করেন। বস্তুতঃ, ভারতের যুবকদের বিভিন্ন উন্নতিকামী জাতির সঙ্গে মিলিত হবার জন্য তিনি আহ্বানও জানিয়েছিলেন। সেইসঙ্গে প্রয়োজন ছিল একটা ভাববিনিময়ের। বিদেশের মানুষের জন্যও ভারতের অন্তর্জগতের দ্বার উন্মুক্ত করতে হবে। তারাও আসবে "আধ্যাত্মিকতার জন্মদাত্রী" ভারতের পবিত্রভূমিতে আনত শ্রদ্ধা ও ভালবাসা নিয়ে। স্বামীজীর সব পরিকল্পনার অন্তরালেই থাকত একটি সামগ্রিক দৃষ্টি। সেই সময় পাশ্চাত্য কৃষ্টির সেরা রত্ন নিবেদিতাকে তিনি সংগ্রহ করেছিলেন ইংল্যান্ড থেকে। ভারতের মেয়েদের জন্য তাঁর একটি পরিকল্পনা ছিল—তার রূপায়ণের প্রথম গৌরব ও ভার আজীবন বহন ও সার্থক করেছিলেন ভগিনী নিবেদিতা

স্বামীজীর সময়ে অর্থাৎ উনিশ শতকের শেষ দশকে পাশ্চাত্যে মেয়েরাই ছিল শিক্ষা ও সংস্কৃতির রাজ্যে অগ্রগামী। নিবেদিতার বুদ্ধি, প্রতিভা, চরিত্রের দার্ঢ্য ও কর্মশক্তি সবই ছিল অনন্যসাধারণ। শুধু তেজস্বিনী ও মননদীপ্তই নয়, তিনি ছিলেন জাতশিল্পী ও অসামান্যা লেখিকা। লন্ডনের বিদ্বৎসমাজে তখনি তিনি সমাদর ও স্বীকৃতি লাভ করেছেন। স্বামীজী এই সম্ভাবনাময় প্রতিভাময়ীকে আহ্বান জানান, কারণ নিবেদিতার মধ্যে আত্মোৎসর্গের মহান প্রেরণা তিনি দেখেছিলেন, দেখেছিলেন "জগৎ-আলোড়নকারী শক্তি"। তাঁর

১ বিবেকানন্দের জীবন ও বিশ্ববাণী—রোমাঁ রোলাঁ, অনুবাদ ঃ ঋষি দাস, ৬ষ্ঠ সং, পৃঃ ২১৫

ভারতযাত্রার সময়ে মার্গারেটের বন্ধু মিঃ হ্যামন্ড একটি অসাধারণ চিত্র দিয়েছেন ঃ "অনন্যসাধারণ জ্যোতির্ময়ী এক তরুণী। নীল উজ্জ্বল নয়ন। বাদামী স্বর্ণাভ কেশ। স্বচ্ছ উজ্জ্বল বর্ণ। মুখের মৃদু হাসিতে আকর্ষণীয় শক্তি। দীর্ঘ অঙ্গের প্রত্যেকটি পেশী যেন গতিশীল, আবেগে চঞ্চল। আগ্রহ, উদ্যমে পূর্ণ হৃদয়। নির্ভীক।"[২]

১৮৯৮-এর ২৮ জানুয়ারি তিনি কলকাতা মহানগরীতে পদার্পণ করলেন। এই প্রাণময়ীকে স্বামীজী 'ভারতহিতায়' 'ভারতসুখায়' উৎসর্গ করে নাম রেখেছিলেন নিবেদিতা। ১১ মার্চ স্টার থিয়েটারে জনসভায় তাঁর পরিচয় দিয়ে তিনি বলেছিলেন ঃ "ইংল্যান্ড আমাদের আর একটি উপহার দিয়েছে—মিস মার্গারেট নোবল। ইহার নিকট আমাদের অনেক আশা।"[৩] নিবেদিতাও সুস্পষ্ট ভাষায় নিজের পরিচয় জানিয়েছিলেন, যা ছিল তাঁর ভাবী জীবন ও কর্মের পূর্বাভাস ঃ "আপনারা এমন এক রক্ষণশীল জাতি, যে-জাতি দীর্ঘদিন ধরিয়া সমগ্র জগতের জন্য শ্রেষ্ঠ আধ্যাত্মিক সম্পদ সযত্নে রক্ষা করিয়া আসিয়াছে। আর ঐ কারণেই সেবার জ্বলন্ত আকাঙ্ক্ষা লইয়া ভারতকে সেবা করিবার জন্যই আমার এদেশে আগমন।"[৪]

স্বামীজী জানতেন নবীন জাতির প্রতিভূর সামনে প্রাচীনের দ্বার স্বভাবতই রুদ্ধ হবে। আমরা ঐ বিদেশিনীর সামনে বহু দ্বারই রুদ্ধ করেছিলাম, কিন্তু যিনি অনেক আগেই অন্তঃপুরের দ্বার অবারিত করে ও অভ্যর্থনার হাত প্রসারিত করে অপেক্ষা করেছিলেন তাঁকে নিবৃত্ত করতে পারিনি।

ফেব্রুয়ারি মাসে শ্রীরামকৃষ্ণের জন্মোৎসবের আগে মিসেস সারা বুল, জোসেফিন ম্যাকলাউড ও নিবেদিতা—তিন বিদেশিনী গিয়েছিলেন তাঁদের পরমগুরু শ্রীরামকৃষ্ণের লীলাস্থান দক্ষিণেশ্বরে। খ্রীস্টান বলে তাঁরা ভবতারিণীর মন্দিরে প্রবেশাধিকার পাননি। শ্রীরামকৃষ্ণের ঘরের দ্বারও রুদ্ধ। সুতরাং তাঁরা পঞ্চবটীর কাছে বাঁধানো পোস্তার ওপর বসে গঙ্গার তরঙ্গিত সৌন্দর্য দর্শন করে আনন্দলাভ করলেন। তাঁদের মন তখন এক দিব্যস্মৃতির পবিত্রতায় ভরপুর। ঘণ্টাখানেক পরেই ছোটখাটো জনতা তাঁদের ঘিরে ফেলল। তাদের বাদানুবাদের বিষয়—শ্রীরামকৃষ্ণের ঘরে এই বিদেশিনীরা প্রবেশ করবেন, অথবা সে-দ্বার রুদ্ধই থাকবে? সর্বধর্ম-সমন্বয়ের মহাতীর্থে এই বাস্তব সংকীর্ণতার সম্মুখীন হয়েছেন তাঁরা। অবশেষে জনৈক ভক্তের বদান্যতায় তাঁরা প্রবেশের অনুমতি পেলেন। শ্রীরামকৃষ্ণ-উৎসবে পূর্ণচন্দ্র দাঁয়ের ঠাকুরবাড়িতে তাঁদের আপ্যায়িত করেছিলেন গোপালের মা। অন্তঃপুরিকারা কৌতূহল নিয়ে তাঁদের দেখেছিলেন।

১৮৯৮ খ্রীস্টাব্দের ১৭ মার্চ ছিল নিবেদিতার কাছে "day of days"—জীবনের সেরা দিন। শুধু নিবেদিতার কাছেই নয়, ভারতীয় নারীদের কাছেও। ভারতের অন্তঃপুরের দ্বার সেদিন খুলে দিলেন শ্রীমা। সেই সমাজে এই গ্রহণ এক আশ্চর্য ঘটনা। স্বামীজীর মনেও দ্বিধা জেগেছিল—এই বিদেশিনীদের ভারতের অন্তঃপুর সর্বতোভাবে গ্রহণ করবে কিনা। পাশ্চাত্য নারীদের সঙ্গে মায়ের অপূর্ব ব্যবহার দেখে স্বামীজী সত্যই নিশ্চিন্ত হয়েছিলেন। সেই ছুঁৎমার্গের দিনে বিদেশী বা ম্লেচ্ছদের ছোঁয়া লাগলে যেখানে অন্তঃপুরিকারা গঙ্গাস্নান করেন, সেখানে মা তাঁদের সঙ্গে আহার করলেন। একসঙ্গে খাওয়া হলো পাশ্চাত্যসমাজে আপন করে নেওয়ার সহজ লোকাচার। মায়ের এই উদার আচরণ দেখে স্বামীজীও কম আশ্চর্য হননি। তিনি এক গুরুভাইকে লিখছেন ঃ "শ্রীমা এখানে আছেন। ইউরোপীয়ান ও আমেরিকান মহিলারা সেদিন তাঁহাকে দেখিতে গিয়াছিলেন। ভাবিতে পারো, মা তাঁহাদের সহিত একসঙ্গে খাইয়াছিলেন?"[৫]

কুমুদবন্ধু সেনকে স্বামী যোগানন্দ বলেছিলেন ঃ "স্বামীজী গভীর আবেগের সঙ্গে আমাকে বলেছেন, 'আমাদের মাতাঠাকুরানী বিরাট আধ্যাত্মিক শক্তির ভাণ্ডার, যদিও আপাতভাবে গভীর সমুদ্রের মতো শান্ত। তাঁর আবির্ভাব

২ ভগিনী নিবেদিতা—প্রব্রাজিকা মুক্তিপ্রাণা, ৫ম সং, পৃঃ ৫৪ ৩ ঐ, পৃঃ ৬৫ ৪ ঐ, পৃঃ ৬৬

৫ স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা, ৮ম খণ্ড, ৪র্থ সং, পৃঃ ৩০

ভারতবর্ষের ইতিহাসে নবযুগোদয় সূচনা করেছে। যে-আদর্শকে জীবনে উপলব্ধি করেছেন, যার প্রকাশ তিনি করছেন, তা কেবল ভারতীয় নারীদেরই মুক্তি দেবে না পরন্তু সমস্ত পৃথিবীর নারীদের মন ও হৃদয়ে প্রবেশ করে তাদের প্রভাবিত করবে।"[৬]

শ্রীমায়ের এই অচিন্ত্য ভূমিকাটি নিবেদিতা বুঝেছিলেন অনায়াসে। তার একটি কারণ হয়তো স্বামীজীর দিব্য সান্নিধ্য। এই অধ্যাত্ম-ব্যক্তিত্বকে তিনি তাঁর অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে অনুধাবন করে লিখেছিলেন: "বিরাট ধর্মাদর্শের ভাস্বরলোকে বাস করেছি, নিঃশ্বাস নিয়েছি।" কিন্তু নারীর মধ্যে প্রাচ্যের অধ্যাত্ম-মহিমার পরিপূর্ণ বিকাশ তিনি আর কোথাও প্রত্যক্ষ করেননি। আমাদের মনে রাখতে হবে, ইতিমধ্যেই সরলা ঘোষাল এবং জগদীশচন্দ্র বসুর বোন লাবণ্যপ্রভা বসুর সঙ্গে তাঁর আলাপ ও আলোচনা হয়েছে। শিক্ষিতা ভারতরমণীকে তিনি দেখেছেন, কিন্তু অভিভূত হননি। কিন্তু শ্রীমায়ের ব্যবহারে, আন্তরিকতায় ও সৌজন্যে এমন কিছু ছিল যা নিবেদিতার মতো নারীকেও বিস্মিত করেছিল। শ্রীমার ঐশী চেতনা তাঁর সত্তার অন্তরতম তলদেশ আলোড়িত করেছিল। বিশেষ বাক্যবিনিময় ও ভাবের আদানপ্রদান ভাষার দূরত্বে হয়তো সম্ভব হয়নি, কিন্তু প্রথম দর্শনেই নিবেদিতাকে জয় করে নিয়েছিলেন শ্রীমা। ১৮৯৮ খ্রীস্টাব্দের ২২ মে তিনি তাঁর বান্ধবী মিসেস হ্যামন্ডকে লিখেছেন শ্রীমায়ের কথা: "অনেকবার ভেবেছি, তোমাকে সেই মহিলার কথা বলব। তিনি শ্রীরামকৃষ্ণের সহধর্মিণী, নাম সারদা।··· তাঁকে ভাল করে জানলে বোঝা যায়, তাঁর মধ্যে সাধারণ বুদ্ধি ও তৎপরতার কী চমৎকার প্রকাশ। তিনি মাধুর্যের প্রতিমূর্তি। এত শান্ত, স্নেহশীলা, আবার ছোট বালিকার মতো সদা উৎফুল্ল। বরাবরই তিনি ছিলেন বিশেষ রক্ষণশীলা। আশ্চর্য, দুজন পাশ্চাত্যবাসিনীকে দেখবার পরমুহূর্তে তাঁর রক্ষণশীলতার কিছুই অবশিষ্ট রইল না। অতিথিদের সব সময়েই ফল দেওয়া হয়। তাঁকেও দেওয়া হলো—সকলকে আশ্চর্য করে তিনি ঐ ফল গ্রহণ করলেন। তাঁর এই আচরণ আমাদের সকলকে মর্যাদা দান করেছে, আর আমার ভবিষ্যৎ কার্যের সম্ভাবনাকে যতখানি সফল করে তুলেছে, আর কিছুই তেমন পারত না। তাঁর মহিমার একটা শ্রেষ্ঠ প্রমাণ দিতে পারি—তাঁর কলকাতায় অবস্থানকালে চৌদ্দ-পনেরো জন উচ্চবর্ণের মহিলা তাঁর পরিচর্যা করেন এবং তিনি অপূর্ব কৌশল ও ভালবাসা দ্বারা তাঁদের সবসময় শান্তির মধ্যে রাখেন।··· সত্যই তিনি শক্তিরূপিণী ও মহানুভবা রমণীগণের অন্যতমা···।"[৭]

স্বামীজী যে-কথা জানিয়েছিলেন কয়েকটি বাক্যে, নিবেদিতা সেই কথাই লিখেছেন পত্রের আকারে। প্রায় তেরো বছর নানাভাবে তাঁর সঙ্গে শ্রীমায়ের যোগ ছিল এবং এই প্রথম মূল্যায়নই দিনদিন গভীর ও গাঢ় হয়ে উঠেছে। শ্রীমারও নিবেদিতার প্রতি ছিল বিশেষ স্নেহ। আমরা জানি মায়ের চোখের সামনে শ্রীরামকৃষ্ণের সন্তানগণ তপস্যায় মগ্ন হয়েছেন, প্রব্রজ্যায় গিয়েছেন, উন্মত্ত হয়েছেন ভগবানলাভের জন্য। মাথাকাটা তপস্যা করেও যে-ছেলেদের পাওয়া যায় না, তেমনই ছেলেদের মা হয়েছিলেন সারদাদেবী। স্বামীজী-নির্দেশিত ত্যাগ ও সেবার আদর্শে সেইসব ছেলেরাই সঙ্ঘকে রূপ দিলেন। মাকে স্থাপন করলেন সংসার ও সঙ্ঘের মধ্যবর্তী স্থানে—তাঁকে সঙ্ঘজননী ও জগজ্জননীর মর্যাদা দিয়ে রচনা করলেন নতুন ইতিহাস। মা নিঃশব্দে নিজের ঐশী শক্তিকে মাতৃত্বের আকারে প্রসারিত করে ক্রমে শত সহস্র সন্তানকে আশ্রয় দিলেন। মায়ের বহু ত্যাগি-সন্তানের সঙ্গে বিশেষ স্থান পেয়েছিলেন তাঁর আদরের 'খুকি'। ব্যক্তিত্বময়ী নিবেদিতা চিরদিনই মায়ের কাছে 'খুকি' ছিলেন। মা একটি অদ্ভুত নামেও তাঁকে সম্বোধন করতেন—'আমার প্রাণের সরস্বতী'। মনস্বিতায় উজ্জ্বল নিবেদিতার এর চেয়ে যোগ্য নাম ভাবা যায় না। মায়ের সরল ও মধুর কথার রেখায় নিবেদিতার চিত্রটি অনবদ্য: "···যেন সাক্ষাৎ দেবী। নরেনকে কি ভক্তিই করে! সে এই দেশে জন্মেছে বলে সর্বস্ব ছেড়ে এসে

৬ শতরূপে সারদা, ১৯৮৫, পৃঃ ৭৬৩

৭ ভারততীর্থে নিবেদিতা, ১ম সং, পৃঃ ৩৫৩-৩৫৪

প্রাণ দিয়ে তার কাজ করছে। কি গুরুভক্তি! এ-দেশের ওপরই বা কি ভালবাসা!"[৮] আরও ছোট কথায় মা তাঁর খুকির অসাধারণত্ব ব্যক্ত করেছেন—"কি মেয়েই ছিল বাবা!"[৯]

নিবেদিতা যে মায়ের কাজের জন্যই চিহ্নিত, একথা স্বামীজী বারবারই উল্লেখ করেছেন। তিনি যেমন মায়ের কাজে নিজেকে সমর্পণ করেছিলেন, তেমনি নিবেদিতারও এক মহান আত্মদানের কথা তিনি জানতেন। উত্তর ভারতে ভ্রমণকালে তিনি তাই নিবেদিতার কাছে বলেছিলেনঃ "কালী, কালী, কালী। তিনি কাল, তিনি পরিবর্তন, অনন্ত শক্তি। যে-হৃদয়ে ভয় নেই, সেখানেই তিনি আছেন। যেখানে ত্যাগ, আত্মবিস্মৃতি, মরণকে আলিঙ্গনের জন্য প্রাণপণ চেষ্টা সেখানেই মা।"[১০] নিবেদিতার বিদ্যালয়ের কাজের সূচনাতেও স্বামীজী অনুরূপ বাক্য উচ্চারণ করেছিলেনঃ "...আমার ধারণা, তুমিও আমার মতো ঐশীশক্তি দ্বারা অনুপ্রাণিত... সুতরাং তুমি যা সবচেয়ে ভাল বলে বিবেচনা করেছ, সেই কাজে আমি তোমাকে সাহায্য করব।"[১১]

উত্তর ভারত ভ্রমণের পর নিবেদিতার আগ্রহে শ্রীমা ১০/২, বোসপাড়া লেনের বাড়িতে সাদরে তাঁকে স্থান দিলেন। কিন্তু রক্ষণশীল সমাজ যে সমালোচনায় মুখর হবে একথা হৃদয়ঙ্গম করে নিবেদিতা শ্রীমার বাড়ির অপরদিকে ১৬নং বাড়িটিতে চলে গেলেন। মায়ের কাছে তাঁর সন্ধ্যাটি কাটত। শ্রীমায়ের পরিবারের মধ্যেই তিনি ভারতীয় জীবনযাত্রার বাস্তব পাঠ নিলেন। স্বামীজীর মুখে বহুবার তিনি শুনেছেন প্রাচ্য ও প্রতীচ্য জীবনাদর্শের তুলনামূলক আলোচনা, তখনকার জীবন যাত্রার মধ্যেও তিনি তাঁর মমতা ও ভালবাসা নিয়ে কত সৌন্দর্য আবিষ্কার করেছিলেন, লেখনী দিয়ে এঁকেছিলেন জীবনচর্যার ছবিঃ "আমার চোখে আমার বাড়িটি অতি সুন্দর। দুটি প্রাঙ্গণ, ছোট তিনতলা... পুরনো কিন্তু হিন্দু স্থাপত্যকলার একটা অসংলগ্ন নিদর্শন।... গলিটি বেশ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ও মনোরমভাবে আঁকাবাঁকা।... কাছেই একটা বস্তী আছে—একসারি নারকেলগাছের তলা ঘেঁষে গাঢ় বাদামী রঙের দেওয়াল আর লাল টালির ছাদওয়ালা কয়েকটি মাটির ঘর... আর একটি বস্তীর প্রবেশপথে পাইপের মতো দেখতে একটি জলের কল —সবসময় সেখানে ঘোমটায় মুখঢাকা মেয়েদের ভিড়—সুদৃশ্য পিতলের অথবা মাটির ঘড়া করে জল নিয়ে যাচ্ছে। রৌদ্রে ভরা চারিদিক—আনন্দিত ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের কলহাস্যে মুখরিত; সর্বত্র শুকোবার জন্য মেলে দেওয়া সদ্য ধোওয়া জামাকাপড় বাতাসে উড়ছে; ইতস্ততঃ দু-একটি গরু চরে বেড়াচ্ছে... কতগুলি বই, ছবি ও আধুনিক জীবনের নিদর্শন দু-একটা সূক্ষ্ম রুচির জিনিসে পরিবেষ্টিত হয়ে টেবিল থেকে আমি বহু শতাব্দীর পুরনো এক জগৎ দেখতে পাই।"[১২]

বাস্তবিক ইউরোপের গতিময় জগৎ থেকে তিনি যেন উৎক্ষিপ্ত হয়েছিলেন এমন এক জগতে যেখানে সময় স্তব্ধ হয়ে আছে, ধীর স্থির এক শান্ত জীবনযাত্রা। বাগবাজারের পরিবেশ, সেখানকার নরনারী, তাদের লোকাচার—সবই ছিল তাঁর কাছে অভিনব। ঘরের মধ্যে দাঁড়িয়ে তিনি 'সবুজ পাগরীবাঁধা প্রহরীর মতো একসারি নারকেলগাছ' দেখতেন—তারা পূর্বদিকে যেখানে আলো ফোটে সেই দিকে যেন মিছিল করে দাঁড়িয়ে। এই পরিবেশের মধ্যে মায়ের বাড়ির জীবনচর্যার যেন কোথায় মিল ছিল। তিনি লিখছেনঃ "শ্রীমার গৃহখানি যেন শান্তি ও মাধুর্যের নিলয়। সূর্যোদয়ের অনেক পূর্বেই এক-এক করিয়া সকলে নীরবে গাত্রোত্থান করিতেন এবং মাদুরের উপর হইতে চাদর ও বালিশ সরাইয়া ফেলিয়া, মালা লইয়া দেওয়ালের দিকে মুখ ফিরাইয়া জপ করিতে বসিতেন... তারপর শ্রীশ্রীমা নিজের ঘরের পূজা আরম্ভ করিতেন। অল্পবয়স্কা রমণীগণ সকলেই সেই সময় দীপ জ্বালিয়া দেওয়া, ধূপ-ধুনা দেওয়া, গঙ্গাজল আনা... ইত্যাদি কর্মে ব্যস্ত থাকিতেন।"[১৩] মায়ের বাড়ির দৈনন্দিন গৃহস্থালীর এই বর্ণনায় নিবেদিতা

৮ শ্রীশ্রীমায়ের কথা, ২য় ভাগ, ৮ম সং, পৃঃ ২৭৭-২৭৮
৯ শ্রীমা সারদাদেবী—স্বামী গম্ভীরানন্দ, ৬ষ্ঠ সং, পৃঃ ২৫২ ১০ ভগিনী নিবেদিতা, পৃঃ ১০৮
১১ ঐ, পৃঃ ১২২ ১২ ভারতবর্ষে নিবেদিতা, পৃঃ ১৬৩ ১৩ ঐ, পৃঃ ৫১-৫২

করেছেন আন্তরিকতা ও শ্রদ্ধা নিয়ে—সেখানে ধর্মই প্রধান, ধর্মকে ধরেই কর্ম। স্বামীজী নিবেদিতাকে ১৯০০ খ্রীস্টাব্দের একটি পত্রে লেখেন: "আমি কেবল এই পর্যন্ত জানি যে, যতদিন তুমি সর্বান্তঃকরণে মায়ের সেবা করিবে, ততদিন তিনিই তোমাকে ঠিক পথে পরিচালনা করিবেন।"[১৪] সেই বছরেই ইংল্যান্ড-যাত্রার দিন স্থির হওয়ার পর স্বামীজী নিবেদিতাকে এক অদ্ভুত আশীর্বাদ করলেন: "যাও, কর্মক্ষেত্রে ঝাঁপ দাও। যদি আমি তোমাকে সৃষ্টি করে থাকি, বিনষ্ট হও। আর যদি মহামায়া তোমাকে সৃষ্টি করে থাকেন, সার্থক হও।"[১৫]

নিবেদিতার বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল ১৮৯৮ খ্রীস্টাব্দের ১৩ নভেম্বর কালীপূজার শুভদিনে। শ্রীমার শুভাগমনে বিদ্যালয়ের উদ্বোধন। মা আশীর্বাদ করেছিলেন: "আমি প্রার্থনা করছি, যেন এই বিদ্যালয়ের ওপর জগন্মাতার আশীর্বাদ বর্ষিত হয় এবং এখান থেকে শিক্ষাপ্রাপ্ত মেয়েরা যেন আদর্শ বালিকা হয়ে ওঠে।"[১৬] মায়ের সঙ্গে নিবেদিতার একটা যোগসূত্র ছিল বরাবর। স্বামীজী নিবেদিতাকে শক্তির শরণাগত হতেই বলেছিলেন। নিবেদিতা নিজের অজ্ঞাতসারে সেই শক্তিরূপিণীর নিবিড় সান্নিধ্যে এসেছিলেন, তাঁর মুখোমুখী বসেছিলেন এবং তাঁরই ভাবনা, আশীর্বাদ ও শুভ্র মূর্তি অন্তরে বহন করেছিলেন। সেই সান্নিধ্যের এক দিব্য মুহূর্ত ধরা আছে ছবির মধ্যে। সে-ছবি অনবদ্য। আমাদের অন্তরে যুগপৎ অনেক তরঙ্গ তোলে—যেন ভবিষ্যৎ বিশ্বের নারী-মহিমার দুটি আদর্শ সম্মিলিত হয়েছে, মিলেছে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য নারী আপন স্বাতন্ত্র্য গরিমা অক্ষুণ্ণ রেখে।

১৮৯৮ খ্রীস্টাব্দের নভেম্বর মাসে এই ছবি তোলা হয়। তখনো নিবেদিতা তেমন অন্তরঙ্গ না হলেও, মায়ের আপন-করা ভালবাসায় মুগ্ধ। মিসেস বুল অনুনয় করায় নিবেদিতার বাড়িতেই ফটো তোলা হয়। মা ধ্যানাসনে বসে আছেন, তাঁর একেবারে কোলের কাছে নিবেদিতা। অতলান্ত হ্রদের মতো শান্ত মাতৃমূর্তি। তাঁর সামনে রূপ-সৌন্দর্য, শিক্ষা, মনস্বিতা, ব্যক্তিত্বে গরিমাময় এক শ্বেতাঙ্গিনী। তাঁর চোখে ভালবাসা, শ্রদ্ধা, সম্ভ্রম ও নতি। মায়ের অবয়বে কী দৃপ্ত ব্যঞ্জনা, কী প্রত্যয়! এই চিত্রের সঙ্গে বাগবাজার পল্লীর তখনকার নোলকপরা, জবুথবু, আড়ষ্ট বালিকাদের অথবা নলিনী, রাধু, মাকু প্রভৃতির শিক্ষার আলোকহীন মুখগুলির কোনরকম সাদৃশ্য নেই। আরও বিস্ময়ে দেখি, মায়ের চেহারায় কোথাও অসহায় ভাব বা সংকোচ নেই। চোখে সস্নেহ আমন্ত্রণ, অঙ্গে গৌরব, পরাবিদ্যার মহিমায় সে-মুখ শান্ত, উজ্জ্বল, অন্তর্লীন ও "সৌম্যাৎ সৌম্যতরা"। মূর্তিমতী মহাবিদ্যা। নিবেদিতা তাঁর বিখ্যাত পত্রে শ্রীমায়ের সম্বন্ধে অন্তরতম কথাটি ব্যক্ত করেছিলেন: "প্রেমময়ি মা,··· সত্যই তুমি ঈশ্বরের আশ্চর্যতম সৃষ্টি। শ্রীরামকৃষ্ণের বিশ্বপ্রেম ধারণের পাত্র।" লিখেছিলেন: "মাগো, ভালবাসায় পরিপূর্ণ তুমি! আর তাতে নেই আমাদের বা জগতের ভালবাসার মতো উচ্ছ্বাস ও উগ্রতা··· যা প্রত্যেককে দেয় কল্যাণস্পর্শ এবং কারো অমঙ্গল চায় না।" লিখেছিলেন: "ভগবানের যাকিছু বিস্ময়কর সৃষ্টি সবই শান্ত ও নীরব।" নিবেদিতার এই অসামান্য পত্র শ্রীমায়ের দিব্যবন্দনাগীতি—আমাদের হৃদয়ের অন্তরতর প্রার্থনা। নিবেদিতা চিঠিতে আক্ষেপ করেছিলেন—"কেন বুঝিনি যে, তোমার বাঞ্ছিত চরণতলে ছোট্ট একটি শিশুর মতো বসে থাকতে পারাটাই যথেষ্ট।"[১৭]

নিবেদিতার কর্মময় জীবনে অবকাশ খুব কমই ছিল। তবু সময় পেলে ছুটে আসতেন মায়ের কাছে। হয়তো ভারত তথা বিশ্বের নারী একদিন নিবেদিতার মতোই শ্রীমার মধ্যে খুঁজে পাবে 'ধ্রুব-মন্দির' ও 'পরম আশ্রয়'। তাঁর দিব্য সান্নিধ্যে লাভ করবে জীবনের পূর্ণ সার্থকতা, তাঁর মহিমায় ফিরে পাবে নিজের স্বরূপের পরিচয়। □

১৪ ভগিনী নিবেদিতা, পৃঃ ১৭৮
১৫ ঐ, পৃঃ ১৯১
১৬ ঐ, পৃঃ ১২৪
১৭ ঐ, পৃঃ ৪০০

# সারদাদেবী এবং নারীর শক্তি ও মূল্য

## সুস্মিতা ঘোষ

ঊনবিংশ শতাব্দীতে স্ত্রীশিক্ষা, সমাজসংস্কার এবং জাতীয়তাবাদের সঙ্গে সঙ্গে নারীর সামাজিক অবস্থানেরও উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন ঘটে। সেযুগে সংস্কারক বা সাহিত্যিকরা অবশ্য বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই 'আলোকপ্রাপ্ত নারী' বলতে প্রতীচ্য এবং ভারতীয় 'স্ত্রীসুলভ' গুণাবলীর সমন্বয়মাত্র মনে করতেন। কিন্তু এর ভিতর দিয়েই ভারতীয় নারীর স্বাধিকার-সচেতন ভূমিকার বীজও বপন করা হয়।[১] এই শতাব্দীর প্রারম্ভ অজ্ঞ, অশিক্ষিত, অবগুণ্ঠনবতী, কুসংস্কারাচ্ছন্ন বঙ্গললনাদের অস্তিত্বের স্তরটি ছিল শোচনীয়। পুরুষেরা ভাবত, "পশুপাখীর মতোই মেয়েছেলেদের ওপর তারা কর্তৃত্ব খাটাবে"।[২] বড় বড় সমাজসংস্কারের পাশে পাশেই উনিশ শতকের অন্যতম লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য ছিল নারী-জাতির উন্নতির প্রতি আগ্রহ। নারীর আত্মশক্তি বিকশিত হচ্ছিল খুব ধীরে। বাইরের জগতে নারীর ব্যক্তিত্ব ক্রমশঃ স্বীকৃতি পাচ্ছিল শ্রদ্ধায়, সম্মানে। মেয়েরা ক্রমশঃ বুঝতে পারছিল নিজেদের মূল্য।[৩] জাতীয় আন্দোলন শুরু হবার পর বিশেষ করে স্বদেশী আন্দোলনকে শক্তিশালী করার জন্য মহিলাদের সাহায্যের প্রয়োজন হয়। এতে রাজনীতির আঙ্গিনায় মহিলাদের প্রবেশ সহজতর হয় এবং নারী নিজের অন্তরে শক্তির উন্মেষ করতে সচেতন হতে থাকে। ধীরে ধীরে নিজের সম্বন্ধে ধারণা, আত্মমর্যাদাবোধ ও আত্মবিশ্বাসের ওপরেই গড়ে উঠেছিল নবজাগ্রত নারীদের ব্যক্তিত্ব।[৪] এযুগের অন্যতম প্রধান শক্তিশালী আন্দোলন ছিল রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ প্রবর্তিত আন্দোলন। শ্রীরামকৃষ্ণের আবির্ভাব যখন ঘটে তখন নারীমুক্তি সম্বন্ধে ধারণা ছিল নিতান্ত সীমাবদ্ধ; তা সমাজের সর্বস্তরের নারীকে স্পর্শ করেনি, কেবল উচ্চবর্ণের নারীদের নিয়েই ভাবনা-চিন্তা চলছিল।[৫] কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণ হীনতম নারীর মধ্যেও জগজ্জননীকে দর্শন করলেন। তিনি নারীকে দেখলেন তার দিব্য স্বরূপে, চৈতন্যময় সত্তায়।[৬] তাঁর কৃপাধন্যা অসংখ্য নারীর মধ্যে নটী বিনোদিনী, বারাঙ্গনা লছমীবাঈ, কামারপুকুরবাসিনী হাড়ীজাতীয়া ভৈরবী ধাই, শ্রীরামকৃষ্ণের পরিচারিকা বৃন্দে ঝি, রানী রাসমণির বাড়ির দাসী ভগবতী প্রমুখ মাত্র কয়েকজনের কথাই আমরা জানি। এঁরা সবাই ছিলেন সমাজের উপেক্ষিত সম্প্রদায়ের।[৭] মানুষ অনন্ত শক্তির অধিকারী, প্রত্যেকের মধ্যেই সেই শক্তি বিদ্যমান। যথার্থ ব্যবহারের মাধ্যমে সেই শক্তি উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পায়—এই আত্মবিশ্বাসের প্রেরণা শ্রীরামকৃষ্ণ শক্তিরূপা নারী-অভ্যুত্থানের জন্যই দিয়েছিলেন।[৮]

যেকোন কাজকে সুসাধিত করার প্রচেষ্টার মধ্যেই মানুষের শক্তির পরিচয় পাওয়া যায়। শারীরিক, মানসিক এবং আধ্যাত্মিক শক্তির বলেই ব্যক্তিগতভাবে মানুষ তার জীবনকে রূপান্তরিত করতে পারে। শ্রীরামকৃষ্ণের যোগ্য উত্তরসাধক স্বামী বিবেকানন্দ ঊনবিংশ শতাব্দীর অত্যাচারিতা,

১ দ্রঃ ভারত-ইতিহাসে নারী—রত্নাবলী চট্টোপাধ্যায় ও গৌতম নিয়োগী (সম্পাঃ), ১৯৮৯, পৃঃ ২৬; স্বাধীনতা আন্দোলন এবং বাংলাদেশে নারী জাগরণ: ১৯১১-১৯২১—ভারতী রায়, পৃঃ ৪৬

২ হিন্দু মহিলার হীনাবস্থা—কৈলাসবাসিনী দেবী ১৮৬৩, পৃঃ ৬১

৩ দ্রঃ অন্তঃপুরের আত্মকথা—চিত্রা দেব, ১৩৯১, পৃঃ ১২৭

৪ ঐ, পৃঃ ১৩১

৫ দ্রঃ বাংলার নবচেতনার ইতিহাস—স্বপন বসু, ১৯৮৫, পৃঃ ১১০

৬ দ্রঃ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ—স্বামী সারদানন্দ, ২য় ভাগ, ১৯৮৪, গুরুভাব: উত্তরার্ধ, পৃঃ ৫৮৫

৭ দ্রঃ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ সংস্পর্শে—নির্মলকুমার রায়, ১৯৮৬, পৃঃ ৩৩৭-৩৪২

৮ দ্রঃ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত, ১৯৮৩, ২।১২।১, পৃঃ ১০২

সামাজিক অধিকারহীনা নারীদের আত্মবলে উদ্বুদ্ধ হবার নবমন্ত্র শুনিয়েছিলেন। তিনি বলেছিলেন, প্রত্যেক ব্যক্তির মধ্যে শক্তি বিদ্যমান। তিনি বলেছিলেন, দেহের চেয়ে মনের শক্তিই বেশি। তিনি বলেছিলেন, স্ত্রীজাতি শক্তিস্বরূপিণী। সর্বোপরি স্বামীজী ব্যক্তিগত চরিত্র এবং জীবনের গুণগত উৎকর্ষকে মানুষের শক্তির উৎস বলে মনে করতেন। তিনি বলতেন, রাজনৈতিক ক্ষমতা, পাণ্ডিত্য কিংবা বাক্চাতুর্যের চেয়ে পবিত্রতা এবং সততার মাধ্যমেই জগতে চিরকাল মহৎ কার্য সম্পন্ন হয়েছে এবং হয়। তাঁর মতে নিষ্কলুষ চরিত্রই মানুষের যথার্থ ঐশ্বর্য। তিনি বলেছেন, সত্য, পবিত্রতা ও নিঃস্বার্থপরতা—এই তিন শক্তির বলে সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডের বিরোধিতার সম্মুখীন হওয়া সম্ভব।[৯] সেইসঙ্গে তিনটি জিনিসের প্রয়োজন—অনুভব করার মতো হৃদয়, ধারণা করবার মতো মস্তিষ্ক ও কাজ করার মতো হাত।[১০] এগুলি তিনি শুধু পুরুষদের জন্যেই বলেননি, নারীদের জন্যও বলেছেন। পবিত্রতার শক্তির সঙ্গে স্বামীজী নারীকে আত্মনির্ভরতাবোধের প্রেরণা দিয়েছেন, যা তাকে কি গৃহাভ্যন্তরে, কি গৃহের বাইরে তার আত্মদৌর্বল্য স্খালনের সহায়তা করবে, নতুন শক্তিতে সঞ্জীবিত করবে।

শ্রীরামকৃষ্ণ নিজের ভাবধারার পরিপুষ্টির জন্য তাঁর "ত্যাগশক্তি, জ্ঞানশক্তি, ভক্তিশক্তি, সেবাশক্তি, প্রেমশক্তি, উদ্ধারশক্তি ও আনন্দশক্তি"র সবটুকু দিয়ে তাঁর সহধর্মিণী সারদাদেবীকে উপযুক্ত আধার করে গড়ে তুলেছিলেন।[১১] তাই "শ্রীরামকৃষ্ণগত-প্রাণা" সারদাদেবী নারীকে তার সেই রূপই দেখতে চেয়েছেন, যেখানে সে দুর্বল নয়, সে শক্তির অধিকারিণী। শ্রীরামকৃষ্ণ জানতেন, সমস্ত প্রতিকূল অবস্থার ভিতর দিয়েই মানুষের শারীরিক এবং মানসিক শক্তির স্ফুরণ ঘটে। সেই বোধ তিনি দিয়েছিলেন তাঁর সহধর্মিণীকে। তাই দেখা যায় যে, সারদাদেবী সাধারণ অর্থে যদিও কখনো সংসারী ছিলেন না, কিন্তু নানা সমস্যা ও প্রতিকূলতার মধ্যে তিনি অবিরত 'সংসার-ধর্ম' করেছেন। তাঁর ভাইদের স্বার্থবুদ্ধি, ভ্রাতুষ্পুত্রীদের পরস্পরের প্রতি হিংসা, ভ্রাতৃবধূর পাগলামি এবং নানা জাতি ও সম্প্রদায়ের, নানারকম চরিত্রের ভক্ত নারী-পুরুষকে নিয়ে তিনি শান্তভাবে তাঁর কাজ করে গিয়েছেন। যেকোন কাজেই তাঁর অসাধারণ নিপুণতা দেখা যেত। কুটনো কোটা, ধান সেদ্ধ করা, পারিবারিক সমস্যার মীমাংসা করা, রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের নেতৃত্বদান করা ইত্যাদি যাবতীয় কাজ তাঁর নিত্যকর্মের অন্তর্ভুক্ত ছিল। তিনি বলতেন: "মানুষের প্রত্যেক খুঁটিনাটি কাজটিতে শ্রদ্ধা দেখলে ঠিক ঠিক মানুষটিকে চেনা যায়।"[১২] অপরের কাজকে শ্রদ্ধা এবং নিজের কাজের প্রতি নিষ্ঠা থেকে মানুষ নিজের সম্যক্ মূল্য উপলব্ধি করতে পারে, নিজের অন্তরাত্মাকে চিনতে পারে। সারদাদেবী সমগ্র নারীজাতিকে আকর্ষণ করতে চেয়েছিলেন সেই কর্মসাধনার পথে, যা তাদের কর্মশক্তি জাগ্রত করে আত্মশক্তিতে বলীয়ান করবে। রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ আন্দোলনে কর্ম আত্মশক্তি বিকাশের প্রধান পন্থা। সারদাদেবী বলতেন, মেয়েরা যেন সকলেই কিছু-না-কিছু কাজ করে। কাজের আকার বড় নয়, শ্রমের প্রকৃতিও গুরুত্বপূর্ণ নয়। বড় এবং গুরুত্বপূর্ণ হলো আন্তরিকতা, কর্ম এবং শ্রমের উদ্দেশ্য। আমাদের অনেকেরই ধারণা নেই প্রতিটি কাজের সামাজিক মূল্য কতখানি। স্বামীজী বলতেন, কর্মপ্রবৃত্তির মূলে চাই মানুষের প্রতি প্রেম, মানুষের প্রতি ভালবাসা। বলতেন, প্রেমই হলো একমাত্র মানুষের প্রেরণাশক্তি। তাঁর এই বাণীতেই তাঁর মানবতাবাদের বীজ নিহিত ছিল। মানবতার পূজারী স্বামীজী প্রেমের সর্বশক্তিমত্তায় বিশ্বাস করতেন। তাই তিনি বলেছেন: "তোমার হৃদয়ে প্রেম আছে তো? তবে তুমি সর্বশক্তিমান।"[১৩] সারদাদেবী তাঁর ব্যক্তিত্বের মাধুর্যে, স্নেহ-ভালবাসায়, কল্যাণ-কামনা ও পবিত্রতায় দুর্বল মানুষের মনে, দুর্বল নারীদের মনে শক্তি সঞ্চার করেছেন। মানুষের দোষ, দুর্বলতা জেনেও তাদের অকাতরে স্নেহ করেছেন তিনি। শোকে দুঃখে প্রাণঢালা সহানুভূতি দেখিয়েছেন, দুশ্চরিত্র লোকের স্বভাব পরিবর্তন করেছেন, দস্যুও ভক্তে পরিণত হয়েছে। সামাজিক প্রথা, বিধি ইত্যাদির প্রতি

৯ দ্রঃ স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা, ১০ম খণ্ড, ১ম সং, পৃঃ ১৭৮

১০ ঐ, ৩য় খণ্ড, ১ম সং, পৃঃ ৪০৯

১১ শ্রীরামকৃষ্ণ [illegible] মা সারদা—স্বামী বুধানন্দ, ১৯৮৬, পৃঃ ৬২

১২ শ্রীশ্রীমায়ের কথা, ২য় ভাগ, ১২শ সং, পৃঃ ২০

১৩ বাণী ও রচনা, ৭ম খণ্ড, ১ম সং, পৃঃ ২৮

তাঁর আনুগত্য ও প্রতিরোধ দুই-ই ছিল। তিনি বলতেন: ভালবাসায় সবকিছু হয়। জোর করে মতলব করে মানুষের পরিবর্তন করা যায় না।[১৪] সমাজের ঘৃণিত, অবহেলিত মানুষকে তিনি ভালবেসেছেন, সমবেদনা জানিয়ে তাদের চরিত্রের পরিবর্তন সাধন করেছেন। জয়রামবাটীর এক বালবিধবার অপরাধের ঘটনায় একবার সারা গ্রাম নিন্দায় মুখর হয়ে ওঠে ও তার প্রতি গঞ্জনা-লাঞ্ছনা চলতে থাকে। সারদাদেবী সব কথা শুনে মেয়েটির ভবিষ্যতের কথা ভেবে অত্যন্ত চিন্তিত হন। তাঁর উদ্বেগের কথা জেনে তাঁর কৃপাপ্রাপ্ত এক জমিদার সমস্ত গোলমাল মিটিয়ে দিয়ে মেয়েটিকে রক্ষা করেন।[১৫]

সারদাদেবী নারীর পরাশ্রয়ী ভাবের পরিবর্তন চাইতেন। কোন এক মহিলাভক্তকে তিনি বলেছিলেন: "কারো কাছে কিছু চেও না, বাপের কাছে তো নয়ই স্বামীর কাছেও নয়।"[১৬] তিনি নারীর অর্থনৈতিক স্বাধীনতার পক্ষপাতী ছিলেন, যা তাকে তার অসহায়তা কাটিয়ে স্বনির্ভর হয়ে উঠতে সাহায্য করবে। তাঁর কৃপাপ্রাপ্ত এক মহিলা সেলাইয়ের কাজ এবং ধাত্রীবিদ্যা শিখেছিলেন। সারদাদেবী এই সমস্ত কাজের খুব প্রশংসা করতেন এবং এই সমস্ত কাজ শিখতে মেয়েদের উৎসাহ দিতেন।[১৭] এইভাবে তিনি মেয়েদের অর্থ-উপার্জনের ভূমিকার ওপর জোর দিয়েছেন, যার ফলে নারীর পক্ষে স্বামীর ভরণীয়া হয়ে অবস্থানের পরিবর্তন সম্ভব। অতীতে সন্তানধারণ ও সন্তান-পালনের বাইরে নারীজীবনের কোন প্রকাশ খুঁজে পাওয়া যেত না। আজ অন্তঃপুরের সীমা অতিক্রম করে বৃহত্তর যে কর্মজীবনের সঙ্গে নারী যুক্ত হয়েছে তাতে সন্তানধারণ এবং সংসার-পালনের সঙ্গে উপার্জনের দায়িত্বও যুক্ত হয়েছে। অতীতে নারীর ভরণ-পোষণ করত পিতা, পতি ও পুত্র। আগে পরিবারে উপার্জনের একক দায়িত্ব ছিল পুরুষের, এখন নারীরাও নিজেদের দায়িত্ব শুধু নিতে এগিয়ে আসেনি, পরিবারের দায়িত্বও পুরুষ সদস্যদের সঙ্গে ভাগ করে নিচ্ছে।

সারদাদেবী নারীর বাড়ির ভিতরের এবং বাইরের ভূমিকার সমন্বয় চেয়েছিলেন। পঞ্চাশ-ষাট বছর আগেও মেয়েদের 'লেখাপড়া' ছিল নীতিশিক্ষা, ব্রতকথা, পৌরাণিক উপাখ্যান পড়া, চিঠি লেখা, হাতের লেখা মকশ করা ইত্যাদি। বস্তুতঃ, এই ছিল সাধারণ মেয়েদের শিক্ষা। ঘরের কাজ, বিশেষ করে সন্তান-পালন ও রান্নাঘরের কাজের ওপরই গুরুত্ব দেওয়া হতো। ক্রমে নারীর অন্তর্নিহিত সম্ভাবনার বিকাশের ওপর জোর দেওয়া শুরু হয়। শিক্ষার অন্যতম উদ্দেশ্য হওয়া উচিত তার কার্যকারিতার দিক—অর্থ উপার্জনের ক্ষমতা। সারদাদেবী তাঁর অল্পবয়সী ভাইঝিদের স্কুলে পড়াবার ব্যবস্থা করেছিলেন তাঁর একান্ত সঙ্গিনী ও অন্যান্যদের বাধাদান সত্ত্বেও।[১৮] এক শিষ্যকে তাঁর নিজের গ্রামে মেয়েদের লেখাপড়া ও কাজকর্ম শেখানোর জন্য চেষ্টা করতে বলেছিলেন।[১৯] তিনি মনে করতেন, মেয়েদের শিক্ষালাভ সুমাতৃত্বের জন্য দরকার, আত্মরক্ষার জন্য দরকার, মানসিক শক্তি এবং বুদ্ধি মার্জনার জন্য দরকার।[২০] শিক্ষার সঙ্গে কর্মের সংযোজন করে নারীর সামাজিক অবস্থার পরিবর্তন ঘটানো সম্ভব। সারদাদেবী নিজের জীবনে নারীর সুপ্ত শক্তির বিকাশের পথ দেখিয়ে নারীর অন্তর্নিহিত শক্তির উন্মেষ এবং নারীর মূল্য প্রতিষ্ঠা করার পথ দেখিয়ে গেছেন।

সারদাদেবীকে বলা হয় 'সংঘজননী'। বস্তুতই তিনি রামকৃষ্ণ সংঘের জননী ছিলেন। কিন্তু কোন্ শক্তিতে? তাঁর অন্তরে যে মাতৃসত্তা ছিল, শ্রীরামকৃষ্ণের শিক্ষায় তারই পরিপূর্ণ বিকাশ হয়েছিল পরবর্তী জীবনে। এই মাতৃত্বের শক্তিই তাঁকে দিয়েছে শত শত গৃহী ও সন্ন্যাসীর জননীর অধিকার। আশ্রমজীবনে শত অসুবিধা সত্ত্বেও তাঁর সন্তানদের সংঘবদ্ধ হয়ে আশ্রমে থাকতে এবং কাজ করতে বলতেন সারদাদেবী। সকলকে তিনি দিতেন কাজ করার শক্তি ও প্রেরণা। তিনি বলতেন: "ভালবাসাই তো আমাদের আসল। ভালবাসাতেই তো তাঁর সংসার গড়ে উঠেছে।"[২১] এই দৃষ্টিভঙ্গির ভিতরে রয়েছে তাঁর সাংগঠনিক

১৪ দ্রঃ শ্রীশ্রীমায়ের স্মৃতিকথা—স্বামী সারদেশানন্দ, ১৩৯৫, পৃঃ ২০৬ ১৫ ঐ, পৃঃ ৫১
১৬ মাতৃসান্নিধ্যে—স্বামী ঈশানানন্দ, ৩য় সং, পৃঃ ২৬০ ১৭ দ্রঃ শ্রীশ্রীমায়ের স্মৃতিকথা, পৃঃ ১৫৯ ১৮ ঐ ১৯ ঐ
২০ দ্রঃ চিরন্তন নারীজিজ্ঞাসা—জ্যোতির্ময়ী দেবী, ১৯৮৮, পৃঃ ৭০ ২১ শ্রীমা সারদা দেবী—স্বামী গম্ভীরানন্দ, পৃঃ ২১৪

প্রতিভার রহস্য। শ্রীরামকৃষ্ণ যখন সারদাদেবীর সম্বন্ধে বলেছিলেন "ও আমার শক্তি",[২২] তখন ভাবী সঙ্ঘের জননীর ভূমিকাও তাঁর মনে হয়েছিল বললে অযৌক্তিক হবে না।

দুঃসহ অবস্থার মধ্যেও অবিচল থেকে সংগ্রাম করে যেমন রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের সন্ন্যাসী ও গৃহী ভক্তদের শক্তির উৎসের সন্ধান সারদাদেবী দিয়েছেন, তেমনই শান্ত ও নির্বিরোধী হলেও পুরুষের শোষণ ও সামন্ততান্ত্রিক মনোভাবের বিরুদ্ধেও তিনি সরব হয়েছেন। একবার এক ভক্তকে তিনি বলেছিলেনঃ "সন্তানদের অনেককে তো দেখি, নিজেদের ভুল ত্রুটি অপরাধের ইয়ত্তা নেই, তবু তারা চায় বউ-ঝিরা তাদের কাছে নত হয়ে থাকুক। এই অন্যায়ের ফলে সামনে যে-দিন আসছে, মেয়েরা পৃথিবীর মতো আর সইবে না।"[২৩]

মানুষকে বাদ দিয়ে ধর্মের কোন স্বতন্ত্র চেহারা নেই। তাই সারদাদেবী সেই ধর্মেই নারীকে উদ্বুদ্ধ করতে চেয়েছিলেন, যেখানে সে দুর্বল নয়—শক্তির অধিকারী। কিন্তু তিনি বর্তমানকালের "নারীবাদ" প্রচারের উদ্দেশ্য নিয়ে মেয়েদের শক্তিময়ী হতে বলেননি। তিনি চেয়েছিলেন, নারীর মধ্যে থাকবে সেই মূল্যবোধ এবং অন্তর্দৃষ্টি যা তাকে তার ক্ষুদ্রতা ও তুচ্ছতাকে অতিক্রম করে তাকে যথার্থ 'শক্তিরূপিণী' করে তুলবে। এই বোধ তাঁর ধর্মচেতনার সঙ্গে যুক্ত থাকবে। সেই ধর্ম মানবতার ধর্ম। সেই ধর্ম নারীর আন্তর্শক্তির বিকাশের ধর্ম। সারদাদেবীর জীবন এবং বাণীতে নারীর আত্মমূল্যে উপলব্ধির যে ইঙ্গিত রয়েছে তা আন্দোলনাশ্রিত নয়, তা আত্মানুসন্ধান এবং আত্মানুশীলনের ওপর প্রতিষ্ঠিত। এই ভাবনা আদর্শনির্ভর, কিন্তু ব্যবহারিক জীবনে প্রয়োগসিদ্ধ। গৃহ এবং বাইরের জগৎ উভয়ই এই প্রয়োগের ক্ষেত্র, উভয়ই নারীর শক্তিসাধনার পীঠস্থান।

মানসিক ও আত্মিক শক্তির বিকাশের জন্য দেহকে অবহেলা করা উচিত নয়। দেহের দুর্বলতায় মানসিক ও আত্মিক শক্তির বিকাশ করা যায় না। বস্তুতঃ মনুষ্যত্বের বিকাশের জন্য দেহ, মন, আত্মা সমস্ত কিছুর দিকে সমান নজর দিতে হয়। ভাবতে আশ্চর্য লাগে, তৎকালীন বহুপ্রকার বিধিনিষেধ ও সংস্কারে আচ্ছন্ন হিন্দু-সমাজের গ্রাম্যবধূ সারদাদেবী বিধবাদের নিরম্বু উপবাস করতে নিষেধ করেছিলেন।[২৪] অকারণ কৃচ্ছ্রতা থেকে তিনি তাদের মুক্ত করে তাদের দিতে চেয়েছিলেন মনুষ্যত্বের পরিপূর্ণ মর্যাদা। গ্রাসাচ্ছাদনের জন্য নারী যখন পরমুখাপেক্ষী তখন তার স্বাধীন মতামত প্রকাশের সুযোগ থাকে না, তখন তাঁর নারীত্বও অনেকখানি সংকুচিত হয়ে পড়ে। এইজন্য সারদাদেবী চাইতেন নারীর জীবননিয়ন্ত্রী শিক্ষা। সেই শিক্ষা নারীর ঐশ্বর্যকে বিকাশ করতে সাহায্য করে। সারদাদেবী মনে করতেন, শিক্ষাই নারীর সঞ্জীবনী শক্তি।

রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের কেন্দ্রশক্তি ছিলেন সারদাদেবী। সন্ন্যাসী সন্তানদের প্রতি তাঁর গভীর স্নেহ ও ভালবাসা সঙ্ঘশক্তির ভিত্তিকে সুদৃঢ় করে রেখেছিল। সেখানে যাতে কোনরকম শিথিলতা না আসে সেজন্য তিনি সঙ্ঘের সভ্যদের সঙ্ঘের নিয়ম সম্পর্কে শ্রদ্ধাশীল থাকতে বলতেন। কঠোরতা, সংযম, ধৈর্য, ক্ষমা, করুণা, সহিষ্ণুতার মধ্যেই সারদাদেবীর বিপুল শক্তির নানা প্রকাশ হয়েছে। সেজন্য রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের প্রত্যেক সভ্যই তাঁর কাছে নতজানু ছিলেন। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, সারদাদেবীর অনুমতি এবং আশীর্বাদ না পাওয়া পর্যন্ত স্বয়ং স্বামী বিবেকানন্দ আমেরিকার ধর্ম-মহাসভায় যোগদান করার ব্যাপারে কোন সিদ্ধান্ত নিতে পারেননি। তাছাড়া আরও অনেক ক্ষেত্রে—পরবর্তী কালে সঙ্ঘপ্রতিষ্ঠার পরেও দেখা গিয়েছে, স্বামীজী সারদাদেবীর সিদ্ধান্তকেই শিরোধার্য করেছেন। স্বামী ব্রহ্মানন্দ, স্বামী শিবানন্দ প্রমুখ অন্যান্য সঙ্ঘনেতাগণের কাছেও সারদাদেবীর ইচ্ছা, নির্দেশ ও সিদ্ধান্তই ছিল শেষকথা। এই অবস্থান তিনি অর্জন করেছিলেন তাঁর নিজের শক্তির সৌজন্যে, শ্রীরামকৃষ্ণের বিধবা পত্নী হিসাবে নয়। সারদাদেবী তাঁর নিজের জীবন দিয়ে দেখিয়েছেন, নারীর অন্তরের ঐশ্বর্যশক্তির সাথে আত্মবুদ্ধির প্রতি আস্থা তার সামনে এক নতুন ভবিষ্যৎ-সম্ভাবনার দ্বার খুলে দিয়ে তাকে করবে অনন্ত শক্তির প্রস্রবণ। নারীর শক্তি ও মূল্যের পরিমাণ সারদাদেবীর মধ্যে পৃথিবী প্রত্যক্ষ করেছে। □

২২ শ্রীমা সারদা দেবী, পৃঃ ১০৫

২৩ সারদা-রামকৃষ্ণ—দুর্গাপুরী দেবী, ১৩৬১, পৃঃ ৩৬১

২৪ শ্রীমা সারদা দেবী, ১৩৭৪, পৃঃ ৫০৬

## কবিতা

# শ্রীসারদা-সপ্তক

### স্বামী অচ্যুতানন্দ

মাগো। নয়নে তোমার পরমা শান্তি
কণ্ঠে ঝরিছে অমিয় ধারা।
বিগ্রহ তব কৃপাপ্রবাহিনী
চিন্ময়ী তনু স্নেহেতে গড়া ॥
স্বরূপ আবরি' এসেছ এবার
ধরা না দিলে কি যায় মা ধরা।
জগজ্জননী সাজি ভিখারিণী
এ লীলা তোমার কেমন পারা ?
সংসার-মাঝে শত শত কাজে
জ্বলিতেছে তব সন্তান যারা।
তাহাদের লাগি' জপিতেছ সদা
করুণাময়ী মা নিদ্রাহারা ॥
'মহামায়া' তুমি বলেছ মা নিজে
'কালী'-রূপে তুমি দিয়েছ ধরা।
'জ্যান্ত দুর্গা'—'সরস্বতী' মা
লজ্জারূপিণী তারিণী তারা ॥
ষোড়শীরূপেতে চরণে তোমার
শ্রীরামকৃষ্ণ আত্মহারা।
ষষ্ঠী শীতলা—সকলি মা তুমি
নানারূপে তব ভুবন ভরা ॥
পবিত্রতার মূরতি মা তুমি
ও রাঙাচরণ দুঃখহরা।
ও রূপমাধুরী ও নাম-অমৃতে
সংসার-মাঝে সারাৎসারা ॥
'মা' বলে ডাকিলে শত কাজ ফেলে
আসিবে ছুটিয়া করিয়া ত্বরা।
বরদা শুভদা অভয়া সারদা
মম হৃদে আজ দাও গো ধরা ॥

# আবাহন

### অরুণকুমার দত্ত

লক্ষ পাশ ছিন্ন করে
আমরা কি এগিয়ে যেতে পারি ?
মমতাময়ী মাগো,
তাই তো নিজেই ধরা দিলে।
এস মা, শিউলি বিছানো প্রাতে
বর্ষাস্নাত বিষণ্ণ সন্ধ্যায়,
এস মগ্ন কর্মচেতনায়
শব্দহীন স্তব্ধ অবকাশে,
এস মুহ্যমান হতাশায়
সাফল্যের উদ্দাম উল্লাসে।
তোমার প্রকাশে
জল স্থল অন্তরীক্ষ
ভরে যাক খুশির ঝলকে,
তোমার সস্নেহ স্পর্শ
সঞ্চার করুক তেজ
অমিত দুর্জয়,
তোমার আশিস
সঞ্জীবিত করে দিক
নতুন জীবন।

# ব্যাকুলতা

### মৃদুল মুখোপাধ্যায়

খেলাঘরের যন্ত্রণাতে ব্যাকুল হলাম।
হে জননি, ব্যাকুল পথেই তোমায় পেলাম।
রুক্ষপথের শুষ্ক ধুলায় পায়ের চিহ্ন
হয়তো ছিল, রৌদ্রে ধূসর হাওয়ায় ক্লিন্ন।
দু-এক ফোঁটা চোখের জলে ভিজিয়ে ধুলো
চিনে নিলাম তোমার পায়ের চিহ্নগুলো।
করুণাময়ি, তোমার চরণপদ্ম ছোঁয়ায়
পথের ধুলোও সাধনাহীন পার পেয়ে যায়।
মানুষ আমি আর কি দেব এই ধরাতে,
ভিজুক তোমার চরণযুগল অশ্রুপাতে।

# সারদামঙ্গল

## বীণাপাণি বন্দ্যোপাধ্যায়*

বন্দে জননী সারদাং সর্বশক্তিস্বরূপিণী
বন্দে শ্রীরামকৃষ্ণপ্রিয়াং জ্ঞানভক্তিপ্রদায়িনী ॥

জয় সারদা শুভদা জ্ঞানদা মুক্তিদা
বরদা সর্বভয়হারিণী,
জয় মা সারদামণি জয় মা সারদামণি
জয় জননী জয় জননী ॥

চিৎস্বরূপা মহামায়া আসিলে ধরিয়া কায়া
নিরাকারা হইয়া সাকার।
ত্রিগুণাতীত সে তত্ত্ব হয়ে সত্ত্ব গুণযুক্ত
এলে জীবে করিতে উদ্ধার ॥

বারোশত ষাট সনে লক্ষ্মীবার শুভক্ষণে
কৃষ্ণা সপ্তমীতে পৌষ মাসে।
নব ধান্যে পূর্ণ ধরা হরি সবা দুঃখভারা
আবির্ভূতা দুঃখহরা এসে ॥

ধন্য জয়রামবাটী পুণ্যময় যার মাটি
হলো তব পদস্পর্শ করে।
এলে মাগো লীলাচ্ছলে শ্যামাসুন্দরীর কোলে
কৃপা করি শ্রীরামচন্দ্রেরে ॥

দেখি সুতা পিতা-মাতা অতিশয় আনন্দিতা
সারা পল্লী আনন্দে মগন।
মেয়ে নহে শশিকলা গৃহ করিয়াছে আলা
যেন লক্ষ্মী আসিল ভবন ॥

স্মরিয়া স্বপনবাণী রামচন্দ্র দ্বিজমণি
আনন্দেতে রোমাঞ্চ শরীরে।
ভাবিলা স্বপন দিয়ে এল অসামান্যা মেয়ে
পেনু লক্ষ্মী কত ভাগ্য করে ॥

ত্রেতাতে আসিল মাতা হইয়া ধরণীসুতা
দ্বাপরেতে রাধা ব্রজেশ্বরী
কলিতে শ্রীনদীয়ায় বিষ্ণুপ্রিয়া যেবা হয়
মোর ঘরে এল সেই নারী ॥

নানান বিভূতি হেরি ভাবেন শ্যামাসুন্দরী
কন্যারূপে দেবী বুঝি এল।
মনে হর্ষ নাহি ধরে আনন্দ উথলি পড়ে
দুঃখনিশি এবে পোহাইল ॥

মাসি আসি দেখি মেয়ে কন তারে কোলে নিয়ে
কন্যাশোক ঘুচিল আমার।
আমার 'সারদা' সেই আসিয়াছে যেন এই
এ মেয়ে যে 'সারদা' আমার ॥

শুনি ভগিনীর কথা মাতা হয়ে আনন্দিতা
রাখিলা সারদামণি নাম।
যে-নাম স্মরণ করে' পাপীতাপী যাবে তরে
ভক্তি মুক্তি লভি' সিদ্ধকাম ॥

তরাতে জগত জনে জনমিলে শুভক্ষণে
ধন্য করি ধূলির ধরণী।
জয় মা সারদামণি জয় শ্রীশ্রীঠাকুরাণী
জয় দেবী, জয় মা জননী ॥

* 'উদ্বোধন'-এর পুরনো গ্রাহিকা, উত্তরপ্রদেশের মির্জাপুরে থাকেন।—সম্পাদক, উদ্বোধন।

# দূরত্ব

## প্রভঞ্জন রায়চৌধুরী

কামারপুকুর থেকে জয়রামবাটী—
মেপেছ কি কত দূর?
কাঁকুড়গাছি থেকে হেঁটেছ কি বাগবাজার
'মায়ের বাড়ী'র পথ—দূরত্ব কত?

শ্রান্ত পথিক, মেপে দেখো
উভয়দিকের প্রান্তসীমা,
একদিকে ঠাকুর, একদিকে মা—
অধিষ্ঠানের কিন্তু এক ঠিকানা।

## জননী সারদামণি
### শৈলেন বন্দ্যোপাধ্যায়

মাতা সারদার জীবনের ধারাখানি,
স্বচ্ছসলিলা শান্ত নদীর মতো ;
বয়ে গিয়েছিল বিতরি' শান্তিবাণী,
গ্রামের বুকেতে নয়ন করিয়া নত।
নাহি উচ্ছ্বাস শততরঙ্গ মেলি',
বাতাস পরশে ওঠে মৃদু হিল্লোল ;
স্নেহময়ী এক জননী আপনা ভুলি',
সন্তান তরে পেতে দিয়েছিল কোল।
গ্রামের বধূরা সকাল-সন্ধ্যা আসি',
নিয়ে যেত বারি মনের কলস ভরি' ;
করুণাময়ীর বুকভরা স্নেহরাশি,
জীবন তাদের দিত পবিত্র করি'।
সুহাসিনী নদী কত পথ ঘুরে ঘুরে,
শস্যশ্যামলা করে দিল কত গ্রাম ;
সব মলিনতা ধুয়ে দিয়ে পূত নীরে,
রেখে গেল পলি জননী সারদা নাম।

## পুণ্যযোগ
### নীলাম্বর চট্টোপাধ্যায়

সেদিন নিবিড় রাত্রি গভীর অন্ধকারে
তুমি দাঁড়াইলে আসিয়া সহসা আমার চিত্তদ্বারে।
নিদ্রিত আমি ছিলেম তখন
তন্দ্রা অলস স্বপন-মগন
এমন সময় কমলনয়ন
রাখিয়া নয়ন 'পরে
কহিলে, 'পথিক, যাত্রার শেষ
চলো তমসার পারে।'
প্রস্তুত আমি রাখিনি নিজেরে
কত বঞ্চনা বাসনা তিমিরে
দেহে আবদ্ধ ছিলাম মগ্ন
তবু অপরূপ করুণায় দিলে ভরে।
শত শত গত জীবনের ক্ষোভ
রহিল না আর কোন অভিযোগ
সহিতে দিলেম নীরব বিরাগে
যতেক ভোগ,
পিপাসার পারে অমৃতের স্বাদ—
এ পুণ্যযোগ ॥

## মাগো
### রমা রায়

ভজন পূজন সাধনেতে মাগো
মন যে আমার বসে না।
একলা ঘরে গাইব আমি
সেই তো আমার পূজা মা।

ফুল যে তোলে বনের মালী,
ফল কিছু সে পায় না।
সেই মালা যে পরায় তোমায়
পুণ্যলাভ করে তো সে-ই, মা।

দিনের শেষে রাত্রি এলে
তুমি থেকো সাথে ছায়া হয়ে।
মোর মনের ভক্তি নয়নের জলে
আমি করব তোমার পূজা, মা।

মোর গোপন পূজার সাক্ষী রবে
আকাশের ঐ চন্দ্র তারা।
অঞ্জলিভরে পান কর মাগো
আমার গানের ঝরনাধারা।

এবার যাবার সময় হয়েছে,
সূর্য অস্ত যায়।
যেতে হবে মাগো কোন্ সুদূরে
কোন্ দূর অজানায়।

গ্রহ তারা সব একই থাকে মাগো,
আকাশেরও রঙ নাহি বদলায়।
শুধু যেন মা মানুষে মানুষে
সব বন্ধন ঘুচে যায়।

দেহ থেকে যায়, মন চলে যায়
বলো বলো মাগো একি বিস্ময়।
যেতে যেতে যদি মনে পাই ব্যথা,
তব স্মৃতি যেন মনে রয়।

বিশেষ রচনা

# পরিব্রাজক স্বামী বিবেকানন্দ

## মহেন্দ্রনাথ দত্ত

[ পূর্বানুবৃত্তি ]

লেখক স্বামী বিবেকানন্দের দ্বিতীয় সহোদর।

একদিন অপরাহ্নে নরেন্দ্রনাথ ও অপর সকলে একত্রিত হয়ে ভজন ও সঙ্গীত করছিলেন। ভাব জমে গেল। সঙ্গীত ও ভজন কিছুক্ষণ চলতে লাগল। গোবিন্দ ডাক্তারের মনে বিশেষ ভক্তি-আনন্দ উদ্দীপিত হলো এবং মধুর সঙ্গীতে মনের আবেগ অধিকতর বৃদ্ধি হওয়ায় ভাব সম্বরণ করতে না পেরে তার দুই নয়নে অশ্রুধারা বিগলিত হতে লাগল। তখন নরেন্দ্রনাথ প্রভৃতি গানে বিশেষ আবিষ্ট হয়েছিলেন, কিন্তু গোবিন্দ ডাক্তারের চক্ষে আনন্দাশ্রু প্রবাহিত হতে দেখে নরেন্দ্রনাথ স্বভাব সম্বরণ করে গোবিন্দ ডাক্তারকে উপহাস ও ব্যঙ্গচ্ছলে বললেন: "তোর তো বড় পানসে চোখ।"

প্রসঙ্গক্রমে গোবিন্দ ডাক্তার একদিন নরেন্দ্রনাথকে জিজ্ঞাসা করলেন: "মৎস্য ও মাংস আহার করা মানুষের পক্ষে উচিত বা অনুচিত?" গোবিন্দ ডাক্তার ছিলেন নিরামিষভোজী; মৎস্য, মাংস কখনো তিনি গ্রহণ করেননি এবং অপরের পক্ষেও এটি অপ্রয়োজনীয় ও ধর্মপথের অন্তরায়—তাঁর এরূপ ধারণা ছিল। নরেন্দ্রনাথ প্রশ্ন শুনে সহাস্যবদনে স্নেহপূর্ণ গম্ভীরভাবে বললেন: "দেখ গোবিন্দ, সিংহ, বাঘ মাংসাশী এবং চড়াই এরা চালের কণা ও কাঁকর খেয়ে জীবনধারণ করে, কিন্তু বাঘ-সিংহের বছরান্তে সন্তান উৎপাদনের (self procreation) প্রবৃত্তি একবার হয়ে থাকে এবং চড়াই প্রভৃতি নিরামিষভোজীরা সততই সন্তান উৎপাদনে ব্যগ্র। মাংসাহার ধর্মপথের কোন অন্তরায় নয়।"

নরেন্দ্রনাথ ও শিবানন্দ স্বামী কিছুদিন প্রয়াগের অপর পার্শ্বে ঝুসিতে বাস করছিলেন। ছত্র থেকে মাধুকরী করে ডালরুটি আনতেন এবং তা-ই আহার করে গুহার ভিতর থাকতেন। গোবিন্দবাবুও মাঝে মাঝে দেখা করে আনাজ-তরকারি দিয়ে আসতেন; তা-ই রান্না করে তরকারি হতো, তবে সর্বদা নয়। গোবিন্দবাবু বর্তমান লেখককে বলেছিলেন: "একদিন আমি ঝুসিতে যাই। নরেন্দ্রনাথ ও শিবানন্দ স্বামীর সঙ্গে কথা বলে সমস্ত দিন অতি আনন্দে কাটে, বিকাল হলে তিনজনে মিলে এলাহাবাদে ফিরলাম। আমার পায়ে জুতো, গায়ে ভাল কাপড়-জামা ইত্যাদি ছিল; মোটকথা আমি সেদিন বেশ সাজগোজ করে বাবুর মতো ছিলাম। নরেন্দ্রনাথের খালি-পা। শুধু-পায়ে হেঁটে হেঁটে গোড়ালি ফেটে গেছে। কৌপীন ও একখানি বহির্বাস এবং গায়ে একখানা মোটা ঘোড়ার লোমের কম্বল। শিবানন্দ স্বামীরও পরিধেয় সেইরূপ। আমি খানিকটা চলে মনে বড় কষ্ট পেতে লাগলাম, পায়ের জুতো খুলে হাতে নিলাম। মনে মনে বলতে লাগলাম, আমি কি অন্যায় করেছি, এই দুই মহাপুরুষ খালি পায়ে কম্বল গায়ে দিয়ে যাচ্ছেন, আর আমি অতি নগণ্য ব্যক্তি এঁদের সঙ্গে জুতো পায়ে দিয়ে আরাম করে যাচ্ছি। আমি যেই পায়ের জুতো খুলে ফেলে হাতে নিয়েছি, নরেন্দ্রনাথের দৃষ্টি অমনি আমার ওপর পড়ল। তিনি স্নেহপূর্ণ মধুর স্বরে আমায় বললেন: 'জুতো খুললে কেন? পায়ে দাও না।' কথায় কিছু না হোক, কিন্তু তাঁর স্বর ও দৃষ্টি থেকে আর একটি ভাব প্রকাশ পেল। তিনি যেন ভিতর থেকে বলতে লাগলেন: 'গোবিন্দ, তুমি সামান্য সুখের প্রত্যাশী, কেন তুমি তা থেকে বঞ্চিত হচ্ছ? তুমি সে উচ্চ জিনিস পাবার জন্য সুখ, মান, ধাম সকলই তো বিসর্জন করনি। তোমার পক্ষে এ সাময়িক ভাবোচ্ছ্বাস, একঘন্টা পরে এ-ভাব থাকবে না। আবার যা তা-ই হবে। আর আমরা একটা মহা উচ্চবস্তু লাভের জন্য সর্বস্ব ত্যাগ করেছি। ভিক্ষান্নে দেহধারণ করছি।'" যাই হোক, গোবিন্দবাবু যখনই এই কথাটি উল্লেখ করতেন তখনই তাঁর মুখভাবের পরিবর্তন হয়ে যেত। গোবিন্দবাবু উচ্ছ্বাসের সঙ্গে বলতেন: "এরূপ ত্যাগ, এরূপ বৈরাগ্য ও এরূপ জ্বলন্ত ঈশ্বরবিশ্বাস কখনো দেখিনি।"

একদিন এক বাঙালী সাধু বৈরাগী, নাম মাধবদাসবাবা (যিনি চিটগঞ্জে এক বাড়ির গণ্ডির মধ্যে ৪০ বছর ছিলেন), নরেন্দ্রনাথ ও তাঁর গুরু-ভাইদের দেখে স্তম্ভিত হয়ে গেলেন, নরেন্দ্রনাথের তীক্ষ্ণ দৃষ্টির সম্মুখীন হতে পারলেন না। মন্ত্রৌ-ষধিরুদ্ধবীর্য সর্পের মতো মস্তক অবনত করে রইলেন—বাঙ্‌নিষ্পত্তি করতে পারলেন না। বৈরাগী মহাশয় অতীব হর্ষিত হয়ে গোবিন্দ ডাক্তারকে বললেন: "গোবিন্দ, তুমি কি সৎসঙ্গই না করছ!"

একদিন নরেন্দ্রনাথ গোবিন্দ ডাক্তারকে বললেন: "আমরা আজ রওনা হব।" গোবিন্দ ডাক্তার কাতর হয়ে নরেন্দ্রনাথকে অনুনয়-বিনয় করতে লাগলেন যে, নরেন্দ্রনাথ যেন অন্ততঃ আর একটা দিন থেকে যান। কারণ, তাঁদের সঙ্গবিচ্যুত হতে গোবিন্দ ডাক্তারের প্রাণ অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হয়ে উঠল। নরেন্দ্রনাথ গম্ভীর-ভাবে গোবিন্দ ডাক্তারকে বললেন: "এতে সত্যের অপলাপ হবে, আমি আজকেই যাব।" তাঁরা সেই দিনই সেখান থেকে গাজীপুর রওনা হলেন।

প্রয়াগে গোবিন্দবাবুর বাড়িতে দিন পনেরো থেকে নরেন্দ্রনাথ পওহারী বাবাকে দর্শন করবার জন্য গাজীপুর গেলেন। পরে বাবুরাম মহারাজ ও শিবানন্দ স্বামী সেখানে গিয়েছিলেন।[৫] নরেন্দ্রনাথ কয়বার গাজীপুরে গিয়েছিলেন, বর্তমান লেখক তা বিশেষ পরিজ্ঞাত নন; সম্ভবতঃ দুই বা তিনবার গিয়েছিলেন। তখন গাজীপুরে শ্রীশচন্দ্র বসুর বাড়ি বা গগনচন্দ্র রায়ের বাড়িতে অনেকেই গিয়ে থাকতেন। শ্রীশচন্দ্র বসু তখন গাজীপুরে মুন্সেফ ছিলেন। গাজীপুরে অবস্থানকালে অমৃতলাল বসু, ডিস্ট্রিক্ট জজ সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রভৃতির সঙ্গে নরেন্দ্রনাথের দেখা ও নানারূপ আলোচনা হয়েছিল। গাজীপুর থেকে নরেন্দ্রনাথ গোবিন্দ-বাবুকে একখানি পত্র দিয়েছিলেন, তার মর্ম ছিল: "গোবিন্দ, আমি গাজীপুর পৌঁছেছি। পওহারী বাবার সাথে দেখা করতে যাব। আশা করি, তাঁর কাছ থেকে কিঞ্চিৎ অমূল্য রত্ন পাব।" ইত্যাদি।

গাজীপুর থেকে গঙ্গার কিনারায়-কিনারায় দুখানি গ্রাম পার হয়ে গেলে পওহারী বাবার আশ্রম। দূরত্ব বোধহয় নয় বা দশ মাইল হবে। গঙ্গার দিকে একটি বাঁধানো ঘাট ছিল, ঘাটের সন্নিকটে একটি গোড়াবাঁধানো অশ্বত্থগাছ। উঠানটি বেশ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন, সম্মুখে একখানি বড় চালাঘর এবং বাঁদিকে লম্বা পাঁচিলঘেরা একটি স্থান। স্থানটি অতি নির্জন ও সুরম্য এবং সেখানে একটি পঞ্চবটী আছে। চালাঘরটিতে লম্বা একটি মেটে দাওয়া আছে এবং সম্মুখে দুটি প্রকোষ্ঠ ও দুটি দরজার মাথায় মালার মতো চৌকো চৌকো সাত রঙের নেকড়ার টুকরো ঝুলানো ছিল। বাঁদিকের দরজাটির অভ্যন্তরে একটি উঠান। দরজাটি সব সময় বন্ধ থাকত এবং কপাটের উপরিভাগে চিঠি ফেলবার মতো সামান্য একটি কাটা গর্ত ছিল। মধ্যের ঘরটির মাঝখানে একটি দরজা ছিল, তা দিয়ে বামপার্শ্বের উঠানটিতে যাওয়া যেত। একটি ছোট গরাদবিহীন জানলা ছিল, তা সর্বদাই বন্ধ থাকত। সেই গবাক্ষের কপাট খুলে পওহারী বাবার ভোজ্যদ্রব্য দেওয়া হতো। ভিতরের উঠানে একটি পাতকুয়া ছিল, কারণ ঘটি বা লোটাতে দড়ি বেঁধে জল তোলার আওয়াজ পাওয়া যেত। তাছাড়া উঠানে গুম্ফা ছিল, পওহারী বাবা নাকি সেখানে বাস করতেন। সাধারণ লোকের সঙ্গে তিনি কখনো কথা বলেননি এবং তাঁর প্রত্যক্ষ দর্শন বড় একটা হতো না। যাকে তিনি কৃপা করতেন তারই সঙ্গে দরজার পূর্বোক্ত ছিদ্র দিয়ে অল্পক্ষণ কথা বলতেন।

এই সময়ে নরেন্দ্রনাথের সঙ্গে পওহারী বাবার কী কথাবার্তা হয়েছিল তা কেউই বিশেষ জানেন না। তবে লন্ডনে বক্তৃতাকালে পওহারী বাবার প্রসঙ্গ ওঠায় তিনি বলেছিলেন: "পওহারী বাবার মতো এমন উচ্চস্তরের লোক অতি অল্পই পাওয়া যায়; তাঁর উচ্চাবস্থার কথা অতি অল্প বললেই পর্যাপ্ত হবে।" কারণ পওহারী বাবা নরেন্দ্রনাথকে বলেছিলেন: "এসব যে ধর্ম-কর্ম করছ, এসবই বাজে জিনিস, আসল এখানে নেই। যেখানে উত্তর মেরু ও দক্ষিণ মেরু এক হয়েছে সেটিই জানবে ধর্মজীবনের প্রথম বনেদ। তারপর থেকে মনকে ধীরে ধীরে ওপরে তুলতে হবে। অর্থাৎ বিপরীত

৫ উল্লিখিত সময়ে স্বামী শিবানন্দের গাজীপুর যাওয়ার কথা 'যুগনায়ক বিবেকানন্দ' বা 'মহাপুরুষ শিবানন্দ' গ্রন্থে পাওয়া যায়নি।—সম্পাদক, উদ্বোধন

ভাব যখন এক হবে বা দ্বন্দ্বাতীত অবস্থায় পেঁছাবে সেইটিই চরম অবস্থা মনে করো না, সেইটি প্রথম সোপান।" নরেন্দ্রনাথ বক্তৃতাকালে এই কথাটি উল্লেখ করে পরম আনন্দ অনুভব করতেন। পওহারী বাবার সঙ্গে কতবার নরেন্দ্রনাথের সাক্ষাৎ হয়েছিল এবং কী কথাবার্তা হয়েছিল, বর্তমান লেখক তা জানেন না, কারণ নরেন্দ্রনাথ এবিষয়ে বড় কিছু কাউকে বলতেন না বা কখনো প্রকাশ করতেন না। তবে তিনি প্রায়ই বলতেন, হৃষীকেশে এক অতি উন্নত সাধু মহাত্মাকে তিনি দেখেছিলেন। সেই মহাত্মার সঙ্গে পরিচিত হয়ে তিনি এতই মুগ্ধ হয়েছিলেন যে জীবনে কোনদিন তাঁকে তিনি ভুলতে পারেননি। সাধুটির নিজের মুখে তিনি শুনেছিলেন যে, তিনি আগে চোর ছিলেন, পওহারী বাবার কুঠিয়ায় চুরি করতে গিয়ে ধরা পড়েন পওহারী বাবার কাছেই। তার পর থেকেই তাঁর মনে অনুশোচনা আসে এবং জীবনে আর কখনো ঐ পথে হাঁটবেন না, সাধন-ভজনে জীবন কাটাবেন বলে প্রতিজ্ঞা করেন। একসময়ের চোরের এরূপ উন্নত মহাত্মায় পরিণতি দেখে নরেন্দ্রনাথ বুঝেছিলেন, পতন বা স্খলন মানুষের শেষকথা নয়, তার অন্তর্নিহিত দেবত্বই তার শেষকথা। এই ধরনের অভিজ্ঞতা নরেন্দ্রনাথের পরিব্রাজক জীবনে আরও হয়েছে। তারই ভিত্তিতে পরবর্তী কালে তাঁকে বলতে শোনা যেত: "There is no saint without a past and there is no sinner without a future."

একদিন নরেন্দ্রনাথ, বাবুরাম মহারাজ ও শিবানন্দ স্বামী পওহারী বাবাকে দর্শন করতে যান। পওহারী বাবার মেটে দালানটি থেকে বেরিয়ে এসে সকলে সম্মুখের অশ্বত্থগাছটির তলায় বসলেন। কেশববাবুর সমাজের অমৃতলাল বসু সেই সময় উপস্থিত ছিলেন। অমৃতলাল বসু কেশববাবুর সঙ্গে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের কাছে যেতেন ও তাঁকে খুব শ্রদ্ধাভক্তি করতেন। অনেক দিন পর দেখা হওয়াতে প্রথমে বেশ মিষ্টালাপ হলো। অমৃতলাল বসুর ভিতর শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের প্রতি কিরূপ শ্রদ্ধাভক্তি আছে জানবার জন্য নরেন্দ্রনাথ দুষ্টামি বুদ্ধি করে বিপরীত ভাব ধারণ করলেন। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের কথা উঠলে নরেন্দ্রনাথ বলতে লাগলেন: "কি একটা লোক ছিল! পুতুলপুজো করত আর থেকে থেকে ভিরমি যেত, তাতে আবার ছিল কী?" বাবুরাম মহারাজ ও শিবানন্দ স্বামী নরেন্দ্রনাথের উদ্দেশ্য বুঝতে পেরে মৃদু মৃদু হাসতে লাগলেন এবং যেন তাঁরা নরেন্দ্রনাথের লোক বলে ভাব প্রকাশ করতে লাগলেন। এই শুনে অমৃতলাল বসু একেবারে চটে উঠে বলতে লাগলেন: "নরেন, তোমার মুখে এমন কথা! পরমহংস মশাই তোমাকে কত সন্দেশ খাওয়াতেন, কত ভালবাসতেন, আর তুমি তাঁকে অবজ্ঞা করে কথা কইছ, এই তোমার কাজ। তুমি পরমহংস মশাইকে মান না! তাঁর মতন তখন কয়টা লোক হয়েছে?" তাঁর ভিতর থেকে আরও কথা বের করবার জন্য নরেন্দ্রনাথ পরমহংস মশায়ের প্রতি আরও কটূক্তি করতে লাগলেন। অমৃতলাল বসু ক্রুদ্ধ হয়ে ততই পরমহংস মশায়ের সুখ্যাতি করতে ও প্রগাঢ় ভক্তির সঙ্গে তাঁর কথা বলতে লাগলেন। অবশেষে অমৃতলাল বসু রেগে বলতে লাগলেন: "যাও, তোমার সঙ্গে তাঁর কথা কইতে নেই, তুমি পরমহংস মশায়ের এমন নিন্দা কর?"—এই বলে সেখান থেকে উঠে গেলেন। নরেন্দ্রনাথ তখন হাসতে হাসতে শিবানন্দ স্বামী ও বাবুরাম মহারাজকে বললেন: "এই লোকটি কিন্তু আজ থেকে আমার ওপর চিরকাল চটে রইল। লোকটির ভিতর পরমহংস মশায়ের প্রতি যে এরকম শ্রদ্ধাভক্তি ছিল তা তো আমরা জানতাম না।"

বর্তমান লেখক যখন গাজীপুরে শ্রীশচন্দ্রের বাড়িতে ছিলেন তখন এই গল্পটি শুনেছিলেন। গাজীপুরে এক সরকারি 'ঠাকুরদা' ছিল। জাতিতে ব্রাহ্মণ এবং গাঁজা, গুলি ও চরসে সিদ্ধপুরুষ। কোন কথা উত্থাপন করবার আগেই ঠাকুরদা বলত: "ও বিষয় আমি জানি" অর্থাৎ সে একটা গেঁজেল সবজান্তা লোক ছিল। একদিন শ্রীশচন্দ্রের বাড়িতে নরেন্দ্রনাথ বসে আছেন, এমন সময় সেই ঠাকুরদা এসে উপস্থিত হয়। সকলে ঠাকুরদাকে পেয়ে খুব স্ফূর্তি করতে লাগল। নরেন্দ্রনাথ ঠাকুরদাকে বেদ পড়ে শোনাতে লাগল: "'কস্মিংশ্চিৎ বনে ভাসুরকো নাম সিংহঃ প্রতিবসতি স্ম'—এই হলো

বেদের প্রথম স্তোত্র। বেদের নাম শুনেই তো ঠাকুরদা আগে থেকে কান্না জুড়ে দিল। নরেন্দ্রনাথ তারপর ব্যাখ্যা শুরু করলেন: "আহা! কি পদ-লালিত্য! কি শব্দ-বিন্যাস! কি ভাবপূর্ণ শ্লোক!" নরেন্দ্রনাথ চেয়ারে বসে আছেন আর ঠাকুরদা মেঝেতে উবু হয়ে বসে বেদের ব্যাখ্যা শুনে হাপুস নয়নে কাঁদছে আর রুদ্ধকণ্ঠে শোক-ব্যঞ্জক 'উহু উহু' করছে। এমন সময় শ্রীশচন্দ্র এসে পড়ল। সে তো নরেন্দ্রনাথের ব্যঙ্গ দেখে হেসে ফেলল। তা দেখে নরেন্দ্রনাথ শ্রীশচন্দ্রের দিকে তাকিয়ে বললেন: "তুই যা এখন, এখান থেকে চলে যা, আমি ঠাকুরদাকে এখন বেদ শোনাচ্ছি। কি বল ঠাকুরদা, বেদ বুঝতে পারছ তো?" শ্রীশচন্দ্র বাড়ির ভিতরে গিয়ে উচ্চৈঃস্বরে হাসতে লাগল, আর গেঁজেল ঠাকুরদা নরেন্দ্রের সম্মুখে বসে বেদের কথা শুনে কাঁদতে লাগল।

পেনিংটন নামে জনৈক ইংরেজ তখন গাজীপুরে ডিস্ট্রিক্ট জজ ছিলেন এবং শ্রীশচন্দ্র বসুর বাড়ির কাছে বাগানবাড়িতে বাস করতেন। শ্রীশচন্দ্র বসুর সঙ্গে তাঁর খুব হৃদ্যতা ছিল। ইংরেজটির বেশ বয়স হয়েছিল এবং বেশ সৎলোক ছিলেন। একটি যুবক-সন্ন্যাসীকে মুন্সেফের বাড়িতে যাতায়াত করতে দেখে ইংরেজটি শ্রীশচন্দ্রের কাছে সন্ন্যাসীর সম্বন্ধে অনুসন্ধান করলেন এবং শ্রীশচন্দ্রও সন্ন্যাসীটির অদ্ভুত প্রতিভা ও পাণ্ডিত্য ইংরেজটিকে বুঝিয়ে দিলেন। ফলে ইংরেজটি সন্ন্যাসীর সঙ্গে আলাপ-পরিচয় করতে ইচ্ছা প্রকাশ করলেন। একদিন শ্রীশচন্দ্র নরেন্দ্রনাথকে সঙ্গে নিয়ে ইংরেজটির বাড়ি গেলেন। নরেন্দ্রনাথ তেজস্বী যুবক ও তর্কযুক্তিতে বিশেষ পারদর্শী; ইংরেজটি বৃদ্ধ ও ধীর। দুজনের মধ্যে নানা প্রসঙ্গ ও দর্শনশাস্ত্রের আলোচনা হতে লাগল। নরেন্দ্রনাথের পাণ্ডিত্য, অসাধারণ তর্কযুক্তি এবং ত্যাগ-বৈরাগ্য দেখে ইংরেজটি আশ্চর্যান্বিত হলেন। নরেন্দ্রনাথও মাঝে মাঝে তাঁর বাড়িতে যেতেন এবং কখনো খ্রীস্টানধর্মের ওপর, কখনো বেদান্ত শাস্ত্রের ওপর, কখনো ইউরোপীয় দর্শনশাস্ত্রের ওপর, কখনো বা ইতিহাসের ওপর আলোচনা করতেন। ধীরে ধীরে ইংরেজটি ও তাঁর পত্নী নরেন্দ্রনাথের অনুরক্ত হয়ে উঠলেন। একদিন ইংরেজটি নরেন্দ্রনাথকে বললেন: "দেখুন স্বামী, আপনি ইংল্যাণ্ডে যান, সেখানে আরও ভাল করে লেখাপড়া শিখুন। আপনার ভিতর যা শক্তি আছে তার ওপর যদি উচ্চবিদ্যা শিক্ষা হয়, তাহলে জগতের বিশেষ কল্যাণকর কাজ হতে পারে; তার জন্য যা খরচ লাগবে, আমি নিজে তা আনন্দের সঙ্গে বহন করতে রাজি আছি।" নরেন্দ্রনাথের তখন মহা বৈরাগ্যভাব, ঐসব কথায় কোন মনোযোগ দিলেন না। নরেন্দ্রনাথের কাছে বৈরাগ্যের কথা ও ভগবানলাভের কথা শুনে ইংরেজটির মন ক্রমশঃ সংসার থেকে ফিরে ধর্মমার্গের দিকে চলল। তিনি মাঝে মাঝে বলতেন: "আর সংসার ভাল লাগে না।" এমন কি তিনি ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন যে, পেনসন নিয়ে অপর স্থানে গিয়ে ধর্মচর্চা করবেন। ইংরেজটির বৈরাগ্যের ভাব দেখে তাঁর পত্নী বিশেষ উদ্বিগ্ন হয়েছিলেন। এই ব্যাপার দেখে বৃদ্ধ ইংরেজটি তাঁর পত্নীকে রহস্য করে বলতেন: "আমি এখনই সন্ন্যাসী হয়ে বের হয়ে যাচ্ছি না, তোমার কোন ভয় নেই গো।" কিন্তু ইংরেজটি ও তাঁর পত্নী উভয়েই নরেন্দ্রনাথকে বিশেষ শ্রদ্ধাভক্তি করতেন, যীশুর মনে যীশুর বৈরাগ্যভাব এবং বাইবেলটি নরেন্দ্রনাথের কাছে নতুনভাবে বুঝতে লাগলেন। সম্ভবতঃ ইউরোপীয়ানদের কাছে নরেন্দ্রনাথের বেদান্ত প্রচার করা এই প্রথম।

শ্রদ্ধেয় ঈশানচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের পুত্র সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় গাজীপুরে আফিম ডিপার্টমেন্টে বড় চাকরি করতেন। সতীশচন্দ্র নরেন্দ্রনাথের বাল্যবন্ধু। সাক্ষাৎ হওয়াতে দুজনে বড় প্রীত হলেন। সতীশচন্দ্র ভাল পাখোয়াজ বাজিয়ে ছিলেন। দক্ষিণেশ্বরে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের কাছে নরেন্দ্রনাথ ধ্রুপদ গাইলে সতীশচন্দ্র পাখোয়াজ নিয়ে অনেক সময় সঙ্গত করতেন। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব সতীশচন্দ্রকে বেশ স্নেহ করতেন, কারণ ঈশানচন্দ্র মুখোপাধ্যায় শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের বিশেষ কৃপালাভ করেছিলেন। গাজীপুরে দুই পুরনো বন্ধু একত্রিত হওয়ায় ভজন ও সঙ্গীত খুব চলেছিল এবং বাল্যবন্ধু হলেও নরেন্দ্রনাথের প্রতি সতীশচন্দ্রের প্রগাঢ় শ্রদ্ধাভক্তি ছিল। [ক্রমশঃ]

# শিকাগো ধর্মমহাসভায় স্বামী বিবেকানন্দের ঐতিহাসিক ভাষণঃ সামাজিক তাৎপর্যসমূহ

সান্ত্বনা দাশগুপ্ত

[ পূর্বানুবৃত্তি ]

**পৌত্তলিকতা ও প্রতীক-উপাসনার যুক্তি**

হিন্দুধর্ম পৌত্তলিক—এই ধারণা পাদ্রীদের প্রচারের ফলে তখন পাশ্চাত্যে প্রায় সকলেরই ছিল। বিবেকানন্দ তাঁর আলোচনায় দেখালেন হিন্দুধর্ম পৌত্তলিক নয়, প্রতিমা প্রতীকমাত্র। স্বামীজী বললেনঃ "প্রতি দেবালয়ের পার্শ্বে দাঁড়িয়ে যে-কেউ শুনতে পাবে পূজক দেববিগ্রহে ঈশ্বরের সমুদয় গুণ, এমনকি সর্বব্যাপিত্ব পর্যন্ত আরোপ করছে। তাছাড়া শাস্ত্রমতে মূর্তি-পূজা প্রথমাবস্থা, কিঞ্চিৎ উন্নত হলে মানসিক প্রার্থনা পরবর্তী স্তর; কিন্তু ঈশ্বরসাক্ষাৎকারই উচ্চতম অবস্থা।"[৩৩] তিনি বললেনঃ "হিন্দুর সমগ্র ধর্মভাব অপরোক্ষানুভূতিতেই কেন্দ্রীভূত। ঈশ্বরকে উপলব্ধি করে মানুষকে দেবতা হতে হবে। মন্দির, প্রার্থনাগৃহ, দেব-বিগ্রহ বা ধর্মশাস্ত্র—সবই মানুষের ধর্মজীবনের প্রাথমিক অবলম্বন ও সহায়কমাত্র; তাকে ক্রমশঃ অগ্রসর হতে হবে।"[৩৪] বিবেকানন্দই প্রথম হিন্দুধর্মের সারসত্যকে বিশ্বের সম্মুখে এমন করে উন্মোচন করলেন।

তিনি আরও দেখালেন, বিগ্রহপূজা যে সকল হিন্দুরই অবশ্যকর্তব্য, তাও নয়। কিন্তু এর সাহায্য যদি কেউ নেয়, তাহলে তাতে অন্যায় কিছু নেই এবং যে-সাধক সে-অবস্থা অতিক্রম করে উচ্চতর অবস্থায় উপনীত হয়েছেন, তিনিও পূর্ববর্তী স্তরটিকে ভ্রান্ত বলতে পারবেন না। অসাধারণ ভাষায় তিনি বললেনঃ "হিন্দুর দৃষ্টিতে মানুষ ভ্রম থেকে সত্যে গমন করে না, পরন্তু সত্য থেকে সত্যে—নিম্নতর সত্য থেকে উচ্চতর সত্যে উপনীত হয়। অতএব, হিন্দুর নিকট নিম্নতম জড়োপাসনা থেকে বেদান্তের অদ্বৈতবাদ পর্যন্ত সাধনার অর্থ অসীমকে ধরার, উপলব্ধি করার জন্য মানবাত্মার বিবিধ চেষ্টা।... প্রত্যেকটি সাধনই ক্রমোন্নতির অবস্থা। প্রত্যেক মানবাত্মাই ঈগল পক্ষীর শাবকের মতো ক্রমশঃ উচ্চ থেকে উচ্চতর স্তরে উঠতে থাকে এবং ক্রমশঃ শক্তি সঞ্চয় করে শেষে সেই মহান সূর্যে উপনীত হয়।"[৩৫]

হিন্দুধর্মের শেষকথা 'অগ্রগতি', 'উপলব্ধি', 'হওয়া'। বিবেকানন্দ বললেনঃ "হিন্দুর পক্ষে সমগ্র ধর্মজগৎ নানারুচিবিশিষ্ট নরনারীর নানা অবস্থা ও পরিবেশের মধ্য দিয়ে সেই এক লক্ষ্যের দিকে অগ্রসর হওয়া ব্যতীত আর কিছু নয়।"[৩৬] এথেকেই তিনি বিশ্বজনীন ধর্মের মূলসূত্রটি পেলেন—"প্রত্যেক ধর্মই জড়ভাবাপন্ন মানুষের চৈতন্য-স্বরূপ দেবত্ব বিকশিত করে এবং সেই এক চৈতন্য-স্বরূপ ঈশ্বরই সকল ধর্মের প্রেরণাদাতা।"[৩৭]

এখানে প্রশ্ন ওঠে—হিন্দুধর্ম ঈশ্বরে বিশ্বাস করে, বৌদ্ধ ও জৈনধর্ম করে না; উভয়ের মধ্যে ঐক্য কোথায়? এসম্পর্কে বিবেকানন্দ বললেনঃ "বৌদ্ধ ও জৈনরা ঈশ্বরের ওপর নির্ভর করেন না বটে, কিন্তু সকল ধর্মের সেই মহান কেন্দ্রীয় তত্ত্ব—মানুষের ভিতর দেবত্ব বিকশিত করার দিকেই তাঁদের ধর্মের সকল শক্তি নিয়োজিত হয়।"[৩৮] স্বামীজীর মতে, সকল ধর্মের মূলকথা একই—মানুষের মধ্যে দেবত্বের বিকাশ ঘটানো।

এই শেষোক্ত সিদ্ধান্তটি সামাজিক দিক থেকে অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ; মনুষ্যত্বের পূর্ণ বিকাশের জন্যই সমাজ, আবার পূর্ণ বিকশিত মানুষদের দ্বারাই উত্তম সমাজ গঠিত হয়। কোন সমাজ

৩৩ দ্রঃ বাণী ও রচনা, ১ম খণ্ড, পৃঃ ২০
৩৪ ঐ, পৃঃ ২৪
৩৫ ঐ, পৃঃ ২৫
৩৬ ঐ, পৃঃ ২৬
৩৭ ঐ
৩৮ ঐ, পৃঃ ২৭

সেজন্য ধর্মকে বাদ দিয়ে চলতে পারে না। চললে সে-সমাজের ক্রমশঃ অধোগতি অবশ্যম্ভাবী। প্রতিষ্ঠ, বলিষ্ঠ, মেধাবী মানুষ, যারা সম্পূর্ণ নিঃস্বার্থ, যাদের লক্ষ্য—বুদ্ধ-কথিত 'বহুজনহিতায় বহুজন-সুখায়' এক সমাজব্যবস্থা, সেরকম মানুষ ব্যতীত সমাজ-সভ্যতার অগ্রগতি কখনই সম্ভব নয়।

## বিশ্বজনীন ধর্মের বৈশিষ্ট্য

একথা সুস্পষ্ট, বিবেকানন্দ তাঁর এই ভাষণে কোথাও বলেননি যে, হিন্দুধর্ম সব ধর্মের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ধর্ম। তিনি বরং বলেছেন ঃ "সকল সংস্কৃত দর্শনশাস্ত্রের মধ্যে এমন ভাব কেউ দেখাতে পারবে না যে, একমাত্র হিন্দুই মুক্তির অধিকারী, আর কেউ নয়। ব্যাস বলছেন, 'আমাদের জাতি ও ধর্মমতের সীমানার বাইরেও আমরা সিদ্ধপুরুষ দেখতে পাই'।"[৩৯] অতএব হিন্দুধর্মের কথা বলতে গিয়ে স্বামীজী এক বিশ্বজনীন ধর্মের কথাই বলেছেন। এই বিশ্বজনীন ধর্মের রূপরেখা ও লক্ষণসমূহ তিনি স্পষ্ট করে নির্দেশ করে বলেছেন ঃ "যদি কখনো একটি সর্বজনীন ধর্মের উদ্ভব হয়, তবে তা কখনো কোন দেশে বা কালে সীমাবদ্ধ হবে না; যে অসীম ভগবানের বিষয় ঐ ধর্মে প্রচারিত হবে, ঐ ধর্মকে তারই মতো অসীম হতে হবে, সেই ধর্মের সূর্য কৃষ্ণভক্ত, খ্রীস্টভক্ত, সাধু, অসাধু—সকলের ওপর সমভাবে স্বীয় কিরণজাল বিস্তার করবে; সেই ধর্ম শুদ্ধ ব্রাহ্মণ্য বা বৌদ্ধ, খ্রীস্টান বা মুসলমান হবে না, পরন্তু সকল ধর্মের সমষ্টি-স্বরূপ হবে, অথচ তাতে উন্নতির সীমাহীন অবকাশ থাকবে; স্বীয় উদারতাবশতঃ সেই ধর্ম অসংখ্য প্রসারিত হস্তে পৃথিবীর সকল নরনারীকে সাদরে আলিঙ্গন করবে, পশুতুল্য অতি হীন বর্বর মানুষ থেকে শুরু করে হৃদয় ও মস্তিষ্কের গুণরাশির জন্য যাঁরা সমগ্র মানবজাতির ঊর্ধ্বে স্থান পেয়েছেন, সমাজ যাঁদের সাধারণ মানুষ বলতে সাহস না করে সভ্রদ্ধ ভয়ে দণ্ডায়মান—সেই সকল শ্রেষ্ঠ মানব পর্যন্ত সকলকেই স্বীয় অঙ্কে স্থান দেবে। সেই ধর্মের নীতিতে কারও প্রতি বিদ্বেষ বা উৎপীড়নের স্থান থাকবে না; তাতে প্রত্যেক নরনারীর দেবস্বভাব স্বীকৃত হবে এবং তার সমগ্র শক্তি মনুষ্যজাতিকে দেবস্বভাব উপলব্ধি করতে সহায়তা করবার জন্যই সতত নিযুক্ত থাকবে।"[৪০]

## বিশ্বজনীন ধর্মভিত্তিক সমাজের বৈশিষ্ট্য

এখানে শেষোক্ত বাক্যে বিশ্বজনীন ধর্মের ভিত্তিতে যে রাষ্ট্র স্থাপিত হবে, তার বৈশিষ্ট্য উদ্ঘাটিত করা হয়েছে। তার মূল বৈশিষ্ট্য ঃ

১। সেই রাষ্ট্রে মানুষের অন্তর্নিহিত দেবত্ব স্বীকৃতি পাবে;

২। তার সমগ্র শক্তি মানুষের এই স্বরূপ উপলব্ধির সহায়তা করবার জন্য সতত নিযুক্ত থাকবে;

৩। সেখানে ধর্মীয় বিদ্বেষ বা উৎপীড়নের স্থান থাকবে না।

## বিশ্বজনীন ধর্মের প্রার্থনা

বিবেকানন্দ তাঁর এই প্রভূত আলোকপ্রদ ভাষণটি শেষ করেন তাঁর সদ্যসৃষ্ট বিশ্বজনীন ধর্মের উপ-যোগী একটি আশ্চর্য প্রার্থনা দিয়ে, যে-প্রার্থনাটিও ছিল সত্যের আলোকোদ্ভাসে উদ্ভাসিত। (উপস্থিত সকল শ্রোতাদের অন্তর সে-মুহূর্তে ঐ সত্যের উপলব্ধির স্পর্শে ভাস্বর হয়ে উঠেছিল।) প্রার্থনাটি হলো এই ঃ "যিনি হিন্দুর ব্রহ্ম, পারসীকদের অহুর-মজদা, বৌদ্ধদের বুদ্ধ, ইহুদীদের জিহোবা, খ্রীস্টানদের 'স্বর্গস্থ পিতা', তিনি তোমাদের মহৎ ভাব কার্যে পরিণত করবার শক্তি প্রদান করুন।" বিবেকানন্দের শেষকথাগুলি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সেগুলি হলো ঃ "পূর্ব গগনে নক্ষত্র উঠেছিল—কখনো উজ্জ্বল, কখনো অস্পষ্ট হয়ে ধীরে ধীরে তা পশ্চিম গগনের দিকে চলতে লাগল। ক্রমে সমগ্র জগৎ প্রদক্ষিণ করে পূর্বাপেক্ষা সহস্রগুণ উজ্জ্বল হয়ে পুনরায় পূর্ব গগনে স্যানপোর (ব্রহ্মপুত্র নদ) সীমান্তে তা উদিত হচ্ছে।"[৪১] যদিও বিবেকানন্দ একথাগুলি অন্য কারও সম্পর্কে বলেছিলেন, কিন্তু কথাকয়টি

৩৯ দ্রঃ বাণী ও রচনা, ১ম খণ্ড, পৃঃ ২৬

৪০ ঐ, পৃঃ ২৭

৪১ ঐ, পৃঃ ২৮

তাঁর সম্পর্কে এবং তাঁর গুরু শ্রীরামকৃষ্ণ সম্পর্কেও সমভাবে প্রযোজ্য।

### চতুর্থ বক্তৃতা : 'ধর্ম ভারতের অত্যাবশ্যকীয় প্রয়োজন নয়' অথবা 'খ্রীস্টানগণ ভারতের জন্য কি করতে পারেন'*

ধর্মমহাসভার মূল অধিবেশনে স্বামীজীর পরবর্তী ভাষণটিতে (২০ সেপ্টেম্বর, দশম দিবসে প্রদত্ত) সুস্পষ্ট ছিল দুজন খ্রীস্টধর্ম-প্রচারকের পঠিত প্রবন্ধের ওপর মন্তব্য। প্রবন্ধ দুটির বিষয়বস্তু ছিল যথাক্রমে 'খ্রীস্টের অনুসরণে পাপী মানুষের পুনর্বাসন' ('Restoration of the Sinful Man Through Christ') ও 'পিকিংয়ের ধর্ম''। প্রথম ভাষণটি ছিল সরাসরি বিবেকানন্দের 'হিন্দুধর্ম'' বিষয়ক ভাষণে 'অমৃতস্য পুত্রাঃ' বলে মানুষকে অভিহিত করার উত্তর। দ্বিতীয়টি ছিল চীনের প্রতিনিধির ভাষণের উত্তর। প্রত্যুত্তরে স্বামীজীর দেওয়া পূর্ণ ভাষণটি সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়েছিল। কিন্তু ব্যারোজ-সম্পাদিত ধর্মমহাসভার রিপোর্টে তা সম্পূর্ণ লিপিবদ্ধ করা হয়নি। ব্যারোজের গ্রন্থে যেটুকু লিপিবদ্ধ, 'Complete Works'-এ শুধু সেটুকুই উদ্ধৃত করা হয়েছে। মেরী লুইস বার্ক বাকি অংশ সংবাদপত্র থেকে উদ্ধার করে তাঁর গ্রন্থে সন্নিবেশিত করেছেন। আমরা মেরী লুইস বার্ক প্রদত্ত পূর্ণ ভাষণটির অনুলিপি এখানে অনুসরণ করব।

খ্রীস্টীয় ধর্মপ্রচারকদের উপরি-উল্লিখিত দ্বিতীয় প্রবন্ধটিতে মন্তব্য করা হয়েছিল—চীনের অধিবাসিগণ শত শত ডলার নোট আর ধূপ তাদের পূর্বপুরুষদের উদ্দেশে পুড়িয়ে নষ্ট করে, সে-অর্থ তারা অনায়াসে খ্রীস্টধর্মের জন্য সদ্ব্যয় করতে পারে। তীক্ষ্ণ উত্তরে স্বামী বিবেকানন্দ বললেন : "মিশনারীগণ চীনাদের খাদ্যের বিনিময়ে শত শত বছর ধরে অনুসৃত ধর্মবিশ্বাসকে পরিত্যাগ করে খ্রীস্টধর্ম গ্রহণ করতে না বলে তাদের ক্ষুধা মেটাবার ব্যবস্থা করলেই ভাল করতেন।"[৪২] এই প্রসঙ্গে তিনি তাঁর নিজ মাতৃভূমি ভারতের দরিদ্র নরনারীদের কথা বললেন, যাদের দারিদ্র্যমুক্তির উপায় সন্ধান করতেই প্রধানতঃ তাঁর আমেরিকায় আসা। তাদের কথা উল্লেখ করে তিনি বললেন : "হে আমার আমেরিকাবাসী ভ্রাতৃবৃন্দ, আপনারা হীদেনদের আত্মার পরিত্রাণের জন্য বিদেশে প্রচারক পাঠাতে এত ভালবাসেন, কিন্তু আমি আপনাদের প্রশ্ন করব, আপনারা ক্ষুধার করাল গ্রাস থেকে তাদের প্রাণ বাঁচানোর জন্য কি করেছেন? ভারতে ৩০ কোটি লোকের বাস, এদের গড়পড়তা মাসিক আয় ৩০ সেন্ট মাত্র। আমি স্বচক্ষে তাদের বছরের পর বছর বনাফুল খেয়ে প্রাণধারণ করতে দেখেছি। কোথাও দুর্ভিক্ষ দেখা দিলে হাজার হাজার লোক অনাহারে মরে। খ্রীস্টধর্ম-প্রচারকরা তাদের প্রাণ বাঁচাতে এগিয়ে এলেন, কিন্তু তাদের পিতৃপিতামহের ধর্ম-পরিত্যাগের বিনিময়ে! এ কি ন্যায়সঙ্গত?... ভারতের অভাব ধর্মের নয়, ভারতে প্রচুর ধর্ম আছে। কিন্তু প্রজ্বলন্ত ভারতের নিপীড়িত নরনারী শুষ্ককণ্ঠে রুটি চাইছে। আর আপনারা তাদের দিচ্ছেন পাথর।"[৪৩]

### দারিদ্র্য ও ক্ষুধা-নিবৃত্তির অগ্রাধিকার

স্বামী বিবেকানন্দ দারিদ্র্য ও ক্ষুধা-নিবৃত্তির দাবিকে অগ্রাধিকার দিয়েছিলেন। বলেছিলেন, ধর্ম তার পরে আসবে। তাঁর গুরু শ্রীরামকৃষ্ণের কথা—'খালি পেটে ধর্ম হয় না'। বিবেকানন্দ সেই কথাই এখানে পুনরাবৃত্তি করেছেন।

বিবেকানন্দ তাঁর এই ভাষণটির মধ্য দিয়ে একথাও উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা করেছেন যে, অনুন্নত দেশগুলির দারিদ্র্য-দূরীকরণে উন্নত দেশগুলির বিশেষ দায়িত্ব আছে। তিনি স্পষ্ট করে বলেছেন, কোন কোন দেশ উন্নত হবে আর অন্য

* 'Complete Works'-এ বক্তৃতাটির শিরোনামা—'Religion is not the Crying Need of India', কিন্তু 'বাণী ও রচনা'তে এর বঙ্গানুবাদ দেওয়া হয়েছে—'খ্রীস্টানগণ ভারতের জন্য কি করতে পারেন?' এটি বিষয়বস্তুর ভিত্তিতে করা হয়েছে।

৪২ Swami Vivekananda in the West : New Discoveries, Part I, p. 124 ৪৩ Ibid

দেশগুলি পিছিয়ে থাকবে—এরকম ব্যবস্থা চলতে দেওয়া সঙ্গত নয়। অন্যত্র একথাও তিনি বলেছেন যে, পাশ্চাত্য দেশগুলির উন্নতি এশিয়াবাসীদের শোষণের বিনিময়ে অর্জিত।[৪৪] সেজন্যই অনুন্নত প্রাচ্য দেশগুলির প্রতি পাশ্চাত্য দেশবাসীদের বিশেষ দায় থেকে যায়। অসহিষ্ণুতা, ধর্মান্ধতা ও শোষণের বিষয়ে বিবেকানন্দ অসহিষ্ণু ছিলেন। ধর্মান্ধতা ও অসহিষ্ণুতা সম্পর্কে এবং সাম্রাজ্যবাদ ও ধর্মপ্রচারকদের ধর্মের ছদ্মবেশে সাম্রাজ্যবাদকে সহায়তার ব্যাপারেও তাঁর ছিল বিরক্তি। সেজন্যই একক সংগ্রাম তিনি চালিয়েছেন এদের বিরুদ্ধে। মিশনারীদের বক্তৃতায় ভারতীয় ধর্মপ্রচারকদের প্রতি বিরূপ কটাক্ষের প্রতিবাদে স্বামীজী বলেছিলেন: "আমি সেই সন্ন্যাসীদের একজন, যাকে 'ভিক্ষুক' বলে বর্ণনা করা হয়েছে। এটাই আমার জীবনের গৌরব। এই হিসাবে আমি খ্রীস্টতুল্য বলে গর্বিত।... প্রাচ্যে অর্থের বিনিময়ে যেকোন বিষয়ে ধর্মশিক্ষাদান হেয় বলে পরিগণিত, আর পারিশ্রমিকের বিনিময়ে ঈশ্বরের নাম শেখানো এতই অধঃপতন বলে বিবেচিত যে, পুরোহিত তার জন্য জাতিচ্যুত হন এবং তার গায়ে সকলে নিষ্ঠীবন নিক্ষেপ করে।"[৪৫]

এখানে বিবেকানন্দ ধর্মপ্রচারকদের পক্ষে 'ত্যাগব্রত'কে একটি গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক মূল্যবোধ বলে বর্ণনা করেছেন। আজকের সমাজ-সংগঠকদের একথা স্মরণে রাখা একান্ত কর্তব্য।

**পরবর্তী ভাষণ: 'বৌদ্ধধর্ম হিন্দুধর্মের পূর্ণাঙ্গ রূপ' ('বৌদ্ধধর্মের সঙ্গে হিন্দুধর্মের সম্বন্ধ')***

২৬ সেপ্টেম্বর ধর্মমহাসভার ষোড়শ দিবসে বৌদ্ধধর্ম সম্বন্ধে নির্ধারিত আলোচনার শেষে বিশিষ্ট বৌদ্ধ প্রতিনিধি সিংহলের অনাগারিক ধর্মপাল স্বামী বিবেকানন্দকে বৌদ্ধধর্ম বিষয়ে আলোচনা করার জন্য আহ্বান জানান। স্বামীজী সেই আহ্বানে সাড়া দিয়ে ভগবান বুদ্ধের প্রতি তাঁর অন্তরের সুগভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করে বলেন: "চীন, জাপান ও সিংহল সেই মহান গুরু বুদ্ধের উপদেশ অনুসরণ করে, কিন্তু ভারত তাঁকে ঈশ্বরাবতার বলে পূজা করে।... যাঁকে আমি ঈশ্বরাবতার বলে পূজা করি, তাঁর বিরুদ্ধ সমালোচনা করা আমার অভিপ্রায়ই নয়।"[৪৬] তাঁর মতে, শাক্যমুনি নতুন কিছু প্রচার করতে আসেননি; যীশুর মতো তিনিও পূর্ণ করতে এসেছিলেন, ধ্বংস করতে আসেননি। স্বামীজী বললেন: "বুদ্ধ ছিলেন হিন্দুধর্মের স্বাভাবিক পরিণতি ও যুক্তিসঙ্গত সিদ্ধান্ত ও ন্যায়সম্মত বিকাশ।"[৪৭] এই প্রসঙ্গে তিনি আরও উল্লেখ করেন, যেকোন বর্ণের মানুষ হিন্দুধর্মে সন্ন্যাসী হতে পারেন; কারণ, ধর্মে জাতিভেদ নেই, জাতিভেদ কেবলমাত্র একটি সামাজিক ব্যবস্থা। তিনি আরও বললেন: "শাক্যমুনি স্বয়ং সন্ন্যাসী ছিলেন এবং তাঁর হৃদয় এত উদার ছিল যে, লুকানো বেদের মধ্য থেকে সত্যকে বার করে তিনি সেগুলি সমগ্র পৃথিবীর লোকের মধ্যে ছড়িয়ে দিলেন—এটাই তাঁর গৌরব। পৃথিবীতে ধর্মপ্রচারের তিনিই প্রথম প্রবর্তক।"[৪৮]

বুদ্ধের অপর একটি গৌরবের কথাও বিবেকানন্দ উল্লেখ করেছিলেন। তা হলো: সকলের প্রতি—বিশেষতঃ অজ্ঞান ও দরিদ্রগণের প্রতি অদ্ভুত সহানুভূতি। এইজন্য তিনি তাঁর উপদেশাবলী সংস্কৃতভাষায় ব্যক্ত করতে অস্বীকার করেছিলেন, কারণ, সংস্কৃত তখন সাধারণ মানুষের কথ্যভাষা ছিল না। তিনি অপার করুণার সঙ্গে বলেছিলেন: "আমি দরিদ্রের জন্য, জনসাধারণের জন্য এসেছি। আমি জনসাধারণের ভাষাতেই কথা বলব।"[৪৯]

[ক্রমশঃ]

৪৪ দ্রঃ Swami Vivekananda in the West ; New Discoveries, p. 112　৪৫ Ibid, p. 125

* ভাষণটির ইংরেজী শিরোনাম ('Complete Works' অনুযায়ী) 'Buddhism the Fulfilment of Hinduism', কিন্তু 'বাণী ও রচনা'য় এর শিরোনামা দেওয়া হয়েছে—'বৌদ্ধধর্মের সহিত হিন্দুধর্মের সম্পর্ক'।

৪৬ দ্রঃ বাণী ও রচনা, ১ম খণ্ড, পৃঃ ৩১　৪৭ ঐ　৪৮ ঐ　৪৯ ঐ

শ্রীমদ্বিদ্যারণ্যবিরচিতঃ

# জীবন্মুক্তিবিবেকঃ

## বঙ্গানুবাদ : স্বামী অলোকানন্দ

[ পূর্বানুবৃত্তি ]

স্মৃতাবপ্যয়মর্থ উপলভ্যতে—

যস্য নাহংকৃতো ভাবো বুদ্ধির্যস্য ন লিপ্যতে।
হত্বাঽপি স ইমাল্লোকান্ ন হন্তি ন নিবধ্যতে॥ ইতি
( শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা, ১৮।১৭ )

### অন্বয়

স্মৃতৌ অপি ( স্মৃতিতেও ), অয়ম্ অর্থঃ ( এই অর্থ ), উপলভ্যতে ( উপলব্ধ হয় )—

যস্য ( যাঁর ), ভাবঃ ( ভাব ), ন অহংকৃতঃ ( অহংকৃত নয় ), যস্য ( যাঁর ), বুদ্ধিঃ ( বুদ্ধি ), ন লিপ্যতে ( লিপ্ত হয় না ), সঃ ( তিনি ), ইমান্ লোকান্ ( এই লোকসকলকে ), হত্বা অপি ( হত্যা করেও ), ন হন্তি ( হত্যাকারী হন না ), ন নিবধ্যতে ( হত্যাজনিত কর্মদ্বারা বদ্ধও হন না )।

### বঙ্গানুবাদ

স্মৃতিতেও এই অর্থ উপলব্ধ হয়—

যাঁর অহংকার অর্থাৎ 'আমি কর্তা'—এই ভাব নেই, যাঁর বুদ্ধি কর্মফলে লিপ্ত হয় না তিনি এই লোকসকলকে হত্যা করেও হত্যাকারী হন না এবং হত্যাজনিত কর্মফলে বদ্ধও হন না।

যস্য ব্রহ্মবিদো ভাবঃ সত্তা স্বভাব আত্মা নাহংকৃতোঽহংকারেণ তাদাত্ম্যাধ্যাসাদন্তর্নাচ্ছাদিতঃ। বুদ্ধির্লেপঃ সংশয়ঃ। তদভাবে ত্রৈলোক্যবধেনাপি ন বধ্যতে, কিমুতান্যেন কর্মণেত্যর্থঃ।

### অন্বয়

যস্য ( যাঁর ) ব্রহ্মবিদঃ ( ব্রহ্মবিদের ), ভাবঃ ( ভাব ), সত্তা-স্বভাব-আত্মা ( সৎস্বরূপ-আত্মা ), ন অহঙ্কৃতঃ ( অহঙ্কৃত নয় ), অহংকারেণ ( অহংকার দ্বারা ), অন্তঃ ( অন্তঃকরণ ), তাদাত্ম্য-অধ্যাসাৎ ( তাদাত্ম্যাধ্যাসবশে ), ন আচ্ছাদিতঃ ( আবৃত নয় ), বুদ্ধিলেপঃ সংশয়ঃ ( বুদ্ধি সংশয়রূপ লেপরহিত ), তদভাবে ( তার অভাব হলে ), ত্রৈলোক্য-বধেন-অপি ( ত্রিলোকের সকল কিছু বধ করলেও ), ন বধ্যতে ( বদ্ধ হন না ), অন্যেন কর্মণা ( অপর সাধারণ কর্মদ্বারা ), কিম্ উত ( কি হতে পারে )।

### বঙ্গানুবাদ

যাঁর অর্থাৎ ব্রহ্মবিদের, ভাব অর্থাৎ সত্তার স্বভাব অর্থাৎ আত্মা অহংকৃত নয় অর্থাৎ অহংকার দ্বারা অন্তঃকরণ তাদাত্ম্যাধ্যাসবশে আবৃত নয় অর্থাৎ 'আমি কর্তা'—এই ভাব নেই, তাঁর বুদ্ধি সর্ববিধ সংশয়রহিত। এরূপ ব্যক্তি ত্রিলোকের সকলকে বধ করলেও নিজে বদ্ধ হন না, অপর সাধারণ কর্মের দ্বারা যে তিনি বন্ধন প্রাপ্ত হন না এবিষয়ে আর বলার কি আছে ?

### বিবৃতি

কর্মে অনাসক্তিই কর্মযোগের মূল রহস্য। জগতে কেউ কর্মহীন থাকে না। গীতায় শ্রীভগবান বলছেন : "ন হি কশ্চিৎ ক্ষণমপি জাতু তিষ্ঠত্যকর্মকৃৎ", অর্থাৎ কেউই ক্ষণকালও কর্মব্যতীত থাকতে পারে না। কিন্তু সাধারণ ব্যক্তি ও জ্ঞানী ব্যক্তির কর্মের মধ্যে পার্থক্য কেবল এই যে, সাধারণ লোকে ফলে আসক্ত হয়ে কর্মানুষ্ঠান করে ও বদ্ধ হয়। আর জ্ঞানী অনাসক্তভাবে কর্মানুষ্ঠান করে জীবন্মুক্তির সুখ আস্বাদন করেন। যেহেতু তিনি শরীর, মন, বুদ্ধি, ইন্দ্রিয়াদির ঊর্ধ্বে বিচরণ করেন তাই কোন কর্মই তাঁর ওপর প্রভাব বিস্তার করতে পারে না। কর্মে অহংতা ও মমতাই বন্ধনের কারণ, জ্ঞানী তদূর্ধ্বে অবস্থান করেন। অবশ্য তিনি সকলকে বধ করেও বদ্ধ হন না—একথাগুলি জ্ঞানীর ওপর কোনরূপ ব্যভিচার আরোপের প্রচেষ্টা নয়, প্রশংসা-মাত্র। বস্তুতঃ জ্ঞানী ব্যক্তির বেচালে পা পড়ে না। সমস্ত জগতের নিন্দা-স্তুতিকে তিনি সমজ্ঞান করেন।

নন্বেবং সতি বিবিদিষাসন্ন্যাসফলেন তত্ত্বজ্ঞানেনৈবাগামিজন্মনো বারিতত্বাদ্বর্তমানজন্মশেষস্য ভোগমন্তরেণ বিনাশয়িতুমশক্যত্বাৎ কিমনেন বিদ্বৎসন্ন্যাসপ্রয়াসেনেতি চেৎ।

**অন্বয়**

মনু ( আচ্ছা ), এবম্ সতি ( এমন যদি হয় ), বিবিদিষাসন্ন্যাসফলেন ( বিবিদিষাসন্ন্যাসের ফল ), তত্ত্বজ্ঞানেন ( ব্রহ্মজ্ঞান দ্বারা ), আগামিজন্মনঃ ( ভবিষ্যৎ জন্মের ), বারিতত্বাৎ ( নিষেধহেতু ), বর্তমানজন্মশেষস্য ( বর্তমান জন্মের অবশিষ্ট কর্মের ), ভোগমন্তরেণ ( ভোগ ব্যতীত ), বিনাশয়িতুম্ ( বিনাশের ), অশক্যত্বাৎ ( অসামর্থ্য হেতু ), অনেন বিদ্বৎসন্ন্যাসপ্রয়াসেন ( এই বিদ্বৎ-সন্ন্যাস-প্রচেষ্টার ), কিম্ ( প্রয়োজন কি ), ইতি চেৎ ( [ প্রতিপক্ষ ] এমন আশঙ্কা করলে )।

(শঙ্কা) আচ্ছা, বিবিদিষাসন্ন্যাসের ফল ব্রহ্মজ্ঞান-দ্বারা যদি ভবিষ্যৎ জন্মের নিরোধ ঘটে, বর্তমান জন্মের অবশিষ্ট কর্ম যদি ভোগ ব্যতীত বিনাশের কোন উপায় না থাকে তাহলে (অশেষ আয়াসসাধ্য) এই বিদ্বৎসন্ন্যাসের প্রচেষ্টার কি প্রয়োজন ?

মৈবম্। বিদ্বৎসন্ন্যাসস্য জীবন্মুক্তিহেতুত্বাৎ, তস্মাদ্বেদনায় যথা বিবিদিষাসন্ন্যাস এবম জীবন্মুক্তয়ে বিদ্বৎসন্ন্যাসঃ সম্পাদনীয়ঃ। ইতি বিদ্বৎসন্ন্যাসঃ।

এবম্ মা ( এমন নয় )। বিদ্বৎসন্ন্যাসস্য ( বিদ্বৎসন্ন্যাসের), জীবন্মুক্তিহেতুত্বাৎ ( জীবন্মুক্তি-ফলহেতু ), তস্মাৎ ( সেজন্য ), যথা ( যেমন ), বিবিদিষাসন্ন্যাসঃ ( বিবিদিষাসন্ন্যাস ), বেদনায় ( জ্ঞানপ্রাপ্তির নিমিত্ত ), এবম্ (এমন), জীবন্মুক্তয়ে ( জীবন্মুক্তির জন্য ), বিদ্বৎসন্ন্যাসঃ (বিদ্বৎসন্ন্যাস), সম্পাদনীয়ঃ ( সম্পাদন কর্তব্য )।

**বঙ্গানুবাদ**

( সমাধান ) এমন নয়। কারণ বিদ্বৎসন্ন্যাস জীবন্মুক্তিফলদায়ী। যেমন বিবিদিষাসন্ন্যাস জ্ঞানপ্রাপ্তির জন্য অনুষ্ঠেয় সেরকম জীবন্মুক্তি-লাভের জন্য বিদ্বৎসন্ন্যাস সম্পাদন কর্তব্য।

**বিবৃতি**

এই গ্রন্থের আদিতে বিবিদিষা ও বিদ্বৎ-সন্ন্যাস ভেদে দুই প্রকার সন্ন্যাসের কথা বলা হয়েছিল। বিবিদিষাসন্ন্যাস বিদেহমুক্তির ও বিদ্বৎসন্ন্যাস জীবন্মুক্তির হেতু বলা হয়েছে। সেই তত্ত্ব বোঝানোর উদ্দেশ্যে এপর্যন্ত দুই প্রকার সন্ন্যাসপ্রকরণের বিস্তৃত আলোচনার উপসংহারে প্রতিপক্ষের শঙ্কা নিরসনের জন্য এই সমাধানবাক্যে পুনর্বার এই দুই সন্ন্যাসের ফল সম্পর্কে জানানো হয়েছে। বিবিদিষাসন্ন্যাস জ্ঞানপ্রাপ্তির জন্য যেমন অবশ্য অনুষ্ঠেয়, সেরকম জীবন্মুক্তিলাভের জন্য বিদ্বৎ-সন্ন্যাসের সম্পাদন আবশ্যক।

ইতি বিদ্বৎসন্ন্যাস। [ ক্রমশঃ ]

নিবন্ধ

# বাঙলা বর্ষ-গণনা প্রসঙ্গে

## সুখময় সরকার

বাঙলার ১৪০০ সাল শুরু হলো, কিন্তু দূরদর্শন, আকাশবাণী এবং বহু সংবাদপত্রে ঢাক-ঢোল পিটিয়ে বলা হচ্ছে, একটা নতুন শতাব্দী শুরু হয়ে গেল। কোন্ শতাব্দী? পঞ্চদশ শতাব্দী তো শুরু হবে একবছর পরে ১৪০১ সালের ১লা বৈশাখ থেকে। তাহলে বলতে পারি, বাঙলার চতুর্দশ শতাব্দীর শেষের বছরটি শুরু হলো। প্রথমেই এই ভ্রমটার নিরসন হওয়া প্রয়োজন। নচেৎ এক বছর আগেই একটা শতাব্দীকে বিদায় দেওয়া হচ্ছে।

যাক সেকথা। বাঙলায় বর্ষ-গণনার উৎপত্তি নিয়ে একটি বিভ্রান্তি আছে। ছেলেবেলায় ইতিহাসে পড়েছিলাম, মোগল সম্রাট আকবর হিজরী সনকে রাজস্ব আদায়ের সুবিধার জন্য বাঙলা সনে রূপান্তরিত করেন। এর কারণস্বরূপ বলা হয় যে, হিজরী সন চান্দ্রগণনা অর্থাৎ ৩৫৪ দিনে বছর, কিন্তু রাজস্ব আদায়ের জন্য একটা সৌর বছর (৩৬৫ দিন) প্রচলনের প্রয়োজন ছিল। ফসল ওঠার পর সাধারণতঃ চৈত্র মাসে খাজনা আদায় করা হতো। তাই আকবরের নির্দেশে তাঁর রাজস্ব-মন্ত্রী টোডরমল 'ফসলী' নামে একটি বর্ষ-গণনার প্রবর্তন করেন। এই 'ফসলী' সনই পরবর্তী কালে 'বঙ্গাব্দ'-গণনায় রূপান্তরিত হয়েছে।

কিন্তু বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে এই সিদ্ধান্ত ভ্রমাত্মক বলে আমার মনে হয়েছে। আমার জন্ম বাঁকুড়া জেলায়। বাঁকুড়ায় বহু প্রত্নবস্তু আছে। সেগুলি বিশ্লেষণ করলে এদের প্রাচীনতা এবং আমাদের সভ্যতার বয়স নির্ণয় করা যায়। বাঁকুড়া শহর থেকে ৭/৮ মাইল দূরে রয়েছে 'সোনাতাপন'-এর মন্দির। বর্তমানে ভগ্নদশা। মন্দিরটি যে একসময় সূর্যদেবতার মন্দির ছিল তাতে সন্দেহ নেই এবং 'স্বর্ণতপন' থেকে 'সোনাতাপন' কথাটির উদ্ভব হয়েছে; তাতেও সন্দেহের অবকাশ নেই। প্রত্নতাত্ত্বিক পণ্ডিতগণ এবিষয়ে একমত যে, 'সোনা-তাপন'-এর মন্দির প্রায় হাজার বছরের পুরনো। অথচ এই মন্দিরের একটি লিখনে বঙ্গাব্দের উল্লেখ রয়েছে। সম্রাট আকবর খ্রীস্টীয় ষোড়শ শতাব্দীতে জীবিত ছিলেন। সুতরাং তাঁর পক্ষে বঙ্গাব্দ-গণনার প্রবর্তন কেমন করে সম্ভবপর?

আরও আছে। বাঁকুড়া জেলার ডিহরগ্রামে যে জোড়া শিবমন্দির আছে তাতেও বঙ্গাব্দের উল্লেখ দেখা যায়। পণ্ডিতদের মতে 'শিব-হর' শব্দ থেকে 'ডিহর' শব্দটি এসেছে, কারণ এখানে দুটি শিবলিঙ্গ আছে এবং ডিহরের এই ভগ্ন মন্দির দুটি অন্ততঃ আটশো বছরের পুরনো।

তাহলে সম্রাট আকবরকে কেমন করে বঙ্গাব্দ-গণনার প্রবর্তক বলে মনে করি?

১৪০০ বছর আগে অর্থাৎ ৫৯৩ খ্রীস্টাব্দে বঙ্গাব্দ-গণনার সূত্রপাত হয়। সেসময় এমন কোন ঐতিহাসিক ঘটনা ঘটেছিল কি, যাকে স্মরণীয় করে রাখার জন্য একটি অব্দ-গণনার প্রবর্তন হয়েছিল? ঐতিহাসিকরা বলছেন, বাংলার দোর্দণ্ডপ্রতাপ নরপতি শশাঙ্কের অভিষেক হয় আনুমানিক ৬০৬ খ্রীস্টাব্দে। 'আনুমানিক' কথাটা মনে রাখতে হবে। ওটা তেরো বছর আগেও তো হতে পারে, অর্থাৎ ৫৯৩ খ্রীস্টাব্দে রাজা শশাঙ্কের রাজ্যাভিষেক হয়েছিল এবং কর্ণসুবর্ণ ছিল তাঁর রাজধানী; অতএব রাজা শশাঙ্কের পক্ষে ৫৯৩ খ্রীস্টাব্দে বঙ্গাব্দ-গণনার প্রবর্তন করা অসম্ভব ছিল না।

১৯৭৭ খ্রীস্টাব্দে আমার একটি গবেষণাপত্র ('Antiquity of Hindu Civilization: An Astronomical Assessment') কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে জমা দিয়েছিলেন তৎকালীন

জ্যোতির্গণিতের অধ্যাপক ডঃ নির্মলচন্দ্র লাহিড়ী। কিন্তু ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার আমার গবেষণাপত্রে উল্লিখিত আলোচনার পাশে লিখে দেন—"I don't agree"। সুতরাং বিশ্ববিদ্যালয় আমার গবেষণাপত্রটি গ্রহণ করেননি। পরে ১৯৭৯ খ্রীস্টাব্দে বারাণসী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয় আমাকে এই গবেষণাপত্রের জন্যই Ph. D. ডিগ্রী দিয়ে সম্মানিত করেন। আমি শ্রদ্ধেয় রমেশচন্দ্র মজুমদারকে একটি পত্রে লিখেছিলাম: "আকবর ছিলেন ভারতসম্রাট; তিনি সর্বভারতীয় অব্দ-গণনার প্রচলন না করে নিতান্ত একটি আঞ্চলিক অব্দ-গণনার প্রচলন করতে যাবেন কেন? বিশেষতঃ বাংলাদেশে মোগল আধিপত্য তেমন উল্লেখযোগ্য ছিল না। তাছাড়া ১লা বৈশাখে কেন বাঙলার বর্ষ-গণনা আরম্ভ হয়, তার সন্তোষজনক উত্তর এপর্যন্ত কেউ দিতে পারেননি।" ডঃ মজুমদার উত্তরে আমাকে শুধু লিখেছিলেন: "তুমি কলকাতায় এলে এবিষয়ে আলোচনা করা যাবে।" কিন্তু দুঃখের বিষয়, অল্পকাল পরেই তিনি পরলোকগমন করেন। সুতরাং এবিষয়ে তাঁর সঙ্গে আর আলোচনার সুযোগ হয়নি।

গুপ্তযুগের সর্বশ্রেষ্ঠ জ্যোতির্বিদ বরাহমিহির তাঁর বিখ্যাত জ্যোতির্গ্রন্থ 'বৃহৎ-সংহিতা'য় স্পষ্টভাবে লিখেছেন যে, ২৪১ শকাব্দে (৩১৯ খ্রীস্টাব্দে) চৈত্র সংক্রান্তিতে মহাবিষুব-দিন হয়েছিল এবং পরদিন ১লা বৈশাখ থেকে গুপ্তাব্দ-গণনার সূত্রপাত হয়। অবশ্য ৩১৯ খ্রীস্টাব্দে প্রথম চন্দ্রগুপ্তের রাজ্যাভিষেক হয়েছিল; কিন্তু সেটা কাকতলীয় ঘটনা, কারণ প্রাচীনকালে বর্ষ-গণনার সঙ্গে রাজনৈতিক ঘটনার কোন সম্পর্ক থাকত না। কাল-গণনার ভার থাকত জ্যোতিষীদের ওপর এবং তাঁরা জ্যোতিষীর যোগ অনুসারে বর্ষ-গণনা শুরু করতেন। ৩১৯ খ্রীস্টাব্দে চৈত্র সংক্রান্তিতে মহাবিষুব-দিন হয়েছিল বলেই পরদিন ১লা বৈশাখ নববর্ষ গণনা আরম্ভ হয়। গুপ্তযুগে শিবপূজার প্রচলন খুব বেশি ছিল। সেযুগের শ্রেষ্ঠ কবি কালিদাস স্বয়ং শিবভক্ত ছিলেন, তার প্রমাণ পাওয়া যায় তাঁর রচিত প্রত্যেকটি কাব্য ও নাটকে। আমার নিশ্চিত সিদ্ধান্ত, ৩১৯ খ্রীস্টাব্দে চৈত্রসংক্রান্তিতে শিবের উপাসনা করে পরদিন নববর্ষ গণনা আরম্ভ হয় বলে আমরা বাঙলা নববর্ষের প্রাক্কালে 'শিবের গাজন' উৎসব করে থাকি। একটা বিশেষ দিনে অব্দ-গণনার প্রচলন হলেও সেটা বেশ কয়েক শতাব্দী ধরে চালু থেকে যায়। ৩১৯ খ্রীস্টাব্দে ১লা বৈশাখ যে গুপ্তাব্দ গণনার প্রচলন হয়েছিল সেটি বাংলাদেশেও চালু হয়ে যায়; কারণ বাংলাদেশে কুমারগুপ্ত এবং স্কন্দগুপ্তের শাসন প্রসারিত ছিল। তাছাড়া গুপ্ত বংশের প্রতিষ্ঠাতা ঘটোৎকচ এবং শ্রীগুপ্ত যে বাঙালী ছিলেন, সেবিষয়ে ঐতিহাসিকরা সকলেই একমত। সুতরাং আমরা এই সিদ্ধান্তে আসতে পারি যে, ৫৯৩ খ্রীস্টাব্দে মহারাজ শশাঙ্কের শাসনকালে যে বঙ্গাব্দ-গণনার প্রবর্তন হয় তাতে গুপ্তাব্দ-গণনার '১লা বৈশাখ' গৃহীত হয়েছে।

এখন চৈত্র সংক্রান্তিতে মহাবিষুব-দিন হয় না; এখন হয় ৭ই চৈত্র। কেন এমন হয়? জ্যোতির্বিজ্ঞানে অয়ন-চলন বা বিষুব-চলন (Precession of the Equinoxes) বলে একটা ব্যাপার আছে। ২১৬০ বছরে অয়ন-দিন বা বিষুব-দিন একমাস করে পশ্চাদ্‌গত হয়। ১৬৭৪ বছরে বিষুব-দিন ২৩ দিন পিছিয়ে এসেছে। এই জন্যই এখন ৭ই চৈত্র মহাবিষুব-দিন হয়। কিন্তু পুরনো প্রথার অনুসরণ আজও অব্যাহত আছে।

এপ্রসঙ্গে আর একটি বিষয় আলোচ্য। ভারত সরকার সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে যে শকাব্দ-গণনার প্রবর্তন করেছেন তাতে ৮ই চৈত্রকে ১লা চৈত্র ধরে বর্ষ-গণনা আরম্ভ হয়। কিন্তু এতে সাধারণ মানুষ একটা অসুবিধা বোধ করে। তাছাড়া চৈত্রাদি মাস গণনা নাক্ষত্র। আর চন্দ্রের সঙ্গে নক্ষত্রের সম্পর্ক। অপর পক্ষে সৌরগণনায় রাশিনামের ব্যবহারই বৈজ্ঞানিক রীতি। অতএব মীন, মেষ, বৃষ ইত্যাদি রাশিনাম দিয়ে শকাব্দ-গণনা উল্লেখ করলে সেটা যেমন একদিক থেকে বিজ্ঞানসম্মত হয়, তেমনি অপরদিক থেকে লোকব্যবহারে সুবিধা হয়। যেমন শকাব্দের ১লা মীন=বঙ্গাব্দের ৮ই চৈত্র=খ্রীস্টাব্দের ২১শে মার্চ। ☐

'প্রাসঙ্গিকী' বিভাগে প্রকাশিত মতামত একান্তভাবেই পত্রলেখক-লেখিকাদের।—সম্পাদক, উদ্বোধন

## পুণ্যস্মৃতি

চন্দ্রমোহন দত্ত মহাশয়ের ধারাবাহিক (চৈত্র ১৩৯৯—আষাঢ় ১৪০০) 'পুণ্যস্মৃতি' প্রবন্ধটি আমার খুবই ভাল লেগেছে। প্রসঙ্গতঃ বলি, দিনটি ছিল শনিবার—পাঠচক্রের দিন। পরের দিন রবিবার পাঠচক্রের কয়েকজন সদস্য-সদস্যা কাশীপুরে দীক্ষা নিতে যাবেন। তাঁদের এগিয়ে দিয়ে পাঠচক্রে এসে বসলাম। বিশেষ একটি কারণে মনটা খুবই খারাপ ছিল। সেদিন পাঠচক্রে উপস্থিতি ছিল খুবই কম। হঠাৎই একজন 'উদ্বোধন' পত্রিকার একটি সংখ্যা নিয়ে পড়তে লাগলেন। তিনি পড়লেন চন্দ্রমোহন দত্তের 'পুণ্যস্মৃতি' রচনাটি। বড় ভাল লাগল; আমার মনের বিষণ্ণতা দূর হয়ে গেল। কিন্তু সেটিই 'পুণ্যস্মৃতি'র প্রথম অংশ ছিল না। সেদিন শোনার পর থেকে 'পুণ্যস্মৃতি' প্রবন্ধটি পড়ার এতই আগ্রহ বেড়ে গেল যে, প্রত্যেকটি সংখ্যা সংগ্রহ করে পড়ে শেষ করলাম।

এই স্মৃতিকথার মধ্যে শ্রীমায়ের অহেতুক করুণার একটি অপরূপ আলেখ্য পাই। মায়ের পদপ্রান্তে এসে একজন সাধারণ মানুষ কিভাবে মহান হতে পারে তার কাহিনী এখানে পাই। বিভিন্ন ঘটনায় মা বুঝিয়ে দিয়েছেন, সঙ্ঘের কাজই হলো ঠাকুরের কাজ। যে-কেউ 'পুণ্যস্মৃতি'র একটি অংশ পড়লে অপর অংশ পড়ার জন্য আকৃষ্ট ও অনুপ্রাণিত হবেনই, প্রভূত আধ্যাত্মিক আনন্দও পাবেন। আমি 'উদ্বোধন' মাঝে মাঝে পড়তাম, কিন্তু 'পুণ্যস্মৃতি' পড়ার পর 'উদ্বোধন' আমাকে আরও আকৃষ্ট করল। এখন 'উদ্বোধন'-এর প্রতি সংখ্যা পড়ার জন্য ব্যাকুল হয়ে থাকি।

**নব মাজী**

প্রযত্নে বলাইচক রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ সেবাশ্রম

বলাইচক, খানাকুল

হুগলী-৭১২৪১৬

## কলকাতায় ধর্মসম্মেলন

গত সেপ্টেম্বরে নেতাজী ইন্ডোর স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত চারদিনব্যাপী ঐতিহাসিক ধর্মসম্মেলনের প্রতিদিনই আমার উপস্থিত থাকার সৌভাগ্য হয়েছিল। প্রতিদিনের আলোচনা শুনে আমার এত ভাল লেগেছে যে, তা প্রকাশ না করে তৃপ্তি হচ্ছে না। সেই সুবিশাল এবং অভাবনীয়ভাবে সংযত জনসমাবেশ মনকে সহজেই উদ্দীপিত করে। যাঁরা ভাষণ দান করেছেন, যেমন সন্ন্যাসিবৃন্দ, বিদগ্ধ বিদ্বৎমণ্ডলী ও বিদেশী অতিথিবর্গ, প্রায় সকলেই সুবক্তা। বিশেষতঃ, প্রথম দুই স্তরের বক্তাদের মধ্যে অনেকেরই ভাষণ অত্যন্ত সুচিন্তিত। তাঁদের বক্তব্য বিষয়ে গভীর জ্ঞান মনকে নাড়া দিয়ে যায়। বিদেশী বক্তাদের ঐকান্তিক শ্রদ্ধা, আন্তরিকতা ও উৎসাহ আমাদের চমৎকৃত করেছে, অভিভূত করেছে। স্বামীজীর নিজের জন্মভূমিতে এসে তাঁর সম্বন্ধে কিছু বলতে পারায় তাঁদের কৃতজ্ঞতাবোধ ও আনন্দ যেন শতধারে প্রকাশিত হয়েছে।

একথা একটুও বাড়িয়ে বলছি না যে, শ্রীশ্রীঠাকুর-স্বামীজীর ভাবধারায় দিব্য আধ্যাত্মিক পরিমণ্ডলে আমরা ঐ কয়দিন ডুবেছিলাম। শেষদিনে প্রতিমা নিরঞ্জনের পর বিজয়া দশমীর শূন্যতা অনুভব করেছি।

পরিশেষে, একথা বলতেই হয় যে, চারদিন ধরে সভা ও অনুষ্ঠানগুলি এত সুষ্ঠু ও শৃঙ্খলার সঙ্গে পরিচালিত হয়েছে যা সকল সংগঠনের কাছে এক উজ্জ্বল আদর্শ হয়ে থাকবে।

**প্রব্রাজিকা প্রবুদ্ধমাতা**

শ্রীরামকৃষ্ণ সারদা সঙ্ঘ

কলকাতা-৭০০০৩৭

পরমপদকমলে

# স্বামীজীর ভারত-পরিভ্রমণের প্রেক্ষাপট

## সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়

[ পূর্বানুবৃত্তি : চৈত্র ১৩৯৯ সংখ্যার পর ]

স্বামীজী ছিলেন দর্শনের ছাত্র। শিক্ষাক্রমে সংস্কৃত ছিল। তিনি কখনোই কোনকিছুকে যথেষ্ট ভাবতে পারতেন না, আরও আরও—এই ছিল তাঁর ধর্ম। গুরুর মানসিকতার সঙ্গে সেই কারণেই তাঁর মানসিকতার অঙ্গাঙ্গী মিলন হয়েছিল। গুরু বলতেন, এগিয়ে যাও। চন্দনের বন, তামার খনি, রুপোর খনি. সোনা, হীরে। জ্ঞান, বোধ, অনুভূতির অরণ্যে এগিয়ে যাও। 'Stagnation is death.' ভারত-পর্যটনকালে সেই কারণেই খেতড়িতে পণ্ডিত নারায়ণদাসের কাছে পতঞ্জলিকৃত পাণিনিসূত্রের মহাভাষ্য শিক্ষা করলেন।

গ্রন্থ, গুরু, স্বদেশ—এই তিন মাধ্যম থেকে শিখতে চেয়েছিলেন স্বামীজী। সমস্যাটা কী না জানলে সমাধান অসম্ভব। 'ড্রয়িংরুম রিফর্মার' অনেক ছিলেন, অনেক আছেন। 'কসমেটিক ট্রিটমেন্ট'-এ ভারত-সমস্যার সমাধান হবে না। ঈশ্বরের জন্যে নয়, তিনি সন্ন্যাসী হয়েছিলেন ভারতের নরনারায়ণের জন্যে, হিন্দুধর্মের প্রকৃত স্বরূপ প্রকাশের জন্যে। এই চাওয়াটা এতই আন্তরিক ছিল যে, সেই মহাবেগে তিনি পরিণত হয়েছিলেন ঝড়ে। সাইক্লোনের স্যাটেলাইট চিত্র অদ্ভুত একটি দৃশ্য পাওয়া যায়। ভয়ঙ্কর একটা 'স্পাইর‍্যাল', মাঝখানটা শূন্য। সেইটা হলো, 'আই অফ দ্য স্টর্ম'। ঐ অংশটুকু শান্ত। বিশাল বিপুল আলোড়নের মধ্যে শান্ত, স্নিগ্ধ একটি বৃত্ত। স্বামীজী সাইক্লোন ; তাঁর হৃদয়ে অসীম একটি শান্ত স্থান, সেখানে তিনি স্থিত। সেখানে গুরু শ্রীরামকৃষ্ণ, সেখানে ব্রহ্ম, অনন্ত, সেখানে ধ্যান, সেখানে 'কসমস'। এমন একজন মহামানব অতীতে আসেননি, ভবিষ্যতে আসবেন কিনা কে জানে! কাল তাঁর কী বিচার করল তা নিয়ে বিচলিত হওয়ার কিছু নেই। স্বামীজী বলেছিলেন, বিবেকানন্দকে বুঝতে হলে আর একজন বিবেকানন্দের প্রয়োজন।

গুরু শ্রীরামকৃষ্ণ একটি সুন্দর উপাখ্যান বলতেন : একজন বাবু তার চাকরকে বললে, তুই এই হীরেটা বাজারে নিয়ে যা। আমায় বলবি, কে কিরকম দর দেয়। আগে বেগুনওয়ালার কাছে নিয়ে যা। চাকরটি প্রথমে বেগুনওয়ালার কাছে গেল। সে নেড়েচেড়ে বললে, ভাই! নয় সের বেগুন আমি দিতে পারি। কাপড়ওয়ালার কাছে গেল। কাপড়ওয়ালা বললে, ভাই! আমি নয়শো টাকা দিতে পারি। মনিব সব শুনে হাসতে হাসতে বললে, এইবার এক জহুরীর কাছে যা—সে কি বলে দেখা যাক। জহুরী একটু দেখেই বললে, এক লাখ টাকা।

এই প্রসঙ্গ উত্থাপনের কারণ, সেই মহামানবকে বোঝার ক্ষমতা আমাদের কোন কালেই হবে না। আর এই সত্যটি তিনি হৃদয়ঙ্গম করেই গিয়েছিলেন। তাঁর কয়েকটি আন্তরিক উক্তিই এর প্রমাণ—

১। "আমরা হিন্দুরা এখনও মানুষ হইনি।"

২। "আমার স্বদেশবাসীরা এখনো মানুষ হয়নি। তাঁরা নিজেদের প্রশংসাবাদ শুনতে খুব প্রস্তুত আছে, কিন্তু তাদের একটা কথামাত্র কয়ে সাহায্য করবার যখন সময় আসে, তখন তাদের আর টিকি দেখতে পাবার জো নেই।"

৩। "বাঙালীরা কেবল বাক্যসার, তাদের হৃদয় নেই, তারা অসার।"

আমি দেখতে চাই, আমি শিখতে চাই, আমি জানতে চাই—এই ত্রিবিধ ধারায় স্বামীজীর পরিক্রমা। চোখ দেখবে, মন শিখবে, বোধ জানবে। স্বামীজীর ভারত পরাধীন ভারত। শাসকের শোষণ, রাজন্য-বর্গের ইংরেজ-তোষণ, মধ্যবিত্তের মগজের বড়াই আর দাসত্বের দম্ভ। গুরু শ্রীরামকৃষ্ণ একদিন ছটফট করতে করতে বলেছিলেন : "মা, আমায় এখানে আনলি কেন ? আমি কি এদের বেড়ার ভিতর থেকে রক্ষা করতে পারব ?" প্রায় সমাধিস্থ অবস্থায় এই উক্তি। ঠাকুর বসে আছেন কেশব সেনের জাহাজে। শ্রীম ব্যাখ্যা করছেন : "ঠাকুর কি দেখিতেছেন যে, সংসারী ব্যক্তিরা বেড়ার ভিতরে বদ্ধ, বাহিরে আসিতে পারিতেছে না, বাহিরের আলোকও দেখিতে

পাইতেছে না—সকলের বিষয়কর্মে হাত-পা বাঁধা ? কেবল বাড়ির ভিতরের জিনিসগুলি দেখিতে পাইতেছে আর মনে করিতেছে যে, জীবনের উদ্দেশ্য কেবল দেহ-সুখ ও বিষয়কর্ম, কামিনী ও কাঞ্চন ?" ঠাকুর বলতেন, দাসত্বের একটা কালো ছাপ পড়ে মুখে। অর্থ আসে অসৎ পথে। অর্থ প্রতিষ্ঠা দেয়, অহঙ্কার দেয়, আত্মকেন্দ্রিক, হিসাবী করে। অর্থাৎ সমাজের একশ্রেণীর মানুষ দেশগঠনের কাজে অচল। সেকাল, একাল, পরকাল—কোনকালেই তাদের সাহায্য পাওয়া যাবে না। এরা হলো বুদ্ধিজীবী— 'মিডাস'। যুক্তি, তর্ক, শাস্ত্র সমালোচনা। কচর-মচর ছাতারে পাখি। ঠাকুর বিশ্বাস করতেন ছোকরাদের, স্বামীজীও বিশ্বাস করতেন ছোকরাদের। পাকা বাঁশ, পাকা হাঁড়ির কর্ম নয়। স্বামীজীর পরিষ্কার স্পষ্ট কথা : "Men, men, these are wanted : everything else will be ready. but strong, vigorous. believing youngmen, sincere to the backbone, are wanted. A hundred such and the world becomes revolutionised." মানুষ চাই মানুষ, শত সহস্র বাছাই করা যুবক। নষ্ট হয়ে যায়নি এমন যুবক। একান্ত আন্তরিক। যাদের ব্রত হবে চরৈবতি। উত্তর থেকে দক্ষিণ গোটা ভারত নানা ছদ্মনামে ঘুরে স্বামীজী দেখেছিলেন—"grinding poverty of the masses and their degradation." বিশাল ভারত, বিশাল দারিদ্র্যের এক মানচিত্র। দাসভূমি। এদের কানের কাছে যতই বল-না-কেন 'শৃণ্বন্তু বিশ্বে অমৃতস্যপুত্রাঃ', অমৃত-ভাণ্ড উৎসারিত হবে না। এদের মুক্তি ধর্মে না অর্থনীতিতে, শিক্ষায় না সমৃদ্ধিতে। দরিদ্রদের দেশে যেমন গণতন্ত্র ভণ্ডামি, সেইরকম ধর্মও এক কুসংস্কার। দুটো শোষণ পাশাপাশি, শোষক দুটি শ্রেণী—জমিদার, 'আপার ক্লাস' আর পুরোহিত। অর্থ, বিত্ত, অন্তর তিনটিই অপহৃত। ওপরতলা, নিচের তলা পাশাপাশি ; ওপর চাইবে ওপরেই থাকতে, নীচ থাকবে পদানত—'they are the masses'। 'মাস' কথনো 'ক্লাসে'র মর্যাদায় উন্নীত হবে না। স্বামীজী প্রশ্ন করছেন—

"Do you feel that millions and millions of descendants of Gods and sages have become next door neighbours to brutes ? Do you feel that millions are starving for ages ?" [ 'My Plan of Campaign' ]

স্বার্থে চুর অমানুষের হাতে জনগণের ভাগ্য ছেড়ে দিলে ধর্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষ সবই ভেসে যাবে। এই নাকি আমাদের বেদান্তের জন্মভূমি। লক্ষ লক্ষ সাধারণ মানুষকে সম্মোহিত করে রাখা হয়েছে। এক ধরনের তামসিক নিদ্রা—"To touch them is pollution, to sit with them is pollution !" ওদের স্পর্শ করো না—অচ্ছুৎ, ভাঙ্গী। "Hopeless they were born, hopeless they must remain !" পরিব্রাজক স্বামীজী মাউণ্ট আবুতে উকিল সাহেবের ডেরায় আশ্রয় পেয়েছেন। সামনেই বর্ষা। কৌপীনবন্ত স্বামীজী ছিলেন গুহাবাসী। উকিল সাহেব তাঁকে আমন্ত্রণ করে আনলেন তাঁর আবাসে। খেতড়ির মহারাজা অজিত সিংহের প্রাইভেট সেক্রেটারি মুন্সি জগমোহনলাল একদিন এসে প্রশ্ন করলেন : "স্বামীজী, একজন হিন্দু সন্ন্যাসী হয়ে কী করে মুসলমানের আশ্রয়ে আছেন ? যেকোন মুহূর্তেই তো আপনার খাবার ছুঁয়ে ফেলতে পারে !" স্বামীজী শুয়েছিলেন। পরিধানে কৌপীন আর একটুকরো বস্ত্র। জগমোহনলাল তখনো জানেন না, কাকে দেখছেন। ভাবছেন, এ তো সেই অনেক সন্ন্যাসীর এক সন্ন্যাসী। 'No better than thieves and rogues.' প্রশ্ন শুনে স্বামীজী উঠে বসলেন, চোখ দুটো জ্বলছে। চোস্ত ইংরেজীতে বললেন : "Sir, what do you mean ? I am a Sannysin. I am above all your social conventions. I can dine even with a Bhangi. I am not afraid of God. because He sanctions it. I am not afraid of the Scriptures, because they allow it. But I am afraid of you people and your society. You know nothing of God and the Scriptures. I see Brahman everywhere, manifested even through the meanest creature. For me there is nothing high or low. Shiva, Shiva !" ( দ্রঃ Life of Swami Vivekananda—Eastern and Western Disciples, Vol. I, 1979, p. 280) [ক্রমশঃ]

বিজ্ঞান-নিবন্ধ

# পরিবেশ-ভাবনা—গতি ও প্রকৃতি

## পশুপতিনাথ চট্টোপাধ্যায়

পরিবেশ সম্বন্ধে সচেতনতা আজ প্রায় সর্বজনীন। এই অবস্থায় এসে পৌঁছানো কিন্তু খুব সহজে হয়নি। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে শিল্পোন্নয়নের ঊর্ধ্বগতির সঙ্গে সঙ্গে পরিবেশ-রক্ষার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে সাধারণ মানুষের দৃষ্টি পড়তে থাকে। দেখা যায়, শহরগুলো ক্রমেই বায়ুদূষণের কবলে পড়ছে। ক্রমবর্ধমান হারে বন কাটা হচ্ছে, নদীর জল দূষিত হয়ে মাছের উৎপাদন কমে যাচ্ছে, জমিতে বেশি পরিমাণে কীটনাশক ওষুধ ও রাসায়নিক সারের ব্যবহারের ফলে ফসলের সাথে মানুষের শরীরে সেই সমস্ত রাসায়নিক দ্রব্য অনুপ্রবেশ করে নানা রকম অসুখের সৃষ্টি করছে। পাশ্চাত্যে, বিশেষ করে আমেরিকায়, এসম্পর্কে মানুষের প্রথম চেতনা জাগে কিছুকাল আগে। আর তারই ফলশ্রুতি হলো ১৯৭০ খ্রীস্টাব্দে আমেরিকায় প্রথম 'পৃথিবী দিবস' পালন। 'পৃথিবী দিবস' এখন তো সারা পৃথিবীতেই পালন করা হচ্ছে। এর পর পরিবেশ-চেতনার একটি দিকনির্ণয়কারী অনুষ্ঠান হয় ১৯৭২ খ্রীস্টাব্দে স্টকহোলমে। এটি ছিল রাষ্ট্রপুঞ্জের নেতৃত্ব আন্তর্জাতিক পরিবেশ সম্মেলন। প্রতিবছর ৫ জুন 'বিশ্ব পরিবেশ দিবস' পালন করা হয় সেই সময় থেকে। রাষ্ট্রপুঞ্জের পরিবেশ কর্মসূচীর সূচনা সেই অনুষ্ঠান থেকেই। এর পরেই সারা পৃথিবীতে সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ে পরিবেশ আন্দোলন একটি নতুন গতি পায়। ২০ বছর পরে ১৯৯২ খ্রীস্টাব্দে ব্রেজিলের রিও-ডি-জেনেরো শহরে অনুষ্ঠিত হলো পরিবেশ মহাসম্মেলন—'বসুন্ধরা শীর্ষ বৈঠক'। এই বৈঠকে ১২ দিন ধরে বিশ্বের ধনী-দরিদ্র, উন্নত-অনুন্নত—সব মিলিয়ে ১৮৫টি দেশের প্রায় ১০ হাজার সরকারি-বেসরকারি প্রতিনিধিরা পৃথিবীর পরিবেশ নিয়ে আলোচনা করেছেন। এথেকে বোঝা যায় যে, পরিবেশ-চেতনা বর্তমানে গুরুত্বলাভ করেছে। আমাদের দেশেও পরিবেশ-চেতনার বিস্তৃতি ঘটেছে।

পরিবেশ-দূষণের অন্যতম কারণ হলো 'গ্রীন হাউস এফেক্ট'। গ্রীন হাউস এফেক্টের অর্থ কি, তার অনুসন্ধানে দেখা যায়—একটা কাঁচের ঘরের ভিতরকার হাওয়া সূর্যকিরণে উত্তপ্ত হয় এবং একবার উত্তপ্ত হলে কাঁচের ভিতর থাকার জন্য সহজে ঠাণ্ডা হয় না। কারণ বাইরের হাওয়া, বিশেষ করে ঠাণ্ডা হাওয়া এই ঘরের ভিতরকার উত্তপ্ত হাওয়াকে প্রভাবিত করতে পারে না। তেমনি আকাশে কার্বন-ডাই-অক্সাইড, মিথেন, নাইট্রো অক্সাইড ও অন্য কিছু গ্যাস কাঁচের বাড়ির মতো পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে এক আস্তরণ সৃষ্টি করে, যাতে তলাকার বায়ু গরম হলে সহজে ঠাণ্ডা হয় না। এই উষ্ণতা সারা বিশ্ব জুড়েই। একেই বলা হয় 'গ্লোবাল ওয়ার্মিং' এবং এই অবস্থা পৃথিবীর প্রভূত পরিমাণে ক্ষতি করতে সক্ষম। ১৯০০ খ্রীস্টাব্দ থেকে প্রতি ১০ বছর পৃথিবীর উত্তাপ বৃদ্ধি পাচ্ছে ০.৫ ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড হিসাবে। পৃথিবীর তাপমাত্রা আর যদি ৪.৫ ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড বৃদ্ধি পায় তাহলে মেরু অঞ্চল স্থলভাগের বরফ আরও বেশি করে গলতে আরম্ভ করবে। সমুদ্রপৃষ্ঠের জলের স্তর ২০ সেন্টিমিটার থেকে ১৪০ সেন্টিমিটার পর্যন্ত বেড়ে যাবে। এই জলস্ফীতি হওয়ার ফলে আশঙ্কা করা যায়, ৩০০ মিলিয়ন মানুষের বিলুপ্তি ঘটবে। বাংলাদেশে এর প্রভাবে শতকরা ১৮ ভাগ স্থলভাগ ও ১৭ মিলিয়ন মানুষের বিলুপ্তি ঘটবে। এছাড়া নীলনদ, গঙ্গা, ইয়াংসি নদীর তীরে লক্ষ লক্ষ মানুষ হয়ে পড়বে গৃহহীন। হিসাব অনুযায়ী ২০৫০ খ্রীস্টাব্দ নাগাদ এই বিপর্যয় ঘটার কথা।

গ্রীন হাউস গ্যাসগুলির প্রধান হলো কার্বন-ডাই-অক্সাইড, সংক্ষেপে কার্বন। আবহাওয়ায় কার্বন নিক্ষেপ বেশি হয় শিল্পোন্নত দেশগুলিতে। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের লোকসংখ্যা সারা পৃথিবীর মাত্র ৫ ভাগ। অথচ সারা পৃথিবীর আবহাওয়ায় যে-পরিমাণ কার্বন নিক্ষিপ্ত হয় তার ২২ ভাগ হয়

আমেরিকায়। মাথাপিছু কার্বন-নিক্ষেপের পরিমাণ আমেরিকায় বছরে ১৫ হাজার পাউন্ড। অন্যদিকে অনুন্নত দেশগুলি, যেখানে সারা পৃথিবীর ৮০ ভাগ লোক বাস করে, তারা সবাই মিলে আবহাওয়ায় কার্বন নিক্ষেপ করে শতকরা ২২ ভাগ। এখানে লক্ষণীয় এই যে, অনুন্নত দেশগুলি যদি অদূর ভবিষ্যতে আমেরিকার মতো শিল্পোন্নত হয় এবং আমেরিকানদের মতো মাথাপিছু কার্বন নিক্ষেপ করে তাহলে বৈজ্ঞানিকদের সযত্ন-কল্পিত হিসাব-নিকাশ সব ওলটপালট হয়ে যাবে এবং সমস্ত বিশ্ব খুব দ্রুত সার্বিক ধ্বংসের দিকে এগিয়ে যাবে।

শিল্পোন্নয়ন এবং দেশের শ্রীবৃদ্ধির কাজে বড় বড় নদীতে বাঁধ দেওয়ার কার্যক্রম সম্বন্ধে আমরা ওয়াকিবহাল। আমাদের দেশে দামোদরের ওপরে বাঁধ, ভাকরা-নাঙ্গাল বাঁধ যখন তৈরি হয়েছিল তখন পরিবেশ সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান ছিল খুবই সীমিত। পরিবেশসংক্রান্ত সমস্যাগুলির কোনরকম বিচার-বিবেচনা না করেই তা করা হয়েছিল। সাধারণ-ভাবে বলা যায়, যে-আশা নিয়ে এই বাঁধগুলি তৈরি করা হয়েছিল তার অনেকাংশই অপূর্ণ রয়ে গেছে। বর্তমানে নর্মদা নদীর ওপর সর্দার সরোবর বাঁধ নিয়ে খুব হৈচৈ হচ্ছে। সরকারি প্রচারযন্ত্রে জনসাধারণকে ক্রমাগতই বোঝানো হচ্ছে, প্রকল্পটি কার্যকরী হলে শিল্পোন্নয়নের কাজে গুজরাটে ও মহারাষ্ট্রে প্রচুর পরিমাণে বিদ্যুৎ পাওয়া যাবে এবং কচ্ছের রুক্ষ এলাকায় জলসেচের ব্যবস্থা হবে। এই বাঁধটি সম্পূর্ণ হলে লক্ষ লক্ষ আদিবাসী পরিবারের এবং পরিবেশের যে অপূরণীয় ক্ষতি হবে সেবিষয়ে সরকারি প্রচারযন্ত্র কিন্তু একেবারে নীরব। এই প্রকল্প রূপায়িত করতে হলে মহারাষ্ট্র অঞ্চলের ৯৫৬৯ হেক্টর অরণ্যানী ধ্বংস হবে। সর্দার সরোবর প্রকল্প শেষ হলে প্রায় ১০ লক্ষ গরিব আদিবাসী বাস্তুচ্যুত এবং অন্যান্যভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হবে। বিশ্বব্যাংকের প্রতিনিধিরা জানিয়েছেন, এই বিপুল সংখ্যক মানুষের পুনর্বাসন সম্ভব নয়। এই প্রকল্পে পরিবেশের যে-ক্ষতি হবে তা পূরণের জন্যে যে অভয়ারণ্যের পরিকল্পনা আছে তাতে গুজরাটের আরও ২০০টি গ্রামের ৪২ হাজার আদিবাসী বাস্তুচ্যুত হবে।

বসুন্ধরা শীর্ষ সম্মেলনে যে ৭টি বিষয়ে আলোচনা হয়েছিল তার মধ্যে একটি ছিল 'জনসংখ্যা বিস্ফোরণ'। আলোচনায় যা পরিষ্কার হয়ে ওঠে তা হলো—পৃথিবীর অনুন্নত দেশগুলিতেই জনসংখ্যা দ্রুত বাড়ছে। শিল্পোন্নত দেশগুলিতে শিক্ষাপ্রসার ও অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নতির জন্যেই জনসংখ্যা স্থিতাবস্থায় পৌঁছেছে। অনুন্নত দেশগুলিতে, বিশেষ করে ভারতবর্ষে দেখা যাচ্ছে, শিক্ষিতদের তুলনায় দরিদ্র অশিক্ষিত মানুষদের সংখ্যাই বেশি বাড়ছে। সেন্সাস রিপোর্ট অনুযায়ী ১৯০১ খ্রীস্টাব্দে ভারতবর্ষের লোকসংখ্যা ছিল ২৩ কোটি। ১৯৯১ খ্রীস্টাব্দে তা বেড়ে ৯০ কোটি ছাড়িয়ে গেছে। এই গণবিস্ফোরণের বিভিন্ন প্রতিক্রিয়া দেখা গিয়েছে। তার অন্যতম হলো মানুষ ও কৃষিজমির অনুপাতিক হ্রাস। ১৯১১ খ্রীস্টাব্দে ভারতের প্রতিটি মানুষের ভাগে ১.১ একর জমি ছিল। ১৯৭৮ খ্রীস্টাব্দে তা হ্রাস পেয়ে দাঁড়িয়েছে ০·৬ একরে। অধিকাংশ জমি অর্থনৈতিকভাবে অলাভজনক হয়ে পড়ছে। এর একটি ফল হয়েছে—কৃষিজীবীর সংখ্যা কমে যাচ্ছে। পাঞ্জাব ও হরিয়ানায়, যেখানে সবুজ-বিপ্লব নিয়ে আমাদের গর্বের সীমা নেই সেখানে ১৯৬১ থেকে ১৯৯১ খ্রীস্টাব্দের মধ্যে কৃষিজীবীর সংখ্যা ৪৪·৬ লক্ষ থেকে কমে ৩৯·৩ লক্ষ হয়েছে এবং ভূমিহীন কৃষি-মজুরের সংখ্যা ১৭·৭ লক্ষ থেকে বেড়ে ৩২·৭ লক্ষে পৌঁছেছে। আরও একটি লক্ষণীয় বিষয় হলো, গত ৩০ বছরে সামগ্রিক উৎপাদন বেড়েছে ২½ গুণ, কিন্তু জনসংখ্যার প্রায় ৪০ শতাংশ রয়েছে দারিদ্র্য-সীমার নিচে। ভোগ্যপণ্য-উৎপাদনকারী বর্তমান শিল্প-সভ্যতার এটাই পরিণতি। দ্বিতীয় বিশ্ব-যুদ্ধের পর পৃথিবীতে শিল্পের উৎপাদন যুদ্ধপূর্বের তুলনায় যদিও চারগুণ বেড়েছে, কিন্তু সেইসঙ্গে পাল্লা দিয়ে বেড়েছে পৃথিবীতে দরিদ্রের সংখ্যা, আর বেড়েছে পৃথিবী ও আবহাওয়ার উষ্ণতা। তাছাড়া বনভূমি ধ্বংস হয়েছে, পানীয়জল দূষিত হয়েছে। যে-উন্নতি মুষ্টিমেয় মানুষের জন্যে এবং যে-উন্নতি প্রকৃতির ভারসাম্য নষ্ট করে সে-উন্নতি কোন উন্নতিই নয়। অথচ উন্নতি ও দারিদ্র্যমুক্তি একান্ত কাম্য। তাই পরিবেশকে রক্ষা করে শিল্পোন্নয়ন ঘটিয়ে আমাদের দারিদ্র্যমুক্ত সমাজগঠন করতে হবে। □

## গ্রন্থ-পরিচয়

# বিশ্বপ্রেমিক বিবেকানন্দের বর্ণোজ্জ্বল জীবনালেখ্য

### অসীম মুখোপাধ্যায়

**প্রজ্বলিত সূর্য** ঃ অরবিন্দ ঘোষ। প্রকাশক ঃ শমিত সরকার, এম. সি. সরকার অ্যান্ড সন্স প্রাইভেট লিমিটেড, ১৪ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলিকাতা-৭৩। পৃঃ ৩৯২+৮। মূল্য ঃ পঞ্চাশ টাকা।

উনবিংশ শতাব্দীতে ভারতবর্ষের নবজাগরণের ইতিহাসে এক ঐতিহাসিক ব্যক্তিত্ব স্বামী বিবেকানন্দ। স্বদেশের সমৃদ্ধিই ছিল এই ঋষি-পুরুষের ধ্যান-জ্ঞান, জীবনব্রত। মহৎ এই ব্রত পালনে তিনি আজীবন অক্লান্ত থেকেছেন। মাতৃভূমির বর্তমান আশা-আকাঙ্ক্ষা ও অতীত গৌরব-ঐশ্বর্যকে প্রমূর্ত করতে তিনি আত্মোৎসর্গ করেছেন। তাঁর বিস্ময়কর ব্যক্তিগত সাফল্য ও বিশ্ববিশ্রুত ব্যক্তিত্বের দ্বারা রক্ষণশীলতায় আবদ্ধ ও কুসংস্কারে নিমজ্জিত মৃতপ্রায় ভারতবাসীর মধ্যে তিনি অতি প্রার্থিত প্রাণের জোয়ার এনেছেন। আত্মসম্মান ও আত্মবিশ্বাসে পুনরুজ্জীবিত করেছেন আপামর ভারতবাসীকে। সৎসাহস ও সদিচ্ছা থাকলে পরাধীন, পতিত স্বদেশবাসীও পাশ্চাত্যের প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বিতার বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে সদর্থক কিছু করতে পারে—এই ইতিবাচক সংবাদটি তিনি ছড়িয়ে দিয়েছেন ভারতবর্ষের কোণে কোণে। ফলতঃ, সমগ্র জাতি জেগে উঠেছে নতুন এক উন্মাদনায়। স্বকীয় উদ্যোগে সমগ্র জাতিকে উদ্দীপ্ত করার এমনতর দৃষ্টান্ত ভারতীয় ইতিহাসে তো নেই-ই, পৃথিবীর ইতিহাসেও বিরল। সে-বিচারে বিবেকানন্দই পুনরুজ্জীবিত ভারতবর্ষের পথিকৃৎ। তিনি আধুনিক ভারতবর্ষের অন্যতম রূপকার। জনজাগরণের মধ্যে নিজের অসীম কর্মোদ্যোগকে সীমাবদ্ধ না রেখে নানা ভাষা, নানা মত, নানা পরিধানের ভারতবাসীকে তিনি তাঁর অমর বাণী ও রচনার মাধ্যমে মৈত্রীর নিবিড় বন্ধনে বেঁধেছেন। এইভাবেই আসমুদ্রহিমাচল বিস্তৃত ভারতবর্ষের রাষ্ট্রীয় অখণ্ডতার সুপ্রাচীন আদর্শটিকে অক্ষুণ্ণ রেখেছেন তিনি। সাম্প্রতিককালে নানা প্রতিকূল পরিস্থিতির হাত থেকে ভারতকে রক্ষার অন্যতম প্রধান উপায় স্বামীজীর অখণ্ড ভারতের আদর্শ ও সমন্বয়ধর্মী চিন্তাধারার অক্লান্ত অনুশীলন।

স্বদেশের এই বরণীয় সন্তানের স্মরণীয় কীর্তির উল্লেখ প্রসঙ্গে ইতিমধ্যেই প্রকাশিত হয়েছে অসংখ্য গ্রন্থ। সেই সুদীর্ঘ সারণীতে একটি ভিন্নতর সংযোজন অরবিন্দ ঘোষের **প্রজ্বলিত সূর্য**। এই জীবনোপন্যাসের উপজীব্য বিষয়—বিবেকানন্দের শিকাগোয় প্রথম আগমন, বিশ্বধর্ম-মহাসভায় তাঁর বক্তৃতাবলী, থাউজ্যান্ড আইল্যান্ডের দিনগুলি, নিউ ইয়র্কে বেদান্ত সোসাইটি স্থাপন, ইংল্যান্ডে মিস হেনরিয়েটা মুলার ও মিস মার্গারেট নোবেলের সঙ্গে পরিচয় এবং পরিশেষে সিংহল ও ভারতে বিজয়ীর বেশে প্রত্যাবর্তন প্রভৃতি। বিষয়বস্তুর মধ্যে বৈচিত্র্য বা নতুনত্ব না থাকলেও আঙ্গিকের অভিনবত্ব ও উপাদেয় উপস্থাপনা অবশ্যই আলোচ্য বইটিকে বিশিষ্টতা দান করেছে। প্রয়োগ-রীতির প্রশংসনীয় পরিবর্তন ঘটিয়ে শ্রীঘোষ তাঁর এই বইতে স্বামীজীকে সরাসরি পাঠকের দরবারে পৌঁছে দিয়েছেন। তাঁর নিজের মুখে বলা প্রথম পাশ্চাত্য পরিব্রাজনার বিচিত্র অভিজ্ঞতার কথা লেখক উপস্থাপন করেছেন পাঠকদের কাছে। ফলতঃ পাঠক ও স্বামীজীর মধ্যে গড়ে উঠেছে আকাঙ্ক্ষিত অন্তরঙ্গতা। স্বামীজীর সান্নিধ্য-লাভের এই দুর্লভ সুযোগ সদ্ব্যবহারে পাঠক স্বাভাবিকভাবেই উন্মুখ হয়ে ওঠে। আর সে-কারণেই উপন্যাসের আদলে লেখা ৩৯২ পৃষ্ঠার বইটি পড়া হয়ে যায় এক নিঃশ্বাসে। বইটির প্রতি পাঠকের অমোঘ আকর্ষণ সৃষ্টির মধ্যেই নিহিত রয়েছে লেখকের স্বাতন্ত্র্য ও সার্থকতা। তথ্যাকীর্ণ অ্যাকাডেমিক আলোচনার পাশাপাশি আমজনতার দিকে লক্ষ্য রেখে সহজ ভাষায় স্বামীজীর মহিমময় জীবনালোচনার সবিশেষ প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। **প্রজ্বলিত সূর্য** সেই প্রয়োজনীয়তা প্রশংসনীয়-ভাবে পূরণ করেছে। শিকাগো ধর্মমহাসভার শতবর্ষপূর্তির প্রেক্ষিতে প্রকাশিত হওয়ায় বইটি

একটি বিশেষ মাত্রা লাভ করেছে। তবে বইটির শিরোনামে 'প্রজ্জ্বলিত' বানানটি যে অশুদ্ধ, তা লেখকের দৃষ্টি এড়িয়ে গিয়েছে।

ভূমিকাতে একাধিক সহায়ক গ্রন্থের উল্লেখ প্রসঙ্গে লেখক বিশিষ্ট বিবেকানন্দ-গবেষক অধ্যাপক শঙ্করীপ্রসাদ বসুর 'বিবেকানন্দ ও সমকালীন ভারতবর্ষ' নামক জনাদৃত গ্রন্থ প্রসঙ্গে যে-মন্তব্য করেছেন—"সেখানে স্বামীজীর আমেরিকা ও ইউরোপ অবস্থানের কাহিনী সাধারণভাবে অনুপস্থিত", তা তথ্যের দিক দিয়ে সঠিক নয়। কারণ, অধ্যাপক বসুর 'বিবেকানন্দ ও সমকালীন ভারতবর্ষ' গ্রন্থের প্রথম খণ্ডের প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় অধ্যায় এবং দ্বিতীয় খণ্ডের একাদশ ও পঞ্চদশ অধ্যায়ে স্বামীজীর আমেরিকা ও ইউরোপে অবস্থানের কাহিনী অনুপুঙ্খভাবে বর্ণিত হয়েছে। অধ্যাপক বসুর উল্লেখিত আকরগ্রন্থের সাহায্য ভিন্ন স্বামীজী সংক্রান্ত সমস্ত আলোচনা অসম্পূর্ণ থেকে যাবার আশঙ্কা রয়ে যায়। ☐

## বিজ্ঞান প্রসঙ্গ

# ম্যালেরিয়া নিয়ে এখন কেউ ভাবছে না

বর্তমানে প্রতি বছর ম্যালেরিয়ায় মারা যায় প্রায় ২০ লক্ষ লোক; কিন্তু যখন, বিশেষ করে আমেরিকার ছেলেরা এই অসুখের মুখোমুখি হয়, তখনই অসুখটির ওপর আন্তর্জাতিক গুরুত্ব দেওয়া হয়। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে দুটি নতুন ওষুধ বের হয়েছিল, ভিয়েৎনাম-যুদ্ধের সময় আরও দুটি। বর্তমানে ম্যালেরিয়া চিকিৎসার অস্ত্রগুলি 'সেকেলে' হয়ে গেছে। ঔষধ-প্রতিহতকারী ( drug resistant ) ম্যালেরিয়া-জীবাণু এখন বেড়েই চলেছে; তার ওপর ঔষধ-প্রস্তুতকারক কোম্পানিগুলি লাভজনক বাজার না পাবার ভয়ে হাত গুটিয়ে নিয়েছে। অসুখটি যেহেতু গরিব দেশের অসুখ, তাই সেখান থেকে মোটা মুনাফা আসবে কি করে?

এইসব কারণে সারা পৃথিবীতে ম্যালেরিয়া রোগীর সংখ্যা বাড়ছে—বিশেষ করে গত দুবছর। প্রতি বছর ২৮ কোটি লোক এই রোগজীবাণুর সংস্পর্শে আসছে এবং তার মধ্যে ১১ কোটি রোগাক্রান্ত হচ্ছে। এই অসুখকে প্রতিহত করার কোন টিকা এখন বাজারে নেই। বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থা কীটনাশক ঔষধ ছড়িয়ে ম্যালেরিয়া নির্মূল করার কার্যসূচী ত্যাগ করেছে ১৯৬৯ খ্রীস্টাব্দে (কার্যসূচী নেওয়া হয়েছিল ১৯৫৫ খ্রীস্টাব্দে)। ১৯৬০ খ্রীস্টাব্দে একই সঙ্গে ল্যাটিন আমেরিকায় ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় ঔষধ-প্রতিহতকারী জীবাণু পাওয়া যেতে আরম্ভ করেছিল। ১৯৮৫ খ্রীস্টাব্দে যে নতুন ঔষধ 'মেফ্লোকুইন' ( mefloquin ) বের হয়েছে, থাইল্যান্ডে এখনই অর্ধেক রোগীর ক্ষেত্রে তা আর কার্যকরী নয়। বহু দেশে ক্লোরোকুইন প্রায় অকেজো হয়ে পড়েছে।

যে-অসুখ থেকে পৃথিবীর ৯০ শতাংশ লোক প্রায় বিপন্মুক্ত হয়েছিল, তা বর্তমানে ৪০ শতাংশের কাছে ভীতিপ্রদ হয়ে দাঁড়িয়েছে। কেন এমন হলো? কারণ বোধহয় অনেক: দারিদ্র্য, চাকরির জন্য বা যুদ্ধের জন্য লোকের স্থানান্তর বা অন্য দেশে যাওয়া, জীবাণুর ঔষধ-প্রতিহত করার ক্ষমতা অর্জন, রাজনৈতিক নেতাদের এবিষয়ে ঔদাসীন্য এবং জীবাণুর বিরুদ্ধে সংগ্রাম করার জন্য যেসব অস্ত্রশস্ত্র (অর্থাৎ ঔষধ) হাতে আছে তারও প্রয়োগের অভাব।

ম্যালেরিয়ার রোগজীবাণু প্রায় ৩০ রকম প্রজাতির অ্যানোফিলিস মশা দ্বারা বাহিত হয়। এইসব মশা আবার কীটনাশক ঔষধকে প্রতিহত করার ক্ষমতা অর্জন করে ফেলে; ফলে স্প্রে করলেও তেমন কাজ হয় না। সে যাই হোক, অনেক বৈজ্ঞানিক যখন বলেন যে, 'আর একটা বিশ্বযুদ্ধ লাগলে আমরা মনোমতো ম্যালেরিয়ার ঔষধ পাব', তখন তা ঠাট্টা করে বললেও অনেকটা সত্য। ☐

**[Science & Information Notes, Indian National Science Academy, October 1992, pp. 33-37.]**

# রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশন সংবাদ

## স্বামী বিবেকানন্দের শিকাগো-ভাষণের শতবর্ষপূর্তি-উৎসব

**দিল্লী আশ্রমের** ব্যবস্থাপনায় দুসপ্তাহব্যাপী অনুষ্ঠানের সূচনা হয় গত ৯ অক্টোবর তালকাটোরা ইন্ডোর স্টেডিয়ামে। অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন প্রধানমন্ত্রী পি. ভি. নরসিমহা রাও। স্বাগত ভাষণ দেন রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের সাধারণ সম্পাদক স্বামী আত্মস্থানন্দজী। সমগ্র উদ্বোধন-অনুষ্ঠানটি দূরদর্শনের জাতীয় কার্যক্রমে সরাসরি দেখানো হয়। এদিন অনুষ্ঠানে ৩৫০০ শ্রোতা উপস্থিত ছিলেন। উদ্বোধন-অনুষ্ঠানের পর এক যুবসমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। সমাবেশে সভাপতিত্ব করেন কেন্দ্রীয় যুব ও ক্রীড়াদপ্তরের রাষ্ট্রমন্ত্রী মুকুল ওয়াস্নিক। ১০ অক্টোবর দিল্লী আশ্রম-প্রাঙ্গণে স্বামীজীর জীবনের ওপর এক প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেন কেন্দ্রীয় মানবসম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রী অর্জুন সিং। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন স্বামী আত্মস্থানন্দজী। ভাষণ দেন স্বামী লোকেশ্বরানন্দজী এবং স্বামী প্রভানন্দজী। অন্যান্য অনুষ্ঠানের মধ্যে ছিল আটটি ধর্মের প্রতিনিধিদের নিয়ে আন্তর্ধর্ম-সম্মেলন, রাজা রামান্নার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত 'বিজ্ঞান, ধর্ম ও বিবেকানন্দ' বিষয়ে আলোচনাচক্র এবং বিশিষ্ট শিল্পীদের কণ্ঠ ও যন্ত্র-সঙ্গীতের আসর।

**মনসাদ্বীপ আশ্রম** জনসভা, পদযাত্রা, ফুটবল প্রতিযোগিতা, রক্তদান-শিবির, যুবসম্মেলন, শিক্ষকদের আলোচনাচক্র এবং বিনামূল্যে ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে বিদ্যালয়ের পোশাক-বিতরণ প্রভৃতি অনুষ্ঠানের মাধ্যমে উক্ত উৎসব পালন করেছে।

**আলমোড়া আশ্রম** গত ২৩ থেকে ৩০ সেপ্টেম্বর আলমোড়া এবং নৈনিতাল জেলার শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ও গ্রামাঞ্চলের বিদ্যালয়সমূহে বক্তৃতা, প্রবন্ধ-রচনা, আবৃত্তি, প্রশ্নোত্তর প্রভৃতি প্রতিযোগিতার আয়োজন করেছিল। সফল প্রতিযোগীদের পুরস্কার দেওয়া হয়েছে। তাছাড়া কুমায়ুন অঞ্চলে বিভিন্ন স্থানে ১২টি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। গত ১১ ও ১২ অক্টোবর ছেলেদের জন্য এবং ১৩ অক্টোবর মেয়েদের জন্য যুবশিবির অনুষ্ঠিত হয়েছে।

**পুনে আশ্রম** আয়োজিত গত ২ ও ৩ অক্টোবর আলোচনাচক্রে বিশিষ্ট পণ্ডিতবর্গ অংশগ্রহণ করেন। সভা দুটিতে প্রচুর সংখ্যক শ্রোতা উপস্থিত ছিলেন। তাছাড়া শোলাপুর, সাতারা, কোলাপুর ও নিপানীর বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে জনসভা ও সাধন-শিবির অনুষ্ঠিত হয়। কয়েকটি ধর্মস্থানেও আলোচনাসভা অনুষ্ঠিত হয়। তার মধ্যে উল্লেখ-যোগ্য মারগাও-এর দামোদর-মন্দির, যেখানে স্বামীজী তাঁর ভারত-পরিক্রমাকালে দুদিন বাস করেছিলেন।

**কোয়েম্বাটোর (তামিলনাড়ু) আশ্রম** ঐ জেলার ১১টি বিদ্যালয়ে এবং পার্শ্ববর্তী গ্রামের ৪টি ক্লাবে প্রবন্ধ, বক্তৃতা, আবৃত্তি, কবিতা-রচনা, চিত্রাঙ্কণ প্রভৃতি প্রতিযোগিতামূলক অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করেছিল। তাছাড়া একটি পুস্তক-প্রদর্শনী এবং ছাত্রছাত্রী ও শিক্ষাকর্মীদের নিয়ে এক সভার আয়োজন করেছিল। এই আশ্রমের শিবানন্দ উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয় স্বামীজীর শিকাগো ধর্মমহা-সভায় যোগদানের শতবর্ষ স্মরণে এক বার্ষিক জেলাভিত্তিক আন্তঃস্কুল ক্রিকেট টুর্নামেন্টের সূচনা করছে। বিজয়ী দলকে 'স্বামী বিবেকানন্দ রোলিং ট্রফি' দেওয়া হবে।

**চেরাপুঞ্জি আশ্রম** ৯টি স্থানে ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে প্রবন্ধ প্রতিযোগিতার আয়োজন করেছিল। এই উপলক্ষে স্বামীজীর জীবন ও বাণী-সম্বলিত কয়েক হাজার বই ছাত্রছাত্রীদের বিনামূল্যে দেওয়া হয়। গত ২৫ সেপ্টেম্বর এক অনুষ্ঠানে সফল প্রতিযোগীদের পুরস্কার দেওয়া হয়। অনুষ্ঠানে বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন।

**বিশাখাপত্তনম আশ্রম** গত ১১ সেপ্টেম্বর এক আলোচনাসভার আয়োজন করে। বিবেকানন্দ যুবসঙ্ঘের সদস্যগণ এই আলোচনায় অংশগ্রহণ করে। তারপর স্বামীজীর জীবন ও বাণী নিয়ে একটি নাটিকা অভিনীত হয়। গত ২৪ অক্টোবর এক অনুষ্ঠানে উপজাতিদের জন্য একটি ভ্রাম্যমাণ চিকিৎসাকেন্দ্রের উদ্বোধন করা হয়।

**হায়দ্রাবাদ আশ্রম** আয়োজিত 'বিবেকানন্দ সাধন-শিবির' নামে একদিনের এক সম্মেলনে বিশিষ্ট ব্যক্তিসহ সহস্রাধিক শ্রোতার সমাগম হয়। মূল ভাষণ দেন রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের অন্যতম সহাধ্যক্ষ শ্রীমৎ স্বামী রঙ্গনাথানন্দজী মহারাজ। স্বামীজীর বাণীর ওপর 'জাগো ভারত' নামে যন্ত্রসঙ্গীতের এক অনুষ্ঠান হয়। এই নামে একটি ক্যাসেটও প্রকাশিত হয়।

**ভুবনেশ্বর আশ্রম** গত ২৪ সেপ্টেম্বর ৫টি ধর্মমতের প্রতিনিধিদের নিয়ে এক আন্তর্ধর্ম সম্মেলনের আয়োজন করে। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন উড়িষ্যার শিক্ষামন্ত্রী প্রফুল্লচন্দ্র ঘাদেই।

**জয়পুর আশ্রমে** গত ২৬ সেপ্টেম্বর ৭টি ধর্মমতের প্রতিনিধিদের নিয়ে অনুরূপ এক সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন রাজস্থান বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক টি. কে. এন. উন্নিথান।

### উৎসব-অনুষ্ঠান

গত ২১-২৪ অক্টোবর **বেলুড় মঠে** ভাবগম্ভীর পরিবেশে শ্রীশ্রীদুর্গাপূজা অনুষ্ঠিত হয়। এই তিনদিন প্রতিমা দর্শন করতে সহস্রাধিক ভক্তসমাগম হয়। মহাষ্টমীর দিন কুমারীপূজা দর্শন করতে প্রচুর জনসমাগম হয়েছিল। ঐদিন প্রায় ত্রিশ হাজার ভক্তকে হাতে হাতে খিচুড়ি প্রসাদ দেওয়া হয়।

**মঠ-মিশনের নিম্নলিখিত শাখাকেন্দ্রগুলিতে** প্রতিমায় শ্রীশ্রীদুর্গাপূজা অনুষ্ঠিত হয়েছে ঃ

আঁটপুর, আসানসোল, বম্বে, বারাসত, কাঁথি, গুয়াহাটি, জলপাইগুড়ি, জামশেদপুর, জয়রামবাটী, কামারপুকুর, করিমগঞ্জ, লখনৌ, মালদা, মেদিনীপুর, পাটনা, রহড়া, শেলা ( চেরাপুঞ্জী ), শিলং, শিলচর, বারাণসী অদ্বৈতাশ্রম, বিবেকনগর ( আমতলী )।

### ছাত্র-কৃতিত্ব

১৯৯৩ খ্রীষ্টাব্দের কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বি. এসসি. পরীক্ষায় **রামকৃষ্ণ মিশন সারদাপীঠ** পরিচালিত **বিদ্যামন্দিরের** একজন ছাত্র অংকে ( সাম্মানিক ) ৫ম স্থান লাভ করেছে।

মহীশূর বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালিত এবছরের বি. এড. পরীক্ষায় **মহীশূর আশ্রম কলেজের** চারজন ছাত্র ২য়, ৪র্থ, ৬ষ্ঠ ও ৯ম স্থান লাভ করেছে।

উত্তরপ্রদেশ মেডিক্যাল ফ্যাকাল্টি পরিচালিত নার্সিং ফাইনাল পরীক্ষায় **বৃন্দাবন আশ্রমের নার্সিং স্কুলের** দুজন ছাত্রী ১ম ও ৩য় স্থান লাভ করেছে।

### দন্তচিকিৎসা-শিবির

গত ৭ অক্টোবর **পুরী মিশন** আয়োজিত পুরী জেলার কুরুঞ্জীপুরে এক দন্তচিকিৎসা-শিবিরে ১৮৯জনের চিকিৎসা করা হয়েছে।

### বহির্ভারত

**বেদান্ত সোসাইটি অব পোর্টল্যান্ড ঃ** স্বামী বিবেকানন্দের আমেরিকা-আগমনের শতবর্ষপূর্তি উপলক্ষে গত ২৫ সেপ্টেম্বর পূজা ও বেদান্ত আলোচনার মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সূচনা করেন স্বামী শান্তরূপানন্দ। এরপর মিসেস ক্যাথি ফ্র্যাডকিন ও মিসেস প্রিসসিলা মেডফ-এর নির্দেশনায় রবিবাসরীয় বিদ্যালয়ের শিশুরা আবৃত্তি, সঙ্গীত, নাটিকা প্রভৃতি পরিবেশন করে।

**বেদান্ত সোসাইটি অব ওয়েস্টার্ন ওয়াশিংটন, সিয়াটল ঃ** গত ১৫ অক্টোবর এই আশ্রমে স্বামী বিবেকানন্দের আমেরিকা-আগমনের শতবর্ষপূর্তি-উৎসবের অঙ্গ হিসাবে উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত ও ভজন পরিবেশন করেছেন তপন ভট্টাচার্য ও সুমিতা চক্রবর্তী। ২৩ অক্টোবর আশ্রমে শ্রীশ্রীদুর্গাপূজা অনুষ্ঠিত হয়। পূজার পর ভক্তিগীতি পরিবেশন এবং প্রসাদ বিতরণ করা হয়। ২৪ অক্টোবর সন্ধ্যা ৭টায় দেবীর সংক্ষিপ্ত পূজার পর বিজয়া অনুষ্ঠিত হয়।

**বেদান্ত সোসাইটি অব টরন্টো, কানাডা ঃ** ২২ ও ২৪ অক্টোবর পূজা, পুষ্পাঞ্জলি, পাঠ, ধ্যান, ভক্তিগীতি, প্রসাদ-বিতরণ প্রভৃতির মাধ্যমে শ্রীশ্রীদুর্গাপূজা অনুষ্ঠিত হয়েছে। ২৫ অক্টোবর বিজয়া দশমীতে শান্তিজল প্রদান করা হয়েছে।

**বস্টন রামকৃষ্ণ বেদান্ত সোসাইটি** এবং **প্রভিডেন্স বেদান্ত সোসাইটি** গত ১০ অক্টোবর যথাক্রমে সকাল ১১টায় ও বিকাল ৫টায় স্বামী বিবেকানন্দের শিকাগো বিশ্বধর্মমহাসভায় যোগদানের শতবর্ষপূর্তি-উৎসব পালন করেছে। রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের অন্যতম সহাধ্যক্ষ শ্রীমৎ স্বামী গহনানন্দজী মহারাজ উক্ত সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন। তিনি 'পাশ্চাত্যে স্বামীজীর বাণী' বিষয়ে বক্তৃতা দেন। স্বামী প্রবুদ্ধানন্দ এবং

স্বামী আদীশ্বরানন্দ যথাক্রমে 'গত একশো বছরে বেদান্তের প্রচার' ও 'বেদান্তের ভবিষ্যৎ' বিষয়ে বক্তৃতা দিয়েছেন। দুটি সভাতেই যথেষ্ট শ্রোতৃ-সমাগম হয়েছিল। সভার শেষে সকলকে বসিয়ে প্রসাদ দেওয়া হয়। এই উপলক্ষে বস্টন কেন্দ্র থেকে একটি স্মারক পুস্তিকা প্রকাশিত হয়েছে। উক্ত পুস্তিকা এবং স্বামীজীর 'শিকাগো বক্তৃতা' বইখানি সমবেত সকলকে বিনামূল্যে বিতরণ করা হয়। শ্রীমৎ স্বামী গহনানন্দজী মহারাজ এখানে থাকাকালীন বিভিন্ন দিনে সোসাইটির দুই কেন্দ্রেই 'শ্রীরামকৃষ্ণের বাণী' বিষয়ে এবং স্বামী প্রবুদ্ধানন্দ প্রভিডেন্সে 'শ্রীশ্রীমায়ের বাণী' বিষয়ে বক্তৃতা দিয়েছেন।

**বেদান্ত সোসাইটি অব স্যাক্রামেন্টো:** গত ২১ অক্টোবর পূজা, ভক্তিগীতি, স্তোত্রপাঠ, প্রসাদ-বিতরণ প্রভৃতির মাধ্যমে শ্রীশ্রীদুর্গাপূজা অনুষ্ঠিত হয়েছে। বিজয়ার দিন ধ্যান, ভক্তিগীতি, পাঠ ও শান্তিজল প্রদান করা হয়েছে। তাছাড়া সাপ্তাহিক আলোচনাদি যথারীতি হয়েছে।

**বেদান্ত সোসাইটি অব নিউ ইয়র্ক:** গত ৩ অক্টোবর 'স্বামীজীর পাশ্চাত্যে আগমন' বিষয়ে বিশেষ ভাষণ দিয়েছেন শ্রীমৎ স্বামী গহনানন্দজী মহারাজ। তাছাড়া শ্রীশ্রীদুর্গাপূজা, সাপ্তাহিক ধর্ম-প্রসঙ্গ ও সমবেত ভক্তিগীতি এবং ১৫ অক্টোবর গীটার ও তবলাবাদন অনুষ্ঠিত হয়েছে।

**বেদান্ত সোসাইটি অব সেন্ট লুইস:** গত ২৪ অক্টোবর পূজা, ধ্যান, সঙ্গীত প্রভৃতির মাধ্যমে শ্রীশ্রীদুর্গাপূজা অনুষ্ঠিত হয়েছে। ১৭ অক্টোবর স্বামী বিবেকানন্দের শিকাগো-বক্তৃতার শতবর্ষ পালন এবং ৩১ অক্টোবর "শ্রীশ্রীদুর্গাপূজার তাৎপর্য" বিষয়ে আলোচনা হয়েছে।

## শ্রীশ্রীমায়ের বাড়ীর সংবাদ

**শ্রীশ্রীশ্যামাপূজা:** গত ২৭ কার্তিক ১৪০০ (১৩ নভেম্বর '৯৩) ভাবগম্ভীর পরিবেশে শ্রীশ্রীশ্যামা-পূজা অনুষ্ঠিত হয়। পরের দিন সকালে হাতে হাতে খিচুড়ি প্রসাদ দেওয়া হয়।

## দেহত্যাগ

**স্বামী সৌখ্যানন্দ (মুরারী)** গত ২ অক্টোবর রামকৃষ্ণ মিশন সেবাপ্রতিষ্ঠানে দুপুর ১২.৪৫মিনিটে ৭৬ বছর বয়সে দেহত্যাগ করেন। তিনি কয়েক মাস ধরে বহুমূত্র ও হৃদ্‌রোগে ভুগছিলেন।

স্বামী সৌখ্যানন্দ ছিলেন শ্রীমৎ স্বামী বিরজানন্দজী মহারাজের মন্ত্রশিষ্য। ১৯৪১ খ্রীস্টাব্দে তিনি ঢাকা (বাংলাদেশ) কেন্দ্রে যোগদান করেছিলেন। ১৯৫৩ খ্রীস্টাব্দে শ্রীমৎ স্বামী শংকরানন্দজী মহারাজের নিকট সন্ন্যাসলাভ করেন। যোগদান-কেন্দ্র ছাড়াও তিনি এলাহাবাদ, কনখল, বৃন্দাবন এবং বারাণসী অদ্বৈতাশ্রমের কর্মী ছিলেন। বিহারের ত্রাণকার্যেও তিনি অংশগ্রহণ করেছিলেন। ১৯৯১ খ্রীস্টাব্দ থেকে তিনি বেলুড় মঠে অবসর জীবনযাপন করছিলেন। তাঁর জীবন ছিল সহজ ও অনাড়ম্বর।

**স্বামী সম্ময়ানন্দ (অচিন্ত্য)** গত ১৭ অক্টোবর রামকৃষ্ণ মিশন সেবাপ্রতিষ্ঠানে বিকাল ৫.২৫ মিনিটে ৮১ বছর বয়সে দেহত্যাগ করেন। তিনি ব্রঙ্কো-নিমোনিয়া ও পার্কিনসন রোগে ভুগছিলেন।

শ্রীমৎ স্বামী অখণ্ডানন্দজী মহারাজের মন্ত্রশিষ্য স্বামী সম্ময়ানন্দ ১৯৩৮ খ্রীস্টাব্দে দিনাজপুর (বাংলাদেশ) কেন্দ্রে যোগদান করেন এবং ১৯৪৭ খ্রীস্টাব্দে শ্রীমৎ স্বামী বিরজানন্দজী মহারাজের নিকট সন্ন্যাসলাভ করেন। যোগদান-কেন্দ্র ছাড়াও তিনি সারগাছি, ভুবনেশ্বর, কলকাতার গদাধর আশ্রম, তমলুক, বাঁকুড়া, রামহরিপুর এবং নরেন্দ্র-পুরের কর্মী ছিলেন। ১৯৮৪ খ্রীস্টাব্দ থেকে তিনি বেলুড় মঠে অবসর জীবনযাপন করছিলেন। দয়ালু ও মধুর স্বভাব ছিল তাঁর বৈশিষ্ট্য।

**আবির্ভাব-তিথি পালন:** গত ২৫ নভেম্বর শ্রীমৎ স্বামী সুবোধানন্দজী মহারাজের জন্মতিথি এবং ২৮ নভেম্বর শ্রীমৎ স্বামী বিজ্ঞানানন্দজী মহারাজের জন্মতিথি উপলক্ষে সন্ধ্যারতির পর তাঁদের জীবনী আলোচনা করেন যথাক্রমে স্বামী দিব্যাশ্রয়ানন্দ এবং স্বামী কমলেশানন্দ।

**সাপ্তাহিক ধর্মালোচনা:** প্রতি শুক্রবার, রবিবার ও বৃহস্পতিবার সন্ধ্যারতির পর যথারীতি চলছে। □

## বিবিধ সংবাদ

### উৎসব-অনুষ্ঠান

**রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ সেবাশ্রম, রানিয়া কুলটুকারী (দক্ষিণ ২৪ পরগনা)** গত ৩ ও ৪ এপ্রিল স্বামী বিবেকানন্দের ভারত-পরিক্রমা ও শিকাগো-বক্তৃতার শতবর্ষ এবং শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ১৫৮তম জন্মোৎসব নানা অনুষ্ঠানের মাধ্যমে উদ্‌যাপন করেছে। প্রথম দিন স্বামীজী সম্পর্কে আলোচনা করেন স্বামী অকল্মষানন্দ। দ্বিতীয় দিন 'কথামৃত' পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন স্বামী শিবনাথানন্দ এবং ধর্মসভায় বক্তব্য রাখেন স্বামী ভৈরবানন্দ ও মনোরঞ্জন রায়। সন্ধ্যায় সরিষা রামকৃষ্ণ মিশনের ভক্তবৃন্দ 'শ্রীশ্রীমা সারদা' গীতি-আলেখ্য পরিবেশন করেন। ঐদিন প্রায় একহাজার ভক্তকে খিচুড়ি প্রসাদ দেওয়া হয়।

**স্বামী বিবেকানন্দের ভারত-পরিক্রমা এবং শিকাগো ধর্মমহাসভায় অংশগ্রহণের শতবর্ষ উদ্‌যাপন কমিটি (বহরমপুর)** গত ৮-১০ মে স্থানীয় 'গ্র্যান্ট হল'-এ তাদের শেষ পর্যায়ের উৎসব উদ্‌যাপন করেছে। আলোচনাসভায় হিন্দু, শিখ, খ্রীস্টান ও ইসলাম ধর্ম সম্পর্কে বক্তব্য রাখেন যথাক্রমে ডাঃ পি. আর. মুখার্জী, সন্তোষ সিং চাওলা, শান্তনু গোস্বামী ও অধ্যাপক আবদুল হাসান। সভাপতিত্ব করেন স্বামী দেবরাজানন্দ। ৯ ও ১০ মে সন্ধ্যায় বিভিন্ন সংস্থার শিল্পিবৃন্দ কর্তৃক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। প্রদর্শনীতে স্থানীয় শিল্পীদের আঁকা ও মাটি দিয়ে তৈরি স্বামীজীর নানা ছবি ও মূর্তি প্রদর্শিত হয়। প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেন স্বামী অনাময়ানন্দ।

**শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-সারদা পাঠচক্র (উত্তর বাকসাড়া, হাওড়া)** গত ৮ মে তৃতীয় বার্ষিক উৎসব এবং স্বামী বিবেকানন্দের ভারত-পরিক্রমা ও শিকাগো-বক্তৃতার শতবর্ষ উদ্‌যাপন করে। এই উপলক্ষে অনুষ্ঠিত ধর্মসভায় সভাপতিত্ব করেন স্বামী মুক্তসঙ্গানন্দ, বক্তব্য রাখেন বরুণকুমার ভট্টাচার্য ও সত্যরঞ্জন চক্রবর্তী। বার্ষিক বিবরণী পাঠ করেন পাঠচক্রের সম্পাদক প্রফুল্লচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়। সঙ্গীত পরিবেশন করেন অঞ্জলি চক্রবর্তী।

**চেতলা শ্রীরামকৃষ্ণ মণ্ডপে (কলকাতা-২৭)** গত ৯-১২ এপ্রিল শ্রীরামকৃষ্ণের ১৫৮তম জন্মোৎসব ও আশ্রমের ৭১তম বার্ষিক উৎসবের উদ্বোধন করেন স্বামী শ্রদ্ধানন্দ। বিভিন্ন দিনের ধর্মসভায় বক্তব্য রাখেন স্বামী নিবৃত্তানন্দ, স্বামী পূর্ণানন্দ, স্বামী অজরানন্দ, শিবশঙ্কর চক্রবর্তী, দীপক গুপ্ত, ডাঃ শ্যামল সেন প্রমুখ। এছাড়া উল্লেখযোগ্য অনুষ্ঠান ছিল নবব্রত ব্রহ্মচারীর ভাগবত-সঙ্গীত, রজত গঙ্গোপাধ্যায় পরিচালিত গীতিনাট্য 'নটী বিনোদিনী', সুরপীঠ গোষ্ঠীর অরুণকৃষ্ণ ঘোষ ও সহশিল্পিবৃন্দ কর্তৃক পরিবেশিত গীতি-আলেখ্য 'শ্রীমা সারদাদেবী' প্রভৃতি। উৎসবের দ্বিতীয় দিন পাঁচশতাধিক ভক্তকে হাতে হাতে প্রসাদ দেওয়া হয়। উৎসব উপলক্ষে একটি স্মরণিকাও প্রকাশিত হয়।

**রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ পাঠচক্র, আদ্রা (পুরুলিয়া)** গত ৮-১০ মে শ্রীরামকৃষ্ণের বার্ষিক জন্মোৎসব এবং স্বামীজীর ভারত-পরিক্রমা ও শিকাগো ধর্মমহাসভায় যোগদানের শতবর্ষপূর্তি-উৎসব উদ্‌যাপন করে। শোভাযাত্রা, বিশেষ পূজা, হোম, প্রসাদ-বিতরণ, যুবসম্মেলন, ধর্মসভা প্রভৃতি ছিল উৎসবের প্রধান অঙ্গ। বিভিন্ন সভায় বক্তব্য রাখেন স্বামী উমানন্দ, প্রণবেশ চক্রবর্তী, ডি. কে. মল্লিক, আবদুস সামাদ, ব্রঃ প্রত্যকচৈতন্য প্রমুখ। যুবসম্মেলনে প্রায় ২০০ যুবপ্রতিনিধি যোগদান করেছিল।

**শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম, রাখালচণ্ডী (উত্তর ২৪ পরগনা)** গত ২৩ মে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জন্মোৎসব উদ্‌যাপন করে। দুপুরে প্রায় সহস্রাধিক ভক্তকে বসিয়ে প্রসাদ দেওয়া হয়। বিকালে ধর্মসভায় আলোচনা করেন স্বামী নিবৃত্তানন্দ, স্বামী মুক্তসঙ্গানন্দ এবং স্বামী দিব্যাশ্রয়ানন্দ।

**হাওড়া রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ আশ্রমে** গত ১৫ ও ১৬ মে দুদিন ধরে শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ জন্মোৎসব পালিত হয়। প্রথম দিনের অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন স্বামী স্বতন্ত্রানন্দ। বক্তব্য রাখেন স্বামী পুরাণানন্দ ও স্বামী আত্মপ্রিয়ানন্দ।

দ্বিতীয় দিনের অনুষ্ঠানে সভানেত্রী ছিলেন প্রব্রাজিকা বিশুদ্ধপ্রাণা। বক্তা ছিলেন প্রব্রাজিকা ভাস্বরপ্রাণা ও প্রব্রাজিকা ধৃতিপ্রাণা। সভায় সঙ্গীত পরিবেশন করেন প্রব্রাজিকা বেদান্তপ্রাণা। উভয় দিনই সভার শুরুতে বক্তাগণের পরিচয় প্রদান করেন অধ্যাপক শঙ্করীপ্রসাদ বসু। ধন্যবাদ জানান যথাক্রমে রবীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং আশ্রম-সম্পাদক বিমলকুমার ঘোষ। প্রথম দিন সঙ্গীত পরিবেশন করেন তরুণকুমার সরকার, অসীম দত্ত ও অমিত ঘোষ।

**রামকৃষ্ণ কুটীর, নবাদর্শ (বিরাটি, কলকাতা-৫৮)** গত ১৬ মে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ১৫৮তম জন্মোৎসব উপলক্ষে বিশেষ পূজা, হোম, ভক্তিগীতি, প্রসাদ-বিতরণ, ছাত্রছাত্রীদের প্রতিযোগিতামূলক অনুষ্ঠান প্রভৃতির আয়োজন করে। বিকালে স্বামী ভবেশ্বরানন্দের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত ধর্মসভায় বক্তব্য রাখেন স্বামী ব্রজেশানন্দ ও স্বামী দিব্যাশ্রয়ানন্দ। সভান্তে প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণকারীদের ঠাকুর, মা ও স্বামীজী-বিষয়ক পুস্তক দেওয়া হয়।

## বাহভারত

### আমেরিকার নিউ জার্সিতে স্বামী বিবেকানন্দের শিকাগো-বক্তৃতার শতবর্ষ উদ্‌যাপন

**বিশেষ সংবাদদাতা :** গত ১১ সেপ্টেম্বর '৯৩ স্বামী বিবেকানন্দের শিকাগো-বক্তৃতার শতবর্ষ উপলক্ষে আমেরিকার নিউ জার্সি স্টেটের রাটগার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভার যুগ্ম উদ্যোক্তা ছিল **নিউ জার্সি পূজা অ্যাসোসিয়েশন ও স্থানীয় রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ বেদান্ত সোসাইটি**। নিউ ইয়র্ক বেদান্ত সোসাইটির অধ্যক্ষ স্বামী তথাগতানন্দের সভাপতিত্বে সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভার প্রারম্ভে নিউ জার্সি পূজা অ্যাসোসিয়েশনের ট্রাস্টের সভাপতি বৈজ্ঞানিক ডঃ ব্রজদুলাল মুখোপাধ্যায় সকলকে স্বাগত জানান। কৃষ্ণা ভট্টাচার্য সমিতির কর্মধারায় শ্রীরামকৃষ্ণ ও স্বামী বিবেকানন্দের মানবসেবার আদর্শকে মূর্ত করে তোলার আহ্বান জানান। উদ্বোধনী ভাষণে স্বামী তথাগতানন্দ পাশ্চাত্য-দেশের জীবনযাত্রার উদাহরণ দিয়ে বলেন যে, স্বামীজীর 'ব্যবহারিক বেদান্ত'ই বস্তুসর্বস্ব পাশ্চাত্যের মানুষকে সঠিক পথের সন্ধান দিতে পারে। সভায় বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন ডঃ চন্দন রায়চৌধুরী ও ডঃ সুভাষচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। ডঃ রায়চৌধুরী তাঁর ভাষণে বলেন যে, স্বামীজীর মধ্য দিয়ে একদিন যে ভারতবর্ষ জীবন্ত হয়ে উঠেছিল আজকে সেই স্বামীজী বিশ্বজয়ী বীররূপে চিহ্নিত হয়ে গেছেন। ডঃ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর ভাষণে বলেন, একশো বছর আগে ১১ সেপ্টেম্বর স্বামীজী বিশ্বমানবের সামনে যে-ভাষণ দিয়েছিলেন তা ছিল দূষণমুক্ত মানবসমাজ সৃষ্টির প্রথম আহ্বান।

সভায় আলোলিকা মুখোপাধ্যায় ও ভবানী মুখোপাধ্যায় ভক্তিগীতি পরিবেশন করেন। নিউ জার্সি ও নিউ ইয়র্ক স্টেটের সন্নিহিত অঞ্চলের বহু গুণী ব্যক্তি এই সভায় উপস্থিত ছিলেন। সমাপ্তি ভাষণ দেন নিউ ইয়র্ক বেদান্ত সোসাইটির সচিব মিস জেন। প্রসাদ-বিতরণের পর সভার কাজ শেষ হয়।

## পরলোকে

শ্রীমৎ স্বামী বিরজানন্দজী মহারাজের মন্ত্রশিষ্যা, শ্রীরামকৃষ্ণ আনন্দ আশ্রমের বনহুগলী শাখার স্থায়ী সদস্যা **অমিয়া সেনগুপ্ত** গত ২৭ মার্চ প্রায় ৭৯ বছর বয়সে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। অমিয়া দেবী ১৯৩৭ খ্রীস্টাব্দে আশ্রমের মূলকেন্দ্র ঢাকায় আশ্রম-বিদ্যালয়ের প্রাথমিক বিভাগে শিক্ষিকার কাজে যোগ দেন। ১৯৫০ খ্রীস্টাব্দে তিনি কলকাতায় আসেন ও বনহুগলী আশ্রম পরিচালিত প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও সারদা শিল্পপীঠ—এই তিনটি শিক্ষায়তনেই শিক্ষিকা হিসাবে কাজ করেন। তিনি চিত্রাঙ্কণেও পারদর্শিনী ছিলেন। নিষ্ঠা ও অতিশয় মধুর স্বভাবের জন্য তিনি তাঁর বন্ধু, সহকর্মী ও ছাত্রীদের কাছে খুব প্রিয় ছিলেন। ❑

স্বামী বিবেকানন্দ প্রবর্তিত, রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের একমাত্র বাংলা মুখপত্র,
পঁচানব্বই বছর ধরে নিরবচ্ছিন্নভাবে প্রকাশিত দেশীয় ভাষায় ভারতের প্রাচীনতম সাময়িক পত্র।

"উত্তিষ্ঠত জাগ্রত
প্রাপ্য বরান্ নিবোধত"

## ৯৫তম বর্ষ

মাঘ ১৩৯৯ থেকে পৌষ ১৪০০
জানুয়ারি থেকে ডিসেম্বর ১৯৯৩

যুগ্ম সম্পাদক

স্বামী পূর্ণাত্মানন্দ

( চৈত্র ১৩৯৯ / মার্চ ১৯৯৩ পর্যন্ত )

সম্পাদক

স্বামী সত্যব্রতানন্দ

( চৈত্র ১৩৯৯ / মার্চ ১৯৯৩ পর্যন্ত )

স্বামী পূর্ণাত্মানন্দ

( বৈশাখ ১৪০০ / এপ্রিল ১৯৯৩ থেকে )

উদ্বোধন কার্যালয়

১, উদ্বোধন লেন, বাগবাজার, কলকাতা-৭০০ ০০৩

বার্ষিক গ্রাহকমূল্য ঃ ছেচল্লিশ টাকা ☐ সডাক ঃ চুয়ান্ন টাকা ☐ প্রতি সংখ্যা ঃ ছয় টাকা

# উদ্বোধন

## ৯৫তম বর্ষ

**মাঘ ১৩৯৯ থেকে পৌষ ১৪০০ / জানুয়ারি থেকে ডিসেম্বর ১৯৯৩**

---

৮০/৬, গ্রে স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০ ০০৬ স্থিত বসুশ্রী প্রেস থেকে বেলুড় রামকৃষ্ণ মঠের ট্রাস্টীগণের পক্ষে স্বামী সত্যব্রতানন্দ কর্তৃক মুদ্রিত ও ১ উদ্বোধন লেন, কলকাতা-৭০০ ০০৩ থেকে প্রকাশিত।

বিশ্বব্যাপী চৈতন্যই ঈশ্বর। সেই বিশ্বব্যাপী চৈতন্যকেই লোকে প্রভু, ভগবান, খ্রীষ্ট, বুদ্ধ বা ব্রহ্ম বলিয়া থাকে—জড়বাদীরা উঁহাকে শক্তিরূপে উপলব্ধি করে এবং অজ্ঞেয়বাদীরা ইহাকেই সেই অনন্ত অনির্বচনীয় সর্বাতীত বস্তু বলিয়া ধারণা করে। উহাই সেই বিশ্বব্যাপী প্রাণ, উহাই বিশ্বব্যাপী চৈতন্য, উহাই বিশ্বব্যাপিনী শক্তি এবং আমরা সকলেই উহার অংশস্বরূপ।

স্বামী বিবেকানন্দ

উদ্বোধনের মাধ্যমে প্রচার হোক
এই বাণী।

শ্রীসুশোভন চট্টোপাধ্যায়

UDBODHAN DECEMBER 1993 Licence No. WB/NC/CL-3 R.N. 8793/57
Phone : 54-2248 Postal Reg. No. WB/NC-1?
54-2403

স্বামী বিবেকানন্দ প্রবর্তিত রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের একমাত্র বাঙলা মুখপত্র,
পঁচানব্বই বছর ধরে নিরবচ্ছিন্নভাবে প্রকাশিত দেশীয় ভাষায় ভারতের প্রাচীনতম সাময়িকপত্র।

# উদ্বোধন

১ মাঘ ১৪০০ (১৫ জানুয়ারি, ১৯৯৪) ৯৬তম বর্ষে পদার্পণ করছে।

## অনুগ্রহ করে স্মরণ রাখবেন

- রামকৃষ্ণ-ভাবান্দোলন ও রামকৃষ্ণ-ভাবাদর্শের সঙ্গে সংযুক্ত ও পরিচিত হতে হলে স্বামী বিবেকানন্দ প্রবর্তিত রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের একমাত্র বাঙলা মুখপত্র **উদ্বোধন** আপনাকে পড়তে হবে।
- স্বামী বিবেকানন্দের ইচ্ছা ও নির্দেশ অনুসারে **উদ্বোধন** নিছক একটি ধর্মীয় পত্রিকা নয়। ধর্ম, দর্শন, সাহিত্য, ইতিহাস, সমাজতত্ত্ব, বিজ্ঞান, শিল্প সহ জ্ঞান ও কৃষ্টির নানা বিষয়ে গবেষণামূলক ও ইতিবাচক আলোচনা **উদ্বোধন**-এ প্রকাশিত হয়।
- **উদ্বোধন**-এর গ্রাহক হওয়ার অর্থ একটি পত্রিকার গ্রাহক হওয়া নয়, একটি মহান ভাবাদর্শ ও ভাবান্দোলনের সঙ্গে যুক্ত হওয়া।
- স্বামী বিবেকানন্দের আকাঙ্ক্ষা ছিল প্রত্যেক বাঙালীর ঘরে **উদ্বোধন** যেন থাকে। সুতরাং আপনার নিজের গ্রাহক হওয়াই যথেষ্ট নয়, অন্যদের গ্রাহক করাও আপনার কাছে স্বামীজীর প্রত্যাশা।
- **উদ্বোধন**-এর বার্ষিক গ্রাহকমূল্য যা ধার্য করা হয় তা **উদ্বোধন**-এর জন্য আমাদের যে বার্ষিক খরচ হয় তার অর্ধাংশ মাত্র। বাকি অর্ধাংশের জন্য আমরা নির্ভর করি সহৃদয় বিজ্ঞাপনদাতাগণের পৃষ্ঠপোষকতা এবং ভক্ত ও শুভানুধ্যায়ীদের আর্থিক দানের ওপর।
- বর্তমানে কাগজের দাম, বাঁধানো এবং মুদ্রণের ব্যয় এবং অন্যান্য আনুষঙ্গিক খরচ (ডাকমাশুল সহ) যেভাবে বেড়ে চলছে বা বাড়ার প্রবণতা দেখা যাচ্ছে তা আমাদের পক্ষে খুবই উদ্বেগের বিষয় হয়ে দাঁড়াচ্ছে। অথচ আমরা যথাসাধ্য চেষ্টা করি যাতে আমাদের সহৃদয় গ্রাহকবর্গের (যাঁদের অনেকেই সাধারণ মধ্যবিত্ত) ওপর বেশি চাপ না পড়ে। **উদ্বোধন**-এর **শারদীয়া সংখ্যাটি** সাধারণ সংখ্যার দ্বিগুণ এবং এই সংখ্যাটি **বিশেষ সংখ্যা** হওয়ার জন্য অলঙ্করণের জন্য খরচও হয় যথেষ্ট। কিন্তু আমরা এই বিশেষ সংখ্যাটির জন্য গ্রাহকদের কাছে আলাদা মূল্য নিই না। বর্তমান দুর্মূল্যের বাজারেও আমরা এবছর বার্ষিক গ্রাহকমূল্য মাত্র দুই টাকা বাড়িয়েছি।
- **স্বামীজী বলেছেন, উদ্বোধন-এর সেবা ঠাকুরেরই সেবা।** সেকথা স্মরণ করে রামকৃষ্ণ-ভাবাদর্শে অনুরাগী ও ভক্তগণ **'উদ্বোধন'**-এর প্রতি তাঁদের সহায়তার হাত বাড়িয়ে দেবেন, এই আশা রাখি।
- **'উদ্বোধন'-এর জন্য সকল আর্থিক দান আয়কর আইনের ৮০ জি ধারা অনুসারে আয়কর-মুক্ত। আর্থিক দান চেক বা ব্যাঙ্ক ড্রাফটে পাঠালে অনুগ্রহ করে 'Ramakrishna Math, Baghbazar'-এই নামে পাঠাবেন।** ঠিকানা: ১ উদ্বোধন লেন, বাগবাজার, কলিকাতা-৭০০ ০০৩ ("উদ্বোধন পত্রিকার সেবায়" যেন চিঠিতে বা M.O. কুপনে লেখা থাকে।)

স্বামী পূর্ণাত্মানন্দ
*সম্পাদক*

---



আগামী বর্ষের (মাঘ-পৌষ) গ্রাহক মূল্য ☐ আটচল্লিশ টাকা ☐ সডাক ছাপান্ন টাকা ☐ প্রতি সংখ্যা ☐ ছয় টাকা

ব্যবস্থাপক সম্পাদক: স্বামী সত্যব্রতানন্দ সম্পাদক: স্বামী পূর্ণাত্মানন্দ